প্রাচ্যবাণী-গবেষণা-গ্রন্থমালা
একাদশ পুষ্প

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ

তৃতীয় খণ্ড

শ্রীশ্রীরাধাগিরিধারিপ্রীতয়ে

শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যার্পণমস্তু

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

তৃতীয় পর্ব—সৃষ্টিতত্ত্ব

চতুর্থ পর্ব—ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ-অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব

পঞ্চম পর্ব—সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় স্ফুরিত

এবং

কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের, পরে (নোয়াখালী) চৌমুহনী কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যক্ষ

শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

এম্-এ., ডি-লিট্-পরবিদ্যাচার্য্য, বিদ্যাবাচস্পতি, ভাগবতভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্তরত্ন, ভক্তিভূষণ, ভক্তিসিদ্ধান্ত-ভাস্কর

কর্ত্তৃক লিখিত

প্রাচ্যবাণী মন্দির

কলিকাতা

প্রকাশক :

প্রাচ্যবাণী-মন্দির পক্ষে

যুগ্মসম্পাদক

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী এম. এ., পি. এইচ. ডি.

৩, ফেডারেশন ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৯

Bound by—Orient Binding Works

(Winners of State award for excellence in book-binding)

100, Baitakkhana Road, Cal—9

প্রাপ্তিস্থান :

১। মহেশ লাইব্রেরী

২।১, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট্, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা—১২

২। শ্রীগুরু লাইব্রেরী

২০৪, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

৩। দাসগুপ্ত এণ্ড কোং

৫৪।৩, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২

৪। সংস্কৃত পুস্তক ভাণ্ডার

৩৮, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—৬

৫। চক্রবর্ত্তী-চাটার্জি এণ্ড কোং

১৫, কলেজ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা—১২

৬। কার্ত্তিক লাইব্রেরী

গান্ধী কলোনী, কলিকাতা—৪০

দ্রষ্টব্য। পুস্তক বিক্রেতারা অনুগ্রহপূর্ব্বক নিম্ন ঠিকানা হইতে গ্রন্থ নিবেন :—

৪৬, রসারোড্ ইষ্ট্ ফার্ষ্ট লেন, টালিগঞ্জ,

কলিকাতা—৩৩

তৃতীয় খণ্ডের মূল্য—২০৲ কুড়ি টাকা

শ্রীপ্রিণ্টিং ওয়ার্কস্, ৬৭, বদ্রীদাস টেম্পল ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৪

হইতে শ্রীঅরবিন্দ সরদার কর্তৃক মুদ্রিত।

নিবেদন

শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনের তৃতীয় খণ্ড প্রকাশিত হইল। এই খণ্ডে আছে তৃতীয় পর্ব্ব (সৃষ্টিতত্ত্ব), চতুর্থ পর্ব্ব (ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ---অচিন্ত্যভেদাভেদ-তত্ত্ব) এবং পঞ্চম পর্ব্ব (সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব)। এই খণ্ড অত্যন্ত বড় হইয়াছে ; ইহাকে দুই খণ্ডে বাঁধাইলে পঠন-পাঠনের কিছু সুবিধা হইত বটে ; কিন্তু তাহাতে খরচও কিছু বাড়িয়া যাইত ; এজন্য এক খণ্ডই করা হইল।

চতুর্থ বা সর্ব্বশেষ খণ্ডে থাকিবে ষষ্ঠ পর্ব্ব (প্রেমতত্ত্ব) এবং সপ্তম পর্ব্ব (রসতত্ত্ব)। কাগজের যোগাড় হইলেই চতুর্থ খণ্ড যন্ত্রস্থ হইবে।

উত্তর প্রদেশ হইতে যে মহানুভব ভক্ত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন প্রকাশের জন্য অনুগ্রহপূর্ব্বক দশ হাজার টাকা দান করিয়াছিলেন বলিয়া দ্বিতীয় খণ্ডের নিবেদনে জানান হইয়াছিল, তিনি সেই উদ্দেশ্যে আরও ছয় হাজার টাকা পাঠাইয়াছেন। তাঁহার চরণে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণিপাত এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের জন্য উল্লিখিত দানের টাকা হইতে তিন হাজার টাকা কলিকাতাস্থিত প্রাচ্যবাণীমন্দিরে দেওয়া হইয়াছে। প্রাচ্যবাণীমন্দির হইতে শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের ভূমিকা, চতুর্থ সংস্করণ, প্রকাশিত হইয়াছে; আদিলীলার পুনর্মুদ্রণেরও আয়োজন হইতেছে। সমগ্র গ্রন্থের চতুর্থ সংস্করণ প্রকাশের দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া প্রাচ্যবাণীমন্দির আমাদিগকে বিশেষরূপে অনুগৃহীত করিয়াছেন। তজ্জন্য প্রাচ্যবাণীমন্দিরের কর্তৃপক্ষকে বিশেষতঃ প্রাচ্যবাণীর যুগ্মসম্পাদক ডক্টর শ্রীল যতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, এম. এ, পি. এইচ ডি. মহোদয়কে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণিপাত এবং কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেছি।

গ্রাহক, অনুগ্রাহক এবং পৃষ্ঠপোষক সুধীবৃন্দের চরণে আমরা আমাদের সশ্রদ্ধ প্রণিপাত জ্ঞাপন করিতেছি এবং আমাদের ত্রুটিবিচ্যুতির জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করিতেছি।

শ্রীশ্রীহরিবাসর
২৩শে আশ্বিন, ১৩৬৫ বঙ্গাব্দ,
৯ই অক্টোবর, ১৯৫৮ খৃষ্টাব্দ।
৪৬, রসারোড্ ইষ্ট ফার্ষ্ট লেন,
কলিকাতা-৩৩

কৃপাপ্রার্থী
শ্রীরাধাগোবিন্দ নাথ

সূচীপত্র

(অনুচ্ছেদ। বিষয়। পত্রাঙ্ক)

তৃতীয়পর্ব—সৃষ্টিতত্ত্ব

প্রথমাংশ

প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে সৃষ্টিতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়। পরিদৃশ্যমান জগৎসম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

দ্বিতীয় অধ্যায়। জগৎ-কারণসম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ

তৃতীয় অধ্যায়। জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান কারণ

চতুর্থ অধ্যায়। বৈদিকী মায়া ও সৃষ্টি

পঞ্চম অধ্যায়। সৃষ্টি

ষষ্ঠ অধ্যায়। পরিণাম-বাদ

সপ্তম অধ্যায়। প্রলয়

তৃতীয় পর্ব—দ্বিতীয়াংশ

সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ

প্রথম অধ্যায়। পরিণামবাদ ও অন্য আচার্য্যগণ

দ্বিতীয় অধ্যায়। বিবর্ত্তবাদ

তৃতীয় অধ্যায়। জগতের মিথ্যাত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

চতুর্থ অধ্যায়। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত

চতুর্থ পর্ব

ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব

তৃতীয় অধ্যায়। অন্যমত সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীব-গোস্বামীর আলোচনা

চতুর্থ অধ্যায়। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ

সূচীপত্র

পঞ্চম পর্ব। সাধ্য-সাধনতত্ত্ব

প্রথমাংশ—সাধ্যতত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়। পুরুষার্থ

দ্বিতীয় অধ্যায়। চতুর্বর্গ

তৃতীয় অধ্যায়। পঞ্চবিধা মুক্তি

চতুর্থ অধ্যায়। পঞ্চম বা পরমপুরুষার্থ

পঞ্চমপর্ব—দ্বিতীয়াংশ

সাধনতত্ত্ব বা অভিধেয়তত্ত্ব

প্রথম অধ্যায়। সাধনের আলম্বন

ষষ্ঠ অধ্যায়। বিভিন্ন সাধন-পন্থা

সূচিপত্র

সপ্তম অধ্যায়। গুরুতত্ত্ব

অষ্টম অধ্যায়। চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা

সূচীপত্র

সূচীপত্র

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

তৃতীয় পর্ব্ব

সৃষ্টিতত্ত্ব

প্রথমাংশ

প্রস্থানত্রয়ে ও গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে সৃষ্টিতত্ত্ব

বন্দনা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমো নমঃ ॥

জয় গৌর নিত্যানন্দ জয়াদ্বৈতচন্দ্র ।
গদাধর শ্রীবাসাদি গৌরভক্তবৃন্দ ॥
জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরশ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥
—শ্রীমদ্ভাগবত ॥১।১।১ ॥

বিশ্ব-সর্গ-বিসর্গাদি-নবলক্ষণলক্ষিতম্ ।
শ্রীকৃষ্ণাখ্যং পরং ধাম জগদ্ধাম নমামি তৎ ॥
—শ্রীধরস্বামিচরণ

পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে শৈলং মূকমাবর্ত্তয়েৎ শ্রুতিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে কৃষ্ণচৈতন্যমীশ্বরম্ ॥

সূত্র

ব্রহ্ম হৈতে জন্মে বিশ্ব ব্রহ্মেতে জীবয়।
সেই ব্রহ্মে পুনরপি হয়ে যায় লয়॥

—শ্রীচৈঃ চঃ॥ ২।৬।১৩৪ ॥

অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাতে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥

—শ্রীচৈঃ, চঃ, ॥১।৭।১১৭-১৮ ॥

জগত-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা॥
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥
কৃষ্ণ-শক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ॥
অগ্নি-শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগত-কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজা-গলস্তন॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহো নহে, যাতে কর্ত্তা হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায়॥

—শ্রীচৈঃ, চঃ, ১।৫।৫১-৫৬ ॥

প্রথম অধ্যায়

পরিদৃশ্যমান জগৎসম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

১। পরিদৃশ্যমান জগৎ ও তাহার সৃষ্টিকর্ত্তা

আমরা এই যে পৃথিবীতে বাস করিতেছি, তাহাতে, আমরা অনেক জিনিস দেখিতে পাই—মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম, নদ, নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, সমুদ্র, জল, বায়ু ইত্যাদি কত কিছু।

আবার, এই পৃথিবীর বাহিরেও দেখিতে পাই—অনন্ত আকাশ, আকাশে চন্দ্র, সূর্য্য, গ্রহ, নক্ষত্র, নীহারিকা ইত্যাদি। হয়তো আরও কত কিছু আছে—আমাদের ক্ষীণ দৃষ্টি যাহাদের নিকটে পৌঁছায় না।

কিন্তু এ-সমস্ত কোথা হইতে কি ভাবে আসিল ? এই সমস্তের কি কেহ সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন ? থাকিলে কে তিনি ?

লৌকিক জগতে আমরা দেখি—আমাদের বস্ত্রালঙ্কারাদি নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তুর মধ্যে প্রত্যেকটীরই একজন নির্ম্মাতা বা সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন। তাহা হইতে অনুমান করা যায় যে, এই জগতেরও একজন সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন।

কিন্তু সেই সৃষ্টিকর্ত্তা কে, অনুমানের দ্বারা তাহা স্থির করা যায় না। কেননা, জ্ঞাতবস্তু সম্বন্ধেই অনুমান সম্ভব, অজ্ঞাত বস্তু অনুমানের বিষয় হইতে পারে না। অগ্নিকে আমরা জানি, আর্দ্র কাষ্ঠকে জানি, অগ্নি-সংযোগে আর্দ্র কাষ্ঠ হইতে ধূমের উৎপত্তি হয়,— ইহাও আমরা জানি। সেজন্য কোনও স্থানে ধূম দেখিলে অনুমান করা হয় সে স্থানে অগ্নি আছে ; কেননা, ধূমের উৎপত্তির হেতু আমাদের জানা আছে। তদ্রূপ জগতের কোনও অংশের উৎপত্তির হেতু যদি আমাদের জানা থাকিত, তাহা হইলেই অনুমান করা যাইত যে, ঐ অংশের উৎপত্তির যাহা হেতু, সমগ্র জগতের উৎপত্তিরও তাহাই হেতু হইতে পারে। কিন্তু তাহা আমাদের জানা নাই ; তাই অনুমানের দ্বারা জগতের কারণ কি, বা জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে, তাহা নির্ণয় করা যায় না।

অথচ, জগতের কোনও সৃষ্টিকর্ত্তা আছেন কিনা, থাকিলে তিনি কে, তাহা জানিবার জন্য আমাদের কৌতূহলও আছে। কিন্তু কিরূপে তাহা জানা যায় ?

২। শাস্ত্রানুসারে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা হইতেছেন পরব্রহ্ম

জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা কে, একমাত্র বেদাদিশাস্ত্র হইতেই তাহা জানা যায় ; ইহা জানিবার আর অন্য কোনও উপায় নাই।

জড়-বিজ্ঞান জগতিস্থ বিভিন্ন বস্তুর উপাদান বিশ্লেষণ করিয়া কয়েকটী মূল উপাদানে পৌঁছিয়াছে। কিন্তু এই সমস্ত মূল উপাদানেরও তো আবার মূল থাকিতে পারে? সেই সর্ব্বশেষ মূল উপাদানই বা কি? আবার, কেবল উপাদান থাকিলেই দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে না; একজন নির্ম্মাতা থাকার প্রয়োজন হয়। এই জগতের নির্ম্মাতাই বা কে?

জড়-বিজ্ঞান যে সমস্ত উপাদানে পৌঁছিয়াছে, সে সমস্ত হইতেছে জড়—সুতরাং সংহনন-শক্তিহীন। সংহনন-শক্তিহীন জড় উপাদানসমূহ আপনা-আপনি মিলিত হইতে পারে না; মিলিত না হইলেও জগতিস্থ অনন্ত-বৈচিত্র্যময় অনন্ত প্রকার দ্রব্যের অনন্ত বৈচিত্র্যময় উপাদানের উদ্ভব হইতে পারে না। এই সংহনন-শক্তি কোথা হইতে আইসে? আবার, স্থাবর-জঙ্গমাদির মধ্যে চেতনা-শক্তিও দৃষ্ট হয়। এই চেতনা-শক্তিই বা কোথা হইতে কিরূপে আইসে?

জড়-বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত এ-সমস্ত প্রশ্নের কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে অসমর্থ। বেদাদি-শাস্ত্র হইতে এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। শাস্ত্র বলেন—জগতের মূল কারণ হইতেছেন সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান্ পরব্রহ্ম ভগবান্। কেবল এই পরিদৃশ্যমান জগৎ নহে, অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ড তিনি সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টি করিয়া তিনিই জগৎকে রক্ষা করেন; আবার, ব্রহ্মাণ্ড যখন ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়া যায়, তখন তাঁহাতেই আবার লয় প্রাপ্ত হয়। তিনি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ।

২ক। সৎকারণবাদ, অসৎকারণবাদ ও বিবর্ত্তবাদ

জগতের সৃষ্টি সম্বন্ধে সৎকারণবাদ, অসৎকারণবাদ প্রভৃতি বিভিন্ন মতবাদ প্রচলিত আছে। এ-স্থলে তাহাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

সৎকারণবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বেও কারণরূপে জগতের অস্তিত্ব ছিল—এইরূপ মতবাদকে সৎকারণ-বাদ বলে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥ ছান্দোগ্য ॥৬।২।১॥—হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল।"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই সৎকারণবাদের সমর্থক প্রমাণ। সৎকারণবাদকে **সৎকার্য্যবাদও** বলে; কেননা, এই মতবাদে কারণরূপে কার্য্যরূপ জগতের পূর্ব্বাস্তিত্ব স্বীকৃত হয়।

এই সদ্ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়েন এবং জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥", "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২।১।২৮॥"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতেই তাহা জানা যায়।

কেহ কেহ বলেন—ব্রহ্মের শক্তিতে তাঁহার বহিরঙ্গা শক্তি জড়রূপা মায়াই জগদ্রূপে পরিণত হইয়া থাকে; ব্রহ্ম নিজে পরিণত হয়েন না। শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় শক্তি-পরিণামকেই

ব্রহ্ম-পরিণাম বলা হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ এই মতাবলম্বী।

সূত্রকার **ব্যাসদেবসম্মত** পরিণামবাদই সৎকারণবাদ।

নিরীশ্বরসাংখ্যও পরিণামবাদী ; কিন্তু ব্রহ্ম-পরিণামবাদী বা ব্রহ্ম-শক্তি-পরিণামবাদী নহে। কেননা, নিরীশ্বর-সাংখ্যমতে ব্রহ্ম বা ঈশ্বর স্বীকৃত নহে। এই মতে জগৎ হইতেছে প্রকৃতির পরিণাম ; কিন্তু এই প্রকৃতি ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের শক্তি নহে ; ইহা হইতেছে এক স্বতন্ত্র তত্ত্ব। ব্যাসদেব বেদান্তসূত্রে নিরীশ্বর-সাংখ্য-প্রকৃতির জগৎকর্ত্তৃত্ব খণ্ডন করিয়াছেন।

অসৎকার্য্যবাদ। সৃষ্টির পূর্ব্বে জগতের কোনও অস্তিত্বই ছিল না, কারণরূপেও না—এইরূপ মতবাদকে বলে অসৎকারণবাদ। "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।২।১॥—কেহ কেহ বলেন যে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎ—অবিদ্যমান-অভাব-স্বরূপই—ছিল ; সেই অসৎ হইতেই সৎস্বরূপ এই জগৎ জন্মিয়াছে।"—এই শ্রুতি-বাক্যে অসৎকারণ-বাদের অস্তিত্বের উল্লেখ পাওয়া যায়।

শ্রুতি এই অসৎকারণবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। "কুতস্তু খলু সোম্যেবং স্যাদিতি হোবাচ কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।২।২॥ – হে সোম্য ! কোন্ প্রমাণানুসারে এইরূপ (অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি) হইতে পারে ? কি প্রকারে অসৎ হইতে সৎ-এর উৎপত্তি হইতে পারে ? পরন্তু নিশ্চয়ই অগ্রে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল।"

অসৎকারণবাদকে **অসৎকার্য্যবাদও** বলে। কেননা, এই মতবাদে অসৎ হইতে জগদ্রূপ কার্য্যের উৎপত্তি হয়।

বিজ্ঞানবাদী বৌদ্ধগণ এইরূপ অসৎ-কারণবাদী। বস্তুর উৎপত্তিতেই তাহার সত্তার আরম্ভ হয় বলিয়া ইহাকে **আরম্ভবাদও** বলা হয়। যেমন, সূত্র হইতে বস্ত্রের উৎপত্তি ; উৎপত্তির পূর্ব্বে বস্ত্রের কোনও সত্তা ছিল না ; উৎপত্তির সঙ্গে সঙ্গেই ইহার সত্তার আরম্ভ। ন্যায় এবং বৈশেষিকও আরম্ভবাদী।

সূত্রকার ব্যাসদেব তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে অসৎ-কারণবাদের খণ্ডন করিয়াছেন।

বিবর্ত্তবাদ। এই মতবাদে জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হয়। জগতের বাস্তবিক কোনও অস্তিত্ব নাই ; রজ্জুতে যে সর্পের ভ্রম হয়, সেই সর্পের যেমন বাস্তবিক অস্তিত্ব থাকে না, তদ্রূপ। এই মতবাদে সৃষ্টিও অবাস্তব। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যই বিবর্ত্তবাদের প্রবর্ত্তক। বিবর্ত্তবাদ শ্রুতিসম্মত নহে।

আরও অনেক মতবাদ প্রচলিত হইয়াছে। বাহুল্যভয়ে সে-সমস্তের উল্লেখ করা হইল না।

সৎকারণবাদ বা সৎকার্য্যবাদ এবং তদনুগত পরিণামবাদই বেদান্তসম্মত। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ সৎকারণবাদী।

৩। কারণ। নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ

কারণ দুই রকমের — নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ।

নিমিত্ত-কারণ। যিনি কর্ত্তা, তিনিই নিমিত্ত-কারণ। যেমন, ঘট-নির্মাতা কুম্ভকার হইতেছেন ঘটের নিমিত্ত-কারণ।

নিমিত্ত-কারণ আবার দুই রকম হইতে পারে—মুখ্য ও গৌণ। যিনি নির্মাণের সঙ্কল্পপূর্ব্বক নির্মাণ করেন, তিনি **মুখ্য-নিমিত্ত কারণ**। যেমন, কুম্ভকার ঘটের মুখ্য নিমিত্ত-কারণ। ঘট-নির্মাণের সঙ্কল্প করিয়াই কুম্ভকার ঘট-নির্মাণে প্রবৃত্ত হয়।

আর, মুখ্য নিমিত্ত-কারণ তাহার কার্য্যের সহায়রূপে যে সমস্ত বস্তু গ্রহণ করিয়া থাকে, সে-সমস্ত বস্তু হইতেছে **গৌণ নিমিত্ত-কারণ**। যেমন, কুম্ভকারের পক্ষে চক্র-দণ্ডাদি। চক্র-দণ্ডাদির কোনওরূপ সঙ্কল্প নাই; কুম্ভকারের দ্বারা নিয়োজিত হইয়া, কুম্ভকারের অধ্যক্ষতায়, ঘট-নির্মাণ-কার্য্যের আনুকূল্য মাত্র করিয়া থাকে।

উপাদান-কারণ। যাহা বস্তুর উপাদান—যাহা দ্বারা বস্তু গঠিত হয় এবং যাহা বস্তুর অঙ্গীভূত, তাহাই বস্তুর উপাদান-কারণ। যেমন, মৃত্তিকা হইতেছে মৃণ্ময় পাত্রের উপাদান-কারণ।

উপাদান-কারণও মুখ্য এবং গৌণ এই দুই রকমের হইতে পারে। যে উপাদান না হইলে বস্তুই নির্ম্মিত হইতে পারে না এবং নির্ম্মিত বস্তুর মধ্যেও যাহা সর্ব্বদা বিদ্যমান থাকে, সেই উপাদানটী হইতেছে বস্তুর **মুখ্য উপাদান**। যেমন, মৃণ্ময় ঘটাদির পক্ষে মৃত্তিকা হইতেছে মুখ্য উপাদান।

আর, যাহা মুখ্য উপাদান নহে, সুতরাং নির্ম্মিত বস্তুর মধ্যেও যাহা উপাদানরূপে সর্ব্বদা বর্ত্তমান থাকে না, অথচ যাহা মুখ্য উপাদানকে বস্তু গঠনোপযোগিত্ব-প্রাপ্তির সহায়তা করে, তাহা হইতেছে **গৌণ উপাদান-কারণ**। যেমন, মৃণ্ময় ঘটাদির ব্যাপারে—জল। মৃত্তিকার সঙ্গে জল মিশাইয়া মৃত্তিকাকে ঘটাদি-নির্মাণোপযোগী করা হয়।

শাস্ত্র বলেন—পরব্রহ্ম এই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ— এই উভয় কারণই।

৪। নির্ভরযোগ্য শাস্ত্র

বেদ এবং বেদানুগত স্মৃতিশাস্ত্রই হইতেছে একমাত্র নির্ভরযোগ্য শাস্ত্র। কেননা, এই সমস্ত শাস্ত্র হইতেছে অপৌরুষেয়—পরব্রহ্মের বাক্য—সুতরাং ভ্রম-প্রমাদাদি-দোষশূন্য। বেদ হইতেছে স্বতঃ-প্রমাণ, প্রমাণ-শিরোমণি।

অন্য শাস্ত্র অপৌরুষেয় নয়। অন্য শাস্ত্র হইতেছে পৌরুষেয়, ব্যক্তিবিশেষের দ্বারা রচিত; তাই তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকার সম্ভাবনা আছে। পৌরুষেয় শাস্ত্রের যে উক্তি বেদাদি-শাস্ত্র দ্বারা সমর্থিত, তাহাই গ্রহণীয় হইতে পারে।

সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্বাদির অবগতির জন্য একমাত্র বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রই অবলম্বনীয়।

এক্ষণে সৃষ্টিতত্ত্ব সম্বন্ধে বেদাদি শাস্ত্রের প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

দ্বিতীয় অধ্যায়

জগৎ-কারণ সম্বন্ধে শাস্ত্রপ্রমাণ

৫। ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ

ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বপ্রথম সূত্রটীই হইতেছে—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা-বিষয়ক। ব্রহ্ম কি বস্তু? এই প্রশ্নের উত্তরে দ্বিতীয় সূত্রেই বলা হইয়াছে—যিনি বিশ্বের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের মূল কারণ, তিনিই ব্রহ্ম।

জন্মাদ্যস্য যতঃ ॥১।১।২॥ ব্রহ্মসূত্র

জগতের কারণ যে ব্রহ্ম, এই সূত্রে তাহাই বলা হইয়াছে। বেদান্তদর্শনের পরবর্ত্তী অংশে সূত্রকার ব্যাসদেব অন্যান্য মতের খণ্ডনপূর্ব্বক ব্রহ্মেরই জগৎ-কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

৬। শ্রুতিপ্রমাণ

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যপ্রমুখ ভাষ্যকারগণ সূত্রোক্তির সমর্থনে যে সকল শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহাদের কয়েকটী উল্লিখিত হইতেছে।

ক। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে, যেন জাতানি জীবন্তি, যৎ প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি, তদ্‌বিজিজ্ঞাসস্ব, তদ্‌ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয়। ভৃগুবল্লী ॥১॥—যাঁহা হইতে এই সমস্ত ভূত (বস্তু সমূহ) উৎপন্ন হয়, উৎপন্ন হইয়া যাঁহা দ্বারা জীবিত থাকে এবং প্রলয়-সময়েও যাঁহাতে প্রবেশ করে, তাঁহাকে জিজ্ঞাসা কর, তিনিই ব্রহ্ম।"

খ। "আনন্দো ব্রহ্মেতি ব্যজানাৎ। আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে, আনন্দেন জাতানি জীবন্তি, আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি ॥ তৈত্তিরীয়। ভৃগুবল্লী ॥৬॥—আনন্দই ব্রহ্ম—ইহা জানিয়াছিলেন। এই সমস্ত ভূত আনন্দ হইতেই জন্মিতেছে, জন্মিয়াও আনন্দদ্বারাই জীবিত থাকে এবং অন্তকালে (প্রলয়ে) ইহারা আনন্দে গিয়াই প্রবেশ করে।"

এই জাতীয় অনেক শ্রুতিবাক্য আছে। এ-সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মই হইতেছেন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কারণ।

৭। স্মৃতিপ্রমাণ

ক। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌ গীতা-প্রমাণ

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

সর্ব্বভূতানি কৌন্তেয় প্রকৃতিং যান্তি মামিকাম্।
কল্পক্ষয়ে পুনস্তানি কল্পাদৌ বিসৃজাম্যহম্ ॥

প্রকৃতিং স্বামবষ্টভ্য বিসৃজামি পুনঃ পুনঃ।
ভূতগ্রামমিমং কৃৎস্নমবশং প্রকৃতের্বশাৎ ॥ ৯।৭-৮ ॥

—হে কৌন্তেয়! কল্পান্তে সমস্ত প্রাণী আমার প্রকৃতিতে গমন করে (লীন হয়), এবং কল্পের আদিতে আমি সেই সকলকে বিশেষভাবে সৃষ্টি করিয়া থাকি। আমি স্বকীয় প্রকৃতিতে অধিষ্ঠিত থাকিয়া প্রকৃতির (মায়ার) প্রভাবে বশীভূত এই সমস্ত প্রাণীকে বার বার বিশেষ প্রকারে সৃষ্টি করিয়া থাকি।”

“পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ।
বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্‌সাম যজুরেব চ ॥
গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ।
প্রভবঃ প্রলয়ঃ স্থানং নিধানং বীজমব্যয়ম্ ॥ ৯।১৭-১৮ ॥

—(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন) আমিই এই জগতের পিতা, মাতা, ধাতা, পিতামহ। আমিই জ্ঞেয় পবিত্র ওঙ্কার এবং ঋক্, যজু ও সামবেদ। আমিই গতি, ভর্ত্তা (পোষণকর্ত্তা), প্রভু, সাক্ষী (শুভাশুভদ্রষ্টা), নিবাস, শরণ এবং সুহৃৎ। আমিই প্রভব (সৃষ্টিকর্ত্তা), প্রলয় (সংহারকর্ত্তা), স্থান (আধার), নিধান (লয়স্থান) এবং অব্যয় (অবিনাশী) বীজ (কারণ)।”

খ। শ্রীমদ্‌ভাগবত-প্রমাণ

“জন্মাদ্যস্য যতোঽন্বয়াদিতরত শ্চার্থেষ্বভিজ্ঞঃ স্বরাট্
তেনে ব্রহ্ম হৃদা য আদিকবয়ে মুহ্যন্তি যৎ সূরয়ঃ।
তেজোবারিমৃদাং যথা বিনিময়ো যত্র ত্রিসর্গোঽমৃষা
ধাম্না স্বেন সদা নিরস্তকুহকং সত্যং পরং ধীমহি ॥১।১।১ ॥

—যিনি সৃষ্টবস্তুমাত্রেই সৎস্বরূপে বর্ত্তমান আছেন বলিয়া ঐ সকল বস্তুর অস্তিত্ব প্রতীতি হইতেছে এবং অবস্তু অর্থাৎ আকাশ-কুসুমাদি অলীক পদার্থে যাঁহার কোনও সম্বন্ধ নাই বলিয়াই তৎসমুদায়ের সত্তার উপলব্ধি হইতেছেনা ; সুতরাং এই পরিদৃশ্যমান জগতের সৃষ্টি, স্থিতি ও প্রলয়ের কারণ যিনি ; যিনি সর্ব্বজ্ঞ ও স্বতঃসিদ্ধ জ্ঞানস্বরূপ ; এবং যে বেদে জ্ঞানিগণও মুগ্ধ হয়েন, সেই বেদ যিনি আদিকবি ব্রহ্মার হৃদয়ে সঙ্কল্পমাত্রে প্রকাশ করিয়াছেন; এবং তেজ, জল বা মৃত্তিকাদির বিকার-স্বরূপ কাচাদিতে ঐ বস্তু সকলের একবস্তুতে অন্য বস্তুর ভ্রম যেরূপ অধিষ্ঠানের সত্যত্বহেতু সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তদ্রূপ যাঁহার সত্যতায় সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়ের সৃষ্টি ভূত, ইন্দ্রিয় ও দেবতা—বস্তুতঃ মিথ্যা হইয়াও সত্যরূপে প্রতীত হইতেছে [অথবা, তেজে জলভ্রমাদি যেরূপ বস্তুতঃ অলীক, তদ্রূপ যাঁহা ব্যতিরেকে গুণত্রয়ের সৃষ্টি সকলই মিথ্যা (যাঁহার পরমার্থ-সত্যত্ব প্রতিপাদনের নিমিত্ত আদ্যন্তযুক্ত অসার বিশ্বের বস্তুতঃ মিথ্যাত্ব না হইলেও মিথ্যাত্ব উক্ত

হইয়াছে)], এবং স্বীয় তেজঃপ্রভাবে যাঁহাতে কুহক অর্থাৎ মায়িক উপাধিসম্বন্ধ নিরস্ত হইয়াছে, সেই সত্যস্বরূপ পরমেশ্বরকে ধ্যান করি।—শ্রীপাদ শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ।"

ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব-বাচক এইরূপ অনেক স্মৃতিবাক্য আছে। বাহুল্যবোধে আর উদ্ধৃত হইল না ;

এইরূপে, প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ হইতে জানা গেল—পরব্রহ্মই হইতেছেন জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-লয়ের একমাত্র কারণ।

তৃতীয় অধ্যায়

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ

৮। নিমিত্ত-কারণত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য

পূর্ব্বে (৩৷৩-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—কার্য্যবিষয়ে সঙ্কল্পপূর্ব্বক যিনি কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন এবং কার্য্য করেন, তিনিই সেই কার্য্যের নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা। পরব্রহ্ম যে এই জগতের এতাদৃশ নিমিত্ত-কারণ, শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা জানা যায়। এ-স্থলে কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে।

(ক) "সোঽকাময়ত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত। স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্ব্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী॥ ৬৷১॥—তিনি (ব্রহ্ম) কামনা করিলেন—আমি বহু হইব, উৎপন্ন হইব। তাহার পর তিনি তপস্যা (চিন্তা) করিলেন। তিনি তপস্যা করিয়া এই চরাচর যাহা কিছু, তৎসমুদয় সৃষ্টি করিলেন।"

(খ) "আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ। নান্যৎ কিঞ্চন মিষৎ। স ঈক্ষত লোকান্ নু সৃজা ইতি॥ ঐতরেয়-শ্রুতি॥১৷১৷১॥ স ইমাঁল্লোকানসৃজত। অম্ভো মরীচীর্ম্মরমাপোঽদোম্ভঃ পরেণ দিবং দ্যৌঃ প্রতিষ্ঠান্তরিক্ষং মরীচয়ঃ। পৃথিবী মরো যা অধস্তাত্তা আপঃ॥ ঐতরেয়॥১৷১৷২॥—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ একমাত্র আত্মাই ছিল। তদ্ভিন্ন সক্রিয় কোনও বস্তুই ছিল না। তিনি সঙ্কল্প করিলেন—আমি লোকসমূহ (অম্ভঃ প্রভৃতি লোকসমূহ) সৃষ্টি করিব।১৷১৷১॥ (এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া ব্রহ্মাণ্ড নির্মাণের পরে) তিনি এই সকল লোক সৃষ্টি করিলেন—অম্ভঃ, মরীচি, মর এবং অপ্ এই চারিটী লোক সৃষ্টি করিলেন। সেই অম্ভোলোকটী দ্যুলোকের উপরে, দ্যুলোক তাহার প্রতিষ্ঠা (আশ্রয়)। অন্তরিক্ষই (বা আকাশই) মরীচি। এই পৃথিবী মরলোক এবং পৃথিবীর নিম্নে যে সমস্ত লোক, সে-সমস্ত অপ্-নামে অভিহিত।১৷১৷২॥"

গ। "তদৈক্ষত বহুস্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃত॥ ছান্দোগ্য॥ ৬৷২৷৩॥—সেই সৎ-ব্রহ্ম ঈক্ষণ (সঙ্কল্প) করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব। তারপর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন।"

ঘ। "স ঈক্ষাঞ্চক্রে॥ প্রশ্নোপনিষৎ॥৬৷৩॥ স প্রাণমসৃজত॥ প্রশ্ন॥৬৷৪॥—তিনি ঈক্ষণ (চিন্তা) করিলেন॥৬৷৩॥ তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন॥৬৷৪॥"

ঙ। "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি॥ ছান্দোগ্য॥৬৷৩৷২॥—সেই সৎ-রূপা দেবতা (ব্রহ্ম) ঈক্ষণ (আলোচনা বা সঙ্কল্প) করিলেন—আমি এই জীবাত্মারূপে (তেজঃ, জল ও পৃথিবী) এই তিন দেবতার (ভূতত্রয়াত্মক দেবতার) অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিব।"

এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সৃষ্টির সঙ্কল্প করিয়াই পরব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে জগতের নিমিত্ত-কারণ বা কর্ত্তা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৯। উপাদান-কারণত্ব-বাচক শ্রুতিবাক্য

পরব্রহ্ম যে জগতের উপাদান-কারণ, শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। এ-স্থলে কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইতেছে।

ক। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ। তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ॥ নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ। নিলয়নঞ্চানিলয়নঞ্চ বিজ্ঞানঞ্চাবিজ্ঞানঞ্চ। সত্যঞ্চানৃতঞ্চ সত্যমভবৎ। যদিদং কিঞ্চ। তৎ সত্যমিত্যাচক্ষতে॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মানন্দ॥৬।১॥—(সৎস্বরূপ ব্রহ্ম) তৎ-সমস্ত সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। প্রবেশ করিয়া তিনি সৎ (মূর্ত্ত বস্তু) এবং ত্যৎ (অমূর্ত্ত বস্তু) হইলেন এবং নিরুক্ত (দেশ-কালাদিপরিচ্ছিন্নরূপে কথিত) ও অনিরুক্ত (তদ্বিপরীত—যাহা দেশ-কালাদি-পরিচ্ছিন্নরূপে কথিত নয়, তাহা), নিলয়ন (আশ্রয়-স্থান) ও অনিলয়ন (অনাশ্রয়-বস্তু), বিজ্ঞান (চেতন) ও অবিজ্ঞান (অচেতন), সত্য ও অসত্য-ইত্যাদি যাহা কিছু আছে, সেই সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম তৎ-সমস্তই হইলেন। ব্রহ্ম এই সমস্ত রূপে প্রকটিত হইয়াছেন বলিয়াই ব্রহ্মবিদ্‌গণ তাঁহাকে সত্য-নামে অভিহিত করেন।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল— মূর্ত্ত (দৃশ্যমান বস্তু—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ) এবং অমূর্ত্ত (অদৃশ্যমান বস্তু—মরুৎ, ব্যোম), চেতন, অচেতন-আদি যত কিছু বস্তু জগতে দৃষ্ট হয়, সত্যস্বরূপ ব্রহ্মই তৎ-সমস্তরূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াছেন। সুতরাং তিনি যে জগতের উপাদান-কারণ—এই শ্রুতি-বাক্য হইতে তাহাই জানা গেল।

উল্লিখিত শ্রুতি পরবর্ত্তী বাক্যেও ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্বের কথা বলিয়াছেন। কিরূপে তিনি উপাদান-রূপে পরিণত হইলেন, তাহা বলা হইয়াছে। এই বাক্যটী এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

খ। "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ। ততো বৈ সদজায়ত। তদাত্মানং স্বয়মকুরুত। তস্মাত্তৎ সুকৃতমুচ্যতে ইতি॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মানন্দ॥৭।১॥—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ অসৎ—অনভিব্যক্ত অর্থাৎ অনভিব্যক্ত-নাম-রূপ-ব্রহ্ম-স্বরূপ—ছিল। সেই অসৎ হইতে এই সৎ—নাম-রূপে অভিব্যক্ত জগৎ—উৎপন্ন (অভিব্যক্ত, হইল। তিনি (সেই ব্রহ্ম) নিজেই নিজেকে এই প্রকার করিলেন (এই অভিব্যক্ত জগৎ-রূপে প্রকটিত করিলেন)। এজন্য তিনি 'সুকৃত' নামে অভিহিত হয়েন।"

পরব্রহ্ম যে নিজেকে নিজে এই জগৎ-রূপে প্রকটিত করিলেন—এই শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা জানা গেল। পরব্রহ্ম নিজেকে নিজে জগৎ-রূপে প্রকটিত করায় তিনিই যে জগতের উপাদান-কারণ—তাহাই জানা গেল।

গ। "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ মর্ত্ত্যঞ্চামৃতঞ্চ স্থিতঞ্চ যচ্চ সচ্চ ত্যচ্চ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ২।৩।১॥—ব্রহ্মের দুইটী রূপ প্রসিদ্ধ —একটী মূর্ত্ত (দৃশ্যমান মূর্ত্তিবিশিষ্ট, পরিচ্ছিন্ন), অপরটী অমূর্ত্ত (দৃশ্যমান-মূর্ত্তিহীন)। একটী মর্ত্ত্য (মরণশীল), অপরটী অমৃতস্বভাব। একটী স্থিত—গতিহীন, স্থাবর ; অপরটী যৎ (গতিশীল) এবং একটী সৎ (অপরোক্ষ - দৃষ্টির বিষয়ীভূত), অপরটী ত্যৎ (পরোক্ষ—দৃষ্টির অগোচর)।"

পরবর্ত্তী বাক্য হইতে জানা যায়, মূর্ত্ত হইতেছে – ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এবং অমূর্ত্ত হইতেছে—মরুৎ ও ব্যোম।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, এই পঞ্চভূতাত্মক জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের রূপবিশেষ। ব্রহ্ম জগৎ-রূপে আত্মপ্রকট করিয়াছেন বলিয়াই জগৎকে তাঁহার রূপ বলা হইয়াছে ; যেমন—মৃণ্ময় ঘটাদিও মৃত্তিকার রূপবিশেষ। সুতরাং ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান-কারণ, তাহাই এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা গেল।

ঘ। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ॥"

এই প্রসিদ্ধ শ্রুতিবাক্যে এই সমস্ত জগৎকেও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। মৃণ্ময় ঘটাদির উপাদান-কারণ বলিয়া মৃত্তিকা হইতে জাত বস্তু মাত্রকেই যেমন মৃত্তিকা বলা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মই এই জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া এই জগৎকেও ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। ইহা হইতেও জানা গেল – ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ।

ঙ। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-এই ছান্দোগ্য-বাক্যেও এই সমস্ত জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়াছে। মৃত্তিকা মৃণ্ময় বস্তুর উপাদান বলিয়া মৃণ্ময় বস্তুকে যেমন মৃত্তিকাত্মক বলা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম এই জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়াছে। ইহা হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ।

এইরূপে, শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল - পরব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ।

১০। নিমিত্তোপাদন-কারণত্ব-সম্বন্ধে ব্রহ্মসূত্র

পরব্রহ্ম যে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ-এই উভয়ই, ব্রহ্মসূত্র হইতেও তাহা জানা যায়। এ-স্থলে কয়েকটী সূত্র উল্লিখিত হইতেছে।

ক। **প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১।৪।২৩॥**

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ—প্রতিজ্ঞাদ্বারা এবং দৃষ্টান্তদ্বারা ইহা প্রতিপন্ন হয়। ইহা অস্বীকার করিলে প্রতিজ্ঞা বাধিত হয় এবং দৃষ্টান্তেরও হানি হয়।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। **প্রকৃতিঃ**—ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের প্রকৃতি অর্থাৎ

উপাদান-কারণ, **চ**—এবং নিমিত্ত-কারণও। **প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ**—শ্রুতিবাক্যে যেরূপ "প্রতিজ্ঞা" দৃষ্ট হয় এবং যেরূপ "দৃষ্টান্ত" দৃষ্ট হয়, তাহারা যাহাতে নিরর্থক না হয়, তদ্রূপ সিদ্ধান্তই করিতে হইবে। ব্রহ্মকে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ বলিয়া স্বীকার করিলেই শ্রুতির প্রতিজ্ঞা এবং দৃষ্টান্ত সার্থক হইতে পারে।

"জন্মাদ্যস্য যতঃ"—এই ব্রহ্মসূত্রে ব্রহ্মকে জগতের কারণ বলা হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম জগতের কি রকম কারণ? নিমিত্ত-কারণ? উপাদান-কারণ? না কি উভয়ই?

আপাতঃদৃষ্টিতে মনে হইতে পারে—ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের কেবল নিমিত্ত-কারণ। কেননা, "স ঈক্ষাঞ্চক্রে, স প্রাণমসৃজত—তিনি ঈক্ষা (সঙ্কল্প) করিলেন, তিনি প্রাণের সৃষ্টি করিলেন।" সঙ্কল্প-পূর্ব্বক যিনি সৃষ্টি করেন, তিনি যে নিমিত্ত-কারণ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ঘটের নির্ম্মাতা কুম্ভকারের দৃষ্টান্তেও তাহাই জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণই, উপাদান-কারণ নহেন।

ব্রহ্ম যে উপাদান-কারণ হইতে পারেন না, তাহা অন্যভাবেও বুঝা যায়। লৌকিক জগতে দেখা যায়—নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ কখনও এক হয় না। ঘটের নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার; কিন্তু উপাদান হইতেছে মৃত্তিকা। মৃত্তিকা কুম্ভকার হইতে ভিন্ন বস্তু। তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে কোনও ভিন্ন বস্তুই হইবে জগতের উপাদান।

পূর্ব্বোল্লিখিত আপত্তির উত্তরেই আলোচ্য সূত্র বলিতেছেন—ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ এবং নিমিত্ত-কারণও। কেননা, ইহা স্বীকার না করিলে শ্রুতিকথিত প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত নিরর্থক হইয়া পড়ে।

শ্রুতিকথিত প্রতিজ্ঞা এইরূপ। "উত তমাদেশমপ্রাক্ষো যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি—(গুরুগৃহে বিদ্যা লাভ করিয়া শ্বেতকেতু ফিরিয়া আসিলে তাঁহার পিতা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন) যদ্দ্বারা অশ্রুতও শ্রুত হয়, অমত (অবিচারিত) বস্তুও মত (বিচারিত) হয়, অজ্ঞাতবস্তুও জ্ঞাত হয়, তুমি কি সেই উপদেশ জিজ্ঞাসা করিয়াছ, পাইয়াছ?" এই বাক্য হইতে জানা গেল—এমন কোনও এক বস্তু আছে. যাহাকে জানিলে সমস্তই জানা হইয়া যায়। সেই বস্তুই হইতেছে শ্রুতির উদ্দেশ্য বা প্রতিজ্ঞার বিষয়। এই বস্তুটী হইতেছে—ব্রহ্ম। ব্রহ্মসম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলেই সমস্তের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। ব্রহ্ম যদি জগতের উপাদান-কারণ হয়েন, তাহা হইলেই এই একবিজ্ঞানে-সর্ব্ববিজ্ঞানরূপ প্রতিজ্ঞা সার্থকতা লাভ করিতে পারে, কেবল নিমিত্ত-কারণ হইলে তাহা হইতে পারে না। কারণ, কার্য্যমাত্রই উপাদানে অন্বিত—উপাদান হইতে অপৃথক্; সুতরাং উপাদানকে জানিলে সেই উপাদান হইতে উদ্ভূত সমস্ত বস্তুকেই জানা যায়। কিন্তু নিমিত্ত-কারণ জন্য-বস্তু হইতে পৃথক্ বলিয়া নিমিত্ত-কারণের জ্ঞানে সমস্ত জন্য-বস্তুর জ্ঞান জন্মিতে পারে না। যেমন, মৃত্তিকাকে জানিলে সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুর স্বরূপ জানা যায়, কিন্তু কুম্ভকারকে জানিলে মৃণ্ময় বস্তুর স্বরূপ জানা যায় না। অট্টালিকার নিমিত্ত-কারণ শিল্পীকে জানিলে অট্টালিকার উপকরণাদি জানা যায় না।

লৌহকে জানিলেই লৌহ-নির্ম্মিত সমস্ত বস্তুর স্বরূপ জানা যায়। এই সমস্ত উদাহরণ হইতে জানা গেল — ব্রহ্মের জ্ঞানে যখন সমস্তের জ্ঞান লাভ হইতে পারে বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন,তখন বুঝিতে হইবে, ব্রহ্ম কেবল নিমিত্ত-কারণ নহেন, তিনি জগতের উপাদান-কারণও।

ব্রহ্মের জগদুপাদনত্ব স্বীকার না করিলে ব্রহ্মের জ্ঞানে সমস্ত জগতের জ্ঞান হওয়া সম্ভব নয়। একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা শ্রুতিতে অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। যথা "কস্মিন্নু ভগবো বিজ্ঞাতে সর্ব্বমিদং বিজ্ঞাতং ভবতি—ভগবন্! কাহাকে জানিলে এই সমস্ত জানা যায়?" এই প্রতিজ্ঞাবাক্যের সঠিক দৃষ্টান্ত, যথা, "যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি-ইতি—যেমন পৃথিবী হইতে ওষধিসকল উদ্ভূত হয়, সেইরূপ এই অক্ষর (ব্রহ্ম) হইতে বিশ্ব প্রাদুর্ভূত হয়।" আর একটী প্রতিজ্ঞা-বাক্য—"আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্—হে মৈত্রেয়ি! আত্মা দৃষ্ট, শ্রুত, মত ও বিজ্ঞাত হইলে এই সমস্তই জানা যায়।" ইহার দৃষ্টান্ত এই। "স যথা দুন্দুভের্হন্যমানস্য ন বাহ্যান্ শব্দান্ শক্নুয়াৎ গ্রহণায়, দুন্দুভেস্তু গ্রহণেন দুন্দুভ্যাঘাতস্য বা শব্দো গৃহীতঃ—যখন দুন্দুভি বাজিতে থাকে, তখন শ্রোতা যেমন বাহিরের শব্দ গ্রহণ করিতে পারে না, কেবল দুন্দুভির শব্দ শুনিয়াই তদন্তর্গত আঘাতোত্থ ধ্বনিসমুদায় গ্রহণ করে, আত্মবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানও সেইরূপ জানিবে।" তাৎপর্য্য এই যে, বিশেষ জ্ঞানমাত্রই সামান্য জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত ; তজ্জন্য সামান্যের জ্ঞানে বিশেষের জ্ঞান সিদ্ধ হইয়া থাকে। যথা-সম্ভব প্রত্যেক বেদান্তেই ব্রহ্মের উপাদান-কারণ-বাচক এইরূপ প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত আছে।

"যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে"-এই শ্রুতিবাক্যের "যতঃ" শব্দে পঞ্চমী বিভক্তি আছে। "জনিকর্ত্তুঃ প্রকৃতিঃ"-এই বিধি অনুসারে, পঞ্চমী বিভক্তিতে প্রকৃতি বা অপাদান সূচিত হইতেছে। তদনুসারে উক্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই জগতের উপাদান।

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্ম যদি উপাদান-কারণ হয়েন, তাহা হইলে নিমিত্ত-কারণ কি? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—যখন অন্য অধিষ্ঠাতা (কর্ত্তা)নাই, তখন তিনিই (ব্রহ্মই) অধিষ্ঠাতা (কর্ত্তা বা নিমিত্ত-কারণ)। লৌকিক জগতে অবশ্য দেখা যায় যে, নিমিত্ত ও উপাদান ভিন্ন, এক নহে। ঘটের উপাদান মৃত্তিকা, নিমিত্ত বা কর্ত্তা কুম্ভকার। কুণ্ডলের উপাদান সুবর্ণ, নিমিত্ত বা কর্ত্তা সুবর্ণকার। কিন্তু ব্রহ্মসম্বন্ধে এই নিয়ম হইতে পারে না। শ্রুতি হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মই ছিলেন, দ্বিতীয় বস্তু ছিল না। ব্রহ্মের উপাদানত্বের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। দ্বিতীয় বস্তু যখন কিছু নাই, তখন ব্রহ্ম নিমিত্ত বা কর্ত্তাও হইবেন ; নচেৎ কর্ত্তা আর কে হইতে পারেন? সুতরাং ব্রহ্মই উপাদান-কারণ এবং ব্রহ্মই নিমিত্ত-কারণ। উপাদান হইতে পৃথক্ নিমিত্ত-কারণ স্বীকার করিতে গেলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সম্ভব হইবে না, প্রতিজ্ঞা ও দৃষ্টান্ত উভয়ই নিরর্থক হইবে।

এইরূপে দেখা গেল—অন্য কোনও কর্ত্তা (নিমিত্ত-কারণ) না থাকায় ব্রহ্মই নিমিত্ত-কারণ এবং অন্য কোনও উপাদান না থাকায় ব্রহ্মই উপাদান-কারণও। কেননা, শ্রুতিতে সৃষ্টির পূর্ব্বে একমাত্র ব্রহ্মের অস্তিত্বের কথাই বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ রামানুজও শ্রীপাদ শঙ্করের ব্যাখ্যার অনুরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন। তিনি বলেন—"উত তমাদেশমপ্রাক্ষ্যঃ"-এই শ্রুতিবাক্যের "আদেশ"-শব্দে ব্রহ্মকে বুঝায়। "আদিশ্যতে—প্রশিষ্যতে অনেন ইতি আদেশঃ। এতস্য বা অক্ষরস্য প্রশাসনে গার্গি সূর্য্যাচন্দ্র-মসৌ বিধৃতৌ তিষ্ঠতঃ'-ইত্যাদি শ্রুতেঃ—যাহাদ্বারা আদিষ্ট হয়, উত্তমরূপে শাসিত হয়, তাহার নাম 'আদেশ'। 'হে গার্গি! এই অক্ষর ব্রহ্মের প্রশাসনে সূর্য্য ও চন্দ্র বিধৃত হইয়া অবস্থিত আছে'-এই শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ।"

শ্রীপাদ রামানুজ বিরুদ্ধ পক্ষের একটী আপত্তির উত্থাপন করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন। আপত্তিটী এই।

একটী বাক্য আছে এইরূপ:—

"বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্
ধ্যায়তেঽধ্যাসিতা তেন তন্যতে প্রের্য্যতে পুনঃ॥
সূয়তে পুরুষার্থাংশ্চ তেনৈবাধিষ্ঠিতা জগৎ।
গৌরনাদ্যন্তবতী সা জনিত্রী ভূতভাবিনী॥ ইতি। —মন্ত্রিকোপনিষৎ॥৩-৫॥

—সমস্ত বিকার-কারণীভূতা ও অচেতন অষ্টবিধ প্রকৃতি জন্মরহিত ও নিত্য। সেই প্রকৃতি পরমেশ্বরাধিষ্ঠিত হইয়াই চিন্তার বিষয়ীভূত হয়, তিনিই তাহাকে বিস্তার করেন এবং স্বকার্য্যে প্রেরণ করেন এবং সেই পরমেশ্বরকর্ত্তৃক অধিষ্ঠিত হইয়াই পুরুষার্থ (ভোগ ও অপবর্গ) ও তদুপযুক্ত জগৎ সৃষ্টি করে। আদ্যন্তরহিত, ভূতভব্যাত্মক গোরূপা সেই প্রকৃতিই সর্ব্বপদার্থের জননী। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

আবার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্।—আমার অধ্যক্ষতায় অর্থাৎ পরিচালনায়ই প্রকৃতি চরাচরাত্মক সমস্ত জগৎ প্রসব করিয়া থাকে।"

শ্রুতিও বলেন—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥ শ্বেতাশ্বতর॥৪।৯-১০॥—মায়ী অর্থাৎ মায়াধীশ্বর এই প্রকৃতি হইতেই এই জগৎ সৃষ্টি করেন। মায়াকে প্রকৃতি (উপাদান) বলিয়া জানিবে এবং মায়াধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা যায়—উপাদান-কারণরূপা প্রকৃতিতে অধিষ্ঠান করিয়াই পরমেশ্বর জগতের সৃষ্টি করেন। ইহাদ্বারা প্রকৃতিরই উপাদানত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে। ব্রহ্ম উপাদান-কারণ নহেন। ব্রহ্মাধিষ্ঠিত প্রকৃতিই জগতের উপাদান-কারণ।

এই আপত্তির উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—"বিকারজননী", এবং "আদ্যন্তরহিত গোরূপা"-প্রকৃতি ইত্যাদি বাক্যে, নামরূপ-বিভাগরহিত কারণাবস্থ ব্রহ্মকেই প্রকৃতি বলা হইয়াছে। কারণ,

ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই নাই। "তত্রাপ্যবিভক্তনামরূপং কারণাবস্থং ব্রহ্মৈব প্রকৃতিশব্দেনাভিধীয়তে ব্রহ্মাতিরিক্তবস্তন্তরাভাবাৎ।" এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও আছে। "সর্ব্বং তৎপরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ—সকলেই তাহাকে প্রত্যাখ্যান করিবে, যে লোক আত্মার অন্যত্র, অর্থাৎ আত্মা হইতে পৃথক্ বলিয়া, সকলকে জানে", "যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ তৎ কেন কং বিজানীয়াৎ—যখন সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কিসের দ্বারা কাহাকে জানিবে"—ইত্যাদি। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই সমস্তই ব্রহ্মস্বরূপ," "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্—এই সমস্তই এই ব্রহ্মাত্মক," ইত্যাদিস্থলে কার্য্যাবস্থ ও কারণাবস্থ সমস্ত জগতেরই ব্রহ্মাত্মকত্বের কথাই জানা যায়।

ইহার পরে "যঃ পৃথিবীমন্তরে সঞ্চরন্,যস্য পৃথিবী শরীরং যং পৃথিবী ন বেদ"-ইত্যাদি কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—পৃথিবী, অব্যক্ত (প্রকৃতি), অক্ষর, আত্মা-এই সমস্তের অন্তরে থাকিয়া পরব্রহ্ম এই সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন। এই সকল শ্রুতিবাক্য—চেতনা-চেতনশরীরধারী বলিয়া সকল সময়েই সকলের আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মকে কখনও নাম-রূপ হইতে বিভক্তরূপে, কখনও বা নামরূপের সহিত অবিভক্তস্বরূপে প্রতিপাদন করিতেছে। তন্মধ্যে আবার বিশেষ এই যে, যখন নামরূপে বিভক্ত হয়েন, তখন সেই ব্রহ্মই বহু এবং কার্য্যস্বরূপ বলিয়া উক্ত হয়েন; আবার যখন নামরূপে বিভক্ত না হয়েন, তখন এক-অদ্বিতীয় এবং কারণ-স্বরূপ বলিয়াও কথিত হয়েন। এইরূপে জানা যায় যে, পরব্রহ্ম সর্ব্বদাই চেতনাচেতন-শরীর-সম্পন্ন। সেই পরব্রহ্মের যে নামরূপে অবিভক্ত কারণাবস্থা, তাহাই "গৌঃ অনাদ্যন্তবতী," "বিকারজননীম্ অজ্ঞাম্" ও "অজাম্ একাম্" ইত্যাদিবাক্যে অভিহিত হইয়াছে।

উপসংহারে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—লৌকিক জগতের নিমিত্ত-কারণ ও উপাদান-কারণ ভিন্ন বটে; কিন্তু প্রাকৃত বস্তু অপেক্ষা ব্রহ্ম বিলক্ষণ। প্রাকৃত উপাদান-কারণ মৃত্তিকাদি অচেতন। সুতরাং অধিষ্ঠাতা বা কর্ত্তা একজন না থাকিলে অচেতন মৃত্তিকাদি ঘটাদিকার্য্যরূপে পরিণত হইতে পারেনা। প্রাকৃত নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকারাদি চেতন হইলেও অল্পজ্ঞ, অল্পশক্তিবিশিষ্ট; ইচ্ছা মাত্রে কোনও বস্তু নির্ম্মাণ করিতে পারে না; এজন্য তাহারা উপাদানের অপেক্ষা রাখে। কিন্তু পরব্রহ্ম চেতন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বশক্তিমান, সত্যসঙ্কল্প; ইচ্ছামাত্রেই তিনি যে কোনও বস্তু প্রস্তুত করিতে পারেন, তিনি বিচিত্রাকার পরিণাম-সাধনেও সমর্থ।

অতএব এক ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। "অতো ব্রহ্মৈব জগতো নিমিত্তমুপাদানঞ্চ।"

পরবর্ত্তী কয়েকটী সূত্রেও উল্লিখিত সিদ্ধান্তই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে।

খ। অভিধ্যোপদেশাচ্চ ॥১।৪।২৪॥

=অভিধ্যোপদেশাৎ (অভিধ্যা=সৃষ্টিসঙ্কল্প; উপদেশ=উল্লেখ। শ্রুতিতে সৃষ্টিসঙ্কল্পের উল্লেখ আছে বলিয়া) চ (ও)।

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। এক ব্রহ্মই যে কর্ত্তা ও উপাদান, তাহার অন্য হেতুও আছে। শ্রুতিতে যে সৃষ্টিসঙ্কল্পের উপদেশ আছে, সেই উপদেশ হইতেই জানা যায়—ব্রহ্ম জগতের কর্ত্তা (নিমিত্ত-কারণ) এবং উপাদান-কারণ। "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়—তিনি (ব্রহ্ম) কামনা (সঙ্কল্প) করিলেন—আমি বহু হইব ও জন্মিব","তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়—তিনি আলোচনা করিলেন, আমি বহু হইব ও জন্মিব।"

"সোঽকাময়ত" এবং "তদৈক্ষত" -এই বাক্যদ্বয়ে সঙ্কল্পপূর্ব্বক স্বতন্ত্রভাবে ব্রহ্মের সৃষ্টিকার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়ার উল্লেখ আছে। তাহাতেই জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের কর্ত্তা বা নিমিত্ত-কারণ।

আর, "বহু স্যাম্"-বাক্যে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম নিজেই বহু হইয়াছেন। তাহাতে জানা যায়—ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের উপাদান-কারণও।

এইরূপে এই সূত্র হইতে জানা গেল—জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই ব্রহ্ম।

শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিতরূপ অর্থই করিয়াছেন।

গ। সাক্ষাচ্চোভয়াম্নাৎ ॥১।৪।২৫॥

শ্রীপাদশঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রুতিতে **সাক্ষাৎ**—সাক্ষাদ্ভাবে বা স্পষ্টভাবে **উভয়াম্নাৎ**—উৎপত্তি ও প্রলয়—এই উভয়ের উল্লেখ আছে বলিয়াও জানা যায় যে, ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ। "সর্ব্বাণি হ বা ইমানি ভূতানি আকাশাদেব সমুৎপদ্যন্তে, আকাশং প্রত্যস্তং যন্তি—এই সমুদয় ভূত আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই উৎপন্ন হয়, আবার আকাশেই (ব্রহ্মেই) লয় প্রাপ্ত হয়।" যে বস্তু যাহা হইতে উৎপন্ন হয় ও যাহাতে লয় প্রাপ্ত হয়, তাহা যে সেই বস্তুর উপাদান, ইহা প্রসিদ্ধ কথা। যেমন, ব্রীহি-যবাদির উপাদান পৃথিবী ; ব্রীহি-যবাদি পৃথিবী হইতে উৎপন্ন হয় ; আবার পৃথিবীতেই লয় প্রাপ্ত হয়। "আকাশাদেব"-এই বাক্যে শ্রুতি সাক্ষাদ্ভাবেই বলিয়াছেন—আকাশ (ব্রহ্ম) হইতেই জগতের উৎপত্তি। "এব"-শব্দ হইতেই বুঝা যায়—ব্রহ্ম অন্য কোনও উপাদান গ্রহণ করেন নাই, নিজেই উপাদান হইয়াছেন। বিশেষতঃ, যে উপাদান হইতে যে দ্রব্যের উৎপত্তি, সেই উপাদানেই তাহার লয় হয়—ইহাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয় ; উপাদান ব্যতীত অন্যত্র লয় দৃষ্ট হয় না।

শ্রুতি যখন বলিয়াছেন, ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং ব্রহ্মেই জগতের লয়, তখন ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ শঙ্কর সূত্রস্থ "উভয়"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"উৎপত্তি ও প্রলয়।" শ্রীপাদ রামানুজ এই "উভয়"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ।"

তিনি বলেন—কেবল যে "প্রতিজ্ঞা", "দৃষ্টান্ত" এবং "অভিধ্যা (সঙ্কল্প)"-শ্রুতিতে এই তিনের উল্লেখ আছে বলিয়াই ব্রহ্মের নিমিত্ত-কারণত্ব এবং উপাদান-কারণত্ব সিদ্ধ হইতেছে, তাহা নহে। শ্রুতিতে সাক্ষাদ্‌ভাবেও ব্রহ্মের নিমিত্ত-কারণত্ব এবং উপাদান-কারণত্ব কথিত হইয়াছে। যথা,

"কিস্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে দুতদ্ যদধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥
ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবাপৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্ ভুবনানি ধারয়ন্॥

—অষ্টক ॥২।৮।৭-৮॥

—জিজ্ঞাসা করি, সেই বনই বা কি? এবং সেই বৃক্ষই বা কি ছিল? সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর যাহা হইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্মাণ করিয়াছেন? এবং সমস্ত জগৎ ধারণ করতঃ যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন? (উত্তর)—হে সুধীগণ, তোমাদিগকে বলিতেছি—ব্রহ্মই বন (কার্য্য) এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষস্বরূপ (উপাদানস্বরূপ) ছিলেন যাহাহইতে আকাশ ও পৃথিবী নির্ম্মিত হইয়াছে। ঈশ্বর সর্ব্বজগৎ ধারণার্থ এই ব্রহ্মেই অধিষ্ঠান করিয়াছিলেন। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ত তীর্থকৃত অনুবাদ।"

এ-স্থলে, লৌকিক দৃষ্টান্তের অনুসরণে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে যে, জগতের সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্ম কি উপাদান গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কি কি উপকরণই বা গ্রহণ করিয়াছিলেন? উত্তরে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বদ্রব্য হইতে বিলক্ষণ-স্বভাব, তিনি সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন; অন্য উপাদান বা উপকরণ গ্রহণের তাঁহার কোনও প্রয়োজন হয় না। ব্রহ্ম নিজেই উপাদান এবং উপকরণ।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল —ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণও।

ঘ। আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত—সেই ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে করিলেন", এই শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের কর্ত্তৃত্ব এবং কর্ম্মত্ব উভয়ের কথাই বলা হইয়াছে। "আত্মানম্ অকুরুত—নিজেকে করিলেন"—এই বাক্যে কর্ম্মত্ব এবং "স্বয়ম্ অকুরুত—নিজেই করিলেন" এই বাক্যে কর্ত্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে। যদি বলা যায়—যাহা পূর্ব্বসিদ্ধ সৎ—যাহা পূর্ব্ব হইতেই বিদ্যমান, কর্ত্তৃরূপে ব্যবস্থিত আছে, কিরূপে তাহার ক্রিয়মাণত্ব (কর্ম্মত্ব) সম্ভব হইতে পারে? (তাৎপর্য্য এই যে, যাহা পূর্ব্বে থাকে না, তাহাই কৃত হইতে পারে; যেমন, ঘট পূর্ব্বে থাকে না, কুম্ভকার ঘট প্রস্তুত করে। যাহা অনাদিকাল হইতেই বর্ত্তমান, তাহাকে কিরূপে আবার করা যায়? ব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই বিদ্যমান; তিনি বরং অপর বস্তুর কর্ত্তা বা নির্ম্মাতা হইতে পারেন। কর্ত্তা হইতে পারিলেও নিজেকে কিরূপে নির্ম্মাণ করিবেন? কেননা, তিনি তো আছেনই)। ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিতেছেন—এ-স্থলে "অকুরুত—

করিলেন”—অর্থ—পরিণত করিলেন। সেই সৎ-ব্রহ্ম অনাদিসিদ্ধ হইলেও আপনাকে তিনি বিকারাত্মক জগদাকারে পরিণত করিলেন। বিকাররূপ পরিণাম মৃত্তিকাদিতেও দৃষ্ট হয়। শ্রুতিবাক্যস্থ “স্বয়ম্”-এই বিশেষণ হইতে জানা যাইতেছে—বিশ্বসৃষ্টির জন্য অন্য কোনও নিমিত্তের অপেক্ষা ছিল না, ব্রহ্ম নিজেই নিমিত্ত।

এইরূপে, এই সূত্র হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম নিজেই বিশ্বের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ।

ব্রহ্ম নিজেকে জগৎ-রূপে পরিণত করিলেন—ইহাদ্বারাই জানা গেল, তিনিই জগতের উপাদান।

শ্রীপাদ শঙ্কর আরও বলিয়াছেন—“পরিণামাৎ”—ইহাকে যদি একটী পৃথক্ সূত্ররূপে গ্রহণ করা হয়, তাহা হইলে এইরূপ অর্থ হইবে।

“সচ্চ ত্যচ্চাভবন্নিরুক্তঞ্চানিরুক্তঞ্চ—ব্রহ্মাই প্রত্যক্ষ, অপ্রত্যক্ষ, বাক্যগোচর ও বাক্যের অগোচর—সমস্তই হইয়াছেন”-এই প্রকার শ্রুতিবাক্যে সামানাধিকরণ্যে ব্রহ্মের পরিণামের কথা বলা হইয়াছে। তাহা হইতেও জানা যাইতেছে যে, ব্রহ্মই বিশ্বের উপাদান-কারণ।

শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। শ্রীপাদ রামানুজ “আত্মকৃতেঃ” এবং “পরিণামাৎ”-এই দুইটী পৃথক্ সূত্ররূপে গ্রহণ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়াছেন।

“আত্মকৃতেঃ”-সূত্রের ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—

“সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়—তিনি কামনা করিলেন, আমি বহু হইব, জন্মিব”-এই শ্রুতিবাক্যে সৃষ্টিকার্য্যের ইচ্ছুক বলিয়া যিনি বর্ণিত হইয়াছেন, তিনিই “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত—নিজেকে নিজে (বহুরূপ) করিয়াছিলেন।” এ-স্থলে সৃষ্টিকার্য্যে ব্রহ্মেরই কর্তৃত্ব এবং কর্মত্ব জানা যাইতেছে। ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে বহুরূপে প্রকটিত করায় তাঁহারই নিমিত্ত-কারণত্ব এবং উপাদান-কারণত্ব জানা যাইতেছে। নাম ও রূপ যখন আত্মা হইতে পৃথক্ না থাকে, তখন সেই অবিভক্ত-নামরূপ-ব্রহ্মই হয়েন কর্ত্তা বা নিমিত্ত-কারণ। আর যখন নাম ও রূপ বিভক্ত হইয়া পড়ে, তখন সেই বিভক্ত-নামরূপ-ব্রহ্মই হয়েন কার্য্য। সুতরাং একেরই কর্তৃত্ব ও কর্মত্বে কোনওরূপ বিরোধ হইতেছে না।

ব্রহ্ম যখন আপনিই আপনাকে জগৎ-রূপে ব্যক্ত করিলেন, তখন তিনিই যে জগতের নিমিত্ত এবং উপাদান, তাহাও প্রতিপন্ন হইতেছে।

আর, “পরিণামাৎ”-এই সূত্রের ভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ রামানুজ একটী প্রশ্নের উত্থাপন করিয়া বলিয়াছেন যে, “পরিণামাৎ”-সূত্রেই সেই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

প্রশ্নটী এই। ব্রহ্ম হইতেছেন “সত্য, জ্ঞান ও অনন্ত”, “ব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ”, “ব্রহ্ম নিষ্পাপ, জরা-মৃত্যু-শোক-বুভুক্ষা-পিপাসাবর্জ্জিত”, “নিষ্কল, নিষ্ক্রিয়, নিরঞ্জন, নির্দ্দোষ ও শান্তস্বভাব”; এতাদৃশ ব্রহ্ম যখন স্বভাবতঃই চেতনাচেতনগত সমস্ত-দোষবর্জ্জিত এবং সর্ব্বাতিশয়-জ্ঞানানন্দৈকসার, তখন

তাঁহার পক্ষে স্বেচ্ছাপূর্ব্বক আপনাকে, অপুরুষার্থভূত অনন্তবৈচিত্র্যময় চেতনাচেতনমিশ্রিত এই জগদ্রূপে পরিণত করা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—"পরিণামাৎ"-এই সূত্রেই ব্যাসদেব উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। "পরিণামাৎ—পরিণামস্বাভাব্যাৎ—পরিণামস্বভাবত্ব-হেতু।" অভিপ্রায় এই যে, এখানে পরব্রহ্ম-সম্বন্ধে যে পরিণামের উপদেশ করা হইতেছে, পরিণামের স্বাভাবিকত্বনিবন্ধনই তাহা দোষাবহ হয় না ; বরং ইহা দ্বারা তাঁহার স্বভাবসিদ্ধ অপ্রতিহত ঐশ্বর্য্যই প্রকাশিত হয়। এইরূপই পরিণামের উপদেশ করা হয় যে, নিজের শরীরস্থানীয় জগৎপ্রপঞ্চ প্রথমতঃ তন্মাত্র ও অহঙ্কারাদিরূপ কারণ-পরম্পরাক্রমে একমাত্র "তমঃ"-শব্দবাচ্য অতিসূক্ষ্ম অচেতন—বস্তুস্বরূপমাত্রে পরিণত হয় ; সেই তমঃও আবার ব্রহ্মেরই শরীর ; সুতরাং ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌রূপে নির্দ্দেশের অযোগ্য ; এইরূপ অতিসূক্ষ্ম দশা প্রাপ্ত হয়, এইরূপে ক্রমে ব্রহ্মেতে একীভাব প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ মিশিয়া যায়। তাহার পর তথাভূত তমঃশরীরসম্পন্ন এবং সর্ব্ব-প্রকার উপাদেয় কল্যাণগুণের আকরস্বরূপ, অপর-সর্ব্ববস্তু-বিলক্ষণ, সর্ব্বজ্ঞ, সত্যসঙ্কল্প, পূর্ণকাম, যদপেক্ষা অধিক নাই, এরূপ অসীম-আনন্দস্বরূপ, লীলার উপকরণভূত এবং নিজেরই শরীররূপী চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর আত্মস্বরূপ পরব্রহ্মই 'আমি পুনশ্চ পূর্বকল্পের ন্যায় নামরূপ-বিভাগ-সম্পন্ন চেতনাচেতন শরীরধারী হইব'-এইরূপ মনস্থ করিয়া প্রলয়ক্রমে আপনাকে জগৎ-শরীরবিশিষ্টরূপে পরিণত করেন ; ইহাই বেদান্ত-শাস্ত্রোপদিষ্ট পরিণাম (অন্য প্রকার নহে)।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

ইহার পরে বহু শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইয়াছেন যে, সমস্ত জগৎ ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্ম সমস্ত জগতের আত্মা।

তাহার পরে তিনি লিখিয়াছেন—"(প্রলয়কালে) পরমাত্মার লীলোপকরণ চেতনাচেতনবস্তুময় শরীরটী অত্যন্ত সূক্ষ্মবশতঃ অসৎ বলিয়াই পরিগণিত হয়। এইজন্য স্বয়ং অপরিচ্ছিন্ন-জ্ঞান ও আনন্দ-স্বভাব পরমাত্মা পুনশ্চ অনন্তবৈচিত্র্যময় আপনার লীলোপকরণসমূহ সমুৎপাদনের ইচ্ছায় স্বীয় শরীর-স্থানীয় প্রকৃতি-পুরুষসমুদায়-পরম্পরাক্রমে মহাভূতপর্য্যন্ত আপনাকে বিশেষ বিশেষ শরীরাকারে পরিণত করিয়া নিজেও তন্ময় হইয়া প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষাত্মক বিচিত্র চেতনাচেতনসমন্বিত—দেবতা হইতে স্থাবর পর্য্যন্ত সমস্ত জগদাকারে পরিণত হইলেন। 'তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য—তিনি তাহারই মধ্যে প্রবেশ করিলেন, তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া'-এই বাক্যে কথিত হইয়াছে যে, জগতের কারণাবস্থায় অবস্থিত পরমাত্মাই কার্য্যাকারে পরিণমমান বস্তুরও আত্মারূপে অবস্থান করিয়া তত্তৎবস্তু-স্বরূপ হইয়াছিলেন। পরমাত্মার উক্ত প্রকারে যে চেতনাচেতনসমষ্টিরূপে জগদাকারে পরিণাম, তাহাতে পরমাত্মার শরীরস্থানীয় চেতনাংশগত সমস্তই অপুরুষার্থ অর্থাৎ জীবের প্রকৃত মঙ্গলকর নহে ; এবং পরমাত্মার শরীরভূত অচেতন-পদার্থগত সমস্ত বিকার (পরিণাম), পরমাত্মগত কার্য্যত্ব এবং সেই অবস্থায় যে, চেতন ও অচেতনের নিয়ামকরূপে আত্মত্ব ; স্বশরীরভূত সেই চেতনাচেতনের নিয়ামকরূপে

আত্মস্বরূপ পরমাত্মা কিন্তু স্বশরীরগত উক্ত অনর্থরাশি ও বিকারদ্বারা স্পৃষ্ট হয়েন না ; পরন্তু অপরিচ্ছিন্ন জ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ তিনি সর্ব্বদা একরূপ থাকিয়া জগতের পরিবর্ত্তনরূপ লীলা সম্পাদন করতঃ অবস্থান করেন। এই কথাই 'সত্যং চানৃতং চ সত্যমভবৎ—সেই সত্যস্বরূপ পরমাত্মা সত্য ও অসত্য-স্বরূপ হইলেন'-বাক্যে অভিহিত হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে) ব্রহ্ম চেতনাচেতনরূপে বিকারপ্রাপ্ত হইয়াও স্বয়ং সত্যই ছিলেন, অর্থাৎ সর্ব্ববিধ দোষসম্বন্ধশূন্য ও অপরিচ্ছিন্নজ্ঞান ও আনন্দস্বরূপ একরূপই ছিলেন। সূক্ষ্মাবস্থাপন্নই হউক, আর স্থূলাবস্থাপন্নই হউক, চেতনাচেতন সমস্তই পরব্রহ্মের লীলোপ-করণ।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

ইহার পরে, সৃষ্টিকার্য্য যে ভগবানের লীলা, তাহা প্রদর্শনার্থ শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ॥শ্বেতাশ্বতর ॥৪।৯॥—মায়াধীশ্বর এই প্রকৃতি হইতে এই বিশ্ব সৃষ্টি করেন ; অন্যে (জীব) আবার তাহাতেই (বিশ্বেই) মায়া দ্বারা আবদ্ধ হয়।' এখানে বলা হইল যে, ব্রহ্ম জগদাকারে বিকারাপন্ন হইলেও যত কিছু বিকার, তৎসমস্তই তাঁহার শরীরস্থানীয় অচেতনাংশে প্রতিষ্ঠিত; আর, যত কিছু অপুরুষার্থ বা অনর্থ, তৎসমস্তই পরমাত্ম-শরীরস্থানীয় ক্ষেত্রজ্ঞ-সংজ্ঞক জীবনিষ্ঠ। এই ব্যবস্থা জ্ঞাপনের উদ্দেশ্যেই ব্রহ্মের শরীরভূত, অথচ তৎকালে ঐরূপ নির্দ্দেশের অযোগ্য অতিসূক্ষ্মাবস্থাপ্রাপ্তিহেতু ব্রহ্মের সহিত একীভাবাপন্ন হইলেও প্রকৃতি ও পুরুষের ঐরূপে ভেদব্যপদেশ করা হইয়াছে ; কারণ, তাহা হইলেই 'তিনি নিজেই আপনাকে (জগদ্রূপে পরিণত) করিলেন'-ইত্যাদির সহিত একার্থতা রক্ষা পায় (মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ)। 'অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ' ইতি ব্রহ্মণি জগদ্রূপতয়া বিক্রিয়মাণেঽপি তৎপ্রকারভূতাচিদংশগতাঃ সর্ব্বে বিকারাস্তৎপ্রকারভূত-ক্ষেত্রজ্ঞগতাশ্চাপুরুষার্থা ইতি বিবেক্তুং প্রকৃতি-পুরুষয়োর্ব্রহ্মশরীরভূতয়োস্তদানীং তথা নির্দ্দেশান-র্হাতিসূক্ষ্মদশাপত্ত্যা ব্রহ্মণৈকীভূতয়োরপি ভেদেন ব্যপদেশঃ, 'তদাত্মানং স্বয়মকুরুত' ইত্যাদি-ভিরৈকার্থ্যাৎ।"

অতএব ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব ও নির্ব্বিকারত্ব প্রতিপাদক শ্রুতিসমূহও উপপন্ন হইতেছে। অতএব ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত ও উপাদান কারণ, (প্রকৃতি নহে)।

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম নিজেকে জগদ্রূপে পরিণত করিলেও তিনি বিকার-প্রাপ্ত হয়েন না ; তাঁহার শরীর-স্থানীয় জড়রূপা প্রকৃতিই (মায়াই) বিকার-প্রাপ্ত হয়। প্রকৃতি ব্রহ্মের শরীর-স্থানীয় বলিয়াই প্রকৃতির পরিণামকে তাঁহারই পরিণাম বলা হইয়াছে। আর, সৃষ্ট-জগতে যত কিছু অনর্থ, তাহাও ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না ; এই সমস্ত অনর্থ জীবের। জীবও তাঁহার শরীর-স্থানীয়।

৬। যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥১।৪।২৭॥

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম। বেদান্ত-বাক্যে ব্রহ্মকে প্রকৃতি বলা হইয়াছে ; সুতরাং

ব্রহ্মই প্রকৃতি বা উপাদান। বেদান্ত-বাক্য যথা। "কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্—তিনি কর্ত্তা, ঈশ বা নিয়ন্তা, পুরুষ (আত্মা), ব্রহ্ম (পূর্ণ), যোনি (প্রকৃতি)", "যদ্ ভূতযোনিং পরিপশ্যন্তি ধীরাঃ—ধীর ব্যক্তিগণ যেই ভূতযোনি (ভূতপ্রকৃতি) ব্রহ্মকে দর্শন করেন"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে "যোনি" বলা হইয়াছে। "যোনি"-শব্দের অর্থ যে প্রকৃতি, ইহা সর্ব্বজনবিদিত। পৃথিবী "যোনিরোষধিবনস্পতীনাম্—পৃথিবী হইতেছে ওষধি ও বনস্পতিদিগের যোনি (উপাদান)।" স্ত্রী-যোনিও অবয়বের দ্বারা গর্ভের উপাদান হয়। কোনও কোনও স্থলে "যোনি"-শব্দের 'স্থান'-অর্থও দৃষ্ট হয়। যথা "যোনিস্তে ইন্দ্র নিষদে অকারি হে ইন্দ্র! আমি তোমার উপবেশনের যোনি (স্থান) প্রস্তুত করিয়াছি।" তথাপি কিন্তু এ-স্থলে "যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ —যেমন, ঊর্ণনাভি (নিজ দেহ হইতে সূত্রের) সৃষ্টি করে এবং পরে (আবার তাহা) গ্রহণও করে"—এই জাতীয় বাক্যশেষ ও তাৎপর্য্য আছে বলিয়া "যোনি"-শব্দের "প্রকৃতি—উপাদান" অর্থই গ্রহণীয়। এইরূপে, লোকে এবং বেদে, সর্ব্বত্রই ব্রহ্মের প্রকৃতিত্বের (উপাদানত্বের) কথাই প্রসিদ্ধ।

যদি বলা যায়—কুম্ভকারাদির দৃষ্টান্তে লৌকিক জগতে দেখা যায়, সঙ্কল্পপূর্ব্বক কর্ত্তৃত্ব কেবল নিমিত্ত-কারণেই সম্ভব, উপাদান-কারণে (মৃত্তিকাদিতে) সঙ্কল্প সম্ভব নয়। ব্রহ্ম যখন সঙ্কল্পপূর্ব্বক সৃষ্টিকার্য্য করিয়াছেন, তখন তিনি নিমিত্ত-কারণ হইতে পারেন; কিন্তু উপাদান-কারণ কিরূপে হইতে পারেন ?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—শ্রুতিবাক্যের অর্থ লৌকিক দৃষ্টান্তের অনুসরণে করা সঙ্গত নয়; আবার শ্রুতিবাক্যের অর্থ অনুমানগম্যও নহে। ইহা কেবল শব্দগম্য (শাস্ত্রগম্য); সুতরাং শাস্ত্রে শাস্ত্রানুরূপ অর্থই গ্রহণীয়। "ন লোকবদিহ ভবিতব্যম্। ন হ্যয়মনুমানগম্যোঽর্থঃ। শব্দগম্যত্বাত্তু অস্যার্থস্য যথাশব্দমিহ ভবিতব্যম্।" শাস্ত্র সেই ঈক্ষণকর্ত্তা (সঙ্কল্পকর্ত্তা) ঈশ্বরকে প্রকৃতি-কারণ (উপাদান-কারণ) বলিয়াছেন; সুতরাং তিনিই উপাদান-কারণ। একথা পূর্ব্বে অনেকবার বলা হইয়াছে; পরেও ইহা বিস্তৃতরূপে প্রতিপাদিত হইবে।

শ্রীপাদ রামানুজও উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন।

এই অনুচ্ছেদে আলোচিত পাঁচটী ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা গেল—ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণও।

চতুর্থ অধ্যায়

বৈদিকী মায়া ও সৃষ্টি

১১। সৃষ্টিকার্য্যে বৈদিকী মায়ার সম্বন্ধ আছে কিনা

পূর্ব্ব অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, সৃষ্টি-ব্যাপারে পরব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ—উভয়ই। অন্য কোনও নিমিত্ত নাই, অন্য কোনও উপাদানও নাই।

ব্রহ্ম হইতেছেন চিদেকমাত্র বস্তু; তাঁহাতে অচিৎ বা জড় বস্তুর স্পর্শও নাই। কিন্তু এই জগতে অচিৎ বা জড় বস্তুও দৃষ্ট হয়। পঞ্চ মহাভূত,পঞ্চ তন্মাত্রাদি সমস্তই অচিৎ বা জড়। একমাত্র ব্রহ্মই যদি জগতের উপাদান-কারণ হয়েন, তাহা হইলে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে অচিৎ বা জড় বস্তু কোথা হইতে আসিল ?

একমাত্র অচিৎ বা জড় বস্তু হইতেছে ব্রহ্মের বহিরঙ্গা ত্রিগুণাত্মিকা মায়া-শক্তি। জগতে যখন জড়বস্তুও দৃষ্ট হয়, তখন ইহাই অনুমিত হইতে পারে যে, বহিরঙ্গা মায়া-শক্তিও জগতের উপাদানভূত। সুতরাং একমাত্র পরব্রহ্মকেই জগতের উপাদান-কারণ বলা কিরূপে সঙ্গত হইতে পারে ?

আবার, "তস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ, তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সংনিরুদ্ধঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৪।৯ ॥"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সৃষ্ট জগতে মায়া জীবকে আবদ্ধ করে। অচেতনা মায়া কার্য্যসামর্থ্যহীনা; তথাপি কিরূপে চেতন জীবকে আবদ্ধ করে? আবার, সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে জীবকে আবদ্ধ করার কর্তৃত্ব যখন মায়ার, তখন ইহাও অনুমিত হইতে পারে যে, মায়ার নিমিত্ত-কারণত্বও আছে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে একমাত্র ব্রহ্মকেই বা কিরূপে নিমিত্ত-কারণ বলা সঙ্গত হয় ?

এইরূপে দেখা যায়, সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে ব্রহ্ম-শক্তি—সুতরাং বৈদিকী—মায়ার সম্বন্ধ আছে; উপাদান-কারণরূপেও সম্বন্ধ অনুমিত হয় এবং নিমিত্ত-কারণরূপেও সম্বন্ধ অনুমিত হয়। এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে—সৃষ্টির সহিত মায়ার বাস্তবিক কোনও সম্বন্ধ আছে কিনা ? থাকিলে, সেই সম্বন্ধের স্বরূপ কি ?

পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে এই বিষয়টী আলোচিত হইতেছে।

১২। সৃষ্টিকার্য্যে বৈদিকী মায়ার সম্বন্ধ আছে

সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের সহিত যখন সৃষ্টিকার্য্যের সম্বন্ধ আছে, তখন তাঁহার সমস্ত শক্তির

সহিত সৃষ্টিকার্য্যের সম্বন্ধ থাকা অস্বাভাবিক নহে। তাঁহার অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি (বা পরাশক্তি, বা স্বরূপ-শক্তি), বহিরঙ্গা মায়া শক্তি এবং জীবশক্তি। এই সমস্তের সহিতই যে সৃষ্টিকার্য্যের বা সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ আছে, শাস্ত্র হইতে তাহা জানা যায়।

ক। **ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধ।** শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম সঙ্কল্পপূর্ব্বক সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়াছেন। কেবল সৃষ্টি-সঙ্কল্পকর্ত্তা এবং সৃষ্টিকর্ত্তা হিসাবেই যে সৃষ্টিকার্য্যের সহিত তাঁহার সম্বন্ধ, তাহাই নহে। শ্রুতি বলেন—জগতের সৃষ্টি করিয়া তিনি তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়াছেন। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ।" বৃহদারণ্যক-শ্রুতি "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ * * * যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি ॥৩।৭।৩॥"-বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া "যো রেতসি তিষ্ঠন্ * * * যো রেতোঽন্তরো যময়তি ॥৩।৭।২৩॥"-বাক্য পর্য্যন্ত একুশটী বাক্যে বলিয়াছেন—পৃথিবী, জল, অগ্নি, অন্তরিক্ষ, বায়ু, স্বর্গ, আদিত্য, দিক্ সমূহ, চন্দ্রতারকা, আকাশ, (ভূতাকাশ), অন্ধকার, তেজঃ, ভূতসমূহ, প্রাণ, বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, মনঃ, ত্বক্, বিজ্ঞান (বুদ্ধি) এবং রেতঃ-এই সমস্তের প্রত্যেকটীর মধ্যেই অবস্থান করিয়া ব্রহ্ম প্রত্যেকটীকেই নিয়ন্ত্রিত করেন। "তৎ সর্ব্বমভবৎ ॥ বৃহদারণ্যক ॥১।৪।১০॥"-বাক্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্মই এই সমস্ত (জগৎ) হইয়াছেন।

এইরূপে শ্রুতি হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম সঙ্কল্পপূর্ব্বক জগতের সমস্ত বস্তুরূপে নিজেকে পরিণত করিয়াছেন এবং সমস্ত বস্তুর অভ্যন্তরে থাকিয়া আবার সমস্ত বস্তুকে নিয়ন্ত্রিত করিতেছেন। সুতরাং সৃষ্টিকার্য্যের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ অত্যন্ত ব্যাপক।

খ। **চিচ্ছক্তির সহিত সম্বন্ধ।** "সোঽকাময়ত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি। স তপোঽতপ্যত তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ॥ ৬।১ ॥", "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।২।৩॥", "স ঈক্ষাঞ্চক্রে ॥ প্রশ্ন ॥৬।৩॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্টি করার নিমিত্ত পরব্রহ্ম ইচ্ছা করিয়াছিলেন, সঙ্কল্প করিয়াছিলেন, ঈক্ষণ করিয়াছিলেন। এই ইচ্ছার বা সঙ্কল্পের বা ঈক্ষণের কর্ত্তৃত্ব-শক্তি যে তাঁহারই নিজস্বা শক্তি, তাঁহারই স্বরূপের অন্তর্ভূর্তা শক্তি—ইহা স্বীকার করিতেই হইবে; কেননা তাঁহার বহির্দ্দেশে অবস্থিতা কোনও শক্তি তাঁহার মধ্যে ইচ্ছাদি জাগাইতে পারে না। একমাত্র চিচ্ছক্তিই হইতেছে পরব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিতা শক্তি। সুতরাং তাঁহার ঈক্ষণাদির কর্ত্তৃত্ব যে চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত, তাহাই জানা গেল।

"একোঽহং বহু স্যাম্"-এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য শ্রীমদ্ভাগবতে পরিস্ফুট করিয়া বলা হইয়াছে। তাহা হইতে জানা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বে পরব্রহ্ম ভগবান্ একাই ছিলেন। "ভগবানেক আসেদমগ্র ॥ শ্রীভা, ৩।৫।২৩॥ আত্মৈবেদমগ্র আসীৎ পুরুষবিধঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥১।৪।১॥" তিনি দৃষ্টি করিয়া তাঁহার অতিরিক্ত অন্য কিছু দেখিতে পাইলেন না। "স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্। শ্রীভা, ৩।৫।২৪॥ সোঽনুবীক্ষ্য নান্যদাত্মনোঽপশ্যৎ ॥ বৃহদারণ্যক ॥১।৪।১॥" কেননা, সমস্তই তাঁহার সঙ্গে এক হইয়া রহিয়াছে। তখন তাঁহার মায়াশক্তি সুপ্তা (সাম্যাবস্থাপন্না) ছিল; কিন্তু তাঁহার দৃষ্টি

বা চিচ্ছক্তি অসুপ্তা ছিল। "সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্ ॥শ্রীভা, ৩।৫।২৪॥ টীকা—সুপ্তাঃ মায়াদ্যাঃ শক্তয়ো যস্য সঃ। অসুপ্তা দৃক্ চিচ্ছক্তি র্যস্যেতি॥ শ্রীধরস্বামিপাদ॥ শক্তির্মায়া। দৃক্ চিচ্ছক্তিঃ স্বরূপভূতান্তরঙ্গশক্তিরিত্যর্থঃ ॥শ্রীজীবগোস্বামী॥"

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—সৃষ্টির পূর্ব্বে মায়াশক্তি সুপ্তা ছিল; কিন্তু পরব্রহ্মের স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তি জাগ্রতা ছিল। এই চিচ্ছক্তির প্রভাবেই তিনি সঙ্কল্প বা ঈক্ষণাদি করিয়াছিলেন। ইহা হইতে জানা যায়—সৃষ্টিসংক্রান্ত ঈক্ষণাদিতে পরব্রহ্মের চিচ্ছক্তিরও সম্বন্ধ বিদ্যমান।

ঈক্ষণাদির পরে, পরব্রহ্ম যে সৃষ্টি করিলেন, তাহাও তাঁহার স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তির দ্বারাই। সৃষ্টিকার্য্যে মায়াশক্ত্যাদির সহায়তা আনুষঙ্গিক ভাবে গ্রহণ করা হইলেও পরব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপভূতা চিচ্ছক্তিদ্বারাই সমস্ত কার্য্য করেন, মায়াশক্ত্যাদির সহায়তা গ্রহণও চিচ্ছক্তিদ্বারাই সাধিত হয়। এই রূপে জানা গেল –সৃষ্টিকার্য্যেও চিচ্ছক্তির সম্বন্ধ বিদ্যমান। সৃষ্টিকার্য্যে চিচ্ছক্তির সম্বন্ধও কিরূপ ব্যাপক ভাবে বিদ্যমান, পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহা আরও পরিস্ফুট হইবে।

গ। জীবশক্তির সহিত সম্বন্ধ

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।৩।২॥"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম জীবাত্মারূপে ক্ষিত্যপ্‌তেজ আদিতে প্রবেশ করিয়া নামরূপ অভিব্যক্ত করিয়াছেন। জীবাত্মা হইতেছে পরব্রহ্মের জীবশক্তিরই অংশ। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে সৃষ্টিকার্য্যের এবং সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডের সহিত জীবশক্তির সম্বন্ধের কথা জানা যায়।

"অপরেহয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ॥ গীতা ৭।৫॥", "মমৈবাংশো জীবলোকে জীবভূতঃ সনাতনঃ॥ গীতা॥ ১৫।৭॥"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা-বাক্য হইতেও সৃষ্টিকার্য্যের সহিত জীবশক্তির সম্বন্ধের কথা জানা যায়।

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, সুপ্তা মায়া বিক্ষুব্ধা হইলে ভগবান্, মহাপ্রলয়ে তাঁহাতে লীন জীবাত্মাকে বিক্ষুব্ধা মায়াতে নিক্ষেপ করেন।

কালবৃত্ত্যাতু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্ ॥শ্রীভা, ৩।৫।২৬॥"

[**টীকা**। বীর্যম্ জীবাখ্যমাধত্ত। 'হন্তেমাস্তিস্রোদেবতাঃ (ছান্দোগ্য।৬।৩।২) ইত্যাদি শ্রুতেঃ॥ শ্রীজীবগোস্বামী॥ বীর্য্যং চিদাভাসম্ আধত্ত। বীর্য্যবান্ চিচ্ছক্তিবান্॥ শ্রীধরস্বামিপাদ॥ বীর্য্যম্ চিদাভাসাখ্যং জীবশক্তিম্॥ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী॥]

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও ইহাই জানা যায়।

"দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥১।৫।৫৭॥

সেই পুরুষ মায়া-পানে করে অবধান।
প্রকৃতি ক্ষোভিত করি করে বীর্য্যাধান॥
স্বাঙ্গবিশেষাভাসরূপে প্রকৃতিস্পর্শন।
জীবরূপ বীজ তাতে কৈল সমর্পণ॥২।২০।২৩৩-৩৪॥"

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও উল্লিখিতরূপ কথা জানা যায়।

"মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্।
সম্ভবঃ সর্ব্বভূতানাং ততো ভবতি ভারত॥
সর্ব্বযোনিষু কৌন্তেয় মূর্ত্তয়ঃ সম্ভবন্তি যাঃ।
তাসাং ব্রহ্ম মহদ্ যোনিরহং বীজপ্রদঃ পিতা॥১৪।৩-৪॥

—(পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন) মহদ্ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি বা মায়া) আমার যোনিস্বরূপ, আমি তাহাতে গর্ভাধান করি। হে ভারত! তাহা হইতেই সমস্ত ভূতের উৎপত্তি হইয়া থাকে। হে কৌন্তেয়! (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) সকল যোনিতে যে সকল মূর্ত্তি সমুৎপন্ন হয়, মহদ্ ব্রহ্ম (অর্থাৎ প্রকৃতি) তাহাদের যোনি (মাতৃস্থানীয়া) এবং আমি বীজদাতা পিতা।"

টীকা। মম স্বভূতা মদীয়া মায়া ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির্যোনিঃ সর্ব্বভূতানাং সর্ব্বকার্য্যেভ্যো মহত্ত্বাৎ ভরণার্চ্চ স্ববিকারাণাং মহদ্ব্রহ্মেতি যোনিরেব বিশেষ্যতে॥ শ্রীপাদ শঙ্কর॥ 'ইতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতামিতি' চেতনপুঞ্জরূপা যা প্রকৃতির্নির্দ্দিষ্টা সেহ সকলপ্রাণিবীজতয়া গর্ভশব্দেন উচ্যতে। তস্মিন্নচেতনে যোনিভূতে মহতি ব্রহ্মণি চেতনপুঞ্জরূপং গর্ভং দধামি। শ্রীপাদ রামানুজ॥ গর্ভং জগদ্বিস্তারহেতুং চিদাভাসম্॥ শ্রীধরস্বামিপাদ॥ গর্ভং পরমাণুচৈতন্যরাশিম্॥ শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ।

এই সমস্ত টীকা হইতে জানা গেল—শ্লোকোক্ত "গর্ভ" এবং "বীজ" শব্দদ্বয়ে জীবাত্মাকে এবং "মহদ্ ব্রহ্ম"-শব্দে জড়রূপা প্রকৃতি বা মায়াকে বুঝাইতেছে।

সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে অনন্তকোটী জীবের অস্তিত্বও সৃষ্টিকার্য্যের সহিত জীবশক্তির সম্বন্ধের পরিচায়ক।

এইরূপে দেখা গেল—সৃষ্টিকার্য্যের সহিত পরব্রহ্মের জীবশক্তিরও সম্বন্ধ আছে।

ঘ। মায়াশক্তির সহিত সম্বন্ধ

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জগতের সহিত মায়ার দুই রকমের সম্বন্ধের কথা জানা যায়—উপাদান-রূপে এবং নিমিত্তরূপে।

উপাদানরূপে সম্বন্ধ

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥ শ্বেতাশ্বতর॥৪।১০॥" এই শ্রুতিবাক্যে মায়াকে প্রকৃতি বা জগতের উপাদান বলা হইয়াছে।

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥গীতা॥৭।৪॥

—(পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন) ভূমি, জল, বায়ু, অগ্নি, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি (মায়া) বিভক্ত হইয়াছে।"

ভূমি, জল-ইত্যাদি হইতেছে জগতের উপাদান। সুতরাং এই গীতাবাক্যেও বহিরঙ্গা মায়াকে জগতের উপাদান বলা হইয়াছে।

"মম যোনির্মহদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি গীতা-(১৪।৩) বাক্যে মহদ্ব্রহ্মকে (মায়াকে) জগতের "যোনি" বলা হইয়াছে। তাহাতেও মায়ার উপাদানত্বই সূচিত হইতেছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ঙ-অনুচ্ছেদে 'যোনিশ্চ হি গীয়তে ॥১।৪।২৭॥-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য দ্রষ্টব্য)।

নিমিত্তরূপে সম্বন্ধ

"অজামেকাং লোহিতশুক্লকৃষ্ণাং বহ্বীঃ প্রজাঃ সৃজমানাং সরূপাঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৪।৫॥"-এই শ্রুতিবাক্যে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিকে (মায়াকে) বহু প্রজার সৃষ্টিকারিণী বলা হইয়াছে।

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১।৪।২৩॥"-এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ মন্ত্রিকোপনিষদের একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন—

"বিকারজননীমজ্ঞামষ্টরূপামজাং ধ্রুবাম্"-ইত্যাদি।

এই বাক্যে মায়াকে "জনিত্রী ভূতভাবিনী" বলা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ১০ক-অনুচ্ছেদে সমগ্র বাক্য এবং তাহার অনুবাদ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতেও জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—

ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ॥৯।১০॥

—আমার অধ্যক্ষতায় প্রকৃতি (মায়া) চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) বিশ্বের সৃষ্টি করে।"

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ গীতা ॥১৮।৬১॥

—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর ভূতসমূহকে যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন।"

"ত্রিভির্গুণময়ৈর্ভাবৈরেভিঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
মোহিতং নাভিজানাতি মামেভ্যঃ পরমব্যয়ম্ ॥ গীতা ॥৭।১৩॥

—(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন) এই ত্রিগুণময় ভাবের দ্বারা (ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার দ্বারা) সমস্ত জগৎ (জীবসমূহ) মোহিত। এজন্য, এই সমস্ত গুণের ঊর্দ্ধে অবস্থিত অব্যয় আমাকে জানিতে পারে না।"

উল্লিখিত গীতা-শ্লোকদ্বয় হইতে জানা গেল—মায়া জগতের জীবকে মোহিত করিয়া সংসারে নানাবিধ কাজ করাইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা গেল—সৃষ্টিকার্য্যের বা সৃষ্ট-ব্রহ্মাণ্ডের সহিত মায়ার সম্বন্ধও অত্যন্ত ব্যাপক।

১৩। সৃষ্টিকার্য্যে বৈদিকী মায়ার সম্বন্ধের স্বরূপ

পূর্ব্ববর্ত্তী ১২ঘ-অনুচ্ছেদে শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণবলে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, উপাদান-কারণরূপে এবং নিমিত্ত-কারণরূপেও সৃষ্টিকার্য্যের সহিত মায়ার সম্বন্ধ বিদ্যমান। কিন্তু একমাত্র ব্রহ্মই যে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু ব্রহ্ম এবং মায়া এই দুই বস্তুর প্রত্যেকেই কিরূপে একই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণও হইতে পারে?

সংক্ষেপে এই প্রশ্নের উত্তর এই যে—ব্রহ্মই হইতেছেন মুখ্য নিমিত্ত-কারণ এবং মুখ্য উপাদান-কারণ ; মায়া হইতেছে গৌণ নিমিত্ত-কারণ এবং গৌণ উপাদান-কারণ। এক্ষণে তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

মায়া যে মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না, তাহার হেতু এই। যিনি সঙ্কল্পপূর্ব্বক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন এবং কর্ম্ম করার সামর্থ্যও যাঁহার আছে, তিনিই মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হইতে পারেন। মায়া জড়রূপা বলিয়া অচেতনা ; সুতরাং তাহার সঙ্কল্প করার সামর্থ্যও থাকিতে পারে না, কর্ম্ম করার সামর্থ্যও থাকিতে পারে না। এজন্য মায়া মুখ্য নিমিত্ত-কারণ হইতে পারে না। ভগবান্ পরব্রহ্ম মায়া দ্বারা সৃষ্টির কার্য্য করাইয়া থাকেন। এজন্য মায়া গৌণ-নিমিত্ত-কারণ মাত্র ; কুম্ভকারের চক্র-দণ্ডাদির ন্যায় সহায়ক-কারণ মাত্র।

মায়া যে মুখ্য উপাদান-কারণও হইতে পারে না, তাহার হেতু এই। সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার এই তিনটী গুণই জগতের যাবতীয় বস্তুর উপাদান বলিয়া পরিগণিত। জগতে অনন্ত প্রকারের বস্তু দৃষ্ট হয়—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, ব্যোম ; অনন্ত প্রকার প্রাণীর অনন্ত প্রকার দেহ ; অনন্ত প্রকার জীবের অনন্ত প্রকার ভোগ্যবস্তু ; গ্রহ, নক্ষত্রাদি। এই সমস্ত অনন্ত প্রকার বস্তুর অনন্ত প্রকার উপাদান। মৃত্তিকা, জল, আকাশ, বাতাস, স্বর্ণ, রৌপ্য, কাংস্য, তাম্র, কাষ্ঠ-আদি প্রত্যেক বস্তুর উপাদানই অন্য বস্তু হইতে ভিন্ন। কিন্তু দৃশ্যমানরূপে এই অনন্ত প্রকার উপাদানের মূল হইতেছে মায়ার পূর্ব্বোল্লিখিত গুণত্রয়। এই গুণত্রয়ের বিভিন্ন পরিমাণের সমবায়ে বা বিভিন্ন প্রকারের সম্মিলনেই দৃশ্যমান বিভিন্ন উপাদানের উৎপত্তি। কিন্তু গুণত্রয় অচেতন জড় বস্তু বলিয়া আপনা-আপনি পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না, বিভিন্ন পরিমাণ নির্ণয়ের সামর্থ্যও তাহাদের থাকিতে পারে না। সুতরাং আপনা-আপনি তাহারা নিজেদিগকে উপাদানরূপে পরিণত করিতে

পারে না। বাহিরের কোনও চেতনাময়ী শক্তিই তাহাদিগকে বিভিন্ন প্রকারে সম্মিলিত করিতে এবং যথোপযোগী ভাবে তাহাদের পরিমাণ নির্ণয় করিতে পারে—সুতরাং তাহাদিগকে উপাদানত্ব দান করিতেও পারে। এই চেতনাময়ী শক্তি হইতেছে পরব্রহ্মেরই শক্তি। পরব্রহ্মের এই চেতনাময়ী শক্তির আনুকূল্য ব্যতীত মায়ার গুণত্রয় উপাদানত্ব লাভ করিতে পারেনা বলিয়াই মায়া হইতেছে গৌণ উপাদান এবং ঐ চেতনাময়ী শক্তিই হইতেছে মুখ্য উপাদান-কারণ।

প্রশ্ন হইতে পারে—চেতনাময়ী শক্তির আনুকূল্য ব্যতীত মায়া বা মায়ার গুণত্রয় যেমন জগতের উপাদানত্ব লাভ করিতে পারে না, তেমনি গুণত্রয় ব্যতীতও চেতনাময়ী শক্তি নিজে উপাদান হইতে পারে না। এই অবস্থায়, উপাদানত্ব-বিষয়ে উভয়েই তুল্য। উভয়ে তুল্য বলিয়া একটীকে মুখ্য এবং অপরটীকে গৌণ উপাদান বলার হেতু কি থাকিতে পারে? গুণত্রয়ের সহযোগ ব্যতীতও যদি চেতনাময়ী শক্তি নিজেকে উপাদানরূপে পরিণত করিতে পারিত, তাহা হইলেই তাহাকে মুখ্য উপাদান-কারণ বলা সঙ্গত হইত।

ইহার উত্তর এই। চেতনাময়ী শক্তির সহযোগিতাব্যতীত মায়ার উপাদানত্ব সম্ভব হয় না; কিন্তু মায়ার সহযোগিতা ব্যতীতও যে চেতনাময়ী চিচ্ছক্তি উপাদানরূপে পরিণত হইতে পারে, তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। চিন্ময় ভগবদ্ধামে জড়রূপা বহিরঙ্গা মায়ার গতি নাই। ভগবদ্ধামে যত কিছু বস্তু আছে, সমস্তই চেতনাময়ী চিচ্ছক্তির বিলাস (১।১।৯৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এজন্যই চেতনাময়ী চিচ্ছক্তির মুখ্য উপাদানত্ব। এই চেতনাময়ী শক্তি পরব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া বাস্তব মুখ্য উপাদানত্ব পরব্রহ্মেরই।

সৃষ্টিব্যাপারে সর্ব্বশক্তিমান্ ব্রহ্মের পক্ষে মায়ার সহযোগিতা-গ্রহণের প্রয়োজন

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—পরব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বশক্তিমান্, সত্যসঙ্কল্প, স্বতন্ত্র এবং অন্য-নিরপেক্ষ। সৃষ্টিব্যাপারে তাঁহার পক্ষে বহিরঙ্গা মায়ার সহযোগিতা-গ্রহণের কি প্রয়োজন থাকিতে পারে?

উত্তর এই। সর্ব্বশক্তিমান্ সত্যসঙ্কল্প ভগবান্ পরব্রহ্ম মায়ার সহযোগিতাব্যতীতও যে ইচ্ছা মাত্র অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করিতে পারেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। তথাপি যে তিনি মায়ার সহযোগিতা গ্রহণ করেন, তাহার হেতু—সৃষ্টিকার্য্যে একক তাঁহার অসামর্থ্য নহে; তাহার হেতু হইতেছে—অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের কর্ম্মফল-ভোগের আনুকূল্য-বিধান।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১২-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—সৃষ্ট জগতে জীবাত্মারও সম্বন্ধ আছে। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মফল ভোগের জন্য সৃষ্ট জগতে আসিয়া পড়ে; কর্ম্মফল ভোগ করাইয়া কর্ম্মফলের লাঘব ঘটাইবার উদ্দেশ্যেই পরম-করুণ ভগবান্ বহির্ম্মুখ জীবকে বিক্ষুব্ধা প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করেন। জীবের কর্ম্ম জড়, কর্ম্মফলও জড়। জড় কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী ভোগ্য বস্তুও জড়ই হইতে হইবে। আবার, যে দেহেন্দ্রিয়াদির সহায়তায় জীব জড় ভোগ্য বস্তু ভোগ করিবে, তাহাও হইতে হইবে জড়; কেননা, জড় বস্তু জড়াতীত ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য হইতে পারে না। চিদ্‌বস্তুও জড়

ইন্দ্রিয়ের ভোগ্য হইতে পারে না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর।" এজন্য, অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবকে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে জড় দেহেন্দ্রিয় দেওয়ার প্রয়োজন। জড় ভোগ্য বস্তু এবং জড় দেহেন্দ্রিয়াদির উপাদানও হইবে জড়—জড়রূপা ত্রিগুণাত্মিকা মায়ার জড়গুণত্রয়। এজন্য গৌণ উপাদানরূপে মায়ার সহযোগিতা গ্রহণের প্রয়োজন।

আবার, জড় ভোগ্যবস্তু উপভোগের উপযোগী কর্ম্মে বহির্ম্মুখ জীবকে প্রবর্ত্তিত করার জন্যও বহির্ম্মুখা জড়রূপা শক্তিরই প্রয়োজন। কেবলমাত্র চেতনাময়ী শক্তির দ্বারা তাহা সম্ভবপর হয় না; কেননা. চেতনাময়ী চিচ্ছক্তির একমাত্র গতি হইতেছে ভগবান্ পরব্রহ্মের দিকে ; বাহিরের ইন্দ্রিয়-ভোগ্য জড়বস্তুর দিকে তাহার গতি নাই, থাকিতেও পারে না। চেতনাময়ী শক্তিই জড়রূপা মায়া শক্তিকে কার্য্যসামর্থ্য দান করিয়া তাহা দ্বারা বহির্ম্মুখ জীবকে ভোগ্যবস্তু উপভোগের উপযোগী কর্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া থাকে। এজন্য, গৌণ নিমিত্ত-কারণরূপেও মায়ার সহযোগিতা গ্রহণের প্রয়োজন।

পরব্রহ্মের শক্তিতেই যে জড়রূপা মায়া সৃষ্টিসম্বন্ধি কার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে, শাস্ত্রে তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে কয়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

"ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্। গীতা ॥৯।১০॥

—আমার অধ্যক্ষতাতে প্রকৃতি (মায়া) চরাচর (স্থাবর-জঙ্গমাত্মক) বিশ্বের সৃষ্টি করে।"

অধ্যক্ষের নিয়ন্ত্রণেই লোক কার্য্য করিয়া থাকে। মায়াও পরব্রহ্মের নিয়ন্ত্রণাধীনেই সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। জড়রূপা মায়ার নিজের কার্য্যসাধক সামর্থ্য নাই বলিয়া সেই সামর্থ্যও যে পরব্রহ্মরূপ অধ্যক্ষ হইতেই প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ পরব্রহ্মের শক্তিতে কার্য্য-শক্তিমতী হইয়াই যে মায়া সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করে– তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেহর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ গীতা ॥ ১৮।৬১॥

—হে অর্জ্জুন! ভূতসমূহকে যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়া দ্বারা ভ্রমণ করাইয়া (কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া) ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করেন।"

ইহা দ্বারা জানা গেল—মায়ারূপ করণের দ্বারা ঈশ্বরই জীবকে কর্ম্মে প্রবর্ত্তিত করাইয়া থাকেন। অর্থাৎ ঈশ্বরের শক্তিতে সামর্থ্যবতী হইয়াই জড়রূপা মায়া জীবকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন—

"জগত-কারণ নহে প্রকৃতি জড়রূপা।
শক্তি সঞ্চারিয়া তারে কৃষ্ণ করে কৃপা॥

কৃষ্ণশক্ত্যে প্রকৃতি হয় গৌণ কারণ।
অগ্নি-শক্ত্যে লৌহ যৈছে করয়ে জারণ॥
অতএব কৃষ্ণ মূল জগত কারণ।
প্রকৃতি কারণ যৈছে অজাগল-স্তন॥
মায়া-অংশে কহি তারে নিমিত্ত-কারণ।
সেহো নহে, যাতে কর্ত্তা-হেতু নারায়ণ॥
ঘটের নিমিত্ত-হেতু যৈছে কুম্ভকার।
তৈছে জগতের কর্ত্তা পুরুষাবতার॥
কৃষ্ণ কর্ত্তা, মায়া তার করেন সহায়।
ঘটের কারণ চক্র-দণ্ডাদি উপায়॥　　—শ্রী চৈ, চ, ১।৫।৫১-৫৬॥"

পঞ্চম অধ্যায়
সৃষ্টি

১৪। পঞ্চ অনাদি তত্ত্ব

প্রভুপাদ সত্যানন্দ গোস্বামি-সম্পাদিত তত্ত্বসন্দর্ভের ৩৪-অনুচ্ছেদের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ পাঁচটী অনাদি তত্ত্বের উল্লেখ করিয়াছেন—ব্রহ্ম, জীব, মায়া, কাল এবং কর্ম্ম। ব্রহ্ম, জীব এবং মায়ার অনাদিত্বের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এক্ষণে কাল ও কর্ম্ম সম্বন্ধে বিদ্যাভূষণপাদ যে প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত হইতেছে।

"অথাহ বাব নিত্যানি পুরুষঃ প্রকৃতিরাত্মা কালঃ"-ইত্যেবং ভাল্লবেয়শ্রুতেঃ।—ভাল্লবেয় শ্রুতি বলেন, পুরুষ (জীব), প্রকৃতি (মায়া), আত্মা (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) এবং কাল—এই সকলই নিত্য (সুতরাং অনাদি)।'

বিষ্ণুপুরাণের শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াও তিনি উল্লিখিত চারিটী তত্ত্বের অনাদিত্ব দেখাইয়াছেন। তাহার পরে লিখিয়াছেন—"তেষ্বীশ্বরঃ স্বতন্ত্রঃ, জীবাদয়স্তু তচ্ছক্তয়োঽস্বতন্ত্রাঃ—উক্ত চারিটী তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বর (ব্রহ্ম) হইতেছেন স্বতন্ত্র, জীবাদি তাঁহার শক্তিসমূহ কিন্তু অস্বতন্ত্র অর্থাৎ ঈশ্বরাধীন।" বিষ্ণুপুরাণ এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে তাঁহার এই উক্তির সমর্থক প্রমাণও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ইহার পরে বিদ্যাভূষণপাদ লিখিয়াছেন—"তত্র বিভুবিজ্ঞানমীশ্বরঃ, অণুবিজ্ঞানং জীবঃ। উভয়ং নিত্যজ্ঞানগুণকম্। সত্ত্বাদিগুণত্রয়বিশিষ্টং জড়ং দ্রব্যং মায়া। গুণত্রয়শূন্যং ভূতবর্ত্তমানাদি-ব্যবহারকারণং জড়ং দ্রব্যং তু কালঃ। কর্ম্মাপ্যনাদিবিনাশি চাস্তি।—ঈশ্বর হইতেছেন বিভুবিজ্ঞান, জীব অণুবিজ্ঞান। উভয়েই নিত্যজ্ঞানগুণবিশিষ্ট। সত্ত্বাদি-গুণত্রয়বিশিষ্ট জড় দ্রব্য হইতেছে মায়া। সত্ত্বাদিগুণত্রয়শূন্য এবং অতীত-বর্ত্তমানাদি-ব্যবহারের কারণস্বরূপ জড়দ্রব্যবিশেষ হইতেছে কাল। কর্ম্মও আছে; কর্ম্ম অনাদি বটে, কিন্তু বিনাশী।" কর্ম্ম হইতেছে অদৃষ্ট।

কর্ম্মের অনাদিত্ব-সম্বন্ধে তিনি "ন কর্ম্মাবিভাগাৎ ইতি চেৎ, ন অনাদিত্বাৎ ॥২।১।৩৫॥"-ব্রহ্মসূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন।

এইরূপে জানা গেল—ব্রহ্ম, জীব, মায়া, কাল এবং কর্ম্ম (বা অদৃষ্ট), এই পাঁচটী তত্ত্ব হইতেছে অনাদি। প্রথমোক্ত চারিটী তত্ত্ব নিত্য; কিন্তু কর্ম্ম বা অদৃষ্ট অনাদি হইলেও নিত্য নহে; যেহেতু. ইহা বিনাশী।

১৫। সৃষ্টির সহায়

পরব্রহ্মই হইতেছেন সৃষ্টির মূল কারণ। মায়া, জীব, কাল ও কর্ম্ম হইতেছে সৃষ্টির সহায়। এই চারিটী অনাদি তত্ত্ব কিরূপে সৃষ্টির সহায় হয়, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

মায়া। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১৩-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—মায়া হইতেছে সৃষ্টি জগতের গৌণ উপাদান-কারণ এবং গৌণ-নিমিত্ত-কারণ। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।২১-অনুচ্ছেদে, বলা হইয়াছে, মায়ার দুইটী বৃত্তি—গুণমায়া ও জীবমায়া। পরব্রহ্মের শক্তিতে গুণমায়ারূপে মায়া বা প্রকৃতি গৌণ উপাদান-কারণরূপে সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে। আর, পরব্রহ্মের শক্তিতে জীবমায়ারূপে মায়া বা প্রকৃতি গৌণ নিমিত্ত-কারণরূপে সৃষ্টিকার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে—অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের স্বরূপের জ্ঞানকে আবৃত করিয়া, দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুতে জীবকে লিপ্ত করায়।

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে জীবের দেহাদি, জীবের ভোগ্য বস্তু-আদি—এই সমস্তেরই গৌণ উপাদান-কারণ গুণমায়া।

জীব। প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে জীব এবং জীবের ভোগ্য বস্তু—এই দুইয়েরই বাহুল্য। পূর্ব্বসঞ্চিত কর্ম্মের ফল ভোগ করার জন্যই অনাদিবহির্ম্মুখ জীবকে সংসারে আসিতে হয়। জীবশক্তির সহিত যে সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডের সম্বন্ধ আছে, তাহা পূর্ব্বেই (৩।১২গ-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে জীবের অস্তিত্ব এবং ভোক্তৃত্ব হইতেই বুঝা যায়, সৃষ্টিব্যাপারে জীবেরও সহায়তা আছে।

কাল। বস্তুর উৎপাদন-ব্যাপারে কালেরও সহায়তা আবশ্যক। দম্বলযোগে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয় সত্য; কিন্তু দুগ্ধের সহিত দম্বলের যোগ হওয়া মাত্রেই তৎক্ষণাৎ দধি উৎপন্ন হয় না; কিছু সময়ের অপেক্ষা করে। সুতরাং সময় বা কালও দধিতে পরিণতির নিমিত্ত দুগ্ধের সহায়তা করিয়া থাকে। তদ্রূপ, পরব্রহ্মের শক্তিতে মায়া বা প্রকৃতি সৃষ্টির উপযোগী বিভিন্ন বৈচিত্র্য প্রাপ্তির পক্ষেও সময়ের বা কালের অনুকূল্য অপরিহার্য্য। সুতরাং কালও সৃষ্টিকার্য্যাদির একটী সহায়। "কালাদ্‌গুণব্যতিকরঃ ॥ শ্রীভা, ২।৫।২২।।"

কর্ম্ম। কর্ম্মফল ভোগের জন্যই অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডে আসিয়া থাকে। ভোগের উপযোগী দেহব্যতীত কর্ম্মফলের ভোগ সম্ভব নয়। সৃষ্টব্রহ্মাণ্ডে কর্ম্মফল-ভোগের উপযোগী দেহ লাভ করিয়াই জীব কর্ম্মফল ভোগ করিয়া থাকে। বিভিন্ন জীবের কর্ম্ম (বা অদৃষ্ট) বিভিন্ন প্রকারের। তাই বিভিন্ন জীব বিভিন্ন প্রকারের দেহ লাভ করিয়া থাকে—কেহ দেবদেহ, কেহ গন্ধর্ব্বদেহ, কেহ মনুষ্যদেহ, কেহ বা পশু-পক্ষি-তরু-গুল্মাদির দেহ লাভ করিয়া থাকে। প্রত্যেকের ভোগায়তন দেহই হয় তাহার কর্ম্মফলের (অদৃষ্টের) অনুযায়ী। সুতরাং জীবের দেহসৃষ্টির ব্যাপারেও কর্ম্ম বা অদৃষ্ট অপেক্ষণীয়।

আবার, বিভিন্ন জীব যে বিভিন্ন ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকে, সে-সমস্ত বস্তুও কর্ম্মফল অনুসারেই সৃষ্ট হইয়া থাকে। সুতরাং জীবের ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টিব্যাপারেও কর্ম্ম বা অদৃষ্ট অপেক্ষণীয়। এইরূপে দেখা যায়—জীবের কর্ম্ম বা অদৃষ্টও সৃষ্টি-কার্য্যের সহায়তা করিয়া থাকে।

প্রকৃতির স্বভাব। সৃষ্টিব্যাপারে আরও একটী বস্তুর সহায়তার প্রয়োজন; সেই বস্তুটী হইতেছে প্রকৃতির (বা মায়ার) স্বভাব। দম্বল-যোগে দুগ্ধ দধিতে পরিণত হয়; কিন্তু ক্ষীর বা

সন্দেশে পরিণত হয় না। ইহা দুগ্ধের স্বভাব। আবার অম্লযোগে দুগ্ধ ছানাতে পরিণত হয়; কিন্তু সন্দেশে পরিণত হয় না। ইহাও দুগ্ধের স্বভাব। বিশেষ-পরিণামের যোগ্যতাই হইতেছে বস্তুর স্বভাব; যে কোনও বস্তু যে কোনও অপর বস্তুতে পরিণত হয় না। উত্তাপ-যোগে দুগ্ধই ক্ষীরে পরিণত হয়; কিন্তু উত্তাপযোগে জল কখনও ক্ষীরে পরিণত হয় না। প্রকৃতিরও স্বভাব এই যে, ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে পর্য্যায়ক্রমে সৃষ্টির উপযোগী বিশেষ বিশেষ পরিণাম লাভ করিতে পারে। প্রকৃতির এতাদৃশ স্বভাব না থাকিলে সৃষ্টিকার্য্যই সম্ভব হইত না। "কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ ॥ শ্রীভা, ২।৫।২২॥"

এ-স্থলে যে সকল সহায়ের কথা বলা হইল, তত্ত্বতঃ তাহারা পরব্রহ্ম বাসুদেব হইতে ভিন্ন নহে; যেহেতু, এ-সমস্ত তাঁহারই শক্তি ও শক্তির কার্য্য এবং তাঁহা হইতে ভিন্ন কিছুই নাই।

"দ্রব্যং কর্ম্ম চ কালশ্চ স্বভাবো জীব এব চ।
বাসুদেবাৎ পরো ব্রহ্মন্ ন চান্যোঽর্থোঽস্তি তত্ত্বতঃ ॥ —শ্রীভা, ২।৫।১৪ ॥

—(সৃষ্টিলীলা বর্ণন-প্রসঙ্গে ব্রহ্মা নারদের নিকটে বলিয়াছেন) হে ব্রহ্মন্! উপাদানভূত মহাভূতাদি দ্রব্য, জন্মনিমিত্তভূত কর্ম্ম, গুণ-ক্ষোভক কাল, পরিণাম-হেতু স্বভাব এবং ভোক্তা জীব— ইহাদের মধ্যে কোনও বস্তুই বাসুদেব হইতে তত্ত্বতঃ ভিন্ন নহে।"

১৬। সৃষ্টিব্যাপার-সম্বন্ধে প্রারম্ভিক বিবরণ

ক। সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের অব্যবহিত কর্ত্তা—পুরুষাবতার ও গুণাবতার

জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা পরব্রহ্ম হইলেও তিনি স্বয়ংরূপে (অর্থাৎ পরব্রহ্মরূপে) সৃষ্টি-আদি কার্য্য করেন না। তাঁহার অংশ-স্বরূপ পুরুষাবতার এবং গুণাবতার রূপেই তিনি এই সকল কার্য্য করিয়া থাকেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ১।১।৮৭-অনুচ্ছেদে প্রথম পুরুষ বা কারণার্ণবশায়ী নারায়ণ (অপর নাম মহাবিষ্ণু), দ্বিতীয় পুরুষ বা গর্ভোদশায়ী নারায়ণ (অপর নাম গর্ভোদশায়ী বিষ্ণু) এবং তৃতীয় পুরুষ বা ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণ বা ক্ষীরোদশায়ী বিষ্ণু—এই তিন পুরুষাবতারের কথা এবং ১।১।৮৮-অনুচ্ছেদে ব্রহ্মা, বিষ্ণু ও শিব (বা রুদ্র)-এই তিন গুণাবতারের কথা বলা হইয়াছে। সাক্ষাদ্ভাবে বা অব্যবহিত ভাবে ইঁহারাই সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের কর্ত্তা। শ্রুতি-স্মৃতি হইতেই তাহা জানা যায়।

"স ব্রহ্মণা সৃজতি, স রুদ্রেণ বিলাপয়তি॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। বহরমপুর-সংস্করণ॥ ৩৮৬ পৃষ্ঠাধৃত মহোপনিষদ্‌বাক্য॥ —তিনি (পরব্রহ্ম) ব্রহ্মাদ্বারা সৃষ্টি করেন, রুদ্রদ্বারা সংহার করেন।"

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির প্রথম অধ্যায়ের চতুর্থ ব্রাহ্মণেও প্রজাপতি (ব্রহ্মা) কর্তৃক সৃষ্টির কথা বর্ণিত হইয়াছে।

শ্রীমদ্ভাগবতেও ইহার অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

সৃজামি তন্নিযুক্তোঽহং হরো হরতি তদ্বশঃ।
বিশ্বং পুরুষরূপেণ পরিপাতি ত্রিশক্তিধৃক্ ॥২।৬।৩২॥

—(ব্রহ্মা বলিতেছেন) তাঁহাকর্ত্তৃক নিযুক্ত হইয়া আমি বিশ্বের সৃষ্টি করি। তাঁহার বশীভূত হইয়া হর (শিব) বিশ্বের সংহার করেন। সেই ত্রিশক্তিধৃক্ ভগবান্ পুরুষরূপে (ক্ষীরোদশায়ী নারায়ণরূপে) বিশ্বের পরিপালন করেন।"

ব্রহ্মা, বিষ্ণু (ক্ষীরোদশায়ী) এবং শিব—এই তিন গুণাবতারের কার্য্য হইতেছে ব্যষ্টি-সৃষ্টাদি সম্বন্ধে।

ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি-আদি হইতেছে পুরুষাবতারের কার্য্য। তদ্বিষয়ে শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া ॥ শ্রীভা, ১।৩।১॥

—সৃষ্টির আদিতে লোক-সৃষ্টির (সমষ্টি-ব্যষ্ট্যুপাধি-জীব সমূহের সৃষ্টির) ইচ্ছায় ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ ভগবান্ মহদাদির সহিত সম্মিলিত (প্রাকৃত-প্রলয়ে মহদাদি-তত্ত্ব যাহাতে লীন ছিল, সেই) এবং ষোড়শকল (সৃষ্টির উপযোগী পূর্ণশক্তি সম্পন্ন) পৌরুষ রূপ প্রকটিত করিলেন।—শ্রীজীব গোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভটীকানুযায়ী অনুবাদ।"

এই শ্লোকের টীকায় লিখিত হইয়াছে—"বিষ্ণোস্তু ত্রীণি রূপাণি পুরুষাখ্যান্যথো বিদুঃ। একন্তু মহতঃ স্রষ্টৃ দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্। তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থং তানি জ্ঞাত্বা বিমুচ্যতে ॥' ইতি নারদীয়তন্ত্রাদৌ মহৎস্রষ্টৃত্বেন প্রথমং পুরুষ্যাখ্যং রূপং যৎ শ্রূয়তে-(ব্রহ্মসংহিতা ॥৫।১৬॥) 'তস্মিন্নাবির-ভূল্লিঙ্গে মহাবিষ্ণুর্জগৎপতিঃ'-ইত্যাদি, (ব্রহ্মসংহিতা ॥৫।১৮) 'নারায়ণঃ স ভগবানাপস্তস্মাৎ সনাতনাৎ। আবিরাসীৎ কারণার্ণোনিধিঃ সঙ্কর্ষণাত্মকঃ। যোগনিদ্রাং গতস্তস্মিন্ সহস্রাংশঃ স্বয়ং মহান্ ॥' ইত্যাদি ব্রহ্মসংহিতাদৌ কারণার্ণবশায়ি-সঙ্কর্ষণত্বেন শ্রূয়তে, তদেব জগৃহ ইতি প্রতিপাদিতম্।"

নারদীয়তন্ত্রাদির এবং ব্রহ্মসংহিতার প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া এই টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ জানাইলেন যে, উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে যে, পৌরুষ রূপের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন **কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু**। তিনিই **মহত্তত্ত্বের সৃষ্টিকর্ত্তা।**

উল্লিখিত ক্রমসন্দর্ভটীকায় উদ্ধৃত নারদীয়তন্ত্রের বাক্যে "দ্বিতীয়ং ত্বণ্ডসংস্থিতম্"-বাক্যে যে দ্বিতীয় পুরুষের কথা বলা হইয়াছে, তিনি হইতেছেন "অণ্ডসংস্থিত—ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে স্থিত গর্ভোদকশায়ী।" ইনি যে প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ীর দ্বিতীয় ব্যূহ (বা প্রকাশ), শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোক হইতে তাহা জানা যায়।

"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ ॥ শ্রীভা, ১।৩।২॥

—ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভোদকে শয়ান এবং যোগনিদ্রা-বিস্তারকারী যাঁহার (যে প্রথম পুরুষ-কারণার্ণব-শায়ীর—তাঁহার দ্বিতীয়ব্যূহের) নাভিপদ্ম হইতে বিশ্বস্রষ্টৃগণের পতি ব্রহ্মা উৎপন্ন হইলেন।"

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিত হইয়াছে—"যস্য পুরুষরূপস্য দ্বিতীয়েন ব্যূহেন ব্রহ্মাণ্ডং প্রবিশ্যাম্ভসি গর্ভোদকে শয়ানস্যেত্যাদি যোজ্যম্।"

ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ড-সমূহের সৃষ্টি হইলে প্রথম পুরুষ এক এক রূপে প্রতি ব্রহ্মাণ্ডের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ জলমধ্যে শয়ন করেন। প্রথম পুরুষের এই রূপকেই ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় তাঁহার দ্বিতীয় ব্যূহ বলা হইয়াছে। ইনিই **গর্ভোদশায়ী পুরুষ** বা **দ্বিতীয়** পুরুষ। ইঁহার নাভিপদ্ম হইতেই ব্রহ্মার উদ্ভব।

পূর্ব্বোল্লিখিত নারদীয়তন্ত্রের বচনে "তৃতীয়ং সর্ব্বভূতস্থম্"-বাক্যে **তৃতীয় পুরুষের** কথা বলা হইয়াছে। ইনি গর্ভোদশায়ীর এক প্রকাশ; প্রতিজীবের অন্তঃকরণে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীভা, ১।৩।৩-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় মহাভারত-শ্রীমদ্ভাগবতাদির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া পুরুষাবতারসমূহের বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন।

দ্বিতীয় পুরুষের উপলক্ষণে, উল্লিখিত পুরুষত্রয়ের শ্রীবিগ্রহ যে মায়াতীত, অপ্রাকৃত, বিশুদ্ধ-সত্ত্বময়, তাহাও শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন।

"তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমুর্জ্জিতম্ ॥১।৩।৩॥"

ইহার ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বিশুদ্ধং জাড্যাংশেনাপি রহিতম্, স্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বাৎ। উর্জ্জিতং সর্ব্বতো বলবৎ, পরমানন্দরূপত্বাৎ। 'কো হ্যেবান্যাৎ। কঃ প্রাণ্যাদ্ যদ্যেষ আকাশঃ আনন্দো ন স্যাৎ ॥ তৈত্তিরীয়শ্রুতি ॥২।৭।১॥' ইতি শ্রুতেস্তস্মাৎ সাক্ষাদ্ ভগবদ্রূপে তু কৈমুত্যমেবায়াতম্।" এই টীকা হইতে জানা গেল—পুরুষত্রয়ের রূপ বা শ্রীবিগ্রহ হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি,—সুতরাং মায়িক-জড় বিবর্জ্জিত। ইহা পরমানন্দস্বরূপ বলিয়া সর্ব্বতোভাবে বলবান্।

খ। বিরাট্ রূপ

শ্রীমদ্ভাগবতে বিরাট্রূপের বর্ণনা এইরূপ দৃষ্ট হয়ঃ—

"পাতালমেতস্য হি পাদমূলং পঠন্তি পার্ষ্ণিপ্রপদে রসাতলম্।
মহাতলং বিশ্বসৃজোঽথ গুল্ফৌ তলাতলং বৈ পুরুষস্য জঙ্ঘে ॥
দ্বে জানুনী সুতলং বিশ্বমূর্ত্তেরূরুদ্বয়ং বিতলঞ্চাতলঞ্চ।
মহীতলং তজ্জঘনং মহীপতে নভস্তলং নাভিসরো গৃণন্তি ॥
উরঃস্থলং জ্যোতিরনীকমস্য গ্রীবা মহর্বদনং বৈ জনোঽস্য।
তপোররাটীং বিদুরাদিপুংসঃ সত্যন্তু শীর্ষাণি সহস্রশীর্ষ্ণঃ ॥
ইন্দ্রাদয়ো বাহব আহুরুস্রাঃ কর্ণৌ দিশঃ শ্রোত্রমমুষ্য শব্দঃ।
নাসত্যদস্রৌ পরমস্য নাসে ঘ্রাণোঽস্য গন্ধো মুখমগ্নিরিদ্ধঃ ॥

ত্যৌরক্ষিণী চক্ষুরভূৎ পতঙ্গঃ পক্ষ্মাণি বিষ্ণোরহনী উভে চ।
তদ্ভ্রূবিজৃম্ভঃ পরমেষ্ঠিধিষ্ণ্যমাপোঽস্য তালু রস এব জিহ্বা॥
ছন্দাংস্যনন্তস্য শিরো গৃণন্তি দংষ্ট্রা যমঃ স্নেহকলা দ্বিজানি।
হাসো জনোন্মাদকরী চ মায়া দুরন্তসর্গো যদপাঙ্গ মাক্ষঃ॥
ব্রীড়োত্তরৌষ্ঠোঽধর এব লোভো ধর্ম্মঃ স্তনোঽধর্ম্মপথোঽস্য পৃষ্ঠম্।
কস্তস্য মেঢ্রং বৃষণৌ চ মিত্রৌ কুক্ষিঃ সমুদ্রা গিরয়োঽস্থিসজ্ঘাঃ॥
নদ্যোঽস্য নাড্যোঽথ তনূরুহাণি মহীরুহা বিশ্বতনোর্নৃপেন্দ্র।
অনন্তবীর্য্যঃ শ্বসিতং মাতরিশ্বা গতির্বয়ঃ কর্ম্ম গুণপ্রবাহঃ॥
ঈশস্য কেশান্ বিদুরম্বুবাহান্ বাসস্তু সন্ধ্যাং কুরুবর্য্য ভূম্নঃ।
অব্যক্তমাহুর্হৃদয়ং মনশ্চ স চন্দ্রমাঃ সর্ব্ববিকারকোষঃ॥
বিজ্ঞানশক্তিং মহিমামনন্তি সর্ব্বাত্মনোঽন্তঃকরণং গিরিত্রম্।
অশ্বাশ্বতর্য্যুষ্ট্রগজা নখানি সর্ব্বে মৃগাঃ পশবঃ শ্রোণিদেশে॥
বয়াংসি তদ্ব্যাকরণং বিচিত্রং মনুর্মনীষা মনুজো নিবাসঃ।
গন্ধর্ব্ববিদ্যাধরচারণাপ্সরঃস্বরস্মৃতীরসুরানীকবীর্য্যঃ॥
ব্রহ্মাননং ক্ষত্রভুজো মহাত্মা বিড়ূরুরঙ্ঘ্রি শ্রিতকৃষ্ণবর্ণঃ।
নানাভিধাভীজ্যগণোপপন্নো দ্রব্যাত্মকঃ কর্ম্ম বিতানযোগঃ॥ শ্রীভা, ২।১।২৬—৩৭॥

—(মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে শ্রীশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন) এই বিরাট্রূপের পাদমূল হইতেছে পাতাল, রসাতল তাঁহার পদের অগ্র ও পশ্চাদ্ভাগ, মহাতল তাঁহার পদের গুল্ফদেশ এবং তলাতল তাঁহার দুই জঙ্ঘা। সুতল সেই বিশ্বমূর্ত্তির দুইটী জানু এবং বিতল ও অতল তাঁহার দুই উরু, মহীতল তাঁহার জঘন এবং নভোমণ্ডল (ভুবর্লোক) তাঁহার নাভি-সরোবর। জ্যোতিঃসমূহ (স্বর্গলোক) তাঁহার বক্ষঃস্থল, মহর্লোক তাঁহার গ্রীবাদেশ, জনলোক তাঁহার বদন, তপোলোক তাঁহার ললাট এবং সত্যলোক হইতেছে সেই সহস্রশীর্ষ বিষ্ণুমূর্ত্তির শিরোদেশ। ইন্দ্রাদি দেবগণ তাঁহার বাহু, দিক্সকল তাঁহার কর্ণকুহর, শব্দ তাঁহার শ্রবণেন্দ্রিয়, অশ্বিনীকুমারদ্বয় তাঁহার দুই নাসিকা, গন্ধ তাঁহার ঘ্রাণেন্দ্রিয়,, এবং প্রদীপ্ত অনল তাঁহার মুখ। অন্তরীক্ষ তাঁহার নেত্রগোলক, সূর্য্য তাঁহার চক্ষুরিন্দ্রিয়, রাত্রি এবং দিবস তাঁহার চক্ষুর পক্ষ্মসকল, ব্রহ্মপদ তাঁহার ভ্রূবিভঙ্গ, জল তাঁহার তালু (জিহ্বার অধিষ্ঠান) এবং রস তাঁহার জিহ্বা। বেদ সকল তাঁহার শিরঃ (ব্রহ্মরন্ধ্র), যম তাঁহার দন্তপংক্তি, পুত্রাদি-স্নেহকলা তাঁহার দন্তসমূহ, লোকসকলকে উন্মত্তকারিণী মায়া তাঁহার হাস্য এবং অপার সংসার তাঁহার কটাক্ষ। ব্রীড়া তাঁহার উত্তরৌষ্ঠ, লোভ তাঁহার অধর, ধর্ম্ম তাঁহার স্তন, অধর্ম্মমার্গ তাঁহার পৃষ্ঠভাগ, প্রজাপতি তাঁহার মেঢ্র, মিত্রাবরুণ তাঁহার দুই বৃষণ, সমুদ্রসকল তাঁহার কুক্ষিদেশ এবং পর্ব্বতসকল তাঁহার অস্থি। নদী সকল তাঁহার নাড়ী, বৃক্ষসকল তাঁহার রোম,

অনন্তবীর্য্য বায়ু তাঁহার নিশ্বাস, বয়ঃ (কাল) তাঁহার গতি, প্রাণিগণের সংসার তাঁহার কর্ম্ম বা ক্রীড়া। মেঘসকল তাঁহার কেশ, সন্ধ্যা তাঁহার বসন, অব্যক্ত (প্রধান) তাঁহার হৃদয় এবং সমস্ত বিকারের আশ্রয়ভূত চন্দ্রমা তাঁহার মন। মহত্তত্ত্ব তাঁহার বিজ্ঞানশক্তি বা চিত্ত, অহঙ্কারতত্ত্ব শ্রীরুদ্র, এবং অশ্ব, অশ্বতরী, উষ্ট্র, হস্তী প্রভৃতি তাঁহার নখ, অপর সমস্ত মৃগপশু তাঁহার কটিদেশ। পক্ষিসকল তাঁহার বিচিত্র শিল্প-নৈপুণ্য, স্বয়ম্ভুব মনু তাঁহার মনীষা, পুরুষ তাঁহার আশ্রয়স্থান, গন্ধর্ব্ব-বিদ্যাধর-চারণ-অপ্সরোগণ তাঁহার স্বরস্মৃতি, অসুরসৈন্য তাঁহার বীর্য্য। ব্রাহ্মণ সকল তাঁহার আনন, ক্ষত্রিয়গণ তাঁহার বাহু, বৈশ্যগণ তাঁহার উরু, শূদ্র তাঁহার চরণ। তিনি নানাবিধ নামধারী বসুরুদ্রাদি দেবগণে পরিবৃত এবং হবিঃসাধ্য যজ্ঞাদি-প্রয়োগ তাঁহারই কার্য্য।"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, বর্ণিত বিরাট্ রূপটী হইতেছে একটী কাল্পনিক রূপ ; চতুর্দ্দশ ভুবনাদিকে এই বিরাট্‌রূপের অবয়বাদি রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। বিরাট রূপের বর্ণনার সূচনাতে শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন,

"অণ্ডকোষে শরীরেঽস্মিন্ সপ্তাবরণসংযুতে।
বৈরাজঃ পুরুষো যোঽসৌ ভগবান্ ধারণাশ্রয়ঃ॥ শ্রী ভা, ২।১।২৫॥

—ক্ষিতি, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, অহঙ্কারতত্ত্ব ও মহত্তত্ত্ব-এই সাতটী আবরণে আবৃত যে ব্রহ্মাণ্ড, সেই ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের মধ্যে অবস্থিত যে বৈরাজ পুরুষ (হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী গর্ভোদক-শায়ী) ভগবান্, তিনিই ধারণার বিষয়।"

"বৈরাজো হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী দেহঃ ভগবানিতি হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী গর্ভোদশায়ী দ্বিতীয়ঃ পুরুষস্তৎপ্রতিমাত্বেনোপাস্যমানো বৈরাজোঽপি ভগবচ্ছব্দেনোচ্যতে॥—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিকৃতা টীকা॥"—এই টীকা হইতে জানা গেল, সপ্তাবরণযুক্ত ব্রহ্মাণ্ডরূপ দেহের মধ্যে যিনি অবস্থিত, তিনি হইতেছেন হিরণ্যগর্ভের অন্তর্য্যামী দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ী। এই ব্রহ্মাণ্ড তাঁহার দেহের বা প্রতিমার তুল্য বলিয়া তাহাকেও "ভগবান্" বলা হইয়াছে ; কেননা, মনঃস্থৈর্য্যের জন্য নবীন উপাসকগণ এই বিরাট্‌রূপের (গর্ভোদশায়ীর দেহরূপে কল্পিত ব্রহ্মাণ্ডের) উপাসনা করিয়া থাকেন। "পূর্ব্বোক্তস্যান্তর্য্যামিনশ্চিদ্‌ঘনস্বরূপে ধারণায়ামসমর্থানামশুদ্ধচিত্তানাং যোগিনাং রাগদ্বেষাদি-মালিন্যনিবৃত্ত্যর্থং বৈরাজধারণামাহ স্থূল ইতি। স্থূলে ভগবতোরূপে ইত্যাদি শ্রী ভা, ২।১।২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী॥—যাঁহারা পূর্ব্বোক্ত চিদ্‌ঘনস্বরূপ অন্তর্য্যামীর ধারণা করিতে অসমর্থ, সেই অশুদ্ধচিত্ত যোগীদিগের রাগদ্বেষাদি মালিন্যনিবৃত্তির জন্য বৈরাজরূপের ধারণার কথা বলা হইয়াছে।"

দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ীর প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্যত্রও এইরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়।

"যস্যাবয়বসংস্থানৈঃ কল্পিতো লোকবিস্তরঃ।
তদ্বৈ ভগবতো রূপং বিশুদ্ধং সত্ত্বমূর্জ্জিতম্॥ শ্রী ভা, ১।৩।৩॥

—যাঁহার (যে দ্বিতীয় পুরুষের) অবয়বসংস্থাদ্বারা ভূরাদি লোকসমূহ কল্পিত হইয়াছে; কিন্তু সেই ভগবানের রূপ হইতেছে বিশুদ্ধ (জড়াংশ-বিবর্জ্জিত) এবং বলবৎ-বিশুদ্ধসত্ত্বময় (অপ্রাকৃত চিন্ময়, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ)।”

ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“যস্য চ তাদৃশত্বেন তত্র শয়ানস্য অবয়বসংস্থানৈঃ সাক্ষাচ্ছ্রীচরণাদিসন্নিবেশৈঃ লোকস্য বিস্তরো বিরাড়াকারঃ প্রপঞ্চঃ কল্পিতঃ—যথা তদবয়ব-সন্নিবেশস্তথৈব ‘পাতালমেতস্য হি পাদমূলম্ (শ্রীভা, ২।১।২৬)’ ইত্যাদিনা নবীনোপাসকান্ প্রতি মনঃস্থৈর্য্যায় প্রখ্যাপিতঃ। ন তু বস্তুতস্তদেব যস্য রূপমিত্যর্থঃ।”

ইহা হইতে জানা গেল—বিরাট্ রূপটী হইতেছে দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ীর একটী কল্পিত রূপ; ইহা তাঁহার বাস্তব বা স্বরূপগত রূপ নহে; কেন না, বিরাট রূপটী হইতেছে প্রাকৃত প্রপঞ্চময়; তাঁহার স্বরূপগত রূপ হইতেছে অপ্রাকৃত চিন্ময়, আনন্দস্বরূপ। নবীন উপাসকদের মন স্থির করার আনুকূল্য বিধানের নিমিত্তই এই বিরাট্ রূপের কল্পনা।

এই বিরাট্ রূপের কল্পানার ভিত্তি যে ঋক্‌বেদ, তাহাও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন। ‘চন্দ্রমা মনসো জাতঃ’ ইত্যারভ্য ‘পদ্ভ্যাং ভূমির্দিশঃ শ্রোত্রাত্তথা লোকানকল্পয়ন্ (ঋক্‌সংহিতা ॥১০।৯০।১৩-১৪)’ ইত্যাদি শ্রুতেস্তৈস্তৈর্হেতুভূতৈর্লোকবিস্তারো রচিত ইত্যর্থঃ।” তিনি ইহার অনুকূল প্রমাণ মহাভারতাদি হইতেও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

কেহ কেহ মনে করেম—বিরাট্‌রূপটী প্রথম পুরুষ কারণার্ণবশায়ীরই কল্পিত রূপ। তাঁহাদের এইরূপ অনুমানের হেতু বোধ হয় এই যে, প্রথম পুরুষের বর্ণনায় বলা হইয়াছে—“জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ। সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ শ্রীভা, ১।৩।১॥” এই শ্লোক হইতে তাঁহারা মনে করেন—প্রথম পুরুষের রূপটী হইতেছে “মহদাদিভিঃ সম্ভূতম্—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্রাদিদ্বারা নিষ্পন্ন” এবং “ষোড়শকলম্—একাদশ ইন্দ্রিয় এবং পঞ্চমহাভূত-এই ষোড়শ কলাযুক্ত।” কিন্তু এইরূপ অনুমান যে বিচারসহ নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা, প্রথম পুরুষ আবির্ভূত হইয়াছেন—“আদৌ—সৃষ্টির আদিতে’; তখনও মহত্তত্ত্বাদির বা একাদশ ইন্দ্রিয়াদির এবং পঞ্চভূতের সৃষ্টি হয় নাই। তখন তাঁহার মহত্তত্ত্বাদি-সমুদ্ভূত রূপ কিরূপে থাকিতে পারে? (এই শ্লোকের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। ক-উপ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বস্তুতঃ বিরাট্ রূপটী যে দ্বিতীয় পুরুষ গর্ভোদশায়ীরই কল্পিত রূপ, পূর্ব্বোল্লিখিত স্মৃতি-শ্রুতি-প্রমাণ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

গ। সর্গ ও বিসর্গ

শ্রামদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, সৃষ্টিকার্য্যের দুইটী পর্য্যায় আছে—সর্গ ও বিসর্গ।

সর্গ। গুণত্রয়ের পরিণামবশতঃ পরমেশ্বর ব্রহ্ম হইতে--আকাশাদি পঞ্চ-মহাভূত, শব্দাদি পঞ্চ-তন্মাত্র, একাদশ ইন্দ্রিয়, মহত্তত্ত্ব এবং অহঙ্কার-তত্ত্ব-এই সমস্তের বিরাট্‌রূপে ও স্বরূপে যে উৎপত্তি, তাহার নাম সর্গ।

"ভূতমাত্রেন্দ্রিয়ধিয়াং জন্ম সর্গ উদাহৃতঃ।
ব্রহ্মণো গুণবৈষম্যাৎ * * ॥ শ্রী ভা, ২।১০।৩॥"

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা। "ভূতানি আকাশাদীনি, মাত্রাণি শব্দাদীনি, ইন্দ্রিয়ানি চ, ধী-শব্দেন মহদহঙ্কারৌ। গুণানাং বৈষম্যাৎ পরিণামাৎ। ব্রহ্মণঃ পরমেশ্বরাৎ কর্ত্তুঃ ভূতাদীনাং যদ্‌বিরাট্‌-রূপেণ স্বরূপতশ্চ জন্ম, সঃ সর্গঃ।"

"অব্যাকৃতগুণক্ষোভান্মহতস্ত্রিবৃতোঽহমঃ।
ভূতসূক্ষ্মেন্দ্রিয়ার্থানাং সম্ভবঃ সর্গ উচ্যতে ॥ শ্রী ভা, ১২।৭।১১॥

—প্রকৃতির গুণক্ষোভ হইতে মহত্তত্ত্ব, মহত্তত্ত্ব হইতে ত্রিবৃত (সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক), অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চমহাভূত সূক্ষ্ম (পঞ্চতন্মাত্র), ইন্দ্রিয়সমূহ এবং ইন্দ্রিয়ার্থ-(ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা)-সমূহের উৎপত্তিকে সর্গ বলে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সর্গঃ কারণ সৃষ্টিঃ সর্গ ইত্যর্থঃ।" তত্ত্ব-সন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহাই লিখিয়াছেন। ইহা হইতে জানা গেল—কারণের সৃষ্টির নাম হইতেছে সর্গ। এ-স্থলে কারণ বলিতে ব্যষ্টি জীবের দেহাদির এবং ভোগ্য বস্তু-আদির উপাদানকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

বিসর্গ। স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্যষ্টি-সৃষ্টির (ব্যষ্টি-জীবের দেহাদি এবং ব্যষ্টি ভোগ্য বস্তু আদির যে সৃষ্টি, তাহার) নাম বিসর্গ।

"বিসর্গঃ পৌরুষঃ স্মৃতঃ ॥ শ্রী ভা, ২।১০।৩॥"

শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা। "পুরুষো বৈরাজঃ ব্রহ্মা, তৎকৃতঃ পৌরুষঃ চরাচরো সর্গো বিসর্গ ইত্যর্থঃ।"

"পুরুষানুগৃহীতানামেতেষাং বাসনাময়ঃ।
বিসর্গোঽয়ং সমাহারো বীজাদ্বীজং চরাচরম্ ॥ শ্রী ভা, ১২।৭।১২॥

—পরমেশ্বরানুগৃহীত মহদাদির বাসনাময় সমাহারকে বলে বিসর্গ, ইহা হইতেছে বীজ হইতে বীজের উৎপত্তির ন্যায় চরাচরের (স্থাবর-জঙ্গমের) উৎপত্তি।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"পুরুষেণ ঈশ্বরেণ অনুগৃহীতানাম্ এতেষাং মহদাদীনাং পূর্ব্বকর্মবাসনাপ্রধানোঽয়ং সমাহারঃ কার্য্যভূতঃ চরাচরপ্রাণিরূপো বীজাদ্বীজমিব প্রবাহাপন্নো বিসর্গ উচ্যতে ইত্যর্থঃ।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"পুরুষঃ

পরমাত্মা। এতেষাং মহদাদীনাম্। জীবস্য পূর্ব্বকর্মবাসনাপ্রধানোঽয়ং সমাহারঃ কার্য্যভূতশ্চরাচর-প্রাণিরূপো বীজাদ্বীজমিব প্রবাহাপন্নো বিসর্গ উচ্যতে। ব্যষ্টিসৃষ্টির্বিসর্গ ইত্যর্থঃ।"

তত্ত্বসন্দর্ভের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"পুরুষঃ পরমাত্মা বিরিঞ্চান্তঃস্থ ইতি বোধ্যম্।—পুরুষ বলিতে এ-স্থলে বিরিঞ্চির (ব্রহ্মার) অন্তরে অবস্থিত পরমাত্মাকে বুঝাইতেছে।"

তাৎপর্য্য এইরূপ। অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের কর্মও অনাদি। পূর্ব্ব-পূর্ব্ব কর্ম্মসংস্কারজাত বাসনা হইতে জীবের পর-পর কর্ম্মের উদ্ভব হয়। এক বীজ হইতে যেমন যথাসময়ে অপর বীজের উদ্ভব হয়, তদ্রূপ। বীজ হইতে বীজের উৎপত্তি যেমন প্রবাহরূপে চলিতে থাকে, জীবের কর্মও তদ্রূপ প্রবাহরূপে চলিতে থাকে এবং তাহার ফলে জীবের জন্মাদিও তদ্রূপ প্রবাহরূপে চলিতে থাকে। পূর্ব্বে সর্গ-প্রসঙ্গে (কারণ-সৃষ্টি প্রসঙ্গে) যে মহদাদির কথা বলা হইয়াছে, সেই মহদাদির সঙ্গেই জীবের পূর্ব্ব-কর্ম-বাসনা জড়িত থাকে। পরমেশ্বরের অনুগ্রহেই মহদাদির মধ্যে জীবের পূর্ব্বকর্ম বাসনার অবস্থিতি। ব্যষ্টিসৃষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্মা প্রতি জীবের দেহাদির সৃষ্টি করিবার সময়ে তাহার কর্মবাসনাজড়িত মহদাদির যথাযথভাবে সমাহার (সম্মিলন) করিয়াই সৃষ্টি করিয়া থাকেন। ব্রহ্মার দ্বারা এই ভাবে যে ব্যষ্টি-সৃষ্টি, তাহার নামই বিসর্গ।

স্থাবরজঙ্গমাত্মক ব্যষ্টিবস্তুর সৃষ্টিই বিসর্গ। ব্রহ্মা এই বিসর্গের কর্ত্তা। আর, স্থাবর-জঙ্গমাত্মক ব্যষ্টি-বস্তুর কারণ-(উপাদান)-ভূত যে মহদাদি, তাহাদের সৃষ্টির নাম সর্গ। পরমেশ্বর ব্রহ্ম (কারণার্ণ-বশায়ী) হইতেছেন এই সর্গের কর্ত্তা।

খ। সৃষ্টির পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা

সৃষ্টি আরম্ভের পূর্ব্বে নামরূপবিশিষ্ট এই দৃশ্যমান জগৎ দৃশ্যমানরূপে ছিল না। নামরূপবিশিষ্ট জগৎ তখন প্রকৃতিতে পরিণত হইয়া প্রকৃতিতেই লীন ছিল। স্ব-স্ব-কর্মফলকে আশ্রয় করিয়া জীব-সমূহও তখন সুক্ষ্মরূপে ভগবানের মধ্যে লীন ছিল। এই অবস্থাকেই মহাপ্রলয় বলে। মহাপ্রলয়ে ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির সত্ত্ব, রজঃ এবং তমঃ—এই তিনটী গুণ থাকে সাম্যাবস্থায়; সুতরাং তখন তাহাদের কোনও ক্রিয়া থাকে না।

তখন একমাত্র ভগবান্ই ছিলেন। পুরুষাদি পার্থিবপর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব তখন ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া বর্ত্তমান ছিল। তখন ভগবানের সৃষ্টি-আদির ইচ্ছাও তাঁহাতেই লীন ছিল।

তখন একমাত্র ভগবান্ই ছিলেন—এ-কথার তাৎপর্য্য এই যে, তাঁহার ধাম-পরিকরাদির সহিত তিনি ছিলেন। সৈন্যপরিবৃত হইয়া রাজা যখন কোনও স্থানে গমন করেন, তখন যেমন বলা হয়—"রাজা যাইতেছেন"—তদ্রূপ। রাজার উল্লেখেই যেমন রাজপরিকরাদির কথাও জানা যায়, তদ্রূপ "একমাত্র ভগবানের" উল্লেখেও তাঁহার নিত্যসিদ্ধ এবং সাধনসিদ্ধ পরিকরগণও সূচিত হয়েন।

"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥ শ্রী ভা, ৩।৫।২৩॥

—স্বষ্টির পূর্ব্বে স্বষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন হইলে সেই সময়ে পুরুষাদি পার্থিব পর্য্যন্ত এই বিশ্ব—(কিরণস্বরূপ) শুদ্ধজীবের আত্মা (মণ্ডলস্থানীয়) এবং প্রভু, বৈকুণ্ঠাদি নানাবৈভবে উপলক্ষিত একমাত্র ভগবানের সহিত একীভূত ছিল।"

টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ইদং বিশ্বং পুরুষাদিপার্থিবপর্য্যন্তং তদানীমেকাকিনাবস্থিতেন ভগবতা সহৈকীভূয়াসীদিত্যর্থঃ। আত্মনাং শুদ্ধজীবানামপি রশ্মিস্থানীয়ানামাত্মা মণ্ডলস্থানীয়ং পরমস্বরূপম্। আত্মেচ্ছা তস্য স্বষ্ট্যাদীচ্ছা তস্যানুগতৌ লীনতায়াং সত্যামিত্যর্থঃ। ননু, বৈকুণ্ঠাদি বহুবৈভবেঽপি সতি কথমেক এবাসীৎ তত্রাহ বৈকুণ্ঠাদিনানামত্যাপি স এবৈক উপলক্ষ্যতে ইতি। সেনাসমেতত্বেঽপি রাজাসৌ প্রযাতীতিবৎ।"

সেই সময়ের অবস্থা আরও বর্ণিত হইয়াছে।

"স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিরসুপ্তদৃক্॥ শ্রী ভা, ৩।৫।২৪॥

—তখন সেই একরাট্ (সর্বাধিকারী) তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা ছিলেন, (অন্য সমস্ত তাঁহাতে লীন থাকায়) তিনি অন্য দৃশ্য (বিশ্ব) কিছুই দেখেন নাই। আত্মাকে (স্বীয় অংশরূপ পুরুষকেও) দেখিতে না পাইয়া যেন তাঁহার (পুরুষের) অভাবই মনে করিলেন (পুরুষ তখন তাঁহা হইতে পৃথক্ ছিলেন না বলিয়া দৃষ্ট হয়েন নাই)। তখন তাঁহার মায়াশক্তি ছিল সুপ্তা; কিন্তু তাঁহার স্বরূপভূতা অন্তরঙ্গা চিচ্ছক্তি অসুপ্তা (জাগ্রতা) ছিল।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"দৃশ্যং বিশ্বং নাপশ্যৎ। তদ্দর্শনাভাবাদেব তল্লীনমাসীদিত্যর্থঃ। তথা আত্মানং আত্মাংশং পুরুষমপি অসন্তমিব মেনে ভেদেন নাপশ্যদিত্যর্থঃ। শক্তির্মায়া। দৃক্ চিচ্ছক্তিঃ স্বরূপভূতান্তরঙ্গশক্তিরিত্যর্থঃ। একরাট্ সর্ব্বাধিকারী।"

ভগবান্ যখন স্বষ্টি করিতে ইচ্ছা করেন, তখন কারণার্ণবশায়ী পুরুষের আবির্ভাব হয়।

"জগৃহে পৌরুষং রূপং ভগবান্ মহদাদিভিঃ।
সম্ভূতং ষোড়শকলমাদৌ লোকসিসৃক্ষয়া॥ শ্রীভা, ১।৩।১॥"

(অনুবাদাদি ৩।১৬ক-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

এই কারণার্ণবশায়ী পুরুষই প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা। এই পুরুষের মধ্যে সূক্ষ্মরূপে সমস্ত বিশ্ব এবং কর্মফলাশ্রিত সূক্ষ্ম জীব মহাপ্রলয়ে অবস্থান করে।

১৭। স্বষ্টির ক্রম। প্রথমে কারণ-স্বষ্টি বা সর্গ

স্বষ্টির ক্রম সম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতে যাহা উল্লিখিত হইয়াছে, এস্থলে তাহার মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইতেছে।

ক। মহত্তত্ত্বের উদ্ভব।

মায়ার (বা প্রকৃতির) সহায়তাতেই ভগবান্ এই বিশ্বের স্থষ্টি করিয়া থাকেন।

"সা বা এতস্য সংদ্রষ্টুঃ শক্তিঃ সদসদাত্মিকা।
মায়া নাম মহাভাগ যয়েদং নির্ম্মমে বিভুঃ॥শ্রীভা, ৩।৫।২৫॥"

কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—স্থষ্টির পূর্ব্বে মায়া বা প্রকৃতি থাকে সাম্যাবস্থাপন্না হইয়া। সাম্যাবস্থা বিনষ্ট না হইলে মায়াদ্বারা কোনও কার্য্য নিষ্পন্ন করা সম্ভবপর হয় না। বাহিরের কোনও ক্রীয়াশীলা (এ-স্থলে চেতনাময়ী) শক্তির ক্রিয়া ব্যতীত কোনও সাম্যাবস্থাই নষ্ট হইতে পারে না। তাই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হইতে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া তাহাতে শক্তি সঞ্চার করেন। ইহার ফলে প্রকৃতি বিক্ষুব্ধা হয়, প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট হয়। কাল-প্রভাবে প্রকৃতি বিক্ষোভিতা হইলে পুরুষ তখন তাহাতে জীবরূপ-বীর্য্যাধান করেন—অর্থাৎ স্ব-স্ব-কর্ম্মফলকে অবলম্বন করিয়া যে সমস্ত জীব মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে পুরুষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করিতেছিল, পুরুষ সে সমস্ত জীবকে তাহাদের কর্ম্মফল সহ বিক্ষুব্ধা প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করেন।

"কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ শ্রীভা, ৩।৫।২৬॥"

তখন পুরুষ কর্ত্তৃকই প্রবর্ত্তিত হইয়া কাল, কর্ম্ম ও প্রকৃতির স্বভাব প্রকৃতিকে যথাযথ ভাবে পরিণাম প্রাপ্ত করাইতে থাকে। এইরূপে জীবাদৃষ্টের অনুকূল প্রথম যে পরিণাম প্রকৃতি লাভ করে, তাহাকে বলে মহত্তত্ত্ব।

"কালং কর্ম্ম স্বভাবঞ্চ মায়েশো মায়য়া স্বয়া।
আত্মন্ যদৃচ্ছয়া প্রাপ্তং বিবুভূষুরুপাদদে॥
কালাদ্ গুণব্যতিকরঃ পরিণামঃ স্বভাবতঃ।
কর্ম্মণো জন্ম মহতঃ পুরুষাধিষ্ঠিতাদভূৎ॥ শ্রীভা, ২।৫।২১-২২॥"

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতেই মহত্তত্ত্বের উদ্ভব ; সুতরাং মহত্তত্ত্বেও সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই তিনটী গুণ থাকিবেই। তিনটী গুণ থাকিলেও কালকর্ম্ম-স্বভাবাদির প্রভাবে মহত্তত্ত্বে সত্ত্ব ও রজোগুণেরই প্রাধান্য। সত্ত্বের গুণ জ্ঞানশক্তি এবং রজঃ-এর গুণ ক্রিয়াশক্তি ; সুতরাং মহত্তত্ত্ব হইল ক্রিয়া-জ্ঞান-শক্তিময় একটা উপাদান-বিশেষ।

"মহতস্তু বিকুর্ব্বানাদ্ রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ। শ্রীভাঃ ২।৫।২৩॥"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"বিকুর্ব্বাণাৎ কালাদিভি র্বিক্রিয়মানাৎ রজঃ-সত্ত্বাভ্যাম্ উপবৃংহিতাদ্ বর্দ্ধিতাদিতি, মহত্তত্ত্বস্য ত্রিগুণত্বেঽপি ক্রিয়াজ্ঞানশক্তিত্বাৎ রজঃসত্ত্বয়োরাধিক্যম্।"

মহত্তত্ত্ব জড়রূপা ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত হইলেও ইহা সম্যক্রূপে জড় নহে। ইহার সঙ্গে পুরুষকর্ত্তৃক সঞ্চারিত চেতনাময়ী শক্তি মিশ্রিত আছে বলিয়া **মহত্তত্ত্ব** হইতেছে **চিদচিৎ**

মিশ্রিত। সুতরাং এই চিজ্জড়মিশ্রিত মহত্তত্ত্ব হইতে যে সমস্ত পরিণামের উদ্ভব হয়, তৎসমস্তও চিজ্জড় মিশ্রিত।

খ। অহঙ্কার তত্ত্বের উদ্ভব

কাল-কর্ম্মাদির প্রভাবে বিকারপ্রাপ্ত রজঃসত্ত্ব-প্রধান মহত্তত্ত্ব হইতে আর একটী তত্ত্বের উদ্ভব হয়; ইহাতে তমোগুণেরই প্রাধান্য—সত্ত্ব ও রজোগুণের অল্পতা। এই তত্ত্বের নাম অহঙ্কার-তত্ত্ব। ইহা হইতেছে দ্রব্য-জ্ঞান-ক্রিয়াত্মক।

"মহতস্তু বিকুর্ব্বাণাদ্ রজঃসত্ত্বোপবৃংহিতাৎ।
তমঃপ্রধানস্ত্বভবদ্ দ্রব্যজ্ঞানক্রিয়াত্মকঃ॥
সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তঃ। শ্রীভা, ২।৫।২৩-২৪॥"

এই অহঙ্কার-তত্ত্ব আবার বিকার প্রাপ্ত হইয়া তিন রূপে অভিব্যক্ত হয়—**সাত্ত্বিক অহঙ্কার**, **রাজস অহঙ্কার** এবং **তামস অহঙ্কার**। তামসাহঙ্কার হইতেছে দ্রব্যশক্তিযুক্ত (অর্থাৎ আকাশাদি-মহাভূতরূপ দ্রব্য উৎপাদনের সামর্থ্য বিশিষ্ট), রাজসাহঙ্কার হইতেছে ক্রিয়াশক্তিবিশিষ্ট (অর্থাৎ ক্রিয়া বা ইন্দ্রিয়-সমূহ উৎপাদনের সামর্থ্যবিশিষ্ট) এবং সাত্ত্বিকাহঙ্কার হইতেছে জ্ঞানশক্তিবিশিষ্ট (অর্থাৎ জ্ঞানসমূহ বা দেবসমূহ উৎপাদনের সামর্থ্যবিশিষ্ট)।

"সোঽহঙ্কার ইতি প্রোক্তো বিকুর্ব্বন্ সমভূত্রিধা।
বৈকারিকস্তৈজসশ্চ তামসশ্চেতি যদ্ভিদা।
দ্রব্যশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্জ্ঞানশক্তিরিতি প্রভো॥ শ্রীভা, ২।৫।২৪॥"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"বৈকারিকঃ সাত্ত্বিকঃ, তৈজসো রাজসঃ, যদ্ভিদা যস্য ভেদঃ। দ্রব্যশক্তিরিত্যাদীনি প্রাতিলোম্যেন ত্রয়াণাং লক্ষণানি। দ্রব্যেষু মহাভূতেষু আকাশাদিষু শক্তিরুৎপাদনসামর্থ্যং যস্য সঃ। এবং ক্রিয়াষু ইন্দ্রিয়েষু তথা জ্ঞানেষু দেবেষু শক্তির্যস্য সঃ।"

এই টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ আরও লিখিয়াছেন—"অত্র সাম্যাবস্থং গুণত্রয়মেব প্রধানং তস্য কালেন সত্ত্বাংশস্য উদ্রেকো মহত্তত্ত্বং রজোঽংশস্য উদ্রেকোঃ মহত্তত্ত্বভেদঃ সূত্রতত্ত্বম্। তমোঽংশস্য উদ্রেক অহঙ্কারতত্ত্বম্। অতোঽহঙ্কারকার্য্যেষু তামসমাকাশাদিকং বহু রাজসং সাত্ত্বিকঞ্চাল্পম্।"

ইহার তাৎপর্য্য এই:—সাম্যাবস্থাপন্ন গুণত্রয়ই হইতেছে প্রধান (প্রকৃতি)। কালাদির প্রভাবে তাহা যখন পরিণতি প্রাপ্ত হইতে থাকে, তখন তাহার এক অংশে সত্ত্বগুণের, এক অংশে রজোগুণের এবং এক অংশে তমোগুণের প্রাধান্য জন্মে। যে অংশে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য জন্মে, তাহাকে **মহত্তত্ত্ব** বলে। যে অংশে রজোগুণের প্রাধান্য জন্মে, তাহাও মহত্তত্ত্বেরই একটী প্রকার ভেদ—ইহাকে **সূত্রতত্ত্ব** বলে। আর, যে অংশে তমোগুণের প্রাধান্য জন্মে, তাহাকে অহঙ্কার-তত্ত্ব বলা হয়। এজন্য অহঙ্কার-তত্ত্বের কার্য্যসমূহের মধ্যে তামস আকাশাদি বহু, রাজস এবং সাত্ত্বিকও আছে, কিন্তু অল্প।

গ। তামসাহঙ্কারের বিকার। পঞ্চ তন্মাত্র ও পঞ্চ মহাভূত।

তামসাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে শব্দগুণযুক্ত **আকাশ** উৎপন্ন হয়। আকাশ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে স্পর্শগুণযুক্ত **বায়ু** উৎপন্ন হয়। আকাশ হইতে বায়ুর উদ্ভব বলিয়া বায়ুতে আকাশের গুণ শব্দও থাকে; সুতরাং বায়ুতে শব্দ ও স্পর্শ—এই দুইটী গুণই বর্ত্তমান। এই বায়ুর লক্ষণ হইতেছে—প্রাণ (দেহ-ধারণ-সামর্থ্য), ওজঃ (ইন্দ্রিয়ের পটুতা) এবং বল (শরীরের পটুতা)। অর্থাৎ প্রাণাদির হেতু হইতেছে বায়ু।

ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব বশতঃ ঐ বায়ু যখন বিকার প্রাপ্ত হয়, তখন তাহা হইতে **তেজঃ** উৎপন্ন হয়। তেজের স্বাভাবিক গুণ হইতেছে রূপ। বায়ু হইতে ইহার উদ্ভব বলিয়া ইহাতে বায়ুর গুণ শব্দ এবং স্পর্শও থাকিবে। এইরূপে তেজের গুণ হইল তিনটী—শব্দ, স্পর্শ ও রূপ।

এই তেজঃ বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে **জল** উৎপন্ন হয়; জলের গুণ—রস। তেজ হইতে উৎপন্ন বলিয়া জলে তেজের গুণ শব্দ, স্পর্শ এবং রূপও আছে। এইরূপে জলের গুণ হইল চারিটী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ ও রস।

জল বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে **ক্ষিতি** উৎপন্ন হয়। ক্ষিতির গুণ—গন্ধ। জল হইতে উৎপন্ন বলিয়া ক্ষিতিতে জলের গুণচতুষ্টয়ও আছে। এইরূপে ক্ষিতির গুণ হইল পাঁচটী—শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস ও গন্ধ।

"তামসাদপি ভূতাদের্বিকুর্ব্বাণাদভূন্নভঃ।
অস্য মাত্রা গুণঃ শব্দো লিঙ্গং যদ্ দ্রষ্টৃদৃশ্যয়োঃ॥
নভসোঽথ বিকুর্ব্বাণাদভূৎ স্পর্শগুণোঽনিলঃ।
পরান্বয়াচ্ছব্দবাংশ্চ প্রাণ ওজঃ সহো বলম্॥
বায়োরপি বিকুর্ব্বাণাৎ কালকর্ম্মস্বভাবতঃ।
উদপদ্যত বৈ তেজো রূপবৎ স্পর্শশব্দবৎ॥
তেজসস্তু বিকুর্ব্বাণাদাসীদম্ভো রসাত্মকম্।
রূপবৎ স্পর্শবচ্চাম্ভো ঘোষবচ্চ পরান্বয়াৎ॥
বিশেষস্তু বিকুর্ব্বাণাদম্ভসো গন্ধবানভূৎ।
পরান্বয়াদ্রসস্পর্শশব্দরূপগুণান্বিতঃ॥ —শ্রীভা, ২।৫।২৫—২৯॥"

পঞ্চ-তন্মাত্র ও পঞ্চ-মহাভূত। এইরূপে দেখা গেল—দ্রব্যশক্তি-বিশিষ্ট তামসাহঙ্কার হইতে শব্দ, স্পর্শ, রূপ, রস এবং গন্ধ এই পাঁচটী তন্মাত্র এবং এই পঞ্চতন্মাত্রের আশ্রয়—যথাক্রমে আকাশ (ব্যোম), বায়ু (মরুৎ), তেজঃ, জল (অপ্) এবং ক্ষিতি—এই পাঁচটী মহাভূত—সাকল্যে দশটী দ্রব্যের উদ্ভব হয়।

ঘ। সাত্ত্বিকাহঙ্কারের বিকার। মন ও ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতা।

সাত্ত্বিকাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে মন (অর্থাৎ মনের উপাদান) এবং মনের অধিষ্ঠাতা চন্দ্রের (ঈশ্বরাধীন শক্তিবিশেষের) উৎপত্তি হয়। এই সাত্ত্বিকাহঙ্কার হইতেই পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের (শ্রোত্র, ত্বক্, চক্ষু, জিহ্বা, এবং ঘ্রাণ বা নাসিকা—এই পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (যথাক্রমে দিক্, বায়ু, সূর্য্য, বরুণ এবং অশ্বিনীকুমার-এই পাঁচ) এবং পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের (বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ-এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের) অধিষ্ঠাত্রী দেবতা (যথাক্রমে অগ্নি, ইন্দ্র, উপেন্দ্র, মিত্র এবং প্রজাপতি—এই পাঁচ)—এই দশটী অধিষ্ঠাত্রী দেবতার উদ্ভব হয়।

"বৈকারিকান্মনো জজ্ঞে দেবা বৈকারিকা দশ।
দিগ্বাতার্কপ্রচেতোঽশ্বিবহ্নীন্দ্রোপেন্দ্রমিত্রকাঃ॥ শ্রীভা, ২।৫।৩০॥"

টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন– "মনঃশব্দেন তদধিষ্ঠাতা চন্দ্রোঽপি দ্রষ্টব্যঃ। অন্যে চ দশ দেবা বৈকারিকাঃ সাত্ত্বিকাহঙ্কারকার্য্যাঃ।"

পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং পঞ্চ-কর্ম্মেন্দ্রিয়—এই দশটী ইন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দশ দেবতা এবং মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র—মোট এগার। এই সমস্ত অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ হইতেছেন—ঈশ্বরাধীন শক্তিবিশেষ, তত্তদিন্দ্রিয়ের কার্য্যকরী শক্তিদাতা। প্রাকৃত দেহের চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়গণের নিজস্ব কোনও কার্য্যকরী শক্তি নাই। মৃতদেহের শক্তিহীন ইন্দ্রিয়াদিই তাহার প্রমাণ। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণের শক্তিতেই চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গ স্ব-স্ব-কার্য্যনির্ব্বাহে সামর্থ্য লাভ করে। এই অধিষ্ঠাত্রী দেবতাগণ ঈশ্বর-শক্তি হইলেও ভোগায়তন প্রাকৃত দেহকে কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী করিবার নিমিত্ত প্রাকৃত-তামসাহঙ্কারের যোগে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।

ঙ। রাজসাহঙ্কারের বিকার

রাজসাহঙ্কার বিকার প্রাপ্ত হইলে তাহা হইতে—চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্—এই পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের এবং বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ— এই পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়ের (অর্থাৎ তাহাদের সূক্ষ্ম উপাদানের) উৎপত্তি হয়।

বুদ্ধি হইতেছে জ্ঞানশক্তি ; আর প্রাণ হইতেছে ক্রিয়াশক্তি। বুদ্ধি এবং প্রাণ এই উভয়ই হইতেছে রাজসাহঙ্কারের কার্য্য। এজন্য চক্ষুরাদি পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় হইতেছে বুদ্ধিবিশেষ এবং বাগাদি পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয় হইতেছে প্রাণবিশেষ। তামসাহঙ্কারজাত বায়ুই প্রাণরূপে রাজসাহঙ্কারের কার্য্যও হইয়া থাকে।

"তৈজসাত্তু বিকুর্ব্বাণাদিন্দ্রিয়াণি দশাভবন্। জ্ঞানশক্তিঃ ক্রিয়াশক্তির্বুদ্ধিঃ প্রাণশ্চ তৈজসৌ।
শ্রোত্রং ত্বগ্ঘ্রাণদৃগ্জিহ্বা বাগ্দোর্মেঢ্রাঙ্ঘ্রিপায়বঃ॥ শ্রীভা, ২।৫।৩১॥"

টীকায় শ্রীপাদ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"তৈজসাৎ রাজসাহঙ্কারাৎ দশাভবন্। তত্র পঞ্চজ্ঞানশক্তির্বুদ্ধিঃ। পঞ্চক্রিয়াশক্তিঃ প্রাণঃ। বুদ্ধিপ্রাণৌ তু তৈজসৌ। পঞ্চশ্রোত্রাদয়ো বুদ্ধিবিশেষাঃ,

পঞ্চ বাগাদয়ঃ প্রাণবিশেষাঃ ইত্যর্থঃ। তত্র তামসাহঙ্কারকার্য্যোঽনিল এব প্রাণরূপেণ তৈজসাহঙ্কার-কার্য্যোঽপি ভবতীতি জ্ঞেয়ম্।"

এইরূপে দেখা গেল—কারণার্ণবশায়ীর শক্তিতে সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতি কাল-কর্ম্মাদির প্রভাবে বিকার প্রাপ্ত হইতে হইতে ক্রমশঃ মহত্তত্ত্ব ও অহঙ্কার-তত্ত্বে পরিণত হয়। অহঙ্কার-তত্ত্ব আবার সাত্ত্বিকাহঙ্কার, রাজসাহঙ্কার এবং তামসাহঙ্কারে পরিণত হয়। তারপর, তামসাহঙ্কার হইতে রূপ-রসাদি পঞ্চ-তন্মাত্র ও ক্ষিত্যপ্‌তেজ-আদি পঞ্চ মহাভূতের উদ্ভব হয়। সাত্ত্বিকাহঙ্কার হইতে মন ও মনের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা চন্দ্র উৎপন্ন হয় এবং পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের ও পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয়ের অধিষ্ঠাত্রী দেবতাদের উৎপত্তিও সাত্ত্বিকাহঙ্কার হইতেই হইয়া থাকে। আর রাজসাহঙ্কার হইতে পঞ্চকর্ম্মেন্দ্রিয়ের এবং পঞ্চ-জ্ঞানেন্দ্রিয়ের উৎপত্তি হইয়া থাকে। ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাত্রী একাদশ দেবতা হইতেছে ঈশ্বরের শক্তিবিশেষ। আর যে ইন্দ্রিয়গণের কথা বলা হইয়াছে, তাহারাও স্থূল ইন্দ্রিয়াদি নহে; পরন্তু স্থূল ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্ম কারণ।

এইরূপে যে সমস্ত দ্রব্যের উৎপত্তির কথা জানা গেল, তাহারা হইতেছে পরবর্ত্তী বিকার-সমূহের কারণ বা উপাদান। সুতরাং এ-পর্য্যন্ত যে সৃষ্টির কথা বলা হইল, তাহা হইতেছে কারণ-সৃষ্টি।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে তেইশটী বিকারভূত তত্ত্বের কথা জানা গেল—মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কার-তত্ত্ব, পঞ্চ তন্মাত্র, পঞ্চ মহাভূত এবং একাদশ ইন্দ্রিয়।

১৮। সৃষ্টির ক্রম। কার্য্যসৃষ্টি

ক। কারণসমূহের মিলনের অসামর্থ্য

পূর্ব্বকথিত মহদাদি তত্ত্বসমূহের প্রত্যেকেরই অভিমানিনী দেবতা আছে। এই অভিমানিনী দেবতাগণ হইতেছেন বিষ্ণুর (কারণার্ণবশায়ীর) অংশ। তাঁহারা কাললিঙ্গ, মায়ালিঙ্গ এবং অংশলিঙ্গ। কাললিঙ্গ বলিতে বিকৃতি বুঝায়। মায়ালিঙ্গ বলিতে বিক্ষেপ বুঝায়। অংশলিঙ্গ বলিতে চেতনা বুঝায়। তাৎপর্য্য এই যে—অভিমানি-দেবতাগণের বিকার-সাধিনী শক্তি আছে, বিক্ষেপকারিণী শক্তি (বিবেক-হর্ষ-শোকাদি জন্মাইবার শক্তি) আছে এবং তাঁহারা চেতনাময়ী। কিন্তু তাঁহাদের এই সমস্ত গুণ প্রত্যেকেই সম-পরিমাণ; অথচ পরস্পরের সহিত তাহাদের কোনওরূপ সম্বন্ধ নাই, প্রত্যেকেই স্বতন্ত্র। সুতরাং ব্রহ্মাণ্ড-রচনায় তাহারা অসমর্থ। এজন্য তাঁহারা কৃতাঞ্জলিপুটে ভগবানের স্তব করিতে লাগিলেন।

"এতে দেবাঃ কলা বিষ্ণোঃ কালমায়াংশলিঙ্গিনঃ।
নানাত্বাৎ স্বক্রিয়ানীশাঃ প্রোচুঃ প্রাঞ্জলয়ো বিভুম্॥ —শ্রী ভা, ৩।৫।৩৮॥
যদৈতেঽসঙ্গতা ভাবা ভূতেন্দ্রিয়মনোগুণাঃ।

যদায়তননির্ম্মাণে ন শেকুর্ব্রহ্মবিত্তম ॥ শ্রী ভা, ২।৫।৩২॥”

সাধারণতঃ দেখা যায়, কেবলমাত্র একটী শক্তি যখন কোনও বস্তুর উপর প্রয়োজিত হয়, তখন কেবল একদিকেই তাহার গতি বা ক্রিয়া চলিতে থাকে ; শক্ত্যন্তরের ক্রিয়াব্যতীত তাহার গতির পরিবর্ত্তন হইতে পারে না। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ প্রকৃতিতে প্রথমে যে শক্তি প্রয়োগ করিলেন, তাহা কেবল এক দিকেই—প্রকৃতির পরিণামের দিকেই ক্রিয়া করিতে লাগিল। তাহার ফলে প্রকৃতি বিভিন্নরূপ বিকার প্রাপ্ত হইল—পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রয়োবিংশতি দ্রব্যে পরিণত হইল। কিন্তু ঐ পরিণাম-দায়িনী শক্তি বিকারসমূহের সম্মিলন-উৎপাদনে সমর্থা নহে। এজন্য ঐ বিকারগুলি পৃথক্ পৃথক্‌ভাবে অবস্থান করিতে লাগিল। চিজ্জড়মিশ্রিত বলিয়া তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যেই চেতনাময়ী শক্তিও আছে (অংশলিঙ্গ) ; পরিণামোৎপাদিনী শক্তিদ্বারা চালিত বলিয়া প্রত্যেকের মধ্যেই ভিন্নরূপে পরিণত হওয়ার শক্তিও আছে (কাললিঙ্গ) এবং ঈশ্বরের চেতনাময়ী শক্তির যোগে কর্ম্মসামর্থ্যবতী মায়ার পরিণাম বলিয়া প্রত্যেকে বিক্ষেপ জন্মাইতেও সমর্থ (মায়ালিঙ্গ)। কিন্তু এই সমস্ত গুণের প্রত্যেকটীই একমুখী শক্তির প্রভাবে অন্যনিরপেক্ষভাবে স্বীয় গতিমুখেই ধাবিত হইতে পারে, পরস্পরের সহিত কোনওরূপ সম্বন্ধ স্থাপন করিতে—সুতরাং মিলিত হইতে—পারে না। প্রচণ্ড আঘাতের ফলে এক খণ্ড প্রস্তর চূর্ণবিচূর্ণ হইলে তাহার অংশগুলি আঘাত হইতে প্রাপ্ত শক্তির বেগে যেমন বিভিন্ন দিকে ছুটিতে থাকে, পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না, তদ্রূপ।

খ। কারণসমূহের মিলনের অসামর্থ্যে সৃষ্টির ব্যর্থতা

ভগবান্ লীলাবশতঃ সৃষ্টিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকিলেও তদ্দারা জীবের মহদুপকার সাধিত হয়। ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি হয় বলিয়াই জীব ভোগায়তন দেহ লাভ করিয়া অদৃষ্টের ফল ভোগ করিতে পারে এবং সাধন-ভজনোপযোগী দেহ লাভ করিয়া ভগবৎ-প্রাপ্তির এবং মোক্ষ লাভের চেষ্টা করিতে পারে। ইহাতে মনে হয়, জীবের কল্যাণের জন্যই সৃষ্টি। কিন্তু জীব যদি ভোগোপযোগী এবং ভজনোপযোগী দেহ পাইতে না পারে এবং তাহার কর্ম্মফলের অনুরূপ ভোগ্য বস্তুও যদি সৃষ্ট না হইতে পারে, তাহা হইলে, অন্ততঃ জীবের দিক্ দিয়া বিচার করিলে, সৃষ্টিক্রিয়াই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। সৃষ্টিকে সার্থকতা দান করিতে হইলে ভোগ্য বস্তুর, দেহাদির এবং এই সমস্তের অবস্থিতির জন্য স্থানাদির সৃষ্টিরও প্রয়োজন ; তাহা না হইলে সৃষ্টিই যেন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। কিন্তু এই সমস্তের সৃষ্টি করিতে হইলে কেবল উপাদানের সৃষ্টিই যথেষ্ট নহে, উপাদানগুলি যথাযথভাবে সম্মিলিত হইয়া যাহাতে দেহাদির উৎপাদন করিতে পারে, তাহাও করার প্রয়োজন আছে। গৃহ-নির্ম্মাণের উপকরণ-সংগ্রহেই গৃহ নির্ম্মিত হয় না, গৃহে বাসও সম্ভবপর হয় না।

পূর্ব্বোল্লিখিত সৃষ্ট কারণগুলি (উপাদানগুলি) পরস্পরের সহিত অযুক্তভাবে—বিচ্ছিন্নভাবে—অবস্থিত। তাহাদের সম্মিলনের ব্যবস্থা না করিলে সৃষ্টিক্রিয়াই অসম্পূর্ণ থাকে এবং সৃষ্টির উদ্দেশ্যও ব্যাহত হইয়া পড়ে।

গ॥ সংহনন-শক্তির প্রয়োগ। ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ দেহের উৎপত্তি

যাহা হউক, মহদাদির অভিমানিনী দেবীগণ কর্ত্তৃক স্তুত হইয়া কারণার্ণবশায়ী ভগবান্ পূর্ব্বোল্লিখিত ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের প্রত্যেকের মধ্যেই সংহনন-শক্তি (পরস্পরের সহিত মিলিত হওয়ার শক্তি) অবলম্বনপূর্ব্বক তাহাদের অন্তর্য্যামিরূপে তাহাদের মধ্যে যুগপৎ প্রবেশ করিলেন। "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশদিতি শ্রুতেঃ।"

"ইতি তাসাং স্বশক্তীনাং সতীনামসমেত্য সঃ।
প্রসুপ্তলোকতন্ত্রাণাং নিশাম্য গতিমীশ্বরঃ॥
কালসংজ্ঞাং তদা দেবীং বিভ্রচ্ছক্তিমুরুক্রমঃ।
ত্রয়োবিংশতিতত্ত্বানাং গণং যুগপদাবিশৎ॥ শ্রীভা, ৩।৬।১-২॥"
তদা সংহত্য চান্যোন্যং ভগবচ্ছক্তিচোদিতাঃ।
সদসত্ত্বমুপাদায় চোভয়ং সসৃজুর্হ্যদঃ॥ শ্রীভা, ২।৫।৩৩॥"

তাহাতেই সমষ্টি-শরীর ও ব্যষ্টি-শরীররূপ অণ্ডের সৃষ্টি হইল।

তিনি তত্ত্বসমূহেব মধ্যে প্রবেশ করিয়া ক্রিয়াশক্তিদ্বারা জীবের সুপ্ত কর্ম্মকে (অদৃষ্টকে) প্রবুদ্ধ করিলেন এবং বিচ্ছিন্নভাবে অবস্থিত তত্ত্বসমূহকে যথাযথভাবে সংযুক্ত করিলেন।

"যোঽনুপ্রবিষ্টো ভগবাংশ্চেষ্টারূপেণ তং গণম্।
ভিন্নং সংযোজয়ামাস সুপ্তং কর্ম্ম প্রবোধয়ন্॥ শ্রীভা, ৩।৬।৩॥"

ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের ক্রিয়াশক্তি প্রবুদ্ধ হওয়ায় ভগবানেরই প্রেরণায় (শক্তিতে) স্ব-স্ব-অংশদ্বারা তাহারা অধিপুরুষের (ব্রহ্মাণ্ডরূপ বিরাট্ দেহের) সৃষ্টি করিল। অর্থাৎ, অন্তর্য্যামিরূপে ভগবান্ তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করায় তাঁহারই শক্তিতে তত্ত্বসমূহ যথাযথভাবে পরিণতি লাভ করিতে এবং পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে লাগিল। তাহার ফলে চরাচরাত্মক লোকসমূহরূপ বিরাট্ দেহের উৎপত্তি হইল।

"প্রবুদ্ধকর্ম্মা দৈবেন ত্রয়োবিংশতিকো গণঃ।
প্রেরিতোঽজনয়ৎ স্বাভির্মাত্রাভিরধিপুরুষম্॥
পরেণ বিশতা স্বস্মিন্ মাত্রয়া বিশ্বসৃগ্ গণঃ।
চুক্ষোভান্যোন্যমাসাদ্য যস্মিল্লোকাশ্চরাচরাঃ॥ শ্রীভা, ৩।৬।৪-৫॥"

স্থূল তাৎপর্য্য হইল এই যে—তত্ত্বসমূহের মধ্যে যখন সংহনন-শক্তি সঞ্চারিত হইল, তখনও তাহাদের মধ্যে পূর্ব্ব-সঞ্চারিত পরিণতি-দায়িনী শক্তি বিদ্যমান ছিল। উভয় শক্তিরই প্রয়োজন। কেননা, জীবাদৃষ্টানুরূপ সৃষ্টির নিমিত্ত তত্ত্বসমূহের পরস্পরের সহিত মিলন যেমন আবশ্যক, অদৃষ্টের অনুরূপভাবে তাহাদের পরিণতিও তেমনি প্রয়োজনীয়। যথাযথভাবে পরিণতি প্রাপ্ত তত্ত্বসমূহের যথাযথ ভাবে সম্মিলনেই ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি।

যে বিরাট্ দেহের সৃষ্টির কথা বলা হইল, তাহা হইতেছে পরিণতিপ্রাপ্ত তত্ত্বসমূহের সম্মিলনে উদ্ভূত একটী অচেতন অণ্ড-বিশেষ। এই অণ্ডটী উত্তরোত্তর কয়েকটী আবরণের দ্বারা আবৃত ; প্রত্যেকটী আবরণই পূর্ব্ববর্ত্তী আবরণ অপেক্ষা দশগুণ অধিক এবং জলাদিদ্বারা নির্ম্মিত। বাহিরের আবরণটী হইতেছে প্রকৃতির আবরণ। (প্রত্যেক ব্রহ্মাণ্ডের বাহিরে পর-পর সাতটী আবরণ আছে। প্রথম আবরণ জল ; তাহার পরের আবরণ তেজঃ ; তাহার পরে বায়ু বা মরুৎ ; তাহার পরে ব্যোম বা আকাশ ; তাহার পরে অহঙ্কার, তাহার পরে মহত্তত্ত্ব এবং তাহার পরে অব্যক্ত প্রকৃতি। এই সমস্ত আবরণের পরিমাণ উত্তরোত্তর দশগুণ করিয়া বর্দ্ধিত হইয়াছে)। এই অণ্ড হইতে হিরণ্যগর্ভাত্মক বিরাট্ পুরুষ আবির্ভূত হইলেন।

"ততস্তেনানুবিদ্ধেভ্যো যুক্তেভ্যোঽণ্ডমচেতনম্।
উত্থিতং পুরুষো যস্মাদুদতিষ্ঠদসৌ বিরাট্ ॥
এতদণ্ডং বিশেষাখ্যং ক্রমবৃদ্ধৈর্দশোত্তরৈঃ।
তোয়াদিভিঃ পরিবৃতং প্রধানেনাবৃতৈর্বহিঃ ॥ শ্রীভা, ৩।২৬।৫১-৫২॥"

এই অণ্ডটী বহু সহস্রবৎসর পর্য্যন্ত জলে অবস্থিত ছিল। তাহার পরে, কাল, কর্ম্ম (জীবাদৃষ্ট) এবং স্বভাবে অধিষ্ঠিত হইয়া সেই হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী পুরুষ তাহাতে প্রবেশ করিয়া জীবসমষ্টির অভিব্যঞ্জক হইয়া অচেতন অণ্ডকে সচেতন করেন। অণ্ডমধ্যে প্রবিষ্ট হইলেও সেই পুরুষ কিন্তু সর্ব্বব্যাপক, অণ্ডের ভিতরে এবং বাহিরেও অবস্থিত—সুতরাং অণ্ডমধ্যে অবস্থিত হইলেও তিনি যেন অণ্ডকে ভেদ করিয়া বাহিরে নির্গত হইয়া অবস্থিত। তাঁহার স্বরূপ হইতেছে এই যে, তাঁহার সহস্র মস্তক, সহস্র বদন, সহস্র চক্ষুঃ, সহস্র বাহু, সহস্র উরু এবং সহস্র চরণ।

"বর্ষপূগসহস্রান্তে তদণ্ডমুদকেশয়ম্।
কালকর্ম্মস্বভাবস্থো জীবোঽজীবমজীবয়ৎ ॥
স এব পুরুষস্তস্মাদণ্ডং নির্ভিদ্য নির্গতঃ।
সহস্রোর্ব্বঙ্ঘ্রিবাহ্বক্ষঃ সহস্রাননশীর্ষবান্ ॥ শ্রীভা, ২।৫।৩৪-৩৫ ॥"

অন্যত্রও শ্রীমদ্ভাগবত উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়াছেন।

"তানি চৈকৈকশঃ স্রষ্টুমসমর্থানি ভৌতিকম্।
সংহত্য দৈবযোগেন হৈমমণ্ডমবাসৃজন্ ॥
সোঽশয়িষ্টাব্ধিসলিলে অণ্ডকোষো নিরাত্মকঃ।
সাগ্রং বৈ বর্ষসাহস্রমন্ববাৎসীৎ তমীশ্বরঃ ॥ শ্রীভা, ৩।২০।১৪-১৫ ॥"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—পরিণামদায়িনী শক্তি এবং সংহনন-শক্তি, এতদুভয়ের ক্রিয়ায় ঈশ্বরাধিষ্ঠিত কাল-কর্ম্মাদির প্রভাবে মহাভূতাদির যথাযথ সম্মিলনে একটী ভৌতিক হৈম

অণ্ডের সৃষ্টি হইল। অণ্ড হইতেছে একটী গোলাকার বস্তু। ঘূর্ণনব্যতীত কোনও তরল বা কোমল বস্তু গোলাকারত্ব প্রাপ্ত হইতে পারে না। আবার, কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তির ক্রিয়াব্যতীত কোনও বস্তুর ঘূর্ণনও সম্ভব নয়। ঘূর্ণনের নিমিত্ত পরস্পর সামকৌণিকী তুইটী শক্তির প্রয়োজন—যে বৃত্তাকার পথে বস্তুটী ঘুরিতে থাকে, তাহার কেন্দ্রের দিকে একটী শক্তি এবং সেই শক্তির সমকোণে বৃত্তের স্পর্শনীরেখার দিকে আর একটী শক্তি— এই তুইটী শক্তির সমবায়ে যে শক্তির উদ্ভব হয়, সেই শক্তির প্রভাবেই বস্তুটী বৃত্তের পরিধিপথে ঘুরিতে থাকে। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ প্রকৃতিতে প্রথমে যে পরিণতিদায়িনী শক্তির সঞ্চার করিয়াছেন, তাহার প্রভাবে প্রকৃতি কেবল ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বে পরিণতিই প্রাপ্ত হইয়াছে, তাহা এই তত্ত্বসমূহের মিলন ঘটাইতে পারে নাই। পরিণতিদায়িনী শক্তিদ্বারা চালিত তত্ত্ব সমূহের পরস্পরের সহিত মিলনের নিমিত্তও অপর একটী সামকৌণিকী শক্তির প্রয়োজন। তাহাতেই বুঝা যায়—তত্ত্বসমূহের মিলনের নিমিত্ত যে সংহনন-শক্তি সঞ্চারিত হইয়াছিল, তাহা পরিণতিদায়িনী শক্তির সামকৌণিকী। সংহনন-শক্তির প্রভাবে মহাভূতাদি তত্ত্বসমূহ সম্মিলিত হইয়া যখন অণ্ডাকারে পরিণত হইয়াছে বলিয়া জানা যায়, তখন ঐ সংহনন-শক্তিটী যে অণ্ডের কেন্দ্রাভিমুখিনী শক্তি —অণ্ডের কেন্দ্র হইতেই যে ইহা ক্রিয়া করিতেছে—তাহাও সহজেই বুঝা যায়। এই কেন্দ্রাভিমুখিনী সংহনন-শক্তির অধিষ্ঠাতারূপেই হিরণ্যগর্ভান্তর্য্যামী সহস্রশীর্ষা পুরুষ অণ্ডমধ্যে অবস্থিত ছিলেন। ইনিই কারণার্ণবশায়ীর দ্বিতীয় স্বরূপ গর্ভোদশায়ী পুরুষ। ইনি ব্যষ্টিব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্য্যামী।

"ইতি তাসাং স্বশক্তীনাম্" হইতে আরম্ভ করিয়া "সোঽনুপ্রবিষ্টো" পর্য্যন্ত পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীভা ৩।৬।১-৩-শ্লোক হইতে জানা যায়, সংহনন-শক্তিকে অবলম্বন পূর্ব্বক কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ত্রয়োবিংশতি তত্ত্বের প্রত্যেকটীর মধ্যেই প্রবেশ করিয়াছেন এবং সংহনন-শক্তিদ্বারা তাহাদিগকে সম্মিলিত করিয়াছেন। ইহা হইতে বুঝা যায় —পরিণামদায়িনী শক্তি এবং সংহনন-শক্তি—এই উভয়শক্তির ক্রিয়ায় প্রত্যেকটী তত্ত্ব এবং তাহার অংশও ঘূর্ণায়মানভাবেই অন্যান্য তত্ত্বের সঙ্গে সম্মিলিত হইয়াছিল, এবং তাহার ফলে সম্মিলিত অংশসমূহও গোলাকারত্ব লাভ করিয়াছিল, গোলাকৃতি অণু-পরমাণুরূপেই তাহারা পরস্পরের সহিত সম্মিলিত হইয়া হৈম অণ্ডের সৃষ্টি করিয়াছিল। যতদিন পর্য্যন্ত সৃষ্ট অণ্ডের অস্তিত্ব থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই উভয়শক্তি ক্রিয়া করিবে, ততদিন পর্য্যন্তই অণু-পরমাণু-আদির এবং অণ্ডেরও ঘূর্ণন অবিরাম চলিতে থাকিবে। স্ব-স্ব-অক্ষরেখার চতুর্দ্দিকে ভূরাদি লোকের ঘূর্ণনই তাহার প্রমাণ।

যাহা হউক, যে হৈম অণ্ডটীর কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে চতুর্দ্দশভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড। এই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকেই দ্বিতীয় পুরুষাবতার গর্ভোদকশায়ীর বিরাট্ রূপ বলিয়া কল্পনা করা হয় (৩।১৬ খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

শাস্ত্র হইতে জানা যায়, কেবল একটী নয়, অনন্ত অণ্ডের—অনন্ত সংখ্যক ব্রহ্মাণ্ডের—সৃষ্টি হইয়াছে।

"দ্যুপতয় এব তে ন যযুরন্তমনন্ততয়া ত্বমপি যদন্তরাণ্ডনিচয়া ননু সাবরণাঃ।
খ ইব রজাংসি বান্তি বয়সা সহ যচ্ছ্রুতয় স্তয়ি হি ফলন্ত্যতন্নিরসনেন ভবন্নিধনাঃ॥
—শ্রীভা, ১০৷৮৭৷৪১॥

—(ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া শ্রুতিগণ বলিয়াছেন) হে ভগবন্! স্বর্গাদি-লোকাধিপতি ব্রহ্মাদি দেবগণও তোমার অন্ত পায়েন না; এমন কি, নিজে অনন্ত বলিয়া তুমি নিজেও নিজের অন্ত পাও না। (তোমার অনন্তত্বের প্রমাণ এই যে), আকাশে ধূলিকণা সমূহ যেরূপ ঘুরিয়া বেড়ায়, তদ্রূপ তোমার মধ্যে (তোমার রোমবিবরে) সাবরণ (উত্তরোত্তর-দশগুণ-সপ্তাবরণযুক্ত) ব্রহ্মাণ্ডসমূহ কালচক্রের দ্বারা (প্রবর্ত্তিত হইয়া) যুগপৎ পরিভ্রমণ করিতেছে। তাই, তোমাতেই সমাপ্তিপ্রাপ্ত শ্রুতিসকল অতদ্‌বস্তু-নিরসনপূর্ব্বক তোমাকে বিষয়ীভূত করিয়াই সফলতা লাভ করিয়া থাকে।"

এই শ্লোক হইতে অনন্ত ব্রহ্মাণ্ডের (অণ্ডনিচয়াঃ) অস্তিত্বের কথা জানা গেল।

যস্য প্রভা প্রভবতো জগদণ্ডকোটিকোটিষ্বশেষ-বসুধাদিবিভূতিভিন্নম্।
তদ্‌ব্রহ্ম নিষ্কলমনন্তমশেষভূতং গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥—ব্রহ্মসংহিতা॥৫।৪০॥

—অনন্ত কোটি ব্রহ্মাণ্ডে, বসুধাদি-বিভূতিদ্বারা যিনি ভেদপ্রাপ্ত হইয়াছেন, সেই পূর্ণ, নিরবচ্ছিন্ন এবং অশেষভূত ব্রহ্ম—প্রভাবশালী যাঁহার অঙ্গপ্রভা, সেই আদিপুরুষ গোবিন্দকে আমি (ব্রহ্মা) ভজন করি।"

এ-স্থলেও অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ডের অস্তিত্বের কথা জানা গেল।

প্রথমপুরুষ কারণার্ণবশায়ী মহাবিষ্ণু অনন্তকোটি ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টি করিয়া তাহাদের প্রত্যেকটীর মধ্যে গর্ভোদকশায়ী দ্বিতীয় পুরুষরূপে প্রবেশ করিলেন।

"দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে মিলন। মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥
অগণ্য অনন্ত যত অণ্ড-সন্নিবেশ। তত রূপে পুরুষ করে সভাতে প্রবেশ॥
শ্রীচৈ, চ, ১।৫।৫৭-৫৯॥"

এই দ্বিতীয় পুরুষাবতার ব্রহ্মাণ্ডমধ্যে প্রবেশ করিয়া অণ্ডমধ্যস্থিত উদকে (বা জলে) শয়ন করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে গর্ভোদশায়ী বলা হয়।

"সেই পুরুষ অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড সৃজিয়া। সব অণ্ডে প্রবেশিলা বহু মূর্ত্তি হঞা॥
ভিতরে প্রবেশি দেখে সব অন্ধকার। রহিতে নাহিক স্থান, করিল বিচার॥
নিজ অঙ্গে স্বেদজল করিল সৃজন। সেই জলে কৈল অর্দ্ধ ব্রহ্মাণ্ড ভরণ॥
ব্রহ্মাণ্ড-প্রমাণ—পঞ্চাশত কোটি যোজন। আয়াম বিস্তার হয় দুই এক সম॥
জলে ভরি অর্দ্ধ তাহা কৈল নিজ বাস। আর অর্দ্ধে কৈল চৌদ্দ ভুবন প্রকাশ॥
শ্রী চৈ, চ, ।৫।৭৮-৮২।"

"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য" ইত্যাদি শ্রীভা, ১।৩।২-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণ লিখিয়াছেন—"যস্য পুরুষস্য দ্বিতীয়ব্যূহেন ব্রহ্মাণ্ডং প্রবিশ্য অম্ভসি গর্ভোদকে শয়ানস্য ইত্যাদি যোজ্যম্—সেই কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের দ্বিতীয় ব্যূহ (দ্বিতীয় স্বরূপ) প্রতি সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেই ব্রহ্মাণ্ড-গর্ভস্থ জলে শয়ন করিলেন।" সেই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"একৈক-প্রকাশেন প্রবিশ্য স্বসৃষ্টে গর্ভোদে শয়ানস্য—এক এক রূপে এক এক ব্রহ্মাণ্ডে প্রবেশ করিয়া সেস্থানে নিজে জল সৃষ্টি করিলেন এবং সেই জলে তিনি শয়ন করিলেন।"

সকল ব্রহ্মাণ্ডের আয়তন সমান নহে। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত স্থানান্তরে বলিয়াছেন—

"—এই ব্রহ্মাণ্ড পঞ্চাশৎ কোটি যোজন। * 　* 　* 　*
কোন ব্রহ্মাণ্ড শতকোটি, কোন লক্ষ কোটি। কোন নিযুত কোটি, কোন কোটি-কোটি॥
২।২১।৬৮-৬৯॥"

আমাদের এই ব্রহ্মাণ্ডের আয়তনই পঞ্চাশৎকোটি যোজন।

চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডের অঙ্গীভূত চতুর্দ্দশ ভুবন হইতেছে এই :—পাতাল, রসাতল, মহাতল, তলাতল, সুতল, বিতল ও অতল—এই সপ্ত পাতাল। আর, ভূর্লোক, (ধরণী), ভুবর্লোক, স্বর্লোক, মহর্লোক, জনলোক, তপোলোক ও সত্যলোক—এই সপ্তলোক। (শ্রীভা, ২।১।২৬-২৮॥)।"

এই চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ডকেই গর্ভোদশায়ীর বিরাট্ রূপ বলিয়া কল্পনা করা হয়।

মহত্তত্ত্ব হইতে আরম্ভ করিয়া চতুর্দ্দশ-ভুবনাত্মক ব্রহ্মাণ্ড পর্য্যন্ত যে সৃষ্টি, তাহাকেই বলা হয় সর্গ। ইহা হইতেছে কারণার্ণবশায়ী প্রথম পুরুষের সৃষ্টি।

ঘ। অবিদ্যার সৃষ্টি

কারণার্ণবশায়ীর সৃষ্টি-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে তৎকর্ত্তৃক অবিদ্যার সৃষ্টির কথাও বলা হইয়াছে। সেস্থলে কারণার্ণবশায়ীর সৃষ্টিকে ছয় রকমে ভাগ করা হইয়াছে (শ্রী ভা, ৩।১০।১৫-১৭); যথা ;

(১) মহত্তত্ত্বের সৃষ্টি
(২) অহঙ্কার-তত্ত্বের সৃষ্টি।
(৩) পঞ্চ তন্মাত্রের ও পঞ্চমহাভূতের সৃষ্টি
(৪) জ্ঞানেন্দ্রিয়-কর্ম্মেন্দ্রিয়ের সৃষ্টি
(৫) ইন্দ্রিয়াধিষ্ঠাতা দেবগণের সৃষ্টি
(৬) অবিদ্যার সৃষ্টি।

অবিদ্যার সৃষ্টি সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"ষষ্ঠস্তু তমসঃ সর্গো যস্ত্ববুদ্ধিকৃতঃ প্রভোঃ॥ শ্রীভা, ৩।১০।১৭॥" টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন :—"মায়ার তিনটী বৃত্তি—প্রধান, অবিদ্যা এবং বিদ্যা। প্রধানের দ্বারা মহত্তত্ত্ব

হইতে আরম্ভ করিয়া পৃথিবী পর্য্যন্ত তত্ত্বসমূহের সৃষ্টি হইয়াছে। এই সমস্ত হইতেই জীবের সমষ্টি-ব্যষ্টিরূপ স্থূল ও সূক্ষ্ম উপাধিসমূহের উদ্ভব।

অবিদ্যাদ্বারা জীবকে মোহিত করা হয়; অবিদ্যার প্রভাবেই জীবের অহংমমত্বাদি জ্ঞান জন্মে, দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মে, রাগদ্বেষাদিতে অভিনিবেশ জন্মে, পঞ্চবিধ অজ্ঞান জন্মে। সত্য-মিথ্যাত্মক এই জগৎ প্রধান ও অবিদ্যাদ্বারা সৃষ্ট।

বিদ্যাদ্বারা পঞ্চবিধ অজ্ঞানের নিবর্ত্তক জ্ঞানের উদ্ভব হয়।"

জীবের কর্ম্মফল ভোগের জন্য অবিদ্যার প্রয়োজন আছে বলিয়াই বোধ হয় অবিদ্যার সৃষ্টি (অর্থাৎ প্রকটন)। আর, সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্য বিদ্যার প্রয়োজন।

উল্লিখিত ছয় রকম সৃষ্টিকে প্রাকৃত সৃষ্টি বলা হয়।

১৯। সৃষ্টির ক্রম। ব্যষ্টি-সৃষ্টি বা বিসৃষ্টি

গর্ভোদশায়ীর নাভিপদ্ম হইতে ব্রহ্মার জন্ম হয়।

"যস্যাম্ভসি শয়ানস্য যোগনিদ্রাং বিতন্বতঃ।
নাভিহ্রদাম্বুজাদাসীদ্ ব্রহ্মা বিশ্বসৃজাং পতিঃ॥ শ্রীভা, ১।৩।২॥

—যোগনিদ্রা অবলম্বন পূর্ব্বক জলে শয়ান পুরুষের নাভিহ্রদ হইতে সমুদ্ভূত পদ্মে বিশ্বস্রষ্টাদের পতি ব্রহ্মার জন্ম হইল।"

"তাঁর নাভিপদ্ম হৈতে উঠিল এক পদ্ম। সেই পদ্ম হৈল ব্রহ্মার জন্মসদ্ম॥
সেই পদ্মনালে হৈল চৌদ্দ ভুবন। তেঁহ ব্রহ্মা হৈয়া সৃষ্টি করিল সৃজন॥
শ্রীচৈ, চ, ১।৫।৮৬-৮৭॥"

এই ব্রহ্মা হইতেই ব্যষ্টিজীবের সৃষ্টি বা বিসর্গ।

ক। সকল কল্পেই সৃষ্টি একরূপ

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়—এই বিশ্ব এক্ষণে যে প্রকার, পূর্ব্বেও এই প্রকারই ছিল এবং ভবিষ্যতেও এই প্রকারই হইবে।

"যথেদানীং তথা চাগ্রে পশ্চাদপ্যেতদীদৃশম্॥৩।১০।১৩॥"

প্রতি কল্পেই পূর্ব্বকল্পের অনুরূপ ভাবে সৃষ্টি হয় এবং মহাপ্রলয়ের পরেও যে সৃষ্টি হয়, তাহাও মহাপ্রলয়ের পূর্ব্ববর্ত্তিনী সৃষ্টিরই অনুরূপ। বেদান্ত-দর্শনও তাহা বলিয়া গিয়াছেন—

"সমাননামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধো দর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ॥ ১।৩।৩০॥ ব্রহ্মসূত্র॥

—নাম ও রূপ সমান হওয়ায় পুনঃপুনঃ আগমনেও কোনও বিরোধ থাকে না; শ্রুতি-স্মৃতিতে এইরূপ উল্লেখ আছে।"

মহাপ্রলয়ে দেব-মনুষ্যাদি থাকে না। কিন্তু তাহার পরে যখন আবার সৃষ্টি হয়, তখন পূর্ব্ব সৃষ্টিতে দেব-মনুষ্যাদির যে সকল নাম ও রূপ ছিল, সে-সকল নামরূপেরই সৃষ্টি হয়।

ইহার অনুকূল শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যও ভাষ্যকারগণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এ-স্থলে কয়েকটী শাস্ত্র-বাক্যের উল্লেখ করা হইতেছেঃ—

"সূর্য্যাচন্দ্রমসৌ ধাতা যথাপূর্ব্বমকল্পয়ৎ।
দিবং চ পৃথিবীং চান্তরিক্ষমথো স্বঃ॥ তৈত্তি, নারা, ৬।২৪॥

—বিধাতা ঠিক পূর্ব্বের ন্যায় সূর্য্য ও চন্দ্রের সৃষ্টি করিলেন, দ্যুলোক, পৃথিবী, অন্তরিক্ষ এবং স্বর্লোকও সৃষ্টি করিলেন।"

"যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥১।৫।৬৪॥

—পর্য্যায়ক্রমে বিভিন্ন ঋতুতে যেরূপ বিভিন্ন প্রকার পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ঋতুচিহ্নসমূহ দৃষ্ট হয়, যুগের আদিতে (পূর্ব্বকল্পীয়) পদার্থসমূহও তদ্রূপ (দৃষ্ট হয়)।"

"ঋষীণাং নামধেয়ানি যাশ্চ বেদেষু দৃষ্টয়ঃ।
শর্ব্বর্য্যন্তে প্রসূতানাং তান্যেবৈভ্যো দদাত্যজঃ।
যথর্ত্তাবৃতুলিঙ্গানি নানারূপাণি পর্য্যয়ে।
দৃশ্যন্তে তানি তান্যেব তথা ভাবা যুগাদিষু॥
যথাভিমানিনোঽতীতাস্তুল্যাস্তে সাম্প্রতৈরিহ।
দেবা দেবৈরতীতৈর্হি রূপৈর্নামভিরেব চ॥ —শ্রীপাদ শঙ্করধৃত-স্মৃতিবাক্য॥

—পরমেশ্বর প্রলয়ের পর পুনঃসৃষ্টিকালে ঋষিদিগকে নাম ও বেদ বিষয়ক জ্ঞান প্রদান করেন। যেমন ঋতুচিহ্নসকল পুনঃপুনঃ দৃষ্ট হয়, ঠিক পূর্ব্বতন বসন্তাদি ঋতুর চিহ্ন (পত্র-পুষ্পাদির উদ্গম্) পরবর্ত্তী বসন্তাদিতে প্রকাশ পায়, তেমনি প্রলয়ের পর যুগারম্ভকালেও পূর্ব্বকল্পীয় পদার্থ সকল উদ্ভূত হইয়া থাকে। অতীত কল্পের দেবতারা যদ্রূপ অভিমানী ও যদ্রূপ নামবিশিষ্ট ছিলেন, বর্ত্তমান দেবতারাও তদ্রূপ নাম, রূপ ও অভিমান ধারণ করেন।"

খ। ব্রহ্মার কৃত সৃষ্টি

ঈশ্বরের শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়া ব্রহ্মা ব্যষ্টিজীবের (অর্থাৎ জীবদেহের) সৃষ্টি করেন। ব্রহ্মার সৃষ্টিকে বৈকৃত বা বৈকারিক সৃষ্টি বলে (শ্রীভা. ৩।১০।১৪, ২৫)। বৈকৃত সৃষ্টি এইরূপঃ—

(১) স্থাবরের সৃষ্টি।

স্থাবর ছয় রকম — প্রথমতঃ, বনস্পতি। যে সকল বৃক্ষে পুষ্প ব্যতিরেকে ফল হয়, তাহা--দিগকে বনস্পতি বলে।

দ্বিতীয়তঃ, ওষধি। যে সকল বৃক্ষ ফল পাকিলেই বিনষ্ট হয়, তাহাদিগকে ওষধি বলে।

তৃতীয়তঃ, লতা। যে সকল উদ্ভিদ বৃক্ষারোহণ করে, তাহাদিগকে লতা বলে।

চতুর্থতঃ, ত্বক্‌সার। বেণু প্রভৃতি। ভিতরে ফাঁপা।

পঞ্চমতঃ, বীরুধ। বীরুধও লতা-বিশেষ ; পূর্ব্বোল্লিখিত লতা অপেক্ষা বীরুধ কঠিন ; বীরুধ বৃক্ষে আরোহণের অপেক্ষা রাখেনা।

ষষ্ঠতঃ, বৃক্ষ। যে সকল উদ্ভিদে প্রথমে পুষ্প হয়, তাহার পরে ফল হয়, তাহাদিগকে বৃক্ষ বলে।

উল্লিখিত স্থাবরসমূহ আহার্য্য-সংগ্রহার্থ উর্দ্ধ দিকে বর্দ্ধিত হয়, তাহাদের চৈতন্য অব্যক্ত ; কিন্তু তাহাদের অন্তরে স্পর্শজ্ঞান আছে। অব্যবস্থিত পরিণামাদি ভেদে স্থাবর-সমূহ বিবিধ ভেদ বিশিষ্ট হইয়া থাকে। (শ্রী ভা. ৩।১০।১৯-২০)।

(২) তির্য্যক্‌ সৃষ্টি। তির্য্যক্‌ প্রাণিগণ ভবিষ্যৎ-জ্ঞানশূন্য, বহুল তমোগুণ-বিশিষ্ট ; কেবল আহার-শয়নাদিতেই তৎপর। তাহারা কেবল ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা তাহাদের অভিলষিত বস্তু জানিতে পারে। তাহাদের হৃদয়ে কোনও জ্ঞান থাকেনা, অর্থাৎ তাহারা দীর্ঘানুসন্ধানশূন্য (শ্রীভা. ৩।১০।২১)।

তির্যক্ প্রাণী আটাইশ রকমের। যথা— গো, ছাগ, মহিষ, কৃষ্ণ (মৃগ বিশেষ), শূকর, গবয়, রুরু (মৃগ বিশেষ), অবি (মেষ) এবং উষ্ট্র। এই নয় প্রকার পশু হইতেছে দ্বিশফ অর্থাৎ ইহাদের প্রতিপদে দুইটী করিয়া খুর আছে।

আর গর্দ্দভ, অশ্ব, অশ্বতর (খচ্চর), গৌর (মৃগ বিশেষ), শরভ এবং চমরী। এই ছয় রকমের পশু একশফ, অর্থাৎ ইহাদের প্রতিপদে একটী করিয়া খুর আছে।

আর, কুক্কুর, শৃগাল, বৃক, ব্যাঘ্র, বিড়াল, শশক, শল্লক (শজারু), সিংহ, বানর, হস্তী, কচ্ছপ এবং গোধা (গোসাপ)—এই দ্বাদশ রকম পশু পঞ্চনখ, অর্থাৎ ইহাদের পাঁচটি করিয়া নখ আছে।

আর, মকরাদি জলচর এবং কঙ্ক, গৃধ্র, বক, শ্যেন, ভাস, ভল্লক, ময়ূর, হংস, সারস, চক্রবাক, পেচক—এই সকল জন্তু খেচর, অর্থাৎ আকাশে বিচরণকারী।

এ-স্থলে উল্লিখিত তির্য্যক্ প্রাণীদিগের মধ্যে— দ্বিশফ হইল নয় রকমের, একশফ ছয় রকমের এবং পঞ্চনখ বার রকমের, মোট সাতাইশ রকমের জীব হইতেছে ভূচর। আর মকরাদি জল- -চর এবং কঙ্করাদি খেচরকে একশ্রেণীভুক্ত অ-ভূচর—রূপে গণ্য করা হইয়াছে। তাহাতে মোট আটাইশ রকমের তির্য্যক্‌ হইল। (শ্রীভা. ৩।১০।২২-২৫)।

(৩) **মনুষ্য-সৃষ্টি।** মনুষ্যগণ একশ্রেণীভুক্ত। মনুষ্যদিগের আহার-সঞ্চার নিম্নদিকে। ইহাদের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্য ; এজন্য ইহারা কর্ম্মে তৎপর এবং দুঃখেও সুখবোধ করে (শ্রীভা, ৩।১০।২৬)।

উল্লিখিত তিন রকমের সৃষ্টিকে বৈকৃত (বা বৈকারিক) সৃষ্টি বলে। পূর্ব্বোল্লিখিত কারণার্ণব-শায়ীর প্রাকৃত সৃষ্টি অপেক্ষা ন্যূনত্ববশতঃই ইহাকে বৈকৃত বলা হয়। ন্যূনত্বের হেতু এই যে, বৈকারিক

হইতেছে অদেবতারূপ সৃষ্টি। "যস্তু বৈকারিকস্তত্ত্বদেবতারূপঃ স তু প্রোক্তঃ॥ শ্রীভা, ৩।১০।২৭ শ্লোক টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী।"

কিন্তু সনৎকুমারাদির সৃষ্টি উভয়াত্মক— প্রাকৃত ও বৈকৃত-এই উভয়ের অন্তর্ভুক্ত; কেননা, তাঁহাদের মধ্যে দেবত্ব ও মনুষ্যত্ব উভয়ই বিদ্যমান। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন— সনৎকুমারাদি ব্রহ্মার মনে আবির্ভূত হইয়াছেন, তজ্জন্য তাঁহাদিগকে সৃজ্যের অন্তর্ভূত এবং অনন্তর্ভূত— উভয়ই বলা যায় বলিয়া তাঁহাদিগকে উভয়াত্মক বলা হইয়াছে। "কৌমারস্তূভয়াত্মক ইতি তেষাং ব্রহ্মণো মনস্যাবির্ভূত-মাত্রত্বাৎ তৎসৃজ্যান্তঃপাতাপাতবিবক্ষয়া। শ্রীভা, ৩।১০।২৭-শ্লোকটীকা।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন— ভগবদ্ধ্যানপূত চিত্ত হইতে ব্রহ্মা সনৎকুমারাদিকে সৃষ্টি করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাদিগকে বৈকৃত-সৃষ্টি বলা যায়। আবার ভগবজ্জন্যত্ব বশতঃ (ব্রহ্মার ধ্যানের ফলে ভগবান্ই তাঁহাদিগকে আবির্ভাবিত করিয়াছেন বলিয়া) তাঁহাদিগকে প্রাকৃত সৃষ্টিও বলা যায়। এজন্য তাঁহাদিগকে উভয়াত্মক বলা হইয়াছে। "সনৎকুমারাদীনাং সর্গস্তু উভয়াত্মক ইতি তেষাং ভগব--দ্ধ্যানপূতেন মনসাস্যাং স্ততোঽসৃজদিত্যগ্রিমোক্তেঃ ভগবদ্ধ্যানজন্যত্বেন ভগবজ্জন্যত্বাচ্চ প্রাকৃতো বৈকৃতশ্চ ইত্যর্থঃ॥ শ্রীভা, ৩।১০।২৭-শ্লোকের টীকা।"

(৪) বৈকারিক দেবসৃষ্টি

ব্রহ্মার কৃত বৈকারিক দেবসৃষ্টি আটপ্রকার যথা— দেব, পিতৃ, অসুর, (গন্ধর্ব্ব, অপ্সরনা) (যক্ষ, রক্ষঃ), (সিদ্ধ, চারণ, বিদ্যাধর), (ভূত, প্রেত, পিশাচ), (কিন্নর, কিংপুরুষ) ইত্যাদি (শ্রীভা, ৩।১০।২৮)।

দেব, পিতৃ, অসুর এই তিন। গন্ধর্ব্ব ও অপ্সরা উভয়ে মিলিয়া এক। যক্ষ ও রক্ষঃ-এই উভয়ে এক। সিদ্ধ, চারণ ও বিদ্যাধর এই তিনে মিলিয়া এক ভেদ। ভূত, প্রেত ও পিশাচ এই তিনে এক ভেদ। কিন্নর, কিংপুরুষ ইত্যাদিতে এক। এই আট রকম ভেদ।

২০। সৃষ্টি ও সাংখ্যদর্শনোক্তা প্রকৃতি

নিরীশ্বর সাংখ্যদর্শন দুইটী মাত্র তত্ত্ব স্বীকার করেন— প্রকৃতি ও পুরুষ। সাংখ্যের পুরুষ হইতেছে জীবাত্মা। সাংখ্যদর্শনের মতে প্রকৃতি অচেতনা, জড়রূপা, স্বতঃপরিণামশীলা এবং স্বতন্ত্রা। সাংখ্যদর্শন ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকার করেন না; সুতরাং প্রকৃতিকে ঈশ্বরের শক্তি বলিয়াও স্বীকার করেন না। এজন্য প্রকৃতি স্বতন্ত্রা।

এই দর্শনের মতে পরিণাম-স্বভাবা বলিয়া প্রকৃতি আপনা-আপনিই মহত্তত্ত্বাদিতে পরিণত হইয়া জগতের সৃষ্টি করিয়া থাকে। বেদান্তদর্শনে সূত্রকার ব্যাসদেব "ঈক্ষতের্নাশব্দম্॥ ১।১।৫॥"-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া প্রথম অধ্যায়ের বহুসূত্রে সাংখ্যের উল্লিখিত মতের খণ্ডন করিয়া ব্রহ্মেরই জগৎ-

-কারণত্ব প্রতিপাদিত করিয়াছেন। অচেতনা প্রকৃতি যে জগৎ-কারণ হইতে পারে না, তাহার স্বতঃ-পরিণামশীলত্বও যে যুক্তিসঙ্গত নহে, সূত্রকার ব্যাসদেব, নানাবিধ পূর্ব্বপক্ষের খণ্ডনপূর্ব্বক, অতি পরিষ্কার ভাবে তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

২১। সৃষ্টি ও বৈশেষিকাদি দর্শন

বৈশেষিক দর্শনের মতে পরমাণুই জগতের কারণ। সূত্রকার ব্যাসদেব সাংখ্যমতের খণ্ডন করিয়া সর্বশেষে "এতেন সর্ব্বে ব্যাখ্যাতা ব্যাখ্যাতাঃ ॥১।৪।২৮॥"-ব্রহ্মসূত্রে বলিয়া গিয়াছেন যে, যে সমস্ত যুক্তিতে সাংখ্যোক্তা প্রকৃতির জগৎ-কারণত্ব খণ্ডিত হইয়াছে, সেই সমস্ত যুক্তিতেই বৈশেষিক দর্শনের পরমাণুর জগৎ-কারণত্ব এবং এই জাতীয় অন্যান্য দর্শনের জগৎ-কারণত্ব-বাদও খণ্ডিত হওয়ার যোগ্য।

সাংখ্য-বৈশেষিকাদি দর্শনের সৃষ্টিতত্ত্ব অবৈদিক, কেবলমাত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত।

ষষ্ঠ-অধ্যায়

পরিণামবাদ

২২। পরিণামবাদ

এই জগৎ হইতেছে পরব্রহ্মের পরিণাম, পরব্রহ্মই জগৎ-রূপে নিজেকে পরিণত করিয়াছেন—ইহাই হইতেছে পরিণামবাদের তাৎপর্য্য।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।৮-১০ অনুচ্ছেদে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে যে, পরব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। তিনি যখন জগতের উপাদান, তখন জগৎ যে তাঁহার পরিণাম, তাহা সহজেই বুঝা যায়। "**আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ** ॥ ১।৪।২৬॥"—এই ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন (৩।১০ ঘ অনুচ্ছেদে এই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

"**তদাত্মানং স্বয়মকুরুত** ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ॥ ৭।১॥"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল, পরিণামবাদই শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রেত এবং ব্যাসদেবেরও সম্মত।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণাম বাদ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৭।১১৪॥
বস্তুত পরিণাম বাদ— সেই ত প্রমাণ ॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৭।১১৬॥"

২৩। সমগ্র ব্রহ্মের পরিণতি, না কি অংশের পরিণতি

প্রশ্ন হইতে পারে—জগৎ যদি ব্রহ্মেরই পরিণাম হয়, তাহা হইলে সমগ্র ব্রহ্মই কি জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন, না কি তাঁহার কোনও এক অংশমাত্র জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই :—

প্রথমতঃ, সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম-সম্বন্ধে।

"**কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্ব-শব্দকোপো বা** ॥২।১।২৬॥"-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"কৃৎস্নপরিণামপ্রসক্তৌ সত্যাং মূলোচ্ছেদঃ প্রসজ্যেত। দ্রষ্টব্যত্বোপদেশানর্থক্যঞ্চাপন্নম্, অযত্নদৃষ্টত্বাৎ কার্য্যস্য, তদ্ব্যতিরিক্তস্য চ ব্রহ্মণোঽভাবাৎ। অজত্বাদিশব্দব্যাকোপশ্চ।—সমগ্র ব্রহ্মের পরিণাম স্বীকার করিলে মূলেরই উচ্ছেদ হইয়া যায়, অর্থাৎ যদি মনে করা যায় যে, সমগ্র ব্রহ্মই জগৎ-রূপে

পরিণত হইয়াছেন, তাহা হইলে ব্রহ্ম-রূপে আর কিছুই থাকে না। ব্রহ্মরূপে যদি কিছু না-ই থাকে, তাহা হইলে শ্রুতি যে বলিয়াছেন—'ব্রহ্মকে দর্শন করিবে, জানিবে'—এই বাক্যোক্ত উপদেশও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কেননা, কার্য্যমাত্রই অযত্নদৃশ্য। ব্রহ্মের পরিণতি বলিয়া যদি জগৎকেই ব্রহ্ম বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে সেই জগৎ তো অনায়াসেই দৃষ্ট হয়, তাহার দর্শনের জন্য কোনওরূপ ধ্যান-ধারণাদি প্রযত্নের প্রয়োজন হয় না—সুতরাং তাহার দর্শনের জন্য শাস্ত্রোপদেশেরও কোনও প্রয়োজন থাকে না—এই অবস্থায় শাস্ত্রোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। আবার সমগ্র ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হইলে জগতের অতিরিক্ত ব্রহ্ম যখন আর থাকে না, তাহার দর্শনাদিরও সম্ভাবনা থাকে না ; সুতরাং এ-স্থলেও ব্রহ্মদর্শনের জন্য শাস্ত্রোপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে। আবার, সমগ্র ব্রহ্মই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন—ইহা স্বীকার করিলে, ব্রহ্ম অজ, অমর, ইত্যাদি কথা যে শ্রুতি বলিয়াছেন, তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে। কেননা, জগতের উৎপত্তি-বিনাশে ব্রহ্মেরই উৎপত্তি-বিনাশ স্বীকার করিতে হয়।"

শ্রীপাদ শঙ্করের এই যুক্তিদ্বারা বুঝা গেল—সমগ্র ব্রহ্ম জগৎ-রূপে-পরিণত হয়েন না।

এ-সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণও আছে। মাণ্ডুক্যশ্রুতি বলেন—"**ওমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং তস্যোপ-ব্যাখ্যানম্। ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চ অন্যৎ ত্রিকালাতীতং তদপি ওঙ্কার এব ॥১॥**—এই পরিদৃশ্যমান জগৎ 'ওম্'-এই অক্ষরাত্মক (অর্থাৎ ব্রহ্মাত্মক)। তাহার সুস্পষ্ট বিবরণ এই যে—ভূত, ভবিষ্যৎ এবং বর্ত্তমান—এই সমস্ত বস্তুই ওঙ্কারাত্মক (ব্রহ্মাত্মক) এবং কালাতীত আরও যাহা কিছু আছে, তাহাও এই ওঙ্কারই (ব্রহ্মই)।"

ইহা হইতে জানা গেল - কালত্রয়ের অধীন এই জগৎ ব্রহ্মাত্মক এবং কালত্রয়ের অতীতেও ব্রহ্ম আছেন। সুতরাং সমগ্র ব্রহ্ম যে জগৎ-রূপে পরিণত হয়েন নাই, তাহাই জানা গেল। কেননা, সমগ্র ব্রহ্মই যদি কালাধীন জগৎ-রূপে পরিণত হইয়া যায়েন, তাহা হইলে কালাতীত ব্রহ্ম আর থাকিতে পারেন না।

বৃহদারণ্যক-শ্রুতির তৃতীয় অধ্যায়ের সপ্তম ব্রাহ্মণে "**যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্** পৃথিব্যা অন্তরো" ইত্যাদি ৩।৭।৩-বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া "**যো রেতসি তিষ্ঠন্ রেতসোঽন্তরো**"-ইতাদি ৩।৭।২২-বাক্য পর্য্যন্ত কয়েকটী বাক্যে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম পৃথিব্যাদি সৃষ্ট পদার্থে বর্ত্তমান থাকিয়াও পৃথিব্যাদি সৃষ্টপদার্থ হইতে ভিন্ন। ইহা হইতেও জানা যায় সৃষ্ট জগতের অতীতেও ব্রহ্ম আছেন ; সুতরাং সমগ্র ব্রহ্ম জগৎ-রূপে পরিণত হইতে পারেন না।

দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্মাংশের পরিণাম-সম্বন্ধে।

সমগ্র ব্রহ্ম যদি জগৎ-রূপে পরিণাম প্রাপ্ত না হয়েন, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে—ব্রহ্মের কোনও এক অংশই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে এবং জগৎ যখন পরিচ্ছিন্ন, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তর-খণ্ডবৎ কোনও অংশই জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছে।

এইরূপ উক্তির উত্তরে বক্তব্য এই। সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ কোনও অংশ থাকিতে পারে না। এজন্যই শ্রুতি ব্রহ্মকে "নিষ্কলম্" বলিয়াছেন। টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ অংশ থাকিতে পারে কেবল পরিচ্ছিন্ন অবয়ব-বিশিষ্ট পৃথিব্যাদি প্রাকৃত বস্তুর। সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের তাদৃশ কোনও প্রাকৃত অবয়ব নাই ; সুতরাং টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ কোনও অংশও তাঁহার থাকিতে পারে না এবং তাদৃশ কোনও অংশের পরিণতিই এই জগৎ—এইরূপ অনুমানও সঙ্গত হয় না। এইরূপ অনুমানের যাথার্থ্য স্বীকার করিলে ব্রহ্মের প্রাকৃত অবয়বহীনত্ব-সম্বন্ধে যে সমস্ত শ্রুতিবাক্য আছে, তাহাদের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়। আবার, ব্রহ্মের তাদৃশ প্রাকৃত অবয়ব স্বীকার করিলে অনিত্যত্ব-প্রসঙ্গও আসিয়া পড়ে ; কেননা, প্রাকৃত অবয়বমাত্রেই অনিত্য। **"কৃৎস্নপ্রসক্তিঃ"**-ইত্যাদি ২।১।২৬-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"অথৈতদ্দোষপরিজিহীর্ষয়া সাবয়বমেব ব্রহ্মাভ্যুপগম্যেত, তথাপি যে নিরবয়বত্বস্য প্রতিপাদকাঃ শব্দা উদাহৃতাঃ, তে প্রকুপ্যেয়ুঃ। সাবয়বত্বে চানিত্যত্ব-প্রসঙ্গঃ। —যদি এই সকল দোষের পরিহারার্থ ব্রহ্মকে সাবয়ব বল, তাহা হইলে নিরবয়বত্ব-প্রতিপাদক শব্দের অর্থহানি হইবে। অপিচ, সাবয়ব-পক্ষে ব্রহ্মের নশ্বরতা আপত্তি হইবে।"

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের কোনও এক অংশও জগৎ-রূপে পরিণত হইতে পারে না।

২৪। সমগ্র ব্রহ্মের বা তাঁহার অংশের পরিণাম অসম্ভব হইলেও জগতের ব্রহ্ম-পরিণামত্ব শ্রুতিসিদ্ধ

প্রশ্ন হইতে পারে—বলা হইয়াছে, জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম। আবার বলা হইল, সমগ্র ব্রহ্মও পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন না, টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডবৎ তাঁহার কোনও অংশও পরিণতি প্রাপ্ত হইতে পারে না ; কেননা, তাদৃশ কোনও অংশই তাঁহার থাকিতে পারে না। তাহা হইলে জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলার তাৎপর্য্য কি ?

সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবই এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন, নিম্নলিখিত সূত্রে।

ক। শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২।১।২৭॥ ব্রহ্মসূত্র ॥

শ্রুতিপ্রমাণানুসারেই উক্ত আশঙ্কার নিরসন হয়। যেহেতু, শব্দগম্য বিষয়ে একমাত্র শব্দই প্রমাণ।

এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—ব্রহ্ম হইতেছেন শব্দমূল, শব্দপ্রমাণক, ইন্দ্রিয়াদি-প্রমাণক নহেন। অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান, বা উপমানাদির দ্বারা ব্রহ্মসম্বন্ধে কিছু জানিবার উপায় নাই ; একমাত্র শ্রুতিপ্রমাণেই ব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হইতে পারে। শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেই জগতের উৎপত্তি এবং তিনি জগৎ

হইতে ভিন্ন। "যথৈব হি ব্রহ্মণো জগদুৎপত্তিঃ শ্রূয়তে, এবং বিকারব্যতিরেকেণাপি ব্রহ্মণোঽবস্থানং শ্রূয়তে।" লৌকিক জগতেও দেখা যায়—মণিমন্ত্র-মহৌষধাদি তাহাদের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে দেশকাল-নিমিত্ত-বৈচিত্র্যবশতঃ অনেক বিরুদ্ধ কার্য্যের উৎপাদন করিয়া থাকে। মণি-মন্ত্রাদির এইরূপ শক্তির মহিমা উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কের বা যুক্তির দ্বারা জানা যায় না। অমুক বস্তুর অমুক সহায়, অমুক বিষয়, অমুক প্রয়োজন—এ সমস্ত যখন উপদেশ ব্যতীত কেবল তর্কের দ্বারা জানা যায় না, তখন অচিন্ত্য-প্রভাব ব্রহ্মের স্বরূপ যে শাস্ত্রব্যতীত কেবল তর্কের দ্বারা জানা যাইতে পারে না, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে ? পৌরাণিকগণও বলিয় থাকেন—"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্। —যে বস্তু অচিন্ত্য, চিন্তার অগোচর, তাহাকে তর্কের সহিত যুক্ত করিবে না (তর্কের সহায়তায় তাহার স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টা করিবে না ; তাহাতে কোনও সমাধান পাওয়া যাইবে না) যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহাই অচিন্ত্য।" এজন্যই বলা হইতেছে—অতীন্দ্রিয় বস্তুর স্বরূপের জ্ঞান শব্দমূলক, প্রত্যক্ষাদি প্রমাণের বিষয় নহে।

তাৎপর্য্য হইল এই যে—ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই সমগ্রভাবে বা আংশিক ভাবেও পরিণাম প্রাপ্ত না হইয়াও তিনি জগৎ-রূপে পরিণত হইতে পারেন। শ্রুতি যখন এইরূপ কথা বলিয়াছেন, তখন তাহা স্বীকার করিয়াই লইতে হইবে।

ব্রহ্মের যে অচিন্ত্য-শক্তি আছে, ব্যাসদেব পরবর্ত্তী সূত্রে তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

খ। আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥ ২।১।২৮॥ ব্রহ্মসূত্র ॥

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—শক্তি-সমূহ বিচিত্র। জগতে দেখা যায়—পরস্পর বিজাতীয় অগ্নি-জলাদি বস্তুতে পরস্পর বিজাতীয়া শক্তি আছে। অগ্নির উষ্ণতা আছে, জলের তাহা নাই। জলের অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব ধর্ম আছে, অগ্নির তাহা নাই ; ইত্যাদি। জগতে দৃশ্যমান বিজাতীয় অগ্নিজলাদির মধ্যেও যখন উষ্ণতাদি শক্তির বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয়, তখন জগতে দৃশ্যমান সর্ব্বপদার্থ হইতে বিজাতীয় পরব্রহ্মেও (আত্মনি) যে, অন্যত্র দেখা যায় না—এতাদৃশী সহস্র সহস্র শক্তি থাকিবে, তাহাতে অসঙ্গতি কিছু নাই। স্মৃতি-শাস্ত্রেও ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তির কথা আছে

মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥

বিষ্ণুপুরাণ ॥ ১।৩।১॥

—নির্গুণ, অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ ও বিমলস্বভাব ব্রহ্মেরও সৃষ্ট্যাদিকর্তৃত্ব কিরূপে স্বীকার করা হইয়া থাকে ?"

সামান্য দৃষ্টিতে পূর্ব্বোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট ব্রহ্মের পক্ষে সৃষ্টি-আদির কর্তৃত্ব সম্ভব নয়। তাই উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তরে ঋষি পরাশর মৈত্রেয়কে বলিয়াছেন—

"শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্ত সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ।
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ১৷৩৷২॥

—যেহেতু, সমস্ত ভাব-পদার্থেরই শক্তিসমূহ চিন্তার ও জ্ঞানের অগোচর; অতএব হে তাপস শ্রেষ্ঠ মৈত্রেয়! ব্রহ্মেরও সর্গাদির শক্তিসমূহ অগ্নির উষ্ণতার ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ। অর্থাৎ অগ্নির উষ্ণত্ব যেমন অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর (অগ্নির উষ্ণতা স্বাভাবিক; কিন্তু অগ্নির এতাদৃশ উষ্ণত্ব কেন, মিশ্রীর কেন এতাদৃশ উষ্ণত্ব নাই, তর্কবিচারের দ্বারা তাহা নির্ণয় করা যায় না। অগ্নির উষ্ণত্ব, মিশ্রীর মিষ্টত্ব ইত্যাদি স্বাভাবিক। তদ্রূপ ব্রহ্মেরও স্বাভাবিকী শক্তি আছে এবং ব্রহ্মের এতাদৃশী স্বাভাবিকী শক্তিও অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরা। এই সমস্ত অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই নির্গুণ, অপরিচ্ছিন্ন শুদ্ধ এবং অমলাত্মা হইয়াও ব্রহ্ম সৃষ্ট্যাদিকার্য্য নির্ব্বাহ করিয়া থাকেন এবং সৃষ্ট্যাদি কার্য্য করিয়াও তিনি অপরিচ্ছিন্ন, শুদ্ধ এবং অমলাত্মাই থাকেন)।"

এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও দৃষ্ট হয়।

"কিং স্বিদ্বনং ক উ স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা পৃচ্ছতে তু তদ্‌যদধ্যতিষ্ঠদ্‌ভুবনানি ধারয়ন্॥
ব্রহ্ম বনং ব্রহ্ম স বৃক্ষ আসীদ্ যতো দ্যাবা পৃথিবী নিষ্টতক্ষুঃ।
মনীষিণো মনসা বিব্রবীমি বো ব্রহ্মাধ্যতিষ্ঠদ্‌ভুবনানি ধারয়ন্॥ —যজুঃ ॥২৷২৷২৭॥

—হে সুধীগণ! জিজ্ঞাসা করি, যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী নিঃসৃত হইয়াছে, সেই বনই বা কি? এবং সেই বৃক্ষই বা কি—যাহাতে অধিষ্ঠান করিয়া পরমেশ্বর সর্ব্বজগৎ পরিপালন করিতেছেন? যাহা হইতে দ্যুলোক ও পৃথিবী প্রাদুর্ভূত হইয়াছে, ব্রহ্মই সেই বন এবং ব্রহ্মই সেই বৃক্ষ। হে মনীষিগণ! আমি তোমাদিগকে বলিতেছি—পরমেশ্বর স্বীয় সঙ্কল্পবলে ত্রিভুবন ধারণ করতঃ তাহাতে অধিষ্ঠান করিতেছেন।"

উল্লিখিত "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ"-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য যে শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতেও ব্রহ্মের অচিন্ত্যশক্তির কথা জানা যায়। তাঁহার উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যটী এই:—

"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণঃ ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ।
একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বান্ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ॥ *
শ্বেতাশ্বতরোপনিষদীতি॥ (সর্ব্বসম্বাদিনী ১৪৪ পৃঃ ধৃত)॥

—সেই পুরাণ-পুরুষ বিচিত্র-শক্তিসম্পন্ন। তাঁহার ন্যায় অপর কাহারই তাদৃশ বিচিত্র-শক্তি নাই। তিনি এক, বশী এবং সকল ভূতের অন্তরাত্মা; সকল দেবতাতে এক তিনিই অনুপ্রবিষ্ট।"

* অধুনাপ্রাপ্ত মুদ্রিত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে এই বাক্যটী দৃষ্ট হয় না।

উল্লিখিত ভাষ্যোক্তি এবং ভাষ্যধৃত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম স্বয়ং কোনওরূপ পরিণাম (বা বিকৃতি) প্রাপ্ত না হইয়াই স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে জগৎ-রূপে পরিণত হইয়াছেন।

২৫। জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম স্বরূপে অবিকৃত থাকেন

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য এবং ভাষ্যোদ্ধৃত শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য হইতে জানা গিয়াছে, অচিন্ত্য-প্রভাব পরব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে স্বরূপে অবিকৃত থাকেন।

তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির কথাও শ্রুতি-স্মৃতি বলিয়া গিয়াছেন; **"আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ॥** ২।১।২৮॥"-এই ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেবও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। আবার, "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত ॥তৈত্তিরীয় ॥ব্রহ্মানন্দ॥৭।১॥"-এইশ্রুতিবাক্য এবং "আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৬॥"-এই ব্রহ্মসূত্র বলিয়াছেন—ব্রহ্ম নিজেই জগদ্রূপে নিজেকে পরিণত করিয়াছেন। "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥ ২।১।২৬ ॥"-ব্রহ্মসূত্রে উত্থাপিত পূর্ব্বপক্ষের আপত্তি খণ্ডন-পূর্ব্বক "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২।১।২৭॥"-ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইলেও সমগ্র ব্রহ্মও পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন না, শ্রুতিতে যে তাঁহার নিরবয়বত্বের কথা বলা হইয়াছে, সেই নিরবয়বত্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যও নিরর্থক হয় না। (অর্থাৎ ব্রহ্মের টঙ্কচ্ছিন্ন-প্রস্তরখণ্ডবৎ কোনও অংশও পরিণাম প্রাপ্ত হয় না)। ব্রহ্ম চিদ্রূপ এবং সর্ব্বব্যাপক তত্ত্ব বলিয়া অবিচ্ছেদ্য; সুতরাং টঙ্কাচ্ছিন্ন-প্রস্তরখণ্ডবৎ কোনও অংশ তাঁহার থাকিতে পারে না; প্রাকৃত অবয়ববিশিষ্ট পরিচ্ছিন্ন পদার্থেরই তদ্রূপ অংশ সম্ভব। ব্রহ্ম প্রাকৃত-অবয়ববিশিষ্ট নহেন বলিয়া, তাঁহার তাদৃশ অংশ থাকা সম্ভব নহে বলিয়া, তাঁহার অংশমাত্র যে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, তাহাও অনুমান করা যায় না। তাৎপর্য্য হইল এই যে—ব্রহ্ম যখন সমগ্রভাবে বা আংশিকভাবেও পরিণাম-প্রাপ্ত বা বিকৃত হয়েন নাই, তখন স্বীকার করিতেই হইবে যে, জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। কিরূপে একথা স্বীকার করা যায়? "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"-শ্রুতি এইরূপ বলিয়াছেন; তাই ইহা স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, ব্রহ্মের স্বরূপের এবং প্রভাবের জ্ঞান একমাত্র শ্রুতিগম্য; ইহা অন্য কোনও প্রমাণগম্য নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম যে স্বরূপে অবিকৃত থাকেন, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায়? আমাদের এই লৌকিক জগতের অভিজ্ঞতায় আমরা জানি—মৃত্তিকা যখন ঘটাদি রূপে পরিণত হয়, তখন মৃত্তিকা বিকার-প্রাপ্ত হয়; যে মৃত্তিকাংশ ঘটাদিরূপে পরিণত হয়, তাহার আর পূর্ব্বস্বরূপ থাকে না। জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম কিরূপে অবিকৃত থাকিতে পারেন?

উত্তরে বক্তব্য এই:—

প্রথমতঃ, আমাদের অভিজ্ঞতা প্রাকৃত জগতের বস্তুনিচয়ের উপর প্রতিষ্ঠিত। যাহা প্রকৃতির অতীত, অপ্রাকৃত, তাহার বিষয়ে আমাদের কোনও অভিজ্ঞতা নাই ; আমাদের প্রাকৃত বিচার-বুদ্ধিও অপ্রাকৃত ব্যাপারে প্রবেশ করিতে পারে না। সুতরাং প্রাকৃত বস্তুর দৃষ্টান্তে অপ্রাকৃত বস্তুসম্বন্ধে বিচার করিতে যাওয়া সঙ্গত হয় না। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত বস্তু সমধর্ম্মবিশিষ্ট নহে। এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—যাহা প্রকৃতির অতীত, তাহা অচিন্তনীয়, আমাদের চিন্তার অতীত। প্রাকৃত জগতের অভিজ্ঞতামূলক তর্কবিচারের দ্বারা তাদৃশ অচিন্ত্য বস্তু সম্বন্ধে কিছুই নির্ণয় করা যায় না ; সুতরাং তাদৃশ বস্তু সম্বন্ধে প্রাকৃত-বুদ্ধিপ্রসূত তর্কের অবতারণা করাও সঙ্গত নয়।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥ মহাভারত॥"

দ্বিতীয়তঃ, মৃত্তিকাদি প্রাকৃত বস্তু হইতেছে বিকারজাত—সুতরাং বিকারধর্ম্মী। প্রকৃতির বিকার হইতে মৃত্তিকাদি প্রাকৃত বস্তু উৎপন্ন। বিকারজাত বলিয়া মৃত্তিকাদি প্রাকৃত বস্তু বিকারধর্ম্মী এবং বিকারধর্ম্মী বলিয়া মৃত্তিকাদি ঘটাদিরূপে পরিণত হইলে বিকৃত হইয়া থাকে, স্ব-স্ব পূর্ব্বস্বরূপে অবস্থান করিতে পারে না।

ব্রহ্ম কিন্তু বিকারজাত নহেন—সুতরাং বিকারধর্ম্মীও নহেন। প্রকৃতির বা অন্য কোনও বস্তুর বিকার হইতে ব্রহ্মের উদ্ভব নয়। তিনি অনাদি, স্বয়ংসিদ্ধ। প্রাকৃত বস্তুর স্বরূপ হইতে ব্রহ্মের স্বরূপ বিলক্ষণ। সুতরাং মৃত্তিকাদি প্রাকৃত বস্তুর ধর্ম্মের সহিত তুলনা করিয়া ব্রহ্মসম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়ার চেষ্টা করার সার্থকতা কিছু নাই। স্বরূপতঃই ব্রহ্ম নির্ব্বিকার ; তাঁহার কোনওরূপ বিকৃতিই সম্ভব নয়। তাই, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে নিজেকে প্রকাশ করিয়াও তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। কোনও বস্তুরই স্বরূপগত ধর্ম্মের ব্যতয় কখনও হইতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, বিকারধর্ম্মী প্রাকৃত বস্তুও কখনও কখনও অন্য বস্তু রূপে পরিণত হইয়াও যে অবিকৃত থাকে, লৌকিক জগতে তাহারও দৃষ্টান্ত বিদ্যমান আছে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥২।১।২৭॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও লৌকিক মণি-মন্ত্র-ঔষধাদির অচিন্ত্য-শক্তির কথা বলিয়া গিয়াছেন। "লৌকিকানামপি মণিমন্ত্রৌষধিপ্রভৃতীনাং দেশকালনিমিত্তবৈচিত্র্যবশাচ্ছক্তয়ো বিরুদ্ধানেককার্য্যবিষয়া দৃশ্যন্তে—লৌকিক মণি, মন্ত্র, ঔষধি প্রভৃতির শক্তি দেশ-কাল-নিমিত্ত-বৈচিত্র্যবশতঃ অনেক বিরুদ্ধ (অর্থাৎ যুক্তিবিরুদ্ধ, সাধারণ যুক্তিতে যাহার কোনও সমাধান পাওয়া যায় না, এতাদৃশ) কার্য্য উৎপাদন করিয়া থাকে, এইরূপ দেখা যায়।"

শাস্ত্রাদিতে মণি-আদির অচিন্ত্য-প্রভাবের কথা দেখা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতে এক স্যমন্তক মণির উল্লেখ আছে ; এই মণি প্রতিদিন অষ্টভার স্বর্ণ প্রসব করিয়াও অবিকৃত থাকে।

"দিনে দিনে স্বর্ণভারানষ্টৌ স সৃজতি প্রভো॥ শ্রীভা, ১০।৫৬।১১॥" একথা শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃতেও বলা হইয়াছে :—

"পরিণামবাদ ব্যাসসূত্রের সম্মত।
অচিন্ত্যশক্ত্যে ঈশ্বর জগদ্রূপে পরিণত॥
মণি যৈছে অবিকৃত প্রসবে হেমভার।
জগদ্রূপ হয় ঈশ্বর—তবু অবিকার॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৬।১৫৪-৫৫॥"

প্রাকৃত জগতের আর একটী দৃষ্টান্ত হইতেছে উর্ণনাভি—মাকড়শা। মাকড়শা নিজের দেহ হইতে সূত্রজাল বিস্তার করিয়াও নিজে অবিকৃত থাকে।

"যথোর্ণনাভিঃ সৃজতে গৃহ্নতে চ যথা পৃথিব্যামোষধয়ঃ সম্ভবন্তি।
যথা সতঃ পুরুষাৎ কেশলোমানি তথাঽক্ষরাৎ সম্ভবতীহ বিশ্বম্॥

—মুণ্ডকশ্রুতি ॥১।১।৭॥

—যেমন উর্ণনাভি নিজের শরীর হইতে তন্তুসমূহকে বিস্তার করে, আবার সেই তন্তুসমূহকে স্বীয় শরীরে গ্রহণ করে; যেমন পৃথিবী হইতে ওষধিসকল উৎপন্ন হয়; যেমন জীবিত লোকের দেহ হইতে কেশ ও লোম উৎপন্ন হয়; তদ্রূপ এই অক্ষর ব্রহ্ম হইতে এই বিশ্বের উৎপত্তি হইয়াছে।"

মণি, উর্ণনাভি-আদি বিকারধর্ম্মী প্রাকৃত বস্তুরও যখন এতাদৃশ অচিন্ত্যশক্তি দেখা যায় যে, তাহাদের স্বদেহ হইতে অন্য বস্তুর প্রকাশ করিয়াও তাহারা অবিকৃত থাকে, তখন অচিন্ত্যপ্রভাব ব্রহ্ম যে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও স্বয়ং স্বরূপে অবিকৃত থাকিতে পারেন, তাহাতে আর বিচিত্র কি আছে?

"অবিচিন্ত্যশক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥
নানা রত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপ অবিকৃতে॥
প্রাকৃত বস্তুতে যদি অচিন্ত্যশক্তি হয়। ঈশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি ইথে কি বিস্ময়॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৭।১১৭-১২৩॥"

২৬। ব্রহ্ম-স্বরূপের পরিণাম নহে, শক্তির পরিণাম

বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্ম বিকারধর্ম্মী নহেন, অর্থাৎ পরিণামধর্ম্মী নহেন। তথাপি তিনি জগদ্রূপে পরিণত হয়েন। ইহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? অপরিণামী কিরূপে পরিণত হইতে পারেন? আবার পরিণত হইয়াও কিরূপে অপরিণামী বা অবিকৃত থাকিতে পারেন?

অপরিণামীর পরিণাম, আবার পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াও অবিকৃত বা অপরিণামী থাকা—ইহা যেন পরস্পর-বিরুদ্ধ ব্যাপার বলিয়া মনে হয়। অবশ্য পরব্রহ্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মের আশ্রয়,

তিনি অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন—ইহা সত্য ; এবং "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।"—সূত্র অনুসারে শ্রুতি যাহা বলেন, তাহাই স্বীকার্য্য--ইহাও সত্য। তথাপি তর্কনিষ্ঠ মন তাহাতে যেন সন্তুষ্ট হইতে চায় না।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই সমস্যার যে সমাধান করিয়াছেন, তাহাতে তর্কনিষ্ঠ মনও সন্তুষ্ট হইতে পারিবে বলিয়া মনে হয়। তাঁহার সমাধানে শাস্ত্রের মর্য্যাদাও রক্ষিত হইয়াছে, যুক্তিনিষ্ঠ-চিত্ত যুক্তিও দেখিতে পাইবে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—পরিণামবাদে ব্রহ্মের স্বরূপ পরিণতি লাভ করে না, ব্রহ্মের শক্তিই পরিণতি প্রাপ্ত হয়। স্মৃতি-শ্রুতির ও ব্রহ্মসূত্রের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া কিরূপে তিনি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। পরিণাম কাহাকে বলে ?

শ্রীজীবের যুক্তিপ্রণালীর অনুসরণ করিতে হইলে প্রথমেই জানা দরকার—পরিণাম-শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

আভিধানিকগণ **দুই রকমের পরিণামের** কথা বলিয়াছেন। এক রকমের পরিণাম হইতেছে—"প্রকৃতেরন্যথাভাবঃ। যথা—মুখস্য বিকারঃ ক্রোধরক্ততা--প্রকৃতির (প্রস্তাবিত বস্তুর) অন্যথা ভাব – অন্যরকম ভাব। যথা—মুখের বিকার বা পরিণাম হইতেছে ক্রোধরক্ততা (ক্রোধবশতঃ মুখের রক্তবর্ণতা)।" এইরূপ বিকারে বা পরিণামে মূল বস্তু রূপান্তর প্রাপ্ত হয় না। মুখ যেরূপ আছে, সেইরূপই থাকে, ক্রোধের সহায়তায় তাহাতে রক্তিমা সঞ্চারিত হয় মাত্র। এই রক্তিমাটী হইতেছে এ-স্থলে মুখের পরিণাম বা বিকার।

দ্বিতীয় রকমের পরিণাম বা বিকার হইতেছে—"প্রকৃতিধ্বংসজন্যবিকারঃ। যথা– কাষ্ঠস্য বিকারো ভস্ম, মৃৎপিণ্ডস্য ঘট ইতি—প্রকৃতির (প্রস্তাবিত বস্তুর) ধ্বংসজনিত বিকার। যথা কাষ্ঠের বিকার ভস্ম, মৃৎপিণ্ডের বিকার ঘট।" এইরূপ বিকারে বা পরিণামে মূল বস্তুটীই ধ্বংস হইয়া যায়, তাহার আর স্বীয় রূপে অস্তিত্ব থাকে না। অগ্নির সহযোগে কাষ্ঠ যখন ভস্মে পরিণত হয়, তখন কাষ্ঠ আর থাকে না। কুম্ভকারের সহায়তায় মৃৎপিণ্ড যখন ঘটে পরিণত হয়, তখন সেই মৃৎপিণ্ডটীর আর অস্তিত্ব থাকে না।

এই দুই রকম পরিণামের কথা শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে দৃষ্ট হয়। "পরিণামঃ (পরি+নম্+ঘঞ্, ভাবে), (পুং) বিকারঃ। প্রকৃতেরন্যথাভাবঃ। যথা—মুখস্য বিকারঃ ক্রোধরক্ততা। কেচিৎ তু। প্রকৃতিধ্বংসজন্যবিকারঃ। যথা—কাষ্ঠস্য বিকারো ভস্ম, মৃৎপিণ্ডস্য ঘট ইতি। ইত্যমরভরতৌ।"

এক্ষণে দেখিতে হইবে—শ্রুতিপ্রোক্ত পরিণামবাদে উল্লিখিত দ্বিবিধ পরিণামের মধ্যে কোন্ পরিণামকে লক্ষ্য করা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপিত "কৃৎস্নপ্রসক্তির্নিরবয়বত্বশব্দকোপো বা ॥২।১।২৬॥"-ব্রহ্মসূত্রের উত্তরে-"শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ২।১।২৭॥"ব্রহ্মসূত্রে এবং "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ

হি॥২।১।২৮॥”-ব্রহ্মসূত্রে ব্যাসদেব যখন বলিয়াছেন—স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম **স্বয়ং** বিকার প্রাপ্ত না হইয়াই জগদ্রূপে পরিণত হয়েন, অর্থাৎ ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও নিজ স্বরূপেই অবস্থান করেন, তাঁহার স্বরূপ নষ্ট হয় না, তখন পরিষ্কার-ভাবেই বুঝা যায় যে, উল্লিখিত দ্বিবিধ পরিণামের মধ্যে দ্বিতীয় রকম পরিণাম—যে পরিণামে মূল বস্তুটী ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়, সেই পরিণাম—ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে।

আবার, “যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো॥ বৃহদারণ্যক॥৩।৭।৩—২২॥”, “সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৩।৩॥”, “তাবানস্য মহিমা ততো জ্যায়ান্ চ পুরুষঃ। পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি॥ ছান্দোগ্য ৩।১২।৬॥”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় যে, জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপে অবস্থান করেন। ইহাতে বুঝা যায়, উল্লিখিত দ্বিবিধ পরিণামের মধ্যে **প্রথম রকমের পরিণাম**—যে পরিণামে বস্তুটী ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না, সেই পরিণামই – **ব্যাসদেবের অভিপ্রেত**।

পরিণামবাদের আলোচনায় **শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও প্রথম রকমের পরিণামকেই ব্যাসদেবের অভিপ্রেত বলিয়া গ্রহণ করিয়াছেন।** তিনি লিখিয়াছেন—“তস্মাৎ ‘তত্ত্বতোঽন্যথা ভাবঃ পরিণামঃ’ ইত্যেব লক্ষণম্, ন তু তত্ত্বস্যেতি। সর্ব্বসম্বাদিনী॥ বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ। ১৪৩ পৃষ্ঠা॥ তত্ত্ব (মূলবস্তু) হইতে অন্যরূপ ভাবই হইতেছে পরিণামের লক্ষণ, তত্ত্বের (মূল বস্তুর) অন্যরূপ ভাব নহে।” মূলবস্তু হইতে অন্যরূপ ভাব—যেমন পূর্ব্বোল্লিখিত আভিধানিক লক্ষণের উদাহরণে, মুখের ক্রোধরক্ততা মূলবস্তু মুখ হইতে ভিন্নরূপ; মুখ পূর্ব্ববৎই থাকে। স্যমন্তকমণি-প্রসূত স্বর্ণভার স্যমন্তক-মণি হইতে ভিন্ন রূপের; স্যমন্তক মণি পূর্ব্ববৎই থাকে। ঊর্ণনাভের দৃষ্টান্তও উল্লেখযোগ্য। ঊর্ণনাভ নিজে অবিকৃত থাকিয়াই সূত্রজাল বিস্তার করিয়া থাকে। সূত্রজাল ঊর্ণনাভ হইতে ভিন্নরূপ-বিশিষ্ট বস্তু। ইহাতে বুঝা গেল—শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম রকমের পরিণামই গ্রহণ করিয়াছেন।

আবার, “ন তু তত্ত্বস্যেতি—তত্ত্বের অন্যরূপ নহে”-এই বাক্যে দ্বিতীয় রকমের পরিণাম নিষিদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয় রকমের পরিণামে তত্ত্ব বা মূল বস্তুই অন্যরূপ ধারণ করে, তাহার নিজের রূপ থাকে না। যেমন, কাষ্ঠ ভস্মরূপে পরিণত হইয়া যায়। “ন তু তত্ত্বস্যেতি”-বাক্যে শ্রীজীব জানাইলেন -যে পরিণামে মূলবস্তুই অন্যরূপ প্রাপ্ত হয়, তাহা কিন্তু পরিণামবাদে অভিপ্রেত নহে।

ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও যে স্বরূপে অবিকৃত থাকেন, প্রথম রকমের পরিণাম স্বীকার করিলে, তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাতে “তদাত্মানং স্বয়মকুরুত”-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের এবং “আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ” ইত্যাদি বেদান্তসূত্র-বাক্যের সহিতও সঙ্গতি রক্ষিত হয় এবং স্যমন্তক মণির বা ঊর্ণনাভির, বা মুখের ক্রোধরক্ততাদির ন্যায় লৌকিক জগতে দৃষ্ট-শ্রুত বস্তুর দৃষ্টান্তে যুক্তিবাদীদের যুক্তি-পিপাসাও তৃপ্তিলাভ করিতে পারে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—**জগতের সৃষ্টিব্যাপারে ব্রহ্ম স্বরূপে অবিকৃত থাকেন।**

খ। ব্রহ্মের মায়াশক্তিই জগদ্রূপে পরিণত হয়

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম রকম পরিণামের প্রসঙ্গে যে লৌকিক বস্তুগুলির দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হইয়াছে, সেইগুলির কথাই এ স্থলেও বিবেচনা করা যাউক।

স্যমন্তক মণি যে স্বর্ণভার প্রসব করে, তাহা স্যমন্তক মণির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনও বস্তুরই পরিণতি, ইহা মণির বহির্ভূত কোনও বস্তু নহে। উর্ণনাভের সূত্রও উর্ণনাভ হইতে পৃথক্ কোনও বস্তু হইতে উদ্ভূত নহে, উর্ণনাভের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনও বস্তুরই পরিণতি। মুখের ক্রোধরক্ততাও মুখের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট রক্তেরই ক্রিয়া।

তদ্রূপ, ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন এই জগৎও ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোনও পদার্থেরই পরিণতি হইবে, ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধহীন কোনও বস্তুর পরিণতি হইতে পারে না; কেননা, শ্রুতি এই জগৎকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়াছেন। "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম", "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"। জগৎকে ব্রহ্মের পরিণামও বলা হইয়াছে।

তাহা হইলে দেখিতে হইবে—ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট কোন্ বস্তুটীর পরিণাম হইতেছে এই জগৎ? সেই বস্তুটীর অন্ততঃ এই দুইটী লক্ষণ থাকা দরকার—প্রথমতঃ, অবস্থাবিশেষে সেই বস্তুটীর পরিণামযোগ্যতা থাকা দরকার। দ্বিতীয়তঃ, তত্ত্বের বিচারে সেই বস্তুটী ব্রহ্মাতিরিক্ত না হওয়া দরকার; ব্রহ্মাতিরিক্ত হইলে সেই বস্তুর পরিণামকে ব্রহ্মের পরিণাম বলা যাইবে না।

এতাদৃশ বস্তু হইতেছে—জড়রূপা প্রকৃতি। পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।১৫ অনুচ্ছেদে "প্রকৃতির স্বভাব" প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, ঈশ্বরের চেতনাময়ী শক্তির যোগে পরিণাম লাভের যোগ্যতা প্রকৃতির আছে—ইহা হইতেছে প্রকৃতির স্বভাব। সুতরাং পূর্ব্বোল্লিখিত প্রথম লক্ষণটী প্রকৃতির আছে। দ্বিতীয় লক্ষণটীও প্রকৃতির আছে; কেননা, জড়রূপা প্রকৃতি হইতেছে পরব্রহ্মেরই শক্তি, বহিরঙ্গা শক্তি। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বর্ত্তমান। অভেদ-বিবক্ষায় শক্তির কার্য্যকে শক্তিমানের কার্য্য বলা যায়। রাজসৈন্যের জয়-পরাজয়কে রাজারই জয়-পরাজয়-রূপে গণ্য করা হয়।

তাহা হইলে দেখা গেল—এই জগৎ হইতেছে পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে বহিরঙ্গা মায়া শক্তিরই পরিণতি। পূর্ব্ববর্ত্তী পঞ্চম অধ্যায়ে স্মৃতিশ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে—পরব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে পরিণতি প্রাপ্ত বহিরঙ্গা মায়া বা প্রকৃতি হইতেই জগতের উদ্ভব। পূর্ব্ববর্ত্তী চতুর্থ অধ্যায়ে স্মৃতিশ্রুতি-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখান হইয়াছে—ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে বহিরঙ্গা মায়াই হইতেছে জগতের গৌণ নিমিত্ত-কারণ এবং গৌণ উপাদান-কারণ। সুতরাং এই জগৎ যে মায়ারই পরিণতি, তাহাই বুঝা যায়।

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ॥ ১।৪।২৬॥"-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে গোবিন্দভাষ্যকার বলিয়াছেন—ব্রহ্মের

পরাশক্তি আছে, ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি বা জীবশক্তি আছে এবং মায়াশক্তিও আছে। ইহাদ্বারা তাঁহার নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব জানা যাইতেছে। "তস্য নিমিত্তত্বমুপাদানত্বঞ্চ অভিধীয়তে।" পরাশক্তিমান্ রূপে ব্রহ্ম নিমিত্ত-কারণ এবং অপর শক্তিদ্বয় দ্বারা তিনি উপাদান। "তত্রাদ্যং পরাখ্যশক্তিমদ্-রূপেণ। দ্বিতীয়ন্ত তদন্যশক্তিদ্বয়দ্বারৈব।" ভাষ্যকার আরও বলিয়াছেন—"এবঞ্চ নিমিত্তং কূটস্থম্ উপাদানন্ত পরিণামীতি সূক্ষ্মপ্রকৃতিকং কর্ত্তৃ স্থূলপ্রকৃতিকং কর্ম্ম। ইত্যেকস্যৈব তত্তচ্চ সিদ্ধম্।— এই রূপে, নিমিত্ত হইল কূটস্থ (নির্ব্বিকার) এবং উপাদান হইল পরিণামী ; সূক্ষ্মপ্রকৃতিক হইলেন কর্ত্তা, আর স্থূলপ্রকৃতিক হইলেন কর্ম। ইহাতে এক ব্রহ্মেরই নিমিত্তত্ব ও উপাদানত্ব, সূক্ষ্ম-প্রকৃতিকত্ব ও স্থূলপ্রকৃতিকত্ব সিদ্ধ হইল।" ইহা হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের মায়াশক্তিই পরিণাম প্রাপ্ত হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া তয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান-স্বরূপব্যূহরূপ-দ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে, ন তু স্বরূপেণ ইতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ। অত স্তন্মূলত্বাৎ ন পরমাত্মোপাদানতা-সংপ্রতিপত্তিভঙ্গঃ॥ পরমাত্মসন্দর্ভঃ। বহরমপুর॥ ১৮৯ পৃষ্ঠা॥" তাৎপর্য্য হইল এই যে—ব্যূহরূপ দ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন, স্বরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন না। যেমন চিন্তামণি। দ্রব্যাখ্যশক্তির (মায়াশক্তির) মূল তিনি বলিয়া পরমাত্মার উপাদান-কারণতাও ক্ষুণ্ণ হইল না।

শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবপাদ বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করিয়াছেন।

> "প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
> সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্ম তত্রিতয়ং ত্বহম্॥ শ্রীভা, ১১।২৪।১৯॥

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় তিনি বলিয়াছেন—"অতএব ক্বচিদস্য ব্রহ্মোপদানত্বং ক্বচিৎ প্রধানো-পাদনত্বঞ্চ শ্রূয়তে। তত্র সা মায়াখ্যা পরিণামশক্তিশ্চ দ্বিবিধা বর্ণ্যতে। নিমিত্তাংশো মায়া উপাদানাংশঃ প্রধানমিতি। তত্র কেবলা শক্তি র্নিমিত্তম্। তদ্ব্যূহময়ী তূপাদানমিতি বিবেকঃ।"

শ্রীজীবের এই ব্যাখ্যা হইতে জানা যায়—মায়ানাম্নী পরিণামশক্তির তুইটী বৃত্তি—মায়া (জীবমায়া) এবং প্রধান (গুণমায়া)। জীবমায়ারূপে প্রকৃতি জগতের (গৌণ) নিমিত্ত-কারণ এবং প্রধানরূপে (গৌণ) উপাদান-কারণ। উপাদানাংশ প্রধানই হইতেছে ব্যূহরূপা দ্রব্যশক্তি এবং এই উপাদানাংশ প্রধানরূপেই ঈশ্বর পরিণাম প্রাপ্ত হইয়াছেন।

উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"অস্য সতঃ কার্য্যস্যোপাদানং যা প্রকৃতিঃ প্রসিদ্ধা যশ্চাস্য আধারঃ কেষাঞ্চিন্মতে অধিষ্ঠানকারণং পুরুষঃ যশ্চ গুণক্ষোভেনাভিব্যঞ্জকঃ কালো নিমিত্তং তত্রিতয়ং ব্রহ্মরূপোঽহমেব প্রকৃতেঃ শক্তিত্বাৎ পুরুষস্য মদংশত্বাৎ কালস্য মচ্চেষ্টারূপত্বাৎ

তত্ত্রিতয়মহমেব। এবঞ্চ প্রকৃতের্জ্জগদুপাদানত্বাদেব মম জগদুপাদানত্বম্। কিঞ্চ। তস্যা বিকারিত্বেঽপি ন মে বিকারিত্বং তস্যা মচ্ছক্তিত্বেঽপি মৎস্বরূপশক্তিত্বাভাবাৎ, কিন্তু বহিরঙ্গশক্তিত্বমেব মৎস্বরূপস্য মায়াতীতত্বেন সর্ব্বশাস্ত্রপ্রসিদ্ধেঃ।—কেহ প্রসিদ্ধা প্রকৃতিকেই জগতের উপাদান বলেন, পুরুষকে অধিষ্ঠান-কারণ বলেন, এবং যে কাল গুণক্ষোভদ্বারা অভিব্যঞ্জক হয়, তাহাকে নিমিত্ত-কারণ বলেন। (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—উল্লিখিত শ্লোকটী শ্রীকৃষ্ণের উক্তি) প্রকৃতি, পুরুষ এবং কাল-এই তিনই ব্রহ্মরূপ আমি। কেননা, প্রকৃতি আমার শক্তি. পুরুষ আমার অংশ এবং কাল আমার চেষ্টা। সুতরাং এই তিনই বস্তুতঃ আমি। এইরূপে প্রকৃতি জগতের উপাদান বলিয়াই আমি জগতের উপাদান। কিন্তু প্রকৃতি বিকারপ্রাপ্ত হইলেও আমি বিকার প্রাপ্ত হই না ; যেহেতু, প্রকৃতি আমার শক্তি হইলেও স্বরূপ-শক্তি নহে (আমার স্বরূপে অবস্থিতা শক্তি নহে), বহিরঙ্গা শক্তিমাত্র। আমি মায়াতীত বলিয়া আমার বহিরঙ্গা শক্তির বিকারে আমি বিকার প্রাপ্ত হই না।”

শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইল এই যে—পরব্রহ্ম স্বরূপে বিকার প্রাপ্ত হয়েন না, উপাদানরূপ বহিরঙ্গা শক্তিরূপেই তিনি পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন। তাঁহার শক্তিতে প্রকৃতিই জগদ্রূপে পরিণত হয়, তিনি স্বরূপে অবিকৃতই থাকেন। প্রকৃতি তাঁহার শক্তি বলিয়া প্রকৃতির উপাদানত্বেই তাঁহার উপাদানত্ব। সুতরাং শ্রুতি-ব্রহ্মসূত্রাদি যে ব্রহ্মকে জগতের উপাদান বলিয়াছেন, তাহাও সিদ্ধ হয়। “মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৪।১০॥-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও মায়ার উপাদানত্বের কথা বলিয়াছেন। আবার ব্রহ্মকেও উপাদান-কারণ বলা হইয়াছে (৩।৮-১০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। মায়ার বা প্রকৃতির উপাদানত্বেই যে ব্রহ্মের উপাদানত্ব তাহাই ইহা হইতে জানা গেল।

“তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ॥২।১।১৪॥”-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—“শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতাঃ সর্ব্বে বিকারাশ্চাপুরুষার্থাশ্চেতি ব্রহ্মণো নিরবদ্যত্বং কল্যাণগুণাকরত্বঞ্চ সুস্থিতম্।—যত প্রকার বিকার ও অপুরুষার্থ, তৎসমস্তই ব্রহ্মশরীরভূত-চেতনাচেতন-পদার্থগত ; সুতরাং পরব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব ও সর্ব্বপ্রকার কল্যাণ-গুণাকরত্বও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল।”

এ-স্থলে শ্রীপাদ রামানুজ বলিলেন—সমস্ত বিকার হইতেছে চেতনাচেতন-বস্তুগত। চেতন-বস্তু—জীবাত্মা ; অচেতন বস্তু—প্রকৃতি বা বহিরঙ্গা মায়া। বহিরঙ্গা মায়াই বিকার প্রাপ্ত হয় ; মায়াবদ্ধ জীব—জীবাত্মা—যে মায়িক দেহাদি ধারণ করে, মায়িক বলিয়া সেই দেহাদিও বিকারী এইরূপে, শ্রীপাদ রামানুজের উক্তি হইতেও জানা গেল—অচেতনা প্রকৃতিই বিকার প্রাপ্ত হয়, পরব্রহ্ম অবিকৃতই থাকেন। এই উক্তিও শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্তের অনুকূল।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি প্রকৃতি বা মায়াই ব্রহ্মের চেতনাময়ী শক্তির যোগে জগদ্রূপে পরিণত হয়, ব্রহ্ম পরিণতি প্রাপ্ত হয়েন না, তিনি স্বরূপে অবিকৃতই থাকেন। শ্রুতি-স্মৃতির সহিতও এই সিদ্ধান্তের সঙ্গতি আছে, লৌকিক জগতের উর্ণনাভি-মণি

প্রভৃতির দৃষ্টান্তের সহায়তায় যুক্তিবাদীদিগের যুক্তিপিপাসাও ইহাতে তৃপ্তি লাভ করিতে পারে।

একই ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির মহত্তত্ত্বাদি বহু বিকার জন্মাইয়া তদ্দ্বারা অনন্ত-বৈচিত্র্যময় জগতের সৃষ্টিই পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির পরিচয় দিতেছে। কিরূপে একই বস্তু অনন্ত বৈচিত্র্যীতে পরিণত হয়, তাহা মানব-বুদ্ধির অগম্য ; তাই ইহা অচিন্ত্য।

গ। ব্রহ্ম-পরিণামবাদ এবং শক্তি-পরিণামবাদ অভিন্ন

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ ॥১।৪।২৬॥", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥২।১।২৭॥", "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২।১।২৮॥"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা যায় – ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হয়েন এবং স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। ইহাই পরিণামবাদ এবং ব্রহ্মই পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন বলিয়া ইহাকে ব্রহ্ম-পরিণামবাদও বলা যায়।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্। ইচ্ছায় জগতরূপে পায় পরিণাম ॥
তথাপি অচিন্ত্য-শক্ত্যে হয় অবিকারী। প্রাকৃত চিন্তামণি তাহে দৃষ্টান্ত যে ধরি।
নানারত্নরাশি হয় চিন্তামণি হৈতে। তথাপিহ মণি রহে স্বরূপে অবিকৃতে ॥

শ্রীচৈ, চ, ১।৭।১১৭-১১৯ ॥"

উপরে উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রগুলির ভাষ্যে ভাষ্যকারগণও প্রাকৃত চিন্তামণি-আদির দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। সুতরাং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহাও ব্রহ্মসূত্রানুগত ব্রহ্ম-পরিণামবাদই।

কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী খ-উপ-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর যে উক্তি আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায় --ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়া শক্তিই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছে। ইহা হইতে শক্তি-পরিণামবাদের কথাই জানা যায়।

ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন—ব্রহ্মসূত্র এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যদিও ব্রহ্ম-পরিণামের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তথাপি শ্রীজীবগোস্বামী কিন্তু শক্তি-পরিণামের কথা বলিয়া একটী অভিনব মতবাদ প্রচার করিয়াছেন—শক্তি-পরিণামবাদ।

কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে কোনও অভিনব মতবাদ প্রচার করেন নাই, ব্রহ্ম-পরিণামের তাৎপর্য্য যে শক্তির পরিণাম, শ্রীজীব যে তাহাই দেখাইয়াছেন এবং এই শক্তি-পরিণামই যে শাস্ত্রেরও অনুমোদিত, তাহাই এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

পরিণামবাদের আলোচনায় শ্রীজীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই জানা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তিনি তাহারই তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন। "যথৈব চিন্তামণিঃ" বাক্য হইতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি লিখিয়াছেন, তত্র চাপরিণতস্যৈব সতোঽচিন্ত্যয়া তয়া শক্ত্যা পরিণাম ইত্যসৌ সন্মাত্রতাবভাসমান-স্বরূপব্যুহরূপ-

দ্রব্যাখ্যশক্তিরূপেণৈব পরিণমতে, ন তু স্বরূপেণ ইতি গম্যতে। যথৈব চিন্তামণিঃ॥ পরমাত্ম-সন্দর্ভঃ। বহরমপুর ॥ ১৮৯ পৃষ্ঠা (পূর্ব্ববর্ত্তী খ উপ-অনুচ্ছেদে ইহার তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য ॥"

ব্রহ্ম-পরিণামের তাৎপর্য্য কিরূপে ব্রহ্মশক্তি-পরিণাম হইতে পারে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রহ্মসূত্র হইতেছে শ্রুতিস্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত। "সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ॥ তৈত্তিরীয়॥ ব্রহ্মানন্দ। ৬।১॥", "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত॥ তৈত্তিরীয়। ব্রহ্মানন্দ। ৭।১॥" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, পরব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন, অর্থাৎ, ব্রহ্মই জগতের উপাদান-কারণ। ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব-বাচক কয়েকটী ব্রহ্মসূত্র পুর্ব্বেই (৩।১০ অনুচ্ছেদে) আলোচিত হইয়াছে।

কিন্তু ব্রহ্ম কি স্বীয় স্বরূপেই জগতের উপাদান, না কি অন্য কোনওরূপে উপাদান, তাহাও শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। শ্বেতাশ্বতর শ্রুতি বলিয়াছেন—"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতৎ। মায়াং তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৪।৯-১০॥—মায়ী (মায়াধীশ্বর) এই প্রকৃতি হইতেই জগতের সৃষ্টি করেন। মায়াকে প্রকৃতি (অর্থাৎ উপাদান) বলিয়া জানিবে এবং মায়াধিষ্ঠাতাকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে।" এই শ্রুতিবাক্যে "মায়িনং তু মহেশ্বরম্"-বাক্যে পর-ব্রহ্মকে "মায়ী—মায়াশক্তির অধিপতি" বলা হইয়াছে এবং মায়াকে জগতের "প্রকৃতি—উপাদান" বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়—ব্রহ্ম যে জগতের উপাদান, তাঁহার মায়াশক্তিরূপেই তিনি উপাদান, স্বরূপে নহেন। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় মায়া শক্তির পরিণামকেই ব্রহ্মের পরিণাম বলা হইয়াছে। স্মৃতিগ্রন্থ শ্রীমদ্ভাগবত হইতে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উক্তির উল্লেখ করিয়াও শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাহা দেখাইয়াছেন।

"প্রকৃতির্যস্যোপাদানমাধারঃ পুরুষঃ পরঃ।
সতোঽভিব্যঞ্জকঃ কালো ব্রহ্মতত্ত্রিতয়ং ত্বহম্॥ শ্রীভা, ১১।২৪।১৯॥"

(পুর্ব্ববর্ত্তী খ-উপ অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।

এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-বাক্য হইতে জানা যায়—স্বীয় বহিরঙ্গা শক্তি মায়ারূপেই ব্রহ্ম জগতের উপাদান এবং এই মায়াশক্তির পরিণামকেই ব্রহ্মের পরিণাম বলা হইয়াছে।

সুতরাং শ্রুতি-স্মৃতির উপর প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মসূত্র যে ব্রহ্ম-পরিণামের কথা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে—ব্রহ্ম-শক্তির পরিণাম।

মণি ও উর্ণনাভির দৃষ্টান্তের সহিতও মায়াশক্তি-পরিণামের সামঞ্জস্য আছে, তাহাও পূর্ব্ববর্ত্তী খ উপ-অনুচ্ছেদের আরম্ভে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ জীবগোস্বামী কোনও অভিনব মতবাদের প্রচার করেন নাই। ব্রহ্ম-পরিণামের তাৎপর্য্য যে ব্রহ্ম-শক্তির পরিণাম, তাহাই তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন। সুতরাং ব্রহ্ম-পরিণামবাদ এবং শক্তি-পরিণামবাদ হইতেছে এক এবং অভিন্ন।

সপ্তম অধ্যায়

প্রলয়

২৭। প্রলয়। ত্রিবিধ—নৈমিত্তিক, প্রাকৃতিক এবং আত্যন্তিক

দিবার সঙ্গে রাত্রির, বা রাত্রির সঙ্গে দিবার যেরূপ সম্বন্ধ, সৃষ্টির সঙ্গে প্রলয়ের, বা প্রলয়ের সঙ্গে সৃষ্টিরও সেইরূপ অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। সৃষ্টির পরে প্রলয়, প্রলয়ের পরে সৃষ্টি, আবার সৃষ্টির পরে প্রলয়-এইরূপ চলিতেছে—প্রবাহরূপে, অনাদিকাল হইতে। সুতরাং সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রসঙ্গে প্রলয়ের কথাও কিছু বলা সঙ্গত।

বিষ্ণুপুরাণের মতে প্রলয় ত্রিবিধ—নৈমিত্তিক প্রলয়, প্রাকৃতিক প্রলয় এবং আত্যন্তিক প্রলয়।

"সর্ব্বেষামেব ভূতানাং ত্রিবিধঃ প্রতিসঞ্চরঃ।
নৈমিত্তিকঃ প্রাকৃতিকস্তথৈবাত্যন্তিকো মতঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ॥৬।৩।১॥"

কল্পান্তে যে প্রলয় হয়, তাহার নাম নৈমিত্তিক প্রলয়; ইহার অপর নাম ব্রাহ্ম প্রলয়। দ্বিপ-রার্দ্ধিক যে প্রলয়, তাহার নাম প্রাকৃতিক বা প্রাকৃত প্রলয়। আর, মোক্ষকে বলে আত্যন্তিক প্রলয়।

"ব্রাহ্মো নৈমিত্তিকস্তেষাং কল্পান্তে প্রতিসঞ্চরঃ।
আত্যন্তিকশ্চ মোক্ষাখ্যঃ প্রাকৃতো দ্বিপরার্দ্ধিকঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ॥৬।৩।২॥"

"কল্প" বলিতে ব্রহ্মার এক দিনকে বুঝায় এবং "পরার্দ্ধ" বলিতে ব্রহ্মার আয়ুষ্কালের অর্দ্ধেককে বুঝায়; সুতরাং "দ্বিপরার্দ্ধ" হইতেছে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল।

২৮। ব্রহ্মার দিন ও আয়ুষ্কাল

ক। ব্রহ্মার দিন

সত্য, ত্রেতা, দ্বাপর ও কলি—এই চারিটী যুগ আছে, ইহা সর্ব্বজন-বিদিত। বিষ্ণুপুরাণের মতে ব্রহ্মার এক দিনের মধ্যে থাকে এক হাজার সত্য যুগ, এক হাজার ত্রেতাযুগ, এক হাজার দ্বাপর যুগ এবং এক হাজার কলিযুগ। ব্রহ্মার একদিনকেই এক কল্প বলা হয়।

"চতুর্যুগসহস্রস্তু কথ্যতে ব্রহ্মণো দিনম্। স কল্পঃ॥ বিষ্ণুপুরাণ॥৬।৩।১১-১২॥"

মনুষ্যমানে সত্য যুগের পরিমাণ ১৭,২৮,০০০ সতর লক্ষ আটাশ হাজার বৎসর; ত্রেতার পরিমাণ ১২,৯৬,০০০ বার লক্ষ ছিয়ানব্বই হাজার বৎসর; দ্বাপরের পরিমাণ ৮,৬৪,০০০ আট লক্ষ

চৌষট্টি হাজার বৎসর ; এবং কলিযুগের পরিমাণ ৪,৩২,০০০ চারিলক্ষ বত্রিশ হাজার বৎসর। ইহাদের সমষ্টি হইল একটী চতুর্যুগের পরিমাণ—৪৩,২০,০০০ তেতাল্লিশ লক্ষ বিশ হাজার বৎসর। এইরূপ এক হাজারটী চতুর্যুগের পরিমাণ হইবে—১০০০ × ৪৩,২০,০০০, অর্থাৎ ৪৩২,০০০০,০০০ চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর।

তাহা হইলে **এক কল্পের** বা **ব্রহ্মার এক দিনের পরিমাণ** হইল—মনুষ্যমানে **চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর।**

খ। ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল

ব্রহ্মার যে এক দিনের কথা বলা হইল, এইরূপ তিনশত ষাইট্ দিনে হয় ব্রহ্মার এক বৎসর এবং এতাদৃশ একশত বৎসর হইতেছে ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল। ইহাকেই দ্বিপরার্দ্ধ কালও বলা হয়। এই রূপে দেখা যায়—ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল হইতেছে মনুষ্যমানে **এককোটি পঞ্চান্ন লক্ষ বায়ান্ন হাজার কোটি বৎসর।**

প্রতিকল্পের বা ব্রহ্মার প্রতিদিনের অন্তে, অর্থাৎ মনুষ্যমানে প্রতি চারিশত বত্রিশ কোটি বৎসর অন্তে একবার নৈমিত্তিক বা ব্রাহ্ম প্রলয় হয়।

আর, ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে, অর্থাৎ সৃষ্টির আরম্ভ হইতে মনুষ্যমানে এককোটি পঞ্চান্ন লক্ষ বায়ান্ন হাজার কোটি বৎসর অন্তে একবার প্রাকৃত প্রলয় হয়। প্রাকৃত প্রলয়কে মহাপ্রলয়ও বলে।

এক্ষণে ত্রিবিধ প্রলয়ের কিঞ্চিৎ বিবরণ প্রদত্ত হইতেছে।

২৯। নৈমিত্তিক প্রলয়

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে তৃতীয় অধ্যায়ে নৈমিত্তিক বা ব্রাহ্ম প্রলয়ের বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

ব্রাহ্ম প্রলয়ে সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় না ; কেবল ভূর্লোক (পৃথিবী), ভুবর্লোক এবং স্বর্গলোক—এই তিনটী লোকই এবং সপ্ত পাতালই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

কল্পের অন্তে মহীতল ক্ষীণপ্রায় হইয়া যায় ; তখন একশত বৎসর (অবশ্য নরমানে) অনাবৃষ্টি চলিতে থাকে। তখন অল্পসার পার্থিব ভূতসমূহ ক্ষয়প্রাপ্ত হয়। তখন ভগবান্ বিষ্ণু রুদ্ররূপ ধারণ করিয়া প্রজাসমূহকে আপনাতে লয়প্রাপ্ত করাইতে চেষ্টা করেন। রুদ্ররূপী ভগবান্ সূর্য্যের সপ্তবিধ রশ্মিতে অবস্থানপূর্ব্বক যাবতীয় জলরাশিকে পান করেন। এইরূপে পৃথিবীতলকে শোষণ করিতে করিতে তিনি নদী, সমুদ্র, শৈল বা শৈল-প্রস্রবণে এবং পাতালে অবস্থিত সমস্ত জলকেও শোষণ করেন। জল পানে ক্রমশঃ পরিপুষ্ট হইয়া সূর্য্যের সপ্তবিধ রশ্মি সপ্তসূর্য্যরূপে প্রকাশ পায়। প্রদীপ্ত সেই সপ্ত সূর্য্য

উর্দ্ধে ও অধোভাগে অবস্থিত সমস্ত ভুবনকে দগ্ধ করিয়া ফেলে, জলাভাবে ত্রিভুবন শুষ্ক হইয়া যায়। সেই সময়ে ত্রিভুবনস্থিত যাবতীয় বৃক্ষাদি শুষ্ক হইয়া যায়, বসুধা কূর্ম্মপৃষ্ঠের আকারে প্রতীয়মান হয়। তখন অনন্তদেবের নিশ্বাসসম্ভূত কালাগ্নি পাতাল-সমূহকে ভস্মীভূত করে, পাতালকে ভস্মসাৎ করিয়া উদ্ধমুখী হইয়া পৃথিবীতলকেও ভস্মসাৎ করে ; ভুবর্লোক এবং স্বর্গলোককেও ভস্মসাৎ করিয়া ফেলে। সেই সময়ে ত্রিভুবন যেন একটা ভর্জ্জন-কটাহের ন্যায় হইয়া পড়ে। সেই সময়ে লোকদ্বয়বাসী মহাত্মাগণ অনল-তাপে পীড়িত হইয়া মর্হলোকে আশ্রয় গ্রহণ করে। সে-স্থানেও সেই প্রচণ্ড তাপ হইতে নিস্তার না পাইয়া তাঁহারা জনলোকে আশ্রয় গ্রহণ করেন। তাহার পরে সেই রুদ্ররূপী ভগবান্ জনার্দ্দন মুখ-নিশ্বাসদ্বারা মেঘসমূহের সৃষ্টি করেন। তৎপর, নীল, পীত, রক্ত, কৃষ্ণ প্রভৃতি বর্ণবিশিষ্ট বিশালকায় মেঘসমূহ বিদ্যুজ্জড়িত হইয়া বিকটধ্বনি করিতে করিতে গগনতলকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে এবং মূষলধারে বারি বর্ষণ করিয়া ত্রিভুবনব্যাপী ভয়ঙ্কর অনলকে শান্ত করে। অনলকে শান্ত করিয়া মেঘসমূহ শতবৎসর পর্য্যন্ত বারি বর্ষণ করিয়া সমস্ত জগৎকে প্লাবিত করে এবং ক্রমশঃ ভুবর্লোক এবং স্বর্গলোককেও প্লাবিত করে। সেই সময়ে লোকসমূহ অন্ধকারময় হইয়া যায়, স্থাবর-জঙ্গমাদি যাবতীয় পদার্থ বিনষ্ট হইয়া যায়। কেবল মেঘসমূহ শতবৎসরেরও অধিক কাল ধরিয়া বারি বর্ষণ করিতে থাকে।

তৃতীয় অধ্যায়ে এই পর্য্যন্ত বলিয়া তাহার পরে চতুর্থ অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—

যখন সপ্তর্ষিগণের স্থান পর্য্যন্ত জলমগ্ন হয়, তখন অখিল ভুবন একটী মহাসমুদ্রের ন্যায় প্রতীয়মান হয়। তখন ভগবান্ বিষ্ণুর মুখ হইতে নিশ্বাসরূপে প্রবল বায়ু সমুৎপন্ন হইয়া শতবৎসর পর্য্যন্ত প্রচণ্ডবেগে প্রবাহিত হইতে থাকে। তখন সেই বিষ্ণু সেই বায়ুকে নিঃশেষরূপে পান করিয়া একাকার সেই সমুদ্র-মধ্যে শেষ-শয্যায় শয়ন করেন। সেই সময়ে জনলোকস্থিত সনকাদি ঋষিগণ এবং ব্রহ্ম-লোকস্থিত মুমুক্ষু ব্যক্তিগণ তাঁহার ধ্যান ও স্তব করিতে থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণু তখন যোগনিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করেন। ইহাই হইতেছে নৈমিত্তিক বা ব্রাহ্ম প্রলয়ের বিবরণ।

ভগবান্ বিষ্ণু যখন যোগনিদ্রা হইতে উত্থিত হয়েন, তখন আবার সৃষ্টি আরম্ভ হয়। সহস্র-চতুর্যুগ-পরিমিতকালে যেমন ব্রহ্মার এক দিন হয়, সেই পরিমিত কালেই আবার তাঁহার এক রাত্রি হয়। যে সময় জগৎ জলদ্বারা প্লাবিত থাকে, সেই সময়টীই তাঁহার রাত্রি। রাত্রিশেষে ব্রহ্মা জাগরিত হইয়া পুনরায় সৃষ্টি আরম্ভ করেন।

৩০। প্রাকৃতিক প্রলয়

বিষ্ণুপুরাণের ষষ্ঠাংশে চতুর্থ অধ্যায়ে প্রাকৃতিক প্রলয় বা মহাপ্রলয়ের বর্ণনা আছে। এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

প্রাকৃতিক প্রলয়েও নৈমিত্তিক-প্রলয়-প্রসঙ্গে কথিত প্রকারে প্রথমে ভুবনত্রয়ই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়।

নৈমিত্তিক-প্রলয়-প্রসঙ্গে কথিত প্রকারে অনাবৃষ্টি ও অনলের সম্পর্ক বশতঃ পাতালাদি সমস্ত লোককে নিঃস্নেহ করিয়া মহত্তত্ত্ব হইতে পৃথিবী পর্য্যন্ত বিকার সমূহকে ধ্বংস করিবার নিমিত্ত ভগবানের ইচ্ছায় প্রলয়-কাল উপস্থিত হইলে (অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল পূর্ণ হইলে), প্রথমতঃ জল-সমূহ পৃথিবীর গন্ধস্বরূপ গুণকে গ্রাস করিয়া থাকে। পৃথিবী হইতে সমস্ত গন্ধ জলদ্বারা আকৃষ্ট হইলে পৃথিবী বিলয় প্রাপ্ত হয়। গন্ধতন্মাত্র বিনষ্ট হইলে পৃথিবী জলের সহিত মিশিয়া যায়। রস হইতেই জলের উৎপত্তি ; সুতরাং জল হইতেছে রসাত্মক। তখন জলসমূহ প্রবৃদ্ধ হইয়া মহাশব্দ করিতে করিতে অত্যন্ত বেগে প্রবাহিত হইয়া সমস্ত ভুবনকে প্লাবিত করিয়া ফেলে। তখন অগ্নি জলের গুণ রসকে শোষণ করিতে আরম্ভ করে। কালক্রমে অগ্নিকর্ত্তৃক শোষিত হইয়া রস-তন্মাত্র বিনষ্ট হইলে জলসমূহ বিলয় প্রাপ্ত হয় এবং রসহীন জলসমূহ তেজে প্রবেশ করে। তৎপরে তেজ অতিশয় প্রবল রূপ ধারণ করিয়া সমস্ত ভুবনে ব্যাপ্ত হয় এবং সমস্ত ভুবনের সারভাগ শোষণ করিয়া নিরন্তর তাপ প্রদান করিতে থাকে। উর্দ্ধ, অধঃ সমস্ত প্রদেশই যখন অগ্নিদ্বারা (তেজোদ্বারা) দগ্ধ হইয়া যায়, তখন বায়ু সমস্ত তেজের আধার প্রভাকরকে গ্রাস করে। তেজঃসমূহ বিনষ্ট হইলে সমস্ত ভুবনই বায়ুময় হইয়া উঠে এবং তেজঃ তখন প্রশান্ত হয়। তখন কেবল প্রবল বায়ুই চতুর্দ্দিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। সমস্ত ভুবনই তখন অন্ধকারময় হইয়া পড়ে। তৎপর সেই প্রচণ্ড বায়ু স্বীয় উৎপত্তিবীজ আকাশকে অবলম্বন করিয়া দশদিকে প্রবাহিত হইতে থাকে। ক্রমশঃ আকাশ বায়ুর গুণ স্পর্শকে গ্রাস করিতে থাকে, বায়ু শান্ত হইয়া যায়। তখন রূপ-রস-গন্ধ-স্পর্শ-মূর্ত্তিহীন আকাশদ্বারাই সমস্ত লোক পরিপূর্ণ থাকে। তখন একমাত্র শব্দই সমস্ত আকাশ মণ্ডলকে পরিব্যাপ্ত করিয়া অবস্থান করে। তখন অহঙ্কার-তত্ত্ব আকাশের গুণ শব্দকে এবং ইন্দ্রিয়সমূহকে গ্রাস করে। ক্রমে অহঙ্কার-তত্ত্বও বুদ্ধিরূপ মহত্তত্ত্বে লয় প্রাপ্ত হয় এবং কালক্রমে মহত্তত্ত্বও স্বীয় কারণ প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়।

ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি ব্যক্ত ও অব্যক্ত—উভয় স্বরূপিণী। পূর্ব্বোক্তরূপে ব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি (অর্থাৎ দৃশ্যমান ব্যক্তব্রহ্মাণ্ড) অব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতিতে লয় প্রাপ্ত হয়। এই অব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি আবার পরব্রহ্মের অংশ—শুদ্ধস্বরূপ এবং সর্ব্বভূতের অধিষ্ঠাতা—পুরুষে (কারণার্ণবশায়ীতে) লয় প্রাপ্ত হয়। ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি এবং পুরুষ আবার পরব্রহ্ম পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়েন। ইহাই হইতেছে প্রাকৃত প্রলয়ের বিবরণ।

যতকাল সৃষ্টি চলিতে থাকে, (অর্থাৎ ব্রহ্মার আয়ুষ্কাল-পরিমিতকাল) ততকাল মহাপ্রলয়ও চলিতে থাকে। মহাপ্রলয়ের অবসানে আবার ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি আরম্ভ হয়।

উল্লিখিত বর্ণনা হইতে বুঝা গেল—যে ক্রমে প্রকৃতি বিকার প্রাপ্ত হইয়া মহত্তত্ত্বাদিতে পরিণত

হয় এবং যে ক্রমে মহত্তত্ত্বাদি হইতে ব্রহ্মাণ্ডের এবং ব্যষ্টি জীবাদির সৃষ্টি হয়, তাহার বিপরীত ক্রমেই সে-সমস্তের ধ্বংস বা মহাপ্রলয় সংসাধিত হয়। কারণার্ণবশায়িরূপে পরব্রহ্ম ভগবান্ যে চেতনাময়ী শক্তি সঞ্চারিত করিয়া প্রকৃতিদ্বারা ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি করাইয়া থাকেন, বিপরীত ক্রমে সেই চেতনাময়ী শক্তির সংহরণ করিয়াই তিনি প্রলয়কার্য্য সমাধা করিয়া থাকেন।

৩১। আত্যন্তিক প্রলয়

নৈমিত্তিক বা ব্রাহ্ম প্রলয়ে ব্রহ্মাণ্ডের অংশমাত্র সপ্ত পাতাল এবং ভূরাদি লোকত্রয় মাত্র— ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; আর প্রাকৃতিক প্রলয়ে বা মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির বিকার সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডই ধ্বংস প্রাপ্ত হয়। এই দুই রকম প্রলয়ে কোনও দ্রব্যেরই আত্যন্তিক ধ্বংস হয় না; যেহেতু, ধ্বংসের পরেও আবার ধ্বংসপ্রাপ্ত বস্তুগুলির সৃষ্টি হয়। বহির্ম্মুখ জীবের কর্ম্মফলও ধ্বংস প্রাপ্ত হয় না; কর্ম্মফলকে আশ্রয় করিয়া জীব সূক্ষ্মরূপে কারণার্ণবশায়ীতে অবস্থান করে।

কিন্তু আত্যন্তিক প্রলয়ে ধ্বংসের যোগ্য সমস্ত বস্তুই আত্যন্তিকভাবে বিনষ্ট হয়। জীবের কর্ম্মই আত্যন্তিকভাবে ধ্বংসের যোগ্য; ইহার আত্যন্তিক ধ্বংস সম্ভবপর বলিয়াই সাধন-ভজনের সার্থকতা। একবার ধ্বংস প্রাপ্ত হইলে যাহার আর পুনরুদ্ভবের সম্ভাবনা থাকে না, তাহাকেই আত্যন্তিক ধ্বংস বলা যায়। ভোগের দ্বারা কর্ম্ম ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়; ধ্বংসপ্রাপ্ত কর্ম্মের আর পুনরুদ্ভব হয় না। কিন্তু যতদিন পর্য্যন্ত জীবের বহির্ম্মুখতা থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত তাহার আবার নূতন কর্ম্ম করার সম্ভাবনা থাকে। বহির্ম্মুখতা দূর হইয়া গেলে আর বন্ধনপ্রদ নূতন কর্ম্ম করা সম্ভব হয় না। সঞ্চিত কর্ম্মও নিঃশেষ হইয়া যায়। তাহা হইলে বুঝা গেল বহির্ম্মুখতার দূরীকরণেই কর্ম্মের এবং কর্ম্মকরণ-সম্ভাবনার আত্যন্তিক ধ্বংস সম্ভবপর হইতে পারে এবং জীব মোক্ষ লাভ করিতে পারে। মোক্ষ-প্রাপ্তিতেই বুঝা যায়, জীবের সমস্ত বন্ধন এবং বন্ধনের মূল বহির্ম্মুখতা আত্যন্তিক ভাবে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। এজন্য মোক্ষকেই আত্যন্তিক প্রলয় বলে; ইহা জীবের মায়াবন্ধনের এবং বহির্ম্মুখতার প্রলয় বা ধ্বংস। জীব নিত্যবস্তু বলিয়া তাহার ধ্বংস সম্ভব নয়।

এইরূপে দেখা গেল—আত্যন্তিক প্রলয় ব্রহ্মাণ্ডের বা ব্রহ্মাণ্ডের অংশ-বিশেষের প্রলয় নহে; ইহা হইতেছে জীবের কর্ম্মবন্ধনের এবং ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতার আত্যন্তিক বিনাশ। আত্যন্তিক প্রলয় কেবল জীববিশেষের পক্ষেই সম্ভব; যিনি শাস্ত্রবিহিত পন্থায় ভজন-সাধন করেন, ভগবানের কৃপায় তাঁহারই বহির্ম্মুখতার আত্যন্তিক প্রলয় সম্ভবপর হইতে পারে।

৩২। প্রাকৃতিক প্রলয়ে প্রাকৃতির অবস্থা ও অবস্থান

ক। প্রলয়ে প্রকৃতির অবস্থা

প্রাকৃতিক প্রলয়ের বিবরণে দেখা গিয়াছে, মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির মহত্তত্ত্বাদি সমস্ত বিকার

বিলুপ্ত হইয়া যায়, সমস্ত বিকারই পুনরায় প্রকৃতিতে পর্য্যবসিত হয়। সুতরাং সেই সময়ে প্রকৃতি থাকে তাহার স্বরূপে, অবিকৃত অবস্থায়।

প্রকৃতি জড়রূপা বলিয়া তাহার স্বতঃসিদ্ধা গতি থাকিতে পারে না, গতির সামর্থ্যও থাকিতে পারে না, আপনা হইতে পরিণাম-প্রাপ্তির যোগ্যতাও থাকিতে পারে না। সুতরাং মহাপ্রলয়ে স্বীয় স্বরূপে অবস্থিতা প্রকৃতি থাকে—ভিতরে বাহিরে সর্ব্বত্র—অচল অবস্থায়; কোনও স্থলেই তাহার কোনও রূপ স্পন্দনাদি থাকে না। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতির স্বত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিনটী গুণের প্রত্যেকটী গুণেরই তখন উল্লিখিতরূপ স্পন্দনাদিহীন অবস্থা জন্মে। ইহাকেই বলা হয় সাম্যাবস্থা। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির গুণত্রয় থাকে সাম্যাবস্থায়।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ীর চেতনাময়ী শক্তির প্রভাবেই প্রকৃতির সাম্যাবস্থা বিনষ্ট হয়। মহাপ্রলয়ে তিনি তাঁহার সেই শক্তির প্রত্যাহার করেন; সুতরাং তখন প্রকৃতিও পুনরায় সাম্যাবস্থাতেই অবস্থান করে।

ইহাই হইতেছে মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির অবস্থা—গুণত্রয়ের সাম্যাবস্থা।

খ। **প্রলয়ে প্রকৃতির অবস্থান**

এক্ষণে জিজ্ঞাস্য হইতেছে—মহাপ্রলয়ে সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতি কোথায় থাকে?

প্রাকৃতিক প্রলয়ের বিবরণে দেখা গিয়েছে, মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ী পুরুষ ও প্রকৃতি পরমাত্মাতে লয় প্রাপ্ত হয়।

"প্রকৃতি র্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্ত-স্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি॥ বিষ্ণুপুরাণ॥৬।৪।৩৮॥
ব্যক্তাব্যক্তাত্মিকা তস্মিন্ প্রকৃতিঃ সম্প্রলীয়তে।
পুরুষশ্চাপি মৈত্রেয় ব্যাপিন্যব্যাহতাত্মনি॥ বি, পু, ॥৬।৪।৪৫॥

শ্রীমদ্ভাগবতও সৃষ্টি-আরম্ভের পূর্ব্ববর্ত্তী প্রলয়-কাল সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

"ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ॥ শ্রীভা, ৩।৫।২৩॥

—সৃষ্টির পূর্ব্বে সৃষ্ট্যাদির ইচ্ছা তাঁহাতে লীন হইলে, (রশ্মিস্থানীয়) শুদ্ধ জীবসমূহের আত্মা (মণ্ডলস্থানীয় পরমস্বরূপ) এবং বৈকুণ্ঠাদি নানামত্যুপলক্ষণ ভগবান্ একাই ছিলেন—তখন পুরুষাদি-পার্থিব পর্য্যন্ত এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল।"

এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন- "ইদং বিশ্বং পুরুষাদি-পার্থিবপর্য্যন্তং তদানীমেকাকিনা স্থিতেন ভগবতা সহ একীভূয়াসীদিত্যর্থঃ—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ হইতে আরম্ভ করিয়া পার্থিব পর্য্যন্ত সমস্ত বিশ্ব তখন এককী অবস্থিত ভগবানের সহিত একীভূত হইয়া ছিল।"

বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে যাহা জানা গিয়াছে, শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোক হইতেও তাহাই জানা গেল। শ্রুতি হইতেও জানা যায়, তখন কেবল এক পরব্রহ্মই ছিলেন।

"সদেব সৌম্য ইদমগ্র আসীৎ॥"

'বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীন্ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ॥"

"একো নারায়ণ এবাসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ॥" ইত্যাদি।

"পৃথিবী অপ্‌সু প্রলীয়তে, আপস্তেজসি লীয়ন্তে, তেজো বায়ৌ লীয়তে, বায়ুরাকাশে লীয়তে, আকাশমিন্দ্রিয়েষু, ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু, তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ লীয়ন্তে, ভূতাদির্ম্মহতি লীয়তে, মহানব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি ইতি॥ পরিণামাৎ॥ ১।৪।২৭-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজধৃত শ্রুতিবাক্য।"

এই সমস্ত স্মৃতি-শ্রুতি-প্রমাণ হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বে মহাপ্রলয়ে প্রকৃতি পরব্রহ্মে লয় প্রাপ্ত হইয়া পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া থাকে।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে শ্রুতি বলেন, মায়া পরব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না। "ন আত্মানং মায়া স্পৃশতি॥ নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী॥ ১।৫।১॥' যে মায়া বা প্রকৃতি পরমাত্মাকে স্পর্শও করিতে পারে না, সেই প্রকৃতি কিরূপে পরমাত্মাতে লীন হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া থাকিতে পারে?

পরব্রহ্ম ভগবানের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তাহা অসম্ভব নয়। শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—

"এতদীশনমীশস্য প্রকৃতিস্থোঽপি তদ্‌গুণৈঃ।

ন যুজ্যতে সদাত্মস্থৈর্যথা বুদ্ধিস্তদাশ্রয়া॥শ্রীভা, ১।১১।৩৯॥

—ভগবদাশ্রয়া বুদ্ধি যেমন দেহের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়াও দেহের সুখ-দুঃখাদির সহিত যুক্ত হয় না, তদ্রূপ মায়াতে থাকিয়াও ঈশ্বর মায়ার গুণের সহিত যুক্ত হয়েন না—ইহাই ঈশ্বরের ঐশ্বর্য্য।"

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেও ভগবানের এতাদৃশী শক্তির কথা জানা যায়।

"ময়া ততমিদং সর্ব্বং জগদব্যক্তমূর্ত্তিনা।

মৎস্থানি সর্ব্বভূতানি ন চাহং তেষ্ববস্থিতঃ॥

ন চ মৎস্থানি ভূতানি পশ্য মে যোগমৈশ্বরম্।

ভূতভৃন্ন চ ভূতস্থো মমাত্মা ভূতভাবনঃ॥ গীতা ॥৯।৪-৫॥

—(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিতেছেন) অব্যক্তমূর্ত্তি আমি এই সমস্ত জগৎ পরিব্যাপ্ত করিয়া আছি। ভূতসমূহ আমাতে অবস্থান করে; কিন্তু আমি তৎসমূহে অবস্থান করি না। আবার, ভূতগণ আমাতে অবস্থানও করিতেছে না। আমার ঐশ্বরিক যোগ দর্শন কর। আমার আত্মা ভূতগণের ধারক এবং জনক হইয়াও ভূতগণে অবস্থিত নহে।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ভূতসমূহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট হইয়াও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত

তাহাদের যেন সম্বন্ধ নাই, অর্থাৎ তাঁহার সহিত তাহাদের স্পর্শ হয় না। ইহাই তাঁহার ঐশ্বরিক যোগ বা অচিন্ত্য-শক্তি। এজন্যই শ্রুতিও পরব্রহ্মকে "অসঙ্গ" বলিয়াছেন।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল - মহাপ্রলয়ে পরব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া থাকিলেও প্রকৃতির সহিত তাঁহার স্পর্শ হয় না ; তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে বা তাঁহার অসঙ্গত্ববশতঃই স্পর্শহীন ভাবেও প্রকৃতি তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া থাকিতে পারে। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো" ইত্যাদি বাক্যে বৃহদারণ্যক-শ্রুতিও তাহাই জানাইয়াছেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও লিখিয়াছেন—

"পুরুষ-নাসাতে যবে বাহিরায় শ্বাস। নিশ্বাস সহিতে হয় ব্রহ্মাণ্ড-প্রকাশ॥
পুনরপি শ্বাস যবে প্রবেশে অন্তরে। শ্বাস-সহ ব্রহ্মাণ্ড পৈশে পুরুষ শরীরে॥
গবাক্ষের রন্ধ্রে যেন ত্রসরেণু চলে। পুরুষের রোমকূপে ব্রহ্মাণ্ডের জালে॥
শ্রী চৈ, চ, ১।৫।৬০-৬২॥"

এই উক্তির সমর্থনে তিনি ব্রহ্মার একটী উক্তির উল্লেখ করিয়াছেন।

"ক্বাহং তমোমহদহংখচরাগ্নিবার্ভূসংবেষ্টিতাণ্ডঘটসপ্তবিতস্তিকায়ঃ।
কেদৃগ্ বিধাবিগণিতাণ্ডপরাণুচর্য্যা বাতাধ্বরোমবিবরস্য চ তে মহিত্বম্॥
শ্রী ভা, ১০।১৪।১১॥

—(ব্রহ্মমোহন-লীলাপ্রসঙ্গে ব্রহ্মা স্তব করিতে করিতে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন) প্রকৃতি, মহৎ (মহত্তত্ত্ব), অহঙ্কার (অহঙ্কারতত্ত্ব), আকাশ, বায়ু, তেজঃ, জল ও পৃথিবী—এই সকলের দ্বারা সংবেষ্টিত যে ব্রহ্মাণ্ডস্বরূপ ঘট, তাহার মধ্যে স্বীয় পরিমাণে সার্দ্ধত্রিহস্ত-পরিমিত-দেহবিশিষ্ট আমি কোথায় ? আর, এই প্রকার অগণিত ব্রহ্মাণ্ডসমূহরূপ পরমাণু-সকলের পরিভ্রমণের পথস্বরূপ গবাক্ষ-সদৃশ রোমবিবর-বিশিষ্ট তোমার মহিমাই বা কোথায় ?"

"যস্যৈকনিশ্বসিতকালমথাবলম্ব্য
জীবন্তি লোমবিলজা জগদণ্ডনাথাঃ।
বিষ্ণুর্মহান্ স ইহ যস্য কলাবিশেষঃ
গোবিন্দমাদিপুরুষং তমহং ভজামি॥ ব্রহ্মসংহিতা॥৫।৪৮॥

—যে মহাবিষ্ণুর (কাণার্ণবশায়ীর) এক নিশ্বাস-পরিমিত কালমাত্র ব্যাপিয়া তদীয় লোমকূপ হইতে আবির্ভূত ব্রহ্মাণ্ডাধিপতিগণ—ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব-আদি—এই জগতে স্ব-স্ব-অধিকারে প্রকট-রূপে অবস্থিতি করেন, সেই মহাবিষ্ণু যাঁহার কলাবিশেষ, সেই আদিপুরুষ শ্রীগোবিন্দকে আমি ভজনা করি।"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতেও জানা যায়—মহাপ্রলয়ে সূক্ষ্মরূপে সমস্ত মায়িক ব্রহ্মাণ্ড (অর্থাৎ

ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি) কারণার্ণবশায়ীতে (এবং কারণার্ণবশায়ীর সঙ্গে পরব্রহ্মে) অবস্থান করিয়া থাকে। এই অবস্থানও অবশ্য অস্পৃষ্টভাবেই।

কিন্তু সমস্যা দেখা দিতেছে শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীর অপর একটী উক্তি হইতে। তিনি বলিয়াছেন—

"মায়া শক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৫।৪৯॥
দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে ঈক্ষণ।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৫।৫৭-৫৮॥"

ইহা হইতে জানা গেল—জড়রূপা মায়া বা প্রকৃতি চিন্ময় জলপূর্ণ কারণসমুদ্রকে স্পর্শ করিতে পারে না। মহাপ্রলয়েও প্রকৃতি কারণ-সমুদ্রের বাহিরেই থাকে। কারণার্ণবশায়ী পুরুষ থাকেন কারণার্ণবে (সৃষ্টির প্রারম্ভে)। তিনি দূর হইতে প্রকৃতির প্রতি দৃষ্টি দান করিয়া প্রকৃতির সাম্যাবস্থা নষ্ট করেন।

"কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ। পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ শ্রীভা, ৩।৫।২৬॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"মায়াধিষ্ঠাত্রা আদিপুরুষেণ দ্বারা মায়াং দূরাদীক্ষণেনৈব সংভুক্তায়াং বীর্য্যং চিদাভাসাখ্যং জীবশক্তিং আধত্ত।—মায়ার অধিষ্ঠাতা আদিপুরুষ (আদ্য অবতার কারণার্ণবশায়ী পুরুষ) দূর হইতেই দৃষ্টিমাত্রদ্বারা মায়াতে চিদাভাসরূপা জীবশক্তিকে অর্পণ করেন।"

এক্ষণে সমস্যা হইতেছে এই যে, মহাপ্রলয়ে মায়া বা প্রকৃতি যদি কারণার্ণবশায়ীতেই (এবং কারণার্ণবশায়ীর সঙ্গে পরব্রহ্মেই) লীন হইয়া থাকে এবং সৃষ্টির প্রারম্ভে কারণার্ণবশায়ী আবির্ভূত হইয়া যদি কারণার্ণবেই অবস্থান করেন, তাহা হইলে মায়াও তো তখন কারণার্ণবশায়ীর অন্তর্ভুক্ত বলিয়া কারণার্ণবেই থাকিবে। এই অবস্থায় কেন বলা হইল "মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে। কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে॥" এবং "দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান। জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥"

ইহার সমাধান বোধ হয় এইরূপ। পুরুষের মধ্যে অবস্থান করিয়াও মায়া যেমন পুরুষকে স্পর্শ করিতে পারে না, তেমনি পুরুষের মধ্যে লীন অবস্থায় কারণার্ণবে থাকিয়াও মায়া কারণার্ণবকে স্পর্শ করিতে পারে না। স্পর্শের অভাবই দূরত্বের সূচক। দুইটী বস্তু পরস্পর হইতে দূরে অবস্থান করিলেই তাহাদের স্পর্শাভাব হয়। মায়া এবং কারণার্ণবের বা কারণার্ণবশায়ীর মধ্যে যে দূরত্বের কথা বলা হইয়াছে, তাহা স্থানের ব্যবধানজনিত দূরত্ব

নহে ; এই দূরত্ব কেবল স্পর্শের অভাবই সূচিত করিতেছে। এইরূপ ব্যবহার অন্যত্রও দৃষ্ট হয়। যথা, পরব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক ; তাঁহার বাহিরে কেহ থাকিতে পারে না, তাঁহা হইতে বাহিরের দিকে মুখ ফিরাইয়া থাকাও কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে ; কেননা, সকলেরই ভিতরে বাহিরে উর্দ্ধে, অধোভাগে—সকল দিকেই তিনি বিদ্যমান। তথাপি সংসারী জীবকে বলা হয়—পরব্রহ্ম ভগবান্ হইতে অনাদি-বহির্ম্মুখ। ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞানের অভাবকেই এ-স্থলে বহির্ম্মুখতা বলা হয়। ভগবান্‌কে অনাদিকাল হইতে জানেনা বলিয়া, তাঁহার সান্নিধ্য অনুভব করে না বলিয়াও সংসারী জীবকে তাঁহা হইতে দূরে অবস্থিত বলা হয়। নিকটে থাকিয়াও দূরে। ইহার তাৎপর্য্য—অনুভূতির অভাব। তদ্রূপ উল্লিখিত স্থলেও স্পর্শাভাবকেই দূরত্ব বলা হইয়াছে। মায়ার সহিত কারণার্ণবের স্পর্শ হয় না বলিয়াই বলা হইয়াছে—মায়া কারণসমুদ্রের বাহিরে থাকে। সম্ভবতঃ এজন্যই "মায়া শক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে"-একথা বলিয়াই ইহার তাৎপর্য্য-প্রকাশার্থই কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে।" আবার "দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান"—এই কথার তাৎপর্য্যও হইতেছে এই যে—মায়াকে স্পর্শ না করিয়াই কারণার্ণবশায়ী পুরুষ মায়ার প্রতি অবধান করিয়া থাকেন—দৃষ্টি করিয়া থাকেন, জীবরূপ বীর্য্য নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন।

অথবা, অন্য রকমেও উক্ত সমস্যার সমাধান হইতে পারে। "বাহির" ও "দূর" শব্দদ্বয়ের গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়াই এই পর্য্যন্ত আলোচনা করা হইয়াছে। ঐ শব্দদ্বয়ের মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলেও শাস্ত্রবাক্যের সহিত বিরোধ হয় বলিয়া মনে হয় না। মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়াই এক্ষণে আলোচনা করা হইতেছে।

পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে মায়ার বা প্রকৃতির অবস্থান-সম্বন্ধে একটী প্রমাণ দৃষ্ট হয়। যথা,

"প্রধানপরব্যোম্নোরন্তরে বিরজা নদী।
বেদাঙ্গস্বেদজনিতস্তোয়ৈঃ প্রস্রাবিতা শুভা॥

—লঘুভাগবতামৃতধৃত-পাদ্মোত্তর-বচন॥

—প্রধান (প্রকৃতি) ও পরব্যোমের মধ্যস্থলে বিরজা নাম্নী নদী (কারণার্ণবেরই অপর নাম বিরজা নদী) ; এই নদী বেদাঙ্গ-শ্রীভগবানের ঘর্ম্মজল হইতে প্রবাহিতা এবং ইহা শুভা (পাবনী)।"

কারণার্ণব চিন্ময় জলপূর্ণ ; তাহার একতীরে চিন্ময়-পরব্যোম ধাম এবং অপর তীরে প্রধান বা প্রকৃতি। ইহা হইতে জানা গেল, কারণার্ণবের বহির্দ্দেশেই প্রকৃতির স্থিতি—নিত্যস্থিতি।

বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"মায়া অবলোকিতে হয় শ্রীসঙ্কর্ষণ।
পুরুষরূপে অবতীর্ণ হইলা প্রথম॥
সেই পুরুষ বিরজাতে করিলা শয়ন।
'কারণাব্ধিশায়ী' নাম জগৎ-কারণ॥

কারণাব্ধি-পারে হয় মায়ার নিত্য স্থিতি।
বিরজার পারে পরব্যোমে নাহি গতি ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২১।২২৯-৩১॥"

ইহা হইতেও জানা গেল—কারণসমুদ্রের একতীরে পরব্যোম, অপর তীরে মায়ার বা প্রকৃতির "নিত্যস্থিতি"। এ-স্থলে "নিত্যস্থিতি"-শব্দ হইতে বুঝা যায় যে, মহাপ্রলয়েও মায়া কারণাব্ধির অপর তীরে—বাহিরে—অবস্থান করে—কারণাব্ধি হইতে পৃথক্‌ভাবে, কারণাব্ধিকে স্পর্শ না করিয়া। যেহেতু,

"মায়াশক্তি রহে কারণাব্ধির বাহিরে।
কারণসমুদ্র মায়া পরশিতে নারে ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৫।৪৯ ॥"

ইহার পরেই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলিয়াছেন—

"দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান ॥
এক অঙ্গাভাসে করে মায়াতে ঈক্ষণ।
মায়া হৈতে জন্মে তবে ব্রহ্মাণ্ডের গণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৫।৫৭-৫৮ ॥"

ইহা হইতেও বুঝা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়েও মায়া বা প্রকৃতি কারণার্ণবকে স্পর্শ না করিয়া কারণার্ণবের বাহিরেই অবস্থান করে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কেন বলা হইল—মহাপ্রলয়ে কারণার্ণবশায়ীর সহিত প্রকৃতি পরব্রহ্মে লীন হইয়া তাঁহার সহিত একীভূত হইয়া যায় ?

"প্রকৃতি র্যা ময়া খ্যাতা ব্যক্তাব্যক্তস্বরূপিণী।
পুরুষশ্চাপ্যুভাবেতৌ লীয়তে পরমাত্মনি ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥৬।৪।৩৮॥

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেও জানা যায়—মহাপ্রলয়ে পুরুষাদি-পার্থিব পর্য্যন্ত এই বিশ্ব ভগবানের সহিত একীভূত ছিল ; অর্থাৎ ব্যক্তস্বরূপিণী প্রকৃতি অব্যক্তস্বরূপিণীরূপে ভগবানের সহিত একীভূতা হইয়া ছিল।

ভগবানেক আসেদমগ্র আত্মাত্মনাং বিভুঃ।
আত্মেচ্ছানুগতাবাত্মা নানামত্যুপলক্ষণঃ ॥ শ্রীভা, ৩।৫।২৩॥"

শ্রুতি হইতেও তাহাই জানা যায়। "পৃথিবী অপ্‌সু প্রলীয়তে, আপস্তেজসি লীয়ন্তে, তেজো বায়ৌ লীয়তে, বায়ুরাকাশে লীয়তে, আকাশমিন্দ্রিয়েষু, ইন্দ্রিয়াণি তন্মাত্রেষু, তন্মাত্রাণি ভূতাদৌ লীয়ন্তে, ভূতাদির্মহতি লীয়তে, মহানব্যক্তে লীয়তে, অব্যক্তমক্ষরে লীয়তে, অক্ষরং তমসি লীয়তে, তমঃ পরে দেবে একীভবতি ॥ পরিণামাৎ ॥ ১।৪।২৭-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজধৃত শ্রুতিবাক্য ॥" "সদেব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ", "বাসুদেবো বা ইদমগ্র আসীৎ ন ব্রহ্মা ন চ শঙ্করঃ", "একো নারায়ণ এবাসীন্ন ব্রহ্মা নেশানঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যও তাহাই।

অর্থাৎ, সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়ে, এক পরব্রহ্ম ভগবান্‌ই ছিলেন, সমগ্র বিশ্ব এবং প্রকৃতিও

তাঁহার সহিত একীভূত ছিল, "তমঃ পরে দেবে একীভবতি।" তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে কারণাব্ধির বাহিরে মায়ার বা প্রকৃতির পৃথক্ অস্তিত্ব কিরূপে সম্ভব হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তর এইরূপ হইতে পারে। এক ভগবান্ পরব্রহ্ম বলিতে কি বুঝায়? শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি আছে। স্বাভাবিকী শক্তি শক্তিমদ্‌বস্তু হইতে অবিচ্ছেদ্যা; যেমন—মৃগমদের গন্ধ মৃগমদ হইতে অবিচ্ছেদ্য, অগ্নির দাহিকা শক্তি অগ্নি হইতে অবিচ্ছেদ্য। স্বাভাবিকী শক্তির সহিতই শক্তিমান্ হয় একটীমাত্র বস্তু। যেমন, মৃগমদের গন্ধের সহিতই মৃগমদ একটী বস্তু; দাহিকা শক্তির সহিতই অগ্নি একটী বস্তু। তদ্রূপ, ব্রহ্মের শক্তির সহিতই ব্রহ্ম একটী বস্তু। "ব্রহ্ম খলু শক্তিমদেকবস্তু। গোবিন্দভাষ্য।" শক্তিকে বাদ দিয়া শক্তিমান্ কখনও থাকিতে পারে না, এক-বস্তুও হইতে পারে না।

প্রকৃতিও পরব্রহ্মেরই স্বাভাবিকী শক্তি; জড়রূপা বলিয়া সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সহিত তাহার স্পর্শ হইতে পারে না বলিয়াই প্রকৃতিকে ব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি বলা হয়; কিন্তু বহিরঙ্গা হইলেও প্রকৃতি ব্রহ্মেরই স্বাভাবিকী শক্তি। সমস্ত-শক্তিবর্গ-সমন্বিত ব্রহ্ম যখন একবস্তু, এবং প্রকৃতিও যখন সমস্ত-শক্তিবর্গেরই অন্তর্ভুক্ত. তখন পরব্রহ্মরূপ একবস্তুর সহিত প্রকৃতিও থাকিবে—অবশ্য স্পর্শের অযোগ্যভাবে। সুতরাং প্রকৃতি ব্রহ্মের সহিত একীভূত—একথা বলা অসঙ্গত হয় না।

যদি বলা যায়—"সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে সমস্ত জগৎকেই তো ব্রহ্ম বলা হইয়াছে। তাহা হইলে এই জগৎও কি ব্রহ্মের সহিত একীভূত?

উত্তরে বলা যায়—সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই, এই জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে বলিয়াই, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" বলিয়াই বলা হইয়াছে "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম।" সুতরাং জগৎও ব্রহ্মের সহিত একীভূত—একথা যে বলা যাইতে পারে না, তাহা নয়। তবে বিশেষত্ব হইতেছে এই যে—এই বিশ্বটী হইতেছে অনিত্য; ইহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। মহাপ্রলয়ে প্রকৃতির বিকার এই বিশ্ব যখন প্রকৃতিতেই পর্য্যবসিত হয় এবং তদবস্থায় প্রকৃতিতেই লীন থাকে, তখন প্রকৃতি স্বীয় নিত্য-স্বরূপে অবস্থান করে। মহাপ্রলয়ের পূর্ব্বে সৃষ্টিকালেও ব্রহ্মাণ্ডের সর্ব্ববহিরাবরণরূপে প্রকৃতি তাহার নিত্যস্বরূপে অবস্থান করে বটে; কিন্তু তখন সেই আবরণই সমগ্রা প্রকৃতি নহে। মহাপ্রলয়ে সমগ্রা প্রকৃতিই স্বীয় নিত্যস্বরূপে অবস্থান করে এবং তখন তাহা হয় পরব্রহ্মের অবিকৃতা শক্তি।

সৃষ্টিকালে জীবের দেহাদিরূপে বিকার-প্রাপ্তা প্রকৃতির নাম-রূপাদি থাকে। মহাপ্রলয়ে নাম-রূপাদি তিরোহিত হইয়া যায়। প্রকৃতি তখন অতিসূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে। এই অতিসূক্ষ্মরূপই প্রকৃতির অবিকৃত স্বরূপ। সৃষ্টিকালে বিকারপ্রাপ্তা প্রকৃতির নাম-রূপাদি থাকে বলিয়া, পৃথক্‌রূপেও তখন তাহার উল্লেখ করা যায়—যেমন, মহত্তত্ত্ব, অহঙ্কারতত্ত্ব, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, নরদেহ, দেবদেহ, বৃক্ষদেহ, ইত্যাদি। কিন্তু মহাপ্রলয়ে নাম-রূপহীন অতি-সূক্ষ্ম অবস্থায় প্রকৃতি থাকে—পৃথক্‌রূপে

উল্লেখের অযোগ্য অবস্থায়। তখন তাহার একমাত্র পরিচয় থাকে এই যে—তাহা পরব্রহ্মের শক্তি, শক্তিমদেকবস্তু ব্রহ্মের শক্তি।

শক্তিমদেকবস্তু পরব্রহ্মের এতাদৃশী শক্তির অবস্থিতিকেই—অর্থাৎ নাম-রূপবিহীন অতিসূক্ষ্ম অবস্থায় অবস্থিতা, সুতরাং পৃথক্‌ভাবে উল্লেখের অযোগ্যা, পরব্রহ্মের সমগ্রা অবিকৃতা শক্তিরূপে প্রকৃতির অবস্থিতিকেই —মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মের সহিত প্রকৃতির একীভূততা বলা হইয়াছে।

এইরূপ একীভূততাতে কারণার্ণবের বাহিরে পৃথক্‌ভাবেই বাস্তবিক প্রকৃতির অস্তিত্ব। কেন না, জড়রূপা প্রকৃতি বা মায়া চিন্ময় জলপূর্ণ কারণার্ণবকে স্পর্শ করিতে পারে না। আর, কারণার্ণবশায়ী পুরুষ থাকেন কারণার্ণবে। সুতরাং প্রকৃতি তাঁহা হইতে দূরেই অবস্থিত থাকে। এজন্যই বলা হইয়াছে—"দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।"

আর একটী কথাও প্রণিধানযোগ্য। বলা হইয়াছে—

"দূর হৈতে পুরুষ করে মায়াতে অবধান।
জীবরূপ বীর্য্য তাতে করেন আধান॥ শ্রী চৈ, চ, ১।৫।৫৭॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়াছেন, বিক্ষুব্ধা মায়াতে পুরুষ জীবরূপ বীর্য্য নিক্ষেপ করেন।

"কালবৃত্ত্যা তু মায়ায়াং গুণময্যামধোক্ষজঃ।
পুরুষেণাত্মভূতেন বীর্য্যমাধত্ত বীর্য্যবান্॥ শ্রীভা, ৩।৫।২৬॥"

এই শ্লোকের টীকাতে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"মায়াধিষ্ঠাত্রা আদিপুরুষেণ দ্বারা দূরাদীক্ষণেনৈব সংভুক্তায়াং বীর্য্যং চিদাভাসাখ্যং জীবশক্তিং আধত্ত।"

ইহা হইতেও জানা যায়—কারণার্ণবশায়ী পুরুষ দূর হইতেই মায়াতে জীবশক্তিকে বা জীবাত্মাকে নিক্ষেপ করেন।

মহাপ্রলয়ে সৃষ্ট ব্রহ্মাণ্ডের জীবসমূহ থাকে কারণার্ণবশায়ীতে লীন। সৃষ্টির প্রারম্ভে তাহা-দিগকে তিনি বিক্ষুব্ধা মায়াতে নিক্ষেপ করেন। কিন্তু মায়াকে যে তিনি নিজের দেহ হইতে দূরে নিক্ষেপ করিয়া তাহার পরে দৃষ্টিদ্বারা শক্তি সঞ্চার করিয়া বিক্ষুব্ধা করিয়াছেন, এইরূপ কোনও উক্তি দৃষ্ট হয় না। ইহাদ্বারা বুঝা যায়—মায়া কারণার্ণবশায়ীর বিগ্রহ-মধ্যে ছিল না, পূর্ব্ব হইতেই দূরে ছিল —কারণার্ণবের বাহিরেই মহাপ্রলয়েও এবং সৃষ্টির আরম্ভকালেও অবস্থিত ছিল।

মহাপ্রলয়ে মায়া যে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত ছিল, বেদবাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। শ্রীপাদ রামানুজ ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে যজুর্ব্বেদের একটী বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"নাসদাসীৎ নো সদাসীৎ, তদানীং তম আসীৎ।

-- সেই সময়ে (সৃষ্টির পূর্ব্বে, মহাপ্রলয়-কালে) অসৎ ছিল না, সৎও ছিল না; তমঃ (প্রকৃতি) ছিল।

[সৎ = কার্য্যাবস্থা, দৃশ্যমান জগৎ। অসৎ = অব্যবহিত কারণাবস্থা, মহত্তত্ত্ব। ১।২।৬৯-চ (১)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য। তমঃ—অবিকৃতা বা সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতি।]

উল্লিখিতরূপ সমাধানে কোনও শব্দেরই গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হয় না। মুখ্য অর্থেরই সঙ্গতি থাকে। গৌণার্থমূলক সিদ্ধান্ত অপেক্ষা মুখ্যার্থ-মূলক সিদ্ধান্তেরই প্রাধান্য।

মুখ্যার্থমূলক সিদ্ধান্তে দেখা গেল, মহাপ্রলয়ে সাম্যাবস্থাপন্না প্রকৃতি কারণার্ণবের বহির্দ্দেশে অবস্থান করে। তখন প্রকৃতির কোনও দৃশ্যমান রূপ থাকে না বলিয়া সৃষ্টির প্রারম্ভে পুরুষ যখন দৃষ্টি করিলেন, তখন দৃশ্য কিছু দেখেন নাই। প্রকৃতি তখন অতিসূক্ষ্মরূপে সাম্যাবস্থায় থাকে বলিয়া তখন তাহাকে সুপ্তাও বলা হয়। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"স বা এষ তদা দ্রষ্টা নাপশ্যদ্দৃশ্যমেকরাট্।
মেনেঽসন্তমিবাত্মানং সুপ্তশক্তিমসুপ্তদৃক্॥ শ্রীভা, ৩।৫।২৪॥"

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে তৃতীয় পর্ব্ব
সৃষ্টিতত্ত্ব-প্রথমাংশ
—সৃষ্টিতত্ত্ব ও প্রস্থানত্রয় এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ—
সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

তৃতীয় পর্ব

সৃষ্টিতত্ত্ব

দ্বিতীয়াংশ

সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ

বন্দনা

বন্দেঽহং শ্রীগুরোঃ শ্রীযুতপদকমলং
শ্রীগুরূন্ বৈষ্ণবাংশ্চ
শ্রীরূপং সাগ্রজাতং সহগণরঘুনাথান্বিতং তং সজীবম্।
সাদ্বৈতং সাবধূতং পরিজনসহিতং কৃষ্ণচৈতন্যদেবং
শ্রীরাধাকৃষ্ণপাদান্ সহগণললিতা-
শ্রীবিশাখান্বিতাংশ্চ।

দুর্গমে পথি মেঽন্ধস্য স্খলৎপাদগতের্মুহুঃ।
স্বকৃপাযষ্টিদানেন সন্তঃ সন্ত্ববলম্বনম্ ॥

সূত্র

ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ।
ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী।
এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি॥
বস্তুত পরিণামবাদ—সেইত প্রমাণ।
'দেহে আত্মবুদ্ধি'—এই বিবর্ত্তের স্থান॥
অবিচিন্ত্য-শক্তিযুক্ত শ্রীভগবান্।
ইচ্ছায় জগত-রূপে পায় পরিণাম॥
তথাপি অচিন্ত্যশক্ত্যে হয় অবিকারী।
প্রাকৃত চিন্তামণি তাতে দৃষ্টান্ত যে ধরি॥

শ্রীচৈ. চ. ১।৭।১১৪-১৮॥

জীবের দেহে আত্মবুদ্ধি—সেই মিথ্যা হয়।
জগৎ মিথ্যা নহে—নশ্বর মাত্র হয়॥

শ্রীচৈ. চ. ২।৬।১৫৭॥

প্রথম অধ্যায়

পরিণামবাদ ও প্রাচীন আচার্য্যগণ

৩৩। শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যগণ এবং শ্রীপাদ শঙ্কর

শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যগণ প্রস্থানত্রয়ানুসারে স্বীকার করেন—বেদান্তবেদ্য পরব্রহ্মই জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কারণ, তিনিই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। তাঁহারা ব্যাসসূত্র-সম্মত পরিণামবাদই স্বীকার করেন।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য অন্যরূপ মতবাদ পোষণ করেন। তিনি পরিণামবাদ স্বীকার করেন না। তিনি বলেন, পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মকে বিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু ব্রহ্ম বিকারী নহেন, তিনি সর্ব্বদাই নির্ব্বিকার; সুতরাং পরিণামবাদ স্বীকার করা যায় না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।২৬-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে—পরিণাম বা বিকার দুই রকমের। প্রথম রকমের পরিণামে মূলবস্তু অবিকৃত থাকিয়াই অন্য বস্তুর সৃষ্টি করে। যেমন, স্যমন্তক মণি, উর্ণনাভি ইত্যাদি। দ্বিতীয় রকমের পরিণামে মূলবস্তু নিজে বিকৃত হইয়াই অন্য বস্তুর উৎপাদন করে। যেমন, মৃত্তিকা, কাষ্ঠ-ইত্যাদি। পরিণামবাদে প্রথম রকমের পরিণামই যে ব্যাসদেবের অভিপ্রেত, তাহাও সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতে বুঝা যায়,—তিনি জানাইতে চাহেন যে, উল্লিখিত দ্বিতীয় রকমের পরিণামের কথাই ব্যাসদেব বলিয়াছেন এবং দ্বিতীয় রকমের পরিণামই একমাত্র পরিণাম। এইরূপে তিনি,—উর্ণনাভির দৃষ্টান্তে প্রথম রকমের পরিণাম শ্রুতিসম্মত হওয়া সত্ত্বেও শ্রীপাদ শঙ্কর—প্রথম রকমের পরিণামের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার ফলে ব্রহ্মের উপাদান-কারণত্ব-সম্বন্ধে যতগুলি ব্রহ্মসূত্র আছে, তাহাদের প্রতিও উপেক্ষাই প্রদর্শিত হইয়াছে। সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের সিদ্ধান্ত অনুসারে, জগৎকর্ত্তা হইয়াও, জগতের উপাদান-কারণ হইয়াও, ব্রহ্ম স্বয়ং অবিকৃত থাকেন। এই সিদ্ধান্ত স্বীকার না করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকারান্তরে যেন ব্যাসদেবকে ভ্রান্তই বলিতেছেন। একথা বলার হেতু এই যে, ব্যাসদেব বলিয়াছেন—জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—জগদ্রূপে পরিণত হইলে ব্রহ্ম অবিকৃত থাকিতে পারেন না।

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত শ্রুতিসম্মত নয়, ব্যাসদেবেরও সম্মত নয়।

দ্বিতীয় অধ্যায়
বিবর্ত্তবাদ

৩৪। শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ

শ্রীপাদ শঙ্কর পরিণামবাদ অস্বীকার করিয়া বিবর্ত্তবাদ স্থাপন করিয়াছেন।

"ব্যাসের সূত্রেতে কহে পরিণামবাদ। ব্যাস ভ্রান্ত বলি তাহা উঠাইল বিবাদ॥
পরিণামবাদে ঈশ্বর হয়েন বিকারী। এত কহি বিবর্ত্তবাদ স্থাপন যে করি॥
শ্রীচৈ, চ, ১।৭।১১৪-১৫॥"

বিবর্ত্তবাদ বুঝিতে হইলে বিবর্ত্তশব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা জানা দরকার।

বিবর্ত্তঃ--"অতাত্ত্বিকোঽন্যথাভাবঃ। স চ অপরিত্যক্তপূর্ব্বরূপস্য রূপান্তর-প্রকারক-প্রতীতি-বিষয়ত্বম্। যথা, মায়াবাদিমতে পরব্রহ্মণি সর্ব্বস্য জগতো বিবর্ত্তঃ।—অতাত্ত্বিক অন্যথাভাবই বিবর্ত্ত। পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অন্যরূপের প্রতীতিবিষয়ত্বই বিবর্ত্ত। যেমন, মায়াবাদীর মতে পরব্রহ্মে জগতের বিবর্ত্ত। (বৈয়াকরণভূষণ-সারদর্পণঃ)।"

"পূর্ব্বরূপাপরিত্যাগেনাসত্যনানাকারপ্রতিভাসঃ। যথা, শুক্তিকায়াং রজতস্য, রজ্জ্বাং সর্পস্য প্রতীতিঃ।—পূর্ব্বরূপ পরিত্যাগ না করিয়া অসত্য নানাকারের যে প্রতিভাস, তাহার নাম বিবর্ত্ত। যেমন, শুক্তিতে (ঝিনুকে) রজতের প্রতীতি, রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি। (অথর্ব্বভাষ্যে শ্রীপাদ সায়নাচার্য্য)।

কখনও কখনও কেহ কেহ শুক্তি দেখিলে রজত বলিয়া মনে করে; কিম্বা রজ্জু দেখিলে সর্প বলিয়া মনে করে। এ-স্থলে শুক্তি বা রজ্জু নিজরূপ পরিত্যাগ করে না—শুক্তি শুক্তিই থাকে, রজ্জু রজ্জুই থাকে; অথচ দ্রষ্টার নিকটে রজত বা সর্প বলিয়া মনে হয়। এইরূপ মনে হওয়ার নামই বিবর্ত্ত। ইহা অবশ্যই ভ্রম। শুক্তি-স্থলে রজত বাস্তবিক নাই; রজ্জু-স্থলেও সর্প বাস্তবিক নাই; সুতরাং রজত-প্রতীতি বা সর্প-প্রতীতি ভ্রান্তিমাত্র; এ-স্থলে রজতের বা সর্পের সত্তা সত্য নহে, অতাত্ত্বিক; কেবল সত্য বলিয়া মনে হয় মাত্র। শুক্তির বা রজ্জুর সত্তাই বাস্তব, সত্য।

এইরূপে বুঝা গেল—কোনও সত্যবস্তুতে যে অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্বের মিথ্যা প্রতীতি, তাহাই হইতেছে বিবর্ত্ত।

শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদও এইরূপ মিথ্যা প্রতীতিবাদমাত্র। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য বস্তু; সত্য বস্তু ব্রহ্মে জগতের মিথ্যা প্রতীতি হয় মাত্র। জগৎ ব্রহ্মের পরিণাম নহে; জগৎ হইতেছে ব্রহ্মে জগতের বিবর্ত্ত মাত্র। শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রম হয়, রজ্জুতে যেমন সর্পের ভ্রম হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মেও জগতের ভ্রম জন্মিতেছে।

ভ্রান্তিবশতঃ লোক যেমন শুক্তিস্থলে রজত দেখিতেছে বলিয়া মনে করে, কিন্তু শুক্তি দেখেনা; কিম্বা রজ্জুস্থলে সর্প দেখিতেছে বলিয়া মনে করে, কিন্তু রজ্জু দেখে না; আবার, কোনও কারণে ভ্রম অপসারিত হইলে যেমন যেস্থলে রজত দেখিতেছিল, সেই স্থলে রজত দেখে না, দেখে শুক্তি; কিম্বা যেস্থলে সর্প দেখিতেছিল, সেই স্থলে সর্প দেখে না, দেখে রজ্জু; তদ্রূপ অবিদ্যাজনিত অজ্ঞান বশতঃ জীবও ব্রহ্ম-স্থলে জগৎ দেখিতেছে বলিয়া মনে করে; কিন্তু যখন অজ্ঞান দূরীভূত হয়, তখন বুঝিতে পারে—জগৎ বলিয়া বাস্তবিক কিছু নাই, আছেন একমাত্র ব্রহ্ম। ব্রহ্মেই তাহার জগৎ-ভ্রম হইয়াছিল।

ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ।

বিবর্ত্তবাদে জগতের বাস্তব সত্তা স্বীকার করা হয় না। তবে শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এই জগৎ আকাশ-কুসুম বা বন্ধ্যাপুত্রের ন্যায় অলীক নহে। আকাশ-কুসুমের বা বন্ধ্যাপুত্রের অস্তিত্বের প্রতীতি কখনও কাহারও নিকটে হয় না। কিন্তু জগতের অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে। ইহাই হইতেছে আকাশ-কুসুমের বা বন্ধ্যাপুত্রের সঙ্গে জগতের পার্থক্য। কিন্তু আকাশ-কুসুমের বা বন্ধ্যাপুত্রের যেমন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জগতেরও তেমনি কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। তাঁহার মতে জগৎ মিথ্যা। যাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই, অথচ অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাকেই তিনি "মিথ্যা" বলেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার প্রচারিত বিবর্ত্তবাদের সমর্থনে কোনও শ্রুতিপ্রমাণ বা স্মৃতিপ্রমাণ বা ব্রহ্মসূত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করেন নাই। এতাদৃশ কোনও শাস্ত্রপ্রমাণ নাইও। তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি কেবল তাঁহার রজ্জু-শুক্তির দৃষ্টান্তেরই উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও লৌকিক দৃষ্টান্তই অলৌকিক বিষয়ে স্বতঃপ্রমাণ হইতে পারে না। শ্রুতিপ্রমাণকে লোকের নিকটে পরিস্ফুট করার জন্য শ্রুতিও কোনও কোনও স্থলে লৌকিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়াছেন। কিন্তু লৌকিক দৃষ্টান্ত হইতে যাহা জানা যায়, তাহা যদি শ্রুতিতে দৃষ্ট না হয়, তাহা হইলে শ্রুতিসম্বন্ধীয় বিষয়ে তাহা প্রমাণরূপে গৃহীত হইতে পারে না। "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ॥", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ॥"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতে, "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"—ইত্যাদি স্মৃতিবাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়।

শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে যখন কোনও শ্রুতিপ্রমাণ নাই, তখন বিবর্ত্তবাদকে শ্রৌতসিদ্ধান্তরূপে স্বীকার করা যাইতে পারে না।

তৃতীয় অধ্যায়
জগতের মিথ্যাত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা

৩৫। সূচনা

শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদের ভিত্তি হইতেছে জগতের মিথ্যাত্ব। জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতে না পারিলে তিনি তাঁহার বিবর্ত্তবাদ প্রতিষ্ঠিত করিতে পারেন না। তাই, জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য তিনি যথেষ্ট চেষ্টা করিয়াছেন। যে সমস্ত শাস্ত্রবাক্যকে অবলম্বন করিয়া তিনি জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহাদের মধ্যে কয়েকটীর প্রসঙ্গে তাঁহার উক্তি আলোচিত হইতেছে।

এই বিষয়ে যে শ্রুতিবাক্যটীকে তিনি প্রধানভাবে অবলম্বন করিয়াছেন, সর্ব্বাগ্রে তাহাই আলোচিত হইতেছে-"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্।"

৩৬। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।১৪-৬॥,

৬।১৪—৬॥—শ্রুতিবাক্যের পূর্ব্বাপর প্রসঙ্গ

ক। পূর্ব্ববর্ত্তী প্রসঙ্গ

যে প্রসঙ্গে এই শ্রুতিবাক্যটী কথিত হইয়াছে, সর্ব্বাগ্রে তাহার উল্লেখ আবশ্যক।

দ্বাদশ বৎসর গুরুগৃহে অবস্থান পূর্ব্বক অধ্যয়নের পরে শ্বেতকেতু যখন স্বগৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন, তখন তাঁহার অবিনীত ভাব দেখিয়া তাঁহার পিতা আরুণি-ঋষি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"শ্বেতকেতো! তোমার গুরুর নিকটে সেই উপদেশটী কি প্রাপ্ত হইয়াছ?" কোনও একটী বিশেষ উপদেশের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই আরুণি এই কথা বলিয়াছিলেন।

কোন্ উপদেশ বা আদেশ?

"যেন অশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতমিতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।১।৩॥—যদ্দ্বারা অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, অচিন্তিত বিষয়ও চিন্তিত হয়, অবিজ্ঞাত পদার্থও বিজ্ঞাত হয়—সেই আদেশ বা উপদেশ।"

এই শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে,—এমন একটী বস্তু আছে, যাহার বিষয় শুনা হইয়া গেলে, যেখানে যে বস্তু আছে, তৎসমস্তের বিষয়ই শুনা হইয়া যায়—অশ্রুত আর কিছু থাকেনা; যাহার বিষয় চিন্তা করিলে, যেখানে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তের বিষয়ই চিন্তিত হইয়া যায়; এবং যে বস্তুটী বিজ্ঞাত হইলে, যেখানে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তই বিজ্ঞাত হইয়া যায়, অবিজ্ঞাত আর কিছুই থাকে না।

এইরূপে দেখা যায় – এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের কথাই ছিল আরুণির লক্ষ্য। এমন একটী বস্তু আছে, যাহাকে জানিলে আর অজ্ঞাত কিছুই থাকে না। শ্বেতকেতু সেই বস্তুটীর কথা তাঁহার গুরুদেবের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন কিনা—ইহাই ছিল শ্বেতকেতুর নিকটে আরুণির জিজ্ঞাস্য।

পিতার কথা শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন—"ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? এক বস্তুর জ্ঞানে অন্য সকল বস্তুর জ্ঞান লাভ কিরূপে হইতে পারে? মৃত্তিকার জ্ঞানে কখনও কি স্বর্ণের বা লৌহের জ্ঞান জন্মিতে পারে? অথবা স্বর্ণের জ্ঞানে কি কখনও মৃত্তিকার বা লৌহের জ্ঞান জন্মিতে পারে?"

তদুত্তরে আরুণি যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—দুইটী বস্তু যদি পরস্পর হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে তাহাদের একটীর জ্ঞানে অবশ্য অপরটীর জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। কিন্তু পরস্পর হইতে ভিন্ন নয়, এইরূপ দুইটী বস্তু যদি থাকে, তাহা হইলে তাহাদের একটীর সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ হইলে অপরটীর সম্বন্ধেও জ্ঞান লাভ হইয়া যায়।

এতাদৃশ দুইটী বস্তু কি হইতে পারে? হইতে পারে, কার্য্য ও কারণ। কার্য্য হইতেছে কারণ হইতে অনন্য –তত্ত্বতঃ অভিন্ন; কেননা, কারণেরই পরিণাম বা রূপান্তর বা অবস্থান্তর হইতেছে কার্য্য।

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে যে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের কথা বলা হইল, তাহা সম্ভবপর হইতে পারে—যদি সেই এক বস্তুটী অন্য সমস্ত বস্তুর কারণ হয় এবং অন্য সমস্ত বস্তু যদি সেই এক বস্তুরই কার্য্য হয়। কিন্তু কি সেই এক বস্তু, যাহা অন্য সমস্তের কারণ?

সেই এক বস্তুটী হইতেছেন—পরব্রহ্ম, যিনি সমস্ত জগতের কারণ, সমস্ত জগৎ হইতেছে তাঁহারই পরিণাম বা কার্য্য। এজন্যই এক ব্রহ্ম সম্বন্ধীয় জ্ঞান লাভ হইলেই সমস্ত জগতের স্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ সম্ভবপর হয়।

কিন্তু ব্রহ্ম জগতের কারণ হইলেও ব্রহ্মের জ্ঞানে কিরূপে ব্রহ্মকার্য্যরূপ-জগতের জ্ঞান জন্মিতে পারে? তিনটী লৌকিক দৃষ্টান্তের অবতারণা করিয়া আরুণি তাহা শ্বেতকেতুকে বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। নিম্নলিখিত দৃষ্টান্তত্রয় অবতারিত হইয়াছে।

আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেনঃ—

(১) "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।১।৪॥

—হে সোম্য! একটী মাত্র মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, 'বাচারম্ভণ বিকার নামধেয়' মৃত্তিকা ইহাই সত্য।

(২) 'যথা সোম্যৈকেন লোহমণিনা সর্ব্বং লোহময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং লোহমিত্যেব সত্যম্॥ ছান্দোগ্য॥৬।১।৫॥

—হে সোম্য! একটীমাত্র লোহমণি (সুবর্ণপিণ্ড) বিজ্ঞাত হইলেই যেমন সমস্ত লোহময় (সুবর্ণময়) পদার্থ বিজ্ঞাত হয়, 'বাচারম্ভণ বিকার নামধেয়' লোহ (সুবর্ণ) ইহাই সত্য।"

(৩) "যথা সোম্যকেন নখকৃন্তনেন সর্ব্বং কার্ষ্ণায়সং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং কৃষ্ণায়সমিত্যেব সত্যম্, এবং সোম্য স আদেশো ভবতীতি। ছান্দোগ্য ॥ ৬।১।৬ ॥

—হে সোম্য! একটী মাত্র নখকৃন্তন (নখকৃন্তনের—নখচ্ছেদক নরুণের—কারণভূত কৃষ্ণায়স বা ইস্পাত) বিজ্ঞাত হইলে যেমন সমস্ত কার্ষ্ণায়স (ইস্পাতময় দ্রব্য) বিজ্ঞাত হয়, 'বাচারম্ভণ বিকার নামধেয়' কৃষ্ণায়স (ইস্পাত) ইহাই সত্য, সেই আদেশও এইরূপই হয়।"

["বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-বাক্যের তাৎপর্য্য পরে আলোচিত হইবে বলিয়া উল্লিখিত অনুবাদে তাহা প্রকাশ করা হইল না, কেবল "বাচারম্ভণ বিকার নামধেয়" লিখিত হইল।]

খ। পরবর্ত্তী প্রসঙ্গ

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-বাক্যের তাৎপর্য্য উপলব্ধি করার জন্য পরবর্ত্তী কয়েকটী বাক্যের মর্ম্মও অবগত হওয়া দরকার। এ-স্থলে তাহাও সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

আরুণির (অরুণ-পুত্র উদ্দালকের) পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যগুলি শুনিয়া শ্বেতকেতু বলিলেন—"আমার অধ্যাপক বোধ হয় এই এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের তত্ত্ব জানিতেন না, জানিলে অবশ্যই আমাকে বলিতেন। পিতঃ, আপনিই আমাকে তাহা উপদেশ করুন ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।১।৭॥"

পুত্র শ্বেতকেতু কর্ত্তৃক জিজ্ঞাসিত হইয়া আরুণি (উদ্দালক) বলিলেন—"সদেব সোম্যেদগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্। তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্, তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।২।১॥

—হে সোম্য! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। এ বিষয়ে কেহ কেহ বলেন—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক অদ্বিতীয় অসৎই—অস্তিত্বহীন অভাবস্বরূপই—ছিল; সেই অসৎ হইতে সৎস্বরূপ এই জগৎ জন্মিয়াছে।"

ইহার পরে আরুণি বলিলেন—"কিরূপে অসৎ হইতে সৎস্বরূপ এই জগতের উৎপত্তি হইতে পারে? তাহা হইতে পারে না। উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ নিশ্চয়ই এক অদ্বিতীয় সৎস্বরূপই ছিল। ছান্দোগ্য ॥৬।২।২॥"

কিরূপে সেই এক অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ হইতে এই জগতের উৎপত্তি হইল? আরুণি তাহাও বলিয়াছেন—

"তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত, তত্তেজ ঐক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি তদপোঽসৃজত ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।২।৩॥

—সেই পূর্ব্বোক্ত এক অদ্বিতীয় সৎ-ব্রহ্ম ঈক্ষণ (আলোচনা) করিলেন—আমি বহু হইব—

জন্মিব। অতঃপর তিনি তেজঃ সৃষ্টি করিলেন। সেই তেজঃ আবার ঈক্ষণ করিল—আমি বহু হইব—জন্মিব। অনন্তর সেই তেজই জলের সৃষ্টি করিল।"

"সেই জল পৃথিবী সৃষ্টি করিল ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।২।৪॥"

এইরূপে এক এবং অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে তেজঃ, জল ও পৃথিবীর উৎপত্তি হইল।

ইহার পরে আরুণি বলিলেন—

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেন আত্মনা অনুপ্রবিশ্য নাম-রূপে ব্যাকরবাণীতি ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৩।২॥

—সেই দেবতা (সৎস্বরূপা দেবতা—সৎস্বরূপ ব্রহ্ম) ঈক্ষণ করিলেন—তেজঃ, জল ও পৃথিবী—ভূতাত্মক এই দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে এই জীবাত্মারূপে আমি প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিব।"

"তখন সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম সঙ্কল্প করিলেন—'সেই তেজঃ, জল ও পৃথিবী—এই ভুতাত্মক দেবতাত্রয়ের প্রত্যেককে আমি ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (ত্র্যাত্মকত্র্যাত্মক) করিব।' এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি জীবাত্মারূপে উক্ত দেবতাত্রয়ের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ অভিব্যক্ত করিলেন। ছান্দোগ্য ॥৬।৩।৩॥"*

---

* **ত্রিবৃৎকরণ।** ছান্দোগ্য শ্রুতিতে তেজঃ, জল ও পৃথিবী—এই তিনটী মাত্র ভূতের উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে : কাজেই এস্থলে "ত্রিবৃৎকরণ" শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে। কিন্তু তৈত্তিরীয় শ্রুতিতে আকাশ এবং বায়ুরও উৎপত্তির কথা বলা হইয়াছে। সুতরাং "ত্রিবৃৎকরণ" শব্দে **"পঞ্চীকরণ"** বুঝিতে হইবে। সদানন্দ যতি পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন—"ত্রিবৃৎকরণশ্রুতেঃ পঞ্চীকরণস্যাপ্যুপলক্ষণার্থত্বাৎ—ত্রিবৃৎকরণশ্রুতিতে পঞ্চীকরণই উপলক্ষিত হইয়াছে।"

কিন্তু পঞ্চীকরণ ব্যাপারটী কি? বিদ্যারণ্যস্বামী লিখিয়াছেন—"দ্বিধা বিধায় চৈকৈকং চতুর্ধা প্রথমং পুনঃ। স্বস্বেতরদ্বিতীয়াংশৈর্যোজনাৎ পঞ্চ পঞ্চ তে ॥ —প্রথমে প্রত্যেক ভূতকে দুই খণ্ডে বিভক্ত করিয়া, পরে প্রত্যেক এক এক খণ্ডকে আবার চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া, ইহার এক এক ভাগকে আবার প্রথমোক্ত অপর ভূতের প্রত্যেক অর্দ্ধ খণ্ডের সহিত মিশ্রিত করিলেই পঞ্চীকৃত প্রত্যেক ভুতের মধ্যেই অন্যভূতচতুষ্টয় থাকে। যথা—

পঞ্চীকৃত তেজঃ = তেজঃ $\frac{১}{২}$ + জল $\frac{১}{৮}$ + পৃথিবী $\frac{১}{৮}$ + বায়ু $\frac{১}{৮}$ + আকাশ $\frac{১}{৮}$ = ১

,, জল = জল $\frac{১}{২}$ + পৃথিবী $\frac{১}{৮}$ + বায়ু $\frac{১}{৮}$ + আকাশ $\frac{১}{৮}$ + তেজঃ $\frac{১}{৮}$ = ১

,, পৃথিবী = পৃথিবী $\frac{১}{২}$ + বায়ু $\frac{১}{৮}$ + আকাশ $\frac{১}{৮}$ + তেজঃ $\frac{১}{৮}$ + জল $\frac{১}{৮}$ = ১

,, বায়ু = বায়ু $\frac{১}{২}$ + আকাশ $\frac{১}{৮}$ + তেজঃ $\frac{১}{৮}$ + জল $\frac{১}{৮}$ + পৃথিবী $\frac{১}{৮}$ = ১

,, আকাশ = আকাশ $\frac{১}{২}$ + তেজঃ $\frac{১}{৮}$ + জল $\frac{১}{৮}$ + পৃথিবী $\frac{১}{৮}$ + জল $\frac{১}{৮}$ = ১

বাচস্পতি মিশ্র কিন্তু ছান্দোগ্যের ত্রিবৃৎকরণই স্বীকার করেন। তাঁহার মতে—

ত্রিবৃৎকৃত তেজঃ = তেজঃ $\frac{১}{২}$ + জল $\frac{১}{৪}$ + পৃথিবী $\frac{১}{৪}$ = ১

,, জল = জল $\frac{১}{২}$ + পৃথিবী $\frac{১}{৪}$ + তেজঃ $\frac{১}{৪}$ = ১

,, পৃথিবী = পৃথিবী $\frac{১}{২}$ + তেজঃ $\frac{১}{৪}$ + জল $\frac{১}{৪}$ = ১

এ-স্থলেও ত্রিবৃৎকৃত প্রত্যেক ভূতের মধ্যেই অন্য দুইটী ভূত থাকে।

ইহার পরে আরুণি শ্বেতকেতুকে বলিলেন—"সেই ব্রহ্ম প্রত্যেক ভূতকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ করিলেন। ত্রিবৃৎকৃত হইয়াও প্রত্যেকটী ভূত কিরূপে এক একটী নামে পরিচিত হইয়া থাকে, তাহা বলিতেছি, শুন ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৩।৪॥"

"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছুক্লং তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্। ছান্দোগ্য ॥৬।৪।১॥

—অগ্নির যে লোহিত (লাল) রূপ দৃষ্ট হয়, তাহা তেজেরই রূপ ; যাহা শুক্ল, তাহা জলের রূপ, আর যাহা কৃষ্ণ, তাহা হইতেছে অন্নের (পৃথিবীর) রূপ। (এইরূপে) অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া গেল। 'বাচারম্ভণ বিকার নামধেয়' উক্ত তিনটী রূপ ইহাই সত্য।"

"যদাদিত্যস্য রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছুক্লং তদপাম্, যৎকৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাদাদিত্যত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণী রূপাণীত্যেব সত্যম্॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৪।২॥

—আদিত্যের যে লোহিতরূপ, তাহা তেজেরই রূপ ; যাহা শুক্ল, তাহা জলের রূপ ; যাহা কৃষ্ণ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর) রূপ। (এইরূপে) আদিত্যের আদিত্যত্ব চলিয়া গেল। 'বাচারম্ভণ বিকার নাম ধেয়' উক্ত তিনটী রূপ ইহাই সত্য।"

"যচ্চন্দ্রমসো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপম্; যচ্ছুক্লং তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাৎ চন্দ্রাচ্চন্দ্রত্বম্। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্ ত্রীণী রূপাণীত্যেব সত্যম্॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৪।৩॥

—চন্দ্রের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজেরই রূপ ; যাহা শুক্ল, তাহা জলের রূপ ; যাহা কৃষ্ণ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর) রূপ। (এইরূপে) চন্দ্রের চন্দ্রত্ব চলিয়া গেল। 'বাচারম্ভণ বিকার নামধেয়' উক্ত তিনটী রূপ ইহাই সত্য।"

"যদ্বিদ্যুতো রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছুক্লং তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য। অপাগাৎ বিদ্যুতো বিদ্যুত্ত্বম্। বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্ ত্রীণী রূপাণীত্যেব সত্যম্॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৪।৪॥

—বিদ্যুতের যে লোহিত রূপ, তাহা তেজেরই রূপ ; যাহা শুক্ল, তাহা জলের রূপ ; যাহা কৃষ্ণ, তাহা অন্নের (পৃথিবীর) রূপ। এইরূপে বিদ্যুতের বিদ্যুততা চলিয়া গেল। 'বাচারম্ভণ বিকার নামধেয়' উক্ত তিনটী রূপ ইহাই সত্য।"

উল্লিখিত উদাহরণত্রয়ে তেজের কথাই বলা হইয়াছে। অগ্নি-আদি তেজোময় পদার্থে কেবল তেজই নহে ; পরন্তু তেজঃ, জল ও পৃথিবী—এই তিনটীর সমবায়। যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে ত্রিবৃৎকৃত তেজঃ। ত্রিবৃৎকৃত জল এবং পৃথিবীর মধ্যেও এইরূপ তিনটীই আছে।

তেজঃ, জল ও পৃথিবী—ইহারা জীবদেহে প্রবিষ্ট হইয়া কিরূপে আবার ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ হইয়া থাকে, আরুণি উদ্দালক তাহাও শ্বেতকেতুর নিকটে বলিয়াছেন।

অন্ন ভুক্ত হইয়া তিন প্রকারে বিভক্ত হয়। স্থূলতম অংশ বিষ্ঠা হয়, মধ্যমাংশ মাংস হয় এবং সূক্ষ্মতম অংশ মনঃ হয়, অর্থাৎ মনোরূপে পরিণত হইয়া মনের উৎকর্ষ সাধন করে। ছান্দোগ্য ॥৬।৫।১॥

জল পীত হইয়াও তিন প্রকারে বিভক্ত হয় এবং সূক্ষ্মতম অংশ প্রাণরূপে পরিণত হয়। ছান্দোগ্য ॥ ৬।৫।২॥

ভূক্ত তেজও তিনরূপে বিভক্ত হয়। স্থূলতম অংশ অস্থি হয়, মধ্যমাংশ মজ্জা হয় এবং সূক্ষ্মতম অংশ বাক্ হয়। ছান্দোগ্য ॥৬।৫।৩॥

এইরূপে দেখা গেল—মনঃ হইতেছে অন্নময় (ভুক্ত অন্নদ্বারা পরিপুষ্ট), প্রাণ হইতেছে জলময় (পীত জলদ্বারা পরিপুষ্ট) এবং বাগিন্দ্রিয় হইতেছে তেজোময় (ভুক্ত তৈলঘৃতাদি তেজঃপদার্থ-দ্বারা পরিপুষ্ট)। ছান্দোগ্য ॥৬।৫।৪॥ পরবর্ত্তী ৬।৬।১—৫ এবং ৬॥৭।১—৬ বাক্যে এই বিষয়টীই আরও পরিস্ফুট করা হইয়াছে।

পরিশেষে আরুণি উদ্দালক শ্বেতকেতুকে বলিয়াছেন—জীবের দেহের মূল কারণ যেমন অন্ন, অন্নের মূল কারণ যেমন জল, জলের মূল কারণ যেমন তেজঃ, তেমনি তেজেরও মূল কারণ হইতেছেন সৎস্বরূপ ব্রহ্ম। এই সমস্ত জন্য-পদার্থই হইতেছে সন্মূলক (সৎস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন), সদায়তন (সৎস্বরূপ ব্রহ্মে অবস্থিত) এবং সৎপ্রতিষ্ঠ (প্রলয়কালেও সৎস্বরূপ ব্রহ্মেই লীন হয়)। "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৮।৪॥"

উদ্দালক আরও বলিয়াছেন—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যম্, স আত্মা ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।৮।৭।—এই সমস্ত জগৎই ঐতদাত্ম্য—সৎস্বরূপ ব্রহ্মাত্মক, সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম সত্য, তিনিই আত্মা।"

গ। উপসংহার

এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান কিরূপে হয়, অর্থাৎ এক ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হইলেই সমস্ত জগতের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে, তাহা বুঝাইবার জন্যই শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালক এত সব কথা বলিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতে তেজের উৎপত্তি, তেজঃ হইতে জলের এবং জল হইতে পৃথিবীর (অন্নের) উৎপত্তি। আবার ত্রিবৃৎকৃত হইয়া এই তিনটী পদার্থই সমস্ত জন্য-পদার্থের উৎপত্তির ও পরিপুষ্টির হেতু হইয়া থাকে, জীবাত্মরূপে ব্রহ্ম এই তিনটী পদার্থেই প্রবেশ করিয়া নামরূপের অভিব্যক্তি করেন। অন্তিমেও আবার সমস্তই ব্রহ্মে লীন হয়। তাই, এই সমস্ত জগৎই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু নহে। সুতরাং এক ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইলেই এই সমস্ত জগতের স্বরূপ অবগত হইয়া যায়।

মৃৎপিণ্ডের দৃষ্টান্তে তিনি বুঝাইয়াছেন—সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থ—ঘট-শরাবাদি—হইতেছে মৃত্তিকা দ্বারা নির্ম্মিত, মৃত্তিকাই তাহাদের উপাদান। সুতরাং এক মৃত্তিকার স্বরূপ অবগত হইলেই ঘট-শরাবাদি সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়া যায়। তদ্রূপ, এক ব্রহ্মের স্বরূপ অবগত হইলেও ব্রহ্ম হইতে জাত সমস্ত বস্তুর স্বরূপ অবগত হইয়া যায়।

প্রশ্ন হইতে পারে—মৃণ্ময় পদার্থের উপাদান হইতেছে মৃত্তিকা ; সুতরাং মৃত্তিকাকে জানিলে মৃণ্ময় পদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়া যায়। কিন্তু ব্রহ্মকে জানিলেই যে সমস্ত জগৎকে জানা যায়,

তাহা কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ? ব্রহ্ম কি জগতের উপাদান ? আরও এক কথা। কুম্ভকার দণ্ড-চক্রাদির সাহায্যে মৃত্তিকা হইতে ঘটাদি প্রস্তুত করে ; ঘটের নিমিত্ত-কারণ কুম্ভকার হইতে ঘটের উপাদান মৃত্তিকা হইতেছে ভিন্ন বস্তু। শ্রুতিতে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম তেজঃ আদির স্বষ্টি করিলেন ; সুতরাং তিনি স্বষ্টিকর্ত্তা বা নিমিত্ত-কারণ হইতে পারেন ; উপাদান-কারণ কিরূপ হইতে পারেন ?

উত্তর। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।২।১।"—এই শ্রুতিবাক্যেই উল্লিখিত প্রশ্নের উত্তর নিহিত রহিয়াছে। অগ্রে—স্বষ্টির পূর্ব্বে—এক এবং অদ্বিতীয় সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিলেন, এই জগৎও তখন সেই সৎই ছিল। তিনি একাকীই ছিলেন, দ্বিতীয় কোনও বস্তু ছিল না। এই অবস্থায় তিনি জগতের স্বষ্টি করিলেন। তাঁহার অতিরিক্ত দ্বিতীয় কোনও বস্তু যখন ছিলনা, অথচ তিনি যখন নাম-রূপবিশিষ্ট জগতের স্বষ্টি করিলেন, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—স্বষ্টিকর্ত্তা ব্রহ্ম নিজেই জগতের উপাদানও, তদতিরিক্ত কোনও উপাদান তিনি গ্রহণ করেন নাই। তদতিরিক্ত কিছু যখন ছিলই না, তখন তদতিরিক্ত উপাদান কোথা হইতেই বা গ্রহণ করিবেন ? শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শন পূর্ব্বক পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ (৩।৮—১০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

"সদেব সোম্যেদসগ্র আসীৎ"—এই বাক্যে বলা হইয়াছে, উৎপত্তির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল। ইহা হইতেও বুঝা যায়—জগতে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও পদার্থ নাই, সুতরাং জগতের উপাদানও ব্রহ্মই।

স্বষ্টিকর্ত্তা পরব্রহ্ম স্বয়ং অবিকৃত থাকিয়াই নিজেকে জগতের উপাদানরূপে পরিণত করেন (৩।২৫-২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি জগতের উপাদানকারণ বলিয়াই তাঁহার বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞান সম্ভব হইতে পারে।

শ্বেতকেতুর নিকটে উদ্দালকের পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যগুলি পরিণাম-বাদেরই সমর্থক।

ঘ। পরিণামের সত্যতা

আরুণি বলিয়াছেন—"একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ···মৃত্তিকা ইত্যেব সত্যম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।১।৪॥—একটী মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞানেই সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়···মৃত্তিকা ইহাই সত্য।"

ঘট-শরাবাদি সমস্ত মৃদ্‌বস্তুতেই মৃত্তিকা আছে। ঘটশরাবাদি ধ্বংস প্রাপ্ত হইলেও মৃত্তিকাতেই পর্য্যবসিত হয়। এজন্য বলা হইয়াছে—একটী মৃৎপিণ্ডের স্বরূপ অবগত হইলেই সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থের স্বরূপ অবগত হইয়া যায়।

ঘটের আকারাদি শরাবে নাই, শরাবের আকারাদিও ঘটে নাই ; অর্থাৎ ঘটে শরাবত্ব নাই, শরাবেও ঘটত্ব নাই। আকারাদির বৈশিষ্ট্যেই নামরূপের বৈশিষ্ট্য। মৃৎপিণ্ডেও ঘটত্ব-শরাবত্বাদি নাই। ঘটত্ব অবগত হইলেই শরাবত্ব অবগত হইয়া যায় না, মৃত্তিকার স্বরূপও

সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়া যায় না। কিন্তু মৃত্তিকার স্বরূপ অবগত হইলেই ঘটাদি সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুর উপাদানের স্বরূপ অবগত হইয়া যায়; যেহেতু, উপাদানরূপে মৃত্তিকা সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থেই বিদ্যমান।

ঘট-শরাবাদি যদি মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ বস্তু হইত, তাহা হইলে মৃত্তিকার জ্ঞানে ঘট-শরাবাদির জ্ঞান জন্মিত না। দুগ্ধের জ্ঞানে প্রস্তরাদির জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—মৃত্তিকা ইহাই সত্য, ইহার একটী তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থেই মৃত্তিকা বিদ্যমান। ইহার আর একটী তাৎপর্য্যও হইতে পারে। তাহা এই। মৃত্তিকা সত্য, অর্থাৎ অস্তিত্ব-বিশিষ্ট পদার্থ। যাহা মৃণ্ময়—মৃত্তিকাময়—তাহাও অস্তিত্ববিশিষ্ট-পদার্থময়, তাহার অনস্তিত্ব সম্ভব নয়। অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তু যাহার উপাদান, তাহা কখনও অস্তিত্বহীন হইতে পারে না, তাহা হইলে, অস্তিত্ব-বিশিষ্ট উপাদানেরই অনস্তিত্ব-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

এইরূপে দেখা গেল—"মৃত্তিকা ইহাই সত্য—মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"-বাক্যে ঘট-শরাবাদি মৃণ্ময় পদার্থের—মৃদ্বিকারের—অস্তিত্ব-বিশিষ্টতাই সূচিত হইয়াছে।

তদ্রূপ, **সত্যস্বরূপ ব্রহ্মরূপ কারণের পরিণাম জগতেরও অস্তিত্বই সূচিত হইতেছে।** ব্রহ্ম সত্যস্বরূপ, নিত্য অস্তিত্বময়; অস্তিত্ববিশিষ্ট ব্রহ্ম যাহার উপাদান, যাহা ব্রহ্মাত্মক, সেই জগৎও অস্তিত্ববিশিষ্টই হইবে; তাহা কখনও অস্তিত্বহীন—মিথ্যা হইতে পারে না। ব্রহ্মোপাদান জগতের অনস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মেরই অনস্তিত্ব-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

বস্তুতঃ, জগৎ যে সৎ-বস্তু, অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তু, তাহা শ্রুতিও বলিয়া গিয়াছেন—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ—এই জগৎ পূর্ব্বে সৎ-ই ছিল।" ইহা দ্বারা জানা গেল—সৃষ্টির পূর্ব্বে—নাম-রূপাদিতে অভিব্যক্তিলাভের পূর্ব্বেও—জগৎ সৎস্বরূপ ব্রহ্মে সৎ-রূপে—অস্তিত্ব-বিশিষ্টরূপেই—অবস্থিত ছিল। যাহার কোনও অস্তিত্বই নাই, কোনও বস্তুতে তাহার থাকা-নাথাকার প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

সৃষ্টির পরেও যে জগৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট, তাহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন। আরুণি শ্বেতকেতুর নিকটে বলিয়াছিলেন—কেহ কেহ বলেন যে, পূর্ব্বে এক অদ্বিতীয় অসৎই ছিলেন; সেই অসৎ হইতেই সৎস্বরূপ এই জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে। "তদ্ধৈক আহুরসদেবেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম, তস্মাদসতঃ সজ্জায়ত॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।২।১॥" এ-স্থলেও জগৎকে "সৎ—অস্তিত্ববিশিষ্ট" বলা হইয়াছে।

ইহার পরে আবার আরুণি বলিয়াছেন—অসৎ হইতে কিরূপে সৎ-এর উৎপত্তি হইতে পারে? অগ্রে এক অদ্বিতীয় সৎই ছিল। "কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।২।২॥"

এই বাক্যেও নাম-রূপে অভিব্যক্ত জগৎকে "সৎ—অস্তিত্ববিশিষ্ট" বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রুতির স্পষ্টোক্তি অনুসারে, সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগতের অস্তিত্ব ছিল, সৃষ্টির পরেও অস্তিত্ব আছে। পূর্ব্বের ও পরের পার্থক্য এই যে—সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল নাম-রূপাদিতে অনভিব্যক্ত, সূক্ষ্ম কারণাবস্থায়; আর, সৃষ্টির পরে জগৎ থাকে কার্য্যাবস্থায়, নাম-রূপাদিতে অভিব্যক্ত অবস্থায়। কারণের সত্যত্বে কার্য্যেরও সত্যত্ব।

কার্য্য হইতেছে কারণেরই রূপান্তর বা অবস্থান্তর। যেমন, উর্ণনাভিরূপ কারণের রূপান্তর হইতেছে তাহার তন্তু। তদ্রূপ ব্রহ্মকার্য্যরূপ জগৎও হইতেছে কারণরূপে অবিকৃত ব্রহ্মের রূপান্তর বা অবস্থান্তর। কারণ সত্য বলিয়া কার্য্যও সত্য বা অস্তিত্ববিশিষ্ট।

অবশ্য ব্রহ্মরূপ কারণের সত্যত্ব এবং জগৎ-রূপ ব্রহ্মকার্য্যের সত্যত্ব এতদুভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব আছে।

সৎ-শব্দ হইতে সত্যশব্দ নিষ্পন্ন। সৎ-শব্দে অস্তিত্ব বুঝায়। "সৎ = অস্ + শতৃক।" সুতরাং সমস্ত সত্য বস্তুতেই অস্তিত্ব হইতেছে সাধারণ। বস্তুর অবস্থার বৈশিষ্ট্য অনুসারে অস্তিত্বের অবস্থারও বৈশিষ্ট্য হইতে পারে।

ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্য বস্তু; তাঁহার অস্তিত্বও নিত্য। এই নিত্য অস্তিত্বময়, সর্ব্ব বিষয়ে নিত্য অস্তিত্বময়, বস্তু হইতেছেন ব্রহ্ম। তিনি সকল সময়ে একই রূপে বিরাজিত। তাঁহার সত্যত্বই মুখ্য সত্যত্ব। নিত্য অস্তিত্বময়ত্বই মুখ্য সত্যত্বের লক্ষণ।

আর জগৎ হইতেছে সৃষ্ট বস্তু; তাহার উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। সুতরাং জগৎ হইতেছে অনিত্য। তাহার অস্তিত্বও অনিত্য। কিন্তু উৎপত্তি ও বিনাশের মধ্যে নাম-রূপাদি-বিশিষ্টরূপেও যে জগতের অস্তিত্ব আছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং জগতের সত্যত্ব বলিতে অনিত্য অস্তিত্বই সূচিত হয়। সত্য-শব্দের মূল অর্থে যখন অস্তিত্ব বুঝায়, তখন এই অস্তিত্ব অনিত্য হইলেও সত্যই হইবে। ইহা হইতেছে সত্য-শব্দের গৌণ অর্থ—অনিত্য অস্তিত্ব-বিশিষ্ট।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকার্য্য জগৎ উভয়ই সত্য হইলেও ব্রহ্ম হইতেছেন মুখ্যার্থে সত্য, নিত্য অস্তিত্ব-বিশিষ্ট; আর ব্রহ্মকার্য্য জগৎ হইতেছে গৌণার্থে সত্য, অনিত্য অস্তিত্ব-বিশিষ্ট।

সুতরাং সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম হইতে উদ্ভূত বলিয়া **জগৎ ও সত্য, কিন্তু তাহা অনিত্য।** জগতের অস্তিত্ব আছে; তবে এই অস্তিত্ব অনিত্য। জগৎ মিথ্যা নহে—অর্থাৎ বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, অথচ অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রতীত হয়, জগৎ এইরূপ কোনও পদার্থ নহে। জগতের এইরূপ মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে জগৎ-কারণ ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। কেননা, এই জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক।

জগৎ মিথ্যা হইলে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হইতে পারে না।

সর্ব্ব-বিজ্ঞান বলিতে জগতের বিজ্ঞানই বুঝায়। জগৎ যদি মিথ্যা—বাস্তব অস্তিত্বহীনই—হয়, তাহা হইলে তাহার আবার বিজ্ঞান কি? যাহার কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নাই, তাহার সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের প্রশ্নও উঠিতে পারে না।

আবার, জগৎ যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে জগৎ হইবে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন-জাতীয় পদার্থ। কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন সত্য। সত্য এবং মিথ্যা—এক জাতীয় নহে। এক জাতীয় বস্তুর জ্ঞানে অপর জাতীয় বস্তুর জ্ঞান জন্মিতে পারে না। গো-জাতীয় বস্তুর জ্ঞানে বৃক্ষজাতীয় বস্তুর জ্ঞান জন্মিতে পারে না। সুতরাং জগৎ মিথ্যা হইলে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না।

শ্বেতকেতুর নিকটে আরুণি উদ্দালক "এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান"-প্রসঙ্গে যাহা বলিয়াছেন, তাহার ভিত্তি হইতেছে—কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব। কার্য্য-কারণের অনন্যত্ববশতঃই কারণরূপ ব্রহ্মের বিজ্ঞানে কার্য্যরূপ সর্ব্বজগতের বিজ্ঞান সম্ভবপর হয়। "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ॥ ২।১।১৫॥"-প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রেও ব্যাসদেব কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। ব্রহ্ম-কার্য্যরূপ জগৎ যদি মিথ্যা হয়, কার্য্য-কারণের অনন্যত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। কেননা, সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম এবং মিথ্যা জগৎ এই উভয়ের অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব) সম্ভব নহে। সত্য ও মিথ্যা কখনও অনন্য হইতে পারে না।

শ্বেতকেতুর নিকটে আরুণি সৎস্বরূপ ব্রহ্মকর্ত্তৃক তেজঃ, জল ও পৃথিবীর সৃষ্টির কথা বলিয়াছেন, তেজ-আদির ত্রিবৃৎকরণের কথাও বলিয়াছেন এবং সমস্ত জগতের সৃষ্টির কথাও বলিয়াছেন। "কথমসতঃ সজ্জায়েতেতি। সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্"-ইত্যাদি ছান্দোগ্য-(৬।২।২)-বাক্যে সৃষ্ট জগৎ যে "সৎ—অস্তিত্ববিশিষ্ট", তাহাও আরুণি বলিয়াছেন। এই অবস্থায় সৃষ্টিকে—সৃষ্ট জগৎকে মিথ্যা বলিতে গেলে ইহাও বলিতে হয় যে, শ্রুতির উক্তি উন্মত্ত-প্রলাপমাত্র। পরব্রহ্মের নিশ্বাসরূপা শ্রুতি কখনও উন্মত্ত-প্রলাপময়ী হইতে পারে না।

ঙ। রজ্জু-সর্প বা শুক্তি-রজত দৃষ্টান্তের অযৌক্তিকতা

যদি বলা যায়—রজ্জু-সর্পের, কিম্বা শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে সৃষ্টি-ব্যাপারের মীমাংসা হইতে পারে। উত্তরে বলা যায়—তাহা হইতে পারে না। ব্রহ্ম-কর্ত্তৃক জগতের সৃষ্টি-ব্যাপারে রজ্জু-সর্প বা শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের উপযোগিতা নাই। কেন না, দৃষ্টান্ত-দার্ষ্ট্যান্তিকের সামঞ্জস্য নাই। একথা বলার হেতু এই :—

প্রথমতঃ, শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টি করেন। কিন্তু রজ্জু সর্পের সৃষ্টি করে না, শুক্তিও রজতের সৃষ্টি করে না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতি বলেন, ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ। কিন্তু রজ্জু সর্পের উপাদান-কারণ নহে, শুক্তিও রজতের উপাদান-কারণ নহে।

সুতরাং দৃষ্টান্ত-দার্ষ্ট্যান্তিকের সামঞ্জস্য নাই।

আবার, রজ্জু-সর্পাদির দৃষ্টান্তে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইতে পারে না। কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বশতঃ ব্রহ্মরূপ কারণের বিজ্ঞানে জগৎ-রূপ কার্য্যের বিজ্ঞান জন্মিতে পারে। কিন্তু রজ্জুর জ্ঞানে সর্পের জ্ঞান জন্মিতে পারে না, শুক্তির জ্ঞানেও রজতের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। রজ্জুসম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিলে রজ্জুস্থলে সর্প-প্রতীতির মিথ্যা জ্ঞান দূরীভূত হইতে পারে বটে ; কিন্তু সর্পের স্বরূপের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। শুক্তি-রজত-সম্বন্ধেও সেই কথাই।

যদি বলা যায়—সর্পের অস্তিত্বই নাই। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার আবার স্বরূপই বা কি স্বরূপের জ্ঞানই বা কি ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার কোনও রূপ স্বরূপও থাকিতে পারে না—ইহা সত্য। কিন্তু সর্পের অস্তিত্বই নাই—ইহা স্বীকার করিলে রজ্জুতে সর্পভ্রমও জন্মিতে পারে না। কেন না, পূর্ব্বসংস্কার বশতঃই ভ্রম জন্মে। রজ্জু-স্থলে সর্পের অস্তিত্ব নাই বটে ; কিন্তু কোনও না কোনও স্থলে সর্পের অস্তিত্ব না থাকিলে, অন্যত্র কোথাও সর্প দর্শন না করিয়া থাকিলে, সর্পসম্বন্ধে কাহারও সংস্কার জন্মিতে পারে না। যিনি কখনও সর্প দেখেন নাই, কিম্বা সর্প সম্বন্ধে কিছু শুনেনও নাই, রজ্জুতে তাঁহার সর্পভ্রম হইতে পারে না—সংস্কারের অভাববশতঃ। সুতরাং রজ্জুস্থলে না হইলেও অন্যত্র সর্পের অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে ; নচেৎ রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তেরই সার্থকতা থাকে না।

ইহার উত্তরে যদি বলা যায়—সর্পের অস্তিত্ব কোথাও নাই। অনাদি সংস্কারবশতঃই রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়।

ইহার' উত্তরে বক্তব্য এই। যে অনাদি-সংস্কারের কথা শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয়, সেই অনাদি সংস্কার অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ; যেমন, জীবের অনাদি-কর্ম্ম-সংস্কার। কিন্তু শাস্ত্রে যে অনাদি-সংস্কারের কথা দৃষ্ট হয় না, তাহা স্বীকার করা যায় না ; যেহেতু, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। অনাদি-সংস্কার বশতঃই যে রজ্জুতে সর্পভ্রম হয়, শুক্তিতে রজত-ভ্রম হয়, কিম্বা ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হয়—তাহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ কোথায় ? শাস্ত্রীয় প্রমাণের অভাবে তাহা স্বীকার করা যায় না।

যাহা হউক, এক্ষণে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং"-বাক্যের তাৎপর্য্য কি, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

৩৭। 'বাচারম্ভণম্'-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের শ্রীপাদ রামানুজের কৃত অর্থ

"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৫॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-এই শ্রুতিবাক্যের যে ব্যাখ্যা করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।১।৪॥"

এই শ্রুতিবাক্যটীর ব্যাখায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন ঃ—

"যথা একমৃৎপিণ্ডারব্ধানাং ঘট-শরাবাদীনাং তস্মাদনতিরিক্তদ্রব্যতয়া তজ্জ্ঞানেন জ্ঞাততেত্যর্থঃ। অত্র কণাদবাদেন কারণাৎ কার্য্যস্য দ্রব্যান্তরত্বমাশঙ্ক্য লোকপ্রতীত্যৈব কারণাৎ কার্য্যস্য অনন্যত্বমুপপাদয়তি 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্' ইতি। আরভ্যতে—আলভ্যতে স্পৃশ্যত ইত্যারম্ভণং 'কৃত্যল্যুটো বহুলম্' ইতি কর্ম্মণি ল্যুট্। বাচা—বাক্পূর্ব্বকেণ ব্যবহারেণ হেতুনেত্যর্থঃ। 'ঘটেনোদকমাহর' ইত্যাদি-বাক্পূর্ব্বকো হ্যুদকাহরণাদিব্যবহারঃ; তস্য ব্যবহারস্য সিদ্ধয়ে তেনৈব মৃদ্দ্রব্যেণ পৃথুবুধ্নোদরাকারত্বাদিলক্ষণো বিকারঃ সংস্থানবিশেষঃ, তৎপ্রযুক্তং চ 'ঘট' ইত্যাদিনামধেয়ং স্পৃশ্যতে—উদকাহরণাদিব্যবহারবিশেষ-সিদ্ধ্যর্থং মৃদ্দ্রব্যমেব সংস্থানান্তরনামধেয়ান্তর-ভাগ্ ভবতি। অতো ঘটাদ্যপি মৃত্তিকেত্যেব সত্যং—মৃত্তিকাদ্রব্যমিত্যেব সত্যং প্রমাণেনোপলভ্যত ইত্যর্থঃ, ন তু দ্রব্যান্তরত্বেন। অতস্তস্যৈব মৃদ্ধিরণ্যাদেদ্র্ব্যস্য সংস্থানান্তরভাক্ত্বমাত্রেণৈব বুদ্ধিশব্দান্ত-রাদয় উপপদ্যন্তে; যথৈকস্যৈব দেবদত্তস্যাবস্থাবিশেষৈঃ বালো যুবা স্থবির ইতি বুদ্ধিশব্দান্তরাদয়ঃ কার্য্যবিশেষাশ্চ দৃশ্যন্তে।

—ঐ শ্রুতির অর্থ এই যে, একই মৃৎপিণ্ড হইতে সমুৎপন্ন ঘট-শরাবাদি পদার্থগুলি যেরূপ সেই মৃৎপিণ্ড হইতে অনতিরিক্ত বা অপৃথক্ বস্তু বলিয়া সেই মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই জ্ঞাত হয়, (ইহাও তদ্রূপ)। এ-বিষয়ে কণাদ-মতানুসারে কারণ হইতে কার্য্যের দ্রব্যান্তরত্ব আশঙ্কাপূর্ব্বক লোকপ্রতীতি অনুসারেই কারণ হইতে কার্য্যের অপৃথগ্ ভাব উপপাদন করিতেছেন। '(ঘটাদি) বিকারমাত্রই বাক্যারব্ধ নামমাত্র, মৃত্তিকাই(১) সত্য', এইবাক্যই 'আরম্ভণ'-শব্দের অর্থ—যাহা আরব্ধ হয়—অলম্ভন করা হয়, অর্থাৎ স্পৃষ্ট হয়, তাহাই 'আরম্ভণ'; 'কৃত্যপ্রত্যয় ও ল্যুট্ (যুট্ বা অনট্) প্রত্যয় বহুলার্থে হয়, অর্থাৎ সূত্রোল্লিখিত অর্থাতিরিক্ত অর্থেও হয়'-এই সূত্রানুসারে কর্ম্মবাচ্যে ল্যুট্ প্রত্যয় হইয়াছে। 'বাচা' অর্থ—বাক্যপূর্ব্বক ব্যবহারানুসারে(২) 'ঘট দ্বারা জল আনয়ন কর' ইত্যাদি শব্দোচ্চারণদ্বারাই জলাহরণাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হইয়া থাকে; সেই ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্যই সেই মৃত্তিকা পদার্থটী স্থূল ও গোলাকার উদরবিশিষ্ট বিকার—অর্থাৎ তাদৃশ আকৃতিবিশেষ এবং তদধীন 'ঘট' ইত্যাদি নাম স্পর্শ করে, অর্থাৎ জলাহরণাদিরূপ বিশেষ ব্যবহার সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকাদ্রব্যই অন্যপ্রকার আকৃতি ও অন্যবিধ নামভাগী হইয়া থাকে। অতএব, প্রকৃতপক্ষে ঘটাদিও মৃত্তিকা স্বরূপই বটে, এবং তাহাই সত্য, অর্থাৎ (ঘটাদিও) মৃত্তিকাদ্রব্যরূপেই সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতেছে, কিন্তু পৃথক্

---

(১) এ-স্থলে "মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্—মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্"-এই বাক্যের অনুবাদে লেখা হইয়াছে—"মৃত্তিকাই সত্য।" প্রকৃত অনুবাদ হইবে—"মৃত্তিকা ইহাই সত্য।",

(২) তাৎপর্য্য—লোকে কোনরূপ কার্য্য করিতে হইলেই পূর্ব্বে তদুপযোগী শব্দের উচ্চারণ করিয়া থাকে; শব্দব্যবহার ব্যতীত প্রায় কোন কার্য্যই নিষ্পন্ন হয় না; এই জন্য ভাষ্যকার লোকব্যবহারকে বাক্পূর্ব্বক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন (মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ)।

দ্রব্যরূপে নহে। অতএব, যেমন একই ব্যক্তিতে অবস্থা-বিশেষ অনুসারে 'বালক, যুবা, বৃদ্ধ' এইরূপ বিভিন্ন প্রকার বুদ্ধি ও শব্দের ব্যবহার-ভেদ দৃষ্ট হইয়া থাকে, তেমনি সেই একই মৃত্তিকা বা হিরণ্যাদি দ্রব্যের কেবল বিভিন্ন প্রকার আকৃতি-বিশেষের সম্বন্ধমাত্রেই প্রতীতি ও শব্দ-ব্যবহারাদির পার্থক্য ঘটিয়া থাকে (মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ)।"

উল্লিখিত ব্যাখ্যার **তাৎপর্য্য** হইতেছে এই। মৃৎপিণ্ডের পরিণাম বা বিকার ঘটাদিও মৃত্তিকা, ঘটাদিও মৃত্তিকাদ্রব্যই, অন্য কোনও দ্রব্য নহে—ইহাই সত্য, ইহাই প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয়। "অতো ঘটাদ্যপি মৃত্তিকেত্যেব সত্যং—মৃত্তিকা-দ্রব্যমিত্যেব সত্যং প্রমাণেন উপলভ্যত ইত্যর্থঃ, ন তু দ্রব্যান্তরত্বেন।" ইহাদ্বারা শ্রীপাদ রামানুজ দেখাইলেন যে, কারণরূপ মৃৎপিণ্ড এবং তাহার কার্য্যরূপ ঘটাদি—এই উভয়ই অনন্য। বস্তুতঃ আরুণি উদ্দালক কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব প্রতিপাদনের জন্যই মৃৎপিণ্ডাদির উদাহরণ অবতারিত করিয়াছেন। কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব প্রতিপাদিত হইলেই জগৎ-কারণ ব্রহ্মের এবং ব্রহ্ম-কার্য্য জগতের অনন্যত্ব প্রতিপাদিত হইতে পারে এবং তাহা প্রতিপাদিত হইলেই এক-বিজ্ঞানে সর্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে।

বিকার-বস্তুটী কি, তাহাই "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-বাক্যে বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজের মতে, "বাচা" এবং "আরম্ভণ" এই দুইটী শব্দের সন্ধিতেই "বাচারম্ভণ"-শব্দটী নিষ্পন্ন হইয়াছে ; বাচা + আরম্ভণ = বাচারম্ভণ। বাচ্-শব্দের তৃতীয়ায় "বাচা"—অর্থ, বাক্যদ্বারা, বাক্য-পূর্ব্বক, "বাচা বাক্পূর্ব্বকেন ব্যবহারেণ হেতুনেত্যর্থঃ।" আর, "আরম্ভণ"—আ + রভ্ + কর্ম্মণি ল্যুট্ বা অনট্ ; কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন ; অর্থ—যাহা আরম্ভ করা হয়, আরব্ধ। তিনি "বিকারঃ"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "সংস্থানবিশেষঃ—অবস্থা-বিশেষ।" মৃদ্বিকার হইতেছে মৃত্তিকার সংস্থানবিশেষ বা অবস্থা-বিশেষ। ঘট, শরাবাদি হইতেছে মৃত্তিকারই অবস্থাবিশেষ। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"—বাক্যপূর্ব্বক যাহার আরম্ভ করা হয়, বাক্যপূর্ব্বক যাহা আরব্ধ হয়।" কি রকম ? "জল আনয়নের জন্য ঘট প্রস্তুত কর বা করি"-ইত্যাদি বাক্যপূর্ব্বক বা সঙ্কল্পপূর্ব্বকই ঘটাদি প্রস্তুত করা হয় ; সুতরাং ঘটাদি মৃদ্বিকারের নির্ম্মাণ বাক্যপূর্ব্বকই আরম্ভ হয়। পরব্রহ্মও বাক্যপূর্ব্বক বা সঙ্কল্পপূর্ব্বকই জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন—"তদৈক্ষত, বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত (ছান্দোগ্য ॥ ৬।২।১॥), অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি (ছান্দোগ্য ৬।৩।২ ॥), অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।৩।৩।"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই ব্রহ্মকর্ত্তৃক সঙ্কল্পপূর্ব্বক বা বাক্য-পূর্ব্বক জগৎ-সৃষ্টির কথা জানা যায়। এজন্যই শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—বিকারের আরম্ভই হয় বাক্যপূর্ব্বক, আগে বাক্য বা সঙ্কল্প, তারপরে বিকার-কার্য্য।

শ্রীপাদ রামানুজ আরম্ভণ-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—স্পর্শ। ইহার সমর্থনে তিনি বলিয়াছেন—কৃত্যপ্রত্যয় ও লুট্ (যুট্ বা অনট্)-প্রত্যয় ব্যাকরণের সূত্রোল্লিখিত অর্থ ব্যতীত অন্য অর্থেও হয়। "কৃত্যলুটো বহুলম্ ইতি কর্ম্মণি ল্যুট্।" কর্ম্মবাচ্যে যখন "আরম্ভণ"-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে, তখন

স্পর্শ-অর্থে ইহার অর্থ হইবে—যাহা স্পৃষ্ট হয়। কাহা কর্তৃক স্পৃষ্ট হইবে? নামধেয় কর্তৃক বা বা নামকর্তৃক (নাম+স্বার্থে ধেয়ট্)। নামকর্তৃক স্পৃষ্ট হওয়া, আর নামকে স্পর্শ করা—একই কথা। এই সঙ্গে বাচা—বাক্যদ্বারা, বাক্যপূর্ব্বক ব্যবহারের দ্বারা—ইহার সঙ্গতি তিনি এইরূপে দেখাইয়াছেন। "বাচা—বাক্যপূর্ব্বক ব্যবহার অনুসারে, 'ঘটদ্বারা জল আনয়ন কর'—ইত্যাদি শব্দোচ্চারণদ্বারাই জলাহরণাদি ব্যবহার নিষ্পন্ন হয়। সেই ব্যবহার নিষ্পাদনের জন্যই সেই মৃত্তিকা-পদার্থটী স্থূল ও গোলাকার উদরবিশিষ্ট বিকার—অর্থাৎ তাদৃশ আকৃতিবিশেষ এবং তদধীন 'ঘট'-ইত্যাদি নামকে স্পর্শ করে; অর্থাৎ জলাহরণাদিরূপ বিশেষ ব্যবহার সম্পাদনের উদ্দেশ্যে মৃত্তিকাদ্রব্যই অন্যপ্রকার আকৃতি ধারণ করে এবং অন্যবিধ নামভাগী হইয়া থাকে।" তাৎপর্য্য এই—জল আনয়নাদির জন্য মৃত্তিকাকে যখন অবস্থান্তর প্রাপ্ত করান হয়, তখন ঘটাদি নাম সেই অবস্থান্তরকে স্পর্শকরে—অবস্থান্তরের বা মৃদ্বিকারের নাম তখনই অবস্থান্তর-ভেদে ঘটশরাবাদি হইয়া থাকে। এতাদৃশ মৃদ্বিকার ঘট-শরাবাদিও মৃত্তিকা—ইহাই সত্য, ইহাই প্রমাণের দ্বারা উপলব্ধ হয়।

তদ্রূপ, ব্রহ্ম যখন স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়েন (স্যমন্তক মণি যেমন স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া স্বর্ণরূপে অবস্থান্তর বা রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, অথবা উর্ণনাভি যেমন স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া তন্তুরূপে রূপান্তর প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ), তখনই তাঁহার এই রূপান্তরের নাম হয় জগৎ। এই জগৎও যে ব্রহ্ম, ব্রহ্ম হইতে অনন্য (অভিন্ন), ইহাই সত্য।

কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব প্রদর্শন-পক্ষেই মৃৎপিণ্ডের উদাহরণের সার্থকতা; অন্য কোনও বিষয়ে নহে।

যাহা হউক, বিকার যে মিথ্যা—শ্রীপাদ রামানুজের ব্যাখ্যা হইতে তাহা জানা যায় না। বরং কারণ সত্য বলিয়া কার্য্যও যে সত্য, তাহাই জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্ম সত্য বলিয়া ব্রহ্মকার্য্য জগৎও সত্য, জগৎ মিথ্যা নহে। সত্য—অস্তিত্ববিশিষ্ট—হইলেও বিকারের যখন উৎপত্তি-বিনাশ আছে, তখন তাহা যে অনিত্য, তাহাও বুঝা গেল।

এইরূপে দেখা গেল—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-বাক্যে জন্য-বস্তুর মিথ্যাত্বের কথা বলা হয় নাই, জন্যবস্তুর নাম-রূপাদি কিরূপে হয়, তাহাই বলা হইয়াছে।

৩৮। "বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের কৃত অর্থ

"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৭॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে গোবিন্দভাষ্যকার শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তাঁহার ব্যাখ্যাও শ্রীপাদ রামানুজের ব্যাখ্যার অনুরূপই। গোবিন্দভাষ্যকার লিখিয়াছেন :—

"একস্মাদেব মৃৎপিণ্ডোপাদানাজ্জাতং ঘটাদি সর্ব্বং তেনৈব বিজ্ঞাতেন বিজ্ঞাতং স্যাৎ, তস্য ততো নাতিরেকাৎ, এবমাদেশে ব্রহ্মণি সর্ব্বোপাদানে বিজ্ঞাতে তদুপাদেয়ং কৃৎস্নং জগৎ বিজ্ঞাতং ভবতীতি তত্রার্থঃ। নন্বু ধীশব্দাদি-ভেদাৎ উপাদেয়ম্ উপাদানাৎ অন্যৎ স্যাৎ-ইতি চেৎ, তত্রাহ। বাচারম্ভণমিতি। আরভ্যত ইতি আরম্ভণং কর্ম্মণি ল্যুট্। কৃত্যল্যুটো বহুলমিতি স্মরণাৎ। মৃৎপিণ্ডস্য কম্বুগ্রীবাদিরূপসংস্থানসম্বন্ধে সতি বিকার ইতি নামধেয়ম্ আরব্ধং ব্যবহর্ত্তৃভিঃ কিমর্থং তত্রাহ। বাচেতি। বাচা বাক্‌পূর্ব্বকেন ব্যবহারেণ হেতুনা। ফলহেতুত্ববিবক্ষয়া তৃতীয়া। ঘটেন জলমানয়েত্যাদি বাক্‌পূর্ব্বকব্যবহারসিদ্ধ্যর্থম্। মৃদ্‌দ্রব্যমেব জাতসংস্থানবিশেষং সৎ ঘটাদিনামভাক্ ভবতি। তস্য ঘটাদ্যবস্থস্যাপি মৃত্তিকা ইতি এব নামধেয়ং সত্যং প্রামাণিকম্। ততশ্চ ঘটাদ্যপি মৃদ্‌দ্রব্যম্ ইতি এব সত্যং ন তু দ্রব্যান্তরম্ ইতি। অতস্তস্যৈব মৃদ্‌দ্রব্যস্য সংস্থানান্তরযোগমাত্রেণ ধীশব্দান্তরাদি সংভবতি। যথা একস্য এব চৈত্রস্য অবস্থাবিশেষ-সম্বন্ধাৎ বালযুবাদিধীশব্দান্তরাদি সংভবতি। মৃদাদ্যুপাদানে তাদাত্ম্যেন সদেব ঘটাদি দণ্ডাদিনা নিমিত্তেন অভিব্যজ্যতে ন তু অসদুৎপদ্যত ইতি অভিন্নমেব উপাদেয়ম্ উপাদানাৎ। ভেদে কিল উন্মানদ্বৈগুণ্যাদ্যাপত্তিঃ। মৃৎপিণ্ডস্য গুরুত্বমেকম্, ঘটাদেশ্চ একমিতি তুলারোহে দ্বিগুণং তৎ স্যাৎ। এবমন্যচ্চ। ন তু শুক্তিরূপ্যাদিবৎ বিবর্ত্তঃ, ন চ শুক্তেঃ সকাশাৎ স্বতঃ অন্যত্র সিদ্ধং রূপ্যমিব ভিন্নম্ ইতি এবকারাৎ। এবমিতি-শব্দানর্থক্যং কষ্টকল্পনঞ্চ নিরস্তম্।

—এক মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলেই সেই মৃৎপিণ্ডরূপ উপাদান হইতে জাত ঘটাদি সমস্ত পদার্থই বিজ্ঞাত হয়; কেননা, ঘটাদিতে মৃৎপিণ্ড হইতে অতিরিক্ত কিছু নাই। এইরূপ দৃষ্টান্তে সমস্তের উপাদানভূত ব্রহ্মকে জানিলেই তাঁহা হইতে উৎপন্ন সমস্ত জগৎকে জানিতে পারা যায়। যদি বলা হয়—ধী-শব্দাদি-ভেদ বশতঃ উপাদেয় (উৎপন্ন দ্রব্য) উপাদান হইতে অন্য (ভিন্ন) বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—'বাচারম্ভণ'-ইত্যাদি। কর্ম্মবাচ্যে ল্যুট্-প্রত্যয়যোগে 'আরম্ভণ'-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে; তাহার অর্থ—যাহা আরব্ধ হইয়াছে। মৃৎপিণ্ড যখন কম্বুগ্রীবাদিরূপ সংস্থান প্রাপ্ত হয় (অর্থাৎ বিভিন্ন আকারে রূপান্তরিত হয়), তখনই তাহার বিকার-নাম আরব্ধ হয়। যাঁহারা ঘটাদি-মৃদ্‌বিকারের ব্যবহার করেন, তাঁহারাই বিকারের নাম আরম্ভ করেন—(এইটী ঘট, এইটী শরাব—ইত্যাদিরূপে)। কেন ব্যবহারকারীরা এইরূপ করেন? তাহা বলা হইতেছে—'বাচা'-এই বাক্যে। বাচা—বাক্‌পূর্ব্বক ব্যবহারের জন্য। এ-স্থলে ফলহেতুত্ব-বিবক্ষায় 'বাচ্'-শব্দে তৃতীয়া বিভক্তি হইয়াছে। কেন? 'ঘটের দ্বারা জল আন'-ইত্যাদি বাক্‌পূর্ব্বক ব্যবহার-সিদ্ধির জন্যই বিকারের নাম আরম্ভ হয়। মৃত্তিকারূপ দ্রব্যটীই সংস্থান-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া ঘটাদি নাম প্রাপ্ত হয়। এই রূপে ঘটাদি অবস্থায় নীত হইলেও, তাহার নাম সেই মৃত্তিকাই—ইহা সত্য, প্রামাণিক। আবার মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন ঘটাদিও যে মৃদ্‌দ্রব্য, অন্য পদার্থ নহে, ইহাও সত্য—প্রমাণসিদ্ধ। অতএব, সেই মৃত্তিকানামক

দ্রব্যটীরই সংস্থানান্তরভেদে (রূপান্তরভেদে) শব্দাদিভেদ (অর্থাৎ ঘটশরাবাদি নামভেদ) সংঘটিত হইয়া থাকে। যেমন, একই চৈত্রের (ব্যক্তিবিশেষের) অবস্থা-বিশেষের সম্বন্ধ বশতঃ বাল-যুবাদি ধী-শব্দভেদাদি হইয়া থাকে, তদ্রূপ। মৃত্তিকাদি উপাদানে তাদাত্ম্যক্রমেই দণ্ডাদি-নিমিত্তের সহায়তায় ঘটাদি অভিব্যক্তি লাভ করে; অসৎ হইতে উৎপন্ন হয় না। এইরূপে উপাদেয় (উৎপন্ন দ্রব্য) উপাদান হইতে অভিন্ন। উপাদান ও উপাদেয় ভিন্ন হইলে পরিমাণের দ্বৈগুণ্যাদি হইত। মৃৎপিণ্ডের গুরুত্ব এক, ঘটেরও গুরুত্ব এক—এইরূপে তুলারোহণে (ওজন করিলে) তাহা দ্বিগুণ হইয়া পড়িত (কিন্তু তাহা হয় না। যে মৃৎপিণ্ডটী দ্বারা ঘট প্রস্তুত হয়, তাহার যে ওজন, ঘটেরও সেই ওজনই)। ইহা (অর্থাৎ ঘটাদি মৃদ্বিকার) শুক্তি-রজতাদির ন্যায় বিবর্ত্তও নহে। শুক্তি হইতে রজত যেমন ভিন্ন পদার্থ, ঘটাদি মৃদ্বিকার মৃত্তিকা হইতে তদ্রূপ ভিন্ন পদার্থ নহে। ইহাই শ্রুতিবাক্যে কথিত "এব"-শব্দের তাৎপর্য্য। ইহাদ্বারা 'এব'-শব্দের কষ্টকল্পনা-প্রসূত অন্যরূপ অর্থও নিরস্ত হইল॥"

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-বাক্যসম্বন্ধে গোবিন্দভাষ্যকার যাহা বলিলেন, তাহার **তাৎপর্য্য** এইরূপ।

কথিত হইয়াছে—এক মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞানেই সমস্ত মৃণ্ময় দ্রব্যের বিজ্ঞান জন্মিতে পারে। তাহাতে কেহ আপত্তি করিয়া বলিতে পারেন—তাহা কিরূপে সম্ভব? মৃৎপিণ্ডের যে নাম, মৃদ্বিকারের সেই নাম নয়; ঘট, শরাবাদি নানাবিধ নামে মৃদ্বিকার পরিচিত। তাহাতে মনে হয়—ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকার হইতেছে মৃৎপিণ্ড হইতে ভিন্ন। ভিন্নই যদি হয়, তাহা হইলে এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে কিরূপে ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকারের জ্ঞান জন্মিতে পারে?

ভাষ্যকার বলিতেছেন—"বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি বাক্যেই শ্রুতি এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন। বিভিন্ন মৃদ্বিকারের ঘট-শরাবাদি নাম ভিন্ন ভিন্ন বটে, এবং এই সমস্ত নাম যে মৃৎপিণ্ডের নাম হইতেও ভিন্ন, তাহাও সত্য। তথাপি ঘট-শরাবাদি কিন্তু মৃৎপিণ্ড হইতে ভিন্ন নহে; কেন না মৃৎপিণ্ড হইতেই ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকারের উৎপত্তি, মৃৎপিণ্ডে যেই মৃত্তিকা আছে, ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকারেও সেই মৃত্তিকাই বিদ্যমান। এই মৃত্তিকা মৃৎপিণ্ডে যেই অবস্থায় থাকে, ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকারে তাহা অপেক্ষা ভিন্ন অবস্থায় বা ভিন্ন আকারাদিতে থাকে; এইটুকুমাত্রই পার্থক্য। প্রকৃতপক্ষে সর্ব্বত্র এক মৃত্তিকাই, ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকারে মৃত্তিকা ভিন্ন অন্য কোনও দ্রব্য নাই। এজন্যই এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই সমস্ত মৃদ্বিকারের জ্ঞান জন্মিতে পারে। মৃদ্বিকারের যে ভিন্ন ভিন্ন নাম, তাহার হেতু এই। ব্যবহারের সুবিধার জন্যই ভিন্ন ভিন্ন নাম প্রযুক্ত হয়। সেই ভিন্ন ভিন্ন নামও আবার প্রযুক্ত হয়—বিকারের অর্থাৎ বিকারভূত দ্রব্যের উৎপত্তির পরে। ব্যবহারের সুবিধার জন্য ভিন্ন ভিন্ন নাম কেন? নামে ব্যবহারের কি সুবিধা হইতে পারে? তাহার উত্তর এই। বিভিন্ন প্রয়োজন সিদ্ধির জন্য মৃত্তিকাদ্বারা বিভিন্ন দ্রব্য প্রস্তুত করা হয়—কোনটী করা হয় জল আনার জন্য, কোনটী করা হয়

রান্না করার জন্য, কোনটী করা হয় অন্নাদি রাখার জন্য-ইত্যাদি। জল আনিতে হইলে কোন্‌টী নিলে সুবিধা হইবে, রান্না করিতে হইলে কোন্‌টী নিলে সুবিধা হইবে, অন্ন রাখার জন্য কোন্‌টী নিলে সুবিধা হইবে—তাহাও জানা দরকার। এই দ্রব্যগুলির যদি ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হয়, তাহা হইলেই ব্যবহারের পক্ষে সুবিধা হইতে পারে। জল আনার জন্য যে দ্রব্যটী প্রস্তুত হইয়াছে, তাহার নাম যদি "ঘট" রাখা হয়, তাহা হইলেই বলা চলে—"ঘট নিয়া জল আন।" এইরূপই ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখার প্রয়োজনীয়তা, এবং এইরূপ নাম রাখিলেই ব্যবহারের পক্ষে সুবিধা হয়। কিন্তু ভিন্ন নামে অভিহিত হইলেও সমস্ত মৃদ্বিকার মৃত্তিকাই—অপর কিছু নহে।

এইরূপই হইতেছে—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্‌"- বাক্যের তাৎপর্য্য—বিকার নামটী ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক বাক্যের দ্বারা আরব্ধ হয়। সমস্তই বিকার—ঘটও বিকার, শরাবাদিও বিকার। ব্যবহারের সুবিধার জন্য ব্যবহারের পূর্ব্বেই তাহাদের ভিন্ন ভিন্ন নাম রাখা হয়। "বাচা"—বাক্যদ্বারা, ব্যবহারের পক্ষে সুবিধাজনক বাক্যদ্বারা বা শব্দদ্বারা, "আরম্ভণম্‌"—আরব্ধ হয় যাহা (আরম্ভণ হইতেছে কর্ম্মবাচ্যে নিষ্পন্ন শব্দ), তাহাই "বিকারো নামধেয়ম্‌"-বিকারনামক বস্তু। আরব্ধ বাক্যই হইতেছে বিকারের নাম।

বিকার যে মিথ্যা বা বাস্তব অস্তিত্বহীন, উল্লিখিতরূপ অর্থ হইতে তাহা বুঝা যায় না। বরং মৃত্তিকা সত্য বলিয়া মৃণ্ময় দ্রব্যও যে মৃত্তিকাময় বলিয়া সত্য—অস্তিত্ব-বিশিষ্ট—তাহাই জানা গেল। ইহা যে শুক্তি-রজতের ন্যায় বিবর্ত্ত নহে, তাহাও শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ দেখাইয়াছেন।

ব্যবহারের সুবিধার জন্য মৃণ্ময় দ্রব্যসমূহ বিভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও এবং এই সকল বিভিন্ন নাম মৃৎপিণ্ডের নাম হইতে ভিন্ন হইলেও মৃণ্ময় দ্রব্যসমূহও মৃত্তিকাই, মৃত্তিকাব্যতীত অন্য কিছু নহে। এজন্য এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানেই সমস্ত মৃণ্ময় দ্রব্যের জ্ঞান—এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান—সম্ভব-পর হইতে পারে।

৩৯। "বাচারম্ভণম্‌"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর কৃত অর্থ

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার পরমাত্ম-সন্দর্ভীয়-সর্ব্বসম্বাদিনীতে (বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ-সংস্করণ, ১৪৪ পৃষ্ঠায়) আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটীর ব্যাখ্যা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"অত্র পরিণামবাদে সোপপত্তিকা চ শ্রুতিরবলোক্যতে—

'বাচারম্ভণং বিকারো নাম ধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্‌॥' ইতি।

অয়মর্থঃ—বাচয়া বাচা আরম্ভণম্‌ আরম্ভো যস্য তৎ। বাচয়া আরভ্যতে যৎ তৎ ইতি বা। যৎ কিঞ্চিৎ বাচারম্ভণম্‌ বাচ্যম্‌ তৎ সর্ব্বম্‌ এব, দণ্ডাদীনাম্‌ অপি অন্যত্র সিদ্ধত্বাৎ।

'বিকারো নামধেয়ম্‌' বিকার এব নামৈব নামধেয়ং স্বার্থে ধেয়ট্‌। স চ ঘটাদিঃ

'বিকারঃ মৃত্তিকা এব। মৃত্তিকাদিকম্ এব দণ্ডাদিনা নিমিত্তেন আবির্ভূতাকারবিশেষং ঘটাদিব্যবহারম্ আপদ্যত ইতি। ততো ন পৃথগিত্যর্থঃ। ইত্যেব সত্যমিতি। ন তু শুক্তিরজতাদিবদ্ বিবর্ত্তঃ। ন তু বা শুক্তেঃ সকাশাৎ স্বতোঽন্যত্র সিদ্ধং রজতমিব ভিন্নমিত্যর্থঃ। বাক্যান্তাপদিষ্টস্য ইতি-শব্দস্য সমুদায়ান্বয়িত্বাৎ, কথমসতঃ সজ্জায়েতেত্যাদিবৎ। অত্রাপি শ্রুত্যৈবেতরমতাক্ষেপঃ। তদেবম্ 'ইতি'-শব্দস্যাপি সার্থকতা। ন তু মৃত্তিকৈব তু সত্যমিতি ব্যাখ্যানম্, নহ্যত্র বিকারত্বে কারণাভিন্নত্বে চ বিধেয়ে বাক্যভেদঃ।

প্রথমস্য অনুবাদেন দ্বিতীয়স্য বিধানাৎ ততশ্চ অনুবাদেনাপি সিদ্ধবিধেয়ত্বাবধারণাৎ উভয়ত্র মুখ্যৈব প্রতিপত্তিরিতি। অত্র মৃত্তিকাশব্দেন ইদং লভ্যতে—যথা সর্ব্বতোঽপি কার্য্যকারণ-পরম্পরাতোঽর্বাক্ চেতনসর্ব্বোপলভ্যমানত্বস্য মৃণ্ময়স্য তদ্বিকারমেব প্রত্যক্ষীক্রিয়তে—ন তু তদ্বিবর্ত্তত্বম্, তথা তৎপ্রাক্সৃষ্টানাং মৃদাদিবস্তূনামনুমেয়ম্।

ইত্থমেবোক্তমেতৎপ্রকারকারকমেব সত্যমিতি।

অত্র বিকারাদিশব্দস্য সাক্ষাদেবাবস্থিতত্বাৎ বিবর্ত্তে তাৎপর্য্যব্যাখ্যানং কষ্টমেবেত্যপ্যনুসন্ধেয়ম্। তদেব সূক্ষ্মচিদচিদ্বস্তুরূপ-শুদ্ধজীবাব্যক্তশক্তেরেব তস্য কারণত্বাদিত্যেতদযুক্তম্।

যতঃ 'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ (ছান্দোগ্য ॥৬।২।১) ইত্যত্রাপি ইদমা তত্তচ্ছক্তিমত্ত্বং স্পষ্টম্ প্রাগপ্যস্তিত্বেন নির্দ্দিষ্টং কারণত্বং সাধয়িতুম্।"

এক্ষণে **শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ব্যাখ্যার তাৎপর্য্য** প্রকাশ করা হইতেছে (শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয় কৃত অনুবাদের অনুসরণে)।

"পরিণামবাদে উপপত্তির সহিত শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। যথা,

'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্।'

এই শ্রুতিবাক্যের অর্থ এইরূপ। বাক্যদ্বারা আরম্ভ যাহার, তাহাই বাচারম্ভণ *। অথবা, যাহা বাক্যদ্বারা আরব্ধ হয়, তাহাই বাচারম্ভণ। যাহা কিছু বাচারম্ভণ, তৎসমস্তই এ-স্থলে বাচ্য। দণ্ডাদি অন্যত্র সিদ্ধ (অর্থাৎ মৃণ্ময় দ্রব্য নির্ম্মাণ-কালে যে দণ্ড-চক্রাদির ব্যবহার করা হয়, সেই দণ্ড-চক্রাদি মৃদ্বিকার নহে ; সে সমস্ত অন্যত্র সিদ্ধ হয়)।

---

* একই অর্থবাচক দুইটী শব্দ আছে—"বাচ্" এবং "বাচা"। উভয়ের অর্থই বাক্য। "বাচ্"-শব্দের তৃতীয়ায় হয় "বাচা" ; আর "বাচা"-শব্দের তৃতীয়ায় হয়—"বাচয়া"। শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ বলদেব "বাচ্"-শব্দ গ্রহণ করিয়া এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামী "বাচা"-শব্দ গ্রহণ করিয়া অর্থ করিয়াছেন। আবার, রামানুজ ও বলদেব তৃতীয়া বিভক্তিযুক্ত "বাচা"-শব্দের সহিত "আরম্ভণ" শব্দের সন্ধি করিয়া "বাচারম্ভণ" শব্দের অর্থ করিয়াছেন—বাচা+আরম্ভণম্=বাচারম্ভণম্। কিন্তু শ্রীজীব এই শব্দটীকে বহুব্রীহি-সমাসসিদ্ধরূপে গ্রহণ করিয়াছেন—"বাচয়া আরম্ভণং যস্য—বাক্যের দ্বারা আরম্ভ হয় যাহার"—তাহাই "বাচারম্ভণম্—বাচারম্ভণ।", অথবা (তিনি অন্যরূপ অর্থও করিয়াছেন), "বাচয়া আরভ্যতে যৎ তৎ—বাক্যদ্বারা যাহা আরব্ধ হয়, তাহা।" সন্ধি-বদ্ধই হউক, কি সমাস-বদ্ধই হউক, তাৎপর্য্য একই।

'বিকারো নামধেয়ম্'—বিকারই নাম। নামধেয় অর্থ—নাম। নাম-শব্দের উত্তর স্বার্থে ধেয়ট্-প্রত্যয় করিয়া নামধেয় পদ সাধিত হইয়াছে। নাম ও নামধেয়—এই তুইটী শব্দের অর্থ একই। "নামধেয়" না বলিয়া "নাম" বলিলেও চলিত। সেই ঘটাদি মৃদ্বিকার মৃত্তিকাই, মৃত্তিকা-ব্যতীত অপর কিছু নহে। মৃত্তিকাদিই দণ্ডাদি-নিমিত্ত-কারণের সহায়তায় আকারবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া ঘটাদি ব্যবহার প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ ঘটাদি নামে ও রূপে ব্যবহৃত হয়। সুতরাং ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন বস্তু নহে—ইহাই সত্য। কিন্তু ইহা শুক্তি-রজতবৎ বিবর্ত্ত নহে, (অর্থাৎ শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রম হয়, তদ্রূপ মৃত্তিকাতে ঘটাদির ভ্রম হইতেছে—এইরূপ নহে, ঘটাদির জ্ঞান ভ্রান্তি মাত্র নহে)। কেননা, রজত শুক্তি হইতে উদ্ভূত নহে ; লৌকিক জগতে রজত স্বতঃসিদ্ধ, অন্যত্র থাকে ; সুতরাং রজত হইতেছে শুক্তি হইতে ভিন্ন বস্তু। কিন্তু ঘটাদি তদ্রূপ নহে ; মৃত্তিকা হইতেই ঘটাদির উৎপত্তি ; মৃত্তিকাব্যতিরেকে ঘটাদির উৎপত্তি হইতে পারে না ; ঘটাদি মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন নহে। এজন্য ঘটাদিকে মৃত্তিকার বিবর্ত্ত বলা যায় না (কেননা, রজ্জুতে সর্পের বিবর্ত্ত—ভ্রমজ্ঞান,—সেই সর্প রজ্জু হইতে ভিন্ন, রজ্জু হইতে তাহার উৎপত্তি নহে। ঘট কিন্তু মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন এবং মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন)। এইরূপ বলার হেতু এই যে, 'অসৎ হইতে কি প্রকারে সৎ-পদার্থের উৎপত্তি হইতে পারে'-এই বাক্যের ন্যায় উদ্ধৃত ছান্দোগ্য-বাক্যের শেষভাগে যে 'ইতি'-শব্দ আছে, সমস্তের সহিতই সেই 'ইতি'-শব্দের অন্বয় আছে। এ-স্থলে শ্রুতিবাক্যদ্বারাই অন্যমত (বিবর্ত্তবাদ) খণ্ডিত হইয়াছে (কেননা, শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে, সৎব্রহ্ম হইতেই সৎ-পদার্থের—জগতের—উৎপত্তি হইয়াছে ; সুতরাং জগৎ যে সৎ—অস্তিত্ববিশিষ্ট, রজ্জুতে সর্পের, বা শুক্তিতে রজতের জ্ঞানের ন্যায় মিথ্যা নহে—তাহাই বলা হইল। আবার, শ্রুতি বলিয়াছেন, সৎ-ব্রহ্ম হইতে জগতের উৎপত্তি, ; কিন্তু রজ্জু হইতে সর্পের, বা শুক্তি হইতে রজতের উৎপত্তি নহে। দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের অসামঞ্জস্য)। মূলশ্রুতিতে 'ইতি'-শব্দ প্রয়োগেরও এইরূপেই সার্থকতা। কিন্তু' মৃত্তিকাই সত্য' এইরূপ ব্যাখ্যা যুক্তিসঙ্গত নহে (কেননা, মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্'—মৃত্তিকা ইহাই সত্য—এইরূপ বলায় বিকারের সত্যত্বই খ্যাপিত হইয়াছে ; মৃত্তিকাকে সত্য বলায়, বিকারও যখন মৃত্তিকাই, মৃত্তিকা-ব্যতিরিক্ত অন্য কিছু নহে, তখন বিকারের সত্যত্বই খ্যাপিত হইয়াছে। কেবল মাত্র কারণরূপ মৃত্তিকাই সত্য, কার্য্যরূপ বিকার সত্য নহে—এইরূপ ব্যাখ্যা সঙ্গত হইতে পারে না)। এ-স্থলে (যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন-ইত্যাদি বাক্যে বিকারত্ব ও কারণাভিন্নত্ব-এই তুইটী বাক্যস্থ আছে বলিয়া বাক্যভেদ হয় নাই—অর্থাৎ একাধিক প্রসঙ্গময় একাধিক বাক্য বলা হয় নাই। কিরূপে বাক্যভেদ হয় নাই, তাহাই দেখান হইতেছে)।

(পূর্ব্বোল্লিখিত বিকারত্ব ও কারণাভিন্নত্ব—এই তুইটীর মধ্যে) প্রথমটীর (অর্থাৎ বিকারত্বের) অনুবাদের দ্বারা (অর্থাৎ ব্যাখ্যানের দ্বারা) দ্বিতয়টীর (অর্থাৎ কারণাভিন্নত্বের) বিধান করা (প্রদর্শন করা) হইয়াছে বলিয়া এবং তৎপর সেই অনুবাদের (ব্যাখ্যানের) দ্বারাও সিদ্ধবিধেয়ত্ব (সিদ্ধ—

পূর্ব্বজ্ঞাত মৃত্তিকা এবং বিকারের কারণাভিন্নত্ব) অবধারিত হইয়াছে বলিয়া উভয়স্থলেই যে মুখ্যা অর্থ-প্রতিপত্তি, তাহাই বুঝিতে হইবে। (তাৎপর্য্য বোধহয় এইরূপ। 'বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্'-এই বাক্যে বিকারের অনুবাদ বা ব্যাখ্যা করা হইয়াছে ; বিকার কি, —ঘটাদি মৃত্তিকার যে মৃত্তিকারই ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত অবস্থা-বিশেষ বা রূপান্তর-বিশেষ, মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন কোনও পদার্থ নহে, তাহা বুঝাইয়া দেওয়া হইয়াছে এবং এইরূপ ব্যাখ্যানের দ্বারাই কারণাভিন্নত্ব—মৃত্তিকার কার্য্য ঘটাদি বিকার যে কারণ-মৃত্তিকা হইতে অভিন্ন, তাহা—প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং মৃত্তিকার সত্যত্ব যেমন মুখ্য, বিকারের সত্যত্বও তেমনি মুখ্য। এইরূপে দেখা গেল—একাধিক প্রসঙ্গ উত্থাপিত হয় নাই, সুতরাং বাক্যভেদও হয় নাই)। এ-স্থলে 'মৃত্তিকা'-শব্দদ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে—সর্ব্বতোভাবে কার্য্য-কারণ-পরম্পরা অবগত হওয়ার পরে, চেতন-সকলেই উপলব্ধি করিতে পারে যে, মৃণ্ময় দ্রব্য —মৃত্তিকার বিকারই, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; কিন্তু এই বিকারসমূহ মৃত্তিকার বিবর্ত্ত নহে, ভ্রান্তি মাত্র নহে। তদ্রূপ, পূর্ব্বসৃষ্ট মৃত্তিকাদির সত্যত্বও অনুমেয়, অর্থাৎ তাহারাও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত নহে, প্রত্যক্ষসিদ্ধ বস্তু, ভ্রান্তিমাত্র নহে।

এইরূপেই বলা হয়—এতৎপ্রকারই সত্য।

এ-স্থলে 'বিকার'-শব্দের স্পষ্ট উক্তি আছে বলিয়া 'বিবর্ত্তে' তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যান কষ্টকল্পনামাত্রই বুঝিতে হইবে (কেননা, বিকার এবং বিবর্ত্ত এক জিনিস নহে। 'বিকার' হইতেছে কোনও বস্তুর অন্যরূপে অবস্থান ; আর, 'বিবর্ত্ত' হইতেছে ভ্রান্তি, যেমন রজ্জুতে সর্পের ভ্রম, রজ্জু হইতে সর্ব্বতোভাবে পৃথক্ বস্তু যে সর্প, তাহার অস্তিত্বের ভ্রম)। বিকারকে বিবর্ত্ত বলিলে কষ্টকল্পনা মাত্র হয় —ইহা কেন বলা হইল, তাহার হেতু এই যে, বিকাররূপ জগৎ হইতেছে সূক্ষ্ম-চিদচিদ্‌বস্তুরূপ অব্যক্ত শক্তি-বিশিষ্ট এবং অব্যক্ত শুদ্ধজীবশক্তি-বিশিষ্ট সৎ-ব্রহ্মরূপ কারণের কার্য্য (ব্রহ্মের চিৎ-শক্তির প্রভাবে অচিৎ-শক্তি বা জড়রূপা প্রকৃতিই দৃশ্যমান জগৎ-রূপে অভিব্যক্ত হয়, কর্ম্মফল-সমন্বিত জীবও তাহাতে থাকে। মহাপ্রলয়ে ব্যক্ত জীব-জগৎ সূক্ষ্মরূপে—অব্যক্তরূপে ব্রহ্মে লীন থাকে। সুতরাং তখন কারণাবস্থ ব্রহ্মের মধ্যে অচিৎশক্তি বা জড়রূপা প্রকৃতি, চিচ্ছক্তির যে অংশ প্রকৃতির বিকৃতি সাধন করে, সেই অংশ এবং ব্রহ্মের শুদ্ধ জীবশক্তির অংশ জীব—এই সমস্তই ব্রহ্মের মধ্যে অব্যক্ত—অনভিব্যক্ত—রূপে অবস্থান করে। এতাদৃশ অব্যক্ত-শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্ম হইতেই জীব-জগতের অভিব্যক্তি বা উৎপত্তি। সুতরাং জীব-জগতের কারণ আছে এবং কারণ আছে বলিয়া তাহা বিবর্ত্ত হইতে পারে না। বিবর্ত্তের পক্ষে এতাদৃশ কোনও কারণ নাই ; রজ্জু সর্পের কারণ নহে ; কেন না, ব্রহ্ম হইতে যেমন জগতের উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ রজ্জু হইতে সর্পের উৎপত্তি হয় না)। কারণাবস্থ ব্রহ্ম যে এতাদৃশ অব্যক্ত-শক্তিবিশিষ্ট, শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়)।

'সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ—এই জগৎ পূর্ব্বে সৎই—সৎ—ব্রহ্মই ছিল'-এই শ্রুতিবাক্যে যে 'ইদম্'-শব্দ আছে, তাহা হইতেই কারণরূপ সৎ-ব্রহ্মের অব্যক্তশক্তিমত্তা স্পষ্টভাবে প্রতিপন্ন হইতেছে

(এ-স্থলে 'ইদম্'-শব্দে দৃশ্যমান বিশ্বকে—জীব-জগৎকে– বুঝাইতেছে। এই বিশ্ব হইতেছে ব্যক্ত-চিদচিৎশক্তি বিশিষ্ট এবং ব্যক্তজীবশক্তিবিশিষ্ট। মহাপ্রলয়ে, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে, এই বিশ্ব যখন সূক্ষ্ম রূপে—অনভিব্যক্তরূপে—সৎ-ব্রহ্মেই অবস্থান করে, তখন তৎকালীন ব্রহ্মও যে অব্যক্ত চিদচিজ্জীব-শক্তিবিশিষ্ট, তাহাও সহজেই বুঝা যায়)। বিশ্বসৃষ্টির পূর্ব্বেও এই চিদচিজ্জীব-শক্তি-বিশিষ্ট সদ্ব্রহ্ম-স্বরূপ ছিল—এইরূপ পূর্ব্বাস্তিত্বের উক্তিতেই নির্দ্দিষ্ট কারণত্ব প্রতিপন্ন হইতেছে (অর্থাৎ সৎ-ব্রহ্মই যে জগতের কারণ, তাহা প্রতিপন্ন হইতেছে ; কেন না, সৃষ্টির পূর্ব্বেও সৎ-ব্রহ্মস্বরূপে জগতের অস্তিত্ব ছিল বলিয়া শ্রুতি বলিতেছেন)।

উপসংহার

এইরূপে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ব্যাখ্যা হইতে—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-এই ব্যক্যটীর তাৎপর্য্য যাহা জানা গেল, তাহা হইতেছে এই—বিকার-নামক দ্রব্যটী হইতেছে বাক্যদ্বারা আরব্ধ। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ ইহার যে তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা শ্রীজীবগোস্বামীর ব্যাখ্যার অনুযায়ী বলিয়াই মনে হয়। সেই তাৎপর্য্য তৎকৃত ব্যাখ্যার প্রসঙ্গেই প্রকাশ করা হইয়াছে। শ্রীজীব বলেন –"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-বাক্যে "বিকারের" পরিচয় দেওয়া হইয়াছে এবং "মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্"-বাক্যে বলা হইয়াছে যে, "বিকারও মৃত্তিকাই—ইহাই সত্য।" সুতরাং মৃত্তিকা যেরূপ সত্য, মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদিও তদ্রূপ সত্য। ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকার মৃত্তিকার বিবর্ত্ত নহে।

বহু শ্রুতিবাক্য এবং ব্রহ্মসূত্র-বাক্যের আলোচনা করিয়া এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (১৪৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—

"তস্মাৎ কার্য্যস্যাপি সত্যত্বং ন তু মিথ্যাত্বম্—অতএব (কারণের ন্যায়) কার্য্যেরও সত্যত্ব উপপন্ন হয়, কিন্তু মিথ্যাত্ব উপপন্ন হয় না।"

ইহার পরে একটী পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়াও শ্রীজীবপাদ তাহার উত্তর দিয়াছেন।

"নন্নু, 'তৎ সত্যং স আত্মা (ছান্দোগ্য ॥ ৬।৮।৭)"-ইতি কারণস্য সত্যত্বাবধারণাৎ বিকারজাতস্যাসত্যত্বমুক্তম্? ন, অবধারকপদাভাবাৎ। প্রত্যুত তস্যৈকস্য সত্যত্বমুক্ত্বা তদুত্থস্য সর্ব্বস্যৈব সত্যত্বমুপদিশ্যতে। রজতং ন শুক্ত্যুত্থং কিন্তু তস্মিন্নধ্যস্তমেব।

—যদি বলা যায়, 'তাহা (জগৎকারণ ব্রহ্ম) সত্য, তিনি আত্মা' এই ছান্দোগ্য-বাক্যে জগৎ-কারণ ব্রহ্মের সত্যত্ব অবধারিত হইয়াছে বলিয়া বিকার-সমূহের অসত্যত্বই কথিত হইয়াছে। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—না, তাহা নয় ; যেহেতু, অবধারকপদের অভাব (অর্থাৎ কারণরূপ ব্রহ্মই সত্য, বিকার সত্য নহে—যাহাদ্বারা ইহা অবধারিত হইতে পারে, এরূপ কোনও পদ বা শব্দ উক্ত শ্রুতিবাক্যে নাই)। প্রত্যুত, এক কারণরূপ ব্রহ্মের সত্যতার কথা বলিয়া ব্রহ্মোদ্ভূত সমস্ত বস্তুর সত্যতাই কথিত হইয়াছে। রজত শুক্তি হইতে উদ্ভুত নয়, রজত কিন্তু শুক্তিতে অধ্যস্ত মাত্র – বিবর্ত্ত মাত্র।

ইহার পরে তিনি লিখিয়াছেন—

"তস্মাৎ বস্তুনঃ কারণত্বাবস্থা কার্য্যাবস্থা চ সত্যৈব। তত্র চাবস্থাযুগলাত্মকমপি বস্ত্বেবেতি কারণানন্যত্বং কার্য্যস্য। তদেতমপ্যুক্তং সূত্রকারেণ 'তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৪॥ ব্রহ্মসূত্র।'

অত্র চ তদনন্যত্বমিত্যেবোক্তং ন তু তন্মাত্রসত্যত্বমিতি।

—অতএব, বস্তুর কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা-উভয় সত্যই। কারণাবস্থা ও কার্য্যাবস্থা—বস্তুর এই দুইটী অবস্থা থাকিলেও উভয় অবস্থাতে তাহা বস্তুই। এজন্যই কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব। সূত্রকার ব্যাসদেবও "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ'-সূত্রে কার্য্য-কারণের অনন্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। এই সূত্রে 'তদনন্যত্বই' বলা হইয়াছে, 'তন্মাত্র সত্য'—এইরূপ বলা হয় নাই (অর্থাৎ 'কারণমাত্র সত্য' একথা বলা হয় নাই; বলা হইয়াছে—কারণ হইতে কার্য্য অনন্য; সুতরাং কারণের সত্যতায় কার্য্যেরও সত্যতা)।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এইরূপে দেখাইলেন—কারণ যেমন সত্য, কার্য্যও তেমনি সত্য। জগৎ-কারণ ব্রহ্ম সত্য বলিয়া ব্রহ্ম-কার্য্য জগৎও সত্য, কখনও মিথ্যা হইতে পারে না—ইহাই শাস্ত্রসম্মত সিদ্ধান্ত।

শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ আলোচ্য শ্রুতিবাক্যটীর যেভাবে অর্থ করিয়াছেন, তাহার সারমর্ম্ম হইতেছে এই :—

"বাচারম্ভণম্"-শব্দটী হইতেছে "নামধেয়ম্" পদের বিশেষণ। "নামধেয়ম্" অর্থ নাম। "বাচারম্ভণম্" অর্থ বাক্যদ্বারা যাহার আরম্ভ হয় (সেই নাম)। "বাক্য" হইতেছে—শব্দ; ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিভিন্ন আকারাদিতে নির্ম্মিত মৃণ্ময় দ্রব্যাদির সূচক শব্দ বা বাক্য। এতাদৃশ শব্দে বা বাক্যেই আরম্ভ হয় যাহার, তাহাই হইতেছে "বাচারম্ভণ নাম।" বাচারম্ভণ নাম যে বিকারের, তাহাই হইতেছে—"বাচারম্ভণং নামধেয়ং বিকারঃ—বাচারম্ভণ নাম (অর্থাৎ বাচারম্ভণ নাম বিশিষ্ট) বিকার।" এইরূপে সমগ্র শ্রুতিবাক্যটীর, অর্থাৎ "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"-এই বাক্যটীর অর্থ হইতেছে—"হে সোম্য! যেমন একটী মৃৎপিণ্ডদ্বারা সমস্ত মৃণ্ময়দ্রব্য বিজ্ঞাত হয়, বাক্যদ্বারা আরম্ভ হয় যে নামের, সেই নামবিশিষ্ট বিকার মৃত্তিকা—ইহাই সত্য।"

এ-স্থলে মৃদ্‌বিকাররূপ মৃণ্ময়দ্রব্যের পরিচয়ই দেওয়া হইয়াছে—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম"-বাক্যে। পরিচয়ের হেতু হইতেছে এই—আকারাদিতে এবং নামাদিতে মৃণ্ময় দ্রব্যকে মৃৎপিণ্ড হইতে ভিন্ন বলিয়া দৃষ্ট হয়। ভিন্ন হইলে মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে মৃণ্ময় দ্রব্যের জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে? এই আশঙ্কার নিরসনের উদ্দেশ্যে বলা হইয়াছে, মৃণ্ময়দ্রব্যরূপ বিকার আকার-নামাদিতে মৃৎপিণ্ড হইতে ভিন্ন হইলেও মৃৎপিণ্ড যেমন মৃত্তিকা, বিকারও তেমনি মৃত্তিকা—অপর কিছু নহে। আকারাদি ও নামাদি—ব্যবহারের সুবিধার জন্যই করা হইয়াছে। আকার-নামাদির

পার্থক্যে মৃণ্ময়দ্রব্যের স্বরূপের পার্থক্য সূচিত হয় না ; কেননা, মৃণ্ময়দ্রব্যরূপ বিকারও মৃত্তিকা— ইহাই সত্য, ইহাই সকলে উপলব্ধি করে এবং কখনও এই উপলব্ধির ব্যভিচার হয় না।

এই অর্থে শ্রুতিপ্রোক্ত কোনও শব্দকে বাদ দেওয়া হয় নাই, কোনও নূতন শব্দেরও অধ্যাহার করা হয় নাই। আবার শ্রুতিপ্রোক্ত শব্দগুলিরও মুখ্যার্থই গৃহীত হইয়াছে। সুতরাং এই অর্থটী হইতেছে শ্রুতিবাক্যের সহজ স্বাভাবিক অর্থ।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে "ইতি" শব্দের এবং তাহার অবস্থিতির একটা বিশেষ তাৎপর্য্য আছে। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা"—এই বাক্যটীর পরেই "ইতি" শব্দটীর স্থান— "ইতিএব সত্যম্।" পূর্ব্ববর্ত্তী সমগ্র বাক্যটীর সঙ্গেই "ইতি" শব্দের অন্বয় এবং এই "ইতি" শব্দে সেই সমগ্র বাক্যটীই লক্ষিত হইয়াছে। "ইতি এব সত্যম—ইহাই সত্য।" কি সত্য ? না— "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা—বাক্যারম্ভণ নাম-বিশিষ্ট বিকার মৃত্তিকা—ইহাই সত্য। সেই বিকার মৃত্তিকাতিরিক্ত কিছু নয়, ইহাই হইতেছে "এব" শব্দের তাৎপর্য্য।

৪০। "বাচারম্ভণম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত অর্থ

ছান্দোগ্যশ্রুতিভাষ্যে "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥"-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—

"হে সোম্য ! যথা লোকে একেন মৃৎপিণ্ডেন রুচককুম্ভাদিকারণভূতেন বিজ্ঞাতেন সর্ব্বমন্যৎ তদ্বিকারজাতং মৃণ্ময়ং মৃদ্বিকারজাতং বিজ্ঞাতং স্যাৎ। কথং মৃৎপিণ্ডে কারণে বিজ্ঞাতে কার্য্যমন্যং বিজ্ঞাতং স্যাৎ ? নৈব দোষঃ, কারণেনানন্যত্বাৎ কার্য্যস্য। যৎ মন্যসে অন্যস্মিন্ বিজ্ঞাতে অন্যৎ ন জ্ঞায়তে ইতি, সত্যমেবং স্যাৎ, যদ্যন্যৎ কারণাৎ কার্য্যং স্যাৎ, নত্বেবমন্যৎ কারণাৎ কার্য্যম্। কথং তর্হীদং লোকে 'ইদং কারণম্, অয়মস্য বিকারঃ' ইতি ? শৃণু—বাচারম্ভণং বাগারম্ভণং বাগালম্বনমিত্যেতৎ। কোঽসৌ ? বিকারঃ নামধেয়ম্ নামৈব নামধেয়ম্, স্বার্থে ধেয়ট্প্রত্যয়ঃ। বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি, পরমার্থতো মৃত্তিকেত্যেব মৃত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি।

—হে সোম্য ! জগতে একটীমাত্র মৃৎপিণ্ড অর্থাৎ ঘট-রুচকাদি মৃণ্ময় পদার্থের কারণীভূত এক খণ্ড মৃত্তিকা জানিলেই যেমন সমস্ত মৃণ্ময় (মৃত্তিকাজাত) পদার্থ জানা হইয়া যায়। ভাল, কারণস্বরূপ মৃৎপিণ্ড পরিজ্ঞাত হইলেই অপর সমস্ত মৃত্তিকা-বিকার বিজ্ঞাত হয় কিরূপে। না,—ইহা দোষাবহ হয় না, যেহেতু কার্য্যবস্তুটী কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে। তুমি যে মনে করিতেছ, অন্য (এক) পদার্থ জানিলে অন্য পদার্থ জানা যায় না—ইহা সত্য হইতে পারিত, যদি কার্য্য-পদার্থটী কারণ হইতে অন্য বা পৃথক্ বস্তু হইত ; বাস্তবিক পক্ষে কার্য্য কিন্তু কারণ হইতে অন্য নহে। ভাল, তাহা হইলে লোক-ব্যবহারে 'ইহা কারণ, ইহা তাহার কার্য্য' এরূপ ভেদব্যবহার হয় কিরূপে ? শ্রবণ

কর,—ইহা কেবল বাচারম্ভণ অর্থাৎ বাক্যাশ্রিত। ইহা কি? ইহা বিকার; নামধেয় অর্থ নামই; স্বার্থে (নাম-অর্থে) ধেয়ট্ প্রত্যয় হইয়াছে। (অভিপ্রায় এই যে), বাক্যারব্ধ নামই একমাত্র ঘটাদি, বিকার বলিয়া (তদতিরিক্ত) কোন বস্তু নাই; প্রকৃত পক্ষে কিন্তু 'মৃত্তিকা' ইহাই, অর্থাৎ মৃত্তিকাই সত্য বস্তু, (বিকার কেবল কথা মাত্র)।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত ভাষ্যানুবাদ।"

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ॥ ২।১।১৪॥" ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন * * মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"—বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"এতদুক্তং ভবতি—একেন মৃৎপিণ্ডেন পরমার্থতো মৃদাত্মনা বিজ্ঞাতেন ঘট-শরাবোদঞ্চনাদিকং মৃদাত্মতাবিশেষাদ্বিজ্ঞাতং ভবেৎ। যতো বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং—বাচৈব কেবলমস্তীত্যারভ্যতে বিকারঃ—ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞ্চেতি. ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি। নামধেয়মাত্রং হ্যেতদনৃতং, মৃত্তিকেত্যেব সত্যমিতি। এষ ব্রহ্মণো দৃষ্টান্ত আম্নাতঃ। তত্র শ্রুতাদ্বাচারম্ভণশব্দাৎ দার্ষ্টান্তিকেঽপি ব্রহ্মব্যতিরেকেণ কার্য্যজাতস্যাভাব ইতি গম্যতে।

—এই বাক্যে বলা হইয়াছে, মৃত্তিকাই ঘট-শরাবাদির পারমার্থিক রূপ। 'ঘট', 'শরাব' এ সকল কেবল নাম অর্থাৎ কথামাত্র; সুতরাং মৃত্তিকা জানিলে ঘট-শরাবাদি সমস্ত মৃণ্ময় বস্তুই জানা হয়। ঘট, শরার, উদঞ্চন (জালা), এ সকল মৃত্তিকা ছাড়া নহে, মৃত্তিকাই উহাদের রূপ; সুতরাং মৃত্তিকাই সত্য; তদ্বিকার সকল মিথ্যা বা নামমাত্র (মৃত্তিকাই ঘটাদির পারমার্থিক রূপ। মৃত্তিকার অন্য সংস্থান কাল্পনিক)। ব্রহ্মেও এই দৃষ্টান্ত দর্শিত হইয়াছে। এই শ্রৌত 'আরম্ভণ'-বাক্যে জানা যাইতেছে, মৃত্তিকার ও মৃত্তিকাকার্য্যের দৃষ্টান্তে কারণ ব্রহ্ম ব্যতিরিক্ত কার্য্যভূত জগৎ নাই। —পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত ভাষ্যানুবাদ।"

উল্লিখিত ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর "বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এইরূপ :—

ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকারের, অর্থাৎ মৃত্তিকারূপ কারণের কার্য্য ঘটশরাবাদির— অস্তিত্ব কেবল নামেই, বস্তুতঃ তাহাদের কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই। তদ্রূপ, ব্রহ্মরূপ কারণের কার্য্য জগতের অস্তিত্বও কেবল নামেই, জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই।

ইহাদ্বারা শ্রীপাদ শঙ্কর জানাইতে চাহিতেছেন যে, ঘট-শরাবাদি হইতেছে মৃত্তিকার বিবর্ত্ত; তদ্রূপ জগৎও ব্রহ্মের বিবর্ত্ত। শুক্তির বিবর্ত্ত যেমন রজত, রজ্জুর বিবর্ত্ত যেমন সর্প—তদ্রূপ। শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রম হয়,—শুক্তির স্থলে যেমন রজত আছে বলিয়া মনে হয়, বাস্তবিক যেমন রজত বলিয়া কোন বস্তু সে-স্থলে নাই, আছে কেবল শুক্তি; তদ্রূপ, ব্রহ্মের স্থলেও জগৎ আছে বলিয়া মনে হয় বটে, কিন্তু বাস্তবিক জগৎ বলিয়া কোনও বস্তু নাই, আছেন কেবল ব্রহ্ম।

এই সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

৪১। "বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি বাক্যের শ্রীপাদ শঙ্করকৃত অর্থের আলোচনা

ক। কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির আলোচনা

"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন"- ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের প্রথমাংশে বলা হইয়াছে—"একটী মৃৎপিণ্ড জানা হইলেই সমস্ত মৃণ্ময়পদার্থ জানা হইয়া যায়।"

একটী মাত্র মৃৎপিণ্ড বিজ্ঞাত হইলে ঘট-শরাবাদি সমস্ত মৃদ্বিকার কিরূপে বিজ্ঞাত হইতে পারে, শ্রীপাদ শঙ্করই তাহা বলিয়াছেন—কারণ হইতে কার্য্য অনন্য বলিয়াই কারণরূপ মৃৎপিণ্ড জানা হইলেই তাহার কার্য্যরূপ ঘট-শরাবাদি জানা হইয়া যায়। কারণ হইতে যদি কার্য্য ভিন্ন হইত, তাহা হইলে কারণের জ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান সম্ভবপর হইত না।

কিন্তু কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বলিতে কি বুঝায়? কার্য্য ও কারণ কি সর্ব্ববিষয়েই অনন্য বা অভিন্ন? না কি কোনও এক বিষয়েই অনন্য?

কার্য্য ও কারণ সর্ব্বতোভাবে অনন্য নয়। মৃৎপিণ্ড এবং মৃদ্বিকার ঘট-শরাবাদি যে সর্ব্ব বিষয়ে অনন্য নহে, ইহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ। মৃৎপিণ্ড এবং ঘট-শরাবাদিতে আকারাদির ভেদ আছে, আবার, ঘট-শরাবাদিরও পরস্পর আকারাদির ভেদ আছে। স্থতরাং কারণরূপ মৃৎপিণ্ড এবং তাহার কার্য্যরূপ শরাবাদি সর্ব্বতোভাবে অনন্য নহে। তবে তাহাদের মধ্যে একটী বস্তু আছে সাধারণ—তাহা কারণেও আছে এবং ঘট-শরাবাদির প্রত্যেকের মধ্যেও আছে। এই সাধারণ বস্তুটী হইতেছে মৃত্তিকা। এই মৃত্তিকাই হইতেছে ঘট-শরাবাদি মৃণ্ময় বস্তুর বা মৃদ্বিকারের উপাদান। এইরূপে দেখা যায়—উপাদানাংশেই মৃৎপিণ্ড এবং তাহার বিকার ঘট-শরাবাদি, অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য, অনন্য। এজন্যই মৃত্তিকার স্বরূপ অবগত হইলেই তাহার কার্য্য ঘট-শরাবাদির স্বরূপ অবগত হইয়া যায়। ঘটশরাবাদি মৃদ্বিকার হইতেছে মৃত্তিকারই সংস্থান-বিশেষ, অবস্থা-বিশেষ বা রূপান্তর-বিশেষ।

যাহা হউক, কার্য্য-কারণের অনন্যত্বের কথা বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেই একটী প্রশ্নের উত্থাপন করিয়াছেন। কার্য্য ও কারণ যদি অনন্য হয়, তাহা হইলে লোকে কেন বলে—"এইটী কারণ, ইহা তাহার কার্য্য?" অর্থাৎ কারণরূপ মৃৎপিণ্ড এবং তাহার কার্য্যরূপ ঘট-শরাবাদি যদি অনন্যই হয়, তাহা হইলে ঘট-শরাবাদিকেও মৃৎপিণ্ড বলা হয় না কেন? কেন বলা হয়—মৃৎপিণ্ড হইতেছে কারণ এবং ঘটশরাবাদি হইতেছে তাহার কার্য্য? ইহাতে কি দুইটী অনন্যবস্তুতে—অভিন্ন বস্তুতে—ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে না? কার্য্য-কারণে যদি ভেদই থাকে, তাহা হইলে কার্য্য-কারণকে অনন্য বলা যায় কিরূপে?

এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়ার জন্যই শ্রীপাদ শঙ্কর "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-বাক্যের অর্থ করিয়াছেন। তাঁহার ভাবে অর্থ করিয়া তিনি বলিয়াছেন—বিকার বলিয়া কোনও বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বই নাই। ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকারেরও বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নাই, কেবল নামই আছে।

ঘট-শরাবাদির কারণ মৃত্তিকাই সত্য, অর্থাৎ কেবল মৃত্তিকারই বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকারের বাস্তব অস্তিত্বই যখন নাই, তখন তাহাদের সহিত মৃত্তিকার ভেদজ্ঞানও মিথ্যা বা ভ্রমাত্মক।

যাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই, তাহার সহিত অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তুর ভেদ-জ্ঞান যে মিথ্যা, এক ভাবে তাহা স্বীকার করা যায়। কেননা, দুইটী অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তুর মধ্যেই ভেদ বা অভেদ থাকা সম্ভব। কিন্তু দুইটী বস্তুর মধ্যে একটী যদি সত্য—অস্তিত্ববিশিষ্ট—হয় এবং অপরটী যদি মিথ্যা—বাস্তব অস্তিত্বহীন—হয়, তাহাদের মধ্যে অনন্যত্বই বা কিরূপে থাকিতে পারে? কার্য্য যদি বাস্তব অস্তিত্বহীন হয়, আর কারণ যদি বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট হয়, তাহাদের মধ্যে অনন্যত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না। সত্য এবং মিথ্যা—এই দুই পদার্থ কখনও অনন্য বা অভিন্ন হইতে পারে না। অথচ, শ্রীপাদ শঙ্করই প্রারম্ভে বলিয়াছেন—কার্য্য ও কারণ অনন্য বলিয়াই এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থের জ্ঞান জন্মিতে পারে।

যদি বলা যায় এক মৃত্তিকাই সত্য, অন্য কিছু সত্য নহে, এই হিসাবেই অনন্য বলা হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই।

"অনন্য"-শব্দের অর্থ হইতেছে—ন অন্য—অন্য নহে। অন্ততঃ দুইটী বস্তু থাকিলেই এবং দুইটী বস্তু অস্তিত্ববিশিষ্ট হইলেই তাহাদের একটী বস্তুকে দেখাইয়া বলা যায়—এই বস্তুটী অপর বস্তুটী হইতে অন্য বা পৃথক্ নহে, বস্তু দুইটী অনন্য। যে-স্থলে কেবলমাত্র একটী বস্তুরই—যেমন, কেবলমাত্র এক মৃত্তিকারই -অস্তিত্ব, সে-স্থলে "অনন্য"-শব্দের কোনও সার্থকতাই থাকিতে পারে না।

যদি বলা যায়—এ-স্থলেও দৃশ্যমানভাবে দুইটী বস্তু আছে। একটী হইতেছে মৃত্তিকা, যাহা সত্য বা বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট। আর একটী হইতেছে মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদি; ঘট-শরাবাদির বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও অস্তিত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতীত হয়—সুতরাং একটা বাস্তব বস্তু বলিয়াই প্রতীত হয়! এই দুইটীকে লক্ষ্য করিয়া "অনন্য" বলিলে কি দোষ হইতে পারে?

দোষ হয় এই—প্রথমতঃ, সত্য এবং মিথ্যা, বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট এবং বাস্তব অস্তিত্বহীন—এই দুই পদার্থ কখনও অনন্য বা অভিন্ন হইতে পারে না। সত্য ও মিথ্যাকে অনন্য বলিলে সত্যেরও মিথ্যাত্ব-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। দ্বিতীয়তঃ, "মৃত্তিকাই সত্য"—এই হেতুতেই উভয়ের "অনন্যত্ব" প্রদর্শিত হইতেছে, অর্থাৎ মৃত্তিকা সত্য বলিয়াই মৃৎপিণ্ড এবং মৃদ্বিকার (যাহাকে মিথ্য বলা হইতেছে সেই মৃদ্বিকার) অনন্য। তাহা হইলে মৃদ্বিকারে মৃত্তিকার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতেছে; নচেৎ অনন্যত্ব-স্বীকৃতির জন্য যে দুই বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃতির প্রয়োজন, তাহাই সিদ্ধ হয় না। মৃদ্বিকারে মৃত্তিকার অস্তিত্ব স্বীকার করিলে মৃদ্বিকারেরও সত্যত্ব স্বীকৃত হইয়া পড়ে; যে বিকারে সত্য মৃত্তিকার অস্তিত্ব আছে, তাহা কখনও অস্তিত্বহীন বা মিথ্যা হইতে পারে না।

বস্তুতঃ, মৃদ্বিকারে যে মৃত্তিকার অস্তিত্ব আছে, তাহা শ্রুতি স্পষ্টভাবেই বলিয়া গিয়াছেন—

"সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ।" শ্রুতি মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদিকে "মৃণ্ময় - মৃত্তিকাময়" বলিয়াছেন। প্রাচুর্য্যার্থে ময়ট্-প্রত্যয়। "মৃদ্‌ভ্রমময়"—মৃত্তিকার ভ্রমমাত্র" বলা হয় নাই।

এইরূপে দেখা গেল —শ্রীপাদ শঙ্কর যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বোল্লিখিত প্রশ্নের সন্তোষজনক উত্তর বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। সন্তোষজনক উত্তর হইত, যদি তিনি বলিতেন—

"কার্য্য এবং কারণকে যে ভিন্ন রূপে উল্লেখ করা হয়, তাহার হেতু এই। কারণরূপ মৃত্তিকার কার্য্য ঘট-শরাবাদিও মৃণ্ময় -মৃত্তিকাময়—হইলেও আকারাদিতে মৃত্তিকা এবং তাহার কার্য্য ঘট-শরবাদির মধ্যে ভেদ আছে, নামেও ভেদ আছে। ব্যবহারের সুবিধার জন্য বিকারের ভিন্ন ভিন্ন আকারাদি করা হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন নামও রাখা হয়। এইরূপ ভেদ আছে বলিয়াই কারণ ও কার্য্য ভিন্ন রূপে উল্লিখিত হয়। ভিন্ন রূপে উল্লিখিত হইলেও তাহারা কিন্তু অনন্য ; কেন না, কার্য্যরূপ ঘট-শরাবাদি বিকারও মৃণ্ময়—মৃত্তিকাময়। কারণরূপ মৃৎপিণ্ডে যে মৃত্তিকা, কার্য্যরূপ ঘট-শরাবাদিতেও সেই মৃত্তিকা। বাক্যারব্ধ বিকার-নামক বস্তুও মৃত্তিকা—ইহাই সত্য।"

এইরূপ উত্তরেই ভেদোক্তির হেতুও বিবৃত হইত এবং শ্রুতির অভিপ্রেত কার্য্য-কারণের অনন্যত্বও রক্ষিত হইত।

খ। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত অর্থের আলোচনা

এক্ষণে শ্রীপাদ শঙ্করকৃত "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-বাক্যের অর্থসম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

শ্রুতিভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বাগারম্ভণং বাগালম্বনমিত্যেতৎ।" তিনি "আরম্ভণ"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—আলম্বন। আলম্বন অর্থ—আশ্রয়। "আরম্ভণ"-শব্দের — "আশ্রয়" অর্থ অভিধানে দৃষ্ট না হইলেও - প্রাসাদের আরম্ভ ভিত্তিকে যেমন প্রাসাদের আশ্রয় বলা যায়, তদ্রূপ —আরম্ভণ-শব্দেও আশ্রয়-অর্থ স্বীকৃত হইতে পারে। *

"আরম্ভণ বা আরম্ভ" শব্দের অর্থ "আলম্ব বা আশ্রয়" শব্দকল্পদ্রুমে দৃষ্ট হয় না। শব্দকল্পদ্রুম লিখিয়াছেন—

"আরম্ভঃ (আ+রভ+ঘঞ্ ভাবে) প্রথমকৃতিঃ। তৎপর্য্যায়ঃ=প্রক্রমঃ ১ উপক্রমঃ ২ অভ্যাদানম্ ৩ উদ্‌ঘাতঃ ৪ আরম্ভঃ ৫। ইত্যমরঃ॥ অভ্যাদানাদিত্রয়মারম্ভমাত্রে। প্রক্রমাদি পঞ্চ আরম্ভমাত্রে ইত্যেকে॥ কেচিত্তু প্রক্রমাদিদ্বয়ং প্রথমারম্ভে॥ অভ্যাদানাদিত্রয়ম্ আরম্ভমাত্রে। ইতি বহুভিরুক্তমপি ন সাধু যতঃ প্রথমকৃতিরেব আরম্ভঃ, তৎ পূর্ব্বদ্বয়ম্ আরম্ভে, শেষত্রয়ম্ আরব্ধে ইত্যাহুঃ। ইতি ভরতঃ॥ ত্বরা। উদ্যমঃ। বধঃ। দর্পঃ। ইতি মেদিনী। প্রস্তাবনা। ইতি ত্রিকাণ্ডশেষঃ।"

এস্থলে চারিজন আভিধানিকের মত উল্লিখিত হইয়াছে। আরম্ভ-শব্দের আলম্ব বা আশ্রয় অর্থ কেহই লেখেন নাই। অমর ও ভরতের মতে প্রথমকৃতিই হইতেছে আরম্ভ। ত্রিকাণ্ডশেষের মতে—প্রস্তাবনাও প্রথমকৃতিই। মেদিনী অবশ্য অন্য কয়েকটী বিশেষ অর্থ দিয়াছেন—ত্বরা, উদ্যম, বধ ও দর্প। ইহাদের কোনওটীর অর্থই "আশ্রয়" নহে।

সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর যে আরম্ভণ-শব্দের অর্থ আলম্বন বা আশ্রয় লিখিয়াছেন, তাহাও অভিধানসম্মত নহে।

শঙ্কর-ভাষ্যের টীকাকার শ্রীপাদ আনন্দগিরি লিখিয়াছেন—"বাচারম্ভণমিত্যত্র বাচেতি তৃতীয়া ষষ্ঠ্যর্থে দ্রষ্টব্যা—বাচ্-শব্দের উত্তর ষষ্ঠী অর্থেই তৃতীয়া বিভক্তি প্রযুক্ত হইয়াছে।" তাহা হইলে "বাচারম্ভণ"-শব্দের অর্থ হইতেছে—বাক্যের অবলম্বন বা আশ্রয়।

"বাচারম্ভণ"-শব্দের উল্লিখিতরূপ অর্থ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন কোঽসৌ?—তাহা কি? অর্থাৎ বাক্যের আশ্রয় যে বস্তুটী, তাহা কি?" উত্তরে বলিয়াছেন—"বিকারঃ নামধেয়ম্ নামৈব নামধেয়ং, স্বার্থে ধেয়ট্-প্রত্যয়ঃ—বিকার নামধেয়; নামধেয়-অর্থ নামই; স্বার্থে ধেয়ট্-প্রত্যয় হইয়াছে।" এ-স্থলে "নামৈব"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—নাম ও নামধেয় একার্থক; কেননা, স্বার্থেই ধেয়ট্-প্রত্যয় হয়। এইরূপে যাহা পাওয়া গেল, তাহা হইতেছে এই—"বাক্যের আশ্রয় যে বস্তুটী, তাহা হইতেছে বিকার-নামক বস্তু।"

ঘট-শরাবাদি মৃদ্বিকার হইতেছে বাক্যের (অর্থাৎ নামরূপ বাক্যের, খট-শরাবাদি নামের) আশ্রয়; কেননা, বিভিন্ন মৃদ্বিকারকে আশ্রয় করিয়াই ঘট-শরাবাদি নাম অবস্থান করে, মৃদ্বিকারসমূহ ঘট-শরাবাদি নামেই পরিচিত হয়।

যাহা হউক, ইহার পরে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"বাগালম্বনমাত্রং নামৈব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি—বাক্যের আশ্রয় মাত্র নামই কেবল, বিকার-নামক কোনও বস্তু নাই।"

প্রথমে তিনি "বাচারম্ভণম্"-শব্দের অর্থ করিলেন "বাগালম্বনম্"; তাহার পরে একটা "মাত্র"-শব্দের অধ্যাহার করিয়া "বাগালম্বনম্"-এর সঙ্গে যোগ করিয়া করিলেন—"বাগালম্বনমাত্রম্—বাক্যের বা নামের আশ্রয়মাত্র।"

প্রণব বা ওঙ্কার সম্বন্ধে শ্রুতি বলিয়াছেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম॥ কঠ শ্রুতি॥ ১।২।১৬॥-এই অক্ষরই (ওঙ্কার বা প্রণবই) ব্রহ্ম।" শ্রুতির এই বাক্যকে স্মৃতি আরও বিশদ্‌ভাবে বর্ণনা করিয়া বলিয়াছেন—"নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।১০৮-ধৃত পদ্মপুরাণ-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন॥" ব্রহ্ম-বিষয়ে নাম ও নামী অভিন্ন। "প্রণবস্তস্য বাচকঃ"-এই প্রমাণ বলে ওঙ্কার বা প্রণব হইতেছে ব্রহ্মের বাচক নাম; আবার উল্লিখিত শ্রুতি-প্রমাণ অনুসারে প্রণব—ব্রহ্মও, ব্রহ্মস্বরূপও। এইরূপে দেখা যায়—প্রণব ব্রহ্মের বাচক নাম বলিয়া ব্রহ্মাশ্রিতও, আবার ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্ম-স্বরূপও। সুতরাং ব্রহ্ম কেবল নামের (প্রণবের) আশ্রয়মাত্র নহেন, প্রণব ব্রহ্ম-স্বরূপও। এই বিধান কেবল ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের বাচক নাম সম্বন্ধেই। ব্রহ্মাতিরিক্ত অন্য সকল বস্তুই কেবল নামের আশ্রয়, অন্য কোনও বস্তু এবং তাহার নাম অভিন্ন নহে। ঘট-নাম এবং ঘট-নামক মৃদ্বস্তু—অভিন্ন নহে। সুতরাং এ-স্থলে মৃদ্বিকার ঘটকে "ঘট-নামের আশ্রয়মাত্র', বলার সার্থকতা কিছু নাই। এইরূপ স্থলে "নামের আশ্রয়" বলিলেই যথেষ্ট হয়, তাহাতেই "নামের আশ্রয়মাত্রত্ব" বুঝাইতে পারে।

তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর মৃদ্বিকার-সম্বন্ধে বলিতে যাইয়া, বিকারকে একবার "বাগালম্বন—

বাক্যের বা নামের আশ্রয়” বলিয়া পুনরায় কেন “মাত্র”-শব্দের অধ্যাহার করিয়া “বাগালম্বনমাত্র—বাক্যের বা নামের আশ্রয়মাত্র” বলিলেন, তাহার হেতু বুঝা যায়, তাঁহার পরবর্ত্তী উক্তি হইতে। “বাগালম্বনমাত্রম্”-শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে যাইয়াই তিনি বলিয়াছেন—‘বাগালম্বনমাত্রং বাগেব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি—বাক্যের বা নামের আশ্রয় মাত্র, (অর্থাৎ) নামই কেবল, বিকার-নামক কোনও বস্তু নাই।”

এ-স্থলেও “বাগালম্বনমাত্র”-শব্দের অর্থ করিতে যাইয়া তিনি “এব” এবং “কেবলম্”-এই দুইটী শব্দের অধ্যাহার করিয়াছেন, “বাগালম্বনমাত্র”-শব্দ হইতে “এব” এবং “কেবল” শব্দদ্বয় পাওয়া যাইতে পারে না, কেন না, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সে-স্থলে “মাত্র”-শব্দটীই অসার্থক, নিরর্থক।

তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ লাভের জন্য তিনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও একটী “মাত্র”-শব্দের অধ্যাহার করিয়াছেন। “ঘটঃ শরাব উদঞ্চনঞ্চেতি, ন তু বস্তুবৃত্তেন বিকারো নাম কশ্চিদস্তি। নামধেয়মাত্রং হ্যেতদনৃতম্—ঘট, শরাব, উদঞ্চন—নামধেয়মাত্র (নামমাত্র), বিকার-নামক বস্তু কিছুই নাই ; এ-সমস্তই অনৃত, অসত্য।”

যাহা হউক, “বিকার বাগালম্বনমাত্র বা নামের আশ্রয়মাত্র” ইহার অর্থ কিরূপে—“নামই কেবল, বিকার-নামক কোনও বস্তু নাই”-হইতে পারে, তাহা বুঝা যায় না। এ-স্থলে যদি এইরূপ অর্থ সম্ভব হয়, তাহা হইলে “মস্তক কেশের আশ্রয় মাত্র”-এই বাক্যের অর্থও হইতে পারে—“মস্তক হইতেছে কেশই কেবল, মস্তক নামে কোনও বস্তু নাই।” ইহাকে একটী অদ্ভুত অর্থ বলিয়াই মনে হয়।

নামের আশ্রয়মাত্র হইতেছে বিকার ; বিকারেরই যদি কোনও অস্তিত্ব না থাকে, তাহা হইলে নামের অস্তিত্ব কিরূপে থাকিতে পারে ? আশ্রয়হীন আশ্রিতের কল্পনা কি সম্ভব ?

যদি বলা যায়—বিবর্ত্তে তাহা সম্ভব। শুক্তিতে যখন রজতের ভ্রম হয়, তখন রজত-বস্তুটীর অস্তিত্ব থাকে না, কিন্তু রজত-নাম ব্যবহৃত হয়। এ-স্থলে রজতের অস্তিত্ব না থাকাসত্ত্বেও রজত-নামের অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। এ-স্থলেও বাস্তবিক অস্তিত্বহীন কোনও পদার্থকে রজত-নামে অভিহিত করা হয় না। শুক্তিস্থলে রজত নাই বটে ; কিন্তু অন্যত্র রজত-নামক একটী বস্তু আছে, অন্ততঃ রৌপ্যবিক্রেতার দোকানে আছে। সেই রজতই হইতেছে রজত-নামের আশ্রয়। রজত-নামক বাস্তব বস্তুটীর সংস্কার যাহার আছে, কেবল মাত্র তাহার পক্ষেই শুক্তিতে রজতের ভ্রম হইতে পারে, অপরের পক্ষে এইরূপ ভ্রম সম্ভবপর নয়। রজত-নামক কোনও বস্তুই যদি কোথাও কোনও কালে না থাকিত, তাহা হইলে রজতের সংস্কারও কাহারও থাকিত না, শুক্তিতে রজত-ভ্রমও কাহারও হইত না। শুক্তির ধবলত্বাদির সঙ্গে রজতের ধবলত্বাদির সাদৃশ্য আছে বলিয়াই শুক্তি দেখিলে পূর্ব্বসংস্কার অনুসারে রজতের জ্ঞান হওয়া সম্ভবপর হয়। সুতরাং বিবর্ত্ত-স্থলেও সম্যক্‌রূপে বাস্তব অস্তিত্বহীন কোনও বস্তু নামের আশ্রয় হয় না।

এইরূপে দেখা যাইতেছে—বাক্যের বা নামের আশ্রয় মাত্র বিকার (অর্থাৎ ঘট-শরাবাদি নামে পরিচিত মৃদ্বিকার) কেবল নামই. বাস্তবিক বিকারের (অর্থাৎ ঘট-শরাবাদির) কোনও অস্তিত্ব নাই—এইরূপ অনুমান নিতান্ত অসমীচীন।

ঘট-শরাবাদি বস্তু কোনও কালে কোথাও যদি না-ই থাকিয়া থাকে, তাহা হইলে কাহাকে উপলক্ষ্য করিয়া ঘট-শরাবাদি নামের আবির্ভাব হইল ?

যদি বলা যায়—ঘট-শরাবাদি বস্তু বাস্তবিক নাই ; তবে আছে বলিয়া মনে হয়। যাহা আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাকেই ঘট-শরাবাদি নামে অভিহিত করা হয়। এইরূপেই নামের আবির্ভাব হইয়াছে।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। যাহা বাস্তবিক নাই, অথচ আছে বলিয়া প্রতীত হয়, তাহা তো বিবর্ত্ত। যেমন শুক্তির বিবর্ত্ত রজত। কিন্তু আলোচ্য শ্রুতিবাক্যে তো বিবর্ত্তের কথা বলা হয় নাই ; বলা হইয়াছে বিকারের কথা। মৃণ্ময় পদার্থকে শ্রুতি পরিষ্কার কথায় "বিকার" বলিয়াছেন, বিবর্ত্ত বলেন নাই। "যথা সোম্যৈকেন মৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ, বাচারম্ভণং 'বিকারো' নামধেয়ম্।"

যদি বলা হয়—বিকারই বিবর্ত্ত। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই—বিকার এবং বিবর্ত্ত এক পদার্থ নহে। একথা বলার হেতু এই।

বিকার এবং বিবর্ত্ত এক পদার্থ নহে

বিকার এবং বিবর্ত্ত যে এক পদার্থ নহে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, বিকার একটী বস্তু হইতে উৎপন্ন হয়। যেমন মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদি মৃত্তিকা হইতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু বিবর্ত্ত কোনও বস্তু হইতে উৎপন্ন হয় না ; শুক্তির বিবর্ত্ত রজত শুক্তি হইতে উৎপন্ন হয় না। বিবর্ত্তের উৎপত্তির মূল হইতেছে সংস্কারজনিত ভ্রান্ত-জ্ঞান।

দ্বিতীয়তঃ, যাহা যে বস্তুর বিকার, তাহা হয় সেই বস্তুময়। যেমন, মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদি—মৃত্তিকাময়। শ্রুতিও মৃদ্বিকারকে "মৃণ্ময় বা মৃত্তিকাময়" বলিয়াছেন। তাৎপর্য্য এই যে, যাহা যে বস্তুর বিকার, তাহার উপাদানও হইতেছে সেই বস্তু। মৃদ্বিকার ঘটাদির উপাদানও মৃত্তিকা।

কিন্তু যাহা যে বস্তুর বিবর্ত্ত, তাহা সেই বস্তুময় নহে, সেই বস্তু বিবর্ত্তের উপাদান নহে। শুক্তির বিবর্ত্ত রজত। রজত কখনও শুক্তিময় নহে, রজতের উপাদানও শুক্তি নহে। রজত শুক্তিময়, অথবা রজতের উপাদান শুক্তি—এইরূপ কেহ বলেও না।

তৃতীয়তঃ, বিকারের নিজস্ব ধর্ম্ম আছে এবং তাহা প্রত্যক্ষসিদ্ধ ; কিন্তু বিবর্ত্তের নিজস্ব কোনও ধর্ম্ম নাই।

যেমন মৃত্তিকার বিকার ঘটকে সকল সময়ে এবং সর্ব্বত্রই দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পায়, ভাঙ্গিয়াও ফেলিতে পারে।

কিন্তু শুক্তির বিবর্ত্ত রজতকে দৃষ্টিশক্তিবিশিষ্ট ব্যক্তিমাত্রেই দেখিতে পায় না; শুক্তিতে রজতের ভ্রম সকলের হয় না; যাহার হয়, তাহারও সকল সময়ে এবং সকল স্থলে হয় না। যাহার শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হয়, সেও তাহাকে (রজতকে) স্পর্শ করিতে পারে না, তুলিয়া লইতে পারে না, কোনও দ্রব্য-ক্রয়ের জন্য ব্যবহার করিতে পারে না। স্পর্শ করিতে বা তুলিয়া লইতে গেলে শুক্তিকেই স্পর্শ করিবে এবং যখন তুলিয়া লইবে, তখন সেই ব্যক্তি বুঝিতে পারিবে যে, শুক্তিতেই তাহার রজতের ভ্রম হইয়াছিল। কিন্তু একটী ঘটকে তুলিয়া লইলে কাহারও মনে হয় না যে—একটী মৃৎপিণ্ডকে তুলিয়া লওয়া হইয়াছে, কিম্বা এতক্ষণ পর্য্যন্ত মৃৎপিণ্ডকেই ঘট মনে করা হইয়াছিল। ঘটকে ভাঙ্গিলে মৃৎপিণ্ড ভগ্ন হইয়াছে বলিয়া কেহ মনেও করে না, দেখেও না; দেখে কেবল ঘটের ভগ্নাংশ। কিন্তু শুক্তির বিবর্ত্ত রজতকে ভাঙ্গিবার চেষ্টা ফলবতী হইলে দেখা যাইবে—শুক্তিই ভগ্ন হইয়াছে, শুক্তির ভগ্নাংশই পড়িয়া রহিয়াছে।

চতুর্থতঃ, কার্য্যকারিত্বেও বিকার এবং বিবর্ত্তের মধ্যে পার্থক্য আছে।

মরুভূমিতে মরীচিকাও একটী বিবর্ত্ত। মরীচিকার জলে কেহ স্নান করিতে পারে না, তাহা কেহ পান করিতেও পারে না। কিন্তু প্রকৃতির বিকার জলে স্নানাদিও করা যায়, তাহা পান করিয়া তৃষ্ণাও দূর করা যায়।

পঞ্চমতঃ, বিকারের গুণ দ্রব্যনিষ্ঠ, কিন্তু বিবর্ত্তের গুণ দ্রষ্টৃনিষ্ঠ।

একটী ঘটের দ্বারা একবারে সর্ব্বাধিক পরিমাণ কত জল আনা যাইতে পারে, তাহা নির্ভর করে ঘটের আয়তনের উপর; যে ব্যক্তি জল আনিবে, তাহার ইচ্ছার উপরে তাহা নির্ভর করে না।

বাস্তব সর্পের দংশনাদির ক্ষমতা আছে; সুতরাং লোকের ভয় জন্মাইবার সামর্থ্যও সর্পেরই মধ্যে অবস্থিত। রজ্জুর বিবর্ত্ত সর্পের দংশনাদির—সুতরাং লোকের ভয় জন্মাইবার—সামর্থ্য নাই। ভীতির হেতু অবস্থিত দ্রষ্টার মনে।

ষষ্ঠতঃ, বিকার হইতেছে মূল বস্তুর সংস্থান-বিশেষ বা রূপান্তর। "বিকারঃ প্রকৃতেরন্যথাভাবঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" যেমন মৃদ্বিকার ঘটাদি হইতেছে মৃত্তিকারই অবস্থা-বিশেষ বা রূপান্তর।

কিন্তু বিবর্ত্ত তাহা নহে। শুক্তির বিবর্ত্ত রজত, শুক্তির অবস্থাবিশেষ বা রূপান্তর নহে।

অর্থাৎ মৃত্তিকা হইতেছে ঘটাদি মৃদ্বিকারের উপাদান; কিন্তু শুক্তি শুক্তির বিবর্ত্ত রজতের উপাদান নহে। রজতে শুক্তি নাই, ঘটাদিতে মৃত্তিকা আছে।

সপ্তমতঃ, বিকার মিথ্যা নহে; কিন্তু বিবর্ত্ত মিথ্যা।

বিবর্ত্ত যে মিথ্যা সে সম্বন্ধে মতভেদ কিছু নাই। কিন্তু বিকার বিবর্ত্তের ন্যায় মিথ্যা নহে।

যদি বিকার মিথ্যা হইত, তাহা হইলে দুগ্ধের বিকার দধি পান করিলে দুগ্ধের গুণই উপলব্ধ হইত, তদতিরিক্ত অন্য কোনও গুণ উপলব্ধ হইত না। কিন্তু দধি পান করিলেই বুঝা যায়—দধির মধ্যে দুগ্ধাতিরিক্ত গুণও আছে। চিকিৎসকগণ কোনও কোনও রোগীকে দুগ্ধ নিষেধ করিয়া দধি পথ্যও দিয়া থাকেন। দুগ্ধের বিকার তক্র যদি মিথ্যা হইত, তাহা হইলে তাহার বাস্তব কোনও গুণও থাকিত না; দুগ্ধের যে গুণ, তক্রেরও সেই গুণমাত্রই থাকিত; কিন্তু তক্রসম্বন্ধে বলা হয়—"সর্ব্বরোগহরং তক্রং কেবলং কফবর্দ্ধনম্"। অথচ দুগ্ধ সম্বন্ধে তাহা বলা হয় না। একই বস্তুর নানারকমের বিকার আছে; যেমন, দুগ্ধের বিকার—দধি, ঘোল, ক্ষীর, ছানা, ননী, মাখন, ঘৃত ইত্যাদি। এই সকল বিভিন্ন বিকারের বিভিন্ন গুণ প্রত্যক্ষসিদ্ধ এবং বিজ্ঞান-সম্মত। বিকারের সত্যত্বে ইহাই প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

বিবর্ত্ত কিন্তু এইরূপ নহে। বিবর্ত্তের যখন বাস্তব অস্তিত্বই নাই, তখন তাহার নিজস্ব কোনও গুণও থাকিতে পারে না।

এই সমস্ত হেতুতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—বিকার এবং বিবর্ত্ত এক পদার্থ নহে। শ্রুতিবাক্যে "বিকার"-শব্দটীই আছে; কিন্তু বিবর্ত্ত-শব্দটী নাই। মৃত্তিকার বিকারকে শ্রুতিতে "মৃণ্ময়—মৃত্তিকাময়, মৃত্তিকোপাদান" বলায় ইহাই দৃঢ়ীকৃত হইয়াছে যে, শ্রুতি যে বিকার-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য "বিবর্ত্ত" নহে। "বিবর্ত্তই" যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে "মৃণ্ময়" বলা হইত না। শুক্তির বিবর্ত্ত রজতকে "শুক্তিময়" বলা হয় না।

তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর "বিকার"কে "বিবর্ত্তে" পর্য্যবসিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। শ্রুতি-বাক্য হইতে তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ নিষ্কাশিত করার উদ্দেশ্যে তিনি "মাত্রং", "এব" এবং "কেবলম্" এই তিনটী শব্দের অধ্যাহার করিয়াছেন। "মাত্র"-শব্দের অধ্যাহার করিয়াও যখন দেখিলেন যে, তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ পাওয়া যাইতেছে না, তখন "এব" এবং "কেবলম্" শব্দদ্বয়ের অধ্যাহার করিয়া, শ্রুতি যাহা বলেন নাই এবং যাহা শ্রুতির অভিপ্রেতও নহে,—তাহাই তিনি বলিলেন—বিকার "নামৈব কেবলং ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি—বিকার কেবল নামই, বিকার-নামক কোনও বস্তু নাই।" তাৎপর্য্য—বিকার বিবর্ত্তই।

যদি বলা যায়—"বিকারো নামধেয়ম্"—এই বাক্য হইতেই পাওয়া যাইতে পারে—"বিকারো নামৈব কেবলম্—বিকার কেবল নামই", তাহা হইলে বক্তব্য এই যে, "নামধেয়ম্"-পদের অর্থ "নামৈব কেবলম্" নহে। স্বার্থে ধেয়ট্-প্রত্যয় হইয়াছে, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন। স্বার্থে ধেয়ট্-প্রত্যয় হওয়ায় "নামধেয়ম্ অর্থ "নাম"। "নামধেয়ম্" না বলিয়া কেবল "নাম" বলিলেও অর্থের ব্যতিক্রম হইত না। "বিকারো নামধেয়ম্" যাহা, "বিকারো নাম"ও তাহাই। তাহা হইলে এই অর্থ পাওয়া যাইতেছে—"বিকারো নামধেয়ম্ = বিকারো নাম = বিকার নামক"। "বিকারো নাম"—এই বাক্যের অর্থ যে "বিকার-নামক", শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি

হইতেই তাহা জানা যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"ন বিকারো নাম বস্তু অস্তি—বিকার-নামক বস্তু নাই।"

"বাচারম্ভণম্"-শব্দের তিনি যে অথ করিয়াছেন, তদনুসারেই "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"—বাক্যের অর্থ হয়—"বাক্যাশ্রয় বিকার-নামক বস্তু", অর্থাৎ ঘট-শরাবাদি বিকার-নামক বস্তু হইতেছে ঘট-শরাবাদি কথার বা নামের আশ্রয়। মৃদ্বিকার মৃণ্ময় বস্তুর নাম হইতেছে ঘট-শরাবাদি। তাহাদের কারণ মৃৎপিণ্ডের সঙ্গে নামেতে মৃদ্বিকার ঘট-শরাবাদির ভেদ আছে বলিয়াই কারণের ও কার্য্যের ভেদের কথা বলা হয় (শ্রীপাদ শঙ্করের উত্থাপিত প্রশ্নই ছিল কার্য্য ও কারণ যদি অনন্যই হয়, তাহা হইলে ভেদরূপে কার্য্য ও কারণের উল্লেখ করা হয় কেন?) কিন্তু শ্রীপাদশঙ্কর, তাঁহারই শব্দার্থ অনুসারে এইরূপ যে স্বাভাবিক অর্থ পাওয়া যায়, তাহা গ্রহণ না করিয়া অন্যরূপ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

যদি বলা যায়—"বিকার" যদি "বিবর্ত্তই" না হইবে, তাহা হইলে শ্রুতি কেন বলিলেন—"মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্ = মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্।"

"মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম"-বাক্যের অর্থেও শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"মৃত্তিকেত্যেব মৃত্তিকৈব তু সত্যং বস্তু অস্তি—'মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্'—ইহার অর্থ এই যে—মৃত্তিকাই কিন্তু সত্য বস্তু হয়।" এ-স্থলে তিনি শ্রুতিবাক্যস্থিত "ইতি"-শব্দকে বাদ দিয়া অর্থ করিয়াছেন; কেননা "ইতি"-শব্দকে বাদ না দিলে তিনি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সহিত সঙ্গতি রাখিতে পারেন না। মৃত্তিকার বিকার মিথ্যা, মৃত্তিকাই সত্য বস্তু (যেমন শুক্তির বিবর্ত্ত রজত মিথ্যা, শুক্তিই সত্য বস্তু, তদ্রূপ)—ইহা দেখাইবার জন্যই তাঁহাকে "ইতি"-শব্দটীকে বাদ দিতে হইয়াছে।

"ইতি"-শব্দের প্রয়োগ যদি নিরর্থক হইত, তাহা হইলে বাক্যের ব্যাখ্যা-প্রসঙ্গে ইহাকে বাদ দেওয়া দূষণীয় হইত না; কিন্তু এ-স্থলে "ইতি" নিরর্থক নহে।

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকা—বাক্যারব্ধ বিকার-নামক বস্তু মৃত্তিকা"-এই বাক্যের শেষে "ইতি"-শব্দের প্রয়োগ করা হইয়াছে; ঐ বাক্যের পরেই বলা হইয়াছে—"ইতি এব সত্যম্—ইহাই সত্য", অর্থাৎ "বাক্যারব্ধ বিকার-নামক বস্তু (ঘট-শরাবাদি-নামবিশিষ্ট বিকার) মৃত্তিকা—ইহাই সত্য।" "ইতি এব"-ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—বিকার-বস্তুটী মৃত্তিকাই, মৃত্তিকাতিরিক্ত অন্য কোনও দ্রব্য নহে; শুক্তি-রজতের ব্যাপারে রজত যেমন শুক্তি হইতে ভিন্ন একটী দ্রব্য, মৃত্তিকা ও মৃদ্বিকারের ব্যাপারে মৃদ্বিকার কিন্তু মৃত্তিকা হইতে ভিন্ন দ্রব্য নহে। ইহা দ্বারা শ্রুতি জানাইলেন—মৃত্তিকার বিকার ঘট-শরাবাদি মৃত্তিকার বিবর্ত্ত নহে। ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই "ইতি এব" প্রযুক্ত হইয়াছে; সুতরাং এ-স্থলে "ইতি" নিরর্থক নহে এবং নিরর্থক নহে বলিয়া বাদ দেওয়ার যোগ্য নহে। বাদ দিলে শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য অবধারিত হইতে পারিবেনা।

"ইত্যেব"-শব্দদ্বারা শ্রুতি বিকারের বিবর্ত্তত্বই খণ্ডন করিয়াছেন।

ব্রহ্মের সহিত জগৎ-প্রপঞ্চের সম্বন্ধ প্রদর্শনের জন্য শ্রুতিতে তিনটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইয়াছে—মৃৎপিণ্ড ও মৃণ্ময় দ্রব্যের দৃষ্টান্ত, স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের দৃষ্টান্ত এবং লৌহ ও লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যের দৃষ্টান্ত। এই তিনটী দৃষ্টান্তের প্রত্যেকটীর প্রসঙ্গেই "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-ইত্যাদি বাক্যটী বলা হইয়াছে। শ্রুতিতে কোনও স্থলেই এই প্রসঙ্গে শুক্তি-রজতের, বা রজ্জু-সর্পের, কিম্বা মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্ত অবতারিত হয় নাই। শ্রুতি-প্রোক্ত দৃষ্টান্তগুলির তাৎপর্য্য-পর্য্যালোচনা করিলেই শ্রুতির প্রকৃত অভিপ্রায় কি, তাহা জানা যাইতে পারে। মৃৎপিণ্ডের দৃষ্টান্তই আলোচিত হউক।

মৃণ্ময় ঘট হইতেছে মৃৎপিণ্ডের বিকার। কোনও এক স্থানে যদি একটী মৃণ্ময় ঘট থাকে, তাহা হইলে যে কোনও লোক যে কোনও সময়েই তাহাকে দেখিতে পায় এবং তাহাকে ঘটরূপেই দেখিতে পায়, অন্য কোনওরূপেই দেখিতে পায় না এবং তাহা যে মৃত্তিকানির্মিত, তাহাও বুঝিতে পারে। যতবারই ঘটটীকে দেখিবে, ততবারই উল্লিখিতরূপ অনুভূতি হইবে। কখনও কাহারও নিকটেই ঘটটীকে মিথ্যা বলিয়া মনে হইবে না, পরন্তু মৃৎপিণ্ডের ন্যায় সত্য বলিয়াই—বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট বলিয়াই—মনে হইবে। ঘট যে সত্য, বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট—ইহাই তাহার প্রমাণ। এই দৃষ্টান্ত-সাদৃশ্যে শ্রুতি দেখাইলেন—মৃৎপিণ্ডের বিকার ঘটের ন্যায় ব্রহ্মবিকার বা ব্রহ্ম-পরিণাম জগৎ-প্রপঞ্চও সত্য। এই প্রসঙ্গে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"-বাক্যে বলা হইল—ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য মৃদ্‌বিকার ঘটাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে পরিচিত হইলেও তাহারাও যে মৃত্তিকা—ইহাই সত্য। তদ্রূপ ব্রহ্মপরিণাম জগৎ-প্রপঞ্চও যে ব্রহ্ম—ঘটাদির উপাদান যেমন মৃত্তিকা, তদ্রূপ জগৎ-প্রপঞ্চের উপাদানও যে ব্রহ্ম—ইহাই সত্য; অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চও সত্য। উপাদানাংশে মৃণ্ময় ঘটাদি যেমন মৃৎপিণ্ড হইতে অনন্য—অভিন্ন, তদ্রূপ উপাদানাংশে জগৎ-প্রপঞ্চও ব্রহ্ম হইতে অনন্য—অভিন্ন। "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ॥ ২।১।১৪॥"-ব্রহ্মসূত্রেও ব্যাসদেব তাহা বলিয়া গিয়াছেন। জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াই এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাও—একমাত্র ব্রহ্মের বিজ্ঞানে সমস্তের জ্ঞানলাভরূপ প্রতিজ্ঞাও—সিদ্ধ হইতে পারে। মৃৎপিণ্ডের ও মৃণ্ময় দ্রব্যাদির দৃষ্টান্তের ইহাই তাৎপর্য্য। স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের এবং লৌহ ও লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যের দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্যও উল্লিখিতরূপই।

কিন্তু শুক্তি-রজতাদির দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্য হইতেছে অন্যরূপ। যে স্থানে একটী শুক্তি থাকে, সে স্থানে শুক্তি-স্থলে সকলেই যে রজত দেখে, তাহা নয়। অনেকেই রজত দেখে না, শুক্তিমাত্রই দেখে। যাহারা রজত দেখে, তাহারাও রজতকে শুক্তিময়রূপে দেখে না এবং সকল সময়েও শুক্তি-স্থলে রজত দেখে না। যাহারা শুক্তিস্থলে একবার রজত দেখিয়াছে, তাহারাও পরে সে-স্থলে রজতের পরিবর্ত্তে শুক্তি দেখিয়া থাকে; তখন বুঝিতে পারে, তাহাদের দৃষ্ট রজত বাস্তবিক মিথ্যা, সত্য নহে। যখন শুক্তি দৃষ্ট হয়, তখন কিন্তু রজত দৃষ্ট হয় না। ইহাই রজতের মিথ্যাত্বের প্রমাণ। ঘটাদির

দর্শন-কালে, তাহারা যে মৃণ্ময়, তাহাও অনুভূত হয় এবং এই অনুভূতি কখনও অন্তর্হিত হয় না। কিন্তু শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজত শুক্তিময় বা শুক্তিনির্ম্মিত, রজতের উপাদান শুক্তি—এইরূপ জ্ঞান কখনও হয় না। রজত মিথ্যা—এইরূপ জ্ঞানই জন্মে এবং এই জ্ঞানই স্থায়িত্ব লাভও করে। মৃণ্ময় ঘটাদির দৃষ্টান্তে ঘটাদির মিথ্যাত্বের জ্ঞান কখনও জন্মে না।

এইরূপই হইতেছে মৃৎপিণ্ড-মৃণ্ময়দ্রব্যাদির দৃষ্টান্ত হইতে শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের পার্থক্য। রজ্জু-সর্প বা মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্যও শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের অনুরূপই।

শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তি ও রজত অনন্য বা অভিন্ন নহে; কেন না, শুক্তি কখনও রজতের উপাদান হইতে পারে না। ব্রহ্ম ও জগৎ-প্রপঞ্চের সম্বন্ধ যদি শুক্তি-রজতের অনুরূপই হয়, তাহা হইলে জগৎ-প্রপঞ্চের ও ব্রহ্মের—কার্য্য ও কারণের—অনন্যত্ব বা অভিন্নত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না এবং তাহাতে "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ॥২।১।১৪॥"-ব্রহ্মসূত্রও নিরর্থক হইয়া পড়ে। আবার শুক্তি রজতের উপাদান নহে বলিয়া শুক্তির জ্ঞানে যেমন রজতের জ্ঞান জন্মিতে পারে না, তদ্রূপ রজতের ন্যায় জগৎ-প্রপঞ্চও যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলেও ব্রহ্মের বিজ্ঞানে জগতের বিজ্ঞান জন্মিতে পারে না। তাহাতে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-প্রতিজ্ঞাও অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

শ্রুতি যখন শুক্তি-রজতাদির দৃষ্টান্ত না দেখাইয়া মৃৎপিণ্ডাদির দৃষ্টান্তই দেখাইয়াছেন, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায় যে, শ্রুতির অভিপ্রায় হইতেছে এইরূপঃ—মৃৎপিণ্ডের সহিত মৃদ্বিকার ঘটাদির যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রহ্মের সহিতও ব্রহ্ম-পরিণাম জগৎ-প্রপঞ্চের তদ্রূপ সম্বন্ধ। মৃৎপিণ্ড যেমন ঘটাদির উপাদান, ব্রহ্মও তেমনি জগতের উপাদান। মৃৎ-পরিণাম ঘটাদি যেমন সত্য, ব্রহ্ম-পরিণাম জগৎও তদ্রূপ সত্য।

জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনই যদি শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে মৃৎ-পিণ্ডাদির পরিবর্ত্তে শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তই অবতারিত হইত। আবার, জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম যে স্বরূপে অবিকৃত থাকেন, ঊর্ণনাভির দৃষ্টান্তে শ্রুতি তাহাও দেখাইয়াছেন।

মৃৎপিণ্ডাদি যে সকল দৃষ্টান্তের সংশ্রবে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্" ইত্যাদি বাক্যটী কথিত হইয়াছে, সেই সকল দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়াই "বাচারম্ভণম্"-বাক্যটীর অর্থ করিতে হইবে। বস্তুতঃ এই বাক্যটীর সহজ এবং স্বাভাবিক অর্থ যে মৃৎপিণ্ডাদির দৃষ্টান্তের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে বাক্যটীর স্বাভাবিক অর্থ নহে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বাক্যটীকে অবলম্বন করিয়া তিনি যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার সহিত মৃৎপিণ্ডাদির দৃষ্টান্তের কোনওরূপ সঙ্গতিই দৃষ্ট হয় না। তাঁহার কৃত অর্থ বরং শুক্তি-রজতাদির দৃষ্টান্তের সহিতই সামঞ্জস্যপূর্ণ। কিন্তু শ্রুতি যখন শুক্তিরজতাদির দৃষ্টান্ত দেখান নাই, তখন শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থকে শ্রুতির অভিপ্রেত অর্থ বলিয়া গ্রহণ করা সঙ্গত হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করের কৃত অর্থ

বিবর্ত্তের সমর্থক, বিকারের সমর্থক নাই। কিন্তু শ্রুতি সর্ব্বত্র "বিকার"-শব্দেরই উল্লেখ করিয়াছেন, কোনও স্থলেই "বিবর্ত্ত"-শব্দের উল্লেখ করেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—বিবর্ত্ত শ্রুতির অভিপ্রেত নহে।

৪২। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি ততো ব্রবীতি চ ভূয়ঃ ॥৩।২।২২॥"—এই ব্রহ্মসূত্রের শ্রীপাদ শঙ্করকৃত অর্থ

পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।১৭ অনুচ্ছেদে উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রের শ্রীপাদ শঙ্করকৃত অর্থের আলোচনা করা হইয়াছে; সুতরাং এ-স্থলে তাহার পুনরালোচনা অনাবশ্যক।

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যেও শ্রীপাদ দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে—জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্মের বিবর্ত্ত এবং তাঁহার উক্তির সমর্থনে তিনি "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন।

সূত্রকার ব্যাসদেব "দ্বে বাব ব্রহ্মণো রূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামূর্ত্তঞ্চ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যকে ভিত্তি করিয়াই উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রের অবতারণা করিয়াছেন। এই সূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—ব্রহ্ম সম্বন্ধে প্রস্তাবিত মূর্ত্তামূর্ত্তরূপের এতাবত্ত্বই (এতৎ-পরিমাণত্বই) নিষিদ্ধ হইয়াছে। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি।" মূর্ত্ত বলিতে যে ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ এই তিনটী ভূতকে এবং অমূর্ত্ত বলিতে যে মরুৎ ও ব্যোম—এই দুইটী ভূতকে বুঝায়, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। এই দুইটীকে ব্রহ্মের রূপ বলা হইয়াছে—"দ্বে বাব ব্রহ্মণোরূপে মূর্ত্তঞ্চৈবামমূর্ত্তঞ্চ।" অর্থাৎ, পঞ্চ-ভূতাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চকে ব্রহ্মের রূপ বলা হইয়াছে। তাহাতে আশঙ্কা হইতে পারে—জগৎ-প্রপঞ্চ যখন ব্রহ্মের রূপ, তখন জগৎ-প্রপঞ্চের যে পরিমাণ বা আয়তন, ব্রহ্মেরও সেই পরিমাণই, সেই আয়তনই; ব্রহ্ম জগদতিরিক্ত নহেন। এই আশঙ্কার নিরসনের নিমিত্ত উল্লিখিত সূত্রে ব্যাসদেব বলিয়াছেন—

"প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি—প্রকৃত (প্রস্তাবিত) এতাবত্ত্বই (জগৎ-প্রপঞ্চের পরিমাণত্বই) প্রতিষিদ্ধ বা নিষিদ্ধ হইয়াছে।" অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মের রূপ বটে; তাহা বলিয়া জগৎ-প্রপঞ্চের যে পরিমাণ, ব্রহ্মের কিন্তু সেই পরিমাণ নহে। ইহাই "এতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি"-বাক্যের তাৎপর্য্য। "এতৎ"-শব্দের উত্তর পরিমাণ-অর্থে "বতুপ্"-প্রত্যয় করিয়া "এতাবৎ" শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে—অর্থ এতৎ পরিমাণম্ অস্য—ইহাই ইহার পরিমাণ।

"এতাবৎ"-এর-ভাব হইল "এতাবত্ত্ব—এতাদৃশ-পরিমাণত্ব।" সুতরাং "এতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি" বাক্যের অর্থ যে—"এতাদৃশ-পরিমাণত্বই নিষেধ করা হইতেছে," তাহা সহজেই বুঝা যায়। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—জগৎ-প্রপঞ্চের যে পরিমাণ, ব্রহ্মসম্বন্ধে সেই পরিমাণই নিষিদ্ধ হইয়াছে, জগৎ-প্রপঞ্চ নিষিদ্ধ হয় নাই। যদি জগৎ-প্রপঞ্চের নিষেধই ব্যাসদেবের বা

শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে পরিমাণ-সূচক "এতাবত্ত্ব'-শব্দের প্রয়োগ না করিয়া "এতৎ"-শব্দেরই প্রয়োগ করা হইত। "এতৎ" এবং "এতাবৎ" সমানার্থক নহে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে বলিয়াছেন—উল্লিখিত সূত্রে জগৎ-প্রপঞ্চের বাস্তব অস্তিত্বই নিষিদ্ধ হইয়াছে। এইরূপ অর্থ হইতে বুঝা যায়—"এতৎ"-অর্থেই তিনি "এতাবৎ"-শব্দকে গ্রহণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা বিচারসহ নহে ; কেননা, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "এতৎ" ও "এতাবৎ" একার্থক নহে। এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর "বতুপ্"-প্রত্যয়ের অর্থকে, অর্থাৎ "বতুপ্"-প্রত্যয়টীকে, বাদ দিয়াই সূত্রের ভাষ্য করিয়াছেন। "বতুপ্"-প্রত্যয়টীকে বাদ না দিলে তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ—জগৎ-প্রপঞ্চের বাস্তব-অনস্তিত্ব-বাচক অর্থ—পাওয়া যাইত না। "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-বাক্যের অর্থ-করণ-প্রসঙ্গে তিনি যে কৌশল অবলম্বন করিয়াছেন, আলোচ্য সূত্রের ভাষ্যেও সেইরূপ কৌশলেরই আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছেন। তাহার ফল হইয়াছে এই যে, 'বাচারম্ভণ"-বাক্যের তৎকৃত অর্থে যেমন শ্রুতির অর্থ প্রকাশ পায় নাই, আলোচ্যসূত্র-ভাষ্যেও ব্যাসদেবের (সুতরাং শ্রুতির) অভিপ্রেত অর্থ প্রকাশ পাইতে পারে নাই।

এইরূপে দেখা গেল – "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন, তাহা ব্যাসদেবের বা শ্রুতির অভিপ্রেত নহে। (বিস্তৃত আলোচনা পূর্ব্ববর্ত্তী ১।২।১৭-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)।

৪৩। তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৪॥ ব্রহ্মসূত্র॥

এই সূত্রের ভাষ্যেও শ্রীপাদ শঙ্কর জগতের মিথ্যাত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন।

ক। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

ব্যবহারিক ভোক্তৃ-ভোগ্য-বিভাগ স্বীকার করা হইলেও পরমার্থতঃ তদ্রূপ কোনও বিভাগই হয় না। কেননা, কার্য্য ও কারণের অনন্যত্বের কথাই শাস্ত্র হইতে জানা যায়। "যস্মাৎ তয়োঃ কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বম্ অবগম্যতে।" আকাশাদি বহু-পদার্থসমন্বিত এই জগৎ হইতেছে কার্য্য এবং তাহার কারণ হইতেছে পরব্রহ্ম। "কার্য্যমাকাশাদিকং বহুপ্রপঞ্চং জগৎ, কারণং পরং ব্রহ্ম।" সেই কারণ হইতে কার্য্যের পরমার্থতঃ অনন্যত্বই জানা যাইতেছে। অনন্যত্ব কি ? কারণ-ব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব। "তস্মাৎ কারণাৎ পরমার্থতোঽনন্যত্বং ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্য অবগম্যতে।"

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে "কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব"-ইহার অর্থ করিলেন—কারণব্যতিরেকে কার্য্যের অভাব—অনন্যত্বং ব্যাতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্য—অর্থাৎ, কারণই আছে, পরমার্থতঃ কার্য্য নাই। ব্রহ্মই আছেন, ব্রহ্মই সত্য ; কিন্তু ব্রহ্মকার্য্য জগৎ-প্রপঞ্চ নাই, তাহা মিথ্যা।

"ব্যতিরেকেণাভাবঃ কার্য্যস্য"-বাক্যের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে। যথা—কারণাতিরিক্ত কার্য্য নাই, অর্থাৎ কার্য্য কারণাতিরিক্ত নহে; কেননা, কারণই হইতেছে কার্য্যের উপাদান; যেমন মৃত্তিকা হইতেছে মৃত্তিকার কার্য্য মৃণ্ময়দ্রব্যের উপাদান। এই অর্থেই কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর এই অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

সত্য ও মিথ্যার অনন্যত্ব অসম্ভব

এ-স্থলে বক্তব্য এই। কারণ ব্রহ্ম এবং তাঁহার কার্য্য জগৎ—এই দুইটী বস্তুর উল্লেখ করিয়া যখন তাহাদের অনন্যত্বের (বা অভিন্নত্বের) কথা বলা হইয়াছে, তখন সেই বস্তুদুইটীর মধ্যে একটীর অস্তিত্ব আছে, অন্যটীর অস্তিত্ব নাই—ইহা কিরূপে হইতে পারে? দুইটীরই অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে অনন্য-শব্দেরই সার্থকতা থাকে না। সত্য ও মিথ্যা—এই দুইটী পদার্থের অনন্যত্ব কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না; সম্ভব হইতে পারে বলিয়া স্বীকার করিলে জগৎ-কারণ ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়েন; কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন মিথ্যাভূত জগৎ-প্রপঞ্চ হইতে অনন্য। "অনন্য"-শব্দের অর্থ হইতেছে—ন অন্য,—অন্য নহে, ভিন্ন নহে। মিথ্যাকে কখনও সত্য হইতে অনন্য বা অভিন্ন বলা যায় না। দুইটী বস্তুর অনন্যত্বের কথা বলিলে তাহাদের মধ্যে একটীর অভাবও সূচিত হইতে পারে না। অনন্য-শব্দের তাৎপর্য্যও অভাব সূচনা করে না।

যদি বলা যায়—শুক্তিতে যে রজতের ভ্রম হয়, সে-স্থলে তো রজতের বাস্তব অস্তিত্ব থাকে না। তদ্রূপ ব্রহ্মেও জগৎ-প্রপঞ্চের ভ্রম হয়; জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই,। প্রথমতঃ, শুক্তি রজতের কারণ নহে, শুক্তি হইতে রজত উৎপন্ন হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম যে জগতের কারণ, ব্রহ্ম হইতে যে জগতের উৎপত্তি হয়—ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। ব্রহ্মের সহিত জগতের যেরূপ সম্বন্ধ, শুক্তির সহিত রজতের সেরূপ সম্বন্ধ নহে। সুতরাং ব্রহ্ম-জগতের সম্বন্ধে শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের যৌক্তিকতা কিছু নাই। দ্বিতীয়তঃ, ব্রহ্ম ও জগৎকে সূত্রকার (স্বয়ং শ্রীপাদ শঙ্করও) অনন্য বলিয়াছেন; কিন্তু শুক্তি ও রজতকে অনন্য বলা হয় না। এই হিসাবেও শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের সার্থকতা কিছু নাই। তৃতীয়তঃ, কার্য্য হইতেছে কারণের অবস্থা-বিশেষ; রজত কিন্তু শুক্তির অবস্থাবিশেষ নহে। চতুর্থতঃ, কার্য্য হইতেছে কারণের বিকার। "একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিই তাহা বলিয়া গিয়াছেন। রজত কিন্তু হইতেছে শুক্তির বিবর্ত্ত—বিকার নহে। বিকার ও বিবর্ত্ত যে এক পদার্থ নহে, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। এ-সমস্ত কারণেও ব্রহ্ম-জগৎ-সম্বন্ধে শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর "অনন্য"-শব্দের যে তাৎপর্য্য ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা যুক্তিসঙ্গত নয়, শাস্ত্রসম্মতও নয়।

(১) বাচারম্ভণ-বাক্য বিবর্ত্ত-বাচক নহে

যাহা হউক, তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া তাহার অর্থ করিয়াছেন। তিনি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে বিচারসহ নয়, শ্রুতিসম্মতও নয়, পরন্তু শ্রুতিবিরুদ্ধ, তাহা পূর্ব্বেই (৩।৪১-খ—অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। সে-স্থলে তিনি "বিকার" ও "বিবর্ত্ত" একার্থক-রূপেই ধরিয়া লইয়াছেন। তাহাও অসঙ্গত।

জগৎ-প্রপঞ্চ যদি ব্রহ্মের বিবর্ত্তই হইত, তাহা হইলে সূত্রকার ব্যাসদেব অনন্যত্বের কথা বলিতেন না, বিবর্ত্তত্বের কথাই বলিতেন। বিবর্ত্তে অনন্যত্ব হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এই প্রসঙ্গে তিনি আর একটী শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। **"অপাগাৎ অগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্"**। সমগ্র শ্রুতিবাক্যটী এই—"যদগ্নে রোহিতং রূপং তেজসস্তদ্রূপম্, যচ্ছুক্লং তদপাম্, যৎ কৃষ্ণং তদন্নস্য ; অপাগাদগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্ ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৪।১॥" পূর্ব্বোল্লিখিত "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-ইত্যাদি বাক্যের যেরূপ অর্থ করিয়াছেন, শ্রীপাদ শঙ্কর "অপাগাৎ অগ্নেরগ্নিত্বং বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি বাক্যেরও তদ্রূপ অর্থেই তেজঃ, জল ও অন্নের (পৃথিবীর) বিকার অগ্নির মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিয়া তেজঃ, জল ও অন্নেরই সত্যত্ব স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন ; ফলতঃ, তিনি বলিতে চাহিয়াছেন—অগ্নি হইতেছে তেজঃ, জল ও অন্নের বিবর্ত্ত। কিন্তু এ-স্থলে বিবর্ত্ত যে শ্রুতির অভিপ্রেত নয়, বিকারই যে অভিপ্রেত, শ্রুতিকথিত "বিকার"-শব্দ হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবেই জানা যায়। এই বাক্যটীর সহজ, স্বাভাবিক এবং প্রকরণসঙ্গত অর্থ শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (১৪৬ পৃষ্ঠায়) এইরূপ লিখিয়াছেন—

"তস্য কারণনৈরপক্ষ্যেণানবস্থানাদিতি পুনর্দ্দর্শয়তি—'অপাগাৎ অগ্নেরগ্নিত্বম্ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং ত্রীণি রূপাণীত্যেব সত্যম্' ইতি। অত্র রূপত্রয়ং সূক্ষ্মরূপতেজোবন্নলক্ষণ-ব্যক্তাৎ (পাঠান্তর-লক্ষণাব্যক্তত্বাৎ) স্বতন্ত্রমগ্নেরগ্নিত্বং ন নিরূপণীয়মস্তীত্যর্থঃ। ন তু অসত্যমেবেতি বক্তব্যম্। সৎকার্য্যতাসম্প্রতিপত্তেঃ সর্ব্বকারণস্য পরমাত্মনঃ সর্ব্বদৈব ব্যতিরেকাসম্ভবাৎ।—কারণকে অপেক্ষা না করিয়া কার্য্য থাকিতে পারে না। ছান্দোগ্য-শ্রুতি তাহাই পুনরায় দেখাইতেছেন।

(এই প্রকার রূপত্রয়ের মিশ্রণে যে অগ্নির উদ্ভব হইয়াছে, সেই) অগ্নির অগ্নিত্ব চলিয়া গিয়াছে। বাক্যারব্ধ বিকার নামক বস্তুটী তেজঃ, জল ও অন্ন—এই তিনটী রূপ, ইহাই সত্য।' এ-স্থলে রূপত্রয় সূক্ষ্ম তেজঃ, জল ও অন্ন এই তিন লক্ষণে ব্যক্ত হইয়াছে বলিয়া অগ্নির স্বতন্ত্র অগ্নিত্ব নিরূপণীয় নহে। তাহা (অগ্নি) অসত্যও নহে। কেননা, সৎকার্য্যতা-সম্প্রতিপত্তির জন্য সর্ব্বকারণ পরমাত্মার ব্যতিরেক সর্ব্বদাই অসম্ভব (অর্থাৎ সৎ-বস্তু হইতে যে কার্য্যের উৎপত্তি, সেই কার্য্যেও সৎ থাকিবেই। সৎ স্বরূপ পরমাত্মাই সমস্তের কারণ ; সুতরাং সমস্ত ব্রহ্মকার্য্যেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম বা পরমাত্মা থাকিবেনই ; এজন্য কার্য্য অসত্য হইতে পারে না। ইহা স্বীকার না করিলে সৎ-কার্য্যতাই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। এজন্য তেজঃ, জল ও অন্নের বিকার অগ্নি অসত্য বা মিথ্যা নহে)।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এইরূপ অর্থের সঙ্গে "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন"-ইত্যাদি বাক্যের সঙ্গতি আছে। বস্তুতঃ "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন" ইত্যাদি বাক্যের বিবৃতিরূপেই "অপাগাৎ অগ্নেরগ্নিত্বম্"-ইত্যাদি বাক্য বলা হইযাছে।

যাহা হউক, আলোচ্য "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"-সূত্রের "আরম্ভণ"-শব্দে কোন্ শ্রুতি-বাক্যটী লক্ষিত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে যাইয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-বাক্যটীর উল্লেখ করিয়াছেন। তাহার পরে সূত্রস্থ "আদি"-শব্দে কোন্ কোন্ শ্রুতিবাক্য লক্ষিত হইয়াছে, তাহা দেখাইতে যাইয়া তিনি বলিয়াছেন—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বং, তৎ সত্যং স আত্মা, তত্ত্বমসি ॥ ছান্দোগ্য ॥৬।৮।৭॥", "ইদং সর্ব্বং, যদয়মাত্মা", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্", "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্" "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন" ইত্যেবমাত্মপ্যাত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতমুদাহর্ত্তব্যম্—'এই সমস্ত ব্রহ্মাত্মক, তিনি সত্য, তিনি আত্মা, তিনি তুমি হও', 'এই সমস্তই আত্মা', 'এই সমস্তই ব্রহ্ম', 'এই সমস্ত আত্মাই', 'নানা বলিয়া কিছু নাই'—এই জাতীয় আত্মার একত্ব-প্রতিপাদক বাক্যসমূহ উদাহরণ-রূপে গ্রহণীয়।"

ইহার পরেই শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"ন চ অন্যথা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে। তস্মাদ্ যথা ঘট-করকাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্যত্বম্, যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনামুষরাদিভ্যোঽনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ ত্বনুপাখ্যত্বাৎ, এবমস্য ভোগ্যভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চ-জাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেনাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।

—অন্যরূপে (অর্থাৎ এই সমস্তই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মই এই সমস্ত—ইহা স্বীকার না করিলে) এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইবে না। অতএব, যেমন ঘট-করকাদিমধ্যস্থ আকাশ মহাকাশ হইতে অনন্য, যেমন মৃগতৃষ্ণিকার জলাদি মরুভূমি-আদি হইতে অনন্য—যেহেতু তাহারা দৃষ্ট-নষ্ট-স্বরূপ (অর্থাৎ তাহারা দৃষ্ট হয় বটে, কিন্তু তাহাদের স্বরূপতঃ অস্তিত্ব নাই), তেমনি এই ভোগ্যভোক্তৃত্বাদি জগৎ-প্রপঞ্চও ব্রহ্মব্যতিরেকে অস্তিত্বহীন (অর্থাৎ ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে, জগতের কোনও অস্তিত্ব নাই, যদিও অস্তিত্ব আছে বলিয়া প্রতীত হয়)—ইহাই বুঝিতে হইবে।"

(২) জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"ইত্যাদি যে কয়টী শ্রুতিবাক্য শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে উদ্ধৃত করিয়াছেন, সেই কয়টী শ্রুতিবাক্য এবং এই জাতীয় অন্যান্য শ্রুতিবাক্যে যে জগৎ-প্রপঞ্চের ব্রহ্মাত্মকত্ব খ্যাপিত হইয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই। কিন্তু "ব্রহ্মাত্মক"-শব্দের তাৎপর্য্য কি ?

এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রসঙ্গেই শ্রুতি জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বের কথা বলিয়াছেন ; কেননা, জগৎ ব্রহ্মাত্মক না হইলে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে শ্রুতি সর্ব্বপ্রথমেই মৃৎপিণ্ডের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। একটী মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থ যেমন বিজ্ঞাত হয়, তেমনি এক ব্রহ্মের বিজ্ঞানেই সমস্ত জগৎ বিজ্ঞাত হইতে পারে। মৃণ্ময় পদার্থ যে মৃত্তিকার বিকার, তাহাও বলা হইয়াছে। "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্ মৃত্তিকা ইতি এব সত্যম্"।

মৃণ্ময়-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—মৃত্তিকাময়, মৃত্তিকাই তাহার উপাদান। এজন্যই মৃত্তিকাকে জানিলে মৃণ্ময় পদার্থকেও জানা সম্ভবপর হইতে পারে। তদ্রূপ ব্রহ্ম যদি সমস্ত জগতের উপাদান হয়েন, তাহা হইলেই ব্রহ্মকে জানিলে সমস্তকে জানা যাইতে পারে।

এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রুতি দেখাইয়াছেন— ব্রহ্ম তেজঃ, জল ও অন্নের সৃষ্টি করিয়াছেন। সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন সৎ-ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ", তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—তেজঃ, জল, ও অন্নের উপাদানও ব্রহ্মই ; কেননা, তখন অন্য উপাদানের অভাব।

তাহার পরে, তেজঃ, জল এবং অন্ন হইতে কিরূপে সমস্ত জগতের সৃষ্টি হইয়াছে, কিরূপে জীবাত্মারূপে ব্রহ্ম ঐ তিন বস্তুতে প্রবেশ করিয়া নাম-রূপাদির অভিব্যক্তি করিলেন, তাহা বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—"সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ॥ ছান্দোগ্য॥৬।৮।৪॥", "সোম্য বিজানীহি নেদমমূলং ভবিষ্যতীতি॥ ছান্দোগ্য॥৬।৮।৫॥", "সন্মূলমন্বিচ্ছ সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ॥ ছান্দোগ্য॥৬।৮।৬॥"

ইহা হইতে জানা গেল— শ্রুতি বলিতেছেন এই জগৎ মূলহীন নহে, অর্থাৎ কারণহীন নহে। সদ্ব্রহ্মই হইতেছেন এই জগতের মূল বা কারণ, সদ্ব্রহ্মই জগতের আশ্রয় এবং সদ্ব্রহ্মেই অন্তিমে জগতের লয়।

সদ্ব্রহ্মকে জগতের মূল বা কারণ বলাতে তিনি যে জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ—এই উভয়ই, তাহাও বলা হইয়া গেল। বেদান্তদর্শনও তাহাই প্রতিপন্ন করিয়াছেন (৩।৮—১০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ইহার পরেই শ্রুতি বলিয়াছেন—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্ তৎ সত্যম্, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো॥ ছান্দোগ্য॥৬।৮।৭"

ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—ব্রহ্ম জগতের উপাদান বলিয়াই জগৎকে "ঐতদাত্ম্যম্—ব্রহ্মাত্মক" বলা হইয়াছে ; কেননা, বস্তুমাত্রই উপাদানাত্মক। তারপর সঙ্গে সঙ্গেই সৎ-ব্রহ্মকে—উপাদানরূপ ব্রহ্মকে—সত্য বলা হইয়াছে। "তৎ সত্যম্।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে—জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম যখন সত্য, তখন উপাদানাত্মক জগৎও সত্য। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলা হইয়াছে "স আত্মা"—সেই সৎস্বরূপ ব্রহ্ম উপাদান হইয়াও সমস্তেরই আত্মা—অন্তর্য্যামী, নিয়ামক ; সমস্তের মধ্যে অবস্থিত থাকিয়া তিনি সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৭।৩॥" তারপর "তত্ত্বমসি"বাক্যেও সেই কথাই বলা হইয়াছে—জীবও ব্রহ্মাত্মক. জীবও সত্য এবং জীবের অন্তর্য্যামী নিয়ন্তাও তিনি।

"ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্", "অত্মৈবেদং সর্ব্বম্", "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম"-ইত্যাদি বাক্যেও জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বই—ব্রহ্মোপাদানকত্বই—কথিত হইয়াছে।

"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৪।১৯॥"-এই শ্রুতিবাক্যেও সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্বের—ব্রহ্মোপাদানকত্বের—কথাই বলা হইয়াছে। সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই নাই। জীব-জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়া ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন পদার্থ নহে। যিনি মনে করেন—এই জগতে নানা—ব্রহ্মাতিরিক্ত ভিন্ন ভিন্ন—পদার্থ আছে, তাঁহার যে ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তাহা সহজেই বুঝা যায় ; কেননা, ব্রহ্মজ্ঞান জন্মিলে তিনি বুঝিতে পারিতেন—সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মোপাদানক, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই নাই। ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে নাই বলিয়াই তিনি জন্ম-মৃত্যুর অতীত হইতে পারেন না, মৃত্যুর পর মৃত্যুকেই প্রাপ্ত হয়েন। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুম্ এতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" "ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নাই"—ইহার অর্থ এই নহে যে—"জগৎ বলিয়া কোনও বস্তুরই বাস্তব অস্তিত্ব নাই, কেবলমাত্র ব্রহ্মই আছেন।" কেননা, ব্রহ্ম যখন সত্য বস্তু এবং এই সত্যবস্তু ব্রহ্ম যখন জগতের উপাদান, তখন জগতের উপাদানও সত্য—বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট। সুতরাং জগৎও সত্য—বাস্তব অস্তিত্ব-বিশিষ্ট। জগৎ ব্রহ্মাত্মক, ব্রহ্মোপাদানক, বলিয়া ব্রহ্ম হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে ; যেমন, মৃণ্ময় ঘট-শরাবাদি মৃত্তিকা হইতে অতিরিক্ত—ভিন্ন—কোনও পদার্থ নহে, তদ্রূপ।

এইরূপে বিভিন্ন শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—ব্রহ্মাত্মকত্ব-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—ব্রহ্মোপাদানকত্ব ; ব্রহ্মই যাহার উপাদান, তাহাই ব্রহ্মাত্মক, তাহাই ঐতদাত্ম্য। ব্রহ্ম জগতের উপাদান বলিয়া এবং ব্রহ্ম সত্য বলিয়া ব্রহ্মাত্মক জগৎও সত্য—বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট। এজন্যই এক ব্রহ্মের বিজ্ঞানেই সমস্ত জগতের জ্ঞান জন্মিতে পারে ; যেমন একটী মৃৎপিণ্ডের বিজ্ঞানেই সমস্ত মৃণ্ময়—মৃত্তিকোপাদানক—বস্তুর জ্ঞান জন্মিতে পারে, তদ্রূপ। কার্য্যের মধ্যে উপাদানরূপে কারণ বিদ্যমান আছে বলিয়াই কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব—অভিন্নত্ব।

(৩) ব্রহ্মৈকত্ব

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ পূর্ব্বক শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতেছে "আত্মৈকত্ব-প্রতিপাদনপর।" অর্থাৎ, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহ আত্মার বা ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপাদন করিতেছেন। ব্রহ্ম যে এক এবং অদ্বিতীয়, তাহাতে কোনও সন্দেহই থাকিতে পারে না। "একমেবাদ্বিতীয়ম্।" ইতঃপূর্ব্বে যে-সকল শ্রুতিবাক্যের আলোচনা করা হইয়াছে, সে-সকল শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গিয়াছে—সৎ-ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় হইয়াও নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণরূপে জগৎ-প্রপঞ্চের স্মৃষ্টি করিয়াছেন। নামরূপাদিবিশিষ্ট জগৎ-প্রপঞ্চরূপে আত্ম-প্রকাশ করিয়াও তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব বা একত্ব তিনি রক্ষা করেন। জগৎ-প্রপঞ্চের স্মৃষ্টির পরে তিনি যে একাধিক হইয়া গেলেন, তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব যে নষ্ট হইয়া গেল, তাহা শ্রুতি কোথাও বলেন নাই। সমস্ত জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই তাঁহার অদ্বিতীয়ত্ব অক্ষুন্ন রহিয়াছে। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও পদার্থ কোথাও নাই, দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চ ব্রহ্মাত্মক—সুতরাং ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে। সুতরাং কারণরূপে তিনি যেমন অদ্বিতীয় ছিলেন, কার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও তিনি অদ্বিতীয়ই থাকেন। মৃত্তিকা ঘট-শরাবাদিতে পরিণত হইয়াও মৃত্তিকাই থাকে, রৌপ্যাদি অন্য কোনও পদার্থ হইয়া যায় না। সুতরাং ব্রহ্মাত্মক জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব ক্ষুন্ন হইতে পারে না।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর "ব্রহ্মৈকত্ব"-শব্দের উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্য গ্রহণ করেন না। তিনি বলেন—জগৎ-প্রপঞ্চের বাস্তব কোনও অস্তিত্বই নাই। একমাত্র ব্রহ্মই আছেন। জগদাদি কোনও বস্তুই নাই। তিনি ইহাও বলিয়াছেন—"ন চ অন্যথা একবিজ্ঞানেন সর্ব্ববিজ্ঞানং সম্পদ্যতে।—একমাত্র ব্রহ্মই আছেন, জগৎ-প্রপঞ্চের কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নাই, ইহা স্বীকার না করিলে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয় না।"

"এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান"-বাক্যের অন্তর্গত "সর্ব্ব"-শব্দেই একাধিক বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকৃত হইয়াছে। এই "সর্ব্ব"-শব্দে জগৎ-প্রপঞ্চকেই বুঝায়। জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহা হইলে "সর্ব্ব"-এর অস্তিত্ব নাই—ইহাই বুঝিতে হইবে। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার "বিজ্ঞান" কিরূপে থাকিতে পারে? এবং এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানই বা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে? সর্ব্বের—জগৎ-প্রপঞ্চের—অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে "সর্ব্ব-বিজ্ঞান"-শব্দের কোনও সার্থকতাই থাকিতে পারে না।

যদি বলা যায়—ইহার সার্থকতা আছে এই ভাবে যে—অজ্ঞলোক মিথ্যা জগৎকে সত্য বলিয়া মনে করে; যখন ব্রহ্ম-জ্ঞান লাভ হইবে, তখন বুঝিতে পারিবে—জগৎ সত্য নহে, মিথ্যা। পূর্ব্বে জগতের স্বরূপের জ্ঞান ছিল না, ব্রহ্মকে জানিলে সেই স্বরূপের—জগতের মিথ্যারের—জ্ঞান হয়। ইহাই সর্ব্ববিজ্ঞান।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানে জগতের স্বরূপ-জ্ঞান হয় না। মৃদ্বিকার

মিথ্যা, ইহা মৃদ্বিকারের স্বরূপের জ্ঞান নয়; মৃদ্বিকার মৃণ্ময়—মৃত্তিকাময়, মৃত্তিকোপাদানক, ইহা জানিলেই মৃদ্বিকারের স্বরূপের জ্ঞান জন্মিতে পারে; কেন না, শ্রুতি মৃদ্বিকারকে "মৃণ্ময়" বলিয়াছেন। মৃদ্বিকার বা জগৎ মিথ্যা—একথা শ্রুতি কোথাও বলেন নাই। সুতরাং জগতের মিথ্যাত্ব-জ্ঞানই জগতের স্বরূপের জ্ঞান—ইহা বলা বলা যাইতে পারে না। যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার আবার স্বরূপ কি?

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, জগৎ মিথ্যা, তাহা হইলেও প্রকরণগত অনন্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্কর যে অনন্যত্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা কিন্তু "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"-সূত্রের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তাঁহার উক্তির আলোচনাদ্বারাই তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(৪) **অনন্যত্ব**

জগতের মিথ্যাত্বের এবং একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্বের কথা বলিয়া এবং তাহাতেই একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হওয়ার কথা বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—

"তস্মাদ্ যথা ঘটকরকাদ্যাকাশানাং মহাকাশাদনন্যত্বং যথা চ মৃগতৃষ্ণিকোদকাদীনামূষরাদিভ্যোঽনন্যত্বং দৃষ্টনষ্টস্বরূপত্বাৎ, স্বরূপেণ ত্বনুপাখ্যত্বাৎ, এবমস্য ভোগ্যভোক্তৃত্বাদিপ্রপঞ্চজাতস্য ব্রহ্মব্যতিরেকেণাভাব ইতি দ্রষ্টব্যম্।

—অতএব, ঘটাকাশ যেমন মহাকাশ হইতে অনন্য, মৃগতৃষ্ণিকার জল যেমন উষরভূমি (মরুভূমি) হইতে অনন্য -যেহেতু, তাহা দৃষ্টনষ্টস্বরূপ,, তাহা আছে বলিয়া মনে হয়, বস্তুতঃ নাই—তেমনি, ভোগ্যভোক্তৃ-প্রপঞ্চেরও ব্রহ্মব্যতিরেকে অভাব, ইহাই বুঝিতে হইবে।"

এ-স্থলে, উপসংহার-বাক্যের সহিত মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্তের সঙ্গতি আছে; মৃগতৃষ্ণিকায় দৃষ্ট জলের যেমন বাস্তব অস্তিত্ব নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল মরুভূমিরই; তদ্রূপ, জগৎ-প্রপঞ্চেরও বাস্তব অস্তিত্ব নাই, অস্তিত্ব আছে কেবল ব্রহ্মেরই। ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের বক্তব্য। এ-স্থলে দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয়।

কিন্তু ঘটাকাশের দৃষ্টান্তটীর সঙ্গতি বুঝা যায় না। ঘটমধ্যস্থিত আকাশের যে অস্তিত্ব নাই তাহা নহে। বৃহদাকাশের যেমন অস্তিত্ব আছে, ঘটমধ্যস্থিত আকাশেরও তেমনি অস্তিত্ব আছে; বস্তুতঃ, বৃহদাকাশের এক অংশই ঘটমধ্যে অবস্থিত। এই দৃষ্টান্তটীর সঙ্গে যে উপসংহার-বাক্যের অন্বয় নাই, তাহাও বলা যায় না। কেননা, মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্তের পূর্ব্বে যেমন "যথা"-শব্দ আছে, তেমনি ঘটাকাশের দৃষ্টান্তের পূর্ব্বেও "যথা"-শব্দ আছে এবং মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্তের পূর্ব্বে অবস্থিত "যথা"-শব্দের সঙ্গে উপসংহার-বাক্যের পূর্ব্বে স্থিত "এবম্"-শব্দের যেমন অন্বয়, এই "যথা"-শব্দেরও তেমনি সেই "এবম্"-শব্দের সহিতই অন্বয়। এই অবস্থায় দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না। যেহেতু, ঘটমধ্যস্থিত আকাশের অস্তিত্ব আছে; কিন্তু জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব নাই বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্করই বলিয়াছেন। এইরূপে দেখা যায়—ঘটাকাশের দৃষ্টান্ত জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্বহীনতা সমর্থন করিতেছে না।

"অনন্য"-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। ঘটাকাশ এবং বৃহদাকাশের অনন্যত্ব অস্বীকার্য্য নহে; কিন্তু এ-স্থলে অনন্যত্ব-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে অভিন্নত্ব; কেননা, বৃহদাকাশে যে আকাশ, ঘটাকাশেও সেই আকাশ। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর মৃগতৃষ্ণিকার জল এবং মরুভূমিকে অনন্য বলিলেন কি অর্থে, তাহা বুঝা যায় না। কেননা মৃগতৃষ্ণিকা এবং মরুভূমি—ঘটাকাশ ও বৃহদাকাশের ন্যায়—এক এবং অভিন্ন নহে। মৃগতৃষ্ণিকার কোনও অস্তিত্বই নাই; কিন্তু মরুভূমির অস্তিত্ব আছে। অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তুর এবং অস্তিত্বহীন বস্তুর অনন্যত্বের তাৎপর্য্য নিশ্চয়ই অভিন্নত্ব হইতে পারে না। আবার, মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্তে তিনি ব্রহ্ম এবং মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চের অনন্যত্বও প্রদর্শন করিতে চাহিয়াছেন। সুতরাং এ-স্থলে "অনন্য"-শব্দের তাৎপর্য্য "অভিন্ন" হইতে পারে না। এক্ষণে দেখিতে হইবে—"অনন্য"-শব্দের আর কোনও অর্থ হইতে পারে কি না।

"অনন্য"-শব্দের একটী অর্থ হইতেছে—ন অন্য—অনন্য, অভিন্ন। ঘটাকাশ এবং বৃহদাকাশের মধ্যে এইরূপ অনন্যত্ব অর্থাৎ অভিন্নত্ব।

"অনন্য"-শব্দের আর একটী অর্থ হইতে পারে—ন নাস্তি অন্যৎ যস্মাৎ—যাহা হইতে অন্য কিছু নাই, যাহা ব্যতীত অন্য কোনও পদার্থই নাই; অর্থাৎ যাহা অদ্বিতীয়। মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্তে শ্রীপাদ শঙ্কর এইরূপ "অদ্বিতীয়" অর্থেই "অনন্য"-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। আর, মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্তে উপসংহার-বাক্যেও জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্বের কথা বলিয়া ব্রহ্মেরও "অদ্বিতীয়ত্বই" (অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত দৃশ্যমান অন্যবস্তুর অনস্তিত্বই) তিনি প্রদর্শন করিয়াছেন।

কিন্তু সংশয় জাগিতেছে এই যে—তিনি দুইটী দৃষ্টান্তে দুইটী ভিন্ন অর্থের ব্যঞ্জক "অনন্য"-শব্দের ব্যবহার করিয়া তাহাদের প্রত্যেকের সঙ্গেই উপসংহার-বাক্যের অন্বয় করিলেন কেন? উভয় অর্থেই ব্রহ্ম ও জগৎ-প্রপঞ্চ "অনন্য", ইহাই কি শ্রীপাদ শঙ্কর জানাইতে চাহেন?

কিন্তু তাহাও মনে হয় না। কেননা, তাঁহার মতে জগৎ যখন মিথ্যা এবং একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, তখন উভয়ের "অভিন্নত্ব" তাঁহার অভিপ্রেত হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না; যে হেতু, সত্য এবং মিথ্যা কখনও "অভিন্ন" হইতে পারে না। ঘটাকাশ এবং বৃহদাকাশ অভিন্ন বটে; কেননা, ঘটাকাশ মিথ্যা নহে। কিন্তু তাঁহার মতে জগৎ-প্রপঞ্চ তো মিথ্যা। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ঘটাকাশের দৃষ্টান্তটীর সঙ্গতি অবোধ্য।

মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্তের সঙ্গে যখন উপসংহার-বাক্যের সঙ্গতি রহিয়াছে, এবং যখন মরুভূমিরই অস্তিত্ব আছে, কিন্তু মৃগতৃষ্ণিকার অস্তিত্ব যখন নাই, তদ্রূপ তাঁহার মতে কেবল ব্রহ্মেরই যখন অস্তিত্ব আছে, কিন্তু জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্ব যখন নাই, তখন বুঝা যাইতেছে "অনন্য"-শব্দের পূর্ব্বোল্লিখিত "অদ্বিতীয়" অর্থই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রেত। "আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতমুদাহর্ত্তব্যম্"-বাক্যেও তিনি তদ্রূপ অভিপ্রায়ই প্রকাশ করিয়াছেন।

তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে জিজ্ঞাস্য এই যে, আলোচ্য "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"-সূত্রে ব্যাসদেব কি পূর্ব্বোল্লিখিত "অদ্বিতীয়ত্ব" অর্থেই "অনন্যত্ব"-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন?

"তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"-সূত্রে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্বই যে সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত, সূত্রটীর আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যায়।

"তদনন্যত্বম্"-শব্দের তুইরকম তাৎপর্য্য হইতে পারে। প্রথমতঃ, তস্য (ব্রহ্মণঃ) অনন্যত্বম্ (অদ্বিতীয়ত্বম্) – ব্রহ্মের অনন্যত্ব বা অদ্বিতীয়ত্ব (অর্থাৎ ব্রহ্মব্যতীত অন্য কিছুই নাই, দৃশ্যমান প্রপঞ্চগত-বস্তু সমূহও নাই ; কেবল কারণরূপ ব্রহ্মই আছেন, কার্য্যরূপ জগৎ নাই)। দ্বিতীয়তঃ, তয়োঃ (কার্য্য-কারণয়োঃ) অনন্যত্বম্—কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব, অভিন্নত্ব।

এখন দেখিতে হইবে—এই তুইটী অর্থের মধ্যে কোন্‌টী সূত্রের অভিপ্রেত। "আরম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"-হইতে তাহা নির্ণয় করা যায়।

"আরম্ভণ"-শব্দে যে "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"-এই বাক্যটীকে লক্ষ্য করা হইয়াছে, তাহা সমস্ত ভাষ্যকার এবং শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়াছেন। "একেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"-এই প্রসঙ্গেই "বাচারম্ভণম্"-আদি বাক্য বলা হইয়াছে। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—কারণরূপ মৃৎপিণ্ড এবং তাহার কার্য্যরূপ মৃণ্ময়দ্রব্যের প্রসঙ্গেই "বাচারম্ভণম্,"-বাক্য বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়, "বাচারম্ভণ-শব্দাদি" হইতে যে অনন্যত্বের কথা জানা যায়, তাহা হইতেছে "কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব—তয়োরনন্যত্বম্", তাহা "তস্য (ব্রহ্মণঃ) অনন্যত্বম্ – ব্রহ্মের অনন্যত্ব" নহে।

তুইটী বস্তুর উল্লেখ করিয়া তাহাদিগকে "অনন্য" বলিলে তাহাদের "অভিন্নত্বই" বুঝায়, "অদ্বিতীয়ত্ব" বুঝাইতে পারে না; কেননা, তুইটী বস্তুকে পাশাপাশি রাখিয়া তাহাদিগকে "অদ্বিতীয়" বলার কোনও অর্থই হয় না ; তাহাদের পরস্পরের সান্নিধ্যই তাহাদের প্রত্যেকটীর "সদ্বিতীয়ত্ব" প্রতিপাদন করিয়া থাকে। সুতরাং কার্য্য-কারণের "অনন্যত্ব" তাহাদের অভিন্নত্বই বুঝায়, "অদ্বিতীয়ত্ব" বুঝাইতে পারে না।

একটী মাত্র বস্তুর উল্লেখ করিয়া তাহাকে "অনন্য" বলিলেও "অভিন্নত্ব" বুঝাইতে পারে না ; কেননা, "অভিন্ন" বলিলেই অন্ততঃ তুইটী বস্তুর অস্তিত্ব ধ্বনিত হয়। এরূপ স্থলে "অনন্য"-শব্দে "অদ্বিতীয়ই" বুঝায়।

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-শ্রুতিবাক্য যখন কার্য্য ও কারণ—এই তুইটী বস্তুর প্রসঙ্গেই কথিত হইয়াছে, তখন "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"-সূত্রটীতে যে সেই তুইটী বস্তুর—কার্য্য ও কারণের—অনন্যত্ব বা অভিন্নত্বই অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। এই সূত্রের "অনন্যত্ব"-শব্দে "অদ্বিতীয়ত্ব" বুঝাইতে পারে না।

অথচ শ্রীপাদ শঙ্কর সূত্রস্থিত “অনন্যত্ব”-শব্দের “অদ্বিতীয়ত্ব” অর্থ গ্রহণ করিয়াই বলিয়াছেন—“আত্মৈকত্বপ্রতিপাদনপরং বচনজাতমুদাহর্ত্তব্যম্।” এবং তাঁহার নিজস্ব ভাবে কয়েকটী শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিয়া, “বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্”-বাক্যেরও তাঁহার কল্পিত অর্থের সহায়তায় সে-সকল শ্রুতিবাক্যের স্বকৃত অর্থের সমর্থন করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মকার্য্যরূপ জগতের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন পূর্ব্বক ব্রহ্মের “অদ্বিতীয়ত্ব” স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব অবশ্য কাহারওই অস্বীকার্য্য নহে; কিন্তু আলোচ্য সূত্রে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব-স্থাপন অভিপ্রেত নহে, কার্য্য-কারণের অভিন্নত্ব-স্থাপনই অভিপ্রেত।

এই আলোচনা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যে “অনন্য”-শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা ব্যাসদেবের সূত্রের অভিপ্রেত নহে, তাহা প্রকরণ-বহির্ভূত। তাঁহার অর্থে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব সিদ্ধ হয় না। মিথ্যা জগৎ এবং সত্য ব্রহ্ম এই দুই বস্তু কখনও অনন্য হইতে পারে না; এই দুই বস্তুকে অনন্য বলিলে জগৎ সত্য এবং ব্রহ্ম মিথ্যা—একথাও বলা যাইতে পারে। আলোচ্য সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজও এই কথাই বলিয়া গিয়াছেন। “যে তু কার্য্যকারণয়োরনন্যত্বং কার্য্যস্য মিথ্যাত্বাশ্রয়ণেন বর্ণয়ন্তি, ন তেষাং কার্য্য-কারণয়োরনন্যত্বং সিধ্যতি, সত্যমিথ্যার্থয়োরৈক্যানুপপত্তেঃ; তথা সতি ব্রহ্মণো মিথ্যাত্বং জগতঃ সত্যত্বং বা স্যাৎ।”

আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রের অভিপ্রায় হইতেছে কার্য্যকারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রদর্শন। কার্য্য ও কারণ—এই উভয়কে সত্যরূপে গ্রহণ করিয়াই এই অভিন্নত্ব প্রদর্শিত হইয়াছে। কারণ-স্বরূপ ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মকার্য্যস্বরূপ জগতের অভিন্নত্ব ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের বিরোধীও নহে, বরং তাহা অদ্বিতীয়ত্বের সমর্থকই। কেননা, কারণরূপে যেই ব্রহ্ম, কার্য্যরূপেও সেই ব্রহ্মই। কার্য্য-কারণের অভিন্নত্ববশতঃ কার্য্যের সত্যত্ব বা অস্তিত্ব স্বীকারে ভেদের প্রসঙ্গও উঠিতে পারে না। দুইটী বস্তু যদি পরস্পর নিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলেই তাহাদের একটীকে অপরটীর ভেদ বলা সঙ্গত হয়। কার্য্য কিন্তু কারণ-নিরপেক্ষ নহে; এজন্য তাহাদের মধ্যে ভেদের প্রসঙ্গ উঠিতে পারে না।

খ। শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

“তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ”—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ যাহা বলিয়াছেন, মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয়ের ভাষ্যানুবাদের আনুগত্যে এ-স্থলে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

“আরম্ভণ-শব্দাদি” হইতে জানা যাইতেছে যে, পরম-কারণ ব্রহ্ম হইতে জগৎ অনন্য—অভিন্ন।

"আরম্ভণ-শব্দাদি"—ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে—যে সমস্ত বাক্যের আদিতে "আরম্ভণ"-শব্দ আছে, সে-সমস্ত বাক্যই "আরম্ভণ-শব্দাদি।" সে-সমস্ত বাক্য হইতেছে এই :—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্॥ (ছান্দোগ্য ॥ ৬।১।৪॥)", "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেক-মেবাদ্বিতীয়ম্, তদৈক্ষত—বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত (ছান্দোগ্য ॥ ৬।২।১॥)," "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য (ছান্দোগ্য ॥৬।৩।৩॥)," "সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ * * * ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্, তৎ সত্যম্, স আত্মা, তত্ত্বমসি শ্বেতকেতো (ছান্দোগ্য ॥৬।৮।৬—৭॥)" ইত্যাদি। ভিন্ন ভিন্ন প্রকরণস্থিত এই জাতীয় বাক্যসমূহই এই সূত্রে "আদি"-শব্দে লক্ষিত হইয়াছে। কেননা, এই জাতীয় অপরাপর বাক্যসমূহও চেতনাচেতনাত্মক জগৎকে পরব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অভিন্ন বলিয়া প্রতিপাদন করিয়াছে।

আরুণি উদ্দালক গুরুগৃহ হইতে প্রত্যাগত তাঁহার অবিনীত পুত্র শ্বেতকেতুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি, অমতং মতম্, অবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্ (ছান্দোগ্য ॥৬।১।৩॥)—যাহাতে অশ্রুত বিষয়ও শ্রুত হয়, চিন্তিত বিষয়ও চিন্তাপথে উদিত হয়, অবিজ্ঞাত পদার্থও বিজ্ঞাত হয়"—সেই বস্তুটীর কথা কি তোমার গুরুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলে? এই শ্রুতিবাক্যে নিখিল জগতের ব্রহ্মৈককারণত্ব এবং কারণ হইতে কার্য্যের অভিন্নত্বই অভিপ্রেত হইয়াছে। কারণ-স্বরূপ-ব্রহ্মবিজ্ঞানে তৎকার্য্যভূত সর্ব্বজগতের বিজ্ঞানই হইতেছে এ-স্থলে প্রতিপাদ্য বিষয়। এক বিষয়ের জ্ঞানে কিরূপে অন্য বিষয়ের জ্ঞান (অর্থাৎ এক ব্রহ্মের জ্ঞানে কিরূপে সর্ব্বজগতের জ্ঞান) সম্ভবপর হইতে পারে, শ্বেতকেতুকে তাহা বুঝাইবার জন্যই উদ্দালক বলিয়াছেন—"যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ—হে সোম্য! এক মৃৎপিণ্ডের জ্ঞানে যেমন সমস্ত মৃণ্ময় পদার্থ বিজ্ঞাত হয়," তদ্রূপ। লৌকিক জগতের সর্ব্বজন-বিদিত একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে কার্য্য-কারণের অভিন্নতা প্রদর্শিত হইয়াছে।

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য এই যে— ঘটশরাবাদি মৃণ্ময় পদার্থগুলি মৃত্তিকা হইতেই উৎপন্ন—সুতরাং মৃত্তিকা হইতে অনতিরিক্ত দ্রব্য। এজন্যই মৃত্তিকার জ্ঞানেই ঘট-শরাবাদি মৃণ্ময় দ্রব্যের জ্ঞান জন্মিতে পারে।

কণাদবাদীরা বলেন—কারণ এক বস্তু এবং কার্য্য অপর একটী বস্তু, কার্য্য ও কারণ অভিন্ন নহে। এই মতের খণ্ডনার্থ এবং কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের জন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"-ইতি।

[এ-স্থলে শ্রীপাদ রামানুজ "বাচারম্ভণম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিয়াছেন। সেই অর্থ পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে (৩।৩৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সেই অর্থের সারমর্ম্ম হইতেছে এই—ব্যবহারের সিদ্ধির নিমিত্ত মৃণ্ময় পদার্থকে ঘট-শরাবাদি নামে অভিহিত করা হয়। 'জল আনার জন্য ঘট প্রস্তুত কর, বা করি'—ইত্যাদি বাক্যপূর্ব্বক বা সঙ্কল্পপূর্ব্বকই মৃণ্ময় দ্রব্যাদির প্রস্তুতি

আরম্ভ হয়। মৃৎপিণ্ড হইতে মৃণ্ময় দ্রব্যের নামাদি ভিন্ন হইলেও মৃণ্ময়দ্রব্য মৃত্তিকারই সংস্থান-বিশেষ বলিয়া, মৃত্তিকার বিকার মৃণ্ময় দ্রব্যাদিও যে মৃত্তিকা, মৃত্তিকাতিরিক্ত কোনও দ্রব্য নহে—ইহাই সত্য। সুতরাং মৃদ্বিকার ঘট-শরাবাদি মৃণ্ময় দ্রব্যও সত্য]।

প্রশ্ন হইতে পারে—যখন একটী মৃণ্ময় ঘট নষ্ট হইয়া যায়, তখনও তাহার কারণ মৃত্তিকা বর্ত্তমান থাকে, মৃত্তিকা নষ্ট হয় না। কার্য্য-কারণ অভিন্ন হইলে কার্য্য-ঘট নষ্ট হইলে কারণ-মৃত্তিকাও নষ্ট হইত। তাহা যখন হয় না, তখন কার্য্য-কারণকে অভিন্ন বলা যায় কিরূপে ?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে কারণভূত দ্রব্যের অবস্থাবিশেষ ; সুতরাং উল্লিখিত প্রশ্নের অবকাশ নাই। একই দ্রব্য—যেমন মৃত্তিকা—যখন বিশেষ বিশেষ অবস্থা লাভ করে, বা বিশেষ অবস্থায় অভিব্যক্ত হয়, তখন তাহার বিশেষ বিশেষ নাম ও কার্য্যাদি হইয়া থাকে—যেমন একই মৃত্তিকা সংস্থান-বিশেষে ঘট-শরাবাদি নামে পরিচিত হয়, ঘট-শরাবাদির কার্য্যও বিভিন্ন হয়। সকল অবস্থাতে কিন্তু একই কারণ-দ্রব্য বিদ্যমান থাকে—ঘট-শরাবাদিতেও মৃত্তিকা বিদ্যমান থাকে। উৎপত্তি কি ? ঘটের যে সংস্থান বা আকৃতি আদি, সেই সংস্থানের সহিত মৃত্তিকার যোগই হইতেছে ঘটের উৎপত্তি। আর বিনাশ কি ? ঘট-কারণ মৃত্তিকা যখন ঘটত্বের সংস্থান ত্যাগ করিয়া অন্যরূপ সংস্থানে অবস্থিত হয়, তখনই হয় ঘটের বিনাশ। সুতরাং কার্য্যের উৎপত্তি ও বিনাশ হইতেছে কারণ-দ্রব্যের সংস্থান-বিশেষ। সকল অবস্থাতেই কারণ-দ্রব্যের সত্তা বিদ্যমান থাকে। সুতরাং কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব স্বীকার করিলে যে কার্য্যের বিনাশে কারণেরও বিনাশ স্বীকার করিতে হইবে—ইহা বলা সঙ্গত হয় না।

ঘটোৎপত্তির পূর্ব্ববর্ত্তী কপালত্ব, চূর্ণত্ব ও পিণ্ডরূপত্ব এই তিনটী অবস্থা পরিত্যাগ করিয়া মৃত্তিকা যেমন ঘটাকার অবস্থাবিশেষ প্রাপ্ত হইয়া থাকে, তেমনি আবার ঘটাকার একত্বাবস্থা পরি-ত্যাগ করিয়া বহুত্বাবস্থা, পুনরায় সেই বহুত্বাবস্থা পরিত্যাগ করিয়া একত্বাবস্থা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। ইহাতে কোনওরূপ বিরোধ নাই।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্ (ছান্দোগ্য ॥৬।২।১॥)"—এই শ্রুতিবাক্যে "ইদম্' কে "সৎ" এবং "এক অদ্বিতীয়" বলা হইয়াছে। "ইদম্"শব্দে নামরূপে অভিব্যক্ত বিবিধ বৈচিত্র্যময় পরিদৃশ্যমান জগৎকে বুঝাইতেছে। স্বষ্টির পূর্ব্বে তাহা নামরূপে অভিব্যক্ত ছিল না, বিবিধ বৈচিত্র্যময়ও ছিল না। তখন অনভিব্যক্তরূপে "সৎ"-এর সঙ্গে একীভূত হইয়াই ছিল। সেই সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন সৎ-সরূপ ব্রহ্মব্যতীত তখন অন্য কোনও অধিষ্ঠাতাও ছিল না ; এজন্য "অদ্বিতীয়" বলা হইয়াছে। ইহাদ্বারা জগতের এবং তৎকারণ সৎ-ব্রহ্মের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্বই প্রতিপাদিত হইয়াছে ; কেননা, জগৎ যদি সৎ-ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন হইত, তাহা হইলে "এই জগৎ পূর্ব্বে সৎ—সৎ-ব্রহ্ম-ছিল"—একথা বলা হইত না এবং সেই সৎ-ব্রহ্মকে "এক এবং অদ্বিতীয়ও" বলা হইত না।

জগৎ তাঁহা হইতে পৃথক্ হইলে জগৎ হইত তাঁহা হইতে "দ্বিতীয়" একটী বস্তু, তখন সৎ-ব্রহ্ম হইতেন "সদ্বিতীয়"—সুতরাং তাঁহাকে তখন "একই—একমেব" বলাও সঙ্গত হইত না।

আবার, "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয় (ছান্দোগ্য।৬।২।৩॥)—তিনি (সেই এক এবং অদ্বিতীয় সৎ ব্রহ্ম) আলোচনা করিলেন—আমি বহু হইব, জন্মিব"—এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়—সেই এক এবং অদ্বিতীয় সৎ-স্বরূপ ব্রহ্মই নিজেকে—স্রষ্টব্য তেজঃপ্রভৃতি বিবিধ স্থাবর-জঙ্গমাকারে অভিব্যক্ত করার সঙ্কল্প করিয়াছেন। এইরূপ সঙ্কল্পপূর্ব্বক তিনি যে তাঁহার সঙ্কল্পিত জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহার উল্লেখও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। ইহা হইতেও অবধারিত হইতেছে যে—কার্য্যস্বরূপ এই জগৎ পরব্রহ্ম হইতে অনন্য বা অভিন্ন পদার্থ।

প্রশ্ন হইতে পারে—সৎ-শব্দবাচ্য পরব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বজ্ঞ, সত্য-সঙ্কল্প এবং সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত। অথচ "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"-এই বাক্যে সেই ব্রহ্মেরই জগদ্রূপত্বের কথা বলা হইয়াছে। ইহা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে? সৎ-শব্দবাচ্য জগতের যে নাম-রূপকৃত বিভাগের অভাবে একত্ব এবং অপর কোনও অধিষ্ঠাতার অনপেক্ষত্ব, পুনরায় তাঁহারই আবার বিচিত্র স্থাবর-জঙ্গমাত্মক-জগদাকারে বহুভাব-ধারণ-বিষয়ক সঙ্কল্প এবং সঙ্কল্পানুরূপ সৃষ্টি—এ সমস্তই বা কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—

"সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতম্ (ছান্দোগ্য॥ ৬।৩।২)—সেই এই দেবতা সঙ্কল্প করিলেন—আমি এই তিন দেবতার (তেজঃ, জল ও পৃথিবীর) অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া নাম ও রূপ প্রকটিত করিব, তাহাদের প্রত্যেকটীকে ত্রিবৃৎ ত্রিবৃৎ (অর্থাৎ ভূতত্রয়াত্মক) করিব" ইত্যাদি। এ-স্থলে "তিস্রোদেবতাঃ"-এই কথায় নিখিল অচেতন বস্তুর নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। স্বাত্মক-জীবাত্মারূপে এই নিখিল অচেতন বস্তুরূপ জগতের মধ্যে অনুপ্রবেশ করিয়া সৎ-স্বরূপ ব্রহ্ম তাহাকে বিচিত্র-নামরূপাত্মক করিবেন—ইহাই উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে। "অনেন জীবেন আত্মনা" ইত্যাদি বাক্যের অর্থ—মদাত্মক-জীবরূপ আত্মা দ্বারা অভ্যন্তরে প্রবেশপূর্ব্বক এই জগৎকে বিচিত্র-নামরূপ-বিশিষ্ট করিব। ইহার তাৎপর্য্য হইল এই যে—তিনি জীবাত্মারূপে অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়াছেন বলিয়াই নিজের এবং জীবের নামরূপবিশিষ্টত্ব সম্ভবপর হইয়াছে। পরব্রহ্ম যে জীবসমন্বিত জগতের অভ্যন্তরে প্রবিষ্ট আছেন, অন্য শ্রুতি হইতেও তাহা জানা যায়। যথা, "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ, তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ (তৈত্তিরীয়॥ আনন্দবল্লী॥ ৬।২॥)—তিনি জগতের সৃষ্টি করিয়া তাহার মধ্যে প্রবেশ করিলেন। তাহার মধ্যে প্রবেশ করিয়া সৎ (প্রত্যক্ষবস্তু) এবং ত্যৎ (পরোক্ষ বস্তু) হইলেন।" কার্য্যাবস্থ ও কারণাবস্থ এবং

স্থূল ও সূক্ষ্ম চেতনাচেতন বস্তুনিচয় যে পরব্রহ্মের শরীর এবং পরব্রহ্মই যে তৎ-সমুদয়ের শরীরী বা আত্মা —তাহা আন্তর্য্যামি-ব্রাহ্মণাদি গ্রন্থেও বলা হইয়াছে।

এ-বিষয়ে পূর্ব্বে যে অনুপপত্তির আশঙ্কা করা হইয়াছিল, ইহা দ্বারা তাহাও নিবস্ত হইল। পরব্রহ্ম আত্মারূপে অধিষ্ঠিত থাকিয়া চেতনাচেতন-বস্তুময় জগতে নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিলেন—এই কথা বলায়, প্রকৃতপক্ষে চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুময় শরীরধারী ব্রহ্মই "জগৎ"-শব্দবাচ্য হইতেছেন। সুতরাং "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"—ইত্যাদি সমস্ত বাক্যই সুন্দররূপে উপপন্ন হইতেছে।

আর, যত বিকার এবং যত অপুরুষার্থ আছে, তৎসমস্তই হইতেছে ব্রহ্মশরীরভূত চেতনাচেতন-পদার্থগত; সুতরাং ব্রহ্মের নির্দ্দোষত্ব এবং সর্ব্ববিধ কল্যাণগুণাকরত্বও সুপ্রতিষ্ঠিত হইল। "অধিকন্তু ভেদনির্দ্দেশাৎ ॥"-এই (২।১।২২) ব্রহ্মসূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-এই শ্রুতিবাক্যও চেতনাচেতনাত্মক সমস্ত জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বের কথাই বলিয়াছেন। "তত্ত্বমসি"-বাক্যও তাহারই উপসংহার করিয়াছেন। আবার, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম ॥ (ছান্দোগ্য ৩।১৪।১)", "আত্মনি খল্বরে দৃষ্টে শ্রুতে মতে বিজ্ঞাতে ইদং সর্ব্বং বিদিতম্ ॥ (বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৫।৬॥", "ইদং সর্ব্বং যদয়মাত্মা", "ব্রহ্মৈবেদং সর্ব্বম্", "আত্মৈবেদং সর্ব্বম্ ॥ (ছান্দোগ্য ॥ ৭।২৫।২॥)"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্ম ও জগতের অনন্যত্বই (অভিন্নত্বই) খ্যাপিত হইয়াছে। আবার, কতকগুলি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্ম ও জগতের ভিন্নত্ব নিষিদ্ধ করিয়াও অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। যথা, "সর্ব্বং তং পরাদাৎ যোঽন্যত্রাত্মনঃ সর্ব্বং বেদ—যিনি সর্ব্বপদার্থকে আত্মা হইতে অন্যত্র (অর্থাৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন) বলিয়া মনে করেন, সর্ব্বপদার্থই তাহাকে বঞ্চিত করে", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন, মৃত্যোঃ স মৃত্যুমাপ্নোতি য ইহ নানেব পশ্যতি। (বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৪।১৯ ॥)—ইহ জগতে নানা (ব্রহ্মভিন্ন) কিছু নাই, যিনি নানাত্বের ন্যায় দর্শন করেন, সেই ভেদদর্শী মৃত্যুর পর মৃত্যু প্রাপ্ত হয়", "যত্র হি দ্বৈতমিব ভবতি, তদিতর ইতরং পশ্যতি ; যত্র ত্বস্য সর্ব্বমাত্মৈবাভূৎ, তৎ কেন কং পশ্যেৎ—যখন দ্বৈতের ন্যায় হয়, তখনই অপরে অপরকে দর্শন করে ; কিন্তু যখন এ-সমস্তই ইহার আত্মস্বরূপ হইয়া যায়, তখন কে কিসের দ্বারা কাহাকে দর্শন করিবে।" এই সকল শ্রুতিবাক্যে অবিদ্বানের (যাহার ব্রহ্মজ্ঞান হয় নাই, তাহার) পক্ষে ভেদ-দর্শন, আর বিদ্বানের (ব্রহ্মজ্ঞান-সম্পন্ন লোকের) পক্ষে অভেদ-দর্শন প্রতিপাদিত করিয়া ব্রহ্ম ও জগতের তাত্ত্বিক অনন্যত্বই (অভিন্নত্বই) প্রতিপাদন করা হইয়াছে। এইরূপে "আরম্ভণ-শব্দাদি" পরম-কারণ ব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্বই (অভিন্নত্বই) প্রতিপাদিত করিয়াছে।

এই বিষয়ে প্রকৃত তত্ত্ব হইতেছে এই—চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুই ব্রহ্মের শরীর বলিয়া চেতনাচেতন সমস্ত-বস্তুবিশিষ্ট ব্রহ্মই "সর্ব্ব"-শব্দবাচ্য। সমস্ত চিদচিদ্‌বস্তু তাঁহার শরীর-স্থানীয় হইলেও কখনও বা তিনি আপনা হইতে পৃথক্ ভাবে নির্দ্দেশের অযোগ্য সূক্ষ্মদশাপন্ন চেতনা-

চেতন বস্তুময় শরীরধারী হয়েন ; তখন তিনি কারণাবস্থ ব্রহ্ম। আবার কখনও বা তিনি বিভিন্ন নামরূপে ব্যবহারের যোগ্য স্থূলাবস্থাপন্ন চেতনাচেতন বস্তুময় শরীরধারী হয়েন ; তখন তিনি কার্য্যাবস্থ ব্রহ্ম। সুতরাং কারণভুত পরব্রহ্ম হইতে তৎকার্য্যভূত এই জগৎ অন্য বা ভিন্ন নহে। শরীরভুত চেতনাচেতন বস্তুর শরীরী ব্রহ্মের কারণাবস্থায় এবং কার্য্যাবস্থায় স্বভাব-ব্যবস্থা এবং গুণদোষব্যবস্থা শ্রুতিসিদ্ধ ; "নতু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ২।১।৯॥"-ব্রহ্ম সূত্রেও তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

["ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ॥২।১।৯॥"-সূত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ। পরব্রহ্মের দুইটী অবস্থা—একটী কার্য্যাবস্থা, অপরটী কারণাবস্থা। স্থূল-সূক্ষ্ম-চেতনাচেতন-শরীরে অধিষ্ঠানপূর্ব্বক চেতনাচেতন সমস্ত বস্তুর শরীরীরূপে যে অবস্থিতি, তাহাই তাঁহার কার্য্যাবস্থা। আর চেতনাচেতন সমস্ত পদার্থ যখন বিলীন হইয়া তাঁহাতে অবস্থান করে, তখন তাঁহার কারণাবস্থা। জাগতিক যে সমস্ত বিকার বা পরিবর্ত্তন এবং জাগতিক যে সমস্ত দোষ, তৎসমস্তই এই কার্য্যাবস্থাপন্ন ব্রহ্মের শরীরগত ; সে সমস্ত বিকার ও দোষের দ্বারা শরীরী ব্রহ্ম বিকৃত বা দোষগ্রস্ত হয়েন না। আর, কারণাবস্থায় কোনও প্রকার দোষই বর্ত্তমান থাকে না ; তখন তিনি স্বতঃ নির্দ্দোষরূপে বিরাজিত]।

কিন্তু কার্য্যের (জগতের) মিথ্যাত্ব অবলম্বন করিয়া যাঁহারা কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব খ্যাপন করেন, তাঁহাদের মতে কার্য্য-কারণের অনন্যত্বই সিদ্ধ হয় না। কেননা, সত্য ও মিথ্যা পদার্থের কখনও ঐক্য উপপন্ন হইতে পারে না ; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে ব্রহ্মেরও মিথ্যাত্ব এবং জগতেরও সত্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারিত।

আলোচ্য ব্রহ্মসূত্রের শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম উপরে প্রকাশ করা হইল। তিনি "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থই গ্রহণ করিয়াছেন ; বাক্যবহির্ভূত কোনও শব্দের অধ্যাহারও তিনি করেন নাই, বাক্যস্থিত কোনও শব্দের প্রত্যাহারও তিনি করেন নাই। স্বাভাবিক এবং মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে, এই শ্রুতিবাক্যে বিকারের বা কার্য্যের সত্যত্বই কথিত হইয়াছে, মিথ্যাত্ব কথিত হয় নাই। তদনুসারেই সূত্রভাষ্যে তিনি কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তাহাতেই যে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান এবং ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাও তিনি দেখাইয়াছেন।

গ। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্যের মর্ম্মও উল্লিখিতরূপই। তিনিও "বাচারম্ভণ"বাক্যের স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্যের সত্যত্ব দেখাইয়াছেন এবং আলোচ্যসূত্রভাষ্যে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব দেখাইয়াছেন।

ঘ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে "বাচারম্ভণ"-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই (৩।৩৯-অনুচ্ছেদে) উল্লিখিত হইয়াছে। তিনিও স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিয়া কার্য্যের সত্যত্ব এবং আলোচ্য সূত্রে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—একই বস্তুর সঙ্কোচাবস্থায় কারণত্ব এবং বিকাশাবস্থায় কার্য্যত্ব। মৃত্তিকার বিকারও মৃত্তিকাই। এজন্যই কার্য্যের বিজ্ঞান কারণের বিজ্ঞানের অন্তর্ভূত; তাই পরম-কারণ ব্রহ্মের জ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান সিদ্ধ হয়। ইহাই হইতেছে বাচারম্ভণ-শব্দলভ্য অনন্যত্ব। "একস্যৈব সঙ্কোচাবস্থায়াং কারণত্বং বিকাশাবস্থায়াং কার্য্যত্বমিতি। বিকারোঽপি মৃত্তিকৈব। ততঃ কারণ-বিজ্ঞানেন কার্য্যবিজ্ঞানমন্তর্ভাব্যত ইত্যেবং পরমকারণে পরমাত্মন্যপি জ্ঞেয়ম্। তদেতদারম্ভণ-শব্দলব্ধমনন্যত্বম্॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ ১৪৬ পৃষ্ঠা ॥"

তিনি আরও বলিয়াছেন– বস্তুর কারণত্বাবস্থা এবং কার্য্যাবস্থা উভয়ই সত্য। অবস্থা দুইটী হইলেও বস্তু একই ; এজন্য কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব। "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ।"-সূত্রেও সূত্রকার ব্যাসদেব তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কারণরূপ ব্রহ্ম কার্য্য হইতে অনন্য—একথাই সূত্রকার বলিয়াছেন ; কিন্তু ব্রহ্মমাত্র সত্য—একথা বলা হয় নাই। "তস্মাদ্ বস্তুনঃ কারণত্বাবস্থা কার্য্যাবস্থা চ সত্যৈব। তত্র চ অবস্থাযুগলাত্মকমপি বস্ত্বেবেতি কারণানন্যত্বং কার্য্যস্য। তদেতপ্যুক্তং সূত্রকারেণ 'তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ॥ (২।১।১৪ ॥ ব্রহ্মসূত্র)' ইতি। অত্র চ তদনন্যত্বমিত্যেবোক্তং ন তু তন্মাত্রসত্যত্বমিতি ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ ১৪৭ পৃষ্ঠা ॥"

৪৪। ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥ ২।১।১৫॥-ব্রহ্মসূত্র

ক। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকৃত ভাষ্যের তাৎপর্য্য

ভাব অর্থ—সত্তা, অস্তিত্ব। ভাবে—কারণের সত্তায় বা অস্তিত্বে। কার্য্য যে কারণ হইতে অনন্য, তাহার হেতু এই যে—কারণের অস্তিত্ব থাকিলে কার্য্যের উপলব্ধি হয়, কারণের অস্তিত্ব না থাকিলে কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। যেমন, মৃত্তিকা থাকিলেই ঘটের উপলব্ধি হয়, তন্তু (সূতা) থাকিলেই পটের (বস্ত্রের) উপলব্ধি হয়, নতুবা হয় না। এক বস্তুর বিদ্যমানতায় অন্য বস্তুর উপলব্ধি হইতে দেখা যায় না। যেমন, অশ্ব গাভী হইতে ভিন্ন বস্তু ; অশ্ব থাকিলে বা অশ্বের দর্শনে গাভীর উপলব্ধি হয় না, তদ্রূপ। কুলালের সহিত ঘটের নিমিত্ত-নৈমিত্তিক সম্বন্ধ থাকিলেও কুলালের বিদ্যমানতায় ঘটের উপলব্ধি হয় না, মৃত্তিকার অস্তিত্বেই ঘটের উপলব্ধি হইতে পারে। অশ্ব ও গাভী ভিন্ন বস্তু বলিয়া অশ্ব না থাকিলেও গাভী থাকিতে পারে, গাভী না থাকিলেও অশ্ব থাকিতে পারে। কিন্তু মৃত্তিকা না থাকিলে ঘট থাকিতে পারে না। ইহাতেই বুঝা যায়—মৃত্তিকা ও ঘট, অর্থাৎ কারণ ও কার্য্য, অনন্য।

এই সূত্রটীর "ভাবাৎ চ উপলব্ধেঃ"-এইরূপ পাঠান্তরও দৃষ্ট হয়। এই পাঠান্তরের তাৎপর্য্য এই যে—কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব কেবলমাত্র শাস্ত্র হইতেই যে জানা যায়, তাহা নহে , প্রত্যক্ষ উপলব্ধি হইতেও তাহা জানা যায়। কার্য্য-কারণের অনন্যত্বে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি

আছে। যেমন, তন্তু-সংস্থানে, তন্তুব্যতিরেকে বস্ত্রনামক বস্তুর উপলব্ধি হয় না ; কেবল কতকগুলি তন্তুই (সূত্রই) আতান-বিতান-ভাবে (টানা ও পড়েন রূপে) অবস্থিত, ইহাই প্রত্যক্ষ ভাবে উপলব্ধ হয় (অর্থাৎ আতান-বিতানে অবস্থিত সূত্র ব্যতীত বস্ত্র অন্য কিছু নহে ; সূত্ররূপ কারণই অবস্থা-বিশেষ প্রাপ্ত হইয়া বস্ত্ররূপ কার্য্যের সৃষ্টি করিয়াছে। এ-স্থলে কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রত্যক্ষ-দৃষ্ট)।

(১) শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারে আলোচ্য সূত্র বিবর্ত্তবাদের সমর্থক নহে; পরন্তু পরিণামবাদেরই সমর্থক

শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাতে মনে হয়, এই সূত্রটী যেন তাঁহার বিবর্ত্তবাদের সমর্থক নহে, পরিণাম-বাদেরই সমর্থক। একথা বলার হেতু এই।

সূত্রভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—কারণের অস্তিত্ব থাকিলেই কার্য্যের উপলব্ধি হয় ; কারণের অস্তিত্ব না থাকিলে কার্য্যের উপলব্ধি হয় না। কিন্তু যে স্থলে শুক্তির অস্তিত্ব নাই, সে-স্থলেও কখনও কখনও রজতের উপলব্ধি হয়—যেমন বণিকের দোকানে। তদ্রূপ, যেখানে রজ্জুর অস্তিত্ব নাই, সে-খানেও সর্পের উপলব্ধি হইতে দেখা যায়—যেমন বনে জঙ্গলে গহ্বরে। সুতরাং বিবর্ত্তের দৃষ্টান্ত আলোচ্য সূত্রের অনুকূল নহে। এজন্যই বোধহয় শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রের ভাষ্যে শুক্তি-রজতাদির দৃষ্টান্ত দেখান নাই।

কারণ সর্ব্বদা কার্য্যে বর্ত্তমান থাকে বলিয়াই কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব। মৃণ্ময় ঘটে তাহার কারণ মৃত্তিকা বিদ্যমান। বস্ত্রে সূত্র বর্ত্তমান। কিন্তু রজতে শুক্তি বর্ত্তমান নাই, সর্পেও রজ্জু বর্ত্তমান নাই। সুতরাং রজ্জু-সর্প বা শুক্তি-রজত অনন্য বা অভিন্ন নহে ; কিন্তু ঘট-মৃত্তিকা অনন্য। এজন্যই বোধহয়, তিনি ঘট-মৃত্তিকা এবং বস্ত্র-সূত্রের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। এই দৃষ্টান্তগুলি পরিণাম-বাদেরই সমর্থক ; যেহেতু, ঘট হইতেছে মৃত্তিকার পরিণাম বা বিকার, বস্ত্র হইতেছে সূত্রের পরিণাম বা বিকার। ঘট কখনও মৃত্তিকার বিবর্ত্ত নহে, বস্ত্রও সূত্রের বিবর্ত্ত নহে।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেই "ভেদে চোপলব্ধেঃ"-সূত্রটী হইতেছে পরিণাম-বাদের সমর্থক, বিবর্ত্তবাদের সমর্থক নহে। আবার, "তদনন্যত্বমারম্ভণশব্দাদিভ্যঃ"-সূত্রের সমর্থনেই যখন "ভাবে চোপলব্ধেঃ"-সূত্রটীর অবতারণা করা হইয়াছে এবং "ভাবে চোপলব্ধেঃ"-সূত্রটী যখন পরিণাম-বাদেরই সমর্থক, তখন "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"-সূত্রটীও যে পরিণাম-বাদেরই সমর্থক, তাহাও সহজেই বুঝা যায়।

সুতরাং উল্লিখিত সূত্রদ্বয়ের কোনওটীই জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদন করিতেছে না।

খ। শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

ভাবে—কার্য্যসদ্ভাবে। উপলব্ধেঃ—কারণের প্রতীতিহেতু। ঘটাদি-কার্য্যের সদ্ভাবে তৎকারণীভূত মৃত্তিকারও উপলব্ধি হয় বলিয়াও কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব অবধারিত হইতেছে। —ইহাই সূত্রের তাৎপর্য্য।

কুণ্ডলাদি-কার্য্যের সদ্ভাবে তৎকারণীভূত স্বর্ণাদির উপলব্ধি হয়—অর্থাৎ, এই কুণ্ডলটী স্বর্ণ-এইরূপ জ্ঞান জন্মে। ইহাতেই কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব বুঝা যাইতেছে। যাহা মৃত্তিকাদি হইতে ভিন্ন দ্রব্য—এইরূপ সুবর্ণাদিতে কখনও মৃত্তিকাদির উপলব্ধি হয় না। কারণ-দ্রব্যই অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইয়া কার্য্য-নামে অভিহিত হয়। সুতরাং কার্য্য ও কারণ হইতেছে অনন্য বা অভিন্ন।

যদি বলা যায়—কার্য্য ও কারণ অভিন্ন নয়, এইরূপও তো দেখা যায়। যেমন, ধূম ও অগ্নি, কিম্বা গোময়জাত বৃশ্চিকাদি এবং গোময়। সুতরাং কার্য্য-কারণের অভিন্নত্ব কিরূপে উপপন্ন হইতে পারে ?

উত্তরে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—অগ্নির কার্য্য ধূম হইলেও এবং ধূম হইতে অগ্নি ভিন্ন পদার্থ হইলেও এ-স্থলে একটী বিবেচ্য বিষয় আছে। অগ্নির সংযোগে আর্দ্র কাষ্ঠ হইতেই ধূমের উৎপত্তি হয় ; এ-স্থলে অগ্নি হইতেছে ধূমের নিমিত্ত-কারণমাত্র, উপাদান-কারণ নহে। উপাদান-কারণের সঙ্গেই কার্য্যের অনন্যত্ব। আর্দ্র কাষ্ঠই হইতেছে ধূমের উপাদান-কারণ, অগ্নি নহে ; আর্দ্র কাষ্ঠের যে রকম গন্ধ, ধূমেরও সে-রকম গন্ধের উপলব্ধি হয়। ইহাতেই বুঝা যায়—আর্দ্র কাষ্ঠই হইতেছে ধূমের উপাদান-কারণ। এজন্য ধূমে অগ্নির উপলব্ধি হয় না, আর্দ্র কাষ্ঠের ধর্ম্ম গন্ধেরই উপলব্ধি হয়।

গোময়জাত বৃশ্চিকাদি সম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে—এ-স্থলে আদি-কারণের-অর্থাৎ গোময়াদিরও কারণীভূত পৃথিবীর প্রত্যভিজ্ঞা বা উপলব্ধি আছে।

সর্ব্বত্রই কার্য্যসদ্ভাবে কারণের উপলব্ধি হয়—"সেই উপাদানই ইহা", এইরূপ প্রতীতি জন্মে। বুদ্ধি ও প্রতীতিভেদাদি কারণদ্রব্যের অবস্থাভেদেই উৎপন্ন হয়—অর্থাৎ কারণ-মৃত্তিকাদি অবস্থান্তর প্রাপ্ত হইলেই ঘটাদি নামে অভিহিত হয়, তদনুরূপ ব্যবহারাদির বিষয়ীভূতও হয়। বস্তুতঃ কার্য্য ও কারণে একই দ্রব্য সর্ব্বদা বর্ত্তমান। সুতরাং কার্য্য-বস্তুটী হইতেছে কারণ-বস্তুটী হইতে অনন্য বা অভিন্ন।

(১) শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যানুসারেও আলোচ্য সূত্রটী পরিণাম-বাদের সমর্থক, বিবর্ত্তবাদের প্রতিকূল

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্য হইতেও বুঝা যায়, আলোচ্য সূত্রটী বিবর্ত্তবাদের অনুকূল নহে ; ইহা পরিণাম-বাদেরই সমর্থক।

সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে—কর্য্যের সদ্ভাবে কারণের উপলব্ধি, অর্থাৎ কার্য্যের মধ্যে যে উপাদানরূপে কারণ বিদ্যমান আছে, তাহার উপলব্ধি। বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিলে ইহা সম্ভবপর হইতে পারে না। কেননা, শুক্তি-রজত-স্থলে রজতের মধ্যে শুক্তির অস্তিত্বের উপলব্ধি হয় না ; কিম্বা, অগ্নি-ধূমের স্থলে ধূমের মধ্যে নিমিত্ত-কারণরূপ অগ্নির উপলব্ধি না হইলেও যেমন ধূমের উপাদান-কারণ আর্দ্র কাষ্ঠের গন্ধের অনুভব হয়, শুক্তি-রজতের স্থলে রজতের মধ্যেও শুক্তির

যেমন অনুভব হয় না, তদ্রূপ অন্য কোনও দ্রব্যেরও অনুভব হয় না। সুতরাং আলোচ্য সূত্রটী বিবর্ত্তবাদের সমর্থন করিতেছেনা।

আবার, কার্য্য উপাদান-কারণের অবস্থা-বিশেষ বলিয়াই কার্য্যের সদ্ভাবে, কার্য্যের মধ্যে উপাদানের উপলব্ধি হয়। অবস্থা-বিশেষই হইতেছে পরিণাম। সুতরাং আলোচ্য সূত্রটী পরিণাম-বাদেরই সমর্থন করিতেছে।

আবার, কার্য্য যখন উপাদান-কারণেরই অবস্থা-বিশেষ এবং উপাদান-কারণ যখন সত্য, তখন কার্য্যও যে সত্য, কিন্তু মিথ্যা নহে—তাহাও এই সূত্র হইতে জানা গেল।

এইরূপে জগতের উপাদান-কারণ ব্রহ্ম সত্য বলিয়া ব্রহ্মকার্য্য জগৎও সত্য, কখনও মিথ্যা নহে, তাহাও এই সূত্র হইতে জানা যাইতেছে।

এই সূত্রের শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভুষণকৃত ভাষ্যও শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যের অনুরূপ।

৪৫। **সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥ ২।১।১৬ ॥-ব্রহ্মসূত্র**

ক। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

সত্ত্ব—অস্তিত্ব ; সত্ত্বাৎ—অস্তিত্ব হইতে, অস্তিত্বের উল্লেখ হইতে। অবর—পরবর্ত্তীকালীন বস্তু, কারণ হইতে উৎপন্ন কার্য্য।

সত্ত্বাৎ চ—অস্তিত্ব হইতেও ; উৎপন্ন হইবার পুর্ব্বে কারণরূপে কার্য্যের অস্তিত্বের কথা শ্রুতিতে উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়াও, অবরস্য—পরবর্ত্তীকালীন কার্য্যের কারণ হইতে অনন্যত্ব সিদ্ধ হয়।

শ্রুতি বলিয়াছেন—“সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ—হে সোম্য! এই বিশ্ব পুর্ব্বে সৎই- সৎ-ব্রহ্মই—ছিল”, “আত্মা বা ইদমেক এবাগ্র আসীৎ—অগ্রে (সৃষ্টির পূর্ব্বে) এই বিশ্ব এক আত্মাই ছিল”, ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে “ইদম্”-শব্দে জগৎকে বুঝায়। “অগ্রে”-শব্দে বুঝায়—সৃষ্টির পূর্ব্বে। আর, “সৎ”-শব্দে সদ্‌ব্রহ্মকে বুঝায়। এই সকল শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ এক সদ্‌ব্রহ্মই ছিল, অর্থাৎ সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ যে কারণরূপে বিদ্যমান ছিল, তাহাই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়। সুতরাং কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে কার্য্যরূপ জগৎ যে অনন্য বা অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদিত হইল।

যাহা যেরূপে যাহাতে থাকে না, তাহা তাহা হইতে উৎপন্নও হইতে পারে না। “যচ্চ যদাত্মনা যত্র ন বর্ত্ততে, ন তৎ তত উৎপদ্যতে।” যেমন, বালুকা হইতে তৈল জন্মে না। কেননা, বালুকাতে তৈল নাই। ব্রহ্ম হইতে যখন জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে—উৎপত্তির পূর্ব্বেও জগৎ ব্রহ্মের মধ্যে ব্রহ্মরূপে বর্ত্তমান ছিল।

অতএব, উৎপত্তির পূর্ব্বেও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব আছে বলিয়া উৎপত্তির পরেও

তাহারা অনন্য বা অভিন্ন—ইহাই উপপন্ন হইতেছে। "তস্মাৎ প্রাগুৎপত্তেরনন্যত্বাৎ উৎপন্নমপি অনন্যদেব কারণাৎ কার্য্যমিত্যবগম্যতে।"

কারণরূপ ব্রহ্মের সত্তার যেমন কোনও কালেই ব্যভিচার হয় না, তদ্রূপ কার্য্যভূত জগতেরও কোনও কালেই সত্তার ব্যভিচার হয় না। সত্ত্ব একই ; সেই হেতুতেও কারণ হইতে কার্য্য অনন্য বা অভিন্ন। "যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বম্। অতোহপি অনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য।"

(১) শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য বিবর্ত্তবাদের অনুকূল নহে, বরং পরিণামবাদেরই অনুকূল

শ্রীপাদ শঙ্কর এই সূত্রের যে ভাষ্য করিয়াছেন, তাহাও তাঁহার বিবর্ত্তবাদের সমর্থন করে না। কেননা, শুক্তিতে রজত দেখার পূর্ব্বে শুক্তিতে রজত থাকে না, কিম্বা রজত শুক্তিরূপেও থাকে না।

আবার, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যখন কারণরূপেই বিদ্যমান থাকে এবং কারণেরই অবস্থা-বিশেষ বা পরিণাম-বিশেষই যখন কার্য্য, তখন শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য যে পরিণাম-বাদেরই সমর্থন করিতেছে, তাহাও জানা যায়।

এই সূত্রটী বিবর্ত্ত-বাদের সমর্থন করে না বলিয়া জগতের মিথ্যাত্বও সমর্থন করিতেছে না ; পরিণাম-বাদের সমর্থন করিতেছে বলিয়া এবং পরিণাম বা বিকারও সত্য বলিয়া আলোচ্য সূত্র জগতের সত্যত্বই প্রতিপাদন করিতেছে। কারণরূপ ব্রহ্ম সত্য বলিয়া তাঁহার সহিত অভিন্ন কার্য্যরূপ জগৎও সত্য। ভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন—"কারণরূপ ব্রহ্মের সত্তার যেমন কোনও কালেই ব্যভিচার হয় না, তেমনি জগদ্রূপ কার্য্যের সত্তাও কোনও কালেই ব্যভিচার প্রাপ্ত হয় না। সত্ত্ব একই। এজন্যও কার্য্য ও কারণের অনন্যত্ব।"

খ। শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

শ্রীপাদ রামানুজধৃত সূত্রটীতে "অবর"-স্থলে "অপর" পাঠ দৃষ্ট হয়। "সত্ত্বাচ্চাপরস্য।" "অপর" এবং "অবর" অর্থ একই। অপর—কার্য্য।

অপরস্য—কার্য্যস্য। কারণে কার্য্যের বিদ্যমানতাবশতঃও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব সিদ্ধ হইতেছে। লোক-ব্যবহারে এবং বেদেও কার্য্য-পদার্থই কারণরূপে উল্লিখিত হইয়া থাকে। যথা লোকব্যবহারে—এই সমস্ত ঘট-শরাবাদি পূর্ব্বে মৃত্তিকাই ছিল। বেদে যথা—"হে সোম্য ! সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ সৎস্বরূপই ছিল।" ইত্যাদি।

গ। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

শ্রীপাদ বলদেব "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" পাঠই গ্রহণ করিয়াছেন। তাঁহার গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্ম এইরূপ।

অবরকালিক উপাদেয় বস্তু (কার্য্য) পূর্ব্বেও উপাদানে তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া থাকে বলিয়াও কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব অবগত হওয়া যায়। শ্রুতিও বলেন—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ—হে সোম্য ! এই জগৎ পূর্ব্বে সৎস্বরূপ ব্রহ্মই ছিল।" স্মৃতিও তাহাই বলেন। যথা—

"ব্রীহিবীজে যথা মূলং নালং পত্রাঙ্কুরৌ তথা।
কাণ্ডং কোশস্তথা পুষ্পং ক্ষীরং তদ্বচ্চ তণ্ডুলম্॥
তুষঃ কণাশ্চ সন্তো বৈ যান্ত্যাবির্ভাবমাত্মনঃ।
প্ররোহহেতুসামগ্র্যমাসাদ্য মুনিসত্তম॥
তথা কর্ম্মস্বনেকেষু দেবাদ্যাস্তনবঃ স্থিতাঃ।
বিষ্ণুশক্তিং সমাসাদ্য প্ররোহমুপযান্তি বৈ॥
স চ বিষ্ণুঃ পরং ব্রহ্ম যতঃ সর্ব্বমিদং জগৎ।
জগচ্চ যো যতশ্চেদং যস্মিংশ্চ লয়মেষ্যতীতি॥ বিষ্ণুপুরাণ॥

—হে মুনি সত্তম! যেমন ব্রীহির বীজে মূল, নাল, পত্র, অঙ্কুর, কাণ্ড, কোশ, পুষ্প, ক্ষীর, তণ্ডুল, তুষ, কণা বিদ্যমান থাকে এবং অঙ্কুরোৎপাদনের সমগ্রকারণ প্রাপ্ত হইলে বীজ হইতে তাহাদের আবির্ভাব হয়; তদ্রূপ বহুবিধ কর্ম্মে দেবাদির শরীর অবস্থিত থাকে, বিষ্ণুশক্তি প্রাপ্ত হইলেই তাহারা প্ররোহিত (অঙ্কুরিত) হইয়া থাকে। সেই বিষ্ণু হইতেছেন পরব্রহ্ম; তাঁহা হইতেই সমস্ত জগৎ উৎপন্ন হইয়াছে; জগৎও তিনি; তাঁহা হইতেই এই জগতের উৎপত্তি এবং তাঁহাতেই এই জগৎ লয় প্রাপ্ত হইবে।"

তিলে তৈলের সত্তা আছে বলিয়াই তিল হইতে তৈলের উৎপত্তি হয়; বালুকায় তৈলের সত্তা নাই বলিয়া বালুকা হইতে তৈলের উৎপত্তি হয় না। কার্য্য ও কারণ—এই উভয়স্থলেই একই পারমার্থিক সত্তা বিরাজিত। "উভয়ত্রাপি একমেব সত্ত্বং পারমার্থিকমিতি।" উৎপত্তির পরে উপাদেয়ে (কার্য্যে) উপাদান-তাদাত্ম্য পূর্ব্বেই (পূর্ব্বসূত্রে) প্রমাণিত হইয়াছে। বিনাশের পরেও উপাদান ও উপাদেয়ে ভেদ থাকে না।

এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য হইল এই যে—বীজের মধ্যে যেমন বৃক্ষ সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে, তেমনি কারণের মধ্যেও কার্য্য সূক্ষ্মরূপে—কারণের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া—বর্ত্তমান থাকে। সেই সূক্ষ্ম অবস্থা যখন স্থূলরূপে অভিব্যক্ত হয়, তখনই তাহাকে কার্য্য বলা হয়। উভয় অবস্থাতেই যখন দ্রব্য একই, তখন কার্য্য ও কারণ যে অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

৪৬। **অসদ্ব্যপদেশান্নেতি চেন্ন ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ ॥২।১।১৭॥ব্রহ্মসূত্র**

=অসদ্ব্যপদেশাৎ ইতি চেৎ, ন, ধর্ম্মান্তরেণ বাক্যশেষাৎ।

পূর্ব্ববর্ত্তী—"সত্ত্বাচ্চাবরস্য"-সূত্রে বলা হইয়াছে—কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্ব্বেও কারণ-রূপে কার্য্যের সত্তা থাকে। তাহাতেই কার্য্য-কারণের অভিন্নত্ব-প্রদর্শন করা সম্ভবপর হইয়াছে। কিন্তু কোনও কোনও শ্রুতিবাক্য হইতে বুঝা যায়, কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হওয়ার পূর্ব্বে কার্য্যের কোনও

সত্ত্ব ছিল না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বলা যায় না—কারণ হইতে কার্য্য অনন্য বা অভিন্ন। এইরূপ পূর্ব্বপক্ষ উত্থাপন করিয়াই এই সূত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

ক। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

"অসদ্ব্যপদেশাৎ"—কোনও কোনও শ্রুতিবাক্যে উৎপত্তির পূর্ব্বে জগতের অসত্ত্বার (অস্তিত্বের অভাবের) কথা বলা হইয়াছে। যেমন, "অসদেব ইদমগ্র আসীৎ (ছান্দোগ্য ॥৬৷২৷১)—এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল," "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ (তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ বল্লী ॥ ৭ ॥)—এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল"-ইত্যাদি। ইহাতে কেহ যদি বলেন—"ন, ইতি চেৎ—না, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব ছিল না", তদুত্তরে বলা হইতেছে—"ন—না, তাহা নয়; উৎপত্তির পূর্ব্বে যে কার্য্যের অস্তিত্ব থাকেনা, একথা ঠিক নহে। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে যে 'অসৎ'-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের আত্যন্তিক অভাব তাহার অভিপ্রায় নয়।" তবে কি? "ধর্ম্মান্তরেণ—ধর্ম্মান্তর হেতু 'অসৎ' বলা হইয়াছে।" কিরূপ ধর্ম্মান্তর? এইদৃশ্যমান জগৎ নাম-রূপে অভিব্যক্ত; নাম-রূপে অভিব্যক্তত্বই হইতেছে এখন ইহার ধর্ম্ম। নাম-রূপে অনভিব্যক্তত্ব হইতেছে নামরূপে অভিব্যক্তত্বের ধর্ম্মান্তর। অভিব্যক্তত্ব এক ধর্ম্ম, অনভিব্যক্তত্ব অন্য ধর্ম্ম—ধর্ম্মান্তর। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যরূপ এই জগৎ নাম-রূপে অভিব্যক্ত ছিল না বলিয়া তৎকালীন জগৎকে 'অসৎ' বলা হইয়াছে—তাৎপর্য্য, আত্যন্তিক অভাব নয়, নাম-রূপে অভিব্যক্তির অভাব। তখন কার্য্য ছিল কারণরূপে অবস্থিত। কারণ হইতে তখন কার্য্য পৃথক্ ছিল না।

কিন্তু উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যে কারণরূপে বিদ্যমান ছিল, কার্য্যের যে আত্যন্তিক অভাব ছিল না, তাহা কিরূপে জানা যায়? "বাক্যশেষাৎ—উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের শেষভাগে যে বাক্য আছে, তাহা হইতে ইহা জানা যায়।" কি সেই বাক্যশেষ? "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এই-রূপ উপক্রম করিয়া, এ-স্থলে যাহাকে "অসৎ" বলা হইয়াছে, তাহাকে লক্ষ্য করিয়াই বাক্যশেষে বলা হইয়াছে—"সৎ তু এব সোম্য ইদমগ্র আসীৎ ॥ (ছান্দোগ্য ॥৬৷২৷২)—হে সোম্য! এই জগৎ কিন্তু পূর্ব্বে সৎই ছিল।" পূর্ব্বে যাহার আত্যন্তিক অসত্ত্ব বা অভাব, পরে তাহার সত্ত্ব বা সদ্ভাব হওয়া যুক্তিসঙ্গত হইতে পারে না। যেমন শশশৃঙ্গ; পূর্ব্বেও ইহার আত্যন্তিক অভাব, পরেও ইহার সদ্ভাব সম্ভবপর নয়। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত "অসৎ-"শব্দে আত্যন্তিক অভাব সূচিত হয় না।

আর, "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ (তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দবল্লী ।৭)"—এই বাক্যের শেষে বলা হইয়াছে "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত (তৈত্তিরীয় ॥ ব্রহ্মানন্দ ॥৭)—তিনি আপনাকে আপনি করিলেন—জগদ্রূপে ব্যক্ত করিলেন।" এই বাক্যশেষ হইতে জানা যায়—উৎপত্তির পূর্ব্বে যাহাকে "অসৎ" বলা হইয়াছে, তাহাই তখন সৎ-ব্রহ্মরূপে অবস্থিত ছিল। সুতরাং "অসৎ"-শব্দে আত্যন্তিক অভাব বুঝায় না।

উপক্রমে সন্দিগ্ধার্থক বাক্য থাকিলে শেষ বাক্য দ্বারাই তাহার তাৎপর্য্য নির্ণয় করিতে

হয়। উপক্রমে যে "অসৎ"-শব্দ আছে, তাহার অর্থ কি আত্যন্তিক অভাব, না কি অন্য কিছুর অভাব—এ বিষয়ে সন্দেহ জন্মিতে পারে। বাক্য-শেষে তাহারই সত্তার কথা বলায় নিশ্চিতভাবেই জানা যাইতেছে যে, "অসৎ"-শব্দে আত্যন্তিক অভাব বুঝায় না।

অতএব ইহাই বুঝিতে হইবে যে, "অসৎ"-শব্দে আত্যন্তিক অনস্তিত্ব বুঝায় না, ধর্ম্মবিশেষের —নামরূপে অভিব্যক্তিরূপ ধর্ম্মের—অভাবই সূচনা করিতেছে। সৃষ্টির পূর্ব্বেও কার্য্যরূপ জগতের অস্তিত্ব ছিল ; কিন্তু সেই অবস্থায় জগৎ ছিল নামরূপে অনভিব্যক্ত।

(১) শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য বিবর্ত্তবাদের অনুকূল নহে

ভাষ্যে বলা হইয়াছে—উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যের অস্তিত্ব থাকে ; কিন্তু অভিব্যক্তির ধর্ম্ম থাকে না। শুক্তির বিবর্ত্ত যে রজত, রজতরূপে দৃষ্ট হওয়ার পূর্ব্বে কিন্তু তাহার কোনও অস্তিত্ব থাকেনা। শুক্তি-স্থলে রজতের আত্যন্তিক অভাব।

আবার, "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত"—এই শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর জানাইতে চাহিয়াছেন—কারণরূপ ব্রহ্মই নিজেকে নিজে জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করিলেন। শুক্তি কিন্তু নিজেকে রজতরূপে নিজে অভিব্যক্ত করে না।

এইরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য অনুসারেই আলোচ্য সূত্র তাঁহার বিবর্ত্তবাদের সমর্থক নহে। ইহা বরং পরিণাম-বাদেরই সমর্থক। সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হওয়ায় এই সূত্রদ্বারা জগতের মিথ্যাত্ব উপপন্ন হয় না, বরং সত্যত্বই প্রতিপাদিত হয়।

খ। শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

শ্রীপাদ রামানুজও শ্রীপাদ শঙ্করের ন্যায় "অসদেবেদমগ্র আসীৎ" এবং "অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ"-শ্রুতিবাক্যদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া বাক্যশেষের দ্বারা শ্রীপাদ শঙ্করের অনুরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিয়াছেন। তদতিরিক্ত তিনি আর একটী শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ইদং বা অগ্রে নৈব কিঞ্চনাসীৎ॥ (যজু, ২।২।৯)—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই দৃশ্যমান কিছুই ছিল না।" পরে তিনি ইহার বাক্যশেষও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "তদসদেব সন্ মনোঽকুরুত স্যামিতি (যজু, ২।২।৯)—সেই অসৎ আত্মসর্জ্জনের ইচ্ছায় মনকে সৃষ্টি করিলেন।" এই বাক্যশেষে আছে—"অসৎই মনকে সৃষ্টি করিলেন।" এ-স্থলে "অসৎ"-শব্দে যদি সৃষ্টিকর্ত্তার আত্যন্তিক অস্তিত্বহীনতা বুঝায়, তাহা হইলে তৎকর্ত্তৃক সৃষ্টিই সম্ভবপর হয় না। ইহাদ্বারা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, এস্থলে "অসৎ"-বস্তুটী তুচ্ছ বা আত্যন্তিক অস্তিত্বহীন নহে। সুতরাং তাহার সহিত একার্থতাপ্রযুক্ত "অসদেব ইদম্"-এই স্থলেও "অসৎ"-শব্দের ঐরূপ অর্থই অবধারিত হইতেছে।

অভিব্যক্তত্ব এবং অনভিব্যক্তত্ব—হইতেছে একই দ্রব্যের দুইটী ধর্ম্ম। সূত্রে "ধর্ম্মান্তরেণ"-পদে অনভিব্যক্তত্ব-ধর্ম্মের কথাই বলা হইয়াছে ; ইহা হইতেছে অভিব্যক্তত্ব ধর্ম্ম হইতে অন্য ধর্ম্ম—ধর্ম্মান্তর। উৎপত্তির পূর্ব্বে একটী ধর্ম্ম এবং উৎপত্তির পরে আর একটী ধর্ম্ম।

গ। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

উপাদেয় ও উপাদান—এই উভয় অবস্থাবিশিষ্ট একই দ্রব্যের স্থূলত্ব ও সূক্ষ্মত্ব—এই দ্বিবিধ অবস্থাত্মক ধর্ম্মই "সৎ" ও "অসৎ" শব্দে বাচিত হইয়া থাকে। স্থূলাবস্থা—সৎ ; আর, সূক্ষ্মাবস্থা—অসৎ। তন্মধ্যে এই স্থূলত্ব-ধর্ম্ম হইতে অন্য বা ভিন্ন হইতেছে সূক্ষ্মত্ব-ধর্ম্ম। সূত্রে "ধর্ম্মান্তরেণ"-পদে এই সূক্ষ্মত্ব-ধর্ম্মই লক্ষিত হইয়াছে। "তদাত্মানং স্বয়মকুরুত—তিনি নিজেকে নিজে (জগদ্রূপে ব্যক্ত) করিলেন"—এই বাক্যশেষ হইতেই তাহা জানা যায়। বাক্যশেষ দ্বারাই সন্দিগ্ধার্থক উপক্রম-বাক্যের অভিপ্রায় নির্ণয় করা সঙ্গত। "অসদ্বা আসীৎ (ছিল)" এবং "আত্মানমকুরুত—নিজেকে করিলেন"-এই উভয় বাক্যের মধ্যে পরস্পর বিরোধ উপস্থিত হয়। যাহা ছিল না, তাহার সহিত কালের সম্বন্ধ হইতে পারে না। "অসতঃ কালেন সহাসম্বন্ধাৎ।" আবার, আত্মার অভাবে কর্ত্তৃত্বও নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে না। "আত্মাভাবেন কর্ত্তৃত্বস্য বক্তুমশক্যত্বাচ্চ।"

৪৭। যুক্তেঃ শব্দান্তরাচ্চ ॥ ২।১।১৮ ॥-ব্রহ্মসূত্র

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের সত্তা এবং কারণ হইতে অনন্যত্ব—যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হয়, অন্য শ্রুতি-বাক্যদ্বারাও সিদ্ধ হয়।

ক। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

উৎপত্তির পূর্ব্বেও যে কার্য্যের সত্ত্ব থাকে এবং কার্য্য যে কারণ হইতে অনন্য—অভিন্ন, তাহা যুক্তিদ্বারাও জানা যায়, শব্দান্তরের (অন্য শ্রুতিবাক্যের) দ্বারাও জানা যায়।

যুক্তি হইতেছে এইরূপ। লৌকিক জগতে দেখা যায়, যে ব্যক্তি দধি প্রস্তুত করিতে ইচ্ছা করে, সে দুগ্ধই সংগ্রহ করে, দধি উৎপাদনের জন্য সে কখনও মৃত্তিকা সংগ্রহ করে না। যাহার ঘট প্রস্তুত করার জন্য ইচ্ছা হয়, সে মৃত্তিকাই সংগ্রহ করে, কখনও দুগ্ধ সংগ্রহ করে না। যাহার রুচক (অলঙ্কার) প্রস্তুত করার ইচ্ছা হয়, সে স্বুবর্ণই সংগ্রহ করে, কখনও মৃত্তিকা বা দুগ্ধ সংগ্রহ করে না। কেন করে না ? না—মৃত্তিকা হইতে দধি হয় না, দুগ্ধ হইতেই দধি হয় ; দুগ্ধ হইতে ঘটাদি হয়না, মৃত্তিকা হইতেই ঘটাদি হয় ; ইত্যাদি।

প্রত্যেক কারণ-দ্রব্যের মধ্যেই একটা বিশেষ যোগ্যতা বা শক্তি আছে, যাহার ফলে সেই দ্রব্য হইতে বিশেষ কার্য্যরূপ-বস্তুর উৎপত্তি হয়—যাহা অন্য কারণ-দ্রব্য হইতে উৎপন্ন হয় না। দুগ্ধের মধ্যে এমন একটা বিশেষ শক্তি আছে, যাহার ফলে দুগ্ধ হইতে দধিই উৎপন্ন হয়, কিন্তু ঘট উৎপন্ন হয় না। আবার, মৃত্তিকার মধ্যেও এমন একটা বিশেষ শক্তি আছে, যাহার ফলে মৃত্তিকা হইতে ঘটাদিই উৎপন্ন হয়, দধি বা স্বর্ণালঙ্কার উৎপন্ন হয় না। এইরূপ বিশেষ শক্তি স্বীকার না করিলে যে-কোনও দ্রব্য হইতেই যে-কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি হইতে পারিত—দুগ্ধ হইতেও ঘটাদি

উৎপন্ন হইতে পারিত, মৃত্তিকা হইতেও দধি-আদি উৎপন্ন হইতে পারিত। তাহা যখন হইতে দেখা যায় না—তখন প্রত্যেক দ্রব্যেরই বিশেষ কার্য্যোৎপাদিকা বিশেষ শক্তি স্বীকার করিতে হইবে।

এই বিশেষ শক্তি কারণ-দ্রব্যে থাকিয়া কার্য্যের নিয়ামিকা হয়—কার্য্য উৎপাদন করে। যে-দ্রব্যে এইরূপ কার্য্যোৎপাদিকা শক্তি থাকেনা, সে-দ্রব্য কোনও কার্য্যের কারণও হইতে পারে না, সুতরাং সেই দ্রব্য হইতে কোন কার্য্যও জন্মায় না। যেমন, দুগ্ধে ঘটোৎপাদিকা শক্তি নাই বলিয়া দুগ্ধ কখনও ঘট-রূপ কার্য্য উৎপাদন করিতে পারে না। দুগ্ধে দধি-উৎপাদিকা বিশেষ-শক্তি আছে বলিয়াই যখন দুগ্ধ হইতে দধির উৎপত্তি হয়, ঘটাদি অন্য কোনও দ্রব্যের উৎপত্তি হয় না, তখন বুঝিতে হইবে—দধি-উৎপাদিকা শক্তিটী হইতেছে দুগ্ধের আত্মভূতা বা স্বরূপভূতা এবং দধিও হইতেছে দধি-উৎপাদিকা শক্তির আত্মভূত; কেননা, দুগ্ধের স্বরূপভূতা দধি-উৎপাদিকা শক্তিই দুগ্ধ হইতে দধি উৎপাদন করে এবং দধির দধিত্ব রক্ষা করে।

এইরূপে জানা গেল—কারণ-দ্রব্যের যে বিশেষ শক্তি, তাহা হইতেছে সেই কারণ-দ্রব্যেরই আত্মভূতা এবং সেই কারণ-দ্রব্য হইতে উৎপন্ন যে কার্য্য, তাহাও হইতেছে সেই বিশেষ-শক্তির আত্মভূত। "তস্মাৎ কারণস্যাত্মভূতা শক্তিঃ, শক্তেশ্চাত্মভূতং কার্য্যম্।"

আবার, অশ্ব ও মহিষে যেরূপ ভেদবুদ্ধি জন্মে—কার্য্য ও কারণে, তত্তদ্দ্রব্যে ও তত্তদ্গুণাদিতে সেইরূপ ভেদবুদ্ধি দৃষ্ট হয় না। ভেদবুদ্ধি জন্মেনা বলিয়া কার্য্য ও কারণের তাদাত্ম্য অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে।

কারণরূপ দুগ্ধাদি দ্রব্য দধি-আদি ভাবে অবস্থিত হইলে তাহা কার্য্য-নাম প্রাপ্ত হয়; সুতরাং দধি-আদি কার্য্যকে দুগ্ধাদি-কারণের অতিরিক্ত বলা যায় না। যে ব্যক্তি পূর্ব্বে মাতৃগর্ভে হাত-পা গুটাইয়া ছিল, ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরে সে ব্যক্তি বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা অতিক্রম করিয়া যায়; ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় অবস্থিত হইলেও কেহ তাহাকে ভিন্ন ব্যক্তি বলে না। একই নট রঙ্গস্থলে উপস্থিত হইয়া নানাবিধ ব্যবহারের অভিনয় করিয়া থাকে। তাহার ব্যবহার বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন হইলেও নটব্যক্তিটী কিন্তু এক এবং অভিন্নই থাকে। তদ্রূপ এক মূল কারণই কার্য্যোৎপত্তির বিভিন্ন পর্য্যায়ের ভিতর দিয়া শেষ কালে চরম কার্য্যরূপে অবস্থিত হয়।

প্রদর্শিত যুক্তিতে জানা গেল—উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যের অস্তিত্ব বা সত্তা থাকে এবং সেই কার্য্য হইতেছে কারণ হইতে অনন্য বা অভিন্ন।

শব্দান্তরের দ্বারাও তাহা জানা যায়। কিরূপে? তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

"অসদ্বা ইদমগ্র আসীৎ"-ইত্যাদি পূর্ব্বসূত্রে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যে "অসৎ"-শব্দ আছে। অন্য যে-সকল শ্রুতিবাক্যে "সৎ"-শব্দের উল্লেখ আছে, সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্যই হইতেছে—শব্দান্তর। এতাদৃশ শব্দান্তর—অর্থাৎ যে সকল শ্রুতিবাক্যে "সৎ"-শব্দ আছে, সেই সকল শ্রুতিবাক্য হইতেছে এইঃ—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ একমেবাদ্বিতীয়ম্—হে সোম্য! এই জগৎ পূর্ব্বে সৎ-ই ছিল।

তাহা এক এবং অদ্বিতীয়"-ইত্যাদি। শ্রুতি প্রথমে বলিয়াছেন—"তদ্ধৈক আহুঃ, অসদেবেদমগ্র আসীৎ—কেহ কেহ বলেন, এই জগৎ পূর্ব্বে অসৎ ছিল।" তাহার পরে বলিয়াছেন—"কথমসতঃ সজ্জায়েত—কিরূপে অসৎ হইতে সৎ জন্মিতে পারে?" তাহার পরে অবধারণ করা হইয়াছে—"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ হে সোম্য! এই জগৎ পূর্ব্বে সৎই ছিল।" এ-স্থলে "ইদম্"-শব্দে কার্য্যরূপ জগৎকে বুঝায় এবং "সৎ"-শব্দে কারণরূপ ব্রহ্মকে বুঝায়। আর, উল্লিখিত "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"-এই বাক্যে উভয়ের (অর্থাৎ কার্য্যরূপ জগতের এবং কারণরূপ ব্রহ্মের) অভিন্নত্বই উল্লিখিত হইয়াছে এবং ইহা দ্বারা উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যরূপ জগতের সত্তার কথাই বলা হইয়াছে।

যদি বলা যায়—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকেনা, কারকব্যাপারে (অর্থাৎ কুম্ভকারাদির ন্যায় কর্ত্তা এবং দণ্ড-চক্রাদির ন্যায় করণ—এ-সমস্তের চেষ্টায়) কার্য্য (কার্য্যরূপ অভিনব বস্তু) উৎপন্ন হয়। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে কারক-ব্যাপার (ঘটরূপ কার্য্যের সম্বন্ধে কুম্ভকার, চক্র-দণ্ডাদির প্রয়োগ) অসার্থক হয়।

উত্তরে বক্তব্য এই। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও কারক-ব্যাপার নিরর্থক হয় না। উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে বটে; কিন্তু কার্য্যাকারে (অভিব্যক্ত-নামরূপাদিরূপে) থাকে না। কার্য্যাকারে থাকে না বলিয়াই তাহার কার্য্যাকারত্ব-সম্পাদনার্থ কারক-ব্যপারের প্রয়োজন হয়। কারক-ব্যাপারটী কার্য্যাকার প্রাপ্ত করায়; সুতরাং তাহা নিরর্থক নহে।

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য কোনও আকারেই থাকেনা—ইহা স্বীকার করিলে কারক-ব্যাপারই নিরর্থক হইয়া পড়ে। কেননা, যাহা নাই, ত্যহা কাহারও বিষয় হইতে পারে না। আকাশের ছেদযোগ্যতা নাই; এজন্য শত শত খড়্গাদি অস্ত্র প্রয়োগ করিলেও আকাশকে ছিন্ন করা যায়না; খড়্গাদি কারক-ব্যাপার নিষ্ফল হইয়া পড়ে।

যদি বলা যায়—কারক-সকল সমাবায়ী কারণকে বিষয় করে, সমবায়ী কারণেই ব্যাপৃত থাকে। উত্তর এই—তাহাও হইতে পারে না। কেননা, দণ্ডচক্রাদি কারক কখনও মৃত্তিকা হইতে সুবর্ণের সৃষ্টি করিতে পারে না। তাই বলা হইতেছে—দুগ্ধাদি দ্রব্য দধ্যাদিরূপে অবস্থিত হইলেই কার্য্য-নাম প্রাপ্ত হয়; শতবর্ষ ব্যাপিয়া চেষ্টা করিলেও কার্য্যের কারণাতিরিক্ততা প্রতিপাদিত হইবেনা। এক মূল কারণই চরম কার্য্য পর্য্যন্ত সেই সেই কার্য্যের আকারে নটের ন্যায় সমুদয় ব্যবহারের আস্পদ হয়।

উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য থাকে না, কারক-ব্যাপারেই অভিনবরূপে উৎপন্ন হয়, এইরূপ বলিতে গেলে কার্য্য ও কারণের ভেদ স্বীকার করিতে হয়। কার্য্য-কারণের ভেদ স্বীকার করিলে, একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের (অর্থাৎ কারণের জ্ঞানে কার্য্যের জ্ঞান-এইরূপ) প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে না। উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্যের সত্তা এবং কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব স্বীকার করিলেই সেই প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইতে পারে। "যদি তু প্রাগুৎপত্তেরসৎ কার্য্যং স্যাৎ, পশ্চাচ্চোৎপদ্য-

মানং কারণে সমবেয়াৎ তদাহনন্যৎ কারণাৎ স্যাৎ। তত্র 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবতি' ইতীয়ং প্রতিজ্ঞা পীড্যেত। সত্ত্বানন্যত্বাবগতেস্ত্বিয়ং প্রতিজ্ঞা সমর্থ্যতে।"

(১) শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য বিবর্ত্তবাদের অনুকূল নহে, পরিণাম-বাদেরই সমর্থক

শ্রীপাদ শঙ্করের উল্লিখিত ভাষ্য তাঁহার বিবর্ত্তবাদের অনুকূল নহে; ইহা বরং পরিণাম-বাদেরই সমর্থক। একথা বলার হেতু এই।

তিনি প্রতিপাদন করিয়াছেন—উৎপত্তির পূর্ব্বেও কার্য্য থাকে; কিন্তু বিবর্ত্তবাদে একথা বলা চলে না; কেননা, শুক্তিতে রজতের জ্ঞান হওয়ার পূর্ব্বে রজতের বা রজত-জ্ঞানের অস্তিত্ব শুক্তিতে থাকে না। সুতরাং উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব বিবর্ত্তবাদের অনুকূল নহে।

ভাষ্যের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্য যদি না থাকে, তাহা হইলে কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিতে হয়; ভেদ স্বীকার করিলে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হয় না। কিন্তু বিবর্ত্ত-বাদে শুক্তি হইতে রজত সর্ব্বদাই ভিন্ন, রজ্জু হইতেও সর্প ভিন্ন পদার্থ: ভিন্ন বলিয়া শুক্তির জ্ঞানে রজতের জ্ঞান জন্মিতে পারে না। তদ্রূপ জগৎ যদি ব্রহ্মের বিবর্ত্তই হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মের জ্ঞানেও জগতের জ্ঞান জন্মিতে পারে না।

উপসংহারে তিনি আরও বলিয়াছেন—উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব এবং কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব) স্বীকার করিলেই এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা রক্ষিত হইতে পারে। বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিলে, উৎপত্তির পূর্ব্বে কার্য্যের অস্তিত্ব এবং কার্য্য-কারণের অনন্যত্বও স্বীকার করা যায় না—সুতরাং এক-বিজ্ঞানে সব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও যে রক্ষিত হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

তিনি আরও বলিয়াছেন—এক মূল কারণই বিভিন্ন ব্যাপারের ভিতর দিয়া চরম কার্য্যে পরিণত হয়। ইহা পরিণাম-বাদেরই কথা, বিবর্ত্তবাদের কথা নহে। কেননা, বিবর্ত্তবাদের রজত শুক্তি হইতে অভিন্নও নহে, শুক্তিই যে বিভিন্ন ব্যাপারের ভিতর দিয়া রজতের অবস্থায় উপনীত হয়, তাহাও নহে।

খ। শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

শ্রীপাদ রামানুজ-প্রদর্শিত যুক্তিটী এই। সত্ত্ব ও অসত্ত্ব হইতেছে পদার্থের দুইটী ধর্ম্ম। যখন স্থূল ও গোলাকার আকৃতির সহিত মৃত্তিকা-নামক দ্রব্যটীর যোগ হয়, তখনই ঘটের উৎপত্তি হয়, তখনই বলা হয়—ঘট আছে, ঘটের সত্তা আছে। এ-স্থলে স্থূল ও গোলাকার আকৃতি হইল ঘটের সত্তা-ধর্ম্ম, সত্তাসূচক ধর্ম্ম। আবার সেই মৃত্তিকারই যখন ঘটাবস্থার বিরোধী অবস্থান্তরের সহিত সম্বন্ধ হয়, অর্থাৎ যখন স্থূল ও গোলাকার আকৃতির সহিত মৃত্তিকার সম্বন্ধ থাকে না, তখনই বলা হয় ঘট নাই, ঘটের সত্তা নাই। ইহাও একটী ধর্ম্ম, ঘটের অসত্ত্বসূচক ধর্ম্ম। তন্মধ্যেও আবার কপালাদি অবস্থা সেই ঘটাবস্থারই বিরোধী। সুতরাং সেই কপালাদি অবস্থাই ঘটাবস্থাপ্রাপ্ত মৃত্তিকার "নাস্তি—

অসৎ"-এই রূপ ব্যবহারের প্রবর্ত্তক। আবার এই অবস্থান্তরাতিরিক্ত ঘটাভাব বলিয়া কোনও পদার্থ উপলব্ধি-গোচরও হয় না। আর, সেই অবস্থাদ্বারাই যখন অভাব-ব্যবহারও উপপন্ন হইতে পারে, তখন "অভাব"-নামে একটা পদার্থের কল্পনা করাও আবশ্যক হয় না।

সূত্রকথিত "শব্দান্তর"-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—

শব্দান্তর (অন্য প্রকার শব্দের ব্যবহার) হইতেও উৎপত্তির পূর্ব্বে অন্য প্রকার ধর্ম্মের সম্বন্ধই উপপন্ন হইতেছে। পূর্ব্বে উদাহৃত "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"-ইত্যাদি বাক্যই এ-স্থলে "শব্দান্তর"-পদের লক্ষ্য। কারণ, সে-সকল বাক্যে "কুতস্তু খলু সোম্যৈবং স্যাৎ (ছান্দোগ্য ॥৬।২।২)—হে সোম্য! কিরূপে এইরূপ হইতে পারে? অর্থাৎ কিরূপে অসৎ হইতে সতের উৎপত্তি হইতে পারে?"-এইরূপে উৎপত্তির পূর্ব্বেও জগতের অসত্ত্ব নিষেধ করিয়া সিদ্ধান্ত করা হইয়াছে যে-"সত্ত্বেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ— হে সোম্য! পূর্ব্বে এই জগৎ কিন্তু সৎই ছিল।" "তদ্ধেদং তর্হ্যব্যাকৃতমাসীৎ, তন্নামরূপাভ্যাং ব্যাক্রিয়ত (বৃহদারণ্যক ॥৩।৪।৭)—তখন (উৎপত্তির পূর্ব্বে) এই জগৎ অব্যাকৃত (নাম-রূপে অনভিব্যক্ত) ছিল, তাহাই নামরূপে অভিব্যক্ত হইল।" এই বাক্যে সুস্পষ্টভাবেই বলা হইল যে, উৎপত্তির পূর্ব্বেও জগৎ ছিল, তবে তখন নামরূপে অনভিব্যক্ত ছিল; উৎপত্তির পরে তাহা নামরূপে অভিব্যক্ত হয়। "অসৎ"-শব্দে নামরূপে অভিব্যক্তির অসত্তাই বুঝাইতেছে, আত্যন্তিকী অসত্তা বুঝায় না।

৪৮। পটবচ্চ ॥২।১।১৯॥-ব্রহ্মসূত্র

শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

একখণ্ড বস্ত্রকে যখন সংবেষ্টিত অবস্থায় (অর্থাৎ গুটাইয়া) রাখা হয়, তখন বুঝিতে পারা যায় না—উহা কি বস্ত্র, না কি অন্য কোনও দ্রব্য; বস্ত্র বলিয়া বুঝিতে পারিলেও উহার দৈর্ঘ্য-বিস্তারাদি জানা যায় না। কিন্তু উহাকে প্রসারিত করিলে জানা যায় যে উহা বস্ত্র; তখন উহার দৈর্ঘ্য-বিস্তারাদিও জানা যায়। সংবেষ্টিত এবং প্রসারিত—এই উভয় অবস্থাতেই কিন্তু একই বস্ত্র, কোনও অবস্থাতেই উহা বস্ত্র ভিন্ন অন্য কোনও দ্রব্য নহে। এইরূপে, বস্ত্র যখন সূত্রাবস্থ বা কারণাবস্থ থাকে, তখন তাহাকে পরিষ্কারভাবে বুঝা যায় না—উহা যে বস্ত্র, তাহা বুঝা যায় না। কিন্তু কারণাবস্থ সূত্র যখন তুরী, বেমা ও তন্তুবায়াদি কারক-ব্যাপারে (অর্থাৎ তন্তুবায়ের তাঁতের সাহায্যে) বিশিষ্ট আকারে সজ্জিত হয়, তখন তাহাকে বস্ত্র বলিয়া পরিষ্কারভাবেই জানা যায়। সূতা ও বস্ত্র দেখিতে বিভিন্ন বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ একই—একই বস্তু, কারণাবস্থায় সূতা এবং কার্য্যাবস্থায় বস্ত্র।

শ্রীপাদ শঙ্করের এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়—কারণ হইতে কার্য্য অনন্য—অভিন্ন। যেমন, সূতা হইতে বস্ত্র অভিন্ন।

(১) **শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য পরিণামবাদেরই সমর্থক, বিবর্ত্তবাদের অনুকূল নহে**

এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য পরিণাম-বাদেরই অনুকূল। কারণরূপ সুতার অবস্থান্তরই হইতেছে কার্য্যরূপ বস্ত্র। অবস্থান্তরকেই পরিণাম বলে। কারণরূপে যেই সুতা, কার্য্যরূপ বস্ত্রেও সেই একই সুতা।

তাঁহার ভাষ্য বিবর্ত্তবাদের অনুকূল নহে। কেননা, শুক্তির অবস্থা-বিশেষ রজত নহে; শুক্তি এবং রজতও এক বস্তু নহে।

শ্রীপাদ রামানুজের ভাষ্যমর্ম্মও শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যের অনুরূপই।

৪৯। যথা চ প্রাণাদি ॥২।১।২০॥-ব্রহ্মসূত্র

ক। শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

লোকের দেহে পাঁচটী প্রাণবায়ু আছে—প্রাণ, অপান, সমান, উদান ও ব্যান। এই পাঁচটীই কিন্তু বায়ু, এক বায়ুরই পাঁচ প্রকারে অভিব্যক্তি; সুতরাং বায়ুই হইল ইহাদের কারণ এবং ইহারা হইল এক বায়ুরই কার্য্য। প্রণায়ামের দ্বারা রুদ্ধ হইলে এই পাঁচটী প্রাণবায়ু কেবল এক কারণরূপে (কারণ বায়ুরূপে) অবস্থান করে (অর্থাৎ তখন পঞ্চ প্রাণের পৃথক্ পৃথক্ বৃত্তি বা ক্রিয়া থাকে না)। রুদ্ধ অবস্থায় ইহা কেবল জীবনকার্য্য মাত্র নির্ব্বাহ করে (অর্থাৎ প্রাণায়ামকারীকে কেবল বাঁচাইয়া রাখে), কিন্তু দেহের আকুঞ্চন-প্রসারাদি কোনও কার্য্যই করে না। কিন্তু যখন প্রাণায়ামের দ্বারা রুদ্ধ হয় না, তখন পাঁচটী প্রাণের বৃত্তিই প্রকাশ পায়, তখন তাহারা জীবন-ধারণ-কার্য্যও নির্ব্বাহ করে এবং তদতিরিক্ত দেহের আকুঞ্চন-প্রসারাদি কার্য্যও নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। এই প্রাণপঞ্চক মূল প্রাণবায়ুরই রকমভেদ মাত্র; মূল প্রাণবায়ু হইতে তাহারা ভিন্ন নহে; সকলগুলিই বায়ুস্বভাব অর্থাৎ স্বরূপতঃ বায়ু; সুতরাং সকলগুলিই বস্তুতঃ এক—অভিন্ন। কার্য্য যে কারণ হইতে অনন্য—অভিন্ন, তাহা এই প্রাণের দৃষ্টান্ত হইতেও জানা যায়—"যথা চ প্রাণাদি।"

সমস্ত জগৎ ব্রহ্মকার্য্য বলিয়া এবং ব্রহ্ম হইতে অনন্য (অভিন্ন) বলিয়া এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হয়। "অতশ্চ কৃৎস্নস্য জগতো ব্রহ্মকার্য্যত্বাৎ তদনন্যত্বাচ্চ সিদ্ধৈষা শ্রৌতী প্রতিজ্ঞা 'যেনাশ্রুতং শ্রুতং ভবত্যমতং মতমবিজ্ঞাতং বিজ্ঞাতম্' ইতি।"

(১) শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য পরিণামবাদেরই সমর্থক, বিবর্ত্তবাদের সমর্থক নহে

পূর্ব্বসূত্র-সমূহের প্রসঙ্গে উল্লিখিত কারণে এ-স্থলেও দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য পরিণাম-বাদেরই সমর্থক, কিন্তু বিবর্ত্তবাদের সমর্থক নহে। পঞ্চপ্রাণ মূল প্রাণবায়ুর বিবর্ত্ত নহে।

খ। শ্রীপাদ রামানুজকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

একই বায়ু যেরূপ শরীরের মধ্যে বিশেষ বিশেষ বৃত্তি লাভ করিয়া প্রাণাপানাদিরূপে নামরূপাদি ধারণ করিয়া বিভিন্ন কার্য্য সম্পাদন করে, তদ্রূপ এক ব্রহ্মই স্থাবর-জঙ্গমাত্মক বিচিত্র

জগতের রূপ ধারণ করেন। এইরূপেই পরম-কারণ ব্রহ্ম হইতে জগতের অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব) সিদ্ধ হয়।

গ। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণকৃত ভাষ্যের মর্ম্ম

প্রাণ ও অপানাদি যেমন প্রাণায়ামদ্বারা সংযমিত হইয়া, সেই সংযম-সময়েও মুখ্যপ্রাণ-মাত্ররূপে বিদ্যমান থাকিয়া, প্রবৃত্তিকালে হৃদয়াদি স্থানসকল মুখ্যের ভজনা করিলে, সেই মুখ্য হইতে স্ব-স্ব-রূপে অভিব্যক্ত হয়, তদ্রূপ জগৎ-প্রপঞ্চও প্রলয়-কালে সূক্ষ্মশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মে ব্রহ্মের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া বিদ্যমান থাকে ; সৃষ্টিকালে তাঁহার সৃষ্টিবাসনা জন্মিলে তাঁহা হইতেই প্রধান ও মহদাদিরূপে প্রাদুর্ভূত হইয়া থাকে। অসৎ-কার্য্যবাদে এইরূপ দৃষ্টান্ত নাই। বন্ধ্যার পুত্র কখনও কোনও স্থানে উৎপন্ন হইতে দেখা যায় না। আকাশকুসুমও কেহ কখনও দেখে নাই। অতএব জীব-প্রকৃতি-শক্তিবিশিষ্ট একমাত্র ব্রহ্মই জগতের উপাদান এবং উপাদেয় (কারণ ও কার্য্য)—এই উভয়াত্মক—ইহা প্রতিপাদিত হইল। এইরূপ কার্য্যাবস্থত্বেও অচিন্তনীয়ত্ব-ধর্ম্মযোগবশতঃ অবিচলিত পূর্ব্বাবস্থত্ব বিদ্যমান থাকে (অর্থাৎ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন)। স্মৃতিও তাহা বলেন—

"ওঁ নমো বাসুদেবায় তস্মৈ ভগবতে সদা।
ব্যতিরিক্তং ন যস্যাস্তি ব্যতিরিক্তোঽখিলস্য যঃ ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥

—সেই ভগবান্ বাসুদেবকে সর্ব্বদা নমস্কার করি—যাঁহার অতিরিক্ত কিছু নাই ; কিন্তু যিনি সমস্ত জগৎ হইতে অতিরিক্ত।"

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের ভাষ্য হইতে জানা গেল—স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম স্বরূপে অবিকৃত থাকেন এবং জগদ্রূপে পরিণত হইলেও তিনি জগতের অতিরিক্ত, জগৎমাত্রই তিনি নহেন। "প্রকৃতৈতাবত্ত্বং হি প্রতিষেধতি"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রও তাহাই বলিয়াছেন।

"আত্মকৃতেঃ পরিণামাৎ", "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতেও জানা যায়—স্বীয় অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম স্বরূপে অবিকৃত থাকেন।

৫০। শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ ও জগতের মিথ্যাত্ব অশাস্ত্রীয়

পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।৪৩-৪৯-অনুচ্ছেদে আলোচিত ব্রহ্মসূত্রগুলিতে কার্য্য-কারণের, অর্থাৎ কার্য্যরূপ জগতের এবং তৎকারণরূপ ব্রহ্মের, অনন্যত্ব বা অভিন্নত্বই প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং এই অনন্যত্ব-বশতঃই যে একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

"প্রকৃতিশ্চ প্রতিজ্ঞাদৃষ্টান্তানুপরোধাৎ ॥১।৪।২৩॥-"এই ব্রহ্মসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া পাঁচটী সূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ (৩।১০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্ম জগতের উপাদান-কারণ হওয়াতেই যে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব (অভিন্নত্ব), তাহাই পূর্ব্ববর্ত্তী ৩।৪৩—৪৯-অনুচ্ছেদে আলোচিত "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৪॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "যথা চ প্রাণাদি ॥২।১।২০॥" পর্য্যন্ত সাতটী সূত্রে প্রদর্শিত হইয়াছে। এই সূত্রগুলিতে উপাদানাংশেই কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ব্রহ্মরূপ (অর্থাৎ ব্রহ্ম-শক্তিরূপ) উপাদানই জগদ্রূপ কার্য্যে পরিণত হয় (৩।২৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রুতি মৃৎপিণ্ড এবং মৃণ্ময় ঘটাদির উদাহরণে তাহা পরিস্ফুট করিয়াছেন। উপাদান-মৃত্তিকাংশে মৃণ্ময় ঘটাদি এবং মৃৎপিণ্ড অভিন্ন। এইরূপে বুঝা যায়—পরিণামবাদ স্বীকার করিয়াই সূত্রকার ব্যাসদেব কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারাই যে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইতে পারে, তাহাও দেখাইয়াছেন।

"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" প্রভৃতি কার্য্য-কারণের অভিন্নত্বসূচক ব্রহ্মসূত্রগুলির ভিত্তিই হইতেছে পরিণামবাদ। বিবর্ত্তবাদ এইসূত্রগুলির ভিত্তি হইতে পারে না। কেননা, বিবর্ত্তবস্তুর কার্য্যত্বই সিদ্ধ হয় না। কেন একথা বলা হইল, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ক। বিবর্ত্তের কার্য্যত্ব অসিদ্ধ

কার্য্য-প্রসঙ্গে কারক-ব্যবহার অপরিহার্য্য, অর্থাৎ কার্য্যোৎপাদনের জন্য কয়েকটী কারক অপরিহার্য্য।

কর্ম্মরূপে কার্য্য নিজেই কর্ম্মকারক। কার্য্যস্রষ্টা কর্ত্তাও আবশ্যক; নতুবা কার্য্য করিবেন কে? তিনি কর্ত্তৃকারক। কার্য্যের উপাদানও অপরিহার্য্য; উপাদান—যাহা হইতে কার্য্যের উৎপত্তি, যেমন মৃত্তিকা হইতে ঘটাদির উৎপত্তি। এই উপাদান হইতেছে অপাদান-কারক। করণের, অর্থাৎ কার্য্যনিষ্পাদনের সহায়ক বস্তুরও, প্রয়োজন; যেমন, ঘট-নির্ম্মাণে দণ্ড-চক্রাদি। এই সমস্ত সহায়ক বস্তু হইতেছে করণ-কারক। আর, কার্য্য উৎপন্ন হইলে তাহার অবস্থানের জন্য আধারের বা অধিকরণেরও প্রয়োজন হয়। যেমন, ঘটাদি রাখার স্থান। ইহা হইতেছে অধিকরণ-কারক।

সৃষ্টির পূর্ব্বে যখন একমাত্র ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই ছিল না, এবং এক অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যখন জগতের সৃষ্টি করিলেন, তখন বুঝিতে হইবে—জগদ্রূপ কার্য্য-প্রসঙ্গে ব্রহ্মই সমস্ত কারকের আস্পদ। কর্ত্তা, কর্ম্ম, করণ, অপাদান, অধিকরণ—সমস্তই ব্রহ্ম। "সম্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ।" ছান্দোগ্য ॥ ৬।৮।৬॥", "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে" ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও তাহাই বলিয়াছেন।

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—সমস্ত কারকের, সমস্ত বিভক্তির, আস্পদই হইতেছেন পরব্রহ্ম।

"যস্মিন্ যতো যেন চ যস্য যস্মৈ যদ্ যো যথা কুরুতে কার্য্যতে চ।
পরাবরেষাং পরমং প্রাক্ স্বসিদ্ধং তদ্ব্রহ্ম তদ্ধেতুরনন্যদেকম্॥ —শ্রীভা, ৬।৪।৩০॥

—যে অধিকরণে, যে অপাদান হইতে, যে করণদ্বারা, যাহার সম্বন্ধে, যৎসম্প্রদানক, যৎকর্ম্মক, যৎকর্ত্তৃক, যে প্রকারে কোন কর্ম্ম কৃত বা কারিত হয়, তিনিই ব্রহ্ম। তিনি ঐ সকলের কারণ; যেহেতু, সকলের অগ্রে তিনি আপনা হইতেই সিদ্ধ। তিনি পর, অপর —সকলেরই পরম-কারণ। তিনি এক—অর্থাৎ অন্যনিরপেক্ষ এবং অনন্য—অর্থাৎ সর্ব্ববিধ ভেদশূন্য।"

কর্ত্তৃকারকে প্রথমা বিভক্তি হয়; কর্ম্মকারকে দ্বিতীয়া, করণ-কারকে তৃতীয়া, অপাদান-কারকে পঞ্চমী এবং অধিকরণ-কারকে সপ্তমী বিভক্তি হয়। বিভক্তি মোট সাতটী। পাঁচ কারকে পাঁচটী বিভক্তির কথা বলা হইল। বাকী রহিল দুইটী—চতুর্থী এবং ষষ্ঠী। শ্লোকস্থ "যস্মৈ"-শব্দে চতুর্থী বিভক্তির এবং "যস্য"-শব্দে ষষ্ঠী বিভক্তির কথা বলা হইয়াছে; এই দুইটী বিভক্তির আস্পদও ব্রহ্ম। কিরূপে? শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"যস্য সম্বন্ধিনঃ, যস্মৈ সম্প্রদানায় —যাহার সম্বন্ধে, যৎসম্প্রদানক।" "কুরুতে"-শব্দে ব্রহ্মের স্বয়ংকর্ত্তৃত্বের কথা এবং "কার্য্যতে"-শব্দে তাঁহার প্রযোজ্য-কর্ত্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—কারক-ব্যবহার ব্যতীত কার্য্য সিদ্ধ হইতে পারে না। কারক-সমূহের মধ্যে কর্ম্মকারক তো কার্য্য নিজেই; অন্য চারিটী কারক হইতেছে কার্য্যের কারণ—কর্ত্তৃকারক হইতেছে নিমিত্তকারণ; অপাদানকারক—উপাদান-কারণ; করণ-কারক—গৌণ নিমিত্ত-কারণ এবং অধিকরণ-কারক—অধিষ্ঠান-কারণ।

পরিণাম-বস্তুতেই এই সমস্ত কারকের ব্যবহার সম্ভবপর। মৃত্তিকার পরিণাম বা বিকার ঘটের সম্বন্ধে—কুম্ভকার (কর্ত্তৃকারক) হইতেছে নিমিত্তকারক, মৃত্তিকা (অপাদান কারক) হইতেছে উপাদান-কারক, দণ্ডচক্রাদি (করণ-কারক) হইতেছে গৌণ নিমিত্ত-কারক, এবং মৃণ্ময়পাত্র রাখিবার স্থান (অধিকরণ-কারক) হইতেছে অধিষ্ঠান-কারক। আর, মৃণ্ময় ঘটাদি হইতেছে কর্ম্মকারক বা কার্য্য।

কিন্তু বিবর্ত্ত-বস্তুতে যে কর্ত্তৃকারকাদির অবকাশ নাই, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

শুক্তির বিবর্ত্ত হইতেছে রজত। শুক্তি যদি রজতের কারণ হয় এবং রজত যদি শুক্তির কার্য্য হয়, তাহা হইলেই শুক্তি-রজতের মধ্যে কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ থাকিতে পারে এবং শুক্তি যদি রজতের উপাদান হয়, তাহা হইলেই কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্বও সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু শুক্তির বিবর্ত্ত রজতের কার্য্যত্ব আছে কিনা, তাহাই বিবেচ্য। রজত-সম্বন্ধে শুক্তির কোনওরূপ কারকত্ব আছে কিনা, তাহাই দেখিতে হইবে।

কর্ত্তৃকারকত্ব। শুক্তি কখনও রজতের কর্ত্তা, অর্থাৎ রজতের নির্ম্মাতা হইতে পারে না।

কেননা, শুক্তি হইতেছে অচেতন জড় বস্তু। অচেতনের কর্ত্তৃত্ব থাকিতে পারে না। সুতরাং শুক্তির কর্ত্তৃকারকত্ব নাই।

অপাদান-কারকত্ব অর্থাৎ উপাদানত্ব। শুক্তি রজতের উপাদান নহে; মৃত্তিকা হইতে যেমন ঘট প্রস্তুত হয়, তদ্রূপ শুক্তি হইতে রজত প্রস্তুত হয় না। ঘটের মধ্যে যেমন মৃত্তিকা আছে, তদ্রূপ রজতের মধ্যে শুক্তি নাই। সুতরাং রজত-সম্বন্ধে শুক্তির উপাদানত্ব বা অপাদান-কারকত্ব থাকিতে পারে না।

শুক্তি অচেতন বলিয়া অন্য উপাদানও সংগ্রহ করিতে পারে না।

কর্ম্মকারকত্ব। শুক্তির উপাদানত্বের অভাবে তাহার কর্ম্মকারকত্বও সিদ্ধ হয় না। শুক্তি তাহার কার্য্যরূপে আত্মপ্রকাশ করে না।

করণ-কারকত্ব। অচেতন বলিয়া কার্য্য-করণের সহায়ক হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়ও শুক্তির নাই, চক্র-দণ্ডাদি উপায় সংগ্রহ করার সামর্থ্যও তাহার নাই। সুতরাং শুক্তির করণ-কারকত্ব থাকিতে পারে না।

অধিকরণ-কারকত্ব বা আশ্রয়ত্ব শুক্তির থাকিতে পারে; কিন্তু কেবলমাত্র আশ্রয়ত্বে আশ্রিত বস্তুর কার্য্যত্ব সিদ্ধ হয় না। ইষ্টকাদি-নির্ম্মিত গৃহে লোকজন ও অনেক জিনিসপত্র থাকে; গৃহ তাহাদের আশ্রয়—অধিষ্ঠান-কারণ মাত্র; কিন্তু লোকজন-জিনিসপত্র গৃহের কার্য্য নহে।

এইরূপে দেখা গেল—কার্য্যোৎপত্তির নিমিত্ত যে যে কারকের ব্যবহার অত্যাবশ্যক বা অপরিহার্য্য, রজতের উৎপাদনে শুক্তির সে-সমস্ত কারকের কারকত্বই নাই। সুতরাং শুক্তি কখনও রজতের কারণ হইতে পারে না, রজতও শুক্তির কার্য্য হইতে পারে না।

অপাদান-কারকত্বের বিচারে দেখা গিয়াছে, শুক্তির বিবর্ত্ত রজতের উপাদানেরই ঐকান্তিক অভাব। উপাদান ব্যতীত কোনও বস্তুরূপ কার্য্যের উৎপত্তি হইতে পারে না। যাহার উৎপত্তিই অসম্ভব, তাহার কার্য্যত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—বিবর্ত্তের কার্য্যত্ব অসিদ্ধ।

খ। বিবর্ত্ত কখনও "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"-আদি ব্রহ্মসূত্রের বিষয়বস্তু নহে

কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব-প্রদর্শনই হইতেছে "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"-আদি সূত্রের উদ্দেশ্য। সুতরাং যে-দুইটী বস্তু কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত, কেবলমাত্র সেই দুইটী বস্তুই এই সকল সূত্রের বিষয়-বস্তু হইতে পারে; কিন্তু কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত নহে, এইরূপ দুইটী বস্তু এই সকল সূত্রের বিষয়বস্তু হইতে পারে না। বিবর্ত্ত-ব্যাপারে, বিবর্ত্ত-বস্তু (যথা রজত) এবং বিবর্ত্তের অধিষ্ঠান বস্তু (যথা শুক্তি) কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধে সম্বন্ধ নয় বলিয়া তাহারা এই সকল সূত্রের বিষয়-বস্তু হইতে পারে না; অর্থাৎ শুক্তি ও রজতের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রদর্শন এই সকল সূত্রের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

উপাদান-কারণের সহিতই কার্য্যের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব; সমস্ত ভাষ্যকারই তাহা দেখাইয়াছেন এবং "যথা সোম্যৈকেন মৃৎপিণ্ডেন সর্ব্বং মৃণ্ময়ং বিজ্ঞাতং স্যাৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যও তাহাই। কিন্তু বিবর্ত্ত-ব্যাপারে, শুক্তি যখন রজতের উপাদান নহে, তখন শুক্তি-রজতের এতাদৃশ অনন্যত্বের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এই দিক্ দিয়াও বুঝা যায়—শুক্তি-রজতের অনন্যত্ব-প্রদর্শন এই সকল সূত্রের অভিপ্রেত হইতে পারে না।

কার্য্য যদি উপাদান-কারণের পরিণাম (বিকার বা অবস্থান্তর) হয়, তাহা হইলেই কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব সিদ্ধ হইতে পারে। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, "তদনন্যত্বমাদি"-সূত্র পরিণাম-বাদেরই সমর্থক, বিবর্ত্তবাদের সমর্থক নহে।

"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্" এই শ্রুতিবাক্যের স্বাভাবিক অর্থে যে বিকার-দ্রব্যের সত্যতার কথাই বলা হইয়াছে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৩।৩৭-৩৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই স্বাভাবিক অর্থ গ্রহণ করিলেই 'তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ" সূত্রে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব সিদ্ধ হইতে পারে।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর "বাচারম্ভণম্"-শ্রুতিবাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে এই শ্রুতি-বাক্যের তাৎপর্য্য হইতে পারে না, শ্রুতিবাক্যের সান্নিধ্যে থাকিয়া শ্রীপাদ যে স্বীয় ব্যক্তিগত অভিমতই ঐ অর্থে ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বে (৩।৪০-৪১ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার এই কল্পিত অর্থের আলোকেই "তদনন্যত্বমাদি"-ব্রহ্মসূত্রের ব্যাখ্যা করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার এই চেষ্টার ফল হইয়াছে এই যে—তিনি সূত্রনির্দ্দিষ্ট পন্থা ত্যাগ করিয়া অন্য পথে চলিয়া গিয়াছেন। ব্রহ্মরূপ কারণ হইতে জগদ্রূপ কার্য্যের অভিন্নত্ব না দেখাইয়া তিনি ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব (অর্থাৎ ব্রহ্ম ভিন্ন পরিদৃশ্যমান জগতের বাস্তব অস্তিত্ব-হীনতা) দেখাইয়াছেন [৩।৪৩ক-অনুচ্ছেদ, বিশেষতঃ তদন্তর্গত (৩), (৪) উপ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব অবশ্য শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে; কিন্তু উল্লিখিত সূত্রের প্রতিপাদ্য হইতেছে কারণরূপ ব্রহ্ম হইতে কার্য্যরূপ জগতের অভিন্নত্ব; ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব এই সূত্রের মুখ্যপ্রতিপাদ্য নহে। সূত্রের অভিপ্রেত অনন্যত্বও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের বিরোধী নহে; কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব হইতেই ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব উপপন্ন হয়।

বিবর্ত্ত-বাদের শুক্তি-রজতের অনন্যত্বও যে "তদনন্যত্বমাদি"-সূত্রের বিষয়বস্তু নহে, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তথাপি শ্রীপাদ শঙ্কর বিবর্ত্ত-ব্যাপারকে আশ্রয় করিয়াই এই সূত্রের আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু তাহাতে যে তিনি শুক্তি-রজতের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত করিতে পারেন নাই, এবং তাঁহার ব্যাখ্যায় যে এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে (৩।৪৩ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

যাহা হউক "তদনন্যত্বম্"-ইত্যাদি সূত্রে বিবর্ত্তবাদ স্থাপনের চেষ্টা করিলেও এই সূত্রেরই সমর্থক পরবর্ত্তী, "ভাবে চোপলব্ধেঃ ॥২।১।১৫॥" হইতে আরম্ভ করিয়া "যথা চ প্রাণাদি ॥২।১।২০॥"

পর্য্যন্ত ছয়টী সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যাহা লিখিয়াছেন, তাহা যে পরিণামবাদেরই সমর্থক, বিবর্ত্তবাদের সমর্থক নহে, তাহাও সেই সকল সূত্রের শঙ্করভাষ্যের আলোচনা-প্রসঙ্গে প্রদর্শিত হইয়াছে [৩।৪৪-৪৯ অনুচ্ছেদের অন্তর্গত ক (১) উপ-অনুচ্ছেদগুলি দ্রষ্টব্য]। এই সকল সূত্রের ভাষ্যে তিনি জগতের মিথ্যাত্ব-প্রতিপাদনের চেষ্টাও করেন নাই ; বরং "সত্ত্বাচ্চাবরস্য ॥২।১।১৬॥"-সূত্রের উপসংহারে তিনি লিখিয়াছেন—"যথা চ কারণং ব্রহ্ম ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি, এবং কার্য্যমপি জগৎ ত্রিষু কালেষু সত্ত্বং ন ব্যভিচরতি। একঞ্চ পুনঃ সত্ত্বম্। অতোঽপি অনন্যত্বং কারণাৎ কার্য্যস্য।—কারণ ব্রহ্ম যেমন কালত্রয়ে তাঁহার সত্তার ব্যভিচার করেন না, তেমনি কার্য্য জগৎও কালত্রয়ে তাহার সত্তার ব্যভিচার করে না। সত্ত্ব বা সত্তা একই। এজন্যও কারণ হইতে কার্য্যের অনন্যত্ব।" এ-স্থলে তিনি জগৎকে ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়াই স্বীকার করিয়াছেন, জগৎকে ব্রহ্মের বিবর্ত্ত বলেন নাই। জগৎকে ব্রহ্মের কার্য্যরূপে স্বীকার করিয়া ব্রহ্মের ন্যায় কালত্রয়েই জগতের অস্তিত্বও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। "কালত্রয়েই জগতের অস্তিত্ব"— ইহার তাৎপর্য্য এই যে, সৃষ্টির পূর্ব্বে নামরূপে অনভিব্যক্ত অবস্থায় কারণরূপে জগতের অস্তিত্ব থকে এবং সৃষ্টির পরে নামরূপে অভিব্যক্ত অবস্থায় কার্য্যরূপেও জগতের অস্তিত্ব আছে এবং সৃষ্টির অবসানে মহাপ্রলয়েও পুনরায় অনভিব্যক্ত অবস্থায় কারণরূপে যখন অবস্থান করিবে, তখনও জগতের অস্তিত্ব থাকিবে।

এ-স্থলে বিবর্ত্তবাদী শ্রীপাদ শঙ্করের লেখনীমুখে স্বপ্রকাশ সত্যই আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। কার্য্য ও কারণ এই উভয়ের সত্যত্বেই কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব এবং তাহাতেই এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হয়।

যাহা হউক, সমর্থক সূত্রগুলি যখন জগতের সত্যত্বের এবং পরিণাম-বাদের সমর্থন করিয়াছে, তখন মূল সূত্রের—"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"-সূত্রের—তাৎপর্য্যও যে তদ্রূপ, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—বিবর্ত্তবাদ এবং জগতের মিথ্যাত্ব সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে ; পরিণাম-বাদ এবং জগতের সত্যত্বই তাঁহার অভিপ্রেত।

মৃৎপিণ্ড এবং মৃণ্ময় বস্তুর দৃষ্টান্তে শ্রুতিও মৃণ্ময় বস্তুকে মৃৎপিণ্ডের "বিকারই" (পরিণামই) বলিয়াছেন, "বিবর্ত্ত" বলেন নাই। এই প্রসঙ্গে **শ্রুতি কোনও স্থলেই মৃত্তিকাদির কার্য্যকে "বিবর্ত্ত" বলেন নাই**, সর্ব্বত্রই "বিকার" বলিয়াছেন। বিকার ও বিবর্ত্ত যে এক নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৩।৪১-খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের কার্য্য ; বিকারের কার্য্যত্বই অসিদ্ধ (৩।৫০-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

মৃৎপিণ্ড এবং মৃণ্ময় বস্তুর দৃষ্টান্তে শ্রুতি বিকারকে সত্যই বলিয়াছেন, মিথ্যা বলেন নাই। **ব্রহ্মকার্য্যরূপ জগৎকেও শ্রুতি কোথাও মিথ্যা বলেন নাই, সত্যই বলিয়াছেন।** "সত্ত্বাচ্চাবরস্য"-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ এবং তাঁহার কল্পিত জগতের মিথ্যাত্ব শাস্ত্রসম্মত নহে, বরং শাস্ত্রবিরুদ্ধ।

"সত্ত্বাচ্চাবরস্য"-সূত্রভাষ্যে কালত্রয়ে জগতের সত্তা স্বীকার করাতে শ্রীপাদ শঙ্কর যেন স্বীয় লেখনী-মুখেই স্বীকার করিয়াছেন যে—"বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"-বাক্যের তিনি যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা শ্রুতিবাক্যটীর প্রকৃত অর্থ নহে। তৎকৃত অর্থ যে সূত্রকার ব্যাস দেবেরও সম্মত নয়, "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"-আদি সাতটী সূত্রই তাহার প্রমাণ। কেননা, কার্য্যের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ব্যাসদেব এই কয়টী সূত্রে কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা পরিণাম-বাদকেও সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন।

৫১। পরিণামবাদ ও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব

যদি বলা যায়, পরিণামবাদ স্বীকার করিয়া জগতের সত্যত্ব বা অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে না ; কেননা, তাহাতে ব্রহ্মাতিরিক্ত আর একটী বস্তুর—জগতের—অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়। ব্রহ্মাতিরিক্ত জগৎ হইবে তখন ব্রহ্মের ভেদ। ভেদ স্বীকার করিলে অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে না। অথচ, "একমেবাদ্বিতীয়ম্", "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—ইত্যাদি শ্রুতি-বাক্যে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব এবং ভেদরাহিত্যের কথাই বলা হইয়াছে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গী নিয়া ভেদের লক্ষণ নির্ণয় করিলে দেখা যাইবে—ব্রহ্মকার্য্য-জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব এবং ভেদরাহিত্য ক্ষুণ্ণ হয় না।

ভেদ কাহাকে বলে ? দুইটী বস্তু যদি সর্ব্বতোভাবে পরস্পর হইতে ভিন্ন হয়, কোনওটীই যদি অপরটীর কোনওরূপ অপেক্ষা না রাখে, প্রত্যেকটীই যদি অন্যনিরপেক্ষ এবং স্বয়ংসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই তাহাদের একটীকে অপরটীর ভেদ বলা সঙ্গত হয়। যদি একটী অপরটীর কোনওরূপ অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে একটীকে অপরটীর ভেদ বলা সঙ্গত হইবে না।

মৃণ্ময় ঘটাদি মৃৎপিণ্ডের ভেদ নহে ; কেননা, মৃণ্ময় ঘটাদি মৃৎপিণ্ডের অপেক্ষা রাখে। মৃৎপিণ্ড হইতেই মৃণ্ময় ঘটাদির উৎপত্তি ; মৃৎপিণ্ড আছে বলিয়াই মৃণ্ময় ঘটাদির উৎপত্তি হইতে পারে; নচেৎ মৃণ্ময় ঘটাদির উৎপত্তিই সম্ভবপর হইত না। সুতরাং মৃণ্ময় ঘটাদি কখনও মৃত্তিকা-নিরপেক্ষ নহে, স্বয়ংসিদ্ধ নহে ; স্বয়ংসিদ্ধ নহে বলিয়া মৃত্তিকা ও ঘটের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ আছে বলা যায় না। মৃণ্ময় ঘটাদি হইতেছে মৃৎপিণ্ডেরই সংস্থান-বিশেষ, মৃত্তিকাতিরিক্ত কোনও বস্তু নহে।

তদ্রূপ ব্রহ্মকার্য্য জগৎও ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু নহে, ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে। ব্রহ্মই স্বীয় স্বরূপে অবিকৃত থাকিয়া জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন ; সৃষ্টির পূর্ব্বে যাহা নাম-রূপে অনভিব্যক্ত ছিল, তাহাই নাম-রূপে অভিব্যক্ত হইয়াছে। একই বস্তুর অনভিব্যক্ত এবং অভিব্যক্ত এই অবস্থাদ্বয়ই

হইতেছে যথাক্রমে কারণরূপ ব্রহ্ম এবং তাঁহার কার্য্যরূপ জগৎ। সুতরাং ব্রহ্মকার্য্য বা ব্রহ্ম-পরিণাম জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব এবং ভেদরাহিত্য ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীদেকমেবাদ্বিতীয়ম্"-এই শ্রুতিবাক্যে এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মরূপেই যে সৃষ্টির পূর্ব্বে জগৎ ছিল, তাহাই বলা হইয়াছে এবং এই এক এবং অদ্বিতীয় ব্রহ্মই যে নিজেকে নাম-রূপে অভিব্যক্ত করিয়া জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহাও শ্রুতি বলিয়া গিয়াছেন। তিনিই যখন নিজেকে জগদ্রূপে অভিব্যক্ত করিলেন—"তদাত্মানং স্বয়মকুরুত", তখন এই জগৎ যে ব্রহ্মাতিরিক্ত একটী বস্তু, তাহা মনে করা সঙ্গত হয় না। জগদ্রূপে অভিব্যক্ত হইয়াও যে ব্রহ্ম অদ্বিতীয়ই থাকেন, "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম। তজ্জলান্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ।

জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু নহে বলিয়া ব্রহ্মের ভেদ নহে। "নেহ নানাস্তি" কিঞ্চন"-ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু নাই; ব্রহ্মাতিরিক্ত এবং ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ বস্তুই হইতেছে—নানা— ভিন্ন ভিন্ন— ব্রহ্মের ভেদ; তদ্রূপ কোনও বস্তু কোথাও নাই। জগৎ তদ্রূপ ব্রহ্মাতিরিক্ত এবং ব্রহ্মনিরপেক্ষ বস্তু নহে—সুতরাং ব্রহ্মের ভেদ নহে। ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মাপেক্ষ জগতের অস্তিত্ব স্বীকারে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"-বাক্যের সহিত কোনও বিরোধ উপস্থিত হয় না। বিরোধ উপস্থিত হয় বলিয়া মনে করিলে ভেদের দার্শনিক লক্ষণের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন করা হইবে।

"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও জগতের ব্রহ্মাত্মকত্বের কথা, ব্রহ্ম হইতে অনতিরিক্ততার কথা— সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অভিন্নত্বের কথাই বলা ইহয়াছে। "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রও সেই কথাই বলিয়াছেন। সূত্রকার ব্যাসদেব কার্য্য-কারণের অভিন্নত্ব প্রদর্শন করিয়া ইহাই জানাইয়াছেন যে, কার্য্যরূপ জগৎ কারণ-রূপ ব্রহ্মের ভেদ নহে এবং ভেদ নহে বলিয়া জগদ্রূপ কার্য্যে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম অদ্বিতীয় এবং ভেদরহিতই থাকেন।

এইরূপে দেখা গেল—পরিণামবাদে জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব এবং ভেদরাহিত্য ক্ষুণ্ণ হয় না। ইহাই ব্রহ্মসূত্রের এবং শ্রুতির অভিপ্রায়।

৩৫২। বিবর্ত্তবাদের অযৌক্তিকতা

বিবর্ত্তবাদ যে শাস্ত্রসম্মত নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদসমূহে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। ইহা যুক্তিসঙ্গতও নহে। শ্রীপাদ রামানুজাদি প্রাচীন আচার্য্যগণ বিবর্ত্তবাদের অশাস্ত্রীয়তা এবং অযৌক্তিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (১৩৭— ৪১ পৃষ্ঠায়) বিবর্ত্তবাদের অযৌক্তিকতা প্রতিপাদন করিয়াছেন।

মায়াবাদ-ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা অবিদ্যার (অর্থাৎ অজ্ঞানের) দুইটী বৃত্তি—আবরণাত্মিকা ও বিক্ষেপাত্মিকা। আবরণাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বরূপকে আবৃত করিয়া রাখে, লোকের পক্ষে ব্রহ্ম-প্রতীতির বাধা জন্মায়। আর বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিদ্বারা সেই আবৃত ব্রহ্মে নানা প্রকার বৈচিত্রী উৎপাদন করে, মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চের প্রতীতি জন্মায়। অবিদ্যার বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তির দ্বারা ব্রহ্মে যে এইরূপ জগৎ-প্রপঞ্চের প্রতীতি, তাহাই বিবর্ত্ত—শুক্তিতে যেমন রজতের ভ্রম, তদ্রূপ ব্রহ্মে জগতের ভ্রম।

যাহা হউক বিবর্ত্তবাদের অযৌক্তিকতা সম্বন্ধে প্রাচীন আচার্য্যগণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এ-স্থলে তাহার তাৎপর্য্য প্রকাশ করা হইতেছে।

ক। অবিদ্যার বা অজ্ঞানের আশ্রয়হীনতা

বিবর্ত্তবাদীরা বলেন—অবিদ্যা বা অজ্ঞানই ব্রহ্মে জগতের ভ্রম উৎপাদন করিয়া থাকে। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজ ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে লিখিয়াছেন—"অবিদ্যা কাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করে? ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া ভ্রম উৎপাদন করিতে পারে না। কারণ, ব্রহ্ম হইতেছেন স্বয়ংপ্রকাশ—জ্ঞানস্বরূপ—সুতরাং অবিদ্যাবিরোধী; অবিদ্যা বা অজ্ঞান কখনও জ্ঞানের নিকটে থাকিতে পারে না—সুতরাং জ্ঞানকে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মকে, আশ্রয় করিতেই পারে না।" (এজন্যই শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী বলিয়াছেন—"অজ্ঞানকে জ্ঞানাশ্রয় বা ব্রহ্মাশ্রয় বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মের শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অপহতপাপ্মত্বাদিই ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।"); সুতরাং ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া অজ্ঞান ভ্রম উৎপাদন করে—ইহা সঙ্গত হইতে পারে না।

শ্রীপাদ রামানুজ আরও বলেন—"ইহাও বলা যায় না যে, জীবকে আশ্রয় করিয়া অবিদ্যা ভ্রম উৎপাদন করে। কেননা, বিবর্ত্তবাদীর মতে জীবভাবটীই হইতেছে অবিদ্যাকল্পিত, অবিদ্যার আশ্রয়েই ব্রহ্ম জীবরূপে প্রতীয়মান হয়েন। যে অবিদ্যা জীবের আশ্রয়, সেই অবিদ্যার আশ্রয় আবার জীব—ইহা নিতান্ত অযৌক্তিক।

এইরূপে দেখা গেল—অবিদ্যার বা অজ্ঞানের কোনও আশ্রয়ই খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। আশ্রয়হীনা অবিদ্যার পক্ষে ভ্রমের উৎপাদনও, বা বিবর্ত্তের সৃষ্টিও, সম্ভবপর হইতে পারে না।

খ। শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তানুসারে বিবর্ত্তবাদ প্রকারে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য

বিবর্ত্তবাদীরা বলেন—বিবর্ত্ত হইতেছে অধ্যাসের ফল। শুক্তিতে রজতের অধ্যাস, ব্রহ্মে জগতের অধ্যাস।

কিন্তু অধ্যাস কি? শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের উপক্রমণিকায় লিখিয়াছেন—"কোঽয়মধ্যাসো নাম? উচ্যতে—স্মৃতিরূপঃ পরত্র পূর্ব্ব-দৃষ্টাবভাসঃ।—এই অধ্যাসটী কি? পূর্ব্বদৃষ্ট বিষয়ের অবভাস পরে যখন স্মৃতিরূপে চিত্তে উদিত হয়, তখন তাহাই অধ্যাস নামে অভিহিত হয়।" ইহা হইতে বুঝা গেল—শুক্তিতে যে রজতের জ্ঞান হয়, তাহা হইতেছে রজতের অধ্যাসবশতঃ।

যিনি পূর্ব্বে রজত দেখিয়াছেন, কোনও কোনও সময়ে তিনি যদি শুক্তি দেখেন, অথচ শুক্তিকে শুক্তি বলিয়া চিনিতে না পারেন, তাহা হইলে শুক্তির শুক্লত্ব দেখিয়া পূর্ব্বদৃষ্ট রজতের শুক্লত্বের কথা তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হইলে শুক্তির শুক্লত্বকে রজতের শুক্লত্ব মনে করিয়া তিনি শুক্তিকে রজত বলিয়া মনে করিতে পাবেন। ইহাই হইতেছে শুক্তিতে রজতের অধ্যাস—শুক্তিতে রজতের ভ্রম বা বিবর্ত্ত। এইরূপ স্থলে পূর্ব্বদৃষ্ট রজতের স্মৃতি চিত্তে বিদ্যমান থাকে; আর ভ্রমকল্পিত রজত তো সাক্ষাদ্‌ভাবেই দৃষ্ট হয়।

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদজীবগোস্বামী বলেন—শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজত যেমন শুক্তির বিবর্ত্ত, তদ্রূপ দৃশ্যমান জগৎ যদি ব্রহ্মেরই বিবর্ত্ত হয়, তাহা হইলে যিনি পূর্ব্বে জগৎ দেখিয়াছেন—সুতরাং যাঁহার চিত্তে পূর্ব্বদৃষ্ট জগতের স্মৃতি উদিত হয়, তাঁহার পক্ষেই ব্রহ্মে জগতের দর্শন সম্ভবপর হইতে পারে। তাঁহার নিকটে দৃশ্যমান জগৎ এবং স্মর্য্যমাণ জগৎ (অর্থাৎ পূর্ব্বদৃষ্ট যে জগৎ তাঁহার স্মৃতিপথে উদিত হওয়াতে, ব্রহ্মস্থলে জগৎ না থাকা সত্ত্বেও তিনি জগৎ দেখিতেছেন বলিয়া মনে করেন, সেই স্মর্য্যমাণ জগৎ) অভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। তাহা হইলে, শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তিস্থলে না হইলেও অন্যত্র যেমন রজতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, তদ্রূপ জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্ত হইলে স্মর্য্যমাণ জগতের বাস্তব অস্তিত্বকেও স্বীকার করিতে হইবে; নচেৎ অধ্যাস বা বিবর্ত্তই সম্ভবপর হয় না। স্মর্য্যমাণ জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকৃত হইলে জগৎ কেবলই বিবর্ত্ত বা ভ্রম-কল্পিত—একথা বলা যায় না। এইভাবে দেখা যায়, বিবর্ত্তবাদের যৌক্তিকতা কিছু নাই।

গ। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জগতের ভ্রম সম্ভবপর নহে

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী আরও বলিয়াছেন—

"অজ্ঞান অর্থ—অন্যথা জ্ঞান। উহা সবিশেষ জ্ঞানান্তর হইতে উদ্ভূত হইয়া নিজেও সবিশেষ হইয়া থাকে; শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত হইতেই তাহা বুঝা যায়।"

শুক্তিতে যে রজতের জ্ঞান, তাহা অবশ্যই অজ্ঞান—অন্যথা জ্ঞান—যাহা যাহা নয়, তাহাকে তাহা বলিয়া জ্ঞান। শুক্তি রজত নহে; তথাপি শুক্তিকে রজত বলিয়া জ্ঞান জন্মিলে তাহা হইবে অন্যথা জ্ঞান, অজ্ঞান। এই অজ্ঞানের উদ্ভব হয়—শুক্তি-রজতের শুক্লত্বের জ্ঞান হইতে। শুক্লত্ব হইতেছে শুক্তির এবং রজতের বিশেষত্ব। সুতরাং বিশেষত্বের জ্ঞান বা সবিশেষ জ্ঞান হইতেই অন্যথা জ্ঞানরূপ অজ্ঞানের উদ্ভব। এই অজ্ঞানে সবিশেষ রজতের—শুক্লত্ববিশিষ্ট রজতের—জ্ঞান আছে বলিয়া, শুক্লত্বের জ্ঞান আছে বলিয়া, এই অজ্ঞানও সবিশেষই। এইরূপে দেখা গেল সবিশেষ জ্ঞান হইতে উদ্ভূত সবিশেষ অজ্ঞান হইতেই শুক্তিতে রজতের জ্ঞান জন্মে এবং শুক্তিই এই সবিশেষ অজ্ঞানের বিষয়ীভূত। শুক্তি সবিশেষ বলিয়াই, শুক্তির শুক্লত্বরূপ বিশেষত্ব আছে বলিয়াই ইহা সম্ভবপর হয়।

"কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কখনও সবিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইতে পারেন না। সুতরাং

সবিশেষ অজ্ঞানের দ্বারা কিরূপে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জগদ্‌বিবর্ত্ত সম্ভবপর হইতে পারে? 'কেতকীর গন্ধ সর্পগন্ধের ন্যায়'—ইত্যাদি-স্থলেও উগ্রতা ও শৈত্যাদি বৈশিষ্ট্যদ্বারাই সাম্য মনন করা হয়।"

তাৎপর্য্য এই। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তির শুক্লত্ব আছে; সুতরাং শুক্তি হইতেছে সবিশেষ বস্তু। শুক্তির শুক্লত্বের জ্ঞানও সবিশেষ জ্ঞান; এই জ্ঞানের সঙ্গে শুক্লত্বরূপ বিশেষত্ব জড়িত আছে। পূর্ব্বদৃষ্ট রজতের শুক্লত্বও রজতের বিশেষত্ব এবং তাহার জ্ঞানও সবিশেষ জ্ঞান। শুক্তি ও রজতের শুক্লত্বের সাম্য-মননেই—কেতকীর গন্ধে এবং সর্পের গন্ধে যেমন উগ্রতা-ইত্যাদি বিষয়ে সাম্য আছে, তদ্রূপ সাম্য-মননেই--শুক্তিতে রজতের জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইহা অবশ্য অজ্ঞান—ভ্রান্ত জ্ঞান। এই অজ্ঞানের মূলে রহিয়াছে শুক্তির শুক্লত্বরূপ বিশেষত্ব—যাহা হইতেছে সবিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূত। ব্রহ্ম যদি নির্ব্বিশেষই হয়েন, তাহা হইলে, শুক্তির শুক্লত্বের ন্যায়, তাঁহাতে কোনও বিশেষত্বই থাকিতে পারে না—সুতরাং নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম সবিশেষ জ্ঞানের বিষয়ীভূতই হইতে পারেন না। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে, স্মর্য্যমাণ সবিশেষ জগতের বিশেষত্বের সদৃশ কোনও বিশেষত্বই যখন নাই, তখন—শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে সাদৃশ্যের জ্ঞান হইতে উদ্ভূত যে অজ্ঞান বশতঃ শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, ব্রহ্ম ও জগতের সম্বন্ধে তাদৃশ অজ্ঞানের উদ্ভবও সম্ভবপর হইতে পারে না; তাদৃশ অজ্ঞানের উদ্ভব যখন হইতে পারে না, তখন—ব্রহ্মে জগতের জ্ঞানও সম্ভবপর হইতে পারে না। তাহা সম্ভবপর বলিয়া মনে করিলে ব্রহ্মকেও সবিশেষ বলিয়াই মনে করিতে হয়।

ঘ। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজতের ন্যায় জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলে দ্বৈত-প্রসঙ্গ; স্বীকার না করিলে অজ্ঞান অসিদ্ধ

"আবার, অজ্ঞানকে যে 'অন্যথা জ্ঞান' বলা হইল, তাহা কি অন্য বস্তুর সদ্ভাবে স্বীকৃত হয়? না কি অন্য বস্তুর অসদ্ভাবে স্বীকৃত হয়? যদি অন্যবস্তুর সদ্ভাব বা অস্তিত্ব স্বীকার করিয়া 'অন্যথা জ্ঞান' স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে দ্বৈতই স্বতঃসিদ্ধ হইয়া পড়ে। আর যদি অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াই 'অন্যথা জ্ঞান' স্বীকৃত হয়, তাহা হইলেও দধিতে আকাশ-কুসুম-ভ্রমের অলীক কল্পনামাত্রই হইবে।"

তাৎপর্য্য এই। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজত হইতেছে শুক্তি হইতে ভিন্ন—শুক্তির অতিরিক্ত—একটী বস্তু। শুক্তিতে যে রজতের জ্ঞান, তাহা হইতেছে অজ্ঞান, অর্থাৎ অন্যথা জ্ঞান—শুক্তির জ্ঞান হইতে অন্যরূপ জ্ঞান। ব্রহ্মেতে যে জগতের জ্ঞান, তাহাও হইতেছে অজ্ঞান—অন্যথা জ্ঞান, ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে অন্যরূপ জ্ঞান। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তি হইতে ভিন্ন—শুক্তির অতিরিক্ত –রজতের অস্তিত্ব স্বীকার করা হইয়া থাকে। ব্রহ্মে জগতের জ্ঞানরূপ অজ্ঞান বা অন্যথা-জ্ঞান-স্থলেও যদি ব্রহ্মাতিরিক্ত জগতের অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম একটী বস্তু এবং জগৎ আর একটী ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু হইয়া পড়ে। তাহাতে স্বাভাবিক ভাবেই "দ্বৈত" স্বীকৃত হইয়া পড়ে, ব্রহ্মের অদ্বৈতত্ব আর থাকে না। এই দিক্ দিয়াও বিবর্ত্তবাদ যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

আর যদি অন্য কোনও বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করা হয়, তাহা হইলে "অন্যথা জ্ঞানের—ব্রহ্মের জ্ঞান হইতে অন্যরূপ জ্ঞানের" কোনও অর্থই হইতে পারে না। কেননা, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তুই যদি না থাকে, তাহা হইলে অন্য বস্তুর জ্ঞান জন্মাও সম্ভবপর হইতে পারে না। অন্য বস্তুর জ্ঞানের মূলই হইতেছে পূর্ব্বদৃষ্টবস্তুর স্মৃতি। অন্য বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার পূর্ব্বদর্শনও সম্ভবপর হয় না—সুতরাং তাহার স্মৃতিও সম্ভবপর হয় না। আকাশ-কুসুমের কোনও অস্তিত্ব নাই ; সুতরাং আকাশ-কুসুমের কোনও দর্শন এবং চিত্তে আকাশ-কুসুমের স্মৃতিপোষণও কাহারও পক্ষে সম্ভবপর নয়। এজন্য দধিতে আকাশ-কুসুমের ভ্রম হওয়াও সম্ভবপর হইতে পারে না। এই দিক্ দিয়াও দেখা যায়—বিবর্ত্তবাদ যুক্তিসিদ্ধ নয়।

ঙ। অনাদি ভ্রম-পরম্পরা-নিয়ম পরম্পরাশ্রয়-দোষ-দুষ্ট

যদি বলা যায়, শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তিতে রজত-ভ্রমের জন্য যে পূর্ব্বসংস্কারের প্রয়োজন, সেই সংস্কার-সিদ্ধির পক্ষে রজতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন হয় না। পূর্ব্ব পূর্ব্ব ভ্রান্ত সংস্কারই পর-পর সংস্কারের হেতু হইতে পারে। তদ্রূপ, ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের জন্যও জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকারের প্রয়োজন হয় না ; জগৎসম্বন্ধে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভ্রান্ত সংস্কারই পর-পর সংস্কারের হেতু হইতে পারে। অজ্ঞান ও জগৎ পরম্পরা-নিয়মে অনাদিসিদ্ধ। সংস্কারজনিত ভ্রম কেবল পূর্ব্বপ্রতীতিরই অপেক্ষা রাখে। প্রতীতি থাকিলে ভ্রমের ব্যতিরেক হইতে দেখা যায় না।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—"অজ্ঞান ও জগৎ পরম্পরা-নিয়মে অনাদিসিদ্ধ"-এই যুক্তি অসঙ্গত ; কেননা, ইহা পরম্পরাশ্রয়-দোষ-দুষ্ট। যেহেতু, বিবর্ত্তবাদী বলেন—অজ্ঞানবশতঃই জগদ্‌বুদ্ধি। আবার, তিনিই বলেন—জগদ্‌বুদ্ধিই অজ্ঞান। "তদসৎ—অজ্ঞানেন জগৎ, জগতজ্ঞান-মিতি পরম্পরাশ্রয়দোষ-প্রসঙ্গাৎ।"

তাৎপর্য্য এই। বিবর্ত্তবাদীরা বলেন—অজ্ঞানবশতঃই লোক শুক্তিতে রজতের ন্যায়, ব্রহ্মেতে জগতের জ্ঞান পোষণ করে; অর্থাৎ ব্রহ্মেতে যে জগতের ভ্রম, তাহার হেতু হইতেছে অজ্ঞান। আবার, তাঁহারাই বলিতেছেন—পূর্ব্বে যে জগদ্‌বুদ্ধি হইয়াছিল, তাহা হইতে উদ্ভূত সংস্কারই হইতেছে পরবর্ত্তী অজ্ঞানের—ব্রহ্মে জগদ্‌বুদ্ধিরূপ অজ্ঞানের—হেতু। এ-স্থলে পূর্ব্ববর্ত্তী ভ্রান্ত-জ্ঞানমূলক জগৎকে বলা হইল পরবর্ত্তী অজ্ঞানের হেতু, অর্থাৎ অজ্ঞানের ফলে জগদ্বুদ্ধি এবং জগদ্‌বুদ্ধির ফলে অজ্ঞান। যে-কারণকে আশ্রয় করিয়া কোনও কার্য্যের উৎপত্তি, সেই কার্য্যকে আশ্রয় করিয়াই সেই কারণের উৎপত্তি—এইরূপ কখনও হইতে পারেনা। কারণের পরে যে কার্য্যের উৎপত্তি, সেই কার্য্য কিরূপে পূর্ব্ববর্ত্তী কারণের হেতু হইতে পারে? তাহা হইতে পারে না। ইহাকে বলে "পরম্পরাশ্রয়-দোষ।" বিবর্ত্তবাদীদের উল্লিখিত যুক্তি পরম্পরাশ্রয়-দোষে দুষ্ট। সুতরাং ইহা অসঙ্গত।

বলা যাইতে পারে—অনাদি বলিয়া পরম্পরাশ্রয়-দোষ হয় না।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—না, ইহাও সঙ্গত নয়। অনাদিত্বের আশ্রয়ে পরস্পরাশ্রয়-দোষ হইতে যে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, শ্রীপাদ শঙ্করই তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। ১।১।৪-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে একস্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“শরীরসম্বন্ধস্য ধর্ম্মাধর্ম্ময়োস্তৎকৃতত্বস্য চেতরেতরাশ্রয়ত্বপ্রসঙ্গাৎ অন্ধপরম্পরৈষা অনাদিত্বকল্পনা—শরীর ব্যতীত ধর্ম্মাধর্ম্ম হয় না, আবার ধর্ম্মাধর্ম্মব্যতীতও শরীর হয় না—এইরূপ ইতরেতরাশ্রয় দোষ (অর্থাৎ পরস্পরাশ্রয়-দোষ) উপস্থিত হয়। এইরূপ পরস্পরাশ্রয়-দোষ পরিহারের নিমিত্ত যে অনাদিত্ব কল্পনা, তাহাও বস্তুতঃ অন্ধ-পরম্পরা—অন্ধ গুরুশিষ্য-পরম্পরাক্রমে প্রাপ্ত উপদেশ যেমন তত্ত্ব-নির্ণয়ের অনুকূল হয় না, ইহাও তদ্রূপ।”

বর্ত্তমান কার্য্যের ন্যায় অতীত কার্য্যেও পরস্পরাশ্রয়-দোষবিশেষ বশতঃ অন্ধপরম্পরান্যায়-প্রদর্শিত দোষ ঘটে; তাহাতে তত্ত্ব নিরূপিত হইতে পারে না।

চ। লৌকিকী যুক্তিতেও বিবর্ত্তবাদ অসিদ্ধ

বিবর্ত্তবাদীদের প্রস্তাবিত ভ্রমের একটা অদ্ভুত বিশেষত্ব আছে। লোক ব্যবহারিক জগতে অনেক ভুল করিয়া থাকে; কিন্তু সেই ভুলের কোনও ধরা-বাঁধা নিয়ম নাই। রজ্জু দেখিলে সকলেরই সর্পভ্রম জন্মে না; কাহারও কাহারও লতাদির ভ্রমও জন্মিতে পারে; কেহ কেহ বা রজ্জুকে রজ্জু বলিয়াই চিনে। শুক্তি দেখিলেও সকলেরই ভ্রম হয় না, অর্থাৎ শুক্তিকে শুক্তি বলিয়াও অনেকে মনে করে। যাহাদের ভ্রম হয়, তাহারাও সকলে শুক্তিকে রজত মনে করে না। কেহ কেহ ক্ষুদ্র লবণ-কণিকার স্তূপ, বা তজ্জাতীয় অন্য বস্তু বলিয়াও মনে করিয়া থাকে। কিন্তু বিবর্ত্তবাদীদের কথিত ভ্রম এক অতি কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার অনুসরণ করিয়া থাকে। একজন লোক যাহাকে আমগাছ বলিয়া ভ্রম করে, অপর সকল মানুষই তাহাকে আমগাছ বলিয়াই ভ্রম করে—তালগাছ, বাঘ, গরু, মানুষ বা অপর কিছু বলিয়া ভ্রম করে না। মনুষ্যেতর জীবের ভ্রমও ঠিক মানুষেরই তুল্য। গোবৎসকে চতুষ্পদ বলিয়া মানুষের যেমন ভ্রম হয়, অপর জীবেরও তদ্রূপ ভ্রমই জন্মে—একপদ, দ্বিপদ, বা অষ্টপদাদি বলিয়া কাহারও ভ্রম জন্মে না। নরশিশুকেও কেহ একপদ, বা চতুষ্পদাদি, বা বৃক্ষাদি বলিয়া ভুল করে না। জন্ম-মৃত্যু-আদির নিয়মসম্বন্ধে মানুষের যে জ্ঞান (যাহা বিবর্ত্তবাদীদের মতে ভ্রান্তিমাত্র), তাহাও সর্ব্বত্র অব্যভিচারী বলিয়াই দৃষ্ট হয়। বিবর্ত্তবাদীর মতে রোগাদিও তো ভ্রান্তিই এবং ঔষধাদিও ভ্রান্তি। কিন্তু রোগাদির চিকিৎসায় যে নিয়ম অনুসৃত হয়, তাহারও ব্যভিচারিত্ব দৃষ্ট হয় না। কুইনাইনদ্বারা উদরাময় বা বসন্তের চিকিৎসা হয় না। নিয়মের বা শৃঙ্খলার অব্যভিচারিত্ব মাত্র সত্য বস্তুর পক্ষেই সম্ভব, মিথ্যা বস্তুতে এইরূপ অব্যভিচারিত্ব কল্পনার অতীত। জাগতিক নিয়মের পূর্ব্বোল্লিখিত অব্যভিচারিত্বই সপ্রমাণ করিতেছে যে, এই জগৎ মিথ্যা নহে, ভ্রান্তিমাত্র নহে; পরন্তু ইহা সত্য এবং সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। বিবর্ত্তে এইরূপ অব্যভিচারিত্ব সম্ভবপর নহে।

ছ। অস্তিত্বহীন বস্তুর অস্তিত্বের ভ্রম অসম্ভব

কোনও বস্তুর অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার অস্তিত্বের ভ্রম কোথাও হইতে দেখা যায় না। রজত একটী স্বতঃসিদ্ধ বস্তু। রজতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে বলিয়াই, যিনি বাস্তব রজত দেখিয়াছেন, পূর্ব্বদৃষ্ট রজতের স্মৃতিতে অন্য বস্তুতে তাঁহার রজতের ভ্রম সম্ভব হইতে পারে। রজতের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলে অন্য বস্তুতে—শুক্তিতে—রজতের ভ্রম সম্ভবপর হইত না। পূর্ব্বোক্ত মতবিরুদ্ধ জগৎপরম্পরা ভ্রমসিদ্ধ নহে (কেন না, বিবর্ত্তবাদীর মতে, পরিদৃশ্যমান বিবর্ত্ত-জগতের অনুরূপ বাস্তব জগৎ নাই)। অনাদিকাল হইতেই পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভ্রমাবভাসিভ ভ্রমমাত্রের আরোপ দ্বারাই জগদ্ভ্রান্তি স্বীকৃত হইতে পারে—একথাও বলা যায় না ; কেননা, প্রসিদ্ধ শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত এবং ব্রহ্মে জগদ্‌বিবর্ত্ত বা জগতের ভ্রম, এক রকম নহে। (এ-স্থলে দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতি নাই। তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে অন্যত্র রজতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই শুক্তিতে রজত-ভ্রম সিদ্ধ হইতে পারে। এই দৃষ্টান্ত অনুসারে, কোথাও জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই ব্রহ্মে জগতের ভ্রম সিদ্ধ হইতে পারে, অন্যথা নহে। কিন্তু বিবর্ত্তবাদী জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ; এজন্য দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সঙ্গতির অভাবে—শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের দ্বারা ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম সপ্রমাণ করা যায় না। আর, জগতের অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া অনাদি পরম্পারাগত ভ্রমকে ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রমের হেতু বলিলেও যে পরস্পরাশ্রয়-দোষ ঘটে, তাহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল – শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম—এইরূপ অনুমান যুক্তিসিদ্ধ নহে)।

শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত অনুসারে, ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম স্বীকার করিতে গেলে, অন্যত্র কোথাও জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। অন্যত্র যদি জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকৃতই হয়, তাহা হইলে দৃশ্যমান জগৎ, শুক্তিতে রজত-ভ্রমের ন্যায়, বাস্তব অস্তিত্বহীন হইলেও, জগতের স্বরূপগত বাস্তব অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবে না। শুক্তি ও রজত—উভয়ই যখন বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট দুইটী পদার্থ, তখন শুক্তিতে যে রজতের প্রতীতি জন্মে, তাহা মিথ্যা হইলেও অন্যত্র তো বাস্তব রজত থাকিবেই। সুতরাং শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম স্বীকার করিলে জগতের মিথ্যাত্ব উপপন্ন হইতে পারে না ; শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তকে সার্থক করিতে হইলে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু বিবর্ত্তবাদী শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন না, অথচ শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের সহায়তায় ব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম প্রতিপাদনের চেষ্টা করেন। ইহা যুক্তিবিরুদ্ধ।

অলীক বস্তু ও মিথ্যা বস্তু

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে, যাহার অস্তিত্ব নাই এবং যাহার অস্তিত্বের প্রতীতিও জন্মে না, তাহা হইতেছে **অলীক**। যেমন, আকাশকুসুম, বন্ধ্যাপুত্র ইত্যাদি।

আর যাহার অস্তিত্ব নাই, অথচ যাহার অস্তিত্বের প্রতীতি হয়, তাহা হইতেছে **মিথ্যা**। যেমন, শুক্তিতে রজতের প্রতীতি, রজ্জুতে সর্পের প্রতীতি, মৃগতৃষ্ণিকায় জলের প্রতীতি। এ-সকল

স্থলে রজতের, সর্পের বা জলের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, অথচ তাহাদের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়। এ-সকল স্থলে রজত-সর্পাদি হইতেছে মিথ্যা।

অলীক এবং মিথ্যা—এই উভয় প্রকারের বস্তুই শ্রীপাদ শঙ্করের মতে বাস্তব অস্তিত্বহীন; কিন্তু তাহাদের ধর্ম্ম বিভিন্ন—অলীক বস্তুতে অস্তিত্বের ভ্রান্ত ধারণাও জন্মে না, মিথ্যাবস্তুতে অস্তিত্বের ভ্রান্ত ধারণা জন্মে। এই বিভিন্নতার হেতু কি হইতে পারে?

যদি বলা যায়—এই বিভিন্নতার হেতু হইতেছে অজ্ঞান বা ভ্রম। তাহা হইলে আবার প্রশ্ন জাগে—এই অজ্ঞান বা ভ্রম (ভ্রমোৎপাদিকা শক্তি) কাহাতে অবস্থিত? ইহা যে বস্তুনিষ্ঠ, তাহা বলা যায় না; কেন না, অলীক বস্তুরও যখন অস্তিত্ব নাই এবং মিথ্যাবস্তুরও যখন অস্তিত্ব নাই, তখন বুঝিতে হইবে—বস্তুই নাই। বস্তুই যদি না থাকে, তাহা হইলে অজ্ঞান বা ভ্রমোৎপাদিকা-শক্তিকে বস্তুনিষ্ঠ বলা যায় না। যদি বলা যায়—অলীক ও মিথ্যা বস্তুর অনস্তিত্বের স্বরূপের পার্থক্যই এইরূপ বিভিন্নতার হেতু। তাহাও সঙ্গত নয়। কেননা, অনস্তিত্ব হইতেছে অস্তিত্বের অভাব—অস্তিত্বের আত্যন্তিক অভাব। আত্যন্তিক অভাবের পরিমাণগত বা প্রকারগত বৈচিত্রী অসম্ভব। অনস্তিত্বের স্বরূপের কোনওরূপ পার্থক্য থাকিতে পারে না। আবার যদি বলা যায়—দ্রষ্টার মধ্যেই এই বিভিন্নতার হেতু বিদ্যমান। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—হেতু যদি দ্রষ্টার মধ্যেই বিদ্যমান থাকে, তাহা হইলে, একই হেতু দুই স্থলে দুই রকম ফল উৎপাদন করিবে কেন? একই হেতু—অস্তিত্বহীন মিথ্যা বস্তুতে অস্তিত্বের ভ্রম জন্মায়, কিন্তু একইরূপ অস্তিত্বহীন অলীক বস্তুতে অস্তিত্বের ভ্রম জন্মায় না। একই হেতুর পক্ষে একই দ্রষ্টার সম্বন্ধে বিভিন্ন ফলোৎপাদন সম্ভবপর নহে। সুতরাং ফলবিভিন্নতার হেতু দ্রষ্টার মধ্যে বর্ত্তমান বলিয়াও স্বীকার করা যায় না।

যদি বলা যায়—অন্য কোনও হেতু নহে, দ্রষ্টার সংস্কারের পার্থক্যই হইতেছে প্রতীতি-পার্থক্যের হেতু। অলীক বস্তু পূর্ব্বে কখনও দৃষ্ট হয় নাই বলিয়া অলীক বস্তু বিষয়ে কোনও সংস্কার থাকিতে পারে না; এইরূপ সংস্কারের অভাবই হইতেছে অলীক বস্তুতে অস্তিত্বের প্রতীতি না জন্মিবার হেতু। আর, মিথ্যা বস্তুতে যখন অস্তিত্বের প্রতীতি জন্মে, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যায়, মিথ্যা-বস্তু বিষয়ক সংস্কার দ্রষ্টার মধ্যে বর্ত্তমান আছে। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে যাহাকে মিথ্যা বস্তু বলা হয়, তাহার অস্তিত্বই স্বীকৃত হইতেছে; তাহার অস্তিত্ব না থাকিলে তাহার দর্শন কখনও সম্ভবপর হইতে পারে না এবং তদ্‌বিষয়ক সংস্কারও জন্মিতে পারে না। এই অবস্থায় মিথ্যা বস্তুকে একেবারে অস্তিত্বহীন বলা সঙ্গত হয় না। ভ্রমোৎপত্তির স্থানে তাহার অস্তিত্ব না থাকিতে পারে; কিন্তু অন্যত্র তাহার অস্তিত্ব অনস্বীকার্য্য।

শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তি-স্থল ব্যতীত অন্যত্রও রজতের অস্তিত্ব আছে এবং তাহা অসম্ভবও নহে। কিন্তু ব্রহ্ম-স্থলে যে জগতের অস্তিত্বের ভ্রম জন্মে, সেই জগতের অন্যত্র অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে কিছু কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়।

প্রথমতঃ, ব্রহ্ম যখন সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগত, তখন ব্রহ্মাতিরিক্ত এমন কোনও স্থানের কল্পনা করা যায় না, যে স্থানে জগতের অস্তিত্ব থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, যুক্তির অনুরোধে ব্রহ্মাতিরিক্ত স্থান আছে বলিয়া মনে করিলে জগৎও হইয়া পড়িবে একটী ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু। তাহা হইলে দ্বৈত-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে, ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব থাকে না, সর্ব্বব্যাপকত্বও থাকে না।

পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভ্রমপরম্পরাজাত সংস্কার হইতে পর-পর জগতের ভ্রমও যে যুক্তিসিদ্ধ নয়, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। দৃশ্যমান জগতের দর্শনের সময়ে পূর্ব্বদৃষ্ট কোনও জগতের স্মৃতিও কাহারও চিত্তে বর্ত্তমান থাকে না।

এই সমস্ত কারণে বুঝা যাইতেছে—ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও স্থানে জগতের বাস্তব অস্তিত্ব যুক্তিবিরুদ্ধ—সুতরাং তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না এবং তাহা স্বীকৃত হইতে পারে না বলিয়া, পূর্ব্বদৃষ্ট বাস্তব জগতের দর্শনজনিত সংস্কারবশতঃই যে এক্ষণে ব্রহ্মে জগতের অস্তিত্ব প্রতীত হইতেছে, তাহাও স্বীকার করা যায় না; অর্থাৎ দৃশ্যমান জগতের দৃশ্যমান অস্তিত্ব যে শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তস্থানীয় রজতের অস্তিত্বের ন্যায় ভ্রান্তি মাত্র, তাহা স্বীকার করা যায় না। ইহা যখন ভ্রান্তি নহে এবং জগৎও যখন সর্ব্বত্রই সর্ব্বদা অব্যভিচারীভাবে দৃষ্ট হইতেছে, তখন ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে, **জগতের বাস্তব অস্তিত্ব আছে।** দৃশ্যমান জগৎ **আকাশ কুসুম বা শশবিষাণের ন্যায় অস্তিত্বহীন নহে।**

শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি হইতেও জগতের বাস্তব অস্তিত্বের কথা জানা যায়

পূর্ব্বেই (৩।৪৫-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, "সত্ত্বাচ্চাবরস্য" ২।১।১৬॥"—সূত্রভাষ্যের উপসংহারে শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের ন্যায় জগতেরও ত্রিকাল-সত্ত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। অন্যত্রও যে তিনি প্রকারান্তরে জগতের বাস্তব অস্তিত্বের কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, এ-স্থলে তাহাও প্রদর্শিত হইতেছে।

"মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্ মায়িনন্তু মহেশ্বরম্॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৪।১০॥"-এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়াকে জগতের উপাদান-কারণ বলিয়া গিয়াছেন। "পূর্ব্বোক্তায়াঃ প্রকৃতের্ম্মায়াত্বং তদধিষ্ঠাতৃসচ্চিদানন্দরূপব্রহ্মণস্তদুপাধিবশান্মায়িত্বঞ্চ। * *। জগৎপ্রকৃতিত্বেনাধস্তাৎ সর্ব্বত্র প্রতিপাদিতা প্রকৃতির্মায়ৈবেতি বিদ্যাদ্বিজানীয়াৎ। তু-শব্দোঽবধারণার্থঃ মহাংশ্চাসাবীশ্বরশ্চেতি মহেশ্বরস্তং মায়িনং মায়ায়াঃ সত্তাস্ফূর্ত্ত্যাদিপ্রদতয়া অধিষ্ঠানত্বেন প্রেরয়িতারমেব বিদ্যাদিতি পূর্ব্বেণ সম্বন্ধঃ।"

শ্রীপাদ শঙ্কর তৎকৃত "বেদান্তকেশরী"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"তুচ্ছত্বান্নাসদাসীদ্ গগনকুসুমবদ্ভেদকং নো সদাসীৎ
কিন্ত্বাভ্যামন্যদাসীদ্ ব্যবহৃতিগতিসন্নাস লোকস্তদানীম্।
কিন্ত্বর্ব্বাগেব শুক্তৌ রজতবদপরো ন বিরাড্ ব্যোমপূর্ব্বঃ
শর্ম্মণ্যাত্মন্যথৈতৎ কুহকসলিলবৎ কিং ভবেদাবরীবঃ ॥২৩॥"

ইহার টীকায় শ্রীপাদ আনন্দজ্ঞান লিখিয়াছেন—"নন্নু নামরূপাত্মকস্য দৃশ্যমানস্য জগতঃ কর্ত্তা উপাদানকারণং কিং স্যাদিতি বিচার্য্যমাণে ন তাবৎ শুদ্ধস্য অনীহস্য ব্রহ্মণঃ তথাত্বম্ উপপদ্যতে। অথ তদতিরিক্তস্য তথাত্বকল্পনে কিমসৎ সদ্বা কল্পনীয়ম্? তত্রাদ্যং নিষেধতি—তুচ্ছত্বাদিতি। তত্র তাবৎ জগদুপাদানকারণং অসৎ নাসীৎ, কুতঃ তস্য অসতঃ গগনকুসুমবৎ তুচ্ছত্বাৎ অত্যন্তাসত্ত্বেন উপাদানকারণত্বানর্হত্বাৎ। অথ নাপি ভেদকং সদ্বাচ্যং পরমার্থসতো ব্রহ্মণঃ সকাশাদ্ অন্যস্য ভেদ-জনকস্য অসম্ভবাৎ, অতঃ পরিশেষাৎ সদসদ্‌বিলক্ষণম্ আসীৎ ইত্যাহ—কিন্তু ইতি। আভ্যাং সদসদ্ভ্যাম্ অন্যৎ বিলক্ষণম্ আসীৎ ইত্যুক্তং ভবতি।" ইত্যাদি

ইহা হইতে জানা গেল—আকাশকুসুমবৎ কোনও অসৎ (অস্তিত্বহীন) বস্তু জগতের উপাদান-কারণ হইতে পারে না; কেননা আত্যন্তিক অস্তিত্বহীন বস্তুর উপাদান-যোগ্যতা নাই। ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও সৎ-বস্তুও উপাদান হইতে পারে না; কেননা, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও সৎ-বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিলে ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করা হয়। ব্রহ্ম শুদ্ধ এবং অনীহ (চেষ্টাশূন্য) বলিয়া ব্রহ্মও উপাদান-কারণ হইতে পারেন না। তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—যাহা সৎও নয়, অসৎও নয়—এরূপ কোনও পদার্থই হইতেছে জগতের উপাদান। কিন্তু কি সেই বস্তুটী? পরবর্ত্তী এক শ্লোকে শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা বলিয়াছেন।

"প্রাগাসীদ্ ভাবরূপং তম ইতি তমসা গূঢ়মস্মাদতর্ক্যং
ক্ষীরান্তর্যদ্বদম্ভো জনিরিহ জগতো নামরূপাত্মকস্য।
কামাদ্ধাতুঃ সিসৃক্ষোরনুগতজগতঃ কর্ম্মভিঃ সংপ্রবৃত্তাদ্
রেতোরূপৈর্মনোভিঃ প্রথমমনুগতৈঃ সন্ততৈঃ কার্য্যমাণৈঃ॥

—বেদান্তকেশরী ॥২৫॥"

ইহার টীকায় শ্রীপাদ আনন্দজ্ঞান লিখিয়াছেন—"অথ পূর্ব্বমুক্তং তদানীং জগৎ নাসীৎ ইতি তর্হি পুনঃ কথম্ উৎপন্নম্ ইত্যাশঙ্ক্য আহ—জগদুপাদানভূতং ভাবরূপং তমঃ ইতি অজ্ঞানম্ আসীৎ, তেন তমসা গূঢ়ম্ আচ্ছাদিতম্ অস্মাৎ কারণাৎ অতর্ক্যং অজ্ঞায়মানম্। কিংবৎ? যদ্বৎ ক্ষীরান্তর্গতম্ অম্ভঃ উদকং ক্ষীরান্তরবর্ত্তমানমপি ন জ্ঞায়তে তদ্বৎ। তত ইহ অস্মিন্ অজ্ঞানে অস্য নামরূপাত্মকস্য জগতঃ জনিঃ উৎপত্তিঃ। ইত্যাদি।"

ইহা হইতে জানা গেল—ভাবরূপ তমঃ বা অজ্ঞানই হইতেছে জগতের উপাদান।

পূর্ব্বে যাহাকে সদসদ্‌বিলক্ষণ বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে ভাবরূপ অজ্ঞান; তাহাই জগতের উপাদান-কারণ।

এক্ষণে বিবেচ্য এই। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে মায়াকে জগতের উপাদান বলিয়াছেন, তাঁহার বেদান্তকেশরী হইতে জানা গেল, সেই মায়াই হইতেছে তাঁহার সদসদ্ভির-নির্ব্বাচ্যা মায়া এবং তাহা হইতেছে ভাবরূপা। পঞ্চদশীকারও মায়াকে ভাবরূপা বলিয়াছেন।

তাহা হইলে বুঝা গেল—জগতের উপাদানভূতা মায়া অভাবাত্মিকা কোনও বস্তু নহে; তাহা হইতেছে ভাবরূপা, অর্থাৎ অস্তিত্ববিশিষ্ট। আত্যন্তিক অস্তিত্বহীন কোনও বস্তু যে উপাদান হওয়ার যোগ্য নহে, তাহা যে তুচ্ছ, তাহা পূর্ব্বশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ আনন্দজ্ঞানও বলিয়া গিয়াছেন।

জগতের উপাদান যদি ভাব-বস্তুই হয়, অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তুই হয়, তাহা হইলে সেই উপাদান হইতে জাত জগৎও অস্তিত্ববিশিষ্ট হইবে; তাহা কখনও বাস্তব অস্তিত্বহীন হইতে পারে না, ইহা প্রকারান্তরে শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকে শ্রীপাদ শঙ্কর ইহাও বলিয়াছেন যে—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ ভাবরূপ তমোদ্বারা আবৃত ছিল—দুগ্ধের মধ্যে যেমন জল অদৃশ্যভাবে লুকায়িত থাকে, তদ্রূপ। দৃষ্ট না হইলেও দুগ্ধের মধ্যে যে জল থাকে, তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। তদ্রূপ, সৃষ্টির পূর্ব্বে যে জগৎ তমোদ্বারা আচ্ছাদিত ছিল, তাহার অস্তিত্বও অনস্বীকার্য্য। এইরূপ উক্তিদ্বারা শ্রীপাদ শঙ্করও জানাইলেন—সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগতের অস্তিত্ব ছিল। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে জগতের মিথ্যাত্ব বা বাস্তব অস্তিত্বহীনত্ব কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে?

জ। আলোচনার সারমর্ম্ম

যাহা হউক, উপরিউক্ত আলোচনার সারমর্ম্ম হইতেছে এই:—

প্রথমতঃ, অবিদ্যা আশ্রয়হীনা বলিয়া তাহা দ্বারা ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমের উৎপাদন অসম্ভব।

দ্বিতীয়তঃ, শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তি-স্থলে রজতের বাস্তব অস্তিত্ব না থাকিলেও অন্যত্র রজতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই শুক্তিতে রজতের ভ্রম উপপন্ন হইতে পারে। কিন্তু বিবর্ত্ত-বাদীরা জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্ত ব্রহ্মে জগদ্ভ্রম প্রতি-পাদনের উপযোগী নহে।

তৃতীয়তঃ, বিবর্ত্তের হেতু হইতেছে অধ্যাস। শ্রীপাদ শঙ্করের স্বীকৃতি অনুসারেই অধ্যাসের জন্য পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি অপরিহার্য্য। জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে পূর্ব্বদৃষ্ট বস্তুরই অভাব হয়, সুতরাং অধ্যাসেরও অভাব হয়। অধ্যাসের অভাব হইলে বিবর্ত্তও অসম্ভব হইয়া পড়ে।

চতুর্থতঃ, শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তিও সবিশেষ বস্তু, রজতও বিশেষ বস্তু। তাহাদের সাধারণ বিশেষত্ব হইতেছে শুক্লত্ব। এই শুক্লত্বের সাম্য হইতেই শুক্তিতে রজতের ভ্রম সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন নির্ব্বিশেষ—সর্ব্ববিধ বিশেষত্ব হীন। সুতরাং সবিশেষ জগতের কোনও বিশেষত্বের সহিতই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাম্য-মনন সম্ভবপর নহে। এজন্য নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে জগদ্ভ্রমও সম্ভবপর হইতে পারে না।

পঞ্চমতঃ, বিবর্ত্তবাদীরা বলেন, শ্রীপাদ শঙ্কর-স্বীকৃত অধ্যাসের সিদ্ধির নিমিত্ত জগতের বাস্তব অস্তিত্ব-স্বীকারের প্রয়োজন হয় না; পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-ভ্রমপরম্পরাজাত সংস্কারই পর-পর ভ্রমের হেতু হইতে পারে। কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না; কেননা, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব ভ্রমপরম্পরা-নিয়ম স্বীকার

করিতে গেলে পরস্পরাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। অনাদিত্বের আশ্রয়েও যে পরস্পরাশ্রয়-দোষ হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না, তাহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

ষষ্ঠতঃ, অস্তিত্বহীন বস্তুর অস্তিত্বের ভ্রম সম্ভবপর নহে। তাহা যদি হইত, তাহা হইলে আকাশ-কুসুমের অস্তিত্বের ভ্রমও কোনও কোনও স্থলে দৃষ্ট হইত। কিন্তু তাহা কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না।

এই সমস্ত কারণে, শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তানুরূপ বিবর্ত্তবাদ যে সম্পূর্ণরূপে অযৌক্তিক, তাহাতে কোনওরূপ সন্দেহই থাকিতে পারে না।

৫৩। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব অযৌক্তিক

শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজতের (কিম্বা রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের) মিথ্যাত্বের ন্যায় জগতের মিথ্যাত্ব যে অযৌক্তিক, পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিবর্ত্তবাদীরা আরও বলেন—লোক স্বপ্নকালে নানাবিধ অদ্ভুত জিনিস দেখে এবং স্বপ্ন-সময়ে সে-সমস্ত জিনিসকে সত্য বলিয়াই মনে করে ; কিন্তু বাস্তবিক সে সমস্ত স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন মিথ্যা, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতঃ জীব এই জগৎকেও সত্য বলিয়া—বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট বলিয়া—মনে করে ; বাস্তবিক জগৎ মিথ্যা।

লোক স্বপ্নে যাহা দেখে এবং স্বপ্নকালে যাহাকে সত্য বলিয়া মনে করে, জাগ্রত হইলে তাহা অবশ্য দেখে না, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞানটী মাত্র জাগ্রত অবস্থায় বিদ্যমান থাকে। কিন্তু জাগ্রত-অবস্থায় তাহা দেখে না বলিয়াই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মিথ্যা কিনা, তাহা বিবেচনা করা দরকার। স্বপ্নের স্বরূপ সম্বন্ধে শ্রুতি কি বলেন, তাহা দেখা যাউক।

ক। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্বরূপ। স্বপ্ন পরমেশ্বর-সৃষ্ট, সত্য।

শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্রের আনুগত্যে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (১৩৮-৪১ পৃষ্ঠায়) স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্বরূপ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহার সার মর্ম্ম উল্লিখিত হইতেছে।

তিনি বলেন—জাগ্রৎ-সৃষ্টি যেমন ঈশ্বরের কৃত—জীবের অজ্ঞানকল্পিত নহে, স্বপ্নসৃষ্টিও তদ্রূপ ঈশ্বরকৃত, ইহাই ঈশ্বরবাদীদিগের অনুমান। "জাগ্রৎসৃষ্টির্যথেশ্বরকৃতত্বেন ন জীবাজ্ঞানমাত্রকল্পিতা, তদ্বৎ স্বপ্নসৃষ্টিরপি ভবেদিতীশ্বরবাদিনামনুমানম্।"

ব্রহ্মসূত্রেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। **"সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥ ৩।২।১॥ ব্রহ্মসূত্র ॥"** এই সূত্রে স্বপ্ন-সৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। "সন্ধ্য"-শব্দের অর্থ স্বপ্ন। জাগর ও সুষুপ্তির সন্ধিস্থলে—মধ্যস্থলে—অবস্থিত বলিয়া স্বপ্নকে "সন্ধ্য" বলা হয়। এই সন্ধ্যসৃষ্টি (স্বপ্নসৃষ্টি) সত্য। "তস্মিন সন্ধ্যে স্থানে তথ্যরূপৈব সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি ॥ শঙ্কর-ভাষ্য।" ইহার পরের সূত্রটী হইতেছে—**"নির্ম্মাতারং চৈকে**

পুত্রাদয়শ্চ ॥৩৷২৷২॥" এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই যে—বেদের এক শাখায় বলা হইয়াছে, ঈশ্বরই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর নির্ম্মাতা এবং স্বপ্নদৃষ্ট পুত্রাদি কাম্যবস্তুর নির্ম্মাতাও ঈশ্বর।" এ-বিষয়ে শ্রুতি প্রমাণ, যথা—"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ॥ কঠশ্রুতি॥ ২৷২৷৮॥-ইন্দ্রিয়গণ সুপ্ত হইলে যে এই পুরুষ কাম্য পদার্থের সৃষ্টি করিয়া জাগ্রত থাকেন।" শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—এ-স্থলে স্বপ্ননির্ম্মাতা জাগ্রত পুরুষ হইতেছেন—"প্রাজ্ঞ—ব্রহ্ম"; কেন না, প্রকরণ-বলে তাহাই জানা যায়। যেহেতু, "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ ॥কঠ ॥১৷২৷১৪॥—যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্য-কারণের অতীত, তাহা বল"-ইত্যাদি বাক্যের পরেই উহা বলা হইয়াছে। প্রকরণের শেষেও ধর্ম্মাদির অতীত প্রাজ্ঞ আত্মার কথা আছে। "তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥কঠ॥২৷২৷৮॥—তিনিই শুক্র (স্বপ্রকাশ), ব্রহ্ম (নিরতিশয় বৃহৎ), অমৃত। এই সমুদয় লোক তাঁহাতেই আশ্রিত, কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ নহে।" স্বাপ্নিক সৃষ্টির কর্ত্তা প্রাজ্ঞ বলিয়া জাগ্রৎ-সৃষ্টি যেমন সত্য, স্বাপ্নিক সৃষ্টিও তদ্রূপ সত্য। "প্রাজ্ঞকর্ত্তৃকা চ সৃষ্টিস্তথ্যরূপা সমধিগতা জাগরিতাশ্রয়া, তথা স্বপ্নাশ্রয়াপি সৃষ্টির্ভবিতুমর্হতি ॥ শঙ্করভাষ্য।"

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রদ্বয় হইতে জানা গেল, জাগ্রৎ-সৃষ্টির ন্যায় স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য এবং উভয় রূপ সৃষ্টিই প্রাজ্ঞ-পরমেশ্বরকৃত।

প্রশ্ন হইতে পারে—জাগ্রৎ-সৃষ্টির উপাদানাদি আছে, স্থানাদির অপেক্ষাও আছে। স্বাপ্নিক সৃষ্টির উপাদান কোথা হইতে আসিবে? আর, লোকে স্বপ্নে রথাদিও দেখে; স্বপ্ন-স্থানে রথাদি থাকিবার স্থানাদি কোথায়? ইত্যাদি প্রশ্নের সমাধান পাওয়া যায় পরবর্ত্তী সূত্রে। পরবর্ত্তী সূত্রে বলা হইয়াছে—**"মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেন অনভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥৩৷২৷৩॥"** এই সূত্রে বলা হইয়াছে—স্বাপ্নিক সৃষ্টি হইতেছে পরমাত্মার শক্তি অঘটন-ঘটন-পটীয়সী মায়ার বিলাসমাত্র, মায়াশক্তিরই কার্য্য।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—"স্বপ্নদৃষ্ট রথ পুষ্করিণী প্রভৃতি পদার্থসমূহ মায়ামাত্র, অর্থাৎ পরমপুরুষের সৃষ্টি। মায়া-শব্দ হইতেছে আশ্চর্য্যবাচক। কেননা, 'জনকস্য কুলে জাতা দেবমায়েব নির্ম্মিতা (রামায়ণ ॥ বাল, ১৷২৭॥) -দেবমায়াই যেন জনকের বংশে কন্যারূপে জন্ম গ্রহণ করিয়াছেন'—ইত্যাদি বাক্যেই তাহা জানা যায়। শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়—'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪৷৩৷১০॥—সে-স্থানে (স্বপ্নস্থলে) রথ নাই, রথযোগ (অশ্বাদি) নাই, পথও নাই।" এই বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—অপরের অনুভবযোগ্য ভাবে রথাদি সে-স্থানে নাই; কিন্তু স্বপ্নদ্রষ্টার অনুভবযোগ্য ভাবে রথাদি আছে। ইহার সঙ্গে-সঙ্গেই বলা হইয়াছে—"অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪৷৩৷১০ ॥—রথ, রথযোগ (অশ্বাদি), পথ সৃষ্টি করেন।" ইহাতেই জানা যায়—স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তির অনুভবযোগ্য ভাবে কেবল স্বপ্ন-কাল-মাত্রের জন্য রথাদি সৃষ্ট হয়; স্বপ্নের অবসানে রথাদির আর সে-স্থানে অস্তিত্ব থাকে না। 'স্বপ্নদৃগনুভাব্যতয়া তৎকালমাত্রাবসানান্ সৃজতে ইত্যাশ্চর্য্য রূপত্বমেবাহ।' কেবলমাত্র স্বপ্নদ্রষ্টার অনুভবের যোগ্য ভাবেই রথাদির সৃষ্টি হয়, তাহাও

কেবল স্বপ্নকালের জন্য, অপরের অনুভবের যোগ্য ভাবে রথাদির স্বষ্টি হয় না—ইহাতেই আশ্চর্য্যরূপতা জানা যাইতেছে। এবম্বিধ আশ্চর্য্য স্বষ্টি একমাত্র সত্যসঙ্কল্প পরমপুরুষের পক্ষেই সম্ভবপর, জীবের পক্ষে তাহা অসম্ভব ; কেননা, জীব স্বরূপতঃ সত্যসঙ্কল্প হইলেও সংসার-দশায় তাহার সত্যসঙ্কল্পত্বাদি অনভিব্যক্ত থাকে ; সুতরাং জীবের পক্ষে উল্লিখিতরূপ আশ্চর্য্যস্বষ্টি অসম্ভব। জীবের স্বপ্নাবস্থায় পরম পুরুষ ব্রহ্মই যে জীবের কাম্য দ্রব্যাদির স্বষ্টি করেন, শ্রুতি হইতেও জানা যায়। 'য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে॥ তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ কঠ ॥ ২।২।৮ ॥ (এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পূর্ব্বেই প্রকাশ কর হইয়াছে)॥" বৃহদারণ্যকের পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যের শেষ ভাগেও বলা হইয়াছে—"অথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ স্বজতে স হি কর্ত্তা॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৩।১০ ॥—বেশান্ত (ক্ষুদ্র জলাশয়), পুষ্করিণী ও নদীসমূহ স্বষ্টি করেন, তিনিই কর্ত্তা।" এই শ্রুতিবাক্যও পূর্ব্বোল্লিখিত কঠশ্রুতির সহিত এক-বাক্যতানুসারেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর পরম-পুরুষ-স্বষ্টত্ব প্রতিপাদন করিতেছে।"

পরবর্ত্তী **"সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩।২।৪॥"**-ব্রহ্মসূত্রেও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সত্যতার কথা বলা হইয়াছে। এই সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, "স্বপ্ন ভাবী শুভাশুভের সূচক ; শ্রুতিও তাহা বলেন এবং স্বপ্নতত্ত্ববিদ্‌গণও তাহা বলেন।" স্বপ্ন যে-সমস্ত ভাবী শুভাশুভ সূচনা করে, সে-সমস্ত শুভাশুভ সত্য ; কেননা, স্বপ্নসূচিত শুভাশুভ বাস্তবিকই সংঘটিত হইতে দেখা যায়। অনেক সময় স্বপ্নে কেহ কেহ ঔষধাদি প্রাপ্ত হয়, মন্ত্রাদিও প্রাপ্ত হয়। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ এই সূত্রের ভাষ্যে লিখিয়াছেন—"বিশ্বামিত্র মুনি স্বপ্নে শিবের নিকট হইতে রামরক্ষামন্ত্র-স্তব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তিনি জাগ্রত হইয়া প্রাতঃকালে স্মরণ করিয়া ঐ স্তব লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। 'আদিষ্টবান্ যথা স্বপ্নে রামরক্ষামিমাং হরঃ। তথা লিখিতবান্ প্রাতঃ প্রবুদ্ধো বুধ কৌশিক ইতি স্বপ্নে স্তোত্রলাভং স্মরন্তি।' যে স্বপ্ন ভাবী সত্যবস্তুর সূচনা করে, যে স্বপ্নে ঔষধাদি এবং মন্ত্রাদি সত্য বস্তু পাওয়া যায়, সেই স্বপ্ন যে সত্য, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ স্বপ্নের সত্যতাসূচক শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে ॥ ছান্দোগ্য ॥৫। ২।৮॥—যখন কাম্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত কোনও ব্যক্তি স্বপ্নযোগে স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করেন, তখন সেই স্বপ্নদর্শনের ফলে তাঁহার কর্ম্মের সাফল্য জানিবে।" অন্য শ্রুতিবাক্য যথা—"অথ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হন্তি।

—স্বপ্নে যদি কেহ কৃষ্ণদন্তবিশিষ্ট কৃষ্ণবর্ণ পুরুষকে দর্শন করেন, তাহা হইলে সেই পুরুষই ইঁহাকে (স্বপ্নদ্রষ্টাকে) বধ করে ; অর্থাৎ ঈদৃশ স্বপ্ন দ্রষ্টার মৃত্যুর সূচনা করে।"

শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন—স্বপ্ন যে বস্তুর

সূচনা করে, তাহা সত্য। তিনি আরও বলিয়াছেন—স্বপ্নতত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন—"কুঞ্জরারোহণাদীনি ধন্যানি, খরযানাদীন্যধন্যানি—স্বপ্নে কুঞ্জরারোহণাদি শুভ, গর্দ্দভারোহণাদি অশুভ।"

উল্লিখিত ব্রহ্মসূত্রগুলি হইতে জানা গেল, জাগ্রৎ-সৃষ্টির ন্যায় স্বাপ্নিক সৃষ্টিও সত্য। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—স্বাপ্নিক সৃষ্টি যদি সত্যই হইবে, তাহা হইলে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর তিরোধান হয় কেন? শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, পরবর্ত্তী সূত্রেই এই প্রশ্নের উত্তর দেওয়া হইয়াছে।

পরবর্ত্তী সূত্রটী হইতেছে—"**পরাভিধানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ** ॥৩।২।৫॥"-এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই :—"পরমেশ্বরের সঙ্কল্প হইতেই (পরাভিধানাৎ) স্বাপ্নিক রথাদির তিরোভাব হইয়া থাকে (তিরোহিতম্), যেহেতু, পরমেশ্বরই হইতেছেন জীবের বন্ধমোক্ষের কর্ত্তা।" পরমেশ্বরই যে বন্ধ-মোক্ষের কর্ত্তা, শ্রুতি-স্মৃতি হইতেও তাহা জানা যায়। স্বপ্ন-সৃষ্টির বা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর তিরোধানের ব্যাপারে জীবের কোনও সামর্থ্যই নাই। শ্রুতিতে যে জীবের কর্তৃত্বের কথা আছে, তাহা ভাক্ত—অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্তৃত্বেই জীবের কর্তৃত্ব। স্বপ্নসৃষ্টিও জাগরবৎ পারমেশ্বরী, সত্য।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-স্থলে শ্রীপাদ রামানুজের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—

"স্বপ্নে চ প্রাণিনাং পুণ্যপাপানুগুণং ভগবতৈব তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যাঃ তত্তৎকালাবসানাঃ তথাভূতাশ্চার্থাঃ সৃজ্যন্তে। তথা চ স্বপ্নবিষয়া শ্রুতিঃ—

ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি। অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে (বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৩।১০) ইত্যারভ্য "স হি কর্ত্তা (বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।১০) ইত্যন্তা। যদ্যপি সকলেতর-পুরুষানুভাব্যতয়া তদানীং ন ভবন্তি, তথাপি তত্তৎপুরুষমাত্রানুভাব্যতয়া তথাবিধানার্থান্ ঈশ্বরঃ সৃজতি। স হি কর্ত্তা। তস্য সত্যসঙ্কল্পস্যাশ্চর্য্যশক্তেস্তাদৃশং কর্তৃত্বং সম্ভবতীর্থঃ।

'য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ।
তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে।
তস্মিল্লোঁকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ কঠশ্রুতি ॥২।২।৮॥'

ইতি চ। সূত্রকারোঽপি **'মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেন'** (৩।২।৩॥ব্রহ্মসূত্র) ইত্যাদিনা জীবস্য কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাদীশ্বরস্যৈব সত্যসঙ্কল্পশক্তিবিলাসমাত্রমিদং স্বাপ্নিকবস্তু জ্ঞাতমিতি ব্যচষ্টে। 'তস্মিন্ লোকাঃ'-ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অপরকালাদিষু শয়ানস্য স্বপ্নদৃশঃ স্বদেহেনৈব দেশান্তর-গমন-রাজ্যাভিষেকশিরশ্ছেদাদয়শ্চ পুণ্যপাপ-ফলভূতাঃ শয়ানদেহস্বরূপ-সংস্থানং দেহান্তরসৃষ্ট্যোপপদ্যন্তে-ইতি।"

তাৎপর্য্য। "শ্রীভগবান্, স্বপ্নদ্রষ্টা প্রাণিগণের স্বপ্নকালে তাহাদের পুণ্য-পাপানুসারে কেবল-মাত্র তাহাদেরই অনুভবযোগ্য এবং স্বপ্নকালমাত্র-স্থায়ী আশ্চর্য্য পদার্থসমূহের সৃষ্টি করেন। স্বপ্ন-

বিষয় কশ্রুতিবাক্যও আছে। যথা—'সেস্থলে (স্বপ্ন-স্থানে) রথ, রথযোগ (অশ্ব), বা পথ থাকে না। অথচ, রথ, রথযোগ (অশ্ব) এবং পথ সৃষ্ট হয়।'-এইরূপ আরম্ভ করিয়া উক্ত শ্রুতিবাক্য শেষকালে বলিয়াছেন—'তিনিই (ব্রহ্মই) কর্ত্তা'। যদিও অন্য লোক-সকলের অনুভবযোগ্য কোনও পদার্থ তৎকালে থাকে না, তথাপি স্বপ্নদ্রষ্টা লোকদিগের অনুভবযোগ্য এবং তাহাদের পুণ্যপাপের অনুরূপ ও স্বপ্নকালমাত্র-স্থায়ী পদার্থসমূহ পরমেশ্বর সৃষ্টি করেন। শ্রুতি বলিয়াছেন—'তিনিই কর্ত্তা।' তিনি সত্যসঙ্কল্প বলিয়া এবং আশ্চর্য্য-শক্তিবিশিষ্ট বলিয়াই তাঁহার এতাদৃশ কর্তৃত্ব সম্ভবপর হয়। কঠশ্রুতি বলিয়াছেন—'নিদ্রিত লোকের ইন্দ্রিয়বর্গ সুপ্ত হইলে এই পুরুষ (পরমেশ্বর) জাগ্রত থাকেন এবং লোকের কাম্যবস্তুসমূহ নির্ম্মাণ করিতে থাকেন। তিনিই শুক্র (অর্থাৎ বিশুদ্ধ), তিনি ব্রহ্ম, তিনি অমৃত। তিনি সমস্ত লোকের আশ্রয় ; কেহই তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।'

ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবও 'মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেন ॥৩।২।৩॥'-ইত্যাদি সূত্রদ্বারা জানাইয়াছেন যে,—'জীব অনভিব্যক্ত-স্বরূপ, জীবের স্বরূপ সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত নহে (অর্থাৎ সংসার-দশায় জীবের স্বরূপগত সত্যসঙ্কল্পত্বাদি এবং শক্তি-আদি সম্যক্‌রূপে অভিব্যক্ত থাকে না) ; এজন্য জীবের পক্ষে সপ্নদৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি সম্ভবপর হইতে পারে না। স্বাপ্নিক বস্তুসকল সত্যসঙ্কল্প ঈশ্বরের সত্যসঙ্কল্প-শক্তিরই বিলাসমাত্র।' পূর্ব্বোল্লিখিত কঠশ্রুতিও ইহা বলিয়াছেন—"তস্মিন্ লোকাঃ ইত্যাদি—লোকসকল তাঁহাকে আশ্রয় করিয়াই থাকে, তাঁহাকে কেহ অতিক্রম করিতে পারে না। গৃহের অভ্যন্তরে (অপরকালাদিষু) শয়ান (নিদ্রিত) ব্যক্তিও যে স্বপ্নাবস্থায় স্বশরীরে দেশান্তরে গমন, রাজ্যাভিষেক, শিরশ্ছেদাদি দর্শন করে—ইহাতে ইহাই প্রতিপন্ন হইতেছে যে, সেই সময়ে তাহার পাপ-পুণ্যের ফলে তাহার শয়ানদেহের অনুরূপ অপর দেহ সৃষ্ট হয় এবং সেই সৃষ্ট শরীরের দ্বারাই তাৎ-কালিক স্বপ্নদৃষ্ট ক্রিয়াসমূহ নিষ্পন্ন হয়।"

শ্রীপাদ রামানুজের উল্লিখিত উক্তি উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"পরমাত্মারই যে স্বপ্নসৃষ্টি, ইহা যুক্তিযুক্তই। জাগ্রৎ-স্বপ্নাদি-ভেদে নিখিল-বিশ্বপ্রপঞ্চের জন্মাদিকর্তৃত্ব-দ্বারা পরমাত্মারই সৃষ্টিকর্তৃত্ব সিদ্ধ হয়। যাঁহারা বলেন--স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থসমূহ স্বকীয় (স্বপ্নদ্রষ্টার) সঙ্কল্পমাত্রের মূর্ত্তি, তাঁহাদের এতাদৃশ মতের অভ্যুপগমবাদেও সূত্রকার ব্যাসদেব একটী সূত্র করিয়াছেন—**'বৈধর্ম্ম্যাৎ চ ন স্বপ্নাদিবৎ ॥২।২।২৯॥'** এই সূত্রের মর্ম্ম এই যে—স্বপ্ন হইতে জাগর-জ্ঞান পৃথক্। কেননা, জাগর-জ্ঞান স্বপ্নজ্ঞানের বিরুদ্ধধর্ম্মবিশিষ্ট। স্বপ্নে যাহা দেখা যায়, জাগরণে তাহা দেখা যায় না। কিন্তু জাগরণে যে সকল পদার্থের জ্ঞান হয়, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায়, তাহাদের অন্যথা-ভাব হয় না। ইহাই এই সূত্রের তাৎপর্য্য। কিন্তু স্বপ্ন যে স্বপ্নদ্রষ্টার নিজের সৃষ্টি, বা নিজের সঙ্কল্পজাত, তাহা এই সূত্রের অভিপ্রেত নহে। কেননা, পরবর্ত্তী **'সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ ॥৩।২।১॥'**-ইত্যাদি সূত্রে স্পষ্টভাবেই বলা হইয়াছে যে, স্বপ্নও পরমেশ্বরেরই সৃষ্টি।"

খ। স্বপ্নসম্বন্ধে শঙ্করমতের অযৌক্তিকতা

"সন্ধ্যে সৃষ্টিরাহ হি ॥৩।২।১॥" এবং "নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥৩।২।২॥"-এই দুইটী ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথ সৃজতে (বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৩।১০॥)", "স হি কর্ত্তা (বৃহদারণ্যক ॥৪।৩।১০॥)", "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন ॥ (কঠশ্রুতি ॥২।২।৮॥)"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর দেখাইয়াছেন যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু পরব্রহ্মেরই সৃষ্ট এবং জাগ্রৎ-সৃষ্টির ন্যায় স্বাপ্নিকী সৃষ্টিও সত্য। কিন্তু তিনি বলেন— ইহা পূর্ব্বপক্ষের মত। তিনি বলেন—"মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ ॥ ৩।২।৩॥"-সূত্রে উল্লিখিত পূর্ব্বপক্ষের উক্তি খণ্ডিত হইয়াছে।

(১) মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্তস্বরূপত্বাৎ ॥৩।২।৩॥" সূত্রের শঙ্করভাষ্য

"মায়ামাত্রন্তু" সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন – স্বাপ্নিকী সৃষ্টি জাগ্রৎ-সৃষ্টির ন্যায় সত্য নহে, ইহা মায়াময়ী (মায়ামাত্রম্) ; তাহাতে সত্যের গন্ধমাত্রও নাই। "নৈতদস্তি—যদুক্তং সন্ধ্যে সৃষ্টিঃ পারমার্থিকীতি। মায়াময়্যেব সন্ধ্যে সৃষ্টির্ন তত্র পরমার্থগন্ধোঽপ্যস্তি।" কেন ? কারণ এই যে, তাহা সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত নহে। সত্য বস্তুর ধর্ম্মসকল স্বপ্ন-স্বরূপে সম্পূর্ণরূপে অভিব্যক্ত হয় না—কার্ৎস্ন্যেনানভিব্যক্ত-স্বরূপত্বাৎ। দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধারাহিত্য—সূত্রস্থ "কার্ৎস্ন্য"-শব্দে সমস্তই অভিপ্রেত হইয়াছে। সত্যবস্তু-বিষয়ক দেশ, কাল, নিমিত্ত ও বাধারাহিত্য স্বাপ্নিক পদার্থে সম্ভবপর নহে। কেননা, স্বপ্ন-স্থানে স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি থাকিবার উপযোগী দেশ (স্থান) থাকে না। সঙ্কুচিত দেহের মধ্যে রথাদির স্থান সঙ্কুলান হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—জীব দেহের বহির্দ্দেশে গিয়া স্বপ্ন দেখে। দেশান্তরীয় দ্রব্যও যখন স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, দেশান্তরে গমনও যখন স্বপ্নে দৃষ্ট হয়, তখন জীব যে দেহের বাহিরে গিয়া স্বপ্ন দেখে—এইরূপ অনুমান অসিদ্ধ হয় না। বিশেষতঃ, তদনুরূপ শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। যথা—"বহিঃ কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্- সেই অমৃত-পুরুষ (আত্মা) কুলায়ের (দেহরূপ গৃহের) বাহিরে যাইয়া যথেচ্ছ বিহার করেন।"

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—সুপ্তজীবের পক্ষে দেহের বাহিরে যাওয়া অসম্ভব। ক্ষণকালের মধ্যে কেহ কি শতযোজন দূরবর্ত্তী স্থানে গিয়া ফিরিয়া আসিতে পারে ? আবার এমন স্বপ্নও আছে—যাহাতে দূরবর্ত্তী স্থানে যাওয়ার কথা আছে, অথচ ফিরিয়া আসার কথা নাই। শ্রুতিতেও এইরূপ একটী স্বপ্নের কথা আছে। যথা—"আমি কুরুদেশে শয্যায় শয়ন করিয়া নিদ্রায় অভিভূত হইয়া স্বপ্নযোগে পঞ্চালদেশে গেলাম এবং তন্মুহূর্ত্তে জাগ্রত হইলাম। 'কুরুষ্বহং শয্যায়াং শয়ানো নিদ্রয়াভিপ্লুতঃ স্বপ্নে পাঞ্চালানভিগতশ্চাস্মিন্ প্রতিবুদ্ধশ্চ'-ইতি।" স্বপ্নদ্রষ্টা যদি সত্য সত্যই পাঞ্চাল দেশে যাইত, তাহা হইলে পাঞ্চালদেশেই থাকিত, পাঞ্চালদেশেই জাগ্রত হইত। কিন্তু সে পাঞ্চালদেশে থাকে নাই, পাঞ্চালদেশে জাগ্রতও হয় নাই ; সে কুরুদেশেই আছে, কুরুদেশেই

জাগ্রত হইয়াছে। আবার, যে-দেহে সে পাঞ্চালদেশে যায়, পার্শ্বস্থ লোক তাহার সে-দেহকে কুরুদেশস্থ শয্যাতেই শয়ান দেখে। দেহের মধ্যেই যে স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, শ্রুতিও তাহা বলেন। যথা—" 'স যত্রৈতৎ স্বপ্ন্যয়াচরতি'-ইত্যুপক্রম্য 'স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে ইতি—'তিনি যাহাতে এই স্বপ্ন দর্শন করেন'-এইরূপ উপক্রম করিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন—'নিজের শরীরেই তিনি ইচ্ছানুরূপ ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েন।' অতএব, পূর্ব্বোল্লিখিত "বহিঃকুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের গৌণ অর্থ গ্রহণ করিলেই 'স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে' এই শ্রুতিবাক্যের সহিত সমন্বয় হইতে পারে। গৌণ অর্থ হইবে এইরূপ—"বহিরিব কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা—অমৃত (আত্মা) যেন শরীরের বাহিরে গিয়া-ইত্যাদি।" শরীরের মধ্যে থাকিয়াও যে ব্যক্তি শরীরের দ্বারা কোনও প্রয়োজন সাধন করে না, তাহাকে শরীরের বাহিরে অবস্থিতের তুল্যই বলা বলা যায়।" যো হি বসন্নপি শরীরে ন তেন প্রয়োজনং করোতি, স বহিরিব শরীরাদ্ভবতি।" স্বপ্নে কোনও স্থানে যাওয়া বা কোনও স্থানে অবস্থানও ঐরূপ গৌণ (যেন যাইতেছে, যেন অবস্থান করিতেছে-এইরূপ) বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে।

স্বপ্নেতে কালের (সময়ের) বিরুদ্ধতাও দেখা যায়। রাত্রিতে স্বপ্ন দেখিতেছে যেন দিবাভাগ। স্বপ্নদর্শনের সময় অতি অল্প ; অথচ, স্বপ্নদ্রষ্টা কখনও কখনও মনে করে যেন শত শত বর্ষ অতীত হইয়া গিয়াছে। স্বপ্নদর্শনের উপযোগী নিমিত্ত (ইন্দ্রিয়াদিও) তখন থাকেনা। স্বপ্নে রথ দেখিতেছে, অথচ তাহার চক্ষু তখন মুদ্রিত, সমস্ত ইন্দ্রিয় সুপ্ত। নিমিষ-কালমধ্যে রথাদি নির্ম্মাণ করার সামর্থ্যও নাই, তদুপযোগী উপকরণাদিও নাই। স্বপ্নদৃষ্ট রথাদি জাগ্রদ্দশায় বাধিত হয়—লুপ্ত হয়, এমন কি স্বপ্নসময়েও তাহা লুপ্ত হয়। স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাব শ্রুতি স্পষ্টকথাতেই শুনাইয়া গিয়াছেন—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি"-ইত্যাদিবাক্যে। সুতরাং স্বপ্নদর্শন মায়া মাত্র। "তস্মান্মায়ামাত্রং স্বপ্নদর্শনম্।"

(২) শ্রীপাদ শঙ্করকৃত ভাষ্যের আলোচনা

"মায়ামাত্রন্তু কার্ৎস্ন্যেন"-ইত্যাদি সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর "মায়া"-শব্দের যে অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, তাহা সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের অভিপ্রেত নহে। শ্রীপাদশঙ্কর সর্ব্বত্রই "মায়া"-শব্দে তাঁহার কল্পিত "সদসদ্ভিরনির্ব্বাচ্যা এবং মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী মায়া" গ্রহণ করেন ; কিন্তু এতাদৃশী মায়া যে অবৈদিকী, তাহা পূর্ব্বেই (১।২।৬৯-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। সূত্রকার ব্যাসদেব বৈদিকী মায়ার কথাই বলিয়াছেন, শ্রুতি-স্মৃতির সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিতে যাইয়া তিনি শ্রুতি-স্মৃতি-বহির্ভূতা মায়ার কথা বলিতে পারেন না। সুতরাং অবৈদিকী মায়ার আশ্রয়ে শ্রীপাদ শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে সূত্রকার ব্যাসদেবের অভিপ্রেত হইতে পারে না, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

স্বকল্পিত মিথ্যাসৃষ্টি-কারিণী মায়ার সহায়তায় শ্রীপাদ শঙ্কর যে ভাবে জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন, ঠিক সেই ভাবেই তিনি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মিথ্যাত্ব উপপন্ন করারও প্রয়াস পাইয়াছেন। বাস্তবিক তিনি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর মিথ্যাত্ব যেন স্বতঃসিদ্ধ ভাবে ধরিয়াই লইয়াছেন

এবং তাঁহার এই অভ্যুপগমের অনুকূল ভাবেই তিনি শ্রুতিবাক্যসমূহের তাৎপর্য্য প্রকাশ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তাহার ফলে, একটী **"ইব"**-শব্দের অধ্যাহার করিয়া তিনি "বহিঃ কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্"-শ্রুতিবাক্যের গৌণ অর্থ করিয়া দেখাইয়াছেন—"স্বপ্নদ্রষ্টা জীব যেন শরীরের বা গৃহের বাহিরে যাইয়াই অভীষ্ট কাম্যবস্তু প্রাপ্ত হয়, বস্তুতঃ শরীরের বা গৃহের বাহিরে যায় না"—এইরূপ অর্থ করিলেই "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে"—এই শ্রুতিবাক্যের সহিত সঙ্গতি থাকিতে পারে।

যে স্থলে মুখ্য অর্থের সঙ্গতি থাকে, সে স্থলে গৌণ অর্থ গ্রহণ অনাবশ্যক এবং শাস্ত্রবিরুদ্ধ। মুখ্য অর্থের সঙ্গতি না থাকিলে অবশ্যই গৌণ অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। কিন্তু আলোচ্য শ্রুতি-বাক্যগুলিতে মুখ্য অর্থের অসঙ্গতি আছে বলিয়া মনে হয় না। একথা বলার হেতু এই। "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে"-এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—"স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি স্বীয় শরীরে যথাকাম (কামনার বা অভীষ্টের অনুকূল ভাবে) পরিবর্ত্তিত হয়েন।" এ-স্থলে "যথাকামং পরিবর্ত্ততে—অভীষ্টের অনুকূল ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়েন"—ইহার তাৎপর্য্য কি? অবস্থান্তর-প্রাপ্তিকেই পরিবর্ত্তন বলে। এই অবস্থান্তর বা পরিবর্ত্তন—মনোভাবাদিরও হইতে পারে, দেহাদিরও হইতে পারে। স্বপ্নদ্রষ্টা ব্যক্তি স্বপ্নে রথাদি দেখে, রথারোহণাদিও করে, স্বপ্নের বৈচিত্রী অনুসারে সুখ বা দুঃখও অনুভব করে। এই সমস্ত ব্যাপারে স্বপ্নদ্রষ্টার যে মনোভাবের পরিচয় পাওয়া যায়, শয়ন-কালে তাহার তদ্রূপ মনোভাব ছিলনা। স্বপ্নে হয়তো কখনও উপবিষ্ট থাকে, কখনও দণ্ডায়মান থাকে, কখনও রাজার পোষাকে থাকে, কখনও বা অন্যরূপে থাকে। এইরূপ দৈহিক অবস্থাও তাহার শয়ন-কালে ছিলনা। আবার, স্বপ্নে হয় তো শয়ন-স্থান হইতে অন্য স্থানেও গমন করে। এ-সমস্তই হইতেছে স্বপ্নদ্রষ্টার অবস্থান্তর-প্রাপ্তি বা পরিবর্ত্তন। এইরূপ পরিবর্ত্তন স্বপ্নদ্রষ্টা নিজে করিতে পারেনা, তাহার তদনুরূপ সামর্থ্য নাই। যিনি রথ, অশ্বাদি, পথ সৃষ্টি করেন (অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে, × × স হি কর্ত্তা॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৩।১০), তিনিই এই সমস্ত অবস্থান্তরের সৃষ্টি করেন। "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্ব্রহ্ম" ইত্যাদি বাক্যে কঠশ্রুতি (২।২।৮) স্পষ্ট কথাতেই জানাইয়াছেন—বিশুদ্ধ ব্রহ্মই সুপ্ত-জীবের কাম্য বস্তুসমূহের **সৃষ্টি** করিয়া থাকেন। স্বপ্নদ্রষ্টার অন্যস্থানে যাওয়ার উপযোগী দেহও তাঁহারই সৃষ্ট। সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বর পরব্রহ্মের অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তির পক্ষে এতাদৃশী সৃষ্টি অসম্ভব নহে। বৃহদারণ্যক "সৃজতে—সৃষ্টি করে" বলিয়াছেন, কঠশ্রুতি "নির্ম্মিমাণঃ—নির্ম্মাণ করেন" বলিয়াছেন; কিন্তু "**যেন** সৃষ্টি করেন", "**যেন** নির্ম্মাণ করেন"—একথা বলেন নাই। "যেন সৃষ্টি করেন, যেন নির্ম্মাণ করেন"-ইত্যাদি বাক্যের কোনও অর্থও হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে—স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য পরমেশ্বর যে অন্য দেহের সৃষ্টি করেন, সেই অন্যদেহে স্বপ্নদ্রষ্টা যখন অন্যত্র গমন করে, তখন তাহার পূর্ব্ববর্ত্তী শয়ানদেহের কি অবস্থা হয়? কি অবস্থা

হয়, তাহা বলা হইতেছে। পূর্ব্বদেহ পূর্ব্ববৎ শয়ন-স্থানেই থাকে এবং তাহা জীবিতও থাকে; কেননা, তখনও সেই দেহে শ্বাস-প্রশ্বাসাদি ক্রিয়া চলিতে থাকে। পরমেশ্বরের যে অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে স্বপ্নদৃষ্ট দ্রব্যাদির সৃষ্টি হয়, সেই অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবেই স্বপ্নদ্রষ্টা স্বীয় শয়ানদেহে থাকিয়াও অন্যদেহে স্বপ্নভোগ করিতে পারে, অন্যত্রও যাইতে পারে। "স্বে শরীরে যথাকামং পরিবর্ত্ততে"-বাক্যে শ্রুতি তাহাই জানাইয়া গিয়াছেন। যাঁহার কৃপাশক্তিতে শৌভরি-আদি ঋষি কায়ব্যূহ প্রকটিত করিয়া একাধিক দেহে অবস্থান করিতে সমর্থ হইয়াছেন, তাঁহার অচিন্ত্যশক্তিতে স্বপ্ন-দ্রষ্টাও উভয় দেহে অবস্থান করিতে পারে। এতাদৃশী শক্তি স্বপ্নদ্রষ্টা জীবের নহে; এই শক্তি হইতেছে অচিন্ত্যপ্রভাব সত্যসঙ্কল্প পরমেশ্বরের।

এইরূপে দেখা গেল—পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে অন্য শরীর গ্রহণ বা অন্যত্র গমন যখন অসম্ভব নয়, বিশেষতঃ শ্রুতিবাক্যে যখন জানা যায়, তাহা নিতান্তই সম্ভবপর, তখন "বহিঃ কুলায়াদমৃতশ্চরিত্বা স ঈয়তে অমৃতো যত্র কামম্"-এই শ্রুতিবাক্যের মুখ্য অর্থেরও সঙ্গতি আছে; সুতরাং ইহার গৌণ অর্থ করার কোনও প্রয়োজনই নাই এবং মুখ্য অর্থের সঙ্গতি আছে বলিয়া গৌণ অর্থ শাস্ত্রসম্মতও হইতে পারে না।

"অন্যত্র যাওয়ার" যদি গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়া "যেন অন্যত্র যায়" বলিতে হয়, তাহা হইলে "স্বপ্নদর্শনেরও" কি গৌণ অর্থ করিতে হইবে? নিদ্রিত স্বপ্নদ্রষ্টার চক্ষু থাকে মুদ্রিত; সে স্বপ্নস্থিত রথাদি দেখিবে কিরূপে? এ-স্থলেও গৌণ অর্থ করিতে গেলে বুঝিতে হইবে—স্বপ্নগত রথাদি বাস্তবিক দৃষ্ট হয় না। বস্তুতঃ দৃষ্টই যদি না হয়, তাহা হইলে জাগ্রত অবস্থায় তাহার স্মৃতি বা জ্ঞান কিরূপে সম্ভব হইতে পারে? বস্তুতঃ স্বপ্নে যে কিছুই দৃষ্ট হয় না, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও বলেন না। তিনি বলেন—স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও স্বপ্নদর্শনের ফল সত্য হইতে পারে। কিন্তু মুদ্রিতনয়ন এবং সুপ্তেন্দ্রিয় ব্যক্তির পক্ষে স্বপ্নসৃষ্ট বস্তুর দর্শন কিরূপে এবং কাহার শক্তিতে হয়? যিনি স্বপ্নগত রথাদির সৃষ্টি করেন, তাঁহার শক্তিতেই যে সুপ্তব্যক্তি রথাদি দর্শন করে, ইহা অস্বীকার করার উপায় নাই। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে তাঁহারই শক্তিতে স্বপ্নদ্রষ্টা স্বীয় দেহে স্বগৃহে শয়ান থাকিয়াও যে অন্যত্র যাইতে পারে, ইহা স্বীকার করিতে আপত্তি কেন? এবং সেই পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তিতেই ক্ষণকালের মধ্যে শতযোজন দূরবর্ত্তী স্থানে গমন স্বীকার করিতেই বা আপত্তি কেন? লৌকিকী দৃষ্টিতে গৃহে থাকিয়াও অন্যত্র গমন, কিম্বা ক্ষণকালের মধ্যে শতযোজন দূরে গমন যেমন অসম্ভব; মুদ্রিত নয়নে এবং ইন্দ্রিয়ের সুপ্তাবস্থায় রথাদির দর্শনও তেমনি অসম্ভব। একটী অসম্ভব ব্যাপারকে সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করাতেই পরমেশ্বরের অচিন্ত্যশক্তি স্বীকার করা হইতেছে। এই অবস্থায় গৃহে থাকিয়াও অন্যত্র গমনাদি অসম্ভব ব্যাপারের, সেই স্বীকৃত অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে, সম্ভবপরতা স্বীকার না করিয়া শ্রুতিবাক্যের গৌণ অর্থ করিতে যাওয়ার যৌক্তিকতা কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয় না।

কুরুদেশে শয়ান থাকিয়া স্বপ্নে পাঞ্চালদেশে যাওয়া এবং পাঞ্চালদেশেই জাগ্রত হওয়া এবং জাগরণের পরে স্বপ্নদ্রষ্টার পক্ষে নিজেকে পাঞ্চালদেশে না দেখিয়া কুরুদেশে দেখা—ইহার মধ্যেও অসামঞ্জস্য কিছু নাই। পাঞ্চালদেশে যাওয়ার উপযোগী যে দেহ স্বপ্নদ্রষ্টার জন্য সৃষ্ট হইয়াছিল, পাঞ্চালদেশেই সেই দেহ অন্তর্হিত হইল। যিনি সৃষ্টি করিয়াছেন, তিনিই তাহা অন্তর্ধাপিত করিলেন। কর্ম্মফল ভোগের জন্য সেই দেহের সৃষ্টি এবং সেই দেহে পাঞ্চালে গমন, সেই কর্ম্মফল ভুক্ত হইয়া গেলে, তাহার প্রয়োজন থাকে না। তাই তখন তাহার অন্তর্দ্ধাপন। অন্তর্দ্ধানের পরে স্বপ্নদ্রষ্টা আর সে-দেহে থাকিতে পারে না ; কেননা, তখন সেই দেহই থাকে না। কুরুদেশে শয়ান যে দেহে স্বপ্নদ্রষ্টা পূর্ব্বেও ছিল, পাঞ্চালগমন-সময়েও ছিল, সেই দেহেই তাহার নিদ্রাভঙ্গ হয়, সেই দেহেই সে নিজেকে কুরুদেশে দেখে।

শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—কর্ম্মফল ভোগের জন্যই স্বপ্নের সৃষ্টি। ইহা অযৌক্তিক নহে। জাগ্রত অবস্থার ন্যায় স্বপ্নাবস্থাতেও জীব সুখ-দুঃখ ভোগ করে। সুখ-দুঃখ হইতেছে কর্ম্মেরই ফল। সুতরাং স্বপ্নগত সুখ-দুঃখও জীবের কর্ম্মেরই ফল। জন্মের সময়ে জীব যে ভোগায়তন দেহ লাভ করে, সেই দেহে প্রারব্ধ কর্ম্মের ফল ভোগ করার সময়ে অপর যে সমস্ত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র এবং স্বল্পকালস্থায়ী কর্ম্মফল উদ্বুদ্ধ হয়, সে-সমস্ত কর্ম্মের ফল ভোগ করাইবার জন্যই কর্ম্মফলদাতা পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক স্বপ্নের সৃষ্টি। স্বপ্নদর্শনের কারণ যে স্বপ্নদ্রষ্টার সুকৃতি-দুষ্কৃতি (কর্ম্ম), "সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥৩।২।৪॥"—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "নিমিত্তত্বস্তু রথাদিপ্রতিভান-নিমিত্ত-মোদত্রাসদর্শনাৎ তন্নিমিত্তভূতয়োঃ সুকৃত-দুষ্কৃতয়োঃ কর্তৃত্বেনেতি বক্তব্যম্।—স্বপ্নেও রথাদি-দর্শনের পর হর্ষ-বিষাদাদি হয়। তাহাতে বিবেচনা করিতে হইবে, মানিতে হইবে যে, সেই সেই স্বপ্নদর্শনের কারণীভূত সুকৃত-দুষ্কৃত (পুণ্য-পাপ) সেই সেই স্বপ্নদর্শনের প্রয়োজক নিমিত্ত-কারণ॥ পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ-কৃত অনুবাদ।" যাহাহউক, যে ক্ষুদ্র কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য তিনি স্বপ্নদ্রষ্টাকে একটী নূতন সৃষ্ট দেহে পাঞ্চাল দেশে লইয়া যায়েন, পাঞ্চালদেশেই সেই কর্ম্মফল ভোক্তব্য। সে-স্থানে সেই ফলের ভোগ হইয়া গেলে আর সেই দেহের প্রয়োজন থাকে না ; এজন্য সে-স্থানেই সেই দেহ অন্তর্হিত হয়।

যাহাহউক, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্বহীনতা দেখাইতে যাইয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি"—এই বাক্যে শাস্ত্র স্পষ্টভাবেই স্বপ্নদৃষ্ট রথাদির অভাবের কথা শুনাইয়া গিয়াছেন। "স্পষ্টঞ্চাভাবং রথাদীনাং স্বপ্নে শ্রাবয়তি শাস্ত্রং—'ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি'-ইত্যাদি।" শ্রীপাদ শঙ্কর যদি সমগ্র শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার ভাষ্যের পাঠকদিগকে তিনি যাহা জানাইতে চাহিয়াছেন, তাহা জানানো বোধহয় সম্ভবপর হইত না। এজন্যই কি তিনি উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যটীর পরবর্ত্তী অংশটী উদ্ধৃত করেন নাই? সমগ্র বাক্যটী হইতেছে এই :—

"ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি, অথ রথান্ রথযোগান্ পথঃ সৃজতে, ন তত্রানন্দা মুদঃ প্রমুদো ভবন্ত্যথানন্দান্ মুদঃ প্রমুদঃ সৃজতে, ন তত্র বেশান্তাঃ পুষ্করিণ্যঃ স্রবন্ত্যো ভবন্ত্যথ বেশান্তান্ পুষ্করিণীঃ স্রবন্তীঃ সৃজতে, স হি কর্ত্তা ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৪।৩।১০ ॥"

এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইল—স্বপ্নস্থানে রথ, অশ্ব, পথ থাকে না ; অথচ রথ, অশ্ব ও পথের সৃষ্টি করা হয়। আনন্দ, মুদ, প্রমোদ থাকে না ; অথচ তৎসমস্তের সৃষ্টি করা হয়। ক্ষুদ্র জলাশয়, পুষ্করিণী, নদী, থাকে না ; অথচ তৎসমস্তের সৃষ্টি করা হয়।

তাৎপর্য্য হইল এই যে—স্বপ্নাদ্রষ্টা স্বপ্নবস্থায় রথ-অশ্বাদি, নদী-পুষ্করিণী প্রভৃতি যাহা যাহা দর্শন করে, তাহাদের কিছুই স্বপ্নদর্শনের স্থানে থাকে না এবং তৎসমস্তের দর্শনে স্বপ্নদ্রষ্টা যে আনন্দাদির অনুভব করে, সেই আনন্দাদিও সেখানে থাকে না। কিন্তু স্বপ্নকালে এই সমস্তের সৃষ্টি হয়। ইহাতে পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়, স্বপ্নদর্শনের পূর্ব্বে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুগুলি থাকে না ; কিন্তু স্বপ্নদর্শন-কালে সে-সমস্তের সৃষ্টি হয়। সৃষ্টি যখন হয়, তখন সে-সমস্তের অস্তিত্বও তখন থাকে ; কেননা, অস্তিত্বহীন বস্তুর সৃষ্টি অসম্ভব। সৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে সৃষ্টিও অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। তবে এ-সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব কেবল স্বপ্নদ্রষ্টার অনুভবগম্য, অপরের অনুভবগম্য নহে। কেননা, তৎসমস্তের সৃষ্টিই হয় স্বপ্নদ্রষ্টার কর্ম্মফল ভোগের উদ্দেশ্যে, অপরের কর্ম্মফল ভোগের জন্য নহে।

ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর অস্তিত্ব আছে, শ্রুতিবাক্যে তাহাদের অভাবের কথা বলা হয় নাই, সদ্ভাবের কথাই বলা হইয়াছে। শ্রুতিবাক্যটীর প্রথমাংশে রথাদির যে অভাবের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে স্বপ্নকালের পূর্ব্বের কথা।

(৩) স্বপ্নদৃষ্টবস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা কে ?

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতেছে—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা কে ? স্বপ্নদ্রষ্টা জীব ? না কি পরমেশ্বর ব্রহ্ম ?

শ্রীপাদ রামানুজ কঠোপনিষদের "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি-ইত্যাদি"-২।২।৮-বাক্য উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, ব্রহ্মই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা। "নির্ম্মাতারঞ্চৈকে পুত্রাদয়শ্চ ॥ ৩।২।২ ॥"—সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—প্রকরণ-অনুসারে এবং বাক্যশেষের দ্বারাও বুঝা যায় প্রাজ্ঞ—পরব্রহ্মই—স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের নির্ম্মাতা। প্রকরণটী হইতেছে প্রাজ্ঞ-ব্রহ্মবিষয়ক ; যেহেতু, "অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাৎ ॥ কঠ ॥ ১।২।১৪ ॥—যাহা ধর্ম্মাতীত, অধর্ম্মাতীত, কার্য্য-কারণের অতীত, তাহা বল"-এই বাক্যপ্রকরণে ইহা বলা হইয়াছে এবং বাক্যশেষেও বলা হইয়াছে—"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন। এতদ্‌বৈ তৎ ॥ কঠ॥ ২।২।৮॥"

কিন্তু "সূচকশ্চ হি শ্রুতেরাচক্ষতে চ তদ্বিদঃ ॥ ৩।২।৪ ॥"-সূত্রভাষ্য শ্রীপাদ শঙ্কর আবার বলিয়াছেন—স্বপ্নদ্রষ্টা জীবই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর নির্ম্মাতা, প্রাজ্ঞ ব্রহ্ম নির্ম্মাতা নহেন। "যদপ্যুক্তং প্রাজ্ঞমেনং নির্ম্মাতারমামনন্তি ইতি, তদপ্যসৎ।"

"নির্ম্মাতারঞ্চৈকে"-ইত্যাদি ৩।২।২॥-সূত্রভাষ্যে তিনি যে কঠ-শ্রুতির উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার বাক্যশেষেই আছে, স্বপ্নসৃষ্টিকর্ত্তা হইতেছেন—"শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চনঃ॥ এতদ্বৈ তৎ॥– বিশুদ্ধ, ব্রহ্ম, অমৃত। তিনিই সমস্ত লোকের আশ্রয়, কেহ তাঁহাকে অতিক্রম করিতে পারে না।" স্বপ্নসৃষ্টিকর্ত্তা যে ব্রহ্ম, এই বাক্যশেষ হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়। শ্রীপাদ শঙ্করও সে-স্থলে তাহা বলিয়াছেন এবং ব্রহ্মপর অর্থই যে প্রকরণ-সঙ্গত, তাহাও তিনি বলিয়াছেন। কিন্তু "সূচকশ্চ" ইত্যাদি ৩।২।৪-সূত্রভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি"-ইত্যাদি কঠ-শ্রুতি (২।২।৮)-বাক্যেও জীবেরই স্বপ্নসৃষ্টিকর্তৃত্বের কথা বলা হইয়াছে। "য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি' ইতি প্রসিদ্ধানুবাদাজ্জীব এবায়ং কামানাং নির্ম্মাতা সঙ্কীর্ত্ত্যতে।" সম্পূর্ণ বিপরীত কথা! এই কঠ-শ্রুতির শেষভাগে যে "তদেব শুক্রং তদেব ব্রহ্ম"-ইত্যাদি প্রাজ্ঞ-ব্রহ্মের কথা আছে, তৎসম্বন্ধে এ-স্থলে তিনি বলেন– এই বাক্যশেষে জীবের জীবভাব নিষেধ করিয়া ব্রহ্মভাবের উপদেশ করা হইয়াছে (অর্থাৎ যে জীব স্বপ্নস্রষ্টা, সেই, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম—ইহাই বলা হইয়াছে)। তিনি আরও বলেন—এইরূপ অর্থ প্রকরণ-বিরুদ্ধও হয় না ; কেননা, পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, প্রকরণটী হইতেছে ব্রহ্ম-প্রকরণ ; "তত্ত্বমসি"-বাক্যানুসারে জীব যখন স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, তখন জীব-প্রকরণ এবং ব্রহ্ম-প্রকরণ একই।

এ সম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রথমতঃ, "তত্ত্বমসি"-বাক্য যে জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব সূচিত করে, ইহা ধরিয়া লইয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার অর্থের সহিত প্রকরণের সঙ্গতি দেখাইয়াছেন ; অর্থাৎ তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে– জীব এবং ব্রহ্ম যখন সর্ব্বতোভাবে একই, তখন জীব-প্রকরণ এবং ব্রহ্ম-প্রকরণও একই। কিন্তু "তত্ত্বমসি"-বাক্য জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ব সূচিত করে না এবং শ্রীপাদ শঙ্কর "তত্ত্বমসি"-বাক্যের যে অর্থ করিয়াছেন, তাহা যে শ্রুতির তাৎপর্য্য নহে, তাঁহার অর্থ-করণ-প্রণালীও যে শাস্ত্রসম্মত নহে, তাহা পূর্ব্বেই (২।৫১ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে। মুক্ত জীবেরও যে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তাহাও পূর্ব্বে (২।৪০-৪৩ অনুচ্ছেদে) প্রস্থান-ত্রয়ের প্রমাণ উল্লেখ পূর্ব্বক প্রদর্শিত হইয়াছে। জীব এবং ব্রহ্ম যখন সর্ব্বতোভাবে এক নহে, তখন জীবপ্রকরণ এবং ব্রহ্ম-প্রকরণও এক হইতে পারে না। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর যে ভাবে তৎকৃত অর্থের সঙ্গে প্রকরণ-সঙ্গতি দেখাইয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে, গ্রহণের যোগ্যও নহে।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"য এষ সুপ্তেষু জাগর্ত্তি কামং কামং পুরুষো নির্ম্মিমাণঃ। তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম" ইত্যাদি কঠ-শ্রুতিবাক্যে স্বপ্নদ্রষ্টা পুরুষকেই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর নির্ম্মাতা বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তিও শ্রুতিবাক্য-বিরুদ্ধ। কেননা, শ্রুতিবাক্যটীতে বলা হইয়াছে—"ইন্দ্রিয়বর্গ সুপ্ত হইলে সেই পুরুষ জাগ্রত থাকিয়া কাম্য পদার্থের (অর্থাৎ স্বপ্নদৃষ্ট পদার্থের) সৃষ্টি করিতে থাকেন।" স্বপ্নদ্রষ্টা তো তখন নিদ্রিতই থাকে ; জাগ্রত থাকিয়া কেহ স্বপ্ন দেখেনা। বিশেষতঃ, ইন্দ্রিয়বর্গের সুপ্তিতেই জীবের সুপ্তি, ইন্দ্রিয়বর্গের জাগৃতিতেই জীবের জাগৃতি। শ্রুতি যখন স্পষ্টকথাতেই

(সুপ্তেষু-শব্দে) স্বপ্নদ্রষ্টার ইন্দ্রিয়বর্গের সুপ্তির কথা বলিয়াছেন, তখন স্বপ্নদ্রষ্টাও যে নিদ্রিত—জাগ্রত নহে—তাহাও পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়। শ্রুতি ইহাও বলিয়াছেন—জাগ্রত পুরুষই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর নির্ম্মাতা। এই জাগ্রত পুরুষ কখনও নিদ্রিত স্বপ্নদ্রষ্টা হইতে পারেন না; তিনি নিশ্চয়ই স্বপ্নদ্রষ্টা হইতে ভিন্ন। কে তিনি? তাহাও শ্রুতি সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন—"তিনি হইতেছেন অমৃত, বিশুদ্ধ সর্ব্বাশ্রয় এবং সর্ব্বানতিক্রমণীয় ব্রহ্ম। "তদেব শুক্রং তদ্‌ব্রহ্ম তদেবামৃতমুচ্যতে। তস্মিন্ লোকাঃ শ্রিতাঃ সর্ব্বে তদু নাত্যেতি কশ্চন॥ এতদ্বৈ তৎ॥ কঠ॥ ২।২।৮॥" এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তি শ্রুতিবিরুদ্ধ।

স্বীয় অভিমতের সমর্থনে শ্রীপাদ শঙ্কর অপর একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া বলিয়াছেন, এই শ্রুতিবাক্যটীও জীববিষয়ক। "স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিতি-ইতি জীবব্যাপারশ্রবণাৎ॥ সূচকশ্চ ইত্যাদি ৩।২।৪॥-সূত্রভাষ্য।" ইহা হইতেছে বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ৪।৩।৯-বাক্য এবং "ন তত্র রথা ন রথযোগা ন পন্থানো ভবন্তি" ইত্যাদি বাক্যের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্য। শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত বাক্যটীর পরবর্ত্তী অংশের প্রতি দৃষ্টি না করিলে ইহার তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে না। পরবর্ত্তী অংশসহ বাক্যটী হইতেছে এইরূপ :—

"স্বয়ং বিহত্য স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা প্রস্বপিত্যত্রায়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি-র্ভবতি॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪।৩।৯॥—নিজেই দেহকে সংজ্ঞাহীন করিয়া (বিহত্য) নিজেই (স্বপ্নদৃশ্য বস্তু) নির্ম্মাণ করিয়া স্বীয় জ্যোতির্দ্বারা স্বীয় গ্রাহ্যরূপ প্রকাশ করিয়া (স্বেন ভাসা) স্বপ্নাবস্থা প্রতিপন্ন করেন (প্রস্বপিতি)। এ-স্থলে এই পুরুষ হইতেছেন স্বয়ং জ্যোতিঃ।"

যিনি এত সব করেন, স্বয়ং স্বপ্নদৃশ্য পদার্থের নির্ম্মাণ করেন, তিনি কে? বাক্যশেষেই শ্রুতি তাহা বলিয়াছেন—"অয়ং পুরুষঃ স্বয়ংজ্যোতি র্ভবতি—এই পুরুষ হইতেছেন স্বয়ংজ্যোতিঃ, জ্যোতিঃস্বরূপ।" ইহা দ্বারা ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কেননা, ব্রহ্মই হইতেছেন জ্যোতিঃ স্বরূপ, তাঁহার জ্যোতিতেই অপর সকল জ্যোতিষ্মান্—ইহা শ্রুতিরই কথা। তর্কের অনুরোধে শ্রীপাদ শঙ্করের কথা—জীবও ব্রহ্মই, এই কথা—স্বীকার করিয়া লইলেও সংসারী জীবে যে ব্রহ্মভাব থাকে না, ইহাও অস্বীকার করা যায় না; কেননা, শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করেন যে, সংসারী জীবে ব্রহ্মভাব থাকে না। স্বপ্রকাশত্ব এবং জ্যোতিঃস্বরূপত্ব হইতেছে ব্রহ্মভাব। সংসারী জীবই স্বপ্নদ্রষ্টা; সুতরাং স্বপ্নদ্রষ্টা সংসারী জীব "স্বয়ংজ্যোতিঃ" হইতে পারে না। অতএব, এ-স্থলে "স্বয়ংজ্যোতিঃ"-শব্দে ব্রহ্মকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে, স্বপ্নদ্রষ্টা জীবকে লক্ষ্য করা হয় নাই। "বিহত্য"-শব্দেও তাহাই সূচিত হইতেছে; স্বপ্নদ্রষ্টা নিদ্রিত জীব নিজের দেহকে নিজে সংজ্ঞাহীন করে না, করিতে পারেও না, করার ইচ্ছাও তাহার হয় না। নিজের দেহকে সংজ্ঞাহীন করার ইচ্ছা কাহারই হয় না (বিহত্য-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার শ্রুতিভাষ্যে লিখিয়াছেন—দেহং পাতয়িত্বা নিঃসম্বোধম্ আপাদ্য। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ ভাষ্যকারের অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়া লিখিয়াছেন—

বিহত্য দেহং বোধরহিতং কৃত্বা)। ব্রহ্মই স্বপ্নদ্রষ্টার দেহকে বোধরহিত—স্বপ্নদর্শনকালে স্বপ্নদ্রষ্টার স্বীয় যথাবস্থিত দেহের অস্তিত্বের জ্ঞানকে তিরোহিত—করেন। ব্রহ্মই স্বীয় জ্যোতির্দ্বারা—স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে—স্বপ্নদৃশ্য বস্তুর নির্ম্মাণ করেন এবং তাহাকে স্বপ্নদ্রষ্টার অনুভবের বিষয়ীভূত করেন (স্বয়ং নির্ম্মায় স্বেন ভাসা স্বেন জ্যোতিষা) এবং এই ভাবেই তিনি স্বপ্নাবস্থাকে প্রতিপন্ন করেন (প্রস্বপিতি। প্রস্বপিতি-শব্দের অর্থে সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় লিখিয়াছেন—স্বপ্নাবস্থাং প্রতিপদ্যতে—অর্থাৎ জীব এই ভাবেই তাহার স্বপ্নাবস্থা অনুভব করিতে পারে)। স্বপ্নদ্রষ্টা জীবের পক্ষে এ-সমস্ত সম্ভবপর নহে।

এইরূপে দেখা গেল—পরমেশ্বর ব্রহ্মই স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা, স্বপ্নদ্রষ্টা জীব নহে। এইরূপ সিদ্ধান্তই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থের সহিত এবং বেদান্তসূত্রের সহিতও সঙ্গতিময়। এইরূপ সিদ্ধান্তে কোনও শ্রুতিবাক্যেরই গৌণার্থ করিতে হয় না।

যাহা হউক "সূচকশ্চ"-ইত্যাদি ৩৷২৷৪৷-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যের শেষভাগে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—

"ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেঽপি প্রাজ্ঞব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে। তস্য সর্ব্বেশ্বরত্বাৎ সর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু অধিষ্ঠাতৃত্বোপপত্তেঃ। পারমার্থিকস্তু নায়ং সন্ধ্যাশ্রয়ঃ সর্গো বিয়দাদিসর্গবৎ ইত্যেতাবৎ প্রতিপাদ্যতে। ন চ বিয়দাদিসর্গস্যাপি আত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি। প্রতিপাদিতং হি 'তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ' ইত্যত্র সমস্তস্য প্রপঞ্চস্য মায়ামাত্রত্বম্। প্রাক্ চ ব্রহ্মাত্মদর্শনাৎ বিয়দাদিপ্রপঞ্চো ব্যবস্থিতরূপো ভবতি, সন্ধ্যাশ্রয়স্তু প্রপঞ্চঃ প্রতিদিনং বাধ্যতে ইত্যতো বৈশেষিকমিদং সন্ধ্যস্য মায়ামাত্রত্বমুদিতম্।—স্বপ্নেও প্রাজ্ঞ আত্মার যে কোনও ব্যাপার নাই, এমন কথা আমরাও বলি না। তিনি সর্ব্বেশ্বর। সকল সময়ে ও সকল অবস্থায় তাঁহার অধিষ্ঠাতৃত্ব আছে। স্বপ্নাশ্রিত সৃষ্টি, আকাশাদি-সৃষ্টির ন্যায় পারমার্থিক অর্থাৎ সত্য নহে—এইমাত্র অভিপ্রেত বা প্রতিপাদ্য। আকাশাদি-সৃষ্টিরও আত্যন্তিক সত্যতা নাই। সমুদয় প্রপঞ্চই মায়িক, মিথ্যা, এ-সকল 'তদনন্যত্বম্'-সূত্রে প্রতিপাদিত হইয়াছে। যাবৎ না ব্রহ্মাত্মসাক্ষাৎকার হয়, তাবৎ আকাশাদি প্রপঞ্চ যথাবস্থিতরূপে থাকে ; কিন্তু স্বপ্নাশ্রিত প্রপঞ্চ প্রতিদিনই বাধিত (অন্যথা) হয়—এইমাত্র বিশেষ বা প্রভেদ। পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশকৃত অনুবাদ।"

এ-স্থলে তিনি বলিতেছেন—"ন চাস্মাভিঃ স্বপ্নেঽপি প্রাজ্ঞব্যাপারঃ প্রতিষিধ্যতে—স্বপ্নেও যে প্রাজ্ঞের—ব্রহ্মের—কোনও ব্যাপার বা কর্ম্ম নাই, একথা আমরাও বলি না।" অর্থাৎ জীবের স্বপ্নাবস্থায় যে ব্রহ্মের কিছু ব্যাপার বা কর্ম্ম আছে, তাহা শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীকার করিতেছেন। কিন্তু কি সেই ব্যাপার বা কর্ম্ম ? সে-স্থলে ব্যাপার তো মাত্র দুইটী—স্বপ্নাবস্থার সৃষ্টি এবং স্বপ্ন-দর্শন। স্বপ্নদর্শন তো জীবেরই ব্যাপার, নিদ্রিত জীবই স্বপ্নদর্শন করিয়া থাকে, প্রাজ্ঞ-ব্রহ্ম স্বপ্নদর্শন করেন না। শ্রীপাদ শঙ্কর শ্রুতিবাক্যের মুখ্যার্থ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গৌণার্থ গ্রহণ করিয়া এবং আরও কৌশল অবলম্বন করিয়া পূর্ব্বে প্রতিপাদিত করিয়াছেন যে, স্বপ্নদ্রষ্টা জীবই স্বপ্নাবস্থার—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টিকর্ত্তা,

প্রাজ্ঞ ব্রহ্ম স্থষ্টিকর্ত্তা নহেন। স্বপ্নদর্শন এবং স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সৃষ্টি—এই উভয় ব্যাপারই যদি স্বপ্নদ্রষ্টা জীবের হয়, তাহা হইলে প্রাজ্ঞ ব্রহ্মের জন্য আর কোন্ ব্যাপার অবশিষ্ট রহিল ?

স্বপ্নদর্শন এবং স্বপ্নসৃষ্টি ব্যতীতও আর একটী ব্যাপার আছে। বোধহয় সেই ব্যাপারের সঙ্গেই প্রাজ্ঞ-ব্রহ্মের সহিত সম্বন্ধের কথা শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন। সেই ব্যাপারটী হইতেছে ব্রহ্মের অধিষ্ঠাতৃত্ব। "সর্ব্বাসু অপি অবস্থাসু অধিষ্ঠাতৃত্বোপদেশাৎ"-বাক্যেই তিনি তাহার ইঙ্গিত দিয়াছেন। এই ইঙ্গিতের তাৎপর্য্য এই ঃ—শুক্তির অধিষ্ঠানে যেমন মিথ্যা রজতের জ্ঞান, তেমনি ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে মিথ্যা আকাশাদি-জগৎ-প্রপঞ্চের জ্ঞান, তেমনি আবার ব্রহ্মের অধিষ্ঠানে মিথ্যা স্বপ্নের জ্ঞান। "ন চ বিয়দাদি-সর্গস্যাপি আত্যন্তিকং সত্যত্বমস্তি"-এই বাক্যে তিনি জগদাদির মিথ্যাত্বের ইঙ্গিত দিয়াছেন। "আত্যন্তিক সত্যত্ব" বলিতে নিত্য অস্তিত্ববিশিষ্টতা এবং নিত্য একরূপত্বই সূচিত হয়। এতাদৃশ আত্যন্তিক সত্য বস্তু হইতেছেন একমাত্র ব্রহ্ম। আর যাহার অস্তিত্ব এবং একরূপত্ব নিত্য নহে, তাহা "আত্যন্তিক সত্য নহে", তাহার সত্যত্ব অনাত্যন্তিক। অনাত্যন্তিক সত্য বস্তুরও অস্তিত্ব আছে, তবে তাহা অনিত্য; তাহার একরূপত্বও অনিত্য, অর্থাৎ তাহা বিকারশীল। তাহা হইলে অনাত্যন্তিক সত্য বস্তু বলিতে বিকারশীল এবং অনিত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট জগদাদি বস্তুকেই বুঝায়। কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বিকারশীল বস্তুর অস্তিত্বই স্বীকার করেন না। এজন্য যাহা আত্যন্তিক সত্য নহে, তাহাকেই তিনি মিথ্যা বলেন। "আকাশাদি জগৎ-প্রপঞ্চ আত্যন্তিক সত্য নহে"-এই কথায় তাঁহার অভিপ্রায় এই যে--জগৎ-প্রপঞ্চ হইতেছে মিথ্যা, তদ্রূপ স্বপ্ন বা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুও মিথ্যা। তবে জগৎ-প্রপঞ্চের ন্যায় স্বপ্নের বা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুরও অধিষ্ঠান হইতেছেন —প্রাজ্ঞ-ব্রহ্ম। অধিষ্ঠান-রূপেই স্বপ্নের সহিত প্রাজ্ঞ-ব্রহ্মের সম্বন্ধ; ইহাই হইতেছে তৎকথিত "ব্যাপার।" স্বপ্নের মিথ্যাত্ব-সম্বন্ধে তিনি পূর্ব্বে যাহা বলিয়াছেন, এ-স্থলেও তাহা রক্ষা করিয়াছেন। কিন্তু স্বপ্নের মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে তাঁহার উক্তি যে বিচারসহ নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৩) **স্বপ্নের সত্যত্ব-সম্বন্ধে দৃষ্টান্ত**

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যে সত্য, স্বপ্নে ঔষধাদি-প্রাপ্তিই তাহার একটী প্রমাণ। স্বপ্নদ্রষ্টা স্বপ্নাবস্থার দেখে—হাতে একটা ঔষধ পাইয়াছে। নিদ্রাভঙ্গে দেখে যে, সেই ঔষধই তাহার হাতে বিদ্যমান। স্বপ্নদৃষ্ট ঔষধ যদি মিথ্যা হইত, তাহা আবার জাগ্রত অবস্থায় হাতে দৃষ্ট হয় কিরূপে ?

এক ভাগ্যবান্ স্বপ্নদ্রষ্টার কথা বলা হইতেছে। তিনি এখনও সুস্থ শরীরে জীবিত আছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে বাতব্যাধিতে তিনি অচল হইয়া ছিলেন। সর্ব্বদা শয়ানই থাকিতে হইত; কোনও ঔষধ-পত্রেই কিছু উপকার হয় নাই। একদিন রাত্রিতে নিদ্রিতাবস্থায় স্বপ্নে দেখেন, মহাদেব আসিয়া তাঁহাকে একটী যোগাসন করার উপদেশ দিলেন। রোগী তাঁহার অসামর্থ্যের কথা জানাইলে মহাদেব কৃপা করিয়া স্বহস্তে তাঁহাকে উপদিষ্ট যোগাসনে উপবিষ্ট করাইলেন। ক্ষণকাল পরে

রোগী জাগ্রত হইয়া দেখিলেন—তিনি সেই আসনেই উপবিষ্ট রহিয়াছেন ; কিন্তু মহাদেব নাই। তিনি নিজে হাঁটিয়া ঘরের বাহিরে আসিয়া আত্মীয়স্বজনকে ডাকিয়া সমস্ত জানাইলেন। তিনি সম্পূর্ণরূপে রোগমুক্ত হইলেন। এই স্বপ্ন যে মিথ্যা, একথা বলা চলেনা।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়—শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন নীলাচলে, তখন চট্টগ্রামবাসী পুণ্ডরীক বিদ্যানিধি-নামক এক ভক্ত পণ্ডিত ভূস্বামী ব্রাহ্মণ নীলাচলে গিয়াছিলেন। ওড়ন-ষষ্ঠী উপলক্ষ্যে চিরাচরিত প্রথা অনুসারে শ্রীশ্রীজগন্নাথদেবকে সেবকগণ মাড়যুক্ত বস্ত্র দিয়াছিলেন বলিয়া বিদ্যানিধি সেবকদিগের প্রতি একটু কটাক্ষ করিয়াছিলেন। রাত্রিতে বিদ্যানিধি স্বপ্নে দেখেন—জগন্নাথ ও বলরাম উভয়ে তাঁহার গণ্ডদেশে চাপড় মারিয়া সেবকদের প্রতি কটাক্ষ করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহাকে শাসন ও তিরস্কার করিতেছেন। শাসন করিয়া জগন্নাথ-বলরাম চলিয়া গেলেন। স্বপ্নে বিদ্যানিধিও দেখিলেন—তাঁহার গণ্ডদ্বয় ফুলিয়া গিয়াছে, হাত বুলাইয়া বুঝিতে পারিলেন, প্রতি গণ্ডে পাঁচটী আঙ্গুলের দাগ রহিয়াছে। তাঁহার এই গণ্ড-স্ফীতি এবং গণ্ডে জগন্নাথ-বলরামের অঙ্গুলির চিহ্ন এবং তাঁহাদের অঙ্গুরীয়কের চিহ্নও পরের দিন জাগ্রত অবস্থায় বিদ্যানিধিও দেখিয়াছেন এবং স্বরূপ-দামোদরাদি অন্যান্য ভক্তগণও দেখিয়াছেন। ইহাদ্বারাও স্বপ্নের সত্যতা প্রতিপাদিত হইতেছে।

এইরূপ দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—স্বপ্ন হইতেছে সত্য এবং পরমেশ্বর-সৃষ্ট।

গ। প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা

যাঁহারা বলেন,—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু যেমন মিথ্যা, এই জগৎও তদ্রূপ মিথ্যা, তাঁহাদের উক্তির সারবত্তা যে কিছু নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে যে, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু পরমেশ্বরসৃষ্ট এবং সত্য—অবশ্য অনিত্য।

যাঁহারা স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে জগতের তুলনা করেন, তাঁহাদের উক্তি হইতে বরং ইহা জানা যায় যে—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় এই জগৎ-প্রপঞ্চও পরমেশ্বর-সৃষ্ট, সত্য অর্থাৎ বাস্তব অস্তিত্ব বিশিষ্ট, কিন্তু অনিত্য।

৫৪। বিবর্ত্তবাদে অদ্বৈত-জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারেনা

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর সঙ্গে, কিম্বা শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজতের সঙ্গে জগৎ-প্রপঞ্চের তুলনা করিতে গেলে একটা দোষের উদ্ভব হয় এই যে—ইহাতে অদ্বৈত-জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারেনা। একথা বলার হেতু এই :—

জাগ্রত অবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু দৃষ্ট না হইলেও তাহার জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। শুক্তি-রজতের

দৃষ্টান্তে, শুক্তির জ্ঞান জন্মিলে রজত দৃষ্ট হয়না বটে ; কিন্তু রজতের জ্ঞান বিদ্যমান থাকে। জগৎ যদি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর ন্যায় হয়, বা শুক্তির বিবর্ত্ত রজতের ন্যায় হয়, তাহা হইলে, বিবর্ত্তবাদীর মতে, ব্রহ্মজ্ঞান হইলে জগতের অস্তিত্ব দৃষ্ট হইবে না ; ইহা স্বীকার করা যায় ; কিন্তু তখনও জগতের স্মৃতিটুকু থাকিবে ; অর্থাৎ ব্রহ্ম-জ্ঞানের সঙ্গে সঙ্গে জগতের জ্ঞানও থাকিবে। ইহা হইবে দ্বৈতজ্ঞান। রজত যেমন শুক্তি হইতে ভিন্ন বস্তু, তদ্রূপ জগৎও হইবে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন বস্তু। উল্লিখিত দ্বৈতজ্ঞানে থাকিবে -ব্রহ্মের জ্ঞান এবং ব্রহ্মাতিরিক্ত জগতের জ্ঞান। ইহাতে শঙ্করের অদ্বৈত-জ্ঞান সিদ্ধ হইতে পারেনা।

যাঁহারা জগতের অনিত্য অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদের মতে জগৎও ব্রহ্মাত্মক—জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নহে। যাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হয়, ব্রহ্মের জ্ঞানের সঙ্গে তাঁহারও জগতের অস্তিত্বের জ্ঞান থাকিবে ; তথাপি এই জ্ঞান দ্বৈতজ্ঞান হইবে না ; কেননা, জগৎ ব্রহ্মাত্মক,—ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নহে ; জগতের জ্ঞান হইবে তখন ব্রহ্মজ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত। একবিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের তাৎপর্য্যই এইরূপ।

৫৫। বিবর্ত্তবাদের দোষ

বিবর্ত্তবাদী শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা,—জগৎ মিথ্যা, জীব মিথ্যা, গুরু মিথ্যা, শিষ্য মিথ্যা, গুরূপদেশ মিথ্যা, শ্রুতিও মিথ্যা, এমন কি ঈশ্বরও মিথ্যা (শ্রীপাদ শঙ্কর শ্রুতিপ্রতিপাদিত অপ্রাকৃত-চিন্ময়-বিশেষত্ব-বিশিষ্ট সবিশেষ ব্রহ্মকেই মায়োপহিত ব্রহ্ম বা সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলেন। মায়োপহিত বলিয়া এতাদৃশ সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরও মিথ্যা)।

এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

ক। জগতের মিথ্যাত্ব

জগৎ যে শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তের রজতের ন্যায় মিথ্যা বা বাস্তব অস্তিত্বহীন নহে, পরন্তু জগতের যে বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তবে সেই অস্তিত্ব যে অনিত্য, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

খ। জীবের মিথ্যাত্ব

শ্রীপাদ শঙ্কর জীব বলিয়া কোনও তত্ত্ব বা বস্তু স্বীকার করেন না। তাঁহার মতে অবিদ্যা-কবলিত ব্রহ্মই জীব, জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, অপর কিছু নহে। ব্রহ্মের জীবভাব অবিদ্যার ফল বলিয়া অবিদ্যা যখন মিথ্যা, তখন জীবভাবও মিথ্যা, অর্থাৎ জীবও মিথ্যা। ইহাই শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায়।

কিন্তু পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্ম নহে। জীব হইতেছে ব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তি, জীবশক্তির অংশ ; জীব নিত্যবস্তু। যাহা নিত্য বস্তু, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না।

জীবের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষেরও অনিত্যত্বের প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়। একথা বলার হেতু এই।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে অবিদ্যাদ্বারা কবলিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন। অবিদ্যা কেন যে ব্রহ্মকে কবলিত করে, তাহার কোনও হেতু দৃষ্ট হয় না। যদি বলা যায়—অনাদি কর্ম্মই হেতু। তাহাও বলা যায় না। কেননা, তাঁহার মতে কর্ম্মও মিথ্যা। বিশেষতঃ, এই কর্ম্ম কাহার কৃত? নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের পক্ষে কর্ম্ম করা সম্ভব নয়; ব্রহ্মের কৃত কর্ম্ম স্বীকার করিলে তাঁহার সবিশেষত্বই স্বীকৃত হইয়া পড়ে। এইরূপে বুঝা গেল—বিনা হেতুতেই অবিদ্যা ব্রহ্মকে কবলিত করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত করায়।

স্বীকার করা গেল, কোনও কারণে অবিদ্যাকবলিত ব্রহ্মের জীবভাব দূরীভূত হইল; তখন মোক্ষ আসিয়া পড়িল। কিন্তু তাহাতে ইহা বুঝা যায় না যে, অবিদ্যা পুনরায় ব্রহ্মকে কবলিত করিবেনা। কবলিত করার হেতু যখন নাই, তখন অবিদ্যা আবারও ব্রহ্মকে কবলিত করিয়া জীবভাব প্রাপ্ত করাইতে পারে। সুতরাং মোক্ষও অনিত্য হইয়া পড়ে।

গ। গুরু-শিষ্যের মিথ্যাত্ব

জীব মিথ্যা হইলে গুরু-শিষ্য মিথ্যা হইতে পারেন; কেননা, গুরু-শিষ্যও স্বরূপতঃ জীবই। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে জীব যখন মিথ্যা নয়, তখন গুরুও মিথ্যা নহেন, শিষ্যও মিথ্যা নহেন এবং গুরুর উপদেশও মিথ্যা নহে।

জীব-জগদাদিকে ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ মনে করিয়াই শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব-স্থাপনের জন্য জীব-জগদাদির মিথ্যাত্ব খ্যাপনে প্রয়াস পাইয়াছেন; কিন্তু সমস্তই ব্রহ্মাত্মক বলিয়া এ-সমস্ত যে ব্রহ্মের ভেদ নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৩।৫১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এ-সমস্ত ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ নহে বলিয়া জীব-জগৎ মিথ্যা নহে, গুরু-শিষ্যও মিথ্যা নহেন।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলিয়াছেন—"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৬।২৩॥—ব্রহ্মে (দেবে) যাঁহার পরা ভক্তি আছে এবং ব্রহ্মে যেরূপ পরা ভক্তি, গুরুতেও যাঁহার তদ্রূপ পরা ভক্তি আছে, সেই মহাত্মার নিকটেই শ্রুতিকথিত অর্থসমূহ আত্মপ্রকাশ করে।"

এই শ্রুতিবাক্যে গুরুদেবে পরা ভক্তির অত্যাবশ্যকত্ব উপদিষ্ট হইয়াছে। গুরু যদি মিথ্যাই হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাতে পরা ভক্তির সার্থকতা কি? অধিকন্তু, মিথ্যা বস্তুতে ভক্তিই বা হইতে পারে কিরূপে?

মহোপনিষদ্ বলিয়াছেন—

"দুর্ল্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্ল্লভং তত্ত্বদর্শনম্।
দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা ॥৪।৭৭॥

—সদ্‌গুরুর করুণা ব্যতীত বিষয়-ত্যাগ দুর্ল্লভ, তত্ত্বদর্শন দুর্ল্লভ, সহজাবস্থাও (জীবের স্বরূপে অবস্থিতিও) দুর্ল্লভ।”

গুরু যদি মিথ্যাই হইবেন, তাহা হইলে তাঁহার করুণাই বা আবার কি ? সেই করুণার সুফলই বা কি হইতে পারে ?

মুণ্ডক-শ্রুতি বলিয়াছেন—

“তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ ॥
তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়।
যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্ ॥

—মুণ্ডক ॥১।২।১২-১৩॥

—তাঁহাকে (ব্রহ্মকে) জানিবার নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া শাস্ত্রজ্ঞ এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর নিকটে যাইবে। তখন সেই বিদ্বান্ গুরু স্বীয় সমীপে উপসন্ন প্রশান্তচিত্ত এবং শমগুণান্বিত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা প্রদান করিবেন। এই ব্রহ্মবিদ্যার দ্বারাই অক্ষরপুরুষ ব্রহ্মকে জানা যাইতে পারে।”

শ্রুতি এ-স্থলে সদ্‌গুরুর পদাশ্রয়ের উপদেশ দিয়াছেন। গুরু যদি মিথ্যাই হয়েন, গুরুর উপদেশও যদি মিথ্যাই হয় (মিথ্যা গুরুর উপদেশও মিথ্যাই হইবে, তাহা কখনও সত্য হইতে পারে না), তাহা হইলে গুরুর পদাশ্রয়ের সার্থকতা কি থাকিতে পারে ? মিথ্যা গুরু ব্রহ্মবিদ্যাই বা কিরূপে দিতে পারেন ? ঐন্দ্রজালিক স্থষ্ট দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক কি কাহাকেও কিছু দিতে পারে ?

শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেও বলিয়াছেন—

“বিচারণীয়া বেদান্তা বন্দনীয়ো গুরুঃ সদা।
গুরূণাং বচনং পথ্যং দর্শনং সেবনং নৃণাম ॥ তত্ত্বোপদেশ ॥৮৪॥

—বেদান্তবাক্যই বিচারণীয়, গুরু সর্ব্বদা বন্দনীয়। গুরুর বচন, দর্শন এবং সেবন মনুষ্যগণের পথ্য—পরম হিতকর।”

মিথ্যা গুরুর বন্দনাই বা কি ? মিথ্যা গুরুর সেবা বা দর্শনেরই বা তাৎপর্য্য কি ? মিথ্যা গুরুর বাক্যেরই বা মূল্য কি ? শুক্তি-রজত-দৃষ্টান্তের রজতের সেবায় বা দর্শনে কি কাহারও কোনও অভীষ্ট পূর্ণ হইতে পারে ?

গুরু যদি মিথ্যাই হইবেন, তাহা হইলে শ্রীপাদ শঙ্কর নিজেকে জগদ্‌গুরু বলিয়াই বা প্রচার করিলেন কেন ?

“কৃতে বিশ্বগুরুর্ব্রহ্মা ত্রেতায়ামৃষিসত্তমঃ।
দ্বাপরে ব্যাস এব স্যাৎ কলাবত্র ভবাম্যহম্ ॥ —মঠানুশাসনম্ ॥২৫॥

—সত্যযুগে বিশ্বগুরু ছিলেন ব্রহ্মা, ত্রেতাযুগে ঋষিসত্তম (বশিষ্ঠ) এবং দ্বাপরে বিশ্বগুরু ছিলেন ব্যাসদেব। এই কলিযুগে আমি (শ্রীপাদ শঙ্কর) হইতেছি বিশ্বগুরু।”

ব্রহ্মা-ব্যাসাদি যে বিশ্বগুরু ছিলেন, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাঁহারা নিজে-দিগকে বিশ্বগুরু বলিয়া নিজেরা প্রচার করিয়াছেন, এইরূপ কোনও শাস্ত্রবাক্য দৃষ্ট হয় কি ?

যাহা হউক, শাস্ত্রানুসারে গুরুপদাশ্রয়, গুরুর আদর্শের অনুসরণ, গুরূপদেশের অনুসরণ—মোক্ষলাভের জন্য অপরিহার্য্য। গুরুই যদি মিথ্যা হয়েন, তাঁহার আদর্শও হইবে মিথ্যা, তাঁহার উপ-দেশও হইবে মিথ্যা। মিথ্যার অনুসরণ বা অনুবর্ত্তন অসম্ভব। ইন্দ্রজালসৃষ্ট রজ্জু আরোহণ করিয়া যখন ইন্দ্রজালসৃষ্ট দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক আকাশের দিকে উঠিয়া যায়, তখন কেহই তাহার অনুসরণ করিতে পারে না। মিথ্যা উপদেশের অনুসরণেও সত্য বস্তু লাভ হইতে পারে না; শ্রুতিই পরিষ্কারভাবে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ ॥কঠশ্রুতিঃ॥ ১।২।১০॥—অধ্রুব (অনিত্য—অসত্য) বস্তুদ্বারা কখনও ধ্রুব (সত্য) বস্তু পাওয়া যায় না।"

এই রূপে দেখা গেল—গুরুর ও গুরূপদেশের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে মোক্ষ-প্রাপ্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

ঘ। শ্রুতির মিথ্যাত্ব

শ্রুতি (এবং শ্রুতির অনুগত শাস্ত্র) যদি মিথ্যা হয়, শ্রুতির উপদেশও মিথ্যা হইয়া পড়ে। শ্রুতি যে ব্রহ্মের উপদেশ করিয়াছেন, সেই ব্রহ্মও মিথ্যা হইয়া পড়েন। ব্রহ্মজ্ঞান লাভের জন্য শ্রুতি যে ব্রহ্মের শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসনাদির কথা বলিয়াছেন, তৎসমস্তও মিথ্যা হইয়া পড়ে। সুতরাং মোক্ষ-লাভও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন—"ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ ॥ কঠশ্রুতিঃ ॥১।২।১০॥"

"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৪॥"—এই ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে একটী পূর্ব্বপক্ষের উত্থাপন করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর এ-সম্বন্ধে তাঁহার বক্তব্য প্রকাশ করিয়াছেন। এ-স্থলে তাহা উদ্ধৃত হইতেছেঃ—

"কথং ত্বসত্যেন বেদান্তবাক্যেন সত্যস্য ব্রহ্মাত্মত্বস্য প্রতিপত্তিরুপপদ্যতে, ন হি রজ্জুসর্পেন দষ্টো ম্রিয়তে, নাপি মৃগতৃষ্ণিকাম্ভসা পানাবগাহনাদি-প্রয়োজনং ক্রিয়ত ইতি।—যদি বল মিথ্যা বেদান্ত-বাক্যে সত্য ব্রহ্মাত্ম-বিজ্ঞান হওয়া কি প্রকারে উপপন্ন হয় ? জীব রজ্জু-সর্পের দংশনে মরে না এবং মৃগতৃষ্ণিকা-জলে পানাবগাহনাদি প্রয়োজনও নিষ্পন্ন করে না।—পণ্ডিতপ্রবর কালীবর বেদান্তবাগীশ কৃত ভাষ্যানুবাদ।"—ইহা হইতেছে পূর্ব্বপক্ষ।

এই পূর্ব্বপক্ষের উক্তির উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—

"নৈষ দোষঃ। শঙ্কাবিষাদাদিনিমিত্তমরণাদিকার্য্যোপলব্ধেঃ স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য চ সর্পদংশনোদক-স্নানাদিকার্য্যদর্শনাৎ।—ইহার প্রত্যুত্তরে আমরা বলি—বেদান্তবাক্য মিথ্যা হইলেও ঐ দোষ প্রদত্ত হইতে পারে না। রজ্জুসর্প-দংশনেও ত্রাস, শঙ্কা ও বিষাদাদি মারক-ক্রিয়া হইতে দেখা যায় এবং সুপ্ত পুরুষও স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট জলে ও মৃগতৃষ্ণিকা-জলে স্নানাদি কার্য্য করিয়া থাকে।—বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ।"

শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তি শুনিয়া কেহ হয়তো বলিতে পারেন—ইহা পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্নের উত্তর হইল না। কেননা, পূর্ব্বপক্ষের বক্তব্য হইতেছে এই যে—মিথ্যা রজ্জু-সর্পের (রজ্জুতে যে সর্পের ভ্রম হয়, সেই সর্পের) দংশনে যেমন কাহারও সত্য মৃত্যু হয় না, মিথ্যা মৃগতৃষ্ণিকার জলে যেমন সত্য জলপানের ও সত্য জলাবগাহনের কার্য্য সাধিত হয় না, তদ্রূপ মিথ্যা বেদান্তবাক্যেও কাহারও সত্য ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইতে পারে না। ইহার উত্তরে বলা হইল—রজ্জুসর্পের দংশনেও ত্রাস, শঙ্কা ও বিষাদাদি মারক-ক্রিয়া হইতে পারে এবং সুপ্ত পুরুষ স্বপ্নকালেও স্বপ্নদৃষ্টজলে পানাবগাহনাদি করিয়া থাকে এবং মৃগতৃষ্ণিকার জলেও পানাবগাহনাদি ক্রিয়া নিষ্পন্ন করিয়া থাকে।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই—লোক জাগ্রত অবস্থাতেই রজ্জুসর্প দেখে। রজ্জুসর্পের দংশনে ত্রাসাদি জন্মিতে পারে; কিন্তু সেই ত্রাস-শঙ্কায় কেহ মরে না। রজ্জুসর্প দ্রষ্টাকে দংশনও করে না—সুতরাং দংশনজনিত মারক ক্রিয়াও অসম্ভব। মৃগতৃষ্ণিকাও দৃষ্ট হয় লোকের জাগ্রত অবস্থায়। মৃগ-তৃষ্ণিকার জল কেহ পান করেনা, সেই জলে কেহ অবগাহনও করে না। পানাবগাহনের চেষ্টা করিলেও সেই চেষ্টা হইয়া যায় ব্যর্থ; সুতরাং সত্য পানাবগাহন হইতে পারে না। রজ্জুসর্প এবং মৃগতৃষ্ণিকা সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে যাহা বলিয়াছেন, তাহা অবাস্তব, প্রত্যক্ষ-বিরোধী; সুতরাং ইহা দ্বারা পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্নের সমাধান হইতে পারে না।

আর, তিনি যে বলিয়াছেন—"সুপ্ত পুরুষ স্বপ্নকালে স্বপ্নদৃষ্ট জলে পানাবগাহনাদি করিয়া থাকে"—ইহা ঠিক। কিন্তু ইহাতেও পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় না। কেননা, স্বপ্নকালের পানাবগাহন জাগ্রতাবস্থার পানাবগাহনের তুল্য নহে; স্বপ্নের অবগাহনে দেহ-বস্ত্রাদি সিক্ত হয় বটে; কিন্তু তাহা স্বপ্নাবস্থাতে। স্বপ্নাবসানে জাগরণের পরে সেই সিক্ততা দৃষ্ট হয় না। যদি জাগ্রতা-বস্থাতেও সেই সিক্ততা দৃষ্ট হইত, তাহা হইলেই পূর্ব্বপক্ষের প্রশ্নের—মিথ্যা বেদান্ত-বাক্যে সত্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তির কথায় যে সন্দেহের উদয় হয়, সেই সন্দেহের—সমাধান হইত।

উল্লিখিতরূপ আশঙ্কার উত্তরে শ্রীপাদ শঙ্কর আবার বলিয়াছেন—"তৎকার্য্যমপ্যনৃতমেবেতি চেৎ ব্রূয়াৎ, তত্র ব্রূমঃ—সে সকল ক্রিয়াও মিথ্যা, একথা বলিলে বলিব"—(ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন)—

"যদ্যপি স্বপ্নদর্শনাবস্থস্য সর্পদংশনোদক-স্নানাদিকার্য্যমনৃতং তথাপি তদবগতিঃ সত্যমেব ফলং প্রতিবুদ্ধস্যাপ্যবাধ্যমানত্বাৎ। নহি স্বপ্নাদুত্থিতঃ স্বপ্নদৃষ্টং সর্পদংশনোদকস্নানাদিকার্য্যং মিথ্যেতি মন্যমানস্তদবগতিমপি মিথ্যেতি মন্যতে কশ্চিৎ। এতেন স্বপ্নদৃশোঽবগত্যবাধনেন দেহমাত্রাত্মবাদো দূষিতো বেদিতব্যঃ।—যদিও স্বপ্নদর্শনাবস্থায় সর্পদংশন ও জলাবগাহন প্রভৃতি মিথ্যা, তথাপি, সে সকলের জ্ঞান মিথ্যা নহে। মিথ্যা হইলে জাগ্রৎকালে তাহার অনুবৃত্তি হইত না। স্বপ্নদর্শক পুরুষ স্বপ্নত্যাগের পর সর্পদংশনাদি কার্য্যকলাপকে মিথ্যা বলিয়া জানিলেও তদবগাহী জ্ঞানকে মিথ্যা বলিয়া জানে না (স্বপ্নে যে 'আমাকে সাপে কামড়াইয়াছে' ইত্যাকার জ্ঞান হইয়াছিল, সে

জ্ঞানকে সে সত্য বলিয়াই জানে)। স্বপ্নদ্রষ্টার স্বপ্নে জ্ঞানের বাধ হয় না, অর্থাৎ তাহা জাগ্রৎ-কালেও অনুবৃত্ত থাকে, এতদ্দ্বারা দেহাত্মবাদেও দোষ দেওয়া হইয়াছে, ইহা জানিতে হইবে।" (এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর কেবল স্বপ্নদৃষ্ট সর্পদংশন এবং স্বপ্নদৃষ্ট জলে স্নানাদির কথাই বলিয়াছেন, রজ্জুসর্প বা মৃগতৃষ্ণিকাজলের কথা কিছু বলেন নাই)।

উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মিথ্যা হইলেও (পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, তিনি স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুকে মিথ্যা বলেন) স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান মিথ্যা নহে; কেননা, স্বপ্নান্তে জাগ্রত অবস্থাতেও স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান থাকে।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রুতিপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"তথা চ শ্রুতিঃ—

"যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥'

অসত্যেন স্বপ্নদর্শনেন সত্যস্য ফলস্য সমৃদ্ধেঃ প্রাপ্তিং দর্শয়তি।

—শ্রুতিও বলিয়াছেন, স্বপ্নদর্শন অসত্য হইলেও তাহার সমৃদ্ধি—ফল—সত্য। যথা—'কাম্য কর্ম্মকালে স্বপ্নে স্ত্রীমূর্ত্তি সন্দর্শন হইলে জানিতে হইবে, তাদৃশ স্বপ্নের ফল কর্ম্মসমৃদ্ধি, অর্থাৎ স্বপ্নে স্ত্রীসন্দর্শন হইলে তাৎকালিক কাম্যকর্ম্ম নির্ব্বিঘ্নে ও উত্তমরূপে নির্ব্বাহ হইবে জানিবে। বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ।"

ইহার পরে তিনি আরও লিখিয়াছেন—

"তথা প্রত্যক্ষদর্শনেষু কেষুচিদরিষ্টেষু জাতেষু ন চিরমিব জীবিষ্যতীতি বিদ্যাদিত্যুক্ত্বা 'অথ যঃ স্বপ্নে পুরুষং কৃষ্ণদন্তং পশ্যতি, স এনং হন্তি' ইত্যাদিনা তেনাসত্যেনৈব স্বপ্নদর্শনেন সত্যং মরণং সূচ্যতে ইতি দর্শয়তি। প্রসিদ্ধঞ্চেদং লোকেঽন্বয়-ব্যতিরেক-কুশলানাম্ ঈদৃশেন স্বপ্নদর্শনেন সাধ্বাগমঃ সূচ্যতে, ঈদৃশেনাসাধ্বাগম ইতি। তথা অকরাদিসত্যাক্ষরপ্রতিপত্তিদৃষ্টা রেখানৃতাক্ষর-প্রতিপত্তেঃ।

—শ্রুতি 'কোন এক অরিষ্ট (মরণের পূর্ব্বলক্ষণ) প্রত্যক্ষ দৃষ্ট হইলে বুঝিতে হইবে, অরিষ্টদর্শক শীঘ্রই মরিবে'—এইরূপ বলিয়া অবশেষে 'যে ব্যক্তি স্বপ্নে কৃষ্ণদন্ত কৃষ্ণবর্ণ বিকট পুরুষ দেখে, স্বপ্নদৃষ্ট সেই পুরুষ শীঘ্রই তাহাকে বিনাশ করে।'—এইরূপ উক্তি করিয়া দেখাইয়াছেন যে, অসত্য স্বপ্নও সত্য মরণের সূচক (অনুমাপক) হয়। 'অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে মঙ্গল হয়, অমুক প্রকার স্বপ্ন দেখিলে অমঙ্গল হয়' এ-সকল তথ্য অন্বয়-ব্যতিরেক-কুশল লৌকিক পুরুষের মধ্যেও প্রসিদ্ধ আছে। অপিচ, মিথ্যা বা কল্পিত রেখাকার জ্ঞানের দ্বারা অকল্পিত অ-করাদি সত্য অক্ষরের জ্ঞান হইতে দেখা যায়। এই সকল দৃষ্টান্তের দ্বারা ইহাই সূচিত হইতেছে যে, বেদান্তশাস্ত্র কল্পিত হইলেও তাহার অকল্পিত সত্য ব্রহ্ম বুঝাইবার ক্ষমতা আছে। বেদান্তবাগীশকৃত ভাষ্যানুবাদ।"

শ্রীপাদ শঙ্কর এ-স্থলে যাহা বলিলেন, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও স্বপ্ন সত্য বস্তুর সূচনা করে। পূর্ব্বে বলিয়াছেন—স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও স্বপ্নদর্শনের জ্ঞান সত্য।

ইহা হইতে শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় এইরূপ বলিয়া জানা গেলঃ—স্বপ্ন মিথ্যা হইলেও যেমন স্বপ্নদর্শনের জ্ঞান সত্য এবং স্বপ্ন যেমন সত্য বস্তুর সূচক হয়, তদ্রূপ বেদান্ত মিথ্যা হইলেও বেদান্তের (অর্থাৎ বেদান্ত আলোচনার) জ্ঞান সত্য এবং মিথ্যা বেদান্ত হইতেছে সত্য বস্তু ব্রহ্মের সূচক।

এক্ষণে এই সম্বন্ধে বক্তব্য এই।

প্রথমতঃ, **স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান**

স্বপ্নদৃষ্ট বস্তু মিথ্যা ; কিন্তু তাহার জ্ঞান সত্য। স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর জ্ঞান হইতেছে—জাগ্রতাবস্থায় স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর স্মৃতি। এই স্মৃতি সত্য। তদ্রূপ, বেদান্ত মিথ্যা হইলেও বেদান্তের জ্ঞান সত্য। বেদান্তের জ্ঞান হইতেছে - বেদান্তের অধ্যয়নাদির ফলে বেদান্ত-কথিত বিষয়-সমুহের এবং তাহাদের তাৎপর্য্যের স্মৃতি। এই স্মৃতি সত্য।

কিন্তু বেদান্তের জ্ঞান বা বেদান্তপ্রোক্ত বিষয়ের স্মৃতি হইতেই কি ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে ? তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। স্বপ্নদর্শনের জ্ঞান বা স্মৃতি হইতে স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুও পাওয়া যায় না, অন্য কোনও বস্তুও পাওয়া যায় না। মিথ্যা বস্তুর স্মৃতিমাত্রে কোনও সত্য বস্তু পাওয়া যায় না। শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে শুক্তিতে যে রজত দৃষ্ট হয়, তাহা মিথ্যা। শুক্তির জ্ঞানে রজতের ভ্রম যখন দূরীভূত হয়, তখনও রজতের স্মৃতি থাকে। তাহার ফলে কেহ সত্য রজত প্রাপ্ত হয় না। যদি বলা যায় --তখন রজত পায় না বটে ; কিন্তু শুক্তি পাওয়া যায়। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তখন যে শুক্তি পাওয়া যায়, তাহা রজতের স্মৃতির ফলে নহে ; শুক্তি-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে রজত-দর্শন তিরোহিত হয়, তাহার পরেই রজতের স্মৃতি হয়। তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, রজতের স্মৃতির ফলেই শুক্তির দর্শন হয়, তাহা হইলেও দেখা যায়—রজতের স্মৃতির ফলে যে শুক্তির দর্শন হয়, সেই শুক্তি হইতেছে রজত অপেক্ষা ভিন্ন বস্তু ; যখন রজত দৃষ্ট হইতেছিল, তখন শুক্তি দৃষ্ট হয় নাই। যাহা দৃষ্ট হয় নাই, তাহাই পরে দৃষ্ট হয় বা প্রাপ্ত হয়। রজতের স্মৃতির সঙ্গেও শুক্তির স্মৃতি জড়িত নাই। মিথ্যা বেদান্তের জ্ঞানে বা স্মৃতিতে যদি কোনও বস্তু পাওয়া যায়, তাহা হইলে তাহাও হইবে- বেদান্তে যাহা কথিত হয় নাই, তদ্রূপ কোনও একটী বস্তু। বেদান্তে কথিত হইয়াছে ব্রহ্মবস্তুর কথা , সুতরাং তাহা হইবে ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু। তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে না।

কেবল বেদান্তের জ্ঞানেই যে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হয় না, তাহা বেদান্ত নিজেই বলিয়া গিয়াছেন। “নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন।” যাঁহারা বেদান্তকে সত্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই শ্রুতিবাক্যকেও সত্য বলিয়া মনে করেন। সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্

গীতাও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "ন বেদযজ্ঞাধ্যয়নৈর্ন দানৈর্ন ন চ ক্রিয়াভির্ন তপোভিরুগ্রৈঃ। এবংরূপঃ শক্য অহং নৃলোকে দ্রষ্টুং ত্বদন্যেন কুরুপ্রবীর ॥১১।৩৮॥"

এইরূপে দেখা গেল -বেদান্তের কেবল জ্ঞান হইতে ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইতে পারে না। সুতরাং বেদান্তকে মিথ্যা বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয়তঃ, স্বপ্নের সূচকত্ব

এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তির গোড়াতেই একটী গলদ রহিয়াছে বলিয়া মনে হইতেছে। সেই গলদটী হইতেছে এই।

তিনি বলেন –বেদান্ত মিথ্যা। বেদান্ত বলিতে বেদান্তের বাক্যকে বুঝায়। বেদান্ত-বাক্য যদি মিথ্যা হয়, তাহা প্রমাণরূপে স্বীকৃত হইতে পারে না। ইন্দ্রজালসৃষ্ট লোকহত্যাকে প্রমাণরূপে গ্রহণ করিয়া কেহ ঐন্দ্রজালিকের শাস্তির বিধান করে না। শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু মিথ্যা বেদান্তের মিথ্যা বাক্যকেই প্রমাণরূপে উপস্থাপিত করিয়া তাঁহার অভীষ্ট বিষয়ের প্রতিপাদন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ইহাই তাঁহার যুক্তির গোড়ার গলদ।

যাহাহউক, যুক্তির অনুরোধে মিথ্যা বেদান্ত-বাক্যকেও সত্যরূপে স্বীকার করিয়াই আলোচনা করা যাউক।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—"মিথ্যা স্বপ্নও সত্য বস্তুর সূচনা করে—একথা শ্রুতি বলেন। শ্রুতি বলেন—স্বপ্নে স্ত্রীলোকের দর্শন হইলে স্বপ্নদ্রষ্টার সমৃদ্ধি লাভ সূচিত হয়। মিথ্যা স্বপ্নের মিথ্যা স্ত্রীলোকের মিথ্যা-দর্শন সত্য সমৃদ্ধির সূচনা করে। মিথ্যা বেদান্ত (অর্থাৎ মিথ্যা বেদান্তের মিথ্যা আলোচনা) কোন্ শুভ বস্তুর সূচনা করে? স্বপ্নদ্রষ্টার মিথ্যা স্ত্রীলোক যে সমৃদ্ধির সূচনা করে, তাহা সেই স্ত্রীলোকের প্রাপ্তি নহে, সেই স্ত্রীলোক হইতে ভিন্ন একটী বস্তুর প্রাপ্তি। মিথ্যা বেদান্ত-বাক্যও যদি কিছু সূচনা করে, তাহাও হইবে বেদান্ত-বাক্য অপেক্ষা পৃথক্ একটী বস্তু—দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের তুলনায় তাহাই বুঝা যায়। বেদান্ত-বাক্য তো ব্রহ্মের কথাই বলিয়া থাকেন। তাহা হইতে ভিন্ন বস্তু হইবে—ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও বস্তু, তাহা ব্রহ্ম হইতে পারে না। তাহা হইলে কি বুঝিতে হইবে—মিথ্যা বেদান্ত ব্রহ্মাতিরিক্ত একটী সত্য বস্তুর সূচনা করিয়া থাকে? ব্রহ্মাতিরিক্ত সত্য বস্তু কি কিছু আছে? শ্রীপাদ শঙ্করের মত স্বীকার করিতে গেলে—ব্রহ্মাতিবিক্ত সত্য বস্তুও স্বীকার করিতে হয়, অর্থাৎ যদি সত্য বস্তু বলিয়া কিছু থাকে, তবে তাহা হইবে ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু। কেননা, ব্রহ্ম যে সত্য বস্তু, ইহা হইতেছে মিথ্যা বেদান্তের মিথ্যা বাক্য।

যাহা হউক, যদিও শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি হইতে প্রতিপাদিত হয় না যে, মিথ্যা বেদান্ত-সূচিত শুভ বস্তুটী হইতেছে ব্রহ্ম, তথাপি যুক্তির অনুরোধে তাহা স্বীকার করিলেও তাহাতে ব্রহ্মই সূচিত হয়েন, ব্রহ্মপ্রাপ্তি সূচিত হয় না। সূচনা ও প্রাপ্তি – এক জিনিস নহে। বিবাহের মঙ্গলা-চরণ হইতেছে ভাবী বিবাহের সূচক; কিন্তু মঙ্গলাচরণই বিবাহ নহে।

আরও একটী কথা। স্বপ্নে স্ত্রীলোকের দর্শন সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর যে শ্রুতিবাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা হইতে জানা যায়—স্ত্রীলোকের দর্শন কেবল সমৃদ্ধির স্থচনামাত্র করে, স্বপ্নদ্রষ্টার সমৃদ্ধি লাভ হইবে, ইহাই জানাইয়া দেয়; কিন্তু সমৃদ্ধিটী স্ত্রীলোক-দর্শনের ফল নহে। তাহা হইতেছে—কাম্যকর্ম্মের ফল। "যদা কর্ম্মস্থ কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি। সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥" এই কাম্যকর্ম্ম কিন্তু স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রীলোকের ন্যায় মিথ্যা বস্তু নহে। জাগ্রত অবস্থায় এই কাম্যকর্ম্ম অনুষ্ঠিত হয়, স্থতরাং তাহা সত্য। তদ্রূপ কোন্ সত্য বস্তুর অনুষ্ঠানের সময়ে মিথ্যা বেদান্ত (অর্থাৎ মিথ্যা বেদান্তের মিথ্যা অধ্যয়নাদি) সত্য বস্তুর স্থচনা করিবে? যদি বলা যায়—সাধনরূপ সত্য কর্ম্মের অনুষ্ঠান। তাহাও হইতে পারে না। কেননা, সাধনের জন্য প্রয়োজন—গুরু, গুরুর উপদেশ, শ্রুতির উপদেশ। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে গুরু, গুরুর উপদেশ, শ্রুতি, শিষ্য আদি সমস্তই যখন মিথ্যা, তখন সাধনও মিথ্যা। বিশেষতঃ, মিথ্যা শিষ্যের সাধনও মিথ্যা। ইন্দ্রজালস্থষ্ট দ্বিতীয় ঐন্দ্রজালিক যাহা কিছু করে, তৎসমস্তই মিথ্যা; তাহা মুগ্ধ দর্শকদের সাময়িক চিত্ত-বিনোদন ব্যতীত কোনও স্থায়ী সত্য ফল উৎপাদন করিতে পারে না। মিথ্যা সাধনে সত্য ব্রহ্মের প্রাপ্তি সম্ভবপর নয়। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ॥ কঠশ্রুতিঃ॥ ১৷২৷১০॥" মিথ্যা সাধনের দ্বারা যদি সত্য ফল ব্রহ্মপ্রাপ্তি সম্ভবপর হইত, তাহা হইলেই উল্লিখিত দৃষ্টান্ত অনুসারে, মিথ্যা বেদান্ত সেই সত্যফলের স্থচক হইতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন সম্ভবপর নয়, তখন মিথ্যা বেদান্তের পক্ষে সত্য ব্রহ্ম-প্রাপ্তির স্থচনাও সম্ভবপর হইতে পারে না।

বস্তুতঃ শ্রীপাদ শঙ্করের উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যটী হইতেছে প্রারব্ধ কাম্যকর্ম্ম-বিষয়ক। উহার পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যটী হইতে তাহা স্পষ্টভাবেই জানা যায়। পূর্ব্ববাক্যটী এইরূপ:—

"অথ খল্বেতয়র্চ্চা পচ্ছ আচামতি—তৎ সবিতুর্ব্বৃণীমহ ইত্যাচামতি, বয়ং দেবস্য ভোজন-মিত্যাচামতি, শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমমিত্যাচামতি, তুরং ভগস্য ধীমহীতি সর্ব্বং পিবতি, নির্ণিজ্য কংসং চমসং বা পশ্চাদগ্নেঃ সংবিশতি চর্ম্মণি বা স্থণ্ডিলে বা বাচং যমোহপ্রসাহঃ, স যদি স্ত্রিয়ং পশ্যেৎ সমৃদ্ধং কর্ম্মেতি বিদ্যাৎ॥ ছান্দোগ্য॥ ৫৷২৷৭॥

—অনন্তর বক্ষ্যমাণ মন্ত্রে পাদক্রমে অর্থাৎ এক এক পাদ মন্ত্র জপ করিতে করিতে এক একবার ভক্ষণ করিবে—প্রকাশমান সবিতার (সূর্য্যের) সেই সর্ব্ববিষয়ক ও শ্রেষ্ঠতম ভোজন আমরা প্রার্থনা করিতেছি এবং অবিলম্বে সেই সূর্য্যের স্বরূপ ধ্যান করিতেছি। এই মন্ত্র জপ করিতে করিতে কংস বা চমস (উভয়ই পাত্রবিশেষ) ধৌত করিয়া তৎসংলগ্ন সমস্ত মন্থ পান করিবে। অতঃপর বাক্য ও মনকে সংযত করিয়া অগ্নির পশ্চাদ্‌ভাগে চর্ম্মে কিম্বা স্থণ্ডিলে (যজ্ঞীয় পবিত্র ভূমিতে) শয়ন করিবে। সেই সুপ্ত ব্যক্তি যদি স্ত্রীমূর্ত্তি দর্শন করে, তাহা হইলে অনুষ্ঠিত কর্ম্মকে সফল বলিয়া জানিবে। আচমনের মন্ত্রবিভাগ এইরূপ:—(১)

'তৎ সবিতুঃ বৃণীমহে', (২) "বয়ং দেবস্য ভোজনম্', (৩) 'শ্রেষ্ঠং সর্ব্বধাতমম্', (৪) 'তুরং ভগস্য ধীমহি'। —মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

ইহার পরেই শ্রুতি বলিয়াছেন,

"তদেষ শ্লোকঃ—

যদা কর্ম্মসু কাম্যেষু স্ত্রিয়ং স্বপ্নেষু পশ্যতি।
সমৃদ্ধিং তত্র জানীয়াৎ তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে
তস্মিন্ স্বপ্ননিদর্শনে॥ ছান্দোগ্য॥ ৫।২।৮॥"

ইহা হইতে জানা গেল—কোনও কাম্যকর্ম্মের অনুষ্ঠাতা অনুষ্ঠানের পরে যদি সংযত-চিত্তে যজ্ঞস্থলীতে বিশেষ স্থানে এবং বিশেষ শয্যায় নিদ্রিত হয় এবং নিদ্রিত অবস্থায় যদি স্বপ্নে স্ত্রীলোকের দর্শন করে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে যে, তাহার অনুষ্ঠিত কাম্যকর্ম্মের ফলরূপ সমৃদ্ধি লাভ হইবে। অনুষ্ঠিত ক্যম্যকর্ম্মটী সত্য, তাহার ফল সত্য, কেবল স্বপ্নটী (শ্রীপাদ শঙ্করের মতে) মিথ্যা। ইহা হইতেই বুঝা যায়, এ সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহার সহিত এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যের কোনও বিরোধ নাই। স্বপ্নদৃষ্ট মিথ্যা স্ত্রীলোক কাম্য কর্ম্মের ফলেরই সূচনা করে, ফল দান করে না। স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রীলোক-স্থানীয় মিথ্যাবেদান্তও কোনও কিছু সূচনা হয়তো করিতে পারে, কিন্তু তাহা দিতে পারে না। সূচনাও যদি করিতে পারে, তাহা হইলে সূচিত বস্তুটী হইবে—মিথ্যা-বেদান্ত-কথিত ব্রহ্মাতিরিক্ত একটী বস্তু, যেমন স্বপ্নদৃষ্ট স্ত্রীলোক-সূচিত কাম্যকর্ম্মের ফল হইতেছে স্ত্রীলোকাতিরিক্ত একটী বস্তু, তদ্রূপ।

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার উক্তির সমর্থনে আরও একটী যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন; তিনি বলেন—শ্রুতি মিথ্যা হইলেও শ্রুতিলব্ধ জ্ঞান যে মিথ্যা নহে, তদ্বিষয়ে একাত্মপ্রতিপাদক প্রমাণই হইতেছে চরম প্রমাণ; ইহার পরে কিঞ্চিন্মাত্র আকাঙ্ক্ষিতব্য থাকে না। "অপি চ অন্ত্যমিদং প্রমাণমাত্মৈকত্বস্য প্রতিপাদকং, নাতঃ পরং কিঞ্চিদাকাঙ্ক্ষ্যমস্তি।" "যজ্ঞ করিবে" ইত্যাদি বিধিবাক্যে যেমন কোন্ যজ্ঞ, কি দিয়া ও কি প্রকারে যজ্ঞ করিবে—এই সকলের অপেক্ষা থাকে, আকাঙ্ক্ষা থাকে, "তত্ত্বমসি"-বাক্যে সেইরূপ কোনও আকাঙ্ক্ষাই থাকেনা। আকাঙ্ক্ষিতব্য থাকে না বলিয়াই আকাঙ্ক্ষার অভাব হয়; আকাঙ্ক্ষিতব্য না থাকিবার কারণ এই যে, সর্ব্বাত্মভাব ঐ জ্ঞানের বিষয়। পিতার উপদেশে শ্বেতকেতুর ঐরূপ অদ্বয়াত্মজ্ঞান জন্মিয়াছিল। অদ্বয়াত্মজ্ঞান লাভের উপায়স্বরূপ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন ও বেদানুবচনাদির বিধানও দৃষ্ট হয়। উহা যে মিথ্যা জ্ঞান, তাহাও বলা চলে না। কেননা, ঐ জ্ঞানে জীবের অবিদ্যানিবৃত্তি হয় এবং তাহার বাধক জ্ঞানান্তরও নাই—অর্থাৎ ঐ জ্ঞানকে বিনষ্ট করিতে পারে, এমন কোনও জ্ঞানান্তরও নাই। (তাৎপর্য্য এই যে, ঐ জ্ঞান সত্য এবং মিথ্যা শ্রুতির জ্ঞান হইতেই তাহা জন্মিয়াছে। সুতরাং শ্রুতি মিথ্যা হইলেও তাহার জ্ঞান মিথ্যা নহে)।

এ সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ তাঁহার শ্রীভাষ্যের জিজ্ঞাসাধিকরণে ১।১।১ সূত্রের ভাষ্যে বলিয়াছেন—"পশ্চাত্তনবাধাদর্শনং চাসিদ্ধং, শূন্যমেব তত্ত্বমিতি বাক্যেন তস্যাপি বাধদর্শনাৎ। তন্তু ভ্রান্তিমূলমিতি চেৎ; এতদপি ভ্রান্তিমূলমিতি ত্বয়ৈবোক্তম্। পাশ্চাত্য-বাধাদর্শনন্তু তস্যৈবেত্যলম-প্রতিষ্ঠিত-কুতর্কপরিহাসেন।—আর যে, পরবর্ত্তী কোনও জ্ঞানের দ্বারা বাধিত নয় বলিয়া শাস্ত্রপ্রতি-পাদিত ব্রহ্ম-জ্ঞানকে সত্য বলা হইয়াছে, সে কথাও প্রমাণ-সিদ্ধ নহে। কারণ, 'শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য'—এই বাক্যদ্বারাই ত তাহারও বাধা পরিদৃষ্ট হইতেছে। যদি বল—এই কথা ভ্রান্তিমূলক (সত্য নহে)। [বেশ কথা], তুমিও ত শাস্ত্রকে ভ্রান্তিমূলক বলিয়াছ (সুতরাং উভয়ের মধ্যে বিশেষ কি আছে?)। অধিকন্তু, শূন্যবাদীর বাক্যেরও পরবর্ত্তী কোনও প্রমাণে বাধা পরিলক্ষিত হয় না। [অতএব তাহার বাক্যেরই প্রামাণ্য হওয়া উচিত]। যাউক, আর অব্যবস্থিত কুতর্কের পরিহাসে প্রয়োজন নাই।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত ভাষ্যানুবাদ।"

পাদটীকায় সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহাশয় শ্রীপাদ রামানুজের যুক্তিটীর তাৎপর্য্য এই ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন :—

"তাৎপর্য্য,—ইতঃপূর্ব্বে শঙ্করমতে উক্ত হইয়াছে যে, ব্রহ্মবোধক বেদের যখন পরবর্ত্তী কোনও প্রমাণে বাধা ঘটেনা, তখন উহার প্রামাণ্যও ব্যাহত হইতে পারে না। রামানুজ বলিতেছেন যে, সে কথাটা ঠিক হইলনা; কারণ, শূন্যবাদী বৌদ্ধগণই ত তোমার ব্রহ্মকে স্থান দেয়না। তাহারা বলে, 'শূন্যং তত্ত্বং, ভাবো বিনশ্যতি, বস্তুধর্ম্মত্বাদ্ বিনাশস্য।' (সাংখ্যদর্শন, ১।৪৪)। অর্থাৎ বিনাশ যখন বস্তুমাত্রেরই ধর্ম্ম বা স্বভাব, তখন ভাব অর্থাৎ সত্তাবিশিষ্ট বস্তুমাত্রই বিনষ্ট হইয়া যায়। অতএব শূন্যই একমাত্র তত্ত্ব বা সত্য পদার্থ। আর শঙ্কর যখন জগৎ-প্রপঞ্চকে মিথ্যা বলেন, তখন 'সর্ব্বম্ অস্তি' অর্থাৎ 'সমস্তই সৎ—শূন্য নহে' বলিয়া শূন্যবাদের বাধা করাও তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং শূন্যবাদীর কথায় বাধিত হওয়ায় ব্রহ্মবাদই অপ্রমাণ হইয়া পড়ে। পক্ষান্তরে, দোষমূলত্ব-নিবন্ধন বেদের অপ্রামাণ্য উভয়ের (অদ্বৈত বাদী ও শূন্যবাদীর) পক্ষে সমান হইলেও অবাধিতত্ববশতঃ শূন্যবাদীর পক্ষই গ্রহণীয় হইতে পারে! তাই বলিয়াছেন যে—

'বেদোঽনৃতো বুদ্ধকৃতাগমোঽনৃতঃ প্রামাণ্যমেতস্য চ তস্য চানৃতম্।
বোদ্ধানৃতো বুদ্ধি-ফলে তথানৃতে যূয়ং চ বৌদ্ধাশ্চ সমানসংসদঃ॥'

অর্থাৎ বেদ অসত্য, বুদ্ধকৃত শাস্ত্রও অসত্য এবং এতদুভয়ের প্রামাণ্যও অসত্য; বোদ্ধা মিথ্যা, এবং তাহার বুদ্ধি ও বোধফল মিথ্যা। সুতরাং অদ্বৈতবাদী ও শূন্যবাদী বৌদ্ধ, উভয়ই তুল্যকক্ষ।"

শ্রীপাদ রামানুজ উল্লিখিত ভাবে শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তির খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন—শ্রুতির মিথ্যাত্ব অযৌক্তিক। যে যুক্তিতে শ্রীপাদ শঙ্কর মিথ্যা শ্রুতির জ্ঞানের সত্যত্ব দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন এবং তদ্দ্বারা অদ্বয়াত্মজ্ঞান বা মোক্ষ লাভের সম্ভাবনাও দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, শ্রীপাদ রামানুজ

বলেন, তাহাও বিচারসহ নহে। শ্রুতিকে সত্য বলিয়া স্বীকার করিলেই সত্য শ্রুতির সত্য উপদেশের অনুসরণে মোক্ষলাভ সম্ভব হইতে পারে, অন্যথা নহে।

এইরূপে দেখা গেল— বেদান্তকে মিথ্যা মনে করিলে ব্রহ্মপ্রাপ্তি বা মোক্ষপ্রাপ্তিই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

বেদান্তের সত্যতা স্বীকার করিলে উল্লিখিতরূপ অদ্ভুত ব্যাপারের আশঙ্কা থাকে না। সত্য বেদান্ত সত্যস্বরূপ ব্রহ্মের সূচনা করেন, অর্থাৎ বেদান্ত-বিহিত উপায়ে সাধন করিলে যে বেদান্ত-প্রতিপাদ্য ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইতে পারে এবং মোক্ষ লাভ হইতে পারে, বেদান্ত তাহা জানাইয়া দেন।

বেদান্ত যে মিথ্যা— শ্রুতি-স্মৃতির কোনও স্থলে তাহার আভাস মাত্রও দৃষ্ট হয় না। সত্যস্বরূপ পরব্রহ্ম তাঁহার নিশ্বাসরূপে যে বেদাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিলেন, তাহা কখনও মিথ্যা হইতে পারে না। বেদকে মিথ্যা বলা অপেক্ষা অধিকতর বেদনিন্দাও আর কিছু হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। ইহা বেদ-প্রবর্ত্তক এবং বেদমূর্ত্তি পরব্রহ্মেরও নিন্দা।

"শাস্ত্রযোনিত্বাৎ"-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করই বেদাদি শাস্ত্রকে "সর্ব্বজ্ঞকল্প" বলিয়াছেন। যাহা মিথ্যা, তাহা আবার "সর্ব্বজ্ঞকল্প" হয় কিরূপে ? সত্যস্বরূপ ব্রহ্ম যে একমাত্র বেদ-প্রতিপাদ্য, বেদান্তবেদ্য —শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। সত্যস্বরূপব্রহ্ম কিরূপেই বা মিথ্যা-বেদান্তবেদ্য হইতে পারেন ? বেদান্ত যদি মিথ্যাই হয়েন, শ্রীপাদ শঙ্করই বা কেন মিথ্যা শাস্ত্রের ভাষ্য করিতে গেলেন ? মিথ্যা-শ্রুতির ভাষ্যও কি মিথ্যা নয় ? বেদান্ত-শাস্ত্র যদি মিথ্যা হয়েন, তাহা হইলে শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ যে বলিয়াছেন—তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণং তে কার্য্যাকার্য্য-ব্যবস্থিতৌ"-এই বাক্যেরই বা সার্থকতা থাকে কিরূপে ? বেদ স্বতঃপ্রমাণ প্রমাণ-শিরোমণি। মিথ্যা বেদ কিরূপে স্বতঃপ্রমাণ এবং প্রমাণ-শিরোমণি হইতে পারেন ?

স্মৃতি-শাস্ত্রে বেদনিন্দা একটী মহা অপরাধের মধ্যে পরিগণিত। এজন্যই কি বলা হয়— "মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী ?"

৬। ঈশ্বরের মিথ্যাত্ব

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে মায়াদ্বারা উপহিত ব্রহ্মই ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্ম। মায়া মিথ্যা বলিয়া ঈশ্বর বা সগুণব্রহ্মও মিথ্যা। এই মত অনুসারে শ্রীকৃষ্ণও হয়েন মায়াময়, মিথ্যা। কিন্তু অপৌরুষেয় শাস্ত্র মহাভারতও শ্রীকৃষ্ণকে সত্য বলিয়া গিয়াছেন।

"সর্ব্বস্য চ সদা জ্ঞানাৎ সর্ব্বমেতং প্রচক্ষতে। সত্যে প্রতিষ্ঠিতঃ কৃষ্ণঃ সত্যমত্র প্রতিষ্ঠিতম্॥
সত্যাৎ সত্যঞ্চ গোবিন্দস্তস্মাৎ সত্যোঽপি নামতঃ॥ বিষ্ণুর্ব্বিক্রমনাদ্দেবো জয়নাজ্জিষ্ণুরুচ্যতে॥
—মহাভারত উদ্যোগপর্ব্ব ॥৭০।১২-১৩॥"

সর্ব্বোপনিষৎ-সারস্বরূপ শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতার একাধিক শ্লোক হইতে জানা যায়— শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় অনাবৃত্তি-লক্ষণা মুক্তি লাভ হয়। অনাবৃত্তি-লক্ষণা মুক্তি হইতেছে সত্য বস্তু। শ্রুতি

বলিয়াছেন, অনিত্য বস্তুর উপাসনাতে নিত্য বস্তু, সত্য বস্তু পাওয়া যায় না। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ॥ মুণ্ডক শ্রুতিঃ॥১।২।১০॥" অনিত্য বস্তুর উপাসনায় কিরূপে নিত্য বস্তু – মোক্ষ—লাভ সম্ভবপর হইতে পারে? অথচ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনায় যে নিত্য বস্তু মোক্ষলাভ হইতে পারে, তাহা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেই জানা যায়। ইহাদ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের সত্যত্ব প্রতিপাদিত হইতেছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের এতাদৃশ অভিমত যে বিচারসহ নহে, পূর্ব্বেই শাস্ত্রপ্রমাণ অবলম্বনে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

সবিশেষ ব্রহ্মই (যাঁহাকে শ্রীপাদ শঙ্কর মায়োপহিত সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন, সেই সবিশেষ ব্রহ্মই) শ্রুতি-স্মৃতির একমাত্র বেদ্য তত্ত্ব। মোক্ষলাভের নিমিত্ত শ্রুতি-স্মৃতি সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসনারই উপদেশ দিয়াছেন। সবিশেষ ব্রহ্ম যদি মিথ্যা হয়েন, তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতির উপদেশ নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমতের প্রতি শ্রদ্ধাবশতঃ যাঁহারা মিথ্যাজ্ঞানে সবিশেষ ব্রহ্মের উপাসনা হইতে বিরত থাকিবেন, তাঁহাদের মোক্ষ-লাভের পথেও বিঘ্ন উপস্থিত হইবে। ইহাই হইতেছে ঈশ্বরের মিথ্যাত্ব-স্বীকারের দোষ।

চ। স্থষ্টি-প্রলয়াদির মিথ্যাত্ব

বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিতে গেলে স্থষ্টিও মিথ্যা হইয়া পড়ে, প্রলয়ও মিথ্যা হইয়া পড়ে।

শুক্তিতে রজতের ভ্রমের ন্যায় ব্রহ্মে জগতের ভ্রম—ইহা স্বীকার করিলে যে স্থষ্টি মিথ্যা হইয়া পড়ে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

শুক্তি কখনও রজতের স্থষ্টি করে না, রজ্জুও সর্পের স্থষ্টি করে না। কিন্তু ব্রহ্ম যে জগতের স্থষ্টি করেন, তাহা সমস্ত শাস্ত্রই বলিয়া গিয়াছেন। "জন্মাদ্যস্য যতঃ॥১।১।২॥"-সূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া বেদান্তদর্শনের প্রথম ও দ্বিতীয় অধ্যায়ে ব্রহ্মেরই জগৎ-কর্ত্তৃত্ব প্রতিপাদিত করা হইয়াছে। "যতো বা ইমানি ভূতানি জায়ন্তে," "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ," "তদৈক্ষত বহু স্যাং প্রজায়েয়েতি, তত্তেজোঽসৃজত," "সেয়ং দেবতৈক্ষত হন্তাহমিমাস্তিস্রো দেবতা অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণীতি"; "তাসাং ত্রিবৃতং ত্রিবৃতমেকৈকাং করবাণীতি; সেয়ং দেবতেমাস্তিস্রো দেবতা অনেনৈব জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরোৎ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে যে, ব্রহ্মকর্ত্তৃকই জগৎ-প্রপঞ্চের স্থষ্টি হইয়াছে এবং এই স্থষ্টি যে মিথ্যা নহে, পরন্তু সত্য, তাহাও শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে পরিষ্কারভাবে জানা যায়। জগৎ-প্রপঞ্চকে শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজতের ন্যায় মিথ্যা মনে করিলে শ্রুতিবাক্য নিরর্থক হইয়া পড়ে এবং "সমান-নামরূপত্বাচ্চাবৃত্তাবপ্যবিরোধাদর্শনাৎ স্মৃতেশ্চ॥১।৩।৩০॥"-ব্রহ্মসূত্রে যে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব-কল্পানুরূপ পর-পর-কল্পের স্থষ্টির কথা বলা হইয়াছে, তাহাও ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

আর, বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করিলে দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্যও থাকে না। কেননা, শুক্তি

রজতের সৃষ্টি করে না, শুক্তি হইতেও রজতের উদ্ভব হয় না। কিন্তু ব্রহ্ম জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, ব্রহ্ম হইতে জগতের উদ্ভব।

সৃষ্টিকে মিথ্যা মনে করিলে প্রলয়ও মিথ্যা হইয়া পড়ে। কেননা, সৃষ্টির বিনাশই হইতেছে প্রলয় ; সৃষ্টিই যদি মিথ্যা হয়, তাহার বিনাশ কখনও সত্য হইতে পারে না। অথচ, শাস্ত্রে সৃষ্টির ন্যায় প্রলয়ের সত্যত্বও দৃষ্ট হয়। প্রলয় সত্য না হইলে—সৃষ্টির পর প্রলয়, প্রলয়ের পরে আবার সৃষ্টি, তাহার পরে আবার প্রলয়, ইত্যাদি সৃষ্টি-প্রলয়-প্রবাহের কথা বলা হইত না। সৃষ্টিকালে যে জগৎ নামরূপে অভিব্যক্তি লাভ করে, নাম-রূপ পরিত্যাগ করিয়া সেই জগতেরই পুনরায় ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি—ইহাই হইতেছে প্রলয়। ব্রহ্ম হইতে উদ্ভব বলিয়াই ব্রহ্মে লয়প্রাপ্তি সম্ভব। লয় প্রাপ্ত হইয়া জগৎ সদ্‌ব্রহ্মের সহিত অভিন্নরূপে অবস্থান করে। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ, একমেবাদ্বিতীয়ম্"-বাক্যে শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন। সৃষ্টি এবং প্রলয় যদি মিথ্যা হয়, তাহা হইলে শ্রুতিবাক্যসমূহেরও সার্থকতা কিছু থাকে না।

বিবর্ত্তবাদে যখন শুক্তির জ্ঞান হয়, তখন রজত দৃষ্ট হয় না বটে ; কিন্তু রজত তখন শুক্তিতে লয় প্রাপ্ত হয় না, শুক্তির মধ্যে প্রবেশ করে না। প্রলয়ে কিন্তু জগৎ ব্রহ্মে প্রবেশ করে এবং ব্রহ্মের সহিত লয়প্রাপ্ত হয়। এ-স্থলেও দৃষ্টান্ত-দার্ষ্টান্তিকের সামঞ্জস্য দৃষ্ট হয় না।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, সৃষ্টিব্যাপারের সঙ্গে জীবের কর্ম্মের একটী বিশেষ সম্বন্ধ আছে। কর্ম্মফল অনুসারেই সমস্ত সৃষ্টি ; সৃষ্টি ও প্রলয়ের মধ্যবর্ত্তী কালেও জীব কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে। যাঁহারা মোক্ষ লাভ করিতে পারে না, মহাপ্রলয়েও তাঁহারা সূক্ষ্মরূপ কর্ম্মফলকে অবলম্বন করিয়াই ব্রহ্মে অবস্থান করেন। সৃষ্টি ও প্রলয় মিথ্যা হইলে কর্ম্ম বা কর্ম্মফলও মিথ্যা হইয়া পড়ে। অবশ্য বিবর্ত্তবাদী শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সৃষ্টি মিথ্যা, প্রলয় মিথ্যা, জগৎ মিথ্যা, জীব মিথ্যা, কর্ম্ম মিথ্যা, এমন কি শ্রুতি-স্মৃতি বিহিতা সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিও তাঁহার মতে মিথ্যা ; কেননা, পঞ্চবিধা মুক্তিতেও জীবের ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ সত্তা থাকে ; শ্রীপাদ শঙ্করের মতে জীবের পৃথক্ সত্তাও মিথ্যা।

সাধু কর্ম্ম, অসাধু কর্ম্ম, সৃষ্টি, প্রলয়, সাধন-ভজন—সমস্তই যদি একই মিথ্যা-পর্য্যায়ভুক্ত হয়, তাহা হইলে কোনও কোনও লোকের মধ্যে যে অসাধু কর্ম্মের প্রবৃত্তি এবং বহির্ম্মুখতা বলবতী হওয়ার সম্ভাবনা আসিয়া পড়িতে পারে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। যে কয়টী বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বলা হইয়াছে—

"মায়াবাদি-ভাষ্য শুনিলে হয় সর্ব্বনাশ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৬।১৫৪॥",

ইহাকেও তাহাদের মধ্যে একটী বলিয়া মনে করা যায়।

৫৬। পারমার্থিক সত্য, ব্যবহারিক সত্য ও অবিদ্যা—বৌদ্ধদর্শন-সম্মত

শ্রীপাদ শঙ্কর সত্যের কোনও বিভাগ স্বীকার করেন না ; তথাপি ব্যবহার-সিদ্ধির জন্য তিনি দুই রকমের সত্য মানিয়া লইয়াছেন—পারমার্থিক সত্য এবং ব্যবহারিক সত্য।

যাহার বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তাহাই **পারমার্থিক সত্য**। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে একমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই হইতেছেন পারমার্থিক সত্য।

আর, যাহার বাস্তবিক অস্তিত্ব নাই, অথচ যাহার অস্তিত্ব আছে বলিয়া ভ্রান্তিবশতঃ ধারণা জন্মে, তাহা হইতেছে **ব্যবহারিক সত্য**। তাঁহার মতে এই দৃশ্যমান জগৎ এবং জগতিস্থ পদার্থসমূহ সমস্তই হইতেছে ব্যবহারিক সত্য, অর্থাৎ ব্যবহারিক ভাবে সত্য, বস্তুতঃ সত্য বা অস্তিত্ববিশিষ্ট নহে।

তিনি আর এক রকম সত্যের কথাও বলেন—**প্রাতিভাসিক সত্য।** ব্যবহারিক সত্যবস্তুকে পারমার্থিক সত্য মনে করিয়া তাহাতে যে আবার ভ্রান্তিবশতঃ অপর অসত্য বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে করা, তাহাই হইতেছে প্রতিভাসিক সত্য। যেমন, শুক্তি ও রজত উভয়েই ব্যবহারিক সত্য বস্তু। ভ্রান্তি বশতঃ শুক্তিতে—শুক্তি-স্থলে—যে রজতের অস্তিত্বের জ্ঞান, সেই অস্তিত্ব হইতেছে প্রতিভাসিক সত্য। বস্তুতঃ ব্যবহারিক সত্য যেমন পারমার্থিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত, তদ্রূপ প্রতিভাসিক সত্যও ব্যবহারিক সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত। সত্যের মুখ্য বিভাগ হইল—পারমার্থিক সত্য এবং ব্যবহারিক সত্য।

বেদান্ত-শাস্ত্রে বা বেদান্তনুগত শাস্ত্রে কিন্তু সত্যের এজাতীয় বিভাগের কথা দৃষ্ট হয় না। কোনও স্থলেই "ব্যবহারিক সত্য" বা "প্রাতিভাসিক সত্য"—এইরূপ কোনও শব্দও দৃষ্ট হয় না, তদনুরূপ তাৎপর্য্যব্যঞ্জক কোনও বাক্যও দৃষ্ট হয় না। বরং বৌদ্ধশাস্ত্রেই দেখা যায়—সত্যের দুইটী ভেদ আছে। যথা—

"দ্বে সত্যে সমুপাশ্রিত্য বুদ্ধানাং ধর্ম্মদেশনা। লোকসংবৃতিসত্যং চ সত্যং চ পরমার্থতঃ॥
যে চানয়োর্ন জানন্তি বিভাগং সত্যয়ো র্দ্বয়ম্। তে তত্ত্বং ন বিজানন্তি গম্ভীর বুদ্ধশাসনে॥
সংবৃতিশ্চ দ্বেধা তথ্যসংবৃতি র্মিথ্যাসংবৃতিশ্চেতি। —বোধিচর্য্যাবতার পঞ্জিকা॥"

বৌদ্ধ শাস্ত্রে আরও বলা হইয়াছে—

"ন চোৎপাদ্যং ন চোৎপন্নঃ প্রত্যয়েঽপি ন কেচন।
সংবিদ্যন্তে কচিৎ কেচিৎ ব্যবহারস্তু কথ্যতে॥"

এ-স্থলে দুই রকম সত্যের কথা পাওয়া গেল—লোকসংবৃতিসত্য এবং পারমার্থিক সত্য। লোকসংবৃতি-সত্যই হইতেছে "ব্যবহারিক সত্য"—লোকের ভ্রান্ত জ্ঞানে যাহা সত্য। এই লোকসংবৃতি-সত্য বা ব্যবহারিক সত্য যে বাস্তবিক মিথ্যাই, তাহাও উল্লিখিত বাক্য হইতে জানা গেল। শ্রীপাদ শঙ্করের "ব্যবহারিক সত্য"ও বাস্তবিক "মিথ্যা।"

এইরূপে দেখা গেল—পারমার্থিক সত্য এবং ব্যবহারিক সত্য, এই দুইটী পারিভাষিক শব্দ

শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধদর্শন হইতেই গ্রহণ করিয়াছেন এবং বৌদ্ধদর্শনে এই দুইটী শব্দের যে তাৎপর্য্য, শ্রীপাদ শঙ্করও ঠিক সেই তাৎপর্য্যেই এই দুইটী শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বৌদ্ধমতেও জগৎ মিথ্যা, শ্রীপাদ শঙ্করের মতেও জগৎ মিথ্যা। বৌদ্ধমতে শূন্য হইতেছে পারমার্থিক সত্য, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন পারমার্থিক সত্য। শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধদের "শূন্য"-স্থলে "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" বসাইয়াছেন —এইটুকুমাত্র বিশেষত্ব।*

জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব প্রদর্শনের জন্য শ্রীপাদ শঙ্কর যে সমস্ত উদাহরণের—শুক্তি-রজতের উদাহরণ, রজ্জু-সর্পের উদাহরণ, মৃগতৃষ্ণিকার উদাহরণ, স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুর উদাহরণ, কি গন্ধর্ব্ব-নগরের উদাহরণ-ইত্যাদি যে সমস্ত উদাহরণের—অবতারণা করিয়াছেন, বৌদ্ধশাস্ত্রেও এই সমস্ত বা এতজ্জাতীয় উদাহরণ দৃষ্ট হয়। যথা, লঙ্কাবতার সূত্রে—

"স্বপ্নোয়মথবা মায়া নগরং গন্ধর্ব্বদর্শিতম্। তিমিরো মৃগতৃষ্ণা বা স্বপ্নো বন্ধ্যা প্রসূগ্যম্॥
অলাতচক্রধূমো বা যদহং দৃষ্টবানিহ। অথবা ধর্ম্মতা হ্যেষা ধর্ম্মাণাং চিত্তগোচরে॥
ন চ বালাববুদ্ধন্তে মোহিতা বিশ্বকল্পনৈঃ। ন দ্রষ্টা ন চ দ্রষ্টব্যং ন বাচ্যো নাপি বাচকঃ।
অন্যত্র হি বিকল্পোঽয়ং বুদ্ধধর্ম্মাকৃতিস্থিতিঃ। যে পশ্যন্তি যথা দৃষ্টং ন তে পশ্যন্তি নায়কমিতি॥"

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—অবিদ্যার প্রভাবেই মিথ্যা জগৎ-প্রপঞ্চকে সত্য বলিয়া মনে হয়, জীবের ক্ষুধা-তৃষ্ণার উদয় হয়, জন্মের পর মৃত্যু, মৃত্যুর পর আবার জন্ম-ইত্যাদি চক্রাকারে পুনঃ পুনঃ চলিতে থাকে। ক্ষুধা-তৃষ্ণা, জন্ম-মৃত্যু প্রভৃতিও বস্তুতঃ মিথ্যা; অবিদ্যার প্রভাবেই এ-সমস্তও সত্য বলিয়া মনে হয়। যে-পর্য্যন্ত তত্ত্ব-জ্ঞানের উদয় না হয়, সেই পর্য্যন্তই এই ব্যাপার চলিতে থাকে। শ্রীপাদ শঙ্করের এতাদৃশী প্রভাব-সম্পন্না অবিদ্যাও বৌদ্ধদর্শনে দেখিতে পাওয়া যায়। লব্ধ-প্রতিষ্ঠ দর্শনাচার্য্য ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন—

"The central doctrine of Budhism is based upon the causal theory involving the formula 'this happening, that happens', which proceeds in a cyclic order in a sort of 'chain-reaction', such that from a group or conglomeration of a

---

* সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত মহাশয় লিখিয়াছেন:—

Taking the Sunyavada theory of Nagarjuna and Candra Kirti, we see that they also introduced the distinction between limited truth and absolute truth. Thus Nagarjuna says in his *Madhyamika Sutras* (মাধ্যমিক সূত্র) that the Buddhas preach their philosophy on the basis of two kinds of truth, truth as veiled by ignorance and depending on common-sense presuppositions and judgments *Samvriti-Satya* (সম্বৃতি-সত্য) and truth as unqualified and ultimate *Paramartha-Satya* (পরমার্থ-সত্য)—A History of Indian Philosophy, by Dr. Surendra Nath Das Gupta, M.A., Ph.D., Vol. II, Cambridge University Press, 1932, P. 3. (ইংরাজী অক্ষরে লিখিত নামগুলি আমাদের দ্বারা বঙ্গাক্ষরে লিখিত হইল)।

momentary nature other conglomerations proceed (*ad infinitum*). The start is made from the idea of ignorance (*avidya*), which consists in the imputation of the reality and permanence to unreal and momentary entities. From this proceed greed, action, birth and rebirth, and so on until the ultimate ignorance and greed are destroyed by knowledge (*bodhi*). Since all things are impermanent, there cannot be any permanent soul or God.—Introduction to "The Cultural Heritage of India", volume III, edited by Prof. Haridas Bhattacharya. M.A. B.L. Darsanasagara, Page. 10"

ইহা হইতে জানা গেল—জীবের মিথ্যাত্ব এবং ঈশ্বরের মিথ্যাত্বও বৌদ্ধদর্শনেরই অভিমত। শ্রীপাদ শঙ্করও এই অভিমতই গ্রহণ করিয়াছেন। এ-সমস্ত শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত নয়।

৫৭। আলোচনার সার মর্ম্ম। বিবর্ত্তবাদ বা জগতের মিথ্যাত্ব শাস্ত্রবিরুদ্ধ। পরিণামবাদ এবং জগতের সত্যত্ব শ্রুতিসিদ্ধ

শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদ-সমূহে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা গেল, বিবর্ত্তবাদ শ্রুতিসম্মত নহে এবং যুক্তিসঙ্গতও নহে। যদি যুক্তিসঙ্গত হইতও, তাহা হইলেও তাহা প্রামাণ্য সিদ্ধান্তরূপে স্বীকৃত হইত না। কেননা, তত্ত্ব-নির্ণয়ে কেবল যুক্তির মূল্য বেশী কিছু নাই। একজন যুক্তিদ্বারা যাহা সিদ্ধ করেন, প্রবলতর যুক্তিপ্রয়োগে অপর জন তাহা খণ্ডিত করিতে পারেন; আবার, তাঁহার সিদ্ধান্তও অপর কেহ হয়তো খণ্ডন করিতে পারেন। তর্কস্থলে যদি স্বীকারও করা যায় যে, শ্রীপাদ শঙ্করের যুক্তি অকাট্য, তথাপিও তাঁহার অকাট্য-যুক্তিপ্রসূত সিদ্ধান্ত গৃহীত হইতে পারে না। কেন না, তাহা শ্রুতিসম্মত নহে। যে যুক্তি শ্রুতি-কথিত তথ্যকে পরিস্ফুট করিতে পারে, কেবল সেই যুক্তিই আদরণীয় হইতে পারে; অন্য যুক্তি আদরণীয় হইতে পারে না। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।" ব্রহ্ম এবং ব্রহ্ম-বিষয়ক ব্যাপার একমাত্র শ্রুতিবেদ্য। এ-বিষয়ে, যে তর্ক শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহার কোনও মূল্য থাকিতে পারে না।

"অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেন যোজয়েৎ।
প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"

ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

যদি বলা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করও তো শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তিনি শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে; কিন্তু শ্রুতির সহজ স্বাভাবিক এবং মুখ্য অর্থ

গ্রহণ করেন নাই। কোনও স্থলে গৌণ অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন, কোনও স্থলে নিজের সুবিধার জন্য শ্রুতিবাক্যবহির্ভূত কোনও কোনও শব্দের অধ্যাহার করিয়াছেন, কোনও কোনও স্থলে বা শ্রুতি-বাক্যস্থিত কোনও কোনও শব্দের পরিত্যাগ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—তিনি শ্রুতির আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, বরং শ্রুতিকেই তাঁহার আনুগত্য স্বীকার করাইতে চেষ্টা করিয়াছেন। আবার, যে শ্রুতিবাক্যটীর উপরে তিনি তাঁহার বিবর্ত্তবাদ বা জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টা করিয়াছেন, সেই "বাচারম্ভণং বিকারো নামধেয়ং মৃত্তিকেত্যেব সত্যম্"-শ্রুতিবাক্যের ব্যাখ্যা-কালে শব্দের অধ্যাহার এবং প্রত্যাহার করিয়াও যখন তাঁহার অভিপ্রেত অর্থ নিষ্কাশিত করিতে পারেন নাই, তখন ঐ শ্রুতিবাক্যের আশ্রয়ে অবস্থান করিয়াই তিনি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যবহির্ভূত স্বীয় অভিপ্রেত কথা প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং তিনি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া থাকিলেও তাঁহার সিদ্ধান্তকে শ্রুতিসম্মত বলা সঙ্গত হইবে না।

একটী জাজ্বল্যমান সত্য এই যে—ব্রহ্ম ও জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে সম্বন্ধ-প্রদর্শনের ব্যাপারে শ্রুতিতে ঊর্ণনাভি ও তাহার তন্তু, মৃত্তিকা ও মৃণ্ময় দ্রব্য, স্বর্ণ ও স্বর্ণনির্ম্মিত অলঙ্কার, লৌহ ও লৌহ-নির্ম্মিত দ্রব্যের দৃষ্টান্ত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু কোনও স্থলেই শুক্তি-রজতের, বা রজ্জু-সর্পের, কিম্বা মৃগতৃষ্ণিকার দৃষ্টান্ত উল্লিখিত হয় নাই। ইহার তাৎপর্য্য কি ? ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শুক্তি-রজতের বা রজ্জু-সর্পের পরস্পরের সহিত যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম ও জগৎ-প্রপঞ্চের মধ্যে তদ্রূপ সম্বন্ধ নহে। যদি তদ্রূপ সম্বন্ধই শ্রুতির অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে রজ্জু-সর্পাদির দৃষ্টান্তই উল্লিখিত হইত ; মৃত্তিকা-মৃদ্বিকারাদির দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত হইত না।

কোনও স্থলে যদি একটী মৃণ্ময় ঘট বিদ্যমান থাকে, যে কোনও লোক যে কোনও সময়েই তাহা দেখিতে পায় এবং মৃণ্ময় ঘটরূপেই দেখিতে পায় ; অন্য কোনওরূপে, এমন কি মৃৎপিণ্ডরূপেও, দেখিতে পায় না। ঘট দেখিয়া ইহাও বুঝিতে পারে যে, ইহা মৃণ্ময়। এই ঘটটী যে মিথ্যা,—ইহা কখনও কাহারও মনে হয় না। ঘটটী যদি সেই স্থানে দীর্ঘকাল থাকে, তাহা হইলে পরবর্ত্তী কোনও সময়েও পূর্ব্ব-দ্রষ্টা যে কেহ আসিলে সেই ঘটটীকে পূর্ব্ববৎ ঘটরূপেই এবং মৃণ্ময় বস্তুরূপেই দেখিতে পাইবে। ইহাতেই ঘটের সত্যত্ব প্রমাণিত হইতেছে। কিন্তু শুক্তি-রজতের ব্যাপারে এইরূপ হয় না। শুক্তি-স্থলে সকলেই যে রজত দেখে, তাহা নয় ; অনেকে শুক্তিই দেখে, রজত দেখে না। কেহ কেহ কোনও কোনও সময়ে শুক্তি না দেখিয়া তৎস্থলে রজত দেখে এবং উহা যে শুক্তিময়, তাহাও বুঝিতে পারে না। যে ব্যক্তি একবার কোনও সময়ে শুক্তি-স্থলে রজত দেখে, সেও হয়তো অন্য সময়ে সে-স্থলে শুক্তিই দেখে, কিন্তু রজত দেখে না। তখন বুঝিতে পারে—যে রজত পূর্ব্বে সে দেখিয়াছিল, তাহা মিথ্যা। ইহাতেই বুঝা যায়—শুক্তি-রজতের দৃষ্টান্তে রজত মিথ্যা। কিন্তু মৃৎপিণ্ড ও মৃণ্ময় ঘটের দৃষ্টান্তে অন্যরূপ ব্যাপার। যখন ঘট দৃষ্ট হয়, তখন মৃৎপিণ্ড নিকটে থাকিলে, ঘট ও মৃৎপিণ্ড উভয়ই দৃষ্ট হয় এবং ইহা বুঝা যায় যে—উপাদানাংশে ঘট ও মৃৎপিণ্ড অভিন্ন। এইরূপে মৃৎপিণ্ডের দৃষ্টান্তে শ্রুতি

জানাইলেন—যখন ব্রহ্মজ্ঞান লাভ হইবে, তখন বুঝা যাইবে—জগৎ এবং ব্রহ্ম অভিন্ন, ব্রহ্মই জগতের উপাদান। তখন শুক্তি-রজতের রজতের ন্যায়, জগৎ অদৃশ্য হইয়া যাইবে না। তখন জগৎ ব্রহ্মাত্মক বলিয়াই মনে হইবে, ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু বলিয়া মনে হইবে না। তখনই বুঝা যাইবে—"নেহ নানাস্তি কিঞ্চন", "যত্র নান্যৎ পশ্যতি নান্যৎ শৃণোতি, নান্যৎ বিজানাতি, স ভূমা।"

স্বর্ণ ও স্বর্ণালঙ্কারের দৃষ্টান্ত এবং লৌহ ও লৌহনির্ম্মিত বস্তুর দৃষ্টান্তের তাৎপর্য্যও মৃৎপিণ্ড ও মৃণ্ময় দ্রব্যের দৃষ্টান্তের অনুরূপই।

শ্রুতি দেখাইয়াছেন—মৃণ্ময়দ্রব্য যেমন মৃত্তিকার বিকার বা পরিণাম, স্বর্ণালঙ্কার যেমন স্বর্ণের পরিণাম, লৌহনির্ম্মিত দ্রব্যাদি যেমন লৌহের পরিণাম, তদ্রূপ জগৎ-প্রপঞ্চও ব্রহ্মের পরিণাম। আবার ঊর্ণনাভি ও তাহার তন্তুর দৃষ্টান্তে শ্রুতি দেখাইয়াছেন—তন্তুজাল বিস্তার করিয়াও যেমন ঊর্ণনাভি অবিকৃত থাকে, জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও তদ্রূপ ব্রহ্ম অবিকৃত থাকেন। ব্যাসদেবও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রে তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

আবার, সূত্রকার ব্যাসদেবের সম্মত (এবং শ্রুতিসম্মতও) পরিণামবাদ স্বীকার করিলেই কার্য্য-কারণের অনন্যত্ব বা অভিন্নত্ব সিদ্ধ হইতে পারে এবং এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইতে পারে। কিন্তু বিবর্ত্তবাদে বা জগতের মিথ্যাত্বে কার্য্য-কারণের অনন্যত্বও সিদ্ধ হইতে পারে না এবং এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হইতে পারে না। পূর্ব্বেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

বিবর্ত্তবাদ অনুসারে জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব স্বীকার করিলে শ্রুতিরও মিথ্যাত্ব-প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; তাহাতে মোক্ষও যে অসম্ভব হইয়া পড়ে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু পরিণামবাদে এই সমস্ত দোষের কোনও অবকাশ থাকে না।

এইরূপে দেখা গেল—বিবর্ত্তবাদ বা জগৎ-প্রপঞ্চের মিথ্যাত্ব শাস্ত্রসম্মত নহে। পরিণামবাদ এবং জগৎ-প্রপঞ্চের সত্যত্ব বা বাস্তব অস্তিত্বই শাস্ত্রসম্মত।

যে বস্তু যাহা নহে, সেই বস্তুকে তাহা বলিয়া মনে করাই হইতেছে বিবর্ত্তের তাৎপর্য্য। দেহেতে আত্মবুদ্ধিই হইতেছে বাস্তবিক বিবর্ত্ত। দেহ জড় বিনশ্বর বস্তু; জীবাত্মা চিন্ময় নিত্য বস্তু। এ-স্থলে দেহেতে যে আত্মবুদ্ধি, ইহাই হইতেছে বিবর্ত্ত। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

"বস্তুত পরিণামবাদ—সেই ত প্রমাণ।
'দেহে আত্মবুদ্ধি'—এই বিবর্ত্তের স্থান॥ শ্রীচৈ,চ, ১।৭।১১৬॥"

৩৮। শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য ও স্থষ্টিতত্ত্ব

শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যও পরিণামবাদী। তিনি বলেন, ব্রহ্মই স্বীয় শক্তিতে জীব-জগদ্রূপে পরিণত হয়েন। ব্রহ্মের দুইটী শক্তি—ভোগ্যশক্তি এবং ভোক্তৃশক্তি। ভোগ্যশক্তিদ্বারা তিনি এই

ভোগ্য জগদ্রূপে এবং ভোক্তৃশক্তিদ্বারা ভোক্তা জীবরূপে পরিণত হয়েন ; কিন্তু এই পরিণামসত্ত্বেও ব্রহ্ম স্বীয় শুদ্ধতায় অবিকৃত থাকেন। কেননা, তাঁহার শক্তির প্রকাশে এবং পরিণামেই ভোগ্যরূপে জগতের এবং ভোক্তৃরূপে জীবের পরিণাম সাধিত হয়। সূর্য্য যেমন তাহার কিরণজালকে বিস্তার করিয়াও এবং সেই কিরণজালকে পুনরায় নিজের মধ্যে আকর্ষণ করিয়াও স্বয়ং একরূপই থাকে, তদ্রূপ। (১)

শ্রীপাদ ভাস্করের উল্লিখিতরূপ উক্তি হইতে বুঝা যায়—স্বীয় শক্তিতে ব্রহ্ম নিজেই জগদ্রূপে পরিণত হয়েন। ইহাতে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে যে, ব্রহ্ম হইতেছেন স্বরূপে অবিকারী ; তাঁহার পরিণামই বা কিরূপে সম্ভব ? এবং তাঁহারই পরিণামভূত এই জগৎই বা কিরূপে পরিবর্ত্তনশীল হইতে পারে ? ইহার উত্তরেই, সূর্য্যের দৃষ্টান্তের সহায়তায়, তিনি বলিয়াছেন—ব্রহ্মের ভোগ্যশক্তির পরিণামেই জগতের পরিণাম (বা পরিবর্ত্তন) সাধিত হয়। ইহাতে বুঝা যায়— ব্রহ্মের বিকারধর্ম্ম না থাকিলেও তাঁহার শক্তির বিকার-ধর্ম্ম আছে।

যাহা হউক, শ্রীপাদ শঙ্করের ন্যায় শ্রীপাদ ভাস্কর বিবর্ত্তবাদ বা জগতের মিথ্যাত্ব স্বীকার করেন না। শ্রীপাদ ভাস্করের মতে ব্রহ্মের পরিণাম এই জগৎও সত্য, রজ্জু-সর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের ন্যায়, কিম্বা শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তে রজতের ন্যায়, এই জগৎ মিথ্যা নহে, বাস্তব-অস্তিত্বহীন নহে ; জগতেরও বাস্তব অস্তিত্ব আছে, তবে জগতের অস্তিত্ব ব্রহ্মের অস্তিত্বের ন্যায় নিত্য নহে। ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের কারণ, আর জগৎ হইতেছে তাঁহার কার্য্য—যেমন, মৃত্তিকা হইতেছে কারণ এবং মৃণ্ময় ঘটাদি হইতেছে তাহার কার্য্য, তদ্রূপ। কার্য্য হইতেছে কারণের বিকাশের এবং পরিণামের অবস্থাবিশেষ (কারণস্যাবস্থামাত্রম্ কার্য্যম্ ॥ ২।১।১৪-ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য)। ইহা শুক্তি-রজতের ন্যায় নহে। শুক্তিরজতের দৃষ্টান্তে রজতের মিথ্যাত্ব পরে অনুভূত হয়, সকলে আবার শুক্তিস্থলে রজত দেখেও না। কিন্তু মৃত্তিকারূপ কারণের কার্য্য মৃণ্ময় ঘটাদিকে সকলে সকল সময়েই ঘটাদিরূপেই দেখে, অন্যরূপ কখনও দেখে না। ইহাতেই বুঝা যায়—মৃত্তিকারূপ কারণের কার্য্য মৃণ্ময়-ঘটাদির বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তদ্রূপ, ব্রহ্মরূপ কারণের কার্য্য এই জগতেরও বাস্তব অস্তিত্ব আছে।

---

(১) Bhaskara maintained···that it was the Brahman which, by its own powers, underwent a real modification. *A History of Indian Philosophy* by Dr. S. N. Dasgupta, 2nd impresson, P. 2.

He possesses two powers ; by one He has become the world of enjoyables (*bhogya-Sakti*), and by the other the individul souls, the enjoyers (*bhoktri*), but inspite of this modification of Himself He remains unchanged in His own purity ; for it is by the manifestation and modification of His powers that the modification of the world as the enjoyable and the enjoyer takes place. It is just as the sun sends out his rays and collects them back into himself, but yet remains in himself the same (*Bhaskara-bhasya*, II. 2. 27, also I. 4. 25). *Ibid*, P. 6.

ক। ভাস্কর-মতসম্বন্ধে আলোচনা

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের ন্যায় শ্রীপাদ ভাস্করও পরিণামবাদ স্বীকার করেন। শ্রীপাদ ভাস্করও শক্তিপরিণামবাদী বলিয়া মনে হয়, গৌড়ীয় আচার্য্যগণও শক্তিপরিণামবাদী। তথাপি কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণের মতে ব্রহ্মের মায়াশক্তির পরিণামই হইতেছে জগৎ; জড় বলিয়া মায়ার বিকার-ধর্ম্ম আছে; এজন্য ব্রহ্মের শক্তিতে এবং অধ্যক্ষতায় মায়া জগদ্রূপে পরিণত হইতে পারে এবং মায়ার পরিণাম জগতেরও পরিবর্ত্তন বা বিকার সম্ভবপর হইতে পারে। কিন্তু শ্রীপাদ ভাস্করের মতে ব্রহ্মের ভোগ্যশক্তির বিকারে বা পরিণামেই জগতের পরিণামিত্ব বা বিকারিত্ব। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীপাদ ভাস্করের মতে ব্রহ্মের ভোগ্যশক্তির বিকার-ধর্ম্ম আছে। বিকারধর্ম্মি-ভোগ্যশক্তিকে যদি বিকার-ধর্ম্মি-জড়-মায়াশক্তি বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে কোনও সমস্যার উদয় হয় না। জড়রূপা মায়ার বিকার এই জগৎও জড়; কিন্তু ভোগ্যশক্তির বিকার জগৎকে তিনি জড় বলিয়া স্বীকার করেন না; তিনি বলেন—এই জগৎ হইতেছে জড়াতীত প্রকাশ এবং জড়াতীত পরিণাম; জগৎ হইতেছে স্বরূপতঃ জড়াতীত—যদিও তাহা জড় বলিয়া কথিত হয়। শেষকালে নানাবৈচিত্র্যময় এই জগৎও জড়াতীত ব্রহ্মে মিশিয়া যাইবে, তাহার কোনও অবশেষ থাকিবে না—একটী লবণের পিণ্ড জলে মিশিয়া গেলে যেমন হয়, তদ্রূপ। (২)

এক্ষণে সমস্যা হইতেছে এই:—

প্রথমতঃ, বস্তু মাত্র দুই রকমের—জড় এবং জড়াতীত; যাহা জড়াতীত, তাহাকে বলা হয় চিৎ। শ্রীপাদ ভাস্করের মতে এই জগৎ হইতেছে স্বরূপতঃ জড়াতীত বা চিদ্‌বস্তু। শ্রুতি-স্মৃতিতে ইহার সমর্থন পাওয়া যায় না। কোন্ প্রমাণবলে তিনি জগৎকে স্বরূপতঃ জড়াতীত বা চিৎ বলিতেছেন, তাহা বলা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ ভাস্করের মতে জগৎ স্বরূপতঃ জড় না হইলেও জড় বলিয়া কথিত হয়। লোকের নিকটে জগৎ জড় বলিয়া প্রতীত হয় বলিয়াই লোকে জগৎকে জড় বলে। কিন্তু বাস্তবিক জড় কোনও বস্তুর অস্তিত্বই যদি না থাকে, তাহা হইলে জড়ের সংস্কারও কাহারও জন্মিতে পারে না—সুতরাং কোনও জড়াতীত বস্তুকে জড় বলিয়া প্রতীতিও জন্মিতে পারে না। শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্ত-বাদের আলোচনা-প্রসঙ্গেই তাহা বলা হইয়াছে। রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় জড়াতীতে জড়ভ্রমও বিবর্ত্তই। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—(তাঁহার কল্পিত) মায়ার প্রভাবেই এইরূপ বিবর্ত্ত জন্মে। কিন্তু

---

(২) The nature of the world is spiritual. The world is a spiritual manifestation and a spiritual transformation, and what passes as matter is in reality spiritual···The world with its diverse forms also will, in the end, return to its spiritual source, the formless Brahman, and nothing of it will be left as the remainder. The material world is dissolved in the spirit and lost therein just as a lump of salt is lost in water (Bhaskara bhasya III. 2. 24). *Ibid*, P. 10.

শ্রীপাদ ভাস্কর শঙ্করের মায়াও স্বীকার করেন না, মায়াজনিত বিবর্ত্তও স্বীকার করেন না। তাহা হইলে—জড়াতীত, বা স্বরূপতঃ চিদ্বস্তু জগতে জড়ভ্রমের হেতু কি ?

তৃতীয়তঃ, জড় বলিয়া কিছুই যখন কোথাও নাই, তখন যে ভোগ্যশক্তির দ্বারা ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হয়েন এবং যে ভোগ্যশক্তির পরিণামেই জগতের পরিণামশীলতা বা পরিবর্ত্তনশীলতা জন্মে, সেই ভোগ্যশক্তিও হইবে জড়াতীতা—চিৎ-স্বরূপা। শ্রীপাদ ভাস্করের মত স্বীকার করিলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে—চিৎ-স্বরূপা ভোগ্যশক্তিও বিকারশীলা। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত জড় বস্তুই হইতেছে বিকারধর্ম্মী, চিদ্‌বস্তু বিকারধর্ম্মী নহে, চিদ্‌বস্তুর উৎপত্তি-বিনাশ নাই। কিন্তু জগতের বিকার আছে, উৎপত্তি-বিনাশ আছে। তিনি বলেন—ভোগ্যশক্তির বিকারেই জগতের বিকার। কিন্তু চিৎবস্তু ভোগ্যশক্তির বিকার কোন্ প্রমাণবলে স্বীকৃত হইতে পারে ?

শক্তি হইতেছে শক্তিমানের গুণ। ব্রহ্মের ভোগ্যশক্তিও ব্রহ্মের গুণ। শ্রীপাদ ভাস্করের মতে গুণ-গুণি-বিভাগ নাই, অর্থাৎ ব্রহ্মের গুণ ব্রহ্মেরই স্বরূপভূত। তাহাই যদি হয়, ব্রহ্মের ভোগ্য-শক্তির বিকার স্বীকার করিলে কি ব্রহ্মেরই বিকার স্বীকার করা হয় না ?

এইরূপে দেখা যায়—শ্রীপাদ ভাস্কর পরিণামবাদ স্বীকার করিলেও পরিণামবাদের সমর্থনে তিনি যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা বিচারসহ নহে।

পরিণামবাদ শ্রুতিসম্মত, ব্যাসদেবেরও সম্মত। শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু পরিণামবাদ স্বীকার করেন না; কেননা, তিনি বলেন—এই জগৎ যে ব্রহ্মের পরিণাম, ইহা স্বীকার করিলে অবিকারী ব্রহ্মের বিকার স্বীকার করিতে হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রুতি-প্রমাণবলে দেখাইয়াছেন—পরিণামবাদে অবিকারী ব্রহ্ম বিকার প্রাপ্ত হয়েন না, ব্রহ্মের জড়রূপা বৈদিকী মায়াশক্তিই বিকার প্রাপ্ত হয়, মায়ার বিকারই জগৎ ; শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় শক্তির পরিণামকেই শক্তিমান্ ব্রহ্মের পরিণাম বলা হয়। জড়বস্তু বলিয়া বৈদিকী মায়ার বিকার-ধর্ম্ম আছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের এই সিদ্ধান্তে শ্রীপাদ শঙ্করের আপত্তিরও অবকাশ থাকে না। শ্রীপাদ ভাস্কর যে ভোগ্যশক্তির কথা বলিয়াছেন, তাহাও বাস্তবিক বৈদিকী মায়াশক্তিই। কেননা, জড়রূপা মায়াই হইতেছে সংসারী জীবের ভোগ্যা। সংসারী জীব মায়িক বস্তুর ভোগই করিয়া থাকে। বৈদিকী মায়াব্যতীত সংসারী জীবের পক্ষে ভোগ্যা অপর কোনও শক্তির উল্লেখও শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং শ্রীপাদ ভাস্কর যদি ব্রহ্মের ভোগ্যা-শক্তিকে বৈদিকী মায়া বলিয়া স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে কোনও সমস্যাই দেখা দিত না। কিন্তু তিনি তাহা স্বীকার করেন না।

চতুর্থ অধ্যায়
প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত

৫৯। শ্রীপাদ শঙ্কর ও বৌদ্ধমত

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় প্রদর্শিত হইয়াছে যে—ব্রহ্মতত্ত্ব, জীবতত্ত্ব, সৃষ্টিতত্ত্বাদি সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমত শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত নহে—সুতরাং অবৈদিক। তাঁহার অভিমত যে মৌলিক, তাহাও বলা যায় না; কেননা, বৌদ্ধমতের সহিত তুলনা করিয়া আলোচনা করিলে দেখা যায়, শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এবং বৌদ্ধমতে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। বস্তুতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের অনুবর্ত্তিগণব্যতীত, প্রাচীন এবং আধুনিক প্রায় সকল আচার্য্যই, কেহ বা প্রত্যক্ষভাবে এবং কেহ বা পরোক্ষভাবে, শঙ্করের মতকে বৌদ্ধমত বা প্রচ্ছন্ন (শ্রুতির আবরণে আচ্ছাদিত) বৌদ্ধমত বলিয়া গিয়াছেন। পদ্মপুরাণও বলিয়াছেন—"মায়াবাদমসচ্ছাস্ত্রং প্রচ্ছন্নবৌদ্ধমুচ্যতে। ময়ৈব বিহিতং দেবি কলৌ ব্রাহ্মণমূর্ত্তিনা॥ (মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিয়াছেন) হে দেবি! মায়াবাদরূপ অসৎ-শাস্ত্রকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত বলা হয়। কলিতে ব্রাহ্মণরূপ ধারণ করিয়া আমিই তাহা প্রচার করিয়াছি।"

বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সর্ব্বপল্লী রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—"শঙ্কর-প্রচারিত মত বৌদ্ধ মাধ্যমিক মতবাদের দ্বারা বিশেষভাবে প্রভাবান্বিত হইয়াছে। শঙ্করের 'ব্যবহারিক' এবং 'পারমার্থিক' এই দুই রকমের ভেদও মাধ্যমিকদের 'সম্বৃতি' এবং 'পরমার্থের' তুল্যই। শঙ্করের 'নির্গুণ ব্রহ্ম' এবং নাগার্জ্জুনের 'শূন্য'-এই দুইয়ের মধ্যেও বিশেষ সাম্য বিদ্যমান। নাগার্জ্জুনের 'নেতি-বাদই' শঙ্করের অদ্বৈতবাদের ভূমিকা প্রস্তুত করিয়াছে।" (১)

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ আরও বলেন—"প্রাচীন বৌদ্ধগণ মনে করিতেন, এই দৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে কিছুই নাই; কিন্তু শঙ্কর মনে করেন, সমস্তের পশ্চাতে একটা সত্য অবশ্যই আছে। তথাপি কিন্তু শঙ্করকল্পিত 'মোক্ষের' সহিত বৌদ্ধদের 'নির্ব্বাণের' পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই। শঙ্কর বলেন—'আমি ব্রহ্ম', আর মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলেন—'আমি শূন্য।' পার্থক্য হইতেছে কেবল একই

---

(১) We need not say that the Advaita Vedanta philosophy has been very much influenced by the Madhyamika doctrine·········The Advaitic distinction of vyavahara, or experience, and paramartha, or reality, correspond to the Samvrti and paramartha of the Madhyamikas. The Nirguna Brahman of Sankara and Nagarjuna's Sunya have much in common·········By his negative logic, whieh reduces experiences to a phenomenon, he prepares the ground for the Advaita Philosophy.—*Indian Philosophy*, by S. Radhakrishnan, Vol. I. P. 668.

বস্তুর ভিন্নভিন্ন ভাবে। প্রাচীন বৌদ্ধমতের মধ্যে যদি এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সত্যতা বসান যায়, তাহা হইলেই শঙ্করের অদ্বৈত-বেদান্ত পাওয়া যায়। (২)

অন্যতম বিশ্ববিখ্যাত দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্তও বলেন—"শঙ্করের ব্রহ্ম হইতেছে অনেকটা নাগার্জ্জুনের শূন্যের মতন।" (৩)

ডক্টর দাসগুপ্ত আরও বলিয়াছেন—"বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদের নিকটে শঙ্করের ঋণ সম্বন্ধে যাহাই বলা যাউক না কেন, তাহা অতিশয়োক্তি হইবে না। বিজ্ঞানভিক্ষু এবং অন্যান্যেরা যে শঙ্করকে প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলিয়াছেন, তাহার মধ্যে অনেকটা সত্য আছে বলিয়াই মনে হয়। শঙ্করের দর্শন হইতেছে অনেকটা বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদ এবং শূন্যবাদের মিশ্রণ; তাহার মধ্যে শঙ্কর কেবল উপনিষদুক্ত আত্মার নিত্যতা সংযোজিত করিয়াছেন।" (৪)

শ্রীপাদ শঙ্করকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের প্রারম্ভে লিখিয়াছেন—ব্রহ্মসূত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য গোপন করিয়া যাঁহারা কেবল নিজেদের অভিমতই প্রকাশ করিয়াছেন, তাঁহাদের মতের খণ্ডনই হইতেছে তাঁহার উদ্দেশ্য। (৫) অন্যত্র তিনি মায়াবাদীকে পরিষ্কার ভাবেই বৌদ্ধমতাবলম্বী বলিয়া গিয়াছেন। (৬) শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদসম্বন্ধে অন্যত্রও

---

(২) Some of the early Buddhists even went to the length of saying that there was nothing behind appearances, not only nothing for us but nothing at all. Sankara, as a Hindu, claims that, beyond the unsatisfactoriness of its phenomena, in its deepest depths, there is the real spirit which embodies all values. Yet Sankara's conception of moksa (freedom) is not much different from the Buddhist view of nirvana [Foot note : বাসনাত্যন্তবিরামঃ। The realisation of the identily of thc individual soul with Brahman (সোহহং or অহং ব্রহ্মাস্মি) answers to the "I am nullity—শূন্যৈবাহম্" of the Madhyamikas, though the emphasis is on the different aspects of the one fact). If we introduce the reality of an absolute Brahman into early Buddhism, we find Advaita Vedanta again.—*Indian Philosophy*, by S. Radhakrishnan, Vol. II. P. 473.

(৩) His (Sankara's) Brahman was very much like the Sunya of Nagarjuna,—*A History of Indian Philosophy*, by S. N. Dasgupta, Vol. I. P. 493.

(৪) The debts of Sankara to the self-luminosity of the Vijnanavada Buddhism can hardly be overestimated. There seems to be much truth in the accusations against Sankara by Vijnana Bhiksu and others that he was a hidden Buddhist himself. I am led to think that Sankara's philosophy is largely a compound of Vijnanavada and Sunyavada Buddhism with the Upanisad notion of the permanence of self superadded.—*Ibid*. PP. 493-94.

(৫) সূত্রাভিপ্রায়সম্বৃত্যা স্বাভিপ্রায়প্রকাশনাৎ। ব্যাখ্যাতং যৈরিদং শাস্ত্রং ব্যাখ্যেয়ং তন্নিবৃত্তয়ে॥

(৬) যে তু বৌদ্ধমতাবলম্বিনো মায়াবাদিন স্তেঽপি অনেন ন্যায়েন সূত্রকারেণৈব নিরস্তাঃ॥ ২।২।২৯-ব্রহ্মসূত্রের ভাস্কর-ভাষ্য।

শ্রীপাদ ভাস্কর বলিয়াছেন—ইহা হইতেছে মহাযানিক বৌদ্ধদের মত, ছিন্নমূল (অর্থাৎ মূলসূত্রের সহিত ইহার কোনও সম্বন্ধ নাই) ; মায়াবাদ প্রচার করিয়া মায়াবাদীরা লোকদিগকে বিভ্রান্ত করিতেছেন। (৭)

শ্রীপাদ শঙ্কর অনেকস্থলে কোনও কোনও বৌদ্ধমতের তীব্র সমালোচনা করিয়াছেন বটে ; কিন্তু ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—তিনি তৎকালে-প্রচলিত বৌদ্ধমতেরই সমালোচনা করিয়াছেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের উপদেশের সমালোচনা করেন নাই। (৮)

অনেকে মনে করেন, শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধধর্ম্মের উচ্ছেদ সাধন করিয়াছেন। কিন্তু ডক্টর দাসগুপ্ত বলেন—শঙ্কর স্বীয় দার্শনিক যুক্তি দ্বারা বৌদ্ধমতকে বিধ্বস্ত করিয়াছেন মনে করিলে ভুল করা হইবে। তিনি যে ভাবে স্বীয় মতবাদের দার্শনিকতা প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাতে বরং কোনও কোনও স্থলে তিনি নিজেই যে বৌদ্ধযুক্তি দ্বারা প্রভাবান্বিত হইয়াছেন, তাহাই মনে হয়। (৯)

ডক্টর দাসগুপ্ত আরও বলিয়াছেন—শঙ্করাচার্য্য যে দৃষ্টিভঙ্গী অবলম্বন করিয়াছেন, তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী বৌদ্ধাচার্য্য অসঙ্গ এবং বসুবন্ধু (বিশেষতঃ বসুবন্ধু তাঁহার বিজ্ঞপ্তিমাত্রতাসিদ্ধি-নামক গ্রন্থে) পূর্ব্বেই তাহা ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। উভয়ের দার্শনিক মতবাদের পার্থক্য প্রায় অকিঞ্চিৎকর। ইহাতেই বুঝা যায়, শঙ্কর-বিরোধীরা তাঁহাকে কেন প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধ বলেন। শঙ্কর বৌদ্ধাচার্য্য বিজ্ঞানবাদী দিঙ্‌নাগের মতবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করিয়াছেন ; কিন্তু বসুবন্ধুর মতবাদ খণ্ডন করার চেষ্টা করেন নাই। (১০)

---

(৭) বিগীতং বিচ্ছিন্নমূলং মহাযানিকবৌদ্ধগাথিতং মায়াবাদং ব্যাবর্ণয়ন্তো লোকান্ ব্যামোহয়ন্তি॥ ১৷৪৷২৫-সূত্রের ভাস্কর-ভাষ্য।

(৮) Sankara had a firm grasp of the real significance as well as the limitations of Buddhist thought, and if at times we are tempted to quarrel with his treatment of the Buddhist schools, we must remember that he wrote in reply to the prevalent views of Buddhism and not the teachings of Buddha,—*Indian Philosophy*, by S. Radhakrishnan, Vol II, P. 673.

(৯) It will be wrong to say that he (Sankara) routed the Buddhists by his philosophical arguments. Rather the philosophical enunciation of his views sometimes seems to show that he was himself influnced by some of the Buddhist arguments—*The Cultural Heritage of India*, 2nd edition, Introduction, P. 6

ডক্‌টর দাসগুপ্ত অন্যত্র লিখিয়াছেন—Sankara and his followers borrowed much of their dialectic form of criticism from the Buddhists.—*A History of Indian Philosophy*, vol.I, P. 493.

(১০) The view point of Sankaracarya is anticipated by Asanga and Vasubadhu (fourth or fifth century), particularly in the latter's work *Vijnaptimatrata Siddhi*. The philosophical difference between the two view points is almost negligible. This explains why the opponents of Sankaracarya called him a crypto Buddhist.

In Buddhism he tried to refute the idealism of Dinnaga but not the view of Vasubandhu—*The Cultural Heritage of Indta*, 2nd edition, Introduction, P. 7.

যাহা হউক, উল্লিখিত উক্তিগুলির যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতে হইলে বৌদ্ধমত-সম্বন্ধে অন্ততঃ সাধারণভাবে কিছু জানা দরকার। এজন্য এ-স্থলে বৌদ্ধ সিদ্ধান্তগুলি সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে।

৬০। প্রাচীন বৌদ্ধমত

খৃষ্টপূর্ব্ব ষষ্ঠ শতাব্দীতে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবর্ত্তক বুদ্ধদেব আবির্ভূত হইয়া তাঁহার মতবাদ প্রচার করেন। তিনি নিজে কোনও গ্রন্থ লিখিয়া যায়েন নাই। তাঁহার অন্তর্দ্ধানের অনেক পরে তাঁহার অনুবর্ত্তিগণ তাঁহার উপদেশগুলি গ্রন্থাকারে সঙ্কলিত করেন।

প্রাচীন বৌদ্ধসাহিত্য পালিভাষায় লিখিত এবং তিন রকমের—সুত্ত (সূত্র), বিনয় এবং অভিধম্ম (অভিধর্ম্ম)। সুত্তভাগে বৌদ্ধনীতি, বিনয়ভাগে বৌদ্ধসন্ন্যাসীদের আচরণাদির কথা এবং অভিধম্ম-ভাগে সুত্তভাগের নীতিগুলিই বিশেষভাবে বিবৃত হইয়াছে।

সুত্তে পাঁচ রকমের সংগ্রহ আছে; সংগ্রহগুলিকে "নিকায়" বলা হয়। পাঁচ রকমের নিকায় হইতেছে—দীঘ (দীর্ঘ) নিকায়, মজ্ঝিম (মধ্যম) নিকায়, সংযুত্ত নিকায়, অঙ্গুত্তর নিকায় এবং খদ্দক নিকায়। অভিধম্মেও পথান, ধম্মসঙ্গনি প্রভৃতি কয়েকটী বিষয় আছে।

উল্লিখিত বৌদ্ধসাহিত্যে যে সমস্ত নীতি, তত্ত্ব এবং মত অভিব্যক্ত হইয়াছে, তাহাকে সাধারণতঃ স্থবিরবাদ বা থেরাবাদ (স্থবিরদের, বা বৃদ্ধদের কথিত বাদ) বলা হয়।

বৌদ্ধাচার্য্য বুদ্ধঘোষ (৪০০ খৃষ্টাব্দ) থেরাবাদ সম্বন্ধে "বিশুদ্ধিমাগ্‌গ"-নামক গ্রন্থ এবং দীঘনিকায়াদির টীকাও লিখিয়াছেন।

ক। পরিদৃশ্যমান জগৎ—

প্রাচীন বৌদ্ধমতে পরিদৃশ্যমান জগতের তত্ত্ব কি, নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা জানা যাইবে।

প্রাচীন বৌদ্ধমতে "পতীচ্চসমুপ্‌পাদ"-নামে একটী মতবাদ আছে; ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—কোনও একটী পদার্থের উৎপত্তি অন্য একটী পদার্থের উপর নির্ভর করে।

বুদ্ধদেব বলেন—জীবের "জরামৃত্যু" তাহার "জাতির (অর্থাৎ জন্মের)" উপর নির্ভর করে; জন্ম নির্ভর করে "ভাবের (পুনর্জন্মজনক কর্ম্মের) উপরে, ভাব নির্ভর করে "উপাদানের (অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির জন্য যে বস্তুর প্রয়োজন, সেই বস্তুর জন্য প্রার্থনার)" উপরে, উপাদান নির্ভর করে "তৃষ্ণার" উপরে, তৃষ্ণা নির্ভর করে,"বেদনার (বেদনের, অনুভবের)" উপরে, বেদনা নির্ভর করে "স্পর্শের (ইন্দ্রিয়-সংযোগের)" উপরে, স্পর্শ নির্ভর করে "আয়তনের (ছয় ইন্দ্রিয়ের এবং তাহাদের ভোগ্যবস্তুর)" উপরে, আয়তন নির্ভর করে "নাম-রূপের (দেহ-মনের)" উপরে, নাম-রূপ নির্ভর করে

"বিজ্ঞানের" উপরে, ; বিজ্ঞান নির্ভর করে "সংস্কারের (রাগ-দ্বেষ-মোহের)" উপরে এবং সংস্কার নির্ভর করে "অবিদ্যার (অজ্ঞানের)" উপরে। অবিদ্যা নিবৃত্ত হইলে সংস্কার নিবৃত্ত হইতে পারে এবং এই ক্রমে জরামৃত্যু নিরাকৃত হইতে পারে। (১)

উল্লিখিত কার্য্যকারণ-শৃঙ্খলে "জরামৃত্যু" হইতে আরম্ভ করিয়া "অবিদ্যা" পর্য্যন্ত দ্বাদশটী পদার্থের কথা জানা গেল।

প্রাচীন বৌদ্ধমতে চারিটী দ্রব্য স্বীকৃত—ক্ষিতি, অপ্, তেজ ও মরুৎ। ইহাদিগকে "মহাভূত" বলে।

এই মতে পাঁচটী স্কন্ধও স্বীকৃত হয়—রূপস্কন্ধ, বেদনাস্কন্ধ, সংজ্ঞাস্কন্ধ, সংস্কার স্কন্ধ এবং বিজ্ঞান স্কন্ধ। স্কন্ধ-শব্দে সমষ্টি বুঝায়।

রূপস্কন্ধ হইতেছে—ক্ষিতি, অপ্, তেজঃ, মরুৎ, এই চারিটী মহাভূত, দেহ এবং ইন্দ্রিয়, ইন্দ্রিয়ের ব্যাপার প্রভৃতি। ইন্দ্রিয়ের বৃত্তি এবং ইন্দ্রিয়জনিত অনুভূতি বা বিজ্ঞপ্তিও ইহার অন্তর্ভুক্ত। "রূপ"-সম্বন্ধে বুদ্ধদেব বলিয়াছেন, ইহা নিজেকে প্রকাশ করে বলিয়া—শীতল-উষ্ণ, ক্ষুধাতৃষ্ণা, মশা-মাছি প্রভৃতির স্পর্শ, বাতাস, সূর্য্য, সর্প ইত্যাদিরূপে নিজেকে প্রকাশ করে বলিয়া—ইহাকে "রূপ" বলা হয়।

বেদনা স্কন্ধ হইতেছে—অনুভূতি ; সুখ, দুঃখ, ঔদাসীন্য-এইরূপ অনুভূতি।

সংজ্ঞা স্কন্ধ হইতেছে—এক রকমের জ্ঞান। ইন্দ্রিয় যে ধারণা জন্মায়, সেই ধারণা সম্বন্ধে চিন্তা এবং সেই ধারণা কি, নামের দ্বারা তাহা জানিবার সামর্থ্য।

সংস্কার স্কন্ধ হইতেছে—সংস্কার ; মানসিক অবস্থাবিশেষ।

বিজ্ঞান স্কন্ধ হইতেছে—জ্ঞান, চিত্ত। (২)

এইরূপে দেখা গেল—যাহা আমাদের অব্যবহিত, এতাদৃশ কায়িক এবং মানসিক অবস্থা-সমূহের সমবায় হইতেছে পঞ্চস্কন্ধ। (৩)

এই জগৎ নিত্য, কি অনিত্য-এসম্বন্ধে প্রাচীন বৌদ্ধমতে কোনও কথা পাওয়া যায় না। এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্থাপন বরং ধর্ম্মবিরোধী বলিয়াই বিবেচিত হইত। (৪)

খ। জীবতত্ত্ব

বুদ্ধদেব বলিতেন—আত্মা (বা জীবাত্মা) বলিয়া কিছু নাই। যাহাকে লোকে জীবাত্মা মনে করে, বস্তুতঃ তাহা হইতেছে পাঁচটী স্কন্ধের সমষ্টি, অথবা তাহাদের কোনও একটী মাত্র (৫),

---

(১) A History of Indian Philosophy by S. N. Dasgupta, Vol. I, Third impression, Pp-84-86.

(২) *Ibid* Pp.—93-95. (৩) *Ibid* P. 93. (৪) *Ibid* P. 166.

(৫) We have seen that Buddha said that there was no atman (soul). He said that when people held that they found the much spoken of soul, they really only found the five Khandas together or any one of them. *Ibid* P. 93.

তাহাদের মানসিক অভিজ্ঞতা—সমষ্টিগত ভাবে বা ব্যষ্টিগত ভাবে। (৬) বৌদ্ধমতে জীবাত্মার নিত্যত্ব বা অপরিবর্ত্তনীয়ত্ব হইতেছে মিথ্যাজ্ঞানের বা অজ্ঞানের ফল, মোহমাত্র। (৭)

গ। পরতত্ত্ব

বৌদ্ধমতে ব্রহ্ম বা নিত্যসত্য বা পরতত্ত্ব কিছু নাই। (৮)

ঘ। দুঃখ

বুদ্ধদেবের মতে কোথাও স্থায়ী কিছু নাই; সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তন এবং অস্থায়িত্বই দুঃখ।

অবিদ্যা বা অজ্ঞানবশতঃই লোকে অস্থায়ী বস্তুকে স্থায়ী বলিয়া মনে করে। এই অবিদ্যা বা অজ্ঞান চারি রকমের—দুঃখ সম্বন্ধে অজ্ঞান, কিরূপে দুঃখের উৎপত্তি হয়, সে-সম্বন্ধে অজ্ঞান, দুঃখধ্বংসের স্বরূপ-সম্বন্ধে অজ্ঞান এবং দুঃখ-নিবৃত্তির উপায় সম্বন্ধে অজ্ঞান।

শ্রুতিতেও অবিদ্যার উল্লেখ আছে; কিন্তু শ্রুতির অবিদ্যা ও বৌদ্ধদের অবিদ্যা এক জিনিস নহে। শ্রুতির অবিদ্যা হইতেছে আত্মতত্ত্ব-সম্বন্ধে অজ্ঞান; শ্রুতিতে কখনও কখনও জ্ঞান-শব্দের প্রতিযোগী শব্দরূপেও অবিদ্যা-শব্দের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। শ্রুতির জ্ঞান হইতেছে আত্মতত্ত্বের প্রকৃত জ্ঞান। (৯)

ঙ। মোক্ষ

বুদ্ধদেবের মতে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিই হইতেছে মোক্ষ—নির্ব্বাণ। এই নির্ব্বাণের স্বরূপ কি, তাহা বলা যায় না। নির্ব্বাণ কি কোনও অস্তিত্ব-বিশিষ্ট নিত্য বস্তু, না কি একটা অনস্তিত্বের অবস্থা—ইহা যিনি নির্ণয় করিতে চাহেন, বৌদ্ধমতে তিনি বিধর্ম্মী বা পাষণ্ড। (১০)

৬১। বৌদ্ধদিগের বিভিন্ন সম্প্রদায়

বুদ্ধদেবের অন্তর্দ্ধানের কয়েকশত বৎসর পরে, বৌদ্ধগণ—মহাসঙ্ঘিক, এক-ব্যবহারিক, লোকোত্তরবাদী, কুক্কুলিক, বহুশ্রুতীয়, প্রজ্ঞপ্তিবাদী, চৈত্তিক, অপরশৈল, উত্তরশৈল, হৈমবত, ধর্ম্মগুপ্তিক, মহীশাসক, কাশ্যপীয়, সৌত্রান্তিক, বাৎসিপুত্রীয়, ধর্ম্মোত্তরীয়, ভদ্রযানীয়,

---

(৬) *Ibid.* P. 110.

(৭) Buddhism holds that this immutable self of man is a delusion and a false knowledge *Ibid.* P. 111.

(৮) There is no Brahman or Supreme permanent reallity and no self. *Ibid* P. 111

(৯) *Ibid.* P. 111

(১০) Any one who seeks to discuss whether Nibbana is either a positive and eternal state or a mere state of non-existence or annihilation, take a view which has been discarded in Buddhism as heretical. *Ibid.* P. 109.

সম্মিতীয়, ছন্নাগরিক, হেতুবাদী বা সর্ব্বাস্তিবাদী, বিভজ্জবাদী, বৈভাসিক, যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদী, মাধ্যমিক বা শূন্যবাদী, মহাযান, হীনযান প্রভৃতি—বহু সম্প্রদায়ে বিভক্ত হইয়া পড়েন। (১)

৬২। মহাযান সম্প্রদায়

মহাযান-মতে সমস্ত দ্রব্যই বস্তুসত্তাহীন এবং অনির্দ্দেশ্যধর্ম্মবিশিষ্ট, মূলে শূন্য। (২) কেহ কেহ মনে করেন—নাগার্জ্জুনই সর্ব্বপ্রথমে শূন্যবাদ প্রচার করিয়াছেন। ডক্টর দাসগুপ্ত বলেন, ইহা ভুল। বস্তুতঃ প্রায় সমস্ত মহাযান-সূত্রই পরিষ্কারভাবে শূন্যবাদ প্রচার করিয়া থাকে, অথবা শূন্যবাদের উল্লেখ করিয়া থাকে।(৩) মহাযান-সূত্র হইতে জানা যায়—সুভূতি বুদ্ধদেবকে বলিয়াছিলেন—বেদনা (অনুভূতি), সংজ্ঞা এবং সংস্কার এই সমস্তই মায়া। সমস্ত স্কন্ধ, ধাতু (মহাভূত) এবং আয়তন (ইন্দ্রিয়) হইতেছে শূন্য এবং ঐকান্তিকী নিষ্ক্রিয়তা। সমস্তই যখন শূন্য, তখন বস্তুতঃ উৎপত্তি-বিকারাদি কোনও প্রক্রিয়াও থাকিতে পারে না, প্রক্রিয়ার বিরাম (ধ্বংসাদিও) থাকিতে পারে না। যাহা সত্য, তাহা শাশ্বতও নয়, অশাশ্বতও নয়, তাহা হইতেছে একেবারে শূন্য (pure void)। প্রকৃত প্রস্তাবে, কোনও জীবও নাই, কোনও বন্ধনও নাই, মোক্ষ বলিয়াও কিছু নাই। বোধিসত্ত্ব (বিজ্ঞ) তাহা জানেন; তথাপি তিনি মায়াজীবের (illusory beings) মায়াবন্ধন (illusory bondage) হইতে মায়ামোক্ষের (illusory salvation) জন্য চেষ্টা করেন। বস্তুতঃ মোক্ষ পাওয়ারও কেহ নাই, মোক্ষ-প্রাপ্তির সহায়কও কেহ নাই। (৪)

এইরূপে জানা গেল, মহাযান-মতে—দৃশ্যমান জগৎ, জীব, জীব-জগতের উৎপত্তি-বিকার-বিনাশ, জীবের বন্ধন, মোক্ষ—সমস্তই বাস্তব অস্তিত্বহীন, সমস্তই মায়া—ইন্দ্রজাল-সৃষ্ট বস্তুর ন্যায়, স্বপ্নের ন্যায়—মিথ্যা। অবিদ্যার স্পর্শেই এ-সমস্তকে সত্য বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতও ঠিক এইরূপই। এ জন্যই শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য শ্রীপাদ শঙ্করের মায়াবাদকে মহাযানিক বৌদ্ধমত বলিয়াছেন। ১।৪।২৫-ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য।

মহাযান-মতে সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুই হইতেছে শূন্য। শঙ্করমতে তৎসমস্ত হইতেছে বস্তুতঃ

---

(১) *Ibid*. PP 112-13

(২) The Mahayanists believed that all things were of a non-essential and indefinable character and void at bottom. *Ibid*. P. 126.

(৩) It is sometimes erroneously thought that Nagarjuna first preached the doctrine of Sunyavada (essencelessness or voidness of all appearance); but in reality almost all the Mahayana sutras either definitely preach this doctrine or allude to it. *Ibid*. P. 126.

(৪) *Ibid*. P. 127.

নির্গুণ ব্রহ্ম। এজন্যই ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণন্ বলিয়াছেন—প্রাচীন বৌদ্ধ মতের মধ্যে যদি এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সত্যতা বসান যায়, তাহা হইলেই শঙ্করের অদ্বৈত বেদান্ত পাওয়া যায়।

যাহাহউক, মহাযান-বাদ কালক্রমে তুই দিকে পরিণতি লাভ করিয়াছে—শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদ এবং বিজ্ঞানবাদ। এস্থলে এই তুইটী বাদ সম্বন্ধে আলোচনা করা হইতেছে।

৬৩। শূন্যবাদ বা মাধ্যমিকবাদ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, মহাযান-সম্প্রদায় হইতেছে শূন্যবাদী। এই মহাযান-সম্প্রদায় হইতে মাধ্যমিক ও বিজ্ঞানবাদাদি যে সমস্ত সম্প্রদায় উদ্ভূত হইয়াছে, শূন্যবাদই হইতেছে তাহাদের সকলের মূলভিত্তি।

নাগার্জ্জুন ছিলেন মাধ্যমিক বা শূন্যবাদের একজন শক্তিশালী আচার্য্য। তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে তিনি এক "মাধ্যমিক-কারিকা" লিখিয়াছেন। আর্য্যদেব, কুমারজীব, বুদ্ধপালিত এবং চন্দ্রকীর্ত্তি নাগার্জ্জুনের কারিকার টীকা করিয়াছেন।

আর্য্যদেব তাঁহার "হস্তবালপ্রকরণবৃত্তি"-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—নিজের অস্তিত্বের জন্য যাহা কিছু অন্য কোনও দ্রব্যের উপর নির্ভর করে, তাহাই মায়া—ইন্দ্রজালবৎ; ইহা প্রমাণ করা যায়। বাহ্য বস্তু সম্বন্ধে আমাদের সমস্ত ধারণাই নির্ভর করে দেশের ধারণার উপরে; সুতরাং অংশ এবং অংশীর (সমগ্রের) ধারণাকেও কেবল দৃশ্য (appearance), মাত্র (বস্তুসত্তাহীন দৃশ্যমাত্র) মনে করিতে হইবে। অতএব, নিজের অস্তিত্বের জন্য যাহা কিছু অপরের অপেক্ষা রাখে, তাহাই মায়া—ইহা জানিয়া কোনও বিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষেই এ সমস্ত দৃশ্যমান বাহ্য বস্তুর প্রতি আসক্তি বা বিদ্বেষ পোষণ করা সঙ্গত নহে (৫)। কেননা, এ সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর বাস্তব অস্তিত্বই কিছু নাই; যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার প্রতি প্রীতি বা বিদ্বেষ পোষণের সার্থকতাও কিছু থাকিতে পারে না।

বুদ্ধদেব-কথিত "প্রতীত্যসমুৎপাদ"-বাদ সম্বন্ধে, নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক-কারিকার ভাষ্যকার চন্দ্রকীর্ত্তি বলেন—সমস্ত উৎপত্তি মিথ্যা (৬)। সুতরাং বুদ্ধদেবের তথাকথিত প্রতীত্যসমুৎপাদের (এক বস্তুর উৎপত্তি অন্য বস্তুর উপর নির্ভর করে—এই মতবাদের) তাৎপর্য্য হইতেছে—অবিদ্যোপহিত বুদ্ধি এবং ইন্দ্রিয়ের নিকটে ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুবৎ প্রকাশ। এক প্রকাশের পর আর এক প্রকাশ আছে; যাহা প্রকাশ পায়, তাহাও আবার বিলুপ্ত হয়, নষ্ট হয়; কোনও প্রকাশেরই স্বভাব বা বাস্তব সত্তা কিছু নাই। যাহা কখনও নষ্ট হয় না, তাহাকে "অমোষধর্ম্ম" বলে; নির্ব্বাণই হইতেছে একমাত্র "অমোষধর্ম্ম"; অন্য সমস্ত জ্ঞান এবং সংস্কার হইতেছে মিথ্যা, প্রকাশের সঙ্গেই নষ্ট হয়। "সর্ব্বসংস্কারাশ্চ মৃষামোষধর্ম্মাণঃ।" (৭)

---

(৫) *Ibid* P. 129. (৬) All origination is false. *Ibid.* P. 139. (৭) *Ibid.* P. 139.

যাহার কোনও অস্তিত্বই নাই, তাহার সম্বন্ধে ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান বলিয়াও কিছু থাকিতে পারে না; সুতরাং তাহার কোনও স্বভাবও থাকিতে পারে না। যাহার কোনও স্বভাব নাই, তাহার উৎপত্তিও থাকিতে পারে না, বিনাশও থাকিতে পারে না। মিথ্যা জ্ঞান (বিপর্য্যাস) বশতঃ যিনি দৃশ্যমান বস্তুর মিথ্যাত্ব উপলব্ধি করিতে পারেন না, দৃশ্যমান বস্তুকে সত্য বলিয়া মনে করেন, তাঁহারই সংসার (কর্ম্ম, জন্ম, মৃত্যু, পুনর্জন্ম)। (৮)

প্রতীত্যসমুৎপাদের বা শূন্যবাদের যথার্থ তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—পরিদৃশ্যমান বস্তুতে সত্যও কিছু নাই, সার বা সত্তাও কিছু নাই (৯)। পরিদৃশ্যমান বস্তুসমূহের সত্তা বা সার যখন কিছু নাই, তখন তাহাদের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। তাহারা বস্তুতঃ আসেও না, যায়ও না। তাহারা হইতেছে কেবল মায়া বা ইন্দ্রজালবৎ। সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুই হইতেছে বাস্তবিক "শূন্য"। "শূন্য"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—পরিদৃশ্যমান কোনও বস্তুরই স্বরূপগত কোনও স্বভাব নাই। এই "নিঃস্বভাবত্বই" হইতেছে শূন্য। (১০)

এই মতে জীবাত্মা বলিয়াও কিছু নাই। জীবাত্মার অনুসন্ধান করিতে গেলে কেবল পাঁচটী স্কন্ধই পাওয়া যাইবে, জীবাত্মা পাওয়া যাইবে না। (১১)

স্বয়ং বুদ্ধদেবও—দৃশ্যমান বস্তুমাত্র, স্বপ্নমাত্র, মরীচিকামাত্র; তাঁহার উপদেশও তদ্রূপ। (১২)

সহজেই বুঝা যায়—মাধ্যমিক বা শূন্যবাদ মতে বন্ধন বলিয়াও কিছু নাই, মোক্ষ বলিয়াও কিছু নাই। সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুই (Phenomena) হইতেছে ছায়ামাত্র, স্বপ্ন, মরীচিকা, মায়া, ইন্দ্রজাল, নিঃস্বভাব। 'আমি বাস্তব নির্ব্বাণ লাভের চেষ্টা করিতেছি'—এইরূপ মনে করাও কেবল মিথ্যা জ্ঞান মাত্র। এইরূপ যে মিথ্যাজ্ঞান, তাহাই অবিদ্যা। (১৩)

"সমস্ত দুঃখের আত্যন্তিক বিনাশই হইতেছে নির্ব্বাণ"—মাধ্যমিক মতের সহিত এই মতের সঙ্গতি নাই। কেননা, মাধ্যমিক মতে দুঃখকষ্টাদির উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। মাধ্যমিক মতে নির্ব্বাণ হইতেছে—দৃশ্যমান পদার্থের বস্তুসত্তাহীনতা; নির্ব্বাণ এমন কোনও বস্তু নহে, যাহার সম্বন্ধে বলা যায়—ইহা নিরস্ত হইয়াছে, বা উৎপন্ন হইয়াছে (অনিরুদ্ধমনুৎপন্নম্)। নির্ব্বাণে দৃশ্যমান সমস্ত বস্তু বিলুপ্ত হয়। আমরা বলিয়া থাকি—নির্ব্বাণে দৃশ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব থাকে না; কিন্তু তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে—রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের ন্যায়। সর্প কখনও ছিল না; তদ্রূপ দৃশ্যমান বস্তুও কখনও ছিল না। (১৪)

---

(৮) *Ibid*. P. 140. (৯) *Ibid*. P. 140.

(১০) *Ibid*. P. 141.

(১১) *Ibid*. P. 141-42

(১২) Even the Buddha himself is a phenomenon, a mirage, or a dream and so are all his teachings. *Ibid*. P. 142.

(১৩) *Ibid*. P. 142-43. (১৪) *Ibid*. P. 142.

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—মাধ্যমিক বা শূন্যবাদে পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা, তাহার বাস্তব অস্তিত্ব কিছু নাই, রজ্জুসর্পের দৃষ্টান্তে সর্পের যেমন কোনও অস্তিত্ব নাই, তদ্রূপ। জীব মিথ্যা, বুদ্ধদেব মিথ্যা, তাঁহার উপদেশও মিথ্যা। জন্ম, মৃত্যু, ক্লেশ, বন্ধন, মোক্ষ প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা। অবিদ্যার প্রভাবেই মিথ্যাবস্তুতে সত্য বলিয়া প্রতীতি জন্মে। শ্রীপাদ শঙ্করের অভিমতও ঠিক এইরূপ। তাঁহার মতেও সমস্ত মিথ্যা, গুরুও মিথ্যা, গুরুর উপদেশও মিথ্যা, শাস্ত্রও মিথ্যা।

শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—শাস্ত্র মিথ্যা হইলেও তাহার অনুসরণে সত্য বস্তু পাওয়া যাইতে পারে, যেমন মিথ্যা স্বপ্ন হইতেও সত্য দৃশ্যমান বস্তু পাওয়া যায়, কিম্বা রজ্জুতে দৃষ্ট মিথ্যা সর্প হইতেও যেমন সত্য ভয় জন্মে, তদ্রূপ। মাধ্যমিক বা শূন্যবাদও তদ্রূপ কথাই বলেন। সমস্ত মায়াময় বস্তুর ন্যায় এই সকল দৃশ্যমান বস্তু যদিও মিথ্যা, তথাপি পুনর্জন্ম ও দুঃখ জন্মাইতে পারে। (১)

৬৪। যোগাচার বা বিজ্ঞানবাদ

বিজ্ঞানবাদও মহাযান-সম্প্রদায় হইতে উদ্ভূত। এই মতেও শূন্যই হইতেছে মূলতত্ত্ব। শূন্যবাদ এবং বিজ্ঞানবাদ এই উভয় মতেই কোনও বস্তুতেই সত্য বলিয়া কিছু নাই, সমস্তই হইতেছে স্বপ্নতুল্য, ইন্দ্রজালতুল্য। পার্থক্য হইতেছে এই যে—শূন্যবাদীরা সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুর অনির্দ্দেশ্যতা প্রতিপাদনেই তৎপর। আর বিজ্ঞানবাদীরা শূন্যবাদীদের মত প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়াও তাঁহাদের নিজস্ব অনাদি-মায়াময়-মৌলিক ধারণা বা বাসনার সহায়তায় দৃশ্যমান বস্তুর ইন্দ্রজালতুল্যতার ব্যাখ্যা দেওয়ার জন্য আগ্রহবান্। (২)

অশ্বঘোষ, অসঙ্গ, বসুবন্ধু প্রভৃতি হইতেছেন বিজ্ঞানবাদের আচার্য্য। "লঙ্কাবতারসূত্র" হইতেছে বিজ্ঞানবাদীদের প্রাচীন গ্রন্থ। এই লঙ্কাবতারসূত্র অবলম্বন করিয়া অশ্বঘোষ "শ্রদ্ধোৎপাদ-শাস্ত্র" লিখিয়াছেন। তিনি আরও অনেক গ্রন্থ লিখিয়াছেন; তন্মধ্যে দুইখানা গ্রন্থের নাম হইতেছে—"যোগাচারভূমিশাস্ত্র" এবং "মহাযানসূত্রালঙ্কার।"

বিজ্ঞানবাদেও সমস্ত ধর্ম্ম (গুণ এবং বস্তু) হইতেছে অজ্ঞ মনের কল্পনামাত্র। তথা-

---

(১) Like all illusions, though false, these appearances can produce all the harm of rebirth and sorrow. *Ibid.* P. 140.

(২) Both of them (Sunyavada and Vijnanavada) agree in holding that there is no truth in anything, everything is only passing appearnce akin to dream or magic. But while the Sunyavadins were more busy in showing this indefinableness of all phenomena, the Vijnanavadins tacitly accepting the truth preached by the Sunyavadins, interested themselves in explaining the phenomena of consciousness by their theory of beginningless illusory root-ideas or instincts of the mind (*vasana*). *Ibid.* P. I27-28.

কথিত বাহ্যজগতের গতি-আদি (উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশাদি) আছে বলিয়া আমরা মনে করি ; বাস্তবিক কিন্তু এ সমস্ত কিছুই নাই ; কেননা, বাহ্য জগতের কোনও অস্তিত্বই নাই। আমরা নিজেরাই বাহ্য-জগৎ সৃষ্টি করি এবং সৃষ্টি করিয়া ইহার অস্তিত্ব আছে মনে করিয়া মুগ্ধ হই (নির্ম্মিতপ্রতিমোহি। লঙ্কাবতারসূত্র)। আমাদের জ্ঞানের দুইটী বৃত্তি আছে—খ্যাতিবিজ্ঞান এবং বস্তুপ্রতিবিকল্প-বিজ্ঞান। খ্যাতিবিজ্ঞান অনুভূতিসমূহকে ধারণ করে ; আর বস্তুপ্রতিবিকল্পবিজ্ঞান কাল্পনিক রচনার দ্বারা সেই অনুভূতিসমূহকে শৃঙ্খলাবদ্ধ করে। এই দুইটী বৃত্তি হইতেছে অভিন্নলক্ষণ এবং পরস্পরের হেতু। "অভিন্নলক্ষণে অন্যোন্যহেতুকে।" ইহারা হইতেছে "অনাদিকাল-প্রপঞ্চ-বাসনাহেতুকঞ্চ (লঙ্কাবতার সূত্র), অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে দৃশ্যমান জগৎপ্রপঞ্চসম্বন্ধে অনাদিকাল হইতেই একটা স্বাভাবিকী প্রবণতা আছে, যাহার ফলে তাহারা কার্য্যে প্রবর্ত্তিত হয়। (৭)

বাহ্যজগৎ সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হইতেছে "নিঃস্বভাব", অর্থাৎ ইহাতে সার বা সত্য কিছু নাই। সমস্তই মায়ার সৃষ্টি, মরীচিকা, স্বপ্ন। এমন কিছুই নাই, যাহাকে বাহ্য বলা যায় ; সমস্তই হইতেছে স্বচিত্তের কাল্পনিক সৃষ্টি ; এই চিত্ত অনাদিকাল হইতে কাল্পনিক দৃশ্য সৃষ্টি করিতে অভ্যস্ত। এই চিত্তই বাহিরে বিষয়ের—কাল্পনিক ভোগ্যবস্তুর—সৃষ্টি করে এবং নিজেকেও আবার আশ্রয়—কাল্পনিক ভোক্তারূপে—সৃষ্টি করে। কিন্তু এই চিত্তের নিজের কোনও দৃশ্যমান রূপ নাই ; সুতরাং তাহারও উৎপত্তি-স্থিতি-বিনাশ নাই ; এই মন বা চিত্ত হইতেছে—"উৎপাদস্থিতিভঙ্গবর্জ্জম্"। এই মন বা চিত্তকে "আলয়বিজ্ঞান" বলা হয়। (৮)

বাহিরে আমরা যে সকল বস্তু দেখি, তাহারা যে বাহিরের কিছু নয়, বস্তুতঃ আমাদের মনেরই (স্বচিত্তেরই), তাহা আমরা বুঝিতে পারি না। এ-সমস্ত বস্তুর রচনা করার জন্য এবং তাহাদের অস্তিত্বে বিশ্বাস করার জন্য আমাদের স্বচিত্তের একটা অনাদি-প্রবণতা আছে। আমাদের জ্ঞানের এমনই একটী স্বভাব যে, ইহা নিজেই জ্ঞাতা এবং জ্ঞেয় হইয়া থাকে এবং মনের এমন একটী ধর্ম্ম আছে যে, বিবিধ আকারের অনুভব লাভ করিতে পারে। উল্লিখিত চারিটী কারণে, আমাদের আলয়বিজ্ঞানে (মনে) আমাদের অনুভূতি-সমূহের (প্রবৃত্তিবিজ্ঞানের) মৃদু তরঙ্গ উৎপন্ন হয় (যেমন জলাশয়ে হইয়া থাকে) এবং এই সমস্ত তরঙ্গই আমাদের ইন্দ্রিয়ের অনুভব রূপে প্রকাশ পায়। এই রূপেই পঞ্চবিজ্ঞানকায়ও (পঞ্চস্কন্ধকে পঞ্চ-বিজ্ঞানকায় বলে) যথাযথরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সমুদ্রের তরঙ্গকে যেমন সমুদ্র হইতে ভিন্ন বলা যায় না, অভিন্নও বলা যায় না, তদ্রূপ আমাদের দৃশ্যমান বস্তু বা জ্ঞানও আলয়বিজ্ঞান হইতে ভিন্নও নয়, অভিন্নও নয়। সমুদ্র যেমন তরঙ্গরূপে নৃত্য করে, তদ্রূপ আমাদের চিত্ত বা আলয়বিজ্ঞানও যেন তাহার বিভিন্ন বৃত্তিরূপে নৃত্য করিতে থাকে। চিত্তরূপে ইহা নিজের মধ্যে সমস্ত কর্ম্মকে একত্রিত করে, মনোরূপে তাহাদের বিধান (যথাযথ সংযোগ)

---

(৭) *Ibid. P. 145.*

(৮) *Ibid. P' 146.*

করিয়া থাকে এবং বিজ্ঞানরূপে পাঁচ রকমের (পঞ্চস্কন্ধের) অনুভূতি রচনা করে। "বিজ্ঞানেন বিজানাতি দৃশ্যং কল্পতে পঞ্চভিঃ।"(৯)

মায়ার প্রভাবেই দৃশ্যমান বস্তুর অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয় এবং মায়ার প্রভাবেই তাহাদের মধ্যে বিষয় ও আশ্রয়ের (জ্ঞাতা ও জ্ঞেয়ের) জ্ঞান জন্মে। ইহাকে সর্ব্বদা সম্বৃতি-সত্যতা (১) বলিয়া মনে করিতে হইবে। বস্তুতঃ, এ-সমস্ত বস্তু আছে, কি নাই, তাহা আমরা কখনও বলিতে পারি না। (২)

সৎ এবং অসৎ সমস্তই মায়াতুল্য। "সদসন্তো মায়োপমাঃ।" গভীর ভাবে যদি লক্ষ্য করা যায়, তাহা হইলে দেখা যায়—সমস্ত দৃশ্যমান বস্তুই হইতেছে সম্পূর্ণরূপে দৃশ্যমানবস্তুহীনতা (negation of all appearances), অসৎ, অভাব ; এমন কি, এই অভাবও অসৎ ; কেননা, অভাবও দৃশ্যমান-বস্তু। ইহা হইতে মনে হইতে পারে, চরম সত্যটী হইতেছে একটী ভাব-বস্তু, অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তু ; কিন্তু তাহা নয় ; কেননা, চরম সত্য বস্তুটী হইতেছে "ভাবাভাবসমানতা ॥ অসঙ্গকৃত মহাযানসূত্রালঙ্কার ॥" এতাদৃশ অবস্থাকে—যাহা স্বয়ংসম্পূর্ণ, যাহার কোনও নাম নাই, বস্তু নাই, তাহাকে—লঙ্কাবতারসূত্রে "তথতা" বলা হইয়াছে। লঙ্কাবতারসূত্রে অন্যত্র ইহাকেই "শূন্যতা" বলা হইয়াছে। এই "শূন্যতা" হইতেছে "এক" এবং ইহার উৎপত্তি নাই, বস্তুও (substance) নাই। ইহাকে অন্যত্র "তথাগতগর্ভ"ও বলা হইয়াছে। (৩)

এ-স্থলে "তথাগতগর্ভ"-সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে মনে হয়, ইহা হইতেছে সর্ব্ব-প্রকারের বিশেষত্বহীন।

ইহাতে মনে হইতে পারে—উল্লিখিত নির্ব্বিশেষ চরম সত্য, অশ্বঘোষের "তথতা-তত্ত্বের" ন্যায় অনেকটা বেদান্তের আত্মা বা ব্রহ্মের মতন (অর্থাৎ শ্রীপাদ শঙ্করের নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের তুল্য। পরবর্ত্তী ৭২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু তাহা যে নয়, লঙ্কাবতারসূত্রে উল্লিখিত বুদ্ধদেবের একটী উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। তাহাতে দেখা যায়, রাবণ বুদ্ধদেবকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"অন্য দার্শনিক পণ্ডিতগণ যে আত্মা স্বীকার করেন, সেই আত্মাও তথাগতগর্ভের ন্যায় নিত্য, কারণ (agent, অর্থাৎ আত্মাই সমস্ত), নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বব্যাপক, এবং বিকারহীন। সুতরাং 'আত্মা' এবং 'তথাগতগর্ভ' যে এক নহে, তাহা কিরূপে বলা যায় ?" ইহার উত্তরে বুদ্ধদেব বলিয়াছিলেন—"না, তথাগতগর্ভ এবং আত্মা এক নহে। তবে যে আমি বলি—'বস্তুতঃ সমস্ত বস্তুই তথাগতগর্ভ', তাহার কারণ হইতেছে এই যে, আমাদের মতে সমস্তই হইতেছে 'নৈরাত্ম্য', অর্থাৎ কোনও দ্রব্যে কোনও বস্তুও নাই, আত্মা বা জীবাত্মা বলিয়াও কিছু নাই। কিন্তু একথা শুনিলে আমার সমস্ত শিষ্যগণই ভয় পাইবেন। বাস্তবিক, তথাগতগর্ভ 'আত্মা' নহে। একটী মৃৎপিণ্ডকে যেমন নানা আকারে পরিণত

(৯) *Ibid*. P. 146. (১) এই সম্বৃতি-সত্যতাকেই শ্রীপাদ শঙ্কর ব্যবহারিক সত্যতা বলেন। (২) *Ibid*. P. 146. (৩) *Ibid*. P. 147.

করা যায়, তদ্রূপ সমস্ত দৃশ্যমান পদার্থের বস্তুসত্তাহীনতা-স্বভাব এবং সর্ব্বধর্ম্মহীনতা-স্বভাবকেই 'গর্ভ' বা 'নৈরাত্ম্য' বলিয়া নানাভাবে বর্ণনা করা হয়। (৪)

ইহা হইতে বুঝা গেল—বুদ্ধদেব "আত্মা" বা "পরমাত্মা" স্বীকার করিতেন না। তাঁহার মতে "শূন্যতা" বা "তথতা", বা "তথাগর্ভই" হইতেছে চরমতম তত্ত্ব।

পরিদৃশ্যমান বস্তু সম্বন্ধে বিজ্ঞানবাদীরাও "প্রতীত্যসমুৎপাদ-বাদ" স্বীকার করেন ; তবে তাঁহাদের এই স্বীকৃতির একটু বৈশিষ্ট্য আছে। তাঁহাদের মতে প্রতীত্যসমুৎপাদ দুই রকমের—বাহ্যিক এবং আভ্যন্তরিক (বা আধ্যাত্মিক)। একটী ঘট প্রস্তুত করিতে হইলে যেমন মৃৎপিণ্ড, কুম্ভকার, চক্রাদির সহায়তার প্রয়োজন হয়, অর্থাৎ ঘটের উৎপত্তি যেমন মৃৎপিণ্ডাদির উপর নির্ভর করে,, তদ্রূপ বাহিরে দৃশ্যমান বস্তু সমূহের মধ্যেও একবস্তুর উৎপত্তি অপর এক বস্তুর উপর নির্ভর করে। ইহাই বিজ্ঞানবাদীদের বাহ্যিক প্রতীত্যসমুৎপাদ। আর, অবিদ্যা, তৃষ্ণা, কর্ম্ম, স্কন্ধ এবং আয়তন-(ইন্দ্রিয়-) সমূহ হইতেছে আভ্যন্তরিক প্রতীত্যসমুৎপাদের ব্যাপার। (৫)

আমাদের বুদ্ধি দুই রকমের - প্রবিচয় বুদ্ধি এবং বিকল্প-লক্ষণ-গ্রহাভিনিবেশ-প্রতিস্থাপিকা বুদ্ধি। প্রবিচয়বুদ্ধির কার্য্য হইতেছে এই যে, ইহা নিম্নলিখিত চারি রকমের কোনও এক রকমে পদার্থকে গ্রহণ করিতে চাহে—(১) বস্তুগুলি হইতেছে ইহা, বা অন্য (একত্বান্যত্ব), (২) উভয়, বা অনুভয় (উভয়ানুভয়), (৩) আছে, বা নাই (অস্তিনাস্তি), এবং (৪) নিত্য, বা অনিত্য (নিত্যানিত্য)। কিন্তু দৃশ্যমান পদার্থসম্বন্ধে ইহাদের কোনওটাই বলা যায় না। আর, দ্বিতীয় রকমের বুদ্ধি হইতেছে মনের একটী অভ্যাস। এই অভ্যাসের প্রভাবে মন বিভিন্ন রকমের পদার্থের রচনা বা কল্পনা করে এবং যথাযথভাবে তাহাদিগকে সজ্জিত করে (পরিকল্প)। যাঁহারা উল্লিখিত দ্বিবিধ বুদ্ধির স্বরূপ অবগত আছেন, তাঁহারা জানেন যে, বাহ্য জগৎ বলিয়া কিছু নাই, কেবল মনের মধ্যেই বাহ্য জগতের অনুভব। জল বলিয়া কিছু নাই ; মন যে স্নেহ রচনা করে, তাহাই জলরূপে বাহিরে প্রতিভাত হয়। তেজঃ এবং বায়ু সম্বন্ধেও তদ্রূপই। এই ভাবে, মিথ্যাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করার যে একটা মিথ্যা অভ্যাস, (মিথ্যাসত্যাভিনিবেশ) আছে; তাহার ফলেই পাঁচটী স্কন্ধও প্রকাশ পায়। যদি এই পাঁচটী স্কন্ধ যুগপৎ প্রকাশ পাইত, তাহা হইলে, তাহাদের মধ্যে যে একটা কার্য্য-কারণ সম্বন্ধ আছে, তাহা বলা যাইত না। যদি একটীর পরে আর একটী প্রকাশ পাইত, তাহা হইলেও তাহাদের মধ্যে কোনওরূপ সম্বন্ধ আছে বলিয়া বলা যাইতনা ; কেননা, তাহাদের মধ্যে সম্বন্ধ ঘটাইতে পারে, এমন কিছু নাই। বাস্তবিক এমন কোনও বস্তু কোথাও নাই, যাহার উৎপত্তি বা বিনাশ আছে। আমাদের কল্পনাই কেবল জ্ঞেয় বস্তুর সৃষ্টি করে এবং আমাদিগকেও জ্ঞাতা বলিয়া মনে করায়। আমরা যে বলি—"এই বস্তুকে জানি", ইহা কেবল "ব্যবহার"মাত্র।(৬)

(৪) *Ibid.* P. 147. Lankavatarasutra. PP. 80—81. (৫) *Ibid.* P. 148. Lankavatarasutra, P. 85. (৬) *Ibid,* P. 148. Lankavatarasutra. P. 87. শ্রীপাদ শঙ্করও এই অর্থেই "ব্যবহারিক"-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

যাহা কিছু বাক্যদ্বারা প্রকাশ করা হয়, তাহা কেবল "বাগ্‌বিকল্প"-মাত্র (বাক্যেরই রচনা) এবং মিথ্যা। কোনওরূপ কার্য্যকারণ-সম্বন্ধ ব্যতীত কোনও বস্তু সম্বন্ধে কথায় কিছু প্রকাশ করা যায় না। কিন্তু এইরূপ কোনও লক্ষণকে সত্য বলা যায় না। যাহা পরমার্থ, তাহাকে বাক্যে প্রকাশ করা যায় না।(৭) (শ্রীপাদ শঙ্করও এইরূপ কথাই বলেন)।

বিজ্ঞানবাদ-মতে সর্ব্বত্র কেবল অস্তিত্বহীনতাই (nonexistence); এই অস্তিত্বহীনতা নিত্যও নহে, ধ্বংসশীলও নহে। এই দৃশ্যমান জগৎ হইতেছে কেবল স্বপ্ন, মায়া। (৮)

বিজ্ঞানবাদ সম্বন্ধে উল্লিখিত আলোচনায় যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা গেল, এই মতে বাহ্য জগৎ বলিয়া কিছু নাই, সমস্তই আমাদের মনে। "নাভাব উপলব্ধেঃ॥ ২।২।২৮"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিত বিজ্ঞানবাদ-মতের খণ্ডন করিয়া দেখাইয়াছেন—"বাহিরে কিছু না থাকিলে মনে তাহার উপলব্ধি হইতে পারে না; সুতরাং বাহ্য জগৎ যে নাই, তাহা নহে, বাহ্য জগৎ আছে।" ইহাতে কেহ মনে করিতে পারেন শ্রীপাদ শঙ্কর বাহ্য জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন; কিন্তু তাহা নহে। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপঃ—বিজ্ঞানবাদীরা যে বলেন. বাহিরে কিছুই নাই, সমস্তই শূন্য, নিরাশ্রয়। ইহা ঠিক নহে। বাহিরে জগৎ আছে; তবে তাহার বাস্তব অস্তিত্ব নাই—তাহা মায়া, স্বপ্ন, মরীচিকা। তাহা শূন্যও নহে, নিরাশ্রয়ও নহে; তাহা হইতেছে নির্গুণ ব্রহ্ম; রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ নির্গুণব্রহ্মে জগদ্‌ভ্রম হয়, রজ্জুর আশ্রয়ে যেমন সর্পের ভ্রম, তদ্রূপ ব্রহ্মের আশ্রয়ে জগতের ভ্রম। (৯)

বিজ্ঞানবাদও বলেন, মায়ার প্রভাবেই বাহিরে জগতের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়, শ্রীপাদ শঙ্করও তাহাই বলেন। এই অংশে বিজ্ঞানবাদীদের সঙ্গে শঙ্করের মতভেদ নাই, মতভেদ কেবল বহির্দৃষ্ট বস্তুর আশ্রয়ের অস্তিত্ব সম্বন্ধে।

বিজ্ঞানবাদীরাও জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না, শ্রীপাদ শঙ্করও জীবাত্মা বলিয়া কোনও তত্ত্ব স্বীকার করে না। এই অংশেও বিজ্ঞানবাদীদের সঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করের মতের ঐক্য আছে। পার্থক্য কেবল এই—বিজ্ঞানবাদীরা বলেন—জীবাত্মাও শূন্য; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—যাহাকে জীব বলা হয়, তাহা হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, তাহা শূন্য নহে।

বিজ্ঞানবাদীরা বলেন, চিত্তের অনাদি বাসনা স্বীয় শক্তিতে মিথ্যা জগতের সৃষ্টি করে এবং

---

(৭) *Ibid.* PP. 148—49.

(৮) There is thus only non-existence, which again is neither eternal nor destructible, and the world is but a dream and a maya. *Ibid.* P, I49

(৯) Vedanta of Sankara admitted the existence of the permanent external world ln some sense. With Sankara the forms of the external world were no doubt illusoy, but they all had a permanent back ground in the Brahman, which was the onty reality behind all mental and the physical phenomena. *Ibid.* P, 168

তাহাকে সত্য বলিয়া প্রতীয়মান করায়। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, চিত্তের অনাদি সংস্কার বশতঃই ব্রহ্মে জগতের ভ্রম জন্মে। জগদ্ভ্রমের হেতু উভয়েরই প্রায় এক রকম।

৬৫। বৌদ্ধ মায়া ও শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া

বৌদ্ধদিগের অতি প্রাচীনগ্রন্থ "লঙ্কাবতারসূত্রে" মায়াসম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, "সর্ব্বদর্শন সংগ্রহে" তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহা হইতেছে এই ঃ—

"মায়া চ মহামতে বৈচিত্র্যাৎ ন অন্যা, ন অনন্যা। যদি অন্যা স্যাৎ, বৈচিত্র্যং মায়াহেতুকং ন স্যাৎ ; অথ অনন্যা স্যাদ্ বৈচিত্র্যান্ মায়াবৈচিত্র্যয়োঃ ন স্যাৎ, স চ দৃষ্টো বিভাগঃ, তস্মাৎ ন অন্যা ন অনন্যা ॥—হে মহামতে! বৈচিত্র্য দৃষ্ট হয় বলিয়া মায়া অন্যাও (ভিন্নাও) নহে, অনন্যাও (অভিন্নাও) নহে। যদি অন্যা হইত, মায়াহেতুক বৈচিত্র্য থাকিত না, আর যদি অনন্যা হইত, তাহা হইলে মায়ার এবং বৈচিত্র্যের বৈচিত্র্য থাকিত না। সেই বিভাগ দৃষ্ট হয়। সুতরাং মায়া অন্যাও নহে, অনন্যাও নহে।"

শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার "বিবেকচূড়ামণি" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"সন্নাপ্যসন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো, ভিন্নাপ্যভিন্নাপ্যুভয়াত্মিকা নো।
সঙ্গাপ্যসঙ্গা হ্যুভয়াত্মিকা নো, মহাদ্ভুতানির্ব্বচনীয়রূপা ॥১১৩॥

—সেই মায়া সদ্‌বস্তুও নহে, অসদ্‌বস্তুও নহে, সদসৎ উভয়াত্মিকাও নহে ; ভিন্নাও নহে, অভিন্নাও নহে, ভিন্ন এবং অভিন্ন এই উভয়াত্মিকাও নহে ; সঙ্গবতী বা অসঙ্গাও নহে এবং এই উভয়াত্মিকাও নহে। এই মায়া অদ্ভুত এবং অনির্ব্বচনীয়রূপা।"

ইহা হইতে জানা গেল, শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া এবং বৌদ্ধ মায়া একরূপই। বৈদিকী মায়ার এ-সকল লক্ষণ নাই।

মায়ার প্রভাবসম্বন্ধেও বৌদ্ধমতের সহিত শঙ্করমতের পার্থক্য কিছু নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—এই প্রপঞ্চ মিথ্যা—রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায়, স্বপ্নের ন্যায়, মরীচিকার ন্যায়, গন্ধর্ব্বনগরের ন্যায় ; বস্তুতঃ দ্রষ্টাও কেহ নাই, দ্রষ্টব্যও কিছু নাই ; বাচ্যও কিছু নাই, বাচকও কিছু নাই। মায়ার প্রভাবেই এ-সমস্তের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে হয়।

বৌদ্ধমতও ঠিক এইরূপই। যথা, লঙ্কাবতারসূত্রে দেখা যায়—

স্বপ্নোহয়মথবা মায়া নগরং গন্ধর্ব্বসংজ্ঞিতম্। তিমিরো মৃগতৃষ্ণা বা স্বপ্নোবন্ধ্যাপ্রসূরয়ম্ ॥
অলাতচক্রধূমো বা যদহং দৃষ্টবানিহ। অথবা ধর্ম্মতা হ্যেষা ধর্ম্মাণাং চিত্তগোচরে ॥
ন চ বালাববুদ্ধন্তে মোহিতা বিশ্বকল্পনৈঃ। ন দ্রষ্টা ন চ দ্রষ্টব্যং ন বাচ্যো নাপি বাচকঃ ॥

ইত্যাদি।

পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে,— বৌদ্ধমতে উৎপত্তি, বিনাশ, জন্ম, মৃত্যু ক্লেশ, বন্ধন, মোক্ষ, সাধক, মুমুক্ষু, প্রভৃতি সমস্তই মিথ্যা ; অবিদ্যা বা মায়ার প্রভাবেই এ সমস্ত আছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহাই বলেন—

বন্ধশ্চ মোক্ষশ্চ মৃষৈব ॥ বিবেকচূড়ামণি ॥ ৫৮১ ॥
অতস্তৌ মায়য়া কৢপ্তৌ বন্ধমোক্ষৌ ন চাত্মনি ॥ ঐ ৫৮৩ ॥
ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন বদ্ধো ন চ সাধকঃ।
ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥ ঐ ৫৮৫ ॥

এইরূপে দেখা গেল—মায়া এবং মায়ার কার্য্য সম্বন্ধে শঙ্করমতে এবং বৌদ্ধমতে পার্থক্য কিছুই নাই। উভয়মতেই মায়া হইতেছে মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী। বৈদিকী মায়ার সে সমস্ত লক্ষণ নাই। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্করের মায়া বৌদ্ধ মায়ার মতনই অবৈদিকী।

৬৬। শ্রীপাদ শঙ্করের ব্রহ্ম এবং বৌদ্ধদের শূন্য

বৌদ্ধগণ শূন্যবাদী। শূন্য হইতেছে—"কিছুনা।" বৌদ্ধগণ বলেন, এই পরিদৃশ্যমান জগতের পশ্চাতে কিছুই নাই। শ্রীপাদ শঙ্কর ইহা স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—পরিদৃশ্যমান জগৎ মিথ্যা হইলেও যখন সত্য বলিয়া প্রতীত হয়, তখন ইহার পশ্চাতে সত্য-অস্তিত্ববিশিষ্ট কিছু অবশ্যই থাকিবে। তিনি বলেন, এই সত্য অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তুটী হইতেছে নির্গুণ বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণন্ বলেন—শঙ্করের "নির্গুণ ব্রহ্ম" এবং শূন্যবাদী নাগার্জ্জুনের "শূন্য"-এই দু'য়ের মধ্যে অনেকটা সাম্য আছে। (১)

এই উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ বলিয়া মনে হয়। "শূন্য" হইতেছে "কিছু না।" আর শ্রীপাদ শঙ্করের "নির্গুণ ব্রহ্ম" হইতেছে "কিছু।" কিন্তু এই "কিছু" কি ? শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এই কিছু হইতেছে—"অস্তিত্ব বা সত্তা"-মাত্র। ছান্দোগ্য-শ্রুতির "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ ॥ ৬।২।১ ॥"-বাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর "সৎ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"সদেব—সদিতি অস্তিতামাত্রং বস্তু সূক্ষ্মং নির্ব্বিশেষং সর্ব্বগতম্ একং নিরঞ্জনং নিরবয়বং বিজ্ঞানম্।—'সদেব'—'সৎ' অর্থ অস্তিত্বমাত্র (বিদ্যমানতামাত্র বা সত্তামাত্র), নির্ব্বিশেষ, সর্ব্বগত, এক, নিরঞ্জন (নির্দ্দোষ) ও নিরবয়ব বিজ্ঞান-স্বরূপ সূক্ষ্ম বস্তু।—দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থের অনুবাদ।" শ্রীপাদ শঙ্করের মতে শ্রুতিকথিত "সৎ"-শব্দের অর্থ হইতেছে কেবল "অস্তিত্বমাত্র, সত্তামাত্র", সত্তাবিশিষ্ট বস্তু নহে ; শ্রুতি কিন্তু "সৎ"ই বলিয়াছেন, "সত্ত্ব বা অস্তিত্ব" বলেন নাই। যাহার "সত্তা" আছে, তাহাই "সৎ" ; "সত্তা" হইতেছে "সৎ"-এর ভাব। "সৎ" না থাকিলে "সৎ"-এর ভাব "সত্তা বা অস্তিত্ব" কিরূপে থাকিতে পারে ?

(১) The Nirguna Brahman of Sankara and Nagarjuna's Sunya have much in common. *Indian Philosoply*, by S. Radhakirshnan, vol. I. P. 665

"সৎ"কে অবলম্বন করিয়াই "সত্তা বা অস্তিত্ব" থাকে ; বস্তুকে অবলম্বন করিয়াই বস্তুর "ভাব" থাকে। "সৎ" ব্যতীত কেবল "সত্তা" কল্পনাতীত বস্তু। তথাপি কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর "সৎ"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"অস্তিতা, সত্তা।" "সৎ" স্বীকার করিলে বিশেষত্বের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়িতে পারে বলিয়াই তাঁহার এইরূপ অর্থকৌশল বলিয়া মনে হয়। যাহা হউক, "সৎ" ব্যতীত কেবল "সত্তা বা অস্তিত্ব"-মাত্রকেই শ্রীপাদ শঙ্কর যখন তাঁহার "নির্গুণ নির্ব্বিশেষ" ব্রহ্ম বলিয়াছেন, তখন পরিষ্কার-ভাবেই বুঝা যায়, তাঁহার "নির্গুণ ব্রহ্ম"ও "কিছুনা"-দ্যোতক "শূন্য"তেই পর্য্যবসিত হইতেছে। সুতরাং তাঁহার "সত্তামাত্র নির্গুণ ব্রহ্ম" এবং বৌদ্ধ "শূন্য" - তুল্যই।

আবার, বৌদ্ধদের "শূন্যও" হইতেছে অনির্দ্দেশ্যস্বরূপ (২)। শ্রীপাদ শঙ্করের ব্রহ্মও অনির্দ্দেশ্যস্বরূপ। "অনিরূপ্যস্বরূপং যন্মনোবাচামগোচরম্। একমেবাদ্বয়ং ব্রহ্ম নেহ নানাস্তি কিঞ্চন॥ বিবেকচূড়ামণি॥ ৪৭৮॥" এ-বিষয়েও শঙ্করের ব্রহ্মে এবং বৌদ্ধদের শূন্যে সমতা বিদ্যমান।

৬৭। মোক্ষ সম্বন্ধে বৌদ্ধমত ও শঙ্করমত

ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্ লিখিয়াছেন—যদিও শঙ্কর পরিদৃশ্যমান মিথ্যাভূত জগতের পশ্চাতে একটা সত্য কিছু আছে বলিয়া স্বীকার করেন, তথাপি শঙ্করের মোক্ষের ধারণা বৌদ্ধদের নির্ব্বাণের ধারণা হইতে বিশেষ ভিন্ন নহে। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—"সোঽহং, অহং ব্রহ্মাস্মি—আমি ব্রহ্ম"; আর মাধ্যমিক বৌদ্ধ বলেন—"শূন্যতৈবাহম্—আমি শূন্যই।" (৩)

শ্রীপাদ শঙ্করের "ব্রহ্ম" এবং বৌদ্ধদের "শূন্য" যখন অনেকটা একরূপ, তখন মোক্ষাবস্থায় "ব্রহ্ম হওয়া" এবং নির্ব্বাণে "শূন্য" হওয়াও অনেকটা একরূপই।

বেদমতে কিন্তু মুক্ত জীবেরও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে ; তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধমতে ও শঙ্করমতে সাধন

উভয় মতেই পরমার্থের সাধন হইতেছে ধ্যান। লঙ্কাবতারসূত্রে বৌদ্ধদের চারি রকমের কথা জানা যায়—(১) বালোপচারিক, (২) অর্থপ্রবিচয়, (৩) তথতালম্বন এবং (৪) তথাগত।

---

(২) অস্তি নাস্তি উভয় অনুভয় ইতি চতুষ্কোটিবিনির্মুক্তং শূন্যতত্ত্বম্॥ সর্ব্বদর্শনসংগ্রহ॥

(৩) Yet Sankara's conception of Moksa (freedom) is not nuch different from the Buddhist view of nirvana. *Indian Philosophy*, by S. Radhakrishnan, vol. II. P. 473,

যাঁহারা সাধনের আরম্ভমাত্র করেন, তাঁদের জন্য যে ধ্যানের ব্যবস্থা করা হইয়াছে, তাহাকে বলে বালোপচারিক। আত্মা বা জীবাত্মা বলিয়া কিছু নাই (পুদ্‌গলনৈরাত্ম্য) এবং দৃশ্যমান সমস্তই পরিবর্ত্তনশীল, অপবিত্র এবং দুঃখজনক—এইরূপ চিন্তাই হইতেছে এই ধ্যান।

দ্বিতীয় রকমের, অর্থাৎ অর্থপ্রবিচয়, ধ্যান হইতেছে উন্নত স্তরের ধ্যান। ইহাতে সমস্ত বস্তুর (অর্থের) স্বরূপ নির্ণয়ের চেষ্টাতেই চিত্তবৃত্তিকে কেন্দ্রীভূত করিতে হয়—আত্মা নাই, কোথাও কিছু নাই, কোনও বস্তুর কোনওরূপ ধর্ম্মও নাই—দ্বিতীয় প্রকারের ধ্যানের লক্ষ্য হইতেছে এইরূপ অনুভূতি।

তৃতীয় প্রকারের ধ্যানে (তথতালম্বনে) এইরূপ উপলব্ধি হয় যে—আত্মা নাই, বাহিরের দৃশ্যমান পদার্থও নাই এবং মনও কল্পনার ফল। সুতরাং মন তখন তথতাতে লীন হইয়া যায়।

চতুর্থ প্রকারের ধ্যানে (তথাগতে)—মনের তথতা-নিমগ্নতা এইরূপ উৎকর্ষ লাভ করে যে, শূন্যতা এবং দৃশ্যমান জগতের অনির্ব্বচনীয়তা সম্যক্‌রূপে উপলব্ধ হয়। তখন যাহা বহির্জ্জগতের জ্ঞানরূপে আত্মপ্রকাশ করে, সেই সমস্ত মূল বাসনা ধ্বংস প্রাপ্ত হয়; জ্ঞানের, অনুভূতির এবং মনের ক্রিয়া বিলুপ্ত হয়। ইহাই নির্ব্বাণ। (৪)

স্থূল তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—আত্মা নাই, জগৎ নাই, আমি তথাগত বা শূন্য—এইরূপ চিন্তাই হইতেছে বৌদ্ধমতের সাধন।

শ্রীপাদ শঙ্করের সাধনও প্রায় তদ্রূপই জগৎ মিথ্যা, ব্রহ্ম সত্য, আমি ব্রহ্ম—ইহাই শঙ্করমতে সাধন। সাধনের পরিপক্কতায় বৌদ্ধমতে যেমন দৃশ্যমান জগতের অনস্তিত্ব এবং সাধকের শূন্যত্ব উপলব্ধ হয়, তেমনি শঙ্করমতেও দৃশ্যমান নানাবিধ বস্তুর অনস্তিত্বের এবং সাধকের পক্ষে ব্রহ্মৈকত্বের উপলব্ধি হয়।

এইরূপে দেখা গেল—সাধনবিষয়েও শঙ্করমতে এবং বৌদ্ধমতে অনেকটা সাদৃশ্য আছে—অবশ্য ধ্যেয়বস্তুসম্বন্ধে সাদৃশ্য।

বেদমতে কিন্তু ভগবানের শরণাপত্তিব্যতীত কেহ মায়া হইতে মোক্ষ লাভ করিতে পারে না। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥"

৬৯। গৌড়পাদের মাণ্ডূক্যকারিকা

শ্রীপাদ শঙ্করের গুরুদেব ছিলেন শ্রীপাদ গোবিন্দ; শ্রীপাদ গোবিন্দের গুরুদেব ছিলেন শ্রীপাদ গৌড়পাদ; সুতরাং শ্রীপাদ গৌড়পাদ ছিলেন শ্রীপাদ শঙ্করের পরমগুরু।

(৪) *A History of Indian Philosophy*, By S, N, Dasgupta, Vol, I, PP, I50-5I,

শ্রীপাদ গৌড়পাদ মাণ্ডূক্য-উপনিষদের একখানা কারিকা-গ্রন্থ লিখিয়াছেন; গৌড়পাদের মাণ্ডুক্যকারিকা-নামেই এই গ্রন্থ প্রসিদ্ধ। মাণ্ডূক্য হইতেছে উপনিষৎ-সমূহের মধ্যে একখানি ক্ষুদ্রতম উপনিষৎ; হইাতে মাত্র বারটী বাক্য আছে। গৌড়পাদ অন্য কোনও উপনিষদের কারিকা বা ভাষ্য লিখেন নাই।

মাণ্ডুক্যকারিকায় গৌড়পাদ বৌদ্ধমতই প্রকটিত করিয়াছেন, কোনও স্থলেই শ্রুতির মত প্রকাশ করেন নাই। এজন্য কেহ কেহ মনে করেন যে, গৌড়পাদ নিজেই সম্ভবতঃ বৌদ্ধ ছিলেন এবং মনে করিতেন, উপনিষদের শিক্ষার সহিত বুদ্ধদেবের শিক্ষার মিল রহিয়াছে। অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন, অসঙ্গ, এবং বসুবন্ধু প্রভৃতি প্রসিদ্ধ বৌদ্ধাচার্য্যগণের পরেই গৌড়পাদের অভ্যুদয় হইয়াছিল। (৫)

গৌড়পাদের কারিকার বিচার করিলেই উল্লিখিত উক্তির যাথার্থ্য উপলব্ধি করা যাইবে।

কারিকা চারিভাগে বা চারিটী প্রকরণে বিভক্ত—আগম প্রকরণ, বৈতথ্য প্রকরণ, অদ্বৈত প্রকরণ এবং অলাতশান্তি প্রকরণ।

প্রথম আগম-প্রকরণে গৌড়পাদ মাণ্ডূক্যশ্রুতির বাক্যগুলিরই অর্থ তাঁহার নিজের ভাবে ব্যক্ত করিয়াছেন। শ্রুতির প্রথম ছয়টী বাক্যের পরেই গৌড়পাদের কারিকা আরম্ভ হইয়াছে। মাণ্ডূক্যশ্রুতির প্রথম বাক্যটীই ব্রহ্মের সবিশেষত্ব-বাচক। "ওঁমিত্যেতদক্ষরমিদং সর্ব্বং, তস্যোপব্যাখ্যানং—ভূতং ভবদ্ ভবিষ্যদিতি সর্ব্বমোঙ্কার এব। যচ্চান্যৎ ত্রিকালাতীতম্, তদপ্যোঙ্কার এব ॥ ১ ॥" এই বাক্যে বলা হইয়াছে—দৃশ্যমান সমস্ত জগৎ, ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান-সমস্তই ওঙ্কার (বা ব্রহ্ম); এই জগৎ হইতেছে কালত্রয়ের অধীন; কিন্তু যাহা ত্রিকালাতীত, তাহাও ওঙ্কারই" দ্বিতীয় বাক্যে বলা হইয়াছে—আত্মা চতুষ্পাদ। তাহার পরে, তৃতীয়, চতুর্থ এবং পঞ্চম বাক্যে চতুষ্পাদের অন্তর্গত তিনটী পাদের পরিচয় দেওয়া হইয়াছে—জাগরিতস্থান হইতেছে "বহিঃপ্রজ্ঞ", স্বপ্নস্থান হইতেছে "অন্তঃপ্রজ্ঞ" এবং সুষুপ্ত-স্থান হইতেছে "প্রজ্ঞানঘন।" ইহার পরে ষষ্ঠবাক্যে বলা হইয়াছে—"এষ সর্ব্বেশ্বর এষ সর্ব্বজ্ঞ এষোঽন্তর্য্যাম্যেষ যোনিঃ; সর্ব্বস্য প্রভবাপ্যয়ৌ হি ভূতানাম্ ॥ —ইনি সকলের ঈশ্বর, ইনি সর্ব্বজ্ঞ, ইনি অন্তর্য্যামী, ইনি যোনি (সর্ব্বজগতের কারণ), ইনিই সর্ব্বভূতের উৎপত্তি ও প্রলয়ের স্থান।"

ইহার পরেই গৌড়পাদ তাঁহার কারিকা আরম্ভ করিয়াছেন। কারিকায় তিনি বলিয়াছেন—একই আত্মা ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থিত; এই ত্রিবিধ অবস্থায় অবস্থানই হইতেছে তাঁহার তিনটী পাদ। প্রথমপাদ হইতেছে—"বহিঃপ্রজ্ঞ"; ইহা বাহ্যবিষয়ক-জ্ঞানসম্পন্ন এবং ব্যাপক (বিভু);

(৫) Gaudapada thus flourished after all the great Buddhist teachers Asvaghosha, Nagarjuna, Asanga and Vasubandhu: and I believe that there is sufficient evidence in his Karikas for thinking that he was possibly himself a Buddhist, and considered that the teachings of the Upanisads tallied with those of Buddha —*A History of Indian Philosophy* by S. N. Dasgupta vol I, 3rd impression P, 423

ইহার নাম—"বিশ্ব"। দ্বিতীয় পাদ হইতেছে "অন্তঃপ্রজ্ঞ"—মানস-স্বপ্নদর্শী ; ইহার নাম "তৈজস"। তৃতীয় পাদ হইতেছে "ঘনপ্রজ্ঞ"—ইহার নাম "প্রজ্ঞা।" ইহার পরে তিনি পাদত্রয়ের ত্রিবিধ ভোগের কথা এবং ভোগজনিত ত্রিবিধ তৃপ্তির কথাও বলিয়াছেন। ইহার পরে তিনি সৃষ্টি সম্বন্ধে বিভিন্ন মতের উল্লেখ করিয়াছেন ; কিন্তু নিজের মত ব্যক্ত করেন নাই।

ইহার পরে শ্রুতির সপ্তম বাক্যে আত্মার চতুর্থ পাদের কথা বলা হইয়াছে। ইহা হইতেছে—"অদৃশ্যম্ অব্যবহার্য্যম্ অগ্রাহ্যম্ অলক্ষণম্ অচিন্ত্যম্ অব্যপদেশ্যম্ একাত্মপ্রত্যয়সারম্ প্রপঞ্চোপশমং শান্তং শিবমদ্বৈতং চতুর্থং মন্যন্তে, স আত্মা স বিজ্ঞেয়ঃ ॥ ৭ ॥"

ইহার পরে তিনি আবার কারিকা আরম্ভ করিয়াছেন। এই কারিকায় একস্থানে তিনি লিখিয়াছেন—"প্রপঞ্চো যদি বিদ্যেত নিবর্ত্তেত ন সংশয়ঃ। মায়ামাত্রমিদং দ্বৈতমদ্বৈতং পরমার্থতঃ ॥১৭॥—এই জগৎ-প্রপঞ্চ যদি বিদ্যমান থাকিত (অর্থাৎ সৎ বা অস্তিত্ববিশিষ্ট হইত), তাহা হইলে অবশ্যই ইহা নিবৃত্ত হইত, ইহাতে সংশয় নাই। (প্রকৃত প্রস্তাবে কিন্তু) এ[illegible] দ্বৈত (অর্থাৎ জগৎ-প্রপঞ্চ) কেবলই মায়া, পরমার্থবিচারে অদ্বৈতই সত্য।"

তিনি আরও বলিয়াছেন—"বিকল্পো বিনিবর্ত্তেত কল্পিতো যদি কেন[illegible]ৎ। উপদেশাদয়ং বাদো জ্ঞাতে দ্বৈতং ন বিদ্যতে ॥১।১৮॥—(গুরুশিষ্যাদিভাবরূপ) বিকল্প যখন কোনও কারণ-বিশেষে (তত্ত্বজ্ঞানের উদ্দেশে) কল্পিত হইয়াছে, তখন তাহা নিবৃত্ত হইবে। [illegible] ই গুরুশিষ্যাদি কল্পনা, আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানের পর আর কোনও দ্বৈতই থাকে না।"

এ-স্থলে গৌড়পাদ বলিলেন—এই জগৎ-প্রপঞ্চ হইতেছে মায়ামাত্র, অর্থাৎ ইহার বাস্তব-অস্তিত্ব কিছু নাই। যখন তত্ত্বজ্ঞানের উদয় হইবে, তখন বুঝা যাইবে, জগৎ-প্রপঞ্চ বলিয়া কিছু নাই, আছেন একমাত্র অদ্বৈত ব্রহ্ম। কিন্তু মাণ্ডূক্যশ্রুতিতে এই উক্তির সমর্থক কোনও বাক্যই নাই। তাঁহার উক্তির সমর্থনে গৌড়পাদও কোনও প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। জগৎ-প্রপঞ্চের বাস্তব-অস্তিত্বহীনতা যে বৌদ্ধমত, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। গৌড়পাদ শ্রুতিবাক্যকে উপলক্ষ্য করিয়া এই বৌদ্ধমত প্রচার করিয়া গিয়াছেন ; অথচ শ্রুতিতে এইরূপ কোনও কথাই নাই।

কারিকার দ্বিতীয় প্রকরণের নাম বৈতথ্য-প্রকরণ। এই প্রকরণে গৌড়পাদ সমস্ত বস্তুর মিথ্যাত্ব খ্যাপন করিয়াছেন। এই প্রকরণে, বা পরবর্ত্তী প্রকরণদ্বয়েও তিনি শ্রুতির কোনও বাক্যের অর্থ প্রকাশ করেন নাই ; তিনি যে বাদরায়ণের কোনও উক্তির মর্ম্ম প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা তিনি নিজেও বলেন নাই। দ্বিতীয়, তৃতীয় এবং চতুর্থ প্রকরণে তিনি কেবল তাঁহার নিজের অভিমতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন, মধ্যে মধ্যে অবশ্য তাঁহার নিজের যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। যুক্তির সমর্থনে কোনও নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই।

যাহাহউক, দ্বিতীয় প্রকরণে প্রথমে তিনি বলিয়াছেন—স্বপ্নদৃষ্ট বস্তুসমূহ অসত্য, মিথ্যা। তাহার পর বলিয়াছেন—জাগ্রৎ-অবস্থায়ও লোকের মনঃকল্পিত বিষয়সমূহ অসৎ—মিথ্যা।

ইহার পরে তিনি বলিয়াছেন—স্বপ্রকাশ (দেব) আত্মা স্বীয় মায়ার প্রভাবে আপনিই আপনাকে (বিভিন্ন পদার্থাকারে) কল্পিত করেন; এবং তিনিই আবার সেই সকল পদার্থের অনুভব করেন; ইহাই বেদান্তের সিদ্ধান্ত। "কল্পয়ত্যাত্মনাত্মানমাত্মা দেব স্বমায়য়া। স এব বুধ্যতে ভেদানিতি বেদান্তনিশ্চয়ঃ ॥২।১২॥" কিন্তু বেদান্তে এতাদৃশী উক্তি কোনও স্থলেই দৃষ্ট হয় না। ইহা অনেকটা বৌদ্ধমতেরই অনুরূপ। পার্থক্য কেবল এই যে—বৌদ্ধমতে দৃশ্যমান মিথ্যাবস্তুর কোনও আশ্রয় নাই, গৌড়পাদের মতে আশ্রয় আছে—সেই আশ্রয় হইতেছে অদ্বৈতব্রহ্ম।

এই প্রসঙ্গে তিনি আরও লিখিয়াছেন—"প্রভু ঈশ্বর সংস্কাররূপে চিত্তমধ্যস্থিত অপরাপর পদার্থসমূহকে বিবিধ আকারে কল্পনা করেন। আবার বহির্দ্দেশে চিত্তসমাবেশ করিয়া নিয়ত পদার্থসমূহের (পৃথিব্যাদির) কল্পনা করিয়া থাকেন। "বিকরোত্যপরান্ ভাবানন্তশ্চিত্তে ব্যবস্থিতান্। নিয়তাংশ্চ বহিশ্চিত্ত এবং কল্পয়তি প্রভুঃ ॥২।১৩॥" কিন্তু এইরূপ কোনও কথা শ্রুতিস্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না; বরং বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের উক্তির সঙ্গেই যেন ইহার সাদৃশ্য আছে বলিয়া মনে হয়।

গৌড়পাদ বলিয়াছেন—

অনিশ্চিতা যথা রজ্জুরন্ধকারে বিকল্পিতা। সর্পধারাদিভির্ভাবৈস্তদ্বদাত্মা বিকল্পিতঃ॥

নিশ্চিতায়াং যথা রজ্জ্বাং বিকল্পো বিনিবর্ত্ততে। রজ্জুরেবেতি চাদ্বৈতং তদ্বদাত্ম-বিনিশ্চয়ঃ ॥২।১৭-৮

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—অন্ধকারে কিছু ঠিক করিতে না পারিলে রজ্জুকেও যেমন সর্প বা জলধারাদি রূপে মনে হয়, জীবও তেমনি নানারূপে বিকল্পিত হইয়া থাকে। আবার, যখন নিশ্চয়রূপে জানা যায় যে, ইহা রজ্জুই, সর্প বা জলধারা নহে, তখন সর্পাদির ভ্রম দূরীভূত হয়। আত্মতত্ত্ব-নিশ্চয়ও তদ্রূপ।

দৃশ্যমান জগৎ-সম্বন্ধে রজ্জুতে সর্পভ্রমের কথা শ্রুতিতে কোনও স্থলেই দৃষ্ট হয় না। ইহাও জগৎ-প্রপঞ্চের অস্তিত্বহীনতা-প্রতিপাদক বৌদ্ধদিগের দৃষ্টান্ত।

গৌড়পাদ তাঁহার কারিকায় বলিয়াছন,

"স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা।
তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ ॥২।৩১॥

—স্বপ্ন ও মায়া যেরূপ (মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ) দৃষ্ট হয়, গন্ধর্ব্বনগরও যেরূপ (মিথ্যা হইয়াও সত্যবৎ) দৃষ্ট হয়, বেদান্তবিষয়ে পণ্ডিতগণ এই জগৎকেও তদ্রূপই দেখিয়া থাকেন।"

ইহা বেদান্তীদের কথা নহে, পরন্তু বৌদ্ধ নাগার্জ্জুনেরই কথা। নাগার্জ্জুনই বলিয়াছেন - "যথা মায়া যথা স্বপ্নো গন্ধর্ব্বনগরং যথা। তথোৎপাদস্তথাস্থানং তথা ভঙ্গ উদাহৃতঃ ॥" গৌড়পাদের উদাহরণ এবং নাগার্জ্জুনের উদাহরণের কোনও পার্থক্যই নাই।

বৌদ্ধদের প্রাচীন গ্রন্থ লঙ্কাবতারসূত্রেও গৌড়পাদের উদাহরণগুলি দৃষ্ট হয়। "স্বপ্নোহয়মথবা মায়া নগরং গন্ধর্ব্বশব্দিতম্। তিমিরো মৃগতৃষ্ণা বা স্বপ্নে বন্ধ্যাপ্রসূরয়ম্ ॥"

কেবল উদাহরণের দ্বারা সত্য নির্ণীত হইতে পারে না ; উদাহরণের সহিত শাস্ত্রপ্রমাণের সঙ্গতি থাকিলেই প্রমাণ-বিষয়ে উদাহরণের মূল্য থাকিতে পারে, অন্যথা নহে।

গৌড়পাদ তাঁহার কারিকায় আরও বলিয়াছেন—উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই, বন্ধনও নাই, সাধকও নাই, মুমুক্ষুও নাই, মুক্তও নাই। ইহাই পারমার্থিক ভাব। "ন নিরোধো ন চোৎপত্তির্ন-বদ্ধো ন চ সাধকঃ। ন মুমুক্ষুর্ন বৈ মুক্ত ইত্যেষা পরমার্থতা ॥২।৩২॥"

শ্রুতি-স্মৃতি কোনও স্থলে এইরূপ কথা বলেন নাই। বৌদ্ধেরাই ইহা বলিয়া থাকেন। "ন চোৎপাদ্যঃ নচোৎপন্নং প্রত্যয়েঽপি ন কেচন। সংবিদ্যন্তে ক্বচিৎ কেচিৎ ব্যবহারস্তু কথ্যতে ॥"

পূর্ব্বে ৬৩-অনুচ্ছেদে শূন্যবাদের আলোচনা-প্রসঙ্গ বলা হইয়াছ, বৌদ্ধশূন্যবাদ-মতে জন্ম, মৃত্যু, ক্লেশ. বন্ধন, জীব, মোক্ষ-আদি সমস্তই মিথ্যা, এমন কি বুদ্ধদেবও মিথ্যা। গৌড়পাদ তাঁহার উল্লিখিত কারিকায় এই বৌদ্ধমতই প্রকাশ করিয়াছেন।

গৌড়পাদ বলেন—তত্ত্বদর্শিগণ জানেন, বহু বলিয়া কিছু নাই ; দ্রব্যসমূহ পৃথক্‌ও নহে, অপৃথক্‌ও নহে। "নাত্মভাবেন নানেদং ন স্বেনাপি কথঞ্চন। পৃথঙ্‌নাপৃথক্ কিঞ্চিদিতি তত্ত্ববিদো বিদুঃ ॥ ২.৩৪ ॥" ইহাও নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিককারিকার "অনেকার্থম্ অনানার্থম্"-এরই প্রতিধ্বনিমাত্র।

তাঁহার কারিকায় তিনি আরও বলিয়াছেন—

"বীতরাগ-ভয়-ক্রোধৈর্ম্মুনিভির্ব্বেদপারগৈঃ।
নির্ব্বিকল্পো হ্যয়ং দৃষ্টঃ প্রপঞ্চোপশমোঽদ্বয়ঃ ॥ ২.৩৫ ॥

—রাগ, ভয় ও ক্রোধশূন্য, বেদার্থতত্ত্বজ্ঞ মুনিগণ কর্ত্তৃক এই আত্মাই নির্ব্বিকল্প (প্রাণাদি-সর্ব্বপ্রকার ভেদবর্জ্জিত), নিষ্প্রপঞ্চ (দ্বৈতবর্জ্জিত) এবং অদ্বিতীয় বলিয়া পরিজ্ঞাত হয়েন।"

লঙ্কাবতারসূত্রেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। যথা—"অদ্বয়াসংসারপরিনির্ব্বাণবৎ সর্ব্বধর্ম্মাঃ তস্মাৎ তর্হি মহামতে শূন্যতানুৎপাদাদ্বয়নিঃস্বভাবলক্ষণে যোগঃ করণীয়ঃ॥", "যদুত স্বচিত্তবিষয়-বিকল্পদৃষ্ট্যানববোধনাৎ বিজ্ঞানানাম্ স্বচিত্তদৃশ্যমাত্রানবতারেণ মহামতে বালপৃথগ্‌জনাঃ ভাবাভাবস্বভাব-পরমার্থ-দৃষ্টিদ্বয়বাদিনো ভবন্তি ॥" (৬)

এইরূপে দেখা গেল—গৌড়পাদ বৌদ্ধমতের অনুসরণেই তাঁহার কারিকার বিতথ্যপ্রকরণে সমস্ত পদার্থেরই মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

কারিকার তৃতীয় ভাগে, অদ্বৈত-প্রকরণে গৌড়পাদ পরমসত্য বস্তুর নির্ব্বিশেষত্ব এবং জীব-ব্রহ্মের একত্ব প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি বলেন—যে সমস্ত বস্তুর জাতি বা জন্ম হয় বলিয়া মনে হয়, প্রকৃত প্রস্তাবে সে-সমস্ত জন্মে না। "যথা ন জায়তে কিঞ্চিজ্জায়মানং সমন্ততঃ।৩।২॥" জন্মের প্রতীতি ভ্রান্তিমাত্র। 'ন কশ্চিজ্জায়তে জীবঃ সম্ভবোঽস্য ন বিদ্যতে। এতত্তদুত্তমং সত্যং যত্র

(৬) Quoted in *A History of Indian Philosophy*, by S. N. Dasgupta Vol. I. 3rd impression, P. 426, Foot-note.

কিঞ্চিন্ন জায়তে ॥৩।৪৮॥-কোনও জীব জন্মগ্রহণ করে না, জীবের উৎপাদক কারণও কিছু নাই। ইহাই সেই উত্তম সত্য বস্তু, যাহাতে কিছুই জন্মে না।” বৌদ্ধরাও এতাদৃশ জন্মরাহিত্যের কথাই বলেন।

গৌড়পাদ বলেন—আত্মা (পরমাত্মা) আকাশতুল্য হইয়াও ঘটাকাশসদৃশ জীবরূপে প্রকাশ পায়েন এবং ঘটাদির ন্যায় দেহসংঘাতভাবে উৎপন্ন বলিয়া প্রতীত হইয়া থাকেন। “আত্মা হ্যাকাশ-বজ্জীবৈর্ঘটাকাশৈরিবোদিতঃ। ঘটাদিবচ্চ সঙ্ঘাতৈ র্জ্জাতাবেতন্নিদর্শনম্ ॥ ৩।৩॥” অর্থাৎ বৃহৎ আকাশ ঘটাদিতে আবদ্ধ হইয়া যেমন ঘটাকাশ বলিয়া পবিচিত হয়, তদ্রূপ পরমাত্মাও উপাধির যোগে জীব বলিয়া কথিত হয়েন। আবার ঘটাদি বিনষ্ট হইলে ঘটমধ্যস্থ আকাশ যেমন বৃহৎ আকাশে বিলীন হইয়া যায়, তদ্রূপ উপাধি বিনষ্ট হইলেও জীব পরমাত্মাতে লীন হইয়া যায়। “ঘটাদিষু প্রলীনেষু ঘটাকাশাদয়ো যথা। আকাশে সম্প্রলীয়ন্তে তদ্বজ্জীব ইহাত্মনি ॥ ৩।৪॥” সমস্ত সংঘাতই (দেহাদি সমষ্টিই) হইতেছে মায়ার স্থষ্টি—স্বপ্নতুল্য (অর্থাৎ সত্য নহে)। দেহাদির আধিক্যে (পশু-পক্ষী প্রভৃতির দেহ অপেক্ষা মনুষ্য-দেবতাদির দেহের উৎকর্ষে), অথবা সমতায় (সকলের দেহ যদি সমানও হয়, তাহা হইলেও), তাহার কোনও কারণ নাই ; এজন্য বুঝিতে হইবে –-এ-সমস্ত হইতেছে মায়াকৃত, এ-সমস্ত সত্য নহে। “সঙ্ঘাতাঃ স্বপ্নবৎ সর্ব্বে আত্মমায়া-বিসর্জ্জিতাঃ। আধিক্যে সর্ব্বসাম্যে বা নোপপত্তির্হি বিদ্যতে ॥ ৩।১০॥” যাহা বাস্তবিকই অসৎ (মিথ্যাভূত), মায়িক বা তাত্ত্বিক, কোনওরূপ জন্মই তাহার হইতে পারে না ; যেমন, মায়াদ্বারা বা প্রকৃত পক্ষেও, বন্ধ্যানারীর পুত্র জন্মিতে পারে না, তদ্রূপ। “অসতো মায়য়া জন্ম তত্ত্বতো নৈব যুজ্যতে। বন্ধ্যাপুত্রো ন তত্ত্বেন মায়য়া বাপি জায়তে ॥৩।২৮ ॥”

বৌদ্ধাচার্য্য নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক-কারিকাতেও অনুরূপ উক্তি দৃষ্ট হয়। “আকাশং শশশৃঙ্গঞ্চ বন্ধ্যায়াঃ পুত্র এব চ অসন্তশ্চাভিব্যয্যন্তে কল্পনা।”

স্বপ্নকালে মন যেমন মায়াদ্বারা দ্বৈতাকারে সমুদ্ভাসিত হইয়া নানাবিধ ক্রিয়া করিয়া থাকে, তদ্রূপ জাগ্রৎকালেও মন মায়াদ্বারা দ্বৈতাকারে প্রতিভাসমান হইয়া বিবিধ কার্য্য করিয়া থাকে। ‘‘যথা স্বপ্নে দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ। তথা জাগ্রদ্দ্বয়াভাসং স্পন্দতে মায়য়া মনঃ॥ ৩।২৯।”

সত্য বস্তু, বাস্তব-অস্তিত্ববিশিষ্ট বস্তু, মাত্র একটী—আত্মা বা ব্রহ্ম ; তদ্ব্যতীত অপর কোনও বস্তুরই কোনওরূপ অস্তিত্ব নাই। এজন্য সেই সত্যবস্তুটীকে “অদ্বয়” বলা হয়। তথাপি স্বপ্নে বা জাগ্রতাবস্থায় যে বহু বস্তুর প্রতীতি জন্মে, তাহার হেতু হইতেছে মায়া। এক মনই মায়াদ্বারা বিবিধ বস্তুরূপে প্রতিভাসমান হয়। ‘‘অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং মনঃ স্বপ্নে ন সংশয়ঃ। অদ্বয়ঞ্চ দ্বয়াভাসং তথা জাগ্রন্ন সংশয়ঃ ॥৩।৩০ ॥” দৃশ্যমান এই চরাচরাত্মক যাহা কিছু দ্বৈত (অদ্বয় ব্রহ্ম ব্যতীত দ্বিতীয় বস্তু) দৃষ্ট হয়, তৎসমস্তই মন, মনঃস্বরূপ ; মনেই জগতের সত্তা, মনের অতিরিক্ত জগতের সত্তা নাই। কারণ, মন যখন অমনীভাব (নিরুদ্ধাবস্থা, সঙ্কল্পবর্জ্জিতত্ব) প্রাপ্ত হয়, তখন এই দ্বৈতভাব থাকে না। “মনোদৃশ্য মিদং দ্বৈতং যৎ কিঞ্চিৎ সচরাচরম্। মনসো হ্যমনীভাবে দ্বৈতং নৈবোপলভ্যতে ॥ ৩।৩১॥” এই উক্তিও বৌদ্ধ বিজ্ঞানবাদীদের উক্তির অনুরূপ।

গৌড়পাদের উক্তির সার মর্ম্ম হইতেছে এই যে—নির্গুণ ব্রহ্মই উপাধির যোগে জীবরূপে প্রতীত হয়েন ; জীব বলিয়া বাস্তবিক কিছুই নাই। নির্গুণ ব্রহ্মের যখন জন্ম, মৃত্যু, সুখ-দুঃখাদি কিছুই নাই, তখন জীবেরও এ-সমস্ত কিছু থাকিতে পারে না। জন্ম-মৃত্যু-প্রভৃতি আছে বলিয়া যে মনে হয়, তাহা হইতেছে মায়াজনিত ভ্রম মাত্র—রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, তদ্রূপ। জীব-জগদাদি কিছুই বস্তুতঃ নাই, মায়ার প্রভাবেই এ-সমস্ত আছে বলিয়া মনে হয়। সমস্তই হইতেছে মায়াপ্রভাবাধীন মনের কার্য্য। এ-সমস্ত কিন্তু শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে ; সমস্তই বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তের প্রতিধ্বনিমাত্র ; পার্থক্য কেবল এই যে—যেস্থলে বৌদ্ধগণ "শূন্য" বলেন, সে-স্থলে গৌড়পাদ "নির্গুণ ব্রহ্ম" বলিয়াছেন।

গৌড়পাদের কারিকার চতুর্থ প্রকরণের নাম "অলাতশান্তি প্রকরণ।" একটী কাষ্ঠযষ্টির অগ্রভাগ যদি অগ্নিদ্বারা প্রজ্জ্বলিত হয় এবং সেই যষ্টিটীকে যদি অতি তীব্রবেগে ঘূর্ণিত করা হয়, তাহা হইলে একটী অগ্নির চক্র দৃষ্ট হয়। ইহাকে "অলাত" বা "অলাতচক্র" বলে। অলাতচক্রের পরিধির সর্ব্বত্র অগ্নি দৃষ্ট হইলেও বাস্তবিক যষ্টির জ্বলন্ত অগ্রভাগব্যতীত অন্যত্র কোনও স্থলেই অগ্নি থাকে না ; তথাপি যে অগ্নি আছে বলিয়া মনে হয়, ইহা ভ্রান্তি ; এই দৃশ্যমান অগ্নি হইতেছে মিথ্যা। সত্য বস্তু হইতেছে কেবল কাষ্ঠদণ্ডের অগ্রভাগস্থিত অগ্নি ; তাহারই বাস্তব অস্তিত্ব আছে। তদ্রূপ, এই দৃশ্যমান জগতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই, জগৎ মিথ্যা ; বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট সত্য বস্তু হইতেছে কেবল নির্গুণ আত্মা বা ব্রহ্ম। অলাত-জ্ঞানের শান্তি বা উপশম হইলে, জগতের মিথ্যাত্ব উপলব্ধি হইলে, বুঝা যাইবে, একমাত্র সত্য বস্তু হইতেছে আত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্ম। অলাতশান্তি-প্রকরণে গৌড়পাদ নানারূপ যুক্তির অবতারণা করিয়া এই তথ্যই প্রকাশ করিয়াছেন। তিনি পূর্ব্ব পূর্ব্ব প্রকরণে যাহা বলিয়াছেন, এই প্রকরণে তাহাই বিশদীকৃত করা হইয়াছে।

জগৎ-প্রপঞ্চ যে অলাতচক্রের ন্যায় মিথ্যা, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত গৌড়পাদ যে-সকল যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহাদের উল্লেখ করা হইতেছে।

কোনও ভূতই (সৎ-পদার্থেই) জন্মে না এবং কোনও অভূতই (অসৎ-পদার্থই) জন্মে না—এইরূপে যাঁহারা বাদানুবাদ করেন, তাঁহারা অজাতিই (অনুৎপত্তিই) খ্যাপন করিয়া থাকেন (৪।৪)। উল্লিখিত বাদ-বিবাদকারীদের অজাতিবাদ (অনুৎপত্তিবাদ) আমরা অনুমোদন করি (৪।৫)। সদসদ্-বাদীগণ অজাত ধর্ম্মেরই (দৃশ্যমান জগৎ-প্রপঞ্চেরই) জাতি (জন্ম বা উৎপত্তি) স্বীকার করেন ; কিন্তু যাহা বস্তুতঃই অজাত ও অমৃত (বিনাশরহিত), তাহা কিরূপে মর্ত্ত্যতাপ্রাপ্ত হইতে পারে ? (৪।৬)। মরণশাল (মর্ত্ত্য) পদার্থ কখনও অমর্ত্ত্য (অমরণশীল) হয় না, অমর্ত্ত্য পদার্থও কখনও মর্ত্ত্য হয় না ; কেন না, কোনও প্রকারেই বস্তুর স্বভাবের বিপর্য্যয় হইতে পারে না (৪।৭)। স্বভাবতঃই সমস্ত ধর্ম্ম (আত্মা বা জীব) জরামরণবর্জিত ; তথাপি জরামরণাদির ইচ্ছা করিয়া তাহারা স্বভাব হইতে চ্যুত হইয়া থাকে (৪।১০)। যাঁহারা মনে করেন—কারণই কার্য্য, তাঁহাদের মতে কারণই কার্য্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে ; কারণ যখন কার্য্যরূপে জন্ম গ্রহণ করে, তখন কারণকে কিরূপে "অজ"—জন্মরহিত—বলা

যায়? বিকারী বস্তুকে কিরূপে নিত্য বলা যায়? (৪।১১)। কার্য্য যদি অজ কারণ হইতে পৃথক্ না হয়, তাহা হইলে কার্য্যও অজ হইয়া পড়ে। জায়মান কার্য্য হইতে অনন্যভূত কারণ কিরূপেই বা ধ্রুব বা নিত্য হইতে পারে? (৪।১২)। যদি বল, অজ পদার্থ হইতেই দ্রব্যের উৎপত্তি; কিন্তু তাহার কোনও দৃষ্টান্ত নাই। আর, জাত পদার্থ হইতে কার্য্য জন্মিলেও অনবস্থা-দোষ আসিয়া পড়ে (৪।১৩)। যাঁহাদের মতে, ফলস্বরূপ দেহাদি-সমষ্টিই হইতেছে তাহার হেতুভূত ধর্ম্মাদির কারণ; তদ্রূপ হেতুভূত ধর্ম্মাদিই হইতেছে তৎফল দেহাদি-সমষ্টির আদি বা কারণ, তাঁহারা হেতু ও ফলের উল্লিখিতরূপ অনাদিত্ব কিরূপে বর্ণনা করিবেন? অর্থাৎ তাঁহাদের উক্তি হইতেছে যুক্তিবিরুদ্ধ (৪।১৪)। যাঁহাদের মতে ফলই (কার্য্যই) হেতুর কারণ এবং হেতুও আবার ফলের কারণ, তাঁহাদের মতে পুত্র হইতেও পিতার জন্ম সম্ভব হইতে পারে; কিন্তু তাহা অসম্ভব (৪।১৫)। কার্য্য ও কারণের উৎপত্তি স্বীকার করিলে তাহাদের পৌর্ব্বাপর্য্যও স্বীকার করিতে হইবে; কেননা, কার্য্য-কারণের যুগপৎ-উৎপত্তি স্বীকার করিলে কার্য্য-কারণরূপ সম্বন্ধই সিদ্ধ হয় না (৪।১৬)। হেতু যদি কার্য্য হইতেই উৎপন্ন হয়, তাহা হইলে তাহার হেতুত্বই সিদ্ধ হয় না; যাহা নিজেই অসিদ্ধ, তাহা কিরূপে ফলোৎপাদন করিবে (৪।১৭)? কার্য্য হইতে যদি কারণের উৎপত্তি হয় এবং কারণ হইতে যদি কার্য্যের উৎপত্তি হয়, তাহা হইলে কোন্‌টী প্রথমে উৎপন্ন হইবে (৪।১৮)? এ-সমস্ত প্রশ্নের উত্তর দিতে বাদী অসমর্থ। কার্য্য-কারণের যুগপৎ উৎপত্তি স্বীকার করিলেও বাদীকথিত উৎপত্তিক্রম বাধিত হয়। বুদ্ধদিগের অজাতিবাদই (কোনও পদার্থেরই উৎপত্তি নাই—এইরূপ মতবাদই) দোষবর্জ্জিত (৪।১৯)। কোনও কিছুই আপনা-আপনিও জন্মে না, পরের দ্বারাও উৎপন্ন হয় না। সৎই হউক, কি অসৎই হউক, কিম্বা সদসৎই হউক—কোনও বস্তুরই জন্ম হয় না (৪।২২)। অনাদি ফল হইতে তাহার কারণ জন্মিতে পারে না; অনাদি কারণ হইতেও ফল জন্মিতে পারে না; ইহাই হইতেছে বস্তুর স্বভাব। কেননা, যাহার আদি বা কারণ নাই, তাহার জন্মও হইতে পারে না (৪।২৩)। যদি বল—বাহ্য বস্তুর (শব্দস্পর্শাদি জগদ্‌বৈচিত্র্যের) অস্তিত্ব অস্বীকার করা যায় না; কেননা, বাহ্যবস্তুর উপলব্ধি—বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শে সুখ-দুঃখাদির অনুভব—আমরা পাইয়া থাকি; উপলব্ধির বিষয় অবশ্যই থাকিবে। উপলব্ধি যখন জন্মে, তখন উপলব্ধির বিষয় বাহ্যবস্তুও নিশ্চয়ই আছে (৪।২৪)। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—সত্যদৃষ্টি (ভূতদর্শন) লাভ হইলে, উপলব্ধির বিষয়ভূত বাহ্যবস্তুকে উপলব্ধির হেতু বলা যায় না। সত্যদৃষ্টিতে, ব্রহ্মদৃষ্টিতে, সমস্ত পদার্থই এক, ব্রহ্ম হইতে কিছুই ভিন্ন নহে (রজ্জুতে যেমন সর্পভ্রম হয়, অথচ সে-স্থলে সর্প বলিয়া কিছু নাই, তদ্রূপ অজ্ঞানবশতঃ ব্রহ্মস্থলে বাহ্যবস্তুর ভ্রম হয়; বাস্তবিক বাহ্যবস্তু বলিয়া কিছু নাই)। (৪।২৫)। চিত্ত কখনও বাহ্য পদার্থকে সংস্পর্শ (গ্রহণ) করে না, এবং অর্থাভাসকেও (মনঃকল্পিত বিষয়কেও) গ্রহণ করে না। কেননা, বাহ্যপদার্থ সত্য নহে এবং অর্থাভাসও চিত্ত হইতে পৃথক্ নহে (অর্থাৎ চিত্তকল্পিত বিষয়সমূহ চিত্তেরই স্বরূপ, চিত্তের অতিরিক্ত নহে)। (৪।২৬)। ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্ত্তমান এই ত্রিবিধ অবস্থাতে চিত্ত কখনও বিষয়কে স্পর্শ করে না; সুতরাং বিপর্য্যাসের (ভ্রান্তির) কারণাভূত বিষয়ই

যখন রহিল না, তখন সেই চিত্তের নির্নিমিত্ত বিপর্য্যাস (ভ্রম) কিরূপেই বা হইবে (৪।২৭) ? এ-সমস্ত কারণে বুঝা যায়—চিত্ত কখনও জন্মে না, চিত্তদৃশ্য বস্তুও জন্মে না। যাঁহারা এতাদৃশ চিত্তের জন্ম দর্শন করেন, তাঁহারা আকাশেও পক্ষিপ্রভৃতির পদচিহ্ন দর্শন করিয়া থাকেন (৪।২৮)। জন্মরহিত চিত্ত যাহা হইতে জন্ম লাভ করে, তাহার প্রকৃতিটী স্বভাবতঃই অজা। অজার জন্ম কিছুতেই সম্ভব হইতে পারে না (৪।২৯)। যাহা আদিতেও নাই, অন্তেও নাই, বর্ত্তমানেও তাহা তদ্রূপই (অর্থাৎ বর্ত্তমানেও তাহা নাই)। মিথ্যার সদৃশ হইয়াও তাহা ভ্রমবশতঃ সত্যের ন্যায় পরিলক্ষিত হয় (৪।৩১)। উৎপত্তি সিদ্ধ হয় না বলিয়া সমস্তই অজ (জন্মরহিত)। বস্তুতঃ, সত্য পদার্থ (ভূত) হইতে কখনও অসৎ পদার্থের (অভূতের) উৎপত্তি হইতে পারে না (৪।৩৮)। প্রত্যক্ষ (প্রত্যক্ষদর্শন) এবং সমাচার (দ্বৈতোচিত ব্যবহারদর্শন)-বশতঃ যেমন মায়াময় হস্তীকে "হস্তী" বলা হয়, তদ্রূপ উপলব্ধিও সমাচারবশতঃ "বস্তু আছে" বলিয়া কথিত হয় (৪।৪৪)। এক বিজ্ঞানই—জাতির (জন্মের) আভাস, ক্রিয়ার আভাস এবং বস্তুর আভাস রূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সেই বিজ্ঞান কিন্তু জাতি-ক্রিয়া-বস্তুধর্ম্মরহিত, শান্ত এবং অদ্বিতীয় (৪।৪৫)। সুতরাং চিত্ত (চিত্তকল্পিত বস্তু মাত্র) জন্মে না, ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মাও অজ। যাঁহারা ইহা জানেন, তাঁহারা আর ভ্রমে পতিত হয়েন না (৪।৪৬)। অলাতের পরিভ্রমণ যেমন সরল ও বক্রাদি নানাভাবে প্রকাশমান হয়, বিজ্ঞান-স্পন্দনও তদ্রূপ গ্রহণাকারে (বিষয়াকারে) এবং গ্রাহকাকারে প্রকাশিত হইয়া থাকে (৪।৪৭)। স্পন্দনহীন অলাত যেমন ঋজুবক্রাদি প্রকাশ বা জন্ম লাভ করে না, অস্পন্দমান (স্বরূপাবস্থ) বিজ্ঞানও তদ্রূপ বিষয়াকারে প্রতিভাত হয় না (৪।৪৮)। অলাত যখন ভ্রমণ করিতে থাকে, তখন ঋজু-বক্রাদি আকারে আভাসসমূহ কখনও অলাত ভিন্ন অন্য কারণ হইতে উৎপন্ন হয় না। স্পন্দন (ভ্রমণ) বিরত হইলেও তাহারা অন্যত্র চলিয়া যায় না, অলাতমধ্যেও প্রবেশ করে না (৪।৪৯)। অলাতচক্রে প্রতীত ঋজুবক্রাদি ভাবসমূহ যখন অবস্তু (দ্রব্যত্বভাবশূন্য, মিথ্যা), তখন অলাত হইতে তাহাদের উৎপত্তি হইতে পারে না ; জন্মাদির আভাসও তদ্রূপই ; উভয়ের মধ্যে কিছুমাত্র বিশেষ নাই (৪।৫০)। উক্ত আভাসসমূহ যখন কোনও বস্তুই নহে, তখন তাহারা বিজ্ঞান হইতে নির্গত হইতে পারে না ; কেননা, বিজ্ঞান ও আভাসের মধ্যে কার্য্যকারণ-ভাব অনুপপন্ন হওয়ায় সেই আভাস-সমূহ সর্ব্বদাই অচিন্ত্য (৪।৫২)। দ্রব্য দ্রব্যের হেতু ; অদ্রব্যের হেতুও অদ্রব্য হইতে পারে ; কিন্তু ধর্ম্মপদবাচ্য আত্মাসমূহের দ্রব্যত্ব বা অদ্রব্যত্ব কখনও উপপন্ন হয় না (৪।৫৩)। এইরূপে জানা যায়—ধর্ম্মসমূহ (বাহ্য জাগতিক-অবস্থাসমূহ) চিত্তজাত নহে, চিত্তও সেই বাহ্য ধর্ম্ম হইতে উৎপন্ন নহে। মনীষীগণ এই প্রকারেই কার্য্য ও কারণের জন্মাভাব নির্ণীত করেন (৪।৫৪)। যতক্ষণ পর্য্যন্ত কার্য্য-কারণভাবে লোকের আবেশ থাকে, ততক্ষণই কার্য্য-কারণ-ভাব প্রকাশ পায়, ততক্ষণই সংসার ; কার্য্য-কারণ-ভাবে আবেশ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে আর কার্য্য-কারণ প্রকাশ পায় না, সংসারও আর থাকে না (৪।৫৫-৫৬)। সংবৃতিদ্বারাই (ব্যবহারিক জ্ঞানেই) সমস্তের জন্ম (অর্থাৎ জন্ম আছে বলিয়া প্রতীতি) ;

কোনও বস্তুই শাশ্বত নহে। আবার, সদ্‌ভাবে (পরমার্থ সত্য ব্রহ্মরূপে) সমস্ত বস্তুই অজ—জন্মরহিত ; সুতরাং কোনও বস্তুরই উচ্ছেদ (ধ্বংস) হয় না (৪।৫৭)। ধর্ম্মপদবাচ্য যে-সমস্ত আত্মা জন্মে বলিয়া কথিত হয়, বস্তুতঃ তাহারা জন্মে না ; সে-সমস্তের জন্ম কেবল মায়া সদৃশ (ইন্দ্রজালতুল্য) ; সেই মায়াও আবার প্রকৃত পক্ষে বিদ্যমান নাই (৪।৫৮)। মায়াময় বীজ হইতে যেমন অঙ্কুর জন্মে, অথচ সেই অঙ্কুর নিত্যও নহে, উচ্ছেদীও (বিনাশশীলও) নহে, ধর্ম্মসমূহের উৎপত্তি-বিনাশও তদ্রূপ (৪।৫৯)। স্বপ্নে বা ইন্দ্রজালে যেমন লোক সকল জন্মে, আবার মরেও, এই দৃশ্যমান জগৎও তদ্রূপ (৪।৬৮)। কল্পিত সংবৃতি-দ্বারা (ব্যবহারিক-ভাবের কল্পনায়) যাহা আছে বলিয়া মনে হয়, পরমার্থ-বিচারে তাহা বাস্তবিক নাই (৪।৭৩)। পদার্থ—আছে, নাই, আছেও—নাইও, আছেও না– নাইও না, তাহাদের গতি আছে, বা গতি নাই—স্থির, বা উভয়াত্মক—ইত্যাদি ভাবে মূঢ় লোকেরাই আত্মাকে আবৃত করিয়া থাকে (৪।৮৩)।

উল্লিখিত প্রকারে গৌড়পাদ তাঁহার "অজাতিবাদ" অর্থাৎ পরিদৃশ্যমান জীব-জগদাদির উৎপত্তি-রাহিত্য এবং বিনাশরাহিত্য প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। সমস্ত বস্তুই অলাতচক্রের ন্যায় মিথ্যা—মায়াময়। তিনি যে তত্ত্ব স্থাপন করিতে চাহিয়াছেন, তাহা হইতেছে বৌদ্ধদের কথিত তত্ত্ব। গৌড়পাদের কারিকার আলোচনা করিয়া ডক্‌টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বলিয়াছেন—নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক-কারিকার এবং লঙ্কাবতারসূত্রের বিজ্ঞানবাদে যে সমস্ত তত্ত্ব প্রকাশ করা হইয়াছে, গৌড়পাদের কারিকায় সে-সমস্তই গৃহীত হইয়াছে; উভয়ের সাদৃশ্য এতই সুস্পষ্ট যে, এই সাদৃশ্য প্রমাণের চেষ্টাও অনাবশ্যক। (১)

ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণন্‌ও বলেন—গৌড়পাদের কারিকার ভাষা এবং ভাবধারার সহিত বৌদ্ধ মাধ্যমিক গ্রন্থের সহিত অদ্ভুত সাদৃশ্য বিদ্যমান ; মাধ্যমিক গ্রন্থে যে সকল দৃষ্টান্ত আছে, গৌড়পাদের কারিকাতেও তাহাদের মধ্যে অনেকটী দৃষ্ট হয়। কারিকাতে বৌদ্ধ যোগাচারের মত উল্লিখিত হইয়াছে এবং ছয়বার বুদ্ধদেবের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। (২)

নাগার্জ্জুনের এবং গৌড়পাদের কয়েকটী সদৃশবাক্য এ-স্থলে উদ্ধৃত করিয়া ডক্‌টর রাধাকৃষ্ণনের উক্তির যাথার্থ্য প্রদর্শিত হইতেছে।

---

(১) It is so obvious that these doctrines are borrowed from the Madhyamika doctrines as found in the Nagarjuna's Karikas and the Vijnanavada doctrines, as found in *Lankavatara*, that it is needless to attempt to prove it.—*A History of Indian Philosophy*, by S. N. Dasgupta, Vol. I, 3rd impression, P. 429.

(২) Indeed, in language and thoughts the Karika of Gaudapada bears a striking resemblence to the Madhyamika writings and contains many illustrations used in them. It refers to the *Yogachara* views, and mentions the name of Buddha half a dozen times.—*Indian Philosophy*, by S. Radhakrishnan, Vol. II. 1941, P. 453.

(১) নাগার্জ্জুন বলিয়াছেন—"ন স্বতো জায়তে ভাবঃ পরতো নৈব জায়তে। প্রকৃতেরন্যথা ভাবো ন জাতূপপদ্যতে॥"

গৌড়পাদের কারিকাতেও লিখিত আছে—"স্বতো বা পরতো বাপি ন কিঞ্চিৎ বস্তু জায়তে। ৪।২২॥ প্রকৃতেরন্যথা ভাবো ন কথঞ্চিদ্ ভবিষ্যতি॥ ৪।২৯॥"

(২) নাগার্জ্জুন বলেন—"যথা মায়া যথা স্বপ্নো গন্ধর্ব্বনগরং যথা। তথোৎপাদস্তথা স্থানং তথা ভঙ্গ উদাহৃতঃ॥"

বৌদ্ধদের প্রাচীন গ্রন্থ লঙ্কাবতারসূত্রও বলেন—"স্বপ্নোয়ঽমথবা মায়া নগরং গন্ধর্ব্ব-শব্দিতম্। তিমিরো মৃগতৃষ্ণা বা স্বপ্নো বন্ধ্যাপ্রসূরয়ম্॥"

আর, গৌড়পাদ বলেন—"স্বপ্নমায়ে যথা দৃষ্টে গন্ধর্ব্বনগরং যথা। তথা বিশ্বমিদং দৃষ্টং বেদান্তেষু বিচক্ষণৈঃ॥২।৩১॥"

(৩) নাগার্জ্জুন বলেন—"নৈবাগ্রং নাবরং যস্য তস্য মধ্যং কুতো ভবেৎ॥"

আর গৌড়পাদ বলেন—"আদাবন্তে চ যন্নাস্তি বর্ত্তমানেঽপি তৎ তথা॥২।৬॥, ৪।৩১॥"

(৪) নাগার্জ্জুন বলেন—"শূন্যমাধ্যাত্মিকং পশ্য পশ্য শূন্যং বহির্গতম্॥"

আর, গৌড়পাদ বলেন—"তত্ত্বমাধ্যাত্মিকং দৃষ্ট্বা তত্ত্বং দৃষ্ট্বা তু বাহ্যতঃ।২।৩৮॥"

নাগার্জ্জুনের "শূন্য"-স্থলে গৌড়পাদ কেবল "তত্ত্ব" বসাইয়াছেন।

(৫) লঙ্কাবতারসূত্র বলেন—"নচোৎপাদ্যং নচোৎপন্নং প্রত্যয়েঽপি ন কেচন। সংবিদ্যন্তে ক্বচিৎ কেচিদ্ ব্যবহারস্তু কথ্যতে॥"

গৌড়পাদও তাঁহার কারিকায়, বিশেষতঃ অলাতশান্তি-প্রকরণে, প্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন যে, কোনও দ্রব্যেরই উৎপত্তি নাই, বিনাশও নাই; তবে যে বিনাশ-উৎপত্তি আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা কেবল সংবৃতিবশতঃ (ব্যবহারিক-জ্ঞানবশতঃ)। "সংবৃত্যা জায়তে সর্ব্বং শাশ্বতং নাস্তি তেন বৈ। সদ্ভাবেন হ্যজং সর্ব্বমুচ্ছেদস্তেন নাস্তি বৈ॥৪।৫৭॥"

এই জাতীয় দৃষ্টান্ত আরও অনেক আছে। বৌদ্ধশাস্ত্রের প্রতিপাদ্য তত্ত্বই গৌড়পাদেরও প্রতিপাদ্য। বৌদ্ধমতে পরিদৃশ্যমান জীবজগতের উৎপত্তি নাই, বিনাশ নাই, স্থিতি নাই; সমস্তই মায়া, ইন্দ্রজাল, মৃগতৃষ্ণিকা। গৌড়পাদও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। পার্থক্য কেবল এই—বৌদ্ধ-গণ "শূন্য"কে পরমার্থ তত্ত্ব বলিয়াছেন; আর, গৌড়পাদ "নির্গুণ আত্মা বা নির্গুণ ব্রহ্মকে" পরমার্থ সত্য বলিয়াছেন।

অলাতশান্তি-প্রকরণের সর্ব্বপ্রথম শ্লোকে গৌড়পাদ বুদ্ধদেবকে "দ্বিপদাং বরঃ—মনুষ্যশ্রেষ্ঠ" বলিয়া বন্দনা করিয়াছেন।

"জ্ঞানেনাকাশকল্পেন ধর্ম্মান্ যো গগনোপমান্।
জ্ঞেয়াভিন্নেন সম্বুদ্ধস্তং বন্দে দ্বিপদাং বরম্॥৪।১॥

—যে জ্ঞান জ্ঞেয় হইতে অভিন্ন, সেই আকাশকল্প জ্ঞানের দ্বারা যিনি গগনোপম ধর্ম্ম-সমূহ সম্যক্‌রূপে অবগত হইয়াছেন, সেই দ্বিপদশ্রেষ্ঠকে বন্দনা করি।"

ঠিক এইরূপ কথাতে নাগার্জ্জুনও তাঁহার মাধ্যমিক-কারিকাতে "বদতাং বরম্"কে বন্দনা করিয়াছেন।

"অনিরোধমনুৎপাদমনুচ্ছেদমশাশ্বতম্। অনেকার্থমনানার্থমনাগমমনির্গমম্॥
যঃ প্রতীত্যসমুৎপাদং প্রপঞ্চোপশমং শিবম্। দেশয়ামাস সম্বুদ্ধস্তং বন্দে বদতাং বরম্॥

—মাধ্যমিকবৃত্তি, পৃ, ৩॥

—সমুৎপাদকে (অর্থাৎ ব্যবহারিকভাবে যাহার উৎপত্তি আছে বলিয়া মনে হয়, তাহাকে) উৎপত্তি-নিরোধ-উচ্ছেদশূন্য, অশাশ্বত, অনেকার্থ, অনানার্থ, অনাগম, অনির্গম জানিয়া যে সম্বুদ্ধ শিব-প্রপঞ্চোপশমের উপদেশ করিয়াছেন, উপদেষ্টার মধ্যে সেই শ্রেষ্ঠকে (বদতাং বরম্) বন্দনা করি।"

নাগার্জ্জুন নিজে ছিলেন বৌদ্ধ এবং বৌদ্ধমত-প্রচারক। উল্লিখিত বন্দনাশ্লোকে "অনিরোধমনুৎ-পাদম্"-ইত্যাদিবাক্যে বৌদ্ধমতেরই উল্লেখ করা হইয়াছে; বুদ্ধদেবই এই বৌদ্ধমতের প্রবর্ত্তক। সুতরাং নাগার্জ্জুন যে "বদতাং বরম্—উপদেষ্টৃশ্রেষ্ঠ" এবং "সম্বুদ্ধ" বলিয়া গৌতমবুদ্ধদেবেরই বন্দনা করিয়াছেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

আর, গৌড়পাদ তাঁহার বন্দনা-শ্লোকে যে গগনোপম ধর্ম্মসমূহের কথা বলিয়াছেন, তৎ-সমস্তও হইতেছে বৌদ্ধদের কথিত ধর্ম্ম; জ্ঞান ও জ্ঞেয়ের অভেদও বৌদ্ধমতই। এ-সমস্ত যিনি আকাশকল্প জ্ঞানের দ্বারা জানিয়াছেন, তিনি বুদ্ধদেবই হইবেন। এই বুদ্ধদেবকেই নাগার্জ্জুনের ন্যায় গৌড়পাদও "সম্বুদ্ধ" বলিয়াছেন। নাগার্জ্জুন তাঁহাকে "বদতাং বরঃ" বলিয়াছেন; আর, গৌড়পাদ "দ্বিপদাং বরঃ" বলিয়াছেন। বাচ্য ব্যক্তি একই।

মাণ্ডুক্য-কারিকা-ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর "সম্বুদ্ধঃ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন— "সম্বুদ্ধঃ সম্বুদ্ধবান্ নিত্যমেব ঈশ্বরো যো নারায়ণাখ্যঃ—নারায়ণ-নামক যে ঈশ্বর গগনোপম ধর্ম্মসমূহকে নিত্যই অবগত আছেন, তিনি সম্বুদ্ধ।" আর, "দ্বিপদাং বরম্"-বাক্যের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"দ্বিপদাং বরং দ্বিপদোপলক্ষিতানাং পুরুষাণাং বরং প্রধানং পুরুষোত্তমম্ ইত্যভিপ্রায়ঃ।—দ্বিপদ পুরুষগণের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—পুরুষোত্তম।" শ্রীপাদ শঙ্করের অভিপ্রায় বোধ হয় এই যে—গৌড়পাদ এ-স্থলে পুরুষোত্তম নারায়ণকেই সম্বুদ্ধ বলিয়াছেন এবং বন্দনা করিয়াছেন। অলাত-শান্তি-প্রকরণে গৌড়পাদ বৌদ্ধমতই ব্যক্ত করিয়াছেন। নারায়ণ বৌদ্ধমতের প্রবর্ত্তক নহেন; সুতরাং তিনি নারায়ণের বন্দনা করিবেন কেন? মত-প্রবর্ত্তক আচার্য্যের বন্দনাই স্বভাবিক এবং শিষ্টাচার-সম্মত। সুতরাং গৌড়পাদ এ-স্থলে যে বুদ্ধদেবেরই বন্দনা করিয়াছেন, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে গৌড়পাদ তাঁহার কারিকায় অনেকস্থলে নাগার্জ্জুনের ভাবাদির অনুকরণ করিয়াছেন; এই বন্দনা-শ্লোকেও তিনি নাগার্জ্জুনেরই অনুকরণ করিয়াছেন।

অলাতশান্তি-প্রকরণে গৌড়পাদ তাঁহার "অজাতিবাদকে" পরিস্ফুট করার চেষ্টা করিয়াছেন। ইহা যে বৌদ্ধদিগের মত, তাহা তিনি—"এবং হি সর্ব্বথা বুদ্ধৈরজাতিঃ পরিদীপিতা"-বাক্যে ৪।১৯-শ্লোকে বলিয়া গিয়াছেন। যাঁহারা মনে করেন যে, তাঁহারা প্রত্যক্ষভাবে বস্তুদর্শন করেন এবং বস্তুর ব্যবহারও করেন এবং জন্মাভাবের কথায় যাঁহারা ভীত হয়েন, সে-সমস্ত বস্তুবাদীদের জন্যই যে বুদ্ধগণ উৎপত্তির উপদেশ করিয়াছেন, গৌড়পাদ ৪।৪২-শ্লোকে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। ৪।৯৮-শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—সমস্ত ধর্ম্মই স্বভাবতঃ নির্ম্মল, আবরণহীন; বুদ্ধগণ এবং মুক্ত নায়কগণ প্রথমে ইহা অবগত হয়েন। এইরূপে দেখা যায়—জীব-জগৎসম্বন্ধে গৌড়পাদ তাঁহার কারিকায় যাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা যে বৌদ্ধ-মতানুযায়ী—একথা তিনি নিজেও জানাইয়া গিয়াছেন।

গৌড়পাদ বৌদ্ধদিগের অনেক পারিভাষিক শব্দও স্বীয় কারিকায় গ্রহণ করিয়াছেন। "পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ"-অর্থেই তিনি সর্ব্বত্র "ধর্ম্ম"-শব্দের ব্যবহার করিয়াছেন। বৌদ্ধ-শাস্ত্রেই "ধর্ম্ম"-শব্দের এতাদৃশ অর্থ দৃষ্ট হয়, শ্রুতি-স্মৃতিতে এই অর্থে "ধর্ম্ম"-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। জৈমিনি বলেন—"চোদনালক্ষণঃ অর্থঃ ধর্ম্মঃ—যাহা বেদে উপদিষ্ট হইয়াছে, তাহা ধর্ম্ম"। "বেদপ্রণিহিতো ধর্ম্মঃ।" কোনও স্থলে বস্তুর স্বভাবকেও শ্রুতিস্মৃতিতে বস্তুর ধর্ম্ম বলা হয়; যেমন, দাহিকা-শক্তি হইতেছে অগ্নির ধর্ম্ম। কিন্তু বৌদ্ধশাস্ত্রে "ধর্ম্ম"-শব্দ অন্য অর্থে ব্যবহৃত হয়।

"সম্বৃতি" এবং "পরমার্থ"-এই দুইটীও বৌদ্ধদের পারিভাষিক-শব্দ। গৌড়পাদ এই দুইটী শব্দও অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন।

জগতের মিথ্যাত্ব প্রতিপাদনের জন্য গৌড়পাদ যে অলাতচক্রের দৃষ্টান্ত অবতারিত করিয়াছেন, লঙ্কাবতারসূত্রেও সেই দৃষ্টান্তটী দৃষ্ট হয়। "অলাতচক্রধূমো বা যদহং দৃষ্টবানিহ।"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল—গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকায় জীব-জগদাদিসম্বন্ধে বৌদ্ধমতই প্রপঞ্চিত করিয়াছেন; বিশেষত্ব এই যে—তিনি বৌদ্ধদের "শূন্য"-স্থলে "নির্গুণব্রহ্মের" কথা বলিয়াছেন।

৭০। গৌড়পাদ ও শঙ্করাচার্য্য

শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার পরমগুরু গৌড়পাদের সমস্ত সিদ্ধান্তই অবিকলভাবে গ্রহণ করিয়াছেন। সিদ্ধান্ত-বিষয়ে গৌড়পাদের এবং শঙ্করের মধ্যে পার্থক্য কিছুই নাই। অন্য বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হয়; যথা,

ক। জীব-জগদাদি-বিষয়ে গৌড়পাদের সিদ্ধান্ত যে বৌদ্ধসিদ্ধান্ত, গৌড়পাদ তাহা অস্বীকার করেন নাই; বরং এ-সকল সিদ্ধান্তের সম্পর্কে "বুদ্ধ"-শব্দের উল্লেখ করিয়া তিনি তাহা পরিষ্কারভাবেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এ-বিষয়ে তাঁহার কপটতা নাই।

কিন্তু তাঁহার গৃহীত এবং অনুসৃত সিদ্ধান্ত যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত, তাহা সম্যক্‌রূপে জানিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন নাই। "গৌড়পাদের সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে"—স্পষ্ট কথায় তাহা তিনি বলেন নাই বটে ; কিন্তু যে-যে স্থলে গৌড়পাদ "বুদ্ধ"-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সে স্থলে তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকা-ভাষ্যে, "বুদ্ধ"-শব্দের "পণ্ডিত" অর্থ করিয়া সাধারণ লোককে তিনি জানাইতে চাহিয়াছেন যে, গৌড়পাদ যে সিদ্ধান্তের কথা বলিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নহে, পরন্ত "পণ্ডিত"দিগের সিদ্ধান্ত। "বুদ্ধ"-শব্দের যে "পণ্ডিত" অর্থ হইতে পারে না, তাহা নহে ; কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতিতে "পণ্ডিত বা জ্ঞানী" অর্থে 'বুদ্ধ"-শব্দের প্রয়োগ দৃষ্ট হয় না। বিশেষতঃ, যে সিদ্ধান্তের প্রসঙ্গে গৌড়পাদ "বুদ্ধ"-শব্দের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগেরই সিদ্ধান্ত ; অপর কোনও পণ্ডিত ঐরূপ সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়া থাকিলে শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার উক্তির সমর্থনে তাঁহার নাম অবশ্যই উল্লেখ করিতেন ; তিনি তাহা করেন নাই।

তথাপি কিন্তু, বোধহয় নিজের অজ্ঞাতসারেই, মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন যে, পরতত্ত্বের স্বরূপব্যতীত অন্য বিষয়ে গৌড়পাদের সিদ্ধান্ত বৌদ্ধ সিদ্ধান্তই। গৌড়পাদ তাঁহার কারিকায় লিখিয়াছেন—"ক্রমতে ন হি বুদ্ধস্য জ্ঞানং ধর্ম্মেষু তায়িনঃ। সর্ব্বে ধর্ম্মাস্তথা জ্ঞানং নৈতদ্ বুদ্ধেন ভাষিতম্ ॥৪।৯৯॥—প্রজ্ঞাবান্ জ্ঞানী বা পরমার্থদর্শী পুরুষের জ্ঞান অপর কোনও বিষয়ে সংক্রামিত হয় না। সমস্ত আত্মা ও জ্ঞান [কোথাও সংক্রামিত হয় না] এই সিদ্ধান্তটী বুদ্ধদেব কর্তৃক কথিত হয় নাই, অর্থাৎ ইহা বৌদ্ধসিদ্ধান্ত নহে ; পরন্তু ইহা ঔপনিষদ সিদ্ধান্ত। মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-কৃত অনুবাদ।"

শ্লোকের শেষার্দ্ধে যে তত্ত্ব প্রকাশিত হইয়াছে, গৌড়পাদ বলেন, তাহা বুদ্ধদেবের কথিত নহে। ইহা দ্বারা বুঝা যায়, অন্য সিদ্ধান্তগুলি বুদ্ধদেবেরই কথিত।

যাহা হউক, উল্লিখিত কারিকা-শ্লোকের শেষার্দ্ধের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—"জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদরহিতং পরমার্থতত্ত্বমদ্বয়মেতৎ ন বুদ্ধেন ভাষিতম্। যদ্যপি বাহ্যার্থ-নিরাকরণং জ্ঞানমাত্রকল্পনা চাদ্বয়বস্তুসামীপ্যম্ উক্তম্। ইদন্তু পরমার্থতত্ত্বম্ অদ্বৈতং বেদান্তেষ্বেব বিজ্ঞেয়-মিত্যর্থঃ ॥—যদিও বাহ্যপদার্থের অস্তিত্ব-খণ্ডন এবং একমাত্র জ্ঞানসত্তাস্থাপন অদ্বয় বস্তুরই (বুদ্ধ-সম্মত বিজ্ঞানেরই) খুব সন্নিকৃষ্ট কথা উক্ত হইয়াছে, অর্থাৎ যদিও আলোচ্য অদ্বৈতবাদ বৌদ্ধ বিজ্ঞানের অত্যন্ত অনুরূপ, তথাপি জ্ঞান, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতা,—এই ত্রিবিধ ভেদ বর্জ্জিত এই অদ্বিতীয় পরমার্থতত্ত্ব বুদ্ধকর্তৃক কথিত হয় নাই, [অর্থাৎ বৌদ্ধসিদ্ধান্ত হইতে ইহা সম্পূর্ণ পৃথক্]। পরন্তু, এই অদ্বৈত পরমাত্মতত্ত্বটি বেদান্ত-শাস্ত্রোক্ত বলিয়াই জানিতে হইবে॥ মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-কৃত অনুবাদ ॥"

শ্রীপাদ শঙ্করের (বা গৌড়পাদের) কথিত নির্গুণ ব্রহ্ম হইতেছেন জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদ-রহিত। শ্রীপাদ শঙ্কর (বা গৌড়পাদ) বলেন—বুদ্ধদেব এই তত্ত্বটীর কথা বলেন নাই। শ্রীপাদ

শঙ্কর বা গৌড়পাদ এ-স্থলে বুদ্ধদেবের কথা বলেন কেন? ত্রিবিধ-ভেদরহিত জ্ঞানসত্তার কথা বুদ্ধদেব বলেন নাই, যদিও বাহ্য জগতের অনস্তিত্বের কথা তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা শঙ্করের বা গৌড়পাদের অভিমতের অনুরূপ—এইরূপ উক্তিতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—পরতত্ত্বরূপে নির্গুণব্রহ্মের কথা ব্যতীত বাহ্য জগতের অনস্তিত্বাদি অন্য সমস্ত কথাই যে বুদ্ধদেব-কথিত, তাহাই শ্রীপাদ শঙ্কর এবং গৌড়পাদ স্বীকার করিয়া লইতেছেন। এইরূপে দেখা গেল—নির্গুণ ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য সমস্ত সিদ্ধান্তই যে বৌদ্ধ-সিদ্ধান্ত, ইহা শ্রীপাদ শঙ্করও প্রকারান্তরে স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

বুদ্ধদেবের কথিত "শূন্যতত্ত্ব"কেও জ্ঞান-জ্ঞেয়-জ্ঞাতৃ-ভেদবর্জ্জিত তত্ত্বই বলা যায়। কেননা, তাঁহার মতে সমস্তই যখন শূন্য—সত্তাহীন, তখন জ্ঞান, জ্ঞেয় এবং জ্ঞাতাও সত্তাহীন। এ-সমস্তের যখন সত্তাই নাই, তখন "শূন্যতত্ত্বে"ই বা এ-সমস্ত কিরূপে থাকিবে? থাকিলে সেই তত্ত্বটীকে "শূন্য"ই বা বলা হইবে কেন? বস্তুতঃ, শ্রীপাদ শঙ্করের জ্ঞানসত্তামাত্র নির্গুণ ব্রহ্মও শূন্যতুল্যই; এবিষয়ে শঙ্করের সিদ্ধান্তও বৌদ্ধসিদ্ধান্তেরই ছায়ামাত্র। পার্থক্য এই,—বৌদ্ধদের "শূন্য" হইতেছে "কিছুনা", আর শঙ্করের "নির্গুণব্রহ্ম" হইতেছেন "কিছু।" শ্রীপাদ শঙ্করের বহুপূর্ব্বে বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষও যে তাহা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পরবর্ত্তী ৭২-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইবে।

শ্রীপাদ শঙ্কর কোনও কোনও বৌদ্ধমতের খণ্ডন করিয়াছেন বটে; কিন্তু তিনি উল্লিখিত বৌদ্ধসিদ্ধান্তগুলির খণ্ডন করেন নাই। শূন্যবাদীরা "শূন্যকে"ই একমাত্র "সত্য" বলিয়া মনে করেন; শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা স্বীকার করেন নাই; তিনি বলিয়াছেন—"অদ্বৈতব্রহ্মই" একমাত্র সত্য। কিন্তু শূন্যবাদীরা যে পরিদৃশ্যমান জগতের মিথ্যাত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন, সেই মিথ্যাত্ব তিনি গ্রহণ করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধ "ক্ষণিকবাদ" খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু ক্ষণিকবাদীদের স্বীকৃত জগতের মিথ্যাত্ব খণ্ডন করেন নাই। বৌদ্ধবিজ্ঞানবাদীরা বলেন, জগৎ মিথ্যা হইলেও বাহিরে তাহা আছে বলিয়া মনে হয় বটে; কিন্তু এই মিথ্যা জগৎও বাস্তবিক বাহিরে নহে—তাহা হইতেছে ভিতরে, মনের মধ্যে। এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন—জগৎ বাহিরে অবস্থিত। কিন্তু বিজ্ঞানবাদীদের কথিত জগতের মিথ্যাত্ব শ্রীপাদ শঙ্কর অস্বীকার করেন নাই। এজন্যই ডক্টর দাসগুপ্ত বলিয়াছেন—শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধ দিঙ্‌নাগের বিজ্ঞানবাদ খণ্ডন করিতে চেষ্টা করিয়াছেন; কিন্তু তিনি বসুবন্ধুর মতের খণ্ডন করেন নাই (১)। ডক্টর রাধাকৃষ্ণন্‌ও লিখিয়াছেন—তৎকালে প্রচলিত বৌদ্ধমতের বিরুদ্ধেই শ্রীপাদ শঙ্কর লেখনী ধারণ করিয়াছেন; কিন্তু বুদ্ধদেবের উপদেশের প্রতিবাদ করেন নাই (২)।

শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধদিগের কোনও কোনও মতের খণ্ডন করিয়াছেন বলিয়া সাধারণ লোক

(১) The Cultural Heritage of India, 2nd edition, Introduction, P.7

(২) *Indian Philosophy*, by S. Radhakrishnan, vol. II, P. 673.

মনে করিতে পারেন—তিনি সমস্ত বৌদ্ধমতেরই খণ্ডন করিয়াছেন ; সুতরাং তিনি যে মতের প্রচার করিয়াছেন, তাহা বৌদ্ধমত হইতে পারে না। আবার, কেহ কেহ ইহাও মনে করিতে পারেন যে—শঙ্করের পক্ষে কোনও কোনও বৌদ্ধমতের খণ্ডন হইতেছে—তাঁহার প্রচারিত মত যে বৌদ্ধমত নহে, তাহা জানাইবার প্রয়াসমাত্র।

খ। গৌড়পাদ মনে করিয়াছেন, বৌদ্ধমতের সহিত শ্রুতিমতের পার্থক্য নাই। তাই, তাঁহার প্রচারিত মত যে বৌদ্ধ মত, তাহা গোপন করিবার চেষ্টা তিনি করেন নাই।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর জানাইতে চাহিয়াছেন—গৌড়পাদ তাঁহার কারিকায় যে সমস্ত সিদ্ধান্তের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত হইতেছে শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত।

গ। গৌড়পাদ বৌদ্ধভাবাবিষ্টচিত্ত ছিলেন বলিয়া মনে করিয়াছেন—বৌদ্ধমতে এবং শ্রুতির মতে পার্থক্য নাই ; কিন্তু শ্রুতিবাক্যের, বা ব্রহ্মসূত্রের, বা বাদরায়ণের কোনও উক্তির আলোচনা-দ্বারা তিনি তাহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই।

শ্রীপাদ শঙ্কর কিন্তু ব্রহ্মসূত্রের এবং কয়েকটী শ্রুতির ভাষ্য করিয়া দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন যে, গৌড়পাদের কথিত সিদ্ধান্তগুলি শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত। ব্রহ্মসূত্রের বা শ্রুতির ভাষ্য রচনায় তাঁহার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল গৌড়পাদের সিদ্ধান্তগুলি যে শ্রুতিদ্বারা সমর্থিত, তাহা প্রদর্শন করা। শ্রুতির বা ব্রহ্মসূত্রের সহজ-মুখ্যার্থ নির্ণয়ের চেষ্টা তিনি করেন নাই। এজন্য স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য তিনি শ্রুতিবাক্যের বিকৃত অর্থও করিয়াছেন। কোনও স্থলে বা শ্রুতিবাক্যবহির্ভূত কোনও শব্দের অধ্যাহার করিয়া, কখনও বা শ্রুতিকথিত কোনও শব্দের প্রত্যাহার করিয়া, তাঁহার অভীষ্ট অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টা করিয়াছেন ; কোনও কোনও স্থলে উল্লিখিত কৌশলেও তাঁহার অভীষ্ট অর্থ নিষ্কাশিত করিতে না পারিয়া শ্রুতিবাক্যটীকে সাক্ষাতে রাখিয়া নিজের অভিমতই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। কোনও স্থলে যখন দেখিয়াছেন, শ্রুতিবাক্য স্পষ্টভাবেই তাঁহার মতের বিরোধী, তখন শ্রুতিবাক্যকে তিরস্কারও করিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ঘ। বৌদ্ধগণ যে-অর্থে "ধর্ম্ম"-শব্দের প্রয়োগ করেন, গৌড়পাদও সেই অর্থেই "ধর্ম্ম"-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধদের অর্থে "ধর্ম্ম"-শব্দের ব্যবহার করেন নাই ; "ধর্ম্ম"-শব্দের প্রয়োগ না করিয়া বৌদ্ধ "ধর্ম্ম"-শব্দের বাচ্য বস্তুরই তিনি উল্লেখ করিয়াছেন। ইহাও কি তাঁহার পক্ষে বৌদ্ধমতকে প্রচ্ছন্ন করার কৌশল কিনা, তাহা তিনিই বলিতে পারেন।

ঙ। বৌদ্ধগণ "ব্যবহারিক" অর্থে "সম্বৃতি"-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন ; গৌড়পাদও "সম্বৃতি"-শব্দেরই প্রয়োগ করিয়াছেন।

কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্কর "সম্বৃতি"-স্থলে "ব্যবহারিক"-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। বৌদ্ধদের "পারমার্থিক"-শব্দ গৌড়পাদের ন্যায় শ্রীপাদ শঙ্করও রাখিয়াছেন। পরমার্থ, বা পারমার্থিক শব্দ

শ্রুতি-স্মৃতিতেও দৃষ্ট হয়। কিন্তু "ব্যবহারিক" অর্থে "সম্বৃতি"-শব্দের প্রয়োগ শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না। ইহাও শ্রীপাদ শঙ্করের একটী কৌশল কিনা, তিনিই জানেন।

মুখ্যতঃ উল্লিখিত কয়টী বিষয়েই গৌড়পাদ ও শঙ্করের মাধ্যে পার্থক্য; সিদ্ধান্ত-বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে পার্থক্য কিছু নাই। গৌড়পাদের কারিকার সিদ্ধান্তগুলি যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর যখন গৌড়পাদের সিদ্ধান্তই অবিকল ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন, তখন তাঁহার সিদ্ধান্তও যে বস্তুতঃ বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তই, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। অবশ্য শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা স্বীকার কারেন নাই; তিনি প্রতিপন্ন করিতে চাহিয়াছেন—তাঁহার সিদ্ধান্ত হইতেছে শ্রুতিরই সিদ্ধান্ত (যদিও তিনি তাহা প্রতিপন্ন করিতে পারেন নাই, ইহা পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনাতেই প্রদর্শিত হইয়াছে)। বস্তুতঃ তিনি বৌদ্ধ-সিদ্ধান্তগুলিকেই শ্রুতির আবরণে প্রচার করিয়াছেন। বৌদ্ধসিদ্ধান্তে এবং গৌড়পাদের বা শঙ্করাচার্য্যের সিদ্ধান্তে পার্থক্য হইতেছে কেবল নিত্য সত্য বস্তু সম্বন্ধে; বৌদ্ধেরা বলেন, সত্য বস্তু হইতেছে "শূন্য"; আর শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন, সত্য বস্তু হইতেছে "নির্গুণ ব্রহ্ম।" কিন্তু তাঁহার "নির্গুণ ব্রহ্মও" যে "শূন্যের"ই তুল্য, শূন্যকল্প,—শূন্যের ছায়ামাত্র, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এ-সমস্ত কারণেই শ্রীপাদ শঙ্করের মতকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত"—শ্রুতিদ্বারা আচ্ছাদিত বৌদ্ধমত—বলা হয়।

কেবল পরিদৃশ্যমান জীবজগৎ-সম্বন্ধেই যে বৌদ্ধমতে এবং শঙ্করমতে ঐক্য আছে, এবং পরতত্ত্ব-সম্বন্ধেও যে শঙ্করমত বৌদ্ধমতকল্প, তাহাই নহে; মোক্ষ এবং মোক্ষের সাধন সম্বন্ধেও উভয় মতের বিশেষ সাদৃশ্য আছে।

শ্রীপাদ শঙ্করের "মোক্ষ" এবং বৌদ্ধদের "নির্ব্বাণ"-এই দুইয়ের মধ্যে যে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই, ডক্টর রাধাকৃষ্ণনের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫৯-অনুচ্ছেদে) তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে বৌদ্ধদের "নির্ব্বাণ" হইতেছে—"শূন্যতাপ্রাপ্তি"; আর শ্রীপাদ শঙ্করের "মোক্ষ" হইতেছে "নির্গুণ-ব্রহ্মত্ব-প্রাপ্তি"। নির্গুণ ব্রহ্মে এবং শূন্যে যখন প্রকৃত প্রস্তাবে পার্থক্য বিশেষ কিছু নাই, শ্রীপাদ শঙ্করের মোক্ষে এবং বৌদ্ধদের নির্ব্বাণেও পার্থক্য বিশেষ কিছু থাকিতে পারে না। বিশেষতঃ, শঙ্করের "নির্গুণ ব্রহ্ম - সর্ব্ববিধ বিশেষত্বহীন ব্রহ্ম—অস্তিতামাত্ররূপ ব্রহ্ম" যে শ্রুতিস্মৃতি-সিদ্ধ নহে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। যাহা শ্রুতিস্মৃতিসিদ্ধই নহে, তাহার সহিত একত্ব-প্রাপ্তিই বা কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে?

সাধন-সম্বন্ধেও যে বৌদ্ধমতে এবং শঙ্করমতে বিশেষ সাদৃশ্য আছে, পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৮-অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শঙ্করমতে যে সাধন, তাহা যে শ্রুতিসম্মত নহে, তাহাও সে-স্থলে প্রদর্শিত হইয়াছে।

বৌদ্ধদের ন্যায় শ্রীপাদ শঙ্করও যখন বলেন—গুরু মিথ্যা, শিষ্য মিথ্যা, গুরুর উপদেশ মিথ্যা,

শাস্ত্র মিথ্যা, বন্ধন মিথ্যা, মোক্ষ মিথ্যা, তখন তাঁহার মতে সাধনের অবকাশই বা কোথায় ? তবে শ্রুতিতে যে সাধনের উপদেশ আছে, তিনি বলেন, তাহা কেবল নিম্ন অধিকারী অজ্ঞ লোকদের জন্য।

"মায়া"-শব্দ শ্রুতি-স্মৃতিতেও আছে, বৌদ্ধগ্রন্থেও আছে; বৈদিকী মায়া এবং বৌদ্ধ মায়া যে এক নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধমায়াই স্বীকার করিয়াছেন এবং শ্রুতি-স্মৃতিতে যে-সকল স্থলে "মায়া"-শব্দ আছে, সে-সকল স্থলে "বৌদ্ধমায়া"র অর্থেই বৈদিকী মায়ার অর্থ করিয়াছেন। এজন্য শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের প্রকৃত তাৎপর্য্য সে-সকল স্থলে তিনি উদ্‌ঘাটিত করিতে পারেন নাই। স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির জন্যই, অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতি হইতে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত নিষ্কাশনের জন্যই, তাঁহাকে এইরূপ করিতে হইয়াছে।

এ-সমস্ত কারণেই পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের মতকে যে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত" বলা হয়, তাহা নিরর্থক নহে, অতিরঞ্জিতও নহে।

৭১। শ্রীপাদ শঙ্করের প্রচারিত "অদ্বৈতমতের" প্রবর্ত্তক

শ্রীপাদ শঙ্কর গৌড়পাদের মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্য রচনা করিয়াছেন। অলাতশান্তিপ্রকরণের প্রথম শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, গৌড়পাদই হইতেছেন "অদ্বৈতদর্শন সম্প্রদায়-কর্ত্তা"—"অদ্বৈত" মতের প্রবর্ত্তক।

মাণ্ডূক্যকারিকার ভাষ্য শেষ করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার "পূজ্যাভিপূজ্য পরমগুরুর" (গৌড়পাদের) চরণ-বন্দনা প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—জন্মজন্মান্তররূপ ভীষণ হিংস্রজন্তুগণকর্ত্তৃক অধ্যুষিত সংসার-সমুদ্রে নিপতিত জীবগণের প্রতি করুণাবশতঃ, বিশুদ্ধবুদ্ধিরূপ মন্থনদণ্ডের দ্বারা বেদসমুদ্রকে আলোড়িত করিয়া, তাহার মধ্য হইতে গৌড়পাদ দেবগণের পক্ষেও দুর্ল্লভ অমৃত (মাণ্ডূক্যকারিকায় প্রপঞ্চিত সিদ্ধান্তসমূহরূপ অমৃত) উদ্ধার করিয়াছেন। "প্রজ্ঞা-বৈশাখবেধ-ক্ষুভিতজলনিধের্ব্বেদনান্নোঽন্তরস্থং ভূতান্যালোক্য মগ্নান্যবিরতজনন-গ্রাহঘোরে সমুদ্রে। কারুণ্যাদুদ্ধারামৃতমিদমমরৈর্দুর্লভং ভূতহেতোর্যস্তং পূজ্যাভিপূজ্যং পরমগুরুমমুং পাদপাতৈর্নতোঽস্মি॥" মাণ্ডূক্যকারিকাতে যে "অদ্বৈতবাদ" খ্যাপিত হইয়াছে, বেদসমুদ্র মন্থন করিয়া গৌড়পাদই যে তাহা উদ্ধার করিয়াছেন, এ-স্থলেও শ্রীপাদ শঙ্কর তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্করের এই উক্তির ধ্বনি হইতেছে এই যে—বেদসমুদ্র মন্থন করিয়া ব্যাসদেব ব্রহ্মসূত্ররূপ রত্ন উদ্ধার করিয়া থাকিলেও তিনি মাণ্ডূক্যকারিকায় খ্যাপিত "অদ্বৈতবাদ"রূপ মহারত্ন উদ্ধার করিতে পারেন নাই; গৌড়পাদই এই মহারত্ন উদ্ধার করিয়াছেন। ইহাতেও জানা যায় —শ্রীপাদ শঙ্করের মতে গৌড়পাদই হইতেছেন এতাদৃশ "অদ্বৈতবাদের" মূল প্রবর্ত্তক।

গৌড়পাদের প্রবর্ত্তিত "অদ্বৈতবাদ"ই শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার ভাষ্যাদিতে প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর অলাতশান্তি-প্রকরণের ভাষ্যারম্ভে গৌড়পাদকে "অদ্বৈতসম্প্রদায়-কর্ত্তা" বলিয়াছেন। তাহাতে জানা যায়, গৌড়পাদ যে কেবল অজ্ঞাতপূর্ব্ব "অদ্বৈতবাদই" প্রচার করিয়াছেন তাহাই নহে, তিনি "অদ্বৈতবাদ-সম্প্রদায়"ও প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। গৌড়পাদ যে সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়াছেন, এই সম্প্রদায়ও সর্ব্বতোভাবে সেই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিয়াছেন। "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থকরণ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন, "সামানাধিকরণ্যের" যে লক্ষণ তিনি করিয়াছেন, সেই লক্ষণ তাঁহার সম্প্রদায় হইতে লব্ধ এবং কোন্ রকম লক্ষণার আশ্রয়গ্রহণ তাঁহার সম্প্রদায়ের অভিপ্রেত নহে, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। "তত্ত্বমসি"-বাক্যের অর্থকরণ-প্রসঙ্গে তিনি যে-সম্প্রদায়ের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহাই হইতেছে গৌড়পাদের প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়। এই সম্প্রদায়ের স্বীকৃত সিদ্ধান্তের প্রতিষ্ঠার জন্যই শ্রীপাদ শঙ্কর কৃতসঙ্কল্প ছিলেন এবং তাঁহার এই সঙ্কল্প-সিদ্ধির অনুকূল ভাবেই তিনি শ্রুতিবাক্যের অর্থ করিতে চেষ্টা করিয়াছেন। ফল হইতেছে এই যে, তিনি শ্রুতির আনুগত্য স্বীকার করেন নাই, বরং শ্রুতিকেই তাঁহার সাম্প্রদায়িক সিদ্ধান্তের আনুগত্য স্বীকার করাইতে প্রয়াস পাইয়াছেন। ইহাই বাস্তবিক সাম্প্রদায়িকতা।

শ্রীপাদ শঙ্করের আবির্ভাবের পূর্ব্বেও বোধায়ন, টঙ্ক, গুহদেব, কপর্দ্দ, ভারুচি, দ্রবিড়াচার্য্য প্রভৃতি আচার্য্যগণ ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। ছান্দোগ্য উপনিষদের (৩।১০।৪-বাক্যের) ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও এক জন পূর্ব্বাচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন (অত্রোক্তঃ পরিহারঃ আচার্য্যৈঃ)। শ্রীপাদ আনন্দগিরি বলেন, এ-স্থলে শ্রীপাদ শঙ্কর যে আচার্য্যের কথা বলিয়াছেন, তিনি হইতেছেন দ্রবিড়াচার্য্য। এই দ্রবিড়াচার্য্য যে ছান্দোগ্য-শ্রুতিরও ভাষ্য করিয়াছিলেন, তাহারও প্রমাণ পাওয়া যায়।(৩)

এ-সমস্ত আচার্য্যদের কেহই শ্রীপাদ শঙ্করের "অদ্বৈত"-মত খ্যাপন করেন নাই। সুতরাং শ্রীপাদ শঙ্কর যে বলিয়াছেন, গৌড়পাদই "অদ্বৈত"-মতের প্রবর্ত্তক, তাহা যথার্থই।

রামানুজাদি শঙ্কর-পরবর্ত্তী আচার্য্যদের মধ্যে মধ্বাচার্য্য ব্যতীত আর সকলেই "অদ্বয়বাদী", বা "অদ্বৈতবাদী"। শ্রুতি যখন "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলিয়াছেন, তখন ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। কিন্তু এ সমস্ত আচার্য্যদের "অদ্বয়বাদে" এবং শ্রীপাদ শঙ্করের প্রচারিত "অদ্বৈতবাদে" পার্থক্য আছে। শ্রীপাদ শঙ্কর দৃশ্যমান জীব-জগদাদির, এমন কি ভগবৎ-স্বরূপাদিরও, বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই; তাঁহার (অর্থাৎ গৌড়পাদেরও) মতে এ-সমস্ত হইতেছে ইন্দ্রজালসৃষ্ট বস্তুর ন্যায়, মায়ামরীচিকার ন্যায় মিথ্যা। একমাত্র ব্রহ্মই সত্য বস্তু—দ্বিতীয়হীন, ভেদহীন, অদ্বৈততত্ত্ব। ইহাই গৌড়পাদের বা শঙ্করের "অদ্বৈততত্ত্ব।" কিন্তু অদ্বয়বাদী অন্যান্য আচার্য্যগণ বলেন—ভগবৎ-স্বরূপাদি নিত্য সত্য, পরিদৃশ্যমান জগৎও মিথ্যা নহে, ইহাও বাস্তব-অস্তিত্ববিশিষ্ট; তবে জগতের অস্তিত্ব অনিত্য। শ্রুতির স্পষ্ট বাক্য অনুসারে তাঁহারা বলেন—দৃশ্যমান জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাত্মক, ইহা ব্রহ্মাতিরিক্ত

(৩) *A History of Indian Philosophy,* by S. N. Dasgupta, Vol. I, 3rd impression, P. 433

বস্তু নহে, ব্রহ্ম হইতে ইহার আত্যন্তিক ভেদ নাই। সুতরাং দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব স্বীকার করিলেও ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয় না। ইহাই হইতেছে গৌড়পাদের বা শঙ্করের কথিত অদ্বয়ত্ব এবং রামানুজাদি কথিত অদ্বয়ত্ব-এই উভয়রূপ অদ্বয়ত্বের পার্থক্য। শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—দৃশ্যমান জগদাদির অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই দ্বৈত, অর্থাৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করা হয়; এজন্য যাঁহারা দৃশ্যমান জগদাদির অস্তিত্ব স্বীকার করেন, তাঁহাদিগকে তিনি (এবং তাঁহার অনুবর্ত্তিগণও) দ্বৈতবাদী বলিয়াছেন। শঙ্করপূর্ব্ববর্ত্তী ভাষ্যকারগণও তাঁহার মতে এতাদৃশ দ্বৈতবাদী ছিলেন; কেননা, তাঁহারাও দৃশ্যমান জগতের অস্তিত্ব (অবশ্য অনিত্য অস্তিত্ব) স্বীকার করিতেন।

বৌদ্ধগণ সমস্তকেই মিথ্যা বলেন, একমাত্র শূন্যই সত্য; সুতরাং বৌদ্ধগণকেও একত্ববাদী, একভাবে অদ্বৈতবাদী, বলা যায়। শ্রীপাদ শঙ্করের "অদ্বৈতবাদ"ও বৌদ্ধদের উল্লিখিতরূপ অদ্বৈতবাদের অনুরূপই। বৌদ্ধমতাবিষ্টচিত্ত গৌড়পাদ বৌদ্ধদের শূন্যবাদের অনুকরণেই "অদ্বৈতবাদ" স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন এবং শ্রীপাদ শঙ্করও গৌড়পাদের অনুসরণ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ শঙ্কর স্বীয় অভীপ্সিত "অদ্বৈতবাদ"-স্থাপনের জন্য মিথ্যাসৃষ্টিকারিণী বৌদ্ধমায়ার শরণাপন্ন হইয়াছেন। এই "মায়ার" সহায়তাতেই তিনি দৃশ্যমান জগদাদির মিথ্যাত্ব খ্যাপনের চেষ্টা করিয়াছেন। বৈদিকী মায়া মিথ্যা-সৃষ্টিকারিণী নহে বলিয়াই তিনি বৈদিক-সাহিত্যে উল্লিখিত "মায়া"র বৈদিক অর্থ গ্রহণ করেন নাই। বৌদ্ধমায়ার কৃপালাভ করিয়াই তিনি জগতের সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয়কে মিথ্যা বলিয়াছেন, ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহকেও মিথ্যা বলিয়াছেন,। কিন্তু শ্রুতি স্পষ্ট ভাবেই জগতের সৃষ্টি-আদির কথা বলিয়া গিয়াছেন এবং এই সৃষ্টি-আদি যে মায়াময়, মিথ্যা, ইন্দ্রজাল-বৎ, শ্রুতি কোনও স্থলেই তাহা বলেন নাই। ভগবৎ-স্বরূপসমূহের মায়াময়ত্বের কথাও শ্রুতি কোনও স্থলে বলেন নাই।

সুতরাং বৌদ্ধভাবাবিষ্টচিত্ত গৌড়পাদই যে শঙ্কর-প্রচারিত "অদ্বৈতবাদের" প্রবর্ত্তক এবং শ্রীপাদ শঙ্করই যে তাহার প্রথম প্রচারক, তাহা পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়। বৈদিক শাস্ত্রে কিন্তু এই মতের সমর্থন দৃষ্ট হয়না। ব্রহ্মের নির্ব্বিশেষত্বের সমর্থক বলিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর যে সকল শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়াছেন, সে-সমস্ত শ্রুতিবাক্য যে ব্রহ্মের প্রাকৃত-বিশেষত্ব-হীনতার কথাই বলিয়াছেন, অপ্রাকৃত বিশেষত্বহীনতার কথা বলেন নাই, বরং বহু শ্রুতিবাক্য যে ব্রহ্মের অপ্রাকৃত বিশেষত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বিশদ্‌রূপে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং গৌড়পাদের বা শ্রীপাদ শঙ্করের মত যে সম্যক্‌রূপে অবৈদিক, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

৭২। বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষ এবং শ্রীপাদ শঙ্কর

ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত তাঁহার সুপ্রসিদ্ধগ্রন্থে বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষের এবং অশ্বঘোষ-

লিখিত "শ্রদ্ধোৎপাদশাস্ত্র"-নামক গ্রন্থে প্রকাশিত তথ্যের একটা বিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন (৪)। এ-স্থলে তাঁহার প্রদত্ত বিবরণের সংক্ষিপ্ত মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

অশ্বঘোষ ছিলেন ব্রাহ্মণ; বেদাদি-শাস্ত্রে তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল। তিনি প্রথমে ছিলেন ভয়ানক বৌদ্ধবিরোধী; তর্কযুদ্ধে বৌদ্ধদিগকে পরাস্ত করার উদ্দেশ্যে তিনি দেশের নানা স্থানে ভ্রমণ করিতেন; কিন্তু পরবর্ত্তী জীবনে তিনি নিজেই বৌদ্ধধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছেন এবং "শ্রদ্ধোৎপাদ-শাস্ত্র"-নামক বৌদ্ধগ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছেন। অন্য বৌদ্ধগণ "আত্মা" বলিয়া কিছু স্বীকার করেন না; কিন্তু অশ্বঘোষ "আত্মা" স্বীকার করিতেন; সম্ভবতঃ, তাঁহার প্রথমজীবনের বেদশাস্ত্রালোচনারই প্রভাবে তিনি "আত্মা" স্বীকার করিতেন; এই আত্মাকেই তিনি অনির্ব্বচনীয় পরম সত্য বলিয়া মনে করিতেন।

অশ্বঘোষের মতে আত্মাতে দুইটী ভাব আছে—ভূততথতা এবং সংসার (জন্ম-মৃত্যুচক্র)। "ভূততথতা" রূপে আত্মা হইতেছে "ধর্ম্মধাতু"-অর্থাৎ দৃশ্যমান পদার্থসমূহের সামগ্রিক একত্ব। অনাদি-কাল হইতে পূর্ব্বপূর্ব্ব কল্পের সঞ্চিত স্মৃতি বা বাসনার ফলে একই আত্মা বিভিন্ন ব্যষ্টিবস্তুরূপে পরিদৃশ্যমান হইয়া থাকে। এই স্মৃতি বা বাসনা দূরীভূত হইলে ব্যক্তিত্বের লক্ষণও দূরীভূত হইবে; তখন আর দৃশ্যমান জগৎ বলিয়া কিছু থাকিবে না। জগতে আমরা বিভিন্ন বস্তুর বিভিন্ন নাম-রূপ দেখিতে পাই; কিন্তু স্বভাবতঃ কোনও দৃশ্যমান বস্তুই নামরূপ-বিশিষ্ট নহে; তাহারা অচিন্ত্য (অর্থাৎ তাহাদের কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ অনির্ণেয়)। কোনওরূপ ভাষাদ্বারাই তাহারা সম্যক্ প্রকাশ্য নহে। তাহাদের মধ্যে ঐকান্তিকী সমতা বিদ্যমান; তাহারা "ভূততথতা" (অর্থাৎ এক আত্মা) ব্যতীত অপর কিছু নয়।(৫)

এই "তথতা"র কোনও "গুণ" নাই; কথাবার্ত্তায় কেবল "তথতা" বলিয়াই কোনও রকমে ইহাকে নির্দ্দেশ করা হয়। সামগ্রিক সত্তার কথা যখন বলা হয়, বা চিন্তা করা হয়, বাস্তবিক তখন বক্তাও কেহ নাই, বক্তব্যও কিছু নাই; চিন্তা করিবারও কেহ নাই, চিন্তনীয়ও কিছু নাই। ইহাই "তথতা-অবস্থা।" এই "ভূততথতা" হইতেছে "অস্তি, নাস্তি, উভয়-অনুভয়"-এই চতুষ্কোটি-পরিবর্জ্জিত, অথবা, "একত্ব, বহুত্ব, উভয়, অনুভয়"-এই চতুষ্কোটিবিবর্জ্জিত একটী তত্ত্ব। ইহা হইতেছে নির্ম্মল বা বিশুদ্ধ আত্মা—যাহা অনাদি, অনন্ত, নিত্য, বিকারহীন রূপে নিজেকে প্রকাশ করে এবং ইহাই সমস্ত পদার্থকে সম্পূর্ণরূপে নিজের মধ্যে ধারণ করে।

---

(৪) *A History of Indian Philosophy*, by S. N. Dasgupta, Vol. I, 3rd impression, PP 129-38.

(৫) They possess absolute sameness (*Samata*). They are subject neither to transfomation nor to destruction. They are nothing but one soul—thatness (*bhutatathata*) *Ibid.* P, 130.

আর, জন্ম-মৃত্যুরূপ বা সংসাররূপ আত্মা, পরম সত্য "তথাগতগর্ভ" হইতেই প্রকাশ পাইয়া থাকে। মর্ত্ত্য এবং অমর্ত্ত্য পরস্পরের সহিত মিলিত হয়। যদিও তাহারা অভিন্ন নয়, তথাপি তাহারা ভিন্নও নয়। এই আত্মাই নিজে মন বা "আলয়বিজ্ঞানের" রূপ ধারণ করে। আলয়বিজ্ঞানের জ্ঞান এবং অজ্ঞান—দুই-ই আছে। আলয়বিজ্ঞানে বা মনে যখন স্মৃতির বা বাসনার মলিনতা থাকে না, তখন মনের পূর্ণাংকে বলে জ্ঞান। ইহা সমস্ত পদার্থের মধ্যেই অনুপ্রবেশ করে এবং ইহাই সমস্ত পদার্থের একত্ব (ধর্ম্মধাতু)। অজ্ঞানরূপ বা অবিদ্যারূপ পবনের দ্বারা মন যখন সঞ্চালিত হয়, তখন বিজ্ঞান-তরঙ্গ (মনোবৃত্তি-তরঙ্গ) দেখা দেয়। কিন্তু মন, অবিদ্যা এবং মনোবৃত্তি—ইহাদের কিন্তু কোনও বাস্তব অস্তিত্ব নাই ; তাহারা একও নয়, বহুও নয়। অজ্ঞান তিন রকমে প্রকাশ পায়—(১) অবিদ্যাকর্ম্মদ্বারা দুঃখোৎপাদনপূর্ব্বক মনের স্থৈর্য্যনাশ, (২) অনুভবিতার বা জ্ঞাতার প্রকাশ এবং (৩) বহির্জগতের সৃষ্টি ; অনুভবিতা বা জ্ঞাতার অপেক্ষাহীনভাবে এই বহির্জগতের নিজস্ব কোনও অস্তিত্ব নাই। অবিদ্যার প্রভাবে কিরূপে ভাল-মন্দের জ্ঞান, সংজ্ঞা (আসক্তি), কর্ম্ম, কর্ম্মবন্ধনজনিত দুঃখাদি জন্মে, তাহাও বলা হইয়াছে।

মৃণ্ময় পাত্রসমূহ আকারাদিতে ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইলেও তাহাদের মূল যেমন মৃত্তিকা, তদ্রূপ অবিদ্যা এবং অবিদ্যার বিভিন্ন রূপও একই তত্ত্ব হইতে উদ্ভূত। এজন্যই বুদ্ধদেব বলিয়াছেন—সমস্ত বস্তুই অনাদিকাল হইতে নির্ব্বাণে অবস্থিত।

অবিদ্যার স্পর্শেই সত্যবস্তু—বাস্তবিক অস্তিত্বহীন অথচ অস্তিত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতীয়মান জগতের রূপ ধারণ করিয়া থাকে।

অশ্বঘোষের তথতা-দর্শনের "নির্ব্বাণ" কিন্তু "কিছুনা" নহে ; যে সমস্ত ব্যাপার-বশতঃ দৃশ্যমান জগতের প্রতীতি জন্মে. সেই সমস্ত ব্যাপারের সহিত সংশ্রবহীন নির্ম্মল তথতাই হইতেছে অশ্বঘোষের মতে "নির্ব্বাণ।"

তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে এক আত্মাই পরম সত্য; অনাদিকাল হইতে পূর্ব্বপূর্ব্বজন্মের স্মৃতি বা বাসনা বশতঃ সেই আত্মাই জীবরূপে প্রতীয়মান হয় এবং অজ্ঞান ও অবিদ্যার প্রভাবে সেই আত্মাই দৃশ্যমান জগদ্রূপে প্রতীত হয়। বস্তুতঃ জীবেরও কোনও অস্তিত্ব নাই, দৃশমান জগতেরও কোনও অস্তিত্ব নাই। স্মৃতি বা বাসনা সম্যক্‌রূপে অন্তর্হিত হইলে এবং অজ্ঞান ও অবিদ্যা সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলে জীব বলিয়াও কিছু থাকিবে না ; তখন থাকিবে কেবল এক এবং অদ্বিতীয় "আত্মা।" ইহাই অশ্বঘোষের "নির্ব্বাণ।"

সর্ব্বশেষে ডক্‌টর দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন—অশ্বঘোষ তাঁহার প্রথম জীবনে বৈদিকশাস্ত্রে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণপণ্ডিত ছিলেন, সুতরাং সহজেই মনে করা যায় যে, বৌদ্ধমত প্রচার-কালেও তিনি উপনিষদের প্রভাব হইতে মুক্ত হইতে পারেন নাই (এ-স্থলে পরমসত্যরূপ বিকারহীন আত্মার অস্তিত্বের স্বীকৃতিই হইতেছে উপনিষদের প্রভাব। কেননা, উপনিষদেই এতাদৃশ আত্মার কথা দৃষ্ট

হয়, বৌদ্ধমতে দৃষ্ট হয় না)। শঙ্করের বেদান্ত-ব্যাখ্যা এবং অশ্বঘোষের বৌদ্ধমত-ব্যাখ্যা একরূপই। (৬)

ডক্টর দাসগুপ্ত আরও বলিয়াছেন—বৌদ্ধগণ মনে করিতেন, তৈথিকগণ (বেদবিশ্বাসিগণ) এক বিকারহীন আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন; ইহা কিন্তু তাঁহাদের কুসংস্কার মাত্র। তাঁহাদিগকে বৌদ্ধমতে আকর্ষণ করিবার জন্যই লঙ্কাবতারসূত্র সাময়িক ভাবে এক সত্যকে স্বীকার করিয়াছেন (কিন্তু পরম-সত্য রূপে স্বীকার করে নাই)। কিন্তু অশ্বঘোষ পরিষ্কার ভাবেই পরম সত্যরূপে এক অনির্ব্বচনীয় তত্ত্বের (আত্মার) স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক-কারিকা অশ্বঘোষের গূঢ়তাৎপর্য্যপূর্ণ দর্শনকে রাহুগ্রস্ত চন্দ্রের ন্যায় স্তিমিত করিয়া দিয়াছে। লঙ্কাবতারে বৌদ্ধ-বিজ্ঞানবাদ যে ভাবে ব্যাখ্যাত হইয়াছে এবং ঐতিহ্যানুগত যে বৌদ্ধমত, নাগার্জ্জুনের মাধ্যমিক-কারিকাতেই তাহা অধিকতর নির্ভরযোগ্যরূপে প্রকটিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। (৭)

শ্রীপাদ শঙ্করের কয়েক শত বৎসর পূর্ব্বে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে অশ্বঘোষের অভ্যুদয়(৮); সুতরাং অশ্বঘোষের মতবাদ শঙ্কর সম্যক্ রূপেই অবগত ছিলেন। অন্যান্য বৌদ্ধদের মতের সহিত অশ্বঘোষের মতের পার্থক্য হইতেছে এই যে—অন্য বৌদ্ধগণ পরম-সত্যরূপে অস্তিত্ববিশিষ্ট কোনও তত্ত্ব স্বীকার করেন না; কিন্তু অশ্বঘোষ তাহা করেন; তাঁহার মতে আত্মাই হইতেছে নিত্য-অস্তিত্ব-বিশিষ্ট পরম তত্ত্ব। অন্যান্য বিষয়ে—জীব-জগতের বাস্তব অস্তিত্বহীনতা, অবিদ্যার প্রভাবেই জীব-জগদাদিকে অস্তিত্ববিশিষ্ট বলিয়া প্রতীতি-প্রভৃতি বিষয়ে—অন্য বৌদ্ধদের সহিত অশ্বঘোষের মতভেদ নাই। শ্রীপাদ শঙ্করের মতবাদও তদ্রূপই। ইহাতে মনে হয়, শ্রীপাদ শঙ্কর বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষের সিদ্ধান্ত-

---

(৬) Considering the fact that Asvaghosa was a learned Brahmin scholar in his early life, it is easy to guess that there was much Upanisad influence in his interpretation of Buddhism, which compares so favourally with the Vedanta as interpreted by Sankara-*Ibid* p. 138.

(৭) The *Lankavatara* admitted a reality only as a make-believe to attract the Tairthikas (heretics) who had a prejudice in favour of an unchangeable self (atman). But Asvaghosa plainly, admitted an unspeakable reality as the ultimate truth. Nagarjuna's Madhyamika doctrines which eclipsed the profound philosoply of Asvaghosa seem to be more faithful to the traditional Buddhist creed and to the Vijnanavada creed of Buddhism as cxplained in *Lankavatara*. *Ibid*. p. 138.

পাদটীকায় ডক্টর দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন—As I have no access to the Chinese translation of Asvaghosa's *Sraddhotpada Sastra*, I had to depend entirely on Suzuki's expressions as they appear in his translation. *Ibid*. p. 138.

(৮) *Ibid*, p. 129

গুলিই অবিকল ভাবে গ্রহণ করিয়াছেন এবং শ্রুতির সহায়তায় তাহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করিয়াছেন। বৌদ্ধ "শূন্য"-স্থলে "নির্গুণ ব্রহ্ম"কে স্থাপন করাতেও শ্রীপাদ শঙ্করের মৌলিকত্ব বোধ হয় নাই; এ-স্থলেও বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষের সিদ্ধান্তই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন।

বৌদ্ধমতে, দৃশ্যমান জগতে কোনও কিছুরই বাস্তব অস্তিত্ব নাই, সমস্তই "শূন্য।" অশ্বঘোষ "শূন্য"-স্থলে "আত্মা" আনয়ন করিয়া বলিয়াছেন—"সমস্তই এক আত্মা", "জীব" বলিয়াও কিছু নাই; যাহাদিগকে জীব বলা হয়, তাহারা হইতেছে প্রকৃত পক্ষে "এক আত্মাই", অপর কিছু নহে। এইরূপে খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষ "এক-জীববাদ" প্রচার করিয়া গিয়াছেন; আর, তাহারই অনুসরণে অষ্টম শতাব্দীতে শ্রীপাদ শঙ্কর সেই **"একজীববাদ"ই** প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

৭৩। প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—শ্রীপাদ শঙ্করের পরমগুরু গৌড়পাদ তাঁহার মাণ্ডূক্যকারিকায় যে-সমস্ত সিদ্ধান্ত প্রচার করিয়া গিয়াছেন, তৎসমস্তই বৌদ্ধসম্মত; গৌড়পাদ তাহা অস্বীকারও করেন নাই। গৌড়পাদের সিদ্ধান্তের বিশেষত্ব এই যে, তিনি বৌদ্ধদের "শূন্য"-স্থলে "নির্গুণ ব্রহ্ম" বসাইয়াছেন। অন্য সমস্ত সিদ্ধান্তই একরূপ। বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষের সিদ্ধান্তের সহিত গৌড়পাদের সিদ্ধান্তের কোনওরূপ পার্থক্যই নাই।

গৌড়পাদের সিদ্ধান্তের সহিত বৌদ্ধসিদ্ধান্তের ঐক্য থাকিলেও এবং তাঁহার সিদ্ধান্ত যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত (অবশ্য পরতত্ত্ব সম্বন্ধীয় সিদ্ধান্ত ব্যতীত অন্য সিদ্ধান্ত, অশ্বঘোষের সিদ্ধান্তের কথা বিবেচনা করিলে সমস্ত সিদ্ধান্তই যে বৌদ্ধ সিদ্ধান্ত), গৌড়পাদ তাহা অস্বীকার না করিলেও, তিনি মনে করিয়াছেন, তাঁহার সিদ্ধান্ত শ্রুতিদ্বারা সমর্থিত; অবশ্য শ্রুতিবাক্যের বিচার করিয়া তিনি তাহা প্রতিপন্ন করার চেষ্টা করেন নাই।

শ্রীপাদ শঙ্কর গৌড়পাদের বা বৌদ্ধাচার্য্য অশ্বঘোষের সমস্ত সিদ্ধান্তই অবিকল ভাবে স্বীকার করিয়া লইয়াছেন; কিন্তু এ-সমস্ত যে বৌদ্ধসিদ্ধান্ত, তাহা তিনি স্বীকার করেন নাই, বরং এ-সমস্ত যে বৌদ্ধসিদ্ধান্ত নহে, লোককে তাহা জানাইবার জন্য নানাবিধ কৌশলও অবলম্বন করিয়াছেন। তিনি সপ্রমাণ করিতে চাহিয়াছেন—শ্রুতিবাক্য হইতেই এ-সমস্ত সিদ্ধান্ত পাওয়া যায়। এ-সমস্ত সিদ্ধান্ত যে শ্রুতিসম্মত, তাহা প্রতিপাদন করার উদ্দেশ্যে, মুখ্য মুখ্য সিদ্ধান্তগুলির বিষয়ে, তিনি তাঁহার কষ্টকল্পনা, স্থলবিশেষে শ্রুতিবাক্য-বহির্ভূত শব্দের অধ্যাহার, এবং শ্রুতিবাক্যস্থিত কোনও কোনও শব্দের প্রত্যাহার এবং যুক্তিচাতুর্য্যাদির সহায়তায় শ্রুতিবাক্যসমূহের যে কদর্থ করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এসমস্ত কৌশল অবলম্বন করিয়াও যে তাঁহার প্রয়াস ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রকৃত প্রস্তাবে তিনি বৌদ্ধমতই প্রচার করিয়াছেন ; এ-সমস্ত যে বৌদ্ধমত, সাধারণ লোক তাহা যেন বুঝিতে না পারে, তজ্জন্য তিনি এই বৌদ্ধমতকে শ্রুতির আবরণে আবৃত করিয়া রাখিয়াছেন। এজন্যই তাঁহার মতকে "প্রচ্ছন্ন বৌদ্ধমত" বলা হয়।

শ্রীপাদ শঙ্কর যে কেবল বৌদ্ধমতই প্রচার করিয়াছেন, তাহাই নহে। তিনি বৌদ্ধদের প্রচার-প্রণালীরও অনুসরণ করিয়াছেন।

বৈদিক যুগেও সন্ন্যাস ছিল; কিন্তু সন্ন্যাসিসঙ্ঘ ছিল বলিয়া জানা যায় না; সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যে ব্যক্তিগত ভাবেই কেহ কেহ সন্ন্যাস গ্রহণ করিতেন। বৌদ্ধযুগেই সন্ন্যাসিসংঘ গঠিত হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর তাহার অনুকরণে সন্ন্যাসিসংঘ গঠন করিয়াছেন।

বৈদিক যুগে সন্ন্যাসিসংঘ ছিল না বলিয়া কোনওরূপ "মঠ"ও ছিল না; বেদানুগত শাস্ত্রে বরং মঠাদির প্রতিষ্ঠা নিষিদ্ধ হইয়াছে বলিয়াই জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবতের "ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্ নৈবাভ্যসেদ্বহূন্। ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥ ৭।১৩।৮॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"নানুবধ্নীত প্রলোভাদিনা বলান্নাপাদয়েৎ, আরম্ভান্ মঠাদিব্যাপারান্॥" তদনুসারে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ—"কখনও প্রলোভনাদি দেখাইয়া বলপূর্ব্বক কাহাকেও শিষ্য করিবে না, বহু গ্রন্থের অভ্যাস করিবে না, শাস্ত্রব্যাখ্যাকে জীবিকা-নির্ব্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিবে না এবং মঠাদিব্যাপারের আরম্ভ করিবে না।" যতিধর্ম্ম-প্রসঙ্গে শ্রীনারদ অন্যান্য উপদেশের সঙ্গে উল্লিখিতরূপ উপদেশ দিয়াছেন। উদ্দেশ্য বোধ হয় এই যে, মঠাদির প্রতিষ্ঠাদিব্যাপারে লিপ্ত হইলে প্রচারের আনুকূল্য হইতে পারে বটে ; কিন্তু সাধন-ভজনের আনুকূল্য হয় না, বরং বিঘ্ন জন্মিতে পারে ; অথচ সাধন-ভজনের উদ্দেশ্যেই সন্ন্যাস গ্রহণ করা হয়। যাহা হউক, বেদ ও বেদানুগত শাস্ত্রের এইরূপ ব্যবস্থা ছিল বলিয়াই প্রাচীন কালে মঠাদি-প্রতিষ্ঠার কথা জানা যায় না। বৌদ্ধযুগেই মঠাদির প্রতিষ্ঠা আরম্ভ হয়, বৌদ্ধদের "বিহারই" মঠ। শ্রীপাদ শঙ্করও তাহার অনুসরণে স্বীয় মতের প্রচারের জন্য চারিটী প্রধান মঠের প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন এবং সমগ্র ভারতবর্ষকে ভৌগলিক ভাবে চারি ভাগে বিভক্ত করিয়া এক এক মঠকে এক এক ভাগে প্রচারকার্য্যের ভার দিয়াছেন। প্রতি মঠেই একজন মঠাধ্যক্ষ এবং বহু সন্ন্যাসী থাকিতেন। সুবিধার জন্য তিনি নিজেকেও কলিযুগের "জগদ্গুরু" অ্যাখ্যা দিয়াছেন এবং প্রত্যেক মঠাধ্যক্ষকেও "তাঁহারই তুল্য" বলিয়া মনে করার আদেশ দিয়াছেন। নিয়ত মঠে বাস না করিয়া স্ব-স্ব অধিকারের মধ্যে মঠাধিপতিগণ বিচরণ করিয়া যেন প্রচারকার্য্য চালাইতে থাকেন, এইরূপ ব্যবস্থাও তিনি করিয়া গিয়াছেন (মঠানুশাসনম্-দ্রষ্টব্য)। এইরূপে তীব্র প্রচার-কার্য্যের ফলেই ভারতের সর্ব্বত্র তাঁহার মতবাদ ব্যাপ্তি লাভ করিয়াছে।

এইরূপে দেখা যায়—প্রচারের জন্য বৌদ্ধগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়াছিলেন, শ্রীপাদ শঙ্করও সেই পন্থারই অনুসরণ করিয়াছেন। ইহা বৈদিক যুগের পন্থা নহে। বিশেষত্ব এই যে, বৌদ্ধগণ তাঁহাদের "বিহার" হইতে যে-সকল সিদ্ধান্ত প্রচার করিতেন, সে-সমস্তকে তাঁহারা "বৌদ্ধসিদ্ধান্ত"

বলিয়াই প্রচার করিতেন; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের মঠ হইতে সে-সকল বৌদ্ধসিদ্ধান্তকেই "বৈদিক সিদ্ধান্ত" বলিয়া প্রচার করা হইত।

৭৪। যুক্তি ও মোক্ষ

যদি কেহ বলেন—শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্ত অবৈদিক হইতে পারে, তাহা বৌদ্ধসিদ্ধান্তও হইতে পারে; কিন্তু তাহা যুক্তিসিদ্ধ; তাহা হইলে বক্তব্য এই ঃ—

কেবলমাত্র যুক্তির উপরেই যে-সিদ্ধান্ত প্রতিষ্ঠিত, যুক্তি-বিলাসীরা তাহাতে প্রীতি অনুভব করিতে পারেন; কিন্তু যাঁহারা অকপট মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, সেই সিদ্ধান্তের অনুসরণ করিতে তাঁহারা সাহস পাইবেন বলিয়া মনে হয় না; কেননা, কেবল যুক্তি, মুক্তি দিতে পারে কিনা সন্দেহ। একথা বলার হেতু এই।

প্রথমতঃ, যুক্তিমূলক সিদ্ধান্তের স্থিরতা নাই। একজন যে যুক্তি দেখাইয়া কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন, অপর কেহ সেই যুক্তির খণ্ডন করিয়া অন্যরূপ সিদ্ধান্ত স্থাপন করিতে পারেন; তাঁহার সিদ্ধান্তও আবার অপর কেহ খণ্ডন করিতে পারেন।

দ্বিতীয়তঃ, লৌকিক ব্যাপারে কেবলমাত্র যুক্তির অনুসরণে যে ফল পাওয়া যায়, তাহা দৃষ্ট হয়; ফলের প্রত্যক্ষ দর্শনে যুক্তির ত্রুটী ধরা পড়ে, তাহার সংশোধনের চেষ্টাও চলিতে পারে। কিন্তু মোক্ষ লৌকিক বস্তু নহে; লৌকিক জগতে কেহ কখনও মোক্ষ দেখে নাই। সুতরাং কেবল যুক্তিবিহিত উপায়ের অনুসরণ করিয়া কেহ দেহত্যাগ করিলে তিনি তাঁহার অভীষ্ট মোক্ষ পাইলেন কিনা, তাহা কেহ বলিতে পারে না।

তৃতীয়তঃ, মোক্ষ লৌকিক বস্তু নহে, ইহা হইতেছে লোকাতীত অপ্রাকৃত বস্তু। লৌকিক জগতের সমস্ত যুক্তিই প্রাকৃত লৌকিক অভিজ্ঞতার উপরে প্রতিষ্ঠিত; প্রাকৃত অভিজ্ঞতামূলক যুক্তিপরম্পরা অপ্রাকৃত বস্তু সম্বন্ধে কোনও সমাধানে পৌঁছিতে পারে না, কেননা, লোকের প্রাকৃত বুদ্ধি অপ্রাকৃত ব্যাপারে প্রবেশ করিতে পারে না। "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্॥"-বাক্যে মহাভারত তাহা বলিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার কোনও কোনও উক্তির সমর্থনে একাধিক স্থলে এই স্মৃতিবাক্যটীর উল্লেখ করিয়াছেন—যদিও স্বীয় সম্প্রদায়ের অভীষ্ট মত প্রতিষ্ঠার দৃঢ়সঙ্কল্পবশতঃ কার্য্যকালে তিনি এই স্মৃতিবাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়াছেন।

এ-সমস্ত কারণে, কেবলমাত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত উপায়ের অনুসরণে মুক্তি লাভ হইতে পারে কিনা, তদ্বিষয়ে সন্দেহের অবকাশ আছে।

পক্ষান্তরে বেদবিহিত উপায় সম্বন্ধে এতাদৃশ সন্দেহের অবকাশ নাই; কেননা, বেদ

অপৌরুষেয়, পরব্রহ্মের বাক্য, সুতরাং ভ্রম-প্রমাদাদির অতীত এবং সেজন্য বেদ হইতেছে প্রমাণ-শিরোমণি। এজন্য, যিনি অকপট মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, নিশ্চিত উপায় সম্বন্ধে বিচারে সমর্থ এবং বিচার করিতে ইচ্ছুক, তিনি বেদবিহিত উপায়ের অনুসরণ করিতেই উৎসুক হইবেন।

যদি কেহ বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিতে অনিচ্ছুক হয়েন, তাঁহার চরণে নিবেদন এই যে—শঙ্কর-পূর্ব্ববর্ত্তী এবং শঙ্কর-পরবর্ত্তী বেদান্তভাষ্যকারগণের সকলেই বেদের অপৌরুষেয়ত্ব স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। বেদ যে পৌরুষেয় শাস্ত্র, একথা যুক্তিবাদী শ্রীপাদ শঙ্করও কোনও স্থলে বলেন নাই। তিনি বরং বেদকে "সর্ব্বজ্ঞকল্প" বলিয়া গিয়াছেন এবং একমাত্র বেদ হইতেই যে ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন। যে সমস্ত আচার্য্য ব্রহ্মপ্রাপ্তির সাধনের বিষয় আলোচনা করিয়া গিয়াছেন, তাঁহাদের আলোচনার ভিত্তি হইতেছে অপৌরুষের বেদ। যাঁহারা অকপট মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা সে-সমস্ত আচার্য্যেরই অনুসরণ করিয়া থাকেন।

যদি কেহ বলেন, ইহা হইতেছে বেদসম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস, তাহা হইলেও বক্তব্য এই যে—মিথ্যাবস্তু সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাস অসার্থক; "জল হইতে ক্ষীর পাওয়া যাইবে"-এতাদৃশ অন্ধবিশ্বাসবশতঃ বহুকাল পর্য্যন্ত জলে উত্তাপ সংযোগ করিলেও ক্ষীর পাওয়া যাইবে না; কিম্বা, "আকাশকুসুম পাওয়াও সম্ভব"-এই অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইয়া সারাজীবন আকাশকুসুমের অনুসন্ধান করিলেও আকাশকুসুম পাওয়া যাইবে না। কিন্তু সত্যবস্তু সম্বন্ধে অন্ধবিশ্বাসের সার্থকতা আছে। "দুই ভাগ উদ্‌জানের সহিত একভাগ অম্লজান মিশাইলে জল পাওয়া যায়।" রসায়নশাস্ত্রকথিত এই বাক্যের উপর অন্ধবিশ্বাস স্থাপন করিয়া অধ্যাপকের আনুগত্যে রসায়ন-শাস্ত্রবিহিত উপায়ের অনুসরণে সত্য জল পাওয়া যায়। বেদবিহিত উপায়ে সাধন করিয়া ঋষিগণ বেদকথিত সত্য বস্তুর অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন; তাঁহারা তাহা জানাইয়াও গিয়াছেন। "বেদাহমেতমজরং পুরাণং সর্ব্বাত্মানং সর্ব্বগতং বিভুত্বাৎ। জন্মনিরোধং প্রবদন্তি যস্য ব্রহ্মবাদিনোঽভিবদন্তি নিত্যম্॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৩।২১॥" বেদের অনুসরণে সাধনভজন করিয়া যিনি তত্ত্বদর্শন করিয়াছেন, এতাদৃশ ভাগ্যবানের আত্যন্তিক অভাব এখনও নাই। তবে কথা হইতেছে এই যে, গুরুদেবের কৃপায় যিনি বিষয় হইতে মনকে নিবৃত্ত করিয়া পরব্রহ্ম ভগবানের দিকে উন্মুখ করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই বেদবিহিত তত্ত্বের অপরোক্ষ অনুভব সম্ভব। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।২৩॥" তাঁহার কৃপাব্যতীত তাঁহার উপলব্ধি অসম্ভব। "নায়মাত্মা প্রবচনেন লভ্যো ন মেধয়া ন বহুনা শ্রুতেন। যমেবৈষ বৃণুতে তেন লভ্যস্তস্যৈষ আত্মা বিবৃণুতে তনুং স্বাম্॥ মুণ্ডক ॥ ৩।২।৩॥"

প্রশ্ন হইতে পারে—কেবলমাত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের অনুসরণে সাধন করিলে কি উল্লিখিতরূপ অপরোক্ষ অনুভব লাভ করা যায় না? এই ভাবে অপরোক্ষ অনুভব লাভ হইতে পারে কিনা, বিবেচনা করা যাউক।

ক। মুক্তি ও জীবন্মুক্তি

বেদানুগত্যে সাধন করিয়া অপরোক্ষ অনুভব লাভ করতঃ "বেদাহমেতমজরং পুরাণম্" ইত্যাদি বাক্যে যাঁহারা তাঁহাদের অনুভবের কথা জানাইয়া গিয়াছেন, তাঁহারা হইতেছেন মুক্ত পুরুষ ; কেননা, শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিলে সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি ছিন্ন হইয়া যায়, সমস্ত সংশয় দূরীভূত হয়, সমস্ত কর্ম্ম ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—অর্থাৎ মায়ার প্রভাব সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হইয়া যায়, সুতরাং মুক্ত হওয়া যায়। "ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ। ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে ॥" কিন্তু মুক্ত হইলেও তাঁহারা যথাবস্থিত দেহে বর্ত্তমান থাকেন ; নচেৎ "বেদাহমেতমজরং পুরাণম্"-ইত্যাদি বাক্য বলিতে পারিতেন না। ইঁহাদিগকেই শ্রুতিস্মৃতি জীবন্মুক্ত বলিয়া গিয়াছেন। জীবন্মুক্ত অর্থ—মুক্ত (মায়ামুক্ত), অথচ জীবিত (অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহে অবস্থিত)। দেহত্যাগের পরেই তাঁহারা বিদেহ-মুক্তি পাইয়া থাকেন। সাধারণতঃ বিদেহ-মুক্তিকেই "মুক্তি" এবং যথাবস্থিত দেহে অবস্থিতিকালের মুক্তিকে "জীবন্মুক্তি" বলা হয়। শ্রুতিস্মৃতি-অনুসারে এই জগৎ-প্রপঞ্চের—সুতরাং দেহেরও—সত্য অস্তিত্ব আছে, যদিও সেই অস্তিত্ব অনিত্য। মায়ার প্রভাবে জড় অনিত্যদেহে আত্মবুদ্ধি পোষণ করিয়া জীব সংসারী হয় ; মায়া এবং মায়ার প্রভাব অপসারিত হইলে দেহেতে আত্মবুদ্ধি—সুতরাং দেহেতে এবং দেহের ভোগ্য বস্তুতে আসক্তিও—অপসারিত হইয়া যায়। এই অবস্থা যাঁহাদের হয়, তাঁহাদিগকেই জীবন্মুক্ত বলা হয়। জীবন্মুক্তিতে দেহ থাকে, দেহের অস্তিত্বের অনুভূতিও থাকে, দেহের ব্যবহারও করিতে পারা যায় ; কিন্তু দেহেতে আত্মবুদ্ধি থাকেনা বলিয়া দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির কার্য্যে বুদ্ধি লিপ্ত হয় না—ইহাই সাধারণ সংসারী লোক হইতে জীবন্মুক্তের বৈশিষ্ট্য।

যুক্তিসর্ব্বস্ব শূন্যবাদী, অথবা শূন্যকল্প-নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীদের মতে জগৎ-প্রপঞ্চের সুতরাং দেহেরও—বাস্তব কোনও অস্তিত্ব নাই ; তাঁহাদের কল্পিত অবিদ্যার বা মায়ার প্রভাবেই, শুক্তিতে রজতের ন্যায়, শূন্যে বা নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মে জগতের ভ্রম হয়। অবিদ্যা বা মায়া দূরীভূত হইলে, শূন্যবাদীদের মতে জীব "শূন্য" হইয়া যায় এবং শূন্যকল্পনির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীদের মতে জীব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইয়া যায় ; ইহাই হইতেছে শূন্যবাদীর মতে নির্বাণ এবং নির্ব্বিশেষ-বাদীর মতে মুক্তি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—কেবলমাত্র যুক্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের অনুসরণে এতাদৃশ নির্বাণ বা মোক্ষ সম্ভব কি না, নিশ্চিতরূপে তাহা বলা যায় না। কিন্তু তাহাতে জীবন্মুক্তি লাভ করা যায় কিনা, এবং জীবন্মুক্তি সম্ভব হইলে "বেদাহমেতমজরং পুরাণম্"-ইত্যাদি বাক্যের ন্যায় "আমি জানিয়াছি, আমি শূন্য", কিম্বা "আমি জানিয়াছি, আমি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম"-ইত্যাদিরূপ অপরোক্ষ অনুভবের কথা বলা সম্ভব কিনা, তাহাই বিবেচ্য।

কিন্তু তাহা সম্ভব নয় ; কেননা, নিৰ্বিশেষ-বাদীদের মতে মুক্ত অবস্থাতে জীব "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" হইয়া যায়। "নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম" কখনও কোনও কথা বলিতে পারেন না, পারিলে তাঁহাকে নির্ব্বিশেষই

বলা চলে না। কথা বলিতে হইলে দেহের এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের সহায়তা গ্রহণ করিতে হয়; তাহা করিতে হইলে দেহাদির অস্তিত্বের অনুভব থাকা আবশ্যক। দেহাদির অস্তিত্বের অনুভব যে পর্য্যন্ত থাকিবে, সেই পর্য্যন্তই মায়ার প্রভাব আছে বলিয়া বুঝিতে হইবে—ইহাই তাঁহাদের অভিমত। এইরূপে দেখা গেল—এই মত স্বীকার করিতে হইলে জীবিত অবস্থায়, অর্থাৎ যথাবস্থিত দেহে অবস্থিতিকালে, কাহারও মুক্তি সম্ভব নহে; অর্থাৎ তাঁহাদের অভিমত অনুসারেই কাহারও জীবন্মুক্তি সম্ভব নয়। জীবন্মুক্তি সম্ভব নয় বলিয়া স্বীয় অপরোক্ষ অনুভবের কথা প্রকাশ করাও কাহারও পক্ষেই সম্ভব নয়। ইহা হইতে বুঝা গেল—তাঁহাদের কথিত মুক্তিসম্বন্ধে তাঁহাদের যুক্তিমূলক বাক্যব্যতীত অন্য কোনও প্রমাণ নাই, মুক্তিপ্রাপ্তজীবের স্বীয় অনুভবমূলক কোনও বাক্যও থাকিতে পারে না।

এতাদৃশ মোক্ষকে অনুমানও বলা চলে না; কেননা, প্রত্যক্ষদৃশ্য ব্যাপারই হইতেছে অনুমানের ভিত্তি। আর্দ্রকাষ্ঠের সঙ্গে অগ্নির সংযোগ হইলে ধূমের উৎপত্তি হয়, ইহা জানা আছে বলিয়াই কোনও স্থলে ধূম দেখিলে অগ্নির অস্তিত্বের অনুমান হয়। কিন্তু এ-স্থলে আর্দ্রকাষ্ঠ-সংযোগে ধূমের উৎপত্তির ন্যায় জ্ঞাত বস্তু কিছু নাই। সুতরাং এতাদৃশ মোক্ষকে অনুমানও বলা যায় না; ইহা কেবল কল্পনামাত্র।

অবশ্য শ্রীপাদ শঙ্কর জীবন্মুক্তি স্বীকার করিয়াছেন এবং জীবন্মুক্তদের কার্য্যের কথাও বলিয়াছেন। তাঁহাদের কার্য্য-সম্বন্ধীয় উক্তিই জানাইয়া দিতেছে যে, যাঁহাদিগকে তিনি জীবন্মুক্ত বলিয়াছেন, তাঁহারই সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহারা মুক্ত নহেন; কেননা, কার্য্য-করণ-কালে তাঁহারা দেহেন্দ্রিয়াদির ব্যবহার করিয়া থাকেন—যাহা তাঁহার কথিত মুক্তজীবের পক্ষে অসম্ভব।

"ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা, আমি ব্রহ্ম"—বহুকাল পর্য্যন্ত এইরূপ চিন্তার অভ্যাস করিতে করিতে তদনুরূপ একটা দৃঢ় সংস্কার হয়তো জন্মিতে পারে এবং সেই সংস্কারের অনুরূপ আচরণও করা যাইতে পারে; কিন্তু পূর্ব্বোল্লিখিত হেতুতে, তাহাও জীবিত অবস্থায় মোক্ষের লক্ষণ হইতে পারে না। যদি বলা যায়, তাহা মোক্ষের লক্ষণ না হইলেও মোক্ষের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা হইতে পারে; কেননা, "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্ভাবভাবিতঃ॥"-এই গীতোক্তি অনুসারে "আমি ব্রহ্ম"-এইরূপ দৃঢ়সংস্কার লইয়া যদি কেহ দেহত্যাগ করেন, তাহা হইলে তিনি ব্রহ্ম হইয়া যাইবেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—জীব যদি স্বরূপতঃ ব্রহ্মই হয়, তাহা হইলে ঐ অবস্থায় হয়তো ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু জীব যে স্বরূপতঃ ব্রহ্ম, ইহা তো শ্রীপাদ শঙ্করের কল্পনামাত্র; তিনি তাহা প্রমাণ করিতে পারেন নাই। কল্পিত আকাশকুসুমের দৃঢ় সংস্কার লইয়া দেহত্যাগ করিলে কেহ আকাশ-কুসুম হইয়া যাইতে পারে না। কোনও অবস্থাতেই কোনও বস্তুর স্বরূপের ব্যত্যয় হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—কেবলমাত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত সিদ্ধান্তের অনুসরণে যে মোক্ষ লাভ হইতে পারে, তাহা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

যদি বলা যায়, শ্রীপাদ শঙ্কর কেবল নিজের যুক্তির সহায়তাতেই তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েন নাই, শ্রুতিস্মৃতির উক্তিও তিনি উদ্ধৃত করিয়াছেন। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে, তিনি শ্রুতিস্মৃতির উক্তি স্থলবিশেষে উদ্ধৃত করিয়াছেন বটে; কিন্তু শ্রুতিস্মৃতির স্বাভাবিক তাৎপর্য্য তিনি গ্রহণ করেন নাই; যেরূপ অর্থ করিলে তাঁহার কল্পিত তাৎপর্য্য পাওয়া যায়, শ্রুতিস্মৃতিবাক্যের সেইরূপ অর্থ নিষ্কাশনের চেষ্টাই তিনি করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই বিশদ্‌ভাবে প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহার মুখ্য সিদ্ধান্তগুলি হইতেছে বৌদ্ধদের সিদ্ধান্ত; বৌদ্ধদের সিদ্ধান্ত শ্রুতির উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, কেবলমাত্র যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। শ্রীপাদ শঙ্করের সিদ্ধান্তও তদ্রূপ।

বেদানুগত্যময় সাধনে মোক্ষের নিশ্চিতত্বসম্বন্ধে জীবন্মুক্ত ঋষিদিগের প্রত্যক্ষ অনুভবাত্মক সাক্ষ্য পাওয়া যায়; বেদবহির্ভূত কেবল-যুক্তি-মূলক সাধনে তাহার অভাব। স্বয়ং ভাষ্যকার মোক্ষের যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, উল্লিখিত হেতুতে, তাঁহারই উক্তি অনুসারে, তাঁহার মধ্যেও সেই লক্ষণের অভাব; সুতরাং তাঁহার উক্তিই বা কতদূর নির্ভরযোগ্য, তাহাও বিবেচ্য। এই অবস্থায় বেদানুগত্যময় সাধনই অকপট মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর নিকটে লোভনীয় হওয়া স্বাভাবিক।

বেদমূলক সিদ্ধান্ত যে অযৌক্তিক, তাহাও নহে; তাহাও যুক্তির উপর প্রতিষ্ঠিত; তবে সেই যুক্তি হইতেছে বেদানুগতা যুক্তি, বেদবহির্ভূতা যুক্তি নহে।

শঙ্কর-ভাষ্যের রহস্য উপলব্ধি করিয়া মুক্তির জন্য উৎসুক হইয়া নীলাচলের শ্রীল সার্বভৌম ভট্টাচার্য্য, বারাণসীর সশিষ্য শ্রীল প্রকাশানন্দ সরস্বতী এবং তাঁহাদেরও পূর্ব্বে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী প্রভৃতি বহু লব্ধপ্রতিষ্ঠ মায়াবাদী যে শঙ্কর-সম্প্রদায় পরিত্যাগপূর্ব্বক বেদানুগত্যময় সাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন, তাহার বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। শ্রীধরস্বামিপাদের সময়ে এতাদৃশ লোকদের যে একটা সম্প্রদায় গঠিত হইয়াছিল, তাহারও প্রমাণ বিদ্যমান। তাঁহাদের পরে যে এইরূপ কেহ করেন নাই, কিম্বা বর্ত্তমানেও যে এইরূপ কেহ নাই, তাহাও মনে করার হেতু নাই। অবশ্য, শঙ্কর-ভাষ্যের রহস্য উপলব্ধি করিয়াও সম্প্রদায়-অনুরোধে সম্প্রদায় ত্যাগ করেন না, এইরূপ লোকের অস্তিত্বের কথাও শ্রীপাদ প্রকাশানন্দের উক্তি হইতে জানা যায়।

৭৫। শ্রীপাদ শঙ্করের স্বরূপ

যাহা হউক, "শঙ্করঃ শঙ্করঃ সাক্ষাৎ"-এই উক্তি হইতে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত পদ্মপুরাণের উক্তি হইতে জানা যায়, ভাষ্যকার শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ছিলেন স্বরূপতঃ মহাদেব। তথাপি তিনি যে বেদবিরোধী বৌদ্ধমত প্রচার করিয়াছেন, তাহার হেতুও সেই পদ্মপুরাণ হইতেই জানা যায়— "স্বাগমৈঃ কল্পিতৈস্ত্বঞ্চ জনান্ মদ্‌বিমুখান্ কুরু। মাঞ্চ গোপয় যেন স্যাৎ সৃষ্টিরেষোত্তরোত্তরা ॥—শ্রীশিবের প্রতি ভগবানের উক্তি।" অসুর-মোহন-লীলা প্রকটনের উদ্দেশ্যে এক লীলাবতাররূপে অবতীর্ণ হইয়া যিনি বেদবিরোধী মত স্পষ্ট ভাবে প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারই আদেশে শ্রীশিব ভাষ্যকার শঙ্কররূপে

অবতীর্ণ হইয়া সেই বেদবিরোধী মতকেই বেদের আবরণে আবৃত করিয়া পুনরায় প্রচার করিয়া গিয়াছেন। বস্তুতঃ শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তিতে তাঁহার এই উভয়স্বরূপত্বের প্রমাণই দৃষ্ট হয় (ভূমিকার ২৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বন্দে গুরূনীশভক্তানীশমীশাবতারকান্ ।
তৎপ্রকাশাংশ্চ তচ্ছক্তীঃ কৃষ্ণচৈতন্যসংজ্ঞকম্ ॥

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে তৃতীয়পর্ব্বে দ্বিতীয়াংশ
—সৃষ্টিতত্ত্ব ও অন্য আচার্য্যগণ—
সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন তৃতীয় পর্ব্ব
—সৃষ্টিতত্ত্ব—
সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

চতুর্থ পর্ব্ব

ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ
অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব

বন্দনা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥

জয় রূপ সনাতন ভট্ট রঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥
এই ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ন নাশ অভীষ্ট পূরণ ॥

কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্ ।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ ॥

অন্তঃকৃষ্ণং বহির্গৌরং দর্শিতাঙ্গাদিবৈভবম্ ।
কলৌ সঙ্কীর্ত্তনাদ্যৈঃ স্মঃ কৃষ্ণচৈতন্যমাশ্রিতাঃ ॥

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

শ্রীচৈতন্যমহাপ্রভুং বন্দে যৎপাদাশ্রয়বীর্য্যতঃ ।
সংগৃহ্নাত্যাকরব্রাতাদজ্ঞঃ সিদ্ধান্তসন্মণীম্ ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

সূত্র

“অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব কৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্।
স্বরূপ-শক্তি-রূপে তাঁর হয় অবস্থান॥
স্বাংশ-বিভিন্নাংশরূপে হইয়া বিস্তার।
অনন্ত বৈকুণ্ঠ ব্রহ্মাণ্ডে করেন বিহার॥
স্বাংশ-বিস্তার—চতুর্ব্বূহ অবতারগণ।
বিভিন্নাংশ—জীব তাঁর শক্তিতে গণন॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৫-৭॥”

“গোলোক পরব্যোম—প্রকৃতির পর॥
চিচ্ছক্তি-বিভূতিধাম—‘ত্রিপাদৈশ্বর্য্য’ নাম।
মায়িক বিভূতি—‘একপাদ অভিধান॥
—শ্রীচৈ,চ, ২।২১।৪০—৪১॥”

“রাধা পূর্ণ-শক্তি, কৃষ্ণ পূর্ণ-শক্তিমান্।
দুই বস্তু ভেদ নাহি শাস্ত্রপরমাণ॥
মৃগমদ তার গন্ধ—যৈছে অবিচ্ছেদ।
অগ্নি-জ্বালাতে যৈছে নাহি কভু ভেদ॥
রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ।
লীলারস আস্বাদিতে ধরে দুইরূপ॥
—শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৮৩—৮৫॥”

“জীবের স্বরূপ হয় কৃষ্ণের নিত্যদাস।
কৃষ্ণের তটস্থা শক্তি ভেদাভেদ প্রকাশ॥
—শ্রীচৈ,চ, ২।২০।১০১॥”

প্রথম অধ্যায়
প্রারম্ভিক জ্ঞাতব্য বিষয়

১। জীব-জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে সম্বন্ধ

ইতঃপূর্ব্বে জীব, জগৎ ও ব্রহ্মের সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। সেই আলোচনায় দেখা গিয়াছে—ব্রহ্মের সঙ্গে জীব ও জগতের একটা বিশেষ সম্বন্ধ আছে। সেই সম্বন্ধটীর স্বরূপ কি, তাহা নির্ণয় করার জন্য প্রস্থানত্রয়ের আশ্রয়ে বিভিন্ন আচার্য্যগণ চেষ্টা করিয়াছেন।

২। বিভিন্ন মতবাদ

ব্রহ্ম যখন এক এবং অদ্বিতীয় এবং তিনিই যখন জীব-জগতের একমাত্র মূল, তখন ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধটীও একরূপই হইবে; পরিদৃশ্যমান ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর সঙ্গে তাঁহার সম্বন্ধ ভিন্ন ভিন্ন হওয়া সম্ভবপর নহে। সাধারণ লোকের নিকটে এই সম্বন্ধের স্বরূপ বিভিন্ন বলিয়া প্রতীয়মান হইলেও অন্ততঃ দার্শনিকের দৃষ্টিতে তাহা একরূপ হওয়াই সঙ্গত। তথাপি বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গী লইয়া বিভিন্ন দার্শনিক পণ্ডিত এই সম্বন্ধটীর প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়াছেন বলিয়া বিভিন্ন মতবাদের উদ্ভব হইয়াছে। দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য অনুসারে একই বস্তু যে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হয়, বৈদুর্য্যমণিই তাহার একটী উদাহরণ। বৈদুর্য্যমণিতে নানাবিধ বর্ণের সমবায়। লাল, নীল, পীত ইত্যাদি বিভিন্ন বর্ণের সমবায়েই বৈদুর্য্যমণির একটী রূপ। কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন দিক্ হইতে, কিম্বা ভিন্ন ভিন্ন স্থান হইতে বৈদুর্য্যমণির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দৃষ্ট হয়; কোনও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গীতে বৈদুর্য্যমণির নানাবর্ণের সমবায়ভূত রূপটীও দৃষ্ট হইতে পারে।

যাহা হউক, ব্রহ্মের সঙ্গে জীবজগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের মধ্যে এই কয়টী বিশেষ উল্লেখযোগ্য : যথা—কেবলাদ্বৈতবাদ বা কেবল অভেদবাদ, বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ, দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ, ভেদাভেদবাদ বা দ্বৈতাদ্বৈতবাদ, শুদ্ধাদ্বৈতবাদ, ইত্যাদি। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ অচিন্ত্যভেদাভেদবাদী।

এই সমস্ত মতবাদ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা বাঞ্ছনীয়। কিন্তু তৎপূর্ব্বে ভেদ ও অভেদ বলিতে কি বুঝায়, তাহা বিবেচনা করার প্রয়োজন।

৩। ভেদ ও অভেদ

দুইটী বস্তু যদি এইরূপ হয় যে, তাহাদের মধ্যে একটী অপরটীর কোনওরূপ অপেক্ষাই

রাখেনা, প্রত্যেকটীই যদি স্বয়ংসিদ্ধ হয়, উভয়ের মধ্যে সাধারণ কোনও পদার্থও যদি না থাকে, তাহা হইলেই একটীকে অপরটী হইতে সর্ব্বতোভাবে ভিন্ন বলা সঙ্গত হয়। এই অবস্থায় বস্তুদুইটীর মধ্যে যে ভেদ, তাহা হইতেছে **আত্যন্তিক ভেদ**।

আর, কোনও বিষয়ে দুইটী বস্তু যদি সর্ব্বতোভাবে একরূপ হয়, তাহা হইলে সেই বিষয়ে তাহাদিগকে অভিন্ন বলা চলে, অর্থাৎ সেই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে **অভেদ** আছে বলা যায়।

কয়েকটী লৌকিক দৃষ্টান্তের সহায়তায় বিষয়টী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক।

যেমন—মৃৎপিণ্ড এবং মৃণ্ময়দ্রব্য ঘট-শরাবাদি। মৃৎপিণ্ডের উপাদানও মৃত্তিকা এবং ঘট-শরাবাদি মৃণ্ময় দ্রব্যের উপাদানও মৃত্তিকা। তাহাদের মধ্যে মৃত্তিকা-দ্রব্যটী হইতেছে সাধারণ উপাদান। তাহাদের উপাদান একই মৃত্তিকা বলিয়া উপাদানের দিক্ দিয়া বিবেচনা করিলে দেখা যায়, তাহারা অভিন্ন, উপাদানাংশে তাহাদের মধ্যে অভেদ।

আবার, আকারাদিতে তাহাদের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। মৃৎপিণ্ডের যেরূপ আকারাদি ঘট-শরাবাদির আকারাদি সেইরূপ নহে; তাহাদের ব্যবহার-যোগ্যতাও একরূপ নহে। ঘটদ্বারা জল আনা যায়; কিন্তু মৃৎপিণ্ডের দ্বারা জল আনা যায় না। এইরূপে দেখা যায়—আকারাদিতে মৃৎপিণ্ড ও মৃণ্ময় দ্রব্যের মধ্যে ভেদ আছে। মৃণ্ময় দ্রব্যের মধ্যেও ঘট-শরাবাদি বিভিন্ন দ্রব্যের মধ্যে ঐরূপ ভেদ বিদ্যমান। কিন্তু এইরূপ ভেদকে স্বয়ংসিদ্ধ ভেদ বলা যায় না। কেননা, ঘট-শরাবাদির আকারাদিগত ভেদ মৃত্তিকা-নিরপেক্ষ নহে। ঘটশরাবাদির আকারাদিগত ভেদ হইতেছে মৃত্তিকারই অবস্থান-বিশেষ হইতে উদ্ভূত এবং মৃত্তিকা না থাকিলেও আকারাদিগত ভেদের উৎপত্তি সম্ভবপর হইতে পারে না। মৃত্তিকাই যখন বিশেষ বিশেষ আকার ধারণ করে তখন ঘট-শরাবাদি ভিন্ন ভিন্ন নামে অভিহিত হয় এবং ভিন্ন ভিন্ন রূপে ব্যবহারের যোগ্যতা লাভ করে। সুতরাং ঘট-শরাবাদির আকারাদিগত ভেদ মৃত্তিকা-নিরপেক্ষ নহে, স্বয়ংসিদ্ধ নহে। সেজন্য ঘট-শরাবাদির আকারাদিগত ভেদকে মৃত্তিকার আত্যন্তিক ভেদ বলা যায় না। কিন্তু ঘট-শরাবাদির মধ্যে যে আকারাদিগতভেদ, তাহা হইতেছে পরস্পর-নিরপেক্ষ। কেননা, ঘটের অস্তিত্ব না থাকিলেও শরাবের অস্তিত্ব থাকিতে পারে এবং শরাবের অস্তিত্ব না থাকিলেও ঘটের অস্তিত্ব থাকিতে পারে। এ-স্থলে ঘটের আকারাদিকে শরাবের আকারাদির আত্যন্তিক ভেদ বলা যায়।

ঘট-শরাবাদির মধ্যে এই যে ভেদের কথা বলা হইল, তাহা হইতেছে তাহাদের জাতিগত ভেদ—ঘট এক জাতীয় বস্তু, শরাব আর এক জাতীয় বস্তু। তাহাদের এই জাতিগত ভেদের মূল হইতেছে ঘট-শরাবাদিরূপে তাহাদের উৎপত্তি।

জীবসমূহের মধ্যেও জাতিগত ভেদ আছে। যেমন, উদ্ভিদ্‌জাতি এবং মনুষ্যজাতি। ইহাদের মধ্যেও ভেদ এবং অভেদ উভয়ই আছে। উদ্ভিদের মধ্যেও জীবাত্মা আছে, মানুষের

মধ্যেও জীবাত্মা আছে এবং জীবাত্মা সকলের মধ্যেই একরূপ—চিন্ময়। এই বিষয়ে উদ্ভিদ এবং মানুষ অভিন্ন। উদ্ভিদের দেহও পঞ্চ-ভূতাত্মক, মানুষের দেহও পঞ্চভূতাত্মক ; এই বিষয়েও তাহাদের মধ্যে অভেদ। কিন্তু উদ্ভিদ এক স্থান হইতে অন্যস্থানে যাইতে পারে না, মানুষ পারে। এই বিষয়ে উদ্ভিদে এবং মানুষে ভেদ আছে। উদ্ভিদ মৃত্তিকা ভেদ করিয়া উৎপন্ন হয় ; কিন্তু মানুষ মাতৃগর্ভ হইতে উৎপন্ন হয়। এই বিষয়েও উদ্ভিদে এবং মানুষে ভেদ আছে। অন্যান্য অনেক বিষয়েও এইরূপ ভেদ দৃষ্ট হয়।

এইরূপে স্থাবর-জঙ্গমাদির মধ্যেও কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও কোনও বিষয়ে অভেদ দৃষ্ট হয়। আবার, কেবল স্থাবরের মধ্যেও আকারাদির ভেদবশতঃ বিভিন্ন প্রকার ভেদ দৃষ্ট হয় এবং কেবল জঙ্গমের মধ্যেও আকারাদির বা উৎপত্তির প্রকার-ভেদ অনুসারে নানা রকমের ভেদ দৃষ্ট হয়।

সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে এই সমস্ত ভেদের মধ্যে অনেক ভেদই লুপ্ত হইয়া যায়। কেননা, স্থাবর-জঙ্গম জীবমাত্রের মধ্যেই একইরূপ চিন্ময় জীবাত্মা বর্ত্তমান এবং তাহাদের সকলের দেহই পঞ্চভূতাত্মক—এবং শেষপর্য্যন্ত ত্রিগুণাত্মক। এই বিষয়ে তাহাদের মধ্যে অভেদ। ব্রহ্মাণ্ডের সমস্ত বস্তুই ত্রিগুণাত্মক ; এই হিসাবেও তাহাদের মধ্যে অভেদ। আবার, "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্" এই শ্রুতিবাক্যানুসারে জীব-জগৎ সমস্তই যখন ব্রহ্মাত্মক, তখন ব্রহ্মাত্মকত্বের দৃষ্টিতে জীব-জগতের সমস্ত বস্তুকেই অভিন্ন বলা যায়।

সূক্ষ্মবিচারে আত্যন্তিক ভেদের দৃষ্টান্ত জগতে দুর্ল্লভ। কেহ কেহ পর্ব্বত ও মানুষকে আত্যন্তিক ভেদ বলিয়া মনে করেন। স্থূলদৃষ্টিতে পর্ব্বত ও মানুষ পরস্পর-নিরপেক্ষ বটে ; সুতরাং তাহাদিগকে পরস্পরের ভেদ বলা যায়। কিন্তু এই ভেদও স্বীকৃত হয় কেবল লোক-ব্যবহার সিদ্ধির নিমিত্ত। সূক্ষ্ম বিচারে পর্ব্বত যেমন ব্রহ্মাত্মক, মানুষও তেমনি ব্রহ্মাত্মক ; এই বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে ভেদ নাই। পর্ব্বত যেমন ত্রিগুণাত্মক, মানুষের দেহও তেমনি ত্রিগুণাত্মক ; এই বিষয়েও তাহাদের মধ্যে ভেদ নাই। মানুষের মধ্যে জীবাত্মা আছে, পর্ব্বতের মধ্যে জীবাত্মা আছে কিনা, বলা যায় না। যদি না থাকে, তাহা হইলে কেবল জীবাত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ে তাহাদের মধ্যে ভেদ থাকিতে পারে। কেবল এক বিষয়ে ভেদ থাকিলেই তাহাদিগকে পরস্পরের আত্যন্তিক ভেদ বলা সঙ্গত হয় না।

বস্তুতঃ আত্যন্তিক ভেদের দৃষ্টান্ত কেবল—চিৎ এবং জড়। যাহা চিৎ, তাহা জড় নহে এবং যাহা জড়, তাহা চিৎ নহে। ইহাও কিন্তু জাতিগত ভেদ—চিজ্জাতীয় এবং অচিজ্জাতীয় বা জড়জাতীয়। সূক্ষ্ম বিচারে কিন্তু চিৎ এবং জড়— উভয়েই ব্রহ্মাত্মক , কেননা, ব্রহ্মাতিরিক্ত কোনও দ্রব্যই কোথাও নাই।

৪। ত্রিবিধ ভেদ

তিন রকমের ভেদ স্বীকৃত হয়—সজাতীয় ভেদ, বিজাতীয় ভেদ এবং স্বগত ভেদ। লৌকিক দৃষ্টান্তের সহায়তায় ত্রিবিধ ভেদের কথা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

সজাতীয় ভেদ। সজাতীয় অর্থ—সমান-জাতীয়। সমানজাতীয় বস্তুসমূহের মধ্যে যে ভেদ, তাহার নাম সজাতীয় ভেদ।

যেমন—মহাত্মা গান্ধীও মানুষ এবং পণ্ডিত জওহরলালও মানুষ। তাঁহারা উভয়েই একই মনুষ্যজাতীয়—সুতরাং সজাতীয়। মনুষ্যজাতির দিক্ দিয়া তাঁহাদের মধ্যে ভেদ নাই, কিন্তু ব্যক্তিগত ভাবে তাঁহাদের মধ্যে ভেদ আছে। ব্যক্তিগত ভেদের যে অস্তিত্ব আছে, তাহা বলিবার হেতু এই যে—মহাত্মা গান্ধী বলিলে কেহ পণ্ডিত জওহরলালকে বুঝে না এবং পণ্ডিত জওহরলাল বলিলেও কেহ মহাত্মা গান্ধীকে বুঝে না। তাঁহাদের ব্যক্তিগত বৈশিষ্ট্যই হইতেছে এই ভেদের হেতু। তাঁহারা হইতেছেন সজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত।

একই আম্রজাতীয় ফলের মধ্যে নানা রকমের ভেদ দৃষ্ট হয়। কোনও আম মধুর, কোনও আম আবার অম্ল। কোনও আমে আঁশ খুব বেশী, কোনও আমে আবার আঁশ খুব কম। এই সমস্তও হইতেছে সজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত।

আবার আমগাছ, কাঁঠালগাছ, তালগাছ, শালগাছ—সমস্তই একই বৃক্ষজাতীয়—সুতরাং সজাতীয়। কিন্তু আমগাছে কাঁঠাল ধরে না, তাল ধরে না। কাঁঠালগাছেও আম ধরে না, তাল ধরে না। তালগাছেও আম ফলে না, কাঁঠাল ফলে না। শালগাছে আম, কাঁঠাল, তাল—কিছুই ফলে না। ভিন্ন ভিন্ন গাছের আকারাদিও ভিন্ন ভিন্ন। এই সমস্তও সজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত।

বিজাতীয় ভেদ। বিজাতীয় অর্থ—ভিন্ন জাতীয়। ভিন্ন জাতীয় বস্তুর মধ্যে যে ভেদ, তাহাকে বলে বিজাতীয় ভেদ।

যেমন—মানুষ হইতেছে মনুষ্য-জাতীয় জীব; আর সিংহ হইতেছে পশুজাতীয় জীব। তাহারা ভিন্ন জাতীয়। তাহাদের আকার এবং আচরণাদিও ভিন্ন। মানুষ এবং সিংহ হইতেছে পরস্পর বিজাতীয় ভেদ এইরূপে মনুষ্য, পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ, বৃক্ষ, লতা, গুল্ম প্রভৃতি হইতেছে বিজাতীয় ভেদের দৃষ্টান্ত; ইহাদের মধ্যে এক জাতীয় জীব হইতেছে অপর সকল জাতীয় জীবের বিজাতীয় ভেদ। তদ্রূপ জড়ও হইতেছে চিৎ-এর বিজাতীয় ভেদ, আলোক অন্ধকারের বিজাতীয় ভেদ।

স্বগত ভেদ। স্বগত অর্থ—নিজের মধ্যে অবস্থিত। নিজের মধ্যে অবস্থিত যে ভেদ, তাহার নাম স্বগত ভেদ।

যেমন, দেহ এবং জীবাত্মা—এই উভয়ে মিলিয়া সংসারী জীব; দেহ এবং জীবাত্মার মধ্যে ভেদ আছে। কেননা, দেহ হইতেছে জড় অচিৎ বস্তু; আর, জীবাত্মা হইতেছে চিদ্বস্তু। উভয়ে

এক জাতীয় বা অভিন্ন জাতীয় বস্তু নহে। জীবের নিজের মধ্যে দেহ ও দেহীর (অর্থাৎ জীবাত্মার) এই যে ভেদ, ইহা হইতেছে স্বগত ভেদ।

জীবের দেহের মধ্যেও স্বগত ভেদ আছে। চক্ষু-কর্ণাদি ইন্দ্রিয়বর্গের কার্য্যকারিতায়ও ভেদ আছে। চক্ষু দেখিতে পায়, কিন্তু শুনিতে বা কথা বলিতে পারে না। কর্ণ শুনিতে পায়, কিন্তু দেখিতে পায় না, কথাও বলিতে পারে না। প্রত্যেক ইন্দ্রিয়েরই এইরূপ ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যক্ষমতা আছে। ইহাও জীবের স্বগতভেদ। এইরূপ ভেদের হেতু হইতেছে—উপাদানের ভেদ। চক্ষুতে তেজোগুণসম্পন্ন রূপ-তন্মাত্রার আধিক্য; তাই চক্ষু দেখিতে পায়। কর্ণে শব্দগুণসম্পন্ন ব্যোমের ভাগ বেশী; তাই কর্ণ শুনিতে পায়। নাসিকাতে গন্ধগুণযুক্ত মৃত্তিকার ভাগ বেশী; তাই নাসিকা গন্ধ অনুভব করিতে পারে; ইত্যাদি।

এতাদৃশ ত্রিবিধভেদের কোনও এক রকম ভেদ যদি স্বয়ংসিদ্ধ বা অন্যনিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলেই তাহাকে বাস্তব বা আত্যন্তিক ভেদ বলা যায়। স্বয়ংসিদ্ধ বা অন্যনিরপেক্ষ না হইলে বাস্তব বা আত্যন্তিক ভেদ বলা সঙ্গত হইবে না, তাহা হইবে আপেক্ষিক বা সাপেক্ষ ভেদ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে বিভিন্ন মতবাদের আলোচনা

ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে যে সমস্ত মতবাদ প্রচলিত আছে, এক্ষণে তৎসম্বন্ধে সংক্ষেপে আলোচনা করা হইতেছে।

৫। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের কেবলাদ্বৈতবাদ

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এক নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই সত্যবস্তু—বাস্তব অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তু। আর, জীব-জগদাদি সমস্তই মিথ্যা বা বাস্তব অস্তিত্বহীন। জীব-জগৎই যখন অস্তিত্বহীন, তখন ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের কোনও সম্বন্ধের কথাও উঠিতে পারে না। অস্তিত্বহীন বস্তুর সহিত অস্তিত্ব-বিশিষ্ট বস্তুর কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। আকাশ-কুসুম বা শশ-বিষাণের সহিত কাহারও কি সম্বন্ধ থাকিতে পারে ?

যদি বলা যায়—শ্রীপাদ শঙ্কর তো জীব-জগৎকে আকাশ-কুসুম বা শশ-বিষাণের ন্যায় অলীক বলেন না ; তিনি বলেন, ভ্রান্তিবশতঃ শুক্তিতে যাঁহারা রজত দেখেন, তাঁহাদের দৃষ্ট রজতের ন্যায়ই জীব-জগৎ মিথ্যা।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—এ-স্থলেও শুক্তির সঙ্গে রজতের কোনও বাস্তব সম্বন্ধ নাই। শুক্তির অধিষ্ঠানে রজত দেখিতেছে বলিয়া ভ্রান্তি জন্মে বটে ; কিন্তু শুক্তি রজতের অধিষ্ঠান নহে, শুক্তি যদি রজতের অধিষ্ঠানই হইত, তাহা হইলে সকলেই শুক্তিতে রজত দেখিত। শুক্তিতে দৃষ্ট রজতের বাস্তব অস্তিত্ব নাই , রজতের অস্তিত্ব থাকিলেই শুক্তিকে রজতের অধিষ্ঠান বলা যাইত এবং সকলেই শুক্তিতে রজত দেখিত। যাহা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে ভ্রান্তিমাত্র এবং এই ভ্রান্তির অধিষ্ঠান হইতেছে দ্রষ্টার মধ্যে, শুক্তির মধ্যে নহে ; শুক্তির মধ্যে হইলে সকলেই শুক্তিস্থলে রজত দেখিত ; কিন্তু সকলে তাহা দেখেনা। সুতরাং শুক্তির সঙ্গে ভ্রম-দৃষ্ট রজতের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না। তদ্রূপ, ব্রহ্মের সঙ্গেও ভ্রমদৃষ্ট জগতের কোনও সম্বন্ধ থাকিতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর বস্তুতঃ ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধের কথা কিছু বলেন নাই। তিনি কেবল ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের কথাই বলিয়াছেন এবং জীব-জগদাদির অস্তিত্ব অস্বীকার করিয়াই তিনি ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্বের কথা প্রকাশ করিয়াছেন।

৬। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

শ্রীপাদ রামানুজের মতে ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ কিরূপ, তৎসম্বন্ধে আলোচনার পূর্ব্বে, তাঁহার মতে জীব ও জগতের স্বরূপ কি, তাহা জানা দরকার। এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

জীব। চিৎ, ব্রহ্মের অংশ, নিত্য, অনাদি, জ্ঞানস্বরূপ ও জ্ঞাতা, কর্ত্তা ও ভোক্তা, পরিমাণে অণু, সংখ্যায় অনন্ত, নিত্যপৃথক্ অস্তিত্ববিশিষ্ট।

আলোচনা। জীবস্বরূপকে "চিৎ" এবং ব্রহ্মের "অংশ" বলা হইয়াছে। এই "চিৎ" কি ? "অংশ"ই বা কিরূপ অংশ ? "জীব ব্রহ্মের চিদংশ" বলিলে বুঝা যাইতে পারে—জীব হইতেছে চিৎস্বরূপ শুদ্ধব্রহ্মের অংশ, অথবা ব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তির অংশ। শুদ্ধব্রহ্মের অংশ হইলে জীবের সংসারিত্ব সম্ভব হয় না ; কেন না, মায়ার প্রভাবেই জীবের সংসারিত্ব ; জড়রূপা মায়া কিন্তু চিৎস্বরূপ ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না। তবে কি চিদ্রূপা শক্তির অংশ ? চিদ্রূপা শক্তির অংশও দুই রকমের হইতে পারে—চিচ্ছক্তির অংশ এবং চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ। চিচ্ছক্তির অংশ হইলেও পূর্ব্বোক্ত কারণে জীবের সংসারিত্ব সম্ভব হয় না। তাহা হইলে কি চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ ? "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাম্"-ইত্যাদি ৭।৫-গীতাশ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ ভোক্তা জীবকে "চিদ্রূপা জীবশক্তি" বলিয়া স্বীকার করিয়াছেন। জীবশক্তি চিদ্রূপা হইলেও বহির্ম্মুখাবস্থায় মায়া তাহাকে অভিভূত করিতে পারে (২।৩১ চ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), সুতরাং জীবের সংসারিত্ব সম্ভব হইতে পারে। কিন্তু গীতাভাষ্যে জীবকে চিদ্রূপা জীবশক্তি বলিয়া থাকিলেও "নাত্মা শ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥২।৩।১৮॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে জীব এবং জগৎ উভয়কেই তিনি ব্রহ্মের কার্য্য বলিয়াছেন। কিন্তু আকাশাদি জগৎ-প্রপঞ্চ যেরূপ কার্য্য, জীবকে তিনি সেইরূপ কার্য্য বলেন নাই। তিনি বলিয়াছেন—কার্য্য হইতেছে কারণের অবস্থান্তর ; আকাশাদিতে ব্রহ্মস্বরূপের অবস্থান্তর-প্রাপ্তি ; কিন্তু জীবে ব্রহ্মস্বরূপের অবস্থান্তর-প্রাপ্তি নহে, জ্ঞানের অবস্থান্তর-প্রাপ্তি, জ্ঞানের সঙ্কোচ-বিকাশ-প্রাপ্তি। ইহাতে মনে হয়—তিনি যেন জীবকে শুদ্ধ ব্রহ্মের অংশ বলিয়াই মনে করেন। কিন্তু ইহা স্বীকার করিতে গেলে বিকার-ধর্ম্মবর্জ্জিত শুদ্ধ-ব্রহ্মের বিকারিত্ব স্বীকার করিতে হয়। জ্ঞানের সঙ্কোচ-বিকাশও বিকারই। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ গীতোক্তির অনুসরণে জীবকে ব্রহ্মের চিদ্রূপা শক্তির অংশ বলিয়াই স্বীকার করেন। তাহাতে জীবের চিদ্রূপত্ব, ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশত্বও সিদ্ধ হয় এবং সংসারিত্ব-স্বীকারেও কোনও সমস্যার উদয় হয় না (২।৩১-চ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

জগৎ। অচিৎ,ব্রহ্মের পরিণাম বা ব্রহ্মস্বরূপের অবস্থান্তর।

আলোচনা। অচিৎ বা জড় জগৎকে ব্রহ্মস্বরূপের অবস্থান্তর বলিয়া স্বীকার করিলে বিকারধর্ম্মহীন ব্রহ্মের বিকারিত্ব স্বীকার করিতে হয় এবং জড়বিবর্জিত শুদ্ধচিৎস্বরূপ ব্রহ্মের জড়রূপ-প্রাপ্তিত্বও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু তাহা সম্ভব নহে। অন্ধকার কখনও আলোকের অবস্থান্তর

হইতে পারে না। বিকারধর্ম্মি-জড়রূপা মায়া যে ব্রহ্মের শক্তি, শ্রীপাদ রামানুজ তাহা স্বীকার করেন। শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় মায়ার পরিণামকেই যদি তিনি ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া স্বীকার করেন এবং সেই অর্থেই যদি তিনি জগৎকে ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে কোনও সমস্যার উদ্ভব হয় না।

শ্রীপাদ রামানুজের মতে জীব-জগৎ সত্য এবং জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শরীর। ইহা শ্রুতিসিদ্ধ। শ্রুতিও বলিয়াছেন—

"অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যো যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরে সংচরন্ যং পৃথিবী ন বেদ॥ যস্যাপঃ শরীরম্ ***॥ যস্য তেজঃ শরীরম্***॥ যস্য বায়ুঃ শরীরম্***॥ যস্য আকাশঃ শরীরম্ ***॥ যস্য মনঃ শরীরম্***॥ যস্য বুদ্ধিঃ শরীরম্ ***॥ যস্যাহঙ্কারঃ শরীরম্॥ যস্য চিত্তং শরীরম্ ***॥ যস্যাবক্ত্যং শরীরম্ ***॥ যস্যাক্ষরং শরীরম্ ***॥ যস্য মৃত্যুঃ শরীরং যো মৃত্যুমন্তরে সঞ্চরন্ যং মৃত্যুর্ন বেদ॥ স এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ॥ সুবালোপনিষৎ ॥৭॥"

বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতেও অনুরূপ বাক্য দৃষ্ট হয়। যথা,

"যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ পৃথিব্যা অন্তরো যং পৃথিবী ন বেদ যস্য পৃথিবী শরীরম্ ** ইত্যাদি॥ ৩।৭।৩-২২॥"

শ্রীপাদ রামানুজের মতে নাম-রূপে অভিব্যক্ত স্থূল জীব-জগৎও ব্রহ্মের শরীর এবং নামরূপে অনভিব্যক্ত সূক্ষ্ম (প্রলয়াবস্থ) জীব-জগৎও ব্রহ্মের শরীর। জগৎ হইতেছে জড় বা অচিৎ। স্থূল জীবদেহও অচিৎ; কিন্তু জীবাত্মা হইতেছে চিৎ। সুতরাং জীব-জগৎ হইতেছে চিদচিদ্ বস্তু। এই চিদচিদ্ বস্তু হইতেছে ব্রহ্মের শরীর। "চিদচিদ্বস্তুশরীরতয়া তৎপ্রকারং ব্রহ্মৈব সর্ব্বদা সর্ব্ব-শব্দাভিধেয়ম্। তৎ কদাচিৎ স্বস্মাৎ স্বশরীরতয়াপি পৃথগ্ব্যপদেশানর্হ-সূক্ষ্মদশাপন্ন-চিদ্চিদ্বস্তুশরীরম্, তৎ কারণাবস্থম্ ব্রহ্ম। কদাচিচ্চ বিভক্ত-নামরূপব্যবহারার্হ-স্থূলদশাপন্ন-চিদচিদ্বস্তুশরীরম্, তচ্চ কার্য্যাবস্থম্। 'তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ॥'-সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ॥"

এইরূপে দেখা গেল, শ্রীপাদ রামানুজের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন—বিশিষ্ট (অর্থাৎ জীব-জগদ্রূপ শরীরবিশিষ্ট) অদ্বৈত (এক এবং অদ্বিতীয়) তত্ত্ব। জীব-জগৎ ব্রহ্মের শরীর বলিয়া ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বস্তু নহে, ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু নহে। এজন্য, জগদ্রূপ শরীরবিশিষ্ট হইয়াও ব্রহ্ম সর্ব্বদা এক এবং অদ্বিতীয়ই থাকেন—প্রলয়কালেও (অর্থাৎ কারণাবস্থ ব্রহ্মও) এক এবং অদ্বিতীয় এবং সৃষ্টিকালেও (অর্থাৎ কার্য্যাবস্থ ব্রহ্মও) এক এবং অদ্বিতীয়। ইহাই হইতেছে বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের তাৎপর্য্য।

এইরূপে জানা গেল—শ্রীপাদ রামানুজের মতে, ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ হইতেছে এই যে, জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্ম হইতেছেন জীব-জগতের শরীরী (অর্থাৎ জীব-জগদ্রূপ শরীরে অবস্থিত তত্ত্ব)।

আলোচনা

ক। স্বরূপে অভেদ, ধর্ম্মে ভেদ

এক্ষণে বিবেচ্য হইতেছে এই যে— জীব-জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়া শ্রীপাদ রামানুজ কি ব্রহ্ম ও জীব-জগতের ভেদ স্বীকার করিতেছেন ? না কি অভেদ স্বীকার করিতেছেন ? অথবা ভেদাভেদ স্বীকার করিতেছেন?

সহজেই বুঝা যায়, জীব-জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ তিনি স্বীকার করেন না ; কেন না, আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করিলে তিনি জীব-জগৎ-বিশিষ্ট ব্রহ্মকে অদ্বয় তত্ত্ব বলিতেন না। বিশেষতঃ, জীব-জগৎ যে ব্রহ্মের পরিণাম, তাহাও তিনি স্বীকার করেন। ব্রহ্মের পরিণাম বলিয়া জীব-জগৎ ব্রহ্ম-নিরপেক্ষ নহে—সুতরাং ব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদও নহে।

জীব-জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যে যে সর্ব্ববিষয়ে আত্যন্তিক অভেদ, তাহাও তিনি স্বীকার করেন বলিয়া মনে হয় না। কেননা. "তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ"-সূত্রভাষ্যে তিনি কারণরূপ ব্রহ্মের সহিত কার্য্যরূপ জীব-জগতের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত করিয়াও বলিয়াছেন—"চেতনাচেতন-বস্তুময় শরীরের এবং শরীরী ব্রহ্মের যে শতশত শ্রুতিসিদ্ধ কারণাবস্থগত এবং কার্য্যাবস্থাগত স্বভাবভেদ এবং তদনুসারে যে গুণ-দোষগত ভেদ বিদ্যমান আছে, তাহা 'ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ ॥ ২।১।৯ ॥'-ব্রহ্মসূত্র ভাষ্যেই উক্ত হইয়াছে।—কারণাৎ পরস্মাদ্‌ব্রহ্মণঃ কার্য্যরূপং জগদনন্যৎ শরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুনঃ শরীরিণো ব্রহ্মণশ্চ কারণাবস্থায়াং কার্যাবস্থায়াঞ্চ শ্রুতিশতসিদ্ধয়া স্বভাবব্যবস্থয়া গুণদোষব্যবস্থা চ 'ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ' ইত্যত্রোক্তা।"

"ন তু দৃষ্টান্তভাবাৎ"-সূত্রভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"দেবতা-মনুষ্য-প্রভৃতি-শরীরধারী জীবগণের শরীরগত বাল্য, যৌবন, বার্দ্ধক্যাদি অবস্থা যেমন আত্মাতে (জীবাত্মাতে) সংক্রান্ত হয় না এবং আত্মগত জ্ঞান-সুখাদি ধর্ম্মও যেমন শরীরে সম্বদ্ধ হয় না, তদ্রূপ পরব্রহ্মের শরীরভূত চিদচিদ্বস্তুর দোষও (সংকোচ ও বিকাশরূপ দোষদ্বয়ও) শরীরী ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না এবং ব্রহ্মের গুণসমূহও তাঁহার শরীরে সংক্রামিত হয় না। সঙ্কোচ-বিকাশরূপ দোষ কেবল ব্রহ্মশরীর-ভূত-চিদচিদ্বস্তুগত, তাহা ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না।—সঙ্কোচ-বিকাশৌ পরব্রহ্মশরীরভূত-চিদচিদ্বস্তুগতৌ। শরীরগতাস্তু দোষা নাত্মনি প্রসজ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ গুণা ন শরীরে। যথা দেব-মনুষ্যাদীনাং সশরীরাণাং ক্ষেত্রজ্ঞানাং শরীরগতা বালত্ব-যুবত্ব-স্থাবিরত্বাদয়ো নাত্মনি সংবধ্যন্তে, আত্মগতাশ্চ জ্ঞানসুখাদয়ো ন শরীরে।"

ইহা হইতে বুঝা গেল—শ্রীপাদ রামানুজের মতে ব্রহ্ম-শরীরভূত চিদচিদ্বস্তুর ধর্ম্ম এবং শরীরী ব্রহ্মের ধর্ম্ম অভিন্ন নহে, তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। অর্থাৎ ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে ধর্ম্মগত ভেদ আছে। স্বরূপে তাহারা ভেদরহিত হইলেও তাহাদের ধর্ম্মের ভেদ আছে। মৃৎপিণ্ড এবং মৃণ্ময় ঘটাদি উভয়েই মৃত্তিকা বলিয়া স্বরূপে অভিন্ন ; কিন্তু মৃৎপিণ্ডে মৃণ্ময় ঘটাদির পৃথোদরত্বাদি ধর্ম্ম নাই বলিয়া তাহাদের যেমন ধর্ম্মগত ভেদ আছে, তদ্রূপ। ব্রহ্ম এবং জীব-জগতের মধ্যে এতাদৃশ

ধর্ম্মগত ভেদ হইতেছে—অভেদের অন্তর্গত ভেদ, অভেদ-নিরপেক্ষ ভেদ নহে। মৃৎপিণ্ড এবং মৃণ্ময় দ্রব্যের মধ্যে যেমন স্বরূপগত অভেদ সত্ত্বেও ধর্ম্মগত ভেদ বিদ্যমান, তদ্রূপ।

ব্রহ্মের শরীররূপে জীব-জগদ্রূপ চিদচিদ্বস্তু হইতেছে ব্রহ্মের বিশেষণ এবং ব্রহ্ম হইতেছেন বিশেষ্য। বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে যে সম্বন্ধ, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যেও সেই সম্বন্ধ। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীপাদ রামানুজের মতে বিশেষ্য ও বিশেষণের মধ্যে অভেদ সম্বন্ধ বর্ত্তমান; কিন্তু বিশেষ্য ও বিশেষণের ধর্ম্মের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। ইহাতে যে ভেদ ও অভেদের কথা পাওয়া গেল, তাহা কিন্তু বিশেষ্য-বিশেষণের ভেদাভেদ সম্বন্ধ নয়। বিশেষ্য-বিশেষণে অভেদ-সম্বন্ধ, তাহাদের ধর্ম্মে ভেদ আছে।

চিদচিদ্বস্তুরূপ জীব-জগতের মূলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিচার করিলে শ্রীপাদ রামানুজ-কথিত বিশেষ্য-বিশেষণের অভেদের কথা স্পষ্টতর ভাবে বুঝা যাইতে পারে। জীব হইতেছে পরব্রহ্মের জীব-শক্তির অংশ বা পরিণতি এবং জড় জগৎ হইতেছে তাঁহার অচিৎ-শক্তির বা মায়া-শক্তির পরিণতি; সুতরাং জীব-জগৎ হইল তত্ত্বতঃ ব্রহ্মের শক্তি। কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি হইতেছে তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তি, ব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্যা শক্তি। শক্তি স্বাভাবিকী এবং অবিচ্ছেদ্যা বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিযুক্ত আনন্দরূপ একবস্তু—তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তিকে বাদ দিয়া তাঁহার একবস্তুত্ব নহে, শক্তিসমন্বিত ভাবেই একবস্তু। সুতরাং ব্রহ্মের শক্তিরূপ বা শক্তির পরিণামরূপ জীব-জগৎ ব্রহ্মাতিরিক্ত বস্তু নহে, ব্রহ্মের সহিত তাহাদের ভেদ থাকিতে পারে না। ব্রহ্মরূপ বিশেষ্যের বিশেষণ-স্থানীয় চিদচিদ্বস্তুরূপ জীব-জগৎও ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন; চিদচিদ্বস্তুময় জীব-জগদ্রূপ ব্রহ্মশরীর এবং শরীরী ব্রহ্ম—এই উভয়ের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান।

শক্তির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া বিবেচনা করিলে ধর্ম্মগত ভেদের কথাও পরিস্ফুট হইয়া উঠে। বস্তুতঃ বস্তুর শক্তি এবং শক্তি হইতে উদ্ভূত বিশেষত্বই হইতেছে বস্তুর ধর্ম্ম। শক্তির স্বরূপের পার্থক্য-বশতঃ শক্তি হইতে উদ্ভূত ধর্ম্মেরও পার্থক্য হইয়া থাকে। ব্রহ্মের তিনটী প্রধান শক্তি—চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি, জীবশক্তি এবং মায়া শক্তি। এই তিনটী হইতেছে তিনটী পৃথক্ শক্তি, তাহাদের স্বরূপও ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য এই তিনটী শক্তি হইতে উদ্ভূত ধর্ম্মও ভিন্ন ভিন্ন। চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত; ব্রহ্মের অশেষ অপ্রাকৃত কল্যাণগুণরাজি এই স্বরূপ-শক্তি হইতে উদ্ভূত। জীব-শক্তিতে বা মায়াশক্তিতে এই স্বরূপ-শক্তির অভাব। এজন্য ব্রহ্মের গুণ জীবে বা মায়াশক্তির পরিণতি জগতে নাই। সেইরূপ, জীব-জগতের ধর্ম্মও ব্রহ্মে নাই। কেননা, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তি হইলেও ব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থিত নহে। ইহাই হইতেছে ব্রহ্মের এবং তাঁহার শরীর-স্থানীয় জীব-জগতের ধর্ম্মগত ভেদের হেতু।

খ। জীব-জগতের ব্রহ্ম-শরীরত্ব এবং ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্ব

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, চিদচিদ্বস্তুরূপ জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শরীর।

অচিৎ বা জড় জগৎও হইতেছে ব্রহ্মের শরীর। অচিৎ হইতেছে চিদ্‌বিরোধী। চিদ্‌বিরোধী বস্তুও যদি ব্রহ্মের শরীরভূত হয়, তাহা হইলে শ্রুতি-স্মৃতি যে পরব্রহ্মকে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গতি কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে ?

পরব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দবিগ্রহ। ব্রহ্মই বিগ্রহ, বিগ্রহই ব্রহ্ম। এই বিগ্রহ অপ্রাকৃত বা চিন্ময় (১।১।৬৫,৬৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্রহ্মে প্রাকৃত (অর্থাৎ অচিৎ বা জড়) কিছু থাকিতে পারে না। জড় বা প্রাকৃত বস্তু হইতেছে বিকারধর্ম্মী ; কিন্তু ব্রহ্ম বা ব্রহ্মবিগ্রহ বিকারহীন। বিকারহীনত্বই প্রাকৃতবস্তুহীনত্ব সূচিত করিতেছে।

তথাপি শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রুতিও যে জীব-জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়াছেন, তাহার হেতু এই। জীবাত্মা যেমন জীবের দেহের মধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও অন্তর্যামী বা নিয়ন্তারূপে জীবের মধ্যে এবং জগতের মধ্যে অবস্থান করেন। "যঃ পৃথিব্যাম্ তিষ্ঠন্ *** যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৩।৭।৩ ॥—যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন *** পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি পৃথিবীর অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত বা পরিচালিত করেন, তিনিই অবিনাশী অন্তর্যামী আত্মা।"-এই বাক্য হইতে আরম্ভ করিয়া ৩।৭।২৩-বাক্য পর্য্যন্ত বাক্যসমূহে বৃহদারণ্যক-শ্রুতি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। দেহের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া জীবাত্মাকে যেমন "দেহী বা শরীরী" এবং দেহকে জীবাত্মার "দেহ—বা শরীর" বলা হয়, তদ্রূপ জীব-জগতের মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়া জীব-জগৎকে ব্রহ্মের "শরীর" এবং ব্রহ্মকে জীব-জগদ্রূপ শরীরের "শরীরী" বলা হইয়াছে। "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ *** যস্য পৃথিবী শরীরম্"-এই বাক্যে বলা হইয়াছে—"ব্রহ্ম পৃথিবীতে অবস্থান করেন, এবং পৃথিবী তাঁহার শরীর।" আরও বলা হইয়াছে—"যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়তি—পৃথিবীর মধ্যে থাকিয়া যিনি পৃথিবীকে নিয়ন্ত্রিত করেন।"

অন্তর্য্যামিরূপে পৃথিবীর মধ্যে অবস্থান করেন বলিয়াই যে পৃথিবীকে ব্রহ্মের শরীর বলা হইয়াছে, শ্রুতিবাক্য হইতে তাহা পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়। এইরূপে, কেবল পৃথিবী নহে, সমস্ত জীব-জগতের মধ্যেই যে অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্ম অবস্থান করেন, তাহাও শ্রুতি বলিয়াছেন। জীব-জগতের অভ্যন্তরে অবস্থিতি-হেতুই জীব-জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলা হইয়াছে। এ-স্থলে "শরীর" -শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে "শরীর-স্থানীয়, শরীরতুল্য।" যে সচ্চিদানন্দবিগ্রহ ব্রহ্মের স্বরূপ, এ-স্থলে "শরীর"-শব্দে তাহাকে বুঝায় না ; কেননা, জীব-জগদ্রূপ ব্রহ্মশরীর সচ্চিদানন্দ নহে, জীব-জগদ্রূপ ব্রহ্ম-শরীরে অচিদ্বস্তু জগৎ আছে। এইরূপ অর্থ না করিলে সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতিবাক্যের সঙ্গতি রক্ষা হয় না।

শ্রীপাদ রামানুজেরও যে উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্যই অভিপ্রেত, তাহা তাঁহার নিজের উক্তি হইতেও বুঝা যায়।

"তদনন্যত্বমারম্ভণ-শব্দাদিভ্যঃ ॥২।১।১৪॥"-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে একদেশী-মতের খণ্ডন-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—

"যে চ কার্য্যমপি পারমার্থিকমভ্যুপয়ন্ত এব জীব-ব্রহ্মণোরৌপাধিকমন্যত্বং, স্বাভাবিকং চানন্যত্বম্, অচিদ্‌ব্রহ্মণোস্তু দ্বয়মপি স্বাভাবিকমিতি বদন্তি, তেষামুপাধিব্রহ্মব্যতিরিক্ত-বস্ত্বন্তরাভাবাদ্ নিরবয়বস্যাখণ্ডিতস্য ব্রহ্মণ এব উপাধিসম্বন্ধাদ্ ব্রহ্মস্বরূপস্যৈব হেয়াকারপরিণামাৎ শক্তিপরিণামাভ্যুপগমে শক্তি-ব্রহ্মণোরনন্যত্বাচ্চ জীব-ব্রহ্মণোঃ কর্ম্মবশ্যতাপহতপাপ্মত্বাদি-ব্যবস্থাবাদিন্যোঽচিদ্‌ব্রহ্মণোশ্চ পরিণামাপরিণামবাদিন্যঃ শ্রুতয়ো ব্যাকুপ্যেয়ুঃ ॥—আর, যাঁহারা কার্য্যেরও পারমার্থিক সত্যতা স্বীকার করিয়া জীব-ব্রহ্মের ভেদকে ঔপাধিক (উপাধিকল্পিত-অস্বাভাবিক) এবং অনন্যত্ব বা অভেদকেই স্বাভাবিক বলিয়া বর্ণন করেন, তাঁহাদের মতেও উপাধি ও ব্রহ্মাতিরিক্ত অপর কোনও বস্তু না থাকায় ফলতঃ নিরবয়ব অখণ্ড ব্রহ্মের সহিতই উপাধি-সম্বন্ধ কল্পিত হওয়ায় স্বরূপতঃ ব্রহ্মেরই হেয়-জগদাকারে পরিণতি হয়। পক্ষান্তরে, ব্রহ্ম-শক্তির পরিণাম স্বীকার করিলেও শক্তি ও শক্তিমান্ ব্রহ্ম যখন অনন্য—একই পদার্থ, তখন জীবের কর্ম্মাধীনতা, আর ব্রহ্মের অপহত-পাপ্ম-স্বভাবতা প্রভৃতি ব্যবস্থা বা পার্থক্য-প্রতিপাদিকা এবং অচেতনের পরিণাম, আর চেতনের অপরিণাম-বোধিনী শ্রুতিসমূহও অসাঞ্জস্যপূর্ণ হইতে পারে।—মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত ভাষ্যানুবাদ।"

এ-স্থলে শ্রীপাদ রামানুজ ব্রহ্মের অপহত-পাপ্মত্বাদির এবং জীবের কর্ম্মাধীনতার, ও অচেতন-জগতের বা মায়ার পরিণামের উল্লেখ করিয়া এবং স্বরূপতঃ ব্রহ্মের অপরিণামিত্বের উল্লেখ করিয়া পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বের কথাই বলিলেন। তাঁহার শরীরস্থানীয় জীব-জগৎ যে ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ হইতে ভিন্নধর্ম্মবিশিষ্ট, তাহাও তিনি জানাইলেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়—চিদচিদ্বস্তুময় জীব-জগৎ ব্রহ্মের শরীর হইলেও তাহা ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহ নহে। তাহা হইলে, এ-স্থলে "শরীর" বলিতে "শরীরস্থানীয়—শরীরতুল্যই" বুঝায়, ইহাই প্রকৃত অভিপ্রায়।

আরও একটী বিবেচ্য বিষয় আছে। সচ্চিদানন্দবিগ্রহ বলিয়া ব্রহ্মে দেহ-দেহি-ভেদ নাই (১।১।৭০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু চিদচিদ্বস্তুময় জীব-জগৎকে ব্রহ্ম-বিগ্রহ মনে করিতে গেলে ব্রহ্মে দেহ-দেহি-ভেদের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। কেননা, অচিদ্বস্তু জড়জগৎ ও চিদ্‌বস্তু ব্রহ্ম—এই দুই বস্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন হইতে পারে না। ইহা হইতেও বুঝা যায়—চিদচিদ্বস্তুময় জীবজগৎ ব্রহ্মের স্বরূপভূত বিগ্রহ নহে। অন্তর্য্যামিরূপে জীব-জগতের মধ্যে ব্রহ্মের অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই জীব-জগৎকে ব্রহ্মের "শরীর" বলা হইয়াছে। এ-স্থলে "শরীর"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—"শরীরতুল্য।"

গ। বিশিষ্টাদ্বৈত-শব্দের ব্যাপক অর্থ

পূর্ব্বে "বিশিষ্টাদ্বৈত"-শব্দের যে অর্থ করা হইয়াছে, তাহাতে "অদ্বৈত"-ব্রহ্মের স্বরূপ সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হয় না। কেননা, সে-স্থলে বলা হইয়াছে—চিদচিদ্বস্তুময়-জীবজগদ্রূপ শরীর-বিশিষ্ট ব্রহ্মই অদ্বৈত ব্রহ্ম। এই অর্থে কেবল জীব-শক্তি এবং অচিৎ-মায়াশক্তির কথাই বলা

হইয়াছে। কিন্তু এই দুইটী শক্তি ব্যতীত ব্রহ্মের আরও একটী প্রধান-শক্তি আছে—চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি। উল্লিখিত অর্থে এই স্বরূপ-শক্তির কথা এবং স্বরূপ-শক্তির বৈভবরূপ ব্রহ্মের ধর্ম্মাদির কথা এবং ব্রহ্মের অনন্ত চিন্ময় ঐশ্বর্য্যের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং পূর্ব্বোক্ত অর্থটীতে ত্রিশক্তিধৃক্ পরব্রহ্মের সম্যক্‌স্বরূপ প্রকাশিত হয় না এবং স্বরূপ-শক্তি ও তাহার বৈভব বাদ পড়িয়াছে বলিয়া ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বও সম্যক্‌রূপে পরিস্ফুট হয় না ; কেননা, চিদচিদ্বস্তুময় জীব-জগদ্‌ব্যতীত যে চিন্ময়-ধামাদি এবং চিন্ময় ঐশ্বর্য্যাদি আছে, তৎসমস্ত উক্ত অর্থে অনুল্লিখিত বলিয়া সেই সমস্তকে কেহ হয় তো ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্বিতীয় বস্তু বলিয়া মনে করিতে পারেন।

"বিশিষ্টাদ্বৈত"-শব্দের অন্যরূপ অর্থও হইতে পারে এবং এই অন্যরূপ অর্থ পূর্ব্বোল্লিখিত অর্থ অপেক্ষা ব্যাপকতর এবং তাহাতে ব্রহ্মের স্বরূপ এবং অদ্বয়ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রকাশিত হইতে পারে। এই ব্যাপকতর অর্থটী প্রদর্শিত হইতেছে।

বিশিষ্টাদ্বৈত = বিশিষ্ট + অদ্বৈত। বিশিষ্ট = বিশেষসমন্বিত = সবিশেষ। অদ্বৈত = দ্বৈত-রহিত = অদ্বয় = অদ্বিতীয়। তাহা হইলে "বিশিষ্টাদ্বৈত"-শব্দের তাৎপর্য্য হইল—সবিশেষ অদ্বয়-তত্ত্ব। ব্রহ্ম হইতেছেন এক এবং অদ্বিতীয় তত্ত্ব। ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন (অর্থাৎ আত্যন্তিক ভেদবিশিষ্ট) কোনও বস্তু নাই। এজন্য ব্রহ্ম হইতেছেন অদ্বৈত বা অদ্বিতীয়। জীব-জগদাদি, ভগবদ্ধামাদি, ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি—যাহা কিছু ব্রহ্ম হইতে পৃথক্ দৃষ্ট হয়, তৎসমস্ত হইতেছে ব্রহ্মের বিশেষণ ; এই সমস্ত ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে ; কেননা, বিশেষ্য ও বিশেষণের আত্যন্তিক ভেদ নাই। ব্রহ্ম হইতেছেন—এই সমস্ত বিশেষণ-বিশিষ্ট অদ্বয়তত্ত্ব।

"বিশিষ্টাদ্বৈত"-শব্দের উল্লিখিতরূপ ব্যাপকতর অর্থ যে শ্রীপাদ রামানুজের অনভিপ্রেত, তাহাও বলা যায় না। কেননা, তিনিও ভগবদ্ধামৈশ্বর্য্যাদির সত্যত্ব স্বীকার করেন। প্রথমোক্ত "চিদচিদ্বস্তুময় জীব-জগদ্রূপ-শরীর-বিশিষ্ট অদ্বয়তত্ত্ব"-অর্থে চিচ্ছক্তির বিলাসভূত ধামৈশ্বর্য্যাদি যে পরিস্ফুট ভাবে সূচিত হয় না, তাহাও অস্বীকার করা যায় না।

যাহা হউক, উল্লিখিত ব্যাপকতর অর্থ গ্রহণযোগ্য হইলে মনে করিতে হইবে—ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগতের সম্বন্ধ কিরূপ, তাহা জানাইবার জন্যই শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—জীব-জগৎ হইতেছে অদ্বয় ব্রহ্মের শরীর-স্থানীয় এবং ব্রহ্ম হইতেছেন জীব-জগদ্রূপ শরীরের শরীরিস্থানীয়। ব্রহ্মের তত্ত্ব সম্যক্‌রূপে প্রকাশের জন্য তিনি জীব-জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলেন নাই।

ঘ। শ্রীপাদ শঙ্করের "অদ্বৈত" ও শ্রীপাদ রামানুজের "অদ্বৈত"

শ্রীপাদ শঙ্করও অদ্বয়বাদী, শ্রীপাদ রামানুজও অদ্বয়বাদী। উভয়ের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে, শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-জগদাদির বা ভগবদ্ধামৈশ্বর্য্যাদির বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ; কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজ তৎ-সমস্তের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন। শ্রীপাদ শঙ্করের মতে এক ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও সত্য বস্তুই নাই বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন "দ্বিতীয়"-হীন—অদ্বৈত। আর শ্রীপাদ রামানুজের

মতে, জীব-জগদাদি বা ধামৈশ্বর্য্যাদিও সত্য, বাস্তব-অস্তিত্ববিশিষ্ট ; কিন্তু সত্য হইলেও তাহারা ব্রহ্মাতিরিক্ত পদার্থ নহে, সমস্তই ব্রহ্মাত্মক। ব্রহ্মাতিরিক্ত কিছু নাই বলিয়া,—সুতরাং ব্রহ্মের বাস্তব দ্বিতীয় কোনও পদার্থ নাই বলিয়া—জীব-জগদাদির এবং ধামৈশ্বর্য্যাদির সত্যত্ব-সত্ত্বেও ব্রহ্ম হইতেছেন—“দ্বিতীয়”-হীন—অদ্বৈত।

অপর বিশেষত্ব এই যে—শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির সত্যত্ব স্বীকার করেন না এবং তজ্জন্য স্বাভাবিকী শক্তির বৈভবরূপ জীব-জগদাদির এবং ধামৈশ্বর্য্যাদির সত্যত্বও স্বীকার করেন না। এক কথায় বলিতে গেলে, তিনি কোনওরূপ বিশেষত্বের সত্যত্বই স্বীকার করেন না। এজন্য তাঁহার “অদ্বৈত ব্রহ্ম” হইতেছেন—নির্ব্বিশেষ অদ্বৈত। আর, শ্রীপাদ রামানুজ ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির এবং শক্তি-বৈভবের—এক কথায় সমস্ত বিশেষত্বের—সত্যত্ব স্বীকার করেন। এজন্য তাঁহার “অদ্বৈত ব্রহ্ম” হইতেছেন—সবিশেষ, বা বিশেষণ-বিশিষ্ট, বা বিশিষ্ট অদ্বৈত।

শ্রীপাদ শঙ্কর কেবলমাত্র নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মেরই বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন বলিয়া এবং অপর কোনও বস্তুরই বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন না বলিয়া তাঁহার মতবাদকে “কেবলাদ্বৈত-বাদ”ও বলা হয়। আর শ্রীপাদ রামানুজের মতবাদকে বলা হয়—“বিশিষ্টাদ্বৈত-বাদ বা সবিশেষাদ্বৈতবাদ।”

৭। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের দ্বৈতবাদ বা ভেদবাদ

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য জীব-জগদাদির সত্যত্ব বা বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন। তাঁহার মতে তত্ত্ব দুইটী—স্বতন্ত্রতত্ত্ব এবং পরতন্ত্র তত্ত্ব। এজন্য তাঁহার মতবাদকে **দ্বৈতবাদ** বলা হয়।

স্বতন্ত্র তত্ত্ব হইতেছেন—ঈশ্বর, সবিশেষ পরব্রহ্ম। আর, পরতন্ত্র তত্ত্ব হইতেছে জীব-জগদাদি।

“পরতন্ত্র”-অর্থই হইতেছে “অস্বতন্ত্র।” শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য স্বতন্ত্র ও অস্বতন্ত্র—এই দুইটী তত্ত্ব স্বীকার করেন বলিয়া তাঁহার মতবাদকে **স্বতন্ত্রবাদ**ও বলা হয়।

তাঁহার মতে স্বতন্ত্র তত্ত্ব পরব্রহ্ম হইতে পরতন্ত্র-তত্ত্ব সমূহের নিত্য স্বাভাবিক ভেদ বিদ্যমান। এজন্য তাঁহার মতবাদকে **ভেদবাদ**ও বলা হয় এবং **স্বাভাবিক ভেদবাদ** এবং **কেবল-ভেদবাদও** বলা হয়। **তত্ত্ববাদও** তাঁহর মতবাদের আর একটী নাম।

ক। শ্রীমন্মধ্বমতে তত্ত্বসমূহের স্বরূপ

ব্রহ্ম—সবিশেষ, সর্ব্বশক্তিমান্, সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত, অনন্ত-কল্যাণ-গুণালয়, স্বতন্ত্র, স্বরাট্, সর্ব্ব-নিয়ন্তা, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, স্বগত-ভেদবর্জ্জিত। এই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ-পরব্রহ্মের কর, চরণ, মুখ, উদরাদি সমস্তই হইতেছে আনন্দ-মাত্র। “আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদি সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদ-বিবর্জ্জিতাত্মা॥ শ্রীমন্মধ্বপ্রণীত মহাভারত-তাৎপর্য্যনির্ণয় ॥১।১১॥” পরব্রহ্ম দেহ-দেহি-ভেদহীন।

তাঁহার নাম, রূপ, গুণ, লীলাদি তাঁহা হইতে অভিন্ন--সমস্তই চিন্ময়। তিনি অজ, নিত্য, ক্ষয়-বৃদ্ধিহীন, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বেশ্বর। তাঁহা হইতেই সৃষ্টি, স্থিতি, সংহার, নিয়মন, জ্ঞান, আবরণ, বন্ধ, মোক্ষ প্রভৃতি হইয়া থাকে।

স্থিতিঃ স্থিতিশ্চ সংহারো নিয়তির্জ্ঞানমাবৃতিঃ।
বন্ধমোক্ষাবপি হ্যাস্মু শ্রুতিষূক্তা হরেঃ সদা॥

—১।১।৩-ব্রহ্মসূত্রের মধ্বভাষ্য।

ঈশ্বর ও ব্রহ্ম একই তত্ত্ব। ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ-মাত্র, উপাদান-কারণ নহেন। অনন্ত জীবের আধার। শ্রীমন্মধ্বমতে শ্রীবিষ্ণুই পরব্রহ্ম।

জীব—পরতন্ত্র-তত্ত্ব, চেতন-স্বরূপ, সত্য, সংখ্যায় অনন্ত, পরিমাণে অণু, ভগবান্ বিষ্ণুর নিত্য-অনুচর, অধীন। জীবের জ্ঞান "স্বল্প", পরমেশ্বরের জ্ঞান "পূর্ণ।" ঈশ্বরের নিরুপাধিক প্রতিবিম্বাংশ। ঈশ্বর তাঁহার প্রতিবিম্বাংশরূপ জীবসমূহের বিম্বস্বরূপ।

নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে ভগদ্ধাম বৈকুণ্ঠে পশু, পক্ষী, নর, তৃণাদি বিভিন্ন আকারে স্ব-স্ব-শুদ্ধস্বরূপে জীবকুল বিরাজিত ; অর্থাৎ বিভিন্ন আকৃতিবিশিষ্ট জীব বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত ; কিন্তু তাহাদের দেহ প্রাকৃত নহে, পরন্তু শুদ্ধ-চেতন, সচ্চিদানন্দাকার। এই সকল শুদ্ধ জীব নিরুপাধিক শ্রীবিষ্ণুরই নিরুপাধিক-প্রতিবিম্বস্বরূপ। শ্রীভগবান্ বিষ্ণু অনন্ত আকারবিশিষ্ট ; অনন্ত-আকৃতি-বিশিষ্ট জীবসমূহের আকাররূপেও তিনি বিরাজিত ; এই সমস্ত অনন্ত আকার তাঁহারই সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহমধ্যে অবস্থিত এবং এই সমস্ত অনন্ত আকারও শুদ্ধ—সচ্চিদানন্দাকার। শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ-মধ্যস্থিত এই সকল অনন্ত-আকারের নিরুপাধিক প্রতিবিম্বও বৈকুণ্ঠধামে শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহের বহির্দ্দেশে শুদ্ধস্বরূপে নিত্য বিরাজিত। ইহারাই শুদ্ধ জীব। প্রতি শুদ্ধ জীবের দুইটী বিগ্রহ—একটী শ্রীবিষ্ণুর মধ্যে, আর একটী বাহিরে। বাহিরের রূপটী হইতেছে ভিতরের রূপের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব ; আর ভিতরের রূপটী হইতেছে তাহার বিম্ব। ভিতরের রূপটী শ্রীবিষ্ণুরই একটী রূপ বলিয়া বাস্তবিক শ্রীবিষ্ণুই হইলেন "বিম্ব", আর বাহিরের রূপটী হইল সেই বিম্বরূপ বিষ্ণুর নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব।

শ্রীমন্মধ্বমতে প্রতিবিম্ব দুই রকমের—সোপাধিক এবং নিরুপাধিক। সময় সময় আকাশে যে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে সূর্য্যের সোপাধিক প্রতিবিম্ব, জলকণারূপ উপাধির যোগে ইহার উৎপত্তি এবং ইহা ক্ষণস্থায়ী। নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব কোনওরূপ উপাধির যোগে উৎপন্ন হয় না। নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বোধ হয়—এক দীপ হইতে জ্বালিত অন্য দীপের তুল্য। প্রথম দীপটী বিম্ব, দ্বিতীয় দীপটী তাহার প্রতিবিম্ব—কোনও তৃতীয় বস্তুর সহায়তায় প্রথম দীপ হইতে দ্বিতীয় দীপ জ্বালা হয় নাই বলিয়া, সাক্ষাদ্ভাবে প্রথম দীপ হইতে দ্বিতীয় দীপটী জ্বালিত হইয়াছে

বলিয়া, তাহাকে প্রথম দীপের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বলা যায়। তদ্রূপ শ্রীবিষ্ণুবিগ্রহমধ্যস্থিত অনন্তরূপের মধ্যে কোনও একরূপের যে বাহিরে প্রকাশ—তৃতীয় কোনও বস্তুর সহায়তা ব্যতীত প্রকাশ—তাহাকেই বিগ্রহমধ্যস্থ রূপের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব বলা হয়।

যাহা হউক, শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এই প্রসঙ্গে পৈঙ্গীশ্রুতির যে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহা এই—

"দ্বিরূপাবংশকৌ তস্য পরমস্য হরের্বিভোঃ। প্রতিবিম্বাংশকশ্চাথ স্বরূপাংশক এব চ॥
প্রতিবিম্বাংশকা জীবাঃ প্রাদুর্ভাবাঃ পরে স্মৃতাঃ। প্রতিবিম্বেষ্বল্পসাম্যং স্বরূপাণীতরাণি ত্বিতি॥
সোপাধিরনুপাধিশ্চ প্রতিবিম্বো দ্বিধেয়তে। জীব ঈশস্যানুপাধিরিন্দ্রচাপো যথা রবেঃ॥

—২।৩।৫০-সূত্রভাষ্য॥

—বিভু পরমেশ্বর শ্রীহরির দুই রকমের অংশ আছে—প্রতিবিম্বাংশ ও স্বরূপাংশ। জীব-সমূহ হইতেছে প্রতিবিম্বাংশ এবং (মৎস্যাদি) অবতারসমূহ হইতেছেন স্বরূপাংশ। প্রতি-বিম্বাংশ জীবসমূহের সহিত শ্রীহরির অল্পসাম্য আছে, কিন্তু স্বরূপাংশ-অবতার সমূহ তাঁহার স্বরূপ (স্বরূপভূত)। প্রতিবিম্ব দুই রকমের—সোপাধিক এবং নিরুপাধিক। জীব হইতেছে ঈশ্বরের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব, আর আকাশে যে ইন্দ্রধনু দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে সূর্য্যের সোপাধিক প্রতিবিম্ব।"

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য যাঁহাদিগকে শ্রীবিষ্ণুর "স্বরূপাংশ" বলিয়াছেন, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাঁহাদিগকেই পরব্রহ্মের "স্বাংশ" বলিয়া থাকেন। স্বরূপাংশরূপ মৎস্যকূর্ম্মাদি শ্রীবিষ্ণুর স্বরূপভূত বলিয়া দ্বিতীয়-মধ্বাচার্য্য-নামে খ্যাত শ্রীবাদিরাজস্বামী তাঁহাদিগকে (স্বরূপাংশসমূহকে) পরমেশ্বরের "অভিন্নাংশ" বলিয়াছেন; শ্রীমন্মধ্বকথিত প্রতিবিম্বাংশজীবকে তিনি পরমেশ্বরের "ভিন্নাংশ" বলিয়াছেন। নারদ-পঞ্চরাত্রের আনুগত্যে গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণও জীবকে পরব্রহ্মের "বিভিন্নাংশ" বলিয়াছেন।

এই দৃশ্যমান জগতে দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, অসুর, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ,লতা-আদি যত রকমের জীবদেহ দেখিতে পাওয়া যায়, মাধ্বমতে চিন্ময় বৈকুণ্ঠেও ভাগবানের নিরুপাধিক প্রতিবিম্বরূপে তদনুরূপ শুদ্ধদেহ-সমূহ নিত্যবিরাজিত এবং তাহাদের বিম্বরূপেও ভগবানের নিত্য আকারসমূহ তাঁহার বিগ্রহমধ্যে বিরাজিত। নিরুপাধিক প্রতিবিম্বসমূহের মধ্যে—সুতরাং তাহাদের বিম্বসমূহের মধ্যেও—অসুরদেহের অনুরূপ দেহও আছে। তবে বিশেষত্ব এই যে—দৃশ্যমান জগতে দেবতা, মনুষ্য, অসুরাদির দেহ জড়, প্রাকৃত, পরিবর্ত্তনশীল; কিন্তু বৈকুণ্ঠস্থ নিরুপাধিক প্রতিবিম্বসমূহ এবং তাহাদের বিম্বসমূহও হইতেছে বিশুদ্ধ—জ্ঞানানন্দাত্মক বিগ্রহ। প্রাকৃত জগতের জীবদেহ রজস্তমোগুণাদি-বিশিষ্ট; কিন্তু বিম্বস্বরূপ ভগবানে রজস্তমোগুণাদির অভাব।

বৈকুণ্ঠে ভগবদ্‌বিগ্রহের বহির্দ্দেশে যে শুদ্ধ জীবদেহ, তাহাই হইতেছে ভগবানের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব ; প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের জীবদেহ কিন্তু নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব নহে।

প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে যে জীবের নরদেহ, বৈকুণ্ঠস্থিত প্রতিবিম্বস্বরূপ তাহার স্বরূপদেহও যে নরদেহই হইবে, তাহার কোনও নিশ্চয়তা নাই। পূর্ব্বকর্ম্ম অনুসারেই সৃষ্টিকালে জীব কর্ম্মফল-ভোগের উপযোগী দেহ পাইয়া থাকে। যাহার বৈকুণ্ঠস্থিত স্বরূপদেহ নরাকৃতি, কর্ম্মফল অনুসারে সৃষ্টিকালে সেই জীব এই ব্রহ্মাণ্ডে পশুদেহও পাইতে পারে, বৃক্ষদেহও পাইতে পারে, কিম্বা অন্য কোনও দেহও পাইতে পারে। কিন্তু তাহার মুক্তি লাভ হইলে স্বরূপগত নরদেহেই তাহার বৈকুণ্ঠে স্থিতি লাভ হইবে। এই ব্রহ্মাণ্ডে এখন যাহার নরদেহ, তাহার বৈকুণ্ঠস্থিত স্বরূপদেহ যদি বৃক্ষাকার হয়, মুক্তিলাভের পর তাহার বৃক্ষাকার স্বরূপদেহেই তাহার স্থিতি হইবে। (১)

"স্বরূপদেহই শরীরী বা জীবাত্মা, তাহা নিত্য সচ্চিদানন্দময় বিবিধ আকার বিশিষ্ট।" (২)

বদ্ধ জীব তিন রকমের—সাত্ত্বিক, রাজসিক, এবং তামসিক।

আলোচনা। শ্রীমন্মধ্বমতে জীব হইতেছে স্বরূপে অণুপরিমিত—সূক্ষ্মতম ; কিন্তু "নিত্য সচ্চিদানন্দময় বিবিধ আকার বিশিষ্ট" স্বরূপদেহ অণুপরিমিত বা সূক্ষ্মতম হইতে পারে না। সুতরাং অণুপরিমিত জীবস্বরূপ বা জীবাত্মা এবং তাহার স্বরূপদেহ—এই উভয়কে এক এবং অভিন্ন বস্তু বলা যায় না। জীব বা জীবাত্মা যখন স্বরূপতঃ ভগবানের অনুচর, তাঁহার সেবক, এবং সেবার উপযোগী দেহ ব্যতীত যখন সেবা সম্ভবপর হইতে পারে না, তখন ইহাই মনে হইতেছে যে—জীব যখন মুক্তি লাভ করে, তখন বৈকুণ্ঠস্থিত তাহার স্বরূপদেহে প্রবেশ করিয়াই ভগবানের সেবা লাভ করিয়া থাকে। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য যখন জীবে-জীবে ভেদও স্বীকার করেন, তখন ইহাই বুঝা যায়—মুক্তাবস্থায় সেবা-বিষয়েও জীবের ভেদ আছে, সকল জীবের সেবা এক রকম নহে। সেবার বৈচিত্রী অনুসারে সেবোপযোগী দেহেরও বৈচিত্রী থাকা স্বাভাবিক। এজন্য প্রতি জীবেরই সেবোপযোগী স্বরূপদেহ বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত। এই সমস্ত দেহ "নিত্য সচ্চিদানন্দময়"—সুতরাং জড়-বিরোধী হইলেও বদ্ধজীব যখন সংসারে থাকে, তখন আর বৈকুণ্ঠস্থিত তাহার স্বরূপদেহে অবস্থান করিয়া ভগবানের সেবা করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর হয় না ; কিন্তু তখনও বৈকুণ্ঠে তাহার স্বরূপদেহ বিরাজ-মান ; কেন না, ইহা নিত্য। কিন্তু তখন যেন এই সচ্চিদানন্দ-স্বরূপদেহও সেবাক্রিয়াহীন বলিয়া অচেতনবৎই অবস্থান করে বলিয়া মনে হয়। তখন নিরুপাধিক প্রতিবিম্বরূপ স্বরূপদেহগুলি যেন বৈকুণ্ঠের শোভাবিশেষরূপেই অবস্থান করে। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "বসন্তি যত্র পুরুষাঃ সর্ব্বে বৈকুণ্ঠ-মূর্ত্তয়ঃ।"-ইত্যাদি ৩।১৫।১৪-শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বৈকুণ্ঠস্য ভগবতো জ্যোতিরংশভূতা বৈকুণ্ঠলোকশোভারূপা যা অনন্তা মূর্ত্তয়ঃ তত্র বর্ত্তন্তে তাসামেকয়া সহ

(১) শ্রীল সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-প্রণীত "বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীমধ্ব", ১৯৩৯ খ্রীষ্টাব্দ-সংস্করণ। সপ্তবিংশ অধ্যায়।

(২) ঐ ঐ ২২৩ পৃষ্ঠা।

যুক্তস্যৈকস্য মূর্ত্তিঃ ভগবতা ক্রিয়ত ইতি বৈকুণ্ঠস্য মূর্ত্তিরিব মূর্ত্তির্যেষামিত্যুক্তম্।” ইহার মর্ম্ম এইরূপ। “ভগবানের জ্যোতির অংশভূতা এবং বৈকুণ্ঠলোকের শোভারূপা অনন্ত মূর্ত্তি বৈকুণ্ঠে নিত্য বিরাজিত। সে-সমস্ত মূর্ত্তির এক মূর্ত্তির সহিত ভগবান্ মুক্তপুরুষের মূর্ত্তি করেন; এজন্য বৈকুণ্ঠের মূর্ত্তির ন্যায় মূর্ত্তি যাঁহাদের—একথা বলা হইয়াছে।”

সালোক্যমুক্তি-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপালগোস্বামি-সংস্করণ। ১০-অনুচ্ছেদ) উল্লিখিত কথাগুলি বলিয়া তৎপরবর্ত্তী ১১শ অনুচ্ছেদে ঐ উক্তির সমর্থক প্রমাণরূপেই বলিয়াছেন—“যথৈবাহ—প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্। আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ।” ইহা হইতেছে শ্রীমদ্ভাগবতের (১।৬।২৯) শ্লোক—ব্যাসদেবের প্রতি নারদের উক্তি। কিরূপে নারদ পার্ষদদেহ পাইয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইয়াছে। সাধুসেবার প্রভাবে ভগবানে নারদের দৃঢ়া মতি জন্মিয়াছে দেখিয়া ভগবান্ নারদকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—তুমি এই নিন্দ্য লোক ত্যাগ করিয়া আমার পার্ষদত্ব লাভ করিবে। “সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ। হিত্বাবদ্যমিমং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি॥ শ্রীভা, ১।৬।২৪॥” ভগবৎ-কথিত এই পার্ষদদেহ নারদ কিরূপে পাইলেন, ব্যাসদেবের নিকটে তাহাই তিনি বলিয়াছেন—“প্রযুজ্যমানে ময়ি” ইত্যাদি শ্লোকে। “শুদ্ধা ভাগবতী তনুর প্রতি আমি প্রযুজ্যমান হইলে আমার আরব্ধ-কর্ম্ম নির্বাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।” শ্লোকস্থ “প্রযুজ্যমানে”-শব্দের অর্থে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—“নীয়মানে—নীত হইলে।” কোথায় নীত হইলে?” ‘যা তনুঃ শ্রীভগবতা দাতুং প্রতিজ্ঞাতা তাং ভাগবতীং ভগবদংশ-জ্যোতিরংশরূপাং শুদ্ধাং প্রকৃতিস্পর্শশূন্যাং তনুং প্রতি”—ভগবৎ-প্রতিশ্রুতা ভাগবতী শুদ্ধা তনুর প্রতি ভগবান্ কর্ত্তৃকই নারদ নীত হইয়াছিলেন। এ-স্থলে “ভাগবতী”-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—“ভগবদংশজোতিরংশরূপা—ভগবানের অংশ যে জ্যোতিঃ, তাহার অংশরূপা।” আর, “শুদ্ধা”-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—“প্রকৃতিস্পর্শশূন্যা”। ভগবদংশরূপা জ্যোতিঃ অবশ্যই প্রকৃতিস্পর্শশূন্যাই হইবে—তাহা হইবে চিন্ময়ী, সচ্চিদানন্দরূপা। এতাদৃশ সচ্চিদানন্দময় পার্ষদদেহের প্রতিই ভগবান্ নারদকে নিয়া গেলেন এবং নিয়া গিয়া সেই দেহই নারদকে দিলেন। ইহা হইতে বুঝা গেল—সেই দেহ ভগবদ্ধামে পূর্ব্বেই বর্ত্তমান ছিল। এইরূপ অনন্ত সচ্চিদানন্দময় দেহই যে বৈকুণ্ঠে নিত্য বর্ত্তমান, তাহাও ধ্বনিত হইল। মুক্তজীবকে এইরূপ কোনও এক দেহে সংযোজিত করিয়াই ভগবান্ পার্ষদত্ব দান করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বৈকুণ্ঠস্থিত এতাদৃশ অনন্ত সচ্চিদানন্দময় দেহকেই জীবের “স্বরূপদেহ” বলিয়াছেন।

এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল—বৈকুণ্ঠস্থিত “স্বরূপদেহ”ই বাস্তবিক জীব বা জীবাত্মা নহে; জীবাত্মা তাহা হইতে ভিন্ন। শ্রীমন্মধ্বমতে এই জীবাত্মা হইতেছে পরব্রহ্ম ভগবানের

নিরুপাধিক প্রতিবিম্বাংশ। আর, স্বরূপদেহও হইতেছে—ভগবদ্‌বিগ্রহমধ্যস্থ নিরুপাধিক বিম্বরূপ ভগবন্মূর্ত্তির নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব।

জগৎ—পরমেশ্বরকর্ত্তৃক সৃষ্ট। পরমেশ্বর ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ; আর, জড়রূপা প্রকৃতি হইতেছে জগতের উপাদান-কারণ। ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতিই মহৎ, অহঙ্কারাদিরূপে পরিণত হইয়া থাকে। জগৎ সত্য—বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট, কিন্তু অনিত্য। জগৎ কার্য্যরূপে অনিত্য, কিন্তু কারণরূপে নিত্য। পরতন্ত্র তত্ত্ব। ভগবান্ বিষ্ণুর বশবর্ত্তী।

মায়া—মায়ার দুই রূপ—মুখ্যা ও অমুখ্যা। মুখ্যা মায়া হইতেছে শ্রীবিষ্ণুর শক্তি; আর অমুখ্যা মায়া হইতেছে প্রকৃতি—জগতের উপাদান।

সৃষ্ট্যাদি কার্য্য—সৃষ্ট্যাদি কার্য্যের উদ্দেশ্যে ভগবান্ বিষ্ণু—বাসুদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ-এই চারিরূপে আত্মপ্রকট করেন।* বাসুদেব-রূপে তিনি জীবগণের গতি-প্রদাতা। বাসুদেবের কান্তা-শক্তির নাম—রমা বা মায়া। সঙ্কর্ষণরূপে তিনি জগতের সংহার-কর্ত্তা। সঙ্কর্ষণের কান্তাশক্তির নাম—জয়া। প্রদ্যুম্নরূপে তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। প্রদ্যুম্নের কান্তা-শক্তির নাম—কৃতি। অনিরুদ্ধরূপে তিনি জগতের পালনকর্ত্তা। অনিরুদ্ধের কান্তাশক্তির নাম—শান্তি। ভগবান্ বিষ্ণু যেমন বাসুদেবাদি-রূপে আত্ম-প্রকাশ করেন, তাঁহার কান্তা-শক্তিও তদ্রূপ তাঁহারই আদেশে বাসুদেবাদির কান্তাশক্তি রমা-আদিরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন।

জগতের সৃষ্টি ও সংহার—এই দুইটী কার্য্য ভাগবান্ বিষ্ণু নিজে করেন না, কিম্বা সৃষ্টিকর্ত্তা প্রদ্যুম্ন, সংহারকর্ত্তা সঙ্কর্ষণও নিজে করেন না। আধিকারিক দেবতা বা মহত্তমজীবের মধ্যে শক্তি সঞ্চার করিয়া তাঁহাদের দ্বারাই এই দুইটী কার্য্য করাইয়া থাকেন। ভগবান্ বিষ্ণু প্রদ্যুম্নরূপে চতুর্ম্মুখ ব্রহ্মাতে সৃষ্টিশক্তি এবং সঙ্কর্ষণরূপে রুদ্রে সংহার-শক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন। কিন্তু জগতের পালন কার্য্য অনিরুদ্ধরূপে তিনি নিজেই করিয়া থাকেন এবং বাসুদেবরূপে তিনি নিজেই জীবের মোক্ষ প্রদান করিয়া থাকেন।

থ। শ্রীমন্ মধ্বাচার্য্যস্বীকৃত পঞ্চভেদ

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য পাঁচ রকমের ভেদের কথা বলেন। যথা—

(১) জীবে ও ঈশ্বরে ভেদ, (২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ, (৩) ঈশ্বরে ও জড়ে ভেদ, (৪) জীবে ও জড়ে ভেদ এবং (৫) জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ। এই পাঁচ রকমের ভেদ সর্ব্বাবস্থাতেই নিত্য; মুক্তাবস্থাতেও জীবের সহিত ঈশ্বরের নিত্য ভেদ বর্ত্তমান থাকে।

"জীবেশয়োর্ভিদা চৈব জীবভেদঃ পরস্পরম্।
জড়েশয়োর্জড়ানাঞ্চ জড়জীবভিদা তথা॥
পঞ্চভেদা ইমে নিত্যাঃ সর্ব্বাবস্থাসু নিত্যশঃ।
মুক্তানাঞ্চ ন হীয়ন্তে তারতম্যং চ সর্ব্বদা॥

—শ্রীমধ্বপ্রণীত মহাভারত-তাৎপর্য্য-নির্ণয়॥১।৭০—৭১॥"

---

* ১।১।১৭৬-ছ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

গ। পঞ্চভেদ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীমন্মধ্বকথিত পঞ্চভেদ-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

(১) জীবেশ্বরে ভেদ

মাধ্বমতে জীবাত্মা চেতন-বস্তু, পরমেশ্বরের অধীন, পরমেশ্বরের অনুচর। জীবের জ্ঞান "স্বল্প"; কিন্তু পরমেশ্বরের জ্ঞান "পূর্ণ।" জীব "অল্পজ্ঞ"; কিন্তু পরমেশ্বর "সর্ব্বজ্ঞ।" বদ্ধ এবং মুক্ত-এই উভয় অবস্থাতেই জীব পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ (বা ভিন্ন) ভাবে অবস্থান করে। এসমস্ত কারণে জীব ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বিদ্যমান।

বক্তব্য। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জীবাত্মাকে "চেতন" বা "চিৎ" বলেন। পরমেশ্বরও "চেতন" বা "চিৎ।" এই বিষয়ে জীব ও ঈশ্বরে অভেদই দৃষ্ট হয়।

জীবকে তিনি পরমেশ্বরের অধীন এবং অনুচর বলেন। ইহা হইতে বুঝা যায়—শ্রীমন্মধ্বমতে জীব পরমেশ্বরের অপেক্ষা রাখে। কেননা, যে বস্তু যাঁহার অধীন বা অনুচর, সেই বস্তু তাঁহার অপেক্ষা না রাখিয়া পারে না। মাধ্বমতে জীব হইতেছে পরতন্ত্র-তত্ত্বের বা অস্বতন্ত্র-তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত। জীব পরমেশ্বর কর্ত্তৃকই নিয়ন্ত্রিত হইয়া থাকে।

ইহা হইতেও জীবের পরমেশ্বরাপেক্ষত্ব জানা যাইতেছে; জীব পরমেশ্বর-নিরপেক্ষ নহে, স্বতন্ত্র নহে। যাহা পরমেশ্বর-নিরপেক্ষ নহে, তাহাকে পরমেশ্বরের বাস্তব ভেদ বা আত্যন্তিক ভেদ বলা যায় না (৪।৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বিশেষতঃ, মাধ্বমতেও পরমেশ্বর এবং জীব--এই উভয়ই যখন চিদ্বস্তু, তখন চিদ্বস্তুরূপে যে তাঁহারা অভিন্ন, তাহাও অস্বীকার্য্য হইতে পারে না। ইহাও আত্যন্তিক ভেদের বিরোধী।

নিত্য পৃথক্ অবস্থিতিতে অবশ্য জীব পরমেশ্বর হইতে ভিন্ন, অর্থাৎ বদ্ধ এবং মুক্ত—উভয় অবস্থাতেই পরমেশ্বর হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে। ইহা হইতেছে অবস্থানগত ভেদ, স্বরূপগত ভেদ নহে। জ্ঞাতৃত্বাদি-বিষয়েও জীব এবং ঈশ্বরে ভেদ আছে, কিন্তু ইহাও হইতেছে গুণগত বা গুণ-তারতম্যগত ভেদ, ইহাও স্বরূপগত বা আত্যন্তিক ভেদ নহে। এ-স্থলেও জ্ঞাতৃত্বাদিতে কিঞ্চিৎ অভেদ আছে। কেননা, পরমেশ্বর সর্ব্বজ্ঞ; জীব স্বল্পজ্ঞ হইলেও অজ্ঞ নহে। এইরূপে দেখা যায়—ঈশ্বর হইতে জীব আত্যন্তিক ভাবে ভিন্ন নহে; জীব ও ঈশ্বরের মধ্যে কোনও কোনও বিষয়ে ভেদ এবং কোনও বিষয়ে অভেদ বিদ্যমান। মাধ্বমতেও তাহা অস্বীকৃত নহে। মাধ্বভাষ্যধৃত ব্রহ্মতর্ক-বাক্য হইতে জানা যায়—

"অবয়ব্যবয়বানাং চ গুণানাং গুণিনস্তথা। শক্তিশক্তিমতোশ্চৈব ক্রিয়ায়াস্তদ্বতস্তথা॥
স্বরূপাংশাংশিনো শ্চৈব নিত্যাভেদো জনার্দ্দনে। জীবস্বরূপেষু তথা তথৈব প্রকৃতাবপি॥
চিদ্রূপায়ামতোঽনংশা অগুণা অক্রিয়া ইতি। হীনা অবয়বৈশ্চেতি কথ্যন্তে তু ত্বভেদতঃ॥
পৃথগ্ গুণাদ্যভাবাচ্চ নিত্যত্বাদুভয়োরপি। বিষ্ণোরচিন্ত্যশক্তেশ্চ সর্ব্বং সম্ভবতি ধ্রুবম্॥

ক্রিয়াদেরপি নিত্যত্বং ব্যক্তব্যক্তিবিশেষণম্। ভাবাভাববিশেষেণ ব্যবহারশ্চ তাদৃশঃ॥
বিশেষস্য বিশিষ্টস্যাপ্যভেদস্তদ্বদেব তু। সর্ব্বং চাচিন্ত্যশক্তিত্বাদ্ যুজ্যতে পরমেশ্বরে॥
তচ্ছক্ত্যৈব তু জীবেষু চিদ্রূপপ্রকৃতাবপি। ভেদাভেদৌ তদন্যত্র হ্যুভয়োরপি দর্শনাৎ॥
কার্য্যকারণয়োশ্চাপি নিমিত্তং কারণং বিনা। —২।৩।২৮-২৯-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যধৃত॥

—জনার্দ্দনে—অবয়বী ও অবয়বসমূহে, শক্তিমান্ ও শক্তিতে, ক্রিয়াবান্ (কর্ত্তা) ও ক্রিয়াতে এবং অংশী ও স্বরূপাংশে—ইহাদের মধ্যে পরস্পর নিত্য অভেদ বিদ্যমান। জীবস্বরূপে এবং চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও তদ্রূপ অভেদ বর্ত্তমান। অতএব, অংশাদির সহিত অংশী-আদির অভেদ-হেতু গুণী-প্রভৃতি হইতে গুণাদির পৃথক্ অবস্থানের অভাবহেতু, তাহাদিগকে অংশ, অগুণ, অক্রিয় ও অবয়বহীন বলা হয়। শ্রীবিষ্ণুর অচিন্ত্য-শক্তিবশতঃ এ-সমস্তই সম্ভব। ক্রিয়াদির নিত্যতা, প্রকাশ ও অপ্রকাশভেদ, অস্তিত্ব ও অনস্তিত্বরূপে ব্যবহার এবং বিশেষ ও বিশিষ্টের অভেদও তদ্রূপেই সিদ্ধ হয়। অচিন্ত্য-শক্তিত্ব-নিবন্ধন পরমেশ্বরে সমস্তই সঙ্গত হয়। আর, তাঁহার শক্তিহেতুই জীব-সমূহে এবং চিদ্রূপা প্রকৃতিতেও তত্তদ্বিষয়গত ভেদ ও অভেদ উভয়ই বর্ত্তমান, যেহেতু অন্যত্র ভেদ ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয়। নিমিত্ত-কারণ ব্যতীত, কার্য্য ও কারণের মধ্যেও এইরূপ ভেদাভেদ স্বীকার্য্য।"

উল্লিখিত প্রমাণে জানা যায়, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভেদাভেদও স্বীকার কয়িয়াছেন। তবে তিনি ভেদাভেদ অপেক্ষা ভেদের উপরেই বিশেষ প্রাধান্য দিয়াছেন, ভেদাভেদের মুখ্যত্ব তিনি স্বীকার করেন নাই। ২।৩।৪৩-ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যে তিনি লিখিয়াছেন—"যতো ভেদেন চাস্যায়মভেদেন চ গীয়তে। অতশ্চাংশত্বমুদ্দিষ্টং ভেদাভেদং ন মুখ্যতঃ॥" এই উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপঃ—"অস্য অয়ম্—ইঁহার ইনি।" জীব ব্রহ্মের—ব্রহ্মের অধীন, ব্রহ্মের অনুচর—সেবক; ব্রহ্ম হইতেছেন জীবের সেব্য। সেব্য ও সেবকে ভেদই বর্ত্তমান। তবে শ্রুতিতে যে অভেদের কথাও দৃষ্ট হয়, তাহার তাৎপর্য্য এই যে—জীবের ব্রহ্মাংশত্ব সূচনার জন্য অভেদ বলা হইয়াছে। এইরূপে ভেদ ও অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হইলেও ভেদাভেদ কিন্তু মুখ্য নয়।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতেছে এই যে—ভেদাভেদের মুখ্যত্ব কেন নাই? ভেদেরই বা মুখ্যত্ব কেন?

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যানুগত শ্রীল গৌড়পূর্ণানন্দ তাঁহার "তত্ত্বমুক্তাবলীতে" এই প্রশ্নের উত্তর দিতে চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"জ্ঞাত্বা সাংখ্য-কণাদ-গৌতম-মতং পাতঞ্জলীয়ং মতং
মীমাংসামতং ভট্টভাস্করমতং ষড়্ দর্শনাভ্যন্তরে।
সিদ্ধান্তং কথয়ন্তু হন্ত সুধিয়ো জীবাত্মনোর্বস্তুতঃ
কিং ভেদোঽস্তি কিমেকতা কিমথবা ভেদেঽপ্যভেদস্তয়োঃ॥

শাস্ত্রেষু পঞ্চসু ময়া খলু তত্র তত্র জীবাত্মনোরতিতরাং শ্রুত এব ভেদঃ।
বেদান্তশাস্ত্রভণিতং কিমিদং শৃণোমি ভেদং ততোঽন্যমুভয়ং ত্রিবিধং বিচিত্রম্ ॥
—শ্রীমৎসুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ-বিরচিত 'গৌড়ীয়ার তিনঠাকুর'-প্রথম ভঙ্গী, ২১১ পৃষ্ঠাধৃত-বচন ॥"

ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই—শ্রীগৌড়পূর্ণানন্দ বলিতেছেন—"জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান ? ভেদ ? না কি অভেদ ? না কি ভেদেও অভেদ ? ষড়্‌দর্শনের অন্তর্গত সাংখ্য, কণাদ, গৌতম, পতঞ্জলি, মীমাংসা ও ভট্ট-ভাস্করের দর্শন-শাস্ত্র বিচার করিয়া আমি দেখিতেছি—জীব ও পরমাত্মার মধ্যে 'অতিতর ভেদ —আত্যন্তিক ভেদ' বিদ্যমান। এই অবস্থায় বেদান্ত-শাস্ত্র কথিত ভেদ, অভেদ ও ভেদাভেদ—এই ত্রিবিধ বিচিত্র মত কিরূপে গ্রহণ করা যায় ?"

বেদান্তদর্শনে বা ব্রহ্মসূত্রে সূত্রকার ব্যাসদেব সাংখ্য-শাস্ত্রাদির অবৈদিক মতের খণ্ডন করিয়া শ্রুতিসম্মত মতেরই প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। নিরীশ্বর-সাংখ্যশাস্ত্রাদি হইতেছে পৌরুষেয় শাস্ত্র ; আর বেদান্ত হইতেছে অপৌরুষেয়। প্রকৃতির অতীত তত্ত্বাদি-বিষয়ে বেদান্তই যে একমাত্র প্রমাণ "শাস্ত্রযোনিত্বাৎ", "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"-ইত্যাদি সূত্রে ব্যাসদেব তাহা পরিষ্কারভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় সাংখ্যাদি-শাস্ত্রকে বেদান্তের উপরে স্থান দেওয়া সঙ্গত হইতে পারে না। যাহা হউক গৌড়পূর্ণানন্দের উক্তি হইতে বুঝা যায়—সাংখ্যাদি-শাস্ত্রের আনুগত্যেই তিনি জীবেশ্বরের ভেদ স্বীকার করিতেছেন। ইহা কিন্তু শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। তিনি তাঁহার ভেদমূলক সিদ্ধান্তকে শ্রুতির এবং বেদানুগত স্মৃতির উপরেই প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করিয়াছেন। তিনি ভেদাভেদবাদের মুখ্যত্ব স্বীকার না করিলেও অশাস্ত্রীয়ত্বের বা অযৌক্তিকত্বের কথা বলেন নাই।

জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদ স্বীকার করিয়াও জীবের নিত্য পৃথক্ অস্তিত্বের এবং জীব ও ব্রহ্মের গুণাদির ভিন্নতার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই তিনি ভেদবাদ স্থাপন করিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত জীবব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে একত্ববাদের সুদৃঢ় প্রতিবাদ জ্ঞাপনের জন্যই বোধ হয় শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথা উচ্চ-স্বরে প্রচার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার ভেদবাদ যে আত্যন্তিক ভেদ জ্ঞাপন করে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। তাঁহারই মতে জীব যখন ব্রহ্মাধীন, ব্রহ্মানুচর—সুতরাং ব্রহ্মাপেক্ষ, তখন জীবকে ব্রহ্মের আত্যন্তিক ভেদ বলা যাইতে পারে না। সূক্ষ্ম বিচারে দেখা যায়—তাঁহার কথিত ভেদ হইতেছে **বাস্তবিক অভেদের অন্তর্গত ভেদ**। অথবা, ইহাকে ভেদাভেদও বলা যায়। ভেদাভেদের কথা তিনিও স্বীকার করিয়াছেন। মুক্তাবস্থাতেও জীব ব্রহ্মের সহিত এক হইয়া যায় না, পরন্তু স্বীয় পৃথক্ অস্তিত্বই রক্ষা করে, তাহা জানাইবার জন্যই ভেদাভেদের প্রাধান্য স্বীকার না করিয়া তিনি ভেদের প্রাধান্য প্রচার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

(২) জীবে জীবে পরস্পর ভেদ

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে জীব স্বরূপে অণু এবং সংখ্যায় অনন্ত। জীব-সংখ্যার অনন্তত্ব হইতেই জীবে জীবে পরস্পর ভেদ আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। এই ভেদেরও বৈচিত্রী আছে। অসংখ্যজীব যেখানে, সেখানে প্রত্যেক জীবেরই পৃথক্ অস্তিত্ব থাকিবে; নচেৎ অসংখ্যত্বই সিদ্ধ হইতে পারে না।

জীব যখন স্বরূপতঃই অণু এবং তাহার সংখ্যাও যখন অনন্ত, তখন বদ্ধ এবং মুক্ত—উভয় অবস্থাতেই পৃথক্ পৃথক্ অবস্থান-ভেদে জীবে জীবে পরস্পর ভেদ থাকিবে।

আবার, প্রকৃতি ও কার্য্যাদিতেও জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ দৃষ্ট হয়। লৌকিক জগতে দেখা যায়, ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রুচি, ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতি এবং প্রবৃত্তি; তদনুসারে তাহাদের কার্য্যাদিও ভিন্ন ভিন্ন। এই দিক্ দিয়াও বদ্ধ অবস্থাতেও জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ আছে।

সাধনের বৈচিত্রী অনুসারে সাধনসিদ্ধ জীবের প্রাপ্য মুক্তিরও বিভিন্নতা আছে—কেহ সাযুজ্য মুক্তি, কেহ সালোক্য মুক্তি, কেহ বা অন্যবিধ মুক্তি লাভ করিয়া থাকে। মুক্তিভেদে তাহাদের মধ্যে কার্য্যাদিতেও কিছু না কিছু ভেদ থাকিবে।

আবার, দেবতা, গন্ধর্ব্ব, মনুষ্য, পশু, পক্ষী, বৃক্ষ, লতা, গুল্মপ্রভৃতি বিভিন্ন জাতীয় জীব সংসারে দৃষ্ট হয়। তাহাদের দেহাদি এবং ক্রিয়াদিও পরস্পর বিভিন্ন। শ্রীমন্মধ্বমতে বৈকুণ্ঠলোকে বিভিন্ন জীবের স্বরূপদেহও দেবতা-গন্ধর্ব্বাদি ভেদে বিভিন্ন।

এইরূপে দেখা গেল—সর্ব্বত্রই জীবে-জীবে পরস্পর ভেদ বর্ত্তমান।

বক্তব্য। কিন্তু জীবে জীবে কেবল যে পরস্পর ভেদই বিদ্যমান, তাহা নয়, কোনও কোনও বিষয়ে অভেদও দৃষ্ট হয়। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতেও জীব হইতেছে চেতন বস্তু। চেতনত্বাংশে সকল জীবের মধ্যেই অভেদ বিদ্যমান। সকলেই পরমেশ্বরের অধীন এবং পরমেশ্বরের অনুচর বা সেবক। এই বিষয়েও জীবমাত্রের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান। ইহাতে বুঝা যায়—শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য-কথিত জীবে জীবে পরস্পর ভেদ হইতেছে অভেদের অন্তর্গত ভেদমাত্র।

শ্রীমন্মধ্বমতে জীব হইতেছে ঈশ্বরের অংশ—নিরুপাধিক প্রতিবিম্বাংশ, আর ঈশ্বর তাহার অংশী। অংশী এবং অংশের মধ্যেও আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করা যায় না, ভেদাভেদই স্বীকার্য্য।

শ্রীপাদ শঙ্করের জীব-ব্রহ্মৈক্যত্ব-বাদের এবং এক-জীববাদের প্রতিবাদেই হয়তো শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জীবে-জীবে পরস্পর ভেদের উপরেও প্রাধান্য দিয়াছেন।

জীবও চিৎ, ঈশ্বরও চিৎ; এজন্য জীব হইল ঈশ্বরের সজাতীয় বস্তু। কিন্তু মাধ্বমতে জীব ও ঈশ্বরে নিত্য ভেদ বর্ত্তমান বলিয়া জীব হইতেছে ঈশ্বরের সজাতীয় ভেদ।

(৩) ঈশ্বরে ও জড়ে ভেদ

ঈশ্বর চিদ্বস্তু; আর জড় হইতেছে চিদ্বিরোধী বস্তু। সুতরাং ঈশ্বরে ও জড়ে ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে।

জড় হইতেছে ঈশ্বরের বিজাতীয় ভেদ।

বক্তব্য। জগৎই হইতেছে জড় বস্তু। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য জগৎকে অস্বতন্ত্র, অর্থাৎ ঈশ্বর-পরতন্ত্র বলিয়া যখন স্বীকার করেন, তখন জগৎকে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ বলা যায় না। আবার, মাধ্বমতে ঈশ্বর হইতেছেন জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা, নিমিত্ত-কারণ। ইহাতেও জগৎকে ঈশ্বর-নিরপেক্ষ বলা যায় না। ঈশ্বর-নিরপেক্ষ নহে বলিয়া জগৎকে ঈশ্বরের আত্যন্তিক ভেদ বলা সঙ্গত হয় না। অবশ্য ঈশ্বরে ও জগতে বস্তুগত ভেদ আছে; যেহেতু, ঈশ্বর হইতেছেন জড়-বিরোধী চিদ্‌বস্তু, আর জগৎ হইতেছে চিদ্‌বিরোধী জড় বস্তু। ঈশ্বর হইতে পৃথক্ ভাবে জগতের অস্তিত্বও স্বীকৃত—সৃষ্টিকালে কার্য্যরূপে স্থূলরূপেও পৃথক্ এবং প্রলয়ে কারণরূপে—সূক্ষ্মরূপে বা প্রকৃতিরূপেও—পৃথক্। এ-স্থলেও বস্তুগতভেদের প্রতি এবং পৃথক্ অস্তিত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ঈশ্বরে ও জগতে (অর্থাৎ জড়ে) ভেদের কথা বলিয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

(৪) **জীবে জড়ে ভেদ**

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জীবে এবং জড়েও ভেদ স্বীকার করেন। জীবাত্মা চিদ্বস্তু; আর জড় হইতেছে চিদ্‌বিরোধী বস্তু। সুতরাং জীবাত্মায় ও জড়ে বস্তুগত ভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য।

আবার, বদ্ধ শরীরী জীবের দেহও জড়বস্তু। জড়দেহ-বিশিষ্ট জীবাত্মা—অর্থাৎ বদ্ধ শরীরী জীব—জড় জগৎ হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে বলিয়া অবস্থিতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাকেও জড় জগৎ হইতে ভিন্ন বলা যায়। কিন্তু উভয়েই ঈশ্বরাধীন বলিয়া অধীনত্বাংশে তাহাদের অভেদও অস্বীকার করা যায় না।

(৫) **জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ**

জড়ে জড়ে পরস্পর ভেদ বলিতে বিভিন্ন জড় বস্তুর মধ্যে পরস্পর ভেদই বুঝায়। এই ভেদও বস্তুতঃ অবস্থানগত এবং গুণাদিগত ভেদ। বিভিন্ন জড় বস্তুও স্বরূপতঃ জড় বলিয়া বস্তুগতভেদ তাহাদের মধ্যে থাকিতে পারে না। বস্তুগত ভাবে তাহাদের মধ্যে অভেদ অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। এইরূপে দেখা যায়—জড়ে জড়ে ভেদ, কেবল পৃথগস্তিত্বগত এবং গুণাদিগত ভেদ মাত্র।

(৬) **স্বতন্ত্র-তত্ত্ব ও পরতন্ত্র তত্ত্ব**

স্বতন্ত্র-তত্ত্ব হইতেছেন একমাত্র ঈশ্বর পরব্রহ্ম। আর, জীব-জগদাদি হইতেছে পরতন্ত্র-তত্ত্ব—ঈশ্বরের অধীন এবং ঈশ্বরকর্ত্তৃক নিয়ন্ত্রিত তত্ত্ব। দুইটী তত্ত্বের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতবাদকে দ্বৈতবাদ বলা হয়।

আবার, স্বতন্ত্র-তত্ত্ব ও পরতন্ত্র-তত্ত্বের মধ্যে নিত্যভেদ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার মতবাদকে ভেদবাদ বলা হয়।

কিন্তু সূক্ষ্মভাবে বিচার করিলে তাঁহার মতবাদকে দ্বৈতবাদও বলা যায় না, ভেদবাদও বলা যায় না। একথা বলার হেতু এই।

দুইটী বস্তু যদি পরস্পর-নিরপেক্ষ হয়, প্রত্যেকেই যদি স্বয়ংসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই তাহাদিগকে পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ দুইটী বস্তু বলা যায় এবং তাহাদের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ আছে বলিয়াও মনে করা যায়। কিন্তু শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের স্বীকৃত তত্ত্বদ্বয়ের মধ্যে একমাত্র স্বতন্ত্র-তত্ত্ব পরমেশ্বরই হইতেছেন অন্যনিরপক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব। "স্বতন্ত্র-তত্ত্ব"-শব্দেই তিনি তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার স্বীকৃত পরতন্ত্র-তত্ত্ব অন্যনিরপক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ তত্ত্ব নহে। "পরতন্ত্র-তত্ত্ব"-শব্দেই তিনি তাহাও স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। জীব ঈশ্বরের অধীন, ঈশ্বরের অনুচর, সেবক ; জীবকে ঈশ্বরের অংশ বলিয়াও তিনি স্বীকার করেন। সুতরাং জীব ঈশ্বর-নিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ একটী দ্বিতীয় বস্তু নহে। তাঁহার মতে জগৎও ঈশ্বর-সৃষ্ট, ঈশ্বর-কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। সুতরাং জগৎও ঈশ্বর-নিরপক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ একটী দ্বিতীয় বস্তু নহে। এইরূপে দেখা গেল—পরতন্ত্র বা অস্বতন্ত্র তত্ত্ব জীব ও জগৎ বস্তুতঃ ঈশ্বরের ভেদও নহে, ঈশ্বর-নিরপক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ এবং স্বতন্ত্র একটী দ্বিতীয় তত্ত্বও নহে। এজন্যই বলা যাইতে পারে যে, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতবাদকে তাত্ত্বিক বিচারে দ্বৈতবাদ বা কেবল-ভেদবাদ বলা সঙ্গত হয় না। নিত্য পৃথক্ অস্তিত্বাদির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যে তিনি স্বতন্ত্র-তত্ত্ব এবং পরতন্ত্র-তত্ত্বের ভেদের কথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। এই ভেদ কিন্তু তাত্ত্বিক ভেদ নহে।

৮। শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যের ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদ

শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যের (১) মতে ব্রহ্মের দুইটী রূপ – কারণরূপ এবং কার্য্যরূপ। কারণরূপে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় ; কার্য্যরূপে তিনি বহু। মৃত্তিকা যেমন কারণরূপে এক, কিন্তু কার্য্যরূপে বহু—ঘট, শরাবাদি। ব্রহ্মও তদ্রূপ কারণরূপে এক, কার্য্যরূপে বহু—জীব, জগদাদি ব্রহ্মের কার্য্য।

কারণরূপে ব্রহ্ম হইতেছেন নিষ্প্রপঞ্চ (লোকাতীত, নিরাকার,) অনন্ত, অসীম, সল্লক্ষণ এবং বোধলক্ষণ। তাঁহার সত্তা, বোধ বা জ্ঞান এবং অনন্তত্ব হইতেছে তাঁহার গুণ, তাঁহার সঙ্গে অবিচ্ছেদ্য ভাবে সংযুক্ত। কেননা, ধর্ম্মধর্ম্মিভেদে স্বরূপের ভেদ হয় না ; গুণরহিত কোনও দ্রব্য নাই, দ্রব্যরহিত কোন গুণও নাই। "ন ধর্ম্মধর্ম্মিভেদেন স্বরূপভেদ ইতি ; ন হি গুণরহিতং দ্রব্যমস্তি, ন দ্রব্যরহিতো গুণঃ॥ ৩।২।২৩-ব্রহ্মসূত্রের ভাস্করভাষ্য। (২) ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। তিনি নিরংশ

---

(১) অনেকে মনে করেন, শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য হইতেছেন শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যের পরবর্ত্তী এবং শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের পূর্ব্ববর্ত্তী।

(২) Apart from Brahman as manifested in the world, the Brahman with diverse forms, there is also the formless Brahman (nisprapanca Brahman) the Brahman which is transcendent and beyond its immanent forms, and it is this Brahman which is to be worshipped. This transcendent Brahman that is to be worshipped is of the nature of pure being and intelligence (Sat-laksana and bodha-laksana-Bhaskara Bhasya III . 2. 23). He is also infinite and unlimited. But though He is thus characterised as being, intelligence, and infinite, yet these terms do not refer to their distinct entities ; they are the qualities of Brahman, the substance, and, like all qualities, they

হইলেও স্বেচ্ছায় জীব-জগদ্রূপে পরিণত হয়েন, কিন্তু পরিণত হইয়াও তিনি স্বরূপে অবিকৃত থাকেন। কারণরূপে ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয় , উপাধির যোগে তিনি বহুত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীপাদ ভাস্করের মতে "উপাধি" বলিতে "অনাদি অবিদ্যা ও কর্ম্ম" বুঝায়। জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, বুদ্ধি প্রভৃতি জড়বস্তু হইতেছে উপাধি।

ব্রহ্মের দ্বিবিধা শক্তি—জীব-পরিণাম-শক্তি এবং অচেতন-পরিণাম-শক্তি ; অথবা ভোক্তৃশক্তি এবং ভোগ্য-শক্তি।

জীব-পরিণাম-শক্তিতেই ব্রহ্ম উপাধির যোগে জীবরূপে পরিণত হয়েন। সংসার-দশায় জীব হইতেছে ব্রহ্মের অংশ, ব্রহ্মের ভোক্তৃশক্তি এবং পরিমাণে অণু। ইহা হইতেছে জীবের ঔপাধিক (বা আগন্তুক) পরিমাণ। স্বাভাবিক অবস্থায় জীব হইতেছে বিভু, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন।

সংসারী জীবের সংখ্যাও বহু। জীবের বহুত্ব ও ভোক্তৃত্ব হইতেছে ঔপাধিক অর্থাৎ অল্পকালস্থায়ী, যাবৎকাল সংসারী, তাবৎকাল স্থায়ী। প্রলয়ে ও মুক্তাবস্থায় জীবের ভোক্তৃত্বাদি থাকে না।

অচেতন-পরিণাম-শক্তিতে ব্রহ্ম উপাধিযোগে জগদ্রূপে পরিণত হয়েন। কিন্তু পরিণত হইয়াও তিনি স্বরূপে অবিকৃত এবং অপরিবর্ত্তিত থাকেন।

জীব ও জগৎ সত্য—মিথ্যা নহে, কিন্তু ঔপাধিক বা অনিত্য। সৃষ্টিকালে এবং স্থিতিকালেই জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন ; কিন্তু প্রলয়-কালে ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হয়।

ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। সৃষ্টিকালে ব্রহ্ম যখন বহু হইতে ইচ্ছা করেন, তখন তিনি তাঁহার পরিণাম-শক্তিতে নামরূপে নিজেকে পরিণত করেন—ভোক্তা জীবরূপে এবং ভোগ্য অচেতন জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। উর্ণনাভি যেমন তন্তুজাল বিস্তার করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও স্বীয় শক্তিতে বহুত্বপূর্ণ জীব জগদ্রূপে নিজেকে প্রকাশ করেন। জীব-জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও পূর্ণ এবং অনন্ত ব্রহ্ম তাঁহার পূর্ণত্ব এবং অনন্তত্ব রক্ষা করেন—ইহা তাঁহার স্বভাব বা স্বরূপগত ধর্ম্ম।

ভাস্করমতে উপাধি হইতেছে অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মময়। এই উপাধিই অসীম ব্রহ্মকে সসীম জীবরূপে পরিণত করে। মহাকাশ ঘটমধ্যে আবদ্ধ হইলে যেমন ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হয়, তদ্রূপ অপরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মও দেহেন্দ্রিয়-নামরূপ উপাধি দ্বারা পরিচ্ছিন্ন হইয়া জীবরূপে পরিণত হয়। উপাধিগ্রস্ত ব্রহ্মরূপ জীবই সংসার-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে। উপাধির বিনাশে জীব ব্রহ্মের সহিত একীভূত হইয়া যায় ; ঘট ভগ্ন হইলে ঘটমধ্যস্থিত আকাশ যেমন মহাকাশের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রূপ।

---

cannot remain different from the substance, for neither can any substance remain without its qualities. nor can any qualities remain without their substance. A substance does not become different by virtue of its qualities.

A History of Indian Philosophy, by Dr. S. N. Dasguptn, Cambridge edition, I940, Vol, III. P. 10.

জীব-জগৎই হইতেছে ব্রহ্মের কার্য্যরূপ।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—**ভাস্করমতে ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধের স্বরূপটী কি ?**

ঘট-শরাবাদি মৃণ্ময় দ্রব্যও মৃত্তিকাই, মৃত্তিকাতিরিক্ত কোনও দ্রব্য নহে। তদ্রূপ, হার-বলয়-কঙ্কণাদিও স্বর্ণই, স্বর্ণাতিরিক্ত কোনও দ্রব্য নহে। সুতরাং কারণরূপ মৃৎপিণ্ডের সহিত কার্য্যরূপ ঘট-শরাবাদির—কিম্বা কারণরূপ স্বর্ণখণ্ডের সহিত হার-বলয়-কঙ্কণাদির—কোনও ভেদ নাই। ঠিক সেই ভাবেই কারণরূপ ব্রহ্মের সহিতও কার্য্যরূপ জীব-জগতের কোনও ভেদ নাই। সুতরাং **কারণরূপ ব্রহ্মে এবং জীব-জগতে অভেদ।** এই অভেদ স্বাভাবিক বা নিত্য।

আবার, আকারাদিতে যেমন ঘট-শরাবাদির সহিত তাহাদের কারণ মৃৎপিণ্ডের ভেদ আছে, কিম্বা হার-বলয়-কঙ্কণাদির সহিত তাহাদের কারণ স্বর্ণখণ্ডের ভেদ আছে, তদ্রূপ জীব-জগতের সহিত কারণরূপ ব্রহ্মেরও ভেদ আছে। কিন্তু এই ভেদ হইতেছে ঔপাধিক বা আগন্তুক। **ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের ঔপাধিক ভেদ** বিদ্যমান।

এইরূপে দেখা গেল, ভাস্করমতে ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বিদ্যমান ; অভেদই স্বাভাবিক, ভেদ কেবল ঔপাধিক বা আগন্তুক। আগন্তুক হইলেও ভেদ সত্য, অভেদের ন্যায়ই সত্য। তবে অভেদের সত্যত্ব হইতেছে নিত্য, ভেদের সত্যত্ব অনিত্য—যাবৎকাল স্থায়ী, তাবৎকাল সত্য। ইহাই হইতেছে শ্রীপাদ ভাস্করের **ঔপাধিক ভেদাভেদবাদ।**

ক। ভেদ ও অভেদের যুগপৎ স্থিতি ও সত্যত্ব

আপত্তি হইতে পারে—দুইটী বস্তুর মধ্যে যুগপৎ ভেদ ও অভেদ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ ভাস্কর বলেন—তত্ত্বের দিক্ হইতে ভেদ ও অভেদ পরস্পর বিরুদ্ধ হইলেও বাস্তব জগতে ভেদ ও অভেদের একত্রাবস্থিতি দৃষ্ট হয়। বাস্তব জগতে অবিমিশ্র ভেদ যেমন অসম্ভব, অবিমিশ্র অভেদও তেমনি অসম্ভব। কোনও বস্তুই অপর কোনও বস্তু হইতে শুদ্ধ ভিন্নও নহে, শুদ্ধ অভিন্নও নহে, কিন্তু ভিন্নাভিন্ন। কার্য্যরূপে এবং ব্যক্তিরূপে প্রত্যেক বস্তুই অপর বস্তু হইতে ভিন্ন ; কিন্তু একই কারণ হইতে উৎপন্ন বস্তুসমূহ পরস্পর ভিন্ন হইলেও কারণের দিক্ দিয়া অভিন্ন ; কিম্বা একই জাতিভুক্ত যে সকল বস্তু, তাহারাও পরস্পর ভিন্ন হইলেও জাতির দিক্ দিয়া অভিন্ন। যথা, একই স্বর্ণনির্ম্মিত হার, বলয়, কুণ্ডলাদি আকারাদিতে পরস্পর ভিন্ন ; কিন্তু স্বর্ণরূপে তাহারা অভিন্ন, যেহেতু হার-বলয়-কুণ্ডলাদি সমস্তই একই স্বর্ণনির্ম্মিত। রাম, শ্যাম, যদু—তিনজন মানুষের নাম। জাতি-হিসাবে তাহাদের মধ্যে কোনও ভেদ নাই, তিনজনই মানব-জাতিভুক্ত ; কিন্তু ব্যক্তি-হিসাবে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে। রামও শ্যামের মত বা যদুর মত নয় ; শ্যামও রাম বা যদুর মত নয়, যদুও রাম বা শ্যামের মত নয়। আবার, শ্যাম মানুষ, অশ্ব-হস্তী-আদি পশু। শ্যাম মনুষ্যজাতীয়, অশ্ব ও হস্তী পশুজাতীয়। এ-

স্থলে জাতিহিসাবে হস্তী ও অশ্ব হইতে শ্যামের ভেদ আছে ; কিন্তু জীবহিসাবে তাহারা অভিন্ন ; কেননা, শ্যামও জীব, অশ্বও জীব, হস্তীও জীব।

এইরূপে দেখা যায়, বাস্তব জগতে ভেদ ও অভেদের একত্রাবস্থিতি আছে। এই ভেদ ও অভেদ—উভয়ই প্রত্যক্ষদৃষ্ট, তাহাদের একত্রাবস্থিতিও প্রত্যক্ষদৃষ্ট—সুতরাং সত্য এবং সমভাবে সত্য ; যাহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট সত্য, তাহাকে অস্বীকার করা যায় না।

তদ্রূপ, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ, তাহাও সত্য, পরস্পরবিরুদ্ধ নহে। পরস্পর-বিরুদ্ধ হইলে জীবজগৎ ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন হইতে পারিতনা, উৎপন্ন হইয়া ব্রহ্মেই স্থিতিলাভ করিতেও পারিত না এবং ব্রহ্মে লীন হইতেও পারিতনা।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ভেদ ও অভেদ সমভাবে সত্য হইলেও সমভাবে নিত্য নহে। ভেদ স্বাভাবিক নহে—ঔপাধিকমাত্র, শাশ্বত নহে ; যতকাল স্থায়ী অর্থাৎ যতকাল ভেদরূপে অবস্থিতি, ততকালই সত্য, ভেদপ্রাপ্তির পূর্ব্বেও সত্য নহে, ভেদ-বিনাশের পরেও সত্য নহে। ভেদের সত্যত্ব অনিত্য। কিন্তু অভেদের সত্যত্ব শাশ্বত, নিত্য।

খ। **শঙ্কর-মত ও ভাস্কর-মতের তুলনা**

শ্রীপাদ শঙ্করের সঙ্গে শ্রীপাদ ভাস্করের কোনও কোনও বিষয়ে ঐক্য আছে, আবার কোনও কোনও বিষয়ে বিরোধও আছে।

ঐক্য—উভয়ের মতেই পরব্রহ্ম স্বরূপতঃ নিরাকার ; উভয়ের মতেই পরব্রহ্ম উপাধির যোগে জীবজগদ্রূপে সাকারত্ব প্রাপ্ত হয়েন।

উভয়ের মতেই জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন। উপাধির যোগেই ব্রহ্মের জীবভাব, উপাধির বিনাশে জীব মুক্ত হয় এবং তখন ব্রহ্মের সঙ্গে একীভূত হইয়া যায়।

বিরোধ—শ্রীপাদ শঙ্করের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিধ-শক্তি-বিবর্জ্জিত ; কিন্তু শ্রীপাদ ভাস্করের মতে ব্রহ্ম সর্ব্বশক্তি-বিবর্জ্জিত নহেন ; ব্রহ্মের জীব-পরিণাম-শক্তি এবং অচেতন-পরিণাম-শক্তি আছে। শ্রীপাদ শঙ্কর ব্রহ্মের কোনও গুণ স্বীকার করেন না। কিন্তু শ্রীপাদ ভাস্কর ব্রহ্মকে সল্লক্ষণ এবং বোধলক্ষণ বলেন এবং তাঁহার এই সত্তাকে, বোধ বা জ্ঞানকে এবং অনন্তত্বকেও ব্রহ্মের স্বরূপভূত গুণ বলিয়া স্বীকার করেন। শ্রীপাদ ভাস্কর বলেন—গুণরহিত কোনও দ্রব্য নাই, দ্রব্যরহিতও কোনও গুণ নাই। তিনি ব্রহ্মের "ইচ্ছা"ও স্বীকার করেন ; তিনি বলেন, ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় জীব-জগদ্রূপে পরিণত হয়েন। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ ভাস্করের ব্রহ্ম একেবারে নির্ব্বিশেষ—সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন—নহেন ; কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ—সর্ব্ববিধ-বিশেষত্ব-হীন।

শ্রীপাদ শঙ্কর পরিণাম-বাদ স্বীকার করেন না ; কিন্তু শ্রীপাদ ভাস্কর পরিণাম-বাদ স্বীকার করেন ; অবশ্য তাঁহার স্বীকৃত পরিণাম হইতেছে উপাধির যোগে পরিণাম। তিনি শ্রীপাদ শঙ্করের বিবর্ত্তবাদ স্বীকার করেন না।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে উপাধি মিথ্যা, উপাধির যোগে যে ভেদ জন্মে, তাহাও মিথ্যা। শ্রীপাদ ভাস্করের মতে উপাধি মিথ্যা নহে, সত্য ; এবং উপাধিজাত ভেদও সত্য—বাস্তব অস্তিত্ব-বিশিষ্ট। শঙ্করের মতে জীব মিথ্যা, ভাস্করের মতে জীব সত্য।

শঙ্করের মতে জগৎ বলিয়া বাস্তবিক কোনও বস্তু নাই ; এই পরিদৃশ্যমান জগৎ হইতেছে ব্রহ্মে জগতের ভ্রান্তি মাত্র। যেমন, শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, তদ্রূপ। ভাস্করের মতে জগৎ ভ্রান্তি-মাত্র নহে, মিথ্যা নহে ; জগৎ সত্য—বাস্তব অস্তিত্বময় বস্তু। উপাধির যোগে ব্রহ্মই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন।

শঙ্করের মতে ভেদমাত্রই মিথ্যা—বাস্তব-অস্তিত্বহীন। ভাস্করের মতে ভেদ মিথ্যা নহে, সত্য—বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট।

শঙ্করের মতে যাহা সত্য, তাহা নিত্যই সত্য—অনাদিকাল হইতে অনন্তকাল পর্য্যন্ত সত্য, বাস্তব অস্তিত্ববিশিষ্ট ; শ্রীপাদ শঙ্করের মতে সত্য ও নিত্য—এই উভয় হইতেছে এক পর্য্যায়ভুক্ত।

কিন্তু ভাস্করের মতে অনিত্যবস্তুও সত্য বা বাস্তব-অস্তিত্ববিশিষ্ট হইতে পারে। অনিত্য বস্তুর সত্যত্ব অস্থায়ী—যাবৎকাল সেই বস্তুটী থাকিবে, তাবৎকাল তাহা সত্য বা অস্তিত্ববিশিষ্ট।

শ্রীপাদ শঙ্করের মতে একমাত্র ব্রহ্মই সত্য, আর সমস্তই মিথ্যা ; ব্রহ্ম ব্যতীত অন্য কোনও বস্তুরই বাস্তব অস্তিত্ব নাই। শ্রীপাদ ভাস্কর তীব্রভাবে এই শঙ্করমতের বিরুদ্ধ সমালোচনা করিয়াছেন। তিনি শঙ্কর মতকে বৌদ্ধমতও বলিয়াছেন।

শঙ্কর-কথিত "উপাধি" হইতেছে মিথ্যা এবং মিথ্যাসৃষ্টিকারী ; ভাস্কর-কথিত উপাধি মিথ্যা নহে, মিথ্যাসৃষ্টিকারীও নহে ; তাহা সত্য এবং সত্যসৃষ্টিকারী।

শ্রীপাদ শঙ্করের "উপাধি" হইতেছে তাঁহার "অনির্ব্বাচ্যা মায়া", যাহার দুইটী বৃত্তি—মায়া ও অবিদ্যা। মায়া দ্বারা উপহিত ব্রহ্মই তাঁহার মতে সবিশেষ ব্রহ্ম বা সগুণ ব্রহ্ম। আর অবিদ্যাদ্বারা উপহিত ব্রহ্ম বা ব্রহ্ম-প্রতিবিম্ব হইতেছে জীব। সগুণব্রহ্ম বা ঈশ্বরও মিথ্যা, জীবও মিথ্যা। অবিদ্যার প্রভাবেই জীব ব্রহ্মেতে জগতের অস্তিত্বের ভ্রম পোষণ করে ; বস্তুতঃ জগৎ মিথ্যা।

শ্রীপাদ ভাস্করের "উপাধি" হইতেছে "অবিদ্যা-কাম-কর্ম্মরূপ।" ইহা মিথ্যা নহে, সত্য। এই উপাধিযুক্ত সবিশেষ বা সগুণব্রহ্মও মিথ্যা নহে, সত্য। উপাধিযুক্ত ব্রহ্ম যে জীব-জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করেন, সেই জীব-জগৎও মিথ্যা নহে, পরন্তু সত্য—কিন্তু অনিত্য।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ শঙ্কর এবং শ্রীপাদ ভাস্করের মধ্যে বিরোধ হইতেছে কেবল "উপাধির" স্বরূপ এবং "উপাধির" প্রভাব-বিষয়ে। অন্য সমস্ত বিষয়েই তাঁহাদের মধ্যে ঐক্য বিদ্যমান। উপাধির স্বরূপ এবং প্রভাব সম্বন্ধে তাঁহাদের মত-বিরোধের ফলেই জীব-জগতের এবং সগুণব্রহ্মের সত্যত্ব-মিথ্যাত্ব সম্বন্ধে তাঁহাদের মধ্যে মতবিরোধ। বৌদ্ধমতেও জীব-জগৎ মিথ্যা।

শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-জগৎকে মিথ্যা বলিয়াছেন বলিয়াই বোধ হয় শ্রীপাদ ভাস্কর শঙ্করের মতকে বৌদ্ধমত বলিয়া কটাক্ষ করিয়াছেন।

গ। ভাস্কর-মত সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ ভাস্করের মতে জীবও স্বরূপতঃ ব্রহ্মই। ইহা যে প্রস্থানত্রয়সম্মত সিদ্ধান্ত নহে, শঙ্করমতের আলোচনা প্রসঙ্গেই তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে।

ব্রহ্মের সহিত উপাধির সংযোগ যে শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত নহে এবং যুক্তি-সম্মতও নহে, শঙ্কর-মতের আলোচনা-প্রসঙ্গে তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ ভাস্কর বলেন—উপাধির যোগেই ব্রহ্ম জীবরূপে পরিণত হয়েন। ইহা স্বীকার করিতে হইলে ব্রহ্মে জীবগত সংসার-দুঃখাদিও স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়; কেননা, শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম সর্ব্বদাই নিরস্ত-নিখিলদোষ।

শ্রীপাদ ভাস্করের "উপাধি" হইতেছে "অনাদি অবিদ্যা ও কর্ম্ম।" এই অবিদ্যার আশ্রয় কে? এই কর্ম্মই বা কাহার?

জীবকে এই অবিদ্যার আশ্রয় বলা যায় না। কেননা, শ্রীপাদ ভাস্করের মতে ব্রহ্মই অবিদ্যারূপ উপাধির যোগে জীব হয়েন; তাহা হইলে ব্রহ্মের জীবরূপতা-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয়; অবিদ্যাকে "অনাদি" বলিয়া তিনিও তাহা স্বীকার করিয়াছেন। তখন তো ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কিছুই থাকে না। তবে কি অবিদ্যার আশ্রয় ব্রহ্ম? তাহাও স্বীকার করা যায় না; কেননা, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্ম কখনও অজ্ঞানরূপা অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারেন না। কোনও রূপ আশ্রয়ব্যতীতও অবিদ্যা থাকিতে পারে না। যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকার করা যায় যে, অবিদ্যা স্বাশ্রয়, তাহা হইলেও একটী পৃথক্ তত্ত্ব স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহাতে ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে না। যদি বলা যায়—অবিদ্যার যোগে ব্রহ্ম যখন জীব হয়েন, তখন সেই জীবই হয় অবিদ্যার আশ্রয়। ইহা স্বীকার করিতে গেলেও অন্যোন্যাশ্রয়-দোষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। এইরূপে দেখা যায়—ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার উপাধির যোগে জীবের উৎপত্তি উপপন্ন হয় না।

তারপর কর্ম্ম। এই কর্ম্ম কাহার? যদি বলা যায়—জীবেরই কর্ম্ম, তাহাও সঙ্গত হয় না। কেননা, ভাস্করমতে জীব তো স্বরূপতঃ ব্রহ্মই; জীবের কর্ম্ম স্বীকার করিলে বাস্তবিক ব্রহ্মেরই কর্ম্ম স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু তাহা শ্রুতিস্মৃতিবিরুদ্ধ। যদি বলা যায়—অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মরূপ জীবই কর্ম্ম করে, শুদ্ধব্রহ্ম কর্ম্ম করেন না। কিন্তু জীবের অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মত্বই তো অসিদ্ধ। যাহা সিদ্ধ নয়, তাহা কর্ম্ম করিবে কিরূপে? অবিদ্যাপ্রসঙ্গে প্রদর্শিত যুক্তিও এ-স্থলে প্রযুজ্য।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ ভাস্করের কথিত উপাধি সম্বন্ধে কোনও শাস্ত্রসম্মত এবং যুক্তিসঙ্গত সমাধানই পাওয়া যায় না। তাহাতে এবং পূর্ব্বোল্লিখিত হেতুতে তাঁহার কথিত ঔপাধিক ভেদাভেদ-বাদও শাস্ত্রবিরুদ্ধ এবং যুক্তিবিরুদ্ধ হইয়া পড়ে।

৯। শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ

শ্রীপাদ নিম্বার্কের মতে **ব্রহ্ম** হইতেছেন—সর্ব্ববৃহত্তম বস্তু, স্বরূপে অনন্ত, শক্তিতে অনন্ত, অনন্ত-কল্যাণ-গুণাকর, কিন্তু হেয়-প্রাকৃত-গুণরহিত, সৎস্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ, সর্ব্বজ্ঞ, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের একমাত্র কর্ত্তা, সমস্তের নিয়ন্তা, জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ, সাকার, ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যময় পুরুষোত্তম, ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা মাধুর্য্যেরই অপরিসীম বৈশিষ্ট্য। তাঁহার মতে শ্রীরাধা-সমন্বিত গোপাল কৃষ্ণই হইতেছেন পরব্রহ্ম। তিনি লীলাবিলাসী।

তাঁহার মতে **জীব** হইতেছে স্বরূপতঃ জ্ঞানস্বরূপ, জড়বিবর্জ্জিত, চিৎ, ব্রহ্মের অংশ, জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্ত্তা, সর্ব্বাবস্থায় ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত, নিত্য, স্বরূপে অণু, সংখ্যায় অনন্ত, মুক্তাবস্থাতেও ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

আর, তাঁহার মতে **জগৎ** হইতেছে অচিৎ বা জড়।

ক। শ্রীপাদ নিম্বার্ক-স্বীকৃত বস্তুত্রয় ও তৎসম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ নিম্বার্ক তিনটী বস্তু স্বীকার করেন। তিনটীই সমভাবে সত্য এবং নিত্য। এই তিনটী বস্তু হইতেছে—ব্রহ্ম, চিৎ ও অচিৎ। ব্রহ্ম--নিয়ন্তা। চিৎ—ভোক্তা জীব। অচিৎ--ভোগ্য।

তাঁহার মতে, অচিৎ আবার তিন রকমের—প্রাকৃত (অর্থাৎ প্রকৃতি হইতে জাত), অপ্রাকৃত (অর্থাৎ যাহা প্রকৃতি হইতে জাত নহে) এবং কাল (সময়)।

প্রকৃতি—সাংখ্যের প্রকৃতির মতন। কিন্তু সাংখ্যের প্রকৃতির ন্যায় স্বতন্ত্রা নহে। শ্রীপাদ নিম্বার্কের প্রকৃতি বা জড়শক্তি হইতেছে সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মের অধীন এবং ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ন্ত্রিত। বৈদিকী মায়াই এই প্রকৃতি বলিয়া মনে হয়। এই প্রকৃতি হইতে উদ্ভূত বস্তুকেই শ্রীপাদ নিম্বার্ক "প্রাকৃত" বলেন।

অপ্রাকৃত—অপ্রাকৃত বস্তুটীর স্বরূপ শ্রীপাদ নিম্বার্ক স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেন নাই। তাঁহার পরবর্ত্তী তাঁহার সম্প্রদায়ের তৃতীয় আচার্য্য শ্রীপাদ পুরুষোত্তমাচার্য্যের রচিত "বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষা" নামক গ্রন্থ হইতে জানা যায়—লৌকিক জগতে অচেতন বস্তুগুলির উপাদান যেমন জড়-প্রকৃতি, তেমনি ভগবদ্ধামাদির, তত্রত্য দেহাদির এবং তত্রত্য অলঙ্কারাদি ভোগ্যবস্তুর উপাদান হইতেছে এই "অপ্রাকৃত" বস্তু। *

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে ভগবদ্ধামাদি এবং তত্রত্য বস্ত্রালঙ্কারাদি সমস্তই হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের চিৎ-শক্তির বা স্বরূপ-শক্তির বিলাস ; সুতরাং তৎসমস্ত "অচিৎ" নহে, পরন্তু চিৎই, তবে অচেতনের মত প্রতীয়মান হইলেও তাহারা প্রাকৃত বা জড়-প্রকৃতিজাত নহে। শ্রীপাদ পুরুষোত্তম তাহাদিগকে প্রকৃতিজাত বলিয়া স্বীকার করেন না বলিয়াই "অপ্রাকৃত" বলিয়াছেন

---

* *The Nimbarka School of Vedanta* By Dr. Roma Chowdhury M. A., *D. Phil* (*Oxon*), *published in The Cultural Heritage of India*, Second edition, Vol. III, 1953, publlshed by The Ramakrishna Msssion Institute of Culture, Calcutta. Page 339.

এবং তাহারা অচেতনবৎ প্রতীয়মান হয় বলিয়াই তাহাদিগকে "অচিৎ" পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। বস্তুতঃ অচেতনবৎ প্রতীয়মান হইলেও তাহারা স্বরূপতঃ অচেতন বা অচিৎ নহে (১।১।৯৭, ১।১।৭৭ এবং ১।১।১০১—অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

পরব্রহ্মের বিগ্রহও সচ্চিদানন্দ। শ্রুতি-স্মৃতি পরব্রহ্মকে "সচ্চিদানন্দবিগ্রহ" বলিয়াছেন। তাঁহাতে দেহ-দেহিভেদ নাই (১।১।৭০ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পরব্রহ্ম যে সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ এবং জ্ঞানস্বরূপ, তাহা শ্রীপাদ নিম্বার্কও স্বীকার করেন। পরব্রহ্মের বিগ্রহ যে তাঁহার স্বরূপভূত, পরব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, তাহাও শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত (১।১।৬৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি যখন চিৎস্বরূপ, তাঁহা হইতে অভিন্ন এবং তাঁহারই স্বরূপভূত বিগ্রহও চিৎ-স্বরূপই হইবে, তাহা কখনও "অচিৎ" হইতে পারে না।

ভগবদ্ধামস্থ ভগবৎ-পরিকরগণের দেহও চিন্ময় (১।১।১০৫—১০৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), "অচিৎ" নহে।

ভগবদ্ধামে বৃক্ষ, লতা, পশু, পক্ষী প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তু আছে, তাহাদের দেহও চিন্ময়, "অচিৎ" নহে।

বস্তুমাত্রই হইতেছে পরব্রহ্মের শক্তির বিলাস। তাঁহার প্রধান শক্তি হইতেছে তিনটী— চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি এবং মায়াশক্তি। এই তিনের অনন্ত বৈচিত্রীই হইতেছে ব্রহ্মের অনন্ত শক্তি। এই তিনটী শক্তির মধ্যে চিচ্ছক্তি এবং জীবশক্তি হইতেছে চিদ্রূপা—চেতনাময়ী এবং মায়াশক্তি বা প্রকৃতি হইতেছে জড়রূপা বা অচেতনা। চিদ্রূপা জীবশক্তির বিলাস হইতেছে অনন্তকোটি জীব। আর যত বস্তু আছে বা হইতে পারে, তৎসমস্তই হইবে—চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত বা চিচ্ছক্তি-ভূত এবং অচিৎ মায়াশক্তি বা প্রকৃতি হইতে জাত। চিচ্ছক্তি হইতে উদ্ভূত বস্তুমাত্রই স্বরূপতঃ চেতন ; কেননা, চিৎ-শব্দেই জ্ঞান বুঝায়। তাহাদের মধ্যে কোনও কোনও বস্তু লীলারস-বৈচিত্রী সম্পাদনের জন্য অচেতনবৎ প্রতীয়মান হইতে পারে ; তথাপি স্বরূপতঃ তাহারা চেতনই, চিৎই। আর, অচিৎ প্রকৃতি হইতে জাত বস্তুমাত্রই হইবে অচেতন। এই অচেতন বস্তুসমূহ প্রকৃতি হইতে জাত বলিয়া তাহাদিগকে "প্রাকৃত" বলা হয়। অচিৎ হইতেছে—যাহা চিৎ নহে, যাহা চিৎ-বিরোধী এবং চিৎ হইতেছে—যাহা অচিৎ নহে, অচিৎ-বিরোধী, জড়-বিরোধী। যাহা চিৎ, তাহা অচিৎ হইতে পারে না এবং যাহা অচিৎ, তাহাও চিৎ হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা যায়, বস্তু স্বরূপতঃ মাত্র দুই শ্রেণীর হইতে পারে—চিৎ এবং অচিৎ। জীব হইতেছে চিদ্রূপা জীবশক্তির অংশ ; সুতরাং জীব বা জীবাত্মাও স্বরূপতঃ চিৎ ; কিন্তু কেবল মাত্র জীবেই সমগ্র চিৎ সীমাবদ্ধ নহে ; ব্রহ্মও চিৎ এবং শ্রীপাদ নিম্বার্কও ব্রহ্মকে চিৎ-স্বরূপ বলিয়াছেন। ব্রহ্ম বিভুচিৎ, জীব অণুচিৎ। উভয়ই চিৎ। ভগবদ্ধামে জড়রূপা মায়া বা অচিৎ

প্রকৃতির গতি নাই, থাকিতেও পারে না ; সুতরাং ভগবদ্ধামে কোনওরূপ প্রাকৃত বা অচিদ্বস্তুও থাকিতে পারে না। তত্রত্য সমস্ত বস্তুই চিজ্জাতীয়।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে এই দুই জাতীয় বস্তুর কথাই জানা যায়—চিজ্জাতীয় এবং অচিজ্জাতীয়। যাহা অচিৎ মায়া বা প্রকৃতি হইতে জাত, তাহাই অচিজ্জাতীয়, তাহাই "প্রাকৃত।" আর, যাহা চিজ্জাতীয়, তাহাই প্রাকৃত-বিরোধী—"অপ্রাকৃত।" এতদ্ব্যতীত তৃতীয় রকমের কোনও বস্তুর কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায় না ; "অচিৎ", অথচ "অপ্রাকৃত"—এইরূপ কোনও বস্তুর কথাও জানা যায় না। শ্রীপাদ পুরুষোত্তমের কথিত এই "অচিৎ অপ্রাকৃত" বস্তুটীর স্বরূপ কি ? ইহা যদি চিচ্ছক্তি হইতেও জাত না হয় এবং প্রকৃতি হইতেও উদ্ভূত না হয়, তাহা হইলে ইহার উদ্ভবের হেতুই বা কি ?

শ্রীপাদ নিম্বার্ক যে ব্রহ্ম, চিৎ এবং অচিৎ—এই তিনটী বস্তুর কথা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ রামানুজেরও অস্বীকৃত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, শ্রীপাদ রামানুজও বলেন—চিদচিদ্রূপস্বরূপ জীব-জগৎ ব্রহ্মের শরীর। এ-স্থলে তিনি ব্রহ্ম, চিৎ এবং অচিৎ—এই তিনটী বস্তুর উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীপাদ নিম্বার্কের ন্যায় তিনিও জীবকেই "চিৎ" বলিয়াছেন। চিৎ-অংশে ব্রহ্ম এবং জীব অভিন্ন হইলেও জীবের নিত্য পৃথক্ অস্তিত্ব-বিবক্ষাতেই বোধ হয় তাঁহারা চিৎ-স্বরূপ জীবের পৃথক্ উল্লেখ করিয়াছেন। কিন্তু শ্রীপাদ রামানুজও "অচিৎ"-শব্দে কেবল জড়-জগৎকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। অন্তর্য্যামী নিয়ন্তারূপে ব্রহ্ম জীব-জগতের মধ্যে অবস্থান করেন ; সুতরাং জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শরীর-স্থানীয় ; ইহা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যেই তিনি জীব-জগৎকে ব্রহ্মের শরীর বলিয়াছেন। ব্রহ্মের স্বরূপগত শরীরই যে জীব-জগৎ, তাঁহার অন্য কোনও শরীর নাই—ইহা শ্রীপাদ রামানুজের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, তাঁহার উপাস্য শ্রীনারায়ণের কর-চরণ-মুখোদরাদি যে চিদচিদ্রূপ জীব-জগতের দ্বারা গঠিত, একথা নিশ্চয়ই রামানুজ স্বীকার করিবেন না। শ্রীনারায়ণের শ্রীবিগ্রহ যে "অপ্রাকৃত", তাহা শ্রীপাদ রামানুজও স্বীকার করেন ; কিন্তু তাঁহার মতে—এই "অপ্রাকৃত" হইতেছে "চিন্ময়", "অচিৎ" নহে। কেননা, "অচিৎ, অথচ অপ্রাকৃত"—এইরূপ কোনও বস্তুর উল্লেখ তিনি কোথাও করেন নাই। শ্রীপাদ রামানুজের স্বীকৃত সাকার ব্রহ্মও হইতেছেন—"সত্যং জ্ঞানমনন্তম্।" যাহা জ্ঞানস্বরূপ, তাহা কখনও "অচিৎ" হইতে পারে না।

শ্রীপাদ পুরুষোত্তম যে ব্রহ্ম-বিগ্রহকে "অচিৎ অপ্রাকৃত" বলিয়াছেন, তাহা শ্রীপাদ নিম্বার্কেরও অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, শ্রীপাদ নিম্বার্কও ব্রহ্মকে সৎ-স্বরূপ, চিৎ-স্বরূপ, জ্ঞান-স্বরূপ বলিয়াছেন। চিৎ-স্বরূপ, জ্ঞানস্বরূপ কখনও "অচিৎ" হইতে পারে না।

খ। শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্যের মতে সৃষ্টিরহস্য

শ্রীপাদ নিম্বার্কের মতে ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। ব্রহ্ম নিজেই নিজেকে জগদ্রূপে পরিণত করেন।

কিভাবে তিনি নিজেকে নিজে জগদ্রূপে পরিণত করেন, তৎসম্বন্ধে শ্রীপাদ পুরুষোত্তম

তাঁহার বেদান্তরত্ন-মঞ্জুষায় বলিয়াছেন —এই জীব-জগৎ হইতেছে পরব্রহ্মের শক্তির বিকাশ। প্রলয়ে তাঁহার চিৎ-শক্তি ও অচিৎ-শক্তি সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মেই অবস্থান করে। সৃষ্টিকালে এই দুইটী স্বাভাবিকী শক্তিই স্থূলরূপে বিকাশ প্রাপ্ত হয়—চিৎ-শক্তি স্থূলজীবরূপে এবং অচিৎ-শক্তি স্থূলজগদ্রূপে বিকাশ-প্রাপ্ত হইয়া প্রলয়ের পূর্ব্বপর্য্যন্ত স্থূলরূপে অবস্থান করে। সৃষ্টির প্রারম্ভে পরব্রহ্ম তাঁহার অনন্ত স্বাভাবিকী শক্তির মধ্যে চিৎ-শক্তিকে জীবাত্মারূপে এবং অচিৎ-শক্তিকে প্রকৃতিরূপে প্রকাশ করেন। এই প্রকৃতি হইতেই ক্রমশঃ জড় জগতের উদ্ভব হয়। সৃষ্টিকালে পরব্রহ্মই প্রত্যেক জীবাত্মার সহিত তাহার কর্ম্মফলের সংযোগ বিধান করেন এবং স্বীয় কর্ম্মফল ভোগের উপযোগী ইন্দ্রিয়াদিও তিনি জীবকে দিয়া থাকেন। পরব্রহ্মই সৃষ্টিকর্ত্তা অর্থাৎ নিমিত্ত-কারণ এবং তিনিই জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করেন বলিয়া তিনি জগতের উপাদান-কারণও।

চিৎ-শক্তি ও অচিৎ-শক্তি ব্রহ্মেরই স্বাভাবিকী শক্তি বলিয়া শক্তির পরিণামই তাঁহার পরিণাম।

সৃষ্টি হইতেছে পরব্রহ্মের লীলাবিশেষ।

শ্রীপাদ নিম্বার্ক জীবকে "চিৎ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। সুতরাং শ্রীপাদ পুরুষোত্তম যাহাকে "চিৎ-শক্তি" বলিয়াছেন তাহা "জীব-শক্তি" কিনা বলা যায় না। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীকৃষ্ণের উক্তি অনুসারে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ জীবকে "জীবশক্তির" অংশই বলিয়াছেন। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যাহাকে পরাশক্তি বলা হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য-গণ তাহাকেই "চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি" বলেন। ইহা পরব্রহ্মের স্বরূপে অবস্থান করে। সুতরাং শ্রীপাদ পুরুষোত্তম-কথিত "চিৎ-শক্তি" এবং গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের "চিচ্ছক্তি" যদি একই বস্তু হয়, তাহা হইলে জীবের সংসারিত্ব সম্ভব হয় না।

গ। নিম্বার্কমতে ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ

এক্ষণে দেখিতে হইবে—শ্রীপাদ নিম্বার্কের মতে জীব-জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধটীর স্বরূপ কি ?

শ্রীপাদ নিম্বার্ক বলেন, ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের ভেদ এবং অভেদ উভয়ই বিদ্যমান। কিরূপে তিনি এই ভেদ ও অভেদ প্রতিষ্ঠিত করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে।

প্রথমে ভেদের কথাই বিবেচনা করা যাউক। শ্রীপাদ নিম্বার্ক বলেন, ব্রহ্মের সঙ্গে চিৎ ও অচিতের বাস্তব ভেদ আছে।

জীবে ব্রহ্মে ভেদ

প্রথমে ব্রহ্মের সহিত জীবের ভেদের কথা বলা হইতেছে। ব্রহ্ম হইতেছেন কারণ. চিৎ বা জীব তাঁহার কার্য্য। ব্রহ্ম পূর্ণ বা অংশী, জীব অংশ। ব্রহ্ম উপাস্য, জীব উপাসক। ব্রহ্ম জ্ঞেয়, জীব জ্ঞাতা। ব্রহ্ম প্রাপ্য, জীব প্রাপক। কার্য্য ও কারণের মধ্যে, অংশ ও অংশীর মধ্যে,

উপাস্য ও উপাসকের মধ্যে, জ্ঞেয় ও জ্ঞাতার মধ্যে এবং প্রাপ্য ও প্রাপকের মধ্যে সর্ব্বদাই ভেদ বর্ত্তমান।

আবার, অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্ম প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই বিরাজিত। জীবহৃদয় হইল ব্রহ্মের বাসস্থান এবং ব্রহ্ম হইলেন জীবহৃদয়ের অধিবাসী। বাসস্থান এবং অধিবাসীর মধ্যেও ভেদ বর্ত্তমান। জীবহৃদয়ে থাকিয়া ব্রহ্ম জীবকে নিয়ন্ত্রিত করেন। তিনি নিয়ন্তা, জীব নিয়ন্ত্রিত। নিয়ন্তা এবং নিয়ন্ত্রিতের মধ্যেও ভেদ বিদ্যমান।

আবার ব্রহ্ম হইতেছেন—সর্ব্বজ্ঞ, বিভু , সর্ব্বগত, সর্ব্বশক্তিমান্ এবং সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়ের কর্ত্তা। কিন্তু জীব হইতেছে অল্পজ্ঞ, অণু, অল্পশক্তি, সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-কর্ত্তৃত্বের শক্তিহীন এবং সম্পূর্ণ রূপে পরব্রহ্মের অধীন এবং সম্পূর্ণরূপে ব্রহ্মাপেক্ষ। মুক্তজীবও স্বরূপে অণু, মুক্তজীবেরও সৃষ্টি-আদির সামর্থ্য থাকে না, মুক্তজীবও সর্ব্বতোভাবে ব্রহ্মাপেক্ষ এবং ব্রহ্ম-নিয়ন্ত্রিত। এই ভাবেও ব্রহ্মও জীবের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান।

জগতে ও ব্রহ্মে ভেদ

এক্ষণে অচিৎ বা জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শিত হইতেছে। ব্রহ্ম কারণ, জগৎ কার্য্য। ব্রহ্ম অংশী, জগৎ অংশ। ব্রহ্ম জ্ঞানস্বরূপ, অস্থূল, অজড়, নিত্যশুদ্ধ। জগৎ জ্ঞানহীন, স্থূল, জড়, অশুদ্ধ। সুতরাং জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে।

জীব-জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যে যে ভেদের কথা বলা হইল, শ্রীপাদ নিম্বার্কের মতে **এই ভেদ** হইতেছে **নিত্য এবং স্বাভাবিক**।

এক্ষণে শ্রীপাদ নিম্বার্কের কথিত অভেদের কথা বিবেচনা করা হইতেছে।

ব্রহ্ম ও জীবজগতে অভেদ এবং ভেদাভেদ

স্বাভাবিক ভেদের কথা বলিয়া শ্রীপাদ নিম্বার্ক আবার ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে অভেদের কথাও বলিয়াছেন।

তিনি বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন কারণ, জীব-জগৎ হইতেছে তাঁহার কার্য্য। কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদ যেমন আছে, তেমনি অভেদও আছে। কেননা, কারণই কার্য্যরূপে অভিব্যক্ত হয়। সুতরাং কার্য্য ও কারণের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ আছে—একথা যেমন বলা যায় না, আত্যন্তিক অভেদ আছে—একথাও তেমনি বলা যায় না। কার্য্য ও কারণের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ—উভয়ই বর্ত্তমান।

মৃৎপিণ্ড হইতে মৃণ্ময় ঘটের উদ্ভব হয়। মৃৎপিণ্ড হইতেছে কারণ, ঘট হইতেছে তাহার কার্য্য। কারণরূপ মৃৎপিণ্ড যেমন মৃত্তিকাই, অপর কিছু নহে, কার্য্যরূপ ঘটও তেমনি মৃত্তিকাই, মৃত্তিকাতিরিক্ত কিছু নহে। উভয়ই মৃত্তিকা বলিয়া উভয়ের মধ্যে অভেদ। আবার মৃৎপিণ্ডের আকারাদি এবং মৃণ্ময় ঘটের আকারাদি একরূপ নহে; এই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান।

অন্যবিষয়েও মৃৎপিণ্ড এবং মৃণ্ময় দ্রব্যের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। মৃৎপিণ্ড কেবল মৃণ্ময় ঘটেরই কারণ নহে, শরাবাদি অন্যান্য মৃণ্ময় দ্রব্যেরও কারণ। মৃৎপিণ্ডের কারণত্ব কেবল ঘটে বা শরাবেই সীমাবদ্ধ নহে; কিন্তু ঘটের ঘটত্ব, কিম্বা শরাবের শরাবত্ব কেবল একবস্তুতেই সীমাবদ্ধ। কারণের কার্য্যাতিরিক্ততাও আছে। এই বিষয়েও মৃৎপিণ্ড ও মৃণ্ময়দ্রব্যের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। তথাপি কিন্তু মৃৎপিণ্ড এবং মৃণ্ময় দ্রব্য—বস্তুতঃ মৃত্তিকাই, মৃত্তিকাতিরিক্ত কিছু নহে। এই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে অভেদ। এই ভেদ এবং অভেদ তুল্যরূপেই সত্য। সুতরাং মৃৎপিণ্ড এবং মৃণ্ময় ঘটাদির মধ্যে **ভেদাভেদ সম্বন্ধ** বিদ্যমান।

অংশী এবং অংশের মধ্যেও তদ্রূপ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। বৃক্ষের শাখা বৃক্ষ হইতে ভিন্ন নহে, বৃক্ষাতিরিক্ত বস্তু নহে। বৃক্ষের যে উপাদান, শাখারও সেই উপাদান। এই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে অভেদ। আবার শাখাটীমাত্রই বৃক্ষ নহে; বৃক্ষ শাখারূপে যেমন বিদ্যমান, তদতিরিক্তরূপেও তেমনি বিদ্যমান। এই বিষয়ে উভয়ের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান। এইরূপে দেখা গেল—অংশী বৃক্ষ এবং অংশ শাখা—এই উভয়ের মধ্যেও ভেদাভেদ-সম্বন্ধই বিদ্যমান।

তদ্রূপ ব্রহ্মও জীব-জগৎ হইতে ভিন্ন এবং অভিন্ন—উভয়রূপই। জীবজগৎ হইতেছে ব্রহ্মের অংশমাত্র, সমগ্রব্রহ্ম জীব-জগদ্রূপে পরিণত হয়েন না। ব্রহ্ম হইতেছেন জীব-জগতের অতিরিক্ত, জীব-জগৎ হইতেছে তাঁহার অংশমাত্রের অভিব্যক্তি। এই বিষয়ে ব্রহ্মে এবং জীব-জগতের মধ্যে ভেদ বর্ত্তমান। আবার, ব্রহ্ম কারণ, জীবজগৎ তাঁহার কার্য্য। কার্য্য হইতেছে কারণাত্মক, কার্য্যের মধ্যে কারণ লীন থাকে। কারণরূপ ব্রহ্মও কার্য্যরূপ জীব-জগতে ওতপ্রোতভাবে লীন হইয়া আছেন। এই বিষয়ে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে অভেদ বিদ্যমান। এইরূপে দেখা গেল—জীব-জগৎ হইতে অতিরিক্তরূপ ব্রহ্ম হইতেছেন জীব-জগৎ হইতে ভিন্ন; আবার জীব-জগতে ওতপ্রোতভাবে লীন বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন জীব-জগৎ হইতে অভিন্ন। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীব-জগৎ হইতেছে ভিন্নাভিন্ন; তাহাদের মধ্যে **ভেদাভেদ সম্বন্ধ** বিদ্যমান এবং এই ভেদাভেদ হইতেছে **স্বাভাবিক**। এইরূপই শ্রীপাদ নিম্বার্কের অভিমত বলিয়া তাঁহার মতবাদকে বলা হয় **স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ**।

ঘ। শ্রীপাদ নিম্বার্কের স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদের সারমর্ম্ম

শ্রীপাদ নিম্বার্কের স্বাভাবিক ভেদাভেদ-বাদের সারমর্ম্ম হইতেছে এইরূপ :—কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন এবং কার্য্য হইতেও কারণ ভিন্ন। আবার, কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন এবং কার্য্য হইতেও কারণ অভিন্ন। অর্থাৎ কার্য্য-**কারণের ভেদ, যথা**—

প্রথমতঃ, কারণ হইতে কার্য্য ভিন্ন। কার্য্যরূপ মৃণ্ময় ঘটাদি আকারাদিতে এবং ব্যবহার-যোগ্যতামূলক গুণাদিতে কারণরূপ মৃৎপিণ্ড হইতে ভিন্ন। ঘটের আকার মৃৎপিণ্ডের আকার হইতে ভিন্ন। ঘটের দ্বারা জলাদি আনয়ন করা যায়; কিন্তু মৃৎপিণ্ডের দ্বারা জলাদি আনয়ন করা যায় না।

দ্বিতীয়তঃ, কার্য্য হইতে কারণ ভিন্ন। একই কারণরূপ মৃৎপিণ্ড হইতে ঘট-শরাবাদি বহু মৃণ্ময় দ্রব্য প্রস্তুত হইতে পারে। মৃৎপিণ্ডের কারণত্ব একটীমাত্র মৃণ্ময় দ্রব্যে সীমাবদ্ধ নহে। কিন্তু ঘটের ঘটত্ব বা কার্য্যত্ব, কিম্বা শরাবের শরাবত্ব বা কার্য্যত্ব কেবলমাত্র ঘটে বা শরাবেই সীমাবদ্ধ। এইরূপে দেখা গেল—কারণের ব্যাপ্তি একটী মাত্র কার্য্যেই সীমাবদ্ধ নহে; কিন্তু কার্য্যের ব্যাপ্তি কেবল সেই কার্য্যেই। এই দিক্ দিয়া কারণকে কার্য্যাতিরিক্ত বা কার্য্য হইতে ভিন্ন বলা হয়।

তারপর, **কার্য্য-কারণের অভেদ, যথা**—

প্রথমতঃ, কারণ হইতে কার্য্য অভিন্ন। কার্য্য হইতেছে কারণাত্মক, কারণ-সত্তাময়, কারণাশ্রয়ী এবং কারণাপেক্ষ। কারণ থাকিলেই কার্য্যের উৎপত্তি সম্ভব, অন্যথা নহে। সুতরাং কার্য্য হইতেছে কারণ হইতে অভিন্ন। যেমন, মৃণ্ময় ঘট হইতেছে মৃত্তিকাই, মৃত্তিকার অতিরিক্ত কিছু নহে। মৃত্তিকা হইতেই ঘটের উৎপত্তি। সুতরাং কারণরূপ মৃত্তিকা হইতে কার্য্যরূপ ঘট অভিন্ন।

দ্বিতীয়তঃ, কার্য্য হইতে কারণ অভিন্ন। কারণরূপ মৃত্তিকা কার্য্যরূপ ঘটাদিতেও বিদ্যমান থাকে। কার্য্যরূপ ঘটে কারণরূপ মৃত্তিকা লীন হইয়া আছে। সুতরাং কার্য্য হইতে কারণ অভিন্ন।

উল্লিখিতরূপ ভেদ এবং অভেদ—উভয়ই সত্য এবং স্বাভাবিক। সুতরাং কারণরূপ ব্রহ্মের সঙ্গে কার্য্যরূপ জীব-জগতের সম্বন্ধ হইতেছে স্বাভাবিক ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

ঙ। নিম্বার্কমতের আলোচনা

শ্রীপাদ নিম্বার্কের মতে জীব ও জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের অংশ। কিন্তু কিরূপ অংশ? তিনি ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের ভেদও স্বীকার করেন। তাহা হইলে কি—জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের বিচ্ছিন্ন অংশ?

কিন্তু টঙ্কচ্ছিন্ন প্রস্তরখণ্ডের ন্যায় ব্রহ্মের বিচ্ছিন্ন অংশ হইতে পারে না; কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন অবিচ্ছেদ্য, সর্ব্বগত।

তিনি বলেন—জীব স্বরূপে অণু এবং সংখ্যায় বহু; সর্ব্বাবস্থাতে, এমন কি মুক্ত অবস্থাতেও, ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। এই জীব ব্রহ্মস্বরূপের অংশ হইলে ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে—সংসারী জীবে যে সমস্ত দোষ দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মেও সেই সমস্ত দোষের স্পর্শ হইয়া থাকে। কিন্তু ইহা স্বীকার করা যায় না; কেননা, শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বদা নিরস্ত-নিখিল-দোষ।

যদি বলা যায়, সংসারী-অবস্থাতেই কর্ম্মফল-জনিত দোষ জীবে দৃষ্ট হয়, কর্ম্মের ফলই জীব ভোগ করিয়া থাকে এবং নূতন কর্ম্মও করিয়া থাকে। জীব-স্বরূপে এই সমস্ত দোষ নাই। এ-সম্বন্ধেও বক্তব্য এই যে, জীব-স্বরূপ যখন ব্রহ্মেরই অংশ—সুতরাং স্বরূপতঃ ব্রহ্মই, তখন স্বীকার করিতেই

হইবে যে, অংশরূপে ব্রহ্মাই কর্ম্মফল ভোগ করেন এবং কর্ম্ম করেন। ইহাও শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত নহে; কেননা, শাস্ত্র অনুসারে ব্রহ্ম কখনও বন্ধনজনক কোনও কর্ম্ম করেন না, তিনি কোনও কর্ম্মফলও ভোগ করেন না।

সম্ভবতঃ উল্লিখিত দোষের পরিহারের জন্যই শ্রীপাদ পুরুষোত্তম জীবকে ব্রহ্মের "চিৎ"-শক্তির বিকাশ বলিয়াছেন এবং এই "চিৎ"-শক্তিকে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তিও বলিয়াছেন। ইহা স্বীকার করিলে জীবকে ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ বলা যায়। কিন্তু এই বিষয়ে শ্রীপাদ পুরুষোত্তমের উক্তি হইতেও এক সমস্যা দেখা দেয়। তিনি বলেন—প্রলয়ে এই "চিৎ-শক্তি" সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে; সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম এই শক্তিকে জীবাত্মার আকারে (in the form of souls) প্রকাশ করেন (১)।

ইহা হইতে বুঝা যায়, সৃষ্টির আরম্ভেই "চিৎ-শক্তি" বহু জীবাত্মার আকারে প্রকাশ প্রাপ্ত হয়, প্রলয়ে কেবল সূক্ষ্ম শক্তিরূপেই ব্রহ্মে অবস্থান করে; প্রলয়ে জীবাত্মার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে এই বিষয়ে শ্রীপাদ নিম্বার্কের উক্তির সঙ্গে শ্রীপাদ পুরুষোত্তমের উক্তির বিরোধ আছে বলিয়া মনে হয়। কেননা, শ্রীপাদ নিম্বার্ক বলেন—সকল সময়েই, এমন কি মুক্তাবস্থাতেও, জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে; কিন্তু শ্রীপাদ পুরুষোত্তমের উক্তি হইতে মনে হয়, প্রলয়ে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে না, সমস্ত জীবই একমাত্র সূক্ষ্ম শক্তিরূপে অবস্থান করে। ইহাতে মনে হয়, শ্রীপাদ পুরুষোত্তমের উক্তি যেন শ্রীপাদ নিম্বার্কের অভিপ্রেত নহে। অবশ্য শ্রীপাদ পুরুষোত্তম যদি প্রলয়কালে ব্রহ্মে লীন জীবসমূহকেই সমষ্টিগত-ভাবে সূক্ষ্ম চিৎশক্তি বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে কোনও বিরোধ থাকে না। ইহাই বোধহয় শ্রীপাদ পুরুষোত্তমের অভিপ্রায়।

জগৎ-সম্বন্ধেও শ্রীপাদ পুরুষোত্তম বলেন—প্রলয়ে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী "অচিৎ-শক্তি" সূক্ষ্মরূপে ব্রহ্মে অবস্থান করে; সৃষ্টির প্রারম্ভে ব্রহ্ম এই শক্তিকে' 'প্রকৃতির আকারে" প্রকাশ করেন এবং এই প্রকৃতিই নানাবিধ পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া জগদ্রূপে পরিণত হয় (২)। এ-স্থলেও দেখা যায়—প্রলয়ে "প্রকৃতি", প্রকৃতিরূপে থাকে না, থাকে সূক্ষ্ম "অচিৎ শক্তি"রূপে। এস্থলেও পূর্ব্বোক্ত-যুক্তি প্রযোজ্য।

শ্রীপাদ পুরুষোত্তমের কথিত "চিৎ-শক্তি" যদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা-কথিত "জীব-শক্তি" হয় এবং "অচিৎ-শক্তি" যদি শ্রুতি-স্মৃতিকথিত জড়রূপা মায়া বা প্রকৃতি হয়, তাহা হইলে "জীব-শক্তির" অংশ জীবকে এবং "মায়া-শক্তির" পরিণাম জগৎকেও—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যদি ভেদাভেদ-সম্বন্ধ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে—ব্রহ্মের ভেদাভেদ-প্রকাশ বলিয়া স্বীকার করা যায়। কিন্তু ইহা শ্রীপাদ নিম্বার্কের সম্মত কিনা বলা যায় না। শ্রীপাদ পুরুষোত্তমের কথিত "চিৎ-শক্তি" সম্বন্ধে পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা যে শ্রীপাদ নিম্বার্কের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না, তাহাও পূর্ব্বেই বলা

---

(১) *The Nimbarka School of Vedanta* By Dr. Roma Chowdhury in The Cultural *Heritage of India,* Second edition; 1953, Vol. III, P: 334. (২) *Ibid.*

হইয়াছে। আর, "অচিৎ"-সম্বন্ধে শ্রীপাদ নিম্বার্ক "প্রাকৃত" ও "অপ্রাকৃত" ইত্যাদি যে বৈচিত্রীর কথা বলিয়াছেন এবং শ্রীপাদ পুরুষোত্তম "প্রাকৃত" ও অপ্রাকৃতের" যে বিবরণ দিয়াছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৯ ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তাহাতে বুঝা যায়—"প্রকৃতি" বলিতে যে কেবল "জড়রূপা মায়াকে" বুঝায়, ইহাও তাঁহারা স্বীকার করেন না। তাহা হইলে ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধের কথা শ্রীপাদ নিম্বার্ক যাহা বলিয়াছেন, তাহাও যুক্তিসিদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে না।

১০। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

ক। বল্লভাচার্য্যের পরিচয়

প্রয়োজন-বোধে এ-স্থলে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের একটু পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের পূর্ব নাম বল্লভভট্ট। তিনি ছিলেন দক্ষিণ ভারতের তৈলঙ্গ ব্রাহ্মণ। তাঁহার পিতার নাম লক্ষ্মণভট্ট। শ্রীমন্মমহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য বৃন্দাবন হইতে নীলাচলে প্রত্যাবর্ত্তনের পথে যখন প্রয়াগে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন বল্লভভট্ট থাকিতেন প্রয়াগের নিকটবর্ত্তী আড়ৈল্ল গ্রামে। তিনি প্রয়াগে আসিয়া শ্রীমন্মমহাপ্রভুর সহিত সাক্ষাৎ করেন। সে-স্থলে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর সহিতও তাঁহার মিলন হয়। বল্লভভট্ট শ্রীমন্‌মহাপ্রভুকে নিমন্ত্রণ করিয়া স্বগৃহে নিয়া গিয়াছিলেন এবং অত্যন্ত ভক্তিশ্রদ্ধা সহকারে প্রভুর ভিক্ষা করাইয়াছিলেন (শ্রী, চৈ, চ, মধ্যলীলা, ১৯শ পরিচ্ছেদ)। প্রভুর সঙ্গে রূপগোস্বামীও বল্লভ-গৃহে গিয়াছিলেন। ইহার কয়েক বৎসর পরে শ্রীপাদ বল্লভভট্ট শ্রীমদ্‌ভাগবতের "সুবোধিনী টীকা" লিখিয়া শ্রীমন্মমহাপ্রভুকে তাহা শুনাইবার জন্য নীলাচলে গমন করেন। সে স্থানে মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গ-প্রভাবে কিশোর গোপালের উপাসনার জন্য তিনি অভিলাষী হয়েন। পূর্ব্বে তাঁহার দীক্ষা ছিল বালগোপাল-মন্ত্রে। নীলাচলে শ্রীমন্মহাপ্রভুর অনুমতি লইয়া তিনি শ্রীল গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষিত হয়েন (শ্রী, চৈ, চ, অন্ত্যলীলা, ৭ম পরিচ্ছেদ)। এইরূপে তিনি গদাধর-শাখাভুক্ত হইয়া পড়েন। যদুনাথ দাস তাঁহার "শাখানির্ণয়ামৃত" নামক গ্রন্থে বল্লভাচার্য্যকে গদাধর-শাখাভুক্ত বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর "বৈষ্ণব-বন্দনা" নামক গ্রন্থেও বল্লভাচার্য্যের বন্দনা দৃষ্ট হয়। কবিকর্ণপূরও তাঁহার "গৌরগণোদ্দেশদীপিকাতে" বল্লভাচার্য্যকে গৌর-পরিকর এবং পূর্বলীলায় শুকদেব ছিলেন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীও তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে গদাধর-শাখা-বর্ণন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"বল্লভ চৈতন্যদাস কৃষ্ণ-প্রেমময় ॥ ১।১২।৮১ ॥" এ-স্থলে তিনি "বল্লভ"-শব্দে বল্লভ-ভট্টকেই লক্ষ্য করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই জানা যায় যে, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ভুক্ত বৈষ্ণবই ছিলেন।

যাহা হউক, নীলাচল হইতে প্রত্যাবর্ত্তনের পরে শ্রীপাদ বল্লভভট্ট প্রয়াগ-নিকটবর্ত্তী আড়েল-গ্রাম পরিত্যাগ করিয়া সপরিবারে মথুরামণ্ডলে গিয়া বাস করেন। সে-স্থলে শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি গোস্বামিবর্গের সহিতও তাঁহার খুব সম্প্রীতি ছিল। তিনি প্রায়ই শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে আসিতেন। সেই সময় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সহিতও তাঁহার সাক্ষাৎকার হইয়াছিল এবং ভক্তিরত্নাকর হইতে জানা যায়, একদিন যমুনাতীরে শ্রীজীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বল্লভভট্টের মধ্যে শাস্ত্রীয় বিচারও হইয়াছিল। এই বিচারে শ্রীজীবের সিদ্ধান্ত খণ্ডন করিতে না পারিয়া বল্লভভট্ট তাহা মানিয়া লইয়া ছিলেন।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর "শ্রীগোপালদেবাষ্টক" নামক গ্রন্থে লিখিত আছে "অধিধরমনুরাগং মাধবেন্দ্রস্য তন্বংস্তদমলহৃদয়োত্থং প্রেমসেবাং বিবৃন্বন্। প্রকটিত-নিজশক্ত্যা বল্লভাচার্য্য-ভক্ত্যা স্ফুরতি হৃদি স এব শ্রীলগোপালদেবঃ॥—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীগোস্বামীর অতি প্রবৃদ্ধ অনুরাগ বিস্তার করতঃ তাঁহারই বিশুদ্ধ হৃদয়োত্থ ভাবময়ী প্রেমসেবার আদর্শ যিনি প্রদর্শন করিয়াছেন, সুপ্রকটিত নিজের সেই শক্তির সহিত এবং বল্লভাচার্য্যের ভক্তির সহিত সেই শ্রীগোপালদেব আমার হৃদয়ে স্ফুরিত হউন।" ইহাতে মনে হয়, শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যও গোপালদেবের (গোবর্দ্ধনেশ্বর গোপালের বা শ্রীনাথের) সেবার বিশেষ আনুকূল্য করিতেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত মধ্যলীলা চতুর্থ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী শ্রীশ্রীগোপালদেবের স্বপ্নাদেশে শ্রীগোপালদেবকে নিভৃত কুঞ্জ হইতে বাহির করিয়া গোবর্দ্ধনের উপরে প্রতিষ্ঠিত করেন। তিনি দুইজন গৌড়ীয় ব্রাহ্মণের উপরে সেবার ভার অর্পণ করেন। "ভক্তিরত্নাকর"-গ্রন্থ হইতে জানা যায়—"সেই দুই বিপ্রের অদর্শনে। কথোদিন সেবে কোন ভাগ্যবন্ত জনে॥ শ্রীদাসগোস্বামী আদি পরামর্শ করি। শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরে কৈল সেবা অধিকারী॥ পিতা শ্রীবল্লভ ভট্ট, তাঁর অদর্শনে। কথোদিন মথুরায় ছিলেন নির্জ্জনে॥ পরম বিহ্বল গৌরচন্দ্রের লীলায়। সদা সাবাধন এবে গোপালসেবায়॥ ভক্তিরত্নাকর। ২১৪-১৪ পৃঃ। বহরমপুর সংস্করণ॥"

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের অন্তর্দ্ধানের পরে তাঁহার দ্বিতীয় পুত্র শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বর মথুরায় নির্জ্জনে বাস করিতে থাকেন। তিনি "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহের" সেবা করিতেন। রাঘবপণ্ডিতের সঙ্গে ব্রজমণ্ডল পরিক্রমা উপলক্ষ্যে শ্রীনিবাস আচার্য্য যখন বিঠ্ঠলেশ্বরের বাসস্থান গাঁঠুলি-গ্রামে গিয়াছিলেন, তখন সে-স্থলে—"বিঠ্ঠলের সেবা কৃষ্ণচৈতন্য-বিগ্রহ। তাহার দর্শনে হৈল পরম আগ্রহ॥ ভক্তিরত্নাকর॥ ৫ম তরঙ্গ॥"

যাহা হউক, গোবর্দ্ধনেশ্বর গোপালের (শ্রীনাথের) সেবক বাঙ্গালী ব্রাহ্মণদ্বয়ের দেহরক্ষার পরে অস্থায়ী ভাবে "কোনও ভাগ্যবন্ত জনে" গোপালের সেবা করিয়াছিলেন। তাহার পরে, শ্রীমন্মহাপ্রভুর একান্তভক্ত-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাসগোস্বামী তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবদের সহিত পরামর্শ করিয়া শ্রীবিঠ্ঠলেশ্বরের উপরে শ্রীগোপালের সেবার ভার অর্পণ করেন।

শ্রীবিঠ্‌লেশ্বরও যে অত্যন্ত শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত গোপালদেবের সেবা করিয়াছিলেন, দাসগোস্বামীর "গোপালরাজ-স্তোত্র" হইতে তাহা জানা যায়। দাস গোস্বামী লিখিয়াছেন—"বিবিধ-ভজনপুষ্পৈ-রিষ্টনামানি গৃহ্ণন্ পুলকিততনুরিহ শ্রীবিঠ্‌ঠলস্তোরুসখ্যৈঃ। প্রণয়মণিসরং স্বং হন্ত তস্মৈ দদানঃ প্রতপতি গিরিপট্টে সুষ্ঠু গোপালরাজঃ॥—যিনি শ্রীবিঠ্‌ঠলের সখ্যপ্রধান বিবিধ ভজনরূপ পুষ্পদ্বারা পুলকিত হইয়া ইষ্টনাম গ্রহণপূর্ব্বক উক্ত বিঠ্‌ঠলেশ্বরকে প্রণয়রূপ মণিমালা অর্পণ করিয়াছেন, সেই শ্রীগোপালরাজ গিরিপট্টে প্রতাপযুক্ত হইয়া মনোহর রূপে বিরাজ করুন।"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায়, গৌরলীলা-রস-রসিক বিঠ্‌ঠলেশ্বরকে সেবার যোগ্য পাত্র মনে করিয়া বৃন্দাবনস্থ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাগ্রগণ্যগণ তাঁহার উপরেই শ্রীগোপালের সেবার ভার অর্পণ করিয়াছিলেন। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য এবং তাঁহার পুত্র শ্রীল বিঠ্‌ঠলেশ্বর উভয়েই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরবর্ত্তীকালে, সম্ভবতঃ বিঠ্‌ঠলেশ্বরের পরে, বল্লভাচার্য্য ও বিঠ্‌ঠলেশ্বরের শিষ্য-প্রশিষ্যাদিই একটা পৃথক্ সম্প্রদায় গঠন করিয়া বল্লভাচার্য্যকে তাহার প্রবর্ত্তকরূপে প্রচার করেন। এই সম্প্রদায় বর্ত্তমানে বল্লভাচারী সম্প্রদায় নামে পরিচিত। দার্শনিক মতবাদে গৌড়ীয়-সম্প্রদায় হইতে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের কিছু পার্থক্য আছে। ইহাই পৃথক্ সম্প্রদায় গঠিত হওয়ার হেতু।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্যের নাম অণুভাষ্য।

খ। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের মতবাদ

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের মতবাদকে **শুদ্ধাদ্বৈতবাদ** বলা হয়। শুদ্ধাদ্বৈত = শুদ্ধ + অদ্বৈত।

শ্রীপাদ শঙ্করও অদ্বৈতবাদী এবং শ্রীপাদ বল্লভও অদ্বৈতবাদী। উভয়ের মধ্যে পার্থক্য এই যে, শ্রপাদ শঙ্করের অদ্বৈতবাদে মায়ার সম্বন্ধ আছে, শ্রীপাদ বল্লভের অদ্বৈতবাদে মায়ার সম্বন্ধ নাই। যাহার সহিত মায়ার সম্বন্ধ নাই, তাহাই "শুদ্ধ।" শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের অদ্বৈতবাদের সহিত মায়ার সম্বন্ধ নাই বলিয়া তাহাকে "শুদ্ধ অদ্বৈতবাদ" বলা হয়। শুদ্ধ-শব্দ "অদ্বৈতের" বিশেষণ। বল্লভমতে ব্রহ্ম কারণ, জীব-জগৎ তাঁহার কার্য্য। কার্য্য ও কারণ উভয়ই "শুদ্ধ" এবং "অভিন্ন।" এজন্য তাঁহার মতবাদকে শুদ্ধাদ্বৈতবাদ বলা হয়। শুদ্ধ অদ্বৈত, অথবা শুদ্ধকার্য্য এবং শুদ্ধ কারণ এই উভয়ের অদ্বৈতত্ব বা অভিন্নত্ব—ইহাই শুদ্ধাদ্বৈত।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য বলেন—উপনিষৎ, গীতা এবং ব্রহ্মসূত্র মায়াসম্বন্ধহীন শুদ্ধ অদ্বৈতের কথাই বলিয়াছেন। শ্রীপাদ শঙ্কর উল্লিখিত তিনটী শাস্ত্রের বিকৃত অর্থ গ্রহণ করিয়াছেন।

স্বীয় মতবাদ-স্থাপনে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য বেদ, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা, ব্রহ্মসূত্র, শ্রীমদ্‌ভাগবত—এই শাস্ত্রচতুষ্টয়কেই প্রধানরূপে অনুসরণ করিয়াছেন! তাঁহার মতে বেদের বা উপনিষদের তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে শ্রীমদ্‌ভগবদ্গীতায়; গীতার তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে ব্রহ্মসূত্রে এবং ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে শ্রীমদ্‌ভাগবতে। শ্রীমদ্‌ভাগবতে ব্যাসদেবের সমাধিলব্ধ

তথ্যসমূহ সন্নিবেশিত হইয়াছে ; এজন্য শ্রীমদ্ভাগবতকে "সমাধিভাষা" বলা হয়। শুদ্ধাদ্বৈতবাদে শ্রীমদ্ভাগবত একটী বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়াছেন।

এক্ষণে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের মতবাদ ব্যক্ত করা হইতেছে।

ব্রহ্ম। সচ্চিদানন্দময়, সর্ব্বব্যাপক, অব্যয়, সর্ব্বশক্তিপূর্ণ, স্বতন্ত্র, সর্ব্বজ্ঞ, গুণবর্জ্জিত, সত্যাদি অনন্ত গুণপূর্ণ, সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদ-বর্জ্জিত, সর্ব্বাধার, মায়ার বশীকর্ত্তা, আনন্দাকার (আনন্দ-ঘনবিগ্রহ), সমস্ত প্রাকৃত-প্রপঞ্চগত পদার্থ হইতে বিলক্ষণ।

"সচ্চিদানন্দরূপং তু ব্রহ্ম ব্যাপকমব্যয়ম্। সর্ব্বশক্তিং স্বতন্ত্রং চ সর্ব্বজ্ঞং গুণবর্জ্জিতম্॥
সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতদ্বৈতবর্জ্জিতম্। সত্যাদিগুণসাহস্রৈর্যুক্তমৌৎপত্তিকৈঃ সদা॥
সর্ব্বাধারং বশ্যমায়মানন্দাকারমুত্তমম্। প্রাপঞ্চিকপদার্থানাং সর্ব্বেষাং তদ্বিলক্ষণম্॥
—শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যকৃত 'সপ্রকাশ-তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধঃ। ১৬৫-৬৭॥"

পরব্রহ্মের অচিন্ত্য ঐশ্বর্য্য। "সর্ব্বভাবসমর্থত্বাদচিন্ত্যৈশ্বর্য্যবদ্ বৃহৎ॥—১।১।২-ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য।"

তিনি বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয়। "বিরুদ্ধসর্ব্বধর্ম্মাশ্রয়ত্বং তু ব্রহ্মণো ভূষণশ্চ॥-'তত্তু সমন্বয়াৎ॥' ১।১।৪-ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য।"

ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তি। "বিরোধাভাবো বিচিত্রশক্তিযুক্তত্বাৎ সর্ব্বভবনসমর্থাচ্চ॥ 'আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি।' ২।১।২৮-সূত্রের অণুভাষ্য।"

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ (সমবায়ী কারণ) উভয়ই।

"জগতঃ সমবায়ি স্যাত্তদেব চ নিমিত্তকম্॥ তত্ত্বার্থদীপনিবন্ধঃ॥ ১৬৮॥"

ব্রহ্ম সাকার, অব্যক্ত নহেন। "প্রত্যক্ষানুমানাভ্যাং শ্রুতিস্মৃতিভ্যাং বা ব্রহ্ম সাকারমনন্ত-গুণপূর্ণং বেতি নাব্যক্তমেবেতি নিশ্চয়ঃ॥ 'অপি সংরাধনে প্রত্যক্ষানুমানভ্যাম্॥' ৩।২।২৪-ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য॥"

পরব্রহ্ম অনন্ত গুণপূর্ণ এবং নির্গুণ—উভয়ই। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য বলেন—সর্প আকারে ঋজু হইয়াও যেমন কুণ্ডলাকারও হইতে পারে, অন্যরূপ অনেকাকারও ধারণ করিতে পারে, তদ্রূপ ব্রহ্মস্বরূপেও ভক্তের ইচ্ছায় সর্ব্বপ্রকার রূপ স্ফুরিত হয়। পরব্রহ্ম সর্ব্ব-বিরুদ্ধধর্ম্মের আশ্রয় বলিয়াই সর্ব্বগুণপূর্ণ হইয়াও ভক্তের ইচ্ছায় নির্গুণরূপে স্ফুরিত হইতে পারেন। "উভয়রূপেণ নির্গুণত্বেনান-ন্তগুণত্বেন সর্ব্ববিরুদ্ধধর্ম্মেণ রূপেণ ব্যপদেশাৎ। তর্হি কথমেকং বস্ত্বনেকধা ভাসতে। তত্রাহ অহিকুণ্ডলবৎ। যথা সর্পঃ ঋজুরনেকাকারঃ কুণ্ডলশ্চ ভবতি, তথা ব্রহ্মস্বরূপং সর্ব্বপ্রকারং ভক্তেচ্ছয়া তথা স্ফুরতি। * * * অতঃ সর্ব্ব বিরুদ্ধধর্ম্মাণামাশ্রয়ো ভগবান্॥ 'উভয়ব্যপদেশাত্বহিকুণ্ডলবৎ॥' ৩।২।২৭-ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য॥"

আবির্ভাব-শক্তি এবং তিরোভাব-শক্তি নামে পরব্রহ্মের দুইটী শক্তি আছে। আবির্ভাব-

শক্তিদ্বারা তিনি তাঁহার কোনও কোনও ধর্ম্মকে আবির্ভাবিত (অনুভব-বিষয়ীভূত) করিয়া থাকেন এবং তিরোভাব-শক্তিদ্বারা তিনি তাঁহার কোনও কোনও ধর্ম্মকে তিরোহিত (অনুভবের অবিয়ীভূত) করিয়া থাকেন। "ইমাবাবির্ভাবতিরোভাবৌ ব্রহ্মণঃ শক্তী॥ তথাচোক্তম্—আবির্ভাবতিরোভাবৌ শক্তী বৈ মুরবৈরিণঃ॥—অণুভাষ্যের শ্রীমৎশ্রীধরশর্ম্মকৃতা বালবোধিনী-টীকা॥ উপোদ্ঘাতঃ॥১৬॥"

বিশুদ্ধাদ্বৈত-মতে রস-স্বরূপ পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন পরব্রহ্ম।

পরব্রহ্মের তিনটী রূপ—আধিদৈবিক, আধ্যাত্মিক এবং আধিভৌতিক। স্বয়ং পরব্রহ্মই আধি-দৈবিক রূপ। তাঁহার আধ্যাত্মিক রূপ হইতেছেন অক্ষর ব্রহ্ম। আর, আধিভৌতিক রূপ হইতেছে জগৎ (বালবোধিনীটীকা॥ উপোদ্ঘাতঃ॥৪॥)।

আধিদৈবিকরূপ পরব্রহ্ম একমাত্র ভক্তিলভ্য, জ্ঞানাদিলভ্য নহেন। পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম হইতেছেন পূর্ণপ্রকট-সচ্চিদানন্দ। তিনি অক্ষর-ব্রহ্ম হইতে শ্রেষ্ঠ। অক্ষর-ব্রহ্ম তাঁহা হইতে ন্যূন। অক্ষর-ব্রহ্মে পরব্রহ্মের আনন্দাংশ কিছু তিরোহিত। জ্ঞানমার্গের সাধকগণ জ্ঞানের দ্বারা এই অক্ষরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়েন। অক্ষর-ব্রহ্মোপাসকগণের পুরুষোত্তমোপাসকত্ব-সিদ্ধ হয় না। ('অক্ষর-ধিয়াং ত্ববরোধঃ'-ইত্যাদি ৩।৩।৩৪-ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য)।

অক্ষর-ব্রহ্মও পরব্রহ্মের ন্যায় সচ্চিদানন্দ; তবে তাঁহাতে আনন্দাংশের বিকাশ পরব্রহ্ম অপেক্ষা কিছু কম। পরব্রহ্মের আনন্দ অসীম; কিন্তু অক্ষরব্রহ্মের আনন্দ সসীম (গণিতানন্দ)।

অক্ষর-ব্রহ্ম পরব্রহ্ম পুরুষোত্তমের পুচ্ছস্বরূপ, পরব্রহ্মের অধিষ্ঠান-স্বরূপ। "স গণিতানন্দঃ * * * স্বরূপতোঽপি তস্মাদ্ধীনত্বং চেতি পৃষ্ঠভাগাদপি দূরস্থিতপুচ্ছস্বরূপত্বং ব্রহ্মণ উচ্যতে। পুরুষোত্তমাধিষ্ঠানত্বাৎ প্রতিষ্ঠাস্বরূপত্বং চ। ('আনন্দময়োভ্যাসাৎ।"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য)।

অক্ষর-ব্রহ্ম পরব্রহ্মের ধামস্বরূপ। পরব্রহ্ম যেখানে যেরূপে বিরাজ করেন, অক্ষরব্রহ্ম সেখানে তদনুরূপ ধামরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া আছেন। পরব্রহ্ম যখন বৈকুণ্ঠবিহারী, অক্ষর-ব্রহ্ম তখন বৈকুণ্ঠ-লোক।

শ্রুতিতে "কূটস্থ", "নির্ব্বিকার", "অব্যক্ত"-এই সকল শব্দে অক্ষরব্রহ্মকেই নির্দ্দেশ করা হইয়াছে। এই অক্ষরব্রহ্ম হইতেছেন পুরুষোত্তমের চরণস্থানীয়। (বালবোধিনী টীকা। উপোদ্ঘাতঃ॥৫॥)

অক্ষর-ব্রহ্মের আবার দুই রূপে অভিব্যক্তি—শুদ্ধাদ্বৈত-জ্ঞানীদিগের জ্ঞানমাত্র-স্ফূর্ত্তি এবং ভক্তগণের ব্যাপী বৈকুণ্ঠরূপে স্ফূর্ত্তি।

অন্তর্য্যামীও পরব্রহ্মের এক স্বরূপ। সর্ব্ব-নিয়মনাদি-কার্য্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনি সূর্য্য-মণ্ডলাদিতে অন্তর্য্যামিরূপে আবির্ভূত হয়েন।

এইরূপে পরব্রহ্মের চারি রকমের স্বরূপের কথা পাওয়া গেল। যথা—প্রথম—পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণ; দ্বিতীয় ও তৃতীয়—অক্ষর-ব্রহ্ম; অক্ষর-ব্রহ্মের দ্বিবিধ স্ফূর্ত্তি—জ্ঞানীদিগের জ্ঞানমাত্রস্বরূপ এবং ভক্তের ব্যাপী বৈকুণ্ঠস্বরূপ। চতুর্থ—পরমাত্মা।

"আমিই আবির্ভূত হইয়া রমণ করিব"—এইরূপ ইচ্ছামাত্রে যখন অন্তঃকরণে সত্ত্ব সমুত্থিত হয়, তখন আনন্দাংশ কিঞ্চিৎ তিরোহিত হয় এবং তখনই পুরুষোত্তম পরব্রহ্ম কেবল ইচ্ছামাত্রেই অক্ষর-ব্রহ্মে পরিণত হয়েন। পরব্রহ্ম যখন জ্ঞানীদের লক্ষ্য মোক্ষ দান করিতে ইচ্ছা করেন, তখন তাঁহার আধার-ভাগভূত এবং চরণস্থানীয় এই অক্ষর ব্রহ্মকে—অক্ষরব্রহ্ম, কাল, কর্ম্ম, ও স্বভাব-এই চারিটীরূপ প্রাপ্ত করাইয়া থাকেন। (বালবোধিনীটীকা। উপোদ্‌ঘাতঃ ॥৫॥)।

অক্ষর তখন প্রকৃতি ও পুরুষরূপে আত্মপ্রকাশ করেন। এই প্রকৃতিই নানাবিধ পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া জগদ্রূপে পরিণত হয়।

কাল, কর্ম্ম এবং স্বভাব—অক্ষরের ন্যায়ই পরব্রহ্মের অবিচ্ছেদ্য রূপ।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য অষ্টাবিংশতি তত্ত্ব স্বীকার করেন। যথা—সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ, পুরুষ, প্রকৃতি, মহৎ, অহঙ্কার, পঞ্চতন্মাত্র, পঞ্চমহাভূত, পঞ্চ কর্ম্মেন্দ্রিয়, পঞ্চ জ্ঞানেন্দ্রিয় এবং মনঃ। অক্ষর, কাল, কর্ম্ম ও স্বভাব সৃষ্টির পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান থাকিলেও তাহারা উল্লিখিত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বের অন্তর্ভুক্ত নহে; কেননা, তাহারা পরব্রহ্ম হইতে অবিচ্ছেদ্য সাধারণ কারণ। উক্ত অষ্টাবিংশতি তত্ত্বই জগতে ব্রহ্মের জগৎ-কারণত্ব প্রকাশ করে। (তত্ত্বার্থদীপিকা, সর্ব্বনির্ণয়। ৮৬)।

উল্লিখিত তত্ত্বগুলির নামের সহিত সাংখ্যকথিত তত্ত্বগুলির নামের ঐক্য থাকিলেও এইগুলি বাস্তবিক সাংখ্যকথিত তত্ত্ব নহে এবং শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য-কথিত 'প্রকৃতি'ও সাংখ্যকথিত 'প্রকৃতি' নহে। সাংখ্যের 'প্রকৃতি' হইতেছে সত্ত্ব, রজঃ তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা; কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ প্রকৃতি হইতে সম্পূর্ণরূপে ভিন্ন। বল্লভাচার্য্যের সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ হইতেছে পরব্রহ্ম ভগবানের বিশুদ্ধ গুণ, অবিচ্ছেদ্য গুণ—বিশুদ্ধ সত্ত্ব, বিশুদ্ধ রজঃ ও বিশুদ্ধ তমঃ। এইগুলি মায়িকগুণ নহে। শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের "প্রকৃতি" হইতেছে ঘনীভূতা প্রথমেচ্ছা। "ঘনীভূতা প্রথমেচ্ছা প্রকৃতিরিত্যভিধীয়তে॥ বালবোধিনীটীকা। উপোদ্‌ঘাতঃ ॥৫॥"

তিন গুণাবতার হইতেছেন উক্তগুণত্রয়ের বিগ্রহ। প্রপঞ্চ-রক্ষণাদির জন্য পরব্রহ্ম ভগবান্ বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণের বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া "বিষ্ণু" নামে, বিশুদ্ধ রজোগুণের বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া "ব্রহ্মা" নামে এবং বিশুদ্ধ তমোগুণের বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া "শিব" নামে খ্যাত হয়েন। মায়িকগুণ এই গুণাবতারত্রয়কে স্পর্শও করিতে পারে না।

বেদের পূর্ব্বকাণ্ডে বা কর্ম্মকাণ্ডে ব্রহ্মের ক্রিয়াশক্তির কথা, উত্তরকাণ্ডে বা উপনিষদে জ্ঞানশক্তির কথা এবং গীতায় ও ভাগবতে ক্রিয়াশক্তি ও জ্ঞানশক্তি—এই উভয়ের কথা এবং তাঁহার মহিমার কথা বর্ণিত হইয়াছে। সর্ব্বত্র একই পরব্রহ্মের কথাই বর্ণিত হইয়াছে।

পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ। ব্রহ্মবিগ্রহ এবং ব্রহ্ম এক এবং অভিন্ন। পরব্রহ্ম পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণের গুণ বা ধর্ম্মও তাঁহার স্বরূপাত্মক। তিনি লীলাময়, সমস্ত অবতারের মূল। সমস্ত কর্ত্তৃত্ব ব্রহ্মগত; তথাপি তাঁহাতে বৈষম্যও নৈর্ঘৃণ্য নাই।

জীব। "একোঽহং বহু স্যাং প্রজায়েয়—আমি এক, বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব"—এই ইচ্ছা বশতঃ পরব্রহ্ম ক্রীড়ার্থ স্বকীয় পূর্ণানন্দকে তিরোহিত করাইয়া জীবরূপ গ্রহণ করেন ; ইহাতে কিঞ্চিন্মাত্রও অবিদ্যা-সম্বন্ধ নাই। এইরূপে, ভগবান্ পরব্রহ্ম যখন বহু হইতে ইচ্ছা করেন, তখন অগ্নি হইতে যেমন স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে সূক্ষ্ম, পরিচ্ছিন্ন এবং চিৎপ্রধান অসংখ্য অংশ উচ্চনীচত্ব-ভাবনাবশতঃ উচ্চনীচরূপে নির্গত হইয়া থাকে। যখন স্বরূপভোগ ও জীবভোগ সমূহের ইচ্ছা ব্রহ্মের মধ্যে জাগ্রত হয়, তখন তাঁহার কৃপাতেই আনন্দাংশ ও ঐশ্বর্য্যাংশ তিরোহিত হয়। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ, শ্রী, জ্ঞান ও বৈরাগ্য—পরব্রহ্মের এই ছয়টী ঐশ্বর্য্যই জীবের মধ্যে তিরোহিত। (বালবোধিনী টীকা উপোদ্ঘাতঃ। ৬)।

"পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততোঽস্য বন্ধবিপর্য্যয়ৌ ॥ ৩।২।৫॥"-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য লিখিয়াছেন—জীব হইতেছে পরব্রহ্মের অংশ। তথাপি যে জীবের দুঃখাদি, পরব্রহ্ম ভগবানের ইচ্ছায় জীবে ভগবদ্ধর্ম্মের তিরোভাবই হইতেছে তাহার হেতু। ঐশ্বর্য্যের তিরোভাবে জীবের দীনত্ব ও পরাধীনত্ব, বীর্য্যের তিরোভাবে সর্ব্বদুঃখ-সহন, যশের তিরোভাবে সর্ব্বহীনত্ব, শ্রীর তিরোভাবে জন্মাদি সর্ব্ববিধ আপদের বিষয়ত্ব, জ্ঞানের তিরোভাবে দেহেতে অহংবুদ্ধি এবং সমস্ত ব্যাপারে বিপরীত জ্ঞান এবং বৈরাগ্যের তিরোভাবে বিষয়াসক্তি। ঐশ্বর্য্য, বীর্য্য, যশঃ ও শ্রী-এই চারিটীর তিরোভাবের কার্য্য হইতেছে জীবের বন্ধ এবং জ্ঞান ও বৈরাগ্যের তিরোভাবের কার্য্য হইতেছে বিপর্য্যয়। ষড়্বিধ ঐশ্বর্য্যরূপ ভগবদ্ধর্ম্মের তিরোভাবেই বন্ধ ও বিপর্য্যয় হইয়া থাকে, অন্য কোনও কারণে নহে।

জীব নিত্য ; যেহেতু, জীবের উৎপত্তি নাই। যে স্থলে নাম-রূপের সম্বন্ধ, সে স্থলেই উৎপত্তি। বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় উচ্চরণের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া নাম-রূপের সহিত জীবের সম্বন্ধ নাই। উচ্চরণ উৎপত্তি নহে। জীব হইতেছে অজর, অমর, অমৃত। সুতরাং জীব নিত্য (বালবোধিনী টীকা। উপোদ্ঘাতঃ। ৬)।

জীব জ্ঞাতা, ভোক্তা, কর্ত্তা। জীবের কর্তৃত্ব পরব্রহ্ম হইতে লব্ধ। জীব ব্রহ্মের চিদংশ।

"বিস্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নের্হি জড়জীবা বিনির্গতাঃ। সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তাৎ সর্ব্বতোঽক্ষিশিরোমুখাৎ॥
নিরিন্দ্রিয়াৎ স্বরূপেণ তাদৃশাদিতি নিশ্চয়ঃ। সদংশেন জড়াঃ পূর্ব্বং চিদংশেনেতরে অপি।
অন্যধর্ম্মতিরোভাবা মূলেচ্ছাতো স্বতন্ত্রিণঃ॥—অংশো নানাব্যপদেশাৎইত্যাদি ২।৩।৪৩ সূত্রের অণুভাষ্য"।

ব্রহ্মাংশভূত জীবের দুঃখ অংশী ব্রহ্মকে স্পর্শ করে না। সূর্য্যপ্রকাশস্থ ঘটাদি বস্তুর দোষের দ্বারা যেমন সূর্য্যপ্রকাশ লিপ্ত হয় না, তদ্রূপ।

জীব পরিমাণে অণু (২।৩।২০-২১ ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য)। শ্রুতিতে কোনও কোনও স্থলে যে জীবের ব্যাপকত্বের উল্লেখ দৃষ্ট হয়, সে-সে স্থলে ভগবদাবেশবশতঃ আনন্দাংশ-প্রাদুর্ভাবযুক্ত জীবই উদ্দিষ্ট। আনন্দাংশ-তিরোভাব-দশায় অণু এবং আনন্দাংশের আবির্ভাব-দশায় ব্যাপক। (বালবোধিনী টীকা। উপোদ্ঘাতঃ। ৮)। আনন্দাংশের আবির্ভাবে জীব যখন ব্যাপক হয়, তখন জীবের কেবল

ব্যাপকতা-ধর্ম্মই লাভ হয়, কিন্তু তাহার অণুত্ব-স্বরূপ নষ্ট হয় না। যশোদা-মাতার ক্রোড়ে অবস্থিত বালকৃষ্ণ তাঁহার বালকাকারেও যেমন জগদাধারভূতত্বাদি ব্যাপকতাধর্ম্ম-বিশিষ্টই, ব্যাপকতাধর্ম্ম-বিশিষ্ট হওয়াতেও যেমন তাঁহার বালকাকার সম্ভব, তদ্রূপ আনন্দাংশের আবির্ভাবে ব্যাপকত্বধর্মযুক্ত হইয়াও জীব স্বরূপে অণু থাকিতে পারে।

এই জীব সংখ্যায় বহু—অনন্ত এবং উচ্চ-নীচ-ভাবাপন্ন। জীব সত্য, মিথ্যা নহে।

জীবের তিনটী অবস্থা—শুদ্ধ, সংসারী এবং মুক্ত। বিস্ফুলিঙ্গের ন্যায় ব্রহ্ম হইতে নির্গত হওয়ার পরে যখন আনন্দাংশের তিরোভাব হয়, যখন পর্য্যন্ত অবিদ্যার সহিতও সম্বন্ধ জন্মে নাই, তখন তদবস্থাপন্ন জীবকে বলা হয় শুদ্ধ জীব। অবিদ্যা-সম্বন্ধরাহিত্যই হইতেছে জীবের শুদ্ধত্ব।

তাহার পরে, ভগবানের ইচ্ছায় ভগবদংশ এই জীবে ষড়্‌বিধ ঐশ্বর্য্যাদিরূপ ভগবদ্ধর্ম্মের তিরোভাব হয়। ভগবদ্ধর্ম্মের তিরোভাব হইলেই জীবের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ জন্মে। অবিদ্যার পাঁচটী পর্ব্ব—দেহ, ইন্দ্রিয়, অন্তঃকরণ ও প্রাণ, ইহাদের অধ্যাস এবং স্বরূপ-বিস্মৃতি। জীব তখন অবিদ্যার এই পঞ্চপর্ব্বদ্বারা বদ্ধ হইলে দুঃখিত বলিয়া কথিত হয়; দুঃখিত বলিয়া কথিত হয় মাত্র, বস্তুতঃ দুঃখ জন্মে না। তখন সূক্ষ্মদেহ ও স্থূল দেহের সহিত সম্বন্ধবশতঃ জীব জন্ম-মরণাদি সংসার-ধর্ম্মের অনুভব করে। এইরূপ জীবকেই সংসারী জীব বলে।

সংসারী জীব ভগবৎ-কৃপায় সৎসঙ্গাদি লাভ করিয়া—বৈরাগ্য, সাংখ্য, যোগ, তপঃ ও কেশবে ভক্তি—এই-পঞ্চ-পর্ব্বাত্মিকা ভক্তি লাভ করিয়া পরমানন্দ-লক্ষণা মুক্তি লাভ করে। যাঁহারা এই মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদিগকে মুক্ত জীব বলা হয়। (বালবোধিনী টীকা। উপোদ্‌ঘাতঃ॥ ১০)।

মায়া। মায়া হইতেছে পরব্রহ্মের শক্তি। মায়ার দুইটী বৃত্তি ব্যামোহিকা (জীব-মোহনকারিণী) এবং আচ্ছাদিকা। ব্যামোহিকা বৃত্তিদ্বারা মায়া জীবকে মুগ্ধ করে এবং তাহার অন্তঃকরণ ও বুদ্ধি-আদিকে মুগ্ধ করে। এইরূপ মুগ্ধত্বপ্রাপ্তা বুদ্ধি বশতঃ জীব সত্য পদার্থকে অন্যরূপ মনে করে; পদার্থ কিন্তু অন্যরূপ হইয়া যায় না। আচ্ছাদিকা বৃত্তিদ্বারা মায়া সত্য বস্তুকে আচ্ছাদিত করিয়া তৎসদৃশ মিথ্যা বস্তু রচনা করে। ইহা দ্বারা দুই রকমের ভ্রম জন্মে—বিদ্যমান বস্তুকে প্রকাশ করে না এবং অবিদ্যমান বস্তুকে প্রকাশ করে। অর্থাৎ মায়ার আচ্ছাদিকা বৃত্তির প্রভাবে বস্তুর যাহা প্রকৃত স্বরূপ, তাহা দৃষ্ট হয় না (ইহা এক রকমের ভ্রম), অন্যথা দৃষ্ট হয় (ইহা আর এক রকমের ভ্রম)। এ-স্থলে বস্তুটী মিথ্যা নহে; যে অন্যথা-জ্ঞান জন্মে, তাহাই মিথ্যা। ("ঋতেঽর্থং যৎ প্রতীয়েত"-ইত্যাদি শ্রীভা ২।৯।৩৩ শ্লোকের বল্লভাচার্য্যকৃতা সুবোধিনী টীকা)।

জগৎ। ব্রহ্ম কারণ, জগৎ তাঁহার কার্য্য। জগৎ সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের আধিভৌতিক রূপ। ব্রহ্ম লীলাবশতঃ স্বীয় চিৎ ও আনন্দকে তিরোহিত করিয়া কেবল সদংশে এই জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করেন। কিন্তু জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করিয়াও—জগদ্রূপে

পরিণত হইয়াও—তিনি অবিকৃত থাকেন। যেমন উর্ণনাভি সূত্রজাল বিস্তার করিয়াও নিজে অবিকৃত থাকে, তদ্রূপ। ব্রহ্মই জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ। প্রকৃতি হইতে, বা পরমাণু হইতে জগতের উৎপত্তি নহে, জগৎ ব্রহ্মের বিবর্ত্তও নহে। জগৎ ব্রহ্মেরই পরিণাম। ব্রহ্ম যখন সত্য, তখন জগৎও সত্য ; জগৎ মিথ্যা নহে।

সৃষ্টির পূর্ব্বেও জগদ্রূপ কার্য্য কারণরূপ ব্রহ্মে বিদ্যমান থাকে। তখন তাহা অবশ্য দৃষ্টিগোচর হয় না। দধির মধ্যেও ঘৃত থাকে ; কিন্তু তাহা যেমন দৃষ্টিগোচর হয় না, তদ্রূপ। ব্রহ্ম যখন কার্য্যরূপে পরিণাম প্রাপ্ত হয়েন, তখন জগৎ দৃষ্টির গোচরীভূত হইয়া থাকে। উভয় অবস্থাতেই জগতের সত্তা বিদ্যমান থাকে। জগতের সৃষ্টি হইতেছে ব্রহ্মের আবির্ভাব-শক্তির বিকাশ। এই আবির্ভাব-শক্তিদ্বারাই সর্ব্বকারণ ব্রহ্ম স্বেচ্ছায় কার্য্যরূপ পরিগ্রহ করিয়া জগদ্রূপে আত্মপ্রকাশ করেন এবং প্রলয় পর্য্যন্ত এইরূপেই অবস্থান করেন। আবার তিরোভাব-শক্তিদ্বারা কার্য্যরূপ জগৎকে তিরোহিত করিয়া তিনি আবার কারণাবস্থা প্রাপ্ত হয়েন। তখন জগৎ আর দৃষ্টির গোচরীভূত থাকেনা।

ব্রহ্ম জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকেন। এইরূপ পরিণামকে **অবিকৃত পরিণাম** বলা হয়। স্বর্ণনির্ম্মিত বলয়-কুণ্ডলাদি হইতেছে স্বর্ণের অবিকৃত পরিণাম ; কেননা, বলয়-কুণ্ডলাদি সমস্ত বস্তুতেই স্বর্ণ অবিকৃত থাকে। বলয়-কুণ্ডলাদি আবার স্বর্ণপিণ্ডরূপও ধারণ করিতে পারে। "অবিকৃতমেব পরিণমতে সুবর্ণম্। সর্ব্বাণি চ তৈজসানি ॥১।৪।২৬-ব্রহ্মসূত্রের বল্লভাচার্য্যকৃত অণুভাষ্য ॥ ব্রহ্মের সদংশও তদ্রূপ জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও অবিকৃত থাকে।

জগৎ ও সংসার। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের মতে জগৎ ও সংসার এক পদার্থ নহে, দুইটী ভিন্ন বস্তু। ভগবানের অবিদ্যা-শক্তির প্রভাবে জীবের যে অহং-মমত্বাদি বুদ্ধি জন্মে, তাহাই সংসার এবং তাহাই জীবের জন্ম-মরণাদি দুঃখের হেতু। এই সংসার হইতেছে অবিদ্যার কার্য্য, ব্রহ্মের কার্য্য নহে ; এজন্য ইহা মিথ্যা। কিন্তু জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের কার্য্য ; এজন্য জগৎ সত্য।

স্বরূপ-বিস্মৃতি, দেহাধ্যাস, ইন্দ্রিয়াধ্যাস, প্রাণাধ্যাস এবং অন্তঃকরণাধ্যাস—অবিদ্যার এই পাঁচটী পর্ব্ব। স্বরূপ-বিস্মৃতি-আদিই সংসার। এই সংসার হইতেছে অবিদ্যাকল্পিত। এজন্য জ্ঞানের দ্বারা সংসারের নাশ সম্ভব। কিন্তু জগৎ ব্রহ্মস্বরূপ বলিয়া তাহার বিনাশ নাই, আবির্ভাব-তিরোভাবমাত্র আছে। জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ—উভয়ই ব্রহ্ম। সংসারের নিমিত্ত-কারণ অবিদ্যা ; সংসার কল্পিত বস্তু বলিয়া তাহার কোনও উপাদান-কারণ থাকিতে পারে না। সংসার-নাশে জগতের কোনও ক্ষতি হয় না। জ্ঞানোৎপত্তি পর্য্যন্তই জীবের সংসার ; মুক্তিলাভ হইলেই সংসারের লয় বা বিনাশ। কিন্তু জগতের লয় হইতেছে ভগবানের ইচ্ছায় জগতের তিরোধান—বিনাশ নহে। সংসারই সুখ-দুঃখাত্মক, জগৎ সুখ-দুঃখাত্মক নহে। এজন্যই জীবন্মুক্ত অবস্থায় জগতে থাকিয়াও জীবের জাগতিক সুখদুঃখের অনুভব হয় না।

সৃষ্টি ও লীলা। সৃষ্টি-ব্যাপার হইতেছে ব্রহ্মের লীলা। তাঁহার বহিঃক্রীড়া-প্রবৃত্তি হইতেই "বহু হওয়ার" ইচ্ছা এবং তাহার ফলেই জগতের সৃষ্টি। লীলার জন্য বৈচিত্রীর প্রয়োজন। এই বৈচিত্রী-সম্পাদনের নিমিত্তই তিনি জীব-সমূহকে বিবিধ ভাবাপন্ন করিয়াছেন এবং এই বৈচিত্রী-সম্পাদনের জন্যই তিনি জীব-সমূহকে স্বীয় অবিদ্যাশক্তির সহিত যুক্তও করিয়া থাকেন—যাহার ফলে জীবসমূহ অহন্তা-মমত্বাস্পদ সংসার-ভাবাপন্ন হয়। আবার তাঁহারই কৃপায় সৎসঙ্গাদি লাভ করিয়া পঞ্চপর্ব্বাত্মিকা বিদ্যার আশ্রয়ে সংসারমুক্ত হইতে পারে।

ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব। প্রশ্ন হইতে পারে, শুদ্ধাদ্বৈত-মতেও অন্তর্য্যামী, জীব, জগৎ-ইত্যাদি ভেদ দৃষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে?

শুদ্ধাদ্বৈত-বাদে ইহার উত্তর এইরূপ। উল্লিখিত ভেদসমূহ বাস্তবিক ব্রহ্মের ভেদ নহে, তাহারা ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। একই সচ্চিদানন্দ পরব্রহ্ম ভগবান্‌ই স্বীয় ইচ্ছানুসারে বিভিন্নরূপে আত্ম-প্রকাশ করেন। তিনিও চিৎ, জীবও চিৎ; সুতরাং জীবকে তাঁহার সজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা, জীব হইতেছে ব্রহ্মেরই চিদংশ, ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে; সুতরাং জীব ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ নহে। আর, ব্রহ্ম চিৎ, এই জড় জগৎ অচিৎ; সুতরাং জগৎকে ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু বস্তুতঃ তাহা নহে। কেননা, জগৎ হইতেছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সদংশ (সৎ-এর অংশ); সুতরাং ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহে। এজন্য জগৎকে ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ বলা যায় না। আবার অন্তর্য্যামী বা অক্ষরব্রহ্মও ব্রহ্মের ন্যায় সচ্চিদানন্দ—সুতরাং ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন। পরব্রহ্মের গুণাদিও তাঁহারই স্বরূপগত—সুতরাং তাঁহা হইতে অভিন্ন—গুণাদিও ব্রহ্মের স্বগতভেদ নহে। এইরূপে দেখা গেল— ব্রহ্ম হইতেছেন—সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য অদ্বয়তত্ত্ব। আপাতঃদৃষ্টিতে যাহাদিগকে ভেদ বলিয়া মনে হয়, সেই জীব-জগদাদিও ব্রহ্মেরই ন্যায় শুদ্ধ— মায়াস্পর্শশূন্য—বলিয়া ব্রহ্ম হইতেছেন শুদ্ধাদ্বৈত-তত্ত্ব।

ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ। জীব হইতেছে ব্রহ্মের চিদংশ এবং জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের সদংশ। অংশ ও অংশীর মধ্যে ভেদ নাই বলিয়া জীবজগতের সহিতও ব্রহ্মের ভেদ নাই। সুতরাং ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ হইতেছে অভেদ-সম্বন্ধ।

গ। শুদ্ধাদ্বৈতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা

(১) সগুণব্রহ্ম ও নির্গুণব্রহ্ম

শুদ্ধাদ্বৈত-মতে ব্রহ্ম হইতেছেন অনন্ত-কল্যাণ-গুণের আকর—সুতরাং সগুণ। এই সমস্ত গুণ হইতেছে শুদ্ধ।

ব্রহ্ম যখন এই সমস্ত শুদ্ধগুণকে স্বীয় ইচ্ছায় তিরোহিত করেন, তখন তিনি নির্গুণ।

শ্রীপাদ রামানুজাদি আচার্য্যবর্গের মতে, গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতেও, হেয় প্রাকৃত (বহিরঙ্গামায়া হইতে উদ্ভূত) গুণের অভাববশতঃই ব্রহ্মকে নির্গুণ বলা হয়। ব্রহ্মের স্বরূপগত

অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের তিরোভাববশতঃ নির্গুণত্বের কথা তাঁহারা বলেন নাই। এই বিষয়ে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের সহিত তাঁহাদের মতভেদ আছে।

কিন্তু এইরূপ মতভেদের একটা সমাধান আছে বলিয়া মনে হয়। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য যখন জীব-জগদাদিকেও শুদ্ধ বলিয়াছেন, তখন স্বয়ং ব্রহ্ম যে তাঁহার মতেও মায়িকগুণহীন—সুতরাং মায়িকগুণহীনত্ববশতঃ নির্গুণ--ইহাও তাঁহার অনভিপ্রেত নহে। আর, বিশুদ্ধ গুণসমূহের তিরোভাব-বশতঃ তিনি যে নির্গুণ ব্রহ্মের কথা বলিয়াছেন, সেই নির্গুণ ব্রহ্মকে যদি জ্ঞানমার্গের সাধকগণ শ্রুতি-স্মৃতি-কথিত যে নির্গুণ-নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্য কামনা করেন, সেই নির্গুণব্রহ্ম মনে করা যায়, তাহা হইলে গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের সহিত শ্রীপাদ বল্লভের এই বিষয়ে মতভেদ থাকেনা।

(২) জীব-স্বরূপ

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে জীবকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তিও বলা হইয়াছে, অংশও বলা হইয়াছে। গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে জীব হইতেছে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপ অংশ—জীব-শক্তিবিশিষ্ট কৃষ্ণের অংশ। কিন্তু শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য তাহা বলেন না; তিনি বলেন—জীব হইতেছে পরব্রহ্মের চিদংশ—পরব্রহ্মের আনন্দাংশ তিরোহিত হইলে যে চিৎ অতিরোহিত থাকে, সেই চিৎ-এর অংশ। তিনি আরও বলেন, পরব্রহ্ম ভগবানের ইচ্ছায় চিদংশ-জীবে যখন ষড়্বিধ-ঐশ্বর্য্যরূপ ভগবদ্ধর্ম্ম তিরোহিত হইয়া যায়, তখন জীবের সহিত অবিদ্যার সংযোগ হয়, তাহাতেই জীবের সংসার—জীবের দুঃখ-দৈন্যাদি—আসিয়া পড়ে।

৩।২।৫-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ বল্লভ চিদংশ-জীবে ভগবদ্ধর্ম্মের তিরোভাবের কথাই বলিয়াছেন; কিন্তু তাঁহার উক্তির সমর্থনে কোনও শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। অবশ্য জীবে যে ষড়্বিধৈশ্বর্য্যাদি ভগবদ্ধর্ম্মের বিকাশ নাই, তাহা অস্বীকার করা যায় না; জীবকে শ্রীকৃষ্ণের জীব-শক্তির অংশ বলিয়া স্বীকার করিলে ভগবদ্ধর্ম্মহীনত্বও উপপাদিত হইতে পারে। কিন্তু জীবকে ব্রহ্ম-স্বরূপের চিদংশ বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে ঐশ্বর্য্যাদি ভগবদ্ধর্ম্মহীনত্বের সমর্থক শাস্ত্র-প্রমাণের প্রয়োজন। চিৎ হইতেছে জ্ঞান। জীব ব্রহ্মের চিদংশ হইলে জীবও হইবে জ্ঞানস্বরূপ। জ্ঞানস্বরূপ জীবে, ভগবানের একবিধ ঐশ্বর্য্য জ্ঞানের তিরোভাব কিরূপে হইতে পারে? জ্ঞানস্বরূপ জীবে জ্ঞানের তিরোভাব স্বীকার করিতে গেলে কি স্বরূপেরই তিরোভাবের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে না?

আবার, চিদংশ বা জ্ঞানস্বরূপ জীবের সহিত অজ্ঞান-রূপা অবিদ্যার সংযোগই বা কিরূপে সম্ভবপর হয়? সেই সংযোগের ফলে জ্ঞানস্বরূপ জীবের বুদ্ধি-বিপর্য্যয়াদিই বা কিরূপে হইতে পারে?

শ্রীপাদ বল্লভ বলেন—অবিদ্যার প্রভাবে চিদংশ-জীবে দেহেন্দ্রিয়াদির অধ্যাস জন্মে। অধ্যাস হইতেছে ভ্রমবিশেষ। চিদংশ জ্ঞানস্বরূপ জীবে অধ্যাসই বা কিরূপে হইতে পারে?

তাঁহার মতে সৃষ্টি হইতেছে লীলাময় পরব্রহ্মের লীলা। লীলার জন্যই পরব্রহ্ম তাঁহার

চিদংশ জীবসমূহকে উচ্চ-নীচ-ভাবাপন্ন করেন এবং তাঁহার ইচ্ছাতেই অবিদ্যার সহিত তাহাদের সংযোগ হয়। লীলারস-সম্পাদনার্থই চিদংশ জীবের সংসারিত্ব। তাহাই যদি হয়, অবিদ্যার প্রভাব হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য সাধন-ভজনের উপদেশের সার্থকতা কোথায়? সৎসঙ্গের ফলে পঞ্চপর্ব্বাত্মিকা বিদ্যার আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব মুক্ত হইতে পারে—একথা শ্রীপাদ বল্লভও বলিয়াছেন। কিন্তু অবিদ্যাজনিত বন্ধন যদি পরব্রহ্মের ইচ্ছাতেই সংঘটিত হয়, তাহা হইতে অব্যাহতি লাভের ইচ্ছা জীবের কিরূপে জন্মিতে পারে? তিনিই বলিয়াছেন—ব্রহ্মধর্ম্ম ঐশ্বর্য্যের তিরোভাবে জীবের পরাধীনত্ব। পরাধীন—অর্থাৎ ভগবান্ পরব্রহ্মের অধীন—জীব ভগবদিচ্ছায় সংঘটিত বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের জন্য স্বাধীন-ইচ্ছা পাইবে কিরূপে? যদি বলা যায়—জীবের সাধন-ভজনও হইতেছে পরব্রহ্মের লীলা-বৈচিত্রী। তাহা হইলে জীবের কৃত কর্ম্মের জন্যও জীব দায়ী হইতে পারে না। অথচ শাস্ত্র বলেন—জীব স্বকৃত-কর্ম্মের ফল ভোগ করিয়া থাকে; জীবের কর্ম্মফল ভগবান্‌কে স্পর্শ করিতে পারে না, ভগবান্ ভোগ করেন না। কিন্তু শ্রীপাদ বল্লভের উক্তি হইতে বুঝা যায়—অবিদ্যার কবলে পতিত হইয়া জীব যাহা কিছু করে, তৎসমস্তই হইতেছে লীলাময় ভগবানের লীলারসের পুষ্টিবিধায়ক; কেননা, লীলারস-বৈচিত্রীর নির্ব্বাহার্থ তিনিই নানাভাবে জীবের দ্বারা সে-সমস্ত করাইয়া থাকেন। তাহার ফলে যে লীলারসের উদ্ভব হয়, তাহা লীলাবিলাসী ভগবান্‌ই ভোগ করেন।

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতে জানা যায়—ব্রহ্মবিষয়ে জীবের অনাদি অজ্ঞতা, অনাদি-বহির্ম্মুখতাই হইতেছে তাহার সংসার-বন্ধনের এবং জন্ম-মৃত্যু-আদির হেতু। কিন্তু শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের মতে পরব্রহ্ম ভগবানের ইচ্ছাতেই, তাঁহার লীলা-সম্পাদনার্থ, জীবের সহিত অবিদ্যার সংযোগ এবং তাহার ফলেই জীবের সংসার-বন্ধন।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়—স্ব-স্ব-কর্ম্মফল অনুসারেই জীবসমূহের উচ্চ বা নীচ ভাব, উচ্চ বা নীচ যোনিতে জন্ম; কিন্তু শ্রীপাদ বল্লভের মতে পরব্রহ্ম ভগবানের লীলার জন্য তিনিই জীবসমূহকে উচ্চ-নীচ-ভাবাপন্ন করিয়া থাকেন।

(৩) জগৎ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে জগৎ হইতেছে পরব্রহ্মের মায়াশক্তির পরিণাম। কিন্তু বিশুদ্ধাদ্বৈত-মতে জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের অবিকৃত পরিণাম, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের সদংশ।

ব্রহ্মের সদংশ জগৎকে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য আবার "জড়ও" বলিয়াছেন। "সদংশেন জড়াঃ ॥ ২।৩।৪৩-ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্য।" ইহাতে বুঝা যায়, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের "সৎ"-অংশকে তিনি "জড়" বলিতেছেন। কিন্তু "জড়" বলিতে চিদ্বিরোধী বা অচিৎ বস্তুকেই বুঝায়। ব্রহ্মের "সৎ" যদি "জড়" হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হয় যে, সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের স্বরূপের মধ্যেও চিদ্বিরোধী বা অচিৎ জড় বস্তু আছে। কিন্তু তাহা শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। ব্রহ্মস্বরূপান্তর্ভূত যে "সৎ", তাহা অচিৎ নহে, তাহাও চিৎ। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের মতে এবং বিষ্ণুপুরাণের মতেও

ব্রহ্মের স্বাভাবিকী চিচ্ছক্তির বা স্বরূপ-শক্তির তিনটী বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ। এই তিনটী যখন চিচ্ছক্তিরই বৃত্তি, তখন তাহারাও প্রত্যেকেই চিচ্ছক্তি। এই তিনটী শক্তির মধ্যে হ্লাদিনী হইতেছে সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের আনন্দাংশের শক্তি, সংবিৎ হইতেছে চিৎ-অংশের শক্তি এবং সন্ধিনী হইতেছে সৎ-অংশের শক্তি। ব্রহ্মের সৎ-অংশের শক্তি সন্ধিনী যখন চিচ্ছক্তি, তখন সৎ কখনও অচিৎ বা জড় হইতে পারে না। যাহা অচিৎ, তাহার শক্তিও অচিৎই হইবে, তাহা কখনও চিচ্ছক্তি হইতে পারে না। অগ্নির কখনও অগ্নি-নির্ব্বাপিকা শক্তি থাকিতে পারে না। ইহা হইতেও বুঝা যায় যে, ব্রহ্মের "সৎ" কখনও "জড়" বা "অচিৎ" হইতে পারে না।

সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মের "সৎ"-শব্দে "সত্তা" বুঝায়—চিৎ-সত্তা, আনন্দ-সত্তা। তাহা কখনও "জড়" বা "অচিৎ" হইতে পারেনা।

জীব-জগতের তৎকথিতরূপ ব্রহ্মাংশত্ব প্রতিপাদনের উদ্দেশ্যে ২।৩।৪৩-ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্যে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য যে যুক্তির অবতারণা করিয়াছেন, তাহা হইতেছে এই ঃ—অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতেও জড়-জীব (জীব-জগৎ) নির্গত হইয়াছে। (চিৎ ও আনন্দের তিরোধানবশতঃ ব্রহ্মের) সৎ-অংশ হইতে জড় (জগৎ) এবং (আনন্দাংশের তিরোভাবে ব্রহ্মের) চিৎ-অংশ হইতে জীব নির্গত হইয়াছে।

"বিস্ফুলিঙ্গা ইবাগ্নের্হি জড়জীবা বিনির্গতাঃ।
সর্ব্বতঃ পাণিপাদান্তাৎ সর্ব্বতোক্ষিশিরোমুখাৎ॥
নিরিন্দ্রিয়াৎ স্বরূপেণ তাদৃশাদিতি নিশ্চয়ঃ।
সদংশেন জড়াঃ পূর্ব্বং চিদংশেনেতরে অপি।
অন্যধর্ম্মতিরোভাবা মূলেচ্ছাতোস্বতন্ত্রিণঃ॥"

অগ্নি হইতে যেমন বিস্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের জীব-শক্তির অংশরূপ জীব এবং মায়াশক্তির পরিণামরূপ জগৎ (যাহারা মহাপ্রলয়ে ব্রহ্মেই সূক্ষ্মরূপে অবস্থান করে, তাহারা) বিনির্গত হয়—এইরূপ অর্থ করিলেও দৃষ্টান্তের সার্থকতা রক্ষিত হইতে পারে। কিন্তু তাহা স্বীকার না করিয়া—ব্রহ্মের সদংশ জড়জগদ্রূপে এবং চিদংশ জীবরূপে নির্গত হইল—এইরূপ অর্থের সমর্থক শাস্ত্র-প্রমাণ কি আছে ? শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য উক্ত সূত্রের ভাষ্যে তদ্রূপ শাস্ত্র-প্রমাণের উল্লেখ করেন নাই। শাস্ত্র-প্রমাণব্যতীত কেবল যুক্তিদ্বারা শাস্ত্রগম্য তত্ত্বসম্বন্ধে কোনও সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সমীচীন বলিয়া মনে হয় না।

"সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বে এই জগৎ "সৎস্বরূপই" ছিল। সেই "সৎ" হইতেই জগতের উৎপত্তি, সেই "সৎ"ই জগদ্রূপে পরিণত হইয়াছেন। কিন্তু শ্রুতিপ্রোক্ত সেই "সৎ" যে চিদ্‌বিরহিত নহে, তাহা পরবর্ত্তী বাক্য হইতে জানা যায়। শ্রুতি হইতে জানা যায়—সেই সৎই "বহু হওয়ার ইচ্ছা করিলেন", "তিন দেবতায় প্রবেশ

করিয়া নাম-রূপ অভিব্যক্ত করিলেন" ; এজন্যই সমস্তই "সন্মূল", "সদায়তন" এবং "সৎপ্রতিষ্ঠ।" ইচ্ছা করার শক্তি, নাম-রূপে অভিব্যক্ত হওয়ার শক্তি, যাঁহার আছে, সেই "সৎ"-এ চিৎ বা জ্ঞান অনভিব্যক্ত থাকিতে পারে না, সেই "সৎ" অচেতনবৎ বা জড়তুল্যও হইতে পারে না।

সচ্চিদানন্দ-পরব্রহ্মের সৎ, চিৎ ও আনন্দ-এই তিনটী পৃথক্ বস্তু নহে। ইহাদের একটীকে অপর তুইটী হইতে বিচ্ছিন্নও করা যায় না। ব্রহ্ম যে আনন্দস্বরূপ—ইহা শ্রুতিপ্রসিদ্ধ। সৎ ও চিৎকে এই আনন্দের বিশেষণস্থানীয়ও বলা যায়। ব্রহ্ম কিরূপ আনন্দ? ব্রহ্ম চিৎ-আনন্দ, অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দ স্বরূপতঃ চিৎ—জ্ঞান, স্বপ্রকাশ ; এবং ব্রহ্ম সৎ-আনন্দ, অর্থাৎ ব্রহ্মের আনন্দ হইতেছে সৎ—নিত্য একইরূপে অস্তিত্ববিশিষ্ট। বিশেষ্যকে বিশেষণ হইতে, বা বিশেষণকে বিশেষ্য হইতে বিচ্ছিন্ন করা যায় না। বিশেষ্যের উল্লেখে বিশেষণও সূচিত হয় ; আবার বিশেষণের উল্লেখেও বিশেষ্য সূচিত হয় ; কেননা, এই বিশেষণ হইতেছে অনন্যসাধারণ। এজন্যই ব্রহ্মকে শ্রুতিতে কোনও স্থলে কেবল "আনন্দ", কোনও স্থলে কেবল "চিৎ", বা "জ্ঞান", কোনও স্থলে বা কেবল "সৎ" বলা হইয়াছে। এই তিনটী শব্দের যে-কোন একটীর উল্লেখেই "সচ্চিদানন্দ" ব্রহ্মকেই বুঝায়। "সদেব সোম্যেদমগ্র আসীৎ"-এই শ্রুতিবাক্যেও "সৎ"-শব্দে "সচ্চিদানন্দ ব্রহ্মকেই" বুঝাইতেছে। এই "সৎ"-এ চিৎ বা জ্ঞান আছে বলিয়াই তিনি "বহু হওয়ার ইচ্ছা করেন", আনন্দ আছে বলিয়াই "সৃষ্টি-লীলার ইচ্ছা করেন।" লীলার সূচনা আনন্দের উচ্ছ্বাসে। সুতরাং চিদ্‌বিরহিত ও আনন্দ-বিরহিত "সৎ" কিরূপে হইতে পারে, বুঝা যায় না।

যদি বলা যায়—"সৎ"-এ যে চিৎ ও আনন্দ নাই, তাহা নহে। যে "সৎ" জগদ্রূপে প্রকাশিত হয়, তাহাতে "চিৎ" ও "আনন্দ" থাকে প্রচ্ছন্ন, অনভিব্যক্ত। পরব্রহ্ম তাঁহার অবির্ভাব-শক্তিতে কেবল "সৎ"কেই প্রকাশিত করেন এবং তিরোভাব-শক্তিতে "চিৎ" ও "আনন্দকে" তিরোহিত করেন, অর্থাৎ অভিব্যক্ত করেন না।

তাহা হইলেও প্রশ্ন উঠে এই যে—এতাদৃশ "সৎ"-বস্তুও ব্রহ্মেরই ন্যায় "শুদ্ধ"—সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত এবং দোষ-স্পর্শের অযোগ্য। কিন্তু জগতে যে বিকারাদি দোষ দৃষ্ট হয়? এই বিকারাদি দোষ তো "সৎ"-ব্রহ্মকেই স্পর্শ করে? তাহাতে সদংশ-জগতের শুদ্ধত্ব থাকে কিরূপে?

ইহার উত্তরে যদি বলা যায়—এই সমস্ত বিকার বাস্তবিক বিকার নহে, এ-সমস্ত হইতেছে "অবিকৃত পরিণাম।" তুগ্ধ দধির রূপ গ্রহণ করিলে দধিকে তুগ্ধের "বিকার" বলা যায় ; কেননা তাহাতে তুগ্ধের তুগ্ধত্ব নষ্ট হইয়া যায়, তুগ্ধের ধর্ম্ম দধিতে থাকে না ; দধিও কখনও পুনরায় তুগ্ধে পরিণত হইতে পারে না। ইহাই বাস্তবিক বিকার। কিন্তু স্বর্ণ যখন অলঙ্কারাদির আকার গ্রহণ করে, তখন অলঙ্কারাদিকে স্বর্ণের "বিকার" না বলিয়া "অবিকৃত পরিণাম" বলাই সঙ্গত। কেন না, অলঙ্কারাদিতে পরিণত হইয়াও স্বর্ণ স্বীয় ধর্ম্ম রক্ষা করে, অলঙ্কারাদি পুনরায় স্বর্ণে পরিণত হইতে পারে। ব্রহ্মের সদংশ জগতে যে পরিবর্ত্তন দৃষ্ট হয়, তাহাও এইরূপ "অবিকৃত পরিণাম", বিকার নহে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞান-বিবৃতি-প্রসঙ্গে শ্রুতি মৃণ্ময়দ্রব্যাদিকে মৃত্তিকার বিকার, স্বর্ণালঙ্কারাদিকে স্বর্ণের বিকারই বলিয়াছেন। তবে এই বিকারের বিশেষত্ব এই যে, ইহা দুগ্ধের দধিরূপে পরিণতির ন্যায় বিকার নহে ; এই বিকারে মৃত্তিকার বা স্বর্ণের স্বরূপ অবিকৃত থাকে। তদ্রূপ, ব্রহ্মের সদংশরূপ জগতের পরিবর্ত্তনে "সৎ"-অংশের স্বরূপ অবিকৃত থাকিতে পারে, তথাপি তাহার মধ্যে একটা পরিবর্ত্তন আসিয়া পড়ে। স্বর্ণ যখন অলঙ্কারাদিতে পরিণত হয়, তখন স্বর্ণের স্বরূপ অবিকৃত থাকিলেও স্বর্ণকে বিভিন্ন আকারাদি গ্রহণ করিতে হয় ; তখন আর স্বর্ণ স্বর্ণপিণ্ড-রূপে থাকে না। আকারাদি আগন্তুক হইলেও এবং স্বর্ণের স্বরূপ অবিকৃত থাকিলেও আগন্তুক আকার গ্রহণও পরিবর্ত্তনই, বিকারই, পরিণামই। কিন্তু সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্ম নিত্য-নির্ব্বিকার, কূটস্থ। তাঁহার প্রচ্ছন্ন-চিদানন্দ-সৎও নিত্য-নির্ব্বিকার, কূটস্থ। প্রচ্ছন্ন-চিদানন্দ-সৎ-এর বিকারিত্ব—স্বরূপের বিকার না হইলেও ভিন্নাকারে পরিণতিরূপ বিকারিত্ব—স্বীকার করিলেও ব্রহ্মেরই বিকারিত্ব স্বীকার করিতে হয়। তাহা স্বীকার করিলে ব্রহ্মের শ্রুতিপ্রসিদ্ধ নির্ব্বিকারত্ব বা কূটস্থত্বই আর রক্ষিত হয় না।

জগতের প্রত্যক্ষদৃষ্ট পরিবর্ত্তন ব্রহ্মের সদংশের পরিবর্ত্তন—ইহা স্বীকার করিলে ব্রহ্মস্বরূপেই যে পরিণাম-যোগ্যতা বিদ্যমান, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। দুগ্ধই দধিরূপে পরিণত হইতে পারে, জল কখনও দধিরূপে পরিণত হয় না। ইহাতে বুঝা যায়, দধিরূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা দুগ্ধের মধ্যে আছে, জলের মধ্যে নাই। স্বর্ণই অলঙ্কারাদির আকার গ্রহণ করিতে পারে, বায়ু পারে না। ইহাতে বুঝা যায়—অলঙ্কাররূপে পরিণত হওয়ার যোগ্যতা স্বর্ণেরই আছে, বায়ুর তাহা নাই। স্বর্ণ-পিণ্ডের মধ্যে এই যোগ্যতা থাকে প্রচ্ছন্ন, তাহা যখন বিকশিত হয়, তখনই স্বর্ণ অলঙ্কারাদির রূপ গ্রহণ করে। তদ্রূপ ব্রহ্মের সদংশরূপ জগতের পরিবর্ত্তন হইতে বুঝা যায়, সৃষ্টির পূর্ব্বেও সচ্চিদানন্দ-ব্রহ্মের সৎ-অংশে—সুতরাং ব্রহ্মেও—জগদ্রূপে পরিণত হওয়ার এবং জগতের বিভিন্ন পরিবর্ত্তন অঙ্গীকার করার যোগ্যতা প্রচ্ছন্ন ভাবে বিদ্যমান থাকে ; তাহা অভিব্যক্ত হইলেই ব্রহ্ম বা ব্রহ্মের সদংশ জগদ্রূপে পরিণত হয়েন এবং জগদ্রূপে পরিণত হইয়া নানাবিধ পরিবর্ত্তনকেও অঙ্গীকার করেন। পরিণামের এই যোগ্যতা—প্রচ্ছন্নভাবেও যখন থাকে, তখনও—ব্রহ্মের কূটস্থত্বের বিরোধী।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের সদংশই জগৎ, এইরূপ সিদ্ধান্ত বিচারসহ হইতে পারে না। তাহাতে জগতের দোষ নির্দ্দোষ-ব্রহ্মকেই স্পর্শ করে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়।

(৪) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ এই গুণত্রয়-সম্বন্ধে

বৈদিকী প্রকৃতি হইতেছে ত্রিগুণাত্মিকা, সত্ত্ব-রজস্তমোগুণময়ী। এই তিনটী গুণের কোনও একটীও ব্রহ্মকে স্পর্শ পর্য্যন্ত করিতে পারে না। এজন্যই শ্রুতিতে ব্রহ্মকে "নির্গুণ" বলা হয়—

"নির্গুণ" বলিতে প্রাকৃতগুণহীনত্বই বুঝায়। প্রকৃতির এই তিনটী গুণব্যতীত অপর কোনও "সত্ত্ব, রজঃ, তমঃ"-গুণের উল্লেখ শ্রুতি-স্মৃতিতে দৃষ্ট হয় না।

কিন্তু শুদ্ধাদ্বৈতবাদের "সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ" এই গুণত্রয় হইতেছে ব্রহ্ম হইতে অচ্ছেদ্য; এই গুণত্রয় শুদ্ধ—শুদ্ধ সত্ত্ব, শুদ্ধ রজঃ এবং শুদ্ধ তমঃ। শুদ্ধ ব্রহ্ম হইতে অচ্ছেদ্য হইতে হইলে এই গুণত্রয়কেও অবশ্য শুদ্ধই হইতে হইবে। কিন্তু এতাদৃশ "শুদ্ধ" গুণত্রয়ের উল্লেখ শাস্ত্রে কোথায় আছে ?

যদি বলা যায়—"শুদ্ধ সত্ত্বের" উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। "সত্ত্বং বিশুদ্ধং বসুদেবশব্দিতম্"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমদ্ভাগবতও "বিশুদ্ধ সত্ত্বের" কথা বলিয়াছেন। এ-স্থলে "বিশুদ্ধ সত্ত্ব" বা "শুদ্ধ সত্ত্ব" উল্লিখিত হইয়া থাকিলেও "শুদ্ধ রজঃ" এবং "শুদ্ধ তমঃ" কি কোথাও উল্লিখিত হইয়াছে ? যদি "শুদ্ধ রজঃ" এবং "শুদ্ধ তমঃ" কোনও স্থলে উল্লিখিত থাকিত, তাহা হইলে বরং উল্লিখিত "বিশুদ্ধ সত্ত্ব" বা "শুদ্ধ সত্ত্ব"-শব্দে "শুদ্ধ সত্ত্ব, শুদ্ধ রজঃ এবং শুদ্ধ তমঃ"-এই গুণত্রয়ের একটী গুণকে বুঝাইতেছে বলিয়া মনে করা যাইতে পারিত। কিন্তু "শুদ্ধ রজঃ" বা "শুদ্ধ তমঃ" শব্দের উল্লেখ কোথাও দৃষ্ট হয় না।

উল্লিখিত "বিশুদ্ধ সত্ত্ব"-শব্দে "অশুদ্ধ বা প্রাকৃত" সত্ত্ব-রজস্তমো গুণত্রয়ের অন্তর্গত সত্ত্ব-গুণের প্রতিযোগী কোনও গুণকে বুঝায় না। এই "বিশুদ্ধ সত্ত্ব" হইতেছে পরব্রহ্মের স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ—সন্ধিনী-প্রধানা স্বরূপ-শক্তি, আধার-শক্তি; কোনও কোনও স্থলে স্বরূপ-শক্তিকেও "শুদ্ধসত্ত্ব" বলা হয় (১।১।১৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহা রজস্তমের স্পর্শহীন প্রাকৃত সত্ত্বও নহে।

পরাশক্তির বা স্বরূপ-শক্তির তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনী (সত্তাসম্বন্ধিনী শক্তি), সম্বিৎ (জ্ঞান-সম্বন্ধিনী শক্তি) এবং হ্লাদিনী (আনন্দ-সম্বন্ধিনী শক্তি) (১।১।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই তিনটী বৃত্তি হইতে উদ্ভূত গুণকেই যদি শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য শুদ্ধ সত্ত্ব, শুদ্ধ রজঃ এবং শুদ্ধ তমঃ বলিয়া থাকেন, তাহা হইলে অন্য কথা। কিন্তু গুণসমূহের এইরূপ নামকরণ যেন তাঁহার নিজস্ব। তাহা হইলেও "তমঃ" আবার "শুদ্ধ" হয় কিরূপে ?

(৫) গুণাবতার সম্বন্ধে

শাস্ত্রে তিন গুণাবতারের উল্লেখ আছে—ব্রহ্মা, বিষ্ণু এবং শিব। বিশুদ্ধাদ্বৈতমতে ব্রহ্মার বিগ্রহ হইতেছে "বিশুদ্ধ রজোগুণ", বিষ্ণুর বিগ্রহ হইতেছে "বিশুদ্ধ সত্ত্বগুণ" এবং শিবের বিগ্রহ হইতেছে "বিশুদ্ধ তমোগুণ।" তাঁহারা প্রত্যেকেই প্রাকৃত-গুণাতীত। পরব্রহ্মই তত্তদ্গুণময় বিগ্রহে প্রবেশ করিয়া তত্তদ্গুণাবতার বলিয়া কথিত হয়েন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে "বিশুদ্ধ সত্ত্ব", "বিশুদ্ধ রজঃ" এবং "বিশুদ্ধ তমঃ"—এই গুণত্রয়ের উল্লেখ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। সুতরাং গুণাবতারত্রয়ের বিগ্রহ উল্লিখিত গুণত্রয়ে গঠিত, ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায় ?

ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব—এই গুণাবতারত্রয়ের বিগ্রহ গুণগঠিত বলিয়াই যে তাঁহাদিগকে "গুণাবতার" বলা হয়, তাহা নহে। তাঁহারা গুণের নিয়ন্তা বলিয়াই তাঁহাদিগকে গুণাবতার বলা হয়।

ব্রহ্মা হইতেছেন প্রাকৃত রজোগুণের নিয়ন্তা, বিষ্ণু প্রাকৃত সত্ত্বগুণের নিয়ন্তা এবং শিব প্রাকৃত তমোগুণের নিয়ন্তা। নিয়ন্তা হইলেও এই সমস্ত গুণের সহিত তাঁহাদের স্পর্শ নাই, সৃষ্টিকার্য্যের জন্য তাঁহারা দূর হইতে গুণসমূহের নিয়ন্ত্রণ করেন (১।১।৮৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বিষ্ণু, ঈশ্বরকোটি ব্রহ্মা এবং ঈশ্বরকোটি শিব—এই তিন গুণাবতার হইতেছেন স্বরূপতঃ পরব্রহ্মই—সুতরাং তাঁহারাও সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ, গুণাতীত, নির্গুণ। এজন্যই "নির্গুণ"রূপেও তাঁহাদের উপাসনার উপদেশ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। যাঁহারা গুণের ভিতর দিয়া তাঁহাদের প্রতি দৃষ্টি করেন, তাঁহারাই তাঁহাদিগকে "সগুণ" বলিয়া মনে করেন এবং অনিত্য সগুণ-বস্তু লাভের আশায় তাঁহাদের উপাসনা করেন।

(৬) সাধন সম্বন্ধে

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য সাধন-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের কিছু সামঞ্জস্য বিদ্যমান। তিনি যে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষিত হইয়াছিলেন, তাঁহার সাধন-সম্বন্ধীয় উক্তি হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুই পরব্রহ্মের শ্রুতিপ্রোক্ত রসস্বরূপত্বের কথা সমুজ্জ্বল ভাবে ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যও পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন।

রসস্বরূপত্বের পূর্ণতম বিকাশ যে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণে, গোপালতাপনী-শ্রুতিপ্রোক্ত সেই তত্ত্বও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই সমুজ্জ্বল ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যও তাহাই বলিয়াছেন।

সাধন-সম্বন্ধে শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য যে মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুরই কথা। মহাপ্রভু যাহাকে "বিধিমার্গ" বলিয়াছেন, শ্রীপাদ বল্লভ তাহাকে "মর্য্যাদামার্গ" বলিয়াছেন এবং মহাপ্রভু যাহাকে "রাগমার্গ" বলিয়াছেন, শ্রীপাদ বল্লভ তাহাকে "পুষ্টিমার্গ" বলিয়াছেন।

বিশেষত্ব হইতেছে এই যে, শ্রীমন্ মহাপ্রভু রাগমার্গে চারি ভাবের ভজনের কথা বলিয়াছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর। কিন্তু শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য তাঁহার পুষ্টিমার্গে কেবল মাত্র মধুর ভাবের ভজনের কথাই বলিয়াছেন। গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণই মধুর ভাবের, বা কান্তাভাবের উপাস্য। তিনি দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য-ভাবের ভজনের কথা বলেন নাই। তাঁহার দীক্ষাই বোধ হয় ইহার হেতু। শ্রীল গদাধর পণ্ডিতগোস্বামীর নিকটে তিনি মধুরভাবে গোপীজন-বল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার মন্ত্রই লাভ করিয়াছিলেন।

এইরূপে দেখা যায়—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষার প্রভাব শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের নির্দ্ধারিত সাধন-পন্থায় বিশেষরূপে পরিস্ফুট হইয়াছে।

১১। শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামীর শুদ্ধাদ্বৈতবাদ

শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামীই শুদ্ধাদ্বৈত-বাদের মূল প্রবর্ত্তক বলিয়া কথিত হয়েন। তিনি শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের অনেক পূর্ব্ববর্ত্তী। বিভিন্ন আচার্য্য তাঁহাদের গ্রন্থে শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামীর যে সমস্ত অভিমত প্রসঙ্গক্রমে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ করিয়াছেন, তদ্ব্যতীত অন্য কোনও মূল গ্রন্থ হইতে তাঁহার মতবাদ সম্বন্ধে বর্ত্তমানে কিছু জানিবার উপায় নাই। শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী তাঁহার শ্রীমদ্‌ভাগবতের ও বিষ্ণুপুরাণের টীকায় এবং শ্রীপাদ মাধবাচার্য্যও তাঁহার সর্ব্বদর্শনসংগ্রহে শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামীর অভিমতের উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার গ্রন্থে শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামীর উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীমদ্‌ভাগবতের "অনর্থোপশমং সাক্ষাদ্ভক্তিযোগমধোক্ষজে। লোকস্যা জানতো বিদ্বাংশ্চক্রে সাত্বতসংহিতাম্॥ ১।৭।৬॥"-শ্লোকের ভাবার্থদীপিকা টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

"এতদুক্তং ভবতি—বিদ্যাশক্ত্যা মায়ানিয়ন্তা নিত্যাবির্ভূত-পরমানন্দস্বরূপঃ সর্ব্বজ্ঞঃ সর্ব্বশক্তিরীশ্বরঃ, তন্মায়য়া সম্মোহিতস্তিরোভূত-স্বরূপস্তদ্‌বিপরীতধর্ম্মা জীবঃ, তস্য চেশ্বরস্য ভক্ত্যা লব্ধজ্ঞানেন মোক্ষ ইতি। **তদুক্তং বিষ্ণুস্বামিনা**—হ্লাদিন্যা সংবিদাশ্লিষ্টঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বরঃ। স্বাবিদ্যাসংবৃতো জীবঃ সংক্লেশনিকরাকরঃ॥ তথা—স ঈশো যদ্বশে মায়া, স জীবো যস্তয়ার্দ্দিতঃ। স্বাবির্ভূতপরমানন্দঃ স্বাবির্ভূতসুদুঃখভূঃ॥ স্বাদৃগুত্থবিপর্য্যাসভবভেদজভীশুচঃ। যন্মায়য়া জুষন্নাস্তে তমিমং নৃহরিং নুম ইত্যাদি।"

এ-স্থলে শ্রীপাদ বিষ্ণুস্বামীর যে অভিমত উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই :—

"ঈশ্বর হইতেছেন সচ্চিদানন্দ বস্তু ; তিনি হ্লাদিনী (আনন্দদায়িনী শক্তি) এবং সংবিৎ (সর্ব্বজ্ঞত্ব-শক্তি) দ্বারা আলিঙ্গিত। আর, জীব স্বীয় (অথবা ঈশ্বরের) অবিদ্যার দ্বারা সংবৃত (সম্যক্‌রূপে আবৃত) এবং সংক্লেশ-সমূহের আকর। মায়া যাঁহার বশে অবস্থিত, তিনি ঈশ্বর— (মায়াধীশই ঈশ্বর) ; আর, যে মায়াদ্বারা অর্দ্দিত (কবলিত ও নিপীড়িত), সে জীব। ঈশ্বর হইতেছেন স্বপ্রকাশ পরমানন্দস্বরূপ ; আর জীব স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ (চিদ্রূপ বলিয়া) হইলেও (মায়াধীনতাবশতঃ) প্রচুর দুঃখের আকর। যাঁহার মায়ার প্রভাবে জীব স্বীয় অজ্ঞান হইতে উত্থিত যে বিপর্য্যাস (স্বরূপের অন্যথাজ্ঞান), সেই বিপর্য্যাস হইতে উত্থিত যে ভেদ (আত্মা হইতে ভিন্ন দেহাদিতে যে অহংমমত্ববুদ্ধি), সেই ভেদ হইতে উদ্ভূত ভয় ও শোক হইতে ভীত ও শোকগ্রস্ত হয়, সেই নৃসিংহদেবকে নমস্কার করি।"

সর্ব্বদর্শন-সংগ্রহে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের "সাকারসিদ্ধি" নামক গ্রন্থের উক্তি এইরূপ উদ্ধৃত হইয়াছে :—

"বিষ্ণুস্বামিমতানুসারিভিঃ নৃপঞ্চাস্য-শরীরস্য নিত্যত্বোপপাদনাৎ। তদুক্তং সাকারসিদ্ধৌ— 'সচ্চিন্নিত্যনিজাচিন্ত্যপূর্ণানন্দৈকবিগ্রহম্। নৃপঞ্চাস্যমহং বন্দে শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মতম্॥ ইতি।

—বিষ্ণুস্বামিমতানুসরণকারীরা নৃপঞ্চাস্যের শরীরের নিত্যত্ব স্বীকার করেন। সাকারসিদ্ধি-

নামক গ্রন্থে বলা হইয়াছে—শ্রীবিষ্ণুস্বামিসম্মত নৃপঞ্চাস্যকে বন্দনা করি। সেই নৃপঞ্চাস্য হইতেছেন সৎ, চিৎ, নিত্য এবং স্বীয় অচিন্ত্য শক্তির প্রভাবে তিনি একমাত্র পূর্ণানন্দবিগ্রহ।”

উল্লিখিত এবং অন্যান্য প্রমাণ হইতে বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের অভিমত যাহা জানা যায়, তাহা এ-স্থলে সংক্ষেপে উল্লিখিত হইতেছে :—

ব্রহ্ম—সৎস্বরূপ, চিৎস্বরূপ, নিত্য, অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, পূর্ণানন্দৈক-বিগ্রহ, সাকার, দেহ-দেহিভেদশূন্য, স্বপ্রকাশ।

জীব—স্বরূপতঃ স্বপ্রকাশ ; কিন্তু পরব্রহ্মের মায়াদ্বারা সম্যক্‌রূপে আবৃত, অশেষ দুঃখের আকর-সদৃশ, মায়াদ্বারা নানাভাবে লাঞ্ছিত। জীব দুই প্রকার—বদ্ধ ও মুক্ত। মুক্ত জীব ভগবদিচ্ছায় সেবার উপযোগী নিত্য বিগ্রহ প্রাপ্ত হইয়া ভগবানের সেবা করেন।

মায়া—ঈশ্বরের বশীভূতা, জীব-পীড়ন-কারিণী, অপর নাম অবিদ্যা।

বিষ্ণুস্বামিসম্প্রদায়ের মতে ঈশ্বর শুদ্ধ, ভগবদ্‌বিগ্রহ শুদ্ধ, ভজনপরায়ণ জীব শুদ্ধ। জীব, জগৎ ও মায়া ঈশ্বরের আশ্রিত। এই রূপেই ব্রহ্মের বা ঈশ্বরের শুদ্ধাদ্বৈতত্ব সিদ্ধ হয়।

১২। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে জীব বা জীবাত্মা হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি, জীবশক্তি। আর, জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের মায়াশক্তির পরিণাম—সুতরাং বস্তুতঃ ব্রহ্মের শক্তি। এইরূপে জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি, আর ব্রহ্ম এই শক্তির শক্তিমান্।

সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান, জীব-জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যেও সেই সম্বন্ধই বর্ত্তমান। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ বিদ্যমান ; সুতরাং জীব-জগৎ এবং ব্রহ্মের মধ্যেও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধই বর্ত্তমান।

পরবর্ত্তী অধ্যায়ের পরের অধ্যায়ে এ-সম্বন্ধে একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করা হইবে।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের আবির্ভাব শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অনেক পরে। তাঁহার মতবাদ পরে আলোচিত হইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

অন্যমত সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর আলোচনা

১৩। নিবেদন

জীব-জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধবিষয়ে স্বীয় অভিমত ব্যক্ত করার পূর্ব্বে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী অন্যান্য মতবাদের আলোচনা ও খণ্ডন করিয়াছেন।

যাঁহারা অভেদবাদী, তাঁহারা বলেন—জীব-জগতের সঙ্গে ব্রহ্মের কোনও ভেদই বাস্তবিক নাই। যে ভেদ দৃষ্ট বা প্রতীত হয়, তাহা হইতেছে উপাধিকৃত। এই উপাধিসম্বন্ধে তাঁহাদের কেহ কেহ—যেমন শ্রীপাদ ভাস্কর—বলেন, উপাধিটী হইতেছে বাস্তব ; আবার কেহ কেহ বলেন—যেমন শ্রীপাদ শঙ্কর—উপাধিটী হইতেছে অবাস্তব, কাল্পনিক বা মিথ্যা।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী উল্লিখিত উভয় রকমের উপাধি-সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। এ-স্থলে তাঁহার আলোচনার মর্ম্ম সংক্ষেপে প্রকাশ করা হইতেছে।

১৪। অভেদ-বাদ সম্বন্ধে আলোচনা। বাস্তব উপাধির যোগ

জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন হইলেও বাস্তব উপাধির যোগে ভেদ প্রাপ্ত হয়—ইহাই কোনও কোনও অভেদবাদীর মত। উপাধির যোগও ভিন্ন ভিন্ন ভাবে হইতে পারে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্মসন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনীতে (বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ। ১১৭-১৮ পৃষ্ঠায়) ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উপাধির সংযোগ সম্বন্ধে যে আলোচনা করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

ক। বাস্তবোপাধি-পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মাই জীব

যাঁহারা বলেন, বাস্তব ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন আকাশখণ্ডের ন্যায় বাস্তব উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ডই হইতেছে অণুপরিমিত জীব, তাঁহাদের উক্তি বিচারসহ নহে। কেননা, শ্রুতি বলেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপী—সুতরাং অচ্ছেদ্য, অখণ্ডনীয়। একটী বস্তুকে দুই বা ততোঽধিক ভাগে বিভক্ত করাই হইতেছে ছেদন-শব্দের তাৎপর্য্য। অচ্ছেদ্য ব্রহ্মের ছেদন বা খণ্ডীকরণ সম্ভবপর নহে।

আবার, জীবকে ব্রহ্মখণ্ড বলিয়া স্বীকার করিলে জীবের শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ অনাদিত্বও থাকেনা। কেননা, উপাধিদ্বারা খণ্ডীকৃত হওয়ার পূর্ব্বে জীবের অস্তিত্ব তাহাতে অস্বীকৃত হইয়া পড়ে।

খ। অণুরূপ-উপাধিযুক্ত অচ্ছিন্ন-ব্রহ্মপ্রদেশ-বিশেষই জীব

যদি বলা যায়, ব্রহ্ম অচ্ছেদ্য বলিয়া বাস্তব-উপাধিদ্বারা তাঁহার অবচ্ছেদ স্বীকার করিতে যদি

আপত্তি হয়, তাহা হইলে অণুপরিমিত উপাধির সহিত সংযুক্ত অবিচ্ছিন্ন ব্রহ্মপ্রদেশ-বিশেষকে জীব বলা যায়।

ইহার উত্তরে বলা যায়—না, তাহাও হইতে পারে না। কেননা, উপাধি হইতেছে গতিশীল, একস্থান হইতে অন্য স্থানে গমন করে। যখন উপাধি ব্রহ্মের এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে গমন করে, তখন ব্রহ্মের যে-প্রদেশের সহিত উপাধি পূর্ব্বে সংযুক্ত ছিল, সেই প্রদেশকে আকর্ষণ করিয়া লইয়া যাইতে পারে না; সেই প্রদেশ তখন উপাধিমুক্ত হয়। আবার তখন যে প্রদেশের সহিত উপাধি সংযুক্ত হয়, উপাধিকর্ত্তৃক সেই প্রদেশের বন্ধন হয়। এইরূপে, এক প্রদেশের পর আর এক প্রদেশে, তাহার পর আর এক প্রদেশে উপাধির গতি হয় বলিয়া ক্ষণে ক্ষণেই ব্রহ্মের বন্ধন-দশা ও মোক্ষ-দশা হইতেছে বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। ইহা যুক্তিসিদ্ধ নহে।

গ। উপাধিযুক্ত ব্রহ্মস্বরূপই জীব

যদি বলা যায়—উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মকে, অথবা উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্মপ্রদেশকে জীব বলিয়া স্বীকার করিতে যদি আপত্তি হয়, তাহা হইলে উপাধিসংযুক্ত ব্রহ্ম-স্বরূপকেই (উপাধিযুক্ত সমগ্রব্রহ্মকেই) জীব বলা যায়।

উত্তরে বলা যায়—না, তাহাও যুক্তিসিদ্ধ নয়। কেননা, সমগ্র ব্রহ্মই যদি উপাধিযুক্ত হইয়া জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন, তাহা হইলে জীবাতিরিক্ত উপাধিশূন্য-ব্রহ্ম বলিয়া কিছু আর থাকে না; অথচ শাস্ত্রে উপাধিবিহীন ব্রহ্মের কথা বলা হইয়াছে। উপাধিযুক্ত সমগ্র ব্রহ্মকে জীব বলিয়া স্বীকার করিতে গেলে আবার সর্ব্বদেহে জীবের একত্বও স্বীকার করিতে হয়; তাহা হইলে এক জনের সুখে বা দুঃখে অপরের বা সকলেরই সুখ বা দুঃখ হয় বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু বাস্তবিক তাহা হয় না।

উপাধিযুক্ত সমগ্র ব্রহ্মকে জীব বলিয়া স্বীকার করিলে "য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতি (শতপথ ব্রাহ্মণ॥ ১৪।৫।৩০)-বাক্যের সহিত এবং "শব্দবিশেষাৎ" ১।২।৫॥-ব্রহ্মসূত্রের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়।

"য আত্মনি তিষ্ঠন্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—অন্তর্য্যামিরূপে ব্রহ্ম জীবের মধ্যে অবস্থান করেন। সমগ্র ব্রহ্মই যদি উপাধির সংযোগে জীব হইয়া যায়েন, তাহা হইলে সেই জীবের মধ্যে তিনি আবার কিরূপে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থান করিতে পারেন? ইহাই বিরোধ।

"শব্দবিশেষাৎ"—এই ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য এই যে—মনোময়ত্বাদি ধর্ম্মে জীব উপাস্য নহে, পরমাত্মা বা ব্রহ্মই উপাস্য। এই সূত্রে উপাসক জীব হইতে উপাস্য ব্রহ্মের পার্থক্যের কথা বলা হইয়াছে। সমগ্র ব্রহ্মই যদি উপাধিযোগে জীব হইয়া যায়েন, তাহা হইলে জীবের উপাস্যরূপ ব্রহ্ম আর থাকেন না। ইহাই বিরোধ।

ঘ। ব্রহ্মাধিষ্ঠান উপাধিই জীব

যদি বলা যায়—ব্রহ্মের অধিষ্ঠানরূপ উপাধিই জীব। 'অথ ব্রহ্মাধিষ্ঠানমুপাধিরেব জীবঃ?" অর্থাৎ উপাধিতে যখন ব্রহ্মের অধিষ্ঠান হয়, তখন সেই উপাধিই জীবনামে কথিত হয়।

তাহাও হইতে পারেনা। কেননা, তাহা হইলে মুক্তিদশায় জীবত্বনাশ ঘটে।

উপাধির বিনাশেই মুক্তি। মুক্তিতে উপাধি যখন থাকেনা, তখন ব্রহ্মাধিষ্ঠানরূপ উপাধিও থাকেনা—সুতরাং জীবও থাকেনা। অথচ শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে জীবাত্মা হইতেছে নিত্য বস্তু; জীবের উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। সুতরাং "ব্রহ্মধিষ্ঠান উপাধিই জীব"—ইহা স্বীকৃত হইতে পারে না। (মুক্ত-অবস্থাতেও যে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে)।

ঙ। বাস্তব উপাধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বই জীব

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে বাস্তব-উপাধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মের জীবত্বসম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—

"তত্র যদ্যপি উপাধেরনাবিদ্যকত্বেন বাস্তবত্বং তর্হি অবিষয়স্য তস্য পরিচ্ছেদবিষয়ত্বাসম্ভবঃ। নির্ধর্ম্মকস্য ব্যাপকস্য নিরবয়বস্য চ প্রতিবিম্বত্বাযোগোঽপি ; উপাধিসম্বন্ধাভাবাৎ, বিম্বপ্রতিবিম্বভেদাভাবাৎ, দৃশ্যত্বাভাবাচ্চ। উপাধিপরিচ্ছিন্নাকাশস্থজ্যোতিরংশস্যৈব প্রতিবিম্বো দৃশ্যতে, ন তু আকাশস্য, দৃশ্যত্বাভাবাদেব॥—প্রভুপাদ সত্যানন্দ গোস্বামিসম্পাদিত তত্ত্ব-সন্দর্ভ ॥৩৭॥"

তাৎপর্য্য। উপাধি অবিদ্যা (বা মিথ্যা) না হইয়া বাস্তব হইলে তদ্দ্বারা ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ অসম্ভব ; কেননা, অপরিচ্ছেদ্য ব্রহ্ম পরিচ্ছেদের বিষয় হইতে পারে না (পূর্ব্ববর্ত্তী ৪।১২ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। আবার, বাস্তব-উপাধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও অসম্ভব। কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বব্যাপক, নিরবয়ব এবং অভেদবাদীদের মতে নির্ধর্ম্মক—নির্ব্বিশেষ। ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক হইলে তাঁহার সহিত উপাধির সম্বন্ধ সংঘটিত হইতে পারে না ; যেহেতু, উপাধির সহিত সম্বন্ধশূন্যতাই হইতেছে নির্ধর্ম্মকত্ব। আর, যিনি সর্ব্বব্যাপক, তাঁহার প্রতিবিম্বও সম্ভবপর নহে। কেননা, দর্পণে কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব উৎপন্ন হওয়ার জন্য দর্পণ ও সেই বস্তুর মধ্যে ব্যবধান থাকার প্রয়োজন। সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের পক্ষে এইরূপ ব্যবধান কল্পনাতীত। বিশেষতঃ, ব্রহ্ম সর্ব্বব্যাপক, সর্ব্বগত বলিয়া সর্ব্বত্রই বিদ্যমান, দর্পণরূপ উপাধির মধ্যেও সর্ব্বত্র বিদ্যমান ; প্রতিবিম্বের স্থান বা অবকাশ কোথায়? তর্কের অনুরোধে প্রতিবিম্ব সম্ভবপর বলিয়া মনে করিলেও ব্রহ্মস্থলেই হইবে সেই প্রতিবিম্ব ; তাহাতে বিম্বরূপ ব্রহ্ম এবং তাঁহার প্রতিবিম্ব এই দুইয়ের একত্রাবস্থিতিবশতঃ প্রতিবিম্বের পৃথক্ অস্তিত্বই থাকিবে না। আবার ব্রহ্ম যখন নিরবয়ব, তাঁহার যখন কোনওরূপ অবয়বই নাই, তখন নিশ্চয়ই তিনি হইবেন অদৃশ্য। অদৃশ্য বস্তুর প্রতিবিম্বই থাকিতে পারে না। অদৃশ্য বায়ুর প্রতিবিম্ব অসম্ভব। অদৃশ্য ব্যাপক আকাশেরও প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। যদি বলা যায়—জলাশয়াদিতে তো আকাশের প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হয়। তাহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—জলাদিতে যাহাকে আকাশের প্রতিবিম্ব বলা হয়, তাহা বাস্তবিক আকাশের প্রতিবিম্ব নহে ; তাহা হইতেছে আকাশস্থ পরিচ্ছিন্ন এবং দৃশ্যমান জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রতিবিম্ব, আকাশের প্রতিবিম্ব নহে। আকাশ অদৃশ্য, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয় নহে ; জ্যোতিষ্কমণ্ডলী দৃশ্যমান, চক্ষুরিন্দ্রিয়ের বিষয়ীভূত ; জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর প্রতিবিম্ব সম্ভবপর

হইতে পারে। যাহা রূপ নহে, কিম্বা রূপের আশ্রয় নহে, তাহা দৃষ্টির গোচরীভূতও হইতে পারে না, কোনও দর্পণে প্রতিবিম্বিতও হইতে পারে না। নিরুপাধিক নির্ধর্ম্মক, নিরবয়ব এবং সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব অসম্ভব। সুতরাং বাস্তব-উপাধিতে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব জীব—এইরূপ অনুমান নিতান্ত অযৌক্তিক।

চ। বাস্তব-উপাধির যোগে ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ব-স্বীকারে মোক্ষাভাব-প্রসঙ্গ

পূর্ব্ববর্ত্তী ঘ-উপ-অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে—জীব নিত্য, মোক্ষাবস্থাতেও জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। কিন্তু অভেদবাদীরা তাহা স্বীকার করেন না। "জীব" বলিয়া তাঁহারা কোনও বস্তুই স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন—উপাধির যোগে ব্রহ্মই জীব-ভাব প্রাপ্ত হয়েন, উপাধির বিনাশে এই জীব-ভাব যখন তিরোহিত হয়, তখন—যাহাকে জীব বলা হয়, তাহা ব্রহ্মত্ব লাভ করে। ঘট নষ্ট হইয়া গেলে ঘটমধ্যস্থিত আকাশ যেমন বৃহদাকাশের সহিত মিশিয়া এক হইয়া যায়, তদ্রূপ। অথবা দর্পণ অপসারিত হইলে দর্পণমধ্যস্থ প্রতিবিম্ব যেমন বিলুপ্ত হয়, তদ্রূপ। যুক্তির অনুরোধে ইহা স্বীকার করিয়াই বিচার করা হইতেছে।

অভেদবাদীদের মতে আবার ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বতোভাবে নির্ধর্ম্মক, নির্ব্বিশেষ। যুক্তির অনুরোধে ইহাও স্বীকার করিয়া লওয়া হইতেছে।

উল্লিখিত দুইটী বিষয় স্বীকার করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে বলিয়াছেন—

"তথা বাস্তবপরিচ্ছেদাদৌ সতি সামানাধিকরণ্যজ্ঞানমাত্রেণ ন তত্ত্যাগশ্চ ভবেৎ। তৎপদার্থ-প্রভাবস্তত্র কারণমিতি চেদস্মাকমেব মতসম্মতম্॥—প্রভুপাদ সত্যানন্দগোস্বামি-সম্পাদিত তত্ত্ব-সন্দর্ভ ॥৩৮॥"

ইহার টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—

"ব্রহ্মৈবাহমিতি জ্ঞানমাত্রেণ তদ্রূপাবস্থিতিঃ স্যাদিতি যদভিমতং তৎখলু উপাধের্বাস্তবত্বপক্ষে ন সম্ভবতীত্যাহ—তথা বাস্তবেতি। আদিনা প্রতিবিম্বো গ্রাহ্যঃ। ন খলু নিগড়িতঃ কশ্চিদ্দীনো রাজৈবাহমিতি জ্ঞানমাত্রাদ্ রাজাভবন্ দৃষ্ট ইতি ভাবঃ। নন্ু ব্রহ্মানুসন্ধিসামর্থ্যাদ্‌ভবেদিতি চেৎ তত্রাহ তৎপদার্থেতি। তথা চ ত্বন্মতক্ষতিরিতি॥"

তাৎপর্য্য। অভেদবাদীরা ব্রহ্মের ভগবত্তা স্বীকার করেন না এবং মনে করেন—উপাধির যোগে ব্রহ্মই জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন; সুতরাং উপাধি দূরীভূত হইলেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে। তাঁহারা ইহাও মনে করেন যে, "আমি ব্রহ্মই"-এই ভাব হৃদয়ে জাগ্রত হইলে জীবের মোক্ষ লাভ হইতে পারে। এজন্য "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে'-ইত্যাদি গীতাবাক্যের অনুসরণে ভগবদ্‌ভজনও তাঁহারা করেন না। "আমি ব্রহ্মই"-এই ভাবই চিত্তে পোষণ করার জন্য তাঁহারা চেষ্টা করেন, মোক্ষ-লাভার্থ তাঁহারা আর কিছুই করেন না। তাঁহারা বলেন—সামানাধিকরণ্য-জ্ঞানমাত্রেই ("আমি ব্রহ্মই"-এইরূপ জ্ঞানমাত্রেই) উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মখণ্ডরূপ জীব, অথবা উপাধিতে

প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মরূপ জীব উপাধিমুক্ত হইয়া ব্রহ্মরূপে অবস্থিতি লাভ করে (অর্থাৎ ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন হইয়া যায়)। এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন—উপাধির বাস্তবত্ব স্বীকার করিলে উহা (অর্থাৎ "আমি ব্রহ্মই"-এইরূপ জ্ঞানমাত্রেই ব্রহ্মরূপে স্থিতি) সম্ভবপর নহে। একটী দৃষ্টান্তের সাহায্যে শ্রীজীবপাদের উক্তির তাৎপর্য্য বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। বাস্তব-শৃঙ্খলে আবদ্ধ কোনও দরিদ্রব্যক্তি যদি মনে করে—"আমি রাজা" এবং নিরন্তর এইরূপ চিন্তা করিতে করিতে যদি তাহার এইরূপ ধারণা ("আমি রাজা"-এই ধারণা) দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হয়, তাহা হইলেও সেই দরিদ্র-ব্যক্তি বাস্তবিক রাজা হইয়া যায় না, তাহার বাস্তব-শৃঙ্খলের বন্ধনও ঘুচিয়া যায় না। তদ্রূপ, "আমি ব্রহ্মই"-এইরূপ জ্ঞানমাত্রেই কোনও জীব ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারেনা—তাহার সেই জ্ঞান দৃঢ় সংস্কারে পরিণত হইলেও না এবং তাহাতে বাস্তব উপাধি হইতেও তাহার অব্যাহতি লাভ হইবে না। সুতরাং তাহার পক্ষে মোক্ষলাভও সম্ভবপর হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—তৎপদার্থের প্রভাবেই (অর্থাৎ ব্রহ্মের প্রভাবেই) মোক্ষ সম্ভবপর হইতে পারে ? ইহার উত্তরে বক্তব্য এই যে—অভেদবাদী ব্রহ্মের প্রভাবের কথা বলিতে পারেননা ; কেননা, তাঁহার ব্রহ্ম নির্ধর্ম্মক-নির্ব্বিশেষ বলিয়া সর্ব্ববিধ-প্রভাবহীন, নির্ধর্ম্মক-ব্রহ্মের কোনও প্রভাবই থাকিতে পারে না। ব্রহ্মের কোনওরূপ প্রভাব নাই বলিয়া ব্রহ্মের প্রভাবে উপাধি-নির্ম্মুক্তি হইবে শিরোহীনের শিরোবেদনার মত অবাস্তব বস্তু। অভেদবাদী যদি ব্রহ্মের প্রভাব স্বীকার করেন, তাহা হইলে তাঁহার কথিত ব্রহ্মের নির্ধর্ম্মকত্বই আর থাকে না।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্মের নির্ধর্ম্মকত্ব এবং উপাধির বাস্তবত্ব স্বীকার করিলে উপাধি-পরিচ্ছিন্ন-ব্রহ্মখণ্ডরূপ, অথবা উপাধিতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মরূপ, জীবের মোক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

এই অনুচ্ছেদের অন্তর্গত বিভিন্ন উপ-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তির যে মর্ম্ম ব্যক্ত করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা গেল—তাঁহার মতে বাস্তব উপাধির যোগে ব্রহ্মের জীবভাব-প্রাপ্তি—সুতরাং জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব—যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

ছ। জড়-উপাধির যোগে ব্রহ্মের জীবত্ব স্বীকারে জীবের কার্য্যসামর্থ্য অসম্ভব

আরও একটী কথা বিবেচ্য। অভেদবাদীদের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন নির্ধর্ম্মক, নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক। কোনও কিছু করার সামর্থ্য তাঁহার নাই ; এ-বিষয়ে তিনি জড়তুল্য। তাঁহার যদি কোনও কার্য্য করার সামর্থ্য থাকিত, তাহা হইলে হয়তো মনে করিতে পারা যাইত যে, তাঁহার কোনও কার্য্যের ফলেই উপাধির সহিত তাঁহার সংযোগ হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার কোনও কার্য্যসামর্থ্যই যখন নাই, তখন কোন্ হেতুতে যে উপাধি অকস্মাৎ ব্রহ্মকে কবলিত করিল, তাহা দুর্নির্ণেয়।

আবার, ব্রহ্মও কার্য্যসামর্থ্যহীন—জড়তুল্য। উপাধিও জড়। দুই জড় বস্তুর সংযোগে কার্য্যসামর্থ্যের উদ্ভবও সম্ভবপর হয় না। অথচ, জড়তুল্য ব্রহ্মের সহিত জড় উপাধির সংযোগে

যে জীবের উদ্ভব হয়, সেই জীবের কার্য্যসামর্থ্যও সংসারে দৃষ্ট হয়, সেই জীবের সম্বন্ধে "আমি ব্রহ্মই"-এইরূপ চিন্তা করার সামর্থ্যও অভেদবাদীরা স্বীকার করেন। ইহাই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

এইরূপে দেখা গেল—বাস্তব উপাধির যোগে ব্রহ্মের জীবভাব-প্রাপ্তি যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

১৫। অভেদবাদ-সম্বন্ধে আলোচনা। অবাস্তব বা কল্পিত উপাধির যোগ

অভেদবাদীদের কথিত বাস্তব-উপাধির যোগে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জীবত্ব-প্রাপ্তির অযৌক্তিকতা দেখাইয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্ম-সন্দর্ভীয়-সর্ব্বসম্বাদিনীতে (বঙ্গীয় সাহিত্য-পরিষৎ-সংস্করণ। ১১৯—৩৩ পৃষ্ঠায়) অবাস্তব বা কল্পিত উপাধির যোগে নির্ধর্ম্মক ব্রহ্মের জীব-ভাব-প্রাপ্তি সম্বন্ধেও আলোচনা করিয়াছেন। বাস্তব উপাধির ন্যায়, কল্পিত উপাধিও নানাভাবে ব্রহ্মের সহিত সংযুক্ত হইতে পারে বলিয়া মনে করা যায়। এজন্য শ্রীজীবপাদও এই বিষয়ে নানাভাবে আলোচনা করিয়াছেন। এ-স্থলে তাঁহার আলোচনার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

এই উপাধি হইতেছে অবিদ্যা-কল্পিত উপাধি।

ক। অবিদ্যা-কল্পিত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব

অভেদবাদীরা বলিতে পারেন—অবিদ্যাকল্পিত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব—ইহা স্বীকার করিলে কোনও দোষের উদ্ভব হইতে পারে না। "তদেবমবিদ্যাকল্পিতোপাধিপরিচ্ছেদে তু ন দোষাঃ কল্প্যন্তে।"

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিতেছেন—"ইহাও যুক্তিসঙ্গত বাক্য নহে। কেননা, জীবভাব-কল্পনার হেতু হইতেছে মূল অবিদ্যা। জীব কখনও অবিদ্যার আশ্রয় হইতে পারে না। জীবকে উহার আশ্রয় মনে করিতে গেলে স্বাশ্রয়াদি-দোষ ঘটে। জীবভাব-কল্পনাহেতোস্তস্যা মূলাবিদ্যায়াঃ। ন চ জীব এব আশ্রয়ঃ, স্বাশ্রয়াদিদোষাৎ॥"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। অচ্ছেদ্য ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ যদিও অসম্ভব, তথাপি পূর্ব্বপক্ষের উক্তি অনুসারে যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, অবিদ্যাকল্পিত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব, তাহা হইলে অবিদ্যাকেই জীব-কল্পনার হেতু বলিতে হয়। তাহা হইলে জীব (অর্থাৎ কল্পিত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম) হইবে অবিদ্যার আশ্রিত এবং অবিদ্যা হইবে তাহার আশ্রয়। এতাদৃশ পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্ম যে নিজেকে জীব বলিয়া মনে করিবে, তাহাও অবিদ্যার প্রভাবেই। অবিদ্যার প্রভাবে নিজেকে জীব বলিয়া মনে করিতে হইলে উল্লিখিত পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই হইবে অবিদ্যার আশ্রয়। কেননা, যে বুদ্ধির দ্বারা লোক নিজেকে ধনী, দরিদ্র, সুখী বা দুঃখী মনে করে, সেই বুদ্ধির আশ্রয়ও

হয় সেই লোকই ; সেই বুদ্ধি সেই লোকের মধ্যেই থাকে, তাহার বাহিরে থাকে না। এইরূপে দেখা গেল—যে অবিদ্যা জীবের আশ্রয়, সেই অবিদ্যাই হইয়া পড়ে জীবের আশ্রিত। কাহারও কোনও আশ্রয় বস্তু আবার তাহার আশ্রিত হইতে পারে না। সুতরাং পূর্ব্বপক্ষের বাক্য যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী আরও বলিয়াছেন—পূর্ব্বপক্ষের মতে ঐশ্বর্য্যও অবিদ্যারই কল্পিত। কিন্তু জীব ঈশ্বর নহে। কেননা, জীবের ঐশ্বর্য্য নাই। তাহা হইলে দেখা গেল—অবিদ্যাকল্পিত উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মের জীবত্ব যখন যুক্তিসিদ্ধ হইতে পারে না এবং জীব যখন ঈশ্বরও নহে, তখন কেবল—শুদ্ধচৈতন্যই জীব—এই অভিমতই অবশিষ্ট থাকে। তাহা হইলে সেই শুদ্ধচৈতন্যেই অবিদ্যার কল্পনা করিতে হয়।

কিন্তু তাহাও সম্ভবপর নহে। একথা বলার হেতু এই। মনে কর, দেবদত্ত-নামক জীব শুদ্ধচৈতন্যস্বরূপ। শুদ্ধচৈতন্য বলিয়া তাঁহাতে অজ্ঞান থাকিতে পারে না, তাঁহাতে অজ্ঞানের স্পর্শও সম্ভব নয়। যিনি জ্ঞানের আশ্রয়—জ্ঞানবান্, তাঁহাতে কখনও কখনও অজ্ঞান দৃষ্ট হইতে পারে ; তাঁহাতে সময় সময় অজ্ঞান আসিতে পারে, আবার সেই অজ্ঞান চলিয়াও যাইতে পারে ; কিন্তু যিনি শুদ্ধচৈতন্য—জ্ঞানস্বরূপ, জ্ঞানমাত্রবস্তু—তাঁহাতে অজ্ঞান কখনও সম্ভবপর নহে। কেননা, জ্ঞান ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ, এই দুইটী বস্তুর একত্রাবস্থিতি একেবারেই অসম্ভব। জ্ঞানবান্ ব্যক্তি জ্ঞানস্বরূপ নহেন ; তিনি জ্ঞানের আশ্রয়মাত্র ; অন্যবস্তুও—অজ্ঞানও—কখনও কখনও সেই আশ্রয়ে থাকিতে পারে। পৃথিবী আলোকের আশ্রয়ও হইতে পারে, অন্ধকারের আশ্রয়ও হইতে পারে ; ভূপৃষ্ঠে আলোক এবং অন্ধকার পাশাপাশি থাকিতে পারে। কিন্তু তেজঃস্বরূপ সূর্য্য কখনও তেজের অত্যন্ত বিরোধী অন্ধকারের আশ্রয় হইতে পারে না।

শুদ্ধচৈতন্যেও যদি অজ্ঞান বা অবিদ্যার প্রভাব স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে মোক্ষও অসম্ভব হইয়া পড়িবে। সুতরাং জীবকে শুদ্ধচৈতন্য বলিয়া স্বীকার করিলে এবং সেই শুদ্ধচৈতন্য-জীবে অবিদ্যার কল্পনা করিতে গেলে, তাহা হইবে একটী যুক্তিবিরুদ্ধ ব্যাপার।

আবার, ঈশ্বর-অবস্থাতে যে অজ্ঞান থাকে না, "ঈক্ষতের্নাশব্দম্॥ ১।১।৫॥" ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—জীব হইতেছে জ্ঞানপ্রতিবন্ধবান্ (অর্থাৎ জীবের সর্ব্বজ্ঞত্ব নাই) ; কিন্তু ঈশ্বরের জ্ঞানে কোনও প্রতিবন্ধ নাই (অর্থাৎ ঈশ্বর সর্ব্বদা সর্ব্বজ্ঞ)। শ্রুতিও বলেন—ঈশ্বর সর্ব্বজ্ঞ। "স সর্ব্বজ্ঞঃ॥ মুণ্ডকশ্রুতি॥ ১।১।৯॥"

খ। অবিদ্যোপহিত শুদ্ধব্রহ্মই জীব

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"যদেব ব্রহ্ম চিন্মাত্রত্বেনাবিদ্যাযোগস্যাত্যন্তাভাবাস্পদত্বাচ্ছুদ্ধং তদেব তদ্‌যোগাদশুদ্ধো জীবঃ, পুনস্তদেব জীবাবিদ্যাকল্পিতমায়াশ্রয়ত্বাদীশ্বরস্তদেব চ তন্মায়াবিষয়ত্বাজ্জীব ইতি বিরোধস্তদবস্থ এব স্যাৎ। তত্র চ শুদ্ধায়াং চিত্যাবিদ্যা,

তদবিদ্যাকল্পিতোপাধৌ তস্যামীশ্বরাখ্যায়াং বিদ্যেতি, তথা বিদ্যাবত্ত্বেঽপি মায়িকত্বমিত্যসমঞ্জসা চ কল্পনা স্যাদিত্যাদ্যনুসন্ধেয়ম্ ॥—প্রভুপাদ সত্যানন্দগোস্বামি-সম্পাদিত তত্ত্বসন্দর্ভ ॥ ৪০ অনুচ্ছেদ ॥"

তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম হইতেছেন চিন্মাত্র বস্তু, জ্ঞানমাত্র বস্তু—সুতরাং অবিদ্যা তাঁহাকে কিছুতেই স্পর্শ করিতে পারেনা। "অগৃহ্যো নহি গৃহ্যতে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও বলিয়াছেন—ব্রহ্ম অবিদ্যার অগৃহ্য, অবিদ্যা ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতেও পারেনা। সুতরাং ব্রহ্ম হইতেছেন নিত্যশুদ্ধ। মায়াবাদীরা বলেন—এতাদৃশ নিত্যশুদ্ধ ব্রহ্মই আবিদ্যার যোগে অশুদ্ধ জীব হইয়াছেন। পুনরায় সেই শুদ্ধ ব্রহ্মই জীবাবিদ্যাকল্পিত মায়ার আশ্রয় হইয়া ঈশ্বর হইয়াছেন। আবার সেই শুদ্ধ ব্রহ্মই সেই ঈশ্বরের মায়া কর্ত্তৃক অভিভূত হইয়া জীব হইয়াছেন। শুদ্ধ চিন্মাত্র বস্তুতে অবিদ্যার সম্বন্ধ, সেই অবিদ্যার সম্বন্ধহেতু ব্রহ্মের জীবত্ব। সেই অবিদ্যাকল্পিত (জীবের দ্বারা কল্পিত) উপাধিতে—অর্থাৎ ঈশ্বরাখ্যবস্তুতে বিদ্যার কল্পনা; আবার বিদ্যাবত্তাতেও মায়িকত্ব। এ-সমস্ত হইতেছে অতীব অসামঞ্জস্যপূর্ণ কল্পনা মাত্র।

এ-স্থলে অসামঞ্জস্য এই রূপ :-

প্রথমতঃ, শুদ্ধ ব্রহ্মে অশুদ্ধ অবিদ্যার স্পর্শ। ইহা শ্রুতির সহিত সামঞ্জস্যহীন।

দ্বিতীয়তঃ, অবিদ্যার যোগে শুদ্ধ ব্রহ্ম অশুদ্ধ জীব হইয়াছেন। এই অবিদ্যা কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া ব্রহ্মকে স্পর্শ করিল? ঈশ্বর হইতে। ঈশ্বর কি? জীবাবিদ্যাকল্পিত মায়ার আশ্রয় হইয়া শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বর হইয়াছেন।

এ-স্থলে বিবেচ্য এই। জীবাবিদ্যাকল্পিত মায়ার আশ্রয় হইয়াই যখন শুদ্ধ ব্রহ্ম ঈশ্বরত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তখন ব্রহ্মের ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্তির পূর্ব্বেই ব্রহ্মের জীবত্ব-প্রাপ্তি আবশ্যক। জীবত্ব-প্রাপ্ত পূর্ব্বে সংঘটিত না হইলে, যে মায়ার আশ্রয় হইয়া ব্রহ্ম ঈশ্বর হয়েন, সেই মায়ার কল্পনা করিবে কে? কেননা, মায়াবাদীরা বলেন, জীব-কল্পিত মায়ার আশ্রয়রূপ ব্রহ্মই ঈশ্বর।

তাঁহারা আরও বলেন—শুদ্ধ ব্রহ্মই ঈশ্বরের মায়া দ্বারা—অবিদ্যার দ্বারা—অভিভূত হইয়া জীবত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—ব্রহ্মের পক্ষে আগে ঈশ্বরত্ব-প্রাপ্তি, তাহার পরে জীবত্ব-প্রাপ্তি।

পূর্ব্বে জীবত্ব সিদ্ধ না হইলে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। আবার পূর্ব্বে ঈশ্বরত্ব সিদ্ধ না হইলেও জীবত্ব সিদ্ধ হইতে পারে না। ইহা এক অদ্ভুত যুক্তি। অসামঞ্জস্যপূর্ণ বাক্য।

তৃতীয়তঃ, তাঁহারাই বলেন, মায়ার দুইটী বৃত্তি—মায়া বা বিদ্যা এবং অবিদ্যা। বিদ্যাদ্বারা উপহিত ব্রহ্ম ঈশ্বর এবং অবিদ্যাদ্বারা উপহিত ব্রহ্ম জীব। ঈশ্বর যখন বিদ্যাদ্বারাই উপহিত, তখন তাঁহাতে অবিদ্যা থাকিতে পারেনা। অথচ, তাঁহারাই আবার বলেন—ঈশ্বরের অবিদ্যাদ্বারা অভিভূত হইয়াই শুদ্ধ ব্রহ্ম জীবত্ব প্রাপ্ত হয়েন। বিদ্যাবত্তাতে অবিদ্যার কল্পনা—ইহাও অসামঞ্জস্যপূর্ণ।

এইরূপে দেখা গেল—অবিদ্যোপহিত ব্রহ্মই জীব, এইরূপ অনুমান যুক্তিবিরুদ্ধ।

গ। পরিচ্ছেদ-প্রতিবিম্ববাদ সম্বন্ধে মায়াবাদীদের তিনটী মতের আলোচনা

মায়াবাদীদের মধ্যে তিনটী মত আছে। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ সেই তিনটী মতের যে আলোচনা করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

প্রথম মত। অবিদ্যা হইতেছে জীবের আশ্রয়স্বরূপিণী। জীব নানা বলিয়া অবিদ্যাও নানা প্রকার। অবিদ্যা, তদাত্মসম্বন্ধ (অবিদ্যার আশ্রিত) জীব এবং তাহাদের বিভাগাদির অনাদিত্ব-নিবন্ধন অজ্ঞানবিষয়ীভূত ব্রহ্ম—শুক্তিতে যেমন রজত-ভ্রম হয়, তদ্রূপ—জগদ্রূপে বিবর্ত্তিত হয়েন।

এ-সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ বলেন—এই মত স্বীকার করিতে গেলে ইহাও স্বীকার করিতে হয় যে, জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মও অজ্ঞানের বিষয়ীভূত হয়েন। তাহা কখনও সম্ভবপর নহে; কেননা, জ্ঞান ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ।

অপর কোনও কোনও মায়াবাদী বলেন—"অজ্ঞানের বিষয়ীভূত ব্রহ্মই ঈশ্বর।"

এই মত স্বীকার করিলেও অন্তর্য্যামি-শ্রুতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। কেননা, অন্তর্য্যামি-শ্রুতি বলেন—"জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মই সর্ব্বত্র অবস্থিত থাকিয়া অন্তর্য্যামিরূপে জীব-জগতের নিয়মন করেন।"

"মায়াবচ্ছিন্ন চৈতন্যই ঈশ্বর, ঈশ্বরের আশ্রয়ই মায়া"—ইহাও বলা যায়না। কেননা, ইহা স্বীকার করিলে তাঁহার অন্তর্য্যামিত্বে "দ্বিগুণীকৃত্য বিরোধ" উপস্থিত হয়"।

আবার "জীবত্ব অবিদ্যাকৃত"—ইহাও স্বীকার করা যায় না। কেননা, অবিদ্যা অনাদি হইলেও অবিদ্যায় জীবের আশ্রয়ত্ব ঘটেনা। রজ্জুতে যে সর্পের ভ্রম হয়, ইহা অজ্ঞান। এই অজ্ঞান রজ্জু-সর্পাদিতে থাকেনা। যে লোক রজ্জুতে সর্প-ভ্রম করে, সেই লোকের মধ্যেই থাকে সেই অজ্ঞান। বীজাঙ্কুরবৎ অজ্ঞানপরম্পরাদ্বারা জীবত্ব-পরম্পরার প্রসক্তি হয়। জন্মে জীবের উৎপত্তি এবং মরণে তাহার অন্ত এবং প্রতিজন্মেই তাহার পার্থক্য-প্রসিদ্ধি ঘটে। এইরূপ সিদ্ধান্তে জীবাত্মা যে অজ, নিত্য ও মোক্ষার্হ—এই শ্রুতি-প্রমাণ মিথ্যা হইয়া পড়ে।

দ্বিতীয় মত। মায়াবাদীদের দ্বিতীয় মত হইতেছে এই যে—"চৈতন্যের অবিদ্যাপ্রতিবিম্বই ঈশ্বর এবং চৈতন্যের আভাসই জীব। ঈশ্বরও মিথ্যা, জীবও মিথ্যা।"

এ-স্থলে যে পদসমূহের সামানাধিকরণ্য আছে, তাহা "রজ্জু-সর্প"-এইরূপ বাধায় সামানাধিকরণ্যমাত্র; অর্থাৎ রজ্জু যেমন সর্প নহে, তদ্রূপ অবিদ্যা-প্রতিবিম্ব চৈতন্যও ঈশ্বর নহে, চৈতন্যাভাসও জীব নহে। জীব-ব্রহ্মের অভেদ-নিষেধক শ্রুতিবাক্য-সমূহই শুদ্ধ-সিদ্ধান্ত-সমর্থক; সুতরাং সেই সকল শ্রুতিবাক্যেরই মহাবাক্যত্ব স্বীকার্য্য।

সুষুপ্তিতে সকলেরই লয় হয়; উত্থিত জীব পুনরায় সম্যক্ প্রকারে প্রতিপন্ন হইয়া থাকে। ইহাতে কোনও অজ্ঞাত সত্তার অঙ্গীকার করা হয় না। এই অভিমত ঈশ্বর-প্রতিপাদন-পক্ষেও অবিরুদ্ধ। কেননা, ঈশ্বরের জ্ঞাত সংস্কারই পরেও অনুবর্ত্তন করে।

তৃতীয় মত। মায়াবাদীদিগের তৃতীয় মত হইতেছে এই :—

সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিগুণাত্মিকা অবিদ্যা ব্রহ্মকে আশ্রয় করিয়া থাকে। কার্য্যলাঘবার্থ সেই অবিদ্যাই "আবরণ-শক্তি" ও "বিক্ষেপ-শক্তি" ভেদে "অবিদ্যা" ও "মায়া" নামে অভিহিত হয়। আবরণ-শক্তিতে (অর্থাৎ অবিদ্যায়) চৈতন্য-প্রতিবিম্ব হইলে উহা "জীব"-নামে কথিত হয় এবং বিক্ষেপ-শক্তিতে (অর্থাৎ মায়াতে) প্রতিবিম্বিত চৈতন্যই "ঈশ্বর।" অর্থাৎ অবিদ্যোপহিত চৈতন্যই জীব এবং মায়োপহিত চৈতন্যই ঈশ্বর।

উপাধিনিষ্ঠরূপে বিম্বের অভিন্নভাবে প্রতীয়মান বিম্বই হইতেছে প্রতিবিম্ব। "আমি ঈশ্বর, এই জগতের স্রষ্টা ; আমি জীব, আমি কিছু জানি না"—এইরূপ জ্ঞান উপাধিনিষ্ঠ চিৎপ্রতিবিম্বেরই অধ্যবসায় মাত্র ; অর্থাৎ ঈশ্বরের কর্ত্তৃত্ব এবং জীবের অজ্ঞতা হইতেছে কেবল উপাধিরই বিলাস-বিশেষ।

শুদ্ধ, স্বপ্রকাশ ব্রহ্মে অবিদ্যা-সম্বন্ধের বিরোধ নাই। অবিদ্যার আর কোনও আশ্রয় নাই ; কেননা, উহার আর অপর নাশক নাই। দিবা দ্বিপ্রহরে সর্ব্বত্রই আলোক, কেবল উলূকই (পেচকই) অন্ধকার দেখে। উলূকের নিকটে অন্ধকার, অপর সকলের নিকটে আলোক—সুতরাং নির্ব্বিরোধ। তদ্রূপ সাক্ষী চৈতন্যের ঘাতক নাই বলিয়া, প্রত্যুত ভাসকত্ব আছে বলিয়া প্রমাণবৃত্তির দ্যোতক। এই কারণে, ঈশ্বরের অধীন অবিদ্যা জীবের অনাদি অদৃষ্টবশতঃ সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ ইহাদের প্রত্যেকের আধিক্যে স্থিতি, সৃষ্টি ও লয় কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে।

উল্লিখিত মত সম্বন্ধে (শ্রীজীবপাদাদি) অন্যান্য আচার্য্যেরা বলেন—ইহা অযুক্ত। অনাদিকাল হইতেই এই অনন্যাশ্রয়া অবিদ্যা দ্বারা জীবাদির দ্বৈতত্ব কল্পিত হইয়া আসিতেছে ; এই দ্বৈত-কল্পনার অন্য কল্পক নাই। জীবাদি-দ্বৈত-কল্পনা অবিদ্যারই স্বভাব। উষ্ণতা যেমন অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি, মায়াবাদীদের মতে ব্রহ্মের তদ্রূপ কোনও শক্তি নাই। ব্রহ্মের স্বাভাবিক-শক্তিমত্তার অভাবহেতু, ব্রহ্মব্যতীত অপর বস্তুরও অভাবহেতু এবং শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তিরও অভাবহেতু ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার কোনও সম্বন্ধই থাকিতে পারে না। ফলতঃ স্বাভাবিকত্ব, আরোপিতত্ব, বা তটস্থত্ব-এই সকল ভাবের কোনও ভাবেই ব্রহ্মের সহিত অবিদ্যার সম্বন্ধ নাই। সুতরাং চক্ষুঃ-কর্ণাদি পঞ্চজ্ঞানেন্দ্রিয় ব্যতীত জীবের যেমন ষষ্ঠ জ্ঞানেন্দ্রিয়ের একান্ত অভাব, ব্রহ্মের পক্ষেও তদ্রূপ অবিদ্যার একান্ত অভাব। (তাৎপর্য্য এই যে মায়াবাদীরা ব্রহ্মের শক্তি স্বীকার করেন না, ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্বও স্বীকার করেন না। এই অবস্থায় অবিদ্যা কোথা হইতে আসিতে পারে ? অবিদ্যার আবরণাত্মিকা বা বিক্ষেপাত্মিকা বৃত্তিই বা কোথা হইতে আসিতে পারে ? এতাদৃশী অবিদ্যার সঙ্গে ব্রহ্মের সম্বন্ধই বা কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে ?)

আবার, শুদ্ধ অদ্বয়চৈতন্যের প্রতিবিম্বত্ব স্বীকার করিতে গেলে প্রতিবিম্বের কল্পনা-কর্ত্তৃত্বাদির অভাব ঘটে। তদ্রূপ কল্পনা করিলেও তাহা নিষ্ফল হইয়া পড়ে। জলে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব পতিত হয় ;

ইহা সম্ভবপর। কেননা, সূর্য্য সাবয়ব, পরিচ্ছিন্ন এবং জল হইতে দূরে অবস্থিত। কিন্তু নিরবয়ব, সর্ব্বব্যাপক, অপরিচ্ছিন্ন—সুতরাং অব্যবহিত—ব্রহ্মের কিরণচ্ছটা কাহার উপর পতিত হইবে? সুতরাং প্রতিবিম্বত্ব-সংঘটন একেবারেই অসম্ভব। অতএব, ব্রহ্মে অবিদ্যাসম্বন্ধ সিদ্ধ হইলেই তৎপ্রতিবিম্ব জীব সিদ্ধ হইতে পারে। আবার, এইরূপ সিদ্ধান্তানুসারে জীব সিদ্ধ হইলেই ব্রহ্মে জীবকল্পিত অবিদ্যা-সম্বন্ধ স্থির হইতে পারে। ইহাতে পরস্পরাশ্রয়-প্রসঙ্গ বা অন্যোন্যাশ্রয়-দোষ ঘটে।

ব্রহ্মে অবিদ্যা-সম্বন্ধ কল্পিত হইলে তাহার ফল হইবে এইরূপ। দিবা দ্বিপ্রহরে প্রখর সূর্য্যজ্যোতিতে অবস্থান করিয়াও উলূক (পেচক) যেমন অন্ধকার দেখে, ব্রহ্মস্বরূপ জীবও তদ্রূপ অবিদ্যার অন্ধকারে অবস্থান করে। সেই অবিদ্যাসম্বন্ধদ্বারাই অবিদ্যা, জীবত্ব, ঈশ্বরত্ব-এইরূপ ভ্রমজ্ঞানের উদয় হয়। আবার তাহা হইতেই জীবাদি-লক্ষণ প্রতিবিম্ব-প্রাপক অপর উপাধির কল্পনা করা হয়। এইরূপ কল্পনার কোনও অর্থ থাকিতে পারে না। জ্ঞানবানে অজ্ঞান দৃষ্ট হইতে পারে, তাহা সম্ভবপরও হইতে পারে। কিন্তু জ্ঞানমাত্রবস্তুতে কখনও উহার সম্ভাবনা থাকিতে পারে না। জ্ঞানে ও অজ্ঞানে অত্যন্ত বিরোধ।

যদি বলা যায়—মরীচিকায় যেমন জলের কল্পনা হয়, তদ্রূপ কল্পনাময়-উপাধির সম্বন্ধে ব্রহ্মের প্রতিবিম্বও সম্ভবপর হইতে পারে? উত্তরে বলা হইতেছে—তাহা হইতে পারে না। কল্পনাময় উপাধির সম্বন্ধে প্রতিবিম্বের সম্ভাবনা নাই। কল্পিত দর্পণে কাহারও প্রতিবিম্ব দৃষ্ট হইতে পারে না।

আবার যদি বলা যায়—সমগ্র আকাশের অবয়ব নাই সত্য; কিন্তু একহস্ত-পরিমিত, কি এক প্রাদেশ-পরিমিত অত্যল্পাংশ আকাশের একদেশ-বিশিষ্ট অবয়ব স্বীকারপূর্ব্বক, উহাতে যে সূর্য্যরশ্মি আপতিত হইয়া সেই আকাশের সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়, উহার অব্যবহিত চ্ছটার সম্বন্ধে সঞ্জাত প্রতিবিম্বের ন্যায় অখণ্ড ব্রহ্মেরও ক্ষুদ্রতম অংশের প্রতিবিম্বতা-ভান অত্যন্ত অসম্ভব নয়।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—এই উক্তিও যুক্তিসঙ্গত নয়। কেননা, নিরবয়ব এবং নীরূপ (রূপহীন) ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব সম্ভপর নয়; উপাধিরও কোনও রূপ নাই; সুতরাং উপাধির প্রতিবিম্বও অত্যন্ত অসম্ভব। দেহের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত চৈতন্যের দেহ-প্রতিবিম্বত্ব কাহারও উপলব্ধির বিষয় হয় না।

আরও বিবেচনার বিষয় আছে। মুখাদির প্রতিবিম্ব দৃশ্য হয়; কিন্তু তাহার দ্রষ্টা প্রতিবিম্ব নহে, তাহার দ্রষ্টা হইতেছে অপর ব্যক্তি। এ-স্থলে, ব্রহ্ম যে প্রতিবিম্বতা প্রাপ্ত হইয়া জীব এবং ঈশ্বর হয়েন, সেই প্রতিবিম্বের দ্রষ্টা কে? আবার, দৃশ্যত্বেই বা জড়ত্ব না হইবে কেন? এই সমস্ত অনুপপত্তি বশতঃ প্রতিবিম্ববাদ স্বীকৃত হইতে পারে না।

প্রতিবিম্বরূপ বস্তুতে নিজোপাধির কল্পনা ও বিনাশের নিমিত্ত তুচ্ছ ভাব প্রদর্শন না করিলে—জীবের প্রামাণ্য-জ্ঞানের দ্বারাও উপাধিরূপ অবিদ্যা বিনাশের সম্ভাবনা থাকে না।

প্রতিবিম্বিত বস্তুর উপাধিনাশের কথা দূরে থাকুক, বিম্ব ও প্রতিবিম্ব পৃথক্ অধিষ্ঠানে অবস্থিত বলিয়া প্রত্যক্ষই ভেদের উপলব্ধি হয়। তাহাতে, প্রতিবিম্ব-সঞ্চালনে বিম্ব-সঞ্চালনও দৃষ্ট হওয়ার কথা; কিন্তু তাহা দৃষ্ট হয় না। বিম্বের বিপরীত দিকে প্রতিবিম্বের উদয় হয়—সূর্য্যের উদয়াস্ত দর্শন না করিলে স্বচ্ছ পদার্থে কেবল ঐ অভাস জ্যোতিই দৃষ্ট হইয়া থাকে—কেবল স্বচ্ছবস্তুতে সংযুক্ত দৃষ্টিবশতঃ তদুদ্‌গত প্রতিবিম্ব দেখিতে পাওয়া যায়। এতাদৃশ স্থলে দর্শনেন্দ্রিয়ের সহিত বিম্ববস্তুর সংযোগ ঘটে না। এই অবস্থায় প্রতিবিম্বের বিম্বত্বাভাবে বিম্বনাশেই আভাস-নাশের ন্যায় মোক্ষতার প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে; অর্থাৎ বিম্ব নাশ প্রাপ্ত হইলেই যেমন তদাভাস প্রতিবিম্বের নাশ হয়, সেইরূপ ব্রহ্মের বিনাশেই অবিদ্যোপাধিক জীবত্ব-নাশ-জনিত মোক্ষত্ব সম্ভবপর হইতে পারে।

তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ। মায়াবাদ-মতে অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব—জীব হইতেছে ব্রহ্মের প্রতিবিম্ব এবং ব্রহ্ম হইতেছেন তাহার বিম্ব। তাহা হইলে প্রতিবিম্বত্ব-বিনাশেই জীবের মোক্ষ সম্ভব। প্রতিবিম্বত্ব দুই রকমে নষ্ট হইতে পারে—এক, অবিদ্যারূপ উপাধির বিনাশে বা অপসারণে, আর—প্রতিবিম্বের বিনাশে। প্রথমতঃ, উপাধির বিনাশ বা অপসারণের কথা বিবেচনা করা যাউক। এই উপাধিকে কে বিনষ্ট বা অপসারিত করিবে? জীব? না কি ব্রহ্ম? জীব তাহা পারে না। কেন না, জীব হইতেছে উপাধিতে প্রতিবিম্বমাত্র, দর্পণে যেমন কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব হয়, তদ্রূপ। প্রতিবিম্বের দ্রষ্টা প্রতিবিম্ব নহে; অর্থাৎ প্রতিবিম্ব জানে না যে, সে একটী প্রতিবিম্ব; সুতরাং তাহার প্রতিবিম্ব-বিনাশের চেষ্টাও সে করিতে পারে না। প্রতিবিম্ব দর্পণকে (উপাধিকে) নষ্টও করিতে পারে না, অপসারিতও করিতে পারে না। ব্রহ্মও পারেন না; কেননা, মায়াবাদীর মতে ব্রহ্ম নির্ব্বিশেষ, নিঃশক্তিক; উপাধিকে বিনষ্ট বা অপসারিত করিবার শক্তি তাঁহার নাই। দ্বিতীয়তঃ, প্রতিবিম্বের বিনাশ। কিন্তু প্রতিবিম্বকেই বা বিনষ্ট করিবে কে? পূর্ব্বোক্ত কারণে প্রতিবিম্বরূপ জীবও তাহা পারে না, ব্রহ্মও পারেন না। আবার, বিম্বকে বিনষ্ট করিলেই প্রতিবিম্বের বিনাশ সম্ভব। বিম্ব হইতেছেন—ব্রহ্ম, যিনি নিত্য বস্তু। সুতরাং ব্রহ্মের বিনাশ কখনও সম্ভব নয়; সুতরাং প্রতিবিম্বের বিনাশও সম্ভব নয়। আবার, বিম্ব বিনষ্ট না হইলে প্রতিবিম্বের বিনাশ—সুতরাং জীবের মোক্ষও—সম্ভবপর হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব—এই মত স্বীকার করিলে জীবের মোক্ষই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

আবার, ঈশ্বর হইতেছেন নিত্য বিদ্যাময়; জীব অনাদিকাল হইতেই "আমি জানিনা"-এইরূপ অভিমান পোষণ করে বলিয়া অবিদ্যোপহিত। ব্রহ্মে বিক্ষেপরূপ অবিদ্যাংশ-সম্বন্ধের কল্পনা অযৌক্তিক বলিয়া ঈশ্বরাকার প্রতিবিম্ব কোনও প্রকারেই উপপন্ন হয় না। এই অবস্থায়, যদি জীব ও ঈশ্বরের পৃথক্ পৃথক্ নিজ উপাধি স্বীকার করা যায়, তাহাতেও দোষ ঘটে। দোষ এই যে, বৃহদারণ্যক-শ্রুতিতে ঈশ্বর-সম্বন্ধে যে সর্ব্বান্তর্য্যামি-শ্রুতিবাক্য দৃষ্ট হয়, সে-সকল শ্রুতিবাক্যের সহিত

বিরোধ উপস্থিত হয়। দুগ্ধজলবৎ পরস্পর মিশ্রিত উপাধিদ্বয়ে প্রতিবিম্বের একত্বই সম্ভাবিত হয়। এই দোষ পরিহারের জন্য ঈশ্বরকে অবিদ্যার প্রতিবিম্ব না বলিয়া যদি মায়া-প্রতিবিম্ব বলা হয়, তাহা হইলে ঈশ্বরের স্বশক্তি ও মায়াবশীকরণত্ব-গুণের অভাবে তাঁহার ঐশ্বর্য্যের অসিদ্ধি হয়। প্রত্যুত জলে চন্দ্রপ্রতিবিম্ব যেমন জলের ক্ষোভে ক্ষুব্ধ এবং জলের স্থৈর্য্যে স্থির হয়, ঈশ্বরকেও তদ্রূপ উপাধির বশ্যতায় তচ্চেষ্টানুগত হইতে হয়। তাহা হইলে ঈশ্বর মায়াধীশ না হইয়া মায়ার বশীভূতই হইয়া পড়েন। আর অধিক কথা কি? শ্রুতি-পুরাণাদি-প্রসিদ্ধ পরমেশ্বরের স্বরূপগত ঐশ্বর্য্যাদিরও মায়িকত্বমাত্র স্বীকার করিতে গেলে পরমেশ্বর-নিন্দাজনিত দুর্ব্বার অনির্ব্বচনীয় মহাপাতক-কোটির প্রসঙ্গও ঘটে।

এই সমস্ত কারণে প্রতিবিম্ববাদ বিচারসহ—সুতরাং স্বীকৃত—হইতে পারে না।

(১) প্রতিবিম্ববাদের সমর্থনে মায়াবাদীদের কথিত শাস্ত্রবাক্যের আলোচনা

পূর্ব্বোল্লিখিত আপত্তির উত্তরে বিরুদ্ধবাদীরা বলিতে পারেন—প্রতিবিম্ববাদ যে শাস্ত্রসম্মত, তাহার প্রমাণ এই ঃ—

"যথা হ্যয়ং জ্যোতিরাত্মা বিবস্বানপো ভিন্না বহুধৈকোঽনুগচ্ছন্।
উপাধিনা ক্রিয়তে ভেদরূপো দেবঃ ক্ষেত্রেষ্বেবমজোঽয়মাত্মা ॥" ইতি।
"এক এব তু ভূতাত্মা ভূতে ভূতে ব্যবস্থিতঃ।
একধা বহুধা চৈব দৃশ্যতে জলচন্দ্রবৎ ॥ ইতি চৈবমাদিষু ॥

—'অত এব চোপমা সূর্য্যকাদিবৎ ॥ ৩।২।১৮ ॥' ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যধৃত প্রমাণ।"

তাৎপর্য্য। "এই জ্যোতির্ময় সূর্য্য এক হইলেও যেমন বহু জলপূর্ণ ঘটে অনুগত (প্রতিবিম্বিত) হইলে বহুর ন্যায় প্রতীয়মান হয়েন, তদ্রূপ এই জন্মাদিরহিত স্বপ্রকাশ আত্মা এক হইলেও (মায়ারূপ) উপাধিদ্বারা বহু ক্ষেত্রে (বহু দেহে) অনুগত হওয়ায় বহুর ন্যায় হইতেছেন। একই ভূতাত্মা প্রত্যেক ভিন্ন ভিন্ন ভূতে (দেহে) অবস্থিত হইয়া জলচন্দ্রের ন্যায় (জলে প্রতিবিম্বিত চন্দ্রের ন্যায়) এক এবং বহু প্রকারে দৃশ্য হইয়া থাকেন।"

এই সকল উক্তি হইতে মনে হইতে পারে—জীব হইতেছে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে এ-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এ-স্থলে বিবৃত হইতেছে। তিনি বলিয়াছেন—"বিম্ব-প্রতিবিম্বনির্দ্দেশশ্চ অম্বুবদগ্রহণাদিত্যাদিসূত্রদ্বয়ে গৌণ এব যোজিতঃ। প্রীতিসন্দর্ভঃ। ৭ম অনুচ্ছেদ ॥ প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-সংস্করণ ॥ ৯৬ পৃষ্ঠা ॥ —বিম্ব-প্রতিবিম্ব-নির্দ্দেশ 'অম্বুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্ ॥ ৩।২।১৯ ॥' এবং 'বৃদ্ধি-হ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্ ॥ ৩।২।২০ ॥'-এই ব্রহ্মসূত্রদ্বয়ে গৌণভাবে যোজিত হইয়াছে।"

সূত্রদ্বয়ের তাৎপর্য্য এই। প্রথমোক্ত "অম্বুবদগ্রহণাৎ তু ন তথাত্বম্"-সূত্র। অম্বুবৎ (জলের ন্যায়) অগ্রহণাৎ (গ্রহণ করা যায় না বলিয়া) তু (কিন্তু) ন তথাত্বম্ (সেইরূপ ভাব নয়)।

জল-সূর্য্যাদির দৃষ্টান্ত এ-স্থলে স্বীকার করা যায় না ; কেননা, পরমাত্মা জল-সূর্য্যাদির ন্যায় পরিচ্ছিন্ন নহে। দূরবর্ত্তী সূর্য্য ও তাহার প্রতিবিম্বের আশ্রয়ভূত জলের সহিত পরমাত্মা ও জীবোপাধির সাম্য নাই বলিয়া জীবকে পরমাত্মার প্রতিবিম্ব বলা যায় না। জীবের উপাধি অবিদ্যা ; তাহা পরমাত্মারই শক্তিবিশেষ, অন্য কিছু নহে। জল থাকে সূর্য্য হইতে দূরবর্ত্তী প্রদেশে ; কিন্তু অবিদ্যা পরমাত্মা হইতে সেইরূপ দূরবর্ত্তী প্রদেশে থাকে না, থাকিতে পারেও না ; কেননা, পরমাত্মা বিভু বা সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহা হইতে দূরবর্ত্তী হওয়া কোনও বস্তুর পক্ষেই সম্ভবপর নহে। আবার, পরিচ্ছিন্ন বস্তুরই প্রতিবিম্ব সম্ভব ; কিন্তু পরমাত্মা অপরিচ্ছিন্ন, এজন্য পরমাত্মার কোনও প্রতিবিম্ব হইতে পারে না। যদি বলা যায়—অপরিচ্ছিন্ন আকাশের যেরূপ প্রতিবিম্ব সম্ভব হয়, অপরিচ্ছিন্ন পরমাত্মার তদ্রূপ প্রতিবিম্ব সম্ভব হইতে পারে। ইহার উত্তরে বলা যায়—আকাশের প্রতিবিম্ব কেহ দেখেনা, প্রতিবিম্ব দেখে আকাশগত পরিচ্ছিন্ন জ্যোতির অংশবিশেষের। শাস্ত্রে যে প্রতিবিম্বের উল্লেখ দেখা যায়, তাহার তাৎপর্য্য—মুখ্যভাবে প্রতিবিম্বের নির্দ্দেশ নহে, গৌণভাবেই এই নির্দ্দেশ। ইহাই হইতেছে "অম্বুবদগ্রহণাৎ"-ইত্যাদি ৩।২।১৯-ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য।

প্রতিবিম্ব-শব্দের গৌণভাবে তাৎপর্য্য কি, পরবর্ত্তী সূত্রে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। পরবর্ত্তী সূত্রটী হইতেছে—**"বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্তর্ভাবাদুভয়-সামঞ্জস্যাদেবম্** ॥ ৩।২।২০ ॥" বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বম্ (বৃদ্ধিভাগিত্ব ও হ্রাসভাগিত্ব) অন্তর্ভাবাৎ (মধ্যে অবস্থানবশতঃ) উভয়-সামঞ্জস্যাৎ (উভয়ের—উপমান ও উপমেয়-এই উভয়ের সামঞ্জস্য রক্ষার নিমিত্ত) এবম্ (এই প্রকার)। সাধর্ম্ম্যাংশেই প্রতিবিম্ব-বাচক-শাস্ত্রবাক্যের তাৎপর্য্যের পর্য্যবসান। এইরূপ হইলেই উপমান ও উপমেয়--এই উভয়ের সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে। পূর্ব্বসূত্রে বিম্ব-প্রতিবিম্ব-ভাবের মুখ্যত্ব নিরসন করিয়া কিঞ্চিৎ সাধর্ম্ম্যগ্রহণপূর্ব্বক প্রকরণগত সেই ভাব ব্যাখ্যাত হইয়াছে। তাহা এইরূপ। সূর্য্য হইতেছে—বৃদ্ধিভাক্—বৃহদায়তন, স্বতন্ত্র, জলাদি-উপাধিধর্ম্মে অসংস্পৃষ্ট। আর, সূর্য্যের প্রতিবিম্ব হইতেছে——হ্রাসভাক্—ক্ষুদ্রায়তন, পরতন্ত্র (অর্থাৎ সূর্য্যের অধীন), জলাদি-উপাধিধর্ম্ম-সংযুক্ত। তদ্রূপ, পরমাত্মা হইতেছেন বিভু, স্বতন্ত্র এবং প্রকৃতিধর্ম্মে নির্লিপ্ত। আর, তাঁহার অংশভূত জীব হইতেছে অণু, পরতন্ত্র এবং প্রকৃতিধর্ম্মে লিপ্ত। এইরূপ ভাবেই বিম্ব-প্রতিবিম্ব-সূচক শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে। ইহাই হইতেছে ৩।২।২০-ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্য।

এ-স্থলে উপমান ও উপমেয়ের সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য হইতেছে এইরূপ। সূর্য্য ও পরমাত্মার সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য, যথা—বৃহদায়তনত্ব, স্বতন্ত্রত্ব এবং উপাধিধর্ম্মে নির্লিপ্ততা। আর, সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ও জীবের সাধর্ম্ম্য বা সাদৃশ্য, যথা—ক্ষুদ্রায়তনত্ব, পরতন্ত্রত্ব এবং উপাধিধর্ম্মে লিপ্তত্ব। এই সাধর্ম্ম্যও কিঞ্চিৎ সাদৃশ্যে, সর্ব্বতোভাবে সমানধর্ম্মত্বে নহে। বৃহদায়তনত্বে সূর্য্য ও পরমাত্মা সমান নহে ; যেহেতু, পরমাত্মা সর্ব্বব্যাপক, সূর্য্য সর্ব্বব্যাপক নহে ; অন্যান্য ধর্ম্ম সম্বন্ধেও তদ্রূপ। সর্ব্বাংশে সমান হইলে উপমান ও উপমেয়, দৃষ্টান্ত ও দার্ষ্ট্যান্তিকের ভেদই থাকেনা, উভয়েই এক হইয়া যায়।

শ্রীপাদ শঙ্করও এই ভাবেই ব্যাখ্যা করিয়াছেন। এজন্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অতএব শঙ্কর-শারীরকেঽপি 'অম্বুবদগ্রহণাত্ন তথাত্বম্'-ইত্যনেন ন্যায়েন প্রতিবিম্বত্বং বিরুধ্য 'বৃদ্ধিহ্রাসভাক্ত্বমন্ত-র্ভাবাদুভয়সামঞ্জস্যাদেবম্' ইতি ন্যায়েন প্রতিবিম্ব-সাদৃশ্যমেব স্থাপ্যতে। তচ্চ প্রতিবিম্বত্বমেবাভাসী-করোতি।" তাৎপর্য্য—শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যেও প্রতিবিম্ব-সাদৃশ্যই স্থাপিত হইয়াছে।

ইহার পরে শ্রীজীবপাদ আরও বলিয়াছেন—"অতঃ **'আভাস এব চ** (২।৩।৫০-ব্রহ্মসূত্র)' ইত্যত্রাপি তদ্‌বদেব মন্তব্যম্। প্রতিবিম্বাভাসস্তু তত্তুল্যঃ, ন তু বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব এবেত্যর্থঃ।—'আভাস এব চ'-এই (২।৩।৫০)-ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্যও তদ্রূপই বুঝিতে হইবে। প্রতিবিম্বের আভাস বলিতে কিন্তু প্রতিবিম্বের তুল্যই বুঝায়, বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব বুঝায় না।"

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শাস্ত্রে যে স্থলে জীবকে পরমাত্মার "প্রতিবিম্ব" বলা হইয়াছে, সে-স্থলে "প্রতিবিম্ব"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে "প্রতিবিম্বের তুল্য", বাস্তবিক প্রতিবিম্ব তাহার তাৎপর্য্য নহে। **"প্রতিবিম্ব"-শব্দের গৌণার্থ হইতেছে—প্রতিবিম্বতুল্য** ; "অম্বুবদগ্রহণাৎ"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রদ্বয়ে ব্যাসদেবই তাহা জানাইয়া গিয়াছেন এবং শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্য হইতেও তাহা বুঝা যায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর তত্ত্বসন্দর্ভের ৪০-অনুচ্ছেদের (প্রভুপাদ শ্রাল সত্যানন্দ-গোস্বামি-সংস্করণ) টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ নৃসিংহোত্তর-তাপনীশ্রুতি হইতে নিম্নলিখিত বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া চাবিদ্যাচ স্বয়মেব ভবতি।—নৃসিংহোত্তরতাপনী, নবম খণ্ড।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে কেহ কেহ মনে করেন—জীব ও ঈশ্বর মায়ারই সৃষ্টি। মায়াতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই ঈশ্বর এবং অবিদ্যাতে প্রতিবিম্বিত ব্রহ্মই জীব।

কিন্তু এই যথাশ্রুত অর্থ যে বিচারসহ নহে, শ্রীপাদ বলদেব তাহা শ্রুতিবাক্যদ্বারাই দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রুতি বলেন—"অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে—ব্রহ্ম হইতেছেন অবিদ্যার বা মায়ার অগৃহ্য ; অবিদ্যা বা মায়া কিছুতেই ব্রহ্মকে স্পর্শ করিতে পারে না।" সুতরাং মায়ার বা অবিদ্যার উপাধি-সংযোগে ব্রহ্মই ঈশ্বর-ভাব বা জীবভাব প্রাপ্ত হয়েন—ইহা স্বীকার্য্য হইতে পারে না।

[বিশেষতঃ, নৃসিংহতাপনী শ্রুতি নিজেই বলিয়া গিয়াছেন—পরমাত্মাকে মায়া স্পর্শও করিতে পারে না। "নাত্মানং মায়া স্পৃশতি ॥ নৃসিংহপূর্ব্বতাপনী ॥ ১।৫।১ ॥"

নৃসিংহতাপনী শ্রুতি এক বার যখন বলিয়াছেন যে, মায়া ব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, তখন সেই নৃসিংহতাপনী যদি আবার বলেন যে, জীব ও ঈশ্বর মায়ারই সৃষ্টি—তাহা হইলে এই বাক্যদ্বয় হইয়া পড়িবে পরস্পর-বিরোধী। কিন্তু ইহার সমাধান কি ?

"জীবেশাবাভাসেন করোতি মায়া"-ইত্যাদি বাক্যটীর যথাশ্রুত বা মুখ্য অর্থ গ্রহণ করিলেই "নাত্মানং মায়া স্পৃশতি"-বাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় এবং "অগৃহ্যো ন হি গৃহ্যতে"-ইত্যাদি

অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের সহিতও বিরোধ দেখা দেয়। এতাদৃশ বিরোধ পরিহারের নিমিত্ত "জীবেশাবাভাসেন"-ইত্যাদি বাক্যটীর গৌণার্থ ই গ্রহণ করিতে হইবে।]

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর আনুগত্যে শ্রীপাদ বলদেবও "অম্বুবদগ্রহণাৎ" ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রদ্বয়ের সহায়তায় দেখাইয়াছেন যে, "জীবেশাবাভাসেন"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের গৌণার্থ (অর্থাৎ আভাসের বা প্রতিবিম্বের সাদৃশ্যার্থ) গ্রহণ করিলেই সমস্ত শ্রুতিবাক্যের সঙ্গতি রক্ষিত হইতে পারে। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে বলিয়াছেন—আভাস-শব্দে তুল্যতাই বুঝায়—"প্রতিবিম্বাভাসস্তু তত্তুল্যঃ, ন তু বস্তুতঃ প্রতিবিম্ব এবেত্যর্থঃ।" উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যেও "আভাস"-শব্দই আছে ; তাহার তাৎপর্য্য—প্রতিবিম্বতুল্য, কিন্তু প্রতিবিম্ব নহে।

গৌণার্থের তাৎপর্য্য এইরূপ। জীবপক্ষে—জলের ক্ষোভে সূর্য্যের প্রতিবিম্ব ক্ষুব্ধ হয়, কিন্তু তাহাতে সূর্য্য ক্ষুব্ধ হয় না। তদ্রূপ, সংসারী জীব মায়াদ্বারা প্রভাবান্বিত হয়, কিন্তু ব্রহ্ম তদ্দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়েন না। ঈশ্বর পক্ষে—সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কার্য্যে অব্যবহিত ভাবে সংশ্লিষ্ট পুরুষাবতার-গুণাবতারাদি মায়াকে পরিচালিত করিয়া তদ্দ্বারা সৃষ্টিসম্বন্ধীয় কার্য্য সমাধা করেন ; সুতরাং মায়ার সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধ আছে ; কিন্তু ব্রহ্মের সহিত মায়ার তদ্রূপ কোনও সম্বন্ধ নাই। কেবলমাত্র মায়ার প্রভাব-সম্বন্ধেই এ-স্থলে উপমান ও উপমেয়ের সাদৃশ্য, অন্য কোনও বিষয়ে নহে।

(২) ব্রহ্মের সর্ব্বগতত্বই পরিচ্ছেদবাদের বিরোধী

ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বগত, সর্ব্বব্যাপক, বিভু বস্তু। ইহা মায়াবাদীদেরও স্বীকৃত। অথচ তাঁহারা বলেন—ঘটের দ্বারা পরিচ্ছিন্ন বৃহদাকাশের অংশ যেমন ঘটাকাশরূপে পরিণত হয়, তদ্রূপ উপাধিদ্বারা পরিচ্ছিন্ন ব্রহ্মই জীব-ভাব প্রাপ্ত হয়েন।

ইহা অযৌক্তিক। কেননা, ব্রহ্ম সর্ব্বগত এবং সর্ব্বব্যাপী বলিয়া তাঁহার কোনওরূপ পরিচ্ছেদই সম্ভবপর নহে। বৃহদাকাশ পরিচ্ছেদযোগ্য ; এজন্য ঘটের দ্বারা তাহার পরিচ্ছেদ সম্ভব। কিন্তু সর্ব্বগত ব্রহ্ম তদ্রূপ নহেন। সূচ্যগ্র-পরিমিত স্থানের কোটি-অংশের এক অংশ সদৃশ স্থানও কোথাও নাই, যে-স্থানে ব্রহ্ম নাই ; যেহেতু, তিনি সর্ব্বগত। ব্রহ্মে পরিচ্ছেদ স্বীকার করিতে গেলে তাঁহার সর্ব্বগতত্বই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে।

(৩) শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর আলোচনার সারমর্ম্ম

শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন— মায়াবাদীদের কথিত অবিদ্যার বা মায়ার অস্তিত্বই সিদ্ধ হয় না। কেননা, তাঁহারা বলেন—একমাত্র ব্রহ্মেরই অস্তিত্ব আছে, অপর কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই এবং সেই ব্রহ্ম আবার সর্ব্ববিশেষত্বহীন, সর্ব্বশক্তিহীন। মায়া বা অবিদ্যা যে একটী শক্তি, তাহাও তাঁহারা স্বীকার করেন। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে মায়ার বা অবিদ্যার অস্তিত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে। একথা বলার হেতু এই :—

প্রথমতঃ, ব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তুরই যখন অস্তিত্ব নাই, তখন মায়া বা অবিদ্যার অস্তিত্ব কিরূপে থাকিতে পারে ? মায়া বা অবিদ্যা যদি ব্রহ্মের স্বরূপভূত হইত, অথবা ব্রহ্মের শক্তি হইত, তাহা হইলে বরং ব্রহ্মের অস্তিত্বের সঙ্গে মায়া বা অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারিত। কিন্তু মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের স্বরূপভূতও নহে, ব্রহ্মের শক্তিও নহে ; এই অবস্থায় মায়া বা অবিদ্যার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মাতিরিক্ত একটী দ্বিতীয় বস্তুর অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ; কিন্তু মায়াবাদীরা বলেন—ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কোনও বস্তুরই অস্তিত্ব নাই ; এবং মায়া বা অবিদ্যা ব্রহ্মের শক্তিও নহে। তাহা হইলে বলা যায় না যে—মায়া বা অবিদ্যার অস্তিত্ব আছে। মায়া বা অবিদ্যাকে মায়াবাদীরা "অভাব-বস্তু"ও বলেন না ; "ভাব-বস্তু"ই বলেন। অথচ তাঁহাদের উক্তি অনুসারেই মায়ার অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে না।

দ্বিতীয়তঃ, শক্তি সর্ব্বদাই শক্তিমানের আশ্রয়ে থাকে ; শক্তিমানের আশ্রয় ব্যতীত শক্তি কখনও পৃথক্ ভাবে থাকিতে পারে না। এই অবস্থায়, মায়া বা অবিদ্যা যদি ব্রহ্মের শক্তি না হয়, এবং ব্রহ্মব্যতীত অপর কোনও বস্তুর অস্তিত্বও যদি না থাকে, তাহা হইলে কাহাকে আশ্রয় করিয়া মায়া বা অবিদ্যা অবস্থান করিতে পারে ? এইরূপে দেখা গেল— আশ্রয়হীনত্ব-বশতঃও শক্তিরূপা মায়া বা অবিদ্যার অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

মায়া বা অবিদ্যার অস্তিত্ব অসিদ্ধ হইলেও যুক্তির অনুরোধে তাহার অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে, পরিচ্ছেদবাদও যুক্তিসিদ্ধ নহে, প্রতিবিম্ববাদও যুক্তিসিদ্ধ নহে। সর্ব্বগত ব্রহ্মের পরিচ্ছেদ অসম্ভব। প্রতিবিম্ববাদ স্বীকার করিলেও শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, নানাবিধ অসমাধেয় সমস্যার উদ্ভব হয়, মায়াবাদীদের কথিত ঈশ্বরত্ব এবং জীবত্বও অসিদ্ধ হইয়া পড়ে, জীবের মোক্ষের সম্ভাবনাও অন্তর্হিত হইয়া যায়।

শ্রুতি-আদি শাস্ত্রে যে স্থলে জীবের ব্রহ্ম-প্রতিবিম্বত্বের কথা বলা হইয়াছে, সে-স্থলে প্রতিবিম্ব-শব্দের যে মুখ্যার্থ অভিপ্রেত নহে, গৌণার্থ—সাদৃশ্যার্থই—অভিপ্রেত, ব্রহ্মসূত্রের প্রমাণে (শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারেও) শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহা দেখাইয়াছেন।

এইরূপে শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন যে—পরিচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদ অযৌক্তিক। মায়াবাদী-আদি অভেদবাদীরা পরিচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদের সহায়তাতেই জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব প্রতিপাদনের চেষ্টা করিয়াছেন। পরিচ্ছেদবাদ এবং প্রতিবিম্ববাদ অযৌক্তিক হওয়ায় জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদও অযৌক্তিক হইয়া পড়ে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম যে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন—এই মতবাদের যৌক্তিকতা কিছু থাকিতে পারে না।

১৬। জীব-ব্রহ্মের অভেদ-প্রতিষেধক শাস্ত্র-প্রমাণ

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যুক্তিদ্বারা দেখাইয়াছেন যে,

জীব-ব্রহ্মের অভেদবাদ অযৌক্তিক। কিন্তু কেবল যুক্তিই যথেষ্ট হইতে পারে না; কেন না, কেবল যুক্তিদ্বারা কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। একজনের যুক্তি অপরজনের দ্বারা খণ্ডিতও হইতে পারে। যুক্তির পশ্চাতে যদি শাস্ত্রবাক্য থাকে, তাহা হইলে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহাই স্বীকার্য্য। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে প্রস্থানত্রয়ের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, জীব-ব্রহ্মের সর্ব্বতোভাবে অভেদ শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে (সর্ব্বসম্বাদিনী। বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ। ১২২-৩৬ পৃষ্ঠা।)।* এ-স্থলে শ্রীজীবপাদের আলোচনার মর্ম্ম প্রকাশ করা হইতেছে।

ক। নেতরে২নুপপত্তেঃ॥ ১।১।১৬॥ ব্রহ্মসূত্র। এবং "ভেদব্যপদেশাচ্চ"॥ ১।১।১৭॥ ব্রহ্মসূত্র

এ-স্থলে প্রথম সূত্রে বলা হইয়াছে—পরব্রহ্মই আনন্দময়, জীব নহে; জীবকে আনন্দময় বলা হয় না। কেন না, আনন্দময়ের জীবত্ব উপপন্ন হয় না। দ্বিতীয় সূত্রটীতেও তাহাই বলা হইয়াছে—ভেদব্যপদেশাচ্চ। শ্রুতি আনন্দময়কে জীব হইতে ভিন্ন বলিয়াছেন—আনন্দময় হইতেছেন জীবের প্রাপ্য এবং জীব তাঁহার প্রাপক-এইরূপ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রাপ্য ও প্রাপক এক হইতে পারে না, ভিন্নই হইবে। শ্রীপাদ শঙ্করও এইরূপ ব্যাখ্যাই করিয়াছেন; কিন্তু এইরূপ ব্যাখ্যা করিয়াও "ভেদব্যপদেশাচ্চ"-সূত্রের ভাষ্যশেষে বলিয়াছেন—সূত্রে যে ভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে অবিদ্যাকল্পিতভেদ; বস্তুতঃ জীব ও ব্রহ্মে কোনও ভেদ নাই (ইহা তাঁহার নিজের কথা, সূত্রের তাৎপর্য্য নহে)।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিতেছেন—উল্লিখিত সূত্রদ্বয়ের (শ্রীপাদ শঙ্কর-কথিত) কল্পনাময় অর্থের সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। বাস্তবভেদেও "সোঽকাময়ত, বহু স্যাং প্রজায়েয় (তৈত্তিরীয়॥ ২।৬।২)—তিনি ইচ্ছা করিলেন, বহু হইব, জন্ম গ্রহণ করিব," ইত্যাদি, "স তপোঽতপ্যত; স তপস্তপ্ত্বা ইদং সর্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ (তৈত্তিরীয়॥ ২।৬।২)—তিনি তপস্যা করিলেন, তপস্যা করিয়া, এই যাহা কিছু আছে, তৎসমস্ত তিনি সৃষ্টি করিলেন"-ইত্যাদি, "রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি (তৈত্তিরীয়॥ ২।৭।১)—তিনি রসস্বরূপ; রসস্বরূপ তাঁহাকে পাইলেই জীব আনন্দী হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের পীড়ন হয় না। এই সকল শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মকে জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বলা হইয়াছে, ব্রহ্মকে পাইলেই জীব যে আনন্দী হইতে পারে, তাহাও বলা হইয়াছে। সৃষ্টিকর্ত্তা ও সৃষ্টবস্তুতে, প্রাপ্য এবং প্রাপকে, অবশ্যই ভেদ আছে। "তপোঽতপ্যত" এবং "বহু স্যাম্"-ইত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মের জ্ঞানের কথাই প্রকাশ করা হইয়াছে।

যদি বলা যায়—"**নান্যোঽতোঽস্তি দ্রষ্টা (বৃহদারণ্যক**॥ ৩।৭।২৩)—তাঁহা হইতে অন্য দ্রষ্টা নাই"-এই শ্রুতিবাক্যে যখন অন্যদ্রষ্টা নিষিদ্ধ হইয়াছে, তখন ব্রহ্ম ও জীবের ভেদ কিরূপে স্বীকার

* সর্ব্বসম্বাদিনীর বঙ্গীয়-সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণে শ্রীল রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ মহোদয়ের যে বঙ্গানুবাদ দৃষ্ট হয়, এস্থলে এবং অন্যান্য স্থলেও প্রায়শঃ সেই বঙ্গানুবাদেরই অনুসরণ করা হইয়াছে।

করা যায় ? ভেদ স্বীকার করিলে জীবরূপ অন্যদ্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করিতে হয় ; তাহা হইবে উল্লিখিত বৃহদারণ্যক-বাক্যের বিরোধী।

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলেন—এ-স্থলে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব নিষিদ্ধ হয় নাই, পূর্ব্ববৎ সম্ভাবিত ব্রহ্মাতিরিক্ত দ্রষ্টা নিষিদ্ধ হইয়াছে। তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ। উল্লিখিত আরণ্যক-বাক্যের পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যগুলিতে বলা হইয়াছে—পৃথিবী, জল, তেজঃ প্রভৃতি ব্রহ্মকে জানেনা, শেষ (৩।৭।২৩)-বাক্যেও বলা হইয়াছে, রেতঃ তাঁহাকে জানেনা ; অথচ তিনি সমস্তের অভ্যন্তরে থাকিয়া অন্তর্য্যামিরূপে সমস্তকে নিয়ন্ত্রিত করেন। পৃথিবী-জলাদি সম্ভাবিত কোনও বস্তুই তাঁহার জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা নহে, একমাত্র তিনিই সকলের জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা, তিনি ব্যতীত অপর কেহই দ্রষ্টা নাই।

শ্রীজীবপাদ অন্যরূপ অর্থও করিয়াছেন। শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি বলেন-"স কারণং কারণাধিপাধিপো ন চাস্য কশ্চিজ্জনিতা ন চাধিপঃ (৬।৯)—ইনি মূল কারণ। কারণসমূহের অধিপতিগণেরও ইনি অধিপতি। ইঁহার জনয়িতা কেহ নাই, ইঁহার অধিপতিও কেহ নাই।" এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইল—ব্রহ্মই হইতেছেন জগতের মূল কারণ, মূল কারণ অন্য কেহ নহে। "তদৈক্ষত"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—সৃষ্টির পূর্ব্বে ব্রহ্ম ঈক্ষণ—দর্শন—করিয়াছিলেন। যিনি সৃষ্টির মূল কারণ, তিনিই এই দর্শনকর্ত্তা বা দ্রষ্টা। ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহ যখন সৃষ্টির মূল কারণ নহে, তখন তিনিই একমাত্র দ্রষ্টা—সৃষ্টির পূর্ব্বে প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা—সৃষ্টিকার্য্যার্থ প্রকৃতির প্রতি ঈক্ষণকর্ত্তা ব্রহ্ম ব্যতীত অপর কেহ নাই। ইহাও উল্লিখিত বৃহদারণ্যক-বাক্যের তাৎপর্য্য হইতে পারে।

যদি বলা যায়—এ-স্থলে বৃহদারণ্যকের উল্লেখ করিয়া যে বলা হইল, জল-তেজ আদির জ্ঞাতৃত্ব বা দ্রষ্টৃত্ব নাই, তাহা কিরূপে স্বীকার করা যায় ? কেননা, অন্যত্র তাহাদের জ্ঞাতৃত্বাদির কথা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। যথা—"মৃদব্রবীৎ—মৃত্তিকা বলিল", "আপো অব্রুবন্ (শতপথ-ব্রাহ্মণ ॥ ৬।১।৩।২।৪)—জল বলিল", "তত্তেজ ঐক্ষত—সেই তেজ দর্শন বা সঙ্কল্প করিল", "তা আপ ঐক্ষন্ত (ছান্দোগ্য ॥ ৬।২।৩-৪)—সেই সমস্ত জল দর্শন বা সঙ্কল্প করিল"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মৃত্তিকা-জলাদির জ্ঞাতৃত্বের কথা জানা যায়। সুতরাং ব্রহ্মব্যতীত অপর কেহ জ্ঞাতা বা দ্রষ্টা নাই—ইহা কিরূপে স্বীকার করা যায় ?

ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—জল ও তেজ আদির যে ঈক্ষণের কথা শুনা যায়, তাহা তাহাদের নিজের শক্তিতে নহে, পরমেশ্বরের আবেশবশতঃই তাহাদের ঈক্ষণাদি সম্ভবপর হয়। শ্রীপাদ শঙ্করও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তাহা বলিয়াছেন। " 'তত্তেজ ঐক্ষত' ইত্যপি পরস্যা এব দেবতায়াঃ অধিষ্ঠাত্র্যাঃ স্ববিকারেষু অনুগতায়াঃ ইয়মীক্ষা ব্যপদিশ্যতে ইতি দ্রষ্টব্যমিতি ॥ ২।১।৫-ব্রহ্মসূত্রভাষ্য ॥"

খ। **বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ** ॥ ১।২।২ ॥ ব্রহ্মসূত্র এবং

অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ ॥ ১।২।৩ ॥ ব্রহ্মসূত্র

এই ব্রহ্মসূত্রদ্বয়েও পরমেশ্বরে জীব হইতে অধিক পারমার্থিক গুণসমূহের অস্তিত্বের কথা বলা হইয়াছে।

"বিবক্ষিতগুণোপপত্তেশ্চ"-এই সূত্রে বলা হইয়াছে—শ্রুতিকথিত সত্য-সঙ্কল্পত্বাদি গুণ কেবল পরব্রহ্মেই উপপন্ন বা সঙ্গত হয়, জীবে নহে। এজন্য পরব্রহ্মই উপাস্য। "অনুপপত্তেস্তু ন শারীরঃ"-এই সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্মে জীবধর্ম্ম উপপন্ন হইতে পারে; কিন্তু জীবে ব্রহ্মধর্ম্ম উপপন্ন হইতে পারেনা (খাটান যায় না)। এজন্য, ব্রহ্মের উপাস্যত্বের কথাই শ্রুতিতে উপদিষ্ট হইয়াছে, জীবের উপাস্যত্বের কথা বলা হয় নাই (শঙ্করভাষ্যানুযায়ী তাৎপর্য্য)। ইহা হইতেও জীব ও ঈশ্বরের ভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে এবং অভিন্নত্ব নিষিদ্ধ হইতেছে।

আরও এক কথা। মায়াবাদীরা বলেন—"জীব নিজের অজ্ঞানের দ্বারা নিজের আত্মায় জগতের কল্পনা করে। জগৎ-কল্পনা অন্যরূপে উপপন্ন হয় না বলিয়া সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণ স্বীকৃত হয়। জীব যখন জগৎ-কল্পনা করে, তখন জীবেই ঐ সকল সত্য-সঙ্কল্পত্বাদি-গুণ উপপন্ন হয়, জীবকল্পিত অন্য কিছুতে তৎসমস্ত উপপন্ন হয় না; ব্রহ্ম নির্গুণ বলিয়া তাঁহাতেও এই সকল গুণ থাকিতে পারে না।"

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলেন—মায়াবাদীদের উল্লিখিত সিদ্ধান্ত স্বীকার করিতে গেলে পূর্ব্বোল্লিখিত ১।২।২ এবং ১।২।৩ ব্রহ্মসূত্রদ্বয়ই অসঙ্গত হইয়া পড়ে। কেননা, সেই সূত্রদ্বয়ে বলা হইয়াছে—সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণসমূহ কেবলমাত্র পরব্রহ্মেই উপপন্ন হয়, জীবে নহে।

গ। **সম্ভোগপ্রাপ্তিরিতি চেন্ন, বৈশেষ্যাৎ** ॥ ১।২।৮ ॥-ব্রহ্মসূত্রের তাৎপর্য্যেও তাহাই বুঝা যায়। এই সূত্রের তাৎপর্য্য এইরূপ। জীব যেমন শরীরে অবস্থান করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও যদি শরীরে অবস্থান করেন, তাহা হইলে জীব যেমন সুখ-দুঃখ ভোগ করিয়া থাকে, ব্রহ্মও তেমনি সুখ-দুঃখ ভোগ করিবেন—ইহা যদি বলা হয় (সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ ইতি চেৎ), তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—ন, না, ব্রহ্মের পক্ষে সুখ-দুঃখভোগের কল্পনা করা যায় না; কেন না—ভোগহেতুর বিশেষত্ব আছে (বৈশেষ্যাৎ)। জীব তাহার কর্ম্মফল অনুসারেই সুখ-দুঃখ ভোগ করে; কিন্তু পরব্রহ্মের কোনও কর্ম্ম নাই; সুতরাং সুখ-দুঃখ ভোগও তাঁহার পক্ষে হইতে পারে না। ইহা হইতেই জীব-ব্রহ্মের ভেদ প্রতিপন্ন হইতেছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—সম্বাদাদি শব্দের ন্যায়, সূত্রস্থিত "সম্ভোগ"-শব্দের অর্থ হইতেছে—সহ-ভোগ (এক সঙ্গে ভোগ), অন্য অর্থ নহে। "সম্ভোগপ্রাপ্তিঃ"-ইহা হইতেছে পূর্ব্বপক্ষের উক্তি; "জীব ও ব্রহ্ম সুখ-দুঃখাদি সহভোগ করে—এক সঙ্গে ভোগ করে"-ইহাই পূর্ব্বপক্ষের উক্তির তাৎপর্য্য; সুতরাং এ-স্থলে সম্ভোগ বা সহভোগ-শব্দেই জীব ও ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করা হইয়াছে এবং সূত্রেও তাহাই বলা হইয়াছে। এ-স্থলে জীব-ব্রহ্মের একত্বের কথা বলা হয় নাই; কেননা, সহ-শব্দ একত্ব-বিরোধী; "একসঙ্গে ভোগ করে" বলিলেই একাধিক বস্তুর

ভোগ সূচিত করা হয়। সূত্রস্থ "বৈশেষ্যাৎ"-শব্দে সূত্রকার ব্যাসদেবও জীব হইতে ব্রহ্মের বিশেষত্ব বা পার্থক্য স্বীকার করিয়াছেন। একই আত্মার অবস্থাভেদে ভেদ-স্বীকার এই সূত্রের অভিপ্রেত নহে—পূর্ব্বপক্ষের উক্ত "সম্ভোগ - সহভোগ"-শব্দ হইতে সূত্রকারের সিদ্ধান্তান্তর্গত "বৈশেষ্যাৎ"-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়।

ঘ। গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ ॥ ১।২।১১ ॥-ব্রহ্মসূত্র হইতেও জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথা জানা যায়। এই সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—"হৃদয়-গুহায় দুইটী আত্মা আছেন—জীবাত্মা ও পরমাত্মা ; শ্রুতিতে ইহাই দৃষ্ট হয়।" এ-স্থলেও "দুই আত্মার" কথা বলা হইয়াছে। "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ২।৬।২ ॥—তাহার সৃষ্টি করিয়া তাহাতেই প্রবেশ করিয়াছেন"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে এবং "অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য" এই জীবাত্মার সহিত* অনুপ্রবেশ করিয়া"—এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা যায়—জীবাত্মার সহিতই পরমাত্মা দেহে প্রবেশ করেন। "উপাধি-প্রবিষ্ট পরমাত্মারই শরীরত্ব"-এইরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত (অর্থাৎ পরমাত্মা বা ব্রহ্মই উপাধির যোগে জীবভাব প্রাপ্ত হইয়া দেহে প্রবেশ করিয়াছেন—সুতরাং জীব ও ব্রহ্ম স্বরূপতঃ অভিন্ন—এইরূপ ব্যাখ্যা অসঙ্গত)। কেননা, শ্রুতিতে উভয়রূপে (অর্থাৎ জীবাত্মারূপে এবং পরমাত্মারূপে) প্রবেশই স্বীকৃত হইয়াছে। এই সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণ এই ; যথা—

"ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ ॥-কঠ ॥ ১।৩।১ ॥ ইতি ॥

সুকৃতিলব্ধ শরীরে হৃদয়রূপ গুহাতে অবস্থিত দুইটী বস্তু কর্ম্মফল (ঋত) ভোগ করেন। তাঁহারা ছায়া ও আতপের ন্যায় পরস্পর-বিরুদ্ধ-ধর্ম্মবিশিষ্ট। ইহা জ্ঞানিগণ, কর্ম্মিগণ এবং ত্রিণাচিকেত-গণ (যাঁহারা তিনবার অগ্নিচয়ন করিয়াছেন, অথবা নাচিকেতবাক্য অধ্যয়ন করিয়াছেন, তাহার অর্থ বুঝিয়াছেন, বুঝিয়া তদনুযায়ী কার্য্য করিয়াছেন, তাঁহাদিগকে ত্রিণাচিকেত বলা হয়। এইরূপ ত্রিণাচিকেতগণ) বলিয়া থাকেন।"

এই শ্রুতিবাক্যে হৃদয়গুহায় প্রবিষ্ট যে দুইটী বস্তুর কথা বলা হইয়াছে, সেই বস্তু দুইটী হইতেছে—জীবাত্মা ও পরমাত্মা। শ্রুতিবাক্যটীতে উভয়েরই কর্ম্মফল ভোগের কথা বলা হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য কি ? জীবই কর্ম্ম করে এবং কর্ম্মফলও ভোগ করে ; পরমাত্মার তো কোনও কর্ম্মই নাই, কর্ম্মফল ভোগও নাই। তথাপি "ঋতং পিবন্তৌ"- বাক্যে উভয়ের কর্ম্মফল ভোগের কথা বলা হইল কেন ? ১।২।১১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"যেমন বহু পথিকের মধ্যে কেবল একজনের ছত্র থাকিলেও দূরবর্ত্তী লোকেরা বলে—'ঐ ছত্রিগণ (ছাতাওয়ালারা) যাইতেছে,' তেমনি শ্রুতি একের (জীবের) কর্ম্মফল ভোগ দেখিয়া উপচারক্রমে উভয়ের ভোগের কথা বলিয়াছেন। অথবা, জীব ভোগ করে, ঈশ্বর বা পরমাত্মা ভোগ করান, এইভাবেও ঐরূপ প্রয়োগ হইতে পারে। যে পাক করায়, তাহাকেও যেমন লোকে পাচক বলে—তদ্রূপ।"

---

* পরবর্ত্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

অন্য শ্রুতিবাক্য, যথা—

“দ্বা সুপর্ণা সযুজা সখায়া সমানং বৃক্ষং পরিষস্বজাতে।

তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি ॥মুণ্ডক॥৩।১।১॥ইতিচ॥

—তুইটী পক্ষী (পরমাত্মা ও জীব) একত্র সমানভাবে দেহরূপ সমান একটী বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়া অবস্থান করেন। তন্মধ্যে একটী পক্ষী (জীব) কর্ম্মফল ভোগ করেন ; অন্য পক্ষীটী (পরমাত্মা) ভোগ করেন না, কেবল উদাসীনভাবে চাহিয়া থাকেন।”

এই “দ্বা সুপর্ণা”-শ্রুতিবাক্যটীর এ-স্থলে যে অর্থ করা হইয়াছে, পঙ্গী-রহস্য-ব্রাহ্মণের একটী উক্তির উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ সেই অর্থ সম্বন্ধে আপত্তি করিয়া বলেন—শ্রুতিবাক্যে যে তুইটী পক্ষীর কথা বলা হইয়াছে, তাহারা হইতেছে—অন্তঃকরণ ও জীব ; তাহারা জীবাত্মা ও পরমাত্মা নহে। বিরুদ্ধপক্ষের এই উক্তি শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যেভাবে খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা বলা হইতেছে। তিনি বলেন : —বিরুদ্ধপক্ষ বলেন—

পৈঙ্গীরহস্য-ব্রাহ্মণে যে বলা হইয়াছে—“‘এতয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি’ ইতি সত্ত্বম্—‘এই তুইটী পক্ষীর অন্য একটী স্বাতু কর্ম্মফল ভোগ করেন’-পৈঙ্গীরহস্য-ব্রাহ্মণের এই বাক্যে যাহার কর্ম্মফল ভোগের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে “সত্ত্ব।” আর, ঐ ব্রাহ্মণেই যে বলা হইয়াছে—“অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি—অন্য পক্ষীটী ভোগ না করিয়া উদাসীনভাবে চাহিয়া থাকেন”-এই স্থলে “অনশ্নন্ যোঽভিপশ্যতি জ্ঞস্তাবেতৌ সত্ত্বক্ষেত্রজ্ঞৌ--ভোগ না করিয়া যিনি চাহিয়া থাকেন, তিনি হইতেছেন—জ্ঞ। সুতরাং এই তুই বস্তু হইতেছে—সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ।” সত্ত্ব-শব্দের অর্থ অন্তঃকরণ ; আর, ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দের অর্থ জীব। সুতরাং উল্লিখিত বস্তু তুইটীর একটী হইতেছে অন্তঃকরণ এবং অপরটী হইতেছে জীব। এই অর্থের সমর্থনে বিরুদ্ধপক্ষ পৈঙ্গীরহস্য-ব্রাহ্মণের অপর একটী বাক্যেরও উল্লেখ করেন। যথা—“তদেতং সত্ত্বং যেন স্বপ্নং পশ্যত্যথ যোঽয়ং শারীর উপদ্রষ্টা ক্ষেত্রজ্ঞ স্তাবেতৌ সত্ত্ব-ক্ষেত্রজ্ঞৌ—যাহা দ্বারা স্বপ্ন দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে সত্ত্ব ; আর, যিনি শারীর উপদ্রষ্টা, তিনি হইতেছেন ক্ষেত্রজ্ঞ। এই তুই বস্তু হইতেছে সত্ত্ব ও ক্ষেত্রজ্ঞ।” ইহা হইতেছে বিরুদ্ধপক্ষের উক্তি।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—না, এইরূপ অর্থ সঙ্গত নহে। পৈঙ্গীরহস্য-ব্রাহ্মণোক্ত সত্ত্ব-শব্দের—অর্থ জীব এবং ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দের অর্থ—পরমাত্মা ; এইরূপ অর্থ ই সঙ্গত। সত্ত্ব-শব্দের অন্তঃকরণ অর্থ এবং ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দের জীব অর্থ সঙ্গত হয় না। কেননা, “পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি—স্বাতু কর্ম্মফল ভোগ করে,”—একথা যাহার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে, তাহা হইবে চেতনবস্তু ; অচেতন বস্তু ভোগ করিতে পারে না। অন্তঃকরণ হইতেছে অচেতন বস্তু ; তাহার পক্ষে ভোগ অসম্ভব ; সুতরাং কর্ম্মফলের ভোক্তা যে সত্ত্ব, তাহা অন্তঃকরণ হইতে পারে না, তাহা হইবে চেতন জীব। জীবকে সত্ত্ব-শব্দে অভিহিত করার কারণ এই যে,শ্রুতিতে —এই জীবই সত্ত্ব-“তদেতৎ সত্ত্বমিত্যাদি।”-বাক্যে সত্ত্বাধিষ্ঠান বলিয়াই জীবকে সত্ত্ব বলা হয়। আর, যিনি ভোগ না করিয়া চাহিয়া থাকেন, তাঁহাকে

ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। এ-স্থলেও ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দে জীবকে বুঝাইতে পারে না ; কেননা, জীব কর্ম্মফল ভোগ করেন না—ইহা অসম্ভব। জীবই কর্ম্মফল ভোগ করেন। পরমাত্মাই কর্ম্মফল ভোগ করেন না ; সুতরাং যে-ক্ষেত্রজ্ঞ কর্ম্মফল ভোগ করেন না—বলা হইয়াছে, সেই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেছেন —পরমাত্মা [ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দের দুইটী অর্থ হয়—জীব (গীতা ॥১৩।২)এবং পরমাত্মা (গীতা ॥১৩।৩)। শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন—"ক্ষেত্রজ্ঞঞ্চাপি মাং বিদ্ধি সর্ব্বক্ষেত্রেষু ভারত॥ গীতা ॥১৩।৩॥" পৈঙ্গীরহস্য-ব্রাহ্মণে যে ক্ষেত্রজ্ঞের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাকে জীব মনে করিলে তাঁহার সম্বন্ধে ভোগ-রাহিত্যের সঙ্গতি থাকে না। এ-স্থলে ক্ষেত্রজ্ঞ-শব্দের পরমাত্মা-অর্থ গ্রহণ করিলেই ভোগ-রাহিত্যের সঙ্গতি থাকে। এজন্যই শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—ক্ষেত্রজ্ঞ অর্থ—পরমাত্মা।] যদি বলা যায়—পৈঙ্গী-শ্রুতিতে ক্ষেত্রজ্ঞকে "শারীর" বলা হইয়াছে। "শারীর" বলিতে শরীরধারী জীবকেই বুঝায়, পরমাত্মাকে বুঝায় না ; সুতরাং এ-স্থলে "ক্ষেত্রজ্ঞ"-শব্দের অর্থ "পরমাত্মা" কিরূপে হইতে পারে ? ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিতেছেন—অন্তর্য্যামি-রূপে পৃথিব্যাদিরূপ-শরীরের অভ্যন্তরে অবস্থান করেন বলিয়া শ্রুতিতে পরমাত্মাকে "শারীর" বলা হইয়াছে ; যথা—"য এবায়ং শারীরঃ পুরুষঃ॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৯।১০॥" পৈঙ্গীব্রাহ্মণে ভোগনিরত ক্ষেত্রজ্ঞকে যে "উপদ্রষ্টা" বলা হইয়াছে, তাহাতেও জানা যায় যে, এই ক্ষেত্রজ্ঞ হইতেছেন—পরমাত্মা। পরমাত্মারই উপদ্রষ্টৃত্বের কথা শাস্ত্রে প্রসিদ্ধ। "উপদ্রষ্টানুমন্তাচ ভর্ত্তা ভোক্তা মহেশ্বরঃ। পরমাত্মেতি চাপ্যুক্তো দেহেহস্মিন্ পুরুষঃ পরঃ॥ গীতা॥ ১৩।২৩॥"

অন্যপ্রকার অর্থ করিতে গেলে, জীব-পরমাত্মগত "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত—

৬। **স্থিত্যাদনাভ্যাঞ্চ** ॥১।২।৭॥-ব্রহ্মসূত্রের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়।

এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই। "দ্যুভ্বাদ্যায়তনং স্বশব্দাৎ॥ ১।৩।১॥"-ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে—ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই হইতেছেন দ্যুলোক-ভূলোকাদির আয়তন বা আশ্রয় ; অর্থাৎ ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই হইতেছেন জগতের আশ্রয় বা আধার। পরবর্ত্তী কয়েকটী সূত্রেও বলা হইয়াছে—পরমাত্মাব্যতীত অপর কোনও বস্তু—প্রকৃতি-জীবাদি—জগদাশ্রয় হইতে পারে না। আলোচ্য "স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ" সূত্রেও বলা হইয়াছে—পরমাত্মাই জগতের আশ্রয়, জীব নহে। কেননা, "দ্বা সুপর্ণা" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে "স্থিতি—উদাসীনভাবে অবস্থান" এবং "অদন—কর্ম্মফলের ভোগ"—এই দুইটী কথা বলা হইয়াছে। এই দুই কথা দ্বারাও জীবের জগদাশ্রয়ত্ব নিষিদ্ধ হইয়াছে। যিনি ভোগ না করিয়া উদাসীনভাবে অবস্থান করেন, তিনি হইতেছেন পরমাত্মা ; আর যিনি কর্ম্মফল ভোগ করেন, তিনি হইতেছেন জীব বা জীবাত্মা। এই বাক্যে পরমাত্মা হইতে জীবের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। পরমাত্মা সর্ব্বজ্ঞ এবং মোক্ষসেতু বলিয়া জগতের আশ্রয় হওয়ার উপযুক্ত ; কিন্তু কর্ম্মফল-ভোক্তা এবং শোক-দুঃখাদিদ্বারা অভিভূত জীব বা জীবাত্মা জগতের আশ্রয় হওয়ার উপযুক্ত নহে।

এইরূপে দেখা গেল—"দ্বা সুপর্ণা"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উপর প্রতিষ্ঠিত "স্থিত্যদনাভ্যাঞ্চ" সূত্রে পরমাত্মা ও জীবের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং জীব-পরমাত্মার অভেদসূচক অর্থ হইবে এই ব্রহ্মসূত্রের বিরোধী।

চ। প্রকাশাদিবন্নৈবং পরঃ ॥২।৩।৪৬॥-ব্রহ্মসূত্র এবং **স্মরন্তি চ** ॥২।৩।৪৭॥ ব্রহ্মসূত্র ॥

এই সূত্রদ্বয়েও জীব ও ব্রহ্মের পার্থক্য প্রদর্শিত হইয়াছে এবং "দ্বা সুপর্ণা"-শ্রুতিবাক্যের অন্তর্গত "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি"-বাক্যের উল্লেখ করিয়া তাঁহার ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও দেখাইয়াছেন যে, জীবই কর্ম্মফল ভোগ করে, পরমাত্মা নির্লিপ্ত থাকেন।

প্রথমোক্ত ২।৩।৪৬—সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—সূর্য্যরশ্মিতে অঙ্গুলি ধারণ করিলে তাহার ফলে রশ্মি যেমন বক্রতা প্রাপ্ত হয়, কিন্তু সেই বক্রতা যেমন সূর্য্যকে স্পর্শ করেনা, তদ্রূপ কর্ম্মফল জীবই ভোগ করে; কিন্তু সেই কর্ম্মফল পরমাত্মাকে স্পর্শ করে না, পরমাত্মা নির্লিপ্তই থাকেন। পরবর্ত্তী ২।৩।৪৭-সূত্রে বলা হইয়াছে—ব্যাসাদি ঋষিগণও জীবের কর্ম্মফলজনিত দুঃখে পরমাত্মার নির্লিপ্ততার কথা স্মরণ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন—"তত্র যঃ পরমাত্মা হি স নিত্যো নির্গুণঃ স্মৃতঃ। ন লিপ্যতে ফলৈশ্চাপি পদ্মপত্রমিবাম্ভসা ॥—জলের মধ্যে অবস্থিত পদ্মপত্রকে যেমন জল স্পর্শ করিতে পারে না, তদ্রূপ নিত্য গুণাতীত পরমাত্মাও কর্ম্মফলের দ্বারা লিপ্ত হয়েন না।"; "কর্ম্মাত্মা ত্বপরো যোঽসৌ মোক্ষবন্ধৈঃ স যুজ্যতে। স সপ্তদশকেনাপি রাশিনা যুজ্যতে পুনঃ ॥—অপর যিনি কর্ম্মাত্মা (অর্থাৎ জীব), তাঁহারই বন্ধন এবং মোক্ষ; তিনিই আবার সপ্তদশ-সংখ্যক রাশিতে (অর্থাৎ ১০ ইন্দ্রিয়, ৫ প্রাণ, ১ মন এবং ১ বুদ্ধি—এই সপ্তদশ রাশিতে—এই সপ্তদশটী বস্তু বিশিষ্ট শরীরে) সংযুক্ত হয়েন।" ভাষ্যে এই সমস্ত প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"স্মরন্তি চ"-এই সূত্রের শেষভাগে যে "চ"-শব্দ আছে, তদ্দ্বারা শ্রুতির কথাই বলা হইয়াছে। শ্রুতিও বলেন—"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্ত্যনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি।—সেই দুইটী পক্ষীর মধ্যে একটী (অর্থাৎ জীব) স্বাদু ফল (কর্ম্মফল) ভোগ করে, অন্যটী (অর্থাৎ পরমাত্মা) ভোগ না করিয়া কেবল চাহিয়া থাকেন।" এবং "একস্তথা সর্ব্বভূতান্তরাত্মা ন লিপ্যতে লোকদুঃখেন বাহ্যঃ।—সেই এক অদ্বিতীয় সর্ব্বভূতান্তরাত্মা—লোকের দুঃখের দ্বারা লিপ্ত হয়েন না।"

এইরূপে দেখা গেল, উল্লিখিত ২।৩।৪৬ এবং ২।৩।৪৭ ব্রহ্মসূত্রদ্বয়ের তাৎপর্য্য হইতেও জীব ও পরমাত্মার পার্থক্যের কথাই জানা যায়।

এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল—জীবাত্মা ও পরমাত্মা—এই উভয়ই জীবদেহে—জীবহৃদয়ে—অবস্থিত এবং তাঁহারা পরস্পর হইতে পৃথক, অর্থাৎ তাঁহারা অভিন্ন নহেন। উভয়ে যখন এক সঙ্গেই জীবহৃদয়ে অবস্থিত, তখন ইহাও পরিষ্কারভাবেই বুঝাযায় যে, তাঁহারা জীবহৃদয়ে প্রবেশও করিয়াছেন। তাহা হইলে শ্রুতি যে বলিয়াছেন—

(১) **অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য**—ইত্যাদি—

এই বাক্যে "অনেন", "জীবেন" এবং "আত্মনা"-এই তিনস্থলে যে তৃতীয়া বিভক্তির প্রয়োগ করা হইয়াছে, সেই **তৃতীয়া বিভক্তি সহার্থেই** প্রযুক্ত হইয়াছে। তাহাতে এই শ্রুতিবাক্যটীর অর্থ হইবে—**এই জীবরূপ আত্মার** (**জীবাত্মার**) **সহিত পরমাত্মা জীবদেহে প্রবেশ করিয়া** নামরূপ ব্যক্ত করিয়াছেন। এই শ্রুতিবাক্যে "আত্মা"-শব্দের প্রয়োগ করার হেতু এই যে, শারীরকে (অর্থাৎ শরীরাভ্যন্তরে অবস্থিত জীবাত্মাকে) আত্মা-শব্দে অভিহিত করার প্রসিদ্ধি আছে। যথা—"ক্ষরাত্মানাবীশতে দেব একঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥১।১০॥—এক (অদ্বিতীয়) দেব পরমাত্মা ক্ষরকে (বিকার-শীল জগৎ-প্রকৃতিকে) এবং আত্মাকে (পুরুষকে—জীবকে) নিয়মিত করেন।" এই বাক্যে শারীর জীবকে "আত্মা" বলা হইয়াছে। "অনেন জীবেনাত্মনা"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যেও জীব-পরমাত্মার ভেদ প্রদর্শনের জন্যই "অনেন—এই" বলা হইয়াছে। অথবা, এ-স্থলে "আত্মা"-শব্দে আত্মাংশ—পরমাত্মার অংশই—বলা হইয়াছে (অর্থাৎ জীব যে পরমাত্মার অংশ, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রেত)।

ছ। শারীরশ্চোভয়েঽপি হি ভেদেনৈনমধীয়তে ॥১।২।২০॥

এই ব্রহ্মসূত্রটীও পূর্ব্ববৎ জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক। এই সূত্রটীর তাৎপর্য্য এইরূপ।

পূর্ব্ববর্ত্তী "ন চ স্মার্ত্তমতদ্ধর্ম্মাভিলাপাৎ ॥১।২।১৯॥"-সূত্রে বলা হইয়াছে—সাংখ্য-স্মৃতিকথিত প্রধান অন্তর্য্যামী নহে। তাহার পরে ১।২।২০-সূত্রের প্রথমে যে "শারীরশ্চ"-শব্দ আছে, শ্রীপাদ শঙ্কর বলেন—এই "শারীরশ্চ" শব্দের সঙ্গে পূর্ব্বসূত্রের 'ন" শব্দ যুক্ত করিতে হইবে—"শারীরশ্চ-অর্থাৎ ন শারীরশ্চ"—শারীর জীবও অন্তর্য্যামী নহে। কেননা, "উভয়েঽপি"—কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন এই উভয় বেদশাখাতেও—"হি"—নিশ্চিত—"ভেদেন"—ভিন্নরূপে, পরমাত্মা হইতে ভিন্নরূপে, "এনম্—জীবম্"—জীবকে "অধীয়তে"—পাঠ[illegible]রা হইয়াছে। অর্থাৎ জীবও অন্তর্য্যামী নহে ; কেননা, কাণ্ব ও মাধ্যন্দিন-এই উভয় বেদশাখাতেই জীবকে পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে। কাণ্বশাখার উক্তি, যথা—"যো বিজ্ঞানে তিষ্ঠন্॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৭।২২॥—যিনি বিজ্ঞানে অবস্থিত থাকিয়া।" মাধ্যন্দিন-শাখার উক্তি, যথা—"য আত্মনি তিষ্ঠন্॥ শতপথ ব্রাহ্মণ ॥১৪।৬।৭।৩০॥—যিনি আত্মাতে অবস্থিত থাকিয়া।" (শঙ্কর-ভাষ্যধৃত প্রমাণ)। কাণ্বশাখার "বিজ্ঞান" এবং মাধ্যন্দিনশাখার "আত্মা"-এই উভয়ই জীববাচক। জীবের মধ্যে থাকিয়া যিনি জীবকে নিয়ন্ত্রিত করেন, তিনি জীব হইতে পারেন না। সুতরাং শারীর-জীব অন্তর্য্যামী (নিয়ন্তা) হইতে পারেন না। অতএব শারীর জীব হইতে অন্য ঈশ্বরই—পরমাত্মাই—অন্তর্য্যামী। "তস্মাচ্ছারীরাদন্য ঈশ্বরোঽন্তর্য্যামীতি সিদ্ধম্ ॥শঙ্করভাষ্য ॥"

এইরূপে আলোচ্যসূত্রের শঙ্কর-ভাষ্য হইতেও জানা গেল—জীবে ও পরমাত্মায় ভেদ আছে।

জ। বিশেষণভেদ-ব্যপদেশাভ্যাং চ নেতরৌ ॥১।২।২২॥ ব্রহ্মসূত্র ॥

এই সূত্রটীও জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক। ভূতযোনি-প্রসঙ্গেই এই সূত্রের অবতারণা। ভূতযোনি

কে? পরমাত্মা? না কি জীব? না কি সাংখ্যোক্ত প্রধান? এই সূত্রে তাহার উত্তর দেওয়া হইয়াছে। ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—"ইতশ্চ পরমেশ্বর এব ভূতযোনিঃ, নেতরৌ—শারীরঃ প্রধানং বা। কস্মাৎ? বিশেষণ-ভেদব্যপদেশাৎ॥ —পরমেশ্বরই– (পরমাত্মাই) ভূতযোনি; শারীরও (জীবও) নহে, প্রধানও নহে। কেন? বিশেষণ ও ভেদের উল্লেখ আছে বলিয়া।" ইহার পরে শ্রুতিপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে—যিনি ভূতযোনি, দিব্য, অমূর্ত্ত-প্রভৃতি বিশেষণের দ্বারা শ্রুতি তাঁহার বিশেষত্ব দেখাইয়াছেন। এই সকল বিশেষণ জীবে সঙ্গত হয় না; সুতরাং জীব কখনও ভূতযোনি হইতে পারে না। আবার "অক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে প্রধানের ভেদ-নির্দ্দেশ করা হইয়াছে; সুতরাং প্রধানও ভূতযোনি হইতে পারে না। সুতরাং পরমাত্মা পরমেশ্বরই ভূতযোনি।

ঝ। জগদ্বাচিত্বাৎ ॥১।৪।১৬॥ব্রহ্মসূত্র॥

এই সূত্রটীও জীব-ব্রহ্মের ভেদবাচক। এই সূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর যে অর্থ করিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ।

কৌষীতকি ব্রাহ্মণে বালাকি-অজাতশত্রু-সংবাদ হইতে জানা যায়—অজাতশত্রু বালাকিকে বলিয়াছিলেন—"যিনি এই সকল পুরুষের কর্ত্তা এবং এই সকল (অর্থাৎ এই জগৎ) যাঁহার কর্ম্ম, তিনিই জ্ঞেয়।" এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—যাঁহাকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তিনি কে? তিনি কি জীব? না প্রাণ? না কি পরমাত্মা? শাস্ত্রবাক্যের বিচার পূর্ব্বক শ্রীপাদ শঙ্কর সিদ্ধান্ত করিয়াছেন—যাঁহাকে জ্ঞেয় বলা হইয়াছে, তিনি জীব নহেন, প্রাণও নহেন, তিনি হইতেছেন পরমাত্মা। কেননা, পরমাত্মাই হইতেছেন জগতের কর্ত্তা, জীব বা প্রাণ কর্ত্তা নহে। যিনি জগৎকর্ত্তা, তিনিই জ্ঞেয়, তিনি পরমাত্মাই।

শ্রীপাদ শঙ্করের ভাষ্যানুসারেই এই সূত্রে জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথা জানা যায়।

ঞ। পরাভিধ্যানাত্তু তিরোহিতং ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ ॥ ৩।২।৫ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥

স্বপ্ন-প্রসঙ্গে এই সূত্রটীর অবতারণা। স্বপ্নস্রষ্টা কে? জীব যখন স্বরূপতঃ সত্যসঙ্কল্প, অপহতপাপ্মা,তখন জীবই স্বপ্নস্রষ্টা হইতে পারেন? এই প্রশ্নের উত্তরেই এই সূত্রে বলা হইয়াছে—না, জীব স্বপ্নস্রষ্টা হইতে পারেনা। কেন? "পরাভিধ্যানাৎ"—পরম পুরুষ ভগবানের ইচ্ছানুসারেই, "তিরোহিতম্"—জীবের স্বরূপগত সত্যসঙ্কল্পত্বাদি তিরোহিত বা আচ্ছাদিত হইয়া রহিয়াছে এবং "ততো হ্যস্য বন্ধ-বিপর্য্যয়ৌ"—সেই পরমেশ্বর হইতেই জীবের বন্ধ ও মোক্ষ হইয়া থাকে। পরমেশ্বর বা পরমাত্মা হইতেছেন কর্ম্মফলদাতা এবং মোক্ষদাতা। অনাদিকর্ম্মফলবশতঃ জীবের বন্ধন—কর্ম্মফল ভোগ করাইবার জন্য পরমেশ্বর পরমাত্মাই জীবের সত্যসঙ্কল্পত্বাদি গুণকে তিরোহিত করিয়া রাখেন এবং তাঁহাকে জানিতে পারিলে তাঁহার কৃপাতেই জীব মোক্ষ লাভ করে।

এই সূত্রেও জীব-ব্রহ্মের ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে।

ট। শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তূপদেশো বামদেববৎ ॥ ১।১।৩০ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥

এই সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ। ইন্দ্র বলিয়াছেন—"আমিই প্রাণ, আমিই প্রজ্ঞাত্মা, আমাকেই জান"। ইন্দ্র যে এইরূপ বলিয়াছিলেন, নিশ্চিতই তিনি বামদেব-ঋষির ন্যায় (বামদেববৎ) শাস্ত্রজ্ঞান অনুসারেই বলিয়াছেন (শাস্ত্রদৃষ্ট্যা তু উপদেশঃ)। ব্রহ্মতত্ত্ব-সাক্ষাৎকারের পরে বামদেব-ঋষি অনুভব করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"আমিই মনু, আমিই সূর্য্য হইয়াছিলাম"-ইত্যাদি।

সূত্রটীর এইরূপ যথাশ্রুত অর্থে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন--এই সূত্রে জীব-ব্রহ্মের অভেদের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—সমস্ত শাস্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিতে হইলে এই সূত্রটীর এইরূপ অর্থ করাই সঙ্গত। সঙ্গত অর্থটী হইতেছে এই :—

"আমিই প্রাণ"-ইত্যাদি বাক্যে ইন্দ্র যে নিজেকেই পরমেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, পরমেশ্বরের সহিত তাঁহার অভেদের কথা বলিয়াছেন, তাহার হেতু এই যে—জীবও চিৎস্বরূপ, পরমেশ্বর পরব্রহ্মও চিৎস্বরূপ। চিদংশে উভয়ই অভিন্ন। "তত্ত্বমসি"-বাক্য হইতেও জীব-ব্রহ্মের চিদংশে অভিন্নতার কথা জানা যায়। এই চিদংশে অভিন্নত্বের অনুভূতিতেই ইন্দ্র নিজেকে পরমেশ্বর বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কোনও কোনও স্থলে বা অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠাতাকেও এক-শব্দে প্রত্যায়িত করা হয়। আবার, কোনও কোনও স্থলে শরীর এবং শরীরীকেও এক-শব্দে প্রত্যায়িত করা হয়। যেমন, বামদেব বলিয়াছিলেন—"আমি মনু হইয়াছিলাম, আমি সূর্য্য হইয়াছিলাম"-ইত্যাদি।

এইরূপে দেখাগেল, আলোচ্য সূত্রে জীবব্রহ্মের আত্যন্তিক অভেদের কথা বলা হয় নাই।

[এই সূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন :—শাস্ত্র বলেন, জীবাত্মা শরীর, ব্রহ্ম বা পরমাত্মা তাহার আত্মা বা শরীরী। 'অহং'-শব্দ সাধারণতঃ জীবাত্মা-সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হয় বটে ; কিন্তু পরমাত্মা যখন জীবাত্মারও আত্মা, তখন পরমাত্মা-সম্বন্ধেও 'অহং'-শব্দ প্রযুক্ত হইতে পারে (শরীর এবং শরীরীকেও কখনও কখনও একই শব্দে প্রত্যায়িত করা হয়—এই কথায় শ্রীজীবপাদও তাহাই বলিয়াছেন)। ইন্দ্র প্রতর্দ্দনকে উপদেশ দেওয়ার সময় এই ভাবে পরমাত্মাকে লক্ষ্য করিয়াই "অহং"-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন। ঋষি বামদেবও এই ভাবে "ব্রহ্ম"কে লক্ষ্য করিয়াই "অহং"-শব্দের প্রয়োগ করিয়াছেন এবং বলিয়াছেন—আমি মনু হইয়াছিলাম, সূর্য্য হইয়া ছিলাম।

শ্রীপাদ নিম্বার্ক বলেন—সমস্তের ব্রহ্মাত্মকত্ব অনুভব করিয়াই ইন্দ্র বলিয়াছিলেন—'আমাকেই জান' ইত্যাদি। বামদেবও সেই ভাবেই বলিয়াছিলেন—"আমি মনু হইয়া ছিলাম, সূর্য্য হইয়াছিলাম।"

শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ নিম্বার্কের ভাষ্য হইতেও জানা যায়—আলোচ্য সূত্রে জীব-ব্রহ্মের অভেদের কথা বলা হয় নাই।]

ঠ। উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥ ১।৩।১৯ ॥ ব্রহ্মসূত্র

এই সূত্রটীও জীব-ব্রহ্মের ভেদ-বাচক, অভেদ-বাচক নহে। তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

ইহা হইতেছে "দহর"-অধিকরণের একটী সূত্র। ইহার ভিত্তি হইতেছে ছান্দোগ্য-উপনিষদের অষ্টম অধ্যায়। এই অধ্যায়ের পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যসমূহে দহর-সম্বন্ধে "অপহতপাপ্মত্বাদি" গুণের উল্লেখ আছে; পরবর্ত্তী প্রজাপতি-বাক্যেও ''অপহত-পাপ্মত্বাদি''-গুণের উল্লেখ আছে। উভয় স্থলে একইরূপ গুণসমূহের উল্লেখ থাকাতে মনে হইতে পারে—"উভয় স্থলে একই বস্তুর কথাই বলা হইয়াছে। প্রজাপতি-বাক্যে যে জীবের কথা বলা হইয়াছে—তাহা সুস্পষ্ট। সুতরাং পূর্ব্ববর্ত্তী বাক্যে উল্লিখিত 'দহর'ও জীবই হইবে।" এইরূপ অনুমান যে যথার্থ নহে, আলোচ্য সূত্রে তাহাই প্রদর্শিত হইয়াছে।

উত্তরাৎ (পরবর্ত্তী বাক্য হইতে) চেৎ (যদি কেহ মনে করে যে, দহর-শব্দে জীবকেই বুঝাইতেছে, তাহা হইলে তাহা সঙ্গত হইবেনা। কেননা, পরবর্ত্তী বাক্যে জীবের) আবির্ভূতস্বরূপঃ তু (আবির্ভূতস্বরূপের কথাই—মোক্ষাবস্থার কথাই—বলা হইয়াছে)।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন ঃ—পূর্ব্বে 'দহর'-বাক্যে 'দহর'-শব্দে যে পরমেশ্বরকেই—পরমাত্মাকেই বুঝায়, তাহা নির্ণীত হইয়াছে এবং 'দহর'-শব্দের 'জীব' অর্থ প্রত্যাখ্যাত হইয়াছে। ছান্দোগ্য-শ্রুতির "এষ অপহতপাপ্মা বিজরো বিমৃতুর্ব্বিশোকো বিজঘৎসোঽপিপাসঃ সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ ॥ ৮।১।৫ ॥"-এই বাক্য হইতে জানা যায়—অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ জীবেও আছে (অর্থাৎ ব্রহ্মের ন্যায় জীবও অপহতপাপ্মা, বিজর বা জরাহীন, বিমৃত্যু বা মৃত্যুহীন, বিশোক, ক্ষুধাহীন, পিপাসাহীন, সত্যকাম এবং সত্যসঙ্কল্প। এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—ব্রহ্ম এবং জীব এই উভয়েরই যখন সমান ধর্ম্ম, তখন উভয়ে কেন এক হইবেন না? তাহার উত্তরে)। সূত্রকার বলিতেছেন—আবির্ভূতস্বরূপস্তু জীবঃ—জীবের স্বরূপ যখন আবির্ভূত হয়, তখনই জীব অপহতপাপ্মাদি হইয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে নহে (অর্থাৎ জীব-স্বরূপে অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ আছে; কিন্তু সংসারী-অবস্থায় জীবের সে-সমস্ত গুণ থাকে প্রচ্ছন্ন; জীব যখন মোক্ষ লাভ করে, তখন জীব স্বীয় স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তখনই তাহার স্বরূপ আবির্ভূত হয়, তখন তাহার অপহতপাপ্মত্বাদি গুণও আবির্ভূত হয়—প্রচ্ছন্নতা ত্যাগ করিয়া প্রকাশ প্রাপ্ত হয়। পরমেশ্বরেরও অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ আছে; কিন্তু পরমেশ্বরের এই সমস্ত গুণ, জীবের স্বরূপগত গুণের ন্যায়, কখনও প্রচ্ছন্ন হয় না, নিত্যই সমুজ্জ্বলভাবে প্রকাশমান থাকে। মোক্ষাবস্থায় জীবের এ-সমস্ত স্বরূপগত গুণ যখন প্রকাশমান হয়, তখন এই কয়টী গুণ-বিষয়ে জীবও ব্রহ্মসাম্য লাভ করিয়া থাকে)। পরমেশ্বরের অনুগ্রহে মুক্তিতে যে জীব তাঁহার গুণসাম্য লাভ করে, "পরমং সাম্যমুপৈতি"—ইত্যাদি (৩।১।৩)-বাক্যে মুণ্ডক-শ্রুতিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—আলোচ্য ১।৩।১৯-ব্রহ্মসূত্রেও জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই বলা হইয়াছে, অভেদের কথা বলা হয় নাই।

আশঙ্কা হইতে পারে—"দহর"-বাক্যে কি পরমেশ্বরকেই (বা ব্রহ্মকেই) বুঝায়? না কি মুক্তজীবকেই বুঝায়? যদি বলা যায়—উভয়কেই বুঝায়, তাহা হইলে বাক্যভেদ-দোষ ঘটে। এই আশঙ্কার নিরাকরণের উদ্দেশ্যেই সূত্রকার ব্যাসদেব নিম্নলিখিত সূত্রটীর অবতারণা করিয়াছেন।

ড। **অন্যার্থশ্চ পরামর্শঃ ॥ ১।৩।২০ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥**

এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই। অন্যার্থঃ চ (পরমেশ্বর-স্বরূপদর্শনার্থই) পরামর্শঃ (তটস্থ-লক্ষণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ জীবস্বরূপের পরামর্শ)। পরমেশ্বর-স্বরূপ-প্রদর্শনার্থই তটস্থ লক্ষণের দ্বারা পুনঃ পুনঃ জীবস্বরূপের কথা বলা হইয়াছে। স্থলবিশেষে যে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যসূচক বাক্য দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে জীব-ব্রহ্মের সাধর্ম্ম্যাংশদ্যোতক। অতএব ছান্দোগ্য-উপনিষদে বলা হইয়াছে—"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ ॥ ৮।১২।৩ ॥—সেই মুক্তজীব সে স্থানে যথেচ্ছ ভ্রমণ, ভক্ষণ, ক্রীড়া ও রমণ (আনন্দোপভোগ) করেন।" ইহার পূর্ব্বে সেই বাক্যেই ছান্দোগ্য-শ্রুতি জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাও বলিয়াছেন—"এষ সংপ্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে, স উত্তমঃ পুরুষঃ ॥ ৮।১২।৩ ॥—সম্যক্‌প্রসন্ন সেই সুষুপ্ত জীবাত্মা এই স্থূল শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পর-জ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়েন, তখন তিনি উত্তম পুরুষ হয়েন।"

অতএব "**উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু** ॥ ১।৩।১৯॥"-ব্রহ্মসূত্রের "আবির্ভূত-স্বরূপঃ" শব্দটী বহুব্রীহি-সমাস নিষ্পন্ন বলিয়াই গ্রহণ করিতে হইবে (আবির্ভূতং স্বরূপমস্যেত্যাবির্ভূতস্বরূপঃ। শঙ্করভাষ্য।, —আবির্ভূত হইয়াছে স্বরূপ যাঁহার, তিনি আবির্ভূতস্বরূপ। এই "আবির্ভূত-স্বরূপ"-শব্দে জীবই অভিহিত হইয়াছে। এ-স্থলে "পরমাত্মা"-অর্থ কষ্টকল্পনাই। মৈত্রেয়ী ব্রাহ্মণেও বলা হইয়াছে—"**ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি। আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ ॥** বৃহদারণ্যক ॥ ২।৪।৫॥—সকলের কামের (প্রীতির) জন্য সকল প্রিয় হয় না। আত্মার কামের (প্রীতির) জন্যই সকল প্রিয় হয়। সেই আত্মাই দ্রষ্টব্য।"—এই সকল বাক্যে মনে হইতে পারে—জীবের দ্রষ্টব্যত্বাদির কথা নির্দ্দেশ করিয়া জীবেরই পরমাত্মত্ব (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের অভিন্নত্ব) প্রদর্শন করা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়। কেননা—জীব পরমপুরুষের আবির্ভূতি-বিশেষ। অপবর্গ-সাধনভূত পরমপুরুষের জ্ঞানেই জীবের যথার্থ স্বরূপ অবগত হওয়া যায়। সেই পরমপুরুষের জ্ঞানলাভের উপযোগিতাদ্বারা জীবের স্বরূপ-যাথার্থ্যের কথা বলিয়া পুনরায় "আত্মা বা অরে"-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইয়াছে—"পরমাত্মাকে অমৃতস্বরূপ জানিতে হইবে"। "যতঃ পরমপুরুষাবির্ভূতিভূতস্য প্রাপ্তুরাত্মনঃ স্বরূপযাথার্থ্যবিজ্ঞানমপবর্গ-সাধনভূত-পরমপুরুষবেদনোপযোগিতয়ানূদ্য পুনঃ 'আত্মা বা' ইত্যাদিনা পরমাত্মৈবামৃতত্বোপায়াদ্দ্রষ্টব্যতয়োপদিশ্যতে।" "তস্য বা এতস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ ঋগ্বেদো যজুর্বেদ-ইত্যাদি ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ২।৪।১০ ॥—সেই মহাভূতের নিশ্বসিত হইতেছে ঋগ্‌বেদ। যজুর্বেদ-ইত্যাদি"-বাক্য সেই পরমাত্মারই প্রতিপাদক।

এইরূপ অভিপ্রায়েই স্বয়ং শ্রীশুকদেবও বলিয়াছেন—"**তস্মাৎ প্রিয়তমঃ স্বাত্মা ॥** শ্রী, ভা, ১০।১৪।৫২॥—এই হেতু স্বীয় আত্মা প্রিয়তম।" এই কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন—"**কৃষ্ণমেনমবেহি ত্বমাত্মানমখিলাত্মনাম্ ॥** শ্রী, ভা, ১০।১৪।৫৫॥—এই শ্রীকৃষ্ণকেই অখিল আত্মার আত্মা বলিয়া জানিবে।" শ্রীকৃষ্ণ অখিলাত্মার আত্মা বলিয়া স্বীয় আত্মা হইতেও প্রিয়তম। এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—**জীবাত্মা হইতেছে পরমেশ্বর-স্বরূপ হইতে ভিন্নই।**

যদি বলা হয়, জীবাত্মা যদি পরমেশ্বর-স্বরূপ হইতে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে নিম্নলিখিত ব্রহ্ম-সূত্রের তাৎপর্য্য অনুসারে জীবাত্মাকে বিকারী মনে করিতে হয়।

ঢ। যাবদ্‌বিকারস্তু বিভাগো লোকবৎ ॥ ২।৩।৭ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥

এই সূত্রের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—লৌকিক জগতে ঘট-কেয়ুরাদি যত কিছু বিভাগবিশিষ্ট (পরস্পর হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থিত) বস্তু দেখা যায়, তৎ সমস্তই হইতেছে বিকার—তাহাদের উৎপত্তি-বিনাশ আছে।

জীবাত্মা যদি পরমেশ্বর বা পরমাত্মা হইতে ভিন্ন বা পৃথক্ হয়, তাহা হইলে স্বীকার করিতে হইবে—জীবাত্মাও বিকারী।

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলেন—জীবাত্মা বিকারশীল পদার্থের সমধর্ম্মক নহে। জড়বস্তুই বিকারশীল। জীবাত্মা জড় বস্তু নহে। ঘট-কেয়ুরাদি জড় বস্তুর উৎপত্তি আছে, বিনাশ আছে। চিদ্রূপ জীবাত্মার উৎপত্তিও নাই, বিনাশও নাই। বিকারশীল জড়বস্তু হইতে জীবাত্মার যে বৈধর্ম্ম্য আছে, তাহা স্বতঃসিদ্ধ। তজ্জন্য কোনওরূপ প্রমাণের অপেক্ষা নাই। আত্মা হইতেছে প্রমাণাদি-বিকারব্যবহারের আশ্রয়স্বরূপ; সুতরাং সেই ব্যবহারের পূর্ব্বেই আত্মা সিদ্ধ হয়। এজন্য বিভাগযুক্তি-লব্ধ ন্যায় এ-স্থলে অবতারিত হইতে পারে না—অর্থাৎ জীবাত্মা-সম্বন্ধে "যাবদ্ বিকারস্তু"-ইত্যাদি সূত্র প্রযোজ্য হইতে পারে না। জীবাত্মার নিত্যত্ব সম্বন্ধে শ্রুতি-প্রমাণও আছে। বৈকুণ্ঠাদি বস্তুর নিত্যত্বের ন্যায় আত্মার নিত্যত্বও শ্রুতি উপদেশ করেন। নিম্নোদ্ধৃত ব্রহ্মসূত্রদ্বারাও "যাবদ্‌বিকারস্তু" ইত্যাদি সূত্রের আশঙ্কা অপসারিত হইতেছে।

ণ। নাত্মাশ্রুতের্নিত্যত্বাচ্চ তাভ্যঃ ॥ ২।৩।১৭ ॥ ব্রহ্মসূত্র

ন আত্মা (আত্মা—জীবাত্মা—উৎপন্ন বা জন্য পদার্থ নহে), শ্রুতেঃ (শ্রুতিবাক্য হেতু) নিত্যত্বাৎ (শ্রুতি আত্মাকে নিত্য বলিয়াছেন বলিয়া) চ (পরন্তু) তাভ্যঃ (শ্রুতিসমূহ হইতে জানা যায়—আত্মা নিত্য)।

আত্মা বা জীবাত্মা যে আকাশাদি বা ঘট-কেয়ুরাদির ন্যায় জন্য পদার্থ নহে, পরন্তু জীবাত্মার যে শ্রুতিকথিত নিত্যত্ব আছে, তাহাই এই সূত্র হইতে জানা গেল। সুতরাং "যাবদ্‌বিকারস্তু"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র জীবাত্মা-সম্বন্ধে প্রযোজ্য হইতে পারে না; সেই সূত্রের প্রয়োগস্থল হইতেছে জন্য পদার্থ।

এইরূপে শ্রুতি ও ব্রহ্মসূত্র হইতে জানা গেল—**পরমাত্মা হইতে জীব ভিন্নই**।

ঈশোপনিষদে একটী বাক্য আছে ; যথা—

(১) **তত্র কো মোহঃ কঃ শোক একত্বমনুপশ্যতঃ॥ ঈশ ॥৭॥**

—যিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব অনুভব করেন, তাঁহার মোহই বা কি ? শোকই বা কি ? অর্থাৎ তিনি শোক-মোহাদির অতীত হয়েন।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে কেহ মনে করিতে পারেন—এ-স্থলে জীব-ব্রহ্মের অভেদের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু তাহা নয়। এই জাতীয় শ্রুতিবাক্য হইতেছে জীব ও পরমাত্মার ঐক্যাপেক্ষক, অর্থাৎ চিদংশে জীব ও পরমাত্মা যে এক, তাহাই এই জাতীয় শ্রুতিবাক্য জানাইতেছেন।

(উল্লিখিত ঈশোপনিষদ্বাক্যে বলা হইয়াছে—"যিনি জীব-ব্রহ্মের একত্ব দর্শন করেন, তাঁহার শোকমোহাদি থাকে না।" যিনি একত্ব দর্শন করেন, অবশ্যই তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব আছে ; নচেৎ দর্শন করিবেন কিরূপে ? ব্রহ্মের সহিত একত্ব প্রাপ্ত হইয়া গেলে তাঁহার আর দর্শনের ক্ষমতাই থাকে না। বিশেষতঃ "কো মোহঃ, কঃ শোকঃ"-এই বাক্য হইতে জানা যায়—সংসারী-জীবের ন্যায় শোক-মোহের কারণ উপস্থিত হইলেও তিনি তদ্দ্বারা অভিভূত হয়েন না। এ-সমস্ত হইতে বুঝা যায়—একত্ব দর্শনকারীর পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। এই একত্ব হইতেছে কেবল চিদংশে)।

মহাভারতেও আছে—

"বহবঃ পুরুষা লোকে সাংখ্যযোগবিচারণে।
নৈতদিচ্ছন্তি পুরুষমেকং কুরুকুলোদ্বহ ॥ শান্তিপর্ব্ব ॥ ৩৫০।২ ॥

—হে কুরুকুলোদ্বহ ! সাংখ্যযোগ-বিচারণ-ব্যাপারে কেহ কেহ বহু পুরুষ (বহু জীব) স্বীকার করেন না, এক পুরুষই স্বীকার করেন।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন —উল্লিখিত মহাভারত-বাক্যে বক্তা পরমতের কথাই বলিয়াছেন; ইহা তাঁহার স্বমত নহে। মহাভারতেই উক্ত শ্লোকের পরবর্ত্তী কতিপয় শ্লোকে বক্তা তাঁহার স্বমতও বলিয়া গিয়াছেন। সে-স্থলে পারস্পরিক জীবভেদ প্রদর্শন করিয়া সাক্ষিরূপে পরমাত্মার বিন্যাস করা হইয়াছে এবং পরমাত্মা যে জীবাত্মা হইতে ভিন্ন—সেই বিষয়ে স্বীয় মতের আতিশয্যও প্রদর্শিত হইয়াছে। যথা,

"বহূনাং পুরুষাণাং হি যথৈকা যোনিরুচ্যতে।
তথা তং পুরুষং বিশ্বমাখ্যামি গুণতোঽধিকম্॥ শান্তিপর্ব্ব ॥ ৩৫০।৩॥

—বহু পুরুষের যেমন এক উৎপত্তিস্থল বলা হইয়াছে, তদ্রূপ আমি সেই গুণাধিক পুরুষকে বিশ্ব বলিয়া অভিহিত করি।"

এইরূপ উপক্রম করিয়া সে-স্থলেই বলা হইয়াছে—

"মমান্তরাত্মা তব চ যে চান্যে দেহিসংজ্ঞিতাঃ।
সর্ব্বেষাং সাক্ষিভূতোঽসৌ ন গ্রাহ্যঃ কেনচিৎ কচিৎ ॥

বিশ্বমূর্দ্ধা বিশ্বভুজো বিশ্বপাদাক্ষিনাসিকঃ।
একশ্চরতি ভূতেষু স্বৈরাচারী যথাসুখম্॥ শান্তিপর্ব্ব॥ ৩৫০।৪-৫।

—আমার অন্তরাত্মা, তোমার অন্তরাত্মা এবং অন্যান্য যে সকল দেহি-সংজ্ঞিত বস্তু আছে (অন্যান্য যে সকল দেহধারী জীব আছে), এই পরমাত্মা তাহাদের সকলেরই সাক্ষিস্বরূপ। ইন্দ্রিয়-দ্বারা ইঁহাকে কেহ কখনও গ্রহণ (প্রত্যক্ষ) করিতে পারে না। ইনি বিশ্বমূর্দ্ধা, বিশ্বভুজ, বিশ্বপাদ, বিশ্বচক্ষুঃ, বিশ্বনাসিক। তিনি এক অদ্বিতীয়। সমস্ত ভূতে তিনি যথাসুখে বিচরণ করেন, তিনি স্বৈরাচারী—স্বতন্ত্র।"

মহাভারতের এই সমস্ত বাক্যে পৃথক্ পৃথক্ বহু জীবের কথা, তাহাদের সকলের অন্তর্য্যামী সাক্ষিস্বরূপ এক পরমাত্মার কথা এবং সেই পরমাত্মা হইতে জীবের ভেদের কথাই বলা হইয়াছে।

(২) **জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করিলে সর্ব্বজ্ঞান-প্রতিজ্ঞারও হানি হয় না।** কেননা. ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বশক্তিময়। সুতরাং জীবাত্মায় ও পরমাত্মায় ভেদ স্বীকার্য্য।

(৩) **ভেদজ্ঞানে মুক্তিরও ব্যাঘাত হয় না।** শ্রুতিতে ভেদ-জ্ঞানেই মুক্তির কথা দৃষ্ট হয়। যথা—

"ভোক্তা ভোগ্যং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ১।১২॥

—(ব্রহ্মকে জানিতে পারিলেই মুক্তি। ব্রহ্মকে কিরূপে জানিতে হইবে, তাহা বলা হইতেছে) ভোক্তা (জীব), ভোগ্য (জগৎ) ও প্রেরিতা (ঈশ্বর পরমাত্মা)-পূর্ব্বোক্ত এই তিনই ব্রহ্ম (ব্রহ্মাত্মক) —এইরূপ মনন করিবে।"

"পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টস্ততস্তেনামৃতত্বমেতি॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ১।৬॥

—পৃথক্ আত্মাকে (জীবাত্মাকে) এবং প্রবর্ত্তক পরমাত্মাকে মনন করিয়া ঈশ্বর-পরমাত্মার সেবায় আনন্দ লাভ করিয়া অমৃতত্ব লাভ করে।"

"জুষ্টং যদা পশ্যত্যন্যমীশমস্য মহিমানমিতি বীতশোকঃ॥ মুণ্ডক॥৩।১।২॥

—সাধক যখন সেবিত ঈশ্বরকে এবং তাঁহার মহিমাকে দর্শন করেন, তখন তিনি বীতশোক (মুক্ত) হয়েন।"

এই সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে **মুক্তাবস্থাতেও ভেদের কথাই জানা যায়।**

ভ। ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চেৎ স্যাল্লোকবৎ॥২।১।১৩॥ব্রহ্মসূত্র॥

এই সূত্রের মাধ্বভাষ্যে বলা হইয়াছে—"কর্ম্মাণি বিজ্ঞানময়শ্চাত্মা পরেঽব্যয়ে সর্ব্ব একী-ভবন্তি (মুণ্ডকশ্রুতি ॥৩।২।৭)—কর্ম্মসমূহ, বিজ্ঞানময় আত্মা. ইহারা সকলেই অব্যয় পরমাত্মাতে প্রবেশ করিয়া একীভূত হয়।" এবং "ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি (মুণ্ডকশ্রুতি ॥৩।২।৯)—ব্রহ্মবিৎ ব্রহ্মই (ব্রহ্মতুল্য) হয়েন।" এই সকল শ্রুতিবাক্যে মুক্তজীবের পরাপত্তির কথা বলা হইয়াছে; সুতরাং জীব-ব্রহ্মের যে বিভাগ নাই—তাহাই বুঝা যাইতেছে (**ভোক্ত্রাপত্তেরবিভাগশ্চ**)। "ইতঃপূর্ব্বে যিনি ছিলেন, মুক্তাবস্থাতেও তিনিই আছেন। এক বস্তু কখনও অন্য বস্তু হইতে পারে না (অর্থাৎ মুক্তিতে

যখন ব্রহ্মের সহিত একত্ব-প্রাপ্তি দেখা যায়, তখন মুক্তির পূর্ব্বেও জীব বস্তুতঃ ব্রহ্মই ছিলেন, ইহাই বুঝা যায়)।" এইরূপ যদি বলা হয় (চেৎ), তাহার উত্তরে বলা হইতেছে—**ন—স্যাল্লোকবৎ**।—না, বিভাগ নাই,—একথা বলা সঙ্গত হয় না। স্যাৎ—বিভাগ আছে। **লোকবৎ**—লৌকিক দৃষ্টান্তের ন্যায়। লৌকিক জগতে,—এক জলের সহিত অপর জল মিশ্রিত হইলে লোকে বলে উভয় প্রকারের জল একীভূত হইয়া গিয়াছে; কিন্তু জল দুইটী ভিন্ন বস্তু বলিয়া একটী আর একটী হইয়া যাইতে পারে না; বস্তুতঃ একটী আর একটীর মধ্যেই প্রবেশ করে। এ-স্থলেও তদ্রূপ—মুক্তজীব ব্রহ্মে প্রবেশ করে, ব্রহ্ম হইয়া যায় না। এই বিষয়ে শ্রুতিপ্রমাণও আছে। যথা—

"যথোদকং শুদ্ধে শুদ্ধমাসিক্তং **তাদৃগেব** ভবতি। এবং মুনের্বিজানত আত্মা ভবতি গৌতম॥ কঠশ্রুতি॥২।১।১৫॥—শুদ্ধজল শুদ্ধজলে মিশিয়া যেমন **তৎসদৃশই** হয়, তদ্রূপ তত্ত্বজ্ঞ মুনির আত্মাও **তাদৃক়**—তাদৃশ—ব্রহ্মসদৃশ হয়।" ব্রহ্মে প্রবেশ করিয়া **তাদৃক**—তাদৃশ—ব্রহ্মসদৃশ—হয়।

স্কন্দ পুরাণও বলেন—

"উদকং তূদকে সিক্তং মিশ্রমেব যথা ভবেৎ।
তদ্বৈ তদেব ভবতি যতো বুদ্ধিঃ প্রবর্ত্ততে॥
এবমেব হি জীবোঽপি তাদাত্ম্যং পরমাত্মনা।
প্রাপ্তোঽপি নাসৌ ভবতি স্বাতন্ত্র্যাদিবিশেষণাৎ॥
ব্রহ্মেশানাদিভির্দেবৈর্যৎপ্রাপ্তুং নৈব শক্যতে।
তদ্‌যৎ স্বভাব-কৈবল্যং স ভবান্ কেবলো হরে॥ ইতীতি।

—জল জলে সিক্ত হইলে যেমন মিশ্রিতই হয়, অথচ লোকের বুদ্ধি মনে করে—তাহা (জল) তাহাই (জলই) হয়; তদ্রূপ জীবও পরমাত্মার সহিত তাদাত্ম্য (ব্রহ্মসাযুজ্য)-প্রাপ্ত হইলেও, স্বাতন্ত্র্যাদি-বিশেষণবশতঃ, ব্রহ্ম হয় না (অর্থাৎ ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্যাদি আছে, জীবের স্বাতন্ত্র্যাদি নাই, জীব পরমেশ্বর-ব্রহ্মের অধীন; সুতরাং, অস্বতন্ত্র জীব কখনও স্বতন্ত্র ব্রহ্ম হইতে পারে না)। ব্রহ্মা-শিবাদি দেবতাগণও (হরির অধীন বলিয়া) সেই স্বভাব-কৈবল্য লাভ করিতে অসমর্থ। হে হরে! কেবল তুমিই স্বভাব-কেবল।"

শ্রীপাদ রামানুজও ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রের শ্রীভাষ্য বলিয়াছেন—"নাপি সাধনানুষ্ঠানেন নির্মুক্তা-বিদ্যস্য পরেণ স্বরূপৈক্য-সম্ভবঃ অবিদ্যাশ্রয়ত্ব-যোগ্যস্য তদর্হত্বাসম্ভবাৎ—সাধনানুষ্ঠানের দ্বারা অবিদ্যা-নির্মুক্ত পুরুষের পক্ষেও পরব্রহ্মের সহিত স্বরূপৈক্য অসম্ভব। কেননা, অবিদ্যার আশ্রয়োপযোগী জীবের তদ্‌যোগ্যতা (ব্রহ্ম-স্বরূপৈক্যযোগ্যতা)-লাভ অসম্ভব।'" শ্রীপাদ রামানুজ এই বিষয়ে যুক্তিও প্রদর্শন করিয়াছেন। যথা, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় মুক্তজীবের ব্রহ্মধর্ম্ম-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে—

"ইদং জ্ঞানমুপাশ্রিত্য মম সাধর্ম্ম্যমমাগতাঃ।
সর্গেঽপি নোপজায়ন্তে প্রলয়ে ন ব্যথন্তি চ ॥১৪।২॥

—এই জ্ঞানকে আশ্রয় করিয়া যাঁহারা আমার সাধর্ম্ম্য লাভ করেন, তাঁহারা সৃষ্টিকালেও আর জন্মগ্রহণ করেন না, প্রলয়কালেও প্রলয়-দুঃখ ভোগ করেন না।"

শ্রীবিষ্ণুপুরাণও বলেন—

"তদ্ভাবভাবমাপন্নস্তদাসৌ পরমাত্মনা।
ভবত্যভেদী ভেদশ্চ তস্যাজ্ঞানকৃতো ভবেৎ ॥৬।৭।৯৩॥

—মুক্তাবস্থায় এই জীব তদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইয়া পরমাত্মার সহিত অভেদী হয়েন। ভেদ জীবের অজ্ঞানকৃত।"

এই শ্লোকের ব্যাখ্যায় শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—"ইতি মুক্তস্য স্বরূপমাহ। তদ্‌ভাবো ব্রহ্মণো ভাবঃ—স্বভাবঃ, ন তু স্বরূপৈক্যম্, তদ্ভাবভাবমাপন্ন ইতি দ্বিতীয়ভাবশব্দানন্বয়াৎ।—এই শ্লোকে মুক্তজীবের স্বরূপ বলা হইয়াছে। 'তদ্‌ভাব' অর্থ—ব্রহ্মের ভাব, ব্রহ্মের স্বরূপৈক্য নহে। "তদ্ভাব-ভাবমাপন্ন"-এই পদের অন্তর্গত দ্বিতীয় 'ভাব'-শব্দ যোগ না করিয়াই এই অর্থ করা হইল।

"ততস্তস্যৈব ভাবোঽপহতপাপ্মত্বাদিরূপঃ স্বভাবো যস্যেতি বহুব্রীহৌ তদ্ভাবভাবং ব্রহ্ম-স্বভাবকত্বমিত্যর্থঃ। ততস্তেন স্বভাবেনৈব পরমাত্মনা সহাভেদী তুল্যো ভবতীতি বিবক্ষিতম্। যতস্তৎ-স্বভাববিরোধী দেবমনুষ্যাদিলক্ষণো ভেদস্তস্যাজ্ঞানকৃত এবেতি।—পরমাত্মার ভাব বা স্বভাব হইতেছে অপহতপাপ্মত্বাদি। এই অপহত-পাপ্মত্বাদিরূপ স্বভাব যাঁহার, তিনি হইতেছেন 'তদ্ভাব'—বহুব্রীহিসমাস। তাঁহার ভাব—তদ্ভাবভাব—ব্রহ্মস্বভাবকত্ব—ইহাই হইতেছে "তদ্ভাবভাব"-শব্দের অর্থ। এই স্বভাবেই পরমাত্মার সহিত অভেদী—তুল্য হয়েন—ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায় (অর্থাৎ মুক্ত জীব অপহতপাপ্মত্বাদি ধর্ম্মে ব্রহ্মের তুল্য হয়েন—ইহাই হইতেছে "তদ্ভাবভাবমাপন্ন"-শব্দের তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম হয়েন না ; অপহতপাপ্মত্বাদি গুণে ব্রহ্মের তুল্য হয়েন, সাধর্ম্ম্য লাভ করেন)। সেই স্বভাব-বিরোধী দেব-মনুষ্যাদি-লক্ষণ যে ভেদ, তাহাই হইতেছে অজ্ঞানকৃত (অর্থাৎ অজ্ঞানবশতঃ জীবের অপহতপাপ্মত্বাদি গুণ যখন প্রচ্ছন্ন থাকে, তখনই জীব সংসারী হয় এবং সংসারে দেব-মনুষ্যাদি ভেদ প্রাপ্ত হয়)।"

এজন্যই "আবির্ভূতস্বরূপস্তু ॥১।৩।১৯॥"-এই ব্রহ্মসূত্রেও ('উত্তরাচ্চেদাবির্ভূতস্বরূপস্তু।"-এই সূত্রের তাৎপর্য্য এই অনুচ্ছেদে পূর্ব্বেই প্রকাশ করা হইয়াছে। এই সূত্রেও)—"এবমেবৈষ সম্প্রসাদোঽস্মাচ্ছরীরাৎ সমুত্থায় পরং জ্যোতিরুপসম্পদ্য স্বেন রূপেণাভিনিষ্পদ্যতে ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১২।৩॥—সম্যক্ প্রসন্ন সেই সুষুপ্ত জীবাত্মা এই স্থূল শরীর হইতে উত্থিত হইয়া পরজ্যোতিঃ পরমাত্মাকে প্রাপ্ত হইয়া স্ব-স্বরূপে পরিনিষ্পন্ন হয়েন।"—এই শ্রুতিবাক্যেও পরমাত্মা হইতে জীবাত্মার ভেদ প্রদর্শিত হইয়াছে। এই বিষয়ে আর একটী শ্রুতিবাক্যও আছে। যথা—"তদা বিদ্বান্

পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ মুণ্ডক ॥৩।১।৩॥—তখন পুণ্যপাপ বিধৌত করিয়া বিদ্বান্ এবং নিরঞ্জন হয়েন এবং পরম সাম্য প্রাপ্ত হয়েন।"

আবার শ্রীবিষ্ণুপুরাণও বলেন—

"আত্মভাবং নয়ত্যেনং তদ্ব্রহ্মধ্যায়িনং মুনে।
বিকার্য্যমাত্মনঃ শক্ত্যা লোহমাকর্ষকো যথা ॥ ৬।৭।৩০॥

—চুম্বক যেমন বিকার্য্য লৌহকে আকর্ষণ করে, তদ্রূপ ব্রহ্মও স্বীয় শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মানুধ্যায়ীকে আত্মভাব (স্বীয় স্বরূপে অস্তিত্ব-সংযোগ) প্রাপ্ত করান।"

এ-স্থলেও ভেদই অভিপ্রেত। যেহেতু, "আত্মভাবম্ আত্মনি অস্তিত্বসংযোগং নয়তি—ব্রহ্মধ্যায়ীকে স্বীয় শক্তিতে নিজের মধ্যে অস্তিত্ব-সংযোগ প্রাপ্ত করান।" এইরূপ অর্থ করিলেই চুম্বকের দৃষ্টান্তের সার্থকতা থাকে, একত্বে সার্থকতা থাকে না (চুম্বক যেমন লৌহকে আকর্ষণ করিয়া নিজের মধ্যে নিয়া থাকে, লৌহ যেমন আকর্ষক চুম্বক হইয়া যায় না, লৌহের যেমন পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে ; তদ্রূপ মুক্ত জীবও ব্রহ্ম হইয়া যায়েন না, ব্রহ্মের মধ্যে তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে)।

(১) এইরূপ সযুক্তিবাক্যের অবিরুদ্ধ বহু ভেদবাচক শ্রুতিবাক্য আছে বলিয়া **"ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি"**-এই শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মতাদাত্ম্যই বুঝিতে হইবে। জীব ব্রহ্মের স্বভাব প্রাপ্ত হয়েন, সাধর্ম্ম্য প্রাপ্ত হয়েন, কিন্তু ব্রহ্ম হয়েন না—ইহাই বুঝিতে হইবে

জীবসমূহের আকাশত্বাদি প্রাপ্তির কথা শুনা যায়। জীবের পক্ষে আকাশত্ব-প্রাপ্তি—আকাশ হইয়া যাওয়া—সম্ভবপর নহে। এসকল স্থলে আকাশত্ব-প্রাপ্তি বলিতে 'আকাশের ধর্ম্ম প্রাপ্তিই' বুঝিতে হইবে ; অর্থাৎ মুক্তজীব আকাশের ন্যায় অসঙ্গ, উদার ইত্যাদি হয়েন—ইহাই বুঝিতে হইবে।

খ। মুক্তোপসৃপ্যব্যপদেশাৎ ॥ ১।৩।২ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥

এই ব্রহ্মসূত্রের অর্থ এই যে— ব্রহ্ম হইতেছেন মুক্ত সাধুগণের উপসৃপ্য বা গতি। এইরূপ অর্থ করিলেই অক্লেশে অর্থসঙ্গতি হইতে পারে। এই সূত্রের মাধ্বভাষ্যে একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত হইয়াছে ; যথা—**"মুক্তানাং পরমা গতিঃ**—ব্রহ্ম হইতেছেন মুক্তদিগের পরমাগতি" ; এই শ্রুতিবাক্যও উল্লিখিত অর্থের সমর্থক। তৈত্তিরীয়-শ্রুতিতেও মুক্তাবস্থায় জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই বলা হইয়াছে। যথা—**"রসো বৈ সঃ, রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি** ॥ ২।৭।১ ॥—তিনি (ব্রহ্ম) রসস্বরূপ। এই রসস্বরূপকে লাভ করিয়াই জীব আনন্দী হয়।" সুতরাং জীব-ব্রহ্মের ভেদই স্বীকার্য্য।

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিও বলেন—

"অস্মান্মায়ী সৃজতে বিশ্বমেতত্তস্মিংশ্চান্যো মায়য়া সন্নিরুদ্ধঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৪।৯ ॥—

—ইহা হইতে মায়ী বিশ্বের সৃষ্টি করেন, সেই বিশ্বে অপর (অর্থাৎ জীব) মায়াদ্বারা সন্নিরুদ্ধ হয়।"

"জ্ঞাজ্ঞৌ দ্বাবজাবীশানীশৌ ॥শ্বেতাশ্বতর ॥ ১।৯ ॥

—উভয়ই অজ ; কিন্তু এক জন (ঈশ্বর)—জ্ঞ (**সর্ব্বজ্ঞ**), **অপর জন** (**জীব**) অজ্ঞ (অল্পজ্ঞ) একজন ঈশ্বর, অপর জন অনীশ্বর।"

"নিত্যোনিত্যানাং চেতনশ্চেতনানামেকো বহূনাং যো বিদধাতি কামান্ ॥শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।১৩ ॥

—(সেই ঈশ্বর) নিত্যসমূহেরও নিত্য, চেতনসমূহেরও চেতন, বহুর মধ্যে তিনি এক। তিনি কামসকলের বিধান করেন।"

"অজো হ্যেকো জুষমাণোঽনুশেতে, জহাত্যেনাং ভুক্তভোগানজোঽন্যঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৪।৫ ॥

—একটী অজ (জীব) কর্ম্মফল ভোগ করেন, অপর অজ (পরমাত্মা) ভুক্ত-ভোগ ত্যাগ করেন।"

মুণ্ডক-শ্রুতি বলেন—**"তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি** ॥ ৩।১।১ ॥

—(একই বৃক্ষে দুইটী পক্ষী) তাহাদের একটী (জীবাত্মা) স্বাদু কর্ম্মফল ভক্ষণ করেন (অন্যটী ভক্ষণ না করিয়া উদাসীন ভাবে চাহিয়া থাকেন)।"

এই সমস্ত শ্রুতিবাক্যে জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই বলা হইয়াছে।

গীতোপনিষৎও বলেন—

"ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ।
অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ গীতা ॥ ৭।৪ ॥
অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্।
জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ গীতা ॥ ৭।৫ ॥

—ভূমি, জল, অগ্নি, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি ও অহঙ্কার—এই আট প্রকারে আমার প্রকৃতি (বহিরঙ্গা মায়া) বিভক্ত হইয়াছে। হে মহাবাহো ! এই আট প্রকারে বিভক্তা প্রকৃতি (জড়রূপা ও ভোগ্যা বলিয়া) অপরা (নিকৃষ্টা); কিন্তু ইহা হইতে উৎকৃষ্টা জীবরূপা আমার অপর একটী প্রকৃতি (শক্তি) আছে—তাহা অবগত হও। এই জীবরূপা শক্তি এই জগৎ ধারণ করিয়া বিরাজিত।"

"মম যোনির্মহদ্ ব্রহ্ম তস্মিন্ গর্ভং দধাম্যহম্ ॥ গীতা ॥ ১৪।৩ ॥

—মহদ্ব্রহ্ম (প্রকৃতি) আমার যোনি-স্বরূপ, আমি তাহাতে গর্ভাধান করি। (অর্থাৎ প্রলয়ে আমাতে লীন জীবাত্মাকে প্রকৃতিতে নিক্ষেপ করি)।"

"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি।
ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢ়ানি মায়য়া ॥ গীতা ॥ ১৮।৬১॥

—হে অর্জ্জুন ! ঈশ্বর সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন এবং যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়াদ্বারা তাহাদিগকে ভ্রমণ করাইতেছেন।"

এই সকল গীতাবাক্য হইতেও জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই জানা যাইতেছে।

দ। **বিশেষণাচ্চ ॥ ১।২।১২ ॥ ব্রহ্মসূত্রের** মাধ্বভাষ্যে যে সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, সে-সমস্ত হইতেও জীব-ব্রহ্মের ভেদের কথাই জানা যায়। যথা—

"সত্য আত্মা সত্যো জীবঃ সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা সত্যং ভিদা মৈবারুণ্যো মৈবরুণ্যো মৈবারুণ্যঃ ॥ পৈঙ্গীশ্রুতিঃ ॥

—আত্মা সত্য, জীব সত্য, ভেদ সত্য-ইত্যাদি।"

"আত্মা হি পরমস্বতন্ত্রোঽধিকগুণো জীবোঽল্পশক্তিরস্বতন্ত্রোঽবরঃ ॥ভাল্লবেয়-শ্রুতি ॥

—আত্মা (পরমাত্মা বা ব্রহ্ম) পরম-স্বতন্ত্র এবং অধিকগুণযুক্ত ; জীব অল্পশক্তি, অস্বতন্ত্র এবং ক্ষুদ্র।"

উক্ত সূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত স্মৃতিবচন-যথা,

"যথেশ্বরস্য জীবস্য ভেদো সত্যো বিনিশ্চয়াৎ।
এবমেব হি মে বাচং সত্যাং কর্ত্তুমিহার্হসি ॥

—জীব ও ঈশ্বরের ভেদ যেমন সত্যরূপে দৃঢ় নিশ্চয় করা হইয়াছে, আমার বাক্যকেও তদ্রূপ সত্য করুন।"

এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতেও জীবব্রহ্মের ভেদের কথা জানা যায়।

ধ। অভেদবাক্যের তাৎপর্য্য

শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে যে জীব-ব্রহ্মের অভেদের কথা বলা হইয়াছে, উপাসনাবিশেষের নিমিত্ত (সাযুজ্যকামীদের উপাসনার জন্য) চিদ্রূপত্বাংশে যে জীব-ব্রহ্মের একাকারত্ব আছে, তাহা জানাইবার নিমিত্তই অভেদের উল্লেখ ; বস্তুর ঐক্য সে-সমস্ত অভেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য নহে।

জীব-ব্রহ্মের ভেদ শাস্ত্রসম্মত হওয়া সত্ত্বেও স্থলবিশেষে যে অভেদের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাতে যে কোনওরূপ অসামঞ্জস্য নাই, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার পরমাত্ম-সন্দর্ভে তৎসম্বন্ধে যে যুক্তি প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহা এই :—

"তদেবং শক্তিত্বে সিদ্ধে শক্তি-শক্তিমতোঃ পরস্পরানুপ্রবেশাৎ শক্তিমদ্ব্যতিরেকে শক্তিব্যতিরেকাৎ চিত্ত্বাবিশেষাচ্চ ক্বচিদভেদ-নির্দ্দেশ একস্মিন্নপি বস্তুনি শক্তি-বৈবিধ্যদর্শনাদ্ ভেদ-নির্দ্দেশশ্চ নাসমঞ্জসঃ ॥ ৩৭-অনুচ্ছেদ ॥ শ্রীমৎ পুরীদাসমহাশয়ের সংস্করণ ॥

—এইরূপে জীবাত্মার ভগবৎ-শক্তিত্ব সিদ্ধ হওয়ায়, শক্তি ও শক্তিমানের পরস্পরের অনুপ্রবেশ-নিবন্ধন, শক্তিমানের ব্যতিরেকে শক্তিরও ব্যতিরেক নিবন্ধন, জীব এবং পরমাত্মা চিদংশে অভিন্ন বলিয়া একই বস্তুতে কখনও অভেদ-নির্দ্দেশ, আবার কখনও বা শক্তির বিবিধতার প্রতি লক্ষ্য করিয়া ভেদ-নির্দ্দেশে অসামঞ্জস্য কিছু নাই।"

তাৎপর্য্য এইরূপ। শাস্ত্রপ্রমাণের দ্বারা শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন—জীবাত্মা হইতেছে

ভগবান্ পরব্রহ্মের শক্তি। আবার "পরস্পরানুপ্রবেশাত্তত্ত্বানাং পুরুষর্ভ ॥ শ্রীভা, ১১।২২।৭-॥"-প্রমাণবলে তিনি দেখাইয়াছেন—জীবশক্তি ও ভগবান্ পরমাত্মা-এই উভয়ের পরস্পর অনুপ্রবেশ আছে। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমান্ পরস্পর হইতে অবিচ্ছেদ্য। এই অবিচ্ছেদ্যত্বের প্রতি দৃষ্টি করিলে জীবশক্তি ও তাহার শক্তিমান্ পরব্রহ্ম ভগবান্ এই উভয়ের অভেদ বলা যায়। আবার, শক্তি যখন শক্তিমানের স্বাভাবিকী, তখন শক্তিমান্ ব্যতীত শক্তি থাকিতে পারেনা; এই বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি করিলেও শক্তি ও শক্তিমানের অভেদ বলা যায়। আবার, পরব্রহ্ম ভগবান্ চিৎস্বরূপ; তাঁহার জীবশক্তিও চিদ্রূপা। এই চিত্ত্বাংশেও উভয়ের মধ্যে অভেদ। এই সমস্ত কারণেই কোনও কোনও স্থলে শাস্ত্র জীব-ব্রহ্মের অভেদের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু জীব এবং ব্রহ্ম যে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন—তাহা ঐ-সমস্ত অভেদ-বাক্যের তাৎপর্য্য নহে; চিত্ত্বাংশাদিতে অভিন্নতাই তাহার তাৎপর্য্য। আবার একই বস্তুতে শক্তির বৈবিধ্য দৃষ্ট হয় বলিয়া—শক্তিমদ্ বস্তু এক, কিন্তু তাহার শক্তি বা শক্তির বৈচিত্র্য বহু বলিয়া—শক্তিমান্ হইতে শক্তির ভেদও বলা হয়। কিন্তু তাহাতে অসামঞ্জস্য কিছু নাই। এক এবং অভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই যদি ভেদ এবং অভেদ বলা হইত, তাহা হইলে অসামঞ্জস্যের প্রসঙ্গ উত্থিত হইত। এ-স্থলে এক এবং অভিন্ন অবস্থার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ভেদ ও অভেদ বলা হয় নাই। সুতরাং অসামঞ্জস্যের প্রসঙ্গও উত্থিত হয় না।

ন। তত্ত্বমসি-বাক্য

যাহা হউক, ইহার পরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"কেহ কেহ যমুনা নির্ঝরকে উদ্দেশ্য করিয়া বলেন—'তুমি কৃষ্ণপত্নী।' অর্থাৎ কেহ কেহ যমুনানদীকেই কৃষ্ণপত্নী বলেন। আবার, সূর্য্যমণ্ডলকে উদ্দেশ্য করিয়াও বলা হয়—"হে সূর্য্য! তুমি ছায়ার পতি।" সূর্য্যকে ছায়ার পতি বলা হয়—ইহা অতি প্রসিদ্ধ। এ-সকল স্থলে অধিষ্ঠাতা ও অধিষ্ঠেয়ের অভেদ-বিবক্ষাতেই এইরূপ বলা হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত বাক্যে "যমুনানির্ঝর"-শব্দে "যমুনানদীকে" না বুঝাইয়া "যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকেই" বুঝাইতেছে। যমুনানদী কৃষ্ণপত্নী নহেন, যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীই কৃষ্ণপত্নী। অথচ যে শব্দটী দ্বারা যমুনানদীর প্রতীতি জন্মিতে পারে, সেই শব্দদ্বারাই যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে জানান হইয়াছে। বৈদিকী ও লৌকিকী ভাষায় এই জাতীয় প্রয়োগ বহুস্থলে দৃষ্ট হয়। কিন্তু যমুনা-শব্দে এইরূপ স্থলে যমুনানদীকে না বুঝাইয়া যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবীকে বুঝাইলেও—যেহেতু একই 'যমুনা'-শব্দদ্বারা যখন যমুনানদী এবং যমুনা-নদীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী উভয়কেই বুঝাইতে পারে, সেই হেতু—যমুনানদী ও যমুনার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এক এবং অভিন্ন, ইহা বলা সঙ্গত হইবে না। যমুনানদী ও তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী ভিন্ন বস্তু

ছান্দোগ্য-প্রোক্ত **তত্ত্বমসি** ॥ (৬।৮।৭॥)-বাক্যেরও উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্য বুঝিতে হইবে। এই বাক্যে জানান হইয়াছে যে—পৃথিবী-জীব-প্রভৃতি হইতেছে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, ব্রহ্ম তাহাদের অধিষ্ঠাতা (যেমন যমুনানদীর অধিধষ্ঠাতা হইতেছে তাহার অধিষ্ঠাত্রী দেবী এবং যমুনা নদী হইতেছে

সেই দেবীর অধিষ্ঠান। তদ্রূপ ব্রহ্ম হইতেছেন পৃথিবী-জীব-প্রভৃতির অধিষ্ঠাতা এবং পৃথিবী-জীবাদি হইতেছে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান—ইহাই তত্ত্বমসি-বাক্যের তাৎপর্য্য)। পৃথিব্যাদি যে ব্রহ্মের অধিষ্ঠান, "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ (বৃহদারণ্যক ॥ ৩।৭।৩)", "যঃ আত্মনি তিষ্ঠন্ (শতপথ ব্রাহ্মণ ॥ ১৪।৬।৭।৩০)"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। ইহা হইতেও জানা গেল—ব্রহ্মের অধিষ্ঠান জীব এবং ব্রহ্ম এক বস্তু নহে। (ঘৃত এবং ঘৃতপাত্র—এক বস্তু নহে। অথচ, ঘৃত আনিতে বলা হইলে ঘৃতপাত্র আনা হয়। এ-স্থলেও অধিষ্ঠান ও অধিষ্ঠেয় একই শব্দে অভিহিত হয়; কিন্তু তাহারা ভিন্ন বস্তু)।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তত্ত্বমসি-বাক্য সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজের উক্তিও উদ্ধৃত করিয়াছেন। ১।১।১ ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যে যে সামানাধিকরণ্য দৃষ্ট হয়, তাহা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত জীবের ঐক্যজ্ঞাপক নহে। 'তৎ' এবং 'ত্বং' পদদ্বয় সবিশেষ ব্রহ্মেরই অভিধায়ক। 'তৎ'-পদে সর্ব্বজ্ঞ সত্যসঙ্কল্প জগৎ-কারণ ব্রহ্মকে বুঝায়; কেননা 'তদৈক্ষত বহু স্যাম্—তিনি সঙ্কল্প করিলেন, বহু হইব' এই প্রকরণেই ঐ বাক্য কথিত হইয়াছে। আর, 'ত্বম্'-পদে চিদচিদ্‌বিশিষ্ট-জীবশরীরক ব্রহ্মকেই বুঝায়। সামানাধিকরণ্য হইতেছে প্রকারদ্বয়াবস্থিত একবস্তুপর—অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যস্থলে এক বস্তুরই ভিন্ন-ভিন্ন-প্রকারদ্যোতক পদের বিন্যাস থাকা প্রয়োজনীয়। সামানাধিকরণ্যের প্রকারদ্বয় পরিত্যাগ করিলে প্রবৃত্তি-নিমিত্ত ভেদই অসম্ভব হইয়া পড়ে—তাহাতে সামানাধিকরণ্যই পরিত্যক্ত হয়।

[শ্রীপাদ শঙ্কর তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিতে যাইয়া 'তৎ' ও 'ত্বম্' পদদ্বয়ের শোধন করিয়া—অর্থাৎ এই পদদ্বয়ের যে স্বাভাবিক অর্থ (যাহা শ্রীপাদ রামানুজের উক্তিতে পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে,) তাহাকে পরিত্যাগ করিয়া উভয় পদেরই অর্থ করিয়াছেন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। শ্রীপাদ রামানুজ বলিতেছেন—ইহাতে সামানাধিকরণ্যই আর থাকিতে পারে না। কেন না, যেস্থলে বিভিন্ন পদ বিভিন্ন অর্থ জ্ঞাপন করিলেও তাহাদের গতি একই বস্তুর প্রতি হয়, সে-স্থলেই সামানাধিকরণ্য গ্রহণ করা যায়। 'তৎ' ও 'ত্বম্' এই পদদ্বয়ের প্রত্যেকটীই যদি একই নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মকে বুঝায়, তাহা হইলে তাহারা বিভিন্নার্থদ্যোতক না হওয়ায় সামানাধিকরণ্যের বিষয় হইতে পারে না। অথচ শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—সামানাধিকরণ্যেই তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিতে হইবে। সামানাধিকরণ্যের কথা বলিয়াও শ্রীপাদ শঙ্কর লক্ষণাবৃত্তিতেই তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিয়াছেন। কিন্তু শাস্ত্রানুসারে মুখ্যার্থের সঙ্গতি থাকিলে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করা অবিধেয়। 'তৎ' ও 'ত্বম্'-এই পদদ্বয়ের বাস্তবিক মুখ্যার্থের অসঙ্গতি নাই (২।৪৯ এবং ২।৫১-ঘ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যাহা হউক, শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন—'সোঽয়ং দেবদত্তঃ'-এস্থলে যেমন লক্ষণাবৃত্তিতে অর্থ করিতে হয়, তেমনি তত্ত্বমসি-বাক্যেরও লক্ষণা-বৃত্তিতেই অর্থ করিতে হইবে। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন]—

"সোঽয়ং দেবদত্তঃ—সেই এই দেবদত্ত" এ-স্থলেও লক্ষণার প্রয়োজন নাই। কেননা, অতীত

সময়ে যে দেবদত্তকে দেখিয়াছি, এখনও তাহাকেই দেখিতেছি ; সুতরাং দেবদত্ত সম্বন্ধে ঐক্যপ্রতীতির কোনও বিরোধ নাই। (তাৎপর্য্যের অনুপপত্তি বা বিরোধ হইলেই মুখ্য অর্থ ত্যাগ করিয়া লক্ষণা গ্রহণ করিতে হয়। পূর্ব্বে কোনও স্থানে দেবদত্তকে দেখিয়াছিলাম, এখন তাহাকে এখানে দেখিতেছি। দেশ-ভেদ-বিরোধ কালভেদে পরিহৃত হইয়াছে। কিন্তু দেবদত্ত একব্যক্তি। ভিন্ন ভিন্ন সময়ে তাহাকে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে দেখা গিয়াছে বটে, কিন্তু তাহাতে ব্যক্তি ভিন্ন ভিন্ন হইয়া যায় নাই। ইহাতে মুখ্যার্থের কোনও হানি হয় না ; সুতরাং লক্ষণা-গ্রহণেরও প্রয়োজন নাই। মায়াবাদীরা বলেন—"সোঽয়ং দেবদত্তঃ" এই বাক্যে "সঃ"-শব্দে পূর্ব্বদৃষ্ট অতীত-কালীয় ব্যক্তিকে বুঝায় ; আর "অয়ং"-শব্দে বর্ত্তমান প্রত্যক্ষগোচর ব্যক্তিকে বুঝায়। অতীতদৃষ্ট ও বর্ত্তমানদৃষ্ট বস্তু সামানাধিকরণ্যে উপস্থাপিত হইতে পারে না ; কিন্তু দৃষ্ট বস্তু একই পদার্থ। এজন্য পূর্ব্বদৃষ্টতা ও পরদৃষ্টতা ধর্ম্মকে ত্যাগ করিয়া লক্ষণাদ্বারা এ-স্থলে কেবল দেবদত্ত-মাত্রেরই অর্থ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। "তৎ ত্বম্ অসি"-বাক্যের অন্তর্গত "তৎ" ও "ত্বম্"-এই প্রকারদ্বয়ের মুখ্য অর্থ বিরুদ্ধ হয় বলিয়া মায়াবাদীরা এই বাক্যের লক্ষণা-অর্থে নির্ব্বিশেষ চৈতন্যমাত্র গ্রহণ করেন। শ্রীপাদ রামানুজ তাহারই প্রতিবাদ করিয়াছেন। বস্তুতঃ "সোঽয়ং দেবদত্তঃ"-বাক্যে পূর্ব্বদৃষ্টত্ব ও পরদৃষ্টতা—এই প্রকার-দ্বয় স্বীকার করিলেই সামানাধিকরণ্য সম্ভব হইতে পারে, উক্ত প্রকারদ্বয় স্বীকার না করিলে প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ভেদ থাকে না বলিয়া সামানাধিকরণ্যের অবকাশই থাকে না। তদ্রূপ, "তৎ ত্বম্ অসি"-বাক্যেও "তৎ" ও ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থদ্বারা সূচিত প্রকারদ্বয় স্বীকার না করিলে সামানাধিকরণ্যই পরিহৃত হয়। শ্রীপাদ শঙ্কর সামানাধিকরণ্যে সর্ব্বতোভাবে ঐক্যই মনে করেন ; তাই তাঁহাকে লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হইয়াছে ; কেননা, লক্ষণার আশ্রয় গ্রহণ না করিলে "তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ের মুখ্যার্থকে ত্যাগ করা যায় না এবং মুখ্যার্থ পরিত্যক্ত না হইলেও সর্ব্বতোভাবে ঐক্য স্থাপিত হইতে পারে না। কিন্তু সামানাধিকরণ্যে বস্তুতঃ ঐক্য বুঝায় না ; কেননা, তাহাতে সামানাধিকরণ্যের অপরিহার্য্য বস্তু প্রবৃত্তি-নিবৃত্তি-ভেদই থাকে না।)

"তৎ ত্বম্ অসি"-বাক্যে লক্ষণা-অর্থ গ্রহণ করিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে ছান্দোগ্য-শ্রুতির "তদৈক্ষত বহু স্যাম্ (৬।২।৩)" এই উপক্রম-বাক্যের সহিতই বিরোধ উপস্থিত হয়। তাহাতে আবার "এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও" অসম্ভব হইয়া পড়ে এবং জ্ঞানস্বরূপ, নিখিল-দোষবিহীন, সর্ব্বজ্ঞ, সমস্ত কল্যাণগুণাত্মক পরব্রহ্মে অজ্ঞানের আশ্রয়ত্বরূপ এবং অজ্ঞানজনিত অনন্ত অপুরুষার্থের আশ্রয়ত্বরূপ দোষের প্রসঙ্গও উপস্থিত হয়।

যদি বলা যায়—"তৎ" ও "ত্বম্" পদদ্বয়ে যে সামানাধিকরণ্য আছে, তাহা ঐক্যার্থক নহে—পরন্তু বাধার্থক, তাহা হইলেও সামানাধিকরণ্যস্থিত উক্ত পদদ্বয়ের অধিষ্ঠান-লক্ষণা এবং নিবৃত্তি-লক্ষণা প্রভৃতি দোষ ঘটে (অর্থাৎ সামানাধিকরণ্যভাব বাধিত বা অসঙ্গত হইলে "তৎ-পদের অধিষ্ঠান চৈতন্য-পরব্রহ্মে একটি লক্ষণা করিতে হয় এবং জীবের জীবত্ব-নিবৃত্তিদ্যোতক "ত্বম্"-পদে আর একটী লক্ষণা

করিতে হয়। এইরূপ লক্ষণার ফলে জীবের জীবত্ব-নিবৃত্তিতেই উহা স্বীয় অধিষ্ঠানক্ষেত্র ব্রহ্ম-চৈতন্যের সহিত এক হয়। এইরূপে দুই পদে লক্ষণা করিতে গেলে উপক্রম-বিরোধ-দোষ এবং শ্রুতিবিরোধ প্রভৃতি বহু দোষ ঘটে)। বাধার্থ ধরিলেও পূর্ব্বোক্ত দোষ থাকিয়াই যায়।

তবে কথিত বাধপক্ষে এইমাত্র বিশেষ যে—পূর্ব্বে যে সমস্ত দোষ প্রদর্শিত হইয়াছে, সে-সমস্ত তো থাকিয়াই যায়, তদুপরি—আরও দুইটী দোষ আসিয়া উপস্থিত হয়। প্রথম দোষ—শুক্তিতে রজতের ভ্রম হয়, সে-স্থলে পরীক্ষাকালে রজত মিলে না। এই কারণে বাধ্য হইয়া সে-স্থলে "নেদং রজতম্—ইহা রজত নহে" বলিয়া রজতের "বাধ—মিথ্যাত্ব" স্বীকার করিতে হয়; কিন্তু "তৎ ত্বম্ অসি"-বাক্যে সেরূপ কিছুমাত্র অনুপপত্তি বা বাধক প্রমাণ না থাকিলেও (কেবল স্বীয় সিদ্ধান্ত রক্ষার্থ) নিরুপায় হইয়া "বাধ" কল্পনা করিতে হয়।

দ্বিতীয় দোষ—"তৎ"-পদে যখন প্রথমেই কেবল অধিষ্ঠান-চৈতন্যমাত্র বুঝাইতেছে, তদতিরিক্ত আর কিছুমাত্র বুঝাইতেছে না, তখন বিরোধী কোনও বস্তুর উপস্থিতি বা সদ্ভাব না থাকায় এ-পক্ষে বাধ বা পরিত্যাগ করা হইবে কাহার? সুতরাং বাধেরও উপপত্তি হয় না।

(তাৎপর্য্য এই :—"শুক্তিই রজত"-এস্থলে প্রত্যক্ষ প্রমাণেই বুঝা যায়-"ইহা রজত নহে" অর্থাৎ রজতের বাধ বা মিথ্যাত্ব প্রত্যক্ষ প্রমাণেই বুঝিতে পারা যায়; সুতরাং বাধ-কল্পনা আবশ্যক হয়। কিন্তু "তৎ ত্বম্ অসি"-বাক্যে সেইরূপ বাধ প্রত্যক্ষ প্রমাণে বুঝা যায় না; তথাপি যেন দায়ে পড়িয়া বাধ স্বীকার করিতে হয়। আবার, "শুক্তিই রজত"-এস্থলে শুক্তিত্বরূপ বিরুদ্ধ—রজত-বিরুদ্ধ—ধর্ম্মটী "শুক্তি"-শব্দই জানাইয়া দেয়; অর্থাৎ শুক্তি যে রজত নহে, শুক্তি-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়। কিন্তু "তৎ ত্বম্ অসি"-স্থলে "তৎ"-পদে কেবলমাত্র অধিষ্ঠান-চৈতন্যের লক্ষণ করায় শুক্তিত্বের ন্যায় কোনও বিরুদ্ধ ধর্ম্মের উপস্থিতি না থাকায় বাধ-কল্পনা অসঙ্গত হইয়া পড়ে)।

যদি বলা যায়—অধিষ্ঠান-চৈতন্যটী প্রথমে অজ্ঞানে আবৃত থাকে; পরে "তৎ"-পদে তাহার প্রকৃত স্বরূপটী উদ্‌ঘাটিত করিয়া দেয়। ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—না, তাহাও বলা সঙ্গত হয় না। কেননা, বাধের পূর্ব্বে ভ্রমাধিষ্ঠানের স্বরূপটী অপ্রকাশিত বা অবিজ্ঞাত থাকিলে তাহাকে আশ্রয় করিয়া ভ্রমও হইতে পারে না, বাধও হইতে পারে না। আর যদি বলা যায়—ভ্রমের আশ্রয়ীভূত অধিষ্ঠানটী আবৃত থাকে না, কিন্তু বাধের অধিষ্ঠানই আবৃত থাকে, তাহা হইলে বলা হইতেছে যে—অধিষ্ঠানের স্বরূপটী যখন ভ্রমের বিরোধী, তখন সেই অধিষ্ঠানের স্বরূপটী প্রকাশমান বা প্রতীতি-গোচর থাকিলে, সেই অধিষ্ঠানকেই অবলম্বন করিয়া ভ্রম বা বাধ কিছুই তো হইতে পারে না। অতএব, ঐ বাক্যে অধিষ্ঠানাতিরিক্ত কোনও ধর্ম্ম স্বীকার না করিলে এবং সেই ধর্ম্মের তিরোধান বা আবরণ স্বীকার না করিলে ভ্রান্তি বাধ উৎপাদন দুরূহ হইয়া পড়ে। এ-বিষয়ে একটী দৃষ্টান্ত প্রদর্শিত হইতেছে। ভ্রমের আশ্রয়ীভূত কোনও এক রাজপুরুষে যদি কেবল পুরুষগত আকার বা

আকৃতিমাত্রের জ্ঞান থাকে, কিন্তু তদতিরিক্ত তাঁহার রাজপুরুষত্বের দ্যোতক কোনও লক্ষণ তাঁহাতে দৃষ্ট না হয়, এবং তিনি যদি এই অবস্থায় ধনুর্ব্বাণ হাতে করিয়া কোনও বনে দাঁড়াইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাকে দেখিলে ব্যাধ বলিয়া ভ্রম জন্মিতে পারে। যদি কেহ বলিয়া দেয় যে—"ইনি রাজা", তাহা হইলে ব্যাধ-ভ্রান্তি দূরীভূত হইতে পারে; কিন্তু যদি বলা হয়--"ইনি একজন পুরুষ বা মনুষ্য", তাহা হইলে ব্যাধ-ভ্রান্তি অপসারিত হইতে পারে না—অর্থাৎ অধিষ্ঠানমাত্রের উপদেশে ভ্রমের নিবৃত্তি হয় না। কেননা, তাঁহার পুরুষাকারে যে ভ্রমাধিষ্ঠানভাব, তাহা তখনও প্রকাশমানই ছিল; সুতরাং তদ্বিষয়ে আর উপদেশেরও আবশ্যক হয় না, কেহ তদ্রূপ উপদেশ দিলেও তাহা ভ্রম-নিবারক হয় না।

শ্রীপাদ রামানুজ ইহার পরে বলিয়াছেনঃ—প্রকৃতপক্ষে, জীব যাঁহার শরীর এবং জগতের যিনি কারণ, "তৎ" ও "ত্বম্" পদ সেই ব্রহ্মবোধক হইলে ঐ পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সঙ্গত হয় এবং ঐরূপ দ্বিবিধ-বিশেষভাব-সম্পন্ন একই ব্রহ্ম-প্রতিপাদনে তাৎপর্য্য স্বীকার করিলে ঐ পদদ্বয়ের সামানাধিকরণ্যও সুসঙ্গত হইতে পারে। আর, সর্ব্বদোষ-বিবর্জ্জিত এবং সমস্ত-কল্যাণগুণাত্মক ব্রহ্মের যে আরও একটী ঐশ্বর্য্য আছে, যাহার নাম হইতেছে জীবান্তর্য্যামিত্ব, তাহাও ঐ কথায় প্রতিপাদিত হইতে পারে। এইরূপ অর্থ করিলে ঐ প্রকরণের উপক্রম বা আরম্ভটীও সুসঙ্গত হয়, এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ব-বিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও সিদ্ধ হয়। সূক্ষ্ম চিৎ-জড়বস্তুনিচয় যেরূপ ব্রহ্মশরীর, স্থূল চিৎ-জড়বস্তুসমষ্টিও তদ্রূপ ব্রহ্মশরীর; স্থূলভাগ ঐ সূক্ষ্মভাগ হইতেই সমুৎপন্ন—সূক্ষ্মভাগেরই কার্য্য; সুতরাং কার্য্য-কারণভাব এবং এবং পরস্পরত্বাদি-বোধক—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ (শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।৭)। পরাঽস্যশক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে (শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।৮)।—তিনি ঈশ্বর সমূহেরও পরম-মহেশ্বর। তাঁহার বিবিধ পরাশক্তির কথা শ্রুত হয়।", "অপহতপাপ্মা * * * সত্যকামঃ সত্যসঙ্কল্পঃ (ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৬)॥ —তিনি পাপনির্মুক্ত * * সত্যকাম, সত্যসঙ্কল্প"-ইত্যাদি পরাপরত্বাদি-বোধক অন্যান্য শ্রুতিবাক্যের সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—লক্ষণাবৃত্তির আশ্রয়ে তত্ত্বমসি-বাক্যের অর্থ করিয়া মায়াবাদীরা যে অভেদ প্রদর্শন করেন, তাহা অসঙ্গত—তত্ত্বমসি-বাক্যে লক্ষণার আশ্রয়-গ্রহণও অসঙ্গত এবং জীব-ব্রহ্মের অভেদও অসঙ্গত।

উপসংহারে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"**তস্মান্নাভেদবাদঃ সঙ্গচ্ছতে**—অভেদ-বাদের কোনও সঙ্গতি নাই।"

শ্রীপাদজীবগোস্বামিকর্তৃক অভেদবাদ-খণ্ডনের তাৎপর্য হইতেছে এই যে—অভেদ-বাদীরা যে বলেন, ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ হইতেছেঅভেদ-সমন্ধ, তাহা যুক্তিসঙ্গতও নহে এবং শাস্ত্রসম্মতও নহে।

১৭। ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে ভাবে অভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে তাহা প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের উক্তির উল্লেখ করিয়া তিনি শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যের ঔপচারিক ভেদাভেদবাদেরও খণ্ডন করিয়াছেন। (১)

ঔপচারিক ভেদাভেদবাদ-সম্বন্ধে ১।১।১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—(ঔপচারিক) ভেদাভেদবাদে ব্রহ্মেই যখন উপাধি-সম্বন্ধ স্বীকৃত হয় এবং এই উপাধিসম্বন্ধবশতঃই যখন ব্রহ্মের জীবত্ব স্বীকৃত হয়, তখন জীবগত দোষাদিও ব্রহ্মেই সংক্রামিত হয় বলিয়া স্বীকার করা হয়। ইহা নিতান্ত অসঙ্গত। সুতরাং নিখিল-দোষবিরহিত অশেষ-কল্যাণ-গুণাত্মক ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদ উপদেশ অবশ্যই পরিত্যজ্য।

১৮। স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য হইতেছেন স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদী। এ-স্থলেও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীপাদ রামানুজের উক্তির উল্লেখ করিয়াই স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদের খণ্ডন করিয়াছেন। (২)

স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদেও ব্রহ্মের স্বতঃই জীবভাব স্বীকৃত হওয়ায় গুণবৎ জীবের দোষগুলিও ব্রহ্মের পক্ষে স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়ায়। শুদ্ধ ব্রহ্মের সহিত সদোষ-জীবের তাদাত্ম্য বা অভেদ অসম্ভব। সুতরাং স্বাভাবিক-ভেদাভেদবাদ অসঙ্গত।

১৯। কেবল ভেদবাদ-সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য কেবল-ভেদবাদী। শ্রীপাদ রামানুজের উক্তির অনুসরণে শ্রীজীবপাদ কেবল-ভেদবাদ-সম্বন্ধে বলিয়াছেন—

কেবল-ভেদবাদীদিগের মতে ব্রহ্ম এবং জীব ও জগৎ অত্যন্ত ভিন্ন। সুতরাং তাঁহাদের

---

(১) শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বা শ্রীপাদ রামানুজ কেহই এ-স্থলে শ্রীপাদ ভাস্করের নাম উল্লেখ করেন নাই। তাঁহারা "ঔপচারিক"-শব্দটীরও উল্লেখ করেন নাই, কেবল "ভেদাভেদ-বাদই" বলিয়াছেন। কিন্তু এই সঙ্গেই পরে যখন স্পষ্টভাবে "স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ" কথার উল্লেখ করিয়া তাহার খণ্ডন করিয়াছেন, তখন এ-স্থলে "ঔপচারিক ভেদাভেদবাদই" তাঁহাদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় এবং এই ঔপচারিক ভেদাভেদ-বাদের সঙ্গে শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্যের নামই বিজড়িত।

(২) এস্থলেও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বা শ্রীপাদ রামানুজ শ্রীপাদ নির্ম্বার্কের নাম উল্লেখ করেন নাই।

মতানুসারে কোনও প্রকারেই জীব-জগতের ব্রহ্মাত্মকত্ব সম্ভবপর নহে ; অথচ শ্রুতিতে জীব-জগতের ব্রহ্মাত্ম-ভাব উপদিষ্ট হইয়াছে। কেবল-ভেদবাদ স্বীকার করিলে সর্ব্ব-বেদান্তই পরিত্যক্ত হয়। ইহা বেদান্ত-বিরোধী।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—গৌতম, কণাদ, জৈমিনি, কপিল এবং পতঞ্জলও ভেদবাদী।

২০। শ্রীপাদ রামানুজের বিশিষ্টাদ্বৈতবাদ

অপর পক্ষে যাঁহারা (বিশিষ্টাদ্বৈতবাদীরা) সমস্ত উপনিষৎ-প্রসিদ্ধ সমস্ত বস্তুকে ব্রহ্মশরীর স্বীকার করেন, তাঁহাদের ব্যাখ্যাত ব্রহ্মাত্মবোধক উপদেশসমূহ সম্যক্‌রূপেই উপপন্ন হয়। মনুষ্যাদি জাতি এবং শুক্লাদি গুণসমূহ যেরূপ বিশেষণ হইয়া থাকে, তদ্রূপ দ্রব্যসমূহও শরীররূপে আত্মার বিশেষণ হইতে পারে ; হইতে পারে বলিয়াই "পুরুষ (আত্মা) স্বীয় কর্ম্মদ্বারা গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা হইয়াছে" ইত্যাদি সামানাধিকরণ্য-ঘটিত প্রয়োগগুলি—কি লোকব্যবহারে, কি বেদপ্রয়োগে—সর্ব্বত্রই মুখ্যরূপে প্রযুক্ত হইতে দেখা যায়। "ষণ্ড গো", "শুক্ল বস্ত্র" ইত্যাদি স্থলে যে ষণ্ডত্ব-জাতি এবং শুক্লগুণ—দ্রব্যরূপী গো ও বস্ত্রের বিশেষণরূপে প্রযুক্ত হয়, জাতি ও গুণের দ্রব্য-বিশেষণত্ব-নিয়মই তাহার কারণ। আর, মনুষ্যত্ব প্রভৃতি জাতিবিশিষ্ট যে দেহপিণ্ড, তাহাও আত্মার প্রকার বা বিশেষণরূপেই প্রযুক্ত হইয়া থাকে। "আত্মা—মনুষ্য, পুরুষ, ষণ্ড, স্ত্রীরূপে জন্মিয়াছে।"—ইত্যাদি স্থলে যে আত্মার সহিত দেহপিণ্ডের সামানাধিকরণ্য-ব্যবহার অব্যাহতভাবে চলিয়া থাকে, দ্রব্যের বিশেষণত্ব-নিয়মই সেই সামানাধিকরণ্য-ব্যবহারের কারণ। কিন্তু পরস্পরব্যাবৃত্ত অর্থাৎ পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত জাতি-গুণাদি ধর্ম্মসকল এই সামানাধিকরণ্যের কারণ নহে। কখনও বা স্থলবিশেষে দ্রব্যসমূহই বিশেষণরূপে অপর দ্রব্যে আশ্রিত থাকিয়া মত্বর্থীয় প্রত্যয় সহযোগে প্রযুক্ত হয়। যথা—দণ্ডী, কুণ্ডলী। "দণ্ড" ও "কুণ্ডল" দুইটী পৃথক্ দ্রব্য, পৃথক্ ভাবে অবস্থিত এবং পৃথক্ ভাবে বিভিন্নাকার-প্রতীতির বিষয় হইয়াও এখানে অপরের (দণ্ডধারীর ও কুণ্ডলধারীর) বিশেষণভাবে প্রযুক্ত হইয়াছে। এই বিশেষণভাবটীও কথিত সামানাধিকরণ্য-বলেই ব্যবস্থাপিত করিতে হয়।

আশঙ্কা হইতে পারে—"ষণ্ড গো"-এ-স্থলে যেমন ষণ্ডত্ব জাতিটী গো'র বিশেষণ হইয়াছে এবং "শুক্লপট" ও "কৃষ্ণপট"—এ-স্থলে "শুক্ল" ও "কৃষ্ণ" গুণ যেমন পটের বিশেষণ হইয়াছে, "পুরুষ কর্ম্মফলে গো, অশ্ব, মনুষ্য, দেবতা, যোষিৎ বা ষণ্ড (যাঁড় বা ক্লীব) হইয়াছে"—এই সকল ব্যবহার-স্থলেও যদি তেমনি মনুষ্যাদি শরীরকে আত্মার বিশেষণ বলিয়া স্বীকার করা যায়, তাহা হইলে বিশেষণ-বিশেষ্য-ভাবাপন্ন-মনুষ্যত্বাদি জাতি ও মনুষ্যাদি ব্যক্তির ন্যায় প্রকার (বিশেষণ) শরীর ও প্রকারী (বিশেষ্য) আত্মারও নিত্যই সহ-প্রতিপত্তি অর্থাৎ সহাবস্থান ও একসঙ্গে প্রতীতি হইতে পারে ? অথচ, এইরূপ প্রতীতি কখনও দেখা যায় না। গোত্বাদি জাতিবিশিষ্টরূপে যেমন

গবাদি শরীরের ব্যবহার করা হয়, সেইরূপ মনুষ্যাদি শরীরকে কেহ কখনও আত্মাশ্রয় বা আত্মনিষ্ঠ বলিয়া আত্মার সহিত অভিন্নরূপে ব্যবহার করে না। সুতরাং বলিতে হইবে যে, "মনুষ্যই আত্মা", অথবা "আত্মাই মনুষ্য"—এইরূপে যে আত্মা ও শরীরের অভেদ-ব্যবহার, উহা লাক্ষণিক (গৌণ) ভিন্ন আর কিছু নহে।

না—এইরূপ সিদ্ধান্ত হইতে পারে না। জাতি ও গুণের ন্যায় মনুষ্যাদি-শরীরও একমাত্র আত্মাশ্রিত, আত্মপ্রয়োজনীয় এবং আত্মারই প্রকার বা ধর্ম্মস্বরূপ। মনুষ্যাদি শরীর যে আত্মাতে আশ্রিত, ইহা—আত্মবিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে শরীর-বিনাশ-দর্শনেই বুঝিতে পারা যায়। আত্মকৃত বিশেষ-বিশেষ কর্ম্মফল ভোগের জন্যই যে শরীরের সৃষ্টি ও অস্তিত্ব, তাহাতেই শরীরের আত্ম-প্রয়োজনীয়তা সমর্থিত হয়। "আত্মাই দেবতা ও মনুষ্য হয়"—ইত্যাদি ব্যবহার-দর্শনেই জানা যায় যে, দেব-মনুষ্যাদি শরীরগুলি আত্মারই প্রকার বা বিশেষণ। গবাদি-শব্দ যে কেবল আত্মাকে না বুঝাইয়া ব্যক্তিকেও বুঝায়, উল্লিখিত আত্মৈকাশ্রয়ত্ব প্রভৃতিই তাহার কারণ। আর, এইরূপ সম্বন্ধ না থাকাতেই দণ্ড-কুণ্ডলাদি পদগুলি বিশেষণ হইলেও মত্বর্থীয় প্রত্যয় (ইন্-প্রভৃতি)-যোগে "দণ্ডী", "কুণ্ডলী" ইত্যাদি রূপে উহাদের বিশেষণ-বিশেষ্যভাব সাধন করিতে হয়। আর, দেব-মনুষ্যাদি শরীরগুলি স্বভাবতঃই আত্মাতে আশ্রিত, আত্মারই প্রয়োজনে প্রযোজিত এবং আত্মারই বিশেষণ। এই কারণেই লৌকিক ও বৈদিক প্রয়োগে "দেবাত্মা" ও "মনুষ্যাত্মা"-এইরূপ সামানাধিকরণ্যে ব্যবহার হইয়া থাকে। জাতি ও মনুষ্যাদি-দেহ—উভয়ই চক্ষুর্গ্রাহ্য; সুতরাং সর্ব্বদাই তদুভয়ের একত্র প্রতীতি হইয়া থাকে; কিন্তু আত্মা চক্ষুর গ্রাহ্য নহে; এজন্য চক্ষুর্দ্বারা দর্শনের সময় কেবল শরীরই দৃষ্ট হয়, আত্মা দৃষ্ট হয় না। আর যে পৃথক্ প্রতীতিগম্য পদার্থের প্রকারতা সম্ভব হয় না—অর্থাৎ যে দুইটী বস্তুর পৃথক্ পৃথক্ প্রতীতি হয়, তদুভয়ের মধ্যে একটী কখনও অপরটীর বিশেষণ হইতে পারে না—একথা বলা যায় না। কেননা, একমাত্র আত্মার আশ্রিত থাকায়, আত্মার প্রয়োজন-সাধনে নিযুক্ত থাকায় এবং আত্মারই বিশেষভাবে ব্যবহার হওয়ায় ঠিক জাত্যাদি পদার্থেরই মত শরীরেরও আত্ম-বিশেষণত্ব বুঝিতে পারা যায়। যেখানে উভয়েরই প্রত্যক্ষ কারণ এক, সেখানেই সহোপলম্ভের নিয়ম—অর্থাৎ সেখানেই উভয়ের এক সঙ্গে প্রতীতি অবশ্যম্ভাবিনী—তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। যেমন, গন্ধ ও রস পৃথিবীর স্বভাবসিদ্ধ গুণ হইলেও চক্ষুর্দ্বারা পৃথিবী-দর্শন-সময়ে তাহার স্বাভাবিক গুণ গন্ধ ও রস দৃষ্ট হয় না (কেননা, পৃথিবী যেমন চক্ষুর গ্রাহ্য, গন্ধ ও রস তদ্রূপ চক্ষুর গ্রাহ্য নয়)। তেমনি, শরীর স্বভাবতঃ আত্মার বিশেষণীভূত হইলেও চক্ষুর দ্বারা শরীর-দর্শনের সঙ্গে সঙ্গে তৎ-সংসৃষ্ট আত্মার দর্শন হয় না। কেননা, আত্মার দর্শনে চক্ষুর সামর্থ্য নাই। সুতরাং এক সঙ্গে প্রতীতি হয় না বলিয়াই শরীরের স্বভাবসিদ্ধ আত্ম-প্রকারতার (আত্ম-বিশেষণভাবের) অভাব হইতে পারে না। আর, আত্ম-বিশেষণ বলিয়াই শরীর ও আত্মার সামানাধিকরণ্য।

যদি বলা যায়—শব্দব্যবহারেও দেখা যায় যে, শরীর-শব্দ কেবল দেহমাত্রকেই বুঝায়, শরীর-শব্দে আত্মাকে বুঝায় না। একথা সঙ্গত নয়। কেননা, শরীর আত্মারই পরিচায়ক। গোত্ব ও শুক্লত্ব—আকৃতি ও গুণকে বুঝায়; তদ্রূপ শরীরও আত্মাকে বুঝায়। অতএব "গো"-আদি শব্দের ন্যায় দেব-মনুষ্য প্রভৃতি শব্দগুলিও আত্মাপর্য্যন্ত বুঝায়। এইরূপ দেব-মনুষ্যাদি দেহধারী জীবসকল পরমাত্মার শরীর বলিয়া পরমাত্মারই বিশেষণ। এজন্য জীবাত্মাবাচক শব্দগুলির অর্থ-ব্যাপ্তি পরমাত্মাপর্য্যন্ত—অর্থাৎ উহারা পরমাত্মার বিশেষণ বলিয়া পরমাত্মাকে বুঝায়।

চিদচিদ্‌বস্তুই ব্রহ্মের শরীর। এ-সম্বন্ধে বহু শ্রুতিবাক্য আছে। যথা—"যস্য পৃথিবী শরীরম্", "যস্য আত্মা শরীরম্"-এইরূপ বহু শ্রুতিবাক্য আছে। চিদচিদ্‌বস্তু ব্রহ্মের শরীর হইলেও এই শরীর অবিদ্যাশক্তিময় বলিয়া তাহার ধর্ম্ম পরমাত্মাকে স্পর্শ করে না। "তত্ত্বমস্যাদি"-বাক্যের অর্থসঙ্গতি করিতে হইলে—"জীব যাঁহার শরীর, যিনি জগতের কারণ, তিনিই ব্রহ্ম" এইরূপ ব্রহ্মতত্ত্ব পরিগ্রহ করিতে হয়; তাহা হইলেই "তৎ" ও "ত্বম্" এই পদদ্বয়ের মুখ্যার্থও সুসঙ্গত হয়। এই পদদ্বয় প্রকারদ্বয়বিশিষ্ট হইয়াও একই বস্তুর প্রতিপাদন করে বলিয়া তাহাতে সামানাধিকরণ্যও সিদ্ধ হয়।

এ স্থলে সামানাধিকরণ্যের আরও একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। ইহা জ্যোতিষ্টোম-মন্ত্র হইতে গৃহীত। যথা—"অরুণয়া একহায়ন্যা পিঙ্গাক্ষ্যা গবা সোমং ক্রীণাতি—অরুণবর্ণা এক বৎসর বয়স্কা পিঙ্গাক্ষী গো-দ্বারা সোম ক্রয় করিবে।" এ-স্থলে "অরুণবর্ণা", "একহায়নী" এবং "পিঙ্গাক্ষী"—এই বিশেষণ-বিশিষ্টতা দ্বারা সোম-ক্রয়ের গো বুঝাইতেছে। এই বিশেষণগুলি গো'র ভিন্ন ভিন্ন প্রকার বোধক হওয়ায় এ স্থলেও সামানাধিকরণ্য স্বীকৃত হইয়াছে। "নীলোৎপল আনয়ন কর"—এইরূপ লৌকিক প্রয়োগেও সামানাধিকরণ্যের প্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

এই প্রকার নিখিল-দোষ-বিবর্জিত, অশেষ-কল্যাণগুণাত্মক ব্রহ্মের জীবান্তর্য্যামিত্বও তাঁহার অপর ঐশ্বর্য্য বলিয়াই প্রতিপন্ন হয়। এইরূপ অর্থ স্বীকার করিলে উক্ত প্রকরণের উপক্রমটীও সুসঙ্গত হয়, এক-বিজ্ঞানে সর্ব্ববিজ্ঞানের প্রতিজ্ঞাও রক্ষিত হয়। সূক্ষ্ম চিদচিদ্‌বস্তুনিচয় যেমন ব্রহ্মের শরীর, স্থূল চিদচিদ্‌বস্তুনিচয়ও তেমনি তাঁহারই শরীর; কেননা, স্থূল চিদচিদ্‌বস্তুও তাঁহারই কার্য্য।

কার্য্য ও কারণের একত্বনিবন্ধন স্থূল চিদ্‌বস্তুও এ স্থলে আধ্যাত্মিক অবস্থাপ্রাপ্ত জীব। এইরূপ সিদ্ধান্ত স্বীকার করিলে—"তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরম্ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৭॥—তিনি ঈশ্বরগণেরও পরম-মহেশ্বর", "পরাস্য শক্তির্বিবিধৈব শ্রূয়তে ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥৬।৮॥—তাঁহার বিবিধ পরাশক্তির কথা শুনা যায়", "অপহতপাপ্মা সত্যকামঃ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৮।১।৫॥—ইনি অপাপবিদ্ধ, সত্যকাম"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের সহিতও কোনও বিরোধ থাকে না।

যদি বলা যায়—এইরূপ হইলে "তত্ত্বমসি"-বাক্যে উদ্দেশ্য-উপাদেয়-বিভাগ কিরূপে জানা

যাইতে পারে? অর্থাৎ কাহাকে লক্ষ্য করিয়া কাহার বিধান করা হইয়াছে, ইহা কিরূপে জানা যাইবে? তদুত্তরে বক্তব্য এই যে, এ-স্থলে কোনও বস্তুকে উদ্দেশ্য করিয়া তৎপক্ষে যে অপর কিছু বিহিত হইয়াছে, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। উদ্দেশ্য ও বিধেয় ভাব এ-স্থলে লক্ষিত হয় নাই। যেহেতু, উক্ত প্রকরণের আরম্ভেই বলা হইয়াছে—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।৮।৭॥-এই সমস্তই এতদাত্মক—ব্রহ্মাত্মক।" উহাতেই উদ্দেশ্য-বিধেয়ভাব প্রাপ্ত হওয়া গিয়াছে। যাহা প্রাপ্ত হওয়া যায় নাই, তৎপ্রতিপাদনই হইতেছে শাস্ত্রের প্রয়োজন—"অপ্রাপ্তে হি শাস্ত্রমর্থবৎ।" ঐপ্রকরণে "ইদং সর্ব্বম্" বলা হইয়াছে; তাহাতেই জীব ও জগৎ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। তাহার পরেই বলা হইয়াছে—"ঐতদাত্ম্যম্।" ইহাতেই প্রতিপাদিত হইয়াছে যে—ব্রহ্মই নির্দ্দিষ্ট জীবজগতের আত্মা। এ-স্থলে হেতুও বলা হইয়াছে। যথা—"সন্মূলাঃ সোম্যেমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ ছান্দোগ্য॥ ৬।৮।৪—হে সোম্য! এই সকল প্রজার (জায়মান পদার্থের) মূলও সদ্‌ব্রহ্ম, আশ্রয়ও সদ্-ব্রহ্ম, এবং প্রতিষ্ঠাও (বিলয়-স্থানও) সদ্‌ব্রহ্ম।" "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলানিতি শান্তঃ॥ ছান্দোগ্য॥ ৩।১৪।১॥—এই সমস্তই ব্রহ্ম (ব্রহ্মস্বরূপ)-ব্রহ্ম হইতেই উৎপন্ন, ব্রহ্মেই স্থিত এবং ব্রহ্মেই বিলীন হয়; অতএব শান্ত হইয়া তাঁহার উপাসনা করিবে"-ইত্যাদি স্থলেও তাহাই বলা হইয়াছে।

আবার, অপরাপর শ্রুতিবাক্যেও ব্রহ্মাতিরিক্ত চিৎ-জড়াত্মক পদার্থের সহিত ব্রহ্মের শরীর-শরীরিভাবরূপ তাদাত্ম্যের কথাই বলা হইয়াছে। যথা—"অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা॥ তৈত্তিরীয়॥৩।১১॥—সর্ব্বাত্মা ব্রহ্ম অন্তরে প্রবিষ্ট থাকিয়া জনসমূহের শাসন করেন", "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ইত্যাদি॥৩।৭।৪॥—যিনি পৃথিবীতে অবস্থান করেন, অথচ পৃথিবী হইতে পৃথক্, পৃথিবী যাঁহার শরীর", "য আত্মনি তিষ্ঠন্-ইত্যাদি॥ শতপথ-ব্রাহ্মণ॥ ১৪।৬।৭।৩০॥—যিনি আত্মায় থাকেন, আত্মা যাঁহার শরীর"-ইত্যাদি হইতে আরম্ভ করিয়া "যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্; যং মৃত্যুর্ন বেদ; এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মা অপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণো॥ সুবাল-শ্রুতিঃ॥ ৭॥—মৃত্যু যাঁহার শরীর, মৃত্যু যাঁহাকে জানে না। ইনি সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা, অপাপবিদ্ধ, দিব্য (অলৌকিক), অদ্বিতীয়, দেব নারায়ণ", "তৎ সৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ; তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ॥ তৈত্তিরীয়॥ ২।৬।২॥—তিনি ভূতসমূহের সৃষ্টি করিয়া তাহাদের মধ্যে প্রবেশ করিলেন এবং সৎ ও ত্যৎ হইলেন।"-ইত্যাদি।

ব্রহ্মসূত্রকারও বলেন—

আত্মেতি তুপগচ্ছন্তি গ্রাহয়ন্তি চ॥ ৪।১।৩॥ ব্রহ্মসূত্র

—ব্রহ্ম আত্মারূপেই উপাস্য; তত্ত্বজ্ঞগণ তাঁহাকে আত্মা-রূপেই প্রাপ্ত হয়েন এবং শিষ্য-দিগকে সেই ভাবেই উপদেশ দিয়া থাকেন।

বাক্যকারও বলেন—"আত্মা ইতি এব তু গৃহ্ণীয়াৎ—তাঁহাকে আত্মারূপেই গ্রহণ করিবে।" এই বিষয়ে ছান্দোগ্য-শ্রুতিও বলেন—"অনেন জীবেনাত্মনানুপ্রবিশ্য নামরূপে ব্যাকরবাণি"-ইহা হইতে জানা যায়—ব্রহ্ম জীবাত্মারূপে (বা জীবাত্মার সহিত) প্রবেশ করিয়া নামরূপ ব্যক্ত করেন। ব্রহ্মাত্মক

জীবরূপে অনুপ্রবেশের দ্বারাই সকল পদার্থেরই বস্তুত্ব ও শব্দবাচ্যত্ব প্রতিপাদিত হয়। "তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ ॥ তৈত্তিরীয়॥ ২।৬।২॥"-এই শ্রুতিবাক্য হইতে ব্রহ্মানুপ্রবেশবশতঃ এবং একার্থ্যবশতঃ জীবেরও ব্রহ্মাত্মকত্ব জানা যায়।

সুতরাং ইহাই বুঝিতে হইবে যে—ব্রহ্মাতিরিক্ত সমস্ত পদার্থ ব্রহ্মশরীর বলিয়াই তাহাদের বস্তুত্ব ; এই অবস্থায় তৎপ্রতিপাদক শব্দসকল এইরূপ অর্থেরই প্রতিপাদন করে। এই কারণে লৌকিক ব্যবহারগত ব্যুৎপত্তি অনুসারে লৌকিক-পদার্থ-প্রতিপাদক শব্দসমূহও তদ্বিশিষ্ট ব্রহ্মেরই প্রতিপাদক। সুতরাং ইহাও স্বীকার করিতে হইবে যে—"ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্"-শ্রুতিবাক্যে যে অর্থ প্রতিজ্ঞাত হইয়াছে, "তত্ত্বমসি"-বাক্যে সামানাধিকরণ্যে তাহারই বিশেষ ভাবে উপসংহার করা হইয়াছে। মধ্যমপুরুষ যুষ্মৎ-শব্দযোগেই হইয়া থাকে।

২১। বিবর্ত্তবাদ সম্বন্ধে আলোচনা

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে ভাবে বিবর্ত্তবাদ খণ্ডন করিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩।৫২-৫৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

২২। পরিণামবাদ স্থাপন

শ্রীপাদ শ্রীজীবগোস্বামী কি ভাবে পরিণামবাদ স্থাপন করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। ৩।২২-২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

চতুর্থ অধ্যায়

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ

২৩। অন্যমতবাদ সম্বন্ধে সংক্ষিপ্তোক্তি

পরব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধটী কিরূপ, শ্রুতিতে স্পষ্টভাবে তাহা বলা হয় নাই। এজন্যই নিজ নিজ দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে ভাষ্যকার আচার্য্যগণ বিভিন্ন মতবাদের প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

পরব্রহ্মের নিত্য অস্তিত্বসম্বন্ধে কোনওরূপ মতভেদ নাই। পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের অস্তিত্বও অবশ্য সকলে স্বীকার করিয়াছেন, কিন্তু একই ভাবে নহে। শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য বলেন — পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের যে অস্তিত্ব প্রতীয়মান হয়, তাহা বাস্তব অস্তিত্ব নহে; তাহা মিথ্যা; রজ্জুতে সর্পভ্রমের ন্যায় ভ্রান্তিমাত্র। জীব-জগতের বাস্তব অস্তিত্বই যখন তিনি স্বীকার করেন না, তখন তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের বাস্তব কোনও সম্বন্ধের প্রশ্নও উঠিতে পারে না। যে বস্তুর কোনও বাস্তব অস্তিত্বই নাই, তাহার সহিত বাস্তব-অস্তিত্ববিশিষ্ট ব্রহ্মের সম্বন্ধের কথাও উঠিতে পারে না।

অপরাপর আচার্য্যগণ পরিদৃশ্যমান জীব-জগতের অস্তিত্বকে রজ্জুসর্পবৎ মিথ্যা বলেন না; তাঁহারা জীবজগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন; তবে এই অস্তিত্ব যে অনিত্য, তাহাও তাঁহারা বলিয়া থাকেন। জীবজগতের এতাদৃশ বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই তাঁহারা ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধের কথা বিচার করিয়াছেন। তথাপি যে তাঁহাদের এক এক জন এক এক রকমের সম্বন্ধের কথা বলিয়াছেন, তাহার হেতু হইতেছে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য। একই বৈদূর্য্যমণিকে দৃষ্টিভঙ্গী অনুসারে যেমন কেহ নীলবর্ণ দেখেন, কেহ পীতবর্ণ দেখেন, ইহাও তদ্রূপ। ভিন্ন ভিন্ন দ্রষ্টা ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখেন বলিয়া বৈদূর্য্যমণির স্বরূপগত বর্ণ যে লোপ পাইয়া যায় [illegible] নহে। আবা[illegible] কোনও হেতুবশতঃ শঙ্খকে কেহ যদি পীতবর্ণযুক্ত দেখেন, তাহাতেও শ[illegible] শ্বেতত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় না। তিনিও শঙ্খই দেখেন; তবে শঙ্খের স্বরূপগত-বর্ণদর্শ[illegible]হার অসামর্থ্য বলিয়া শঙ্খের স্বরূপগত বর্ণ তাঁহার উপলব্ধির বিষয়ীভূত হয় না।

তদ্রূপ জীব-জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকা[illegible] পরব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়ে বিভিন্ন আচার্য্য যে বিভিন্ন মতবাদের প্রচার করি[illegible]ছেন, তাহার হেতুও হইতেছে তাঁহাদের দৃষ্টিভঙ্গীর পার্থক্য।

কেহ কেহ বলেন—জীব-জগৎ ও ব্রহ্মের [illegible]ধ্য কোনও ভেদই নাই। আবার কেহ কেহ বলেন—জীব-জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ [illegible]মান—যেমন শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য। অপর কোনও

কোনও আচার্য্য বলেন—ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান। ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ বলেন—এই ভেদাভেদ হইতেছে ঔপচারিক—যেমন শ্রীপাদ ভাস্করাচার্য্য। আবার কেহ কেহ বলেন—এই ভেদাভেদ হইতেছে স্বাভাবিক—যেমন শ্রীপাদ নিম্বার্কাচার্য্য।

কিন্তু এই সমস্ত মতবাদ স্বীকার করিতে গেলে যে শ্রুতি-স্মৃতির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহা দেখাইয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী অধ্যায়ে শ্রীজীবপাদের আলোচনা প্রদর্শিত হইয়াছে।

২৪। শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্যের মতবাদ

শ্রীপাদ রামানুজাচার্য্য বলেন—জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শরীর। ইহা শ্রুতিবিরুদ্ধ নহে। "যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাপঃ শরীরম্" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ রামানুজ এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাহা দেখাইয়াছেন। শ্রীপাদ রামানুজের মতে জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শরীর, আর ব্রহ্ম হইতেছেন শরীরী; সুতরাং জীবজগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইতেছে শরীর-শরীরী সম্বন্ধ।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই শরীর-শরীরী সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। যদি তিনি ইহা স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে তিনি আর অচিন্ত্যভেদাভেদ সম্বন্ধ স্থাপনের চেষ্টা করিতেন না। শ্রীপাদ রামানুজ-কথিত শরীর-শরীরী সম্বন্ধ স্বীকার না করার হেতুও আছে। এই হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, জগৎ হইতেছে চিদ্‌বিরোধী জড় বস্তু। আর ব্রহ্ম হইতেছেন জড়বিরোধী চিদ্‌বস্তু। জগৎকে ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মকে তাহার শরীরী মনে করিতে হইলে পরব্রহ্মে দেহ-দেহি ভেদ স্বীকার করিতে হয়, স্বগত ভেদও স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু পরব্রহ্মে দেহদেহি-ভেদ নাই, স্বগতভেদও নাই। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে ব্রহ্ম হইতেছেন সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগতভেদশূন্য তত্ত্ব। শ্রীপাদ শঙ্করের মতেও ব্রহ্ম হইতেছেন ত্রিবিধ ভেদশূন্য তত্ত্ব।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীপাদ রামানুজ ব্রহ্মে স্বগতভেদ স্বীকার করেন। ইহাতে মনে হইতে পারে—জীবজগৎ-রূপ ব্রহ্ম-শরীরকে তিনি ব্রহ্মের স্বরূপগত বিগ্রহ বলিয়াই মনে করেন। তাহা স্বীকার করিলে ব্রহ্মের স্বরূপগত বিগ্রহকে জড়াংশবিশিষ্ট বলিয়া স্বীকার করিতে হয়; কেননা, ব্রহ্মশরীররূপ জগৎ হইতেছে চিদ্‌বিরোধী জড়বস্তু। কিন্তু তাহা শ্রুতিবিরুদ্ধ; কেননা শ্রুতিবাক্য অনুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।

তৃতীয়তঃ, জগৎ হইতেছে বিকারশীল। বিকারশীল জগৎকে ব্রহ্মের স্বরূপগত বিগ্রহ বলিয়া স্বীকার করিলে ব্রহ্মকেও বিকারী বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রুতি-স্মৃতি অনুসারে ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্বাবস্থায় নির্ব্বিকার।

চতুর্থতঃ, শরীরী থাকে শরীরের মধ্যে, শরীরের বাহিরে শরীরীর কোনও অস্তিত্ব থাকে না। জীব-জগৎকে যদি ব্রহ্মের শরীর এবং ব্রহ্মকে যদি তাহার শরীরী মনে করা হয়, তাহা হইলে মনে করিতে হইবে—ব্রহ্মের অস্তিত্ব জীব-জগতের মধ্যেই সীমাবদ্ধ। ইহা স্বীকার করিতে গেলে ব্রহ্মের ব্রহ্মত্ব বা সর্ব্বব্যাপকত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে।

আধার-আধেয়ভাবে শরীর-শরীরী সম্বন্ধ মনে করিতে গেলেও সেই প্রশ্নই উঠে। বিশেষতঃ কেবল জীব-জগৎই যে শরীররূপে ব্রহ্মের আধার, তাহাই নহে; ব্রহ্মও জীব-জগতের আধার বা আশ্রয়। "ইমাঃ সর্ব্বাঃ প্রজাঃ সদায়তনাঃ সৎপ্রতিষ্ঠাঃ॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।৮।৬॥"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতি তাহাই বলিয়াছেন।

পঞ্চমতঃ, জীব-জগৎ ব্রহ্মের বিশেষণ, আর ব্রহ্ম তাহার বিশেষ্য। যদি বলা যায়—বিশেষণ-বিশেষ্যরূপ সম্বন্ধই হইতেছে শরীর-শরীরী সম্বন্ধের তাৎপর্য্য। তাহা হইলেও বলা যায়, জীব-জগৎই ব্রহ্মের একমাত্র বিশেষণ নহে। "পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের একপাদ বিশেষণমাত্র; তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি বা ত্রিপাদ বিশেষণ হইতেছে জীব-জগতের অতীত। ত্রিপাদ বিভূতিকে বাদ দিয়া কেবলমাত্র একপাদ বিভূতিস্বরূপ জীব-জগৎকে ব্রহ্মের বিশেষণ বা শরীর বলিলে ব্রহ্ম-শরীরের বা ব্রহ্ম-বিশেষণের সম্যক্ পরিচয় পাওয়া যায় না।

যদি বলা যায়—জীবজগৎ যে ব্রহ্মের শরীর, ইহা তো শ্রুতিই বলিয়াছেন; ইহা তো শ্রুতিবিরুদ্ধ নয়?

উত্তরে বক্তব্য এই। জীব-জগৎ যে ব্রহ্মের শরীর, একথা শ্রুতিও বলিয়াছেন সত্য; কিন্তু জীব-জগৎ যে ব্রহ্মের স্বরূপগত বিগ্রহ, তাহা শ্রুতি বলেন নাই; ব্রহ্মের সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহত্বের কথাই শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ। "যস্য পৃথিবী শরীরং যস্যাপঃ শরীরম্" ইত্যাদি বাক্যে যে শরীরের কথা বলা হইয়াছে, অন্য শ্রুতি বাক্যের আলোকে তাহার তাৎপর্য্য গ্রহণ করিতে হইবে। অন্য শ্রুতিবাক্য, যথা—"অন্তঃ প্রবিষ্টঃ শাস্তা জনানাং সর্ব্বাত্মা" তৈত্তিরীয় আরণ্যক॥ ৩।১১॥—সর্ব্বাত্মা জনসমূহের অন্তরে প্রবিষ্ট হইয়া তাহাদের শাসন করেন", "যঃ পৃথিব্যাং তিষ্ঠন্ ** যস্য পৃথিবী শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরো যময়ত্যেষ ত আত্মান্তর্য্যাম্যমৃতঃ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ৩।৭।৩॥—যিনি পৃথিবীতে অবস্থিত ** পৃথিবী যাঁহার শরীর, যিনি অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিবীকে পরিচালিত করেন, তিনিই তোমার জিজ্ঞাসিত অমৃত অন্তর্য্যামী আত্মা", ইহার পরবর্ত্তী ৩।৭।৪ হইতে আরম্ভ করিয়া ৩।৭।২৩ পর্য্যন্ত বাক্যে বৃহদারণ্যক শ্রুতি বলিয়াছেন—"যিনি জলে, অগ্নিতে, অন্তরিক্ষে, বায়ুতে, দ্যুলোকে, আদিত্যে, দিক্সমূহে, চন্দ্রতারকায়, আকাশে, অন্ধকারে, তেজে, সর্ব্বভূতে, প্রাণে, ইন্দ্রিয়ে, চক্ষুতে, কর্ণে, মনে, ত্বকে, বিজ্ঞানে (বুদ্ধিতে) এবং রেতে অবস্থিত এবং এই সমস্তেরই ... তিনি অন্তর্য্যামী আত্মা, "অন্তঃশরীরে নিহিতো গুহায়ামজ একো নিত্যো যস্য পৃথিবী

শরীরং যঃ পৃথিবীমন্তরে সংচরন্ ** যস্যাপঃ শরীরম্ ** যস্য তেজঃ শরীরম্ ** যস্য বায়ুঃ শরীরম্ ** যস্যাকাশঃ শরীরম্ ** যস্য মনঃ শরীরম্ ** যস্য বুদ্ধিঃ শরীরম্ ** যস্যাহঙ্কারঃ শরীরম্ ** যস্য চিত্তং শরীরম্ ** যস্যাব্যক্তং শরীরম্ ** যস্যাক্ষরং শরীরম্ ** যস্য মৃত্যুঃ শরীরম্ যো মৃত্যুমন্তরে সংচরন্ যং মৃত্যুর্ন বেদ। স এষ সর্ব্বভূতান্তরাত্মাঽপহতপাপ্মা দিব্যো দেব একো নারায়ণঃ॥ সুবালোপনিষৎ ॥ ৭ ॥—যিনি এক, নিত্য, অজ এবং যিনি অন্তঃশরীরে গুহায় অবস্থিত, এবং পৃথিবী, জল, তেজঃ, বায়ু, আকাশ, মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার, চিত্ত, অব্যক্ত, অক্ষর, ও মৃত্যু যাঁহার শরীর এবং পৃথিবী আদির অভ্যন্তরে থাকিয়া যিনি সকলকে পরিচালিত করেন, অথচ পৃথিবী আদি যাঁহাকে জানে না, তিনিই সর্ব্বভূতান্তরাত্মা, অপহতপাপ্মা, দিব্য দেব এক নারায়ণ", "তৎসৃষ্ট্বা তদেবানুপ্রাবিশৎ ; তদনুপ্রবিশ্য সচ্চ ত্যচ্চাভবৎ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ২।৬।২॥—তাহার সৃষ্টি করিয়া তাহাতে অনুপ্রবেশ করিলেন ; তাহাতে অনুপ্রবেশ করিয়া সৎ এবং ত্যৎ হইলেন।"—এই সমস্ত শ্রুতি-বাক্যে বলা হইয়াছে—পরব্রহ্ম পৃথিব্যাদির অভ্যন্তরে থাকিয়া পৃথিব্যাদিকে নিয়ন্ত্রিত করেন এবং পৃথিব্যাদি হইতেছে তাঁহার শরীর। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—তিনি নিয়ন্তৃরূপে পৃথিব্যাদির অভ্যন্তরে থাকেন বলিয়াই পৃথিব্যাদিকে তাঁহার শরীর এবং তাঁহাকে পৃথিব্যাদির শরীরী বলা হইয়াছে। যেমন সংসারী জীবের জীবাত্মা জড়দেহের মধ্যে থাকে বলিয়া জীবাত্মাকে দেহী (শরীরী) এবং জড়দেহকে জীবাত্মার দেহ (শরীর) বলা হয়, তদ্রূপ। জড়দেহ যেমন জীবাত্মার স্বরূপগত দেহ নহে, তদ্রূপ জীব-জগৎও ব্রহ্মের স্বরূপগত বিগ্রহ নহে। জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শরীরস্থানীয়—শরীরতুল্য। এইরূপ অর্থ গ্রহণ না করিলে ব্রহ্মবিষয়ক অপর শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় ; কেননা, শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্ম হইতেছেন সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ।

এই সমস্ত কারণেই বোধহয় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীপাদ রামানুজ-কথিত শরীর-শরীরী সম্বন্ধ স্বীকার করেন নাই। অন্তর্য্যামিরূপে বা নিয়ন্তৃরূপে জীব-জগতের সহিত ব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, তাহাই হইতেছে শরীর-শরীরী সম্বন্ধের তাৎপর্য্য। জীব-জগতের সহিত ব্রহ্মের এই জাতীয় সম্বন্ধ আরও আছে ; যথা—কার্য্য-কারণ-সম্বন্ধ, সৃষ্ট-সৃষ্টিকর্তৃসম্বন্ধ, রক্ষিত-রক্ষক-সম্বন্ধ, আশ্রিত-আশ্রয় সম্বন্ধ ইত্যাদি।

২৫। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্ত। জীব-জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইতেছে শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ

শ্রুতিবিরুদ্ধ বলিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী অভেদবাদ, ভেদবাদ, দ্বিবিধ-ভেদাভেদবাদ আদি স্বীকার করেন নাই। তিনি বলেন—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, জীব-জগৎ ও ব্রহ্মের মধ্যেও

সেই সম্বন্ধই বিদ্যমান। কেননা, জীব ও জগৎ উভয়ই হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের শক্তি। জীব এবং জগৎ যে পরব্রহ্মের শক্তি, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; এ-স্থলে অতি সংক্ষেপে তাহা পুনরায় প্রদর্শিত হইতেছে।

জীব। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥৭।৫॥"-এই গীতাবাক্যে যে জীবশক্তির উল্লেখ আছে, সেই জীবশক্তির অংশই হইতেছে অনন্তকোটি জীব। বিশেষ আলোচনা ২।৭-১৫-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

জগৎ। "ভূমিরাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতি-রষ্টধা ॥৭।৪॥"-এই গীতাবাক্য হইতে জানা যায়, ভূমি-জল-প্রভৃতির সমষ্টিভূত এই জগৎ হইতেছে পরব্রহ্মের বহিরঙ্গা শক্তি মায়ার পরিণাম। সুতরাং জগৎ হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। বিশেষ আলোচনা ৩।২৬ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এইরূপে জানা গেল, জীব ও জগৎ হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি এবং ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমান্। সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ বিদ্যমান, জীব-জগতের সহিত পরব্রহ্মেরও সেই সম্বন্ধই বর্ত্তমান।

কেবলমাত্র জীবজগতের সহিতই যে পরব্রহ্মের এইরূপ সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাহা নহে; সমস্ত বস্তুর সহিতই ব্রহ্মের এতাদৃশ সম্বন্ধ।

"পাদোঽস্য বিশ্বা ভূতানি ত্রিপাদস্যামৃতং দিবি"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়—এই পরিদৃশ্যমান ব্রহ্মাণ্ড হইতেছে পরব্রহ্মের একপাদ বিভূতিমাত্র। তাঁহার ত্রিপাদ বিভূতি হইতেছে অমৃত—নিত্য, প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের বা মায়ার অতীত, অপ্রাকৃত—চিন্ময়। অনন্ত ভগদ্ধাম-সমূহ হইতেছে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বা চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ—সুতরাং স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তিই। বিশেষ বিবরণ ১।১।৯৫—১০৩ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য। চিন্ময় ভগদ্ধামে যে সমস্ত বস্তু আছে, তৎসমস্তও তদ্রূপই।

ভগবদ্ধামে পরব্রহ্ম ভগবানের লীলা-পরিকরও আছেন। তাঁহারাও পরব্রহ্মেরই স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ—সুতরাং স্বরূপতঃ পরব্রহ্মেরই স্বরূপ-শক্তি। বিশেষ আলোচনা ১।১।১০৪-৭ অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

এইরূপে দেখা গেল—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত চিন্ময় ভগবদ্ধামস্থিত সমস্ত বস্তু এবং লীলা-পরিকরাদি—সমস্তই হইতেছে পরব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপ-শক্তি। সুতরাং তাঁহাদের সহিত পরব্রহ্মের যে সম্বন্ধ, তাহাও হইতেছে শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধই।

অতএব, জীব, জগৎ, ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামস্থিত বস্তুনিচয় এবং ভগবৎ-পরিকর—সমস্তই স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের শক্তি বলিয়া তৎসমস্তের সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধও হইতেছে শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ।

আবার ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদিও তাঁহার স্বরূপশক্তিরই বিলাস—সুতরাং স্বরূপতঃ ভগবানের শক্তি। তাহা হইলে ভগবানের রূপগুণ-লীলাদির সহিত ভগবানের সম্বন্ধও হইতেছে শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ।

২৬। শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধের স্বরূপ। অচিন্ত্য ভেদাভেদ সম্বন্ধ

এক্ষণে দেখিতে হইবে—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধটীর স্বরূপ কি। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কি ভেদই বর্ত্তমান? না কি অভেদই বর্ত্তমান? না কি ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান?

ক। শক্তি ও শক্তিমান

যে শক্তি কোনও বস্তুতে অবিচ্ছেদ্যভাবে নিত্য বর্ত্তমান থাকে, তাহাকেই সেই বস্তুর শক্তি বলা হয়। সাময়িকভাবে কোনও বস্তুতে যে শক্তির আগমন হয়, তাহাকে সেই বস্তুর শক্তি বলা হয় না। অগ্নি-তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত লৌহও সাময়িক ভাবে দাহিকা শক্তির আশ্রয় হয়; কিন্তু তাহাকে লৌহের শক্তি বলা হয় না। উহা হইতেছে লৌহে প্রবিষ্ট অগ্নিরই শক্তি। অগ্নির দাহিকা শক্তি হইতেছে অগ্নি হইতে অবিচ্ছেদ্যা। কোনও কোনও স্থলে অগ্নি-স্তম্ভনের কথা শুনা যায়। অগ্নিতে মহৌষধিবিশেষ প্রক্ষিপ্ত করিলে অগ্নির ঔজ্জ্বল্যাদি বর্ত্তমান থাকা সত্ত্বেও দাহিকা শক্তি প্রকাশ পায় না; তখন আগুনে হাত দিলে হাত পুড়িয়া যায় না। মহৌষধের প্রভাবে অগ্নির দাহিকাশক্তিটী নষ্ট হইয়া গিয়াছে, সুতরাং দাহিকা শক্তিটী অগ্নি হইতে পৃথক্ হইয়া গিয়াছে—এইরূপ অনুমান সঙ্গত হইবে না। কেননা, মহৌষধটী অগ্নি হইতে তুলিয়া আনিলে সেই অগ্নিরই দাহিকা শক্তি পুনরায় কার্য্যকরী হইয়া থাকে। সুতরাং বুঝিতে হইবে—মহৌষধির প্রভাবে অগ্নির দাহিকাশক্তিটী স্তম্ভিত হইয়া থাকে মাত্র, স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না মাত্র, কিন্তু নষ্ট হয় না। ইহা হইতেই বুঝা যায়—অগ্নির দাহিকা শক্তি হইতেছে অগ্নি হইতে অবিচ্ছেদ্যা। এই দাহিকা শক্তি হইতেছে অগ্নির স্বাভাবিকী শক্তি, আগন্তুকী নহে। কেবল অগ্নির নহে, বস্তুমাত্রেরই শক্তি হইতেছে স্বাভাবিকী, অবিচ্ছেদ্যা।

পরব্রহ্মের অনন্ত-শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তি প্রধান—চিচ্ছক্তি (বা পরাশক্তি, বা স্বরূপ-শক্তি), জীবশক্তি (বা ক্ষেত্রজ্ঞাশক্তি) এবং মায়াশক্তি।

> কৃষ্ণের অনন্ত শক্তি তাতে তিন প্রধান।
> চিচ্ছক্তি, মায়াশক্তি, জীবশক্তিনাম॥ শ্রীচৈ,চ, ২।৮।১১৬॥

বস্তুতঃ পরব্রহ্মের অনন্তশক্তি হইতেছে এই তিনটী শক্তিরই অনন্ত বৈচিত্রী।

> স্বাভাবিক কৃষ্ণের তিন শক্তি হয়॥
>
> কৃষ্ণের স্বাভাবিক তিন শক্তি পরিণতি।
> চিচ্ছক্তি, জীবশক্তি, আর মায়াশক্তি॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২০।১০২৩॥

শ্রুতি-স্মৃতি হইতেও এই তিন শক্তির কথা জানা যায়। "পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্র স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ ॥৬।৮॥"-এই শ্বেতাশ্বতর-বাক্যে পরাশক্তি বা চিচ্ছক্তির কথা, " রাপোঽনলো বায়ুঃ খং মনো বুদ্ধিরেব চ। অহঙ্কার ইতীয়ং মে ভিন্না প্রকৃতিরষ্টধা ॥ গীতা ॥৭ "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ॥ গীতা ॥৭।১৪॥" ইত্যাদি গীতাবাক্যে এবং "মায়ান্তু প্র বিদ্যান্মায়িনং তু মহেশ্বরম্॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৪।১০॥"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে মায়াশক্তির কথা "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্। জীবভূতাং মহাবাহো যয়েদং ধার্য্যতে জগৎ ॥ গী ৭।৫॥"—ইত্যাদি গীতাবাক্যে জীবশক্তির কথা জানা যায়। এই তিনটী শক্তিই হইতেছে প ভগবানের স্বাভাবিকী পক্তি।

শক্তিমান্ হইতে তাহার স্বাভাবিকী শক্তিকে পৃথক্ করা যায়না বলিয়া শক্তি ও শক্তিমা এই উভয়ে মিলিয়াই এক বস্তু। বস্তুটী হইল বিশেষ্য, তার শক্তি হইল তার বিশেষণ। বি এবং বিশেষণ মিলিয়াই হইল বস্তুটী। ব্রহ্মের আনন্দ হইল বিশেষ্য, আর শক্তি হইল তাঁ বিশেষণ। ব্রহ্ম হইলেন শক্তিমান্ আনন্দ। বিশেষ্যের সঙ্গে বিশেষণের নিত্য অবিচ্ছেদ্য সম্ব তাই বিশেষণযুক্ত বিশেষ্যই হইল বস্তু।

(১) শ্রীজীবপাদ-কথিত শক্তির লক্ষণ আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত

বিষ্ণুপুরাণের "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ তৎসত্তামাত্রম্॥ ৬।৭।৫৩॥—যাহা ভেদরহিত, তাহা স মাত্র"; এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—এ-স্থলে পূর্ব্বোক্ত স্বরূপকেই কার্য্যো হইলে শক্তি-শব্দে অভিহিত করা হইয়াছে। অতএব, স্বরূপের কার্য্যোন্মুখত্বের দ্বারাই শক্তিত্ব, স্ব নহে—ইহাই জানা গেল। সুতরাং যাহা বিশেষ্যরূপ, স্বয়ং তাহাই শক্তিমদ্‌বিশেষণরূপ; কার্য্যোন্মুখত্ব শক্তি; জগৎও কার্য্যক্ষমত্বমূল। সেই ক্ষমত্বাদিরূপ সেই শক্তি নিত্যাই। "প্রত্যস্তমিতভেদং যৎ ত সত্তামাত্রম্-ইত্যত্র প্রাগুক্তং স্বরূপমেব কার্য্যোন্মুখং শক্তিশব্দেনোক্ত মিতি। অতঃ স্বরূপস্য কার্য্যোন্মুখ নৈব শক্তিত্বং ন, স্বত ইত্যায়াতম্। ততশ্চ বিশেষ্যরূপং তদেব স্বয়ং শক্তিমদ্‌বিশেষণরূপং কার্য্যোন্মুখ তু শক্তিঃ। জগচ্চ কার্য্যক্ষমত্বমূলমিতি। তৎক্ষমত্বাদিরূপা নিত্যৈব সা শক্তিরিত্যবগম্যতে ॥—শ্রীভগব সন্দর্ভীয় সর্ব্বসম্বাদিনী ॥৩৬ পৃষ্ঠা॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উল্লিখিত বাক্যে শক্তির যে লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা হইতে বুঝা যায়—কোনও দ্রব্যের শক্তি. সেই দ্রব্য হইতে অতিরিক্ত কিছু নহে; কার্য্যোন্মুখ সেই হইতেছে তাহার শক্তি। দ্রব্য ও দ্রব্যশক্তি বস্তুতঃ একই। এই লক্ষণ অনুসারে, কস্তুরীর গন্ধ (হইতেছে কার্য্যোন্মুখ (স্ব-প্রকাশোন্মুখ) কস্তুরী, অপর কিছু নহে। অগ্নির উত্তাপ (শক্তি) হইতে কর্য্যোন্মুখ (স্ব-প্রকাশোন্মুখ) অগ্নিই, অপর কিছু নহে। সূর্য্য এবং সূর্য্যরশ্মি সম্বন্ধেও তদ্রূপই বুঝি হইবে। শ্রীজীবকথিত শক্তির এতাদৃশ লক্ষণ হইতে বুঝা যায়—কস্তুরীর গন্ধ বিকীর্ণ হইয়া কস্তুরীর ওজন কমিয়া যাইবে; কেননা, গন্ধরূপে বাস্তবিক কস্তুরীই বহির্গত হইয়া যায়। আধু জড়বিজ্ঞানও তাহাই বলে (ভূমিকায় ৩০-ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে দেখা গেল—শ্রীজীব

থিত শক্তির লক্ষণ আধুনিক-বিজ্ঞান-সম্মত। দ্রব্যের শক্তিই হইতেছে দ্রব্যের বিশেষণ, আর, দ্রব্যটী ভগইতেছে তাহার বিশেষ্য। কার্য্যোন্মুখ বা স্ব-প্রকাশোন্মুখ বিশেষ্য যখন হইল বিশেষণ, তখন শক্তিশেষণ ও বিশেষ্যাতিরিক্ত কিছু নহে ; বিশেষ্য ও বিশেষণ এই উভয়ে মিলিয়াই হইল বস্তু ; কস্তুরী এবং স্তুরীর গন্ধ—এই উভয় মিলিয়াই কস্তুরী, অগ্নি এবং তাহার উত্তাপ—এই উভয়ে মিলিয়াই অগ্নি ; ২৬ ননা, গন্ধহীন কস্তুরী নাই, উত্তাপহীন অগ্নিও নাই।

ইহাতে কেহ বলিতে পারেন—বিশেষ্য এবং বিশেষণ মিলিয়াই যদি বস্তু হয়, বিশেষণকে মানে বিশেষ্য হইতে—অর্থাৎ শক্তিকে যদি শক্তিমান্ হইতে—পৃথক্ই না করা যায়, তাহা হইলে ক্ ভাবে শক্তিকে স্বীকার করারই বা প্রয়োজন কি ? কেবল বস্তু বলিলেই তো চলিতে পারে ? স্তুতোঽত্যন্তব্যতিরেকেণ তস্য নিরূপ্যত্বাভাবান্ন ততঃ পৃথক্ত্বমস্তীত্যভিপ্রায়েণৈব তথোক্তমিতি জ্ঞেয়ম্। বলা স্তেবাস্তু—কা তত্র শক্তির্নাম। শ্রীভগবৎসন্দর্ভীয়-সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ সাহিত্য পরিষৎসংস্করণ ॥ ৩৬ পৃষ্ঠা ॥” হয় এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—“ইতি মতং তু ন লৌবদান্তিনাং মতম্; সত্যপি বস্তুনি মন্ত্রাদিনা শক্তিস্তম্ভাদি-দর্শনাৎ যুক্তিবিরুদ্ধঞ্চৈতৎ॥—ইহা হই বেদান্তীদের মত নহে। মন্ত্রাদির প্রভাবে কোনও বস্তুর শক্তিমাত্র স্তম্ভিত হইতে দেখা যায় ; কিন্তু ম বস্তুটী থাকে (যেমন অগ্নির দাহিকা শক্তি স্তম্ভিত হইলেও বিশেষ্যরূপ অগ্নি থাকে)। সুতরাং পা শক্তির পৃথক্ নাম না থাকা যুক্তিসঙ্গত হইবেনা।” অগ্নিস্তম্ভনের ব্যাপারে দেখা যায়—শক্তি না অনুভূত না হইলেও শক্তিমানের অনুভব হয় ; হাত না পুড়িলেও আগুন দেখা যায়। সুতরাং অগ্নি এবং তাহার দাহিকাশক্তিকে পৃথক্ নামে অভিহিত করাই সঙ্গত।

এক্ষণে দেখা যাউক, ত্রিবিধা স্বাভাবিকী শক্তির সহিত শক্তিমান্ পরব্রহ্মের সম্বন্ধের স্বরূপটী কিরূপ ? শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কি ভেদই বর্ত্তমান ? না কি অভেদ ? না কি ভেদাভেদ ?

খ। শক্তি ও শক্তিমানের সম্বন্ধ। ভেদাভেদ-সম্বন্ধ

কস্তুরীর দৃষ্টান্ত ধরিয়াই আলোচনা করা যাউক। কস্তুরীর গন্ধ হইতেছে কস্তুরীর শক্তি।

কস্তুরীর গন্ধকে যখন কস্তুরী হইতে পৃথক্ করা যায় না, তখন মনে হয়, উভয়ের মধ্যে যেন কোনও ভেদ নাই। কিন্তু অভেদ-সিদ্ধান্ত করিতে গেলেও এমন এক সমস্যা দেখা দেয়, যাহাতে অভেদ-সিদ্ধান্ত করা যায় না। সমস্যাটী এই। যেখানে কস্তুরী দেখা যায়না, কস্তুরী হয়তো একটু সামান্য দূরদেশে অলক্ষিত ভাবে আছে, সেখানেও কস্তুরীর গন্ধ অনুভূত হয়। ঘরের মধ্যে এক সাজি সুগন্ধি মল্লিকা ফুল থাকিলে ঘরের বাহিরেও তাহার গন্ধ পাওয়া যায়। এইরূপে, কস্তুরীর বহির্দ্দেশেও যখন কস্তুরীর গন্ধ অনভূত হয়, তখন কস্তুরী ও কস্তুরীর গন্ধ একেবারে অভিন্ন, তাহা মনে করা চলেনা।

আবার, কস্তুরীর বহির্দ্দেশে গন্ধ অনুভূত হয় বলিয়া কস্তুরী ও কস্তুরীর গন্ধের ভেদ আছে—ইহাও মনে করা যায়না ; এইরূপ মনে করিতে গেলেও আর এক সমস্যা উপস্থিত হয়। কস্তুরী ও

তাহার গন্ধের মধ্যে ভেদ আছে মনে করিতে গেলে, উভয়কে দুইটী পৃথক্ বস্তু বলিয়া মনে করিলে, জলের অম্লজান ও উদকজানের মত, কস্তুরী এবং তাহার গন্ধকে সগন্ধ-কস্তুরীর দুইটী উপাদান বলিয়া মনে করিতে হয়। উপাদান বলিয়া মনে করিলে,গন্ধ বাহির হইয়া গেলে কস্তুরীর ওজন কমিয়া যাইতে বাধ্য। কিন্তু অভিজ্ঞতা হইতে জানা যায়, তাহাতে কস্তুরীর ওজন কমেনা (২।৩।২৬-ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য)। সুতরাং তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে করা যায় না। *

এইরূপে দেখা গেল—কস্তুরী এবং তাহার গন্ধের মধ্যে কেবল-অভেদ-মনন যেমন দুষ্কর, কেবল ভেদ-মননও তেমনি দুষ্কর। অথচ ভেদ আছে বলিয়া যেমন মনে হয়, অভেদ আছে বলিয়াও তেমনি মনে হয়।

এবিষয়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও উক্তরূপ দুষ্করত্বের কথাই বলেন। তিনি বলেন শক্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্নরূপে চিন্তা করা যায় না বলিয়া উহাদের ভেদ প্রতীত হয়, আবার ভিন্নরূপেও চিন্তা করা যায়না বলিয়া অভেদ প্রতীত হয়। তাই, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যুগপৎ ভেদ এবং অভেদই স্বীকার করিতে হয় এবং এই ভেদাভেদ যে অচিন্ত্য, তাহাও স্বীকার করিতে হয়। "তস্মাৎ স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ অভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তিমতো র্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতো তৌ চ অচিন্ত্যৌ ইতি ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা ॥"

শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ বা কেবল অভেদ চিন্তা করা কেন অসম্ভব, তাহাও শ্রীজীব বলিয়াছেন।

কেবল অভেদ-মননে যে দোষ জন্মে, সর্ব্বপ্রথমে বিষ্ণুপুরাণের একটী শ্লোকের আলোচনা করিয়া শ্রীজীব তাহা দেখাইয়াছেন। শ্লোকটী এই ঃ—

"জ্ঞাতশ্চতুর্ব্বিধো রাশিঃ শক্তিশ্চ ত্রিবিধা গুরো।
বিজ্ঞাতা চাপি কার্ৎস্নেন ত্রিবিধা ভাবভাবনা ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৬।৮।৭॥"

এই শ্লোকে মৈত্রেয় পরাশরকে বলিয়াছেন—"গুরুদেব ! অপনার নিকটে আমি ঈশ্বরের চতুর্ব্বিধ রূপের কথা অবগত হইলাম (সেই চতুর্ব্বিধ রূপ হইতেছে এই—পরব্রহ্ম, ঈশ্বর, বিশ্বরূপ এবং লীলামূর্ত্তি। বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৬।৭ অধ্যায়।) ত্রিবিধ শক্তির কথাও অবগত হইলাম (ত্রিবিধ শক্তি হইতেছে—পরাশক্তি, ক্ষেত্রজ্ঞা শক্তি ও অবিদ্যাশক্তি। বিষ্ণুপুরাণ ৬।৭।৬১)। এতদ্ব্যতীত ত্রিবিধ ভাবনা সম্বন্ধেও অবগত হইলাম (ত্রিবিধ ভাবনা—ব্রহ্মভাবাত্মিকা ভাবনা, কর্ম্মভাবাত্মিকা ভাবনা এবং উভয়াত্মিকা ভাবনা। সনন্দনাদি ব্রহ্ম-ভাবনায় নিরত, দেবাদি স্থাবরান্ত কর্ম্মভাবনা-পরায়ণ এবং হিরণ্যগর্ভাদি উভয়-ভাবনাপরায়ণ। বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৬।৭।৪৮—৫১ শ্লোক ॥)"

ইহার পরেই মৈত্রেয় পরাশরকে আরও বলিয়াছেন—

* আধুনিক বিজ্ঞান প্রমাণ করিয়াছেন যে, গন্ধ বাহির হইয়া গেলে কস্তুরীর ওজন কমে।

"ত্বৎপ্রসাদান্ময়া জ্ঞাতং জ্ঞেয়ৈরন্যৈরলং দ্বিজ।
যথৈতদখিলং বিষ্ণোর্জগন্ন ব্যতিরিচ্যতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ৬।৮।৮ ॥

—হে দ্বিজ! আপনার প্রসাদে আমি জানিতে পারিলাম যে, এই অখিল জগৎ বিষ্ণু হইতে ভিন্ন নহে; অতএব আমার আর জানিবার বিষয় কিছু নাই।"

বিষ্ণুপুরাণের এই উক্তি হইতে মনে হইতে পারে—এ-স্থলে ব্রহ্ম ও জগতের মধ্যে কেবল অভেদের কথাই বলা হইয়াছে। কিন্তু অতঃপর প্রদর্শিত হইয়াছে যে, কেবল অভেদ বিষ্ণুপুরাণের অভিপ্রেত নহে।

যাহা হউক, প্রথমোল্লিখিত "জ্ঞাতশ্চতুর্ব্বিধোরাশিঃ"-ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণের ৬।৮।৭-শ্লোকের আলোচনায়, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (৩৭ পৃষ্ঠায়) বলিয়াছেন—

"ইতি শ্রীমৈত্রেয়স্যানুবাদেঽপি পৌনরুক্ত্যদোষহানায়াসন্নিহিতসন্নিধাপন-লক্ষণকষ্টকল্পনা প্রসজ্জ্যেত। চতুর্ব্বিধরাশিকথনেনৈব স্বরূপস্যোক্তত্বাৎ।—ইহা মৈত্রেয়ের অনুবাদ-বাক্য (পূর্ব্বকথিত বাক্যের পুনরুক্তিমাত্র)। এ-স্থলে চতুর্ব্বিধ রাশি বলাতেই স্বরূপতত্ত্ব কথিত হইয়াছে। সুতরাং কেবল অভেদার্থ গ্রহণ করিলে মৈত্রেয়ের অনুবাদেও পুনরুক্তি দোষহানির জন্য অসন্নিহিত-সন্নিধাপনরূপ কষ্টকল্পনার প্রসক্তি হয়।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ। বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকে চতুর্ব্বিধরূপে পরতত্ত্বের স্বরূপের কথাই বলা হইয়াছে। শক্তির প্রভাবেই পরতত্ত্ব বস্তুর এই চতুর্ব্বিধ বৈচিত্র্য। শক্তিকে যদি শক্তিমান্ হইতে আত্যন্তিক ভাবে অভিন্ন মনে করা হয়, তাহা হইলে উক্ত চতুর্ব্বিধ রূপের মধ্যেও আত্যন্তিক অভেদ মনে করিতে হইবে, অর্থাৎ উক্ত চতুর্ব্বিধরূপ যে সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন এবং রূপবাচক শব্দগুলিও যে একার্থবোধক, তাহাই মনে করিতে হইবে। তাহাই যদি মনে করিতে হয়, তাহা হইলে একার্থবোধক চারিটী শব্দ প্রয়োগের কোনও সার্থকতা থাকে না। পুনরুক্তিদোষ আসিয়া পড়ে। কিন্তু শাস্ত্রবাক্যে পুনরুক্তি দোষ স্বীকার করা যায় না।

এইরূপে দেখা গেল—শক্তি ও শক্তিমানের আত্যন্তিক অভেদ স্বীকার করিলে দোষ-প্রসঙ্গ উপস্থিত হয়।

অবার, আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করিলেও দোষ দেখা দেয়। কেবল ভেদ স্বীকারে দোষ এই। শক্তি যদি শক্তিমান্ ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিক ভাবে ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মকে সেই শক্তির শক্তিমান্ বলা চলেনা। শক্তি ব্রহ্ম হইতে দ্বিতীয় একটী বস্তু হইয়া পড়ে; তাহাতে ব্রহ্মের শ্রুতি-প্রসিদ্ধ অদ্বয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। আবার শক্তি ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিক ভাবে ভিন্ন হইলে শক্তির প্রভাবে ব্রহ্মের চতুর্ব্বিধ রূপে আত্মপ্রকাশ করাও অসম্ভব হইয়া পড়ে। যদি বলা যায়—ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন শক্তিই স্বীয় প্রভাবে ব্রহ্মকে চতুর্ব্বিধরূপে প্রকাশ করিয়া থাকে, তাহা হইলেও ব্রহ্মের স্বাতন্ত্র্য ক্ষুণ্ণ হইয়া পড়ে। "পরাস্য শক্তি র্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়াচ" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে

যে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির কথা, স্বভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া ও বলক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে, ভেদ স্বীকার করিলে তাহার সহিতও বিরোধ উপস্থিত হয়।

এইরূপে দেখা গেল—শক্তি ও শক্তিমানের কেবল ভেদ স্বীকারেও দোষ উপস্থিত হয়।

ইহার পরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকেরও আলোচনা করিয়াছেন। শ্লোকটী এইঃ—

"জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে।
অগুণায়াবিকারায় নমস্তে প্রাকৃতায় চ॥ শ্রীভা, ১০।১৬।৪০॥"

এই শ্লোকটী হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি কালীয়-নাগপত্নীগণের উক্তি। নাগপত্নীগণ বলিতেছেন—"জ্ঞানবিজ্ঞাননিধি, অনন্তশক্তি, অগুণ, অবিকারী, প্রকৃতি-প্রবর্ত্তক ব্রহ্মকে (শ্রীকৃষ্ণকে) নমস্কার।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"জ্ঞানবিজ্ঞাননিধয়ে জ্ঞানং জ্ঞপ্তিঃ, বিজ্ঞানং চিচ্ছক্তিঃ উভয়োর্নিধয়ে তাভ্যাং পূর্ণায়। কথং তথাত্বমত উক্তং ব্রহ্মণেঽনন্তশক্তয়ে। কথম্ভূতায় ব্রহ্মণে অগুণায়াবিকারায়। কথম্ভূতায়ানন্তশক্তয়ে প্রাকৃতায় প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকায় অপ্রাকৃতায় ইতি বা অপ্রাকৃতানন্তশক্তিযুক্তায়। অয়মর্থঃ। অগুণত্বাদবিকারং ব্রহ্ম জ্ঞপ্তিমাত্রত্বাৎ কারণাতীতম্, প্রকৃতিপ্রবর্ত্তকত্বাৎ অনন্তশক্তিঃ বিজ্ঞাননিধিত্বাদীশ্বরঃ কারণম্; তদুভয়াত্মনে নম' ইতি।—জ্ঞান—জ্ঞপ্তি; বিজ্ঞান—চিচ্ছক্তি; এই উভয়দ্বারা যিনি পূর্ণ, তিনি জ্ঞানবিজ্ঞান-নিধি, তাঁহাকে নমস্কার। তিনি তথাবিধ কেন, তাহা বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে—'ব্রহ্মণে অনন্তশক্তয়ে—তিনি অনন্তশক্তিযুক্ত ব্রহ্ম, তাঁহাকে নমস্কার।' কি রকম ব্রহ্ম? অগুণায় অবিকারায়—তিনি অগুণ (প্রাকৃত গুণহীন) এবং অবিকার। কি রকম অনন্তশক্তি? তিনি প্রকৃতির প্রবর্ত্তক, অ নন্ত অপ্রাকৃতশক্তিযুক্ত। অগুণত্ব-নিবন্ধন তিনি অবিকার, জ্ঞপ্তিমাত্র বা জ্ঞানমাত্র বলিয়া তিনি ব্রহ্ম এবং কারণাতীত। প্রকৃতির প্রবর্ত্তক বলিয়া তিনি অনন্তশক্তি। তিনি বিজ্ঞাননিধি বলিয়া ঈশ্বর এবং কারণ। এই উভয়াত্মককে নমস্কার।"

এ-স্থলেও শক্তি ও শক্তিমানের কেবল অভেদ-স্বীকারেও দোষ দেখা দেয়, কেবল ভেদ-স্বীকারেও দোষ দেখা দেয়।

কেবল অভেদ-স্বীকারের দোষ এই। শ্রীধরস্বামিপাদের ব্যাখ্যানুসারে বিজ্ঞান-শব্দে চিচ্ছক্তি বুঝায়। পরব্রহ্মকে জ্ঞানবিজ্ঞান-নিধি—জ্ঞান-বিজ্ঞান পূর্ণ বলা হইয়াছে। তাঁহাকে অনন্ত- শক্তিও—অনন্তশক্তিবিশিষ্টও—বলা হইয়াছে। যদি শক্তি ও শক্তিমানের আত্যন্তিক অভেদ স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে কেবলমাত্র "ব্রহ্ম"-শব্দের উল্লেখেই শক্তি ও শক্তিমান্—উভয়ই সূচিত হইত, ব্রহ্মকে "জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধি" এবং "সর্ব্বশক্তি" বলার কোনও সার্থকতা থাকে না; তাহাতে বরং পুনরুক্তি-দোষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে। "জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধি" এবং "সর্ব্বশক্তি" এই শব্দদ্বয়ে শক্তি-

মান্ ব্রহ্মে এবং তাহার শক্তিতে ভেদেরই ইঙ্গিত দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু এই ভেদও আত্যন্তিক ভেদ নহে।

আত্যন্তিক ভেদ স্বীকারের দোষ এই। আত্যন্তিক ভেদ-স্বীকারে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব ক্ষুণ্ণ হয়। আবার, শক্তি যদি শক্তিমান্ ব্রহ্ম হইতে আত্যন্তিকভাবেই ভিন্ন হয়, তাহা হইলে ব্রহ্ম "জ্ঞান-বিজ্ঞান-নিধি" এবং "সর্ব্বশক্তি" হইতে পারেন না। এই শব্দদ্বয় দ্বারা ব্রহ্মশক্তির স্বাভাবিকত্বই সূচিত হইতেছে। আত্যন্তিকভাবে ভিন্না শক্তি কখনও স্বাভাবিকী হইতে পারে না। অথচ শক্তি যে ব্রহ্মের স্বাভাবিকী, তাহা শ্রুতিই বলিয়া গিয়াছেন।

ইহার পরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—শ্রীরামানুজীয়গণ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদের কথা বলেন। তাহা হইলেও শক্তি যে স্বরূপেরই অন্তরঙ্গ—সুতরাং স্বরূপভূত—তাহাও তাঁহারা প্রতিপন্ন করিয়া থাকেন। শক্তি যদি স্বরূপের অন্তরঙ্গ এবং স্বরূপভূত হয়, তাহা হইলে শক্তি ও শক্তিমৎ-স্বরূপের আত্যন্তিক ভেদ আছে বলা যায় না এবং আত্যন্তিক অভেদ আছে বলিয়াও মনে করা যায় না। রামানুজীয়গণ বিশিষ্টকেই অব্যভিচারিরূপে স্বরূপ বলিয়া স্বীকার করেন, কেবল বিশেষ্যকে অব্যভিচারিরূপে স্বরূপ বলিয়া তাঁহারা প্রতিপাদন করেন না। সুতরাং তাঁহাদের মতেও স্বরূপ-শক্তি অবশ্যই স্বীকার্য্য।

শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করিয়াই রামানুজীয়গণ ব্রহ্মের স্বগতভেদ স্বীকার করিয়া থাকেন। কিন্তু আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করিলে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে না। শক্তির অন্তরঙ্গত্ব এবং স্বরূপভূতত্ব স্বীকার করিলে অদ্বয়ত্ব-প্রতিজ্ঞার সহিত বিরোধ উপস্থিত হয় না। দৃষ্টান্তস্থলে বলা যায়—ব্রহ্মে ষড়্ভাববিকার (জায়তে, অস্তি, বিপরিণমতে, বর্দ্ধতে, অপক্ষীয়তে, নশ্যতি—জন্ম, অস্তিত্ব, বিপরিণাম, বৃদ্ধি, ক্ষয় এবং বিনাশ—এই ছয় রকমের বিকার) নিষিদ্ধ হইলেও অস্তিত্বটী সর্ব্বথা অপরিহার্য্য। এ-স্থলেও তদ্রূপ। (তাৎপর্য্য এই—ব্রহ্মস্বরূপের অস্তিত্ব স্বীকৃত। রামানুজীয়দের মতে স্বরূপ বলিতে শক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মকেই বুঝায়। শক্তি ব্রহ্মের স্বরূপভূত হওয়ায় অদ্বয়ত্ব প্রতিজ্ঞার হানি হইতে পারে না। রামানুজীয়েরা শক্তি-শক্তিমানের ভেদ স্বীকার করিয়াও যখন ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্বীকার করেন, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়, তাঁহারা শক্তির আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করেন না, আত্যন্তিক ভেদ স্বীকার করিলে অদ্বয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে না)।

কোনও কোনও স্থলে তন্মাত্র-বস্তুতেও এতাদৃশ স্বগতভেদের যাথার্থ্য পরিলক্ষিত হয়। যেমন. পৃথিবী ; তাহার গুণ বা শক্তি হইতেছে গন্ধ-তন্মাত্র—যাহা একমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারা অনুভব-যোগ্য, অঙ্গুলি-আদিদ্বারা অনুভবযোগ্য নহে। এই গন্ধেরও নানাবিধ বিশেষ বা ভেদ আছে (ইহাই স্বগত ভেদ); কিন্তু সেই সমস্ত বিশেষ বা ভেদ কেবলমাত্র ঘ্রাণেন্দ্রিয়দ্বারাই অনুভূত হইতে পারে ; অঙ্গুলি নিক্ষেপের দ্বারা অনুভূত হইতে পারে না। বিভিন্ন গন্ধবিশিষ্ট মৃত্তিকার বিভিন্নতার মূল কিন্তু

গন্ধেরই বিভিন্নতা, এই বিভিন্নতা গন্ধাতিরিক্ত কোনও বস্তু নহে। কেন না, ঘ্রাণেন্দ্রিয় দ্বারাই তাহাদের অনুভব হয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই প্রসঙ্গে শ্রুতিবাক্যেরও আলোচনা করিয়াছেন।

"বিজ্ঞানম্ আনন্দম্ ব্রহ্ম॥ বৃহদারণ্যক ॥৩।৯।২।৮॥ ব্রহ্ম হইতেছেন বিজ্ঞান এবং আনন্দ।" বিজ্ঞান-শব্দে জড়বিরোধিত্ব এবং আনন্দ-শব্দে দুঃখবিরোধিত্ব বুঝায়। শ্রুতিবাক্যটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এই—ব্রহ্মবস্তু হইতেছেন বিজ্ঞান (জড়বিরোধী, অজড় চিন্ময়), এবং আনন্দ বা সুখ (দুঃখবিরোধী—তাঁহাতে দুঃখের ছায়াও নাই)। এই দুইটী তাঁহার গুণ বা ধর্ম্ম--স্বরূপশক্তির ক্রিয়ায় উদ্ভূত। শক্তি ও শক্তি-মানের আত্যন্তিক অভেদ মনে করিতে গেলে এই দুইটী শব্দের ব্যঞ্জনাতেও আত্যন্তিক অভেদ—অর্থাৎ এই দুইটী শব্দকেও সম্যক্‌রূপে একার্থক—মনে করিতে হয়। তাহাতে পুনরুক্তি-দোষের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে।

আবার, বিজ্ঞান ও আনন্দকে সম্যক্‌রূপে ভিন্ন মনে করিলেও ব্রহ্মে স্বগত ভেদ স্বীকার করিতে হয়। তাহাও দোষের ; যেহেতু, ব্রহ্ম হইতেছেন সর্ব্ববিধ-ভেদরহিত অদ্বয়তত্ত্ব। "কিমিহ বিজ্ঞানানন্দশব্দৌ একার্থৌ ভিন্নার্থৌ বা ? নাদ্যঃ—পৌনরুক্ত্যাৎ। অন্ত্যশ্চেৎ—বিজ্ঞানত্বমানন্দত্বঞ্চ তত্রৈকস্মিন্নেব ইতি তাদৃশ স্বগতভেদাপত্তিঃ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ॥৩৮পৃষ্ঠা॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভেদ এবং অভেদসম্বন্ধে অনেক বিচার করিয়াছেন। শেষকালে সিদ্ধান্ত করিয়াছেন--শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল অভেদ মনে করিতে গেলেও অনেক দোষ দেখা দেয়। তর্কের দ্বারাও নির্দ্দোষ সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় না। তাই শক্তি ও শক্তিমানের ভেদ সাধন করা যেমন দুষ্কর, অভেদ সাধন করাও তেমনি দুষ্কর। এজন্য কেহ কেহ ভেদাভেদ-সাধন-চিন্তার অসমর্থতাপ্রযুক্ত অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদই স্বীকার করেন। "অপরে তু 'তর্কাপ্রতিষ্ঠানাৎ (ব্রহ্মসূত্র॥ ২।১।১১)' ভেদেঽপ্যভেদেঽপি নির্ম্মর্য্যাদদোষ-সন্ততিদর্শনেন ভিন্নতয়া চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদং সাধয়ন্তঃ তদ্বদভিন্নতয়াপি চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ ভেদমপি সাধয়ন্তোঽচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদং স্বীকুর্ব্বন্তি॥ সর্ব্ব-সম্বাদিনী ॥ ১৪৯ পৃষ্ঠা ॥"

তিনি নিজে যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদই স্বীকার করেন, তাহাও শ্রীজীবপাদ বলিয়া গিয়াছেন। "স্বমতে তু অচিন্ত্যভেদাভেদাবেব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ।।১৪৯ পৃষ্ঠা ॥"

কিন্তু পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ-মনন করিতে গেলেও এমন এক সমস্যার উদ্ভব হয়, যাহার কোনও সমাধান পাওয়া যায়না। আবার কেবল অভেদ-মনন করিতে গেলেও এমন এক সমস্যার উদ্ভব হয় , যাহার কোমও সমাধান পাওয়া যায় না। তাই, বাধ্য হইয়া ভেদ এবং অভেদ এই উভয়ের যুগপৎ বিদ্যমানতা স্বীকার করিতে হইতেছে। কিন্তু এই স্বীকৃতির মূলে সমস্যা-সমাধানের অসামর্থ্যব্যতীত অন্য কোনও যুক্তি নাই। এই অবস্থায় কোনও স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া সম্ভব কিনা এবং সঙ্গত কিনা ?

গ। অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরত্ব

এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায় বিষ্ণুপুরাণে। বিষ্ণুপুরাণ হইতে জানা যায়—মৈত্রেয় পরাশরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—

নির্গুণস্যাপ্রমেয়স্য শুদ্ধস্যাপ্যমলাত্মনঃ।
কথং সর্গাদিকর্তৃত্বং ব্রহ্মণোঽভ্যুপগম্যতে ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥ ১।৩।১ ॥

—যিনি নির্গুণ (সত্ত্বাদিগুণশূন্য), যিনি অপ্রমেয় (দেশ-কালাদিদ্বারা অপরিচ্ছিন্ন), যিনি শুদ্ধ (দোষরহিত, বা সহকারিশূন্য) এবং যিনি অমলাত্মা (রাগাদি-দোষরহিত), সেই ব্রহ্মের পক্ষে জগৎ-সৃষ্ট্যাদির কর্তৃত্ব কিরূপে স্বীকৃত হইতে পারে ?”

এই প্রশ্নের উত্তরে পরাশর মৈত্রেয়কে বলিয়াছিলেন—

“শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ।
যতোঽতো ব্রহ্মণস্তাস্তু সর্গাদ্যা ভাবশক্তয়ঃ
ভবন্তি তপতাং শ্রেষ্ঠ পাবকস্য যথোষ্ণতা ॥ —বিষ্ণুপুরাণ ॥ ১।৩।২ ॥

—হে তপস্বিশ্রেষ্ঠ ! সমস্ত ভাব-পদার্থের শক্তিসমূহ যেমন অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর, তদ্রূপ ব্রহ্মের জগৎ-সৃষ্ট্যাদি ভাব-শক্তিও অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর; ইহা অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায় স্বভাবসিদ্ধ।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—

“লোকে হি সর্ব্বেষাং ভাবানাং মণিমন্ত্রাদীনাং শক্তয়ঃ অচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ। অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্‌জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকং তস্য গোচরাঃ সন্তি। যদ্বা, **অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি-বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুম্ অশক্যাঃ**। কেবলমর্থাপত্তিজ্ঞানগোচরাঃ সন্তি। যত এবমতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ সর্গাদ্যাঃ সর্গাদিহেতুভূতাঃ ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব, পাবকস্য দাহকত্বাদি-শক্তিবৎ। অতো গুণাদিহীনস্য অপি অচিন্ত্যশক্তিমত্ত্বাৎ ব্রহ্মণঃ সর্গাদিকর্তৃত্বং ঘটত ইত্যর্থঃ। শ্রুতিশ্চ—‘ন তস্য কার্য্যং করণঞ্চ বিদ্যতে, ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে। পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া চ। মায়ান্তু প্রকৃতিং বিদ্যান্মায়িনন্তু মহেশ্বরম্’-ইত্যাদি। যদ্বা এবং যোজনা, সর্ব্বেষাং ভাবানাং পাবকস্যোষ্ণতা-শক্তিবদচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব। ব্রহ্মণঃ পুনস্তাঃ স্বভাবভূতাঃ স্বরূপাদভিন্নাঃ শক্তয়ঃ। ‘পরাস্য শক্তির্ব্বিবিধৈব শ্রূয়তে’-ইত্যাদি শ্রুতেঃ। অতো মণিমন্ত্রাদিভিরগ্নেরৌষ্ণ্যবৎ ন কেনচিদ্ বিহন্তুং শক্যতে। অতএব তস্য নিরঙ্কুশমৈশ্বর্য্যম্। তথা চ শ্রুতিঃ—‘স বা অয়মাত্মা সর্ব্বস্য বশী সর্ব্বস্যেশানঃ সর্ব্বস্যাধিপতিঃ’ ইত্যাদি। ‘তপতাং শ্রেষ্ঠ’ ইতি সম্বোধয়ন্ কাপি তপঃশক্তিঃ স্বয়ংবেদ্যেতি সূচয়তি। যত এবমতো ব্রহ্মণো হেতোঃ সর্গাদ্যা ভবন্তি, নাত্র কাচিদনুপপত্তিরিত্যর্থঃ॥”

টীকার মর্ম্মানুবাদ। লৌকিক জগতে দেখা যায়, মণিমন্ত্রাদি ভাববস্তুর শক্তি অচিন্ত্য-

জ্ঞানগোচর। অচিন্ত্য—তর্কাসহ, যুক্তিতর্কদ্বারা যাহা নির্ণীত হইতে পারেনা। এতাদৃশ যে জ্ঞান—কোনও প্রমাণসিদ্ধ কার্য্যের অন্য কোনও প্রকারে উপপত্তি বা সমাধান হয়না বলিয়া যাহা স্বীকৃত হয়, এতাদৃশ যে জ্ঞান—তাহাই হইতেছে অচিন্ত্য-জ্ঞান ; তাহার বিষয় যাহা, তাহাই অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর। অথবা, **যাহা ভিন্নাভিন্নত্বাদি বিকল্পদ্বারা চিন্তার অযোগ্য, তাহাই অচিন্ত্য**। যাহা কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর, তাহাই অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর। এইরূপে, ব্রহ্মেরও তাদৃশী সর্গাদিহেতুভূতা স্বভাবসিদ্ধা ভাবশক্তি আছে—অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায়। এজন্য ব্রহ্ম গুণাদিহীন হইলেও অচিন্ত্যশক্তিমান্ বলিয়া তাঁহার সর্গাদিকর্তৃত্ব সম্ভবপর হয়। শ্রুতিও বলেন—'তাঁহার কার্য্য নাই, করণ নাই ; তাঁহার সমান এবং অধিকও দৃষ্ট হয় না। তাঁহার বিবিধ পরাশক্তির কথা শুনা যায়, স্বাভাবিকী জ্ঞানক্রিয়া এবং বলক্রিয়ার কথাও শুনা যায়।' 'মায়াকে প্রকৃতি বলিয়া জানিবে এবং মায়ীকে মহেশ্বর বলিয়া জানিবে। ইত্যাদি।" অথবা, এইরূপ যোজনাও করা যায়—অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় সমস্ত ভাববস্তুরই অচিন্ত্যজ্ঞান-গোচরা শক্তি আছে। ব্রহ্মের তাদৃশী শক্তিসমূহ তাঁহার স্বভাবভূতা, স্বরূপ হইতে অভিন্না। "পরাস্য শক্তি র্বিবিধৈব শ্রূয়তে" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যও তাহাই বলেন। এজন্য মণিমন্ত্রাদির প্রভাবে অগ্নির দাহিকা শক্তির ন্যায় ব্রহ্মের শক্তি কোনরূপেই প্রতিহত হওয়ার যোগ্য নহে। অতএব ব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য হইতেছে নিরঙ্কুশ। শ্রুতিও বলেন—"সেই এই আত্মা সকলের বশীকারক, সকলের ঈশান (নিয়ন্তা), সকলের অধিপতি ইত্যাদি।" শ্লোকে "তপতাং শ্রেষ্ঠ"-এই ভাবে সম্বোধন করায় কোনও স্বয়ংবেদ্যা তপঃশক্তিই সূচিত হইয়াছে। এই সমস্ত হেতুতে ব্রহ্মরূপ হেতু হইতেই সর্গাদি হইয়া থাকে, ইহাতে কোনওরূপ অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) নাই।

এই টীকা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার তাৎপর্য্য এই :—

প্রথমতঃ, পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তিসমূহ তাঁহার স্বরূপভূতা, স্বরূপ হইতে অভিন্না, স্বাভাবিকী—অগ্নির দাহিকা-শক্তির ন্যায়। বিশেষত্ব এই যে, মণি-মন্ত্রাদির প্রভাবে অগ্নির দাহিকা-শক্তি কখনও কখনও স্তম্ভিত হইতে পারে ; কিন্তু ব্রহ্মের শক্তি কোনও কিছুদ্বারাই প্রতিহত হইতে পারেনা। পরব্রহ্মের ঐশ্বর্য্য হইতেছে নিরঙ্কুশ।

দ্বিতীয়তঃ, জল, অগ্নি, প্রভৃতি যে সমস্ত বস্তুর অস্তিত্ব আছে, তাহাদিগকে বলে ভাববস্তু। পরব্রহ্ম ভাববস্তু, তাঁহার শক্তিসমূহও ভাববস্তু।

সমস্ত ভাববস্তুর শক্তিসমূহ হইতেছে অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর।

(১) তর্কাসহ জ্ঞান

যে জ্ঞান কোনও যুক্তিতর্কদ্বারা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেনা, অথচ প্রত্যক্ষ সত্য বলিয়া যাহাকে স্বীকার না করিয়াও পারা যায়না, তাহাই হইল **অচিন্ত্য জ্ঞান** বা তর্কাসহ জ্ঞান। মিশ্রী মিষ্ট ; কিন্তু কেন মিষ্ট ? যবক্ষার তিক্ত ; কিন্তু কেন তিক্ত ? বিষ খাইলে মানুষ মরে, কিন্তু দুধ খাইলে মরে না ; কিন্তু কেন ? এ-সমস্ত কেন'র কোনও উত্তর নাই, এ-সকল সমস্যার কোনও সমাধান

নাই। কিন্তু উত্তর নাই বলিয়া, বা সমাধান নাই বলিয়া—অর্থাৎ মিশ্রী কেন মিষ্ট এবং কেন মিশ্রী তিক্ত নহে, যবক্ষার কেন তিক্ত এবং যবক্ষার কেন মিষ্ট নহে, বিষ খাইলে মানুষ মরে, কিন্তু দুধ খাইলে কেন মরে না, কোনওরূপ যুক্তিতর্কদ্বারা এ-সমস্ত সপ্রমাণ করা যায় না বলিয়া—মিশ্রীর মিষ্টত্ব, বা যবক্ষারের তিক্তত্ব, কিম্বা বিষের প্রাণসংহারকত্ব অস্বীকার করা যায় না। এইরূপ, মিশ্রীর মিষ্টত্বের জ্ঞান, যবক্ষারের তিক্তত্বের জ্ঞান—এ-সমস্ত জ্ঞানকেই বলা হয় অচিন্ত্য-জ্ঞান বা তর্কাসহ জ্ঞান। মিষ্টত্ব হইল মিশ্রীর শক্তি, তিক্তত্ব হইল যবক্ষারের শক্তি। তাই মিশ্রী আদি ভাববস্তুর শক্তির জ্ঞান হইল অচিন্ত্য জ্ঞান।

বিষ্ণুপুরাণ বলেন—সমস্ত ভাববস্তুর শক্তির জ্ঞানই হইতেছে অচিন্ত্য-জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত, অচিন্ত্যজ্ঞান-গোচর। আগুনের যে উত্তাপ আছে, কস্তুরীর যে গন্ধ আছে—আমরা ইহা জানি, এবং জানিয়া রাখিতে পারি ; কিন্তু যুক্তিতর্কদ্বারা, চিন্তাভাবনাদ্বারা, তাহার হেতু নির্ণয় করিতে পারিনা। আধুনিক বিজ্ঞানও কোনও বস্তুর শক্তির হেতু নির্ণয় করিতে পারেনা, বস্তুর ধর্ম্ম বা শক্তির আবিষ্কারমাত্র করিতে পারে। কোন্ বস্তু বিষরূপে মারাত্মক, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে ; কিন্তু কেন তাহা মারাত্মক, তাহা বলিতে পারে না। অম্লজান ও উদকজান মিলিয়া জল হয়, বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে ; কিন্তু কেন হয়, তাহা বলিতে পারে না। দুই ভাগ উদকজান এবং একভাগ অম্লজান মিশাইলে জল হয়, কিন্তু অম্লজান ও উদকজান সমপরিমাণে মিশিয়া জল উৎপাদন করিতে পারে না—বিজ্ঞান তাহা বলিতে পারে ; কিন্তু কেন এইরূপ হয় বা হয় না, তাহা বিজ্ঞান বলিতে পারে না। কিন্তু কারণ বলিতে পারা যায় না বলিয়া—যাহা হয় বা হয় না বলিয়া প্রত্যক্ষ দেখা যায়, তাহাকে অস্বীকার করার উপায় নাই। বিজ্ঞান তাহা অস্বীকার করেও না। এইরূপে যাহা স্বীকার করিয়া লইতে হয়, তাহাই অচিন্ত্য জ্ঞান বা তর্কাসহ জ্ঞান।

(২) **অর্থাপত্তি-জ্ঞান**

শ্রীধরস্বামিপাদ অচিন্ত্য-জ্ঞান-শব্দের এক অর্থ করিয়াছেন—তর্কাসহ-জ্ঞান। তাহার তাৎপর্য্য পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। তিনি অন্য অর্থ করিয়াছেন—“যদ্বা অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদিবিকল্পৈশ্চিন্তয়িতু-মশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচরাঃ—ভিন্ন বলিয়াও চিন্তা করা যায় না, অভিন্ন বলিয়াও চিন্তা করা যায় না, কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর।”

কিন্তু “অর্থাপত্তি-জ্ঞান”-শব্দের তাৎপর্য্য কি ? যে অর্থকে (বা অতি প্রসিদ্ধ বস্তুকে) অস্বীকার করা যায় না, অথচ যাহার হেতুসম্বন্ধেও কোনও উল্লেখ দৃষ্ট হয় না, তাহার হেতু সম্বন্ধে যে “আপত্তি বা কল্পনা” করা হয় এবং সেই কল্পনাদ্বারা যে জ্ঞান লাভ হয়, তাহাই হইতেছে অর্থাপত্তি-জ্ঞান।

অর্থাপত্তি দুই রকমের—দৃষ্টার্থাপত্তি ও শ্রুতার্থাপত্তি। দৃষ্টান্তের সাহায্যে এই দুই রকমের অর্থাপত্তি বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক।

দৃষ্টার্থাপত্তি। দেবদত্ত-নামক লোক দিনে ভোজন করেন না ; অথচ, তাঁহার শরীর হৃষ্ট, পুষ্ট,

বলিষ্ঠ, কর্ম্মঠ। দিনে বা রাত্রিতে কোনও সময়েই আহার না করিলে এইরূপ শরীর থাকা সম্ভব নয়। সুতরাং এ-স্থলে স্বীকার করিতে হইবে যে, দেবদত্ত দিনে ভোজন করেন না বটে, কিন্তু রাত্রিতে ভোজন করেন। এ-স্থলে দেবদত্তের "দিনে ভোজনাভাব" এবং "দেহের বলিষ্ঠত্বাদি" প্রত্যক্ষ প্রমাণদ্বারা সিদ্ধ (অর্থ); সুতরাং তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তাহার হেতু দৃষ্ট হয় না। এজন্য একটী হেতুর আপত্তি (বা কল্পনা) করা হয়—রাত্রিভোজন। দৃষ্ট (বা প্রত্যক্ষ প্রমাণসিদ্ধ) অর্থের উপপত্তির জন্য "রাত্রিভোজন"রূপ হেতুর আপত্তি (বা কল্পনা) করা হয় বলিয়া ইহাকে "দৃষ্টার্থাপত্তি" বলা হয়।

শ্রুতার্থাপত্তি। যাহা দৃষ্ট বা প্রত্যক্ষ দৃষ্ট নহে, শ্রুতমাত্র—শ্রুতি-স্মৃতি-আদি শাস্ত্র হইতে শ্রুত বা জ্ঞাত এবং অতিপ্রসিদ্ধ, অথচ যাহার হেতু সম্বন্ধে কোনও উল্লেখ পাওয়া যায় না, তৎসম্বন্ধে যে হেতুর আপত্তি বা কল্পনা করিয়া লওয়া হয়, তাহাকে বলে শ্রুতার্থাপত্তি। একটী দৃষ্টান্তের অবতারণা করা হইতেছে।

শ্রুতি হইতে জানা যায়—অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করিলে স্বর্গ লাভ হয়। শ্রুতির উক্তি বলিয়া ইহা অস্বীকার করা যায় না। অথচ ইহার হেতুর কোনও উল্লেখ নাই। যদি বলা যায়—অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞই তো স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু বলিয়া কথিত হইয়াছে; সুতরাং হেতুর উল্লেখ নাই বলা যায় কিরূপে? তাহার উত্তরে বক্তব্য এই—যাহা ফলের সহিত অব্যবহিত, তাহাই হেতু হইতে পারে; যাহা ফল হইতে ব্যবহিত, তাহা হেতু হইতে পারে না—ইহাই ন্যায়শাস্ত্রের বিধান। অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ করা হয় লোকের জীবিত অবস্থায়; যজ্ঞকর্ত্তার স্বর্গপ্রাপ্তি হয় মৃত্যুর পরে; সুতরাং অগ্নিষ্টোম যজ্ঞ এবং স্বর্গপ্রাপ্তি এই উভয়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান অনেক। এজন্য অগ্নিষ্টোম যজ্ঞকে স্বর্গপ্রাপ্তির হেতু বলা যায় না।

এ-স্থলে মনে করা হয়—অগ্নিষ্টোম-যজ্ঞের ফলে যজ্ঞকর্ত্তার একটী বিশেষ বস্তু—পুণ্য – লাভ হয়। এই পুণ্য স্বর্গপ্রাপ্তি পর্য্যন্ত তাঁহার মধ্যে থাকে এবং এই পুণ্যই হইতেছে স্বর্গপ্রাপ্তির অব্যবহিত হেতু। এ-স্থলে শ্রুতিসিদ্ধ বস্তুর উপপত্তির নিমিত্ত পুণ্যরূপ হেতুর আপত্তি বা কল্পনা করা হয় বলিয়া ইহাকে শ্রুতার্থাপত্তি বলে।

স্বামিপাদকৃত "অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর"-শব্দের উল্লিখিত উভয়রূপ অর্থেরই পর্য্যবসান কিন্তু একই পদার্থে, পার্থক্য কেবল হেতু-সম্বন্ধে। প্রথম প্রকারের অর্থে তিনি "অচিন্ত্য"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন "তর্কাসহ—যুক্তিতর্কের দ্বারা অনির্ণেয়"; সুতরাং এ-স্থলে যুক্তিতর্কদ্বারা হেতু-নির্ণয়ের প্রয়াস বৃথা। দ্বিতীয় প্রকার অর্থে—অর্থাপত্তিতে—বলা হইয়াছে—একটা হেতুর কল্পনা করা যাইতে পারে। হেতুনির্ণয়ের চেষ্টা করা হউক বা না হউক, প্রত্যক্ষদৃষ্ট বা শাস্ত্রলব্ধ প্রসিদ্ধ বস্তুটী (অর্থটী) উভয় প্রকারের অর্থেই স্বীকার করিতে হইবে। প্রসিদ্ধ বস্তুর স্বীকৃতিতেই উভয়প্রকার অর্থের পর্য্যবসান।

"অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর"-শব্দের উল্লিখিত উভয় প্রকারের অর্থই শাস্ত্রসম্মত। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ"-এই ব্রহ্মসূত্রে এবং "অচিন্ত্যাঃ খলু যে ভাবা ন তাংস্তর্কেণ যোজয়েৎ। প্রকৃতিভ্যঃ পরং যত্তু তদচিন্ত্যস্য লক্ষণম্ ॥"-এই মহাভারত-বাক্যে প্রকৃতির অতীত বস্তুর (অর্থাৎ শ্রুতার্থের)

অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরত্বের কথা বলা হইয়াছে এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানমচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ—এই বিষ্ণুপুরাণবাক্যে প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বস্তুর (দৃষ্টার্থের এবং শ্রুতার্থের) শক্তির অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরত্বের কথা বলা হইয়াছে।

"অচিন্ত্য-জ্ঞান-গোচর" শব্দের তাৎপর্য্য-ব্যাখ্যানে শ্রীধরস্বামিপাদ পরিষ্কার ভাবেই বলিয়াছেন, শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে কেবল ভেদ স্বীকার করাও যেমন যায় না, কেবল অভেদ স্বীকার করাও যায় না; ইহা কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর। "অচিন্ত্যা ভিন্নাভিন্নত্বাদি-বিকল্পৈশ্চিন্তয়িতুমশক্যাঃ কেবলমর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচরাঃ (শক্তয়ঃ) সন্তি।" কেবল ভেদ আছে বলিয়াও চিন্তা করা যায় না, আবার কেবল অভেদ আছে বলিয়াও চিন্তা করা যায় না। অথচ ভেদ এবং অভেদ উভয়ই দৃষ্ট হয়। এই ভেদ এবং অভেদের যুগপৎ অস্তিত্বও অস্বীকার করা যায় না। ভেদ এবং অভেদের এই যুগপৎ অস্তিত্বই হইতেছে অচিন্ত্যজ্ঞানগোচর বা কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর। ইহাই শ্রীধর স্বামিপাদের উক্তির তাৎপর্য্য এবং এই তাৎপর্য্য যে শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

(৩) অর্থাপত্তি-ন্যায়ে কল্পিত হেতু। ভেদাভেদের অচিন্ত্য-শক্তি

কিন্তু এ-স্থলে একটী প্রশ্ন দেখা দিতেছে এই যে—স্বামিপাদ বলেন, শক্তি ও শক্তিমানের যুগপৎ ভেদাভেদ-সম্বন্ধ হইতেছে কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর। ইহা হইতে বুঝা গেল—যুগপৎ ভেদাভেদের একটা হেতু কল্পিত হইতে পারে। কিন্তু সেই কল্পিত হেতুটী কি? স্বামিপাদ তাহার উল্লেখ করেন নাই। উল্লেখ না করার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—"হেতু কল্পনা করিতে চাও কর; কিন্তু যুগপৎ ভেদাভেদের অস্তিত্ব অবশ্য স্বীকার্য্য।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে একটা হেতু অনুমিত হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—"স্বমতে তু অচিন্ত্যভেদাভেদৌ এব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাদিতি॥ সর্ব্বসম্বাদিনী॥ বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ সংস্করণ॥ ১৪৯ পৃষ্ঠা॥—অচিন্ত্য—শক্তিময়ত্ববশতঃ অচিন্ত্যভেদাভেদই স্বীকৃত।" এ-স্থলে কাহার অচিন্ত্য-শক্তিময়ত্বের কথা বলা হইয়াছে? ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিময়ত্ব তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, তাহাই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে ব্রহ্ম-শব্দের উল্লেখ স্বাভাবিক হইত, "ব্রহ্মণঃ অচিন্ত্য-শক্তিময়ত্বাৎ"—একথাই তিনি বলিতেন। তাহা তিনি বলেন নাই। বিশেষতঃ বিষ্ণুপুরাণের "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ"-এই বাক্যে সমস্ত বস্তুর শক্তির কথাই বলা হইয়াছে, কেবল ব্রহ্ম-শক্তির কথা বলা হয় নাই। প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বস্তুর সহিতই তাহাদের শক্তিনিচয়ের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বিষ্ণুপুরাণ-বাক্যের ব্যাপকত্বকে খর্ব্ব করিয়া কেবল যে ব্রহ্ম ও ব্রহ্ম-শক্তিতেই সেই বাক্যের তাৎপর্য্য পর্য্যবসিত করিবেন—এইরূপ অনুমান সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। শ্রীধরস্বামিপাদ সমস্ত ভাববস্তুর ভেদাভেদ-সম্বন্ধকেই তর্কাসহ-জ্ঞানগোচর বা কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর বলিয়াছেন এবং পরে বলিয়াছেন—ব্রহ্মেরও তাদৃশ শক্তি-

সমূহ আছে। "যত এবমতো ব্রহ্মণোঽপি তাস্তথাবিধাঃ শক্তয়ঃ সর্গাদিহেতুভূতা ভাবশক্তয়ঃ স্বভাবসিদ্ধাঃ শক্তয়ঃ সন্ত্যেব, পাবকস্য দাহকত্বাদি শক্তিবৎ।"

এই সমস্ত কারণে মনে হয়, ব্রহ্মের অচিন্ত্য শক্তিই ভেদাভেদ সম্বন্ধের হেতু—ইহা শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিপ্রেত নহে। "অচিন্ত্যভেদাভেদৌ এব অচিন্ত্যশক্তিময়ত্বাৎ"—এই বাক্য হইতে বুঝা যায়—"অচিন্ত্য-শক্তিময়ত্ব" যেন "ভেদাভেদের"ই বিশেষণ-স্থানীয়। ভেদাভেদের অচিন্ত্য-শক্তিময়ত্ব বা অচিন্ত্যপ্রভাব বা অচিন্ত্য স্বভাবই যেন শ্রীজীবপাদের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহার এমন একটা স্বভাব বা প্রভাব আছে, যাহাতে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান থাকিতে পারে এবং এই স্বভাব বা প্রভাবটী চিন্তার অতীত।

ছুই ভাগ উদকজানের সহিত এক ভাগ অম্লজান মিশাইলে যে জলের উদ্ভব হয়, তাহার হেতু কি? অর্থাপত্তি-ন্যায়ে বলা যায়, উদকজানের এবং অম্লজানের কোনও এক অচিন্ত্য-শক্তিই হইতেছে ইহার হেতু। মিলনকারীর শক্তিতে জলের উদ্ভব হয় না, উদকজানের এবং অম্লজানের মধ্যে স্বভাবতঃ অবস্থিত কোনও শক্তিই হইতেছে ইহার হেতু; যুক্তিতর্কদ্বারা এই শক্তি নির্ণীত হইতে পারে না, ইহা এক অচিন্ত্যশক্তি। তদ্রূপ শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ ও অভেদ বিদ্যমান, তাহাদের কোনও এক অচিন্ত্য-শক্তিই হইতেছে তাহাদের যুগপৎ অস্তিত্বের হেতু।

ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তিই যদি পরস্পর-বিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্বের হেতু হইত, তাহা হইলে বিষ্ণুপুরাণাদি-বাক্যের আলোচনা না করিয়া সোজাসোজিই শ্রীজীব বলিতে পারিতেন—ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবেই যুগপৎ ভেদ ও অভেদের বিদ্যমানতা সম্ভব হয়। কিন্তু তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি বরং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদাভেদের অচিন্ত্যত্বের কথাই বলিয়াছেন। "স্বরূপাদভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদ্ভেদঃ, ভিন্নত্বেন চিন্তয়িতুমশক্যত্বাদভেদশ্চ প্রতীয়ত ইতি শক্তিশক্তি-মতোর্ভেদাভেদাবেবাঙ্গীকৃতৌ **তৌ চ অচিন্ত্যৌ** ইতি॥ সর্ব্বসম্বাদিনী॥ ৩৬-৩৭ পৃষ্ঠা॥"

প্রশ্ন হইতে পারে—"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়োস্তাদৃশাঃ স্যুঃ। একো বশী সর্ব্বভূতান্তরাত্মা সর্ব্বান্ দেবানেক এবানুবিষ্টঃ॥ ('আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি ॥২।১।২৮॥ ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিবাক্য)।—সেই পুরাণপুরুষ বিচিত্র-শক্তিসম্পন্ন; তাদৃশ-শক্তি অপর কাহারও নাই। তিনি এক বশীকারক, সর্ব্বভূতের অন্তরাত্মা; তিনি এক হইয়াও সকল দেবতাতে অনুপ্রবিষ্ট।"—এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, একমাত্র পুরাণ-পুরুষ-ব্রহ্মেরই বিচিত্র-শক্তি বা অচিন্ত্য-শক্তি আছে, অপর কাহারও তাদৃশী শক্তি নাই। যদি ভেদাভেদ-সম্বন্ধের অচিন্ত্য-শক্তি স্বীকার করা হয়, তাহা হইলে উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।

ইহার উত্তরে বলা যায়—ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে। তিনি তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে এক হইয়াও অন্তরাত্মারূপে সর্ব্বভূতে অবস্থিত, সর্ব্বদেবতায় অনু-প্রবিষ্ট। এই অচিন্ত্য-শক্তির প্রভাবে তিনি অনেক অঘটন ঘটাইতে পারেন। তাঁহার অচিন্ত্য-শক্তির

ব্যাপকত্ব সর্ব্বাতিশায়ী। "ন চান্যেষাং শক্তয়োস্তাদৃশাঃ স্যুঃ"—এই বাক্যে শ্রুতি বলিয়াছেন—ব্রহ্মের অচিন্ত্য-শক্তির ন্যায় অচিন্ত্য-শক্তি আর কাহারও নাই। তাৎপর্য্য এই যে—সর্ব্বাতিশায়ি-ব্যাপকত্ব বিশিষ্টা অচিন্ত্য-শক্তি অপর কাহারও নাই, তাহা কেবল ব্রহ্মেরই আছে। ভেদাভেদ-সম্বন্ধের অচিন্ত্য-শক্তি কেবলমাত্র সেই সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ, তাহার বাহিরে ইহার ব্যাপ্তি নাই। সুতরাং ভেদাভেদ-সম্বন্ধের অচিন্ত্য-শক্তিত্ব—যে অচিন্ত্য-শক্তির ব্যাপকত্ব ভেদাভেদ-সম্বন্ধের বাহিরে নাই, যাহা কেবল সেই সম্বন্ধেই সীমাবদ্ধ, তদ্রূপ অচিন্ত্য শক্তিত্ব—ব্রহ্মের সর্ব্বাতিশায়ি-ব্যাপকত্ববিশিষ্টা অচিন্ত্য-শক্তি হইতে ভিন্নরূপ। এক জাতীয় হইলেও ব্যাপকত্বে বিস্তর পার্থক্য। সুতরাং বিরোধ কিছু নাই। বিরোধ নাই বলিয়াই মণিমন্ত্রাদিরও অচিন্ত্যশক্তি সকলেরই স্বীকৃত এবং ভাববস্তুমাত্রেরই শক্তির অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচরত্ব বিষ্ণুপুরাণে স্বীকৃত হইয়াছে। উল্লিখিত আলোচনা হইতে মনে হয়—অর্থাপত্তি-ন্যায়ে ভেদাভেদ সম্বন্ধের উপপত্তির জন্য যে হেতুর কল্পনা করা যাইতে পারে, তাহা হইতেছে শক্তি শক্তিমানের ভেদাভেদ সম্বন্ধেরই এক অচিন্ত্য শক্তি বা অচিন্ত্য ধর্ম্ম।

ঘ। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ আধুনিক বিজ্ঞানের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ

শ্রীপাদ জীবগোস্বামিকথিত শক্তির যে লক্ষণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তাহা স্মরণে রাখিয়া বিচার করিলে তাঁহার পূর্ব্বোল্লিখিত উক্তির মর্ম্ম পরিস্ফুট হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—কার্য্যোন্মুখ দ্রব্যই (স্বরূপই) হইতেছে সেই দ্রব্যের শক্তি। সুতরাং দ্রব্য এবং দ্রব্যের শক্তি বস্তুগত ভাবে অভিন্ন ; কিন্তু তাহাদের মধ্যে কেবল অভেদ, বা আত্যন্তিক অভেদ স্বীকার করিলেও দোষ দেখা দেয় ; কেননা, বস্তুগত ভাবে অভিন্ন হইলেও তাহারা সর্ব্বতোভাবে অভিন্ন নহে—শক্তিতে কার্য্যোন্মুখতা আছে, দ্রব্যে তাহা নাই। এই অংশে তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে ; কিন্তু এই ভেদের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া তাহাদের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদও স্বীকার করা যায় না ; কেননা, তাহাতে তাহাদের মধ্যে যে বস্তুগত অভেদ আছে, তাহা অস্বীকৃত হইয়া পড়ে। একটী দৃষ্টান্ত ধরিয়া বিবেচনা করা যাউক। অগ্নি ও তাহার দাহিকাশক্তি বা উত্তাপ। দাহিকাশক্তি বা উত্তাপ হইতেছে কার্য্যোন্মুখ বা স্বপ্রকাশোন্মুখ (অপরের নিকটে নিজের অনুভবোৎপাদক কার্য্যে উন্মুখ) অগ্নি। অগ্নিদ্রব্যটীও অগ্নি, তাহার শক্তিও অগ্নি ; বস্তুগতভাবে উভয়েই এক-তেজোদ্রব্য ; অগ্নি হইতেছে ঘনত্বপ্রাপ্ত তেজঃ এবং তাহার শক্তি হইতেছে তরলত্বপ্রাপ্ত তেজঃ ; কার্য্যোন্মুখতাবশতঃই তাহার তরলত্ব। অগ্নিদ্রব্যে তেজের এক অবস্থা, তাহার শক্তিতে তেজের আর এক অবস্থা ; অবস্থা ভিন্ন হইলেও বস্তুটী কিন্তু উভয়ত্রই এক—একই তেজঃ। বস্তুগতভাবে উভয়ে একই তেজঃ বলিয়া তাহাদের মধ্যে অভেদ বিদ্যমান। কিন্তু এই অভেদকে আত্যন্তিক অভেদ মনে করিলে তাহাদের অবস্থাগত ভেদ অস্বীকৃত হইয়া পরে, কিন্তু অবস্থাগত ভেদকে অস্বীকার করিতে গেলে অগ্নির শক্তিই অস্বীকৃত হইয়া পড়ে ; সুতরাং তাহাদের আত্যন্তিক অভেদ স্বীকার করা যায় না। আবার, তাহাদের অবস্থাগত ভেদের প্রতি লক্ষ্য করিলে দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান—অগ্নিদ্রব্যে তেজের অবস্থা ঘন, শক্তিতে তেজের অবস্থা তরল।

কিন্তু এই ভেদকে আত্যন্তিক ভেদও বলা যায় না ; কেননা, বস্তুগতভাবে তাহাদের মধ্যে অভেদ বিদ্যমান—বস্তুগতভাবে উভয়ই তেজঃ। এইরূপে দেখা গেল--অগ্নি এবং তাহার দাহিকা শক্তির মধ্যে—সাধারণ ভাবে শক্তিমান ও শক্তির মধ্যে—কেবল ভেদও স্বীকার করা যায় না, কেবল অভেদও স্বীকার করা যায় না। অথচ ভেদ এবং অভেদ যে যুগপৎ বিদ্যমান, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। কেননা, যে-খানে অগ্নি, সে-খানেই দাহিকা শক্তি বা উত্তাপ ; যে-খানে কস্তুরী, সেখানেই কস্তুরীর গন্ধ ; যে-খানেই কস্তুরীর গন্ধ, সে-খানেই প্রত্যক্ষ ভাবে বা পরোক্ষ ভাবে কস্তুরী বিদ্যমান। ইহা প্রত্যক্ষ সিদ্ধ, অতি প্রসিদ্ধ—সুতরাং অস্বীকার করার উপায় নাই। এজন্য শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকার করিতেই হইবে। অথচ ভেদ ও অভেদের এতাদৃশ যুগপৎ অস্তিত্বের কোনও কারণ নির্ণয় করা যায় না ; এজন্য ইহাকে অচিন্ত্য বলা হয়—চিন্তাভাবনা দ্বারা, তর্কযুক্তির দ্বারা ইহার কারণ নির্ণয় করা যায় না। এজন্যই বলা হইয়াছে—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শক্তির যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, তাহা আধুনিক-বিজ্ঞানসম্মত। আধুনিক বিজ্ঞান শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে বস্তুগত অভেদ স্বীকার করিয়া থাকে। আবার ভেদও স্বীকার করিয়া থাকে ; কেননা, অগ্নির উষ্ণত্ব, মিশ্রির মিষ্টত্ব, বিষের মারকত্ব, ইত্যাদিও বিজ্ঞান স্বীকার করে। অগ্নি প্রভৃতি দ্রব্যের শক্তির অস্তিত্ব স্বীকারেই শক্তি-শক্তিমানের ভেদ স্বীকৃত হইয়া পড়িতেছে। এইরূপে দেখা যায়—দ্রব্য ও দ্রব্যের শক্তির যুগপৎ ভেদ এবং অভেদ বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু এই ভেদ এবং অভেদের উল্লেখমাত্র বিজ্ঞান করিয়া থাকে ; ভেদ এবং অভেদের যুগপৎ অস্তিত্বের কোনও কারণ বিজ্ঞান নির্ণয় করিতে পারে না —ইহাই অচিন্ত্য, বিজ্ঞানের পক্ষেও অচিন্ত্য। কারণ নির্ণয় করিতে পারে না বলিয়া বিজ্ঞান ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্বকে অস্বীকার করে না ; অস্বীকার করার উপায় নাই।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের সহিত আধুনিক বিজ্ঞানেরও সঙ্গতি আছে। অন্য কোনও মতবাদের সহিত বিজ্ঞানের এইরূপ সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না।

ঙ। পরব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির মধ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ শ্রুতার্থাপত্তিজ্ঞানগোচর

যাহা হউক, যে অর্থাপত্তি-ন্যায়ের আশ্রয়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পরব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির সম্বন্ধকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়াছেন, তাহা হইতেছে শ্রুতার্থাপত্তি। কেননা, ব্রহ্মের স্বাভাবিকী শক্তির কথা শ্রুতিতে দৃষ্ট হয়। এই শক্তির সহিত ব্রহ্মের ভেদের কথাও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় ; এজন্য শ্রীপাদ রামানুজাদি শক্তি ও শক্তিমানের ভেদের কথা বলিয়াছেন। আবার ব্রহ্মের সহিত তাঁহার শক্তির অভেদের কথাও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় ; এজন্য কোনও কোনও স্থলে শক্তি-শক্তিমানের অভেদ-বিবক্ষায় একত্বের কথাও দৃষ্ট হয়। অথচ, কেবল ভেদ স্বীকার করিলেও যে দোষের উদ্ভব হয়, এবং কেবল অভেদ স্বীকার করিলেও যে দোষের উদ্ভব হয়, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকার না করিয়া উপায় নাই। ভেদ

ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান বলিয়াই কেহ কেবল ভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া ভেদের কথা বলিয়াছেন, আবার কেহ কেবল অভেদের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া অভেদের কথা বলিয়াছেন। ভেদাভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকার করিলেই উভয় প্রকার বাক্যের সমন্বয় সম্ভবপর হইতে পারে। সুতরাং ভেদাভেদ সম্বন্ধও শাস্ত্রসম্মত। এইরূপে দেখা গেল--পরব্রহ্মের শক্তি যেমন শাস্ত্রসম্মত, পরব্রহ্মের সহিত তাঁহার শক্তির ভেদাভেদও তেমনি শাস্ত্রসম্মত—সুতরাং অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু কিরূপে পরস্পর-বিরুদ্ধ ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অস্তিত্ব স্বীকৃত হইতে পারে ?

বিষ্ণুপুরাণের শ্লোকব্যাখ্যায় শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী বলিয়াছেন—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহা হইতেছে অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর, কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর। পরব্রহ্ম ও তাঁহার শক্তির মধ্যে যে সম্বন্ধ, তাহাও হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ; এই সম্বন্ধ হইতেছে কেবল অর্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর। পরব্রহ্মের শক্তি এবং পরব্রহ্মের সহিত তাঁহার শক্তির ভেদাভেদও শাস্ত্রসম্মত বলিয়া পরব্রহ্মের সহিত তাঁহার শক্তির অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধও হইবে শ্রুতার্থাপত্তি-জ্ঞানগোচর।

শ্রুতার্থাপত্তি যে শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সুতরাং শ্রুতার্থাপত্তি হইতেছে শব্দপ্রমাণের তুল্যই প্রামাণ্য। ইহার আশ্রয়ে যে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায়, তাহা কেবল স্বকপোল-কল্পনা মাত্র নহে, তাহাও শাস্ত্রসম্মত—সুতরাং অনুপেক্ষণীয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শাস্ত্রপ্রমাণ-বলে দেখাইয়াছেন—জীব ও জগৎ হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের শক্তি; জীব-জগতের অতীত অপ্রাকৃত ভগবদ্ধামসমূহ, ভগবদ্ধামস্থ লীলাপরিকর-সমূহ এবং ধামস্থিত বস্তুনিচয় এবং ভগবানের রূপ-গুণ-লীলাদিও হইতেছে স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি। সুতরাং এই সমস্তের সহিত পরব্রহ্ম ভগবানের সম্বন্ধ হইবে—শক্তির সহিত শক্তিমানের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ। শক্তির সহিত শক্তিমানের সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। সুতরাং পরব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধও হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ। আবার, এই সম্বন্ধ হইতেছে শ্রুতার্থাপত্তি-ন্যায়-সিদ্ধ।

২৭। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের বিশেষত্ব

ক। পরিণামবাদ ও ভেদাভেদবাদ বাদরায়ণ-সম্মত

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত বিশেষ আলোচনার পর লিখিয়াছেন—

"The above discussion seems to prove convincingly that *Badarayana's philosophy was some kind of Bhedabheda-vada* or a theory of transcendence and immanence of God (Brahman)— even in the light of Sankara's own commentary.

He believed that the world was a product of a real transformation of Brahman, or rather of His powers and energies (*Sakti*). God Himself was not exhausted by such a transformation and always remained as the master creator Who by His play created the world without any extraneous assistance. The world was thus a real transformation of God's powers, while He Himself, though remaining immanent in the world through His powers, transcended it at the same time, and remained as its controller, and punished or rewarded the created mundane souls in accordance with their bad and good deeds.—*A History of Indian Philosophy* by Surendranath Dasgupta, M.A.. Ph. D., Vol. II. Cambridge University Press, 1932, pp. 42-43."

মর্ম্মানুবাদ। "এমন কি শঙ্করের নিজের ভাষ্য হইতেও মনে হইতেছে যে, উপরি উক্ত আলোচনা সন্তোষজনক ভাবেই প্রমাণ করিতেছে যে, **বাদরায়ণের দর্শন ছিল কোনও এক রকমের ভেদাভেদবাদ**—ভগবান্ ব্রহ্ম সমস্ত বস্তুরূপে জগতে থাকিয়াও জগতের অতীত। তিনি (বাদরায়ণ) বিশ্বাস করিতেন যে, ব্রহ্মের—বরঞ্চ ব্রহ্মের শক্তির—বাস্তব পরিণামই হইতেছে জগৎ। এইরূপ পরিণামে ভগবান্ নিজে নিঃশেষ হইয়া যায়েন নাই ; তিনি সর্ব্বদাই মূল স্রষ্টারূপে বিরাজিত ; বাহিরের কোনওরূপ সহায়তা ব্যতীতই তিনি লীলাবশতঃ জগতের সৃষ্টি করিয়াছেন। এইরূপে, এই জগৎ হইতেছে ভগবানের শক্তির বাস্তব পরিণাম ; তাহা সত্ত্বেও, তাঁহার শক্তিরূপে জগতের সমস্ত বস্তুরূপে অবস্থান করিয়াও, তিনি জগতের অতীত থাকেন এবং জগৎকে নিয়ন্ত্রিত করেন, সংসারী জীব-সমূহকে তাহাদের সৎকর্ম্মের জন্য পুরস্কৃত করেন এবং অসৎকর্ম্মের জন্য শাস্তি দিয়া থাকেন।"

ডক্‌টর দাসগুপ্তের সুচিন্তিত সিদ্ধান্ত হইতে জানা গেল—সূত্রকর্ত্তা ব্যাসদেবের (বাদরায়ণের) অভিপ্রায় হইতেছে এই যে, এই জগৎ হইতেছে ভগবান্ পরব্রহ্মের শক্তির বাস্তব পরিণাম. ব্রহ্ম তাঁহার এই শক্তিদ্বারা জগৎ-রূপে অবস্থান করিয়াও জগতের অতীত এবং জগতের নিয়ন্তা।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও বলেন—এই জগৎ হইতেছে ব্রহ্মের শক্তির—মায়াশক্তির—বাস্তব পরিণাম (৩।২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই পরিণাম-বাদই ব্যাসদেবের সম্মত বলিয়া কোনও এক রকমের ভেদাভেদ-বাদও তাঁহার সম্মত। কেননা, পরিণামবাদ স্বীকার করিলে ভেদাভেদ-বাদ স্বীকার না করিয়া পারা যায় না।

খ। পরিণামবাদ ও ভেদাভেদবাদ পুরাণসম্মত এবং এবং শঙ্কর-পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণেরও সম্মত

যাহা হউক, উল্লিখিত উক্তির পরে ডক্‌টর দাসগুপ্ত বলিয়াছেন :—

"The doctrine of *Bhedabheda-vada* is certainly prior to Sankara as it is the dominant view of most of the *Puranas*. It seems probable also that Bhatri

prapanca refers to Bodhayana, who is referred to as Vrttikara by Ramanuja, and as *Vrttikara* and *Upavarsa* by Sankara, and to Dramidacarya referred to by Sankara and Ramanuja ; all held some form of *Bhedabheda* doctrine.

Bhatriprapanca has been referred to by Sankara in his commentary on the *Brihadaranyaka Upanisad ;* and Anandajnana, in his commentary on Sankara's commentary, gives a number of extacts from Bhatriprapanca's Bhasya on *Brihada ranyaka Upanisad.* Prof M. Hiriyanna collected these fragments in a paper read before the Third Oriental Congress in Madras, 1924, and there he describes Bhatriprapanca's philosophy as follows : The doctrine of Bhatriprapanca is monism, and it is of a *Bhedabheda* type. The relation between Brahman and *jiva,* as that between Brahman and the world, is one of identity in difference. An implication of this view is that both the *Jiva* and the physical world evolve out of Barhman, so that the doctrine may be described as *Brahma Parinama vada—A History of Indian Philosophy* by Surendranath Dasgupta, M.A., Ph. D., Vol II, Cambridge University Press, 1932, P. 43."

মর্ম্মানুবাদ। "ইহা নিশ্চিত যে, ভেদাভেদবাদ শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী ; যেহেতু ভেদাভেদবাদই অধিকাংশ পুরাণের প্রধান অভিমত। ভেদাভেদবাদ যে শঙ্কর-পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণেরও সম্মত, তাহাও বুঝা যায়। একথা বলার হেতু এই। ভর্তৃপ্রপঞ্চ বোধায়নের উল্লেখ করিয়াছেন। বৃত্তিকার বলিয়া রামানুজ এবং বৃত্তিকার ও উপবর্ষ বলিয়া শঙ্করও এই বোধায়নের উল্লেখ করিয়াছেন। ভর্ত্তৃ-প্রপঞ্চ দ্রমিড়াচার্য্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন এবং শঙ্কর এবং রামানুজও দ্রমিড়াচার্য্যের উল্লেখ করিয়াছেন। ইঁহারা (বোধায়ন এবং দ্রমিড়াচার্য্যাদি) সকলেই কোনও এক রকমের ভেদাভেদবাদের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

শঙ্কর তাঁহার বৃহদারণ্যক-উপনিষদের ভাষ্যে ভর্তৃপ্রপঞ্চের উল্লেখ করিয়াছেন। শঙ্করভাষ্যের টীকাকার আনন্দজ্ঞান বৃহদারণ্যক-শ্রুতির ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চকৃত-ভাষ্য হইতে অনেকগুলি বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। অধ্যাপক এম্-হিরিয়ন্ন এই বাক্যগুলি সংগ্রহ করিয়া, ১৯২৪ খৃষ্টাব্দে মাদ্রাজে যে তৃতীয় প্রাচ্য-সম্মেলন হইয়াছিল, তাহাতে এক প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তিনি ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের দর্শন এই ভাবে বর্ণন করিয়াছেন। যথা—'**ভেদাভেদ-জাতীয় অদ্বয়-তত্ত্বই ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের অভিপ্রেত। জীব ও জগতের সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইতেছে বহুতে একত্বের সম্বন্ধ।**' এই অভিমতের একটী ব্যঞ্জনা হইতেছে এই যে, জীব এবং এই দৃশ্যমান জগৎ ব্রহ্ম হইতেই উদ্ভূত ; সুতরাং **ভর্ত্তৃপ্রপঞ্চের মতবাদকে ব্রহ্মপরিণামবাদ বলা যায়।**"

ইহা হইতে জানা গেল—ভর্তৃপ্রপঞ্চ, বোধায়ন এবং দ্রমিড়াচার্য্য—ইঁহারা সকলেই শঙ্করের পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্য। বোধায়ন ভর্তৃপ্রপঞ্চেরও পূর্ব্ববর্ত্তী। ইঁহারা সকলেই পরিণামবাদ এবং ভেদাভেদবাদ (ভদাভেদ-মূলক অদ্বয়বাদ) স্বীকার করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা গেল, পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণও পরিণামবাদ এবং কোনও এক রকমের ভেদাভেদবাদ স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। এই বিষয়ে সূত্রকার বাদরায়ণের মতের সহিত ইঁহাদের মতের পার্থক্য কিছু নাই।

গ। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের বৈশিষ্ট্য

পূর্ব্ববর্ত্তী উপ-অনুচ্ছেদদ্বয় হইতে জানা গেল—বাস্তব-পরিণামবাদ এবং কোনও এক রকমের ভেদাভেদবাদ হইতেছে সূত্রকার ব্যাসদেবের—সুতরাং বেদান্তের—সম্মত এবং পুরাণাদি স্মৃতিশাস্ত্রেরও সম্মত এবং বোধায়নাদি শঙ্কর-পূর্ব্ব আচার্য্যগণেরও সম্মত।

পূর্ব্ববর্ত্তী ক উপ-অনুচ্ছেদ হইতে জানা যায়—পরব্রহ্মের শক্তির বাস্তব পরিণামই ব্যাসদেবের (বাদরায়ণের) সম্মত। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও ব্রহ্ম-শক্তির—ব্রহ্মের মায়া-শক্তির—পরিণাম এবং এক রকমের ভেদাভেদ-বাদ স্বীকার করিয়াছেন। এইরূপে দেখা গেল, এই বিষয়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতবাদের সঙ্গে সূত্রকার ব্যাসদেবের (বা বেদান্তের), স্মৃতিশাস্ত্রের এবং শঙ্কর-পূর্ব্ববর্ত্তী আচার্য্যগণের মতবাদের কোনও বিরোধ নাই।

সূত্রকার ব্যাসদেব এবং বোধায়নাদি পূর্ব্বাচার্য্যগণ বলিয়াছেন—জীব-জগতের সঙ্গে পরব্রহ্মের সম্বন্ধ হইতেছে কোনও এক রকমের ভেদাভেদ সম্বন্ধ। কিন্তু তাহা কিরূপ ভেদাভেদ ?

এ-সম্বন্ধে ডক্টর দাসগুপ্ত বলেন—

"It is indeed difficult to say what were the exact charateristics of Badarayana's *Bhedabheda* doctrine of Vedanta ; but there is very little doubt that it was some special type of *Bhedabheda* doctrine, and, as has already been repeatedly pointed out, even Sankara's own commentary (if we exclude only his parenthetic remarks, which are often inconsistent with the general drift of his own commentary and the context of the *Sutras*, as well with their purpose and meaning, so far as it can be made out from such a context) shows that it was so. If, however, it is contended that this view of real transformation is only from a relative point of view (*vyavaharika*), then there must at least be one *Sutra* where the absolute (*paramarthika*) point of view is given ; but no such *Sutra* has been discovered even by Sankara himself.—*A History of Indian Philosophy* by Surendranath Dasgupta, M.A., Ph. D., Vol II, Cambridge University Press, 1932, P:44.

তাৎপর্য্য। "বেদান্তে যে ভেদাভেদ-তত্ত্বের কথা বাদরায়ণ বলিয়াছেন, তাহার বাস্তব লক্ষণ কি, তাহা বলা বাস্তবিকই শক্ত। কিন্তু ইহা যে এক বিশেষ রকমের ভেদাভেদ, তাহা প্রায় নিঃসন্দেহেই বলা যায়। শ্রীপাদ শঙ্কর তাঁহার সূত্রভাষ্যে মাঝে মাঝে এমন অনেক মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন, যাহাদের সহিত তাঁহার ভাষ্যের সাধারণ ভাবের সহিতও সঙ্গতি নাই, সূত্রের প্রকরণের সহিত এবং সূত্রের প্রকরণ হইতে যে অর্থের প্রতীতি হয়, সেই অর্থের সহিত এবং সূত্রের উদ্দেশ্যের সহিতও সঙ্গতি নাই। এই সমস্ত অপ্রাসঙ্গিক মন্তব্য বাদ দিয়া তাঁহার সূত্রভাষ্য হইতে যাহা জানা যায়, তাহা হইতেও বুঝা যায় যে, কোনও এক বিশেষ রকমের ভেদাভেদই বেদান্তের অভিপ্রেত। যদি বলা যায়, বেদান্তে যে বাস্তব-পরিণামের কথা বলা হইয়াছে, তাহা কেবল ব্যবহারিক দৃষ্টিতেই বলা হইয়াছে, উহা পারমার্থিক নহে। তাহার উত্তরে বলা যায়—উহা যদি কেবল ব্যবহারিকই হয়, তাহা হইলে পারমার্থিক অর্থবাচক অন্ততঃ একটী সূত্রও তো থাকিবে? কিন্তু শঙ্কর নিজেও এইরূপ একটী সূত্রেরও আবিষ্কার করিতে পারেন নাই।"

কিন্তু সূত্রকার ব্যাসদেবের কথিত এবং বেদান্তের অভিপ্রেত বিশেষ রকমের ভেদাভেদের বাস্তব লক্ষণ কি হইতে পারে? ভাস্করাচার্য্য ঔপাধিক ভেদাভেদের কথা বলিয়াছেন, নিম্বার্কাচার্য্য স্বাভাবিক ভেদাভেদের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহাদের কথিত ভেদাভেদবাদ বেদান্ত-সম্মত—সুতরাং ব্যাসদেবেরও সম্মত—হইতে পারে না; কেননা, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—তাঁহাদের ভেদাভেদ-বাদের সঙ্গে শ্রুতিবাক্যের বিরোধ আছে।

কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদের কথা বলিয়াছেন, তাহার সঙ্গে কোনও শ্রুতি-বাক্যেরই বিরোধ নাই। যে শ্রুতার্থাপত্তির আশ্রয়ে তিনি তাঁহার সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন, তাহাও শ্রুতি-স্মৃতিসম্মত। সুতরাং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর সিদ্ধান্ত যে সর্ব্বশাস্ত্রের অবিরুদ্ধ এবং শাস্ত্রসম্মত—এক কথায় বলিতে গেলে, সর্ব্বতন্ত্রসিদ্ধান্ত—তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না। ইহা হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদের একটী বৈশিষ্ট্য।

অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদের অপর বৈশিষ্ট্য হইতেছে ইহার সর্ব্বাতিশায়ী ব্যাপকত্ব।

পূর্ব্বাচার্য্যগণ ব্রহ্মের সঙ্গে কেবল জীব-জগতেরই সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করিয়াছেন। কিন্তু জীব-জগতের অতীতেও অনেক বস্তু আছে। অপ্রাকৃত চিন্ময় ভগবদ্ধাম, ধামস্থিত ভগবানের লীলা-পরিকরবৃন্দ, ধামস্থিত অন্যান্য বস্তু নিচয়, ভগবানের ঐশ্বর্য্যাদি, তাঁহার রূপগুণলীলাদি—এইরূপ অনেক বস্তু আছে প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত। এই সমস্তের সহিত পরব্রহ্মের সম্বন্ধের বিষয় পূর্ব্বাচার্য্য-গণ বিবেচনা করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না; কিন্তু শ্রীপাদ জীবগেস্বামী এই সমস্তের কথাও বিবেচনা করিয়াছেন। তিনি শাস্ত্রপ্রমাণ-বলে দেখাইয়াছেন—প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডের অতীত এই সমস্ত হইতেছে পরব্রহ্ম ভগবানের স্বরূপ শক্তির বিলাস—সুতরাং স্বরূপতঃ তাঁহারই শক্তি। জীব-জগৎ যেমন ব্রহ্মের শক্তি, প্রপঞ্চাতীত বস্তুনিচয়ও তেমনি ব্রহ্মের শক্তি। প্রপঞ্চ এবং প্রপঞ্চাতীত সমস্ত বস্তুই স্বরূপতঃ

ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া এবং শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ আছে বলিয়া পরিদৃশ্যমান মায়িক ব্রহ্মাণ্ড হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত রাজ্যের সমস্ত বস্তুর সঙ্গেই পরব্রহ্মের অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বর্ত্তমান।

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়—পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ "রসো বৈ সঃ" বলিয়া এবং লীলাব্যপদেশে পরিকর-ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদন করেন বলিয়া অনাদিকাল হইতেই অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত। এই সমস্ত অনন্তরূপে আত্মপ্রকট করিলেও তাঁহার একত্ব অক্ষুণ্ণই থাকে। তিনি একেই বহু, আবার বহুতেও এক—"বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্" বলিয়া অক্রূর তাঁহার স্তব করিয়াছেন। তাঁহার এই সকল বহুরূপ স্বরূপতঃ তাঁহা হইতে অভিন্ন এবং প্রত্যেক রূপই "সর্ব্বগ অনন্ত, বিভু।" সকল রূপই তাঁহার মধ্যে অবস্থিত। তিনি এবং তাঁহার এ-সকল স্বরূপ "সর্ব্বগ, অনন্ত, বিভু" হইলেও লীলানুরোধে, স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন হইয়াও যেমন তিনি পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান, তাঁহার বিভিন্ন রূপও স্বরূপে অপরিছিন্ন হইয়াও পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান। আবার লীলানুরোধে তিনি যেমন তাঁহার স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন, অথচ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান ধামে বিরাজিত এবং লীলায় বিলসিত, তাঁহার বিভিন্ন স্বরূপও তদ্রূপ তাঁহাদের—স্বরূপতঃ অপরিচ্ছিন্ন অথচ পরিচ্ছিন্নবৎ প্রতীয়মান—স্ব-স্বধামে বিরাজিত এবং লীলায় বিলসিত। এইরূপে তাঁহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াও মনে হয়। এতাদৃশ ভেদ এবং অভেদ যুগপৎ নিত্য-বিরাজিত; ইহাও এক অচিন্ত্য ব্যাপার।

এই সমস্ত ভগবৎস্বরূপের বৈশিষ্ট্যের মূল হইতেছে শক্তিবিকাশের বৈশিষ্ট্য; তাঁহাদের মধ্যে শক্তির ন্যূনবিকাশ, আর শ্রীকৃষ্ণে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ; এজন্য তাঁহাদের এবং শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে সম্বন্ধ হইতেছে অংশাংশি-সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণে শক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তিনি হইতেছেন অংশী এবং অন্য ভগবৎ-স্বরূপে শক্তির ন্যূন—আংশিক—বিকাশ বলিয়া তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের অংশ। এই অংশাংশি-সম্বন্ধের মূলও হইতেছে শক্তি। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে তাঁহাদিগকে শ্রীকৃষ্ণের শক্তিও মনে করা যায়; অন্ততঃ, স্বরূপে শ্রীকৃষ্ণ এবং অন্য ভগবৎস্বরূপের মধ্যে অভেদ-সত্ত্বেও তাঁহাদের ভেদের হেতু যে শক্তি বা শক্তিবিকাশের বৈশিষ্ট্য, তাহা অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধও হইতেছে, শক্তিমান ও শক্তির সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধই। এইরূপে দেখা গেল—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহার অনন্তস্বরূপের সম্বন্ধও হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

আবার শ্রুতিস্মৃতি হইতে ইহাও জানা যায় যে, ভগবান্ এবং তাঁহার নাম অভিন্ন, নাম ও নামীতে কোনও ভেদ নাই। আবার পৃথগ্ভাবে নামকীর্ত্তনাদির এবং নামের মোক্ষাদিদায়িনী ও ভগবদ্বশীকরণীশক্তির কথা বিবেচনা করিলে এবং "কলিকালে নামরূপে কৃষ্ণ অবতার॥ শ্রীচৈ,চ, ১।১৭।১৯॥"-বাক্যের কথা বিবেচনা করিলে নাম ও নামীর মধ্যে ভেদের কথাও জানা যায়। নাম ও নামীর মধ্যে এতাদৃশ ভেদ এবং অভেদও এক অচিন্ত্য ব্যাপার।

নামের মোক্ষাদিদায়কত্ব এবং ভগবদ্ বশীকরণ-সামর্থ্যের কথা বিবেচনা করিলে নামকে তাঁহার শক্তিও বলা যায়। নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেছে শুদ্ধা সাধনভক্তির একটী অঙ্গ। শুদ্ধা সাধনভক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ (৫।৫৪-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য)—সুতরাং তত্ত্বতঃ স্বরূপশক্তিই। এই দিক্ দিয়া বিচার করিলে ভগবন্নামকেও ভগবানের শক্তি মনে করা যায়। সুতরাং নামের সহিত নামী ভগবানের সম্বন্ধও হইতেছে, শক্তি ও শক্তিমানের সহিত যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধই—অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ।

এইরূপে জানা গেল—জীব-জগৎ, জগতিস্থ বস্তুনিচয়, মায়াতীত ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামস্থিত-বস্তুনিচয়, ভগবানের নাম-রূপগুণ-লীলাদি, লীলাপরিকরাদি, অনন্তভগবৎ-স্বরূপাদি যে-স্থানে যাহা কিছু আছে, তৎসমস্তের সঙ্গে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

এজন্যই বলা যায়--**গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদটীর ব্যাপকত্ব সর্ব্বাতিশায়ী; এতবড় ব্যাপকত্বের কথা আর কেহই বলেন নাই।**

অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদের আর একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য হইতেছে এই যে, ইহা **আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত** [ভূমিকায় "আধুনিক বিজ্ঞান ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ"—প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য। ভূমিকা ১৩৯ পৃষ্ঠা; পূর্ব্ববর্ত্তী ক (১) এবং খ উপ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। অন্য কোনও মতবাদই আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত নহে।

অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদের আরও বিশেষত্ব এই যে—ইহাতে সকল শ্রুতিবাক্যের প্রতিই সমান মর্য্যাদা প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্যবহারিক বলিয়া কোনও শ্রুতিবাক্যের প্রতিই উপেক্ষা প্রদর্শন করা হয় নাই, জীব-জগদাদি সত্যবস্তুর মিথ্যাত্বও প্রতিপাদন করা হয় নাই, শ্রুতিবিহিত ব্রহ্মের শক্তিকেও অস্বীকার করা হয় নাই, মায়ারও শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত সন্তোষজনক সমাধান পাওয়া যায়, মুখ্যাবৃত্তি পরিত্যাগ করিয়া শ্রুতিবাক্যের ব্যখ্যানে অবৈধ-ভাবে লক্ষণার আশ্রয়ও নিতে হয় না।

জীব-ব্রহ্মের ভেদ-বাচক এবং অভেদ-বাচক আপাতঃদৃষ্টিতে পরস্পর-বিরোধী শ্রুতিবাক্য-গুলিরও অতি সুন্দর সমন্বয় এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-তত্ত্ব হইতে পাওয়া যায়। জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ সম্বন্ধ বলিয়া, ভেদবাচক-শ্রুতিবাক্যে ভেদদৃষ্টির প্রাধান্য এবং অভেদবাচক শ্রুতি-বাক্যে অভেদ-দৃষ্টির প্রাধান্য সূচিত হইয়াছে। আর জীব ব্রহ্মের শক্তিরূপ অংশ বলিয়া অংশ-অংশী-জ্ঞানে জীব-ব্রহ্মের ভেদাভেদের কথা বলা হইয়াছে।

২৮। অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদ ও অদ্বয়-তত্ত্ব

প্রশ্ন হইতে পারে, শ্রুতি ব্রহ্মকে অদ্বয়-তত্ত্ব বলিয়াছেন। "একমেবাদ্বিতীয়ম্—ব্রহ্ম হইতেছেন এক এবং অদ্বিতীয়।" ব্রহ্মব্যতীত দ্বিতীয় কোনও বস্তু কোথায়ও নাই, ব্রহ্মের কোনও ভেদ নাই। কিন্তু অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদে অভেদ স্বীকৃত হইলেও ভেদও স্বীকৃত হইয়া থাকে। সুতরাং

ব্রহ্মের অদ্বিতীয়ত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? বিশেষতঃ, এই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ হইতেছে বাস্তব পরিণামবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত ; বাস্তব-পরিণাম-বাদে জীব-জগদাদির বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকৃত হয়। জীব-জগদাদির যদি বাস্তব অস্তিত্বই থাকে, তাহা হইলে জীব-জগদাদিই তো ব্রহ্মের ভেদ হইয়া পড়ে। তাহাতে কিরূপে ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব রক্ষিত হইতে পারে ?

এতাদৃশ প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই যে, ব্রহ্মসম্বন্ধে শ্রুতি "একমেবাদ্বিতীয়ম্" যেমন বলিয়াছেন, তেমনি আবার "সর্ব্বং খল্বিদং ব্রহ্ম—এই সমস্তই (দৃশ্যমান জীব-জগৎ সমস্তই) ব্রহ্ম"—একথাও বলিয়াছেন এবং "ঐতদাত্ম্যমিদং সর্ব্বম্ - এই জীব-জগৎ সমস্তই ব্রহ্মাত্মক"-তাহাও বলিয়াছেন। ইহা হইতেই বুঝা যায়--জীব-জগতের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই ব্রহ্মকে "একমেবাদ্বিতীয়ম্" বলা হইয়াছে। সমস্ত ব্রহ্মাত্মক "ঐতদাত্ম্যমিদংসর্ব্বম্"—বলিয়াই, কোনও বস্তুই ব্রহ্মাতিরিক্ত নহে বলিয়াই, এই সমস্তের বাস্তব অস্তিত্ব সত্ত্বেও ব্রহ্ম এক এবং অদ্বিতীয়।

কেবল জীব-জগৎই যে ব্রহ্মাত্মক বা ব্রহ্মের প্রকাশ, তাহা নহে। "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্-জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে। শ্রীভা, ১।২।১১॥"-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—"অদ্বয়মিতি তস্যাখণ্ডত্বং নির্দ্দিশ্যান্যস্য তদনন্যত্ব-বিবক্ষয়া তচ্ছক্তিত্বমেবাঙ্গীকরোতি। তত্র শক্তিবর্গলক্ষণতদ্ধর্ম্মাতিরিক্তং কেবলং জ্ঞানং ব্রহ্মেতি শব্দ্যতে, অন্তর্য্যামিত্বময়-মায়াশক্তিপ্রচুর-চিচ্ছক্ত্যংশবিশিষ্টং পরমাত্মেতি, পরিপূর্ণসর্ব্বশক্তিবিশিষ্টং ভগবানিতি॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। শ্রীলপুরীদাস মহোদয়-সম্পাদিত ॥৬॥—অদ্বয়-পদে সেই তত্ত্বের অখণ্ডত্ব নির্দ্দেশ করিয়া সেই তত্ত্বের সহিত অন্যের অনন্যতা (অভিন্নতা) দেখাইবার অভিপ্রায়ে তাঁহার (সেই তত্ত্বের) শক্তিত্বই স্বীকার করিতেছেন। শক্তিবর্গলক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল জ্ঞান হইতেছে ব্রহ্ম-শব্দবাচ্য ; অন্তর্য্যামিত্ব-ময় মায়াশক্তিপ্রচুর চিচ্ছক্তির অংশবিশিষ্ট বস্তু পরমাত্মা-শব্দবাচ্য এবং পরিপূর্ণ-শক্তিবিশিষ্ট বস্তু ভগবান্-শব্দবাচ্য।"

ইহার পরে--ব্রহ্ম, পরমাত্মা ও ভগবান্—এই আবির্ভাবত্রয়যুক্ত তত্ত্বের সাক্ষাৎকার যে ভক্তিদ্বারাই সম্ভবপর হইতে পারে, তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের পরবর্ত্তী "তচ্ছ্রদ্দধানা মুনয়ো জ্ঞানবৈরাগ্যযুক্তয়া। পশ্যন্ত্যাত্মনি চাত্মানং ভক্ত্যা শ্রুতগৃহীতয়া॥ শ্রীভা, ১।২।১২॥"-শ্লোকের উল্লেখ করিয়া তাহার আলোচনা-প্রসঙ্গে তিনি লিখিয়াছেন--"কীদৃশং তৎ ? আত্মানং স্বরূপাখ্য-জীবাখ্য-মায়াখ্য-শক্তীনামাশ্রয়ম্॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥৭॥ শ্রীলপুরীদাস মহাশয়-সংস্করণ॥—সেই আত্মা বা পরতত্ত্ব কিরূপ ?—তিনি স্বরূপ-শক্তি, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির আশ্রয়।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীভগবৎসন্দর্ভেও তিনি লিখিয়াছেন—ব্রহ্ম সৎ-রূপে পৃথিব্যাদিরূপ স্থূলকার্য্য, প্রকৃত্যাদিরূপে তিনি অসৎ-সূক্ষ্মকারণ, এই দুই বহিরঙ্গ-বৈভবের অতীত শ্রীবৈকুণ্ঠাদি হইতেছে তাঁহার স্বরূপ-বৈভব, শুদ্ধজীব হইতেছে তাঁহার তটস্থ-বৈভব-ইত্যাদি। "যদ্ব্রহ্ম সৎ স্থূলং কার্য্যং পৃথিব্যাদিরূপম্, অসৎ সূক্ষ্মং কারণং প্রকৃত্যাদিরূপম্, তয়োর্বহিরঙ্গ-বৈভবয়োঃ পরং স্বরূপ-বৈভবং শ্রীবৈকুণ্ঠাদিরূপম্,

তটস্থ-বৈভবং শুদ্ধজীবরূপঞ্চ-ইত্যাদি ॥ ১৬ অনুচ্ছেদ। শ্রীল পুরীদাস মহাশয় সংস্করণ।" সেই অনুচ্ছেদেই তিনি আরও বলিয়াছেন—"একমেব তৎ পরমং তত্ত্বং স্বাভাবিকাচিন্ত্যশক্ত্যা সর্ব্বদৈব স্বরূপ-তদ্রূপবৈভব-জীব-প্রধানরূপেণ চতুর্দ্ধাবতিষ্ঠতে, সূর্য্যান্তর্মণ্ডলস্থতেজ ইব মণ্ডলতদ্বহির্গতরশ্মি-তৎপ্রতিচ্ছবিরূপেণ।—এক অদ্বিতীয় পরম-তত্ত্বই স্বীয় স্বাভাবিকী অচিন্ত্যশক্তির দ্বারা সর্ব্বদাই ভগবৎ-স্বরূপ, স্বরূপ-বৈভব (ভগবদ্ধামাদি), জীব ও প্রধান (জগৎ) রূপে চতুর্ধা বিরাজিত।"

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—একই পরম-তত্ত্ব শক্তিবর্গ-লক্ষণ-তদ্ধর্ম্মাতিরিক্ত কেবল-জ্ঞানস্বরূপ ব্রহ্মরূপে, অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপরূপে, অনন্ত ভগবদ্ধামাদিরূপে, এবং জগদ্রূপে বিরাজিত। ভগবদ্ধামাদি তাঁহার স্বরূপশক্তির বৈভব, শুদ্ধজীব তাঁহার জীবশক্তির বৈভব এবং জগৎ তাঁহার মায়াশক্তির বৈভব। এই সমস্তরূপে এক পরম-তত্ত্বই বিরাজিত বলিয়া এই সমস্তের দৃশ্যমান পৃথক্ অস্তিত্ব সত্ত্বেও পরম তত্ত্বের অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হয়। কেননা, এই দৃশ্যমান ভেদ-স্বরূপ জীব-জগদাদি পরমতত্ত্বের বাস্তবভেদ নহে। জীব-জগদাদি যে পরব্রহ্মের বাস্তব ভেদ নহে, তাহা বুঝিতে হইলে ভেদ ও অভেদের স্বরূপ সম্বন্ধে একটু আলোচনার প্রয়োজন।

ক। ভেদ ও অভেদ

দার্শনিক দৃষ্টিতে ভেদ কাহাকে বলে এবং অভেদই বা কাহাকে বলে, তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ৪।৩-অনুচ্ছেদে বিবৃত হইয়াছে। দুইটী বস্তুর প্রত্যেকেই যদি স্বয়ংসিদ্ধ, অন্যনিরপেক্ষ হয়, তাহা হইলেই তাহাদের একটীকে অপরটীর ভেদ বলা যায়। যদি একটী বস্তু কোনও বিষয়ে অপরটীর অপেক্ষা রাখে, তাহা হইলে তাহাদের মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ আছে বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

পূর্ব্ববর্ত্তী ৪।৪-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে, ভেদ তিন প্রকার—সজাতীয়, বিজাতীয় এবং স্বগত।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—ব্রহ্মের স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয় ভেদও নাই, এবং স্বয়ংসিদ্ধ বিজাতীয় ভেদও নাই। "অদ্বয়ত্বং চাস্য স্বয়ংসিদ্ধ-তাদৃশাতাদৃশ-তত্ত্বান্তরাভাবাৎ স্বশক্ত্যেক-সহায়ত্বাৎ পরমাশ্রয়ং তং বিনা তাসামসিদ্ধত্বাচ্চ ॥ তত্ত্ব-সন্দর্ভঃ ॥ ৫১ অনুচ্ছেদ ॥ বহরমপুর সংস্করণ ॥ ১২৩-১২৪ পৃষ্ঠা ॥—ব্রহ্ম কেবল স্ব-শক্ত্যেক-সহায় (অর্থাৎ স্বয়ংসিদ্ধ); তাঁহার তাদৃশ (অর্থাৎ সজাতীয়) অন্য কোনও তত্ত্ব নাই এবং অতাদৃশ (বা বিজাতীয়) অন্য কোনও তত্ত্বও নাই ; এজন্য তিনি অদ্বয়—তত্ত্বান্তররহিত। তিনিই শক্তি সমূহের পরম আশ্রয়, তাঁহা ব্যতীত শক্তি সিদ্ধ হয় না, অর্থাৎ ব্রহ্ম না থাকিলে তাঁহার শক্তিও থাকিতে পারে না (সুতরাং শক্তির পরিণামাদিও থাকিতে পারে না)।"

খ। সজাতীয়-ভেদহীনতা

ব্রহ্ম হইতেছেন চিদ্‌বস্তু। জীবও চিদ্ বস্তু ; ভগবদ্ধাম, ভগবৎ-পরিকর এবং অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ—ইঁহারাও চিদ্ বস্তু ; অথচ তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব আছে। সুতরাং মনে হইতে পারে, ইঁহারা ব্রহ্মের সজাতীয়—এ সকল চিৎ-জাতীয় বলিয়া, ব্রহ্মের সজাতীয়—ভেদ ; কিন্তু ইঁহারা কেহই স্বয়ংসিদ্ধ

নহেন। নিজেদের অস্তিত্বাদির জন্য ইঁহারা সকলেই ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখেন। ব্রহ্ম আছেন বলিয়াই ইঁহাদের অস্তিত্বাদি, ব্রহ্মের অভাবে ইঁহাদের অস্তিত্বাদিই অসম্ভব। যেহেতু, জীব হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি—চিদ্রূপা জীবশক্তি, অথবা জীবশক্তিবিশিষ্ট ব্রহ্মের অংশ (২।১৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ধাম-পরিকরাদিও হইতেছেন ব্রহ্মের শক্তি—স্বরূপ-শক্তির বিলাস, অথবা স্বরূপ-শক্তিবি৷শষ্ট ব্রহ্মের অংশ। ভগবৎ-স্বরূপসমূহও স্বরূপ-শক্তিবিশিষ্ট পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অংশ। এই সমস্তের কেহই স্বয়ংসিদ্ধ নহেন বলিয়া ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ হইতে পারেন না। সুতরাং ব্রহ্ম হইতেছেন সজাতীয়-ভেদশূন্য। "তৎস্বরূপ-বস্ত্বন্তরাণাংচ তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ ন তৈঃ সজাতীয়োঽপি ভেদঃ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী॥ সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ॥ ৫৬ পৃষ্ঠা।"

গ। **বিজাতীয় ভেদহীনতা**

দুঃখসঙ্কুল জড় মায়িক ব্রহ্মাণ্ড জড় বলিয়া চিদ্‌বিরোধী; আর ব্রহ্ম হইতেছেন আনন্দস্বরূপ চিদ বস্তু। সুতরাং মনে হইতে পারে—মায়িক ব্রহ্মাণ্ড চিৎস্বরূপ ও আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ; কিন্তু তাহা নয়। কেননা, জড়রূপা মায়াশক্তি ব্রহ্মেরই শক্তি বলিয়া ব্রহ্মের অপেক্ষা রাখে। জগৎ এই মায়াশক্তিরই পরিণতি। মায়া এবং মায়ার পরিণতি ব্রহ্মাণ্ড, ব্রহ্মনিরপেক্ষ স্বয়ংসিদ্ধ বস্তু নহে বলিয়া, বস্তুতঃ ব্রহ্মের ভেদই নহে। সুতরাং ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদও নাই। "ন চাব্যক্তগত-জাড্যদুঃখাদিভিঃ বিজাতীয়ো ভেদঃ, অব্যক্তস্যাপি তচ্ছক্তিরূপত্বাৎ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী। সাহিত্যপরিষৎ॥ ৫৬ পৃষ্ঠা।"

বিজাতীয় ভেদহীনতা সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী অন্য হেতুরও উল্লেখ করিয়াছেন। তিনি বলেন—অথবা, নৈয়ায়িকগণ যেমন জ্যোতির অভাবকেই তমঃ (অন্ধকার) বলিয়া অভিহিত করেন, সেইরূপ ভাবে বলা যাইতে পারে যে, যাহা জড় এবং দুঃখ বলিয়া অনুভূত হয়, তাহা মায়াকৃত চিদানন্দশক্তির তিরোভাব হইতেই উদ্ভূত হয় (অর্থাৎ জড় হইতেছে চিৎ-এর তিরোভাবমাত্র এবং দুঃখ হইতেছে আনন্দের তিরোভাব মাত্র; ইহারা অভাবাত্মক)। অভাবের অনুভাব ব্যতীত ইহা অপর কোনও পদার্থ নহে। উহা অভাবমাত্র। অভাব-নামক কোনও ভিন্ন পদার্থ হইতে জড়-দুঃখের উদ্ভব হয় না। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে বলিতে হয়—বিজাতীয় ভেদই আপতিত হয়। কেবলাদ্বৈতবাদীদের পক্ষেও এইরূপ ভেদ-স্বীকার অপরিহার্য্য হইয়া পড়ে। "অথবা, নৈয়ায়িকানাং 'জ্যোতিরভাব এব তমঃ' তথাঙ্গীকৃত্য তাদৃশচিন্তানুভাব-মায়াকৃত-চিদানন্দ-শক্তি-তিরোভাব-লক্ষণাভাব-মাত্র-শরীরত্বেন নির্ণেতব্যত্বাদিতি; ন চাভাবেনৈব। তর্হি বিজাতীয়ঽসৌ ভেদ আপতিত ইতি। বক্তব্যম্। কেবলাদ্বৈতবাদিনামপি তদপরিহার্য্যত্বাৎ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী॥ ৫৬ পৃষ্ঠা।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—ব্রহ্মাণ্ডের জড়ত্ব ও দুঃখ কোনও ভাববস্তু নহে; জড়ত্ব হইতেছে চিৎ-এর অভাব এবং দুঃখ হইতেছে আনন্দের অভাব। এই অভাব হইতেছে মায়াকৃত। অভাবাত্মক বলিয়া জড় ও দুঃখের বস্তুত্বই সিদ্ধ হয় না; সুতরাং জড়-দুঃখময় জগৎও ভেদ বলিয়া গণ্য হইতে

পারে না। আর, অভাবকে যদি একটী ভাববস্তু বলিয়া মনে করা হয়, তাহা হইলে এই অভাবই ভাবরূপ ব্রহ্মবস্তুর বিজাতীয় ভেদ হইয়া পড়ে; কিন্তু তাহা কেবলাদ্বৈতবাদীরাও স্বীকার করেন না।

ঘ। স্বগতভেদ-হীনতা

ব্রহ্মের স্বগতভেদও নাই। স্বগত অর্থ নিজের মধ্যে। স্বগত ভেদ বলিতে আভ্যন্তরীণ ভেদ বুঝায়।

যে বস্তুর একাধিক উপাদান আছে, উপাদান-ভেদে তাহার মধ্যেই স্বগত ভেদ থাকিতে পারে। যেমন দালানের ইট, চুণ, লোহা, কাঠ ইত্যাদি; এই সমস্ত উপাদান পরস্পর বিভিন্ন; ইহারা দালানের স্বগত ভেদ। আবার উপাদানের বিভিন্নতাবশতঃ তাহাদের উপর শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্ন হইবে। পরস্পরের সহিত তাহাদের মিলনে পরিমাণের তারতম্যানুসারে দালানের বিভিন্ন অংশে কোনও শক্তির ক্রিয়াও বিভিন্নরূপে অভিব্যক্ত হইবে। শক্তিক্রিয়ার এইরূপ বিভিন্ন অভিব্যক্তি বা বিভিন্ন অভিব্যক্তির হেতুও দালানের স্বগত ভেদ। ব্রহ্মে এইরূপ কোনও ভেদ থাকিতে পারে না; কারণ, ব্রহ্ম হইতেছেন চিদ্‌ঘন বা আনন্দঘন বস্তু। ব্রহ্মে চিৎ বা আনন্দ ব্যতীত অপর কোনও বস্তুই নাই; একই চিদ্‌বস্তু বা আনন্দবস্তু একই ভাবে ব্রহ্মে সর্ব্বত্র বিরাজিত। উপাদানগত ভেদ না থাকাতে ব্রহ্মের যে কোনও অংশেই যে কোনও শক্তি অভিব্যক্ত হইতে পারে। জীবের জড় দেহ ক্ষিতি, অপ্‌, তেজ-আদি পঞ্চভূতে নির্ম্মিত; এই পঞ্চভূতের পরিমাণও সর্ব্বত্র সমান নহে; চক্ষুতে তেজের ভাগ বেশী বলিয়া চক্ষুর দৃষ্টিশক্তি আছে; কিন্তু শ্রবণশক্তি নাই; কর্ণে শব্দগুণ মরুতের ভাগ বেশী বলিয়া কর্ণের শ্রবণশক্তি আছে, কিন্তু দর্শনশক্তি নাই; ইত্যাদি। এ-সমস্ত হইল জীবদেহের স্বগত ভেদ। চিদেকরূপ ব্রহ্মবস্তুতে বিভিন্ন উপাদান নাই বলিয়া এজাতীয় পার্থক্য থাকিতে পারে না। তাই ব্রহ্মসংহিতা বলিয়াছেন—"অঙ্গানি যস্য সর্ব্বেন্দ্রিয়বৃত্তিমন্তি—তাঁহার সকল অঙ্গই সকল ইন্দ্রিয়ের শক্তি ধারণ করে।" ইহা তাঁহার স্বগত-ভেদহীনতার পরিচায়ক।

একটী চিনির পুতুল, তাহার হাত, পা, নাক, কান ইত্যাদি আছে; সুতরাং আপাতঃ দৃষ্টিতে পুতুলটীর স্বগত ভেদ আছে বলিয়া মনে হইতে পারে; কিন্তু তাহার সর্ব্বত্রই একরূপ মিষ্টত্ব বিরাজিত, একই উপাদান, সুতরাং বস্তুতঃ ভেদ নাই। ভিন্ন ক্রিয়ার উৎপাদনেই ভেদ বুঝাইতে পারে। পুতুলের সর্ব্বত্রই একই ক্রিয়া—মিষ্টত্ব। পূর্ব্বোল্লিখিত ব্রহ্মসংহিতা-বাক্য হইতে জানা যায়, ব্রহ্মের সর্ব্বত্রই ক্রিয়াসাম্য; সুতরাং স্বগত ভেদ আছে বলিয়া মনে করা যায় না। ইহা হইল ব্রহ্মের স্বগত-ভেদ-হীনতারএকটী দিক্। আরও বিবেচনার বিষয় আছে।

প্রশ্ন হইতে পারে, ব্রহ্মের তো অনেক রূপের কথা শুনা যায়। তাঁহার যদি অনেক রূপ থাকে, তাঁহার স্বরূপ-ভেদ স্বীকার করিতেই হইবে? ইহার উত্তরে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে (৫৮ পৃষ্ঠায়) বেদান্তদর্শনের **"ন ভেদাদিতি চেৎ-ন প্রত্যেকমতদ্‌বচনাৎ"** ৩।২।১২॥"-

সূত্রের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্যের মর্ম্ম এইরূপ। "এতদ্ ব্রহ্ম অপূর্ব্বম্ অনপরম্ অনন্তরম্ অবাহ্যম্। আত্মা ব্রহ্ম সর্ব্বানুভূতিরিত্যনুশাসনমিতি বৃহদারণ্যকে সর্বেষাং রূপাণাম্ ঐক্যোক্তেরিত্যর্থঃ।—এই ব্রহ্ম অপূর্ব্ব, অনপর, অনন্তর, অবাহ্য, আত্মা, ব্যাপক এবং সর্ব্বানুভূতিস্বরূপ —এই বৃহদারণ্যক বাক্যে, অনন্ত প্রকাশে (বহুরূপেও) ব্রহ্মের একত্বের ভাবই ব্যক্ত হইয়াছে।"

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বেদান্তদর্শনের পরবর্ত্তী সূত্রটীরও উল্লেখ করিয়াছেন। **অপি চৈবমেকে** ॥৩।২।১৩॥—এই সূত্রের গোবিন্দভাষ্য বলেন—কোনও কোনও বেদশাখাধ্যায়ী বলেন, ব্রহ্ম অমাত্র এবং অনন্তমাত্র ; তাঁহাদের মতে ব্রহ্ম অভিন্ন এবং অনন্তরূপ। অমাত্র অর্থ—স্বাংশভেদশূন্য ; আর অনেকমাত্র অর্থ—অসংখ্য-স্বাংশবিশিষ্ট। তাৎপর্য্য এই যে—তাঁহার অংশের ভেদ নাই, সংখ্যাও নাই। (কথাগুলি পরস্পর-বিরোধী বলিয়া মনে হয় ; সমাধান এই)। স্মৃতি বলেন—একই পরমেশ্বর বিষ্ণু যে সর্ব্বত্র অবস্থিত, তাহাতে সংশয় নাই। তিনি এক হইয়াও স্বীয় ঐশ্বর্য্য-প্রভাবে সূর্য্যের ন্যায় বহুরূপে প্রতিভাত হইয়া থাকেন। "এক এব পরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বত্রাপি ন সংশয়ঃ। ঐশ্বর্য্যাদ্রূপমেকঞ্চ সূর্য্যবদ্ বহুধেয়ত ইতি স্মৃতেশ্চ।" (একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি ॥ গোপালতাপনী শ্রুতি)। বৈদুর্য্যমণি যেমন দ্রষ্টৃভেদে বহুরূপে প্রতিভাত হয়, অভিনয়কারী নট যেমন অনেক প্রকার ভাব প্রকাশ করিয়াও নিজে একই স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তদ্রূপ ব্রহ্ম ধ্যানভেদে বিভিন্নরূপে প্রতিভাত হইলেও স্বীয় স্বরূপ ত্যাগ করেন না। (একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ শ্রীচৈ. ব. স্থ।৯।১৪১ ॥)

উক্ত বেদান্তসূত্রের মর্ম্ম হইতে জানা গেল—ব্রহ্ম বহুরূপে প্রতিভাত হইয়াও তাঁহার একরূপতা ত্যাগ করেন না। বহু রূপেই তিনি একরূপ। "বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্ ॥ শ্রীভাগবত ॥" ব্রহ্ম কখনও একরূপতা ত্যাগ করেন না বলিয়াই তাঁহাতে স্বগত-ভেদের অভাব সূচিত হইতেছে।

শ্রীজীবপাদ উক্ত আলোচনার উপসংহারে বলিয়াছেন—অন্যবস্তুর প্রবেশদ্বারা তাঁহার একরূপতা কখনও নষ্ট হয় না বলিয়া তাঁহাতে স্বগত ভেদ থাকিতে পারে না। স্বর্ণ যখন কুণ্ডলরূপে প্রতিভাত হয়, তখন তাহাতে স্বগত ভেদ জন্মিয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে ; কিন্তু তাহাতে অন্য বস্তু প্রবেশ করে না বলিয়া, স্বর্ণ অবিকৃত ভাবে স্বর্ণই থাকিয়া যায় বলিয়া স্বগত ভেদ জন্মিয়াছে বলা যায়না। স্বর্ণ এবং স্বর্ণাতিরিক্ত রত্নাদিদ্বারা গঠিত কুণ্ডল-কুণ্ডলাকারে স্বর্ণের অত্যন্ত ভেদ বলিয়া মনে হয় ; কিন্তু এই ভেদের হেতু হইতেছে অন্যবস্তুর প্রবেশ—রত্নাদির প্রবেশ। কুণ্ডলস্থিত স্বর্ণ কিন্তু স্বর্ণই থাকিয়া যায়, অন্য কিছু হইয়া যায় না ; সুতরাং কুণ্ডলাকার-প্রাপ্ত স্বর্ণকে স্বর্ণের স্বগতভেদ বলা যায় না। "তদেবং স্বগতভেদে তু পরিহার্য্যে স্বর্ণরত্নাদি-ঘটিতৈক-কুণ্ডলবদ্ বস্ত্বন্তর-প্রবেশেনৈব স প্রতিষেধ্যত ইতি স্থিতম্ ॥ সর্ব্বসম্বাদিনী ॥ ৫৬ পৃষ্ঠা ॥"

এই দৃষ্টান্ত হইতে বুঝা যায়, ব্রহ্মে কোনও সময়েই চিদ্ ব্যতীত অন্যবস্তুর প্রবেশ অসম্ভব বলিয়াই ব্রহ্মকে স্বগত-ভেদশূন্য বলা হইয়াছে।

এ-বিষয়ে একটু নিবেদন আছে। পরব্রহ্ম স্বীয় স্বরূপের একত্ব রক্ষা করিয়াও বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করেন ; এই সমস্ত বিভিন্নরূপকেই বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ বলা হয়। এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের যে স্বতন্ত্র সত্তা নাই, এক পরব্রহ্মই যে এই সমস্তরূপে আত্মপ্রকট করেন, অথবা স্বীয় বিগ্রহেই এ-সমস্ত রূপ প্রকটিত করেন, একথা শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবও বলিয়াছেন।

"একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৯।১৪১॥"

আবার, "একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি"—গোপালতাপনী শ্রুতির এই বাক্যও তাহাই বলেন এবং উপরি-উদ্ধৃত বেদান্তসূত্র হইতেও তাহাই জানা যায়। তথাপি কিন্তু এই সমস্ত রূপকে স্বয়ংসিদ্ধ পৃথক্‌রূপ মনে না করিলেও—অনেকে ব্রহ্মেরই পৃথক্ পৃথক্ রূপ বলিয়া মনে করেন। অর্জ্জুন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহে বিশ্বরূপ দেখিয়াছিলেন ; কিন্তু এই বিশ্বরূপকে তিনি শ্রীকৃষ্ণরূপই মনে করেন নাই ; তাই তাঁহার চির-পরিচিত রূপ দেখাইবার নিমিত্ত তিনি শ্রীকৃষ্ণের নিকটে প্রার্থনা জানাইয়াছিলেন। দেবকী-বসুদেব কংস-কারাগারে প্রথমে শঙ্খ-চক্র-গদাপদ্ম-ধারী চতুর্ভুজরূপ এবং পরে নরশিশুবৎ দ্বিভুজরূপ দেখিয়াছিলেন ; এই দুই রূপকেও তাঁহারা একেরই দুইটী পৃথক্ রূপ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এইরূপে বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপকে যাঁহারা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরই বিভিন্নরূপ বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা এই সমস্ত রূপকে শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু ইঁহারা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ-নিরপেক্ষ নহেন বলিয়া, তাঁহারা যে বাস্তবিক পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সজাতীয় ভেদ নহেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে একটী উক্তি আছে এইরূপ ঃ—

"পূর্ণ ভগবান্ অবতরে যেই কালে।
আর সব অবতার তাতে আসি মিলে
নারায়ণ চতুর্ব্ব্যূহ মৎস্যাদ্যবতার।
যুগমন্বন্তরাবতার যত আছে আর ॥
সভে আসি কৃষ্ণ-অঙ্গে হয় অবতীর্ণ।
ঐছে অবতরে কৃষ্ণ ভগবান্ পূর্ণ ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।৪।৯—১১॥"

শ্রীবৃহদ্‌ভাগবতামৃতও বলেন—

'একঃ স কৃষ্ণো নিখিলাবতারসমষ্টিরূপঃ ॥ ২।৪।১৮৬ ॥

—শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন নিখিল অবতারের সমষ্টিরূপ।'

লঘুভাগবতামৃতের শ্রীকৃষ্ণামৃতম্-এর ৩৬৮-৩৭২-বাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়।

এই সমস্ত কারণে যাঁহারা বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপকে পরব্রহ্ম হইতে পৃথক্ বলিয়া মনে

করেন না, পরন্তু শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহেরই অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন—"একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ", তাঁহারা বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপকে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের স্বগত ভেদ বলিয়া মনে করিতে পারেন। কিন্তু এই সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ স্বয়ংসিদ্ধ নহেন বলিয়া, শ্রীকৃষ্ণনিরপেক্ষ নহেন বলিয়া, আপাতঃদৃষ্টিতে স্বগত ভেদ বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ স্বগত ভেদ নহেন।

শ্রীমদ্ভাগবতের "বদন্তি তৎ তত্ত্ববিদস্তত্ত্বং যজ্জ্ঞানমদ্বয়ম্। ব্রহ্মেতি পরমাত্মেতি ভগবানিতি শব্দ্যতে॥"—এই শ্লোকেও অদ্বয়-তত্ত্বের তিনটী স্বগত-ভেদের কথা বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে—ব্রহ্ম, পরমাত্মা এবং ভগবান্। কিন্তু ইঁহাদের কেহই অদ্বয়-তত্ত্ব-নিরপেক্ষ বা স্বয়ংসিদ্ধ নহেন বলিয়া প্রকৃত প্রস্তাবে তাঁহারা স্বগতভেদ নহেন। বস্তুতঃ স্বগত-ভেদই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে শ্রীমদ্ভাগবতে পরতত্ত্বকে অদ্বয়-তত্ত্ব বলা হইত না। সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য তত্ত্বই অদ্বয়-তত্ত্বরূপে অভিহিত হইতে পারেন।

এইরূপে দেখা যাইতেছে—সজাতীয় ও বিজাতীয় ভেদের ন্যায় স্বগত ভেদের বিচারেও শ্রীজীবগোস্বামী স্বয়ংসিদ্ধত্বের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াছেন।

তাহা হইলে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে—ব্রহ্ম হইতেছেন স্বয়ংসিদ্ধ সজাতীয়-ভেদশূন্য, স্বয়ংসিদ্ধ-বিজাতীয়-ভেদশূন্য এবং স্বয়ংসিদ্ধ-স্বগত-ভেদশূন্য। এজন্য ব্রহ্ম হইতেছেন—অদ্বয়তত্ত্ব।

শ্রীপাদ শঙ্করও উল্লিখিত ত্রিবিধ-ভেদহীনতা দেখাইয়া ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার পন্থা অন্য রকম। তিনি এক ব্রহ্ম ব্যতীত দৃষ্ট-শ্রুত অন্যবস্তুর—জীব, জগৎ, ভগবৎ-স্বরূপাদি, ভগবদ্ধামাদি কোনও বস্তুরই—বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার করেন নাই। এমন কি ব্রহ্মের শক্তির অস্তিত্বও তিনি স্বীকার করেন নাই। এসমস্তের বাস্তব অস্তিত্ব স্বীকার না করিলে ভেদের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। কিন্তু এ-সমস্তের বাস্তব অস্তিত্ব নাই—ইহা যে শ্রুতিসম্মত সিদ্ধান্ত নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বেদান্ত-সম্মত এবং সূত্রকার ব্যাসদেব-সম্মত বাস্তব-পরিণাম-বাদ স্বীকার করিয়াই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ এবং অদ্বয়-বাদ স্থাপন করিয়াছেন। তাঁহার অদ্বয়বাদ হইতেছে বস্তুতঃ বহুর মধ্যে একত্ববাদ—unity in diversity, ইহাই যে বোধায়নাদি পূর্ব্বাচার্য্যদেরও অভিপ্রেত, ডক্টর সুরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত মহাশয়ের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

২৯। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভুষণের মতবাদ

শ্রীপাদ বলদেবের পূর্ব্ববিবরণ

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অনেক পরবর্ত্তী। তিনি প্রথমে কেবল-

ভেদবাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের শিষ্য ছিলেন। পরে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ে শ্যামানন্দী পরিবারের শ্রীল রাধা-দামোদরের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ভুক্ত হয়েন। পরে নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবের বেশ গ্রহণ করিয়া "একান্তি-গোবিন্দদাস" নামে খ্যাত হইয়াছিলেন। শেষ-জীবনে তিনি বৃন্দাবনে বাস করিয়াছিলেন।

কেহ কেহ বলেন, তিনি নিষ্কিঞ্চন শ্রীশ্রীপীতাম্বরদাসের নিকটে ভক্তিশাস্ত্র এবং শ্রীল বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীর নিকটে শ্রীমদ্ ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন—

ব্রহ্মসূত্রের শ্রীগোবিন্দভাষ্য, সিদ্ধান্তরত্ন (বা ভাষ্যপীঠক), প্রমেয়রত্নাবলী, বেদান্তস্যমন্তক, সিদ্ধান্তদর্পণ, সাহিত্যকৌমুদী, কাব্যকৌস্তুভ, শ্রীমদ্ ভাগবতের টীকা বৈষ্ণবানন্দিনী, শ্রীমদ্ ভগবদ্-গীতার গীতাভূষণভাষ্য, তত্ত্বসন্দর্ভের টীকা-ইত্যাদি।

তাঁহার "প্রমেয়রত্নাবলী"-গ্রন্থে তিনি মাধ্ব-সম্প্রদায়ের মতই প্রকটিত করিয়াছেন।

শ্রীগোবিন্দভাষ্য রচনার একটা ইতিহাস আছে। এক সময়ে শ্রীশ্রীরূপগোস্বামিপাদ-প্রকটিত শ্রীশ্রীগোবিন্দদেবের সেবা সম্বন্ধে জয়পুরে একটা গোলমাল উপস্থিত হইয়াছিল। নানা কারণে শ্রীশ্রীগোবিন্দদেব শ্রীবৃন্দাবন হইতে জয়পুরে স্থানান্তরিত হইয়াছিলেন। জয়পুরের মহা-রাজগণই তদবধি শ্রীগোবিন্দজীর সেবার পরিচালনা করিতেন। সে স্থানে শ্রীনারায়ণপূজার আগে শ্রীগোবিন্দজীর পূজা হইত। শ্রী-সম্প্রদায়ী কয়েকজন মহান্ত-বৈষ্ণব ইহাতে আপত্তি উত্থাপন করেন। শ্রীগোবিন্দজীর পূজার পূর্ব্বে শ্রীনারায়ণের পূজার প্রথা প্রবর্ত্তনই ছিল তাঁহাদের উদ্দেশ্য। অম্বরাধিপতি দ্বিতীয় জয়সিংহের সময়ে ১৬৪০ শকাব্দায় এই ঘটনা হইয়াছিল *। শাস্ত্রীয় বিচারের দ্বারা এই বিষয়ের মীমাংসার জন্য জয়পুরাধিপতি শ্রীবৃন্দাবন হইতে শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত আনয়নের জন্য চেষ্টা করেন। শ্রীবৃন্দাবনস্থ বৈষ্ণবগণ শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীকেই জয়পুরে পাঠাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন; কিন্তু বার্দ্ধক্যবশতঃ চক্রবর্ত্তিপাদ জয়পুর যাইতে সম্মত হইলেন না। তাঁহার অনুমোদনক্রমে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণই জয়পুরে প্রেরিত হইলেন। ✢ তাঁহার সঙ্গে বিচারে বিরুদ্ধ-পক্ষ নিরস্ত হইলেন; তথাপি তাঁহারা গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের ব্রহ্মসূত্রভাষ্য দেখিতে চাহিলেন। বিদ্যাভূষণপাদ বলিলেন—কিছু সময় পাইলে তিনি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্য উপস্থাপিত করিতে পারেন।

---

* কাশীস্থিত গভর্ণমেণ্ট সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ মহামহোপাধ্যায় শ্রীল গোপীনাথ কবিরাজ এম-এ মহোদয় সম্পাদিত বলদেব বিদ্যাভূষণ-পাদের সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থের ভূমিকা দ্রষ্টব্য।

✢ কেহ কেহ বলেন—শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ শ্রীবৃন্দাবনে "অবস্থানকালে জয়পুরের অন্তর্গত 'গলতার গাদী'-নামক মঠে উদাসীন বৈদান্তিকদিগের যে এক সভা হয়, ঐ সভায় নিজগুরু চক্রবর্ত্তিমহাশয়ের সহিত উপস্থিত হইয়া বিচারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য-সম্প্রদায়ের প্রাধান্য স্থাপন-পূর্ব্বক উক্ত মঠে শ্রীমন্মহাপ্রভুর মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠা করাইয়াছিলেন। ঐ মূর্ত্তি ঐস্থানে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে।"—প্রভুপাদ শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামি কর্তৃক ১৩০৪ সালে সম্পাদিত ও প্রকাশিত "সিদ্ধান্তরত্নম্"-গ্রন্থের মুখবন্ধ।

সময় পাইলেন। ইহার পরে শ্রীগোবিন্দজীউর মন্দিরে বসিয়া তিনি ব্রহ্মসূত্রভাষ্য রচনা করেন। কথিত আছে, শ্রীগোবিন্দদেবের নির্দ্দেশেই তিনি এই ভাষ্য রচনা করিয়াছিলেন। "অথ সর্ব্বেশ্বরো ভগবান্ নন্দসূনু র্বজ্রনাভ-প্রীত্যর্চ্চাবতারয়তাবির্ভূতানন্তরং শ্রীরূপেণ চাভিষিক্তঃ শ্রীমদ্ বৃন্দাটব্যধিদেবতাত্বেন যশ্চকাস্তি তন্নিষ্ঠমনা ভাষ্যকৃৎ তন্নির্দ্দেশেনৈব ব্রহ্মসূত্রার্থান্ বিবৃণ্বন্ তৎপ্রণতিং মঙ্গলমাচচার॥ গোবিন্দভাষ্য-মঙ্গলাচরণ-টীকা॥—সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ নন্দতনয় বজ্রনাভের প্রীতির বশীভূত হইয়া অর্চ্চাবতাররূপে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। অনন্তর (কালপ্রভাবে শ্রীবিগ্রহ অদৃশ্য হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী শ্রীবিগ্রহের আবিষ্কার করিয়া পুনরায় সেবা প্রকটিত করেন এবং) বৃন্দাবনের অধিদেবতারূপে শ্রীপাদ রূপ তাঁহাকে অভিষিক্ত করেন। (নানাকারণে এই শ্রীবিগ্রহ বৃন্দাবন হইতে জয়পুরে স্থানান্তরিত হয়েন)। ভাষ্যকার (শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ) গোবিন্দনিষ্ঠমনা হইয়া শ্রীগোবিন্দদেবেরই নির্দ্দেশে ব্রহ্মসূত্রের অর্থ বিবৃত করেন। ভাষ্যের মঙ্গলাচরণে এজন্য তিনি গোবিন্দদেবের প্রণাম করিয়াছেন।—সত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবাদিস্তুতং ভজদ্রূপম্। গোবিন্দং তমচিন্ত্যং হেতুমদোষং নমস্যামঃ॥" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার "সিদ্ধান্তরত্নম্"-গ্রন্থে নিজেও লিখিয়াছেন—"বিদ্যারূপং ভূষণং মে প্রদায় খ্যাতিং নিন্যে তেন যো মামুদারঃ। শ্রীগোবিন্দঃ স্বপ্ননির্দ্দিষ্টভাষ্যো রাধাবন্ধুর্বন্ধুরাঙ্গঃ স জীয়াৎ॥৮।৩১॥—যে উদারপুরুষ আমাকে বিদ্যারূপ ভূষণ প্রদান করিয়া তদ্দ্বারা আমার খ্যাতি বিস্তার করিয়াছেন, যাঁহার স্বপ্নাদেশে আমি বেদান্তসূত্রের ভাষ্য প্রকাশ করিয়াছি, সেই শ্রীরাধাবন্ধু ত্রিভঙ্গভঙ্গিম শ্রীগোবিন্দ জয়যুক্ত হউন।"

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের অভিমত

বেদান্তভাষ্যের উপক্রমে এবং গীতাভূষণভাষ্যে বিভিন্ন তত্ত্বসম্বন্ধে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ যাহা বলিয়া গিয়াছেন, এ-স্থলে সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

ব্রহ্ম। সর্ব্বোচ্চ তত্ত্ব, সবিশেষ, সর্ব্বেশ্বর, বিভু, বিজ্ঞানানন্দস্বরূপ, স্বতন্ত্র, সর্ব্বকর্ত্তা, সর্ব্বজ্ঞ, মুক্তিদাতা, অনন্ত-অচিন্ত্যগুণের আধার, অনন্ত-অচিন্ত্যশক্তির আধার। ব্রহ্ম সগুণ ও নির্গুণ। সগুণ অর্থ—অনন্ত অপ্রাকৃত কল্যাণগুণের আকর। আর নির্গুণ অর্থ প্রাকৃত—ত্রিগুণাত্মিকা প্রকৃতি হইতে জাত কোনও—গুণ তাঁহাতে নাই। তিনি জ্ঞান ও জ্ঞাতা, আনন্দ ও আনন্দময়। স্বরূপ-শক্তিমান্। প্রকৃতি-আদিতে অনুপ্রবেশ ও তন্নিয়মন দ্বারা জগতের সৃষ্টি করিয়া জীবের ভোগ ও মুক্তির বিধান করেন। তিনি এক এবং বহুভাবে বিভিন্ন হইয়াও গুণ-গুণিভাবে এবং দেহ-দেহিভাবে জ্ঞানীর প্রতীতিবিষয় হয়েন। ব্রহ্ম পরস্পর-বিরুদ্ধ ধর্ম্মের আশ্রয়। তিনি বিভু হইয়াও ভক্তিগ্রাহ্য, একরস হইয়াও স্বরূপভূত জ্ঞানানন্দ প্রদান করেন; বৈষম্যহীন এবং ন্যায়পরায়ণ হইয়াও ভক্তপক্ষপাতী, অংশহীন হইয়াও সাংশ, জগতের উপাদন-কারণ হইয়াও স্বরূপে পরিণামহীন এবং অপরিবর্ত্তিত।

বিশেষ

পরব্রহ্মের গুণ—সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণসমূহ—তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী, তিনি অনন্তকল্যাণগুণাত্মক। সুতরাং ব্রহ্মের গুণ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন, ভিন্ন নহে। তাঁহার শক্তিও স্বাভাবিকী বলিয়া তাঁহা হইতে অভিন্না, ভিন্না নহে। কিন্তু ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের গুণ ও শক্তির ভেদ না থাকিলেও **বিশেষ** আছে। "বিশেষ" হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ। "বিশেষ" হইতেছে ভেদের প্রতিনিধি। যাহা ভেদের অভাব-স্থলেও ভেদের প্রতীতি জন্মায় তাহাই "বিশেষ।" "বিশেষস্তু ভেদপ্রতিনিধি র্ন ভেদঃ। স চ ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্য্যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিভাবাদিব্যবহারস্য হেতুঃ। সত্তা সতী ভেদো ভিন্নঃ কালঃ সর্ব্বদাস্তীত্যাদিষু বিদ্বদ্ভিঃ প্রতীতঃ। তৎপ্রতীত্যন্যথানুপপত্ত্যা॥ বিদ্যাভূষণপাদকৃত ১১১-গীতাশ্লোকভাষ্য।—'বিশেষ' হইতেছে ভেদপ্রতিনিধি, ভেদ নহে। ভেদের অভাবসত্ত্বেও এই 'বিশেষ' ধর্ম্ম-ধর্ম্মি-ভাবাদি-ব্যবহাররূপ ভেদকার্য্যের হেতু হয়। 'সত্তা' ও 'সৎ', 'ভেদ' ও 'ভিন্নত্ব', 'কাল সর্ব্বদা বিদ্যমান'—ইত্যাদি-স্থলে যে ভেদ প্রতীত হয়, তাহা বাস্তবিক ভেদ নহে, 'বিশেষ' মাত্র (অর্থাৎ লৌকিক ব্যবহারে কাল্পনিক ভেদ)। অন্যথা এই ভেদের উপপত্তি হয় না। (অর্থাৎ 'বিশেষ' স্বীকার না করিলে প্রতীত ভেদের কোনও রূপ সমাধান হয় না। যেখানে বস্তুতঃ কোনও ভেদ নাই, সে-খানে যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়—ইহা হইতেছে এই "বিশেষ"-বশতঃ। [বিষ্ণুপুরাণের "শক্তয়ঃ সর্ব্বভাবানামচিন্ত্যজ্ঞানগোচরাঃ"—ইত্যাদি ১।৩।২-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ "অচিন্ত্য"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—অন্যথানুপপত্তিপ্রমাণক। "অচিন্ত্যং তর্কাসহং যজ্‌জ্ঞানং কার্য্যান্যথানুপপত্তিপ্রমাণকম্।" (পূর্ব্ববর্ত্তী ২৭-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ইহা হইতে জানা যায়—"অন্যথা অনুপপত্তি"-শব্দের অর্থ হইতেছে—অচিন্ত্য। ভেদের অভাবসত্ত্বেও "বিশেষ" যে ভেদের প্রতীতি জন্মায়, তাহা হইতেছে অচিন্ত্য, যুক্তিতর্কের অগোচর। ইহা "বিশেষেরই এক অচিন্ত্য-প্রভাব]।

ব্রহ্ম যুগপৎ "সৎ" ও "সত্তাবান", "জ্ঞান" ও "জ্ঞাতা," "আনন্দ" ও "আনন্দময়।" সত্তাবান্ জ্ঞাতা, আনন্দময় - এই সমস্ত হইতেছে ব্রহ্মের বিশেষণ, বা গুণ, ধর্ম্ম , আর ব্রহ্ম হইতেছেন—বিশেষ্য, গুণী, বা ধর্ম্মী। গুণ ও গুণী অভিন্ন বলিয়া ব্রহ্মই ধর্ম্ম এবং ব্রহ্মই ধর্ম্মী ; সুতরাং ধর্ম্ম ও ধর্ম্মী অভিন্ন। তথাপি লোকব্যবহারে বোধসৌকর্য্যার্থ জ্ঞাতৃত্ব, আনন্দময়ত্বাদিকে যখন ব্রহ্মের গুণ বলিয়া উল্লেখ করা হয়, তখন এই জ্ঞাতৃত্বাদিকে ব্রহ্ম হইতে যেন ভিন্ন বলিয়াই মনে হয়। কুণ্ডলাকারে (কুণ্ডলী পাকাইয়া) অবস্থিত সর্পও সর্প ই, সর্প ভিন্ন অন্য কিছু নয় ; তথাপি লোকব্যবহারে যখন "সর্পের কুণ্ডল" বলা হয়, তখন সর্পের গুণ (বা অবস্থানবিশেষ) কুণ্ডলকে যেন সর্প হইতে ভিন্ন বলিয়া মনে হয়. ইহাই "বিশেষ"—"বিশেষ" তাহার অচিন্ত্য-প্রভাবে এই ভেদের প্রতীতি জন্মায়। "বিশেষ" বস্তুতঃ "ভেদ" নহে, আপাত-ভেদের প্রতীতি-কারক মাত্র, ভেদ-প্রতিনিধি।

এই "বিশেষের" দুইটী কার্য্য। প্রথমতঃ, ধর্ম্ম ও ধর্ম্মীতে বস্তুতঃ ভেদ না থাকিলেও ভেদ-

ব্যবহারের উৎপাদন। দ্বিতীয়তঃ, সত্য, জ্ঞান, আনন্দাদি যে একপর্য্যায়ভুক্ত নহে, তাহার প্রদর্শন। পৃথিবী, ধরণী, অবনী প্রভৃতি শব্দ এক পৃথিবীকেই বুঝায় ; সুতরাং তাহারা এক পর্য্যায়ভুক্ত, সকলেই পৃথিবী-শব্দের পর্য্যায় ; কিন্তু সত্য, জ্ঞান, আনন্দাদি শব্দের যে এইরূপ পর্য্যায়তা নাই, "বিশেষ"ই তাহা জানাইয়া দেয়। "বিশেষস্ত্ববশ্যং স্বীকার্য্যঃ। স চ ভেদপ্রতিনিধির্ভেদাভাবেঽপি ভেদকার্য্যস্য ধর্ম্মধর্ম্মিব্যবহারস্য সত্যাদিশব্দাপর্য্যায়তায়াশ্চ নিবর্ত্তকঃ। ইতরথা সত্তা সতী ভেদো ভিন্নঃ কালঃ সর্ব্বদাস্তিদেশঃ সর্ব্বত্রেত্যবাধিত-ব্যবহারানুপপত্তিঃ। ইত্যাদি॥ সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥১।১৯॥"

পরব্রহ্মে দেহ-দেহি-ভেদও নাই, তথাপি যে ভেদের প্রতীতি হয়, তাহাও "বিশেষ।"

পরব্রহ্ম হইতেছেন সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য তত্ত্ব ; পরব্রহ্ম ভগবান্ এবং তাঁহার শক্তি যখন অভিন্ন, তিনি ও তাঁহার শক্তি ব্যতীত যখন অন্য কোনও বস্তুরই অস্তিত্বই নাই, তখন তাঁহাতে "সজাতীয়" ও "বিজাতীয়" ভেদ থাকিতে পারে না। আর তিনি যখন জ্ঞানানন্দ-স্বরূপ, তাঁহার বিগ্রহে যখন জ্ঞানানন্দব্যতীত অপর কিছুই নাই, তখন তাঁহাতে "স্বগত ভেদ"ও থাকিতে পারে না। শাখা, প্রশাখা, পত্র, পুষ্পাদি যেরূপ বৃক্ষের স্বগত-ভেদ, ব্রহ্মের অনন্ত গুণ ও শক্তি কিন্তু ব্রহ্মের সেইরূপ স্বগত-ভেদ নহে ; কেননা, ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন এবং ব্রহ্মের সহিত একীভূত ; ব্রহ্ম একাত্মক। ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি ব্রহ্মেরই ন্যায় পরিপূর্ণ, দোষহীন এবং অপরিবর্ত্তনীয় (সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥১।১৫-১৮)।

পরব্রহ্মে স্বগত-ভেদ না থাকিলেও "অচিন্ত্য বিশেষ" বশতঃই ব্রহ্ম-সম্বন্ধে জ্ঞান, আনন্দ, কর-চরণাদি ভেদবোধক শব্দের ব্যবহার হয়। "বিশেষের" অচিন্ত্য-শক্তিই ব্রহ্ম হইতে স্বরূপতঃ অভিন্ন জ্ঞানানন্দ-কর-চরণাদিকে "ভিন্নবৎ" প্রকাশ করিয়া থাকে।

"স্বগতভেদোঽপি তত্র নেত্যভিপ্রেত্যাহ শ্রুতিঃ নেহ নানাস্তি কিঞ্চনেতি। স্মৃতিশ্চ নির্দ্দোষ-পূর্ণগুণবিগ্রহ আত্মতন্ত্রো নিশ্চেতনাত্মক-শরীরগুণৈশ্চ হীনঃ। আনন্দমাত্র-করপাদমুখোদরাদিঃ সর্ব্বত্র চ স্বগতভেদবিবর্জ্জিতাত্মা॥ ইতি। তথাপি বৈদুর্য্যবদ**চিন্ত্যেন বিশেষমহিম্না** তৈঃ শব্দৈর্ব্যবহারো বিদুষামপি নির্বাধঃ। ন চৈবং ভেদাভেদৌ স্যাতাং নিষেধবাক্যবাকোপাৎ। তস্মাদচিন্ত্যত্বমেব শরণমিতি সন্তোষ্টব্যম্॥ সিদ্ধান্তরত্নম্॥ ১।১৮॥— 'এই ব্রহ্মে কিছুই নানা নাই' ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে ব্রহ্মের স্বগতভেদহীনতাই অভিপ্রেত। স্মৃতিও (নারদ পঞ্চরাত্রও) বলেন—পরমেশ্বর মুগ্ধত্বাদিদোষশূন্য, সার্ব্বজ্ঞ্যাদিগুণপরিপূর্ণবিগ্রহ, আত্মতন্ত্র, জড়শরীরধর্ম্মরহিত, তাঁহার কর, পদ, মুখ ও উদরাদি সমস্তই আনন্দমাত্র ; তিনি সর্ব্বত্রই স্বগত-ভেদবিবর্জ্জিতাত্মা। তথাপি, বৈদূর্যমণির ন্যায়, **অচিন্ত্য বিশেষ-মহিমাতেই** (বিশেষের অচিন্ত্য শক্তিতেই) কর-চরণ-মুখ-বিগ্রহ-গুণাদির ভেদ আছে বলিয়া প্রতীত হয়। ভেদাভেদ আছে—ইহাও বলা সঙ্গত নয়। কেননা, ভেদাভেদ স্বীকার করিলে ভেদ-নিষেধক শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। সুতরাং অবিচিন্ত্যত্ব (বিশেষের অচিন্ত্য-প্রভাব) স্বীকার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইবে।"

বিদ্যাভূষণ ও কণাদের বিশেষ

বৈশেষিক-দর্শনের প্রবর্ত্তক কণাদও এক "বিশেষ" স্বীকার করেন। কিন্তু কণাদের "বিশেষ" এবং বলদেব বিদ্যাভূষণের "বিশেষ" এক নহে। বিদ্যাভূষণের "বিশেষ" কি বস্তু, তাহা এ-স্থলে বলা হইয়াছে—যে-সমস্ত বস্তু স্বরূপতঃ অভিন্ন, সে-সমস্তকে যাহা ভিন্ন বলিয়া প্রতীত করায়, তাহাই হইতেছে বিদ্যাভূষণের "বিশেষ।" কিন্তু কণাদের "বিশেষ" অন্যরূপ। কণাদের "বিশেষ" কি, সংক্ষেপে তাহার পরিচয় দেওয়া হইতেছে। কণাদ-স্বীকৃত ছয়টী পদার্থের মধ্যে দুইটী হইতেছে—"সামান্য" ও "বিশেষ"। সামান্য-শব্দে জাতি বা সার্বত্রিকত্ব বুঝায়; যাহা এক শ্রেণীর বস্তুর মধ্যে সমান ভাবে সকলের মধ্যেই বর্ত্তমান, তাহা হইতেছে সামান্য। যেমন, সকল গাভীতে, সকল ষণ্ডে গোত্ব আছে (গাভীও গো এবং ষণ্ডও গো); এই গোত্ব হইতেছে "সামান্য।" কিন্তু ষণ্ড এবং গাভী এক নহে, পরস্পর হইতে পার্থক্যসূচক ইহাদের কয়েকটী বিশেষ লক্ষণ আছে, এই বিশেষ লক্ষণগুলিকেও বিশেষ বলা যায়, কিন্তু ইহা কণাদের "বিশেষ" নহে। ষণ্ড ও গাভীর পার্থক্যসূচক বিশেষ লক্ষণগুলি দৃশ্যমান, নির্ণয়ের যোগ্য। কণাদের "বিশেষ" হইতেছে বিশ্বের মূল কারণ সম্বন্ধে। কণাদ হইতেছেন পরমাণু-কারণবাদী। তাঁহার মতে বিশ্বের সমস্ত বস্তুই ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অবয়বের দ্বারা গঠিত; সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্রতম অবয়বকে বলা হয় পরমাণু। পরমাণুসমূহ নিত্য, অবিভাজ্য, নিরংশ। একই বস্তুর দুইটী পরমাণু সর্ব্বতোভাবে একই রকম, তথাপি কিন্তু তাহারা এক নহে,—দুই, তাহাদের পার্থক্য আছে। এই পার্থক্যের হেতু নির্ণয় করা যায় না। জলের দুইটী পরমাণু—পরিমাণাদিতে, আকারাদিতে, গুণাদিতে ঠিক একই রকম; সুতরাং তাহাদের পার্থক্যের কোনও হেতু খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। অথচ তাহারা যে দুইটী পৃথক্ পরমাণু, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সুতরাং স্বীকার করিতেই হইবে—তাহাদের প্রত্যেকের মধ্যে নিশ্চয়ই এমন একটা কিছু আছে, যাহা তাহাদের এই পার্থক্যের হেতু। যাহা সর্ব্বতোভাবে একইরূপ পরমাণুদ্বয়ের মধ্যে এই পার্থক্য জন্মায়, অথচ যাহা নির্ণয় করা যায় না, তাহাই হইতেছে কণাদের "বিশেষ।" এইরূপে দেখা গেল—বিদ্যাভূষণের "বিশেষ" এবং কণাদের "বিশেষ" এক নহে।

ব্রহ্মের ত্রিবিধ শক্তি—পরাশক্তি (বা বিষ্ণুশক্তি বা স্বরূপ শক্তি), অপরা শক্তি (বা ক্ষেত্রজ্ঞা বা জীবশক্তি) এবং অবিদ্যাশক্তি বা মায়াশক্তি। এই অবিদ্যা-শক্তি তমঃ নামেও অভিহিত হয়। ব্রহ্মের এই তিনটী শক্তিই স্বাভাবিকী।

ব্রহ্ম জগতের নিমিত্ত-কারণ এবং উপাদান-কারণ উভয়ই। পরাশক্তির শক্তিমান্ রূপে ব্রহ্ম হইতেছেন জগতের নিমিত্ত-কারণ; আর, জীবশক্তি ও মায়াশক্তির শক্তিমান্ রূপে তিনি জগতের উপাদান-কারণ। জীবশক্তি হইতে জীবের এবং অবিদ্যাশক্তি হইতে জগতের উদ্ভব। নিমিত্তকারণ-রূপে ব্রহ্ম কূটস্থ-নিত্য-অপরিণামী ও অপরিবর্ত্তনীয়-নিত্য একরূপ। উপাদান-কারণরূপে ব্রহ্ম পরিণামি-নিত্য—জগদ্রূপে পরিণত হয়েন, কিন্তু জগদ্রূপে পরিণত হইয়াও ব্রহ্ম অবিকৃতই থাকেন।

পরাশক্তি বা স্বরূপ-শক্তির তিনটী বৃত্তি—সন্ধিনী, সম্বিৎ ও হ্লাদিনী। এই পরাশক্তি ব্রহ্মের স্বরূপভূতা, ব্রহ্ম হইতে অভিন্না; কেবল "বিশেষ"-বলেই ব্রহ্মের বিশেষণরূপে ভিন্না বলিয়া মনে হয় (সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥১।৪১)।

ব্রহ্ম জগতের স্রষ্টা, রক্ষক ও সংহারক, জীবের কর্ম্মফলদাতা। পরাশক্তির সহায়তায় ব্রহ্ম যে-সকল কার্য্য করেন, তৎসমস্ত নিত্য; কিন্তু প্রকৃতি ও কালের সহায়তায় তিনি যাহা করেন, তাহা অনিত্য।

মায়া বা প্রকৃতি। সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণের সাম্যাবস্থা। প্রকৃতি বা মায়া ব্রহ্মের শক্তি, নিত্য, ব্রহ্মের আশ্রিতা এবং বশ্যা।

জীব। অণুচৈতন্য, নিয়ামক-ব্রহ্মকর্তৃক নিয়ম্য; সংখ্যায় বহু, এবং নানা অবস্থাপন্ন; স্বরূপতঃ ভগবদ্দাস। জীব স্বরূপতঃ ব্রহ্মের শক্তি, ব্রহ্ম এই শক্তির শক্তিমান্। ব্রহ্মের বিভিন্নাংশ।

জগৎ। পরব্রহ্মের শক্তির কার্য্য। পরব্রহ্ম সত্য বলিয়া জগৎও সত্য, জগৎ "মিথ্যা" নহে; সত্য হইলেও নিত্য নহে—অনিত্য।

পঞ্চতত্ত্ব। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ পাঁচটী তত্ত্ব স্বীকার করেন।—ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম। তন্মধ্যে, বিভু-সংবিৎ হইতেছেন ঈশ্বর। অণুসংবিৎ হইতেছে জীব। সত্ত্বাদি-গুণত্রয়াশ্রয়দ্রব্য হইতেছে প্রকৃতি। ত্রিগুণশূন্য জড়দ্রব্যবিশেষ হইতেছে কাল। আর, পুরুষ-প্রযত্ন-নিষ্পাদ্য অদৃষ্টাদি-শব্দবাচ্য পদার্থ-বিশেষ হইতেছে কর্ম্ম।

এই পাঁচটী তত্ত্বের মধ্যে ঈশ্বরাদি চারিটী তত্ত্ব (অর্থাৎ ঈশ্বর, জীব, প্রকৃতি ও কাল) হইতেছে নিত্য; জীবাদি তত্ত্বচতুষ্টয় ঈশ্বরবশ্য বা ঈশ্বরাধীন। কর্ম্ম প্রাগভাববৎ অনাদি, কিন্তু বিনাশী। (শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা ॥ ১।১-শ্লোকের গীতাভূষণভাষ্য)।

শ্রীগোবিন্দ-ভাষ্যের উপক্রমে শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ বলিয়াছেন—জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম—এই চারিটী তত্ত্ব হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি; শক্তিমদ্ ব্রহ্ম এক বস্তু। এজন্য পঞ্চতত্ত্ব-স্বীকারেও ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের সঙ্গতি থাকে। "চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাৎ একং শক্তিমদ্ ব্রহ্ম ইতি অদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতি।"

ভগবানের নিত্যধামস্থিত কাল প্রাকৃত নহে; তাহা হইতেছে ভগবদ্রূপ—ভগবানেরই প্রকাশবিশেষ, ভগবান্ হইতে অভিন্ন। শ্রীভগবান্ স্বীয় লীলার অনুকূল্যার্থ নিজেই চন্দ্রস্যূর্য্যাদিরূপ ধারণ করিয়া তাহাদের উদয়াস্তাদিদ্বারা কালের বিভাগ করিয়া থাকেন। এইরূপ কালবিভাগ থাকিলেও সেখানে কালের অয়ন-বৎসরাদিরূপতা নাই। সেখানে দিবা-রাত্রিরূপ কালে ভগবদিচ্ছা-নুসারে এককালেই সকল ঋতুর আবির্ভাব হয় এবং তদনুরূপ লীলা নিষ্পন্ন হইয়া থাকে। এইরূপে সেস্থানে লীলানুগুণ কালাংশের আবির্ভাব-তিরোভাবও ঘটিয়া থাকে (সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥ ২।৪৪)।

৩০। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা

ক। পরব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণ ও শক্তির মধ্যে সম্বন্ধ

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের মতে পরব্রহ্ম-ভগবানের অনন্ত-কল্যাণগুণ হইতেছে তাঁহার স্বরূপানুবন্ধী এবং তাঁহার স্বাভাবিকী শক্তিও তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী। এজন্য ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি অভিন্ন; ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের গুণের মধ্যে এবং ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের শক্তির মধ্যেও কোনও ভেদ নাই। তবে যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক ভেদ নহে, তাহা হইতেছে "বিশেষ" বা প্রাতীতিক ভেদ। "বিশেষ" তাহার অচিন্ত্য-শক্তিতে এই ভেদের জ্ঞান জন্মায়।

এইরূপে দেখা গেল, **ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের গুণ-শক্তি বিষয়ে শ্রীপাদ বলদেব হইতেছেন প্রকৃত প্রস্তাবে অভেদবাদী।**

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতেও পরব্রহ্মের গুণ হইতেছে স্বরূপানুবন্ধী এবং স্বাভাবিকী শক্তিও স্বরূপানুবন্ধিনী। এই বিষয়ে শ্রীপাদ বলদেবের অভিমত শ্রীপাদ জীবের মতেরই অনুরূপ। শ্রীপাদ শ্রীজীবের মতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের শক্তি ও ব্রহ্মের গুণের মধ্যে ভেদ ও অভেদ যুগপৎ বর্ত্তমান; এই ভেদ এবং অভেদ উভয়ই সত্য, কোনওটীই প্রাতীতিক নহে। কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবের মতে অভেদই সত্য, ভেদ প্রাতীতিক। এ-স্থলে শ্রীপাদ বলদেব শ্রীপাদ জীব হইতে ভিন্ন মত পোষণ করিয়াছেন। ভেদ ও অভেদ পরস্পর-বিরোধী হইলেও ভেদাভেদের বা ভেদাভেদ-সম্বন্ধের অচিন্ত্য-শক্তি বশতঃ তাহাদের যুগপৎ অবস্থিতি স্বীকৃত হয়-ইহাই শ্রীজীবপাদের সিদ্ধান্ত। কিন্তু **শ্রীপাদ বলদেব ভেদাভেদ সম্বন্ধ স্বীকারই করেন না**; তিনি বলেন—ভেদাভেদ স্বীকার করিলে "নেহ নানাস্তি কিঞ্চন"—ইত্যাদি ভেদনিষেধক শ্রুতিবাক্যের সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়। ন চৈবং ভেদাভেদৌ স্যাতাং নিষেধবাক্যব্যাকোপাৎ॥ সিদ্ধান্তরত্নম্॥ ১।১৮॥"

খ। পরব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে সম্বন্ধ

শ্রীপাদ বলদেবের মতে জীবও পরব্রহ্মের শক্তি এবং প্রকৃতি বা মায়াও পরব্রহ্মের শক্তি। এ-বিষয়ে শ্রীপাদ জীবের সহিত তাঁহার মতভেদ নাই।

শ্রীপাদ বলদেবের মতে পরব্রহ্মের জীব-শক্তি হইতে জীবের উদ্ভব এবং মায়াশক্তি হইতে জগতের উদ্ভব। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে জীব হইতেছে জীব-শক্তির অংশ, আর জগৎ হইতেছে মায়ার পরিণাম। সুতরাং এই বিষয়েও উভয়ের মধ্যে বিশেষ মতভেদ দৃষ্ট হয় না।

শ্রীপাদ বলদেবের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমৎ-এক বস্তু; শ্রীজীবপাদেরও তাহাই অভিমত।

পরব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন—জীব, প্রকৃতি, কাল ও কর্ম্ম এই চারিটী পদার্থ ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া এবং ব্রহ্ম শক্তিমৎ এক বস্তু বলিয়া পঞ্চতত্ত্ব-স্বীকারেও ব্রহ্মের অদ্বয়ত্বের সঙ্গতি থাকে। "চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাৎ একং শক্তিমদ্‌ব্রহ্ম ইতি অদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতি॥ গোবিন্দভাষ্যের উপক্রম॥" এ-স্থলেও তিনি **শক্তি ও শক্তিমানের অভেদই স্বীকার**

করিয়াছেন। জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া তাঁহার উক্তিতে জীব-জগতের সহিতও ব্রহ্মের অভেদই সূচিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

গ। শ্রীপাদ বলদেব ও মাধ্বমত

কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবের অন্য একটী উক্তি হইতে বুঝা যায়—ব্রহ্ম ও ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধী গুণের মধ্যে যেরূপ অভেদ, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে ঠিক সেইরূপ অভেদ যেন তাঁহার অভিপ্রেত নয়। এইরূপ অনুমানের হেতু এই।

শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ তাঁহার বেদান্তস্যমন্তকে (৩।১৭) এবং প্রমেয়রত্নাবলীতে (৪।৬-৭) যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ :—শাস্ত্রে জীব ও ব্রহ্মের যে অভেদোক্তির কথা আছে, তদায়ত্ত-বৃত্তিকত্ব এবং তদ্ব্যাপ্যত্ব দ্বারাই তাহা সিদ্ধ হয় ; অর্থাৎ, জীব ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিক (ব্রহ্মাধীন) বলিয়া এবং ব্রহ্মব্যাপ্য (ব্রহ্ম ব্যাপক, জীব তাঁহার ব্যাপ্য) বলিয়াই জীব ও ব্রহ্মের অভেদের কথা শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে ; বাগাদি ইন্দ্রিয় প্রাণায়ত্তবৃত্তিক (প্রাণাধীন) বলিয়া যেমন প্রাণরূপে অভিহিত হয়, তদ্রূপ। ছান্দোগ্য-শ্রুতির "ন বৈ বাচো ন চক্ষুংষি ন শ্রোত্রাণি ন মনাংসীত্যাচক্ষতে, প্রাণা ইত্যেবাচক্ষতে, প্রাণো হ্যেবৈতানি সর্ব্বাণি ভবতি॥ ৫।১।১৫॥"-বাক্য হইতে জানা যায়, বাক্, চক্ষুঃ, কর্ণ, মনঃ প্রভৃতি ইন্দ্রিয়গণ মুখ্যপ্রাণের অধীন বলিয়া "প্রাণ"-নামেই অভিহিত হয় ; তদ্রূপ, জীবও ব্রহ্মাধীন বলিয়া ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলিয়া কথিত হয়। তাঁহার সিদ্ধান্তরত্নের ৬।২৭ অনুচ্ছেদেও শ্রীপাদ বলদেব এই কথাই বলিয়াছেন।

গোবিন্দভাষ্যের উপক্রমেও শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"জীবাদয়স্তু তদ্বশ্যাঃ—জীবাদি পর-ব্রহ্ম ভগবানের বশীভূত বা অধীন।"

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি"-ইত্যাদি ২।৩।৪১-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যেও তিনি লিখিয়াছেন—"তদ্ব্যাপ্যতয়ৈনং জীবং তদাত্মকমেকে আথর্ব্বণিকা অপ্যধীয়ন্তে—জীব ব্রহ্মের ব্যাপ্য বলিয়া আথর্ব্বণিকগণ জীবকে ব্রহ্মাত্মক বলিয়া থাকেন।" তিনি সে-স্থলে আরও লিখিয়াছেন—"তত্ত্ব-মসীত্যেতদপি পরস্য পূর্ব্বায়ত্ত-বৃত্তিকত্বাদি বোধয়তি—তত্ত্বমস্যাদি-বাক্যেও জীবের ব্রহ্মায়ত্ত-বৃত্তিকত্ব (ব্রহ্মাধীনত্ব) বুঝাইতেছে।"

তাঁহার সিদ্ধান্তরত্নের ৬।২৮ অনুচ্ছেদে মোক্ষধর্ম্মের জনক-যাজ্ঞবল্ক্য-সংবাদের "অন্যশ্চ পরমো রাজস্তথান্যঃ পঞ্চবিংশকঃ" ইত্যাদি বাক্যটী উদ্ধৃত করিয়া তিনি বলিয়াছেন—"জীবের ব্রহ্মনিষ্ঠত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব হেতু তাহাকে ব্রহ্মাত্মক বলা হইয়া থাকে। মোক্ষধর্ম্মে বলা হইয়াছে—'হে রাজন্! পরমাত্মা ও জীবাত্মা পরস্পর ভিন্ন হইলেও জীবাত্মা পরমাত্মাতেই থাকেন বলিয়া সাধুগণ উভয়কে একই দর্শন করেন।' গীতাতেও আছে—'ভগবন্! তুমি সকলকে ব্যাপিয়া আছ বলিয়া তোমাকে সকল বলা হয়। সর্ব্বং সমাপ্নোষি ততোঽসি সর্ব্ব ইতি চ।"

জীবসম্বন্ধে শ্রীপাদ বলদেবের এই সমস্ত উক্তি হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা যায়—ব্রহ্মের

সহিত জীবের বাস্তব অভেদ তাঁহার অভিপ্রেত নহে ; শাস্ত্রে যে জীব ও ব্রহ্মের অভেদের কথা বলা হইয়াছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, জীব হইতেছে ব্রহ্মায়ত্তবৃত্তিক (ব্রহ্মাধীন) এবং ব্রহ্মকর্ত্তৃক ব্যাপ্য। ব্রহ্মাধীন এবং ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়াই জীবকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা হয়, স্বরূপতঃ অভিন্ন নহে — ইহাই তাঁহার অভিপ্রায়।

আবার, জগৎ সম্বন্ধেও শ্রীপাদ বলদেবের অভিপ্রায় উল্লিখিতরূপই। অর্থাৎ ব্রহ্মাধীন এবং ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়াই জগৎকে ব্রহ্মের অভিন্ন বলা হয়, স্বরূপতঃ অভিন্ন নহে। তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলীতে (৪।৬-৭) তিনি লিখিয়াছেন—"প্রাণৈকাধীনবৃত্তিত্বাদ্ বাগাদেঃপ্রাণতা যথা। তথা ব্রহ্মাধীনবৃত্তে র্জগতো ব্রহ্মতোচ্যতে ॥ * * * ব্রহ্মব্যাপ্যত্বতঃ কৈশ্চিজ্জগদ্‌ব্রহ্মেতি মন্যতে ॥—প্রাণের অধীন বলিয়া যেমন বাগাদি ইন্দ্রিয়কে প্রাণ বলা হয়, তদ্রূপ ব্রহ্মাধীনবৃত্তি বলিয়া জগৎকে ব্রহ্ম বলা হয়। * * জগৎ ব্রহ্মকর্ত্তৃক ব্যাপ্য বলিয়া কেহ কেহ জগৎকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করেন।" সিদ্ধান্তরত্নের ৬।২৭ অনুচ্ছেদেও তিনি তাহাই বলিয়াছেন।

জীব ও জগৎ ব্রহ্মের শক্তি বলিয়া এবং ব্রহ্মের শক্তি ব্রহ্ম হইতে অভিন্না বলিয়া তিনি গোবিন্দ-ভাষ্যের উপক্রমে জীব-জগৎকে ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন বলিয়াছেন। কিন্তু উপরি উদ্ধৃত বাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—তিনি ব্রহ্ম ও জীব-জগতের বাস্তবিক অভিন্নতা স্বীকার করেন না। তাঁহার অভিপ্রায় এই যে – ব্রহ্মাধীন এবং ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়াই জীব-জগৎকে ব্রহ্মের সহিত অভিন্ন বলা হয়, বস্তুতঃ জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে। ইহাতে মনে হয়, ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের **অভেদ যেন ঔপচারিক**, বাস্তব নহে।

যাহা হউক, "জীব-জগৎ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন নহে"—কেবল একথা বলিয়াই তিনি ক্ষান্ত হয়েন নাই। জীব-জগৎ যে ব্রহ্ম হইতে ভিন্ন তাহাও তিনি স্পষ্ট কথায় বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ বলদেব তাঁহার প্রমেয়রত্নাবলীতে লিখিয়াছেন—মোক্ষাবস্থাতেও ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদের কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় বলিয়া এই ভেদ পারমার্থিক। "এষু মোক্ষেঽপি ভেদোক্তেঃ **স্যাদ্‌ভেদঃ পারমার্থিকঃ** ॥৪।৩॥"

তিনি আরও লিখিয়াছেন—নিত্য ও চেতন এক ঈশ্বর হইতে বহু নিত্য ও চেতন জীব পরস্পর ভিন্ন ; সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের ভেদ সনাতন। "একস্মাদীশ্বরান্নিত্যাচ্চেতনাত্তাদৃশা মিথঃ। ভিদ্যন্তে বহবো জীবাস্তেন **ভেদঃ সনাতনঃ** ॥ প্রমেয়রত্নাবলী ॥৪।৫॥"

"অংশো নানাব্যপদেশাদন্যথা চাপি"-ইত্যাদি ২।৩।৪১-ব্রহ্মসূত্রের গোবিন্দভাষ্যেও তিনি ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদের কথাই লিখিয়াছেন। "তত্ত্বমসিত্যেতদপি পরস্য পূর্ব্বায়ত্তবৃত্তিকত্বাদি বোধয়তি, পূর্ব্বোক্তশ্রুত্যাদিভ্যো ন তু অন্যৎ। **তস্মাদীশাৎ জীবস্যাস্তিভেদঃ**।

তাঁহার সিদ্ধান্তরত্ন-নামক গ্রন্থেও তিনি লিখিয়াছেন—প্রকৃতি-জীবরূপ প্রপঞ্চ হইতে তদাশ্রয় ঈশ্বরের ভেদ আনন্দময়াধিকরণ হইতে সিদ্ধ হয়। "প্রকৃতি-জীবরূপাৎ প্রপঞ্চাৎ তদাশ্রয়স্যেশ্বরস্য

ভেদস্ত্বানন্দময়াদ্যধিকরণেভ্যঃ সিদ্ধঃ॥ সিদ্ধান্তরত্ন ॥৮।১ ” ; “তদেবং সর্ব্বেশ্বরস্য ভগবতঃ শ্যামসুন্দরস্য জীবজড়াত্মকাৎ প্রপঞ্চাদ্ ভেদঃ ॥ সিদ্ধান্তরত্ন ॥৮।২৪॥—এইরূপে সর্ব্বেশ্বর ভগবান্ শ্যামসুন্দর হইতে জীব-জড়াত্মক প্রপঞ্চের ভেদ।”

“ন ত্বেবাহং জাতু নাসং ন ত্বং নেমে জনাধিপাঃ।”—ইত্যাদি শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ২।১২-শ্লোকের গীতাভূষণভাষ্যেও ব্রহ্ম হইতে জীবের পারমার্থিক ভেদের কথা তিনি বলিয়া গিয়াছেন। “পৃথগাত্মানং প্রেরিতারঞ্চ মত্বা জুষ্টংস্ততাস্তেনামৃতত্বমেতীত্যাদিনা ভেদ এবামৃতত্বফলশ্রবণাৎ। বিরুদ্ধধর্ম্মাবচ্ছিন্নপ্রতি-যোগিতয়া লোকে তস্যাজ্ঞাতত্বাচ্চ। তে চ ধর্ম্মা বিভুত্বাণুত্বস্বামিত্বভৃত্যত্বাদয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যা মিথো বিরুদ্ধা বোধ্যাঃ। অভেদস্তু ফলস্তত্র ফলানঙ্গীকারাৎ অজ্ঞাতশ্চ শশশৃঙ্গবদসত্ত্বাৎ। তস্মাৎ **পারমার্থিকস্তদ্ভেদঃ সিদ্ধঃ**।”

উল্লিখিত বাক্যসমূহে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ **ব্রহ্ম হইতে জগতের পারমার্থিক এবং সনাতন ভেদের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।**

এ-স্থলে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—শ্রীপাদ বলদেবের মতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি অভিন্ন। তবে যে তাঁহাদের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, তাহা বাস্তবিক ভেদ নহে, তাহা হইতেছে “বিশেষ”—যাহা ভেদের অভাব-সত্ত্বেও ভেদের প্রতীতি জন্মায়।

কিন্তু উল্লিখিত বাক্যসমূহ হইতে জানা যায়—তিনি ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের পারমার্থিক ভেদ স্বীকার করেন। জীব এবং জগৎও তাঁহার মতে শক্তি—জীব স্বরূপতঃ জীবশক্তি এবং জগৎ স্বরূপতঃ মায়াশক্তি। এ-স্থলে দেখা যাইতেছে, তিনি ব্রহ্ম হইতে জীবশক্তি ও মায়াশক্তির পার-মার্থিক ভেদ স্বীকার করিতেছেন, এই ভেদ সম্বন্ধে তিনি “বিশেষ” বলিতেছেন না। “বিশেষ” হইতেছে প্রাতীতিক ভেদ, পারমার্থিক ভেদ নহে।

ইহাতে বুঝা যায়—তিনি কেবল স্বরূপ-শক্তি-সম্বন্ধেই “বিশেষ” স্বীকার করেন, জীবশক্তি ও মায়াশক্তি সম্বন্ধে “বিশেষ” তাঁহার অভিপ্রেত নয়। মর্ম্ম হইতেছে এই যে—ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মের স্বরূপানুবন্ধী গুণের এবং স্বরূপ-শক্তিরই অভেদ; ব্রহ্ম হইতে তাঁহার গুণের এবং স্বরূপশক্তির যে ভেদ আছে বলিয়া মনে হয়, সেই ভেদ প্রাতীতিকমাত্র, তাহা পারমার্থিক নহে। কিন্তু ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মের জীবশক্তির এবং মায়াশক্তির ভেদ পারমার্থিক, এই ভেদ “বিশেষ” নহে।

শ্রীপাদ বলদেব, ব্রহ্মায়ত্ত এবং ব্রহ্মব্যাপ্য বলিয়া ব্রহ্মের সহিত যে অভেদের কথা বলিয়াছেন, তাহাকে বাস্তব অভেদ বলিয়া স্বীকার করা যায় না। বলবান্ হস্তীও অনেক সময় মানুষের আয়ত্তে থাকে; তাহাতে সেই হস্তীর সহিত মানুষের অভেদ বলিয়া মনে করা যায় না। বিশেষতঃ, তাঁহার কথিত অভেদ বরং ভেদেরই পরিচায়ক। যে বস্তু ব্রহ্মের আয়ত্তে এবং ব্রহ্মের ব্যাপ্য, সেই বস্তু ব্রহ্ম হইতে ভিন্নই হইবে, ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইতে পারে না। তাঁহার কথিত এই অভেদকে বরং ভেদেরই প্রকারবিশেষ বলা যায়। যে ভেদকে তিনি সনাতন এবং পারমার্থিক ভেদ বলিয়াছেন,

তাঁহার এই অভেদেও সেই ভেদেরই ছায়া দৃষ্ট হয়। সুতরাং ব্রহ্ম ও জীবজগতের মধ্যে তিনি যে ভেদাভেদের কথা বলিয়াছেন, তাহাতে ভেদেরই মুখ্যত্ব তাঁহার অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়।

জীব-ব্রহ্ম সম্বন্ধে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যেরও এইরূপ একটী উক্তি আছে। ২।৩।৪৩-ব্রহ্মসূত্রভাষ্যে তিনি বলিয়াছেন—"বহুধা গীয়তে বেদৈর্জীবোহংশস্তস্য তেন তু। যতো ভেদেন চাস্যায়মভেদেন চ গীয়তে। অতশ্চাংশত্বমুদ্দিষ্টং ভেদাভেদং ন মুখ্যতঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এই—"জীব যে ব্রহ্মের অংশ, তাহা বেদে বহুরূপে বলা হইয়াছে। বেদে জীব ও ব্রহ্মের ভেদের কথাও আছে, অভেদের কথাও আছে। সুতরাং ভেদাভেদের কথাই জানা যায়। এ-সকল স্থলে জীবের ব্রহ্মাংশত্বকে লক্ষ্য করিয়াই ভেদাভেদ বলা হইয়াছে, ভেদাভেদের মুখ্যত্ব নাই।" শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ভেদবাদী; তাঁহার নিকটে ভেদেরই মুখ্যত্ব, ভেদাভেদের মুখ্যত্ব নাই।

ইহাতে মনে হয়, শ্রীপাদ বলদেবও যেন মধ্বাচার্য্যের আনুগত্যেই ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের ভেদেরই প্রাধান্য খ্যাপন করিতে চেষ্টিত হইয়াছেন।

ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের যে অভেদের কথা তিনি বলিয়াছেন, তাহাতে মাধ্বমতের প্রভাবই পরিস্ফুট। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য জীব ও জগৎকে পরতন্ত্র-তত্ত্ব বলিয়াছেন। পরতন্ত্র-তত্ত্ব বলিতে ব্রহ্ম-পরতন্ত্রত্ব বা ব্রহ্মায়ত্তত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্যত্বই সূচিত হয় এবং এই ব্রহ্মায়ত্তত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্যত্বকেই শ্রীপাদ বলদেব ব্রহ্মের সহিত জীবজগতের অভিন্নত্বের হেতু বলিয়াছেন। সুতরাং এ-স্থলেও তাঁহার মাধ্বমতানুগত্যই সূচিত হইতেছে।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের ভেদের যে সমস্ত লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, শ্রীপাদ বলদেবও সেই সমস্ত লক্ষণের কথাই বলিয়াছেন।

ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে যে ভেদ ও অভেদের কথা শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন, তাহারা কিন্তু পরস্পর-বিরোধী নহে। কেননা, তাঁহার কথিত ভেদ হইতেই অভেদের উৎপত্তি, তাঁহার কথিত ভেদের পর্য্যবসানই তাঁহার কথিত অভেদে। লক্ষণ বিচার করিলেই তাহা বুঝা যাইবে।

তাঁহার কথিত ভেদের লক্ষণ তিনি তাঁহার ২।১২-গীতাশ্লোকের ভাষ্যে প্রকাশ করিয়াছেন। "তে চ ধর্ম্মা বিভুত্বাণুত্ব-স্বামিত্বভৃত্যত্বাদয়ঃ শাস্ত্রৈকগম্যা মিথো বিরুদ্ধা বোধ্যাঃ।" ব্রহ্ম বিভু, জীব অণু; ব্রহ্ম স্বামী বা প্রভু, জীব ভৃত্য বা সেবক ইত্যাদি। বিভুত্ব অণুত্বের বিরোধী, স্বামিত্ব ভৃত্যত্বের বিরোধী। সুতরাং বিভুত্ব ও অণুত্বের মধ্যে ভেদ, স্বামিত্ব ও ভৃত্যত্বের মধ্যেও ভেদ বর্ত্তমান। বিভুত্ব, অণুত্ব, স্বামিত্ব প্রভৃতি হইতেছে ধর্ম্ম। শ্রীপাদ বলদেব দেখাইলেন—ব্রহ্মের ধর্ম্ম ও জীবের ধর্ম্ম—এই উভয়ের মধ্যে ভেদ বিদ্যমান।

তাঁহার কথিত উল্লিখিতরূপ ধর্ম্মভেদ হইতেই যে তাঁহার কথিত অভেদ আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে, তাহাই এক্ষণে প্রদর্শিত হইতেছে।

ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদের আর একটী হেতু হইতেছে এই যে—ব্রহ্ম বিভু, কিন্তু জীব

অণু। অণু ও বিভুর মধ্যে স্বভাবতঃই ব্যাপ্য-ব্যাপকত্ব-সম্বন্ধ বিরাজিত। বিভু-ব্রহ্ম ব্যাপক এবং অণু জীব তাঁহার ব্যাপ্য।

ব্রহ্ম ও জীবের মধ্যে ভেদের আর একটী হেতু হইতেছে—ব্রহ্ম স্বামী, কিন্তু জীব ভৃত্য। ভৃত্য সর্ব্বদাই স্বামীর বা প্রভুর আয়ত্তে থাকে। ইহা হইতেছে স্বামি-ভৃত্যের স্বাভাবিক ধর্ম্ম।

এইরূপে দেখা গেল—জীব ও ব্রহ্মের মধ্যে ভেদের যে সমস্ত লক্ষণের কথা শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন, তাহাদের স্বাভাবিক পরিণামই হইতেছে ব্রহ্মায়ত্তত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব ; সুতরাং তাদৃশ ভেদ ব্রহ্মায়ত্তত্ব ও ব্রহ্মব্যাপ্যত্বের বিরোধী নহে। আবার এতাদৃশ ব্রহ্মায়ত্তত্ব এবং ব্রহ্মব্যাপ্যত্বকেই তিনি জীব-ব্রহ্মের মধ্যে অভিন্নত্বের হেতুরূপে উল্লেখ করিয়াছেন। তাহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, তাঁহার কথিত অভেদ হইতেছে তাঁহার কথিত ভেদেরই স্বাভাবিক পরিণাম। সুতরাং তাঁহার কথিত ভেদ ও অভেদ পরস্পর-বিরোধী নহে এবং পরস্পর-বিরোধী নহে বলিয়া এইরূপ ভেদ ও অভেদের যুগপৎ অবস্থিতি অসম্ভব নহে। এই ভেদাভেদ অচিন্ত্য-জ্ঞানগোচর নহে; সুতরাং ইহা অচিন্ত্য-ভেদাভেদ নহে।

উল্লিখিতরূপ ভেদে এবং অভেদে যে অসঙ্গতি নাই, তাহা শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ তাঁহার সিদ্ধান্তরত্নে নিজেই স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। "তত্র যান্যভেদপরাণীব বাক্যানি কানিচিৎ প্রতীয়ন্তে, তানি ক্বচিত্তন্মাত্রায়ত্তবৃত্তিকতয়া তন্নিষ্ঠতয়া তদ্ব্যাপ্যতয়া বা বিশ্বং তদাত্মকমিতি বোধয়েয়ুঃ। ক্বচিজ্জীবেশয়োঃ স্থানৈক্যান্মত্যৈক্যাচ্চাভেদং বোধয়ন্তি। ক্বচন শক্তেঃ জীবজড়রূপায়াঃ শক্তিমতঃ পরেশাদনন্যত্বাদভেদমাহুঃ। ক্বচিচ্চ ভগবদাবির্ভাবেষু প্রতীতং স্বগতভেদং নিবারয়ন্তীতি সর্ব্বমনবদ্যম্॥ সিদ্ধান্তরত্নম্॥ ৮।২৫॥"

ইহার টীকায় লিখিত হইয়াছে—"নন্নু শাস্ত্রং চেৎ সর্ব্বভেদপরং তর্হি অভেদবাক্যানাং সঙ্গতিঃ কথমিত্যপেক্ষায়াং পূর্ব্বদর্শিতামপি তাং পুনর্বিশদতয়াত্তে দর্শয়তি। তত্রেতি শাস্ত্রে। * * *"

তাৎপর্য্যানুবাদ। "সমস্ত শাস্ত্র ভেদপর হইলেও অভেদপর বাক্যসকলের অসঙ্গতি হইতেছে না। কারণ, ব্রহ্মাধীন স্থিতি, ব্রহ্মাধীন বৃত্তি, ব্রহ্মব্যাপ্যত্ব এবং ব্রহ্মাধিকরণত্ব প্রযুক্তই শাস্ত্রে বিশ্বকে ব্রহ্মাত্মক দেখাইয়াছেন। কোথাও বা জীব ও ব্রহ্মের স্থানের ঐক্য এবং মতির ঐক্য হেতুও তদুভয়ের অভেদ বলিয়াছেন। কোথাও বা জীব-জড়রূপাশক্তি শক্তিমান্ পরমেশ্বর হইতে অতিরিক্ত নয় বলিয়াই অভেদ নির্দ্দেশ করিয়াছেন। আবার কোথাও বা ভগবদবতার-সকলের অবতারী ভগবানের স্বরূপ হইতে প্রতীত স্বগতভেদের নিবারণার্থই তাদৃশ অভেদ স্বীকার করিয়াছেন। এই প্রকার সকল বাক্যেরই সঙ্গতিদ্বারা শাস্ত্রসকল দোষরহিত হইতেছে।"—প্রভুপাদ শ্রীল শ্যামলাল গোস্বামিকৃত অনুবাদ।

বিশিষ্টাদ্বৈতবাদের সমর্থনের প্রসঙ্গে তিনি আরও বলিয়াছেন—"ভেদাভেদ-শ্রুত্যোর্বিষয়ভেদ-প্রদর্শনাৎ মিথো বিরুদ্ধার্থপ্রতীতি র্নিবর্ত্তিতা॥ সিদ্ধান্তরত্নম্॥ ৮।২৬॥—ভেদবোধক ও অভেদবোধক শ্রুতিদ্বয়ের বিষয়ভেদ প্রদর্শন দ্বারা পরস্পর-বিরুদ্ধার্থ-প্রতীতি-জন্য দোষ নিরস্ত হইল।" এ-স্থলে

"বিষয়ভেদ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—যে-যে-বিষয়ে ভেদের কথা বলা হইয়াছে, সে-সে বিষয়ে অভেদের কথা বলা হয় নাই এবং যে-যে বিষয়ে অভেদের কথা বলা হইয়াছে, সে-সে বিষয়ে ভেদের কথা বলা হয় নাই। সুতরাং কোনওরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারেনা।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—জীব-জগতের ব্রহ্মায়ত্তত্ব-ব্রহ্মব্যাপ্যত্বাদি হেতুমূলক যে অভেদের কথা বলা হইয়াছে, সেই অভেদও তৎকথিত ভেদেরই পরিণাম বলিয়া এ-স্থলেও ভেদেরই—অর্থাৎ মাধ্বমতেরই—প্রাধান্য।

শ্রীপাদ বলদেবের সিদ্ধান্তরত্ন গ্রন্থের ৮।৩০ অনুচ্ছেদের টীকা হইতে জানা যায়—তিনি কেবল-দ্বৈতবাদকে **(মাধ্ব মতকেই) নির্দ্দোষ মনে করেন** এবং মাধ্বমতের নির্দ্দোষত্ব বুঝিতে পারিয়াও যাঁহারা এই মতের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বাতন্ত্র্যাবলম্বন করেন, তাঁহারা যে মাধ্বমতাবলম্বী তত্ত্ববাদীদের তাড়নীয়, তাহাও তিনি মনে করেন। "কেবলে দ্বৈতে চ **নির্দ্দোষেঽপি** তদ্বাদিশিষ্যতাপত্তিঃ। ন চ উভয়সমুচ্চয়ঃ। স্বাতন্ত্র্যেতু হরেঃ কৌলিকাঃ সন্নিহিতাশ্চেৎ **তত্ত্ববাদিভিস্তাড়নীয়াঃ।** ইত্যুপেক্ষ্যা এব কুধিয়ঃ॥"

ইহা হইতে মাধ্বমতের প্রতি শ্রীপাদ বলদেবের পরানুরক্তিই সূচিত হইতেছে।

গোবিন্দভাষ্যের "সূক্ষ্মা"-নাম্নী টীকাতেও লিখিত হইয়াছে—"মধ্বমুনি-মতানুসারতঃ ব্রহ্ম-সূত্রাণি ব্যাচিখ্যাসু ভাষ্যকারঃ শ্রীগোবিন্দৈকান্তী বিদ্যাভূষণাপরনামা বলদেবঃ নির্ব্বিঘ্নায়ৈ তৎপূর্ত্তয়ে শিষ্টাচার-পরিপ্রাপ্ত-শাস্ত্রপ্রতিপাদ্যেষ্টদেবতা-নমস্কাররূপং মঙ্গলমাচরতি। (মঙ্গলাচরণাংশের টীকা)॥ —মাধ্বমুনির (মাধ্বচার্য্যের) মতানুসারে ব্রহ্মসূত্র-সমূহের ব্যাখ্যা করার অভিলাষী বলদেববিদ্যাভূষণ-নামা একান্তী শ্রীগোবিন্দ নির্ব্বিঘ্নে অভিলাষ পূরণের উদ্দেশ্যে শিষ্টপরম্পরাগত রীতি অনুসারে শাস্ত্র-প্রতিপাদ্য ইষ্টদেবতার (শ্রীগোবিন্দদেবের) নমস্কাররূপ মঙ্গলাচরণ করিতেছেন"। ইহাতেও বুঝা যায়, ব্রহ্মসূত্র-ভাষ্য-প্রণয়নে তিনি মাধ্বমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ বলদেব প্রথমে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন। পরে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকিলেও মনে হয়, তিনি তাঁহার পূর্ব্বসম্প্রদায়াচার্য্য শ্রীমধ্বচার্য্যের মতের প্রভাব হইতে সম্যকরূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই। এজন্য তাঁহার লিখিত গ্রন্থাদিতে পুনঃ পুনঃ মাধ্বমতের উল্লেখ দৃষ্ট হয়।

কিন্তু মাধ্ব-প্রভাব হইতে সম্যক্‌রূপে মুক্ত হইতে পারেন নাই বলিয়া তিনি যে সর্ব্বত্র কেবল মাধ্বমতই ব্যক্ত করিয়াছেন, তাহা নহে। অনেকস্থলে স্বীয় স্বীকৃত সিদ্ধান্তরূপে তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের সিদ্ধান্তও প্রকাশ করিয়াছেন। দুয়েকটী দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

মধ্বাচার্য্য হইতেছেন ভেদবাদী। তাঁহার ব্রহ্ম সজাতীয়-বিজাতীয়-ভেদহীন তত্ত্ব নহেন। তাঁহার মতে জীব ও ব্রহ্মে কেবল-ভেদ, জগৎ ও ব্রহ্মেও কেবল-ভেদ। সুতরাং জীব (চেতন) হইল ব্রহ্মের সজাতীয় ভেদ এবং জড় জগৎ হইল ব্রহ্মের বিজাতীয় ভেদ। কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবের মতে

পরব্রহ্ম হইতেছেন সজাতীয়-বিজাতীয়-স্বগত-ভেদশূন্য তত্ত্ব। ইহা মাধ্বগত-বিরোধী, কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতের অনুগত।

আবার, মধ্বাচার্য্য দ্বৈতবাদী। জীব-জগদাদির সহিত ব্রহ্মের কেবল-ভেদ বিদ্যমান বলিয়া জীব-জগদাদি হইতেছে ব্রহ্মের দ্বিতীয় বস্তু। তাঁহার মতে ব্রহ্ম অদ্বয়-তত্ত্ব নহেন। কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবের মতে ব্রহ্ম হইতেছেন অদ্বয়-তত্ত্ব। ইহা মাধ্বমতের বিরোধী ; কিন্তু শ্রীপাদ জীব-গোস্বামীর মতের অনুগত।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণই হইতেছেন পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম। কিন্তু শ্রীপাদ বলদেবের মতে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন পরতত্ত্ব পরব্রহ্ম ; আর পরব্যোমাধিপতি নারায়ণ হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বা প্রকাশবিশেষ। এজন্যই নারায়ণের মহিষী শ্রী লক্ষ্মী দেবী পর-ব্যোমাধিশ্বরী হইয়াও শ্রীকৃষ্ণের চরণ-সেবা প্রার্থনা করিয়া সুচির-কালব্যাপী ব্রতধারণপূর্ব্বক উৎকট তপস্যাচরণ করিয়াছিলেন। (সিদ্ধান্তরত্ন॥ ২।১৭)। ইহাও মাধ্বমতের প্রতিকূল, কিন্তু গৌড়ীয় মতের অনুগত।

এইরূপ বহু দৃষ্টান্ত আছে। অবশ্য সকল বিষয়েই যে তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও বলা যায় না।

ঘ। সমন্বয়-চেষ্টা

কিন্তু প্রশ্ন হইতেছে এই যে—মাধ্বমতের প্রাধান্য দিয়াও অন্ততঃ কয়েকটী প্রধান প্রধান বিষয়ে তিনি মাধ্বমত স্বীকার করিলেন না কেন ? বাস্তবিক নির্দ্দোষ হইলে অবশ্যই তিনি যে সকল বিষয়েই মাধ্বমত গ্রহণ করিতেন, এই অনুমান অস্বাভাবিক নয়। তবে কি তিনি মাধ্বমত ও গৌড়ীয়-মতের মধ্যে সমন্বয় স্থাপনের চেষ্টা করিয়াছেন ? এই বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতবাদের আলোচনায় পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে, তাঁহার কেবল-ভেদবাদ বিচারসহ নহে। জীব-জগৎকে ব্রহ্মের ভেদ বলিয়াও তিনি বলিয়াছেন—জীব-জগৎ হইতেছে ব্রহ্মাধীন। সুতরাং জীব-জগৎ যে ব্রহ্মনিরপেক্ষ নহে, তাহা তিনি স্বীকার করিলেন। দুইটী বস্তু যদি সর্ব্বতোভাবে পরস্পর-নিরপেক্ষ হয়, স্বয়ংসিদ্ধ হয়, তাহা হইলেই তাহাদিগকে পরস্পরের বাস্তবিক ভেদ বলা সঙ্গত নয়। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে জীব-জগৎ ঈশ্বরাধীন বলিয়া ঈশ্বর-নিরপেক্ষ নহে। তাঁহার মতেও জীব-জগৎ স্বয়ংসিদ্ধ নহে। তিনি বলেন—জীব হইতেছে ঈশ্বর পরব্রহ্মের নিরুপাধিক প্রতিবিম্বাংশ, ঈশ্বর-পরব্রহ্ম হইতেছেন প্রতিবিম্বাংশ জীবের বিম্বরূপ অংশী। সুতরাং তাঁহারই উক্তি অনুসারে জীব স্বয়ংসিদ্ধ হইতে পারে না। যেহেতু, জীবের অস্তিত্বও ঈশ্বরের অস্তিত্বের উপর নির্ভর করে—প্রতিবিম্ব যেমন বিম্বের অস্তিত্বের উপরে নির্ভর করে, তদ্রূপ। আবার জগৎ-সম্বন্ধেও তিনি বলেন--ঈশ্বর পরব্রহ্মই জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা। সুতরাং জগৎও স্বয়ংসিদ্ধ নহে।

কেননা, জগতের উদ্ভব এবং অস্তিত্বাদি ঈশ্বরের অপেক্ষা রাখে। এই সমস্ত কারণে জীব-জগৎকে ব্রহ্মের বাস্তব ভেদ বলা সঙ্গত হয় না; সুতরাং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের স্বীকৃতি অনুসারেই তাঁহার কেবল-ভেদবাদ সিদ্ধ হইতে পারে না।

কিন্তু তাঁহার কেবল-ভেদবাদ সিদ্ধ না হইলেও তিনি যে জীব-জগৎকে ব্রহ্মের ভেদ বলিয়াছেন, ভেদ-শব্দে যদি পৃথক্ অস্তিত্ব সূচিত হয়, তাহা হইলে তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে। জীব ও জগৎ ব্রহ্ম হইতে পৃথক্‌ভাবে অবস্থিত। জীব-ব্রহ্মের ভেদ-কথন-প্রসঙ্গে তিনি একটী কথা বলেন এই যে, বদ্ধাবস্থায় এবং মুক্তাবস্থায়ও ব্রহ্ম হইতে জীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে এবং এই অস্তিত্ব সত্য। সুতরাং ভেদ-শব্দের পৃথক্ অস্তিত্ব-সূচক অর্থ অসঙ্গত হইতে পারে না। শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের মতে জগতেরও পৃথক্ অস্তিত্ব আছে এবং এই অস্তিত্ব অনিত্য হইলেও সত্য। সুতরাং জগৎ-সম্বন্ধেও ভেদ-শব্দের পৃথক্ অস্তিত্ব-সূচক অর্থ অসঙ্গত হইতে পারে না।

এইরূপে দেখা গেল—ভেদ-শব্দের কেবল-ভেদ বা তাত্ত্বিক ভেদ অর্থ গ্রহণ না করিয়া পৃথগস্তিত্ব-বিশিষ্টত্ব অর্থ গ্রহণ করিলেই মধ্বাচার্য্যের মত "নির্দ্দোষ" হইতে পারে।

শ্রীপাদ বলদেব যে ব্রহ্ম হইতে জীবের ভেদকে পারমার্থিক এবং সনাতন বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য যদি ব্রহ্ম হইতে জীবের নিত্য (শুদ্ধাবস্থায় এবং মুক্তাবস্থাতেও) পৃথক্ অস্তিত্ব হয়, তাহা হইলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সিদ্ধান্তের সহিতও সঙ্গতি থাকে এবং ভেদ-শব্দের উল্লিখিত অর্থে মাধ্ব-মতের সহিতও সঙ্গতি থাকে। জগতের ভেদ-সম্বন্ধেও তদ্রূপ অর্থই গ্রহণীয়। পৃথক্ অস্তিত্বকে পারমার্থিক বলার তাৎপর্য্য এই যে—ইহা সত্য, মিথ্যা নহে। সম্ভবতঃ শ্রীপাদ শঙ্করের উক্তির প্রতি-বাদেই এই পৃথক্ অস্তিত্বকে পারমাথিক বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ শঙ্কর জীব-জগতের পারমার্থিক অস্তিত্ব স্বীকার করেন না।

পরতত্ত্ব-সম্বন্ধেও বক্তব্য এই। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে বিষ্ণু বা বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণই পরতত্ত্ব। কিন্তু শ্রীপাদ বলদেব বলেন—ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই পরতত্ত্ব। এই দুই মতের মধ্যে বাস্তবিক আত্যন্তিক বিরোধ নাই। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ ও শ্রীনারায়ণে তত্ত্বগত ভেদ নাই। ভেদ কেবল শক্তি-বিকাশের তারতম্যে। "সিদ্ধান্ততস্ত্বভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ। রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণ-রূপমেষা রসস্থিতিঃ॥"—এই স্মৃতিবাক্য অনুসারে রসত্বের দিক্ দিয়া নারায়ণ অপেক্ষা কৃষ্ণের উৎকর্ষ অবশ্যই স্বীকার্য্য। "রসো বৈ সঃ"—এই শ্রুতিবাক্যানুসারে পরব্রহ্ম যখন রসস্বরূপ, তখন তাঁহার যে স্বরূপে রসের চরমোৎকর্ষ, সেই স্বরূপই হইবেন পরব্রহ্ম। অন্যান্য স্বরূপ হইবেন তাঁহার অংশ-তুল্য, তাঁহা অপেক্ষা ন্যূন। শ্রীনারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে রসের উৎকর্ষ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ হইবেন অংশী এবং শ্রীনারায়ণ তাঁহার অংশতুল্য। লঘুভাগবতামৃতের "স্বরূপমন্যাকারং যত্তস্য ভাতি বিলাসতঃ। প্রায়েণাত্মসমং শক্ত্যা স বিলাসো নিগদ্যতে॥"—এই শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-রূপের লক্ষণ ব্যক্ত হইয়াছে। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন—রূপমাধুর্য্য, বেণুমাধুর্য্য, লীলা-মাধুর্য্য

এবং প্রেমমাধুর্য্য—এই চারিটী হইতেছে শ্রীগোবিন্দের অসাধারণ গুণ। এই সমস্ত গুণ-বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষা শ্রীনারায়ণ ন্যূন। বিলাসরূপের লক্ষণসূচক উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব লিখিয়াছেন—"আত্মসমং স্বমূলতুল্যম্। প্রায়েণেতি কৈশ্চিদ্গুণৈরূণমিত্যর্থঃ। তে চ 'লীলাপ্রেম্ণা প্রিয়াধিক্যং মাধুর্য্যে বেণুরূপয়োঃ। ইত্যসধারণং প্রোক্তং গোবিন্দস্য চতুষ্টয়ম্॥"—ইত্যুক্ত্যা যথা নারায়ণে ন্যূনাঃ।" এ-স্থলে শাস্ত্রসিদ্ধ গৌড়ীয়-সিদ্ধান্তকে স্বীকার করিয়াই শ্রীপাদ বলদেব শ্রীনারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের বিলাস-রূপ বলিয়াছেন, যদিও তত্ত্বের বিচারে তাঁহাদের মধ্যে স্বরূপগত পার্থক্য নাই; কেননা, পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার বিলাস-রূপে শ্রীনারায়ণরূপে বৈকুণ্ঠে লীলা করিয়া থাকেন। ("বিলাস" হইতেছে একটী পারিভাষিক শব্দ)। সিদ্ধান্তরত্নের ২।১৭-অনুচ্ছেদেও শ্রীপাদ বলদেব শ্রীনারায়ণকে শ্রীকৃষ্ণের আবির্ভাব বলিয়াছেন এবং শ্রীকৃষ্ণসেবা-প্রাপ্তির অভিপ্রায়ে নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবীর উৎকট তপস্যার উল্লেখ করিয়া নারায়ণ অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণে রসোৎকর্ষের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং মাধ্ব-সম্প্রদায় শ্রীনারায়ণকে পরব্রহ্ম বলিলেও এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায় শ্রীগোবিন্দকে পরব্রহ্ম বলিলেও তাঁহাদের মতের মধ্যে আত্যন্তিক বিরোধ কিছু নাই। আত্যন্তিক বিরোধের অভাব দেখাইয়া শ্রীপাদ বলদেব উভয়মতের সমন্বয় সাধনের প্রয়াস পাইয়াছেন বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপাদ বলদেবের সিদ্ধান্তে বা উক্তিতে সমন্বয়-সাধনের প্রয়াস আছে বলিয়া মনে করিলেও সেই প্রয়াসের পর্য্যাবসান যে মাধ্বমতের সংশোধনে, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। উল্লিখিত আলোচনা হইতেই তাহা পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়।

শ্রীপাদ বলদেবের গ্রন্থাদিতে মাধ্বমতের অনেক উক্তি উল্লিখিত হইয়াছে বলিয়া কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, তিনি অধিকাংশ-স্থলে মাধ্বমতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। পরব্রহ্মের স্বরূপ, পরব্রহ্মের ভেদত্রয়হীনতা, পরব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব প্রভৃতি প্রধান প্রধান বিষয়ে তিনি গৌড়ীয় মতেরই অনুসরণ করিয়াছেন। সাধ্য-সাধন-বিষয়েও গৌড়ীয়-মতের অনুসরণের প্রাধান্যই তাঁহার মধ্যে লক্ষিত হয়। গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-দর্শনে রসতত্ত্ব হইতেছে একটী অপূর্ব্ব বস্তু; মাধ্বমতে এই রসতত্ত্বের বিষয় বিশেষ কিছু পাওয়া যায় না। শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব গৌড়ীয় রসতত্ত্বসম্বন্ধে যাহা প্রকাশ করিয়াছেন তাহা অতি সুন্দর, গৌড়ীয় ভক্তমাত্রেরই পরম আস্বাদ্য।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে শ্রীলক্ষ্মীদেবীই হইতেছেন ভগবৎ-কান্তাকুল-শিরোমণি। তিনি কৃষ্ণকান্তা গোপীদিগের সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা ভক্তগণের হৃদয়-বিদারক। কিন্তু অথর্ব্বোপ-নিষদের পুরুষবোধিনী শ্রুতির উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ বলদেব বলিয়াছেন—গোপীকুলশিরোমণি শ্রীরাধাই হইতেছেন ভগবৎ-প্রেয়সীবৃন্দের মধ্যে মুখ্যতমা এবং বৈকুণ্ঠেশ্বরী লক্ষ্মী ও দুর্গাদি হইতেছেন—অংশিনী শ্রীরাধার অংশ; শ্রীরাধাই শ্রীকৃষ্ণের "আদ্যা প্রকৃতি।" "রাধিকা চেতি যস্যা অংশে লক্ষ্মীদুর্গাদিকা

শক্তিরিতি অগ্রে চ তস্যাদ্যা প্রকৃতীরাধিকা নিত্যনির্গুণ-সর্ব্বালঙ্কারশোভিতা প্রসন্নাশেষ-লাবণ্য-সুন্দরীত্যাদি ॥ ঋক্‌পরিশিষ্টে চ। রাধয়া মাধবো দেবো মাধবেনৈব রাধিকা বিভ্রাজন্তে জনেষ্বা ইতি ॥ সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥ ২।২২॥" শ্রীপাদ বলদেবের এই বাক্যও মাধ্বমত-বিরোধী, অথচ গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-মতের অনুগত।

এই সমস্ত কারণে মনে হয়,—গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসিদ্ধান্তের প্রভাবই শ্রীপাদ বলদেবের উপরে সর্ব্বাতিশায়ী।

তথাপি একথা বলাও বোধহয় সঙ্গত হইবে না যে, তিনি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের সমস্ত সিদ্ধান্তই গ্রহণ করিয়াছেন।

৬। শ্রীপাদ বলদেব ও অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ

শ্রীপাদ বলদেব ঔপচারিক এবং স্বাভাবিক ভেদাভেদবাদ খণ্ডন করিয়াছেন; কিন্তু শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদ সম্বন্ধে তিনি কোনওরূপ আলোচনা করেন নাই। কিন্তু তাহা বলিয়াই, তিনি যে শ্রীজীবপাদের এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করিয়াছেন, তাহাও মনে করা যায় না। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মের শক্তির, এমন কি যে কোনও প্রাকৃত বস্তুর সহিতও তাহার শক্তির, সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ। তদনুসারে জীব-জগৎ, অপ্রাকৃত ভগবদ্ধাম, ভগবদ্ধামস্থিত যাবতীয় বস্তু, ভগবৎ-পরিকরাদি—সমস্তের সহিতই ব্রহ্মের সম্বন্ধ হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ।

শ্রীপাদ বলদেব কেবল ব্রহ্মের সহিত ব্রহ্মের গুণ এবং শক্তির সম্বন্ধের কথা এবং ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধের কথারই উল্লেখ করিয়াছেন।

ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি সম্বন্ধে শ্রীপাদ বলদেব বলেন—ব্রহ্ম হইতে ব্রহ্মের গুণ ও শক্তি অভিন্ন; ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের গুণ ও শক্তির মধ্যে কোনও ভেদ নাই। তবে যে ভেদ আছে বলিয়া প্রতীতি জন্মে, তাহা ভেদ নহে; তাহা হইতেছে "বিশেষ।" তাঁহার মতে "বিশেষ"ই ভেদের প্রতীতি জন্মায়। এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের শক্তি ও গুণের মধ্যে তিনি বাস্তব ভেদই স্বীকার করেন না, তাঁহার মতে ব্রহ্ম এবং ব্রহ্মের গুণ ও শক্তির মধ্যে একমাত্র অভেদই বর্ত্তমান। সুতরাং এই বিষয়ে ভেদাভেদের প্রশ্নই তাঁহার নিকট উঠিতে পারে না। ভেদাভেদের প্রশ্ন উঠিলেই তো সমাধানের জন্য অচিন্ত্যত্বের শরণ গ্রহণের প্রয়োজন হইতে পারে। ভেদাভেদ যখন তিনি স্বীকারই করেন না (ন চৈবং ভেদাভেদৌ স্যাতাং নিষেধবাক্যব্যাকোপাৎ ॥ সিদ্ধান্তরত্নম্ ॥ ১।১৮), তখন অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ-স্বীকৃতির প্রশ্নও তাঁহার সম্বন্ধে উঠিতে পারে না।

ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের সম্বন্ধ-বিষয়েও তিনি বলেন—জীব, প্রকৃতি (জগৎ), কর্ম্ম ও কাল হইতেছে ব্রহ্মের শক্তি। ব্রহ্ম হইতেছেন শক্তিমৎ এক বস্তু। সুতরাং জীব-জগদাদির অস্তিত্ব সত্ত্বেও

ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব সিদ্ধ হয়। "চতুর্ণামেষাং ব্রহ্মশক্তিত্বাৎ একং শক্তিমদ্‌ব্রহ্ম ইতি অদ্বৈতবাক্যেঽপি সঙ্গতিরিতি।—গোবিন্দভাষ্যের উপক্রম।" এ-স্থলেও তিনি শক্তিমান্ ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদ্রূপ-ব্রহ্মশক্তির অভেদই স্বীকার করিলেন।

তিনি অবশ্য অন্যত্র যে জীব-জগৎকে ব্রহ্মের "পারমার্থিক এবং সনাতনভেদ"ও বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কিন্তু তিনি যখন অভেদের উপরেই ব্রহ্মের অদ্বয়ত্ব প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তখন স্পষ্টতঃই বুঝা যায় জীব-জগতের "পারমার্থিক এবং সনাতন" ভেদের উপর তিনি মুখ্যত্ব আরোপ করেন নাই। জীব-জগৎ সত্য এবং ব্রহ্ম হইতে জীব-জগতের সর্ব্বাবস্থায় পৃথক্ অস্তিত্বও সত্য এবং নিত্য—ইহাই হইতেছে তাঁহার "পারমার্থিক এবং সনাতন" ভেদের তাৎপর্য্য। ব্রহ্ম-শক্তিরূপ জীব-জগৎ স্বরূপতঃ ব্রহ্ম হইতে অভিন্ন হইলেও তাহাদের পৃথক্ অস্তিত্ব অসম্ভব নয় এবং অসঙ্গতও নয়। ঘটাদি মৃণ্ময় দ্রব্যও মৃত্তিকা হইতে পৃথক্ ভাবে অবস্থান করে; কস্তুরীর গন্ধকে বা অগ্নির উত্তাপকেও কস্তুরী বা অগ্নি হইতে পৃথক্ অস্তিত্ব ধারণ করিতে দেখা যায়। এইরূপে দেখা যায়, শ্রীপাদ বলদেবের নিকটে ব্রহ্ম ও জীব-জগতের অভেদই মুখ্য, ভেদ গৌণ এবং অভেদের অবিরোধী। এই ভেদও কেবল অবস্থানগত ভেদ; সুতরাং ইহার মুখ্যত্ব নাই। এই ভেদ অভেদের অবিরোধী বলিয়া ভেদ-স্বীকারেও অভেদ অনুপপন্ন হয় না। বস্তুদ্বয়ের মধ্যে এক বিষয়ে ভেদ, আর এক বিষয়ে অভেদ যে অসম্ভব বা অসঙ্গত নয়, তাহা শ্রীপাদ বলদেবও বলিয়া গিয়াছেন। "ভেদাভেদশ্রুত্যোর্বিষয়-ভেদপ্রদর্শনাৎ মিথো বিরুদ্ধার্থপ্রতীতির্নিবর্ত্তিতা॥ সিদ্ধান্তরত্নম্।৮।২৬॥"

এই আলোচনা হইতে দেখা গেল—ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে অভেদ-সম্বন্ধই শ্রীপাদ বলদেবের অভিপ্রেত; ভেদাভেদ-সম্বন্ধ তাঁহার অভিপ্রেত নহে। তিনি জগতের "পারমার্থিক এবং সনাতন" ভেদের কথা বলিয়াছেন বলিয়া যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে ভেদাভেদ-সম্বন্ধ তাঁহার অনভিপ্রেদ নহে, তাহা হইলেও ইহাকে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ বলা যায় না। কেননা, তাঁহার কথিত অভেদ ও ভেদ পরস্পর-বিরোধী নহে বলিয়া তাহাদের যুগপৎ অবস্থিতির সমাধানের জন্য "অচিন্ত্যত্বের বা অর্থাপত্তি-ন্যায়ের" আশ্রয় গ্রহণের প্রয়োজন হয় না।

এই গেল ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে সম্বন্ধের কথা। আর, ব্রহ্ম এবং তাঁহার গুণ সম্বন্ধে যে শ্রীপাদ বলদেব ভেদই স্বীকার করেন না, কেবল অভেদই স্বীকার করেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রহ্ম ও জীব-জগদাদির সম্বন্ধ-বিষয়ে শ্রীপাদ বলদেব হইতেছেন অভেদবাদী, তিনি অচিন্ত্যভেদাভেদ-বাদী নহেন।

বস্তুতঃ ব্রহ্ম ও জীব-জগতের মধ্যে যে অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-সম্বন্ধ বিদ্যমান, শ্রীপাদ বলদেব কোনও স্থলে তাহা বলেনও নাই এবং শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ন্যায় সাধারণভাবে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধ-বিষয়ে তিনি কোনও আলোচনাও করেন নাই।

৩১। অচিন্ত্য ভেদাভেদবাদ ও মাধ্বমত

কেহ কেহ মনে করেন—অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ হইতেছে শ্রীমধ্বমতের অন্তর্গত। এই উক্তির সমর্থনে তাঁহারা যে যুক্তির অবতারণা করেন, তাহা হইতেছে এই ঃ—

"ভেদ বা অভেদ সাধন করিতে হইলে প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ প্রমাণই অবলম্বন করিতে হয়। (ক) প্রত্যক্ষ-প্রমাণে প্রতিযোগী ও অনুযোগীর প্রত্যক্ষত্ব প্রয়োজন; (ভেদের অবধিকে প্রতিযোগী এবং ভেদের আশ্রয়কে অনুযোগী বলে)। 'ঘট পট হইতে ভিন্ন' এই বাক্যে পট প্রতিযোগী এবং ঘট অনুযোগী। ঘটপটের পরস্পর ভেদকে প্রত্যক্ষ করিতে হইলে, ঘট পট যে কি বস্তু, তাহারও প্রত্যক্ষ হওয়া চাই। দৃশ্য বস্তুতেই প্রত্যক্ষ প্রমাণ চলে, কিন্তু পরমাণু প্রভৃতি অচাক্ষুষ বস্তুতে প্রত্যক্ষের যোগ্যতা নাই; অতএব ঐ স্থলে ভেদজ্ঞানও পরাহত। (খ) ভেদ-জ্ঞানবিষয়ে অনুমানও সম্ভবপর নহে; যেহেতু অনুমান প্রত্যক্ষমূলক; প্রত্যক্ষেরই যখন ব্যভিচারিতা দৃষ্ট হইল, তখন অনুমানও যে ঐ বিষয়ে অযোগ্য, তাহা বলাই বাহুল্য। (গ) শব্দপ্রমাণেও ভেদজ্ঞান জন্মাইতে পারে না, যেহেতু শব্দ সামান্যাকারে সঙ্কেত-বিশিষ্ট হইয়া সামান্যাকারেই অর্থেরও দ্যোতক হয়। 'মধুর'-শব্দের উচ্চারণে দুগ্ধ, সন্দেশাদি যাবতীয় মধুরগুণযুক্ত বস্তুর স্মরণ হইলেও মাধুর্য্যগুণব্যাপ্য বিশেষধর্ম্মযুক্ত গাঢ় মধুর, পাতলা মধুর ইত্যাদি এক একটী বস্তু উপস্থিত হয় না। পদার্থ বহু বলিয়া যেমন কোনও বিশেষ পদার্থে শব্দের সঙ্কেতও নাই, তদ্রূপ জীবও বহু বলিয়া কোনও বিশেষ জীবে শাব্দ সঙ্কেত হয় না। জাতি, গুণ, দ্রব্য ও ক্রিয়াতেই শব্দের সঙ্কেত বলিয়া বিশেষজ্ঞগণের মত। পক্ষান্তরে ঘট না থাকিলে যেমন ঘটাভাব হয় না, 'আছে জ্ঞান' না হইলে যেমন 'নাই জ্ঞান' হয় না, তদ্রূপ ভেদ-জ্ঞান না হইলেও অভেদ জ্ঞান হয় না। কাজেই প্রমাণিত হইল যে অভেদ-জ্ঞান সর্ব্বতোভাবে ভেদজ্ঞানেরই অপেক্ষিত। অভেদের উপজীব্য ভেদজ্ঞানে যখন প্রমাণত্রয় নিরস্ত হইল, তখন অভেদসম্বন্ধেও সেই কথা। এইরূপে সমস্ত পদার্থগত গভীরতম তত্ত্বের প্রকৃত বিচার করিয়া দেখা যায় যে, শুধু ভিন্নত্ব বা অভিন্নত্ব পুরস্কারে বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় করা দুঃসাধ্য; বস্তুর একটী শক্তিবিশেষও অনিবার্য্য কারণে স্বীকার করিতে হয়, তখন ঐ শক্তিকে স্বরূপ হইতে অভিন্ন বলিয়া চিন্তা করিতে না পারিয়া ভেদ এবং ভিন্ন বলিয়া চিন্তনীয় নয় বলিয়া অভেদও প্রতীতির বিষয়ীভূত হইতেছে। অতএব ঐ শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য এবং তাহা অচিন্ত্য, সুতরাং শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভেদবাদের অনুসরণে শ্রীমহাপ্রভুর ভেদাভেদ আসিল। মরণ যেমন জন্মাপেক্ষী, তেমনি অভেদও ভেদাপেক্ষী, অতএব শ্রীমধ্বমতের ভেদকে অপেক্ষা করিয়াই অভেদবাদও আসিয়াছে।"—শ্রীহরিদাস দাস মহাশয়ের "শ্রীশ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণবসাহিত্য", প্রথম খণ্ড, ১১২ পৃষ্ঠা, ৪৬২ শ্রীচৈতন্যাব্দ সংস্করণ।

উল্লিখিত যুক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ—

প্রথমতঃ, ভেদ-জ্ঞান না হইলে অভেদ-জ্ঞান হয় না। অভেদ-জ্ঞান ভেদ-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে।

দ্বিতীয়তঃ, ভেদ-জ্ঞান এবং অভেদ-জ্ঞান ইহাদের কোনওটীই প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ এই প্রমাণত্রয়ের বিষয়ীভূত নহে।

তৃতীয়তঃ, শুধু ভিন্নত্ব বা অভিন্নত্ব পুরস্কারে বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় করা দুঃসাধ্য।

চতুর্থতঃ, অনিবার্য্যকারণে বস্তুর একটী শক্তিবিশেষও স্বীকার করিতে হয়।

পঞ্চমতঃ, বস্তু ও বস্তুর শক্তি এই দু'য়ের মধ্যে ভেদ এবং অভেদ উভয়ই প্রতীতির বিষয়ীভূত হয়; সুতরাং শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য এবং তাহা অচিন্ত্য।

সুতরাং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের ভেদবাদের অনুসরণে শ্রীমন্মহাপ্রভুর ভেদাভেদবাদ আসিল।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। অভেদ-জ্ঞান ভেদ-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে—এই বাক্যের তাৎপর্য্য কি এবং সেই তাৎপর্য্যের ব্যাপ্তি কতদূর পর্য্যন্ত, তাহা বিবেচনা করা আবশ্যক। স্বর্ণ ও লৌহ—এই দুইটী বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ ও তটস্থ-লক্ষণের ভেদ জানা থাকিলেই বুঝা যায়—তাহারা অভিন্ন নহে, তাহাদের মধ্যে অভেদ নাই। এই দুইটী বস্তুর মধ্যে অভেদের অনস্তিত্বের জ্ঞান, তাহাদের মধ্যে ভেদের অস্তিত্বজ্ঞানের অপেক্ষা রাখে; এ পর্য্যন্তই অপেক্ষার ব্যাপকত্ব। কিন্তু তাহাদের মধ্যে ভেদ আছে জানিলেই তাহাদের মধ্যে অভেদের জ্ঞান জন্মে না। আলোক এবং অন্ধকারের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়াই কেহ তাহাদিগকে অভিন্ন মনে করে না।

আবার, অভেদ-জ্ঞান ভেদ-জ্ঞানের অপেক্ষা রাখে না। অভেদ যদি ভেদের অপেক্ষা রাখিত, তাহা হইলে কোনও একটী বিষয়ে দুইটী বস্তুর মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেই সেই বিষয়ে দুইটী বস্তুর মধ্যে অভেদ প্রতিপন্ন হইত। কিন্তু তাহা কখনও সম্ভবপর নয়। একই বিষয়ে দুইটী বস্তুর মধ্যে যুগপৎ আত্যন্তিক ভেদ ও অভেদ থাকিতে পারে না।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য ব্রহ্মের সহিত জীবের অভেদের কথা বলিয়াছেন; কিন্তু ব্রহ্মের সহিত জীবের আত্যন্তিক ভেদ হইতেই যে এই অভেদের উদ্ভব, তাহা তিনি বলেন নাই। তিনি জীব-ব্রহ্মের ভেদই স্বীকার করেন না। অভেদ যদি ভেদের অপেক্ষা রাখিত, তাহা হইলে তিনি যে জীব-ব্রহ্মের ভেদ স্বীকার করেন, তাহাই অনুমিত হইতে পারিত। কিন্তু এইরূপ অনুমান সঙ্গত হইতে পারে না।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য ব্রহ্মের সহিত জীব-জগতের আত্যন্তিক ভেদের কথাই বলিয়া গিয়াছেন, অভেদের কথা তিনি বলেন নাই। তাঁহার ভেদোক্তি অভেদোক্তিতে বা ভেদাভেদোক্তিতেই পর্য্যবসিত হয়—এইরূপ অনুমানও নিতান্ত অসঙ্গত। যে-স্থলে আত্যন্তিক ভেদ, সে-স্থলে অভেদের বা ভেদাভেদের অবকাশ থাকিতে পারে না। জন্ম-মরণের দৃষ্টান্ত এ-স্থলে সঙ্গতিহীন। মরণ হইতেছে জন্মের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম। "জাতস্য হি ধ্রুবো মৃত্যুঃ।" কিন্তু অভেদ কখনও ভেদের অবশ্যম্ভাবী পরিণাম নহে; তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে আলোক এবং অন্ধকারের ভেদও পরিণামে লোপ পাইত। আবার, মরণ জন্মের অপেক্ষা রাখে সত্য; কেননা, জন্ম না হইলে কাহারও মৃত্যু হইতে

হইতে পারে না। সেই ভাবে, অভেদকে ভেদাপেক্ষী বলা বলা যায় না ; কেননা, তুইটী বস্তুর মধ্যে আত্যন্তিক ভেদ না থাকিলে যে তাহাদের মধ্যে অভেদ হইতে পারে না, তাহা নহে। বরং আত্যন্তিক ভেদ থাকিলেই অভেদ অসম্ভব হয়।

এইরূপে দেখা গেল—"মরণ যেমন জন্মাপেক্ষী, তেমনি অভেদও ভেদাপেক্ষী ; অতএব মধ্বমতের ভেদকে অপেক্ষা করিয়াই অভেদবাদও আসিয়াছে"– এই উক্তির সারবত্তা কিছু দৃষ্ট হয় না। ভেদবাদকে অপেক্ষা করিয়া অভেদবাদ আসে না ; ভেদবাদের প্রতিবাদেই অভেদবাদ আসে। "ভেদ-বাদকে অপেক্ষা করিয়া অভেদবাদ আসিয়াছে"—ইহা মনে করিলে বুঝা যায়—ভেদবাদেরই পরিণাম হইতেছে অভেদবাদ ; যেমন, স্বর্ণনির্ম্মিত বলয়-কঙ্কণাদি স্বর্ণাপেক্ষী, স্বর্ণের পরিণাম, তদ্রূপ। কিন্তু অভেদ কখনও ভেদের পরিণাম –ভেদাপেক্ষী—হইতে পারে না।

তারপর অন্য কথা। "শুধু ভিন্নত্ব বা অভিন্নত্ব পুরস্কারে বস্তুতত্ত্ব নির্ণয় করা তুঃসাধ্য"—একথা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য বলেন নাই। ভিন্নত্ব-পুরস্কারেই তিনি বস্তুতত্ত্ব-নির্ণয়ের চেষ্টা করিয়াছেন।

"বস্তুর একটী শক্তিবিশেষও অনিবার্য্য কারণে স্বীকার করিতে হয়"—একথা বলারও সার্থকতা কিছু নাই। কেননা, ব্রহ্মবস্তুর শক্তির কথা শ্রুতিই বলিয়া গিয়াছেন এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যও তাহা স্বীকার করিয়া গিয়াছেন।

"শক্তি ও শক্তিমানের ভেদাভেদ অবশ্যই স্বীকার্য্য এবং তাহা অচিন্ত্য"—এইরূপ কথা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য কোনওস্থলে বলেন নাই। এজন্য—"সুতরাং শ্রীমধ্বাচার্য্যের ভেদবাদের অনুসরণে শ্রীমহাপ্রভুর ভেদাভেদ আসিল"—একথারও যুক্তিযুক্ততা কিছু দৃষ্ট হয় না।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল–যাঁহারা বলেন, শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের "কেবল-ভেদ-বাদের" উপরেই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ" প্রতিষ্ঠিত, তাঁহাদের উক্তির সার-বত্তা কিছুই নাই।

আবার কেহ কেহ বলেন—"শ্রীমাধ্বমতের প্রধান সিদ্ধান্ত শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্বের স্বীকৃতিই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের মূল।" *

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। কেবল শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যই যে শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন, তাহা নহে। শ্রীপাদ রামানুজ, শ্রীপাদ নিম্বার্কাদিও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। বিশেষতঃ, পরব্রহ্মের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্ব ও নিত্যত্ব শ্রুতিস্মৃতি-সম্মত। শ্রুতি-স্মৃতি যদি বিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্বের কথা না বলিতেন এবং শ্রীপাদ রামানুজাদিও যদি তাহা না বলিতেন এবং কেবলমাত্র শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যই যদি তাহা বলিতেন, তাহা হইলেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পক্ষে সচ্চিদানন্দত্বের ও নিত্যত্বের স্বীকৃতি মাধ্ব-সম্প্রদায়ানুগত্যের পরিচায়ক বলিয়া মনে করা

---

* শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিদ্যাবিনোদ বিরচিত "অচিন্ত্যভেদাভেদবাদ," ১৯৯১ খৃষ্টাব্দ-সংস্করণ, ২৫০ পৃষ্ঠায় উদ্ধৃত।

যাইতে পারিত। শ্রুতি-স্মৃতির আনুগত্যেই শ্রীমন্মহাপ্রভু এবং তাঁহার চরণানুগত বৈষ্ণবাচার্য্যগণ শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন। এই বিষয়ে মাধ্বমতের নিকটে তাঁহাদের ঋণিত্ব কিছু নাই, মাধ্বমতের সঙ্গে সাম্যমাত্র আছে—যেমন রামানুজ-নিম্বার্কাদি-মতের সঙ্গেও এই বিষয়ে সাম্য আছে, তদ্রূপ।

আবার, শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্বের স্বীকৃতিই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের মূল হইতে পারে না। শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াও শ্রীপাদ রামানুজাদি অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী নহেন। অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদের মূল হইতেছে—শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধের স্বরূপ, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব এবং নিত্যত্ব হইতে শক্তি ও শক্তিমানের মধ্যে সম্বন্ধের স্বরূপ জানা যায় না, তাহা কেবল শ্রীবিগ্রহের স্বরূপেরই পরিচায়ক।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীবিগ্রহের সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্বের স্বীকৃতিই অচিন্ত্য-ভেদাভেদ-বাদের মূল এবং শ্রীমন্মধ্বাচার্য্য সচ্চিদানন্দত্ব ও নিত্যত্ব স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ও তাহা স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ও মাধ্বমতানুগত—এইরূপ যাঁহারা বলেন, তাঁহাদের উক্তিরও সারবত্তা কিছু নাই।

বস্তুতঃ গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদের "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ" কোনও পূর্ব্বাচার্য্যের আনুগত্যে প্রতিষ্ঠিত হয় নাই। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ব্রহ্মের সঙ্গে জীব-জগদাদির সম্বন্ধ-বিষয়ে পূর্ব্বাচার্য্যদের সকলের মতই খণ্ডন করিয়াছেন। কেবলমাত্র শ্রুতি-স্মৃতি এবং ব্রহ্মসূত্রকার ব্যাসদেবের আনুগত্যেই অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

৩২। মাধ্বসম্প্রদায় ও গৌড়ীয় সম্প্রদায়

উল্লিখিত যুক্তি সমূহের অবতারণা করিয়া মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য যাঁহারা প্রয়াস পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের ধারণা এই যে—গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে মাধ্বসম্প্রদায়েরই একটী শাখা, মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

কিন্তু এইরূপ ধারণা বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না; কেননা, সাধ্য-সাধনাদি-বিষয়ে মাধ্বসম্প্রদায়ের সহিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোনওরূপ মিল দেখা যায় না। মাধ্বসম্প্রদায়ের উপাস্য হইতেছেন বৈকুণ্ঠের লক্ষ্মী-নারায়ণ; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপাস্য হইতেছেন ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণ। মাধ্বসম্প্রদায় বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণকেই পরব্রহ্ম মনে করেন; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের মতে ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণই পরব্রহ্ম। মাধ্বসম্প্রদায়ের উপাসনা হইতেছে—"বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কৃষ্ণে সমর্পণ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।৯।২৬৮॥"; গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের উপাসনা হইতেছে—বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মের পরিত্যাগপূর্ব্বক

কৃষ্ণপ্রীত্যর্থে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি উত্তমা সাধনভক্তির অনুষ্ঠান। মাধ্বসম্প্রদায়ের কাম্য হইতেছে—পঞ্চবিধা মুক্তি—"পঞ্চবিধ মুক্তি পাঞা বৈকুণ্ঠে গমন। সাধ্যশ্রেষ্ঠ হয় এই শাস্ত্রনিরূপণ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।৯।২৬৯॥"; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাম্য হইতেছে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা ; পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও মুক্তিই গৌড়ীয় সম্প্রদায়েয় কাম্য নহে। দার্শনিক মতবাদের দিক্ দিয়াও মাধ্বসম্প্রদায় হইতেছে ভেদবাদী, দ্বৈতবাদী ; কিন্তু গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদী, অদ্বয়বাদী। এইরূপে দেখা গেল—কোনও বিষয়েই এই দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে মিল নাই।

যদি বলা যায়—উভয় সম্প্রদায়ই তো জীব-ব্রহ্মের মধ্যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ স্বীকার করেন। উত্তরে বক্তব্য এই যে—সেব্য-সেবক-ভাবের স্বীকৃতিতেই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না ; কেননা, তাহা হইলে গৌড়ীয়-সম্প্রদায়কে শ্রীসম্প্রদায় বা নিম্বার্ক সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্তও বলা চলে ; যেহেতু, এই দুই সম্প্রদায়ও সেব্য-সেবক ভাব স্বীকার করেন। বস্তুতঃ, জীব-জগদাদির সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধ-বিষয়ে মতবিভেদই হইতেছে সম্প্রদায়-বিভেদের হেতু। মাধ্বসম্প্রদায়ের ন্যায় শ্রীসম্প্রদায়ও লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক, তাঁহাদের কাম্যও একই—মুক্তি ; তথাপি তাঁহারা দুইটী ভিন্ন সম্প্রদায় ; যেহেতু, জাব-জগদাদির সহিত ব্রহ্মের সম্বন্ধবিষয়ে তাঁহাদের মতভেদ আছে।

তথাপি গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে যে কেহ কেহ মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন, অধুনাপ্রাপ্ত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা-নামক গ্রন্থের কয়েকটী শ্লোক দেখিলে তাহার কারণ অনুমিত হইতে পারে। সেই শ্লোক কয়টী সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে। ১৩২০ বঙ্গাব্দে বহরমপুর হইতে প্রকাশিত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার চতুর্থ সংস্করণ অবলম্বনেই আলোচনা করা হইতেছে।

গৌরগণোদ্দেশদীপিকা হইতেছে সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীমন্মহাপ্রভুর বিশেষ কৃপাপাত্র শ্রীল কবি-কর্ণপূরের রচিত। এই গ্রন্থের ২০শ শ্লোকে কর্ণপুর লিখিয়াছেন—"যঃ শ্যামো দধদাস বর্ণকমমুং শ্যামং যুগে দ্বাপরে। সোঽয়ং গৌরবিধুর্বিভাতি কলয়ন্নামাবতারং কলৌ ॥২০॥—যিনি দ্বাপর যুগে শ্যামবর্ণ ধারণ করিয়া শ্যাম-নামে অভিহিত হইয়াছিলেন, তিনিই কলিযুগে গৌরবিধু-নামে অবতীর্ণ হইয়া বিরাজ করিতেছেন।" এই শ্লোকে বলা হইল—দ্বাপর-লীলার শ্রীকৃষ্ণই হইতেছেন বর্ত্তমান কলির শ্রীগৌরাঙ্গসুন্দর। কয়েক শ্লোকের পরে ২৬শ শ্লোকে কর্ণপূর বলিয়াছেন—"স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্ব্বসুদুষ্করে। অন্তর্বহীরসাম্বোধিঃ শ্রীনন্দনন্দনোঽপি সন্ ॥২৬॥—রসাম্ভোধি শ্রীনন্দনন্দন হইয়াও শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া—যে ভাবকান্তির অঙ্গীকার পূর্ব্বে (ব্রজলীলায়) সুদুষ্কর ছিল।" এই শ্লোকে বলা হইল—(পূর্ব্বোল্লিখিত ২০শ শ্লোকে বলা হইয়াছে—দ্বাপরে অবতীর্ণ শ্যামবর্ণ শ্রীকৃষ্ণই এই কলিতে শ্রীগৌরাঙ্গরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; কিন্তু শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ কিরূপে গৌরবর্ণ হইলেন ? এই প্রশ্নের সমাধানরূপেই পরবর্ত্তী ২৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে) গৌরাঙ্গী শ্রীরাধার ভাব ও কান্তি অঙ্গীকার করিয়াছেন বলিয়াই শ্রীরাধার গৌরকান্তিতে শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়াছেন। এই দুইটী

শ্লোকের বক্তব্য বিষয় সম্বন্ধে একটা ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ বিদ্যমান ; পূর্ব্বশ্লোক-কথিত শ্যামের গৌরত্ব-প্রাপ্তির হেতুই পরবর্ত্তী শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে,। সুতরাং পূর্ব্বকথিত শ্লোকের অব্যবহিত পরেই পরবর্ত্তী শ্লোকের স্বাভাবিক স্থান হওয়া সঙ্গত।

কিন্তু অধুনাপ্রাপ্ত গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের মধ্যে আরও অনেকগুলি শ্লোক দৃষ্ট হয়। উল্লিখিত ২০শ শ্লোকের পরেই আছে--

"প্রাদুর্ভূতাঃ কলিযুগে চত্বারঃ সাম্প্রদায়িকাঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাহ্বয়াঃ পাদ্মে যথা স্মৃতাঃ।
অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ।
শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ ॥২১॥

—কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী সম্প্রদায় প্রাদুর্ভূত হয়। পদ্মপুরাণে লিখিত আছে যে, কলিযুগে শ্রী, ব্রহ্ম, রুদ্র ও সনক—এই চারিটী ক্ষিতিপাবন বৈষ্ণবসম্প্রদায় হইবেন।"

ইহার পরেই লিখিত হইয়াছে—"তত্র মাধ্বীসম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে।—প্রস্তাবক্রমে এ-স্থলে উল্লিখিত চারিটী সম্প্রদায়ের মধ্যে মাধ্বীসম্প্রদায় (ব্রহ্মসম্প্রদায়) লিখিত হইতেছে।"

ইহার পরে মাধ্বীসম্প্রদায়ের বিবরণ-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে—পরব্যোমেশ্বর নারায়ণের শিষ্য ব্রহ্মা, ব্রহ্মার শিষ্য নারদ, নারদের শিষ্য ব্যাস, ব্যাসের শিষ্য শুকদেব, শুকদেবের বহু শিষ্য ও প্রশিষ্য জগতে বর্ত্তমান। মহাযশা মধ্বাচার্য্য ব্যাসদেবের নিকটে কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা লাভ করেন। মধ্বাচার্য্য বেদসমূহের বিভাগ করিয়া শতদূষণী নাম্নী সংহিতা প্রণয়ন করেন, এই শতদূষণীতে নির্গুণ-ব্রহ্মের খণ্ডন করিয়া সগুণ ব্রহ্ম পরিষ্কারভাবে নির্ণীত হইয়াছে। মধ্বাচার্য্যের শিষ্য হইতেছেন পদ্মনাভাচার্য্য, পদ্মনাভের শিষ্য নরহরি, নরহরির শিষ্য দ্বিজোত্তম মাধব, মাধবের শিষ্য অক্ষোভ, অক্ষোভের শিষ্য জয়তীর্থ, জয়তীর্থের শিষ্য জ্ঞানসিন্ধু, জ্ঞানসিন্ধুর শিষ্য মহানিধি, মহানিধির শিষ্য বিদ্যানিধি, বিদ্যানিধির শিষ্য রাজেন্দ্র, রাজেন্দ্রের শিষ্য জয়ধর্ম্মমুনি, তাঁহার শিষ্য ভক্তিরত্নাবলীগ্রন্থ-প্রণেতা শ্রীমদ্‌বিষ্ণুপুরী, জয়ধর্ম্মের শিষ্য পুরুষোত্তম, পুরুষোত্তমের শিষ্য হইতেছেন বিষ্ণুসংহিতা-প্রণেতা ব্যাসতীর্থ, ব্যাসতীর্থের শিষ্য ভক্তিরসাশ্রয় লক্ষ্মীপতি, লক্ষ্মীপতির শিষ্য মাধবেন্দ্র—তিনি বৃন্দাবনস্থ কল্পতরুর অবতার এবং এই ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। মাধবেন্দ্রের শিষ্য ঈশ্বরপুরী, অদ্বৈত ও রঙ্গপুরী। শ্রীগৌরচন্দ্র ঈশ্বরপুরীকে গুরুত্বে বরণ করিয়া প্রাকৃতাপ্রাকৃতাত্মক জগৎকে প্লাবিত করিয়াছিলেন (গৌরগণোদ্দেশদীপিকা ॥২২-২৫ শ্লোক)।

ইহার পরেই আছে—"স্বীকৃত্য রাধিকাভাবকান্তী পূর্ব্বস্মৃতুষ্করে"-ইত্যাদি—পূর্ব্বোদ্ধৃত ২৬শ শ্লোক।

এক্ষণে **বিবেচ্য** হইতেছে এই। পূর্ব্বোদ্ধৃত ২০শ এবং ২৬শ শ্লোকের মধ্যবর্ত্তী ২১—২৫ শ্লোকসমূহের সহিত ২০শ এবং ২৬শ শ্লোকের কোনও সঙ্গতি দৃষ্ট হয় না। মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি

একেবারেই "খাপছাড়া।" ২০শ শ্লোকে বলা হইয়াছে, শ্যামবর্ণ কৃষ্ণই গৌরবর্ণে কলিতে অবতীর্ণ হইয়াছেন ; আর, ২৬শ শ্লোকে বলা হইয়াছে শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ গৌরবর্ণ হইয়াছেন। মাধ্বীসম্প্রদায়ের শিষ্য শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর শিষ্যত্ব অঙ্গীকার না করিলে যদি শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের পক্ষে শ্রীরাধার ভাবকান্তি স্বীকার করা—সুতরাং গৌরবর্ণ স্বীকার—অসম্ভব হইত, তাহা হইলেও বরং কোনও রকমে মনে করা যাইতে পারিত যে, এই মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলির সঙ্গে ২০শ ও ২৬শ শ্লোকের কিছু সঙ্গতি আছে। কিন্তু এইভাবে সঙ্গতি-স্বীকারও বিচারসহ নহে। কেননা,

প্রথমতঃ, শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন নাই, দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন গৌরবর্ণ কৃষ্ণ, দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্ব হইতেই তিনি গৌরবর্ণ, অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণের পূর্ব্বেই শ্যামবর্ণ কৃষ্ণ শ্রীরাধার ভাবকান্তি অঙ্গীকার করিয়া গৌরবর্ণ হইয়াছেন।

দ্বিতীয়তঃ, গৌরবর্ণ হওয়ার জন্য যদি শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের পক্ষে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে দীক্ষা গ্রহণের অপেক্ষা রাখিতে হয়, তাহা হইলে গৌরবর্ণ স্বরূপকে অনিত্য, অর্থাৎ অনাদিসিদ্ধ নয়, বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। তাহা হইলে মুণ্ডকশ্রুতিপ্রোক্ত "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং" ইত্যাদি, মহাভারতের "সুবর্ণবর্ণো হেমাঙ্গঃ"-ইত্যাদি, শ্রীমদ্‌ভাগবতের "শুক্লো রক্তস্তথা পীতঃ"-ইত্যাদি এবং "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ইত্যাদি বাক্যে পীতবর্ণ-স্বরূপকে যে অনাদিসিদ্ধ—নিত্য-বলা হইয়াছে, তাহাই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকে গৌরসুন্দরকে বর্ত্তমান কলির উপাস্য বলা হইয়াছে ; যিনি অনিত্য, তাঁহার উপাসনার বিধি শাস্ত্রে থাকিতে পারে না, তাঁহার উপাসনায় কোনও স্থায়ী ফলও পাওয়া যায় না। "ন হ্যধ্রুবৈঃ প্রাপ্যতে হি ধ্রুবন্তৎ"-শ্রুতিবাক্যই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

এইরূপে দেখা গেল—মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলির সহিত ২০শ ও ২৬শ শ্লোকের কোনওরূপ সঙ্গতিই নাই ; মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি একেবারেই "খাপছাড়া।"

আরও বক্তব্য আছে। ক্রমশঃ বলা হইতেছে ঃ—

প্রথমতঃ, মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলির প্রথমেই বলা হইয়াছে—পদ্মপুরাণমতে কলিতে কেবলমাত্র চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায় থাকিবে। "অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি চত্বারঃ সম্প্রদায়িনঃ। শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকা বৈষ্ণবাঃ ক্ষিতিপাবনাঃ॥" কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত পদ্মপুরাণে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না।

যদি বলা যায়—বর্ত্তমানে প্রচলিত পদ্মপুরাণে উক্ত শ্লোকটী না থাকিলেও কবিকর্ণপূর যখন গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকা লিখিয়াছিলেন, তখন তিনি পদ্মপুরাণে ইহা দেখিয়াছেন। নচেৎ, তিনি ইহা লিখিতেন না। অন্যত্রও এইরূপ দৃষ্ট হয়। যথা, "আত্মনি চৈবং বিচিত্রাশ্চ হি"—ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্রের ভাষ্যে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য একটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন এই যে—"বিচিত্রশক্তিঃ পুরুষঃ পুরাণো ন চান্যেষাং শক্তয়স্তাদৃশাঃ স্যুঃ।" এবং তিনি বলিয়াছেন, ইহা শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির বাক্য ;

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার সর্ব্বসম্বাদিনীতে তাহা উদ্ধৃত করিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতিতে এই বাক্যটী নাই। গোপালপূর্ব্বতাপনী শ্রুতির প্রথমেই আছে—"কৃষির্ভূ বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃতিবাচকঃ। তয়োরৈক্যং পরংব্রহ্ম কৃষ্ণ ইত্যভিধীয়তে॥" শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে উক্ত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন (শ্রীচৈ,চ, ২।৯।৪ শ্লোক) এবং উহা মহাভারতের উদ্যোগপর্ব্বের শ্লোক বলিয়া কথিত হইয়াছে। কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত মহাভারতে শ্লোকটীর রূপ অন্যপ্রকার—'কৃষির্ভূ বাচকঃ শব্দো ণশ্চ নির্বৃত্তিবাচকঃ। কৃষ্ণস্তভাবযোগাচ্চ কৃষ্ণো ভবতি সাত্বতঃ॥ উদ্যোগপর্ব্ব॥ ৭০।৫॥" আবার, শ্রীমদ্ভাগবতের টীকায় শ্রীকৃষ্ণের জন্মলীলা-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও শ্রীহরিবংশ হইতে একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন—"গর্ভকালে ত্বসম্পূর্ণে অষ্টমে মাসি তে স্ত্রিয়ৌ। দেবকী চ যশোদা চ সুষুবাতে সমং তদা॥" কিন্তু বর্ত্তমানে প্রচলিত মুদ্রিত হরিবংশে এই শ্লোকটী দৃষ্ট হয় না। এতাদৃশ আরও উদাহরণ থাকা অসম্ভব নয়। সুতরাং বর্ত্তমানে প্রচলিত পদ্মপুরাণে "অতঃ কলৌ ভবিষ্যন্তি"-ইত্যাদি শ্লোকটী দৃষ্ট না হইলেই মনে করা সঙ্গত হয় না যে, কবিকর্ণপূরের সময়ে এই শ্লোকটী পদ্মপুরাণে ছিল না। নানা কারণে অনেক গ্রন্থ নষ্ট বা অপ্রচলিত হইয়া গিয়াছে। পদ্মপুরাণের যে আদর্শে উক্ত শ্লোকটী ছিল, বর্ত্তমানকালের পদ্মপুবাণ-সম্পাদকগণ হয়তো সেই আদর্শ পায়েন নাই।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। প্রতিপক্ষ যে হেতু দেখাইয়াছেন, তাহা উপেক্ষণীয় নহে। কিন্তু কবিকর্ণপূরের সময়ে প্রচলিত (অবশ্য হস্তলিখিত) পদ্মপুরাণে যদি ঐ শ্লোকটী থাকিত, তাহা হইলে, কর্ণপূরের সমকালীন শ্রীশ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদি, কিছুকাল পরের শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী এবং শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণাদি প্রবীণ বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা অবশ্যই জানিতেন এবং কলিতে কেবলমাত্র চারিটী বৈষ্ণব সম্প্রদায়ই থাকিবে, তদতিরিক্ত থাকিবে না, তাহাও তাঁহারা জানিতেন। কিন্তু তাঁহাদের গ্রন্থাদিতে কোনও স্থলেই তাঁহাদের কেহই তাহার উল্লেখ করেন নাই। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বশেষ বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের সময়েও যে বৈষ্ণব সম্প্রদায়ের সংখ্যা চারির মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল, তাহার প্রমাণ পাওয়া যায় না; বরং তদ্রূপ কোনও সীমা যে ছিল না, তাহারই প্রমাণ পাওয়া যায়। একথা বলার হেতু এই। গল্‌তা গদীর ব্যাপারে সুপণ্ডিত বৈষ্ণবদের সঙ্গে বিদ্যাভূষণ-পাদের বিচার হইয়াছিল এবং সুপণ্ডিত প্রতিপক্ষ বৈষ্ণবগণ বিদ্যাভূষণপাদের গোবিন্দভাষ্য স্বীকার করিয়া লইয়া ছিলেন। বিদ্যাভূষণপাদ তাঁহার গোবিন্দভাষ্যে যে মতবাদ খ্যাপিত করিয়াছেন, তাহা উল্লিখিত চারিটী সম্প্রদায়ের কোনও সম্প্রদায়েরই মতবাদ নহে, তাহা একটী পৃথক্ মতবাদ। বৈষ্ণব-সম্প্রদায় যদি কেবল মাত্র চারিটীই শাস্ত্রসিদ্ধ হইত, তাহা হইলে সুপণ্ডিত প্রতিপক্ষ বৈষ্ণব পণ্ডিতগণ চারিসম্প্রদায়ের বহির্ভূত গোবিন্দভাষ্যের মতবাদ কখনও অঙ্গীকার করিতেন না, অসম্প্রদায়ী বলিয়া বিদ্যাভূষণকে ধিক্কারই করিতেন। কিন্তু তাঁহারা তাহা করেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—সে-সময় পর্য্যন্তও পদ্মপুরাণে আরোপিত উল্লিখিত শ্লোকটীর কথা কেহ জানিতেন না। সুতরাং ঐ শ্লোকটী

পরবর্ত্তী কালের—কবিকর্ণপূরের অনেক পরবর্ত্তীকালের—এইরূপ অনুমান উপেক্ষণীয় হইতে পারে না।

দ্বিতীয়তঃ, মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে—"তত্র মাধ্বীসম্প্রদায়ঃ প্রস্তাবাদত্র লিখ্যতে।" কিন্তু প্রস্তাবিত বিষয় হইতেছে—শ্যামবর্ণ কৃষ্ণের গৌরত্ব-প্রাপ্তি। এই প্রসঙ্গে মাধ্বীসম্প্রদায়ের বিবরণ কিরূপে আসিতে পারে? যে হেতুটী থাকিলে আসিতে পারিত, সেই হেতুও যে নাই, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

তৃতীয়তঃ, মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী ছিলেন মাধ্বসম্প্রদায়-ভুক্ত। কিন্তু তাহাই বা কিরূপে স্বীকার করা যায়? মাধ্বসম্প্রদায়ের সাধ্য-সাধনের সঙ্গে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের সাধ্য-সাধনের কোনও সঙ্গতিই দৃষ্ট হয় না। মাধ্বসম্প্রদায় শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র ছিলেন কান্তাভাবে শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসক। মাধ্বসম্প্রদায়ের উপাসনা হইতেছে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভগবানে অর্পণ; পুরীপাদের উপাসনা ছিল শুদ্ধা ভক্তির উপাসনা। শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য ব্রজসুন্দরীদিগকে স্বর্বেশ্যা বলিয়া মনে করিতেন; বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিপাদগণ শ্রীমদ্‌ভাগবতের টীকায় মধ্বাচার্য্যের এতাদৃশ মতবাদের তীব্র সমালোচনা করিয়া গিয়াছেন। এই অবস্থায় মাধ্ব-সম্প্রদায়-ভুক্ত মাধবেন্দ্রপুরী যে ব্রজের কান্তাভাবে শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের উপাসনায় ব্রতী হইবেন, ইহা কিরূপে বিশ্বাস করা যায়? আরও একটী কথা। মাধ্বসম্প্রদায়ের মধ্যে সন্ন্যাসীদিগের "পুরী" উপাধি কাহারও নাই। তাঁহাদের সম্প্রদায়গত উপাধি হইতেছে "তীর্থ।" অন্যসম্প্রদায়ী কোনও সন্ন্যাসী মাধ্বসম্প্রদায়ে দীক্ষা নিলেও তাঁহার "তীর্থ" উপাধি হইয়া থাকে। কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের উপাধি ছিল "পুরী", তাঁহার "তীর্থ" উপাধি ছিল না। তিনি যে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না, ইহাও তাহার একটী প্রমাণ। শ্রীমৎ সুন্দরানন্দ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় তাঁহার "অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ" নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—"শ্রীআনন্দতীর্থ মধ্বাচার্য্যের সন্ন্যাস-শিষ্যপারম্পর্য্যে এ-পর্য্যন্ত কোথাও 'তীর্থ'-সন্ন্যাসনামের পরিবর্ত্তে 'পুরী'-নাম গ্রহণের ইতিহাসও পাওয়া যায় না (১৯৪ পৃষ্ঠা)।" বিদ্যাবিনোদ মহাশয় আরও লিখিয়াছেন—"ব্যাসতীর্থের শিষ্য 'লক্ষ্মীপতি', বা লক্ষ্মীপতির শিষ্য 'মাধবেন্দ্রপুরী', ইহা তত্ত্ববাদিগণের কোনও মঠাম্নায়েই পাওয়া যায় নাই (অচিন্ত্য-ভেদাভেদবাদ। ২২৪ পৃষ্ঠা)।"

সুপ্রসিদ্ধ দার্শনিক পণ্ডিত ডক্‌টর সুরেন্দ্র নাথ দাসগুপ্ত লিখিয়াছেন:—বেলগম ও পুনায় মাধ্বসম্প্রদায়ের যে দুইটী মঠ আছে, সেই দুইটী মঠ হইতে মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা সংগ্রহ করিয়া ডক্‌টর ভাণ্ডারকার ১৮৮২—৩ খৃষ্টাব্দে একটী তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন। এই তালিকাতে আনন্দ-তীর্থ বা মধ্বাচার্য্য হইতে আরম্ভ করিয়া সত্যবিৎতীর্থ পর্য্যন্ত পঁয়ত্রিশজন গুরুর নাম আছে। প্রথম ছয় জনের নাম হইতেছে—আনন্দতীর্থ বা মধ্বাচার্য্য, পদ্মনাভতীর্থ, নরহরিতীর্থ, মাধবতীর্থ, অক্ষোভ-তীর্থ এবং জয়তীর্থ। সর্ব্বশেষ সত্যবিৎতীর্থ ১৮০৪ শক বা ১৮৮২ খৃষ্টাব্দপর্য্যন্ত (অর্থাৎ যে সময়ে ভাণ্ডারকার এই তালিকা প্রস্তুত করিয়াছেন, সেই সময় পর্য্যন্তও) জীবিত ছিলেন। ডক্‌টর দাসগুপ্ত

লিখিয়াছেন—গোবিন্দভাষ্যের সূক্ষ্মানাম্নীটীকাতে (সুতরাং গৌরগণোদ্দেশদীপিকার ২১—২৫ শ্লোকেও) মাধ্বসম্প্রদায়ের যে গুরুপরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহার সহিত ভাণ্ডারকারের সংগৃহীত—সুতরাং বেলগম ও পুনার মাধ্বমঠে রক্ষিত—গুরুপরম্পরার কেবল প্রথম ছয় জনেরই, অর্থাৎ আনন্দতীর্থ হইতে জয়তীর্থ পর্য্যন্ত ছয় জনেরই, নামের মিল আছে ; আর কোনও মিল নাই। * বেলগম ও পুনায় অবস্থিত মাধ্বমঠের গুরুপরম্পরায় লক্ষ্মীপতি, বা মাধবেন্দ্রপুরী, বা ঈশ্বরপুরী—ইঁহাদের কাহারও নামই নাই। মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরাসম্বন্ধে মাধ্বমঠের দলিলকে অবিশ্বাস করার কোনও হেতু থাকিতে পারে না।

সুতরাং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী যে মধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন, এইরূপ অনুমান বিচারসহ হইতে পারে না।

চতুর্থতঃ, মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে প্রমাণ করার চেষ্টা করা হইয়াছে যে—গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। কিন্তু ইহা কবিকর্ণপূরের অভিমত হইতে পারে না ; কেননা তাঁহার "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয় নাটকে" তিনি অন্য মত প্রচার করিয়া গিয়াছেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভু এবং শ্রীপাদ সার্বভৌম-ভট্টাচার্য্যের মধ্যে কথোপকথন-প্রসঙ্গে কবিকর্ণপূর লিখিয়াছেন—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যঃ—কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্।—শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিলেন—(দক্ষিণদেশ-ভ্রমণকালে) কতিপয় বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসকই। অপর তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবদেরও দেখিয়াছি ; তাঁহারাও তদ্রূপই (অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের উপাসকই)। তাঁহাদের মত নিরবদ্য (নির্দ্দোষ) নহে।" (মাধ্বসম্প্রদায়কেই তত্ত্ববাদী বলা হয়)।

এ-স্থলে কবিকর্ণপূর শ্রীমন্মমহাপ্রভুর মুখে প্রকাশ করাইয়াছেন—তত্ত্ববাদী মাধ্বসম্প্রদায়ের মত নিরবদ্য নহে। ইহাতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে মধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহাই কর্ণপূরের অভিমত। কেননা, তিনি যে মহাপ্রভুর মতের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া স্বীয় একটী অভিনব মতবাদ প্রচার করিয়াছেন, ইহা কল্পনা করা যায় না। এই অবস্থায় তাঁহার গৌরগণোদ্দেশ দীপিকায় তিনি লিখিতে পারেন না যে—গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত।

দাক্ষিণাত্য-ভ্রমণ-সময়ে মাধ্বসম্প্রদায়ের আচার্য্যদের সঙ্গে বিচার করিয়া শ্রীমন্মমহাপ্রভুই তাঁহাদের মতবাদের খণ্ডন করিয়াছেন ; শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে তাহা জানা যায়।

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী পরিষ্কার ভাবেই মাধ্বসম্প্রদায়কে "অন্য সম্প্রদায়" বলিয়া উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। শ্রামন্মধ্বাচার্য্য শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের ১১-১৪ অধ্যায়ত্রয় অঙ্গীকার করেন নাই। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীগোস্বামী শ্রীভা, ১০।১২।১-শ্লোকের লঘুতোষণী টীকায় লিখিয়াছেন-"তদীয়-স্ব-সম্প্রদায়ানঙ্গীকার-প্রামাণ্যেন তস্যাপ্রামাণ্যং চেৎ, অন্যসম্প্রদায়াঙ্গীকার-

* *A History of Indian Philosophy* by Surendranath Dasgupta, Vol. IV, 1955, P. 56.

প্রামাণ্যেন বিপরীতং কথং ন স্যাৎ ॥—তাঁহার (শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের) স্বীয় সম্প্রদায়কর্ত্তৃক শ্রীমদ্ভাগবতের দশম স্কন্ধের দ্বাদশাদি অধ্যায়ত্রয় অস্বীকৃত হইয়াছে বলিয়া যদি সেই অধ্যায়ত্রয় অপ্রামাণ্য হয়, তাহা হইলে, অন্য সম্প্রদায়কর্ত্তৃক সেই অধ্যায়ত্রয় অঙ্গীকৃত হইলে সেই প্রমাণবলে তাহা বিপরীত কেন হইবেনা ?" এ-স্থলে শ্রীজীবপাদ মাধ্বসম্প্রদায়কে "তদীয় সম্প্রদায়—তাঁহার অর্থাৎ মধ্বাচার্য্যের সম্প্রদায়" বলিয়াছেন এবং আলোচ্য অধ্যায়ত্রয় সম্বন্ধে যাঁহারা মধ্বাচার্য্যের বিপরীত মতেরই সমর্থন করেন, তাঁহাদিগকে "অন্য সম্প্রদায়—অর্থাৎ মাধ্বসম্প্রদায় হইতে ভিন্ন সম্প্রদায়" বলিয়া গিয়াছেন। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও উল্লিখিত মাধ্বমতের অনুমোদন করেন না, বিপরীত মতেরই সমর্থন করেন। এইরূপে জানা গেল—শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—গৌড়ীয় সম্প্রদায় হইতেছে মাধ্বসম্প্রদায় হইতে একটী পৃথক্ সম্প্রদায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার সর্বসম্বাদিনীতেও (সাহিত্যপরিষৎ-সংস্করণ ॥ ১৪৯ পৃঃ) "শ্রীরামানুজমত", "মধ্বাচার্য্যমত" এবং "স্বমত—অর্থাৎ শ্রীজীবের সম্প্রদায়ের মত"-এইরূপ বলিয়াছেন। ইহাতেও পরিষ্কার ভাবে বুঝা যায়—গৌড়ীয় মত যে মাধ্বমত হইতে ভিন্ন, গৌড়ীয় সম্প্রদায় যে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে, ইহাই হইতেছে শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায়।

তাঁহার তত্ত্বসন্দর্ভেও তিনি মাধ্বমতকে—"প্রচুরপ্রচারিত বৈষ্ণবমত-বিশেষ" বলিয়া গিয়াছেন (তত্ত্বসন্দর্ভ॥ সত্যানন্দগোস্বামিসংস্করণ ॥ ২৮ ॥) শ্রীজীবপাদ যদি মাধ্বসম্প্রদায়কে স্বীয় সম্প্রদায় বলিয়াই স্বীকার করিতেন, তাহা হইলে মাধ্বমতকে "বৈষ্ণবমত-বিশেষ" বলিতেন না।

বস্তুতঃ গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের কেহই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলেন নাই।

শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ সরস্বতীর "শ্রীচৈতন্যচন্দ্রামৃত"-গ্রন্থের টীকার উপসংহারে টীকাকার শ্রীআনন্দী লিখিয়াছেন – শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেই গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক এবং তদীয় পার্ষদ (শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি) গোস্বামিগণই এই সম্প্রদায়ের গুরু। "স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামা তদুপাসকসম্প্রদায়-প্রবর্ত্তকো ভবতি **অতঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যমহাপ্রভু-স্বয়ংভগবানেব সম্প্রদায়প্রবর্ত্তকস্তৎপার্ষদা এব সম্প্রদায়গুরবো, নান্যে।"

কবিকর্ণপূরের শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়নাটক হইতেও তাহাই জানা যায়। নাটকে লিখিত হইয়াছে—

"শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য—কিয়ন্ত এব বৈষ্ণবা দৃষ্টাস্তেঽপি নারায়ণোপাসকা এব। অপরে তত্ত্ববাদিনস্তে তথাবিধা এব। নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্। অপরে তু শৈবা এব বহবঃ। পাষণ্ডাস্তু মহাপ্রবলা ভূয়াংস এব। কিন্তু ভট্টাচার্য্য! রামানন্দমতমেব মে রুচিতম্।

সার্ব্বভৌমঃ—ভবন্মত এব প্রবিষ্টোঽসৌ, ন তস্য মতকর্ত্তৃতা। স্বামিন্! অতঃপরমস্মাকমপ্যেতদেব মতং বহুমতং সর্ব্বশাস্ত্রপ্রতিপাদ্যঞ্চৈতদিতি ॥৮।১॥"

তাৎপর্য্যানুবাদ। "শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব বলিলেন—(দক্ষিণদেশে) কতিপয় বৈষ্ণবকে দেখিয়াছি। তাঁহারা শ্রীনারায়ণের উপাসকই। অপর, তত্ত্ববাদী বৈষ্ণবদেরও দেখিয়াছি ; তাঁহারাও তদ্রূপই (অর্থাৎ শ্রীনারায়ণের উপাসকই)। তাঁহাদের মত নিরবদ্য (নির্দ্দোষ) নহে। অপর যাঁহারা আছেন, তাঁহাদের মধ্যে শৈবই বহু। কিন্তু মহাপ্রবল পাষণ্ডগণের সংখ্যাই ভূয়সী। কিন্তু ভট্টাচার্য্য ! রামানন্দের মতই আমার রুচিসম্মত।

(একথা শুনিয়া) সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিলেন—প্রভু ! তোমার মতেই রামানন্দ (রায়) প্রবিষ্ট হইয়াছেন ; তাঁহার মত-কর্তৃতা নাই (অর্থাৎ রামানন্দ রায় নিজে কোনও মতের প্রবর্ত্তক নহেন, তোমার মতই তিনি গ্রহণ করিয়াছেন)। অতএব, আমাদেরও এই মতই শ্রেষ্ঠ মত, তাহাই বহু-লোকের স্বীকৃত মত এবং সর্ব্বশাস্ত্র-প্রতিপাদ্য।"

কবিকর্ণপূরের উল্লিখিত উক্তি হইতে স্পষ্টভাবেই জানা যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভুই হইতেছেন গৌড়ীয় মতের প্রবর্ত্তক।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়—সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য এক সময়ে তালপত্রে নিম্নোদ্ধৃত শ্লোক দুইটী লিখিয়া প্রভুকে দেওয়ার জন্য জগদানন্দ-পণ্ডিতের নিকটে দিয়াছিলেন ঃ—

"বৈরাগ্যবিদ্যানিজভক্তিযোগশিক্ষার্থমেকঃ পুরুষঃ পুরাণঃ।
শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যশরীরধারী কৃপাম্বুধির্যস্তমহং প্রপদ্যে ॥
কালান্নষ্টং ভক্তিযোগং নিজং যঃ প্রাদুষ্কর্ত্তুং কৃষ্ণচৈতন্যনামা।
আবির্ভূতস্তস্য পাদারবিন্দে গাঢ়ং গাঢ়ং লীয়তাং চিত্তভৃঙ্গঃ ॥

—বৈরাগ্যবিদ্যা (বৈরাগ্যের বিধানাদি) এবং স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ শিক্ষা দেওয়ার নিমিত্ত যে এক করুণাসিন্ধু পুরাণ-পুরুষ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে অবতীর্ণ হইয়াছেন, আমি তাঁহার শরণ গ্রহণ করি। কালপ্রভাবে বিনষ্ট স্ববিষয়ক ভক্তিযোগ পুনরায় প্রচার করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যনামে যিনি আবির্ভূত হইয়াছেন, তাঁহার চরণকমলে আমার মনোমধুকর গাঢ়রূপে আসক্ত হউক।"

সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের এই উক্তি হইতেও জানা যায়—শ্রীমন্মহাপ্রভুই হইতেছেন গৌড়ীয় মতের—সুতরাং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের—প্রবর্ত্তক।

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অতি পরিষ্কার ভাবেই জানা যায়—শ্রীমন্মমহাপ্রভুই হইতেছেন গৌড়ীয়মতের এবং গৌড়ীয়-সম্প্রদায়ের প্রবর্ত্তক। শ্রীচৈতন্যচন্দ্রোদয়-নাটক হইতে জানা যায়, কবিকর্ণপূরও তাহাই মনে করিতেন। মাধ্বমত যে তাঁহার অভিপ্রেত নহে, তাঁহার নাটকের "নিরবদ্যং ন ভবতি তেষাং মতম্"-শ্রীমন্মহপ্রভুর মুখে প্রকাশিত মাধ্বমতসম্বন্ধে এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। সুতরাং গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকার ২০শ ও ২৬শ শ্লোকের মধ্যবর্ত্তী যে সকল শ্লোকে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত বলিয়া বর্ণন করা হইয়াছে, সে-সকল শ্লোক

কবিকর্ণপূরের রচিত বলিয়া মনে করা সঙ্গত হয়না। বিশেষতঃ, পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ২০শ ও ২৬শ শ্লোকের সহিত মধ্যবর্ত্তী এই সকল শ্লোকের কোনও সঙ্গতিই নাই।

মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলিতে বলা হইয়াছে— মধ্বাচার্য্য "কৃষ্ণদীক্ষা"লাভ করিয়াছিলেন। "কৃষ্ণদীক্ষা"-শব্দে শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষাই বুঝায়। শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে যাঁহার দীক্ষা হয়, তিনি শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই করিয়া থাকেন। কিন্তু মধ্বাচার্য্য শ্রীকৃষ্ণের উপাসক ছিলেন না, তিনি ছিলেন শ্রীনারায়ণের উপাসক; কবিকর্ণপূর তাহা জানিতেন এবং পূর্ব্বোল্লিখিত তাঁহার নাটকোক্তিতেও তাহা তিনি বলিয়া গিয়াছেন। ইহা হইতেও বুঝা যায়—মধ্যবর্ত্তী শ্লোকগুলি কবিকর্ণপূরের লিখিত নহে, অর্থাৎ কর্ণপূরলিখিত মূল গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকায় এই শ্লোকগুলি ছিলনা; পরবর্ত্তী কালে কেহ এই শ্লোকগুলি গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে প্রবেশ করাইয়া দিয়াছেন।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের গোবিন্দভাষ্যের "সূক্ষ্মা"-নাম্নী টীকার প্রথম ভাগেও গৌরগণোদ্দেশ-দীপিকাতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির অনুরূপ কয়েকটী শ্লোক আছে; এই শ্লোকগুলির মর্ম্মও গণোদ্দেশদীপিকাতে প্রক্ষিপ্ত শ্লোকগুলির মর্ম্মের অনুরূপ। এই "সূক্ষ্মা"-টীকা কাহার লিখিত, তাহা বলা যায় না। প্রভুপাদ শ্রীল শ্যামলালগোস্বামিসম্পাদিত সংস্করণে টীকার প্রারম্ভে বা উপসংহারে টীকাকারের নাম দৃষ্ট হয় না। ইহাতে কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন যে, এই টীকাটীও স্বয়ংভাষ্যকার বিদ্যাভূষণপাদেরই লিখিত। কিন্তু তাহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, টীকার প্রারম্ভেই বলা হইয়াছে—"ভাষ্যমেতদ্বিরচিতং বলদেবেন ধীমতা—ধীমান্ বলদেব এই ভাষ্য (গোবিন্দভাষ্য) রচনা করিয়াছেন।" পরমভাগবত শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ যে নিজেকে "ধীমান্" বলিয়াছেন, ইহা বিশ্বাস করা যায় না। নিজের মহিমা প্রকাশ করা বৈষ্ণবাচার্য্যদের রীতি নহে। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর ন্যায় মহাবিজ্ঞ ব্যক্তিও নিজেকে "বরাকো রূপঃ—ক্ষুদ্র রূপ" বলিয়াছেন। কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন "মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়। মোর নাম লয়ে যেই, তার পাপ হয়।" এইরূপই হইতেছে বৈষ্ণব-গ্রন্থকারদের রীতি। যাহাহউক, "সূক্ষ্মা"-টীকার প্রারম্ভে আরও বলা হইয়াছে-"ভাষ্যং যস্য নির্দ্দেশাৎ রচিতং বিদ্যাভূষণেনেদম্। গোবিন্দঃ সঃ পরমাত্মা মমাপি সূক্ষ্মাং করোত্যস্মিন্॥—যাঁহার নির্দ্দেশে বিদ্যাভূষণকর্ত্তৃক এই ভাষ্য রচিত হইয়াছে, সেই পরমাত্মা গোবিন্দই এই বিষয়ে আমার সূক্ষ্ম করিতেছেন (অর্থাৎ তাঁহার কৃপাতেই আমি সূক্ষ্মানাম্নী টীকা লিখিতেছি)।" ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই বুঝা যায়—টীকাকার হইতেছেন শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ হইতে ভিন্ন ব্যক্তি। এই টীকাকারই "তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা" বলিয়া মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার পরিচয় দিয়াছেন এবং তৎপ্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভুকে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রকাশ করিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়—টীকাকার নিজেই ছিলেন মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত, "তত্র স্বগুরুপরম্পরা যথা"-বাক্যে তিনি তাহা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। "আনন্দতীর্থনামা সুখময়ধামা যতির্জীয়াৎ। সংসারার্ণবতরণিং

যমিহ জনাঃ কীর্ত্তয়ন্তি বুধাঃ॥” আনন্দতীর্থনামা শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যসম্বন্ধে টীকাকারের এই প্রশংসাবাক্যেও তাহাই সমর্থিত হইতেছে।

ইহাতে বুঝা যায়—মাধ্বসম্প্রদায়ের প্রতি অনুরক্ত এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়প্রবর্ত্তক শ্রীমন্মহাপ্রভুকে এবং গৌড়ীয়সম্প্রদায়কেও মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া প্রচার করিতে উৎসুক কোনও লোকই “সূক্ষ্মা”-নাম্নী টীকায় উল্লিখিত শ্লোকগুলিও লিখিয়াছেন এবং তিনিই বা তাঁহার অনুবর্ত্তী কেহই গৌরগণোদ্দেশদীপিকার আলোচ্য শ্লোকগুলিও লিখিয়াছেন। যাঁহারা নির্বিচারে গৌরগণোদ্দেশদীপিকার উল্লিখিত শ্লোকগুলিকে অকৃত্রিম বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাঁহারাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যাইবে—গৌড়ীয় সম্প্রদায় মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত নহে; ইহা হইতেছে শ্রীমন্মহাপ্রভু কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত একটী পৃথক্ সম্প্রদায়, শ্রী-ব্রহ্ম-রুদ্র-সনকাদি চারিটী সম্প্রদায় হইতে পৃথক্ একটী সম্প্রদায়। পূর্ব্ব আলোচনা হইতে ইহাও বুঝা যাইবে—বৈষ্ণবদের সম্প্রদায় যে মাত্র চারিটী, তদরিক্ত যে কোনও বৈষ্ণবসম্প্রদায় নাই বা থাকিতে পারেনা, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে—“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র” যে মাধ্বমত উপদেশ করিয়া গিয়াছেন, শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ নিজেই তাঁহার রচিত “প্রমেয়রত্নাবলী”-গ্রন্থে উল্লেখ করিয়াছেন।

“শ্রীমধ্বঃ প্রাহ বিষ্ণুং পরতমমখিলাম্নায়বেদ্যঞ্চ বিশ্বং
সত্যং ভেদঞ্চ জীবান্ হরিচরণজুষস্তারতম্যঞ্চ তেষাম্।
মোক্ষং বিষ্ণ্বঙ্ঘ্রিলাভং তদমলভজনং তস্য হেতুং প্রমাণং
প্রত্যক্ষাদিত্রয়ঞ্চেত্যুপদিশতি হরিঃ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রঃ॥ ১।৫॥

—শ্রীমধ্ব বলিয়াছেন—(১) বিষ্ণু হইতেছেন পরতমতত্ত্ব, (২) বিষ্ণু অখিলবেদবেদ্য, (৩) বিশ্ব সত্য, (৪) বিশ্ব ও বিষ্ণুতে ভেদ বিদ্যমান, (৫) জীবসমূহ হইতেছে শ্রীহরির চরণসেবক (দাস), (৬) জীবসমূহের মধ্যে তারতম্য আছে, (৭) বিষ্ণু-পাদপদ্ম লাভই মোক্ষ, (৮) বিষ্ণুর অমল ভজনই মোক্ষের হেতু, (৯) প্রত্যক্ষাদি (অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান ও শব্দ-এই) ত্রিবিধ প্রমাণ। হরি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্র ইহা উপদেশ করেন।”

উক্ত শ্লোকে শ্রীমন্মাধ্বচার্য্যের কথিত বলিয়া যে কয়টী বস্তুর উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহাদের সমস্তই যে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রচারিত তত্ত্বের আত্যন্তিক বিরোধী, তাহা নহে। কয়েকটী বিষয় শ্রীমহাপ্রভুরও অনুমোদিত। যথা, বিষ্ণুই পরমতত্ত্ব (বিষ্ণু-শব্দ সর্ব্বব্যাপকত্ব-বাচক; শ্রীকৃষ্ণও বিষ্ণু; রাসপঞ্চাধ্যায়ীর সর্ব্বশেষ শ্লোকে শ্রীল শুকদেবগোস্বামীও রাসলীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণকে “বিষ্ণু” বলিয়াছেন। এই অর্থে বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণই পরমতত্ত্ব), বিশ্ব সত্য (অর্থাৎ জগৎ মিথ্যা নহে), জীবসমূহ শ্রীহরির চরণ-সেবক (কৃষ্ণের নিত্যদাস জীব), বিষ্ণু-পাদপদ্ম-লাভই মোক্ষ (বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের চরণ সেবালাভ পরম-পুরুষার্থ), বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণের অমল ভজন (অর্থাৎ শুদ্ধা ভক্তিই) মোক্ষের বা পরম-পুরুষার্থেরও হেতু—এ-সমস্ত শ্রীমন্মহাপ্রভুরও অনুমোদিত।

কিন্তু উল্লিখিত শ্লোকের উক্তি হইতে মনে হইতে পারে, মধ্বোপদিষ্ট সমস্ত বিষয়ই যেন শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যচন্দ্রের অনুমোদিত, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যও মাধ্বমতই উপদেশ করিয়াছেন—সুতরাং তিনিও মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্তই ছিলেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুর প্রচারিত মত যে শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণের অবিদিত ছিল, তাহা নহে। বিদ্যাভূষণপাদ নিজেও যে তাঁহার বেদান্তভাষ্যে এবং অন্যান্য গ্রন্থে মাধ্বমত প্রচার করিয়াছেন, তাহাও নহে (৪।৩০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তথাপি "প্রমেয়রত্নাবলী"-গ্রন্থে উল্লিখিতরূপ উক্তি কেন দৃষ্ট হয়? ইহার হেতু নিম্নলিখিতরূপ বলিয়া মনে হয়।

শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ পূর্ব্বে মাধ্বসম্প্রদায়ে ছিলেন, পরে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন। ইহাতে মধ্বানুগত লোকগণ তাঁহার প্রতি রুষ্ট হইয়াছিলেন অনুমান করিয়া যদি কেহ বলেন—তাঁহাদের মনস্তুষ্টির জন্যই শ্রীপাদ বিদ্যাভূষণ "প্রমেয়রত্নাবলী" লিখিয়া তাহাতে উল্লিখিত শ্লোকটী সংযোজিত করিয়া তাঁহাদিগকে জানাইতে চাহিয়াছেন যে--তিনি মাধ্বসম্প্রদায় ত্যাগ করেন নাই, শ্রীমন্মহাপ্রভুও এবং তাঁহার সম্প্রদায়ও মাধ্বসম্প্রদায়েরই অন্তর্ভুক্ত, তাহা হইলে মনে করিতে হয় যে, বিদ্যাভূষণপাদ ছিলেন অত্যন্ত লঘুচিত্ত এবং বালবুদ্ধি। এইরূপ মনে করিলে তাঁহার প্রতি অবিচারই করা হইবে। শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের মত কিরূপ ছিল এবং গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে প্রবেশের পরে বলদেবের আচরণাদিই বা কিরূপ ছিল, মধ্বানুগত লোকগণ তাহা অবশ্যই জানিতেন। শ্লোকাক্তিতে তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন কেন? ইহাতে মনে হয়—মাধ্বসম্প্রদায়ে অবস্থান-কালেই শ্রীপাদ বলদেব "প্রমেয়রত্নাবলী" লিখিয়াছিলেন ("প্রমেয়রত্নাবলী"-গ্রন্থে মাধ্বমতই প্রকটিত হইয়াছে); পরবর্ত্তী কালে "সূক্ষ্মা"-টীকাকারের ন্যায় কোনও ব্যক্তি উল্লিখিত শ্লোকটী, বা তাহার শেষাংশ তাহাতে যোজনা করিয়া দিয়াছেন। ইহা বলদেবের লেখা হইতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে এই গ্রন্থের ভূমিকায় "গৌড়ীয় সম্প্রদায় ও মাধ্বসম্প্রদায়" শীর্ষক প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য।

ক । শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর গুরুপরম্পরা

শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী যখন মাধ্বসম্প্রদায়ভুক্ত নহেন, তখন অধুনাপ্রাপ্ত গৌরগণোদ্দেশদীপিকার কৃত্রিম শ্লোকগুলিতে তাঁহার যে গুরুপরম্পরা প্রদত্ত হইয়াছে, তাহা তাঁহার গুরুপরম্পরা হইতে পারে না। তাহা হইলে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর গুরুপরম্পরা কি?

এই প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করা সহজ নহে। শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র কোন্ সম্প্রদায়ে কৃষ্ণদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন, বর্ত্তমানে তাহা জানিবার উপায় নাই। তাঁহার শিষ্যপরম্পরা বর্ত্তমানে আছেন কিনা, তাহাও নিশ্চিতরূপে বলা যায় না; থাকিলেও তাঁহাদের নিকটে গুরুপরম্পরা আছে কিনা, তাহাও বলা যায় না। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভুও শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রের শিষ্য ছিলেন; কিন্তু তিনি পুরীপাদের গুরুপরম্পরা পাইয়াছিলেন কিনা, বলা যায় না।

গুরুপরম্পরার আনুগত্যে যাঁহারা ভজন করেন, তাঁহাদের পক্ষে গুরুপরম্পরা—গুরুপ্রণালিকা এবং তদনুগতা সিদ্ধপ্রণালিকা—অপরিহার্য্য। মহাপ্রভুর প্রবর্ত্তিত গৌড়ীয় সম্প্রদায়েই এতাদৃশ

আনুগত্যময় ভজন প্রচলিত। গৌড়ীয় সম্প্রদায় ব্রজের প্রেমসেবা-প্রার্থী বলিয়া এবং ব্রজের প্রেম-সেবায় সাধনসিদ্ধ ভক্তকে নিয়োজিত করার অধিকার একমাত্র নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরদেরই বলিয়া, এই সম্প্রদায়ের পক্ষে গুরুপরম্পরার আনুগত্যমূলক ভজন অত্যাবশ্যক। যাঁহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, তাঁহাদের পক্ষে এতাদৃশ আনুগত্যময় ভজন অত্যাবশ্যক বলিয়া মনে হয় না; কেননা, উপাস্যের সেবা তাঁহাদের প্রধান লক্ষ্য নহে এবং সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তিতেও প্রাণঢালা প্রেমসেবার অবকাশ নাই; সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত ভক্তগণ হইতেছেন—শান্তভক্ত; শ্রীকৃষ্ণে তাঁহারা "মমতাগন্ধহীন। শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৭৭॥" শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র অবশ্য ব্রজের প্রেমসোবাকামীই ছিলেন। কিন্তু তাঁহার উপাসনা কিরূপ ছিল, তাহা নিশ্চিতরূপে জানা যায় না। তাঁহার উপাসনাও যদি গুরুপরম্পরার আনুগত্যময়ীই হয়, তাহা হইলে তাঁহার শিষ্যানুশিষ্যদের নিকটে তাঁহার গুরুপরম্পরা থাকিবার সম্ভাবনা। থাকিলেও কিন্তু তাহা বর্ত্তমানে দুষ্প্রাপ্য।

কিন্তু শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর গুরুপরম্পরা পাওয়া না গেলেও ভজনের ব্যাপারে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কোনওরূপ প্রত্যবায়ের সম্ভাবনা নাই। গুরুপরম্পরার স্বরূপ বিচার করিলেই তাহা বুঝা যাইবে এবং তখন ইহাও বুঝা যাইবে যে, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার মধ্যে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে স্থান দেওয়া যায় না।

খ। গুরুপরম্পরা বা গুরুপ্রণালিকা

সাধকের গুরুপরম্পরা বা গুরুপ্রণালিকা হইতেছে তাঁহার গুরুবর্গের নামের তালিকা। ইহাতে থাকে সাধকের গুরুর নাম, গুরুর গুরুর নাম, তাঁহার গুরুর নাম ইত্যাদি। যেমন কোনও সাধকের গুরুপ্রণালিকাতে ঊর্দ্ধদিক্ হইতে নিম্নের দিকে কয়েকটী নাম আছে—ক, খ, গ, ঘ, ইত্যাদি। এ-স্থলে ক হইতেছেন খ-এর দীক্ষাগুরু, খ হতেছেন গ-এর দীক্ষাগুরু, গ হইতেছেন ঘ-এর দীক্ষাগুরু, ইত্যাদি। সন্নিহিত প্রতি দুইজনই হইতেছেন দীক্ষাগুরু এবং দীক্ষার শিষ্যরূপে সম্বন্ধান্বিত। এতাদৃশ সম্বন্ধহীন কাহারও নামই গুরুপরম্পরার বা গুরুপ্রণালিকার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না। এক্ষণে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা বা গুরুপ্রণালিকার কথা বিবেচনা করা যাইক।

গ। গৌড়ীয়সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরা বা গুরুপ্রণালিকা

সকলেই জানেন, গৌড়ীয় সম্প্রদায় কয়েকটী পরিবারে বিভক্ত—নিত্যানন্দ-পরিবার, অদ্বৈত-পরিবার, গদাধর-পরিবার, গোপালভট্ট-পরিবার, ঠাকুরমহাশয়ের পরিবার ইত্যাদি। প্রবর্ত্তকদের নামের পার্থক্য-বশতঃই এই সকল পরিবারের পার্থক্য, সাধন-ভজন-প্রণালীতে পার্থক্য কিছু নাই। পার্থক্য কেবল বিভিন্ন পরিবারের সাধকদের তিলকে। তিলক দেখিলেই জানা যায়, কে কোন্ পরিবারভুক্ত। নিত্যানন্দ-পরিবারের আদিগুরু হইতেছেন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভু; অদ্বৈত-পরিবারের আদিগুরু—শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য প্রভু; গদাধর-পরিবারের আদিগুরু—শ্রীগদাধর পণ্ডিত গোস্বামী; ইত্যাদি। এই আদিগুরুগণের কেহই শ্রীমন্মহাপ্রভুর মন্ত্রশিষ্য নহেন। এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভু কোনও

পরিবারেরই গুরুপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত নহেন। শ্রীমন্মহাপ্রভু গুরুপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত না হওয়ায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীও গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত হইতে পারেন না। গুরুশিষ্য-সম্বন্ধের বিবেচনায় শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্র-পুরীর কোনও ব্যবধান নাই বটে; কিন্তু শ্রীমন্মহাপ্রভুর সঙ্গে বিভিন্ন পরিবারের আদিগুরুদেব অপূরণীয় ব্যবধান বিদ্যমান।

এ-স্থলে একটী কথা বিবেচ্য। শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষাগ্রহণ হইতেছে কেবল লোকশিক্ষার্থ--সাধন-ভজন করিতে হইলে দীক্ষাগ্রহণ যে অত্যাবশ্যক, তাহা জানাইবার নিমিত্ত। মহাপ্রভুর দীক্ষাগ্রহণ নিজের ভজনের জন্য নহে; কেননা, তিনি নিজেই স্বয়ংভগবান্-সুতরাং ভজনীয়; তিনি আবার কাহার ভজন করিবেন? তিনি জগদ্‌গুরু; তিনি আবার কাহাকে গুরুরূপে বরণ করিবেন? প্রশ্ন হইতে পারে—তাঁহার কোনও কোনও আচরণে তো দেখা যায় - তিনিও শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়াছেন। উত্তরে বক্তব্য এই -সে-সমস্ত আচরণে তিনি স্বীয় ব্রজেন্দ্রনন্দনস্বরূপের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির আস্বাদন করিয়াছেন; গৌররূপে তিনি স্বীয় ব্রজেন্দ্র-নন্দন-স্বরূপের মাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া থাকেন—ইহা হইতেছে গৌরস্বরূপের স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা; ইহা তাঁহার সাধন নহে। জীবতত্ত্ব সাধক স্বীয় গুরুপরম্পরার আনুগত্যে ভগবল্লীলার স্মরণাদিদ্বারা লীলারস আস্বাদনের চেষ্টা করিয়া থাকেন। শ্রীমন্মহাপ্রভুও যে তদ্রূপ শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী এবং শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর আনুগত্যে লীলারস আস্বাদন করিয়াছেন, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—তাঁহার দীক্ষা হইতেছে কেবল লোকশিক্ষার্থ, স্বীয় সাধন-ভজনের জন্য নহে। নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিয়া তিনি স্বীয় ব্রজলীলার আস্বাদন করিয়াছেন। শ্রীরাধা আবার কাহার আনুগত্য করিবেন?

শ্রীমন্মহাপ্রভুও নামকীর্ত্তনাদি করিতেন; কিন্তু ইহা ছিল তাঁহার পক্ষে নামমাধুর্য্যের আস্বাদন; আনুষঙ্গিক ভাবে ইহা হইয়া পড়িয়াছে– জীবজগতে নামসঙ্কীর্ত্তনরূপ ভজনাঙ্গের আদর্শ স্থাপন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর দীক্ষাগ্রহণসম্বন্ধে যাহা বলা হইল, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের দীক্ষাগ্রহণ-সম্বন্ধেও তাহা প্রযোজ্য। তাঁহার পার্ষদগণের মধ্যে যাঁহারা ভক্ততত্ত্ব, লীলাশক্তি তাঁহাদের মধ্যে সাধকভক্তের ভাব সঞ্চারিত করাইয়া, ভজনের আদর্শ স্থাপনের জন্য তাঁহাদের দ্বারা সাধকোচিত ভজনের আদর্শ স্থাপন করাইয়াছেন; তাহাতেই মহাপ্রভুর "আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়"-প্রতিজ্ঞা সিদ্ধ হইয়াছে; যেহেতু, তিনিই পঞ্চতত্ত্বরূপে—ভক্ততত্ত্বরূপেও—অবতীর্ণ হইয়াছেন। "পঞ্চতত্ত্বাত্মকং কৃষ্ণং ভক্তরূপস্বরূপকম্। ভক্তাবতারং ভক্তাখ্যং নমামি ভক্তশক্তিকম্॥"

এক্ষণে প্রস্তাবিত বিষয়ের আলোচনা করা যাউক। গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অভীষ্ট হইতেছে স্বয়ংভগবানের প্রেমসেবা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। স্বয়ংভগবানের লীলার দ্বিবিধ

প্রকাশ—ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপ-লীলা। উভয় লীলার সেবাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাম্য। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ই তাহা বলিয়া গিয়াছেন—"হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ।" যাঁহারা এই উভয় লীলার নিত্যপরিকর, তাঁহারাই এই সেবা দিতে পারেন, অপর কেহ পারেন না; কেননা, সেবার মুখ্য অধিকার একমাত্র নিত্যপরিকরদের; কৃপা করিয়া তাঁহারা যাঁহাকে সেবায় নিয়োজিত করিবেন তিনিই সেবা পাইতে পারেন।

দেখা গিয়াছে, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের বিভিন্ন পরিবারের আদিগুরুগণ হইতেছেন—শ্রীমন্নিত্যানন্দ, শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য, শ্রীল গদাধরপণ্ডিত গোস্বামী, ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই হইতেছেন ব্রজলীলা এবং নবদ্বীপলীলা-এই উভয় লীলারই নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ; সুতরাং উভয় লীলার সেবাই তাঁহারা দিতে পারেন। ইহার উপরে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাম্য আর কিছু নাই; ইহা যাঁহারা দিতে পারেন, তাঁহারাই গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার শীর্ষস্থানে অবস্থিত। তাঁহাদের উপরে আর কাহাকেও গুরুপরম্পরায় স্থান দেওয়ার আর কোনও প্রয়োজনই থাকিতে পারে না। এজন্যই জীবশিক্ষার্থ তাঁহারা যাঁহাদের নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের নামও বিভিন্ন পরিবারের গুরুপরম্পরায় দৃষ্ট হয় না।

পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে, শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরায় স্থান দেওয়া যায় না; কেননা, পুরীপাদের অনুশিষ্য শ্রীমন্ মহাপ্রভু বিভিন্ন পরিবারের আদিগুরুদের দীক্ষাগুরু নহেন। কিন্তু অদ্বৈত-পরিবারের আদিগুরু শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্য তো শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীরই মন্ত্রশিষ্য; সুতরাং অদ্বৈত-পরিবারের গুরুপ্রণালিকাতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে কোনও বাধাই থাকিতে পারে না। তথাপি কিন্তু অদ্বৈত-পরিবারের গুরুপ্রণালিকাতেও পুরীপাদের নাম নাই।* ইহাতেই বুঝা যায়—গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরায় ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ ব্যতীত অপর কাহারও অন্তর্ভুক্তির যে কোনও প্রয়োজন নাই, ইহাই ছিল গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যদের অভিপ্রায়। সুতরাং পূর্ব্বপ্রদর্শিত কারণে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর গুরুপরম্পরাকে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার অন্তর্ভুক্ত তো করা যায়ই না, তাহাতে আবার ভজনবিষয়ে গৌড়ীয়

---

* শ্রীল কবিকর্ণপুর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীকে ব্রজের কোনও পরিকর বলিয়া উল্লেখ করেন নাই। পূর্ব্বে যে কয়টী শ্লোককে কৃত্রিম বলা হইয়াছে, তাহাদের একটীতে শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রকে "ব্রজের কল্পবৃক্ষের অবতার" বলা হইয়াছে। "তস্য শিষ্যো মাধবেন্দ্রো যদ্ধর্ম্মোঽয়ং প্রবর্ত্তিতঃ। কল্পবৃক্ষস্যাবতারো ব্রজধামনি তিষ্ঠতঃ॥" কল্পবৃক্ষও ব্রজপরিকর বটেন, কিন্তু ব্রজস্থ গোপ-গোপীদিগের ন্যায় সেবা কল্পবৃক্ষের নাই। লীলাশক্তির প্রভাবে কল্পবৃক্ষের মধ্যে বৃক্ষধর্ম্মমাত্রই প্রকটিত, বৃক্ষরূপে যতটুকু সেবা সম্ভব, কল্পবৃক্ষ ততটুকু সেবাই করিয়া থাকেন। এজন্য ব্রজের কল্পবৃক্ষ স্বরূপতঃ চিন্ময় হইলেও স্থাবর-ধর্ম্মবিশিষ্ট। সাক্ষাদ্‌ভাবে যে সমস্ত গোপগোপী শ্রীকৃষ্ণের অন্তরঙ্গ সেবা করিতেছেন, সাধনসিদ্ধ জীবকে তাঁহারা যে ভাবে সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন, কল্পবৃক্ষ সেভাবে কৃপা প্রকাশ করেন না।

সম্প্রদায়ের কোনও প্রত্যবায়ও হইতে পারেনা। কেননা, স্ব-স্ব-পরিবারের আদিগুরুর কৃপাতেই সাধকগণ তাঁহাদের চরমতম অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরের প্রার্থনা হইতেই তাহা জানা যায়।

বৃন্দাবনের নিভৃত নিকুঞ্জে যুগল-কিশোরের সেবার জন্য স্বীয় অভীষ্ট-লালসা প্রকাশ করিয়া শ্রীল ঠাকুর মহাশয় উপসংহারে বলিয়াছেন,

শ্রীগুরু করুণাসিন্ধু, লোকনাথ দীনবন্ধু, মুই দীনে কর অবধানে।
রাধাকৃষ্ণ বৃন্দাবন, প্রিয়নর্ম্মসখীগণ, নরোত্তম মাগে এই দানে॥

অন্যত্রও তিনি বলিয়াছেন,

শুনিয়াছি সাধুমুখে বলে সর্ব্বজন। শ্রীরূপকৃপায় মিলে যুগল চরণ॥
হা হা প্রভু সনাতন গৌর-পরিবার। সবে মিলি বাঞ্ছা পূর্ণ করহ আমার॥
শ্রীরূপের কৃপা যেন আমা প্রতি হয়। সে পদ আশ্রয় যাঁর সেই মহাশয়॥
প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥

অন্যত্র,

শ্রীরূপ পশ্চাতে আমি রহিব ভীত হঞা। দোঁহে পুনঃ কহিবেন আমা পানে চাঞা॥
সদয় হৃদয় দোঁহে কহিবেন হাসি। কোথায় পাইলে রূপ এই নবদাসী॥
শ্রীরূপ মঞ্জরী তবে দোঁহবাক্য শুনি। মঞ্জনালী দিল মোরে এই দাসী আনি॥
অতি নম্রচিত্ত আমি ইহারে জানিল। সেবাকার্য্য দিয়া তবে হেথায় রাখিল॥
হেন তত্ত্ব দোঁহাকার সক্ষাতে কহিয়া। নরোত্তমে সেবায় দিবে নিযুক্ত করিয়া॥

আবার,

হা হা প্রভু লোকনাথ রাখ পাদদ্বন্দ্বে। কৃপাদৃষ্ট্যে চাহ যদি হইয়া আনন্দে॥
মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হঙ পূর্ণতৃষ্ণ। হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ॥

শ্রীল লোকনাথ গোস্বামী হইতেছেন শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের দীক্ষাগুরু। তিনি নবদ্বীপলীলাতে শ্রীমন্মহাপ্রভুর নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ এবং ব্রজলীলাতেও তিনি শ্রীশ্রীরাধাগোবিন্দের নিত্য-সিদ্ধ পার্ষদ; ব্রজলীলায় তাঁহার নাম মঞ্জনালী, শ্রীরাধার কিঙ্করী। উভয় লীলাতেই তিনি নিত্য বিরাজিত বলিয়া উভয়লীলার সেবাই তিনি দিতে পারেন। এজন্য ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"প্রভু লোকনাথ! তোমার কৃপাদৃষ্টি হইলেই "হেথায় চৈতন্য মিলে, সেথা রাধাকৃষ্ণ'।" কিরূপে তাহা মিলিতে পারে, তাহাও ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন। তিনি ছিলেন কান্তাভাবের উপাসক। কান্তা-ভাবের সেবা দেওয়ার মুখ্য অধিকার হইতেছে শ্রীরূপের—যিনি ব্রজলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীরূপ-মঞ্জরী এবং নবদ্বীপলীলার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদ শ্রীরূপ গোস্বামী। তাই ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"প্রভু লোকনাথ কবে সঙ্গে লঞা যাবে। শ্রীরূপের পাদপদ্মে মোরে সমর্পিবে॥" ইহা হইতেছে নবদ্বীপ-

লীলার কথা। আর ব্রজলীলাসম্বন্ধে ঠাকুর মহাশয় প্রার্থনা জানাইয়াছেন—মঞ্জনালী তাঁহাকে শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণে অর্পণ করিবেন এবং শ্রীরূপ মঞ্জরী তাঁহাকে যুগলকিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন।

যাঁহারা ঠাকুরমহাশয়ের পরিবারভুক্ত, তাঁহারা গুরুপরম্পরাক্রমে শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের এবং তাঁহার কৃপায়—নবদ্বীপলীলায় শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীর এবং ব্রজলীলায় শ্রীমঞ্জনালীর চরণে স্থান পাইবেন। তখন শ্রীল লোকনাথ গোস্বামীই তাঁহাদিগকে—নবদ্বীপলীলায় শ্রীরূপ গোস্বামীর এবং ব্রজলীলায় মঞ্জনালীরূপে তিনিই শ্রীরূপ মঞ্জরীর চরণে সমর্পণ করিবেন। তখন কৃপা করিয়া শ্রীরূপ-গোস্বামী তাঁহাদিগকে নবদ্বীপলীলার সেবায় এবং শ্রীরূপ মঞ্জরী তাঁহাদিগকে শ্রীরাধাগোবিন্দের সেবায় নিয়োজিত করিবেন।

কান্তাভাবব্যতীত অন্যভাবের সাধকদেরও উল্লিখিতরূপেই সেবালাভের সৌভাগ্য ঘটে।

এইরূপে দেখা গেল—যিনি যে পরিবারের আদিগুরু, তিনিই সেই পরিবারভুক্ত ভাগ্যবান্ সাধককে গুরুপরম্পরাক্রমে স্বীয় চরণে প্রাপ্ত হইয়া, অন্য কাহারও অপেক্ষা না রাখিয়া ভাবানুকূল লীলায় ভগবৎ-প্রেষ্ঠের চরণে, অর্পণ করিয়া থাকেন এবং সেই ভগবৎ-প্রেষ্ঠ সেই ভাগ্যবান্ ভক্তকে তাঁহার অভীষ্ট সেবায় নিয়োজিত করিয়া থাকেন।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—কোনও পরিবারের গুরুপরম্পরায় সেই পরিবারের আদিগুরু পর্য্যন্ত থাকিলেই যথেষ্ট, আদিগুরুর গুরুপরম্পরা তাহার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করার কোনও প্রয়োজন হয় না।

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরীর গুরুপরম্পরা জানিবার জন্য কাহারও কৌতুহল জাগিতে পারে বটে; কিন্তু তাহা জানিতে না পারিলেও ভজন-ব্যাপারে সাধকের কোনও প্রত্যবায়ের আশঙ্কা দেখা যায় না।

ঘ। গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করার দোষ

কোনও লব্ধপ্রতিষ্ঠ সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া গৌরব অনুভব করাই সাধকের লক্ষ্য নহে; ভজনই হইতেছে তাঁহার লক্ষ্য। গৌড়ীয় সম্প্রদায়কে মাধ্বসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত বলিয়া মনে করিলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের লক্ষ্যের অনুকূল সাধন-ভজনই অসম্ভব হইয়া পড়ে। একথা বলার হেতু এই।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের কাম্যবস্তু হইতেছে ব্রজভাব-প্রাপ্তি এবং স্বীয় অভীষ্ট ব্রজভাবের অনুরূপ নবদ্বীপভাব-প্রাপ্তি। এজন্য গৌরপরিকরদের মধ্যে বিভিন্ন ভাবের পরিকর থাকিলেও যাঁহাদের মধ্যে ব্রজভাবের অনুরূপ ভাব বিরাজিত, তাঁহারাই হইতেছেন গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের পূর্ব্বোল্লিখিত বিভিন্ন পরিবারের আদিগুরু; যাঁহাদের মধ্যে বৈকুণ্ঠাদির ভাব বিরাজিত, তাঁহাদের কাহারও নামে কোনও গৌড়ীয় বৈষ্ণব-পরিবার দৃষ্ট হয় না; শ্রীবাস-পরিবার বা মুরারীগুপ্ত-পরিবার দেখা যায় না; কেননা, শ্রীবাসপণ্ডিত হইতেছেন নারদ, লক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক; আর মুরারিগুপ্ত হইতেছেন হনুমান,

শ্রীরামচন্দ্রের উপাসক। শ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের বা শ্রীরামচন্দ্রের সেবা গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাম্য নহে; তাঁহাদের কাম্য হইতেছে ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা এবং তদ্ভাবানুযায়িনী শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের সেবা। শ্রীবাসপণ্ডিত বা শ্রীমুরারি গুপ্ত ব্রজপরিকর নহেন বলিয়া সাধককে তাঁহারা ব্রজে নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের চরণে সমর্পণ করিতে পারেন না। ব্রজলীলায় তাঁহাদের কোনও পরিকরদেহের প্রমাণ নাই।

ব্রজভাব-প্রাপ্তির সাধন হইতেছে রাগানুগাভক্তি; মনে নিজের সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই সিদ্ধদেহে গুরুপরম্পরার সিদ্ধদেহের আনুগত্যে সাধককে শ্রীকৃষ্ণসেবার চিন্তা করিতে হয়। মাধ্ব-সম্প্রদায় হইতেছে বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের উপাসক; মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার—আদিগুরু ব্রহ্মার বা ব্রহ্মারও গুরু শ্রীনারায়ণের—ব্রজে যে কোনও পরিকর-দেহ আছে, তাহার কোনও প্রমাণ নাই। সুতরাং ব্রজভাবের সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণব মাধ্বসম্প্রদায়ের গুরুপরম্পরার আনুগত্যে কিরূপে রাগানুগার ভজন করিতে পারেন ?

এইরূপে দেখা যায়—মাধ্বসম্প্রদায়ের আনুগত্য স্বীকার করিলে গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের অভীষ্ট-প্রাপক সাধন-ভজনই অসম্ভব হইয়া পড়ে।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে চতুর্থ পর্ব্ব
—ব্রহ্মের সহিত জীব-জগদাদির সম্বন্ধ—
বা
অচিন্ত্য-ভেদাভেদতত্ত্ব
সমাপ্ত

গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শন

পঞ্চম পর্ব

সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব

প্রথমাংশ

সাধ্য-তত্ত্ব

বন্দনা

অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জন-শলাকয়া ।
চক্ষুরুন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ ॥

বাঞ্ছাকল্পতরুভ্যশ্চ কৃপাসিন্ধুভ্য এব চ ।
পতিতানাং পাবনেভ্যো বৈষ্ণবেভ্যো নমোনমঃ ॥

বন্দে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবং তং করুণার্ণবম্ ।
কলাবপ্যতিগূঢ়েয়ং ভক্তির্যেন প্রকাশিতা ॥

মূকং করোতি বাচালং পঙ্গুং লঙ্ঘয়তে গিরিম্ ।
যৎকৃপা তমহং বন্দে পরমানন্দমাধবম্ ॥

জয় রূপ সনাতন ভট্টরঘুনাথ ।
শ্রীজীব গোপালভট্ট দাস রঘুনাথ ॥

এ-ছয় গোসাঞির করি চরণ বন্দন ।
যাহা হৈতে বিঘ্ননাশ অভীষ্ট-পূরণ ॥

সূত্র

শ্রুতির্মাতা পৃষ্টা দিশতি ভবদারাধনবিধিং
যথা মাতুর্বাণী স্মৃতিরপি তথা বক্তি ভগিনী।
পুরাণাদ্যা যে বা সহজনিবহাস্তে তদনুগা
অতঃ সত্যং জ্ঞাতং মুরহর ভবানেব শরণম্ ॥

ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য বিপর্য্যয়োঽস্মৃতিঃ।
তন্মায়য়াতো বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা ॥

শ্রীভা ১১।২।৩৭ ॥

কৃষ্ণ প্রাপ্য সম্বন্ধ, ভক্তি — প্রাপ্যের সাধন ॥

শ্রীচৈ চ. ২।২০।১০৯ ॥

একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ ॥

শ্রীচৈ. চ. ২।৯।১৪১ ॥

যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

শ্রীভা, ৪।৩১।১৪ ॥

অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোঽন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম ॥

শ্রীভা, ৩।২।২৩ ॥

ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥

শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৫১॥

প্রথম অধ্যায়
পুরুষার্থ

১। পরমার্থ-তত্ত্ব

জীবের পরমার্থ, অর্থাৎ পরমতম কাম্যবস্তুটী কি ? জীব তো অনেক জিনিসই পাইতে চায় ; সে সমস্ত হয়তো পাইয়াও থাকে ; কিন্তু যে কোনও কাম্য বস্তুই পাউক না কেন, তাহাতে তাহার চাওয়া শেষ হয় না। এমন কোনও বস্তু কি নাই, যাহা পাইলে জীবের আর চাহিবার কিছু থাকেনা? যাহা পাইলে সব "চাওয়ার" আত্যন্তিক অবসান হয় ? যদি এমন কিছু থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাহাই হইতেছে জীবের চরমতম কাম্য বস্তু, পরম-পুরুষার্থ।

কিন্তু এতাদৃশ কোনও বস্তু—যাহা পাইলে সমস্ত "চাওয়ার" আত্যন্তিক অবসান হয়, এমন কোনও বস্তু--কি আছে বা থাকিতে পারে? মনে হয় যেন এমন একটী বস্তু নিশ্চয়ই আছে। তাহা না হইলে জীবের এই "চাওয়ার" প্রবৃত্তি কেন ? যদি বলা যায়—কর্ম্মফলবশতঃ সংসারী জীবেরই এইরূপ "চাওয়া", শুদ্ধ জীবের বা মুক্ত জীবের এইরূপ কোনও "চাওয়া" নাই।

শুদ্ধ বা মুক্ত জীবের কোনও "চাওয়া" নাই, ইহা স্বীকার করিলেই বুঝা যায় যে, মুক্তজীব এমন একটা কিছু পাইয়াছে, যাহাতে তাহার সমস্ত "চাওয়া" ঘুচিয়া গিয়াছে ; যাহা পাইয়াছে, তাহাই তাহার পরম-পুরুষার্থ, চরমতম-কাম্যবস্তু। সংসারী জীব তাহা পায়না বলিয়াই তাহার "চাওয়ার" অবসান হয়না। কি তাহার চরমতম কাম্য বস্তু, তাহাই হয়তো সংসারী জীব জানেনা ; অথচ সমস্ত "চাওয়ার" নিবর্ত্তক একটা বস্তু যে সে চায়, তাহাও অস্বীকার করা যায় না। সেইটী পায়না বলিয়াই সে এটা-ওটা খুঁজিয়া বেড়ায় ; কিন্তু সমস্ত "চাওয়া" যাহাতে ঘুচিয়া যাইতে পারে, তাহা সে পায়না।

কিন্তু সমস্ত "চাওয়ার" নিবর্ত্তক সেই চরমতম কাম্য বস্তুটী কি ? এ সম্বন্ধে দার্শনিক পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ দৃষ্ট হয়। চার্ব্বাক-মতাবলম্বীরা দেহাতিরিক্ত কোনও জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন না ; দেহের সুখই তাঁহাদের একমাত্র পরমতম কাম্য। অনিচ্ছাসত্ত্বেও এই দেহে দুঃখ আসিয়া পড়িলে তাঁহারা তাহাকে দূর করিতে চেষ্টা করেন; যখন দুঃখকে দূর করা যায়না, তখন তাঁহারা দৈহিক সুখের প্রবাহেই দুঃখের গ্লানিকে ভাসাইয়া দিতে, অথবা ঢাকিয়া রাখিতে চেষ্টা করেন।

আর, যাঁহারা দেহাতিরিক্ত নিত্য জীবাত্মার অস্তিত্ব স্বীকার করেন (বৈদিক শাস্ত্র জীবাত্মার নিত্য অস্তিত্বই স্বীকার করেন), তাঁহাদের মধ্যেও মতভেদ দৃষ্ট হয়। কেহ বলেন, আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিই জীবের পরম-পুরুষার্থ ; আবার কেহ বলেন, নির্ম্মল, অবিনশ্বর এবং অপরিসীম সুখই হইতেছে

জীবের পরম পুরুষার্থ। বিবেচনা করিলে দেখা যায়, উল্লিখিত তুইটীর মধ্যে প্রথমটীর মধ্যে দ্বিতীয়টী অন্তর্ভুক্ত নহে; কিন্তু দ্বিতীয়টীর মধ্যে প্রথমটী অন্তর্ভুক্ত। কেননা, যে-খানে নির্ম্মল, অবিনশ্বর এবং অপরিসীম সুখ, সেখানে সুখবিরোধী তুঃখের অস্তিত্বই থাকিতে পারে না; আলোকের মধ্যে যেমন অন্ধকার থাকিতে পারে না, তদ্রূপ। এ-স্থলে তুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি একটী আনুষঙ্গিক ব্যাপার। কিন্তু কেবলমাত্র তুঃখ-নিবৃত্তিতে সুখ থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে।

কিন্তু এই তুইটীর মধ্যে কোন্‌টী জীবস্বরূপের কাম্য? কেবল আত্যন্তিকী তুঃখ-নিবৃত্তি? না কি নির্ম্মল, অবিনশ্বর এবং অপরিসীম সুখ?

সংসারী জীবের অবস্থা বিবেচনা করিলে দেখা যায়, সুখই তাহার একমাত্র কাম্য। সংসারী জীব যাহা কিছু করে, তাহার মূলে রহিয়াছে সুখ-বাসনা। সংসারী জীবকে অবশ্য সুখ এবং তুঃখ উভয়ই ভোগ করিতে হয়; কিন্তু সে সুখ ভোগ করে আগ্রহের সহিত, তৃপ্তির সহিত; আর তাহাকে তুঃখ-ভোগ করিতে হয়, অনিচ্ছার সহিত। তুঃখ-নিবৃত্তির জন্য জীব অবশ্য চেষ্টা করে; কিন্তু সে সুখের পথে বাধা দিতে চাহে না এবং সে সুখকে আগ্রহের সহিত আহ্বান করে। এ-স্থলে দেখা যায়—সংসারী জীব সুখও চাহে এবং তুঃখ-নিবৃত্তিও চাহে। কিন্তু সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিলাভের পরে সে কি কেবল তুঃখ-নিবৃত্তিই চাহিবে? না কি কেবল সুখই চাহিবে?

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সংসারী জীবের মধ্যে সুখবাসনা যেমন দৃষ্ট হয়, তুঃখনিবৃত্তির বাসনাও তেমনি দৃষ্ট হয়। কিন্তু এই তুইটীর মধ্যে প্রাধান্য কোন্‌টীর?

যদি সুখবাসনার প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তুঃখনিবৃত্তির বাসনা হইবে আনু-ষঙ্গিক বা গৌণ। জীব সুখ চাহে বলিয়াই সুখের বিপরীত এবং সুখভোগের অন্তরায়-স্বরূপ তুঃখ-বস্তুকে চাহে না; যখন অনিচ্ছাসত্ত্বেও তুঃখ আসিয়া পড়ে, তখন তাহাকে দূরীভূত করিতে এবং অনাগত ভাবী তুঃখের সম্ভাবনাকেও দূর করিতে চেষ্টা করে।

আর, যদি তুঃখ-নিবৃত্তির বাসনারই প্রাধান্য স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে সুখবাসনার গৌণত্বই স্বীকার করিতে হইবে। "তুঃখ-নিবৃত্তিই আমার কাম্য; সুখ আমার কাম্য নয়। তবে সুখ যদি আসে, আসুক, তাহাকেও বাধা দিতে চাইনা"—এইরূপ ভাব।

ক। সুখবাসনা জীবের স্বরূপগত

কিন্তু বিচার করিলে দেখা যায়—সুখবাসনার গৌণত্ব উপপন্ন হয়না। সুখের জন্য সংসারী জীবের যদি আগ্রহ না থাকিত, অনিচ্ছাসত্ত্বেও সুখ আসিয়া পড়িলে সংসারী জীব যদি ঔদাসীন্যের সহিত তাহাকে গ্রহণ করিত, তাহা হইলেই সুখ-বাসনাকে গৌণ বলা যাইত। কিন্তু অনস্বীকার্য্যভাবেই দেখা যায়—সংসারী জীবের মধ্যে সুখবাসনা বলবতী, জীব যত কিছু কাজ করে, সুখের উদ্দেশ্যেই তাহা করে; সুখের জন্য আগ্রহের অভাব, অথবা সুখের প্রতি বিতৃষ্ণা, কাহারও মধ্যেই দৃষ্ট হয় না; চেষ্টার ফলে বা বিনা চেষ্টাতেও যখন সুখ আসিয়া পড়ে, তখন সংসারী জীব তাহা তৃপ্তির সহিতই

উপভোগ করিয়া থাকে। অনিচ্ছাসত্ত্বেও দুঃখ আসিয়া পড়িলে জীব অনিচ্ছার সহিতই, যেন বাধ্য হইয়াই, তাহা ভোগ করে, ক্বচিৎ কোনও ভাগ্যবান্ জীব তাহা ঔদাসীন্যের সহিত ভোগ করে। আবার, ইহাও দেখা যায়—চেষ্টার ফলে কোনও দুঃখ নিবৃত্ত হইয়া গেলেও সংসারী জীব তাহাতেই চরমা তৃপ্তি লাভ করিতে পারে না, তখনও সুখ-লাভের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকে। এই সমস্ত কারণে বুঝা যায়—সংসারী জীবের মধ্যে সুখ-বাসনারই প্রাধান্য, দুঃখ-নিবৃত্তি-বাসনার প্রধান্য নাই, দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা হইতেছে গৌণ বা আনুষঙ্গিক।

যদি বলা যায়—"সংসারী জীবের মধ্যেই সুখ-বাসনার প্রাধান্য; জীব-স্বরূপের মধ্যে কিন্তু সুখ-বাসনা নাই।" ইহা কতদূর সত্য, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে।

যদি স্বীকার করা যায় যে, সংসারী জীবের মধ্যেই সুখ-বাসনা, জীব-স্বরূপে বা শুদ্ধ জীবে সুখ-বাসনা নাই, তাহা হইলে দেখিতে হইবে, সুখ-বাসনা-সম্বন্ধে শুদ্ধজীব এবং সংসারী জীবের মধ্যে এই পার্থক্যের হেতু কি ?

শুদ্ধজীব এবং সংসারী জীবের মধ্যে পার্থক্য কি এবং কেন ? পার্থক্যের হেতু হইতেছে মায়াবন্ধন। শুদ্ধজীবের মায়াবন্ধন নাই, সংসারী জীবের তাহা আছে। শুদ্ধজীবই মায়াবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া সংসারী জীব হয় এবং মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারিলে আবার শুদ্ধজীবাবস্থা প্রাপ্ত হয়। সুতরাং উভয়ের মধ্যে পার্থক্যের হেতুভূত মায়াবন্ধন হইতেছে একটী আগন্তুক বস্তু। এই মায়াবন্ধনব্যতীত সংসারী জীবের মধ্যে আগন্তুক বস্তু অন্য কিছু নাই। একমাত্র এই মায়াবন্ধনই যখন শুদ্ধজীব ও সংসারী জীবের মধ্যে পার্থক্যের হেতু, তখন ইহা স্বীকার করিতেই হইবে যে—সুখ-বাসনা-বিষয়ে শুদ্ধজীব ও সংসারী জীবের মধ্যে যে পার্থক্য, তাহার হেতুও হইবে এই মায়াবন্ধন; মায়াবন্ধন হইতেই সংসারী জীবের মধ্যে সুখবাসনা উদ্ভূত হইয়াছে। মায়াবন্ধন যখন আগন্তুক, তখন এই সুখবাসনাও হইবে আগন্তুক।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—কেবলমাত্র মায়াবন্ধন হইতে স্বরূপতঃ-সুখবাসনাহীন জীবের মধ্যে সুখবাসনা উদ্ভূত হইতে পারে কিনা।

কেবলমাত্র বন্ধনই সুখবাসনা জন্মাইতে পারেনা। বন্ধন নিজেকেও নিজে জন্মাইতে পারেনা; অপর কেহই বন্ধন জন্মাইয়া থাকে। জীবের মায়াবন্ধন জন্মায় মায়া—স্বীয় প্রভাবে। জীবের মধ্যে সুখবাসনা জন্মাইবার সামর্থ্য যদি কাহারও থাকে, তবে মায়া ব্যতীত অপর কেহ তাহা জন্মাইতে পারেনা; কেননা, সংসারী জীবের মধ্যে একমাত্র আগন্তুক বস্তু হইতেছে মায়া বা মায়ার প্রভাব।

কিন্তু মায়ার পক্ষে সুখবাসনা জন্মাইবার সামর্থ্য আছে কিনা ? জড়রূপা মায়া আপনা হইতে কিছুই জন্মাইতে পারেনা। ঈশ্বরের শক্তিতে কার্য্য-সামর্থ্য লাভ করিয়া মায়া নিজের স্বরূপভূত উপাদানের দ্বারা চরাচর জগতের সৃষ্টি, সংসারী জীবের নানাবিধ ভোগ্য বস্তুর সৃষ্টি, করিয়া

থাকে। "ময়াধ্যক্ষেণ প্রকৃতিঃ সূয়তে সচরাচরম্ ॥গীতা ॥ ৯।১০ ॥" জীবের দেহ এবং ভোগ্যবস্তুর সৃষ্টি করিয়া মায়া স্বীয় জীবমায়া-অংশে জীবের দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া তাহাদ্বারা ভোগ্যবস্তু ভোগ করাইয়া থাকে। সুখের আশাতেই মায়াবদ্ধ জীব মায়িক ভোগ্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকে ; সুখের আশা তাহার না থাকিলে, অথবা কেহ তাহার মধ্যে সুখের বাসনা উৎপাদিত না করিলে, ভোগ্যবস্তুর ভোগের জন্য তাহার প্রবৃত্তিও হইত না। জীবের স্বরূপে যদি সুখ-বাসনা না-ই থাকে, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—মায়াই তাহার মধ্যে সুখ-বাসনা জন্মাইয়া থাকে।

কিন্তু স্বরূপতঃ-সুখবাসনাহীন জীবের মধ্যে মায়া স্বীয় প্রভাবে সুখ-বাসনা জন্মাইতে পারে কিনা ?

তাহা পারেনা। কেননা, স্বরূপতঃ-সুখ-বাসনাহীন জীবে কেহই সুখবাসনা জন্মাইতে পারেনা। স্বরূপে যাহা নাই, তাহা জন্মাইতে পারিলে স্বরূপের ব্যতয়ই সংঘটিত করা হইবে। কোনও অবস্থাতেই কোনও বস্তুর স্বরূপের ব্যতয় সম্ভবপর নয়।

যদি বলা যায়—লৌহের স্বরূপে দাহিকা-শক্তি নাই ; অগ্নি তাহার মধ্যে দাহিকা-শক্তির সৃষ্টি করে।

উত্তরে বক্তব্য এই। অগ্নি লৌহের দাহিকা-শক্তি সৃষ্টি করেনা ; স্বীয় দাহিকা-শক্তি লৌহে সাময়িকভাবে সঞ্চারিত করে মাত্র। লৌহের দাহিকা-শক্তির সৃষ্টি যদি হইত, তাহা হইলে লৌহে তাহা পরবর্ত্তীকালে সর্ব্বদাই থাকিত।

লৌহের দৃষ্টান্তে যদি বলা যায়—মায়াও সংসারী জীবে সুখবাসনা সঞ্চারিত করিয়া থাকে।

উত্তরে বক্তব্য এই। অগ্নির নিজস্ব স্বরূপগত দাহিকা-শক্তি আছে বলিয়াই অগ্নি লৌহে তাহা সঞ্চারিত করিতে পারে ; শীতল জল কখনও লৌহে দাহিকা-শক্তি সঞ্চারিত করিতে পারে না। তদ্রূপ মায়ার স্বরূপে যদি সুখ-বাসনা থাকে, তাহা হইলে অবশ্য মায়া জীবের মধ্যে তাহা সঞ্চারিত করিতে পারিবে।

কিন্তু মায়ার স্বরূপে সুখ-বাসনা নাই, সুখবাসনা কেন, কোনও রূপ বাসনাই নাই, থাকিতেও পারেনা। কেননা, মায়া হইতেছে স্বরূপতঃ জড়রূপা। জড় বস্তুর কোনওরূপ বাসনা থাকিতে পারেনা ; বাসনা হইতেছে চেতনের ধর্ম্ম।

প্রশ্ন হইতে পারে, কিন্তু ঈশ্বরের চিন্ময়ী শক্তিতে শক্তিমতী হইয়া মায়া যখন জগতের সৃষ্টি করে, তখন তো তাহার মধ্যে সাময়িক ভাবে—যত দিন সৃষ্টি চলিতে থাকে, তত কাল পর্য্যন্ত—চিন্ময়ী শক্তির দ্বারা সঞ্চারিত সুখবাসনা থাকিতে পারে এবং সেই সুখবাসনাই মায়া সংসারী জীবে সঞ্চারিত করিতে পারে।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। সৃষ্টিকারিণী মায়ার যদি সুখবাসনা থাকিত, তাহা হইলে তাহার ভোক্তৃত্বও থাকিত ; সুখবাসনা ভোক্তৃত্ব জন্মাইবেই।

সুখবাসনা থাকিলেই ভোক্তৃত্ব বা ভোগযোগ্যতা থাকিবে। কিন্তু মায়ার ভোক্তৃত্বের বা ভোগক্ষমতার কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। শাস্ত্র মায়াকে সংসারী জীবের ভোগ্যাই বলিয়া গিয়াছেন। এজন্যই মায়াশক্তি হইতে জীবশক্তির উৎকর্ষ। "অপরেয়মিতস্ত্বন্যাং প্রকৃতিং বিদ্ধি মে পরাম্-"ইত্যাদি গীতাশ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন— অচেতনা মায়া বা প্রকৃতি চেতন জীবের ভোগ্যা বলিয়া এবং জীব তাহার ভোক্তা বলিয়াই মায়া হইতে জীবের উৎকর্ষ। 'ইতস্ত্বন্যামিতোঽচেতনায়াঃ চেতনভোগ্যভূতায়াঃ প্রকৃতের্ব্বিসজাতীয়াকারাং জীবভূতাং পরাং তস্যা ভোক্তৃত্বেন প্রধানভূতাং চেতনরূপাং মদীয়াং প্রকৃতিং বিদ্ধি।" শ্রীধরস্বামী, বলদেব, মধুসূদনাদি টীকাকারগণের অভিপ্রায়ও তদ্রূপ। ইহা হইতে জানা গেল —মায়ার সুখবাসনা বা ভোক্তৃশক্তি নাই; সুতরাং মায়া সংসারী জীবে সুখবাসনা সঞ্চারিত করিতে সমর্থা নহে।

উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—সংসারী জীবের সুখবাসনা আগন্তুকী নহে; আগন্তুকী না হইলেই ইহা হইবে তাহার স্বরূপগত বাসনা; সুতরাং শুদ্ধজীবেও সুখবাসনা আছে।

শুদ্ধ জীব হইতেছে চিদ্বস্তু; সুতরাং তাহার সুখবাসনা থাকা অস্বাভাবিক নহে। শুদ্ধজীবের জ্ঞাতৃত্ব এবং কর্তৃত্বও আছে। "জ্ঞঃ অতএব ॥ ২।৩।১৮ ॥"-ব্রহ্মসূত্র হইতে জীবের জ্ঞাতৃত্বের কথা এবং "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থবত্ত্বাৎ ॥ ২।৩।৩৩ ॥"-ব্রহ্মসূত্র হইতে জীবের কর্তৃত্বের কথা জানা যায়। স্বরূপে সুখবাসনা থাকিলেই জ্ঞাতৃত্বের ও কর্তৃত্বের ফলে সুখভোগ সম্ভবপর হইতে পারে। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা—মুক্ত পুরুষ সর্ব্বজ্ঞ ব্রহ্মের সহিত সমস্ত কাম্য বস্তু ভোগ করিয়া থাকেন", "স তত্র পর্য্যেতি জক্ষৎ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ—মুক্ত পুরুষ সে-স্থানে হাস্য, ক্রীড়া করিয়া আনন্দ অনুভব করেন", "রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি—রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইয়া জীব আনন্দী হয়" ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেই মুক্ত বা শুদ্ধ জীবের আনন্দ উপভোগের কথা জানা যায়। শুদ্ধজীবের যে সুখবাসনা আছে, ইহাই তাহার প্রমাণ।

আনন্দস্বরূপ, সুখস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সহিত জীবের অনাদিসিদ্ধ, নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ আছে বলিয়াই জীবের এই সুখবাসনা। এই বাসনাটী হইতেছে বাস্তবিক আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ, পরব্রহ্মের জন্যই, অন্য কোনও সুখের জন্য নহে। এই বাসনাটী নিত্য বলিয়া সংসারী জীবের মধ্যেও তাহা থাকিবে। কিন্তু এই বাসনাটী যে বস্তুতঃ আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্মের জন্যই, ব্রহ্মবিষয়ে অনাদি-অজ্ঞত্ববশতঃ সংসারী জীব তাহা বুঝিতে পারে না, মনে করে—মায়িক ভোগ্যবস্তুর জন্যই তাহার এই বাসনা। জীবকে তাহার কর্ম্মফল ভোগ করাইবার উদ্দেশ্যে মায়াও স্বীয় জীবমায়া-অংশে তাহার দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়া (অর্থাৎ তাহার বুদ্ধিকে তাহার দেহের দিকে পরিচালিত করিয়া) তাহার সুখবাসনাকেও প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর দিকে চালিত করিয়া থাকে। তাহার ফলেই সংসারে ভোগ্যবস্তুর উপ-ভোগে সংসারী জীবের আগ্রহ। কিন্তু তাহাতে তাহার স্বাভাবিকী সুখবাসনা চরমাতৃপ্তি লাভ করিতে পারে না। কেননা, জড় ভোগ্য বস্তু জড়বিরোধী চিদ্রূপ জীবাত্মার বাস্তব কাম্য হইতে পারে না।

স্বাভাবিকী সুখবাসনার তাড়নায় জীব চায়—বাস্তব সুখ। তাহা কিন্তু দেশে, কালে, বস্তুতে সীমাবদ্ধ প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে দুর্ল্লভ। কেননা, সুখবস্তুটী হইতেছে ভূমা, অসীম। সসীম (পরিচ্ছিন্ন) বস্তুতে অসীম সুখবস্তু কিরূপে পাওয়া যাইবে ? "নাল্পে সুখমস্তি" ; কেননা, বাস্তব-সুখ হইতেছে ভূমা, অসীম। "যো বৈ ভূমা তৎ সুখম্, নাল্পে সুখমস্তি, ভূমৈব সুখম্ ভূমাত্বেব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৭।২৩।১ ॥—যাহা ভূমা, তাহাই সুখ, অল্প বা সীমাবদ্ধ বস্তুতে সুখ নাই ; ভূমাই সুখ। অতএব ভূমা-সম্বন্ধেই জিজ্ঞাসা করা উচিত।"

ভূমা-সুখের জন্য জীবের স্বাভাবিকী বাসনা আছে বলিয়াই সেই বাসনার চরমা তৃপ্তির জন্য শ্রুতি ভূমার (আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্মের) অনুসন্ধানের উপদেশ দিয়াছেন—"ভূমা তু এব বিজিজ্ঞাসিতব্য ইতি।" তাৎপর্য্য এই যে, যদি জীব তাহার স্বাভাবিকী সুখবাসনার চরমাতৃপ্তি লাভ করিতে চায়, তাহা হইলে একমাত্র ভূমা সম্বন্ধেই (ভূমা তু এব) তাহার জিজ্ঞাসা করা—অনুসন্ধান করা—কর্ত্তব্য। সেই ভূমাস্বরূপ, আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্মব্যতীত অন্য কোনও বস্তুর অনুসন্ধানে তাহার সুখবাসনার চরমা তৃপ্তি লাভ হইবে না, সুখের অনুসন্ধানে দৌড়াদৌড়ি-ছুটাছুটিরও অবসান হইবে না। ইহাই শ্রুতিবাক্যস্থ "তু" এবং "এব" শব্দদ্বয়ের তাৎপর্য্য।

ভূমাস্বরূপ, রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইলেই যে জীবের স্বাভাবিকী সুখবাসনার মূল লক্ষ্য বস্তুটীকে পাওয়া যায় এবং তাহাতেই যে জীব তাহার অনাদিকাল হইতে অভীষ্ট সুখ বা আনন্দকে পাইয়া সুখী বা আনন্দী হইতে পারে, তাহাও শ্রুতি পরিষ্কার ভাবে বলিয়া গিয়াছেন।

"রসো বৈ সঃ। রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি॥ তৈত্তিরীয়॥ আনন্দ॥৭॥—তিনি রসস্বরূপ। রসস্বরূপকেই পাইয়াই জীব আনন্দী হয়।"

এই শ্রুতিবাক্যে দুইটী অবধারণাত্মক বা নিশ্চয়াত্মক অব্যয়-শব্দ আছে—"হি" এবং "এব"। ইহাদের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—রসস্বরূপকে পাইলেই জীব আনন্দী হইতে পারে, অন্য কোনও বস্তুকে পাইলে আনন্দী হইতে পারিবে না। ইহাতেই বুঝা যায়—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ ব্রহ্মই হইতেছে জীবের সুখবাসনার একমাত্র লক্ষ্য বস্তু, অন্য কিছু নহে। তাহার সুখবাসনার এই লক্ষ্য বস্তুটীকে পাইলেই জীব প্রকৃত-প্রস্তাবে "আনন্দী" হইতে পারে, অন্য কিছুতেই নহে এবং এই ভাবে "আনন্দী" হইলেই তাহার আর অপর কোনও কাম্য বস্তু থাকে না, কাম্যবস্তু লাভের জন্য আর ছুটাছুটিরও প্রয়োজন থাকে না।

পরব্রহ্ম আনন্দস্বরূপ। কিরূপ আনন্দ ? অপূর্ব্ব-আস্বাদন-চমৎকারিত্বময় আনন্দ—রসস্বরূপ। "রসে সারশ্চমৎকারো যং বিনা ন রসো রসঃ।"

আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্মের এই আনন্দ যে কিরূপ অনির্ব্বচনীয় এবং অপরিসীম, এই আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মলোকের আনন্দও যে অকিঞ্চিৎকর, তৈত্তিরীয়-শ্রুতি আনন্দমীমাংসায় তাহা জানাইয়াছেন (৮ম অনুবাক্) এবং সর্ব্বশেষে বলিয়া গিয়াছেন—"যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ॥

তৈত্তিরীয় ॥৯॥”-এই আনন্দ এমনি অপরিসীম যে, বাক্য এবং মনও ইহার সীমায় পৌঁছিতে পারে না, বাক্যদ্বারা ইহার সম্যক্ বর্ণন অসম্ভব, এমন কি মনও এই আনন্দের সম্যক্ ধারণা করিতে অসমর্থ।

এতাদৃশ আনন্দের জন্যই জীবস্বরূপের স্বাভাবিকী বাসনা। এই বাসনার চরিতার্থতাই হইতেছে জীবের পরমকাম্য, পরমপুরুষার্থ।

দুঃখ-নিবৃত্তি জীবের পরমার্থ নয়। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রাপ্তিতে, সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় দুঃখ আপনা হইতেই দূরীভূত হয়। তাহাও শ্রুতি পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া গিয়াছেন।

“আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ৯ ॥—ব্রহ্মের আনন্দকে জানিলে আর কোনও ভয়ই থাকে না।”

কেবলমাত্র দুঃখ-নিবৃত্তির পুরুষার্থতা – সুতরাং লোভনীয়তা—আছে বলিয়াও মনে হয় না।

সংসারী জীব সুখের জন্যই লালায়িত ; এজন্য দুঃখমিশ্রিত হওয়া সত্ত্বেও জীব সংসার-সুখ উপভোগ করিয়া থাকে। ইহাতেও তাহার স্বাভাবিকী সুখবাসনা সূচিত হইতেছে। দুঃখমিশ্রিত হইলেও সংসারে কিছু সুখ তো পাওয়া যায়। কিন্তু আত্যন্তিকী দুঃখ-নিবৃত্তিতে দুঃখের আত্যন্তিক অবসান হইতে পারে বটে, কিন্তু সুখ তো নাই। সুতরাং সুখলেশ-গন্ধশূন্যা আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির জন্য সাধনে অগ্রসর হওয়ার জন্য সংসারী লোক প্রলুব্ধ হইতে পারে না। অনির্ব্বচনীয় এবং অপরিমিত অবিমিশ্র সুখের আশাতেই সংসারের দুঃখমিশ্রিত স্বল্প-পরিমিত সুখ ত্যাগ করিতেও জীবের লোভ জন্মিতে পারে। আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তিতে জীবের স্বরূপগতা স্বাভাবিকী সুখবাসনার তৃপ্তি লাভ হইতে পারে না ; সুতরাং তাহার বাস্তব পুরুষার্থতাও থাকিতে পারে না।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, জীব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহারও পুরুষার্থতা উপপন্ন হয় না। যে জীবের মধ্যে স্বাভাবিকী সুখবাসনা নিত্য বিরাজিত, সেই জীব কিসের প্রলোভনে নিজেকে বিলুপ্ত করিতে চেষ্টা করিবে ?

এইরূপে দেখা গেল—একমাত্র **আনন্দস্বরূপ রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রাপ্তিই হইতেছে জীবের পরমার্থভূত বস্তু, অন্য কিছু নহে।**

দ্বিতীয় অধ্যায়
চতুর্ব্বর্গ

২। চারি পুরুষার্থ বা চতুর্ব্বর্গ

প্রশ্ন হইতে পারে—আনন্দস্বরূপ, রসস্বরূপ-ব্রহ্মপ্রাপ্তিই যদি জীবের পরম-পুরুষার্থ হয়, তাহা হইলে শাস্ত্রে আবার, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ-এই চারিটী পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে কেন ?

উল্লিখিত চারিটী পুরুষার্থ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করিলেই শাস্ত্রকর্তৃক তাহাদের উল্লেখের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে।

সংসারে নানারকমের লোক আছে; তাহাদের সকলের রুচি ও প্রবৃত্তি এক রকম নহে। মোটামুটী ভাবে তাহাদের কাম্য বস্তুকে চারি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। এই চারিটী শ্রেণীই হইতেছে চারিটী পুরুষার্থ - ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ।

পর পর উৎকর্ষের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া এই চারিটী পুরুষার্থের নাম লিখিতে গেলে—প্রথমে কাম, তাহার পরে অর্থ, তাহার পরে ধর্ম্ম এবং সর্ব্বশেষে মোক্ষের উল্লেখ করিতে হয়।

কাম বলিতে স্থূলতম উপায়ে কেবল স্থূল-ইন্দ্রিয়তৃপ্তির বাসনাকে বুঝায়। ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর যথেচ্ছ ভোগব্যতীত যাঁহারা আর কিছুই চাহেন না, তাঁহাদের অভীষ্ট বস্তুকেই প্রথম পুরুষার্থ কাম বলা যায়। পশুগণ এইরূপ ইন্দ্রিয়ভোগ ব্যতীত আর কিছুই জানে না। মানুষের মধ্যেও পশুপ্রকৃতি লোকের একান্ত অভাব নাই ; অথবা প্রত্যেক লোকের মধ্যেই পাশব-বৃত্তি অল্পবিস্তর দৃষ্ট হয়। যাঁহাদের মধ্যে সংযমের একান্ত অভাব, তাঁহারা এই পশুপ্রবৃত্তির দ্বারাই চালিত হইয়া থাকেন। এই শ্রেণীর লোকের সংযমহীন স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগবাসনাই তাঁহাদের পুরুষার্থ—কাম।

অর্থ। পূর্ব্বোল্লিখিত কামের পরবর্ত্তী পুরুষার্থ হইল অর্থ। অর্থ বলিতে সাধারণতঃ টাকা-পয়সা, বিষয়-সম্পত্তি-আদিকেই বুঝায়। এ-সমস্ত প্রাপ্তির ইচ্ছাই দ্বিতীয় পুরুষার্থ। ইহার উদ্দেশ্যও ইন্দ্রিয়-তৃপ্তিই ; কিন্তু স্থূল উপায়ে স্থূল ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তুর ভোগ অপেক্ষা ইহা একটু উন্নত ধরণের। পশু অর্থাদি চায় না, অর্থে তাহার প্রয়োজনও নাই ; স্বীয় শিশ্নোদরের তৃপ্তিতেই পশু সন্তুষ্ট। পশু-প্রকৃতি মানুষ অর্থ চাহিলেও তাহা কেবল স্থূল ভোগের জন্যই। কিন্তু এমন লোকও আছেন, যাঁহারা লোক-সমাজে মান-সম্মান, প্রসার-প্রতিপত্তি প্রভৃতি চাহেন। টাকা-পয়সা-বিত্তসম্পত্তি না থাকিলে তাহা পাওয়া যায় না। তাই তাঁহারা অর্থ চাহেন। এ-সকল লোক ইন্দ্রিয়-ভোগও চাহেন, অধিকন্তু মান-সম্মান-প্রসার-প্রতিপত্তি-আদি প্রাপ্তির অনুকূল অর্থাদিও চাহেন। ইন্দ্রিয়-ভোগের ব্যাপারেও তাঁহারা উপায়-সম্বন্ধে বিবেচনাশীল। দেহের, মনের এবং সমাজের স্বাস্থ্য

যাহাতে ক্ষুণ্ণ না হয়, সেদিকে তাঁহাদের দৃষ্টি থাকে। তাঁহাদের ভোগচেষ্টা একটা নীতির এবং সংযমের উপর প্রতিষ্ঠিত। তাই তাঁহাদের নৈতিক জীবনেরও অধঃপতনের সম্ভাবনা খুব কম। কখনও পদস্খলন হইলেও তাঁহারা অনুতপ্ত হয়েন এবং আত্মশোধনের চেষ্টা করেন। লোকসমাজে মান-সম্মানাদির প্রত্যাশা করেন বলিয়া তাঁহারা উচ্ছৃঙ্খলতা হইতে দূরে থাকিতে চেষ্টা করেন। জন-হিতকর কার্য্যেও তাঁহারা যথাসাধ্য আনুকূল্য করিতে চেষ্টা করেন। কিন্তু এজন্য অর্থের প্রয়োজন। আর সমাজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে উল্লিখিতরূপ জীবনযাত্রা নির্ব্বাহই একতম প্রধান লক্ষ্য (বা অর্থ) বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে। এজন্য এই শ্রেণীর লোকদের পুরুষার্থকে বলা যায়—**অর্থ**।

উল্লিখিত দুই শ্রেণীর লোকের মধ্যে, প্রথমোক্ত শ্রেণীর লোক কেবল শিশ্নোদরাদি স্থূল ইন্দ্রিয়ের সুখের জন্যই ব্যস্ত; উপায়-সম্বন্ধেও তাঁহারা বিশেষ সাবধান নহেন; নীতি বা সংযমাদির অপেক্ষাও তাঁহারা বিশেষ কিছু রাখেন না। আর, দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকগণও স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভোগ চাহেন; কিন্তু উপায় সম্বন্ধে তাঁহারা সাবধান; তাঁহারা নীতি ও সংযমাদির অপেক্ষা রাখেন। আবার, কেবল স্থূল ইন্দ্রিয়ের ভোগেই তাঁহারা তৃপ্ত নহেন; সূক্ষ্ম ইন্দ্রিয়ের ভোগও তাঁহাদের অভীপ্সিত; সমাজ-সেবা, পরোপকারাদিদ্বারা চিত্তের প্রসন্নতা-বিধানও তাঁহাদের কাম্য। এই দুই শ্রেণীর লোক পরকালের কথা চিন্তা করেন না; উভয়ই ইহকাল-সর্ব্বস্ব।

ধর্ম্ম। আর এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা উল্লিখিত দ্বিতীয় শ্রেণীর অনুরূপ ভোগও চাহেন এবং তদতিরিক্ত আরও কিছু চাহেন। তাঁহারা কেবল ইহকালের ভোগেই তৃপ্ত নহেন। মৃত্যুর পরে পরকালে, স্বর্গাদি-লোকের সুখ-ভোগও তাঁহাদের কাম্য। পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখভোগ পাইতে হইলে শাস্ত্রবিহিত ধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন। শাস্ত্র বলেন—স্বধর্ম্মের (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের) অনুষ্ঠানে ইহকালের সুখ-সম্পদ্ এবং পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ পাওয়া যাইতে পারে। তাই স্বধর্ম্মানুষ্ঠানই তাঁহাদের লক্ষ্য। ইঁহাদের পুরুষার্থকে বলা যায় ধর্ম্ম।

এ-স্থলে যে তিনটী পুরুষার্থের কথা বলা হইল, তাহাদের পর্য্যবসান কেবলমাত্র দেহের সুখে, বা দেহস্থিত ইন্দ্রিয়ের সুখে। স্বর্গসুখও দেহেরই সুখ। বেদবিহিত পুণ্যকর্ম্মের ফলে লোক ব্রহ্মলোকেও যাইতে পারে, ব্রহ্মলোকের সুখও উপভোগ করিতে পারে; কিন্তু তাহাও কেবল দেহেরই সুখ। পুণ্যকর্ম্ম-লব্ধ স্বর্গসুখ বা ব্রহ্মলোকের সুখও কিন্তু অনিত্য। যে পর্য্যন্ত পুণ্যকর্ম্মের ফল বিদ্যমান থাকে, সে-পর্য্যন্তই এ-সকল লোকে থাকা যায়; পুণ্য শেষ হইয়া গেলে—ভোগের সঙ্গে সঙ্গেই পুণ্য ক্রমশঃ ক্ষয়প্রাপ্ত হইতে থাকে; কেননা, পুণ্য হইতেছে ক্ষয়শীল জড়বস্তু; এই পুণ্য সম্পূর্ণরূপে ক্ষয়-প্রাপ্ত হইয়া গেলে—আবার এই মর্ত্ত্যলোকে ফিরিয়া আসিতে হয়। "ক্ষীণে পুণ্যে মর্ত্ত্যলোকং বিশন্তি॥ গীতা॥—পুণ্য ক্ষয় হইয়া গেলে আবার মর্ত্ত্য-

লোকে আসিয়া থাকে।", "আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ॥ গীতা ॥ ৮।১৬॥—হে অর্জ্জুন ! ব্রহ্মলোক পর্য্যন্ত সমস্তলোকবাসীদিগকেই পুনরাবর্ত্তন করিতে হয়।" আবার, এই মর্ত্ত্যলোকের বা সংসারের সুখও অবিমিশ্র নয় —দুঃখমিশ্রিত, পরিণাম-দুঃখময় এবং অনিত্য—বড় জোর মৃত্যুপর্য্যন্ত স্থায়ী। শাস্ত্রাদি হইতে জানা যায়—স্বর্গসুখও অবিমিশ্র নয়; স্বর্গেও কিছু দুঃখ আছে—অসুরাদি হইতে ভয়, ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয়ের (বা নৈমিত্তিক প্রলয়ের) ভয়। ব্রহ্মার দৈনন্দিন প্রলয়ে স্বর্গপর্য্যন্ত নিম্নস্থিত সমস্ত লোক ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় (৩।২৯—অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বাস্তবিক উল্লিখিত তিন রকম পুরুষার্থের বাস্তব পুরুষার্থতাও নাই। কেননা, পুরুষ বা জীব চায়—দুঃখলেশহীন অবিচ্ছিন্ন নিত্য সুখ। উল্লিখিত পুরুষার্থত্রয়ে তাহা পাওয়া যায় না।

মোক্ষ। উল্লিখিত বিষয়সমূহ চিন্তা করিয়া যাঁহারা উক্ত পুরুষার্থত্রয়ের প্রতি লুব্ধ হয়েন না, এমন এক শ্রেণীর লোকও আছেন। অবশ্য তাঁহাদের সংখ্যা হয়তো খুবই কম। "মনুষ্যাণাং সহস্রেষু কশ্চিৎ যততি সিদ্ধয়ে ॥ গীতা ॥ ৭।৩॥—সহস্র সহস্র মানুষের মধ্যেও একজন সিদ্ধিলাভের জন্য চেষ্টা করিয়া থাকেন।" তাঁহারা খোঁজেন এমন একটী সুখ, যাহা ধর্ম্ম-অর্থ-কামজনিত সুখের ন্যায় দুঃখ-সঙ্কুলও নয়, অনিত্যও নয়। তাঁহারা আরও ভাবেন—ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-জনিত সুখ হইল দেহের সুখ; দেহ অনিত্য, দেহের সুখও হইবে অনিত্য। যতদিন অনিত্য দেহের সহিত সম্বন্ধ থাকিবে, ততদিন জীব নিত্যসুখ পাইতে পারে না। অনিত্য দেহের সহিত সম্বন্ধের ছেদন কিসে হইতে পারে? মায়ার বন্ধনে আছে বলিয়াই মায়িক অনিত্য দেহের সহিত জীবের সম্বন্ধ। মায়ার বন্ধন ঘুচাইতে পারিলেই অনিত্য দেহের সহিত জীবের সম্বন্ধের অবসান হইতে পারে, নিত্য সুখের সন্ধান মিলিতে পারে।

উল্লিখিতরূপ চিন্তা করিয়া তাঁহারা মায়ার বন্ধন ঘুচাইবার জন্য চেষ্টা করেন। বন্ধন ঘুচানের নামই মুক্তি বা মোক্ষ। ইহাই তাঁহাদের কাম্য। এজন্য এই শ্রেণীর লোকদের পুরুষার্থকে বলে **মোক্ষ**।

যাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন, তাঁহাদের আর সংসারে আসিতে হয় না, জন্ম-জরা-ব্যাধি-মৃত্যু আদির দুঃখও ভোগ করিতে হয় না। শুদ্ধজীব-স্বরূপে তাঁহারা আনন্দস্বরূপ রসস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবানের সহিত মিলিত হয়েন। তাঁহাদের সুখ নিত্য, নিরবচ্ছিন্ন, দুঃখ-গন্ধ-লেশশূন্য। সুতরাং মোক্ষের বাস্তব-পুরুষার্থতা আছে।

উল্লিখিত চারিবিধ পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষেরই শ্রেষ্ঠত্ব, বাস্তব-পুরুষার্থতা। কামই যাঁহাদের পুরুষার্থ, জগতে তাঁহাদের সংখ্যাই সর্ব্বাধিক। অর্থ যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের সংখ্যা আরও কম। ধর্ম্ম যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের সংখ্যা তদপেক্ষাও কম। আর মোক্ষ যাঁহাদের পুরুষার্থ, তাঁহাদের সংখ্যা খুবই কম। অধিকাংশ লোকেরই মিশ্রপুরুষার্থ।

এই চারিটী পুরুষার্থকে **চতুর্ব্বর্গও** বলা হয়।

৩। চারিপুরুষার্থের পর্য্যায়-ক্রম

ক্রমোৎকর্ষের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই উল্লিখিত আলোচনায় কাম, অর্থ, ধর্ম্ম ও মোক্ষ—এইরূপ ক্রম করা হইয়াছে। শাস্ত্রকারগণের ক্রম কিন্তু অন্য রকম—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। জীবের কল্যাণের জন্যই এইরূপ ক্রম করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়।

যাঁহারা দেহসুখব্যতীত অন্য কিছু জানেন না, জানিতে চেষ্টাও করেন না, দৈহিক-সুখাদির জন্যই যদি তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে ধর্ম্মকে (স্বধর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে) আশ্রয় করেন, তাহা হইলে অর্থ ও কাম-উভয়ই তাঁহারা পাইতে পারেন ; কেননা, স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানে ইহ কালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য এবং পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখও পাওয়া পায়। অধিকন্তু বেদের আশ্রয়ে থাকিলে সংযমাদিও ক্রমশঃ তাঁহাদের অভ্যস্ত হইয়া পড়িতে পারে এবং চিত্ত-শুদ্ধির সম্ভাবনাও থাকে। চিত্ত-শুদ্ধি হইলে কোনও ভাগ্যে মোক্ষ-সম্বন্ধেও তাঁহাদের অনুসন্ধিৎসা জাগিতে পারে। শাস্ত্রকথিত পর্য্যায়ের এইরূপ সম্ভাবনা—মঙ্গলের দিকে ক্রমশঃ অগ্রসর হওয়ায় সম্ভাবনা—আছে।

স্বধর্ম্মাচরণের ফলে অর্থ-কামাদি লাভ হইলেও তৎসমস্ত কিন্তু স্বধর্ম্মাচরণের মুখ্য ফল নহে। এই গুলিকেই মুখ্য ফল বলিয়া যাঁহারা মনে করেন, তাঁহারা বঞ্চিতই হয়েন ; কেননা, কোনও সময়েই তাঁহাদের সংসার-বাসনার নিবৃত্তি হইতে পারেনা। ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে অর্থ, অর্থের ফলে কাম বা ভোগ্য বস্তু, তাহার ফলে ইন্দ্রিয়-প্রীতি। তাহার ফলে আরও ভোগ্য বস্তু পাওয়ার জন্য বাসনা বর্দ্ধিত হয়। কেননা, ভোগে কখনও বাসনার নিবৃত্তি হয়না। "ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি। হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয় এবাভিবর্দ্ধতে॥ শ্রীভা, ৯।১৯।14॥—ঘৃতের দ্বারা অগ্নি যেমন প্রশমিত হয় না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হয়, তদ্রূপ ভোগের দ্বারাও ভোগবাসনা প্রশমিত হয়না, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।" ভোগ্য বস্তুর জন্য বাসনা বর্দ্ধিত হইলেই আবার স্বধর্ম্মানুষ্ঠানের প্রবৃত্তি জাগে। অনুষ্ঠানের ফলে আবার অর্থ ও কাম। এইরূপেই পরম্পরাক্রমে চলিতে থাকে। "অন্যে তু মন্যন্তে ধর্ম্মস্যার্থঃ ফলম্, তস্য চ কামঃ ফলম্, তস্য চেন্দ্রিয়প্রীতিঃ। প্রীতেশ্চ পুনরপি ধর্ম্মার্থাদি-পরম্পরেতি॥ শ্রীভা, ১।২।৯-শ্লোকটীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ।" যাঁহারা এইরূপ পরম্পরার অনুসরণ করেন, তাঁহাদিগকে সংসার-সমুদ্রেই থাকিতে হয়।

শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—ধর্ম্মের ফল অর্থ নহে, অর্থের ফলও কাম নহে, কামের ফলও ইন্দ্রিয়তৃপ্তি নহে ; যে পর্য্যন্ত জীবিত থাকা যায়, সে পর্য্যন্তই এ-সমস্ত ফল। ধর্ম্মকর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি-লাভের যে প্রসিদ্ধি আছে, তন্মাত্রই ধর্ম্মকর্ম্মের ফল নহে। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই হইতেছে ফল।

ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥
কামস্য নেন্দ্রিয়প্রীতির্লাভো জীবেত যাবতা। জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥
শ্রীভা, ১।২।৯-১০॥

তাৎপর্য্য এইরূপ। ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য = হ্যাপবর্গস্য ধর্ম্মস্য। হ্যাপবর্গস্য = হি + আপবর্গস্য।

আপবর্গস্য = আ + অপবর্গস্য = অপবর্গ (মোক্ষ) পর্য্যন্ত যে ধর্ম্ম। স্বধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া মোক্ষধর্ম্ম পর্য্যন্ত যত রকম ধর্ম্ম আছে, তাহাদের ফল কামাদি—ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তু এবং ভোগে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ—নহে। কেননা, যত কাল জীবিত থাকা যায়, তত কালই ভোগ্যবস্তুর ভোগে ইন্দ্রিয়তৃপ্তি লাভ হইতে পারে ; এ-সমস্ত অল্পকালস্থায়ী। স্বর্গপ্রাপ্তিও ধর্ম্মের ফল নহে ; স্বর্গলাভও অল্পকালস্থায়ী, অনিত্য। অনিত্য বস্তু ধর্ম্মের ফল হইতে পারেনা। ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে উল্লিখিতরূপ অনিত্য বস্তুও লাভ হইতে পারে ; কিন্তু তাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানের মুখ্য ফল নহে। কেননা, ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী নিত্য সুখই চাহেন ; নিত্য সুখ কাম্য বলিয়া তাহাই ধর্ম্মের বাস্তবিক ফল। নিত্য সুখ পাওয়া যায়—মোক্ষে, ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে ; সুতরাং ধর্ম্মের মুখ্য ফল হইতেছে তত্ত্বজিজ্ঞাসা। যে পর্য্যন্ত ভগবত্তত্ত্ব-জিজ্ঞাসা না জাগিবে, সেই পর্য্যন্তই বুঝিতে হইবে—ধর্ম্মের মুখ্য ফল এখনও অনাগত।

ব্যতিরেকী ভাবেও শ্রীমদ্‌ভাগবত তাহা জানাইয়াছেন।

ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বক্‌সেনকথাসু যঃ।
নোৎপাদয়েদ্ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥

শ্রীভা, ১।২।৮ ॥

তাৎপর্য্য। সুষ্ঠুরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াও ধর্ম্ম যদি ভগবৎ-কথাদিতে রতি না জন্মাইতে পারে (অর্থাৎ ধর্ম্মানুষ্ঠানে যদি ভগবৎ-কথায় রতি না জন্মে), তাহা হইলে সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান কেবল শ্রমমাত্রেই পর্য্যবসিত হয়।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শাস্ত্রকথিত ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—চতুর্ব্বর্গের এইরূপ ক্রমের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ। লোক অর্থ ও কাম চাহে বটে ; কিন্তু ধর্ম্ম (স্বধর্ম্ম) হইতেও অর্থ ও কাম পাওয়া যায়, স্বর্গাদিও পাওয়া যায় ; তাহাতে সংযমের এবং চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনাও আছে। সুতরাং ধর্ম্মকে আশ্রয় করিয়াই অর্থ-কামাদি লাভের চেষ্টা করা সঙ্গত। দেহাত্মবুদ্ধি এবং দেহসুখ-সর্ব্বস্ব জীবকে সৎপথে রাখিবার জন্য শাস্ত্রের এইরূপ করুণামূলক বিধান। ইহার পরে করুণাবশতঃ শাস্ত্র আরও বলিয়াছেন—ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে অর্থ-কামাদি লাভ হইতে পারে বটে ; কিন্তু অর্থ-কামাদিকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফল—অর্থাৎ একমাত্র বা মুখ্য ফল—মনে করা সঙ্গত নয়। কেননা, অর্থ-কামাদি, এমন কি স্বর্গও, অনিত্য। ধর্ম্মানুষ্ঠানকারী অনিত্য ফল চাহেননা, নিত্য ফল—নিত্য সুখই—তাঁহার কাম্য। তজ্জন্য প্রয়োজন মোক্ষ। মোক্ষ-লাভের জন্য প্রয়োজন তত্ত্ব-জ্ঞান—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞান এবং নিজের স্বরূপেরও জ্ঞান। এই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইলেই জীব বুঝিতে পারিবে—মায়াবন্ধনের ফলে দেহাত্মবুদ্ধি জন্মিয়াছে বলিয়াই জীব দেহের সুখের জন্য লালায়িত হইতেছে ; তাহার সুখবাসনার মুল লক্ষ্য হইতেছে কিন্তু সুখস্বরূপ পরব্রহ্ম। মায়ামুগ্ধতাবশতঃ জীব তাহা বুঝিতে পারেনা। বুঝিতে পারেনা বলিয়া—স্বরূপতঃ যাহা সুখস্বরূপ পরব্রহ্মের জন্য বাসনা, তাহাকে দেহ-সুখের বাসনামাত্র মনে করিয়া—জীব দেহসুখ-লাভের জন্য ধর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হয়। সেই ধর্ম্মানুষ্ঠান যদি জানাইতে পারে

যে—তাহার এই সুখবাসনা হইতেছে বাস্তবিক সুখস্বরূপ-পরব্রহ্মের জন্য বাসনা, তাহা হইলেই ধর্ম্মানুষ্ঠান সার্থক হইতে পারে। এজন্য শাস্ত্র বলিয়াছেন—তত্ত্ব-জিজ্ঞাসাই হইতেছে ধর্ম্মের ফল—মুখ্য ফল। এ রূপে দেখা গেল—দেহ-সুখ-লুব্ধ সংসারী জীবকে ধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতে বলিয়াও শাস্ত্র কৃপা করিয়া জানাইয়াছেন, ধর্ম্মানুষ্ঠানের ফলে অর্থ-কামাদি বা স্বর্গাদি লাভ হইলেও জীব যেন এই অর্থ-কামাদিগকেই ধর্ম্মানুষ্ঠানের একমাত্র বা মুখ্য ফল বলিয়া মনে না করে, তত্ত্বজিজ্ঞাসাকেই যেন মুখ্য ফল বলিয়া মনে করে। তত্ত্বজিজ্ঞাসাই জীবকে মোক্ষের দিকে লইয়া যাইবে। শাস্ত্রের উল্লিখিত ক্রমের পর্য্যবসান হইতেছে মোক্ষে।

এ-স্থলে ইহাও জানা গেল যে, মোক্ষেরই বাস্তবিক পুরুষার্থতা আছে, ধর্ম্মার্থ-কামের বাস্তব পুরুষার্থতা নাই।

ক। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষের সহায়কও নহে

উল্লিখিত আলোচনা হইতে ধর্ম্মাদিকে (বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদিকে) মোক্ষের সহায় বলিয়াও মনে হইতে পারে ; কিন্তু তাহারা বাস্তবিক মেক্ষের সহায় নহে। কেননা, মৈত্রেয়ী শ্রুতি বলেন—

বর্ণাশ্রমাচারযুতা বিমূঢ়াঃ কর্ম্মানুসারেণ ফলং লভন্তে।
বর্ণাদিধর্ম্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি ॥১।১৩॥

—বিমূঢ় লোকগণ বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের আচরণ করিয়া কর্ম্মানুযায়ী ফল (অর্থ, কাম, স্বর্গাদি) লাভ করিয়া থাকে। বণাদিধর্ম্ম পরিত্যাগ করিলেই জীব স্বানন্দতৃপ্ত হইতে পারে।"

এই শ্রুতিবাক্যে বলা হইয়াছে—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদি পরিত্যাগ করিলেই জীব স্বীয় স্বরূপের অভীষ্ট আনন্দ লাভ করিতে পারে ; সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদি যে পরমার্থলাভের সহায় নয়, তাহাই বুঝা যায়। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণও শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায় বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥—বর্ণাশ্রমাদি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া এক মাত্র আমার শরণাপন্ন হও।"

যাঁহারা বিমূঢ়, মায়ামুগ্ধ—সুতরাং দেহসুখ-সর্ব্বস্ব—কেবল মাত্র তাঁহাদিগকে লক্ষ্য করিয়াই ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-এই ক্রমের কথা বলা হইয়াছে। প্রথমেই মোক্ষের কথা যাঁহারা চিন্তা করিতে অসমর্থ, তাঁহাদের জন্যই উল্লিখিতরূপ ব্যবস্থা। তাঁহাদের চিত্তেও যখন তত্ত্বজিজ্ঞাসা জাগিবে, তখন তাঁহারাও বর্ণাশ্রমাদি ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র মোক্ষ-প্রাপক ধর্ম্মের অনুষ্ঠানে রত হইবেন।

কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম ত্যাগেরও অধিকার-বিচার আছে ; পরে তাহা বিবৃত হইবে (৫।২৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম সাক্ষাদ্ভাবে মোক্ষের সহায়ক না হইলেও মোক্ষপথে অগ্রসর হওয়ার আনুকূল্য করিতে পারে (৫।২৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

তৃতীয় অধ্যায়
পঞ্চবিধা মুক্তি

৪। মোক্ষের প্রকার-ভেদ

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে,—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গের মধ্যে একমাত্র মোক্ষেরই বাস্তব পুরুষার্থতা আছে। কেননা, মোক্ষে নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ আছে, আনুষঙ্গিক ভাবে দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তিও আছে।

মোক্ষ এবং মুক্তি একই—মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি। যতদিন পর্য্যন্ত জীবের স্বল্পমাত্রও মায়াবন্ধন থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্তই তাহাকে সংসারে পুনরাবর্ত্তন করিতে হইবে। স্বধর্ম্মাদির অনুষ্ঠানে ব্রহ্মলোকেও হয়তো যাইতে পারে ; কিন্তু মায়াবন্ধন থাকিলে ব্রহ্মলোক হইতেও এই মর্ত্ত্যলোকে আবার ফিরিয়া আসিতে হয়।

"আব্রহ্মভুবনাল্লোকাঃ পুনরাবর্ত্তিনোঽর্জ্জুন ॥ গীতা ॥ ৮।১৬॥"

মোক্ষ বা মুক্তি লাভ করিলে আর ফিরিয়া আসিতে হয় না। সুতরাং মুক্তির লক্ষণ হইল—অনাবৃত্তি, সংসারে গতাগতির অবসান। যে পর্য্যন্ত পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে পাওয়া না যাইবে, সে-পর্য্যন্তই সংসারে গতাগতি ; তাঁহাকে পাইলেই আর সংসারে ফিরিয়া আসিতে হয় না।

পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে তাহাই বলিয়াছেন ঃ—

"অপ্রাপ্য মাং নিবর্ত্তন্তে মৃত্যুসংসারবর্ত্মনি ॥ গীতা ॥ ৯।৩ ॥

—আমাকে না পাইয়া মৃত্যুসমাকুল সংসার-পথে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া থাকে।"

"মামুপেত্য তু কৌন্তেয় পুনর্জ্জন্ম ন বিদ্যতে ॥ গীতা ॥ ৮।১৬ ॥

—হে কৌন্তেয়! আমাকে পাইলে কিন্তু আর পুনর্জ্জন্ম থাকে না।"

শ্রুতি বলেন—পরাবিদ্যার ফলেই মোক্ষ লাভ হইতে পারে। পরাবিদ্যায় অক্ষর ব্রহ্মের প্রাপ্তি হয়। "পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ মুণ্ডকশ্রুতি ॥ ১।১।৫ ॥ —পরাবিদ্যা, যদ্দ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মকে প্রাপ্ত হওয়া যায়।" "অধিগম্যতে"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—"প্রাপ্যতে" ; কেননা, অধিপূর্ব্বক গম্-ধাতুর অর্থ—প্রাপ্তি।

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—পরব্রহ্ম ভগবানের প্রাপ্তিতেই মোক্ষ বা মুক্তি। যে-কোনও রকম প্রাপ্তিতেই মুক্তি।

৫। ভগবৎপ্রাপ্তির বিভিন্নতা

কিন্তু যে কোনও রকম "প্রাপ্তি" আবার কি? পরব্রহ্ম ভগবান্ তো এক এবং অদ্বিতীয় একই বস্তুর প্রাপ্তি আবার ভিন্ন ভিন্ন রকমের কিরূপে হইতে পারে? তাহা কেবল একরূপই হইবে।

একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাওয়া অসম্ভবও নয়, অসঙ্গতও নয়। এক জনে অবশ্য ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাইতে পারে না ; কিন্তু ভিন্ন ভিন্ন লোক একই বস্তুকে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাইতে পারে। লৌকিক জগতে দেখা যায়—একই পুরুষকে কেহ পুত্ররূপে, কেহ পতিরূপে, কেহ ভ্রাতারূপে, কেহ বা বন্ধুরূপে পাইয়া থাকেন। পুত্ররূপে, পতিরূপে, ভ্রাতারূপে, বন্ধুরূপে পাওয়া ঠিক এক রকমের প্রাপ্তি নহে, এ সকল প্রাপ্তি ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্তি। যাঁহারা সেই একই পুরুষকে এ-সকল ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাইয়া থাকেন, তাঁহার সহিত তাঁহাদের আচরণাদিও ভিন্ন ভিন্ন ; ভিন্ন ভিন্ন ভাবেই তাঁহারা তাঁহার প্রীতিবিধান করিতে চেষ্টা করেন ; সেই একই পুরুষের সম্বন্ধে তাঁহাদের অবস্থানাদিও ঠিক একইরূপ নহে।

তদ্রূপ, পরব্রহ্ম ভগবান্ এক এবং অদ্বিতীয় হইলেও ভিন্ন ভিন্ন জীব তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাইতে পারেন ; ইহা অসম্ভব নহে।

যদি বলা যায়—পূর্ব্বোল্লিখিত পুরুষের দৃষ্টান্তে একই পুরুষের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন ভাব—পুত্রভাব, পতিভাব, ভ্রাতৃভাব, বন্ধুভাব-ইত্যাদি ভিন্ন ভিন্ন ভাব—বর্ত্তমান আছে বলিয়াই তাঁহাকে ভিন্ন ভিন্ন লোক ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাইতে পারেন। কিন্তু রসস্বরূপ পরব্রহ্ম হইতেছেন—একরস। তাঁহাকে কিরূপে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে পাওয়া যাইবে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। শ্রুতি পরব্রহ্মকে রসস্বরূপ বলিয়াছেন। "রসো বৈ সঃ।" রস-স্বরূপে তিনি এক এবং অদ্বিতীয়। কিন্তু তাঁহার এই "এক রসই" অনন্ত-বৈচিত্র্যময়। এজন্য শ্রুতি তাঁহাকে "সর্ব্বরসঃ" ॥ (ছান্দোগ্য ॥ ৩।১৪॥) বলিয়াছেন। একাধিক রস-বৈচিত্র্যের অভাবে "সর্ব্ব"-শব্দের সার্থকতা থাকে না। রসস্বরূপ ভগবান্ অনন্ত-রস-বৈচিত্র্যময়, অশেষ-রসামৃত-বারিধি। ভিন্ন ভিন্ন জীব রসস্বরূপ পরব্রহ্মের ভিন্ন ভিন্ন রস-বৈচিত্রীর উপলব্ধির জন্য বাসনা পোষণ করিতে পারেন এবং সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে ভিন্ন ভিন্ন রসবৈচিত্রীকে পাইতে পারেন। ভিন্ন ভিন্ন রসবৈচিত্রীর প্রাপ্তিই হইতেছে একই রসস্বরূপের ভিন্ন ভিন্ন রূপ প্রাপ্তি। অনন্ত-রসবৈচিত্রীর অবস্থান একই রসস্বরূপের মধ্যেই। সুতরাং বিভিন্ন লোকের পক্ষে ব্রহ্মের বিভিন্ন রস-বৈচিত্রীর প্রাপ্তিও একই রসস্বরূপ পরব্রহ্মেরই প্রাপ্তি।

স্মৃতি-শ্রুতি অনুসারে পরব্রহ্ম ভগবান্ যেমন একেই বহু, আবার বহুতেও এক (১।১।৭৯-৮৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তেমনি একরস হইয়াও তিনি "সর্ব্বরসঃ" এবং "সর্ব্বরসঃ" হইয়াও একরস।

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥ গীতা ৪।১১॥", "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠশ্রুতিঃ ॥ ১।২।১৬॥" ইত্যাদি স্মৃতি-শ্রুতি-বাক্য হইতেও জানা যায়—মুক্ত জীব ব্রহ্মকে বিভিন্ন ভাবে পাইতে পারেন।

সুতরাং ভগবৎ-প্রাপ্তির বিভিন্নতা শাস্ত্রসম্মত।

৬। বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বাসনার স্বরূপভূততা

প্রশ্ন হইতে পারে, বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন স্বরূপভূত বাসনা থাকিলেই বিভিন্ন ভাবে একই পরব্রহ্মকে পাইতে পারে। কিন্তু সকল জীবই যখন পরব্রহ্ম ভগবানের একই জীবশক্তির অংশ, তখন সকলেরই একইরূপ বাসনা থাকাই সম্ভবপর বলিয়া মনে হয় ; তাঁহাদের মধ্যে বিভিন্নরূপ বাসনা কিরূপে থাকিতে পারে ?

উত্তরে বক্তব্য এই। এই সংসারে যে বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বাসনা আছে, সকলের বাসনা যে সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে, ইহা প্রত্যক্ষদৃষ্ট। আবার, জীবের বাসনা যে তাহার স্বরূপভূত, ইহা যে আগন্তুক কোনও বস্তু নহে, তাহাও পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে (৫।১-অনুচ্ছেদে)। সুতরাং বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বাসনাও তাহাদের স্বরূপভূত।

বলা যাইতে পারে—জীবের বাসনা-বস্তুটী তাহার স্বরূপভূত নিত্য বস্তু হইতে পারে। সকল জীব যখন স্বরূপতঃ একই জীবশক্তি, তখন তাহাদের স্বরূপভূতা বাসনাও একরূপই হইবে। কেবল সংসারী অবস্থায় জীব যখন বিভিন্ন ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর ভোগের জন্য লালায়িত হয়, তখনই তাহার একই বাসনা নানাবিধ বৈচিত্রী ধারণ করে। সংসারমুক্ত হইয়া গেলে বাসনার বৈচিত্রী থাকিবে না ; তখন সকলের বাসনাই একরূপ হইবে।

এ-স্থলে বিবেচ্য এই। সংসারী জীব বিভিন্ন ভোগ্যবস্তুর জন্য লালায়িত হয় কেন ? পূর্ব্ব-সঞ্চিত-কর্ম্মফলজাত সংস্কারের বিভিন্নতা বশতঃই এইরূপ হয়। পূর্ব্বসঞ্চিত বিভিন্ন কর্ম্ম বিভিন্ন সংস্কার জাগায়। কিন্তু জীব বিভিন্ন কর্ম্ম কেন করে ? কর্ম্ম যখন অনাদি, তখন কর্ম্মের বিভিন্নতাও অনাদি। তাহাতে বুঝা যায়, অনাদিকাল হইতেই জীব বিভিন্ন কর্ম্ম করিয়া আসিতেছে। বিভিন্ন কর্ম্মের বাসনাও হইবে বিভিন্ন প্রকারের। ইহাতেই বুঝা যায়—অনাদি কাল হইতেই বিভিন্ন জীবের বাসনা বিভিন্ন প্রকারের। অবশ্য অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ জীবসমূহের বাসনার বিভিন্নতা অনাদি হইলেই যে এই বিভিন্নতা তাহাদের স্বরূপভূত, তাহা বলা যায় না ; তাহা আগন্তুকও হইতে পারে। জীবের মায়াবন্ধনও অনাদি ; কিন্তু তাহা তাহার স্বরূপভূত নহে, আগন্তুক মাত্র। কিন্তু সংসারী জীবের বাসনার বিভিন্নতা যে স্বাভাবিকী, আগন্তুকী নহে, শাস্ত্র হইতে তাহা জানা যায়। শাস্ত্র বলেন—বিভিন্ন মুক্তজীব বিভিন্নভাবে পরব্রহ্মকে প্রাপ্ত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে"-ইত্যাদি গীতা বাক্য, এবং "যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ"-ইত্যাদি কঠ-শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। সূত্রকার ব্যাসদেবও তাঁহার ব্রহ্মসূত্রের সর্ব্বশেষ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—মুক্তজীব তাঁহার ইচ্ছানুসারে সেবার উপযোগী দেহ লাভ করিতে পারেন, তদ্রূপ ইচ্ছা না থাকিলে সূক্ষ্ম অণুরূপেও অবস্থান করিতে পারেন। ইহাতেও বিভিন্ন মুক্ত জীবের বিভিন্ন বাসনার কথা জানা যায়। মুক্তজীবের বাসনার বিভিন্নতা হইবে স্বাভাবিকী ; কেননা, মুক্ত অবস্থায় জীবের মধ্যে আগন্তুকী কোনও বাসনা থাকিতে পারে না।

জীব যখন স্বরূপতঃ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস (২।২৯ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য), তখন বিভিন্ন

জীবের বিভিন্ন বাসনা, এমন কি একই জীবেরই বিভিন্ন বাসনা, থাকা স্বাভাবিক। তাহা না হইলে কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী কৃষ্ণসেবাই সম্ভবপর হইতে পারে না। একথা বলার হেতু প্রদর্শিত হইতেছে।

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম স্বয়ংরূপে এবং বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপরূপে অনাদিকাল হইতেই অনন্ত-লীলারস-বৈচিত্রী আস্বাদন করিতেছেন। তাঁহার লীলা অনন্ত; এই অনন্তলীলার প্রত্যেক লীলাতেই তাঁহার পরিকরবৃন্দ তাঁহার সেবা করিতেছেন। তাঁহাদের সেবা-বাসনা বৈচিত্র্যময়ী না হইলে অনন্ত-বৈচিত্র্যময়ী লীলাতে তাঁহার সেবা সম্ভবপর হইতে পারে না। এই সমস্ত লীলার পরিকররূপে নিত্যমুক্ত জীবগণও আছেন; সুতরাং তাঁহাদের সেবাবাসনাও হইবে বৈচিত্র্যময়ী, কেবল একরূপা হইতে পারে না। "সোঽশ্নুতে সর্ব্বান্ কামান্ সহ ব্রহ্মণা বিপশ্চিতা ॥ তৈত্তিরীয়-শ্রুতিঃ॥ আনন্দবল্লী॥ ১।২॥"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায় –"মুক্তজীব সর্ব্বজ্ঞ পরমেশ্বরের সহিত সমস্ত কাম্যবিষয় ভোগ করেন।" ভক্তচিত্ত-বিনোদনই ভক্তবৎসল-ভগবানের একমাত্র কাম্য। "মদ্ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ ॥ পদ্মপুরাণ ॥" অনন্ত-বৈচিত্রীময়ী লীলাতে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবান্ যে সমস্ত লীলারস-বৈচিত্রীর আস্বাদন করেন, তত্তৎ-লীলার সেবায় নিয়োজিত মুক্তজীবগণকেও তিনি যথা-যোগ্য ভাবে সেই সমস্ত রসবৈচিত্রীর আস্বাদন করাইয়া থাকেন। সে-সমস্ত বৈচিত্র্যময়ী লীলাতে মুক্তজীবগণ তাঁহার সেবা করিয়া থাকেন। ইহা হইতেও জীবের সেবা-বাসনার বৈচিত্রী বুঝা যাইতেছে।

পূর্ব্বে (২।২৭ ঘ-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—জীবের অণুস্বাতন্ত্র্য আছে এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য কৃষ্ণ-নিত্যদাস জীবের পক্ষে এই অণুস্বাতন্ত্র্য অপরিহার্য্য। এই অণুস্বাতন্ত্র্যের ফলেই ভিন্ন ভিন্ন সাধক একই ভগবান্‌কে ভিন্ন ভিন্ন রূপে পাইতে চাহেন এবং ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু ভগবানের কৃপায় পাইয়াও থাকেন।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—বিভিন্ন জীবের পক্ষে বিভিন্নরূপে ভগবান্‌কে পাওয়ার বাসনা অসম্ভব নহে, শাস্ত্রবিরুদ্ধও নহে। বিভিন্নরূপ বাসনা হইতেছে জীবের স্বরূপভূতা বাসনা।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এক ব্রজধামেই দাস্য-সখ্যাদি চারিভাবের লীলা আছে; চারিভাবের লীলাপরিকরও আছেন। পরিকরগণ লীলাতে তাঁহার সেবা করেন। চারিভাবের লীলা একরূপ নহে; সুতরাং চারিভাবের পরিকরদের সেবাও—সুতরাং সেবাবাসনাও—সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে। যাঁহারা অনাদিসিদ্ধ পরিকর, স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ, তাঁহাদের মধ্যেও এইরূপে বিভিন্ন-সেবাবাসনা দৃষ্ট হয়। স্বরূপশক্তির কৃপায় যে সমস্ত নিত্যমুক্ত জীব, বা সাধনসিদ্ধ জীব এই সকল লীলায় ভগবানের সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যেও বিভিন্ন-সেবাবাসনা দৃষ্ট হয়।

দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিভাবের সেবার উত্তরোত্তর উৎকর্ষ; সুতরাং মধুর

ভাবের সেবাই সর্বোৎকর্ষময়ী। তথাপি, সাধক ভক্তদের মধ্যে সকলেরই যে মধুরভাবের সেবার জন্য লোভ জন্মে, তাহা নয়। এমনও দেখা যায়—শাস্ত্রবিহিত লক্ষণ-বিশিষ্ট গুরুর নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ত্রিশ-চল্লিশ বৎসর পর্য্যন্ত মধুর ভাবের ভজন করিয়াও কেহ কেহ আবার বৈকুণ্ঠেশ্বর নারায়ণের মন্ত্রে পুনরায় দীক্ষা গ্রহণ করিয়া থাকেন। কেন এমন হয় ? ভগবান্‌কে ধ্রুব বলিয়াছেন—"ত্বৎসাক্ষাৎ-করণাহ্লাদবিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥" এই উক্তি হইতে জানা গেল — ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দের তুলনায় ব্রহ্মানন্দ নিতান্ত তুচ্ছ। তথাপি কেহ কেহ ব্রহ্মানন্দের (সাযুজ্যমুক্তিজনিত আনন্দের) জন্য সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। আবার কেহ কেহ সাযুজ্যমুক্তিপ্রাপক সাধন ত্যাগ করিয়াও সেবা-প্রাপক সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। জীবের স্বরূপগত বাসনার অনাদি বৈচিত্রী স্বীকার না করিলে ইহার কোনও সমাধান পাওয়া যায় না। শ্রুতিস্মৃতিতে বিভিন্ন প্রকার মুক্তির এবং বিভিন্ন প্রকার সেবার উল্লেখ হইতেই বিভিন্ন জীবের স্বরূপগত বাসনার বিভিন্ন বৈচিত্রীর কথা জানা যায়।

অনন্ত কোটি জীব হইতেছে ভগবানের জীবশক্তির অংশ ; জীবশক্তি হইতেছে ভগবানের সেবিকা ; কেননা, শক্তিমানের সেবাই হইতেছে শক্তির স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য। সেবাদ্বারা নানা ভাবে সেব্যের প্রীতিবিধানই হইতেছে সেবকের বা সেবিকার স্বরূপানুবন্ধিনী বাসনা। জীবশক্তিও তাহার অনন্ত কোটি অংশে সেবাবাসনার অনন্ত কোটি বৈচিত্রী বিস্তার করিয়া স্বরূপশক্তির কৃপার অপেক্ষা করিয়া বিরাজিত ; স্বরূপশক্তির কৃপা লাভ হইলে অনন্ত কোটি প্রকারে ভগবানের সেবার সৌভাগ্য লাভ করিয়া ধন্য হইতে পারে। ভক্তচিত্তবিনোদন-ব্রত ভগবান্‌ও বিভিন্ন রূপের সেবা দিয়া তাহার চিত্তবিনোদন করিয়া থাকেন। অনন্ত কোটি জীবের অনন্তবৈচিত্রীময়ী সেবা বস্তুতঃ একই জীবশক্তির সেবাই। এইরূপে দেখা যায়—বিভিন্ন জীবের বিভিন্ন বাসনাবৈচিত্রী হইতেছে তাহাদের স্বরূপগত ; ইহা আগন্তুক নহে। এজন্যই বদ্ধ অবস্থাতেও তাহাদের রুচিভেদ, প্রকৃতিভেদ।

মায়াবদ্ধ জীবে তাহার স্বরূপগত বাসনা থাকে প্রচ্ছন্ন। সাধুসঙ্গের প্রভাবে, বা কৃষ্ণকৃপায়, বা ভক্তির কৃপায় তাহা প্রকাশ পাইতে পারে।

৭। যে কোনও গুণাতীত স্বরূপের প্রাপ্তিতেই মুক্তি

একই অদ্বয়-জ্ঞানতত্ত্ব রসস্বরূপ পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতেই অনন্তরূপে আত্ম প্রকাশ করিয়া আছেন। তাঁহার এ-সমস্ত রূপ হইতেছেন—(১) অনন্ত ভগবৎস্বরূপ ; যথা ব্রজবিহারী স্বয়ংরূপ ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণ, দ্বারকা-মথুরাবিহারী বাসুদেব এবং পরব্যোমস্থ নারায়ণ-রাম-নৃসিংহ-সদাশিবাদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপগণ, (২) পরমাত্মা এবং (৩) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম। এই নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম কিন্তু শ্রীপাদ শঙ্করের কথিত সর্ব্ববিধ-বিশেষত্বহীন, সর্ব্বশক্তিহীন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম নহেন। শ্রীপাদ শঙ্করের নির্ব্বিশেষ

ব্রহ্ম যে শ্রুতিসিদ্ধ নহেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। বেদশাস্ত্রসম্মত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম হইতেছেন অসম্যক্‌-প্রকাশ স্বরূপ ; এই স্বরূপেও স্বরূপ-শক্তি আছে ; কিন্তু স্বরূপ-শক্তির বিকাশ নাই। এই স্বরূপ অমূর্ত্ত (১।১।৯২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ভগবৎ-স্বরূপসমূহ হইতেছেন অশেষ-রসামৃত-বারিধি পরব্রহ্ম ভগবানের অনন্ত-রস-বৈচিত্রীরই মূর্ত্তরূপ ; পরমাত্মাও এক রসবৈচিত্রীর রূপ এবং নির্ব্বেশেষ ব্রহ্মও এক রসবৈচিত্রীর প্রকাশ।

এই সমস্তই হইতেছেন গুণাতীত, মায়িক-গুণস্পর্শ-বিবর্জ্জিত। যে সাধকের চিত্ত রসস্বরূপ পরব্রহ্মের যে রসবৈচিত্রীতে আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই রসবৈচিত্রীকে পাওয়ার জন্য, সেই রসবৈচিত্রীর উপলব্ধির জন্য, সেই রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ বা সেই রসবৈচিত্রীর উল্লিখিত প্রকাশকে, পাওয়ার উপযোগী সাধন-পন্থা অবলম্বন করিয়া থাকেন এবং ভগবানের কৃপায় সেই রসবৈচিত্রীকে, সেই রসবৈচিত্রীর মূর্ত্ত-রূপকে, বা প্রকাশকে, পাইতেও পারেন। পরব্রহ্মের উল্লিখিত বিভিন্ন প্রকাশের প্রত্যেক প্রকাশই গুণাতীত বলিয়া তাঁহার প্রাপ্তিতেই সাধক জীব মুক্ত হইতে পারেন।

সৃষ্টি-ব্যাপারের সহিত অব্যবহিতভাবে যে-সকল ভগবৎ-স্বরূপ সংশ্লিষ্ট, তাঁহাদের সহিত মায়ার বা মায়িক উপাধির সংশ্রব আছে (১।১।৯৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাঁহাদিগকে গুণময় (মায়িক-গুণময়) বলা হয়। এই সমস্তের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বরকোটি (অর্থাৎ স্বরূপতঃ সচ্চিদানন্দ ঈশ্বর), পরব্যোমেও তাঁহারা গুণাতীত সচ্চিদানন্দরূপে অবস্থিত আছেন। গুণময়রূপে তাঁহাদের উপাসনা করিলে সাধক গুণাতীত বা মুক্ত হইতে পারেন না। কিন্তু গুণাতীতরূপে তাঁহাদের কোনও এক স্বরূপের উপাসনাতে গুণাতীত—সুতরাং মুক্ত—হওয়া যায়। কেননা গুণাতীতরূপে তাঁহাদের উপাসনা হইতেছে বস্তুতঃ পর-ব্যোমস্থিত তাঁহাদের গুণাতীত স্বরূপেরই উপাসনা।

গুণাতীত স্বরূপের উপাসনাতেই নির্গুণত্ব বা মুক্তত্ব লাভ করা যায়।

"হরির্হি নির্গুণঃ সাক্ষাৎ পুরুষঃ প্রকৃতেঃ পরঃ।
স সর্ব্বদৃগুপদ্রষ্টা তং ভজন্নির্গুণো ভবেৎ ॥ শ্রীভা ১০।৮৮।৫॥

—শ্রীহরি নির্গুণ (মায়িক-গুণস্পর্শশূন্য), প্রকৃতির অতীত, সাক্ষাৎ-ঈশ্বর; সর্বদর্শী ও সর্বসাক্ষী। তাই তাঁহার ভজন করিলেই নির্গুণ (গুণাতীত) হওয়া যায়।"

সগুণ বা গুণময় স্বরূপের ভজনে গুণময় বস্তু—ধনজনাদি—প্রাপ্ত হওয়া যায়, কিন্তু গুণাতীতত্ব বা মুক্তি পাওয়া যায় না।

মহারাজ পরীক্ষিৎ শুকদেবের নিকটে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—দেব, অসুর, মনুষ্য-ইঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ভোগবিলাসবর্জিত শিবের উপাসনা করেন, তাঁহারা প্রায়ই ধনী ও ভোগ-শালী হয়েন ; আর যাঁহারা সর্বভোগাস্পদ লক্ষ্মীপতি হরির আরাধনা করেন, তাঁহারা ধনী বা ভোগী হয়েন না কেন ?

দেবাসুর-মনুষ্যেষু যে ভজন্ত্যশিবং শিবম্।
প্রায়স্তে ধনিনো ভোজা ন তু লক্ষ্ম্যাঃ পতিং হরিম্ ॥ শ্রীভা ১০।৮৮।১ ॥

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীশুকদেবগোস্বামী যাহা বলিয়াছিলেন, তাহার মর্ম্ম হইতেছে এই:— শ্রীহরি নির্গুণ বা গুণাতীত বলিয়া তাঁহার ভজনে গুণময় ধনাদি পাওয়া যায় না। যাঁহারা এতাদৃশ নির্গুণ হরির ভজন করেন, শ্রীহরি বরং ক্রমশঃ তাঁহাদের ধনাদি হরণ করেন, যেন তাঁহারা একান্তচিত্তে তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিতে পারেন। এজন্য ধনজনাদি গুণময় বস্তুতে লুব্ধ সাধারণ লোক নির্গুণ শ্রীহরির ভজন না করিয়া গুণময়—আশুতোষ-গুণময়—দেবতাসমূহের ভজন করে এবং ধন-সৌভাগ্যাদি গুণময় বস্তু লাভ করিয়া এমনই প্রমত্ত হইয়া পড়ে যে, যাঁহাদের প্রসাদে ধন-সৌভাগ্যাদি লাভ করিয়াছে, সেই সমস্ত দেবতাদিগকেও বিস্মৃত হয় এবং অবজ্ঞা করে (শ্রীভা, ১০।৮৮।৫-১১)।

অতো মাং সুদুরারাধ্যং হিত্বান্যান্ ভজতে জনঃ।
ততস্ত আশুতোষেভ্যো লব্ধরাজ্যশ্রিয়োদ্ধতাঃ।
মত্তাঃ প্রমত্তা বরদান্ বিস্মরন্ত্যবজানতে॥শ্রীভা, ১০।৮৮।১১॥

(যুধিষ্ঠিরের নিকটে শ্রীভগবদুক্তি)

এইরূপে দেখা গেল—যে কোনও গুণাতীত স্বরূপের উপাসনাতেই মুক্তি পাওয়া যাইতে পারে। বিভিন্ন গুণাতীত স্বরূপ রসস্বরূপ পরব্রহ্মের বিভিন্ন রসবৈচিত্রীরই প্রকাশ বা মূর্ত্তরূপ বলিয়া তাঁহাদের প্রাপ্তিও পরব্রহ্মের প্রাপ্তিই। বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর প্রাপ্তিতে কেবল প্রাপ্তির প্রকার ভেদই সূচিত হয়।

৮। পঞ্চবিধা মুক্তি

মুক্তি সর্ব্বথা একরূপ হইলেও, মুক্তির কোনওরূপ প্রকারভেদ না থাকিলেও, মুক্তজীবের ব্রহ্মপ্রাপ্তির প্রকারভেদে শ্রুতি-স্মৃতিতে মুক্তির পাঁচ রকম ভেদের কথা বলা হইয়াছে—সাযুজ্য, সালোক্য, সারূপ্য, সার্ষ্টি এবং সামীপ্য। (১।২।৬৮-গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ক। **সাযুজ্যমুক্তি।** সাযুজ্য হইতেছে ব্রহ্মে (অর্থাৎ ব্রহ্মের কোনও এক গুণাতীত স্বরূপে) প্রবেশ। ব্রহ্মে প্রবিষ্ট জীবের সূক্ষ্ম চিৎকণরূপে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মে প্রবেশ করে বলিয়া সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তজীবও ব্রহ্মানন্দ উপভোগ করেন। ব্রহ্মানন্দের অনুভবে সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তজীব এতই তন্ময় হইয়া পড়েন যে, নিজের অস্তিত্বের অনুসন্ধানও তাঁহার থাকে না।

এই সাযুজ্য আবার দুই রকমের—ঈশ্বর-সাযুজ্য এবং ব্রহ্মসাযুজ্য। প্রাকৃতগুণহীন অথচ অনন্ত অপ্রাকৃত কল্যাণগুণবিশিষ্ট কোনও ভগবৎ-স্বরূপে প্রবেশই হইতেছে ঈশ্বর-সাযুজ্য। আর, শ্রুতি-কথিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ হইতেছে ব্রহ্মসাযুজ্য। যাঁহারা এতাদৃশ ব্রহ্মসাযুজ্য লাভ করেন, সিদ্ধলোকে তাঁহাদের স্থিতি হয় (১।১।৯৬-গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের ন্যায় ঈশ্বর-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবেরও পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে, তাঁহার স্বরূপগত কর্তৃত্ব-ভোক্তৃত্বাদিও থাকে। আনন্দস্বরূপ ভগবানে প্রবিষ্ট হইয়া আনন্দনিমগ্নতার স্ফূর্তিই তাঁহাদের চিত্তে প্রধানরূপে জাগরূক থাকে। "অস্য ভগবল্লক্ষণানন্দনিমগ্নতাস্ফূর্ত্তিরেব প্রধানম্ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণ ॥ ১৯৪ পৃষ্ঠা ॥" এই আনন্দ-নিমগ্নতা হইল, ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের ন্যায় আন্তরিক ব্যাপার। কখনও কখনও তাঁহাদের (ঈশ্বর-সাযুজ্যপ্রাপ্তদের) বাহ্যানন্দের উপভোগও হয়। যদি ভগবানের ইচ্ছা হয় এবং ভগবান্ অনুগ্রহ করিয়া যদি তাঁহাদিগকে বাহ্যানন্দ উপভোগের উপযোগিনী কিঞ্চিৎ শক্তি দান করেন, তাহা হইলে তাঁহারা যথাযোগ্যভাবে ভগবদ্দত্ত তদীয় অপ্রাকৃত ভোগোচ্ছিষ্টলেশ অনুভব করিতে পারেন। "ক্বচিদিচ্ছয়া তদনুগ্রহেণ তদীয়তচ্ছক্তিলেশপ্রাপ্ত্যৈব যথাযুক্তং বহিস্তদ্দত্তাপ্রাকৃততদ্ভোগোচ্ছিষ্টলেশমেবানু-ভবতীত্যেকে ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৯৪ পৃষ্ঠা।"

এই ভোগ যে তাঁহারা সর্ব্বতোভাবে উপভোগ করেন, তাহাও নহে; কেননা, ভগবানের সমান ভোগ উপলব্ধির শক্তি তাঁহাদের নাই, তাঁহারা তাঁহার কৃপায় শক্তির লেশমাত্র প্রাপ্ত হয়েন। "জগদ্ব্যাপারবর্জ্জম্"-ইত্যাদি ব্রহ্মসূত্র হইতেই তাহা জানা যায়। "তত্র চ ন তু তমেব সর্ব্বমেব চানুভবতীত্যভ্যুপগম্যম্। সর্ব্বথা তৎপ্রাপ্তেরনভ্যুপগমত্বাৎ। জগদ্ব্যাপারাদিনিষেধেন ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৯৫ পৃষ্ঠা।"

উল্লিখিত উক্তির সমর্থক শ্রুতিবাক্যও প্রীতিসন্দর্ভে উদ্ধৃত হইয়াছে। "যদৈনং মুক্তো নু প্রবিশতি মোদতে চ কামাং শ্চৈবানুভবতীতি বৃহৎ শ্রুতৌ। —মুক্তব্যক্তি ভগবানে প্রবেশ করেন, আনন্দ অনুভব করেন, কামসকলও অনুভব করেন ॥ বৃহৎ-শ্রুতি ॥"; "ব্রহ্মাভিসম্পদ্য ব্রহ্মণা পশ্যতি ব্রহ্মণা শৃণোতীত্যাদিমাধ্যন্দিনায়নশ্রুতৌ।"—মুক্ত পুরুষ ব্রহ্ম প্রাপ্ত হইয়া ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করেন ইত্যাদি॥ মাধ্যন্দিনায়নশ্রুতি।"

উল্লিখিত শ্রুতিপ্রমাণের "ব্রহ্মদ্বারা দর্শন করেন, ব্রহ্মদ্বারা শ্রবণ করেন"-ইত্যাদি ব্যক্য হইতে বুঝা যায়—ভগবৎ-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের মধ্যে দর্শন-শ্রবণাদির উপযোগী ইন্দ্রিয়াদির অভিব্যক্তি নাই, থাকিতেও পারে না; কেননা, তাঁহারা সূক্ষ্ম অণুচিদ্রূপেই সে-স্থলে অবস্থান করেন। ভগবান্ কৃপা করিয়া অনুভবাদির জন্য কিঞ্চিৎ শক্তি দান করিলেই তাঁহারা অনুভবাদি লাভ করিতে পারেন। তাঁহাদের এই ভোগও অতি সামান্য, পূর্ণ নহে; ভগবানের সম্পূর্ণ আনন্দও তাঁহারা উপভোগ করিতে পারেন না। 'মুক্ত্যঃ প্রাপ্য পরং বিষ্ণুং তদ্ভোগাল্লেশতঃ ক্বচিৎ। বহিষ্ঠান্ ভুঞ্জতে নিত্যং নানন্দাদীন্ কথঞ্চন ॥ মাধ্বভাষ্যধৃত বচন ॥—মুক্তপুরুষেরা পরপুরুষ বিষ্ণুকে প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার ভোগলেশ হইতে কোন স্থলে বহিঃস্থিত কিঞ্চিৎ ভোগ নিত্য উপভোগ করেন; কিন্তু বিষ্ণুর সম্পূর্ণ আনন্দাদি ভোগ করিতে পারেন না।"

পরমাত্মার সহিত মিলনও সাযুজ্যই, পরমাত্ম-সাযুজ্য।

সাযুজ্যমুক্তি-প্রাপ্ত জীবের সেবোপযোগী কোনও পৃথক্ দেহ থাকে না বলিয়া তাঁহার সম্বন্ধে সেবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; তাঁহার সেবাবাসনাও বিকশিত হয় না।

মাধ্বমতে সাযুজ্য

সাযুজ্যমুক্তি সম্বন্ধে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের অভিমত অন্যরূপ। সংক্ষেপে তাহা উল্লিখিত হইতেছে।

মাধ্বমতে বৈকুণ্ঠলোকে প্রত্যেক জীবেরই একটী নিত্য এবং চিন্ময় "স্বরূপ দেহ" আছে। জীব সংখ্যায় অনন্ত বলিয়া এই "স্বরূপদেহও" সংখ্যায় অনন্ত। এই অসংখ্য স্বরূপদেহ-সমূহের আকার একরূপ নহে। খগ-মৃগ-নর-তৃণ-আদির ভিন্ন ভিন্ন আকারের ন্যায় এই সকল স্বরূপদেহের আকারও ভিন্ন ভিন্ন (৪।৭-ক-অনুচ্ছেদ "জীব" দ্রষ্টব্য)। এই সমস্ত স্বরূপদেহ থাকে পরমেশ্বর শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহের বহির্দ্দেশে। আবার, শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহের অভ্যন্তরেও এই সমস্ত স্বরূপদেহের অনুরূপ দেহসকল আছে। বহিঃস্থিত স্বরূপদেহসমূহ হইতেছে অন্তঃস্থিত দেহসমূহের নিরুপাধিক প্রতিবিম্ব; আর অন্তঃস্থিত দেহসমূহ হইতেছে তাহাদের বিম্ব। শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহমধ্যস্থ প্রত্যেক বিম্বদেহের অনুরূপ একটী নিরুপাধিক প্রতিবিম্বদেহ —অর্থাৎ স্বরূপদেহ --তাঁহার বহির্দ্দেশে নিত্য বিরাজিত।

মুক্তজীব যখন—বৈকুণ্ঠে অবস্থিত তাঁহার স্বরূপদেহের অনুরূপ যে বিম্বদেহ শ্রীবিষ্ণুর বিগ্রহ-মধ্যে অবস্থিত আছে, সেই—বিম্বদেহে প্রবেশ করেন, তখনই বলা হয়, তিনি সাযুজ্য প্রাপ্ত হইয়াছেন। বিম্বদেহে প্রবেশই হইতেছে মাধ্বমতে সাযুজ্য। সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীব শ্রীবিষ্ণুর অনুভূত আনন্দ উপভোগ করেন; কখনও কখনও বা বিষ্ণুর বিগ্রহের বহির্দ্দেশে আসিয়াও আনন্দোপভোগাদি করিয়া থাকেন।

খ। সালোক্য মুক্তি। সালোক্য হইতেছে সমানলোকতা। যে সাধক যে ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, সেই ভগবৎ-স্বরূপের লোক বা ধামের প্রাপ্তিকেই সালোক্য-মুক্তি বলে। সালোক্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীব ভগবৎ-কৃপায় করচরণাদিবিশিষ্ট পার্ষদদেহ-লাভ করেন। এই পার্ষদদেহ অপ্রাকৃত, চিন্ময় এবং নিত্য। শ্রীনারদ তাঁহার পার্ষদদেহ-লাভ সম্বন্ধে ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন—

"প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ॥ শ্রীভা, ১।৬।২৯॥

—শুদ্ধা ভাগবতী তনুর প্রতি আমি প্রযুজ্যমান হইলে আরব্ধকর্ম্ম-নির্ব্বাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"অনেন পার্ষদতনূনামকর্ম্মারব্ধত্বং শুদ্ধত্বং নিত্যত্বমিত্যাদি সূচিতং ভবতীত্যেষা—ইহাদ্বারা পার্ষদ-তনুসমূহের অকর্ম্মারব্ধত্ব (অর্থাৎ কর্ম্মফল-জনিত প্রাকৃতদেহ যে নহে, তাহা), শুদ্ধত্ব (মায়িকগুণবর্জ্জিতত্ব), নিত্যত্বাদি সূচিত হইতেছে।"

সালোক্যমুক্তিপ্রাপ্ত জীবের পার্ষদদেহে পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

গ। সারূপ্যমুক্তি। সারূপ্য হইতেছে সমানরূপতা। যিনি যে ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, মুক্ত অবস্থায় তিনি যদি সেই ভগবৎ-স্বরূপের ধামে সেই ভগবৎ-স্বরূপের সমান রূপ প্রাপ্ত হয়েন,

(অর্থাৎ চতুর্ভুজ নারায়ণের উপাসক যদি নারায়ণের ন্যায় চতুর্ভুজ রূপ প্রাপ্ত হয়েন), তাহা হইলে তাঁহার মুক্তিকে সারূপ্য-মুক্তি বলা হয়। ভগবৎস্পর্শে অজ্ঞানবন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া গজেন্দ্র পীতবসন ও চতুর্ভুজ ভগবানের রূপ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।

গজেন্দ্রো ভগবৎস্পর্শাদ্ বিমুক্তোঽজ্ঞানবন্ধনাৎ।
প্রাপ্তো ভগবতো রূপং পীতবাসাশ্চতুর্ভুজঃ॥ শ্রীভা, ৮।৪।৬॥

সারূপ্যমুক্তিতে কেবল রূপেরই—করচরণাদির সংখ্যায় এবং বর্ণাদিতেই—সাম্য। ভগবানের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদি, সর্ব্বজন-চিত্তাকর্ষকত্বাদি এবং শ্রীবৎস-কৌস্তুভ ও করচরণ-চিহ্নাদিতে মুক্তজীব ভগবানের সাম্য লাভ করিতে পারে বলিয়া মনে হয় না (সার্ষ্টিমুক্তিপ্রসঙ্গে এ-সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য)। এসমস্ত হইতেছে ভগবানের নিজস্ব বস্তু। বস্তুতঃ "সারূপ্য"-শব্দ হইতেও কেবল আকারেরই তুল্যতা বুঝায়। কেননা, "সারূপ্য" হইতেছে "সমানরূপতা"; রূপ-শব্দে "আকার" বুঝায়। "আকৃতিঃ কথিতা রূপে।"

মাধ্বমতে সারূপ্য

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যের মতে সারূপ্য-সম্বন্ধেও একটু বিশেষত্ব আছে। তাঁহার মতে, বৈকুণ্ঠস্থিত "স্বরূপদেহ"-প্রাপ্তিই (সাযুজ্যমুক্তি-প্রসঙ্গে মাধ্বমতের আলোচনা দ্রষ্টব্য) হইতেছে সারূপ্যমুক্তি। মাধ্বমতে উপাস্যের সমানরূপ-প্রাপ্তি সারূপ্য নহে, জীবের "স্বরূপ-দেহ"-প্রাপ্তিই সারূপ্য। বিভিন্ন জীবের "স্বরূপদেহ" বিভিন্ন আকারবিশিষ্ট বলিয়া সারূপ্যে ভিন্ন ভিন্ন মুক্ত জীব ভিন্ন ভিন্ন আকার প্রাপ্ত হয়েন।

শ্রীমন্মধ্বাচার্য্যের কথিত মুক্তিকে "সারূপ্য-প্রাপ্তি" না বলিয়া "স্বরূপদেহ-প্রাপ্তি" বলিলেই বোধহয় প্রাপ্তির স্বরূপ-বাচক শব্দের সার্থকতা থাকিতে পারে। "সারূপ্য-প্রাপ্তি, বা সমানরূপতা প্রাপ্তি" বলিতে কোনও একটী রূপের সমান অন্য একটী রূপের প্রাপ্তিকেই বুঝায়। মাধ্বমতে এতাদৃশ "সমানরূপের প্রাপ্তিকে" সারূপ্য বলা হয় না। মুক্তজীব তাঁহার "স্বরূপ-দেহ" প্রাপ্ত হইলেই বলা হয়, তাঁহার "সারূপ্য-প্রাপ্তি" হইয়াছে। ইহা বস্তুতঃ "সারূপ্য বা সমানরূপতা" নহে; ইহা হইতেছে স্বীয় "স্বরূপদেহ-প্রাপ্তি।"

যাহা হউক, সারূপ্য-মুক্তিতেও পার্ষদদেহে মুক্তজীবের পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে। এই পার্ষদ-দেহও অপ্রাকৃত, চিন্ময়, নিত্য।

ঘ। **সার্ষ্টি মুক্তি।** মনুসংহিতার "ধান্যদঃ শাশ্বতং সৌখ্যং ব্রহ্মদো ব্রহ্মসার্ষ্টিতাম্॥ ৪।২৩২॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ কুল্লূকভট্ট "সার্ষ্টিতাম্"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন-"সমানগতিতাং তুল্যতাম্" এবং শ্রীপাদ মেধাতিথি লিখিয়াছেন—"অর্ষণস্ঋষ্টিঃ, সমানা ঋষ্টির্যস্য সার্ষ্টিঃ, ছান্দসাৎ সমানস্য সভাবঃ। ঋষী গতৌ (ঋষ্-ধাতুঃ) অর্ষণং বা সার্ষ্টিঃ, তদ্ভাবশ্চ সার্ষ্টিতা উভয়থাপি ব্রহ্মণঃ সমানগতিত্বাৎ।" ইহা হইতে জানা গেল, ঋষ্টি-শব্দ হইতে সার্ষ্টি-শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। সমান ঋষ্টি যাহার, তাহাই

সার্ষ্টি। ঋষ্টি-শব্দের অর্থ—"গতি", অমরকোষের মতে "খড়্গ।" খড়্গ-শব্দে কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য সূচিত করে। কুল্লূভট্ট এবং মেধাতিথি-উভয়েই সার্ষ্টিতা-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—সমানগতিত্ব। তাহা হইলে উপাস্য ভগবানের সহিত সমান-গতিত্ব (অমরকোষের অর্থ ধরিলে ঐশ্বর্য্যের দিকে সমগতিত্ব)-প্রাপ্তিই সার্ষ্টি মুক্তি। অমরকোষে লিখিত ঋষ্টি-শব্দের অর্থের তাৎপর্য্য ঐশ্বর্য্য গ্রহণ করিলে সার্ষ্টি-শব্দে সমান ঐশ্বর্য্য বুঝায়। যাঁহারা উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের সমজাতীয় ঐশ্বর্য্য কামনা করেন, তাঁহারা এই সার্ষ্টি মুক্তি পাইয়া থাকেন। তাঁহারাও চিন্ময় ও নিত্য পার্ষদ-দেহে পৃথক্‌রূপে অবস্থান করেন।

সার্ষ্টিমুক্তি-প্রাপ্ত জীবসম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভ-নামক গ্রন্থে (প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণ গোপাল গোস্বামি-সম্পাদিত সংস্করণ॥ ১৮৬-৮৭ পৃষ্ঠায়) কয়েকটী শ্রুতিবাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"স তত্র পর্য্যেতি জক্ষন্ ক্রীড়ন্ রমমাণঃ স্ত্রীভির্ব্বা যানৈর্ব্বা জ্ঞাতিভির্ব্বা নোপজনং স্মরন্নিদং শরীরম্॥ ছান্দোগ্য॥ ৮।১২।৩॥—সেই মুক্ত পুরুষ সে-স্থানে (অর্থাৎ ভগবদ্ধামে) যাইয়া স্ত্রীপুরুষের সংযোগে জাত এই শরীর স্মরণ না করিয়াই যথেচ্ছ ভ্রমণ, ভোজন, ক্রীড়া করিয়া আনন্দ উপভোগ করেন, যানবাহনাদি-যোগে বিহার করেন, এবং তত্রত্য স্ত্রীগণের সহিত ও জ্ঞাতি (সমভাবাপন্ন পার্ষদ) গণের সহিত অবস্থান করেন।"

"আপ্নোতি স্বারাজ্যম্॥ তৈত্তিরীয়॥ শিক্ষাবল্লী॥ ৬॥—স্বারাজ্য (অংশভূত ব্রহ্মাদি দেবগণের আধিপত্য) লাভ করেন।"

"সর্ব্বেঽস্মৈ দেবা বলিমাহরন্তি॥ তৈত্তিরীয়॥ শিক্ষাবল্লী॥ ৫॥—সমস্ত দেবগণ মুক্তপুরুষের জন্য বলি (পূজোপহার) আহরণ করেন।"

"তস্য সর্ব্বেষু লোকেষু কামচারো ভবতি॥ ছান্দোগ্য॥ ৭।২৫।২॥—সমস্ত লোকে মুক্তপুরুষের স্বচ্ছন্দ-গতি হয়।"

"এষ সর্ব্বেশ্বরঃ॥ বৃহদারণ্যক॥ ৪।৪।২২॥—ইনি সর্ব্বেশ্বর।"

এ-সমস্ত শ্রুতিবাক্যে মুক্ত পুরুষের ঐশ্বর্য্যের কথা বলা হইয়াছে বটে; তথাপি কিন্তু ভগবানের সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে। ব্রহ্মসূত্রও বলেন-"জগদ্ব্যাপারবর্জ্জং প্রকরণাৎ অসন্নিহিতত্বাচ্চ॥ ৪।৪।১৭॥-ব্রহ্মসূত্র॥—জগতের সৃষ্টি-স্থিতি-প্রলয়-সামর্থ্য মুক্ত পুরুষের নাই।"

চরিত্রে, ঔদার্য্যে, কারুণ্যাদি-গুণে ভগবানের সমান যে কোথাও কেহ নাই, তাহা—কংস-কারাগারে আবির্ভূত হওয়ার পরে দেবকী-বসুদেবের নিকটে—ভগবান্ নিজমুখেই ব্যক্ত করিয়াছেন।

"অদৃষ্ট্বান্যতমং লোকে শীলৌদার্য্যগুণৈঃ সমম্।
অহং সুতো বামভবং পৃশ্নিগর্ভ ইতি স্মৃতঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩।৩৩॥

—(তোমরা—অংশে—সুতপা ও পৃশ্নিরূপে জন্ম গ্রহণ করিয়া তপস্যা করিয়া আমার মত পুত্র পাওয়ার নিমিত্ত বর প্রার্থনা করিয়াছিলে ; কিন্তু) চরিত্রে, ঔদার্য্যে, গুণে আমার সমান কেহ কোথাও নাই বলিয়া আমি নিজেই পৃশ্নিগর্ভ-নামে তোমাদের পুত্র হইয়াছি।”

ভগবানের ঐশ্বর্য্যের সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তি কাহারও পক্ষে অসম্ভব। সুতরাং সার্ষ্টিমুক্তিতে যে সমান ঐশ্বর্য্য-প্রাপ্তির কথা বলা হয়, তাহা হইতেছে ভাক্ত বা গৌণ। “ততো ভাক্তমেব সমানৈশ্বর্য্যম্ ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৮৮ পৃষ্ঠা ॥” সার্ষ্টিমুক্তিতে অণিমাদি ঐশ্বর্য্যের প্রাপ্তিও আংশিক মাত্র। “অতএবাণিমাদি-প্রাপ্তিরপ্যংশেনৈব জ্ঞেয়া ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ১৮৮ পৃষ্ঠা ॥”

বৃহদ্ভাগবতামৃতের ২।৪।১৯৯-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামী লিখিয়াছেন—পার্ষদগণ অপেক্ষা শ্রীভগবানের অসাধারণ বিশেষত্ব এই যে, ভগবানে স্বাভাবিক (স্বরূপানুবন্ধী) পরম-ঐশ্বর্য্যবিশেষ বর্ত্তমান এবং অনন্য-সাধারণ মধুর-মধুর-বিচিত্র সৌন্দর্য্যাদি মহিমাবিশেষ বর্ত্তমান। পার্ষদগণ অপেক্ষা ভগবানের এই সকল বৈশিষ্ট্য না থাকিলে, পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্যাদি ভগবানের তুল্যই হইলে, পার্ষদগণ বিচিত্র ভজন-রস অনুভব করিতে পারিতেন না। “এবং পার্ষদেভ্যস্তেভ্যোঽপি সকাশাৎ ভগবত্তাভিধেয়স্বাভাবিকপরমৈশ্বর্য্য-বিশেষাপেক্ষয়া তথানন্যসাধারণমধুরমধুরবিচিত্র-সৌন্দর্য্যাদি-মহিমবিশেষদৃষ্ট্যা ভগবতো মহান্ বিশেষঃ সিদ্ধ্যত্যেব। অন্যথা সদা পরমভাবেন তেষাং তস্মিন্ বিচিত্র-ভজনরসানুপপত্তেরিতি দিক্।” পার্ষদগণের ঐশ্বর্য্য যে ভগবানের ঐশ্বর্য্য অপেক্ষা ন্যূন, তাহাই এ-স্থলে বলা হইল।

মুক্ত জীব সামান্য ঐশ্বর্য্য যাহা কিছু পাইয়া থাকেন, তাহার মূল ভগবৎ-কৃপা। এই ঐশ্বর্য্য প্রাকৃত নহে বলিয়া অবিনশ্বর, নিত্য।

ঙ। **সামীপ্যমুক্তি**। যে মুক্তিতে ভগবানের সমীপে (নিকটে) থাকা যায়, তাহার নাম সামীপ্যমুক্তি। সামীপ্যমুক্তিতেও নিত্য চিন্ময় পার্ষদদেহ-প্রাপ্তি হয় এবং সেই দেহেই ভগবানের নিকটে থাকা হয়।

৯। পঞ্চবিধা মুক্তিতে আনন্দিত্বের তারতম্য

শ্রুতি বলিয়াছেন, রসস্বরূপ পরব্রহ্মকে পাইয়াই জীব মুক্ত হয়েন এবং আনন্দী হয়েন। “রসং হ্যেবায়ং লব্ধ্বানন্দী ভবতি ॥ তৈত্তিরীয় ॥ আনন্দ ॥ ৭ ॥” এই রসস্বরূপ পরব্রহ্ম অনাদিকাল হইতে বিভিন্নরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া বিরাজিত বলিয়া এই সকল প্রকাশের কোনও এক মায়াতীত প্রকাশের প্রাপ্তিতেও জীব মুক্ত হইতে পারেন (৫।৩ গ-অনুচ্ছেদ) এবং আনন্দীও হইতে পারেন ; কিন্তু সকল প্রকাশে রসত্বের সমান অভিব্যক্তি নহে বলিয়া সকল প্রকাশের প্রাপ্তিতে মুক্ত জীব সমভাবে আনন্দী হইতে পারেন না।

রসস্বরূপ পরব্রহ্মের বিভিন্ন প্রকাশ স্বরূপে অভিন্ন হইলেও—অর্থাৎ প্রত্যেক প্রকাশই বিভু, সর্ব্বগ, অনন্ত এবং সচ্চিদানন্দ হইলেও—শক্তিবিকাশের তারতম্য অনুসারে তাঁহাদের সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্য-রসত্বাদির বিকাশে তারতম্য আছে (১।১।৭৯-৮৫ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যে স্বরূপে সমস্ত শক্তির পূর্ণতম বিকাশ, সেই স্বরূপেই রসত্বেরও পূর্ণতম বিকাশ; অন্যান্য স্বরূপে শক্তিবিকাশের ন্যূনতা বলিয়া রসত্বেরও ন্যূন বিকাশ।

এইরূপে ব্রজবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণে রসত্বের—মাধুর্য্যাদির—পূর্ণতম বিকাশ; তাঁহা অপেক্ষা দ্বারকা-মথুরা-বিলাসী বাসুদেবে মাধুর্য্যাদির এবং রসত্বের কম বিকাশ; বাসুদেব অপেক্ষা আবার পরব্যোমাধিপতি নারায়ণে কম বিকাশ। শ্রীনারায়ণাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের ধাম পরব্যোমে। তাঁহাদের মধ্যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের মধ্যেই শক্তির—সুতরাং মাধুর্য্যাদির এবং রসত্বেরও—সর্ব্বাধিক বিকাশ; অন্যান্য ভগবৎ-স্বরূপে যথাযোগ্য ভাবে শক্তির—সুতরাং মাধুর্য্যাদির এবং রসত্বেরও—নারায়ণ অপেক্ষা ন্যূনতর বিকাশ। শ্রুতিবিহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তি থাকিলেও শক্তির বিকাশ নাই বলিয়া রসত্বেরও ন্যূনতম বিকাশ। এই স্বরূপে আনন্দ আছে, কিন্তু আনন্দের বৈচিত্রী নাই; এই নির্ব্বিশেষ স্বরূপ হইতেছেন নিস্তরঙ্গ আনন্দসমুদ্রতুল্য।

পরব্রহ্মের এই সমস্ত গুণাতীত প্রকাশের মধ্যে স্বীয় বাসনা অনুসারে মুক্ত জীব যে প্রকাশকে প্রাপ্ত হইবেন, তাঁহার অনুভূত আনন্দও, তাঁহার আনন্দিত্বও, হইবে সেই প্রকাশে অভিব্যক্ত রসত্বের অনুরূপ। ইহা হইতেই বুঝা যায়—বিভিন্ন মুক্তজীবের আনন্দিত্বও হইবে বিভিন্ন। যিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে প্রবেশ লাভ করিবেন, তাঁহার আনন্দিত্ব হইবে ন্যূনতম।

১০। ব্রহ্মানন্দ ও ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত আনন্দ

নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা ভগবৎ-সাক্ষাৎকারজনিত—অর্থাৎ কোনও সবিশেষ স্বরূপের সাক্ষাৎকারজনিত—আনন্দ যে উৎকর্ষময়, ধ্রুবের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। ভগবান্ যখন কৃপা করিয়া ধ্রুবকে দর্শন দিয়াছিলেন, তখন ধ্রুব বলিয়াছিলেন—"হে জগদ্‌গুরো! তোমার সাক্ষাৎকারজনিত যে বিশুদ্ধ আনন্দ, তাহা হইতেছে সমুদ্রের তুল্য; তাহার তুলনায় ব্রহ্মানন্দ হইতেছে গোষ্পদতুল্য।

ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে।
সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো॥ হরিভক্তিসুধোদয়॥ ১৪।৩৬॥"

এ-স্থলে কেবল আনন্দ-বৈচিত্রীর প্রতি লক্ষ্য রাখিয়াই ব্রহ্মানন্দকে "গোষ্পদ"-তুল্য বলা হইয়াছে। পরিমাণে ব্রহ্মানন্দও বিভু—সুতরাং সমুদ্রতুল্য।

সাক্ষাৎকারের কথা দূরে, ভগবৎ-সম্বন্ধি বস্তুমাত্রের মাধুর্য্যও নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ-সম্বন্ধে তুচ্ছতা-জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে; শ্রীশুকদেব এবং চতুঃসনই তাহার প্রমাণ।

শ্রীশুকদেব ছিলেন জন্মাবধি ব্রহ্মানন্দসমুদ্রে নিমগ্ন। তাঁহার এই ব্রহ্মানন্দ-নিমগ্নতা এমনই সান্দ্র এবং অন্যানুসন্ধান-তিরোধাপক ছিল যে, তাঁহার পিতা ব্যাসদেবের "হা পুত্র, হা পুত্র" রূপ উচ্চ আহ্বানের ধ্বনিও তাঁহার কর্ণে প্রবেশ করিতে পারে নাই। কিন্তু ব্যাসদেবের নিয়োজিত লোকদের মুখে ভগবানের মহিমার কথা ব্রহ্মানন্দ-সমুদ্রে নিমজ্জিত শুকদেবের "কানের ভিতর দিয়া মরমে প্রবেশ" করিয়া তাঁহার চিত্তকে এমনভাবে আকৃষ্ট করিয়াছিল যে, তিনি সেই লোকদের কণ্ঠস্বর লক্ষ্য করিয়া তাঁহাদের নিকটে উপনীত হইলেন এবং তাঁহাদের সঙ্গে ব্যাসদেবের নিকটে আসিয়া অধ্যয়নরূপে শ্রীমদ্ভাগবতের আস্বাদন করিয়া মুগ্ধ হইলেন, পূর্ব্বানুভূত ব্রহ্মানন্দের দিকে আর কখনও তাঁহার চিত্ত ফিরিয়া যায় নাই।

"হরেগুর্ণাক্ষিপ্তমতির্ভগবান্ বাদরায়ণিঃ।
অধ্যগান্মহদাখ্যানং নিত্যং বিষ্ণুজনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীভা ১।৭।১১॥

—ভগবদ্ভক্তগণ সর্ব্বদা যাঁহার অতীব প্রিয়, সেই ভগবান্ বাদরায়ণি শ্রীশুকদেব গোস্বামী, হরিগুণ-শ্রবণে আক্ষিপ্তচেতা হইয়া এই বিস্তীর্ণ আখ্যান শ্রীমদ্ভাগবত অধ্যয়ন করিয়াছিলেন।"

"স্বসুখনিভৃতচেতাস্তদ্ব্যুদস্তান্যভাবোঽপ্যজিতরুচিরলীলাকৃষ্টসার স্তদীয়ম্।
ব্যতনুত কৃপয়া যস্তত্ত্বদীপং পুরাণং তমখিলবৃজিনঘ্নং ব্যাসসূনুং নতোঽস্মি॥
—শ্রীভা ১২।১২।৬৯॥

—(শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন) যাঁহার চিত্ত ব্রহ্মানন্দে পরিপূর্ণ ছিল এবং তজ্জন্য অন্য সমস্ত বিষয়ে মনোব্যাপারশূন্য (অন্য সমস্ত বিষয় হইতে মানোবৃত্তিকে দূরে রাখিতে সমর্থ) হইয়াও অজিত শ্রীকৃষ্ণের মনোহর লীলাদ্বারা আকৃষ্টচিত্ত হইয়া কৃপাবশতঃ যিনি শ্রীকৃষ্ণতত্ত্ব-প্রকাশক শ্রীমদ্ভাগবত-পুরাণ লোকে (জগতে) প্রচারিত করিয়াছেন, অখিলপাপনাশক সেই ব্যাসনন্দন শ্রীশুকদেবকে আমি প্রণাম করি।"

চতুঃসন, অর্থাৎ সনক-সনন্দনাদি চতুষ্টয়, জন্মাবধি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দেই নিমগ্ন ছিলেন; কিন্তু শ্রীভগবানের চরণতুলসীর গন্ধের মাধুর্য্যে আকৃষ্ট হইয়া তাঁহারাও ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

"তস্যারবিন্দনয়নস্য পদারবিন্দকিঞ্জল্কমিশ্রতুলসীমকরন্দবায়ুঃ।
অন্তর্গতঃ স্ববিবরেণ চকার তেষাং সংক্ষোভমক্ষরজুষামপি চিত্ততন্বোঃ॥
—শ্রীভা, ৩।১৫।৪৩॥

—সেই কমল-নয়ন ভগবানের চরণকমলের কেশর মিশ্রিত তুলসীর মকরন্দযুক্ত বায়ু নাসা-রন্ধ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া ব্রহ্মানন্দসেবী তাঁহাদের (সেই সনকাদির) চিত্তে এবং দেহে সম্যক্ ক্ষোভ জন্মাইয়াছিল, অর্থাৎ চিত্তে অতিশয় হর্ষ এবং দেহে রোমাঞ্চাদি প্রকাশ করাইয়াছিল।"

কবি, হবি, অন্তরীক্ষ, প্রবুদ্ধ, পিপ্পলায়ন, আবির্হোত্র, দ্রবিড়, চমস ও করভাজন-এই নব যোগীন্দ্র জন্মাবধিই ছিলেন নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মজ্ঞানের সাধক। শ্রীকৃষ্ণের গুণকথায় আকৃষ্টচিত্ত হইয়া তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

নব যোগীশ্বর জন্মাবধি সাধক জ্ঞানী।
বিধি-শিব-নারদ মুখে কৃষ্ণগুণ শুনি॥
গুণাকৃষ্ট হঞা করে কৃষ্ণের ভজন।
একাদশ স্কন্ধে তার ভক্তিবিবরণ॥ শ্রীচৈ. চ. ২।২৪।৮৪-৫॥

"অক্লেশাং কমলভুবঃ প্রবিশ্য গোষ্ঠীং কুর্ব্বন্তং শ্রুতিশিরসাংশ্রুতিং শ্রুতিজ্ঞাঃ।
উত্তুঙ্গং যদুপুরসঙ্গমায় রঙ্গং যোগীন্দ্রাঃ পুলকভৃতো নবাপ্যবাপুঃ॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (৩।১।৪) ধৃত-মহোপনিষদ্‌বচনম্॥

—বেদার্থবেত্তা নবযোগীন্দ্র, সর্ব্ববিধ-ক্লেশবিবর্জ্জিত ব্রহ্মার সভায় উপস্থিত হইয়া উপনিষৎ শ্রবণ করিতে করিতে নয় ভ্রাতাই পুলকাঙ্গ হইয়া (শ্রীকৃষ্ণদর্শনার্থ) যদুপুরে গমনের নিমিত্ত অত্যন্ত কৌতুহল প্রাপ্ত (উৎকণ্ঠিত) হইয়া ছিলেন।"

আবার, শাস্ত্রবিহিত উপায়ে সাধন করিয়া যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তি লাভ করেন, পূর্ব্বভক্তি-বাসনা থাকিয়া থাকিলে, ভক্তির কৃপায় ভজনোপযোগী দিব্য দেহ লাভ করিয়া তাঁহারাও যে ভগবানের ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, নৃসিংহতাপনী-শ্রুতির ভাষ্যে সর্ব্বজ্ঞ ভাষ্যকারও তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

"মুক্তা অপি লীলয়া বিগ্রহং কৃত্বা ভগবন্তং ভজন্তে।"
[১।২।৬৮ খ (২), (৩) অনুচ্ছেদে এই বাক্যের আলোচনা দ্রষ্টব্য]

সাযুজ্যপ্রাপ্ত মুক্তজীবের ব্রহ্মানন্দ হইতে ভগবৎ-সাক্ষাৎকার-জনিত আনন্দ, এমন কি ভগবৎ-সম্বন্ধি-বস্তুর মাধুর্য্যাস্বাদন-জনিত আনন্দও যে অধিকতর লোভনীয়, উল্লিখিত শাস্ত্রপ্রমাণাদি হইতে তাহাই জানা গেল।

১১। সাযুজ্যমুক্তির আনন্দিত্ব ও সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির আনন্দিত্ব

ক। সাযুজ্য অপেক্ষা সালোক্যাদিতে আনন্দিত্বের উৎকর্ষ

সাযুজ্য মুক্তিতে মুক্তজীবের পৃথক্ দেহ থাকেনা ; কিন্তু সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে মুক্ত জীবের পৃথক্ পার্ষদদেহ থাকে। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য-মুক্তিতে মুক্তজীব নির্ব্বিশেষ আনন্দকে লাভ করেন, সূক্ষ্ম চিৎকণরূপে নির্ব্বিশেষ আনন্দে প্রবেশ করিয়া নির্ব্বিশেষ (অর্থাৎ বৈচিত্র্যহীন) আনন্দই অনুভব করেন ; কিন্তু সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে মুক্তজীব সবিশেষ আনন্দস্বরূপ কোনও এক ভগবৎস্বরূপকে প্রাপ্ত হইয়া সবিশেষ (অর্থাৎ বৈচিত্রীময়) আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন। বৈচিত্র্যহীন আনন্দ অপেক্ষা বৈচিত্র্যময় আনন্দের উপভোগ যে উৎকর্ষময়, তাহা সহজেই বুঝা যায়—নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ সমুদ্র অপেক্ষা তরঙ্গায়িত উচ্ছ্বসিত সমুদ্র যেমন উৎকর্ষময় এবং নিস্তরঙ্গ নিস্তব্ধ সমুদ্রে

নিমজ্জিত ব্যক্তি অপেক্ষা তরঙ্গময় উচ্ছ্বসিত সমুদ্রে তরঙ্গের সঙ্গে উন্মজ্জিত নিমজ্জিত ব্যক্তির অনুভবও যেমন অধিকতর বৈচিত্র্যময়, তদ্রূপ।

ঈশ্বর-সাযুজ্য প্রাপ্ত জীব ব্রহ্মদ্বারা দর্শন-শ্রবণাদিও করিতে পারেন, সুতরাং দর্শন-শ্রবণাদি-জনিত আনন্দও কিঞ্চিৎ অনুভব করিতে পারেন এবং কখনও কখনও ভগবৎ-কৃপায় বাহ্যানন্দও উপভোগ করিতে পারেন, যথাযোগ্যভাবে ভগবদ্দত্ত কিঞ্চিৎ অপ্রাকৃত ভোগোচ্ছিষ্টলেশও উপভোগ করিতে পারেন (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ; কিন্তু নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে তাহাও সম্ভব নয়। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের উৎকর্ষময় আনন্দ কিন্তু ঈশ্বর-সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের পক্ষে দুর্ল্লভ।

এইরূপে দেখা গেল—সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের আনন্দিত্ব সাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবের আনন্দিত্ব অপেক্ষা উৎকর্ষময়।

খ। সালোক্যাদিতেও আনন্দিত্বের তারতম্য

সাযুজ্য অপেক্ষা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির আনন্দিত্ব উৎকর্ষময় হইলেও এই চতুর্ব্বিধা মুক্তির আনন্দিত্ব সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে ; এই সকল মুক্তির আনন্দিত্বেরও তারতম্য আছে।

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি যাঁহারা লাভ করেন, তাঁহাদের সকলের স্থানই পরব্যোমে। পরব্যোমে অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের ধাম বিরাজিত। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, এ-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন অশেষ-রসামৃতবারিধি পরব্রহ্মের বিভিন্ন রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ। যাঁহার যে-রসবৈচিত্রীতে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ ভগবৎ-স্বরূপেরই উপাসনা করিয়া থাকেন এবং উপাসনার সিদ্ধিতে সেই ভগবৎ-স্বরূপকেই প্রাপ্ত হইয়া থাকেন। বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপে রসত্বের বিভিন্ন বৈচিত্রীর বিকাশ বলিয়া বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের প্রাপ্তিতে রসত্বের অনুভব, বা আনন্দিত্বও হইবে বিভিন্ন রকমের। পরব্যোমস্থিত ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে পরব্যোমাধিপতি নারায়ণেই রসত্বের সর্ব্বাধিক বিকাশ বলিয়া তাঁহার প্রাপ্তিতে আনন্দিত্বেরও হইবে সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ।

ইহা হইল বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের প্রাপ্তিতে আনন্দিত্বের তারতম্য-সম্বন্ধে সাধারণ কথা। আবার বিশেষ কথাও আছে। আনন্দিত্বের এই বিশেষত্ব নির্ভর করে মুক্তির বিশেষত্বের উপর। এক এক রকমের মুক্তিতে আনন্দিত্বও এক এক রকম হইয়া থাকে।

(১) ভগবৎ-সাক্ষাৎকার

মুক্তজীব ব্রহ্ম-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীব নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সাক্ষাৎকার এবং ঈশ্বরসাযুজ্যপ্রাপ্ত জীবও ঈশ্বর-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধ-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবও ভগবৎ-সাক্ষাৎকার লাভ করেন। মুক্তজীবের এই সাক্ষাৎকার হইতেছে অনাবৃত সাক্ষাৎকার ; এই সাক্ষাৎকারে ব্রহ্ম বা ভগবানের এবং মুক্তজীবের মধ্যে মায়ার কোনওরূপ আবরণ থাকে না। ভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, তখন তাঁহার কৃপায় সকলেই তাঁহার

দর্শন পাইয়া থাকেন ; কিন্তু সকলের দর্শন সমান নহে। ভগবানের স্ব-প্রকাশিকা শক্তি যোগমায়া যাঁহার নিকটে ভগবানের স্বরূপ যতটুকু প্রকাশ করেন, তিনি ততটুকুমাত্রই দর্শন করিতে পারেন। অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "নাহং প্রকাশঃ সর্ব্বস্য যোগমায়াসমাবৃতঃ॥ গীতা॥ ৭।২৫॥" যাঁহারা বহিরঙ্গা মায়ার আবরণে আবৃত, প্রকটলীলাকালে তাঁহারা ভগবানের দর্শন পাইলেও কিন্তু ভগবানের স্বরূপদর্শন পায়েন না ; তাঁহাদের এবং ভগবানের মধ্যে মায়ার আবরণ থাকে। এই দর্শন অনাবৃত দর্শন নহে। এমন কি, ভগবৎকৃপায় সাধনের প্রভাবে যাঁহাদের রজঃ ও তমঃ দূরীভূত হইয়া যায়, কেবল সত্ত্বমাত্র অবশিষ্ট থাকে, তাঁহাদের দর্শনও অনাবৃত নহে, সে-স্থলেও সত্ত্বগুণের আবরণ থাকে। মায়িক সত্ত্বগুণ তাঁহার মধ্যে তখনও থাকে বলিয়া তিনিও মায়ামুক্ত নহেন ; তাই অনাবৃত দর্শন তাঁহার পক্ষেও সম্ভব নয়। কিন্তু যাঁহারা সম্যক্রূপে মায়া-নির্ম্মুক্ত হইয়াছেন, তাঁহাদের এবং ব্রহ্মের বা ভগবানের মধ্যে কোনও আবরণ থাকেনা। তাঁহাদের ব্রহ্মসাক্ষাৎকার, বা ভগবৎ-সাক্ষাৎকার, হয় অনাবৃত।

বস্তুতঃ, সাক্ষাৎকার হইলেই জীব মায়া ও মায়ার প্রভাব হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্তও হইতে পারেন।

ভিদ্যতে হৃদয়গ্রন্থিশ্ছিদ্যন্তে সর্ব্বসংশয়াঃ।
ক্ষীয়ন্তে চাস্য কর্ম্মাণি তস্মিন্ দৃষ্টে পরাবরে॥ মুণ্ডক॥ ২।২।৮॥

(২) সাক্ষাৎকার দ্বিবিধ—অন্তঃসাক্ষাৎকার ও বহিঃসাক্ষাৎকার

এই অনাবৃত সাক্ষাৎকার আবার দুই রকমের—অন্তঃসাক্ষাৎকার এবং বহিঃসাক্ষাৎকার। "স চাত্মসাক্ষাৎকারো দ্বিবিধঃ, অন্তরাবির্ভাব-লক্ষণো বহিরাবির্ভাবলক্ষণশ্চ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ৭-অনুচ্ছেদ॥ প্রভুপাদ প্রাণগোপাল গোস্বামি-সংস্করণ॥ ১১৯ পৃষ্ঠা।" অন্তঃসাক্ষাৎকার হইতেছে অন্তরে বা চিত্তে দর্শন ; আর, বহিঃসাক্ষাৎকার হইতেছে বাহিরে দর্শন।

ভগবান্ যখন কৃপা করিয়া কাহারও অন্তঃকরণে বা চিত্তে নিজেকে আবির্ভূত বা প্রকাশিত করেন, তখনই তাঁহার অন্তঃসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

ভগবান্ যখন কৃপা করিয়া কাহারও নয়নের সাক্ষাতে নিজেকে আবির্ভূত বা প্রকাশিত করেন, তখনই তাঁহার বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ হয়।

যাঁহারা বহিঃসাক্ষাৎ লাভ করেন, তাঁহাদের অন্তঃসাক্ষাৎকারও হইয়া থাকে। লৌকিক জগতেও তাহা দেখা যায়—স্নেহময়ী জননী সাক্ষাতেও তাঁহার সন্তানকে দেখেন ; আবার সন্তানের অনুপস্থিতি-কালে অন্তরেও তাহাকে দেখেন।

(৩) অন্তঃসাক্ষাৎকার হইতে বহিঃসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ

অন্তঃসাক্ষাৎকার হইতে বহিঃসাক্ষাৎকার অধিকতর লোভনীয়, অধিকতর আনন্দময়। স্নেহময়ী জননী দূরদেশে স্থিত তাঁহার সন্তানের কথা সকল সময়েই চিন্তা করেন, অন্তর্নেত্রে

সন্তানকে দেখেনও। তথাপি তিনি সাক্ষাদ্‌ভাবে সন্তানের জন্য লালায়িত হয়েন এবং যখন তাহার দর্শন পায়েন, তখন আনন্দের আবেগে অশ্রুবর্ষণও করিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (৯ম অনুচ্ছেদে, ১৬৬-৬৭ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"ঈদৃশেঽপি ভগবৎ-সাক্ষাৎকারে বহিঃ-সাক্ষাৎকারস্যোৎকর্ষমাহ—গৃহীত্বাজাদয়ো যস্য শ্রীমৎপাদাব্জ-দর্শনম্। মনসা যোগপাকেন স ভবান্ মেঽক্ষিগোচরঃ॥ (শ্রীভা, ১২।৯।৫)। টীকা চ—যস্য তব শ্রীমৎপাদাব্জদর্শনং মনসাপি গৃহীত্বা প্রাপ্য প্রাকৃতা অপ্যজাদয়ো ভবন্তি স ভগবান্ মেঽক্ষিগোচরো জাতোঽস্তি কিমতঃপরং বরেণেত্যর্থ ইত্যেষা।—উভয়বিধ ভগবৎসাক্ষাৎকার ঈদৃশ (ব্রহ্মসাক্ষাৎকার হইতে শ্রেষ্ঠ) হইলেও বহিঃসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ বা শ্রেষ্ঠত্ব কথিত হইয়াছে। (মার্কণ্ডেয় শ্রীনারায়ণ-ঋষিকে বলিয়াছেন) 'যাঁহার শ্রীমচ্চরণকমল যোগপক্কমনের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া প্রাকৃত-লোকও ব্রহ্মাদি হইয়াছেন, সেই আপনি আমার নয়নগোচর হইয়াছেন (শ্রীভা, ১২।৯।৫)।' এই শ্লোকের শ্রীধরস্বামি-পাদের টীকা এইরূপ—'যে তোমার শ্রীমচ্চরণকমল মনের দ্বারা প্রাপ্ত হইয়া (ধ্যানযোগে অবলোকন করিয়া) প্রাকৃত জীবও (মায়াপরবশ জীবও) ব্রহ্মাদি হইয়াছেন, সেই ভগবান্ আমার নয়নগোচর হইয়াছেন। ইহার পরে আর বরের কি প্রয়োজন ?"

বহিঃসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-স্থলে শ্রীমদ্‌ভাগবতের আরও একটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

"যৎপাদপাংশুর্বহুজন্মকৃচ্ছ্রতো ধৃতাত্মভির্যোগিভিরপ্যগম্যঃ।
স এব যদ্দৃগ্‌বিষয়ঃ স্বয়ং স্থিতঃ কিং বর্ণ্যতে দিষ্টমতো ব্রজৌকসাম্॥ শ্রীভা, ১০।১২।১২॥

—যোগিগণ বহুজন্মপর্য্যন্ত কৃচ্ছ্রাদি ব্রতদ্বারা সংযতচিত্ত হইয়াও যাঁহার চরণরেণু লাভ করিতে পারেন না, সেই ভগবান্ স্বয়ং যে সকল ব্রজবাসীর দৃষ্টিগোচরে অবস্থিত আছেন, তাঁহাদের ভাগ্যের কথা আর কি বলিব ?"

শ্রীনারদ সর্ব্বদা ভগবানের গুণকীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন এবং ভগবানের যশঃকীর্ত্তনের সময়ে যেন আহূতের ন্যায় ভগবান্ তাঁহার হৃদয়ে আবির্ভূত হইতেন (অর্থাৎ যশঃকীর্ত্তন-কালে নারদ ভগবানের অন্তঃসাক্ষাৎকার লাভ করিতেন); তথাপি তিনি শ্রীকৃষ্ণদর্শনের (বহিঃসাক্ষাৎকারের) লালসায় পুনঃ পুনঃ যাইয়া দ্বারকায় বাস করিতেন।

"প্রগায়তঃ স্ববীর্য্যাণি তীর্থপাদঃ প্রিয়শ্রবাঃ।
আহূত ইব মে শীঘ্রং দর্শনং যাতি চেতসি॥ শ্রীভা, ১।৬।৩৪॥

—(ব্যাসদেবের নিকটে নারদ বলিয়াছেন) যাঁহার চরণের আবির্ভাব-স্থল তীর্থ হইয়া থাকে, স্বীয় যশঃকথা যাঁহার প্রিয়, সেই ভগবান্ তাঁহার যশঃকীর্ত্তন-সময়ে যেন আহূতের ন্যায় আমার চিত্তে আবির্ভূত হইয়া আমাকে দর্শন দিয়া থাকেন।"

"গোবিন্দভুজগুপ্তায়াং দ্বারাবত্যাং কুরূদ্বহ।
অবাৎসীন্নারদোঽভীক্ষ্ণং কৃষ্ণোপাসনলালসঃ॥ শ্রীভা, ১১।২।১॥

—(শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন)—হে কুরুবংশধর! কৃষ্ণদর্শন-লালসায় নারদ গোবিন্দ-বাহুদ্বারা পরিরক্ষিত দ্বারকায় বারংবার বাস করিয়াছেন।"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে অন্তঃসাক্ষাৎকার অপেক্ষা বহিঃসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ জানা যাইতেছে।

(৪) সালোক্য-সারূপ্য-সার্ষ্টি অপেক্ষা সামীপ্যের উৎকর্ষ

বহু সাধক বিভিন্ন ভাবে একই ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করিতে পারেন এবং মুক্ত অবস্থায় স্ব-স্ব-বাসনা অনুসারে কেহ বা সালোক্য, কেহ বা সারূপ্য, কেহ বা সার্ষ্টি এবং কেহ বা সামীপ্য লাভ করিতে পারেন।

যাঁহারা সালোক্য লাভ করেন, তাঁহারা কেবল উপাস্য স্বরূপের সহিত একই লোকে—অর্থাৎ উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপ যে ধামে অবস্থিত, সেই ধামে—বাস করিবার অধিকার পায়েন, ভগবানের সমীপে বা নিকটে তাঁহারা থাকেন না। তাঁহারা কেবল অন্তঃসাক্ষাৎকারই লাভ করেন, বহিঃ-সাক্ষাৎকার তাঁহাদের ভাগ্যে ঘটেনা।

যাঁহারা সারূপ্য লাভ করেন, তাঁহারাও কেবল উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের সমান রূপ লাভ করিয়া তাঁহার ধামেই বাস করেন, তাঁহার সমীপে বা সান্নিধ্যে থাকেন না। সুতরাং তাঁহাদেরও অন্তঃসাক্ষাৎকারই লাভ হয়, বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ হয় না।

সার্ষ্টি-প্রাপ্ত জীবগণও উপাস্য-ভগবৎ-স্বরূপের সমজাতীয় কিঞ্চিৎ ঐশ্বর্য্য লাভ করিয়া সেই ভগবৎ-স্বরূপের ধামেই বাস করেন, সান্নিধ্যে বাস করেন না। তাঁহাদেরও কেবল অন্তঃসাক্ষাৎকার লাভ, বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ হয় না।

কিন্তু যাঁহারা সামীপ্য মুক্তি লাভ করেন, তাঁহারা উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের ধামে তাঁহারই সমীপে বা সান্নিধ্যে বাস করিবার সৌভাগ্য লাভ করেন। তাঁহাদের বহিঃসাক্ষাৎকার লাভ ঘটে।

অন্তঃসাক্ষাৎকার অপেক্ষা বহিঃসাক্ষাৎকারের উৎকর্ষ বলিয়া সালোক্য, সারূপ্য ও সার্ষ্টি অপেক্ষা সামীপ্যেরই উৎকর্ষ। "সালোক্যাদিষু চ সামীপ্যস্যাধিকং বহিঃসাক্ষাৎকারময়ত্বাৎ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ১৬ অনুচ্ছেদ॥ ২০০ পৃষ্ঠা।"

সালোক্য-সারূপ্য-সার্ষ্টির আনন্দ কেবল অন্তঃসাক্ষাৎকারজনিত। কিন্তু সামীপ্যের আনন্দ হইতেছে বহিঃসাক্ষাৎকারজনিত—সুতরাং উৎকর্ষময়। যাঁহারা ভগবানের সান্নিধ্যে বাস করেন, সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের রূপদর্শন—সৌন্দর্য্য-মাধুর্য্যাদির দর্শনও—যেমন তাঁহাদের হইয়া থাকে, তেমনি আবার ভগবানের লীলাদর্শনের সৌভাগ্যও তাঁহাদের হইয়া থাকে। ভগবানের লীলাতে পরিকররূপে ভগবানের সেবা করার সৌভাগ্যও তাঁহাদের লাভ হয়। লীলা-ব্যপদেশে

যে রস উৎসারিত হয়, ভগবান্ নিজেও তাহা আস্বাদন করেন, আবার পরিকর-ভক্তবৃন্দকেও তাহা আস্বাদন করাইয়া থাকেন। ভগবৎকৃপায় সাক্ষাদ্ভাবে লীলারসের আস্বাদনও সামীপ্যপ্রাপ্ত মুক্তজীবগণের ভাগ্যে ঘটিয়া থাকে। কিন্তু সালোক্যাদি ত্রিবিধ-মুক্তিপ্রাপ্ত পার্ষদদের পক্ষে মানসে তাহা অনুভূত হইলেও সাক্ষাৎ অনুভব সম্ভবপর নহে।

এ-সমস্ত কারণেই সালোক্য-সারূপ্য-সার্ষ্টিপ্রাপ্ত মুক্তজীবদের আনন্দিত্ব অপেক্ষা সামীপ্য-প্রাপ্ত মুক্তপুরুষগণের আনন্দিত্ব পরমোৎকর্ষময়।

(৫) **পরব্যোমাধিপতি নারায়ণের সামীপ্য সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষময়**

পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে প্রত্যেক ভগবৎ-স্বরূপের ধামেই সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির স্থান আছে। পরব্যোমাধিপতি নারায়ণই অন্য সমস্ত ভগবৎস্বরূপ হইতে পরমোৎকর্ষময় বলিয়া অন্যান্য ভগবৎস্বরূপের ধাম অপেক্ষা শ্রীনারায়ণের ধামের মুক্তিচতুষ্টয়ও পরমোৎকর্ষময়। সালোক্যাদি মুক্তিত্রয় অপেক্ষা সামীপ্য আবার পরমোৎকর্ষময় বলিয়া শ্রীনারায়ণের ধামের সামীপ্য হইতেছে পরব্যোমের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষময়।

এইরূপে দেখা গেল—পরব্যোমস্থ বিভিন্ন ভগবদ্ধামের চতুর্ব্বিধা মুক্তির মধ্যে শ্রীনারায়ণের ধামের সামীপ্যমুক্তিই হইতেছে সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষময়, এই মুক্তির আনন্দিত্বও হইতেছে সর্ব্বাতিশায়ী।

১২। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি সম্বন্ধে সাধারণ আলোচনা

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করেন, ভগবৎ-পার্ষদরূপে নিত্য চিন্ময় দেহে তাঁহারা পরব্যোমে অবস্থান করেন। পরব্যোম হইতেছে ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধাম। পরব্যোমস্থ ভগবৎ-স্বরূপগণের মধ্যে মাধুর্য্য অপেক্ষা ঐশ্বর্য্যের বিকাশই বেশী এবং তত্রত্য পরিকর-গণের মধ্যেও ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্য (১।১।১২৯ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ক। সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবগণ শান্তভক্ত

পরব্যোমস্থ চতুর্ব্বিধ-মুক্তিপ্রাপ্ত পরিকর-ভক্তগণকে **শান্তভক্ত** বলা হয়। নব-যোগীন্দ্র, সনক-সনাতনাদি হইতেছেন শান্তভক্ত। "শম"-শব্দের অর্থ—ভগবন্নিষ্ঠতা। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"শমো মন্নিষ্ঠতা বুদ্ধেঃ॥ শ্রীভা, ১১।১৯।৩৬॥" এইরূপ "শম" যাঁহাদের আছে, তাঁহারাই শান্তভক্ত। এজন্য শান্তভক্তের একটী লক্ষণ হইতেছে—"কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা" এবং তাহার ফলে "কৃষ্ণ বিনা তৃষ্ণা ত্যাগ।"

শান্তরসে স্বরূপবুদ্ধ্যে কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা॥ শ্রী চৈ, চ ২।১৯।১৭৩॥
কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ —তার কার্য্য মানি॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৭৪॥
কৃষ্ণনিষ্ঠা, তৃষ্ণাত্যাগ—শান্তের দুই গুণে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৭৫॥

শান্তভক্তের চিত্তে ভগবানের স্বরূপের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। স্বরূপে ভগবান্ হইতেছেন পরব্রহ্ম, পরমাত্মা। শান্তভক্তের চিত্তে ভগবানের সম্বন্ধে এইরূপ জ্ঞানই—অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-প্রধান-জ্ঞানই—বিরাজিত। এজন্য ভগবানের সম্বন্ধে শান্তভক্তের মমত্ববুদ্ধি জন্মিতে পারে না—"ভগবান্ আমার আপন জন"-এইরূপ জ্ঞান জন্মেনা।

শান্তের স্বভাব—কৃষ্ণে মমতাগন্ধহীন।
পরং ব্রহ্ম পরমাত্মা জ্ঞানপ্রবীণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৭৭ ॥

শান্তভক্তের ভাব মদীয়তাময় নহে, পরন্তু তদীয়তাময়। "ভগবান্ আমার"-এই জ্ঞান তাঁহার নাই; "আমি ভগবানের, ভগবান্ আমার অনুগ্রাহক, আমি তাঁহার অনুগ্রাহ্য"-ইত্যাদি ভাবই শান্তভক্তের চিত্তে বলবান্।

ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ শান্তভক্তের চিত্তে ভগবানের সম্বন্ধে "প্রিয়ত্ব-বুদ্ধি" সম্যক্‌রূপে বিকশিত হয় না। এজন্যই শান্তভক্ত "মমতাগন্ধহীন"; প্রিয়ত্ববুদ্ধির কিঞ্চিৎ বিকাশ আছে; নচেৎ, শান্তভক্তের পক্ষে "কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা" এবং "কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ" সম্ভব হইত না।

ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্যবশতঃ শান্তভক্তের "সেবাবাসনা"ও সম্যক্‌রূপে বিকশিত হইতে পারেনা। "যিনি ঈশ্বর, পরমাত্মা, পরিপূর্ণ-স্বরূপ, আত্মারাম, তাঁহার আবার সেবার প্রয়োজনই বা কোথায়?" শান্তভক্তের চিত্তে তাঁহার স্বরূপগত সেবাবাসনা উদ্বুদ্ধ হইতে চাহিলেও উল্লিখিতরূপ ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে তাহা প্রতিহত হয়। সুতরাং স্বতঃস্ফূর্ত্ত প্রাণঢালা ভগবৎ-সেবা শান্তভক্তের পক্ষে অসম্ভব। যাঁহারা সামীপ্যমুক্তি লাভ করেন, ভগবানের লীলাদিতে তাঁহারাও ভগবানের সেবা করেন বটে; কিন্তু সঙ্কোচের সহিত; কোনও কোনও স্থলে হয়তো কেবল আদেশ-পালন মাত্র।

খ। শান্তভক্ত দ্বিবিধ

শান্তভক্ত দুই শ্রেণীর—আত্মারাম ও তাপস। কৃষ্ণের বা কৃষ্ণভক্তের কৃপাতে যে সমস্ত আত্মারাম বা তাপস কৃষ্ণভক্তি লাভ করেন, তাঁহারা শান্তভক্ত। "শান্তাঃ স্যুঃ কৃষ্ণ-তৎপ্রেষ্ঠ-কারুণ্যেন রতিং গতাঃ। আত্মারামা স্তদীয়াধ্ববদ্ধশ্রদ্ধাশ্চ তাপসাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫ ॥" সনক-সনন্দনাদি আত্মারাম শান্তভক্ত। "আত্মারামাস্ত সনক-সনন্দনমুখা মতাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫ ॥" আর, ভক্তিব্যতীত মুক্তি নির্ব্বিঘ্ন হয় না, ইহা ভাবিয়া যাঁহারা যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার করেন, অথচ মুক্তিবাসনা ত্যাগ করেন না, তাঁহাদিগকে তাপস শান্তভক্ত বলে। "মুক্তির্ভক্ত্যৈব নির্ব্বিঘ্নেত্যাত্ত-যুক্তবিরক্ততাঃ। অনুজ্ঝিতমুমুক্ষা যে ভজন্তে তে তু তাপসাঃ ॥ ভ, র, সি, ৩।১।৫ ॥"

শান্তভক্তগণের প্রায়শঃ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দজাতীয় সুখই অনুভূত হয়; ভগবানের সর্ব্বচিত্তাকর্ষক গুণের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাঁহাদের চিত্তে গুণাদির স্ফূর্ত্তি হইয়া থাকে, সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের স্ফূর্ত্তিও হইয়া থাকে। কিন্তু নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানন্দ-জাতীয় সুখ অঘন—তরল; আর সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ ভগবানের অনুভবে যে আনন্দ, তাহা ঘন, প্রচুরতর। "প্রায়ঃ স্বসুখজাতীয়ং সুখং

স্যাদত্র যাগিনাম্। কিন্ত্বাত্মসৌখ্যমঘনং ঘনস্ত্বীশময়ং সুখম্॥ ভ, র, সি, ৩।১।৩॥" এইরূপ অনুভবলব্ধ আনন্দ রসরূপে পরিণত হওয়ার পক্ষে ভগবৎ-স্বরূপের অনুভব (শ্রীবিগ্রহরূপে ভগবৎ-সাক্ষাৎকারই) প্রধানহেতু ; ব্রজের দাস্যাদিভাবের ভক্তের ন্যায় ভগবানের লীলাদির মনোজ্ঞত্ব ইহার প্রধান কারণ নহে। "তত্রাপীশস্বরূপানুভবস্যৈবোরুহেতুতা। দাসাদিবন্মনোজ্ঞতা লীলাদে র্ন তথা মতা॥ ভ, র, সি, ৩।১।৪॥"

গ। সালোক্যাদি মুক্তি দ্বিবিধা

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির প্রত্যেকটীই আবার দুই রকমের—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা। "সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি। সালোক্যাদির্দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা॥ ভ, র, সি, ১।২।২৯॥" বৈকুণ্ঠের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই তাহাতে সুখ এবং ঐশ্বর্য্য বর্ত্তমান। যাঁহাদের চিত্তে এই সুখ এবং ঐশ্বর্য্য লাভের বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের মুক্তি হইল—সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা। আর, যাঁহাদের চিত্তে প্রেমের স্বভাববশতঃ সেবার বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে, তাঁহাদের মুক্তি হইল—প্রেমসেবোত্তরা। এই প্রেমসেবা অবশ্য ব্রজের ন্যায় মদীয়তাময়ী প্রেমসেবা নহে ; যেহেতু, শান্তভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মদীয়তাময় ভাবেরই অভাব ; এই প্রেমসেবা হইতেছে—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানময়-প্রেমের সেবা, তদীয়তাভাবময়-প্রেমসেবা। যাঁহারা সেবা চাহেন, তাঁহারা সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি গ্রহণ করেন না।

ঘ। সালোক্যাদি মুক্তিকামীদের মধ্যে মুক্তিবাসনারই প্রাধান্য

মায়াবদ্ধাবস্থায় কোনও ভাগ্যে জন্ম-মৃত্যু-আদি হইতে অব্যাহতি লাভের জন্য যাঁহাদের বা না জাগে, তাঁহারা তাহার উপায়ের অনুসন্ধান করিয়া যখন জানিতে পারেন যে, ভগবানের দ্রব্যাপন্ন না হইলে মায়াজনিত সংসার-দুঃখ হইতে মুক্তি পাওয়া যায় না (মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়া- শক্তিং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥ ৭।১৪ ॥, তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি ন্যান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥ ..তাশ্বতর-শ্রুতি), তখন মুক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই তাঁহারা সাধনে প্রবৃত্ত হয়েন। ভগবানের সঙ্গে জীবের স্বরূপতঃ যে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ, প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ, সংসারী অবস্থায় জীব তাহা জানিতে পারেনা। সুতরাং কেবল মুক্তিলাভের বাসনাতেই সাধারণতঃ অনেকে সাধনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন। শেষপর্য্যন্তও সাধারণতঃ ইঁহাদের চিত্তে মুক্তিবাসনাই বলবতী থাকে। এই জাতীয় সাধকগণই তাঁহাদের সাধনের পরিপক্কতায় ভগবৎকৃপায় সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করেন। মুক্তি লাভের জন্যই তাঁহারা মুক্তিদাতা ঈশ্বর ভগবানের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন বলিয়া ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানও তাঁহাদের চিত্তে প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে। ইহাই হইতেছে সালোক্যাদি মুক্তির উপাসকদের এবং সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবদের চিত্তের সাধারণ অবস্থা।

নিজেদের মুক্তি-বাসনাই সাধনের প্রবর্ত্তক বলিয়া ইঁহাদের মধ্যে কাহারও কাহারও নিত্য-কৃষ্ণ-দাসত্বের জ্ঞানও স্ফুরিত হয়না, সুতরাং কৃষ্ণসেবার বাসনাও স্ফুরিত হয় না। তজ্জন্য তাঁহাদের

স্বরূপভূতা সুখবাসনা সংসারাবস্থায় যেমন নিজেদের সুখবাসনাতেই পর্য্যবসিত হইয়া থাকে, মুক্ত' হাতেও তেমনি তদ্রূপই থাকে ; ভগবৎ-সেবাবাসনা স্ফুরিত হয়না বলিয়া এই সুখবাসনার গতি ভগব নের দিকে চালিত হইতে পারেনা। মুক্তাবস্থাতেও তাঁহারা নিজেদের সুখই চাহেন, ভগবদ্ধামের সুখৈশ্বর্য্যই তাঁহাদের কাম্য হয়। ইহাদের মুক্তিকেই "সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা" বলা হইয়াছে। ইহাদের পক্ষে মুক্তি-বাসনারই প্রাধান্য, সুখৈশ্বর্য্যবাসনা আনুষঙ্গিক ; মুক্তিপ্রাপ্তির পরে সুখৈশ্বর্য্য (সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা—সুখৈশ্বর্য্য উত্তরে বা পরে যাহার, তাদৃশী মুক্তি)।

আর, কোনও ভাগ্যবশতঃ যাঁহাদের কৃষ্ণদাসত্বের জ্ঞান স্ফুরিত হয় এবং ভগবানের সঙ্গে প্রিয়ত্ব-সম্বন্ধের জ্ঞানও কিঞ্চিৎ স্ফুরিত হয়, তাঁহারা মুক্তি লাভের পরে কিঞ্চিৎ সেবাও কামনা করেন। নিজেদের জন্য মুক্তিবাসনা বলবতী থাকে বলিয়া তাঁহাদের পক্ষে প্রিয়ত্ব-সম্বন্ধের জ্ঞান সম্যক্‌রূপে স্ফুরিত হইতে পারে না ; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্যও প্রিয়ত্ব-সম্বন্ধ-জ্ঞানের সম্যক্ স্ফুরণের পক্ষে অন্তরায় হইয়া পড়ে। এইরূপ ভক্তগণের মুক্তিকেই "প্রেমসেবোত্তরা" বলা হইয়াছে। ইঁহাদের পক্ষেও মুক্তি-বাসনারই প্রাধান্য, প্রেমসেবা আনুষঙ্গিক। মুক্তিপ্রাপ্তির পরে প্রেমসেবা (প্রেমসেবোত্তরা-প্রেমসেবা উত্তরে বা পরে যাহার, তাদৃশী মুক্তি)।

এইরূপে দেখা গেল—সালোক্যাদি মুক্তিকামী সাধকদের মধ্যে মুক্তিবাসনারই প্রাধান্য।

চতুর্থ অধ্যায়

পঞ্চম বা পরম পুরুষার্থ

১৩। পঞ্চম পুরুষার্থ—প্রেম

ক। প্রেম ও প্রেমের পুরুষার্থতা

পূর্ব্বে চারিটী পুরুষার্থের কথা বলা হইয়াছে—ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ। ইহাও বলা হইয়াছে যে, এই চারিটী পুরুষার্থের মধ্যে প্রথম তিনটীর বাস্তব-পুরুষার্থতাই নাই; কিন্তু চতুর্থ পুরুষার্থ মোক্ষের পুরুষার্থতা আছে। এক্ষণে তদতিরিক্ত আর একটী পুরুষার্থের কথা বলা হইতেছে। এই পঞ্চম-পুরুষার্থটী হইতেছে **প্রেম**—ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম। প্রেম-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—**কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য ইচ্ছা**। "কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম॥ শ্রীচৈ. চ. ১।৪।১৪১॥"

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়—পরব্রহ্মই জীবের একমাত্র প্রিয় (১।১।১৩৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); এজন্য শ্রুতি প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথাই বলিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত॥ বৃহদারণ্যক॥ ১।৪।৮॥" প্রিয়রূপে উপাসনার তাৎপর্য্যই হইতেছে প্রিয়ের প্রীতি-বিধান। প্রিয়ের নিকটে নিজের জন্য কিছু চাওয়া হইতেছে প্রিয়ত্ব-বিরোধী; তাহা প্রিয়ের সেবা নহে, পরন্তু নিজের সেবা।

প্রিয়ত্ব-বস্তুটী হইতেছে পারস্পরিক। যে দুই জনের মধ্যে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ বিদ্যমান, তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রিয়; সুতরাং তাঁহারা পরস্পর পরস্পরের প্রীতিবিধানের জন্যই উৎসুক। আমার প্রিয়ব্যক্তি যখন আমার প্রীতিবিধান করেন, তখন তাহা হয় প্রিয়কর্তৃক আমার সেবা; এই সেবার বিনিময়ে তিনি যদি আমার নিকটে কিছু প্রত্যাশা করেন, তাহা হইবে প্রিয়ত্ব-ধর্ম্ম-বিরোধী।

ভগবান্ পরব্রহ্ম জীবের প্রিয়। প্রিয়ত্ব-বস্তুটী পারস্পরিক বলিয়া জীবও স্বরূপতঃ পরব্রহ্মের প্রিয়; পরব্রহ্মও জীবের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। ভগবান্ নিজমুখেই বলিয়াছেন—"মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ॥ পদ্মপুরাণ॥—আমার ভক্তচিত্ত-বিনোদনের জন্য আমি নানাবিধ কার্য্য করিয়া থাকি।"

জীব কৃষ্ণের নিত্যদাস; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসেবাই হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই জীবের একমাত্র প্রিয় বলিয়া প্রিয়রূপে তাঁহার সেবা—একমাত্র তাঁহার প্রীতিবিধানাত্মিকা সেবাই—হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। এজন্যই শ্রুতি প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন।

কিন্তু প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে হইলে সর্ব্বাগ্রেই প্রয়োজন তাদৃশী সেবার

বাসনা। সেবার জন্য বলবতী বাসনা না থাকিলে বাস্তবিকী সেবা হইতে পারে না; কেবল আদেশ পালনে সেবা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। সেবা যদি কেবল সেব্যের প্রীতির অপেক্ষা রাখে, আদেশাদির অপেক্ষা না রাখে, তাহা হইলেই সেবা পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

কৃষ্ণসেবার জন্য এতাদৃশী স্বতঃস্ফূর্ত্তা বলবতী বাসনার নামই প্রেম। **প্রেম** হইতেছে **কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা**। এতাদৃশী বাসনাকে সম্বল করিয়া কৃষ্ণসেবায় প্রবৃত্ত হইতে পারিলেই "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"-এই শ্রুতিবাক্য পূর্ণ সার্থকতা লাভ করিতে পারে।

কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাই যখন নিত্য-কৃষ্ণদাস জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য এবং কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনারূপ প্রেম ব্যতীত যখন ঈদৃশী সেবা অসম্ভব, তখন এই প্রেম যে জীবের একটী অভীষ্ট বা অর্থ, তাহা অস্বীকার করা যায়না। এইরূপে দেখা গেল কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমেরও পুরুষার্থতা আছে।

খ। প্রেমের পঞ্চম-পুরুষার্থতা

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে--প্রেম পুরুষার্থ হইলেও ইহাকে পঞ্চম পুরুষার্থ কেন বলা হইবে? চতুর্থ-পুরুষার্থ মোক্ষ হইতে যদি প্রেমের উৎকর্ষ থাকে, তাহা হইলেই ইহাকে মোক্ষের পরবর্ত্তী পঞ্চম-পুরুষার্থ বলা সঙ্গত হইতে পারে। মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ আছে কিনা?

মোক্ষ হইতেও প্রেমের যে উৎকর্ষ আছে, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) **জীবের স্বরূপানুবন্ধী ভাবের বিকাশে প্রেমের উৎকর্ষ**

মোক্ষ বলিতে সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিকেই বুঝায়। ইহাদের মধ্যে সাযুজ্যে যে জীবের স্বরূপগত কৃষ্ণদাসত্ব—সুতরাং সেব্য-সেবক ভাবই—স্ফুরিত হয় না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আবার সালোক্যাদি চতুর্বিধা মুক্তির মধ্যে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তিতেও যে কৃষ্ণদাসত্বের বা সেব্য-সেবক-ভাবের স্ফুরণ হয় না, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। প্রেমসেবোত্তরা সালোক্যাদি মুক্তিতে কৃষ্ণদাসত্বের এবং প্রিয়ত্বের কিঞ্চিৎ বিকাশ হইলেও তাহা যে মুখ্য নহে, পরন্তু আনুষঙ্গিক, তাহাও পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। এইরূপে দেখা গেল—মোক্ষের কোনও কোনও স্তরে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ভাবেরই স্ফুরণ নাই, কোনও কোনও স্তরে তাহার স্ফুরণ থাকিলেও তাহা অতি সামান্য।

কিন্তু প্রেমের লক্ষ্যই হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। সুতরাং প্রেমে জীবের স্বরূপানুবন্ধী ধর্ম্মের বিশেষ বিকাশ। এই বিষয়ে মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ।

(২) **কৃষ্ণসেবা-ব্যতীত অন্যবাসনাহীনত্বে প্রেমের উৎকর্ষ**

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, মোক্ষে বা পঞ্চবিধা মুক্তিতে মোক্ষ-বাসনারই, অর্থাৎ নিজের জন্য আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির বাসনারই, প্রাধান্য। কিন্তু কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাই প্রেমের লক্ষ্য বলিয়া মোক্ষ-বাসনার স্থান প্রেমে নাই। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাকামী, তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছুই চাহেন না, এমন কি মোক্ষপর্য্যন্তও তাঁহারা চাহেন না। ইহাতেই কৃষ্ণদাসত্ব-ভাবের—সেব্য-

সেবক-ভাবের প্রচুর বিকাশ সূচিত হইতেছে। যিনি কৃষ্ণদাস, কৃষ্ণের সেবা ব্যতীত অন্য কিছুই তাঁহার কাম্য হইতে পারে না।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার্থিগণ নিজেরা তো মোক্ষ চাহেনই না, শ্রীকৃষ্ণ উপযাচক হইয়াও যদি তাঁহাদিগকে মোক্ষ দিতে চাহেন, তথাপি তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না। একথা শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিয়া গিয়াছেন।

"সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।১৩॥"
"ন পারমেষ্ঠ্যং ন মহেন্দ্রধিষ্ণ্যং ন সার্ব্বভৌমং ন রসাধিপত্যম্।
ন যোগসিদ্ধীরপুনর্ভবং বা ময্যর্পিতাত্মেচ্ছতি মদ্বিনাঽন্যৎ॥ শ্রীভা, ১১।১৪।১৪॥

—(উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) যাঁহাদের চিত্ত আমাতে অর্পিত হইয়াছে, তাঁহারা কি পারমেষ্ঠিপদ (ব্রহ্মপদ), কি ইন্দ্রত্ব, কি সার্ব্বভৌমত্ব (সমস্ত জগতের আধিপত্য), কি রসাধিপত্য (পাতালের আধিপত্য), অথবা কি যোগসিদ্ধি, এমন কি অপুনর্ভব (বা মোক্ষ)—আমাভিন্ন এ-সমস্তের কোনটীই তাঁহারা ইচ্ছা করেন না।"

শ্রীকৃষ্ণ-সেবার্থীরা শ্রীকৃষ্ণসেবা ব্যতীত অন্য কিছুই কামনা করেন না। এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ।

শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবার্থিগণ মোক্ষ চাহেন না বলিয়া যে তাঁহাদের মোক্ষ হয় না, তাঁহাদের মায়াবন্ধন যে ঘুচিয়া যায় না, তাহা নহে। সূর্য্যোদয়ে অন্ধকারের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তিতেই তাঁহাদের মায়াবন্ধন আপনা-আপনিই অপসারিত হইয়া যায়। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন। শ্রুতি॥" অবশ্য এইভাবে মায়ানির্ম্মুক্তির গোপন-বাসনাও সাধনকালে তাঁহাদের চিত্তে থাকে না ; এইরূপ গোপন-বাসনা হইতেছে কপটতা ; কপটতা প্রেমের বিরোধী।

(৩) মমত্ববুদ্ধির বিকাশে প্রেমের উৎকর্ষ

যেখানে প্রেম, সেখানেই মমত্ববুদ্ধি। প্রেম বা কৃষ্ণেন্দ্রিয়প্রীতি-ইচ্ছা এবং মমত্ববুদ্ধি—ইহারা পরস্পর পরস্পরের নিত্য সহচরী। অথবা, মমত্ববুদ্ধি হইতেছে প্রেমের বা প্রিয়ত্ববুদ্ধিরই স্বাভাবিক ফল।

প্রেমবশতঃ ভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ে মমত্ববুদ্ধি জাগ্রত হয়, শ্রীকৃষ্ণে তাঁহার মদীয়তাময়—শ্রীকৃষ্ণ আমারই-এইরূপ—ভাব জন্মে। কিন্তু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিপ্রাপ্ত শান্তভক্তগণ হইতেছেন—শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে "মমতাগন্ধহীন।"

স্বরূপতঃ যিনি জীবের একমাত্র প্রিয়, তাঁহাকে "আমার একান্ত আপন" বলিয়া মনে করিতে না পারা বিশেষ সৌভাগ্যের পরিচায়ক নয়।

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ।

(৪) **ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতায় প্রেমের উৎকর্ষ**

প্রেম বিশেষ গাঢ়ত্ব লাভ করিলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে মমত্ববুদ্ধিও বিশেষ গাঢ়ত্ব লাভ করে। সেই অবস্থায় শ্রীকৃষ্ণ ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম হইলেও এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের বিকাশ দর্শন করিলেও তাঁহার ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রেমিক ভক্তের হৃদয়ে জাগ্রত হয় না, শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যকেও শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্য বলিয়া তিনি মনে করেন না। প্রেমিকভক্ত তখনও শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার আপন-জন বলিয়াই মনে করেন, কখনও ঈশ্বর বা ভগবান্ বলিয়া মনে করিতে পারেন না। গাঢ় প্রেম এবং গাঢ় মমত্ববুদ্ধির ফলেই এইরূপ হইয়া থাকে। গাঢ় প্রেমরূপ সমুদ্রের অতল জলে যেন ঐশ্বর্য্যজ্ঞান আত্মগোপন করিয়া থাকে (১।১।১২৯-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

কিন্তু সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ত শান্তভক্তদের মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে।

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ।

(৫) **সেবায় প্রেমের উৎকর্ষ**

গাঢ় প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন এবং মমত্ববুদ্ধিময় বলিয়া কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার জন্য তাদৃশ-প্রেমবান্ ভক্তের উৎকণ্ঠা অত্যন্ত বলবতী হইয়া উঠে; সুতরাং তাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবাও হয় সঙ্কোচহীনা প্রাণঢালা সেবা। তাহাতেই জীবের স্বরূপগত কৃষ্ণদাসত্বের এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে প্রিয়ত্ব-বুদ্ধির সম্যক্ সার্থকতা।

কিন্তু সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত জীবদের মধ্যে যাঁহারা নিজের বাসনা অনুসারে সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি পাইয়া থাকেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে সেবার প্রশ্নই উঠিতে পারে না; আর, যাঁহারা প্রেম-সেবোত্তরা মুক্তি পাইয়া থাকেন, প্রিয়ত্ববুদ্ধির অসম্যক্ স্ফুরণবশতঃ এবং মমতাগন্ধহীনতা-বশতঃ তাঁহাদের পক্ষেও সঙ্কোচহীনা প্রাণঢালা সেবার সৌভাগ্য ঘটে না।

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ।

(৬) **কৃষ্ণপ্রীতির স্ফুরণে প্রেমের উৎকর্ষ**

শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যাঁহার প্রীতি যতটুক্ উদ্বুদ্ধ হয়, তাঁহার বিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের প্রাতিও ততটুকু স্ফুরিত হইয়া থাকে। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥ গীতা॥ ৪।১১॥"-ভগবানের এই উক্তিই তাহার প্রমাণ। "কৃষ্ণ কেমন? যার মনে যেমন"-এই লৌকিক প্রবাদও ইহারই সমর্থক।

প্রেমিক ভক্ত শ্রীকৃষ্ণকে তাঁহার আপন-জন মনে করেন, অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন; শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে নিতান্ত আপন-জন, অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

"সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্।
মদন্যত্তে ন জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি ॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৮॥

—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমিও সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারাও আমাকে ছাড়া আর কিছু জানেন না ; আমিও তাঁহাদিগকে ছাড়া অন্য কিছু জানি না।”

"যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥ গীতা ॥ ৯।২৯ ॥

—যাঁহারা ভক্তি (প্রেম) সহকারে আমার ভজন (সেবা) করেন, তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি।”

এইরূপে দেখা গেল—ভক্তচিত্তস্থিত কৃষ্ণ-সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনারূপ প্রেম শ্রীকৃষ্ণের মধ্যেও ভক্তসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী প্রীতির স্ফুরণ করিয়া থাকে। কিন্তু সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত শান্তভক্তের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাদৃশ প্রেমের অভাব—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের চিত্তেও ভক্তের প্রতি তদনুরূপ প্রীতিবিকাশের অভাব।

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ।

(৭) শ্রীকৃষ্ণবশীকরণ-শক্তিতে প্রেমের উৎকর্ষ

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম প্রেমের বশীভূত, প্রেম তাঁহার বশীভূত নহে (১।১।১২৮-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সর্ব্ববশীকর্ত্তা হইয়াও তিনি একমাত্র প্রেমেরই বশীভূত, অন্য কিছুর বশ্য নহেন। মাঠর শ্রুতিও বলিয়াছেন—“ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।” প্রেমের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে তাঁহার বশ্যতারও তারতম্য হইয়া থাকে। সালোক্যাদি মুক্তিপ্রাপ্ত শান্ত ভক্তগণের মধ্যে বিশুদ্ধ প্রেমের অভাব—সুতরাং তাঁহাদের নিকটে ভগবানের তাদৃশী বশ্যতারও অভাব (১।১।১২৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(৮) শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যাস্বাদন-সামর্থ্যে প্রেমের উৎকর্ষ

রসঘনবিগ্রহ, মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় হইতেছে প্রেম।

পঞ্চম পুরুষার্থ সেই প্রেম মহাধন।
কৃষ্ণের মাধুর্য্যরস করায় আস্বাদন ॥ শ্রী, চৈ, চ, ১।৭।১৩৭॥

লৌকিক জগতেও দেখা যায়—কোনও শিশু অন্যের দৃষ্টিতে কুৎসিত হইলেও তাহার জননীর স্নেহময়ী দৃষ্টিতে কুৎসিত নহে। এজন্য কবি বলিয়াছেন—

যদ্যপি সন্তান হয় অসিত-বরণ।
প্রসূতির কাছে তাহা কষিত-কাঞ্চন ॥

কোনও আস্বাদ্য বস্তু যে-কোনও ইন্দ্রিয়দ্বারাই আস্বাদ্য হয় না ; তাহা কেবল যথাযোগ্য ইন্দ্রিয়েরই আস্বাদ্য হয়। রসগোল্লা-সন্দেশাদি কেবলমাত্র রসনাদ্বারাই আস্বাদ্য, চক্ষুঃ-কর্ণাদিদ্বারা আস্বাদ্য নহে। প্রত্যেক বস্তুর আস্বাদনের জন্যই নির্দ্দিষ্ট করণ আছে। ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদনের করণ হইতেছে ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম। এই প্রেম যাঁহার মধ্যে যত বেশী বিকশিত, তিনি ভগবন্মাধুর্য্যও ততবেশী অনুভব করিতে পারেন ; যাঁহার মধ্যে এই প্রেমের বিকাশ নাই, তিনি তাহা মোটেই

অনুভব করিতে পারেন না। শ্রীল কৃষ্ণদাস-কবিরাজ গোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে শ্রীকৃষ্ণের মুখে ইহাই প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

আমার মাধুর্য্য নিত্য নব নব হয়।
স্ব স্ব প্রেম অনুরূপ ভক্তে আস্বাদয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১২৫ ॥

সাযুজ্যপ্রাপ্তজীবের এবং সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ত জীবের সহিত প্রেমের কোনও সম্বন্ধই নাই। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদনের বিশেষ কোনও সম্ভাবনাই থাকিতে পারে না। যাঁহারা প্রেমসেবোত্তরা সালোক্যাদি-মুক্তি লাভ করেন, তাঁহাদের মধ্যে প্রেমের কিঞ্চিৎ বিকাশ থাকিলেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-মিশ্রণবশতঃ এবং শ্রীকৃষ্ণে মমতাগন্ধহীনতাবশতঃ তাহা অত্যন্ত দুর্ব্বল। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণের (অথবা পরব্যোমস্থিত শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশ সমূহের) মাধুর্য্যের আস্বাদনও হইবে অতি ক্ষীণ। কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে প্রেমেরই প্রাধান্য—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে মমতাবুদ্ধিরও প্রাধান্য—তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদনও হইবে প্রাচুর্য্যময়।

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ।

(৯) কৃষ্ণমাধুর্য্যের প্রকটনে প্রেমের উৎকর্ষ

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম রসঘনবিগ্রহ, মাধুর্য্যঘনবিগ্রহ হইলেও তাঁহার মাধুর্য্যকে বাহিরে অভিব্যক্ত এবং তরঙ্গায়িত করিতে পারে একমাত্র ভক্তের প্রেম। যাঁহার মধ্যে প্রেমের যত অধিক বিকাশ, তাঁহার সান্নিধ্যেই শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যেরও তত অধিক অভিব্যক্তি। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ যখন শ্রীরাধার সান্নিধ্যে থাকেন, শ্রীরাধার সর্ব্বাতিশায়ী প্রেমের প্রভাবে তখন তাঁহার মাধুর্য্য এত অধিকরূপে বিকশিত হয় যে, তাহার দর্শনে স্বয়ং মদন পর্য্যন্ত মুগ্ধ হয়।

রাধা সঙ্গে যদা ভাতি তদা মদনমোহনঃ। গোবিন্দলীলামৃত ॥ ৮।৩২ ॥

এই মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণই প্রকট-লীলাতে যখন দ্বারকা-মথুরায় গমন করেন, তখন সে-স্থানে কিন্তু তাঁহার মদনমোহনরূপ কখনও বিকশিত হয় না। তাহার হেতু এই যে—দ্বারকা-মথুরায় তাঁহার মদনমোহনরূপের মাধুর্য্যকে অভিব্যক্ত করার উপযোগী প্রেমের অভাব।

প্রেমই যে কৃষ্ণমাধুর্য্যের অভিব্যক্তি ঘটাইতে পারে, শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেও তাহা বুঝা যায়। মাঠর শ্রুতি বলেন—"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি—ভক্তিই সাধকজীবকে শ্রীভগবানের নিকটে নিয়া থাকে (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য উপলব্ধি করায়), ভক্তিই সাধকজীবকে শ্রীকৃষ্ণের দর্শন দেওয়ায়।" এ-স্থলে "ভক্তি"-শব্দের অর্থ—প্রেমভক্তি বা প্রেম। "দর্শয়তি"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—"দর্শন করায়, অভিব্যক্ত বা প্রকাশ করায়।" মাধুর্য্যাদির দর্শনেই স্বরূপের দর্শন। যাঁহার মধ্যে ভক্তির বা প্রেমের বিকাশ যত বেশী, তাঁহার নিকটেই মাধুর্য্যাদির বিকাশও হইবে ততবেশী।

অন্য শান্তভক্তগণের মধ্যে প্রেম তো নাই-ই, প্রেমসেবোত্তরা-মুক্তিপ্রাপ্তশান্তভক্তদের মধ্যেও

প্রেমের বিকাশ অতিসামান্য বলিয়া তাঁহাদের দুর্ব্বল প্রেম ভগবন্মাধুর্য্যের অতিসামান্যমাত্র বিকাশই সাধন করিতে পারে। কিন্তু যাঁহাদের মধ্যে প্রেমবিকাশের প্রাচুর্য্য, তাঁহাদের সান্নিধ্যে ভগবন্মাধুর্য্য-বিকাশেরও প্রাচুর্য্য।

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ।

(১০) আনন্দিত্বে প্রেমের উৎকর্ষ

ভগবন্মাধুর্য্য আস্বাদনের একমাত্র উপায় যখন প্রেম এবং প্রেমই যখন ভগবন্মাধুর্য্যকে বাহিরে অভিব্যক্ত করিতে পারে, তখন সহজেই বুঝা যায়—যাঁহার মধ্যে প্রেমের বিকাশ যত বেশী, তিনিই ভগবন্মাধুর্য্যেরও ততবেশী আস্বাদন লাভ করিতে এবং আস্বাদন লাভ করিয়া ততবেশী আনন্দী হইতে পারেন।

মাধুর্য্যাস্বাদন-জনিত আনন্দিত্বে আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম অপেক্ষাও প্রেমবান্ ভক্তের উৎকর্ষ। কেননা, কৃষ্ণবিষয়ক প্রেম ভক্তের মধ্যেই থাকে, ভক্তই সেই প্রেমের আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণ কেবল তাহার বিষয়। শ্রীকৃষ্ণ নিজে নিজবিষয়ক প্রেমের আশ্রয় নহেন বলিয়া একমাত্র কৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আস্বাদ্য শ্রীকৃষ্ণমাধুর্য্যের আস্বাদন তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। প্রেমের বিষয় অপেক্ষা আশ্রয়ের আস্বাদনই অধিক। শ্রীকৃষ্ণের কথায় কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন, "যে প্রেমের দ্বারা শ্রীরাধা আমার মাধুর্য্য সমগ্রভাবে আস্বাদন করিতেছেন,

সেই প্রেমার শ্রীরাধিকা 'পরম আশ্রয়'। সেই প্রেমার আমি হই কেবল 'বিষয়'॥
বিষয়জাতীয় সুখ আমার আস্বাদ। তাহা হৈতে কোটিগুণ আশ্রয়ের আহ্লাদ॥
আশ্রয়জাতীয় সুখ পাইতে মন ধায়। যত্নে আস্বাদিতে নারি কি করি উপায়॥

শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১১৪-১৬॥"

ইহা হইতেই প্রেমবান্ ভক্তের আনন্দিত্বের উৎকর্ষ জানা যাইতেছে।

প্রেমবান্ ভক্তের আনন্দিত্বের উৎকর্ষ আর একভাবেও উপলব্ধ হয়। হ্লাদিনী-শক্তির বৃত্তি বলিয়া প্রেম নিজেই পরম আস্বাদ্য। যিনি এই প্রেমের আশ্রয়, তাঁহার আনন্দ প্রেমের বিষয়ের আনন্দ অপেক্ষা অধিকই হইবে। যে মৃৎপাত্রে আগুন থাকে, আগুনের উষ্ণতার প্রভাবে তাহা যত উত্তপ্ত হয়, আগুনের সান্নিধ্যে উপবিষ্ট লোক তত উত্তাপ অনুভব করেনা।

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ।

(১১) সেবার উৎকর্ষে প্রেমের উৎকর্ষ

জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাই হইতেছে তাহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। কৃষ্ণসেবার তাৎপর্য্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান। সুতরাং যে সেবাতে শ্রীকৃষ্ণ যত বেশী প্রীতি লাভ করেন, সেই সেবাই হইতেছে ততবেশী উৎকর্ষময়ী। শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে যাহা লোভনীয়, সেবার ব্যপদেশে তাহার পরিবেশনই হইতেছে তাঁহার বিশেষ প্রীতির হেতু।

কিন্তু রসিক-শেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লোভনীয় বস্তুটী কি? পূর্ব্বেই (১।১।১২৩-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে—রসস্বরূপত্ব-স্বভাববশতঃ রসস্বরূপ পরব্রহ্মের রসাস্বাদন-স্পৃহা অত্যন্ত বলবতী। স্বরূপানন্দ এবং স্বরূপ-শক্ত্যানন্দ তাঁহার আস্বাদনীয় হইলেও ভক্ত্যানন্দরূপ স্বরূপ-শক্ত্যানন্দই তাঁহার পক্ষে অধিকতর লোভনীয় (১।১।১২৫-২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

ভক্তি বা প্রেমভক্তি বা প্রেম যখন রসরূপে পরিণত হইয়া পরম আস্বাদন-চমৎকারিতা ধারণ করে, তখন তাহা হয় রসিক-শেখর ভগবানের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। এই প্রেম থাকে পরিকর-ভক্তের চিত্তে। লীলার ব্যপদেশে রসরূপে তাহা উৎসারিত হইয়া রসস্বরূপ ভগবানের উপভোগ্য হয়। ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনেই তাঁহার সমধিক আনন্দ।

এই প্রেম যতই গাঢ় ও নির্ম্মল হয়, প্রেমরস-নির্য্যাসও ততই আস্বাদ্য এবং রসিক-শেখরের ততই প্রীতিজনক হইয়া থাকে।

প্রেমসেবোত্তরা মুক্তিপ্রাপ্ত শান্তভক্তগণের চিত্তে যে প্রেম, তাহা তত গাঢ়ও নহে, তত নির্ম্মলও নহে। তাঁহাদের প্রেম যে তরল, তাহার প্রমাণ এই যে, তাঁহাদের প্রেমের মধ্যে ঐশ্বর্য্য-জ্ঞান প্রবেশ করিয়া প্রাধান্য লাভ করিতে পারে। আর, তাঁহাদের প্রেমের সঙ্গে নিজেদের জন্য কিছু চাওয়া—মুক্তিবাসনা—আছে। স্বসুখ-বাসনা বা স্বীয় দুঃখনিবৃত্তি-বাসনাই হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনারূপ প্রেমের পক্ষে মলিনতা। এই উভয়ই তাঁহাদের প্রেমের পক্ষে আস্বাদ্যত্ব—সুতরাং লোভনীয়ত্ব—লাভের প্রত্যবায়। ভগবান্ নিজেই বলিয়াছেন—

"ঐশ্বর্য্যশিথিল-প্রেমে নাহি মোর প্রীত॥
আমারে ঈশ্বর মানে আপনাকে হীন।
তার প্রেমে-বশ আমি না হই অধীন॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।১৪-১৫॥"

কিন্তু যে প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই, স্বসুখবাসনা বা স্বীয় দুঃখনিবৃত্তির বাসনা নাই, তাহার ছায়া পর্য্যন্তও নাই, সেই প্রেমই গাঢ় এবং নির্ম্মল, সেই প্রেমই রসিক-শেখরের পরম লোভনীয়, সেই প্রেমের বশ্যতা-স্বীকারে তিনি পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম যখন বিশেষরূপে গাঢ়তা লাভ করে, তখন তাহার মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারেনা, সেই প্রেমের আশ্রয় ভক্ত তখন ষড়ৈশ্বর্য্যপূর্ণ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেও ঈশ্বর বলিয়া মনে করেন না; মমত্ববুদ্ধিও তখন বিশেষ সান্দ্রতা লাভ করে বলিয়া ভক্তগণ পরব্রহ্ম স্বয়ং-ভগবান্‌কেও নিজেদেরই একজন বলিয়া মনে করেন। গাঢ় প্রেমের গাঢ়তার তারতম্যানুসারে কোনও কোনও ভক্ত বা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করেন, নিজেদের অপেক্ষা বড় মনে করেন না; আবার প্রেমের আরও গাঢ়তার ফলে কোনও ভক্ত বা শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সন্তান-জ্ঞানে নিজেদের অপেক্ষা হীন—নিজেদের লাল্য, পাল্য, অনুগ্রাহ্যও—মনে করেন। প্রেমরস-নির্য্যাসলোলুপ

এবং প্রেমবশ্য রসিকশেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বতোভাবে ইহাদেরই বশ্যতা স্বীকার করিয়া আনন্দ অনুভব করেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী শ্রীকৃষ্ণের মুখে একথাই প্রকাশ করাইয়াছেন।

"আপনাকে বড় মানে—আমারে সম হীন।
সর্ব্বভাবে আমি হই তাহার অধীন॥ শ্রীচৈ, চ ১।৪।২০॥"

এইরূপে দেখা গেল—সালোক্যাদি-মুক্তিপ্রাপ্ত ভক্তগণের সেবা অপেক্ষা মোক্ষাদিবাসনাশূন্য প্রেমের সেবা উৎকর্ষময়ী।

এই বিষয়েও মোক্ষ অপেক্ষা প্রেমের উৎকর্ষ।

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গেল—নানাবিষয়েই মোক্ষ অপেক্ষা প্রেম উৎকর্ষময়। এজন্য **চতুর্থ-পুরুষার্থের উর্দ্ধে, প্রেমের স্থান, প্রেম হইতেছে পঞ্চম-পুরুষার্থ।**

(১২) **শ্রুতিস্মৃতিতে প্রেমের পঞ্চমপুরুষার্থতা**

প্রেম, প্রেমভক্তি, ভক্তি, (অর্থাৎ সাধ্যভক্তি)—এ-সমস্ত শব্দ একার্থক। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "তুর্ল্লভো মানুষো দেহো"-ইত্যাদি ১১।২।২৯-শ্লোকের "দীপিকাদীপন"-টীকায় লিখিত হইয়াছে—

"ভক্তেঃ পঞ্চমপুরুষার্থত্বং গৌতমীয়ে শ্রীনারদেনোক্তম্। ভদ্রমুক্তং ভবদ্ভিস্তু মুক্তিস্তুর্য্যা পরাৎপরা। নিরহং যত্র চিৎসত্তা তুর্য্যা সা মুক্তিরুচ্যতে॥ পূর্ণাহন্তাময়ী ভক্তিস্তুর্য্যাতীতা নিগদ্যতে॥ ইতি॥ শ্রুতেশ্চ॥ সর্ব্বদৈনমুপাসীত॥ মুক্তানামপি ভক্তি র্হি পরমানন্দ-রূপিণীত্যাদিকা॥

—ভক্তির (প্রেমভক্তির বা প্রেমের) পঞ্চম পুরুষার্থত্বের কথা গৌতমীয়ে (গৌতমীয় তন্ত্রে) শ্রীনারদকর্ত্তৃক কথিত হইয়াছে। শ্রীনারদ বলিয়াছেন—'আপনারা যে বলিয়াছেন, পরাৎপরা মুক্তি তুর্য্যা (অর্থাৎ চতুর্থস্থানীয়া), তাহা ভদ্র (উত্তম)। যে-স্থলে চিৎসত্তা 'নিরহং'-ভাবে থাকে, সেস্থলে মুক্তিকে তুর্য্যা বলা হয়। 'পূর্ণাহন্তাময়ী ভক্তি' তুর্য্যাতীতা (তুর্য্যার বা চতুর্থস্থানীয়ার অতীতা—পঞ্চমস্থানীয়া) বলিয়া কথিত হয়। এইরূপ শ্রুতিবাক্যও দৃষ্ট হয়। যথা, 'সর্ব্বদা ইঁহার (পরব্রহ্ম ভগবানের) উপাসনা করিবে॥ মুক্তদিগের পক্ষেও ভক্তিই পরমানন্দরূপিণী॥'—ইত্যাদি।"

শ্রুতিস্মৃতিবিহিতা সাযুজ্যমুক্তিতে জীব চিৎকণরূপে ব্রহ্মে প্রবেশ করেন; তখন তাঁহার পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে বটে, কিন্তু কোনও দেহ থাকে না। সেই অবস্থায় মুক্তজীব ব্রহ্মানন্দের আস্বাদনে এতই তন্ময়তা লাভ করেন যে, তাঁহার নিজের অস্তিত্বের জ্ঞানও তাঁহার থাকে না। গৌতমীয় বাক্যে, মুক্ত জীবের এইরূপ ভাবকেই "নিরহং"-ভাব বলা হইয়াছে। এইরূপ "নিরহং-ভাব বিশিষ্টা"মুক্তিকেই "তুর্য্যা বা চতুর্থস্থানীয়া" বলা হইয়াছে; কেননা, ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ—এই চারি পুরুষার্থের মধ্যে মোক্ষ বা মুক্তি হইতেছে চতুর্থস্থানীয় (তুর্য্য)।

আর, ভক্তি-শব্দের অর্থ—ভজন, সেবা (সেব্যের প্রীতিবিধান)। যে মুক্ত জীব এই সেবার সৌভাগ্য লাভ করেন, তাঁহার সেবোপযোগী দেহও থাকিবে; অবশ্য তাঁহার এই দেহ হইবে অপ্রাকৃত

চিন্ময়। নিজের পৃথক্ অস্তিত্ব সম্বন্ধে এবং তাঁহার অভীষ্ট-সেবাসম্বন্ধেও তাঁহার পূর্ণজ্ঞান থাকার প্রয়োজন ; নচেৎ, সেবাই অসম্ভব হইবে। এজন্য ভক্তিকে বলা হইয়াছে—"পূর্ণাহন্তাময়ী।"

ভক্তির বা সেবার আনন্দ ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষা পরমোৎকর্ষময়। ভগবৎসেবার আনন্দের কথা দূরে, ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের আনন্দও ব্রহ্মানন্দের তুলনায়, মহাসমুদ্রের তুল্য। ধ্রুবের উক্তিই তাহার প্রমাণ। তিনি শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছিলেন—"ত্বৎসাক্ষাৎকরণাহ্লাদ-বিশুদ্ধাব্ধিস্থিতস্য মে। সুখানি গোষ্পদায়ন্তে ব্রাহ্মাণ্যপি জগদ্‌গুরো ॥ হরিভক্তিসুধোদয় ॥" তুর্য্যা মুক্তিতে ব্রহ্মানন্দের অনুভব ; কিন্তু ভক্তিতে পরম উৎকর্ষময় ভগবৎসেবানন্দের আস্বাদন। এজন্য মুক্তি অপেক্ষা ভক্তি গরীয়সী, মুক্তির ঊর্দ্ধে ভক্তির স্থান। তাই শ্রীনারদ বলিয়াছেন—মুক্তি তুর্য্যা ; কিন্তু ভক্তি তুর্য্যাতীতা—চতুর্থেরও অতীত, অর্থাৎ পঞ্চমস্থানীয়। এইরূপে স্মৃতিগ্রন্থ গৌতমীয়তন্ত্র হইতে, শ্রীনারদের উক্তিতে, ভক্তির, বা প্রেমের পঞ্চম পুরুষার্থতার কথা জানা গেল।

"দীপিকাদীপন"-টীকায় ভক্তির পঞ্চমপুরুষার্থত্বের সমর্থক শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত হইয়াছে। "সর্ব্বদা ভগবানের উপাসনা (সেবা) করিবে।" মুক্তির পূর্ব্বেও সেবা এবং মুক্তির পরেও সেবা যদি হয়, তাহা হইলেই "সর্ব্বদা সেবা" সম্ভব হইতে পারে। অন্য শ্রুতিও বলিয়াছেন –"মুক্তা অপি এনমুপাসত ইতি।—মুক্তেরাও ভগবানের সেবা করেন।" কেন মুক্তেরাও ভগবানের সেবা করেন, টীকায় উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্য হইতে তাহাও জানা যায়—"ভক্তি হইতেছে মুক্তদিগের পক্ষেও পরমানন্দ-রূপিণী"—ব্রহ্মানন্দ অপেক্ষাও নিরতিশয়রূপে আনন্দস্বরূপিণী।"

এইরূপে স্মৃতি-শ্রুতি হইতেও জানা গেল—ভক্তি বা **প্রেম হইতেছে পঞ্চমপুরুষার্থ।**

পঞ্চমপুরুষার্থ প্রেম এতাদৃশ পরমোৎকর্ষময় বলিয়াই শ্রুতি প্রিয়রূপে পরব্রহ্মের উপাসনার কথা বলিয়াছেন—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত। বৃহদারণ্যক ॥ ১।৪।৮॥" এবং প্রেমের সহিত শ্রীহরির ভজনের কথাও বলিয়াছেন—"প্রেম্‌ণা হরিং ভজেৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ভ (২৩৪ অনুচ্ছেদে)-ধৃত শতপথশ্রুতি।"

১৪। প্রেমের পরম-পুরুষার্থতা এবং পরমতম পুরুষার্থতা

ক। দাস্যাদি পঞ্চভাব

রসিক-শেখর পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের পাঁচভাবের পরিকর আছেন—শান্তভাব, দাস্যভাব, সখ্যভাব, বাৎসল্যভাব এবং মধুরভাব বা কান্তাভাব। তিনি এই পাঁচভাবের পরিকর-ভক্তদের প্রেমরসই আস্বাদন করিয়া থাকেন।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—এই পাঁচভাবের মধ্যে শান্তভাবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করিয়া থাকে, প্রেম তাহাতে গৌণ। ঐশ্বর্য্য-প্রধান পরব্যোমেই এই ভাবের, অর্থাৎ শান্তভক্তদের স্থান।

পরব্যোমে শ্রীকৃষ্ণও নারায়ণাদি ঐশ্বর্য্য-প্রধান ভগবৎ-স্বরূপসমূহরূপে এই শান্ত-ভক্তদের ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানপ্রধান-প্রেমরসই আস্বাদন করিয়া থাকেন।

দাস্যাদি চারিটী ভাবে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনারূপ প্রেমেরই প্রাধান্য; ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য এই চারিভাবের কোনও ভাবেই নাই। এজন্য পরব্যোমে বা বৈকুণ্ঠে এই চারিভাবের কোনওটীরই অস্তিত্ব নাই। এই চারিটী ভাবের স্থান দ্বারকা-মথুরায় এবং ব্রজে।

এই চারিটী ভাব পর-পর উৎকর্ষময়—দাস্যভাব অপেক্ষা সখ্যভাবের উৎকর্ষ, সখ্য অপেক্ষা বাৎসল্যভাবের উৎকর্ষ এবং বাৎসল্য অপেক্ষা কান্তাভাবের বা মধুরভাবের উৎকর্ষ। প্রেমের এবং তজ্জনিত মমত্ববুদ্ধির ক্রমশঃ গাঢ়ত্বই হইতেছে এইরূপ উৎকর্ষের হেতু। প্রেমের এবং মমত্ববুদ্ধির ক্রমশঃ গাঢ়ত্ববশতঃ এই চারিভাবেরও ক্রমশঃ গুণাধিক্য এবং স্বাদাধিক্য জন্মিয়া থাকে। তাহা বলা হইতেছে।

দাস্যভাব। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শান্তভাবের গুণ হইতেছে "কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা" এবং তাহার ফল "কৃষ্ণবিনা তৃষ্ণাত্যাগ।" দাস্যভাবেও তাহা আছে। দাস্যভাবের ভক্তগণও কৃষ্ণব্যতীত আর কিছু জানেন না, কৃষ্ণসেবা ব্যতীত আর কিছু চাহেন না। অধিকন্তু তাঁহাদের আছে—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্য-ময়ী সেবা, দাস্যপ্রেমের উপযোগী প্রাণঢালা সেবা। এইরূপে দেখা গেল—দাস্যের দুইটী গুণ—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা এবং প্রাণঢালা সেবা। তথাপি দাস্যভাব কিন্তু গৌরববুদ্ধিময়; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ সেব্য, দাসগণ তাঁহার সেবক। সেব্যের প্রতি সেবকের গৌরববুদ্ধি স্বাভাবিকী।

সখ্যভাব। সখ্যে দাস্য অপেক্ষাও প্রেমের এবং মমত্ববুদ্ধির আধিক্য। তাহার ফলে সখ্য-ভাবের ভক্তগণ—শ্রীকৃষ্ণের পরিকর সখাগণ—কৃষ্ণকে নিজেদের সমান মনে করেন, তাঁহাকে নিজেদের অপেক্ষা বড় মনে করেন না। ইহাই হইতেছে দাস্য অপেক্ষা সখ্যের উৎকর্ষ। সখ্যভাবে দাস্যের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা এবং প্রাণঢালা সেবাও আছে; অধিকন্তু আছে গৌরববুদ্ধিহীনতা, সঙ্কোচহীনতা। এইরূপে সখ্যের গুণ হইল তিনটী—কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, সেবা এবং গৌরববুদ্ধিহীনতা।

বাৎসল্যভাব। বাৎসল্যে সখ্য অপেক্ষাও প্রেমের এবং মমত্ববুদ্ধির অধিক গাঢ়তা। তাহার ফলে বাৎসল্যভাবের ভক্তগণ—দ্বারকা-মথুরায় দেবকী-বসুদেব এবং ব্রজে নন্দ-যশোদা—পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেও নিজেদের সন্তান—নিজেদের লাল্য, পাল্য, অনুগ্রাহ্য—মনে করেন, সর্ব্বনমস্য এবং সর্ব্বারাধ্য শ্রীকৃষ্ণের নমস্কারাদিও নিঃসঙ্কোচে গ্রহণ করিয়া থাকেন। সখ্যে এইরূপ লাল্য-পাল্য-অনু-গ্রাহ্যাদি-জ্ঞানের অভাব।

বাৎসল্যভাবে সখ্যের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা, সেবা, গৌরববুদ্ধিহীনতাও আছে. অধিকন্তু আছে লাল্য-পাল্য-অনুগ্রাহ্যাদিবুদ্ধি। এইরূপে বাৎসল্যের গুণ হইল চারিটী।

সম্বন্ধানুগা প্রীতি। উল্লিখিত তিন ভাবের সেবাতে কিন্তু সম্বন্ধের জ্ঞানই প্রাধান্য লাভ করে। দাস্যভাবে কেবলমাত্র সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ। সখ্যে সমান-সমান-ভাবরূপ সম্বন্ধ। আর বাৎসল্যে পিতা-মাতার সহিত সন্তানের যে সম্বন্ধ, সেই সম্বন্ধ। এই তিন ভাবের কোনও ভাবের সেবাতেই সম্বন্ধের

মর্য্যাদা লজ্ঘিত হয় না। দাস্য-ভাবের ভক্তগণ শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের সমান, কিম্বা নিজেদের অনুগ্রাহ্য বা লাল্য-পাল্য মনে করিতে পারেন না, তাঁহাদের প্রেমের স্বভাবে তদ্রূপ কোনও ভাবও তাঁহাদের চিত্তে জাগে না। সখ্যভাবের ভক্তগণও শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের লাল্য, পাল্য, বা অনুগ্রাহ্য মনে করেন না; সুতরাং তদ্রূপ কোনও সেবার বা ব্যবহারের কথাও তাঁহাদের চিত্তে উদিত হয় না। বাৎসল্য-ভাবের ভক্তগণও সন্তানের প্রতি পিতামাতার যেরূপ ব্যবহার হওয়া উচিত, তদতিরিক্ত কোনও ব্যবহারের কথা ভাবিতে পারেন না, তদতিরিক্ত কোনও ব্যবহারও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে করেন না। এইরূপে দেখা গেল — উল্লিখিত তিন ভাবের সেবা হইতেছে সম্বন্ধের অনুগত। এজন্য এই তিন ভাবের সেবাকে বলা হয় **সম্বন্ধানুগা** এবং এই তিন ভাবের কৃষ্ণরতিকে বলা হয় সম্বন্ধানুগা রতি।

কান্তাভাব। ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সীদিগের — দ্বারকা-মথুরায় রুক্মিণ্যাদি শ্রীকৃষ্ণমহিষী-দিগের এবং ব্রজে শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী শ্রীরাধিকাদি গোপসুন্দরীদিগের—ভাব। ইহাতে বাৎসল্য অপেক্ষাও প্রেমের এবং মমত্ববুদ্ধির গাঢ়ত্ব। তাহার ফলে, সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই হইতেছে কৃষ্ণ-প্রেয়সীদিগের একমাত্র কাম্য। প্রয়োজন হইলে স্বীয় অঙ্গদ্বারাও তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের সম্বন্ধটীও তাহার অনুকূল। এ-স্থলে প্রেমের—বা কৃষ্ণের প্রীতিবিধানের বাসনারই—প্রাধান্য। শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের যে কান্ত-কান্তা-সম্বন্ধ, তাহাও এই প্রেমেরই অনুগত। এজন্য কান্তাভাবের সেবাকে বলা হয়—**প্রেমানুগা।**

কান্তাভাবে বাৎসল্যের কৃষ্ণৈকনিষ্ঠতা আছে, সেবা আছে, গৌরবুদ্ধিহীনতা আছে, লাল্য-পাল্য-জ্ঞানও আছে; অধিকন্তু আছে সেবাবিষয়ে অপেক্ষাহীনতা। এইরূপে কান্তাভাবের গুণ হইল পাঁচটী।

গুণের আধিক্যে প্রেমে স্বাদের আধিক্যও হইয়া থাকে। কান্তাভাবে সর্ব্বাধিক গুণ বলিয়া—সুতরাং সর্ব্বাধিক আস্বাদ্যত্ব বা মাধুর্য্য বলিয়াই এই ভাবকে মধুর ভাবও বলা হয়। সকল ভাবই মধুর; কান্তাভাবে মধুরতার সর্ব্বাতিশায়িত্ব।

খ। ব্রজপ্রেম পরমপুরুষার্থ

উল্লিখিত দাস্যাদি চারিভাবের পরিকর দ্বারকা-মথুরায়ও আছেন, ব্রজেও আছেন। দ্বারকা-মথুরা অপেক্ষা ব্রজে দাস্যাদি চারিটী ভাবেরই বৈশিষ্ট্য আছে।

দ্বারকা-মথুরায় পরব্যোম অপেক্ষাও ঐশ্বর্য্যের এবং মাধুর্য্যের বিকাশ অনেক বেশী এবং মাধুর্য্যের বিকাশ ঐশ্বর্য্য অপেক্ষাও বেশী (১।১।১২৯-খ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের ভাব ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত মাধুর্য্যময়। কিন্তু ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত হইলেও মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য। দ্বারকা-মথুরার পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম অত্যন্ত গাঢ় হইলেও এমন গাঢ় নয় যে, তাহাতে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে না। তাঁহাদের প্রেমে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে। এজন্যই তাঁহাদের প্রেম মাধুর্য্য-প্রধান ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রিত। মাধুর্য্যপ্রধান বলিয়া সাধারণত:

তাঁহাদের প্রেমও মাধুর্য্যময় ; তথাপি কিন্তু সময় সময় ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে। যখন ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান স্ফুরিত হয়, তখন তাঁহাদের সেবাবাসনাও সঙ্কুচিত হইয়া যায় (১।১।১২৯-খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তথাপি কিন্তু দ্বারকা-মথুরার প্রেম পরব্যোমের প্রেম অপেক্ষা সমধিক উৎকর্ষময়। কেননা, পরব্যোমে ঐশ্বর্য্যেরই সর্ব্বদা প্রাধান্য, কোনও সময়েই মাধুর্য্যের প্রাধান্য নাই ; কিন্তু দ্বারকা-মথুরায় সাধারণতঃ মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য, ঐশ্বর্য্যের প্রাধান্য সাময়িক।

ব্রজে ঐশ্বর্য্য এবং মাধুর্য্য—উভয়েরই পূর্ণতম বিকাশ ; তথাপি মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী প্রাধান্য। এ-স্থলে পূর্ণতম-বিকাশময় ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের অনুগত, মাধুর্য্যদ্বারা পরিমণ্ডিত এবং পরিসিঞ্চিত ; তাই ব্রজের ঐশ্বর্য্যও মধুর। মাধুর্য্যদ্বারা পরিমণ্ডিত এবং পরিসিঞ্চিত বলিয়া ব্রজের ঐশ্বর্য্য কখনও স্বীয় স্বাভাবিক রূপ প্রকটিত করিতে পারে না, ত্রাস বা সঙ্কোচ জন্মাইতে পারে না ব্রজপরিকরদের প্রেমকে কোনও রূপেই সঙ্কুচিত করিতে পারে না। ব্রজে ঐশ্বর্য্যের বিকাশও হয় কেবল প্রেমের বা মাধুর্য্যের সেবার উদ্দেশ্যে, মাধুর্য্যের পুষ্টিবিধানের উদ্দেশ্যে (১।১।১২৯-গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এজন্য ব্রজপরিকরদের প্রেম বা কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা সর্ব্বদা অক্ষুণ্ণই থাকে, বরং উত্তরোত্তর বর্দ্ধিতই হইয়া থাকে।

পরব্যোমে মমতাবুদ্ধিময় প্রেম নাই, দ্বারকা-মথুরায় এবং ব্রজে তাহা আছে। সুতরাং পরব্যোমের প্রেম অপেক্ষা দ্বারকা-মথুরার এবং ব্রজের প্রেমের শ্রেষ্ঠত্ব স্বীকার করিতেই হইবে।

আবার, দ্বারকা-মথুরার প্রেম অপেক্ষাও ব্রজপ্রেমের উৎকর্ষ। কেননা, দ্বারকা-মথুরার প্রেমে যদিও মাধুর্য্যেরই প্রাধান্য, তথাপি ইহা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্রিত, মধ্যে মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে মাধুর্য্য ক্ষুণ্ণ হয় ; কিন্তু ব্রজের প্রেম কোনও সময়েই ঐশ্বর্য্যদ্বারা ক্ষুণ্ণ হয় না, বরং পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে।

ব্রজের প্রেমে স্বসুখবাসনা বা স্বীয় দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা নাই ; দ্বারকা-মথুরার প্রেমেও তাহা নাই। দ্বারকা-মথুরার প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান মিশ্রিত আছে ; কিন্তু ব্রজপ্রেমে তাহাও নাই। ব্রজের প্রেমই হইতেছে বিশুদ্ধ নির্ম্মল, ব্রজের প্রীতিই কেবলা প্রীতি। ইহাই দ্বারকা-মথুরার প্রেম অপেক্ষা ব্রজপ্রেমের অপূর্ব্ব এবং অনির্ব্বচনীয় উৎকর্ষ।

ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য আস্বাদনের জন্য পরবোমস্থ নারায়ণাদি ভগবৎ-স্বরূপগণ পর্য্যন্ত, এমন কি নারায়ণের বক্ষোবিলাসিনী লক্ষ্মীদেবী পর্য্যন্ত উৎকণ্ঠিত, দ্বারকা-মথুরার পরিকরগণও উৎকণ্ঠিত। কিন্তু যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকর, তাঁহাদের চিত্ত কখনও অন্যত্র আকৃষ্ট হয় না।

ইহাতেই ব্রজপ্রেমের পরম-পুরুষার্থতা জানা যাইতেছে।

গ। ব্রজের কান্তাপ্রেম পরমতম পুরুষার্থ

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ব্রজের দাস্য হইতে সখ্যের, সখ্য হইতে বাৎসল্যের এবং বাৎসল্য হইতে কান্তাপ্রেমের উৎকর্ষ ; সুতরাং কান্তাপ্রেমই সর্ব্বাপেক্ষা উৎকর্ষময়।

কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।৬৩ ॥

পূর্ব্ব পূর্ব্ব রসের গুণ পরে পরে হয়। দুই তিন গণনে পঞ্চ পর্য্যন্ত বাড়য় ॥
গুণাধিক্যে স্বাদাধিক্য বাড়ে প্রতি রসে। শান্ত-দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যের গুণ মধুরেতে বৈসে ॥
আকাশাদির গুণ যেন পর পর ভূতে। দুই তিন ক্রমে বাড়ে পঞ্চ পৃথিবীতে ॥
পরিপূর্ণ কৃষ্ণপ্রাপ্ত এই প্রেমা হৈতে। এই প্রেমের বশ কৃষ্ণ কহে ভাগবতে ॥
কৃষ্ণের প্রতিজ্ঞা দৃঢ় সর্ব্বকাল আছে। যে যৈছে ভজে কৃষ্ণ তারে ভজে তৈছে ॥
এই প্রেমার অনুরূপ না পারে ভজিতে। অতএব ঋণী হয়—কহে ভাগবতে ॥

শ্রীচৈ, চ, ২।৮।৬৬-৭১ ॥"

গুণাধিক্যে, স্বাদাধিক্যে, শ্রীকৃষ্ণের পরিপূর্ণ সেবাপ্রাপ্তিতে, শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী শক্তিতে ন্তাপ্রেম সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। আবার, শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্য-বর্দ্ধন-সামর্থ্যেও কান্তাপ্রেম অতুলনীয়।

"যদ্যপি কৃষ্ণসৌন্দর্য্য মাধুর্য্যের ধূর্য্য।
ব্রজদেবীর সঙ্গে তাঁর বাড়য়ে মাধুর্য্য ॥ শ্রী চৈ চ, ২।৮।৭২॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার অষ্টম পরিচ্ছেদ হইতে জানা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য দক্ষিণ দেশ ভ্রমণ উপলক্ষ্যে যখন গোদাবরীতীরস্থ বিদ্যানগরে তৎকালীন স্বাধীন নরপতি রাজা প্রতাপরুদ্রের অধীনে রাজমহেন্দ্রী প্রদেশের শাসনকর্ত্তা পরম ভাগবত, মহাপ্রেমিক এবং সর্ব্বশাস্ত্রে পরম পণ্ডিত রায় রামানন্দের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, তখন তিনি রায় রামানন্দকে বলিয়াছিলেন—

"পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।৫৪॥

রামানন্দ! শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখপূর্ব্বক বল—সাধ্যবস্তু কি ?"

প্রভুর আদেশে রায় রামানন্দ শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক সাধ্যতত্ত্ব বলিতে আরম্ভ করিলেন। রুচিভেদে এবং প্রকৃতিভেদে বিভিন্ন লোক সাধ্যবস্তু সম্বন্ধে বিভিন্ন ধারণা পোষণ করিয়া থাকে। রামানন্দরায়ও লোক-প্রতীতি অনুসারে বিভিন্ন সাধ্য বস্তুর উল্লেখ করিলেন—বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া তিনি ক্রমশঃ কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ, স্বধর্ম্মত্যাগ, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির কথা বলিলেন। ইহাদের মধ্যে তিনি এক একটীর কথা বলেন, শুনিয়া প্রভু বলেন—"এহো বাহ্য, আগে কহ আর।" কেননা, ইহার কোনওটীতেই জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী শ্রীকৃষ্ণসেবার অবকাশ নাই; বর্ণাশ্রমধর্ম্মে অনিত্য স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে; অন্যান্য ধর্ম্মদ্বারা মুক্তিলাভ হইতে পারে মাত্র। ইহার পরে রামানন্দ জ্ঞানশূন্যা ভক্তির কথা যখন বলিলেন, তখন প্রভু বলিলেন—"এহো হয়—আগে কহ আর।" তখন রামানন্দ প্রেমভক্তির কথা বলিলেন—"রায় কহে—প্রেমভক্তি সর্ব্বসাধ্য সার।" প্রভু তাহাতেও তৃপ্তি লাভ করিতে পারিলেন না, বলিলেন "এহো হয়—আগে কহ আর।" প্রভু রামানন্দের মুখে প্রেমভক্তির বিশেষ বিবরণই প্রকাশ করাইতে চাহিলেন। তখন "রায় কহে—দাস্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার।" শুনিয়া প্রভু বলিলেন—

"এহো হয়—আগে কহ আর।" তখন "রায় কহে—সখ্যপ্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।" এইবার প্রভু বলিলেন—"এহোত্তম, আগে কহ আর॥" এতক্ষণ পর্য্যন্ত প্রভু কেবল "এহো হয়ই" বলিয়াছেন; কিন্তু সখ্যপ্রেমের কথা শুনিয়া বলিলেন—"এহোত্তম।" সখ্যপ্রেমে কোনওরূপ সঙ্কোচ নাই; তাই প্রভু বলিলেন—"এহোত্তম।" কিন্তু প্রভু "এহোত্তম" বলিয়াও আবার বলিলেন—"আগে কহ আর।" প্রেমের আরও গাঢ়তর অবস্থার কথাই প্রভু জানিতে চাহিলেন। তখন রামানন্দ রায় বলিলেন—"বাৎসল্য-প্রেম সর্ব্বসাধ্য সার।" বাৎসল্য-প্রেমে সঙ্কোচ তো নাই-ই, প্রেমের নিবিড় গাঢ়ত্ব বশতঃ শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে লাল্য-পাল্য-অনুগ্রাহ্য-জ্ঞান এবং ভক্তের নিজের সম্বন্ধে লালক-পালক-অনুগ্রাহক-জ্ঞান আছে। এই প্রেমের প্রভাবে যশোদামাতা শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাঁহার বন্ধন পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন; যাহা হউক, বাৎসল্য-প্রেমের কথা শুনিয়া প্রভু বলিলেন—"এহোত্তম—আগে কহ আর!" প্রভু প্রেমভক্তিকে "এহো হয়" বলিয়াছেন, প্রেমভক্তি বিকাশের বিভিন্ন বৈচিত্রীর মধ্যে দাস্য-প্রেমকেও "এহো হয়" এবং পরবর্ত্তী সখ্য এবং বাৎসল্যকে "এহোত্তম" বলিয়া জানাইলেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য হইতেছে পরম পুরুষার্থ। কিন্তু এইরূপে পরম পুরুষার্থের কথা শুনিয়াও প্রভু সম্যক্ তৃপ্তিলাভ করিতে পারিলেন না। তাই তিনি বলিলেন—"আগে কহ আর"—রামানন্দ, বাৎসল্য অপেক্ষাও অধিকতর উৎকর্ষময় যদি কিছু থাকে, তাহা বল।

হইার পরে "রায় কহে—কান্তাপ্রেম সর্ব্বসাধ্যসার॥ শ্রীচৈ,চ, ২।৮।৬৩॥" বাৎসল্য-প্রেম অপেক্ষাও কান্তাপ্রেমের উৎকর্ষের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—বাৎসল্য-প্রেমের সেবা সম্বন্ধানুগা; কিন্তু কান্তাপ্রেমের সেবা প্রেমানুগা। তারপর রামানন্দরায় কান্তাপ্রেমের উৎকর্ষ সম্বন্ধে যে সমস্ত হেতুর কথা বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হইয়াছে—গুণাধিক্য, স্বাদাধিক্য, সেবার পরিপূর্ণতা, কৃষ্ণের মাধুর্য্য-বর্দ্ধকত্ব, কৃষ্ণবশীকরণ-শক্তির সর্ব্বাতিশায়িত্ব ইত্যাদি।

কিন্তু কান্তাপ্রেমের কথা শুনিয়াও

"প্রভু কহে—এই সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়।
কৃপা করি কহ, যদি আগে কিছু হয়॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।৭৩॥"

কান্তাপ্রেম যে "সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়—সাধ্যবস্তুর সর্ব্বশেষ সীমা, পরমতম সাধ্য বস্তু বা পরমতম পুরুষার্থ, ইহা, সুনিশ্চিত"-ইহাও প্রভু বলিলেন। তথাপি আবার কেন বলিলেন—"কৃপা করি কহ, যদি আগে কিছু হয়"?

ইহার পরে রায় রামানন্দ যাহা বলিয়াছেন, তাহাতে কৃষ্ণকান্তাকুলশিরোমণি শ্রীরাধার—যাঁহার মধ্যে কান্তাপ্রেমের চরমতম বিকাশ, যাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবাকে উপলক্ষ্য করিয়া এবং যাঁহার শ্রীকৃষ্ণসেবার আনুকূল্য এবং পরিপুষ্টি বিধানই অন্য-কৃষ্ণকান্তাগণের একমাত্র ব্রত, সেই শ্রীরাধার—প্রেমের অসাধারণ মহিমার কথাই বলা হইয়াছে। মূলকান্তাশক্তি শ্রীরাধার প্রেমের এই অসাধারণ

মহিমাই কান্তাপ্রেমের সুনিশ্চিত সাধ্যাবধিত্বের হেতু। রাধাপ্রেমের এই অসাধারণ মহিমার কথা শুনিয়াও প্রভু সেই "সাধ্যাবধি সুনিশ্চয়"ই বলিলেন।

"প্রভু কহে—সাধ্যবস্তুর অবধি এই হয়
তোমার প্রসাদে ইহা জানিল নিশ্চয়॥ শ্রীচৈ চ. ২।৮।১৫৭।"

সাধারণভাবে "প্রেমভক্তির" কথা বলিয়া তাহার বিশেষ বিবৃতি-প্রসঙ্গে রায় রামানন্দ যে দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ও কান্তাপ্রেমের কথা বলিয়াছেন, তাঁহার উল্লিখিত শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে পরিষ্কার ভাবে জানা যায়—তিনি ব্রজের দাস্য-সখ্যাদির কথাই বলিয়াছেন।

এইরূপে জানা গেল—**ব্রজের কান্তাপ্রেমই** হইতেছে সাধ্যশিরোমণি বা **পরমতম পুরুষার্থ**।

সাধ্যতত্ত্ব আলোচনার পরেও একদিন রায়রামানন্দ এবং মহাপ্রভুর মধ্যে প্রশ্নোত্তরচ্ছলে ইষ্টগোষ্ঠী হইয়াছিল। এই ইষ্টগোষ্ঠী হইতেও ব্রজপ্রেমের পরমপুরুষার্থতা এবং কান্তাপ্রেমের পরমতম-পুরুষার্থতার কথাই জানা যায়। এই ইষ্টগোষ্ঠীতে প্রভু প্রশ্নকর্তা এবং রামানন্দ উত্তরদাতা।

কীর্ত্তিমধ্যে জীবের কোন্ বড় কীর্ত্তি?। কৃষ্ণপ্রেম-ভক্ত বলি যার হয় খ্যাতি॥ ২।৮।২০০॥
মুক্তমধ্যে কোন্ জীব মুক্ত করি মানি?। কৃষ্ণপ্রেম যার—সেই মুক্তশিরোমণি॥ ২।৮।২০৩॥
শ্রেয়োমধ্যে কোন্ শ্রেয়ঃ জীবের হয় সার?। কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ বিনা শ্রেয়ঃ নাহি আর॥২।৮।২০৫॥
কাহার স্মরণ জীব করে অনুক্ষণ?। কৃষ্ণনাম-গুণ-লীলা প্রধান স্মরণ॥ ২।৮।২০৬॥ ইত্যাদি।

এ-সমস্ত হইল সাধারণভাবে ব্রজ-প্রেমের পরম-পুরুষার্থের কথা। কান্তাপ্রেমের পরমতম-পুরুষার্থের কথাও ঐ ইষ্টগোষ্ঠী হইতে জানা যায়।

সম্পত্তি মধ্যে জীবের কোন্ সম্পত্তি গণি?। রাধাকৃষ্ণপ্রেম যার সেই বড় ধনী॥২।৮।২০১॥
গান মধ্যে কোন গান জীবের নিজধর্ম্ম?। রাধাকৃষ্ণের প্রেমকেলি যে গীতের মর্ম্ম॥ ২।৮।২০৪॥
ধ্যেয়মধ্যে জীবের কর্ত্তব্য কোন্ ধ্যান?। রাধাকৃষ্ণ-পদাম্বুজ-ধ্যান প্রধান॥ ২।৮।২০৭॥
সর্ব্বত্যাজি জীবের কর্ত্তব্য কাহাঁ বাস?। ব্রজভূমি বৃন্দাবন, যাহাঁ লীলা রাস॥ ২।৮।২০৮॥
শ্রবণমধ্যে জীবের কোন্ শ্রেষ্ঠ শ্রবণ?। রাধাকৃষ্ণ-প্রেমকেলি কর্ণরসায়ন॥ ২।৮।২০৯॥
উপাস্যের মধ্যে কোন্ উপাস্য প্রধান?। শ্রেষ্ঠ উপাস্য—যুগল রাধাকৃষ্ণনাম॥২।৮।২১০॥ ইত্যাতি।

১৫। সাধ্যতত্ত্ব

যাঁহার যাহা কাম্যবস্তু, তাহাই তাঁহার সাধ্য, তাহাই তাঁহার পুরুষার্থ। পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদসমূহে অনেক প্রকারের পুরুষার্থের বা সাধ্যবস্তুর কথা বলা হইয়াছে।

ধর্ম্ম, অর্থ ও কাম-এই ত্রিবর্গের লক্ষ্য অনিত্য স্বর্গসুখাদি। ইহার যে বাস্তব পুরুষার্থতাই নাই, স্বর্গাদি-প্রাপ্তিতে যে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি এবং নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখ নাই, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

মোক্ষের বাস্তব পুরুষার্থতা আছে, মোক্ষে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি এবং নিত্য নিরবচ্ছিন্ন সুখও আছে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু মোক্ষের পুরুষার্থতা থাকিলেও পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম যে মোক্ষ অপেক্ষাও উৎকর্ষময়, তাহাও প্রদর্শিত হইয়াছে।

প্রেমের মধ্যেও আবার দ্বারকা-মথুরার ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র প্রেমে মাধুর্য্যের প্রাধান্য থাকিলেও যখন ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান স্ফুরিত হয়, তখন প্রেম যে শিথিলতা প্রাপ্ত হয়, সুতরাং এই দুই ধামে প্রেমসেবার যে সমভাবে নিরবচ্ছিন্নতা নাই, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। দ্বারকা-মথুরার প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান পরব্যোম-প্রেম অপেক্ষা উৎকর্ষময় হইলেও বিশেষ গাঢ় নহে ; তাহার মধ্যে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রবেশ করিতে পারে ।

কিন্তু ব্রজের প্রেম নিবিড়রূপে সান্দ্র বলিয়া ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান তাহার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যও মাধুর্য্যের ন্যায় পূর্ণতম বিকাশময় হইলেও মাধুর্য্যেরই সর্ব্বাতিশায়ী আধিক্য-বশতঃ মাধুর্য্যের দ্বারা পরিমণ্ডিত, পরিসিঞ্চিত এবং পরিচালিত। এ-স্থলে ঐশ্বর্য্যের প্রকাশও হয় কেবল মাধুর্য্যের সেবার নিমিত্ত, মাধুর্য্যের পরিপুষ্টি-সাধনের নিমিত্ত। এজন্য ব্রজের প্রেম হইতেছে পরমপুরুষার্থ।

পরম-পুরুষার্থ ব্রজপ্রেমের মধ্যে আবার কান্তাপ্রেম যে পরমতম পুরুষার্থ, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

কিন্তু কান্তাপ্রেম পরমতম পুরুষার্থ হইলেও সকল সাধকের চিত্তই যে কান্তাপ্রেমের জন্য লুব্ধ হইবে, কিম্বা পরমপুরুষার্থ ব্রজপ্রেমের বৈচিত্রী দাস্য, সখ্য, বা বাৎসল্য-প্রেমের জন্য লুব্ধ হইবে, তাহা নহে। কেননা, ভিন্ন ভিন্ন লোকের রুচি ও প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। প্রত্যেকেই নিজের রুচি অনুসারেই স্বীয় সাধ্যবস্তু নির্ণয় করিয়া থাকে।

'যথোত্তরমসৌ স্বাদবিশেষোল্লাসময্যপি।
রতির্বাসনয়া স্বাদ্বী ভাসতে কাপি কস্যচিৎ ॥ ভ, র, সি, ২।৫।২১ ॥

—(শান্ত, দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর) এই পঞ্চবিধা কৃষ্ণরতি (কৃষ্ণপ্রেম) উত্তরোত্তর স্বাদাধিক্যবিশিষ্ট হইলেও বাসনাভেদে কোনও রতি কোনও ভক্তের নিকটে বিশেষ রুচিকর হইয়া থাকে।” (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)

ক। গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের সাধ্যতত্ত্ব

শ্রীমন্ মহাপ্রভুর চরণানুগত গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ পরম-পুরুষার্থ প্রেমের যেমন পারমার্থিকতা স্বীকার করেন, তেমনি মোক্ষেরও পারমার্থিকতা স্বীকার করেন। কোনওটীকেই তাঁহারা অবাস্তব মনে করেন না।

মোক্ষের অন্তর্গত পঞ্চবিধা মুক্তির মধ্যে সাযুজ্যের পারমার্থিকতা গৌড়ীয় মতে স্বীকৃত হইলেও তাহার লোভনীয়তা স্বীকৃত নহে ; কেননা, সাযুজ্যে জীবের স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাসত্বের ভাব স্ফুরিত হয়

না বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবার অবকাশ নাই। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির মধ্যেও সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি গৌড়ীয়মতে আদরণীয় নহে ; কেননা, তাহাতেও জীবের স্বরূপানুবন্ধিনী কৃষ্ণসেবা-বাসনার স্ফুরণ নাই। গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সালোক্যাদির মধ্যে প্রেমসেবোত্তরা মুক্তির অনুমোদন করেন।

"সালোক্যাদিস্তথাপ্যত্র ভক্ত্যা নাতিবিরুধ্যতে ॥
সুখৈশ্বার্য্যোত্তরা সেয়ং প্রেমসেবোত্তরেত্যপি।
সালোক্যাদি দ্বিধা তত্র নাদ্যা সেবাজুষাং মতা ॥ ভ র. সি. ১।২।২৮-২৯ ॥

—সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি ভক্তির অতি-বিরোধী* নহে। সালোক্যাদি মুক্তি দুই রকমের— সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা এবং প্রেমসেবোত্তরা (৫।১২-গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এই দুই রকমের মধ্যে প্রথমটী (অর্থাৎ সুখৈশ্বর্য্যোত্তরা মুক্তি) সেবাকামীদের সম্মত নহে।

(১) মুক্তি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কাম্য নহে, রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই কাম্য

কিন্তু গৌড়ীয় মতে মোক্ষের পারমার্থিকতা স্বীকৃত হইলেও এবং প্রেম সেবোত্তরা সালোক্যাদি মুক্তি গৌড়ীয়মতে অনুমোদিত হইলেও পঞ্চবিধা মুক্তির কোনওটীই গৌড়ীয় মতে একান্ত ভাবে কাম্য নহে। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা-মাধুর্য্যই এই মতে একান্ত কাম্য।

"কিন্তু প্রেমৈকমাধুর্য্যভুজ একান্তিনো হরৌ। নৈবাঙ্গীকুর্ব্বতে জাতু মুক্তিং পঞ্চবিধামপি ॥
তত্রাপ্যেকান্তিনাং শ্রেষ্ঠা গোবিন্দহৃতমানসাঃ। যেষাং শ্রীশপ্রসাদোঽপি মনোহর্ত্তুং ন শক্নুয়াৎ ॥
ভ, র, সি, ১।২।৩০-৩১ ॥

—কিন্তু একমাত্র প্রেমসেবার মাধুর্য্য-পিপাসু, শ্রীহরিতে একান্ত অনুরক্ত ভক্তগণ কখনও পঞ্চবিধা মুক্তিকে অঙ্গীকার করেন না। ইঁহাদের মধ্যেও শ্রীগোবিন্দের মাধুর্য্যাদিতে যাঁহাদের মন অপহৃত হইয়াছে, তাঁহারা শ্রেষ্ঠ ; কারণ, বৈকুণ্ঠাধিপতি নারায়ণের এবং দ্বারকাধিপতি বাসুদেবের প্রসন্নতাও তাঁহাদের মনকে হরণ করিতে পারে না।"

এই শ্লোকের টীকায় "শ্রীশঃ-"শব্দের অর্থে বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন —"শ্রীশঃ পরব্যোমাধিপঃ উপলক্ষণত্বেন শ্রীদ্বারকানাথোঽপি—শ্রীশ-শব্দে পরব্যোমাধিপতি শ্রীনারায়ণকে বুঝায়, উপলক্ষণে শ্রীদ্বারকানাথকেও (বাসুদেবকেও) বুঝায়।"

ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণে রসত্বের পরমোৎকর্ষবশতঃই যে গোবিন্দাপহৃতচিত্ত ভক্তদের মন শ্রীনারায়ণ বা শ্রীবাসুদেবের প্রসন্নতাতেও লুব্ধ হয় না, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাও বলিয়াছেন।

"সিদ্ধান্ততস্তভেদেঽপি শ্রীশকৃষ্ণস্বরূপয়োঃ।
রসেনোৎকৃষ্যতে কৃষ্ণরূপমেষা রসস্থিতিঃ ॥ ভ, র, সি, ১।২।৩২ ॥

—তত্ত্বের বিচারে (ব্রজবিহারী) শ্রীকৃষ্ণে এবং পরব্যোমাধিপতি নারায়ণে ও দ্বারকাধিপতি

---

*"অতিবিরোধী নহে"—বলায় কোনও কোনও বিষয়ে বিরোধই ধ্বনিত হইতেছে। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য এবং মোক্ষ-বাসনাই কৃষ্ণসেবার প্রতিকূল—সুতরাং বিরোধী।

বাসুদেবে (পূর্ব্বশ্লোকের টীকা দ্রষ্টব্য) কোনও ভেদ না থাকিলেও রসবিষয়ে শ্রীকৃষ্ণরূপের উৎকর্ষ। রসের স্বভাবই এই যে, তাহা যাহাকে আশ্রয় করে, তাহার উৎকর্ষ সাধন করিয়া থাকে।”

এইরূপে দেখা গেল—অখিল-রসামৃতবারিধি স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাই (অর্থাৎ পরম-পুরুষার্থ প্রেমই) গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণের অভিমত কাম্যবস্তু। পঞ্চবিধা মুক্তির কোনওরূপ মুক্তিই তাঁহাদের অভিপ্রেত নহে।

পরমধর্ম্ম-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতও তাহাই বলিয়াছেন।

“ধর্ম্মঃ প্রোজ্ ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাং সতাম্॥ শ্রীভা, ১।১।২॥
—এই শ্রীমদ্ ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুদিগের প্রোজ্ ঝিত-কৈতব পরমধর্ম্মের কথা বলা হইয়াছে।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-“অত্র শ্রীমতি সুন্দরে ভাগবতে পরমো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি। পরমত্বে হেতুঃ প্রকর্ষেণ উজ্ ঝিতং কৈতবং ফলাভিসন্ধিলক্ষণং কপটং যস্মিন্ সঃ। প্র-শব্দেন মোক্ষাভিসন্ধিরপি নিরস্তঃ। কেবলমীশ্বরারাধনলক্ষণো ধর্ম্মো নিরূপ্যতে ইতি। —এই সুন্দর ভাগবতে পরম-ধর্ম্ম নিরূপিত হইয়াছে। পরমত্বের হেতু এই যে—এই ধর্ম্মে ফলাভিসন্ধান-লক্ষণ কৈতব বা কপট প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে। প্র-শব্দে মোক্ষাভিসন্ধিপর্য্যন্ত নিরস্ত হইয়াছে। কেবলমাত্র ঈশ্বরারাধনা (ঈশ্বরের প্রীতির নিমিত্ত ঈশ্বরের সেবা)-রূপ ধর্ম্মই নিরূপিত হইয়াছে।”

এই টীকা হইতে জানা গেল—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী কৃষ্ণসেবাই পরম-ধর্ম্মের লক্ষ্য। ইহাতে ইহকালের বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখবাসনা নাই,, এমন কি মোক্ষবাসনাও (পঞ্চবিধা মুক্তির বাসনাও) নাই। ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যদেরও একমাত্র অভিপ্রেত বস্তু।

শ্রুতির উপদেশের তাৎপর্য্যও এইরূপ। শ্রুতি প্রিয়রূপে পরব্রহ্মেরই উপাসনার কথা বলিয়াছেন, “আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত॥ বৃহদারণ্যক॥ ১।৪।৮॥” এবং প্রেমের সহিত অর্থাৎ কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনার সহিত শ্রীহরির ভজনের কথাও বলিয়াছেন, “স হোবাচ যাজ্ঞবল্ক্যস্তৎ পুমানাত্মহিতায় প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ॥ ভক্তিসন্দর্ভে ২৩৪-অনুচ্ছেদ-ধৃত শতপথ-শ্রুতিবাক্য ; শ্রীপুরীদাস মহাশয়-সংস্করণ।—সেই যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন—অতএব আত্মহিতের জন্য জীব প্রেমের সহিত হরির ভজন করিবে।”

(২) গৌর-গোবিন্দের প্রেমসেবাই কাম্য

পূর্ব্বে (১।২।১৩২-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, রসস্বরূপ স্বয়ংভগবান্ পরব্রহ্ম দুইরূপে রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন—প্রেমের বিষয়রূপে এবং প্রেমের আশ্রয়রূপে। ব্রজবিহারী শ্রীকৃষ্ণে প্রেমের বিষয়ত্বেরই প্রাধান্য। প্রেমের বিষয়-প্রধানরূপেই তিনি ব্রজে লীলা করেন। তিনি **শ্যামকৃষ্ণ**।

প্রেমের আশ্রয়-প্রধানরূপে তিনিই হইতেছেন—**গৌরকৃষ্ণ**, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর (১।১।১৮৮-৯৭ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর হইতেছেন—রাধাকৃষ্ণ-মিলিত-স্বরূপ, “রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ” (১।১।১৯৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

এই দুই রূপের লীলাতেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মের লীলারস আস্বাদনের পূর্ণতা এবং জীবের পক্ষে রসস্বরূপ পরব্রহ্মের সেবারও পূর্ণতা।

উল্লিখিত দুইরূপের লীলার সেবাতেই যে সেবার পূর্ণতা, একথা বলার হেতু এই। রস আস্বাদনের নিমিত্ত রসস্বরূপ পরব্রহ্মের যতরকম বাসনা আছে, সেই সমস্ত বাসনাপূরণের আনুকূল্য বিধান করিতে পারিলেই জীবের পরিপূর্ণ-সেবা সম্ভবপর হইতে পারে। কোনও একজাতীয় বাসনা পূরণের আনুকূল্যের অভাবে সেবা থাকিয়া যাইবে অপূর্ণ।

রসস্বরূপ পরব্রহ্ম তাঁহার ব্রজলীলাতে মুখ্যতঃ বিষয়জাতীয় রসই আস্বাদন করিয়া থাকেন; অথচ আশ্রয়জাতীয় রসের আস্বাদনের জন্যও ব্রজলীলাতে তাঁহার বলবতী লালসা (১।১।১৩২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু ব্রজে আশ্রয়জাতীয় রসের সম্যক্ আস্বাদন অসম্ভব। শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপেই তিনি সর্ব্বতোভাবে আশ্রয়জাতীয় রসের আস্বাদন করিয়া থাকেন (১।১।১৮৮-৮৯-অনুচ্ছেদ এবং ১।১।১৩২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং এই উভয় রূপের লীলাতে যিনি পরব্রহ্মের সেবা করিতে পারেন, তাঁহার পক্ষেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মের পূর্ণসেবা হইয়া থাকে। কেবল একস্বরূপের সেবা হইবে আংশিকী সেবা—কেবল আশ্রয়-প্রধানরূপের সেবা, অথবা কেবল বিষয়-প্রধান রূপের সেবা।

রসস্বরূপ পরব্রহ্মের পূর্ণসেবাকামী বলিয়াই গৌড়ীয়-বৈষ্ণবাচার্য্যগণ উল্লিখিত উভয় রূপের—শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীগৌরের—সেবাকেই তাঁহাদের কাম্য বলিয়া মনে করেন। এজন্য শ্রীকৃষ্ণের উপাস্যত্বের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা শ্রীশ্রীগৌরের উপাস্যত্বের কথাও বলিয়া গিয়াছেন।

পতিত-পাবন শ্রীমন্নিত্যানন্দপ্রভুও উভয় স্বরূপের ভজনের উপদেশ দিয়াছেন। তাঁহার দুইটী অতিপ্রসিদ্ধ উপদেশ এই :—

"বোল কৃষ্ণ, গাও কৃষ্ণ, ভজহ কৃষ্ণেরে।
কৃষ্ণ প্রাণ, কৃষ্ণ ধন, কৃষ্ণ সে জীবন।
হেন কৃষ্ণ বোল ভাই হই এক মন॥
—শ্রীচৈতন্যভাগবত, মধ্যখণ্ড, প্রথম অধ্যায়।"

"ভজ গৌরাঙ্গ, কহ গৌরাঙ্গ, লহ গৌরাঙ্গের নাম।
যে জন গৌরাঙ্গ ভজে, সে জন আমার প্রাণ॥"
"আমারে কিনিয়া লহ, ভজ গৌরহরি।"
"চৈতন্য সেব, চৈতন্য গাও, লও চৈতন্যনাম।
চৈতন্যে যে ভক্তি করে, সেই মোর প্রাণ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১।২৪॥"

শ্রীচৈতন্যভাগবতকার শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরও লিখিয়াছেন—

"ভজ কৃষ্ণ, স্মর কৃষ্ণ, শুন কৃষ্ণ নাম।
কৃষ্ণ হউ সবার জীবন ধন প্রাণ॥—শ্রীচৈ, ভা, মধ্য, দ্বিতীয় অধ্যায়।"

"ভজ ভজ আরে ভাই, চৈতন্যচরণে।
অবিদ্যাবন্ধন খণ্ডে যাহার শ্রবণে ॥ শ্রীচৈ, ভা, অন্ত্য, তৃতীয় অধ্যায় ॥"

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামী তাঁহার শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে লিখিয়াছেন –

"ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৫১ ॥"
"অতএব পুনঃ কহোঁ ঊর্দ্ধবাহু হৈয়া।
চৈতন্য নিত্যানন্দ ভজ কুতর্ক ছাড়িয়া ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৮।১২ ॥"-ইত্যাদি।

শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এবং শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী তাঁহাদের স্তবাদিতে শ্রীকৃষ্ণের এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর—উভয়ের উপাস্যত্বের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনাদি বৈষ্ণবাচার্য্য গোস্বামিবর্গ যেমন শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিতেন, তেমনি শ্রীগৌরাঙ্গের ভজনও করিতেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর তাঁহার "প্রার্থনা"-আদি গ্রন্থে শ্রীগৌর এবং শ্রীগোবিন্দ—উভয়ের ভজনের কথাই বলিয়া গিয়াছেন এবং এই উভয়রূপের সেবাই যে কাম্য, তাহাও পরিষ্কারভাবে বলিয়া গিয়াছেন—"মনোবাঞ্ছা সিদ্ধি তবে, হঙ পূর্ণতৃষ্ণ। হেথায় চৈতন্য মিলে সেথা রাধাকৃষ্ণ ॥—শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনা (৪৩), শ্রীহরিসাধক-কণ্ঠহার, ২৩৭ পৃষ্ঠা।" এ-স্থলে শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—যদি এ-স্থলে (নবদ্বীপলীলায়) শ্রীচৈতন্যের সেবা এবং সে-স্থলে (ব্রজলীলায়) শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায়, তাহা হইলেই মনোবাঞ্ছা সিদ্ধ হইতে পারে, পূর্ণতৃষ্ণও হওয়া যায়। অর্থাৎ কেবল এক লীলার সেবাতেই তৃষ্ণা পূর্ণ হয় না, উভয় লীলার সেবাতেই তৃষ্ণা পূর্ণতা লাভ করিতে পারে।

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরের এবং শ্রীশ্রীগোবিন্দের লীলামাধুর্য্যের মিশ্রণে যে এক অপূর্ব্ব "সুমাধুর্য্য" আবির্ভূত হয়, শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী তাহা অতি সুন্দর ভাবে প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন।

"চৈতন্য-লীলামৃতপুর, কৃষ্ণলীলা সুকর্পূর, দোঁহে মেলি হয় সুমাধুর্য্য।
সাধুগুরু-প্রসাদে, তাহা যেই আস্বাদে, সেই জানে মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্য ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২৫।২২৯॥"

কিরূপে এই মাধুর্য্য-প্রাচুর্য্যের আস্বাদন লাভ করা যায়, তাহাও তিনি বলিয়া গিয়াছেন।

"কৃষ্ণলীলামৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিগে বহে যাহা হৈতে।
সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২৫।২৩॥"

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরও বলিয়া গিয়াছেন—

"গৌরাঙ্গগুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে ॥ প্রার্থনা ॥"
"গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধামাধব-অন্তরঙ্গ ॥-প্রার্থনা ॥"

শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যে বর্ত্তমান কলির উপাস্য, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলিয়া গিয়াছেন।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্।
যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তন-প্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ শ্রীভা, ১১।৫।৩২॥"

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য ১।১।১৮৯-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

রাগানুগা-ভক্তি-প্রসঙ্গে এই বিষয়ে আরও একটু বিস্তৃত আলোচনা করা হইবে (৫।৬২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

খ। অন্য ভগবৎ-স্বরূপের উপাসকদের সঙ্গে গৌড়ীয়দের বিরোধাভাব

যদিও শ্রীনারায়ণাদির সেবাপ্রাপ্তি গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের কাম্য নহে, তথাপি কিন্তু শ্রীনারায়ণাদির উপাসকদের প্রতি তাঁহাদের প্রীতির অভাব নাই। শ্রীপাদ শ্রীবাসপণ্ডিত ছিলেন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক ; শ্রীল মুরারিগুপ্ত ছিলেন শ্রীশ্রীরাম-সীতার উপাসক ; শ্রীল নৃসিংহানন্দ ব্রহ্মচারী ছিলেন— শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসক। তথাপি তাঁহারা প্রত্যেকেই ছিলেন শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অন্তরঙ্গ পার্ষদ। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর দক্ষিণদেশ-ভ্রমণ উপলক্ষ্যে শ্রীরঙ্গপট্টমে শ্রীল বেঙ্কটভট্টের সহিত প্রভুর খুব সৌহার্দ্দ জন্মিয়াছিল ; কিন্তু ভট্ট ছিলেন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীনারায়ণের উপাসক। তাহাতে তাঁহাদের মধ্যে সৌহার্দ্দের ব্যত্যয় হয় নাই।

সেব্য-সেবকভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া শাস্ত্রীয় পন্থায় যাঁহারা ভগবদ্‌ভজন করেন— তাঁহারা যে-কোনও মায়াতীতস্বরূপের উপাসকই হউন না কেন, তাঁহাদের সহিত গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের বিরোধের কোনও হেতু থাকিতে পারে না।

যাঁহারা কেবল শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাই করেন, শ্রীগৌরের উপাসনা করেন না, (যেমন শ্রীনিম্বার্ক সম্প্রদায়), তাঁহাদের সহিতও গৌড়ীয়দের কোনও বিরোধ নাই, থাকিতেও পারে না।

স্বীয় রুচি অনুসারে অশেষ-রসামৃত-বারিধি রসস্বরূপ-পরব্রহ্মের যে রসবৈচিত্রীতে যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপেরই আরাধনা করিবেন এবং তাঁহার উপাসনাই সেই সাধকের রুচির অনুকূল বলিয়া তাহার অবলম্বনেই তিনি সহজে সাধন-পথে অগ্রসর হইতে পারেন।

যাঁহারা গৌর ও গোবিন্দ—এই উভয়স্বরূপের উপাসক, তাঁহাদের মধ্যেও ভাবের ভেদ থাকিতে পারে—কেহ দাস্যভাবে, কেহ সখ্যভাবে, কেহ বাৎসল্যভাবে, কেহ বা কান্তাভাবেও উপাসনা করিতে পারেন। কিন্তু এইরূপ ভাবভেদেও পরস্পরের মধ্যে প্রীতির অভাবের কোনও হেতু থাকিতে পারে না। লৌকিক জগতেও দেখা যায়—একই ব্যক্তির মাতা-পিতা-ভ্রাতা-ভগিনী স্ত্রী বা পতি প্রভৃতি সকলেই পরস্পর প্রীতির বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াই নিজ নিজ ভাবে তাহার সেবা করিয়া থাকেন।

নমো ব্রহ্মণ্যদেবায় গোব্রাহ্মণহিতায় চ।
জগদ্ধিতায় কৃষ্ণায় গোবিন্দায় নমো নমঃ ॥

জয়তি জননিবাসো দেবকীজন্মবাদো যদুবরপরিষৎস্বৈর্দোভিরস্যন্নধর্ম্মম্।
স্থিরচরবৃজিনঘ্নঃ সুস্মিতশ্রীমুখেন ব্রজপুরবনিতানাং বর্দ্ধয়ন্ কামদেবম্ ॥

নমো মহাবদান্যায় কৃষ্ণপ্রেমপ্রদায় তে।
কৃষ্ণায় কৃষ্ণচৈতন্যনাম্নে গৌরত্বিষে নমঃ ॥

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণবদর্শনের পঞ্চমপর্ব্বে প্রথমাংশ
—সাধ্যতত্ত্ব—
সমাপ্ত

পঞ্চম পর্ব্ব

দ্বিতীয়াংশ

সাধন-তত্ত্ব বা অভিধেয়-তত্ত্ব

সাধ্যবস্তু সাধনবিনু কোহো নাহি পায় ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।৮।১৫৮॥
দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া।
মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥৭।১৪॥
ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি।
ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ মাঠর-শ্রুতি ॥
ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ।
ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥ গীতা ॥ ১৮।৫৬॥
মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে ॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ ॥
গীতা ॥ ১৮।৬৫-৬৬॥
ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব।
ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥
ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ শ্রদ্ধয়াত্মা প্রিয়ঃ সতাম্।
ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥
শ্রীভা, ১১।১৪।২০—২১॥
কৃষ্ণভক্তি হয়—অভিধেয়-প্রধান।
ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগ-জ্ঞান ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।১৪॥
তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন।
মায়াজাল ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।১৮॥
যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥
শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।২০॥
পরা জয়া তদক্ষরমধিগম্যতে ॥ মুণ্ডক ॥ ১।১।৬॥
আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ১।৪।৮॥
প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ ॥ শতপথ-শ্রুতিঃ ॥

প্রথম অধ্যায়

সাধনের আলম্বন

১৬। সাধন

সাধ্য বস্তু বা অভীষ্ট বস্তু প্রাপ্তির জন্য যে উপায় অবলম্বন করা হয়, তাহাকে বলে সাধন। যেমন, পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে হইলে অধ্যয়নের প্রয়োজন। এ-স্থলে পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া হইতেছে সাধ্য এবং অধ্যয়ন হইতেছে তাহার সাধন।

সাধন ব্যতীত সাধ্যবস্তু পাওয়া যায় না। অধ্যয়নব্যতীত পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া যায় না। "সাধ্যবস্তু সাধন বিনু কেহো নাহি পায়॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১৫৮॥"

যাঁহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী বা ভগবৎ-সেবাকামী, তাঁহাদিগকে সাধন করিতে হইবে।

১৭। সাধনের আলম্বন ভগবান্

সাধনের একটা অবলম্বন দরকার। বৃক্ষের অগ্রভাগে উঠিতে হইলে বৃক্ষকে অবলম্বন করিয়াই হস্ত-পদাদির সাহায্যে উঠিতে হয়। ভূপৃষ্ঠ হইতে লম্ফ প্রদানপূর্ব্বক বৃক্ষের অগ্রভাগে উঠিবার প্রয়াস হইবে ব্যর্থ; তাহাতে বরং অঙ্গহানির বা ভূ-পতনের সম্ভাবনা আছে।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষী বা ভগবৎ-সেবাকামী সাধকেরও সাধনের অবলম্বন আবশ্যক। নিরালম্ব সাধন ফলপ্রসূ হইতে পারে না। তাহার হেতু বলা হইতেছে।

সাধনে সিদ্ধি লাভ করার পূর্ব্বপর্য্যন্ত সাধক জীব থাকেন মায়াবদ্ধ। মায়ার বন্ধন হইতে অব্যাহতিই হইতেছে মোক্ষ। জীবের কর্ম্মানুসারে মায়া কেবল তাঁহাকে বাঁধিতেই থাকে। এই মায়াকে অপসারিত করিতে পারিলেই তাঁহার মোক্ষ। কিন্তু নিজের শক্তিতে মায়াকে অপসারিত করা জীবের পক্ষে অসম্ভব; কেননা, মায়া হইতেছে পরব্রহ্ম ভগবানের শক্তি, আবার পরব্রহ্মের চিন্ময়ী শক্তিতে কার্য্যসামর্থ্যবতী--সুতরাং জীবের পক্ষে একান্তভাবে দুরতিক্রমণীয়া। একথা পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

"দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ॥ গীতা ৭।১৪ ॥

—আমার (শ্রীকৃষ্ণের) এই গুণময়ী দৈবী মায়া দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া।"

কিন্তু জীবের পক্ষে মায়া দুর্ল্লঙ্ঘনীয়া বলিয়া সংসারী জীব যে অনন্ত কাল পর্য্যন্ত মায়াদ্বারাই

কবলিত থাকিবে, তাহা নহে ; তাহা হইলে শাস্ত্রে মোক্ষের উপদেশই ব্যর্থ হইয়া পড়ে। জীব কিরূপে এই মায়ার কবল হইতে মুক্ত হইতে পারে, পরম-করুণ ভগবান্ তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥ ৭।১৪ ॥

—যাঁহারা আমারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহারা মায়ার হাত হইতে উদ্ধার লাভ করিতে পারেন।"

শ্লোকস্থ "মামেব—আমারই" শব্দ হইতে জানা যাইতেছে—ভগবানের শরণাপন্ন হওয়া ব্যতীত কেহই মায়ার কবল হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারেন না। এব—অবধারণে।

মায়ার অধীশ্বর ভগবানে শরণাপত্তিই হইতেছে মোক্ষ-প্রাপক সাধনের একমাত্র ভিত্তি ; অন্য কোনও ভিত্তির কথা গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। তিনি বিবিধ প্রকার সাধনের উপদেশ দিয়াছেন সত্য ; কিন্তু সে-সমস্ত সাধনের সাধারণ-ভিত্তি হইতেছে তাঁহাতে শরণাপত্তি।

ভগবচ্ছরণাপত্তিব্যতীত কেবল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই যদি মোক্ষ লাভ সম্ভবপর বলিয়া মনে করা যায়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—জীবের নিজের চেষ্টাতেই—সাধনরূপ চেষ্টাতেই—মোক্ষ লাভ হইতে পারে। তাহা স্বীকার করিতে গেলে "মম মায়া দুরত্যয়া"-এই বাক্যই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

পরব্রহ্ম ভগবানের কোনও রকমের প্রাপ্তিই হইতেছে মোক্ষ (৫।৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তিনি যে স্বপ্রকাশ তত্ত্ব, তাহা শ্রুতি-স্মৃতি-প্রসিদ্ধ। তিনি যে-সাধকের নিকটে কৃপা করিয়া নিজেকে প্রকাশ করেন, সেই সাধকই তাঁহাকে পাইতে পারেন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যঃ"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যই তাহার প্রমাণ। যদি সাধক কেবল নিজের সাধন-চেষ্টাতেই তাঁহাকে পাইতে পারেন, তাহা হইলে পরব্রহ্মের স্বপ্রকাশতাই থাকে না, তিনি সাধকের সাধন-প্রকাশ্য হইয়া পড়েন। এজন্যই বলা হইয়াছে—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে।" পরব্রহ্ম ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই শরণাগত-বৎসল ভগবান্ সাধকের নিকটে আত্ম-প্রকাশ করিয়া থাকেন।

শরণাগতিও কেবল মুখের কথাতেই সিদ্ধ হয় না। যে পর্য্যন্ত চিত্ত বিশুদ্ধ না হয়, সে-পর্য্যন্ত কায়মনোবাক্যে শরণাগত হওয়া অসম্ভব। ভগবচ্চরণে শরণাপত্তির বলবতী বাসনা চিত্তে পোষণ করিয়া সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেই ক্রমশঃ চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইতে পারে, অবশেষে বাস্তব-শরণাপত্তি সিদ্ধ হইতে পারে।

বিভিন্ন সাধক পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে বিভিন্ন ভাবে পাইতে চাহেন (৫।৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। তাই তাঁহাদের সাধনও হয় ভিন্ন ভিন্ন। এজন্য গীতায় বিভিন্ন সাধন-পন্থার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। কিন্তু সকল সাধন-পন্থার মূল ভিত্তি হইতেছে ভগবচ্ছরণাপত্তি।

লৌকিক জগতে দেখা যায়—বিভিন্ন স্থান হইতে একই স্থানে যাওয়ার বিভিন্ন রাস্তা আছে ; আবার, একই স্থান হইতে বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার, বা বিভিন্ন স্থান হইতে বিভিন্ন স্থানে যাওয়ার জন্যও বিভিন্ন রাস্তা আছে। এই সমস্ত রাস্তারই মূল অধিষ্ঠান হইতেছে মাত্র একটী—ভূ-পৃষ্ঠ। আকাশ-

মার্গে তাদৃশ বহু পথের অধিষ্ঠানও একটী মাত্র—আকাশ। তদ্রূপ, বিভিন্ন ভাবের সাধকের জন্য উপদিষ্ট বিভিন্ন সাধন-পন্থারও অধিষ্ঠান মাত্র একটী—ভগবচ্ছরণাপত্তি। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে"-বাক্যে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ সেই সাধারণ অধিষ্ঠানের বা সাধারণ ভিত্তির কথাই বলিয়াছেন।

অন্যভাবেও বিষয়টী বিবেচিত হইতে পারে। অনাদিবহির্ম্মুখতা, পরব্রহ্ম-বিষয়ে অনাদি অজ্ঞতাই, হইতেছে জীবের মায়াবন্ধনের—সংসার-দুঃখের, জন্ম-মৃত্যু-আদির—একমাত্র হেতু। এই হেতুর নিরসন হইলেই জীব মায়াবন্ধন হইতে এবং মায়াবন্ধন-জনিত জন্মমৃত্যু-আদি হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারেন। একমাত্র হেতু যখন ব্রহ্মবিষয়ে অনাদি অজ্ঞতা এবং অনাদি বহির্ম্মুখতা, তখন ব্রহ্ম-বিষয়ক জ্ঞান লাভ হইলেই দুঃখ-দুর্দ্দশার হেতু দূরীভূত হইতে পারে ; ইহার আর দ্বিতীয় কোনও উপায় নাই। একথাই শ্রুতি বলিয়াছেন—"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥-শ্বেতাশ্বতর॥" পরব্রহ্মকে জানার জন্যই সাধন। যাঁহাকে জানিতে হইবে, তাঁহার প্রতি মনের লক্ষ্য রাখা অপরিহার্য্যরূপেই আবশ্যক। এজন্যই শ্রুতি বলিয়াছেন—"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ॥ বৃহদারণ্যক॥ ২।৪।৫॥—আত্মা বা পরব্রহ্মই দ্রষ্টব্য, শ্রোতব্য, মন্তব্য, নিদিধ্যাসিতব্য (ধ্যেয়)।" স্মৃতিও বলিয়াছেন—"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ॥ পাদ্মোত্তর॥ ৭২।১০০॥—সর্ব্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করিবে, কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না।" গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ একথাই বলিয়াছেন—"তস্মাৎ সর্ব্বেষু কালেষু মামনুস্মর॥ ৮।৭॥—সেই হেতু (তুমি) সর্ব্বদা আমার স্মরণ কর।"

ইহা হইতে জানা গেল—সাধনের আলম্বন হইতেছেন পরব্রহ্ম ভগবান্। তাঁহাকে জানা-ই যখন মোক্ষের একমাত্র হেতু, তখন সহজেই বুঝা যায়—ভগবান্‌ই হইতেছেন **সাধনের একমাত্র আলম্বন।**

সর্ব্বদা ভগবানের স্মৃতি, সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি মনের লক্ষ্য রাখা—এ-সমস্তই শরণাগতির লক্ষণ। একমাত্র ভগবানের শরণগ্রহণই কাম্য বলিয়া সর্ব্বদা তাঁহার স্মরণ-মননাদি উপদিষ্ট হইয়াছে।

যাঁহারা মোক্ষ চাহেন না, কেবলমাত্র ভগবানের প্রেমসেবাই যাঁহাদের কাম্য, তাঁহারা যে ভগবানের শরণাপন্ন হইবেন, তাহা বলাই বাহুল্য। যাঁহার সেবা কাম্য, তাঁহার স্মরণও স্বাভাবিক।

সর্ব্ববিধ ফলদাতা একমাত্র পরব্রহ্ম। "ফলমত উপপত্তেঃ॥ ৩।২।৩৭॥-ব্রহ্মসূত্র॥" সুতরাং মোক্ষদাতাও তিনি, প্রেমদাতাও তিনি। তাঁহার শরণাপন্ন না হইলে কিরূপে অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যাইতে পারে?

মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণগ্রহণ যে অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক, গীতা হইতেই তাহা জানা যায়। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী"-ইত্যাদি (গীতা॥ ৭।১৪॥)-বাক্যে মায়ানিবৃত্তির জন্য শ্রীকৃষ্ণশরণাপত্তির কথা বলিয়া পরবর্ত্তী "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ"-ইত্যাদি গীতা॥ ৭।১৫॥-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, যে-সমস্ত দুষ্কৃতি-লোক মূঢ়, নরাধম, মায়াপহৃতজ্ঞান এবং আসুর-ভাবাপন্ন,

তাহারাই শ্রীকৃষ্ণভজন করে না (তাহাদের মায়ানিবৃত্তিও অসম্ভব)। তাহার পরে "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্"-ইত্যাদি গীতা ॥৭।১৬॥-শ্লোকে তিনি বলিয়াছেন—যাঁহারা সুকৃতি, তাঁহাদের মধ্যে কেহ বা আর্ত্তরূপে, কেহ বা অর্থার্থিরূপে, কেহ বা জিজ্ঞাসুরূপে এবং কেহ বা জ্ঞানিরূপে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিয়া থাকেন। এ-স্থলে, আর্ত্ত এবং অর্থার্থী হইতেছেন "সকাম", আর জিজ্ঞাসু এবং জ্ঞানী হইতেছেন "মোক্ষকাম।" ইহা হইতে জানা গেল—ঐহিক বা পারত্রিক কাম্যবস্তু লাভের জন্য যেমন শ্রীকৃষ্ণভজন অপরিহার্য্য, তেমনি মোক্ষ লাভের জন্যও শ্রীকৃষ্ণভজন অপরিহার্য্য। পরবর্ত্তী ৫।২৫ক-অনুচ্ছেদে এ-সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

১৮। উপাস্য

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদে বলা হইয়াছে, ভগবান্ই সাধনের আলম্বন। ভগবানের শরণাপন্ন হইয়া উপাসনা করিলেই তিনি কৃপা করিয়া সাধককে তাঁহার অভীষ্ট দান করিয়া থাকেন। "আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ", "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও পরব্রহ্ম ভগবানের উপাসনার কথা বলিয়া গিয়াছেন।

অতএব **ভগবান্ই** হইতেছেন **সাধকের উপাস্য।**

শ্রুতি-স্মৃতি সর্ব্বত্র পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের উপাসনার উপদেশই দিয়াছেন। তথাপি মোক্ষাকাঙ্ক্ষী সাধক স্বীয় অভিরুচি অনুসারে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের অনন্তপ্রকাশের মধ্যে যে কোনও এক মায়াতীত ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করিতে পারেন।

ক। মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপ

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি-কামী সাধকদের মধ্যে যিনি স্বীয় অভীষ্ট মুক্তি লাভ করিয়া যে ভগবৎ-স্বরূপের ধামে অবস্থান করিতে ইচ্ছুক, তিনি স্বীয় ভাবের অনুকূলরূপে শাস্ত্রবিহিত পন্থায় সেই ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করিলেই তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে। অর্থাৎ যাঁহারা সালোক্যাদি মুক্তি লাভ করিয়া শ্রীনারায়ণের ধামে বাস করিতে বাসনা করেন, তাঁহারা নিজ নিজ ভাবে শ্রীনারায়ণের উপাসনা করিবেন, যাঁহারা শ্রীনৃসিংহদেবের ধামে বাস করিতে ইচ্ছুক, তাঁহারা শ্রীনৃসিংহদেবের উপাসনা করিবেন ; ইত্যাদি।

সাযুজ্যমুক্তিকামীদের মধ্যে যাঁহারা ঈশ্বর-সাযুজ্যকামী, তাঁহারা যে ভগবৎ-স্বরূপের সহিত সাযুজ্যকামী, সেই ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনাই করিবেন।

আর যাঁহারা শ্রুতি-স্মৃতিবিহিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যকামী, তাঁহারা নিজেদের অভিরুচি অনুসারে যে-কোনও মায়াতীত সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা করিতে পারেন। কেননা, সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপই মুক্তি দিতে পারেন ; নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম মুক্তি দিতে পারেন না।

কারণ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে কৃপাদির অভিব্যক্তি নাই ; অথচ শ্রুতি বলেন—যাঁহার প্রতি ব্রহ্মের কৃপা হয়, কেবল তিনিই ব্রহ্মকে পাইতে পারেন। "যমেবৈষ বৃণোতি তেন এষ লভ্যঃ।"

এজন্য যিনি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্যকামী. তিনি যদি স্বীয় অভীষ্ট-কামনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কোনও সবিশেষ ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনায় প্রবৃত্ত হয়েন এবং সেই সবিশেষ-স্বরূপের চরণে স্বীয় অভীষ্ট সিদ্ধির প্রার্থনা জ্ঞাপন করেন, তাহা হইলে সেই ভগবৎ-স্বরূপের কৃপায় তিনি কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন। কেবল নিজের সাধন-চেষ্টা দ্বারাই যে কেহ মায়ার বন্ধন ছিন্ন করিতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে।

স্বীয় অভিরুচি অনুসারে যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনায় মোক্ষ লাভ হইতে পারিলেও পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবানের উপাসনাতে তাহা অপেক্ষাকৃত সুলভ হইতে পারে ; কেননা, স্বয়ংভগবানের মধ্যেই কৃপাদির পূর্ণতম বিকাশ এবং তাঁহার উপাসনায় বিভিন্ন ভাবের সাধকও স্ব-স্ব অভীষ্ট লাভ করিতে পারেন, সাক্ষাৎ ভগবানের উক্তিই তাহার প্রমাণ। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্ ॥ গীতা ॥ ৪।১১॥"

খ। প্রেমসেবাকামীর উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপ

যাঁহারা প্রেমসেবাকামী, তাঁহাদের উপাস্য হইতেছেন পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ। কেননা, শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপ প্রেম দিতে পারেন না (১।১।১৩৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। স্বসুখ-বাসনাশূন্য বা স্বদুঃখনিবৃত্তি-বাসনাশূন্য কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনারূপ প্রেম একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের ধামেই বিরাজিত, অন্য কোনও ভগবৎ-স্বরূপের ধামে তাহা নাই। সুতরাং এতাদৃশ প্রেম শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও ভগবৎ-স্বরূপই দিতে পারেন না। এজন্য প্রেমকামী বা প্রেমসেবাকামী সাধকদের উপাস্য হইতেছেন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ।

গ। বিশুদ্ধ-নির্ম্মল-প্রেমসেবাকামী গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের উপাস্য

যে প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান নাই, স্বসুখ-বাসনার গন্ধলেশও নাই, যাহা একমাত্র কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী-সেবার তীব্র বাসনাতেই পর্য্যবসিত, সেই প্রেমই হইতেছে বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেম। ইহা একমাত্র ব্রজেরই অসাধারণ সম্পত্তি। গৌরকৃষ্ণের লীলাস্থান নবদ্বীপও ব্রজেরই এক প্রকাশ বলিয়া—স্বয়ংভগবদ্রূপে পরব্রহ্মের বিহারোপযোগী প্রকাশ বলিয়া—এই প্রেম নবদ্বীপেরও সম্পত্তি।

এই বিশুদ্ধ নির্ম্মল প্রেমের অপর নাম ব্রজপ্রেম। রসস্বরূপ পরব্রহ্ম ব্রজে ও নবদ্বীপে এই ব্রজপ্রেমেরই আস্বাদন করিয়া থাকেন। তিনি ব্রজে এই প্রেমরস আস্বাদন করিয়া থাকেন শ্যাম-কৃষ্ণরূপে, প্রেমের বিষয়-প্রধানরূপে। ব্রজে তিনি প্রেমের সর্ব্ববিধ-বৈচিত্রীরই বিষয় ; কিন্তু সর্ব্ব-বিধ বৈচিত্রীর আশ্রয় নহেন ; কান্তাপ্রেমের চরমতম-বিকাশ মাদনাখ্য-মহাভাবের তিনি কেবল বিষয় মাত্র , আশ্রয় নহেন (১।১।১৩২-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কিন্তু নবদ্বীপে তিনি গৌরকৃষ্ণরূপে প্রেমের সর্ব্ব-বিধ-বৈচিত্রীরই আশ্রয়, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" বলিয়া মাদনাখ্য মহাভাবেরও আশ্রয় এবং

অখণ্ড-প্রেমভাণ্ডারেরও আশ্রয় (১।১।১৮৮-৮৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এজন্য ব্রজের কেবলা-কান্তা-প্রীতি-দানের সামর্থ্য গৌরকৃষ্ণেই সর্ব্বাতিশায়িরূপে প্রকটিত (১।২।৫১-অনুচ্ছেদ-১০০২ পৃঃ দ্রষ্টব্য)।

এজন্য যাঁহারা (যেমন শ্রীনিম্বার্ক-সম্প্রদায়) কেবল ব্রজেই রস-স্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেমসেবা প্রার্থী, তাঁহাদের পক্ষে ব্রজবিহারী শ্যামকৃষ্ণই একমাত্র উপাস্য।

কিন্তু যাঁহারা (যেমন গৌড়ীয়-বৈষ্ণব সম্প্রদায়) ব্রজ ও নবদ্বীপ—এই উভয় ধামেই রসস্বরূপ পরব্রহ্মের প্রেমসেবা-প্রার্থী, তাঁহাদের পক্ষে ব্রজবিহারী শ্যামকৃষ্ণ এবং নবদ্বীপবিলাসী গৌরকৃষ্ণ এই উভয়ই তুল্যরূপে উপাস্য।

১৯। অন্য স্বরূপের প্রতি উপেক্ষা অপরাধজনক

যিনি যেই ভগবৎ-স্বরূপের উপাসক, সেই ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি তাঁহার প্রাণঢালা শ্রদ্ধা, প্রীতি ও ভক্তি নিতান্ত আবশ্যক; কিন্তু অন্য ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অবজ্ঞা, অনাদর বা উপেক্ষা হইবে তাঁহার পক্ষে অপরাধজনক, সাধনে অগ্রগতির পক্ষে অন্তরায়। কেননা, অন্যস্বরূপের প্রতি অবজ্ঞাদি তাঁহার উপাস্য-স্বরূপকেই স্পর্শ করে; তাহাতে উপাস্য-স্বরূপ প্রসন্ন হইতে পারেন না।

বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ হইতেছেন এক এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেরই বিভিন্ন প্রকাশ এবং সেই এক এবং অদ্বিতীয় পরব্রহ্মেই তাঁহাদের অবস্থিতি; শক্তিবিকাশের তারতম্য থাকিলেও স্বরূপতঃ তাঁহারা পরব্রহ্ম হইতে ভিন্ন নহেন। পরব্রহ্ম একেই বহু এবং বহুতেও এক (১।১।৭৯-৮৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বহুতেও তিনি যখন এক, তখন বহুর মধ্যে একস্বরূপের অবজ্ঞাদিও সেই এক এবং অদ্বিতীয়ের অবজ্ঞাদিতেই পর্য্যবসিত হয়। আবার একেই যখন তিনি বহু, তখন সেই অবজ্ঞাদি বহুতেও—সুতরাং সাধকের নিজের উপাস্যস্বরূপের অবজ্ঞাদিতেও—পর্য্যবসিত হয়। একটী বিশাল-কায় বৃক্ষের অসংখ্য শাখা-প্রশাখা লইয়াই সমগ্র বৃক্ষ; কোনও একটী শাখা বা প্রশাখাও বৃক্ষাতিরিক্ত নহে। একটী শাখার উপরে অত্যাচার করা হইলে, বৃক্ষটীর উপরেই সেই অত্যাচার করা হয়—সুতরাং সমস্ত শাখা-প্রশাখার উপরে অত্যাচারেই তাহা পর্য্যবসিত হইয়া থাকে। কাহারও চরণে প্রণিপাত, অথচ পৃষ্ঠদেশে মুষ্ট্যাঘাত করিলে যে অবস্থা হয়, এক ভগবৎ-স্বরূপের উপাসনা এবং অন্য ভগবৎ-স্বরূপগণের প্রতি অবজ্ঞাদি-প্রদর্শনেরও সেই অবস্থাই।

একের প্রতি পূজা, অপরস্বরূপের প্রতি উপেক্ষাদি-প্রদর্শন করিলে ভগবৎ-স্বরূপের মধ্যে ভেদ আছে বলিয়া মনে করিতে হয়; কিন্তু

ঈশ্বরত্বে ভেদ মানিলে হয় অপরাধ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।৯।১৪০॥"

কেননা,

"একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান-অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার-রূপ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৯।১৪১॥"

"মণির্যথা বিভাগেন নীলপীতাদিভির্যুতঃ।
রূপভেদমবাপ্নোতি ধ্যানভেদাত্তথাচ্যুতঃ॥
—শ্রীচৈ,চ, ২।৯।১৪১-পয়ারপ্রসঙ্গে ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচন॥"

কোনও ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অবজ্ঞাদিজনিত অপরাধ হইতেছে ভগবানে অপরাধ। ভগবানে অপরাধ জন্মিলে জীবন্মুক্ত সাধকের মধ্যেও আবার সংসার-বাসনা জাগিয়া উঠিতে—অর্থাৎ জীবন্মুক্তত্বও বিনষ্ট হইয়া যাইতে—পারে।

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসার-বাসনাম্।
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥
—শ্রীচৈ,চ, ২।২৫-পরিচ্ছেদে ধৃত বাসনাভাষ্যধৃত-পরিশিষ্টবচন॥

—অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবানে অপরাধ জন্মিলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হয়েন।"

২০। উপাস্যরূপে স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উৎকর্ষ

পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সমস্ত শক্তির, সমগ্র ঐশ্বর্য্য-মাধুর্য্যের, রসস্বরূপত্বের এবং করুণত্বের পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া উপাস্যরূপেও তাঁহার সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ। কোনও বিষয়েই তাঁহার সমানও কেহ নাই, অধিক থাকা তো দূরে। "ন তৎসমশ্চাভ্যধিকশ্চ দৃশ্যতে॥ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতি॥৬।৮॥"

মাধুর্য্য

মাধুর্য্যই ভগবত্তার সার (১।১।১৪০-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেই এই মাধুর্য্যের পূর্ণতম বিকাশ; তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য—

"কোটি ব্রহ্মাণ্ড পরব্যোম, তাহাঁ যে স্বরূপগণ, বলে হরে তা'সভার মন।
পতিব্রতা-শিরোমণি, যাঁরে কহে বেদবাণী, আকর্ষয়ে সেই লক্ষ্মীগণ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২১।৮৮॥"
"আপন মাধুর্য্যে হরে আপনার মন। আপনে আপনা চাহে করিতে আলিঙ্গন॥
শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১১৪॥"

শ্রীকৃষ্ণ—"শৃঙ্গারসরাজময় মূর্ত্তিধর।
অতএব আত্মপর্য্যন্ত সর্ব্বচিত্তহর॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১১২॥"

করুণা

শ্রীকৃষ্ণের করুণা এতই বলবতী যে, কেহ

"কৃষ্ণ তোমার হঙ' যদি বোলে একবার।
মায়াবদ্ধ হৈতে কৃষ্ণ তারে করে পার॥ শ্রী, চৈ, চ, ২।২২।২২॥"

ইহার শাস্ত্রীয় প্রমাণ এই :—

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্ ব্রতং মম॥
—হরিভক্তিবিলাস ॥১১।৩৯৭-ধৃত রামায়ণ-বচন॥

—আমার শরণাগত হইয়া যিনি একবার মাত্র বলেন—'হে ভগবন্! আমি তোমার', আমি (ভগবান্) তাঁহাকে সর্ব্বদা অভয় দান করিয়া থাকি—ইহাই আমার ব্রত।"

শ্রীকৃষ্ণের এতই করুণা যে, তিনি অন্যকামীকেও স্বচরণ দিয়া থাকেন।

"অন্যকামী যদি করে কৃষ্ণের ভজন। না মাগিতেও কৃষ্ণ তারে দেন স্বচরণ॥
কৃষ্ণ কহে—আমায় ভজে মাগে বিষয়সুখ। অমৃত ছাড়ি বিষ মাগে, এই বড় মূর্খ॥
অমি বিজ্ঞ, এই মূর্খে বিষয় কেনে দিব। স্বচরণামৃত দিয়া বিষয় ভুলাইব॥
শ্রীচৈ, চ, ২২।২৪-২৬॥"

"সত্যং দিশত্যর্থিতো নৃণাং নৈবার্থদো যৎ পুনরর্থিতা যতঃ।
স্বয়ং বিধত্তে ভজতামনিচ্ছতামিচ্ছাপিধানং নিজপাদপল্লবম্॥ শ্রীভা, ৫।১৯।২৬॥

—(দেবগণ ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন) শ্রীভগবান্ প্রার্থিত হইয়া মনুষ্যদিগের প্রার্থিত বিষয় দান করিয়া থাকেন—ইহা সত্য (কখনও ইহার অন্যথা হয় না); তথাপি কিন্তু (প্রার্থিত বিষয়ের দানের দ্বারা) তিনি পরমার্থদাতা হয়েন না; যেহেতু, (দেখিতে পাওয়া যায়, একবার) প্রার্থিত বস্তু পাওয়ার পরেও সেই ব্যক্তিই আবার (অন্য বস্তু) প্রার্থনা করিয়া থাকে। (তবে কি ভগবান্ কাহাকেও পরমার্থ দান করেন না? এই প্রশ্নের আশঙ্কা করিয়া বলিতেছেন) যাঁহারা ভগবানের ভজন করেন, অথচ ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির নিমিত্ত ইচ্ছা করেন না, ভগবান্ স্বয়ং তাঁহাদের অন্যকামনার আচ্ছাদক স্বীয় পাদপল্লব তাঁহাদিগকে দান করিয়া থাকেন।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স তু পরমকারুণিকঃ তৎ-পাদপল্লবমাধুর্য্যাজ্ঞানেন তদনিচ্ছতামপি ভজতাং ইচ্ছাপিধানং সর্ব্বকামসমাপকং নিজপাদপল্লমেব বিধত্তে তেভ্যো দদাতীত্যর্থঃ। যথা মাতা চর্ব্ব্যমাণাং মৃত্তিকাং বালকমুখাদপসার্য্য তত্র খণ্ডং দদাতি তদ্বদিতি ভাবঃ। এবমপ্যুক্তং 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম' ইত্যাদৌ তীব্রত্বং ভক্তেঃ। তথোক্তং গারুড়ে। 'যদ্দুর্ল্লভং যদপ্রাপ্যং মনসো যন্ন গোচরম্। তদপ্যপ্রার্থিতং ধ্যাতো দদাতি মধুসূদনঃ॥' এবং শ্রীসনকাদীনামপি ব্রহ্মজ্ঞানিনাং ভক্ত্যনুবৃত্ত্যা তৎপাদপল্লবপ্রাপ্তির্জ্ঞেয়া॥ —ভগবচ্চরণকমলের মাধুর্য্যের কথা জানেন না বলিয়া সেই চরণকমল-প্রাপ্তির ইচ্ছা যাঁহাদের নাই, তাঁহারা যদি অন্য কামনা সিদ্ধির জন্য ভগবানের ভজন করেন, পরম-কারুণিক ভগবান্ তাঁহাদিগকেও

অন্য কামনার আচ্ছাদক এবং সর্ব্বকাম-পরিপূরক স্বীয় পাদপল্লব দিয়া থাকেন। যে বালক মাটী খাইতেছে, মাতা যেমন তাহার মুখ হইতে মাটী ফেলিয়া দিয়া মুখে খণ্ড (মিষ্টদ্রব্য-বিশেষ) দিয়া থাকেন, তদ্রূপ। ইহার প্রমাণ এই যে, 'অকামঃ সর্ব্বকামো বা'-ইত্যাদি শ্লোকে ভক্তির তীব্রত্বের কথা জানা যায় (যাঁহারা নিষ্কাম, বা সর্ব্বকাম, বা মোক্ষকাম, তাঁহাদেরও যখন তীব্রভক্তিযোগের সহিত ভগবদ্ভজনের কথা 'অকামঃ সর্ব্বকামঃ''-শ্লোক হইতে জানা যায়, তখন বুঝা যাইতেছে, তাঁহাদের চিত্তে ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির কামনা জাগিয়াছে, তাঁহাদের অন্য সমস্ত কামনা দূরীভূত হইয়াছে)। গরুড় পুরাণ হইতেও জানা যায়—যাহা তুর্ল্লভ, যাহা অপ্রাপ্য, যাহা মনেরও অগোচর, ধ্যানকারী সাধক তাহা প্রার্থনা না করিলেও মধুসূদন তাঁহাকে তাহা দিয়া থাকেন। ব্রহ্মজ্ঞানী শ্রীসনকাদিও ভক্তির অনুবৃত্তি করিয়া ভগবৎ-পাদপল্লব প্রাপ্ত হইয়াছিলেন।"

অন্যকামনা মনে পোষণ করিয়াও যদি কেহ ভগবানের ভজন করেন, তাহা হইলেও যে ভগবৎ-কৃপায় অন্যকামনা পরিত্যাগ করিয়া তিনি ভগবচ্চরণ-প্রাপ্তির জন্য অভিলাষী হয়েন, তাহার আরও প্রমাণ আছে।

"কাম লাগি কৃষ্ণ ভজে পায় কৃষ্ণরসে।
কাম ছাড়ি দাস হৈতে হয় অভিলাষে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।২৭॥"

"স্থানাভিলাষী তপসি স্থিতোঽহং ত্বাং প্রাপ্তবান্ দেবমুনীন্দ্রগুহ্যম্।
কাচং বিচিন্বন্নিব দিব্যরত্নং স্বামিন্ কৃতার্থোঽস্মি বরং ন যাচে॥

—হরিভক্তিসুধোদয় ॥৭।২৮॥

—(পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ যখন ধ্রুবকে দর্শন দিয়া বর প্রার্থনা করিতে বলিয়াছিলেন, তখন ধ্রুব বলিয়াছিলেন) হে প্রভো! কাচের অন্বেষণ করিতে করিতে লোক যেমন দিব্যরত্ন প্রাপ্ত হয়, আমিও তদ্রূপ স্থানাভিলাষী (পিতৃসিংহাসন বা পিতৃপুরুষদেরও অপ্রাপ্ত একটী অপূর্ব্ব লোক লাভ করিবার নিমিত্ত অভিলাষী) হইয়া তপস্যা করিতে করিতে দেবেন্দ্র এবং মুনীন্দ্রদিগের পক্ষেও তুর্ল্লভ তোমার চরণ প্রাপ্ত হইয়াছি। স্বামিন্! ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইয়াছি; আমি আর অন্য কোনও বর চাই না।"

পিতৃসিংহাসনাদির লোভে ধ্রুব আকুল প্রাণে পদ্মপলাশলোচন ভগবানের নাম কীর্ত্তন করিতেছিলেন। পদ্মপলাশলোচন ভগবান্ যখন কৃপা করিয়া ধ্রুবকে দর্শন দিলেন, তখন তাঁহার দর্শনের প্রভাবেই ধ্রুবের পিতৃসিংহাসনাদি লাভের বাসনা তিরোহিত হইয়া গেল, পদ্মপলাশ-লোচনের চরণপ্রাপ্তির জন্যই তাঁহার একমাত্র বাসনা জাগিয়া উঠিল। ইহা পরমকরুণ ভগবানের কৃপার এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য।

এইরূপ কৃপাবৈশিষ্ট্য স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নারায়ণাদি-প্রকাশেও সম্ভব। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণে এতাদৃশ কৃপাবৈশিষ্ট্যও অসাধারণরূপে বিকশিত। কংসের চর বালঘাতিনী পূতনা গত দ্বাপরের

প্রকটলীলায় শ্রীকৃষ্ণের জীবন-নাশ করিবার অভিপ্রায়ে স্তন্যদায়িনীতুল্যা রমণীর ছদ্মবেশে, স্বীয় স্তনে তীব্র কালকূট লিপ্ত করিয়া, শিশুরূপী কৃষ্ণকে স্বীয় অঙ্কে স্থাপন করিয়া, যেন স্তন্যপান করাইবার উদ্দেশ্যেই, তাঁহার মুখে স্বীয় স্তন ঢুকাইয়া দিয়াছিল। পূতনা মনে করিয়াছিল—স্তন্য পান করার পূর্ব্বেই তীব্র কালকূট পান করিয়া শিশু গতাসু হইবেন। কিন্তু হইয়া গেল বিপরীত। শ্রীকৃষ্ণ স্তন্যের সহিত পূতনার প্রাণবায়ুকেই আকর্ষণ করিলেন। পূতনা গতাসু হইল। পূতনাকে শ্রীকৃষ্ণ ধাত্রীগতি দিলেন, অর্থাৎ ব্রজের বিশুদ্ধ বাৎসল্যপ্রেম দিলেন এবং অনুরূপ সিদ্ধদেহ দিয়া শ্রীকৃষ্ণের ধাত্রীরূপে যশোদামাতার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার দিলেন। তাঁহার প্রতি বৈরিভাবাপন্ন লোকগণ যদি শ্রীকৃষ্ণের হস্তে নিহত হয়, তাহা হইলে সাধারণতঃ তিনি তাঁহাদিগকে সেবা-সম্ভাবনা-হীন নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্যই দিয়া থাকেন। কিন্তু পূতনার মধ্যে ভক্তির আভাস—স্তন্যদানের কপটতাময় অভিনয়—ছিল বলিয়া পূতনাকে তিনি প্রেমসেবার অধিকার দিলেন। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের অসাধারণ কারুণ্যের ইহা একটী পরমোজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের এতাদৃশ করুণাবৈশিষ্ট্যের কথা স্মরণ করিয়াই উদ্ধব বলিয়াছিলেন—

"অহো বকী যং স্তনকালকূটং জিঘাংসয়াপায়য়দপ্যসাধ্বী।
লেভে গতিং ধাত্র্যুচিতাং ততোহন্যং কং বা দয়ালুং শরণং ব্রজেম॥ শ্রীভা, ৩।২।২৩॥

–(বিদুরের নিকটে উদ্ধব বলিয়াছিলেন) অহো! (শ্রীকৃষ্ণের কি আশ্চর্য্য দয়ালুতা)! দুষ্টা পূতনা প্রাণবিনাশের ইচ্ছায় যাঁহাকে স্বীয় স্তনলিপ্ত কালকূট পান করাইয়াও ধাত্রীর (মাতৃবৎ লালন-পালন-কারিণীর) উপযুক্তা গতি লাভ করিয়াছে, সেই শ্রীকৃষ্ণব্যতীত এমন দয়ালু আর কে আছেন যে, তাঁহার ভজন করিব ?"

"বিজ্ঞ জনের হয় যদি কৃষ্ণগুণ-জ্ঞান।
অন্য ত্যজি ভজে তাতে—উদ্ধব প্রমাণ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২।৫২॥"

অক্রূরও শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছিলেন—

"কঃ পণ্ডিতস্ত্বদপরং শরণং সমীয়াদ্ ভক্তপ্রিয়াদৃতগিরঃ সুহৃদঃ কৃতজ্ঞাৎ।
সর্ব্বান্ দদাতি সুহৃদো ভজতোহভিকামানাত্মানমপ্যপচয়াপচয়ৌ ন যস্য॥
—শ্রীভা, ১০।৮৮।২৬॥

—যিনি ভজনকারী সুহৃদ্‌কে সকল অভিলষিত দান করেন, এমন কি আত্মপর্য্যন্তও দান করিয়া থাকেন, যাঁহার হ্রাস নাই, বৃদ্ধি নাই, সেই ভক্তপ্রিয়, সত্যবাক্, সর্ব্বসুহৃদ্ এবং কৃতজ্ঞ (যিনি যাহা করেন, তাহা যিনি জানেন) তোমাব্যতীত কোন্ পণ্ডিত অপর কাহারও শরণাপন্ন হইবেন ?"

"ভক্তবৎসল কৃতজ্ঞ সমর্থ বদান্য।
হেন কৃষ্ণ ছাড়ি পণ্ডিত নাহি ভজে অন্য॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৫১॥"

প্রশ্নোত্তরে এই পয়ারের মর্ম্ম এইরূপে প্রকাশ করা যায়ঃ—শ্রীকৃষ্ণকে ভজন কর। প্রশ্ন—

কেন ? শ্রীকৃষ্ণকে ভজন করিয়া কি হইবে ? উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ ভক্তবৎসল ; যিনি তাঁহার ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার প্রতি অত্যন্ত স্নেহ ও করুণা প্রকাশ করেন। সন্তানের প্রতি মায়ের যেরূপ স্নেহ ও করুণা, ভক্তের প্রতিও শ্রীকৃষ্ণের সেইরূপ স্নেহ ও করুণা। সন্তান যখন মা মা বলিয়া কাঁদিতে থাকে, মা যেমন তখনই অত্যন্ত ব্যাকুলতার সহিত দৌড়িয়া আসিয়া সন্তানকে কোলে তুলিয়া লয়েন, ধূলা-ময়লা-মাখানো ছেলেকেও কোলে তুলিয়া আদর যত্ন করেন, ধূলা-ময়লা না ছাড়াইয়াও স্তন্য পান করাইয়া সান্ত্বনা দান করেন—শ্রীকৃষ্ণ তেমনি ব্যগ্রতার সহিত ভজনকারী জীবকে শ্রীচরণে টানিয়া লয়েন, পাপাদির বিচার করেন না, কেহ তাঁহার শরণাপন্ন হইলে অমনি তিনি তাঁহাকে গ্রহণ করেন, তাহার পাপ-কলুষাদি দূর করিয়া শ্রীচরণকমলের সুধা পান করাইয়া জীবের সংসার-ভ্রমণ-জনিত শ্রান্তি-ক্লান্তি দূর করেন, তাহার ত্রিতাপ-জ্বালা নিবারণ করেন। যে ছেলে মায়ের বিরুদ্ধাচরণ করে, মায়ের অনিষ্ট কামনা করে, মা যেমন তাহার প্রতিও স্নেহশীলা—সেইরূপ, যে জীব শ্রীকৃষ্ণের অনিষ্ট করার জন্য তাঁহার সমীপবর্ত্তী হয়, কৃষ্ণ তাহাকেও কৃপা করেন। পূতনাই তাহার দৃষ্টান্ত। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করাই কর্ত্তব্য। প্রশ্ন—আমি যে ভজন করিতেছি, তাহা তিনি জানিতে পারিলে তো আমাকে কৃপা করিয়া শ্রীচরণে স্থান দিবেন। ছেলে যখন কাতর প্রাণে মা মা বলিয়া ডাকে, তখনই মা তাকে কোলে নেন। কিন্তু আমি তো কাতর প্রাণে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতে পারিব না। আমি তো ঐকান্তিক ভাবে তাঁহার ভজন করিতে পারিবনা ; বিষয়-বাসনায় আমার চিত্ত যে মলিন, বিষয়ের আকর্ষণে আমার চিত্ত যে বিক্ষিপ্ত। আমার ডাক তাঁর চরণে পৌঁছিবে কেন ? উত্তর—তুমি কাতর প্রাণে অকপট-চিত্তে তাঁকে ডাকিতে সমর্থ নাই বা হইলে। তথাপি তোমার ডাক তাঁর চরণে পৌঁছিবে, তোমার ভজনের বিষয়—তাহা ঐকান্তিক না হইলেও—তিনি জানিতে পারিবেন; কারণ, তিনি যে কৃতজ্ঞ ; যে যে ভাবে যাহা করে, তাহাই তিনি জানিতে পারেন। সুতরাং তোমার হতাশ হওয়ার কিছু কারণ নাই ; শ্রীকৃষ্ণ-ভজন কর। প্রশ্ন—আচ্ছা, তিনি না হয়, আমি যাহা করি, তাহা জানিতে পারিলেন ; আমার প্রার্থনার বিষয়ও জানিতে পারিলেন এবং তিনি ভক্তবৎসল বলিয়া আমার প্রার্থনার বস্তু আমাকে দেওয়ার জন্য তাঁহার ইচ্ছাও হইতে পারে ; কিন্তু তাহা দেওয়ার শক্তি তাঁহার আছে তো ? উত্তর--হাঁ, তাহা দেওয়ার শক্তি তাঁহার আছে। তিনি সর্ব্ববিষয়ে সমর্থ—তিনি না করিতে পারেন, এমন কিছু কোথাও নাই। তিনি সর্ব্বশক্তিমান্। তুমি যাহা চাও, তাহাতো দিতে পারেনই ; যাহা চাওয়ার কল্পনা পর্য্যন্ত হয়ত তুমি করিতে পারনা, এমন বস্তু দেওয়ার শক্তিও তাঁর আছে। অতএব শ্রীকৃষ্ণভজন কর। প্রশ্ন—আচ্ছা, আমি যাহা চাই, তাহা দেওয়ার শক্তি তাঁহার থাকিতে পারে ; কিন্তু তিনি তাহা দিবেন কিনা ? দেওয়ার প্রবৃত্তি তাঁহার হইবে কিনা ? অনেক ধনীর ধন আছে, পরের দুঃখ দেখিলে তাঁহাদের চিত্তও বিগলিত হয় ; কিন্তু কৃপণতা বশতঃ কাহারও দুঃখ দূর করার জন্য ধনব্যয় করিতে তাঁহারা প্রস্তুত নহেন। উত্তর—শ্রীকৃষ্ণ তেমন নহেন, তিনি কৃপণ নহেন। শ্রীকৃষ্ণ বদান্য—দাতার শিরোমণি ; একপত্র তুলসী বা একবিন্দু জল তাঁহার উদ্দেশ্যে যে ভক্ত দেন,

তাঁহাকে শ্রীকৃষ্ণ আত্মপর্য্যন্ত দান করিয়া থাকেন--এতবড় দাতা তিনি। এসমস্ত কারণে শ্রীকৃষ্ণ ভজনীয়-গুণের নিধি—তাঁহার গুণের বিষয় যিনি অবগত আছেন, তিনি শ্রীকৃষ্ণকে ভজন না করিয়া থাকিতে পারেন না।

পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ যে সর্ব্বভাবে সাধকের আনুকূল্য করেন, শ্রীমদ্ভগবদগীতা হইতেও তাহা জানা যায়। তিনি অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

"তেষাং সততযুক্তানাং ভজতাং প্রীতিপূর্ব্বকম্।
দদামি বুদ্ধিযোগং তং যেন মামুপযান্তি তে॥ ১০।১০॥

—নিরন্তর মদনুরক্তচিত্ত ও প্রীতিসহকারে আমার ভজনকারী লোকদিগকে আমি সেইরূপ বুদ্ধিযোগ প্রদান করিয়া থাকি, যাহাতে তাঁহারা আমাকে পাইতে পারেন।"

"অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে।
তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্॥ ৯।২২॥

—অনন্যচিন্তাপরায়ণ যে সকল ব্যক্তি আমার উপাসনা করেন, আমি সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত (সর্ব্বপ্রকারে মদেকনিষ্ঠ) ব্যক্তিদিগের যোগ ও ক্ষেম বহন করিয়া থাকি (অর্থাৎ তাঁহাদের প্রয়োজনীয় ধনাদিলাভের ও তৎপালনের ব্যবস্থা করিয়া থাকি)।

স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে গুরুপদাশ্রিত সাধক মাত্রকেই কৃপা করিয়া থাকেন, তাহা তিনি নিজমুখেই উদ্ধবের নিকটে প্রকাশ করিা গিয়াছেন।

"নৃদেহমাদ্যং সুলভং সুদুর্ল্লভং প্লবং সুকল্পং গুরুকর্ণধারম্।
ময়ানুকূলেন নভস্বতেরিতং পুমান্ ভবাব্ধিং ন তরেৎ স আত্মহা॥

শ্রীভা, ১১।২০।১৭॥

—সমস্ত কর্ম্মফলের (সাধনেরও) মূল নরদেহ সুদুর্ল্লভ (নিজের চেষ্টাতে কেহ পাইতে পারে না), অথচ যদৃচ্ছাক্রমে ভগবৎকৃপায় সুলভ হয়। (সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে) ইহা হইতেছে সুগঠিত নৌকার তুল্য। এই নরদেহরূপ তরণীতে যাদ গুরুদেবকে কর্ণধাররূপে বরণ করা হয়, তাহা হইলে আমার (শ্রীকৃষ্ণের) আনুকূল্যরূপ পবনের দ্বারা প্রেরিত হইয়া ইহা সংসারসমুদ্রের অপর তীরে পৌঁছিতে পারে। এত সুযোগ থাকা সত্ত্বেও যে লোক ভবসমুদ্র উত্তীর্ণ হইতে পারে না, সে আত্মঘাতী।"

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের প্রতিও পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের যে অশেষ করুণা, তৎকর্ত্তৃক বেদাদি-শাস্ত্রের প্রকটন হইতেই তাহা জানা যায়। অনাদি কাল হইতেই তাহাদের জন্য তিনি তাঁহার নিশ্বাসরূপে বেদাদি শাস্ত্র প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন। "অস্য মহতো ভূতস্য নিশ্বসিতমেতদ্ যদ্ ঋগ্বেদো যজুর্ব্বেদঃ সামবেদোঽথর্ব্বাঙ্গিরস ইতিহাসঃ পুরাণম্॥ মৈত্রেয়ী উপনিষৎ॥ ৬।৩২॥" উদ্দেশ্য—যেন বেদাদিশাস্ত্রের আলোচনা করিয়া, অনাদিকাল হইতে ভগবদ্‌বিষয়ে অজ্ঞ মায়ামুগ্ধ সংসারী লোক

তাঁহার বিষয়েজ্ঞান লাভ করিয়া সংসার-দুঃখ হইতে অব্যাহতি লাভ করিয়া তাঁহার অভয় চরণে আশ্রয় লাভ করিতে পারে। ইহাতেও যেন তাঁহার জীব-উদ্ধারের জন্য উৎকণ্ঠা প্রশমিত হয় না। তাই তিনি যুগে-যুগে, মন্বন্তরে-মন্বন্তরে, যুগাবতার-মন্বন্তরাবতারাদিরূপে অবতীর্ণ হইয়া জীবের উদ্ধারের উপায় জানাইয়া থাকেন ; আবার স্বয়ংরূপে অবতীর্ণ হইয়াও তাঁহাকে পাওয়ার উপায়ের কথা বলিয়া থাকেন। যেমন, গত দ্বাপরে অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া জগতের জীবকে উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্‌যাজী মাং নমস্কুরু।
মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥
সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা ॥ গীতা ১৮।৬৫-৬৬"

কিন্তু এইরূপ উপদেশ দিয়াও যেন তিনি তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন না। "এই উপদেশের অনুসরণ করিলে সাধক শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম লাভ করিতে পারেন ; প্রেম লাভ করিলেই শ্রীকৃষ্ণকে পাইতে পারেন। কিন্তু কয়জন লোকই বা উপদেশের অনুসরণ করিবে ? যদি প্রেমলাভের উপায়-মাত্র না বলিয়া প্রেমই দেওয়া যায়, তাহা হইলে সকল জীবই কৃতার্থতা লাভ করিতে পারে।" এ-সমস্ত ভাবিয়াই যে পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ গত দ্বাপরে ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন—

"অহমেব ক্বচিদ্ ব্রহ্মন্ সন্ন্যাসাশ্রমমাশ্রিতঃ।
হরিভক্তিং গ্রাহয়ামি কলৌ পাপহতান্নরান্॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।৩।১৫-শ্লোকধৃত উপপুরাণ-বচন॥

—হে ব্রহ্মন্ ব্যাসদেব! কোনও কোনও কলিযুগে স্বয়ং আমিই সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করিয়া পাপহত মনুষ্যদিগকেও হরিভক্তি গ্রহণ করাইয়া থাকি।"

হরিভক্তি—হরিবিষয়ক-প্রেমভক্তি—প্রেম।

পাপহত লোকদিগকেও প্রেমদানের কথাতেই নির্ব্বিচারে আপামর সাধারণকে প্রেমদানই সূচিত হইতেছে

তিনি যে আপামর-সাধারণকে প্রেমভক্তি দিয়া থাকেন, শ্রুতি হইতেই তাহা জানা যায়। কিন্তু তিনি তাহা নির্ব্বিচারে দান করেন—শ্যাম-কৃষ্ণরূপে নহে, পরন্তু রুক্মবর্ণ—গৌর—কৃষ্ণরূপে। তাঁহার এই গৌর-কৃষ্ণরূপের দর্শনমাত্রেই লোকের পাপ-পুণ্যাদি সমস্ত কর্ম্মফল বিধৌত হইয়া যায়, নিরঞ্জন হইয়া লোক প্রেমভক্তি লাভ করিয়া থাকে।

"যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্।
তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি॥

—মুণ্ডকোপনিষৎ ॥ ৩।১।৩ ॥

(১।১।১৯১-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)

এত করুণা যাঁহার, লোকনিস্তারের জন্য এত ব্যাকুলতা যাঁহার, তাঁহা অপেক্ষা আর কাহার মধ্যে ভজনীয় গুণের অধিক বিকাশ থাকিতে পারে ?

এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—

"অকামঃ সর্ব্বকামো বা মোক্ষকাম উদারধীঃ ॥
তীব্রেণ ভক্তিযোগেন যজেত পুরুষং পরম্ ॥ শ্রীভা, ২।৩।১০ ॥

—অকাম (স্বসুখ-বাসনাদিশূন্য একান্ত ভক্ত), কিম্বা ধনজনাদি-সর্ব্বকাম কর্ম্মী, অথবা মোক্ষকামী—যিনিই হউন না কেন, তিনি যদি উদারবুদ্ধি (সুবুদ্ধি—নিরপেক্ষভাবে বিচার করিতে সমর্থ) হয়েন, তাহা হইলে তীব্র ভক্তিযোগের সহিত পর-পুরুষ (পরব্রহ্ম স্বয়ং) ভগবান্‌কেই ভজন করিবেন।"

"ভুক্তি-মুক্তি-সিদ্ধিকামী সুবুদ্ধি যদি হয়।
গাঢ় ভক্তিযোগে তবে কৃষ্ণেরে ভজয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।২৩ ॥"

ভজনীয় গুণের মধ্যে তুইটী সর্ব্বপ্রধান, সর্ব্বাধিকরূপে সাধকের চিত্তাকর্ষক—মাধুর্য্য এবং করুণা। এই তুইটী গুণেরই সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে। তাঁহার অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য অন্য-সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের এবং তাঁহাদের কান্তাশক্তি লক্ষ্মীগণের চিত্তকেও আকৃষ্ট করে, এমন কি তাঁহার নিজের চিত্তকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে। জীবনিস্তারেয় জন্য তাঁহার করুণা তাঁহার প্রাণ-বিনাশোদ্যতা পূতনাকে পর্য্যন্ত ধাত্রীগতি দিয়াছে এবং আপামর-সাধারণকে নির্ব্বিচারে প্রেমভক্তি দানের জন্যও তাঁহাকে প্ররোচিত করিয়া থাকে এবং তাহা দান করাইয়াও থাকে। তাঁহাতেই ভজনীয় গুণের সর্ব্বাতিশায়ী উৎকর্ষ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

সাধনের অধিকার ও সাধকভেদ

২১। স্বরূপগত অধিকার

ক। জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার

ভগবৎ-প্রাপ্তির, বা ভগবৎ-সেবাপ্রাপ্তির জন্যই সাধন। ভগবৎ-প্রাপ্তিতে, বা ভগবৎ-সেবা-প্রাপ্তিতে যাঁহার স্বরূপগত অধিকার আছে, সাধনেও তাঁহার স্বরূপগত অধিকার থাকিবে।

জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের শক্তি, শ্রীকৃষ্ণের শক্তিরূপ অংশ এবং তজ্জন্য শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বা নিত্যসেবক। শক্তিমানের সেবায় শক্তির, অংশীর সেবায় অংশের এবং সেব্য প্রভুর সেবায় সেবকের স্বরূপগত অধিকার স্বীকার করিতেই হইবে। নচেৎ শক্তিত্ব, অংশত্ব এবং সেবকত্বই অস্বীকৃত বা অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

অনাদি-ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাবশতঃ, ভগবদ্‌বিষয়ে অনাদি অজ্ঞতাবশতঃ, সংসারী জীব ভগবানের সহিত তাহার এই স্বরূপানুবন্ধী সেব্যসেবকত্ব-সম্বন্ধের কথা জানে না ; কিন্তু জানে না বলিয়াই তাহার সেই সম্বন্ধ লুপ্ত হইয়া যাইতে পারে না ; কেননা, এই সম্বন্ধটী হইতেছে নিত্য, অনাদিসিদ্ধ। কৃষ্ণশক্তি-রূপে, কৃষ্ণাংশরূপে এবং কৃষ্ণদাসরূপে জীব নিত্য বলিয়া পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাহার সম্বন্ধও নিত্য; সুতরাং কোনও অবস্থাতেই এই সম্বন্ধ বিলুপ্ত হইতে পারে না। সংসারী জীবের পক্ষে এই সম্বন্ধের জ্ঞান থাকে প্রচ্ছন্ন, দুর্ব্বাসনাদির আবরণে আবৃত। এই আবরণ দূরীকরণের জন্যই সাধন-ভজন। আবরণ দূরীভূত হইলে সেই প্রচ্ছন্ন জ্ঞান স্ফূর্ত্তি লাভ করিতে পারে। ভগবানের সহিত জীবের সেব্যসেবক-সম্বন্ধ নিত্য এবং অবিচ্ছেদ্য বলিয়া ভগবৎসেবাও হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। এই স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়ার চেষ্টাই হইতেছে সাধন। ভগবৎসেবায় জীবের স্বরূপগত অধিকার আছে বলিয়া সেই অধিকারের অনুরূপ সেবাতে নিজেকে নিয়োজিত করার চেষ্টাতেও জীবের স্বরূপগত অধিকার থাকিবেই। তাহা স্বীকার না করিলে মোক্ষোপদেশক শাস্ত্রই ব্যর্থ হইয়া পড়ে।

এইরূপে জানা গেল—জীবমাত্রেরই সাধনে স্বরূপগত অধিকার আছে। অগ্নিকে যেমন তাহার স্বরূপগত-দাহিকাশক্তি হইতে কেহ বঞ্চিত করিতে পারে না, তেমনি স্বরূপতঃ কৃষ্ণের নিত্যদাস জীবকেও কেহ তাহার সাধনের স্বরূপগত অধিকার হইতে বঞ্চিত করিতে পারে না। বঞ্চিত করিতে পারে—ইহা স্বীকার করিতে গেলে স্বরূপগত ধর্ম্মের ব্যত্যয়ও সম্ভবপর বলিয়া স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু বস্তুর স্বরূপগত ধর্ম্মের ব্যত্যয় কিছুতেই হইতে পারে না।

খ। দৈহিক যোগ্যত্বের বিচারে একমাত্র মানুষেরই অধিকার

সাধনবিষয়ে জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার থাকিলেও মানুষ্যব্যতীত অন্যজীবের দৈহিক অধিকার থাকিতে পারেনা। কেননা, সাধন করিতে হয় শাস্ত্রের আনুগত্যে, অথবা অপরের মুখে শ্রুত শাস্ত্রানুগত উপদেশের আনুগত্যে। মনুষ্যেতর জীব—পশুপক্ষীপ্রভৃতি—শাস্ত্রালোচনাও করিতে পারেনা, অপরের উপদেশ গ্রহণ বা অনুসরণ করার যোগ্যতাও তাহাদের নাই। একমাত্র মানুষই শাস্ত্রালোচনা করিতে পারে, কিম্বা অপরের মুখে শাস্ত্রবিহিত উপদেশ শুনিয়া তাহার মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারে এবং সেই উপদেশের অনুসরণও করিতে পারে।

অতএব, দৈহিক-যোগ্যতার বিচারে একমাত্র মানুষেরই সাধন-ভজনে অধিকার উপপন্ন হয়। নরদেহই হইতেছে ভজনের মূল। "নৃদেহমাদ্যম্॥ শ্রীভা, ১১।২০।১৭॥"

গ। ভগবদ্‌ভজনে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার

ভগবদ্‌ভজনে জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে ;

"শাস্ত্রতঃ শ্রূয়তে ভক্তৌ নৃমাত্রস্যাধিকারিতা।
সর্ব্বাধিকারিতাং মাঘস্নানস্য ব্রুবতা যতঃ ;।
দৃষ্টান্তিতা বশিষ্ঠেন হরিভক্তি র্নৃপং প্রতি।
যথা পাদ্মে॥ সর্ব্বেঽধিকারিণো হ্যত্র হরিভক্তৌ যথা নৃপ॥
কাশীখণ্ডেচ॥ অন্ত্যজা অপি তদ্রাষ্ট্রে শঙ্খচক্রাঙ্কধারিণঃ।
সংপ্রাপ্য বৈষ্ণবীং দীক্ষাং দীক্ষিতা ইব সংবভুরিতি॥ ভ, র, সি, ॥ ১।২।৩৩-৩৪॥

—শাস্ত্র হইতে জানা যায়, ভক্তিবিষয়ে মনুষ্যমাত্রেরই অধিকার আছে। যেহেতু, মহামুনি বশিষ্ঠ হরিভক্তির দৃষ্টান্ত প্রদর্শনপূর্ব্বকই, মাঘস্নানে যে সকল বর্ণেরই সমান অধিকার আছে, মহারাজ দিলীপের নিকটে তাহা বলিয়াছেন।

পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়, বশিষ্ঠ দিলীপকে বলিয়াছেন—'হে নৃপ! হরিভক্তিতে (অর্থাৎ ভক্তিমার্গের সাধনে) যেমন সকলেরই অধিকার আছে, (তদ্রূপ মাঘস্নানেও সকলেরই অধিকার আছে)।

কাশীখণ্ডে দেখিতে পাওয়া যায়—'সেই রাষ্ট্রে অন্ত্যজেরাও বৈষ্ণবী দীক্ষায় দীক্ষিত হইয়া শঙ্খচক্রাদিচিহ্ন ধারণপূর্ব্বক যাজ্ঞিকের ন্যায় শোভা পাইয়া থাকে'।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—

"নীচ জাতি নহে কৃষ্ণভজনে অযোগ্য। সৎকুল বিপ্র নহে ভজনের যোগ্য॥
যেই ভজে সে-ই বড়, অভক্ত হীন ছার। কৃষ্ণভজনে নাহি জাতি-কুলাদি-বিচার॥
শ্রীচৈ, চ, ৩।৪।৬২-৬৩॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেও জানা যায়—

"বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্‌।
মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থ-প্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ শ্রীভা, ৭।৯।১০॥

—(শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে প্রহ্লাদ বলিয়াছেন) পদ্মনাভ শ্রীভগবচ্চরণারবিন্দ-বিমুখ দ্বাদশগুণান্বিত (ধর্ম্ম, সত্য, দম, তপঃ, মাৎসর্য্যাভাব, লজ্জা, তিতিক্ষা, অসূয়াহীনতা, যজ্ঞ, দান, ধৃতি বা জিহ্বোপস্থের বেগ-সম্বরণ এবং শ্রুত বা বেদাধ্যয়ন—এই দ্বাদশ-গুণান্বিত) ব্রাহ্মণ অপেক্ষা—যিনি ভগবচ্চরণে মন, বাক্য, চেষ্টা, অর্থ ও প্রাণ সমর্পণ করিয়াছেন—এরূপ শ্বপচকেও আমি শ্রেষ্ঠ মনে করি; কেননা, এতাদৃশ শ্বপচও নিজেকে এবং স্বীয় কুলকে পবিত্র করিতে পারেন; কিন্তু অতিশয় সম্মানিত সেই ব্রাহ্মণ তাহা পারেন না।"

এ-স্থলে শ্বপচেরও ভগবদ্‌ভজনের কথা জানা গেল। (শ্বপচ—কুক্কুরমাংসভোজী নীচজাতিবিশেষ)।

"কিরাতহূণান্ধ্রপুলিন্দপুক্কসা আভীরশুহ্মা যবনাঃ খশাদয়ঃ।
যেহন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াশ্রয়াঃ শুধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥ শ্রীভা, ২।৪।১৮॥

—(শ্রীশুকদেব বলিতেছেন) যাঁহার ভক্তবৃন্দের চরণ আশ্রয় করিলে কিরাত, হূণ, অন্ধ্র, পুলিন্দ, পুক্কস, আভীর, শুহ্ম, যবন এবং খশাদি এবং অন্য পাপযোনিতে জাত লোকগণও বিশুদ্ধতা লাভ করিয়া থাকে, সেই প্রভাবশালী ভগবান্‌কে নমস্কার করি।"

এ-স্থলেও কিরাতাদির ভগবদ্‌ভজনের কথা জানা গেল।

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেও জানা যায়,শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন—

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেহপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রাস্তেহপি যান্তি পরাং গতিম্‌॥ ৯।৩২॥

—হে পার্থ! যাহারা পাপযোনি (হীনকুলজাত), যাহারা স্ত্রীলোক, যাহারা বৈশ্য, যাহারা শূদ্র, আমার সেবা করিয়া তাহারাও পরা গতি লাভ করিতে পারে।"

এ-স্থলেও জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষ স্ত্রী-শূদ্রাদির ভগবদ্‌ভজনের কথা জানা গেল।

ভগবদ্‌ভজনে জীবমাত্রেরই স্বরূপগত অধিকার আছে বলিয়াই জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই ভগবদ্‌ভজনের কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে।

কর্ম্মমার্গে অবশ্য অধিকারভেদ স্বীকৃত হয়। বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্রাদির জন্য ভিন্ন ভিন্ন রকমের কর্ত্তব্য উপদিষ্ট হইয়াছে। ব্রাহ্মণকন্যা বা ব্রাহ্মণপত্নীও ব্রাহ্মণোচিত সকল কর্ম্মের অধিকারিণী নহেন। কিন্তু কর্ত্তব্যের ভেদ থাকিলেও বোধ হয় ফলভেদ নাই। অর্জ্জুন ছিলেন ক্ষত্রিয়; যুদ্ধ ছিল তাঁহার স্বধর্ম্ম—বর্ণোচিত ধর্ম্ম। গীতা হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে যুদ্ধ করিবার উপদেশ দিয়া বলিয়াছেন—যুদ্ধে জয় লাভ করিতে পারিলে রাজত্ব-সুখ এবং যুদ্ধে নিহত

হইলে স্বর্গসুখ লাভ হইবে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-পালনের ফলই হইতেছে ইহকালের সুখ-সম্পদ এবং পরকালে স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগ।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের লক্ষ্য যে সুখ-সম্পদ, তাহা হইতেছে জড়, অনিত্য। তাহা ভোগও করে লোকের জড় অনিত্য দেহ। দেহী জীবাত্মা কিন্তু চিদ্রূপ, নিত্য; সুতরাং জড় অনিত্য সুখসম্পদের সহিত, কিম্বা তাহার সাধন বর্ণাশ্রমধর্ম্মাদির সহিত জীবাত্মার কোনওরূপ স্বরূপানুবন্ধী সম্বন্ধ থাকিতে পারেনা। জড় অনিত্য বস্তুর সহিত জড় অনিত্য বস্তুরই সজাতীয় সম্বন্ধ থাকিতে পারে। জড়দেহের অবস্থাভেদে জড়-সাধনেরও ভেদ থাকিতে পারে। কিন্তু ভগবদ্‌ভজন জীবের স্বরূপানুবন্ধী কর্ত্তব্য বলিয়া দেহসম্বন্ধীয় কোনওরূপ ভেদবিচার তাহাতে থাকিতে পারেনা। ব্রাহ্মণত্বাদি বা স্ত্রীপুংস্ত্বাদি হইতেছে দেহের, দেহীর নহে।

বর্ণাশ্রমধর্ম্মে ব্রাহ্মণ-কন্যার বা ব্রাহ্মণ-পত্নীর সর্ব্বতোভাবে ব্রাহ্মণোচিত অধিকার না থাকিলেও ব্রহ্মজ্ঞান বা ভগবদ্‌ভজনে যে সেই অধিকার আছে, শ্রুতিপ্রসিদ্ধা গার্গী, মৈত্রেয়ী প্রভৃতিই তাহার প্রমাণ।

২২। শ্রদ্ধাভেদে অধিকারভেদ

জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে, বা স্ত্রীপুরুষ-নির্ব্বিশেষে, মানুষমাত্রেরই ভগদ্‌ভজনে স্বরূপগত অধিকার থাকিলেও সকল লোকের চিত্তের অবস্থা সমান নহে বলিয়া সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার, বা প্রবৃত্ত হইলে অগ্রসর হওয়ার, যোগ্যতাও সকলের সমান হইতে পারেনা। কেননা, সাধকের পক্ষে ভজনীয়-বিষয়ে মনঃসংযোগ একান্ত আবশ্যক। চিত্তের অবস্থা অনুসারে মনঃসংযোগ-যোগ্যতাও ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন রূপ হইয়া থাকে। মায়ামলিনতার, বা ইন্দ্রিয়-ভোগ-বাসনার আবরণ যাহার মধ্যে যত বেশী, ভজনীয়-বিষয়ে তাহার মনঃসংযোগের যোগ্যতাও হইবে তত কম।

ক। শ্রদ্ধা। শ্রদ্ধাই সাধন-ভজনের মূল

জীবের স্বরূপগত অবস্থা, তাহা হইতে সংসারগত অবস্থার বৈলক্ষণ্য এবং ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানাদি—একমাত্র শাস্ত্র হইতেই, অথবা শাস্ত্রজ্ঞ ব্যক্তির নিকট হইতেই, মায়াবদ্ধ সংসারী জীব জানিতে পারে। অনাদি ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ জীবের পক্ষে আপনা হইতে এ-সকল বিষয়ে জ্ঞানলাভ অসম্ভব।

“অনাদ্যবিদ্যাযুক্তস্য পুরুষস্যাত্মবেদনম্।
স্বতো ন সম্ভবাদন্যস্তত্ত্বজ্ঞো জ্ঞানদো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ১১।২২।১০॥

—(উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) অনাদিকাল হইতে অবিদ্যাযুক্ত জীবের পক্ষে আপনা-আপনি তত্ত্বজ্ঞান অসম্ভব বলিয়া অন্য তত্ত্বজ্ঞই তাহার জ্ঞানদাতা হইয়া থাকেন।”

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে একথাই বলিয়াছেন।

"মায়ামুগ্ধ জীবের নাহি স্বতঃ কৃষ্ণজ্ঞান। জীবের কৃপায় কৈল কৃষ্ণ বেদ-পুরাণ॥
শাস্ত্র-গুরু-আত্মারূপে আপনা জানান। 'কৃষ্ণ মোর প্রভু ত্রাতা' জীবের হয় জ্ঞান॥
শ্রীচৈ, চ ২।২০।১০৭-৮॥"

চিত্তের অবস্থাভেদে ভিন্ন ভিন্ন লোকের চিত্তে শাস্ত্রবাক্যের প্রভাবও ভিন্ন ভিন্ন রূপে অনুভূত হয়।

যাঁহারা দেহসুখৈকসর্ব্বস্ব, এই জগতের অতিরিক্ত কিছু আছে বলিয়াই তাঁহারা বিশ্বাস করিতে পারেন না। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যেও তাঁহাদের কোনওরূপ বিশ্বাস জন্মেনা, শাস্ত্রকথিত উপায় অবলম্বন করিয়া সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হওয়ার জন্যও তাঁহাদের ইচ্ছা জন্মেনা।

শাস্ত্রবাক্যে যাঁহাদের বিশ্বাস জন্মে, তাঁহাদের বিশ্বাসেরও অনেক রকমভেদ থাকিতে পারে।

শাস্ত্রবাক্য মিথ্যা নহে, এইরূপ জ্ঞান যাঁহাদের আছে, তাঁহাদের মধ্যেও এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহাদের ভোগবাসনা অত্যন্ত বলবতী। শাস্ত্র-বাক্যে বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও তাঁহারা নিজেদিগকে ভোগবাসনার স্রোতেই ঢালিয়া দেন, তাঁহাদের শাস্ত্রবিশ্বাস কেবল মুখের কথাতেই পর্য্যবসিত হয়।

তাঁহাদের মধ্যে আবার এমন এক শ্রেণীর লোক আছেন, যাঁহারা শাস্ত্রীয় পন্থার অনুসরণে ইহকালের এবং পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখ লাভের জন্য চেষ্টিত হইয়া থাকেন। ইঁহারা কর্ম্মী।

আবার এমন লোকও আছেন, যাঁহারা অনিত্য বলিয়া স্বর্গাদি-লোকের সুখও চাহেন না, পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তিই যাঁহাদের কাম্য।

এমনও আবার আছেন, যাঁহারা মোক্ষও চাহেন না, চাহেন মাত্র ভগবানের প্রেমসেবা।

স্বর্গাদি-লোককামী, কি মোক্ষকামী, অথবা প্রেমসেবাকামী—ইঁহাদের সকলেরই শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস আছে এবং সেই বিশ্বাসের প্রাধান্যও তাঁহাদের মধ্যে দৃষ্ট হয়। এজন্য তাঁহারা নিজ নিজ অভিপ্রায় অনুসারে শাস্ত্রবিহিত উপায়ে সাধন-ভজনে প্রবৃত্ত হইয়া থাকেন।

এইরূপ **শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসকেই শ্রদ্ধা বলে।**

সাধন-ভজনের প্রয়োজনীয়তার কথা জানা যায়, একমাত্র শাস্ত্র হইতে। সুতরাং শাস্ত্রবাক্যে **বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধাই হইতেছে সাধন-ভজনের মূল।**

শ্রীমদ্‌ভগবদগীতাতেও শ্রদ্ধার অপরিহার্য্যতার কথা বলা হইয়াছে।

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি॥ গীতা॥ ৪।৩৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন) যিনি (শাস্ত্রবাক্যে, গুরুবাক্যে) শ্রদ্ধাবান্

(বিশ্বাসযুক্ত), তন্নিষ্ঠ (শাস্ত্রবাক্যে, গুরুবাক্যে নিষ্ঠাবান্) এবং জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞান লাভ করিয়া অচিরে পরাশান্তি লাভ করিতে পারেন।"

"অজ্ঞশ্চাশ্রদ্দধানশ্চ সংশয়াত্মা বিনশ্যতি।
নায়ং লোকোহস্তি ন পরো ন সুখং সংশয়াত্মনঃ॥ গীতা॥ ৪।১০॥

—কিন্তু যিনি অজ্ঞান ও শ্রদ্ধাবিহীন, সংশয়শীল, তিনি বিনাশপ্রাপ্ত হয়েন। সংশয়চিত্ত লোকের ইহলোকও নাই, পরলোকও নাই, সুখও নাই।"

খ। শ্রদ্ধার মূল—সাধুসঙ্গ

অনাদি-বহির্ম্মুখ জীবের শ্রদ্ধা বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসও আপনা-আপনি জন্মিতে পারে না। মায়ার প্রভাবে তাহার চিত্ত সর্ব্বদা ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর অন্বেষণে বাহিরের দিকেই ধাবিত হয়। বহির্ম্মুখী চিত্তগতিকে শাস্ত্রমুখী করিতে হইলে একটী বলবতী শক্তির প্রয়োজন। সাধুসঙ্গই হইতেছে এই বলবতী শক্তির উৎস।

রেলগাড়ীর ইঞ্জিন রেল-রাস্তার উপর দিয়া কেবল এক দিকেই চলিতে পারে। কোনও কোনও ষ্টেশনে তাহার গতিমুখ ফিরাইবার বন্দোবস্ত আছে। সেই ষ্টেশনে না গেলে ইঞ্জিনের গতিমুখ ফিরান যায় না। ভোগসুখমত্ত সংসারী জীবের চিত্তও তেমনি কেবল ভোগসুখের দিকেই অনবরত গতিশীল। তাহার গতি অন্য দিকে ফিরাইতে হইলে সাধুসঙ্গের প্রয়োজন। একমাত্র সাধুসঙ্গের প্রভাবেই মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্তের গতি শাস্ত্রাভিমুখী বা ভজনোন্মুখী হইতে পারে।

"সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ।
তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধারতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ শ্রীভা, ৩।২৫।২৫॥

—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) সাধুদিগের সহিত প্রকৃষ্টরূপে সঙ্গ হইলে আমার বীর্য্যপ্রকাশক কথা উপস্থিত হয়। সেই কথা চিত্ত ও কর্ণের তৃপ্তিদায়ক। প্রীতিপূর্ব্বক সেই কথার সেবা করিলে অপবর্গবর্ত্মস্বরূপ আমাতে ক্রমশঃ শ্রদ্ধা, রতি ও ভক্তি জন্মিতে পারে।"

"প্রকৃষ্টসঙ্গ" হইতেছে সাধুর নিকটে যাইয়া তাঁহার মুখনিঃসৃত ভগবৎ-কথাদির শ্রবণাদি, তাঁহার আচরণাদিতে মনোনিবেশ, সম্ভব হইলে তাঁহার কিঞ্চিৎ পরিচর্য্যাদি। সাধুমুখ-নির্গলিত ভগবৎ-কথাদির একটা অদ্ভুত চিত্তাকর্ষিণী শক্তি আছে। তাহার প্রভাবে লোকের চিত্ত ক্রমশঃ সেই দিকে আকৃষ্ট হইতে পারে, শাস্ত্রবাক্যাদিতে লোকের শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। সাধুর আচরণাদি দর্শনেরও তাদৃশ ফল। সাধুর পরিচর্য্যাদিতে, সাধুর উপদেশাদি শ্রবণের ফলে ও সাধুর কৃপায় শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে।

এজন্যই শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ শ্রীভা, ১১।২৬।২৬॥

—অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুর সঙ্গ করিবেন। সাধুগণই উপদেশ-বাক্য দ্বারা তাঁহার মনের বিশেষ আসক্তি (সংসারাসক্তি) ছেদন করিয়া থাকেন।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তীর্থদেবাদিসঙ্গাদপি সৎসঙ্গঃ শ্রেয়ান্ ইতি দর্শয়তি।—তীর্থের সঙ্গ বা দেবতাদির সঙ্গ অপেক্ষাও যে সৎসঙ্গ শ্রেষ্ঠ, তাহাই এই শ্লোকে প্রদর্শিত হইয়াছে।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ টীকায় লিখিয়াছেন—"অসৎসঙ্গত্যাগেঽপি ন কিঞ্চিৎ স্যাৎ, কিন্তু সৎসঙ্গেনৈবেত্যাহ তত ইতি।—শ্লোকস্থ 'ততঃ'-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, কেবল অসৎসঙ্গ ত্যাগেই বিশেষ কিছু হইবে না, সৎসঙ্গও প্রয়োজন—অর্থাৎ অসৎসঙ্গ তো ত্যাগ করিতেই হইবে ; কিন্তু কেবল তাহাতেই চিত্তের দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইবে না ; সৎসঙ্গও করিবে, সাধুর মুখে উপদেশাদি শুনিবে ; তাহাতেই দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইতে পারে।"

দুর্ব্বাসনা (ইন্দ্রিয়ভোগবাসনা) তরল হইলেই শাস্ত্রবাক্যে বা সাধুবাক্যে বিশ্বাস জন্মিবার সম্ভাবনা।

এইরূপে দেখা গেল—সাধুসঙ্গের, সাধুমুখে ভগবৎ-কথাদি শ্রবণের, সাধুর উপদেশাদি শ্রবণের ফলেই মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্তে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে।

গ। প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষীর শ্রদ্ধা

প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষীর শ্রদ্ধাসম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—

'শ্রদ্ধা'-শব্দে বিশ্বাস কহে সুদৃঢ় নিশ্চয়।
কৃষ্ণভক্তি কৈলে—সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়॥ শ্রীচৈ চ, ২।২২।৩৭॥

কৃষ্ণভক্তি করিলেই সমস্ত কর্ম্ম করার ফল পাওয়া যায়, স্বতন্ত্রভাবে আর কোনও কর্ম্ম করার প্রয়োজন হয়না—এই শাস্ত্রবাক্যে যে সুদৃঢ়, নিশ্চিত—অচল, অটল—বিশ্বাস, তাহার নামই শ্রদ্ধা।

কৃষ্ণভক্তি করিলেই যে "সর্ব্বকর্ম্ম কৃত হয়," তাহার সমর্থক শাস্ত্রবাক্যও মহাপ্রভু বলিয়াছেন।

"যথা তরোর্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা॥ শ্রীভা ৪।৩১।১৪॥

—বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে যেমন তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা সমস্তই তৃপ্তিলাভ করিয়া থাকে, প্রাণকে বাঁচাইয়া রাখিলেই যেমন সমস্ত ইন্দ্রিয় বাঁচিয়া থাকে, তদ্রূপ এক অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই সমস্তের পূজা হইয়া যায়।"

ঘ। সগুণা ও নির্গুণা শ্রদ্ধা

শ্রদ্ধা-শব্দের একটী আভিধানিক অর্থ—আদর (শব্দকল্পদ্রুম)। আদর বলিতে প্রিয়ত্ববুদ্ধি, বা পূজ্যত্ববুদ্ধিকেও বুঝায়। যেখানে আদর, প্রিয়ত্ববুদ্ধি, বা পূজ্যত্ববুদ্ধি, সেখানে বিশ্বাসও স্বাভাবিক। এজন্য শ্রদ্ধা-শব্দের অর্থ বিশ্বাসও হইতে পারে। বাস্তবিক, বিশ্বাস বা আদরই শ্রদ্ধা-শব্দের সাধারণ

অর্থ। যাঁহার শাস্ত্রবাক্যের প্রতি আদর আছে, শাস্ত্রবাক্যে তাঁহার বিশ্বাসও জন্মে। পূর্ব্বে (৫।২২ ক অনুচ্ছেদে) শাস্ত্রবাক্যের প্রতি বিশ্বাসকে শ্রদ্ধা বলা হইয়াছে।

কিন্তু যাঁহারা শাস্ত্র জানেন না, আলস্যাদিবশতঃ শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য কৌতুহল যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের মধ্যেও বস্তু-বিশেষের প্রতি শ্রদ্ধা বা বিশ্বাস দেখা যায়। শাস্ত্রজ্ঞানহীন ব্যক্তিরও পিতামাতার প্রতি, বা দেবদ্বিজের প্রতি শ্রদ্ধা দৃষ্ট হয়। পূর্ব্বজন্মার্জ্জিত কর্ম্মজাতসংস্কার হইতেই এই শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, মান্য বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদিগের আচরণ দর্শন হইতেও ইহা জন্মিতে পারে; আবার কুলপরম্পরাপ্রাপ্ত রীতি হইতেও ইহা জন্মিতে পারে। এইরূপ শ্রদ্ধার মধ্যে কোনও কোনও স্থলে গতানুগতিক ভাবের শ্রদ্ধাও থাকিতে পারে। গতানুগতিক ভাবের শ্রদ্ধার মূল্য বিশেষ কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। অনেক স্থলে ইহা কেবল লোকাচারের বা দেশাচারের যান্ত্রিক অনুসরণমাত্র।

(১) **গুণময়ী বা সগুণা শ্রদ্ধা**

পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কারজাত শ্রদ্ধা বাস্তবিক হৃদয় হইতেই উত্থিত হয়। পূর্ব্বজন্মে যিনি সত্ত্বগুণ-প্রধান কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহার চিত্তে সত্ত্বগুণই প্রধান্য লাভ করিবে এবং তাঁহার কর্ম্ম-সংস্কারজাত শ্রদ্ধাও হইবে সাত্ত্বিকী। সত্ত্বগুণই তাঁহার শ্রদ্ধাকে নিয়ন্ত্রিত করিবে। এইরূপে, পূর্ব্বজন্মে যাঁহারা রজোগুণ-প্রধান বা তমোগুণ প্রধান কর্ম্ম করিয়াছেন, তাঁহাদের কর্ম্মসংস্কারজাত শ্রদ্ধাও হইবে রাজসী বা তামসী।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে এই তিন রকমের শ্রদ্ধার কথা বলিয়া গিয়াছেন। শ্রীমদ্ ভগবদ্গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধার কথা বলিয়াছেন এবং শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ পূর্ব্বক যাঁহারা স্ব স্ব ইচ্ছা অনুসারে চলিয়া থাকেন, তাঁহারা যে শান্তি বা পরাগতি লাভ করিতে পারেন না, তাহাও বলিয়াছেন। শ্রীকৃষ্ণের উপদেশ শুনিয়া অর্জ্জুন জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন— যাঁহারা শাস্ত্র জানেন না এবং শাস্ত্রজ্ঞান লাভের জন্য চেষ্টাও যাঁহাদের নাই, তাঁহাদের শ্রদ্ধা কিরূপ ?

এই জিজ্ঞাসার উত্তরে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছিলেন,

"ত্রিবিধা ভবতি শ্রদ্ধা দেহিনাং সা স্বভাবজা।
সাত্ত্বিকী রাজসী চৈব তামসী চেতি তাং শৃণু॥ গীতা ॥ ১৭।২॥

—দেহীদিগের স্বভাবজ (পূর্ব্বকর্ম্ম-সংস্কারজাত) শ্রদ্ধা তিন রকমের—সাত্ত্বিকী, রাজসী এবং তামসী তুমি এই ত্রিবিধা শ্রদ্ধার কথা শুন।"

দেহীদিগের মধ্যে উল্লিখিত তিন রকমের শ্রদ্ধার হেতু কি, শ্রীকৃষ্ণ তাহাও বলিয়াছেন।

"সত্ত্বানুরূপা সর্ব্বস্য শ্রদ্ধা ভবতি ভারত।
শ্রদ্ধাময়োঽয়ং পুরুষো যো যচ্ছ্রদ্ধঃ স এব সঃ॥ গীতা ॥১৭।৩॥

—হে ভারত! সকলেরই শ্রদ্ধা হয় সত্ত্বের (অর্থাৎ অন্তঃকরণের) অনুরূপ (অর্থাৎ যাঁহার যেরূপ অন্তঃকরণ, তাঁহার শ্রদ্ধাও তদ্রূপ ; যাঁহার অন্তঃকরণ স্বত্ত্বগুণপ্রধান, তাঁহার শ্রদ্ধাও হইবে সত্ত্বগুণ-

প্রধানা বা সাত্ত্বিকী ; ইত্যাদি এজন্য) এই পুরুষ শ্রদ্ধাময় (অর্থাৎ সকলেরই অন্তঃকরণ অনুসারে কোনও না কোনও এক রকমের শ্রদ্ধা আছে)। যিনি (পূর্ব্বজন্মে) যেরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট (ছিলেন), (ইহ জন্মেও) তিনি সেইরূপ শ্রদ্ধাবিশিষ্ট হইয়া থাকেন (অর্থাৎ যেরূপ শ্রদ্ধার সহিত কোনও লোক পূর্ব্ব জন্মে কর্ম্ম করিয়াছেন, ইহ জন্মেও তাঁহার তাদৃশী—কর্ম্মফলজাত সংস্কারের অনুরূপ—শ্রদ্ধা জন্মিয়া থাকে।)"

কাহার মধ্যে কিরূপ শ্রদ্ধা, তাহার কার্য্যাদি দ্বারাই তাহা জানা যায়।

"যজন্তে সাত্ত্বিকা দেবান্ যক্ষরক্ষাংসি রাজসাঃ।
প্রেতান্ ভূতগণাংশ্চান্যে যজন্তে তামসা জনাঃ॥ গীতা ॥ ১৭।৪॥

(স্ব-স্ব-অভীষ্ট লাভের আশায়) সাত্ত্বিক ব্যক্তিগণ (সত্ত্বপ্রকৃতি) দেবগণের পূজা করেন, রাজসিক ব্যক্তিগণ (রজঃপ্রকৃতি) যক্ষ ও রাক্ষসগণের এবং এতদ্ভিন্ন তামসিক ব্যক্তিগণ (তমোগুণবিশিষ্ট) ভূত-প্রেতগণের পূজা করিয়া থাকেন।"

যাঁহার মধ্যে যে গুণের প্রাধান্য, তাঁহার শ্রদ্ধাতেও সেই গুণেরই প্রাধান্য (অর্থাৎ তাঁহার শ্রদ্ধাও তদ্‌গুণময়ী) এবং স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য সেই শ্রদ্ধাদ্বারা চালিত হইয়া তিনি তদ্‌গুণপ্রধান বস্তুরই শরণ গ্রহণ করেন। যাঁহার শ্রদ্ধা সাত্ত্বিকী, সত্ত্বপ্রকৃতি দেবগণেই তাঁহার শ্রদ্ধা বা প্রীতি, যাঁহার শ্রদ্ধা রাজসী, রজঃপ্রকৃতি যক্ষ-রাক্ষসাদিতেই তাঁহার প্রীতি।

গুণপ্রাধান্যভেদে এবং শ্রদ্ধাভেদে অভীষ্টপূরক বস্তুর ভেদ। আবার, শ্রদ্ধাভেদে যেমন লোকের আহার্য্যবস্তুর ভেদ, যজ্ঞ-তপস্যা-দানাদিরও যে তদ্রূপ ভেদ হইয়া থাকে, অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ তাহাও বলিয়াছেন (গীতা সপ্তদশ অধ্যায়ে)।

মায়িক গুণ হইতে উদ্ভূত এবং মায়িক গুণের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত বলিয়া উল্লিখিত তিন প্রকারের শ্রদ্ধাই সগুণা বা গুণময়ী।

এ-স্থলে কেবল শাস্ত্রজ্ঞানহীন লোকদের শ্রদ্ধার কথাই বলা হইল ; তাঁহাদের শ্রদ্ধা সগুণা।

শাস্ত্রজ্ঞানবিশিষ্ট লোকদের শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসরূপা শ্রদ্ধাও যদি গুণময় বস্তুতে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে তাঁহাদের সেই শ্রদ্ধাও হইবে সগুণা ; কেননা, তাহাতে তাঁহাদের চিত্তস্থিত গুণ প্রতিফলিত হয়। এজন্য যাঁহারা নির্গুণা ভক্তিরও যাজন করেন, তাঁহাদের ভক্তিও সগুণা হইতে পারে—গুণানুসারে তামসিকী, রাজসিকী এবং সাত্ত্বিকী ভক্তি নামে অভিহিত হইতে পারে (৫।৫০-ক, খ, গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৭ ॥—আধ্যাত্মতত্ত্ব-বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিকী ; কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, তাহা রাজসী।" এই শ্লোকের দীপিকাদীপনটীকায় "আধ্যাত্মিকী"-শব্দের অর্থ লিখিত হইয়াছে—"বেদান্তশাস্ত্রবিষয়িনী।" ইহাও শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা ; বেদান্ত-শাস্ত্রে বিশ্বাস থাকিলেই সেই শাস্ত্রের চর্চ্চাদি সম্ভব। কর্ম্মানুষ্ঠানে শ্রদ্ধাও শাস্ত্রবাক্যে

বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা ; শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস থাকিলেই শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানজাত ফলের আশায় কর্ম্মানুষ্ঠানে প্রবৃত্তি জন্মে। এই দুই বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসরূপ শ্রদ্ধা হওয়াতেও নির্গুণ-ভগবানে বা ভগবৎসেবায় তাহা প্রয়োজিত হয় না বলিয়া তাহাও সগুণা (সাত্ত্বিকী এবং রাজসী) হইয়াছে।

নির্গুণা শ্রদ্ধা

যাঁহাদের শ্রদ্ধা গুণময় কর্ম্মসংস্কার হইতে উদ্ভূত নহে, নির্গুণ সৎসঙ্গ হইতেই যাঁহাদের শ্রদ্ধার উদ্ভব, ভগবদ্‌গুণ-শ্রবণমাত্রেই গুণাতীত ভগবানের দিকেই যে শ্রদ্ধার প্রবাহ ছুটিতে থাকে, ইহলোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য বা পরলোকের স্বর্গাদিলোকের সুখরূপ কোনও গুণময় বস্তুর প্রতিই যাঁহাদের শ্রদ্ধা ক্ষণকালের জন্যও অগ্রসর হয় না, এমন কি কৈবল্য-মোক্ষের প্রতিও না, কেবলমাত্র নির্গুণ ভগবানেই, ভগবৎসেবাতেই, যাঁহাদের শ্রদ্ধা প্রয়োজিত হয়, তাঁহাদের শ্রদ্ধা হইতেছে নির্গুণা।

সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৭ ॥

—(উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিকী; কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, তাহা রাজসী ; অধর্ম্ম (অ-পরধর্ম্মে) যে শ্রদ্ধা, তাহা তামসী, আমার সেবা-বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা কিন্তু নির্গুণা।”

২৩। শ্রদ্ধার তারতম্য-ভেদে অধিকারিভেদ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, তিনিই সাধন-ভজনে অধিকারী। শ্রদ্ধার, বা শ্রদ্ধার গাঢ়তার, তারতম্য অনুসারে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তিন রকম অধিকারীর কথা বলিয়াছেন – উত্তম, মধ্যম এবং কনিষ্ঠ।

উত্তম অধিকারী

“শাস্ত্রে যুক্তৌ চ নিপুণঃ সর্ব্বথা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ।
প্রৌঢ়শ্রদ্ধোঽধিকারী যঃ স ভক্তাবুত্তমো মতঃ ॥ ভ, র, সি, ১।২।১১॥

– যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে এবং শাস্ত্রানুগত-যুক্তিপ্রদর্শনে নিপুণ, যিনি দৃঢ়নিশ্চয় (অর্থাৎ শাস্ত্রকথিত তত্ত্বাদিসম্বন্ধে এবং সাধন-সম্বন্ধে যিনি সন্দেহলেশশূন্য), এবং যাঁহার শ্রদ্ধা অত্যন্ত গাঢ়, ভক্তিবিষয়ে তিনি **উত্তম অধিকারী**।”

শাস্ত্রযুক্ত্যে সুনিপুণ দৃঢ় শ্রদ্ধা যার।
উত্তম অধিকারী সেই তারয়ে সংসার ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৩৯ ॥”

মধ্যম অধিকারী

“যঃ শাস্ত্রাদিষ্বনিপুণঃ শ্রদ্ধাবান্ স তু মধ্যমঃ ॥ ভ, র, সি, ১।২।১২ ॥

—যিনি শাস্ত্রজ্ঞানে এবং শাস্ত্রসম্মত-যুক্তিবিন্যাসে অনিপুণ (বিশেষ নিপুণ নহেন, শাস্ত্রবিচারে বলবতী বাধা প্রদত্ত হইলে সমাধান করিতে অসমর্থ), কিন্তু যিনি দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্ (বাধার সমাধান করিতে না পারিলেও যাঁহার শ্রদ্ধা বিচলিত হয় না), তিনি ভক্তিবিষয়ে **মধ্যম অধিকারী**।"

"শাস্ত্রযুক্তি নাহি জানে দৃঢ় শ্রদ্ধাবান্।
মধ্যম অধিকারী সেই মহাভাগ্যবান্ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৪০ ॥"

কনিষ্ঠ অধিকারী

"যো ভবেৎ কোমলশ্রদ্ধঃ স কনিষ্ঠো নিগদ্যতে ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৩ ॥

—(শাস্ত্রজ্ঞানে, কি শাস্ত্রসম্মত-যুক্তিবিন্যাসে নিপুণতা তো দূরের কথা) যাঁহার শ্রদ্ধাও কোমল (অর্থাৎ বিরুদ্ধতর্কাদিদ্বারা যাঁহার শ্রদ্ধা টলিয়া যাইতে পারে), তিনি ভক্তিবিষয়ে **কনিষ্ঠ অধিকারী**।"

"যাঁহার কোমল শ্রদ্ধা সে কনিষ্ঠ জন।
ক্রমে ক্রমে তেঁহো ভক্ত হইবে উত্তম ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৪১ ॥"

ভক্তিমার্গের সাধকের সম্বন্ধে উল্লিখিতরূপ অধিকারিভেদের কথা বলা হইয়া থাকিলেও যে-কোনও পন্থাবলম্বীদের পক্ষেই উহা প্রযোজ্য। কেননা, অন্য পন্থাবলম্বীদের মধ্যেও শ্রদ্ধার গাঢ়তার তারতম্য থাকিতে পারে।

২৪। রতি-প্রেম-তারতম্যভেদে ভক্তভেদ

ভগবানে রতি ও প্রেমের তারতম্যভেদে শ্রীমদ্ভাগবত তিন রকম ভক্তের কথা বলিয়া গিয়াছেন—উত্তম ভক্ত, মধ্যম ভক্ত এবং প্রাকৃত বা কনিষ্ঠ ভক্ত।

উত্তম ভক্ত

"সর্ব্বভূতেষু যঃ পশ্যেদ্ ভগবদ্ভাবমাত্মনঃ।
ভূতানি ভগবত্যাত্মন্যেষ ভাগবতোত্তমঃ ॥ শ্রীভা, ১১।২।৪৫ ॥

—যিনি সর্ব্বভূতে স্বীয় অভীষ্ট (বা উপাস্য) ভগবানের বিদ্যমানতা অনুভব করেন, যিনি স্বীয় উপাস্য-ভগবানেও সকল প্রাণীর অস্তিত্ব অনুভব করেন (অথবা নিজের চিত্তে যে ভগবান্ স্ফুরিত হয়েন, যিনি সকল প্রাণীকেই সেই ভগবানে স্বীয় প্রেমের অনুরূপ প্রেমযুক্ত মনে করেন) তিনিই ভাগবতোত্তম।"

আব্রহ্মস্তম্ব পর্য্যন্ত সকলের মধ্যেই যিনি ভগবদ্ভাব অনুভব করেন, অর্থাৎ সকলের মধ্যেই ভগবান্ আছেন—এইরূপ যিনি অনুভব করেন, অথবা ভগবানের প্রতি নিজে যে ভাব পোষণ করেন, অন্যান্য সকলেও ভগবানের প্রতি সেই ভাবই পোষণ করেন—এইরূপ যিনি মনে করেন, তিনি উত্তম ভক্ত। ইনি সর্ব্বত্র সমদর্শী।

মধ্যম ভক্ত

"ঈশ্বরে তদধীনেষু বালিশেষু দ্বিষৎসু চ।
প্রেমমৈত্রীকৃপোপেক্ষা যঃ করোতি স মধ্যমঃ॥ শ্রীভা, ১১।২।৪৬॥

—যিনি ঈশ্বরে প্রেম, ভগবদ্‌ভক্তে মৈত্রী, অজ্ঞজনে কৃপা এবং ভগবদ্দ্বেষী বহির্ম্মুখ জনের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তিনি মধ্যম ভক্ত।"

মানসিক অবস্থাবিশেষের দ্বারা মধ্যম ভক্তের লক্ষণ প্রকাশ করিতেছেন। সর্ব্বত্র ভগবৎ-স্ফূর্ত্তিতে বা ভগবৎপ্রেমের স্ফূর্ত্তিতে উত্তম ভক্ত সর্ব্বত্র সমদর্শী। কিন্তু মধ্যম ভক্তের তদ্রূপ হয় না বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন নহেন। সর্ব্বত্র সমদৃষ্টিসম্পন্ন হওয়ার মত মনের অবস্থা তাঁহার হয় না বলিয়া তিনি উত্তম ভক্তরূপে গণ্য হয়েন না।

প্রাকৃত ভক্ত

"অর্চ্চায়ামেব হরয়ে পূজাং যঃ শ্রদ্ধয়েহতে।
ন তদ্ভক্তেষু চান্যেষু স ভক্তঃ প্রাকৃতঃ স্মৃতঃ॥ শ্রীভা, ১১।২।৪৭॥

—যিনি শ্রদ্ধাপূর্ব্বক প্রতিমাতেই হরিকে পূজা করেন, হরিভক্তকে, বা অন্যকে পূজা করেন না, তিনি প্রাকৃত ভক্ত।"

কায়িক লক্ষণে এবং কিঞ্চিৎ মানসিক লক্ষণের দ্বারা প্রাকৃত ভক্তের পরিচয় দিতেছেন। যিনি কেবল প্রতিমাতেই শ্রদ্ধাপূর্ব্বক ভগবৎ-পূজা করিয়া থাকেন (ইহা কায়িক লক্ষণ), কিন্তু ভগবদ্‌ভক্তের বা ভক্তব্যতীত অন্য লোকেরও আদর করেন না–তাঁহাকে প্রাকৃত ভক্ত বলে। এইরূপ ভক্তের প্রতিমাপূজাতেও যে শ্রদ্ধা, তাহা শাস্ত্রার্থের অনুভবজনিত শ্রদ্ধা নহে, ইহা লোকপরম্পরাগত শ্রদ্ধামাত্র। "ইয়ঞ্চ শ্রদ্ধা ন শাস্ত্রার্থাবধারণজাতা। যস্যাত্মবুদ্ধিঃ কুণপঃ ইত্যাদি শাস্ত্রাজ্ঞানাৎ। তস্মাল্লোকপরম্পরাপ্রাপ্তা এব ইতি। শ্রীজীব।" এইরূপ শ্রদ্ধাকে আন্তরিক শ্রদ্ধা বলা যায় না; শ্রদ্ধা আন্তরিক হইলে ভগবানের প্রতি কিছু প্রীতি জন্মিত এবং ভগবানে প্রীতি জন্মিলে ভক্তমাহাত্ম্যও তিনি অবগত হইতেন এবং সর্ব্বত্র শ্রীকৃষ্ণের অধিষ্ঠান মনে করিয়া সকলের প্রতিই আদর দেখাইতেন—অন্ততঃ কাহারও প্রতিই অনাদর করিতে পারিতেন না। শাস্ত্রার্থের অনুভবজনিত শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, কিন্তু যাঁহার চিত্তে এখনও প্রেমের উদয় হয় নাই, বস্তুতঃ তিনিই মুখ্য কনিষ্ঠ ভক্ত। "অজাতপ্রেমা শাস্ত্রীয়শ্রদ্ধাযুক্তঃ সাধকস্তু মুখ্যঃ কনিষ্ঠো জ্ঞেয়ঃ। শ্রীজীব।"

এই শ্লোকে প্রাকৃত-ভক্ত-শব্দে—যিনি সম্প্রতিমাত্র ভজন আরম্ভ করিয়াছেন (অধুনৈব প্রারব্ধভক্তিঃ—শ্রীধরস্বামী), কিন্তু ভজনব্যাপার এখনও যাঁহার চিত্তে কোনও ক্রিয়া প্রকাশ করিতে পারে নাই, সকলকে আদর করার উপযোগিনী মানসিক অবস্থা এখনও যাঁহার হয় নাই—তাঁহাকেই বুঝাইতেছে।

সাধনব্যাপারে মানসিক অবস্থাভেদে যে-কোনও পন্থাবলম্বী সাধকদেরই উল্লিখিতরূপ ভেদ থাকিতে পারে।

২৫। উদ্দেশ্যভেদে সাধকভেদ—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে উদ্দেশ্যভেদে চারি রকম সাধকের কথা বলিয়াছেন।

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ ॥ গীতা ॥ ৭।১৬ ॥

—হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী—এই চারি রকমের সুকৃতি ব্যক্তিগণ আমার ভজন করিয়া থাকেন।"

আর্ত্ত—রোগাদিদ্বারা, বা আপদ্‌বিপদাদিদ্বারা, অভিভূত ব্যক্তিগণ রোগাদি হইতে, বা আপদ বিপদাদি হইতে, নিষ্কৃতিলাভের উদ্দেশ্যে ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।

জিজ্ঞাসু—ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানার্থী, বা আত্মতত্ত্ব-জ্ঞানার্থী ব্যক্তিগণ ভগবত্তত্ত্বাদি জানিবার উদ্দেশ্যে ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।

অর্থার্থী—ইহকালের বা পরকালের স্বর্গাদিলোক-প্রাপ্তি যাঁহাদের উদ্দেশ্য, তাঁহারাও নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।

জ্ঞানী—বিশুদ্ধান্তঃকরণ নিষ্কাম ব্যক্তিগণও ভগবানের ভজন করিয়া থাকেন।

উল্লিখিত চারি প্রকারের সাধকের মধ্যে "আর্ত্ত" এবং "অর্থার্থী"-এই দুই রকমের সাধক হইতেছেন সকাম ; কেননা, তাঁহারা ইহকালের বা পরকালের দেহভোগ্য বস্তু প্রাপ্তির উদ্দেশ্যেই সাধন করিয়া থাকেন। আর, "জিজ্ঞাসু" এবং জ্ঞানী"—এই দুই রকমের সাধক হইতেছেন মোক্ষকামী। তাঁহারা দেহভোগ্য কোনও বস্তু চাহেন না।

'আর্ত্ত' 'অর্থার্থী'—দুই সকাম ভিতরে গণি।
'জিজ্ঞাসু' 'জ্ঞানী'--দুই মোক্ষকাম মানি ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।৬৭ ॥

শ্লোকস্থ "সুকৃতিনঃ"-শব্দেরও একটা তাৎপর্য্য আছে। যাঁহারা "সুকৃতি", তাঁহারাই স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির উদ্দেশ্যে ভগবদ্‌ভজন করিয়া থাকেন। "সুকৃতি-"শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ এবং মধুসূদন সরস্বতীপাদ লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বজন্মসু-কৃতপুণ্যাঃ", "পূর্ব্বজন্মকৃতপুণ্যসঞ্চয়াঃ"—যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য আছে, তাঁহারাই "সুকৃতি।" শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—যাঁহারা স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত ধর্ম্মের পালন করেন, তাঁহারা "সুকৃতি।"

শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"স যদি পূর্ব্বং কৃতপুণ্যস্তর্হি মাং ভজতি, অন্যথা ক্ষুদ্রদেবতা-ভজনেন সংসরতি, এবমুত্তরত্রাপি দ্রষ্টব্যম্।--যাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত পুণ্য আছে, তিনিই ভগবদ্‌ভজন করেন ; তাহা না থাকিলে স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির জন্য ক্ষুদ্রদেবতার ভজন করিয়া সংসারগ্রস্তই হইয়া থাকেন ; পরবর্ত্তী (গীতা ॥ ৭।২০-২৩ শ্লোকোক্ত) বাক্যে তাহা দৃষ্ট হয়।"

ক। ঐহিক বা পারত্রিক কাম্যবস্তু, কিম্বা মোক্ষ—সমস্তই শ্রীকৃষ্ণভজন-সাপেক্ষ

পূর্ব্ববর্ত্তী "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং

তরন্তি তে ॥ গীতা ॥ ৭।১৪ ॥”-বাক্যে বলা হইয়াছে, ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। ইহাতে প্রশ্ন হইতে পারে—“ভগবানের শরণাপন্ন না হইলে যদি মায়ামুক্ত হওয়া না যায়, তাহা হইলে সকলে কেন ভগবানের শরণাপন্ন হয় না ?—যদি ত্বাং প্রপন্নাঃ মায়ামেতাং তরন্তি, কস্মাৎ ত্বামেব সর্ব্বে ন প্রপদ্যন্তে ? ইত্যুচ্যতে ন মামেতি (শ্রীপাদ শঙ্কর)।

পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ এই প্রশ্নের উত্তর দিয়াছেন।

“ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥ গীতা ॥ ৭।১৫ ॥

—বিবেকহীন নরাধম দুষ্কৃতকারিগণ মায়াদ্বারা অপহৃতজ্ঞান হইয়া এবং অসুরস্বভাব আশ্রয় করিয়া আমার ভজন করেনা।”

এই শ্লোক হইতে জানা গেল, যাহারা “দুষ্কৃতি—দুষ্কৃতকারী”, তাহারাই শ্রীকৃষ্ণভজন করে না।

“দুষ্কৃতিনঃ”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“পাপকারিণঃ—পাপকর্ম্মকারিগণ।” শ্রীপাদ রামানুজও তাহাই লিখিয়াছেন—“দুষ্কৃতিনঃ পাপকর্ম্মাণঃ।” তিনি বলেন—এই শ্লোকে দুষ্কৃত-তারতম্যানুসারে চারি প্রকারের পাপকর্ম্মাদের কথা বলা হইয়াছে ; যথা—“মূঢ়াঃ”, “নরাধমাঃ”, “মায়য়াপহৃতজ্ঞানাঃ” এবং “আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ।” শ্রীপাদ রামানুজ এই চারি রকমের দুষ্কৃতি লোকদের বিবরণও দিয়াছেন।

মূঢ়। যাহারা শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের অপরিজ্ঞানহেতু প্রাকৃত বিষয়ে আসক্ত হইয়া জীবনপাত করে, তাদৃশ বিপরীত-জ্ঞানসম্পন্ন-লোকগণই **মূঢ়**। শ্রীপাদ বলদেব এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ মূঢ় লোকের লক্ষণ আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ বলেন যাহারা কর্ম্মজড়, বিষ্ণু-শ্রীকৃষ্ণকেও ইন্দ্রাদিবৎ-কর্ম্মাঙ্গ বলিয়া মনে করে, অথবা জীববৎ কর্ম্মাধীন বলিয়া মনে করে, তাহারা মূঢ়। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—পশুতুল্য কর্ম্মীরাই মূঢ়। “নূনং দৈবেন নিহতা যে চাচ্যুতকথাসুধাম্। হিত্বা শৃণ্বন্ত্যসদ্‌গাথাঃ পুরীষমিব বিড্‌ভুজঃ ॥—বিষ্ঠাভোজীরা যেমন পুরীষ ভোজন করে, তদ্রূপ যাহারা সুধাতুল্য অচ্যুতকথা পরিত্যাগ করিয়া অন্য অসৎকথা শ্রবণ করে, তাহারা নিশ্চয়ই দৈবকর্ত্তৃক বিড়ম্বিত” এবং “মুকুন্দং কো বৈ ন সেবেত বিনা নরেতরম্।—পশু ভিন্ন আর কে-ই বা মুকুন্দের সেবা করেনা ?”-ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্যই তাহার প্রমাণ।

নরাধম। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—পূর্ব্বোক্ত প্রকারে নিজেকে এবং ভোগ্যজাতকেও যাহারা নিজেদের সেবার বা ভোগের জন্য বলিয়া মনে করে, ভগবৎ-স্বরূপের সামান্যজ্ঞান থাকিলেও ভগবদুন্মুখতার অযোগ্য যাহারা, তাহারা নরাধম। শ্রীপাদ বলদেব বলেন—বিপ্রাদিকুলে জন্মবশতঃ নরোত্তমতা লাভ করিয়াও যাহারা অসৎকাব্যার্থে আসক্তি বশতঃ পামরতাভাগী হইয়াছে, তাহারা নরাধম। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ বলেন—কিঞ্চিৎকাল ভক্তির সাধন হেতু প্রাপ্তনরত্ব হইয়াও শেষকালে ‘ফলপ্রাপ্তি

বিষয়ে সাধনোপযোগ নাই'—ইহা মনে করিয়া যাহারা ইচ্ছা করিয়াই ভক্তিকে ত্যাগ করে, তাহারা নরাধম। স্বকর্তৃক-ভক্তিত্যাগই তাহাদের অধমত্বের লক্ষণ। (তাৎপর্য্য এই :—যাহারা কিছুকাল ভক্তির সাধন করিয়াছে, সুতরাং যাহারা নরদেহ-প্রাপ্তির উপযোগী কার্য্যই করিয়াছে, কিন্তু শীঘ্র ভক্তির ফল পাইতেছেনা বলিয়া—ফলপ্রাপ্তিবিষয়ে ভক্তিসাধনের উপযোগিতা নাই —ইহা মনে করিয়া শেষকালে ভক্তির সাধন ইচ্ছা করিয়াই ত্যাগ করে, তাহারা হইতেছে নরাধম)।

মায়াপহৃতজ্ঞান। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—ভগবদ্বিষয়ক এবং ভগবদৈশ্বর্য্য-বিষয়ক জ্ঞান প্রস্তুত (শাস্ত্রসিদ্ধ) হইলেও অসদ্ভাবনাদি কূটযুক্তির দ্বারা যাহাদের তাদৃশ জ্ঞান অপহৃত হয়, তাহারাই মায়াপহৃত-জ্ঞান। শ্রীপাদ বলদেব বলেন—সাংখ্যাদি-মতপ্রবর্ত্তকগণ হইতেছেন মায়াপহৃত-জ্ঞান। অসংখ্য-শ্রুতিবাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সর্ব্বজ্ঞত্ব, সর্ব্বৈশ্বর্য্যবিশিষ্টত্ব, সর্ব্বসৃষ্টিকর্তৃত্ব, মুক্তি-দাতৃত্বাদি প্রসিদ্ধ ধর্ম্ম প্রমাণিত হওয়া সত্ত্বেও সাংখ্যাদি-মতাবলম্বীরা শ্রীকৃষ্ণের ঈশ্বরত্বের অপলাপ করিয়া প্রকৃতিকেই সর্ব্বসৃষ্টিকর্ত্রী এবং মোক্ষদাত্রী বলিয়া কল্পনা করেন। মায়ার প্রভাবেই তাঁহারা শতশত কুটীল কুযুক্তির উদ্ভাবন করিয়া উল্লিখিতরূপ সিদ্ধান্ত করিয়া থাকেন। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ বলেন—শাস্ত্রের অধ্যয়ন এবং অধ্যাপন করিলেও যাঁহাদের জ্ঞান মায়াদ্বারা বিলুপ্ত হইয়াছে, তাঁহারাই মায়াপহৃত-জ্ঞান। তাঁহারা মনে করেন—বৈকুণ্ঠবিহারী নারায়ণই চিরকাল ভক্তির যোগ্য। রাম এবং কৃষ্ণাদি মানুষমাত্র—সুতরাং ভক্তির অযোগ্য। "অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্।"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। এতাদৃশ লোকগণ শ্রীকৃষ্ণের (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের প্রকাশবিশেষ নারায়ণাদির) শরণাপন্ন হইলেও বস্তুতঃ তাঁহাদিগকে শরণাপন্ন বলা যায় না (৫।১৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

আসুর-ভাবাশ্রিত। শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক এবং শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যবিষয়ক জ্ঞান সুদৃঢ়রূপে উপপন্ন; যাঁহাদের তাদৃশ জ্ঞান শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক দ্বেষেই পরিণত হয়, তাঁহারাই আসুর-ভাবাশ্রিত। এই চারি প্রকারের পাপকর্ম্মারা উত্তরোত্তর পাপিষ্ঠতর, আসুর-ভাবাশ্রিতগণ পাপিষ্ঠ-তম। শ্রীপাদ বলদেব বলেন—যাঁহারা মায়ার প্রভাবে নির্ব্বিশেষ-চিন্মাত্রবাদী, তাঁহারা আসুর-ভাবাশ্রিত। অসুরগণ যেমন নিখিল আনন্দের আকরস্বরূপ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে শরের দ্বারা বিদ্ধ করে, আসুর-ভাবাশ্রিত লোকগণও শ্রীকৃষ্ণের নিত্যচৈতন্যাত্মক বিগ্রহ শ্রুতিসিদ্ধ হইলেও অদৃশ্যত্বাদিহেতু তাহার খণ্ডন করিয়া থাকেন। এ-স্থলে মায়াই তাদৃশী বুদ্ধি উৎপাদনের হেতু। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—জরাসন্ধাদি অসুরগণ শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে লক্ষ্য করিয়া শর নিক্ষেপ করিয়া যেমন তাহাকে বিদ্ধ করে, আসুর-ভাবাশ্রিত লোকগণও কুশাস্ত্রাদিহেতুমৎ-কুতর্কদ্বারা নিত্য বৈকুণ্ঠে বিরাজিত শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহকে খণ্ডিতই করেন, কিন্তু তাঁহার শরণাপন্ন হয়েন না।

শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—যাহারা হিংসা, মিথ্যা, প্রভৃতি লক্ষণবিশিষ্ট, তাহারাই আসুর-

ভাবাশ্রিত। শ্রীধরস্বামিপাদ এবং মধুসূদনসরস্বতীপাদ বলেন—"দম্ভো দর্পোঽভিমানশ্চ ক্রোধঃ পারুষ্যমেব চ ॥ গীতা ॥ ১৬।৪॥"-ইত্যাদি বাক্যে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ—দম্ভ, দর্প, অভিমান, ক্রোধ, পারুষ্যাদিকে আসুরিক ভাব বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। এই সমস্ত আসুরিক-ভাবাশ্রিত লোকগণ ভগবৎ-শরণাগতির অযোগ্য বলিয়া সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের ভজন করে না।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণ-ভজনই মায়ার বন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভের একমাত্র উপায় হইলেও উল্লিখিতরূপ দুষ্কৃতি লোকগণ শ্রীকৃষ্ণ-ভজন করে না। ইহার পরেই "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"সুকৃতি লোকগণই আমার ভজন করিরা থাকেন—কেহ বা আর্ত্তরূপে, কেহ বা অর্থার্থিরূপে, কেহ বা জিজ্ঞাসুরূপে, আবার কেহ বা জ্ঞানিরূপে ; অর্থাৎ কেহ কেহ নিজেদের অভীষ্ট ভোগপ্রাপ্তির জন্য, আবার কেহ বা মোক্ষপ্রাপ্তির জন্য আমার জন করেন। ভজনকারী সকলেই সুকৃতি তাঁহাদের সুকৃতি আছে বলিয়াই আমার ভজন করিয়া থাকেন।"

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে ইহাও জানা গেল যে—রোগাদি হইতে অব্যাহতিরূপ ঐহিক কাম্যবস্তু, কিম্বা স্বর্গাদিলোকের সুখরূপ পারত্রিক কাম্য বস্তু পাইতে হইলে যেমন শ্রীকৃষ্ণভজন অপরিহার্য্য, তেমনি মোক্ষ পাইতে হইলেও শ্রীকৃষ্ণভজন অপরিহার্য্য।

ক। মুক্তি ও মাধ্বমত

উল্লিখিত আলোচনায়, "ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ। মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ ॥৭।১৫॥"-গীতাশ্লোক হইতে জানা যায়—মূঢ়, নরাধম, মায়াদ্বারা যাঁহাদের জ্ঞান অপহৃত হইয়াছে তাঁহারা এবং অসুরস্বভাব দুষ্কৃতি লোকগণ ভগবানের ভজন করেন না। ইহাতে বুঝা যায়, তাঁহারা মুক্তিও পাইতে পারেন না। কোনও ভাগ্যে যদি কখনও শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে তাঁহাদের প্রবৃত্তি জন্মে, তাহা হইলে হয়তো মোক্ষ-পথের পথিক হইতে পারেন। কিন্তু গীতার ষোড়শ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণের উক্তি হইতে অন্যরূপ ভাব মনে জাগে। সে-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"তানহং দ্বিষতঃ ক্রূরান্ সংসারেষু নরাধমান্। ক্ষিপাম্যজস্রমশুভানাসুরীষ্বেব যোনিষু॥
আসুরীং যোনিমাপন্না মূঢ়া জন্মনি জন্মনি। মামপ্রাপ্যৈব কৌন্তেয় ততো যান্ত্যধমাং গতিম্ ॥১৬।১৯-২০॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) আমি সেই [আমার প্রতি] দ্বেষপরায়ণ ক্রূরবুদ্ধি, অশুভকারী নরাধমদিগকে সংসারে নিরন্তর আসুরযোনিতে নিক্ষেপ করিয়া থাকি। হে কৌন্তেয়! জন্মে জন্মে আসুরী যোনি প্রাপ্ত সেই সকল মূঢ়গণ আমাকে না পাইয়াই তাহা হইতেও (অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মাপেক্ষাও) অধোগতি প্রাপ্ত হয়।"

এই উক্তি হইতে মনে হয় যে, অসুর-স্বভাব লোকদিগের কোনও কালেই মোক্ষ সম্ভব নহে।

শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্য-প্রবর্ত্তিত সম্প্রদায়ও এইরূপ অভিমতই পোষণ করিয়া থাকেন। মাধ্বমতে

জীব তিন রকমের। প্রথম রকম হইতেছে মুক্তিযোগ্য ; ব্রহ্মা, বায়ু প্রভৃতি দেবতাগণ, নারদাদি ঋষিগণ, পিতৃগণ, অম্বরীষাদি ভক্ত রাজগণ, বা উন্নত লোকগণ হইতেছেন মুক্তিযোগ্য ; ইঁহারা পরমেশ্বরকে জ্ঞানানন্দাত্মক বলিয়া চিন্তা করেন। ইঁহারাই মোক্ষ-লাভের যোগ্য। দ্বিতীয় রকম হইতেছে সাধারণ সংসারী লোকগণ। ইঁহারা নিত্য সংসারী, সর্ব্বদা জন্ম-মৃত্যুর কবলে পতিত ; ইঁহারা কখনও স্বর্গসুখও ভোগ করেন, কখনও সংসারের সুখদুঃখও ভোগ করেন, আবার কখনও নরকযন্ত্রণাও ভোগ করেন ; ইঁহারা কখনও মোক্ষ লাভ করিতে পারেন না। আর, তৃতীয় রকম হইতেছে অসুরাদি ; ইঁহারা তমোযোগ্য—নিত্য সংসারী হইতে ভিন্ন, সর্ব্বদা নরকযন্ত্রণা ভোগ করিয়া থাকেন। দেবতারা কখনও নরকে যায়েন না, অসুরেরাও কখনও মোক্ষলাভ করিতে পারেন না এবং নিত্য সংসারীরাও মোক্ষ লাভ করেন না। (১)

মাধ্ব-সম্প্রদায়ের এই অভিমত সংসারী লোকের পক্ষে নিতান্ত হতাশা-ব্যঞ্জক। মায়াবদ্ধ সংসারী জীব ব্রহ্মা বা বায়ুও নয়, নারদাদি ঋষিও নয়, অম্বরীষাদির ন্যায় পরমভাগবতও নয়। তাঁহাদিগকে যদি অনন্তকাল পর্য্যন্ত সংসারেই থাকিতে হয়, মোক্ষলাভের কোনও সম্ভাবনাই যদি তাঁহাদের না থাকে, তাহা হইলে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ অনাদিকাল হইতে বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন কাহাদের জন্য ? কাহাদের জন্যই বা তিনি নানাবিধ অবতাররূপে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন ? তাঁহার পতিতপাবন-নামের সার্থকতাই বা কি ? ব্রহ্মা, বায়ু, নারদ, অম্বরীষাদি তো পতিত নহেন ; কেবলমাত্র তাঁহাদের মোক্ষদানেই কি ভগবানের পতিতপাবনত্ব-গুণের সার্থকতা ? মায়ার প্রভাবেই জীবের সংসারিত্ব ; মায়ার প্রভাব হইতেছে আগন্তুক, জীবের স্বরূপে মায়া নাই। আগন্তুক বলিয়া মায়ার প্রভাব অপসারিত হওয়ার যোগ্য। এই অবস্থাতেও যদি সংসারী জীবের মোক্ষলাভের সম্ভাবনা না থাকে, তাহা হইলে শ্রীপাদ মধ্বাচার্য্যই বা সাধন-ভজনের উপদেশ দিয়াছেন কাহাদের জন্য ? যাঁহারা সাধন-ভজন করেন না, সর্ব্বদা সংসার নিয়াই ব্যস্ত, সাধনভজনে উন্মুখতা লাভের প্রাথমিক উপায় স্বরূপ মহৎ-সঙ্গ লাভের সৌভাগ্যও যাঁহাদের হয় না, তাঁহাদিগকে অবশ্যই সংসারী হইয়াই থাকিতে হইবে ; কিন্তু কোনও কালে কোনও জন্মেই যে সাধনভজনের বা সাধুসঙ্গের সৌভাগ্য তাঁহাদের হইবেনা, এইরূপ অনুমানেরই বা হেতু কি থাকিতে পারে ? এই গেল সংসারী লোকদের কথা।

মাধ্বসম্প্রদায়ের মতে অসুরগণ চিরকাল নরকেই বাস করিয়া থাকে। উল্লিখিত গীতাশ্লোকে অসুরদের চিরকাল নরকবাসের কথা বলা হয় নাই ; বলা হইয়াছে, পুনঃ পুনঃ আসুরী যোনিতে জন্মলাভ করে। একবার মৃত্যুর পরে নরকে গেলেও নরকভোগের পরেও আবার আসুরী যোনিতেই জন্ম হয় এবং "যান্ত্যধমাং গতিম্" বাক্য হইতে জানা যায়—কৃমিকীটাদি যোনিতেও জন্ম হইতে পারে ;

(১) *A History of Indian Philosophy*, by Dr, S. N, Dasgupta, Vol. IV, 1955, Pp 155 and 318.

মনুষ্যেতর যোনিতে জন্ম হইলে সাধনভজনের সুযোগ থাকেনা বলিয়া মোক্ষের সম্ভাবনাও তাহাদের থাকিতে পারে না।

উল্লিখিত গীতাশ্লোকগুলির টীকায় শ্রীপাদ শঙ্কর, শ্রীপাদ রামনুজ, শ্রীপাদ মধুসূদন, শ্রীপাদ শ্রীধর স্বামী প্রভৃতি যাহা লিখিয়াছেন, তাহাও হতাশাব্যঞ্জক। শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ বলেন, যাহারা পাপবশতঃ অসুরকুলে হিরণ্যকশিপু-আদিরূপে বা তদনুগত রাজকুলে শিশুপালাদিরূপে জন্মগ্রহণ করিয়াছে, তাহারা বামনাদি ভগবদবতার-সমূহের প্রতি বিদ্বেষভাবাপন্ন থাকিলেও বেদবিহিত কর্ম্মানুষ্ঠানে রত ছিল। বামনাদি অবতার কর্ত্তৃক নিহত হইয়া তাহারা ক্রমশঃ উর্দ্ধগতি লাভ করিয়া পরে শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া মোক্ষলাভ করিয়াছে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—গীতার ১৬।২০ শ্লোকের "মামপ্রাপ্যৈব তু কৌন্তেয়" বাক্য হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণকে না পাইলেই অসুরদের অধমাগতি লাভ হয়, শ্রীকৃষ্ণকে পাইলে তাহা হয়না, মোক্ষই লাভ হয়। গত দ্বাপরে শ্রীকৃষ্ণ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, তখন কংসাদি ভগবদ্‌বিদ্বেষী অসুরগণ শত্রুভাবে অনবরত শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা করিয়া শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইয়া মোক্ষলাভ করিয়াছিলেন। এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন—"নিভৃতমরুন্মনোঽক্ষ দৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ॥ ১০।৮৭।২৩॥—শ্রুতিগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন, নিভৃতস্থলে প্রাণায়ামাদিদ্বারা বায়ু নিরুদ্ধ করিয়া কঠোর যোগপরায়ণ মুনিগণ যাঁহাকে হৃদয়ে উপাসনা করেন, সেই তোমার শত্রুগণ তোমার স্মরণ করিয়াই তোমাকে পাইয়া থাকেন।" চক্রবর্ত্তিপাদ ভাগবতামৃতকারিকার একটী প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "মাং কৃষ্ণরূপিণং যাবন্নাপ্নুবন্তি মমদ্বিষঃ। তাবদেবাধমাং যোনিং প্রাপ্নুবন্তীতি॥—ভগবান্ বলিতেছেন, মদ্বিদ্বেষী অসুরগণ যে পর্য্যন্ত কৃষ্ণরূপী আমাকে প্রাপ্ত না হয়, সে পর্য্যন্তই তাহারা উত্তরোত্তর অধমযোনি লাভ করে।" ইহা হইতে জানা গেল, শ্রীকৃষ্ণহস্তে নিহত হইলে অসুরগণও মোক্ষলাভ করিতে পারে। এজন্যই শ্রীকৃষ্ণকে "হতারিগতিদায়ক" বলা হয়।

শ্রীকৃষ্ণ অঘাসুর-বকাসুরাদিকেও মুক্তি দিয়াছেন, পূতনাকে প্রেম দিয়া ধাত্রীগতিও দিয়াছেন।

আবার, মুণ্ডকশ্রুতি হইতে জানা যায়, রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবানের দর্শনমাত্রেই লোকের পাপপুণ্যরূপ সমস্ত কর্ম্মফল দূরীভূত হয়, লোক তৎক্ষণাৎ প্রেমলাভ করেন। "যদা পশ্যঃ পশ্যতে রুক্মবর্ণং কর্ত্তারমীশং পুরুষং ব্রহ্মযোনিম্। তদা বিদ্বান্ পুণ্যপাপে বিধূয় নিরঞ্জনঃ পরমং সাম্যমুপৈতি ॥ মুণ্ডক॥ ৩।১।৩॥ (১।২।৫১-অনুচ্ছেদে এই বাক্যের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)।" পাপের ফলেই অসুরত্ব। রুক্মবর্ণ পুরুষের দর্শনমাত্রেই যখন সমস্ত পাপ—সুতরাং অসুরত্বও—দূরীভূত হইয়া যায় এবং ব্রহ্মাদিরও দুর্ল্লভ প্রেম লাভ হয় বলিয়া শ্রুতি বলিয়াছেন, তখন প্রাণে বিনষ্ট না হইয়াও যে অসুর প্রেম লাভ করিয়া ভগবৎ-পার্ষদত্বলাভ করিতে পারে, তাহাই জানা গেল।

যদি বলা যায়—রুক্মবর্ণ স্বয়ংভগবান্ যখন ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, কোনও অসুর যদি তখন জন্মগ্রহণ না করে, তাহা হইলে তো তাহার প্রেমলাভও হইবে না, অসুরত্বও বিনষ্ট

হইবে না। ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—"লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব॥ শ্রীচৈ, চৈ, ৩।২।৫॥" লোকের উদ্ধার করা যদি ভগবানের স্বভাবই হয়, তাহা হইলে তিনি কোনও না কোনও সময়ে সকল জীবকেই উদ্ধার করিবেন। তিনি "সত্যং শিবং সুন্দরম্॥" শিবত্ব এবং সুন্দরত্ব তাঁহার স্বরূপগত ধর্ম্ম; লোক-নিস্তারের ইচ্ছাতেই তাহার বিকাশ। স্বরূপগত ধর্ম্মের ব্যত্যয় হইতে পারে না।

মাধ্বমতে সংসারী জীবের এবং অসুরের মোক্ষের কোনও সম্ভাবনাই নাই। এই মত বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। জীবের সংসারিত্ব এবং অসুরত্ব যখন মায়ারই ক্রিয়া এবং জীবের পক্ষে মায়া যখন আগন্তুকী, তখন মায়া অপসারিত হওয়ার সম্ভাবনাও রহিয়াছে। শ্রীপাদ মাধ্ব বলেন—বৈকুণ্ঠে সকল জীবেরই চিন্ময় স্বরূপদেহ বিদ্যমান; মোক্ষলাভ করিলে জীব স্বীয় স্বরূপদেহে প্রবেশ করে। এই স্বরূপদেহের অস্তিত্ব স্বীকার করিয়াই প্রকারান্তরে তিনি সকল জীবের পক্ষে মোক্ষের সম্ভাবনা স্বীকার করিয়াছেন। যাহার মোক্ষের কোনও কালেই সম্ভাবনা নাই, তাহার স্বরূপদেহ থাকার সার্থকতা কোথায়?

শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, বহুজন্ম পর্য্যন্ত স্বধর্ম্মাচরণ করিলে বিরিঞ্চত্ব লাভ করা যায়। "স্বধর্ম্মনিষ্ঠঃ শতজন্মভিঃ পুমান্ বিরিঞ্চতামেতি॥ শ্রীভা, ৪।২৪।২৯॥" বিরিঞ্চ হইতেছে ব্রহ্মার একটী নাম। স্বধর্মাচরণ হইতেছে সংসারী লোকেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে বুঝা যায়—মাধ্বমতে যে ব্রহ্মাকে মোক্ষার্হ বলা হইয়াছে, সেই ব্রহ্মাও পূর্ব্বে সংসারী লোকই ছিলেন এবং সংসারী অবস্থায় স্বধর্মাচরণাদি দ্বারা ব্রহ্মা হইয়া মোক্ষার্হ হই য়াছেন। সুতরাং সংসারী লোকগণ কখনও মোক্ষলাভ করিতে পারে না, এইরূপ অনুমানের সার্থকতা দেখা যায় না। সংসারী লোকের জন্যই সাধন-ভজনের ব্যবস্থা। সংসারী লোক যদি কোনও কালেই মোক্ষলাভ করিতে না পারে, তাহা হইলে শ্রুতি-প্রোক্ত সাধনভজনের উপদেশই নিরর্থক হইয়া পড়ে।

খ। পঞ্চম প্রকারের সাধক—প্রেমসেবার্থী

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্"-ইত্যাদি গীতা॥ ৭।১৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—"এতে ত্রয়ঃ সকামা গৃহস্থাঃ। জ্ঞানী বিশুদ্ধান্তঃকরণঃ সন্ন্যাসীতি চতুর্থোঽয়ং নিষ্কামঃ। ইত্যেতে প্রধানীভূতভক্ত্যধিকারিণশ্চত্বারো নিরূপিতাঃ। তত্রাদিমেষু ত্রিষু কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিঃ। অন্তিমে চতুর্থে জ্ঞানমিশ্রা। 'সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য (গীতা ॥৮।১২)' ইত্যগ্রিমগ্রন্থে যোগমিশ্রাপি বক্ষ্যতে। জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রা কেবলা ভক্তি র্যা সা তু সপ্তমধ্যায়ারম্ভে এব 'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ (গীতা ॥৭।১॥)' ইত্যনেনৈ উক্তা। পুনশ্চাষ্টমেঽপ্যধ্যায়ে 'অনন্যচেতাঃ সততম্ (গীতা॥ ৮।১৪॥)' ইত্যনেন, নবমে 'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ (গীতা॥ ৯।১৩-১৪)' ইতি শ্লোকদ্বয়েন 'অনন্যা-শ্চিন্তয়ন্তো মাম্ (গীতা ॥৯।২২)' ইত্যনেন চ। নিরূপয়িতব্যেতি প্রধানীভূতা কেবলেতি দ্বিধৈব ভক্তির্মধ্যমেঽস্মিন্নধ্যায়ষট্‌কে ভগবতোক্তা। যা তু তৃতীয়া গুণীভূতা ভক্তিঃ কর্ম্মিণি জ্ঞানিনি

যোগিনি চ কর্মাদিফলসিদ্ধ্যর্থা দৃশ্যতে, তস্যাঃ প্রাধান্যাভাবাৎ ন ভক্তিত্বব্যপদেশঃ ; কিন্তু তত্র তত্র কর্ম্মাদীনামেব প্রাধান্যাৎ। 'প্রাধান্যেন ব্যপদেশা ভবন্তি'-ইতি ন্যায়েন কর্ম্মত্ব-জ্ঞানত্ব-যোগত্বব্যপদেশঃ, তদ্বতামপি কর্ম্মিত্ব-জ্ঞানিত্ব-যোগিত্ব-ব্যপদেশো ন তু ভক্তত্বব্যপদেশঃ। ফলঞ্চ সকামকর্ম্মণঃ স্বর্গঃ, নিষ্কাম-কর্ম্মণো জ্ঞানযোগঃ, জ্ঞানযোগয়োর্নির্ব্বাণমোক্ষ ইতি। অথ দ্বিধায়াঃ ভক্তেঃ ফলমুচ্যতে, তত্র প্রধানী-ভূতাসু ভক্তিষু মধ্যে আর্ত্তাদিষু ত্রিষু যাঃ কর্ম্মমিশ্রা যাঃ কর্ম্মমিশ্রাস্তিস্রঃ সকামাঃ ভক্তয়ঃ, তাসাং ফলং তত্তৎকামপ্রাপ্তিঃ। বিষয়সাদ্‌গুণ্যাৎ তদন্তে সুখৈশ্বর্য্যপ্রধান-সালোক্যমোক্ষপ্রাপ্তিশ্চ, ন তু কর্ম্মফলস্বর্গ-ভোগান্ত ইব পাতঃ। যদ্বক্ষ্যতে, 'যান্তি মদ্‌যাজিনো মাম্ (গীতা ॥৯ ২৫)'-ইতি চতুর্থ্যাঃ জ্ঞানমিশ্রায়াস্তত উৎকৃষ্টায়াস্তু ফলং শান্তিরতিঃ সনকাদিষ্বিব। ভক্তভগবৎকারুণ্যাধিক্যবশাৎ কস্যাশ্চিৎ তস্যাঃ ফলং প্রেমোৎকর্ষশ্চ শ্রীশুকাদিষ্বিব। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তির্যদি নিষ্কামা স্যাৎ, তদা তস্যাঃ ফলং জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিঃ ; তস্যাঃ ফলমুক্তমেব। ক্বচিচ্চ স্বভাবাদেব দাসাদিভক্তসঙ্গোত্থবাসনাবশাদ্বা জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্রভক্তিমতামপি দাস্যাদিপ্রেম স্যাৎ, কিন্তু ঐশ্বর্য্যপ্রধানমেবেতি। অথ জ্ঞানকর্ম্মাদ্যমিশ্রায়াঃ শুদ্ধায়াঃ অনন্যাকিঞ্চ-নোত্তমাদিপর্য্যায়াঃ ভক্তেঃ বহুপ্রভেদায়াঃ দাস্যসখ্যাদিপ্রেমবৎ পার্ষদত্বমেব ফলম্।"

তাৎপর্য্যানুবাদ। "(আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী) এই তিন হইতেছে সকাম গৃহস্থ। চতুর্থ জ্ঞানী হইতেছে বিশুদ্ধান্তঃকরণ নিষ্কাম সন্ন্যাসী। এইরূপে প্রধানীভূতা ভক্তির চারি প্রকার অধিকারী নিরূপিত হইল। তন্মধ্যে প্রথম তিন প্রকারে যে ভক্তি লক্ষিত হয়, তাহা হইতেছে কর্ম্মমিশ্রা (বেদবিহিত কর্ম্মের সহিত মিশ্রিতা)। আর, চতুর্থে (জ্ঞানীতে) যে ভক্তি লক্ষিত হয়, তাহা হইতেছে জ্ঞানমিশ্রা। গীতার অষ্টম অধ্যায়ের ১২শ শ্লোকে ভগবান্ যোগমিশ্রা ভক্তির কথাও বলিয়াছেন। যথা 'সর্ব্বদ্বারাণি সংযম্য মনো হৃদি নিরুধ্য চ। মূর্দ্ধ্ন্যাধায়াত্মনঃ প্রাণমাস্থিতো যোগধারণাম্ ॥ গীতা ॥ ৮।১২॥ ওমিত্যেকাক্ষরং ব্রহ্ম ব্যাহরন্ মামনুস্মরন্। যঃ প্রযাতি ত্যজন্ দেহং স যাতি পরমাং গতিম্। ৮।১৩॥–সকল ইন্দ্রিয়দ্বার সংযত করিয়া এবং মনকে হৃদয়ে নিরুদ্ধ করিয়া ভ্রূযুগমধ্যে প্রাণ-সংস্থাপনপূর্ব্বক স্থির যোগাভ্যাসে রত হইয়া 'ওঁ' এই একাক্ষর ব্রহ্ম (নাম) উচ্চারণপূর্ব্বক আমাকে স্মরণ করিয়া যিনি দেহত্যাগ করতঃ প্রয়াণ করেন, তিনি পরমা গতি লাভ করেন।' আর, যে ভক্তির সহিত জ্ঞান-কর্ম্মাদির মিশ্রণ নাই, সেই কেবলা ভক্তির কথা সপ্তম অধ্যায়ের আরম্ভেই বলা হইয়াছে। যথা—'ময্যাসক্তমনাঃ পার্থ যোগং যুঞ্জন্মদাশ্রয়ঃ ॥ গীতা ।৭।১॥—হে পার্থ! আমাতে চিত্ত আসক্ত করিয়া আমার আশ্রয় গ্রহণ পূর্ব্বক যোগাভ্যাস করিলে ইত্যাদি।' আবার অষ্টম অধ্যায়েও এই কেবলা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। যথা—'অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ। তস্যাহং সুলভঃ পার্থ নিত্যযুক্তস্য যোগিনঃ ॥ ৮।১৪॥ —হে পার্থ! অনন্যচিত্তে যিনি নিয়ত প্রতিদিন আমাকে স্মরণ করেন, সেই নিত্যযুক্ত যোগীর পক্ষে আমি সহজলভ্য।' আবার নবম অধ্যায়েও কেবলা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে। যথা—'মহাত্মানস্তু মাং পার্থ দৈবীং প্রকৃতিমাশ্রিতাঃ। ভজন্ত্য-নন্যমনসো জ্ঞাত্বা ভূতাদিমব্যয়ম্ ॥ সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা

নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥ গীতা ॥৯।১৩-১৪॥ —হে পার্থ ! দৈবী প্রকৃতি আশ্রয় করিয়া মহাত্মাগণ, আমাকে অব্যয় (সনাতন) এবং ভূতসমূহের আদি-কারণ জানিয়া, অনন্যচিত্তে আমার ভজন করেন ; তাঁহারা সতত আমার (গুণ-মহিমাদি) কীর্ত্তন করেন, দৃঢ়ব্রত হইয়া সর্ব্বদা আমার জন্য যত্ন করেন, ভক্তি-সহকারে আমাকে নমস্কার করেন এবং নিত্যযুক্ত হইয়া আমার উপাসনা করেন।' নবম অধ্যায়ের অপর শ্লোকেও বলা হইয়াছে—'অনন্যাশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে। তেষাং নিত্যাভিযুক্তানাং যোগক্ষেমং বহাম্যহম্ ॥৯।২২॥—যাঁহারা অনন্যমনে আমারই চিন্তা করিতে করিতে আমার উপাসনা করেন, আমি সেই সকল নিত্যাভিযুক্ত (সর্ব্বপ্রকারে মদেকনিষ্ঠ) ব্যক্তিগণের যোগ ও ক্ষেম বহন করি (ধনাদি লাভ ও তাহার রক্ষণের বিধান করিয়া থাকি)।' গীতাশাস্ত্রের (অষ্টাদশ অধ্যায়ের মধ্যে) মধ্যবর্ত্তী এই ছয়টী অধ্যায়ে প্রধানীভূতা এবং কেবলা-এই দুই রকমের ভক্তিই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিরূপিত হইয়াছে। তৃতীয় রকমের যে ভক্তি কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং যোগীদিগের মধ্যে দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে গুণীভূতা ভক্তি ; কর্ম্মাদির ফলসিদ্ধির নিমিত্তই তাঁহারা এই ভক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকেন। কিন্তু গুণীভূতা ভক্তির প্রাধান্য নাই বলিয়া তাহাতে ভক্তিত্বের ব্যপদেশ হইতে পারে না ; কেননা, তত্তৎ-স্থলে কর্ম্মাদিরই প্রাধান্য। 'প্রাধান্যদ্বারাই ব্যপদেশ হইয়া থাকে' এই নীতি অনুসারে কর্ম্মাদিমিশ্রা ভক্তিরও কর্ম্মত্ব, জ্ঞানত্ব, যোগত্বাদি ব্যপদেশই হইয়া থাকে (অর্থাৎ কর্ম্মাদির প্রাধান্য বশতঃ কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিকেও কর্ম্ম, জ্ঞানমিশ্রা ভক্তিকেও জ্ঞান এবং যোগমিশ্রা ভক্তিকেও যোগই বলা হয়), এবং সেই সেই ভাবে যাঁহারা সাধন করেন, তাঁহাদিগকেও কর্ম্মী, জ্ঞানী এবং যোগীই বলা হয়, ভক্ত বলা হয় না। ফলেরও বিশেষত্ব আছে। সকাম কর্ম্মের ফল স্বর্গ, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল জ্ঞানযোগ এবং জ্ঞান ও যোগের ফল নির্ব্বাণ-মোক্ষ। প্রধানীভূতা এবং কেবলা ভক্তির ফলও কথিত হইতেছে। প্রধানীভূতা ভক্তির মধ্যে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী-এই তিনের প্রধানীভূতা ভক্তি হইতেছে কর্ম্ম-মিশ্রা ; তাঁহারা সকাম। স্ব-স্ব-কাম্যবস্তু-প্রাপ্তিই তাঁহাদের ভক্তির ফল। বিষয়সাদ্‌গুণ্যবশতঃ (অর্থাৎ প্রধানীভূতা ভক্তির গুণে) কাম্যপ্রাপ্তির পরে সুখৈশ্বর্য্য-প্রধান সালোক্য-মোক্ষ-প্রাপ্তিও তাঁহাদের হইয়া থাকে ; কর্ম্মের ফল স্বর্গসুখের ভোগান্তে যেমন স্বর্গ হইতে পতন হয়, তাঁহাদের কিন্তু তদ্রূপ হয় না (অর্থাৎ গুণীভূতা ভক্তির সহিত মিশ্রিত কর্ম্মের ফলে যে স্বর্গপ্রাপ্তি হয়, তাহা অনিত্য ; কিন্তু প্রধানীভূতা ভক্তির সহিত মিশ্রিত কর্ম্মের ফলে কাম্য বস্তু লাভের পরে প্রধানীভূতা ভক্তির প্রভাবেই নিত্য সালোক্যমোক্ষ লাভ হইতে পারে)। গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—'যান্তি মদ্‌যাজিনো মাম্—যাঁহারা আমার ভজন করেন, তাঁহারা আমাকে প্রাপ্ত হয়েন (তাঁহাকে পাইলে আর পতন হয়না)।' আর, চতুর্থ প্রকারের অর্থাৎ জ্ঞানীর জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা প্রধানীভূতা ভক্তির ফল তাহা হইতেও উৎকৃষ্ট—সনকাদির ন্যায় শান্তিরতি। ভক্তের এবং ভগবানের কারুণ্যাধিক্যবশতঃ কোনও কোনও স্থলে ঈদৃশী ভক্তির ফল প্রেমোৎকর্ষও হইয়া থাকে, যেমন শ্রীশুকাদির হইয়াছিল। কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি যদি নিষ্কামা হয়, তাহা হইলে তাহার ফল হয় জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি ; জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির ফলের কথা পূর্ব্বেই

বলা হইয়াছে। কখনও কখনও সাধকের স্বভাববশতঃই কিম্বা দাস্যাদিভাবের ভক্তের সঙ্গ হইতে উত্থিত বাসনার ফলেও যাঁহাদের জ্ঞানকর্ম্মাদি মিশ্রা ভক্তি আছে, তাঁহাদের দাস্যাদি প্রেমও হইয়া থাকে; কিন্তু সেই দাস্যাদিপ্রেম হইবে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান। আর, জ্ঞানকর্ম্মাদির সহিত সংস্রবশূন্যা কেবলা ভক্তির—যাহার অপরাপর নাম শুদ্ধাভক্তি, অনন্যাভক্তি, অকিঞ্চনা ভক্তি এবং উত্তমা ভক্তি—তাহার দাস্য-সখ্যাদি অনেক ভেদ আছে। ইহার ফল হইতেছে পার্ষদত্ব-প্রাপ্তি, পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা।"

উল্লিখিত টীকা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সারমর্ম্ম এই ঃ—

(১) যাঁহারা কর্ম, জ্ঞান, বা যোগের অনুষ্ঠান করেন, সাধনের ফল-প্রাপ্তির জন্য তাঁহাদিগকে ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ করিতে হয়। এই ভক্তি হইতেছে গুণীভূতা ; ইহার প্রাধান্য নাই, কর্ম্ম-জ্ঞানাদিরই প্রাধান্য। সকাম কর্ম্মের ফল স্বর্গপ্রাপ্তি ; ইহা অনিত্য। ফলভোগের পরে স্বর্গ হইতে পতন হয়। আর, নিষ্কাম কর্ম্মের ফল নির্ব্বাণ-মোক্ষ (সাযুজ্য মুক্তি) ; ইহা নিত্য।

(২) "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্" ইত্যাদি শ্লোকে যে চারি প্রকারের সাধকের কথা বলা হইয়াছে, তাঁহাদের ভক্তি হইতেছে প্রধানীভূতা ; এই ভক্তির প্রাধান্য আছে ; ইহা গুণীভূতা ভক্তি নহে—সুতরাং প্রাধান্যহীনা নহে। এই প্রধানীভূতা ভক্তির ফলে আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু এবং অর্থার্থী— এই তিন রকম সাধক স্ব-স্ব অভীষ্ট ফল লাভ করেন এবং ফললাভের পরে প্রধানীভূতা ভক্তির প্রভাবেই তাঁহারা সুখৈশ্বর্য্য-প্রধান সালোক্যমোক্ষ লাভ করিতে পারেন।

বুঝা যাইতেছে—ইঁহাদের ভক্তি প্রধানীভূতা বলিয়া স্ব-স্ব কাম্যবস্তু লাভের পরেও ভক্তির কৃপায় ইঁহারা ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত থাকেন ; তাহার ফলেই সালোক্যমোক্ষ লাভ করিতে পারেন। ফল-প্রাপ্তির পরে ভক্তিসাধনে প্রবৃত্ত না থাকিলে তাঁহাদের মোক্ষলাভ হইবে কিনা, সন্দেহ।

আর, চতুর্থ রকমের যে জ্ঞানী ভক্ত, প্রধানীভূতা ভক্তির প্রভাবে তাঁহারা সনকাদির ন্যায় শান্ত-রতি লাভ করিতে পারেন। ভক্তের এবং ভক্তবৎসল ভগবানের কারুণ্যাধিক্য-বশতঃ ইঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ প্রেমোৎকর্ষও লাভ করিতে পারেন ; যেমন শ্রীশুকদেব পাইয়াছিলেন।

জ্ঞানকর্ম্মাদিমিশ্রা ভক্তির সাধকগণ স্ব-স্ব স্বভাববশতঃ, কিম্বা দাস্যাদিভাবের ভক্তের সঙ্গ হইতে উত্থিত বাসনাবশতঃ ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান প্রেমও লাভ করিতে পারেন।

আর্ত্তাদি চতুর্ব্বিধ ভক্তসম্বন্ধে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

"এই চারি সুকৃতি হয়ে মহাভাগ্যবান্। তত্তৎ কামাদি ছাড়ি মাগে শুদ্ধভক্তিদান॥
সাধুসঙ্গ কিবা কৃষ্ণের কৃপায়। কামাদি দুঃসঙ্গ ছাড়ি শুদ্ধভক্তি পায়॥

শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।৬৮-৬৯॥"

(৩) কর্ম্মজ্ঞানাদির সহিত সংস্রবশূন্যা কেবলা ভক্তির (অর্থাৎ শুদ্ধা, বা অনন্যা, বা অকিঞ্চনা, বা উত্তমা ভক্তির) ফল হইতেছে দাস-সখাদি পার্ষদরূপে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা-প্রাপ্তি।

এইরূপে দেখা গেল—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী-উদ্দেশ্যভেদে বা বাসনাভেদে এই চারি রকমের ভক্ত ব্যতীত পঞ্চম প্রকারেরও ভক্ত আছেন। এই পঞ্চম প্রকারের ভক্তের বা সাধকের একমাত্র কাম্য হইতেছে দাস-সখাদি পার্ষদরূপে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা, কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। এই পঞ্চম প্রকারের ভক্ত বা সাধক স্বর্গাদি চাহেন না, এমন কি মোক্ষাদিও চাহেন না। তাঁহারা গুণীভূতা ভক্তির সাধক নহেন, প্রধানীভূতা ভক্তির সাধকও নহেন ; তাঁহারা হইতেছেন অনন্যাভক্তির সাধক।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতে এই অনন্যা ভক্তির কথাও যে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, চক্রবর্ত্তিপাদের উল্লিখিত টীকাতে তাহার প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

এইরূপে, গীতা হইতেই উদ্দেশ্যভেদে পাঁচ রকমের সাধকের কথা জানা গেল—আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী, জ্ঞানী এবং অনন্যভক্ত বা প্রেমসেবাপ্রার্থী।

২৬। সাধনে প্রবর্ত্তক কারণের ভেদে সাধক-ভক্তভেদ

ভক্তিমার্গের সাধকদের মধ্যে দুইটী শ্রেণী দৃষ্ট হয়। এক শ্রেণীর সাধক ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন শাস্ত্রবিধির ভয়ে। ইঁহাদের ভজন-পন্থাকে বলা হয় বিধিমার্গ—বিধিপ্রবর্ত্তিত সাধনমার্গ। ভগবানের প্রতি প্রীতিবশতঃ ইঁহারা ভগবদ্ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন না। নিজেদের সংসার-যন্ত্রণা হইতে উদ্ধারের জন্যই ইঁহাদের ভজন। ইঁহাদের ভজনকে বৈধীভক্তি বলা হয়।

আর এক শ্রেণীর সাধক ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লোভবশতঃ। ইঁহাদের ভজনপন্থাকে বলা হয় রাগমার্গ। রাগ অর্থ অনুরাগ, আসক্তি, প্রীতি। রাগ-প্রবর্ত্তিত মার্গ—রাগমার্গ। ভগবানে ইঁহাদের প্রীতি আছে।

পরবর্ত্তী ৫।৪৪-৪৫ অনুচ্ছেদে বিধিমার্গ ও রাগমার্গের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

২৭। পরমধর্ম্ম-সাধনে অধিকারী

শ্রীমদ্ভাগবতের ১।১।২-শ্লোক হইতে জানা যায়—চতুর্ব্বিধ পুরুষার্থের বাসনা পরিত্যাগপূর্ব্বক একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা প্রাপ্তির—উদ্দেশ্যে যে ধর্ম্মের অনুষ্ঠান করা হয়, তাহাকে বলে পরমধর্ম্ম এবং ইহাও জানা যায় যে, একমাত্র নির্ম্মৎসর সাধুগণই এই পরমধর্ম্ম-যাজনের অধিকারী।

"ধর্ম্মঃ প্রোজ্ঝিতকৈতবোঽত্র পরমো নির্ম্মৎসরাণাম্ সতাম্।"—শ্রীভা, ১।১।২॥

—এই শ্রীমদ্ভাগবতে নির্ম্মৎসর সাধুদিগের প্রোজ্ঝিতকৈতব পরমধর্ম্মের বিষয় কথিত হইয়াছে।"

শ্রীধরস্বামিপাদ টীকায় লিখিয়াছেন—"প্রোজ্ঝিতকৈতব"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, পরমধর্ম্মে ধর্ম্ম, অর্থ, কাম তো দূরে, মোক্ষবাসনাও থাকিবে না, থাকিবে একমাত্র ভগবদারাধনার—ভগবৎসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী-সেবার—বাসনা। ইহাই অকিঞ্চনা বা শুদ্ধা ভক্তি।

টীকায় তিনি আরও লিখিয়াছেন—"অধিকারিতোঽপি ধর্ম্মস্য পরমত্বমাহ নির্ম্মৎসরাণাং পরোৎকর্ষাসহনং মৎসরঃ তদ্রহিতানাং সতাং ভূতানুকম্পিনাম্। (উদ্দেশ্যের দিক্ দিয়া এই ধর্ম্মের পরমত্ব তো আছেই, এই ধর্ম্ম যাজনের) অধিকারীর দিক্ দিয়াও ইহার যে পরমত্ব আছে, তাহাও শ্লোকে বলা হইয়াছে। মৎসরতাহীন ভূতানুগ্রাহক সাধুগণই এই ধর্ম্মযাজনের অধিকারী। মৎসর-শব্দে পরের উৎকর্ষের অসহন বুঝায়।"

যাহারা পরের উৎকর্ষ সহ্য করিতে পারে না, (অর্থাৎ যাহারা পরশ্রীকাতর) এবং প্রাণীদিগের প্রতি যাহাদের অনুকম্পা নাই, তাহারা এই পরমধর্ম্ম যাজনের অধিকারী নহে। যাহারা পরশ্রীকাতর নহে, সকল জীবের প্রতিই যাহাদের অনুকম্পা আছে, তাহারাই এই পরমধর্ম্ম যাজনের অধিকারী।

২৮। নির্ব্বেদাদি অবস্থাভেদে অধিকারিভেদ

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"যোগাস্ত্রয়ো ময়া প্রোক্তা নৃণাং শ্রেয়োবিধিৎসয়া।
জ্ঞানং কর্ম্ম চ ভক্তিশ্চ নোপায়োঽন্যোঽস্তি কুত্রচিৎ॥
নির্ব্বিণ্ণানাং জ্ঞানযোগো ন্যাসিনামিহ কর্ম্মসু।
তেষ্বনির্ব্বিণ্ণচিত্তানাং কর্ম্মযোগশ্চ কামিনাম্॥
যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যঃ পুমান্।
ন নির্ব্বিণ্ণো নাতিসক্তো ভক্তিযোগোঽস্য সিদ্ধিদঃ॥—শ্রীভা, ১১।২০।৬—৮॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) মনুষ্যদিগের শ্রেয়ঃ-সাধনেচ্ছায় আমি তিন রকমের যোগের কথা বলিয়াছি—জ্ঞানযোগ, কর্ম্মযোগ এবং ভক্তিযোগ। এতদ্ব্যতীত কল্যাণ-সাধনের আর কোনও উপায় কোথাও নাই। এই তিন প্রকার যোগের মধ্যে, যাঁহারা কর্ম্মে নির্ব্বিণ্ণ-ন্যাসী (অর্থাৎ যাঁহারা দুঃখবুদ্ধিতে কর্ম্মে এবং কর্ম্মফলে বিরক্ত এবং এজন্য যাঁহারা কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন), তাঁহাদের পক্ষে জ্ঞানযোগ সিদ্ধিপ্রদ। যাঁহারা কর্ম্ম ও কর্ম্মফলবিষয়ে দুঃখবুদ্ধিহীন, সুতরাং যাঁহারা কামী (কর্ম্ম-ফলাকাঙ্ক্ষী, সুতরাং) নির্ব্বিণ্ণ নহেন, তাঁহাদের পক্ষে কর্ম্মযোগই সিদ্ধিদ। আর, যাঁহারা কোনও-রূপ ভাগ্যোদয়-বশতঃ আমার কথাদিতে শ্রদ্ধাযুক্ত, কর্ম্ম ও কর্ম্মফলবিষয়ে যাঁহারা অত্যন্ত নির্ব্বিণ্ণও নহেন, অত্যন্ত আসক্তও নহেন, তাঁহাদের পক্ষে ভক্তিযোগই সিদ্ধিদ।"

টীকায় প্রথম শ্লোকোক্ত কর্ম্মযোগ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ শ্রীধরস্বামী লিখিয়াছেন—"কর্ম্ম চ নিষ্কামম্"

অর্থাৎ এ-স্থলে "কর্ম্ম"-শব্দে "নিষ্কাম কর্ম্মই" অভিপ্রেত। একথা বলার হেতু এই যে, তিনি "শ্রেয়"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"মোক্ষ"; নিষ্কাম কর্ম্মই মোক্ষের উপায়ভূত, সকাম কর্ম্ম নহে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অকিঞ্চনাখ্যায়া ভক্তেঃ সর্ব্বোর্দ্ধভূমিকাবস্থিতত্বং অধিকারি-বিশেষনিষ্ঠত্বঞ্চ দর্শয়িতুং প্রক্রিয়ান্তরম্। তত্র পরতত্ত্বস্য বৈমুখ্যপরিহারায় যথাকথঞ্চিৎ সান্মুখ্যমাত্রং কর্ত্তব্যত্বেন লভ্যতে। তচ্চ ত্রিধা। নির্ব্বিশেষরূপস্য তদীয়ব্রহ্মাখ্যাবির্ভাবস্য জ্ঞানরূপং সবিশেষরূপস্য চ তদীয়ভগবদাখ্যাবির্ভাববিশেষস্য ভক্তিরূপমিতি দ্বয়ম্। তৃতীয়ঞ্চ তস্য দ্বয়স্যৈব দ্বারং কর্ম্মার্পণরূপম্। * * শ্রেয়াংসি মুক্তিত্রিবর্গ-প্রেমাণি। অনেন ভক্তেঃ কর্ম্মত্বং ব্যাবৃত্তম্।"

শ্রীজীবপাদের টীকার তাৎপর্য্য এইরূপ। অকিঞ্চনা (বিশুদ্ধা) ভক্তি যে সর্ব্বভূমিকার ঊর্দ্ধে অবস্থিত এবং তাহার অধিকারীরও যে একটা বিশেষত্ব আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত অন্য এক প্রক্রিয়ার কথা বলা হইয়াছে। সেই প্রাক্রয়াতে, পরতত্ত্বসম্বন্ধে বৈমুখ্যপরিহারের নিমিত্ত যথাকথঞ্চিৎ সান্মুখ্যমাত্রই কর্ত্তব্যরূপে পাওয়া যায়। তাহা তিন রকমের জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্ম। ভগবানের ব্রহ্মনামক নির্ব্বিশেষরূপ আবির্ভাবের সান্মুখ্যের জন্য জ্ঞান, ভগবন্নামক তাঁহার সবিশেষরূপের সান্মুখ্যের জন্য ভক্তি—এই দুইটী প্রকার। আর, তৃতীয়টী হইতেছে উল্লিখিত প্রকারদ্বয়ের (জ্ঞানের ও ভক্তির) দ্বারস্বরূপ কর্ম্মার্পণ। শ্রেয়ঃ বলিতে মুক্তি. ত্রিবর্গ (ধর্ম্ম অর্থ, কাম) এবং প্রেমকে বুঝায়। ভক্তি যে কর্ম্ম নহে, এই শ্লোকে তাহাও বলা হইয়াছে (কেননা, জ্ঞান, কর্ম্ম ও ভক্তি—এই তিনের পৃথক্ পৃথক্ ভাবে উল্লেখ করা হইয়াছে)।

প্রথম শ্লোকস্থ কর্ম্ম বা কর্ম্মযোগ হইতেছে—শ্রীধরস্বামীর মতে "নিষ্কাম কর্ম্ম" এবং শ্রীজীবের মতে "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ।" শ্রীজীবের মতে, "কৃষ্ণে কর্ম্মার্পণ" হইতেছে জ্ঞান ও ভক্তির দ্বারস্বরূপ, অর্থাৎ প্রথমে কর্ম্মার্পণরূপ অনুষ্ঠান করিলেই জ্ঞানযোগ ও ভক্তিযোগের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়। কর্ম্ম (কর্ম্মার্পণ), জ্ঞান এবং ভক্তি-এই তিনটী হইতেও তিনি "অকিঞ্চনা ভক্তি"কে ঊর্দ্ধে স্থান দিয়াছেন। ইহাতে বুঝা যায়, এ-স্থলে যে "ভক্তিযোগ" কথিত হইয়াছে, তাহা "অকিঞ্চনা বা শুদ্ধা ভক্তি" লাভের উপায় নহে, তাহা হইতেছে যেন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র-ভক্তিযোগই। তাঁহার উক্তি হইতে ইহাও বুঝা যায় যে, কর্ম্ম, জ্ঞান ও ভক্তি (ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রভক্তিযোগ)—এই তিনের দ্বারা "যথাকঞ্চিৎ ভগবৎ-সান্মুখ্যই" লাভ হয়, পূর্ণতম সান্মুখ্য লাভ হইতে পারে একমাত্র অকিঞ্চনা ভক্তিতে। সম্পূর্ণ বৈমুখ্য দূর করিবার অভিপ্রায়েই যথাকথঞ্চিৎ-সান্মুখ্য-বিধায়ক জ্ঞানযোগাদির উপদেশ করা হইয়াছে। শাস্ত্রকথিত নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মে শক্তি-আদির ন্যূনতম বিকাশ এবং অন্য ভগবৎস্বরূপেও শক্তি-আদির আংশিক বিকাশ বলিয়াই তাঁহাদের সাক্ষাৎকারে পূর্ণ সান্মুখ্যের অভাব। পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণে শক্তি-আদির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহার সাক্ষাৎকারেই পূর্ণতম সান্মুখ্য। ইহাই শ্রীজীবপাদের উক্তির তাৎপর্য্য।

তিনি অকিঞ্চনা ভক্তির অধিকারীর বিশেষত্বের কথাও বলিয়াছেন। পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে—সেই বিশেষত্ব হইতেছে নির্ম্মৎসরতা এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য লোভ।

উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের "নির্ব্বিণ্ন" এবং "ন্যাসী"-এই শব্দদ্বয়ের অর্থে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কর্ম্মসু নির্ব্বিণ্নানাং দুঃখবুদ্ধ্যা তৎফলেষু বিরক্তানাম্। অতএব তৎসাধনভূতকর্ম্ম-ন্যাসিনাং জ্ঞানযোগঃ।—কর্ম্মে দুঃখবুদ্ধিবশতঃ কর্ম্মফলবিষয়ে বিরক্ত এবং তজ্জন্য সেই ফলসাধক কর্ম্মত্যাগকারীদের জ্ঞানযোগ।" শ্রীজীবপাদও একটু পরিস্ফুটভাবে তাহাই লিখিয়াছেন। "ঐহিক-পারলৌকিকবিষয়প্রতিষ্ঠাসুখেষু বিরক্তচিত্তানাম্, অতএব তৎসাধনলৌকিক-বৈদিক-কর্ম্মসন্ন্যাসিনাম্।—ঐহিক এবং পারলৌকিক সুখবিষয়ে বিরক্তচিত্তদিগের এবং তজ্জন্য তত্তৎসুখের সাধন লৌকিক ও বৈদিক কর্ম্মত্যাগীদিগের।"

"যদৃচ্ছয়া"-শব্দের অর্থে স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কেনাপি ভাগ্যোদয়েন—কোনওরূপ সৌভাগ্যের উদয়ে"; আর শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"কেনাপি পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্‌ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত-মঙ্গলোদয়েন।—পরমস্বতন্ত্র ভগবদ্‌ভক্তের সঙ্গ এবং তাঁহার কৃপা হইতে জাত কোনও মঙ্গলের (সৌভাগ্যের) উদয়ে।" একমাত্র পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্‌ই হইতেছেন পরমস্বতন্ত্র—অন্যনিরপেক্ষ—ভগবান্। তাঁহার প্রেমসেবাব্যতীত অন্য কামনা যাঁহাদের নাই, তাঁহারাই পরমস্বতন্ত্রভগবদ্‌ভক্ত। বস্তুতঃ এতাদৃশ ভক্তের সঙ্গ এবং কৃপা ব্যতীত ভগবৎ-কথার শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে না। শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায়। "শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ। স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবণাৎ॥ শ্রীভা, ১।২।১৬॥—শৌনকাদি ঋষিদিগের নিকটে শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন—হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থ-নিষেবনের ফলে নিষ্পাপ লোকের ভাগ্যে মহৎসেবা লাভ হয়; তাহা হইতেই মহতের ধর্ম্মে শ্রদ্ধা জন্মে। শ্রদ্ধা জন্মিলেই ভগবৎকথা-শ্রবণে ইচ্ছা জন্মে, শ্রবণের ফলে ভগবৎ-কথায় রুচি জন্মে (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলেন—নির্ব্বেদের কারণ হইতেছে নিষ্কাম-কর্ম্ম-হেতুক অন্তঃকরণ-শুদ্ধি; অত্যাসক্তির কারণ—অনাদি অবিদ্যা; এবং অত্যাসক্তি-রাহিত্যের কারণ—যাদৃচ্ছিক মহৎসঙ্গ।

২৯। কর্ম্মত্যাগের অধিকারী

এই প্রসঙ্গে উদ্ধবের নিকটে ভগবান্ কর্ম্মত্যাগের অধিকারের কথাও বলিয়াছেন।

"তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্ব্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে॥ শ্রীভা, ১১।২০।৯॥

—যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ অবস্থা না জন্মে, কিম্বা আমার কথা শ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সে-পর্য্যন্ত নিত্য-নৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম করিবে।"

যাঁহার নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তাঁহারও কর্ম্মে অধিকার নাই, ভগবৎ-কথাদি শ্রবণাদিতে যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে, তাঁহারও কর্ম্মে অধিকার নাই। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী টীকায় বলিয়াছেন- শ্রদ্ধা চেয়মাত্যন্তিক্যেব জ্ঞেয়া, সা চ ভগবৎকথাশ্রবণাদিভিরেব কৃতার্থীভবিষ্যামীতি, ন তু কর্ম্মজ্ঞানাদি-ভিরিতি দৃঢ়ৈবাস্তিক্যলক্ষণৈব তাদৃশশুদ্ধভক্তসঙ্গোদ্ভূতৈব জ্ঞেয়া।—এ-স্থলে শ্রদ্ধাশব্দে আত্যন্তিকী

শ্রদ্ধার কথাই বলা হইয়াছে। 'ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতেই আমি কৃতার্থতা লাভ করিতে পারিব, কর্ম্ম-জ্ঞানাদিদ্বারা পারিবনা'—এইরূপ যে দৃঢ়া এবং আস্তিক্যলক্ষণা শ্রদ্ধা, তাহাই হইতেছে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা ; এইরূপ আত্যন্তিকী শ্রদ্ধাবিশিষ্ট শুদ্ধভক্তের সঙ্গ হইতেই এই আত্যন্তিকী শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—স্মৃতিশ্রুতিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মও তো ভগবানেরই আদেশ। তাহার লঙ্ঘনে কি কোনও প্রত্যবায় হইবে না ? বিশেষতঃ শ্রীভগবান্ই বলিয়াছেন—"শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে যস্তে উল্লঙ্ঘ্য বর্ত্ততে। আজ্ঞাচ্ছেদী মম দ্বেষী মদ্ভক্তোঽপি ন বৈষ্ণবঃ॥—শ্রুতি ও স্মৃতি আমারই আজ্ঞা ; যে আমার সেই আজ্ঞা লঙ্ঘন করে, সে আজ্ঞাচ্ছেদী, আমার দ্বেষকারক ; আমার ভক্ত হইলেও সে বৈষ্ণব নহে।" এই অবস্থায় শ্রুতিস্মৃতিবিহিত কর্ম্মত্যাগে প্রত্যবায় হওয়ারই তো কথা।

ইহার উত্তরে শ্রীজীবপাদ এবং চক্রবর্ত্তিপাদ বলিয়াছেন—"শ্রুতিস্মৃতী মমৈবাজ্ঞে" ইত্যাদি বাক্যের অনুসরণে নির্ব্বিণ্ণ এবং শ্রদ্ধালুর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ না করিলেই দোষ হইবে, কর্ম্মত্যাগ করিলে দোষ হইবে না। কেননা, যাহার নির্ব্বেদ বা শ্রদ্ধা জন্মে নাই, তাহার পক্ষেই কর্ম্ম-করণের ব্যবস্থা। নির্ব্বেদ বা শ্রদ্ধা জন্মিলে যে কর্ম্ম ত্যাগ করিতে হইবে, ইহাও ভগবানেরই আজ্ঞা ; এই আজ্ঞা পালন না করিলেই নির্ব্বিণ্ণ বা শ্রদ্ধালুর পক্ষে আজ্ঞালঙ্ঘনরূপ দোষ হইবে। শাস্ত্রে অধিকারিবিশেষের জন্য অধিকার-বিশেষ বিহিত হইয়াছে। কর্ম্মত্যাগের কথা ভগবান্ অন্যত্রও বলিয়াছেন।

"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্।
ধর্ম্মান্ সংত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স চ সত্তমঃ ॥—শ্রীভা, ১১।১১।৩২ ॥

—শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—গুণ এবং দোষ সম্যক্‌রূপে জানিয়া যিনি আমার আদিষ্ট স্বধর্ম্মসমূহকেও সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া আমার ভজন করেন, তিনিও সত্তম।"

স্বধর্ম্মাচরণে চিত্তশুদ্ধি হইতে পারে—এইটী গুণ। স্বধর্ম্মাচরণে স্বর্গাদি-লাভও হইতে পারে ; কিন্তু স্বর্গাদি লাভ যেমন হইতে পারে, স্বর্গ হইতে স্খলিত হইতে হয় বলিয়া, নরকগমনও তেমনি হইতে পারে ; আবার, বাসনার তাড়নায় চিত্ত নানা দিকে ধাবিত হয় বলিয়া ভগবদ্ধ্যানেরও বিঘ্ন জন্মে। এসমস্ত হইতেছে দোষ। কিন্তু ভগবদ্ভজনে সমস্তই পাওয়া যাইতে পারে—এইরূপ বিচার করিয়া যিনি দৃঢ়নিশ্চয় হইয়াছেন, তিনি বেদবিহিত নিত্যনৈমিত্তিকাদি সমস্ত স্বধর্ম্ম সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া যদি ভগবদ্ভজন করেন, তাহা হইলে তিনিও সত্তম। "ধর্ম্মাচরণে সত্ত্বশুদ্ধ্যাদীন্ গুণান্ বিপক্ষে নরকপাতাদীন্ দোষাংশ্চ আজ্ঞায় জ্ঞাত্বাপি মদ্ধ্যানবিক্ষেপতয়া মদ্ভক্ত্যৈব সর্ব্বং ভবিষ্যতীতি দৃঢ়নিশ্চয়েনৈব ধর্মান্ সংত্যজ্য ॥ শ্রীধর স্বামিপাদ।"

উল্লিখিত শ্লোকে "স চ সত্তমঃ—তিনিও সত্তম"-বাক্যে "চ—ও"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—পূর্ব্ববর্ত্তী তিনটী শ্লোকে সত্তমের লক্ষণে "কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, তিতিক্ষু, সত্যসার-"ইত্যাদি গুণের কথা বলা হইয়াছে। সে-সমস্ত গুণের অধিকারী না হইলেও যিনি স্বধর্ম্মাদির দোষগুণ বিচার করিয়া,

ভক্তির মহিমার কথা জানিয়া, সমস্ত স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক ভগবদ্‌ভজন করেন, তিনিও যে সত্তম, ইহাই আলোচ্য শ্লোকে বলা হইয়াছে।

এ-স্থলে ভগবৎকথা-শ্রবণাদির মাহাত্ম্যে আত্যন্তিকী শ্রদ্ধাই হইতেছে মূল হেতু। এইরূপ শ্রদ্ধা যাঁহার আছে, অথবা যাঁহার সম্পূর্ণরূপে নির্ব্বেদ জন্মিয়াছে, তিনিই কর্ম্মত্যাগে অধিকারী। অধিকারী বলিয়া কর্ম্মত্যাগে তাঁহার কোনওরূপ প্রত্যবায় হইবেনা, বরং উল্লিখিতরূপ অধিকারী যদি স্বীয় অধিকারের অনুকূল সাধন-ভজনের জন্য কর্ম্মত্যাগ না করেন, তাহা হইলেই তাঁহার পক্ষে দোষ হইবে।

কর্ম্মত্যাগের কথা শ্রুতিতেও দৃষ্ট হয়।

"বর্ণাশ্রমাচারযুতা বিমূঢ়াঃ কর্ম্মানুসারেণ ফলং লভন্তে। বর্ণাদিধর্ম্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি ॥ মৈত্রেয়ীশ্রুতি ॥ ১।১৩ ॥—বর্ণাশ্রমাচারযুক্ত বিমূঢ়গণ কর্ম্মানুসারেই ফল পাইয়া থাকেন। যাঁহারা বর্ণাদিধর্ম্ম পরিত্যাগ করেন, তাঁহারাই স্বানন্দতৃপ্ত হইতে পারেন।"

কর্ম্মত্যাগের অধিকার লাভ করিয়া তাহার পরে কর্ম্মত্যাগ করিয়া ভগদ্‌ভজন করিলেই স্বানন্দতৃপ্ত হওয়া যায়। ভজন না করিলে তাহা সম্ভব হইতে পারেনা।

সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ ॥ গীতা ॥ ১৮।৬৬ ॥—সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণাপন্ন হও।"

এইরূপ করিলেই শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি হইতে পারে। "মামেবৈষ্যসি—কৃষ্ণোক্তি ॥ গীতা ॥ ১৮।৬৫ ॥"

ক। অনধিকারীর পক্ষে কর্ম্মত্যাগ অবিধেয়

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে পরিষ্কার ভাবেই জানা গেল, কর্ম্মত্যাগ-সম্বন্ধে অধিকার-বিচার আছে ; যিনি কর্ম্মত্যাগের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছেন, তাঁহার পক্ষেই কর্ম্মত্যাগ বিধেয়, অপরের পক্ষে বিধেয় নহে। "তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত"-বাক্যে পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত ১১।২০।৯-শ্লোকে তাহাই বলা হইয়াছে। কর্ম্মত্যাগের অধিকার হইতেছে—চিত্তের একটা অবস্থা-প্রাপ্তি—যে অবস্থায় নির্বেদ জন্মে, বা ভগবৎ-কথাশ্রবণাদিতে শ্রদ্ধা জন্মে, সেই অবস্থা-প্রাপ্তি। যাঁহার চিত্তের এই অবস্থা জন্মে, তিনি স্বীয় অবস্থার অনুকূল ভজন-পন্থা অবলম্বনের জন্যই কর্ম্মত্যাগ করেন। কিন্তু যাঁহার সেই অবস্থা জন্মে নাই, তিনিও যদি কর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাহা হইলে তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে প্রবাহিত হইয়া যাইতে হইতে পারে। একথা বলার হেতু এই। সাধন-ভজনের অনুকূল অবস্থা চিত্তে জাগ্রত হয় নাই বলিয়া তিনি সাধন-ভজনেও প্রবৃত্ত হইবেন না ; আবার কর্ম্ম বা বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মত্যাগ করার ফলে তাঁহাকে বেদের গণ্ডীর বাহিরে যাইতে হইবে। বেদের আশ্রয়ে থাকিয়া স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান করিলে ক্রমশঃ চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা থাকে ; কিন্তু বেদের আশ্রয় ত্যাগ করিলে সেই সম্ভাবনা হইতেও দূরে সরিয়া যাইতে হয়। তখন হয়তো তাঁহাকে উচ্ছৃঙ্খলতার

স্রোতেই ভাসিয়া যাইতে হইবে। বেদের আনুগত্যে বর্ণাশ্রমধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া থাকিলে কোনও সৌভাগ্যের উদয়ে বেদের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিতে পারে, বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম অপেক্ষা উৎকর্ষময় অপর কোনও ধর্ম্মের সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাও মনে জাগিতে পারে; তখন "আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান"-ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত ভাগবত-শ্লোকের উক্তির অনুরূপ বিচারের সৌভাগ্যও জন্মিতে পারে। কিন্তু বেদের আশ্রয় ত্যাগ করিলে সেই সম্ভাবনাও তিরোহিত হইয়া যায়।

বস্তুতঃ বৈদিক সমাজের ভিত্তিই হইতেছে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম বা বেদবিহিত কর্ম্ম। দেহাত্মবুদ্ধি সংসারী লোক দেহের সুখভোগই চাহেন। বেদবিহিত কর্ম্মের বা বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুসরণে ইহকালের বা পরকালের দেহের সুখভোগাদি লাভও হইতে পারে এবং কোনও ভাগ্যোদয়ে বেদে দৃঢ়বিশ্বাস জন্মিলে জীবস্বরূপের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্যের জন্য অনুসন্ধিৎসাও জাগিতে পারে। অনধিকারী ব্যক্তি বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ত্যাগের ব্যপদেশে বেদের আশ্রয় ত্যাগ করিলে তাঁহার সমস্ত সম্ভাবনাই অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। এজন্যই পরমকরুণ শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন,

তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত ন নির্বিদ্যেত যাবতা।
মৎকথাশ্রবণাদৌ বা শ্রদ্ধা যাবন্ন জায়তে ॥ শ্রীভা, ১১।২০।৯ ॥

খ। কর্ম্মত্যাগ দ্বিবিধ

কর্ম্মত্যাগ দুই রকমের হইতে পারে। প্রথমতঃ, কর্ম্মফলের ত্যাগ, অনুষ্ঠান রক্ষা; ইহা কেবল আংশিক কর্ম্মত্যাগমাত্র। দ্বিতীয়তঃ, কর্ম্মের ফলত্যাগ এবং অনুষ্ঠানেরও ত্যাগ; ইহাই কর্ম্মের পূর্ণ ত্যাগ, সম্যক্ ত্যাগ।

যাঁহারা শুদ্ধা ভক্তিতে অনধিকারী, তাঁহাদের জন্যই অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ কর্ম্মফল-ত্যাগের কথা বলিয়াছেন।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপস্যসি কৌন্তেয় তৎ কুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥ গীতা ॥ ৯।২৭ ॥

—হে কৌন্তেয়! তুমি যাহা কিছু কার্য্য কর, যাহা ভক্ষণ কর, যে হোম কর, যে দান কর এবং যে তপস্যা কর, সেই সমস্ত আমাতে অর্পণ কর।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ভো অর্জ্জুন! সাম্প্রতং তাবত্তব কর্ম্মজ্ঞানাদীনাং ত্যক্তুমশক্যত্বাৎ সর্ব্বোৎকৃষ্টায়াং কেবলায়ামনন্যভক্তৌ নাধিকারঃ, নাপি নিকৃষ্টায়াং সকামভক্তৌ; তস্মাত্ত্বং নিষ্কামাং জ্ঞানকর্ম্মমিশ্রাং প্রধানীভূতামেব ভক্তিং কুর্ব্বিত্যাহ যৎকরোষীতি দ্বাভ্যাম্।—হে অর্জ্জুন! সম্প্রতি তুমি কর্ম্মজ্ঞানাদি ত্যাগ করিতে অসমর্থ বলিয়া সর্ব্বোৎকৃষ্টা কেবলা অনন্যাভক্তিতে অধিকারী নহ; নিকৃষ্টা সকামা ভক্তিতেও তোমার রুচি নাই। সুতরাং তুমি নিষ্কামা জ্ঞানকর্ম্মমিশ্রা প্রধানীভূতা ভক্তিরই আচরণ কর: কিরূপে তাহা করা যায় —'যৎ করোষি'-ইত্যাদি শ্লোকদ্বয়ে তাহা বলা হইয়াছে।" উল্লিখিতরূপে কর্ম্মার্পণের ফল কি,

পরবর্ত্তী শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণ তাহাও বলিয়াছেন—"শুভাশুভফলৈরেবং মোক্ষ্যসে কর্ম্মবন্ধনৈঃ। সংন্যাসযোগযুক্তাত্মা বিমুক্তো মামুপৈষ্যসি॥ গীতা॥ ৯।২৮॥—এইরূপ করিলে শুভাশুভফলরূপ কর্ম্মবন্ধন হইতে তুমি মুক্তি লাভ করিবে এবং সন্ন্যাস (কর্ম্মফলত্যাগ)-রূপ যোগদ্বারা সমাহিতচিত্ত হইয়া আমাকে প্রাপ্ত হইবে।"

"যৎ করোষি"—ইত্যাদি ৯।২৭ - গীতাশ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—এই শ্লোকে কথিত কর্ম্মত্যাগ নিষ্কাম-কর্ম্মযোগও নহে, ভক্তিযোগও নহে। ইহা নিষ্কাম-কর্ম্মযোগ কেন নহে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন—নিষ্কাম-কর্ম্মযোগে ভগবানে শাস্ত্রবিহিত কর্ম্মের অর্পণই বিধেয়, ব্যবহারিক কর্ম্মের অর্পণের উপদেশ নাই; অথচ, এই শ্লোকে, লৌকিক বা বৈদিক যাহা কিছু কর্ম্ম করা যায়, যাহা কিছু আহার করা যায়, তৎসমস্ত ব্যবহারিক কর্ম্মার্পণের উপদেশও আছে। আর ইহা ভক্তিযোগ কেন নহে, তৎসম্বন্ধে তিনি বলেন—অনন্যা ভক্তিতে অনুষ্ঠানের পর অর্পণের বিধি নাই, অর্পণের পরে অনুষ্ঠানের বিধি (অর্থাৎ ভগবৎ-প্রীত্যর্থেই সমস্ত অনুষ্ঠানের বিধি) বিহিত হইয়াছে। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥ ইতি পুংসর্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা।"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদও লিখিয়াছেন—"বিষ্ণৌ অর্পিতা ভক্তিঃ ক্রিয়তে, নতু কৃত্বা পশ্চাদর্প্যত ইতি।—বিষ্ণুতে অর্পিতা ভক্তিরই অনুষ্ঠান করিবে; অনুষ্ঠানের পরে অর্পণ নহে।" ইহাই শুদ্ধাভক্তির লক্ষণ। আলোচ্য গীতাশ্লোকের বিধান হইতেছে—অনুষ্ঠানের পরে অর্পণ; এজন্য ইহা ভক্তিযোগ নহে।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—যাঁহারা শুদ্ধাভক্তির অধিকারী নহেন, তাঁহাদের জন্যই ফলত্যাগপূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের বিধান। ইহা হইতেছে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি, ইহাতে ভক্তি প্রধানীভূতা; কর্ম্মের প্রাধান্য নাই; কেননা, কর্ম্মফল লাভের আকাঙ্ক্ষা নাই। ইহা হইতেছে —দ্বিবিধ কর্ম্মত্যাগের প্রথম রকমের ত্যাগ—আংশিক কর্ম্মত্যাগ। কেবল কর্ম্মফলের ত্যাগ, অনুষ্ঠানের ত্যাগ নহে।

আর, যাঁহারা সর্ব্বোত্তমা শুদ্ধাভক্তির বা অনন্যাভক্তির অধিকারী, তাঁহাদের জন্যই শ্রীকৃষ্ণ "মন্মনা ভব মদ্ভক্তঃ"—ইত্যাদি বাক্য বলিয়াছেন এবং তাঁহাদের জন্যই তিনি বলিয়াছেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ॥ গীতা॥ ১৮।৬৬॥—সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর।" এস্থলে "সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগের" তাৎপর্য্য কি?

এই শ্লোকের টীকায় বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"ন চ পরিত্যজ্য ফলত্যাগ এব তাৎপর্য্যমিতি ব্যাখ্যেয়মস্য বাক্যস্য।—এই বাক্যে 'পরিত্যজ্য'-শব্দের তাৎপর্য্য কেবল ফলত্যাগমাত্র নহে।" এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের "দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাম্"-ইত্যাদি, "মর্ত্ত্যো যদা

ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা”-ইত্যাদি, “আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্”-ইত্যাদি, “তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত”-ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছেন যে, কেবল কর্ম্মের ফলত্যাগ নহে, অনুষ্ঠানের ত্যাগও গীতোক্ত “পরিত্যজ্য”-শব্দের তাৎপর্য্য। তিনি বলেন—“পরি”-শব্দের তাৎপর্য্যেও অনুষ্ঠান-ত্যাগ সূচিত হইতেছে। এই শ্লোকে শরণাগতির কথা বলা হইয়াছে। শরণাগতের নিজের কর্তৃত্ব কিছু থাকিতে পারেনা। চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন—“নন্থু যোহি যচ্ছরণো ভবতি, স হি মূল্যক্রীতঃ পশুরিব তদধীনঃ, সঃ তং যৎকারয়তি তদেব করোতি, যত্র স্থাপয়তি তত্রৈব তিষ্ঠতি, যদ্ভোজয়তি তদেব ভুঙ্‌তে ইতি শরণাপত্তিলক্ষণস্য ধর্ম্মস্য তত্ত্বম্।—যিনি যাঁহার শরণ গ্রহণ করেন, তিনি মূল্যক্রীত পশুর মতই তাঁহার অধীন হয়েন। তিনি (শরণ্যব্যক্তি) যাহা করায়েন, তিনি তাহাই করেন; যাহা খাওয়ান, তিনি তাহাই খায়েন; যেখানে তাঁহাকে রাখেন, সেখানেই তিনি থাকেন। ইহাই হইতেছে শরণাপত্তিলক্ষণ-ধর্ম্মের তত্ত্ব।” এই উক্তির সমর্থনে চক্রবর্ত্তিপাদ “আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পং প্রাতিকূল্যবিবর্জ্জনম্”-ইত্যাদি বায়ুপুরাণের প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী এবং শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণের টীকার তাৎপর্য্যও উল্লিখিতরূপই।

“মামেব শরণং ব্রজ”-বাক্যের অর্থে চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—“একং মাং শরণং ব্রজ, ন তু ধর্ম্মজ্ঞানযোগং দেবতান্তরাদিকমিত্যর্থঃ—একমাত্র আমারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) শরণ গ্রহণ কর, ধর্ম্মজ্ঞান-যোগের বা দেবতান্তরাদির শরণ গ্রহণ করিবেনা।” ধর্ম্মজ্ঞানযোগের শরণ নিষিদ্ধ হওয়ায় তাহার অনুষ্ঠানও নিষিদ্ধ হইল। শ্রীপাদ বলদেববিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—“সর্ব্বান্ পরিত্যজ্য স্বরূপতস্ত্যক্ত্বা মাং সর্ব্বেশ্বরং কৃষ্ণং নৃসিংহদাশরথ্যাদিরূপেণ বহুধাবির্ভূতং বিশুদ্ধভক্তিগোচরং সন্তমবিদ্যাপর্য্যন্তসর্ব্বকাম-বিনাশকমেকং, ন তু মত্তোঽন্যং শিতিকণ্ঠাদিকং শরণং ব্রজ প্রপদ্যস্ব।—সমস্ত ধর্ম্ম স্বরূপতঃ পরিত্যাগ করিয়া—যিনি নৃসিংহ-রামচন্দ্রাদি বহুরূপে আবির্ভূত হইয়াছেন, যিনি একমাত্র বিশুদ্ধা ভক্তির গোচর, যিনি অবিদ্যা পর্য্যন্ত-সর্ব্বকাম-বিনাশক, সেই সর্ব্বেশ্বর আমার—শ্রীকৃষ্ণের—শরণ গ্রহণ কর, আমা হইতে অন্য শিতিকণ্ঠাদির শরণ গ্রহণ করিবে না।”

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—শুদ্ধা ভক্তির (শুদ্ধভক্তি-যাজনের) অধিকারী হইয়া যাঁহারা সর্ব্বেশ্বর স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে বর্ণাশ্রমাদি-ধর্ম্মের স্বরূপতঃ ত্যাগ—অর্থাৎ ফলত্যাগ এবং অনুষ্ঠান-ত্যাগও—বিধেয়। ইহাই উল্লিখিত দ্বিবিধ-কর্ম্মত্যাগের মধ্যে দ্বিতীয় প্রকারের, সম্যক্ কর্ম্মত্যাগের, তাৎপর্য্য।

শ্রীপাদ রামানুজের উক্তির আলোচনা

“সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য”-ইত্যাদি গীতা (১৮।৬৬)-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ রামানুজ বলিয়াছেন—“ফলসঙ্গ-কর্তৃত্বাদিপরিত্যাগেন পরিত্যজ্য মামেকমেব কর্ত্তারমারাধয়—ফলসঙ্গ এবং কর্তৃত্বাদি পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র কর্ত্তা আমারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) আরাধনা কর।” তিনি আরও বলিয়াছেন—ইহাই (অর্থাৎ ফলসঙ্গ বা কর্ম্মফলে আসক্তি ত্যাগ এবং কর্তৃত্বাভিমানত্যাগই) সমস্ত

ধর্ম্মের শাস্ত্রীয় ত্যাগ। ইহার প্রমাণরূপে তিনি গীতার ১৮।৪ হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮।১১ পর্য্যন্ত শ্লোকগুলির উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-বাক্যের মর্ম্ম হইতেছে এই যে—শাস্ত্রবিহিত "যজ্ঞ-দান-তপঃকর্ম্ম" সমস্তই করিবে; কিন্তু এ-সমস্তের ফলের প্রতি যেন আকাঙ্ক্ষা না থাকে এবং এ-সমস্তের অনুষ্ঠানের সময়ে কর্ত্তৃত্বাভিমানও যেন না থাকে। তাঁহার মতে—কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান-ত্যাগ বিধেয় নহে, ফলত্যাগ এবং কর্ত্তৃত্বাভিমান-ত্যাগই বিধেয়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। গীতার সর্ব্বশেষ অষ্টাদশ অধ্যায়ে শ্রীকৃষ্ণ "মোক্ষযোগ" কীর্ত্তন করিয়াছেন। তিনি দুই রকম মোক্ষের কথা বলিয়াছেন—প্রথমতঃ, পরা-শান্তি-প্রাপ্তি এবং শাশ্বত-স্থান (ধাম)-প্রাপ্তি। "তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্॥ ১৮।৬২॥"; দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮।৬৫॥"

গীতার ১৮।৪ শ্লোক হইতে ১৮।৬২ শ্লোক পর্য্যন্ত উপদেশ-সমূহে শ্রীকৃষ্ণ প্রথম প্রকারের মোক্ষের কথা বলিয়া তাহার পরে বলিয়াছেন "ইতি তে জ্ঞানমাখ্যাতং গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং ময়া॥ ১৮।৬৩॥ —এই সকল বাক্যে আমি তোমাকে (অর্জ্জুনকে) গুহ্য হইতে গুহ্যতর জ্ঞানের উপদেশ দিলাম।" এই প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"যজ্ঞ, দান, তপস্যা, কর্ম্ম ত্যাজ্য নহে, অবশ্যকর্ত্তব্য; কেননা, এ-সমস্ত হইতেছে চিত্তশুদ্ধিজনক (১৮।৫॥); কিন্তু এ-সমস্ত কর্ম্মও ফলাসক্তি-ত্যাগপূর্ব্বকই কর্ত্তব্য (১৮।৬)।" ইহার পরে—যথাক্রমে তিনি তামসিক ত্যাগ, রাজসিক ত্যাগ এবং সাত্ত্বিক ত্যাগের লক্ষণ বলিয়াছেন। পরে তিনি—সাত্ত্বিক জ্ঞান, রাজসিক জ্ঞান এবং তামসিক জ্ঞানের কথা; পরে আবার সাত্ত্বিক, রাজসিক ও তামসিক কর্ম্মের কথা; সাত্ত্বিক, রাজসিক, তামসিক কর্ত্তার কথা; সাত্ত্বিকী, রাজসিকী ও তামসী বুদ্ধির কথা; সাত্ত্বিকী, রাজসিকী, ও তামসী ধৃতির কথা; সাত্ত্বিক, রাজসিক এবং তামসিক সুখের কথা; ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র এই চারিবর্ণের গুণানুসারে স্বাভাবিক কর্ম্মের কথা; নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধির কথা; নৈষ্কর্ম্ম্যসিদ্ধিপ্রাপ্ত লোকের কিরূপে ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইতে পারে, সেই কথা; ভক্তির প্রভাবে তাঁহাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) তত্ত্বতঃ জানিতে পারিলে যে তাঁহাতে প্রবেশ লাভ করা যায়, তাহার কথা; তাঁহার আশ্রিত সাধকগণ তাঁহাতে সমস্ত কর্ম্ম অর্পণ করিলে যে অব্যয় শাশ্বত পদ লাভ করিতে পারে, তাহার কথা—বলিয়া সর্ব্বশেষে বলিয়াছেন—"ঈশ্বরঃ সর্ব্বভূতানাং হৃদ্দেশেঽর্জ্জুন তিষ্ঠতি। ভ্রাময়ন্ সর্ব্বভূতানি যন্ত্রারূঢানি মায়য়া॥ তমেব শরণং গচ্ছ সর্ব্বভাবেন ভারত। তৎপ্রসাদাৎ পরাং শান্তিং স্থানং প্রাপ্স্যসি শাশ্বতম্ ১৮।৬১-৬২॥—হে অর্জ্জুন! ঈশ্বর ভূতসমূহকে যন্ত্রারূঢ় প্রাণীর ন্যায় মায়াদ্বারা ভ্রমণ করাইয়া (কার্য্যে প্রবৃত্ত করাইয়া) সকল ভূতের হৃদয়ে অবস্থান করিতেছেন। হে ভারত! তুমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহারই (সেই হৃদয়াধিষ্ঠিত ঈশ্বরেরই) শরণ গ্রহণ কর; তাঁহার অনুগ্রহে পরমা শান্তি ও নিত্যধাম প্রাপ্ত হইবে।" এইরূপ উপদেশকেই শ্রীকৃষ্ণ "গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং জ্ঞানম্" (১৮।৬৩) বলিয়াছেন।

কিন্তু "গুহ্যাদ্ গুহ্যতরং জ্ঞানম্"-বাক্যের তাৎপর্য্য কি? শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী লিখিয়াছেন—"পূর্ব্বং হি গুহ্যাৎ কর্ম্মযোগাৎ গুহ্যতরং জ্ঞানযোগমাখ্যাতম্। অধুনা তু কর্ম্মযোগাৎ তৎফলভূতজ্ঞানাচ্চ সর্ব্বস্মাদতিশয়েন গুহ্যং রহস্যং গুহ্যতমং পরমং সর্ব্বতঃ প্রকৃষ্টং মে মম বচো বাক্যং ভূয়ঃ...শৃণু॥—'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ॥ ১৮।৬৪'-শ্লোকের টীকা।—(শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিলেন) পূর্ব্বে আমি তোমাকে কর্ম্মযোগের কথা বলিয়াছি; তাহা হইতেছে 'গুহ্য'; জ্ঞানযোগের কথাও বলিয়াছি, তাহা হইতেছে গুহ্য-কর্ম্মযোগ হইতেও গুহ্য—সুতরাং 'গুহ্যতর।' এক্ষণে গুহ্যকর্ম্মযোগ হইতে এবং কর্ম্মযোগের ফলভূত গুহ্যতর জ্ঞানযোগ হইতেও এবং সমস্ত যোগ হইতে অতিশয়রূপে গুহ্যরহস্য— গুহ্যতম এবং সমস্ত হইতে প্রকৃষ্ট বলিয়া পরম বাক্য শ্রবণ কর। 'সর্ব্বগুহ্যতমং ভূয়ঃ শৃণু মে পরমং বচঃ॥১৮।৬৪'॥ গুহ্যতর জ্ঞানযোগের কথা বলিয়া গুহ্যতম বাক্যটী বলিয়াছেন। "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু। মামেবৈষ্যসি সত্যং তে প্রতিজানে প্রিয়োঽসি মে॥ ১৮।৬৫— অর্জ্জুন! মন্মনা(মদ্গতচিত্ত) হও, আমার ভক্ত হও, আমার যাজন কর, আমাকে নমস্কার কর। তুমি আমার প্রিয়; এজন্য সত্য করিয়া, প্রতিজ্ঞা করিয়া তোমাকে বলিতেছি যে- এইরূপ করিলে তুমি আমাকেই পাইবে।"

পূর্ব্বে গুহ্যতর বাক্যে বলা হইয়াছে—পরা শান্তি (সম্যক্‌রূপে মায়ানিবৃত্তি) পাইবে এবং শাশ্বত ধাম পাইবে (ইচ্ছানুরূপ ভাবে পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও একপ্রকারের মুক্তি লাভ করিয়া নিত্য ভগবদ্ধামে যাইতে পারিবে)। এ-স্থলে ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা বলা হয় নাই, কেবল ধাম-প্রাপ্তির কথাই বলা হইয়াছে। পঞ্চবিধা মুক্তির অন্তর্গত সামীপ্য-মুক্তিতে ভগবৎ-সান্নিধ্য-প্রাপ্তিও হইতে পারে; কিন্তু তাহাও পরব্যোমে—সুতরাং স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্য-প্রাপ্তি নহে, শ্রীকৃষ্ণের অংশভূত শ্রীনারায়ণাদির সান্নিধ্যপ্রাপ্তিমাত্র।

কিন্তু গুহ্যতম পরমবাক্যে শ্রীকৃষ্ণ-প্রাপ্তির—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের সেবাপ্রাপ্তির—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাপ্রাপ্তির—কথা বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ মধুসূদন তাঁহার টীকাতে ইহাকেই সর্ব্বাপেক্ষা প্রকৃষ্ট বলিয়াছেন। এই পরম এবং গুহ্যতম বাক্যের প্রসঙ্গেই "সর্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ" বলা হইয়াছে। গুহ্যকর্ম্মযোগ, গুহ্যতর জ্ঞানযোগাদি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া তাঁহার শরণাপন্ন হওয়ার কথা এ-স্থলে বলা হইয়াছে। গুহ্যতর জ্ঞানযোগে চিত্তাধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের শরণ গ্রহণের কথাই বলা হইয়াছে; কিন্তু যিনি চিত্তাধিষ্ঠাতা অন্তর্য্যামী ঈশ্বররূপে প্রতি জীবের হৃদয়ে অবস্থিত, সেই শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণের কথা বলা হয় নাই। কিন্তু গুহ্যতম পরমবাক্যে চিত্তাধিষ্ঠাতা ঈশ্বরের শরণ গ্রহণের কথা বলা হয় নাই, তাঁহার অংশী স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণের উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। শরণ্যের বিশেষত্ব অনুসারে ধর্ম্মত্যাগেরও বৈশিষ্ট্য থাকিবে। গুহ্যতর জ্ঞানযোগে কর্ম্মের অনুষ্ঠান ত্যাগ উপদিষ্ট হয় নাই, ফলত্যাগই উপদিষ্ট হইয়াছে; ফলত্যাগের সঙ্গে অনুষ্ঠান-ত্যাগও স্বীকৃত হইলেই কর্ম্মত্যাগের বৈশিষ্ট্য থাকিতে পারে। "পরিত্যজ্য"-শব্দের "পরি"-উপসর্গেই এই বিশেষত্ব সূচিত

হইতেছে। "পরি—সর্ব্বতোভাবঃ। উপসর্গবিশেষঃ। অস্যার্থঃ—সর্বতোভাবঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" পরি-উপসর্গের অর্থ হইতেছে—সর্ব্বতোভাব। পরিত্যজ্য—সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিয়া। কেবল ফলত্যাগ কখনও সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ হইতে পারে না, ইহা হইতেছে একদেশী ত্যাগ। অনুষ্ঠানের এবং অনুষ্ঠানজনিত ফলের ত্যাগই হইতেছে সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ। ইহাই "পরি"-উপসর্গের তাৎপর্য্য।

শ্রীপাদ রামানুজ বলেন—"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য"-বাক্যে কেবল ফলত্যাগের কথাই বলা হইয়াছে, অনুষ্ঠান-ত্যাগের কথা বলা হয় নাই। তাঁহার এই উক্তি বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। ফলত্যাগকে কেবল "ত্যাগ"ই বলা হইয়াছে, "পরিত্যাগ" বলা হয় নাই। "সর্ব্বকর্ম্মফলত্যাগং প্রাহুস্ত্যাগং বিচক্ষণাঃ॥ গীতা॥ ১৮।২॥" গুহ্যতর জ্ঞানযোগে ফলকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ-পূর্ব্বক কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা আছে—চিত্তশুদ্ধির জন্য। শ্রীপাদ মধুসূদন তাঁহার পূর্ব্বোদ্ধৃত টীকায় বলিয়াছেন—"ফলানুসন্ধান-রহিত কর্ম্মযোগের ফলই হইতেছে জ্ঞানযোগ।" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির উপায়স্বরূপ গুহ্যতম ভক্তিযোগে ফলাকাঙ্ক্ষারহিত কর্ম্মানুষ্ঠানের প্রয়োজন নাই; কেননা, চিত্তশুদ্ধির অভাব প্রভৃতি অন্তরায় শ্রীকৃষ্ণই দূরীভূত করিয়া থাকেন। "অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি"-বাক্যেই তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন। আবার, গুহ্যতর জ্ঞানযোগেরও প্রয়োজন নাই; কেননা, জ্ঞানযোগের যাহা ফল, তাহা "সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্যে" উপদিষ্ট হয় নাই; এই "গুহ্যতম-পরমবাক্যের" লক্ষ্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তি।

শ্রীপাদ রামানুজ মোক্ষপ্রাপক গুহ্যতর জ্ঞানযোগ হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রাপক গুহ্যতম ভক্তিযোগের বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টি করেন নাই বলিয়াই কেবল ফলাকাঙ্ক্ষাত্যাগের কথা বলিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার অভিপ্রায় যে যুক্তিসঙ্গত নহে এবং শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্যসম্মতও নহে, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতেই তাহা বুঝা যাইবে।

তৃতীয় অধ্যায়

শাস্ত্রানুগত্য

৩০। শাস্ত্রানুগত্যের আবশ্যকতা

ক। যুক্তি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, যাঁহার শ্রদ্ধা, বা শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস আছে, একমাত্র তিনিই সাধনে অধিকারী। শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস হইতেই শাস্ত্রানুগত্য সুচিত হইতেছে।

বস্তুতঃ শাস্ত্রানুগত্য সাধকের পক্ষে অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক। কেননা, সাধনের প্রয়োজনীয়তার কথা শাস্ত্রই জানাইয়া দেন এবং কিরূপে সেই সাধন করিতে হইবে, তাহাও শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। অবশ্য যিনি শাস্ত্রানুগত্যে সাধন করিয়া কৃতার্থতা লাভ করিয়াছেন, তিনিও সাধনের কথা বলিতে পারেন ; তাঁহার উপদেশাদিও শাস্ত্রবহির্ভূত হইবে না।

মোক্ষপ্রাপক, বা ভগবৎসেবা-প্রাপক সাধনের বিষয়ে অনাদি-ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ সাধনবিহীন সুপণ্ডিত ব্যক্তিরও ব্যক্তিগত অভিমতের কোনও মূল্য নাই। কেননা, লৌকিক বিষয়ে তাঁহার যথেষ্ট অভিজ্ঞতা থাকিতে পারে ; কিন্তু সাধন-ভজন-বিষয়ে তাঁহার কোনও অভিজ্ঞতা নাই। যে-বিষয়ে যাঁহার কোনও অভিজ্ঞতাই নাই, সেই বিষয়ে তাঁহার উপদেশাদিরও গুরুত্ব বিশেষ কিছু থাকিতে পারে না। আইন-বিষয়ে যিনি বিশেষ অভিজ্ঞ, মোকদ্দমাদি-সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশের বিশেষ মূল্য আছে, কিন্তু ঔষধের ব্যবস্থার জন্য কেহই তাঁহার শরণাপন্ন হয় না।

যিনি শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়াছেন, অথচ সাধনভজনহীন, সাধন-সম্বন্ধে তাঁহার উপদেশও নির্ব্বিচারে গ্রহণযোগ্য হইতে পারে না। কেননা, প্রথমতঃ, যিনি শাস্ত্রবিহিত উপায়ে সাধন করেন, তিনিই শাস্ত্রের মর্ম্ম উপলব্ধি করিতে পারেন। একথা শ্রুতিই বলিয়া গিয়াছেন। "যস্য দেবে পরা-ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতি ॥৬।২৩॥ —ভগবানে যাঁহার পরা ভক্তি, ভগবানে যেমন ভক্তি, গুরুদেবেও যাঁহার তাদৃশী ভক্তি, শ্রুতিকথিত তত্ত্বসমূহ তাঁহার নিকটেই আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকে।" দ্বিতীয়তঃ, সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-সম্বন্ধে সাধন-হীন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত যাহা বলিবেন, তাহার সম্বন্ধে তাঁহার নিজের কোনও আনুষ্ঠানিক অভিজ্ঞতা নাই। তাঁহার উক্তি কেবল তাঁহার ব্যক্তিগত অনুমানও হইতে পারে। কেবল অনুমান সকল স্থলে নির্ভর-যোগ্য নহে।

যিনি নিজে শাস্ত্রীয় পন্থায় সাধক, তাঁহার উপদেশের অবশ্য মূল্য আছে। কিন্তু তাঁহার উপদেশেরও শাস্ত্রের সহিত সঙ্গতি আছে কিনা, বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। কেননা, তিনি তাঁহার

অনুভবের উপর ভিত্তি করিয়াও উপদেশ দিতে পারেন ; কিন্তু তাঁহার সেই অনুভব শাস্ত্রসম্মত কিনা, তাহা হয়তো তিনি বিচার করিয়া দেখেন নাই। দিগ্‌ভ্রান্ত লোক দক্ষিণ দিক্‌কেও পশ্চিম দিক্ বলিয়া মনে করে ; ইহা তাহার অনুভব ; কিন্তু এই অনুভব ভ্রান্ত। অবশ্য ইহা ভ্রান্ত অনুভব বলিয়া সেই লোক মনে করে না। এই অনুভবের বশবর্ত্তী হইয়া যদি দিগ্‌ভ্রান্ত লোক গতিপথে অগ্রসর হইতে থাকে এবং অপরকেও অগ্রসর করায়, কেহই গন্তব্যস্থলে উপনীত হইতে পারিবে না।

খ। শাস্ত্রপ্রমাণ

শাস্ত্রবিধির অনুসরণের অত্যাবশ্যকতার কথা শাস্ত্র হইতেই জানা যায়। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়া গিয়াছেন —

"যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥

তস্মাচ্ছাস্ত্রং প্রমাণন্তে কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ। জ্ঞাত্বা শাস্ত্রবিধানোক্তং কর্ম্ম কর্ত্তু মিহার্হসি॥

গীতা ॥১৬।২৩—২৪॥

—শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগ করিয়া যিনি যথেচ্ছভাবে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়েন, তিনি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন না, সুখলাভ করিতে পারেন না, পরাগতিও লাভ করিতে পারেন না। অতএব কোন্ কার্য্য করণীয় এবং কোন্ কার্য্য অকরণীয়, সেই বিষয়ে শাস্ত্রই হইতেছে প্রমাণ। তুমি শাস্ত্রোক্ত বিধান জানিয়া তদনুসারে কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবে।"

শেষ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"কার্য্যাকার্য্যব্যবস্থিতৌ কিং কর্ত্তব্যং কিমকর্ত্তব্যমিত্যস্মিন্ বিষয়ে নির্দ্দোষমপৌরুষেয়ং বেদরূপং শাস্ত্রমেব প্রমাণম্, ন তু ভ্রমাদি-দোষবতা পুরুষেণোৎপ্রেক্ষিতং বাক্যম্।—কি কর্ত্তব্য এবং কি-ই বা অকর্ত্তব্য—এই বিষয়ে নির্দ্দোষ অপৌরুষেয় বেদরূপ শাস্ত্রই প্রমাণ, ভ্রমাদিদোষযুক্ত কোনও লোকের কথিত বাক্য প্রমাণ নহে।"

শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"ধর্ম্মশাস্ত্রেতিহাস-পুরাণোপবৃংহিতা বেদা যদেব পুরুষোত্তমাখ্যং পরং তত্ত্বং তৎপ্রীণনরূপং তৎপ্রাপ্ত্যুপায়ভূতঞ্চ কর্ম্মাববোধয়ন্তি, তৎশাস্ত্রবিধানোক্তং তত্ত্বং কর্ম্ম চ জ্ঞাত্বা যথাবদন্যূনাতিরিক্তং বিজ্ঞায় কর্ত্তুমর্হসি তদেবোপাদাতুমর্হসি।—ধর্ম্মশাস্ত্র, ইতিহাস ও পুরাণের দ্বারা উপবৃংহিত বেদ যে পরম পুরুষাখ্য পরতত্ত্বের কথা, তাঁহার প্রীতিসম্পাদনরূপ এবং তাঁহার প্রাপ্তির উপায়রূপ কর্ম্মের কথা জানাইয়া গিয়াছেন, শাস্ত্রবিধানোক্ত সেই তত্ত্ব এবং কর্ম্ম যথাযথরূপে—অন্যূনাতিরিক্তরূপে—জানিয়া তদনুসারে কর্ম্ম করিবে।"

"অন্যূনাতিরিক্তরূপে" জানার তাৎপর্য্য এই যে—পরতত্ত্ব সম্বন্ধে এবং পরতত্ত্বের প্রীতিবিধান-সম্বন্ধে, তাঁহার প্রাপ্তির উপায় সম্বন্ধে বেদাদিশাস্ত্রে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা সম্যক্‌রূপে (অন্যূনরূপে) জানিতে হইবে। তদতিরিক্ত (অর্থাৎ শাস্ত্রে যাহা কথিত হয় নাই, এরূপ) কিছু জানিবে না ; অর্থাৎ স্বীয় আচরণকে একমাত্র শাস্ত্রোপদেশদ্বারাই পরিচালিত করিবে, শাস্ত্রাতিরিক্ত কোনও কিছুদ্বারা (নিজের ইচ্ছা দ্বারা, বা শাস্ত্রবহির্ভূত কোনও পৌরুষেয় বাক্যদ্বারা) পরিচালিত করিবে না।

ইহাদ্বারা সর্ব্বতোভাবে শাস্ত্রানুগত্যের আবশ্যকতার কথাই জানা গেল।

শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও জানা যায়, উদ্ধব শ্রীকৃষ্ণের নিকটে বলিয়াছেন—

"পিতৃদেবমনুষ্যাণাং বেদশ্চক্ষুস্তবেশ্বর।
শ্রেয়স্ত্বনুপলব্ধেঽর্থে সাধ্যসাধনয়োরপি॥ শ্রীভা, ১১।২০।৪॥

—মোক্ষবিষয়ে এবং সাধ্যসাধনবিষয়েও তোমার (বাক্যরূপ) বেদই হইতেছে পিতৃলোক, দেবলোক এবং মনুষ্যলোকদিগের শ্রেষ্ঠচক্ষুঃস্বরূপ (অর্থাৎ প্রমাপক, জ্ঞানহেতু)।"

[শ্লোকস্থ "তব বেদ,"-পদের অর্থে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"তব ত্বদ্বাক্যরূপো বেদ এব—তোমার বাক্যরূপ বেদই।" আর "অনুপলব্ধয়ে অর্থে"-পদের টীকায় তিনি লিখিয়াছেন—"মোক্ষে এবং স্বর্গাদিতেও", শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ভগবৎস্বরূপ-বিগ্রহবৈভবাদৌ—ভগবানের স্বরূপ, বিগ্রহ এবং বৈভবাদি বিষয়ে (বেদই একমাত্র প্রমাণ)"]।

এই শ্লোকে পরব্রহ্ম-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্যকেই বেদ বলা হইয়াছে; সুতরাং বেদ হইতেছে নির্দ্দোষ, অভ্রান্ত। আর এই বেদ হইতেছে চক্ষুঃস্বরূপ—নির্দ্দোষ চক্ষুর তুল্য। নির্দ্দোষ চক্ষুদ্বারা যেমন কোনও বস্তুর স্বরূপের পরিচয় পাওয়া যায়, তদ্রূপ নির্দ্দোষ বেদ এবং বেদানুগত শাস্ত্রদ্বারাই ভগবত্তত্ত্ব-বিষয়ে এবং সাধ্যসাধন-বিষয়ে অভ্রান্ত জ্ঞান জন্মিতে পারে। আবার, চক্ষুর সহায়তাতেই যেমন লোক তাহার গন্তব্যপথে নিরাপদে অগ্রসর হইতে পারে, তদ্রূপ শাস্ত্রের সহায়তাতেই সাধক তাঁহার সাধন-পথে নির্ব্বিঘ্নে অগ্রসর হইতে পারেন। সাধকের পক্ষে শাস্ত্রানুগত্য যে অপরিহার্য্য, তাহাই এই শ্লোক হইতেও জানা গেল।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—

"শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥
—ভ, র, সি, ১।২।৪৬-ধৃত-ব্রহ্মযামলবচন॥

—শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ ও নারদপঞ্চরাত্র—এই সকল শাস্ত্রের বিধিকে উল্লঙ্ঘন করিয়া শ্রীহরিতে ঐকান্তিকী ভক্তি করিলেও তাহা কল্যাণ-দায়ক হয় না, বরং তাহা উৎপাতবিশেষই হইয়া থাকে।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"শ্রুতিস্মৃত্যাদিং বিনা ইতি নাস্তিকতয়া তং ন মত্বেত্যর্থঃ। ন ত্বজ্ঞানেন আলস্যেন বা ত্যক্ত্বা ইত্যর্থঃ।—শ্রুতিস্মৃতি-আদির বিধি বিনা—ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, নাস্তিকতাবশতঃ শাস্ত্রবিধি গ্রহণ না করা; অজ্ঞান বা আলস্যবশতঃ শাস্ত্র-বিধির পরিত্যাগ এ-স্থলে অভিপ্রেত নয়।" বেদ না মানাই হইতেছে নাস্তিকতা। নাস্তিকতায় বেদের প্রতি অবজ্ঞা সূচিত হয়। অজ্ঞানবশতঃ, বা আলস্যবশতঃ, বেদবিধির অপালনে বেদের প্রতি অবজ্ঞা সূচিত হয় না।

পরবর্ত্তী শ্লোকে ভক্তিসারমৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।
বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে ॥ ভ. র. সি. ১।২।৪৭ ॥

—পূর্ব্বোদ্ধৃত ব্রহ্মযামল-বাক্যে যে ঐকান্তিকী হরিভক্তির কথা বলা হইয়াছে, বস্তুতঃ তাহা ঐকান্তিকী নহে ; কেননা, তাহাতে অশাস্ত্রীয়তা (শাস্ত্রাবজ্ঞাময়তা) দৃষ্ট হয়। বিচার করিয়া দেখিলে ইহাকে ঐকান্তিকী বলা যায় না; অবিচারেই ঐকান্তিকী বলিয়া প্রতীতি জন্মে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ননু তর্হি কথমৈকান্তিকী স্যাৎ তদ্রূপত্বে চ কথমুৎপাতায় কল্পতে তত্রাহ ভক্তিরিতি। ইয়ং নাস্তিকতাময়ী বৌদ্ধাদীনাং বুদ্ধ-দত্তাত্রেয়াদিষু ভক্তি র্যদৈকান্তিকীব প্রতীয়তে তদপ্যবিচারাদেব ইত্যর্থঃ। তত্র হেতুঃ যদ্ যস্মাৎ অশাস্ত্রীয়তা শাস্ত্রাবজ্ঞাময়তা তত্রেক্ষ্যতে শাস্ত্রমত্র বেদ-তদঙ্গাদি। শাস্ত্রযোনিত্বাদিতি ন্যায়াৎ। তদা তত্তদবতারি-ভগবদজ্ঞারূপানাদি-সৎপম্পরাপ্রাপ্ত-বেদবেদাঙ্গাবজ্ঞায়াং সত্যাং কথমৈকান্তিকী সা স্যাদিতি ভণ্যতাম্। কিঞ্চ যেনৈব বেদাদিপ্রামাণ্যেন বুদ্ধাদীনামবতারত্বং গম্যতে তেনৈব বুদ্ধস্যাসুরমোহনার্থং পাষণ্ডশাস্ত্র-প্রপঞ্চয়িতৃত্বঞ্চ শ্রূয়তে বিষ্ণুধর্ম্মাদৌ ত্রিযুগনামব্যাখ্যানে। তত্র তু শ্রীভগবদাবেশমাত্রঞ্চোপাখ্যায়তে তস্মাৎ তদাজ্ঞাপি ন প্রমাণীকর্ত্তব্যেতি।"

টীকার মর্ম্ম। "ব্রহ্মযামল-বচনে যে ভক্তিকে ঐকান্তিকী বলা হইয়াছে, তাহা কিরূপে ঐকান্তিকী হইতে পারে? আবার, ঐকান্তিকী হইলেই বা তাহা কিরূপে উৎপাতবিশেষ হইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তরেই 'ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়ম্'-ইত্যাদি শ্লোক বলা হইয়াছে। বুদ্ধ-দত্তাত্রেয়াদিতে বৌদ্ধাদির যে নাস্তিকতাময়ী (বেদশাস্ত্রাদির প্রতি অবজ্ঞাময়ী) ভক্তি দৃষ্ট হয়, তাহাও অবিচারবশতঃই ঐকান্তিকীর ন্যায় প্রতীত হয়। কেননা, সে-স্থলে অশাস্ত্রীয়তা, শাস্ত্রাবজ্ঞাময়তা, দৃষ্ট হয়। এ-স্থলে শাস্ত্র বলিতে বেদ-বেদাঙ্গাদিকে বুঝায়। (বৌদ্ধাদির ভক্তি বেদ-বেদাঙ্গ-সম্মতা নহে, পরন্তু বেদ-বেদাঙ্গাদির অবজ্ঞাময়ী)। 'শাস্ত্রযোনিত্বাৎ'-এই ব্রহ্মসুত্র হইতেই তাহা জানা যায় (এই ব্রহ্মসুত্রে বলা হইয়াছে—একমাত্র বেদশাস্ত্র হইতেই ব্রহ্মতত্ত্বাদি জানা যায়। সুতরাং যাহা বেদশাস্ত্রসম্মত নহে, পরন্তু বেদাদিশাস্ত্রের অবজ্ঞাময়, তাহাদ্বারা ব্রহ্মতত্ত্বাদি জানা যাইতে পারে না, বেদবিরুদ্ধা ভক্তি ঐকান্তিকী বলিয়া মনে হইলেও বস্তুতঃ তাহা ঐকান্তিকী বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না। কেননা, একমাত্র ব্রহ্মেই যাহার অন্ত, তাহাকেই ঐকান্তিক বলা যায় ; যেহেতু, জগতের আদি ও অন্ত হইতেছেন একমাত্র ব্রহ্ম, অপর কিছু নহে)। সুতরাং অবতারী ভগবানের আজ্ঞারূপ এবং অনাদি-সৎপরম্পরাপ্রাপ্ত বেদ-বেদাঙ্গাদির অবজ্ঞা যাহাতে দৃষ্ট হয়, তাহা কিরূপে ঐকান্তিকী ভক্তি হইতে পারে? যদি বলা যায়, বুদ্ধাদিও তো ভগবদবতার ; সুতরাং বুদ্ধাদির বাক্য কেন প্রমাণরূপে গৃহীত হইবে না? ইহার উত্তরে বলা হইতেছে—যে বেদাদি-শাস্ত্রপ্রমাণে বুদ্ধাদির অবতারত্ব অবগত হওয়া যায়, সেই বেদাদি-শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে ইহাও জানা যায় যে, অসুর-মোহনার্থ পাষণ্ড (বেদবিরোধী)-শাস্ত্র প্রপঞ্চিত করার নিমিত্তই বুদ্ধদেবের অবতার ; বিষ্ণুধর্মাদিতে ত্রিযুগ-নামব্যাখ্যান হইতেই তাহা অবগত হওয়া যায়।

বুদ্ধদেব যে শ্রীভগবানের আবেশমাত্র, সে-স্থলে তাহাই উপাখ্যাত হইয়াছে। এজন্য তাঁহার আজ্ঞাও প্রমাণরূপে পরিগণিত হইতে পারে না।”

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর উল্লিখিত উক্তিসমূহ হইতেও সাধকের পক্ষে বেদাদি-শাস্ত্রের আনুগত্য যে অপরিহার্য্য, তাহাই জানা গেল।

শাস্ত্রানুগত্য সম্বন্ধেও বিচারের প্রয়োজন। বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে সকল রকম সাধন-পন্থার কথাই দৃষ্ট হয়। যিনি স্বীয় অভীষ্ট-প্রাপ্তির অনুকূল যে সাধন-পন্থা অবলম্বন করিবেন, সেই সাধন-পন্থার অনুকূল শাস্ত্রের আনুগত্যই তাঁহাকে স্বীকার করিতে হইবে ; নচেৎ তাঁহার সাধনে বিভ্রাট উপস্থিত হইতে পারে। কেবলা প্রীতি লাভের উদ্দেশ্যে যিনি শুদ্ধাভক্তিমার্গের অনুশীলন করিবেন, সাযুজ্যকামীর সাধনের অনুকূলশাস্ত্রের আনুগত্য হইবে তাঁহার সাধনের প্রতিকূল। এজন্য “শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি”-ইত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্বোদ্ধৃত ১।২।৪৬-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—“শ্রুত্যাদয়োঽপ্যত্র বৈষ্ণবানাং স্বাধিকারপ্রাপ্তাস্তদ্‌ভাগা এব জ্ঞেয়াঃ। স্বে স্বে অধিকার ইত্যুক্তেঃ।—এই শ্লোকে যে শ্রুত্যাদি-শাস্ত্রের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদ্বারা বৈষ্ণবদের স্ব-স্ব অধিকারপ্রাপ্ত শাস্ত্রভাগই বুঝিতে হইবে। যেহেতু, স্ব স্ব অধিকারের কথা শাস্ত্রেও দৃষ্ট হয়।” শ্লোকে ঐকান্তিকী হরিভক্তির প্রসঙ্গই কথিত হইয়াছে। ঐকান্তিকী হরিভক্তি প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষী বৈষ্ণবদেরই কাম্য ; এজন্য শ্রীজীবপাদ “বৈষ্ণবানাম্” লিখিয়াছেন। “স্বে স্বে অধিকার ইত্যুক্তেঃ”-বাক্যে তিনি আবার সকল অধিকারীর কথাও বলিয়াছেন ; ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যিনি যে পন্থাবলম্বী, সেই পন্থার অনুকূল শাস্ত্রভাগের আনুগত্যই তাঁহার পক্ষে স্বীকার্য্য।

শাস্ত্রবিধিকে নিশ্ছিদ্র প্রাচীরের তুল্য মনে করা যায়। শাস্ত্রবিধিরূপ নিশ্ছিদ্র-প্রাচীর-বেষ্টিত স্থানেই সাধনের ফলরূপ জল সঞ্চিত হয়। কোনও শাস্ত্রবিধি নিজের রুচিসম্মত নহে মনে করিয়া সাধক যদি তাহার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করেন, তাহা হইলে সেই নিশ্ছিদ্র প্রাচীরে একটী ছিদ্র করা হইবে এবং সেই ছিদ্র দিয়া শাস্ত্রবহির্ভূত স্বীয় অভিমত-পন্থার অনুসরণের ফলস্বরূপ লোনা কলুষিত জল প্রবেশ করিয়া সাধনের ফলরূপ জলকেও কলুষিত করিয়া ফেলিবে। সাধনের ফলকে বিশুদ্ধ রাখার জন্য সর্ব্ববিষয়ে শাস্ত্রানুগত্যের একান্ত প্রয়োজন।

৩১। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায় ও শাস্ত্রানুগত্য

গৌড়ীয় বৈষ্ণবসম্প্রদায় শাস্ত্রানুগত্যের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর প্রমাণ হইতেই তাহা জানা গিয়াছে।

রায় রামানন্দের মুখে সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব প্রকাশ করাইবার উদ্দেশ্যে শ্রীমন্ মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছেন—“পঢ় শ্লোক সাধ্যের নির্ণয়॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।৫৪॥” অর্থাৎ, প্রভু বলিলেন—“রামানন্দ!

সাধ্যবস্তু কি, তাহা বল এবং যাহা বলিবে, তাহার সমর্থক শ্লোক—শাস্ত্রপ্রমাণ—বলিবে।" তাৎপর্য্য এই যে, শাস্ত্রপ্রমাণদ্বারা যাহা সমর্থিত নয়, তাহা গ্রহণীয় হইতে পারে না।

বারাণসীতে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীকে তত্ত্বাদিবিষয়ে উপদেশ দিয়া মহাপ্রভু তাঁহাকে ভক্তিশাস্ত্রাদি প্রচারের জন্য আদেশ করিয়াছিলেন এবং বলিয়াছিলেন—"সর্ব্বত্র প্রমাণ দিবে পুরাণ-বচন ॥শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।২৫৫॥"

শ্রীমন্ মহাপ্রভু নিজেও কখনও শাস্ত্রবিরুদ্ধ কথা বলেন নাই; বহুস্থলে তিনি তাঁহার উক্তির মসর্থক শাস্ত্রবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

ক। অশাস্ত্রীয় হইলে গুরুর আদেশও অননুসরণীয়

অশাস্ত্রীয় হইলে গুরুর আদেশও যে অনুসরণীয় নয়, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে নারদপঞ্চরাত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—"শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতম্"-ইত্যাদি লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর আশ্রয় যিনি গ্রহণ করেন না, তাঁহার উভয় সঙ্কট উপস্থিত হয়। সঙ্কট এই যে—গুরুদেব শাস্ত্রজ্ঞ নহেন বলিয়া সকল সময়ে শাস্ত্রসঙ্গত আদেশ দিতে অসমর্থ। সেই আদেশ পালন করিলে শাস্ত্রের অমর্য্যাদা হয়; আবার পালন না করিলে গুরুর অমর্য্যাদা হয়। এই উভয় সঙ্কট। এ-স্থলে শ্রীজীব নারদপঞ্চরাত্রের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ। তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্ ॥
—ভক্তিসন্দর্ভ ॥ ২৩৮-অনুচ্ছেদ-ধৃতপ্রমাণ।

—যিনি (যে গুরু) অন্যায় (শাস্ত্রবিরুদ্ধ) কথা বলেন এবং যিনি (যে শিষ্য) অন্যায় ভাবে (শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়া অপালনীয়, তাহার পালন অন্যায়, এইরূপ অন্যায় ভাবে) তাহা পালন করেন, তাঁহাদের উভয়েরই অক্ষয়কাল ঘোর নরকে বাস হয়।"

খ। পরমার্থ-বিষয়ে গুরুর আদেশও বিচারণীয়

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীল নরোত্তমদাস-ঠাকুরমহাশয় তাঁহার প্রেম-ভক্তিচন্দ্রিকা-নামক গ্রন্থে লিখিয়াছেন—

"গুরুমুখপদ্মবাক্য, হৃদি করি মহাশক্য, আর না করিহ মনে আশা।
শ্রীগুরুচরণে রতি, এই যে উত্তম গতি, যে প্রসাদে পূরে সর্ব্ব আশা ॥"

ইহাতে মনে হইতে পারে, শ্রীগুরুদেব যাহা বলিবেন, তাহাই নির্ব্বিচারে গ্রহণীয়। কিন্তু ইহা যে ঠাকুর-মহাশয়ের অভিপ্রেত নহে, প্রেমভক্তিচন্দ্রিকাতেই তাঁহার পরবর্ত্তী বাক্য হইতে তাহা জানা যায়। সে-স্থলে তিনি লিখিয়াছেন—

"সাধু শাস্ত্র গুরুবাক্য,　হৃদয়ে করিয়া ঐক্য,
সতত ভাসিব প্রেম মাঝে ॥"

এ-স্থলে তিনি বলিয়াছেন—সাধুর বাক্য, শাস্ত্রবাক্য ও গুরুর বাক্য—এই তিনটীকে "হৃদয়ে

ঐক্য” করিতে হইবে। তাৎপর্য্য এই যে, এই তিনটী বাক্যের যদি ঐক্য হয়, তাহা হইলেই গ্রহণীয় এবং তাহা হইলেই সাধক “সতত ভাসিব প্রেম মাঝে।”

সাধুবাক্য বা গুরুবাক্যের সহিত যদি শাস্ত্রবাক্যের কোনওরূপ বিরোধ না থাকে, তাহা হইলেই ঐক্য সম্ভব এবং তাহা হইলেই সাধুর বাক্যও গ্রহণীয় এবং গুরুর বাক্যও গ্রহণীয় হইতে পারে।

কিন্তু সাধুবাক্যের সহিত, বা গুরুবাক্যের সহিত যদি শাস্ত্রবাক্যের ঐক্য না থাকে, তাহা হইলে কি কর্ত্তব্য ? পূর্ব্বোল্লিখিত ভক্তিসন্দর্ভধৃত নারদপঞ্চরাত্রের ‘যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতম্’’-ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে, এ-স্থলে সাধুর বাক্যও গ্রহণীয় নয়, গুরুর বাক্যও গ্রহণীয় হইতে পারে না।

সাধু এবং গুরু—ইঁহাদের কেহই যদি শাস্ত্রজ্ঞ—সুতরাং তত্ত্বজ্ঞ—না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের বাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকা অসম্ভব নয়। কিন্তু বেদবাক্যে বা বেদানুগত-শাস্ত্রবাক্যে ভ্রম-প্রমাদাদি দোষ থাকিতে পারে না ; সুতরাং শাস্ত্রবাক্যই অনুসরণীয়।

শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয়ের উল্লিখিত বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—সাধুবাক্য বা গুরুবাক্যের সহিত শাস্ত্রবাক্যের ঐক্য আছে কিনা, তাহাই বিচার করিতে হইবে। শাস্ত্রবাক্যই বিবাদ-স্থলে মধ্যস্থ-স্থানীয়। ইহা তিনি অন্যত্রও বলিয়া গিয়াছেন।

“বিচার করিয়া মনে, ভক্তিরস আস্বাদনে, মধ্যস্থ শ্রীভাগবত পুরাণ ॥
প্রার্থনা (২০) শ্রীহরিসাধক-কণ্ঠহার, ১৮৪ পৃষ্ঠা।”

উল্লিখিত “যো ব্যক্তি ন্যায়রহিতং”-ইত্যাদি নারদপঞ্চরাত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অতএব দূরত এবারাধ্যস্তাদৃশো গুরুঃ—অতএব দূর হইতেই তাদৃশ গুরুর আরাধনা করিবে।” অর্থাৎ তাদৃশ গুরুর নিকটে না যাইয়া দূরে থাকিয়াই তাঁহার প্রতি শ্রদ্ধা-ভক্তি পোষণ করিবে।

ইহার পরে তিনি লিখিয়াছেন—“বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব—গুরু যদি বৈষ্ণব-বিদ্বেষী হয়েন, তাহা হইলে তিনি পরিত্যাজ্যই।” এই উক্তির সমর্থনে তিনি একটী শাস্ত্রবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্য্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥—ইতি স্মরণাৎ॥

—যে গুরু গর্হিত আচরণে রত, কোন্‌টী কার্য্য (করণীয়) এবং কোন্‌টী অকার্য্য (অকরণীয়), যে গুরু তাহা জানেন না, এবং যে গুরু উৎপথগামী, সেই গুরুকে পরিত্যাগ করাই বিধেয়।”

পরিত্যাগের যৌক্তিকতা-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“তস্য বৈষ্ণবভাব-রাহিত্যেন অবৈষ্ণবতয়া ‘অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন’-ইত্যাদি বচনবিষয়ত্বাচ্চ।—তাদৃশ গুরুর মধ্যে বৈষ্ণবভাব নাই বলিয়া তিনি অবৈষ্ণব। ‘অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন”-ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতে জানা যায়—অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্র গ্রহণ করিলে নিরয়-গমন হয়।’ উল্লিখিত গুরু এই শাস্ত্রবাক্যের বিষয়ীভূত।”

উল্লিখিতরূপ গুরুর আচরণাদি শাস্ত্রবিরুদ্ধ বলিয়াই শাস্ত্র তাঁহার পরিত্যাগের বিধান দিয়াছেন। এ-স্থলেও শস্ত্রানুগত্যের অপরিহার্য্যতার কথাই জানা গেল।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উল্লিখিত প্রমাণদ্বয়ে গুরুর আচরণের বিচারও বিহিত হইয়াছে। বিচার না করিলে কিরূপে স্থির করা যাইবে—গুরু যে আদেশ করেন, তাহা ন্যায়, কি অন্যায়? গুরুর পরিত্যাগ সঙ্গত কিনা?

পরমার্থ-লাভের প্রতিকূল হইলে গুরুর আদেশও যে লঙ্ঘনীয় হইতে পারে, বলি-মহারাজের আচরণে ইহার দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। শ্রীভগবান্ বামনরূপে যখন বলিকে ছলনা করিতে আসেন, তখন বলি-মহারাজের গুরু শুক্রাচার্য্য বলিকে পুনঃ পুনঃ নিষেধ করিয়াছিলেন—বামনদেবের কোনও কথায় প্রতিশ্রুতি দিতে। বলি গুরুর আদেশ উপেক্ষা করিয়াও বামনদেবের মনস্তুষ্টি সাধন করিয়াছিলেন এবং তদ্দ্বারাই শ্রীহরির কৃপা লাভ করিয়াছিলেন। শুক্রাচার্য্যের আদেশ ছিল ভক্তিবিরোধী, ভগবৎ-সেবার প্রতিষেধক—সুতরাং অন্যায়; তাই তাহার লঙ্ঘনে বলির অপরাধ হয় নাই, মঙ্গল হইয়াছে। অবিচারে—গুরুর আদেশ বলিয়াই—যদি তিনি শুক্রাচার্য্যের আদেশ পালন করিতেন, তাহা হইলে ভগবৎকৃপা হইতেই বঞ্চিত হইতেন।

শ্রীজীবগোস্বামীর শাস্ত্রপ্রতিষ্ঠিত উক্তি এবং বলি-মহারাজের দৃষ্টান্ত হইতে জানা যায়—পরমার্থ-বিষয়ে গুরুর আদেশও নির্ব্বিচারে পালনীয় নহে।

উপরে উদ্ধৃত শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর-মহাশয়ের "সাধুশাস্ত্রগুরুবাক্য"-ইত্যাদি উক্তির তাৎপর্য্য এই যে—ভক্তিরসের আস্বাদন পাইতে হইলে, অর্থাৎ "সতত ভাসিব প্রেমমাঝে"-অবস্থা পাইতে হইলে, বেদানুগতশাস্ত্র শ্রীমদ্ ভাগবতকেই মধ্যস্থ বলিয়া স্বীকার করিতে হইবে; যিনি যাহাই বলেন না কেন, তাহার সহিত শ্রীমদ্ ভাগবতাদি বেদানুগত ভক্তিশাস্ত্রের ঐক্য আছে কিনা, তাহা বিচার করিয়া দেখিতে হইবে। নচেৎ সাধুবাক্য বা গুরুবাক্য যদি অশাস্ত্রীয় হয়, তাহা হইলে তাহার অনুসরণে পূর্ব্বোদ্ধৃত নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ অনুসারে প্রত্যবায়ভাগী হইতে হইবে।

এইরূপে জানা গেল—"গুরুমুখ-পদ্মবাক্য, হৃদি করি মহাশক্য"-বাক্যের অভিপ্রায়ও এই যে, শ্রীগুরুদেবের যে বাক্যটী শাস্ত্রবাক্যের সহিত সঙ্গতিপূর্ণ, তাহাই অনুসরণীয়।

গ। গুরুর আদেশ সম্বন্ধে সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের উক্তির আলোচনা

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা যায়, শাস্ত্রপ্রমাণ এবং মহাজনের বাক্যানুসারে গুরুর আদেশও বিচারণীয়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে অন্যরূপ একটী উক্তি দৃষ্ট হয়।

"ভট্টাচার্য্য কহে—গুরু আজ্ঞা বলবান্।
গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্রপরমাণ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১০।১৪১॥"

এই উক্তির গূঢ় তাৎপর্য্য অবগত হইতে হইলে কোন্ প্রসঙ্গে ইহা বলা হইয়াছে, তাহা জানা দরকার। প্রসঙ্গটী এই।

শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরী ছিলেন লৌকিকী লীলায় শ্রীমন্ মহাপ্রভুর দীক্ষাগুরু। সিদ্ধি-প্রাপ্তিকালে পুরীগোস্বামী তাঁহার সেবক শ্রীগোবিন্দকে আদেশ করিয়াছিলেন—"কৃষ্ণচৈতন্য-নিকটে রহি সেবহ তাঁহারে॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১০।১৩০॥" তদনুসারে শ্রীগোবিন্দ নীলাচলে আসিয়া শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের নিকটে পুরীগোস্বামীর অভিপ্রায় জানাইলেন। সে-সময়ে শ্রীপাদ সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যও প্রভুর নিকটে ছিলেন। গোবিন্দের কথা শুনিয়া, গোবিন্দকে আলিঙ্গন করিয়া,

"প্রভু কহে ভট্টাচার্য্য করহ বিচার। গুরুর কিঙ্কর হয় মান্য সে আমার॥
ইহাকে আপন সেবা করাইতে না জুয়ায়। গুরু আজ্ঞা দিয়াছেন, কি করি উপায়॥
শ্রীচৈ,চ, ২।১০।১৩৯-৪০॥"

তখনই সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্য বলিয়াছিলেন—"—গুরু আজ্ঞা বলবান্। গুরু আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে—শাস্ত্রপরমাণ॥"

স্বীয় উক্তির সমর্থনে সার্ব্বভৌম একটী প্রমাণবাক্যেরও উল্লেখ করিয়াছেন ; যথা—

"স শুশ্রূবান্ মাতরি ভার্গবেণ পিতুর্নিয়োগাৎ প্রহৃতং দ্বিষদ্বৎ।
প্রত্যাগ্রহীদগ্রজশাসনং তৎ আজ্ঞা গুরূণাং হ্যবিচারণীয়া॥ রঘুবংশ॥১৪।৪৬॥

—পিতার আদেশে পরশুরাম স্বীয় জননীকে শত্রুর ন্যায় প্রহার (শিরশ্ছেদন) করিয়াছিলেন—ইহা শ্রবণ করিয়া লক্ষ্মণ জ্যেষ্ঠভ্রাতা শ্রীরামচন্দ্রের (সীতাকে বনে লইয়া যাইয়া পরিত্যাগ করার) আদেশ প্রতিপালন করিয়াছিলেন ; যেহেতু, গুরুজনেয় আজ্ঞা অবিচারণীয়া (বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না)।"

পরশুরামের মাতা রেণুকা ব্যভিচারদোষে দুষ্টা হইলে তাঁহাকে হত্যা করিবার জন্য পরশুরামের পিতা জমদগ্নি পরশুরামকে আদেশ করিয়াছিলেন। তদনুসারে পরশুরাম—লোকে শত্রুকে যেভাবে হত্যা করে, তদ্রূপ নৃশংসভাবে—কুঠারের আঘাতে নিজের মাতাকে হত্যা করিয়াছিলেন ; তিনি মনে করিয়াছিলেন—পিতা গুরুজন, তাঁহার আদেশ কোনওরূপ বিচার না করিয়াই পালন করিতে হয়।

লঙ্কেশ্বর রাবণকে সবংশে নিহত করিয়া শ্রীরামচন্দ্র যখন সীতাদেবীকে লইয়া অযোধ্যায় ফিরিয়া আসিলেন, তখন ভরত শ্রীরামের হস্তেই রাজ্যভার অর্পণ করিলেন। একদিন এক গুপ্তচর আসিয়া শ্রীরামচন্দ্রকে জানাইল যে, নগরমধ্যে কেহ কেহ—সীতাদেবী দীর্ঘকাল রাবণের অধীনে ছিলেন বলিয়া—সীতাদেবীর চরিত্র-সম্বন্ধে এবং তাঁহাকে গ্রহণ করিয়া রাজরাণী করিয়াছেন বলিয়া স্বয়ং শ্রীরামচন্দ্রসম্বন্ধেও কাণাঘুষা করিতেছে। শুনিয়া রামচন্দ্র ভাবিলেন—"যদিও আমি জানি, সীতাদেবীর চরিত্রে কলঙ্কের ছায়ামাত্রও নাই, তথাপি লোকে কিন্তু তাহা

বুঝিবে না ; সাধারণ লোক সীতাদেবীকে সন্দেহের চক্ষুতেই দেখিবে এবং আমি তাঁহাকে গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া, নগরের মধ্যে কোনও নারী দুশ্চরিত্রা হইলে, আমাকেই আদর্শস্থানীয় মনে করিয়া তাহার স্বামীও তাহাকে গ্রহণ করিবে ; ইহাদ্বারা নারীদের মধ্যে সংযম শিথিল হইয়া যাইবে, আমার রাজ্যমধ্যে ব্যভিচারের স্রোত প্রবাহিত হইবে। তাই, প্রজাসাধারণের মঙ্গলের নিমিত্ত নিরপরাধিনী সীতাকেই আমায় বর্জ্জন করিতে হইবে ; তাহাতে আমার হৃৎপিণ্ড ছিঁড়িয়া যাইবে সত্য ; কিন্তু ব্যক্তিগত সুখ-দুঃখের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া কাজ করা রাজার ধর্ম্ম নয় ; প্রজা-রঞ্জনই রাজার ধর্ম্ম।” এইরূপ ভাবিয়া শ্রীরামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডাকিয়া সমস্ত কথা অকপটে প্রকাশ করিলেন এবং বাল্মীকির তপোবন দর্শন করাইবার ছলে সীতাকে লইয়া গিয়া সেই স্থানে পরিত্যাগ করিয়া আসার জন্য আদেশ করিলেন। রামচন্দ্রের আদেশ লক্ষ্মণের মনঃপূত হইল না ; কিন্তু তিনি শুনিয়াছিলেন—পরশুরাম পিতার আদেশে স্বীয় জননীকে পর্য্যন্ত হত্যা করিয়াছিলেন। এক্ষণে সেই কথা স্মরণ করিয়া তিনি মনে করিলেন—শ্রীরামচন্দ্র আমার গুরুজন—জ্যেষ্ঠভ্রাতা, পিতৃতুল্য। পিতার আদেশে পরশুরাম স্বীয় জননীকে হত্যা পর্য্যন্ত করিয়াছিলেন ; পিতৃতুল্য শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে আমাকেও মাতৃতুল্যা সীতাদেবীকেও বর্জ্জন করিয়া আসিতে হইবে। কারণ, পরশুরামের আচরণ হইতেই জানা যাইতেছে—গুরুজনের আদেশ কাহারও বিচারের বিষয়ীভূত হইতে পারে না— “এই আদেশ সঙ্গত কি অসঙ্গত”, গুরুজনের আদেশ সম্বন্ধে এইরূপ বিচার করা সঙ্গত নহে। এইরূপ বিবেচনা করিয়া লক্ষ্মণ অগ্রজ শ্রীরামচন্দ্রের আদেশ পালন করিলেন।

এই শ্লোকে গুরুসম্বন্ধে যে কথা লিখিত হইয়াছে, তাহা কেবল শ্রীপরশুরাম এবং শ্রীলক্ষ্মণের আচরণ সম্বন্ধে। পরশুরামের মাতৃহত্যা—তাঁহার নিজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে—নিতান্ত বিসদৃশ মনে হইলেও সমস্ত সমাজের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে সমাজ-সংস্কারকদের বা সমাজ-হিতৈষীদের দৃষ্টিতে নিতান্ত অসঙ্গত বলিয়া হয়তো বিবেচিত হইবে না ; কোনও রমণী ব্যভিচারিণী হইলে তাহার নিজের সন্তানও যে তাহাকে ক্ষমা করেনা—পরশুরামের আচরণ হইতে সমাজ তাহা শিখিয়াছে। আর ব্যক্তিগতভাবে দেখিতে গেলে, সীতার বনবাসে রামের ও লক্ষ্মণের চরিত্রে প্রেমহীনতা ও নির্ম্মমতার পরিচয় পাওয়া যায় বটে ; কিন্তু এস্থলে তাঁহাদের আচরণের বিচার করিতে হইবে— প্রজারঞ্জনের নিমিত্ত, প্রজাদের মধ্যে সামাজিক ও চরিত্রগত বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য শ্রীরামের উৎকণ্ঠার দিকে লক্ষ্য রাখিয়া। সীতার বনবাসে স্বামীর বা দেবরের কর্ত্তব্য হয়তো ক্ষুণ্ণ হইয়াছে ; কিন্তু রাজার কর্ত্তব্যের অক্ষুণ্ণতা রক্ষা হইয়াছে, শ্রীরামচন্দ্রের রাজোচিত গুণাবলী উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিয়াছে। তাই এই দুই স্থানেই গুরুজনের আজ্ঞার অবিচারণীয়তা সমীচীন বলিয়া বিবেচিত হইতে পারে ; এস্থলে যে দুইটী বিষয়ে গুরুজনের আদেশের কথা বলা হইয়াছে, তাহার কোনটীই পরমার্থ-সম্বন্ধীয় বিষয় নহে ; পরন্তু শ্রীজীবগোস্বামী-আদির যে ব্যবস্থা পূর্ব্বে উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা পরমার্থ-সম্বন্ধীয়, ভক্তিসম্বন্ধীয় ব্যবস্থা ; সুতরাং সাধকদের পক্ষে তাহারই সমাদর বেশী হইবে

পরমার্থ-বিষয়ে গুরুর আদেশও যে বিচারণীয়, অশেষ-শাস্ত্রপারদর্শী এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুর অশেষ-কৃপাভাজন সার্ব্বভৌম-ভট্টাচার্য্যও তাহা জানিতেন। কিন্তু শ্রীভগবান্ যে স্বতন্ত্র—সমস্ত বিধি-নিষেধের অতীত, তাহাও তিনি জানিতেন; আর, প্রভু যে গোবিন্দকে আলিঙ্গন দ্বারা অন্তরে অঙ্গীকারই করিয়াছেন, বাহিরেও অঙ্গীকার করিতে একান্তই উৎসুক, তাহাও জানিতেন এবং শ্রীপাদ পুরীগোস্বামীর আদেশও যে একটু লোকাচার-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইলেও ভক্তিবিরোধী নহে, তাহাও জানিতেন। আর, শ্রীগোবিন্দ যে বাস্তবিক প্রভুর গুরুস্থানীয় নহেন, গুরুর সেবক মাত্র, সুতরাং তাঁহার সেবাগ্রহণ যে লৌকিকভাবেও বিশেষ-পরমার্থ-প্রতিকূল নহে, তাহাও তিনি জানিতেম। আরও জানিতেন—পরশুরাম-অবতারে, ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়াই শ্রীভগবান্ পিতার আদেশে মাতার অঙ্গেও কুঠারাঘাত করিয়াছিলেন—আর শ্রীরাম-অবতারেও ন্যায়-অন্যায় বিচার না করিয়া শ্রীরামচন্দ্রের আদেশে লক্ষ্মণরূপে সীতাদেবীকে নির্ব্বাসিত করিয়া আসিয়াছিলেন। সার্ব্বভৌম মনে করিলেন—উক্ত দুই বারেই যখন ভগবান্ নির্ব্বিচারে গুরুর আদেশ পালন করিয়াছেন, তখন এইবারই বা আর বিচারের প্রয়োজন কি? তাই বোধ হয়, প্রভুর অভিপ্রায় বুঝিয়া এবং পূর্ব্ব-আচরণ স্মরণ করিয়াই সার্ব্বভৌম বলিলেন—"গুরু-আজ্ঞা না লঙ্ঘিবে শাস্ত্রপরমাণ ॥" এবং এই উক্তির প্রমাণরূপে রঘুবংশ হইতে একটী শ্লোকও উচ্চারণ করিলেন। তিনি কোনও ভক্তিশাস্ত্রের শ্লোক বা কোনও ঋষিবাক্য উচ্চারণ করিলেন না।

ঘ। ভক্তের শাস্ত্রসম্মত আচরণই সাধকের অনুসরণীয়

যাহাহউক, গৌড়ীয় সম্প্রদায়ে শাস্ত্রানুগত্যের কিরূপ প্রাধান্য, উজ্জ্বলনীলমণি-গ্রন্থের একটী শ্লোক হইতেও তাহা জানা যায়। ব্রজগোপীদিগের কৃষ্ণরতি-প্রসঙ্গে উজ্জ্বলনীলমণিতে বলা হইয়াছে,

"বর্ত্তিতব্যং শমিচ্ছদ্ভির্ভক্তবৎ ন তু কৃষ্ণবৎ। ইত্যেবং ভক্তিশাস্ত্রাণাং তাৎপর্য্যস্য বিনির্ণয়ঃ॥

—উঃ নীঃ মঃ। কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণ ॥ ১২ ॥

—যাঁহারা মঙ্গল কামনা করেন, তাঁহারা ভক্তবৎ আচরণই (ভক্তের আচরণের অনুকরণই) করিবেন, কখনও কৃষ্ণবৎ আচরণ (শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ) করিবেন না। এইরূপই হইতেছে ভক্তিশাস্ত্রসমূহের নির্ণীত তাৎপর্য্য।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"কান্তারসের কথা তো দূরে, অন্যরসেও শ্রীকৃষ্ণভাব অনুকরণীয় নহে।—আস্তাং তাবদস্য রসস্য বার্ত্তা, রসান্তরেঽপি শ্রীকৃষ্ণভাবো নানুবর্ত্তিতব্য ইত্যর্থঃ।" কৃষ্ণবৎ আচরণের নিষেধ করিয়া ভক্তবৎ আচরণের বিধি দেওয়া হইল। কিন্তু ভক্তের আচরণের অনুকরণসম্বন্ধেও বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বিশেষ বিচারের উপদেশ দিয়াছেন। ভক্ত দুইরকম—সিদ্ধভক্ত এবং সাধক ভক্ত। যাঁহারা ভগবানের লীলাপরিকরভুক্ত, তাঁহারাই সিদ্ধভক্ত। আর যাঁহারা যথাবস্থিত দেহে সাধন করিতেছেন, তাঁহারা সাধক ভক্ত। এই দুই শ্রেণীর ভক্তের মধ্যে সাধকের পক্ষে কাহার আচরণ অনুকরণীয়? বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন—সিদ্ধভক্তের

সমস্ত আচরণ অনুকরণীয় নহে ; কারণ, লীলাবিষ্ট অবস্থায় প্রেম-বৈবশ্যবশতঃ সিদ্ধভক্তের আচরণ কোনও কোনও সময়ে শ্রীকৃষ্ণের আচরণের তুল্য হইয়া থাকে। শারদীয় রাসে রাসস্থলী হইতে শ্রীকৃষ্ণ অন্তর্হিত হইলে, তাঁহার বিরহজনিত আর্ত্তিবশতঃ গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের আচরণের অনুকরণ করিয়াছিলেন বলিয়া শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়। শ্রীকৃষ্ণের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে শ্রীকৃষ্ণে গাঢ়-তন্ময়তা লাভ করিয়া তাঁহাদের কেহ কেহ বলিয়াছিলেন—'আমি কৃষ্ণ, এই দেখ আমি গোবর্দ্ধন ধারণ করিতেছি'—ইহা বলিয়া স্বীয় উত্তরীয় বস্ত্র ঊর্দ্ধে ধারণ করিয়াছিলেন। এতাদৃশ আচরণ কৃষ্ণের আচরণের তুল্য বলিয়া সাধকের পক্ষে অনুকরণীয় নহে। কেননা, শ্রীশুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছিলেন—"নৈতৎ সমাচরেজ্জাতু মনসাপি হ্যনীশ্বরঃ। বিনশ্যত্যাচরন্মৌঢ্যাদ্ যথাঽরুদ্রোঽব্ধিজং বিষম্॥ শ্রীভাঃ ১০।৩৩।৩০ ॥—অনীশ্বর (অর্থাৎ জীব) (বাক্য বা কর্ম্মের দ্বারা দূরের কথা) মনেও কখনও এই সমস্তের (শ্রীকৃষ্ণের আচরণের) সমাচরণ (একাংশও আচরণ) করিবে না। রুদ্রব্যতীত অপর কেহ অজ্ঞতাবশতঃ সমুদ্রোদ্ভব বিষ পান করিলে যেমন তৎক্ষণাৎই বিনাশ প্রাপ্ত হয়, মূঢ়তাবশতঃ (কোনও জীব ঈশ্বরাচরণের অনুকরণ) করিলেও তদ্রূপ বিনাশ প্রাপ্ত হয়।" সুতরাং সিদ্ধভক্তদের সকল আচরণ অনুকরণীয় নহে। আবার, সাধক ভক্তদের আচরণও সর্ব্বথা অনুকরণীয় নহে। কেননা, "অপি চেৎ সুদুরাচারো ভজতে মামনন্যভাক্। সাধুরেব স মন্তব্যঃ সম্যগ্ ব্যবসিতো হি সঃ॥ গীতা ॥ ৯।৩০ ॥"—এই শ্লোকের মর্ম্ম হইতে জানা যায়, সাধক ভক্তগণের মধ্যেও সুদুরাচার—পরস্বাপহারী, পরস্ত্রীগামী আদি—থাকিতে পারেন। তাঁহাদের এ-সমস্ত গর্হিত আচরণ অনুকরণীয় নহে। এইরূপ বিচার করিয়া আচার্য্যগণ সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, যে সমস্ত ভক্ত ভক্তিশাস্ত্রের বিধিসমূহ পালন করেন, তাঁহাদের ভক্তিশাস্ত্রানুমোদিত আচরণই অনুকরণীয়, অন্য আচরণ অনুকরণীয় নহে। "ননু ভক্তানাং সিদ্ধানাং সাধকানাং বা আচারোঽনুসরণীয়ঃ ? নাদ্যঃ সিদ্ধানাং প্রায়ঃ কৃষ্ণতুল্যাচারত্বাৎ, যথাহি যৎপাদপঙ্কজপরাগেত্যত্র স্বৈরং চরন্তীতি। নাপি দ্বিতীয়ঃ। সাধকেষু মধ্যে দুরাচারো ভজতে মামনন্যভাগিত্যাদিভিঃ। মৈবম্। বর্ত্তিতব্যমিতি তব্যপ্রত্যয়েন ভক্তিশাস্ত্রোক্তা যে বিধয়স্তদ্বন্তএবাত্র ভক্তা ভক্তশব্দেন উক্তাঃ, ন তু কৃষ্ণবৎ॥ উল্লিখিত উজ্জ্বলনীলমণি-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী।"

এইরূপে দেখা গেল—বৈষ্ণবাচার্য্যগণ সর্ব্বত্রই শাস্ত্রবিহিত আচরণের কথাই বলিয়া গিয়াছেন।

ঙ। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যের দৃষ্টান্ত

শ্রীমদদ্বৈতপ্রভুর বাক্য এবং আচরণ হইতেও দৃঢ় শাস্ত্রানুগত্যের উপদেশ পাওয়া যায়। বিবরণটী এইরূপ।

শ্রীলহরিদাস ঠাকুর আবির্ভূত হইয়াছিলেন যবনকুলে ; কিন্তু তিনি ছিলেন পরম-ভাগবত। তিনি মাসে কোটিনাম গ্রহণ করিতেন ; ইহাই ছিল তাঁহার ব্রত। শ্রীল অদ্বৈত আচার্য্য তাঁহাকে

অত্যন্ত প্রীতি করিতেন। হরিদাস ঠাকুর যখন অদ্বৈত-আচার্য্যের বাসস্থান শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন শ্রীঅদ্বৈত তাঁহার জন্য গঙ্গাতীরে নির্জ্জন স্থানে একটী গোঁফা করিয়া দিয়াছিলেন এবং প্রতিদিনই তাঁহার আহার যোগাইয়াছিলেন। তাহাতে সঙ্কোচ অনুভব করিয়া হরিদাস বলিয়াছিলেন—

"—গোসাঞি করেঁ। নিবেদন। মোরে প্রত্যহ অন্ন দেহ কোন্ প্রয়োজন॥
মহা মহা বিপ্র হেথা কুলীন সমাজ। নীচে আদর কর না বাসহ লাজ ?॥
অলৌকিক আচার তোমার কহিতে বাসেঁ। ভয়। সেই কৃপা করিবে, যাতে মোর রক্ষা হয়॥
—শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।২০৫-৭॥"

তখন,

"আচার্য্য কহেন,—তুমি না করিহ ভয়। সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥
'তুমি খাইলে হয় কোটিব্রাহ্মণ ভোজন। শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।২০৮-৯॥"

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য কেবল মুখেই একথা বলিলেন না, কার্য্যেও তিনি তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন। শ্রীঅদ্বৈত—

"এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।২০৯॥"

শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য ছিলেন বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণ। "বারেন্দ্র-ব্রাহ্মণকুলশাস্ত্র" হইতে জানা যায়—শ্রীঅদ্বৈত একদিন পিতৃশ্রাদ্ধ করিয়া হরিদাসকে ব্রাহ্মণ হইতেও শ্রেষ্ঠ মনে করিয়া তাঁহাকেই শ্রাদ্ধের পাত্রান্ন ভোজন করাইয়াছিলেন; কথিত আছে, ইহাতে অদ্বৈতাচার্য্যের কুটুম্ব নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণ-মণ্ডলী নিজেদিগকে অবমানিত মনে করিয়া সেই দিন তাঁহার গৃহে ভোজন করিলেন না। কাজেই শ্রীঅদ্বৈতও সেই দিন সবান্ধবে উপবাসী রহিলেন। পরের দিন অনেক অনুনয়-বিনয়ের পরে তাঁহারা সিধা (নিজেদের বাসস্থানে রান্না করিয়া খাইবার দ্রব্য) লইতে স্বীকার করিলেন, কিন্তু তাঁহার গৃহে অন্ন গ্রহণ করিতে সম্মত হইলেন না। সকলকে সিধা দেওয়া হইল। দৈবচক্রে সেই দিন খুব বৃষ্টি হইল; তাহার ফলে সমস্ত আগুন নিভিয়া গেল। সেই গ্রামে, কিম্বা পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে কোথাও ব্রাহ্মণগণ আগুন পাইলেন না। আগুনের অভাবে তাঁহাদের রান্না করাও হইল না। এদিকে ক্ষুধায়ও তাঁহারা কাতর হইয়া পড়িলেন। তখন তাঁহারা বুঝিলেন, শ্রীঅদ্বৈতের প্রভাবেই এই অদ্ভুত ঘটনা ঘটিয়াছে। পূর্ব্বদিনের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হইয়া তাঁহারা অদ্বৈতের নিকটে আসিয়া পূর্ব্ব দিনের বাসি অন্নই খাইতে স্বীকার করিলেন। তখন শ্রীঅদ্বৈত তাঁহাদের সকলকে সঙ্গে করিয়া হরিদাসের গোঁফায় গিয়া উপস্থিত হইলেন। সেখানে গিয়া তাঁহারা দেখিলেন—সমস্ত গ্রামের মধ্যে একমাত্র হরিদাসের নিকটেই একটী মৃৎপাত্রে আগুন রহিয়াছে। দেখিয়া সকলে বিস্মিত হইলেন এবং হরিদাসের অসামান্য মহিমা দেখিয়া স্তম্ভিত হইলেন।

এই বিবরণ হইতে, অদ্বৈতাচার্য্যের শাস্ত্রনিষ্ঠা কিরূপ বলবতী ছিল, তাহাই জানা গেল।

তিনি অপেক্ষা রাখিতেন একমাত্র শাস্ত্রের, লোকের বা সমাজের অপেক্ষা তিনি রাখিতেন না। তাই, হরিদাস যবনকুলোদ্ভব হইলেও তাঁহার মধ্যে শ্রেষ্ঠব্রাহ্মণোচিত গুণকর্ম্ম দেখিয়া তিনি তাঁহাকেই শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। নিমন্ত্রিত ব্রাহ্মণগণ যে তাহাতে নিজেদিগকে অবমানিত মনে করিবেন, তাহা যে তিনি জানিতেন না, ইহাও নহে। তথাপি তিনি তাহা করিয়াছেন। তিনি দেখাইলেন—শাস্ত্রের প্রাধান্য সর্ব্বাতিশায়ী।

সাধক কেবল শাস্ত্রের অপেক্ষাই রাখিবেন, অন্যবস্তু সম্বন্ধে হইবেন অপেক্ষাহীন, নিরপেক্ষ। দামোদর পণ্ডিতকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন —

"তোমাসম নিরপেক্ষ নাহি আমার গণে।
নিরপেক্ষ না হৈলে ধর্ম্ম না যায় রক্ষণে॥　শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।২২॥"

এইরূপই হইতেছে গৌড়ীয় বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ে শাস্ত্রানুগত্যের আদর্শ। বস্তুতঃ যিনি যে-পন্থাবলম্বীই হউন না কেন, সাধনের ব্যাপারে শাস্ত্রানুগত্যের প্রাধান্য না দিলে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া তাঁহার পক্ষে বিঘ্নসঙ্কুলই হইবে।

চতুর্থ অধ্যায়
আচার

৩২। আচার। সদাচার ও অসদাচার

আহার-বিহারাদি জীবিকা-নির্ব্বাহের ব্যাপারে লোক যেরূপ ব্যবহার করে, তাহাকে আচার বলা হয়।

আচার দুই রকমের—সদাচার ও অসদাচার। সৎ বা সাধুলোকগণের আচরণকে **সদাচার** বলে ; তাহার বিপরীত হইতেছে **অসদাচার**।

সাধবঃ ক্ষীণদোষাশ্চ সচ্ছব্দঃ সাধুবাচকঃ। তেষামাচরণং যত্তু সদাচারঃ স উচ্যতে॥

—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ॥৩।৮-ধৃত বিষ্ণুপুরাণ-বচন ॥

—দোষহীন ব্যক্তিরাই সাধু। সৎ-শব্দ সাধুবাচক। সাধুগণের আচরণই সদাচার নামে অভিহিত।"

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—

'ন কিঞ্চিৎ কস্যচিৎ সিধ্যেৎ সদাচারং বিনা যতঃ।
তস্মাদবশ্যং সর্ব্বত্র সদাচারোহ্যপেক্ষ্যতে ॥৩।৩॥

—যে হেতু সদাচার ব্যতীত কাহারও কোনও কর্ম্ম সিদ্ধ হয়না, সেজন্য সর্ব্বত্রই সদাচারের অপেক্ষা রাখিতে (অবশ্যই সদাচার পালন করিতে) হইবে।"

লৌকিক জগতেও সদাচার-সম্পন্ন ব্যক্তিই প্রশংসনীয় এবং অসদাচারী নিন্দার্হ।

৩৩। সামান্য সদাচার ও বিশেষ সদাচার

সদাচার দুই রকমের—সামান্য সদাচার এবং বিশেষ সদাচার।

ক। সামান্য সদাচার।

যে সমস্ত আচার মনুষ্যমাত্রকেই সমান ভাবে পালন করিতে হয়, সে সমস্ত হইতেছে সামান্য সদাচার। যেমন, মিথ্যাকথা বলিবে না, চুরি করিবে না, পরদার-গমন করিবে না, কাহাকেও হিংসা করিবে না, সর্ব্বদা সত্যকথা বলিবে, সরল ব্যবহার করিবে-ইত্যাদি। জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকল মানুষকেই সামান্য সদাচার পালন করিতে হয় ; নচেৎ সমাজের মধ্যেও বিশৃঙ্খলা এবং অশান্তির উদ্ভব হয়, লোকের মনোবৃত্তিও ক্রমশঃ নিম্নগামিনী হইতে থাকে।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—

"অহিংসা সত্যমস্তেয়মকামক্রোধলোভতা।
ভূতপ্রিয়হিতেহা চ ধর্ম্মোহয়ং সার্ব্ববর্ণিকঃ॥ শ্রীভা, ১১।১৭।২১॥

—অহিংসা, সত্য, অস্তেয় (অচৌর্য্য), কাম-ক্রোধ-লোভরাহিত্য, প্রাণিহিতকর অথচ প্রিয় এইরূপ কার্য্যে যত্ন,—এ সমস্ত হইতেছে সকল বর্ণের সমানরূপে সেব্য ধর্ম্ম।”

“বৃত্তিঃ সঙ্করজাতীনাং তত্তৎকুলকৃতা ভবেৎ।
অচৌরাণামপাপানামন্ত্যজান্তেবসায়িনাম্॥ শ্রীভা, ৭।১১।৩০॥”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“তত্তৎকুলকৃতা কুলপরম্পরাপ্রাপ্তা পরম্পরাপ্রাপ্তমপি চৌর্য্যং হিংসাদিকঞ্চ নিষেধতি, অচৌরাণামপাপানাঞ্চ ইতি। তৎপ্রদর্শনার্থং কাংশ্চিৎ প্রতিলোমবিশেষানাহ অন্ত্যজেতি! রজকশ্চর্ম্মকারাশ্চ নটবরুড় এব চ। কৈবর্ত্তমেদভিল্লাশ্চ সপ্তৈতে অন্ত্যজাঃ স্মৃতাঃ॥ অন্তেবসায়িনশ্চ চণ্ডাল-পুক্কস-মাতঙ্গাদয়ঃ তেষাং পরম্পরয়া প্রাপ্তৈব বস্ত্রনির্নেজনাদিবৃত্তিরিত্যর্থঃ।”

উল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকে শ্রীনারদঋষি প্রতিলোমজ লোকদিগের ধর্ম্মের কথা বলিয়াছেন। শ্রীধরস্বামীর (শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীরও) টীকানুসারে উক্ত শ্লোকের তাৎপর্য্য এইরূপ :-

“(রজক, চর্ম্মকার, নট, বরুড়, কৈবর্ত্ত, মেদ ও ভিল্ল—এই সাত রকমের অন্ত্যজদিগের এবং (চণ্ডাল, পুক্কস, মাতঙ্গাদি) অন্তেবাসীদিগের এবং সঙ্কর-জাতির পক্ষেও কুলপরম্পরা গত (যেমন রজকদিগের পক্ষে বস্ত্রধৌতি, চর্ম্মকারদিগের এবং অন্যান্যের পক্ষে স্ব-স্ব জাতীয় ব্যবসায় আদি) বৃত্তিই তাহাদের ধর্ম্ম। কিন্তু চৌর্য্য ও হিংসাদি তাহাদের কুলপরম্পরাগত বৃত্তি হইলেও তাহা ত্যাগ করিতে হইবে, কুলপরম্পরা প্রাপ্ত হইলেও চৌর্য্য-হিংসাদি ধর্ম্ম নহে,—অধর্ম্মই।”

চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—“অচৌরত্বে সত্যেব বৃত্তিঃ কুলকৃতা বিহিতা পাপাভাবশ্চোক্ত ইতি ভাবঃ।—চৌর্য্যবিহীন হইলেই কুলপরম্পরা-প্রাপ্তা বৃত্তি পাপশূন্য হইবে, অন্যথা তাহা বিহিত নহে।”

খ। বিশেষ সদাচার

উল্লিখিত অহিংসা, অচৌর্য্যাদি জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলের পক্ষে সামান্য সদাচার হইলেও কোনও কোনও বর্ণের এবং আশ্রমের পক্ষে বিশেষ সদাচারের বিধিও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। এই বিশেষ সদাচারও অবশ্য-পালনীয়।

“গৃহস্থেন সদা কার্য্যমাচারপরিপালনম্। ন হ্যাচারবিহীনস্য সুখমত্র পরত্র চ॥
যজ্ঞদানতপাংসীহ পুরুষস্য ন ভূতয়ে। ভবন্তি যঃ সদাচারং সমুল্লঙ্ঘ্য প্রবর্ত্ততে॥
—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস॥৩।৪ ধৃত মার্কণ্ডেয়পুরাণ-বচন॥

—(মার্কণ্ডেয়-পুরাণে মদালসা ও অলর্কসংবাদে লিখিত হইয়াছে) গৃহী ব্যক্তি সর্ব্বদা আচার পালন করিবেন। ইহলোকে ও পরলোকে কুত্রাপি আচারহীনের সুখ নাই। যে ব্যক্তি সদাচার লঙ্ঘনপূর্ব্বক কার্য্যে প্রবৃত্ত হয়েন, ইহলোকে যজ্ঞ, দান ও তপস্যা তাঁহার পক্ষে মঙ্গলদায়ক হয় না।

“আচারহীনং ন পুনন্তি বেদা যদপ্যধীতা সহ ষড়্ভিরঙ্গৈঃ।
ছন্দাংস্যেনং মৃত্যুকালে ত্যজন্তি নীড়ং শকুন্তা ইব জাতপক্ষাঃ ॥
—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ॥৩।৫ ধৃত ভবিষ্যোত্তর-বচন ॥

—(ভবিষ্যোত্তর-পুরাণে শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে কথিত হইয়াছে) বেদসমূহ যদি ষড়ঙ্গের সহিতও অধীত হয়, তথাপি আচারহীন পুরুষকে পবিত্র করে না। জাতপক্ষ বিহঙ্গগণ যেরূপ নীড় ত্যাগ করে, তদ্রূপ বেদসমূহও মরণকালে তাহাকে পরিত্যাগ করে (অর্থাৎ সেই আচারহীন পুরুষ পরকালে বেদাধ্যয়নের ফল পায় না। এ স্থলে ব্রাহ্মণের কথাই বলা হইয়াছে)।”

শ্রীকৃষ্ণ-যুধিষ্ঠির-সংবাদে আরও বলা হইয়াছে,

“কপালস্থং যথা তোয়ং শ্ব-দৃতৌ বা যথা পয়ঃ। দুষ্টং স্যাৎ স্থানদোষেণ বৃত্তিহীনে তথা শুভম্ ॥
আচাররহিতো রাজন্নেহ নামুত্র নন্দতি ইতি ॥

—যেরূপ নর-কপালস্থ, অথবা কুক্কুর-চর্ম্মনির্ম্মিত পাত্রস্থ, জল বা দুগ্ধ দূষিত হয়, সেইরূপ সদাচার-বর্জ্জিতের তীর্থভ্রমণাদি পুণ্যকর্ম্ম (শুভম্) দূষিত হইয়া থাকে। হে রাজন্! আচারহীন ব্যক্তি ইহলোক বা পরলোক---কোনও লোকেই আনন্দ লাভ করিতে পারে না।”

“অনধ্যয়নশীলঞ্চ সদাচারবিলঙ্ঘনম্। সালস্যঞ্চ দুরন্নাদং ব্রাহ্মণং বাধতেঽন্তকঃ ॥
ততোঽভ্যসেৎ প্রযত্নেন সদাচারং সদা দ্বিজঃ। তীর্থান্যপ্যভিলষন্তি সদাচারসমাগমম্ ॥
—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ॥ ৩।৯ ধৃত কাশীখণ্ড-বচন ॥

—(কাশীখণ্ডে স্কন্দ ও অগস্ত্য সংবাদে কথিত হইয়াছে) অনধ্যয়নশীল, সদাচারলঙ্ঘী, আলস্য-প্রকৃতি, দুষ্টান্নভোজী ব্রাহ্মণকে কৃতান্তদেব দণ্ড প্রদান করিয়া থাকেন। অতএব দ্বিজাতি-জন সর্ব্বদা যত্নসহকারে সদাচার অভ্যাস করিবেন। তীর্থসমূহও সদাচারীর সমাগম কমনা করেন।”

আজকাল কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—খাওয়া-দাওয়ার সঙ্গে ধর্ম্মের কোনও সম্বন্ধ নাই। যাঁহার যে বস্তুতে রুচি, তিনি সেই বস্তুই গ্রহণ করিতে পারেন।

ইহা কিন্তু সঙ্গত কথা নহে। লোকের ভোগ্যবস্তুর মধ্যে কতকগুলিতে তমোগুণের, কতক-গুলিতে রজোগুণের এবং কতকগুলিতে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য আছে। এ-সমস্ত বিচার করিয়াই শাস্ত্র আহার্য্যবস্তু-নির্ণয়ের ব্যবস্থা দিয়াছেন। সত্ত্বগুণ-প্রধান বস্তুর গ্রহণে লোকের মধ্যে সত্ত্বগুণের আধিক্য জন্মিতে পারে। শ্রুতিও বলিয়াছেন—“আহারশুদ্ধেঃ সত্ত্বশুদ্ধিঃ, সত্ত্বশুদ্ধেঃ ধ্রুবানুস্মৃতিঃ ॥—শুদ্ধ আহার হইতেই চিত্তশুদ্ধি জন্মে ; চিত্তশুদ্ধ হইলেই ধ্রুবানুস্মৃতি—ভগবৎ-স্মৃতির তৈলধারাবৎ অপরিচ্ছিন্নতা—জন্মিতে পারে।” এ-স্থলে “আহার”-শব্দে চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় দ্বারা যাহা আহরণ বা গ্রহণ করা যায়, তাহাকেই বুঝাইতেছে। যাহা চিত্তের চাঞ্চল্য জন্মায় না, অজ্ঞানতাবৃদ্ধি করে না, অথচ চিত্তের স্থৈর্য্য আনয়নের অনুকূল, তাহাই শুদ্ধ আহার। ভোজ্যবস্তু বিষয়েও তদ্রূপ বিচার আবশ্যক।

সত্ত্বগুণ-প্রধান বস্তুই গ্রহণীয়। বিশুদ্ধ আহারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিলে চিত্তশুদ্ধির সম্ভাবনা কমিয়া যায়, ইন্দ্রিয়পরায়ণতাই স্থায়িত্ব লাভ করে এবং বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

"জিহ্বার লালসে যেই ইতি উতি ধায়।
শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ শ্রীচৈ, চ, ৩৬।২২৫॥"

ভবিষ্যপুরাণে বলা হইয়াছে—

"আচারপ্রভবো ধর্ম্মঃ সন্তশ্চাচারলক্ষণাঃ।
—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ॥৩।১০ ধৃত ভবিষ্যোত্তর-বচন ॥

—ধর্ম্ম আচার হইতে সমুৎপন্ন, সাধুরা সদাচারবিশিষ্ট।"

গ। সাধকের সদাচার

বিভিন্ন পন্থাবলম্বী সাধকগণ সামান্য-সদাচার এবং স্ব-স্ব-বর্ণাশ্রমোচিত আচার অবশ্যই পালন করিবেন; তদতিরিক্ত কতকগুলি বিশেষ আচারও তাঁহাদিগকে পালন করিতে হয়। এই বিশেষ আচারগুলি মোটামুটিভাবে সকল পন্থাবলম্বীরই প্রায় সমান। যাহা কিছু বিশেষত্ব আছে, তাহার আচরণও অবশ্যকর্ত্তব্য ; নচেৎ সাধন-পথে অগ্রগতি বিঘ্নিত হইতে পারে।

সাধকের মুখ্য আচার হইতেছে—যিনি যে-পন্থাবলম্বী, সেই পন্থার জন্য শাস্ত্রে যে সমস্ত সাধনাঙ্গের উল্লেখ করা হইয়াছে, সেই সমস্ত—সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান। অন্যান্য আচার হইতেছে সাধনানুষ্ঠানের সহায়ক।

আচার আবার দুই রকমের—গ্রহণাত্মক ও বর্জ্জনাত্মক। গ্রহণাত্মক আচারের নামই **বিধি,** বিধির পালন করিতে হয়। আর, বর্জ্জনাত্মক আচার হইতেছে **নিষেধ,** নিষেধ-কথিত আচার-গুলির বর্জ্জন করিতে হয়।

পঞ্চম অধ্যায়

বৈষ্ণবাচার

৩৪। বৈষ্ণবাচার

কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান, ভক্তি হইতেছে ভিন্ন ভিন্ন সাধন-পন্থার নাম। ভক্তিমার্গের সাধককেই বৈষ্ণব বলা হয়। বৈষ্ণবের আচারও সাধকের বিশেষ সদাচারেরই অন্তর্ভূক্ত (৫।৩৩ গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। বৈষ্ণবাচার সম্বন্ধে একটু বিশেষ আলোচনার উদ্দেশ্যেই পৃথক্ একটী অধ্যায়ের অবতারণা করা হইতেছে। বৈষ্ণবাচারসম্বন্ধে যাহা বলা হইবে, তাহা যে কেবল বৈষ্ণবসম্প্রদায়েরই নিজস্ব আচরণ, তাহা মনে করা সঙ্গত হইবে না। এই আচরণগুলি সম্বন্ধে আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে—সাধারণভাবে এইগুলি সকল সাধকসম্প্রদায়ের পক্ষেই প্রযোজ্য।

৩৫। শুদ্ধাভক্তির সাধক বৈষ্ণবের আচার

শুদ্ধাভক্তির সাধক বৈষ্ণবের আচার সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন—

"অসৎসঙ্গ-ত্যাগ এই বৈষ্ণব-আচার। স্ত্রীসঙ্গী এক 'অসাধু'—কৃষ্ণাভক্ত আর॥
এ-সব ছাড়িয়া আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম। অকিঞ্চন হঞা লয় কৃষ্ণৈকশরণ॥
শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৪৯-৫০॥"

এই উপদেশে, বর্জ্জনাত্মক আচার হইল—অসৎসঙ্গ ত্যাগ করিবে, আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিবে। এগুলি (অর্থাৎ অসৎ সঙ্গ এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম) হইল নিষেধ। আর গ্রহণাত্মক আচার হইল—অকিঞ্চন হইবে এবং কৃষ্ণৈকশরণ হইবে। এগুলি হইল বিধি।

দিগ্ দর্শনরূপে অসতের দুইটী দৃষ্টান্তও এই উপদেশে দেওয়া হইয়াছে—স্ত্রীসঙ্গী এবং কৃষ্ণাভক্ত। এই উক্তির সমর্থক শাস্ত্রবাক্যও উল্লিখিত হইয়াছে।

এ-স্থলে এই উপদেশগুলি সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

ক। অসৎসঙ্গ ত্যাগ

অসৎসঙ্গ-ত্যাগের উপদেশে সৎসঙ্গ-গ্রহণই ধ্বনিত হইতেছে। সৎসঙ্গই গ্রহণাত্মক সদাচার। কিন্তু "সৎ"-শব্দের তাৎপর্য্য কি, তাহা জানিলেই "অসৎ" কি, তাহা বুঝা যাইবে।

খ। সৎসঙ্গ

সৎসঙ্গই হইল বৈষ্ণবের সদাচার। এখন সৎসঙ্গদ্বারা কি বুঝা যায়, দেখা যাউক ; সৎ-এর সঙ্গ

সৎসঙ্গ। সৎ কাকে বলে? অস্-ধাতু হইতে সৎ-শব্দ নিষ্পন্ন। অস্-ধাতু অস্ত্যর্থে। সুতরাং সৎ-শব্দের অর্থ হইল,—যিনি আছেন। কোন্ সময় আছেন, তাহার যখন কোনও উল্লেখ বা ইঙ্গিত নাই, তখন বুঝিতে হইবে যে, যিনি সকল সময়েই আছেন,—সৃষ্টির পূর্ব্বেও যিনি ছিলেন, সৃষ্টির সময়েও যিনি ছিলেন, সৃষ্টির পরেও যিনি ছিলেন এবং আছেন, ভবিষ্যতেও যিনি থকিবেন—অনাদি কালেও যিনি ছিলেন, অনন্তকাল পর্য্যন্তও যিনি থাকিবেন,—যাঁহার অস্তিত্ব নিত্য শাশ্বত—তিনিই মুখ্য সৎ। তাহা হইলে, তিনি সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীকৃষ্ণ। সুতরাং সৎ-শব্দের মুখ্য অর্থ হইল শ্রীকৃষ্ণই—শ্রীকৃষ্ণই আদি, মূল সৎ, একমাত্র সৎ-বস্তু। আবার সৎ-অর্থ সত্যও হয়; যিনি মূল সত্যবস্তু, যিনি সত্যং জ্ঞানমানন্দং ব্রহ্ম; সত্যব্রতং সত্যপরং ত্রিসত্যমিত্যাদি বাক্যে ব্রহ্মরুদ্রাদি দেবগণ যাঁহাকে স্তুতি করিয়া থাকেন, সেই স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণই মূল সৎবস্তু। তাহা হইলে শ্রীকৃষ্ণের সঙ্গই হইল মুখ্য-সৎসঙ্গ। কিন্তু জীবের পক্ষে যথাবস্থিত দেহে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ অসম্ভব; একমাত্র ভাবোপযোগী সিদ্ধ-দেহেই শ্রীকৃষ্ণসঙ্গ সম্ভব এবং ভাবোপযোগী সিদ্ধ-দেহে ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে সেবা উপলক্ষ্যে শ্রীকৃষ্ণসঙ্গই বৈষ্ণবের কাম্যবস্তু। ইহা একমাত্র সিদ্ধাবস্থাতেই সম্ভব; তথাপি ইহাই অনুসন্ধেয়, ইহাই সৎসঙ্গের মধ্যে মুখ্যতম। আর, এই অনুসন্ধেয় বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়ে যাঁহারা সহায়তা করেন, তাঁহাদের সঙ্গও সৎ-সঙ্গ। সিদ্ধাবস্থায় সেবার নিমিত্ত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সঙ্গরূপ সৎসঙ্গ লাভ করিতে হইলে যে-যে আচরণ বা অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, সেই সমস্ত আচরণ বা অনুষ্ঠানের সঙ্গও সাধকের পক্ষে সৎ-সঙ্গ। তাহা হইলে, ভজনাঙ্গ-সমূহের অনুষ্ঠান এবং তদনুকূল আচারের পালনই সৎ-সঙ্গ। শ্রীকৃষ্ণের নাম, রূপ, গুণ, লীলা প্রভৃতির স্মরণ, মনন, ধ্যান, কীর্ত্তন, লীলাগ্রন্থাদির পঠন,পাঠন,শ্রবণ, কীর্ত্তন,পূজন, শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চন-বন্দনাদি; তুলসী-বৈষ্ণব-মথুরামণ্ডলাদির সেবন—স্থূলতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট চৌষট্টি-অঙ্গ ভজন, কি নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানাদিই সাধক বৈষ্ণবের পক্ষে সৎ-সঙ্গ; ইহাই সদাচার। লীলাস্মরণ—বা অন্তশ্চিন্তিত সেবোপযোগী সিদ্ধদেহে, নিজ ভাবানুকূল লীলাপরিকরদের আনুগত্যে ব্রজেন্দ্রনন্দনের মানসিক-সেবা উপলক্ষ্যে তাঁহার সঙ্গই সাধক-বৈষ্ণবের পক্ষে মুখ্য সৎসঙ্গ বলিয়া মনে হয়। কারণ, ইহাতে ক্ষণেকের জন্যও শ্রীকৃষ্ণ-বিস্মৃতি আসিতে পারে না।

সৎ-সম্বন্ধীয় বস্তুর সঙ্গও সৎ-সঙ্গ; সৎ-সম্বন্ধীয় অর্থাৎ ব্রজেন্দ্র-নন্দন-সম্বন্ধীয়। ব্রজেন্দ্রনন্দন-সম্বন্ধীয় বস্তুর সঙ্গ বলিতে উপরি উক্ত ভজনাদির অনুষ্ঠানই বুঝায়।

সৎ-অর্থ সাধুও হয়; সুতরাং সৎ-সঙ্গ বলিতে সাধু-সঙ্গ বা মহৎ-সঙ্গ বুঝায়। ইহাও ভজনাঙ্গেরই অন্তর্ভুক্ত। "কৃষ্ণভক্তি-জন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৪৮॥"

গ। অসৎসঙ্গ

যাহা সৎ নয়, তাহার সঙ্গই অসৎ-সঙ্গ। সঙ্গ-অর্থ সাহচর্য্যও হয়, আসক্তিও হয়। তাহা হইলে—শ্রীকৃষ্ণ-ব্যতীত অন্য বস্তুর সাহচর্য্য বা অন্য বস্তুতে আসক্তি, কিম্বা সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান ব্যতীত অন্য কার্য্যাদির অনুষ্ঠান বা অন্য কার্য্যাদিতে আসক্তিও অসৎসঙ্গ। আত্মারাম-শ্লোকের ব্যাখ্যা

উপলক্ষ্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"দুঃসঙ্গ কহিয়ে কৈতব আত্মবঞ্চনা। কৃষ্ণ কৃষ্ণভক্তি বিনা অন্য কামনা। শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।৭০॥" শ্রীকৃষ্ণ-কামনা, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য বস্তুর কামনাই দুঃসঙ্গ বা অসৎসঙ্গ। বাহিরের কোনও বস্তুর বা লোকের সঙ্গ অপেক্ষা কামনার সঙ্গ ঘনিষ্ঠ। বাহিরের বস্তুর বা লোকের সঙ্গও আন্তরিক কামনারই অভিব্যক্তি মাত্র। বস্তু বা লোক থাকে বাহিরে, ইচ্ছা করিলে আমরা তাহা হইতে দূরে সরিয়া যাইতে পারি; কিন্তু কামনা থাকে হৃদয়ের অন্তস্তলে, আমরা যেখানে যাই, কামনাও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে যায়। সুতরাং কৃষ্ণ-কামনা ও কৃষ্ণভক্তিকামনা ব্যতীত অন্য কামনাই সাধকের বিশেষ অনিষ্টজনক, এজন্য সর্ব্বপ্রযত্নে পরিত্যাজ্য। এইরূপ অসৎসঙ্গ ত্যাগ করাই বৈষ্ণবের সদাচার।

আমাদের দেহ এবং দেহের ভোগ্যবস্তুও অনিত্য, জড়—সুতরাং অসৎ। এ-সমস্ত বস্তুতে যে আসক্তি (সঙ্গ), তাহাও অসৎসঙ্গ। তাহাও পরিত্যাজ্য।

খ। **স্ত্রী-সঙ্গী।**

সন্জ্ ধাতু হইতে সঙ্গ-শব্দ নিষ্পন্ন; সন্জ্ ধাতুর অর্থ আসক্তি। তাহা হইলে সঙ্গ-শব্দেও আসক্তি বুঝায়। (শ্রীমদ্‌ভাগবতের ৩।৩১।৩৯ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদও "সঙ্গমাসক্তিং" অর্থ লিখিয়াছেন)। সঙ্গ আছে যাহার তিনি সঙ্গী; তাহা হইলে সঙ্গী-শব্দের অর্থ হইল—আসক্তিযুক্ত; আর স্ত্রীসঙ্গী অর্থ—স্ত্রীলোকে আসক্তিযুক্ত; অর্থাৎ কামুক; নিজের স্ত্রীতেই হউক, কি পরের স্ত্রীতেই হউক, স্ত্রীলোকে যাহার আসক্তি আছে, তাহাকেই স্ত্রী-সঙ্গী বলা যায়। কেহ কেহ বলেন, স্ত্রী-সঙ্গী-অর্থ এখানে পরস্ত্রী-সঙ্গী বা পরদার-রত; কিন্তু আমাদের মনে হয়, পরস্ত্রী-সঙ্গী ত বটেই, স্ব-স্ত্রীতে আসক্তিযুক্ত লোককেও এখানে লক্ষ্য করা হইয়াছে। স্ত্রী-সঙ্গী অর্থ কেবলমাত্র পরস্ত্রী-সঙ্গী নহে; এইরূপ মনে করার হেতু এই—প্রথমতঃ শ্রীমন্মহাপ্রভু এখানে বৈষ্ণবের বিশেষ আচারের কথা বলিতেছেন। সুতরাং যাহা নিষেধ করিবেন, তাহা বৈষ্ণবের পক্ষে অবশ্যত্যাজ্য, অপরের পক্ষে অবশ্যত্যাজ্য না হইতেও পারে; এস্থলে স্ত্রী-সঙ্গী অর্থ যদি কেবল পরস্ত্রী-সঙ্গই হয়, এবং পরস্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ করা যদি কেবল বৈষ্ণবেরই বিধি হয়, তাহা হইলে অপর কাহারও পক্ষে ইহা নিন্দনীয়—সুতরাং পরিত্যাজ্য—না হইতেও পারে। কিন্তু ইহা সমীচীন নহে। পরদার-গমন মানুষমাত্রের পক্ষেই নিষিদ্ধ; ইহা মানুষের পক্ষে সাধারণ নিষেধ; বৈষ্ণবও মানুষ, মানুষের সাধারণ নিয়ম তো তাহাকে পালন করিতেই হইবে, অধিকন্তু কতকগুলি বিশেষ নিয়মও পালন করিতে হইবে। এখানে বৈষ্ণবের বিশেষ-নিয়মের মধ্যেই যখন স্ত্রী-সঙ্গ-ত্যাগের আদেশ দিতেছেন, তখন ইহা স্পষ্টই বুঝা যায়, পরস্ত্রী-সঙ্গ ত্যাগ তো বটেই, স্ব-স্ত্রীতেও আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে। দ্বিতীয়তঃ স্ত্রী-শব্দে সাধারণতঃ পরস্ত্রী বুঝায় না—বরং সাধারণতঃ বিবাহিতা পত্নীকেই বুঝায়। অবশ্য "স্ত্রী" বলিতে যখন "স্ত্রীজাতি" বুঝায়, তখন স্ত্রী-শব্দে স্ত্রীলোকমাত্রকেই বুঝাইতে পারে। আমাদের মনে হয়, এখানে স্ত্রীলোকমাত্রকেই বুঝাইতেছে—সুতরাং স্ত্রী-সঙ্গ অর্থ স্ত্রীলোক-মাত্রের সঙ্গ—তা নিজের স্ত্রীই হউক, কি অপর কোনও

স্ত্রীলোকই হউক, যে কোনও স্ত্রীলোকে আসক্তিই বৈষ্ণবের পক্ষে নিষিদ্ধ হইতেছে। তৃতীয়তঃ, ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুমাত্রে আসক্তিই হইতেছে ভজনবিরোধী ; কেননা, মনকে ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু হইতে সরাইয়া নিয়া ভগবদুন্মুখ করিবার চেষ্টাই হইতেছে সাধকের লক্ষ্য বা কর্ত্তব্য। নিজের বিবাহিতা পত্নীও ইন্দ্রিয়ভোগ্যা ; সুতরাং তাহাতে আসক্তিও ভজনবিরোধী—সুতরাং পরিত্যাজ্য। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"শিশ্নোদরপরায়ণ কৃষ্ণ নাহি পায়॥ শ্রী চৈ, চ, ৩।৬।২২৫॥" যিনি শিশ্নপরায়ণ, তিনি নিজের স্ত্রীতেও আসক্ত।

স্ত্রী-সঙ্গীর সঙ্গত্যাগের উপদেশ দিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের কয়েকটী প্রমাণেরও উল্লেখ করিয়াছেন। তাঁহার উল্লিখিত শ্লোকগুলির আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে।

"ন তথাস্য ভবেন্মোহো বন্ধশ্চান্যপ্রসঙ্গতঃ।
যোষিৎসঙ্গাৎ যথা পুংসো যথাতৎসঙ্গিসঙ্গতঃ॥ শ্রীভা, ৩।৩১।৩৫-॥

—স্ত্রীসঙ্গ (স্ত্রীলোকে আসক্তি) এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ হইতে পুরুষের যেরূপ মোহ ও সংসারবন্ধন হয়, অন্যজনের সঙ্গ হইতে সেইরূপ হয় না।"

এই শ্লোকে সঙ্গ-শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—সঙ্গোঽত্র তদ্বাসনয়া তদ্বার্ত্তাময়ঃ—স্ত্রীসঙ্গের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া স্ত্রীসঙ্গবিষয়ক কথাবার্ত্তাময় সঙ্গ। যাহারা গৃহী, তাহাদের পক্ষে স্ত্রীলোকের সংশ্রব ত্যাগ সম্ভব নহে, কিন্তু স্ত্রীসঙ্গমের কামনা পোষণ করিয়া স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়া এবং সংশ্রবে যাইয়াও যাহাতে সঙ্গমের বাসনা বর্দ্ধিত হইতে পারে, তদ্রূপ আলাপ-আলোচনা দূষণীয়। স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ করিলেও তদ্রূপ কথাবার্ত্তা হওয়ার সম্ভাবনা, সুতরাং ইন্দ্রিয়-তৃপ্তির বাসনা বিশেষরূপে উদ্দীপিত হওয়ার সম্ভাবনা আছে। তাই স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গও দূষণীয়।

স্ত্রীসঙ্গের এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গের দোষ দেখাইয়া এই শ্লোকে ঐরূপ সঙ্গত্যাগের উপদেশই দিতেছেন।

"সত্যং শৌচং দয়া মৌনং বুদ্ধির্হ্রী শ্রীর্যশঃ ক্ষমা। শমো দমো ভগশ্চেতি যৎসঙ্গাদ্ যাতি সংক্ষয়ম্॥
তেষ্বশান্তেষু মূঢ়েষু খণ্ডিতাত্মস্বসাধুষু। সঙ্গং ন কুর্য্যাচ্ছোচ্যেষু যোষিৎক্রীড়ামৃগেষু চ॥
শ্রীভা, ৩।৩১।৩৩-৩৪॥

—(ভগবান্ বলিয়াছেন) যাহাদের সঙ্গের প্রভাবে সত্য (সত্যের প্রতি আদর), শৌচ (পবিত্রতা), দয়া, মৌন (বাক্‌সংযম), সদ্‌বুদ্ধি, লজ্জা, শ্রী (সৌন্দর্য্য, বা ধনধান্যাদিসম্পত্তি), কীর্ত্তি, ক্ষমা (সহিষ্ণুতা), শম (বাহেন্দ্রিয়-সংযম), দম (অন্তরিন্দ্রিয়-নিগ্রহ) এবং ভগ (উন্নতি) সম্যক্‌রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়—সে সমস্ত অশান্ত (বাসনার দাস চঞ্চলচিত্ত), মূঢ় (স্ত্রীমায়ায় মুগ্ধ), শোচনীয়-দশাগ্রস্ত, দেহে আত্মবুদ্ধিবিশিষ্ট এবং স্ত্রীলোকের ক্রীড়ামৃগতুল্য অসাধু (অসদাচার) ব্যক্তিদের সঙ্গ (তাহাদের সহিত একত্র বাস বা কথোপকথনাদি) করিবে না।"

এ-স্থলে "যোষিৎক্রীড়ামৃগ"-শব্দদ্বারা স্ত্রীলোকে অত্যাসক্তিযুক্ত লোককেই বুঝাইতেছে।

যাহা হউক, উল্লিখিত দুইটী শ্লোকের পরে এই প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে আরও কয়েকটী শ্লোক আছে। অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—স্বয়ং প্রজাপতি ব্রহ্মা পর্য্যন্ত স্বীয় কন্যার রূপে মুগ্ধ হইয়া গর্হিত কর্মে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন।

প্রজাপতিঃ স্বাং দুহিতরং দৃষ্ট্বা তদ্রূপধর্ষিতঃ।
রোহিদ্ভূতাং সোঽন্বধাবদৃষ্যরূপী হতত্রপঃ॥—শ্রীভা, ৩।৩১।৩৬॥

ইহার পরে বলা হইয়াছে—যে ব্রহ্মা স্ত্রীলোকদর্শনে এত বিচলিত হইয়াছেন, তাঁহার সৃষ্ট মরীচ্যাদি, মরীচ্যাদির সৃষ্ট কশ্যপাদি এবং কশ্যপাদির সৃষ্ট দেব-মনুষ্যাদি যে যোষিন্মায়ায় আকৃষ্ট হইবেন, তাহাতে আর বিচিত্রতা কি?

তৎসৃষ্টসৃষ্টসৃষ্টেষু কো ন্বখণ্ডিতধীঃ পুমান্।
ঋষিং নারায়ণমৃতে যোষিন্ময়্যেহ মায়য়া॥ শ্রীভা, ৩।৩১।৩৭॥

ইহার পরে বলা হইয়াছে—দিগ্‌বিজয়ী বীরগণ পর্য্যন্তও স্ত্রীলোকের ভ্রূভঙ্গীমাত্রে তাহার পদানত হইয়া পড়ে।

বলং মে পশ্য মায়ায়াঃ স্ত্রীময্যা জয়িনো দিশাম্।
যা করোতি পদাক্রান্তান্ ভ্রূবিজৃম্ভেণ কেবলম্। শ্রীভা, ৩।৩১।৩৮।

ইহার পরে বলা হইয়াছে—

"সঙ্গং ন কুর্য্যাৎ প্রমদাসু জাতু যোগস্য পারং পরমারুরুক্ষুঃ।
সৎসেবয়া প্রতিলব্ধাত্মলাভো বদন্তি যা নিরয়দ্বারমস্য॥ শ্রীভা, ৩।৩১।৩৯॥

—যে ব্যক্তি যোগের পরপারে আরোহণ করিতে ইচ্ছুক, প্রমদার সঙ্গ করা তাঁহার কর্ত্তব্য নহে। ফলতঃ যোগীরা বলেন—সৎসঙ্গদ্বারা যাঁহার আত্মলাভ প্রতিলব্ধ হইয়াছে, তাঁহার পক্ষে স্ত্রীলোক নরকের দ্বারস্বরূপ।"

এই পর্য্যন্ত স্ত্রীসঙ্গসম্বন্ধে শ্রীমদ্ভাগবতের যে কয়টী শ্লোকের কথা বলা হইল, তাহাদের কোনওটীতেই, বা কোনওটীর টীকাতেই—"যোষিৎ"-শব্দে কেবল যে পরস্ত্রী বুঝায়, তাহার উল্লেখ নাই। বরং শেষোক্ত শ্লোকের টীকায় শ্লোকোক্ত "প্রমদাসু"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াসু অপি।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"প্রমদাসু স্বীয়াসু অপি সঙ্গং আসক্তিং ন কুর্য্যাৎ।—নিজের বিবাহিতা স্ত্রীতেও আসক্তিযুক্ত হইবে না।" টীকার "স্বীয়াসু অপি"-অংশের "অপি"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—পরকীয়া স্ত্রীর সঙ্গ তো দূরের কথা, স্বকীয়া স্ত্রীর প্রতিও আসক্তি পোষণ করিবে না।

শ্রীমদ্ভাগবতের পরবর্ত্তী শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা যায়, স্ত্রীর প্রতি আসক্তি-পোষণ তো দূরের কথা, যিনি বুদ্ধিমান্, তাঁহার পক্ষে স্ত্রীলোকের কোনওরূপ সংশ্রবই মঙ্গলজনক নহে।

"যোপযাতি শনৈর্ম্মায়া যোষিদ্দেববিনির্ম্মিতা।
তামীক্ষেতাত্মনো মৃত্যুং তৃণৈঃ কূপমিবাবৃতম্॥ শ্রীভা, ৩।৩১।৪০॥"

এই শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"যা চ পুরুষং বিরক্তং জ্ঞাত্বা স্বীয় নিষ্কামতাং ব্যঞ্জয়ন্তী শুশ্রূষাদিমিষেণ উপযাতি, সাপি অনর্থকারিণীত্যাহ যোপযাতীতি। অত্র তৃণাচ্ছাদিতকূপস্য ময়ি জনঃ পতত্বিতি ভাবনাভাবাৎ কস্যচিৎ পার্শ্বেঽপ্যনাগমাৎ সর্ব্বত্রোদাসীনা বা ভক্তিজ্ঞানবৈরাগ্যাদি-মতী বা উন্মাদাদচেতনা নিদ্রাণা বা মৃতাপি বা স্ত্রীঃ সর্ব্বথৈব দূরে পরিত্যাজ্যা ইতি-ব্যঞ্জিতম্॥" এই টীকানুযায়ী উক্ত শ্লোকের মর্ম্ম এইরূপঃ—"স্ত্রীলোক দেবনির্ম্মিত মায়াবিশেষ; এই মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া বড় শক্ত ব্যাপার। এজন্য স্ত্রীলোকের সংশ্রবে যাওয়াই সঙ্গত নহে। পুরুষকে বিরক্ত নিষ্কাম মনে করিয়া নিজেরও নিষ্কামতা জ্ঞাপনপূর্ব্বক কেবল সেবাশুশ্রূষার উদ্দেশ্যেও যদি কোনও স্ত্রী কোনও পুরুষের নিকটবর্ত্তিনী হয়, তাহা হইলেও ঐ স্ত্রীকে নিজের অমঙ্গলকারিণী বলিয়া মনে করিবে—তৃণাচ্ছাদিত কূপের ন্যায়, তাহাকে স্ত্রীত্বাচ্ছাদিত নিজমৃত্যুর ন্যায় জ্ঞান করিবে। স্ত্রীলোক যদি ভক্তিমতী, জ্ঞানমতী এবং বৈরাগ্যমতীও হয়, অথবা উন্মাদ-রোগবশতঃ অচেতনাও হয়, কিম্বা নিদ্রিতা, এমন কি মৃতাও হয়, তথাপি তাহা হইতে দূরে থাকিবে।" উক্ত আলোচনা হইতে বোধ হয় স্পষ্টই বুঝা যায়—"স্ত্রী-সঙ্গী এক অসাধু" বলিতে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কেবল পরস্ত্রী-সঙ্গকেই লক্ষ্য করেন নাই, স্বকীয়া স্ত্রীতে আসক্তিযুক্ত ব্যক্তিকেও লক্ষ্য করিয়াছেন।

বলবান্ ইন্দ্রিয়বর্গের প্রভাব হইতে দূরে থাকার জন্য সাধককে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হয়। এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা নাবিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবানিন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি॥
শ্রীভা, ৯।১৯।১৭॥ মনুসংহিতা ॥২।২১৫॥

—মাতা, ভগিনী, কিম্বা কন্যা—ইঁহাদের সহিতও একই সঙ্কীর্ণ আসনে বসিবেনা; কারণ, বলবান্ ইন্দ্রিয়সকল বিদ্বান্ ব্যক্তিকেও আকর্ষণ করিয়া থাকে।"

"দুর্ব্বার ইন্দ্রিয় করে বিষয় গ্রহণ।
দারবী প্রকৃতি হরে মুনেরপি মন॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২।১১৭॥"

আরও একটী কথা এস্থানে বিবেচ্য। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যে কেবল পুরুষ বৈষ্ণবের আচারেরই উপদেশ দিয়াছেন, তাহা নহে; স্ত্রীলোক-বৈষ্ণবের আচারও উপদেশ করিয়াছেন। স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই ভক্তিমার্গে সমান অধিকার। পুরুষের পক্ষে যেমন স্ত্রী-সঙ্গ ভজনের পক্ষে দূষণীয়, স্ত্রীলোকের পক্ষেও পুরুষ-সঙ্গ সেইরূপ ভজনের পক্ষে দূষণীয়। স্ত্রী-সঙ্গ-প্রসঙ্গে শ্রীমদ্‌ভাগবতের যে শ্লোকগুলি উপরে আলোচিত হইল, তাহাদের অব্যবহিত পরে ৪১।৪২ শ্লোকেই ইহার স্পষ্ট উল্লেখ আছে। এই শ্লোকদ্বয়ের মর্ম্ম এইঃ—"পুরুষ স্ত্রী-সঙ্গ-বশতঃ, অন্তকালে স্ত্রীর ধ্যান করিতে করিতে স্ত্রীত্ব

প্রাপ্ত হয়। স্ত্রীলোক মোহবশতঃ যাঁহাকে পতি বলিয়া মনে করে, সেও পুরুষতুল্য আচরণ-কারিণী ভগবন্মায়া মাত্র। বিত্ত, অপত্য, গৃহাদি সমস্তই ভগবন্মায়া। ব্যাধের সঙ্গীত যেমন শ্রবণ-সুখদ হওয়াতে মৃগের নিকটে অনুকূল বলিয়া প্রতীত হয়, কিন্তু তাহা মৃগের পক্ষে যেমন মৃত্যু-স্বরূপ; তেমনি পতি, পুত্র, গৃহবিত্তাদি অনুকূল বলিয়া মনে হইলেও মুক্তিকামা স্ত্রীর পক্ষে সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়। "যা মন্যতে পতিং মোহান্মন্মায়ামৃষভায়তীম্। স্ত্রীত্বং স্ত্রীসঙ্গতঃ প্রাপ্তো বিত্তাপত্যগৃহপ্রদম্॥ তামাত্মনো বিজানীয়াৎ পত্যপত্যগৃহাত্মকম্। দৈবোপসাদিতং মৃত্যুং মৃগয়োর্গায়নং যথা॥ শ্রীভা, ৩।৩১।৪১-৪২॥"

জীবের উপস্থ-লালসা অত্যন্ত বলবতী বলিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু স্ত্রীসঙ্গ-ত্যাগের এবং স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গত্যাগের উপরে বিশেষ গুরুত্ব দিয়াছেন।

৬। কৃষ্ণাভক্ত-সঙ্গত্যাগ

কৃষ্ণ + অভক্ত = কৃষ্ণাভক্ত যাঁহারা কৃষ্ণের অভক্ত, তাঁহাদিগকেই এ-স্থলে কৃষ্ণাভক্ত বলা হইয়াছে।

অভক্ত দুই রকমের হইতে পারে—এক, যিনি শ্রীকৃষ্ণের বা কোনও ভগবৎ-স্বরূপের ভজন করেন না, অথচ ভগবদ্‌বিদ্বেষীও নহেন। আর, যিনি ভগবদ্‌ভজন করেন না এবং ভগবদ্-বিদ্বেষী, তজ্জন্য ভক্তবিদ্বেষীও।

প্রথম রকমের অভক্তের সঙ্গে ভক্তিপুষ্টির কোনও সম্ভাবনা নাই; বরং বিষয়বার্ত্তা শুনিবার সম্ভাবনা আছে; বিষয়বার্ত্তা-শ্রবণে নিজের চিত্তেও বিষয়বাসনা বলবতী হইতে পারে, ভজনের প্রতিকূলতা জন্মিতে পারে; সুতরাং এতাদৃশ অভক্তের সঙ্গও বাঞ্ছনীয় নহে।

দ্বিতীয় রকমের অভক্তের সঙ্গ-প্রভাবে চিত্তবৃত্তি বিশেষরূপে কলুষিত হইতে পারে এবং ভজনবিষয়েও বিমুখতা জন্মিতে পারে।

"বরং হুতবহজ্জ্বালাপঞ্জরান্তর্ব্যবস্থিতিঃ। ন শৌরিচিন্তাবিমুখজনসংবাসবৈশসম্॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৫১) ধৃত কাত্যায়নসংহিতা-বচন।

—অগ্নি-শিখাময় পিঞ্জরের মধ্যে বাস করাও বরং ভাল; তথাপি কৃষ্ণচিন্তাবিমুখ জনের সহবাসরূপ ক্লেশ ভোগ করিবে না।"

"আলিঙ্গনং বরং মন্যে ব্যালব্যাঘ্রজলৌকসাম্। ন সঙ্গঃ শল্যযুক্তানাং নানাদেবৈকসেবিনাম্॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৫১) ধৃত-বিষ্ণুরহস্যবচন।

—যদি সর্প, ব্যাঘ্র ও কুম্ভীরের সহিত আলিঙ্গন ঘটে, তাহাও বরং ভাল, তথাপি যেন বাসনারূপ-শল্যবিদ্ধ নানাদেবোপাসকের সংসর্গ না ঘটে।"

"সঙ্গং ন কুর্য্যাদসতাং শিশ্নোদরতৃপাং ক্বচিৎ।
তস্যানুগস্তমস্যন্ধে পতত্যন্ধানুগান্ধবৎ॥ শ্রীভা, ১১।২৬।৩॥

ভগবদ্ভক্তিহীনা যে মুখ্যাঽসন্তস্ত এব হি।
তেষাং নিষ্ঠা শুভা ক্বাপি ন স্যাৎ সচ্চরিতৈরপি॥

—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (১০।২২৯) ধৃত প্রমাণ।

—শিশ্নোদরপরায়ণ অসৎ ব্যক্তির সঙ্গ করিলে অন্ধের অনুগামী অন্ধের ন্যায় অন্ধতম কূপে পতিত হইতে হয়। ভগবদ্ভক্তিবিমুখেরাই মুখ্য অসাধু। সদাচারনিষ্ঠ হইলেও কুত্রাপি তাহাদের গতি শুভ হয় না।”

সাধকের পক্ষে একটী কথা স্মরণ রাখা বিশেষ আবশ্যক। এ-স্থলে যে স্ত্রীসঙ্গীর সঙ্গ, কিবা কৃষ্ণবহির্ম্মুখ জনের সঙ্গ নিষিদ্ধ হইল, তাহাতে স্ত্রীসঙ্গীর প্রতি, কৃষ্ণবহির্ম্মুখজনের প্রতি যেন কাহারও অবজ্ঞার ভাব না আসে। কাহাকেও অবজ্ঞা করিলে বোধ হয় অপরাধী হইতে হইবে। স্ত্রী-সঙ্গীই হউন, আর কৃষ্ণ বহির্ম্মুখই হউন, কেহই বৈষ্ণবের অবজ্ঞার বা নিন্দার পাত্র নহেন। সকল জীবের মধ্যেই, পরমাত্মরূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত আছেন; সুতরাং সকল জীবই শ্রীভগবানের শ্রীমন্দিরতুল্য। কোনও সেবক তাঁহার শ্রীমন্দিরে শ্রীবিগ্রহকে ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলে শ্রীমন্দির যদি অপরিষ্কার-অপরিচ্ছন্ন অবস্থায় পড়িয়া থাকে, তাহা হইলে কোনও ভক্তই ঐ শ্রীমন্দিরের বা শ্রীমন্দিরস্থ শ্রীবিগ্রহের অবজ্ঞা করেন না; অভক্ত-জীব সংস্কারবিহীন শ্রীমন্দিরতুল্য—তাঁহার অন্তরেও শ্রীভগবান্ আছেন; সুতরাং ভক্তের নিকটে তিনিও সম্মানার্হ। “জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণের অধিষ্ঠান॥” এজন্যই বলা হইয়াছে “ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবৎ করিবেক বহু মান্য করি॥ এই সে বৈষ্ণব-ধর্ম্ম সবারে প্রণতি॥ শ্রীচৈতন্যভাগবত॥”

স্বরূপতঃ কোনও জীবই অসৎ নহে, সুতরাং অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধার পাত্র নহে। জীবের শিশ্নোদর-পরায়ণতা, কিম্বা কৃষ্ণ-বহির্ম্মুখতাই অবজ্ঞার বিষয়; এ সমস্ত হইতে দূরে থাকিবে। অসদ্ভাবের আধার বলিয়াই ইন্দ্রিয়-পরায়ণ ও কৃষ্ণবহির্ম্মুখ ব্যক্তির সংসর্গ ত্যাজ্য; আধেয়ের দোষে আধার ত্যাজ্য। সুরার আধার হইলে স্বর্ণপাত্রও অস্পৃশ্য; কিন্তু স্বর্ণপাত্র স্বরূপতঃ অস্পৃশ্য নহে; সুরার অস্পৃশ্যতা স্বর্ণপাত্রে সংক্রমিত বা অরোপিত হইয়াছে। তথাপি, অসৎলোক দেখিলেই মাদৃশ জীবের মনে একটা অবজ্ঞার ভাব আসে। এরূপ স্থলে অবজ্ঞার অপরাধ হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য এইভাবে সতর্কতা অবলম্বন করা যায়ঃ—আমার মধ্যে যে ভাব নাই, যে ভাবের ধারণাও আমার নাই, আমি অপরের মধ্যে সেই ভাবটীর অস্তিত্ব লক্ষ্য করিতে পারি না। আমার মধ্যে যে ভাবটী জাগ্রত বা সুপ্তাবস্থায় আছে, অপরের সেই ভাবটীই আমি লক্ষ্য করিতে পারি। সুতরাং যখনই অপরের মধ্যে ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা বা ভগবদ্বহির্ম্মুখতা আমি দেখিতে পাই, তখনই বুঝিতে পারি, আমার নিজের মধ্যেই ঐ দোষটী বর্ত্তমান রহিয়াছে। এরূপ স্থলে আমি মনে করিতে পারি—দর্পণে যেমন কোনও বস্তুর প্রতিবিম্ব প্রতিফলিত হয়, সেই রূপই ঐ ব্যক্তির মধ্যে আমার ইন্দ্রিয়-পরায়ণতা ও ভগবদ্বহির্ম্মুখতাদি প্রতিফলিত হইয়াছে। আমার মঙ্গলের জন্য, আমার সংশোধনের জন্যই, পরম-

করুণ শ্রীভগবান্ আমার সাক্ষাতে আমার দোষটী প্রকট করিয়াছেন ; ঐ দোষটী আমার—তাহার নহে,"—এইরূপ চিন্তা অভ্যাস করিতে করিতে শ্রীমন্মমহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে দোষটী সংশোধনের চেষ্টা করিলে, কোনও সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায়, ঐ দোষটী নির্ম্মূলভাবে দূরীভূত হইতে পারে এবং ভক্তির পূতধারায় হৃদয় পরিষিক্ত হইলে ঐরূপ দোষের ধারণা পর্য্যন্তও হৃদয় হইতে নিঃসারিত হইতে পারে। তখন নিতান্ত অসচ্চরিত্র—নিতান্ত বহির্ম্মুখ লোককে দেখিলেও তাহার দোষ লক্ষিত হইবে না।

চ। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ত্যাগ

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের ত্যাগও বৈষ্ণবের বর্জ্জনাত্মক আচার। ইহার হেতু এই—বর্ণাশ্রমধর্ম্মদ্বারা ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য বস্তু লাভ হয়। কিন্তু ইহকালের বা পরকালের ভোগ্য-বস্তু-লাভের বাসনা যতদিন হৃদয়ে থাকিবে, ততদিন ভক্তির কৃপা হইতে পারে না, সুতরাং বৈষ্ণবের উদ্দেশ্য-সিদ্ধির সম্ভাবনাও জন্মিতে পারে না। "ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে। তাবদ্ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫॥" এজন্য বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ভক্তির অঙ্গ নহে ; "সম্মতং-ভক্তি-বিজ্ঞানাং ভক্ত্যঙ্গত্বং ন কর্ম্মণাং॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু॥ ১।২।১১৮॥" বর্ণাশ্রমধর্ম্মের অনুষ্ঠানে জীব রৌরব হইতেও উদ্ধার পাইতে পারে না। "চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে। স্বধর্ম্ম করিয়াও সে রৌরবে পড়ি মজে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।১৯॥" তাই শ্রুতিও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগের কথা বলিয়াছেন। "বর্ণাদিধর্ম্মং হি পরিত্যজন্তঃ স্বানন্দতৃপ্তাঃ পুরুষা ভবন্তি। মৈত্রেয় উপনিষৎ।—যাঁহারা বর্ণাশ্রমাদিবিহিত ধর্ম্ম ত্যাগ করেন, তাঁহারা স্বানন্দতৃপ্ত হয়েন।" এ কথার তাৎপর্য্য ইহা নয় যে—কেবলমাত্র বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিলেই লোক কৃতার্থ হইতে পারে। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যাঁহারা ভগবদ্ভজন করেন, তাঁহারাই ভগবানের কৃপায় কৃতার্থতা লাভ করিতে পারেন। একথাই শ্রীভগবান্ অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া উপদেশ করিয়াছেন। "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥ গীতা ১৮।৬৬॥" শ্রীমদ্ভাগবতও বলেন—"আজ্ঞায়ৈবং গুণান্ দোষান্ ময়াদিষ্টানপি স্বকান্। ধর্ম্মান্ সন্ত্যজ্য যঃ সর্ব্বান্ মাং ভজেৎ স তু সত্তমঃ॥ ১১।১১।৩২॥" গীতোক্ত "পরিত্যজ্য—পরিত্যাগ করিয়া" এবং শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত "সন্ত্যজ্য সম্যক্‌রূপে ত্যাগ করিয়া"-বাক্য হইতে ভজনের আরম্ভেই স্বধর্ম্মাদি ত্যাগের কথা জানা যায়। শ্রীমদ্ভাগবত অন্যত্রও একথা বলিয়াছেন।

"ত্যক্ত্বা স্বধর্ম্মং চরণাম্বুজং হরের্ভজন্নপক্কোঽথ পতেত্ততো যদি।
যত্র ক্ব বাভদ্রমভূদমুষ্য কিং কোবার্থ আপ্তোঽভজতাং স্বধর্ম্মতঃ॥ ১।৫।১৭॥

—শ্রীনারদ শ্রীব্যাসদেবকে বলিতেছেন—স্বধর্ম্ম পরিত্যাগপূর্ব্বক হরিচরণ-পদ্ম ভজনকারী কোনও ব্যক্তির যদি অপক্ক দশাতেই (ভজনারম্ভেই) কিম্বা যে কোনও অবস্থাতেই পতন (ভজনপথ হইতে চ্যুতি বা মৃত্যু) হয়, তাহা হইলে কি তাহার কোনও অকল্যাণ হয়?—হয় না। আর হরি-

চরণারবিন্দের ভজনব্যতিরেকে কেবল স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠান দ্বারা কোন্ ব্যক্তিই বা অর্থ লাভ করিয়াছে ?—কেহই না।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী বলিয়াছেন—এই শ্লোকের “ত্যক্ত্বা”-শব্দের “ক্ত্বা” প্রত্যয়ের দ্বারা ভজনারম্ভ-দশাতেই স্বধর্ম্মানুষ্ঠান নিষিদ্ধ হইয়াছে, স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া যিনি ভজন করেন, তাঁহার কোনও অমঙ্গল হয় না। “ক্ত্বা-প্রত্যয়েন ভজনারম্ভদশায়ামপি কর্ম্মানুবৃত্তির্নিষিদ্ধা স্বধর্ম্মং ত্যক্ত্বা যো ভজন্ স্যাদমুষ্যাভদ্রং তাবন্ন ভবেদেব।” যদি অপক্ক (ভগবৎ-প্রাপ্তির অযোগ্য) অবস্থায়ও তাঁহার মৃত্যু হয়, অথবা যদি অন্য কোনও বস্তুতে আসক্তিবশতঃ (যেমন ভরত-মহারাজ হরিণ-শিশুতে আসক্ত হইয়াছিলেন) বা দুরাচারতাবশতঃ ভক্তিপথ হইতে তিনি ভ্রষ্ট হয়েন, তথাপিও স্বধর্ম্মত্যাগবশতঃ কোনও অমঙ্গল তাঁহার হইবে না। “যদি পুনঃ অপক্কো ভগবৎপ্রাপ্ত্যযোগ্যো ম্রিয়েত জীবন্দেব বা কথঞ্চিদন্যাসক্তস্ততো ভজনাৎ দুরাচারতয়া বা পতেৎ তদপি কর্ম্মত্যাগনিমিত্তমভদ্রং নো ভবেদেব।” কেন অমঙ্গল হইবে না, তাহার হেতুরূপে চক্রবর্ত্তিপাদ বলিতেছেন—“ভক্তিবাসনায়াস্ত্বনুচ্ছিত্তি-ধর্মত্বাৎ সূক্ষ্মরূপেণ তদাপি সত্ত্বাৎ কর্মানধিকারাদিত্যাহ।—স্বরূপতঃই ভক্তিবাসনার বিনাশ নাই; পতিত বা মৃত অবস্থাতে তাহা সূক্ষ্মরূপে বর্ত্তমান থাকে।” উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবগোস্বামীও তাহাই বলিয়াছেন—“ভক্তিবাসনায়া স্ত্ববিচ্ছিত্তিধর্ম্মত্বাৎ—ভক্তিবাসনার ধর্ম্মই এই যে, ইহার বিনাশ নাই।” এজন্যই গীতাতেও শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“ন মে ভক্ত প্রণশ্যতি।” ভক্তিবাসনা হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তি ; স্বরূপশক্তি নিত্য—অবিনাশী বস্তু।

বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মত্যাগের সম্বন্ধে অবশ্য অধিকার-বিচার আছে ; পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।২৯-অনুচ্ছেদে সেই বিচার দ্রষ্টব্য।

ছ। অকিঞ্চন হওয়া

শুদ্ধাভক্তির সাধক বৈষ্ণবকে অকিঞ্চন হইতে হইবে। ইহা হইতেছে গ্রহণাত্মক আচার।

কিছুই নাই যাঁহার, তাঁহাকেই অকিঞ্চন বলা হয়। এই অকিঞ্চন কিন্তু ব্যবহারিক জগতের ধন-জনাদিহীন নিঃস্ব ব্যক্তি নহে। সমস্ত থাকিয়াও যাঁহার কিছু নাই, তিনিই অকিঞ্চন। ধনজন-পুত্র-বিত্তাদি থাকা সত্ত্বেও যিনি এ-সমস্তকে আপন মনে করেন না, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণ বা শ্রীকৃষ্ণচরণ ব্যতীত অপর কিছুকেই যিনি আপন মনে করেন না, সেই ভক্তই অকিঞ্চন। শ্রীকৃষ্ণপ্রাপ্তির জন্য, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার জন্য, শ্রীকৃষ্ণভক্তি লাভ করিবার জন্য যিনি গৃহবিত্ত-স্ত্রীপুত্রাদি সমস্ত (অর্থাৎ এ-সমস্তে আসক্তি) ত্যাগ করিয়াছেন, তিনিই অকিঞ্চন।

“প্রভু কহে সনাতন, কৃষ্ণ যে রতন ধন, অনেক যে দুঃখেতে মিলয়।
দেহ গেহ পুত্র দার, বিষয় বাসনা আর, সর্ব্ব আশা যদি তেয়াগয়॥—ভক্তমাল॥”

শ্রীমদ্ভাগবত হইতে অকিঞ্চনের লক্ষণ জানা যায়।

"মত্তোঽপ্যনন্তাৎ পরতঃ পরস্মাৎ স্বর্গাপবর্গাধিপতের্ন কিঞ্চিৎ।
যেষাং কিমু স্যাদিতরেণ তেষামকিঞ্চনানাং ময়ি ভক্তিভাজাম্॥

—শ্রীভা, ৫।৫।২৫॥

—(ভগবান্ বলিয়াছেন) আমি অনন্ত, আমি পরাৎপর, আমি স্বর্গ ও অপবর্গের (মোক্ষের) অধিপতি ; এতাদৃশ আমার নিকট হইতেও যাঁহাদের প্রার্থনীয় কিছু নাই, আমাতে ভক্তিপরায়ণ সেই অকিঞ্চনদিগের অন্য প্রার্থনীয় বস্তু আর কি থাকিতে পারে ?"

কৃষ্ণকামনা এবং কৃষ্ণভক্তিকামনা ব্যতীত অন্য সমস্ত কামনা ত্যাগই হইতেছে অকিঞ্চনের লক্ষণ। কৃষ্ণকামনা এবং কৃষ্ণভক্তিকামনা ব্যতীত অন্য সমস্ত কামনাই যেন হৃদয় হইতে অন্তর্হিত হয়, ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা করিবে।

জ। **কৃষ্ণৈকশরণ**

অন্য সমস্ত পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইবে।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও দেখা যায়, অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন—

"সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ।
অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি মা শুচঃ॥১৮।৬৬॥

—বর্ণাশ্রমাদি সমস্ত ধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র আমার শরণ গ্রহণ কর। সমস্ত অন্তরায় (পাপ) হইতে আমি তোমাকে রক্ষা করিব ; তুমি শোক করিও না।"

"মামেকং শরণং ব্রজ"-বাক্যের তাৎপর্য্যই "কৃষ্ণৈকশরণ"-শব্দে অভিব্যক্ত হইয়াছে। একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেরই শরণ গ্রহণ বিধেয়, অন্য কোনও দেবদেবীর শরণ নয়, অন্য কোনও ধর্ম্মেরও নয়। শ্রীল নরোত্তম দাসঠাকুর মহাশয়ও তাঁহার "প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা"-গ্রন্থে বলিয়াছেন—"অসৎ ক্রিয়া কুটি-নাটি, ছাড় অন্য পরিপাটী, অন্য দেবে না করিহ রতি। আপনা আপনা স্থানে, পীরিতি সভায় টানে, ভক্তিপথে পড়য়ে বিগতি॥২৭॥", "অন্য ব্রত অন্য দান, নাহি কর বস্তু জ্ঞান, অন্য সেবা অন্য দেবপূজা। হা হা কৃষ্ণ বলি বলি, বেড়াব আনন্দ করি, মনে মোর নাহি যেন দুজা॥৪১॥ (দুজা = দ্বিধা, সন্দেহ)॥"

উল্লিখিত গীতা-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণও লিখিয়াছেন—

"প্রাক্তনপাপপ্রায়শ্চিত্তভূতান্ কৃচ্ছ্রাদীন্ সবিহিতাংশ্চ সর্ব্বান্ ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য স্বরূপতস্ত্যাক্ত্বা মাং সর্ব্বেশ্বরং কৃষ্ণং নৃসিংহদাসরথ্যাদিরূপেণ বহুধাবির্ভূতং বিশুদ্ধভক্তিযোগগোচরং সন্তমবিদ্যা-পর্য্যন্তসর্ব্বকামবিনাশকমেকং ন তু মত্তোঽন্যং শিতিকণ্ঠাদিকং শরণং ব্রজ প্রপদ্যস্ব।— (শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন) পূর্ব্বপাপের প্রায়শ্চিত্তভূত বেদবিহিত কৃচ্ছ্রাদি সমস্ত ধর্ম্ম স্বরূপতঃ (অনুষ্ঠান) পরিত্যাগ করিয়া, যে আমি নৃসিংহ-দাশরথি-আদি বহুরূপে আবির্ভূত, যে আমি একমাত্র বিশুদ্ধ-ভক্তিযোগের গোচর এবং যে আমি অবিদ্যা পর্য্যন্ত সর্ব্বকাম-বিনাশক, সেই সর্ব্বেশ্বর শ্রীকৃষ্ণ আমার শরণ গ্রহণ কর। কিন্তু আমা হইতে অন্য শিতিকণ্ঠাদির শরণ গ্রহণ করিবে না।"

শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীও লিখিয়াছেন—“কেচিদ্‌বর্ণধর্ম্মাঃ কেচিদাশ্রমধর্ম্মাঃ কেচিৎ সামান্যধর্ম্মা ইত্যেবং সর্ব্বানপি ধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য বিদ্যমানানবিদ্যমানান্ বা শরণত্বেনানাদৃত্য মামীশ্বরমেকমদ্বিতীয়ং সর্ব্বধর্ম্মাণামধিষ্ঠাতারং ফলদাতারং চ শরণং ব্রজ। ধর্ম্মাঃ সন্তু ন সন্তু বা কিং তৈরন্যসাপেক্ষৈঃ ভগবদনুগ্রহাদেব তু অন্য নিরপেক্ষাদহং কৃতার্থো ভবিষ্যামীতি নিশ্চয়েন পরমানন্দঘনমূর্ত্তিমনন্তং শ্রীবাসুদেবমেব ভগবন্তমনুক্ষণভাবনয়া ভজস্ব ইদমেব পরমং তত্ত্বং নাতোঽধিকমস্তীতি বিচারপূর্ব্বকেন প্রেমপ্রকর্ষেণ সর্ব্বানাত্মচিন্তাশূন্যয়া মনোবৃত্ত্যা তৈলধারাবদবিচ্ছিন্নয়া সততং চিন্তয়েত্যর্থঃ।—বর্ণধর্ম্ম বা আশ্রমধর্ম্ম, কিম্বা সামান্যধর্ম্ম— ইত্যাদিরূপ সমস্তধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া, সে-সমস্ত বিদ্যমান্ই হউক, কি অবিদ্যমান্ই হউক —শরণত্বরূপে অনাদর করিয়া অর্থাৎ সে সমস্তের শরণ গ্রহণ না করিয়া, এক এবং অদ্বিতীয় ঈশ্বর সমস্ত ধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা এবং ফলদাতা আমারই শরণ গ্রহণ কর। তাৎপর্য্য এই যে—ধর্ম্মসমূহ থাকুক, বা না থাকুক, সে সমস্ত সাপেক্ষধর্ম্মে (সর্ব্বধর্ম্মের অধিষ্ঠাতা এবং ফলদাতা শ্রীকৃষ্ণের কৃপাব্যতীত কোনও ধর্ম্মই ফল দিতে পারে না ; সুতরাং সমস্ত ধর্ম্মই কৃষ্ণকৃপাসাপেক্ষ ; এতাদৃশ সাপেক্ষ ধর্ম্মে) আমার কি প্রয়োজন ? অন্যনিরপেক্ষ ভগবদনুগ্রহ হইতেই আমি কৃতার্থ হইতে পারিব—এইরূপ দৃঢ়নিশ্চয়তার সহিত পরমানন্দ-ঘনবিগ্রহ অনন্ত (সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মতত্ত্ব) ভগবান্ বাসুদেবকেই অনুক্ষণ চিন্তা করিয়া ভজন কর। ইহাই পরম তত্ত্ব, ইহার অধিক আর কিছু নাই, এইরূপ বিচারপূর্ব্বক প্রেমপ্রকর্ষের সহিত এবং সমস্ত অনাত্মবিষয়ে (অনিত্য জড় বিষয়ে) চিন্তাশূন্য হইয়া তৈলধারাবৎ অবিচ্ছিন্ন মনোবৃত্তিদ্বারা সর্ব্বদা শ্রীকৃষ্ণের চিন্তা কর।”

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলিয়াছেন—যেমন বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলেই তাহার স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা প্রভৃতি তৃপ্ত (পুষ্ট) হয় ; যেমন ভোজনদ্বারা প্রাণের তৃপ্তি সাধন করিলেই ইন্দ্রিয়াদি তৃপ্ত হয় ; তদ্রূপ অচ্যুত শ্রীকৃষ্ণের আরাধনাতেই সমস্তের পূজা হইয়া থাকে।

যথা তরোর্ম্মূলনিষেচনেন তৃপ্যন্তি তৎস্কন্ধভুজোপশাখাঃ।
প্রাণোপহারাচ্চ যথেন্দ্রিয়াণাং তথৈব সর্ব্বার্হণমচ্যুতেজ্যা ॥

—শ্রীভা, ৪।৩১।১৪॥”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“কিঞ্চ নানাকর্ম্মভিঃ তত্তদ্দেবতাপ্রীতিনিমিত্তান্যপি ফলানি হরেঃ প্রীত্যা ভবন্তি, কেবলং তত্তদ্দেবতারাধনেন তু ন কিঞ্চিদিতি সদৃষ্টান্তমাহ যথেতি। মূলাৎ প্রথমবিভাগাঃ স্কন্ধাঃ, তদ্বিভাগা ভুজাঃ, তেষামপি উপশাখাঃ, উপলক্ষণমেতৎ, পত্রপুষ্পাদয়োঽপি তৃপ্যন্তি। ন তু মূলসেকং বিনা তাঃ স্বস্বনিষেচনেন। প্রাণস্যোপহারো ভোজনম্, তস্মাদেব ইন্দ্রিয়াণাং তৃপ্তিঃ, ন তু তত্তদিন্দ্রিয়েষু পৃথক্ পৃথগন্নলেপনেন। তথা অচ্যুতারাধনমেব সর্ব্বদেবতারাধনং, ন পৃথগিত্যর্থঃ।—নানাবিধ কর্ম্মদ্বারা সেই সেই দেবতার প্রীতি হইতে যে ফল পাওয়া যায়, শ্রীহরির প্রাতি দ্বারাই তাহা পাওয়া যায় ; কেবল সেই সেই দেবতার আরাধনাদ্বারা (অর্থাৎ শ্রীহরির প্রীতি উৎপাদনের জন্য শ্রাহরির আরাধনা না করিয়া কেবল সেই সেই দেবতার আরাধনা দ্বারা) যে কিছুই

পাওয়া যায় না, এই শ্লোকে দৃষ্টান্তদ্বারা তাহা বলা হইয়াছে। বৃক্ষের মূল হইতে প্রথম যে কাণ্ড জন্মে, তাহার নাম স্কন্ধ, স্কন্ধের বিভাগ হইতেছে ভুজ বা শাখা, শাখার বিভাগ উপশাখা। ইহা উপলক্ষণ। পত্রপুষ্পাদির তৃপ্তিও ইহাতে সূচিত হইতেছে। বৃক্ষের মূলে জল সেচন করিলে স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদি সমস্তই তৃপ্তিলাভ করে। মূলে জল না দিয়া পৃথক্ পৃথক্ ভাবে স্কন্ধ, শাখা, উপশাখা, পত্রপুষ্পাদিতে জল সেচন করিলে তাহারা তৃপ্ত হয় না। প্রাণোপহার হইতেছে ভোজন। ভোজন হইতেই ইন্দ্রিয়াদির তৃপ্তি, ইন্দ্রিয়সমূহে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে অন্ন লেপন করিলে তাহাদের তৃপ্তি হয় না। তদ্রূপ অচ্যুতের আরাধনাতেই সমস্ত দেবতার আরাধনা হয়, পৃথক্ ভাবে দেবতাদের আরাধনাতে তাঁহাদের আরাধনা বা তৃপ্তি হয় না।”

স্বামিপাদের টীকা অনুসারে শ্রীমদ্ভাগবতের উল্লিখিত শ্লোকের তাৎপর্য্যে জানা গেল—শ্রীকৃষ্ণের সেবাতেই সমস্ত কর্ম্মের ফলও পাওয়া যায় এবং সমস্ত দেবতার প্রীতিও জন্মে। সুতরাং অন্য-দেবতাদির শরণ গ্রহণ না করিয়া একমাত্র শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিলেই সকলের শরণ গ্রহণ হইয়া যায়, শ্রীকৃষ্ণকে বাদ দিয়া অন্য দেবতাদির শরণ গ্রহণ করিলে বস্তুতঃ তাঁহাদের শরণ গ্রহণও সিদ্ধ হয় না। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—“কৃষ্ণভক্তি করিলে সর্ব্ব-কর্ম্ম কৃত হয়॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২২।৩৭॥”

ইহাতে অন্য দেবতাদির প্রতি অবজ্ঞা সূচিত হয়না। কৃষ্ণৈকশরণ সাধকের পক্ষে ব্রহ্মা-রুদ্রাদি অন্যদেবতার অবজ্ঞা প্রত্যবায়জনক।

“হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ। ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৫৩) ধৃত পাদ্মবচন॥

—ভগবান্ হরি সমস্ত দেবেশ্বর দিগেরও ঈশ্বর ; অতএব তিনিই সর্ব্বদা আরাধ্য ; কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রহ্মারুদ্রাদি অন্য দেবতার প্রতি কখনও অবজ্ঞা প্রদর্শন করিবেনা (কেননা, সেই অবজ্ঞা শ্রীহরিকেই স্পর্শ করে)।”

শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপরের শরণ-ত্যাগ, কিম্বা শ্রীকৃষ্ণারাধনাব্যতীত অন্য ধর্ম্মের ত্যাগে যে কোনও প্রত্যবায় হয় না, পূর্ব্বোদ্ধৃত গীতাশ্লোকের “ অহং ত্বাং সর্ব্বপাপেভ্যো মোক্ষয়িষ্যামি, মা শুচঃ” বাক্যেই শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিয়াছেন। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহা জানা যায়। নবযোগীন্দ্রের একতম করভাজন ঋষি নিমি-মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন—সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইলে দেব-ঋষি-পিত্রাদির নিকটেও আর ঋণী হইতে হয় না।

“দেবর্ষি ভূতাপ্তনৃণাং পিতৄণাং ন কিঙ্করো নায়মৃণী চ রাজন্।
সর্ব্বাত্মনা যঃ শরণং শরণ্যং গতো মুকুন্দং পরিহৃত্য কর্ত্তম্॥ শ্রীভা, ১১।৫।৪১॥

—(ঋষি করভাজন নিমি-মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন) হে রাজন্। কৃত্যাকৃত্য কর্ম্ম পরিহার-পূর্ব্বক যিনি সর্ব্বতোভাবে শরণীয় (শরণাগত-পালক) মুকুন্দের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি আর

দেবতা, ঋষি, ভূত, পোষ্য-কুটুম্বাদি বা পিতৃপুরুষগণের নিকটে ঋণী থাকেন না (কাজেই, তাঁহাদের কাহারও) কিঙ্কর থাকেন না।”

দেবাদির নিকটে মানুষের পাঁচটী ঋণ আছে; যথা—দেব-ঋণ, ঋষি-ঋণ, পিতৃ-ঋণ, ভূত-ঋণ, এবং নৃ-ঋণ বা নর-ঋণ (আত্মীয় স্বজনের নিকটে ঋণ)। ইন্দ্রাদি দেবতাগণ রৌদ্র-বৃষ্টি-আদি দ্বারা আমাদের জীবন-ধারণের উপযোগী শস্যাদি উৎপাদনের সহায়তা করেন; এজন্য আমরা দেবতাদিগের নিকটে ঋণী। ঋষিগণ যজ্ঞাদিদ্বারা ইন্দ্রাদি-দেবতাগণের তৃপ্তি বিধান করিয়া রৌদ্রবৃষ্টি-আদি-কার্য্যের আনুকূল্য করেন এবং তাঁহাদের সাধনলব্ধ ভগবত্তত্ত্বাদি শাস্ত্রাকারে লিপিবদ্ধ করিয়া আমাদের পারমার্থিক মঙ্গল বিধান করেন, এজন্য আমরা ঋষিদিগের নিকটে ঋণী। আমাদের জন্ম, শরীর এবং শরীর-রক্ষাদির জন্য আমরা পিতামাতার নিকটে ঋণী। কাক, শকুন, কুক্কুর-প্রভৃতি প্রাণী (ভূত), বিষ্ঠা বা মৃত জন্তুর পচা মাংসাদি আহার করে বলিয়া বায়ু-মণ্ডল দূষিত পদার্থে দুর্গন্ধময় ও বিষাক্ত হইতে পারে না; গো-মহিষাদি প্রাণী আমাদের কৃষিকার্য্যাদির প্রধান সহায়, দুগ্ধাদি দ্বারাও তাহারা মানুষের যথেষ্ট উপকার করে। মৎস্যাদি জলচর জন্তু পুষ্করিণী-আদির ময়লা জিনিস আহার করে বলিয়া পানীয় জল দূষিত হইতে পারে না। এই রূপে প্রত্যেক ইতর-প্রাণীই মানুষের কোনও না কোনও উপকার সাধন করিতেছে; এজন্য আমরা তাহাদের নিকটে ঋণী। আর আত্মীয়স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশী দ্বারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে আমরা কত রকমে উপকৃত হইতেছি। যাহারা আত্মীয়স্বজন বা প্রতিবেশী নহে, তাহাদের দ্বারাও পরোক্ষ ভাবে কত উপকার পাইতেছি। কৃষকেরা শস্য উৎপাদন করিয়া আমাদের জীবিকা-নির্ব্বাহের সংস্থান করিয়া দেয়; তাঁতী কাপড় বুনিয়া শীত-লজ্জাদি নিবারণের সহায়তা করে; ইত্যাদি। যদি বলা যায়, তাহারা তো তাহাদের জীবিকানির্ব্বাহের উপায়রূপে এসব করিয়া থাকে, জিনিসের পরিবর্ত্তে তাহারা মূল্য লইয়া থাকে। ইহার উত্তরে বলা যায় যে, তাহারা জীবিকা-নির্ব্বাহের জন্য অন্য উপায়ও অবলম্বন করিতে পারিত; তখন মূল্য দিলেও আমরা ঐসকল প্রয়োজনীয় জিনিস পাইতাম না। এই সমস্ত উপকারের জন্য মানুষ-সাধারণের নিকটেই আমরা ঋণী। হোমের দ্বারা দেব-ঋণ, শাস্ত্রাধ্যাপন দ্বারা ঋষিঋণ, সন্তানোৎপাদন ও শ্রাদ্ধ-তর্পণাদি দ্বারা পিতৃঋণ, বলি (জীব-সমূহের খাদ্যবস্তু) দ্বারা ভূত-ঋণ এবং অতিথি-সৎকারের দ্বারা আত্মীয়স্বজনের ঋণ বা নর-ঋণ শোধিত হয়। “অধ্যাপনং ব্রহ্মযজ্ঞঃ পিতৃযজ্ঞস্তু তর্পণম্। হোমো দৈবো বলির্ভৌতো নৃ-যজ্ঞোঽতিথি-পূজনম্॥ মনু।৩।৭০॥”, “নিবাপেন পিতৄনর্চ্চেৎ যজ্ঞৈর্দ্দেবাং স্তথাতিথীন্। অন্নৈর্মুনীংশ্চ স্বাধ্যায়ৈরপত্যেন প্রজাপতিম্॥ বিষ্ণুপুরাণ॥ ৩।৯।৯॥” এই পাঁচটী ঋণ শোধের উপায়কে **পঞ্চযজ্ঞ** বলে। যাঁহারা সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হইয়া শ্রীকৃষ্ণভজন করেন, স্বতন্ত্রভাবে পঞ্চযজ্ঞ না করিলেও তাঁহাদের কোনও প্রত্যবায় হয় না; উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক হইতে তাহাই জানা গেল।

"মৎকর্ম্ম কুর্ব্বতাং পুংসাং ক্রিয়ালোপো ভবেদ্ যদি। তেষাং কর্ম্মাণি কুর্ব্বন্তি ত্রিস্রঃ কোট্যো মহর্ষয়ঃ॥
—বৃহদ্ভাগবতামৃত ॥২।৪।২০৯-শ্লোকের টীকায় ধৃত প্রমাণ॥

—(শ্রীভগবান্ বলিতেছেন) আমার কর্ম্মে রত ব্যক্তিদিগের যদি ক্রিয়ালোপ হয়, তাহা হইলে, তাঁহাদের কর্ম্ম তিন কোটি মহর্ষি করিয়া থাকেন।"

ইহা দ্বারা বুঝা যায়—শরণাগত ভজনকারীকে কর্ম্মকাণ্ডের অঙ্গীভূত কোনও ক্রিয়ার লোপ-জনিত কোনও প্রত্যবায়ের ভাগী হইতে হয় না।

ঝ। শরণাগতির লক্ষণ

শরণাগতির ছয়টি লক্ষণ আছে। যথা,

আনুকূল্যস্য সঙ্কল্পঃ প্রাতিকূল্যস্য বর্জনম্। রক্ষিষ্যতীতি বিশ্বাসো গোপ্তৃত্বে বরণং তথা।
আত্মনিক্ষেপ-কার্পণ্যে ষড়্বিধা শরণাগতিঃ॥ হ, ভ, বি (১১।৪১৭) ধৃত শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্র বচন॥

—ভগবদ্ভজনের অনুকূল বিষয়ের ব্রতরূপে (অবিচলিত রূপে) গ্রহণ, তাহার প্রতি-কূল বিষয়ের ত্যাগ, 'ভগবান্ আমাকে নিশ্চয়ই রক্ষা করিবেন'-এইরূপ দৃঢ় বিশ্বাস, রক্ষাকর্ত্তা রূপে তাঁহাকে বরণ করা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ এবং শ্রীকৃষ্ণ-চরণে আর্ত্তিজ্ঞাপন (আমি নিতান্ত অভি-মানী, ভক্তিহীন, মহা অপরাধী, হে শ্রীকৃষ্ণ! তোমার কৃপা ব্যতীত আমার আর অন্য গতি নাই, আমাকে রক্ষাকর, রক্ষাকর—ইত্যাদি রূপে আর্ত্তি ও দৈন্য জ্ঞাপন) —এই ছয় প্রকার হইতেছে শরণাগতির লক্ষণ।"

এই ছয়টী লক্ষণের মধ্যে রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণই প্রধান; অন্য পাঁচটী আনুষঙ্গিক, অনুপূরক-পরিপূরক মাত্র। রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণই অঙ্গী, অন্য পাঁচটী তাহার অঙ্গ। রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ এবং শরণাগতি একই কথা; কাহাকেও রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ করিলেই তাঁহার শরণাগত হওয়া হইল, তাঁহার শরণ বা আশ্রয় লওয়া হইল। যাঁহার আশ্রয় লওয়া হয়, তাঁহার প্রীতির অনুকূল বিষয়ের গ্রহণ এবং প্রতিকূলবিষয়ের ত্যাগ, আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে এবং রক্ষা করিবার যোগ্যতা যে তাঁহার আছে, এই বিশ্বাস পূর্ব্বেই জন্মিয়া থাকিবে—নচেৎ রক্ষাকর্ত্তারূপে তাঁহার বরণই সম্ভব হয় না; আর রক্ষাকর্ত্তা-রূপে যাঁহার বরণ করা হয়, তাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণও করিতেই হয় এবং স্বীয় দৈন্য জ্ঞাপনও করিতে হয়। এইরূপে অনুকূল বিষয়ের গ্রহণাদি পাঁচটী বিষয় রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণের অঙ্গ বা আনুষঙ্গিক ক্রিয়াই হইল। শরণাগতি বা অকিঞ্চনত্বের মুখ্য লক্ষণ হইল রক্ষাকর্ত্তারূপে বরণ।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ।
তার মধ্যে প্রবেশয়ে 'আত্মসমর্পণ'॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৫৩॥

শরণাগত ও অকিঞ্চনের একই লক্ষণ হইলেও এবং উভয়েই শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়া থাকিলেও, সম্ভবতঃ স্থলবিশেষে উভয়ের মধ্যে একটু পার্থক্য থাকে; এই পার্থক্য আত্মসমর্পণের প্রবর্ত্তক

-হেতুবশতঃ। যিনি সংসার ভোগ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, যথাসাধ্য চেষ্টাও করিয়াছিলেন, কিন্তু কৃতকার্য্য হইতে পারেন নাই, সাংসারিক আপদ্‌বিপদে ব্যতিব্যস্ত হইয়া—সংসারে বিরক্ত হইয়াছেন; অনন্যোপায় হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকে শরণাগত বলা চলে, কিন্তু বোধ হয় অকিঞ্চন বলা চলে না। আর সংসারভোগ কৃষ্ণ-ভক্তির প্রতিকূল জানিয়া—তাঁহার স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য শ্রীকৃষ্ণসেবাপ্রাপ্তির আনুকূল্য বিধান করিতে পারে, এমন কিছুই সংসারে তাঁহার নাই জানিয়া সংসার-প্রীতি ছাড়িয়া—যিনি শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য শ্রীকৃষ্ণের শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহাতে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, তাঁহাকেই অকিঞ্চন বলে। পূর্ব্বোক্ত কারণে যিনি শরণাগত, তাঁহার কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের হেতু—সংসারভোগে তাঁহার অকৃতকার্য্যতা ; আর যিনি অকিঞ্চন—তাঁহার পক্ষে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণের হেতু—শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনা। অকিঞ্চন সকল সময়েই সংসারে নিস্পৃহ ; শরণাগত সংসারে নিস্পৃহ ছিলেন না, কিন্তু ব্যর্থমনোরথ হইয়া কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন। যিনি অকিঞ্চন, তিনি কৃষ্ণ-সেবার জন্য সংসার ছাড়িয়াছেন, আর যিনি শরণাগত, তিনি সংসারভোগে ব্যর্থ-মনোরথ হইয়া সংসার ছাড়িয়াছেন ; এস্থলে সংসারই তাঁহাকে ছাড়িয়াছে বলা যায়। যিনি অকিঞ্চন, তিনি নিশ্চিতই শরণাগত ; কিন্তু যিনি শরণাগত, তিনি সকলক্ষেত্রে অকিঞ্চন না হইতেও পারেন—অন্ততঃ প্রারম্ভে। যিনি অকিঞ্চন হইয়া শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হয়েন, ভক্তিমার্গের সাধনে তিনি অচিরাৎ সাফল্য লাভ করিতে পারেন।

যাহা হউক, উল্লিখিত অর্থে প্রারম্ভে শরণাগত ও অকিঞ্চনে কিছু পার্থক্য থাকিলেও উভয়ের পর্য্যবসান কিন্তু একই আত্মসমর্পণে ; এজন্যই বোধ হয় বলা হইয়াছে—"শরণাগত অকিঞ্চনের একই লক্ষণ। তার মধ্যে প্রবেশয়ে আত্মসমর্পণ।" তার মধ্যে - লক্ষণের মধ্যে।

ঞ। শরণাগতির মহিমা

(১) আনন্দানুভব

শরণাগতির লক্ষণের কথা বলিয়া শাস্ত্র শরণাগতির মহিমার কথাও বলিয়াছেন।

"তবাস্মীতি বদন্ বাচা তথৈব মনসা বিদন্। তৎস্থানমাশ্রিতস্তন্বা মোদতে শরণাগতঃ॥

—হ. ভ. বি. (১১।৪১৮) ধৃত শ্রীবৈষ্ণবতন্ত্রবচন॥

—'হে ভগবন্! 'আমি তোমারই হইলাম'—মুখে এইরূপ বলিয়া, মনে মনেও সেইরূপ জানিয়া এবং শরীরের দ্বারা শ্রীবৃন্দাবনাদি ভগবল্লীলাস্থান আশ্রয় করিয়া শরণাগত ব্যক্তি আনন্দ উপভোগ করিয়া থাকেন।"

এই শ্লোকের মর্ম্ম এই যে - কেবল যন্ত্রের ন্যায় বাহ্যিক আচরণে আনুকূল্যের গ্রহণ এবং প্রাতিকূল্যের বর্জ্জনাদি করিলেই—কেবল মুখে "হে ভগবন্! আমি তোমার"-এইরূপ বলিলেই শরণাগত হওয়া যায় না। কায়মনোবাক্যে ভগবানের হওয়া চাই, বাহিরে যেরূপ আচরণ করিবে, মনের ভাবও ঠিক তদনুরূপ হওয়া চাই। শরণাগত হইয়া যিনি শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন,

তাঁহার নিজের বলিতে আর কিছুই থাকে না—তাঁহার দেহও আর তাঁহার নিজের নহে, আত্মসমর্পণের পরে তাহা শ্রীকৃষ্ণেরই সম্পত্তি হইয়া যায়; তখন হইতে দেহকে বা দেহসম্বন্ধী ইন্দ্রিয়াদিকে তাঁহার নিজের কাজে নিয়োজিত করার তাঁহার কোনও অধিকারই থাকেনা—বিক্রীত গরুকে যেমন আর নিজের কাজে লাগান যায় না, তদ্রূপ। দেহকে এবং ইন্দ্রিয়াদিকে সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের কার্য্যেই নিয়োজিত করিতে হইবে। যাঁহার নিকটে আত্মসমর্পণ করা হয়, তাঁহার বাড়ীতেই থাকিতে হয়; এইভাবে থাকিলেই মনেও একটু স্বস্তি বোধ হয়; তাই শরণাগত ব্যক্তি শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাস্থল-বৃন্দাবনাদিতে বাস করিয়া আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন।

এইরূপ বাস্তব-শরণাগতি সাধন-ভজন-সাপেক্ষ। শরণাগতির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া যথাবিহিত উপায়ে সাধন-ভজন করিতে করিতে কোনও ভাগ্যে ভগবৎকৃপায় কায়মনোবাক্যে শরণাগত হওয়া যায়। তখনই সাধক "মোদতে—আনন্দ অনুভব করেন," তাহার পূর্ব্বে, সম্যক্‌রূপে শরণাগত হওয়ার পূর্ব্বে, ভগবৎ-স্থানাদির আশ্রয়েও সম্যক্ আনন্দ অনুভব করা সম্ভব হয় না।

(২) **শ্রীকৃষ্ণের বিচিকীর্ষিতত্ত্ব**

শরণাগতির মহিমা সম্বন্ধে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

শরণ লঞা করে কৃষ্ণে আত্মসমর্পণ।
কৃষ্ণ তারে করে তৎকালে আত্মসম॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২।৫৪॥

এই উক্তির সমর্থনে তিনি যে প্রমাণের উল্লেখ করিয়াছেন, তাহার আলোচনা করিলেই মহাপ্রভুর উক্তির তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। প্রমাণ-শ্লোকটী এই।

"মর্ত্ত্যো যদা ত্যক্তসমস্তকর্ম্মা নিবেদিতাত্মা বিচিকীর্ষিতো মে।
তদামৃতত্বং প্রতিপদ্যমানো ময়াত্মভূয়ায় চ কল্পতে বৈ॥ —শ্রীভা, ১১।২৯।৩৪॥

—(উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) মানুষ যখন অপর সমস্ত কর্ম্ম ত্যাগ করিয়া আমাতে (শ্রীকৃষ্ণে) আত্মসমর্পণ করে, তখন তাহার জন্য বিশেষ কিছু করিবার নিমিত্ত আমার ইচ্ছা হয় (বিচিকীর্ষিতো মে); তাহার ফলে সেই মানুষ জীবন্মুক্ত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া (অমৃতত্বং প্রতিপদ্যমানঃ) আমার ঐশ্বর্য্যভোগের (মায়াত্মভূয়ায়) যোগ্য হয়।"

কোনও ভগবদ্‌ভক্ত মহাপুরুষের কৃপায় কেহ যখন নিত্যনৈমিত্তিকাদি সমস্ত কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া শ্রীকৃষ্ণে আত্মাকে (নিজেকে) নিবেদন করেন, শ্রীকৃষ্ণচরণে আত্মসমর্পণ করেন, (মর্ত্ত্যো যদা যাদৃচ্ছিকমদ্‌ভক্তকৃপাপ্রসাদাত্ত্যক্তানি সমস্তানি নিত্যনৈমিত্তিককাম্যানি কর্ম্মাণি যেন সঃ নিবেদিতাত্মা।—শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী), তখন তিনি শ্রীকৃষ্ণের "বিচিকীর্ষিতঃ" হয়েন—তাঁহার জন্য বিশেষ কিছু করার নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয় (বিচিকীর্ষিতো বিশিষ্টং কর্ত্তুমিষ্টো ভবতি।—শ্রীধর স্বামিপাদ)। কর্ম্মী, বা যোগী, বা জ্ঞানীর জন্য শ্রীকৃষ্ণ যাহা করেন, তাহা অপেক্ষাও বিলক্ষণ—অতি উত্তম—কিছু করার জন্য শ্রীকৃষ্ণের ইচ্ছা হয়। আত্মসমর্পণকারীকে তিনি যাহা

দেন, তাঁহার জন্য তিনি যাহা করেন, তাহা অনিত্য বা মায়িক কিছু নহে ; পরন্তু তাহা নিত্য, গুণাতীত। যেই সময়ে ভক্তসাধক শ্রীকৃষ্ণে আত্মসমর্পণ করেন, সেই সময় হইতে আরম্ভ করিয়াই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে ঐরূপ বিলক্ষণ বস্তু দিতে অভিলাষী হয়েন। "তদা তৎক্ষণমারভ্যৈব স মর্ত্ত্যো মে ময়া বিচিকীর্ষিতঃ বিশিষ্টং কর্ত্তুমিষ্টঃ মৎপ্রতিপদ্যমানেন মদ্‌ভক্ত্যাভ্যাসেন যোগিজ্ঞানিপ্রভৃতিভ্যোঽপি বিলক্ষণ এব কর্ত্তুমভীপ্সিতঃ স্যাদিতি তেন মদ্‌ভক্তেন ময়া কার্য্যঃ সত্যভূত এবং নাপ্যবিদ্যাকার্য্যো মিথ্যাভূত এব কিন্তু মৎকার্য্যো গুণাতীত এব সন্॥ চক্রবর্ত্তিপাদ)।" ভগবানের এতাদৃশী ইচ্ছার ফলে আত্মসমর্পণকারী ভক্ত "অমৃতত্ব—অবিনাশিত্ব, জীবন্মুক্তত্ব" লাভ করেন। (অমৃতত্বং—মৃতং নাশস্তদভাবত্বম্। চক্রবর্ত্তী। মোক্ষম্—স্বামিপাদ)। তিনি তখন ভগবানের সমজাতীয় ঐশ্বর্য্য-লাভের যোগ্য হয়েন (মায়াত্মভূয়ায় মদৈক্যায় মৎসমানৈশ্বর্য্যায়েতি যাবৎ॥ স্বামিপাদ)। তখন তিনি (শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উক্তি অনুসারে শ্রীকৃষ্ণের) আত্মসম হয়েন—শ্রীকৃষ্ণের তুল্য মায়াতীতত্ব লাভ করেন, অর্থাৎ জীবন্মুক্ত হয়েন এবং শ্রীকৃষ্ণের কয়েকটী গুণেও সাম্য লাভ করেন, (মম সাধর্ম্ম্যমাগতাঃ॥ গীতা॥ ১৪।২)।

(৩) কৃষ্ণগুণসাম্য

শ্রীকৃষ্ণের অনন্ত গুণের মধ্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে চৌষট্টিটী প্রধানগুণের উল্লেখ করা হইয়াছে (২।১।১১—১৮ শ্লোকে)। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও গুণ ভক্তজীবের মধ্যেও সঞ্চারিত হয়, কিন্তু বিন্দু বিন্দু পরিমাণে ; পরিপূর্ণরূপে একমাত্র পুরুষোত্তম শ্রীকৃষ্ণেই সমস্ত গুণ বিরাজিত।

"জীবেষ্বেতে বসন্তোঽপি বিন্দুবিন্দুতয়া ক্বচিৎ। পরিপূর্ণতয়া ভান্তি তত্রৈব পুরুষোত্তমে॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ॥২।১।১২॥"

কোন্ কোন্ গুণ ভক্তজীবে বিন্দুবিন্দুরূপে সঞ্চারিত হয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাও বলিয়াছেন।

"যে সত্যবাক্য ইত্যাদ্যা হ্রীমানিত্যন্তিমা গুণাঃ।
প্রোক্তাঃ কৃষ্ণেঽস্য ভক্তেষু তে বিজ্ঞেয়া মনীষিভিঃ॥ —ভ, র, সি, ২।১।১৪৩॥

—শ্রীকৃষ্ণের গুণসমূহের মধ্যে 'সত্যবাক্য' হইতে আরম্ভ করিয়া 'হ্রীমান্' পর্য্যন্ত যে কয়টী গুণ উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সমস্ত গুণ যথাসম্ভবরূপে কৃষ্ণভক্তেও বিরাজিত থাকে, এইরূপই মনীষিগণ বলিয়া থাকেন।"

"সত্যবাক্য" হইতে "হ্রীমান্"-পর্য্যন্ত গুণগুলি হইতেছে এই :—

"————সত্যবাক্যঃ প্রিয়ংবদঃ। বাবদূকঃ সুপাণ্ডিত্যো বুদ্ধিমান্ প্রতিভান্বিতঃ।
বিদগ্ধশ্চতুরো দক্ষঃ কৃতজ্ঞঃ সুদৃঢ়ব্রতঃ। দেশকালসুপাত্রজ্ঞঃ শাস্ত্রচক্ষুঃশুচির্ব্বশী।
স্থিরো দান্তঃ ক্ষমাশীলো গম্ভীরো ধৃতিমান্‌সমঃ। বদান্যো ধার্মিকঃ শূরঃ করুণো মান্যমানকৃৎ।
দক্ষিণো বিনয়ী হ্রীমান্। —ভ, র, সি, ২।১।১১॥

—১। সত্যবাক্য ; ২। প্রিয়ম্বদ ; ৩। বাবদূক (শ্রুতিমধুর ও অর্থপরিপাটীযুক্ত বাক্য-প্রয়োগে পটু) ; ৪। সুপণ্ডিত ; ৫। বুদ্ধিমান্ ; ৬। প্রতিভান্বিত ; ৭। বিদগ্ধ ; ৮। চতুর ; ৯। দক্ষ ; ১০। কৃতজ্ঞ ; ১১। সুদৃঢ়ব্রত ; ১২। দেশকালসুপাত্রজ্ঞ ; ১৩। শাস্ত্রচক্ষুঃ (যিনি শাস্ত্রানুসারে কর্ম্ম করেন) ; ১৪। শুচি ; ১৫। বশী ; (জিতেন্দ্রিয়) ; ১৬। স্থির ; ১৭। দান্ত , ১৮। ক্ষমাশীল ; ১৯। গম্ভীর ; ২০। ধৃতিমান্ ; ২১। সম ; ২২। বদান্য (দাতা) ; ২৩। ধার্ম্মিক ; ২৪। শূর ; ২৫। করুণ ; ২৬। মান্যমানকৃৎ ; ২৭। দক্ষিণ (সৎস্বভাবগুণে কোমলচিত্ত) ; ২৮। বিনয়ী ; এবং ২৯। হ্রীমান্ (লজ্জাযুক্ত)।”

এই সমস্ত গুণ শ্রীকৃষ্ণে শরণাগত ভক্তব্যতীত অপরের মধ্যেও থাকিতে পারে। উপরে উদ্ধৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর “জীবেষ্বেতে বসন্তোহপি” ইত্যাদি ২।১।১২-শ্লোকের টীকায় “ক্বচিৎ”-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“ক্বচিদিতি। ভগবদনুগৃহীতেষ্বিত্যেব মুখ্যতয়াঙ্গীকৃতম্। অতএব বিন্দুত্বমপি অন্যেষু তু তদাভাসত্বমেব জ্ঞেয়ম্।—ভগবানের অনুগৃহীত ভক্তদের মধ্যে বিন্দুবিন্দু রূপে মুখ্যরূপে অঙ্গীকৃত। অপরের মধ্যে তাহাদের আভাসমাত্র—ইহাই বুঝিতে হইবে।”

(৪) **দেবগুণের আধার**

শ্রীকৃষ্ণে শরণাপন্ন অকিঞ্চন ভক্তের মধ্যে দেবতাদের গুণসমূহ বিরাজিত থাকে।

“যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ।
হরাবভক্তস্য কুতো মহদ্গুণা মনোরথেনাসতি ধাবতো বহিঃ॥ শ্রীভা, ৫।১৮।১২॥

—ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি আছে, সমস্তগুণের সহিত সমস্ত দেবগণ তাঁহাতে নিত্য বাস করেন। আর, যে ব্যক্তির হরিতে ভক্তি নাই, তাঁহার মহদ্গুণ সকল কোথায় ? যেহেতু, সে-ব্যক্তি সর্ব্বদা মনোরথের দ্বারা অসৎপথে—অনিত্য-বিষয়সুখাদিতে—ধাবিত হয়েন।”

এই সকল মহদ্গুণ কি, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে দিগ্দর্শনরূপে, তাহা বলা হইয়াছে।

“কৃপালু, অকৃতদ্রোহ, সত্যসার সম। নির্দ্দোষ, বদান্য, মৃদু, শুচি, অকিঞ্চন॥
সর্ব্বোপকারক, শান্ত, কৃষ্ণৈকশরণ। অকাম, অনীহ, স্থির, বিজিতষড়্গুণ॥
মিতভুক, অপ্রমত্ত, মানদ, অমানী। গম্ভীর, করুণ, মৈত্র, কবি, দক্ষ, মৌনী॥ ২।২২।৪৫-৭॥”

“তিতিক্ষবঃ কারুণিকাঃ সুহৃদঃ সর্ব্বদেহিনাম্।
অজাতশত্রবঃ শান্তাঃ সাধবঃ সাধুভূষণাঃ॥ শ্রীভা, ৩।২৫।২১॥

—তিতিক্ষু (ক্ষমাশীল), করুণ, সকল প্রাণীর সুহৃৎ (বন্ধু), অজাতশত্রু (যাঁহাদের শত্রু কেহ নাই), শান্ত, সাধু (শাস্ত্রানুবর্ত্তী) এবং সাধুভূষণ (সুশীলতাই ভূষণ যাঁহাদের—স্বামিপাদ)—(এই সমস্ত গুণ ভক্তের মধ্যে থাকে)।”

(৫) **সর্ব্বথা ভগবানের রক্ষণীয়**

শরণাগতপালক পরমকরুণ ভগগবান্ তাঁহার চরণে শরণাগত ভক্তকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করেন ; ইহা যে তাঁহাদ ব্রত, তাহা ভগবান্ নিজমুখেই বলিয়া গিয়াছেন।

"সকৃদেব প্রপন্নো যস্তবাস্মীতি চ যাচতে।
অভয়ং সর্ব্বদা তস্মৈ দদাম্যেতদ্‌ব্রতম্ মম ॥

—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (১১।৩৯৭) ধৃত এবং সহস্রনামভাষ্যে'সুব্রতঃ'-নামের অর্থপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যকর্তৃক ধৃত শ্রীরামায়ণে শ্রীরামচন্দ্রের বাক্য।

—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) আমার শরণাপন্ন হইয়া যিনি একবার মাত্র যাচ্‌না করেন—'হে ভগবন্ ! আমি তোমার হইলাম', আমি তাঁহাকে সর্ব্বদা অভয় প্রদান করিয়া থাকি ; ইহাই আমার ব্রত।"

এই অনুচ্ছেদে শরণাগতির মাহাত্ম্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইল, সম্যক্ শরণাগতি সিদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেও সাধক ভক্তের পক্ষে তাহার অনুকূল আচরণই কর্ত্তব্য এবং প্রতিকূল আচরণ সর্ব্বথা বর্জ্জনীয়।

৩৬। অভিমান ত্যাগ

সাধক ভক্তের পক্ষে সর্ব্ববিধ অভিমান ত্যাগ করার চেষ্টা করা একান্ত আবশ্যক। অভিমান থাকিলে শরণাগতির দিকেও মন অগ্রসর হয় না, চিত্তে ভক্তির আবির্ভাবও হয় না। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরমহাশয় তাঁহার প্রেমভক্তিচন্দ্রিকায় বলিয়া গিয়াছেন,

"অভিমানী ভক্তিহীন, জগমাঝে সেই দীন।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়া গিয়াছেন,

"দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্।
পণ্ডিত কুলীন ধনীর বড় অভিমান ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৪।৬৪ ॥"

ক। আগন্তুক অভিমান

সর্ব্ববিধ অভিমানের মূল হইতেছে দেহেতে আত্মবুদ্ধিরূপ অভিমান। ধনের অভিমান, জনের অভিমান, জাতির অভিমান, কৌলীন্যের অভিমান, রূপের অভিমান, বিদ্যার অভিমান, প্রসার-প্রতিপত্তির অভিমানাদি সমস্তই হইতেছে দেহেতে আত্মবুদ্ধিরূপ মূল অভিমানের শাখাপ্রশাখা-পত্র-পুষ্পমাত্র। কেননা, ধনজন-জাতিকুলাদি সমস্তের সম্বন্ধই হইতেছে দেহের সঙ্গে, দেহী জীবাত্মার সঙ্গে ইহাদের কোনও বাস্তব সম্বন্ধ নাই।

দেহেতে আত্মবুদ্ধিরূপ অভিমান হইতেছে জীবস্বরূপের পক্ষে আগন্তুক, স্বরূপগত নহে। অনাদিবহির্ম্মুখ জীব যখন বহিরঙ্গা মায়ার কবলে নিজেকে সমর্পণ করিয়াছে, তখনই মায়া স্বীয় জীবমায়া-অংশে জীবের দেহেতে আত্মবুদ্ধি জন্মাইয়াছে (২।৩১ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। জীবের স্বরূপে মায়া

নাই (২।৮ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং জীবের উপরে মায়ার প্রভাব আগন্তুকমাত্র, ইহা জীবের স্বরূপগত নহে। দেহেতে আত্মবুদ্ধিও আগন্তুকী ; এজন্যই ইহা অপসারণের যোগ্যা।

দেহাত্মবুদ্ধিরূপ মূল অভিমান আগন্তুক বলিয়া তাহার শাখাপ্রশাখারূপ অন্যান্য অভিমানও আগন্তুক—সুতরাং অপসারণীয়। এ-সমস্ত অভিমান মায়ার প্রভাবজাত বলিয়া জীব কেবল নিজের শক্তিতে এ-সকলকে অপসারিত করিতে অসমর্থ ; কেননা, জীবের নিজের শক্তির পক্ষে মায়া দুরতিক্রমণীয়া। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া ॥ গীতা ॥ ৭ ১৪ ॥" একমাত্র ভগবানের শরণাগতিব্যতীত অন্য কোনও উপায়েই মায়ার প্রভাব হইতে অব্যাহতি পাওয়া যাইতে পারে না ; ইহা শ্রীভগবান্‌ই বলিয়া গিয়াছেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥ ৭।১৪ ॥"

শবণাগতি-সিদ্ধির জন্য সাধন-ভজনের প্রয়োজন। ভজনকালে ভগবানের এবং শ্রীগুরুদেবের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া অভিমানাদি ত্যাগের জন্য সাধকেরও যত্ন ও আগ্রহ আবশ্যক। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।১১৫ ॥" (এ-স্থলে "ভক্তি"-অর্থ - সাধনভক্তি)। নিজের যত্ন এবং আগ্রহ থাকা চাই, অভিমানাদি দূরীভূত হওয়ার জন্য ভগবচ্চরণে প্রার্থনা জ্ঞাপন চাই। তাহা হইলেই তাঁহার কৃপায় ক্রমশঃ অভিমান দূর হইতে পারে।

মায়াবদ্ধ জীবের অভিমান সর্ব্বদাই তাহার চিত্তবৃত্তিকে বাহিরের দিকে আকর্ষণ করিয়া থাকে; সুতরাং অভিমান যখন জাগ্রত থাকে, তখন চিত্তবৃত্তিকে অন্তর্ম্মুখী, ভগবদুন্মুখী, করা যায় না।

খ। স্বরূপগত অভিমান

দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অভিমান এবং তাহা হইতে উদ্ভূত অন্যান্য অভিমান দূরীভূত হইলেই জীবের কৃষ্ণদাস-অভিমান স্ফুরিত হইতে পারে। জীব স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস বলিয়া (২।২৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) কৃষ্ণদাস-অভিমান হইতেছে তাহার পক্ষে স্বাভাবিক, স্বরূপগত ; ইহা দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অভিমানের ন্যায় মায়াজনিত অগন্তুক অভিমান নহে। আগন্তুক অভিমান হইতে জীব যাহা করে, তাহা তাহার বন্ধনজনক ; কিন্তু স্বরূপগত কৃষ্ণদাস-অভিমান বন্ধনজনক নহে ; এই অভিমানের বশে জীব যাহা করে, তাহা হইতেছে জীবের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য। আগন্তুক অভিমান দূর করিয়া স্বরূপগত কৃষ্ণদাস-অভিমানকে জাগ্রত করার চেষ্টাই সাধক জীবের কর্ত্তব্য। সাধন-ভজনের সঙ্গে কিরূপে আগন্তুক অভিমানকে অপসারিত করার চেষ্টা করিতে হয়, শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

"নাহং বিপ্রো ন চ নরপতির্নাপি বৈশ্যো ন শূদ্রো
নাহং বর্ণী ন চ গৃহপতির্নো বনস্থো যতির্ব্বা।
কিন্তু প্রোদ্যন্নিখিলপরমানন্দপূর্ণামৃতাব্ধে
র্গোপীভর্ত্তুঃ পদকমলয়োর্দাসদাসানুদাসঃ ॥ পদ্যাবলী ॥ ৭২ ॥

—(সাধক ভক্ত মনে মনে চিন্তা করিবেন) আমি ব্রাহ্মণ নহি. ক্ষত্রিয় নহি, বৈশ্য নহি, শূদ্র

নহি (অর্থাৎ আমি চারিবর্ণের মধ্যে কোনও বর্ণভুক্ত নহি) ; আমি ব্রহ্মচারী নহি, গৃহস্থ নহি, বানপ্রস্থ নহি, সন্ন্যাসীও নহি (অর্থাৎ আমি চারিটী আশ্রমের মধ্যে কোনও আশ্রমভুক্ত নহি)। কিন্তু আমি হইতেছি—প্রকৃষ্টরূপে প্রকটিত-নিখিল-পরমানন্দপূর্ণ অমৃতসমুদ্রতুল্য গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের চরণকমলদ্বয়ের দাসদাসানুদাসমাত্র।”

লোকের মধ্যে ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি চারিটী বর্ণ আছে। আবার, ব্রহ্মচর্য্যাদি চারিটী আশ্রমও আছে। ব্রাহ্মণাদি বর্ণও দেহের এবং ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রমও দেহেব—সুতরাং আগন্তুক। দেহী জীবাত্মার কোনও বর্ণও নাই, কোনও আশ্রমও নাই। এজন্য কেবল জীবস্বরূপের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া সাধক ভক্ত—তিনি যে বর্ণেই জন্ম গ্রহণ করিয়া থাকুন না কেন, এবং যে আশ্রমেই অবস্থিত থাকুন না কেন—মনে প্রাণে চিন্তা করিবেন, “আমি স্বরূপতঃ কোনও বর্ণভুক্তও নহি, কোনও আশ্রমভুক্তও নহি।” তবে আমি কে? “আমি একমাত্র অশেষরসামৃতবারিধি গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের দাসদাসানুদাস। ইহাই আমার স্বরূপগত পরিচয়।” মনে প্রাণে এইরূপ চিন্তা করিবেন এবং ভগবানের চরণেও প্রার্থনা করিবেন—“প্রভু, স্বরূপতঃ আমি তোমার দাস—দাসদাসানুদাস। লৌকিক বর্ণাশ্রমের আগন্তুক অভিমান যেন আমার চিত্ত হইতে দূরীভূত হয় এবং আমার স্বরূপগত কৃষ্ণদাস-অভিমান যেন জাগ্রত হয়, কৃপা করিয়া প্রভু তাহাই কর।”

ভগবানের কৃপায় জীবের স্বরূপগত কৃষ্ণদাস-অভিমান যখন জাগ্রত হয়, তখন ব্রহ্মানন্দনিন্দি অপ্রাকৃত পরমানন্দের অনুভব জন্মে। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্যপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন—

কৃষ্ণদাস-অভিমানে যে আনন্দসিন্ধু।
কোটিব্রহ্মসুখ নহে তার এক বিন্দু॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৬।৪০॥

এই আনন্দ হইতেছে আনন্দঘন-বিগ্রহ পরব্রহ্মের আনন্দ ; সুতরাং এই আনন্দের অনুভব বন্ধন জন্মায়না, বরং জন্ম-মৃত্যু-আদির ভয় দূরীভূত করে।

আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চনেতি॥ তৈত্তিরীয় শ্রুতিঃ॥ ২।৪॥

গ। তৃণাদপি শ্লোক

কি ভাবে ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে, স্বরূপদামোদর ও রায়রামানন্দের নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

“তৃণাদপি সুনীচেন তরোরিব সহিষ্ণুনা।
অমানিনা মানদেন কীর্ত্তনীয়ঃ সদা হরিঃ॥ শিক্ষাষ্টক-শ্লোক॥

—তৃণ হইতেও সুনীচ হইয়া, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইয়া, অমানী হইয়া এবং মানদ হইয়া শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করিতে হয় (তাহা হইলেই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে)।”

ভগবন্নাম-গ্রহণ-সম্বন্ধে দেশ-কালাদির অপেক্ষা না থাকিলেও এবং হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম গ্রহণেও মোক্ষাদি পাওয়া যায় সত্য ; কিন্তু নামের মুখ্য ফল প্রেম পাইতে হইলে নাম গ্রহণকালে

চিত্তের একটী বিশেষ অবস্থার প্রয়োজন। চিত্তের এই বিশেষ অবস্থার কথাই উল্লিখিত শ্লোকে বলা হইয়াছে। চিত্তের যে অবস্থা হইলে সাধক তৃণ অপেক্ষাও সুনীচ হইতে পারেন, তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হইতে পারেন, অমানী এবং মানদ হইতে পারেন, সেই অবস্থার কথাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে। এ-স্থলে চিত্তের উল্লিখিতরূপ অবস্থা লাভের পরে নামকীর্ত্তনের ব্যবস্থা দেওয়া হইয়াছে মনে করিলে ইহাকে "সাঁতার শিখিয়া জলে নামার" ব্যবস্থার তুল্যই মনে করা হয়। জলে না নামিলে কখনও সাঁতার শিক্ষা করা যায় না। জলে নামিয়াই সাঁতারের চেষ্টা করিতে হয়, চেষ্টার ফলে ক্রমশঃ সাঁতার শিক্ষা হইয়া যায়। চিত্তের উল্লিখিতরূপ অবস্থাটী পাওয়ার নিমিত্ত শ্রীভগবানের চরণে এবং শ্রীনামের নিকটে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া মনে-প্রাণে শ্রীনামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে—নিরন্তর নাম-কীর্ত্তন করিলে—নামেরই কৃপায় সাধকের চিত্তের উল্লিখিতরূপ অবস্থা জন্মিতে পারে।

যতক্ষণ পর্য্যন্ত সাধকের দেহাত্মবুদ্ধিরূপ অভিমান থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত তাঁহার পক্ষে তৃণ অপেক্ষা সুনীচ হওয়া, কিম্বা তরুর ন্যায় সহিষ্ণু হওয়া, অথবা অমানী এবং মানদ হওয়া সম্ভব নহে। "তৃণাদপি"-শ্লোকে মহাপ্রভু যাহা বলিয়াছেন, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে দেহাত্মবুদ্ধিজনিত সর্ব্ববিধ অভিমান ত্যাগ। শ্রীনামের এবং শ্রীভগবানের কৃপার উপর নির্ভর করিয়া নামকীর্ত্তন করিবার সময় কিভাবে উল্লিখিত অবস্থা-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টা করিতে হইবে, তাহাই মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন। উল্লিখিত শ্লোকটীর আলোচনা করিলেই তাহা বুঝা যাইবে। এ-স্থলে শ্লোকটী আলোচিত হইতেছে।

(১) তৃণাদপি সুনীচ

"উত্তম হঞা আপনাকে মানে 'তৃণাধম'। শ্রী চৈ, চ, ৩।২০।১৭॥"

সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠও যদি হয়েন, তথাপি সাধক নিজেকে সর্ব্ববিষয়ে সর্ব্বাপেক্ষা হেয় মনে করিবেন। প্রথমে সাধকের চিত্তে এইরূপ ভাব হয়তো স্বতঃস্ফুর্ত্ত হইবে না; কিন্তু নিজের অবস্থা বিচার করিয়া দেখিতে চেষ্টা করা সঙ্গত।

"তৃণ অত্যন্ত তুচ্ছ পদার্থ; কিন্তু সেই তৃণও গবাদির সেবায় আত্মনিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইতেছে। গৃহ-নির্ম্মাণাদির সহায়তা করিয়া তৃণ লোকের অনেক উপকার করিতেছে; প্রত্যক্ষভাবে বা পরোক্ষভাবে তৃণদ্বারা ভগবৎ-সেবারও আনুকূল্য হইতেছে—ব্যঞ্জনরূপে কোনও কোনও তৃণকে ভক্ত ভগবানের উদ্দেশ্যে নিবেদন করেন, পূজাদিতে দুর্ব্বার প্রয়োজন হয়, দরিদ্র ভক্ত তৃণাদি দ্বারা ভগবন্মন্দিরও করেন; ইত্যাদিরূপে তৃণের দ্বারা ভগবৎ-সেবার আনুকূল্য হইয়া থাকে। কিন্তু আমা-দ্বারা কাহারও কোনও উপকারই সাধিত হইতেছেনা, ভগবৎ-সেবারও কোনওরূপ আনুকূল্য হইতেছেনা; আমি তৃণ হইতেও অধম; আমর মত অধম কেহ নাই"—ইত্যাদি ভাবিয়া সাধক নিজেকে তৃণ অপেক্ষাও হেয় জ্ঞান করিবেন।

শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন—

পুরীষের কীট হৈতে মুঞি সে লঘিষ্ঠ ॥
মোর নাম শুনে যেই, তার পুণ্যক্ষয়।
মোর নাম লয়ে যেই, তার পাপ হয়॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৫।১৮৩-৪ ॥

অবশ্য ভক্তি হইতে উত্থিত দৈন্যবশতঃই কবিরাজগোস্বামী এই কথাগুলি বলিয়াছেন। ভক্তির কৃপাতেই এইরূপ অকপট দৈন্য জন্মিতে পারে। যাঁহার প্রতি ভক্তির কৃপা যত বেশী প্রকটিত হয়, তিনি নিজেকে তত বেশী ছোট মনে করেন। "সর্ব্বোত্তম আপনাকে হীন করি মানে॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২৩।১৪॥" কিন্তু বিচার করিয়া দেখিলে অনাদিবহির্ম্মুখ জীবের সম্বন্ধে উল্লিখিত কথাগুলি তাত্ত্বিক ভাবেও সত্য বলিয়া বুঝা যাইবে।

মনুষ্যব্যতীত অপর জীব কেবল স্ব-স্ব প্রারব্ধ কর্ম্মফলই ভোগ করিয়া থাকে; বিচারবুদ্ধি নাই বলিয়া তাহারা নূতন কর্ম্ম কিছু করিতে পারেনা; শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে তো পারেই না; তদুপ-যোগিনী বুদ্ধি তাহাদের নাই। বিচারবুদ্ধির পরিচালনাদ্বারা বা শাস্ত্রাদির আলোচনাদ্বারা, বা মহৎ-সঙ্গ লাভের চেষ্টা দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের আবশ্যকতা উপলব্ধি করিবার সামর্থ্য তাহাদের নাই। সুতরাং তাহারা যদি শ্রীকৃষ্ণভজন না করে, তাহা হইলে তাহাদের পক্ষে তাহা গুরুতর দোষের নয়। কিন্তু মানুষ ভজনোপযোগী দেহ পাইয়াছে, এবং সেই দেহে হিতাহিত বিষয়ে বিচারের বুদ্ধিও পাইয়াছে। এই অবস্থায় মানুষ যদি শ্রীকৃষ্ণভজন না করে, স্বীয় বিচারবুদ্ধির অপব্যবহার করিয়া কেবল ইন্দ্রিয়-ভোগ্যব্যাপারেই সর্ব্বদা লিপ্ত থাকে এবং ভগবদ্‌বহির্ম্মুখতাবর্দ্ধক কর্ম্মেই রত থাকে, তাহা হইলে তাহার আচরণ হইবে অমার্জ্জনীয়; কেননা, শ্রীকৃষ্ণভজনের নিমিত্তই ভগবান্ তাহাকে এ-সমস্ত দিয়াছেন। এ-বিষয়ে বস্তুতঃ বিষ্ঠার কৃমি হইতেও সেই ব্যক্তি হইবে নিকৃষ্ট। কারণ, প্রথমতঃ, কৃমি ভজনোপযোগী দেহ ও বুদ্ধি পায় নাই; মানুষ পাইয়াছে—ভজন না করিলে সেই পাওয়া হইয়া যায় নিরর্থক। দ্বিতীয়তঃ, কৃমি নূতন কর্ম্ম করিয়া নিজের অধঃপতনের পথ প্রশস্ত করিতে পারে না; কেননা, নূতন কর্ম্ম করায় উপযোগিনী বুদ্ধি তাহার নাই। মানুষের তাহা আছে এবং তাহার অপব্যবহারে নূতন কর্ম্ম করিয়া মানুষ অধঃপতিত হইতে পারে। এইরূপ বিচার করিয়া সাধক বুঝিতে পারেন—"ভজনোপযোগী নরদেহ পাইয়াও আমি ভজন করিতেছি না; সাধ্যসাধন-নির্ণয়োপযোগিনী বুদ্ধি পাইয়াও আমি সাধন করিতেছি না; বরং সেইবুদ্ধিকে দেহের সুখানুসন্ধানেই নিয়োজিত করিতেছি। সুতরাং আমি পুরীষের কীট হইতেও অধম।"

(২) তরোরিব সহিষ্ণু

সাধক ভক্ত বৃক্ষের ন্যায় সহিষ্ণু হইবেন। বৃক্ষের সহিষ্ণুতা দুই রকমের—অন্যকৃত দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা এবং প্রকৃতিদত্ত দুঃখ সহ্য করার ক্ষমতা।

দুই প্রকারে সহিষ্ণুতা করে বৃক্ষসম।
বৃক্ষে যেন কাটিলেহ কিছু না বোলয়। শুখাইয়া মৈলে কারে পানী না মাগয়॥

যেই যে মাগয়ে, তারে দেয় আপন ধন।
ঘর্ম্ম বৃষ্টি সহে, আনের করয়ে রক্ষণ ॥ শ্রীচৈ,চ, ৩।২০।১৭—৯॥

কোনও ব্যক্তি যদি বৃক্ষকে কাটিতে থাকে, তাহা হইলেও বৃক্ষ তাহাকে কিছু বলেনা, কোনওরূপ আপত্তিও করে না, তাহার নিকটে নিজের দুঃখও জানায় না। ভক্ত সাধকও এইরূপ সহিষ্ণু হইতে চেষ্টা করিবেন। অপর কেহ যদি তাঁহার কোনওরূপ অনিষ্ট করে, তাহা হইলেও তিনি তাহার প্রতি রুষ্ট হইবেন না, নিজেও বিচলিত হইবেন না। "আমার স্বকৃত পূর্ব্বকর্ম্মের ফল এই ব্যক্তি বহন করিয়া আনিতেছে মাত্র ; ইহার কোনও দোষ নাই"—ইত্যাদি ভাবিয়া সমস্ত সহ্য করিবেন।

বৃষ্টির অভাবে বৃক্ষ যদি শুকাইয়া মরিয়াও যায়, তথাপি বৃক্ষ কাহারও নিকটে জল চাহেনা, স্থিরভাবে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া জলাভাব-কষ্ট সহ্য করে। সাধকভক্ত এইরূপ সহিষ্ণু হইতে চেষ্টা করিবেন। আধ্যাত্মিক, আধিভৌতিক, আধিদৈবিক—যে কোনও দুঃখ-বিপদই উপস্থিত হউক না কেন, স্বীয় কর্ম্মফল মনে করিয়া সাধক অবিচলিত চিত্তে তাহা সহ্য করিতে চেষ্টা করিবেন, দুঃখ-বিপদ হইতে উদ্ধারলাভের আশায় কাহারও নিকটে সাহায্যপ্রার্থী হইবেন না।

বৃক্ষের নিকটে পত্র-পুষ্প-ফলাদি যে যাহা চায়, বৃক্ষ তাহাকেই তাহা দেয়, কাহাকেও বঞ্চিত করে না ; এমন কি, যে বৃক্ষের ডাল কাটে, এমন কি মূলও কাটে, বৃক্ষ তাহাকেও ফল, ফুল, পত্র, শাখা —সমস্তই দেয়। শত্রুজ্ঞানে তাহাকেও বঞ্চিত করে না। সাধকভক্তও এইরূপ বদান্য হইতে চেষ্টা করিবেন ; যে যাহা চাহিবে, নিজের শক্তি-অনুরূপ, তাহাকেই তাহা দিবেন ; এমন কি, যে ব্যক্তি শত্রুতাচারণ করে, সেও যদি কিছু চাহে, তাহাকেও বঞ্চিত করিবেন না, অত্যন্ত প্রীতির সহিত তাহাকেও নিজের শক্তি অনুসারে তাহার প্রার্থিত বস্তু দিবেন।

বৃক্ষ নিজে রৌদ্রে পুড়িয়া মরিতেছে, বা অতি বৃষ্টিপাতে সর্ব্বাঙ্গে সিক্ত হইতেছে, এমন সময়েও যদি কেহ তাহার ছায়ায় বসিয়া তাপ-নিবারণ করিতে চাহে, বা বৃষ্টি হইতে আত্মরক্ষা করিতে চাহে, তথাপি বৃক্ষ তাহাকে ছায়া বা আশ্রয় দিয়া রক্ষা করে ; নিজে কষ্ট স্বীকার করিয়াও বৃক্ষ অপরের উপকার করে। সাধকভক্তও এইরূপে পরোপকারের চেষ্টা করিবেন। নিজে না খাইয়াও অন্নার্থীকে অন্ন দিবেন ; নিজে বিশেষ অসুবিধা ভোগ করিয়াও সাধ্যমত প্রার্থীর সুবিধা করিয়া দিতে চেষ্টা করিবেন।

(৩) **অমানী ও মানদ**

সাধক ভক্ত কাহারও নিকট হইতে কোনওরূপ সম্মানের প্রত্যাশা করিবেন না, অথচ সকলকেই সম্মান করিবেন।

উত্তম হঞা বৈষ্ণব হবে নিরভিমান।
জীবে সম্মান দিবে জানি কৃষ্ণ-অধিষ্ঠান ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।২০ ॥

অমানী

ধনে, মানে, কুলে, বিদ্যায়, বুদ্ধিতে এবং ভক্তিতে সর্ব্বোত্তম হইলেও সাধক ভক্ত ধনমানাদির কোনওরূপ অভিমান চিত্তে পোষণ করিবেন না। "আমি ধনী, আমি বিদ্বান, আমি কুলীন, আমি ভক্ত"-ইত্যাদি মনে করিয়া কাহারও নিকট হইতে কোনওরূপ সম্মান-প্রাপ্তির বাসনা চিত্তেও পোষণ করিবেন না। তিনি নিজেকে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট মনে করিবেন। অন্যের বিচারে সর্ব্ববিষয়ে তাঁহা অপেক্ষা নিকৃষ্ট, এমন কেহও যদি তাঁহার প্রতি কোনওরূপ অবজ্ঞা প্রদর্শন করে, তাহা হইলেও তিনি যেন একটুকুও মনঃক্ষুণ্ণ না হয়েন।

মানদ

ভক্ত সাধক জীবমাত্রের প্রতিই সম্মান প্রদর্শন করিবেন। প্রত্যেক জীবের মধ্যেই পরমাত্মা-রূপে শ্রীকৃষ্ণ বিরাজিত—ইহা মনে করিয়া ভক্ত সাধক সকলের প্রতিই সম্মান দেখাইবেন, কাহাকেও অবজ্ঞা করিবেন না।

শ্রীশুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন,

"অন্তর্দেহেষু ভূতানামাত্মাস্তে হরিরীশ্বরঃ।
সর্ব্বং তদ্ধিষ্ণ্যমীক্ষধ্বমেবং বস্তোষিতো হ্যসৌ॥ শ্রীভা, ৬।৪।১৩॥

—সকল প্রাণীরই দেহাভ্যন্তরে আত্মা (পরমাত্মা)-রূপে ভগবান্ শ্রীহরি অবস্থিত আছেন; অতএব প্রাণিমাত্রকেই শ্রীহরির স্থান (শ্রীমন্দির) বলিয়া অবলোকন করিবে, কাহারও প্রতি দ্রোহাচরণ করিবে না; এইরূপ করিলেই ভগবান্ হরি প্রসন্ন হইবেন।"

"বিসৃজ্য স্ময়মানান্ স্বান্ দৃশং ব্রীড়াঞ্চ দৈহিকীম্।
প্রণমেদ্দণ্ডবদ্ভূমাবাশ্বচাণ্ডালগোখরম্॥ শ্রীভা, ১১।২৯।১৬॥

—(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন) অন্তর্য্যামী-ঈশ্বরদৃষ্টিতে—সকলের মধ্যেই অন্তর্য্যামিরূপে ঈশ্বর আছেন, এইরূপ মনে করিয়া—চণ্ডাল, কুক্কুর, গো এবং গর্দ্দভ পর্য্যন্ত সকলকেই ভূমিতে দণ্ডবৎ পতিত হইয়া প্রণাম করিবে। ইহাতে তোমার স্বজনগণ যদি তোমাকে উপহাসও করে, তাহা গ্রাহ্য করিবে না; 'আমি উত্তম, এই জীব নীচ; সুতরাং কিরূপে আমার নমস্য হইতে পারে'—ইত্যাদি দৈহিকী দৃষ্টি বা লজ্জা পরিত্যাগ করিয়া সকলকেই দণ্ডবৎ প্রণাম করিবে।"

[টীকা। অন্তর্য্যামীশ্বরদৃষ্ট্যা সর্ব্বান্ প্রণমেৎ॥ দৈহিকীং দৃশং অহমুত্তমঃ স তু নীচ ইতি দৃষ্টিম্ তয়া দৃশা যা ব্রীড়া লজ্জা তাঞ্চ বিসৃজ্য শ্বচাণ্ডালাদীন্ অভিব্যাপ্য প্রণমেৎ॥ শ্রীধরস্বামী॥]

"মনসৈতানি ভূতানি প্রণমেদ্ বহু মানয়ন্।
ঈশ্বরো জীবকলয়া প্রবিষ্টো ভগবানিতি॥ শ্রীভা ৩।২৯।৩৪॥

—(ভগবান্ বলিয়াছেন) অন্তর্য্যামিরূপে ঈশ্বর ভগবান্ সকল জীবের মধ্যেই প্রবিষ্ট হইয়া

আছেন, এইরূপ মনে করিয়া মনের দ্বারা (আন্তরিক ভাবে) বহু সম্মান প্রদর্শন পূর্ব্বক সমস্ত প্রাণীকেই প্রণাম করিবে।"

[টীকা। জীবকলয়া—জীবানাং কলয়া পরিকলনেন অন্তর্য্যামিতয়া প্রবিষ্ট ইতি দৃষ্ট্যা ইত্যর্থঃ॥ শ্রীধরস্বামী॥ জীবকলয়া তদন্তর্য্যামিতয়া ইত্যর্থঃ॥ শ্রীজীবগোস্বামী॥]

উল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-বাক্যসমূহের স্মরণেই শ্রীপাদ বাসুদেব সার্ব্বভৌম বলিয়াছেন,

"ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি। দণ্ডবত করিবেক বহু মান্য করি॥

এই সে বৈষ্ণবধর্ম্ম—সভারে প্রণতি। সেই ধর্ম্মধ্বজী, যার ইথে নাহি রতি॥ শ্রীচৈ, ভা, ॥অন্ত্য॥৩"

সংসারী লোকের চিত্তে সাধারণতঃ কোনও না কোনও অভিমান থাকেই; এজন্য লোক আন্তরিক সম্মানপ্রদর্শনপূর্ব্বক প্রাণিমাত্রকেই দণ্ডবৎ প্রণিপাত করিতে পারে না। কিন্তু সমাজের মধ্যে শীর্ষস্থানীয় ব্রাহ্মণের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করিতে বোধ হয় কাহারও আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান বিশেষ ক্ষুণ্ণ হয় না। এই স্তর হইতে আরম্ভ করিয়া সকলের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের অভ্যাস আয়ত্ত করা বোধ হয় অপেক্ষাকৃত সহজ। ইহা দেখাইবার জন্যই বোধহয় গয়া-গমনের পথে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এক সময়ে স্বীয় দেহে জ্বর প্রকটিত করিয়া ব্রাহ্মণের পাদোদক পান করিয়াছিলেন।*

(৪) কাহারও উদ্বেগের কারণ না হওয়া

যাহা হউক, প্রাণিমাত্রের প্রতি সম্মান-প্রদর্শনের উল্লিখিতরূপ উপদেশ হইতে আপনা-আপনিই ইহা আসিয়া পড়ে যে, বৈষ্ণব সাধক কোনও প্রকারেই কাহারও উদ্বেগ জন্মাইবেন না—কার্য্যের দ্বারা তো দূরের কথা, বাক্যদ্বারাও না, এমন কি মনের দ্বারাও না। একথাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়া গিয়াছেন।

"প্রাণিমাত্রে মনোবাক্যে উদ্বেগ না দিবে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৬৬॥"

"অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ॥ গীতা॥ ১২।১২॥" এবং "যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে তু যঃ॥ গীতা ১২।১৫॥"-ইত্যাদি বাক্যের মর্ম্মই উল্লিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের বাক্যে প্রতিধ্বনিত হইয়াছে।

মহাভারতও বলিয়াছেন—

"পিতেব পুত্রং করুণো নোদ্বেজয়তি যো জনম্। বিশুদ্ধস্য হৃষীকেশস্তূর্ণং তস্য প্রসীদতি॥

—ভ, র, সি,—(১।২।৫৩)-ধৃত মহাভারতবচনম্॥

---

* মধ্যপথে জ্বর প্রকাশিলেন ঈশ্বরে। শিষ্যগণ হইলেন চিন্তিত অন্তরে॥
পথে রহি করিলেন বহু প্রতিকার। তথাপি না ছাড়ে জ্বর, হেন ইচ্ছা তাঁর॥
তবে প্রভু ব্যবস্থিলা ঔষধ আপনে। 'সর্ব্বদুঃখ খণ্ডে বিপ্রপাদোদক পানে'॥
বিপ্রপাদোদকের মহিমা বুঝাইতে। পান করিলেন প্রভু আপনি সাক্ষাতে।
বিপ্রপাদোদক পান করিয়া ঈশ্বর। সেই ক্ষণে সুস্থ হৈলা, আর নহি জ্বর॥
—শ্রীচৈতন্যভাগবত॥ আদি॥ ১২॥

—যিনি কোনও প্রাণীকেই উদ্বেগ দেন না, করুণ পিতা যে ভাবে পুত্রের প্রতি ব্যবহার করেন, যিনি তদ্রূপই প্রাণিমাত্রের প্রতি ব্যবহার করেন, সেই বিশুদ্ধহৃদয় সাধকের প্রতি ভগবান্ হৃষীকেশ শীঘ্রই প্রসন্ন হয়েন।”

৩৭। সাধুসঙ্গ

সাধুর লক্ষণ

সাধু, মহৎ, ভাগবত, ভাগবতপ্রধান-প্রভৃতি শব্দ একার্থক। যাঁহারা ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণ করিয়াছেন, বিষয়-নিস্পৃহ, তাঁহারাই সাধু বা মহৎ। শ্রীমদ্‌ভাগবতে মহতের লক্ষণ কথিত হইয়াছে।

“মহান্তস্তে সমচিত্তাঃ প্রশান্তাঃ বিমন্যবঃ সুহৃদঃ সাধবো যে॥
যে বা ময়ীশে কৃতসৌহৃদার্থা জনেষু দেহম্ভরবার্ত্তিকেষু।
গৃহেষু জায়াত্মজরাতিমৎসু ন প্রীতিযুক্তা যাবদর্থাশ্চ লোকে॥—শ্রীভা, ৫।৫।২-৩॥

—যাঁহারা সর্ব্বত্র সমদর্শী, যাঁহারা প্রশান্ত (অর্থাৎ যাঁহাদের বুদ্ধি প্রকৃষ্টরূপে ভগবানে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হইয়াছে), যাঁহারা ক্রোধশূন্য, সুহৃৎ (উত্তম অন্তঃকরণ বিশিষ্ট), যাঁহারা সাধু (অর্থাৎ পরদোষগ্রহণ করেন না), যাঁহারা ঈশ্বরে সৌহৃদ্য বা প্রীতি স্থাপন করিয়া সেই প্রীতিকেই পরমপুরুষার্থ মনে করেন (ভগবৎ-প্রীতি ব্যতীত অন্য বস্তুকে যাঁহারা অসার— অকিঞ্চিৎকর—মনে করেন) বিষয়াসক্ত ব্যক্তিসকলে, কিম্বা স্ত্রীপুত্র-ধনাদিযুক্ত গৃহ বিদ্যমান থাকিলেও সে-সমুদয়ে যাঁহাদের প্রীতি নাই এবং লোকমধ্যে থাকিয়াও ভগবৎ-সেবনাত্মক ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের জন্য যে পরিমাণ অর্থের দরকার, তদতিরিক্ত অর্থে যাঁহাদের স্পৃহা নাই, তাঁহারা মহৎ।”

“গৃহীত্বাপীন্দ্রিয়ৈরর্থান্ যো ন দ্বেষ্টি ন হৃষ্যতি।
বিষ্ণোর্মায়ামিদং পশ্যন্ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥
দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়াং যো জন্মাপ্যয়ক্ষুদ্‌ভয়তর্ষকৃচ্ছ্রৈঃ।
সংসারধর্ম্মৈরবিমুহ্যমানঃ স্মৃত্যা হরের্ভাগবতপ্রধানঃ॥
ন কামকর্ম্মবীজানাং যস্য চেতসি সম্ভবঃ।
বাসুদেবৈকনিলয়ঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥
ন যস্য জন্মকর্ম্মাভ্যাং ন বর্ণাশ্রমজাতিভিঃ।
সজ্জতেঽস্মিন্নহম্ভাবো দেহে বৈ স হরেঃ প্রিয়ঃ॥
ন যস্য স্বঃ পর ইতি বিত্তেষ্বাত্মনি বা ভিদা।
সর্ব্বভূতসমঃ শান্তঃ স বৈ ভাগবতোত্তমঃ॥
ত্রিভুবনবিভবহেতবেঽপ্যকুণ্ঠস্মৃতিরজিতাত্মসুরাদিভির্বিমৃগ্যাৎ।

ন চলতি ভগবৎপাদারবিন্দাৎ লবনিমিষার্দ্ধমপি যঃ স বৈষ্ণবাগ্র্যঃ ॥
ভগবত উরুবিক্রমাঙ্ঘ্রি শাখানখমণিচন্দ্রিকয়া নিরস্ততাপে।
হৃদি কথমুপসীদতাং পুনঃ স প্রভবতি চন্দ্র ইবোদিতেঽর্কতাপঃ ॥
বিসৃজতি হৃদয়ং ন যস্য সাক্ষাৎ হরিরবশাভিহিতোঽপ্যঘৌঘনাশঃ।
প্রণয়রশনয়া ধৃতাঙ্ঘ্রি পদ্মঃ স ভবতি ভাগবতপ্রধান উক্তঃ ॥

—শ্রীভা, ১১।২।৪৮-৫৫ ॥

—(ভগবানে আবিষ্টচিত্ত বলিয়া রূপরসাদি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর নিমিত্ত যিনি লালায়িত নহেন), রূপরসাদি ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য বস্তু গ্রহণ করিলেও এই বিশ্বকে বিষ্ণুমায়ারূপে দর্শন (মনন) করিয়া যিনি হর্ষদ্বেষাদি প্রকাশ করেন না (হর্ষ-দ্বেষ-কাম-মোহাদির বশীভূত হয়েন না), তিনি ভাগবতোত্তম। হরিস্মৃতিবশতঃ দেহের জন্মমৃত্যু, প্রাণের ক্ষুধা, মনের ভয়, বুদ্ধির তৃষ্ণা এবং ইন্দ্রিয়ের পরিশ্রমরূপ সংসারধর্ম্ম দ্বারা যিনি মুহ্যমান হয়েন না, তিনি ভাগবত-প্রধান। যাঁহার চিত্তে কামকর্ম্ম-বাসনার (ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তু-প্রাপ্তির জন্য চেষ্টার বাসনার) উদয় হয়না এবং একমাত্র বাসুদেবই যাঁহার আশ্রয়, তিনিই ভাগবতোত্তম। পাঞ্চভৌতিক দেহে জন্ম, কর্ম্ম, বর্ণ, আশ্রম, জাতি প্রভৃতি বশতঃ যাঁহার চিত্তে অহংভাবের (অভিমানের) উদয় হয় না, তিনিই শ্রীহরির প্রিয়। যাঁহার স্বপক্ষ-পরপক্ষ জ্ঞান নাই, বিত্তবিষয়েও যাঁহার আপন-পর জ্ঞান নাই (এই বস্তুটী আমার, অপরের নহে- এইরূপ জ্ঞান যাঁহার নাই), দেহবিষয়েও যাঁহার ভেদ-জ্ঞান নাই (নিজের দেহে এবং অপরের দেহে যাঁহার সমান প্রীতি), সকল প্রাণীতেই যাঁহার সমদৃষ্টি এবং যিনি শান্তচিত্ত, তিনিই ভাগবতোত্তম। ভগবচ্চরণারবিন্দকেই সার করিয়াছেন বলিয়া ত্রিভুবনের বিভব (রাজত্ব) লাভের সম্ভাবনা উপস্থিত হইলেও নিমিষার্দ্ধের জন্যও যিনি ইন্দ্রাদিদেবগণেরও অন্বেষণীয় ভগবচ্চরণারবিন্দ হইতে বিচলিত হয়েন না, তিনিই বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ। চন্দ্র উদিত হইলে যেমন আর সূর্য্যের উত্তাপ থাকেনা, তদ্রূপ উরুবিক্রম ভগবানের পদাঙ্গুলি-নখরের স্নিগ্ধ কিরণে যাঁহার সমস্ত বিষয়তাপ দূরীভূত হইয়াছে, তিনিই ভাগবত-প্রধান। যাঁহার নাম অবশে উচ্চারিত হইলেও সমস্ত পাপরাশি বিনষ্ট হইয়া যায়, সেই শ্রীহরি যাঁহার হৃদয় পরিত্যাগ করেন না, পরন্তু প্রেমরজ্জু দ্বারা স্বীয় পাদপদ্মে আবদ্ধ হইয়া শ্রীহরি যাঁহার হৃদয়ে সর্ব্বদা অবস্থান করেন, তিনিই ভাগবত-প্রধান বলিয়া কথিত হয়েন।"

অগ্নির প্রভাবে যেমন কালো কয়লার মলিনত্ব দূরীভূত হইয়া যায়, কয়লা উজ্জ্বল হইয়া উঠে, তদ্রূপ সাধনের প্রভাবে এবং ভগবৎ-কৃপায় ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণকারী ভক্তের চিত্তের বিষয়বাসনাদি সমস্ত কালিমা দূরীভূত হইয়া যায়, শুদ্ধাভক্তির আবির্ভাবে তাঁহার চিত্ত সমুজ্জ্বল হইয়া উঠে।

খ। সাধুসঙ্গ

সাধুসঙ্গ-শব্দে কেবল সাধুর নিকটে অবস্থিতিকেই বুঝায় না। সাধুর বা মহতের নিকটে গমন, অবস্থিতি, দণ্ডবৎ-প্রণামাদি, সম্ভবপর হইলে মহতের সেবাপরিচর্য্যাদি, সাধুর মুখে

ভগবৎ-প্রসঙ্গাদি-শ্রবণ, ভগবন্নামাদির কীর্ত্তনাদিদ্বারা সাধুর সেবা, সাধুর আচরণাদি-লক্ষ্য-করণ ও আচরণাদির অনুসরণের চেষ্টা, সাধুর উপদেশ শ্রবণ ও উপদেশ অনুসারে নিজেকে পরিচালিত করা— ইত্যাদি সমস্তই সাধুসঙ্গের অন্তর্ভুক্ত।

মহতের পদরজঃ, পদজল এবং ভুক্তাবশেষ গ্রহণ করার চেষ্টাও বিশেষ আবশ্যক। সাক্ষাদ্‌ভাবে এ-সমস্ত গ্রহণের সম্ভাবনা না থাকিলে পরোক্ষভাবেও, অর্থাৎ মহতের দৃষ্টির অগোচরেও, কৌশলক্রমে এ-সমস্ত গ্রহণ করা যায়। "তৃণাদপি সুনীচ" ভাববশতঃ কোনও কোনও ভক্ত নিজের গোচরীভূত ভাবে তাঁহার পাদোদকাদি অপরকে দিতে চাহেন না। এরূপ স্থলে তাঁহার দৃষ্টির অগোচরে গ্রহণ করাই সমীচীন। মহতের মনে কষ্ট দেওয়া সঙ্গত নয়।

গ। সাধুসঙ্গ-মহিমা

সাধুসঙ্গের অপরিহার্য্যতা

অসৎসঙ্গ-ত্যাগ-প্রসঙ্গে সাধুসঙ্গের আবশ্যকতার কথা পূর্ব্বেই (৫।৩৫-অনুচ্ছেদ) কিছু বলা হইয়াছে।

সাধনপথে প্রবেশের পক্ষে শ্রদ্ধার আবশ্যকতার কথাও পূর্ব্বে (৫।২২ ক অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। সাধুসঙ্গ হইতেই শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে, "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো" ইত্যাদি শ্রী ভা, ৩।২৫।২৪ শ্লোকের উল্লেখপূর্ব্বক, তাহাও পূর্ব্বে (৫।২২ খ অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মিবার হেতু-কথন-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"সাধনাভিনিবেশেন কৃষ্ণতদ্‌ভক্তয়োস্তথা।
প্রসাদেনাতিধন্যানাং ভাবো দ্বেধাভিজায়তে॥ ১।৩।৫॥

—যাঁহারা 'অতিধন্য', দুই রকমে তাঁহাদের মধ্যে কৃষ্ণরতির আবির্ভাব হইতে পারে— প্রথমতঃ, সাধনে অভিনিবেশ; দ্বিতীয়তঃ, কৃষ্ণের এবং কৃষ্ণভক্তের অনুগ্রহ।"

এই শ্লোকের টীকায় "অতিধন্যানাম্‌"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অতিধন্যানাং প্রাথমিকমহৎসঙ্গজাত-মহাভাগ্যানাং 'ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ' ইত্যাদেঃ—'ভবাপবর্গো ভ্রমতো' ইত্যাদি শ্রী ভা, ১০।৫১।৫৩ শ্লোকানুসারে জানা যায়, প্রাথমিক মহৎসঙ্গজাত মহাভাগ্য যাঁহাদের লাভ হইয়াছে, তাঁহারাই অতি ধন্য।"

আবার, "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যো জনঃ" ইত্যাদি শ্রী ভা, ১১।২০।৮-শ্লোকের টীকাতেও "যদৃচ্ছয়া"-শব্দের অর্থে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"কেনাপি পরমস্বতন্ত্রভগবদ্‌ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত-পরমমঙ্গলোদয়েন—পরমস্বতন্ত্র-ভগবদ্‌ভক্ত সঙ্গদ্বারা সেই ভক্তের কৃপায় যাঁহার পরমমঙ্গলের উদয় হইয়াছে, ইত্যাদি।"

সাধনভক্তির অধিকারি-বর্ণনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে॥১।২।৯॥—অতিভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে (তিনি সাধনভক্তির

অধিকারী)।" এ-স্থলেও টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতিভাগ্যেন মহৎসঙ্গাদিজাতসংস্কার-বিশেষেণ—মহৎসঙ্গজাত সংস্কারবিশেষকেই এ-স্থলে অতিভাগ্য বলা হইয়াছে।"

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—প্রথমে যাঁহার মহৎসঙ্গের এবং মহৎকৃপালাভের সৌভাগ্য জন্মিয়াছে, তিনিই শ্রদ্ধালাভের এবং সাধনভক্তি অনুষ্ঠানের অধিকারী। সুতরাং সাধনেচ্ছুর পক্ষে সর্ব্বপ্রথমেই মহৎসঙ্গ অপরিহার্য্য।

উজ্জ্বল জ্বলন্ত কয়লার সঙ্গব্যতীত কালো কয়লার মলিনতা যেমন দূরীভূত হইতে পারে না, তদ্রূপ মহতের সঙ্গব্যতীতও মায়ামুগ্ধ জীবের চিত্তের দুর্ব্বাসনা (বিষয়-ভোগবাসনা)-রূপ মলিনতা অপসারিত হইতে পারে না। এই দুর্ব্বাসনাই হইতেছে সংসার। কৃষ্ণকামনা বা কৃষ্ণভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনাই হইতেছে দুর্ব্বাসনা। ইহাই সংসার। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু এইরূপ অন্যকামনাকে "দুঃসঙ্গ", "কৈতব", "আত্মবঞ্চনা" বলিয়াছেন।

দুঃসঙ্গ কহিয়ে—কৈতব আত্মবঞ্চনা।
'কৃষ্ণ'-কৃষ্ণভক্তি' বিনু অন্য কামনা॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২৪।৭০॥

এই দুঃসঙ্গ দূর করার একমাত্র উপায়ও হইতেছে মহৎসঙ্গ।

"ততো দুঃসঙ্গমুৎসৃজ্য সৎসু সজ্জেত বুদ্ধিমান্।
সন্ত এবাস্য ছিন্দন্তি মনোব্যাসঙ্গমুক্তিভিঃ॥ শ্রী ভা ১১।২৬।২৬॥

—অতএব বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সৎসঙ্গ করিবেন। সাধুব্যক্তিগণই উপদেশ-বাক্য দ্বারা ঐ ব্যক্তির মনের বিশেষ আসক্তি (সংসারাসক্তি) ছেদন করিয়া থাকেন।"

"সৎসঙ্গান্মুক্তদুঃসঙ্গো হাতুং নোৎসহতে বুধঃ।
কীর্ত্ত্যমানং যশো যস্য সকৃদাকর্ণ্য রোচনম্॥ শ্রী ভা ১।১০।১১॥

—সৎসঙ্গপ্রভাবে যিনি (কৃষ্ণকামনা ও কৃষ্ণভক্তিকামনা ব্যতীত অন্যকামনারূপ) দুঃসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়াছেন, সেই বুদ্ধিমান্ জন, সাধুগণ কর্ত্তৃক কীর্ত্ত্যমান রুচিকর ভগবদ্‌যশঃ একবার শ্রবণ করিলে আর সৎসঙ্গ ত্যাগ করিতে সমর্থ হয়েন না।"

"ভবাপবর্গো ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ।
সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্‌গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥—শ্রী ভা, ১০।৫১।৫৩

—(ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়া মুচুকুন্দ বলিয়াছেন) হে অচ্যুত! এই সংসারে ভ্রমণ করিতে করিতে যখন কোনও ব্যক্তির সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়, তখনই তাহার ভগবদ্‌ভক্ত-সঙ্গ লাভ হয়। যখনই ভক্তসঙ্গ লাভ হয়, তখনই (সৎসঙ্গ প্রভাবে, সাধুর কৃপায়) সাধুদিগের একমাত্র গতি এবং কার্য্যকারণ-নিয়ন্তৃস্বরূপ তোমাতে রতি উৎপন্ন হয়।"

"কোন ভাগ্যে কারো সংসার ক্ষয়োন্মুখ হয়।
সাধুসঙ্গে তবে কৃষ্ণে রতি উপজয়॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২২।২৯॥"

মহতের কৃপাব্যতীত ভক্তি জন্মিতে পারেনা ; এমন কি সংসার-বাসনাও দূরীভূত হইতে পারেনা।

মহৎকৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়।
কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু, সংসার নহে ক্ষয়॥ শ্রী চৈ, চ, ২।২২।৩২॥

নারদের সঙ্গ এবং কৃপার প্রভাবে দস্যু রত্নাকর যে আদিকবি পরমভাগবত বাল্মিকীতে পরিণত হইয়াছিলেন, তাহা অতি সুবিদিত। সেই নারদেরই কৃপায় এক ব্যাধ যে মহাভাগবত হইয়া গিয়াছিলেন, স্কন্দপুরাণ হইতে তাহাও জানা যায়। জীবহত্যাই ছিল এই ব্যাধের জীবিকা-নির্ব্বাহের একমাত্র উপায়। কিন্তু নারদের কৃপায় পরে তাঁহার এমন অবস্থা হইয়াছিল যে, পিপীলিকাদি নষ্ট হইবে আশঙ্কা করিয়া তিনি পরে পথ চলিতেও ইতস্ততঃ করিতেন। তাঁহার এই অবস্থা দেখিয়া নারদ বলিয়াছিলেন—

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়োগুণাঃ। হরিভক্তৌপ্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।২৪ পরিচ্ছেদধৃত স্কান্দবচন॥

—হে ব্যাধ ! তোমার এ-সমস্ত অহিংসাদিগুণ অদ্ভুত নহে ; যাঁহারা হরিভক্তিতে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহারা কখনও অপরকে দুঃখ দেন না।"

মহাপুরুষগণ বস্তুতঃ স্পর্শমণির তুল্য। ইহা তাঁহাদের কৃপার এক অচিন্ত্যশক্তি।

শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্যও বলিয়া গিয়াছেন—

"ক্ষণমিহ সজ্জনসঙ্গতিরেকা ভবতি ভবার্ণবতরণে নৌকা॥

—এই সংসারসমুদ্র উত্তীর্ণ হওয়ার পক্ষে—একমাত্র নৌকা হইতেছে সজ্জনসঙ্গ ; ক্ষণকালের জন্যও যদি সজ্জনসঙ্গ হয়, তাহাও সংসার-সমুদ্র হইতে উদ্ধার লাভের হেতু হইতে পারে।"

শ্রীমদ্ভাগবতও তাহাই বলেন—

"সংসারেঽস্মিন্ ক্ষণার্দ্ধোঽপি সৎসঙ্গঃ শেবধির্নৃণাম্॥ শ্রীভা, ১১।২।৩০॥

—(নিমি-মহারাজ নবযোগীন্দ্রের নিকটে বলিয়াছেন) এই সংসারে অর্দ্ধক্ষণের জন্যও যদি সাধুসঙ্গ হয়, তাহাও লোকের পক্ষে শেবধি (সর্ব্বাভীষ্টপ্রদ)।"

"সাধুসঙ্গ সাধুসঙ্গ সর্ব্বশাস্ত্রে কয়।
লবমাত্র সাধুসঙ্গে সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৩৩॥"

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং ন পুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশিষঃ॥ শ্রীভা, ১।১৮।১৩॥

—(শৌনকাদি ঋষির নিকটে শ্রীসূতগোস্বামী বলিয়াছেন) ভগবদ্ভক্তজনের সহিত যে অত্যল্পসঙ্গ, তাহার (ফলের) সঙ্গেও স্বর্গ ও মুক্তির তুলনা করা যায় না ; (ধনরাজ্যসম্পৎলাভ-সম্বন্ধে) মানুষের আশীর্ব্বাদের কথা আর কি বলিব ?"

ঘ। ভক্তপদরজ আদির মহিমা

পরমভাগবত মহাপুরুষদের পদরজ-আদির এক অপূর্ব্ব মহিমা। ভক্তপদরজ-আদির কৃপা না হইলে ভক্তিপথে অগ্রসর হওয়া যায় না, ভগবত্তত্ত্ব-জ্ঞানাদিও লাভ করা যায় না। শাস্ত্রে তাহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়।

"রহূগণৈতত্তপসা ন যাতি ন চেজ্যয়া নির্ব্বপণাদ্‌গৃহাদ্‌ বা।
ন ছন্দসা নৈব জলাগ্নিসূর্য্যৈর্বিনা মহৎপদরজোঽভিষেকম্॥ শ্রীভা, ৫।১২।১২॥

—(শ্রীভরত মহারাজ রহূগণকে বলিয়াছেন) হে মহারাজ রহূগণ! মহাপুরুষদিগের পাদরজোদ্বারা অভিষিক্ত না হইলে—তপস্যা, বৈদিক কর্ম্ম, অন্নাদি দান, গৃহাদিনির্ম্মাণার্থ পরোপকার, বেদাভ্যাস, অথবা জল, অগ্নি বা সূর্য্যের উপাসনা—এ-সমস্ত দ্বারাও ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ করা যায় না।"

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাপগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ শ্রীভা, ৭।৫।৩২॥

—(প্রহ্লাদ তাঁহার গুরুপুত্রের নিকটে বলিয়াছেন) যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের চরণ-ধূলিদ্বারা অভিষেক না হয়, সে পর্য্যন্ত লোকসকলের মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করিতে পারে না (অর্থাৎ সে পর্য্যন্ত শ্রীকৃষ্ণপাদপদ্মে তাহাদের মন যায় না) —শ্রীভগবৎপাদপদ্মে মতি জন্মিলেই সকল অনর্থের (বহির্ম্মুখতার এবং তজ্জনিত বিষয়ভোগ-বাসনাদির) নিবৃত্তি হইতে পারে।"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন—

"ভক্তপদধূলি আর ভক্তপদজল।
ভক্তভুক্ত-অবশেষ—তিন মহাবল॥ (পাঠান্তর-সাধনের বল)॥
এই তিন সেবা হৈতে কৃষ্ণপ্রেমা হয়।
পুনঃ পুনঃ সর্ব্বশাস্ত্রে ফুকারিয়া কয়॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।১৬।৫৫-৫৬॥"

শ্রীল নরোত্তম-দাস ঠাকুরমহাশয়ও বলিয়া গিয়াছেন—

"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি,
তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।"
"বৈষ্ণবের উচ্ছিষ্ট, তাহে মোর মননিষ্ঠ।"

বিদ্যুৎশক্তি-সঞ্চারিত লৌহ এবং সাধারণ লৌহ দেখিতে এক রকম হইলেও তাহাদের শক্তির পার্থক্য আছে। তদ্রূপ ভক্তপদরজঃ, ভক্তপদজল এবং ভক্তভুক্তাবশেষ—এই সমস্ত সাধারণ দৃষ্টিতে অন্য ধূলি, জল বা অন্নাদির মত হইলেও তাহাদের এক অচিন্ত্য-শক্তি আছে; ভক্তের কৃপা-শক্তিদ্বারা এসকল বস্তু শক্তিমান্। এতাদৃশ মহিমা যুক্তিতর্কের অতীত।

ঙ। ভগবদ্ভক্তের দর্শন-স্মরণাদির মহিমা

ভগবদ্ভক্তের দর্শন-স্মরণাদির এবং বন্দনাদির এবং ভগবদ্ভক্তের সঙ্গে আলাপাদির মহিমাও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে।

"দর্শনস্পর্শনালাপসহবাসাদিভিঃ ক্ষণাৎ। ভক্তাঃ পুনন্তি কৃষ্ণস্য সাক্ষাদপি চ পুক্কসম্॥

—হ, ভ, বি, (১০।১১৫)ধৃত ব্রহ্মাণ্ডপুরাণবাক্য।

—শ্রীকৃষ্ণের ভক্তগণ দর্শন, স্পর্শন, আলাপ ও সহবাসাদিদ্বারা আশু সাক্ষাৎ পুক্কসেরও পবিত্রতা সাধন করিয়া থাকেন।"

যাঁহার মধ্যে যে বৃত্তি বলবতী, তাঁহার সঙ্গ তাঁহার দর্শন, তাঁহার স্মরণাদিতে এবং তাঁহার সহিত আলাপাদিতে সাধারণতঃ সে বৃত্তিগত ভাবই চিত্তে সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা। ভগবদ্ভক্ত সর্ব্বদা ভগবানের নামরূপগুণাদির চিন্তাই করিয়া থাকেন, ভগবদ্বিষয়িনী কথাতেই রত থাকেন, সাংসারিক বিষয়ের কথা তাঁহার চিত্তে স্থান পায় না। তাঁহার সঙ্গের প্রভাবে, কিম্বা তাঁহার দর্শনাদিতে, তাঁহার সহিত আলাপাদিতে, এমন কি তাঁহার নিকটে অবস্থিতিতেও সাংসারিক কোনও বিষয়ের ভাব চিত্তে উদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে না, বরং ভগবৎসম্বন্ধী বিষয়ের ভাবই চিত্তে সঞ্চারিত হওয়ার সম্ভাবনা বেশী। ইহাতে জীবের বহির্ম্মুখতাকে সঙ্কুচিত করিয়া অন্তর্ম্মুখতার দিকে চিত্ত-বৃত্তিকে সঞ্চালিত করার সুযোগ যথেষ্ট আছে। ইহাই পরম লাভ। ভগবদ্ভক্তের বন্দনাগীতিও তদ্রূপই ফলপ্রদ।

৩৮। অপরাধ-ত্যাগ

সাধারণতঃ পাপ ও অপরাধ একার্থক বলিয়া গ্রহণ করা হয়; কিন্তু ভক্তিশাস্ত্রে এই দুইয়ের বিস্তর পার্থক্য দৃষ্ট হয়। অবশ্য পাপ ও অপরাধ উভয়েই অন্যায় এবং গর্হিত কর্ম্ম; এই হিসাবে উভয়েই একজাতীয়। কিন্তু ন্যায়-বিরুদ্ধতার এবং গর্হিতত্বের গুরুত্বের পার্থক্য আছে; এই পার্থক্য অনুসারেই পাপ ও অপরাধের পার্থক্য।

ক। পাপ

স্মৃতিশাস্ত্রাদি হইতে জানা যায়—প্রাণিহত্যা, চৌর্য্য, পরদারগমন, অসৎপ্রলাপ, পারুষ্য (অপ্রিয়ভাষণ), পৈশুন্য (খলতা), মিথ্যা, পরদ্রব্যে স্পৃহা, হিংসা, অপরের অনিষ্ট চিন্তা, সুরাপানাদি, অভক্ষ্য-ভক্ষণাদি হইতেছে পাপ। ইহাদের আবার রকমভেদে নয়টী শ্রেণীও করা হইয়াছে—অতিপাতক, মহাপাতক, অনুপাতক, উপপাতক, সঙ্করীকরণ, অপাত্রীকরণ, জাতিভ্রংশকর, মলাবহ ও প্রকীর্ণ।

এই সমস্ত পাপের স্বরূপ বিচার করিলে বুঝা যায়—দেহাত্মবুদ্ধিবশতঃ লোকের চিত্তে যে

অভিমান এবং ভোগবাসনা জন্মে, তাহা হইতেই এ-সমস্ত অসৎকর্ম্মের উদ্ভব। দেহ অনাত্ম (জড়) বস্তু; এই অনাত্ম দেহের অনাত্ম অভিমান এবং অনাত্মবস্তুর ভোগের জন্য বাসনা হইতেই অনাত্মবস্তু সম্বন্ধে, কায়দ্বারা, বাক্যদ্বারা এবং মনের দ্বারা যে অসৎকর্ম করা হয়, তাহাই পাপ। এ-সমস্ত পাপ-কর্মের ফলে সমাজের মধ্যে বিশৃঙ্খলা জন্মে, পাপীরও ইহকালে সমাজে গ্লানি হয়, রোগ-শোকাদিও ভোগ করিতে হয় এবং পরকালে নরক ভোগ হইয়া থাকে। সমাজও অনাত্ম বস্তু, নরকও অনাত্মবস্তু। এইরূপে দেখা গেল—অনাত্ম বস্তুর সঙ্গেই যে অবিহিত কর্মের সম্বন্ধ, তাহাই পাপ।

পাপকর্মের ফল ভোগ করে অনাত্মদেহ; পাপের ফল—দেহের এবং দেহসম্বন্ধি মনের গ্লানি—ইহকালে লোকনিন্দা, রোগ-শোকাদি এবং পরকালে নরকভোগ। স্মৃতিশাস্ত্র-বিহিত প্রায়শ্চিত্তাদির যথাবিধি অনুষ্ঠানে পাপের মূলীভূত কারণ দূরীভূত না হইলেও কৃতপাপের গ্লানিজনক ফল বিনষ্ট হইতে পারে।

কিন্তু অপরাধ পাপ অপেক্ষাও গুরুতর বস্তু। কর্মকাণ্ডের অন্তর্গত স্মৃতিবিহিত প্রায়শ্চিত্তের অনুষ্ঠানে অপরাধ দূরীভূত হয় না। প্রায়শ্চিত্তবিবেকে নববিধ পাপের প্রায়শ্চিত্তের বিধানই দৃষ্ট হয়, অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের বিধান দৃষ্ট হয় না। কিন্তু এই অপরাধের স্বরূপ কি?

খ। অপরাধ

ভক্তিশাস্ত্রে এই কয় রকম অপরাধের উল্লেখ দৃষ্ট হয়—সেবাপরাধ, নামাপরাধ, বৈষ্ণবাপরাধ এবং ভগবদপরাধ।

সেবাপরাধ হইতেছে ভগবানের শ্রীবিগ্রহ-সেবা সম্বন্ধে অপরাধ, অর্থাৎ অবিহিত কর্মকরণ। নামাপরাধ হইতেছে ভগবানের নামের নিকটে অপরাধ। বৈষ্ণবাপরাধ হইতেছে বৈষ্ণবের বা ভগবদ্ ভক্তের নিকটে অপরাধ। ভগবদপরাধ হইতেছে ভগবানের নিকটে অপরাধ।

ভগবদ্‌বগ্রিহের সেবা অনাত্ম (বা জড়) দেহের সহায়তায় করা হইলেও তাহার লক্ষ্য কিন্তু অনাত্ম বস্তু নহে, তাহার মুখ্য সম্বন্ধও অনাত্ম বস্তুর সঙ্গে নহে। বিগ্রহ-সেবার লক্ষ্য হইতেছে জীবাত্মার সঙ্গে পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানের অভীষ্টানুরূপ মিলন। জীবাত্মা এবং ভগবান্-কেহই অনাত্ম বস্তু নহেন, উভয়ই চিদ্‌বস্তু, আত্মবস্তু। সুতরাং সেবাপরাধ হইতেছে—আত্মবস্তু-সম্বন্ধে গর্হিত কর্ম।

ভগবন্নামের শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিও অনাত্মদেহের সহায়তায় সাধিত হইলেও নাম অনাত্ম বস্তু নহে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির লক্ষ্যও অনাত্মবস্তু নহে। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামীর ন্যায় নামও সচ্চিদানন্দ। আর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির লক্ষ্যও হইতেছে পরব্রহ্ম পরমাত্মা ভগবানের সহিত জীবাত্মার অভীষ্টানুরূপ মিলন। সুতরাং নামাপরাধও হইতেছে—আত্মবস্তু সম্বন্ধে গর্হিত কর্ম।

বৈষ্ণব, বা ভগবদ্‌ভক্ত, বা সাধু হইতেছেন ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়। ভগবান্‌ই বলিয়াছেন—সাধুগণ আমার হৃদয়, আমি সাধুগণের হৃদয়। তাঁহারাও আমাকে ছাড়া আর কিছু জানেন না, আমিও তাঁহাদের ছাড়া আর কিছু জানি না। "সাধবো হৃদয়ং মহ্যং সাধূনাং হৃদয়ন্ত্বহম্। মদন্যত্তে ন

জানন্তি নাহং তেভ্যো মনাগপি॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৮॥” সুতরাং কোনও ভগবদ্‌ভক্তের সম্বন্ধে কোনও গর্হিত কর্মে ভগবান্‌ই অসন্তুষ্ট হয়েন। অতএব বৈষ্ণবাপরাধও হইতেছে—আত্মবস্তু সম্বন্ধে গর্হিত কর্ম্ম।

আর ভগবৎ-সম্বন্ধে যে গর্হিত কর্ম, ভগবদবজ্ঞাদি, তাহাও যে আত্মবস্তু সম্বন্ধেই গর্হিত কর্ম, তাহা সহজেই বুঝা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—**অপরাধ হইতেছে আত্মবস্তু সম্বন্ধে গর্হিত কর্ম্ম।**

পাপ হইতেছে অনাত্মবস্তু সম্বন্ধে গর্হিত কর্ম এবং অপরাধ হইতেছে আত্মবস্তু সম্বন্ধে গর্হিত কর্ম। পাপের ফল স্পর্শ করে অনাত্ম ক্ষণভঙ্গুর দেহকে; আর অপরাধের ফল স্পর্শ করে আত্মবস্তু দেহীকে, জীবাত্মাকে। অপরাধ জীবাত্মার ভগবদুন্মুখতার বিঘ্ন জন্মায়, ভজন-সাধনে বিঘ্ন জন্মায়।

অপরাধ-শব্দের অর্থ হইতেছে—অপগত হয় রাধ যাহা হইতে, তাহা অপরাধ। রাধ-শব্দের অর্থ হইতেছে—সন্তোষ। তাহা হইলে, অপরাধ হইতেছে এরূপ একটি কর্ম, যাহা হইতে সন্তোষ দূরীভূত হয়। কাহার সন্তোষ দুরীভূত হয়? সেবাপরাধ-স্থলে সেবার সন্তোষ, নামাপরাধ স্থলে নামের সন্তোষ, বৈষ্ণবাপরাধ স্থলে বৈষ্ণবের (কার্য্যতঃ ভক্তবৎসল এবং ভক্তপ্রিয় ভগবানের) সন্তোষ এবং ভগবদপরাধ-স্থলে ভগবানের সন্তোষ—দূরীভূত হয়, অর্থাৎ অপরাধ জন্মিলে তাঁহারা প্রসন্ন হয়েন না। সেবা, নাম, বৈষ্ণব এবং ভগবান্ অপ্রসন্ন হইলে সাধকের সমস্ত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানই ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়।

এক্ষণে অপরাধগুলি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

গ। সেবাপরাধ

সেবা-অপরাধ—আগম-শাস্ত্রে বত্রিশ প্রকারের সেবাপরাধের উল্লেখ আছে, যথা—(১) গাড়ী, পাল্কী-আদিতে চড়িয়া, অথবা জুতা-খড়মাদি পায়ে দিয়া শ্রীমন্দিরে গমন, (২) ভগবৎসম্বন্ধীয় উৎসবাদির সেবা না করা, অর্থাৎ তাহাতে যোগ না দেওয়া, (৩) বিগ্রহ-সাক্ষাতে প্রণাম না করা, (৪) উচ্ছিষ্ট বা অশুচি অবস্থায় ভগবদ্‌বন্দনাদি, (৫) এক হস্তে প্রণাম, (৬) ভগবদগ্রে প্রদক্ষিণ, অর্থাৎ প্রদক্ষিণ সময়ে শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে আসিয়া যে রীতিতে প্রদক্ষিণ করা হইতেছিল, সেই রীতির পরিবর্ত্তন না করিয়া প্রদক্ষিণ করা, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহকে পৃষ্ঠ দেখাইয়া প্রদক্ষিণ করা, (৭) শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে পাদ-প্রসারণ, (৮) পর্য্যঙ্কবন্ধন, অর্থাৎ শ্রীবিগ্রহের অগ্রে হস্তদ্বারা জানুদ্বয় বন্ধনপূর্ব্বক উপবেশন, (৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে শয়ন, (১০) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে ভোজন, (১১) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে মিথ্যাকথা বলা, (১২) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে উচ্চস্বরে কথা বলা, (১৩) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে পরস্পর আলাপাদি করা, (১৪) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে রোদন, (১৫) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কলহ, (১৬) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি অনুগ্রহ বা (১৭) নিগ্রহ, (১৮) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে কাহারও প্রতি নিষ্ঠুর-বাক্য-প্রয়োগ, (১৯) কম্বল গায়ে দিয়া সেবাদির কাজ করা, (২০) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে পরনিন্দা, (২১) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে পরের স্তুতি, (২২) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে অশ্লীল কথা বলা, (২৩) শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে অধোবায়ুত্যাগ, (২৪) সামর্থ্য

থাকা সত্ত্বেও মুখ্য উপচার না দিয়া গৌণ উপচারে পূজাদি করা, (২৫) অনিবেদিত দ্রব্য ভক্ষণ, (২৬) যে কালে যে ফলাদি জন্মে, সেই কালে শ্রীভগবান্‌কে তাহা না দেওয়া, (২৭) আনীত দ্রব্যের অগ্রভাগ অন্যকে দিয়া অবশিষ্টাংশ ভগবন্নিমিত্ত ব্যঞ্জনাদিতে ব্যবহার, (২৮) শ্রীমূর্ত্তিকে পেছনে রাখিয়া বসা, (২৯) শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে অন্য ব্যক্তিকে অভিবাদন, (৩০) গুরুদেব কোনও প্রশ্ন করিলেও চুপ করিয়া থাকা, (৩১) নিজে নিজের প্রশংসা করা, (৩২) দেবতা-নিন্দা। এতদ্ব্যতীত বরাহপুরাণে আরও কতকগুলি সেবা-অপরাধের উল্লেখ আছে, যথা—(১) রাজ-অন্ন ভক্ষণ, (২) অন্ধকার গৃহে শ্রীমূর্ত্তি স্পর্শ করা, (৩) অনিয়মে শ্রীবিগ্রহসমীপে গমন, (৪) বাদ্যব্যতিরেকে মন্দিরের দ্বার উদ্‌ঘাটন, (৫) কুক্কুরাদিকর্ত্তৃক দুষিত ভক্ষ্যবস্তুর সংগ্রহ, (৬) পূজা করিতে বসিয়া মৌনভঙ্গ এবং (৭) মল-মূত্রাদি ত্যাগের জন্য গমন, (৮) অবৈধ পুষ্পে পূজন, (৯) গন্ধমাল্যাদি না দিয়া আগে ধূপপান, (১০) দন্তধাবন না করিয়া (১১) স্ত্রীসম্ভোগের পর শুচি না হইয়া (১২) রজস্বলা স্ত্রী স্পর্শ করিয়া (১৩) দীপ স্পর্শ করিয়া (১৪) শব স্পর্শ করিয়া (১৫) রক্তবর্ণ, অধৌত, পরের ও মলিন বস্ত্র পরিধান করিয়া (১৬) মৃত দর্শন করিয়া (১৭) অপানবায়ু ত্যাগ করিয়া (১৮) ক্রুদ্ধ হইয়া (১৯) শ্মশানে গমন করিয়া (২০) ভুক্তান্নের পরিপাক না হইতে (২১) কুসুম্ভ অর্থাৎ গাঁজা খাইয়া (২২) পিন্যাক অর্থাৎ আফিং খাইয়া এবং (২৩) তৈল মর্দ্দন করিয়া—শ্রীহরির স্পর্শ ও সেবা করা অপরাধ। অন্যত্রও কতকগুলি সেবাপরাধের উল্লেখ পাওয়া যায়—ভগবৎ-শাস্ত্রের অনাদর করিয়া অন্য শাস্ত্রের প্রবর্ত্তন, শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে তাম্বূল চর্ব্বণ, এরণ্ডাদি-নিষিদ্ধ-পত্রস্থ পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন, আসুর কালে পূজন, কাষ্ঠাসনে বা ভূমিতে পূজন, স্নান করাইবার সময় বাম হাতে শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শ, শুষ্ক বা যাচিত পুষ্পদ্বারা অর্চ্চন, পূজাকালে থুথু ফেলা, পূজাবিষয়ে আত্মশ্লাঘা, ঊর্দ্ধপুণ্ড্রধারণের স্থানে বক্র ভাবে তিলক ধারণ, পাদ প্রক্ষালন না করিয়া শ্রীমন্দিরে গমন, অবৈষ্ণব-পক্ক বস্তুর নিবেদন, অবৈষ্ণবের সম্মুখে পূজন, নখস্পৃষ্ট জলদ্বারা স্নান করান, ঘর্ম্মাক্তকলেবর হইয়া পূজন, নির্ম্মাল্যলঙ্ঘন ও ভগবানের নাম লইয়া শপথাদি করণ। এতদ্ব্যতীত আরও অনেক অপরাধ শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। (শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস। ৮।২০০-১৬। শ্লোক দ্রষ্টব্য)।

উল্লিখিত সেবাপরাধগুলি একত্রে বিবেচনা করিলে মনে হয়, যে কোনও আচরণে শ্রীবিগ্রহের প্রতি অশ্রদ্ধা, অবজ্ঞা, মর্য্যাদার অভাব বা প্রীতির অভাব প্রকাশ পায়, সাধারণতঃ তাহাই সেবাপরাধ।

সেবা-অপরাধ যত্নসহকারে পরিত্যাজ্য, দৈবাৎ যদি কখনও কোন অপরাধ ঘটে, তবে সেবা-দ্বারা বা শ্রীভগবচ্চরণে শরণাপত্তি দ্বারা উহা হইতে মুক্তি প্রার্থনা করিলে অপরাধমুক্ত হওয়া যায়। তাহাতেও যদি অপরাধ হইতে মুক্ত হইতে পারা না যায়, এবং পুনঃ পুনঃ অপরাধ হইতে থাকে, তবে শ্রীহরিনামের শরণাপন্ন হইতে হইবে। নামের কৃপায় সমস্ত অপরাধ খণ্ডিত হয়। নাম সকলের সুহৃদ; কিন্তু শ্রীনামের নিকটে যাহার অপরাধ হয়, তাহার অধঃপতন নিশ্চিত।

ঘ। নামাপরাধ

আলোচনা

নামাপরাধসম্বন্ধে প্রচলিত ধারণা এই যে, নামাপরাধ এই দশটী ঃ—যথা (১) সাধুনিন্দা, (২) শ্রীবিষ্ণু ও শিবের নামাদির স্বাতন্ত্র্যমনন, (৩) গুরুর অবজ্ঞা, (৪) শ্রুতির ও তদনুগত শাস্ত্রের নিন্দা, (৫) হরিনামের মহিমায় অর্থবাদ-মনন, (৬) প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থকল্পনা, (৭) নাম-বলে পাপে প্রবৃত্তি, (৮) অন্য শুভক্রিয়াদির সহিত নামের সমতা-মনন, (৯) শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ এবং (১০) নাম-মাহাত্ম্য শুনিয়াও নামে অপ্রীতি। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।২।৫৪-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদও পদ্মপুরাণের নাম করিয়া অতি সংক্ষেপে উল্লিখিত দশটীকেই নামাপরাধ বলিয়া গিয়াছেন ; সংক্ষেপে উল্লেখ করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—প্রমাণ-বচন শ্রীশ্রীহরি-ভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত প্রমাণবচন-সমূহের আলোচনার পূর্ব্বে প্রসঙ্গক্রমে অন্য দু'একটী কথা বলা দরকার। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"সেবানামাপরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন।" এই অপরাধ-গুলিকে যখন দূরে বর্জ্জন করার উপদেশই প্রভু দিয়াছেন, তখন সহজেই বুঝা যায় যে, শ্রীমন্-মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া চেষ্টা করিলে এই অপরাধগুলি না করিয়াও পারা যায় ; যাহা হইতে দূরে সরিয়া থাকা যায়, তাহা ভবিষ্যতের বস্তুই হইবে—তাহা গতকালের বা পূর্ব্বজন্মের কোনও বস্তু হইতে পারে না। কারণ, গত বস্তু আমাদের বর্ত্তমান বা ভবিষ্যৎ চেষ্টার অধীন নহে। যাহা হউক, উল্লিখিত অপরাধগুলির নাম করিলেই বুঝা যায়—প্রথম নয়টী অপরাধ-জনক কাজ চেষ্টা করিলে লোকে না করিয়াও চলিতে পারে ; কিন্তু শেষ অপরাধটী—দশমটী—লোকের চেষ্টার বাহিরে ; প্রীতি বস্তুটী অন্তরের জিনিস, ইহা বাহিরের বস্তু নহে ; চেষ্টাদ্বারা বা ইচ্ছামাত্রেই কাহারও প্রতি মনের প্রীতি জন্মান যায় না। নাম-মাহাত্ম্য শুনিলেও যদি নামে আমার প্রীতি না জন্মে, তবে সে জন্য আমি আমার বর্ত্তমান কার্য্যের ফলে কিরূপে দায়ী হইতে পারি? আমি তো চেষ্টা করিয়া নামের প্রতি অপ্রীতিকে ডাকিয়া আনিতেছি না? অপ্রীতিকে যদি চেষ্টা করিয়া ডাকিয়া আনিতাম, তাহা হইলে নিশ্চয়ই আমার অপরাধ হইতে পারিত। নামমাহাত্ম্য শুনিলেও যে নামে অপ্রীতি থাকে, তাহা বরং গত কর্ম্মের বা পূর্ব্ব-অপরাধের ফল হইতে পারে, কিন্তু আমার কোনও বর্ত্তমান কর্ম্মের ফল হইতে পারে না ; সুতরাং ইহা হইতে দূরে সরিয়া থাকাও সম্ভব নহে। কাজেই মনে হইতে পারে—শ্রীমন্মহাপ্রভু যে কয়টী অপরাধের কথা মনে করিয়া তাহাদিগের "বিদূরে বর্জ্জনের" উপদেশ দিয়াছেন, দশম-অপরাধটী তাহাদের অন্তর্ভুক্ত হইতে পারে না ; উল্লিখিত দশম-অপরাধটী সম্বন্ধেও এক সমস্যা দেখিতে পাওয়া যায়।

নবম-অপরাধটী সম্বন্ধেও এক সমস্যা আছে। শ্রদ্ধাহীন ব্যক্তিকে নামোপদেশ করিলে উপদেষ্টার অপরাধ হইবে। শাস্ত্রবাক্যে "সুদৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসকে" শ্রদ্ধা বলে। এই শ্রদ্ধা যাঁর

আছে, তাঁহাকে নামোপদেশ করার কোনও প্রয়োজনই হয় না। উপদেশের প্রয়োজনই হয়—শ্রদ্ধাহীন বহির্ম্মুখ জনের নিমিত্ত। শাস্ত্রাদিতে এবং মহাজনদের আচরণেও তাহার অনুকূল প্রমাণ পাওয়া যায়। "সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদঃ" ইত্যাদি শ্রীভা, ৩।২৫।২৪ শ্লোকে দেখা যায় সাধুদের মুখে ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে শ্রোতার শ্রদ্ধাদি জন্মে; ইহা হইতে বুঝা যায়—পূর্ব্বে এই শ্রোতার শ্রদ্ধা ছিল না; সাধুদের মুখে হরিকথা শুনিয়া তাহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে; এই শ্রোতা শ্রদ্ধাহীন বলিয়া সাধুগণ তাহাকে হরিকথা শুনাইতে ক্ষান্ত হন নাই, প্রসঙ্গক্রমে উপদেশ দিতেও বিরত হন নাই। আবার মায়াপিশাচীর কবলে কবলিত বহির্ম্মুখ জীব-সম্বন্ধেও শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—'ভ্রমিতে ভ্রমিতে যদি সাধু বৈদ্য পায়। তার উপদেশ-মন্ত্রে পিশাচী পালায়॥ শ্রীচৈ,চ, ১।২২।১২-১৩॥" এস্থলেও শ্রদ্ধাহীন বহির্ম্মুখ জীবের প্রতি সাধুদের উপদেশের কথা জানিতে পারা যায়। আবার, শ্রীমন্নিত্যানন্দাদি যাহাকে-তাহাকে হরিনাম উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া—"যে না লয় তারে লওয়ায় দন্তে তৃণ ধরি"—এইভাবেও সকলকে হরিনাম দিয়াছেন বলিয়াও—শুনা যায়। নবদ্বীপের মুসলমান কাজির তো নামের প্রতি, কি হিন্দুধর্ম্মের প্রতিও শ্রদ্ধা ছিল না; তিনি নামকীর্ত্তনের সহায় খোল পর্য্যন্তও ভাঙ্গিয়া দিয়াছিলেন; কিন্তু স্বয়ং মহাপ্রভুই তাঁহাকে "হরি" বলার উপদেশ দিয়াছিলেন। এসমস্ত প্রমাণ হইতে দেখা যায়—শ্রদ্ধাহীনকে বা বহির্ম্মুখকে উপদেশ দেওয়া অপরাধজনক নহে; তথাপি উক্ত তালিকায় শ্রদ্ধাহীনকে নামোপদেশ দেওয়া অপরাধজনক বলা হইয়াছে; ইহাও এক সমস্যা। কেহ হয়তো বলিতে পারেন—শ্রদ্ধাহীন জনকে নামদীক্ষা দিবে না—ইহাই উক্ত বাক্যের তাৎপর্য্য। তাহাও হইতে পারে না; কারণ, নামে দীক্ষার প্রয়েজন নাই, পুরশ্চর্য্যাদির প্রয়োজন নাই—শ্রীমন্ মহাপ্রভুই তাহা বলিয়া গিয়াছেন (শ্রীচৈ,চ, ২।১৫।১০৯)।

আরও একটী কথা। উল্লিখিত তালিকার ৬ষ্ঠ অপরাধটী—প্রকারান্তরে হরিনামের অর্থ কল্পনা করা, ইহাও—৫ম অপরাধেরই—নামে অর্থবাদ কল্পনারই—অন্তর্ভুক্ত; ইহা স্বতন্ত্র একটী অপরাধ নহে; যে ব্যক্তি নামে অর্থবাদ কল্পনা করিতে চায় না, সে কখনও প্রকারান্তরে নামের অর্থ করিতেও চাহিবে না; অর্থবাদেরই আনুষঙ্গিক ফল অর্থান্তর-কল্পনা।

যাহা হউক, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পদ্মপুরাণ হইতে উদ্ধৃত প্রমাণ-বচন দেখিবার নিমিত্ত শ্রীজীবগোস্বামী ভক্তি-রসামৃতের টীকায় উপদেশ দিয়া গিয়াছেন; এসমস্ত প্রমাণবচনের প্রতি দৃষ্টি করিলে এবং শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর টীকানুসারে তাহাদের অর্থোপলব্ধি করার চেষ্টা করিলে উক্ত কয়টী সমস্যারই সমাধান হইয়া যায়। শ্রীপাদসনাতন-গোস্বামীর টীকাসম্মত অর্থে যে দশটী নামাপরাধ পাওয়া যায়, তাহাদের প্রত্যেকটীই যুক্তিসঙ্গত এবং চেষ্টা করিলে প্রত্যেকটীকেই "বিদূরে বর্জ্জন" করা যায়। শ্রীপাদসনাতনের টীকাসম্মত দশটী অপরাধ এই ঃ—

নামাপরাধ—

নামাপরাধ **দশটী**; যথা (১) সাধুনিন্দা বা সজ্জনদিগের দুর্নাম রটনা। (২) শ্রীশিব ও বিষ্ণুর নাম-রূপ-লীলাদিকে ভিন্ন মনে করা। (শ্রীশিব শ্রীবিষ্ণুরই অবতারবিশেষ; তিনি স্বতন্ত্র ঈশ্বর নহেন; তাই, শ্রীবিষ্ণু হইতে তাঁহাকে পৃথক্ স্বতন্ত্র ঈশ্বর মনে করিয়া বিষ্ণুনামাদি হইতে শিবের নামাদিকে ভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়)। * (৩) শ্রীগুরুদেবের অবজ্ঞা। (৪) বেদাদি-শাস্ত্রের নিন্দা। (৫) হরিনামে অর্থবাদ কল্পনা করা; (অর্থাৎ "নামের যেসকল শক্তির কথা শাস্ত্রে উল্লিখিত হইয়াছে, সে সকল শক্তি বস্তুতঃ নামের নাই; পরন্তু সেই সকল প্রশংসা-সূচক অতিরঞ্জিত বাক্যমাত্র"—এইরূপ মনে করা)। (৬) নামের বলে পাপে প্রবৃত্তি (অর্থাৎ কোনও পাপ-কর্ম্ম করিবার সময়ে—"একবার হরিনাম করিলে—এমন কি নামাভাসেও—যখন তৎক্ষণাৎ সমস্ত পাপ দূরীভূত হইয়া যায় বলিয়া শাস্ত্রে লিখিত আছে, তখন, আমি এই পাপকর্ম্মটী করিতে পারি; পরে না হয় একবার কি বহুবার হরিনাম করিব; তাহা হইলেই তো আমার এই কর্ম্মজনিত পাপ দূর হইবে।"—এইরূপ মনে করিয়া—নাম গ্রহণ করিলেই কৃতকর্ম্মের পাপ হইতে অব্যাহতি পাইতে পারিবে--এই ভরসায় কোনও পাপকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলে নামাপরাধ হইবে)। বহুকালযাবৎ যমযাতনা ভোগ করিলেও, অথবা যম-নিয়মাদির অনুষ্ঠানেও এইরূপ লোকের শুদ্ধি ঘটে না; "নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধির্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮৪॥" (৭) ধর্ম্ম, ব্রত, ত্যাগ, হোমাদি শুভকর্ম্মাদির ফলের সহিত শ্রীহরিনামের ফলকে সমান মনে করা (ইহাতে নামের মাহাত্ম্যকে খর্ব্ব করা হয় বলিয়াই বোধ হয় ইহাতে অপরাধ হইয়া থাকে)। (৮) নামশ্রবণে বা নামগ্রহণে অনবধানতা বা চেষ্টাশূন্যতা। "ধর্ম্মব্রত-ত্যাগহুতাদি-সর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি প্রমাদঃ। হ, ভ, বি, ১১।২৮৫॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"যদ্বা ধর্ম্মাদি-শুভ-ক্রিয়া-সাম্যমেকোঽপরাধঃ। প্রমাদঃ নাম্ন্যনবধান-তাপ্যেকঃ। এবমত্রাপরাধদ্বয়ম্।" (অনবধানতাতে উপেক্ষা প্রকাশ পাইতেছে)। (৯) নাম-মাহাত্ম্য-শ্রবণ করিয়াও নামগ্রহণ-বিষয়ে প্রাধান্য না দিয়া, আমি-আমার-ইত্যাদি জ্ঞানে বিষয়-ভোগাদিতেই প্রাধান্য দেওয়া। "নাম্নি প্রীতিঃ শ্রদ্ধা ভক্তির্বা তয়া রহিতঃ সন্, যঃ অহং-মমাদি-পরমঃ, অহন্তা মমতা চ আদিশব্দেন বিষয়ভোগাদিকং চৈব পরমং প্রধানম্, ন তু নামগ্রহণং যস্য তথাভূতঃ স্যাৎ সোঽপ্যপরাধকৃৎ। হ, ভ, বি, ১১।২৮৬ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী।" [শেষোক্ত দুই রকমের অপরাধের পার্থক্য এই যে, ৮ম রকমের নামাপরাধে নামের প্রতি উপেক্ষা প্রকাশ পাইতেছে, সম্যক্‌রূপে চেষ্টাশূন্যতা প্রকাশ পাইতেছে; কিন্তু ৯ম রকমের নামাপরাধে উপেক্ষা বা সম্যক্ চেষ্টশূন্যতা নাই; নামগ্রহণ করা হয় বটে; কিন্তু নামে প্রীতির অভাববশতঃ নামগ্রহণে

---

* শ্রীশিব বিষ্ণুতত্ত্ব-শ্রীকৃষ্ণেরই এক প্রকাশ বলিয়া শ্রীশিবের নাম-গুণ-লীলাদিও বস্তুতঃ শিবরূপে শ্রীকৃষ্ণেরই নাম-গুণ-লীলাদিই।

প্রাধান্য দেওয়া হয় না। ৮ম রকমের অপরাধে নামগ্রহণে যেন প্রবৃত্তিরই অভাব ; ৯ম রকমে নাম গ্রহণ-বিষয়ে প্রাধান্য-দানের প্রবৃত্তির অভাব। উভয় রকমের মধ্যেই পূর্ব্বাপরাধ সূচিত হইতেছে, আবার নূতন অপরাধের কথাও বলা হইয়াছে। পূর্ব্বাপরাধের ফলে—৮ম রকমে নাম-গ্রহণাদিতে অবধানতা জন্মে না, গ্রহণের চেষ্টা না করাতেও নূতন করিয়া অপরাধ হইয়া থাকে ; আর ৯ম রকমে, পূর্ব্বাপরাধের ফলে নামগ্রহণাদি-বিষয়ে প্রাধান্য দেওয়ার প্রবৃত্তি হয় না এবং নামগ্রহণাদি বিষয়ে প্রাধান্য না দেওয়াতে আবার নূতন করিয়া অপরাধ হইয়া থাকে]। (১০) যে শ্রদ্ধাহীন, বিমুখ এবং যে উপদেশাদি শুনে না অর্থাৎ গ্রাহ্য করে না, তাহাকে উপদেশ দেওয়া। "অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ হ, ভ, বি, ১১।২৮৫।" [এইরূপ অপরাধকে শিব-নামাপরাধ বলা হইয়াছে ; শ্রীবিষ্ণুতে ও শ্রীশিবে স্বরূপতঃ অভেদ বলিয়া শিবনামাপরাধ-শব্দে এস্থলে ভগবন্নামাপরাধই বুঝাইতেছে এস্থলে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস—শ্রদ্ধাহীন জনকে নামোপদেশ করিলে অপরাধ হইবে—একথা বলেন নাই; বলা হইয়াছে—"অশ্রদ্দধানে (শ্রদ্ধাহীনে) বিমুখে অপি (এবং বিমুখ হইলেও) অশৃণ্বতি (যে উপদেশ শুনে না, গ্রাহ্য করে না, তাহাকে) যশ্চ উপদেশঃ (যে উপদেশ), তাহা অপরাধজনক। "অপি" এবং "অশৃণ্বতি" এই দুইটি শব্দের উপরই সমস্ত তাৎপর্য্য নির্ভর করিতেছে। অপি-শব্দের সার্থকতা এই যে—শ্রদ্ধাহীন এবং বিমুখ জনকে তো উপদেশ দেওয়াই যায় ; কিন্তু কোনও লোক শ্রদ্ধাহীন এবং বিমুখ হইলেও তাহাকে উপদেশ দিবে না—যদি সেইব্যক্তি উপদেশ না শুনে—গ্রাহ্য না করে, উপেক্ষা করে (অশৃণ্বতি)। অশৃণ্বতি-শব্দ হইতে ইহাও সূচিত হইতেছে যে,—দু'এক বার তাহাকে উপদেশ দিবে (নতুবা, সে উপদেশ শুনে কি না, গ্রাহ্য করে কি না, তাহাই বা জানিবে কিরূপে ? দু'একবার উপদেশ দিয়াও), যখন দেখিবে— সে উপদেশ গ্রাহ্য করে না, তাহা হইলে আর তাহাকে উপদেশ দিবে না—দিলে অপরাধ হইবে। এস্থলে অপরাধের হেতু এই যে—যে গ্রাহ্যই করে না, তাহাকে নামোপদেশ দিতে গেলে সে ব্যক্তি নামের অবজ্ঞা—অবমাননা. অমর্য্যদা—করিবে , উপদেষ্টাকেই এইরূপ অবজ্ঞাদির অপরাধ স্পর্শ করিবে। কারণ, উপদেষ্টাই ইহার নিমিত্ত ; তিনি উপদেশ না করিলে অবজ্ঞাদির অবকাশ হইত না]।

নামাপরাধের প্রমাণবচনগুলিও এস্থলে প্রদত্ত হইতেছে। (১) সতাং নিন্দা নাম্নঃ পরম-মপরাধং বিতনুতে যতঃ খ্যাতিং যাতঃ কথমু সহতে তদ্বিগরিহাম্। (২) শিবস্য শ্রীবিষ্ণোর্য ইহ গুণনামাদিকমলং ধিয়া ভিন্নং পশ্যেৎ স খলু হরিনামাহিতকরঃ॥ (৩) গুরোরবজ্ঞা (৪) শ্রুতিশাস্ত্র-নিন্দনং (৫) তথার্থবাদো হরিনাম্নি কল্পনম্। (৬) নাম্নো বলাদ্ যস্য হি পাপবুদ্ধি র্ন বিদ্যতে তস্য যমৈর্হি শুদ্ধিঃ॥ (৭) ধর্ম্মব্রতত্যাগহুতাদিসর্ব্বশুভক্রিয়াসাম্যমপি (৮) প্রমাদঃ। (৯) অশ্রদ্দধানে বিমুখেঽপ্যশৃণ্বতি যশ্চোপদেশঃ শিবনামাপরাধঃ॥ (১০) শ্রুতেঽপি নামমাহাত্ম্যে যঃ প্রীতিরহিতো-ঽধমঃ। অহং-মমাদি-পরমো নাম্নি সোঽপ্যপরাধকৃৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮২-৮৬ ধৃত পাদ্মবচন।

নামাপরাধ ক্ষালনের উপায়

যাহাহউক, যদি কোনওপ্রকার অনবধানতাবশতঃ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বদা নামসঙ্কীর্ত্তন করিয়া নামের শরণাপন্ন হওয়াই উচিত। "জাতে নামাপরাধেহপি প্রমাদেন কথঞ্চন। সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮৭॥" কেহ কেহ বলেন, কোনও সাধুর নিন্দাজনিত অপরাধ হইলে তাঁহার স্তুতি করা এবং তাঁহার কৃপালাভের চেষ্টা করাও উচিত। শিবের পৃথক্ ঈশ্বরত্ব-জ্ঞানজনিত অপরাধ হইলে, শাস্ত্রের বা শাস্ত্রজ্ঞ-সাধুর উপদেশ অনুসারে তদ্রূপ বুদ্ধিও ত্যাগ করিবে। শ্রীগুরুর নিকটে অপরাধ-স্থলে তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া তাঁহাকে প্রসন্ন করিতেও হইবে। শাস্ত্র-নিন্দাজনিত অপরাধ হইলে, ঐ নিন্দিত শাস্ত্রের বার বার প্রশংসাও করিবে।

ঙ। বৈষ্ণবাপরাধ

পূর্ব্বোল্লিখিত দশটী নামাপরাধের মধ্যে সর্ব্বপ্রথমটী—সাধুনিন্দা। ইহাও বৈষ্ণবাপরাধের মধ্যে পরিগণিত। বৈষ্ণবাপরাধ অত্যন্ত গুরুতর বলিয়া এ-স্থলে এ-সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা হইতেছে।

কোনও ভগবদ্ভক্তের বা বৈষ্ণবের নিকটে যে অপরাধ, কোনও বৈষ্ণব-সম্বন্ধে যে অবাঞ্ছনীয় আচরণ, তাহাই বৈষ্ণবাপরাধ।

স্কন্দপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—

"যো হি ভাগবতং লোকমুপহাসং নৃপোত্তম। করোতি তস্য নশ্যন্তি অর্থধর্ম্মযশঃসুতাঃ॥

—হ, ভ, বি, ১০।২৩৮ ধৃত প্রমাণ।

—(স্কন্দপুরাণে মার্কণ্ডেয়-ভগীরথ-সংবাদে লিখিত আছে) হে রাজেন্দ্র! ভগবদ্ভক্তের প্রতি উপহাস করিলে ধর্ম্ম, অর্থ, কীর্ত্তি এবং সন্তান বিনাশ প্রাপ্ত হয়।"

"হন্তি নিন্দতি বৈ দ্বেষ্টি বৈষ্ণবান্নাভিনন্দতি। ক্রুধ্যতে যাতি নো হর্ষং দর্শনে পতনানি ষট্॥

—হ, ভ, বি, ২।২৩৯-ধৃত স্কান্দপ্রমাণ।

—কোনও বৈষ্ণবকে প্রহার করিলে, নিন্দা করিলে, দ্বেষ করিলে, অভিনন্দন না করিলে (অর্থাৎ অনাদর করিলে), বৈষ্ণবের প্রতি ক্রোধ প্রকাশ করিলে, কিম্বা বৈষ্ণবদর্শনে হর্ষ প্রকাশ না করিলে পতন হয় (অর্থাৎ অপরাধ হয়)।"

বৈষ্ণবে জাতিবুদ্ধিও অপরাধজনক

শূদ্রং বা ভগবদ্ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥

—হ, ভ, বি, ১০।৮৬ ধৃত ইতিহাসসমুচ্চয়-প্রমাণ।

—শূদ্র, নিষাদ (চণ্ডাল), বা শ্বপচ হইলেও ভগবদ্ভক্তকে সামান্যজাতিজ্ঞানে নীচ বলিয়া দর্শন করিবে না। বৈষ্ণবকে সামান্যজাতিরূপে দর্শন করিলে নরকে গমন করিতে হয়, ইহাতে সন্দেহ নাই।"

কেননা,

"ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়ো বৈশ্যঃ শূদ্রো বা যদিবেতরঃ। বিষ্ণুভক্তিসমাযুক্তো জ্ঞেয়ঃ সর্ব্বোত্তমোত্তমঃ॥

—হ, ভ, বি, ১০।৭৮ ধৃত স্কন্দপুরাণ কাশীখণ্ড-প্রমাণ।

—হরিভক্তিমান্ হইলে কি বিপ্র, কি ক্ষত্রিয়, কি বৈশ্য, কি শূদ্র, কিম্বা অপর কোনও জাতিই হউক না কেন, সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকেন।"

"স্মৃতঃ সম্ভাষিতো বাপি পূজিতো বা দ্বিজোত্তমাঃ। পুনাতি ভগবদ্ভক্তশ্চাণ্ডালোপি যদৃচ্ছয়া॥

—হ, ভ, বি, ১০।৮৯ ধৃত ইতিহাসসমুচ্চয়ে নারদপুণ্ডরীক-সংবাদে॥

—হে দ্বিজোত্তমগণ! ভগবদ্ভক্ত ব্যক্তি চণ্ডাল হইলেও তাঁহাকে স্মরণ করিলে, তাঁহার সহিত সম্ভাষণ করিলে, কিম্বা তাঁহার পূজা করিলে পবিত্রতা লাভ করা যায়।"

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—জাতিবুদ্ধিবশতঃ, বা অন্য কোনও কারণবশতঃ কোনও বৈষ্ণবের প্রতি বৈষ্ণবোচিত সম্মান প্রদর্শিত না হইলে অপরাধ হইয়া থাকে।

(১) বৈষ্ণবাপরাধের সাংঘাতিক কুফল

শ্রীমন্মহাপ্রভু প্রয়াগে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে বৈষ্ণবাপরাধের সাংঘাতিক কুফলের কথা বর্ণন করিয়াছেন। তিনি ভক্তিকে একটী কোমলাঙ্গী লতার সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন, যাহা ক্ষুদ্র কোনও জীব—এমন কি মূষিকও—উৎপাটিত বা ছিন্ন করিতে পারে। আর, বৈষ্ণবাপরাধকে তিনি মত্ত হস্তীর সঙ্গে তুলনা করিয়াছেন। মত্ত হস্তী যেমন অনায়াসেই কোমলাঙ্গী লতাকে উৎপাটিত বা ছিন্ন করিতে পারে, তদ্রূপ বৈষ্ণবাপরাধও ভক্তিকে সমূলে উৎপাটিত করিতে পারে।

"যদি বৈষ্ণব-অপরাধ উঠে হাথী মাতা। উপাড়ে বা ছিণ্ডে, তার শুকি যায় পাতা॥
তাতে মালী যত্ন করি করে আবরণ। অপরাধ-হস্তী যৈছে না হয় উদ্গম॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৩৮-৯॥

[হাথী মাতা—মত্ত হস্তী; মালী—ভক্তিলতার পোষক সাধক।]

(২) ভক্তিলতার উপশাখা

শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু ভক্তিলতার উপশাখার কথাও বলিয়াছেন।

"কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি-ভুক্তি-বাঞ্ছা যত—অসঙ্খ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটীনাটি জীবহিংসন। লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাড়ি যায়। স্তব্ধ হঞা মূল শাখা বাড়িতে না পায়॥
প্রথমেই উপশাখার করিয়েছেদন। তবে মূল শাখা বাড়ি যায় বৃন্দাবন॥ শ্রীচৈ,চ ২।১৯।১৪০-৪৩॥"

শাখা হইতে যে শাখা নির্গত হয়, তাহাকেই সাধারণতঃ উপশাখা বলে; এই উপশাখা মূল বৃক্ষের বা লতারই অঙ্গ; ইহার পুষ্টিতে মূল বৃক্ষের বা লতারই পুষ্টি সাধিত হয়। উল্লিখিত পয়ারসমূহে ভক্তিলতার উপশাখা বলিতে এইরূপ শাখার শাখাকে লক্ষ্য করা হয় নাই; কারণ, তাহা হইলে উপশাখার পুষ্টিতে মূল-লতার পুষ্টি স্থগিত হইত না, মূল-লতা শুকাইয়া যাইত না। কোনও

কোনও গাছের শাখাদির উপরে আর এক রকম লতাজাতীয় গাছ দেখিতে পাওয়া যায় ; ইহাকে সাধারণতঃ পরগাছা বলে। এই পরগাছা মূল গাছ হইতে রস আকর্ষণ করিয়া নিজের পুষ্টিসাধন করে, তাতে রসাভাবে মূল গাছের অনিষ্ট হয়, মূল গাছের যে শাখায় পরগাছা জন্মে, সেই শাখাটী শুকাইয়া যায়। এ-স্থলে ভক্তিলতার উপশাখা বলিতে এই জাতীয় আগন্তুক পরগাছার কথাই বলা হইয়াছে।

ভক্তিলতার এই উপশাখা কি ? তাহার কথাও বলা হইয়াছে। ভুক্তি-মুক্তি-বাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটী, জীবহিংসা, লাভ, প্রতিষ্ঠা-ইত্যাদি হইতেছে ভক্তিলতার উপশাখা।

ভুক্তি-বাসনা—নানারকমের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য ভোগের বাসনা। মুক্তিবাসনা—পরকালে মোক্ষ-বাসনা ; ইহা ভক্তিবিরোধী ; অথবা, ইহকালেই কোনও বিপদ হইতে উদ্ধার লাভের বাসনা। কুটিনাটী—কুটিলতা, স্বার্থসিদ্ধির জন্য অসরল ব্যবহার। লাভ—অর্থাদি লাভের বাসনা। প্রতিষ্ঠা—মান-সম্মান-প্রসার-প্রতিপত্তি লাভের বাসনা।

এগুলিকে ভক্তিলতার উপশাখা বা পরগাছা বলার হেতু এই :—শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে দুর্ভাগ্যবশতঃ সাধকের মনে যদি আত্মসুখ-বাসনা, বা দারিদ্র্যাদি-দুঃখনিবৃত্তির বাসনা জাগ্রত হয়, তাহা হইলে তিনি তাঁহার সাধনাঙ্গকে উপলক্ষ্য করিয়াই, সাধনাঙ্গকে জীবিকা-নির্ব্বাহের পণ্যরূপে পরিণত করিয়াই, তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ করিতে প্রয়াসী হইতে পারেন। ভগবানের নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির কীর্ত্তনরূপ ভজনাঙ্গের সহায়তাতেই যদি তিনি অপরের নিকট হইতে নিজের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য, মান-সম্মান-প্রসার-পতিপত্তি-আদি, প্রয়োজনীয় অর্থাদি আদায় করিতে চাহেন এবং সেই উদ্দেশ্যে তিনি যদি কুটিলতাদির আশ্রয় গ্রহণ করেন, অর্থাদির লোভে অপরের পীড়নাদি করেন, তাহা হইলেই এ-সমস্ত হইবে তাঁহার ভক্তিলতার পক্ষে উপশাখা বা পরগাছা। এই অবস্থায় তিনি শ্রবণকীর্ত্তনাদি যে সকল ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন, তাহার ফলে এই উপশাখাই পুষ্টি লাভ করিবে, ভক্তিপথে তিনি অগ্রসর হইতে পারিবেন না। সাধন করিতে করিতে যদি তাঁহার চিত্তে শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনার পরিবর্ত্তে মোক্ষবাসনা জাগে, তাহা হইলেও সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে মোক্ষবাসনাই বর্দ্ধিত হইবে, ভগবৎ-সেবাবাসনা অন্তর্হিত হইয়া যাইবে। এজন্যই বলা হইয়াছে—"প্রথমেই উপশাখার করিয়ে ছেদন। তবে মূল শাখা বাঢ়ি যায় বৃন্দাবন ॥" পরবর্ত্তী ৫।১১০-১৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

চ। ভগবদপরাধ

ভগবৎ-সম্বন্ধী অপরাধকে ভগবদপরাধ বলে। ভগবানের প্রতি অবজ্ঞা, ভগবদ্‌বিগ্রহকে প্রাকৃত বা মায়াময় মনে করা, নরলীল ভগবান্‌কে মানুষ মনে করা-ইত্যাদি হইতেছে ভগবদপরাধ।

মায়াবাদীরা শ্রীকৃষ্ণকে মায়াময় বলেন। ইহা ভগবদপরাধ।

"প্রভু কহে—মায়াবাদী কৃষ্ণ-অপরাধী ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১৭।১২৫॥"

যদি অচিন্ত্যমহাশক্তিসম্পন্ন শ্রীভগবানে অপরাধ হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হয়েন।

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্। যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥
—বাসনাভাষ্যধৃত-পরিশিষ্ট বচনম্॥"

৩৯। বৈষ্ণব ব্রত পালন

বৈষ্ণব সাধকের পক্ষে শাস্ত্রবিহিত বৈষ্ণব-ব্রতসমূহ অবশ্য-পালনীয়। একাদশী বা হরিবাসর-ব্রত, জন্মাষ্টমী, রামনবমী, নৃসিংহচতুর্দ্দশী, শিবচতুর্দ্দশী প্রভৃতি হইতেছে বৈষ্ণব-ব্রত।

চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের স্ত্রীলোক এবং পুরুষ, সকলের পক্ষেই একাদশীব্রত কর্ত্তব্য। "ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়বিশাং শূদ্রাণাঞ্চৈব যোষিতাম্। মোক্ষদং কুর্ব্বতাং ভক্ত্যা বিষ্ণোঃ প্রিয়তরং দ্বিজাঃ॥ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ১২।৬-ধৃত বৃহন্নারদীয়-বাক্য।" "ব্রহ্মচারী গৃহস্থো বা বানপ্রস্থোঽথবা যতিঃ। একাদশ্যাং হি ভুঞ্জানো ভুঙ্‌ক্তে গোমাংসমেব হি॥ হ, ভ, বি, ১২।১৫ ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন॥" "সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ স্বজনৈর্ভক্তিসংযুতঃ। একাদশ্যামুপবসেৎ পক্ষয়োরুভয়োরপি॥ হ, ভ, বি, ১২।১৯-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন॥"

পূর্ব্বোদ্ধৃত "সপুত্রশ্চ সভার্য্যশ্চ"-ইত্যাদি প্রমাণ হইতে জানা যায়, শুক্লপক্ষীয়া এবং কৃষ্ণপক্ষীয়া—এই উভয় একাদশীই অবশ্য-পালনীয়া এবং "সভার্য্যশ্চ"-শব্দ হইতে জানা যায়—সধবা নারীর পক্ষেও একাদশীব্রত অবশ্য-পালনীয়।

একটী স্মৃতিবাক্য আছে—"পত্যৌ জীবতি যা নারী উপবাসব্রতঞ্চরেৎ। আয়ুঃ সা হরতি ভর্ত্তুর্নরকঞ্চৈব গচ্ছতি॥—পতির জীবিতাবস্থায় যে নারী উপবাস-ব্রতের আচরণ করে, সে তাহার স্বামীর আয়ু হরণ করে এবং নরকেও গমন করে।" এই বাক্যটীর উল্লেখ করিয়া কেহ কেহ সধবা নারীর পক্ষে একাদশীর উপবাসও নিষিদ্ধ বলিয়া মত প্রকাশ করেন। কিন্তু "সভার্য্যশ্চ"-ইত্যাদি বাক্যে যখন সস্ত্রীক একাদশীব্রত-পালনের বিধি দেওয়া হইয়াছে, এবং পূর্ব্বোদ্ধৃত "ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়বিশাম্"-ইত্যাদি বাক্যেও "যোষিতাম্"-শব্দে সধবা-বিধবা সকল স্ত্রীলোকের পক্ষেই সেই বিধান দেওয়া হইয়াছে, তখন সধবার পক্ষে একাদশীব্রত নিষিদ্ধ হইতে পারে না; নিষিদ্ধ বলিয়া মনে করিলে শাস্ত্রবাক্য লঙ্ঘিত হয়। তবে এই বিষয়ে সুধী পণ্ডিতগণ এইরূপ সমাধান করেন যে, সধবার পক্ষে একাদশী প্রভৃতি বৈষ্ণব-ব্রত ব্যতীত অন্য ব্রতোপবাসই নিষিদ্ধ, একাদশীব্রত নিষিদ্ধ নহে। কেননা, একাদশীব্রত নিত্য বলিয়া সকলের পক্ষেই পালনীয়। "অত্র ব্রতস্য

নিত্যত্বাদবশ্যং তৎ সমাচরেৎ॥ হ, ভ, বি, ১২।৩॥” স্ত্রীলোকেরা নানাবিধ কাম্যবস্তু লাভের আশায় নানাবিধ অন্যব্রত করিয়া থাকেন। এ-সমস্ত ব্রতের নিত্যত্ব নাই; করণে ফল পাওয়া যাইতে পারে; কিন্তু অকরণে কোনও দোষ নাই। সুতরাং অন্যব্রতের অকরণে দোষ নাই।

ব্রতের নিত্যত্বের চারিটী লক্ষণ আছে।—ভগবানের সন্তোষবিধান, শাস্ত্রোক্ত-বিধি-প্রাপ্তি, ভোজনের নিষিদ্ধতা এবং ব্রতের অকরণে প্রত্যবায়। “তচ্চ কৃষ্ণপ্রীণনত্বাদ্বিধিপ্রাপ্তত্বতস্তথা। ভোজনস্য নিষেধাচ্চাকরণে প্রত্যবায়ঃ॥ হ, ভ, বি, ১২।৪॥” একাদশীব্রতের এই চারিটী লক্ষণ আছে বলিয়া সকলেরই পালনীয়। সমস্ত বৈষ্ণবব্রতেরই এতাদৃশ নিত্যত্ব আছে।

একাদশীকে শ্রীহরিবাসর (শ্রীহরির দিন) বলে; এই ব্রত পালন করিলে শ্রীহরি অত্যন্ত প্রীত হয়েন। মহাপ্রসাদ-ভোজী বৈষ্ণবের পক্ষেও এই দিনে মহাপ্রসাদ-গ্রহণ নিষেধ; একাদশীতে উপবাসের ব্যবস্থা সকলের জন্যই; বৈষ্ণব তো কোনও সময়েই মহাপ্রসাদব্যতীত অপর কিছু আহার করেন না; সুতরাং বৈষ্ণবের উপবাস অর্থই মহাপ্রসাদত্যাগ—“বৈষ্ণবো যদি ভুঞ্জীত একাদশ্যাং প্রমাদতঃ। বিষ্ণ্বর্চ্চনং বৃথা তস্য নরকং ঘোরমাপ্নুয়াদিতি। ** অত্র বৈষ্ণবানাং নিরাহারত্বং নাম মহাপ্রসাদান্নপরিত্যাগ এব। ভক্তিসন্দর্ভঃ। ২৯৯॥” শ্রীভগবানের প্রীত্যর্থে শ্রীমহাপ্রসাদ-ত্যাগে দোষ হয় না, মহাপ্রসাদের অবমাননাও হয় না।

হরিবাসর বলিতে সমস্ত বৈষ্ণব-ব্রতকে বুঝাইলেও রূঢ়ী অর্থে একাদশীব্রতকেই বুঝায়।

বৈষ্ণব-ব্রতে পূর্ব্ববিদ্ধা ত্যাগ করিতে হয়। তিথি-নক্ষত্রাদির সংযোগে আটটী মহাদ্বাদশীও আছে। মহাদ্বাদশী হইলে শুদ্ধা (উপবাসযোগ্যা) একাদশীতে উপবাসী না থাকিয়া মহাদ্বাদশীতেই উপবাস করিতে হয় *

৪০। মালা-তিলকাদি বৈষ্ণবচিহ্নধারণ

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে মালাতিলকাদি ধারণের নিত্যত্বের কথা শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ পূর্ব্বক লিখিত হইয়াছে।

ক। মালাধারণ

মালাসম্বন্ধে বলা হইয়াছে, “ধারয়েত্তুলসীকাষ্ঠভূষণানি চ বৈষ্ণবঃ॥ হ, ভ, বি, ৪।১৮॥—বৈষ্ণব তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিত ভূষণ ধারণ করিবেন।”

সে-স্থলেই স্কন্দপুরাণের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে—

“সন্নিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্।

---

* বৈষ্ণবব্রত-সম্বন্ধে যাঁহারা বিশেষ বিবরণ জানিতে ইচ্ছুক তাঁহারা শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস, অথবা লেখকসম্পাদিত গৌরকৃপাতরঙ্গিনী-টীকাসম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত তৃতীয় সংস্করণের ২।২৪।২৫৩-৫৪-পয়ারের টীকা দেখিতে পারেন

মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ ॥ হ, ভ, বি, ৪।১১৮ ॥

—যিনি তুলসীকাষ্ঠবিরচিত মালা হরিকে অর্পণ করিয়া পরে নিজে ধারণ করেন, তিনি নিশ্চয়ই ভাগবতোত্তম।”

গরুড়পুরাণের প্রমাণও উল্লিখিত হইয়াছে,

“ধারয়ন্তি ন যে মালাং হৈতুকাঃ পাপবুদ্ধয়ঃ।
নরকান্ন নিবর্ত্তন্তে দগ্ধাঃ কোপাগ্নিনা হরেঃ॥ হ, ভ, বি, ৪।১২০ ॥

—যে সমস্ত হেতুবাদপরায়ণ পাপমতি মানব মালা ধারণ করে না, তাহারা হরিকোপানলে দগ্ধীভূত হয় এবং নরক হইতে আর প্রত্যাবর্ত্তন করে না।”

(১) মালাধারণের মাহাত্ম্য

“নির্ম্মাল্যতুলসীমালাযুক্তো যশ্চার্চ্চয়েদ্ধরিম্। যদ্ যৎ করোতি তৎসর্ব্বমনন্তফলদং ভবেৎ॥
—হ, ভ, বি, ৪।১২২-ধৃত অগস্ত্যসংহিতাবচন।

—শ্রীহরিতে নিবেদিত তুলসীমালা ধারণ করিয়া যিনি ভগবানের অর্চ্চনা করেন এবং অপরাপর যে সমস্ত ক্রিয়ার অনুষ্ঠান করেন, তৎসমস্তই অনন্তফলপ্রদ হয়।”

“তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ। অপ্যশৌচোঽনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ॥
—হ, ভ, বি, ৪।১২৫-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন॥

—শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন, যিনি তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতা মালা কণ্ঠে বহন করেন, অপবিত্র বা আচারভ্রষ্ট হইলেও তিনি অবশ্য আমাকে প্রাপ্ত হইবেন।”

“সদা প্রীতমনাস্তস্য কৃষ্ণো দেবকীনন্দনঃ।
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ॥
—হ. ভ. বি. ৪।১২৮ধৃত গরুড়পুরাণবচন॥

—যিনি তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা ধারণ করেন, দেবকীনন্দন শ্রীকৃষ্ণ সর্ব্বদা তাঁহার প্রতি প্রীতমনা থাকেন।”

এ-সম্বন্ধে বহু শাস্ত্রবাক্য শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত হইয়াছে।

(২) মালার উপকরণ

পদ্মবীজ, রুদ্রাক্ষ, আমলকী ফল, তুলসীপত্র, তুলসীকাষ্ঠ-এই সমস্তের মালাই পুরাণাদি শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। তুলসীপত্রের মালা পুনঃ পুনঃ নূতন করিয়া রচনা না করিলে ব্যবহারের সুবিধা হইতে পারে বলিয়া মনে হয় না। বৈষ্ণবদের মধ্যে তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিত মালারই সর্ব্বত্র প্রচলন। তুলসী ভগবানের অত্যন্ত প্রিয়, অত্যন্ত পবিত্রতাসাধক। শ্রীভগবানে অর্পণ করিয়াই প্রসাদী মালা ব্যবহারের বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

কেবল বৈষ্ণবের পক্ষে নহে, বেদানুগত সকল লোকের পক্ষেই মালাধারণের বিধান শাস্ত্রে বিহিত আছে।

খ। তিলকধারণ

পুরাণপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ললাটাদি দ্বাদশ অঙ্গে তিলকধারণের আবশ্যকতার কথাও বলিয়া গিয়াছেন।

শাস্ত্রে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণেরই বিধি দেওয়া হইয়াছে।

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ললাটে তু সর্ব্বেষাং প্রথমং স্মৃতম্।
ললাটাদিক্রমেণৈব ধারণন্তু বিধীয়তে॥ হ, ভ, বি, ৪.৬৯-ধৃত পাদ্মোত্তরবচন।

—প্রথমে ললাটদেশে ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক রচনার বিধান সর্ব্বজনের পক্ষেই নির্দ্দিষ্ট ; ললাটাদি-ক্রমেই ধারণের বিধি নিরূপিত হইয়াছে।"

"ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ধরেদ্বিপ্রো মৃদা শুভ্রেণ বৈদিকঃ।
ন তির্য্যক্ ধারয়েদ্বিদ্বানাপদ্যপি কদাচন॥ হ, ভ, বি, ৪।৭৪-ধৃত পাদ্মোত্তরবচন॥

—বৈদিক বিপ্র শুভ্র মৃত্তিকাদ্বারা ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। বিদ্বান্ ব্যক্তি আপৎকালেও কখনও তির্য্যক পুণ্ড্র রচনা করিবেন না।"

স্কন্দপুরাণও বলিয়াছেন—মরণকাল উপস্থিত হইলেও তির্য্যক পুণ্ড্র করিবে না। "তির্য্যক্ পুণ্ড্রং ন কুর্ব্বীত সংপ্রাপ্তে মরণেঽপি চ॥ হ, ভ, বি, ৪।৭৫-ধৃত স্কান্দবচন।"

"বৈষ্ণবাণাং ব্রাহ্মণানামূর্দ্ধপুণ্ড্রং বিধীয়তে। অন্যেষান্তু ত্রিপুণ্ড্রং স্যাদিতি ব্রহ্মবিদো বিদুঃ॥
ত্রিপুণ্ড্রং যস্য বিপ্রস্য ঊর্দ্ধপুণ্ড্রং ন দৃশ্যতে। তং স্পৃষ্ট্বাপ্যথবা দৃষ্ট্বা সচেলং স্নানমাচরেৎ॥
ঊর্দ্ধপুণ্ড্রে ন কুর্ব্বীত বৈষ্ণবাণাং ত্রিপুণ্ড্রকম্। কৃতত্রিপুণ্ড্রমর্ত্ত্যস্য ক্রিয়া ন প্রীতয়ে হরেঃ॥

—হ, ভ, বি, ৪।৭৬-ধৃত প্রমাণ॥

—বৈষ্ণব ও ব্রাহ্মণগণ ঊর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবেন, অন্যেরা ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিবেন। বেদবিদ্গণ এইরূপই বলিয়া গিয়াছেন। যে বিপ্রের ললাটে ত্রিপুণ্ড্র দৃষ্ট হয়, কিন্তু ঊর্দ্ধপুণ্ড্র লক্ষিত হয় না, তাঁহার স্পর্শ বা দর্শন করিলে সচেলে স্নান করিবে। বৈষ্ণবেরা ঊর্দ্ধপুণ্ড্রস্থলে ত্রিপুণ্ড্র করিবেন না। যে ব্যক্তি ত্রিপুণ্ড্র ধারণ করিয়া কার্য্য করেন, তাঁহার সেই কর্ম্ম শ্রীহরির প্রীতির হেতু হয় না।"

শ্রুতিতেও ঊর্দ্ধপুণ্ড্র তিলকের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে।

"হরেঃ পদাক্রান্তিমাত্মনি ধারয়তি যঃ স পরস্য প্রিয়ো ভবতি স পুণ্যবান্।
মধ্যে ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রং যো ধারয়তি স মুক্তিভাগ্ ভবতি॥
—হ, ভ, বি, ৪।৮৭-ধৃত যজুর্ব্বেদের হিরণ্যকেশীয়শাখাবাক্য।

—যাঁহার শরীরে হরিপদচিহ্ন বিরাজমান থাকে, তিনি ভগবান্ হরির প্রিয় হয়েন এবং তিনিই পুণ্যবান্। যিনি মধ্যেছিদ্রযুক্ত-উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক ধারণ করেন, তিনি মোক্ষ লাভ করিয়া থাকেন।”

(১) **উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক**

“আরভ্য নাসিকামূলং ললাটান্তং লিখেন্মৃদম্। নাসিকায়াস্ত্রয়ো ভাগা নাসামূলং প্রচক্ষতে॥
সমারভ্য ভ্রুবোর্মূলমন্তরালং প্রকল্পয়েৎ॥—হ, ভ, বি, ৪।৮৫-ধৃত পাদ্মোত্তর-বচন॥

—নাসামূল হইতে আরম্ভ করিয়া ললাটদেশের শেষ পর্য্যন্ত মৃত্তিকা লিখন করিবে। নাসিকার তিন ভাগকেই এ-স্থলে নাসামূল বলা হইয়াছে। ভ্রূযুগলের মূল হইতে আরম্ভ করিয়া (মধ্যে) ছিদ্র রচনা করিবে।”

“নিরন্তরালং যঃ কুর্য্যাদূর্দ্ধপুণ্ড্রং দ্বিজাধমঃ। স হি তত্র স্থিতং বিষ্ণুং লক্ষ্মীঞ্চৈব ব্যপোহতি॥
অচ্ছিদ্রমূর্দ্ধপুণ্ড্রন্তু যে কুর্ব্বন্তি দ্বিজাধমাঃ। তেষাং ললাটে সততং শুনঃ পাদো ন সংশয়ঃ॥
তস্মাচ্ছিদ্রান্বিতং পুণ্ড্রং দণ্ডাকারং সুশোভনম্। বিপ্রাণাং সততং ধার্য্যং স্ত্রীণাঞ্চ শুভদর্শনে॥
—হ, ভ, বি, ৪।৮৬-৮৭-ধৃত পাদ্মোত্তর-বচন॥

—যে দ্বিজাধম মধ্যভাগে ছিদ্র না রাখিয়া উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তিনি তত্রত্য বিষ্ণু ও লক্ষ্মীকে দূরীভূত করিয়া দেন। যে সমস্ত দ্বিজাধম ছিদ্রহীন উর্দ্ধপুণ্ড্র রচনা করেন, তাঁহাদের ললাটদেশে সর্ব্বদা কুক্কুরপদ সংস্থিত থাকে, ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং হে শুভদর্শনে! ব্রাহ্মণগণ এবং স্ত্রীলোকগণ সর্ব্বদা দণ্ডাকার, ছিদ্রবিশিষ্ট, মনোহর পুণ্ড্র ধারণ করিবেন।”

(২) **হরিমন্দির**

সচ্ছিদ্র উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলককে হরিমন্দির বলা হয়।

“নাসাদিকেশপর্য্যন্তমূর্দ্ধপুণ্ড্রং সুশোভনম্। মধ্যে ছিদ্রসমাযুতং তদ্বিদ্যাদ্ধরিমন্দিরম্॥
বামপার্শ্বে স্থিতো ব্রহ্মা দক্ষিণে তু সদাশিবঃ। মধ্যে বিষ্ণুং বিজানীয়াৎ তস্মান্মধ্যং ন লেপয়েৎ॥
—হ, ভ, বি, ৪।৮৭॥

—নাসিকা হইতে আরম্ভ করিয়া কেশপর্যন্ত বিস্তৃত, অতীব সুন্দর এবং মধ্যে ছিদ্রবিশিষ্ট উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলককে হরিমন্দির বলা হয়। উর্দ্ধপুণ্ড্রের বামপার্শ্বে ব্রহ্মা, দক্ষিণপার্শ্বে সদাশিব এবং মধ্যস্থলে বিষ্ণু অধিষ্ঠিত থাকেন ; সুতরাং মধ্যস্থল লেপন করা কর্ত্তব্য নহে।”

(৩) **তিলক-বিধি**

শরীরের দ্বাদশ-স্থানে হরিমন্দিরাখ্য উর্দ্ধপুণ্ড্র তিলক রচনা করিয়া কেশবাদি দ্বাদশ ভগবৎ-স্বরূপের নামোচ্চারণপূর্ব্বক যথাক্রমে ঐ দ্বাদশ তিলক স্পর্শ করিয়া কেশবাদি দ্বাদশ ভগবৎস্বরূপের ধ্যান করিতে হয়। ললাটে কেশব, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, দক্ষিণকুক্ষিতে বিষ্ণু, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, দক্ষিণ স্কন্ধে ত্রিবিক্রম, বামকুক্ষিতে বামন, বামবাহুতে শ্রীধর, বামস্কন্ধে

হৃষীকেশ, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ এবং কটিতে দামোদর-এই-দ্বাদশ স্থানে দ্বাদশ মূর্ত্তির ধ্যান করিবে। হ, ভ, বি ৪ ৬৭-৮-ধৃত পাদ্মোত্তর-প্রমাণ।

এইরূপে হরিমন্দিরাখ্য তিলকে ভগবৎস্বরূপসমূহকে প্রতিষ্ঠিত করিয়া তাঁহাদের ধ্যান করিলে চিত্ত ও দেহ বিশুদ্ধ হইতে পারে, ভগবচ্চরণে আত্মসমর্পণের ভাবও—"এই দেহের সমস্ত অঙ্গ শ্রীভগবানের, কোনও অঙ্গই আমার নহে; সুতরাং ভগবৎসম্বন্ধি কার্য্যব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যে এই দেহের কোনও অঙ্গকে নিয়োজিত করা আমার কর্ত্তব্য নহে"-এইরূপ ভাব—হৃদয়ে স্ফুরিত হইতে পারে।

(৪) **তিলক-মৃত্তিকা**

তীর্থক্ষেত্রের মৃত্তিকাদ্বারা তিলক রচনার বিধানই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। "যত্তু দিব্যং হরিক্ষেত্রং তস্যৈব মৃদমাহরেৎ। হ, ভ, বি, ৪।৮৭ ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।—দিব্য হরিক্ষেত্র হইতেই মৃত্তিকা গ্রহণ করিবে।" তুলসীমূলস্থ মৃত্তিকার কথাও বলা হইয়াছে। তন্মধ্যে গোপীচন্দনের মাহাত্ম্যই বিশেষ-ভাবে পুরাণাদিতে কীর্ত্তিত হইয়াছে।

গ। চক্রাদিচিহ্ন-ধারণ

গোপীচন্দনাদিদ্বারা ভগবন্নামাক্ষর এবং চক্রাদিচিহ্ন-ধারণের মাহাত্ম্যও শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে। শ্রুতিতেও চক্রাদিচিহ্ন-ধারণের মহিমা দৃষ্ট হয়।

ধৃতোর্দ্ধপুণ্ড্রঃ কৃতচক্রধারী বিষ্ণুং পরং ধ্যায়তি যো মহাত্মা।
স্বরেণ মন্ত্রেণ সদা হৃদিস্থিতং পরাৎপরং যন্মহতো মহান্তম্॥

—হ, ভ, বি, ৪।৯৮-ধৃত যজুর্ব্বেদীয় কঠশাখা॥

—যে মহানুভব ব্যক্তি উর্দ্ধপুণ্ড্র এবং চক্রধারণ করিয়া স্বর ও মন্ত্রযোগে হৃদিস্থিত মহৎ হইতেও মহান্ এবং পরাৎপর বিষ্ণুর ধ্যান করেন, (তিনিই ধন্য)।"

"এভির্ব্বয়মুরুক্রমস্য চিহ্নৈরঙ্কিতা লোকে সুভগা ভবেম।
তদ্বিষ্ণোঃ পরমং পদং যে গচ্ছন্তি লাঞ্ছিতাঃ॥ ইত্যাদি॥

—হ, ভ, বি, ৪।৯৮-ধৃত অথর্ব্ববেদবাক্য।

—উরুক্রমের এই সমস্ত চিহ্নদ্বারা অঙ্কিত হইয়া আমরা লোকমধ্যে সৌভাগ্যবান্ হইব। এই সমস্ত-চিহ্নে-চিহ্নিত ব্যক্তিরাই হরির সেই পরমধামে গমন করেন; ইত্যাদি।"

এই সমস্তই ভগবৎ-স্মৃতি-উদ্দীপনের এবং ভগবানে আত্মসমর্পণের অনুকূল।

কেবল বৈষ্ণবের পক্ষে নহে, বেদানুগত সকলের পক্ষেই যে তিলকাদির ধারণ বিহিত, পূর্ব্বোদ্ধৃত শাস্ত্রপ্রমাণসমূহ হইতেই তাহা জানা যায়।

৪১। জ্ঞান-বৈরাগ্যের জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াস ত্যাগ

ভগবত্তত্ত্বাদির জ্ঞান এবং বৈরাগ্য অর্জ্জনের উদ্দেশ্যে স্বতন্ত্র প্রয়াস বৈষ্ণবের পক্ষে বিহিত নহে। এই দুইটী বস্তু সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিলেই এই নিষেধের তাৎপর্য্য বুঝা যাইবে। জ্ঞান ও বৈরাগ্য বলিতে কি বুঝায়, তাহাই প্রথমে আলোচিত হইতেছে।

ক। জ্ঞান

জ্ঞানের তিনটী অঙ্গ—প্রথমতঃ, ত্বম্-পদার্থবিষয়ক জ্ঞান, বা জীবের স্বরূপ-বিষয়ক জ্ঞান ; দ্বিতীয়তঃ, তৎ-পদার্থবিষয়ক জ্ঞান, বা ভগবৎ-স্বরূপ-বিষয়ক-জ্ঞান ; তৃতীয়তঃ, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞান। এই তিনটীর মধ্যে তৃতীয়টী (অর্থাৎ জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞান) ভক্তিমার্গের সম্পূর্ণ বিরোধী ; কেননা, এইরূপ জ্ঞানে ভগবানের সহিত জীবের সেব্যসেবকত্ব-ভাবই নষ্ট হইয়া যায়। এজন্য, এইরূপ জ্ঞান ভক্তির অঙ্গ তো নহেই, ইহাদ্বারা ভক্তির সামান্যমাত্র আনুকূল্যও হয় না ; সুতরাং ভক্তসাধকের পক্ষে ইহা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাজ্য।

কিন্তু জ্ঞানের প্রথম দুইটী অঙ্গ—জীবের ও ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধে জ্ঞান—ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে উপেক্ষণীয় নহে। জীবের ও ভগবানের স্বরূপ-সম্বন্ধে কোনও জ্ঞান না থাকিলে জীবে ও ভগবানে স্বরূপতঃ যে কি সম্বন্ধ, তাহাও জানা যায় না ; সুতরাং ভজনের পক্ষেও সুবিধা হয় না। জ্ঞানের এই দুইটী অঙ্গ ভক্তির অনুকূল। এজন্যই শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীমন্‌মহা-প্রভুকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—“কে আমি ?”, অর্থাৎ জীবের স্বরূপ কি (ত্বম্-পদার্থের জ্ঞান), “আমারে কেন জারে তাপত্রয়। ইহা নাহি জানি আমি কেমনে হিত হয়।” এই প্রশ্নের উত্তরেই ভগবত্তত্ত্বের (তৎ-পদার্থের) জ্ঞান আসিয়া পড়ে। এই তত্ত্বদুইটী জানা না থাকিলে শ্রদ্ধাও দৃঢ় হইতে পারে কিনা সন্দেহ। শ্রীল কবিরাজগোস্বামীও লিখিয়াছেন—“সিদ্ধান্ত বলিয়া চিত্তে না কর অলস। যাহা হৈতে লাগে কৃষ্ণে সুদৃঢ় মানস॥ শ্রীচৈ,চ, ১।২।৯৯॥” সুতরাং এই দুইটী তত্ত্বের জ্ঞান উপেক্ষণীয় নহে।

খ। বৈরাগ্য

বৈরাগ্য-শব্দের অর্থ ভোগত্যাগ। এই বৈরাগ্য আবার দুই রকমের—যুক্ত বৈরাগ্য এবং শুষ্ক বৈরাগ্য বা ফল্গু বৈরাগ্য। এই দুই রকম বৈরাগ্যের স্বরূপ কথিত হইতেছে।

(১) যুক্ত বৈরাগ্য

“অনাসক্তস্য বিষয়ান্ যথার্হমুপযুঞ্জতঃ।
নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে যুক্তং বৈরাগ্যমুচ্যতে॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ॥১।২।১২৫॥

—যাঁহার অন্তরে শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা আছে (নির্ব্বন্ধঃ কৃষ্ণসম্বন্ধে), (বিষয়ে) আসক্তিহীন হইয়া যথাযোগ্যভাবে (স্বীয় ভক্তির উপযোগী যাহাতে হয়, সেইভাবে) যিনি বিষয় উপভোগ করেন, তাঁহার বৈরাগ্যকে যুক্ত বৈরাগ্য বলে।”

শ্রীলরঘুনাথদাস গোস্বামীর গৃহত্যাগের পূর্ব্বে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিম্নলিখিত বাক্যে তাঁহাকে যুক্ত বৈরাগ্যের উপদেশ দিয়াছিলেন।

মর্কট বৈরাগ্য না কর লোক দেখাইয়া। যথাযোগ্য বিষয় ভুঞ্জ অনাসক্ত হৈয়া॥
অন্তর্নিষ্ঠা কর, বাহ্যে লোক ব্যবহার। অচিরাতে কৃষ্ণ তোমায় করিবে উদ্ধার॥

শ্রীচৈ,চ, ২।১৬।২৩৬ – ৭॥

"মর্কট বৈরাগ্য না কর" ইত্যাদি—মর্কট বৈরাগ্য=বাহ্য বৈরাগ্য। আহারে, বিহারে, বসন-ভূষণে, বাসস্থানাদিতে এরূপ কোনও আচরণ করিবে না, যাহা দেখিলে লোকে মনে করিতে পারে—তোমার বিষয়-বৈরাগ্য জন্মিয়াছে। বৈরাগ্যের বাহিরের চিহ্ন ধারণ করিবে না। কিন্তু "অন্তর্নিষ্ঠা কর"—মন যাহাতে শ্রীকৃষ্ণে নিষ্ঠা প্রাপ্ত হয়, তাহা করিবে। অন্য দশজন বাহিরে যেভাবে ব্যবহার করে, যেরূপ আচরণ করে, তুমিও সেইরূপ আচরণ করিবে। আর অনাসক্ত হইয়া "যথাযোগ্য বিষয়" ভোগ কর—ভক্তির অনুকূল ভাবে বিষয়ভোগ করিবে, যাহাতে ভক্তির বিঘ্ন জন্মিতে পারে, এমনভাবে বিষয় ভোগ করিবে না।

শ্রীকৃষ্ণে চিত্ত নিষ্ঠাপ্রাপ্ত হইলে ভিতরে অবশ্যই বৈরাগ্য জন্মিবে; কিন্তু বাহিরে অন্য দশজনের মতনই আচরণ করিবে, যেন ভিতরের বৈরাগ্য কেহ বুঝিতে না পারে। তবে অন্য দশজনের সঙ্গে সাধকের বাহিরের আচরণে পার্থক্য থাকিবে এই যে—অন্য দশজন বিষয় ভোগ করেন, তাঁহাদের বিষয়-বাসনা চরিতার্থ করার জন্য; তাঁহাদের বিষয়-ভোগের পশ্চাতে থাকে তাঁহাদের বিষয়াসক্তি। কিন্তু সাধক বিষয় ভোগ করিবেন অনাসক্ত হইয়া। কোনও বস্তুর প্রতি লোভ, বা কোনও বস্তুর প্রতি বিরক্তি তাঁহার থাকিবে না। পোষাক-পরিচ্ছদ, আহার-বিহারাদির বস্তু সম্বন্ধে সাধক থাকিবেন উদাসীন।

অনাসক্ত ভাবে যে বিষয়ভোগ, তাহাও হইবে—যথাযোগ্যভাবে—ভক্তি-অঙ্গের, সাধন-ভক্তির, রক্ষার উপযোগী ভাবে। যতটুকু বিষয়ভোগে ভক্তি-অঙ্গ রক্ষিত হইতে পারে, ততটুকু ভোগই বিধেয়, তদতিরিক্ত নহে। যেমন, আহার সম্বন্ধে, শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত দ্রব্যই আহার করিবে, অনিবেদিত কিছু গ্রহণ করা সঙ্গত নয়। শাস্ত্রনিষিদ্ধ বস্তুও ভগবানে নিবেদন করিবে না। অন্যান্য বস্তু সম্বন্ধেও তদ্রূপ। শাস্ত্রবিহিত আচরণের পালন এবং শাস্ত্রনিষিদ্ধ আচরণের অপালন অবশ্য-কর্ত্তব্য। গৃহী ভক্তের অর্থোপার্জ্জনাদি সম্বন্ধেও, যে পরিমাণ অর্থোপার্জ্জন না হইলে জীবিকা নির্ব্বাহ হয় না, সেই পরিমাণ অর্থোপার্জ্জনের জন্যই সদ্‌ভাবে চেষ্টা করিবে, তদতিরিক্ত নহে; কেননা, অতিরিক্ত অর্থোপার্জ্জনের চেষ্টায় ক্রমশঃ অর্থের প্রতি লালসা জন্মিতে পারে; তাহাতে ভজনের বিঘ্ন জন্মিতে পারে; যাঁহার প্রচুর সম্পত্তি আছে, তিনিও তাহা শ্রীকৃষ্ণের বিষয়জ্ঞানে ভজনের অনুকূলভাবে ব্যবহার করিবেন।

ইহাই যুক্ত বৈরাগ্যের—ভক্তির উপযুক্ত বৈরাগ্যের—লক্ষণ। এ-স্থলে ভক্তির প্রতিকূল বিষয়ের এবং ভোগ্য বস্তুতে আসক্তির ত্যাগই হইতেছে বৈরাগ্য।

যুক্তবৈরাগ্যপ্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভগদ্গীতার কয়েকটী শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন।

অদ্বেষ্টা সর্ব্বভূতানাং মৈত্রঃ করুণ এব চ। নির্ম্মমো নিরহঙ্কারঃ সমদুঃখসুখঃ ক্ষমী॥
সন্তুষ্টঃ সততং যোগী যতাত্মা দৃঢ়নিশ্চয়ঃ। মর্য্যর্পিতমনোবুদ্ধির্যো মদ্ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যস্মান্নোদ্বিজতে লোকো লোকান্নোদ্বিজতে তু যঃ। হর্ষামর্ষভয়োদ্বেগৈর্মুক্তো যঃ স চ মে প্রিয়ঃ॥
অনপেক্ষঃ শুচির্দক্ষ উদাসীনো গতব্যথঃ। সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী যো মে ভক্তঃ স মে প্রিয়ঃ॥
যো ন হৃষ্যতি ন দ্বেষ্টি ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। শুভাশুভপরিত্যাগী ভক্তিমান্ যঃ স মে প্রিয়ঃ॥
সমঃ শত্রৌ চ মিত্রে চ তথা মানাপমানয়োঃ। শীতোষ্ণসুখদুঃখেষু সমঃ সঙ্গবিবর্জ্জিতঃ॥
তুল্যনিন্দাস্তুতির্মৌনী সন্তুষ্টো যেন কেনচিৎ। অনিকেতঃ স্থিরমতির্ভক্তিমান্ মে প্রিয়ো নরঃ॥
যে তু ধর্ম্মামৃতমিদং যথোক্তং পর্য্যুপাসতে। শ্রদ্দধানা মৎপরমা ভক্তাস্তেঽতীব মে প্রিয়াঃ॥

—গীতা ॥১২।১৩—২০॥

অনুবাদ। অর্জ্জুনকে লক্ষ্য করিয়া শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন:—"যিনি কাহাকেও দ্বেষ করেন না (অপর কেহ তাঁহাকে দ্বেষ করিলেও,—'আমার প্রারব্ধানুসারে পরমেশ্বর-কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াই ইনি আমাকে দ্বেষ করিতেছেন'—এইরূপ বুদ্ধিতে যিনি জীবমাত্রের প্রতিই দ্বেষশূন্য); (সমস্ত জীবেই পরমেশ্বর অধিষ্ঠিত আছেন এইরূপ বুদ্ধিতে) যিনি জীবমাত্রের প্রতিই স্নিগ্ধ; (কানও কারণে কোনও জীবের খেদ উপস্থিত হইলে—'ইহার যেন আর খেদ না হয় ও অসদ্গতি না হয়—এইরূপ বুদ্ধিতে) যিনি করুণ; যিনি দেহাদিতে মমতাশূন্য (এই দেহ আমার-ইত্যাদি জ্ঞানশূন্য); যিনি নিরহঙ্কার অর্থাৎ যিনি দেহাদিতে আত্মবুদ্ধিশূন্য (এই দেহই আমি, এইরূপ জ্ঞান যাঁহার নাই); সুখের সময়ে হর্ষে এবং দুঃখের সময়ে উদ্বেগে যিনি ব্যাকুল নহেন; যিনি সর্ব্ববিষয়ে সহনশীল; যিনি লাভেও প্রসন্নচিত্ত, ক্ষতিতেও প্রসন্নচিত্ত, যিনি যোগী অর্থাৎ ভক্তিযোগযুক্ত; যিনি জিতেন্দ্রিয়; "আমি শ্রীভগবদ্দাস"-এইরূপ দৃঢ়-নিশ্চয় হইতে যিনি কুতর্কাদিদ্বারা বিচলিত হয়েন না; এবং যিনি মন এবং বুদ্ধি আমাতেই (শ্রীকৃষ্ণে) অর্পণ করিয়াছেন, সেই ভক্তই আমার প্রিয়। যাঁহা হইতে লোকে উদ্বেগ পায় না, (অর্থাৎ লোকের উদ্বেগজনক কার্য্য যিনি করেন না); যিনি লোক হইতে উদ্বিগ্ন হয়েন না (অপর কেহও যাঁহার উদ্বেগজনক কার্য্য করেন না) এবং যিনি হর্ষ, অমর্ষ, ভয় ও উদ্বেগ হইতে মুক্ত, তিনিই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। যিনি অনপেক্ষ (কোনও কিছুরই অপেক্ষা রাখেন না), শুচি (যাঁহার ভিতর বাহির পবিত্র), দক্ষ (স্ব-শাস্ত্রের অর্থবিচারে সমর্থ, অথবা কর্ম্মপটু), উদাসীন (যাঁহার স্বপক্ষ, পরপক্ষ নাই), গতব্যথ (অন্যে অপকার করিলেও যিনি মনে কষ্ট পায়েন না), যিনি সর্ব্বারম্ভ-পরিত্যাগী (ভক্তিবিরোধী-উদ্যমাদি শূন্য)—সেই ভক্ত আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়।

যিনি প্রিয়বস্তু পাইয়াও হৃষ্ট হয়েন না, অপ্রিয় বস্তু পাইলেও যিনি তাহাতে দ্বেষ করেন না, প্রিয়বস্তুটী নষ্ট হইয়া গেলেও যিনি তজ্জন্য শোক করেন না . প্রিয়বস্তুটী পাওয়ার জন্যও যিনি আকাঙ্ক্ষা করেন না, এবং যিনি শুভাশুভ কর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়াছেন—সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তিই আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। যিনি শত্রুতে এবং মিত্রে, মানে এবং অপমানে, শীতে এবং উষ্ণে, সুখে এবং দুঃখে—সমভাবাপন্ন, যিনি আসক্তিবর্জ্জিত, নিন্দায় ও স্তুতিতে যাঁহার সমান জ্ঞান, যিনি মৌনী (যিনি বাক্য সংযত করিয়াছেন), যিনি যাহাতে-তাহাতেই সন্তুষ্ট, যিনি অনিকেত (গৃহাদিতে মমত্ববুদ্ধিশূন্য) এবং যিনি স্থিরবুদ্ধি—সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার (শ্রীকৃষ্ণের) প্রিয়। এইরূপে আমি (শ্রীকৃষ্ণ) যাহা বলিলাম, যে ব্যক্তি এই ধর্ম্মামৃতে শ্রদ্ধাবান্ হইয়া উপাসনা করেন, সেই ভক্তিমান্ ব্যক্তি আমার অতীব প্রিয়।"

যিনি যুক্ত বৈরাগ্য গ্রহণ করেন, তাঁহার লক্ষণগুলিই উল্লিখিত গীতাবাক্যগুলিতে ব্যক্ত-হইয়াছে।

(২) ফল্গু বৈরাগ্য বা শুষ্ক বৈরাগ্য

"প্রাপঞ্চিকতয়া বুদ্ধ্যা হরিসম্বন্ধিবস্তুনঃ।
মুমুক্ষুভিঃ পরিত্যাগো বৈরাগ্যং ফল্গু কথ্যতে॥ ভক্তিরসামৃত সিন্ধুঃ ॥১।২।১২৬॥

—মুমুক্ষুজনগণকর্ত্তৃক প্রাকৃতবুদ্ধিতে হরিসম্বন্ধি বস্তুর পরিত্যাগকে ফল্গু বৈরাগ্য বলে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"অথ ফল্গুবৈরাগ্যং তু ভক্ত্যনুপযুক্তং যত্তদেব জ্ঞেয়ম্। তচ্চ ভগবদ্‌বহির্ম্মুখানামপরাধপর্য্যন্তং স্যাদিত্যাহ প্রাপঞ্চিকতয়েতি। হরিসম্বন্ধিবস্ত্বত্র তৎপ্রসাদাদিঃ। তস্য পরিত্যাগো দ্বিবিধঃ। অপ্রার্থনা প্রাপ্তানঙ্গীকারশ্চ। তত্রোত্তরস্তু সুতরামপরাধ এব জ্ঞেয়ঃ। প্রসাদাগ্রহণং বিষ্ণোরিত্যাদি বচনেষু তচ্ছ্রবণাৎ॥

—যাহা ভক্তির (ভক্তিযোগের) অনুপযুক্ত, তাহাই ফল্গু বৈরাগ্য বলিয়া জানিবে। ফল্গু বৈরাগ্যে ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ লোকদিগের যে অপরাধ পর্য্যন্ত হয়, 'প্রাপঞ্চিকতয়া'-ইত্যাদি বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। এ-স্থলে 'হরিসম্বন্ধি বস্তু' বলিতে ভগবৎ-প্রসাদাদিকে বুঝাইতেছে। ভগবৎ-প্রসাদাদির পরিত্যাগ দুই রকমের—এক, প্রসাদাদির প্রার্থনা না করা; আর, (অপ্রার্থিত ভাবে) পাওয়া গেলেও তাহা গ্রহণ না করা। শেষেরটী (অর্থাৎ প্রাপ্ত প্রসাদাদি গ্রহণ না করা) অপরাধ বলিয়াই জানিতে হইবে। 'বিষ্ণুর প্রসাদ গ্রহণ না করা"-ইত্যাদি শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেই তাহা জানা যায়।"

শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত অন্নাদির নাম মহাপ্রসাদ। "কৃষ্ণের উচ্ছিষ্ট হয় 'মহাপ্রসাদ' নাম॥ শ্রীচৈ.চ. ৩।১৬।৫৪॥" মহাপ্রসাদাদি (আদি-শব্দে প্রসাদী মাল্য-চন্দনাদি) হইতেছে অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু। কোনও প্রাকৃত বস্তুও যখন যথাবিহিত ভাবে ভগবানে অর্পিত হয় এবং ভগবান্‌কর্ত্তৃক গৃহীত হয়, তখন তাহা আর প্রাকৃত থাকে না, তাহা অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে, চিন্ময় হইয়া যায়। যাঁহারা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ, তাঁহারাই মহাপ্রসাদাদিকে প্রাপঞ্চিক বা প্রাকৃত বলিয়া মনে করেন; ইহার

হেতুও পূর্ব্বকৃত অপরাধ এবং চিন্ময়বস্তুকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করাও অপরাধ। ইহা ভক্তি-বিরোধী।

প্রাপঞ্চিক বস্তুজ্ঞানে যাঁহারা চিন্ময় মহাপ্রসাদাদিও ত্যাগ করেন, তাঁহাদের এতাদৃশ ত্যাগকেই ফল্গু বৈরাগ্য বলে। যাঁহারা মুমুক্ষু—মোক্ষকামী, ভগবৎ-সেবাকামী নহেন,—তাঁহারা প্রাকৃত ভোগ্যবস্তু ত্যাগ করিবার জন্যই প্রয়াসী এবং প্রাকৃত বস্তু মনে করিয়া তাঁহারা মহাপ্রসাদাদিও পরিত্যাগ করেন। কাহারও নিকটে মহাপ্রসাদাদি প্রার্থনাও করেন না, অযাচিত ভাবে পাইলেও তাহা গ্রহণ করেন না। অযাচিত ভাবে পাইলেও গ্রহণ না করিলে মহাপ্রসাদে অবজ্ঞাই প্রকাশ করা হয়; এইরূপ অবজ্ঞা অপরাধজনক।

মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদের চিত্তে অহৈতুকী শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির বাসনা থাকে না; থাকিলে তাঁহারা মহাপ্রসাদাদি পরিত্যাগ করিতে পারিতেন না। তাঁহারা মনে করেন, ইন্দ্রিয়ভোগ্য প্রাকৃত বস্তুর ভোগের জন্য যে বাসনা তাহাই বন্ধনের হেতু; এই বাসনা পরিত্যাগ করিতে পারিলেই আর বন্ধন থাকিবে না। প্রাকৃত ভোগ্যবস্তুর গ্রহণ হইতে বিরত থাকিলেই ভোগবাসনা দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু এইরূপ ত্যাগে ভোগবাসনার মূল উৎপাটিত হইতে পারে না; কেবল ভোগবাসনার শাখা-প্রশাখাগুলিকে চাপিয়া রাখার চেষ্টা—কিম্বা ভোগ্যবস্তু হইতে দূরে থাকার চেষ্টাই—প্রাধান্য লাভ করে, ভোগবাসনা প্রচ্ছন্নভাবে অবস্থিত থাকে। বাসনার মূল হইতেছে মায়ার প্রভাব। কোনও লোকই নিজের চেষ্টায় মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না; ভগবানের শরণাপন্ন হইলেই মায়ার হাত হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায়; ইহার আর অন্য উপায় নাই। অর্জ্জুনকে উপলক্ষ্য করিয়া ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই নিজে তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া। মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা॥৭।১৪॥" ফল্গু বৈরাগ্যে অন্তরে সুপ্ত বাসনা থাকে; অথচ বাহিরে বাসনাতৃপ্তির চেষ্টার অভাব বলিয়া আমরা ইহাকে স্থূল দৃষ্টিতে বৈরাগ্য বলিয়া মনে করি। এজন্যই ইহাকে ফল্গুবৈরাগ্য বলা হয়। যে নদীর উপরে জল দেখা যায় না, কিন্তু ভিতরে জল আছে, বাহিরে কেবল বালি মাত্র দেখা যায়, তাহাকে ফল্গুনদী বলে। ফল্গু বৈরাগ্যেও বাহিরে বৈরাগ্যের লক্ষণ, কিন্তু ভিতরে ভোগবাসনা, হয়তো অজ্ঞাত-সারেই, সুপ্ত থাকে। উভয়ের প্রকৃতির সমতা আছে বলিয়া নদীর ন্যায় এইরূপ বরাগ্যৈকেও "ফল্গু" বলা হয়।

ফল্গুবৈরাগ্যে, ভগবৎ-কৃপার উপর নির্ভর না করিয়া, কেবল নিজের শক্তিতে ভোগবাসনা দূর করার জন্য চেষ্টা হয় বলিয়া ইন্দ্রিয়বৃত্তির সঙ্গে কঠোর সংগ্রাম করিতে হয়। ইহার ফলে হৃদয় শুষ্ক, নীরস ও কঠিন হইয়া যায় বলিয়াই ইহাকে শুষ্ক বৈরাগ্যও বলা হয়।

ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে ফল্গুবৈরাগ্য পরিত্যাজ্য, যুক্তবৈরাগ্যই তাঁহার সাধন-ভজনের অনুকূল।

গ। জ্ঞান ও বৈরাগ্য ভক্তির অঙ্গ নহে

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"জ্ঞান-বৈরাগ্য ভক্তির কভু নহে অঙ্গ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২।৮২॥"

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"জ্ঞানবৈরাগ্যয়োর্ভক্তিপ্রবেশায়োপযোগিতা।
ঈষৎ প্রথমমেবেতি নাঙ্গত্বমুচিতং তয়োঃ॥১।২।১২০॥

— ভক্তিমার্গে প্রবেশের পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের প্রথমেই ঈষৎ উপযোগিতা আছে; ইহাদিগকে ভক্তির (সাধনভক্তির) অঙ্গ বলিয়া মনে করা উচিত নহে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী জ্ঞানের তিনটী অঙ্গের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন যে, জ্ঞানসম্বন্ধে শ্লোকোক্ত "ঈষৎ"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, জীব ও ব্রহ্মের ঐক্যবিষয়ক জ্ঞান ত্যাগ করিতে হইবে। "তত্র ঈষদিতি ঐক্যবিষয়ং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ।" ইহাতে বুঝা যায়—জ্ঞানের অপর দুইটী অঙ্গের,—অর্থাৎ তৎপদার্থের ও ত্বংপদার্থের জ্ঞানের—উপযোগিতা আছে। আর, বৈরাগ্যসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—এ-স্থলে বৈরাগ্য-শব্দে ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগী (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানোপযোগী, মোক্ষকামীদের অভীষ্ট) বৈরাগ্যই বুঝিতে হইবে এবং "ঈষৎ"-শব্দের তাৎপর্য্যে তিনি লিখিয়াছেন, ভক্তিবিরোধী বৈরাগ্য পরিত্যাগ করিতে হইবে। "বৈরাগ্যঞ্চাত্র ব্রহ্মজ্ঞানোপযোগ্যেব, তত্র চ ঈষদিতি ভক্তিবিরোধিনং ত্যক্ত্বেত্যর্থঃ।" ইহাতে বুঝা যায়, ফল্গুবৈরাগ্যই পরিত্যাজ্য এবং যুক্তবৈরাগ্য স্বীকার্য্য।

টীকায় তিনি আবার ইহাও লিখিয়াছেন যে, সাধনের প্রথম অবস্থায় অন্য বস্তুতে চিত্তের আবেশ পরিত্যাগ করার নিমিত্তই তদ্রূপ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের (তৎপদার্থের ও ত্বংপদার্থের জ্ঞানের এবং যুক্ত বৈরাগ্যের) উপযোগিতা আছে বটে; কিন্তু অন্যাবেশ পরিত্যাগের ফলে ভক্তিতে (সাধনভক্তিতে) প্রবেশলাভ হইলে ঐ জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কোনও প্রয়োজন নাই; তখন তাহা অকিঞ্চিৎকর হইয়া পড়ে; কেননা, তখন বৈরাগ্যের কথা, কি জীব ও ভগবানের তত্ত্বাদির কথা ভাবিতে গেলেও সাধনভক্তির বিচ্ছেদ হয়; এজন্য ইহা ভক্তির অঙ্গ নহে। "তচ্চ তচ্চ প্রথমমেবেত্যন্যাবেশপরিত্যাগমাত্রায় তে উপাদীয়েতে তৎপরিত্যাগেন জাতে চ ভক্তিপ্রবেশে তয়োরকিঞ্চিৎকরত্বাৎ। তত্তদ্‌ভাবনায়া ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাৎ॥"

ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ হইলে সাধকের পক্ষে নিরবচ্ছিন্নভাবে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের জন্য চেষ্টা করাই কর্ত্তব্য। এই সময়ে যদি পৃথক্‌ভাবে তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য, কিম্বা বৈরাগ্যের অভ্যাস করার জন্য চেষ্টা করা হয়, তাহা হইলে এতাদৃশী চেষ্টার সময়ে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান সম্ভব হয় না; সুতরাং সাধনের নিরবচ্ছিন্নতাও থাকে না।

যাহা হউক, ভক্তিতে প্রবেশের পরে জ্ঞান-বৈরাগ্যের অনুসরণ দূষণীয় কেন, তাহাও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন।

"যদুভে চিত্তকাঠিন্যহেতু প্রায়ঃ সতাং মতে।
সুকুমারস্বভাবেয়ং ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা ॥ ১।২।১২১॥

—সাধুগণের অভিমত এই যে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য-এই দুইটী চিত্তকাঠিন্যের হেতু ; সুকোমল-স্বভাবা ভক্তিই ভক্তিযোগে প্রবেশের হেতু বলিয়া কথিত হয়।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম এইরূপ :—

ভক্তিমার্গে প্রবেশের পরেও যদি জ্ঞান ও বৈরাগ্যের অনুসরণ করা হয়, তাহা হইলে দোষান্তরের (ভক্তিবিচ্ছেকতা ব্যতীত অন্য দোষের) উৎপত্তি হয়। ইহাতে চিত্তকাঠিন্য জন্মে। কেননা, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ে ভিন্ন ভিন্ন মত প্রচলিত আছে। ভক্তির বিরুদ্ধমত-সমূহ খণ্ডন করিবার উদ্দেশ্যে কেবল যদি শুষ্ক তত্ত্বের আলোচনা করা হয়, তাহা হইলে হৃদয় নীরস ও কঠিন হইয়া পড়ে। আবার, বৈরাগ্যের জন্য দুঃখসহন অভ্যাস করিতে গেলেও চিত্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

প্রশ্ন হইতে পারে—জ্ঞান ও বৈরাগ্যকে তো ভক্তিমার্গে প্রবেশের সহায় বলা হইয়াছে ; ভক্তিমার্গে প্রবেশ করার পরে এই দুইটী সহায়কে পরিত্যাগ করিলে সহায় ব্যতীত ভক্তির উত্তরোত্তর প্রবেশ—ভক্তিপথে ক্রমশঃ অগ্রগতি কিরূপে সম্ভব হইতে পারে ?

এই প্রশ্নের উত্তরে ইহাই বলা যায় যে, প্রথম অবস্থায় যে জ্ঞান ও বৈরাগ্য সহায় হয়, তাহা কেবল অন্য বস্তুতে আবেশ ছুটাইবার জন্য। অন্যাবেশ যখন অনেকটা ছুটিয়া যায়, তাহার ফলে যখন ভক্তিমার্গে প্রবেশ লাভ হয়, তখনই তাহাদের কাজ শেষ হইয়া যায় ; সুতরাং ইহার পরে যখন ভক্তির কিঞ্চিৎ উন্মেষ হয়, তখন আর তাহাদের কোনও প্রয়োজনীয়তাই থাকে না। কিঞ্চিৎ উন্মেষিতা ভক্তিই তখন ভক্তিবৃদ্ধির সহায় হয়, পূর্ব্ব-পূর্ব্ব সময়ে অনুষ্ঠিত ভক্তিই পরবর্ত্তী সময়ে অনুষ্ঠিত ভক্তির সহায় হয়। শ্লোকস্থ "ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতা" বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

আবার যদি বলা যায়—জ্ঞান ও বৈরাগ্যের সাধনে অনেক কষ্ট করিতে হয় বলিয়া চিত্ত-কাঠিন্য জন্মিতে পারে, ইহা স্বীকার করা যায় ; কিন্তু ভক্তিমার্গের সাধনেও তো আয়াস স্বীকার করিতে হয় ? এই আয়াসেও তো চিত্তের কাঠিন্য জন্মিতে পারে ? ইহার উত্তরে বলা যায়—ভক্তির সাধনে (ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে) যে আয়াস, তাহাতে চিত্তকাঠিন্য জন্মিবার সম্ভাবনা নাই ; কেননা, ভক্তি হইতেছে সুকোমল-স্বভাবা। শ্লোকস্থ "সুকুমারস্বভাবেয়ম্" বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। ভক্তিমার্গের সাধনে সৌন্দর্য্য, মাধুর্য্য ও বৈদগ্ধীর মূল আধার শ্রীভগবানের পরম মধুর রূপ-গুণ-লীলাদির চিন্তা করিতে হয়, তাহাতে চিত্ত অত্যন্ত কোমল হয়, আর্দ্রীভূত হয়, ভক্তির উৎস বিচ্ছুরিত হইতে থাকে ; সুতরাং ভক্তিমার্গের সাধনে যে আয়াস, তাহাতে চিত্তকাঠিন্যের কোনও আশঙ্কা নাই। অতএব, যিনি ভগবদ্‌বিষয়ে চিত্তের আর্দ্রতা জন্মাইতে ইচ্ছুক, ভক্তিমার্গের সাধনই তাঁহার কর্ত্তব্য।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার এই উক্তির সমর্থনে শ্রীনৃসিংহদেবের প্রতি প্রহ্লাদ কর্তৃক উক্ত শ্রীমদ্‌ভাগবতের দুইটী শ্লোকও (৭।৯।৪৯-৫০) উদ্ধৃত করিয়াছেন।*

জ্ঞান এবং বৈরাগ্য যে ভক্তিমার্গের অনুকূল নহে, শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেও তাহা জানা যায়। উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"তস্মান্মদ্‌ভক্তিযুক্তস্য যোগিনো বৈ মদাত্মনঃ।
ন জ্ঞানং ন চ বৈরাগ্যং প্রায়ঃ শ্রেয়ো ভবেদিহ॥ শ্রীভা, ১১।২০।৩১॥

—(জ্ঞান-বৈরাগ্যাদির সাহচর্য্যব্যতীত একমাত্র অন্যনিরপক্ষ ভক্তিদ্বারাই সমস্ত হৃদয়গ্রন্থি, সমস্ত সংশয় এবং প্রারব্ধব্যতীত সমস্ত কর্ম্ম বিনষ্ট হইয়া যাইতে পারে বলিয়া) যিনি আমাতে চিত্ত সমর্পণ করিয়াছেন এবং যিনি আমাতে ভক্তিযুক্ত, এতাদৃশ যোগীর (ভক্তিযোগীর) পক্ষে জ্ঞান ও বৈরাগ্য প্রায়ই মঙ্গলজনক (ভক্তির পুষ্টিসাধক) হয়না।"

শ্লোকস্থ-"প্রায়ঃ-প্রায়ই"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, প্রারম্ভে জ্ঞান ও বৈরাগ্যের কিছু উপযোগিতা আছে, পরে নাই।

ঘ। ভক্তিসাধনেই আনুষঙ্গিকভাবে জ্ঞান-বৈরাগ্যের আবির্ভাব

প্রশ্ন হইতে পারে, জ্ঞান ও বৈরাগ্য যদি ভক্তিমার্গে পরিত্যাজ্যই হয়, তাহা হইলে সংসারাসক্তিই বা কিরূপে দূরীভূত হইবে এবং তত্ত্বজ্ঞানই বা কিরূপে লাভ হইবে? ভগবত্তত্ত্বজ্ঞান লাভ না হইলে তো জন্মমৃত্যুরই অবসান হইতে পারেনা। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়॥ শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিঃ॥"

এই প্রশ্নের উত্তরে বলা যায়—একমাত্র ভক্তিমার্গের আশ্রয়েই বৈরাগ্য ও জ্ঞান আপনা-আপনি, স্বতন্ত্র প্রয়াস ব্যতীতই, আসিয়া উপস্থিত হয়।

বৈরাগ্যসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—

"রুচিমুদ্বহতস্তত্র জনস্য ভজনে হরেঃ।
বিষয়েষু গরিষ্ঠোঽপি রাগঃ প্রায়ো বিলীয়তে॥ ১।২।১২৪॥

---

*উত্তরতস্তু তয়োরনুগতৌ দোষান্তরমিত্যাহ যদুভে ইতি। কাঠিন্যহেতুত্বঞ্চ নানাবাদনিরসনপূর্ব্বকতত্ত্ববিচারস্য দুঃখসহনাভ্যাসপূর্ব্বকবৈরাগ্যস্য চ ব্রহ্মস্বরূপত্বাৎ। তর্হি সহায়ং বিনোত্তরোত্তরভক্তিপ্রবেশঃ কথং স্যাত্তত্রাহ ভক্তিস্তদ্ধেতুরীরিতেতি। তস্য ভক্তিপ্রবেশস্য হেতু ভক্তিরীরিতা। উত্তরোত্তরভক্তিপ্রবেশস্য হেতুঃ পূর্ব্বপূর্ব্বভক্তিরেবেত্যর্থঃ। নন্নু ভক্তিরপি তত্তদায়াসসাধ্যত্বাৎ কাঠিন্যহেতুঃ স্যাত্তত্রাহ সুকুমারস্বভাবেয়মিতি। শ্রীভগবন্মধুর-রূপগুণাদিভাবনাময়ত্বাদিতি। তস্মাদ্ ভগবতি নিজচিত্তস্য সার্দ্রতাং কর্ত্তুমিচ্ছুনা ভক্তিরেব কার্য্যেতি ভাবঃ। প্রাধান্যেন চ যথোক্তং শ্রীপ্রহ্লাদেন, "নৈতে গুণা ন গুণিনো মহদাদয়ো যে সর্ব্বে মনঃপ্রভৃতয়ঃ সহদেবমর্ত্ত্যাঃ। আদ্যন্তবন্ত উরুগায় বিদন্তি ত্বামেব বিমৃষ্য সুধিয়ো বিরমন্তি শব্দাৎ॥ তত্তেঽর্হত্তম নমঃ স্তুতিকর্মপূজাঃ কর্ম স্মৃতিশ্চরণয়োঃ শ্রবণং কথায়াম্। সংসেবয়া ত্বয়ি বিনেতি ষড়ঙ্গয়া কিং ভক্তিং জনঃ পরমহংসগতৌ লভেত (শ্রী ভা, ৭।৯।৪৯-৫০)॥"

—শ্রীভগবান্ হরির ভজনে যাঁহার রুচি জন্মিয়াছে, তাঁহার বিষয়ানুরাগ অত্যন্ত গুরুতর (গরিষ্ঠ) হইলেও ভজনপ্রভাবে তাহা সম্যক্রূপে বিলয়প্রাপ্ত হয়।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—“ভক্তিতে (সাধন-ভক্তিতে) রুচিমাত্র জন্মিলেই বিষয়াসক্তি বিলুপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং বৈরাগ্যের অভ্যাস করিয়া চিত্তকাঠিন্যের উৎপাদন যুক্তিযুক্ত নহে। শ্লোকস্থ ‘প্রায়ো বিলীয়তে’-বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভজনে রুচি জন্মিলে পরিণামে বিষয়াসক্তি সম্পূর্ণরূপেই বিলয় প্রাপ্ত হয়।” (১)

বিষয়াসক্তি হইতেছে মায়ার প্রভাব; মায়ার প্রভাব দূরীভূত হইলেই বিষয়াসক্তিও দূরীভূত হইতে পারে। কিন্তু স্বরূপশক্তি-ব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারেনা (১।১।২৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভক্তিমার্গের সাধনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠানের সঙ্গেই স্বরূপশক্তি সাধকের চিত্তে প্রবেশ করে এবং ক্রমশঃ মায়ার প্রভাবকে অপসারিত করিয়া থাকে (৫।৬৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এজন্য ভক্তিমার্গের আশ্রয়ে আপনা-আপনিই বিষয়াসক্তি দূরীভূত হইতে পারে। ভক্তিনিরপেক্ষ স্বতন্ত্র প্রয়াসে তাহা হইতে পারেনা; কেননা, বৈরাগ্যের জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াসে চিত্তে স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে না।

এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

“কৃষ্ণোন্মুখং স্বয়ং যান্তি যমাঃ শৌচাদয়স্তথা।
ইত্যেষাঞ্চ ন যুক্তা স্যাদ্ভক্ত্যঙ্গান্তরপাতিতা॥ ১।২।১২৮॥

—কৃষ্ণোন্মুখ ব্যক্তিদিগের পক্ষে যম, নিয়ম ও শৌচাদি আপনা-আপনিই উপস্থিত হয়; এজন্য উহাদিগকেও (যম-নিয়মাদিকেও) ভক্ত্যঙ্গ বলা যাইতে পারেনা।”

শ্রীমন্মহাপ্রভুও শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন-“যম-নিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্ত-সঙ্গ॥ শ্রীচৈ, চৈ, ২।২২।৮৩॥” (বুলে ভ্রমণ করে, ঘুরিয়া বেড়ায়)। (২)

---

(১) ভক্তৌ রুচিমাত্রমেব তস্য বিষয়রাগবিলাপকম্। তস্মাদ্বৈরাগ্যাভ্যাসে কাঠিন্যং ন যুক্তমিত্যাহ রুচিমিতি। অত্র রুচিমুদ্বহতঃ প্রায়ো বিলীয়ত ইতি পরিণামতস্তু কার্ৎস্ন্যেনৈব বিলীয়ত ইত্যর্থঃ।

(২) **যম**—“আনৃশংস্যং ক্ষমা সত্যং অহিংসা দম আর্জ্জবম্। ধ্যানং প্রসাদোমাধুর্য্যং সন্তোষশ্চ যমা দশ॥—বহ্নি-পুরাণে যম-শার্ম্মিলোপাখ্যান॥ —অনিষ্ঠুরতা, ক্ষমা, সত্য, অহিংসা, দম (ইন্দ্রিয়-সংযম,) সরলতা, ধ্যান, প্রসাদ (প্রসন্নতা, নির্ম্মলতা), মাধুর্য্য (ব্যবহারাদিতে রুক্ষতার অভাব) ও সন্তোষ—এই দশটীকে যম বলে।” মনুসংহিতার মতে, অহিংসা, সত্যবচন, ব্রহ্মচর্য্য, অকল্কতা বা দম্ভহীনতা, এবং অস্তেয় (চৌর্য্যহীনতা), এই পাঁচটীই যম; “অহিংসা সত্যবচনং ব্রহ্মচর্য্যমকল্ককতা। অস্তেয়মিতি পঞ্চেতে যমাশ্চৈব ব্রতানি চ॥” গরুড় পুরাণের মতে, ব্রহ্মচর্য্য, দয়া, ক্ষমা, ধ্যান, সত্য, দম্ভহীনতা, অহিংসা, অস্তেয়, মাধুর্য্য ও দম এই কয়টী যম। “ব্রহ্মচর্য্যং দয়া ক্ষান্তির্ধ্যানং সত্যমকল্কতা। অহিংসাঽস্তেয়মাধুর্য্যে দমশ্চৈতে যমাঃ স্মৃতাঃ॥ (শব্দকল্পদ্রুমধৃত প্রমাণসমূহ)।

নিয়ম—বেদান্তসারের মতে শৌচ, সন্তোষ, তপঃ, স্বাধ্যায় ও ঈশ্বর-প্রণিধান; এই পাঁচটীকে নিয়ম বলে—“শৌচং সন্তোষস্তপঃ স্বাধ্যায় ঈশ্বরপ্রণিধানঞ্চ।” তন্ত্রসারের মতে, তপঃ, সন্তোষ, আস্তিক্য, দান, দেবপূজা, সিদ্ধান্ত-শ্রবণ, লজ্জা, মতি, জপ ও হোম—এই দশটীকে নিয়ম বলে। “তপঃ সন্তোষ আস্তিক্যং দানং দেবস্য পূজনম্। সিদ্ধান্তশ্রবণবৈ হ্রীর্মতিশ্চ জপোহুতম্। দশৈতে নিয়মাঃ প্রোক্তা যোগশাস্ত্রবিশারদৈঃ॥” (শব্দকল্পদ্রুমধৃত প্রমাণ)।

স্কন্দপুরাণও একথা বলিয়া গিয়াছেন,

"এতে ন হ্যদ্ভুতা ব্যাধ তবাহিংসাদয়ো গুণাঃ।

হরিভক্তৌ প্রবৃত্তা যে ন তে স্যুঃ পরতাপিনঃ॥ —ভ, র, সি, ১।২।১২৮-ধৃত-স্কান্দবচন॥

[৫।৩৭গ-অনুচ্ছেদের শেষভাগে এই-শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য]

স্কন্দপুরাণ আরও বলিয়াছেন,

অন্তঃশুদ্ধি র্বহিঃশুদ্ধিস্তপঃশান্ত্যাদয়স্তথা। অমী গুণাঃ প্রপদ্যন্তে হরিসেবাভিকামিনাম্॥

—ভ, র, সি, ১।২।১২৮-ধৃত-প্রমাণ।

—অন্তঃশুদ্ধি, বাহ্যশুদ্ধি, তপস্যা এবং শান্তি-প্রভৃতি গুণ-সকল হরিসেবাভিলাষী ভক্তের আশ্রয় গ্রহণ করে।"

আর, জ্ঞান-সম্বন্ধে-শ্রীমদ্-ভাগবত-বলেন,

"বাসুদেবে ভগবতি ভক্তিযোগঃ প্রয়োজিতঃ।

জনয়ত্যাশু বৈরাগ্যং জ্ঞানঞ্চ যদহৈতুকম্॥ শ্রীভা ১।২।৭॥

—ভগবান্ বাসুদেবে প্রয়োজিত-ভক্তিযোগ শীঘ্রই বৈরাগ্য এবং অহৈতুক (শুষ্কতর্কাদির অগোচর ঔপনিষদ) জ্ঞান জন্মাইয়া থাকে।"

[টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-'অহেতুকং শুষ্কতর্কাদ্যগোচরম্ ঔপনিষদমিত্যর্থঃ।']

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল, ভক্তি-যোগের প্রভাবে সংসারে অনাসক্তিরূপ বৈরাগ্য তো জন্মেই, অধিকন্তু শ্রুতিকথিত তত্ত্বজ্ঞানও আপনা-আপনি জন্মিয়া থাকে—যে তত্ত্বজ্ঞান শুষ্কতর্কের অগোচর। পরব্রহ্মের ন্যায় পরব্রহ্ম-বিষয়ক তত্ত্বও স্বপ্রকাশ বস্তু; কেবলমাত্র ভক্তিদ্বারাই পরব্রহ্মকে এবং তাঁহার তত্ত্বাদিকে জানা যায়। "ভক্তিরেব এনৎ দর্শয়তি॥ মাঠর শ্রুতিঃ॥ ভক্ত্যা মামভিজানাতি॥ গীতা॥ ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ॥ শ্রীভাগবত॥" আবার ব্যতিরেকী মুখেও শাস্ত্র বলিয়া গিয়াছেন—ভগবান্ কেবল ভক্তিলভ্য,—যোগ-জ্ঞান-কর্ম্মাদির পক্ষে সুলভ নহেন। "ন সাধয়তি মাং যোগো ন সাংখ্যং ধর্ম্ম উদ্ধব। ন স্বাধ্যায়স্তপস্ত্যাগো যথা ভক্তির্মমোর্জ্জিতা॥ শ্রীভা, ১১।১৩।২০॥"

ভগবানের রূপ-গুণলীলামহিমাদির শ্রবণকীর্ত্তন হইতেছে ভক্তিমার্গের একটী প্রধান সাধনাঙ্গ। ভগবন্মহিমাদি-কথার এতাদৃশ অনুশীলন করিতে গেলে আনুষঙ্গিকভাবেই ভগবত্তত্ত্বাদি সাধারণভাবে অবগত হওয়া যায়; তাহাতে স্বতন্ত্রভাবে কোনওরূপ আয়াস স্বীকারও করিতে হয় না, সুতরাং চিত্তকাঠিন্য জন্মিবার আশঙ্কাও থাকে না। হৃৎকর্ণ-রসায়ন-ভগবৎকথারসের স্রোতে প্রবাহিত হইয়া, কথারসে সর্ব্বতোভাবে পরিনিষিক্ত হইয়াই তত্ত্বকথাগুলি কর্ণের ভিতর দিয়া হৃদয়ে প্রবেশ করে; কথারসে সর্ব্বতোভাবে পরিনিষিক্ত হইয়া আসে বলিয়া তাহারা সরস, সুকোমল এবং সুখশ্রাব্যরূপেই গৃহীত হয়। এইভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের আনুষঙ্গিকভাবে যে তত্ত্বজ্ঞান লাভ হয়, তদ্দ্বারা চিত্তকাঠিন্য জন্মিবার কোনও আশঙ্কাই থাকিতে পারে না।

জ্ঞান-বৈরাগ্যলাভের জন্য স্বতন্ত্রপ্রয়াস পরিত্যাজ্য

উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে জীব-ব্রহ্মের ঐক্য জ্ঞান এবং ফল্গু বৈরাগ্য সর্ব্বতোভাবে বর্জ্জনীয়; কেননা, এই দুইটী বস্তু ভক্তিবিরোধী। জীব ও ব্রহ্মের তত্ত্ববিষয়ক জ্ঞান এবং যুক্তবৈরাগ্য সাধকের ভজনের সহায়করূপে অনুকূল; কিন্তু এই দুইটীও সাধনের অঙ্গ নহে। প্রথম অবস্থায় ভক্তি-সাধনে প্রবেশের জন্য অন্যাবেশ দূর করার নিমিত্ত ভগবত্তত্ত্বাদির কিঞ্চিৎ জ্ঞান এবং কিঞ্চিৎ যুক্তবৈরাগ্যের প্রয়োজনীয়তা আছে বটে; কিন্তু ভক্তিমার্গে প্রবেশের পরে তাহাদের আর প্রয়োজনীয়তা থাকেনা; তখন বরং তাহারা ভক্তিসাধনের বিঘ্ন জন্মায়। ভক্তিমার্গের সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে আনুষঙ্গিকভাবেই ভগবত্তত্ত্বাদি বিনা আয়াসে অবগত হওয়া যায় এবং ভক্তিসাধনে রুচি জন্মিলে সংসারাসক্তিও ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকে, অর্থাৎ আপনা-আপনিই বৈরাগ্য আসিয়া পড়ে। সুতরাং জীব ও ব্রহ্মের তত্ত্বজ্ঞান লাভের নিমিত্ত, কিম্বা শাস্ত্রবিহিত যুক্তবৈরাগ্য লাভের নিমিত্তও স্বতন্ত্র প্রয়াস পরিত্যাজ্য।

ষষ্ঠ অধ্যায়
বিভিন্ন সাধন-পন্থা

৪২। অভীষ্ট-ভেদে সাধন-পন্থার ভেদ

সকলের অভীষ্ট এক রকম নহে। প্রত্যেকেই স্বীয় অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল সাধনপন্থা অবলম্বন করেন। বিভিন্ন সাধকের অভীষ্ট বিভিন্ন বলিয়া তাঁহাদের সাধন-পন্থাও বিভিন্ন।

সাধারণতঃ এই কয় রকমের সাধনপন্থার কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়— কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ ও ভক্তিমার্গ।

কর্ম্মমার্গ

কর্ম্মমার্গ আবার দুই রকমের **সকাম কর্ম্ম** ও **নিষ্কামকর্ম্ম**। যাঁহারা ইহকালের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, বা পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগ কামনা করেন, তাঁহাদের পন্থার নাম সকাম-কর্ম্মমার্গ। সকামভাবে বেদবিহিত বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের, বা স্বধর্ম্মের অনুষ্ঠানই তাঁহাদের কর্ত্তব্য।

আর, যাঁহারা মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, তাঁহারা নিষ্কাম-কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠেয়ও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মাদিই ; তবে তাঁহারা তাহা করেন নিষ্কামভাবে, কর্ম্মের ফলাকাঙ্ক্ষা পরিত্যাগপূর্ব্বক। নিষ্কাম-কর্ম্মের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হয় , চিত্ত শুদ্ধ হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে।

যোগ মার্গ। যাঁহারা পরমাত্মার সহিত মিলন চাহেন, তাঁহাদের সাধন-পন্থাকে বলে যোগমার্গ। পরমাত্মার সহিত মিলনও বস্তুতঃ সাযুজ্য মুক্তি, পরমাত্মার সহিত সাযুজ্যপ্রাপ্তি।

জ্ঞানমার্গ। যাঁহারা ব্রহ্মসাযুজ্যকামী, তাঁহাদের সাধন-পন্থাকে বলে জ্ঞানমার্গ। জ্ঞানের তিনটী অঙ্গের মধ্যে ইঁহারা তৃতীয় অঙ্গটীরই (অর্থাৎ জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞানেরই) অনুশীলন করিয়া থাকেন (৫।৪১ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং জ্ঞানমার্গ হইতেছে একটা পারিভাষিক শব্দ।

জ্ঞানমার্গের, বা যোগমার্গের সাধক ভগবৎকৃপায় মোক্ষলাভ করিলে চিৎকণরূপেই ব্রহ্মে বা পরমাত্মায় অবস্থান করেন। তাঁহার পৃথক্ কোনও দেহ থাকে না, কিন্তু পৃথক্ অস্তিত্ব থাকে।

ভক্তিমার্গ। যাঁহারা মোক্ষ লাভ করিয়া ভগবৎসেবাকামী, তাঁহাদের সাধন-পন্থাকে বলে ভক্তিমার্গ। ভক্তিমার্গের সাধক মোক্ষলাভের পরে পৃথক্ চিন্ময় পার্ষদদেহে ভগবদ্ধামে অবস্থান করেন।

৪৩। ভক্তিমার্গ

ভজনে প্রবর্ত্তক ভাবভেদে ভক্তিমার্গও দুই রকমের—বিধিমার্গ (বা শাস্ত্রবিধি-প্রবর্ত্তিত মার্গ) এবং রাগমার্গ বা রাগানুগাভক্তিমার্গ (৫।২৬ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

বিধিমার্গের ভক্তগণ সালোক্যাদি (অর্থাৎ সালোক্য, সারূপ্য, সামীপ্য ও সার্ষ্টি—এই চতুর্ব্বিধা মুক্তির মধ্যে স্ব-স্ব অভিপ্রায় অনুসারে কোনও এক রকমের) মুক্তি পাইয়া পরব্যোমে, বা বৈকুণ্ঠে ভগবৎপার্ষদত্ব লাভ করেন।

রাগমার্গে বা রাগানুগামার্গের ভক্তগণ পার্ষদদেহে ব্রজে ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করিয়া থাকেন।

এই দুইটী ভক্তিমার্গ সম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে আলোচনা করা হইতেছে।

৪৪। বিধিমার্গ

বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পালনে স্বর্গাদি লাভ হইতে পারে ; কিন্তু স্বর্গ হইতেও পুণ্যশেষে আবার ফিরিয়া আসিতে হয় ; আবার জন্ম-মৃত্যু, রোগ-শোক, স্বর্গ-নরক। শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে জন্ম-মৃতু-রোগশোক-নরকাদির অবসান নাই। কেননা, সংসার-যন্ত্রণার হেতু হইতেছে মায়াবন্ধন। শ্রীকৃষ্ণের ভজন না করিলে মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না। গীতাতে শ্রীকৃষ্ণ তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥৭।১৪॥"

"চারিবর্ণাশ্রমী যদি কৃষ্ণ নাহি ভজে।
স্বকর্ম্ম করিতে সেই রৌরবে পড়ি মজে॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২।১৯॥"

শ্রীমদ্‌ভাগবতও বলেন—

"মুখবাহূরুপাদেভ্যঃ পুরুষস্যাশ্রমৈঃ সহ। চত্বারো জজ্ঞিরে বর্ণা গুণৈর্বিপ্রাদয়ঃ পৃথক্॥
য এষাং পুরুষং সাক্ষাদাত্মপ্রভবমীশ্বরম্। ন ভজন্ত্যবজানন্তি স্থানাদ্‌ভ্রষ্টাঃ পতন্ত্যধঃ॥
শ্রীভা, ১১।৫।২-৩॥

—পুরুষের (ভগবানের) মুখ, বাহু, উরু ও চরণ হইতে সত্ত্বাদিগুণ তারতম্যে পৃথক্ পৃথক্ বিপ্রাদি চারিবর্ণের—চারি আশ্রমের সহিত—উৎপত্তি হইয়াছে। এই চারিবর্ণের, কি চারি আশ্রমের মধ্যে যাঁহারা অজ্ঞতাবশতঃ নিজেদের উৎপত্তির মূল ঈশ্বর-পুরুষের ভজন করেন না, তাঁহারা স্থানভ্রষ্ট (বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট) হইয়া অধঃপতিত হয়েন (সংসারের অনিবৃত্তিই তাঁহাদের অধঃপাত-শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী)। আর, যাঁহারা জানিয়াও সেই আত্মপ্রভব ভগবানের ভজন করেন না, সুতরাং অবজ্ঞাই করেন, তাঁহারাও স্থানভ্রষ্ট (বর্ণাশ্রম হইতে ভ্রষ্ট) হইয়া অধঃপতিত হয়েন— (মহা-নরকে পতিত হয়েন—চক্রবর্ত্তিপাদ। অবজ্ঞাবশতঃ তাঁহাদের কৃতঘ্নতাদি অপরাধও হইয়া থাকে—শ্রীধরস্বামিপাদ)।"

তাহা হইলে উপায় কি ? কিরূপে সংসার-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায় ? শাস্ত্র তাহাও বলিয়াছেন।

"তস্মাদ্ ভারত সর্ব্বাত্মা ভগবান্ হরিরীশ্বরঃ।
শ্রোতব্যঃ কীর্ত্তিতব্যশ্চ স্মর্ত্তব্যশ্চেচ্ছতাভয়ম্॥ শ্রীভা, ২।১।১৫॥

—(শ্রীশুকদেব পরীক্ষিৎ-মহারাজকে বলিয়াছেন) হে ভরতবংশ্য পরীক্ষিৎ! (গৃহাসক্ত ব্যক্তি-গণ বিত্ত-পুত্র-কলত্রাদিতে আসক্ত হইয়া নিজেদের মায়াবন্ধন দৃঢ়তর করিয়া তুলিতেছে বলিয়া তাহাদের মধ্যে) যাহারা অভয় (মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি) ইচ্ছা করে, তাহাদের পক্ষে সর্ব্বাত্মা ভগবান্ শ্রীহরির গুণলীলাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন এবং স্মরণই কর্ত্তব্য।"

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্ব্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ।
সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।২।৫)-ধৃত পাদ্মোত্তর (৭২।১০০)-বচনম্॥

—সর্ব্বদা বিষ্ণুর স্মরণ করা কর্ত্তব্য; কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হওয়া উচিত নহে। যত বিধি ও নিষেধ আছে, তৎসমস্তই—এই তুই বিধি-নিষেধের কিঙ্কর (অধীন, অনুপূরক-পরিপূরক)।"

উল্লিখিতরূপ শাস্ত্রবাক্যাদির আলোচনা করিয়া যাঁহারা মনে করেন—শ্রীকৃষ্ণভজন ব্যতীত যখন সংসার-যন্ত্রণা হইতে অব্যাহতি লাভ হইতে পারে না, তখন শ্রীকৃষ্ণভজন না করিলে তো চলিবে না; অবশ্যই শ্রীকৃষ্ণভজন করিতে হইবে। তখন তাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন। তাঁহাদের ভজনের এই প্রবৃত্তি জন্মে একমাত্র শাস্ত্রবিধি হইতে। এজন্য তাঁহাদের ভজনকে বলা হয় **বিধিমার্গের** (বিধিকর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত মার্গের) ভজন এবং তাঁহাদের ভক্তিসাধনকেও বলা হয় **বিধিভক্তি** (শাস্ত্রবিধি-কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত ভক্তি বা ভক্তিসাধন)।

অন্ততঃ প্রথম অবস্থাতে বিধিমার্গের সাধকের ভগবানে প্রীতি থাকে না; ভগবানের সেবা লাভের উদ্দেশ্যেও তিনি ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন না। তিনি ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন কেবল নিজের সংসার-নিবৃত্তির জন্য, ভজন তাহার উপায়মাত্র। অবশ্য ভগবৎকৃপায় ভজনে অগ্রসর হইলে ভগবানে প্রীতি জন্মিতেও পারে।

বিধিমার্গের সাধকগণের মধ্যে ভগবানের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান বিশেষরূপে প্রাধান্য লাভ করে। তাঁহাদের ভজনের আরম্ভই হয় ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের আশ্রয়ে। ভগবান্ স্বর্গ-নরকাদি কর্ম্মফলদাতা এবং তিনিই একমাত্র মুক্তিদাতা; সুতরাং তিনি ঈশ্বর, তাঁহার অনন্ত ঐশ্বর্য্য। সাধনের পরিপক্ক অবস্থাতেও যদি তাঁহাদের মধ্যে এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানেরই প্রাধান্য থাকে, তাহা হইলে তাঁহাদের গতিও হইবে ভগবানের ঐশ্বর্য্যপ্রধান ধামে—বৈকুণ্ঠে বা পরব্যোমে। সেই ধামে তাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি লাভ করিবেন।

"ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে বিধি-ভজন করিয়া।
বৈকুণ্ঠেতে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পায়্যা॥ শ্রীচৈ,চ, ১।৩।১৫॥"

বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্য বলিয়া ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বিশুদ্ধপ্রেম এবং ব্রজবিলাসী ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা পাওয়া যায় না।

"বিধিভক্ত্যে ব্রজভাব পাইতে নাহি শক্তি। শ্রীচৈ,চ, ১।৩।১৩॥"

"বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥ শ্রীচৈ,চ, ২।৮।১৮২॥"

৪৫। রাগমার্গ

ক। রাগ

রাগমার্গের তাৎপর্য্য বুঝিতে হইলে "রাগ" বলিতে কি বুঝায়, তাহা জানা দরকার। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুতে রাগের লক্ষণ এইরূপ কথিত হইয়াছে :—

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ। ভ, র, সি, ১।২।১৩১॥

—অভীষ্ট বস্তুতে স্বাভাবিকী যে একটা প্রেমময়ী তৃষ্ণা (অভীষ্টবস্তুর সেবাদ্বারা তাঁহাকে সুখী করার তীব্রবাসনা) থাকে, তাহার ফলে ইষ্টবস্তুতে (শ্রীকৃষ্ণে) একটা পরমাবিষ্টতা জন্মিয়া থাকে। যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা হইতে এই পরমাবিষ্টতা উৎপন্ন হয়, সেই প্রেমময়ী তৃষ্ণার নাম হইতেছে রাগ।"

[ইষ্টে স্বানুকূল্যবিষয়ে স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা তস্যাঃ হেতুঃ প্রেমময়-তৃষ্ণেত্যর্থঃ। সা রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তিরায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ॥ শ্রীজীবগোস্বামিকৃত-টীকা॥]

রাগের উল্লিখিত লক্ষণ শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে এইরূপে বিবৃত হইয়াছে :—

"ইষ্টে গাঢ় তৃষ্ণা 'রাগ'—এই স্বরূপ লক্ষণ।
ইষ্টে আবিষ্টতা—এই তটস্থ লক্ষণ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২।৮৬॥"

এই পয়ারে রাগের স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে। বস্তুতঃ কোনও বস্তুর পরিচয় পাওয়া যায়—তাহার স্বরূপলক্ষণে এবং তটস্থ লক্ষণে। এ-স্থলে রাগের এই দুইটী লক্ষণের কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

খ। রাগের স্বরূপলক্ষণ

ইষ্টে গাঢ়তৃষ্ণা—ইষ্টবস্তুতে যে গাঢ় তৃষ্ণা, বা বলবতী লালসা, তাহাই রাগের স্বরূপ-লক্ষণ ; অর্থাৎ বলবতী লালসাই রাগ ; ইহাদ্বারাই রাগ গঠিত ; বলবতী লালসার আকৃতি এবং প্রকৃতি যাহা, রাগের আকৃতি এবং প্রকৃতিও তাহাই। এস্থলে রাগকে তৃষ্ণা বলা হইয়াছে ; তৃষ্ণার স্বরূপ কি, তাহা আলোচনা করিলেই রাগের স্বরূপ আরও পরিষ্কার রূপে বুঝা যাইবে। জল-পানের ইচ্ছাকে তৃষ্ণা বলে। দেহে যখন প্রয়োজনীয় জলীয় অংশের অভাব হয়, তখনই তৃষ্ণার উৎপত্তি। তৃষ্ণা হইলেই জলপানের জন্য একটা উৎকণ্ঠার উদয় হয় ; তৃষ্ণা যতই গাঢ় হয়, উৎকণ্ঠাও ততই প্রবল হইয়া উঠে ;

শেষকালে এমন অবস্থা হয় যে, জল না পাইলে আর প্রাণেই যেন বাঁচা যায় না। তৃষ্ণার এই অবস্থাতেই তাকে গাঢ়তৃষ্ণা বলে। ইহাই হইল তৃষ্ণার আসল অর্থ। তারপর, কোনও বস্তু লাভ করিবার জন্য একটা বলবতী আকাঙ্ক্ষা যখন হৃদয়ে উত্থিত হয়, তখন ঐ আকাঙ্ক্ষাজনিত উৎকণ্ঠার সাম্যে, ঐ আকাঙ্ক্ষাকেও তৃষ্ণা বলা হয়। তৃষ্ণায় যেমন জল পাইবার জন্য উৎকণ্ঠা জন্মে, আকাঙ্ক্ষাতেও বাঞ্ছিত বস্তুটী পাওয়ার জন্য উৎকণ্ঠা জন্মে; এজন্য আকাঙ্ক্ষাকে তৃষ্ণা বলা হয়। এস্থলে এই বলবতী আকাঙ্ক্ষার অর্থেই তৃষ্ণা-শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। ইষ্টবস্তুর জন্য যে আকাঙ্ক্ষা, তাহাই তৃষ্ণা। কিন্তু "ইষ্টবস্তুর জন্য আকাঙ্ক্ষা" বলিতে কি বুঝায়? বলা যাইতে পারে, ইষ্টবস্তু পাওয়ার জন্য আকাঙ্ক্ষা। কিন্তু ইষ্টবস্তুর পাওয়া কিসের জন্য? সেবার জন্য। ইষ্টবস্তুর সেবা দ্বারা তাঁহাকে সুখী করার জন্য যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা বা লালসা, তাহাই যখন অত্যন্ত বলবতী হয়—তাহাই যখন এমন বলবতী হয় যে, তজ্জনিত উৎকণ্ঠায় "প্রাণ যায় যায়" অবস্থা হয়, তখন তাহাকে রাগ বলে। জলের অভাব-বোধে যেমন তৃষ্ণার উৎপত্তি, তদ্রূপ ইষ্টবস্তুর সেবার অভাব বোধে—"আমি আমার ইষ্টবস্তুর সেবা করিতে পারিতেছি না, তাঁহার না জানি কতই কষ্ট হইতেছে,"—এইরূপ বোধে—সেবা-বাসনার উৎপত্তি।

একটী কথা এখানে স্মরণ রাখিতে হইবে যে, তৃষ্ণা যেমন প্রাকৃত মনের একটা বৃত্তি, শ্রীকৃষ্ণরূপ ইষ্টবস্তুর সেবা-বাসনা সেইরূপ প্রাকৃত মনের একটা বৃত্তি নহে। ইহা চিচ্ছক্তির একটা বৃত্তি-বিশেষ; শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা—স্বরূপ-শক্তির বিলাস-বিশেষ।

গ। রাগের তটস্থ লক্ষণ

ইষ্টে আবিষ্টতা—ঐ ইষ্টবস্তুর প্রীতির উদ্দেশ্যে তাঁহার প্রেমময়-সেবা-বাসনার ফলে ইষ্টবস্তুতে যে পরম-আবিষ্টতা জন্মে, তাহাই রাগের তটস্থ-লক্ষণ। আবিষ্টতা অর্থ তন্ময়তা। আবিষ্ট অবস্থায় লোকের বাহ্যস্মৃতি থাকে না; নিজে যে কে, কি তাহার কার্য্য, কি তাহার স্বভাব, তাহার কিছু জ্ঞানই থাকে না; যে বিষয় ভাবিতে থাকে, ঠিক সেই বিষয়ের সহিতই যেন তাদাত্ম্য প্রাপ্তহয়। ভূতাবিষ্ট অবস্থায় লোক ভূতের মতই ব্যবহার করে, নিজের স্বাভাবিক কার্য্য তাহার কিছুই থাকে না। এইরূপই আবেশের লক্ষণ। ইষ্টবস্তুর কথা ভাবিতে ভাবিতে যখন কাহারও চিত্তে আবেশ আসে, তখন তাঁহার মনে হয়, তিনি যেন বাস্তবিক ইষ্টের সেবাই করিতেছেন; তিনি যে বসিয়া বসিয়া চিন্তা মাত্র করিতেছেন—একথাই তাঁহার আর মনে থাকে না। অথবা, যদি ইষ্টবস্তুর গুণক্রিয়াদির কথা চিন্তা করিতে করিতে আবেশ আসে, তখন তিনি অনেক স্থলে তাঁহার ইষ্টবস্তুর মতনই ব্যবহারাদি করিতে থাকেন—যেমন, শ্রীরাসে শ্রীকৃষ্ণের অন্তর্ধানের পরে ব্রজগোপীদের মধ্যে কেহ কেহ নিজেকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। ইষ্টবস্তুর কোনও কার্য্যের কথা ভাবিতে ভাবিতে কার্য্যের সহায়তাকারী অন্য কোনও বস্তুর চিন্তা ঘনীভূত হইলে, সেই বস্তুর আবেশও হইয়া থাকে; যেমন শ্রীরাসে কোনও গোপী নিজেকে পূতনা, বা বকাসুর ইত্যাদি মনে করিয়া তদ্রূপ আচরণ করিয়াছিলেন।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এ স্থলে "স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা" লিখিয়াছেন। "স্বারসিকী"-শব্দের

অর্থ স্ব-রস-সম্বন্ধীয় ; স্ব-রস-শব্দের অর্থ নিজের রস। তাহা হইলে "স্বারসিকী পরমাবিষ্টতা"-শব্দদ্বারা বুঝা যাইতেছে যে, যাহার সেই রস, যেই রসোচিত আবিষ্টতা,—যিনি যেই রসের পাত্র, সেই রস তাঁহার ইষ্ট-শ্রীকৃষ্ণকে পান করাইবার বলবতী বাসনায় যে আবিষ্টতা ; অথবা, যিনি যেই ভাবের আশ্রয়, সেই ভাবোচিত সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণকে প্রীত করিবার নিমিত্ত বলবতী-লালসা-বশতঃ যে পরমাবিষ্টতা, তাহাই রাগের তটস্থ-লক্ষণ। এজন্যই শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ "স্বারসিকী"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "স্বাভাবিকী"—স্বীয়-ভাবোচিত। এইরূপ আবিষ্টতা, তদুচিত কার্য্যদ্বারা বুঝা যায় বলিয়া ইহাকে তটস্থ-লক্ষণ বলা হইয়াছে। এ-স্থলে স্বাভাবিকী আবিষ্টতার দু'একটী উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। শ্রীকৃষ্ণ যখন মথুরায় গিয়াছিলেন, তখন বাৎসল্যের প্রতিমূর্ত্তি যশোদামাতা, তাঁহার প্রাণ-গোপালের ভাবনায় এতই আবিষ্ট হইয়া পড়িতেন যে, মাঝে মাঝে ননী হাতে করিয়া "বাছা, গোপাল, ননী খাও"—বলিয়া প্রাতঃকালে ঘর হইতে বাহির হইতেন। গোপাল যে ব্রজে নাই, ইহাই তাঁহার মনে থাকিতনা। ইহাই পরমাবিষ্টতার লক্ষণ ; বাৎসল্যরসে গলিয়া মা যেমন ছোট ছেলেকে ননী-মাখন খাওয়াইবার জন্য ব্যাকুল হয়েন, যশোদা-মাতাও তদ্রূপ ব্যাকুল হইতেন ; ইহাই তাঁহার নিজভাবের, বা নিজ রসের অনুকূল (স্বারসিকী) আবিষ্টতা। (যশোদা মাতা বাৎসল্য-রসের পাত্র)। শ্রীকৃষ্ণের মথুরায় অবস্থান-কালে কৃষ্ণপ্রিয়া ব্রজসুন্দরীগণ নিজ নিজ ভাবে এতই আবিষ্ট হইতেন যে, কৃষ্ণ যে ব্রজে নাই, তাহাই তাঁহারা সময় সময় ভুলিয়া যাইতেন ; এবং কৃষ্ণের সহিত মিলনের আশায় কুঞ্জাদিতে অভিসারও করিতেন ; কুঞ্জনিকটে তমালাদি দর্শন করিয়া, কিম্বা আকাশে নবীন-মেঘাদি দর্শন করিয়া নিজেদের প্রাণকান্ত সমাগত বলিয়াই মনে করিতেন; অনেক সময় তমালাদি-বৃক্ষকে কৃষ্ণ-জ্ঞানে আলিঙ্গনও করিতেন। কান্তাভাবের আশ্রয় ব্রজগোপীগণের এই আচরণই তাঁহাদের ভাবোচিত হইয়াছে। ইহা তাঁহাদের স্বারসিকী (মধুর-রসোচিত) পরমাবিষ্টতার লক্ষণ। মিলনাবস্থায়ও নিজ নিজ ভাবোচিত সেবার কার্য্যে কখনও কখনও তাঁহারা এমন তন্ময় হইয়া পড়িতেন যে, তাঁহাদের বাহ্যস্মৃতির লেশমাত্রও থাকিত না ; পরমাবেশের ফলে, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-সেবার যে-কার্য্যে রত থাকিতেন, সেই কার্য্য ব্যতীত তাঁহার অপর কিছুরই যেন জ্ঞান থাকিতনা ; নিজের কথা তো মনে থাকিতই না, অনেক সময় যাঁহার সেবা করিতেন, তাঁহার কথাও যেন মনে থাকিত না, মনে থাকিত সেবাটুকু মাত্র। এইরূপ যে সেবামাত্রৈক-তন্ময়তা, ইহাই পরমাবিষ্টতা। মধুর-ভাবোচিত এইরূপ বিলাসমাত্রৈক-তন্ময়তাময়-সেবার সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে—"না সো রমণ না হাম রমণী॥" ইহা শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাবের বৈচিত্রী-বিশেষ—"স্বারসিকী পরমাবিষ্টতার" একটী দৃষ্টান্ত।

যিনি যেই রসের পাত্র, শ্রীকৃষ্ণসম্বন্ধে তাঁহার পক্ষে সেই রসের পরিচায়ক কার্য্যাদিতে আবিষ্ট হওয়াই তাঁহার স্বারসিকী-পরমাবিষ্টতা, এবং ইহাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহার "রাগের" পরিচায়ক।

এই রাগের বা তৃষ্ণার একটী অপূর্ব্ব বিশেষত্ব এই যে, ইহার কখনও শান্তি নাই। প্রাকৃত মনের বৃত্তি যে তৃষ্ণা, জল পান করিলেই তাহার শান্তি হয় ; কিন্তু রাগাত্মিকা যে তৃষ্ণা, শ্রীকৃষ্ণ-সেবা

করিয়াও তাহার শান্তি হওয়া তো দূরের কথা, বরং এই তৃষ্ণা উত্তরোত্তর বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হয়। "তৃষ্ণা-শান্তি নহে, তৃষ্ণা বাঢ়ে নিরন্তর ॥ শ্রীচৈ, চ. ১।৪।১৩০ ॥" এই জন্যই সেবাসুখের আস্বাদ্যতা মন্দীভূত হয় না। প্রাকৃত-জগতে বলবতী ক্ষুধা যখন বর্ত্তমান থাকে, তখন উপাদেয় খাদ্য অত্যন্ত মধুর বলিয়া অনুভূত হয়। কিন্তু আহারের সঙ্গে সঙ্গে যতই ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতে থাকে, ততই খাদ্য বস্তুর মধুরতার অনুভবও কমিতে থাকে। ক্ষুন্নিবৃত্তি হইয়া গেলে অমৃততুল্য বস্তুতেও অরুচি জন্মে। কিন্তু আহারের সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধা না কমিয়া যদি ক্রমশঃ বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইত, তাহা হইলেই অপর্য্যাপ্ত ভোজ্য-রস-আস্বাদন-লালসার চরিতার্থতা হইত। প্রাকৃত-জগতে ইহা অসম্ভব। চিচ্ছক্তির বিলাস যে প্রেমময়ী তৃষ্ণা, তাহার স্বরূপগত ধর্ম্মই এই যে, আকাঙ্ক্ষিত বস্তুটী যতই পান করা যায়, ততই এই তৃষ্ণা বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইতে থাকে ; এজন্যই সেই আকাঙ্ক্ষিত বস্তু (নিজ ভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণ-সেবাসুখ ও শ্রীকৃষ্ণ-মাধুর্য্য) যতই আস্বাদন করা যাউক না কেন, ইহা প্রতি-মুহূর্ত্তেই নিত্য নূতন বলিয়া অনুভূত হয়—যেন পূর্ব্বে আর কখনও ইহার আস্বাদন করা হয় নাই, যেন এই-ই সর্ব্বপ্রথম আস্বাদন করা হইতেছে।

এই গেল রাগের লক্ষণ। রাগের লক্ষণ বলিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণ বলিয়াছেন।

ঘ। রাগাত্মিকা ভক্তি

পূর্ব্বে রাগের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, সেই লক্ষণান্বিত-রাগময়ী ভক্তির নাম হইতেছে রাগাত্মিকা ভক্তি।

"ইষ্টে স্বারসিকী রাগঃ পরমাবিষ্টতা ভবেৎ।
তন্ময়ী যা ভবেদ্ভক্তিঃ সাত্র রাগাত্মিকোদিতা ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৩১ ॥"
"রাগময়ী ভক্তির হয় রাগাত্মিকা নাম ॥ শ্রীচৈ, চ ২।২২।৮৭ ॥"

নিত্যবৃদ্ধিশীলা উৎকট-উৎকণ্ঠাময়ী যে শ্রীকৃষ্ণসেবা-লালসা, তাহাই রাগাত্মিকা সেবার প্রবর্ত্তক। "তন্ময়ী তদেকপ্রেরিতা। তৎপ্রকৃতবচনে ময়ট্ ॥ ভ, র, সি, টীকায় শ্রীজীব।"

রাগাত্মিকা ভক্তিতে রাগেরই আধিক্য ; এজন্য "রাগাত্মিকা—রাগই আত্মা যাহার" বলা হইয়াছে। আয়ুর বর্দ্ধক বলিয়া ঘৃতকে যেমন আয়ুঃ বলা হয়, তদ্রূপ রাগাত্মিকাতে রাগের আধিক্য-বশতঃই রাগ ও রাগাত্মিকার অভেদের কথা বলা হইয়াছে। "সা রাগো ভবেৎ তদাধিক্যহেতুতয়া তদভেদোক্তিরায়ুর্ঘৃতমিতিবৎ ॥ টীকায় শ্রীজীব।" রাগই হইতেছে রাগাত্মিকার স্বরূপ—ইহাই তাৎপর্য্য।

(১) রাগাত্মিকা ভক্তি স্বতন্ত্রা

রাগাত্মিকা ভক্তি স্বরূপতঃ "রাগ—স্বরূপ-শক্তি" বলিয়া এবং স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায় শ্রীকৃষ্ণের সেবায় কেবল স্বরূপশক্তিরই অধিকার বলিয়া এই রাগাত্মিকা ভক্তিও হইতেছে স্বতন্ত্রা, সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষা। সেবার ব্যাপারে এই ভক্তি তাহার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণেরও অপেক্ষা

রাখে না ; কেননা শ্রীকৃষ্ণও ভক্তির বশীভূত, প্রভাবে ভক্তি শ্রীকৃষ্ণ অপেক্ষাও গরীয়সী। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ। ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ মাঠর-শ্রুতিঃ ॥"

ঙ। রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয়—

রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয় সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

বিরাজন্তীমভিব্যক্তং ব্রজবাসিজনাদিষু।
রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ১।২।১৩১॥

—ব্রজবাসিজনাদিতে এই রাগাত্মিকা অভিব্যক্ত রূপে বিরাজিত। রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তির নাম রাগানুগা।"

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও শ্রীপাদ-সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন,

রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগতা ভক্তি 'রাগানুগা' নামে ॥ শ্রীচৈ, চৈ, ২।২২।৮৫॥

এ-সম্বন্ধে একটু আলেচনা করা হইতেছে।

এ স্থলে-ব্রজবাসী-শব্দের তাৎপর্য্য কি ? যিনি ব্রজে বাস করেন, তাঁহাকেই ব্রজবাসী -বলা যাইতে পারে ; কিন্তু যাঁহারা ব্রজে (শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানে) বাস করেন, তাঁহাদের মধ্যে রকম-ভেদ থাকিতে পারে—যেমন, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্ত বিগ্রহরূপ অনাদিসিদ্ধ-পরিকরগণ (নন্দযশোদা, শ্রীরাধা-ললিতা-বিশাখাদি), পরিকর-ভুক্ত-নিত্যমুক্ত-জীব, সাধনসিদ্ধ জীব ইত্যাদি। ইঁহাদের মধ্যে কোন্ রকমের "ব্রজবাসী" এ-স্থলে অভিপ্রেত ? না কি সকল রকমের ব্রজবাসীই এ-স্থলে অভিপ্রেত ?

একটী বৃক্ষে বৃক্ষের শাখা-প্রশাখাদিও থাকে, নানাবিধ কৃমি-কীটও থাকে, পক্ষী বা সর্পাদিও থাকে ; সকলকেই বৃক্ষবাসী বলা যায় ; কিন্তু ইহাদের স্বরূপের এবং অবস্থানের রকমভেদ আছে। কৃমিকীটাদি, কি পক্ষি-সরীসৃপাদি হইতেছে বৃক্ষ হইতে স্বরূপতঃ ভিন্ন বস্তু ; তাহারা হইতেছে আগন্তুক, সর্ব্বদা বৃক্ষে অবস্থানও করেনা ; বৃক্ষের প্রথমাবস্থা হইতেও তাহারা বৃক্ষে বাস করেনা ; কোনও কোনওটী বা একবার চলিয়া গেলে আর বৃক্ষে ফিরিয়াও আসেনা। কিন্তু শাখা-প্রশাখাদি "বৃক্ষবাসী" হইলেও ইহাদের মত "বৃক্ষবাসী" নহে। শাখা-প্রশাখাদি হইতেছে বৃক্ষের অঙ্গীভূত, বৃক্ষের উপাদানে এবং শাখা-প্রশাখাদির উপাদানে কোনও পার্থক্য নাই, তাহারা বৃক্ষের স্বরূপভূত ; বৃক্ষের প্রথমাবস্থা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বদাই তাহারা বৃক্ষে অবস্থিত। এইরূপে দেখা যায়—স্বরূপের এবং অবস্থানের বিবেচনায় কৃমিকীট-পক্ষি-সরীসৃপাদিরূপ "বৃক্ষবাসী" হইতে শাখা-প্রশাখাদিরূপ "বৃক্ষবাসীর" পার্থক্য বিদ্যমান। শাখা-প্রশাখাদির অবস্থান স্বাভাবিক, কৃমিকীটাদির অবস্থান স্বাভাবিক নহে ; শাখা-প্রশাখাদির পক্ষে বৃক্ষে অবস্থান হইতেছে অন্যনিরপেক্ষ ; কিন্তু কৃমিকীটাদির অবস্থান অন্যনিরপক্ষ নহে, তাহাদের অবস্থান বৃক্ষের অবস্থা, সময় এবং তাহাদের প্রয়োজনাদির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং শাখা-প্রশাখাদিকে এবং কৃমিকীটাদিকে একই প্রকারের "বৃক্ষবাসী" বলা যায় না। কৃমিকীটাদির অবস্থান অন্যনিরপেক্ষ

এবং স্বাভাবিক নহে বলিয়া তাহাদিগকে বাস্তবিক "বৃক্ষবাসী" বলাও সঙ্গত হয়না। কিন্তু শাখা-প্রশাখাদির অবস্থান অন্যনিরপেক্ষ এবং স্বাভাবিক বলিয়া তাহাদিগকেই স্বরূপতঃ "বৃক্ষবাসী" বলা সঙ্গত। যাঁহার গৃহ, তিনিও "গৃহবাসী", আর যিনি কিছু সময়ের জন্য গৃহস্বামীর অনুমোদনে সেই গৃহে আসিয়া বাস করেন, তিনিও "গৃহবাসী"--কিন্তু তিনি কেবল অল্পসময়ের জন্য সেই গৃহে "গৃহবাসী"; বস্তুতঃ এই আগন্তুক "গৃহবাসীকে" কেহই সেই গৃহের গৃহবাসী বা বাসিন্দা বলেও না, গৃহস্বামীকেই সেই গৃহের বাসিন্দা বা "গৃহবাসী" বলা হয়।

তদ্রূপ, যাঁহাদের ব্রজে বাস অন্যনিরপেক্ষ, স্বাভাবিক, ব্রজের সহিত স্বরূপতঃ যাঁহাদের কোনও ভেদ নাই, উল্লিখিত শ্লোকে এবং পয়ারে তাঁহাদিগকেই "ব্রজবাসী" বলা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। কিন্তু তাঁহারা কাহারা? এই প্রশ্নের উত্তর নির্ণয় করিতে হইলে কয়েকটী বিষয়ের বিচার আবশ্যক।

প্রথমতঃ, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরভুক্ত সাধনসিদ্ধ-জীব। ব্রজধামের সহিত ইঁহাদের স্বরূপগতঃ ভেদ বিদ্যমান। ব্রজধাম হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির একরকমের বিলাস—সুতরাং স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তি; কিন্তু জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের জীবশক্তির অংশ—স্বরূপতঃ জীবশক্তি, ব্রজধাম বা স্বরূপশক্তি হইতে ভিন্ন রকম বস্তু। বৃক্ষের সহিত শাখা-প্রশাখাদির যেরূপ সম্বন্ধ, ব্রজধামের সহিত জীবের সেইরূপ সম্বন্ধ নহে, সজাতীয় সম্বন্ধ নহে। আবার, সাধনসিদ্ধ-জীব সাধনে সিদ্ধিলাভ করার পরেই ব্রজে বাসের অধিকার পাইয়া থাকে, তৎপূর্ব্বে নহে। সুতরাং সাধনসিদ্ধ জীবের ব্রজে বাস স্বাভাবিক নহে, অন্যনিরপক্ষও নহে এবং সাধনে সিদ্ধির অপেক্ষা রাখে।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরভুক্ত নিত্যমুক্ত জীব। ইঁহারাও স্বরূপতঃ জীবতত্ত্ব—সুতরাং জীবশক্তি বলিয়া স্বরূপশক্তির বিলাসস্বরূপ ব্রজধামের সহিত ইঁহাদের স্বরূপগত ভেদ বিদ্যমান। ইঁহাদের ব্রজে বাস অন্যনিরপেক্ষও নহে, স্বরূপশক্তির কৃপালাভ করিয়াই নিত্যমুক্তজীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা ও পরিকরত্ব লাভ করিয়া থাকেন (২।৩০ ক অনু)।

এ-সমস্ত কারণে ব্রজপরিকরভুক্ত নিত্যমুক্ত এবং সাধনসিদ্ধ জীবকেও স্বাভাবিক এবং অন্যনিরপেক্ষ "ব্রজবাসী" বলা যায়না বলিয়া মনে হয়।

তৃতীয়তঃ, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপ অনাদিসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণ— নন্দ-যশোদাদি, শ্রীরাধিকাদি। ইঁহাদের সহিত ব্রজধামের স্বরূপগত কোনও পার্থক্য নাই; কেননা, উভয়েই তত্ত্বতঃ স্বরূপশক্তি। অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ইঁহাদের সাধনাদির অপেক্ষাও নাই, সময়েরও অপেক্ষা নাই; কেননা, ইঁহারা অনাদিকাল হইতেই পরিকররূপে বিরাজিত এবং ব্রজধামে অবস্থিত। নিত্যমুক্ত বা সাধনসিদ্ধ জীবের ন্যায় ইঁহারা স্বরূপশক্তির কৃপার অপেক্ষাও রাখেন না; কেননা ইঁহারা নিজেরাই স্বরূপশক্তি। সুতরাং ইঁহাদের ব্রজে বাস সর্ব্বতোভাবে স্বাভাবিক এবং অন্যনিরপেক্ষ। ইঁহাদিগকেই প্রকৃত প্রস্তাবে "ব্রজবাসী"—স্বাভাবিক, অন্যনিরপেক্ষ এবং স্বতঃসিদ্ধ "ব্রজবাসী"—বলা যায়।

আবার, "রাগাত্মিকা ভক্তি"ও যখন স্বরূপতঃ "রাগ" বা "স্বরূপ-শক্তি", তখন সেই ভক্তির স্বাভাবিক, অন্যনিরপেক্ষ এবং স্বতঃসিদ্ধ আশ্রয়ও হইতে পারেন কেবল স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপ ব্রজপরিকরবর্গ—নন্দযশোদি-শ্রীরাধিকাদি।

এইরূপে বুঝা যায়—পূর্ব্বোল্লিখিত শ্লোকে এবং পয়ারে "ব্রজবাসী"-শব্দে যাঁহারা অভিপ্রেত হইয়াছেন, শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহরূপ অনাদিসিদ্ধ ব্রজপরিকর নন্দ-যশোদাদি-শ্রীরাধাললিতা-বিশাখাদিই তাঁহারা। তাঁহারাই রাগাত্মিকা ভক্তির স্বাভাবিক, অন্যনিরপেক্ষ এবং স্বতঃসিদ্ধ আশ্রয়।

(১) রাগাত্মিকার সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী

পূর্ব্বে [ঘ (১) অনুচ্ছেদে] বলা হইয়াছে—রাগাত্মিকা ভক্তি হইতেছে স্বতন্ত্রা, অন্যনিরপেক্ষা। রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয় নন্দ-যশোদাদি-শ্রীরাধিকাদি পরিকর ভক্তগণ এই স্বতন্ত্রা এবং অন্যনিরপেক্ষা রাগাত্মিকা ভক্তির দ্বারা প্রেরিত হইয়াই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন ; সুতরাং তাঁহাদের সেবাও হইতেছে স্বাতন্ত্র্যময়ী। সেবাটী হইতেছে বাস্তবিক রাগাত্মিকা ভক্তিরই, পরিকরবর্গের দেহাদির সহায়তায় রাগাত্মিকা ভক্তিই সেবা করিয়া থাকে। রাগাত্মিকা স্বতন্ত্রা এবং অন্যনিরপেক্ষা বলিয়া এই সেবাও হইতেছে স্বাতন্ত্র্যময়ী। রাগাত্মিকা সর্ব্বতোভাবে স্বতন্ত্রা এবং অন্যনিরপেক্ষা বলিয়া পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পয়ারে ইহাকে "মুখ্যা" বলা হইয়াছে।

চ। রাগাত্মিকা ভক্তি দ্বিবিধা—সম্বন্ধরূপা এবং কামরূপা

রাগাত্মিকা ভক্তি দুই রকমের—**সম্বন্ধরূপা** এবং **কামরূপা**। শ্রীকৃষ্ণের ব্রজপরিকরদের ভাবভেদে এই ভেদ।

ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারি ভাবের পরিকর আছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (বা কান্তা ভাব)। রক্তক-পত্রকাদি দাস্য ভাবের, সুবল-মধুমঙ্গলাদি সখ্যভাবের, পিতা-মাতাদি (নন্দ-যশোদাদি) বাৎসল্য ভাবের এবং শ্রীরাধিকাদি কৃষ্ণকান্তাগণ হইতেছেন মধুর ভাবের পরিকর। সকল ভাবের পরিকরদেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত একটা সম্বন্ধের অভিমান আছে। দাস্যভাবের পরিকরদের সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ (বা প্রভু-ভৃত্য সম্বন্ধ), সখ্যভাবের পরিকরদের সখা-সখা বা সমান-সমান-সম্বন্ধ, বাৎসল্য ভাবের পরিকরদের পিতা-পুত্র বা মাতাপুত্র সম্বন্ধ এবং মধুরভাবের পরিকরদের কান্তা-কান্ত সম্বন্ধ।

(১) সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকা

সকল ভাবের পরিকরদেরই শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্বন্ধের অভিমান থাকিলেও দাস্য, সখ্য ও বাৎসল্য ভাবের পরিকরদের শ্রীকৃষ্ণসেবা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাঁহাদের সম্বন্ধের অনুরূপ ; যেরূপ সেবায় তাঁহাদের সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষিত হইতে পারে না, সেইরূপ সেবা তাঁহারা করেন না, সেইরূপ কোনও সেবার কথাও তাঁহাদের মনে জাগে না। এজন্য তাঁহাদের সেবার প্রবর্ত্তিকা রাগাত্মিকা ভক্তিকে বলা হয় **সম্বন্ধরূপা**। যেমন, দাস্যভাবের ভক্ত রক্তক-পত্রকাদি। কোনও একটী সুমিষ্ট দ্রব্য আহার করার সময়ে শ্রীকৃষ্ণকে তদ্রূপ বস্তু দেওয়ার জন্য ইচ্ছা হইলেও তাঁহাদের উচ্ছিষ্ট দ্রব্যটী

শ্রীকৃষ্ণকে দেওয়ার ইচ্ছা তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত হয় না। প্রভুকে ভৃত্যের উচ্ছিষ্ট দেওয়া যায় না। সখ্যভাবের পরিকর সুবল-মধুমঙ্গলাদি উচ্ছিষ্ট ফলও দিয়া থাকেন; কিন্তু তাঁহাদের সখা শ্রীকৃষ্ণকে তাড়ন-ভর্ৎসনাদি করার জন্য তাঁহাদের চিত্তে কোনও ইচ্ছা জাগেনা। শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদের সখা, সমান-সমান ভাব। তাড়ন-ভর্ৎসন করিতে গেলে নিজেকে বড় বা গুরুজনরূপে পরিণত করা হয়। তাহা তাঁহাদের সম্বন্ধের অনুরূপ নহে। বাৎসল্য-ভাবের পরিকর নন্দ-যশোদাদি নিজেদিগকে শ্রীকৃষ্ণের পিতামাতা—সুতরাং গুরুজন, লালক-পালক-অনুগ্রাহক—মনে করেন; সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের মঙ্গলের জন্য তাঁহারা তাঁহার তাড়ন-ভর্ৎসনাদিও করেন; নিজেদের উচ্ছিষ্টাদি তো দিয়া থাকেনই। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের এমন কোনও সেবার কথা তাঁহাদের মনে জাগেনা, যাহা পিতা-মাতার পক্ষে অশোভন বা অন্যায়। এই তিন ভাবের পরিকরদের পক্ষে আগে সম্বন্ধ, তাহার পরে সেবা, সম্বন্ধের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া সেবা। ইঁহাদের রাগাত্মিকা সেবার বাসনা সম্বন্ধের গণ্ডীর বাহিরে কখনও যায়না।

(২) কামরূপা রাগাত্মিকা

কিন্তু কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের রাগাত্মিকা ভক্তি সম্বন্ধের কোনও অপেক্ষাই রাখেনা। সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁহাদের রাগাত্মিকার কাম্য—তাহা যে প্রকারেই হউক না কেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই তাঁহাদের একমাত্র কামনা বলিয়া তাঁহাদের রাগাত্মিকাকে বলা হয় কামরূপা—কামনার (প্রীতি-কামনার) অনুরূপা। সেবাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের জন্য ব্রজসুন্দরীগণ বেদধর্ম্ম, কুলধর্ম্ম, স্বজন, আর্য্যপথাদিও ত্যাগ করিতে পারেন এবং করিয়াও থাকেন—যদি সে সমস্ত ত্যাগ না করিলে তাঁহাদের অভীষ্ট সেবা করা অসম্ভব হয়। তাঁহাদের শ্রীকৃষ্ণসেবাকে প্রতিহত করিতে পারে, এমন কোনও প্রতিবন্ধকই নাই; এইরূপ কোনও প্রতিবন্ধক উপস্থিত হইলেও তাঁহারা অনায়াসে এবং অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাকে অতিক্রম করিতে সমর্থ। তাঁহাদের সহিত শ্রীকৃষ্ণের কান্তা-কান্ত সম্বন্ধ বিদ্যমান। সাধারণতঃ কান্তার (বা পত্নীর) পক্ষে কান্তের (বা পতির) সম্বন্ধে যেরূপ ব্যবহার কোথাও দৃষ্ট হয়না, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্য প্রয়োজন হইলে ব্রজসুন্দরীগণ অকুণ্ঠিত চিত্তে তাহাও করিয়া থাকেন। সম্বন্ধের গণ্ডী তাঁহাদের সেবায় বাধা দিতে পারে না। এ-সম্বন্ধে একটা দৃষ্টান্তের উল্লেখ করা হইতেছে।

একসময়ে দ্বারকায় শ্রীকৃষ্ণ অসুস্থতার ভাণ করিলেন; নারদ চিকিৎসার উপায় জিজ্ঞাসা করিলে শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন, "আমার কোনও প্রেয়সী যদি তাঁহার পায়ের ধূলা আমাকে দেন, তাহা হইলে আমি ভাল হইতে পারি।" শ্রীকৃষ্ণের ষোল হাজার মহিষী; নারদ প্রত্যেকের নিকটে গেলেন; কেহই পায়ের ধূলা দিলেন না; স্বামীকে কিরূপে পায়ের ধূলা দিবেন? তাতে যে পত্নীধর্ম্ম নষ্ট হইবে !! নারদ তারপর ব্রজে গেলেন; কৃষ্ণের অসুখের কথা শুনিয়া কৃষ্ণপ্রেয়সী প্রত্যেক ব্রজসুন্দরীই অসঙ্কুচিত-চিত্তে পায়ের ধূলা দিতে প্রস্তুত হইলেন। ব্রজসুন্দরীগণের অপেক্ষা কেবল কৃষ্ণের সুখ—সম্বন্ধের অপেক্ষা তাঁহাদের নাই। পাপ হয়, তাহা হইবে তাঁহাদের; তাঁদের পাপে, তাঁদের অধর্ম্মে

কৃষ্ণ যদি সুখী হয়েন— অম্লান বদনে তাঁহারা তাহা করিতে পারেন; কারণ, তাঁদের ব্রতই হইল, সর্ব্বতোভাবে কৃষ্ণকে সুখী করা। ইহাই কামরূপার অপূর্ব্বতা ও বিশিষ্টতা।

প্রশ্ন হইতে পারে, কৃষ্ণসুখের জন্য যে বাসনা, তাকে ত প্রেম বলা হয়; আর আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনাকেই কাম বলা হয়। ব্রজসুন্দরীদিগের কৃষ্ণ-সুখ-বাসনাকে প্রেম না বলিয়া কাম বলা হইল কেন? সুতরাং, তাঁহাদের রাগাত্মিকাকে প্রেমরূপা না বলিয়া কামরূপাই বা বলা হইল কেন? ইহার উত্তর এই ঃ—"প্রেমৈব গোপরামাণাং কাম ইত্যগমৎ প্রথাম্॥ ভ, র সি, ১।২।১৪৩॥" ব্রজসুন্দরী-দিগের যে প্রেম (কৃষ্ণসুখবাসনা), তাহাকেই 'কাম'-নামে অভিহিত করার প্রথা শাস্ত্রে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহার হেতু আছে। শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করার জন্য তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সহিত যে সমস্ত লীলাদি করিয়া থাকেন, কাম-ক্রীড়ার সহিত তাহাদের বাহ্য সাদৃশ্য আছে; এজন্য ঐ সমস্ত ক্রীড়াকে প্রেমক্রীড়া না বলিয়া কামক্রীড়া বলা হইয়াছে। "সহজে গোপীর প্রেম নহে প্রাকৃত কাম। কাম-ক্রীড়াসাম্যে তার কহি কাম নাম॥ শ্রীচৈ, চৈ, ২।৮।১৬৪॥" কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত গোপীদের যে ক্রীড়া, কামক্রীড়ার সহিত তাহার বাহ্য সাদৃশ্য থাকিলেও মূলতঃ কোনও সাদৃশ্য নাই, বরং একটী অপরটীর সম্পূর্ণ বিপরীত। নিজের সুখের জন্য যে ক্রীড়া, তাহা কাম; আর কৃষ্ণের সুখের জন্য যে ক্রীড়া, তাহা প্রেম। গোপাদের ক্রীড়া প্রেমক্রীড়া। শ্রীমদ্ভাগবতের "যত্তে সুজাতচরণাম্বুরুহং" ইত্যাদি (শ্রীভা, ১০।২৯।১৯॥) শ্লোকই প্রমাণ দিতেছে যে, কৃষ্ণসঙ্গমে গোপীদিগের আত্মসুখ-বাসনার লেশমাত্রও ছিল না। তাঁহারা যাহা কিছু করিয়াছেন, তাহাই কৃষ্ণসুখের জন্য। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি তাঁহাদের উদ্দেশ্য নহে, তাঁহাদের উদ্দেশ্য শ্রীকৃষ্ণসুখ; আলিঙ্গন-চুম্বনাদিতে শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, তাই তাঁহারা আলিঙ্গন-চুম্বনাদি অঙ্গীকার করিয়াছেন। আলিঙ্গন-চুম্বনাদি প্রীতি-প্রকাশের একটী উপায় মাত্র। ছোট শিশুও বয়স্কদিগকে আলিঙ্গন করে, তাহাদের মুখে চুম্বন করিয়া থাকে; কিন্তু ইহাতে পশুভাব কোথায়? দাদা মহাশয় তাঁহার ছোট নাতি-নাতিনীদিগকে আলিঙ্গন করেন, চুম্বন করেন; তাহাতে কোনও পক্ষেরই পশুভাব থাকে না, কোনও পক্ষেরই চিত্তবিকার জন্মে না। এসমস্ত হইতেছে প্রীতি-প্রকাশের স্বাভাবিক উপায় মাত্র।

যাহা হউক, সম্বন্ধরূপাতে রাগাত্মিকা ভক্তি যে সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে, তাহা নহে; রাগাত্মিকাকে যদি সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখিতে হইত, তাহা হইলে কামরূপাতেও তাহা রাখিতে হইত; কেননা, কামরূপাতেও কান্তা-কান্ত সম্বন্ধ আছে। সম্বন্ধের মর্য্যাদা যাহাতে রক্ষিত হয়না, এইরূপ কোনও বাসনা যদি তাঁহাদের চিত্তে জাগ্রত হইত এবং সম্বন্ধের কথা বিবেচনা করিয়া যদি সেই বাসনার অনুরূপ ব্যবস্থা হইতে তাঁহারা বিরত থাকিতেন, তাহা হইলেও বুঝা যাইত যে, তাঁহাদের রাগাত্মিকা—সম্বন্ধের অপেক্ষা রাখে; কিন্তু তদ্রূপ কোনও বাসনাই তাঁহাদের রাগাত্মিকা তাঁহাদের চিত্তে জাগায় না। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাগাত্মিকা ভক্তি হইতেছে স্বতন্ত্রা, অন্যনিরপেক্ষা। রসবৈচিত্রী সম্পাদনের নিমিত্তই দাস্য-সখ্য-বাৎসল্য ভাবে রাগাত্মিকা ভক্তি নিজেকে কেবল সম্বন্ধের অনুরূপ ভাবে প্রকাশ

করিয়া থাকে, তদতিরিক্ত করেনা ; আর মধুরভাবে নিজেকে সর্ব্বতোভাবে প্রকাশ করে। মধুরভাবে (অর্থাৎ কামরূপাতেই) রাগাত্মিকাভক্তির স্বাতন্ত্র্যের পূর্ণতম বিকাশ।

ছ। রাগানুগা ভক্তি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, রাগাত্মিকার অনুগতা যে ভক্তি, তাহার নাম রাগানুগা ভক্তি।

"রাগাত্মিকামনুসৃতা যা সা রাগানুগোচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৩১॥"

"রাগাত্মিকা ভক্তি মুখ্যা ব্রজবাসিজনে।
তার অনুগত ভক্তি 'রাগানুগা' নামে ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২।৮৫॥"

কিন্তু "রাগাত্মিকার অনুগতা"—একথার তাৎপর্য্য কি ? ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—রাগাত্মিকার যে-সমস্ত সেবা, সে-সমস্ত সেবার আনুকূল্য ও সহায়তা করা। রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয় যাঁহারা—নন্দযশোদাদি, কি সুবল-মধুমঙ্গলাদি, কি শ্রীরাধা-ললিতাদি– তাঁহাদের আনুগত্যে সেবা করা ; যে-সমস্ত সেবাদ্বারা তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণকে সুখী করেন, সে-সমস্ত সেবার আয়োজনাদি করিয়া আনুকূল্য করা—ইহাই হইতেছে রাগানুগা ভক্তি বা রাগানুগা সেবা।

(১) রাগানুগা ভক্তির নিত্যসিদ্ধ আশ্রয়

শ্রীকৃষ্ণের ব্রজলীলা নিত্য, অনাদিকাল হইতেই চলিয়া আসিতেছে। তিনি আবার স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়; স্বরূপ-শক্তি বা স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ পরিকরগণব্যতীত অন্য কিছুরই অপেক্ষা তিনি রাখেন না। রাগাত্মিকা ভক্তির আনুকূল্যও অনাদিকাল হইতেই আবশ্যক; সুতরাং রাগানুগা ভক্তির আশ্রয়রূপ তাঁহার স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ অনাদিসিদ্ধ পরিকরও অবশ্যই আছেন। শ্রীরূপ মঞ্জরী, শ্রীঅনঙ্গমঞ্জরী, শ্রীরতিমঞ্জরী, শ্রীরসমঞ্জরী প্রভৃতি হইতেছেন মধুরভাবের রাগানুগা ভক্তির নিত্যসিদ্ধ আশ্রয়। অন্যান্য ভাবেরও রাগানুগাভক্তির আশ্রয়রূপ অনাদিসিদ্ধ পরিকর আছেন। অনাদিসিদ্ধ বলিয়া ইঁহাদের রাগানুগাভক্তি সাধনলব্ধা নহে, অনাদিকাল হইতেই তাঁহাদের মধ্যে রাগানুগা ভক্তি স্বাভাবিক ভাবে বিরাজিত। তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ—সুতরাং তত্ত্বতঃ স্বরূপ-শক্তি; রাগানুগা ভক্তিও তত্ত্বতঃ স্বরূপ-শক্তি; সুতরাং স্বাভাবিক ভাবেই তাঁহাদের মধ্যে রাগানুগা থাকিতে পারে।

পূর্ব্বেই (ঙ-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, যে-সমস্ত অনাদিসিদ্ধ ব্রজপরিকর স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তবিগ্রহ, রাগাত্মিকার সেবায় তাঁহাদের স্বাভাবিক অধিকার আছে। এ-স্থলে রাগানুগার যে নিত্য-সিদ্ধ আশ্রয়ের কথা বলা হইল, তাঁহারাও স্বরূপ-শক্তিরই মূর্ত্তবিগ্রহ ; সুতরাং রাগাত্মিকার সেবাতেও তাঁহাদের স্বরূপগত এবং স্বাভাবিক অধিকার আছে। কিন্তু রাগাত্মিকার সেবা না করিয়া তাঁহারা কেবল রাগানুগার সেবা কেন করেন ?

এই প্রশ্নের উত্তর এই যে– রাগানুগার সেবাও যখন লীলাসিদ্ধির জন্য আবশ্যক এবং লীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণও যখন স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়, তখন রাগানুগার আশ্রয়রূপে স্বরূপশক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ পরিকরেরও আবশ্যক। এজন্য তাঁহারা রাগানুগার আশ্রয়রূপেই সেবা করিয়া থাকেন।

(২) জীবের সেবা আনুগত্যময়ী। রাগাত্মিকায় জীবের অধিকার নাই, রাগানুগাতেই অধিকার

জীব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণেব নিত্যদাস। দাসের সেবা সর্ব্বদাই আনুগত্যময়ী, কখনও স্বাতন্ত্র্যময়ী হইতে পারে না।

যদি বলা যায়—জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি বলিয়াই তো শ্রীকৃষ্ণের নিত্য দাস। শ্রীনন্দযশোদাদি, কি শ্রীরাধা-ললিতাদিও শ্রীকৃষ্ণের শক্তি; তাঁহাদের যখন স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকাসেবায় অধিকার থাকিতে পারে, তখন জীবের কেন থাকিবে না?

উত্তর এই। শ্রীনন্দযশোদাদি, কি শ্রীরাধা-ললিতাদিও শক্তি হইলেও তাঁহারা জীবশক্তি নহেন, তাঁহারা হইতেছেন শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তি; আর ভক্তিও হইতেছে স্বরূপ-শক্তি। তাঁহাদের সহিত ভক্তির সম্বন্ধ হইতেছে সজাতীয়, স্বাভাবিক এবং অন্যনিরপেক্ষ (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); সুতরাং স্বাতন্ত্র্যময়ী সেবাতে তাঁহাদের অধিকার থাকিতে পারে।

কিন্তু জীব শ্রীকৃষ্ণের শক্তি হইলেও স্বরূপ-শক্তি নহে, জীবের মধ্যে স্বরূপ-শক্তি থাকেও না (২।৮-অনু)। শ্রীকৃষ্ণস্বরূপের সেবায় স্বরূপ-শক্তিরই স্বরূপগত অধিকার; কেননা, শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন স্ব-স্বরূপ-শক্ত্যেক-সহায়; স্বরূপ-শক্তিব্যতীত অন্য কোনও শক্তির—জীবশক্তিরও—তিনি কোনও অপেক্ষা রাখেন না। স্বরূপ-শক্তি কৃপা করিয়া অধিকার দিলেই অন্য শক্তি শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার পাইতে পারে। স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিয়াই মায়াশক্তি সৃষ্টিকার্য্য-নির্ব্বাহরূপ সেবা করিতে সমর্থা হয়; তদ্রূপ স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করিয়াই জীবশক্তির অংশরূপ জীব শ্রীকৃষ্ণসেবার অধিকার লাভ করিতে পারে (২।৩০-ক অনু)। জীবের কৃষ্ণসেবার অধিকারই যখন স্বরূপ-শক্তির কৃপাসাপেক্ষ, তখন তাহার সেবা যে স্বাতন্ত্র্যময়ী নহে, তাহা সহজেই বুঝা যায়; স্বরূপ-শক্তির অপেক্ষা না রাখিয়াই যদি জীব কৃষ্ণসেবার অধিকারী হইতে পারিত, তাহা হইলেই তাহার সেবা স্বাতন্ত্র্যময়ী হইতে পারিত। কিন্তু তাহা যখন নয়, তখন তাহার সেবা সকল সময়েই হইবে আনুগত্যময়ী, স্বরূপ-শক্তির আনুগত্যেই জীবের সেবার অধিকার।

এজন্য স্বাতন্ত্র্যময়ী রাগাত্মিকাতে জীবের—নিত্যমুক্ত, কি সাধনসিদ্ধ জীবের—অধিকার থাকিতে পারে না, আনুগত্যময়ী রাগানুগার সেবাতেই জীবের অধিকার।

(৩) রাগানুগাতেও নিত্যসিদ্ধ রাগানুগা-পরিকরদের আনুগত্যেই জীবের সেবা

রাগানুগার পূর্ব্বকথিত নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সেবাও আনুগত্যময়ী। আবার, রাগানুগার সেবাপ্রাপ্ত জীবের সেবাও আনুগত্যময়ী। কিন্তু ইঁহাদের আনুগত্য সর্ব্বতোভাবে এক রকম হইতে পারে না। কেননা, নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ হইতেছেন স্বরূপ-শক্তির মূর্ত্তবিগ্রহ; তাঁহাদের আনুগত্য স্বেচ্ছাধীন, স্বরূপশক্তির কৃপাজাত নহে, কেননা, তাঁহারা নিজেরাই স্বরূপশক্তি। কিন্তু জীবের আনুগত্য স্বেচ্ছাপ্রাপ্ত নহে, স্বরূপশক্তির কৃপায় প্রাপ্ত—সুতরাং স্বরূপশক্তির অধীন। রাগানুগার সেবাতেও নিত্যসিদ্ধ পরিকরদেরই মুখ্য অধিকার, তাঁহাদের কৃপাতেই জীব সেই সেবা পাইতে

পারেন। এজন্য, রাগানুগার নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের আনুগত্যেই জীবের সেবা। যেমন, মধুরভাবে রাগানুগার নিত্যসিদ্ধ পরিকর শ্রীরূপাদি মঞ্জরীগণের আনুগত্যেই রাগানুগার সেবা প্রাপ্ত বা রাগানুগার সেবাভিলাষী জীবের সেবা। শ্রীরূপাদি মঞ্জরীগণই অনাদিকাল হইতে রাগানুগার সেবায় অভিজ্ঞা; তাঁহাদের আনুগত্য ব্যতীত সেবার প্রণালীও শিক্ষা করা যায় না। শ্রীরূপাদি মঞ্জরীগণ হইতেছেন মঞ্জরীরূপ জীবদিগের (মঞ্জরী অর্থ—কিঙ্করী, শ্রীরাধিকার কিঙ্করী বা দাসী) অধীশ্বরী। সেবাপরায়ণা মঞ্জরীদিগেরও ভিন্ন ভিন্ন যূথ (দল) আছে। শ্রীরূপাদি মঞ্জরী হইতেছেন **যূথেশ্বরী**।

গ। রাগানুগা-সাধনভক্তির প্রবর্ত্তক—লোভ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, রাগাত্মিকা ভক্তিতে জীবের অধিকার নাই, আনুগত্যময়ী রাগানুগা-ভক্তিতেই তাহার অধিকার আছে। কিন্তু রাগানুগাভক্তি লাভের জন্য যে সাধন, সেই সাধনে কিরূপ জীবের অধিকার আছে? ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন, শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য যাঁহার লোভ জন্মে, তিনিই রাগানুগা-সাধনভক্তির অধিকারী।

"রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠা যে ব্রজবাসিজনাদয়ঃ। তেষাং ভাবাপ্তয়ে লুব্ধো ভবেদত্রাধিকারবান্।
তত্তদ্ভাবাদিমাধুর্য্যে শ্রুতে ধী র্যদপেক্ষতে। নাত্র শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ তল্লোভোৎপত্তিলক্ষণম্॥
—ভ, র, সি, ১।২।১৪৭-৪৮॥

—রাগাত্মিকৈকনিষ্ঠ যে সকল ব্রজবাসিজনাদি, তাঁহাদের ভাবপ্রাপ্তির জন্য যাঁহাদের চিত্ত লুব্ধ হয়, তাঁহারাই এই রাগানুগা ভক্তিতে অধিকারী। ব্রজপরিকরদের দাস্যসখ্যাদি ভাবমাধুর্য্যের কথা শুনিয়া সেই ভাবমাধুর্য্যের প্রতি যে শ্রবণকর্ত্তার বুদ্ধি অতিশয়রূপে উন্মুখী হয়, তিনি শাস্ত্র বা যুক্তির অপেক্ষা রাখেন না। ইহাই লোভোৎপত্তির লক্ষণ (অর্থাৎ কখনও শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখেনা)।"

এই তথ্যই শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন।—

"রাগময়ী ভক্তির হয় 'রাগাত্মিকা' নাম। তাহা শুনি লুব্ধ হয় কোন ভাগ্যবান্॥
লোভে ব্রজবাসিভাবে করে অনুগতি। শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে রাগানুগার প্রকৃতি॥
শ্রী, চৈ, চ, ২।২২।৮৭-৮৮॥"

এই পয়ারগুলির উক্তির আলোচনা করিলেই বিষয়টী পরিস্ফুট হইবে।

তাহা শুনি লুব্ধ হয় ইত্যাদি—লীলাগ্রন্থাদিতে, অথবা অনুরাগী ভক্তের মুখে রাগাত্মিকা-ভক্তির অপূর্ব্ব মাধুর্য্যের কথা শুনিয়া তদনুরূপ সেবা পাইবার জন্য কোনও ভাগ্যবানের লোভ জন্মিলে, তিনি তাহা পাইবার উদ্দেশ্যে ব্রজবাসীদিগের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া থাকেন। এই আনুগত্য-মূলক ভজনই রাগানুগা-ভক্তি।

ভাগ্যবান্—কৃষ্ণ-কৃপা, অথবা ভক্তকৃপা-প্রাপ্তি-রূপ সৌভাগ্য যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনি। ব্রজপরিকরদিগের রাগাত্মিকা-সেবার কথা শুনিলেই যে সকলের মনেই কৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত লোভ জন্মে, তাহা নহে। এই লোভের দুইটী হেতু আছে; একটী কৃষ্ণ-কৃপা, অপরটী ভক্তকৃপা। "কৃষ্ণতদ্ভক্ত-

কারুণ্যমাত্রলোভৈক-হেতুকা। ভ, র, সি, ১।২।১৬৩॥” এই কৃপাই এইরূপ লোভের একমাত্র হেতু। অন্য কোনও উপায়েই এই লোভ জন্মিতে পারে না। এই কৃপা যাঁহার লাভ হইয়াছে, তিনিই ভাগ্যবান্। ভক্তকৃপা ইহজন্মেও লাভ হইতে পারে, পূর্ব্বজন্মেও লাভ হইয়া থাকিতে পারে; যাঁহাদের পূর্ব্বজন্মে লাভ লইয়াছে, তাঁহারা ইহজন্মে স্বভাবতঃই কৃষ্ণসেবায় লোভযুক্ত।

ব্রজবাসিভাবে ইত্যাদি—যাঁহার কৃষ্ণসেবায় লোভ জন্মিয়াছে, তিনি ঐ সেবা-লাভের জন্য ব্রজবাসীদিগের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিয়া ভজন করেন। ব্রজবাসী-শব্দে এস্থলে রাগাত্মিকার অধিকারী ব্রজবাসীদিগকেই বুঝাইতেছে; তাঁহাদের ভাবের আনুগত্য স্বীকার করিতে হইবে। ব্রজপরিকরদিগের মধ্যে দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর, এই চারিভাবের রাগাত্মিক ভক্ত আছেন। যে ভাবে যাঁহার চিত্ত লুব্ধ হয়, তাঁহাকে সেই ভাবের আনুগত্যই স্বীকার করিতে হইবে। আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্র ভাবে, ভজন করিলেও ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। “সখী-অনুগতি বিনা ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানে। ভজিলেও, নাহি পায় ব্রজেন্দ্র-নন্দনে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১৮৫॥” ব্রজলীলায় প্রবেশের জন্য লক্ষ্মীর লোভ হইয়াছিল; তিনি যথেষ্ট ভজনও করিয়াছিলেন; কিন্তু ব্রজগোপীদিগের আনুগত্য স্বীকার না করিয়া স্বতন্ত্রভাবে ভজন করিয়া তিনি লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন নাই। রাগাত্মিকার আনুগত্যময় ভজনকেই রাগানুগা বলে।

শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে—শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখে না। পূর্ব্বোদ্ধৃত “তত্তদ্‌ভাবাদি-মাধুর্য্যে” ইত্যাদি শ্লোকের “ধীঃ অত্র ন শাস্ত্রং ন যুক্তিঞ্চ যৎ অপেক্ষতে”-এই অংশেরই অর্থ বাঙ্গালা পয়ারে বলা হইয়াছে—“শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে।” শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃতটীকাকার শ্রীলবিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তিপাদও এই পয়ারের অর্থে লিখিয়াছেন—“অত্রায়মর্থঃ; রাগানুগা ভক্তিঃ শাস্ত্রযুক্তিং ন মন্যতে; তজ্জননে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা নাস্তীত্যর্থঃ। তত্তদ্ভাবাদি-মাধুর্য্য-শ্রবণেন জাতত্বাৎ।” সুতরাং এখানে “নাহি মানে” অর্থ—“অপেক্ষা রাখেনা।” কিন্তু শাস্ত্রযুক্তির এই অপেক্ষা রাখেনা কখন? উত্তর—সেবার লোভোৎপত্তি-সময়ে। “লোভোৎপত্তিকালে শাস্ত্রযুক্ত্যপেক্ষা ন স্যাৎ; সত্যাঞ্চ তস্যাং লোভত্বস্যৈব অসিদ্ধেঃ। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা॥” ব্রজবাসীদিগের সেবামাধুর্য্যের কথা শুনিয়াই তাহা পাইবার জন্য লোভ জন্মে; লোভ জন্মিবার নিমিত্ত শাস্ত্রীয়-প্রমাণের বা যুক্তির কোনও প্রয়োজনই হয়না; বাস্তবিক, যেখানে শাস্ত্রের বা যুক্তির প্রয়োজন, সেখানে লোভই সম্ভব নহে; সেখানে কর্ত্তব্য ও অকর্ত্তব্য বোধের সম্ভাবনা। লোভের প্রত্যাশায় কেহ কখনও শাস্ত্রালোচনা করেনা; অথবা, লোভনীয় বস্তুর প্রাপ্তি-বিষয়ে, কাহারও মনে নিজের যোগ্যতা বা অযোগ্যতা সম্বন্ধেও কোনও বিচার উত্থিত হয় না। লোভনীয় বস্তুর কথা শুনিলেই, অথবা লোভনীয় বস্তু দেখিলেই আপনা-আপনিই লোভ আসিয়া উপস্থিত হয়। রসগোল্লা দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা হয়; তেঁতুল দেখিলেই মুখে জল আসে। “তেঁতুল দেখিলেই সকলের মুখেই জল আসে—ইহা লোকে বলে, গ্রন্থাদিতেও লেখা আছে”

—এইরূপ বিচারের ফলেই যে তেঁতুল দেখিলে মুখে জল আসে, তাহা নহে। জ্বর-বিকার-গ্রস্ত রোগীরও তেঁতুল দেখিলেই খাইতে ইচ্ছা হয়, মুখে জল আসে ; তেঁতুল যে তাহার পক্ষে কুপথ্য, সুতরাং খাওয়া উচিত নয়, এইরূপ কোনও যুক্তির ধারই ইচ্ছা বা জল—ধারেনা ; ইচ্ছা মনে আসিবেই। জলও মুখে আসিবেই। এইরূপই লোভের ধর্ম্ম। ইহা বুঝাইবার জন্যই বলা হইয়াছে—"শাস্ত্রযুক্তি নাহি মানে"—শাস্ত্রযুক্তির কোনও অপেক্ষা রাখেনা।

অথবা—লোভ নিজের ধর্ম্ম প্রকাশ করিবেই ; সে শাস্ত্রের নিষেধও শুনিবেনা, যুক্তির নিষেধও শুনিবেনা। চিকিৎসা-শাস্ত্র বলিতেছে—জ্বর-রোগীর পক্ষে তেঁতুল কুপথ্য ; তথাপি জ্বর-রোগীর তেঁতুল খাওয়ার লোভ হয়। যুক্তি বলিতেছে—জ্বর-রোগী তেঁতুল খাইলে তাহার জ্বর বৃদ্ধি পাইবে ; তথাপি রোগীর তেঁতুল খাইতে ইচ্ছা হয়। সংসারী লোকের পক্ষে প্রাকৃত-দেহে রাগের সহিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সাক্ষাৎ সেবা অসম্ভব ; ইহা শাস্ত্রও বলে, যুক্তিও বলে ; কিন্তু তথাপি, যিনি কৃষ্ণকৃপা বা ভক্তকৃপা লাভ করিয়াছেন, তাঁহার মনে শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভ জন্মে।

বৈধী ও রাগানুগা ভক্তির পার্থক্য এই যে, শাস্ত্র-শাসনের ভয়ই বৈধী-ভক্তির প্রবর্ত্তক, ; আর শ্রীকৃষ্ণসেবার লোভই হইল রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক।

ঋ। রাগানুগায় প্রারম্ভে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা নাই, ভজনে অপেক্ষা আছে

লোভ জন্মিবার সময়ে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা থাকেনা সত্য ; কিন্তু লোভনীয় বস্তুটী লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রযুক্তির অপেক্ষা রাখিতে হয়। রসগোল্লা খাওয়ার লোভ জন্মিলেই কিন্তু রসগোল্লা খাওয়া হয় না। রসগোল্লার যোগাড় করিতে হইবে—কোথায় রসগোল্লা পাওয়া যায়, কিরূপে সেখানে যাওয়া যায়, সেখানে গিয়াই বা কিরূপে রসগোল্লা সংগ্রহ করিতে হয়, ইত্যাদি বিষয়—যাঁহারা রসগোল্লা খাইয়াছেন, তাঁহাদের নিকটে জানিয়া লইতে হইবে এবং তাঁহাদের উপদেশ অনুসারে চলিতে হইবে (মহাজনো যেন গতঃ সঃ পন্থাঃ) ; অথবা কিরূপে রসগোল্লা তৈয়ার করিতে হয়, তাহা পুস্তকাদিতে দেখিয়া লইতে হইবে এবং রসগোল্লা যিনি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাঁহার উপদেশানুসারে তৈয়ারের চেষ্টা করিতে হইবে। সেইরূপ, রাগমার্গে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার নিমিত্ত যাঁহার লোভ জন্মিয়াছে, নজেকে সেই সেবার উপযোগী করার জন্য কি কি উপায় আছে, তাঁহাকে তাহা শাস্ত্রাদি হইতেই দেখিয়া লইতে হইবে এবং উপযুক্ত ভক্তের নিকটে তদনুকূল উপদেশাদি গ্রহণ করিতে হইবে। ইহার আর অন্য উপায় নাই। শাস্ত্র, গুরু ও বৈষ্ণবের উপদেশ ব্যতীত কেহই এই পথে অগ্রসর হইতে পারে না ; কারণ, মায়াবদ্ধ জীবের এবিষয়ে কোনও অভিজ্ঞতাই নাই। শাস্ত্রযুক্তি না-মানাই রাগমার্গের ভজন নহে। তাহাই যদি হইত, তাহা হইলে, কৃষ্ণকে না-মানাই রাগমার্গের ভজন হইত ; কারণ, শাস্ত্রই জীবের নিকটে কৃষ্ণের পরিচয় দিয়াছেন। অন্ন-পাকের বিধি এই যে—হাঁড়িতে জল দিয়া তাহাতে চাউল দিয়া সিদ্ধ করিতে হয়। ইহাকে বিধিমার্গ মনে করিয়া এই বিধিকে না মানিয়া, যদি আমি একখণ্ড পাতার উপরে চাউল রাখিয়া সিদ্ধ করি, অথবা হাঁড়ি

উল্টাইয়া তাহার উপরে বিধিপ্রোক্ত চাউলের পরিবর্ত্তে কতকগুলি মাটী রাখিয়া, আগুনে জ্বাল দেওয়ার পরিবর্ত্তে জল ঢালিয়া দেই, তাহা হইলে নিশ্চয়ই অন্ন পাইব না। অন্ন পাইতে হইলে অন্নপাকের বিধি অনুসারেই চলিতে হইবে। নচেৎ অন্ন তো পাওয়াই যাইবে না, বরং একটা উৎপাতের সৃষ্টি হইবে। ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা পাইতে হইলেও তদুদ্দেশ্যে যে সকল শাস্ত্রীয় বিধি আছে, তাহার অনুসরণ করিতেই হইবে। রাগমার্গের শাস্ত্রবিধি উপেক্ষা করিয়া নিজের মনগড়া উপায় অবলম্বন করিলে ভজন হইবে না, হইবে একটী উৎপাৎ-বিশেষ। এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন :—"স্মৃতিশ্রুতিপুরাণাদিপঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। আত্যন্তিকী হরিভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে ॥১।২।৪৬॥"

ভজনে প্রবৃত্তি জন্মিবার হেতুকে উপলক্ষ্য করিয়াই বিধিমার্গ এবং রাগমার্গ বলা হইয়াছে; কিন্তু ভজনের ব্যাপারে বিধিমার্গের জন্য যেমন বিধি-নিষেধের কথা শাস্ত্র বলিয়াছেন, রাগমার্গের জন্যও তেমনি বিধি-নিষেধ শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে। শ্রীমন্মহাপ্রভুও তদনুরূপ উপদেশ দিয়া গিয়াছেন।

যাহা হউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে জানা গেল, রাগানুগা ভক্তির সাধক বা সাধিকা স্বীয় ভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের আনুগত্যেই ভজন করিবেন। কিন্তু শ্রীকৃষ্ণপরিকরগণ থাকেন শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থলে; এই পৃথিবীতে অবস্থিত সাধক বা সাধিকা কিরূপে তাঁহাদের আনুগত্য করিতে পারেন? এই বিষয় পরে আলোচিত হইবে।

রাগানুগা ভক্তিরও দুই রকম ভেদ আছে; পরে তাহা প্রদর্শিত হইবে [৫।৬১ খ (৭) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

৪৬। বিভিন্ন সাধনপন্থায় বিভিন্নরূপে ভগবদুপলব্ধি

কেহ হয়ত বলিতে পারেন—"পরতত্ত্বের স্বরূপ হইতেছে বাক্য ও মনের অগোচর; সুতরাং জীবের এমন কোনও শক্তি নাই, যদ্দ্বারা পরতত্ত্বের স্বরূপ, জীবের স্বরূপ এবং পরতত্ত্বের সঙ্গে জীবের সম্বন্ধ সম্যক্‌রূপে নির্ণয় করিতে পারে। এমতাবস্থায় জীব যে ভাবেই তাঁহার উপাসনা করুক না কেন, তিনি নিজ মুখ্য স্বরূপেই তাঁহাকে কৃপা করিবেন। তরল জলের দ্রাবকতা-শক্তি না জানিয়া আমি যদি মনে করি যে, জল মিশ্রিকে গলাইতে পারে না এবং ইহা মনে করিয়া যদি আমি এক টুকরা মিশ্রি জলে ফেলিয়া দেই, তাহা হইলে জল কি মিশ্রিকে গলাইবে না? নিশ্চয় গলাইবে—আমার অজ্ঞতাকে হেতু করিয়া জল কখনও তাহার শক্তি পূর্ণরূপে প্রয়োগ করিতে ক্ষান্ত থাকিবে না। তদ্রূপ পরতত্ত্বের স্বরূপাদি-সম্বন্ধে জীবের অপূর্ণ জ্ঞানকে হেতু করিয়া পরতত্ত্ব কখনও সাধক-জীবের নিকটে নিজের অপূর্ণ শক্তি বা অপূর্ণস্বরূপ প্রকাশ করিবেন না; তাঁহার পূর্ণতম স্বরূপেই সকল সাধকের

নিকটে তিনি আত্মপ্রকট করিবেন। সুতরাং জ্ঞানী ও ভক্ত নিজেদের জ্ঞানের অপূর্ণতা-বশতঃ বিভিন্ন ভাবে পরতত্ত্বের উপাসনা করিলেও তাঁহাদের প্রাপ্তি একরূপই হওয়ার সম্ভাবনা।

ইহার উত্তর এই—পরতত্ত্বাদির স্বরূপ যে বাক্য-মনের অগোচর, তাহা সত্য। তথাপি বাক্যদ্বারা তাঁহার স্বরূপাদির যতটুকু প্রকাশ করা যায়, দিগ্-দর্শনরূপে শাস্ত্র তাহা প্রকাশ করিয়াছেন। সাধককে শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাস করিতে হইবে, নচেৎ সাধনই অসম্ভব।

প্রাকৃত জগতে বস্তুশক্তি বুদ্ধিশক্তির কোনও অপেক্ষাই রাখেনা। অগ্নির দাহিকা শক্তি না জানিয়াও কেহ যদি আগুনে হাত দেয়, তবে তাহার হাত পুড়িবেই। আগুন সর্ব্বজ্ঞ নহে, অন্তর্য্যামী নহে, সর্ব্বশক্তিমান্‌ও নহে, আগুনের একাধিক স্বরূপও নাই। যদি আগুনের এই সমস্ত থাকিত, তাহা হইলে হয়ত আমার অভিপ্রায় অবগত হইয়া আমার বাসনাপূর্ত্তির নিমিত্ত তাহার যে স্বরূপে দাহিকাশক্তি নাই, আমার হাতের চতুর্দ্দিকে সেই স্বরূপেই আত্মপ্রকট করিত। কিন্তু প্রাকৃত আগুনের পক্ষে তাহা অসম্ভব; সুতরাং আগুন তাহার নিজ বস্তুশক্তিই প্রকাশ করিবে। কিন্তু পরতত্ত্ব-সম্বন্ধে এই যুক্তি খাটিতে পারেনা—তিনি বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেন, এজন্য তাঁহার নাম "ভাবগ্রাহী জনার্দ্দনঃ।" তিনি ভাবটী মাত্র গ্রহণ করেন—অর্থাৎ সাধকের ভাবানুরূপ ফলই প্রদান করেন। গীতাতেও ইহার প্রমাণ আছে; "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্—যে আমাকে যে ভাবে উপাসনা করে, আমিও তাহাকে সেইভাবেই কৃপা করি।" ইহা শ্রীকৃষ্ণের উক্তি। "আমাকে যে যেই ভাবেই ভাবুকনা কেন—জ্ঞানমার্গেই হউক, কি যোগমার্গেই হউক, কি ভক্তিমার্গেই হউক—যেই মার্গেই ইচ্ছা ভজন করুক না কেন—আমি সকলকেই একই ভাবে কৃপা করিব"—একথা শ্রীকৃষ্ণ বলেন নাই। সাধকের ভাব অনুসারেই তিনি ফল দিয়া থাকেন। তাঁহার একটী নাম বাঞ্ছাকল্পতরু—তিনি সকলের যথাযোগ্য বাসনা পূর্ণ করেন। ইহার হেতু এই যে, পরতত্ত্ব সর্ব্বশক্তিমান্, বহুস্বরূপে তিনি আত্মপ্রকট করিতে পারেন। সাধকদিগের মনোবাসনা পূর্ত্তির জন্য বহুস্বরূপেই তিনি অনাদি কাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া বিরাজিত; তিনি অন্তর্য্যামী, সাধকের মনোবাসনা জানিতে পারেন; তিনি বদান্য, সাধক যাহা চায়, তাহাই দিতে সমর্থ এবং তাহাই দিয়া থাকেন। লোকের মনোগত বাসনানুসারে কাজ করার শক্তি নাই বলিয়াই প্রাকৃত বস্তু কাহারও বুদ্ধিশক্তির অপেক্ষা রাখেনা, রাখিতে পারেনা—নিজের শক্তি সকল সময়েই একরূপে প্রকাশ করে। কিন্তু পরতত্ত্বের শক্তি সীমাবদ্ধ নহে—তাই সাধকের মনোগত বাসনানুসারে ফল দিতে সমর্থ এবং ফল দিয়াও থাকেন। "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী।"

শাস্ত্রে যে বিভিন্ন প্রকারের মুক্তি বা ভগবৎ-প্রাপ্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেও বিভিন্ন সাধন-পন্থার অনুসরণে বিভিন্নরূপে ভগবৎ-প্রাপ্তির কথাই জানা যায়।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

সেই কৃষ্ণপ্রাপ্তিহেতু ত্রিবিধ সাধন। জ্ঞান, যোগ, ভক্তি—তিনের পৃথক্ লক্ষণ॥

তিন সাধনে ভগবান্ তিন স্বরূপে ভাসে। ব্রহ্ম, পরমাত্মা, ভগবত্ত্বে প্রকাশে॥
'ব্রহ্ম আত্মা' শব্দে যদি কৃষ্ণকে কহয়। রূঢ়িবৃত্তে নির্ব্বিশেষ অন্তর্য্যামী কয়॥
জ্ঞানমার্গে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম প্রকাশে। যোগমার্গে অন্তর্য্যামিস্বরূপেতে ভাসে॥
রাগভক্তি বিধিভক্তি হয় দুইরূপ। স্বয়ংভগবত্ত্বে ভগবত্ত্বে—প্রকাশ দ্বিরূপ॥
রাগভক্ত্যে ব্রজে স্বয়ংভগবান্ পায়। বিধিভক্ত্যে পার্ষদদেহে বৈকুণ্ঠে যায়॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।৫৭-৬২॥

যদিও ব্যাপক অর্থ ধরিলে ব্রহ্মশব্দে ও আত্মাশব্দে অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণকেই বুঝায়, তথাপি রূঢ়িবৃত্তিতে ব্রহ্মশব্দে শ্রীকৃষ্ণের নির্ব্বিশেষ-প্রকাশ ব্রহ্মকে এবং আত্মা বা পরমাত্মা-শব্দে তাঁহার অন্তর্য্যামিস্বরূপকেই বুঝায়।

একই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ জ্ঞানমার্গের সাধকের নিকটে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মরূপে, যোগমার্গের সাধকের নিকটে অন্তর্য্যামী পরমাত্মারূপে এবং ভক্তিমার্গের সাধকের নিকটে ভগবান্‌রূপে আত্মপ্রকাশ করেন।

ভক্তিমার্গ আবার দুই রকমের—রাগভক্তি বা রাগানুগাভক্তিমার্গ এবং বিধিভক্তিমার্গ। রাগানুগাভক্তিমার্গের সাধকের নিকটে তিনি ব্রজবিলাসী স্বয়ংভগবান্‌রূপে এবং বিধিমার্গের ভক্তের নিকটে বৈকুণ্ঠ বা পরব্যোম বিলাসী নারায়ণাদি ভগবৎস্বরূপরূপে আত্মপ্রকাশ করিয়া থাকেন।

বিভিন্ন পন্থাবলম্বী সাধকগণ একই পরতত্ত্ববস্তুর বিভিন্ন স্বরূপের ধ্যান করেন; এজন্য তাঁহাদের উপলব্ধিও বিভিন্ন রকমের।

একই ঈশ্বর ভক্তের ধ্যান অনুরূপ।
একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৯।১৪১॥

ক। উপলব্ধি, প্রাপ্তি ও জ্ঞান একই তাৎপর্য্যবোধক

অপরোক্ষ উপলব্ধি, অপরোক্ষ জ্ঞান ও প্রাপ্তি পরস্পর হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ নহে। অপরোক্ষ উপলব্ধি এবং অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে বাস্তবিক প্রাপ্তিরই অনুগামী বা ফল।

যিনি কখনও বরফ দেখেন নাই, পুস্তকাদি হইতে বরফের বিশদ্ বিবরণ অবগত হইলে তিনিও বরফ সম্বন্ধে কিছু জ্ঞান লাভ করিতে পারেন; কিন্তু ইহা তাঁহার পরোক্ষ জ্ঞানমাত্র, অপরোক্ষ বা সাক্ষাদ্‌ভাবের জ্ঞান নহে। পুস্তকাদি হইতে তিনি জানিতে পারেন—বরফ অত্যন্ত শীতল; কিন্তু কিরূপ শীতল, তাহা জানিতে পারেন না। যখন তিনি বরফ প্রাপ্ত হয়েন, তখনই তিনি বুঝিতে পারেন, বরফ কিরকম শীতল। বরফের শীতলত্বের প্রত্যক্ষ বা অপরোক্ষ জ্ঞান তখনই তাঁহার জন্মিতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে। এই অপরোক্ষ জ্ঞান হইতেছে প্রাপ্তির অনুগামী।

পরব্রহ্ম সম্বন্ধেও এইরূপ। যিনি পরব্রহ্মের যে স্বরূপের উপাসনা বা ধ্যান করেন, সেই স্বরূপের প্রাপ্তিতেই তাঁহার প্রত্যক্ষ জ্ঞান, প্রত্যক্ষ উপলব্ধি, জন্মিতে পারে, তৎপূর্ব্বে নহে।

সাযুজ্যমুক্তিতে যে ব্রহ্মস্বরূপে প্রবেশ লাভ হয়, তাহাও এক রকমের প্রাপ্তিই—জলে প্রবেশ করিলে জলের প্রাপ্তির ন্যায় প্রাপ্তি। জলে প্রবেশ করিলে যেমন জলের স্বরূপ-গুণাদির অপরোক্ষ অনুভব হয়, ব্রহ্মে প্রবেশ করিলেও ব্রহ্মের অপরোক্ষ জ্ঞান, বা অপরোক্ষ উপলব্ধি জন্মিতে পারে।

শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যও এইরূপই। মুণ্ডকশ্রুতি বলিয়াছেন—"পরা যয়া অক্ষরমধিগম্যতে—পরাবিদ্যাদ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে পাওয়া যায়।" শ্রীপাদ শঙ্করও "অধিগম্যতে"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"প্রাপ্যতে—প্রাপ্ত হওয়া যায়।" এই পরাবিদ্যাই হইতেছে ব্রহ্মজ্ঞান-লাভের, ব্রহ্মোপলব্ধির একমাত্র উপায়। ইহা হইতেই বুঝা যায়—ব্রহ্মপ্রাপ্তি হইলেই ব্রহ্মসম্বন্ধে অপরোক্ষ জ্ঞান ও অপরোক্ষ উপলব্ধি লাভ হইতে পারে।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—উপলব্ধি, প্রাপ্তি ও জ্ঞান-এই তিনটীর তাৎপর্য্য হইতেছে একই।

৪৭। কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা রাখে

পূর্ব্বে (৫।৪২-অনুচ্ছেদে) কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ এবং ভক্তিমার্গের কথা বলা হইয়াছে। ইহাদের মধ্যে প্রথম তিনটী, অর্থাৎ কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ এবং জ্ঞানমার্গ, ভক্তির সহায়তা-ব্যতীত স্ব-স্ব ফলদানে সমর্থ নহে; ভক্তির সাহচর্য্যেই তাহারা স্ব-স্ব ফলদানে সমর্থ হয়।

"ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ॥
এই সব সাধনের অতিতুচ্ছ ফল।
কৃষ্ণভক্তি বিনে তাহা দিতে নারে বল ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।১৪-১৫ ॥

এই উক্তির সমর্থক কয়েকটী প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্।
কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্ ॥—শ্রীভা, ১।৫।১২ ॥

—(শ্রীনারদের উক্তি) নিরুপাধি ব্রহ্মজ্ঞানও ভগবদ্‌ভক্তিবর্জ্জিত হইলে সম্যক্‌রূপে শোভা পায় না (অর্থাৎ মোক্ষসাধক হয় না); সুতরাং সাধনকালে এবং ফলভোগ-কালেও দুঃখপ্রদ কাম্যকর্ম্ম এবং নিষ্কামকর্ম্মও যে ঈশ্বরে অর্পিত না হইলে শোভা পাইবে না (অর্থাৎ ফলদায়ক হইবে না), তাহাতে আর বলিবার কি আছে? (শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুয়ায়ী মর্ম্ম)।"

"তপস্বিনো দানপরা যশস্বিনো মনস্বিনো মন্ত্রবিদঃ সুমঙ্গলাঃ।
ক্ষেমং ন বিন্দন্তি বিনা যদর্পণং তস্মৈ সুভদ্রশ্রবসে নমো নমঃ ॥ —শ্রীভা, ২।৪।১৭ ॥

—(শ্রীশুকোক্তি) তপস্বিগণ (জ্ঞানিগণ), দানশীলগণ (কর্ম্মিগণ), যশস্বিগণ (অশ্বমেধাদি-যজ্ঞকর্ত্তৃগণ), মনস্বিগণ (যোগিগণ), মন্ত্রবিদ্‌গণ (আগমবেত্তাগণ) এবং সদাচার-পরায়ণগণ—

যে ভগবানে তাঁহাদের তপস্যাদির অর্পণ না করিলে মঙ্গল লাভ করিতে পারেন না, সেই সুমঙ্গল যশস্বী শ্রীভগবান্‌কে পুনঃ পুনঃ নমস্কার করি।”

“তুলাপুরুষদানাদ্যৈরশ্বমেধাদিভির্ম্মখৈঃ। বারাণসীপ্রয়াগাদিতীর্থ-স্নানাদিভিঃ প্রিয়ে॥
গয়াশ্রাদ্ধাদিভিঃ পিত্রৈর্ব্বেদপাঠাদিভির্জপৈঃ। তপোভিরুগ্রৈর্নিয়মৈর্ধর্মৈর্ভূতদয়াদিভিঃ॥
গুরুশুশ্রূষণৈঃ সত্যৈর্ধর্ম্মৈর্বর্ণাশ্রমাদিতৈঃ। জ্ঞানধ্যানাদিভিঃ সম্যক্ চরিতৈর্জন্মজন্মভিঃ॥
ন যাতি তৎপরং শ্রেয়ো বিষ্ণুং সর্ব্বেশ্বরেশ্বরম্। সর্ব্বভাবৈরণাশ্রিত্য পুরাণং পুরুষোত্তমম্॥
—নারদপঞ্চরাত্র ॥৪।২।১৭-২০॥

—(মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিয়াছেন) সর্ব্বতোভাবে সর্ব্বেশ্বরেশ্বর পুরাণপুরুষোত্তম বিষ্ণুর শরণাপন্ন না হইলে তুলাপুরুষ-দানাদিদ্বারা, অশ্বমেধাদি-যজ্ঞানুষ্ঠানদ্বারা, বারাণসী-প্রয়াগাদি-তীর্থস্নানদ্বারা, গয়াশ্রাদ্ধাদিদ্বারা, বেদপাঠাদিদ্বারা, জপাদিদ্বারা, উগ্রতপস্যার দ্বারা, যম-নিয়মাদিদ্বারা, ভূত-সকলের প্রতি দয়াদিরূপ ধর্ম্মদ্বারা, গুরু-শুশ্রূষাদ্বারা, সত্যধর্ম্মদ্বারা, বর্ণাশ্রমাদিধর্ম্মদ্বারা, জ্ঞান-ধ্যানাদিদ্বারা বহু জন্মেও ভগবৎপর শ্রেয়ঃ হইতে পারে না।”

“শ্রেয়ঃসৃতিং ভক্তিমুদস্য তে বিভো ক্লিশ্যন্তি যে কেবলবোধলব্ধয়ে।
তেষামসৌ ক্লেশল এব শিষ্যতে নান্যদ্‌যথা স্থূলতুষাবঘাতিনাম্॥ শ্রীভা. ১০।১৪।৪॥

—(ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) হে বিভো! অভ্যুদয়-অপবর্গ-প্রভৃতি শ্রেয়ের (মঙ্গলের) মার্গস্বরূপ তোমাতে-ভক্তিকে ত্যাগ করিয়া যাঁহারা কেবল জ্ঞানলাভার্থ (শাস্ত্রাভ্যাসাদির বা সাধনের) ক্লেশ স্বীকার করেন, অন্তঃসারহীন স্থূল-তুষাবঘাতীর ন্যায় তাঁহাদিগের কেবল ক্লেশই অবশিষ্ট থাকে, অন্য কিছুই লাভ হয় না।”

এই শ্লোকের টীকার উপসংহারে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—“অয়ং ভাবঃ। যথা অল্প-প্রমাণং ধান্যং পরিত্যজ্য অন্তঃকণহীনান্ স্থূলধান্যাভাসাংস্তুষান্ যে অপঘ্নন্তি তেষাং ন কিঞ্চিৎ ফলম্ এবং ভক্তিং তুচ্ছীকৃত্য যে কেবলবোধলাভায় প্রযতন্তে তেষামপীতি।—যাঁহারা অল্প-পরিমাণ ধান্য পরিত্যাগ করিয়া বহুল-পরিমাণ স্থূলধান্যাভাস অন্তঃকণহীন তুষরাশির উপরে আঘাত করেন, তাঁহাদের যেমন কোনও ফলই হয় না, তদ্রূপ যাঁহারা ভক্তিকে তুচ্ছজ্ঞান করিয়া কেবল জ্ঞানলাভের জন্য প্রযত্ন করেন, তাঁহাদেরও কোনও ফললাভই হয় না (অর্থাৎ কেবলজ্ঞান লাভ হয় না)।”

উল্লিখিত প্রমাণ-সমূহ হইতে জানা গেল, ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান—ইহাদের কোনটীই স্বীয় ফলদান করিতে সমর্থ নহে।

শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্রও একথাই বলেন—

ওঁ সা মুখ্যেতরাপেক্ষিত্বাৎ ॥১০॥

—সেই ভক্তিই মুখ্যা; কেননা, (কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদি) অন্য সাধন—ভক্তির অপেক্ষা রাখে।”

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের ২০৫-অনুচ্ছেদে এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—

“শ্রীগীতাসু চ—শ্রীভগবানুবাচ ‘অমানিত্বমদম্ভিত্বম্ (১৩।৮)’ ইত্যাদিকং জ্ঞানযোগমার্গমুপক্রম্য মধ্যে ‘ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী (১৩।১১)’ ইত্যপ্যুক্ত্বা, প্রান্তে ‘তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শনম্ (১৩।১২)’ ইতি সমাপ্যাহ ‘এতজ্‌জ্ঞানমিতি প্রোক্তমজ্ঞানং যদতোঽন্যথা (১৩।১২)’ ইতি। ততো ভক্তিযোগং বিনা জ্ঞানং ন ভবতীত্যর্থঃ। অতোঽন্তেপ্যুক্তম্-‘মদ্‌ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায়োপপদ্যতে (১৩।১৯)’ ইতি।”

মর্ম্মানুবাদ। ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত যে জ্ঞান (জ্ঞানমার্গের সাধনের ফল) লাভ করা যায় না, শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় শ্রীভগবানের বাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ‘অমানিত্ব, অদম্ভিত্ব’-ইত্যাদি বাক্যে জ্ঞানযোগমার্গের উপক্রম করিয়া মধ্যে বলিয়াছেন—‘আমাতে ঐকান্তিকী নিষ্ঠার সহিত অব্যভিচারিণী ভক্তি’ ইত্যাদি ; তাহার পরে শেষে তিনি বলিয়াছেন—‘তত্ত্বজ্ঞানার্থদর্শন’, এইরূপে সমাপন করিয়া ভগবান্ বলিয়াছেন—‘যাহা বলা হইল, তাহাই জ্ঞান; ইহার বিপরীত যাহা, তাহাই অজ্ঞান।’ ইহা হইতে জানা যায়, ভক্তিযোগ ব্যতীত জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। অতএব সর্ব্বশেষেও তিনি বলিয়াছেন—‘আমার ভক্ত ইহা বিদিত হইয়া মদ্‌ভাব প্রাপ্ত হইতে যোগ্য হয়েন।”

শ্রীজীবগোস্বামিপাদের উক্তির তাৎপর্য্য এই। গীতার ত্রয়োদশ অধ্যায়ে, ক্ষেত্র-ক্ষেত্রজ্ঞ-বিভাগযোগ-কথন-প্রসঙ্গে জ্ঞানযোগমার্গের কথাই বলা হইয়াছে। জ্ঞানযোগমার্গের সাধকের পক্ষে কিরূপ আচরণ কর্ত্তব্য, ‘অমানিত্ব (আত্মশ্লাঘারাহিত্য, বা অপরের নিকট হইতে সম্মান লাভের আকাঙ্ক্ষা-ত্যাগ), দম্ভহীনতা, অহিংসা ইত্যাদি বাক্যে তাহা বলা হইয়াছে। ইহার মধ্যেই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন-‘ময়ি চানন্যযোগেন ভক্তিরব্যভিচারিণী—ঐকান্তিকী-নিষ্ঠার সহিত আমাতে (ভগবানে) অব্যভিচারিণী ভক্তি’ করিতে হইবে। ইহাদ্বারাই বুঝা যায়—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে অব্যভিচারিণী ভক্তি হইতেছে জ্ঞানযোগমার্গের সাধকের পক্ষে অত্যাবশক। সর্ব্বশেষে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“মদ্‌ভক্ত এতদ্বিজ্ঞায় মদ্ভাবায়োপপদ্যতে।” এই শ্লোকের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—“মদ্‌ভক্তো ময়ীশ্বরে সর্ব্বজ্ঞে পরমগুরৌ বাসুদেবে সমর্পিতসর্ব্বাত্মভাবে যৎ পশ্যতি শৃণোতি স্পৃশতি বা সর্ব্বমেব ভগবান্ বাসুদেব ইত্যেবং গ্রহাবিষ্টবুদ্ধির্মদ্‌ভক্তঃ সন্ এতৎ যথোক্তং সম্যক্‌দর্শনং বিজ্ঞায় মদ্‌ভাবায় মম ভাবো মদ্ভাবঃ পরমাত্মভাবস্তস্মৈ পরমাত্মভাবায় উপপদ্যতে যুজ্যতে ঘটতে মোক্ষং গচ্ছতি।” এই ভাষ্যের তাৎপর্য্য এই। বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণ হইতেছেন ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ, পরম বা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গুরু; তাঁহাতে যিনি সর্ব্বাত্ম সমর্পণ করিয়াছেন, এবং তাহার ফলে গ্রহাবিষ্টের ন্যায়,—যাহা কিছু দেখেন, শুনেন, বা স্পর্শ করেন, তৎসমস্তকেই যিনি ভগবান্ বাসুদেব বলিয়া মনে করেন, শ্লোকস্থ ‘মদ্‌ভক্ত’-শব্দে তাঁহাকেই বুঝাইতেছে (ভগবান্ বাসুদেব শ্রীকৃষ্ণে অনন্যনিষ্ঠা ভক্তি ব্যতীত কেহই এইরূপ হইতে পারেন না। যাহাহউক, শ্রীপাদ শঙ্কর বলিয়াছেন), এতাদৃশ ভক্তই পরমাত্মভাব

বা মোক্ষ-লাভ করিতে সমর্থ। ইহা হইতেও মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে ভক্তির অপরিহার্য্যতার কথাই-জানা যাইতেছে।

ক। ভক্তির অপরিহার্য্যতা কেন ?

প্রশ্ন হইতে-পারে—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান ভক্তির অপেক্ষা রাখে কেন ? ইহার উত্তর এই :—

যাঁহারা কর্ম্মী, তাঁহারা স্বর্গাদি-লোকের সুখরূপ ফল চাহেন। কিন্তু তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্ম জড় বলিয়া ফলদানে অসমর্থ। একমাত্র পরব্রহ্ম-ভগবান্ই ফলদাতা। "ফলমত উপপত্তেঃ॥ ৩।২।৩৭॥"-এই বেদান্তসূত্র এবং "অহং হি সর্ব্বযজ্ঞানাং ভোক্তা চ প্রভুরেব চ॥ ৯।২৪॥"-এই গীতাবাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। সুতরাং ফলপ্রাপ্তির জন্য সকাম কর্ম্মীর পক্ষেও ভক্তির বা শ্রীকৃষ্ণভজনের প্রয়োজন।

আর যাঁহারা নিষ্কাম-কর্ম্মমার্গ, কি যোগমার্গ, কিম্বা জ্ঞানমার্গের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহাদের সকলেরই কাম্য হইতেছে মোক্ষ, বা মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি। নিজের চেষ্টায় কেহই মায়াবন্ধন হইতে অব্যাহতি লাভ করিতে পারে না; কেননা, ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন—তাঁহার দৈবী গুণময়ী মায়া জীবের পক্ষে দুরতিক্রমণীয়া। "দৈবী হ্যেষা গুণময়ী মম মায়া দুরত্যয়া॥ গীতা ॥৭।১৪॥" তিনি আরও বলিয়াছেন—যাঁহারা তাঁহারই (শ্রীকৃষ্ণেরই) শরণাপন্ন হয়েন, একমাত্র তাঁহারাই মায়ার কবল হইতে নিষ্কৃতি লাভ করিতে পারেন। "মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে॥ গীতা ॥৭।১৪॥" ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের শরণাপন্ন হওয়ার তাৎপর্য্যই হইতেছে ভক্তি-যোগের আশ্রয় গ্রহণ করা।

একথা বলিয়া শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—

"ন মাং দুষ্কৃতিনো মূঢ়াঃ প্রপদ্যন্তে নরাধমাঃ।
মায়য়াপহৃতজ্ঞানা আসুরং ভাবমাশ্রিতাঃ॥ গীতা ॥৭।১৫॥

—যাহারা দুষ্কৃতি, মূঢ় (বিবেকহীন), নরাধম, যাহাদের জ্ঞান মায়াদ্বারা অপহৃত হইয়াছে, এবং যাহারা অসুরসুলভ ভাবকে আশ্রয় করিয়াছে, তাহারা আমার ভজন করেনা (সুতরাং মায়ার কবল হইতেও তাহারা অব্যাহতি লাভ করিতে পারেনা।)

ইহার পরেই শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুন।
আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥ গীতা ॥৭।১৬॥

—হে ভরতর্ষভ অর্জ্জুন! আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অর্থার্থী এবং জ্ঞানী-এই চারি রকমের সুকৃতি জনগণ আমার ভজন করেন।"

এই বাক্যের "আর্ত্ত" এবং "অর্থার্থী"-এই দুই রকমের সুকৃতি লোক হইতেছেন সকাম (কর্ম্ম-মার্গের উপাসক) আর, "জিজ্ঞাসু" এবং "জ্ঞানী" (জ্ঞানমার্গের উপাসক) হইতেছেন মোক্ষাকাঙ্ক্ষী

(৫।২৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এইরূপে, গীতাবাক্য হইতে জানা গেল—কর্ম্মমার্গাবলম্বী লোকদিগের কাম্যবস্তু লাভের জন্যও ভগবদুপাসনার প্রয়োজন এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষীদিগের মোক্ষলাভের জন্যও ভগবদুপাসনার প্রয়োজন। ভগবদুপাসনা ব্যতীত ইহকালের বা পরকালের অভীষ্ট ভোগ্য বস্তুও পাওয়া যায় না, মোক্ষও পাওয়া যায় না।

এ-স্থলে "আর্ত্ত, জিজ্ঞাসু, অথার্থী এবং জ্ঞানী"-এইরূপ পৃথক্ পৃথক্ পদ-প্রয়োগের তাৎপর্য্য হইতে বুঝা যায়—কর্ম্ম-জ্ঞানাদি বিভিন্ন পন্থাবলম্বীদের কথাই এ-স্থলে বলা হইয়াছে। "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাম্"-বাক্য হইতে বুঝা যাইতেছে যে, কর্ম্ম-জ্ঞানাদি-মার্গে বিহিত সাধনের সঙ্গে শ্রীকৃষ্ণভজন করিলেই সাধনের অভীষ্ট-ফল-প্রাপ্তি সম্ভবপর হইতে পারে, অন্যথা নহে। ইহাদ্বারা জানা যাইতেছে যে, ভক্তির সাহচর্য্য ব্যতীত কর্ম্ম-জ্ঞানাদি কোনও সাধনই সাধকের অভীষ্ট-ফল-প্রদানে সমর্থ নহে। (ভূমিকায় ২৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

নিষ্কাম কর্ম্মীই হউন, বা যোগীই হউন, কিম্বা জ্ঞানীই হউন, সকলেই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী, সকলেই মায়ার কবল হইতে সম্যক্‌রূপে অব্যাহতি কামনা করেন। কিন্তু ভগবানের স্বরূপশক্তি ব্যতীত অন্য কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না (১।১।২৩-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। সুতরাং মায়ানির্ম্মুক্তির জন্য সাধকের চিত্তে স্বরূপ-শক্তির আবির্ভাব একান্তরূপে অপরিহার্য্য। ভক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি —সুতরাং তত্ত্বতঃ স্বরূপশক্তিই (৪।৪৮, ৫৪ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এজন্যই মোক্ষাকাঙ্ক্ষী কর্ম্মি-যোগি-জ্ঞানীর পক্ষেও ভক্তির অপরিহার্য্যতা।

সাধনভক্তির (অর্থাৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের) অনুষ্ঠানের ফলেই সাধকের চিত্তে মায়াপসারণ-সমর্থা ভক্তির বা স্বরূপশক্তির আবির্ভাব হইতে পারে (৫।৪৮ক, ৬৩ক অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এজন্য, যাঁহারা কর্ম্মমার্গ, বা যোগমার্গ, বা জ্ঞানমার্গের অনুসরণে মোক্ষ লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, স্ব-স্ব মার্গবিহিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা যদি শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানও করেন, তাহা হইলেই তাঁহারা স্ব-স্ব অভীষ্ট মোক্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইবেন, অন্যথা নহে।

এজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—"মামেব যে প্রপদ্যন্তে মায়ামেতাং তরন্তি তে ॥ গীতা ॥ ৭।১৪ ॥" মায়ানির্ম্মুক্তির জন্য যত রকম সাধন-পন্থা আছে, ভগবৎ-শরণাপত্তি বা ভগবদ্‌ভজন হইতেছে তাহাদের সাধারণ ভূমিকা। ভক্তিনিরপেক্ষ কর্ম্মযোগ-জ্ঞান মুক্তি দিতে পারে না।

ভক্তিমুখ-নিরীক্ষক কর্ম্মযোগজ্ঞান ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।১৪ ॥
অজাগলস্তনন্যায় অন্য সাধন।
অতএব হরি ভজে বুদ্ধিমান্ জন ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।৬৬ ॥

খ। **ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা, পরমস্বতন্ত্রা**

ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞান স্ব-স্ব-ফলদানে অসমর্থ ; কিন্তু ভক্তি কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানের কোনও অপেক্ষাই রাখে না। কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির সাহচর্য্যব্যতীতই ভক্তি স্বীয় ফল দান করিতে সমর্থা।

অন্যনিরপেক্ষভাবেই ভক্তি স্বীয় ফল শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা দিতে তো সমর্থাই, আবার কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানের ফলও দিতে সমর্থা। কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, বা জ্ঞানমার্গে যে সকল সাধনাঙ্গ বিহিত হইয়াছে, তৎসমস্তের অনুষ্ঠান না করিয়াও স্ব-স্ব অভীষ্ট হৃদয়ে পোষণ করিয়া সাধকগণ যদি কেবল শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেও তাঁহারা স্ব-স্ব-অভীষ্ট ফল পাইতে পারেন। ভক্তি অন্যনিরপেক্ষা, পরম-স্বতন্ত্রা, প্রবলা।

কেবল জ্ঞান মুক্তি দিতে নারে ভক্তি বিনে॥
কৃষ্ণোন্মুখে সেই মুক্তি হয় বিনা জ্ঞানে॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২।১৬॥
ভক্তি বিনু কোন সাধন দিতে নারে ফল।
সব ফল দেয় ভক্তি স্বতন্ত্র প্রবল॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।৬৫॥

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—

"যৎ কর্ম্মভির্যৎ তপসা জ্ঞানবৈরাগ্যতশ্চ যৎ। যোগেন দানধর্ম্মেণ শ্রেয়োভিরিতরৈরপি॥
সর্ব্বং মদ্ভক্তিযোগেন মদ্ভক্তো লভতেঽঞ্জসা। স্বর্গাপবর্গং মদ্ধাম কথঞ্চিদ্ যদি বাঞ্ছতি॥
—শ্রীভা, ১১।২০।৩২।৩৩॥

—কর্ম্ম, তপস্যা, জ্ঞান, বৈরাগ্য, যোগ, দান এবং অন্যান্য শ্রেয়ঃপ্রাপক অনুষ্ঠানের দ্বারা যাহা যাহা পাওয়া যায়, আমার ভক্তগণ মদ্বিষয়ক ভক্তিযোগদ্বারা তৎসমস্তই অনায়াসে লাভ করিতে পারেন। স্বর্গ, অপবর্গ (মোক্ষ), কিম্বা আমার ধাম—যাহা কিছু তাঁহারা বাঞ্ছা করেন, তাহাই তাঁহারা পাইতে পারেন।"

শ্লোকস্থ "মদ্ভক্তাঃ"-শব্দ হইতে বুঝা যায়, যাঁহারা কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির জন্য বিহিত কোনও সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবল "ভক্তিযোগের—ভক্তিমার্গের জন্য বিহিত সাধনাঙ্গের" অনুষ্ঠানই করেন, ইচ্ছা করিলে তাঁহারাও স্বর্গ-মোক্ষাদি (অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির লভ্য) সমস্তই পাইতে পারেন।

ইহা হইতেই জানা গেল—কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির কোনওরূপ অপেক্ষা না রাখিয়াই ভক্তি তত্তৎ-মার্গের ফল-প্রদানে সমর্থা।

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"-এই শ্রীকৃষ্ণোক্তি হইতেও তাহাই জানা যায়। যে ভাব চিত্তে পোষণ করিয়া সাধক শ্রীকৃষ্ণের ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে সেই ভাবানুরূপ বস্তু দান করিয়া থাকেন। পরব্রহ্ম ভগবান্ হইতেছেন ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু।

শ্রুতিও সে-কথাই বলিয়াছেন। ব্রহ্মের বাচক (নাম) প্রণব উপলক্ষ্যে বলা হইয়াছে, যিনি এই ব্রহ্মবাচক এবং ব্রহ্মাভিন্ন প্রণবকে জানেন, তিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তাহাই পাইতে পারেন। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠোপনিষৎ।" ভগবন্নামের শরণগ্রহণ হইতেছে ভক্তিমার্গের অন্তর্গত একটী সাধনাঙ্গ।

গ। একই ভক্তি কিরূপে বিভিন্ন ফল দিতে পারে ?

প্রশ্ন হইতে পারে—কর্ম্মী, যোগী এবং জ্ঞানী, ইঁহাদের অভীষ্ট বস্তু এক নহে। ইঁহারা স্ব-স্ব পন্থার জন্য বিহিত সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া কেবলমাত্র ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলে তাঁহাদের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইতে পারে—ইহা স্বীকার করিলেও, সেই ভক্তির প্রভাবে তাঁহাদের পক্ষে বিভিন্ন-ফল-প্রাপ্তির সম্ভাবনা কিরূপে থাকিতে পারে ? একই ভক্তির প্রভাবে এক রকমের ফল-প্রাপ্তিই সম্ভবপর।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। কর্ম্মী, যোগী এবং জ্ঞানী যদি স্ব-স্ব অভীষ্ট বস্তুর বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া কেবল মাত্র ভক্তি-অঙ্গেরই অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলেও ভক্তির কৃপায় তাঁহাদের অভীষ্ট সিদ্ধির সম্বন্ধে সন্দেহের কোনও হেতু থাকিতে পারেনা।

যিনি সকাম-কর্ম্মী, তিনি স্বর্গাদি-লোকের সুখ কামনা করেন। ফলদাতা একমাত্র স্বয়ং ভগবান্ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ; তিনি ভক্তির বশীভূত। "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ॥ মাঠর শ্রুতি॥" সাধকের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হইলে এই ভক্তির প্রভাবেই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার অভীষ্ট স্বর্গাদি-লোকের সুখ তাঁহাকে দিয়া থাকেন। "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্"-বাক্যে শ্রীকৃষ্ণ তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

যাঁহারা যোগী, তাঁহারা চাহেন পরমাত্মার সহিত মিলন, পরমাত্মার অপরোক্ষ অনুভূতি। যাঁহারা নিষ্কাম কর্ম্মী, বা জ্ঞানী, তাঁহাদের কাম্য হইতেছে মোক্ষ, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অপরোক্ষ উপলব্ধি। পরমাত্মা, বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম, কিম্বা অন্য কোনও ভগবৎস্বরূপ—সমস্তই হইতেছেন পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ, সচ্চিদানন্দ প্রকাশ। বিভিন্ন স্বরূপের উপলব্ধিকামী সাধকগণের প্রত্যেকেই স্বীয় অভীষ্ট স্বরূপের ধ্যান করিয়া থাকেন। এজন্য তাঁহাদের বাসনার বিভিন্নতা।

ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে যখন সাধকের চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তখন সেই ভক্তি সাধকের বাসনা অনুসারে তাঁহার চিত্তকে রূপায়িত করেন, সাধকের বাসনানুরূপ স্বরূপের উপলব্ধির যোগ্যতা দান করেন। বিভিন্ন সাধকের বাসনা বিভিন্ন বলিয়া তাঁহাদের চিত্তও ভক্তিদ্বারা বিভিন্ন ভাবে রূপায়িত হয়, একই ভাবে রূপায়িত হয় না; কেননা, সাধকের বাসনা অনুসারেই তাঁহার চিত্ত রূপায়িত হইয়া থাকে।

একটী দৃষ্টান্তের সহায়তায় ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। আমরা জানি, ফটোগ্রাফীতে কোনও ব্যক্তির বা বস্তুর প্রতিকৃতি গৃহীত হয়। এই প্রতিকৃতি সত্য, দর্পণে দৃষ্ট প্রতিকৃতির ন্যায় মিথ্যা নহে। ফটোগ্রাফীর যন্ত্রের (যাহাকে ক্যামেরা বলে, সেই ক্যামেরার) ভিতরে বিশেষ ভাবে প্রস্তুত একখানি কাচ রাখা হয়; ইহাকে "নেগেটিভ্" বলে। এই কাচখানি রাসায়নিক বস্তু-বিশেষের দ্বারা সম্যক্-রূপে অনুপ্রবিষ্ট, রাসায়নিক বস্তু-বিশেষের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়াই "নেগেটিভ্ নামে পরিচিত হয়। এই নেগেটিভের" সম্মুখভাগে অব্যবহিত ভাবে যে বস্তু থাকে, তাহারই প্রতিকৃতি নেগেটিভে

গৃহীত হয়। ক্যামেরার সম্মুখভাগে অনেক বস্তু থাকিলেও যে বস্তুটী নেগেটিভের সম্মুখভাগে অবস্থিত, কেবল তাহার প্রতিকৃতিই নেগেটিভে গৃহীত হয়, অন্য বস্তুর প্রতিকৃতি গৃহীত হয় না।

ভক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তির, বা শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি—সুতরাং তত্ত্বতঃ স্বরূপশক্তি বা শুদ্ধসত্ত্ব। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে এই শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে আবির্ভূত হইয়া ক্রমশঃ মায়ার প্রভাবকে এবং মায়াকে অপসারিত করিয়া থাকে (৫।৬৩ অনুচ্ছেদ-দ্রষ্টব্য)। যখন মায়ার প্রভাব সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হয়, তখন সাধকের চিত্তের সহিত শুদ্ধসত্ত্বের যোগ হয় এবং চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যলাভ করে (৫।৬৩ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত চিত্তই ফটোগ্রাফীর নেগেটিভের তুল্য; চিত্ত যেন কাচের তুল্য এবং শুদ্ধসত্ত্ব যেন রাসায়নিক বস্তু-বিশেষের তুল্য। শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত চিত্তরূপ নেগেটিভের সম্মুখভাগে অব্যবহিত রূপে ভগবানের যে প্রকাশ থাকিবেন, সেই প্রকাশই চিত্তরূপ নেগেটিভে ধরা পড়িবেন, গৃহীত হইবেন। যিনি যে স্বরূপের, বা যে প্রকাশের ধ্যান করেন, তাঁহার চিত্তের সাক্ষাতে কেবল সেই স্বরূপ, বা সেই প্রকাশই বিদ্যমান থাকেন। যিনি পরমাত্মার ধ্যান করেন, তাঁহার চিত্তের সাক্ষাতে কেবল পরমাত্মাই থাকেন, যিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের ধ্যান করেন, তাঁহার চিত্তের সাক্ষাতে কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই থাকেন, অপর কিছু থাকে না। এজন্য যোগীর চিত্তরূপ নেগেটিভে কেবল পরমাত্মাই গৃহীত হয়েন, জ্ঞানীর চিত্তরূপ নেগেটিভে কেবল নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মই গৃহীত হয়েন এবং সেবাকামী ভক্তের চিত্তরূপ নেগেটিভে কেবল ভগবান্‌ই—গৃহীত হয়েন। এই ভাবে একই ভক্তি বিভিন্ন সাধকের বাসনা অনুসারে তাঁহাদিগের চিত্তে বিভিন্ন ভগবৎপ্রকাশের উপলব্ধি জন্মাইয়া থাকে। বাসনার বিভিন্নতাতেই ধ্যেয় বস্তুর বিভিন্নতা।

এইরূপে দেখা গেল, একই ভক্তির পক্ষে বিভিন্ন ভাবের সাধকের চিত্তে বিভিন্ন ভগবৎ-প্রকাশের উপলব্ধি-দান অসম্ভব নহে।

যাহা হউক, যে ভক্তির এতাদৃশ মহিমার কথা জানা গেল, সেই—ভক্তির স্বরূপ কি, এক্ষণে তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

৪৮। ভক্তির লক্ষণ

ভক্তি বস্তুটী কি, তাহাই এক্ষণে বিবেচিত হইতেছে। বস্তুর পরিচয় হয় তাহার স্বরূপ-লক্ষণ এবং তটস্থ লক্ষণের দ্বারা। ভক্তির এই দুইটী লক্ষণ কি, তাহা দেখা যাউক।

ক। ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ

ভজ্‌-ধাতু হইতে "ভক্তি"-শব্দ নিষ্পন্ন; ভজ্‌-ধাতুর অর্থ সেবা। সুতরাং "ভক্তি" শব্দের মুখ্য অর্থ হইতেছে—সেবা।

সেবার দুইটী রূপ থাকিতে পারে—সাধনাবস্থার সেবা এবং সিদ্ধ-অবস্থায় পরিকররূপে সেবা। সাধনকালে যে সেবা, তাহা হইতেছে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-বিশেষ। আর, সিদ্ধাবস্থার সেবা সাধন নহে, তাহা হইতেছে সাধ্য বা সাধকের কাম্য বস্তু। সাধনাবস্থায় যে সেবা, মোটামোটি তাহার স্বরূপ জানা গেল এই যে—ইহা হইতেছে সাধনের অঙ্গবিশেষ। কিন্তু সিদ্ধাবস্থায় যে সেবা, তাহার স্বরূপ কি ?

একমাত্র ভক্তিমার্গের সাধকগণই সিদ্ধাবস্থায় ভগবানের সেবা কামনা করেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভক্তিমার্গের সাধকদের মধ্যেও দুইটী শ্রেণী আছে—বিধিমার্গের সাধক এবং রাগমার্গের সাধক। ইহাও বলা হইয়াছে যে, বিধিমার্গের সাধকদের সেবার সঙ্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান এবং স্বসুখবাসনা ও স্বীয়দুঃখ-নিবৃত্তির বাসনা মিশ্রিত আছে। সুতরাং সিদ্ধাবস্থায় তাঁহাদের সেবা বা ভক্তি অবিমিশ্রা নহে এবং অবিমিশ্রা নহে বলিয়া এই ভক্তির স্বরূপের জ্ঞানে ভক্তির বাস্তব স্বরূপ জানা যাইতে পারেনা। লবণমিশ্রিত চিনির জ্ঞানে বিশুদ্ধ চিনির স্বরূপজ্ঞান জন্মিতে পারেনা।

কিন্তু রাগমার্গের বা রাগানুগামার্গের সাধকদের সিদ্ধাবস্থায় যে সেবা, তাহার সঙ্গে স্বসুখবাসনা বা স্বীয়দুঃখনিবৃত্তির বাসনাও মিশ্রিত নাই, ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানও মিশ্রিত নাই। তাঁহাদের সেবা বা ভক্তি হইতেছে অবিমিশ্রা, বিশুদ্ধা, কেবলা। ইহার স্বরূপের জ্ঞানেই ভক্তির স্বরূপের বাস্তব জ্ঞান জন্মিতে পারে। এই সেবার, বা ভক্তির স্বরূপ কি, তাহাই বিবেচিত হইতেছে।

শুদ্ধাভক্তিমার্গের বা রাগানুগামার্গের সাধকদের একমাত্র কাম্য হইতেছে—কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা। কিন্তু এতাদৃশী সেবা লাভের পূর্ব্বে অপরিহার্য্যরূপে প্রয়োজনীয় বস্তু হইতেছে—এতাদৃশী সেবার জন্য বাসনা, অকপট বলবতী বাসনা ; কেননা, সেবার জন্য উৎকণ্ঠাময়ী বাসনা না জন্মিলে সেবা সার্থকতা লাভ করিতে পারে না। কৃষ্ণসুখের জন্য, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতির জন্য, এতাদৃশী বাসনার নাম হইতেছে—প্রেম।

> আত্মেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—তারে বলি 'কাম।' কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-ইচ্ছা—ধরে 'প্রেম' নাম ॥
> কামের তাৎপর্য্য—নিজ সম্ভোগ কেবল। কৃষ্ণসুখ তাৎপর্য্য—হয় প্রেম ত প্রবল ॥
>
> —শ্রীচৈ,চ, ১।৪।১৪১—৪২ ॥

এই কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতি-বাসনারূপ প্রেমেরই পর্য্যবসান বা পরিণতি হইতেছে কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবা ; এতাদৃশী সেবা হইতেছে প্রেমেরই রূপায়ণ, মূর্ত্তরূপ, এবং এতাদৃশী সেবাই হইতেছে শুদ্ধাভক্তিমার্গের সাধকদের কাম্য বা সাধ্যবস্তু। সুতরাং প্রেমের স্বরূপ অবগত হইলেই এই সাধ্যসেবার, বা সিদ্ধাবস্থায় সেবার বা ভক্তির স্বরূপ অবগত হওয়া যায়।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—প্রেমের স্বরূপ কি ? পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—প্রেম হইতেছে বাসনা-বিশেষ, কৃষ্ণেন্দ্রিয়-প্রীতিবাসনা। কিন্তু বাসনা হইতেছে চিত্তের একটী বৃত্তি।

এক্ষণে দেখিতে হইবে—প্রেমরূপ যে বাসনা, তাহা কি জীবের প্রাকৃতচিত্তের একটী বৃত্তি ? না কি অপর কিছু ? অপর কিছু হইলে তাহাই বা কি ?

প্রেমের পর্য্যবসান বা পরিণতিই সেবা বা ভক্তি বলিয়া এবং সেবা বা ভক্তি প্রেমেরই মূর্ত্তরূপ বলিয়া প্রেমকে "প্রেমভক্তিও" বলা হয়, আবার শুধু "ভক্তি"ও বলা হয় ; আবার কখনও কখনও "ভাব"ও বলা হয় এবং "রতি"ও বলা হয়। নারদভক্তিসূত্রেও ভক্তিকে "পরমপ্রেমরূপা" এবং "অনির্ব্বচনীয় প্রেমস্বরূপ" বলা হইয়াছে। "ওঁ সা কস্মৈ পরমপ্রেমরূপা ॥৭।২॥ ওঁ অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ ॥ ৭।৫১॥"

যাহা হউক, শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম হইতেছেন জীবের প্রাকৃত মনোনয়নাদির অগোচর ; তাৎপর্য্য এই যে, জীবের কোনও প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তিই তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না, তাঁহার কোনওরূপ উপলব্ধি লাভ করিতে পারে না। আবার, শ্রুতি ইহাও বলেন—"ধীরাস্তং পরিপশ্যন্তি—যাঁহারা ধীর, যাঁহাদের চিত্তচাঞ্চল্য সর্ব্বতোভাবে দূরীভূত হইয়াছে, তাঁহারা তাঁহাকে সম্যক্‌রূপে দর্শন করিতে পারেন।" বহিরঙ্গা মায়ার প্রভাবেই জীবের চিত্তচাঞ্চল্য, অধীরতা, জন্মে। মায়ার প্রভাব সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলেই পরব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়। ইহা হইতে জানা গেল, যে ইন্দ্রিয়বৃত্তিদ্বারা "ধীরগণ" পরব্রহ্মের দর্শন পায়েন, তাহা প্রাকৃত ইন্দ্রিয়বৃত্তি নহে।

শ্রুতি আরও বলিয়াছেন —"ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ ভক্তিরেব ভূয়সী ॥ সন্দর্ভগ্রন্থে শ্রীজীবগোস্বামিধৃত মাঠরশ্রুতিবাক্য।—একমাত্র ভক্তিই (প্রেমভক্তিই, বা প্রেমই) ইহাকে (জীবকে) পরব্রহ্ম ভগবানের নিকটে নিয়া থাকে (সান্নিধ্য অনুভব করায়), একমাত্র ভক্তিই (প্রেমভক্তিই, বা প্রেমই) সাধককে পরব্রহ্মের দর্শন পাওয়ায় ; পরমপুরুষ পরব্রহ্ম ভক্তির (বা প্রেমের) বশীভূত ; ভক্তিই ভূয়সী।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, ভক্তিই সাধকজীবকে ভগবানের নিকটে নেয় (ভগবৎসান্নিধ্য উপলব্ধি করায়), ভগবানের দর্শন পাওয়ায় এবং ভগবান্‌কে বশীভূত করে। ইহাতে বুঝা যায়, ভক্তি হইতেছে একটী শক্তি এবং ভগবৎসান্নিধ্য-প্রাপণ, ভগবদ্দর্শন-প্রাপণ এবং ভগবদ্‌বশীকরণ হইতেছে তাহার কার্য্য।

কিন্তু এই ভক্তিরূপা শক্তিটী কাহার ? জীবের ? না কি ভগবানের ?

শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়, পরব্রহ্ম ভগবান্ হইতেছেন স্বপ্রকাশ-তত্ত্ব ; নিজের শক্তিতে তিনি আত্মপ্রকাশ করেন, অপর কাহারও শক্তিতে নহে। "নিত্যাব্যক্তোঽপি ভগবানীক্ষতে নিজশক্তিতঃ। তামৃতে পরমাত্মানং কঃ পশ্যেতামিতং প্রভুম্ ॥ নারায়ণাধ্যাত্ম-বচন ॥—নিত্য অব্যক্ত (লোকনয়নের অগোচরীভূত) ভগবান্ তাঁহার নিজের শক্তিতেই দৃষ্ট হয়েন। তাঁহার সেই নিজ শক্তি ব্যতীত অমিত পরমাত্মা প্রভুকে কে দেখিতে পায় ? অর্থাৎ কেহই দেখিতে পায় না।"

অন্য কোনও উপায়েই তাঁহাকে জানা যায় না। "ন চক্ষুর্ন শ্রোত্রং ন তর্কো ন স্মৃতির্বেদো

হ্যেবৈনং বেদয়তি ॥ ২।১।৩-ব্রহ্মসূত্রের মাধ্বভাষ্যধৃত-ভাল্লবেয়শ্রুতিবাক্য ॥—(প্রাকৃত) চক্ষুকর্ণদ্বারা, তর্কদ্বারা, স্মৃতি-বেদদ্বারা (স্মৃতি-বেদাধ্যয়ন দ্বারা) ইঁহাকে জানা যায় না।" তিনি যাঁহাকে বরণ করেন, একমাত্র তিনিই তাঁহাকে জানিতে পারেন। "যমেবৈষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যঃ॥ মুণ্ডকশ্রুতি ॥৩।২।৩॥"

সুতরাং ভক্তিরূপা শক্তি যখন সাধক জীবের নিকটে ভগবান্‌কে প্রকাশ করে, দর্শন দেওয়ায়, তখন এই শক্তি যে ভগবানেরই শক্তি, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিন্তু ইহা ভগবানের কোন্ শক্তি ?

পরব্রহ্ম ভগবানের অনন্ত শক্তির মধ্যে তিনটী শক্তিই প্রধান, অর্থাৎ তিনটী শক্তিই হইতেছে তাঁহার অনন্তশক্তির মূল ; এই তিনটী শক্তির অনন্ত বৈচিত্রীই হইতেছে তাঁহার অনন্তশক্তি। এই তিনটী শক্তি হইতেছে—চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তি, জীবশক্তি এবং বহিরঙ্গা মায়াশক্তি। এই তিনটী শক্তির মধ্যে কোন্ শক্তি বা কোন্ শক্তির বৃত্তি হইতেছে ভক্তি ?

শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায়, বহিরঙ্গা মায়াশক্তি পরব্রহ্মকে স্পর্শও করিতে পারে না, পরব্রহ্মের নিকটবর্ত্তিনীও হইতে পারে না (১।১।১৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ভক্তি যখন সাধকজীবকে পরব্রহ্ম ভগবানের সান্নিধ্যে নেয়, সান্নিধ্যে নিয়া ভগবানের দর্শন করায় এবং ভগবানকে বশীভূতও করে, তখন এই ভক্তি বহিরঙ্গা মায়া বা তাহার কোনও বৃত্তি হইতে পারে না।

আবার, সাধকজীব হইতেছে ভগবানের জীবশক্তির অংশ (১।২।৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ; সুতরাং জীব হইতেছে স্বরূপতঃ ব্রহ্মের জীবশক্তি। এই জীবশক্তিরূপ সাধক-জীবকে যখন ভক্তি ভগবানের দর্শন করায়, তখন পরিষ্কারভাবেই বুঝা যাইতেছে যে, ভক্তি হইতেছে জীবশক্তি হইতে পৃথক্ একটী বস্তু, ভক্তি জীবশক্তি বা জীবশক্তির বৃত্তিবিশেষ নহে। ভক্তি হইতেছে কর্ত্তা, জীব কর্ম্ম। কর্ত্তা ও কর্ম্ম এক হইতে পারে না। জীবশক্তি নিজেই যদি নিজেকে ভগবৎ-সান্নিধ্য উপলব্ধি করাইতে পারিত, ভগবান্‌কে পাওয়াইতে বা বশীভূত করিতে পারিত, তাহা হইলে জীবের বহির্ম্মুখতাই সম্ভবপর হইত না, সাধন-ভজনের উপদেশও বৃথা হইয়া পড়িত।

এইরূপে দেখা গেল—ভক্তি বহিরঙ্গা মায়া শক্তিও নহে, জীবশক্তিও নহে, কিম্বা এই দুইটী শক্তির কোনওটীর কোনও বৃত্তিও নহে। অবশিষ্ট রহিল এক চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি।

ভক্তি যখন পরব্রহ্মেরই শক্তি, এবং পরব্রহ্মের তিনটী শক্তির মধ্যে ভক্তি যখন মায়াশক্তিও হইতে পারে না, জীবশক্তিও হইতে পারে না, তখন পারিশেষ্যন্যায়ে এই ভক্তি হইবে চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি, স্বরূপতঃ চিচ্ছক্তি বা স্বরূপ-শক্তিই, অন্য কিছু হইতে পারে না।

শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীল শুকদেব গোস্বামীর একটী উক্তি হইতেও জানা যায়, ভক্তি স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। রাসলীলা-বর্ণনের উপসংহারে তিনি বলিয়াছেন,

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ   শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং   হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥

—শ্রীভা, ১০ ৩৩।৩৯॥

—ব্রজবধূদিগের সহিত পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের এই (রাসাদি) লীলা (লীলার কথা) যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া নিরন্তর শ্রবণ এবং কীর্ত্তন করেন, ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া তিনি অচিরেই হৃদ্‌রোগ কামকে পরিত্যাগ করিয়া ধীর হয়েন।"

এই শ্লোকোক্তি হইতে জানা গেল, রাসলীলাদির কথা শ্রবণবৎকীর্ত্তনের ফলে প্রথমেই ভগবানে পরাভক্তি লাভ হয়, তাহার পরে হৃদ্‌রোগ কাম অপসারিত হইয়া থাকে। ইহাতে বুঝা যায়, পরাভক্তির প্রভাবেই হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হয়। হৃদ্‌রোগ কাম হইতেছে দেহেন্দ্রিয়ের সুখবাসনা; মায়ার প্রভাব হইতেই ঈদৃশী বাসনার উৎপত্তি। পরাভক্তিই মায়ার প্রভাবজাত এই দেহেন্দ্রিয়-সুখবাসনাকে দূরীভূত করে; এই বাসনা যে পুনরায় আসিতে পারে না, শ্লোকস্থ "ধীরঃ"-শব্দ হইতেই তাহা জানা যায়। ইহাতে বুঝা গেল, পরাভক্তি মায়ার প্রভাবকে এবং মায়াকেও সর্ব্বতো-ভাবে দূরীভূত করিয়া দেয়।

কিন্তু বহিরঙ্গা মায়া একমাত্র স্বরূপশক্তিদ্বারাই নিরসনীয়া (১।১।২৩-অনুচ্ছেদ-দ্রষ্টব্য); স্বরূপশক্তিব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারেনা। তাহা হইলে পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীশুকোক্তি হইতে জানা গেল, পরাভক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তিই, বা স্বরূপশক্তির বৃত্তিই, অপর কিছু নহে। শ্লোকোক্ত "পরাভক্তি" হইতেছে "প্রেমভক্তি"। উক্ত শ্লোকের টীকায় লিখিত হইয়াছে—"ভক্তিং প্রেমলক্ষণাং পরাম্॥ বৈষ্ণবতোষণী॥ পরাং প্রেমলক্ষণাম্॥ চক্রবর্ত্তী॥"

শ্বেতাশ্বতরোপনিষৎ বলেন—

"যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ।
তস্যৈতে কথিতাহ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ ৬।২৩॥

—পরমদেব পরব্রহ্মে যাঁহার পরা ভক্তি, পরব্রহ্মে যেরূপ, গুরুদেবেও যাঁহার তাদৃশী ভক্তি, সেই মহাত্মার নিকটে কথিত অর্থ (তত্ত্ব)-সমূহ প্রকাশ পাইয়া থাকে।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা যায়, যাঁহার পরা ভক্তি আছে, তিনিই ব্রহ্মের তত্ত্ব অবগত হইতে পারেন। ব্রহ্মের ন্যায় তাঁহার তত্ত্বাদিও স্বপ্রকাশ। শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহা বুঝা যায়। "প্রকাশন্তে"-ক্রিয়ার কর্ত্তা হইতেছে "অর্থাঃ।" অর্থসমূহ (শ্রুতি-কথিত ব্রহ্মতত্ত্বসমূহ) আত্মপ্রকাশ করেন। স্বপ্রকাশ-পরব্রহ্ম স্বীয় তত্ত্বের সহিত নিজেকে প্রকাশ করেন—তাঁহার নিজের শক্তিতেই। তাঁহার স্বপ্রকাশিকা শক্তি হইতেছে তাঁহারই স্বরূপশক্তি (১।১।৬৬-অনুচ্ছেদ-দ্রষ্টব্য)। উল্লিখিত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল, পরব্রহ্মে যাঁহার পরাভক্তি আছে, তাঁহার নিকটেই পরব্রহ্মের তত্ত্বসমূহ

আত্মপ্রকাশ করে ; ইহাতে বুঝা যায়, পরাভক্তির প্রভাবেই তত্ত্বসমূহ প্রকাশিত হয়। ইহা হইতেও জানা গেল যে, পরাভক্তি হইতেছে ভগবান্ পরব্রহ্মের স্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ।

"ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ॥ গীতা॥ ১৮।৫৫॥"-এই ভগবদুক্তি হইতেও জানা যায়, ভগবানের স্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই হইতেছে ভক্তি।

"মদ্রূপমদ্বয়ং ব্রহ্ম মধ্যাদ্যন্তবিবর্জ্জিতম্।
স্বপ্রভং সচ্চিদানন্দং ভক্ত্যা জানাতি চাব্যয়ম্॥

—প্রীতিসন্দর্ভ ১-অনুচ্ছেদধৃত বাসুদেবোপনিষদ্‌বাক্য॥

—আমার রূপ—যাহা অদ্বয় ব্রহ্ম, যাহার আদি নাই, মধ্য নাই, অন্ত নাই, যাহা স্বপ্রভ (স্বপ্রকাশ), সচ্চিদানন্দ এবং অব্যয়, আমার সেই রূপ—ভক্তিদ্বারাই জানা যায়।"

এই শ্রুতিবাক্য হইতেও জানা গেল—ভক্তি হইতেছে পরব্রহ্ম ভগবানের স্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ।

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন,

"কেচিৎ কেবলয়া ভক্ত্যা বাসুদেবপরায়ণাঃ।
অঘং ধুন্বন্তি কার্ৎস্নেন নীহারমিব ভাস্করঃ॥ ৬।১।১৫॥

—সূর্য্য যেমন নীহারকে দূরীভূত করে, বাসুদেবপরায়ণ কোনও কোনও ভক্ত তদ্রূপ কেবলা ভক্তিদ্বারাই পাপকে সম্যক্‌রূপে বিধূনিত করিয়া থাকেন।"

পাপ হইতেছে মায়ার প্রভাবজাত বস্তু। ভক্তিদ্বারা তাহা সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হয়। পাপের মূলীভূত কারণ মায়ার সম্যক্ অপসারণেই পাপ সম্যক্‌রূপে দূরীভূত হইতে পারে। সুতরাং এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ভক্তিদ্বারাই মায়া সম্যক্‌রূপে অপসারিত হইতে পারে। ইহা হইতেও জানা গেল—ভক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি ; কেননা, স্বরূপশক্তিব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারেনা।

এইরূপে দেখা গেল—কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনারূপা **ভক্তি** (বা প্রেমভক্তি, বা ভাব, বা রতি) **হইতেছে পরব্রহ্ম-ভগবানের চিচ্ছক্তির বা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ।** ইহাই হইতেছে ভক্তির (বা প্রেমের, বা ভাবের) স্বরূপ।

এজন্যই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু "ভাব"-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন—"শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষাত্মা॥১।৩।১॥-ভাব হইতেছে শুদ্ধসত্ত্বস্বরূপ।" ইহার টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—

অত্র শুদ্ধসত্ত্বং নাম যা ভগবতঃ সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তেঃ সংবিদাখ্যা বৃত্তিঃ। ন তু মায়াবৃত্তিবিশেষঃ। * * * শুদ্ধসত্ত্ববিশেষত্বং নাম চাত্র যা স্বরূপশক্তিবৃত্ত্যন্তরলক্ষণা। 'হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংস্থিতৌ। হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে॥' ইতি বিষ্ণুপুরাণা-নুসারেণ হ্লাদিনীনাম্নী মহাশক্তিস্তদীয়সারবৃত্তিসমবেততৎসারাংশত্বমিত্যবগন্তব্যং তয়োঃ সমবেতয়োঃ

সারত্বঞ্চ তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানকতদীয়ানুকূল্যেচ্ছাময়পরমবৃত্তিত্বম্। * * * সামান্যতো লক্ষিতা যা ভক্তিঃ সৈব নিজাংশবিশেষে ভাব উচ্যতে। স চ কিং কিং স্বরূপস্তত্রাহ কৃষ্ণস্য স্বরূপশক্তিস্বরূপঃ শুদ্ধসত্ত্ব-বিশেষো যঃ স এবাত্মা তন্নিত্যপ্রিয়জনাধিষ্ঠানং তয়া নিত্যসিদ্ধং স্বরূপং যস্য সঃ।

টীকার তাৎপর্য্য। "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিৎ"-ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৬৯)-বাক্য হইতে জানা যায়, একমাত্র ভগবানেই স্বরূপশক্তি বিরাজিত; এই স্বরূপশক্তির তিনটী বৃত্তি—হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সংবিৎ। ভগবানের এই স্বরূপশক্তি হইতেছে সর্ব্বপ্রকাশিকা শক্তি। শুদ্ধসত্ত্ব হইতেছে এই সর্ব্বপ্রকাশিকা স্বরূপশক্তির সংবিৎ-নাম্নী বৃত্তি, ইহা মায়াশক্তির বৃত্তি নহে (অর্থাৎ মায়িক রজস্তমো বিবর্জ্জিত সত্ত্ব নহে; কেননা, উল্লিখিত বিষ্ণুপুরাণ-শ্লোকে বলা হইয়াছে, ভগবানে মায়িক সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ নাই)। বিষ্ণুপুরাণে স্বরূপশক্তির যে তিনটী বৃত্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে হ্লাদিনীরূপা যে মহাশক্তি, তাহার সারবৃত্তির সহিত সংবিৎ সমবেত হইলে যাহা হয়, তাহারই সার হইতেছে শুদ্ধসত্ত্ব; ইহা হইতেছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যেচ্ছাময়ী পরমবৃত্তি; ভগবানের নিত্য-পরিকরগণই হইতেছে ইহার অধিষ্ঠান। সামান্যভাবে যে ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহারই অংশ-বিশেষের নাম ভাব। এই ভাবের স্বরূপ কি? শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তিরূপ যে শুদ্ধসত্ত্ববিশেষ, তাহাই হইতেছে ভাবের আত্মা বা স্বরূপ।"

এই টীকা হইতে জানা গেল—স্বরূপতঃ ভাব হইতেছে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির সংবিৎ ও হ্লাদিনী—এই দুইটী বৃত্তির সারস্বরূপ—সুতরাং স্বরূপশক্তিই; ইহা মায়াশক্তির বৃত্তি নহে। সুতরাং ভক্তিও স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। *

---

* "ভাব"-শব্দে সাধারণতঃ প্রেম বা প্রেমভক্তিকেই বুঝায়; যেমন—গোপীভাব, ব্রজভাব। গোপীভাব বলিতে গোপীপ্রেম এবং ব্রজভাব বলিতে ব্রজপ্রেমকেই বুঝায়। "ভাব" আবার একটী পারিভাষিক বা বিশেষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। প্রেমের যে প্রথম আবির্ভাব, তাহাকেও "ভাব" বা প্রেমাঙ্কুর বলা হয়। প্রেমের বা প্রেমভক্তির প্রথম আবির্ভাব বলিয়া এই বিশেষ অর্থজ্ঞাপক "ভাবকে" ভক্তির অংশ বলা যায়। ভক্তির অংশ এই ভাবই যখন স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ, তখন ভক্তিও যে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কেননা, অংশ ও অংশী বস্তুগত ভাবে একই। সূর্য্যের অংশ কিরণ এবং সূর্য্য-উভয়ই একই তেজোবস্তু—কিরণ হইতেছে তরল তেজঃ এবং সূর্য্য ঘনত্বপ্রাপ্ত তেজঃ।

ভাবের আর একটী বিশেষ অর্থ আছে—গাঢ়ত্বপ্রাপ্ত প্রেমের এক উচ্চ স্তর, অনুরাগের পরবর্ত্তী প্রেমস্তরকেও "ভাব" বলা হয়; ভাব (প্রেমাঙ্কুর), প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব—কৃষ্ণরতি ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে এই কয়টী স্তরে পরিণত হয়।

"রতি" এবং "প্রেম"-এই দুইটী শব্দেরও সাধারণ অর্থে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনাকে বুঝায়; যেমন, কৃষ্ণরতি, কৃষ্ণপ্রেম। আবার, এই দুইটী শব্দ—বিশেষ অর্থেও ব্যবহৃত হয়। "রতি"-শব্দে বিশেষ অর্থে "প্রেমাঙ্কুর" বা বিশেষার্থক "ভাব"কেও বুঝায়। আর "প্রেম"-শব্দে বিশেষ অর্থে প্রেমাঙ্কুরের (বা ভাবের, বা রতির) গাঢ়ত্বপ্রাপ্ত স্তরকেও বুঝায়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভের ৬১-অনুচ্ছেদে বলিয়াছেন—শ্রীবিষ্ণুপুরাণে প্রহ্লাদ তাঁহার একটী উক্তিতে অতিদেশ * দ্বারা ভগবৎপ্রীতির (অর্থাৎ ভক্তির) স্বরূপলক্ষণ দেখাইয়াছেন। প্রহ্লাদের উক্তিটী এই ঃ—

"যা প্রীতিরবিবেকানাং বিষয়েষ্বনপায়িনী।
ত্বামনুস্মরতঃ সা মে হৃদয়ান্নাপসর্পতু ॥ বিষ্ণুপুরাণ ১।২০।১৯॥

– প্রহ্লাদ শ্রীনৃসিংহদেবের নিকটে বলিলেন—অবিবেকিগণের (বিষয়াসক্ত লোকদিগের) বিষয়ভোগে যে অবিচলিতা প্রীতি থাকে, নিরন্তর তোমার স্মরণপরায়ণ আমার হৃদয় হইতে সেই প্রীতি যেন অন্তর্হিত না হয়।"

এ-স্থলে "প্রীতি"-শব্দে "ভক্তি" বুঝায়। কেননা, অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে প্রহ্লাদ "ভক্তি"-শব্দই ব্যবহার করিয়াছেন।

নাথ জন্মসহস্রেষু যেষু যেষু ব্রজাম্যহম্।
তেষু তেষ্বচ্যুতা ভক্তিরচ্যুতাস্তু সদা ত্বয়ি ॥ বিষ্ণুপুরাণ ॥১।২০।১৮॥

—প্রহ্লাদ বলিলেন, হে নাথ ! হে অচ্যুত ! (আমার কর্ম্মফল অনুসারে আমাকে সহস্র সহস্র জন্ম গ্রহণ করিতে হইবে, সহস্র সহস্র যোনিতে ভ্রমণ করিতে হইবে) যে যে সহস্র যোনিতে আমি পরিভ্রমণ (জন্মগ্রহণ) করি, সেই সেই যোনিতে জন্ম গ্রহণ করিয়াও যেন তোমাতে আমার অচ্যুতা (নিরবচ্ছিন্না) ভক্তি থাকে।"

এই নিরবচ্ছিন্না ভক্তি কিরূপ, তাহাই তিনি "যা প্রীতিরবিবেকানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকে বলিয়াছেন। সুতরাং এ-স্থলে "প্রীতি" ও "ভক্তি" একই বস্তু।

প্রহ্লাদের উল্লিখিতরূপ প্রার্থনা শুনিয়া ভগবান্‌ও যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতেও উহাই জানা যায়। তিনি বলিয়াছেন,

"ময়ি ভক্তিস্তবাস্ত্যেব ভূয়োঽপ্যেবং ভবিষ্যতি। বি,পু, ১।২০।২০॥

—আমার প্রতি তোমার ভক্তি তো আছেই, পুনঃপুনঃ জন্মগ্রহণ করিলেও এইরূপই থাকিবে।"

এজন্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও বলিয়াছেন—"সা ভাগবতী ভক্তিঃ প্রীতিরিত্যর্থঃ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥৬১॥—সেই ভাগবতী ভক্তি হইতেছে প্রীতিই।"

"যা প্রীতিরবিবেকানাম্"-ইত্যাদি শ্লোকে বিষয়প্রীতি এবং ভগবৎপ্রীতি—এই উভয়রূপ প্রীতির অবিচলিতত্বরূপ সমান লক্ষণ থাকিলেও উভয়ের অনেক পার্থক্য আছে ; কেননা, প্রথমটী অর্থাৎ বিষয়প্রীতি হইতেছে মায়াশক্তির বৃত্তি এবং পরেরটী, অর্থাৎ ভগবৎপ্রীতি বা ভক্তি হইতেছে

---

* অতিদেশ—অন্যধর্ম্মের অন্যত্র আরোপণ। প্রহ্লাদকর্ত্তৃক বিষয়প্রীতির ধর্ম্ম ভগবৎপ্রীতিতে আরোপিত হইয়াছে।

স্বরূপশক্তির বৃত্তি। "যা যল্লক্ষণা, সা তল্লক্ষণা ইত্যর্থঃ। ন তু যা সৈবেতি বক্ষ্যমাণলক্ষণৈক্যাৎ। তথাপি পূর্ব্বস্যা মায়াশক্তিবৃত্তিময়ত্বেন উত্তরস্যাঃ স্বরূপশক্তিবৃত্তিময়ত্বেন ভেদাৎ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥৬১॥"

বিষয়প্রীতি ও ভগবৎপ্রীতির কোনও বিষয়ে সমান লক্ষণ দেখাইয়া শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন— বিষয়প্রীতি যে মায়াশক্তিবৃত্তিময়ী, তাহা শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতেও জানা যায়।

"ইচ্ছা দ্বেষঃ সুখং দুঃখং সংঘাতশ্চেতনা ধৃতিঃ।
এতৎক্ষেত্রং সমাসেন সবিকারমুদাহৃতম্॥ গীতা॥ ১৩।৭॥

—ইচ্ছা, দ্বেষ, দুঃখ, সংঘাত (শরীর), চেতনা, ধৈর্য্য –বিকারযুক্ত এসকল পদার্থ ক্ষেত্রনামে অভিহিত হয়।"

মায়িক দেহাদি পদার্থকে গীতাশাস্ত্রে ক্ষেত্র বলা হইয়াছে এবং আত্মাকে ক্ষেত্রজ্ঞ বলা হইয়াছে। বিষয়প্রীতি-জনিত যে সুখ, তাহা ক্ষেত্রপদার্থেরই অন্তর্ভুক্ত, সুতরাং তাহাও মায়িক, মায়ার সত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ। সুতরাং বিষয়প্রীতি হইতেছে মায়াশক্তিময়ী।

ইহার পরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বহু শাস্ত্রপ্রমাণের আলোচনা করিয়া ভগবৎপ্রীতির বা প্রেমভক্তির গুণাতীতত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন। এ-স্থলে দুয়েকটী প্রমাণের আলোচনা প্রদর্শিত হইতেছে।

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—

"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৪॥

—কৈবল্য হইতেছে সাত্ত্বিক জ্ঞান; বৈকল্পিক, অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ক জ্ঞান, হইতেছে রাজসিক; প্রাকৃত (অর্থাৎ বালক, মূক প্রভৃতির জ্ঞানের তুল্য) জ্ঞান হইতেছে তামস। আমাবিষয়ক (পরমেশ্বর-বিষয়ক) জ্ঞান হইতেছে নির্গুণ।"

"সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৯॥

—আত্মোত্থ সুখ সাত্ত্বিক; বিষয়ভোগজনিত সুখ রাজস; মোহ-দৈন্য-সমুৎপন্ন সুখ তামস; এবং আমার (ভগবানের) শরণাপত্তিজনিত সুখ নির্গুণ।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন— ভগবৎ-প্রীতি বা ভক্তি হইতেছে ভগবৎসম্বন্ধিজ্ঞানরূপা এবং তৎসম্বন্ধিসুখরূপা। "তত্র তস্যা ভগবৎসম্বন্ধিজ্ঞানরূপত্বেন তৎসম্বন্ধিসুখরূপত্বেন চ গুণাতীতত্বং শ্রীভগবতৈব দর্শিতম্। প্রীতিসন্দর্ভঃ॥ ৬২॥" সুতরাং ভগবদ্বিষয়কজ্ঞানের এবং ভগবৎসম্বন্ধি সুখের গুণাতীতত্ব প্রদর্শিত হইলেই ভগবৎপ্রীতিরও গুণাতীতত্ব প্রদর্শিত হইয়া যায়। ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীব তাহাই দেখাইয়াছেন।

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
—শ্রীভা, ৩।২৯।১১-১২॥

—(ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতিকে বলিয়াছেন) আমার গুণ শ্রবণমাত্রে সর্ব্বান্তর্য্যামী আমাতে সমুদ্রগামী-গঙ্গাসলিলের ন্যায় মনের অবিচ্ছিন্না গতি হইতেছে নির্গুণ-ভক্তিযোগের লক্ষণ ; যে ভক্তি পুরুষোত্তমে অহৈতুকী (ফলানুসন্ধানরহিতা) এবং অব্যবহিতা (স্বরূপসিদ্ধা বলিয়া সাক্ষাদ্রূপা)।"

এ-স্থলেও ভক্তির গুণাতীতত্ব কথিত হইয়াছে। ভক্তির গুণাতীতত্ব হইতেই জানা যায়—ভক্তি মায়াশক্তির বৃত্তি নহে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তির পরমানন্দরূপতাও দেখাইয়াছেন।

"মৎসেবয়া প্রতীতং তে সালোক্যাদিচতুষ্টয়ম্।
নেচ্ছন্তি সেবয়া পূর্ণাঃ কুতোঽন্যৎ কালবিপ্লুতম্॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৭॥

—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) আমার সেবার প্রভাবে সালোক্যাদি মুক্তিচতুষ্টয় আপনা-আপনি উপস্থিত হইলেও তাঁহারা (আমার ভক্তগণ) তাহা গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন না, পারমেষ্ঠ্যাদি কালনাশ্য বস্তুর কথা আর কি বলিব ? আমার সেবাতেই তাঁহারা পরিতৃপ্ত থাকেন।"

"সালোক্যসার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত।
দীয়মানং ন গৃহ্নন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।১৩॥

—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) সালোক্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য ও সাযুজ্য—এই পঞ্চবিধা মুক্তি যদি আমি উপযাচক হইয়াও দিতে ইচ্ছা করি, তাহা হইলেও আমার ভক্তগণ তাহা গ্রহণ করেন না, আমার সেবা ব্যতীত অপর কিছুই তাঁহারা ইচ্ছা করেন না।"

পারমেষ্ঠ্যাদি সুখ অনিত্য ; তাহাতে আবার এই সুখ বাস্তব সুখও নহে, ইহা স্বত্ত্বগুণজাত চিত্তপ্রসাদ মাত্র, মায়িক। শ্রুতির আনন্দমীমাংসায় প্রদর্শিত হইয়াছে, ব্রহ্মাণ্ডে পারমেষ্ঠ্য সুখ অপেক্ষা অধিকতর প্রাচুর্য্যময় সুখ আর কিছু নাই। ভক্তগণ তাহাও ইচ্ছা করেন না। পঞ্চবিধা মুক্তির সুখ হইতেছে বাস্তব সুখ, ভূমারূপ সুখ, তাহাতে মায়ার কোনওরূপ প্রভাবের স্পর্শই নাই ; কিন্তু ভক্তির কৃপাপ্রাপ্ত ভক্তগণ তাহাও চাহেন না ; তাঁহারা চাহেন একমাত্র ভগবানের সেবা—ভক্তি। ইহাতেই বুঝা যায়—ভক্তির যে আনন্দ, তাহা হইতেছে সালোক্যাদি মোক্ষের আনন্দ অপেক্ষাও পরমোৎকর্ষময়। ইহা হইতে জানা যায়, এই পরমানন্দ-স্বরূপা ভক্তি হইতেছে হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"সর্ব্বমেতৎ যস্যামেব কবয় ইত্যাদি গদ্যে ব্যক্তমস্তি।—

ভক্তির পরমানন্দরূপত্ব, গুণাতীতত্ব এবং নিত্যত্ব-এই সমস্তই 'যস্যামেব কবয়'-ইত্যাদি গদ্যে ব্যক্ত হইয়াছে। এই গদ্য-বাক্যটী নিম্নে উদ্ধৃত হইতেছে।

"যস্যামেব কবয় আত্মানমবিরতং বিবিধবৃজিন-সংসারপরিতাপোপতপ্যমানমনুসবনং স্নাপয়ন্তস্তয়ৈব পরয়া নির্ব্বৃত্যা হ্যপবর্গমাত্যন্তিকং পরমপুরুষার্থমপি স্বয়মাসাদিতং নো এবাদ্রিয়ন্তে ভগবদীয়ত্বেনৈব পরিসমাপ্তসর্ব্বার্থাঃ॥ শ্রীভা, ৫।৬।১৭॥
—পণ্ডিতগণ নানাবিধ অনর্থরূপ সংসার-সন্তাপে সতত পরিতপ্ত আত্মাকে ভক্তিরূপ অমৃত-প্রবাহে অবিরত স্নান করাইয়া যে পরমানন্দ প্রাপ্ত হয়েন, তাহার ফলে চরম ও পরম মোক্ষ স্বয়ং আগত হইলেও তাঁহারা তাহার আদর করেন না। কেননা, তাঁহারা ভগবানের আপন জন বলিয়া সকল পুরুষার্থই সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

এই গদ্যবাক্যে "পরমানন্দ"-শব্দে ভক্তির পরমানন্দস্বরূপতা, "স্বয়ং আগত চরম ও পরম মোক্ষের প্রতি অনাদর"-বাক্যে ভক্তির গুণাতীতত্ব এবং নিত্যত্ব সূচিত হইয়াছে।

ভক্তির ভগবদ্‌বশীকরণীশক্তিও শ্রীজীবপাদ প্রতিপাদিত করিয়াছেন।

"অহং ভক্তপরাধীনো হ্যস্বতন্ত্র ইব দ্বিজ।
সাধুভির্গ্রস্তহৃদয়ো ভক্তৈর্ভক্তজনপ্রিয়ঃ॥ শ্রীভা, ৯।৪।৬৩॥

—(শ্রীভগবান্ দুর্ব্বাসাকে বলিয়াছেন) হে দ্বিজ! ভক্তজনপ্রিয় আমি অস্বতন্ত্রের মত ভক্ত-পরাধীন; সাধুভক্তগণকর্ত্তৃক আমি গ্রস্তহৃদয়।"

ভগবান্ বলিয়াছেন—"অস্বতন্ত্র জীব যেমন পরাধীন হয়, তদ্রূপ পরম স্বতন্ত্র হইয়াও আমি ভক্তপরাধীন (অন্যের নিকটে আমি স্বতন্ত্র; কিন্তু ভক্তের নিকটে আমার কোনও স্বাতন্ত্র্য নাই)। কারণ, যাঁহারা মুক্তি পর্য্যন্ত কামনা করেন না, আমার সুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা ব্যতীত আর কিছুই যাঁহারা চাহেন না, সেই সাধুভক্তগণকর্ত্তৃক আমি গ্রস্তহৃদয়, অর্থাৎ তাঁহাদের ভক্তিদ্বারা আমার হৃদয় পরমবশীকৃত হইয়া আছে। কেননা, আমি ভক্তজনপ্রিয়—ভক্তজনের প্রতি আমি অত্যন্ত প্রীতিমান্, তাঁহাদের প্রীতিলাভে আমি প্রীতিমান্।" ইহাতে বুঝা গেল, ভগবানের প্রতি সাধু-ভক্তের প্রীতি অনুভব করিয়া ভগবান্ অত্যন্ত আনন্দ লাভ করেন।

ভগবানের আনন্দ দুই রকম—স্বরূপানন্দ ও স্বরূপশক্ত্যানন্দ (বা ভক্ত্যানন্দ)। স্বরূপশক্ত্যানন্দ আবার দ্বিবিধ—মানসানন্দ ও ঐশ্বর্য্যানন্দ (১।১।১২৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। "অহং ভক্তপরাধীনো"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীভগবানের মানসানন্দ-সমূহের মধ্যে ভক্ত্যানন্দেরই সাম্রাজ্য বা একাধিপত্য দর্শিত হইয়াছে। আবার, স্বরূপানন্দ ও ঐশ্বর্য্যানন্দসমূহেও যে ভক্ত্যানন্দের একাধিপত্য, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকদ্বয়ে ভগবানের উক্তি হইতেই তাহা জানা যায়। ভগবান্ বলিয়াছেন—

"নাহমাত্মানমাশাসে মদ্‌ভক্তৈঃ সাধুভির্বিনা।
শ্রিয়ঞ্চাত্যন্তিকীং ব্রহ্মন্ যেষাং গতিরহং পরা॥ শ্রীভা, ১১।৪।৬৪॥

—(ভগবান্ দুর্ব্বাসার নিকটে বলিয়াছেন) হে ব্রহ্মন্! আমি যাঁহাদের পরমা গতি, সেই সাধুভক্তগণ ব্যতীত, আমি নিজেকেও এবং নিজের আত্যন্তিকী শ্রীকেও (সম্পৎকেও) অভিলাষ করি না।"

"ন তথা মে প্রিয়তম আত্মযোনি র্ন শঙ্করঃ।
ন চ সঙ্কর্ষণো শ্রীর্নৈবাত্মা চ যথা ভবান্॥ শ্রীভা, ১১।১৪।১৫॥

—(উদ্ধবের প্রতি ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) উদ্ধব! (ভক্তত্বাতিশয়বশতঃ) তুমি আমার যেরূপ প্রিয়তম, আত্মযোনি ব্রহ্মা (আমার পুত্র হইলেও), শঙ্কর (আমার গুণাবতার হইলেও), সঙ্কর্ষণ (বলদেব, আমার ভ্রাতা হইলেও), লক্ষ্মী (আমার জায়া হইলেও), সেইরূপ নহেন। এমন কি, আমার নিজস্বরূপও (পরমানন্দঘনরূপ হইলেও) আমার সেইরূপ প্রিয়তম নহে।"

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে ভগবদুক্তি হইতেই জানা যায়, ভগবানের স্বরূপানন্দ এবং ঐশ্বর্য্যানন্দ হইতেও ভক্ত্যানন্দ (ভক্তের ভক্তি বা প্রীতির আস্বাদনে ভগবান্ যে আনন্দ লাভ করেন, তাহা) পরমোৎকর্ষময়।

শ্রুতি হইতেও ভক্ত্যানন্দের পরমোৎকর্ষের কথা জানা যায়। "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি, ভক্তিবশঃ পুরুষঃ, ভক্তিরেব ভূয়সী॥ মাধ্বভাষ্যধৃত মাঠরশ্রুতিবাক্য॥—ভক্তিই ভক্তকে (ভগবদ্ধামে, ভগবানের নিকটে) লইয়া যায়, ভক্তিই ভক্তকে ভগবদ্দর্শন করাইয়া থাকে; শ্রীভগবান্ ভক্তির বশীভূত; ভক্তিই ভূয়সী (ভগবৎপ্রাপ্তির শ্রেষ্ঠ সাধন; অথবা, প্রভাবে সর্ব্বশক্তিমান্ ভগবান্ হইতেও গরীয়সী—কেননা, ভক্তি ভগবানকেও বশীভূত করিয়া থাকে)।"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—ভক্তিতে প্রচুর আনন্দ বর্ত্তমান; ভক্তির এই নিরতিশয় আনন্দ অনুভব করিয়া নিত্যতৃপ্ত পূর্ণতমস্বরূপ ভগবান্ও ভক্তির বশীভূত হইয়া পড়েন, আনন্দোন্মত্ত হইয়া পড়েন। কিন্তু এতাদৃশী ভক্তির লক্ষণ কি? "যা চৈবং ভগবন্তং স্বানন্দেন মদয়তি, সা কিংলক্ষণা স্যাদিতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥৬৫॥"

ভক্তির লক্ষণ-বিচার-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—

"এই ভক্তি নিরীশ্বর-সাংখ্যমতাবলম্বীদের প্রাকৃত-সত্ত্বময়-মায়িক-আনন্দরূপা হইতে পারে না; কেননা, শ্রুতি হইতে জানা যায়, ভগবান্ কখনও মায়াপরবশ হইতে পারেন না, মায়া কখনও ভগবান্‌কে অভিভূত করিতে পারে না; বিশেষতঃ, তিনি স্বতঃতৃপ্ত, পূর্ণতমস্বরূপ, বলিয়া আপনাতেই আপনি তৃপ্ত। এই ভক্তি আবার নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মবাদীদিগের ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দরূপাও নহে; কেননা, ব্রহ্মানুভবজনিত আনন্দও এক রকমের স্বরূপানন্দ; ভক্তির আনন্দ কিন্তু স্বরূপানন্দ হইতেও উৎকর্ষময়। ব্রহ্মানন্দে আনন্দের এইরূপ পরমোৎকর্ষময়ত্ব উপপন্ন হয় না। সুতরাং ভক্তির আনন্দ যে জীবের স্বরূপানন্দরূপ নহে, তাহা বলাই বাহুল্য; কেননা, অণুচিৎ জীবের স্বরূপানন্দ অতি ক্ষুদ্র। তাহা হইলে, এই পরমোৎকর্ষময় ভগবদ্-বশীকরণসামর্থ্যবিশিষ্ট এই ভক্ত্যানন্দটী কি? বিষ্ণুপুরাণ-প্রমাণ হইতে তাহা জানা যাইতে পারে। বিষ্ণুপুরাণ বলিয়াছেন—

"হ্লাদিনীসন্ধিনীসম্বিত্ত্বয্যেকা সর্ব্বসংশ্রয়ে।
হ্লাদতাপকরী মিশ্রা ত্বয়ি নো গুণবর্জ্জিতে ॥ বি, পু, ১।১২।৬৯॥

—হে ভগবন্! হ্লাদিনী (আহ্লাদকরী), সন্ধিনী (সত্তাদায়িনী) এবং সম্বিৎ (জ্ঞানদায়িনী, বিদ্যা)-এই তিন বৃত্তিবিশিষ্টা এক স্বরূপশক্তি সর্ব্বাধিষ্ঠানভূত আপনাতেই অবস্থান করিতেছে। মনঃ-প্রসাদকারিণী সাত্ত্বিকী, বিষয়জনিত-তাপদায়িনী তামসী এবং প্রসাদ ও তাপ-এই উভয়মিশ্রা রাজসী-এই ত্রিবিধ শক্তি প্রাকৃত-গুণবর্জ্জিত আপনাতে নাই।"

এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন –"ইতি শ্রীবিষ্ণুপুরাণানুসারেণ হ্লাদিন্যাখ্যতদীয়স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপৈবেত্যবশিষ্যতে যয়া খলু ভগবান্ স্বরূপানন্দবিশেষীভবতী। যয়ৈব তং তমানন্দমন্যানপ্যনুভাবয়তীতি।—এই শ্রীবিষ্ণুপুরাণের উক্তি অনুসারে, ভগবানের হ্লাদিনীনাম্নী স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপই অবশিষ্ট থাকে, যদ্দ্বারা ভগবান্ নিজেও অভূতপূর্ব্ব স্বরূপানন্দবিশিষ্ট হয়েন এবং যদ্দ্বারা সেই সেই আনন্দ অপরকেও অনুভব করাইয়া থাকেন।"

ইহার তাৎপর্য্য এই ঃ—মূলবস্তুমাত্র আনন্দস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবান্। স্বরূপে এবং শক্তি-রূপে তাঁহার প্রকাশ। স্বরূপের প্রকাশ দ্বিবিধ – নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম এবং সবিশেষ ভগবান্। আর, শক্তির প্রকাশ ত্রিবিধ—মায়াশক্তি, জীবশক্তি এবং স্বরূপশক্তি। দ্বিবিধ স্বরূপের প্রকাশের মধ্যে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের অনুভবজনিত আনন্দ যে আনন্দপ্রাচুর্য্যময়ী ভক্তির আনন্দ হইতে পারে না, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, সবিশেষ ভগবৎস্বরূপের স্বরূপানন্দ অপেক্ষাও যে ভক্ত্যানন্দ পরমোৎকর্ষময়,—সুতরাং এবম্বিধ স্বরূপানন্দও যে ভক্ত্যানন্দ নহে,—তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। সারমর্ম্ম এই যে—পরব্রহ্ম ভগবানের কোনওরূপ স্বরূপানন্দই যে ভক্ত্যানন্দ নহে, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। বাকী রহিল ভগবানের শক্তি। শক্তির মধ্যে মায়াশক্তির গুণত্রয়ের মধ্যে একমাত্র সত্ত্বগুণেরই চিত্তপ্রসন্নতাবিধায়ক সুখ বা আনন্দ জন্মাইবার সামর্থ্য আছে, রজঃ ও তমো-গুণের তাহা নাই। কিন্তু সত্ত্বগুণজাত আনন্দও যে ভক্ত্যানন্দ হইতে পারে না – সুতরাং মায়াশক্তি যে ভক্ত্যানন্দের হেতু নহে—তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, জীবশক্তির অংশই জীব; জীবের স্বরূপানন্দ হইতেছে জীবশক্তি হইতে উদ্ভূত আনন্দ; কিন্তু তাহাও অতি ক্ষুদ্র বলিয়া যে পরমোৎকর্ষময় ভক্ত্যানন্দ হইতে পারে না, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। এইরূপে ভক্ত্যানন্দবিষয়ে ভগবানের স্বরূপানন্দও বাদ পড়িল, তাঁহার মায়াশক্তি এবং জীবশক্তিও বাদ পড়িল। সর্ব্বশেষ বাকী রহিল কেবল স্বরূপশক্তি। স্বরূপশক্তির হ্লাদিনী, সন্ধিনী এবং সম্বিৎ—এই তিনটী বৃত্তির মধ্যে আবার হ্লাদিনীরই হ্লাদজননী বা আনন্দদায়িনী শক্তি আছে, সন্ধিনী এবং সম্বিতের তাহা নাই। এইরূপে দেখা গেল—সর্ব্বশেষ কেবল হ্লাদিনীই অবশিষ্ট থাকে; সুতরাং হ্লাদিনী-নাম্নী-স্বরূপশক্তির আনন্দই হইবে ভক্ত্যানন্দ। ইহাদ্বারাই ভগবান্ নিজেও আনন্দপ্রাচুর্য্য অনুভব করেন এবং ভক্তগণকেও আনন্দ অনুভব করাইয়া থাকেন।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—হ্লাদিনী ভগবানের স্বরূপশক্তি বলিয়া সর্ব্বদা ভগবানেই বিরাজিত ; জীবের মধ্যে স্বরূপশক্তি নাই, সুতরাং হ্লাদিনীও নাই (২।৮-অনুচ্ছেদ-দ্রষ্টব্য)। অথচ, ভক্ত্যানন্দের অনুভবেই ভগবানের আনন্দ-প্রাচুর্য্য। কিন্তু ভক্তি থাকে ভক্তের হৃদয়ে। ভক্তি যদি হ্লাদিনী শক্তির বৃত্তিই হয়, এবং সেই হ্লাদিনী যখন একমাত্র ভগবানেই অবস্থিত থাকে, অন্যত্র থাকেনা, বিশেষতঃ জীবের মধ্যে যখন হ্লাদিনী নাই, তখন ভক্তের মধ্যে কিরূপে ভক্তি থাকিতে পারে ? এবং ভক্তের ভক্তি হইতে উদ্ভূত আনন্দের আস্বাদনই বা কিরূপে ভগবান্ পাইতে পারেন ?

শ্রুতার্থাপত্তিন্যায়ে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই আপত্তির সমাধান করিয়াছেন। অতি প্রসিদ্ধ বলিয়া যাহাকে অস্বীকার করা যায়না, অথচ যাহার কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়না, তাহার স্বীকৃতির অনুকূল যে কারণের কল্পনা করা হয়, তাহাকে বলে অর্থাপত্তি-প্রমাণ (অবতরণিকা ২-অনুচ্ছেদ-দ্রষ্টব্য)। ইহাও সর্ব্বজনস্বীকৃত প্রমাণসমূহের মধ্যে একটী প্রমাণ। অর্থাপত্তি দুই রকমের——দৃষ্টার্থাপত্তি এবং শ্রুতার্থাপত্তি।

যে অনস্বীকার্য্য বস্তুটী দৃষ্ট হয়, তাহাকে বলে দৃষ্টার্থ এবং তাহার জন্য যে কারণের কল্পনা করা হয়, তাহাকে বলে **দৃষ্টার্থাপত্তি**। যেমন, অবতরণিকা ২-অনুচ্ছেদে দেবদত্তের দৃষ্টান্ত।

আর, যে অনস্বীকার্য্য বস্তুটী শ্রুতিস্মৃতি হইতে জানা যায়, তাহাকে বলে শ্রুতার্থ এবং তাহার সম্বন্ধে কারণের কল্পনাকে বলে **শ্রুতার্থাপত্তি**। ভক্ত্যানন্দের আস্বাদনে ভগবান্ যে আনন্দ-প্রাচুর্য্য অনুভব করেন এবং যে ভক্তির আনন্দ তিনি আস্বাদন করেন, সেই ভক্তি যে ভক্তের হৃদয়েই থাকে—ইহা শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ, সুতরাং অনস্বীকার্য্য। কিন্তু ইহার কোনও কারণ পাওয়া যায়না ; কেননা, ভক্তি হইতেছে হ্লাদিনী নাম্নী স্বরূপশক্তির বৃত্তি ; অথচ সাধক জীবে হ্লাদিনী নাই, হ্লাদিনী থাকে ভগবানের মধ্যে। এই অবস্থায় হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ ভক্তি কিরূপে ভক্তের মধ্যে থাকিতে পারে ? ভক্তের চিত্তে ভক্তির অস্তিত্বের কোনও কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায়না। অথচ ভক্তের চিত্তে যে ভক্তি আছে, শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ বলিয়া ইহা অস্বীকারও করা যায়না। এস্থলে, অর্থাৎ শ্রুতিস্মৃতি-প্রসিদ্ধ অনস্বীকার্য্য বস্তুর যে কারণের কল্পনা, তাহা হইতেছে শ্রুতার্থাপত্তি। শ্রীপাদ জীব ইহাকে বলিয়াছেন—“শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তিপ্রমাণ—শ্রুতার্থের (শ্রুতিস্মৃতি-বিহিত, সুতরাং অনস্বীকার্য্য অর্থের বা বিষয়ের) অন্যথা (কারণ কল্পনা না করিলে) অনুপপত্তি (অসঙ্গতি) হয় বলিয়া সেই অর্থের (অনস্বীকার্য্য বিষয়ের সঙ্গতি রক্ষার জন্য যে) আপত্তি (কারণ কল্পনা), সেই প্রমাণ।”

এই শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণের আশ্রয়ে ভক্তচিত্তে হ্লাদিনীর বৃত্তি ভক্তির অস্তিত্বসম্বন্ধে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী একটী কারণের কল্পনা করিয়াছেন। ভক্তি যখন হ্লাদিনীর বৃত্তি এবং হ্লাদিনী যখন কেবল ভগবানের মধ্যেই থাকে, তখন ভক্তের চিত্তে হ্লাদিনীর আগমন ব্যতীত ভক্ত-চিত্তে ভক্তির অস্তিত্ব সিদ্ধ হইতে পারেনা। আবার, হ্লাদিনীও যখন ভগবানেরই শক্তি এবং ভগবানের মধ্যেই

অবস্থিত, তখন ভগবান্ ব্যতীত অপর কেহও হ্লাদিনীকে ভক্তচিত্তে পাঠাইতে পারেন না, ভক্ত নিজেও ভগবানের মধ্য হইতে হ্লাদিনীকে স্বীয় চিত্তে আনয়ন করিতে সমর্থ নহেন; কেননা, জীবশক্তি অপেক্ষা স্বরূপশক্তি গরীয়সী, উৎকর্ষময়ী। এই অবস্থায় অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে ভগবান্ই তাঁহার হ্লাদিনীকে ভক্তচিত্তে সঞ্চারিত করেন। একথাই শ্রীজীব এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন:—

"শ্রুতার্থান্যথানুপপত্ত্যর্থাপত্তিপ্রমাণসিদ্ধত্বাৎ তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্যমানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে। অতস্তদনুভবেন শ্রীভগবানপি শ্রীমদ্ভক্তেষু প্রীত্যাতিশয়ং ভজত ইতি॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ॥৬৫॥

—শ্রুতার্থাপত্তিপ্রমাণ-সিদ্ধ বলিয়া, সেই হ্লাদিনীরই কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি (ভগবৎকর্ত্তৃক) নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্তা হইয়া ভগবৎপ্রীতিনামে বিরাজ করে। সেই প্রীতি অনুভব করিয়া ভগবান্ও ভক্তগণের প্রতি অতিশয় প্রীতিমান্ হইয়া থাকেন।"

এক্ষণে আর একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। হ্লাদিনী তো ভগবানের মধ্যেই আছে। তিনি তো নিজের মধ্যেই সেই হ্লাদিনীর আনন্দ উপভোগ করিতেছেন। এই উপভোগে ভগবানের যে আনন্দ, ভক্তচিত্তে নিক্ষিপ্তা হ্লাদিনীর বৃত্তিস্বরূপ ভক্তির বা প্রীতির আস্বাদনে তাঁহার তাহা অপেক্ষাও পরমোৎকর্ষময় আনন্দের হেতু কি?

একটী দৃষ্টান্তের সহায়তায় এই প্রশ্নটীর উত্তর দেওয়া যায়। কোনও বংশীবাদকের বংশীধ্বনির মাধুর্য্যে বংশীবাদকও মুগ্ধ হয়েন, শ্রোতাও মুগ্ধ হয়েন। কিন্তু বংশীধ্বনিটী ফুৎকার-বায়ুর কার্য্যব্যতীত অন্য কিছু নহে। এই ফুৎকারবায়ু বংশীর মাধ্যমে ব্যতীত বাদকের মুখ হইতে নিঃসৃত হইলে কাহারও নিকটেই মধুর বলিয়া মনে হয়না, ফুৎকারকারীর নিকটেও না। বংশীরন্ধ্রদ্বারা প্রকাশিত হইলেই তাহা অপূর্ব্ব মাধুর্য্য ধারণ করে। তদ্রূপ, হ্লাদিনীনাম্নী স্বরূপশক্তি যখন ভগবানের মধ্যে থাকে, তখন হ্লাদিনীর স্বরূপগত ধর্ম্ম বশতঃ তাহার মাধুর্য্য থাকিলেও, যখন ভক্তচিত্ত-সহযোগে প্রকাশ পায়, তখন তাহা এক অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য ধারণ করে; তাহা এমনই আনন্দ-চমৎকারিতা ধারণ করে যে, তাহা যাঁহার শক্তি, সেই ভগবান্ও তাহাতে মুগ্ধ হইয়া পড়েন। আর, এই অপূর্ব্ব আনন্দ-চমৎকারিতাময়ী প্রীতির আধার বলিয়া ভক্তও তাহা আস্বাদন করেন—যে পাত্রে অগ্নি থাকে, সেই পাত্রও যেমন অগ্নির উত্তাপে তপ্ত হয়, তদ্রূপ। এই প্রীতির আনন্দে ভক্ত ও ভগবান্ উভয়েই পরস্পরে আবিষ্ট হইয়া পড়েন এবং পরস্পরের বশবর্ত্তী হইয়াও পড়েন।

এই সমস্ত বিচার করিয়া শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তির্মায়াদিময়ী ন ভবতি। কিন্তর্হি—স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা, যদানন্দপরাধীনঃ শ্রীভগবানপি ইতি। যথা চ শ্রীমতী গোপালতাপনীশ্রুতিঃ–বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি। উত্তরতাপনী॥১৮॥—ভগবৎপ্রীতিরূপা বৃত্তি মায়াদিময়ী নহে। তাহা হইলে উহা কি বস্তু? তাহা হইতেছে

স্বরূপশক্ত্যানন্দরূপা, শ্রীভগবান্‌ও এই আনন্দের পরাধীন। গোপালতাপনী শ্রুতিও তাহা বলিয়াছেন —'বিজ্ঞানঘন, আনন্দঘন শ্রীকৃষ্ণ সচ্চিদানন্দরসস্বরূপ ভক্তিযোগে অধিষ্ঠিত আছেন'।"

পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল, **ভক্তি হইতেছে তত্ত্বতঃ স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ।** ইহাই ভক্তির **স্বরূপলক্ষণ**।

খ। ভক্তির তটস্থ লক্ষণ

ভক্তির স্বরূপলক্ষণের আলোচনায় তাহার কয়েকটী তটস্থ লক্ষণও পাওয়া গিয়াছে; যথা,

(১) ভক্তি সাধককে ভগবানের ধামে বা নিকটে নেয়;

(২) ভক্তি সাধককে ভগবদ্দর্শন করায়,

(৩) ভক্তি ভগবান্‌কেও বশীভূত করিতে সমর্থা;

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার প্রীতিসন্দর্ভে (৬৭-৭২-অনুচ্ছেদে) শাস্ত্রবাক্যের আলোচনা করিয়া ভক্তির আরও কয়েকটী তটস্থ লক্ষণের কথা বলিয়া গিয়াছেন; যথা,

(৪) চিত্তশুদ্ধি, অর্থাৎ সাধকের চিত্ত হইতে কৃষ্ণ-কৃষ্ণসেবা-কামনা ব্যতীত অন্য কামনার অপসারণ;

(৫) চিত্তের দ্রবীকরণ; ইত্যাদি।

গ। শ্রুতি-প্রোক্তা পরাবিদ্যাই ভক্তি

মুণ্ডকশ্রুতি বলিয়াছেন, পরাবিদ্যাদ্বারা অক্ষর ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। "পরা যয়া অক্ষর-মধিগম্যতে ॥ মুণ্ডক ॥১।১।৫॥"

বিষ্ণুপুরাণের "সংজ্ঞায়তে যেন তদস্তদোষং শুদ্ধং পরং নির্ম্মলমেকরূপম্। সংদৃশ্যতে বাপ্যধি-গম্যতে বা তজ্‌জ্ঞানমজ্ঞানমতোঽন্যদুক্তম্ ॥৬।৫।৮৭॥"-এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—-"যেন জ্ঞায়তে পরোক্ষবৃত্ত্যা সংদৃশ্যতে সাক্ষাৎক্রিয়তে, অধিগম্যতে নিঃশেষাবিদ্যানিবৃত্ত্যা প্রাপ্যতে তজ্‌জ্ঞানং পরাবিদ্যা। অজ্ঞানং অবিদ্যান্তর্বর্ত্তিনী অপরা বিদ্যা ইত্যর্থঃ।" ইহার তাৎপর্য্য এইঃ-"যাহাদ্বারা সমস্ত অবিদ্যা নিঃশেষে নিবৃত্ত হইয়া যায় এবং অবিদ্যা-নিবৃত্তির পরে পরব্রহ্মের সাক্ষাৎকার লাভ হয়, তাঁহাকে পাওয়া যায়, তাহাই হইতেছে জ্ঞান, তাহাই পরাবিদ্যা। আর, অজ্ঞান হইতেছে অবিদ্যার অন্তর্বর্ত্তিনী অপরা বিদ্যা।"

স্বামিপাদের টীকা হইতে ইহাও জানা গেল—অপরা-বিদ্যাদ্বারা পরব্রহ্মের জ্ঞান জন্মেনা; যেহেতু, অপরা বিদ্যা হইতেছে অবিদ্যার বা মায়ার অন্তর্বর্ত্তিনী, অর্থাৎ মায়াশক্তির বৃত্তি। কিন্তু পরাবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মের জ্ঞানলাভ হয়, সাক্ষাৎকার লাভ হয়, ব্রহ্মকে পাওয়া যায়। সুতরাং পরাবিদ্যা যে অবিদ্যার বা মায়াশক্তির বৃত্তি নহে, পরন্তু ব্রহ্মের স্বপ্রকাশতা-শক্তি স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি, তাহাই জানা গেল। "হ্লাদিনী সন্ধিনী সংবিদ্"-ইত্যাদি বিষ্ণুপুরাণ (১।১২।৬৯)-শ্লোকের টীকায় স্বামিপাদ

তাহা পরিষ্কার ভাবেই বলিয়া গিয়াছেন। হ্লাদিনী, সন্ধিনী ও সংবিৎ—স্বরূপশক্তির এই তিনটী বৃত্তির কথা বলিয়া তিনি বলিয়াছেন—"তদেবং তস্যাস্ত্র্যাত্মকত্বে সিদ্ধে যেন স্বপ্রকাশতা-লক্ষণেন তদ্বৃত্তি-বিশেষণ স্বরূপং বা স্বরূপশক্তিবিশিষ্টং বাবির্ভবতি, তদ্বিশুদ্ধসত্ত্বং তচ্চান্যনিরপেক্ষস্তৎপ্রকাশ ইতি জ্ঞাপন-জ্ঞানবৃত্তিকত্বাৎ সম্বিদেব অস্য মায়য়া স্পর্শাভাবাদ্ বিশুদ্ধত্বম্। * * সংবিদংশপ্রধানমাত্মাবিদ্যা হ্লাদিনীসারাংশপ্রধানং গুহ্যবিদ্যা। * * * তত্রৈব শ্রীবিষ্ণুপুরাণে লক্ষ্মীস্তবে স্পষ্টীকৃতে। যজ্ঞবিদ্যা মহাবিদ্যা গুহ্যবিদ্যা চ শোভনে। আত্মবিদ্যা চ দেবী ত্বং বিমুক্তিফলদায়িনীতি॥ যজ্ঞবিদ্যা কর্ম্মবিদ্যা, মহাবিদ্যা অষ্টাঙ্গযোগঃ, গুহ্যবিদ্যা ভক্তিঃ, আত্মবিদ্যা জ্ঞানম্॥" স্বামিপাদের এই টীকা হইতে জানা গেল—শুদ্ধসত্ত্ব-নামক স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই অন্যনিরপেক্ষ ভাবে পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে প্রকাশ করিয়া থাকে। আত্মবিদ্যা এবং গুহ্যবিদ্যা (ভক্তি) হইতেছে স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি। পরব্রহ্ম ভগবানে্র জ্ঞান এবং প্রাপ্তি যদ্দ্বারা হইতে পারে, সেই পরাবিদ্যাও যে ভগবানের স্বপ্রকাশকতা-শক্তি স্বরূপশক্তিরই বৃত্তিবিশেষ, এই টীকা হইতে তাহাই জানা গেল।

এস্থলে পরাবিদ্যার যে সমস্ত লক্ষণ জানা গেল, ভক্তিরও সে সমস্ত লক্ষণ বিদ্যমান। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি" ইত্যাদি গীতাবাক্যে, "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-বাক্যে জানা যায়, ভক্তিদ্বারাই পরব্রহ্মকে জানা যায়, পাওয়া যায়। পূর্ব্বোদ্ধৃত গোপালোত্তরতাপনী শ্রুতির "বিজ্ঞানঘন আনন্দঘনঃ সচ্চিদানন্দৈকরসে ভক্তিযোগে তিষ্ঠতীতি ॥১৮॥"-বাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়। "ভক্তিরেব এনং নয়তি, ভক্তিরেব এনং দর্শয়তি"-ইত্যাদি মাঠরশ্রুতি-বাক্য হইতেও জানা যায়—কেবল মাত্র ভক্তিই (অপর কিছু নহে—ইহাই এব-শব্দের তাৎপর্য্য ; কেবল মাত্র ভক্তিই) সাধককে পর-ব্রহ্মের ধামে, নিকটে, নিয়া থাকে, পরব্রহ্ম ভগবানের দর্শন পাওয়াইয়া থাকে। পরাবিদ্যারও ঠিক এই সমস্ত লক্ষণই। পরাবিদ্যাদ্বারাই ব্রহ্মজ্ঞান ও ব্রহ্মসাক্ষাৎকার লাভ হইয়া থাকে, ব্রহ্মের প্রাপ্তি হইতে পারে ; অন্য অপরাবিদ্যাদ্বারা তাহা হয় না। আবার, পরাবিদ্যার ন্যায় ভক্তিও যে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তিবিশেষ, ভক্তি যে মায়াশক্তির বৃত্তি নহে, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—পরবিদ্যা এবং ভক্তি একই বস্তু।

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে যে, যাঁহারা কৃষ্ণসুখৈকতাৎ-পর্য্যময়ী সেবা কামনা করেন, ভক্তি হইতেছে তাঁহাদেরই কাম্য। যাঁহারা সাযুজ্যকামী, তাঁহারা তো সেবা চাহেন না, তাঁহারা চাহেন কেবল ব্রহ্মে প্রবেশ ; সুতরাং ভক্তিতে তাঁহাদের কি প্রয়োজন ? অথচ শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরাবিদ্যাদ্বারা সাযুজ্যমুক্তি পাওয়া যায়। সুতরাং পরাবিদ্য্য ও ভক্তি কিরূপে এক হইতে পারে ?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় (৫।২৫।ক এবং ৫।৪৭ ক অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে—সর্ব্ববিধ মোক্ষকামীদেরও ভক্তির প্রয়োজন হয়। ভক্তির প্রকাশভেদে অনেক বৈচিত্রী আছে ; পূর্ণতম প্রকাশেই কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা পাওয়া যায়, আংশিক প্রকাশে

তাহা পাওয়া যায় না। সাযুজ্যমুক্তিই হউক, কিম্বা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিই হউক, যে কোনও রকমের মুক্তির জন্যই পরব্রহ্মসম্বন্ধীয় জ্ঞানলাভের প্রয়োজন; অবশ্য এই জ্ঞান সকলের পক্ষে এক রকম নহে। পরব্রহ্ম ভগবানের অনন্ত প্রকাশের মধ্যে যিনি যে প্রকাশের প্রাপ্তি, বা যে প্রকাশে প্রবেশলাভরূপ সাযুজ্যমুক্তি কামনা করেন, সেই প্রকাশের তত্ত্বজ্ঞান তাঁহার পক্ষে অপরিহার্য্য। ব্রহ্মে প্রবেশের জন্য যে তত্ত্বজ্ঞানের প্রয়োজন, তাহাও ভক্তিদ্বারাই সম্ভব হইতে পারে। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতায় "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্॥ ১৮।৫৫॥"-এই ভগবদ্‌বাক্য হইতেই তাহা জানা যায়। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—ভক্তিদ্বারা তাঁহাকে জানিলেই তাঁহাতে প্রবেশ লাভ করা যায়। এ-স্থলে ভক্তির কৃপার আংশিক বিকাশ; ইহাও ভক্তির এক বৈচিত্রী। ইহাকে আত্মবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যাও বলা হয়। কিন্তু পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীধরস্বামিপাদের টীকা হইতে জানা গিয়াছে—আত্মবিদ্যাও স্বরূপশক্তির বৃত্তি। ভক্তিকে তিনি গুহ্যবিদ্যা বলিয়াছেন। আত্মবিদ্যাতে সম্বিৎশক্তির প্রাধান্য এবং গুহ্যবিদ্যাতে হ্লাদিনীশক্তির প্রাধান্য (১।১।৯-১০ অনু)। প্রধানীভূতা বৃত্তির পার্থক্য থাকিলেও মূলবস্তুটী হইতেছে এক স্বরূপশক্তিই। আত্মবিদ্যাতে সম্বিতের প্রাধান্য থাকিলেও তাহাতে যে হ্লাদিনী নাই, তাহা নহে; হ্লাদিনী না থাকিলে সাযুজ্যকামী, বা সাযুজ্যপ্রাপ্ত ব্যক্তি ব্রহ্মানন্দের অনুভব কোথা হইতে পাইবেন? আর ভক্তিরূপা গুহ্যবিদ্যাতেও হ্লাদিনীর প্রাধান্য বলিয়া যে সম্বিৎ নাই, তাহাও নহে; সম্বিৎ না থাকিলে আনন্দপ্রাচুর্য্যের অনুভব লাভ হইবে কিরূপে? একই স্বরূপশক্তিরই সম্বিৎ ও হ্লাদিনীরূপ বৃত্তিদ্বয়ের অভিব্যক্তি-বৈচিত্রী অনুসারে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির বা পরাবিদ্যার বৈচিত্রীভেদ। আত্মবিদ্যা এবং গুহ্যবিদ্যাও ভক্তির বা পরাবিদ্যারই দুইটী বৈচিত্রী—আত্মবিদ্যাতে সম্বিতের অভিব্যক্তির আতিশয্য, হ্লাদিনীর ন্যূনতা; আর গুহ্যবিদ্যাতে হ্লাদিনীর পূর্ণতম বিকাশ, সম্বিদেরও পূর্ণতম বিকাশ; তাহা না হইলে হ্লাদিনীর আনন্দপ্রাচুর্য্যের পূর্ণতম অনুভব সম্ভব হইত না।

এইরূপে দেখা গেল—পরাবিদ্যা ও ভক্তি এক এবং অভিন্ন হইলেও কোনওরূপ বিরোধ উপস্থিত হইতে পারে না।

পরাবিদ্যা এবং ভক্তি যে অভিন্ন, শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেও তাহা বুঝা যায়। মুণ্ডকশ্রুতি প্রথমে বলিয়াছেন—পরাবিদ্যার দ্বারাই অক্ষরব্রহ্মকে পাওয়া যায়, বা জানা যায়। "অথ পরা যয়া তদক্ষরমধিগম্যতে॥১।১।৫॥" তাহার পরে অপরা বিদ্যার কর্ম্মাদির অসারতার কথা বলিয়া ব্রহ্মজ্ঞান-লাভার্থ শ্রীগুরুদেবের শরণ গ্রহণ করার উপদেশ দিয়াছেন। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ ১।২।১২॥" এবং সঙ্গে সঙ্গেই বলিয়াছেন—গুরুদেবের নিকটে উপস্থিত হইলে গুরুদেব শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা জানাইবেন, যে ব্রহ্মবিদ্যাদ্বারা অক্ষর-ব্রহ্মকে তত্ত্বতঃ জানা যায়। "তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রসন্নচিত্তায় শমন্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ ১।২।১৩॥" এ-সমস্ত শ্রুতিবাক্য হইতে জানা

গেল—পরাবিদ্যা এবং ব্রহ্মবিদ্যা অভিন্ন এবং এই পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারাই পরব্রহ্মকে তত্ত্বতঃ জানা যায়।

যদ্দ্বারা ব্রহ্মকে তত্ত্বতঃ জানা যায়, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা তাহাকে ভক্তি বলিয়াছেন। "ভক্ত্যা মামভিজানাতি যাবান্ যশ্চাস্মি তত্ত্বতঃ। ততো মাং তত্ত্বতো জ্ঞাত্বা বিশতে তদনন্তরম্ ॥১৮।৫৫॥"

সর্ব্বোপনিষৎসার গীতার বাক্য এবং মুণ্ডকোপনিষদের বাক্য মিলাইয়া দেখিলে বুঝা যায়—শ্রুতিতে যাহাকে পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা বলা হইয়াছে, গীতায় তাহাকেই ভক্তি বলা হইয়াছে।

আবার, শ্বেতাশ্বতরশ্রুতিতে ভক্তি-শব্দেরই স্পষ্ট উল্লেখ দৃষ্ট হয়। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥৬।২৩॥"

মুণ্ডকশ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্ম পরাবিদ্যালভ্য ; আর শ্বেতাশ্বতর বলিয়াছেন—ব্রহ্ম পরাভক্তি-লভ্য।

সুতরাং পরাবিদ্যা বা ব্রহ্মবিদ্যা এবং ভক্তি যে অভিন্ন, তাহাই জানা গেল।

যদি বলা যায়, পরাবিদ্যাদ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায়, ভক্তিদ্বারাও ব্রহ্মকে জানা যায় ; কেবল ইহাতেই পরাবিদ্যা ও ভক্তির অভিন্নত্ব কিরূপে সূচিত হইতে পারে ?

উত্তরে বলা যায়—শ্রুতিবাক্য হইতেই উভয়ের অভিন্নত্ব প্রতিপাদিত হয়। মুণ্ডকশ্রুতি বলিয়াছেন, বিদ্যা মাত্র দুইটী—পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা। অপরাবিদ্যাদ্বারা ব্রহ্মকে জানা যায় না, একমাত্র পরাবিদ্যাদ্বারাই ব্রহ্মকে জানা যায়। পরাবিদ্যা এবং ভক্তি বা ভক্তিরূপবিদ্যা যদি ভিন্ন হয়, তাহা হইলে পরাবিদ্যা ও অপরাবিদ্যা ব্যতীত আরও একটী তৃতীয় বিদ্যা স্বীকার করিতে হয়। কিন্তু শ্রুতি কোনও তৃতীয় বিদ্যা স্বীকার করেন না। সুতরাং পরাবিদ্যা এবং ভক্তি যে এক এবং অভিন্ন, তাহাই প্রতিপাদিত হইতেছে।

ঘ। সাধ্যভক্তি

পূর্ব্বোদ্ধৃত "তস্যা হ্লাদিন্যা এব কাপি সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তির্নিত্যং ভক্তবৃন্দেষ্বেব নিক্ষিপ্য-মানা ভগবৎপ্রীত্যাখ্যয়া বর্ত্ততে ॥ প্রীতিসন্দর্ভঃ ॥ ৬৫॥"-এই বাক্য হইতে জানা যায়, স্বরূপশক্তি হ্লাদিনীর কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তি শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্তা হইয়া ভক্তচিত্তে গৃহীত হইলেই তাহা ভগবৎপ্রীতি বা ভক্তি নামে খ্যাত হইয়া ভক্তহৃদয়ে বিরাজ করে।

উল্লিখিত বাক্যের "ভক্তেষু এব"-অংশ হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনী-বৃত্তিবিশেষ কেবল ভক্তচিত্তেই গৃহীত হইতে পারে এবং ভক্তচিত্তেই ভগবৎপ্রীতিরূপে বা ভক্তিরূপে বিরাজ করে। "ভক্তচিত্তে" বলার তাৎপর্য্য এই যে, সাধনভক্তির প্রভাবে যাঁহাদের চিত্ত বিশুদ্ধ হইয়াছে, তাঁহাদের বিশুদ্ধ চিত্তেই হ্লাদিনীর বৃত্তি গৃহীত হইতে পারে এবং তাঁহাদের চিত্তের সহিত সংযুক্ত হইয়া প্রীতি বা ভক্তির রূপ ধারণ করিতে পারে। মায়ামলিন চিত্তে তাহা ভক্তিরূপে পরিণত হইতে পারে না।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি-শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয়॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২।৫৭॥

এইরূপে দেখা গেল --সাধনের ফলেই ভগবৎপ্রীতি বা ভক্তি সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হইতে পারে। সুতরাং যে ভক্তির কথা ইতঃপূর্ব্বে আলোচিত হইয়াছে, তাহা হইতেছে **সাধ্যভক্তি**, সাধনের ফলে প্রাপ্যা ভক্তি।

যে উপায়ে এই ভক্তি লাভ করা যায়, তাহাকে বলা হয় ভক্তিমার্গ—ভক্তির দিকে অগ্রসর হওয়ার বা ভক্তিলাভের মার্গ বা পন্থা। এই পন্থাকে সাধনভক্তিও বলা হয়। পরবর্ত্তী ৪৯-অনুচ্ছেদে সাধনভক্তির কথা বলা হইতেছে।

৬। ভক্তির তত্ত্বসম্বন্ধে অন্যান্য আচার্য্যগণ

(১) ভক্তিসম্বন্ধে শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতীর উক্তি

এ-স্থলে যে আলোচনা করা হইয়াছে, তাহাতে বুঝা গেল—পরাবিদ্যা, ব্রহ্মবিদ্যা এবং ভক্তি অভিন্ন। কিন্তু শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী তাঁহার "ভক্তিরসায়ন"-গ্রন্থের প্রথম উল্লাসের প্রথম শ্লোকের টীকায় লিখিয়াছেন—"স্বরূপ-সাধন-ফলাধিকারিবৈলক্ষণ্যাদ্ ভক্তিব্রহ্মবিদ্যয়োঃ ১৮॥—ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে স্বরূপগত, সাধনগত, ফলগত ও অধিকারিগত যথেষ্ট বৈলক্ষণ্য আছে॥ মহামহোপাধ্যায় দুর্গাচরণ সাংখ্যবেদান্ততীর্থকৃত অনুবাদ।"

ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপগত ভেদ সম্বন্ধে সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন "দ্রবীভাবপূর্ব্বিকা হি মনসো ভগবদাকারতা সবিকল্পকবৃত্তিরূপা ভক্তিঃ, দ্রবীভাবানুপেতাদ্বিতীয়াত্মমাত্রগোচরা নির্ব্বিকল্পকমনসো বৃত্তির্ব্রহ্মবিদ্যা॥ ১৯ ॥—দ্রবীভূত মনের যে ভগবদাকারে সবিকল্পক বৃত্তি, তাহার নাম ভক্তি; আর দ্রবীভাবরহিত মনের যে কেবলই অদ্বিতীয় আত্মবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক বৃত্তি, তাহার নাম ব্রহ্মবিদ্যা॥ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয়ের অনুবাদ॥"

পাদটীকায় সাংখ্যবেদান্ততীর্থ মহোদয় উল্লিখিত উক্তির তাৎপর্য্য এইরূপ লিখিয়াছেন। "ভগবানের মাহাত্ম্যপূর্ণ গ্রন্থ শ্রবণ করিয়া লোকের মন প্রথমে ভগবদ্‌ভাবে দ্রবীভূত হয় যেন গলিয়া যায়; পরে সেই মন ভগবদাকারে আকারিত হয়। এই যে ভগবদাকারে মনের বৃত্তি, ইহাই ভক্তি। এইরূপ মনোবৃত্তিতে ধ্যাতৃ, ধ্যান ও ধ্যেয়াদিবিষয়ক ভেদবুদ্ধি বিদ্যমান থাকে; সুতরাং ভক্তিকে সবিকল্পক মনোবৃত্তি বলিতে হইবে; ব্রহ্মবিদ্যায় কিন্তু কোন প্রকার ভেদবুদ্ধিই থাকেনা; সুতরাং উহাকে নির্ব্বিকল্পক বৃত্তি বলিতে হয়। ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার মধ্যে এই প্রকার ভেদ লক্ষ্য করিয়াই উভয়ের পার্থক্য বলা হইয়াছে।"

আর, ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার সাধনগত ভেদ সম্বন্ধে সরস্বতীপাদ বলিয়াছেন—"ভগবদ্-গুণগরিমগ্রন্থনরূপগ্রন্থশ্রবণং ভক্তিসাধনম্, তত্ত্বমস্যাদি-বেদান্তমহাবাক্যং ব্রহ্মবিদ্যাসাধনম্ ॥ ১৯ ॥—

ভগবদ্‌গুণগৌরব-বর্ণনাত্মক গ্রন্থশ্রবণ হইতেছে ভক্তির সাধন, আর 'তত্ত্বমসি'' প্রভৃতি বেদান্তবাক্যশ্রবণ হইতেছে ব্রহ্মবিদ্যার সাধন বা উপায়॥ সাংখ্যবেদান্ততীর্থ-মহোদয়ের অনুবাদ॥"

ইহা হইতে বুঝা গেল—সরস্বতীপাদ যে ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যার কথা বলিয়াছেন, তাহারা হইতেছে সাধনের ফল—সাধ্য বস্তু।

ফলগত ভেদসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—"ভগবদ্‌বিষয়ক-প্রেমপ্রকর্ষঃ ভক্তিফলম্, সর্ব্বানর্থমূলাজ্ঞাননিবৃত্তির্ব্রহ্মবিদ্যাফলম্॥ ১৯॥—ভক্তির ফল হইতেছে ভগবদ্‌বিষয়ে প্রেমের উৎকর্ষ, আর ব্রহ্মবিদ্যার ফল হইতেছে সর্ব্ববিধ অনর্থের মূলীভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তি॥ সাংখ্যবেদান্ততীর্থমহোদয়ের অনুবাদ॥"

এক্ষণে বিবেচ্য এই। যে ভক্তির কথা শ্রীপাদ মধুসূদন সরস্বতী বলিয়াছেন, তাহার স্বরূপসম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন—দ্রবীভূত মনের ভগবদাকারতা। ভগবদাকারতা বলিতে কি বুঝায়, তাহা ভক্তিরসায়নের প্রথম উল্লাসের তৃতীয় শ্লোকে তিনি পরিষ্কার ভাবে বলিয়াছেন। "দ্রুতস্য ভগবদ্ধর্ম্মাদ্ধারাবাহিকতাং গতা। সর্ব্বেশে মনসো বৃত্তির্ভক্তিরিত্যভিধীয়তে॥—ভগবানের গুণনামাদি-শ্রবণবশতঃ দ্রবীভূত মনের যে, সর্ব্বেশ্বরে (পরমেশ্বরে) ধারাবাহিকরূপে (নিরন্তর) একাকার বৃত্তি অর্থাৎ চিন্তাপ্রবাহ, তাহা 'ভক্তি' নামে অভিহিত হইয়া থাকে॥ সাংখ্যবেদান্ততীর্থমহোদয়ের অনুবাদ॥"

এ-স্থলে "ভক্তি"-সম্বন্ধে সরস্বতীপাদ যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ভক্তির স্বরূপ-লক্ষণ সম্যক্‌রূপে জানা যায় বলিয়া মনে হয় না। কেননা, বস্তুর স্বরূপ-লক্ষণ সম্বন্ধে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"আকৃতি প্রকৃতি এই-স্বরূপলক্ষণ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।২৯৬॥" সরস্বতীপাদের উক্তিতে "আকৃতি"-মাত্র জানা গেল—ভগবানের দিকে দ্রবীভূত চিত্তের ধারাবাহিক গতি। "মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ। লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্॥ শ্রীভা, ৩।২৯।১২॥" তাঁহার উক্তির সমর্থনে সরস্বতীপাদও এই শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই উক্তিতে কিন্তু ভক্তির "প্রকৃতি" বা উপাদান জানা গেল না। কেবল "আকৃতির" জ্ঞানেই বস্তুর স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞান জন্মিতে পারে না। "এই জলপাত্রটীর আকৃতি কলসীর মতন"-ইহা বলিলেই জলপাত্রটীর স্বরূপ সম্যক্‌রূপে জানা যায়না; স্বরূপের সম্যক্ জ্ঞানের জন্য—পাত্রটীর উপাদান মৃত্তিকা, না কি পিতল, না অন্য কিছু, তাহাও জানা দরকার। সরস্বতীপাদ ভক্তির এইরূপ "প্রকৃতির" কথা বলেন নাই। ভক্তির "প্রকৃতি" বা উপাদান যে ভগবানের স্বরূপ-শক্তি, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ তাহা দেখাইয়াছেন (৫।৪৮ক অনুচ্ছেদ)। "ভক্তি" স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি (একটী রূপ) বলিয়াই ভক্তির আবির্ভাবে মায়া দূরীভূত হইতে পারে।

তারপর ব্রহ্মবিদ্যা-সম্বন্ধে। ব্রহ্মবিদ্যার স্বরূপ কি, তাহাও সরস্বতীপাদ বলেন নাই। তিনি কেবল বলিয়াছেন—"দ্রবীভাবরহিত কেবলই অদ্বিতীয় আত্মবিষয়ক নির্ব্বিকল্পক বৃত্তিই ব্রহ্মবিদ্যা।" এ-স্থলেও তিনি ব্রহ্মবিদ্যার কেবল "আকৃতির" কথাই বলিয়াছেন। ভক্তির হইতে

ব্রহ্মবিদ্যার আকৃতিগত পার্থক্য এই যে —ভক্তি হইতেছে দ্রবীভূত চিত্তের (বা চিত্তবৃত্তির) পরমেশ্বরের দিকে নিরবচ্ছিন্না গতি ; আর ব্রহ্মবিদ্যা হইতেছে দ্রবীভাবরহিত চিত্তের (চিত্তবৃত্তির নহে) নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত একাকারতা-প্রাপ্তি। ভক্তির আকৃতি হইতেছে প্রবাহরূপা ; আর ব্রহ্মবিদ্যার আকৃতি হইতেছে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মস্বরূপে নিস্তরঙ্গ হ্রদরূপা। ইহাই পার্থক্য। কিন্তু 'ব্রহ্মবিদ্যা"-বস্তুটীর প্রকৃতি বা উপাদান কি, তাহা সরস্বতীপাদ বলেন নাই। তবে ব্রহ্মবিদ্যার ফলসম্বন্ধে তিনি যাহা বলিয়াছেন, তাহা হইতে ব্রহ্মবিদ্যার প্রকৃতি বা উপাদান অনুমিত হইতে পারে। তিনি বলিয়াছেন—"ব্রহ্মবিদ্যার ফল হইতেছে সর্ব্ববিধ অনর্থের মূলীভূত অজ্ঞানের নিবৃত্তি।" এই "অজ্ঞান" হইতেছে "অবিদ্যা" – বা মায়া। ব্রহ্মবিদ্যার ফলে যখন মায়ার নিবৃত্তি হয়, তখন ব্রহ্মবিদ্যা যে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা ; কেননা, স্বরূপ-শক্তিব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারেনা (১।১।২৩-অনু)। আত্মবিদ্যাই ব্রহ্মবিদ্যা। শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—আত্মবিদ্যা হইতেছে স্বরূপ-শক্তির (শুদ্ধসত্ত্বের) বৃত্তি ; স্বরূপ-শক্তিতে বা শুদ্ধসত্ত্বে যখন সম্বিতের প্রাধান্য থাকে, তখন তাহার নাম হয় আত্মবিদ্যা (১।১।৯-অনু), আর যখন হ্লাদিনীর প্রাধান্য থাকে, তখন তাহার নাম হয় গুহ্যবিদ্যা বা ভক্তি (১।১।১০-অনু)।

এইরূপে জানা গেল ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যা, এই উভয়ই হইতেছে তত্ত্বতঃ স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ; সুতরাং তত্ত্বের বিচারে উভয়ের মধ্যে পার্থক্য কিছু নাই। পার্থক্য হইতেছে কেবল আকৃতিগত—ভক্তি প্রবাহরূপা, আর ব্রহ্মবিদ্যা নিস্তরঙ্গ হ্রদরূপা ; অথবা, পার্থক্য কেবল স্বরূপগত—ভক্তিতে হ্লাদিনীর অংশ বেশী, ব্রহ্মবিদ্যায় সম্বিদের অংশ বেশী। ভক্তিতে যে সম্বিৎ নাই, তাহাও নহে ; সম্বিৎ না থাকিলে ভক্তির আনন্দের অনুভব হইতনা। আবার, ব্রহ্মবিদ্যায়ও যে হ্লাদিনী নাই, তাহাও নহে ; হ্লাদিনী না থাকিলে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও যে আনন্দস্বরূপ, তাহার অনুভবও সম্ভবপর হইতনা। সুতরাং ভক্তি ও ব্রহ্মবিদ্যা—উভয়েই স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিদ্বয় বিদ্যমান ; সুতরাং তাহাদের মধ্যে তত্ত্বতঃ পার্থক্য কিছু নাই।

সরস্বতীপাদ অন্যান্য যে সকল পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন, যে সমস্ত হইতেছে ভক্তি ও ব্রহ্ম-বিদ্যার আকৃতিগত পার্থক্যের ফল মাত্র। (৫।৪৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(২) নারদ-ভক্তিসূত্রে ও শাণ্ডিল্য-ভক্তিসূত্রে ভক্তিতত্ত্ব

ভক্তির তত্ত্বসম্বন্ধে শাণ্ডিল্যভক্তি-সূত্র বলিয়াছেন– "অথাতো ভক্তিজিজ্ঞাসা ॥ ১।১॥ সা পরানুরক্তিরীশ্বরে ॥১।২"-ভক্তি হইতেছে ঈশ্বরে পরানুরক্তি।" ইহাদ্বারা ভক্তির আকৃতি বা রূপের কথাই জানা গেল, প্রকৃতির বা উপাদানের কথা কিছু জানা গেল না।

নারদ-ভক্তিসূত্র বলিয়াছেন—"অথাতো ভক্তিং ব্যাখ্যাস্যামঃ ॥১॥ সা তস্মিন্ পরমপ্রেমরূপা ॥ ২॥ অমৃতরূপা চ ॥৩॥ অনির্ব্বচনীয়ং প্রেমস্বরূপম্ ॥৫১॥ গুণরহিতং কামনারহিতং প্রতিক্ষণবর্দ্ধমানম-বিচ্ছিন্নং সূক্ষ্মতরমনুভবরূপম্ ॥৫৪॥—ভক্তি হইতেছে পরমপ্রেমরূপা, অমৃতস্বরূপা, অনির্ব্বচনীয়

প্রেম-স্বরূপ ; ইহা গুণরহিত, কামনারহিত, অবিচ্ছিন্ন ভাবে প্রতিক্ষণে বর্দ্ধনশীল, সূক্ষ্মতর অনুভবরূপ ।”

ইহা দ্বারাও ভক্তির কেবল আকৃতির বা রূপের কথাই জানা গেল, প্রকৃতির বা উপাদানের কথা পরিষ্কারভাবে কিছু জানা গেল না। নারদভক্তিসূত্রে ভক্তির প্রকৃতির ধর্ম্মের কথা অবশ্য বলা হইয়াছে—ইহা অমৃতরূপ, নির্গুণ, অন্যকামনারহিত ; অর্থাৎ এই ভক্তি মায়িক বস্তু নহে ; মায়িক বস্তু অমৃতরূপ (অবিনশ্বর) হইতে পারে না ; ইহা মায়াতীত কোনও বস্তু, “গুণরহিতম্”-শব্দেই তাহা বলা হইয়াছে। মায়াতীত হইলে তাহা হইবে চিদ্‌বস্তু। কিন্তু জীবশক্তিও চিদ্‌বস্তু, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মও চিদ্‌বস্তু, ভগবানের স্বরূপশক্তিও চিদ্‌বস্তু এবং ভগবান্‌ও চিদ্‌বস্তু। এ সমস্তের মধ্যে কোন্ চিদ্‌বস্তুটী ভক্তির স্বরূপ, নারদভক্তিসূত্র হইতে তাহা জানা যায় না।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন -জীবশক্তি, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দ এবং ভগবানের স্বরূপানন্দও ভক্তি নহে, ভক্তি হইতেছে হ্লাদিনীর বা হ্লাদিনী-প্রধানা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি (৫।৪৮ক-অনু)। বস্তুতঃ, গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্যগণ ব্যতীত অপর কেহই ভক্তির স্বরূপ-নির্ণয়ের জন্য চেষ্টা করেন নাই।

৪৯। সাধনভক্তি

যে সাধনে চিত্তে ভক্তির (পূর্ব্বোল্লিখিত সাধ্যভক্তির) আবির্ভাব হইতে পারে, তাহাকে বলে সাধনভক্তি।

পরবর্ত্তী (৫।৫৪-অনুচ্ছেদের) আলোচনা হইতে জানা যাইবে, ভক্তি লাভের যে সাধন, তাহাও সাধ্যভক্তির ন্যায় স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি—সুতরাং স্বরূপতঃ ভক্তিই। এজন্য এই সাধনকে সাধন-ভক্তি বা সাধনরূপা ভক্তি বলা হয়। এইরূপে ভক্তি হইল দ্বিবিধা—সাধনভক্তি বা সাধনরূপা ভক্তি এবং সাধ্যভক্তি বা সাধ্যরূপা ভক্তি।

কিন্তু কেবল মাত্র ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই যে সকলে সাধন ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তাহা নহে। কেহ কেহ ভক্তি ব্যতীত অন্য বস্তু লাভ করিবার উদ্দেশ্যেও সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। দেবহূতির নিকটে ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন,

“ভক্তিযোগো বহুবিধো মার্গৈর্ভাবিনি ভাব্যতে।
স্বভাবগুণমার্গেণ পুংসাং ভাবো বিভিদ্যতে॥ শ্রীভা, ৩।২৯।৭॥”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—“ভক্তিযোগঃ এক এব ভাবিনি ভাবোঽভিপ্রায়স্তদ্বতি পুরুষে মার্গৈঃ প্রকারবিশেষৈঃ বহুবিধো ভাব্যতে চিন্ত্যতে জ্ঞায়ত ইত্যর্থঃ। স চ ভাবঃ। স্বভাবভূতাঃ যে গুণাঃ তম-আদয়স্তেষাং মার্গেণ বৃত্তিভেদেন নানাবিভেদবান্ ভবতি। —ভক্তিযোগ একই, (বিভিন্ন নহে) ; কিন্তু ভাব (অভিপ্রায়)-বান্ পুরুষে মার্গ বা প্রকারবিশেষদ্বারা

বহুবিধ বলিয়া চিন্তিত হয়। সেই ভাব বা অভিপ্রায় কি ? তম-আদি যে স্বভাবভূত গুণসমূহ, তাহাদের বৃত্তিভেদে (মার্গে) নানা বিভেদবান্ হইয়া থাকে।”

শ্লোকের তাৎপর্য্য। ভক্তিযোগ একই ; কিন্তু লোকের মধ্যে তমঃ, রজঃ ও সত্ত্ব-এই তিনটী গুণ আছে। যাহারা এই সকল মায়িক গুণের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে না, এক এক গুণের প্রাধান্যে তাহাদের মধ্যে এক এক রকম অভিপ্রায় (ভাব) জাগ্রত হইয়া থাকে। সুতরাং বিভিন্ন লোকের ভাব বা অভিপ্রায়ও হয় বিভিন্ন। স্ব-স্ব অভিপ্রায় সিদ্ধির জন্য তাহারা সকলেই ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করিয়া থাকে ; সুতরাং ভাবভেদে তাহাদের ভক্তিযোগও বিভিন্ন।

তম-আদি মায়িক গুণই এই সকল লোকের সাধনের প্রবর্ত্তক বলিয়া তাহাদের ভক্তিযোগকে বা সাধনভক্তিকে সগুণ বলা হয়।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকার তাৎপর্য্যও উল্লিখিতরূপই। পরবর্ত্তী শ্লোকের টীকার প্রারম্ভে তিনি লিখিয়াছেন—“তত্র সকামা কৈবল্যকামা চ উপাসকসঙ্কল্পগুণৈস্তদ্‌গুণত্বেনোপচর্য্যতে। তত্র সকামা দ্বিবিধা তামসী রাজসী চ। * * * অথ কৈবল্যকামা সাত্ত্বিক্যেব।—সেই সগুণা ভক্তি (সাধনভক্তি) দুই রকমের—সকামা এবং কৈবল্যকামা। উপাসকের সঙ্কল্পরূপ গুণানুসারেই সকামা এবং কৈবল্যকামা নাম উপচারিত হয়। সকামা ভক্তি আবার দুই রকমের—তামসী এবং রাজসী। আর, কৈবল্যকামা ভক্তি হইতেছে সাত্ত্বিকী।”

এইরূপে জানা গেল, সগুণা সাধনভক্তি হইতেছে তিন রকমের—তামসিকী, রাজসিকী এবং সাত্ত্বিকী।

ভক্তি স্বরূপতঃ গুণাতীতা, নির্গুণা ; কেননা, ভক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি (সাধনভক্তি এবং সাধ্যভক্তি—উভয়ই স্বরূপশক্তির বৃত্তি) ; সুতরাং মায়িকগুণ ভক্তিকে স্পর্শ করিতে পারে না। সাধকের চিত্তের তম-আদিগুণ তাহাতে প্রতিফলিত হয় বলিয়াই ভক্তিকে (সাধনভক্তিকে) সগুণা—তামসী, রাজসী, সাত্ত্বিকী—বলা হয়। “ভক্তিঃ স্বরূপতঃ নির্গুণাঽপি পুংসাং স্বাভাবিকতম-আদি গুণোপরক্তা সতী তামস্যাদি-নামভিঃ সগুণা ভবতীতি ভাবঃ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।৭-শ্লোকটীকায় চক্রবর্ত্তি-পাদ।” প্রতিফলিত গুণের দ্বারা ভক্তি বাস্তবিক সগুণা হইয়া যায় না। বর্ণহীন স্বচ্ছ স্ফটিক-স্তম্ভের নিকটে রক্তাদিবর্ণ বিশিষ্ট কোনও বস্তু রক্ষিত হইলে স্ফটিকস্তম্ভটীকেও রক্তাদিবর্ণ বিশিষ্ট বলিয়া মনে হয়। কিন্তু স্তম্ভ বাস্তবিক রক্তাদিবর্ণবিশিষ্ট হইয়া যায় না। তদ্রূপ তম-আদিগুণের প্রতিফলনে ভক্তিও বাস্তবিক তম-আদিগুণবিশিষ্টা হইয়া যায় না ; উপচারবশতঃই তামসী, রাজসী ও সাত্ত্বিকী নামে অভিহিতা হয়।

যাহা হউক, দেবহূতির নিকটে ভগবান্ কপিলদেব সগুণা ও নির্গুণা—এই উভয়বিধ সাধন-ভক্তিরই বর্ণনা করিয়াছেন। পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদসমূহে সেই বর্ণনা প্রদত্ত হইতেছে।

৫০। সগুণা সাধনভক্তি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, সগুণা ভক্তি তিন রকমের--তামসী, রাজসী এবং সাত্ত্বিকী। এই তিন রকমের ভক্তির বিষয় আলোচিত হইতেছে।

ক। তামসী ভক্তি

ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন,

"অভিসন্ধায় যো হিংসাং দম্ভং মাৎসর্য্যমেব বা।
সংরম্ভী ভিন্নদৃগ্ভাবং ময়ি কুর্য্যাৎ স তামসঃ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।৮॥

—হিংসা, দম্ভ, বা মাৎসর্য্য—এসমস্তের সঙ্কল্প করিয়া, ভিন্নদৃষ্টি হইয়া (নিজের সুখ-দুঃখে এবং অপরের সুখ-দুঃখে ভেদ মনন করিয়া) যে ক্রোধী (উপলক্ষণে লোভী আদি) ব্যক্তি আমাতে (ভগবানে) ভক্তি করে, সে তামস (অর্থাৎ তাহার সাধনভক্তি হইতেছে তামসী)।"

টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"সংরম্ভী ক্রোধী। ভিন্নদৃক্ ভেদদর্শী স্মিন্নপি পরস্মিন্নপি সুখদুঃখং সমানং ন পশ্যতীতি নিরনুকম্প ইত্যর্থঃ।—সংরম্ভী-শব্দের অর্থ ক্রোধী (শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—অত্র সংরম্ভীতি লোভাদীনামুপলক্ষণং জ্ঞেয়ম্—সংরম্ভ-শব্দে লোভাদিও উপলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া জানিবে)। ভিন্নদৃক্-শব্দের অর্থ—ভেদদর্শী। নিজের এবং পরের সুখ-দুঃখকে যে ব্যক্তি সমান বলিয়া মনে করে না, সে-ব্যক্তিই ভিন্নদর্শী; অনুকম্পাহীন। ভাবং ভক্তিম্—ভাব-শব্দের অর্থ ভক্তি।"

চক্রবর্ত্তিপাদ তাঁহার টীকায় এ-সম্বন্ধে বৃহন্নারদীয়-বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—"যশ্চান্যস্য বিনাশার্থং ভজতে শ্রদ্ধয়া হরিম্। ফলবৎ পৃথিবীপাল সা ভক্তিস্তামসাধমা॥ যোহর্চ্চয়েৎ কৈতবধিয়া স্বৈরিণী স্বপতিং যথা। নারায়ণং জগন্নাথং সা বৈ তামসমধ্যমা॥ দেবপূজাপরান্ দৃষ্ট্বা স্পর্দ্ধয়া যোহর্চ্চয়েদ্ধরিম্। শৃণুষ্ব পৃথিবীপাল সা ভক্তি স্তামসোত্তমা॥" মর্ম্মার্থ—"যে ব্যক্তি অপরের বিনাশের উদ্দেশ্যে শ্রদ্ধার সহিত শ্রীহরির ভজন করে, তাহার ভক্তি হইতেছে অধম-তামসী। স্বৈরিণী রমণীর স্বীয় পতির সেবার ন্যায় কৈতব (বঞ্চনা)-বুদ্ধিতে যে ব্যক্তি ভগবানের অর্চ্চনা করে, তাহার ভক্তি হইতেছে মধ্যম-তামসী। আর, অন্যকে দেবপূজাপরায়ণ দেখিয়া যে ব্যক্তি স্পর্দ্ধার সহিত শ্রীহরির অর্চ্চনা করে, তাহার ভক্তি হইতেছে উত্তম-তামসী।"

এইরূপে দেখা গেল, উদ্দেশ্যভেদে তামসীভক্তি তিন রকমের—উত্তম, মধ্যম এবং অধম।

খ। রাজসী ভক্তি

"বিষয়ানভিসন্ধায় যশ ঐশ্বর্য্যমেব বা।
অর্চ্চাদাবর্চ্চয়েদ্ যো মাং পৃথগ্ভাবঃ স রাজসঃ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।৯॥

—(ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন) বিষয় (ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু), যশঃ, অথবা ঐশ্বর্য্যাদিলাভের

সঙ্কল্প করিয়া আমাব্যতীত অন্যবস্তুতে স্পৃহাবিশিষ্ট (পৃথগ্‌ভাবঃ) যে ব্যক্তি প্রতিমাদিতে আমার অর্চ্চনা করে, সে রাজস (অর্থাৎ তাহার ভক্তি রাজসী ভক্তি)।”

উদ্দেশ্যভেদে রাজসীভক্তিও তিন রকমের— উত্তম, মধ্যম ও অধম।

গ। সাত্ত্বিকী ভক্তি

“কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য পরস্মিন্ বা তদর্পণম্।
যজেদ্‌যষ্টব্যমিতি বা পৃথগ্‌ভাবঃ সঃ সাত্ত্বিকঃ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।১০॥

—(ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন) কর্ম্মনির্হারের (নির্হার অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয় বা মোক্ষ, পাপক্ষয়। কর্ম্মনির্হারের অর্থাৎ কর্ম্মক্ষয়ের বা পাপক্ষয়ের) উদ্দেশ্যে, কিম্বা ক্রিয়মাণ কর্ম্মের বন্ধন হইতে রক্ষা পাওয়ায় উদ্দেশ্যে যে ব্যক্তি পরমেশ্বরে কর্ম্মার্পণ করে, কিম্বা আমা হইতে অন্যবস্তুতে স্পৃহাবিশিষ্ট (পৃথগ্‌ভাবঃ) যে ব্যক্তি কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে ভগবানে ভক্তি করে, সে সাত্ত্বিক (অর্থাৎ তাহার ভক্তি হইতেছে সাত্ত্বিকী ভক্তি।”

বিভিন্ন টীকাকারের উক্তির তাৎপর্য্য। কর্ম্মক্ষয়কামী বা মোক্ষকামী ব্যক্তি ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ম্মার্পণ করিয়া থাকে ; কেননা, ভগবানের কৃপা ব্যতীত কর্ম্মক্ষয় বা মোক্ষলাভ হইতে পারে না। এ-স্থলে ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে ভগবৎপ্রীতি নহে, ভগবৎপ্রীতি হইতে সাধকের নিজের অভীষ্ট কর্ম্মক্ষয় বা মোক্ষই হইতেছে মূল উদ্দেশ্য, ভক্তিলাভ বা ভগবৎসেবাপ্রাপ্তি মূল উদ্দেশ্য নহে ; এজন্যই “পৃথগ্‌ভাবঃ” বলা হইয়াছে। আর “যষ্টব্যমিতি যজেৎ”-বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে এই। সর্ব্বদা ভগবদ্‌ভজনের বিধান শাস্ত্রে আছে। এজন্য কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতে যে ভজন, অথচ ভক্তিতত্ত্ব জানিয়া ভক্তিলাভের জন্য যে ভজন নহে, তাহাও সাত্ত্বিকী ভক্তি।

সাত্ত্বিকী সাধন-ভক্তির উদ্দেশ্যও হইতেছে কেবল সাধকের মোক্ষাদিলাভের অভীষ্ট-পূরণ ; ভক্তিলাভ বা ভগবৎসেবা ইহার উদ্দেশ্য নহে।

সাত্ত্বিকী ভক্তিও তিন রকমের—উত্তম, মধ্যম এবং অধম।

ঘ। কৈবল্য সগুণ কেন

পূর্ব্বোদ্ধৃত “কর্ম্মনির্হারমুদ্দিশ্য”-ইত্যাদি শ্রীভা, ৩।২৯।১০-শ্লোক হইতে জানা গিয়াছে, সাত্ত্বিকী ভক্তি হইতে মোক্ষ বা কৈবল্য লাভ হইয়া থাকে। এজন্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন— “কৈবল্যকামা সাত্ত্বিকী।” ইহাদ্বারা বুঝা যায়—কৈবল্যপ্রাপ্তির সাধনই হইতেছে সগুণ, সত্ত্বগুণময়ী ভক্তি (সাধনভক্তি)।

কিন্তু কৈবল্য হইতেছে এক রকমের মোক্ষ। কৈবল্য-প্রাপ্ত জীবের মধ্যে মায়ার কোনও গুণই, এমন কি সাত্ত্বিকগুণও, থাকিতে পারে না ; থাকিলে তাঁহাকে মুক্ত বা মোক্ষপ্রাপ্ত বলা যায় না ; কেননা, সম্যক্‌রূপে মায়ানিবৃত্তিই হইতেছে মোক্ষ। ব্রহ্মজ্ঞান-লাভেই কৈবল্য বা মোক্ষ। যতক্ষণ পর্য্যন্ত মায়ার কোনও প্রভাব, বা কোনও গুণ সাধকের চিত্তে থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্ম-

জ্ঞান লাভ হইতে পারে না। এই যুক্তি হইতে মনে হয়, যে ব্রহ্মজ্ঞানের ফল হইতেছে কৈবল্য, তাহা হইবে গুণাতীত বা নির্গুণ।

কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ কৈবল্যকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলিয়াছেন।

"কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং রজো বৈকল্পিকঞ্চ যৎ।
প্রাকৃতং তামসং জ্ঞানং মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৪॥

—কৈবল্য হইতেছে সাত্ত্বিক জ্ঞান, বৈকল্পিক (অর্থাৎ দেহাদিবিষয়ক) জ্ঞান হইতেছে রাজস, প্রাকৃত (অর্থাৎ বালক-মূকাদির জ্ঞানের তুল্য) জ্ঞান হইতেছে তামস এবং মন্নিষ্ঠ (অর্থাৎ ভগবন্নিষ্ঠ) জ্ঞান হইতেছে নির্গুণ।"

এ-স্থলে চারি রকমের জ্ঞানের কথা বলা হইয়াছে; তন্মধ্যে কেবল ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞানকেই নির্গুণ বলা হইয়াছে; অন্য তিন রকমের জ্ঞানকে এই ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞান হইতে পৃথক্ করিয়া উল্লেখ করায় সহজেই বুঝা যায়, অন্য তিন রকমের জ্ঞান—কৈবল্যও—নির্গুণ নহে; তাহারা সগুণ; কৈবল্যও সগুণ। কিন্তু কৈবল্য যখন এক রকমের মোক্ষ, তখন তাহাকে সগুণ বলা হইল কেন?

(১) কৈবল্যের সাধনে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের ১৩৪-অনুচ্ছেদে (শ্রীমৎপুরীদাস-মহোদয়ের সংস্করণ) এই বিষয়ে যে আলোচনা করিয়াছেন, এ-স্থলে তাহার মর্ম্ম প্রকাশিত হইতেছে।

উল্লিখিত "কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানম্"-ইত্যাদি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া তিনি লিখিয়াছেন—"কেবলস্য নির্ব্বিশেষস্য ব্রহ্মণঃ শুদ্ধজীবাভেদেন জ্ঞানং কৈবল্যম্; ত্বং-পদার্থমাত্রজ্ঞানস্য কৈবল্যত্বানুপপত্তিঃ, তৎপদার্থজ্ঞানসাপেক্ষত্বাৎ। সত্ত্বযুক্তে হি চিত্তে প্রথমতঃ শুদ্ধং সূক্ষ্মং জীবচৈতন্যং প্রকাশতে; ততশ্চিদেকাকারত্বাভেদেন তস্মিন্ শুদ্ধং পূর্ণং ব্রহ্মচৈতন্যমপি অনুভূয়তে; ততঃ সত্ত্বগুণস্যৈব তত্র কারণতা-প্রাচুর্য্যাৎ সাত্ত্বিকম্। তথা চ শ্রীগীতোপনিষদি 'সত্ত্বাৎ সঞ্জায়তে জ্ঞানম্ (১৪।১৭)'-ইত্যাদি।"

মর্ম্মানুবাদ। 'কেবল'-শব্দে নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মকে বুঝায়। এই কেবলের বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত শুদ্ধজীবের অভেদ-জ্ঞানকে বলা হয় কৈবল্য। একমাত্র ত্বং-পদার্থের (অর্থাৎ শুদ্ধজীবচৈতন্যের) জ্ঞানে কৈবল্যসিদ্ধ হইতে পারে না; কেননা, কৈবল্যে তৎ-পদার্থের (অর্থাৎ ব্রহ্মচৈতন্যের) জ্ঞানের অপেক্ষাও আছে (শুদ্ধজীব ও ব্রহ্মের অভেদ-জ্ঞানই কৈবল্য; সুতরাং ব্রহ্মচৈতন্যের জ্ঞানব্যতীত একমাত্র শুদ্ধজীবচৈতন্যের জ্ঞানে কৈবল্য সিদ্ধ হইতে পারে না)। সত্ত্বযুক্ত চিত্তেই প্রথমতঃ শুদ্ধ সূক্ষ্ম জীবচৈতন্য প্রকাশ পায়। তাহার পরে সেই চিত্তে চিদাকারত্বাংশে অভিন্নরূপে শুদ্ধ পূর্ণ ব্রহ্মচৈতন্য অনুভূত হয়েন। (স্বরূপতঃ জীব হইতেছে অণুচৈতন্য; আর ব্রহ্ম হইতেছেন বিভুচৈতন্য। অণুত্বে এবং বিভুত্বে তাহাদের মধ্যে স্বরূপগত ভেদ আছে। তথাপি, জীবও স্বরূপে চৈতন্য বলিয়া এবং ব্রহ্মও স্বরূপে চৈতন্য বলিয়া চৈতন্যাংশে তাহাদের মধ্যে অভেদ। এজন্য চৈতন্যাংশে তাহাদের মধ্যে অভেদের জ্ঞান সম্ভব)। এইরূপ অভেদের জ্ঞানই হইতেছে কৈবল্য। সত্ত্বগুণযুক্ত চিত্তেই প্রথমে শুদ্ধ

জীবচৈতন্যের প্রকাশ এবং তাহার পরে সেই সত্ত্বগুণযুক্তচিত্তেই চিদাকারত্বাংশে অভিন্নরূপে ব্রহ্মচৈতন্যের অনুভব হয়। এইরূপে দেখা গেল, কৈবল্যজ্ঞানে কারণরূপে সত্ত্বগুণেরই প্রাচুর্য্য। এজন্য কৈবল্যকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বলা হইয়াছে। শ্রীমদ্ভগবদ্গীতাতেও বলা হইয়াছে—'সত্ত্বগুণ হইতেই জ্ঞান জন্মে।' এ-স্থলেও কারণরূপে সত্ত্বগুণের প্রাধান্যের কথাই জানা যায়।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—কৈবল্য-জ্ঞানের সাধনে সত্ত্বগুণের প্রাধান্য বলিয়া কৈবল্যকে সাত্ত্বিক জ্ঞান, বা সগুণ বলা হয়।

(২) কৈবল্যজ্ঞান ভগবন্নিষ্ঠ

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—কৈবল্যজ্ঞানের সাধনে সত্ত্বগুণের প্রাচুর্য্য থাকিতে পারে; তাহাতে সাধনকে সাত্ত্বিক বা সগুণ বলা যাইতে পারে। কিন্তু কৈবল্যজ্ঞানের মধ্যে তো সত্ত্বগুণ নাই, থাকিতেও পারে না; তথাপি কৈবল্যকে সাত্ত্বিক জ্ঞান বা সগুণ বলা হইল কেন? কৈবল্য-জ্ঞান স্বরূপে সত্ত্বগুণাতীত বলিয়া তাহাকে নির্গুণ কেন বলা হইবে না?

ইহার উত্তরে বলা যায়—ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, কেবল ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞানই নির্গুণ, "মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্", অপর কোনওরূপ জ্ঞানই নির্গুণ নহে। কৈবল্যজ্ঞানে ভগবন্নিষ্ঠ বা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাব বলিয়া কৈবল্যজ্ঞানকে সগুণ বলা হয়।

যদি বলা যায়, সত্ত্ব হইতেও তো ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞান জন্মিতে পারে; সুতরাং কৈবল্যজ্ঞানের সঙ্গেও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞান থাকিতে পারে।

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—প্রথমতঃ, সত্ত্বাদিগুণ বিদ্যমান থাকিলেও ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাব পরিলক্ষিত হয়; দ্বিতীয়তঃ, সত্ত্বগুণ ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের হেতু নহে।

(৩) সত্ত্বগুণ-সদ্ভাবেও ভগবজ্‌জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে

সত্ত্বাদি গুণের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও যে ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে, শ্রীমদ্ ভাগবতের নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকগুলির দ্বারা শ্রীজীবপাদ তাহা দেখাইয়াছেন।

"দেবানাং শুদ্ধসত্ত্বানামৃষীনাঞ্চামলাত্মনাম্।
ভক্তি র্মুকুন্দচরণে ন প্রায়েণোপজায়তে॥ শ্রীভা.৬।১৪।২॥
মুক্তানামপি সিদ্ধানাং নারায়ণপরায়ণঃ।
সুদুর্ল্লভঃ প্রশান্তাত্মা কোটিষ্বপি মহামুনে॥ শ্রীভা.৬।১৪।৫॥

—(শ্রীল শুকদেবের নিকটে পরীক্ষিৎ মহারাজ বলিয়াছেন) শুদ্ধ (রজস্তমোহীন) সত্ত্বগুণবিশিষ্ট দেবগণের এবং অমলাত্মা ঋষিগণেরও মুকুন্দচরণে প্রায়শঃ ভক্তির উদয় হয়না। হে মহামুনে! কোটি কোটি সিদ্ধ মুক্তদিগের মধ্যেও একজন প্রশান্তাত্মা নারায়ণপরায়ণ ভক্ত সুদুর্ল্লভ।"

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয় হইতে জানা গেল—দেবতা এবং ঋষিদিগের মধ্যে সত্ত্বাদি সদ্‌গুণ থাকা সত্ত্বেও ভক্তির বা ভগবদ্বিষয়ক জ্ঞানের অভাব থাকিতে পারে।

(৪) রজস্তমোগুণের বিদ্যমানত্বেও ভগবজ্জ্ঞান জন্মিতে পারে, সৎসঙ্গ প্রভাবে

ইহার পরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন, রজস্তমোগুণের বিদ্যমানতা সত্ত্বেও আবার কিন্তু ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে।

"রজস্তমঃস্বভাবস্য ব্রহ্মন্ বৃত্রস্য পাপ্মনঃ।
নারায়ণে ভগবতি কথমাসীদ্ দৃঢ়া মতিঃ॥ শ্রীভা.৬।১৪।১॥

—(শ্রীল শুকদেবের নিকটে মহারাজ পরীক্ষিৎ জিজ্ঞাসা করিয়াছেন) হে ব্রহ্মন্! রজস্তমঃস্বভাব পাপীয়ান্ বৃত্রের ভগবান্ নারায়ণে কিরূপে দৃঢ়া (অবিচলা) মতি জন্মিয়াছিল ?"

(৫) মহৎসঙ্গ এবং মহৎকৃপাই নির্গুণ ভগবজ্জ্ঞানের একমাত্র হেতু

মহারাজ পরীক্ষিতের এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীল শুকদেব গোস্বামী বলিয়াছেন—বৃত্রাসুর পূর্ব্ব-জন্মে ছিলেন চিত্রকেতু-নামক রাজা। সেই জন্মে তিনি শ্রীনারদ ও শ্রীঅঙ্গিরাদি মহাভাগবতদিগের সঙ্গ ও কৃপালাভের সৌভাগ্য পাইয়াছিলেন। তাহার ফলেই ভগবানে তাঁহার অবিচলা ভক্তি জন্মিয়াছিল। মহৎসঙ্গ এবং মহৎকৃপা ব্যতীত যে ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারেনা, শ্রীপ্রহ্লাদের উক্তি হইতেও তাহা জানা যায়।

"নৈষাং মতিস্তাবদুরুক্রমাঙ্‌ঘ্রিং স্পৃশত্যনর্থাগমো যদর্থঃ।
মহীয়সাং পাদরজোঽভিষেকং নিষ্কিঞ্চনানাং ন বৃণীত যাবৎ॥ শ্রীভা, ৭।৫।৩২॥

—যে পর্য্যন্ত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের চরণরেণুদ্বারা স্বীয় অভিষেক বরণ না করিবে, সে পর্য্যন্ত এ-সমস্ত গৃহব্রতীদিগের মতি উরুক্রম ভগবানের চরণকে স্পর্শ করিতে পারিবেনা; যাঁহার মতি ভগবচ্চরণকে স্পর্শ করে, তাঁহার সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া যায়।"

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—ভগবৎকৃপাপ্রাপ্ত নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষগণের সঙ্গই হইতেছে ভক্তিলাভের, বা ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানলাভের একমাত্র হেতু।

শ্রীজীবপাদ প্রথমে দেখাইয়াছেন—চিত্তে রজস্তমোহীন শুদ্ধ সত্ত্বগুণ বিরাজিত থাকিলেই যে ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান জন্মে, তাহা নয় (পূর্ব্বোল্লিখিত দেবতাগণ এবং অমলাত্মা ঋষিগণের দৃষ্টান্তই তাহার প্রমাণ)। তাহার পরে বৃত্রাসুরের দৃষ্টান্তদ্বারা দেখাইয়াছেন—চিত্তে রজস্তমোগুণের প্রাবল্য থাকিলেও মহাপুরুষের কৃপায় ভগবন্নিষ্ঠ জ্ঞান জন্মিতে পারে। ইহাদ্বারা বুঝাগেল, নিষ্কিঞ্চন মহাপুরুষের সঙ্গ বা কৃপাই হইতেছে ভক্তিলাভের বা ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানলাভের একমাত্র হেতু; সত্ত্বাদি সদ্‌গুণ ইহার হেতু নহে। সুতরাং কৈবল্যজ্ঞানের প্রধান হেতু যে সত্ত্ব, তাহা হইতে নির্গুণ ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞান জন্মিতে পারে না—সুতরাং কৈবল্যজ্ঞানও নির্গুণ হইতে পারে না।

(৬) মহৎসঙ্গ নির্গুণ

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—কৈবল্যজ্ঞানের হেতু সত্ত্বগুণ বলিয়া কৈবল্যজ্ঞান নির্গুণ হইতে পারে না, ইহাই বলা হইল। কিন্তু যাহাকে নির্গুণ বলা হয়, সেই ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের হেতু

বলা হইল মহৎসঙ্গ। মহৎসঙ্গ কি নির্গুণ? মহৎসঙ্গ যদি নির্গুণ না হয়, তাহা হইলে ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানই বা কিরূপে নির্গুণ হইতে পারে?

ইহার উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—মহৎসঙ্গ নির্গুণ। মহৎসঙ্গ নির্গুণ কেন, তাহাও তিনি দেখাইয়াছন।

"তুলয়াম লবেনাপি ন স্বর্গং নাপুনর্ভবম্।
ভগবৎসঙ্গিসঙ্গস্য মর্ত্ত্যানাং কিমুতাশাষঃ॥ শ্রীভা, ১।১৮।১৩॥

—(শ্রীসূত গোস্বামীর নিকটে শৌনকাদি ঋষিগণ বলিয়াছেন) ভগবদ্‌ভক্তের সহিত যে অত্যল্পকালের সঙ্গ, তাহার সহিত স্বর্গেরও তুলনা হয় না, মোক্ষেরও তুলনা হয় না। মর্ত্ত্য জীবদিগের আশীর্ব্বাদের (রাজত্বাদি-সুখের) কথা আর কি বলা যাইবে?"

এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীজীব বলিয়াছেন—উল্লিখিত উক্তি হইতে, নির্গুণাবস্থা (মোক্ষাবস্থা) হইতেও সাধুসঙ্গের আধিক্যের কথা জানা যাইতেছে; সুতরাং সাধুসঙ্গ পরম নির্গুণই। "ইত্যুক্ত্যা নির্গুণাবস্থাতোঽপ্যধিকত্বাৎ পরমনির্গুণ এব।"

ইহার পরে শ্রীমদ্‌ভাগবতের সপ্তম স্কন্ধের "সমঃ প্রিয়ঃ সুহৃদ্ ব্রহ্মন্॥৭।১।১॥"- ইত্যাদি শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"ইন্দ্রাদি সগুণ দেবতাদির প্রতি ভগবানের যে কৃপা, তাহা বাস্তবী নহে; কিন্তু প্রহ্লাদাদিতে তাঁহার যে কৃপা, তাহা বাস্তবী (সপ্তম স্কন্ধের বিবরণ হইতে তাহা জানা যায়)। ইহা দ্বারা ভগবদ্‌ভক্তগণের নির্গুণত্ব প্রতিপাদিত হইয়াছে। ভক্তগণ নির্গুণ বলিয়া ভক্তসঙ্গও নির্গুণ।

(৭) ত্রিবিধ গুণসঙ্গের নিবৃত্তির পরেই ভক্তির অনুবৃত্তি

ভক্তের এবং ভক্তসঙ্গের নির্গুণত্ব প্রতিপাদনের পরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"তথা ভক্তেরপি গুণসঙ্গনির্ধূননানন্তরঞ্চানুবৃত্তিঃ শ্রূয়তে—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ—এই ত্রিবিধগুণসঙ্গের সর্ব্বাতোভাবে নিবৃত্তির পরেই ভক্তির অনুবৃত্তির—গঙ্গাস্রোতের ন্যায় নিরবচ্ছিন্ন গতির—কথা শুনা যায়।" তাৎপর্য্য হইতেছে এইঃ—যতদিন পর্য্যন্ত সাধকের চিত্তে সত্ত্ব, রজঃ ও তমোগুণ থাকিবে, ততদিন পর্য্যন্ত নিরবচ্ছিন্ন ভাবে তাঁহার ভগবদ্‌ভক্তির গতি ভগবানের দিকে অগ্রসর হইবে না, গুণসমূহ বাধা জন্মাইবে। অনবরত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে যখন মায়িক সত্ত্বাদি গুণত্রয় দূরীভূত হইবে, তখনই সাধকের ভক্তিপ্রবাহ অপ্রতিহতগতিতে ভগবচ্চরণের দিকে ধাবিত হইবে। এইরূপই শাস্ত্র হইতে জানা যায়। যথা, উদ্ধবের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"তস্মাদ্দেহমিমং লব্ধ্বা জ্ঞান-বিজ্ঞান-সম্ভবম্।
গুণসঙ্গং বিনির্ধূয় মাং ভজন্তু বিচক্ষণাঃ॥ শ্রীভা ১১।২৫।৩৩॥

—যাহা হইতে জ্ঞান (পরোক্ষজ্ঞান) এবং বিজ্ঞান (অপরোক্ষ জ্ঞান) লাভ করা সম্ভবপর হইতে

পারে, সেই মনুষ্যদেহ লাভ করিয়া বিচক্ষণ ব্যক্তিগণ গুণসঙ্গ (মায়িক গুণত্রয়ের সঙ্গ) সম্যক্‌রূপে বিধৌত করিয়া আমার (ভগবানের) ভজন করুক।”

উক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—নৈর্গুণ্যই হইতেছে ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের হেতু।

(৮) **ভগবজ্‌জ্ঞান স্বতঃই নির্গুণ**

ইহাতে যদি কেহ মনে করেন যে, কৈবল্যজ্ঞানের হেতু সত্ত্বগুণ বলিয়া (অর্থাৎ কৈবল্যের হেতু সগুণ বলিয়া) যেমন কৈবল্যজ্ঞানকে সগুণ বলা হয়, তদ্রূপ যদি ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের হেতু নৈর্গুণ্য বলিয়াই ভগবজ্‌জ্ঞানকে নির্গুণ বলা হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে লক্ষণাময়-কল্পনামাত্র। “পরমেশ্বরজ্ঞানস্য নৈর্গুণ্যহেতুত্বেন নির্গুণত্বোক্তিস্তু লক্ষণাময়-কষ্টকল্পনা ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥” কেননা, ভগবজ্‌জ্ঞানের ন্যায় কৈবল্যজ্ঞানও নৈর্গুণ্যহেতুক ; যেহেতু, কৈবল্যজ্ঞানের সাধনে সত্ত্বগুণের প্রাচুর্য্য থাকিলেও মায়িক-গুণনিবৃত্তি না হইলে কৈবল্যজ্ঞানও জন্মিতে পারে না এবং পূর্ব্বে শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে যে, গুণসঙ্গ বিনির্ধূত করিয়াই ভগবজ্‌জ্ঞান লাভের জন্য ভজন করিতে হয়। কেবল হেতুর দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই যদি ফলস্বরূপ কৈবল্যজ্ঞানের এবং ভগবজ্‌জ্ঞানের সগুণত্ব বা নির্গুণত্ব নির্ণয় করিতে হয়, তাহা হইলে, ভগবজ্‌জ্ঞানের ন্যায় কৈবল্যজ্ঞানকেও নির্গুণ বলিতে হয়; কেন না, উভয়ের হেতুই নৈর্গুণ্য। এইরূপ বিচারে উভয়ের মধ্যে কোনওরূপ পার্থক্য থাকে না। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণ এতদুভয়ের পার্থক্যের কথা বলিয়াছেন। “কৈবল্যং সাত্ত্বিকং জ্ঞানং···মন্নিষ্ঠং নির্গুণং স্মৃতম্॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৪॥” ; তিনি কৈবল্যজ্ঞানকে সাত্ত্বিক অর্থাৎ সগুণ এবং ভগবজ্‌জ্ঞানকে নির্গুণ বলিয়াছেন।

সুতরাং ভগবজ্‌জ্ঞানের হেতু নির্গুণ বলিয়াই যে ভগবজ্‌জ্ঞানকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, তাহা নহে ; ভগবজ্‌জ্ঞান স্বতঃই নির্গুণ ; ভগবজ্‌জ্ঞান স্বতঃ নির্গুণ বলিয়াই তাহাকে নির্গুণ বলা হইয়াছে। কৈবল্যজ্ঞান এবং ভগবজ্‌জ্ঞান—এই উভয়ের হেতু সমান থাকা সত্ত্বেও যখন ভগবজ্‌জ্ঞানকে নির্গুণ এবং কৈবল্যজ্ঞানকে সাত্ত্বিক বা সগুণ বলা হইয়াছে, তখন বুঝিতে হইবে, কেবল জ্ঞানের স্বরূপগত ধর্ম্মের প্রতিই লক্ষ্য রাখা হইয়াছে, হেতুর প্রতি লক্ষ্য রাখা হয় নাই। এই অবস্থায় ভগবজ্‌জ্ঞানকে যখন নির্গুণ এবং কৈবল্যজ্ঞানকে সগুণ বলা হইয়াছে, তখন স্পষ্টভাবেই বুঝা যায়, ভগবজ্‌জ্ঞানের ন্যায় কৈবল্যজ্ঞান স্বতঃ নির্গুণ নহে বলিয়াই তাহাকে সাত্ত্বিক বা সগুণ বলা হইয়াছে।

এজন্যই ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

“সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থং বিষয়োত্থং তু রাজসম্।
তামসং মোহদৈন্যোত্থং নির্গুণং মদপাশ্রয়ম্॥ শ্রীভা, ১১।২৫। ২৯॥

—আত্মোত্থ সুখ (অর্থাৎ ত্বংপদার্থজ্ঞানোত্থ, ত্বংপদার্থ অণুচৈতন্য জীবস্বরূপের অনুভবজনিত সুখ) হইতেছে সাত্ত্বিক, বিষয়োত্থ (ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তুর অনুভবজনিত) সুখ হইতেছে রাজস, মোহ-দৈন্যাদি

হইতে সমুদ্ভূত সুখ হইতেছে তামস এবং আমার অনুভবজনিত (অর্থাৎ তৎ-পদার্থ শ্রীভগবানের অনুভবজনিত, ভগবৎ-কীর্ত্তনাদি হইতে উদ্ভূত) সুখ হইতেছে নির্গুণ।"

(৯) ভগবজ্‌জ্ঞানলাভের সাধনও নির্গুণ

যাহা হইতে তৎ-পদার্থ ভগবানের অনুভব জন্মে, সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-লক্ষণা ক্রিয়ারূপা যে ভক্তি (সাধনভক্তি), তাহাও যে নির্গুণ, নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণ হইতে তাহাও জানা যায়।

"শুশ্রূষোঃ শ্রদ্দধানস্য বাসুদেবকথারুচিঃ।
স্যান্মহৎসেবয়া বিপ্রাঃ পুণ্যতীর্থনিষেবয়া ॥ শ্রীভা, ১।২।১৬ ॥

—(শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিদিগের নিকটে বলিয়াছেন) হে বিপ্রগণ! পুণ্যতীর্থের সেবা করিলে (তীর্থস্থানাদিতে গমন-বসনাদি করিলে প্রায়শঃ) মহতের সঙ্গলাভের সম্ভাবনা হইতে পারে। সেই মহতের সেবা (অর্থাৎ দর্শন, স্পর্শন, সম্ভাষণাদি) হইতে মহতের আচরণের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। মহদ্‌গণ স্বভাবতঃই পরস্পরের সঙ্গে যে ভগবৎকথাদির আলোচনা করিয়া থাকেন, সেই কথা শ্রবণের জন্যও ইচ্ছা জন্মিতে পারে। এইরূপে ভগবৎকথা শ্রবণ করিতে করিতে ভগবৎকথায় রুচি জন্মিতে পারে।"

এই উক্তি হইতে জানা গেল, ভগবৎ-কথা-শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির প্রবৃত্তির এবং ভগবৎকথা-শ্রবণকীর্ত্তনাদিজনিত সুখের একমাত্র হেতু হইতেছে সৎসঙ্গ। সৎসঙ্গ যে নির্গুণ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নির্গুণ সৎসঙ্গ হইতে প্রবর্ত্তিত শ্রবণকীর্ত্তনাদি ক্রিয়াও হইবে নির্গুণা। এইরূপে দেখা গেল—ভগবৎকথার, বা ভগবদনুভবের যে সুখ, তাহার হেতুও হইতেছে নির্গুণ সৎসঙ্গ এবং নির্গুণ-সৎসঙ্গজাত নির্গুণ-শ্রবণকীর্ত্তনাদি। ভগবদনুভবজনিত সুখও নির্গুণ, তাহার হেতুও নির্গুণ।

(১০) কৈবল্যজ্ঞান ভগবৎপ্রসাদজ নহে

প্রশ্ন হইতেছে, ভগবদনুভবজনিত সুখের (ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানের) হেতু নির্গুণ বলিয়া যদি তাহাকে নির্গুণ বলা যায়, তাহা হইলে কৈবল্যজ্ঞান (বা ব্রহ্মজ্ঞান) নির্গুণ হইবে না কেন? ব্রহ্ম-জ্ঞানও তো নির্গুণ ভগবৎ-প্রসাদ হইতেই জন্মিয়া থাকে? কেননা, সত্যব্রত মহারাজের প্রতি ভগবান্‌ শ্রীমৎস্যদেব বলিয়াছেন—

"মদীয়ং মহিমানঞ্চ পরং ব্রহ্মেতি শব্দিতম্‌।
বেৎস্যস্যনুগৃহীতং মে সংপ্রশ্নৈর্বিবৃতং হৃদি ॥ শ্রীভা, ৮।২৪।৩৮॥

—হে রাজন্‌! পরব্রহ্ম-পদবাচ্য আমার যে মহিমা (আমার অসম্যক্‌ প্রকাশ নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্ম), তোমার প্রশ্নে আমি তাহা বিবৃত করিব এবং আমার অনুগ্রহে তুমিও তাহা হৃদয়ে অনুভব করিতে পারিবে।"

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—ভগবৎ-প্রসাদ হইতেই কৈবল্যজ্ঞান বা নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের জ্ঞান জন্মিয়া থাকে। ভগবৎ-প্রসাদ যখন নির্গুণ, তখন ব্রহ্মজ্ঞান বা কৈবল্যজ্ঞান নির্গুণ হইবেনা কেন?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"দুই রকম উপাসকের হৃদয়ে ব্রহ্ম-জ্ঞানের আবির্ভাব হইয়া থাকে—ভগবদুপাসকের এবং ব্রহ্মোপাসকের। তন্মধ্যে ভগবদুপাসকের চিত্তে যে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেছে আনুষঙ্গিক (ভগবজ্‌জ্ঞানের আনুষঙ্গিক ভাবে সেই ব্রহ্ম-জ্ঞান জন্মে। নির্ব্বিশেষ ব্রহ্ম অনন্ত-অচিন্ত্যশক্তিযুক্ত ভগবানেরই মহিমা বলিয়া তাঁহার অনুভবও ভগবদনুভবেরই অন্তর্ভুক্ত ; এ-স্থলে ব্রহ্মানুভবের প্রাধান্য নাই, প্রাধান্য ভগবদনুভবেরই)। আর, ব্রহ্মো-পাসকের চিত্তে যে ব্রহ্মজ্ঞান জন্মে, তাহা হইতেছে স্বতন্ত্র (ব্রহ্মোপাসক ভগবদনুভব লাভ করেন না, কেবল-মাত্র নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মেরই অনুভব লাভ করেন ; সুতরাং তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান হইতেছে স্বতন্ত্র, প্রধানীভূত))। আবার, ভগবদুপাসকগণ ভগবৎ-শক্তিরূপা ভক্তির প্রভাবে, ত্বং-পদার্থ-জীবচৈতন্যের সহিত কিঞ্চিৎ ভেদরূপেই ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন। শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা এবং শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায়। "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা ন শোচতি ন কাঙ্ক্ষতি। সমঃ সর্ব্বেষু ভূতেষু মদ্‌ভক্তিং লভতে পরাম্‌॥ গীতা॥ ১৮।৫৪॥"-এই ভগবদুক্তি হইতে জানা যায়, কোনও কোনও ভক্তিসাধক ক্রমমুক্তির রীতি অনুসারে মুক্তিসুখ অনুভবের আশায় সাধন করিতে করিতে যখন ব্রহ্মভূত—গুণমালিন্যের অপগমে অনাবৃত-চৈতন্যহেতু ব্রহ্মরূপত্বপ্রাপ্ত—হয়েন, তখন তিনি সর্ব্বদাই প্রসন্নচিত্ত থাকেন ; নষ্ট বস্তুর জন্যও তখন তাঁহার কোনও শোক জন্মেনা, অপ্রাপ্ত বস্তুর জন্যও তাঁহার তখন আর বাসনা জাগে না ; সর্ব্বভূতে ব্রহ্মসত্তার উপলব্ধি হয় বলিয়া তিনি সর্ব্বত্র সমদর্শী হইয়া থাকেন। ইহার পরে তিনি ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া থাকেন। আবার, "আত্মারামাশ্চ মুনয়ো নির্গ্রন্থা অপ্যুরুক্রমে। কুর্ব্বন্ত্যহৈতুকীং ভক্তিমিত্থম্ভূতগুণো হরিঃ॥ শ্রীভা, ১।৭।১০॥"-এই সূতোক্তি হইতে জানা যায়, মায়াগ্রন্থিহীন আত্মারাম (সুতরাং ব্রহ্মানুভবপ্রাপ্ত) মুনিগণও ভগবানে অহৈতুকী ভক্তি করিয়া থাকেন। এই দুই প্রমাণ হইতে জানা গেল, ভক্তিসাধকের নিকটে পরাভক্তির পরিকর-রূপেই—সুতরাং ভক্তি হইতে ভিন্ন রূপেই—ব্রহ্মানুভব প্রকাশিত হয় ; ইহা হইতে ইহাও জানা গেল যে, ভক্তিসাধক জীবচৈতন্য হইতে ভেদরূপেই ব্রহ্মের অনুভব পাইয়া থাকেন ; ভক্তির প্রভাবেই এইরূপ হইয়া থাকে। ব্রহ্মোপাসকগণ কিন্তু জীবচৈতন্য হইতে অভিন্নরূপেই ব্রহ্মস্বরূপের অনুভব করিয়া থাকেন।

ভগবদুপাসকের অনুভব এবং ব্রহ্মোপাসকের অনুভব যে এক রকম নহে, উক্ত আলোচনা হইতে তাহাই জানা গেল ; কিন্তু উভয়রূপ অনুভবের হেতুই ভগবৎপ্রসাদ ; একই ভগবৎপ্রসাদ হইতে দুই রকমের অনুভব যখন দেখা যাইতেছে, তখন মনে করিতে হইবে, উভয়স্থলে ভগবৎ-প্রসাদের স্বরূপ এক রকম নহে ; এক রকম হইলে অনুভবও একরকম হইত। কেবল অনুভবরূপ ফলে নহে, অনুভবজনিত চরম ফলেও পার্থক্য দৃষ্ট হয়। কি পার্থক্য, তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

"নাত্যন্তিকং বিগণয়ন্ত্যপি তে প্রসাদং কিন্বন্যদর্পিতভয়ং ভ্রুব উন্নয়ৈস্তে।
যেঽঙ্গ ত্বদঙ্ঘ্রিশরণা ভবতঃ কথায়াঃ কীর্ত্তন্যতীর্থযশসঃ কুশলা রসজ্ঞাঃ॥ শ্রীভা, ৩।১৫।৪৮॥

—(বৈকুণ্ঠেশ্বর ভগবানের স্তব করিতে করিতে চতুঃসন বলিয়াছেন) হে প্রভো ! তোমার যশঃ পরম-রমণীয় এবং পরম পবিত্র ; তোমার চরণে শরণাগত যে সকল কুশলব্যক্তি তোমার কথার (ভগবৎসম্বন্ধীয় কথাদির) রসজ্ঞ, তাঁহারা তোমার প্রসাদরূপ আত্যন্তিককেও (কৈবল্য বা সাযুজ্য-মোক্ষকেও) আদর করেন না, অন্য ইন্দ্রাদিপদের কথা আর কি বলা যাইবে ? বস্তুতঃ ইন্দ্রাদিপদেও তোমার ভ্রূভঙ্গিমাত্রে ভয় নিহিত হয়।”

এই উক্তি হইতে জানা গেল—অন্যেরা (অর্থাৎ মোক্ষাকাঙ্ক্ষীরা) জীবচৈতন্য ও ব্রহ্ম-চৈতন্যের অভেদজ্ঞানরূপ যে মোক্ষকে আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, পরমবিজ্ঞ-ভক্তিরস-রসিকগণ তাহারও আদর করেন না ; অথচ সেই মোক্ষও ভগবৎ-প্রসাদ হইতে প্রাপ্ত। ভক্তিরস-রসিকগণ তাদৃশ মোক্ষের যে কেবল আদর করেন না, তাহাই নহে ; ভক্তিবিরুদ্ধ বলিয়া তাদৃশ মোক্ষকে তাঁহারা নরকবৎ তুচ্ছও মনে করেন। তাহার প্রমাণ প্রদর্শিত হইতেছে।

“নারায়ণপরাঃ সর্ব্বে ন কুতশ্চন বিভ্যতি।
স্বর্গাপবর্গনরকেষ্বপি তুল্যার্থদর্শিনঃ॥ শ্রীভা, ৬।১৭।২৮॥

—(মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিয়াছেন) যাঁহারা শ্রীনারায়ণপরায়ণ, তাঁহারা সকলেই (অর্থাৎ প্রত্যেকেই) কোথা হইতেও কিছুমাত্র ভীত হয়েন না। স্বর্গ, মোক্ষ এবং নরককেও তাঁহারা তুল্যার্থ (সমানরূপে কাম্য) বলিয়া মনে করেন।”

স্বর্গসুখে মত্ত হইয়া থাকিলে ভগবদ্‌ভজনের কথা মনে জাগে না ; নরকের দুঃসহ যন্ত্রণায়ও তদ্রূপই হয়। কৈবল্যমোক্ষে তো সেব্যসেবক-ভাবই থাকে না ; সুতরাং স্বর্গ, মোক্ষ ও নরক—তিনটীই ভক্তিবিরোধী বলিয়া ভক্তিরস-রসিকগণ তিনটীকেই নিতান্ত হেয় মনে করেন। অথচ, ভগবৎ-প্রসাদ ব্যতীত এই তিনটীর কোনওটীই লভ্য নহে।

উল্লিখিত প্রমাণ হইতে জানা গেল—কৈবল্যসাধনের ফল এবং ভক্তিসাধনের ফল, উভয়ই একই ভগবৎ-প্রসাদ হইতে লভ্য হইলেও তাহাদের স্বরূপের অনেক পার্থক্য ; কৈবল্য-সাধক যাহাকে আত্যন্তিক শ্রেয়ঃ বলিয়া মনে করেন, ভক্তিসাধক তাহাকে হেয় বলিয়া মনে করেন। কিন্তু ভক্তির ফলকে কৈবল্যসাধক হেয় বলিয়া মনে করেন না ; তাহার প্রমাণ চতুঃসন ; সনক-সনন্দনাদি চতুঃসন বাল্যাবধি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মানন্দেই নিমগ্ন ছিলেন ; ভক্তির মহিমা উপলব্ধি করিয়া (ভগবানের চরণস্থিত তুলসীর সৌগন্ধ্যে আকৃষ্ট হইয়া) তাঁহারাও নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান পরি-ত্যাগ পূর্ব্বক ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। ইহাতেই বুঝা যায়, কৈবল্যমোক্ষ এবং ভগবজ্-জ্ঞান—এতদুভয়ই ভগবৎ-প্রসাদলভ্য হইলেও উভয়স্থলে ভগবৎ-প্রসাদের স্বরূপ এক রকম নহে। এক স্থলে বাস্তব প্রসাদ, অপর স্থলে প্রসাদের আভাস—ইহাই বুঝিতে হইবে। কোন্ স্থলে প্রসাদ এবং কোন্ স্থলে প্রসাদের আভাস ? ভগবজ্‌জ্ঞান-বিষয়েই প্রসাদ, অন্যত্র আভাস—ইহাই বুঝিতে হইবে। কেননা, মোক্ষাকাঙ্ক্ষী চতুঃসনেরও ভগবজ্‌জ্ঞানলাভের নিমিত্ত, ভগবদ্-

ভজনের জন্য আকাঙ্ক্ষার উদ্ভবের কথা দৃষ্ট হয়; এবং এই আকাঙ্ক্ষার উদয় হওয়ার পরে মোক্ষবিষয়ে তাঁহাদেরও হেয়ত্ববুদ্ধির কথা জানা যায়।

এইরূপে দেখা গেল, ব্রহ্মজ্ঞান ভগবৎ-প্রসাদ হইতে আবির্ভূত নয়, প্রসাদের আভাস হইতেই আবির্ভূত। যদি স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে মোক্ষকে কেহ ভগবৎ-প্রসাদ বলিয়া মনে করেন, তাহা হইলে নিজ কল্পিত বলিয়া তাহা হইবে সগুণই। "স্বমত্যানুসারেণ প্রসাদতয়া গৃহ্যমাণশ্চেন্মতিকল্পিতত্বাৎ সগুণ এব।"

কৈবল্যমোক্ষ যে ভগবৎ-প্রসাদ নয়, অন্য ভাবেও তাহা বুঝা যায়। বহুকাল যাবৎ শ্রবণ-মনন-নিদিধ্যাসন-যম-নিয়মাদি আয়াসসাধ্য সাধন করিয়া যে সাযুজ্য পাওয়া যায়, ভগবানের প্রতি বিদ্বেষ-ভাবাপন্ন অসুরস্বভাব লোকগণ ভগবানের হস্তে নিহত হইয়াও সেই সাযুজ্যমুক্তিই পাইয়া থাকে। স্বহস্তে নিহত অসুরদিগকে ভগবান্ যে সাযুজ্যমুক্তি দিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহার কৃপাই এবং ভক্তিসাধককে তিনি যে স্বচরণসেবা দিয়া থাকেন, তাহাও তাঁহার কৃপা। কিন্তু উভয় স্থলের কৃপা কি এক রকম? তাহা কখনই হইতে পারে না। ভক্তিসাধকের ব্যাপারেই তাঁহার বাস্তব কৃপার আবির্ভাব; কেননা, এই কৃপার ফলে জীব স্বীয় স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ভগবৎসেবায় প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে; শ্রুতি যে বলিয়াছেন—"আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ বৃহদারণ্যক ॥১।৪।৮॥-প্রিয়রূপে পরব্রহ্ম পরমাত্মার উপাসনা করিবে।", "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ॥ শতপথশ্রুতি॥—প্রেমের, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী বাসনার, সহিত পরব্রহ্ম শ্রীহরির ভজন করিবে", তাহার সার্থকতা যে কৃপাদ্বারা লাভ করা যায়, তাহাই বাস্তব কৃপা। আর, উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন পূর্ব্বক যাঁহারা কেবল নিজেদের আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির জন্যই কৈবল্যমুক্তি চাহেন, কিম্বা শ্রুতি-প্রোক্ত প্রিয়ত্বের বা আনুকূল্যের পরিবর্ত্তে বিদ্বেষের বা প্রাতিকূল্যের ভাব লইয়া যাঁহারা ভগবানের সঙ্গে যুদ্ধবিগ্রহাদি করিয়া থাকেন, তাঁহারা যে কৃপার ফলে সাযুজ্যমুক্তি পাইয়া থাকেন, সাযুজ্যমুক্তি পাইয়া স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ভগবৎসেবা হইতে বঞ্চিত হয়েন, পরব্রহ্ম ভগবানের সহিত স্বরূপানু-বন্ধি প্রিয়ত্ব-সম্বন্ধের জ্ঞানটুকু হইতেও বঞ্চিত হয়েন, তাহা কখনও বাস্তব কৃপা হইতে পারে না, তাহা হইতেছে কৃপার আভাসমাত্র। সূর্য্যের আভাস অরুণের উদয়ে জগতের অন্ধকার দূরীভূত হয়; তদ্রূপ ভগবৎকৃপার আভাসের আবির্ভাবে মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর সংসারবন্ধন দূরীভূত হয়। সূর্য্য উদিত হইলে পর জীবের স্বাভাবিক কার্য্যাদি অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে; তদ্রূপ ভগবানের বাস্তব কৃপার আবির্ভাবেই জীবস্বরূপের স্বরূপানুবন্ধি কর্ত্তব্য ভগবৎসেবার সৌভাগ্যের উদয় হইতে পারে।

কৈবল্যজ্ঞান বাস্তবিক ভগবৎ-প্রসাদ-জনিত হইতে পারে না; প্রসন্নতা হইতেই প্রসাদ বা কৃপার স্ফুরণ। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন, 'যে ভজন্তি তু মাং ভক্ত্যা ময়ি তে তেষু চাপ্যহম্ ॥গীতা॥৯।২৯॥ —যাঁহারা ভক্তির সহিত আমার ভজন করেন, তাঁহারা আমাতে অবস্থান করেন, আমিও তাঁহাদের মধ্যে অবস্থান করি।" ইহাতে বুঝা যায়, ভক্তি-সাধককেই তিনি অত্যন্ত প্রিয় বলিয়া মনে করেন।

"যথা মহান্তি ভূতানি ভূতেষূচ্চাবচেষ্বনু। প্রবিষ্টান্যপ্রবিষ্টানি তথা তেষু নতেষ্বহম্ ॥শ্রীভা ২।৯।৩৪॥"-এই ভগবদুক্তি হইতেও তাহাই জানা যায়। ভগবচ্চরণে প্রণত ভক্তসাধককে ভগবান্ অত্যন্ত প্রিয় মনে করেন বলিয়া ভক্তের প্রতিই তাঁহার প্রসন্নতা —প্রসাদ—স্বাভাবিক। কিন্তু নিজেদের প্রিয় বলিয়া যাঁহারা ভগবানের ভজন করেন না, তাঁহার নিকট হইতে নিজেদের দুঃখনিবৃত্তি আদায় করার জন্যই যাঁহারা ভজন করেন, ভগবানের সহিত নিজেদের স্বরূপানুবন্ধি প্রিয়ত্ব-সম্বন্ধের কথাও চিন্তা করেন না, সেব্যসেবক-সম্বন্ধের কথা চিন্তা করেন না, বরঞ্চ স্বরূপবিরোধী অভেদ-সম্বন্ধের কথাই ভাবনা করেন, তাঁহাদের সম্বন্ধে ভগবানের বাস্তব প্রসন্নতাও জন্মিতে পারেনা। তথাপি যে তাঁহারা মোক্ষ লাভ করেন, তাহা তাঁহার বাস্তব প্রসন্নতাবশতঃ নয়, তাহা হইতেছে ভগবানের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃ ; ভগবান্ পরব্রহ্ম হইতেছেন —"সত্যং শিবং সুন্দরম্ ।" ইহা তাঁহার শিবত্বের—মঙ্গল স্বরূপত্বেরই—ফল। বরফের নিকটে গেলে বরফের স্বরূপগত ধর্ম্মবশতঃই যেমন দেহের তাপ দূরীভূত হয়, তদ্রূপ।

যাহা হউক, প্রশ্ন ছিল এই যে—নির্গুণ সৎসঙ্গ হইতে জাত ভক্তি যেমন নির্গুণা হয় এবং সেই ভক্তির ফলে নির্গুণ ভগবৎ-প্রসাদ হইতে জাত ভগবদ্ বিষয়ক জ্ঞান বা ভক্তিসুখও যেমন নির্গুণ হয়, তদ্রূপ, নির্গুণ ভগবৎ-প্রসাদ হইতে জাত ব্রহ্মজ্ঞান, বা কৈবল্যসুখ নির্গুণ হইবে না কেন? এই প্রশ্নের উত্তরই উল্লিখিত আলোচনায় দৃষ্ট হয়। এই অলোচনায় বলা হইয়াছে—ব্রহ্মজ্ঞান, বা কৈবল্য-সুখ ভগবৎ-প্রসাদজাত নয়। এজন্য ইহাকে নির্গুণ বলা যায় না। বিশেষতঃ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৈবল্যজ্ঞানের উদ্ভবও গুণসম্বন্ধ হইতে, সত্ত্বগুণই ইহার হেতু। "বিশেষতস্তস্য গুণসম্বন্ধেন জন্মাঙ্গীকৃতমিতি।" সুতরাং কৈবল্যজ্ঞান হইল সগুণ।

(১১) গুণময় দেহেন্দ্রিয়াদিদ্বারা অনুষ্ঠিত হইলেও ভগবজ্ জ্ঞানের সাধন নির্গুণ

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—কৈবল্য-সাধকের কৈবল্যজ্ঞানের হেতু সগুণ বলিয়া তাঁহার কৈবল্যজ্ঞানকেও সগুণ বলা হইল। কিন্তু ভক্তিসাধকও তো তাঁহার ইন্দ্রিয়াদির সহায়তাতেই ভজন করিয়া থাকেন। লোকের—সুতরাং ভক্তিসাধকেরও—অন্তরিন্দ্রিয় এবং বহিরিন্দ্রিয়-এই উভয়ই গুণময়, পঞ্চভূতে গঠিত। গুণময় ইন্দ্রিয়-সহযোগে তাঁহার যে জ্ঞান ও ক্রিয়ার (ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের) উদ্ভব হয়, তাহা কিরূপে নির্গুণ হইতে পারে? আর তাহা যদি নির্গুণ না হয়, তাহা হইলে তাঁহার ভগবদ্‌বিষয়ক জ্ঞানই বা কিরূপে নির্গুণ হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—জ্ঞানশক্তি ও ক্রিয়াশক্তি ত্রিগুণাত্মক জড়ের ধর্ম্ম হইতে পারেনা ; জড় ঘটে যেমন জ্ঞান বা ক্রিয়াশক্তি নাই, তদ্রূপ। অচেতন জড় বস্তুর কোনও রূপ জ্ঞান বা ক্রিয়াশক্তি থাকিতে পারেনা। জ্ঞান ও ক্রিয়া হইতেছে চৈতন্যের ধর্ম্ম। সুতরাং ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় অনুষ্ঠিত সাধনাঙ্গ বাস্তবিক জড় ইন্দ্রিয়ের কার্য্য হইতে পারে না। তবে কি ইহা চৈতন্যস্বরূপ জীবের ধর্ম্ম? না, তাহাও নয় ; কেননা স্বতন্ত্ররূপে কিছু করিবার সামর্থ্য জীব-চৈতন্যের নাই ; জীবের শক্তি ঈশ্বরের অধীন (ব্রহ্মসূত্রও তাহা বলিয়া গিয়াছেন। জীব সম্বন্ধে "কর্ত্তা শাস্ত্রার্থ-বত্ত্বাৎ॥২।৩।৩৩॥"-সূত্রে জীবের কর্ত্তৃত্বের কথা বলিয়া পরে বলিয়াছেন "পরাৎ তু তৎ শ্রুতেঃ ॥২।৩।৪১॥-

শ্রুতি হইতে জানা যায়, পরমেশ্বর হইতেই জীবের কর্তৃত্ব) ; সুতরাং জীব-চৈতন্যের কর্তৃত্বাদি-বিষয়ে মুখ্যত্ব নাই। কোনও দেবতাকর্তৃক আবিষ্ট লোকের ন্যায় পরমেশ্বরের শক্তিতেই জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তির বিকাশ হইয়া থাকে। সুতরাং জীবের জ্ঞান ও ক্রিয়াশক্তি মুখ্যতঃ পরমাত্ম-চৈতন্য-স্বরূপেরই ধর্ম্ম। শ্রীমদ্ভাগবত হইতেও তাহা জানা যায়।

"দেহেন্দ্রিয়প্রাণমনোধিয়োঽমী যদংশবিদ্ধাঃ প্রচরন্তি কর্ম্মসু ।
নৈবান্যদা লৌহমিবাপ্রতপ্তং স্থানেষু তদ্ দ্রষ্ট্রপদেশমেতি ॥ শ্রীভা. ৬।১৬।২৪॥

—অগ্নির শক্তিতে-উত্তপ্ত হইয়াই যেমন লৌহ অন্য বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারে, শীতল লৌহ যেমন তাহা পারে না, তদ্রূপ ব্রহ্মচৈতন্যের অংশে (শক্তিতে) আবিষ্ট হইয়াই জীবের দেহ, ইন্দ্রিয়, প্রাণ, মন, বুদ্ধি-এসমস্ত (জাগ্রৎ-কালে ও স্বপ্নকালে) স্ব-স্ব কার্য্যে প্রচরণশীল হয়, অন্যসময়ে (সুষুপ্তি ও মূর্চ্ছাদির সময়ে ব্রহ্মচৈতন্যের অংশে বা শক্তিতে আবেশ থাকেনা বলিয়া) তাহারা স্ব-স্ব-কার্য্যে প্রচরণশীল হয় না। অগ্নির শক্তিতে প্রতপ্ত লৌহ অন্য বস্তুকে দগ্ধ করিতে পারিলেও অগ্নিকে যেমন দগ্ধ করিতে পারেনা, তদ্রূপ ব্রহ্মের চৈতন্যাংশে আবিষ্ট দেহেন্দ্রিয়াদিও অন্য কর্ম্ম করিতে পারিলেও ব্রহ্মচৈতন্যকে জানিতে পারেনা ; জীবও তদবস্থায় তাঁহাকে জানিতে পারেনা (দেহোঽসবোঽক্ষা ইত্যাদি শ্রীভা, ৬।৪।২৫-শ্লোক তাহার প্রমাণ)। জাগ্রদাদি অবস্থায় জীবকে দ্রষ্টা বলা হয়, সে স্থলেও জীব হইতেছে কর্ম্মভূত, মুল কর্ত্তা সেই ব্রহ্মই ; জীবের দ্রষ্টৃত্বসিদ্ধির নিমিত্ত স্বীয় কিঞ্চিৎ চৈতন্য জীবকে দিয়া নিজেই তাহা প্রাপ্ত হয়েন।"

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল, ব্রহ্মচৈতন্যের শক্তিতে আবিষ্ট হইয়াই জড় দেহেন্দ্রিয়াদি কার্য্যসামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে। "প্রাণস্য প্রাণমুত চক্ষুষশ্চক্ষুরুত শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনঃ॥ বৃহদারণ্যক ॥৪।৪।১৮॥ —সেই পরমাত্মা ব্রহ্ম হইতেছেন প্রাণের প্রাণ, চক্ষুর চক্ষু, শ্রোত্রের শ্রোত্র, মনের মন", "ন ঋতে ক্রিয়তে কিঞ্চনারে ॥ ঋক্ ॥—সেই ব্রহ্মচৈতন্য ভিন্ন কেহই কিছু করিতে পারে না"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্য হইতেও তাহাই জানা যায়।

(১২) সমস্ত ইন্দ্রিয়সাধ্য ক্রিয়া নির্গুণা নহে

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—স্বতন্ত্রভাবে দেহেন্দ্রিয়াদির কোনও কার্য্য করারই সামর্থ্য যদি না থাকে, ব্রহ্মের চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়াই যদি জড় দেহেন্দ্রিয়াদি সমস্ত কার্য্য করিয়া থাকে, তাহা হইলে ব্রহ্মের চৈতন্যাংশই সমস্ত ইন্দ্রিয়সাধ্য কর্ম্মের মুখ্য হেতু বলিয়া এবং ব্রহ্মের চৈতন্যাংশ নির্গুণ বলিয়া জীবের ইন্দ্রিয়সাধ্য সমস্ত কর্ম্মই নির্গুণ হইবে না কেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন-"ত্রৈগুণ্যকার্য্য-প্রাধান্যেন তে গুণময়ত্বে-নোচ্যতে, পরমেশ্বরপ্রাধান্যেন তু স্বতো গুণাতীতে এব। —জীবের ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তি ব্রহ্মের চৈতন্যাংশদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলেও যদি প্রধানরূপে ত্রিগুণময় কার্য্যে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে সেই

ক্রিয়াশক্তি এবং জ্ঞানশক্তিকে গুণময়ী বলা হয়। আর, যদি গুণাতীত পরমেশ্বরকে লক্ষ্য করিয়াই প্রধানরূপে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান ও ক্রিয়া স্বতঃই গুণাতীত হইবে।”

এই উক্তির সমর্থক প্রমাণ শ্রীমদ্ভাগবতেই দৃষ্ট হয়।

“যদ্ যুজ্যতেঽসুবসুকর্ম্মমনোবচোভির্দেহাত্মজাদিষু নৃভিস্তদসৎ পৃথক্ত্বাৎ।
তৈরেব সদ্ ভবতি যৎ ক্রিয়তেঽপৃথক্ত্বাৎ সর্ব্বস্য তদ্ভবতি মূলনিষেচনং যৎ॥

—শ্রীভা, ৮।৯।২৯॥

—(দেবতাগণের অমৃতপানপ্রসঙ্গে শ্রীল শুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন) মানবগণ প্রাণ, ধন, কর্ম্ম, মন এবং বাক্যদ্বারা দেহ এবং পুত্রাদির উদ্দেশ্যে যাহা কিছু করে, তৎসমস্তই অসৎ (অর্থাৎ ব্যর্থ হয়); কেননা, পৃথক্ বুদ্ধিতে (দেহ-পুত্রাদি পরমাত্মা হইতে পৃথক—এইরূপ বুদ্ধিতেই) তৎসমস্ত কৃত হয়। কিন্তু অপৃথক্ বুদ্ধিতে (দেহ-পুত্রাদি পরমাত্মা হইতে তত্ত্বতঃ পৃথক্ নহে-এইরূপ বুদ্ধিতে) সে-সমস্ত ধনাদিদ্বারা ঈশ্বরোদ্দেশ্যে যাহা করা হয়, তাহাই সৎ (অর্থাৎ সার্থক)। বৃক্ষের মূলদেশে জলসেচন করিলে শাখা-পত্রাদি সকলেরই যেমন তৃপ্তি হয়, তদ্রূপ সকলের আশ্রয়ভূত এবং সকলের মধ্যে অন্তর্য্যামিরূপে অবস্থিত পরমেশ্বরের প্রীতির জন্য যাহা কিছু করা হয়, তাহাদ্বারা দেহ-পুত্রাদি সকলেরই প্রীতি জন্মিতে পারে।”

মূল শ্লোকের “পৃথক্ত্বাৎ”-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে – দেহ-প্রাণ-ধনাদি পরমাত্মা হইতে অন্য বস্তুর আশ্রয়ে প্রয়োজিত হয় বলিয়া তাহা “অসৎ”। “পৃথক্ত্বাৎ পরমাত্মেতরাশ্রয়ত্বাৎ।” আর “অপৃথক্ত্বাৎ”-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—একমাত্র পরমেশ্বরকে আশ্রয় করিয়া ধনপ্রাণাদি প্রয়োজিত হয় বলিয়া তাহা “সৎ।” অর্থাৎ লোকের জ্ঞানক্রিয়াদি ধনপ্রাণাদির যোগে যদি দেহ-পুত্রাদি গুণময় বস্তুতে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে সেই জ্ঞান-ক্রিয়াদি হইবে অসৎ, অনিত্য, গুণময়। কিন্তু ঐ ধনপ্রাণাদির যোগেই জ্ঞান-ক্রিয়াদি যদি গুণাতীত পরমেশ্বরে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-ক্রিয়াদিও হইবে “সৎ—নির্গুণ।”

এইরূপে দেখা গেল—লোকের জ্ঞান-ক্রিয়াদি গুণাতীত ব্রহ্মচৈতন্যদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলেও তাহা যদি গুণময় দেহ-পুত্রাদির সম্বন্ধে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে জ্ঞান-ক্রিয়াদি হইবে সগুণ; আর তাহা যদি গুণাতীত পরমেশ্বর-সম্বন্ধে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে নির্গুণ। জ্ঞান-ক্রিয়াদির প্রবর্ত্তক ব্রহ্মচৈতন্যাংশ নির্গুণ হইলেও যে বস্তুসম্বন্ধে তাহা প্রয়োজিত হয়, সেই বস্তুর যে ধর্ম্ম, জ্ঞান-ক্রিয়াদিতেও সেই ধর্ম্মই প্রতিফলিত হয়, অর্থাৎ সেই বস্তুর ধর্ম্মই জ্ঞান-ক্রিয়াদিতে উপচারিত হয়।

(১৩) কৈবল্যজ্ঞান সগুণ কেন

এইরূপে দেখা গেল, নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্যাংশদ্বারা প্রবর্ত্তিত ইন্দ্রিয়সাধ্য-জ্ঞানক্রিয়াদি যদি নির্গুণ পরমেশ্বরবিষয়ে প্রয়োজিত হয়, তাহা হইলে তাহাতে নির্গুণ পরমেশ্বরের নির্গুণত্ব-

ধর্ম্মই প্রতিফলিত হইবে; নির্গুণে নির্গুণ প্রতিফলিত হয় বলিয়া তাহাও হইবে নির্গুণ— স্বভাবতঃই নির্গুণ; অর্থাৎ হরিভক্তির সাধন নির্গুণ; বিশেষতঃ, গুণসঙ্গ হইতে যে এই সাধনের উদ্ভব, তাহা অঙ্গীকৃত হয় না। ব্রহ্মজ্ঞান যেমন গুণসম্বন্ধ হইতে উদ্ভূত হয়, হরিভক্তি তদ্রূপ নহে। "অতো যুক্তমেব জ্ঞানক্রিয়াত্মিকায়া হরিভক্তের্নির্গুণত্বম্। বিশেষতস্তস্যা গুণসম্বন্ধেন জন্মাভাবশ্চাঙ্গীকৃতঃ। ন তু ব্রহ্মজ্ঞানস্যেব গুণসম্বন্ধেন জন্মভাব ইতি।"

তাৎপর্য্য এই। ত্রিগুণাত্মিকা মায়া জীবের চিত্তবৃত্তিকে জীবেব নিজের দিকেই চালিত করে—জীবের দৈহিক-সুখাদির, অথবা দুঃখনিবৃত্তির বাসনাই জাগায়। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত॥ বৃহদারণ্যক ॥ ১।৪।৮॥, প্রেম্না হরিং ভজেৎ॥ শতপথ-শ্রুতি ॥"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যে প্রিয়-পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত শ্রীকৃষ্ণের উপাসনার কথা বলা হইয়াছে, সেই উপাসনার বাসনা, নিজের সম্বন্ধে সমস্ত বাসনাদি-পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির বাসনা ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা মায়া কখনও জীবের চিত্তে জাগায় না। মায়ার রজস্তমোগুণ দেহেন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তুর বাসনা জাগাইয়া জীবকে উন্মত্ত করিয়া তোলে; আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির বা ব্রহ্মসুখানুভবের বাসনা জাগায় না; সত্ত্বগুণ হইতেই এই বাসনার উদ্ভব। সত্ত্বগুণজাত এই বাসনাও গুণময়ী; এই গুণময়ী বাসনার প্রভাবেই আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির বা ব্রহ্মানন্দ-অনুভবের জন্য সাধক কৈবল্যমুক্তির উদ্দেশ্যে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। অনুষ্ঠান অবশ্য দেহেন্দ্রিয়াদিদ্বারাই করিয়া থাকেন; এই দেহেন্দ্রিয়াদির জ্ঞানক্রিয়া নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্যাংশদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইলেও তাহা প্রয়োজিত হয় কিন্তু সত্ত্বগুণজাতা বাসনার লক্ষ্য দুঃখনিবৃত্তিতে বা ব্রহ্মানন্দে; এজন্য এ-স্থলে সাধকের জ্ঞানক্রিয়াদিতে সত্ত্বগুণের ধর্ম্মই প্রতিফলিত হয় বলিয়া তাঁহার সাধনও হয় সত্ত্বগুণময় বা সাত্ত্বিক (পূর্ব্বোদ্ধৃত শ্রীভা, ৩।২৯।১০-শ্লোক)।

প্রশ্ন হইতে পারে—সাধন হয়তো সগুণ হইতে পারে; কিন্তু এই সাত্ত্বিক সাধনের ফলে যে কৈবল্যপ্রাপ্তি হয়, তাহাতে তো সত্ত্বগুণ থাকে না। এই অবস্থায় কৈবল্যসুখকে কেন সাত্ত্বিক বলা হইল (সাত্ত্বিকং সুখমাত্মোত্থম্। শ্রীভা. ১১।২৫।২৯॥ পূর্ব্বে উদ্ধৃত)।

ইহার উত্তর এই। কৈবল্যে যে আত্মোত্থসুখ জন্মে, তাহাতে সত্ত্বগুণ না থাকিলেও সত্ত্বগুণের প্রভাবের ফল বিদ্যমান থাকে। কিরূপে? তাহা বলা হইতেছে। কর্দ্দমনির্ম্মিত ঘট হয় কোমল; সহজেই তাহার রূপ বিকৃত হইয়া যাইতে পারে; কিন্তু উত্তাপ-সংযোগে ঘটের রূপ স্থায়িত্ব লাভ করিয়া থাকে। ঘট যখন স্থায়ী রূপ লাভ করে, তখন উত্তাপদায়ক অগ্নি অপসারিত হইলেও এবং ঘট অত্যন্ত শীতল হইয়া গেলেও উত্তাপের ফলে ঘট যে রূপ পাইয়াছে, তাহা থাকিয়া যায়। তদ্রূপ, সত্ত্বগুণ সাধকের চিত্তে আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির, বা ব্রহ্মানন্দ অনুভবের জন্য যে বাসনা জাগায়, সেই বাসনা দ্বারাই সাধকের চিত্ত রূপায়িত হয়। সাধনের সিদ্ধিতে সত্ত্বগুণ তিরোহিত হইলেও চিত্তের সেই রূপায়ণ থাকিয়া যায়; তাহাতেই সিদ্ধ সাধক কৈবল্যসুখ অনুভব করিতে পারেন। সত্ত্বগুণের ক্রিয়ার

ফল থাকিয়া যায় বলিয়াই কৈবল্যসুখকে সাত্ত্বিক বলা হয়। কৈবল্যসুখের বাসনার গতি সাধকের নিজের দিকে, একমাত্র প্রিয় পরব্রহ্ম ভগবানের দিকে নহে।

যাহা হউক, ভগবান্ কপিলদেব উল্লিখিতরূপে সগুণা সাধনভক্তির কথা বলিয়া নির্গুণা সাধনভক্তি-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহাই পরবর্ত্তী অনুচ্ছেদে আলোচিত হইতেছে।

৫১। নির্গুণা সাধনভক্তি

সগুণা সাধনভক্তির লক্ষণ প্রকাশ করিয়া ভগবান্ কপিলদেব নির্গুণা সাধনভক্তির লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা এস্থলে প্রকাশ করা হইতেছে।

"মদ্‌গুণশ্রুতিমাত্রেণ ময়ি সর্ব্বগুহাশয়ে। মনোগতিরবিচ্ছিন্না যথা গঙ্গাম্ভসোঽম্বুধৌ॥
লক্ষণং ভক্তিযোগস্য নির্গুণস্য হ্যুদাহৃতম্। অহৈতুক্যব্যবহিতা যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে॥
সালোক্য-সার্ষ্টি-সামীপ্য-সারূপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥
স এব ভক্তিযোগাখ্য আত্যন্তিক উদাহৃতঃ। যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥
—শ্রীভা, ৩।২৯।১১-১৪॥

—(ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতির নিকটে বলিয়াছেন) আমার (ভগবানের) গুণ (কথাপ্রসঙ্গ) শ্রবণ মাত্রেই সর্ব্বগুহাশয় (প্রাকৃতগুণময় ইন্দ্রিয়-সকলের অগোচর যে স্থান—হৃদয়, সে স্থানে গুহ্য ও নিশ্চল ভাবে অবস্থিত) আমাতে, সমুদ্রাভিমুখে গঙ্গাস্রোতের ন্যায়, অবিচ্ছিন্না যে মনোগতি, তাহাই নির্গুণ ভক্তিযোগের লক্ষণ বা স্বরূপ বলিয়া কথিত হয়। পুরুষোত্তম ভগবানে যে ভক্তি (শ্রোত্রাদিদ্বারা সেবন) অহৈতুকী (মোক্ষাদি-ফলাভিসন্ধানশূন্যা) এবং অব্যবহিতা (জ্ঞান-কর্ম্মাদিরূপ ব্যবধান-রহিতা, সাক্ষাদ্রূপা), তাহাও সেই নির্গুণ ভক্তিযোগের স্বরূপ বা লক্ষণ। (অহৈতুকীত্ব কি রকম, তাহা বিশেষরূপে বলা হইতেছে) যাঁহারা আমার (ভগবানের) জন (ভক্ত), তাঁহারা নিজেদের জন্য কোনও কিছুই কামনা করেন না; এমন কি, আমিও যদি তাঁহাদিগকে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য এবং সাযুজ্য, এই পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক প্রকারের মুক্তি দিতে চাই, তথাপি তাঁহারা তাহা গ্রহণ করেন না, আমার সেবাব্যতীত কিছুই তাঁহারা গ্রহণ করেন না। ইহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ (আত্যন্তিক বা পরম পুরুষার্থ) বলিয়া শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে। এইরূপ ভক্তিযোগে মায়িক গুণত্রয় অতিক্রম করিয়া আমার (ভগবানের) সাক্ষাৎকার লাভ করা যায়।"

শ্রীকপিলদেব-কথিত নির্গুণ ভক্তিযোগের উৎপত্তিহেতুটীও নির্গুণ। এই হেতুটী হইতেছে ভগবদ্‌গুণশ্রবণ। ইহা নির্গুণ কেন, তাহা বলা হইতেছে।

প্রথমতঃ, সাধুসঙ্গের এবং সাধুমুখে ভগবৎকথা শ্রবণের ফলেই ভক্তিযোগের প্রতি লোকের মন যাইতে পারে, অন্যথা নহে। "কৃষ্ণভক্তিজন্মমূল হয় সাধুসঙ্গ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৪৮॥ ভবাপবর্গো

ভ্রমতো যদা ভবেৎ জনস্য তর্হ্যচ্যুত সৎসমাগমঃ। সৎসঙ্গমো যর্হি তদৈব সদ্গতৌ পরাবরেশে ত্বয়ি জায়তে রতিঃ॥ শ্রীভা, ১০।৫১।৫৩॥; সতাং প্রসঙ্গান্মমবীর্য্যসংবিদো ভবন্তি হৃৎকর্ণরসায়নাঃ কথাঃ। তজ্জোষণাদাশ্বপবর্গবর্ত্মনি শ্রদ্ধা রতির্ভক্তিরনুক্রমিষ্যতি॥ শ্রীভা, ৩।২৫।২৫॥" পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—সাধুসঙ্গ নির্গুণ [৫।৫০ ঘ (৬) অনু]।

দ্বিতীয়তঃ, ভগবদ্ গুণ, ভগবৎকথাদিও নির্গুণ, অপ্রাকৃত। কেননা, প্রকৃতি বা মায়া ভগবান্‌কে স্পর্শও করিতে পারে না। এজন্যই শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—

"মাং ভজন্তি গুণাঃ সর্ব্বে নির্গুণং নিরপেক্ষকম্।
সুহৃদং সর্ব্বভূতানাং সাম্যাসঙ্গাদয়ো গুণাঃ॥ শ্রীভা, ১১।১৩।৪০॥

—সর্ব্বভূতের সুহৃৎ, সর্ব্বনিরপেক্ষক নির্গুণ (প্রাকৃতগুণহীন) আমাকে সাম্য ও অসঙ্গাদি অপ্রাকৃত গুণসকল ভজন করিয়া থাকে।"

তৃতীয়তঃ, শ্রবণকর্ত্তার শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয় গুণময় হইলেও তাহারা যে গুণাতীত ব্রহ্ম-চৈতন্যাংশে আবিষ্ট হইয়াই স্ব-স্ব-কার্য্য করিয়া থাকে এবং তাহাদের কার্য্য নির্গুণ-ভগবদ্ বিষয়ে প্রয়োজিত হইলে তাহাও (অর্থাৎ শ্রবণকর্ত্তার জ্ঞান-ক্রিয়াদিও) যে নির্গুণ হয়, তাহা পূর্ব্বেই [৫।৫০খ (১১)] প্রদর্শিত হইয়াছে। শ্রীভগবান্‌ও তাহা বলিয়া গিয়াছেন,

"সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসং স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৬॥

—সঙ্গ (আসক্তি)-রহিত কর্ত্তা সাত্ত্বিক, রাগান্ধ (বিষয়াবিষ্ট) কর্ত্তা রাজস, স্মৃতিবিভ্রষ্ট (অনুসন্ধানশূন্য) কর্ত্তা তামস এবং আমার আশ্রিত (আমার শরণাগত) কর্ত্তা নির্গুণ।"

এই শ্লোক হইতে জানা গেল—ভগবদাশ্রিতা ক্রিয়াদিও নির্গুণ।

এইরূপে দেখা গেল—ভগবদ্‌গুণ-শ্রবণ সম্পর্কিত সমস্ত বিষয়ই নির্গুণ; এজন্যই ভগবদ্ গুণ-শ্রবণমূলক ভক্তিযোগকে নির্গুণ বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বকথিত ভক্তিযোগকে নির্গুণ বলার আরও হেতু এই যে—গুণময় কোনও বস্তুই ইহার লক্ষ্য নয়। যাঁহারা ভক্তিযোগাবলম্বী, তাঁহারা পঞ্চবিধা মুক্তি পর্য্যন্ত কামনা করেন না, স্বর্গাদি-লোকের কথা তো দূরে। তাঁহাদের একমাত্র লক্ষ্য নির্গুণ ভগবানের নির্গুণা সেবা।

পুরুষোত্তম ভগবানে এতাদৃশা যে ভক্তি, তাহা আবার অহৈতুকী এবং অব্যবহিতা।

"**অহৈতুকী**" বলার তাৎপর্য্য এই যে, ইহাতে সাধকের নিজের জন্য চাওয়া কিছু নাই; কৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবাই হইতেছে তাঁহার কাম্য। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত॥ বৃহদারণ্যক॥ ১।৪।৮॥—প্রিয়রূপে সেই পরমাত্মা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে", "প্রেম্‌ণা হরিং ভজেৎ॥ ভক্তিসন্দর্ভ, ২৩৪-অনুচ্ছেদধৃত শতপথশ্রুতিবচন॥—প্রেমের সহিত (একমাত্র কৃষ্ণসুখের বাসনার সহিত) হরির ভজন করিবে"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যে যাহা বলা হইয়াছে, নির্গুণ ভক্তিযোগের সাধকের পক্ষে তাহাই

অনুসরণীয়। গোপালপূর্ব্বতাপনী-শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ভক্তিরস্য ভজনং ইহামুত্রোপাধিনৈরাস্যেনামুস্মিন্ মনঃকল্পনম্ এতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্॥ ১।৩॥—এই শ্রীকৃষ্ণের ভজনই (সেবাই) ভক্তি; ভক্তি (বা সেবা) হইতেছে ইহকালের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যাদির লালসা পরিত্যাগপূর্ব্বক এবং পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগের, এমন কি মোক্ষের, বাসনা পর্য্যন্ত সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগপূর্ব্বক, একমাত্র শ্রীকৃষ্ণেই মনের সঙ্কল্প-স্থাপন (অবিচ্ছিন্না মনোগতি); ইহারই নাম নৈষ্কর্ম্ম্য (শ্রীকৃষ্ণসেবার কর্ম্মব্যতীত অন্যকর্ম্ম পরিত্যাগ-রূপ নৈষ্কর্ম্ম্য)।"

আর, **অব্যবহিতা** বলার তাৎপর্য্য এই যে—শ্রীকৃষ্ণবিষয়ে যে মনোগতি, শ্রোত্রাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের যে সেবা, তাহা অন্য কিছুদ্বারা, জ্ঞান-কর্ম্মাদিদ্বারা, ব্যবহিত হয় না। শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল কার্য্যব্যতীত অন্য কোনও কার্য্যই সাধকের চিত্ত এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ-এই উভয়ের মধ্যে স্থান পায় না। সাধকের মন নিরবচ্ছিন্ন ভাবেই সাক্ষাদ্‌ভাবে শ্রীকৃষ্ণচরণে নিবিষ্ট থাকে, শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিই সর্ব্বদা তাঁহার চিত্তে জাগ্রত থাকে।

এই ভক্তিযোগকে **আত্যন্তিক** বলার তাৎপর্য্য এই। অত্যন্ত-শব্দ হইতেই আত্যন্তিক-শব্দ নিষ্পন্ন। অত্যন্ত = অতি + অন্ত, শেষসীমা। যে ভক্তিযোগে দুঃখনিবৃত্তির এবং সুখপ্রাপ্তির শেষসীমায় পৌঁছান যায়, তাহাই আত্যন্তিক ভক্তিযোগ। সাযুজ্যমুক্তিকেও কেহ কেহ আত্যন্তিক কাম্য বলিয়া মনে করিতে পারেন; কিন্তু তাহা ঠিক নহে; কেননা, সাযুজ্যমুক্তির আত্যন্তিকতা একদেশিকী; ইহাতে মায়ানিবৃত্তি হয় বলিয়া কেবলমাত্র আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি হইতে পারে; ব্রহ্মানন্দের অনুভবে নিত্য চিন্ময়সুখের আস্বাদনও হয়; কিন্তু তাহা কেবল সুখসত্তার আস্বাদনমাত্র; স্বরূপশক্তির ক্রিয়া নাই বলিয়া তাহাতে রসবৈচিত্রীর আস্বাদন নাই; এজন্য সুখ-আস্বাদনের দিক্ দিয়া সাযুজ্যকে আত্যন্তিক বলা যায় না। প্রাণঢালা সেবার অবকাশ নাই বলিয়া সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতেও আনন্দাস্বাদনের আত্যন্তিকতা নাই। একমাত্র শুদ্ধমাধুর্য্যময় ব্রজের প্রেমসেবাতেই আনন্দাস্বাদনের আত্যন্তিকতা আছে, (৫।১৪-১৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); শ্লোকস্থ "মদ্‌ভাবায়োপপদ্যতে"-বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। "মম ভাবায় বিদ্যমানতায়ৈ সাক্ষাৎকারায়েত্যর্থঃ, উপপদ্যতে সমর্থো ভবতি॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥২৩৪॥ -আমার (ভগবানের) সাক্ষাৎকারের যোগ্যতা লাভ করে। ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীলবোপদেবকৃত মুক্তাফল-গ্রন্থের হেমাদ্রিটীকাও (শ্রীভা, ৩।২৯।৭-শ্লোকের) উদ্ধৃত হইয়াছে। "অয়মাত্যন্তিকঃ, ততঃ পরং প্রকারান্তরাভাবাৎ; অস্যৈব ভক্তিযোগ ইত্যাখ্যান্বর্থেন, ভক্তিশব্দস্যাত্রৈব মুখ্যত্বাৎ। ইতরেষু ফল এব অনুরাগঃ, ন তু বিষ্ণৌ, ফলালাভেন ভক্তিত্যাগাৎ ইত্যেষা॥—এই ভক্তিযোগই আত্যন্তিক পুরুষার্থ; কেননা, এই নির্গুণ ভক্তিযোগের পরে আর প্রকারান্তর (অধিকতর কাম্য) কিছু নাই। ইহারই ভক্তিযোগ আখ্যা—শব্দার্থ হইতেই তাহা জানা যায়; কেননা, এ-স্থলে ভক্তি-শব্দেরই মুখ্যত্ব। গুণময় ভক্তি-যোগাদিতে স্বীয় কাম্য ফলের প্রতিই সাধকের অনুরাগ থাকে; কিন্তু

শ্রীবিষ্ণুতে অনুরাগ থাকে না ; ফল লাভ না হইলে ভক্তিকে পরিত্যাগ করা হয় ; সুতরাং অন্য সাধনে ভক্তির মুখ্যত্ব নাই।"

"মদ্ভাবায়"-শব্দের আর একটী অর্থও হইতে পারে—ভগবদ্বিষয়ক প্রেম। কেননা, ভাব-শব্দের একটী অর্থ প্রেমও হয় ; যেমন, গোপীভাব, ব্রজভাব, ব্রজজনের ভাব—ইত্যাদি-স্থলে প্রেম-অর্থেই ভাব-শব্দের প্রয়োগ। এই অর্থ গ্রহণ করিলে "মদ্ভাবায়"-শব্দের অর্থ হইবে—"মদ্-বিষয়ক (অর্থাৎ ভগবদ্বিষয়ক) প্রেম।" নির্গুণ-ভক্তিযোগে এই প্রেম লাভ হইতে পারে ; এই প্রেমই পঞ্চম বা পরমপুরুষার্থ (৫।১৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

পঞ্চম-পুরুষার্থ প্রেম লাভ হইলে মায়াজনিত দুঃখের আত্যন্তিকী নিবৃত্তি হইয়া যায়, "যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণম্"-বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে। ভগবৎ-সাক্ষাৎকারের বা প্রেমলাভের, আনুষঙ্গিক ভাবেই আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তি আপনা-আপনিই হইয়া যায় ; সূর্য্যোদয়ে যেমন অন্ধকার আনুষঙ্গিকভাবেই অপসারিত হইয়া যায়, তদ্রূপ। "আনন্দং ব্রহ্মণো বিদ্বান্ ন বিভেতি কুতশ্চন"—এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য হইতেও তাহা জানা যায়।

নির্গুণ ভক্তিযোগ উপায়মাত্র নহে, উপেয়ও। সাধনে সিদ্ধিলাভ করিলেই ভক্তি পরিত্যক্ত হয় না ; সিদ্ধাবস্থাতেও ভক্তি বা ভগবানের প্রেমসেবা চলিতে থাকে। সিদ্ধাবস্থায় প্রেমসেবা পাওয়ার জন্যই সাধনরূপা ভক্তির অনুষ্ঠান। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধ দেহে পাবে তাহা, পক্কাপক্কমাত্র সে বিচার।"

এই নির্গুণ ভক্তিযোগকে আত্যন্তিক, বা অকিঞ্চন ভক্তিযোগও বলা হয় এবং উত্তমা সাধন-ভক্তিও বলা হয়।

৫২। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উত্তমা সাধনভক্তি

ভগবান্ কপিলদেব জননী দেবহূতির নিকটে নির্গুণ ভক্তিযোগ, বা উত্তমা সাধনভক্তি সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে তাহারই মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।

ক। "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্"-শ্লোক

অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্।
আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনং ভক্তিরুত্তমা॥১।১।৯॥

—অন্য (শ্রীকৃষ্ণভক্তিব্যতীত অন্যবস্তুর) অভিলাষশূন্য, জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত এবং আনুকূল্যময় (শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূল যে) কৃষ্ণানুশীলন, তাহার নাম উত্তমা ভক্তি।"

এই শ্লোকের মর্ম্ম শ্রীমন্মহাপ্রভু এই ভাবে প্রকাশ করিয়াছেন। যথা,

"অন্যবাঞ্ছা অন্য পূজা ছাড়ি জ্ঞান কর্ম্ম।
আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১৯।১৪৮॥"

এই পয়ারের আলোকে উল্লিখিত শ্লোকটীর আলোচনা করা হইতেছে।

জ্ঞান —নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধান। জ্ঞানের তিনটী বিভাগ আছে,—ভগবৎ-তত্ত্বজ্ঞান, জীবের স্বরূপ-জ্ঞান এবং এতদুভয়ের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞান; প্রথমোক্ত দুই বিষয়ের জ্ঞান ভক্তি-বিরোধী নহে; শেষোক্ত জ্ঞান,—ভগবান্ ও জীবের ঐক্য-বিষয়ক জ্ঞান—ভক্তিবিরোধী, ভক্তিমার্গের অনুষ্ঠানে এই জ্ঞান বর্জ্জনীয়।

কর্ম্ম —স্বর্গাদি-ভোগ-সাধক কর্ম্ম। এই সমস্তই ভক্তির উপাধি; এই উপাধি দুই রকমের—এক অন্য বাসনা, আর অন্য-মিশ্রণ। অন্য বাসনা—শ্রীকৃষ্ণসেবাব্যতীত ভুক্তি-মুক্তি-বাসনাদি। অন্য মিশ্রণ—জ্ঞান-কর্ম্মাদির আবরণ, নির্ব্বিশেষব্রহ্মানুসন্ধান, স্বর্গাদিপ্রাপক নিত্যনৈমিত্তিকাদি কর্ম্ম, বৈরাগ্য, যোগ ইত্যাদি। শুদ্ধাভক্তি এই সমস্ত উপাধিশূন্য হইবে।

আনুকূল্যে —শ্রীকৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলভাবে। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হন, সেই ভাবে; অর্থাৎ কংস-শিশুপালাদির মত প্রতিকূল বা শত্রুভাবে নহে; নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুমঙ্গল বা ব্রজ-গোপীদের মত অনুকূল বা আত্মীয়ভাবে।

সর্ব্বেন্দ্রিয়ে—সমস্ত ইন্দ্রিয় দ্বারা।

কৃষ্ণানুশীলন—শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন বা শ্রীকৃষ্ণ-বিষয়ক চেষ্টা। এই অনুশীলন দুই রকমের; প্রবৃত্ত্যাত্মক ও নিবৃত্ত্যাত্মক; প্রবৃত্ত্যাত্মকচেষ্টা—গ্রহণ-চেষ্টা; আর নিবৃত্ত্যাত্মকচেষ্টা—ত্যাগের চেষ্টা। ইহাদের প্রত্যেকে আবার কায়িক, মানসিক ও বাচনিক ভেদে ত্রিবিধ। কায়িকচেষ্টা শ্রবণাদি ও পরিচর্য্যাদি, তীর্থগৃহে গমনাদি। মানসিক চেষ্টা—স্মরণ। বাচনিকচেষ্টা কীর্ত্তনাদি। তাহা হইলে, আনুকূল্যে প্রবৃত্ত্যাত্মক-কৃষ্ণানুশীলন হইল—কৃষ্ণের প্রীতির অনুকূলভাবে তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির শ্রবণ, তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির স্মরণ ও কীর্ত্তনাদি। আর নিবৃত্ত্যাত্মক-অনুশীলন হইল—যাহাতে তাঁহার অপ্রীতি হয়, এইরূপ ভাবে, অথবা কংস-শিশুপালাদির ন্যায় হিংসা ও বিদ্বেষাদির বশীভূত হইয়া তাঁহার নামাদি উচ্চারণ করা হইতে, তাঁহার গুণে ও লীলাদিতে দোষারোপ করা হইতে, তাঁহার অপ্রীতিকর কোনও বিষয় শ্রবণ করা হইতে, তাঁহার নিন্দাদি শ্রবণ করা হইতে, কি এসমস্তের স্মরণাদি করা হইতে বিরত থাকা।

আনুকূল্যে সর্ব্বেন্দ্রিয়ে কৃষ্ণানুশীলন— এইটী শুদ্ধাভক্তির **স্বরূপ লক্ষণ**; **অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা, ছাড়ি জ্ঞানকর্ম্ম**—এইটী শুদ্ধাভক্তির **তটস্থলক্ষণ**। তাহা হইলে শুদ্ধাভক্তি হইল এইরূপ—অত্যাশ্চর্য্য-লীলা-মাধুর্য্যাদি দ্বারা যিনি প্রাকৃত ও অপ্রাকৃত সমস্ত বিশ্বকে, এমন কি, নিজের চিত্তকে পর্য্যন্ত আকর্ষণ করেন, সর্ব্বৈশ্বর্য্য-মাধুর্য্যপূর্ণ সেই স্বয়ংভগবান্ যে শ্রীকৃষ্ণ—অন্যবাসনা ও জ্ঞানকর্ম্মাদির সংস্রব ত্যাগ করিয়া সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা, সেই শ্রীকৃষ্ণের আনুকূল্যময় অনুশীলনই শুদ্ধাভক্তি। এই অনুশীলনে শ্রীকৃষ্ণের

প্রীতির অনুকূল ভাবে তাঁহার নাম-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি এবং শ্রীকৃষ্ণলীলাস্থলাদিতে গমনাদি করিতে হইবে। আর, প্রীতির প্রতিকূল শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণাদি ত্যাগ করিতে হইবে; ভক্তিবাসনা ব্যতীত ভোগ-সুখবাসনাদি সমস্ত ত্যাগ করিতে হইবে; স্বতন্ত্র ঈশ্বর-জ্ঞানে অন্য দেবতার পূজা এবং জ্ঞান, যোগ, কর্ম্ম, তপস্যাদির সংশ্রব সর্ব্বতোভাবে ত্যাগ করিতে হইবে; আর, সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই শ্রীকৃষ্ণসেবায় বা সেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করিতে হইবে। সমস্ত ইন্দ্রিয়কে কিরূপে শ্রীকৃষ্ণসেবায় বা সেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করা যায়? পাঁচটী জ্ঞানেন্দ্রিয় -চক্ষু, কর্ণ, নাসিকা, জিহ্বা ও ত্বক্। পাঁচটী কর্ম্মেন্দ্রিয়—বাক্, পাণি, পাদ, পায়ু ও উপস্থ। চারিটী অন্তরিন্দ্রিয়—মন, বুদ্ধি, অহঙ্কার ও চিত্ত। চক্ষুদ্বারা শ্রীমূর্ত্তি-দর্শন, লীলাস্থলাদি দর্শন; কর্ণদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের নাম-গুণ-লীলাদি শ্রবণ; নাসিকাদ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদী তুলসী-গন্ধ-পুষ্পাদির ঘ্রাণ-গ্রহণ; জিহ্বা দ্বারা নাম-গুণ-লীলাদি-কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদ-আস্বাদনাদি; ত্বক্দ্বারা শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদি-গন্ধ-মাল্যাদির স্পর্শানুভব, লীলাস্থলের রজঃ-আদি, নামমুদ্রা তিলকাদি ধারণ। বাক্যদ্বারা নাম-গুণ-লীলাদিকথন; পাণি (হস্ত) দ্বারা শ্রীকৃষ্ণসেবোপযোগী পুষ্পাদি-দ্রব্যের আহরণ, সঙ্কীর্ত্তনাদিতে বাদ্যাদি, হরিমন্দির-মার্জ্জনাদি-করণ; পাদ (পা) দ্বারা তীর্থস্থল বা হরিমন্দিরাদিতে গমন, সেবোপযোগী দ্রব্যাদি-সংগ্রহার্থ গমনাগমন; পায়ু ও উপস্থ দ্বারা মলমূত্রাদি ত্যাগ করিয়া দেহকে সেবোপযোগী রাখা। মন দ্বারা শ্রীকৃষ্ণ-গুণলীলাদির স্মরণ; বুদ্ধিকে শ্রীকৃষ্ণনিষ্ঠ করা; অহঙ্কারদ্বারা—আমি শ্রীকৃষ্ণদাস—এই অভিমানপোষণ; এবং চিত্তকে (অনুসন্ধানাত্মিকা বৃত্তিকে) শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক অনুসন্ধানে নিয়োজিত করা। এইরূপে সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই শ্রীকৃষ্ণসেবার অনুকূল বিষয়ে নিয়োজিত করা যাইতে পারে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অন্যাভিলাষিতাশূনম্" ইত্যাদি শ্লোকেও এই পয়ারের কথাই বলা হইয়াছে। পয়ারের "অন্যবাঞ্ছা অন্যপূজা ছাড়ি"-বাক্যে শ্লোকের, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্", "জ্ঞানকর্ম্ম ছাড়ি"-বাক্যে "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্", এবং "আনুকূল্যে ইত্যাদি"-বাক্যে "আনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"-অংশের তাৎপর্য্য প্রকাশ পাইয়াছে। উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"শ্লোকস্থ কর্ম্ম-শব্দে স্মৃতি-শাস্ত্রাদিবিহিত নিত্যনৈমিত্তিক কর্ম্মাদিকেই বুঝায়, তৎসমস্তই ত্যাগ করিতে হইবে। ভজনের অঙ্গীভূত পরিচর্য্যাদিকে ত্যাগ করিতে হইবে না; যেহেতু, এইরূপ পরিচর্য্যাও কৃষ্ণানুশীলনের অঙ্গীভূত। 'জ্ঞানকর্ম্মাদি'-শব্দের অন্তর্ভুক্ত 'আদি'-শব্দে বৈরাগ্য, সংখ্যযোগাভ্যাসাদি বুঝায়; এসমস্তও ত্যাগ করিতে হইবে; যেহেতু, বৈরাগ্যাদি ভক্তির অঙ্গ নহে। ভক্তির অনুশীলন করিতে করিতে বৈরাগ্যাদি আপনা-আপনিই আসিয়া উপস্থিত হয়।" "জ্ঞান-বৈরাগ্য কভু নহে ভক্তি-অঙ্গ। যমনিয়মাদি বুলে কৃষ্ণভক্তসঙ্গ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৮২-৩॥" এই প্রসঙ্গে পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৪১-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকের এবং শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত-পয়ারের "কৃষ্ণানুশীলন"-

শব্দটী হইতেই বুঝা যায়, এস্থলে সাধনভক্তির কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাহা পরিষ্কার করিয়াই বলিয়াছেন। উল্লিখিত পয়ারোক্তির পরে তিনি বলিয়াছেন,

"এই শুদ্ধভক্তি, ইহা হৈতে প্রেম হয়॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৪৯॥" ইহা প্রেম-লাভের সাধন। ইহা হইতে পঞ্চম এবং পরমপুরুষার্থ প্রেম লাভ হয় বলিয়াই ইহাকে "ভক্তিরুত্তমা—উত্তমা সাধনভক্তি" বলা হইয়াছে।

উল্লিখিত শ্লোকস্থ "অনুকূল্যেন কৃষ্ণানুশীলনম্"-অংশে কপিলদেবোক্ত "যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে" অংশের তাৎপর্য্য, "অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্"-শব্দে কপিলদেবোক্ত "অহৈতুকী"-শব্দের তাৎপর্য্য এবং "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"-শব্দে কপিলদেবোক্ত "অব্যবহিতা"-শব্দের তাৎপর্য্য প্রকাশিত হইয়াছে।

খ। নারদপঞ্চরাত্র-শ্লোক

উল্লিখিত উক্তির সমর্থনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে নারদপঞ্চরাত্র এবং শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে।

'সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তং তৎপরত্বেন নির্ম্মলম্। হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনং ভক্তিরুচ্যতে॥

—ভ, র, সি, (১।১।১০-ধৃত নারদপঞ্চরাত্রবচন।

—সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা ইন্দ্রিয়ের অধীশ্বর শ্রীকৃষ্ণের সেবাকে ভক্তি (সাধনভক্তি) বলে ; সেই সেবাটী সকল প্রকার উপাধিশূন্য এবং সেবাপরত্বরূপে নির্ম্মল।"

ইহার টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তৎপরত্বেন—আনুকূল্যেন ; সর্ব্বেত্যন্যাভিলাষিতাশূন্যম্ ; সেবনমনুশীলনম্ ; নির্ম্মলং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্। অত উত্তমত্বং স্বত এবোক্তম্॥"

এই শ্লোকদ্বারা পূর্ব্ব (১।১।৯)-শ্লোকের মর্ম্ম কিরূপে সমর্থিত হয়, টীকাতে তাহাই বলা হইয়াছে। এই শ্লোকের "তৎপরত্বেন"-শব্দের অর্থ পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "আনুকূল্যেন।" "তৎপর—শ্রীকৃষ্ণপর বা শ্রীকৃষ্ণসেবাপর" ; শ্রীকৃষ্ণপরায়ণতা, বা শ্রীকৃষ্ণসেবাপরায়ণতা দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আনুকূল্য সূচিত হয়। উপাধি-শব্দে শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনাব্যতীত অন্য বাসনাকে বুঝায়। "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্ত"-শব্দে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "অন্যাভিলাষিতাশূন্য"কে বুঝায়। "সেবন"-শব্দে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত" "অনুশীলন"কে বুঝায়। "নির্ম্মল" শব্দে পূর্ব্বশ্লোকোক্ত "জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃত"কে বুঝায়। জ্ঞানকর্ম্মাদিই হইতেছে ভক্তির মলিনতা। যাহাতে শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনাব্যতীত অন্য কোনও বাসনা থাকে না, যাহা একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির আনুকূল্যময়, যাহা জ্ঞান-কর্ম্ম-বৈরাগ্যাদিরূপ মলিনতাশূন্য, সমস্ত ইন্দ্রিয়দ্বারা ইন্দ্রিয়াধিপতি শ্রীকৃষ্ণের তাদৃশ অনুশীলনই হইতেছে ভক্তি (সাধনভক্তি) ; "অনুশীলন বা সেবন"-শব্দের বিশেষণগুলি হইতেই জানা যায়—ইহা স্বতঃই উত্তম, ইহার উত্তমতা-বিধানের নিমিত্ত অন্য কিছুর সহায়তা গ্রহণ করিতে হয় না।

এই শ্লোকের "সর্ব্বোপাধিবিনির্ম্মুক্তম্"-শব্দে কপিলদেবোক্ত "অহৈতুকীম্" শব্দের এবং

"হৃষীকেণ হৃষীকেশসেবনম্"-শব্দে কপিলদেবোক্ত "যা ভক্তিঃ পুরুষোত্তমে"-অংশের মর্ম্ম প্রকাশিত হইয়াছে।

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ে যে কপিলদেবোক্ত নির্গুণা সাধনভক্তির কথাই বলা হইয়াছে, "মদ্‌গুণ-শ্রুতিমাত্রেণ"-ইত্যাদি শ্রীভা ৩।২৯।১১-১৪ শ্লোকের উল্লেখ করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাও দেখাইয়াছেন।

গ। "কৃতিসাধ্যা"-শ্লোক এবং সাধনভক্তির ফল

পূর্ব্ববর্ত্তী **ক** ও **খ** অনুচ্ছেদে উল্লিখিত সাধনভক্তির ফলে সাধকের চিত্তে যে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে, নিম্নোদ্ধৃত শ্লোকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহা জানাইয়াছেন।

কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা।
নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥১।২।২॥

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এইঃ—

"সা সাধনাভিধা (ভক্তিঃ) কৃতিসাধ্যা"—পূর্ব্বে যে সাধনাভিধা (সাধননাম্নী) ভক্তির, (অর্থাৎ সাধনভক্তির) কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে "কৃতিসাধ্যা—কৃতি (ইন্দ্রিয়বর্গ) দ্বারা সাধনীয়া; ইন্দ্রিয়বর্গের সহায়তাতেই সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। "হৃষীকেণ হৃষীকেশ-সেবনম্॥ নারদপঞ্চরাত্র॥"

এই সাধনভক্তির সাধ্য বা লক্ষ্য কি? তাহাই বলা হইয়াছে "সাধ্যভাবা"-শব্দে। এই সাধনভক্তির "সাধ্য" বা লক্ষ্য হইতেছে 'ভাব—কৃষ্ণপ্রেম, বা কৃষ্ণপ্রেমের প্রথম আবির্ভাব—যাহাকে রতি বা ভাব, বা প্রেমাঙ্কুর বলা হয়।" এই উত্তমা সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে ভাব বা প্রেম লাভ হয়।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলই যখন ভাব বা প্রেম, তখন বুঝা যায়, সাধনভক্তি দ্বারাই প্রেম উৎপাদিত হয়। তাহাই যদি হয়, এই "ভাব" হইয়া পড়ে একটী জন্য-পদার্থ বা কৃত্রিম বস্তু; অথচ ভাব বা প্রেমকে বলা হয় পরমপুরুষার্থ। যাহা কৃত্রিম বা জন্য পদার্থ, তাহা কিরূপে পরম-পুরুষার্থ হইতে পারে? "ভাবস্য সাধ্যত্বে কৃত্রিমত্বাৎ পরমপুরুষার্থত্বাভাবঃ স্যাৎ?" -উল্লিখিত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী।

এই আশঙ্কার উত্তরেই শ্লোকে বলা হইয়াছে—"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য"-ইত্যাদি। ভাব বা প্রেম হইতেছে নিত্যসিদ্ধ বস্তু, ইহা জন্য বা উৎপাদ্য পদার্থ নহে; যেহেতু,ইহা হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষ (৫।৪৮ ক অনু)। স্বরূপশক্তি এবং তাহার সমস্ত বৃত্তিও নিত্য, অনাদি-সিদ্ধ। তবে যে বলা হইয়াছে—সাধনভক্তির সাধ্য হইতেছে "ভাব"? এই উক্তির তাৎপর্য্যই প্রকাশ করা হইয়াছে—"নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা"-বাক্যে। সাধকের হৃদয়ে নিত্যসিদ্ধ ভাবের প্রকটন বা আবির্ভাবকেই এ-স্থলে "সাধ্যতা" বলা হইয়াছে। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে চিত্ত বিশুদ্ধ হইলে সেই বিশুদ্ধচিত্তে নিত্যসিদ্ধ ভাব বা প্রেম আবির্ভূত হয়—ইহাই হইতেছে তাৎপর্য্য।

নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম, সাধ্য কভু নয়।
শ্রবণাদি শুদ্ধচিত্তে করয়ে উদয় ॥শ্রীচৈ.চ. ২।২২।৫৭॥

পূর্ব্বে (৫।৪৮ক-অনুচ্ছেদে) প্রীতিসন্দর্ভের বাক্য উদ্ধৃত করিয়া প্রদর্শিত হইয়াছে—শ্রীকৃষ্ণ তাঁহার হ্লাদিনী শক্তির কোনও এক সর্ব্বানন্দাতিশায়িনী বৃত্তিকে নিয়ত ভক্তবৃন্দে নিক্ষিপ্ত করেন। সেই বৃত্তিই ভক্তচিত্তে গৃহীত হইয়া ভগবৎ-প্রীতি (প্রেম) নামে অভিহিত হয়। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে সাধকের চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হয়, তখনই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হ্লাদিনীবৃত্তিবিশেষ ভক্তচিত্তে গৃহীত হইতে পারে এবং চিত্তের সহিত মিলিত হইতে পারে এবং তখনই তাহা প্রেমনামে অভিহিত হয়। এইরূপে দেখা গেল—হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষ প্রেম জন্য বা কৃত্রিম পদার্থ নহে; ইহা অনাদি-সিদ্ধ, নিত্য; হ্লাদিনীরূপে নিত্যই শ্রীকৃষ্ণে বিরাজিত। ভক্তচিত্তে তাহার আবির্ভাব বা আগমন মাত্র হয় এবং ভক্তচিত্তের শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনার সহিত মিলিত হইলেই তাহা প্রেমনামে অভিহিত হইয়া থাকে।

যাহা হউক, পূর্ব্বে উল্লিখিত ভক্তিরসামৃতসিন্ধু-শ্লোক হইতে জানা গেল—সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে সাধকের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবির্ভাব হইয়া থাকে। শ্রীকপিলদেব-কথিত "যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্‌ভাবায়োপপদ্যতে"-বাক্যের তাৎপর্য্যও ইহাই।

সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে যে প্রেমের বা প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহা শ্রীমদ্‌ভাগবতে অন্যত্রও বলা হইয়াছে।

ভক্ত্যা সঞ্জাতয়া ভক্ত্যা বিভ্রত্যুৎপুলকং তনুম্ ॥শ্রীভা, ১১।৩।৩১॥

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ভক্ত্যা সাধনভক্ত্যা সঞ্জাতয়া প্রেমলক্ষণয়া ভক্ত্যা।" এই টীকানুসারে শ্লোকটীর তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপঃ—"সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে প্রেমভক্তির আবির্ভাব হয়, প্রেমভক্তির আবির্ভাব হইলে দেহে পুলক জন্মে।"

ঘ। চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হইলে তাহার আর তিরোভাব হয়না

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—হ্লাদিনী শক্তি বা তাহার বৃত্তিবিশেষ নিত্যসিদ্ধ হইতে পারে; কিন্তু ভক্তচিত্তে তাহার আবির্ভাব তো নিত্যসিদ্ধ নয়? ভক্তচিত্তের কৃষ্ণপ্রীতিবাসনার সহিত তাহার সংযোগ বা মিলনও নিত্যসিদ্ধ নয়; তাহা হইতেছে আগন্তুক। যাহা আগন্তুক, তাহা চলিয়াও যাইতে পারে; এই মিলন বা সংযোগের অবসানও হইতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই ঃ—

চিত্ত হইতে মায়া এবং মায়ার প্রভাব দূরীভূত হইয়া গেলেই চিত্ত সম্যক্‌রূপে শুদ্ধ হয় এবং এইরূপ শুদ্ধচিত্তের সহিতই হ্লাদিনীর বৃত্তিবিশেষের সংযোগ হয়। তখন হ্লাদিনী ব্যতীত অপর কোনও শক্তিই চিত্তকে বা চিত্তবৃত্তিকে নিয়ন্ত্রিত করিতে পারে না। হ্লাদিনীর একমাত্র গতি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের দিকে, শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে। এই হ্লাদিনী তখন ভক্তের চিত্তবৃত্তিকেও

শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণের দিকেই চালিত করিবে, অন্য কোনও দিকে চালিত করিবেনা। সুতরাং ভক্তের চিত্তেও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা তখন থাকিতে পারেনা। অন্য কোনও বাসনা জন্মিবার সম্ভাবনাও নাই; কেননা, অন্য দিকে চিত্তবৃত্তিকে পরিচালিত করিবার জন্য কোনও শক্তিই তখন ভক্তচিত্তে থাকেনা। যদি অন্য বাসনা জন্মিবার সম্ভাবনা থাকিত, তাহা হইলেই চিত্তের সঙ্গে হ্লাদিনীর সংযোগও নষ্ট হওয়ায় সম্ভাবনা থাকিত।

অগ্নির উত্তাপে ধানকে যদি বেশীরকমে ভর্জ্জিত করা হয়, কিম্বা বেশীরকমে সিদ্ধ করা হয়, তাহা হইলে যেমন সেই ধানের আর অঙ্কুরোদ্‌গম হয় না, তদ্রূপ যাঁহাদের বুদ্ধিবৃত্তি শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট হয়, তাঁহাদের চিত্তেও আর কখনও শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাসনাব্যতীত অন্য বাসনার—স্বসুখ-বাসনার—উদ্‌গম হইতে পারেনা। একথা স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন।

ন ময্যাবেশিতধিয়াং কামঃ কামায় কল্পতে।
ভর্জ্জিতাঃ ক্বথিতা ধানাঃ প্রায়ো বীজায় নেষ্যতে॥ শ্রীভা, ১০।২২।২৬॥

স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের আবির্ভাবে ভক্তের বুদ্ধি যখন শ্রীকৃষ্ণে আবিষ্ট হয়, তখন তাঁহার চিত্তে কৃষ্ণপ্রীতিবাসনাব্যতীত অন্য বাসনা থাকেনা; এই বাসনাই তখন হইতে ভক্তের চিত্তে বিরাজ করে। কৃষ্ণপ্রীতির বাসনাই প্রেম। এইরূপে দেখা গেল, প্রেম একবার চিত্তে আবির্ভূত হইলে তাহার আর তিরোভাব হয়না।

হ্লাদিনীপ্রধানা স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষই শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক নিক্ষিপ্ত হইয়া ভক্তের শুদ্ধচিত্তে গৃহীত হইয়া প্রেম-নামে অভিহিত হয়। ভক্তের চিত্ত বিশুদ্ধ বলিয়া এবং প্রেমকে অপসারিত করার জন্য কিছু সেই চিত্তে থাকে না বলিয়া প্রেম অপসারিত হইতে পারে না। কিন্তু প্রেম বা স্বরূপশক্তি যদি নিজে সেই চিত্ত হইতে চলিয়া যায়, তাহা হইলে তো ভক্তচিত্তের সহিত প্রেমের বিচ্ছেদ হইতে পারে?

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। প্রেম বা প্রেমের নিদানীভূত স্বরূপশক্তি ভক্তচিত্ত হইতে চলিয়া যায় না। একথা বলার হেতু এই ঃ—

প্রথমতঃ, এই স্বরূপশক্তি হইতেছে শ্রীকৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রেরিত। শ্রীকৃষ্ণের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেছে প্রিয়ত্বের সম্বন্ধ—শ্রীকৃষ্ণ যেমন জীবের প্রিয়, জীবও তেমনি শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়। অনাদিবহির্ম্মুখ জীব তাহার একমাত্র প্রিয় শ্রীকৃষ্ণকে ভুলিয়া রহিয়াছে; কিন্তু সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্ববিৎ শ্রীকৃষ্ণ তাহা ভুলেন না। যখন তিনি দেখেন—কোনও ভাগ্যে কোনও জীব প্রিয়রূপে তাঁহার উপাসনা করিতেছে, তখন পরমকরুণ, পরমপ্রিয় ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ সেই ভাগ্যবান্ জীবকে তাঁহার সহিত প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য—যোগক্ষেমাদি বহন করিয়া, তাঁহার প্রাপ্তির উপযোগিনী বুদ্ধি-আদি দিয়া—সেই সাধক-ভক্তের আনুকূল্য করিয়া থাকেন এবং তাঁহার কৃপায় ভক্তের চিত্ত শুদ্ধতা লাভ করিলে, তাঁহার অভীষ্ট প্রিয়ত্বের সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য প্রেমের নিদানীভূত স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষকে ভক্তের চিত্তে সঞ্চারিত করেন। শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্তজীবকে বঞ্চিত করার উদ্দেশ্যে তিনি এই স্বরূপ-

শক্তির বৃত্তিকে পাঠান না, ভক্তসাধককে স্বীয় চরণসেবা দিয়া কৃতার্থ করার জন্যই পাঠাইয়া থাকেন। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের পক্ষে সেই স্বরূপশক্তিকে অপসারিত করার সম্ভাবনা নাই। সম্ভাবনা আছে মনে করিলে তাঁহাকে জীবের একমাত্র এবং পরমতম প্রিয় বলাও সঙ্গত হয়না।

দ্বিতীয়তঃ, স্বরূপশক্তির একমাত্র কাম্য হইতেছে তাহার শক্তিমান্ শ্রীকৃষ্ণের সেবা। স্বরূপশক্তি নিজেও নানা ভাবে এবং নানারূপে শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা প্রীতিবিধান করিতেছে। আবার, অপরের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা প্রীতিবিধান করাইতে পারিলেও স্বরূপশক্তির আনন্দ ; কেননা, যে প্রকারেই হউক এবং যে-কোনও ব্যক্তিদ্বারাই হউক, শ্রীকৃষ্ণের সেবা বা প্রীতিবিধানই হইতেছে স্বরূপশক্তির একমাত্র ব্রত। শ্রীকৃষ্ণ যখন তাহাকে কোনও ভক্তের চিত্তে পাঠাইয়া দেন, তখন সেই ভক্তদ্বারা সেবা করাইয়া শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধানই স্বরূপশক্তিরও কাম্য হইয়া পড়ে ; সুতরাং স্বরূপশক্তি নিজে ইচ্ছা করিয়া সেই ভক্তের চিত্ত ত্যাগ করিতে পারে না, তদনুরূপ প্রবৃত্তিও তাহার হইতে পারেনা। বিশেষতঃ, স্বরূপশক্তিকে ভক্তচিত্তে প্রেরণের ব্যাপারে শ্রীকৃষ্ণের বাসনাই হইতেছে সেই ভক্তের সেবা গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কৃতার্থ করা। আবার, স্বরূপশক্তির একমাত্র ব্রতও হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের প্রীতিবিধান, শ্রীকৃষ্ণের বাসনাপূরণ। সুতরাং শ্রীকৃষ্ণের এই বাসনা-পূরণের জন্যও স্বরূপ-শক্তিকে সর্ব্বদা নিরবচ্ছিন্নভাবে ভক্তচিত্তে থাকিতে হইবে। এইরূপে দেখা গেল—স্বরূপশক্তির নিজের পক্ষেও ভক্তচিত্ত-পরিত্যাগের প্রশ্ন উঠিতে পারেনা।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। কেবল আগন্তুকত্বই অপসরণের হেতু নহে ; বিজাতীয়ত্বই হইতেছে অপসরণের মুখ্য হেতু। বিশুদ্ধ জলের সহিত জলের বিজাতীয় ধূলাবালি মিলিত হইলে প্রক্রিয়াবিশেষের দ্বারা ধূলাবালিকে অপসারিত করা যায়। কিন্তু জলের সহিত জল মিলিত হইলে তাহাকে অপসারিত করা যায় না। জড়রূপা মায়া হইতেছে চিদ্রূপ জীবস্বরূপের বিজাতীয় বস্তু এবং আগন্তুকও। বিজাতীয়া বলিয়া মায়া অপসারিত হওয়ায় যোগ্য। কিন্তু চিদ্রূপ জীবের সঙ্গে চিদ্রূপা—অর্থাৎ জীবস্বরূপের সজাতীয়া—স্বরূপশক্তির মিলন হইলে, এই মিলন আগন্তুক হইলেও, জীবস্বরূপ হইতে তাহাকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না, জলের সহিত মিলিত জলকে যেমন বিচ্ছিন্ন করা যায় না, তদ্রূপ।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—ভক্তচিত্তে আবির্ভূত হইয়া স্বরূপশক্তি প্রেমরূপে পরিণত হইলে ভক্তচিত্তের সহিত তাহার বিচ্ছেদের কোনও সম্ভাবনাই থাকেনা।

৫৩। সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে সাধনভক্তির স্বরূপ লক্ষণ ও তটস্থ লক্ষণ সম্বন্ধে যাহা জানা গেল, সংক্ষেপে তাহা হইতেছে এইরূপঃ—

স্বরূপলক্ষণ। শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির অনুকূলভাবে, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যে, সমস্ত ইন্দ্রিয়ের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের অনুশীলন বা সেবা।

এই অনুশীলন হইবে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতিবাসনাব্যতীত অন্যবাসনাশূন্য ; অর্থাৎ ইহকালের সুখ-সম্পদ্ বা পরকালের স্বর্গাদিলোকের সুখবাসনা, এমন কি পঞ্চবিধা মুক্তির বাসনাও এই অনুশীলনে থাকিবে না।

এই অনুশীলনের সঙ্গে জ্ঞানমার্গের বা কর্ম্মমার্গের অনুশীলন থাকিবে না, বৈরাগ্যাদিলাভের জন্য স্বতন্ত্র প্রয়াসও থাকিবে না।

এ-স্থলে যে স্বরূপ-লক্ষণের কথা বলা হইল, তাহা হইতেছে সাধনভক্তির আকৃতিরূপ স্বরূপ-লক্ষণ। ইহার প্রকৃতিরূপ (বা উপাদানরূপ) স্বরূপলক্ষণ হইতেছে—স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি (পরবর্ত্তী ৫৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

তটস্থ লক্ষণ। সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে মায়া দূরীভূত হয় এবং কৃষ্ণপ্রেম লাভ হয়।

সাধনভক্তির করণ হইতেছে সাধকের ইন্দ্রিয়বর্গ ; ইন্দ্রিয়বর্গের সহায়তাতেই সাধনভক্তি অনুষ্ঠিত হয়।

৫৪। উত্তমা সাধনভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি

পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৫১-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক সমূহে ভক্তিযোগকে "নির্গুণ" বলা হইয়াছে। ইহাকে "নির্গুণ" বলার হেতুও পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় কথিত হইয়াছে।

নির্গুণ ভক্তি-যোগে প্রবৃত্তি জন্মে সাধুসঙ্গ হইতে [৫।৫০-ঘ (৫)-অনুচ্ছেদ] ; সাধুসঙ্গ হইতেছে নির্গুণ [৫।৫০ ঘ (৬)-অনুচ্ছেদ]। ভক্তিযোগের সাধন সাধকের গুণময় ইন্দ্রয়াদির সহায়তায় অনুষ্ঠিত হইলেও জড় ইন্দ্রিয়ের কোনও কর্ত্তৃত্ব নাই ; নির্গুণ ব্রহ্মচৈতন্যের অংশে আবিষ্ট হইয়াই ইন্দ্রিয়াদি কার্য্যসামর্থ্য লাভ করিয়া থাকে এবং নির্গুণ-ব্রহ্মচৈতন্যের অংশে আবিষ্ট ইন্দ্রিয়াদির জ্ঞান-ক্রিয়াও নির্গুণ ভগবানেই প্রয়োজিত হয় ; এজন্য সাধকের ইন্দ্রিয়সাধ্য জ্ঞানক্রিয়াও নির্গুণা [৫।৫০-ঘ (১১)-অনুচ্ছেদ]। ইহার পর্য্যবসানও ভগবজ্‌জ্ঞানে ; ভগবজ্‌জ্ঞান স্বতঃই নির্গুণ [৫।৫০-ঘ (৮) অনুচ্ছেদ]। এইরূপে দেখা গেল, ভক্তিযোগে প্রবৃত্তি হইতে আরম্ভ করিয়া সমগ্র সাধনই হইতেছে নির্গুণ, অর্থাৎ ইহা ত্রিগুণময়ী বহিরঙ্গা মায়ার ব্যাপার নহে।

তবে কি ইহা জীবশক্তির কার্য্য ? সাধন করে তো জীব, জীবশক্তির অংশ জীব। জীব-শক্তিতে মায়ার স্পর্শ নাই (২।৮-অনুচ্ছেদ)। সুতরাং ভক্তিযোগের সাধন জীবের কার্য্য হইলেও নির্গুণ হইতে পারে।

উত্তরে বক্তব্য এই। ভক্তিযোগের সাধন বস্তুতঃ জীবেরও কার্য্য নহে। কেননা, স্বতন্ত্ররূপে

কিছু করিবার সামর্থ্য জীবচৈতন্যের নাই ; জীবের শক্তি ঈশ্বরের অধীন ; জীবের কর্তৃত্ব মুখ্য নহে ; ঈশ্বরের কর্তৃত্বই মুখ্য [৫।৫০-ঘ (১১-অনুচ্ছেদ] ; সুতরাং সাধনকে বস্তুতঃ জীবের বা জীবশক্তির কার্য্যও বলা যায় না।

ভগবানের মুখ্যশক্তি তিনটী—মায়াশক্তি, জীবশক্তি এবং চিচ্ছক্তি বা স্বরূপশক্তি। ভক্তিযোগ যখন মায়াশক্তিরও কার্য্য নহে, জীবশক্তিরও কার্য্য নহে, তখন পরিশিষ্ট-ন্যায়ে ইহা যে স্বরূপ-শক্তিরই কার্য্য বা বৃত্তি, তাহাই জানা যায়।

ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন, এই নির্গুণ ভক্তিযোগের প্রভাবে মায়িকগুণত্রয় দূরীভূত হয় এবং শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক ভাব বা প্রেম আবির্ভূত হয়। "যেনাতিব্রজ্য ত্রিগুণং মদ্ভাবায়োপপদ্যতে॥ শ্রীভা, ৩।১১।১৪॥" ইহা হইতেই বুঝা যায়—নির্গুণ ভক্তিযোগ বা উত্তমা সাধনভক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি ; কেননা, স্বরূপশক্তিব্যতীত অপর কিছুই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে না।

"অন্যাভিলাষিতাশূন্যম্"-ইত্যাদি ভক্তিরসামৃতসিন্ধু (১।১।৯)-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব-গোস্বামীও "অনুশীলনম্"-শব্দ-প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"এতচ্চ কৃষ্ণতদ্ভক্ত-কৃপয়ৈকলভ্যং শ্রীভগবতঃ স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিরূপম্, অতঃ অপ্রাকৃতমপি কায়াদিবৃত্তি-তাদাত্ম্যেন এব আবির্ভূতম্ ইতি জ্ঞেয়ম্। —এই কৃষ্ণানুশীলন (অর্থাৎ উত্তমা সাধনভক্তি) একমাত্র কৃষ্ণের কৃপা বা, কৃষ্ণভক্তের কৃপা হইতেই লাভ করা যায়। (কৃষ্ণের কৃপাও স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি, কৃষ্ণভক্তের কৃপাও স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া) এই কৃষ্ণানুশীলনও শ্রীভগবানের স্বরূপশক্তির বৃত্তিস্বরূপ—সুতরাং অপ্রাকৃত (অর্থাৎ প্রকৃতির বা মায়ার বৃত্তি নহে) ; অপ্রাকৃত হইলেও কায়াদির (দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদির) বৃত্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া আবির্ভূত হইয়া থাকে।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর এই উক্তি হইতেও জানা গেল—উত্তমা সাধনভক্তি হইতেছে স্বরূপ-শক্তিরই বৃত্তি।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (১৩৫-অনুচ্ছেদে) লিখিয়াছেন—"তদেবমভিপ্রেত্য জ্ঞানরূপায়া ভক্তের্নির্গুণত্বমুক্ত্বা ক্রিয়ারূপায়া ব্যচষ্টে। তত্রাপ্যস্তু তাবৎ শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপায়াঃ, ভগবৎ-সম্বন্ধেন বাসমাত্ররূপায়া আহ

"বনন্তু সাত্ত্বিকো বাসো গ্রাম্যো রাজস উচ্যতে।
তামসং দ্যূতসদনং মন্নিকেতন্তু নির্গুণম্॥ শ্রীভা, ১১।২৫।২৫॥

—শ্রীভগবান্ এইরূপ অভিপ্রায়েই জ্ঞানরূপা ভক্তির নির্গুণত্ব বর্ণন করিয়া ক্রিয়ারূপা ভক্তিরও নির্গুণত্ব বর্ণন করিতেছেন। তন্মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনরূপা ভক্তি (সাধনভক্তি) যে নির্গুণ, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? ভগবৎ-সম্বন্ধ আছে বলিয়া ভগবন্মন্দিরে বাস করাও যে নির্গুণ, তাহাও শ্রীভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন। যথা, 'বানপ্রস্থাবলম্বীদিগের যে বনে বাস, তাহা হইতেছে সাত্ত্বিক ; গৃহস্থগণ যে গ্রামে বাস করেন, তাহা হইতেছে রাজস ; দ্যূতে (জুয়াখেলা, মদ্যপান,

মিথ্যা-প্রবঞ্চনাদি যেস্থানে হয়,সেই স্থানে) বাস হইতেছে তামস ; কিন্তু ভগবৎসেবাপরায়ণ ভক্তগণ যে আমার (ভগবানের) নিকেতনে (ভগবানের শ্রীমন্দিরে) বাস করেন, তাঁহাদের সেই বাস হইতেছে নির্গুণ।”

এই শ্লোকের আলোচনা-প্রসঙ্গে ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম এইরূপ। “বনং বাসঃ”-ইতি তৎসম্বন্ধিনী বসনক্রিয়েত্যর্থঃ—‘বনংবাসঃ’-বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে বনসম্বন্ধিনী বসনক্রিয়া।” অর্থাৎ “বনে বাস”ই সাত্ত্বিক, বন সাত্ত্বিক নহে। কেননা, বৃক্ষ-সমষ্টিই হইতেছে বন ; বৃক্ষসমূহ হইতেছে রজস্তমঃপ্রধান বস্তু ; তাহাদের মধ্যে যে সত্ত্বগুণ আছে, তাহা রজস্তমোগুণের সহিত মিশ্রিত বলিয়া তাহার প্রাধান্য নাই ; তাহা হইতেছে গৌণ। এজন্য বনকে সাত্ত্বিক বলা যায় না। তবে “বনে বাস”-ক্রিয়াটী সাত্ত্বিকী হইতে পারে। কেননা, সত্ত্বগুণ-প্রধান বানপ্রস্থাবলম্বী লোকগণই বনে বাস করার ইচ্ছা করেন এবং বনে বাস-কালে বনের নির্জনতাদি আবার তাঁহাদের সত্ত্বগুণকে বর্দ্ধিত করে। এইরূপে দেখা যায়—বানপ্রস্থাবলম্বীদের বনেবাসের প্রবৃত্তিও জন্মে সত্ত্বগুণ হইতে এবং বনে বাসের ফলে তাঁহাদের সত্ত্বগুণ আবার বর্দ্ধিতও হইতে পারে। সুতরাং বনেবাসেরই বাস্তবিক সাত্ত্বিকত্ব, বনের সাত্ত্বিকত্ব নিতান্ত গৌণ। “আয়ুর্ঘৃতম্”-বাক্যে ঘৃত বস্তুতঃ আয়ুঃ না হইলেও ঘৃতপানে আয়ুঃ বর্দ্ধিত হয় বলিয়া যেমন ঘৃতকেই আয়ুঃ বলিয়া প্রকাশ করা হয়, তদ্রূপ বনবাসে সত্ত্ব-গুণ বর্দ্ধিত হইতে পারে বলিয়া বনবাসকে সাত্ত্বিক বলা হইয়াছে। রাজস-তামসাদি সম্বন্ধেও তাহাই। “গ্রাম্যঃ বাসঃ রাজসঃ”-বাক্যের তাৎপর্য্য—গ্রামসম্বন্ধী বাস। গৃহস্থগণই সাধারণতঃ গ্রামে বাস করেন ; তাঁহাদের মধ্যে রজোগুণের প্রাধান্যবশতঃ বিষয়ভোগের জন্য তাঁহারা গ্রামে বাস করেন এবং বিষয়-ভোগে তাঁহাদের চিত্তে রজোগুণের প্রভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইতে থাকে। এ-স্থলেও “গ্রামে বাস”-ক্রিয়ারই রাজসত্ব, গ্রামের (অর্থাৎ স্থান-বিশেষের) রাজসত্বের প্রাধান্য নাই। দ্যূতসদন-সম্বন্ধেও সেই কথা। তমোগুণপ্রধান দুরাচারগণই দ্যূতসদনাদিতে বাস করিতে ইচ্ছা করে, এতাদৃশ বাসের ফলে তাহাদের মধ্যে তমোগুণের প্রভাব আরও বর্দ্ধিত হইতে পারে। এ-স্থলে “দ্যূতসদনাদিতে বাস”-ক্রিয়ারই বাস্তবিক তামসত্ব। “মন্নিকেতম্-ইত্যত্রাপি”—মন্নিকতনে অর্থাৎ ভগবন্মন্দিরে বাসকে নির্গুণ বলা হইয়াছে, সে-স্থলেও মন্দিরে বাসের নির্গুণত্বের কথাই বলা হইয়াছে। নির্গুণ-ভগবৎ-সেবা-পরায়ণ ভক্তগণেরই ভগবন্মন্দিরে বাসের প্রবৃত্তি হয় এবং তাদৃশ বাসের ফলে তাঁহাদের নির্গুণত্বের প্রভাবও বর্দ্ধিত হইতে থাকে। তবে বনবাসাদি হইতে ভগবন্মন্দিরে বাসের বিশেষত্ব এই যে—বনবাস সাত্ত্বিক হইলেও বন যেমন সাত্ত্বিক নহে, শ্রীমন্দির কিন্তু তদ্রূপ নহে। ভগবৎ-সম্বন্ধের মাহাত্ম্যে শ্রীমন্দিরও, স্পর্শমণি-ন্যায়ে, নির্গুণ হইয়া থাকে। আলোচ্য শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামি-পাদও লিখিয়াছেন—“ভগবন্নিকেতন্তু সাক্ষাত্তদাবির্ভাবান্নির্গুণং স্থানম্—ভগবন্মন্দির কিন্তু সাক্ষাৎ ভগবানের আবির্ভাববশতঃ নির্গুণ স্থান।” বনাদি-স্থলে বাসস্থানটী সত্ত্বাদি-গুণপ্রধান নহে, কেবল

মাত্র বাসক্রিয়ারই সাত্ত্বিকত্বাদি ; কিন্তু ভগবন্মন্দির-সম্বন্ধে—ভগবন্মন্দিরও নির্গুণ এবং ভগবন্মন্দিরে বাস-ক্রিয়াও নির্গুণা। বনে বাস সাত্ত্বিক বলিয়া যেমন বনকে সাত্ত্বিক বলা হয়, তদ্রূপ ভগবন্মন্দিরে বাস-ক্রিয়াটী নির্গুণা বলিয়াই যে শ্রীমন্দিরকে নির্গুণ বলা হইয়াছে—তাহা নহে ; শ্রীমন্দির বস্তুতঃই নির্গুণ—নির্গুণ ভগবানের সাক্ষাৎ আবির্ভাব-বশতঃ। ভগবন্মন্দির যে নির্গুণ, তাহা অবশ্য সকলে অনুভব করিতে পারে না ; নির্গুণ-ভক্তিপূত চক্ষুর্দ্বারাই তাহার উপলব্ধি সম্ভব। "তাদৃশত্বন্তু তাদৃশ-ভক্তিচক্ষুর্ভিরেবোপলব্ধব্যম্।" একথাই শাস্ত্রও বলিয়া গিয়াছেন। "দিবিষ্ঠাস্তত্র পশ্যন্তি সর্ব্বানেব চতুর্ভুজান্॥ ভক্তিসন্দর্ভধৃত-ব্রাহ্মবচন॥ —দিব্যধামে যাঁহারা অবস্থিত, তাঁহারা সকলকেই চতুর্ভুজ-রূপে দর্শন করেন (সাধারণ লোক তদ্রূপ দেখে না)।"

উল্লিখিত শ্লোকের আলোচনায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দেখাইয়াছেন—নির্গুণ ভগবানের সহিত সম্বন্ধবশতঃ নির্গুণত্বপ্রাপ্ত ভগবন্মন্দিরে বাসরূপ ক্রিয়াও যখন নির্গুণা, তখন ভগবৎসম্বন্ধিনী সমস্ত ক্রিয়াই—ভক্তিসাধন-ক্রিয়াও—নির্গুণাই হইবে।

ভগবন্মন্দিরে কেবলমাত্র বাসক্রিয়ার নির্গুণত্বের কথা বলিয়া ভগবৎসম্বন্ধিনী সমস্ত-ক্রিয়ারই নির্গুণত্বের কথাও শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন। যথা,

সাত্ত্বিকঃ কারকোঽসঙ্গী রাগান্ধো রাজসঃ স্মৃতঃ।
তামসঃ স্মৃতিবিভ্রষ্টো নির্গুণো মদপাশ্রয়ঃ॥ শ্রীভা.১১।২৫।২৬॥

—(উদ্ধবের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) যিনি অনাসক্ত ভাবে কর্ম্ম করেন, সেই কর্ত্তা (অর্থাৎ কর্ম্ম) সাত্ত্বিক ; যে কর্ত্তা রাগান্ধ (রাগ বা আসক্তিবশতঃ অন্ধ, কেবল অভীষ্ট ফললাভেই অভিনিবিষ্ট), তিনি (অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্ম) রাজস ; যে কর্ত্তা স্মৃতিবিভ্রষ্ট (অনুসন্ধানশূন্য) হইয়া কর্ম্ম করেন, তিনি (তাঁহার কর্ম্ম) তামস, আর যে কর্ত্তা আমারই (ভগবানেরই) শরণাপন্ন, তিনি (অর্থাৎ তাঁহার কর্ম্ম) নির্গুণ।"

এই শ্লোকের আলোচনায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"অত্র চ ক্রিয়ায়ামেব তাৎপর্য্যম্, ন তদাশ্রয়ে দ্রব্যে ; সাত্ত্বিককারকস্য শরীরাদিকং হি গুণত্রয়-পরিণতমেব॥—এ-স্থলে ক্রিয়াতেই সাত্ত্বিকত্ব-রাজসত্বাদির তাৎপর্য্য ; ক্রিয়াশ্রয় দ্রব্যে তাৎপর্য্য নহে। কেননা, যিনি সাত্ত্বিক কর্ম্ম করেন, তাঁহার শরীরাদিও (অর্থাৎ কর্ম্মসাধন দ্রব্য দেহ এবং দেহস্থিত ইন্দ্রিয়াদিও) সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই গুণত্রয়ের পরিণামই, (কেবল সত্ত্বগুণের পরিণাম নহে)। তাৎপর্য্য এই যে, কর্ম্মসাধন-দ্রব্য দেহ ও ইন্দ্রিয়াদি গুণত্রয়ের পরিণাম হওয়া সত্ত্বেও যখন সত্ত্বগুণ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মকে সাত্ত্বিক, রজোগুণ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মকে রাজস এবং তমোগুণ-প্রবর্ত্তিত কর্ম্মকে তামস বলা হইয়াছে, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়, কেবল ক্রিয়াসম্বন্ধেই সাত্ত্বিক-রাজস-তামস বলা হইয়াছে, ক্রিয়া-সাধন-দ্রব্যসম্বন্ধে তাহা বলা হয় নাই। দ্রব্যসম্বন্ধে যদি বলা হইত, দ্রব্য ত্রিগুণময় বলিয়া সমস্ত কর্ম্মকেই ত্রিগুণময় বলা হইত। তদ্রূপ ভগবৎ-সম্বন্ধিনী ক্রিয়ামাত্রই,—সেই ক্রিয়ার সাধনদ্রব্য গুণময় হইলেও, তাহা হইবে—নির্গুণ।

ক। সাধনভক্তির হেতুভূতা শ্রদ্ধাও নির্গুণা।

ভগবৎসম্বন্ধি-ক্রিয়ামাত্রের নির্গুণত্বের কথা বলিয়া সেই ক্রিয়াতে প্রবৃত্তির হেতুভূতা যে শ্রদ্ধা, তাহার নির্গুণত্বের কথাও শ্রীভগবান্ বলিয়া গিয়াছেন। যথা,

"সাত্ত্বিক্যাধ্যাত্মিকী শ্রদ্ধা কর্ম্মশ্রদ্ধা তু রাজসী।
তামস্যধর্ম্মে যা শ্রদ্ধা মৎসেবায়ান্তু নির্গুণা ॥ শ্রীভা,১১।২৫।২৭॥

—(উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) অধ্যাত্মতত্ত্ব-বিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা সাত্ত্বিকী; কর্ম্মানুষ্ঠানে যে শ্রদ্ধা, তাহা কিন্তু রাজসী; অধর্ম্মে (অপর-ধর্ম্মে) যে শ্রদ্ধা, তাহা তামসী; আমার সেবাবিষয়ে যে শ্রদ্ধা, তাহা কিন্তু নির্গুণা।"

এজন্যই অজামিলের বিবরণে ধর্ম্মপ্রসঙ্গে যমদূত ও বিষ্ণুদূত গণের উক্তিসম্বন্ধে শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন,

"অজামিলোঽপ্যথাকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ। ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্ ॥
ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ। অনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ ॥
—শ্রীভা, ৬।২।২৪-২৫॥

—বিষ্ণুদূতগণ শুদ্ধ ভাগবত ধর্ম্ম সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, অজামিল তাহা শুনিলেন এবং যমদূত গণের কথিত বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য গুণময় ধর্ম্মের কথাও শুনিলেন। (বিষ্ণুগতগণ-কথিত ভাগবত-ধর্ম্মের কথায়) শ্রীহরির মাহাত্ম্য শ্রবণের ফলে অজামিল শীঘ্রই ভগবানে ভক্তিমান্ হইয়াছিলেন। নিজের পূর্ব্বকৃত অশুভ কর্ম্মসকলের কথা স্মরণ করিয়া অজামিলের মহান্ অনুতাপ জন্মিয়াছিল।"

শ্লোকস্থ-"ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চ গুণাশ্রয়ম্"-বাক্যের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"শুদ্ধং নির্গুণম, ত্রৈবেদ্যং বেদত্রয়প্রতিপাদ্যং গুণাশ্রয়ম্।—শুদ্ধ-শব্দের অর্থ হইতেছে নির্গুণ; ত্রৈবেদ্য-শব্দের অর্থ-বেদত্রয়-প্রতিপাদ্য; তাহা গুণাশ্রয়, গুণময়।" এ-স্থলে বেদ-শব্দে বেদের কর্ম্মকাণ্ডকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে; কেননা, শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার ৯।২০-শ্লোকে "ত্রৈবিদ্যা"-শব্দে এবং ৯।২১-শ্লোকে "ত্রয়ীধর্ম্মম্"-শব্দে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা যায়—ত্রৈবেদ্য-শব্দে বেদের কর্ম্মকাণ্ডকেই বুঝায় (যাহার অনুসরণে স্বর্গাদি ভোগলোক প্রাপ্ত হওয়া যায়)।

খ। সাধনভক্তি স্বয়ংপ্রকাশ

উল্লিখিতরূপ আলেচনার পরে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (১৩৯-অনুচ্ছেদ) লিখিয়াছেন—"অতএব ভক্তেঃ ভগবৎ-স্বরূপশক্তিত্ববোধকং স্বয়ংপ্রকাশত্বমাহ—অতএব (ভক্তি নির্গুণ বলিয়া) ভক্তি যে ভগবানের স্বরূপ-শক্তি, তাহা বুঝাইবার নিমিত্ত তাহার (ভক্তির) স্বয়ংপ্রকাশ-কত্বের কথাও বলা হইয়াছে।" যথা,

"যজ্ঞায় ধর্ম্মপতয়ে বিধিনৈপুণায় যোগায় সাংখ্যশিরসে প্রকৃতীশ্বরায়।
নারায়ণায় হরয়ে নম ইত্যুদারং হাস্যন্ মৃগত্বমপি যঃ সমুদাজহার॥—শ্রীভা, ৫।১৪।৪৫॥

—(ভারত-সম্রাট্ ভরত-মহারাজ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের উদ্দেশ্যে সাম্রাজ্য পরিত্যাগ করিয়া ভক্তিযোগের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। দৈবাৎ একটী হরিণ-শিশুর প্রতি তাঁহার মমতা জন্মিয়াছিল বলিয়া তিনি তাহার লালন-পালন করিয়াছিলেন। দেহত্যাগ-সময়ে সেই হরিণ-শিশুর কথা চিন্তা করিয়াছিলেন বলিয়া পরজন্মে তিনি হরিণ বা মৃগ হইয়া জন্ম গ্রহণ করেন। মৃগদেহ হইতে উৎক্রমণকালে তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে মহারাজ ভরতের বিবরণ-কথন-প্রসঙ্গে, তাহা এইভাবে বর্ণন করিয়াছেন):—

পরমভাগবত শ্রীভরত দ্বিতীয় জন্মে যে মৃগদেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, সেই মৃগদেহ-পরিত্যাগ-সময়ে, পূর্ব্বজন্মের ভক্তিসংস্কারবশতঃ, হাস্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে বলিয়াছিলেন—'যিনি যজ্ঞস্বরূপ, যিনি ধর্ম্মপতি (অর্থাৎ যজ্ঞাদি ধর্ম্মকর্ম্মের ফলদাতা), যিনি বিধিনৈপুণ (অর্থাৎ যাঁহা হইতে যজ্ঞ-বিধির নৈপুণ্য লাভ করা যায়, সুতরাং মূলতঃ যিনিই ধর্ম্মানুষ্ঠানকর্ত্তা), যিনি অষ্টাঙ্গযোগস্বরূপ, যিনি সাংখ্যশিরঃস্বরূপ (অর্থাৎ সাংখ্যের—জ্ঞানের—আত্ম-অনাত্মজ্ঞানের মুখ্য ফলস্বরূপ), যিনি প্রকৃতির ঈশ্বর (মায়ানিয়ন্তা), যিনি নারায়ণ (অর্থাৎ নার বা জীবসমূহ যাঁহার অয়ন বা আশ্রয়. যিনি সর্ব্বজীবের অন্তর্য্যামী নিয়ন্তা), সেই শ্রীহরিকে নমস্কার (অর্থাৎ যিনি বেদের কর্ম্মকাণ্ড, জ্ঞানকাণ্ড এবং দেবতাকাণ্ডের প্রতিপাদ্য, সেই শ্রীহরিকে নমস্কার)।"

উল্লিখিত বাক্যে মৃগদেহে অবস্থিত ভরত মহারাজ ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহার চরণে নমস্কার জানাইয়াছেন। তখন তিনি ছিলেন মুমুর্ষু অবস্থায়—সুতরাং অবশ ; বিশেষতঃ, তিনি ছিলেন মৃগদেহবিশিষ্ট ; কোনও মৃগের জিহ্বায়—উচ্চৈঃস্বরে, অপরের শ্রবণযোগ্য এবং বোধগম্য ভাষায় ভগবানের মহিমা কীর্ত্তন, বা নামোচ্চারণ, বা ভগবানের প্রতি নমস্কার জ্ঞাপন নিতান্ত অসম্ভব। ইহাতেই বুঝা যায়—ভগবানের মহিমাকীর্ত্তনাদি মৃগের জিহ্বার কার্য্য নহে ; জিহ্বার অপেক্ষা না রাখিয়াই কীর্ত্তনরূপ ভজনাঙ্গ আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইয়াছে, আত্মপ্রকাশ করিয়াছে। ভগবানের মহিমাদির কীর্ত্তন হইতেছে উত্তমা সাধনভক্তির অঙ্গ। উল্লিখিত বিবরণ হইতে জানা গেল—উত্তমা সাধনভক্তি হইতেছে স্বপ্রকাশ।

শ্রীমদ্ভাগবতের অষ্টমস্কন্ধ হইতে জানা যায়—পাণ্ড্যদেশীয় বিষ্ণুব্রতপরায়ণ রাজা ইন্দ্রদ্যুম্ন অগস্ত্যমুনির অভিসম্পাতে হস্তিযোনি প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। হস্তিরূপ ইন্দ্রদ্যুম্ন এক সময়ে চিত্রকূট-পর্ব্বতস্থিত এক সরোবরে কুম্ভীরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কিছুতেই নিজেকে মুক্ত করিতে পারিতেছিলেন না। পূর্ব্বজন্মের ভগবদারাধনার ফলে তখন তাঁহার মধ্যে ভগবৎ-স্মৃতি জাগ্রত হইয়াছিল এবং তিনি তাঁহার হস্তিদেহেই আর্ত্তির সহিত নানাভাবে ভগবানের স্তবস্তুতি করিতে লাগিলেন। তাঁহার স্তবে প্রসন্ন হইয়া ভগবান্ তাঁহাকে উদ্ধার করিয়াছিলেন। ভরত মহারাজের মৃগজিহ্বার ন্যায় ইন্দ্রদ্যুম্নের হস্তিজিহ্বার পক্ষেও ভগবৎ-স্তুতি অসম্ভব। ইহা হইতেও জানা যায়—গজেন্দ্রের স্তবস্তুতিরূপ ভগবন্-মহিমাকীর্ত্তনও হইতেছে স্বয়ংপ্রকাশ।

কিন্তু কোনও গুণময় বাক্য স্বয়ংপ্রকাশ হইতে পারে না ; কেননা, মায়িকগুণ স্বয়ংপ্রকাশ নহে। মৃগরূপী ভরতের এবং গজেন্দ্ররূপী ইন্দ্রদ্যুম্নের ভগবন্মহিমাকীর্ত্তন স্বয়ংপ্রকাশ বলিয়া গুণময় হইতে পারে না ; ইহা অবশ্যই নির্গুণা স্বরূপশক্তিরই বৃত্তি ; কেননা, স্বরূপশক্তি হইতেছে স্বয়ংপ্রকাশ বস্তু। ভগবন্মহিমাকীর্ত্তনাদিরূপ সাধনভক্তির এতাদৃশ স্বয়ংপ্রকাশত্ব হইতেই জানা যায়, **সাধনভক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তি, বা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তি।**

পূর্ব্বে ৫।৫৩ অনুচ্ছেদে) আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলনকে (অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিকে) সাধনভক্তির স্বরূপলক্ষণ বলা হইয়াছে। তাহা হইতেছে কিন্তু "আকৃতি"-রূপ স্বরূপ লক্ষণ— সাধন ভক্তির "আকৃতি বা আকার" ; আর, স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিত্ব হইতেছে তাহার "প্রকৃতি" বা উপাদান। "আকৃতি প্রকৃতি এই স্বরূপ-লক্ষণ ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২০।২৯৬ ॥" [৫।৪৮গ (১)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

৫৫। উত্তমা সাধনভক্তির নববিধ অঙ্গ

প্রহ্লাদের পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু নিজেকে অজেয়, অজর, অমর এবং প্রতিপক্ষহীন অদ্বিতীয় রাজারূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার উদ্দেশ্যে মন্দর-পর্ব্বতে গমন করিয়া উৎকট তপস্যায় রত হইয়াছিলেন (শ্রী, ভা, ৭।৩।১-২)। যখন তিনি এইভাবে তপস্যায় নিরত ছিলেন, তখন তাঁহার অনুপস্থিতির সুযোগে দেবতাগণ দৈত্যদিগের বিরুদ্ধে যুদ্ধের আয়োজন করিলেন, ভয়ে দৈত্যগণ গৃহ-স্বজনাদি পরিত্যাগপূর্ব্বক পলায়ন করিল। দেবরাজ ইন্দ্র হিরণ্যকশিপুর রাজপুরী বিনষ্ট করিয়া দৈত্যরাজ-মহিষীকে লইয়া গেলেন ; তিনি ছিলেন তখন অন্তঃস্বত্বা। পথিমধ্যে নারদের সহিত ইন্দ্রের সাক্ষাৎ হইলে নারদ ইন্দ্রকে উপদেশ দিলেন, তাহার ফলে দেবরাজ হিরণ্যকশিপুর মহিষীকে নারদের হস্তে অর্পণ করিলেন। নারদ তাঁহাকে স্বীয় আশ্রমে নিয়া কন্যার ন্যায় পালন করিতে লাগিলেন এবং তাঁহাকে ভক্তিতত্ত্ব শিক্ষা দিতে লাগিলেন। নারদের কৃপায় গর্ভস্থ শিশুও সেই উপদেশ শ্রবণ এবং হৃদয়ে ধারণ করিতে পারিলেন। এই শিশু যখন ভূমিষ্ঠ হইলেন, তখন তাঁহারই নাম হইল প্রহ্লাদ। নারদের কৃপায় মাতৃগর্ভে অবস্থান-কালে প্রহ্লাদ যে ভক্তিতত্ত্ব শুনিয়াছিলেন, তিনি তাহা বিস্মৃত হন নাই ; ভূমিষ্ঠ হইয়াও তিনি তদনুসারে নিজেকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন (শ্রী, ভা, ৭ম স্কন্ধ ৭ম অধ্যায়)। নারদের কৃপাই প্রহ্লাদের ভক্তির মূল। তপস্যায় সিদ্ধিলাভ করিয়া ব্রহ্মার বর লাভ করিয়া হিরণ্যকশিপু প্রবল পরাক্রমে রাজত্ব করিতে লাগিলেম, স্বর্গ জয় করিয়া ইন্দ্রপুরীতেই বাস করিতে লাগিলেন। যথাসময়ে তিনি স্বীয় পুত্র প্রহ্লাদকে অধ্যয়নার্থ গুরুগৃহে পাঠাইলেন।

গুরুগৃহ হইতে আগত প্রহ্লাদ যখন পিতার চরণে যাইয়া প্রণত হইলেন, তখন তাঁহার পিতা দৈত্যরাজ হিরণ্যকশিপু তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ ও স্নেহভরে আলিঙ্গনাদি করিয়া বলিলেন—"বৎস! এত কাল গুরুগৃহে থাকিয়া যাহা শিখিয়াছ, তাহার মধ্যে উত্তম যাহা, তাহার কিঞ্চিৎ শুনাও দেখি।" তখনই পিতার কথার উত্তরে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন :—

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ স্মরণং পাদসেবনম্। অর্চ্চনং বন্দনং দাস্যং সখ্যমাত্মনিবেদনম্॥
ইতি পুংসার্পিতা বিষ্ণৌ ভক্তিশ্চেন্নবলক্ষণা। ক্রিয়েত ভগবত্যদ্ধা তন্মন্যেঽধীতমুত্তমম্॥
—শ্রীভা, ৭।৫।২৩,২৪॥

—শ্রীবিষ্ণুর শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, পাদসেবন, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য ও আত্মনিবেদন— এই নবলক্ষণা ভক্তি (প্রথমতঃ) ভগবান্ বিষ্ণুতে সাক্ষাদ্ ভাবে অর্পিত হইয়া (তাহার পরে) যদি কোনও লোককর্ত্তৃক অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহাকেই আমি উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"ইতি নবলক্ষণানি যস্যাঃ সা অধীতেন চেদ্ ভগবতি বিষ্ণৌ ভক্তিঃ ক্রিয়েত সা চ অর্পিতৈব সতী যদি ক্রিয়েত, ন তু কৃতা সতী পশ্চাদর্প্যেত, তদুত্তমমধীতং মন্যে—শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নবলক্ষণ-বিশিষ্টা ভক্তি যদি কোনও অধীত ব্যক্তিকর্ত্তৃক প্রথমে ভগবান্ বিষ্ণুতে অর্পিত হইয়া তাহার পরে কৃত (অর্থাৎ অনুষ্ঠিত) হয়, তাহা হইলেই তাহাকে উত্তম অধ্যয়ন বলিয়া মনে করি ; অনুষ্ঠিত হওয়ার পরে যদি ভগবানে অর্পিত হয়, তাহা হইলে তাহা তদ্রূপ হইবে না।"

এই বিষয়ে শ্রীপাদজীবগোস্বামী এবং শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চবক্রবর্ত্তীর টীকার তাৎপর্য্যও উল্লিখিতরূপই।

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—অনুষ্ঠানের পূর্ব্বে কিরূপে ভগবানে অর্পিত হইতে পারে? সন্দেশ প্রস্তুত করার পূর্ব্বে তাহা কিরূপে কাহাকেও দেওয়া যায়?

উত্তরে বক্তব্য এই যে, এ-স্থলে তাৎপর্য্য-বৃত্তিতে অর্থ করিতে হইবে। কোনও বস্তু যদি কাহাকেও অর্পণ করা যায়, তাহা হইলে সেই বস্তুটীতে অর্পণকারীর আর কোনও স্বত্ব-স্বামিত্ব থাকেনা, নিজের কোনও ব্যাপারে অর্পণকারী আর তাহা ব্যবহার করিতে পারেন না, তাহার স্বত্ব-স্বামিত্ব বর্ত্তিবে একমাত্র তাঁহাতে, যাঁহাকে বস্তুটী অর্পণ করা হয়। তাঁহার কোনও কার্য্যের জন্যই অর্পণকারী তাহা ব্যবহার করিতে পারেন, নিজের জন্য পারেন না। ভৃত্য গ্রীষ্মকালে পাখা কিনিয়া আনিয়া কর্ত্তাকে দিল, তাহা তখন কর্ত্তার পাখা হইল ; ভৃত্য নিজের জন্য তাহা ব্যবহার করিতে পারে না ; তবে সেই পাখা দিয়া ভৃত্য তাহার প্রভুর অঙ্গে বাতাস করিয়া প্রভুর সুখ বিধান করিতে পারে। ইহা হইল আগে অর্পণ, তাহার পরে অনুষ্ঠানের ন্যায়। "শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভগবানেরই জিনিস ; কেননা, তৎসমস্ত তাঁহার প্রীতির সাধন ; তাঁহারই জিনিস দ্বারা তাঁহারই ভৃত্য আমি তাঁহার প্রীতি-বিধানের চেষ্টা করিতেছি"-এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলেই সেই অনুষ্ঠান হইবে শুদ্ধা ভক্তির অঙ্গ। আহার সকলেরই প্রয়োজন ; আহারের আয়োজনও সকলেই করিয়া থাকে ; কিন্তু ইহার মধ্যে দুই রকমের লোক আছে। এক—যাহারা নিজেদের জন্য রান্নাদি করিয়া খাইতে বসিয়া ঠাকুরের নামে নিবেদন করে। আর—যাহারা রান্নাদিই করে ঠাকুরের জন্য ; ঠাকুরের জন্য রাঁধিয়া সমস্তই ঠাকুরের ভোগে নিবেদন করিয়া পরে

ঠাকুরের প্রসাদ গ্রহণ করে। প্রথমোক্ত ব্যক্তিগণের আগে অনুষ্ঠান, পরে ভগবানে অর্পণ। শেষোক্ত ব্যক্তিগণের আগেই অর্পণ, পরে অনুষ্ঠান। ঠাকুরের জন্য রান্না করে ঠাকুরেরই জিনিস; সুতরাং সমস্ত জিনিস পূর্ব্বেই অর্পিত হইয়া গিয়াছে, রান্নাদির অনুষ্ঠান পরে। ভোগ-নিবেদন বস্তুতঃ প্রথম অর্পণ নহে। "প্রভো! তোমারই জিনিস, তোমারই উদ্দেশ্যে তোমারই ভৃত্য রাঁধিয়া আনিয়াছে, কৃপা করিয়া গ্রহণ কর"-ইহাই ভোগনিবেদনের তাৎপর্য্য; সুতরাং ইহা সর্ব্বপ্রথম অর্পণ নহে; ইহা হইতেছে অর্পিত বস্তুর সংস্কারপূর্ব্বক সম্মুখে আনয়ন; ইহাও অবশ্য অনুষ্ঠানই বটে—কিন্তু ভগবৎপ্রীতির উদ্দেশ্যে সমর্পণের পরবর্ত্তী অনুষ্ঠান।

"এ-সমস্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভগবানেরই নিমিত্ত, ভগবানেরই প্রীতির নিমিত্ত, আমার ধর্ম্মার্থাদি লাভের নিমিত্ত নহে, আমার ইহকালের বা পরকালের কোনওরূপ সুখের নিমিত্ত নহে, এমন কি আমার মোক্ষের নিমিত্তও নহে"-এইরূপ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিয়া যদি কেহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করেন—কিন্তু আগে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করিয়া পরে সেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির ফলমাত্র ভগবানে অর্পণ করার কথা যদি তাঁহার মনেও না জাগে, তাহা হইলেই বলা যায় যে, তিনি আগে তৎসমস্ত ভগবানে অর্পণ করিয়া পরে তৎসমস্তের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করা হইতেছে একমাত্র ভগবানের প্রীতির নিমিত্ত, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে নহে। "শ্রীবিষ্ণাবেবার্পিতা তদর্থমেবেদমিতি ভাবিতা, ন তু ধর্ম্মার্থাদিম্বর্পিতা ॥ শ্রীজীব॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-স্থলে গোপালতাপনী শ্রুতির প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। "ভক্তিরস্য ভজনং তদিহামুত্রোপাধি-নৈরাস্যেনামুস্মিন্ মনঃকল্পনমেতদেব চ নৈষ্কর্ম্ম্যম্।—ইহকালের এবং পরকালের সমস্ত উপাধি (কাম্য বস্তু) পরিত্যাগ পূর্ব্বক ভগবানেই মনের যে কল্পন (সমস্ত সঙ্কল্প ভগবানের প্রীতিতেই পর্য্যবসিত করণ), তাহাই হইতেছে তাঁহার ভজন (প্রীতিবিধান), তাহাই ভক্তি, তাহাই নৈষ্কর্ম্ম্য।" ভক্তিরসামৃত সিন্ধুর "আনুকূল্যেন অন্যাভিলাষিতাশূন্যং কৃষ্ণানুশীলনম্" এবং শ্রীমদ্ভাগবতের "অহৈতুকী ভক্তিঃ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।১২॥"-প্রভৃতির তাৎপর্য্যও তাহাই।

শ্লোকস্থ "অদ্ধা"-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে--সাক্ষাৎ রূপে, ফলরূপে বা কর্ম্মাদ্যর্পণরূপ পরম্পরারূপে নহে। "অদ্ধা সাক্ষাদ্রূপা, নতু কর্ম্মাদ্যর্পণরূপপরম্পরা ভক্তিরিয়ম্॥ শ্রীজীব॥"; "অদ্ধা সাক্ষাদেব, ন তু জ্ঞানকর্ম্মাদের্ব্যবধানেনেত্যর্থঃ। চক্রবর্ত্তী॥—সাক্ষাদ্ ভাবেই, জ্ঞানকর্ম্মাদির ব্যবধানে নহে—ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের "অব্যবহিতা ভক্তিঃ॥৩।২৯।১২॥" এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "জ্ঞানকর্ম্মাদ্য-নাবৃতং কৃষ্ণানুশীলনম্"-ইত্যাদি বাক্যের তাৎপর্য্য।

শ্লোকস্থ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির তাৎপর্য্য কি, শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ক্রমসন্দর্ভ-টীকার অনুসরণে তাহাই এক্ষণে আলোচিত হইতেছে।

শ্রবণং—নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাময়শব্দানাং শ্রোত্রস্পর্শঃ (ক্রমসন্দর্ভ); শ্রীভগবানের নাম, রূপ, গুণ, পরিকর-সম্বন্ধিনী কথা ও লীলা-সম্বন্ধিনী কথার শ্রবণ বা কর্ণকুহরে প্রবেশ। মহদ্ ব্যক্তি-

দিগের মুখ-নিঃসৃত নামরূপাদি-কথা-শ্রবণেরই বিশেষ মাহাত্ম্য। শ্রবণের মধ্যে শ্রীভাগবত-শ্রবণই পরম শ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, শ্রীমদ্ভাগবত পরম-রসময় গ্রন্থ এবং এই গ্রন্থের শব্দ-সমূহেরও একটা বিশেষ শক্তি আছে। নাম, রূপ, গুণ, পরিকর ও লীলা—ইহাদের যে কোনও একটীর শ্রবণে, অথবা যে কোনও ক্রমানুসারে দুইটী বা তিনটীর শ্রবণেও প্রেমলাভ হইতে পারে সত্য ; তথাপি কিন্তু নামের পর রূপ, রূপের পর গুণ, গুণের পর পরিকর এবং পরিকরের পর লীলার কথা শ্রবণের একটা বিশেষ সুবিধা ও উপকারিতা আছে। প্রথমতঃ নাম-শ্রবণে অন্তঃকরণ-শুদ্ধি হইয়া থাকে ; শুদ্ধান্তঃকরণে রূপের কথা শুনিলেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণরূপটী উদিত হইতে পারে ; চিত্তে শ্রীকৃষ্ণপরূপটী সম্যক্‌রূপে উদিত হইলে পরে যদি গুণের কথা শুনা যায়, তাহা হইলেই চিত্তে সে সমস্ত গুণ স্ফুরিত হইতে পারে ; গুণ স্ফুরিত হইলেই পরিকরদের কথা শ্রবণ করার সুবিধা ; কারণ, গুণ স্ফুরিত হইলেই পরিকরদের বৈশিষ্ট্যের জ্ঞানে গুণ-বৈশিষ্ট্য স্ফুরিত হয় ; এইরূপে নাম, রূপ, গুণ এবং পরিকর-বৈশিষ্ট্য স্ফুরিত হইলেই চিত্তে সম্যক্‌রূপে লীলার স্ফুরণ হইতে পারে।

কীর্ত্তনং—নাম-রূপ-গুণ-পরিকর-লীলাকথার কীর্ত্তন। এস্থলেও শ্রবণের ন্যায় নামরূপাদির যথাক্রমে কীর্ত্তন বিশেষ উপকারী। নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত—"নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্—ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব।" কিরূপে নামকীর্ত্তন করিলে কৃষ্ণপ্রেম জন্মিতে পারে, তৃণাদপি শ্লোকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাহা বলিয়া গিয়াছেন। কলিকালে নামকীর্ত্তনই বিশেষ প্রশস্ত। "নামসঙ্কীর্ত্তন কলৌ পরম উপায়। শ্রীচৈ,চ, ৩।২০।৭॥ ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ—নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি॥ তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন। শ্রীচৈ,চ, ৩।৪।৬৫-৬৬।" যেহেতু, "নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে।" নামকীর্ত্তনসম্বন্ধে কাল-দেশাদির নিয়মও নাই। "খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। কাল-দেশ-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ শ্রীচৈ,চ, ৩।২০।১৪॥" নাম-কীর্ত্তনসম্বন্ধে কাল-দেশাদির নিয়ম না থাকিলেও কলিতে নামকীর্ত্তনের প্রশস্ততার হেতু এই যে—"সর্ব্বত্রৈব যুগে শ্রীমৎকীর্ত্তনস্য সমানমেব সামর্থ্যং কলৌ তু শ্রীভগবতা কৃপয়া তদ্‌গ্রাহ্যতে, ইত্যপেক্ষয়ৈব তত্তৎ-প্রশংসেতি স্থিতম্—সকল যুগেই কীর্ত্তনের সমান সামর্থ্য, কলিতে শ্রীভগবান্ নিজেই কৃপা করিয়া তাহা গ্রহণ করান, এই অপেক্ষাতেই কলিতে কীর্ত্তনের প্রশংসা (ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব)।" ভগবান্ কলিযুগে দুইভাবে নাম প্রচার করেন। প্রথমতঃ, যুগাবতার-রূপে। কলিযুগের ধর্ম্মই হইল নাম-সঙ্কীর্ত্তন ; সাধারণ কলিতে যুগাবতার-রূপেই ভগবান্ নাম-সঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন, নাম বিতরণ করেন। এইরূপে ভগবান কর্ত্তৃক নাম বিতরিত হয় বলিয়া কলিযুগে নামের বৈশিষ্ট্য। দ্বিতীয়তঃ, বিশেষ কলিতে—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ যে দ্বাপরে অবতীর্ণ হন, তাহার অব্যবহিত পরবর্ত্তী কলিতে—স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন তাঁহার কৃপা-শক্তিকে পূর্ণতমরূপে বিস্তারিত করিয়া শ্রীশ্রীগৌররূপে এইরূপ বিশেষ কলিতেই—আপামর-সাধারণকে হরিনাম গ্রহণ করাইয়া থাকেন, অন্য কোনও যুগে এইরূপ করেন না—ইহা এইরূপ বিশেষ কলিতে হরিনামের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। পরমকৃপালু শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজে এবং তাঁহার পার্ষদগণের দ্বারা আপামর

সাধারণকে নামগ্রহণ করাইবার সময়ে নামের সঙ্গে নামগ্রহণকারীর মধ্যে স্বীয় কৃপাশক্তি সঞ্চারিত করিয়া থাকেন, যাহার প্রভাবে নামগ্রহণকারী অবিলম্বেই নামের মুখ্য ফল অনুভব করিতে সমর্থ হয়—ইহা কলিতে হরিনামের দ্বিতীয় বিশেষত্ব। এই বৈশিষ্ট্য অন্য কোনও যুগে সম্ভব হয় না ; কারণ, অন্য কোনও যুগে শ্রীচৈতন্য আত্মপ্রকট করেন না। মহাভাবময়ী শ্রীরাধাই পূর্ণতম প্রেম-ভাণ্ডারের একমাত্র অধিকারিণী ; নিজে সেই প্রেমভাণ্ডারের আস্বাদন করিয়া আপামর সাধারণকে তাহার আস্বাদন পাওয়াইবার সঙ্কল্প লইয়াই শ্রীরাধার নিকট হইতে ঐ প্রেম-ভাণ্ডার গ্রহণ করিয়া স্বয়ং ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র শ্রীরাধাকৃষ্ণ-যুগলিত-বিগ্রহ শ্রীচৈতন্যরূপে বিশেষ কলিতে আত্মপ্রকট করিয়া থাকেন এবং এই প্রেম আস্বাদনের মুখ্য উপায়স্বরূপ নাম বিতরণ করিবার ও করাইবার সময়ে নামকে প্রেমমণ্ডিত করিয়া দিয়া থাকেন। প্রেমময়বপু শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর শ্রীমুখোদ্‌গীর্ণ নাম প্রেমামৃত-বিমণ্ডিত, পরমমধুর, অচিন্ত্য-শক্তিসম্পন্ন ; শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর অপ্রকটের পরেও জীবের মঙ্গলের নিমিত্ত প্রচারিত তাঁহার শ্রীমুখোচ্চারিত নাম পরম-শক্তিশালী—ইহা এই কলিতে নামের অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য। এসমস্ত কারণে কীর্ত্তনকারীর প্রতি নামের কৃপা কলিতে যত সহজে হয়, অন্য কোনও যুগে তত সহজে হয় না। "অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্—এজন্যই কলিতে যদি অন্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতেও হয়, তাহা হইলেও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের সংযোগেই তাহা করিবে। শ্রীজীব।" কিন্তু সাধককে দশটী নামাপরাধ হইতে নিজেকে রক্ষা করিয়া নামকীর্ত্তন করিতে হইবে, নচেৎ নাম অভীষ্ট ফল—প্রেম—প্রদান করিবে না। অপরাধ থাকিলে নাম-কীর্ত্তন করা সত্ত্বেও প্রেমের উদয় হয় না। "হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥ তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ শ্রীচৈ,চ, ১।৮।২৫—২৬।" নামাপরাধ থাকিলে যাঁহার নিকটে অপরাধ, তিনি ক্ষমা করিলে, কিম্বা অবিশ্রান্ত নামকীর্ত্তন করিলেই সেই অপরাধের খণ্ডন হইতে পারে। "মহদপরাধস্য ভোগ এব নিবর্ত্তক স্তদনুগ্রহো বা—মহতের নিকটে অপরাধ হইলে ভোগের দ্বারা, অথবা তাঁহার অনুগ্রহদ্বারাই তাহার ক্ষয় হইতে পারে। ক্রমসন্দর্ভ।" নিজের দৈন্য প্রকাশ, স্বীয় অভীষ্টের বিজ্ঞপ্তি, স্তবপাঠাদিও এই কীর্ত্তনেরই অন্তর্ভুক্ত (শ্রীজীব)।

স্মরণম্—লীলাস্মরণ। নামকীর্ত্তনাপরিত্যাগেন স্মরণং কুর্য্যাৎ—নামসঙ্কীর্ত্তন পরিত্যাগ না করিয়া, নামসঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গেই স্মরণ করিবে—শ্রীভগবানের লীলাদির চিন্তা করিবে। স্মরণের পাঁচটী স্তর—স্মরণ, ধারণা, ধ্যান, ধ্রুবানুস্মৃতি ও সমাধি। **স্মরণ**—শ্রীভগবল্লীলাদিসম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ অনুসন্ধান। **ধারণা**—অন্য সমস্ত বিষয় হইতে চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া ভগবল্লীলাদিতে সামান্যকারে মনোধারণ হইল ধারণা। **ধ্যান**—বিশেষরূপে রূপাদির চিন্তনকে ধ্যান বলে। **ধ্রুবানুস্মৃতি**—অমৃত-ধারার ন্যায় অবিচ্ছিন্নভাবে যে চিন্তন, তাহার নাম ধ্রুবানুস্মৃতি। **সমাধি**—ধ্যেয়মাত্রের স্ফুরণকে বলে সমাধি। লীলাস্মরণে যদি কেবল লীলারই স্ফূর্ত্তি হয়, অন্য কিছুর স্ফূর্ত্তি লোপ পাইয়া যায়, তবে তাহাকেও সমাধি (বা গাঢ় অবেশ) বলে ; দাস্যসখাদি ভাবের ভক্তদেরই এই জাতীয় সমাধি হইয়া

থাকে। আর পূর্ব্বোক্ত ধ্যেয়মাত্রের (উপাস্য শ্রীকৃষ্ণস্বরূপাদির) স্ফুরণজনিত সমাধি প্রায়শঃ শান্তভক্তদেরই হইয়া থাকে। রাগানুগামার্গে লীলা-স্মরণেরই মুখ্যত্ব। স্মরণাঙ্গের বিশেষত্ব এই যে, মনের যোগ না না থাকিলে স্মরণাঙ্গের অনুষ্ঠান একেবারেই অসম্ভব এবং মনের যোগই ভজনকে সাসঙ্গত্ব দান করিয়া সফল করে। শ্রীলঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"সাধন স্মরণ লীলা। * * মনের স্মরণ প্রাণ। (প্রেমভক্তিচন্দ্রিকা)।" প্রাণহীন দেহ যেমন শৃগাল-কুক্কুরাদির আক্রমণের বিষয় হয়, ভগবৎস্মৃতিহীন মনও কাম-ক্রোধাদির ক্রীড়ানিকেতন হইয়া পড়ে। যাহা হউক, স্মরণে মনঃসংযোগের একান্ত প্রয়োজন ; মন শুদ্ধ না হইলে মনঃসংযোগ সম্ভব হয় না ; অন্যান্য অঙ্গ এবং পুনঃ পুনঃ চেষ্টার ফলে স্মরণাঙ্গও চিত্তশুদ্ধির সহায়তা করিয়া স্মরণাঙ্গের সুষ্ঠু অনুষ্ঠানের সহায়তা করে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৭৬-৭৮ অনুচ্ছেদ) নাম, রূপ, গুণ, পরিকর, সেবা ও লীলার স্মরণের কথাও বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, নামের পরে রূপ, তাহার পরে গুণ-ইত্যাদি ক্রমে স্মরণ করাই সঙ্গত। নাম-স্মরণ-সম্বন্ধে তিনি বলিয়াছেন – নামের স্মরণ শুদ্ধান্তঃকরণের অপেক্ষা রাখে ; অর্থাৎ অন্তঃকরণ শুদ্ধ না হইলে নামের স্মরণ সুষ্ঠু হয় না। কীর্ত্তন কিন্তু শুদ্ধ অন্তঃকরণের অপেক্ষা রাখে না।

পাদসেবনং—চরণ-সেবা। কিন্তু সাধকের পক্ষে শ্রীভগবানের চরণসেবা সম্ভব নহে বলিয়া পাদ-শব্দে এস্থলে চরণ না বুঝাইয়া অন্য অর্থ বুঝায়। এস্থলে পাদ-শব্দে ভক্তিশ্রদ্ধাদি বুঝায়। শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—'পাদসেবায়াং পাদশব্দো ভক্ত্যৈব নির্দ্দিষ্টঃ। ততঃ সেবায়াং সাদরত্বং বিধীয়তে।" পাদসেবন-শব্দে সেবায় সাদরত্ব—খুব প্রীতির সহিত সেবা—বুঝাইতেছে। শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, স্পর্শন, পরিক্রমা, অনুব্রজন, ভগবন্মন্দিরে বা গঙ্গা, পুরুষোত্তম (শ্রীক্ষেত্র), দ্বারকা, মথুরাদি তীর্থস্থানাদিতে গমন, মহোৎসব, বৈষ্ণবসেবা, তুলসীসেবা প্রভৃতি পাদসেবার অন্তর্ভুক্ত (ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীব)।

অর্চ্চনং—পূজা। ক্রমসন্দর্ভে শ্রীজীবগোস্বামী বলেন—"শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির যে কোনও এক অঙ্গের অনুষ্ঠানেই যখন পুরুষার্থ সিদ্ধ হইতে পারে এবং "শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদিত্যাদি" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর (১।২।১২৯) বচনে যখন তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়, তখন শ্রীভাগবতমতে—পঞ্চরাত্রাদিবিহিত অর্চ্চনমার্গের অত্যাবশ্যকতা নাই। তথাপি যাঁহারা শ্রীনারদাদি-কথিত পন্থার অনুসরণ করিতে ইচ্ছুক, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চনাঙ্গের আবশ্যকতা আছে ; কারণ, শ্রীগুরুদেব দীক্ষাবিধানের দ্বারা শ্রীভগবানের সহিত তাঁহাদের যে সম্বন্ধ সূচনা করিয়া দেন, শ্রীনারদবিহিত অর্চ্চনাঙ্গের অনুষ্ঠানে তাহা পরিস্ফুট হইতে পারে।"

অর্চ্চন দুই রকমের—বাহ্য ও মানস ; যথাশক্তি উপাচারাদি সংগ্রহ করিয়া দেবালয়াদিতে শ্রীমূর্ত্তি-আদির যথাবিহিত পূজাই বাহ্যপূজা। আর কেবল মনে মনে যে পূজা, তাহার নাম মানস পূজা, মানস-পূজার উপকরণাদি মনে মনেই সংগ্রহ করিতে হয়, মনে করিতে হয়—"সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ

সাক্ষাতে উপস্থিত; তাঁহারই সাক্ষাতে আমিও উপস্থিত থাকিয়া পাদ্য-অর্ঘ্যাদি দ্বারা তাঁহার সেবা করিতেছি, স্বর্ণথালাদিতে যথেচ্ছভাবে উপকরণাদি সজ্জিত করিয়া তদ্দ্বারা তাঁহার পূজা করিতেছি, তাঁহার আরতি-আদি করিতেছি, তাঁহাকে চামর-ব্যজন করিতেছি, দণ্ডবৎ-নতি-পরিক্রমাদিও করিতেছি—ইত্যাদি।" বাহ্য পূজার পূর্ব্বে মানস-পূজার বিধি আছে; সুতরাং মানস-পূজা অর্চ্চনেরই একটী অঙ্গ—মানস-পূজাই অর্চনাঙ্গের সাসঙ্গত্ব দান করে।* শিলাময়ী, দারুময়ী, ধাতুময়ী, বালুকাময়ী, মৃণ্ময়ী লেখ্যা বা চিত্রপটাদি, মণিময়ী এবং মনোময়ী—এই আট রকমের শ্রীমূর্ত্তির মধ্যে মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তিটী কোনও পরিদৃশ্যমান বস্তুদ্বারা গঠিত নহে, শাস্ত্রাদিতে শ্রীকৃষ্ণরূপের যে বর্ণনা আছে, তদনুযায়ী মনে চিন্তিত শ্রীকৃষ্ণমূর্ত্তিই এই মনোময়ী শ্রীমূর্ত্তি—মানসীমূর্ত্তি। শ্রীমূর্ত্তিপূজার উপলক্ষ্যে এই মনোময়ী-মূর্ত্তিপূজার বিধি থাকাতে বাহ্যপূজাব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে কেবল মানস-পূজার বিধিও পাওয়া যাইতেছে; ক্রমসন্দর্ভে মানস-পূজা-সম্বন্ধে শ্রীজীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"এষা ক্বচিৎ স্বতন্ত্রাপি ভবতি। মনোময্যা মূর্ত্তেরষ্টমতয়া স্বাতন্ত্র্যেণ বিধানাৎ। অর্চ্চাদৌ হৃদয়ে বাপি যথালব্ধোপচারকৈরিত্যাবির্হোত্র-বচনে বা-শব্দাৎ।" এই সমস্ত প্রমাণ হইতে বাহ্যপূজা না করিয়া কেবলমাত্র মানস-পূজার বিধিও পাওয়া যায়। মানস-পূজার মাহাত্ম্য-সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একটী উপাখ্যান শ্রীজীবগোস্বামী ক্রমসন্দর্ভে বিবৃত করিয়াছেন। তাহা এই। প্রতিষ্ঠানপুরে এক বিপ্র ছিলেন; অত্যন্ত দরিদ্র; স্বীয় কর্ম্মফল মনে করিয়া এই দারিদ্র্যকে তিনি শান্তচিত্তেই বহন করিতেন। এই সরলবুদ্ধি বিপ্র একদিন এক ব্রাহ্মণ-সভায় বৈষ্ণব-ধর্ম্মের বিবরণ শুনিলেন; প্রসঙ্গক্রমে তিনি শুনিলেন—"তে চ ধর্ম্মা মনসাপি সিদ্ধ্যন্তি—সেই বৈষ্ণবধর্ম্ম কেবল মনের দ্বারাও সিদ্ধ হইতে পারে।" ইহা শুনিয়া তিনিও মানস-পূজাদি করিতে ইচ্ছুক হইলেন। তিনি প্রত্যহ গোদাবরীতে স্নান করিয়া নিত্যকর্ম্ম সমাপন পূর্ব্বক মন স্থির করিয়া মনে মনে শ্রীহরিমূর্ত্তি স্থাপন পূর্ব্বক মানস-পূজায় প্রবৃত্ত হইতেন; তিনি মনে করিতেন—তিনি নিজেও যেন পট্টবস্ত্র পরিয়াছেন, শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদি করিতেছেন; তারপর স্বর্ণ-রৌপ্য-কলসে সমস্ত তীর্থের জল আনিয়া তাহাতে সুগন্ধি দ্রব্যাদি মিশ্রিত করিয়া এবং অপর নানাবিধ পরিচর্য্যার দ্রব্য আনিয়া শ্রীমূর্ত্তির স্নানাদি করাইয়া মণিরত্নাদি দ্বারা বেশভূষা করাইতেছেন, তারপর আরত্রিকাদি করিয়া মহারাজোপচারে ভোগরাগাদি দিয়া পরম পরিতোষ লাভ করিতেন। দিনের পর দিন এই ভাবে বিপ্রের ভজন চলিতে লাগিল। এইরূপে বহুকাল অতিবাহিত হইল। একদিন তিনি মনে মনে ঘৃত-সমন্বিত পরমান্ন প্রস্তুত করিয়া স্বর্ণথালায় তাহা ঢালিয়া (মনে মনে) শ্রীহরির ভোজনের নিমিত্ত থালাখানা হাতে ধরিয়া উঠাইতে গিয়া বুঝিতে পারিলেন যে, পরমান্ন অত্যন্ত গরম। যে পরিমাণ গরম হইলে ভোজনের উপযোগী হইতে পারে, তদপেক্ষা অধিক গরম কিনা—তাহা পরীক্ষা করিবার নিমিত্ত যেই মাত্র তিনি মনে মনে পরমান্নের মধ্যে আঙ্গুল দিলেন, তৎক্ষণাৎই তাঁহার আঙ্গুল পুড়িয়া গেল বলিয়া তাঁহার মনে হইল (এসমস্তই কিন্তু মনে মনে হইতেছে)। আঙ্গুল পুড়িয়া যাওয়ায় পোড়া অঙ্গুলির স্পর্শে পরমান্ন নষ্ট হইয়া গেল—ইহা ভাবিতেই তাঁহার আবেশ ছুটিয়া বাহ্যস্ফূর্ত্তি হইল;

* পরবর্ত্তী ৫৬-অনুচ্ছেদে সাসঙ্গত্বের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য।

বাহ্যজ্ঞান ফিরিয়া আসার পরে তিনি দেখিলেন—তাঁহার যথাবস্থিত দেহের আঙ্গুল পুড়িয়া গিয়াছে, সেই আঙ্গুলে বেশ বেদনাও অনুভূত হইতেছে। এদিকে শ্রীনারায়ণ বৈকুণ্ঠে বসিয়া বিপ্রের এসমস্ত ব্যাপার জানিয়া একটু হাসিলেন ; তাঁহার হাসি দেখিয়া লক্ষ্মীদেবী হাসির কারণ জিজ্ঞাসা করিলে ভক্তবৎসল শ্রীনারায়ণ সেই বিপ্রকে বৈকুণ্ঠে আনাইয়া লক্ষ্মী-আদিকে দেখাইলেন এবং তাঁহার ভজনে তুষ্ট হইয়া বিপ্রকে বৈকুণ্ঠেই স্থান দান করিলেন।

অর্চ্চনাঙ্গের সাধনে সেবাপরাধাদি বর্জ্জন করিতে হইবে। অর্চ্চনাঙ্গের বিধি এবং সেবাপরাধাদির বিবরণ শ্রীহরিভক্তিবিলাসাদিতে দ্রষ্টব্য।

বন্দনং— নমস্কার। বস্তুতঃ ইহা অর্চ্চনেরই অন্তর্ভুক্ত ; তথাপি বন্দনাদির অত্যধিক মাহাত্ম্যবশতঃ বন্দনও একটী স্বতন্ত্র অঙ্গরূপে কীর্ত্তিত হইয়াছে। এক হস্তে, বস্ত্রাবৃতদেহে, শ্রীমূর্ত্তির অগ্রে, পশ্চাতে বা বামভাগে নমস্কারাদি করিলে অপরাধ হয়। অর্চ্চনাঙ্গের ন্যায় বন্দনেও অপরাধ-বিচার আছে।

দাস্যং—আমি শ্রীকৃষ্ণের দাস—এইরূপ অভিমানের সহিত তাঁহার সেবা। কেবল এইরূপ অভিমান থাকিলেই ভজন সিদ্ধ হয়। "অস্তু তাবত্তদ্ভজনপ্রয়াসঃ কেবলতাদৃশত্বাভিমানেনাপি সিদ্ধির্ভবতি—ক্রমসন্দর্ভ।" পরিচর্য্যাদ্বারাই দাস্য প্রকাশ পায়।

সখ্য—বন্ধুবৎ-জ্ঞান। শ্রীভগবান্ অনন্ত ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইলেও সাধক যদি তাঁহাকে স্বীয় বন্ধুর ন্যায় মনে করেন, বন্ধুর ন্যায় মনে করিয়া তাঁহার (ভগবানের) মঙ্গলের বা সুখের নিমিত্ত চেষ্টা করেন, তাহা হইলেই ভগবানের প্রতি তাঁহার সখ্য প্রকাশ পায়। গ্রীষ্মের উত্তাপে উপাস্য-দেবের খুব কষ্ট হইতেছে মনে করিয়া সাধক যদি তাঁহাকে ব্যজন করিতে থাকেন, চন্দনাদি সুগন্ধি ও শীতল দ্রব্যের যোগাড় করিয়া দেন, তাহা হইলেই বন্ধুর কাজ হইবে। দাস্য অপেক্ষা সখ্যের বিশেষত্ব এই যে, সখ্যে প্রীতিমূলক বিশ্রম্ভ—বিশ্বাসময় ভাব আছে।

আত্মনিবেদনং—শ্রীভগবানে আত্মসমর্পণ। আত্মসমর্পণ করিলে নিজের জন্য আর কোনও চেষ্টাই থাকে না ; দেহ, মন, প্রাণ সমস্তই শ্রীভগবানের কার্য্যেই নিয়োজিত হইয়া থাকে। যে ব্যক্তি তাহার গরু বিক্রয় করিয়া ফেলে, সে যেমন আর সেই গরুর ভরণ-পোষণাদির জন্য কোনওরূপ চেষ্টা করে না, তদ্রূপ যিনি ভগবানে আত্মসমর্পণ করেন, তিনিও আর নিজের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত স্বতন্ত্রভাবে কোনও চেষ্টা করেন না।

৩৬। সাসঙ্গ ও অনাসঙ্গ ভজন

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সাসঙ্গ সাধন এবং অনাসঙ্গ সাধন—এই দুই রকমের সাধনের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু সাসঙ্গ এবং অনাসঙ্গ বলিতে কি বুঝায় ?

যে সাধনে "আসঙ্গ" নাই, তাহা হইতেছে "অনাসঙ্গ" সাধন ; আর, যাহাতে "আসঙ্গ" আছে, তাহা হইতেছে "সাসঙ্গ" সাধন।

কিন্তু "আসঙ্গ" কি ? ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।১।২৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"আসঙ্গেন সাধননৈপুণ্যমেব বোধ্যতে, তন্নৈপুণ্যঞ্চ সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিঃ।—আসঙ্গ-শব্দে সাধন-নৈপুণ্যই বুঝায় ; সেই নৈপুণ্য হইতেছে সাক্ষাদ্‌ ভজনে প্রবৃত্তি।"

যে উপায়ে বা কৌশলে সাধন-ভজন সার্থক হইতে পারে, তাহা যিনি জানেন এবং সাধন-ভজন-ব্যাপারে যিনি সেই কৌশলের প্রয়োগ করেন, তাঁহাকেই ভজন-বিষয়ে নিপুণ বলা যায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, ভক্তিমার্গের এই কৌশলটী হইতেছে—সাক্ষাদ্‌ ভজনে প্রবৃত্তি—"শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাতে উপস্থিত থাকিয়া তাঁহার প্রীতির জন্যই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা হইতেছে, সাক্ষাদ্‌ভাবে তাঁহার চরণেই ফুল-চন্দনাদি দেওয়া হইতেছে, তাঁহার সাক্ষাতে থাকিয়া তাঁহার প্রীতির নিমিত্তই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি করা হইতেছে"—সাধকের চিত্তের এইরূপ একটী ভাব। কৃষ্ণস্মৃতিহীন ভাবে ইহা কখনও সম্ভব হইতে পারে না। সুতরাং কৃষ্ণস্মৃতিই সাধকের সাধনকে সাসঙ্গত্ব দান করিয়া সার্থক করিতে পারে ; তাই শ্রীকৃষ্ণস্মৃতিহীন ভাবে ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান হইবে অনাসঙ্গ সাধন।

এজন্যই বলা হইয়াছে,

"স্মর্ত্তব্যঃ সততং বিষ্ণুর্বিস্মর্ত্তব্যো ন জাতু চিৎ। সর্ব্বে বিধিনিষেধাঃ স্যুরেতয়োরেব কিঙ্করাঃ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।৫-ধৃত পাদ্মোত্তর-বচন॥

—সর্ব্বদা শ্রীবিষ্ণুর স্মরণ করিবে (ইহাই মূল বিধি) ; কখনও তাঁহাকে বিস্মৃত হইবে না (ইহাই হইতেছে মূল নিষেধ)। অন্য সমস্ত বিধি-নিষেধ হইতেছে উল্লিখিত বিধি-নিষেধদ্বয়ের কিঙ্কর (অনুপূরক ও পরিপূরক)।"

এ-স্থলে অন্বয়ীমুখে এবং ব্যতিরেকী মুখে সর্ব্বদা কেবল ভগবৎস্মৃতির উপদেশই দেওয়া হইয়াছে। সমস্ত বিধিনিষেধের প্রাণবস্তুই হইতেছে ভগবৎ-স্মৃতি ; ভগবৎ-স্মৃতিহীনভাবে বিধি-নিষেধের পালনে সাধনপথে অগ্রসর হওয়া যায় না।

ক। ভগবৎ-স্মৃতিই সাধনের প্রাণবস্তু

শ্রুতি বলিয়াছেন, ব্রহ্মকে জানিলেই জন্মমৃত্যুর অতীত হওয়া যায় (অর্থাৎ মোক্ষ লাভ করা যায়), ইহার আর অন্য উপায় নাই। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি, নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়।" পরব্রহ্মকে অনাদিকাল হইতে জানেনা বলিয়াই, অনাদিকাল হইতে ব্রহ্মকে বিস্মৃত হইয়া আছে বলিয়াই, জীবের সংসার-বন্ধন। এই অনাদি-বিস্মৃতিই সংসার-বন্ধনের হেতু বলিয়া এই হেতুকে দূর করিতে পারিলেই সংসার-বন্ধন অপসারিত হইতে পারে। বিস্মৃতিকে দূর করিতে হয় স্মৃতিদ্বারা। এজন্যই মোক্ষকামীর পক্ষে সর্ব্বদা, অর্থাৎ সকল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই, বিষ্ণুস্মৃতির ব্যবস্থা।

আর, যাঁহারা পরব্রহ্ম ভগবানের প্রেমসেবাকামী, তাঁহারাও তাঁহাদের একমাত্র প্রিয় ভগবান্‌কে অনাদিকাল হইতেই বিস্মৃত হইয়া আছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত॥ বৃহদারণ্যক॥ ১।৪।৮॥", "প্রেম্ণ হরিং ভজেৎ॥ শতপথশ্রুতিঃ॥"—ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের অনুসরণে তাঁহারাও রস-স্বরূপ প্রিয়স্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবানের প্রীতিবিধানের জন্য বলবতী ইচ্ছার (প্রেমের) সহিত প্রিয়-রূপে তাঁহার উপাসনা করিয়া থাকেন। সেই প্রিয়স্বরূপের স্মৃতি, সকল সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই, তাঁহাদের চিত্তে পোষণ করা কর্ত্তব্য। যাঁহাকে প্রিয়রূপে পাইতে হইবে, তাঁহার স্মৃতি চিত্তে জাগ্রত না থাকিলে তাঁহাতে প্রিয়ত্ববুদ্ধিই বা কিরূপে জন্মিবে এবং প্রিয়রূপে তাঁহাকে পাওয়াই বা যাইবে কিরূপে ?

সুতরাং সকলের পক্ষেই সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান-সময়ে সর্ব্বদা ভগবৎ-স্মৃতি চিত্তে পোষণ করা একান্ত কর্ত্তব্য। এইরূপ সাধনকেই সাসঙ্গ সাধন বলে। ইহাই ভজন-নৈপুণ্য।

কেবলমাত্র ভক্তিমার্গের সাধককেই যে স্বীয় উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিতে হয়, তাহা নহে; সকল পন্থাবলম্বীরই ইহা অত্যাবশ্যক। "তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি"-ইত্যাদি শ্রুতিবাক্যের উল্লেখ করিয়া, মোক্ষাকাঙ্ক্ষীরও যে তাহা প্রয়োজন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। আর একটী বিষয়েও মোক্ষাকাঙ্ক্ষীর অবহিত হওয়া প্রয়োজন। পূর্ব্বেই (৫।৪৭-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগ ভক্তির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং মোক্ষাকাঙ্ক্ষীকেও ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানও তাঁহার সাধন-নৈপুণ্যের অন্তর্ভুক্ত, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানব্যতীত তাঁহার সাধনও সাসঙ্গ হইতে পারে না। আবার, ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের সময়ে উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের স্মৃতিও অপরিহার্য্য। "চতুর্ব্বিধা ভজন্তে মাং জনাঃ সুকৃতিনোঽর্জ্জুনঃ। আর্ত্তো জিজ্ঞাসুরর্থার্থী জ্ঞানী চ ভরতর্ষভ॥"-ইত্যাদি গীতাবাক্যে, সকাম-সাধকের এবং মোক্ষাকাঙ্ক্ষী জ্ঞানীর যে ভগবদ্‌ভজনের কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেই ভগবৎ-স্মৃতির অপরিহার্য্যত্বের কথা জানা যায়। যাঁহার ভজন করিতে হইবে, তাঁহার স্মৃতি অবশ্যই অপরিহার্য্য।

এইরূপে দেখা গেল—সকল পন্থাবলম্বী সাধকের পক্ষেই ভগবৎ-স্মৃতি অপরিহার্য্য। বস্তুতঃ ভগবৎ-স্মৃতিই হইতেছে সাধনের প্রাণবস্তু।

যিনি নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মসাযুজ্য চাহেন, নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের স্মৃতি তাঁহার চিত্তে না থাকিলে কিরূপে তাঁহার সাধন সার্থকতা লাভ করিবে ? যিনি পরমাত্মার সহিত মিলন চাহেন, পরমাত্মার স্মৃতি তাঁহার চিত্তে না থাকিলে তাঁহার সাধনই বা কিরূপে সার্থক হইতে পারে ?

খ। অনাসঙ্গ ভজনে প্রেম লাভ হইতে পারেনা

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হরিভক্তিকে (প্রেমকে) সুদুর্ল্লভা বলিয়াছেন।

"জ্ঞানতঃ সুলভা মুক্তির্ভুক্তি র্যজ্ঞাদিপুণ্যতঃ॥
সেয়ং সাধনসাহস্রৈ র্হরিভক্তিঃ সুদুর্ল্লভা॥ ভ,র,সি, ১।১।২৩-ধৃত তন্ত্রবচন।

—মহাদেব ভগবতীর নিকটে বলিয়াছেন—নৈপুণ্যসহকৃত জ্ঞানমার্গের অনুসরণে অনায়াসেই মুক্তি লাভ হইতে পারে এবং নৈপুণ্যসহকারে অনুষ্ঠিত যজ্ঞাদি-পুণ্যকর্ম্মদ্বারা স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগ-প্রাপ্তিও সুলভ হইতে পারে ; কিন্তু এই হরিভক্তি সহস্র সহস্র সাধনেও সুদুর্ল্লভা।"

হরিভক্তির (বা প্রেমের) এই সুদুর্ল্লভত্ব দুই রকমের—এক, কিছুতেই পাওয়া যায় না, অর্থাৎ একেবারেই অলভ্য ; আর, পাওয়া যায় বটে, তবে শীঘ্র নয়। কিরূপ সাধনে একেবারেই দুর্ল্লভ এবং কিরূপ সাধনেই বা বিলম্বে হইলেও পাওয়া যাইতে পারে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহাও বলিয়াছেন।

"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি।
হরিণা চাশ্বদেয়েতি দ্বিধা স্যাৎ সা সুদুর্ল্লভা॥ ভ,র,সি, ১।১।২২॥

—হরিভক্তি দুই রকমে সুদুর্ল্লভা। এক—অনাসঙ্গভাবে (অর্থাৎ সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভাবে) বহুকাল সাধন করিলেও পাওয়া যায়না (অর্থাৎ অনাসঙ্গ-সাধনে একেবারেই অলভ্যা) ; আর—(সাসঙ্গ ভাবে ভজন করিলেও) শ্রীহরিকর্তৃক আশু (শীঘ্র) অদেয়া (অর্থাৎ পাওয়া যায় বটে, কিন্তু শীঘ্র নহে)।" [চাশ্বদেয়া—চ+আশু+অদেয়া]

অনাসঙ্গ-সাধন সম্বন্ধেই শ্রীল কবিরাজ গোস্বামী বলিয়াছেন,

"বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ-কীর্ত্তন।
তবু নাহি পায় কৃষ্ণপদে প্রেমধন॥ শ্রীচৈ,চ,১।৮।১৫॥"

অনাসঙ্গ-ভাবে (সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিহীন ভাবে) বহু জন্ম পর্যন্ত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম পাওয়া যায়না।

আর, সাসঙ্গ ভাবে ভজন করিলেও যে শীঘ্র পাওয়া যায়না, তাহার তাৎপর্য্য কি ? কতদিন পর্য্যন্ত, বা কত জন্ম পর্য্যন্ত সাসঙ্গ ভজন করিলে প্রেম পাওয়া যায় ?

এ-স্থলে শ্লোকস্থ "আশু—শীঘ্র"-শব্দে কোনওরূপ সময়ের সীমাকে লক্ষ্য করা হয় নাই, সাধকের চিত্তের একটী অবস্থাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। যে পর্য্যন্ত সাধকের চিত্তের একটা বিশেষ অবস্থা না জন্মে, সে-পর্য্যন্ত হরিভক্তি বা প্রেম লাভ হয়না। কি সেই অবস্থা ?

"ভুক্তিমুক্তিস্পৃহা যাবৎ পিশাচী হৃদি বর্ত্ততে।
তাবদ্ ভক্তিসুখস্যাত্র কথমভ্যুদয়ো ভবেৎ॥ ভ,র,সি, ১।২।১৫॥ পদ্মপুরাণ-বচন॥

—যে পর্য্যন্ত চিত্তে ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহারূপা পিশাচী থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত সেই চিত্তে কিরূপে ভক্তিসুখের আবির্ভাব হইবে ?"

ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, যে পর্য্যন্ত সাধকের চিত্তে ভুক্তির (ইহকালের সুখসম্পদ্, কি পরকালের স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগের) বাসনা থাকিবে, এমন কি, যে পর্য্যন্ত মুক্তির জন্য বাসনাও থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত প্রেমভক্তির আবির্ভাব সম্ভবপর নহে। কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার

বাসনা হৃদয়ে স্ফুরণের জন্য ভগবানের চরণে প্রার্থনা জানাইয়া সাসঙ্গ ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে গুরুকৃপায় এবং ভগবৎ-কৃপায় যখন চিত্ত হইতে ভুক্তিবাসনা এবং মুক্তিবাসনা সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইয়া যায়, তখনই সাধকের চিত্ত প্রেমভক্তির আবির্ভাবের যোগ্যতা লাভ করে, তাহার পূর্ব্বে নহে।

গ। উত্তমা ভক্তিতে সাসঙ্গত্বের বিশেষত্ব

যাঁহারা ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবাপ্রার্থী, তাঁহাদের সাধনকেই উত্তমা বা শুদ্ধা সাধনভক্তি বলা হয়। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের চারিভাবের পরিকর আছেন—দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর (বা কান্তাভাব)। সাধক ভক্ত স্বীয় অভিরুচি অনুসারে এই চারিভাবের যে কোনও একভাবের সেবা কামনা করিতে পারেন। সেবার উপযোগী পার্ষদদেহ লাভ করিয়া সিদ্ধ অবস্থাতে স্বীয় ভাবোচিত লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবাই ভক্তসাধকের কাম্য। সুতরাং তাঁহার সাসঙ্গত্ব, বা ভজননৈপুণ্য, বা সাক্ষাদ্‌ ভজনে প্রবৃত্তি হইবে—স্বীয় অভীষ্ট পার্ষদদেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহে সাক্ষাদ্‌ভাবে, অর্থাৎ পার্ষদদেহে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে উপস্থিত থাকিয়া, শ্রীকৃষ্ণসেবার চিন্তা। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন, ইহাই শুদ্ধা ভক্তিমার্গের ভূতশুদ্ধি।

ভূতশুদ্ধি-ব্যাপারটী হইতেছে এইরূপ। জীবের দেহের উপাদানভূত পঞ্চমহাভূত জড় বস্তু বলিয়া বাস্তবিক অশুদ্ধ ; চিদ্রূপ জীবাত্মার সহিত সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাহারা চেতন বলিয়া, সুতরাং শুদ্ধ বলিয়া, পরিগণিত হয়। দেহাত্মবুদ্ধি জীব এই জড়, অচেতন, দেহকেই "আমি" বলিয়া মনে করে বটে ; বস্তুতঃ, দেহ কিন্তু "আমি বা জীব" নহে। দেহ বা দেহের উপাদান পঞ্চমহাভূত হইতেছে বাস্তবিক জীব বা জীবাত্মা হইতে ভিন্ন। এইরূপ যে অবধারণ, তাহাই ভূতশুদ্ধি। দেহের উপাদান ভূতপঞ্চকের বিশোধনই ভূতশুদ্ধি। (১)

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—জপহোমাদি ক্রিয়া শাস্ত্রোক্ত বিধান অনুসারে অনুষ্ঠিত হইলেও ভূতশুদ্ধিব্যতীত সমস্তই নিষ্ফল হইয়া যায়।(২)

কিরূপে ভূতশুদ্ধি করিতে হয়, শাস্ত্রপ্রমাণ-প্রদর্শনপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। "প্রথমে করকচ্ছপিকা মুদ্রা রচনা করত প্রদীপকলিকাকার জীবাত্মাকে বুদ্ধিযোগে

---

(১) শরীরাকারভূতানাং ভূতানাং যদ্বিশোধনম্। অব্যয়ব্রহ্মসম্পর্কাৎ ভূতশুদ্ধিরিয়ংমতা॥ হরিভক্তিবিলাস॥ ৫।৩৩॥ শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামিকৃত টীকা। যথা। শরীরস্য আকারভূতানাম্ আকৃতিত্বং প্রাপ্তানাং শরীরতয়া পরিণতানামিত্যর্থঃ পঞ্চমহাভূতানামুপলক্ষণমেতৎ সর্ব্বেষামেব দৈহিকতত্ত্বানাম্ অব্যয়ব্রহ্মণো জীবতত্ত্বস্য সম্পর্কাৎ তদাত্মকতয়া। যদ্বা, শ্রীভগবতোঽংশত্বেন সম্বন্ধাদ্ধেতোর্বিশোধনং কার্য্যকারণাদিভিন্নতয়া বিজ্ঞানং যদিয়বেম ভূতশুদ্ধির্মতাঽভিজ্ঞৈঃ॥

(২) ভূতশুদ্ধিং বিনা কর্ত্তুর্জপহোমাদিকাঃ ক্রিয়াঃ। ভবন্তি নিষ্ফলাঃ সর্ব্বা যথাবিধ্যপ্যনুষ্ঠিতাঃ॥ হ, ভ, বি, ৫।৩৪। টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নিষ্ফলা ভবন্তি আত্মশোধনং বিনা মূলাশুদ্ধেঃ—জপহোমাদি ক্রিয়ার যে মূল, ভূতশুদ্ধি না করিলে তাহাই অশুদ্ধ থাকিয়া যায় বলিয়া সমস্ত ক্রিয়া নিষ্ফল হইয়া যায়।"

হৃদয়কমল হইতে লইয়া শিরঃস্থ সহস্রদল কমলের অন্তর্ব্বর্ত্তী পরমাত্মাতে সংযোজিত করিবে। তদনন্তর চিন্তা করিবে যে, পৃথ্ব্যাদি তত্ত্বসকল তাঁহাতে বিলীন হইয়াছে। বামকর উত্তানভাবে রাখিয়া তন্নিম্নে দক্ষিণ হস্ত সম্বদ্ধ করিলেই তাহাকে করকচ্ছপিকা মুদ্রা কহে; ভূতশুদ্ধিতে এই মুদ্রা আবশ্যক। যথাবিধানে দেহ শুদ্ধ করিয়া দাহ করিবে; পুনর্ব্বার সুধাবর্ষণ দ্বারা উহাকে আশু উৎপাদন করিয়া দৃঢ়ীভূত করত তাহাতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা করিতে হইবে। ত্রৈলোক্য-সম্মোহনতন্ত্রেও এই বিষয়ে কথিত আছে যে, সুধীব্যক্তি নাভিপ্রদেশগত অনিলদ্বারা পাপপুরুষসহ শরীরকে শুষ্ক করিবে এবং ঐ শরীরকে হৃৎপ্রদেশস্থ বহ্নিদ্বারা দাহ করিতে হইবে। তার পর ভাবনা করিবে যে, ভালপ্রদেশস্থ সহস্রার-কমলস্থ বিশুদ্ধ পূর্ণশশী সুধাময়। সেই শশাঙ্ক হইতে ক্ষরিত সুধাধারাদ্বারা দগ্ধীভূত শরীরকে প্লাবিত করিবেন। তদনন্তর চিন্তা করিবেন, এই পাঞ্চভৌতিক শরীর ঐ সমস্ত বর্ণাত্মিকা ধারার সহযোগে যেন পূর্ব্ববৎ হইয়াছে, ইত্যাদি। তৎপরেও বর্ণিত আছে যে, মন্ত্রবিৎ ব্যক্তি তদনন্তর বিশুদ্ধ আত্মতত্ত্ব-স্বরূপ তেজ ঐ সহস্রদল কমল হইতে প্রণবদ্বারা আকর্ষণপূর্ব্বক হৃৎপ্রদেশে সংস্থাপিত করিয়া অব্যয় হরির ভাবনা করিবেন। অথবা পূর্ব্বকথিত রূপে সামর্থ্য না হইলে কেবলমাত্র চিন্তাদ্বারাই ভূতশুদ্ধি করত তদনন্তর সম্প্রদায়ানুসারে প্রাণায়াম করিবেন।—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্নকৃত অনুবাদ।”(৩)

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা গেল—জপহোমাদি, বা শ্রীভগবানের চিন্তাদিও যথাবস্থিত অশুদ্ধ পঞ্চভূতাত্মক দেহের করণীয় নহে; উল্লিখিত বিধানে এই দেহকে শুদ্ধ করিয়া আর একটী অন্তশ্চিন্তিত দেহেই তৎসমস্ত করণীয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—

“অথ তেষাং শুদ্ধভক্তানাং ভূতশুদ্ধ্যাদিকং যথামতি ব্যাখ্যায়তে। তত্র ভূতশুদ্ধির্নিজাভিলষিত-ভগবৎসেবৌপয়িক-তৎপার্ষদদেহ-ভাবনাপর্য্যন্তৈব তৎসেবৈকপুরুষার্থিভিঃ কার্য্যা, নিজানুকূল্যাৎ॥ ভক্তিসন্দর্ভ॥ ২৮৬॥--শুদ্ধ ভক্তগণের ভূতশুদ্ধি প্রভৃতির প্রকার যথামতি ব্যাখাত হইতেছে। তন্মধ্যে ভূতশুদ্ধি—স্বীয় অভিলষিত ভগবৎ-সেবার উপযোগী ভগবৎ-পার্ষদদেহ-ভাবনা পর্য্যন্তই কর্ত্তব্য। যেহেতু, শুদ্ধভক্তগণ ভগবৎসেবাকেই একমাত্র পুরুষার্থ বলিয়া মনে করেন, তাহাই তাঁহাদের একমাত্র কাম্য; তাঁহাদের পক্ষে ঐরূপ ভাবনাই নিজেদের ভাবের অনুকূল হইয়া থাকে।”

এইরূপে দেখা গেল—স্বীয় অভীষ্ট সেবার উপযোগী পার্ষদদেহের চিন্তাই হইতেছে শুদ্ধভক্তের ভূতশুদ্ধি। এইরূপ পার্ষদ-দেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহে স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবার চিন্তাই, অন্তশ্চিন্তিত পার্ষদ-দেহে শ্রীকৃষ্ণের সান্নিধ্যে থাকিয়া তাঁহার প্রীতির উদ্দেশ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলেই শুদ্ধভক্তের ভজন সাসঙ্গ হইতে পারে।

প্রশ্ন হইতে পারে—শাস্ত্রে কোনও কোনও স্থলে এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয় যে, সাধক নিজেকে স্বীয় অভীষ্টদেবতারূপে চিন্তা করিবেন, কিম্বা ভগবানের সহিত সাধক নিজের ঐক্য চিন্তা করিবেন। এ-সকল স্থলে উল্লিখিতরূপ পার্ষদ-দেহ-চিন্তার সঙ্গতি কিরূপে রক্ষিত হইতে পারে?

(৩) শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস ॥৫।৩৫-৪১॥ গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত, ১৩১৮ বঙ্গাব্দ।

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন,

"এবং যত্র যত্রাত্মনো নিজাভীষ্ট-দেবতারূপত্বেন চিন্তনং বিধীয়তে, তত্র তত্রৈব পার্ষদত্বে গ্রহণং ভাব্যম্, অহংগ্রহোপাসনায়াঃ শুদ্ধভক্তৈর্দ্বিষ্টত্বাৎ। ঐক্যঞ্চ তত্র সাধারণ্যপ্রায়মেব—তদীয়চিচ্ছক্তিবৃত্তি-বিশুদ্ধসত্ত্বাংশবিগ্রহত্বাৎ পার্ষদানাম্॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২৮৬॥—এইরূপে, যেখানে-যেখানে সাধকের স্বীয় অভীষ্টদেবরূপে নিজেকে চিন্তা করিবার বিধান শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে, সেখানে-সেখানেও স্বীয় অভীষ্ট-দেবের পার্ষদত্বই ভাবনা করিতে হইবে ; কেননা, (নিজেকে স্বীয় অভীষ্টদেবরূপে চিন্তা করা হইতেছে অহংগ্রহোপাসনা) অহংগ্রহোপাসনাকে শুদ্ধভক্তগণ দ্বেষ করিয়া থাকেন (ইহা তাঁহাদের ভাবের প্রতিকূল)। উল্লিখিত বিধানে যে ঐক্যের কথা আছে, তাহা সাধারণ্যপ্রায়ই ; অর্থাৎ ভগবান্ বিভুচৈতন্য এবং জীব অণুচৈতন্য ; চৈতন্যাংশ উভয়ের মধ্যেই আছে বলিয়া চৈতন্যাংশ হইতেছে উভয়ের মধ্যে সাধারণ ; চৈতন্যাংশে উভয়ের ঐক্য চিন্তাই উল্লিখিতরূপ বিধানের তাৎপর্য্য। আর, যে পার্ষদদেহের চিন্তা করিতে হইবে, সিদ্ধাবস্থায় ভক্ত জীব সেই পার্ষদদেহই লাভ করিবেন এবং সেই পার্ষদদেহও হইবে ভগবানের চিচ্ছক্তির বৃত্তিবিশেষ শুদ্ধসত্ত্ববিগ্রহ—সুতরাং চৈতন্য-স্বরূপ। সেই পার্ষদদেহের সহিতও চৈতন্যাংশে ভগবানের সাম্য বা একতা আছে।

সার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—শুদ্ধ ভক্ত সকল স্থলেই স্বীয় অভীষ্ট সেবার উপযোগী পার্ষদ-দেহ চিন্তা করিবেন। ইহা তাঁহার ভজনের সাসঙ্গত্বের বিশেষত্ব।

৫৭। আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা এবং স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২১৭-অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন, পূর্ব্বে যে সাধন-ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহা হইতেছে তিন রকমের—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা এবং স্বরূপসিদ্ধা। এ-স্থলে তাঁহার আনুগত্যে এই তিন রকমের সাধনভক্তির কিঞ্চিৎ পরিচয় দেওয়া হইতেছে।

ক। আরোপসিদ্ধা ভক্তি

"তত্রারোপসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি ভগবদর্পণাদিনা ভক্তিত্বং প্রাপ্তা কর্ম্মাদিরূপা।—তন্মধ্যে, যাহা স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, অথচ ভগবানে অর্পণাদিদ্বারা যাহা ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, তাহা হইতেছে আরোপসিদ্ধা ভক্তি ; যেমন কর্ম্মাদিরূপে।"

তাৎপর্য্য এই—"অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"-ইত্যাদি প্রমাণে জানা গিয়াছে, যে সাধনভক্তিতে আনুকূল্যের সহিত কৃষ্ণানুশীলন আছে, এবং যে অনুশীলনে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনাব্যতীত অন্য কোনও বাসনা থাকে না এবং জ্ঞানকর্ম্মাদির সহিত যাহা মিশ্রিত নহে, তাহাই হইতেছে উত্তমা সাধনভক্তি বা স্বরূপতঃ ভক্তি। যাহাতে এ-সমস্ত লক্ষণ নাই, তাহা স্বরূপতঃ ভক্তি নহে। ভক্তির সাহচর্য্যব্যতীত কর্ম্মাদি কোনও ফল দিতে পারে না বলিয়া যাঁহারা স্ববিষয়ক কোনও

অভীষ্ট সিদ্ধির জন্য ভগবানের সন্তোষার্থ নিজেদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মাদি ভগবানে অর্পণ করেন, তাঁহাদের অনুষ্ঠিত কর্ম্মাদি স্বরূপতঃ ভক্তি নহে ; তথাপি ভগবানে অর্পণাদি করা হয় বলিয়া সেই কর্ম্মাদিকেও এক রকমের ভক্তি বলা হয় ; কেননা, অর্পণ করা হয় ভগবৎ-সন্তোষার্থ, যদিও এই ভগবৎ-সন্তোষের উদ্দেশ্য হইতেছে সাধকের নিজের অভীষ্টসিদ্ধি ; সুতরাং ইহাতে অন্যাভিলাষিতাশূন্য কৃষ্ণানুশালন নাই ; এজন্য ইহা বাস্তবিক ভক্তি নহে ; ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপিত হয় মাত্র। এজন্য ইহাকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলে, ইহার ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয় কেবল আরোপের দ্বারা।

প্রশ্ন হইতে পারে—যাহা স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, আরোপের দ্বারাই বা তাহার ভক্তিত্ব কিরূপে সিদ্ধ হইতে পারে ? মৃণ্ময় পাত্রকে গলিত স্বর্ণদ্বারা আবৃত করিলে তাহাকে স্বর্ণনির্ম্মিত পাত্র বলিয়া পরিচিত করা যায় (তাহাতে স্বর্ণনির্ম্মিতত্ব আরোপিত হয়) বটে ; কিন্তু বস্তুতঃ তো তাহা স্বর্ণনির্ম্মিত হইয়া যায় না।

শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর আলোচনা হইতে এইরূপ প্রশ্নের একটা উত্তর পাওয়া যাইতে পারে।

"নৈষ্কর্ম্ম্যমপ্যচ্যুতভাববর্জ্জিতং ন শোভতে জ্ঞানমলং নিরঞ্জনম্। কুতঃ পুনঃ শশ্বদভদ্রমীশ্বরে ন চার্পিতং কর্ম্ম যদপ্যকারণম্॥ শ্রীভা,১।৫।১২॥—ভগবদ্‌ভক্তিহীন নির্ম্মল ব্রহ্মজ্ঞানও বিশেষ শোভা পায়না (অর্থাৎ তদ্দ্বারা তত্ত্বসাক্ষাৎকার হয়না); ঈশ্বরে অনর্পিত—সুতরাং সতত অমঙ্গলরূপ যে-সকাম এবং নিষ্কাম কর্ম্ম যদি ভগবদ্‌ভক্তিহীন হয়, তাহা যে শোভা পাইবেনা (সফল হইবেনা), তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে ?"-এই শ্লোকের উল্লেখ করিয়া শ্রীপাদ জীব বলিয়াছেন—"ইত্যাদৌ সকাম-নিষ্কামযোর্দ্বয়োরপি কর্ম্মণো নিন্দা, ভগবদ্‌বৈমুখ্যাবিশেষাৎ।—এ-সমস্ত প্রমাণ-শ্লোকে সকাম এবং নিষ্কাম-এই উভয়বিধ কর্ম্মেরই নিন্দার কথা জানা যায় ; সকাম কর্ম্মেও যেমন ভগবদ্‌-বৈমুখ্য, নিষ্কাম-কর্ম্মেও তদ্রূপ ভগবদ্‌বৈমুখ্য ; ভগবদ্‌বৈমুখ্য-বিষয়ে সকাম ও নিষ্কাম কর্ম্মের বিশেষত্ব কিছু নাই।" তাৎপর্য্য এই যে, ভগবদ্‌বৈমুখ্য থাকিলে, অর্থাৎ ভক্তিসংশ্রব-বর্জ্জিত হইলে, জ্ঞানমার্গের সাধনেও যেমন ফল পাওয়া যায়না, তেমনি সকাম-কর্ম্মেরও ফল পাওয়া যায়না, নিষ্কাম-কর্ম্মেরও ফল পাওয়া যায়না।

কিন্তু ভগবানে অর্পিত হইলে যাদৃচ্ছিক ব্যবহারিক প্রয়াসও ভক্তিত্ব প্রাপ্ত হয়, বৈদিক কর্ম্মের কথা আর কি বলা যাইবে ?

"কায়েন বাচা মনসেন্দ্রিয়ৈর্ব্বা বুদ্ধ্যাত্মনা বানুসৃতস্বভাবাৎ।
করোতি যদ্ যৎ সকলং পরস্মৈ নারায়ণায়েতি সমর্পয়েত্তৎ ॥শ্রীভা, ১১।২।৩৬॥

—(নবযোগীন্দ্রের একতম শ্রীল কবি নিমি-মহারাজের নিকটে বলিয়াছেন) কায় (দেহ), বাক্য, মন ও ইন্দ্রিয়দ্বারা, বুদ্ধি ও চিত্তের দ্বারা, কিম্বা অনুসৃত স্বভাব হইতে (অর্থাৎ নিজের স্বভাব বশতঃ দৈহিক ও ব্যবহারিক) যাহা কিছু করা হয়, তৎসমস্ত পরম-পুরুষ শ্রীনারায়ণে অর্পণ করিবে।"

শ্রীল কবি এই কথাগুলি বলিয়াছেন ভাগবতধর্ম্ম-প্রসঙ্গে। নিমিমহারাজের প্রশ্নের উত্তরে ভাগবতধর্ম্মের (উত্তমা সাধনভক্তির) কথা বলিয়া শ্রীল কবি তাহার পরে উল্লিখিত শ্লোকোক্ত কথা গুলি বলিয়াছেন। উক্ত শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভটীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"প্রথমতস্ত-ত্রাপ্যলসানাং তদ্দ্বারমাহ কায়েনেতি।—কায়েন-ইত্যাদি শ্লোকে প্রথমতঃ অলস প্রকৃতি লোকদিগের জন্য ভাগবতধর্ম্মের দ্বারের কথা বলা হইয়াছে।" তাৎপর্য্য এই যে, ভাগবতধর্ম্ম-যাজনের অনুকূল মনের অবস্থা যাঁহাদের জন্মে নাই, সেই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য চেষ্টাও যাঁহারা করেন না, তাদৃশ অলস লোকগণ প্রথমে তাঁহাদের কৃত সমস্ত কর্ম্ম শ্রীনারায়ণে অর্পণ করিবেন। অর্পণের সময়ে যথাকথঞ্চিৎ ভগবৎ-স্মৃতি জন্মিতে পারে। ক্রমশঃ অভ্যাসের ফলে যথাবিহিত উপায়ের অনুসরণে তাঁহারাও ভাগবতধর্ম্ম-যাজনের অনুকূল মানসিক অবস্থা লাভ করিতে পারিবেন। ভগবৎ-স্মৃতিই ভক্তি; কর্ম্মাদির অর্পণের সময়ে যথাকথঞ্চিৎ ভগবৎ-স্মৃতি জন্মে বলিয়াই কর্ম্মার্পণাদিকে আরোপসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়। স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, ভগবৎ-স্মৃতিরূপ ভক্তির কিঞ্চিৎ স্পর্শ ইহাতে আছে বলিয়া উপচারবশতঃই, ইহাতে ভক্তিত্ব আরোপিত হয়। সুতরাং ইহা গলিতস্বর্ণদ্বারা আবৃত মৃণ্ময় পাত্রের তুল্য নহে; এতাদৃশ মৃণ্ময় পাত্রের মৃদংশে গলিত স্বর্ণের প্রবেশ নাই; কিন্তু কর্ম্মাদির অর্পণকারীর চিত্তে ভগবৎ-স্মৃতিরূপা ভক্তির কিঞ্চিৎ, সাময়িক ভাবে হইলেও কিঞ্চিৎ, স্পর্শ আছে।

কেবল বেদবিহিত কর্ম্মাদি নহে, ব্যবহারিক কর্ম্মাদির অর্পণের কথাও উল্লিখিত শ্রীমদ্ ভাগবত-শ্লোকে বলা হইয়াছে। টীকায় শ্রীধর স্বামিপাদও লিখিয়াছেন – "ন কেবলং বিধিতং কৃতমেবেতি নিয়মঃ, স্বভাবানুসারিলৌকিকমপি।" শ্রীমদভগবদ্ গীতাতেও এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়।

"যৎ করোষি যদশ্নাসি যজ্জুহোষি দদাসি যৎ।
যত্তপ্যস্যসি কৌন্তেয় তৎকুরুষ্ব মদর্পণম্ ॥৯।২৭॥

—(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) হে কৌন্তেয়! তুমি যে কিছু কার্য্য কর, যাহা ভোজন কর, যাহা হোম কর, যাহা দান কর, ও যে তপস্যা কর, তৎসমস্ত আমাতে অর্পণ করিবে।"

এই গীতাবাক্যে লৌকিক কর্ম্মের অর্পণের কথাও জানা যায়।

ভক্তিসন্দর্ভে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী আরোপসিদ্ধা ভক্তিসম্বন্ধে অনেক আলোচনা করিয়াছেন। বাহুল্যভয়ে তাহা এ-স্থলে উল্লিখিত হইলনা।

খ। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি

যাহা স্বরূপতঃ ভক্তি নহে, ভক্তির পরিকররূপে সংস্থাপিত হয় বলিয়া যাহার ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়, তাহাকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলে।" "সঙ্গসিদ্ধা স্বতো ভক্তিত্বাভাবেঽপি তৎপরিকরতয়া সংস্থাপনেন॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥২১৭॥"

ভাগবতধর্ম্ম প্রসঙ্গে শ্রীমদ্ ভাগবতে বলা হইয়াছে,

তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ। অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ ॥
সর্ব্বতো মনসোঽসঙ্গমাদৌ সঙ্গঞ্চ সাধুষু। দয়াং মৈত্রীং প্রশ্রয়ঞ্চ ভূতেষ্বদ্ধা যথোচিতম্ ॥
শৌচং তপস্তিতিক্ষাঞ্চ মৌনং স্বাধ্যায়মার্জ্জবম্। ব্রহ্মচর্য্যমহিংসাঞ্চ সমত্বং দ্বন্দসংজ্ঞয়োঃ ॥
সর্ব্বত্রাত্মেশ্বরান্বীক্ষাং কৈবল্যমনিকেততাম্। বিবিক্ত চীরবসনং সন্তোষং যেন কেন চিৎ ॥ ইত্যাদি ॥
শ্রীভা,১১।৩।২২-২৫ ॥

তাৎপর্য্য এই। যদ্দারা ভগবান্ শ্রীহরি পরিতুষ্ট হয়েন, শ্রীগুরুদেবের শরণাপন্ন হইয়া সেই ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে। আর, সকল বিষয় হইতে মনের আসক্তি পরিহার পূর্ব্বক সাধুসঙ্গ করিবে, যথাযথ ভাবে লোকের প্রতি দয়া, মৈত্রী, সম্মান প্রদর্শন করিবে। শৌচ, তপস্যা, তিতিক্ষা, মৌন, স্বাধ্যায়, সরলতা, ব্রহ্মচর্য্য, অহিংসা, শীতোষ্ণ-সুখদুঃখাদিতে সমতা—প্রভৃতির অভ্যাস করিবে। সর্ব্বত্র ঈশ্বরের অস্তিত্ব আছে বলিয়া মনে করিবে, একান্তে বাস করিবে, গৃহাদির প্রতি মমতা ত্যাগ করিবে, যাহা কিছু পাওয়া যায়, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিবে ইত্যাদি।

ভাগবত-ধর্ম্মযাজীর পক্ষে এ-স্থলে যে সমস্ত আচরণের কথা বলা হইয়াছে, তাহাদের সমস্তই কিন্তু স্বরূপতঃ ভক্তি নহে; তবে এই সমস্ত হইতেছে ভক্তির সহায়ক, পরিকরতুল্য। সুর্ব্ববিষয়ে অনাসক্তি, লোকবিষয়ে দয়া-মৈত্রী-প্রভৃতি, মৌন-স্বাধ্যায় প্রভৃতির সহিত সাক্ষাদ্ভাবে ভগবানের সম্বন্ধ নাই; অথচ এ-সমস্তের দ্বারা ভগবদ্ভক্তির সহায়তা হয়; অন্য বিষয় হইতে চিত্তকে বিযুক্ত করিয়া ভগবদ্বিষয়ে নিয়োজিত করার আনুকূল্য হয়। এইরূপে, ভক্তির সহায়ক বা পরিকর বলিয়াই এই সমস্তের ভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়, ভক্তির সঙ্গবশতঃই ইহাদের ভক্তিত্ব। এজন্য এ-সমস্তকে সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি বলা হয়।

গ। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি

যাহা স্বতঃই ভক্তি—অর্থাৎ সাক্ষাদ্ভাবে কেবলমাত্র শ্রীকৃষ্ণপ্রীতির উদ্দেশ্যেই যাহা অনুষ্ঠিত হয়, যাহাতে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনা ব্যতীত অন্য কোনও বাসনা থাকেনা, জ্ঞান-যোগ-কর্ম্মাদির সহিতও যাহার কোনও সম্বন্ধ থাকেনা,—তাহাই স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। ভক্তি-অঙ্গের সহিত অনুষ্ঠিত হয় বলিয়া ইহার ভক্তিত্ব নহে, ভক্তির আরোপবশতঃও ইহার ভক্তিত্ব নহে, ইহা স্বরূপতঃই ভক্তি। ইহা হইতেছে সাক্ষাদ্ভাবে ভগবৎ-প্রীতিসাধিকা, আনুষঙ্গিক রূপে নহে। সাক্ষাদ্ভাবেই ভগবানের সহিত ইহার সম্বন্ধ, পরম্পরাক্রমে নহে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই হইতেছে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিতে (৫।৫৫-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ভগবানের প্রীতির উদ্দেশ্যেই বিষ্ণুর নামরূপ-গুণাদির শ্রবণ ও কীর্ত্তন, বিষ্ণুর স্মরণ, বিষ্ণুর পাদসেবন (অর্থাৎ আদরপূর্ব্বক বিষ্ণুর পরিচর্য্যাদি), বিষ্ণুর অর্চ্চন, বিষ্ণুর বন্দনা, বিষ্ণুর দাস্য, বিষ্ণুর সখ্য এবং বিষ্ণুতে আত্মসমর্পণ করা হয়। ইহাতে অব্যবধানে, সাক্ষাদ্ভাবেই, বিষ্ণুসম্বন্ধিনী কায়িক-বাচনিক-মানসিকী চেষ্টা রহিয়াছে।

আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইতে স্বরূপসিদ্ধার বৈশিষ্ট্য এই যে, আরোপ-সিদ্ধা ভক্তিতে ভগবানের সহিত কোনওরূপ সাক্ষাৎ সম্বন্ধ নাই (অর্থাৎ কেবলমাত্র ভগবৎপ্রীতির জন্যই আরোপসিদ্ধা ভক্তি অনুষ্ঠিত হয়না), অনুষ্ঠিত কর্ম্মাদি ভগবানে অর্পিত হয় মাত্র ; কিন্তু স্বরূপসিদ্ধাতে ভগবানের সহিত সাক্ষাৎ সম্বন্ধ, অর্পণের দ্বারা সম্বন্ধ নহে। আরোপসিদ্ধাতে ভগবানের সঙ্গে সম্বন্ধ হইতেছে আনুষঙ্গিক ; কিন্তু স্বরূপসিদ্ধাতে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে, সম্বন্ধ হইতেছে সাক্ষাদ্‌ভাবে।

সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি হইতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির বৈশিষ্ট্য এই যে, বিষয়ে অনাসক্তি, লোকের প্রতি যথাযথ ভাবে দয়ামৈত্রী-সম্মানাদি বস্তুতঃ ভক্তি (অর্থাৎ সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎ-প্রীতিবাসনা-মূলক কোনও ব্যাপার) নহে, ভক্তির সহায়কমাত্র ; কিন্তু স্বরূপসিদ্ধাতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবৎ-প্রীতিবাসনামূলক বলিয়া, কেবলমাত্র ভক্তিসহায়ক নহে বলিয়া, স্বরূপতঃই ভক্তি।

স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির একটী অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য এই যে, অবুদ্ধিপূর্ব্বকও যদি ইহা অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলেও ভক্তিত্বের বা ভক্তির ফলপ্রাপ্তির ব্যভিচার হয়না। "স্বরূপসিদ্ধা চ অজ্ঞানাদিনাপি তৎ প্রাদুর্ভাবে ভক্তিত্বাব্যভিচারিণী সাক্ষাত্তদনুগত্যাত্মা তদীয় শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥২১৭॥"

শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন-"প্রত্যুত মূঢ়প্রোন্মত্তাদিষু তদনুকর্ত্তৃষ্বপি কথঞ্চিৎ সম্বন্ধেন ফলপ্রাপকত্বাৎ স্বরূপসিদ্ধত্বম্।—ভক্তির অনুকরণকারী মূঢ়প্রোন্মত্ত প্রভৃতি ব্যক্তিতেও যদি ভক্তির কথঞ্চিৎ সম্বন্ধ জন্মে, তাহা হইলেও ভক্তির ফল পাওয়া যায় ; ইহাতেই শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির স্বরূপসিদ্ধভক্তিত্ব সিদ্ধ হইতেছে।"

আগুনের দাহিকা-শক্তি বা তাপদাতৃত্ব আছে, ইহা না জানিয়াও, কিম্বা ইহা যে আগুন, তাহা না জানিয়াও কেহ যদি আগুনের সহিত নিজের সম্বন্ধ ঘটায়, তাহা হইলে আগুন তাহাকে দগ্ধ বা উত্তপ্ত করিবেই। এই দগ্ধীকরণ, বা উত্তপ্তীকরণ দ্বারাই জানা যায়—ইহা স্বরূপতঃই আগুন, দাহিকা শক্তি বা উত্তাপদাতৃত্ব ইহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। তদ্রূপ, ইহা যে ভক্তি, ইহার যে কোনওরূপ ফল দানের ক্ষমতা আছে, তাহা না জানিয়াও যদি কেহ ভক্তির অনুকরণ করে (অর্থাৎ ভক্তির অনুষ্ঠানের অনুরূপ ক্রিয়া করে), এবং তাহাতে যদি ভক্তির কিছু ফল পাওয়া যায়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে, তাহা স্বরূপতঃই ভক্তি, ভক্তির ফল দেওয়ার শক্তি তাহার স্বরূপভূতা।

ভক্তি-অঙ্গের যে এইরূপ স্বরূপগতা শক্তি আছে, তাহা দেখাইবার নিমিত্ত শ্রীপাদ জীব গোস্বামী কয়েকটী উদাহরণের উল্লেখ করিয়াছেন। এ-স্থলে দুয়েকটী উদাহরণ উল্লিখিত হইতেছে।

পূর্ব্বজন্মে প্রহ্লাদ ছিলেন এক ব্রাহ্মণ-সন্তান। যৌবনে তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত কলুষিত হইয়া পড়ে, তিনি একটী বারবনিতাতে অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়েন। এক দিন সেই বেশ্যাটীর সহিত তাঁহার মনোমালিন্য হওয়ায় মনের দুঃখে তিনি সমস্ত দিন উপবাসী থাকেন। দৈবাৎ সেদিন ছিল শ্রীনৃসিংহচতুর্দ্দশী ; কিন্তু তিনি তাহা জানিতেন না। তথাপি নৃসিংহচতুর্দ্দশীতে তাঁহার উপবাস হইয়া

গেল (ইহা হইল নৃসিংহচতুর্দ্দশীব্রতের অজ্ঞানকৃত অনুকরণ)। তিনি ইহারও ফল পাইয়াছিলেন। পরজন্মে তিনি শ্রীনৃসিংহদেবের পরমভক্ত হইয়াছিলেন। নৃসিংহচতুর্দ্দশীর ব্রতপালন হইতেছে নববিধা ভক্তির অন্তর্গত পাদসেবনের অন্তর্ভুক্ত। অজ্ঞাতসারে তাহার অনুকরণেও কিছু ফল পাওয়া গিয়াছিল।

অপর দৃষ্টান্ত। একটী শ্যেন পাখী কুক্কুরকর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া কুক্কুরের হাত হইতে অব্যাহতি লাভের আশায় একটী গৃহের চতুর্দ্দিকে ঘুরিতে লাগিল। সেই গৃহটী ছিল ভগবন্মন্দির; শ্যেন অবশ্য তাহা জানিত না। এই ব্যাপারে শ্যেন পাখীটী ভগবন্মন্দির পরিক্রমার অনুকরণ করিয়াছে। তাহার ফলেই পাখীটীর বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি হইয়াছিল। (ইহাও পাদসেবনের অনুকরণ)।

এইরূপে দেখা গেল, ভক্তি-অঙ্গের অজ্ঞানকৃত অনুকরণেও ভক্তির কিছু ফল পাওয়া যায়। ফলদাতা হইতেছেন ভগবান্। এইরূপ অনুকরণেও তিনি কিছু প্রীতি লাভ করেন বলিয়াই কিছু ফল দিয়া থাকেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি-অঙ্গ স্বরূপতঃই যে ভগবৎ-প্রীতিবিধায়ক, উল্লিখিত দৃষ্টান্তসমূহদ্বারা তাহাই প্রতিপাদিত হইল। অজ্ঞাতসারে, এমন কি নিদ্রিত অবস্থাতেও, যদি কাহারও মুখে চিনি দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সে-ব্যক্তি চিনির মিষ্টত্ব অনুভব করিবে। এই মিষ্টত্ব চিনির স্বরূপগত ধর্ম্ম বলিয়াই, চিনি স্বরূপতঃ মিষ্ট বলিয়াই, ইহা সম্ভব। তদ্রূপ অজ্ঞাতসারেও যদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান বা অনুষ্ঠানের অনুকরণ করা হয়, তাহা হইলেও যখন তদ্দ্বারা ভগবানের প্রীতি জন্মিতে পারে বলিয়া জানা যায়, তখন পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায় যে, শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের স্বরূপতঃই ভগবৎ-প্রীতিজনকত্ব-শক্তি আছে। যাহা সাক্ষাদ্‌ভাবে ভগবানের প্রীতিজনক, তাহাই ভক্তি। সুতরাং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা ভক্তি যে স্বরূপতঃই ভক্তি, স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি, তাহাই প্রতিপাদিত হইল।

ঘ। সকৈতবা এবং অকৈতবা ভক্তি

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—আরোপসিদ্ধা, সঙ্গসিদ্ধা এবং স্বরূপ-সিদ্ধা, এই তিন রকমের মধ্যে প্রত্যেক রকমের ভক্তিই আবার সকৈতবা এবং অকৈতবা-এই দুই রকমের হইতে পারে। "তদেবং ত্রিবিধাপি সা পুনরকৈতবা সকৈতবা চেতি দ্বিবিধা জ্ঞেয়া॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২১৭॥"

আরোপসিদ্ধা এবং সঙ্গসিদ্ধার সহিত যে-ভক্তির সম্বন্ধ থাকে বলিয়া তাহাদের আরোপসিদ্ধ-ভক্তিত্ব এবং সঙ্গসিদ্ধভক্তিত্ব সিদ্ধ হয়, সেই ভক্তিমাত্রেই যদি অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে সেই আরোপসিদ্ধা এবং সঙ্গসিদ্ধা ভক্তি হইবে অকৈতবা। আর, যদি সাধকের স্বীয় অভীষ্ট অন্য ফল-প্রাপ্তির অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে উভয়ই হইবে সকৈতবা।

তাৎপর্য্য এই যে—অনুষ্ঠিত কর্ম্মাদির ভগবানে অর্পণাদি যদি কেবল ভগবদ্‌ভক্তিলাভের উদ্দেশ্যেই কৃত হয়, তাহা হইলে কর্ম্মাদ্যর্পণরূপা আরোপ-সিদ্ধা ভক্তি হইবে অকৈতবা। আর, যদি স্বর্গাদি-লোকের সুখ, কিম্বা মোক্ষলাভের উদ্দেশ্যে (ভক্তিব্যতীত অন্য কাম্য বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে)

অর্পণ করা হয়, তাহা হইলে সেই আরোপসিদ্ধা ভক্তি হইবে সকৈতবা। সঙ্গসিদ্ধা ভক্তিও যদি কেবল ভগবদ্‌ভক্তি লাভের উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে অকৈতবা ; আর যদি অন্য উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে সকৈতবা।

আর, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিতে জ্ঞান-কর্ম্মাদির কোনও সংশ্রব নাই। উত্তমা ভক্তিই হইতেছে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, উত্তমা ভক্তি হইতেছে—জ্ঞানকর্ম্মাদিদ্বারা অনাবৃত আনুকূল্যময় শ্রীকৃষ্ণানুশীলন। তথাপি যদি কেহ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিরূপা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভক্তিনিষ্ঠা দৃঢ়ীকরণের উদ্দেশ্যে ভগবত্তত্ত্বাদিবিষয়ে জ্ঞানের অনুশীলন করেন এবং লোকসংগ্রহার্থ বা ভগবৎপ্রীতিকামনায় বেদবিহিত কর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করেন, তাহা হইলে তাঁহার এইরূপ জ্ঞানকর্ম্মাদি হইবে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির পরিকর। এইরূপ স্থলে যদি ভগবদ্‌ভক্তিতেই তাঁহার একমাত্র অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি হইবে অকৈতবা। আর, যদি ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষাদিতেই তাঁহার একমাত্র অপেক্ষা থাকে, তাহা হইলে তাঁহার স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি হইবে সকৈতবা। "স্বরূপসিদ্ধায়াশ্চ যস্য ভগবতঃ সম্বন্ধেন তাদৃশং মাহাত্ম্যং তন্মাত্রাপেক্ষ-পরিকরত্বঞ্চেদকৈতবত্বম্, প্রয়োজনান্তরাপেক্ষয়া কর্ম্মজ্ঞানপরিকত্বঞ্চেৎ সকৈতবত্বম্॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২১৭॥" শ্রীমদ্‌ভাগবতের প্রমাণেই তাহা জানা যায়। "ধর্ম্মঃ প্রোজ ঝিতকৈতবোঽত্র পরমঃ॥ শ্রীভা, ১।১।২॥"-ইত্যাদি শ্লোক হইতে জানা যায়, যাহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বাসনারূপ কৈতব প্রকৃষ্টরূপে পরিত্যক্ত হইয়াছে, ভগবদারাধনা বা ভগবৎপ্রীতিই যাহার একমাত্র লক্ষ্য, তাহাই হইতেছে পরমধর্ম্ম (৫।২৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। কৈতব নাই বলিয়া ইহা হইতেছে অকৈতব পরমধর্ম্ম এবং একমাত্র ভগবৎপ্রীতিই ইহার লক্ষ্য বলিয়া ইহা হইতেছে অকৈতবা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। শ্রীমদ্‌ভাগবতের এই প্রমাণে ইহাও ধ্বনিত হইতেছে যে, যাহাতে ধর্ম্মার্থকামমোক্ষ-বাসনারূপ কৈতব বিদ্যমান, তাহা হইবে সকৈতর, সকৈতব পরমধর্ম্ম, বা সকৈতবা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি। শ্রীমদ্‌ভাগবতের অন্য একটী প্রমাণও ইহার সমর্থন করিতেছে। "প্রীয়তেঽমলয়া ভক্ত্যা হরিরন্যদ্‌বিড়ম্বনম্। শ্রীভা, ৭।৭।৫২॥—শ্রীনারদ বলিয়াছেন, অমলা (নিষ্কামা বা শুদ্ধা) ভক্তিদ্বারাই শ্রীহরি প্রীতি লাভ করেন, (দান, তপঃ, ইজ্যা, ব্রত প্রভৃতি) অন্য যাহা কিছু, তাহা বিড়ম্বনামাত্র (অর্থাৎ শ্রীহরির প্রীতিজনক নহে)।" তাৎপর্য্য এই যে, অমলা ভক্তিতেই (অর্থাৎ যাহাতে ভগবৎপ্রীতিবাসনাব্যতীত অন্যবাসনারূপ মলিনত্ব নাই, তাহাতেই) ভগবান্ প্রীতি লাভ করেন ; সুতরাং তাহাই অকৈতবা ভক্তি। আর, যাহাতে অন্য বাসনা থাকে, তাহা সমলা, সকৈতবা।

কৃষ্ণকামনা বা কৃষ্ণভক্তিকামনাব্যতীত অন্য কামনাকেই কৈতব বলা হয়।

দুঃসঙ্গ কহি কৈতব আত্মবঞ্চনা। 'কৃষ্ণ'-'কৃষ্ণভক্তি' বিনু অন্যকামনা॥

শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।৭০॥

অজ্ঞান তমের নাম কহিয়ে 'কৈতব'। ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ-বাঞ্ছা আদি সব ॥

—শ্রীচৈ, চ, ১।১।৫০ ॥

কৃষ্ণভক্তির বাধক যত শুভাশুভ কর্ম্ম। সেহ এক জীবের অজ্ঞান-তমো ধর্ম্ম ॥

শ্রীচৈ, চ, ১।১।৫২ ॥

৫৮। মিশ্রাভক্তি

পূর্ব্বে শ্রবণকীর্ত্তনাদিরূপা যে স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহার সঙ্গে কর্ম্মজ্ঞানাদির কোনওরূপ মিশ্রণ না থাকিলে তাহা হইবে অমিশ্রা বা শুদ্ধা ভক্তি। কিন্তু তাহার সহিত যদি কর্ম্মজ্ঞানাদির মিশ্রণ থাকে, তাহা হইলে তাহা হইবে মিশ্রা ভক্তি। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২২৬-৩০ অনুচ্ছেদে) মিশ্রাভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তাঁহার আনুগত্যে এ-স্থলে মিশ্রাভক্তির কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া হইতেছে।

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—স্ব-স্ব ফলদানবিষয়ে কর্ম্ম, যোগ ও জ্ঞান, ইহাদের প্রত্যেকেই ভক্তির অপেক্ষা রাখে। সুতরাং কর্ম্মী, যোগী এবং জ্ঞানী-ইঁহাদের প্রত্যেকেরই স্ব-স্ব-মার্গবিহিত অনুষ্ঠানের সঙ্গে ভক্তির মিশ্রণ থাকিবে। ইঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তি হইবে মিশ্রাভক্তি। আবার, চিত্তের অবস্থা অনুসারে, ভক্তিমাত্রকামীদের মধ্যেও কেহ কেহ জ্ঞানকর্ম্মাদির অনুষ্ঠান করিতে পারেন। তাঁহাদের অনুষ্ঠিত ভক্তিও হইবে মিশ্রাভক্তি। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী কৈবল্যকামীদের মিশ্রাভক্তির এবং ভক্তিমাত্রকামীদেব মিশ্রাভক্তির বিষয় আলোচনা করিয়াছেন।

ক। কৈবল্যকামা মিশ্রাভক্তি

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী কৈবল্যকামা ভক্তিকে দুই রকম বলিয়াছেন—কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা এবং জ্ঞানমিশ্রা। "অথ কৈবল্যকামা, ক্বচিৎ কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ক্বচিজ্‌জ্ঞানমিশ্রা চ।"

এ-স্থলে "জ্ঞান"-শব্দের অর্থ হইতেছে "ঐকাত্ম্যদর্শন" অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মার অভেদ-দর্শন। "জ্ঞানঞ্চৈকাত্ম্যদর্শনম্ ॥ শ্রীভা, ১১।১৯।২৭।" এই জ্ঞান-সাধনের অঙ্গ শ্রবণ-মননাদি এবং বৈরাগ্য, যোগ, সাংখ্যও - ঐকাত্ম্যদর্শনরূপ জ্ঞানের অঙ্গ বলিয়া জ্ঞানেরই অন্তর্ভুক্ত, জ্ঞান বলিয়াই পরিচিত, (ভক্তি বলিয়া পরিগণিত হয় না)। "তদীয়শ্রবণমননাদীনাং বৈরাগ্য-যোগসাংখ্যানাঞ্চ তদঙ্গত্বাত্তদন্তঃপাতঃ।"

(১) কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা কৈবল্যকামা ভক্তি

শ্রীমদ্‌ভাগবতের তৃতীয় স্কন্ধ সপ্তবিংশ অধ্যায় হইতে জানা যায়, জননী দেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবকে বলিয়াছেন—প্রকৃতি ও পুরুষ হইতেছে পরস্পরের আশ্রয়; সুতরাং প্রকৃতি কখনও পুরুষকে ত্যাগ করে না; অথচ প্রকৃতি-পুরুষের বিয়োগ না ঘটিলেও মোক্ষ অসম্ভব। কিরূপে পুরুষের মোক্ষ সম্ভবপর হইতে পারে?

এই প্রশ্নের উত্তরে ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছিলেন,

"অনিমিত্তনিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণামলাত্মনা। তীব্রেণ ময়ি ভক্ত্যা চ শ্রুতসম্ভৃতয়া চিরম্।
জ্ঞানেন দৃষ্টতত্ত্বেন বৈরাগ্যেন বলীয়সা। তপোযুক্তেন যোগেন তীব্রেণাত্মসমাধিনা॥
প্রকৃতিঃ পুরুষস্যেহ দহ্যমানা ত্বহর্নিশম্। তিরোভবিত্রী শনকৈরগ্নের্যোনিরিবারণিঃ।

— শ্রীভা, ৩।২৭।২১-২৩॥"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নিমিত্তং ফলম্, তন্ন নিমিত্তং প্রবর্ত্তকং যস্মিন্ তেন নিষ্কামেন ; অমলাত্মনা নির্ম্মলেন মনসা ; জ্ঞানেন শাস্ত্রোত্থেন ; যোগো জীবাত্মপরমাত্মনোর্ধ্যানম্— 'যোগঃ সন্নহনোপায়ধ্যানসঙ্গতিযুক্তিষু'-ইতি নানার্থবর্গাৎ। ধ্যানমেব ধ্যাতৃ-ধ্যেয়-বিবেকরহিতং সমাধিঃ। অত্র 'সর্ব্বাসামেব সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্ (শ্রীভা, ১৯।৮১।১৯)'-ইত্যুক্ত্যা ভক্তেরেবাঙ্গিত্বেঽপি অঙ্গবন্নির্দ্দেশস্তেষাং তত্র সাধনান্তরসামান্যদৃষ্টিরিত্যভিপ্রায়েণ। অতএব তেষাং মোক্ষমাত্রমেব ফলমিতি।"

এই টীকা অনুসারে উল্লিখিত শ্লোকত্রয়ের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপঃ—ফলাভিসন্ধানশূন্য স্বধর্ম্মদ্বারা, নির্ম্মলচিত্তদ্বারা, ভগবৎকথা-শ্রবণদ্বারা পরিপুষ্টা তীব্রভক্তিদ্বারা, তত্ত্বদর্শী শাস্ত্রোত্থজ্ঞানের দ্বারা, বলীয়ান্ বৈরাগ্যের দ্বারা, তপোযুক্ত যোগ (জীবাত্মা-পরমাত্মার ধ্যানরূপ যোগ) দ্বারা এবং তীব্র আত্মসমাধি দ্বারা (অর্থাৎ ধ্যানই তীব্র হইলে যখন ধ্যাতৃ-ধ্যেয়-বিবেকশূন্য হয়, তখন তাহাকে সমাধি বলা হয় ; এতাদৃশ সমাধিদ্বারা) প্রকৃতি অহর্নিশ প্রচুরভাবে অভিভূয়মানা হইলে ক্রমে ক্রমে, অগ্নিযোনি কাষ্ঠের ন্যায়, পুরুষের নিকট হইতে তিরোহিতা হয়। তাৎপর্য্য এই যে—অগ্নি-প্রজ্জ্বলনের কারণ হইতেছে কাষ্ঠ ; অগ্নিকে নির্ব্বাপিত করিতে হইলে কাষ্ঠকে অগ্নি হইতে বিদূরিত করিতে হয়। তদ্রূপ, প্রকৃতি বা মায়াকে পুরুষ হইতে দূরীকরণের জন্য উল্লিখিত উপায় সকল (নিষ্কাম কর্ম্ম, নির্ম্মল চিত্ত, তীব্রভক্তি প্রভৃতি) অবলম্বন করিতে হইবে।

এ-স্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় হইতেছে এই যে—"সর্ব্বাসামপি সিদ্ধীনাং মূলং তচ্চরণার্চ্চনম্॥ শ্রীভা, ১০।৮১।১৯॥—সর্ব্বপ্রকার সিদ্ধির মূল হইতেছে ভগবচ্চরণার্চ্চন, বা ভক্তি"-এই বাক্য হইতে জানা যায়, ভক্তিই হইতেছে সমস্ত সাধনের অঙ্গিনী ; কর্ম্ম, যোগ, জ্ঞান প্রভৃতি হইতেছে ভক্তির অঙ্গ ; তথাপি উল্লিখিত কপিলদেব-বাক্যে ভক্তিকেই যে কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগের অঙ্গরূপে নির্দ্দেশ করা হইয়াছে, তাহার কারণ এই যে, যাঁহারা উল্লিখিত প্রকারে সাধন করেন, ভক্তিতে তাঁহাদের কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির সহিত সাধারণ দৃষ্টি থাকে ; অর্থাৎ কর্ম্ম-যোগ-জ্ঞানাদির প্রতি তাঁহাদের যেরূপ দৃষ্টি, ভক্তির প্রতিও সেইরূপ দৃষ্টি। কর্ম্ম-জ্ঞান-যোগাদির ন্যায় ভক্তিকেও তাঁহারা তাঁহাদের সাধনের অঙ্গ মনে করেন। ভক্তির প্রতি প্রাধান্য-জ্ঞান তাঁহাদের নাই। এজন্য মোক্ষমাত্ররূপ ফলই তাঁহারা লাভ করেন, ভক্তির মুখ্য ফল ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম তাঁহারা লাভ করিতে পারেন না।

উল্লিখিত কপিলদেব-বাক্য হইতে জানা গেল—কৈবল্যমুক্তি লাভের উদ্দেশ্যে যাঁহারা ভক্তির

অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের ভক্তির সহিত কর্ম্ম (স্বধর্ম্ম) এবং জ্ঞান (শাস্ত্রোত্থ জ্ঞান, বা জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য জ্ঞান) মিশ্রিত থাকে বলিয়া তাঁহাদের কৈবল্যকামা ভক্তি হইতেছে কর্ম্ম-জ্ঞান-মিশ্রা।

(২) জ্ঞানমিশ্রা কৈবল্যকামা ভক্তি

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, কৈবল্য-মোক্ষকামীর জ্ঞানের (অর্থাৎ জীবাত্মা-পরমাত্মার অভেদ চিন্তার) সহিত ভক্তির সাহচর্য্য অপরিহার্য্য। এ-স্থলে জ্ঞানের সহিত মিশ্রিতা ভক্তিই হইতেছে জ্ঞানমিশ্রা কৈবল্যকামা ভক্তি।

কৈবল্যকামীর আচরণ-কথন-প্রসঙ্গে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

বিবিক্তক্ষেমশরণো মদ্ভাব-বিমলাশয়ঃ।
আত্মানং চিন্তয়েদেকমভেদেন ময়া মুনিঃ॥ শ্রীভা, ১১।১৮।২১॥

—মুনি বিজন ও নির্ভয় স্থানে অবস্থান করিয়া মদীয় ভাবনাদ্বারা নির্ম্মলচিত্ত হইয়া আমার সহিত (চিদংশে) অভিন্নরূপে আত্মাকে চিন্তা করিবেন।"

এ-স্থলে "মদ্ভাব"-শব্দের অর্থ "আমার (ভগবানের) ভাবনা"; ভগবচ্চিন্তা হইতেছে ভক্তি। এই ভক্তির সহিত "ভগবান্ ও আত্মার (জীবাত্মার) অভেদ চিন্তা"-রূপ জ্ঞানের মিশ্রণ আছে বলিয়া এই ভক্তি হইতেছে জ্ঞানমিশ্রা (কৈবল্যকামা) ভক্তি।

খ। ভক্তিমাত্রকামা মিশ্রাভক্তি

ভগবদ্ভক্তিই যাঁহাদের একমাত্র চরম-কাম্য, তাঁহাদের মধ্যেও সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের সঙ্গে কেহ কেহ কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতে পারেন, কেহ কেহ বা কর্ম্ম ও জ্ঞানের, আবার কেহ কেহ বা জ্ঞানের অনুশীলনও করিতে পারেন। এইরূপে ভক্তিমাত্রকামা মিশ্রাভক্তিও তিন রকমের হইতে পারে—কর্ম্মমিশ্রা, কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা এবং জ্ঞানমিশ্রা। বলা বাহুল্য, এস্থলে "জ্ঞান"-শব্দে জীবাত্মা-পরমাত্মার ঐক্য-জ্ঞানকে বুঝায় না, ভগবত্তত্ত্বাদির জ্ঞানকেই বুঝায়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের ২২৮—৩০-অনুচ্ছেদত্রয়ে এই ত্রিবিধা ভক্তিমাত্রকামা মিশ্রাভক্তির স্বরূপ দেখাইয়াছেন। তাঁহারই আনুগত্যে এক্ষণে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

(১) ভক্তিমাত্রকামা কর্ম্মমিশ্রা ভক্তি

উদ্ধবের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের উক্তিতে কর্ম্মমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা মিশ্রাভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"শ্রদ্ধামৃতকথায়াং মে শশ্বন্মদনুকীর্ত্তনম্। পরিনিষ্ঠা চ পূজায়াং স্তুতিভিঃ স্তবনং মম॥
শ্রীভা, ১১।১৯।২০॥

মদর্থেঽর্থপরিত্যাগো ভোগস্য চ সুখস্য চ। ইষ্টং দত্তং হুতং জপ্তং মদর্থং যদ্ ব্রতং তপঃ॥
এবং ধর্ম্মৈর্মনুষ্যাণামুদ্ধবাত্মনিবেদিনাম্। ময়ি সঞ্জায়তে ভক্তিঃ কোঽন্যোঽর্থোঽস্যাবশিষ্যতে॥
শ্রীভা, ১১।১৯।২৩—২৪॥

—(শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) হে উদ্ধব ! আমার অমৃতময়ী কথায় শ্রদ্ধা (কথা-শ্রবণ বিষয়ে আদর), নিরন্তর আমার (নাম-রূপ-গুণাদির) কীর্ত্তন, আমার পূজাতে পরিনিষ্ঠা (সর্ব্বতোভাবে নিষ্ঠা), স্তুতি সমূহদ্বারা আমার স্তব, মদ্‌ভজনার্থ (ভজনবিরোধী) অর্থের (বিষয়ের) পরিত্যাগ, ভোগের (ভোগসাধন চন্দনাদির) এবং (পুত্রোপলালনাদিরূপ) সুখের পরিত্যাগ, আমার (প্রীতির) উদ্দেশ্যে ইষ্টাদি বৈদিক কর্ম্ম, (বিষ্ণু-বৈষ্ণব-সন্তোষার্থে) দান, হুত (ব্রাহ্মণ-বৈষ্ণবাদিকে ঘৃতপক্কান্নাদি-সমর্পণ), (ভগবানের নাম ও মন্ত্রাদির) জপ, আমার (প্রীতির) উদ্দেশ্যে (একাদশী-প্রভৃতি) ব্রত-পালনরূপ তপস্যা,—এই সমস্ত ধর্ম্মদ্বারা আমাতে আত্মনিবেদন-কারী মনুষ্যদিগের মদ্‌বিষয়িনী ভক্তির উদয় হয়। এই প্রকার কায়মনোবাক্যদ্বারা কেবলমাত্র আমার (ভগবানের) সন্তোষার্থ অনুষ্ঠিত ধর্ম্মে অবস্থিত থাকিয়া যাঁহারা আমাতে (ভগবানে) আত্মনিবেদন করেন, এবং কেবল ভক্তিই কামনা করেন, ভজনের বিনিময়ে অন্য কিছু কামনা করেন না, সাধনরূপ বা সাধ্যরূপ কোন্ বস্তুই বা তাঁহাদের অবশিষ্ট থাকে ? [আপনা-আপনিই তাঁহাদের সর্ব্বপ্রয়োজন সিদ্ধ হইয়া থাকে। ভক্তি-মাত্রকামী ভক্ত ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাদির প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিলেও সে-সমস্ত তাঁহার আশ্রিত বা অনুগত হইয়াই থাকে ; কেননা, 'যস্যাস্তি ভক্তির্ভগবত্যকিঞ্চনা সর্ব্বৈর্গুণৈস্তত্র সমাসতে সুরাঃ॥ শ্রীভা, ৫।১৮।১২॥—ভগবানে যাঁহার অকিঞ্চনা ভক্তি থাকে, সুরগণ (গরুড়াদি ভগবানের প্রিয়-পার্ষদগণ) সর্ব্বগুণের সহিত তাঁহাতে অবস্থান করেন']।"

এ-স্থলে দেখা গেল—ভক্তিকামীর শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির সহিত ইষ্টাদি বৈদিক কর্ম্মের মিশ্রণ আছে। এজন্য এই ভক্তিমাত্রকামা মিশ্রাভক্তি হইতেছে কর্ম্মমিশ্রা।

(২) ভক্তিমাত্রকামা কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তি

দেবহূতির নিকটে কপিলদেবের উপদেশে ভক্তিমাত্রকামা কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়। ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন,

"নিষেবিতানিমিত্তেন স্বধর্ম্মেণ মহীয়সা। ক্রিয়াযোগেণ শস্তেন নাতিহিংস্রেণ নিত্যশঃ॥
মদ্ধিষ্ণ্যদর্শনস্পর্শ-পূজাস্তুত্যভিবন্দনৈঃ। ভূতেষু মদ্ভাবনয়া সত্ত্বেনাসঙ্গমেন চ॥
মহতাং বহুমানেন দীনানামনুকম্পয়া। মৈত্র্যা চৈবাত্মতুল্যেষু যমেন নিয়মেন চ॥
আধ্যাত্মিকানুশ্রবণান্নামসঙ্কীর্ত্তনাচ্চ মে। আর্জ্জবেনার্য্যসঙ্গেন নিরহংক্রিয়য়া তথা॥
মদ্ধর্ম্মণো গুণৈরেতৈঃ পরিসংশুদ্ধ আশয়ঃ। পুরুষস্যাঞ্জসাভ্যেতি শ্রুতমাত্রগুণং হি মাম্॥
—শ্রীভা, ৩।২৯।১৫-১৯॥"

মর্ম্মানুবাদ। ভগবান্ কপিলদেব বলিয়াছেন—যিনি শ্রদ্ধাদিযুক্ত হইয়া নিত্য-নৈমিত্তিক কর্ম্মরূপ স্বধর্ম্মের সম্যক্‌রূপে অনুষ্ঠান করেন, অতিহিংসা বর্জ্জনপূর্ব্বক (অর্থাৎ প্রাণাদি পীড়া পরি-ত্যাগ করিয়া ফলপত্রাদি জীবায়ব অঙ্গীকার পূর্ব্বক) উত্তম দেশ-কালাদিতে পঞ্চরাত্রাদি-শাস্ত্রপ্রোক্ত বৈষ্ণবানুষ্ঠানরূপ ক্রিয়াযোগের নিষ্কামভাবে নিত্য অনুষ্ঠান করেন, আমার (ভগবানের) প্রতিমার

দর্শন-স্পর্শন-পূজা-স্তুতি-নমস্কার করেন, আমি (ভগবান্) অন্তর্য্যামিরূপে সর্ব্বভূতে বিরাজিত—এইরূপ ভাবনা করেন, ধৈর্য্য ও বৈরাগ্যের অভ্যাস করেন, মহাত্মাদিগের প্রতি বহু সম্মান প্রদর্শন করেন, দীনজনের প্রতি দয়া এবং আত্মতুল্য লোকদের প্রতি বন্ধুভাব প্রদর্শন করেন, (অহিংসা, অচৌর্য্য, ব্রহ্মচর্য্য ও অপরিগ্রহ-এই চতুর্ব্বিধ) যম এবং (শৌচ, সন্তোষ, তপস্যা, স্বাধ্যায় এবং ঈশ্বর-প্রণিধান—এই পঞ্চবিধ) নিয়ম পালন করেন, আত্ম-অনাত্মবিবেক-শাস্ত্র শ্রবণ করেন, আমার (ভগবানের) নামসঙ্কীর্ত্তন করেন, সাধুসঙ্গ করেন, এবং যিনি সরল ও নিরহঙ্কার, মদ্ বিষয়ক ধর্ম্মের এই সমস্ত গুণে তাঁহার চিত্ত বিশুদ্ধ হয় (অন্যাবেশ দূরীভূত হইয়া কেবল ভগবানেই তাঁহার গাঢ় আবেশ জন্মে)। তখন তিনি আমার (ভগবানের) গুণশ্রবণমাত্রেই অনায়াসে আমাকে প্রাপ্ত হয়েন (অর্থাৎ ভগবদ্ বিষয়ে ধ্রুবানুস্মৃতি বা অবিচ্ছিন্না মনোগতি লাভ করেন)।”

এস্থলে নামসঙ্কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির সঙ্গে স্বধর্ম্মাচরণরূপ কর্ম্মের এবং আধ্যাত্মিক (আত্ম-অনাত্মবিবেক-শাস্ত্র) শ্রবণাদিরূপ জ্ঞানের মিশ্রণ আছে ; অথচ সাধকের অভীষ্ট হইতেছে একমাত্র ভগবদ্ ভক্তি। এজন্য ইহা হইতেছে কর্ম্মজ্ঞানমিশ্রা ভক্তিমাত্রকামা মিশ্রা ভক্তি।

(৩) ভক্তিমাত্রকামা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তি

চিত্রকেতুর প্রতি ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণের উক্তিতে ভক্তিমাত্রাকামা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উদাহরণ দৃষ্ট হয়।

“দৃষ্টশ্রুতাভির্মাত্রাভির্নির্মুক্তঃ স্বেন তেজসা।
জ্ঞানবিজ্ঞানসংতৃপ্তো মদ্ ভক্তঃ পুরুষোভবেৎ॥ শ্রীভা, ৬।১৬।৬২॥

—(ভগবান্ শ্রীসঙ্কর্ষণ বলিয়াছেন) স্বীয় বিবেকবলে ঐহিক ও আমুষ্মিক বিষয় হইতে নির্ম্মুক্ত হইয়া জ্ঞান (শাস্ত্রোত্থজ্ঞান) এবং বিজ্ঞান (অপরোক্ষ অনুভূতি) লাভ করিয়া সম্যক্ রূপে তৃপ্ত হইয়া সাধক আমার (ভগবানের) ভক্ত হয়েন।”

এস্থলে সাধকের কাম্য বস্তু হইতেছে কেবল ভগবদ্ ভক্তি। তাঁহার সাধনে জ্ঞান মিশ্রিত আছে বলিয়া ইহা হইতেছে ভক্তিমাত্রকামা জ্ঞানমিশ্রা ভক্তির উদাহরণ।

যাহার সহিত কর্ম্মজ্ঞানাদির কোনওরূপ মিশ্রণ নাই, তাহাই হইতেছে শুদ্ধা বা স্বরূপ-সিদ্ধা ভক্তি। স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

সকামা এবং কৈবল্যকামা স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি

স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি বস্তুতঃ সকামাও নহে, কৈবল্যকামাও নহে ; ইহার একমাত্র লক্ষ্য হইতেছে ভগবদ্ভক্তি। কেহ কেহ অন্য উদ্দেশ্য সিদ্ধির অভিপ্রায়েও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। এ-সকল স্থলে উপাসকের সঙ্কল্পগুণ ভক্তিতে উপচারিত হয়। এইরূপ উপচার

বশতঃ স্বরূপসিদ্ধা ভক্তি দুই রকম ভেদ প্রাপ্ত হয়—সকামা এবং কৈবল্যকামা। যাঁহারা কৈবল্য-প্রাপ্তির সঙ্কল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিকে বলে কৈবল্যকামা ভক্তি; আর যাঁহারা ভক্তিপ্রাপ্তির বা কৈবল্যপ্রাপ্তির সঙ্কল্প ব্যতীত অন্য কোনও অভীষ্ট প্রাপ্তির সকল্প হৃদয়ে পোষণ করিয়া শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের স্বরূপসিদ্ধা ভক্তিকে বলে **সকামা ভক্তি**।

যাঁহার মধ্যে সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ-এই তিনটী গুণের যে গুণটী প্রবল, তাঁহার সঙ্কল্পও হয় তদনুরূপ। এই গুণের প্রতিফলনে ভক্তি হইয়া যায় (গুণোপচার বশতঃ) সগুণা।

সকামা ভক্তি আবার দুই রকমের—তামসী এবং রাজসী। কৈবল্যকামা ভক্তি সাত্ত্বিকী।

পূর্ব্বেই ৫।৫০-ক অনুচ্ছেদে তামসী ভক্তির কথা, ৫।৫০-খ অনুচ্ছেদে রাজসী ভক্তির কথা এবং ৫।৫০-গ-অনুচ্ছেদে সাত্ত্বিকী বা কৈবল্যকামা ভক্তির কথা আলোচিত হইয়াছে।

৬০। বৈধী ভক্তি

সাধনে প্রবর্ত্তক মনোভাব অনুসারে স্বরূপসিদ্ধা (বা অকিঞ্চনা, বা উত্তমা, বা আত্যন্তিকী) ভক্তি দুই রকমের—বৈধী এবং রাগানুগা।

কেবলমাত্র শাস্ত্রোক্ত বিধিদ্বারা প্রবর্ত্তিত হইয়া সাধক যখন স্বরূপসিদ্ধা ভক্তির অনুষ্ঠান করেন, তখন তাঁহার ভক্তিকে বলা হয় বৈধী ভক্তি, বা বিধিমার্গের ভক্তি। বিধিমার্গ সম্বন্ধে পূর্ব্বে (৫।৪৪-অনুচ্ছেদে) আলোচনা করা হইয়াছে।

বিধিমার্গে সাধনভক্তির অঙ্গগুলির কথা এ-স্থলে বলা হইতেছে।

ক। চৌষট্টি অঙ্গ সাধনভক্তি

উত্তমা সাধনভক্তির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নয়টী অঙ্গের কথা পূর্ব্বেই (৫।৫৫-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে। ইহাদের কোনও কোনওটীর আবার অনেক বৈচিত্রী আছে; তাহাতে সাধনভক্তিও বহুবিধ হইয়া পড়ে। "বিবিধাঙ্গ সাধনভক্তি বহুত বিস্তার॥ শ্রীচৈ,চ ২।২২।৬০॥" শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে বিধিমার্গে সাধনভক্তির চৌষট্টিটী অঙ্গের কথা বলিয়াছেন। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের মধ্যলীলার দ্বাবিংশ পরিচ্ছেদে এবং ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ববিভাগ-দ্বিতীয় লহরীতে তাহাদের উল্লেখ আছে। এ-স্থলে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু হইতে সাধনভক্তির এই চৌষট্টিটী অঙ্গের নাম উল্লিখিত হইতেছে; পরে তাহাদের সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইবে।

(১) গুরুপদাশ্রয়, (২) দীক্ষাদি-শিক্ষণ, (৩) গুরুসেবা, (৪) সাধুবর্ত্মানুগমন, (৫) সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা, (৬) কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ, (৭) কৃষ্ণতীর্থে (দ্বারকাদিতে বা গঙ্গাদির সমীপে) বাস, (৮) যাবৎ-নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ (সর্ব্ববিধ ব্যবহারে যাবদর্থানুবর্ত্তিতা), (৯)

হরিবাসর-সম্মান (একাদশী-আদি ব্রতের পালন), (১০) ধ্যত্র্যশ্বত্থাদির গৌরব (ধ্যত্র্যশ্বত্থ-গো-বিপ্র- বৈষ্ণবপূজন)।

এই দশটী অঙ্গ সাধনভক্তির আরম্ভ স্বরূপ। "এষামত্র দশাঙ্গানাং ভবেৎ প্রারম্ভরূপতা ॥ ভ,র, সি, ১।২।৪৩॥" এই দশটী অঙ্গ গ্রহণ না করিলে সাধনের আরম্ভ হইতে পারে না।

(১১) ভগবদ্‌বিমুখ জনের সঙ্গত্যাগ, (১২) শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্ব (বহু শিষ্য না করা), (১৩) মহারম্ভাদিতে অনুদ্যম, (১৪) বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস ও ব্যাখ্যানবাদ বর্জ্জন, (১৫) ব্যবহারে অকার্পণ্য, (১৬) শোকাদির বশীভূত না হওয়া, (১৭) অন্যদেবতায় অবজ্ঞাহীনতা, (১৮) প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া, (১৯) সেবাপরাধ-নামাপরাধ উদ্ভূত হইতে না দেওয়া (সেবানামা-পরাধাদি বিদূরে বর্জ্জন), (২০) শ্রীকৃষ্ণ বা কৃষ্ণভক্ত সম্বন্ধে বিদ্বেষ বা নিন্দা সহ্য না করা।

শেষোক্ত (১১-২০ পর্য্যন্ত) দশটী অঙ্গ বর্জ্জনাত্মক। এ-স্থলে যে দশটী বিষয় নিষিদ্ধ হইল, ভজনকামীকে সেগুলি বর্জ্জন করিতে হইবে।

উল্লিখিত বিশটী অঙ্গ হইতেছে ভক্তিতে প্রবেশ করার পক্ষে দ্বারস্বরূপ। "অস্যাস্তত্র প্রবেশায় দ্বারত্বেঽপ্যঙ্গবিংশতেঃ। ভ,র,সি ১।২।৪৩॥" দ্বার বলার তাৎপর্য্য এই যে, গৃহের মধ্যে প্রবেশ করিতে হইলে যেমন দ্বার দিয়াই যাইতে হইবে, দ্বারব্যতীত অন্য কোনও দিক্ দিয়াই যেমন গৃহের মধ্যে প্রবেশ করা যায়না, তদ্রূপ ভক্তির সাধনে প্রবেশ লাভ করিতে হইলেও উক্ত বিশটী অঙ্গ পালন করিতে হইবে, এই বিশটী অঙ্গকে উপেক্ষা করিয়া কেহ ভক্তিসাধনের যোগ্য হইতে পারেনা।

উল্লিখিত বিশটী অঙ্গের মধ্যে আবার প্রথমোক্ত গুরুপদাশ্রয়, দীক্ষা ও গুরুসেবা—এই তিনটী প্রধান। "ত্রয়ং প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকম্ ॥ ভ,র,সি, ১।২।৪৩॥" যিনি গুরুপদে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া, যথারীতি দীক্ষা গ্রহণ করেন এবং শ্রদ্ধাপূর্ব্বক গুরুসেবাদিদ্বারা গুরুকৃপা লাভ করিতে পারেন, সাধনভক্তি তাঁহার পক্ষেই সুগম ও সুখজনক হইয়া থাকে।

অতঃপর মুখ্য ভজনাঙ্গগুলি কথিত হইয়াছে; যথা—

(২১) শ্রীহরিমন্দিরাখ্যতিলকাদি বৈষ্ণব-চিহ্নধারণ, (২২) শরীরে শ্রীহরির নামাক্ষর লিখন, (২৩) নির্ম্মাল্যধারণ, (২৪) শ্রীহরির অগ্রে নৃত্য, (২৫) দণ্ডবৎ নমস্কার, (২৬) শ্রীমূর্ত্তিদর্শনে অভ্যুত্থান, বা গাত্রোত্থান, (২৭) অনুব্রজ্যা (শ্রীমূর্ত্তির পাছে পাছে গমন), (২৮) ভগবদধিষ্ঠান-স্থানে গমন, (২৯) পরিক্রমা, (৩০) অর্চ্চন (পূজা), (৩১) পরিচর্য্যা, (৩২) গীত, (৩৩) সঙ্কীর্ত্তন, (৩৪) জপ, (৩৫) বিজ্ঞপ্তি (নিবেদন), (৩৬) স্তবপাঠ, (৩৭) নৈবেদ্যের (মহাপ্রসাদের) স্বাদ গ্রহণ, (৩৮) চরণামৃতের স্বাদ গ্রহণ, (৩৯) প্রসাদী ধূপমাল্যাদির সৌরভ গ্রহণ, (৪০) শ্রীমূর্ত্তির স্পর্শন, (৪১) শ্রীমূর্ত্তির দর্শন, (৪২) আরতি ও উৎসবাদির দর্শন, (৪৩) শ্রবণ, (৪৪) ভগবৎ-কৃপেক্ষণ (কৃপাপ্রাপ্তির জন্য আশা ও প্রার্থনা), (৪৫) স্মরণ, (৪৬) ধ্যান, (৪৭) দাস্য, (৪৮) সখ্য, (৪৯) আত্মনিবেদন, (৫০) শ্রীকৃষ্ণে নিবেদনের উপযোগী শাস্ত্রবিহিত দ্রব্যাদির মধ্যে

স্বীয় প্রিয় বস্তু শ্রীকৃষ্ণে অর্পণ, (৫১) কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা (যাহা কিছু করিবে, তাহা যেন শ্রীকৃষ্ণসেবার্থ হয়), (৫২) সর্ব্বতোভাবে শ্রীকৃষ্ণে শরণাগতি, কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুমাত্রের সেবন, যথা (৫৩) তুলসীসেবা, (৫৪) শ্রীমদ্ভাগবতাদি শাস্ত্রের সেবা, (৫৫) মথুরাধামের সেবা এবং (৫৬) বৈষ্ণবাদির সেবা ; (৫৭) নিজের অবস্থানুযায়ী দ্রব্যাদির দ্বারা ভক্তবৃন্দসহ মহোৎসব করণ, (৫৮) কার্ত্তিকাদি ব্রত (নিয়মসেবাদি), (৫৯) জন্মাষ্টমী আদি উৎসব, (৬০) শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবা, (৬১) রসিকভক্তের সহিত শ্রীমদ্ভাগবতের অর্থাস্বাদন, (৬২) সজাতীয় আশয়যুক্ত (সমভাবাপন্ন), আপনা হইতে শ্রেষ্ঠ এবং স্নিগ্ধপ্রকৃতি সাধুর সঙ্গ, (৬৩) নামসঙ্কীর্ত্তন এবং (৬৪ শ্রীমথুরামণ্ডলে অবস্থিতি।

(১) পঞ্চপ্রধান সাধনাঙ্গ

উল্লিখিত চৌষট্টি অঙ্গের মধ্যে শেষোক্ত পাঁচটী অর্থাৎ শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবন, রসিক ভক্তের সহিত ভাগবতার্থের আস্বাদন, সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন এবং মথুরাবাস-এই পাঁচটী অঙ্গ সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—

"দুরূহাদ্ভুতবীর্য্যেঽস্মিন্ শ্রদ্ধা দূরেঽস্তু পঞ্চকে।
যত্র স্বল্পোঽপি সম্বন্ধঃ সদ্ধিয়াং ভাবজন্মনে॥ ১।২।১১০॥

—(উল্লিখিত) পাঁচটী দুর্জ্ঞেয় ও আশ্চর্য্য-প্রভাবশালী ভজনাঙ্গে—শ্রদ্ধা দূরে থাকুক—অত্যল্পমাত্র সম্বন্ধ থাকিলেও নিরপরাধ ব্যক্তিগণের চিত্তে ভাবের (কৃষ্ণপ্রেমের) উদয় হইতে পারে।" [সদ্ধিয়াং—নিরপরাধচিত্তানাম্॥ শ্লোকটীকায় শ্রীজীবগোস্বামী]

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

সাধুসঙ্গ, নামকীর্ত্তন, ভাগবত-শ্রবণ মথুরাবাস, শ্রীমূর্ত্তির শ্রদ্ধায় সেবন॥
সকল সাধনশ্রেষ্ঠ এই পঞ্চ অঙ্গ। কৃষ্ণপ্রেম জন্মায় এই পাঁচের অল্পসঙ্গ॥

শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৭৪-৭৫॥

(২) ভজনে দেহেন্দ্রিয়াদির পৃথক্‌রূপে এবং সমষ্টিরূপে ব্যবহার

পৃথক্ ও সমষ্টিরূপে, শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা এই চৌষট্টি অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হইবে। "ইতি কায়-হৃষীকান্তঃকরণানামুপাসনাঃ। চতুষষ্টিঃ পৃথক্ সাঙ্ঘাতিকভেদাৎ ক্রমাদিমাঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।৪৩॥"

অভ্যুত্থান, পশ্চাদ্‌গমন বা অনুব্রজ্যা, তীর্থাদিতে গমন, দণ্ডবন্নতি প্রভৃতি শরীরের দ্বারা ; শ্রবণ, কীর্ত্তন, মহাপ্রসাদভোজনাদি জিহ্বাকর্ণাদি ইন্দ্রিয়দ্বারা ; স্মরণ ও জপাদি অন্তঃকরণদ্বারা—এই সমস্তই শরীর, ইন্দ্রিয় ও অন্তঃকরণের দ্বারা পৃথক্ পৃথক্‌রূপে অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত। আর,—সাধুসঙ্গ, ভাগবত-শ্রবণ, নামসকীর্ত্তন প্রভৃতির উদ্দেশ্যে শরীরদ্বারা গমন, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয়ের দ্বারা সাধুদর্শন, সাধুর উপদেশ-ভাগবত-কথা-নামকীর্ত্তনাদির শ্রবণ, ভগবদ্‌বিষয়ক প্রশ্নাদি জিজ্ঞাসা ও নামকীর্ত্তনাদি করণ ;

এবং অন্তঃকরণদ্বারা ভাগবত-কথাদির মর্ম্মোপলব্ধি—এই সমস্তই শরীর, ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণদ্বারা সমষ্টিরূপে অনুষ্ঠানের দৃষ্টান্ত। যে অনুষ্ঠানে শরীর, চক্ষুঃকর্ণাদি ইন্দ্রিয় এবং অন্তঃকরণ-ইহাদের সকল-গুলিরই একসঙ্গে ব্যবহারের প্রয়োজন হয়, সেই অনুষ্ঠানেই তাহাদের সমষ্টিরূপে ব্যবহার।

(৩) চৌষট্টি অঙ্গ সাধনভক্তির পর্য্যবসান নববিধা ভক্তিতে

চৌষট্টি অঙ্গ সাধনভক্তির মধ্যে প্রথম বিশটী অঙ্গকে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—সাধন-ভক্তিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ। এই বিশটী অঙ্গের মধ্যে প্রথম দশটী হইতেছে গ্রহণাত্মক এবং দ্বিতীয় দশটী বর্জ্জনাত্মক। গুরুপদাশ্রয়াদি প্রথম দশটী অঙ্গকে গ্রহণ করিয়া এবং ভগবদ্‌বিমুখ লোকের সঙ্গত্যাগাদি দশটী অঙ্গকে বর্জ্জন করিয়া সাধক সাধনভক্তিতে প্রবেশ করার জন্য নিজেকে প্রস্তুত করিবেন। এই গুলি অনেকটা আচারস্থানীয়, সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের জন্য চিত্তকে অনুকূল অবস্থায় আনয়নের উপায়স্বরূপ। এ-সমস্ত আচারের পালন করিলেই সাধনভক্তিতে প্রবেশের, অর্থাৎ সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের, যোগ্যতা লাভ করা যায়। এজন্য এই গুলিকে ভক্তিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ বলা হইয়াছে।

পরবর্ত্তী চুয়াল্লিশটী অঙ্গ হইতেছে বস্তুতঃ নববিধা ভক্তি অঙ্গেরই শাখা-প্রশাখাতুল্য। একথা বলার হেতু এই।

এই চুয়াল্লিশটী অঙ্গের মধ্যে নববিধা ভক্তির অন্তর্গত—শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, অর্চ্চন, বন্দন, দাস্য, সখ্য এবং আত্মনিবেদন—এই আটটী অঙ্গের স্পষ্ট উল্লেখই আছে। অবশিষ্ট ছয়ত্রিশটী অঙ্গের মধ্যে কোনও কোনওটী উল্লিখিত আটটীর কোনও কোনওটীর অঙ্গমাত্র—যেমন, শ্রীমূর্ত্তির সেবা, শ্রীমূর্ত্তির দর্শন-স্পর্শন-আরতি, মহাপ্রসাদ-ভোজন, চরণামৃত-গ্রহণ, ধূপমাল্যাদির সৌরভ-গ্রহণ প্রভৃতি অর্চ্চনেরই অঙ্গ; গীত, জপ, স্তবপাঠ প্রভৃতিকে কীর্ত্তনের অঙ্গ বলিয়া মনে করা যায়; ভগবৎ-কৃপেক্ষণ, বিজ্ঞপ্তি, শরণাগতি প্রভৃতিকে আত্মনিবেদনের অঙ্গ বলা যায়; ইত্যাদি। আর, তুলসীসেবাদি কৃষ্ণসম্বন্ধীয় বস্তুমাত্রের সেবাদিকে নববিধা ভক্তির অন্তর্গত পাদসেবন বলিয়া মনে করা যায়।

এইরূপে দেখা গেল—চৌষট্টি অঙ্গ ভক্তি হইতেছে বস্তুতঃ নববিধা ভক্তিরই বিবৃতি, এই চৌষট্টি অঙ্গের পর্য্যাবসান নববিধা ভক্তিতেই।

(৪) এক অঙ্গের অনুষ্ঠানেও অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—সাধক স্বীয় বাসনা অনুসারে এক বা বহু মুখ্য অঙ্গের অনুষ্ঠান করিলেও নিষ্ঠা এবং তাহার পরে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন।

সা ভক্তিরেকমুখ্যাঙ্গাশ্রিতানেকাঙ্গিকাথবা।
স্ববাসনানুসারেণ নিষ্ঠাতঃ সিদ্ধিকৃদ্‌ভবেৎ॥ ১।২।১২৮॥

এই প্রসঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,

এক অঙ্গ সাধে—কেহো সাধে বহু অঙ্গ।
নিষ্ঠা হৈলে উপজয়ে প্রেমের তরঙ্গ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৭৬॥

সাধনভক্তিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ গুরুপদাশ্রয়াদি প্রথমে কথিত বিশটী অঙ্গের গ্রহণ প্রত্যেক সাধকেরই আবশ্যক। এই বিশটী অঙ্গ ব্যতীত অপর অঙ্গসমূহই মুখ্য অঙ্গ; তাহাদের মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই তাহাদের সার; তাহার মধ্যে আবার সাধুসঙ্গাদি পাঁচটী অঙ্গকে মুখ্যতম বলা হইয়াছে। সাধক দ্বারস্বরূপ বিশটী অঙ্গের গ্রহণ অবশ্যই করিবেন; তাঁহার স্বীয় রুচি অনুসারে শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধ অঙ্গের মধ্যে যে কোনও এক অঙ্গের, বা একাধিক অঙ্গেরও, অনুষ্ঠান করিতে পারেন। যাঁহার যে অঙ্গে (বা যে সকল অঙ্গে) রুচি, তিনি সেই অঙ্গেরই (বা সে সকল অঙ্গেরই) অনুষ্ঠান করিবেন। অনুষ্ঠান করিতে করিতে অনর্থনিবৃত্তি হইয়া গেলে সাধনে নিষ্ঠা জন্মিবে, ক্রমশঃ রুচি. আসক্তি এবং তৎপরে প্রেমাঙ্কুর জন্মিবে এবং যথাসময়ে প্রেমের উজ্জ্বল আলোকে চিত্ত উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে।

সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ত্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থনিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥
রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম। সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দধাম॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।৬-৯॥

এক অঙ্গের সাধনেও যে অভীষ্ট সিদ্ধ হইতে পারে, তাহার দৃষ্টান্তরূপে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু নিম্নলিখিত শ্লোকটীর উল্লেখ করিয়াছেন।

"শ্রীবিষ্ণোঃ শ্রবণে পরীক্ষিদভবদ্বৈয়াসকিঃ
কীর্ত্তনে প্রহ্লাদঃ স্মরণে তদঙ্‌ঘ্রিসেবনে লক্ষ্মীঃ পৃথুঃ পূজনে।
অক্রূরস্ত্বভিবন্দনে কপিপতির্দাস্যেহথ সখ্যেহর্জ্জুনঃ
সর্ব্বস্বাত্মনিবেদনে বলিরভূৎ কৃষ্ণাপ্তিরেষাং পরা॥ ১।২।১২৯॥-ধৃতপ্রমাণ॥

—শ্রীবিষ্ণুর (নামগুণলীলাদির) শ্রবণে পরীক্ষিৎ, শুকদেব কীর্ত্তনে, প্রহ্লাদ স্মরণে, লক্ষ্মী চরণসেবনে, রাজা পৃথু পূজনে, অক্রূর বন্দনে, হনুমান্ দাস্যে, অর্জ্জুন সখ্যে এবং বলিরাজা সর্ব্বতোভাবে আত্মনিবেদনে—কৃতার্থ হইয়াছিলেন; ইঁহাদের কৃষ্ণপ্রাপ্তি হইয়াছিল।"*

মহারাজ অম্বরীষাদি একাধিক অঙ্গের সাধন করিয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

---

* এস্থলে একটী প্রশ্ন উঠিতে পারে। যাঁহারা এক অঙ্গের সাধনে সিদ্ধিলাভ করিয়াছেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দিতে যাইয়া এই শ্লোকে লক্ষ্মী, অর্জ্জুন ও হনুমানের নাম কেন উল্লিখিত হইল? ইঁহারা তো সাধনসিদ্ধ নহেন; ইঁহারা হইলেন নিত্যসিদ্ধ ভগবৎ-পরিকর। উত্তর—অর্জ্জুন ও হনুমান্ নিত্যসিদ্ধ হইলেও প্রকট-লীলায় তাঁহারা যখন ভগবানের সঙ্গে অবতীর্ণ হইয়াছেন, তখন সাধক জীবের ন্যায় একাঙ্গ সাধনেরই আদর্শ স্থাপন করিয়া গিয়াছেন। তাঁহাদের ন্যায় একাঙ্গ সাধনেও যে ভগবৎ-চরণ-প্রাপ্তি সম্ভব, তাহা জানাইবার নিমিত্তই তাঁহাদের নাম উল্লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীরামচন্দ্র ও শ্রীকৃষ্ণচন্দ্র হইলেন নরলীল; তাঁহাদের পার্ষদ

"স বৈ মনঃ কৃষ্ণপদারবিন্দয়োর্বচাংসি বৈকুণ্ঠগুণানুবর্ণনে।
করৌ হরের্মন্দিরমার্জ্জনাদিষু শ্রুতিঞ্চকারাচ্যুতসৎকথোদয়ে॥
মুকুন্দলিঙ্গালয়দর্শনে দৃশৌ তদ্‌ভৃত্যগাত্রস্পরশেঽঙ্গসঙ্গম্।
ঘ্রাণঞ্চ তৎপাদসরোজসৌরভে শ্রীমত্তুলস্যা রসনাং তদর্পিতে॥
পাদৌ হরেঃ ক্ষেত্রপদানুসর্পণে শিরো হৃষীকেশপদাভিবন্দনে।
কামঞ্চ দাস্যে ন তু কামকাম্যয়া যথোত্তমঃশ্লোকজনাশ্রয়া রতিঃ॥— শ্রীভা, ৯।৪।১৮-২০॥

—মহারাজ অম্বরীষ কৃষ্ণপাদপদ্মে মন, কৃষ্ণ-গুণানুবর্ণনে বাগিন্দ্রিয়, হরিমন্দির-মার্জ্জনাদিতে করদ্বয়, অচ্যুতের পবিত্র কথায় শ্রবণ (কর্ণদ্বয়), মুকুন্দের বিগ্রহ ও মন্দিরাদির দর্শনে নয়নদ্বয়, ভগবদ্‌ভক্তের গাত্রস্পর্শে অঙ্গ-সঙ্গ, কৃষ্ণপাদপদ্ম-সৌরভযুক্ততুলসীর গন্ধ-গ্রহণে নাসিকা, কৃষ্ণে নিবেদিত অন্নাদির গ্রহণে রসনা (জিহ্বা), ভগবৎ-ক্ষেত্র-গমনে চরণদ্বয়, হৃষীকেশের চরণ-বন্দনে মস্তক নিযুক্ত করিয়াছিলেন। বিষয়-ভোগের অঙ্গরূপে তিনি কখনও স্রক্‌চন্দনাদি গ্রহণ করেন নাই; উত্তমঃশ্লোক শ্রীভগবানের চরণ যাঁহারা আশ্রয় করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে যে ভক্তি থাকে, সেই ভক্তির আবির্ভাবের অনুকূল বলিয়াই তিনি শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত স্রক্‌চন্দনাদি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদজ্ঞানে গ্রহণ করিয়াছেন—এইরূপে তাঁহার কামও (ভোগবাসনাও) ভগবদ্দাস্যেই নিয়োজিত বা পর্য্যবসিত হইয়াছিল।"

এ-স্থলে কৃষ্ণপাদপদ্মে মনঃসংযোগদ্বারা স্মরণ, কৃষ্ণগুণানুবর্ণনে বাগিন্দ্রিয়-নিয়োগদ্বারা কীর্ত্তন, অচ্যুত-সৎকথায় কর্ণনিয়োগদ্বারা শ্রবণ এবং অবশিষ্ট কয়টী অনুষ্ঠানে পাদসেবনই সূচিত হইতেছে। অম্বরীষ মহারাজ যে নববিধ-ভক্তি-অঙ্গের মধ্যে শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ এবং পাদসেবন—এই একাধিক অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন, তাহাই এই শ্লোকে বলা হইল।

(৫) নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

হনুমান্ ও অর্জ্জুন প্রকট-লীলায় মানুষের জন্য ভজনের আদর্শ দেখাইতে পারেন। কিন্তু শ্রীলক্ষ্মীদেবীর সম্বন্ধে তো একথা বলা যায় না; শ্রীনারায়ণ যদি নরলীলা করিবার জন্য জগতে অবতীর্ণ হইতেন, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গে লক্ষ্মীদেবীও অবতীর্ণ হইতে পারিতেন এবং ভজনের আদর্শও স্থাপন করিতে পারিতেন; কিন্তু নারায়ণের এই ভাবে অবতরণের কথা জানা যায় না; সুতরাং লক্ষ্মীদেবীর একাঙ্গ সাধনের কথা এই শ্লোকে দৃষ্টান্তরূপে উল্লিখিত হইল কেন? উত্তর এইরূপ বলিয়া মনে হয়। "সাধনে ভাবিবে যাহা, সিদ্ধদেহে পাবে তাহা" এবং "যাদৃশী ভাবনা যস্য সিদ্ধির্ভবতি তাদৃশী"—এই ন্যায় অনুসারে যিনি সাধকদেহে ভগবানের চরণ-সেবারূপ সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিবেন, ভগবৎকৃপায় সাধনের পরিপক্কতায় সিদ্ধ পার্ষদদেহেও তিনি চরণসেবা লাভ করিতে পারিবেন। পরিকরদের মধ্যে চরণ-সেবার অধিকারীও যে আছেন, শ্রীলক্ষ্মীদেবীই তাহার প্রমাণ। তিনি নারায়ণের বক্ষো-বিলাসিনী হইলেও নারায়ণের চরণসেবাতেই তাঁহার লালসার আধিক্য। "কান্তসেবা সুখপুর, সঙ্গম হৈতে সুমধুর, তাতে সাক্ষী লক্ষ্মীঠাকুরাণী। নারায়ণের হৃদে স্থিতি, তবু পাদসেবায় মতি, সেবা করে দাসী অভিমানী॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।৫১॥"

ভজনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ— নববিধা ভক্তি। কৃষ্ণপ্রেম কৃষ্ণ দিতে ধরে মহাশক্তি ॥
তার মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নামসঙ্কীর্ত্তন। নিরপরাধ নাম হৈতে হয় প্রেমধন ॥

শ্রীচৈ, চ, ৩।৪।৬৫-৬৬ ॥

যত রকমের সাধনাঙ্গ আছে, তাহাদের মধ্যে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তিই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কেননা, নববিধা ভক্তির অনুষ্ঠানেই কৃষ্ণপ্রেম এবং কৃষ্ণসেবা লাভ হইতে পারে। এই নববিধা ভক্তির মধ্যে আবার নামসঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; যেহেতু, নিরপরাধভাবে নামসঙ্কীর্ত্তন করিলে প্রেম লাভ হইতে পারে।

নামসঙ্কীর্ত্তনের শ্রেষ্ঠত্বসম্বন্ধে মহাপ্রভু অন্যত্রও বলিয়াছেন "নববিধ ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৫।১০৮ ॥" শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানে ত্রুটি বা অপূর্ণতা থাকিতে পারে ; কেননা, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি স্বয়ংপূর্ণ নহে ; নাম কিন্তু ত্রুটিহীন, স্বয়ংপূর্ণ। এজন্য নাম শ্রবণকীর্ত্তনাদির ত্রুটি বা অপূর্ণতা দূর করিতে পারে, তাহাদের পূর্ণতা বিধান করিতে পারে।

নাম যে স্বয়ংপূর্ণ, তাহার হেতু হইতেছে এই যে, নাম এবং নামী অভিন্ন। ব্রহ্মবাচক প্রণবের প্রসঙ্গে কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—নামাক্ষরই ব্রহ্ম। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্।" পরব্রহ্ম ভগবানের নাম ভগবান্ হইতে অভিন্ন বলিয়া পরব্রহ্ম যেমন পূর্ণ, তাঁহার নামও তেমনি পূর্ণ।

নামচিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নামনামিনোঃ ॥

—ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥ ১।২।১০৮ ॥ ধৃত পদ্মপুরাণবচন ॥

নামী ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া নাম পূর্ণ, সুতরাং নামসঙ্কীর্ত্তনও পূর্ণ ; অন্য কোনও ভজনাঙ্গই নামী ভগবানের সহিত অভিন্ন নহে, সুতরাং স্বয়ংপূর্ণও নহে। এজন্য নামসঙ্কীর্ত্তনই অন্য ভজনাঙ্গের অপূর্ণতা দূরীভূত করিতে পারে এবং এজন্য নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গও।

নামসঙ্কীর্ত্তন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সাধনাঙ্গ, শ্রুতিও তাহা বলেন। ব্রহ্মবাচক প্রণবসম্বন্ধে কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—"এতদালম্বনং শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্ ॥ ১।২।১৭॥" এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করও বলিয়াছেন—"যত এবং অতএব এতদালম্বনং ব্রহ্মপ্রাপ্ত্যালম্বানানাং শ্রেষ্ঠং প্রশস্যতমম্। —*এইরূপ বলিয়া (নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া)* ব্রহ্মপ্রাপ্তির যত রকম আলম্বন (উপায়) আছে, তাহাদের মধ্যে ব্রহ্মের নাম ওঙ্কারই (ওঙ্কারের উপলক্ষণে নামই) শ্রেষ্ঠ আলম্বন।"

এইরূপে নামসঙ্কীর্ত্তনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ-ভজনাঙ্গত্বের কথা জানা গেল।

(৬) নামসঙ্কীর্ত্তনের সংযোগেই অন্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, "নববিধা ভক্তি পূর্ণ হয় নাম হৈতে ॥ শ্রীচৈ ,চ, ২।১৫।১০৮ ॥" সুতরাং স্ব-স্ব-রুচি অনুসারে যাঁহারা নামসঙ্কীর্ত্তনব্যতীত অন্য কোনও অঙ্গের অনুষ্ঠান করেন, তাঁহাদের পক্ষে নামসঙ্কীর্ত্তন সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না ; কেননা, নামসঙ্কীর্ত্তনব্যতীত তাঁহাদের

অনুষ্ঠিত ভক্তি-অঙ্গ পূর্ণতা লাভ করিতে পারে না। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা, ৭।৫।২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও একথাই লিখিয়াছেন। "অতএব যদ্যন্যা ভক্তিঃ কলৌ কর্ত্তব্যা, তদা তৎসংযোগেনৈবেত্যুক্তম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ (শ্রীভা, ১১।৫।৩২) ইতি ॥ –অতএব কলিতে যদি অন্য ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে হয়, তাহা হইলে নামসঙ্কীর্ত্তনের সংযোগেই তাহা করিবে। শ্রীমদ্ভাগবতও বলিয়াছেন—সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারের দ্বারাই সুমেধা ব্যক্তিগণ যজন করিয়া থাকেন।"

সত্যত্রেতাদি সকল যুগেই নামের সমান মহিমা। তথাপি যে শ্রীজীবপাদ বিশেষরূপে কলিযুগের কথা বলিয়াছেন, তাহার হেতু এই যে, নামসঙ্কীর্ত্তনই কলির যুগধর্ম্ম; যুগধর্ম্ম অবশ্য-পালনীয়। আবার, যুগাবতাররূপে স্বয়ংভগবান্ই কলিতে কলির যুগধর্ম্ম নামসঙ্কীর্ত্তন প্রচার করেন; তাঁহার প্রীতির জন্য নামসঙ্কীর্ত্তন অবশ্যকর্ত্তব্য। আবার বিশেষ কলিতে (বর্ত্তমান কলির ন্যায় বিশেষ কলিতে) স্বয়ংভগবান্ নিজেই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে সঙ্কীর্ত্তনের ব্যপদেশে নামমাধুর্য্য আস্বাদন করিয়া জীবের কল্যাণের নিমিত্ত তাহা বিতরণ করিয়াছেন। "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১১।৫।৩২ ॥-শ্লোক-প্রমাণ হইতে জানা যায়, বর্ত্তমান কলির উপাস্যও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর; স্বীয় নামরূপ-গুণ-লীলাদির মাধুর্য্য আস্বাদনই তাঁহার স্বরূপানুবন্ধিনী লীলা। এজন্যই শ্রীমদ্ভাগবতে বলা হইয়াছে, সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারের দ্বারাই তাঁহার যজন করা কর্ত্তব্য; কেননা, সঙ্কীর্ত্তনে তিনি সমধিক প্রীতি লাভ করিয়া থাকেন।

(৭) মর্য্যাদা মার্গ

শাস্ত্রবিধির প্রতি প্রবল মর্য্যাদাই বৈধীভক্তির বা বিধিমার্গে ভজনের প্রবর্ত্তক বলিয়া কেহ কেহ এই বিধিমার্গকে মর্য্যাদামার্গও বলিয়া থাকেন।

শাস্ত্রোক্তয়া প্রবলয়া তত্তন্মর্য্যদয়ান্বিতা।
বৈধিভক্তিরিয়ং কৈশ্চিন্মর্য্যাদামার্গ উচ্যতে ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৩০॥

(৮) নববিধা সাধনভক্তি বেদবিহিতা

শ্রীমদ্ভাগবতের "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"-ইত্যাদি ৭।৫।২৩-শ্লোকে যে নববিধা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, বেদেও যে সেই নববিধা ভক্তির উল্লেখ পাওয়া যায়, এ-স্থলে তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, শ্রবণসম্বন্ধে। "সে দু শ্রবোভির্যুজ্যং চিদভ্যসৎ ॥ ঋগ্বেদ ।১৫৬।২॥—পরমাত্মা শ্রীবিষ্ণুর যশঃকথা কর্ণদ্বারা পুনঃ পুনঃ শ্রবণ করিয়া তাঁহাকে পাওয়ার অভ্যাস করুক।" পুনঃ পুনঃ অভ্যাসের কথা ব্রহ্মসূত্রেও দৃষ্ট হয়। "আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥৪।৪।১॥"

দ্বিতীয়তঃ, কীর্ত্তনসম্বন্ধে। "বিষ্ণোর্নু কং বীর্য্যানি প্রবোচন্ ॥ ঋক্ ॥১।১৫৪।১॥ –আমি এখন শ্রীবিষ্ণুর (লীলাদি) কীর্ত্তন করিতেছি।", "তত্তদিদস্য পৌংস্যং গৃণীমসীনস্য ত্রাতুরবৃকস্য মীলহুষঃ॥

ঋক্॥১।১৫৫।৪॥—ত্রিভুবনেশ্বর, জগদ্রক্ষক, কৃপালু, সর্ব্বেচ্ছাপরিপূরক ভগবান্ বিষ্ণুর চরিত্র কীর্ত্তন করিতেছি।", "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ঋক্ ॥১।১৫৬।৩॥—হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, স্বপ্রকাশরূপ; তাই এই নামের সম্বন্ধে কিঞ্চিন্মাত্র জানিয়াও কেবলমাত্র নামের অক্ষরমাত্রের উচ্চারণের প্রভাবেও তোমাবিষয়িনী ভক্তি লাভ করিতে পারিব।" "বর্দ্ধন্তু ত্বা সুষ্ঠুতয়ো গিরো মে॥ ঋক্॥৭।৯৯।৭॥—হে বিষ্ণো! তোমার স্তুতিবাচক আমার বাক্য তুমি সুষ্ঠুরূপে বর্দ্ধিত কর।"

তৃতীয়তঃ, স্মরণসম্বন্ধে। "প্রবিষ্ণবে শুষমেতু মন্ম গিরিক্ষিত উরুগায়ায় বৃষ্ণে॥ ঋক্ ॥১।১৫৪।৩॥—উরুগায় ভগবানে আমার স্মরণ বলবৎ হউক।"

চতুর্থতঃ, পাদসেবন-সম্বন্ধে। "যস্য ত্রীপূর্ণা মধুনা পদান্যক্ষীয়মানা স্বধয়া মদন্তি॥ ঋক্ ॥১।১৫৪।৪॥—যে ভগবানের মাধুর্য্যমণ্ডিত এবং অক্ষয় তিন চরণ (চরণের তিন বিন্যাস ভক্তকে) আনন্দিত করে।"

পঞ্চমতঃ, অর্চ্চনসম্বন্ধে। "প্র বঃ পান্তমন্ধসো ধিয়ায়তে মহে শূরায় বিষ্ণবে চার্চত॥ঋক্॥১।১৫৫।১॥—তোমরা সকলে মহান্ এবং শূর (বীর) বিষ্ণুর অর্চ্চনা কর।"

ষষ্ঠতঃ, বন্দনসম্বন্ধে। "নমো রুচায় ব্রাহ্ময়ে॥ যজুর্ব্বেদ ॥৩১।২০॥—পরমসুন্দর ব্রহ্মবিগ্রহকে আমি নমস্কার করি।"

সপ্তমতঃ, দাস্যসম্বন্ধে। "তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ঋক্॥১।১৫৬।৩॥—হে বিষ্ণো! আমি তোমার সুমতির (কৃপার) ভজন করি।"

অষ্টমতঃ, সখ্যসম্বন্ধে। "উরুক্রমস্য স হি বন্ধু রিত্থা বিষ্ণোঃ॥ঋক্॥১।১৫৪।৫॥—তিনি উরুক্রম বিষ্ণুর বন্ধু বা সখা।"

নবমতঃ, আত্মনিবেদন-সম্বন্ধে। "য পূর্ব্ব্যায় বেধসে নবীয়সে সুমজ্জানয়ে বিষ্ণবে দদাশতি॥ ঋক্ ॥১।১৫৬।২।—যিনি অনাদি, জগৎ-স্রষ্টা, নিত্যনবায়মান ভগবান্‌কে আত্মনিবেদন করিয়া থাকেন।"

"আত্মা বা অরে দ্রষ্টব্যঃ শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যো মৈত্রেয়ি॥ বৃহদারণ্যক ॥২।৪।৫॥"—ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও শ্রবণ, মননাদির (স্মরণাদির) কথা বলিয়া গিয়াছেন।

সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্গীতায়ও "মচ্চিত্তা মদ্গতপ্রাণা বোধয়ন্তঃ পরস্পরম্। কথয়ন্তশ্চ মাং নিত্যং তুষ্যন্তি চ রমন্তি চ ॥১০।৯॥"-শ্লোকে স্মরণের ও কীর্ত্তনের কথা, "সততং কীর্ত্তয়ন্তো মাং যতন্তশ্চ দৃঢ়ব্রতাঃ। নমস্যন্তশ্চ মাং ভক্ত্যা নিত্যযুক্তা উপাসতে ॥৯/১৪॥"-শ্লোকে কীর্ত্তন ও নমস্কারের (বন্দনার) কথা, "অনন্যচেতাঃ সততং যো মাং স্মরতি নিত্যশঃ ॥৮।১৪।"-শ্লোকে এবং "অনন্যশ্চিন্তয়ন্তো মাং যে জনাঃ পর্য্যুপাসতে ॥৯।২২।"-শ্লোকে চিন্তা বা স্মরণের কথা, "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু ॥৯।৩৪॥, ১৮।৬৫।"-শ্লোকে (মদ্ভক্ত-শব্দে) দাস্য, স্মরণ, অর্চ্চন এবং নমস্কারের (বন্দনার) কথা,

"শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ শৃণুয়াদপি যো নরঃ ॥১৮।৭১॥"-শ্লোকে শ্রবণের কথা, "সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ। ১৮।৬৬॥"-ইত্যাদি শ্লোকে শরণ বা আত্মনিবেদনের কথা, "গতির্ভর্ত্তা প্রভুঃ সাক্ষী নিবাসঃ শরণং সুহৃৎ॥৯।১৮॥"-শ্লোকে সখ্যের কথা পাওয়া যায়।

এইরূপে দেখা গেল—নববিধা ভক্তি হইতেছে বেদমূলা।

৬১। রাগানুগাভক্তি

রাগমার্গের ভক্তির বিষয় পূর্ব্বে (৫।৪৫-অনুচ্ছেদে) আলোচিত হইয়াছে। সে-স্থলে রাগের লক্ষণ এবং রাগাত্মিকা ভক্তির লক্ষণও কথিত হইয়াছে। রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয় যে শ্রীকৃষ্ণের নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরগণ, তাহাও সে-স্থলে বলা হইয়াছে। রাগাত্মিকা ভক্তির অনুগতা ভক্তিকেই যে রাগানুগা ভক্তি বলা হয়, তাহাও কথিত হইয়াছে। রাগাত্মিকা ভক্তির আশ্রয় নিত্যসিদ্ধ ব্রজপরিকরদের শ্রীকৃষ্ণসেবার কথা শুনিয়া সেই সেবার অনুকূল ভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য যে লোভ, তাহাই যে রাগানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তক, বৈধিভক্তির ন্যায় শাস্ত্রবিধি যে ইহার প্রবর্ত্তক নহে, তাহাও সে-স্থলে বলা হইয়াছে।

রাগানুগা সাধনভক্তির অঙ্গগুলি কি, তাহাই এক্ষণে কথিত হইতেছে।

রাগানুগার সাধন সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন,

"সেবা সাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি। তদ্ভাবলিপ্সুনা কার্য্যা ব্রজলোকানুসারতঃ ॥
শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীনি বৈধভক্ত্যুদিতানি তু। যান্যঙ্গানি চ তান্যত্র বিজ্ঞেয়ানি মনীষিভিঃ ॥

১।২।১৫১-৫২॥

—ব্রজস্থিত নিজাভীষ্ট-শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়পরিকর-বর্গের ভাবলিপ্সু ব্যক্তি তাঁহাদের (ব্রজ-পরিকরদের) অনুসরণ পূর্ব্বক (তাঁহাদের আনুগত্যে) সাধকরূপে (যথাবস্থিত দেহদ্বারা) এবং সিদ্ধরূপে (স্বীয় ভাবানুকূল শ্রীকৃষ্ণসেবোপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহদ্বারা) শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবেন। বৈধী ভক্তি-প্রসঙ্গে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি যে সকল ভক্ত্যঙ্গের কথা বলা হইয়াছে, মনীষিগণ রাগানুগা ভক্তিতেও (সাধকগণের স্বস্ব-যোগ্যতা অনুসারে) সেই সকল অঙ্গের উপযোগিতা স্বীকার করেন।"

উক্ত শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সাধকরূপেণ যথাবস্থিতদেহেন। সিদ্ধরূপেণ অন্তশ্চিন্তিতাভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন। তস্য ব্রজস্থস্য শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠস্য যো ভাবো রতিবিশেষস্তল্লিপ্সুনা। ব্রজলোকাস্তত্র কৃষ্ণপ্রেষ্ঠজনাস্তদনুগতাশ্চ তদনুসারতঃ ॥১৫১॥ বৈধভক্ত্যুদিতানি স্বস্বযোগ্যানীতি জ্ঞেয়ম্ ॥১৫২॥"

রাগানুগার সাধন সম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভুও তাহাই বলিয়াছিলেন।

'বাহ্য' 'অন্তর' ইহার দুই ত সাধন। বাহ্য—সাধকদেহে করে শ্রবণকীর্ত্তন ॥
মনে —নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥

শ্রীচৈ,চ,২।২২।৮৯-৯০ ॥

রাগনুগার সাধন দুই রকমের—বাহ্য ও অন্তর।

ক। বাহ্যসাধন

বাহ্যসাধন করিতে হয়—সাধক-দেহে, যথাবস্থিত দেহে, অর্থাৎ সাধক যে-দেহে অবস্থিত আছেন, সেই দেহে, পিতামাতা হইতে প্রাপ্ত পাঞ্চভৌতিক দেহে। শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির (শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর টীকানুসারে, বৈধীভক্তির) অঙ্গগুলির মধ্যে রাগানুগার অনুকূল অঙ্গগুলির অনুষ্ঠানই হইতেছে বাহ্য সাধন।

প্রতিকূল ভজনাঙ্গ

শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধ অঙ্গের মধ্যে কোন্ কোন্ অঙ্গ রাগানুগার অনুকূল এবং কোন্ কোন্ অঙ্গ তাহার প্রতিকূল, সাধকের পক্ষে তাহাও জানা দরকার।

নববিধ ভ্যক্তঙ্গের মধ্যে অর্চ্চনও একটী অঙ্গ। অর্চ্চনাঙ্গ-ভক্তির মধ্যে, অহংগ্রহোপাসনা, মুদ্রা, ন্যাস, দ্বারকাধ্যান ও রুক্মিণ্যাদির পূজন শাস্ত্রে বিহিত আছে। কিন্তু এসমস্ত স্বীয়ভাবের বিরুদ্ধ বলিয়া রাগানুগা-মার্গের সাধকের পক্ষে আচরণীয় নহে। যদি বলা যায়, ইহাতে তো ভক্তির অঙ্গ-হানি হইবে; সুতরাং প্রত্যবায় হইতে পারে। ইহার উত্তরে এই বলা যায় যে, ভক্তি-মার্গে প্রীতির সহিত ভজনে কিঞ্চিৎ অঙ্গহানি হইলেও তাহাতে দোষ হয় না। "নহ্যঙ্গোপক্রমে ধ্বংসো মদ্ভক্তেরুদ্ধবাণ্বপি ॥ শ্রীভা, ১১।২৯।২০॥—শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, হে উদ্ধব! মদ্ভক্তি-লক্ষণ এই ধর্ম্মের উপক্রমে অঙ্গ-বৈগুণ্যাদি ঘটিলেও ইহার কিঞ্চিন্মাত্রও নষ্ট হয় না।" ইহার যতটুকু হয়, তত টুকুই পূর্ণ; কারণ, নির্গুণাভক্তির স্বরূপই এইরূপ। এস্থলে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, অঙ্গ-হানিতে দোষ হয় না বটে, কিন্তু অঙ্গীর হানিতে দোষ আছে। উপরোক্ত ন্যাস-মুদ্রা-দ্বারকাধ্যানাদি হইতেছে অর্চ্চনার অঙ্গ; সুতরাং অর্চ্চনা হইল এস্থলে অঙ্গী; দীক্ষিতের পক্ষে অর্চ্চনার অনাচরণে বা অন্যথাচরণে দোষ হইবে। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি প্রধান অঙ্গগুলিই অঙ্গী; তাহাদের অনুষ্ঠান না করিলে সাধকের ভক্তির অনিষ্ট হইয়া থাকে। কারণ, ঐ সমস্ত অঙ্গীকে আশ্রয় করিয়াই সাধক ভক্তিপথে অগ্রসর হইতে চেষ্টা করেন; যদি সেই অঙ্গীকেই ত্যাগ করা হইল, তাহা হইলে আশ্রয়কেই ত্যাগ করা হইল। আশ্রয় ত্যাগ করিলে নিরাশ্রয় অবস্থায় সাধক আর কিরূপে থাকিতে পারেন? সুতরাং তাঁহার পতন নিশ্চিত। "অঙ্গিবৈকল্যে তু অস্ত্যেব দোষঃ। যান্ শ্রবণোৎকীর্ত্তনাদীন্ ভগবদ্ধর্ম্মানাশ্রিত্য ইত্যুক্তেঃ ॥"—রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা।

নববিধা ভক্তির উপলক্ষণে এ-স্থলে পূর্ব্বোল্লিখিত চৌষট্টি অঙ্গ সাধনভক্তির কথাই বলা হইয়াছে। গুরুপদাশ্রয়াদি প্রথম বিশটী অঙ্গকে ভক্তিতে প্রবেশের দ্বারস্বরূপ বলা হইয়াছে। এই বিশটী অঙ্গ বৈধীভক্তিরও দ্বারস্বরূপ, রাগানুগা ভক্তিরও দ্বারস্বরূপ। সুতরাং রাগানুগার সাধকের পক্ষেও এই বিশটী অঙ্গ উপেক্ষণীয় নহে। অন্যান্য অঙ্গগুলি যে নববিধা ভক্তিরই অন্তর্ভুক্ত, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে।

যাহাহউক, পূর্ব্বোল্লিখিত অর্চ্চনাঙ্গ ব্যতীত রাগানুগা সাধনভক্তির অন্যান্য অঙ্গসম্বন্ধে রাগবর্ত্ম-

চন্দ্রিকার উক্তি এইরূপ—ভজনাঙ্গগুলিকে পাঁচভাগে বিভক্ত করা যায়; স্বাভীষ্ট-ভাবময়, স্বাভীষ্ট ভাবসম্বন্ধী, স্বাভীষ্ট ভাবের অনুকূল, স্বাভীষ্টভাবের অবিরুদ্ধ এবং স্বাভীষ্টভাবের বিরুদ্ধ।

দাস্য-সখ্যাদি ও ব্রজে বাস—এই সমস্ত ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্টময়; ইহারা সাধ্যও বটে, আবার সাধনও বটে। গুরু-পদাশ্রয়, গুরু-সেবা, জপ, ধ্যান, স্বীয়ভাবোচিত নাম-রূপ-গুণ-লীলাদির শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা-ভক্তি, একাদশীব্রত, কার্ত্তিকাদিব্রত, ভগবন্নিবেদিত নির্ম্মাল্য-তুলসী-গন্ধ-চন্দন-মাল্য-বসনাদি ধারণ ইত্যাদি ভজনাঙ্গগুলি, স্বাভীষ্ট ভাবসম্বন্ধীয়; ইহাদের কোনটী বা সাধ্য প্রেমের উপাদান-কারণ, আবার কোনটী বা নিমিত্ত-কারণ। তুলসীকাষ্ঠমালা, গোপীচন্দনাদি-তিলক, নাম-মুদ্রা-চরণ-চিহ্নাদিধারণ, তুলসী সেবন, পরিক্রমা, প্রণামাদি ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্ট ভাবের অনুকূল। গো, অশ্বত্থ, ধাত্রী, বিপ্রাদির সম্মান ইত্যাদি ভজনাঙ্গ স্বাভীষ্ট ভাবের অবিরুদ্ধ; এই সমস্ত অঙ্গ ভাবের উপকারক। বৈষ্ণবসেবা উক্ত চারি প্রকারের প্রত্যেকের মধ্যেই আছে। এই সমস্ত রাগানুগামার্গের সাধকেব কর্ত্তব্য। অহংগ্রহোপাসনা, ন্যাস, মুদ্রা, দ্বারকাধ্যান, মহিষীধ্যানাদি—স্বাভীষ্ট ভাবের বিরুদ্ধ, সুতরাং রাগমার্গের সাধকের পরিত্যাজ্য।

রাগানুগা-মার্গের সাধক স্বীয় ভাবের প্রতিকূল ভজনাঙ্গগুলি পরিত্যাগ করিয়া যথাবস্থিত দেহে অন্যান্য অঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিবেন। রাগমার্গের সাধন সর্ব্বদাই ব্রজবাসীদের আনুগত্যময়,—বাহ্যসাধনেও ব্রজবাসী শ্রীরূপ-সনাতন গোস্বামিগণের আনুগত্য স্বীকার করিয়া তাঁহাদের প্রদর্শিত পন্থার অনুসরণ করিতে হইবে। পূর্ব্বোল্লিখিত "সেবা সাধকরূপেণ" ইত্যাদি শ্লোকে একথাই বলা হইয়াছে। রাগমার্গের সাধকের পক্ষে "ব্রজে-বাস" একটী প্রধান অঙ্গ বলিয়া উল্লেখ করা হইয়াছে (কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা); সামর্থ্য থাকিলে যথাবস্থিত দেহেই ব্রজধামে বাস করিবে; নচেৎ মনে মনে ব্রজে-বাস চিন্তা করিবে।

আর একটী কথাও স্মরণে রাখা প্রয়োজন। যথাবস্থিত-দেহের সাধনেও সর্ব্বতোভাবে মনের যোগ রাখিতে হইবে। কারণ, "বাহ্য-অন্তর ইহার দুই ত সাধন।" মনের যোগ না রাখিয়া কেবল বাহিরে যন্ত্রের মত অনুষ্ঠানগুলি করিয়া গেলে ঠিক রাগানুগা-মার্গের ভজন হইবেনা। এজন্যই শ্রীচরিতামৃত বলিয়াছেন, অনাসক্ত (অর্থাৎ সাক্ষাদ্‌ভজনে প্রবৃত্তিশূন্য, বা মনোযোগশূন্য) ভাবে, "বহু জন্ম করে যদি শ্রবণ কীর্ত্তন। তথাপি না পায় কৃষ্ণ-পদে প্রেমধন॥ ১।৮।১৫॥" অন্যত্র, "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে॥ ২।২৪।১১৫॥" ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলেন—"সাধনৌঘৈরনাসঙ্গৈরলভ্যা সুচিরাদপি॥ ১।১।২২॥" বাহ্যক্রিয়ার সঙ্গে কিরূপে মনের যোগ রাখিতে হয়, তাহার দিগ্‌দর্শনরূপে দু'একটী উদাহরণ দেওয়া হইতেছে। স্নানের সময় কেবল জলে নামিয়া ডুব দিলেই রাগানুগা-ভক্তের স্নান হইবে না; বাহ্য-স্নানে বাহ্য-দেহ পবিত্র হইতে পারে, কিন্তু অন্তর্দ্দেহ পবিত্র হইবে কিনা সন্দেহ; তজ্জন্য বাহ্যস্নানের সময় ভগবচ্চরণ স্মরণ করা কর্ত্তব্য। "যঃ স্মরেৎ পুণ্ডরীকাক্ষং স বাহ্যাভ্যন্তরশুচিঃ।" তিলক করিয়া-"কেশবায় নমঃ, নারায়ণায় নমঃ" ইত্যাদি কেবল মুখে বলিয়া

গেলেই রাগানুগা-ভক্তের তিলক হইবে না ; মনে মনেও যথাযথ অঙ্গে কেশব-নারায়ণাদির স্মরণ করিয়া তত্তদঙ্গস্থিত হরিমন্দির (তিলক) যে তাঁহাদিগকে অর্পণ করা হইল, তত্তৎ-মন্দিরে যে কেশব-নারায়ণাদিকে স্থাপন করা হইল, তাহাও মনে মনে ধারণা করার চেষ্টা করিতে হইবে। "ললাটে কেশবং ধ্যায়েদিত্যাদি।" সমস্ত ভজনাঙ্গগুলিতেই এইরূপে যথাযথভাবে মনের যোগ রাখিতে চেষ্টা করা উচিত। শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায়, এইরূপ করিতে পারিলে সমস্ত ভজনাঙ্গগুলিই প্রায় স্বাভীষ্টভাবময়ত্ব প্রাপ্ত হইবে।

খ। অন্তর সাধন

অন্তর-সাধনটী হইতেছে কেবল অন্তরের বা অন্তরিন্দ্রিয়ের—মনের—সাধন। শ্রবণকীর্ত্তনাদি বাহ্য সাধন অনুষ্ঠিত হয় চক্ষুঃকর্ণজিহ্বা-কর-চরণাদি বিহিরিন্দ্রের সহায়তায় ; কিন্তু অন্তর-সাধন অনুষ্ঠিত হয় কেবল মনের দ্বারা, মানসিকী চিন্তাদ্বারা। সাধক নিজের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ চিন্তা করিয়া সেই দেহেই ব্রজে স্বীয় ভাবানুকূল-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন, সর্ব্বদা এইরূপ চিন্তাই করিবেন ; ইহাই অন্তর সাধন। কিন্তু সিদ্ধদেহ বলিতে কি বুঝায় ?

(১) **সিদ্ধদেহ**

সাধক ভগবৎকৃপায় সাধনে সম্যক্ সিদ্ধি লাভ করিলে স্বীয় অভীষ্ট সেবার উপযোগী যেই দেহে তিনি স্বীয় অভীষ্ট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিবার বাসনা পোষণ করেন, সেইটীই হইতেছে বাস্তবিক তাঁহার সিদ্ধদেহ। সেবালিপ্সু সাধকের প্রতি কৃপা করিয়া পরমকরুণ শ্রীভগবান্ই শ্রীগুরুদেবের চিত্তে সেই সিদ্ধদেহের একটা দিগ্দর্শন স্ফুরিত করেন। শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে তাহা জানাইয়া দেন। এইরূপে, শ্রীগুরুদেব সিদ্ধ-প্রণালিকাতে বর্ণ-বয়স-বেশ-ভূষা-সেবা ইত্যাদির উল্লেখ করিয়া শিষ্য সাধকের যে স্বরূপটী নির্দ্দিষ্ট করিয়া দেন, তাহাই ঐ সাধকের সিদ্ধ-দেহ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুর কৃপায় সাধক সিদ্ধি লাভ করিতে পারিলে, ঐরূপ দেহেই তিনি শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা করিবেন। সাধন-সময়ে ঐ দেহটী মনে চিন্তা করিয়া, ঐ দেহটী যেন নিজেরই, এইরূপ বিবেচনা করিয়া—যথাযোগ্য ভাবে ঐ দেহদ্বারাই ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা চিন্তা করিতে হয়। এজন্য ঐ দেহটীকে অন্তশ্চিন্তিত দেহও বলে।

রাত্রির ও দিনের যে সময়ে নিজ-ভাবোচিত ব্রজেন্দ্র-নন্দনের যে সেবা করা প্রয়োজন, সেই সময়ে মানসে অন্তশ্চিন্তিত দেহে সাধক সেই সেবা করিবেন। এস্থলে অষ্টকালীন সেবার কথাই বলা হইয়াছে। ইহাকে লীলাস্মরণও বলে।

সিদ্ধ-প্রণালিকাতে গুরু-পরম্পরাক্রমে সকলেরই সিদ্ধ-দেহের বিবরণ আছে। অন্তশ্চিন্তিত-সেবায়ও শ্রীগুরুদেবের সিদ্ধ-রূপের এবং গুরু-পরম্পরা সকলেরই সিদ্ধ-রূপের আনুগত্য স্বীকার করিয়া সেবা করিতে হইবে।

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে রাগানুগামার্গে কান্তাভাবের সাধকের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের একটা দিগ্‌দর্শন দৃষ্ট হয়। তাহা এই ঃ—

"আত্মানং চিন্তয়েত্তত্র তাসাং মধ্যে মনোরমাম্। রূপযৌবনসম্পন্নাং কিশোরীং প্রমদাকৃতিম্॥
নানাশিল্পকলাভিজ্ঞাং কৃষ্ণভোগানুরূপিণীম্। প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্‌মুখীম্॥
রাধিকানুচরীং নিত্যং তৎসেবনপরায়ণাম্। কৃষ্ণাদপ্যধিকং প্রেম রাধিকায়াং প্রকুর্ব্বতীম্॥
প্রীত্যানুদিবসং যত্নাত্তয়োঃ সঙ্গমকারিণীম্। তৎসেবনসুখাহ্লাদভাবেনাতিসুনির্বৃতাম্॥
ইত্যাত্মানাং বিচিন্ত্যৈব তত্র সেবাং সমাচরেৎ॥ ৫২।৭-১১॥

—(শ্রীসদাশিব নারদের নিকটে বলিয়াছেন, ব্রজেন্দ্রনন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিতে হইলে) নিজেকে তাঁহাদের (গোপীগণের) মধ্যবর্ত্তিনী, রূপযৌবনসম্পন্না মনোরমা কিশোরী রমণীরূপে চিন্তা করিবে ; শ্রীকৃষ্ণের ভোগের (প্রীতির) অনুরূপা, নানাবিধ-শিল্পকলাভিজ্ঞা, কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রার্থিত হইলেও ভোগপরাঙ্‌মুখী রমণীরূপে নিজেকে চিন্তা করিবে। সর্ব্বদা শ্রীরাধিকার কিঙ্করীরূপে, তাঁহার সেবাপরায়ণারূপে, নিজেকে চিন্তা করিবে। শ্রীকৃষ্ণে অপেক্ষাও শ্রীরাধিকাতে অধিক প্রীতিমতী হইবে। প্রীতির সহিত প্রতিদিন শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-সংঘটনে যত্নপর হইবে (অবশ্য মানসে, কেবল চিন্তাদ্বারা) এবং তাঁহাদের সেবা করিয়া আনন্দে বিভোর হইয়া রহিয়াছ, এইরূপ চিন্তা করিবে। নিজেকে এইরূপ চিন্তা করিয়া সর্ব্বদা ব্রজে তাঁহাদের সেবা করিবে।"

কান্তাভাবের সেবায় কেবলমাত্র গোপীদেরই অধিকার। সাধক নিজেকেও শ্রীরাধার কিঙ্করী (মঞ্জরী) গোপকিশোরীরূপে চিন্তা করিয়া তাঁহাদের সেবার চিন্তা করিবেন। কোনওরূপ ভোগবাসনা যেন সাধকের চিত্তে (সিদ্ধদেহেও) না জাগে। গোপ-কিশোরীদেহই কান্তাভাবের সেবার উপযোগী দেহ।

ইহা হইতে সখ্যাদি ভাবের সিদ্ধদেহের পরিচয়ও অনুমিত হইতে পারে। সখ্যভাবের পরিকরগণ সকলেই গোপবালক। সখ্যভাবের সাধকের অন্তশ্চিন্তনীয় সিদ্ধদেহও হইবে গোপকিশোর দেহ এবং তদনুরূপ বেশভূষাসমন্বিত। অন্যান্য ভাবের সিদ্ধদেহও তত্তদ্‌ভাবের নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের অনুরূপই হইবে

বলাবাহুল্য, অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের সেবা এবং বেশভূষাদি সমস্তই হইতেছে কেবল ভাবনা-ময়, কেবল মনে মনে চিন্তামাত্র ; এই সেবা সাধকের যথাবস্থিত দেহের সেবা নহে, অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের বেশভূষাদিও যথাবস্থিত দেহে ধারণীয় নহে। কান্তাভাবের কোনও পুরুষ সাধক যদি তাঁহার যথাবস্থিত পুরুষদেহে রমণীর বেশভূষা ধারণ করেন, কিম্বা সখ্যভাবের সাধিকা কোনও নারী যদি তাঁহার নারীদেহে, গোপবালকের ন্যায়, পুরুষের বেশভূষা ধারণ করেন, তবে তাহা হইবে বিড়ম্বনা-মাত্র, অনর্থের উৎপাদক [পরবর্ত্তী ৫।৬১ খ (৫)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের অনুরূপ ভাবে বাহ্য যথাবস্থিতদেহের সজ্জাকরণের কথা শাস্ত্র কোনও স্থলে বলেন নাই, এইরূপ কোনও

সদাচারও দৃষ্ট হয় না। তদনুরূপ কোনও আদর্শও নাই। শ্রীমন্মহাপ্রভু নিজেকে শ্রীরাধা মনে করিতেন এবং শ্রীরাধার ভাবে আবিষ্ট হইয়াই ব্রজলীলার মাধুর্য্য আস্বাদন করিতেন ; কিন্তু তিনি কখনও শ্রীরাধার ন্যায় পোষাক পরিতেন না। স্বরূপদামোদর এবং রায়রামানন্দ ছিলেন ব্রজলীলার ললিতা-বিশাখা ; গৌরপরিকররূপে তাঁহারাও কখনও ললিতা-বিশাখার বেশ ধারণ করিতেন না। ব্রজের শ্রীরূপমঞ্জরীও গৌরপার্ষদ শ্রীরূপগোস্বামী ; তিনিও কখনও শ্রীরূপমঞ্জরীর পোষাক ধারণ করিতেন না। কোনও পুরুষ সর্ব্বদা স্ত্রীলোকের পোষাক ধারণ করিয়া থাকিলেই যে তাঁহার চিত্তে স্ত্রীলোক-অভিমান জাগ্রত হয়, কিম্বা তাঁহার পুরুষাভিমান তিরোহিত হয়, অথবা গুম্ফ শ্মশ্রু-আদি পুরুষচিহ্ন বিলুপ্ত হইয়া যায়, তাহা নহে। সময়বিশেষে তাঁহার পুরুষচিহ্ন দৃষ্টির গোচরীভূত হয়, তখন তিনি নিজেকে পুরুষ বলিয়াই মনে করেন। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিন করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন ॥" রাগানুগার ভজনে মনে মনেই ভাবানুকূল সিদ্ধদেহের—সুতরাং সেই সিদ্ধদেহের পোষাকাদির—চিন্তা করিবার বিধি; উল্লিখিত পদ্মপুরাণশ্লোক হইতেও তাহাই জানা যায়। যথাবস্থিতদেহে সিদ্ধদেহের অনুরূপ পোষাকাদি ধারণের কোনও বিধান কোথাও দৃষ্ট হয় না।

(২) **সিদ্ধপ্রণালিকা**

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবদের মধ্যে বিভিন্ন পরিবার আছে ; যথা—নিত্যানন্দ-পরিবার, অদ্বৈত-পরিবার, গদাধর-পরিবার, ইত্যাদি। বিভিন্ন পরিবারের সাধন-প্রণালী যে বিভিন্ন, তাহা নহে। গুরুপরম্পরা-ক্রমে আদিগুরুর নাম অনুসারেই পরিবারের নাম হয় ; সকল পরিবারের সাধনপ্রণালীই সাধারণতঃ একরূপ।

আদিগুরু (শ্রীনিত্যানন্দ, শ্রীঅদ্বৈত, বা শ্রীগদাধর ইত্যাদি) হইতে আরম্ভ করিয়া সাধকের স্বীয় দীক্ষাগুরুপর্য্যন্ত গুরুবর্গের নাম যে তালিকায় থাকে, তাহাকে বলে **গুরুপ্রণালিকা**। গুরু-প্রণালিকাতে গুরুবর্গের প্রত্যেকেরই যদি সিদ্ধদেহের বিবরণ (সিদ্ধদেহের নাম, বর্ণ, বয়স, বেশ ভূষা, সেবা ইত্যাদি) উল্লিখিত হয়, তাহা হইলেই তাহাকে সিদ্ধপ্রণালিকা বলা হয়। সুতরাং গুরুপ্রণালিকা এবং সিদ্ধ-প্রণালিকা সর্ব্বতোভাবে একরূপ নহে ; গুরুপ্রণালিকা বরং সিদ্ধপ্রণালিকারই অন্তর্ভুক্ত। সিদ্ধ-প্রণালিকাতে স্বীয় দীক্ষাগুরুর পরে সাধকের সিদ্ধদেহেরও পরিচয় থাকে।

বলাবাহুল্য, দীক্ষাগুরুই সিদ্ধপ্রণালিকা দেওয়ার প্রকৃত অধিকারী। ইহাই গৌড়ীয়-বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ের চিরাচরিত রীতি। দীক্ষাগুরুর যে পরিবার, সাধকেরও সেই পরিবার। অন্তশ্চিন্তিত দেহে দীক্ষাগুরুর সিদ্ধস্বরূপের (বা সিদ্ধদেহের) আনুগত্যেই সাধককে অন্তর-সাধন করিতে হয়। শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের প্রার্থনাদি গ্রন্থ হইতে জানা যায়, গৌরপার্ষদ শ্রীল লোকনাথগোস্বামী ছিলেন তাঁহার দীক্ষাগুরু এবং মঞ্জলালী ছিল লোকনাথগোস্বামীর ব্রজলীলার সিদ্ধদেহের নাম। ঠাকুরমহাশয় ব্রজলীলার সেবা-প্রসঙ্গে মঞ্জলালীর আনুগত্যের কথাই পুনঃপুনঃ বলিয়া গিয়াছেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ছিলেন ঠাকুরমহাশয়ের শিক্ষাগুরু ; অন্তশ্চিন্তিত দেহের সেবায় তিনি কোনও-স্থলেই শ্রীজীবগোস্বামীর সিদ্ধদেহের আনুগত্যের কথা বলেন নাই।

এইরূপে জানা গেল —শিক্ষাগুরু অনুসারে গুরুপ্রণালিকা বা সিদ্ধপ্রণালিকা হয় না। শিক্ষা-গুরু একাধিক থাকিতে পারেন। শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীর ছয় জন শিক্ষাগুরু ছিলেন। শিক্ষাগুরুদের পরিবারও ভিন্ন ভিন্ন হইতে পারে। সাধক যে-পরিবারের গুরুর নিকটে দীক্ষিত, তাঁহারও সেই পরিবার। শিক্ষাগুরুর পরিবার অনুসারে সাধকের পরিবার নির্ণীত হয় না ; শিক্ষা-গুরুদের বিভিন্ন পরিবার থাকিতে যখন বাধা নাই, তখন তাহা হইতেও পারে না। দীক্ষাগুরুর পরিবারের গুরুপরম্পরার আনুগত্যে ভজন করিলেই গুরুপরম্পরার কৃপায় সাধক সেই পরিবারের আদিগুরুর চরণে উপনীত হইতে পারেন এবং তাঁহার কৃপায় ভগবচ্চরণে অর্পিত হইতে পারেন। (৪।৩২-গ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

(৩) অন্তর-সাধনের প্রণালী

অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে কি ভাবে সেবা করিতে হয়, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু এবং শ্রীশ্রীচৈতন্য-চরিতামৃত তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।
তত্তৎকথারতশ্চাসৌ কুর্য্যাদ্‌বাসং ব্রজে সদা॥ ভ.র.সি. ১।২।১৫০॥

—রাগানুগামার্গের সাধক—শ্রীকৃষ্ণকে স্মরণ করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়তম পরিকরবর্গের মধ্যে যিনি নিজের অভীষ্ট, তাঁহাকে স্মরণ করিয়া নিজভাবানুকূল লীলাকথায় অনুরক্ত হইয়া (সমর্থ হইলে যথাবস্থিত দেহেই, অসমর্থপক্ষে কেবল অন্তশ্চিন্তিত দেহে) সর্ব্বদা ব্রজে বাস করিবেন।"*

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন,

নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥
দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৯১-৯২॥

পূর্ব্বোদ্ধৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকে যাহা বলা হইয়াছে, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পয়ার-দ্বয়েও তাহাই বলা হইয়াছে। এই পয়ারদ্বয়ের আলোচনা করিলেই কথিত বিষয়টী পরিস্ফুট হইতে পারে।

(৪) অন্তর-সাধনে কাহার আনুগত্য করা হইবে

পূর্ব্বে (৫।৪৫-ছ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, রাগানুগা হইতেছে আনুগত্যময়ী। রাগানুগার সাধক সিদ্ধিলাভ করিলেও গুরুপরম্পরার আনুগত্যের যোগে স্বীয় ভাবের অনুকূল নিত্যসিদ্ধ-ব্রজ-

---

* সামর্থ্যে সতি ব্রজে শ্রীমন্নন্দব্রজরাজাবাসস্থানে শ্রীবৃন্দাবনাদৌ শরীরেণ বাসং কুর্য্যাৎ, তদভাবে মনসাপি ইত্যর্থঃ॥ "কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা"-(ভ, র, সি, ১।২।১৫০)-বাক্যের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী।

পরিকরদের আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবা করিবেন, সাধকাবস্থাতেও গুরুপরম্পরার আনুগত্যে সেই ব্রজ-পরিকরদের আনুগত্যেই সিদ্ধদেহে সেবা করিবেন। কিরূপে ব্রজপরিকরদের আনুগত্যে সাধককে সেবা করিতে হইবে, পূর্ব্ববর্ত্তী (৩)-অনুচ্ছেদে উদ্ধৃত প্রমাণসমূহে তাহার নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে। উদ্ধৃত পয়ারদ্বয়ের অর্থালোচনা করিয়া তাহা প্রদর্শিত হইতেছে—"নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা।"

নিজাভীষ্ট—নিজের আকাঙ্ক্ষণীয়, নিজে যাহা ইচ্ছা করেন। **কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ**—শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়। **নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ**—শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্তপ্রিয় পরিকর যাঁহারা, তাঁহাদের মধ্যে যিনি নিজ-ভাবানুকূল বলিয়া সাধকের নিজেরও বাঞ্ছনীয়, তিনিই সাধকের পক্ষে নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর—এই চারিভাবের পরিকরই ব্রজে আছেন; এই চারিভাবেরই রাগাত্মিক-ভক্তও ব্রজে আছেন। "দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২।৯২॥" দাস্যভাবের পরিকরদের মধ্যে রক্তক-পত্রকাদি দাসভক্ত শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তাঁহারা দাস্যভাবে কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। তাঁহারাই দাসযূথের যূথেশ্বর। সখ্যভাবের মধ্যে সুবলাদি সখাগণ কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। বাৎসল্যভাবের মধ্যে শ্রীনন্দ-যশোদা কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। আর মধুরভাবে শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনী-ললিতা-বিশাখাদি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। সাধক ভক্ত যে ভাবের সাধক, ব্রজে সেই ভাবের মধ্যে যিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, তিনি সাধকের নিজাভীষ্ট; কারণ, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যই সাধকের লোভনীয়, সেই কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের আনুগত্যই তাঁহাকে করিতে হইবে। অথবা **নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ**—নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণ—নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ, তাঁহার প্রেষ্ঠ—নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণ চারিভাবের লীলাতে বিলাসবান্; সাধক যেভাবের লীলায় শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে ইচ্ছা করেন, সেই ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ হইলেন তাঁহার অভীষ্ট কৃষ্ণ—সাধকের নিজের অভীষ্ট কৃষ্ণ বা নিজাভীষ্ট কৃষ্ণ; সেইভাবের লীলায় বিলাসবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিকরদের মধ্যে যিনি বা যাঁহারা মুখ্য বা শ্রীকৃষ্ণের অত্যন্ত প্রিয়, তিনি বা তাঁহারা হইলেন সেই ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ—সুতরাং সাধকের নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ। **পাছে ত লাগিয়া**—পাছে পাছে থাকিয়া, অনুগত হইয়া। নিজাভীষ্ট কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের অনুগত হইয়া অন্তর্ম্মনা হইয়া নিরন্তর সেবা করিবে।

অন্তর্ম্মনা—যিনি বাহিরের বিষয় হইতে মনকে আকর্ষণ করিয়া অন্তশ্চিন্তিত-দেহদ্বারা শ্রীকৃষ্ণের সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন, তিনি অন্তর্ম্মনা। দাস্যভাবের সাধক রক্তক-পত্রকাদি নন্দমহারাজের দাসবর্গের, সখ্যভাবের ভক্ত সুবলাদির এবং বাৎসল্যভাবের ভক্ত শ্রীনন্দযশোদার আনুগত্য স্বীকার করিবেন।

"লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃ কার্য্যাত্র সাধকৈঃ।
ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া॥ ভ,র,সি,১।২।১৬০॥

—বাৎসল্যসখ্যাদিতে (বাৎসল্য-সখ্যাদি ভাবের সেবাতে) লুব্ধ সাধকগণ ব্রজেন্দ্র (নন্দমহারাজ)-

সুবলাদির ভাবচেষ্টিত মুদ্রাদ্বারা (তাঁহাদের সেবার আনুগত্যে) ভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন।” মধুর-ভাবের সাধক শ্রীরাধিকা-ললিতাদির আনুগত্য স্বীকার করিবেন। এস্থলে শ্রীরাধাললিতা-নন্দ-যশোদাদি যে সমস্ত কৃষ্ণপ্রেষ্ঠের কথা বলা হইল, তাঁহারা সকলেই রাগাত্মিকাভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন। কিন্তু রাগাত্মিকার অনুগত রাগানুগা সেবাই সাধক ভক্তের প্রার্থনীয় ; সুতরাং সোজাসোজি শ্রীনন্দযশোদাদির আনুগত্য লাভের চেষ্টা করিলে তাঁহার অভীষ্ট সিদ্ধ হওয়ার সম্ভাবনা নাই। রাগানুগা সেবায় যাঁহাদের অধিকার আছে, সেইরূপ নিত্যসিদ্ধ-ব্রজপরিকরদিগের চরণ আশ্রয় করিলেই তাঁহারা কৃপা করিয়া রাগানুগা-সেবায় শিক্ষিত করিয়া সাধক-ভক্তকে শ্রীনন্দযশোদাদি রাগাত্মিকা-সেবাধিকারী কৃষ্ণপ্রেষ্ঠদের চরণে অর্পণ করিয়া সেবায় নিয়োজিত করিতে পারেন। যথা, যিনি মধুর ভাবের সাধক তিনি গুরুমঞ্জরীবর্গের আনুগত্যে, রাগানুগা-সেবার মুখ্যা অধিকারিণী শ্রীরূপমঞ্জরীর চরণ আশ্রয় করিবেন ; শ্রীরূপমঞ্জরীই কৃপা করিয়া তাঁহাকে ললিতা-বিশাখাদি সখীবর্গের এবং শ্রীমতীবৃষভানু-নন্দিনীর আনুগত্য দিয়া শ্রীযুগল-কিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন। [৫।৪৫ ছ (৩)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

(৫) **অন্তর-সাধন কেবলই ভাবনাময়**

রাগানুগার অন্তর্গত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বাহ্য-সাধনই চক্ষুঃকর্ণাদি বহিরিন্দ্রিয় দ্বারা সাধ্য ; কিন্তু অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে সেবার চিন্তারূপ অন্তর-সাধন কেবলই মনের কাজ, ইহা কেবল মানসিকী চিন্তামাত্র। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (৩১১-অনুচ্ছেদে) শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাহা দেখাইয়াছেন।

বিদেহবাসিনী পিঙ্গলানাম্নী কোনও বারবনিতা কোনও সৌভাগ্যবশতঃ যখন নির্ব্বেদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তখন গত জীবনের প্রতি তাঁহার ধিক্কার জন্মিয়াছিল , তখন তিনি সঙ্কল্প করিয়াছিলেন—

“সুহৃৎ প্রেষ্ঠতমো নাথ আত্মা চায়ং শরীরিণাম্।
তৎ বিক্রীয়াত্মনৈবাহং রমেঽনেন যথা রমা ॥ শ্রীভা, ১১।৮।৩৫॥

—ভগবান্ শ্রীনারায়ণই সুহৃৎ, প্রিয়তম, নাথ এবং সমস্ত শরীরীর আত্মা। আমি আত্মবিক্রয় (আত্মসমর্পণরূপ) মূল্যদ্বারা শ্রীনারায়ণকে ক্রয় করিয়া, লক্ষ্মী যেমন ভাবে রমণ করেন, আমিও তেমন ভাবে রমণ করিব।”

এই শ্লোকের আলোচনায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী(ভক্তিসন্দর্ভের ৩১০ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন—“এ-স্থলে শ্রীনারায়ণের স্বাভাবিক সৌন্দর্য্য-সৌহৃত্ত্যাদি ধর্ম্মের দ্বারা নারায়ণের স্বাভাবিক পতিত্ব স্থাপন করিয়া নারায়ণব্যতীত অন্য সকলের ঔপাধিক পতিত্বই অভিপ্রেত হইয়াছে। “পতাবেকত্বং সা গতা যস্মাচ্চরুমন্ত্রাহুতিব্রতা”—ছান্দোগ্যপরিশিষ্টের এই বাক্য অনুসারে জানা যায়—চরু, মন্ত্র ও আহুতিদ্বারাই কোনও রমণী অন্য পতির সহিত একাত্মতা প্রাপ্ত হয়। তাৎপর্য্য এই যে, দেহাভিমানী যে পুরুষের সহিত যে রমণীর বিবাহ হয়, তাহার সহিত সেই দেহাভিমানিনী রমণীর বাস্তবিক একাত্মতা নাই ; বিবাহানুষ্ঠানের অঙ্গীভূত চরু, মন্ত্র ও আহুতি প্রভৃতির দ্বারাই একাত্মতা আরোপিত হয়। সুতরাং এই একাত্মতা বা

পতি-পত্নীসম্বন্ধ হইতেছে আরোপিত, আগন্তুক, ঔপাধিক, পরন্তু স্বাভাবিক নহে। কিন্তু পরমাত্মার সঙ্গে স্বাভাবিক সম্বন্ধই বর্ত্তমান ; শ্লোকস্থ "আত্মা"-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। পরমাত্মা নারায়ণের সহিত এইরূপ স্বাভাবিক সম্বন্ধ আছে বলিয়াই তাঁহাকে "সুহৃৎ প্রেষ্ঠতম" বলা হইয়াছে; তিনি স্বভাবতঃই সুহৃৎ এবং প্রেষ্ঠতম। সুতরাং শ্রীনারায়ণের পতিত্ব আরোপিত নহে। তথাপি, অন্য কন্যা যেমন বিবাহাত্মক আত্মসমর্পণের দ্বারা কোনও পুরুষকে পতিরূপে গ্রহণ করিয়া তাহার সহিত রমণ করে, তদ্রূপ (পিঙ্গলা বলিতেছেন) আমিও আত্মদানরূপ মূল্যদ্বারা শ্রীনারায়ণকে বিশেষরূপে ক্রয় করিয়া তাঁহার সহিত রমণ করিব। আমার সাক্ষাতে স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত মনোহররূপ-বিশিষ্ট নারায়ণের সহিত, লক্ষ্মী যেমন রমণ করেন, আমিও তেমনি রমণ করিব। এইরূপে এই শ্লোকে, নারায়ণের প্রতি লক্ষ্মীদেবীর যেরূপ অনুরাগ, সেইরূপ অনুরাগে পিঙ্গলার রুচি প্রদর্শিত হইয়াছে।

রাগানুগাতে প্রবৃত্তিও নিম্নলিখিতরূপ।

"সন্তুষ্টা শ্রদ্দধত্যেদ্ যথালাভেন জীবতি।
বিহরাম্যমুনৈবাহমাত্মনা রমণেন বৈ ॥ শ্রীভা,১১।৮।৪০॥

—(পিঙ্গলা আরও সঙ্কল্প করিলেন) আমি শ্রদ্ধাবতী হইয়া যথালাভে জীবিকানির্ব্বাহ করিব, তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকিব এবং এই রমণের সহিত মনের দ্বারাই (আত্মনা) বিহার করিব।"

এই শ্লোকের আলোচনায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী (ভক্তিসন্দর্ভ, ৩১১–অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন —"শ্লোকস্থ 'অমুনা রমণেন'-বাক্যের অর্থ— ভাবগর্ভ-রমণের সহিত ; শ্রীনারায়ণকে আমার রমণরূপে, পতিরূপে, ভাবনা করিয়া, তাঁহার সহিত "আত্মনা মনসৈব তাবদ্ বিহরামি—মনের দ্বারাই বিহার করিব অর্থাৎ মানসিকী চিন্তাদ্বারাই, বিহার করিব, বিহারের চিন্তা মাত্র করিব।" *

শ্রীনারায়ণের সহিত যথাবস্থিত দেহে বিহারাদি অসম্ভব। কেননা, নারায়ণ থাকেন তাঁহার ধাম বৈকুণ্ঠে, সাধক বা সাধিকা থাকেন এই প্রাকৃত ব্রহ্মাণ্ডে। নারায়ণ হইতেছেন মায়াতীত সচ্চিদানন্দবিগ্রহ, সাধক বা সাধিকার যথাবস্থিত দেহ হইতেছে প্রাকৃত, মায়িক গুণময়। এই দুইয়ের সংযোগ অসম্ভব। এজন্য কেবল চিন্তাদ্বারাই, অন্তশ্চিন্তিতদেহ দ্বারাই, ভগবানের সহিত সাধক বা সাধিকার মিলন বা বিহারাদি সম্ভবপর হইতে পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন —"রুচিপ্রধানস্য মার্গস্যাস্য মনঃপ্রধানত্বাৎ, তৎপ্রেয়সীরূপেণাসিদ্ধায়াস্তাদৃশভজনে প্রায়ো মনসৈব যুক্তত্বাৎ। অনেন শ্রীপ্রতিমাদৌ তাদৃশীনামপ্যৌদ্ধত্যং পরিহৃতম্। এবং পিতৃত্বাদিভাবেষ্বপ্যনসন্ধেয়ম্ ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ৩১১।—রুচিপ্রধান এই রাগানুগাভক্তিপথে মনেরই (মানসিকী চিন্তারই) প্রাধান্য। পিঙ্গলা এখনও প্রেয়সীরূপে সিদ্ধিলাভ করেন নাই ; সুতরাং কান্তাভাবের ভজন মনের

* ব্রজের কান্তাভাবের উপাসনায় কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের সহিত বিহারের চিন্তা ভজনবিরোধী। নিজের যথাবস্থিত দেহে বিহারের চিন্তা তো দূরে, সাধক নিজেকে যে গোপকিশোরীরূপে চিন্তা করিবেন, সেই গোপকিশোরী কৃষ্ণকর্ত্তৃক প্রার্থিতা হইলেও ভোগপরাঙ্মুখীই থাকিবেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬১ খ (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

(চিন্তার) দ্বারা করাই যুক্তিযুক্ত। ইহাদ্বারা ইহাও বুঝা গেল—(শ্রীনারায়ণের) প্রতিমাদিতে তাদৃশী-দিগের ঔদ্ধত্যও পরিহৃত হইয়াছে। অর্থাৎ পিঙ্গলা কখনও শ্রীনারায়ণের শ্রীবিগ্রহাদির সহিত বিহারের (বিগ্রহাদিগকে আলিঙ্গন-চুম্বনাদির) সঙ্কল্প বা চেষ্টা করেন নাই। পিতৃত্বাদি ভাবের সাধনও এই প্রকারই অনুসন্ধান করিতে হইবে (অর্থাৎ যাঁহারা বাৎসল্য-ভাবের সাধক, তাঁহাদের পক্ষেও কেবল মানসিকী সেবাই কর্ত্তব্যা ; লৌকিক জগতে মাতা যেভাবে তাঁহার শিশু সন্তানকে কোলে করেন, স্তন্যপান করান, শ্রীবিগ্রহ লইয়া তদ্রূপ আচরণ সঙ্গত নহে। সখ্যাদি ভাব সম্বন্ধেও কেবল অন্তশ্চিন্তিত দেহে মানসিকী সেবাই বিধেয়।)”

এইরূপে দেখা গেল—রাগানুগীয় ভজনের অন্তর সাধন হইতেছে কেবল মনেরই কার্য্য ; যথাবস্থিত দেহের কার্য্য ইহাতে কিছুই নাই। সিদ্ধদেহের চিন্তাও মনের ব্যাপার, স্বীয় অভীষ্টলীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবাও মনেরই ব্যাপার। সাধক বা সাধিকা মনে মনে নিজের সিদ্ধদেহের চিন্তা করিয়া, সেই দেহে নিজের তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি চিন্তা করিয়া, সেই দেহের দ্বারা স্বীয় অভীষ্টলীলা-বিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতেছেন বলিয়া চিন্তা করিবেন।

(৬) **অন্তর-সাধনে ধ্যানের স্থান**

ভক্তিমার্গে, বিশেষতঃ রাগানুগার অন্তর-সাধনে, শ্রীকৃষ্ণ কোন্ স্থানে অবস্থিত বলিয়া চিন্তা করিতে হইবে ? তাঁহার ধামেই কি তাঁহাকে চিন্তা করিতে হইবে ? না কি সাধকের হৃদয়ে ?

এসম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৬ অনুচ্ছেদে) বলিয়াছেন—“অথ মুখ্যং ধ্যানং শ্রীভগবদ্ধামগতমেব, হৃদয়কমলগতন্তু যোগিমতম্। ‘স্মরেদ্ বৃন্দাবনে রম্যে’-ইত্যাদ্যুক্ত-ত্বাৎ। অতএব মানসপূজা চ তত্রৈব চিন্তনীয়া॥—মুখ্য ধ্যান হইতেছে শ্রীভগবানের ধামগত (অর্থাৎ ভক্তিমার্গের সাধক ভগবদ্ধামেই স্বীয় উপাস্য স্বরূপের ধ্যান করিবেন)। হৃদয়-কমলে ধ্যান যোগমার্গা-বলম্বীদের অভিমত (ভক্তিমার্গাবলম্বীদের জন্য বিধেয় নহে)। যেহেতু, শাস্ত্রে কথিত হইয়াছে—(ভক্তিমার্গের সাধক) ‘রম্য বৃন্দাবনেই শ্রীকৃষ্ণের স্মরণ করিবে।’ অতএব, মানসপূজাও (অন্তর-সাধনের সেবাও) শ্রীবৃন্দাবনেই চিন্তনীয়া।”

অন্তর-সাধন-প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও তাহাই বলিয়াছেন। “কুর্য্যাদ্ বাসং ব্রজে সদা॥ ১। ২।১৫০॥ [৫।৬১খ (৩)-অনুচ্ছেদ-দ্রষ্টব্য]”। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—“মনে নিজ সিদ্ধদেহ করিয়া ভাবন। রাত্রিদিনে করে ব্রজে কৃষ্ণের সেবন॥ শ্রীচৈ,চ,২।২২।৯০॥ ব্রজে রাধাকৃষ্ণ-সেবা মানসে করিবে॥ শ্রীচৈ,চ,৩।৬।২৩৫।”

কেবল মানসিকী সেবাতেই নহে, যে-খানে যে-খানে ধ্যানের কথা আছে, সে-খানে সে-খানেই ভগবদ্ধামের ধ্যানই ভক্ত সাধকের পক্ষে সঙ্গত, হৃৎকমলে ধ্যান ভক্তিসম্মত নহে। ইহা হইতে জানা গেল—“হৃদি বৃন্দাবনে, কমলাসনে, কমলা সহ বিহর”-ইত্যাদি পদ ভক্তিমার্গের অনুকূল নহে, যোগ-মার্গেরই অনুকূল।

প্রশ্ন হইতে পারে—ভক্তিমার্গে রাগানুগীয় কান্তাভাবের সাধনে কামগায়ত্রীর ধ্যানের উপদেশ দৃষ্ট হয়। "বৃন্দাবনে অপ্রাকৃত নবীন মদন। কামগায়ত্রী কামবীজে যাঁর উপাসন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১০৯॥" কিন্তু শাস্ত্রে দেখা যায়, সূর্য্যমণ্ডলেই কামগায়ত্রীর ধ্যান করিতে হয়। এ-স্থলে কি কর্ত্তব্য ?

এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—"কামগায়ত্রীধ্যানঞ্চ যৎ সূর্য্যমণ্ডলে শ্রূয়তে, তত্তত্রৈব চিন্ত্যম্। 'গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ॥ (ব্রহ্মসংহিতা॥ ৫।৪৮)'-ইত্যত্র এব-কারাৎ। তত্র শ্রীবৃন্দাবননাথঃ সাক্ষান্ন তিষ্ঠতি, কিন্তু তেজোময়প্রতিমাকারেণৈবেতি॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২৮৬॥— কামগায়ত্রীর ধ্যান সূর্য্যমণ্ডলে করিতে হইবে—এইরূপ যে শুনা যায়, তাহাও শ্রীবৃন্দাবনেই চিন্তা করিতে হইবে, সূর্য্যমণ্ডলে নহে। কেননা, ব্রহ্মসংহিতা বলেন—'গোলোক এব নিবসত্যখিলাত্মভূতঃ— নিখিলাত্মভূত গোবিন্দ (শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত) গোলোকেই (বৃন্দাবনেই) বাস করেন।' এ-স্থলে 'এব'-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীগোবিন্দ স্বয়ং গোলোকেই থাকেন, অন্যত্র কোথায়ও থাকেন না। শ্রীবৃন্দাবন-নাথ শ্রীকৃষ্ণ সূর্য্যমণ্ডলে সাক্ষাৎ-ভাবে থাকেন না, তেজোময় প্রতিমাকারেই থাকেন।"

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু কামগায়ত্রীর যে অর্থ প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেও জানা যায়—ব্রজেই কামগায়ত্রীর ধ্যান করিতে হয়। তিনি বলিয়াছেন—কামগায়ত্রী হইতেছে গোপীগণের সহিত লীলাবিলাসী অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ। কামগায়ত্রীর অন্তর্গত সার্দ্ধচব্বিশটী অক্ষর হইতেছে শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিত সার্দ্ধচব্বিশটী চন্দ্র—দশ করনখে দশ চন্দ্র, দশ পদনখে দশ চন্দ্র, দুই গণ্ড দুই চন্দ্র, সমগ্র বদনমণ্ডল এক চন্দ্র, ললাটস্থিত চন্দনবিন্দু এক চন্দ্র, এই মোট চব্বিশটী পূর্ণচন্দ্র ; আর, ললাট অর্দ্ধচন্দ্র। তাৎপর্য্য এই যে, শ্রীকৃষ্ণের সমস্ত অঙ্গ-প্রত্যঙ্গই পরম-মনোহর, তাঁহার দর্শনে ত্রিজগৎ "কামময়" হয়, অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণের অসমোর্দ্ধ মাধুর্য্য দর্শনে তাঁহার সেবার জন্য সকলের চিত্তেই উৎকণ্ঠাময়ী লালসা জাগে।

"কামগায়ত্রী মন্ত্ররূপ, হয় কৃষ্ণের স্বরূপ, সার্দ্ধ চব্বিশ অক্ষর যার হয়।
সে অক্ষর চন্দ্র হয়, কৃষ্ণে করি উদয়, ত্রিজগৎ কৈল কামময়॥
সখি হে কৃষ্ণমুখ দ্বিজরাজরাজ।
কৃষ্ণবপু সিংহাসনে, বসি রাজ্যশাসনে, করে সঙ্গে চন্দ্রের সমাজ॥
দুই গণ্ড সুচিক্কণ, জিনি মণিদর্পণ, সেই দুই পূর্ণচন্দ্র জানি।
ললাট অষ্টমী ইন্দু, তাহাতে চন্দনবিন্দু, সেহো এক পূর্ণচন্দ্র মানি॥
কর-নখ চাঁদের হাট, বংশী উপর করে নাট, তার গীত মুরলীর তান।
পদনখচন্দ্রগণ, তলে করে নর্ত্তন, নূপুরের ধ্বনি যার গান॥
নাচে মকরকুণ্ডল, নেত্রলীলাকমল, বিলাসী রাজা সতত নাচায়।
ভ্রূ-ধনু নাসা বাণ, ধনুর্গুণ দুই কাণ, নারীগণ লক্ষ্য বিন্ধে তায়॥

এই চাঁদের বড় নাট, পসারি চাঁদের হাট, বিনিমূল্যে বিলায় নিজামৃত।
কাঁহো স্মিত-জ্যোৎস্নামৃতে, কাহাকে অধরামৃতে, সব লোক করে আপ্যায়িত ॥
বিপুল আয়তারুণ, মদন-মদঘূর্ণন, মন্ত্রী যার এই দুই নয়ন।
লাবণ্যকেলিসদন, জননেত্র-রসায়ন, সুখময় গোবিন্দ-বদন ॥
যার পুণ্যপুঞ্জফলে, সে-মুখদর্শন মিলে, দুই অক্ষ্যে কি করিবে পান।
দ্বিগুণ বাঢ়ে তৃষ্ণা-লোভ, পিতে নারে মনঃক্ষোভ, দুঃখে করে বিধির নিন্দন ॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।২১।১০৪-১১॥"

এ-স্থলে কামগায়ত্রীর অর্থে গোপনারীপরিবৃত, গোপীগণ-চিত্তবিনোদনতৎপর, বংশীবাদনরত, নানালঙ্কারভূষিত মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণের বর্ণনাই করা হইয়াছে। এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ একমাত্র ব্রজেরই বস্তু, সূর্য্যমণ্ডলের নহে।

(৭) কামানুগা ও সম্বন্ধানুগা ভক্তি

পূর্ব্বে (৫।৪৫চ-অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, রাগাত্মিকা ভক্তি দুই রকমের—সম্বন্ধরূপা এবং কামরূপা। রাগাত্মিকার অনুগতা ভক্তিই যখন রাগানুগা, তখন রাগাত্মিকার এই উভয়রূপ বৈচিত্রীর অনুগতাই হইবে রাগানুগা ভক্তি। কিন্তু সম্বন্ধরূপা এবং কামরূপাতে যখন ভেদ বিদ্যমান, তখন তাহাদের অনুগতা রাগানুগাতেও অনুরূপ ভেদ থাকিবে। এজন্য সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকার অনুগতা রাগানুগাকে বলে **সম্বন্ধানুগা** এবং কামরূপা রাগাত্মিকার অনুগতা রাগানুগাকে বলা হয় কামানুগা। তাৎপর্য্য এই যে—যাঁহারা দাস্য, সখ্য, বা বাৎসল্য ভাবের রাগাত্মিকার আনুগত্যে ভজন করেন, তাঁহাদের রাগানুগাকে বলা হয় সম্বন্ধানুগা এবং যাঁহারা মধুরভাবের রাগাত্মিকার আনুগত্যে ভজন করেন, তাঁহাদের রাগানুগাকে বলা হয় কামানুগা। এই দুই রকমের রাগানুগা ভক্তি সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

অ। কামানুগা

শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ব্রজসুন্দরীগণই হইতেছেন কামরূপা রাগাত্মিকার আশ্রয়। তাঁহাদের ভাবের আনুগত্যময়ী যে ভক্তি বা সাধনভক্তি, তাহার নামই কামানুগা ভক্তি। "কামানুগা ভবেত্তৃষ্ণা কামরূপা-নুগামিনী ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ॥ ১।২।১৫৩॥—কামরূপা ভক্তির অনুগামিনী যে তৃষ্ণা, তাহার নাম কামানুগা ভক্তি।" এস্থলে কাম-শব্দের অর্থ যে প্রেম, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা, তাহা পূর্ব্বেই (৫।৪৫-চ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে।

এই কামানুগা ভক্তি আবার দুই রকমের—সম্ভোগেচ্ছাময়ী এবং তত্তদ্‌ভাবেচ্ছায়ী। সম্ভোগে-চ্ছাময়ী তত্তদ্‌ভাবেচ্ছাত্মেতি সা দ্বিধা ॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫৩ ॥"

কেলিবিষয়ক-তাৎপর্য্যবতী যে ভক্তি, তাহার নাম **সম্ভোগেচ্ছাময়ী** ; আর, স্বস্বযূথেশ্বরীদিগের ভাবমাধুর্য্য-কামনাকেই **তত্তদ্‌ভাবেচ্ছাময়ী** ভক্তি বলে।

কেলিতাৎপর্য্যবত্যেব সম্ভোগেচ্ছাময়ী ভবেৎ।
তদ্‌ভাবেচ্ছাত্মিকা তাসাং ভাবমাধুর্য্যকামিতা॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫৪॥

(১) **সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামানুগা**। ইহাতে শ্রীকৃষ্ণের সহিত সম্ভোগের ইচ্ছা থাকে। কিন্তু সম্ভোগেচ্ছাময়ী কামানুগার সাধনে ব্রজে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাওয়া যায় না।

ভক্তিরসামৃত-সিন্ধু বলেন, যদি কেহ ব্রজসুন্দরীদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়াও ভজন করেন, যদি রাগানুগা ভক্তির যে সমস্ত বিধি আছে, সেই সমস্ত বিধি অনুসারেও ভজন করেন, এমন কি দশাক্ষর-অষ্টাদশাক্ষর মন্ত্রে, কামগায়ত্রী-কামবীজেও শ্রীশ্রীমদনগোপালের ভজন করেন, কিন্তু মনে যদি সম্ভোগেচ্ছা, কি রমণাভিলাষ থাকে, তাহা হইলে সাধক, ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাইবেন না; সিদ্ধাবস্থায় তাঁহার দ্বারকায় মহিষীবর্গের কিঙ্করীত্ব লাভ হইবে। "রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্ যো বিধিমার্গেণ সেবতে। কেবলেনৈব স তদা মহিষীত্বমিয়াৎ পুরে॥ ভ, র, সি, ১।২।১৫৭॥" ইহার টীকায় "বিধিমার্গেণ" শব্দের অর্থে শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"বল্লবীকান্তত্বধ্যানময়েন মন্ত্রাদিনাপি কিমুত মহিষীকান্তত্বধ্যানময়েত্যর্থঃ।" শ্রীচক্রবর্ত্তিপাদ এই প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন—"বস্তুতস্তু লোভপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনমেব রাগমার্গ উচ্যতে, বিধিপ্রবর্ত্তিতং বিধিমার্গেণ সেবনং বিধিমার্গ ইতি।" এই সমস্ত হইতে বুঝা যায়, শ্লোকোক্ত "বিধিমার্গেণ"-শব্দের অর্থ—রাগানুগার ভজন-বিধি। শ্রীজীবগোস্বামিপাদ "মহিষীত্বং" শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন "মহিষীত্বং তদ্বর্গানুগামিত্বমিতি।" —এ-স্থলে 'মহিষীত্ব'-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে 'মহিষীবর্গের অনুগামিত্ব' অর্থাৎ মহিষীদিগের কিঙ্করীত্ব।" বাস্তবিক জীবের পক্ষে মহিষীত্ব লাভ হইতে পারে না; মহিষীবর্গ শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির অংশ—শ্রীকৃষ্ণের প্রেয়সী। আর জীব তাঁহার জীবশক্তির বা তটস্থাশক্তির অংশ—তাঁহার দাস।

রমণেচ্ছা থাকিলে যথাবিহিত উপায়ে রাগানুগার ভজন করিয়াও কেন ব্রজে শ্রীশ্রীরাধা-গোবিন্দের সেবা পাওয়া যায় না, কেনই বা দ্বারকায় মহিষীদের কিঙ্করীত্ব লাভ হয়, তাহার যুক্তিমূলক হেতুও আছে। রমণেচ্ছাতেই স্বসুখবাসনা সূচিত হইতেছে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে—জীব স্বরূপতঃ কৃষ্ণদাস বলিয়া এবং আনুগত্যই দাসত্বের প্রাণবস্তু বলিয়া আনুগত্যময়ী সেবাতেই তাহার স্বরূপগত অধিকার এবং জীব একমাত্র আনুগত্যময়ী সেবাই পাইতে পারে। যে সাধক বা সাধিকার মনে রমণেচ্ছা জাগে, ব্রজে তিনি আনুগত্য করিবেন কাহার? ব্রজে স্বসুখ-বাসনারূপ বস্তুটীরই একান্ত অভাব—পরিকরবর্গ চাহেন শ্রীকৃষ্ণের সুখ, আর শ্রীকৃষ্ণ চাহেন পরিকরদের সুখ (মদ্‌ভক্তানাং বিনোদার্থং করোমি বিবিধাঃ ক্রিয়াঃ - শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন, আমার ভক্তদের চিত্তবিনোদনের উদ্দেশ্যেই আমি বিবিধ ক্রিয়া বা লীলা করিয়া থাকি, ইহাই আমার ব্রত); স্বসুখ-বাসনা কাহারও মধ্যেই নাই। যাঁহার চিত্তে রমণেচ্ছারূপা স্বসুখ-বাসনা আছে, তিনি যাঁহার আনুগত্য করিবেন, তাঁহার মধ্যেও স্বসুখ-বাসনা না থাকিলে আনুগত্য সম্ভব নয়। কিন্তু ব্রজপরিকরদের মধ্যে স্বসুখ-বাসনা নাই বলিয়া রমণেচ্ছুক সাধক বা সাধিকা ব্রজে কাহারও আনুগত্য পাইতে পারেন না; সুতরাং তাঁহার ব্রজপ্রাপ্তিও সম্ভব

নয়। দ্বারকায় মহিষীদের মধ্যে সময় সময় স্বসুখ-বাসনাময়ী রমণেচ্ছা জাগ্রত হয়; সুতরাং উক্তরূপ সাধক বা সাধিকার পক্ষে দ্বারকায় মহিষীদিগের আনুগত্য লাভ সম্ভব হইতে পারে; তাই মহিষীদের কিঙ্করীত্বই তাঁহার পক্ষে সম্ভব। ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তাঁহাকে তাহা দিয়া থাকেন।

অর্চ্চনমার্গের উপাসনায় আবরণ-পূজার বিধান আছে। শ্রীকৃষ্ণের মহিষীবৃন্দও আবরণের অন্তর্ভুক্ত। দশাক্ষর গোপাল-মন্ত্রাদি দ্বারা গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের উপাসনাতেও আবরণস্থানীয়া মহিষীদের প্রতি যদি সাধকের অতিশয় প্রীতি জাগে, তাহা হইলে মহিষীদের ভাবের স্পর্শে তাঁহার চিত্তে রমণেচ্ছা জাগিতে পারে। "রিরংসাং সুষ্ঠু কুর্ব্বন্" ইত্যাদি পূর্ব্বোদ্ধৃত ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিচরণও তাহাই লিখিয়াছেন। "রিরংসাং কুর্ব্বন্নিতি ন তু শ্রীব্রজদেবীভাবেচ্ছাং কুর্ব্বন্নিত্যর্থঃ, কিন্তু সুষ্ঠু ইতি মহিষীবদ্ ভাবস্পৃষ্টতয়া কুর্ব্বন্ ন তু সৈরিন্ধ্রীবত্তদস্পৃষ্টতয়া ইত্যর্থঃ। শ্রীমদ্দশাক্ষরাদাবপ্যাবরণপূজায়াং তন্মহিষীষ্বেব তস্য অত্যাদরাদিতি ভাবঃ।" যাঁহারা ব্রজদেবীদিগের ভাবের আনুগত্য কামনা করেন, সে সমস্ত রাগানুগামার্গের সাধকগণের পক্ষে অর্চ্চনাঙ্গে দ্বারকাধ্যান, মহিষীদিগের পূজানাদি আচরণীয় নহে।

(২) তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগা

শ্রীকৃষ্ণের মাধুর্য্যের কথা, কিম্বা কৃষ্ণকান্তা ব্রজসুন্দরীদিগের সহিত শ্রীকৃষ্ণের লীলাদির কথা শুনিয়া ব্রজসুন্দরীদিগের আনুগত্যে লীলাতে শ্রীকৃষ্ণের সেবার জন্য লুব্ধ হইয়া যিনি রাগানুগামার্গে ভজন করেন, তাঁহার সাধনভক্তিকে বলা হয় তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগা। তাঁহার চিত্তে কোনও সময়েই সম্ভোগেচ্ছা জাগে না। সাধনে সিদ্ধি লাভ করিয়া লীলায় প্রবেশ করার পরেও আপনা হইতে তাঁহার সম্ভোগেচ্ছা তো জাগেই না, শ্রীকৃষ্ণ যদি কোনও কারণে, তাঁহার চিত্তবিনোদনের জন্য, তাঁহার সহিত রমণাভিলাষী হয়েন, তাহা হইলেও তিনি ভোগপরাঙ্মুখীই থাকেন। "প্রার্থিতামপি কৃষ্ণেন তত্র ভোগপরাঙ্মুখীম্ ॥ পদ্মপুরাণ, পাতালখণ্ড ॥৫২।৮॥"

তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগাই বিশুদ্ধ-কামানুগা। "তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মিকা"-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"তত্তদ্ভাবেচ্ছাত্মেতি তস্যাস্তস্যা নিজনিজাভীষ্টায়া ব্রজদেব্যা যো ভাব স্তদ্বিশেষস্তত্র যা ইচ্ছা সৈবাত্মা প্রবর্ত্তিকা যস্যাঃ সেতি মুখ্যকামানুগা জ্ঞেয়া।" শ্রীরূপমঞ্জরী প্রভৃতি স্বীয় অভীষ্ট ব্রজদেবীদিগের আনুগত্য স্বীকার করিয়া, সম্ভোগবাসনাদি সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ পূর্ব্বক রাগাত্মিকাময়ী শ্রীকৃষ্ণসেবার আনুকূল্য-বিধানের নিমিত্ত যে বলবতী ইচ্ছা, তাহাই তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগা ভক্তির প্রবর্ত্তিকা। ইহাই মুখ্য কামানুগা।

তত্তদ্ভাবেচ্ছাময়ী কামানুগার ভজনে যে কান্তাভাবের সেবোপযোগী গোপীদেহ লাভ হইতে পারে, তাহার প্রমাণ পুরাণাদিতে দৃষ্ট হয়। পদ্মপুরাণ হইতে জানা যায়, পুরাকালে দণ্ডকারণ্যবাসী মুনিগণ শ্রীরামচন্দ্রের দর্শন করিয়া তদপেক্ষাও অধিকতর মাধুর্য্যময় শ্রীকৃষ্ণের কান্তাভাবময়ী সেবার

জন্য লুব্ধ হইয়া ব্রজসুন্দরীদিগের আনুগত্যে ভজন করিয়াছিলেন এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রকটলীলাকালে ব্রজে গোপীগর্ভে জন্ম গ্রহণ করিয়া গোপী-ভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইয়া কৃতার্থ হইয়াছিলেন।

পুরা মহর্ষয়ঃ সর্ব্বে দণ্ডকারণ্যবাসিনঃ। দৃষ্ট্বা রামং হরিং তত্র ভোক্তুমৈচ্ছন্ সুবিগ্রহম্॥
তে সর্ব্বে স্ত্রীত্বমাপন্নাঃ সমুদ্ভূতাশ্চ গোকুলে। হরিং সংপ্রাপ্য কামেন ততো মুক্তা ভবার্ণবাৎ॥
—শ্রী,র,সি, ১।২।১৫৬-ধৃত পদ্মপুরাণ-বচন।

ইঁহারাই ঋষিচরী গোপীনামে পরিচিত। রাসলীলাপ্রসঙ্গে শ্রীমদ্ভাগবতে এই ঋষিচরী গোপীদের উল্লেখ দৃষ্ট হয়। যাঁহারা গৃহে আবদ্ধ হইয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহারাই ঋষিচরী।

আর, শ্রীমদ্ভাগবত হইতে জানা যায়, বেদাভিমানিনী দেবীগণও ব্রজগোপীদের আনুগত্যে ভজন করিয়া গোপীদেহ লাভ করিয়া কান্তাভাবে ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছিলেন।

"নিভৃতমরুন্মনোক্ষদৃঢ়যোগযুজো হৃদি যন্মুনয় উপাসতে তদরয়োঽপি যযুঃ স্মরণাৎ।
স্ত্রিয় উরগেন্দ্রভোগভুজদণ্ডবিষক্তধিয়ো বয়মপি তে সমাঃ সমদৃশোঽঙ্ঘ্রিসরোজসুধাঃ॥
— শ্রীভা, ১০।৮৭।২৩॥

—(শ্রুত্যভিমানিনী দেবীগণ শ্রীকৃষ্ণকে বলিয়াছেন) প্রাণ, মন ও ইন্দ্রিয়বর্গের সংযমন-পূর্ব্বক দৃঢ়যোগযুক্ত মুনিগণ হৃদয়মধ্যে যে-তোমার (নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মাখ্য তত্ত্বের) উপাসনা করেন (উপাসনা করিয়া প্রাপ্ত হয়েন), তোমার প্রতি শত্রুভাবাপন্ন ব্যক্তিগণও (তোমার অনিষ্ট চিন্তায়, বা তোমা হইতে ভয়বশতঃ) তোমার স্মরণ করিয়া তাহা (সেই ব্রহ্মাখ্যতত্ত্ব) পাইয়াছে। আর, সর্পরাজের শরীর-তুল্য তোমার ভুজদণ্ডে আসক্তবুদ্ধি ব্রজস্ত্রীগণ তোমার যে চরণ-সরোজ-সুধা সাক্ষাদ্ভাবে বক্ষে ধারণ করেন, তাঁহাদের আনুগত্য অবলম্বন পূর্ব্বক আমরাও তাঁহাদের ন্যায় (সেই চরণ-সরোজসুধা) প্রাপ্ত হইয়াছি।"

শ্রুতিগণ প্রকাশান্তরে গোপীদেহ লাভ করিয়া ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করিয়াছেন। ইঁহাদিগকে শ্রুতিচরী গোপী বলা হয়। শ্রীমদ্ভাগবতে রাসলীলা-প্রসঙ্গে ইঁহাদের কথাও আছে। যাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের বংশীধ্বনি শ্রবণমাত্রেই উন্মত্তার ন্যায় ছুটিয়া গিয়া শ্রীকৃষ্ণের সহিত মিলিত হইয়াছিলেন, যাঁহাদিগকে কেহ বাধা দিতে পারে নাই, তাঁহাদের মধ্যে দুই শ্রেণীর গোপী ছিলেন—নিত্যসিদ্ধ গোপীগণ এবং সাধনসিদ্ধ ঋষিচরী গোপীগণ।

আ। সম্বন্ধানুগা

নন্দমহারাজের দাস রক্তকপত্রকাদি, শ্রীকৃষ্ণের সখা সুবল-মধুমঙ্গলাদি এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রতি বাৎসল্যময় নন্দযশোদা হইতেছেন সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকার আশ্রয় বা পরিকর। ইহাঁদের কাহারও ভাবের আনুগত্যে যে ভজন, তাহারই নাম সম্বন্ধানুগা রাগানুগা ভক্তি।

"সা সম্বন্ধানুগা ভক্তিঃ প্রোচ্যতে সদ্ভিরাত্মনি। যা পিতৃত্বাদিসম্বন্ধমননারোপণাত্মিকা॥
লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ ভক্তিঃকার্য্যাত্র সাধকৈঃ। ব্রজেন্দ্রসুবলাদীনাং ভাবচেষ্টিতমুদ্রয়া॥
—ভক্তিরসামৃতসিন্ধুঃ ॥১।২।১৫৯-৬০॥

—নিজেতে পিতৃত্বাদি সম্বন্ধের মননারোপণাত্মিকা যে ভক্তি, তাহাকে সম্বন্ধানুগা ভক্তি বলা হয়। বাৎসল্য-সখ্যাদিতে যাঁহাদের চিত্ত লুব্ধ হয়, সে-সমস্ত সাধকগণ ব্রজেন্দ্র-সুবলাদির ভাব ও চেষ্টা দ্বারা (ভাব ও চেষ্টার আনুগত্যে) সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিবেন।"

এ-স্থলে "বাৎসল্য-সখ্যাদৌ"-শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে "দাস্যভাবকে" এবং "ব্রজেন্দ্র-সুবলাদীনাম্" শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে দাস্যভাবের পরিকর "রক্তক-পত্রকাদিকে" বুঝাইতেছে।

রাগানুগা-ভক্তি-প্রসঙ্গে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—"নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥ দাস সখা পিত্রাদি প্রেয়সীর গণ। রাগমার্গে এই সব ভাবের গণন॥ শ্রীচৈ, চ,২।২২।৯১-৯২॥ [৫।৬১খ (৩)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]। কামানুগা এবং সম্বন্ধানুগা-এই উভয় প্রকারের রাগানুগা সম্বন্ধেই এইরূপ আনুগত্যময় ভজনের কথা বলা হইয়াছে। কামানুগার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সম্বন্ধানুগার ভজনও তদনুরূপ । শ্রীনন্দ-যশোদার বাৎসল্যময়ী সম্বন্ধরূপা রাগাত্মিকার সেবার কথা শুনিয়া বাৎসল্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা প্রাপ্তির জন্য যাঁহার লোভ জন্মে, তিনি তৎসেবোপযোগী অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে নন্দযশোদার আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবার চিন্তা করিবেন। সুবলাদি সখাগণের সখ্যভাবময়ী সম্বন্ধরূপা-রাগাত্মিকার সেবার কথা শুনিয়া সখ্যভাবে শ্রীকৃষ্ণের সেবা-প্রাপ্তির জন্য যিনি লুব্ধ হয়েন, তিনি সেবাপযোগী অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে সুবলাদির আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণ-সেবার চিন্তা করিবেন এবং রক্তক-পত্রকাদির দাস্যভাবময়ী সম্বন্ধরূপা-রাগাত্মিকার সেবার কথা শুনিয়া দাস্যভাবে শ্রীকৃষ্ণসেবার জন্য যিনি লুব্ধ হয়েন, তিনি সেবোপযোগী অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে রক্তক-পত্রকাদির আনুগত্যে শ্রীকৃষ্ণসেবার চিন্তা করিবেন। এইরূপই সম্বন্ধানুগা রাগানুগার ভজন।

গ। সাধকের পক্ষে দোষাবহ অভিমান

রাগানুগার অন্তর-সাধনে সাধক যদি নিজেকে শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের সহিত অভিন্ন মনে করেন (অর্থাৎ বাৎসল্য ভাবের সাধনে—আমি নন্দ বা আমি যশোদা, ইত্যাদি অভিমান ; সখ্যভাবের সাধনে আমিই সুবল-এইরূপ অভিমান ; কান্তাভাবের সাধনে আমিই শ্রীরাধা যা ললিতা-ইত্যাদি অভিমান পোষণ করেন), তাহা হইলে ইহা হইবে তাঁহার পক্ষে অপরাধজনক।

উপরে উদ্ধৃত "লুব্ধৈর্বাৎসল্যসখ্যাদৌ"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব গোস্বামী লিখিয়াছেন —"পিতৃত্বাদ্যভিমানোহি দ্বিধা সম্ভবতি স্বতন্ত্রত্বেন, তৎপিত্রাদিভিরভেদভাবনয়া চ। অত্রান্ত্যমনুচিতং ভগবদভেদোপাসনাবত্তেষু ভগবদ্বদেব নিত্যত্বেন প্রতিপাদয়িষ্যমাণেষু তদনৌচিত্যাৎ। তথা তৎপরিকরেষু তত্তুচিতভাবনা-বিশেষেণাপরাধাপাতাৎ।" এই টীকার তাৎপর্য্য এইরূপ। ব্রজেন্দ্রের বা সুবলাদির ভাবের অভিমানও দুই রকমের—স্বতন্ত্ররূপে পিতৃত্বাদির অভিমান এবং পিত্রাদির সহিত অভেদ-মনন। এই দুইয়ের মধ্যে পিত্রাদির সহিত অভেদ-মনন অনুচিত ; যেহেতু, শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিজেকে অভিন্ন জ্ঞান করিলে (অর্থাৎ আমিই শ্রীকৃষ্ণ—এইরূপ মনে করিলে) যেরূপ অপরাধ হয়, তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণের (শ্রীনন্দযশোদাদি, শ্রীসুবলাদির, বা শ্রীরাধা-চন্দ্রাবলী-ললিতা-বিশাখাদির) সহিত নিজেকে

অভিন্ন মনে]করিলেও (আমিই শ্রীনন্দ বা যশোদা, আমিই সুবল বা মধুমঙ্গলাদি, আমিই শ্রীরাধা বা শ্রীললিতা, বা চন্দ্রাবলী-আদি—এইরূপ মনে করিলেও) সেইরূপ অপরাধই হইয়া থাকে। ইহার কারণ এই যে, নিত্যসিদ্ধ পরিকরতত্ত্বে ও ভগবত্তত্ত্বে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই—কেননা, নিত্যসিদ্ধ পরিকরগণ শ্রীকৃষ্ণেরই স্বরূপ-শক্তির বিলাস। তাই এইরূপ অভিমান অনুচিত। কিন্তু সাধক-জীবের পক্ষে স্বীয় ভাবানুকূল সিদ্ধদেহের চিন্তায় দোষের কিছু নাই ; যেহেতু, তাঁহার এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ শ্রীকৃষ্ণের সহিত অভিন্ন নিত্যসিদ্ধ দেহ নহে। তাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"সেবাসাধকরূপেণ সিদ্ধরূপেণ চাত্র হি।" এই শ্লোকের "সিদ্ধরূপেণ"-শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন "অন্তশ্চিন্তিতা--ভীষ্টতৎসেবোপযোগিদেহেন—অভীষ্ট সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহে।" পদ্মপুরাণও এজন্যই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে শ্রীকৃষ্ণের অষ্টকালীয় লীলায় সেবার উপদেশ দিয়াছেন। (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৬১খ(১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। যাহাহউক, এই গেল নন্দ-যশোদাদির সহিত অভেদ-মননের কথা। আর স্বতন্ত্র-রূপে পিতৃত্বাদির অভিমানের তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ—শ্রীকৃষ্ণকে পুত্ররূপে মনে করা, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র—এইরূপ অভিমান পোষণ করা। কিন্তু এইরূপ অভিমানেও যদি সাধক মনে করেন যে, আমি শ্রীনন্দ বা শ্রীযশোদা, তাহা হইলেও পূর্ব্ববৎ অপরাধই হইবে। যাহা হউক, শ্রীকৃষ্ণ আমার পুত্র—এই রূপ অভিমানে শ্রীকৃষ্ণকৃপায় সাধক যদি সিদ্ধিলাভ করিতে পারেন, তাহা হইলে তিনি যে নন্দ-যশোদার ন্যায় পুত্ররূপে কৃষ্ণকে পাইবেন, তাহা নহে। তবে তিনি কিরূপে কৃষ্ণকে পুত্ররূপে পাইবেন, পরবর্ত্তী "নন্দসূনোরধিষ্ঠানং তত্র পুত্রতয়া ভজন্। নারদস্যোপদেশেন সিদ্ধোঽভূদ্ বৃদ্ধবর্দ্ধকিঃ॥ ভ, র, সি, ১।২। ১৬১॥"-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব তাহা জানাইয়াছেন। "সিদ্ধোঽভূদিতি বালবৎসহরণ-লীলায়াং তৎ-পিতৃণামিব সিদ্ধির্জ্ঞেয়া।" ব্রহ্ম-মোহন-লীলায় ব্রহ্মা শ্রীকৃষ্ণের সখা গোপবালকগণকে এবং বৎসসমূহকে হরণ করিয়া লইয়া গেলে লীলাশক্তির প্রভাবে শ্রীকৃষ্ণই সেই সমস্ত গোপবালক এবং বৎসরূপে আত্ম প্রকট করিয়া গৃহে প্রত্যাবর্ত্তন করেন। গোপবৃদ্ধগণ মনে করিলেন, অন্য দিনের ন্যায় সেই দিনও তাঁহাদের পুত্রগণই গোচারণ হইতে গৃহে ফিরিয়া আসিয়াছেন ; বস্তুতঃ আসিয়াছেন—শ্রীকৃষ্ণ, তাঁহাদের পুত্রগণের রূপ ধরিয়া। এস্থলেও গোপগণ কৃষ্ণকেই পুত্ররূপে পাইলেন—কিন্তু চিনিতে পারেন নাই। একবৎসর পর্য্যন্ত তাঁহারা এইরূপে তাঁহাদের পুত্রবেশী শ্রীকৃষ্ণের লালন-পালনাদি করিয়াছিলেন। যাহা হউক, এসমস্ত গোপগণ যেরূপ সাময়িকভাবে শ্রীকৃষ্ণকে স্ব-স্ব-পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন, যাঁহারা পুত্রজ্ঞানে শ্রীকৃষ্ণের ভজন করিবেন, তাঁহারাও সেইরূপ ভাবেই পুত্ররূপে শ্রীকৃষ্ণকে পাইবেন। "বাল-বৎসহরণ-লীলায়াং তৎপিতৃণামিব সিদ্ধির্জ্ঞেয়া"-বাক্যে শ্রীজীব গোস্বামী তাহাই বলিলেন। উল্লিখিত গোপবৃদ্ধগণ তাঁহাদের পুত্রের আকারে শ্রীকৃষ্ণকে এক বৎসরের জন্য পুত্ররূপে পাইয়াছিলেন বটে ; কিন্তু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি তাঁহাদের পুত্রবৎ-বাৎসল্য ছিল নিত্য। তাঁহাদের বাৎসল্য নিত্য হইলেও তাহা লালন-পালনাদিতে নিত্য-অভিব্যক্তি লাভ করে নাই। যিনি আনুগত্য ব্যতীত স্বতন্ত্রভাবে নিজেকে কৃষ্ণের পিতা বা মাতা এবং কৃষ্ণকে নিজের পুত্রজ্ঞানে ভজন করিবেন, সিদ্ধিলাভে ব্রজে তাঁহার জন্ম হইলে

কৃষ্ণেতে তাঁহারও নিত্য বাৎসল্যভাব থাকিতে পারে, সাময়িক ভাবে সেই ভাব লালন-পালনাদিতেও অভিব্যক্ত হইতে পারে—পূর্ব্বোল্লিখিত গোপবৃদ্ধদিগের ন্যায়। কিন্তু যাঁহারা "নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠের" আনুগত্যে ভজন করিবেন, পার্ষদরূপে তাঁহারা লালন-পালনাদি নিত্যসেবার অধিকারী হইতে পারিবেন এবং শ্রীকৃষ্ণকে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াও চিনিতে পারিবেন।

যদি কেহ বলেন—নন্দ-যশোদা, সুবল-মধুমঙ্গলাদি, কি শ্রীরাধাললিতাদির সহিত নিজের অভেদ-মনন যদি অপরাধজনক হয়, পূর্ব্বোক্ত সিদ্ধদেহ-চিন্তনে কি তদ্রূপ অপরাধ হইবে না? উত্তরে বলা যায়—সিদ্ধদেহ-চিন্তনে তদ্রূপ অপরাধের হেতু নাই। কারণ, শ্রীনন্দযশোদাদি শ্রীকৃষ্ণের স্বরূপ-শক্তির বিলাস বলিয়া তত্ত্বতঃ শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন, শ্রীকৃষ্ণই লীলাবিলাসের উদ্দেশ্যে তত্তৎ-রূপে অনাদিকাল হইতে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন। সাধকের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ (বা নিত্যমুক্ত কি সাধন-সিদ্ধ জীবের সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ) তদ্রূপ নয়; ইহা হইল সেবার উপযোগী এবং স্বরূপশক্তির কৃপাপ্রাপ্ত একটী চিন্ময় দেহ, যাহার সাহায্যে তটস্থাশক্তি-জীব শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিতে পারে। জীব সিদ্ধাবস্থাতেও তটস্থা-শক্তিই থাকে, স্বরূপ-শক্তি হইয়া যায়না—যদিও স্বরূপ-শক্তির কৃপা লাভ করে। কিন্তু—নন্দ-যশোদাদি হইলেন স্বরূপ-শক্তি, তাঁহারা জীবতত্ত্ব নহেন; তাঁহারা স্বরূপ-শক্তি বলিয়াই স্বরূপতঃ তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন। তাঁহারা হইলেন শ্রীকৃষ্ণের স্বাংশ, আর জীব হইল তাঁহার বিভিন্নাংশ। পার্থক্য অনেক। স্বাংশগণ হইলেন স্বরূপশক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ; আর বিভিন্নাংশ জীব হইল তটস্থ-শক্তিযুক্ত কৃষ্ণের অংশ। তটস্থা শক্তি জীবকে স্বরূপশক্তিময় ভগবানের সহিত অভিন্ন মনে করিলে অপরাধ হয়। তাই শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"জীবে ঈশ্বর জ্ঞান এই অপরাধ চিন।" কিন্তু স্বরূপশক্তি-শ্রীরাধাকে কৃষ্ণের সহিত অভিন্ন মনে করিলে অপরাধের হেতু নাই; যেহেতু "রাধা কৃষ্ণ ঐছে সদা একই স্বরূপ"।

ঘ। রাগানুগায় শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি বাহ্যসাধন উপেক্ষণীয় নহে

রাগানুগামার্গের ভক্তিতে অন্তর-সাধন বা লীলা-স্মরণই মুখ্য ভজনাঙ্গ। কিন্তু তাহা বলিয়া বাহ্য-সাধন বা যথাবস্থিতদেহের সাধন উপেক্ষণীয় নহে; বাহ্য-সাধনদ্বারা অন্তর-সাধন পুষ্টিলাভ করে; আবার অন্তর-সাধন দ্বারাও বাহ্য সাধনে প্রীতি জন্মিয়া থাকে। যশোদা-মাতা শ্রীকৃষ্ণকে স্তন্য পান করাইতেছিলেন, এমন সময় দেখিলেন, উনুনের উপরে দুধ উছলিয়া পড়িয়া যাইতেছে; তাড়াতাড়ি কৃষ্ণকে ফেলিয়া রাখিয়াও তিনি দুধ সামলাইতে গেলেন। যশোদা-মাতার নিকটে কৃষ্ণ অপেক্ষা অবশ্যই দুধ বেশী প্রীতির বস্তু নহে; তথাপি কৃষ্ণকে ফেলিয়া দুধ রক্ষা করিতে গেলেন—কৃষ্ণ তখনও পেট ভরিয়া স্তন্য পান করেন নাই। ইহার কারণ, দুধ কৃষ্ণেরই জন্য; দুধ নষ্ট হইলে কৃষ্ণ খাইবে কি? কৃষ্ণ পোষ্য, দুধ পোষক। পোষ্যে প্রীতিবশতঃই পোষকে প্রীতি। যশোদা-মাতা যেমন পোষ্য কৃষ্ণকে ত্যাগ করিয়া পোষক দুগ্ধকে রক্ষা করিতে গেলেন, কোনও কোনও রাগানুগা-ভক্তও সেইরূপ

অনেক সময় পোষ্য-লীলাস্মরণ ত্যাগ করিয়া পোষক বাহ্য সাধনে মনোনিবেশ করেন। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির সঙ্গেও অবশ্য লীলাস্মরণ চলিতে পারে।

৬। পুষ্টিমার্গ

রাগানুগা ভক্তি কেবলমাত্র কৃষ্ণকৃপা এবং কৃষ্ণভক্তের কৃপা হইতেই পাওয়া যায়। এই রাগানুগা ভক্তিকে কেহ কেহ পুষ্টিমার্গও বলিয়া থাকেন।

কৃষ্ণতদ্‌ভক্তকারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা।
পুষ্টিমার্গতয়া কৈশ্চিদিয়ং রাগানুগোচ্যতে॥ ভ, র, সি, ১।২।১৬৩॥

(১) মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ

গৌড়ীয় বৈষ্ণবাচার্য্য শ্রীপাদ রূপগোস্বামী তাঁহার ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে ভক্তিমার্গে দ্বিবিধ সাধনের কথা বলিয়াছেন—বিধিমার্গ এবং রাগানুগামার্গ। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, কেহ কেহ বিধিমার্গকে মর্য্যাদামার্গও বলেন [৫।৬০ক (৭) অনুচ্ছেদ] এবং রাগানুগামার্গকে পুষ্টিমার্গও বলেন [৫।৬১-৬-অনুচ্ছেদ]। শ্রীপাদ রূপগোস্বামী এ-স্থলে বোধহয় শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যকেই লক্ষ্য করিয়াছেন। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যই মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গের কথা বলিয়াছেন।

শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য ৩।৩।২৯, ৪।২৩, ৪।১।১৩, ৪।৪।৯, ৩।৪।৪৬-প্রভৃতি ব্রহ্মসূত্রের অণুভাষ্যে মর্য্যাদামার্গ ও পুষ্টিমার্গ সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি বলেন—"তমেব বিদিত্বা অতিমৃত্যুমেতি নান্যঃ পন্থা বিদ্যতে অয়নায়"-ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া মোক্ষ লাভের জন্য যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের ভজনমার্গকে বলে মর্য্যাদামার্গ—মোক্ষলাভের জন্য শাস্ত্রবাক্যের প্রতি মর্য্যাদা বশতঃ যে মার্গ বা পন্থা অনুসৃত হয়, তাহাই মর্য্যাদামার্গ। গৌড়ীয় সম্প্রদায় ইহাকেই শাস্ত্রবিধি-প্রবর্ত্তিত ভজনমার্গ—বিধিমার্গ—বলেন। আর, বল্লভমতে-"যমৈবেষ বৃণুতে তেন এষ লভ্যঃ"-ইত্যাদি শাস্ত্রবাক্য শুনিয়া পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের প্রাপ্তির জন্য যাঁহারা ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন, তাঁহাদের ভজনমার্গকে বলে পুষ্টিমার্গ। পুষ্টি ও পোষণ একার্থক। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "পোষণং তদনুগ্রহঃ॥ ২।১০।৪॥"-বাক্য অনুসারে পোষণ (বা পুষ্টি)-শব্দের অর্থ হইতেছে—ভগবদনুগ্রহ। ভগবদনুগ্রহবশতঃই যে পন্থায় লোক ভজনে প্রবৃত্ত হয়, তাহাকে বলে পুষ্টিমার্গ (অনুগ্রহমার্গ)। রাগানুগামার্গসম্বন্ধে শ্রীপাদ রূপগোস্বামীও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণতদ্‌ভক্তকারুণ্যমাত্রলাভৈকহেতুকা।" ভজনে প্রবর্ত্তক হেতু উভয়েরই এক।

শ্রীপাদ বল্লভ বলেন—"কৃতিসাধ্যং সাধনং জ্ঞানভক্তিরূপং শাস্ত্রেণ বোধ্যতে। তাভ্যাং বিহিতাভ্যাং মুক্তির্মর্য্যাদা। তদ্রহিতানামপি স্বরূপবলেন স্বপ্রাপণং পুষ্টিরুচ্যতে॥ ৩।৩।২৯-ব্রহ্মসূত্রের অনুভাষ্য॥" তাৎপর্য্য—ইন্দ্রিয়সাধ্য যে সাধন, তাহা হইতেছে জ্ঞানভক্তিরূপ; তদ্দ্বারা যে মুক্তি লাভ হয়, তাহাই মর্য্যাদা। আর কৃতিসাধ্য সাধন ব্যতীত কেবল স্বরূপবলে যে স্বপ্রাপণ (কৃষ্ণপ্রাপ্তি), তাহা হইতেছে পুষ্টি।

মর্য্যাদামার্গের ফল সাযুজ্য, পুষ্টিমার্গের ফল সাক্ষাদ্‌ভগবদধরামৃত। মর্য্যাদামার্গে ভগবচ্চরণা-

রবিন্দে ভক্তি ; পুষ্টিমার্গে ভগবন্মুখারবিন্দে ভক্তি। মর্য্যাদামার্গে শ্রবণাদিদ্বারা সুখসম্বন্ধ লাভ হয়। ইহা সুলভ। পুষ্টিমার্গে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণপ্রদত্ত পুষ্টিভক্তিদ্বারা গোপীগণদ্বারা ভগবানের অধরামৃতসেবন সম্পাদিত হয় ; ইহা দুর্লভ।

(২) **মর্য্যাদামার্গীয় ও পুষ্টিমার্গীয় জীব**

বল্লভমতে মুক্ত ও অমুক্ত-এই দুই রকমের জীব। মুক্ত আবার দ্বিবিধ—জীবন্মুক্ত এবং মুক্ত (বিদেহমুক্ত)। অমুক্ত জীব আবার দ্বিবিধ—দৈব এবং আসুর। দৈব জীব আবার দ্বিবিধ—মর্য্যাদামার্গীয় ও পুষ্টিমার্গীয় ; মুক্তাবস্থাতেও ইঁহাদের ভেদ থাকে। অর্থাৎ যাঁহারা মর্য্যাদা-মার্গীয় জীব, তাঁহারাই মর্যাদামার্গে ভজন করেন এবং ভজনসিদ্ধিতে মুক্তিলাভ করেন ; গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করেন না। আর, যাঁহারা পুষ্টিমার্গীয় জীব, তাঁহারাই পুষ্টিমার্গের ভজনে প্রবৃত্ত হয়েন এবং ভজনসিদ্ধিতে গোপীজনবল্লভ শ্রীকৃষ্ণের সেবা লাভ করেন। এইরূপে দেখা গেল—বল্লভ-মতে এতাদৃশ জীবভেদ হইতেছে—অবস্থাগত ভেদমাত্র।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ও জীবের অবস্থাগত ভেদ স্বীকার করেন। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্য নিত্যমুক্ত জীবের কথা কিছু বলেন নাই। গৌড়ীয় সম্প্রদায় নিত্যমুক্ত জীবও স্বীকার করেন। গৌড়ীয় মতে মুক্ত জীব তিন রকমের—নিত্যমুক্ত (যাঁহারা কখনও মায়ার কবলে পতিত হয়েন নাই, অনাদিকাল হইতেই ভগবৎ-পার্ষদ), সাধনমুক্ত (সাধনসিদ্ধ, সাধনের প্রভাবে যাঁহারা মায়ামুক্ত হইয়া ভগবদ্ধামাদিতে বিরাজিত) এবং জীবন্মুক্ত। শ্রীপাদ বল্লভাচার্য্যের মর্য্যাদামার্গীয় এবং পুষ্টিমার্গীয় মুক্ত জীবগণও গৌড়ীয়মতের সাধনমুক্ত বা সাধনসিদ্ধদের অন্তর্ভুক্ত। যাঁহারা উল্লিখিতরূপ মুক্তজীব নহেন, গৌড়ীয় মতে তাঁহারা অনাদিকাল হইতে মায়াবদ্ধ - সংসারী। বল্লভমতের দৈব ও আসুর জীবগণ এই অনাদিবদ্ধ জীবগণের অন্তর্ভুক্ত।

শ্রীমদ্ভাগবতের "নৃষু তব মায়য়া ভ্রমমমীষ্ববগত্য ভৃশম্"-ইত্যাদি ১০।৮৭।৩২-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও চারি প্রকার জীবের কথা বলিয়াছেন :—(১) অবিদ্যাবৃত বদ্ধ জীব, (২) ভক্তিযুক্তজ্ঞানের সাধনে অবিদ্যাবরণমুক্ত মুক্তজীব, (৩) কেবলা বা প্রধানীভূতা ভক্তির সাধনে অবিদ্যাবরণমুক্ত এবং চিদানন্দময়-ভজনোপযোগী দেহপ্রাপ্ত সিদ্ধভক্ত এবং (৪) অবিদ্যাযোগরহিত নিত্যপার্ষদ (নিত্যমুক্ত)। এ-স্থলে উল্লিখিত প্রথম রকমের জীব হইতেছে বল্লভমতের দৈব ও আসুর জীব ; দ্বিতীয় রকমের জীব হইতেছে বল্লভমতের মর্য্যাদামার্গীয় মুক্ত জীব ; তৃতীয় রকমের জীব হইতেছে বল্লভমতের পুষ্টিমার্গীয় মুক্ত জীব। চতুর্থ রকমের নিত্যমুক্ত জীবসম্বন্ধে বল্লভমত নীরব।

গৌড়ীয় সম্প্রদায়ের নিত্যমুক্তজীব-স্বীকৃতির একটা বিশেষ দার্শনিক গুরুত্ব আছে। নিত্যমুক্ত জীব স্বীকার না করিলে সমস্ত জীবেরই অনাদি-বহির্মুখতা এবং মায়াবদ্ধতা স্বীকার করিতে হয়। তাহাতে মনে হইতে পারে যে, জীবের বহির্মুখতার মূল যে অনাদিকর্ম্ম, সেই অনাদিকর্ম্মের প্রবর্ত্তক মনোভাব জীবমাত্রের মধ্যেই বর্ত্তমান—সুতরাং সেই মনোভাব হইতেছে জীবের স্বরূপগত ; স্বরূপগত

হইলে জীবের মোক্ষ সম্বন্ধেই আশঙ্কা জন্মে। নিত্যমুক্ত-জীবের স্বীকৃতিতে সেই আশঙ্কার নিরসন হইয়াছে। ইহাই হইতেছে নিত্যমুক্তজীব-স্বীকৃতির দার্শনিক গুরুত্ব।

বল্লভমতে ভজন-পন্থা মাত্র দুইটী --মর্য্যাদামার্গ এবং পুষ্টিমার্গ। দৈব জীবগণই এই দুই মার্গে ভজনের অধিকারী। আসুর-জীবদের ভজনাদি বা মোক্ষাদি সম্বন্ধে তিনি কিছু বলেন নাই। তবে আসুর জীব সম্বন্ধে তিনি কি মাধ্বমতের অনুগামী ? (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।২৫-ক অনুচ্ছেদে মাধ্বমত দ্রষ্টব্য)।

বল্লভমতে মর্য্যাদামার্গের সাধকগণ সিদ্ধাবস্থায় ব্যাপি-বৈকুণ্ঠলোকে সাযুজ্য মুক্তি লাভ করেন। গৌড়ীয়মতে কিন্তু বিধিমার্গের সাধকগণ সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য সামীপ্য-এই চতুর্বিধা মুক্তিই লাভ করেন। বিধিমার্গও ভক্তিমার্গই ; ভক্তিমার্গের সাধকগণ সাযুজ্য চাহেন না , জ্ঞানমার্গের সাধকগণই সাযুজ্যকামী এবং তাঁহারাই সাযুজ্য পাইয়া থাকেন।

চ। রাগানুগার সাধনে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী প্রীতির উদয় হয়

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মমহাপ্রভু বলিয়াছেন—

এইমত করে যেবা রাগানুগা ভক্তি। কৃষ্ণের চরণে তার উপজয় প্রীতি॥
প্রীত্যঙ্কুরের—'রতি', 'ভাব'—হয় দুই নাম। যাহা হৈতে বশ হয় শ্রীভগবান্॥
যাহা হৈতে পাই কৃষ্ণের প্রেমসেবন। শ্রীচৈ, চ ২।২২।৯৩-৯৫॥

রাগানুগা সাধনভক্তির ফলে সাধকের চিত্তে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবির্ভাব হয়। গাঢ়তা অনুসারে প্রেমের অনেক স্তর আছে। সর্ব্বপ্রথম যে স্তর, প্রথমে সেই স্তরেরই আবির্ভাব হইয়া থাকে ; এই স্তরকে 'প্রীত্যঙ্কুর বা প্রেমাঙ্কুর' বলা হয়, 'রতি'ও বলা হয় এবং 'ভাবও' বলা হয়। সাধনের পরিপক্কতায় প্রথমে এই "ভাব"ই সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হয়। পূর্ব্বোল্লিখিত "কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা"-বাক্যে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও তাহাই বলিয়াছেন। সাধনভক্তি হইতেছে—সাধ্যভাবা, অর্থাৎ সাধনভক্তির সাধ্যবস্তু, প্রাপ্যবস্তু, হইতেছে "ভাব", বা "রতি", বা "প্রেমাঙ্কুর।" এই ভাবই ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে প্রেমের বিভিন্ন স্তরে পরিণত হয়। এ-বিষয় পরে বিশেষরূপে আলোচিত হইবে।

৬২। রাগানুগায় নবদ্বীপলীলা

পূর্ব্বে [৫।১৫-ক (২)-অনুচ্ছেদে] বলা হইয়াছে, গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের পক্ষে শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর ও শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন—উভয়েই তুল্যভাবে ভজনীয় ; শ্রীশ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীশ্রীব্রজলীলা উভয়েই তুল্যভাবে সেবনীয়। শ্রীমন্মহাপ্রভু ব্রজরসের সংবাদ কলিহত জীবকে দিয়া গেলেন এবং তাঁহার আস্বাদনের উপায় বলিয়া দিলেন, তদনুরূপ ভজনের আদর্শও দেখাইয়া গেলেন—কেবল এজন্যই যে তিনি ভজনীয়, তাহা নহে। কেবল এজন্যই তাঁহার ভজন করিলে, তাঁহার প্রতি কৃতজ্ঞতা মাত্র প্রদর্শিত হয় ;

কিন্তু কেবল কৃতজ্ঞতা-প্রকাশই যথেষ্ট নহে; শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গের ভজন কেবল সাধন-মাত্র নহে, ইহা সাধ্যও বটে; তাঁহার ভজন স্বাভীষ্ট-ভাবময়। ইহার হেতু এই ঃ—

ক। ব্রজলীলা ও নবদ্বীপলীলার স্বরূপ

শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনে ও শ্রীশ্রীগৌরসুন্দরে স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই; শ্রীব্রজলীলা ও শ্রীনবদ্বীপলীলায়ও স্বরূপগত পার্থক্য কিছু নাই। শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর (শ্রীরাধিকার) মাদনাখ্য-মহাভাব এবং হেম-গৌর-কান্তি অঙ্গীকার করিয়াই শ্রীব্রজেন্দ্রনন্দন গৌরাঙ্গ হইয়াছেন; তাঁহার নবজলধর-শ্যামকান্তি—নবগোরচনা-গৌরী বৃষভানু-নন্দিনীর হেম-গৌর-কান্তির—অঙ্গের—অন্তরালে ঢাকা পড়িয়া রহিয়াছে; তাই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর অন্তঃকৃষ্ণ বহির্গৌর; তিনি রাধা-ভাবদ্যুতি-সুবলিত কৃষ্ণস্বরূপ—অপর কেহ নহেন। শ্রীব্রজধামে তিনি যে লীলাস্রোত প্রবাহিত করেন, তাহাই যেন প্রবল-বেগ ধারণ করিয়া শ্রীনবদ্বীপে উপস্থিত হয়। শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীলা,—ব্রজেন্দ্র-নন্দনের একই লীলা-প্রবাহের দুইটী অংশমাত্র। শ্রীশ্রীব্রজেন্দ্রনন্দনের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্যময় লীলাকদম্বের উত্তরাংশই শ্রীনবদ্বীপলীলা। ব্রজলীলার পরিণত অবস্থাই নবদ্বীপলীলা। যে উদ্দেশ্যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন লীলা প্রকট করেন, সেই উদ্দেশ্য-সিদ্ধির আরম্ভ ব্রজে—আর পূর্ণতা নবদ্বীপে। পরম করুণ রসিক-শেখর শ্রীকৃষ্ণের লীলা-প্রকটনের মুখ্য উদ্দেশ্য—রস-আস্বাদন এবং গৌণ উদ্দেশ্য—রাগমার্গের ভক্তি-প্রচার। ব্রজে তিনি অশেষ-বিশেষে রস আস্বাদন করেন; কিন্তু তথাপি তাঁহার রস-আস্বাদন পূর্ণতা লাভ করে না। কারণ, ব্রজে তিনি শ্রীরাধিকাদি পরিকরবর্গের প্রেম-রস-নির্য্যাস মাত্র আস্বাদন করেন; কিন্তু নিজের অসমোর্দ্ধমাধুর্য্য-রসটী আস্বাদন করিতে পারেন না। এই মাধুর্য্য-আস্বাদনের একমাত্র করণ—শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর মাদনাখ্য-মহাভাব। শ্রীকৃষ্ণের মধ্যে তাহা নাই। তাই তিনি শ্রীমতীর মাদনাখ্য-মহাভাব অঙ্গীকার করিয়া শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে বিরাজিত এবং এই-ভাবে তিনি নিজের মাধুর্য্য-রস আস্বাদন করেন। রস-আস্বাদনের যে অংশ ব্রজে অপূর্ণ থাকে, তাহা নবদ্বীপে পূর্ণ হয়। আর তাঁর করুণা। শ্রীকৃষ্ণের নিত্যদাস জীব, তাঁহার সেবা ভুলিয়া অনাদিকাল হইতেই সংসার-দুঃখ ভোগ করিতেছে; সংসার-রসে মত্ত হইয়া তাঁহাকে ভুলিয়া রহিয়াছে; ক্ষণস্থায়ী বিষয়-সুখকেই একমাত্র কাম্যবস্তু মনে করিয়া—যদিও তাহাতে তৃপ্তি পাইতেছে না, তথাপি তাহার অনুসন্ধানেই—দেহ, মন, প্রাণ নিয়োজিত করিয়া অশেষ দুঃখভোগ করিতেছে। ইহা দেখিয়া পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণের হৃদয় বিগলিত হইয়া গেল। একটা নিত্য, শাশ্বত ও অসমোর্দ্ধ আনন্দের আদর্শ দেখাইয়া মায়াবদ্ধ-জীবের বিষয়-সুখের অকিঞ্চিৎকরতা দেখাইবার নিমিত্ত তাঁহার ইচ্ছা হইল। প্রকট ব্রজে তিনি তাহাই জানাইলেন। "অনুগ্রহায় ভক্তানাং মানুষং দেহমাশ্রিতঃ। ভজতে তদৃশীঃ ক্রীড়া যাঃ শ্রুত্বা তৎপরোভবেৎ॥ শ্রী ভা, ১০।৩৩।৩৬॥" প্রকট ব্রজলীলায় তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সহিত লীলা করিয়া, তাঁহার সেবায় যে কি অপূর্ব্ব ও অনির্ব্বচনীয় আনন্দ আছে, তাহা জীবকে জানাইলেন, জীবের মানস-চক্ষুর সাক্ষাতে তিনি এক পরম-লোভনীয় বস্তু উপস্থিত করিলেন। কিন্তু সেই বস্তুটী পাওয়ার

উপায়টী প্রকট ব্রজলীলায় দেখাইলেন না। যদিও গীতায় "মন্মনা ভব মদ্ভক্তো মদ্যাজী মাং নমস্কুরু" বলিয়া দিগ্ দর্শনরূপে ঐ উপায়ের একটা উপদেশ দিয়া গেলেন, তথাপি কিন্তু একটা সর্ব্বচিত্তাকর্ষক আদর্শের অভাবে সাধারণ জীব ঐ উপদেশ কার্য্যে পরিণত করিতে পারিল না। পরমকরুণ শ্রীকৃষ্ণ তাহা দেখিলেন ; দেখিয়া তাঁহার করুণা-সমুদ্র আরও উদ্বেলিত হইয়া উঠিল ; তিনি স্থির করিলেন—"আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভায়॥ আপনে না কৈলে ধর্ম্ম শিখান না যায়। শ্রীচৈ, চ, ১।৩।১৮-১৯॥" প্রকট নবদ্বীপলীলায় ভক্তভাব অঙ্গীকার করিয়া তিনি নিজে ব্রজ-রস-আস্বাদনের উপায়-স্বরূপ ভজনাঙ্গগুলির অনুষ্ঠান করিলেন, তাঁহার পরিকরভুক্ত-গোস্বামিগণের দ্বারাও অনুষ্ঠান করাইলেন ; তাহাতে জীব ভজনের একটা আদর্শ পাইল ; ব্রজলীলায় যে লোভনীয় বস্তুটী জানাইয়াছিলেন, নবদ্বীপলীলায় তাহা পাওয়ার উপায়টীর আদর্শ দেখাইয়া গেলেন—জীব তাহা দেখিল, দেখিয়া মুগ্ধ হইল ; ভজন করিতে লুব্ধ হইল। ইহাই তাঁহার করুণার পূর্ণতম অভিব্যক্তি। ব্রজলীলায় যে করুণা-বিকাশের আরম্ভ, নবদ্বীপলীলায় তাহার পূর্ণতা।

শ্রীভগবানের প্রেমবশ্যতার বিকাশেও ব্রজলীলা হইতে নবদ্বীপলীলার উৎকর্ষ। ব্রজে রাস-লীলায় "ন পারয়েহহং নিরবদ্যসংযুজামিত্যাদি"-শ্রীভা, ১০।৩২।২২ শ্লোকে কেবল মুখেই ব্রজসুন্দরীদিগের প্রেমের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ নিজেকে ঋণী বলিয়া স্বীকার করিলেন ; কিন্তু নবদ্বীপ-লীলায় শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর মাদনাখ্য মহাভাবকে অঙ্গীকার করিয়া কার্য্যেও তাঁহার ঋণিত্ব খ্যাপন করিলেন। শ্রীশ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর পূর্ণতম রসিক-শেখর ; তাঁহাতেই পূর্ণতম কৃষ্ণত্বের অভিব্যক্তি।

শ্রীরাধাকৃষ্ণের মিলন-রহস্যেও ব্রজ-অপেক্ষা নবদ্বীপের একটু বিশেষত্ব আছে। নিতান্ত ঘনিষ্ঠতম মিলনেও ব্রজে উভয়ের অঙ্গের স্বতন্ত্রতা বোধ হয় লোপ পায় না ; কিন্তু নবদ্বীপে উভয়ে মিলিয়া এক হইয়া বিরাজিত। ব্রজে শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে নিজের প্রতি অঙ্গ দ্বারা আলিঙ্গন করিবার নিমিত্ত শ্রীমতী বৃষভানুনন্দিনীর বলবতী আকাঙ্ক্ষা (প্রতি অঙ্গ লাগি মোর প্রতি অঙ্গ ঝুরে) ; নবদ্বীপেই তাঁহার সেই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয়। এখানে শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনী নিজের প্রতিঅঙ্গ দ্বারাই শ্রীকৃষ্ণের প্রতি অঙ্গকে আলিঙ্গন করিয়া রহিয়াছেন ; তাই শ্যামসুন্দরের প্রতি শ্যাম অঙ্গই গৌর হইয়াছে। নবদ্বীপে শৃঙ্গার-রসরাজ-মূর্ত্তিধর শ্রীকৃষ্ণ ও মহাভাবস্বরূপিণী শ্রীরাধিকা উভয়ে মিলিয়া এক হইয়াছেন। "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপ। শ্রীচৈ, চ, ২।৮।২৩৩॥" এই রাইকানু-মিলিত তনুই শ্রীশ্রীগৌর-সুন্দর। "সেই দুই এক এবে চৈতন্য-গোসাঞি। শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৫০॥" শ্রীগৌরাঙ্গ-সুন্দর—রায়-রামানন্দ-কথিত "না সো রমণ না হাম রমণী"-পদোক্ত মাদনাখ্য মহাভাবের বিলাস-বৈচিত্রী-বিশেষের চরম পরিণতি। এইরূপে শ্রীব্রজেন্দ্র নন্দন যেমন শ্রীগৌরাঙ্গরূপে নবদ্বীপে প্রকট হইলেন, তাঁহার সমস্ত ব্রজপরিকরবর্গও নবদ্বীপলীলার উপযোগী দেহে তাঁহার সঙ্গে শ্রীনবদ্বীপে প্রকট হইলেন।

এক্ষণে বোধ হয় বুঝা যাইবে যে, শ্রীনবদ্বীপ-লীলা ও শ্রীব্রজলীলায় স্বরূপতঃ কোনও পার্থক্যই

নাই—ইহারা একই লীলাপ্রবাহের দুইটী ভিন্ন ভিন্ন অংশ মাত্র ; বরং নানা কারণে ব্রজলীলা অপেক্ষা নবদ্বীপলীলারই উৎকর্ষ দেখা যায়।

খ। উভয় লীলা তুল্যভাবে ভজনীয়

নবদ্বীপলীলা ও ব্রজলীলা একসূত্রে গ্রথিত ; সুতরাং একটীকে ছাড়িতে গেলেই গাঁথা মালার সৌন্দর্য্যের ও উপভোগ্যত্বের হানি হয়। যে সূত্রে মালা গাঁথা হয়, তাহা যদি ছিঁড়িয়া যায়, তাহা হইলে মালাগুলি সমস্তই যেমন মাটীতে পড়িয়া যায়, মালা তখন আর যেমন গলায় ধারণের উপযুক্ত থাকে না ; সেইরূপ, নবদ্বীপলীলা ও ব্রজলীলার সংযোগ-সূত্র ছিঁড়িয়া দিলে উভয় লীলাই বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িবে, জীব উভয় লীলার সম্মিলিত আস্বাদনযোগ্যতা হইতে বঞ্চিত হইবে। নবদ্বীপলীলায় শ্রীগৌরসুন্দর রাধাভাবে বিভাবিত হইয়া ব্রজলীলাই আস্বাদন করিয়া থাকেন ; সুতরাং ব্রজলীলাই নবদ্বীপলীলার উপজীব্য বা পোষক ; তাই ব্রজলীলা বাদ দিলে নবদ্বীপলীলাই বিশুষ্ক হইয়া যায়। আবার নবদ্বীপলীলাকে বাদ দিলে, অকৃতজ্ঞতাদোষ তো সংঘটিত হয়ই, তাহা ছাড়া, ব্রজলীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনাও নষ্ট হইয়া যায়। মধু স্বতঃই আস্বাদ্য সত্য ; কিন্তু ঘনীভূত অমৃতময় ভাণ্ডে ঢালিয়া যদি মধু আস্বাদন করা যায়, তাহা হইলে নিশ্চয়ই তাহার মাধুর্য্য সর্ব্বাতিশায়ী ভাবে বর্দ্ধিত হয় ; আর, তাহার সঙ্গে যদি কর্পূর মিশ্রিত করিয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে আস্বাদনের উন্মাদনাও বিশেষরূপে বর্দ্ধিত হইয়া থাকে। ব্রজলীলা মধুস্বরূপ ; আর নবদ্বীপলীলা কর্পূর-মিশ্রিত ঘনীভূত অমৃতভাণ্ড। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু সাক্ষাৎ মাধুর্য্য-মূর্ত্তি। তিনিই নবদ্বীপে ব্রজরসের পরিবেশক। রস ঘরে থাকিলেই তাহার আস্বাদন পাওয়া যায় না ; পরিবেশকের পরিবেশন-নৈপুণ্যের উপরেই আস্বাদনের বিচিত্রতা নির্ভর করে। রসিক-শেখর শ্রীমন্মহাপ্রভুর মত পরিবেশন-নৈপুণ্য অন্যত্র দুর্ল্লভ। তাই নবদ্বীপলীলা বাদ দিলে ব্রজলীলার মাধুর্য্য-বৈচিত্রী এবং আস্বাদনের উন্মাদনা নষ্ট হইয়া যায়। ব্রজলীলারূপ অমূল্য রত্ন নবদ্বীপ-লীলারূপ সমুদ্রেই পাওয়া যায়, অন্যত্র নহে ; তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"গৌরপ্রেম-রসার্ণবে, সে তরঙ্গে যেবা ডুবে, সে রাধা-মাধব অন্তরঙ্গ।" শ্রীল কবিরাজ গোস্বামীও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণলীলা-মৃতসার, তার শত শত ধার, দশদিকে বহে যাহা হৈতে। সে গৌরাঙ্গলীলা হয়, সরোবর অক্ষয়, মনোহংস চরাহ তাহাতে॥ শ্রীচৈঃ চঃ ২।২৫।২২৩॥" এইজন্যই শ্রীগৌরাঙ্গ ও শ্রীব্রজেন্দ্র-নন্দন উভয়-স্বরূপই সমভাবে ভজনীয় ; শ্রীনবদ্বীপলীলা ও শ্রীব্রজলীলা—উভয় লীলাই সমভাবে সেবনীয়। উভয় ধামই সাধকের সমভাবে কাম্য॥ "এথা গৌরচন্দ্র পাব, সেথা রাধাকৃষ্ণ॥ শ্রীল ঠাকুর মহাশয়॥"

শ্রীমন্মাপ্রভুর কৃপায় গৌরলীলায় ডুব দিতে পারিলে ব্রজলীলা আপনা-আপনিই স্ফুরিত হইবে ; ইহাই শ্রীল ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন ঃ—"গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে॥" ইহার হেতুও দেখা যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলা একসূত্রে গ্রথিত।

এই লীলার সূত্র, সপরিকর শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই সাক্ষাদ্‌ভাবে জীবের হাতে ধরাইয়া দেন। একটী দৃষ্টান্ত দ্বারা ইহা বুঝিতে চেষ্টা করা যাউক। মনে করুন, আপনি যেন মধুরভাবের উপাসক এবং শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবারভুক্ত। আপনার গুরুপরম্পরায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভুই উচ্চতম-সোপনে অবস্থিত। শ্রীবৃন্দাবনের যুগল-কিশোরের লীলায় শ্রীমন্নিত্যানন্দ-প্রভু শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরী ; ব্রজলীলা ও নবদ্বীপ-লীলার সঙ্গে ব্রজ-পরিকর ও নবদ্বীপপরিকরগণ একসূত্রে গ্রথিত। শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভু কৃপা করিয়া ঐ লীলা-সূত্রটী তাঁহার শিষ্যের হাতে দিলেন, তিনি আবার তাঁহার শিষ্যের হাতে দিলেন ; এইরূপে গুরুপরম্পরাক্রমে ঐ লীলা-সূত্র আপনার হাতে আসিয়া পড়িল। গুরুবর্গের কৃপায় এষং শ্রীমন্নিত্যানন্দ প্রভুর কৃপায় আপনি যদি ঐ লীলা-সূত্রটী ধরিয়া শ্রীমন্নিত্যানন্দের চরণে পৌঁছিতে পারেন, তাহা হইলে আপনার নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ লাভ হইল। সেখানে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু যখন ব্রজভাবে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহার পার্ষদবর্গও নিজ নিজ ব্রজভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন ; এবং ঐ লীলা-সূত্র-ধারণের মাহাত্ম্যে সপরিকর গৌরসুন্দরের কৃপায় আপনিও তাঁহাদের শ্রীচরণ অনুসরণ করিয়া ব্রজলীলায় প্রবেশ করিতে পারিবেন। তাহা হইলে দেখা গেল, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর কৃপায় নবদ্বীপ-লীলায় প্রবেশ লাভ হইলে ব্রজলীলা স্বতঃই স্ফুরিত হইতে পারে। যে বাগানে লক্ষ লক্ষ সুগন্ধি গোলাপ প্রস্ফুটিত হইয়া আছে, কোনও রকমে সেই বাগানে পৌঁছিতে পারিলেই গোলাপের সুগন্ধ তখন আপনা-আপনিই নাসিকারন্ধ্রে প্রবেশ করে ; তজ্জন্য তখন আর স্বতন্ত্র কোনও চেষ্টা করিতে হয় না।

এজন্যই বলা হইয়াছে, নবদ্বীপ-লীলা ও ব্রজলীলা তুল্যভাবে ভজনীয়। বাহ্যে যথাবস্থিত দেহের অর্চ্চনাদিতে সপরিকর গৌরসুন্দর এবং সপরিকর ব্রজেন্দ্র-নন্দন অর্চ্চনীয়। শ্রবণ-কীর্ত্তনানিতেও উভয় স্বরূপের নাম-রূপ-গুণলীলাদি সেবনীয়। অন্তর-সাধনেও উভয় লীলা সেবনীয়। অন্তর সাধন অন্তশ্চিন্তিত দেহে করিতে হয়। ব্রজের ও নবদ্বীপের অন্তশ্চিন্তিত দেহ একরূপ নহে। আপনি যদি শ্রীনিত্যানন্দ-পরিবার-ভুক্ত মধুর-ভাবের উপাসক হয়েন, তাহা হইলে আপনার এবং আপনার গুরুবর্গের ব্রজের সিদ্ধদেহ হইবে, মঞ্জরী দেহ ; আর নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ হইবে পুরুষ ভক্ত দেহ। ব্রজে আপনি গোপকিশোরী, নবদ্বীপে কিশোর ব্রাহ্মণকুমার। কোনও কোনও ভক্ত বলেন—নবদ্বীপের সিদ্ধদেহ ব্রাহ্মণাভিমানী না হইয়া, অন্যজাত্যভিমানীও হইতে পারে। যাহা হউক, অন্তর সাধনের অষ্টকালীন লীলাস্মরণে, অন্তশ্চিন্তিত-দেহে সর্ব্বপ্রথমে আপনাকে নবদ্বীপ-লীলার স্মরণ করিতে হইবে ; কারণ, গৌর-লীলারূপ অক্ষয়-সরোবর হইতেই কৃষ্ণলীলার ধারা প্রবাহিত হইয়াছে। নবদ্বীপে অন্তশ্চিন্তিত ভক্তরূপ-সিদ্ধ-দেহে সিদ্ধগুরুবর্গের আনুগত্য আশ্রয় করিলে তাঁহারা কৃপা করিয়া আপনাকে শ্রীমন্নিত্যা নন্দপ্রভুর চরণে সমর্পণ করিবেন ; তারপর শ্রীনিতাই কৃপা করিয়া আপনাকে অঙ্গীকার করিলে তিনি অপনাকে শ্রীরূপ গোস্বামীর চরণে অর্পণ করিবেন। শ্রীগৌরের চরণে অর্পণ করিয়া শ্রীরূপ আপনাকে সেবায় নিয়োজিত করিবেন।

মধুর-ভাবের সাধকের নিকটে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রাধাভাবদ্যুতি-সুবলিত ; তাঁহার মধ্যেই শ্রীমতী

রাধিকার সমস্ত ভাব প্রকটিত ; যদি কখনও কৃষ্ণভাবের লক্ষণ দেখা যায়, মধুর ভাবের সাধক তাহাকেও কৃষ্ণভাবে আবিষ্টা শ্রীমতী রাধারাণীর ভাব বলিয়াই আস্বাদন করেন। তাঁহার নিকটে শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরই শ্রীরাধা এবং তাঁহার পরিকরবর্গ বৃন্দাবনের সখীমঞ্জরী। শ্রীগৌর যখন রাধাভাবে আবিষ্ট হয়েন, তাঁহার পরিকরবর্গও নিজ নিজ ব্রজলীলোচিত ভাবে আবিষ্ট হইয়া থাকেন।

এইরূপে নবদ্বীপলীলার সেবায় নিয়োজিত থাকিলেই নবদ্বীপ-পরিকরগণ যখন ব্রজভাবে আবিষ্ট হইবেন, তখন তাঁহাদের ভাবতরঙ্গ তাঁহাদের কৃপায় আপনাকেও স্পর্শ করিবে ; সেই তরঙ্গের আঘাতে তাঁহাদের সঙ্গে আপনিও ব্রজলীলায় উপস্থিত হইবেন। তখন আপনা-আপনিই ব্রজলীলার উপযোগী মঞ্জরী-দেহ আপনার স্ফুরিত হইবে ; সেই দেহে, গুরুরূপা-মঞ্জরীবর্গের কৃপায় আপনি শ্রীমতী অনঙ্গমঞ্জরীর চরণে অর্পিত হইবেন ; তিনি কৃপা করিয়া আপনাকে অঙ্গীকার করিলে, মঞ্জরীদিগের যূথেশ্বরী শ্রীমতী রূপমঞ্জরীর চরণে আপনাকে অর্পণ করিবেন। শ্রীমতী রূপ-মঞ্জরী তখন কৃপা করিয়া আপনাকে শ্রীমতী বৃষভানু-নন্দিনীর চরণে অর্পণ করিয়া যুগল-কিশোরের সেবায় নিয়োজিত করিবেন। এই ভাবেই অন্তর-সাধনের বিধি।

রাগানুগার ভজনই আনুগত্যময়। শ্রীনবদ্বীপে গুরুবর্গের আনুগত্যে শ্রীরূপাদি গোস্বামিগণের আনুগত্য , এই গোস্বামিগণই সাধককে গৌরের চরণে অর্পিত করিয়া সেবায় নিয়োজিত করেন। আর ব্রজে, গুরুরূপা মঞ্জরীগণের আনুগত্যে শ্রীরূপাদি-মঞ্জরী-বর্গের আনুগত্য। শ্রীরূপাদি-মঞ্জরীবর্গই সাধকদাসীকে শ্রীমতীবৃষভানুনন্দিনীর চরণে অর্পণ করিয়া যুগল-কিশোরের সেবায় নিয়োজিত করেন। এই গেল মধুর-ভাবের সাধকদের কথা। অন্যান্য ভাবের সাধকদিগকেও এই ভাবে উভয় লীলায়, নিজ নিজ ভাবানুকুল লীলাপরিকরগণের চরণাশ্রয় করিতে হয়। ইহাই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন, "নিজাভীষ্ট-কৃষ্ণ-প্রেষ্ঠ পাছে ত লাগিয়া। নিরন্তর সেবা করে অন্তর্মনা হঞা॥" ভক্তিরসামৃত-সিন্ধুও একথাই বলিয়াছেন—"কৃষ্ণং স্মরন্ জনঞ্চাস্য প্রেষ্ঠং নিজসমীহিতম্।"

ব্রজলীলায় সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহে যেমন ব্রজলীলায় সেবার চিন্তা করিতে হয়, তদ্রূপ নবদ্বীপলীলায় সেবার উপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহেও নবদ্বীপ-লীলায় সেবার চিন্তা—শ্রীশ্রীগৌর সুন্দরের অষ্টকালীয় লীলায় সেবার চিন্তা, তাঁহার পরিচর্য্যাদির চিন্তা—করিতে হয়। ব্রজের ভাবে আবিষ্ট হইয়া শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর যখন ব্রজলীলার রসাস্বাদন করিবেন, তখন তাঁহার ভাবের তরঙ্গের দ্বারা স্পৃষ্ট হইয়া সাধকের চিত্তেও সেই রসের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিবে। "গৌরাঙ্গ-গুণেতে ঝুরে, নিত্যলীলা তারে স্ফুরে।"

গ। শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসনা

কেহ হয়তো বলিতে পারেন—শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন শ্রীকৃষ্ণই এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া দেবী (এবং শ্রীশ্রীলক্ষ্মীদেবী) যখন মহাপ্রভুর কান্তা, তখন গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের কান্তাভাবের উপাসনায় ব্রজে যেমন শ্রীশ্রীরাধাকৃষ্ণের উপাসনা করিতে হয়, নবদ্বীপেও তেমনি শ্রীশ্রীগৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার (বা শ্রীশ্রীগৌর-

লক্ষ্মীপ্রিয়ার) উপাসনাই হইবে সঙ্গত। কিন্তু ইহা বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কেননা, গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়া বা গৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়ার উপাসনা ব্রজভাবের অনুকূল নহে। একথা বলার হেতু কথিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, শ্রীশ্রীগৌরসুন্দর কেবল শ্রীকৃষ্ণ নহেন ; তিনি হইতেছেন রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ। মিলিত স্বরূপ হইলেও তাঁহাতে রাধাভাবেরই প্রাধান্য ; তাই তিনি নিজেকে শ্রীরাধা এবং ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণকে স্বীয় প্রাণবল্লভ বলিয়া মনে করেন। "গোপীভাব যাতে প্রভু করিয়াছেন একান্ত। ব্রজেন্দ্রনন্দনে মানে আপনার কান্ত॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১৭।২৭০॥, "রাধিকার ভাবমূর্ত্তি প্রভুর অন্তর। সেই ভাবে সুখদুঃখ উঠে নিরন্তর॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৪।৯৩॥" ইহাই প্রভুর স্বরূপানুবন্ধী ভাব। এই স্বরূপানুবন্ধি-ভাবানুগতা লীলায় তিনি হইতেছেন শ্রীরাধা। কান্তাভাবের উপাসকগণ শ্রীরাধার কিঙ্করীত্বের অভিমানই পোষণ করিয়া থাকেন ; তাই নবদ্বীপলীলার সেবাতেও তাঁহারা গুরুপরম্পরার আনুগত্যে শ্রীরাধাস্বরূপ গৌরেরই যদি আনুগত্য করেন, তাহা হইলেই তাঁহাদের অভীষ্ট ব্রজভাবের সহিত সঙ্গতি থাকিতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ"-গৌরসুন্দর যখন নিজেকে শ্রীরাধা বলিয়া মনে করেন এবং এই শ্রীরাধাভাবই যখন তাহার স্বরূপানুবন্ধী ভাব, তখন ভাববিষয়ে তিনি নিজেই কান্তা-শ্রীকৃষ্ণকান্তা ; কান্তার আবার কান্তা থাকিতে পারে না। শ্রীরাধার কোনও কান্তা নাই। রাধাকৃষ্ণ-মিলিত স্বরূপ রাধাভাবাবিষ্ট গৌরের যদি কান্তা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে তাঁহার স্বরূপগত-ভাববিরোধী। যাহা স্বরূপগত ভাববিরোধী, ভাবময়ী উপাসনায় তাহার স্থান থাকিতে পারে না।

যদি বলা যায়--গৌরসুন্দর যখন "রসরাজ মহাভাব দুই একরূপ" এবং তিনি নিজেকে শ্রীরাধা মনে করেন বলিয়া তাঁহার কান্তা থাকা যখন সম্ভব নয়, তখন শ্রীশ্রীলক্ষ্মীপ্রিয়া এবং শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া কি গৌরের কান্তা নহেন ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়ার স্বরূপ কি, তাহা দেখিতে হইবে। কবিকর্ণপূর তাঁহার গৌরগণোদ্দেশদীপিকায় লিখিয়াছেন—লক্ষ্মীপ্রিয়া দেবী ছিলেন জানকী ও রুক্মিণীর মিলিত স্বরূপ ; তাঁহার পিতা বল্লভাচার্য্যও ছিলেন জনক ও ভীষ্মক। "পুরাসীজ্জনকো রাজা মিথিলাধিপতির্ম্মহান্। অধুনা বল্লভাচার্য্যো ভীষ্মকোঽপি চ সম্মতঃ॥ শ্রীজানকী রুক্মিণী চ লক্ষ্মীনাম্নী চ তৎসুতা॥৪৪-৫॥" ; আর শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ছিলেন ভূস্বরূপিণী সত্যভামা, তাঁহার পিতা সনাতনমিশ্র ছিলেন রাজা সত্রাজিত। "শ্রীসনাতনমিশ্রোঽয়ং পুরা সত্রাজিতো নৃপঃ। বিষ্ণুপ্রিয়া জগন্মাতা যৎকন্যা ভূস্বরূপিণী॥ গৌ, গ, ৪৭॥" বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর বিবাহের ঘটক ছিলেন বিপ্র কাশীনাথ ; পূর্ব্বে সত্যভামার বিবাহের জন্য রাজা সত্রাজিত যে বিপ্রকে শ্রীকৃষ্ণের নিকটে পাঠাইয়াছিলেন, তিনিই এইস্থলে শ্রীকাশীনাথ হইয়াছেন। "যশ্চ সত্রাজিতা বিপ্রঃ প্রহিতো মাধবং প্রতি। সত্যোদ্বাহায় কুলকঃ শ্রীকাশীনাথ এব সঃ॥ গৌ, গ, দী, ৫০॥" ইহা হইতেও বুঝা গেল, শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ছিলেন সত্যভামা। এইরূপে জানা গেল, লক্ষ্মীপ্রিয়া এবং বিষ্ণুপ্রিয়া-ইঁহাদের কেহই ব্রজপরিকর ছিলেন না।

শ্রীমন্মহাপ্রভুতে শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, রামচন্দ্রাদি সমস্ত ভগবৎস্বরূপই বিরাজিত ; বিশেষ বিশেষ লীলায় বিশেষ বিশেষ স্বরূপের ভাব প্রকটিত হয়। স্বয়ংভগবানে অনন্ত ভাববৈচিত্রীর সমাবেশ থাকিলেও তিনি যখন যেরূপ ভাববিশিষ্ট পরিকরের সন্নিধানে থাকেন, তাঁহার মধ্যে তখন সেইরূপ ভাবের অনুরূপ ভাবই অভিব্যক্ত হয়। প্রকটলীলাতে মদনমোহন শ্রীকৃষ্ণই ব্রজে রাসাদিলীলাতে শুদ্ধ মাধুর্য্যময় রসের আস্বাদন করিয়াছেন ; কিন্তু তিনিই যখন মথুরায় এবং দ্বারকায় ছিলেন, তখন তাঁহার মদনমোহনরূপও প্রকটিত হয় নাই, শুদ্ধ মাধুর্য্যময় রসের আস্বাদনও হয় নাই। তখন তত্তৎ-ধামের পরিকরদের ভাবের অনুরূপ ভাবই তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছিল ; দ্বারাকা-মথুরায় তিনি বাসুদেব। তদ্রূপ, লক্ষ্মীদেবী বা বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীর সান্নিধ্যেও মহাপ্রভুতে ব্রজবিহারী কৃষ্ণের ভাব প্রকটিত হইতে পারে না, তাঁহাদের সান্নিধ্যে তাঁহার মধ্যে বাসুদেবের ভাবই—লক্ষ্মীদেবীর সান্নিধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ভাবও—প্রকটিত হইতে পারে। "রসরাজ মহাভাব দুই এক রূপের" ভাব তো প্রকটিত হইতেই পারে না ; কেননা, এই রূপটী নিজেই নিজেকে কৃষ্ণকান্তা মনে করেন ; এই রূপের পক্ষে কান্তা গ্রহণের প্রশ্নই উঠিতে পারে না। এইরূপে দেখা গেল—মহাপ্রভু যে লক্ষ্মীপ্রিয়া বা বিষ্ণুপ্রিয়াকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহা রাধাকৃষ্ণ-মিলিতস্বরূপ গৌররূপেও নহে, ব্রজবিলাসী শ্রীকৃষ্ণরূপেও নহে, পরন্তু বাসুদেবরূপে এবং তাঁহাদের সহিত তাঁহার লীলাও ছিল বাসুদেবের লীলা (লক্ষ্মীপ্রিয়াদেবীর সম্পর্কে শ্রীরামচন্দ্রের লীলাও)।

এই আলোচনা হইতে জানা গেল—শ্রীশ্রীগৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার বা শ্রীশ্রীগৌরলক্ষ্মীপ্রিয়ার উপাসনা ব্রজভাবের অনুকূল নহে ; ইহা দ্বারকা-ভাবেরই বা অযোধ্যা-ভাবেরই অনুকূল। সুতরাং যিনি ব্রজভাবের এবং তদনুকূল নবদ্বীপ-ভাবের উপাসক, তিনি যদি কান্তাভাবের উপাসক হয়েন, তাহা হইলে গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার, বা গৌর-লক্ষ্মীপ্রিয়ার উপাসনা তাঁহার ভাবানুকূল হইতে পারে না। শ্রীরাধাভাবাবিষ্টরূপে গৌরের উপাসনাই হইবে তাঁহার অভীষ্ট ভাবের অনুকূল।

আজকাল কেহ কেহ শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীরাধা বলিয়া প্রচার করার প্রয়াস পাইতেছেন। কিন্তু প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণের কেহই এরূপ কথা বলেন নাই। বস্তুতঃ, শ্রীরাধার ভাবও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতে কখনও প্রকটিত হয় নাই। অন্য গোপী হইতে শ্রীরাধার ভাবের বৈশিষ্ট্য হইতেছে মাদন, মোহন এবং মোহনজনিত দিব্যোন্মাদ। মোহনের সূদ্দীপ্ত সাত্ত্বিক এবং মোহনজনিত দিব্যোন্মাদও শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াতে দৃষ্ট হইয়াছে বলিয়া কোনও প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য বলেন নাই। মোহন-ভাবের উদয় হয় বিরহে। শ্রীমন্মহাপ্রভুর সন্ন্যাসের পর হইতে বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সুদীর্ঘকাল গৌরবিরহিণী ছিলেন। যদি তাঁহার মধ্যে শ্রীরাধার ভাব থাকিত, তাহা হইলে এই সময়ে তাঁহার মধ্যে দিব্যোন্মাদও প্রকাশ পাইত ; কিন্তু তাহা প্রকাশ পায় নাই।

শ্রীরাধার ভাব তো দূরে, অন্য গোপীদের মহাভাবের লক্ষণও তাঁহার মধ্যে প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া কোনও প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্য বলেন নাই। এজন্যই কবিকর্ণপূর বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীকৃষ্ণের

দ্বারকামহিষী সত্যভামা বলিয়াছেন। মহিষীদের পক্ষে মহাভাব "অতি দুর্ল্লভ।" শ্রীউজ্জ্বলনীলমণি মহাভাবসম্বন্ধে বলিয়াছেন –"মুকুন্দমহিষীবৃন্দৈরপ্যাসাবতিদুর্ল্লভঃ।"

প্রকটলীলাতে মহাভাববতী গোপসুন্দরীগণ –শ্রীরাধাও– ছিলেন লৌকিকী প্রতীতিতে শ্রীকৃষ্ণের পরকীয়া কান্তা ; কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াদেবী সম্বন্ধে এইরূপ প্রতীতি কাহারও ছিলনা। শচীমাতা তাঁহাকে স্বীয় পুত্রবধূরূপেই গ্রহণ করিয়াছেন। যদি বলা যায় – প্রকট নবদ্বীপ-লীলাতে অপ্রকট ব্রজের ভাব প্রকটিত হইয়াছে, অপ্রকট ব্রজে শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ শ্রীকৃষ্ণের স্বকীয়া কান্তা। তাহা হইলেও শ্রীরাধার সর্ব্বভাবোদ্‌গমোল্লাসী মাদনাখ্য মহাভাব তো থাকিবে ? কিন্তু বিষ্ণুপ্রিয়াতে মাদন প্রকাশ পাইয়াছে বলিয়া প্রাচীন বৈষ্ণবাচার্য্যগণ বলেন নাই। বিশেষতঃ, অপ্রকটে বিরহ নাই ; বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে গৌরের বিরহ-যন্ত্রণা ভোগ করিতে হইয়াছে।

এইরূপে দেখাগেল—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবীতে শ্রীরাধার, এমন কি অন্য কোনও ব্রজগোপীর, ভাবও নাই ; কবিকর্ণপূর যে তাঁহাকে সত্যভামা বলিয়া গিয়াছেন, তাহাই ঠিক। সত্যভামার ভাব তাঁহাতে প্রকটিত হইয়াছিল।

তর্কের অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে—শ্রীবিষ্ণুপ্রিয়াদেবী ছিলেন শ্রীরাধা, শ্রীকৃষ্ণরূপে গৌরসুন্দর তাঁহাকে বিবাহ করিয়াছেন, তাহাহইলেও গৌরবিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসনা কান্তাভাবের সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণবদের অভীষ্টলাভের অনুকূল হইবেনা। কেননা, তাঁহাদের অভীষ্ট হইতেছে প্রেমের বিষয়-প্রধানরূপ এবং আশ্রয়-প্রধানরূপ-এই দুইরূপেই রসিকশেখর শ্রীকৃষ্ণের সেবা। ব্রজে তাঁহার বিষয়প্রধানরূপ এবং নবদ্বীপে রাধাকৃষ্ণমিলিত স্বরূপে তাঁহার আশ্রয়প্রধান রূপ। যুক্তির অনুরোধে যদি বিষ্ণুপ্রিয়াদেবীকে শ্রীরাধা এবং গৌরসুন্দরকে কেবল শ্রীকৃষ্ণ (গৌরকে কেবল শ্রীকৃষ্ণ মনে না করিলে বিবাহের প্রশ্নই উঠিতে পারেনা, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে ; তাহা) মনে করা যায়, তাহা হইলে এ-স্থলেও তিনি হইবেন ব্রজেরই ন্যায় বিষয়প্রধানস্বরূপ—বিষ্ণুপ্রিয়ারূপা শ্রীরাধার প্রেমের বিষয়। প্রেমের আয়শ্রপ্রধানরূপ আর কোথাও থাকেনা। সুতরাং গৌর-বিষ্ণুপ্রিয়ার উপাসনা কান্তাভাবের সাধক গৌড়ীয় বৈষ্ণবের অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল হইতে পারে না।

৬৩। কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাবের ক্রম

প্রেমাবির্ভাবের ক্রমসম্বন্ধে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—

কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়। তবে সেই জীব সাধুসঙ্গ যে করয়॥
সাধুসঙ্গ হৈতে হয় শ্রবণকীর্ত্তন। সাধনভক্ত্যে হয় সর্ব্বানর্থ-নিবর্ত্তন॥
অনর্থনিবৃত্তি হৈতে ভক্ত্যে নিষ্ঠা হয়। নিষ্ঠা হৈতে শ্রবণাদ্যে রুচি উপজয়॥

রুচি হৈতে ভক্ত্যে হয় আসক্তি প্রচুর। আসক্তি হৈতে চিত্তে জন্মে কৃষ্ণে প্রীত্যঙ্কুর॥
সেই ভাব গাঢ় হৈলে ধরে 'প্রেম' নাম। সেই প্রেম প্রয়োজন—সর্ব্বানন্দ ধাম॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।৫-৯॥

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও এইরূপ কথাই বলিয়াছেন ;

"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থনিবৃত্তিঃ স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥
অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ॥ ১।৪।১১ ॥

—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন-ক্রিয়া (শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান), তারপর অনর্থ-নিবৃত্তি, তারপর (ভজনাঙ্গে) নিষ্ঠা, তারপর (ভজনাঙ্গে) রুচি, তারপর (ভজনাঙ্গে) আসক্তি, তারপর ভাব (বা প্রেমাঙ্কুর, বা রতি) এবং তারপর প্রেমের উদয় হয়। ইহাই হইতেছে সাধকদিগের চিত্তে প্রেমবির্ভাবের ক্রম।"

এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"কোনো ভাগ্যে কোনো জীবের শ্রদ্ধা যদি হয়।" এ-স্থলে "ভাগ্য" বলিতে প্রাথমিক সৎসঙ্গরূপ, বা মহৎকৃপারূপ ভাগ্যকেই বুঝাইতেছে। এই "ভাগ্য" হইল শ্রদ্ধার, অর্থাৎ শাস্ত্রবাক্যে দৃঢ় নিশ্চিত বিশ্বাসের, হেতু। "যদৃচ্ছয়া মৎকথাদৌ জাতশ্রদ্ধস্তু যো জনঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১১।২০।৮ শ্লোকের টীকায় "যদৃচ্ছয়া"-শব্দের অর্থে শ্রীজীব-গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কেনাপি পরমস্বতন্ত্রভগবদ্ভক্তসঙ্গ-তৎকৃপাজাত-পরমমঙ্গলোদয়েন—পরম-স্বতন্ত্র ভগবদ্ভক্ত-সঙ্গদ্বারা সেই ভক্তের কৃপায় যাঁহার কোনও সৌভাগ্যের উদয় হইয়াছে, ইত্যাদি।" সাধনের ফলে যাঁহাদের কৃষ্ণরতি জন্মিতে পারে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।৩।৫ শ্লোকে তাঁহাদিগকে "অতিধন্য"-বলা হইয়াছে ; এই "অতিধন্য"-শব্দের টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতিধন্যানাং প্রাথমিক-মহৎসঙ্গজাত-মহাভাগ্যানাং—প্রথমেই মহৎ-সঙ্গজাত মহাভাগ্যের উদয় যাঁহাদের হইয়াছে।" সাধনভক্তির অধিকারিবর্ণনে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"যঃ কেনাপ্যতিভাগ্যেন জাতশ্রদ্ধোঽস্য সেবনে—অতি ভাগ্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণসেবায় যাঁহার শ্রদ্ধা জন্মিয়াছে। ১।২।৯॥" এ স্থলেও টীকায় শ্রীজীব লিখিয়াছেন—"অতিভাগ্যেন মহৎসঙ্গাদিজাত-সংস্কারবিশেষেণ—মহৎসঙ্গাদিজাত সংস্কারবিশেষকেই এস্থলে ভাগ্য বলা হইয়াছে।" এসকল প্রমাণবচন হইতে জানা যায়—শ্রদ্ধার হেতুভূত যে ভাগ্য,, তাহা হইল—প্রাথমিক সৎসঙ্গরূপ বা মহৎকৃপারূপ ভাগ্য।

প্রাথমিক সাধুসঙ্গরূপ বা মহৎকৃপারূপ সৌভাগ্যবশতঃ যদি কোনও জীবের ভগবৎ-কথাদিতে বা শাস্ত্রবাক্যে শ্রদ্ধা (দৃঢ়বিশ্বাস) জন্মে, তাহা হইলে সেই জীব তখন (দ্বিতীয়বার) সাধুসঙ্গ করে। সাধুসঙ্গে সাধুদিগের মুখে ভগবৎ-লীলা-কথাদি শুনিতে পায় এবং তাঁহাদের সঙ্গে সময় সময় নাম-রূপগুণ-লীলাদির কীর্ত্তনও করিয়া থাকে। সাধুদিগের আচরণাদি দেখিয়া ভজন করিতে ইচ্ছা হয় এবং ভজন করিয়াও থাকে। এইরূপে ঐকান্তিকতার সহিত সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে সেই জীবের চিত্ত হইতে দুর্ব্বাসনাদি (অনর্থ) দূরীভূত হয়। দুর্ব্বাসনা দূরীভূত হইলে ভক্তি-অঙ্গে

তাহার বেশ নিষ্ঠা জন্মে। নিষ্ঠার সহিত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে রুচি জন্মে (অর্থাৎ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে আনন্দ পায়) ; এইরূপে রুচির সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্তি-অঙ্গে আসক্তি জন্মে, অর্থাৎ রুচি গাঢ় হয় এবং তখন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদিতে এমন আনন্দ পায় যে, তাহা আর ছাড়িতে পারে না। ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে এই আসক্তি গাঢ় হইলেই শ্রীকৃষ্ণে রতি জন্মে। এই রতি গাঢ় হইলেই প্রেম আখ্যা প্রাপ্ত হয়।

ক। প্রেমাবির্ভাবের ক্রমসম্বন্ধে আলোচনা

ভক্তিবিকাশের ক্রমসম্পর্কে একটী কথা বিবেচ্য। বলা হইয়াছে, অনর্থনিবৃত্তি * হইয়া গেলে তাহার পরে রুচি, আসক্তি ও রতির উদয় হয়। রতি হইল হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তিবিশেষ। আর অনর্থ হইল মায়ার ক্রিয়া। সুতরাং মায়ার নিবৃত্তি হইয়া গেলেই রতির বা হ্লাদিনীর বা শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হইয়া থাকে—ইহাই জানা গেল। "ভক্তিনির্ধূতদোষাণাম্" ইত্যাদি ভ, র, সি, ২।১।৪-শ্লোক হইতেও ঐ একই কথা জানা যায়। সমস্ত দোষ সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলে—দোষ-সমূহ মায়ারই

---

* **অনর্থ**। যাহা অর্থ (অর্থাৎ পরমার্থ) নহে, তাহাই অনর্থ ; ভুক্তি-মুক্তি-স্পৃহাদি দুর্ব্বাসনা ; কৃষ্ণ-কামনা ও কৃষ্ণ-ভক্তি-কামনা ব্যতীত অন্য কামনা। মাধুর্য্য-কাদম্বিনীর মতে অনর্থ চারি প্রকারের :—দুষ্কৃত-জাত, সুকৃত-জাত, অপরাধ-জাত, ভক্তি-জাত। দুরভিনিবেশ, দ্বেষ, রাগ প্রভৃতিকে দুষ্কৃতজাত অনর্থ বলে। ভোগাভিনিবেশ প্রভৃতি বিবিধ অনর্থের নামই সুকৃতজাত অনর্থ। নামাপরাধ-সমূহই (সেবাপরাধ নহে) অপরাধজাত অনর্থ। আর ভক্তির সহায়তায় (অর্থাৎ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানকে উপলক্ষ্য করিয়া) ধনাদিলাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি প্রাপ্তির আশাই ভক্তিজাত অনর্থ। ভক্তিরূপ মূল-শাখাতে ইহা উপশাখার ন্যায় বৃদ্ধিপ্রাপ্ত হইয়া মূল-শাখা (ভক্তিকে) বিনষ্ট করিয়া দেয়।

উক্ত চতুর্ব্বিধ অনর্থের নিবৃত্তি আবার পাঁচ রকমের—একদেশবর্তিনী, বহুদেশবর্ত্তিনী, প্রায়িকী, পূর্ণা ও আত্যন্তিকী। অল্পপরিমাণে আংশিকী অনর্থনিবৃত্তিকে একদেশবর্ত্তিনী নিবৃত্তি বলে। বহুপরিমাণে আংশিকী নিবৃত্তিকে বহুদেশবর্ত্তিনী বলে। যখন প্রায় সমস্ত অনর্থেরই নিবৃত্তি হইয়াছে, অল্পমাত্র বাকী আছে, তখন তাহাকে প্রায়িকী নিবৃত্তি বলে। যখন সম্পূর্ণরূপে অনর্থের নিবৃত্তি হইয়া যায়, তখন তাহাকে পূর্ণা নিবৃত্তি বলে। পূর্ণা নিবৃত্তিতে সমস্ত অনর্থ দূরীভূত হইয়া থাকিলেও আবার অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা থাকে। ভক্তি-রসামৃতসিন্ধুর পূর্ব্ব বিভাগের তৃতীয় লহরীর ২৪।২৫-শ্লোকে দেখা যায়, শ্রীকৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-ভক্তের চরণে অপরাধ হইলে, জাতরতি ভক্তের রতিও লুপ্ত হয়, অথবা হীনতা প্রাপ্ত হয়, এবং সুপ্রতিষ্ঠিত মুমুক্ষুতে গাঢ়-আসক্তি জন্মিলে রতি ক্রমশঃ রত্যাভাসে, অথবা অহংগ্রহোপাসনায় পরিণত হয়। (ভাবোঽপ্যভাবমায়াতি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠাপরাধতঃ। আভাসতাঞ্চ শনকৈর্ন্যূনজাতীয়তামপি। গাঢ়াসঙ্গাৎ সদায়াতি মুমুক্ষৌ সুপ্রতিষ্ঠিতে। আভাসতামসৌ কিম্বা ভজনীয়েশভাবতাম্)। সুতরাং দেখা যায়, জাতরতি-ভক্তেরও বৈষ্ণবাপরাধাদির সম্ভাবনা আছে। যেরূপ অনর্থ-নিবৃত্তিতে পুনরায় অনর্থোদ্গমের সম্ভাবনা পর্য্যন্ত নিরাকৃত হইয়া যায়, তাহাকে আত্যন্তিকী নিবৃত্তি বলে।

অপরাধজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি—ভজনক্রিয়ার পরে একদেশবর্তিনী, রতির উৎপত্তিতে প্রায়িকী, প্রেমের আবির্ভাবে পূর্ণা এবং শ্রীকৃষ্ণচরণ-লাভে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। দুষ্কৃতজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি—ভজনক্রিয়ার পরে প্রায়িকী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা, এবং আসক্তির পরে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে। ভক্তিজাত অনর্থসমূহের নিবৃত্তি ভজনক্রিয়ার পরে একদেশবর্ত্তিনী, নিষ্ঠার পরে পূর্ণা এবং রুচির পরে আত্যন্তিকী হইয়া থাকে।

কার্য্য বলিয়া, মায়া সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলেই—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা লাভ করে। শ্রীভা, ১১।১৫।২২ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী স্পষ্টই লিখিয়াছেন—"ভক্তেরেপি গুণসঙ্গনির্ধূননানন্তরং চানুবৃত্তিঃ শ্রূয়তে।—মায়ার গুণসঙ্গ সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইলেই ভক্তির উদয় হয়।" মায়ার তিনটী গুণ—সত্ত্ব, রজঃ ও তমঃ। যখন রজঃ ও তমঃ প্রাধান্য লাভ করে, তখন মায়াকে বলে অবিদ্যা; আর, রজঃ ও তমঃ নিবৃত্ত হইয়া গেলে একমাত্র সত্ত্বই যখন অবশিষ্ট থাকে, তখন মায়াকে বলে বিদ্যা। গীতা ১৮।৫৫-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদ "ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ"-ইত্যাদি শ্রী, ভা, ১১। ১৪।২১ শ্লোকের উল্লেখ করিয়া লিখিয়াছেন—"তয়া ভক্ত্যৈব তদনন্তরং বিদ্যোপরমাত্তুত্তরকালে মাং জ্ঞাত্বা মাং বিশতি।" ইহা হইতেও বুঝা যায়—বিদ্যার নিবৃত্তির পরেই ভক্তিদ্বারা ভগবান্‌কে জানিতে পারা যায়। জানা যায় মনের বৃত্তিবিশেষদ্বারা; কিন্তু প্রাকৃত মনের বৃত্তিদ্বারা অপ্রাকৃত ভগবান্‌কে জানা যায় না; মন বা চিত্ত যদি শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হইয়া অপ্রাকৃতত্ব লাভ করে, তাহা হইলে ভগবান্‌কে জানিতে পারে। সুতরাং বিদ্যার নিবৃত্তির পরেই যখন ভগবান্‌কে জানিবার যোগ্যতা জন্মে, তখন বুঝিতে হইবে—অবিদ্যা-নিবৃত্তির পরে তো বটেই, বিদ্যারও নিবৃত্তির পরেই—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্তির যোগ্যতা লাভ করে, তৎপূর্ব্বে নহে।

যাহাহউক, উল্লিখিত শ্রীজীবগোস্বামী-প্রভৃতির বাক্য হইতে জানা যায়—অবিদ্যা এবং বিদ্যার সম্যক্ নিবৃত্তি না হইলে ভক্তির উদয় হইতে পারে না। কিন্তু শ্রীমদ্‌ভাগবতে অন্যরূপ উক্তিও দেখিতে পাওয়া যায়। রাসলীলা-বর্ণনের উপসংহারে শ্রীলশুকদেবগোস্বামী বলিয়াছেন,

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ বর্ণয়েদ্ যঃ।
ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগমাশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ॥ শ্রীভা, ১০।৩২।৩৯॥

—যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া ব্রজবধূদিগের সহিত বিষ্ণু (সর্ব্বব্যাপক ব্রহ্মতত্ত্ব) শ্রীকৃষ্ণের এই সমস্ত রাসাদিলীলার কথা নিরন্তর শ্রবণ করেন এবং শ্রবণানন্তর বর্ণন করেন, ভগবানে পরাভক্তি লাভ করিয়া হৃদ্‌রোগ কামাদিকে তিনি শীঘ্রই পরিত্যাগ করেন এবং ধীর (অচঞ্চল) হয়েন।"

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল, শ্রদ্ধার সহিত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের ফলে প্রথমে চিত্তে পরাভক্তির উদয় হয়, তাহার পরে হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হয়। এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—

"অত্র তু হৃদ্‌রোগাপহানাৎ পূর্ব্বমেব পরমভক্তি-প্রাপ্তিঃ।—হৃদ্‌রোগ দূরীভূত হওয়ার পূর্ব্বেই পরাভক্তি লাভ হয়।" হৃদ্‌রোগ হইল মায়ার কার্য্য; সুতরাং এস্থলে মায়ানিবৃত্তির পূর্ব্বেই ভক্তিলাভের কথা জানা যায়। আবার কর্ম্মমার্গ, যোগমার্গ, জ্ঞানমার্গ প্রভৃতিতেও আনুষঙ্গিকভাবে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের উপদেশ দেখা যায়; কারণ, ভক্তির কৃপাব্যতীত কর্ম্ম-যোগাদি স্বস্বফল দান করিতে পারে না। এইরূপে কর্ম্মমার্গাদিতে ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলেও হ্লাদিনীশক্তির বৃত্তিবিশেষের—কলারূপা ভক্তির—বিদ্যাতে বা কর্ম্মযোগে প্রবেশের

কথাও দেখা যায়। "হ্লাদিনী-শক্তিবৃত্তের্ভক্তেরেব কলা কাচিদ্‌বিদ্যাসাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা কর্ম্মসাফল্যার্থং কর্ম্মযোগেঽপি প্রবিশতি, তয়া বিনা কর্ম্মজ্ঞানযোগাদীনাং শ্রমমাত্রত্বোক্তেঃ। গী, ১৮।৫৫-শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।" আবার "ব্রহ্মভূতঃ প্রসন্নাত্মা"-ইত্যাদি গীতা ১৮।৫৪-শ্লোকের টীকায়ও চক্রবর্ত্তিপাদ লিখিয়াছেন—"জ্ঞানে শান্তেঽপি অনশ্বরাং জ্ঞানন্তর্ভূতাং মদ্‌ভক্তিং শ্রবণকীর্ত্তনাদি-রূপাং লভতে। তস্যা মৎস্বরূপশক্তিবৃত্তিত্বেন মায়াশক্তিভিন্নত্বাৎ অবিদ্যাবিদ্যয়োরপগমেঽপি অনপগমাৎ।" ইহা হইতেও জানা যায়—জ্ঞানমার্গের সাধকের চিত্তে—জ্ঞানের আনুষঙ্গিক ভাবে শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠানের ফলে—বিদ্যা এবং অবিদ্যা বর্ত্তমান থাকাসত্ত্বেও—ভক্তির উদয় হয়। অথচ পূর্ব্বোদ্ধৃত বাক্যাদি হইতে জানা যায়—বিদ্যা এবং অবিদ্যার নিবৃত্তি না হইলে ভক্তির উদয় হইতে পারে না।

(১) ভক্তির প্রভাবে ক্রমশঃ রজঃ, তমঃ ও সত্ত্বগুণের তিরোভাব

এসমস্ত পরস্পরবিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান বোধ হয় এইরূপ :—মায়া তিরোহিত হওয়ার পূর্ব্বেও হ্লাদিনী-শক্তির (অর্থাৎ হ্লাদিনী-প্রধান শুদ্ধসত্ত্বের) বৃত্তিরূপা ভক্তি—সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের ফলে—চিত্তে উদিত হইতে পারে বটে; কিন্তু মায়ারঞ্জিত চিত্তের সহিত তাহার স্পর্শ হইতে পারেনা। স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে সচ্চিদানন্দ-স্বরূপ ভগবান্ যেমন অন্তর্য্যামিরূপে প্রত্যেক জীবের হৃদয়েই অবস্থান করেন, অথচ মায়ারঞ্জিত হৃদয়ের সহিত তাঁহার সংস্পর্শ হয় না; তদ্রূপ, হ্লাদিনীর বৃত্তিরূপা ভক্তিও স্বীয় অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে মায়ারঞ্জিত চিত্তকে স্পর্শ না করিয়া জীবের চিত্তে অবস্থান করিতে পারে। উপলব্ধি চিত্তের কার্য্য বলিয়া এবং প্রাকৃত চিত্ত কোনও অপ্রাকৃত বস্তুর উপলব্ধি করিতে পারেনা বলিয়া ভক্তির স্পর্শহীন প্রাকৃত চিত্ত তখনও ঐ ভক্তির উপলব্ধি লাভ করিতে পারেনা। "পূর্ব্বং জ্ঞানবৈরাগ্যাদিষু মোক্ষসিদ্ধ্যর্থং কলয়া বর্ত্তমানয়া অপি সর্ব্বভূতেষু অন্তর্য্যামিন ইব তস্যাঃ (ভক্তেঃ) স্পষ্টোপলব্ধি র্নাসীদিতিভাবঃ। গীতা ১৮।৫৪ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তী।" নিষ্ঠার সহিত ভক্তিমার্গের সাধনেই মায়াকে সম্যক্‌রূপে নির্জ্জিত করা যায়, শ্রীভা, ১১।২৫।৩২ শ্লোকের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়। "এতাঃ সংসৃতয়ঃ পুংসো গুণকর্ম্মনিবন্ধনাঃ। যেনেমে নির্জ্জিতাঃ সৌম্য গুণা জীবেন চিত্তজাঃ। ভক্তিযোগেন মন্নিষ্ঠো মদ্‌ভাবায় প্রপদ্যতে॥" মায়া-পরাজয়ের ক্রমসম্বন্ধেও শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—"রজস্তমশ্চাভিজয়েৎ সত্ত্বসংসেবয়া মুনিঃ॥১১।২৫।৩৪॥—সত্ত্ব-সংসেবাদ্বারা রজঃ ও তমঃকে নির্জ্জিত করিতে হয়।" সাত্ত্বিক ভাব অবলম্বন-পূর্ব্বক ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে করিতে ভক্তিরাণী কৃপা করিয়া সত্ত্বময়ী বিদ্যাকে রজস্তমোময়ী অবিদ্যার নিরসনোপযোগিনী শক্তি প্রদান করেন; "ভক্তেরেব কলা কাচিদ্‌বিদ্যাসাফল্যার্থং বিদ্যায়াং প্রবিষ্টা"—গীতা ১৮।৫৫ শ্লোকের টীকায় চক্রবর্ত্তিপাদের এই উক্তি হইতে তাহাই বুঝা যায়। এইরূপে শক্তিমতী বিদ্যা রজস্তমোরূপা অবিদ্যাকে সম্যক্‌রূপে পরাজিত করিয়া নিজেই একাকিনী চিত্তমধ্যে বিরাজিত থাকে। তখন আবার একমাত্র ভক্তির সাহায্যে—ভক্ত্যুত্থ বিতৃষ্ণার সাহায্যেই—এই সত্ত্বরূপা বিদ্যাকেও পরাজিত করিতে হয়। "সত্ত্বঞ্চাভিজয়েদ্ যুক্তো নৈরপেক্ষ্যেণ শান্তধীঃ। শ্রীভা, ১১।২৫।৩৫॥ (নৈরপেক্ষ্যেণ—ভক্ত্যুত্থবৈতৃষ্ণ্যেন। চক্রবর্ত্তী)॥"

সত্ত্ব স্বচ্ছ; ইহাতে অন্যবস্তু প্রতিফলিত হইতে পারে। সত্ত্বে প্রকাশ-গুণ আছে; ইহা অন্যবস্তুকে প্রকাশ করিতে পারে। শান্তত্বগুণও আছে; তাই ইহা জ্ঞানের হেতু। এজন্য রজঃ ও তমঃকে পরাজিত করিয়া একমাত্র সত্ত্ব যখন হৃদয়ে বিরাজিত থাকে, তখন সাধক সুখ, ধর্ম্ম ও জ্ঞানাদিদ্বারা সংযুক্ত হয়। "যদেতরৌ জয়েৎ সত্ত্বং ভাস্বরং বিশদং শিবম্। তদা সুখেন যুজ্যেত ধর্ম্মজ্ঞানাদিভিঃ পুমান্॥ শ্রীভা, ১১।২৫।১৩॥" ইহার তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে—অবিদ্যার তিরোধানে একমাত্র বিদ্যাদ্বারাই চিত্ত যখন আবৃত থাকে, তখন বিদ্যার (বা সত্ত্বের) স্বচ্ছতাবশতঃ তাহাতে শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিফলিত হয় এবং তাহার (সত্ত্বের) প্রকাশত্ববশতঃ প্রতিফলিত-শুদ্ধসত্ত্ব চিত্তে প্রকাশিত হয় এবং তাহারই ফলে কিঞ্চিৎ সুখ এবং জ্ঞানও প্রকাশিত হইয়া থাকে। এই শুদ্ধসত্ত্ব তাহার অচিন্ত্যশক্তির প্রভাবে বিদ্যাবৃত চিত্তে প্রতিফলিত হইয়া সেই চিত্ত হইতে বিদ্যাকেও দূরীভূত করে। এইরূপে, অবিদ্যা ও বিদ্যা উভয়ে দূরীভূত হইলে চিত্ত সাম্যক্‌রূপে মায়ানির্ম্মুক্ত—ভক্তিনির্ধূতদোষ—হইয়া শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা—অর্থাৎ স্পর্শযোগ্যতা—লাভ করিয়া থাকে; তখন তাহাতে শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাব হয়—অর্থাৎ শুদ্ধসত্ত্ব বা ভক্তি তখন তাহাকে স্পর্শ করে। (সম্ভবতঃ এজন্যই শ্রীজীব-গোস্বামীও শ্রীভা. ১।৩।৩৪ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় সত্ত্বময়ী বিদ্যাকে স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা বিদ্যার—অর্থাৎ ভক্তির বা শুদ্ধসত্ত্বের—আবির্ভাবের দ্বারস্বরূপ বলিয়াছেন। "বিদ্যা তদ্রূপা যা মায়া স্বরূপশক্তিভূত-বিদ্যাবির্ভাবদ্বারলক্ষণা সত্ত্বময়ী মায়াবৃত্তিঃ ইত্যাদি)।" যাহা হউক, এইরূপে শুদ্ধসত্ত্বের স্পর্শ লাভ করিয়া চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে। তখন চিত্তের প্রাকৃতত্ব ঘুচিয়া যায়, তাহা তখন অপ্রাকৃত হয়। এইরূপে শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—সুতরাং অপ্রাকৃতত্বপ্রাপ্ত—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের বা ভক্তির উপলব্ধিলাভেও সমর্থ হয় এবং এইরূপ চিত্তেই শুদ্ধসত্ত্ব রতি-আদিরূপে পরিণত হয়।

উল্লিখিত আলোচনার সারমর্ম্ম এই যে—সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে প্রথমতঃ রজস্তমোময়ী অবিদ্যা তিরোহিত হয়; তখন চিত্ত কেবল সত্ত্বময়ী বিদ্যাদ্বারা অধিকৃত থাকে; এই সত্ত্বে চিচ্ছক্তির বিলাসরূপ শুদ্ধসত্ত্ব প্রতিফলিত হইয়া ক্রমশঃ বিদ্যাকেও দূরীভূত করে। তখন চিত্ত হইতে মায়া সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হইয়া যায় বলিয়া চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের আবির্ভাবযোগ্যতা (অর্থাৎ স্পর্শযোগ্যতা) লাভ করে; শুদ্ধসত্ত্বের স্পর্শে—অগ্নির স্পর্শে লৌহের ন্যায়—চিত্ত শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হয়; শুদ্ধসত্ত্বের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত চিত্তেই শুদ্ধসত্ত্ব আবির্ভূত হইয়া রতিরূপে পরিণত হয়। পরবর্ত্তী খ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

খ। চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই ভক্তির আবির্ভাব

"বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ"-ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের যে মর্ম্ম পূর্ব্ববর্ত্তী ক-অনুচ্ছেদে প্রকাশ করা হইয়াছে, তাহা হইতে জানা গিয়াছে যে, শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি ভক্ত্যঙ্গের অনুষ্ঠানের ফলে আগেই চিত্তে ভক্তির আবির্ভাব হয়, তাহার পরে হৃদ্‌রোগ কাম (মায়া-মলিনতা) দূরীভূত হয়। মায়ামলিনতা দূরীভূত হইয়া গেলে তাহার পরে চিত্তের সহিত ভক্তির

সংযোগ হয়, তাহার পূর্ব্বে হয় না। চিত্তের বিশুদ্ধি-সাধনের জন্য পূর্ব্বেই যে ভক্তির আবির্ভাবের প্রয়োজন, তাহাই এ-স্থলে প্রদর্শিত হইতেছে।

পূর্ব্বেই (৫।৪৮-ক অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, সাধ্যভক্তি হইতেছে স্বরূপশক্তির বৃত্তি এবং (৫।৫৪-অনুচ্ছেদে) ইহাও বলা হইয়াছে যে, সাধনভক্তিও স্বরূপশক্তির বৃত্তি। উভয়ই স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া, সুতরাং উভয়ই সজাতীয়া বা স্বরূপতঃ অভিন্না বলিয়া, সাধনভক্তিকে অবলম্বন বা উপলক্ষ্য করিয়া সাধকের চিত্তে সাধ্যভক্তির আবির্ভাব অস্বাভাবিক নহে। বস্তুতঃ শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি সাধনভক্তির যোগেই যে চিত্তে সাধ্যা পরাভক্তির উদয় হয়, "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ" —ইত্যাদি শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোক হইতেই তাহা জানা যায়।

পূর্ব্বে (১।১।২৩-অনুচ্ছেদে) ইহাও বলা হইয়াছে যে, একমাত্র স্বরূপশক্তিই মায়াকে এবং মায়ার প্রভাবকে অপসারিত করিতে পারে, অন্য কিছুদ্বারাই মায়া অপসারিত হইতে পারে না। ভক্তি স্বরূপশক্তির বৃত্তি বলিয়া ভক্তিই মায়াকে অপসারিত করিতে পারে, অন্য কিছু পারে না। ভক্তিরূপেই স্বরূপশক্তি সাধকের চিত্তে আবির্ভূত হইয়া থাকে এবং আবির্ভূত হইয়া মায়াকে, মায়িক গুণত্রয়কে, দূরীভূত করিয়া থাকে; "বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিঃ" —ইত্যাদি প্রমাণ হইতেই তাহা জানা যায়। সুতরাং চিত্ত বিশুদ্ধ হওয়ার পূর্ব্বেই, চিত্তের বিশুদ্ধি-সম্পাদনের জন্য, চিত্তে স্বরূপশক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির আবির্ভাব যে অপরিহার্য্যরূপে আবশ্যক, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

গ। রাগানুগামার্গের সাধকের যথাবস্থিত দেহে প্রেম-পর্য্যন্তই আবির্ভূত হইতে পারে

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, সাধনভক্তির যোগে চিত্তে আবির্ভূতা ভক্তি, (বা স্বরূপশক্তির বা শুদ্ধসত্ত্বের বৃত্তি,) মায়াকে অপসারিত করিয়া সাধকের চিত্তের সহিত সংযুক্ত হইলে চিত্ত তাহার সহিত তাদাত্ম্য লাভ করে এবং সেই চিত্তে শুদ্ধসত্ত্ব রতিরূপে (বা প্রেমাঙ্কুর, বা ভাব রূপে) পরিণত হয়। রতি বা ভাব হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়িনী প্রীতির প্রথম আবির্ভাব। এই রতি বা ভাবই গাঢ়তা প্রাপ্ত হইলে প্রেম নামে অভিহিত হয়।

এ-স্থলে একটী বিষয় প্রণিধানযোগ্য। রতি, ভাব এবং প্রেম—এই তিনটী শব্দের প্রত্যেকটীরই দুই রকমের তাৎপর্য্য আছে। গাঢ়তা বর্দ্ধিত হইতে হইতে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি বিভিন্ন স্তর অতিক্রম করিয়া যায়। বিভিন্ন স্তরময়ী কৃষ্ণপ্রীতিকেও সাধারণভাবে, স্তরনির্ব্বিশেষে, "রতি বা কৃষ্ণরতি" বলা হয়; যেমন, দাস্যরতি, সখ্যরতি, বাৎসল্যরতি, কান্তারতি। সাধারণভাবে কৃষ্ণপ্রীতিকে "প্রেম"ও বলা হয়; যেমন, দাস্যপ্রেম, সখ্যপ্রেম, ইত্যাদি। "ভাব" সম্বন্ধেও তদ্রূপ। আবার, কৃষ্ণপ্রীতির স্তরবিশেষও তত্তৎ-নামে অভিহিত হয়। যেমন, কৃষ্ণপ্রীতির প্রথম আবির্ভাবকেও "রতি" বলা হয়, "ভাব"ও বলা হয়॥ এ-স্থলে "রতি বা ভাব" প্রযুক্ত হয় একটা বিশেষ অর্থে, সাধারণ অর্থে নহে। আবার, রতির পরবর্ত্তী স্তরকেও

"প্রেম" বলা হয়; এ-স্থলেও একটী বিশেষ অর্থেই "প্রেম"-শব্দের প্রয়োগ। তদ্রূপ, "ভাব"-শব্দে কৃষ্ণপ্রীতির প্রথম আবির্ভাবকেও বুঝায়, আবার কয়েক স্তরের পরবর্ত্তী প্রীতি-স্তরকেও বুঝায়।

যাহাহউক, কৃষ্ণপ্রীতির প্রথম আবির্ভাব "রতি" গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে ক্রমশঃ প্রেম, স্নেহ, মান, প্রণয়, রাগ, অনুরাগ, ভাব ও মহাভাব-এই সকল স্তরে পরিণত হয়; মহাভাবও আবার মোদন ও মাদন-এই দুই স্তরে উন্নীত হয় (পরবর্ত্তী পর্ব্বে এই সকল বিষয় একটু বিস্তৃত ভাবে আলোচিত হইবে)। কেবল রাগানুগামার্গের সাধকের চিত্তেই এ সমস্ত স্তরের কয়েকটী আবির্ভূত হইতে পারে।

(১) দাস্য-সখ্যাদি ভাবের ঊর্দ্ধতম প্রেমস্তর

রতি হইতে মহাভাবপর্য্যন্ত প্রেমের যে কয়টী স্তরের কথা বলা হইল, ব্রজের সকল ভাবের পরিকরের মধ্যেই যে সে-সকল প্রেমস্তর বিদ্যমান থাকে, তাহা নহে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতনের নিকটে বলিয়াছেন,

শান্তরসে শান্তরতি প্রেমপর্য্যন্ত হয়। দাস্যরতি রাগপর্য্যন্ত ক্রমে ত বাঢ়য়॥
সখ্যবাৎল্য (রতি) পায় অনুরাগ সীমা। সুবলাদ্যের ভাবপর্য্যন্ত প্রেমের মহিমা॥
—শ্রীচৈ, চ, ২।২৩।৩৪-৬৫॥

এ-স্থলে বলা হইয়াছে, শান্তরতি প্রেম পর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়; "প্রেমপর্য্যন্ত" বলিতে "প্রেমের পূর্ব্বসীমাই" বুঝিতে হইবে; কেননা, শান্তরতিতে মমতাবুদ্ধি নাই বলিয়া বিশুদ্ধ-প্রেমোদয়ের প্রমাণ পাওয়া যায়না। "দাস্যরতি রাগপর্য্যন্ত" বাক্যে বুঝিতে হইবে যে, রাগের শেষ সীমাপর্য্যন্ত দাস্য-ভক্তের প্রেম বর্দ্ধিত হয়; কেননা, "দাস্য-ভক্তের রতি হয় রাগদশা-অন্ত॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।২৫॥" আর, "সখ্য-বাৎসল্য রতি পায় অনুরাগসীমা"; এই বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে—সখ্যে অনুরাগ পর্য্যন্ত (কিন্তু অনুরাগের শেষ সীমাপর্য্যন্ত নহে) এবং বাৎসল্যে অনুরাগের শেষসীমা পর্য্যন্ত রতি বর্দ্ধিত হয়। "সখাগণের রতি অনুরাগ পর্য্যন্ত। পিতৃ-মাতৃ-স্নেহ-আদি অনুরাগ-অন্ত॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২৪।২৬॥" সখ্যরতি সাধারণতঃ অনুরাগ পর্য্যন্তই বর্দ্ধিত হয়; কিন্তু সুবলাদি প্রিয়নর্ম্মসখাদিগের সখ্যরতি ভাব পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পাইয়া থাকে। ইহা সুবলাদির প্রেমের এক বৈশিষ্ট্য।

আর, কান্তাভাবের পরিকরদের রতি মহাভাবপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়। মহাভাব হইলেই গোপীত্ব বা কৃষ্ণকান্তাত্ব সিদ্ধ হয়।

শান্তরতির স্থান পরব্যোমে। ব্রজে শান্তভক্ত নাই।

এইরূপে দেখা গেল—ব্রজের দাস্যভক্তের কৃষ্ণরতি রাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত, সখ্যভক্তের রতি (সাধারণতঃ) অনুরাগ পর্য্যন্ত (অবশ্য অনুরাগের শেষ সীমাপর্য্যন্ত নহে), বাৎসল্যরতি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এবং কান্তারতি মহাভাবপর্য্যন্ত বর্দ্ধিত হয়।

ব্রজের রাগানুগামার্গের সাধক স্বীয় অভীষ্ট-সেবার উপযোগী প্রেমস্তর লাভ করিতে পারিলেই পার্ষদরূপে লীলায় প্রবেশ করিতে পারেন। অর্থাৎ যিনি দাস্যভাবের সাধক, তিনি যদি রাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত, যিনি সখ্যভাবের সাধক, তিনি যদি অনুরাগ পর্য্যন্ত, যিনি বাৎসল্যভাবের সাধক, তিনি যদি অনুরাগের শেষ সীমা পর্য্যন্ত এবং যিনি কান্তাভাবের সাধক, তিনি যদি মহাভাব লাভ করিতে পারেন, তাহা হইলেই তিনি লীলায় প্রবেশলাভ করিতে পারেন।

(২) যথাবস্থিত দেহে প্রেমের বেশী হয়না এবং কেন হয়না

কিন্তু রাগানুগামার্গের সাধক তাঁহার যথাবস্থিত দেহে প্রেমাবির্ভাবের দ্বিতীয় স্তর প্রেম পর্য্যন্তই লাভ করিতে পারেন, তাহার বেশী নহে।

ইহার কারণ এইরূপ বলিয়া অনুমিত হয়। ব্রজের ভাব হইল শুদ্ধমাধুর্য্যময়, সম্যক্‌রূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, শ্রীকৃষ্ণে মমত্ববুদ্ধিময়। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান জগতে, ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক আবেষ্টনে, তাহা বোধ হয় সম্যক্‌রূপে পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে না। স্নেহ-মান-প্রণয়াদির আবির্ভাব এবং পরিপুষ্টির জন্য ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্যময় আবেষ্টনের প্রয়োজন; এইরূপ আবেষ্টন এই জগতে সুদুর্ল্লভ বলিয়াই বোধ হয় সাধকের যথাবস্থিত দেহে স্নেহ-মানাদির আবির্ভাব হয় না। প্রশ্ন হইতে পারে—প্রেম পর্য্যন্ত তাহা হইলে কিরূপে হইতে পারে? প্রেমও তো "মমত্বাতিশয়াঙ্কিতঃ?" ইহার উত্তর বোধ হয় এই। এই প্রেম হইল রতি বা ভাবের গাঢ় অবস্থা (ভাবঃ স এব সান্দ্রাত্মা বুধৈঃ প্রেমা নিগদ্যতে)। আর, ভাব (বা রতি) হইল প্রেমরূপ সূর্য্যের কিরণ-সদৃশ (প্রেমসূর্য্যাংশুসাম্যভাক্)। এস্থলে প্রেম-শব্দে সম্যক্‌বিকাশময় ব্রজপ্রেমই সূচিত হইতেছে—সূর্য্য-শব্দের ধ্বনি হইতেই তাহা বুঝা যায়। সূর্য্য যখন মধ্যাহ্ন গগনে সমুদ্‌ভাসিত হয়, তখনই তাহার পূর্ণ মহিমা; তদ্রূপ প্রেমেরও পূর্ণ মহিমা তাহার পূর্ণতম-বিকাশে। সূর্য্য উদিত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার কিরণ প্রকাশ পায়; তখন অন্ধকার কিছু কিছু দূরীভূত হইলেও সম্যক্‌রূপে তিরোহিত হয় না। এই রতির বা ভাবের গাঢ়তা প্রাপ্ত অবস্থাই প্রেম—উদীয়মান্ সূর্য্যতুল্য। উদীয়মান্ সূর্য্য বাহিরের অন্ধকার দূর করে, কিন্তু গৃহমধ্যস্থ অন্ধকার সম্যক্‌রূপে দূর করে না। তদ্রূপ, উদীয়মান্ সূর্য্যসদৃশ প্রেমের আবির্ভাবেও বোধহয় সাধকের চিত্তকন্দরে কিছু কিছু ঐশ্বর্য্যের ভাব থাকিয়া যায়। এরূপ অনুমানের হেতু এই যে, বৈকুণ্ঠ-পার্ষদদের যে ভাব, তাহার নাম শান্ত ভাব; শান্তভাব প্রেম পর্য্যন্ত বৃদ্ধি পায় (শান্তরসে শান্তিরতি প্রেম পর্য্যন্ত হয়। ২।২৩।৩৪॥); কিন্তু শান্তভক্তের এই প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে। অবশ্য বৈকুণ্ঠভাবের সাধক ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতা চাহেন না বলিয়া শান্তভক্তের প্রেমে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে নিবিড়; তাই তাঁহার চিত্তে ভগবান্ সম্বন্ধে মমত্ব-বুদ্ধি জন্মিতে পারে না; কিন্তু ব্রজভাবের সাধকের অভীষ্ট সম্পূর্ণরূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন বলিয়া তাঁহার চিত্তে প্রেমোদয়ে কিছু ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকিলেও তাহা খুবই তরল, ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীনতার বাসনাই এই ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের নিবিড়তাপ্রাপ্তির পক্ষে বলবান্ বিঘ্নস্বরূপ হইয়া পড়ে। তাঁহার ঐশ্বর্য্যজ্ঞান খুব তরল বলিয়াই প্রেমের

আবির্ভাবে শ্রীকৃষ্ণ-সম্বন্ধে তাঁহার মমত্ববুদ্ধি জাগ্রত হইতে পারে। জগতের ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান আবেষ্টন তাঁহার এই তরল-ঐশ্বর্য্যজ্ঞানকে অপসারিত করার অনুকূল নহে বলিয়াই বোধ হয় ব্রজভাবের সাধকের প্রেম গাঢ়তা লাভ করিয়া স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হইতে পারে না এবং বোধ হয় এজন্যই তাঁহার যথাবস্থিত দেহে প্রেম পর্য্যন্তই লাভ হয়। এইরূপ ভক্তকে বলে জাতপ্রেম ভক্ত।

জাতপ্রেম ভক্তের প্রেম আরও গাঢ়তা লাভ করিয়া স্নেহ-মান-প্রণয়াদি-স্তরে উন্নীত হওয়ার পক্ষে অনুকূল আবেষ্টনের—ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধমাধুর্য্য-ভাবাত্মক আবেষ্টনের—প্রয়োজন। কিন্তু এই ব্রহ্মাণ্ডে এইরূপ আবেষ্টনের অভাব। তাই জাতপ্রেম ভক্তের দেহভঙ্গের পরে যোগমায়া কৃপা করিয়া তাঁহাকে—তখন যে-ব্রহ্মাণ্ডে শ্রীকৃষ্ণের লীলা প্রকটিত থাকে, সেই ব্রহ্মাণ্ডে—প্রকট-লীলাস্থলে—আহিরী-গোপের ঘরে জন্মাইয়া থাকেন।

সেই স্থানের আবেষ্টন ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন, শুদ্ধমাধুর্য্যময়। সেইস্থানে নিত্যসিদ্ধ শ্রীকৃষ্ণ-পরিকরদের সঙ্গের প্রভাবে, তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণকথাদি-শ্রবণের প্রভাবে, তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিয়া ভাবানুকূল লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবার উপযোগী স্তর পর্য্যন্ত উন্নীত হয় এবং তখনই তিনি সেবোপযোগী সিদ্ধদেহ লাভ করিয়া লীলায় প্রবিষ্ট হয়েন। উজ্জ্বলনীলমণির-কৃষ্ণবল্লভা-প্রকরণের-"তদ্‌ভাববদ্ধরাগা যে জনাস্তে সাধনে রতাঃ।"-ইত্যাদি ৩১শ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী এইরূপই লিখিয়াছেন। " * * ননু যে ইদানীন্তনা রাগানুগীয়-সাধনবন্তো নিষ্ঠা-রুচ্যাসক্ত্যাদি-কক্ষারূঢ়তয়া কস্মিংশ্চিজন্মনি যদি জাতপ্রেমাণঃ স্যুস্তে তর্হি ভগবৎসাক্ষাৎসেবাযোগ্যা স্তদ্দেহান্তক্ষণ এব প্রপঞ্চাগোচরপ্রকাশে তৎপরিকরপদবীং প্রাপ্‌স্যন্তি কিম্বা প্রপঞ্চগোচর-কৃষ্ণাবতার-সময়ে। তত্রোচ্যতে। সাধকদেহে প্রেমপরিণামরূপাণাং স্নেহমান-প্রণয়াদীনাং স্থায়িভাবানাং আবির্ভাবাসম্ভবাৎ গোপিকাদেহেষু এব নিত্যসিদ্ধাদিগোপীনাং মহাভাববতীনাং সঙ্গমহিম্না দর্শন-শ্রবণ-স্মরণ-গুণকীর্ত্তনাদিভিস্তে অবশ্যমেবোপপদ্যন্তে তেষামেব অসাধারণলক্ষণত্বাৎ তান্ বিনা গোপীত্বাসিদ্ধেঃ * * *। অতএব প্রপঞ্চাগোচরস্য বৃন্দাবনীয়স্য প্রকাশস্য সাধকানাং প্রাপঞ্চিকলোকানাঞ্চ তত্র প্রবেশাদর্শনেন সিদ্ধানামেব প্রবেশদর্শনেন চ জ্ঞাপিতাৎ কেবলসিদ্ধ-ভূমিত্বাৎ স্নেহাদয়োভাবাঃ স্বস্ব সাধনৈরপি ন তূর্ণং ফলন্তি। অতো যোগমায়য়া জাতপ্রেমাণো ভক্তাস্তে প্রপঞ্চগোচরে বৃন্দাবনস্য প্রকাশ এব শ্রীকৃষ্ণাবতার-সময়ে তং প্রথম-প্রাপণার্থং নীয়ন্তে। তস্য সাধকানাং নানাবিধ-কর্ম্মিপ্রভৃতি-প্রাপঞ্চিক-লোকানাঞ্চ সিদ্ধানাঞ্চ তত্র প্রবেশদর্শনেনানুমিতাৎ সাধকসিদ্ধভূমিত্বাৎ। তত্রোৎপত্ত্যনন্তরমেব শ্রীকৃষ্ণাঙ্গসঙ্গাৎ পূর্ব্বমেব তত্তদ্‌ভাবসিদ্ধ্যর্থমিতি।"

সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্য্যন্তই লাভ হইতে পারে, ভক্তিরসামৃতসিন্ধু, শ্রীমদ্‌ভাগবত, এবং শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর উক্তি হইতেও তাহাই মনে হয়। প্রেমবিকাশের ক্রমসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"আদৌ শ্রদ্ধা ততঃ সাধুসঙ্গোঽথ ভজনক্রিয়া। ততোঽনর্থ-নিবৃত্তিঃ

স্যাৎ ততো নিষ্ঠা রুচিস্ততঃ॥ অথাসক্তিস্ততো ভাবস্ততঃ প্রেমাভ্যুদঞ্চতি। সাধকানাময়ং প্রেম্ণঃ প্রাদুর্ভাবে ভবেৎ ক্রমঃ। ১।৪।১১॥—প্রথমে শ্রদ্ধা, তারপর সাধুসঙ্গ, তারপর ভজন-ক্রিয়া, তারপর অনর্থনিবৃত্তি, তারপর (ভজনাঙ্গে) নিষ্ঠা, তারপর ভজনাঙ্গে রুচি, তারপর (ভজনাঙ্গে) আসক্তি, তারপর ভাব (অর্থাৎ রতি বা প্রীত্যঙ্কুর), তারপর প্রেমের উদয় হয়। সাধকদিগের প্রেমাবির্ভাবে ইহাই ক্রম।” ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সাধনভক্তি-প্রসঙ্গে ইহার পরে আর কিছু বলা হয় নাই ; প্রেমের পরবর্ত্তী স্নেহ, মান, প্রণয়াদিস্তরের আবির্ভাবের ক্রমসম্বন্ধেও কিছু বলা হয় নাই। সাধন-ভক্তির পরিচয় প্রদান-প্রসঙ্গেও ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—চিত্তে ভাবের (অর্থাৎ প্রেমের) আবির্ভাবই সাধন-ভক্তির লক্ষ্য ; প্রেমের পরবর্ত্তী স্নেহ-মানপ্রণয়াদির আবির্ভাব যে সাধনভক্তির লক্ষ্য, তাহা বলা হয় নাই। “কৃতিসাধ্যা ভবেৎ সাধ্যভাবা সা সাধনাভিধা। নিত্যসিদ্ধস্য ভাবস্য প্রাকট্যং হৃদি সাধ্যতা॥” যথাবস্থিত দেহেই সাধনভক্তির অনুষ্ঠান করিতে হয়। ইহাতে মনে হয়, সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্য্যন্তই আবির্ভূত হয়, ইহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অভিপ্রায়। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু তাহা যেন পরিষ্কারভাবেও বলিয়া গিয়াছেন। “প্রেম্ণ এব বিলাসত্বাদ্বৈরল্যাৎ সাধকেষ্বপি। তত্র স্নেহাদয়ো ভেদা বিবেচ্য ন হি শংসিতাঃ॥ ১।৪।১৩॥”-এ-স্থলে বলা হইল স্নেহাদি প্রীতিস্তরসমূহ প্রেমেরই বিলাস (বৈচিত্রীবিশেষ) বলিয়া এবং সাধকভক্তদের মধ্যে স্নেহাদি বিরল বলিয়া (দৃষ্ট হয় না বলিয়া) ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে সে-সমস্ত বিবেচিত হইল না। সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে স্নেহাদির আবির্ভাব হয় না, এই উক্তি হইতে, তাহাই ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়। শ্রীপাদ সনাতন-গোস্বামীর নিকটে জাতপ্রেম ভক্তের লক্ষণসম্বন্ধে বলিতে গিয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের “এবং ব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্ত উচ্চৈঃ। হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১১।২।৪০॥”-শ্লোকের উল্লেখ করিয়াছেন। এই শ্লোকে ব্রতরূপে অবলম্বিত নামসঙ্কীর্ত্তনের মহিমায় সাধকের চিত্তে যে প্রেমের উদয় হয় এবং প্রেমের আবির্ভাবে যে চিত্তদ্রবতা, হাস্য, রোদন, চীৎকার, উন্মাদবৎ নৃত্য এবং লোকাপেক্ষাহীনতাদি লক্ষণ প্রকাশ পায়, তাহাই বলা হইয়াছে। স্নেহ-মান-প্রণয়াদির উদয়ে কি কি লক্ষণ প্রকাশ পায়, প্রভুকর্ত্তৃক তাহা বলা হয় নাই। ইহাতেও বুঝা যায়, সাধকের যথাবস্থিত দেহে যে প্রেম পর্য্যন্তই আবির্ভূত হইতে পারে, ইহাই শ্রীমদ্ভাগবতের এবং শ্রীমন্মহাপ্রভুরও উক্তির অভিপ্রায়। পূর্ব্বোল্লিখিত চক্রবর্ত্তিপাদের উক্তিও এ-সমস্ত শাস্ত্রোক্তিরই অনুরূপ।

(৩) সিদ্ধদেহ-প্রাপ্তির ক্রম

যাহা হউক, উজ্জ্বলনীলমণির কৃষ্ণবল্লভাপ্রকরণের ৩১-শ্লোকের চক্রবর্ত্তিপাদকৃত আনন্দ-চন্দ্রিকা টীকার যে অংশ পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার পরে উক্ত টীকাতেই লিখিত হইয়াছে—“রাগানুগীয়-সম্যক্ সাধননিরতায় উৎপন্নপ্রেম্ণে ভক্তায় চিরসময়বিধৃতসাক্ষাৎসেবাভিলাষ-মহোৎকণ্ঠ্যায় কৃপয়া ভগবতা সপরিকর-স্বদর্শনং তদভিলষণীয়-সেবাপ্রাপ্ত্যনুভাবকমলব্ধ-স্নেহাদিপ্রেমভেদায়াপি

সাধকদেহেঽপি স্বপ্নেঽপি সাক্ষাদপি সকৃদ্দীয়ত এব। ততশ্চ শ্রীনারদায়েব চিদানন্দময়ী গোপিকাকার-তদ্ভাবভাবিতা তনুশ্চ দীয়তে ততশ্চ বৃন্দাবনীয়-প্রকটপ্রকাশে কৃষ্ণপরিকর-প্রাদুর্ভাবসময়ে সৈব তনু র্যোগমায়য়া গোপিকাগর্ভাত্‌দ্‌ভাব্যতে উক্তন্যায়েন স্নেহাদিপ্রেমভেদসিদ্ধ্যর্থম্।" তাৎপর্য্যার্থ—"রাগানুগীয় মার্গে সম্যক্ সাধননিরত জাতপ্রেম ভক্তের চিত্তে বহুকাল পর্য্যন্ত যখন শ্রীকৃষ্ণের সাক্ষাৎ সেবালাভের জন্য বলবতী উৎকণ্ঠা জাগিতে থাকে, সেই ভক্তের চিত্তের তখন পর্য্যন্ত স্নেহাদি প্রেমভেদ উদিত না হইয়া থাকিলেও শ্রীকৃষ্ণ তখন দয়া করিয়া সেই ভক্তের সাধক দেহেই স্বপ্নে এবং সাক্ষাদ্‌ভাবেও তাঁহাকে সপরিকরে একবার দর্শন দেন। তারপর, শ্রীনারদকে ভগবান্ যেমন চিদানন্দময় দেহ দিয়াছিলেন, তদ্রূপ সেই জাতপ্রেম সাধককেও চিদানন্দময় তদ্‌ভাব-ভাবিত গোপিকাকার দেহ দেন। তারপর, বৃন্দাবনের প্রকট-প্রকাশে শ্রীকৃষ্ণপরিকরদের আবির্ভাব-সময়ে, স্নেহাদি প্রেমভেদ সিদ্ধির নিমিত্ত, সেই দেহই যোগমায়া কর্ত্তৃক গোপিকাগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত হয়।" কান্তাভাবের সাধকসম্বন্ধে উল্লিখিত কথাগুলি বলা হইয়াছে বলিয়াই "গোপিকাকার-দেহ" বলা হইয়াছে; কান্তাভাবের সাধকের-অন্তশ্চিন্তিত দেহ "গোপিকাকার।" যদি সখ্যভাবের সাধকের কথা বলা হইত, তাহা হইলে "গোপাকার দেহই" বলিতেন; যেহেতু, তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহ "গোপাকার—গোপবালকের আকারই" হইবে। যাহা হউক, উক্ত টীকায় বলা হইল—সপরিকর-ভগবান্ জাতপ্রেম ভক্তকে একবার দর্শন দেন। কান্তাভাবের সাধক শ্রীরাধিকাদি গোপীগণের সহিত লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবাই অন্তশ্চিন্তিত দেহে চিন্তা করিয়া থাকেন; শ্রীকৃষ্ণও তাঁহাকে গোপীজন-বল্লভরূপেই শ্রীরাধিকাদি গোপীগণ-পরিবেষ্টিত হইয়াই দর্শন দিয়া থাকেন। তাহার পরে, সেই জাতপ্রেম ভক্তকে তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত গোপিকাকার একটী দেহ দিয়া থাকেন এবং এই দেহটী চিদানন্দময়। কিন্তু এই চিদানন্দময় গোপীদেহ দেওয়ার তাৎপর্য্য কি? ভক্তের যথাবস্থিত দেহটীই যে গোপীদেহে পর্য্যবসিত হইয়া যায়, তাহা নহে। দেহভঙ্গ পর্য্যন্ত জাতপ্রেম ভক্তেরও যথাবস্থিত সাধকদেহই থাকে। দেহভঙ্গের পরেই গোপকন্যার দেহ পাইয়া থাকেন। প্রশ্ন হইতে পারে—তাহাই যদি হইবে, তাহা হইলে কেন বলা হইল, সপরিকরে দর্শন দানের পরে ভগবান্ সাধককে চিদানন্দময় গোপীদেহ দিয়া থাকেন? ইহার উত্তর বোধহয় এইরূপ। জলৌকা যেমন একটী তৃণকে অবলম্বন করিয়া আর একটী তৃণকে পরিত্যাগ করে, তদ্রূপ জীবও তাহার মৃত্যু-সময়ে যে কর্ম্মফল উদ্‌বুদ্ধ হয়, সেই কর্ম্মফলের ভোগোপযোগী দেহকে আশ্রয় করিয়া, অথবা তাহার সংস্কারানুরূপ দেহকে আশ্রয় করিয়া তাহার পরে তাহার পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করিয়া থাকে (শ্রীভা, ১০।১।৩৯-৪২)। স্ব-স্ব-সংস্কার অনুসারে দেহত্যাগ-সময়ে যাহা যাহা চিন্তা করা যায়, জীব তাহা তাহাই পাইয়া থাকে। "যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ॥ গীতা। ৮।৬॥" (ভোগায়তন দেহ, বা সংস্করানুরূপ দেহ, কিম্বা অন্তকালে ভাবনার অনুরূপ দেহ ভগবান্‌ই দিয়া থাকেন)। ইহা একটী ভাবনাময় দেহ (২।৩৩-খ-অনু, ১২৭৪ পৃঃ)। এই দেহকে আশ্রয়

করিয়াই জীব পূর্ব্বদেহ ত্যাগ করে। জাতপ্রেম ভক্তের সাধনানুরূপ বা সংস্কারানুরূপ দেহ হইতেছে তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহ। শ্রীকৃষ্ণ সপরিকরে দর্শন দিয়া সাধকের এই অন্তশ্চিন্তিত দেহটীকেই সম্পূর্ণ-চিদানন্দময় করিয়া দেন। দেহভঙ্গ-সময়ে—সপরিকর ভগবদ্দর্শনের পরে দেহভঙ্গ হয় বলিয়া, দর্শন-লাভের পরেই—জাতপ্রেম ভক্ত দেহভঙ্গ-সময়ে তাঁহার সংস্কার-অনুরূপ চিদানন্দময় এই দেহকে আশ্রয় করিয়াই তিনি তাঁহার যথাবস্থিত দেহত্যাগ করেন। এই দেহই পরে যথাসময়ে যোগমায়া প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভাবিত করাইয়া থাকেন।

টীকায় বলা হইয়াছে "শ্রীনারদায় ইব"—নারদকে শ্রীভগবান্ যেমন চিদানন্দময় দেহ দিয়াছিলেন, তদ্রূপ। নারদ তাঁহার যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়া চিদানন্দময়-দেহে বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন; উপরে উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতোক্ত জলৌকার দৃষ্টান্ত-অনুসারে বলা যায়, ভবদ্দত্ত চিদানন্দময় দেহকে আশ্রয় করিয়াই নারদ তাঁহার যথাবস্থিত দেহ ত্যাগ করিয়াছিলেন। দেহের চিদানন্দময়ত্বাংশেই নারদের প্রাপ্ত দেহের সঙ্গে জাতপ্রেম ভক্তের প্রাপ্ত দেহের সাদৃশ্য; সর্ব্ববিষয়ে সাদৃশ্য নাই। যেহেতু, নারদ যে দেহ পাইয়াছিলেন, তাহা ছিল বৈকুণ্ঠ-পার্ষদের দেহ; জাতপ্রেম-ভক্ত দেহভঙ্গের পরে যে দেহ লাভ করেন, তাহা ব্রজলীলার পার্ষদ দেহ নহে; প্রেম ক্রমশঃ গাঢ় হইতে হইতে অভীষ্ট-লীলায় শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হইলেই ভক্ত পরিকরত্ব লাভ করিতে পারেন এবং তখন যে দেহে তিনি লীলায় প্রবেশ করিবেন, সেই দেহই হইবে তাঁহার পার্ষদ-দেহ বা সিদ্ধ-দেহ। জাতপ্রেম ভক্ত যে শ্রীকৃষ্ণদর্শন লাভের পরে এইরূপ সিদ্ধদেহ পাইয়া থাকেন, তাহা চক্রবর্ত্তিপাদ বলেন নাই; তিনি বলিয়াছেন—চিদানন্দময় গোপিকাদেহ পাইয়া থাকেন। ইহা হইতেছে ভাবময় দেহ; শ্রীকৃষ্ণ সাধকের অন্তশ্চিন্তিত দেহেরই তখন সত্যতা বিধান করেন।

এই দেহটীর আশ্রয়ে জাতপ্রেম ভক্ত যখন প্রকটলীলা-স্থলে জন্মগ্রহণ করেন, তখন নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গের মাহাত্ম্যে, তাঁহাদের মুখে শ্রীকৃষ্ণের রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শ্রবণাদির মাহাত্ম্যে, তাঁহার প্রেম ক্রমশঃ গাঢ়তা লাভ করিতে করিতে যখন সেবার উপযোগী স্তরে উন্নীত হয়, তখনই পরিকররূপে তিনি লীলাতে প্রবিষ্ট হয়েন। তাঁহাকে সেই দেহ ত্যাগ করিয়া অপর একটী দেহ আর গ্রহণ করিতে হয়না। তাঁহাকে সেই দেহ কেন ত্যাগ করিতে হয় না, তাহার হেতুও বোধহয় আছে। সিদ্ধদেহের মোটামুটি এই কয়টী লক্ষণ দেখা যায়—প্রথমতঃ, ইহা সচ্চিদানন্দময়; দ্বিতীয়তঃ, ভাবানু-রূপ, অর্থাৎ যিনি কান্তাভাবের সাধক, তাঁহার সিদ্ধদেহ হইবে গোপীদেহ, ইত্যাদি; তৃতীয়তঃ, ইহাতে থাকিবে ভাবানুকূল সেবার উপযোগী স্তর পর্য্যন্ত প্রেমের বিকাশ। এক্ষণে, জাতপ্রেম ভক্ত যে দেহে প্রকটলীলাস্থলে জন্ম গ্রহণ করেন, তাহাতে প্রথম দুইটী লক্ষণ বিদ্যমান, বাকী কেবল তৃতীয় লক্ষণটী, অর্থাৎ প্রেমের যথোচিত পুষ্টি। সাধকভক্তের যথাবস্থিত দেহেই যখন রতির আবির্ভাব হয় এবং সেই রতি যখন প্রেম পর্য্যন্ত পুষ্টিলাভ করিতে পারে, তখন প্রকটলীলাস্থলে গোপীগর্ভ হইতে আবির্ভূত

ভাবানুরূপ সচ্চিদানন্দময় দেহে নিত্যসিদ্ধ পরিকরদের সঙ্গাদির প্রভাবে যে সেবার উপযোগী স্তর পর্য্যন্ত প্রেম উন্নীত হইতে পারে, তাহাতে সন্দেহের কোনও অবকাশ থাকিতে পারেনা।

যে সময়ে প্রকট-বৃন্দাবনলীলায় আহিরী-গোপের ঘরে জাত-প্রেম সাধকের জন্ম হইবে, ঠিক সেই সময়ে প্রকট-নবদ্বীপলীলাস্থানেও ব্রাহ্মণের বা অপরের গৃহে এক স্বরূপে তাঁহার জন্ম হইবে। সেস্থানেও নিত্যসিদ্ধ-পরিকরদের সঙ্গাদির ও শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির প্রভাবে তাঁহার ভাব পরিপুষ্টি লাভ করিবে এবং তিনি শ্রীগৌরসুন্দরের সেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইবেন। শ্রীনবদ্বীপলীলা এবং শ্রীবৃন্দাবন-লীলা উভয়ই যখন নিত্য, আর প্রকট লীলাও যখন নিত্য, তখন জাতপ্রেম সাধকের যথাবস্থিত দেহ-ত্যাগের সময়ে কোনও না কোনও ব্রহ্মাণ্ডে নবদ্বীপলীলা এবং ব্রজলীলা প্রকট থাকিবেই; সুতরাং জাত প্রেম-সাধককে দেহত্যাগের পরে নিত্যলীলায় প্রবেশের জন্য কিছুকাল অপেক্ষা করিতেও হইবে না।

৬৪। বিধিমার্গের ভজনে পার্ষদদেহ-প্রাপ্তির ক্রম

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শাস্ত্রবিধিই হইতেছে বিধিমার্গের ভজনের প্রবর্ত্তক। ভগবান্ কর্ম্মফল-দাতা, তিনিই মুক্তিদাতা, তাঁহার ভজন না করিলে সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না—এই জাতীয় ভাব হইতেই বিধিমার্গের ভজনে প্রবৃত্তি। সুতরাং বিধিমার্গের ভজনে আরম্ভ হইতেই সাধকের চিত্তে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে। অবশ্য বিধিমার্গে ভজন করিতে করিতেও মহৎ-কৃপাজাত কোনও এক পরম-সৌভাগ্যের উদয় হইলে ব্রজেন্দ্র-নন্দনের প্রেমসেবার জন্য লোভও জন্মিতে পারে; এইরূপ লোভ যখন জন্মিবে, তখন সাধকের ভজন রাগানুগাতেই পর্য্যবসিত হইবে। কিন্তু যাঁহাদের এতাদৃশ লোভ জন্মেনা, সিদ্ধাবস্থাতেও তাঁহাদের চিত্তে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানের প্রাধান্যই থাকিয়া যায়।

বৈধীভক্তি হইতেও প্রীত্যঙ্কুর এবং প্রেম জন্মিতে পারে। কিন্তু এই প্রেমের সঙ্গে রাগানুগা হইতে উন্মেষিত প্রেমের পার্থক্য আছে। বিধিমার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের প্রেম ভগবানের মহিমা-জ্ঞানযুক্ত; আর রাগানুগামার্গানুবর্ত্তী ভক্তগণের প্রেম কেবল মাধুর্য্যময়। "মহিমাজ্ঞানযুক্তঃ স্যাদ্বিধিমার্গানুসা-রিণাম্। রাগানুগাশ্রিতানান্ত প্রায়শঃ কেবলো ভবেৎ॥ ভ, র, সি, ১।৪।১০॥" বৈধীভক্তি হইতে জাত প্রেম মমত্ব-বুদ্ধিময় প্রেমও নহে। ইহা হইতেছে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধানা সাধারণ-প্রীতি মাত্র। বিধিমার্গের ভজনে শুদ্ধ-মাধুর্য্যময় ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা পাওয়া যায় না। "বিধিমার্গে না পাইয়ে ব্রজে কৃষ্ণচন্দ্র॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১৮২॥" বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিলে বৈকুণ্ঠে সার্ষ্টি-সারূপ্যাদি চতুর্বিধা মুক্তি লাভ হয়। "বিধিমার্গে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানে ভজন করিয়া। বৈকুণ্ঠকে যায় চতুর্ব্বিধ মুক্তি পাঞা॥ শ্রীচৈ, চ, ১।২।১৫॥" যদি মধুরভাবে লোভ থাকে, অথচ ভজন বিধিমার্গানুসারেই করা হয়, তাহা হইলে শ্রীরাধা ও শ্রীসত্যভামার ঐক্য-হেতু দ্বারকায় স্বকীয়াভাবে সত্যভামার পরিকররূপে ঐশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্র মাধুর্য্যজ্ঞান লাভ হইবে। "মধুরভাবলোভিত্বে সতি বিধিমার্গেণ ভজনে দ্বারকায়াং শ্রীরাধাসত্যভাময়ো-

রৈক্যাৎ সত্যভামাপরিকরত্বেন স্বকীয়াভাবমৈশ্বর্য্যজ্ঞানমিশ্রমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। রাগবর্ত্ম চন্দ্রিকা ।।” আর শুদ্ধরাগমার্গের ভজন হইলে, ব্রজে পরকীয়াভাবে শ্রীরাধিকার পরিকররূপে শুদ্ধ-মাধুর্য্যজ্ঞানই লাভ হইবে। “রাগমার্গেণ ভজনে ব্রজভূমৌ শ্রীরাধাপরিকরত্বেন পরকীয়াভাবং শুদ্ধমাধুর্য্যজ্ঞানং প্রাপ্নোতি। রাগবর্ত্মচন্দ্রিকা ।”

বিধিমার্গের সাধকের প্রেম ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান বলিয়া যথাবস্থিত দেহেই তিনি তাহা পাইতে পারেন; কেননা, এই জগতের ঐশ্বর্য্যভাবাত্মক পরিবেশ তাঁহার সাধ্যভাবের প্রতিকূল নহে। সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে দেহভঙ্গের পরেই তিনি সেবার উপযোগী চিন্ময় বা শুদ্ধসত্ত্বাত্মক পার্ষদদেহ লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকেন। শ্রীনারদ এবং শ্রীঅজামিলই তাহার প্রমাণ।

সাধুসেবার প্রভাবে ভগবানে নারদের দৃঢ়া মতি জন্মিয়াছে দেখিয়া ভগবান্ নারদকে পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন—তুমি এই নিন্দ্যলোক ত্যাগ করিয়া আমার পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হইবে।

সৎসেবয়া দীর্ঘয়াপি জাতা ময়ি দৃঢ়া মতিঃ।
হিত্বাবদ্যমিদং লোকং গন্তা মজ্জনতামসি ॥ শ্রীভা, ১।৬।২৫ ॥

ইহার পরে, সাধনের পরিপক্কতায় শ্রীনারদ কি ভাবে পার্ষদদেহ পাইয়াছিলেন, তাহা তিনি ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন।

“প্রযুজ্যমানে ময়ি তাং শুদ্ধাং ভাগবতীং তনুম্।
আরব্ধকর্ম্মনির্ব্বাণো ন্যপতৎ পাঞ্চভৌতিকঃ ॥ শ্রীভা, ১।৬।২৯ ॥

—(ভগবৎকথিত) সেই শুদ্ধা ভাগবতী তনুর প্রতি আমি প্রযুজ্যমান (নীত) হইলে আমার আরব্ধ-কর্ম্মনির্ব্বাণ পাঞ্চভৌতিক দেহ নিপতিত হইল।”

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—“প্রযুজ্যমানে নীয়মানে – নীত হইলে।” কোথায় নীত হইলে ? “যা তনুঃ শ্রীভগবতা দাতুং প্রতিজ্ঞাতা তাং ভাগবতীং ভগবদংশজ্যোতিরংশ-রূপাং শুদ্ধাং প্রকৃতিস্পর্শশূন্যাং তনুং প্রতি—ভগবৎ-প্রতিশ্রুতা শুদ্ধা ভাগবতী তনুর প্রতিই ভগবান্‌কর্ত্তৃক নারদ নীত হইয়াছিলেন।” এ-স্থলে “ভাগবতী”-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—“ভগবদংশজ্যোতিরংশ-রূপা—ভগবানের অংশ যে জ্যোতিঃ, তাহার অংশরূপা” ; আর “শুদ্ধা”-শব্দের অর্থ করা হইয়াছে—“প্রকৃতিস্পর্শ-শূন্যা।” ভগবানের অংশরূপা জ্যোতিঃ বলিতে তাঁহার স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষকেই বুঝায়; তাহার অংশ যাহা, তাহাও স্বরূপশক্তির বা শুদ্ধসত্ত্বেরই বৃত্তিবিশেষ, সুতরাং শুদ্ধা—প্রকৃতিস্পর্শশূন্যা। এতাদৃশ মায়াতীত শুদ্ধসত্ত্বময় (চিন্ময়) পার্ষদদেহের প্রতিই ভগবান্ নারদকে নিয়া গেলেন এবং নিয়া গিয়া সেই দেহই নারদকে দিলেন। এই অপ্রাকৃত পার্ষদদেহেই নারদ বৈকুণ্ঠে অবস্থান করিতে লাগিলেন।

নারদের দৃষ্টান্ত হইতে জানা গেল, বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তির সাধনে সাধক সিদ্ধি লাভ করিলে প্রারব্ধ-ভোগান্তে যথাবস্থিত-সাধকদেহ ত্যাগের সঙ্গে সঙ্গেই লিঙ্গদেহ ত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎই অপ্রাকৃত

পার্ষদদেহ লাভ করিয়া থাকেন এবং তখন হইতেই পার্ষদরূপে বৈকুণ্ঠের উপযোগি-সেবাদিতে তাঁহার অধিকার জন্মে।

অজামিলের বিবরণ হইতেও তাহা জানা যায়। সাধনের পরিপক্কতায় অজামিল—

"হিত্বা কলেবরং তীর্থে গঙ্গায়াং দর্শনাদনু। সদ্যঃ স্বরূপং জগৃহে ভগবৎপার্শ্ববর্ত্তিনাম্॥

সাকং বিহায়সা বিপ্রো মহাপুরুষকিঙ্করৈঃ। হৈমং বিমানমারুহ্য যযৌ যত্র শ্রিয়ঃ পতিঃ॥

--শ্রীভা, ৬।২।৪৩-৪৪॥

--(যমদূতগণের নিকট হইতে যে বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে রক্ষা করিয়াছিলেন, সাধনের পরিপক্কাবস্থায় অজামিল সেই বিষ্ণুদূতগণকে তাঁহার সাক্ষাতে উপস্থিত দেখিয়া তাঁহাদের চরণ বন্দনা করিলেন) তাঁহাদের দর্শনের পরেই অজামিল সেই তীর্থে (অজামিলের ভজন-স্থলে, গঙ্গাদ্বারে) গঙ্গায় স্বীয় কলেবর পরিত্যাগ করিয়া তৎক্ষণাৎ ভগবৎপার্ষদদিগের স্বরূপ (পার্ষদদেহ) গ্রহণ করিলেন এবং সেই সকল মহাপুরুষ-কিঙ্করদের (বিষ্ণুদূতদের) সহিত সুবর্ণময় বিমানে আরোহণ করিয়া, সে-স্থানে (বৈকুণ্ঠে) গমন করিলেন।"*

এ-স্থলেও দেখা গেল, যথাবস্থিত সাধকদেহ পরিত্যাগের অব্যবহিত পরেই অজামিল পার্ষদদেহ লাভ করিয়াছিলেন।

৬৫। অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ

কেহ হয়তো মনে করিতে পারেন, রাগানুগা-মার্গের সাধকের অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহটী তো কাল্পনিক; সুতরাং পরিণামে ইহা কিরূপে সত্য হইতে পারে ?

---

* অজামিল-নামে এক ব্রাহ্মণযুবক এক দাসীর মোহে পতিত হইয়া পতিপ্রাণা সাধ্বী পত্নীকে এবং স্বধর্ম্মনিষ্ঠ তপস্যাপরায়ণ মাতাপিতাকে পরিত্যাগ করিয়া সেই দাসীর গৃহে গিয়া বাস করিয়াছিলেন। দাসীর এবং তাহার কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত অর্থসংগ্রহের জন্য অজামিল অশেষবিধ দুষ্কর্ম্মে রত হইয়া পড়িয়াছিলেন। দাসীগর্ভে তাঁহার কয়েকটী সন্তানও জন্মিয়াছিল। কনিষ্ঠ পুত্রটীর নাম রাখা হইয়াছিল নারায়ণ; এই পুত্র নারায়ণের প্রতি অজামিল অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ ছিলেন। বৃদ্ধ অজামিল মুমূর্ষু-অবস্থায় দেখিলেন, ভীষণদর্শন যমদূতগণ আসিয়া তাঁহাকে বন্ধন করিতেছেন। ভয়ে তিনি নিকটে ক্রীড়ারত বালককে "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া আর্ত্তির সহিত ডাকিতে লাগিলেন। ইহাতে তাঁহার পক্ষে ভগবানের "নামাভাস" করা হইল এবং তাহার ফলেই তাঁহার সমস্ত পাপ এবং পাপের মূল পর্য্যন্ত বিনষ্ট হইয়াছিল। অজামিলের মুখে নারায়ণের নাম উচ্চারিত হইতেছে শুনিয়া, তাঁহাকে নিষ্পাপ জানিয়া, বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং যমদূতগণের বন্ধন হইতে তাঁহাকে মুক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। যমদূতগণ ও বিষ্ণুদূতগণের মধ্যে যে কথাবার্ত্তা হইয়াছিল, অজামিল তাহা শুনিয়া নির্ব্বেদ অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন এবং সমস্ত ত্যাগ করিয়া গঙ্গাদ্বারে গিয়া সাধনে মনোনিবেশ করিলেন। তাঁহার সাধন-পরিপক্কতায় সেই বিষ্ণুদূতগণ তাঁহার নিকটে আসিয়াছিলেন; তাঁহাদিগকে দেখিয়াই অজামিল চিনিতে পারিলেন—ইঁহারাই তাঁহাকে যমদূতগণের কবল হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহটী যে কাল্পনিক, তাহা বলা যায় না। শ্রীগুরুদেব দিগ্‌দর্শনরূপে এই দেহটীর পরিচয় তাঁহার শিষ্য সাধককে কৃপা করিয়া জানাইয়া দেন। শ্রীগুরুদেব কৃপা করিয়া তাঁহার শিষ্যকে যে সিদ্ধদেহের পরিচয় দিয়া থাকেন, তাহা তাঁহার কল্পিত নহে। সাধকের মঙ্গলের নিমিত্ত পরম-করুণ শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার গুরুদেবের চিত্তে ঐ রূপটী স্ফুরিত করেন। "কৃষ্ণ যদি কৃপা করে কোন ভাগ্যবানে। গুরু অন্তর্য্যামীরূপে শিক্ষায় আপনে॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৩০॥" "লোক নিস্তারিব এই ঈশ্বর-স্বভাব॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২।৫॥"-বশতঃ মায়াবদ্ধ জীবের বহির্মুখতা ঘুচাইয়া তাঁহাকে স্বচরণ-সেবায় প্রতিষ্ঠিত করাইবার নিমিত্ত পরম-করুণ পরব্রহ্ম-শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতেই তাঁহার নিশ্বাস-রূপে অপৌরুষেয় বেদ-পুরাণাদি প্রকটিত করিয়া রাখিয়াছেন, যুগাবতারাদিরূপে প্রতিযুগে এবং সময় বিশেষে স্বয়ংরূপেও অবতীর্ণ হইয়া জীবের শ্রেয়োলাভের উপায় বলিয়া দিতেছেন; আবার যাঁহারা প্রীতিপূর্ব্বক তাঁহার ভজন করেন, তাঁহাকে পাওয়ার উপযোগিনী বুদ্ধিও তিনি তাঁহাদিগকে দিয়া থাকেন (গীতা ১০।১০); সুতরাং সাধকের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে তিনি যে তাঁহার গুরুদেবের চিত্তে রাগানুগামার্গের ভজনে অপরিহার্য্য-সিদ্ধদেহের রূপ স্ফুরিত করিবেন, ইহা অস্বাভাবিক বা অযৌক্তিক নহে।

ঐশ্বর্য্যমার্গের সাধক নারদকেও ভগবান্ কৃপা করিয়া সিদ্ধদেহ-দানের প্রতিশ্রুতি দিয়াছিলেন। ঐশ্বর্য্য-মার্গের সাধনে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ-ভাবনার প্রয়োজন দৃষ্ট হয়না; অজামিল তদ্রূপ কোনও ভাবনা করিয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়না। কিন্তু রাগানুগামার্গের সাধনে সিদ্ধদেহ-ভাবনা অপরিহার্য্য। কিন্তু ভগবান্ না জানাইলে অন্তরে চিন্তনীয় দেহের পরিচয় সাধক জানিবেন কিরূপে? তিনিই কৃপা করিয়া শ্রীগুরুদেবের চিত্তে তাহা প্রকাশ করিয়া সাধককে কৃতার্থ করিয়া থাকেন।

সত্যস্বরূপ শ্রীভগবান্ গুরুদেবের চিত্তে যে রূপটী স্ফুরিত করেন, তাহা আকাশকুসুমের ন্যায় অসত্য হইতে পারে না; তাহা সত্য। শাস্ত্রোক্তধ্যানমন্ত্রে বা স্তবাদিতে বর্ণিত ভগবৎ-স্বরূপের রূপ চিন্তা করিতে গেলে সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের নিকটে সাধারণতঃ তাহা যেমন অস্পষ্ট বলিয়াই মনে হয়, ভগবৎ-কৃপায় সাধনে অগ্রসর হইতে হইতে তাহা যেমন ক্রমশঃ স্পষ্ট হইতে স্পষ্টতর হইতে থাকে, তদ্রূপ এই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহও সাধনের প্রথম অবস্থায় সাধকের চিন্তায় অস্পষ্ট হইতে পারে; কিন্তু ক্রমশঃ ভক্তিরাণীর কৃপা তাঁহার চিত্তে যতই পরিস্ফুট হইবে, অন্তশ্চিন্তিত দেহটীও ক্রমশঃ ততই উজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। অবশেষে ভক্তিরাণীর পূর্ণকৃপা পরিস্ফুট হইলে চিত্ত যখন বিশুদ্ধ হইবে, তখন এই অন্তশ্চিন্তিত দেহটীও সাধকের মানস-নেত্রে স্বীয় পূর্ণমহিমায় জাজ্বল্যমান হইয়া উঠিবে। তখন সাধক এই সিদ্ধদেহের সঙ্গে স্বীয় তাদাত্ম্য মনন করিয়া সেই দেহেই স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ-সেবা করিয়া তন্ময়তা লাভ করিবেন। ভগবৎ-কৃপায় সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে সাধকের দেহ-ভঙ্গের পরে যথাসময়ে ভক্তবৎসল ভগবান্ তাঁহাকে তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহের অনুরূপ একটী দেহ দিয়াই সেবায় প্রবিষ্ট করাইয়া থাকেন। শ্রীমদ্ভাগবতের "ত্বং ভক্তিযোগপরিভাবিত-হৃৎসরোজে আস্সে

শ্রুতেক্ষিত-পথো ননু নাথ পুংসাম্। যদ্ যদ্ ধিয়া ত উরুগায় বিভাবয়ন্তি তত্তদ্বপুঃ প্রণয়সে সদনুগ্রহায় ॥ ৩।৯।১১ ॥"*-এই শ্লোকের শেষার্দ্ধ হইতেই তাহা জানা যায়। এই শ্লোকের শেষার্দ্ধের টীকায় একরকম অর্থে শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"যদ্বা তে সাধকভক্তাঃ স্ব-স্ব-ভাবানুরূপং যদ্ যদ্ ধিয়া বিভাবয়ন্তি তত্তদেব বপুঃ তেষাং সিদ্ধদেহান্ প্রণয়সে প্রকর্ষেণ তান্ প্রাপয়সি অহো তে স্বভক্তপারবশ্যমিতি ভাবঃ।—অথবা (অর্থাৎ এই শ্লোকের এইরূপ তাৎপর্য্যও হইতে পারে যে), সাধক-ভক্তগণ স্ব-স্ব-ভাব অনুসারে নিজেদের যে-যে-রূপ তাঁহারা মনে মনে ভাবনা করেন, ভক্তপরবশ ভগবান্ তাঁহাদিগকে সেই-সেই-রূপ সিদ্ধদেহই প্রকৃষ্টরূপে দিয়া থাকেন।"

প্রশ্ন হইতে পারে—কেবল চিন্তাদ্বারাই কি অন্তশ্চিন্তিত দেহের অনুরূপ একটী দেহ পাওয়া যাইতে পারে? এই প্রশ্নের উত্তর শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই পাওয়া যায়। শ্রীমদ্ভাগবত বলেন—"যত্র যত্র মনো দেহী ধারয়েৎ সকলং ধিয়া। স্নেহাদ্দ্বেষাদ্ ভয়াদ্বাপি যাতি তত্তৎ-স্বরূপতাম্॥ কীটঃ পেশস্কৃতং ধ্যায়ন্ কুড্যাং তেন প্রবেশিতঃ। যাতি তৎসাত্মতাং রাজন্ পূর্ব্বরূপমসন্ত্যজন্ ॥ ১১।৯।২২-২৩॥—স্নেহবশতঃ, কিম্বা দ্বেষবশতঃ, কিম্বা ভয়বশতঃও যদি কোনও লোক চিন্তাদ্বারা মনকে কোনও বস্তুতে সম্যক্‌রূপে ধারণ করে, তাহা হইলে সেই লোক সেই বস্তুর স্বরূপতা প্রাপ্ত হয়। একটী কীট পেশকৃৎ-কর্ত্তৃক ধৃত হইয়া যদি পেশকৃতের আলয়ে নীত হয়, তাহা হইলে ভয়বশতঃ সেই পেশকৃতের চিন্তা (ধ্যান) করিতে করিতে স্বীয় পূর্ব্বদেহ ত্যাগ না করিয়াও সেই কীট পেশকৃতের রূপ প্রাপ্ত হয় (কুমারিয়া-পোকা কোনও তেলাপোকাকে ধরিয়া তাহার বাসায় লইয়া গেলে কুমারিয়া-পোকার চিন্তা করিতে করিতে তেলাপোকাটী যে কুমারিয়া-পোকাতে পরিণত হইয়া যায়, এরূপ একটী লোক-প্রসিদ্ধিও আছে)।" শ্রীমদ্ভাগবতের অন্যত্রও ঠিক এই রূপ উক্তিই দৃষ্ট হয়। "কীটঃ পেশস্কৃতা রুদ্ধঃ কুড্যায়াং তমনুস্মরন্। সংরম্ভভয়যোগেন বিন্দতে তৎস্বরূপতাম্॥ ৭।১।২৭॥" হরিণ-শিশুর প্রতি স্নেহজনিত আসক্তিবশতঃ জন্মান্তরে ভরত-মহারাজের হরিণদেহ-প্রাপ্তির কথাও অতি প্রসিদ্ধ। সুতরাং সিদ্ধদেহের চিন্তাদ্বারা পরিণামে তদনুরূপ একটী দেহপ্রাপ্তি অসম্ভব বা অস্বাভাবিক নহে।

এক্ষণে আবার প্রশ্ন হইতে পারে—কুমারিয়া-পোকার চিন্তা করিতে করিতে তেলাপোকা যে দেহ পায়, তাহা হইতেছে প্রাকৃত দেহ; হরিণশিশুর চিন্তা করিতে করিতে ভরত-মহারাজ যে হরিণ-দেহ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, তাহাও প্রাকৃত দেহ। সাধক অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের চিন্তা করিতে করিতে পরিণামে যে দেহ পাইবেন, তাহাও কি প্রাকৃত দেহ?

উত্তর। সাধক তাঁহার চিন্তার ফলে কি প্রাকৃত দেহ পাইবেন, না কি অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহ পাইবেন, তাহা নির্ভর করে তাঁহার চিন্তার স্বরূপের উপরে। তেলাপোকা তাহার প্রাকৃত মনের

---

*শ্লোকানুবাদ। ব্রহ্মা শ্রীভগবান্‌কে বলিয়াছেন—হে নাথ! বেদাদি-শাস্ত্র-শ্রবণে যাঁহার প্রাপ্তির উপায় জানা যায়, সেই তুমি লোকদিগের ভক্তিযোগ-প্রভাবে যোগ্যতাপ্রাপ্ত হৃৎপদ্মে বাস কর। হে উরুগায়! সেই ভক্তগণ বুদ্ধিদ্বারা যে-যে রূপের চিন্তা করেন, তাঁহাদের প্রতি অনুগ্রহ-প্রদর্শনার্থ সেই-সেই শরীর তুমি তাঁহাদের সমীপে প্রকটিত কর।

প্রাকৃত-বুদ্ধিদ্বারা কুমারিয়া-পোকার প্রাকৃত দেহকে চিন্তা করিয়া প্রাকৃত দেহ পায়। ভরতমহারাজ পরম-ভাগবত হইলেও তিনি চিন্তা করিয়াছিলেন প্রাকৃত হরিণশিশুর প্রাকৃত দেহকে এবং তাঁহার চিন্তাও উদ্ভূত হইয়াছিল মনের প্রাকৃতাংশ হইতে। যে চিন্তার স্বরূপই প্রাকৃত, চিন্তনীয় বিষয়ও প্রাকৃত, তাহার ফলে প্রাপ্ত দেহটীও প্রাকৃতই হইবে।

এক্ষণে সাধক-ভক্তের চিন্তার স্বরূপ-সম্বন্ধে বিবেচনা করা যাউক। সাধক-ভক্ত ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়া থাকেন। ভক্তি-অঙ্গ হইল স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ এবং দেহ-ইন্দ্রিয়াদিদ্বারা যখন ভক্তি-অঙ্গ অনুষ্ঠিত হয়, তখন দেহ-ইন্দ্রিয়াদিও স্বরূপশক্তির সেই বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয় (ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর "অন্যাভিলাষিতাশূন্যমিত্যাদি" ১।১।৯-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"এতচ্চ কৃষ্ণতদ্‌ভক্তকৃপয়ৈকলভ্যং শ্রীভগবতঃ স্বরূপ-শক্তিবৃত্তিরূপমতোঽপ্রাকৃতমপি কায়াদিবৃত্তিতাদাত্ম্যেন এব আবির্ভূতমিতি জ্ঞেয়ম্")। সাধকের ইন্দ্রিয়াদি যখন স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত হয়, তখন তাঁহার ইন্দ্রিয়বৃত্তি –চিন্তাও– স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া যায়; সুতরাং তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহের চিন্তাও হইয়া যায় স্বরূপ-শক্তির সহিত তাদাত্ম্য প্রাপ্ত; যেহেতু, এই চিন্তাও সাধন-ভক্তির অঙ্গই। অবশ্য সাধনের প্রথম অবস্থাতেই যে সাধকের চিত্তেন্দ্রিয় এবং চিত্তেন্দ্রিয়ের বৃত্তি স্বরূপ-শক্তির সহিত সম্যক্‌রূপে তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত হয়, তাহা নহে। বৈষয়িক-ব্যাপারের সংশ্রব এইরূপ তাদাত্ম্য-প্রাপ্তির পক্ষে বিঘ্ন জন্মায়; কিন্তু বিঘ্ন জন্মাইলেও ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান একেবারে ব্যর্থ হয় না, হইতে পারেও না। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানের আধিক্যে স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত দেহেন্দ্রিয়াদির তাদাত্ম্য-প্রাপ্তির আধিক্য—সুতরাং দেহেন্দ্রিয়াদির অপ্রাকৃতত্বলাভেরও আধিক্য—হইয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে বৈষয়িক ব্যাপারের সংশ্রবের ন্যূনতায় দেহেন্দ্রিয়াদির প্রাকৃতত্বের ন্যূনতা হইতে থাকে। ভোজ্য বস্তুর গ্রহণে যেমন দেহের তুষ্টি-পুষ্টির সঙ্গে সঙ্গে ক্ষুধার অপসরণ হয়—ঠিক তদ্রূপ। সম্পূর্ণভাবে প্রেমোদয় হইলেই দেহেন্দ্রিয়াদি সম্যক্‌রূপে নির্গুণ বা অপ্রাকৃত হইয়া যায় এবং দেহেন্দ্রিয়াদির গুণময়াংশ বা প্রাকৃত-অংশও সম্যক্‌রূপে নষ্ট হইয়া যায়। শ্রীমদ্‌ভাগবতের "জহুর্গুণময়ং দেহমিত্যাদি"-১০।২৯।১১-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই লিখিয়াছেন। "গুরূপদিষ্ট-ভক্ত্যারম্ভদশাত এব ভক্তানাং শ্রবণ-কীর্ত্তন-স্মরণ-দণ্ডবৎপ্রণতি-পরিচর্য্যাদিময্যাং শুদ্ধভক্তৌ শ্রোত্রাদিষ্ প্রবিষ্টায়াং সত্যাং 'নির্গুণো মদুপাশ্রয়ঃ' ইতি ভগবদুক্তে র্ভক্তঃ স্বশ্রোত্রাদিভি র্ভগবদ্‌গুণাদিকং বিষয়ীকুর্ব্বন্ নির্গুণো ভবতি। ব্যবহারিকশব্দাদি-কমপি বিষয়ীকুর্ব্বন্ গুণময়োঽপি ভবতি ইতি ভক্তদেহস্য অংশেন নির্গুণত্বং গুণময়ত্বং চ স্যাৎ। ততশ্চ 'ভক্তিঃ পরেশানুভবো বিরক্তিঃ' ইতি 'তুষ্টিঃ পুষ্টিঃ ক্ষুদপায়োঽনুঘাসম্' ইতি ন্যায়েন ভক্তিবৃদ্ধিতারতম্যেন নির্গুণদেহাংশানামাধিক্যতারতম্যং স্যাৎ তেন চ গুণময়দেহাংশানাং ক্ষীণত্বতারতম্যং স্যাৎ। সম্পূর্ণ-প্রেম্ণ্যুৎপন্নে তু গুণময়দেহাংশেষু নষ্টেষু সম্যক্ নির্গুণ এতদ্দেহঃ স্যাৎ।" ভক্তির কৃপায় সাধকের প্রকৃত পাঞ্চভৌতিক দেহ যে অপ্রাকৃত হইয়া যায়, শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও তাঁহার বৃহদ্‌ভাগবতামৃতে

তাহা বলিয়া গিয়াছেন। "কৃষ্ণভক্তিসুধাপানাদ্দেহদৈহিকবিস্মৃতেঃ। তেষাং ভৌতিকদেহেঽপি সচ্চিদানন্দরূপতা ॥ বৃ, ভা, ১।৩।৪৫ ॥"

যাহাহউক, উল্লিখিত আলোচনা হইতে বুঝা গেল,—সাধক-ভক্তের অন্তশ্চিন্তিত দেহের যে চিন্তা, তাহা প্রাকৃত গুণময় বস্তু নহে ; স্বরূপতঃ তাহা হইল স্বরূপশক্তির বৃত্তিবিশেষের সহিত তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত ; সাধনের পরিপক্কতায় তাহা স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষই হইয়া যায়। আর, যে সিদ্ধদেহটীর চিন্তা করা হয়, তাহাও প্রাকৃত নহে, তাহাও অপ্রাকৃত—চিন্ময়। একটী অপ্রাকৃত চিন্ময় দেহসম্বন্ধে স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিবিশেষ চিন্ময়ী চিন্তার ফলে যে দেহ প্রাপ্তি হইবে, তাহা প্রাকৃত হইতে পারে না ; তাহা হইবে অপ্রাকৃত—চিন্ময়, শুদ্ধসত্ত্বাত্মক। বিশেষতঃ সপরিকর শ্রীকৃষ্ণ জাতপ্রেম ভক্তকে দর্শন দিয়া তাঁহার অন্তশ্চিন্তিত দেহকে যে চিদানন্দময় করিয়া থাকেন, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে [৫।৬৩ (৩)-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য]।

৬৬। রাগানুগাভক্তি বেদবিহিতা

রাগানুগাভক্তিতে যথাবস্থিত দেহের বাহ্যসাধন শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধাভক্তি যে বেদবিহিতা; তাহা পূর্ব্বেই ৫।৬০ (৮)-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে। রাগানুগার অন্তর-সাধন, অন্তশ্চিন্তিত-সিদ্ধদেহে স্বীয়-অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবা, নববিধাভক্তির অন্তর্ভুক্ত "স্মরণ" ব্যতীত অন্য কিছু নহে। স্বীয় উপাস্যের রূপ-গুণাদির এবং লীলাদির চিন্তাই হইতেছে স্মরণ বা ধ্যান। "শ্রোতব্যো মন্তব্যো নিদিধ্যাসিতব্যঃ"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রুতিও স্মরণ বা ধ্যানের উপদেশ করিয়াছেন।

যদি বলা যায়—স্মরণ বা ধ্যান অবশ্যই শ্রুতিবিহিত; কিন্তু অন্তশ্চিন্তিত দেহও কি বেদবিহিত ?

উত্তরে বলা যায়—রাগানুগার অন্তশ্চিন্তিত দেহ বেদবিরুদ্ধ নহে। সাধক যে ভাবে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম ভগবান্‌কে পাইতে অভিলাষী, তাঁহার স্মরণ বা ধ্যানও হইবে সেই ভাবের অনুকূল। যিনি নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মের সহিত সাযুজ্যকামী, তিনি চিদংশে নিজেকেও চিৎস্বরূপ ব্রহ্মের সমান বা অভিন্ন বলিয়া চিন্তা করেন। যিনি ভগবানের সেবাকামী, তিনি সেবকরূপে নিজের পৃথক্ অস্তিত্বের কথা, যেরূপ দেহে সেবা করিতে অভিলাষী, নিজের সেইরূপ দেহের কথা এবং সেই দেহে লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সেবার কথাও চিন্তা করিবেন। এই সমস্তই হইতেছে স্মরণের বা ধ্যানের বিভিন্ন বৈচিত্র্য। বেদানুগত শাস্ত্র পদ্মপুরাণে যে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের দিগ্‌দর্শনরূপে পরিচয় দেওয়া হইয়াছে, তাহাও পূর্ব্বে [৫।৬১ খ (১)-অনুচ্ছেদে] প্রদর্শিত হইয়াছে ; সুতরাং অন্তশ্চিন্তিত দেহও বেদসম্মত।

রাগানুগার ভজন হইতেছে প্রীতির ভজন, প্রিয়রূপে রসস্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের উপাসনা, প্রেমের সহিত, কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবাবাসনার সহিত, তাঁহার উপাসনা। শ্রুতিও এতাদৃশ ভজনের উপদেশ দিয়া গিয়াছেন। "আত্মানমেব প্রিয়মুপাসীত ॥ বৃহদারণ্যক ॥ ১।৪।৮ ॥-প্রিয়রূপে পরমাত্মা পরব্রহ্মের উপাসনা করিবে", "প্রেম্ণা হরিং ভজেৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥ ২৩৪-অনুচ্ছেদধৃত-শত-পথশ্রুতিঃ ॥—প্রেমের সহিত শ্রীহরির ভজন করিবে।"

সুতরাং রাগানুগাভক্তি যে বেদবিহিতা, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

সপ্তম অধ্যায়

গুরুতত্ত্ব

পূর্ব্বকথিত চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তির সর্ব্বপ্রথম অঙ্গই হইতেছে "গুরুপাদাশ্রয়"; তাহার পরেই "দীক্ষা" এবং "গুরুসেবা।" ভক্তিরসামৃতসিন্ধু আবার, এই তিনটী অঙ্গকে প্রথম বিশটী অঙ্গের মধ্যে "প্রধান" বলিয়াছেন। "ত্রয়ং প্রধানমেবোক্তং গুরুপাদাশ্রয়াদিকম্ ॥ ভ.র.সি. ১।২।৪৩ ॥" এইরূপে দেখা যায়—সাধনব্যাপারে শ্রীগুরুদেবের একটী বিশেষত্ব আছে। সুতরাং গুরু বলিতে কি বুঝায়, গুরুর লক্ষণ কি, গুরু কয় রকমের এবং গুরুর স্বরূপ-তত্ত্বই বা কি, সাধকের পক্ষে এই সমস্ত অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক। এ-স্থলে এ-সমস্ত বিষয় আলোচিত হইতেছে।

৬৭। গুরু

ক। অবধূত ব্রাহ্মণের চব্বিশ গুরু

প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে যাঁহার নিকটে ভজনবিষয়ে কিছু শিক্ষা করা যায়, তিনিই গুরু। শ্রীমদ্ভাগবতের একাদশ স্কন্ধ হইতে জানা যায়, এক অবধূত ব্রাহ্মণের চব্বিশ জন গুরু ছিলেন। যথা, (১) পৃথিবী, (২) বায়ু, (৩) আকাশ, (৪) জল, (৫) অগ্নি, (৬) চন্দ্র, (৭) সূর্য্য, (৮) কপোত, (৯) অজগর, (১০) সিন্ধু, (১১) পতঙ্গ, (১২) মধুকর, (১৩) হস্তী, (১৪) ভ্রমর, (১৫) হরিণ, (১৬) মৎস্য, (১৭) পিঙ্গলা, (১৮) কুরর, (১৯) বালক, (২০) কুমারী, (২১) শরনির্ম্মাতা লোহকার, (২২) সর্প, (২৩) উর্ণনাভি, এবং (২৪) সুপেশকৃৎ (কীটবিশেষ)। এই চতুর্ব্বিংশতি গুরুকে আশ্রয় করিয়া অবধূত ব্রাহ্মণ শিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন পূর্ব্বক আপনা-আপনিই ইহাদের বৃত্তি শিক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীভা, ১১।৭।৩২-৩৫ ॥

এই চতুর্ব্বিংশতি বস্তুর আচরণ দেখিয়া যাহার মধ্যে যে আচরণ শিক্ষণীয় বা অনুকরণীয়, অবধূত ব্রাহ্মণ আপনা হইতেই তাহা গ্রহণ করিয়াছেন এবং সেই বস্তুকে গুরু বলিয়া মনে করিয়াছেন। যেমন, পৃথিবীর নিকটে ধৈর্য্য ও ক্ষমা; বায়ুর নিকটে ইন্দ্রিয়াদির অপেক্ষাহীনতা, প্রাণবৃত্তিতেই সন্তুষ্টি এবং অনাসক্তভাবে বিষয়গ্রহণ; আকাশের নিকটে আত্মার অসঙ্গত্ব ও অবিচ্ছেদ্যত্ব; ইত্যাদি। এ-সমস্ত হইল পরোক্ষভাবের শিক্ষা; পৃথিব্যাদি অবধূতকে কোনও উপদেশ করে নাই।

খ। ত্রিবিধ গুরু

যাঁহাদের নিকট হইতে ভজনাদিবিষয়ে সাক্ষাদ্ভাবে কিছু জানা যায়, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী

তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২০২-২০৭-অনুচ্ছেদে) সে সকল গুরুর সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। তিনি তিন রকম গুরুর কথা বলিয়াছেন—শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু। তাঁহার আনুগত্যে এই তিন রকম গুরুর বিষয় বিবৃত হইতেছে।

৬৮। শ্রবণগুরু

যাঁহার নিকটে ভগবত্তত্ত্বাদি সম্বন্ধে কিছু শ্রবণ করা যায়, তিনিই শ্রবণগুরু।

ক। শ্রবণগুরুর লক্ষণ

শ্রবণগুরুর লক্ষণের কথা, অর্থাৎ ভগবত্তত্ত্বাদি জানিবার নিমিত্ত কাহাকে শ্রবণগুরুরূপে বরণ করা সঙ্গত, ভক্তিসন্দর্ভ তাহাও বলিয়াছেন।

"অতঃ শ্রবণগুরুমাহ—
তস্মাদ্‌গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্।
শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ শ্রীভা, ১২।৩।২১॥

—অতএব, শ্রবণগুরুর লক্ষণ বলা হইয়াছে; যথা—যিনি উত্তম-শ্রেয়ঃকামী, তিনি—শব্দব্রহ্ম-বেদে পারদর্শী, পরব্রহ্মে অপরোক্ষ অনুভবসম্পন্ন এবং উপশান্তচিত্ত (অর্থাৎ ক্রোধ-লোভাদির অবশীভূত) গুরুর শরণ গ্রহণ করিবেন।"

এই শ্লোকের টীকায় "শাব্দে নিষ্ণাতম্"-অংশের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-"শাব্দে ব্রহ্মণি বেদে তাৎপর্য্যবিচারেণ নিষ্ণাতং তথৈব নিষ্ঠাং প্রাপ্তম্।—বেদের তাৎপর্য্যবিচারের দ্বারা বেদবিষয়ে যাঁহার নিষ্ঠা জন্মিয়াছে।" শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন-"শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ন্যায়তো ব্যাখ্যানতো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞম্ অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগাৎ।—শাস্ত্রবিহিত যুক্তিপ্রমাণের সহায়তায় বেদশাস্ত্রের ব্যাখ্যা নির্দ্ধারণ করিয়া যিনি তত্ত্বজ্ঞ হইয়াছেন, সেই গুরুর নিকটেই জিজ্ঞাসা করিবে। কেননা, তত্ত্বজ্ঞ না হইলে তিনি জিজ্ঞাসুর সন্দেহ নিরসন করিতে পারিবেন না।" আর "পারে চ নিষ্ণাতম্"-অংশের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ এবং শ্রীজীবপাদ উভয়েই লিখিয়াছেন—"অপরোক্ষ অনুভবসম্পন্ন।" স্বামিপাদ বলেন—অপরোক্ষ অনুভবসম্পন্ন না হইলে তিনি উপদিষ্ট বিষয়ের জ্ঞান শ্রোতার মধ্যে সঞ্চারিত করিতে পারিবেন না। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসেও শ্রীগুরূপসত্তি-প্রকরণে "তস্মাদ গুরুং প্রপদ্যেত"ইত্যাদি শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে (১।৭ শ্লোক)। তাহার টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"শাব্দে ব্রহ্মণি বেদাখ্যে ন্যায়তো নিষ্ণাতং তত্ত্বজ্ঞম্ অন্যথা সংশয়নিরাসকত্বাযোগ্যত্বাৎ। পারে চ ব্রহ্মণি অপরোক্ষানুভবেন নিষ্ণাতম্ অন্যথা বোধসঞ্চারাযোগাৎ। পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ উপশমাশ্রয়ং পরমশান্তমিতি।" তাৎপর্য্য—পূর্ব্বোল্লিখিত টীকাসমূহের অনুরূপই। শ্রীপাদ সনাতন

বলিতেছেন—"উপশমাশ্রয়"-শব্দে পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বই দ্যোতিত হইয়াছে ; অর্থাৎ যিনি পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন, তিনিই "উপশমাশ্রয়" হইতে পারেন।

এই শ্লোকের অনুরূপ উক্তি শ্রুতিতেও আছে। "তদ্ বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্॥ মুণ্ডক॥ ১।২।১২॥ --তাহা (ব্রহ্মতত্ত্ব) জানিবার নিমিত্ত সমিৎপাণি হইয়া শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ গুরুর শরণ গ্রহণ করিবে।" এই শ্রুতিবাক্যের "শ্রোত্রিয়—শাস্ত্রজ্ঞ" শব্দে শ্রীমদ্ ভাগবত-শ্লোকের "শাব্দে নিষ্ণাতম্"-শব্দের এবং "ব্রহ্মনিষ্ঠম্"-শব্দে শ্রীমদ্ভাগবতের "পারে নিষ্ণাতম্"-শব্দের তাৎপর্য্যই প্রকাশ করা হইয়াছে। "উপশমাশ্রয়ম্"-শব্দটী পরব্রহ্ম-নিষ্ণাতত্ব-জ্ঞাপক, অর্থ—ক্রোধলোভাদির অবশীভূত। "পরব্রহ্মনিষ্ণাতত্বদ্যোতকমাহ উপশমাশ্রয়ং ক্রোধলোভাদ্য-বশীভূতম্॥ শ্রীপাদ বিশ্বনাথচক্রবর্ত্তী॥" পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতি যাঁহার হয় নাই, তিনি কাম-ক্রোধ-লোভাদির অবশীভূত হইতে পারেন না।

উল্লিখিত শ্লোক হইতে জানা গেল—তত্ত্বপ্রতিপাদক বেদে এবং বেদানুগত শাস্ত্রে যিনি বিশেষরূপে অভিজ্ঞ, পরব্রহ্ম-ভগবানের (বা তাঁহার কোনও আবির্ভাবের) অপরোক্ষ অনুভূতি যিনি লাভ করিয়াছেন এবং অপরোক্ষ অনুভূতি লাভ করিয়াছেন বলিয়া যিনি কাম-ক্রোধ-লোভাদির বশীভূত নহেন, তিনিই শ্রবণগুরু হওয়ার যোগ্য, তাঁহার নিকটেই তত্ত্বাদি শ্রবণের জন্য উপস্থিত হইতে হইবে। শাস্ত্রজ্ঞ না হইলে তিনি জিজ্ঞাসুর সন্দেহ দূর করিতে পারিবেন না, অপসিদ্ধান্ত জানাইয়া বরং জিজ্ঞাসুকে ভ্রান্তপথে চালিত করিবেন। আর, অপসিদ্ধান্ত না বলিলেও সন্দেহ দূর করিতে না পারিলে জিজ্ঞাসুর বৈমনস্য বা শৈথিল্য জন্মিতে পারে। আবার, তিনি যদি ভগবানের অপরোক্ষ অনুভূতি-সম্পন্ন না হয়েন, তাহাহইলে জিজ্ঞাসুর চিত্তে তিনি উপদিষ্ট জ্ঞানকে সঞ্চারিত করিতে পারিবেন না, তাঁহার কৃপা জিজ্ঞাসুর চিত্তে বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবেনা।

এতাদৃশ গুরুব্যতীত অপরকে শ্রবণগুরুরূপে বরণ করা যে বিধেয় নহে, শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাহাও বলিয়াছেন।

"বক্তা সরাগো নীরাগো দ্বিবিধঃ পরিকীর্ত্তিতঃ। সরাগো লোলুপঃ কামী তদুক্তং হৃন্ন সংস্পৃশেৎ॥
উপদেশং করোত্যেব ন পরীক্ষাং করোতি চ। অপরীক্ষ্যোপদিষ্টং যৎ লোকনাশায় তদ্ ভবেৎ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-প্রমাণ॥

—বক্তা দুই রকমের, সরাগ এবং নীরাগ (রাগহীন)। তন্মধ্যে, যিনি লোলুপ (লোভপরায়ণ) এবং কামী (ভোগসুখের জন্য কামনাবিশিষ্ট), তিনি সরাগ; তাঁহার উপদেশ শ্রোতার হৃদয়-স্পর্শী হয় না। কেবল উপদেশই করা হয়, কিন্তু (শ্রোতা সেই উপদেশ গ্রহণে অধিকারী কিনা, তাহা) পরীক্ষা করেন না ; পরীক্ষা না করিয়া যে উপদেশ দেওয়া হয়, তাহাতে লোকনাশই ঘটিয়া থাকে।"

নীরাগ বক্তার সম্বন্ধে বলা হইয়াছে,

"কুলং শীলমাচারমবিচার্য্য গুরুং গুরুম্। ভজেত শ্রবণাত্থর্থী সরসং সার-সাগরম্॥
কামক্রোধাদিযুক্তোঽপি কৃপণোঽপি বিষাদবান্। শ্রুত্বা বিকাশমায়াতি স বক্তা পরমোগুরুঃ॥
—ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ॥

—নীরাগ বক্তা সরস ও সারগ্রাহী। এতাদৃশ নীরাগ বক্তার কুল, শীল ও আচারের বিচার না করিয়া শ্রবণাত্থর্থী হইয়া তাঁহাকে গুরু-রূপে বরণ করিবে। যে বক্তার উপদেশ শ্রবণ করিয়া কামক্রোধাদিযুক্ত, কৃপণ এবং বিষাদগ্রস্ত ব্যক্তিও বিকাশ (চিত্তের উল্লাস) লাভ করে, তিনি শ্রেষ্ঠ গুরু।"

এই সকল প্রমাণ হইতে জানা গেল—যিনি সরাগ (ইন্দ্রিয়াসক্ত) এবং ইন্দ্রিয়াসক্ত বলিয়া লোভী এবং কামী, আবার লোভী এবং কামী বলিয়া লোভের বা কামনার বস্তু পাইবার আশায় শ্রবণে অনধিকারী ব্যক্তিকেও উপদেশ দেওয়ার জন্য যিনি উৎসুক, তিনি কাহারও শ্রবণগুরু হওয়ার যোগ্য নহেন। তাঁহার উপদেশে কোনও উপকার হয় না। আর, যিনি নীরাগ, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়াসক্ত নহেন, তিনিই সরস এবং সার-সাগর—শাস্ত্রের সারভূত বস্তু কি, তাহা তিনি জানেন এবং হৃদয়স্পর্শি-ভাবে তাহা তিনি ব্যক্ত করিতেও পারেন। শ্রোতা যদি কাম-ক্রোধাদিযুক্তও হয়, এবং তজ্জন্য কৃপণ ও বিষাদগ্রস্তও হয়, তথাপি উল্লিখিতরূপ নীরাগ বক্তার উপদেশ শুনিলে আনন্দ লাভ করিতে পারে। এতাদৃশ নীরাগ ব্যক্তির কুল, শীল, আচারাদির বিচার না করিয়াও শ্রবণগুরুরূপে তাঁহার বরণ করা সঙ্গত।

শ্রীল রায়রামানন্দের মুখে সাধ্যসাধনতত্ত্ব প্রকাশ করাইয়া শ্রীমন্মহাপ্রভু যখন তাহা শ্রবণ করিতেছিলেন, তখন প্রভু বলিয়াছিলেন—"কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়। যেই কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা সেই গুরু হয়॥ শ্রীচৈ, চ, ২।৮।১০০॥" প্রকরণবলে এ-স্থলেও শ্রবণগুরুর কথাই বলা হইয়াছে বলিয়া বুঝা যায়। ইহা হইতেও জানা গেল—কৃষ্ণতত্ত্ব-বেত্তা হইলে জাতিকুলাদি-নিরপেক্ষ ভাবে যে-কেহই শ্রবণগুরু হইতে পারেন।

খ। বহু শ্রবণগুরুর আবশ্যকতা

যাহা হউক, পূর্ব্বোল্লিখিত লক্ষণবিশিষ্ট একজন শ্রবণগুরু পাওয়া না গেলে যুক্তি ও ব্যাখ্যা প্রভৃতি জানিবার অভিপ্রায়ে কেহ কেহ একাধিক শ্রবণগুরুর আশ্রয়ও গ্রহণ করেন। বহু শ্রবণগুরুর আবশ্যকতার কথা শ্রীমদ্ ভাগবতও বলিয়াছেন।

"ন হ্যেকস্মাদ্ গুরোর্জ্ঞানং সুস্থিরং স্যাৎ সুপুষ্কলম্।
ব্রহ্মৈতদদ্বিতীয়ং বৈ গীয়তে বহুধর্ষিভিঃ॥

শ্রীভা, ১১।৯।৩১॥

—এক (শ্রবণ)-গুরু হইতে (পারমার্থিক) জ্ঞান সুস্থির ও পূর্ণ হয়না; কেননা, একই অদ্বিতীয় ব্রহ্মকে বুঝাইবার জন্য ভিন্ন ভিন্ন ঋষি ভিন্ন ভিন্ন যুক্তির অবতারণা করিয়া থাকেন। (যদুমহা-রাজের নিকটে ভগবান্ দত্তাত্রেয়ের উক্তি)।"

গ। শ্রবণার্থীর যোগ্যতা

উপরে (ক-অনুচ্ছেদে) উদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ-বচনে কেবল যে শ্রবণগুরুর যোগ্যতার ও অযোগ্যতার কথা বলা হইয়াছে, তাহা নহে, শ্রবণার্থীর যোগ্যতাদি পরীক্ষার কথাও বলা হইয়াছে এবং অযোগ্য ব্যক্তির প্রতি উপদেশের অহিতকারিতার কথাও বলা হইয়াছে। কিন্তু শ্রবণার্থীর যোগ্যতা কিরূপ ?

শ্রীমদ্‌ভগবদ্‌গীতা হইতে শ্রবণার্থীর যোগ্যতা সম্বন্ধে কিছু জানা যায়। অর্জ্জুনের নিকটে সর্ব্বগুহ্যতম পরমবাক্য উপদেশ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাকে বলিয়াছেন,

"ইদন্তে নাতপস্কায় নাভক্তায় কদাচন।
ন চাশুশ্রূষবে বাচ্যং ন চ মাং যোঽভ্যসূয়তি ॥ গীতা ॥১৮।৬৭॥

—এই গীতার্থতত্ত্ব তুমি ধর্ম্মানুষ্ঠানবিরহিত (অথবা অজিতেন্দ্রিয়) ব্যক্তিকে কখনও বলিবেনা। ভক্তিহীন ব্যক্তিকেও কখনও বলিবেনা। শ্রবণে অনিচ্ছুক (অথবা সেবাশুশ্রূষাদিতে অনিচ্ছুক) ব্যক্তিকেও বলিবেনা। যে আমার (পরমেশ্বর শ্রীকৃষ্ণের) প্রতি অসূয়াপরবশ (মনুষ্যদৃষ্টিতে দোষারূপ করিয়া যে আমার নিন্দা করে, তাদৃশ) ব্যক্তিকেও বলিবেনা।"

শ্রীকৃষ্ণ অন্যত্রও অর্জ্জুনের নিকটে বলিয়াছেন,

"শ্রদ্ধাবান্ লভতে জ্ঞানং তৎপরঃ সংযতেন্দ্রিয়ঃ।
জ্ঞানং লব্ধ্বা পরাং শান্তিমচিরেণাধিগচ্ছতি ॥ গীতা ॥ ৪।৩৯ ॥

—যিনি (গুরুবাক্যে এবং শাস্ত্রবাক্যে) শ্রদ্ধাবান্, যিনি গুরুবাক্য-শাস্ত্রবাক্য-পরায়ণ, এবং যিনি জিতেন্দ্রিয়, তিনিই জ্ঞান লাভ করিতে পারেন এবং জ্ঞানলাভ করিয়া অচিরে পরা শান্তি পাইতে পারেন।"

"তদ্বিদ্ধি প্রাণিপাতেন পরিপ্রশ্নেন সেবয়া।
উপদেক্ষ্যন্তি তে জ্ঞানং জ্ঞানিনস্তত্ত্বদর্শিনঃ ॥ গীতা ॥ ৪।৩৪ ॥

—(অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) প্রণিপাত, প্রশ্ন এবং সেবা দ্বারা জ্ঞান লাভ কর। তত্ত্বদর্শী জ্ঞানিগণ জ্ঞানবিষয়ে তোমাকে উপদেশ করিবেন।"

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার ষট্‌সন্দর্ভান্তর্গত সর্ব্বপ্রথম তত্ত্বসন্দর্ভের মঙ্গলাচরণের পরেই লিখিয়াছেন,

"যঃ শ্রীকৃষ্ণপদাম্ভোজভজনৈকাভিলাষবান্।
তেনৈব দৃশ্যতামেতদন্যস্মৈ শপথোঽর্পিতঃ ॥

—যিনি একমাত্র শ্রীকৃষ্ণপদকমলের ভজনের জন্যই অভিলাষী, তিনিই এই গ্রন্থ দর্শন (আলোচনা) করিবেন, অন্যের প্রতি শপথ অর্পিত হইল (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণ-ভজনার্থিব্যতীত অন্য কেহ যেন এই গ্রন্থের আলোচনা না করেন)।"

মুণ্ডকশ্রুতি হইতেও শ্রবণার্থীর যোগ্যতা জানা যায়। "তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রসন্নচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥ মুণ্ডক॥ ১।২।১৩॥—তখন সেই বিদ্বান্ (শ্রোত্রিয় এবং ব্রহ্মনিষ্ঠ) গুরু যথাবিধি উপসন্ন, প্রসন্নচিত্ত ও শমগুণান্বিত শিষ্যকে যথাবিধি ব্রহ্মবিদ্যা জানাইবেন—যে ব্রহ্মবিদ্যা দ্বারা অক্ষর পুরুষকে জানা যায়।" এই শ্রুতিবাক্যের ভাষ্যে শ্রীপাদ শঙ্করাচার্য্য লিখিয়াছেন—"প্রশান্তচিত্তায় উপরত-দর্পাদিদোষায়—যাঁহার দর্পাদিদোষ দূরীভূত হইয়াছে (তাঁহাকে প্রশান্তচিত্ত বলে)। শমান্বিতায় বাহ্যেন্দ্রিয়োপরমেণ চ যুক্তায় সর্ব্বতো বিরক্তায়েত্যতৎ—যাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয় উপরত হইয়াছে, যিনি সর্ব্বতোভাবে বিরক্ত, তাঁহাকেই শমান্বিত বলে।" এই ভাষ্য হইতে জানা গেল—যাঁহার দর্পাদিদোষ নাই, যাঁহার বাহ্যেন্দ্রিয় সম্যক্রূপে সংযত হইয়াছে এবং যিনি ইন্দ্রিয়ভোগ্যবস্তু-বিষয়ে সর্ব্বতোভাবে আসক্তিহীন, তিনিই যোগ্য শ্রবণার্থী।

এই সমস্ত উক্তি হইতে জানা গেল—গুরুর (এ-স্থলে শ্রবণগুরুর) প্রতি এবং শাস্ত্রের প্রতি যাঁহার শ্রদ্ধা আছে, ভগবানের সচ্চিদানন্দবিগ্রহত্বে, সর্ব্বজ্ঞত্বে, করুণত্বে যাঁহার বিশ্বাস আছে, যিনি ভজনেচ্ছু, গুরুদেবের সেবা-শুশ্রূষাদিতে যাঁহার আগ্রহ আছে, যিনি জিতেন্দ্রিয়, গুরুদেবকে প্রণিপাতাদি করিতে, কিম্বা শ্রদ্ধার সহিত তত্ত্বাদিবিষয়ে গুরুদেবের নিকটে প্রশ্নাদি করিতে যিনি সঙ্কোচ অনুভব করেন না, যিনি বাস্তবিকই তত্ত্বজিজ্ঞাসু, যিনি দর্প-দম্ভাদিহীন, ভোগ্যবস্তুতে আসক্তিহীন, তিনিই তত্ত্বাদিশ্রবণের যোগ্য পাত্র।

ঘ। দ্বিবিধ শ্রবণার্থী

শ্রবণার্থীও আবার দুই রকমের হইতে পারেন—রুচিপ্রধান এবং বিচারপ্রধান।

তত্ত্বাদির বিচার ব্যতীতই ভগবৎকথা-শ্রবণাদিতে যাঁহার রুচি বা প্রীতি জন্মিয়াছে, তিনিই রুচিপ্রধান শ্রবণার্থী। রুচিপ্রধান শ্রবণার্থীর শ্রবণীয় বিষয় শ্রীনারদের উক্তি হইতে জানা যায়। দেবর্ষি নারদ ব্যাসদেবের নিকটে বলিয়াছেন,

"তত্রান্বহং কৃষ্ণকথাঃ প্রগায়তামনুগ্রহেণাশৃণবং মনোহরাঃ।
তাঃ শ্রদ্ধয়া মেঽনুপদং বিশৃণ্বতঃ প্রিয়শ্রবস্যঙ্গ মমাভবদ্রতিঃ॥ শ্রীভা, ১।৫।২৬॥

—হে অঙ্গ (ব্যাসদেব)! সেই ঋষিগণের আশ্রয়ে থাকিয়া তাঁহাদেরই অনুগ্রহে আমি প্রতিদিন তাঁহাদের কীর্ত্তিত মনোহর কৃষ্ণকথা শ্রবণ করিতাম। শ্রদ্ধার সহিত সেই কৃষ্ণকথার প্রতিপদ শ্রবণ করিতে করিতে প্রিয়শ্রবা শ্রীহরিতে আমার রতির উদয় হইয়াছিল।"

যোগ্য শ্রবণগুরুর মুখে এতাদৃশ কৃষ্ণকথা শ্রবণই রুচিপ্রধান সাধকগণের অনুকূল।

আর, শাস্ত্রবাক্যের বিচার করিয়া তাহার পরে, বিচারের ফলে, যাঁহাদের শ্রবণেচ্ছা

জাগ্রত হয়, তাঁহাদিগকে বিচারপ্রধান শ্রবণার্থী বলা হয়। তাঁহাদের পক্ষে চতুঃশ্লোকাদি তত্ত্ববিচারপূর্ণ কথার শ্রবণই অনুকূল।

"ভগবান্ ব্রহ্ম কার্ৎস্ন্যেন ত্রিরন্বীক্ষ্য মনীষয়া।
তদধ্যবস্যৎ কূটস্থো রতিরাত্মন্ যতো ভবেৎ॥ শ্রীভা, ২।২।৩৪॥

—ভগবান্ ব্রহ্মা একাগ্রচিত্ত হইয়া স্বীয় মনীষার (প্রজ্ঞাবুদ্ধির) দ্বারা সমগ্র বেদ তিনবার অনুশীলন করিয়াছিলেন এবং তাহার ফলেই—পরমাত্মা ভগবানে কিরূপে রতি জন্মিতে পারে, তাহা তিনি নির্ণয় করিয়াছিলেন।"

বিচারপ্রধান সাধকগণ শাস্ত্রার্থ-বিচারের দ্বারা বুঝিতে পারেন যে, ভবপাশে বন্ধন করিতে এবং ভবপাশ হইতে মুক্ত করিতে এবং কৈবল্য প্রদান করিতে সমর্থ একমাত্র পরব্রহ্ম সনাতন শ্রীবিষ্ণুই, অপর কেহ নহেন।

বন্ধকো ভবপাশেন ভবপাশাচ্চ মোচকঃ।
কৈবল্যদঃ পরংব্রহ্ম বিষ্ণুরেব সনাতনঃ॥ ভক্তিসন্দর্ভধৃত-স্কান্দবচন॥

উল্লিখিত দুই রকম সাধকের সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে। রুচিপ্রধান সাধকের দৃষ্টান্তে শ্রীনারদের কথা বলা হইয়াছে। "রুচিপ্রধান"-শব্দ হইতেই রুচির প্রাধান্যের কথা জানা যায়, অন্য কিছুর (অর্থাৎ ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদির) অস্তিত্বও ধ্বনিত হয়। রুচির প্রাধান্য-বশতঃ মনোহারিণী কৃষ্ণকথায় প্রবৃত্তি জন্মে; শেষ পর্য্যন্তও যদি ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানাদি থাকে, তাহা হইলে সাধন ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানহীনা প্রীতিতে পর্য্যবসিত হইবে না। প্রাপ্তি হইবে ঐশ্বর্য্যাত্মক ধাম বৈকুণ্ঠে সালোক্যাদি মুক্তি। নারদও বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্বই লাভ করিয়াছিলেন। রুচির প্রাধান্য থাকে বলিয়া নির্ব্বিশেষ ব্রহ্মসাযুজ্য প্রাপ্তি হইবে না। ঐশ্বর্য্যজ্ঞানহীন শুদ্ধভক্তের কৃপারূপ সৌভাগ্যের ফলে যদি রুচিপ্রধান সাধকের চিত্ত হইতে ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান অন্তর্হিত হয়, তাহা হইলে তাঁহার চিত্তে একমাত্র রুচিই বর্ত্তমান থাকিবে; তখন তাঁহার সাধনের লক্ষ্য হইবে কৃষ্ণসুখৈকতাৎপর্য্যময়ী সেবা; সেই অবস্থায় তাঁহাকে রুচিপ্রধান সাধক না বলিয়া রুচিকেবল সাধক বলাই বোধহয় সঙ্গত হইবে।

বিচার-প্রধান সাধকদের চিত্তে প্রথম অবস্থায় ভগবৎকথাদিতে রুচি থাকে না। আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির বাসনাই শাস্ত্রাদিবিচারে তাঁহাদের প্রবর্ত্তক। শাস্ত্র-বিচারের দ্বারা তাহারা জানিতে পারেন যে, ভগবান্ই মুক্তিদাতা; সুতরাং ভগবানের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞানও তাঁহাদের থাকে। শাস্ত্রবিচারের দ্বারা তাঁহারা ইহাও অবগত হয়েন যে, ভক্তিব্যতীত মুক্তিলাভ হইতে পারে না; এজন্য তাঁহারা ভক্তির সাহচর্য্য গ্রহণ করেন। তখন হয়তো তাঁহাদের চিত্তে রুচির উদয় হইতে পারে। রুচির উদয় হইলেও ঐশ্বর্য্যজ্ঞান থাকে বলিয়া তাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি পাইয়া বৈকুণ্ঠপার্ষদত্ব লাভ করিতে পারেন। আর, যদি রুচির উদয় না হয়, কেবল

আত্যন্তিকী দুঃখনিবৃত্তির বাসনাই প্রাধান্য লাভ করে, তাহা হইলে স্ব-স্ব-বাসনা অনুসারে তাঁহারা সাযুজ্যমুক্তিও লাভ করিতে পারেন। কোনও সৌভাগ্যবশতঃ শাস্ত্রবিচার করিতে করিতে যদি ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান এবং মুক্তিবাসনা দূরীভূত হয় এবং কেবল রুচির উদয় হয়, তখন কৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনাও চিত্তে জাগ্রত হইতে পারে।

যাঁহারা ব্রজেন্দ্রনন্দন কৃষ্ণের প্রেমসেবাকামী, তাঁহারা পৃথক্ একটা শ্রেণীভুক্ত; তাঁহারা বিচারপ্রধান তো নহেনই, রুচিপ্রধানও নহেন; তাঁহাদিগকে বরং রুচিকেবল সাধক বলা যায়।

স্বীয় ভাবের অনুকূল শ্রবণগুরুর শরণাপন্ন হওয়াই সঙ্গত; নচেৎ, ভাবপুষ্টির সম্ভাবনা থাকিবে না, ভাববিপর্য্যয়ের আশঙ্কাও অসম্ভব নয়।

৬৯। শিক্ষাগুরু

যাঁহার নিকটে ভজনবিধি শিক্ষা করা যায়, তিনি শিক্ষাগুরু। শ্রবণগুরুর নিকটে ভগবৎ-কথা-শ্রবণাদির ফলে ভজনের জন্য ইচ্ছা জাগিতে পারে। ভজনের ইচ্ছা জাগ্রত হইলে কিরূপে ভজন করিতে হয়, তাহা যাঁহার নিকটে শিক্ষা করা যায়, তিনি হইতেছেন শিক্ষাগুরু।

শ্রবণগুরু এবং ভজনশিক্ষাগুরু একজনও হইতে পারেন; অর্থাৎ যাঁহার নিকটে তত্ত্বাদি শ্রবণ করা হয়, তিনি শিক্ষাগুরুও হইতে পারেন। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—"অথ শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২০৬॥—শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরু প্রায় একজনই হইয়া থাকেন।" এই উক্তির প্রমাণরূপে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈস্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥ ১১।৩।২২॥

—(এই শ্লোকের পূর্ব্ববর্ত্তী-"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত॥১১।৩।২১"-শ্লোকে শ্রবণগুরুর কথা বলা হইয়াছে। ১১।৩।২২-শ্লোকের "তত্র"-শব্দে সেই শ্রবণগুরুকেই বুঝাইতেছে। 'তস্মাদ্গুরুং প্রপদ্যে-তেতি পূর্ব্বোক্তেস্তত্র শ্রবণগুরৌ। শ্রীজীবপাদ) 'গুরুই আত্মা (প্রিয়) এবং গুরুই দৈবত (পরমা-রাধ্য)'-এইরূপ বুদ্ধিসম্পন্ন হইয়া, অমায়ায় (অর্থাৎ নির্দ্দম্ভ হইয়া) এবং অনুবৃত্তিদ্বারা (আনুগত্য স্বীকার করিয়া) সে স্থানেই (অর্থাৎ শ্রবণগুরুর নিকটেই) ভাগবত-ধর্ম্মসমূহ শিক্ষা করিবে—যে সকল ভাগবত-ধর্ম্মে আত্মদ (যিনি ভক্তের নিকটে আত্মপর্য্যন্ত দান করেন, সেই) আত্মা শ্রীহরি সন্তুষ্টি লাভ করিয়া থাকেন। (শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

(অমায়য়া নির্দ্দম্ভয়া অনুবৃত্ত্যা তদনুগত্যা শিক্ষেৎ॥ টীকায় শ্রীজীব)

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—যিনি শ্রবণগুরু, তিনিই ভজনশিক্ষা-গুরুও হইতে পারেন।

আরও জানা গেল—নির্দ্দম্ভ হইয়া এবং গুরুদেবের আনুগত্য স্বীকার করিয়াই ভজনশিক্ষা করিতে হয়। শ্রবণ-সম্বন্ধেও সেই কথাই।

শ্রবণগুরুর নিকটে ভজনশিক্ষার সুযোগ না থাকিলে শাস্ত্রোক্ত লক্ষণবিশিষ্ট অপর কোনও গুরুর নিকটেও ভজনশিক্ষা করা যায়, তাহাতে কোনও দোষ হয়না। "শ্রবণগুরুভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি"-এই শ্রীজীবোক্তির অন্তর্গত "প্রায়িক"-শব্দ হইতেই তাহা জানা যায়।

শ্রবণগুরুর ন্যায় শিক্ষাগুরুও একাধিক হইতে পারেন। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, ভজনের বিবিধ অঙ্গ। ভিন্ন ভিন্ন গুরুর নিকটে ভিন্ন ভিন্ন ভজনাঙ্গের বিধি শিক্ষা করা যায়। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বহু শিক্ষাগুরুর উল্লেখ করিয়াছেন।

মন্ত্রগুরু, আর যত **শিক্ষাগুরুগণ** ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১।১৭॥

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজ গোস্বামীর ছয়জন শিক্ষাগুরু ছিলেন। তিনি নিজেই বলিয়াছেন,

শ্রীরূপ, সনাতন, ভট্টরঘুনাথ। শ্রীজীব, গোপালভট্ট, দাস রঘুনাথ॥
এই ছয়গুরু—শিক্ষাগুরু যে আমার। তাঁ সভার পাদপদ্মে কোটি নমস্কার॥
শ্রীচৈ, চ, ১।১।১৮-১৯॥

শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন-"অস্য শিক্ষাগুরোর্ব্বহুত্বমপি প্রাগ্বজ্‌জ্ঞেয়ম্।—পূর্ব্ববৎ (শ্রবণগুরুর ন্যায়) শিক্ষাগুরুর বহুত্বও জানিবে।"

বলা বাহুল্য, শ্রবণগুরুর যে সকল লক্ষণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, শিক্ষাগুরুরও সেই সমস্ত লক্ষণই বুঝিতে হইবে।

স্বীয় ভাবের অনুকূল শিক্ষাগুরুর চরণাশ্রয়ই সঙ্গত। তাহা না হইলে, ভাবের অনুকূল ভজনবিধি অবগত হওয়া সম্ভবপর না হইতেও পারে এবং ভজন-বিপর্য্যয়ও জন্মিতে পারে।

৭০। দীক্ষাগুরু

যথাবিধানে যিনি উপাসনার মন্ত্র উপদেশ করেন, তিনিই দীক্ষাগুরু। মন্ত্র দান করেন বলিয়া তাঁহাকে মন্ত্রগুরুও বলা হয়। "মন্ত্রগুরু আর যত শিক্ষাগুরুগণ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১।১৭॥" এই বাক্যে "মন্ত্রগুরু"-শব্দে মন্ত্রদাতা দীক্ষাগুরুর কথাই বলা হইয়াছে।

ক। দীক্ষাগুরু একাধিক হইতে পারেন না

শ্রবণগুরু বহু হইতে পারেন, শিক্ষাগুরুও বহু হইতে পারেন; কিন্তু মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরু একজনই হইবেন। "মন্ত্রগুরুস্তু এক এব॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২০৭॥"মন্ত্রগুরু যে একাধিক হইতে পারেন না, শ্রীজীব গোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে তাহার প্রমাণরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাত্তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেন্মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥ শ্রীভা, ১১।৩।৪৮॥

—(যোগীন্দ্র আবির্হোত্র নিমিমহারাজকে বলিয়াছেন) আচার্য্যের (শ্রীগুরুদেবের) নিকটে (মন্ত্রদীক্ষারূপ-) অনুগ্রহ লাভ করিয়া সেই গুরুদেবকর্ত্তৃক প্রদর্শিত আগম (মন্ত্রবিধি-শাস্ত্র) অনুসারে (অর্থাৎ গুরুদেবের নিকট হইতে যে মন্ত্র পাওয়া যায়, সেই মন্ত্রে যে ভাবে অর্চ্চনার বিধি আগমশাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, সেই বিধি অনুসারে) স্বীয় অভীষ্ট ভগবন্মূর্ত্তির অর্চ্চনা করিবে (অর্থাৎ, পরব্রহ্ম ভগবান্ অনাদিকাল হইতেই অনন্ত স্বরূপে আত্মপ্রকট করিয়া আছেন ; তন্মধ্যে যে স্বরূপ সাধকের অভীষ্ট, সেই স্বরূপেরই অর্চ্চনা করিবেন। দীক্ষামন্ত্রও অবশ্য সেই স্বরূপের অনুরূপই হইয়া থাকে)।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"অনুগ্রহো মন্ত্রদীক্ষারূপঃ। আগমো মন্ত্রবিধি-শাস্ত্রম্।" এবং সর্ব্বশেষে তিনি লিখিয়াছেন—"অস্যৈকত্বমেকবচনেন বোধ্যতে—শ্লোকের 'আচার্য্যাৎ'-এই এক বচনের দ্বারাই মন্ত্রগুরুর একত্ব বুঝিতে হইবে।" অর্থাৎ শ্লোকস্থ "আচার্য্য"-শব্দে মন্ত্রগুরুকেই বুঝাইতেছে। এই আচার্য্য-শব্দ এক বচনে (আচার্য্য-শব্দের পঞ্চমী বিভক্তির একবচনে 'আচার্য্যাৎ' হইয়াছে, সুতরাং একবচনে) ব্যবহৃত হইয়াছে। সুতরাং মন্ত্রগুরু যে একজনই হইবেন, বহু নহেন, ইহাই শ্লোকের অভিপ্রায় বলিয়া বুঝিতে হইবে।

খ। গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী ব্যতিরেকী ভাবেও মন্ত্রগুরুর একত্ব প্রতিপাদন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—একবার যাঁহার নিকটে মন্ত্রগ্রহণ করা হয়, তাঁহার সম্বন্ধে কোনওরূপ অসন্তুষ্টির ভাব জন্মিলেই অন্য একজনকে গুরুত্বে বরণ করার প্রয়োজন হইতে পারে। এইরূপে অনেক গুরুর আশ্রয় গ্রহণে পূর্ব্ব পূর্ব্ব গুরুর ত্যাগই সূচিত হয়। কিন্তু **গুরুত্যাগ শাস্ত্রে নিষিদ্ধ**। কেননা, ব্রহ্মবৈবর্ত্তাদি পুরাণে গুরুত্যাগের নিষেধ করা হইয়াছে।

"বোধঃ কলুষিতস্তেন দৌরাত্ম্যং প্রকটীকৃতম্।
গুরুর্যেন পরিত্যক্তস্তেন ত্যক্তঃ পুরা হরিঃ॥

—যে ব্যক্তি গুরুকে পরিত্যাগ করিয়াছেন, তিনি পূর্ব্বেই শ্রীহরিকে ত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার বুদ্ধি কলুষিত, গুরুত্যাগের দ্বারা তিনি তাঁহার দৌরাত্ম্যই প্রকাশ করিয়া থাকেন।"

শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর নিকটে স্বীয় ভাবের অনুকূল দীক্ষামন্ত্র যিনি গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে গুরুত্যাগ নিতান্ত অসঙ্গত। গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হওয়ায় বহু দীক্ষাগুরুর প্রশ্নও উঠিতে পারে না। সুতরাং মন্ত্রগুরু যে এক জনই হইবেন, তাহাই প্রতিপাদিত হইল।

গ। স্থলবিশেষে গুরুত্যাগের বিধান

যাঁহার নিকটে একবার দীক্ষামন্ত্র গ্রহণ করা হয়, স্থলবিশেষে তাঁহাকে ত্যাগ করার বিধানও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। ভক্তিমার্গের সাধক শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট বৈষ্ণব গুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণ

করিবেন ; অন্যথা সাধনপথে অগ্রসর হওয়ার কোনও সম্ভাবনাই তাঁহার থাকিবে না। কোনও কারণে যদি কেহ অবৈষ্ণবের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাঁহার পক্ষে বৈষ্ণব গুরুর নিকটে পুনরায় মন্ত্রগ্রহণের বিধানও শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

'অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ। পুনশ্চ বিধিনা সম্যক্ গ্রাহয়েদ্ বৈষ্ণবাদ্‌গুরোঃ॥

—ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২০৭-অনুচ্ছেদধৃত-নারদপঞ্চরাত্র-বচনম্॥

—অবৈষ্ণবের উপদিষ্ট মন্ত্রে নিরয়ে গমন করিতে হয়। (যিনি অবৈষ্ণবের নিকটে মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন, তিনি) পুনরায় যথাবিধি বৈষ্ণব গুরুর নিকট হইতে মন্ত্র গ্রহণ করিবেন।"

শাস্ত্রে যে গুরুত্যাগ নিষিদ্ধ হইয়াছে, এ-স্থলে সেইরূপ গুরুত্যাগ হয় না। কেননা, যিনি অবৈষ্ণব, ভক্তিমার্গের সাধক নহেন, ভক্তিমার্গের অনুকূল মন্ত্রদানের অধিকারই তাঁহার থাকিতে পারে না ; সুতরাং তৎকর্ত্তৃক মন্ত্রোপদেশকে শাস্ত্রসম্মত দীক্ষাও বলা যায় না এবং এতাদৃশ মন্ত্রোপদেশে তাঁহার বাস্তব গুরুত্বও সিদ্ধ হয় না।

শ্রীজীবগোস্বামী অন্যত্রও বলিয়াছেন, "বৈষ্ণববিদ্বেষী চেৎ পরিত্যাজ্য এব—গুরু যদি বৈষ্ণববিদ্বেষী হয়েন, তাঁহাকে পরিত্যাগ করিবে।" এই উক্তির সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যটীও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"গুরোরপ্যবলিপ্তস্য কার্যাকার্য্যমজানতঃ।
উৎপথপ্রতিপন্নস্য পরিত্যাগো বিধীয়তে॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২৩৮॥

—যিনি অবলিপ্ত (বিষয়ে আসক্ত), কার্য্যাকার্য্যবিষয়ে অনভিজ্ঞ এবং উৎপথগামী (ভক্তিবিরুদ্ধ-পন্থাবলম্বী), সেই গুরুর পরিত্যাগই বিধেয়।"

এ-স্থলেও গুরুত্যাগের দোষ জন্মিতে পারে না। কেননা, এ-স্থলেও এই গুরুতে বৈষ্ণবের লক্ষণ বিদ্যমান নাই। সুতরাং পূর্ব্বোদ্ধৃত "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন" ইত্যাদি প্রমাণ অনুসারে তাঁহার পরিত্যাগই বিধেয় ; তাঁহার গুরুত্বই অসিদ্ধ হইয়া পড়ে।

ঘ। সাধকের ভাবের পরিবর্ত্তনে পুনরায় দীক্ষার রীতি

যিনি প্রথমতঃ একভাবের মন্ত্রগ্রহণ করিয়াছেন, কোনও কারণে অন্যভাবে যদি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা হইলে পরবর্ত্তী-ভাবের অনুকূল মন্ত্রগ্রহণের রীতিও প্রচলিত আছে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীপাদ বল্লভভট্ট প্রথমে বালগোপাল-মন্ত্রে (বাৎসল্য-ভাবের মন্ত্রে) দীক্ষিত হইয়াছিলেন। যখন তিনি নীলাচলে আসিয়াছিলেন, তখন মধুর-ভাবের উপাসক শ্রীল গদাধরপণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গপ্রভাবে কিশোর-গোপালের (মধুরভাবের) উপাসনার জন্য তাঁহার লোভ জন্মিল। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর আদেশ গ্রহণ করিয়া তিনি গদাদরপণ্ডিত-গোস্বামীর নিকটেই পুনরায় কিশোর-গোপাল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছিলেন।

জীবের একমাত্র লক্ষ্য হওয়া উচিত—শ্রীকৃষ্ণভজন। দাস্য-সখ্যাদি চতুর্ব্বিধ ভাবের যে

কোনও এক ভাবেই ভজন করা যায়। যাঁহার চিত্ত যে ভাবের সেবার জন্য লুব্ধ হয়, সেই ভাবের অনুকূল ভজনই তাঁহার চিত্তবৃত্তির অনুকূল—সুতরাং সেই ভাবের ভজনপন্থা অবলম্বন করিলেই তাঁহার পক্ষে ভজনপথে অগ্রসর হওয়ার সুবিধা। সংসারী জীব সিদ্ধ নহে, সাধকমাত্র; তাঁহার ভাবও সকল সময়ে একরকম থাকা সাধারণতঃ সম্ভব নহে। অবশ্য দাস্য-সখ্যাদি ভাবের প্রতি লোভও জন্মে একমাত্র মহৎসঙ্গ হইতে। একভাবের মহতের সঙ্গে এক রকমের ভাবে লোভ জন্মিতে পারে; আর এক ভাবের মহতের প্রভাব যদি বলবত্তর হয়, তাহা হইলে তাঁহার সঙ্গগুণে তাঁহার ভাবেই চিত্ত লুব্ধ হইতে পারে। বল্লভভট্টেরও তাহাই হইয়াছিল। অথবা শ্রীপাদ বল্লভভট্টের স্বরূপভূতা বাসনাই হয়তো ছিল কান্তাভাবে ভজনের অনুকূল; শ্রীপাদ পণ্ডিত গোস্বামীর সঙ্গপ্রভাবে তাহা পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে (৫।৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

একমাত্র লক্ষ্য যখন ভজন, প্রীতির সহিত কোনও একভাবের ভজন, তখন কেবল লোভনীয় ভাবেরই অপেক্ষা রাখা আবশ্যক, অন্য কোনও অপেক্ষা থাকিলে স্বীয় ভাবের অনুকূল ভজনে বিঘ্ন জন্মিতে পারে। এজন্য শ্রীপাদ বল্লভভট্ট স্বীয় ভাবের অনুকূল মন্ত্র গ্রহণ করিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে ইহা দূষণীয় হয় নাই। পূর্ব্বগুরুর প্রতি অবজ্ঞা বা অশ্রদ্ধা তাঁহার ছিল না; কেবল চিত্তগত ভাবের পরিবর্ত্তন হওয়াতেই তিনি পুনরায় ভাবানুকূল মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন; তাহাতে পূর্ব্বগুরুর পক্ষেও অসন্তোষের কোনও হেতু থাকিতে পারে না, সুতরাং তাঁহার নিকটে অপরাধেরও সম্ভাবনা থাকিতে পারেনা। তিনিও বরং ইহাতে সন্তুষ্টই হইবেন; কেননা, সাধক জীব স্বীয় ভাবানুকূল ভজন-পন্থায় অগ্রসর হউক, মহৎ-লোকমাত্রই তাহা আশা করেন।

যদি বলা যায়—বল্লভভট্ট তো তাঁহার পূর্ব্বগুরুর নিকটেও আবার কিশোরগোপাল-মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিতে পারিতেন; গদাধর পণ্ডিত গোস্বামীর নিকটে কেন দীক্ষা নিলেন?

উত্তরে বক্তব্য এই। পূর্ব্বগুরু ছিলেন বাৎসল্যভাবের উপাসক, এজন্যই তিনি শ্রীপাদ বল্লভভট্টকে বাৎসল্যভাবের মন্ত্র দিয়াছিলেন। বাৎসল্যভাবের উপাসক মধুরভাবের মন্ত্রে দীক্ষা দিতে পারেন না, দেনও না। কেননা, যথাবস্থিত দেহের এবং অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহের সাধনেও শ্রীগুরুদেবের আনুগত্যেই সাধক অগ্রসর হয়েন। উভয়ে এক ভাবের সাধক না হইলে তাহা সম্ভবপর হইতে পারে না। কেননা, গুরু ও শিষ্য দুই ভাবের সাধক হইলে তাঁহাদের অন্তশ্চিন্তিত দেহ হইবে দুই রকমের এবং তাঁহাদের সেবনীয়া লীলাও হইবে দুই রকমের, সেবার স্থানও হইবে ভিন্ন ভিন্ন; সুতরাং অন্তশ্চিন্তিত দেহে গুরুদেবের সিদ্ধদেহের আনুগত্য শিষ্যের পক্ষে সম্ভব হইবে না। বিশেষতঃ, যিনি নিজে যে ভাবের সাধক, তিনি সেই ভাবের পথেই অপরকে (শিষ্যকে) চালিত করিতে পারেন, অন্যভাবের পথে চালনা তাঁহার পক্ষে সম্ভব নহে।

৬। ত্যাগ না করিয়া গুরুদেবের সান্নিধ্য হইতে দূরে থাকার বিধান

ভক্তিসন্দর্ভের ২৩৮ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতম্"

ইত্যাদি শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর চরণ যিনি আশ্রয় করেন নাই, সময় সময় তাঁহাকে সঙ্কটে পতিত হইতে হয়। মৎসরতাদিবশতঃ তাদৃশ গুরু যদি মহাভাগবতের সৎকারাদিব্যাপারে শিষ্যকে অনুমতি না দেন, তাহা হইলে শিষ্যকে দুই রকমের সঙ্কটে পতিত হইতে হয়; গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়া কি মহতের সেবাই করিবেন? না কি গুরুর আদেশ পালন করিয়া মহতের সেবা না করিবেন? এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ নারদপঞ্চরাত্রের নিম্নলিখিত বচনটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"যো বক্তি ন্যায়রহিতমন্যায়েন শৃণোতি যঃ।
তাবুভৌ নরকং ঘোরং ব্রজতঃ কালমক্ষয়ম্॥

—যিনি অন্যায় (অশাস্ত্রীয়) কথা বলেন এবং যিনি সেই অন্যায় কথার পালন করেন, তাঁহারা উভয়ে ঘোর নরকে গমন করেন এবং অক্ষয়কাল পর্য্যন্ত সেই নরকে বাস করেন।"

শ্রীজীব বলিয়াছেন—"অতএব দূরত এবারাধ্য স্তাদৃশো গুরুঃ—অতএব এতাদৃশ গুরুকে দূর হইতেই আরাধনা করিবে।" অর্থাৎ তাঁহার সান্নিধ্যে যাইবে না; দূর হইতেই যথাসম্ভব ভাবে তাঁহার সেবা করিবে।

এরূপ স্থলে গুরুর আদেশ লঙ্ঘন করিয়াও মহতের সেবা বিধেয় বলিয়া মনে হয়। কেননা, "মহৎ কৃপা বিনা কোন কর্ম্মে ভক্তি নয়। কৃষ্ণভক্তি দূরে রহু সংসার নহে ক্ষয়॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৩২॥", "মহৎসেবাং দ্বারমাহুর্ব্বিমুক্তেঃ॥ শ্রীভা, ৫।৫।২॥"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভের ২৩৮-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—"যথোক্তলক্ষণস্য শ্রীগুরোরবিদ্যমানতায়ান্তু তস্যৈব মহাভাগবতস্যৈকস্য নিত্যসেবনং পরমং শ্রেয়ঃ। স চ শ্রীগুরুবৎ সমবাসনঃ স্বস্মিন্ কৃপালুচিত্তশ্চ গ্রাহ্যঃ॥—শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর অবিদ্যমানতায় কোনও পরম-ভাগবতের নিত্যসেবা পরম শ্রেয়ঃ। যাঁহার সেবা করা হইবে, তিনি কিরূপ হওয়া প্রয়োজন? তিনি গুরুদেবের সমবাসন হইবেন, অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব যে ভাবের সাধক, সেই পরম-ভাগবতও সেই ভাবের সাধক হইবেন; এবং যিনি তাঁহার সেবা করিবেন, তাঁহার প্রতি কৃপালুচিত্তও হইবেন।" সাধকের প্রতি মহাভাগবতের কৃপা না থাকিলে তাঁহার প্রতি রতি জন্মিতে পারে না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী হরিভক্তিসুধোদয়ের একটী প্রমাণ-বচনও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"যস্য যৎসঙ্গতিঃ পুংসো মণিবৎ স্যাৎ স তদ্গুণঃ।
স্বকুলর্দ্ধ্যৈ ততো ধীমান্ স্বযূথ্যান্যেব সংশ্রয়েৎ॥

—যাঁহার যে জাতীয় সঙ্গ হইবে, মণির মত তিনি তদ্গুণযুক্ত হইবেন। অতএব, বুদ্ধিমান্ ব্যক্তি স্বীয় কুলবৃদ্ধির জন্য (স্বীয় ভাবাদিপুষ্টির নিমিত্ত) স্বীয় যূথের (স্বীয় ভাবের অনুরূপ সাধকগণের মধ্যে) কোনও পরম ভাগবতেরই আশ্রয় গ্রহণ করিবেন।"

চ। দীক্ষাগুরুর লক্ষণ

(১) তিন রকম গুরুর একই লক্ষণ

শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু—এই তিন রকমের গুরুর কথা বলিয়াও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে কেবল শ্রবণগুরুর লক্ষণই বলিয়াছেন; কিন্তু শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরুর লক্ষণসম্বন্ধে পৃথক্‌ভাবে কিছু বলেন নাই। "শ্রবণগুরু-ভজনশিক্ষাগুর্ব্বোঃ প্রায়িকমেকত্বমিতি"-বাক্যে শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর প্রায়িক একত্বের কথা বলিয়া তিনি প্রকারান্তরে জানাইলেন যে, শ্রবণগুরু এবং ভজন-শিক্ষাগুরুর লক্ষণেও একত্ব বিদ্যমান। শ্রবণগুরু ও ভজনশিক্ষাগুরুর লক্ষণে যদি কোনও পার্থক্য থাকিত, তাহা হইলে তিনি ভজনশিক্ষাগুরুর লক্ষণের কথাও বলিতেন। তাহা যখন বলেন নাই, তখন বুঝা যায়, এই উভয় গুরুর লক্ষণে কোনওরূপ পার্থক্য নাই। পৃথক্‌ভাবে তিনি দীক্ষাগুরুর লক্ষণসম্বন্ধেও কিছু বলেন নাই; তাহাতেও বুঝা যায়,—শ্রবণগুরু সম্বন্ধে কথিত লক্ষণই দীক্ষাগুরুরও লক্ষণ। অবণগুরুর লক্ষণের বিচার করিলেও তাহা বুঝা যায়।

"তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত"-ইত্যাদি বাক্যেই শ্রবণগুরুর মুখ্য লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে (পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৮ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য); এই মুখ্য লক্ষণ হইতেছে—"শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্।" যিনি বেদাদি-শাস্ত্রে অভিজ্ঞ, ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভবসম্পন্ন এবং উপশান্তচিত্ত, তিনিই শ্রবণগুরু হওয়ার যোগ্য। এই তিনটী লক্ষণের মধ্যে "অপরোক্ষ অনুভব"কেই প্রধান লক্ষণ বলা যায়; ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব যাঁহার আছে, তিনিই উপশান্তচিত্ত হইতে পারেন, অপর কেহ উপশান্তচিত্ত হইতে পারেন না। শিষ্যের সংশয়-নিরসনের জন্যই শাস্ত্রজ্ঞত্বের প্রয়োজন। ইহাকেও মুখ্য লক্ষণ বলা যায় না; কেননা, শ্রবণগুরু শিষ্যের যে সংশয় ছেদন করিতে পারিবেন না, সেই সংশয়ের নিরসনের জন্য তিনি শিষ্যকে অপর কোনও শাস্ত্রজ্ঞের নিকটেও পাঠাইতে পারেন; তাহাতে তাঁহার আপত্তির কোনও হেতু থাকিতে পারে না; কেননা, ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন বলিয়া তিনি নির্ম্মৎসর। পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব অপেক্ষা উৎকর্ষময় আর কোনও লক্ষণ থাকিতে পারে না। ভজনের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে তিন রকমের গুরুর মধ্যে দীক্ষাগুরুরই প্রাধান্য; সুতরাং শ্রবণগুরুর লক্ষণ অপেক্ষা উৎকর্ষময় কোনও লক্ষণ যদি থাকে, সেই লক্ষণই হইবে দীক্ষাগুরুর বিশেষ লক্ষণ। কিন্তু পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব অপেক্ষা উৎকর্ষময় কোনও লক্ষণ যখন নাই, তখন শ্রবণ-গুরুর লক্ষণকেই দীক্ষাগুরুরও লক্ষণ বলিয়া মনে করা সঙ্গত। তদপেক্ষা ন্যূন কোনও লক্ষণও দীক্ষাগুরুর লক্ষণ হইতে পারেনা; কেননা, যিনি নিজেই পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করেন নাই, তিনি কিরূপে শিষ্যের চিত্তে অনুভব জন্মাইবেন?

ভক্তিসন্দর্ভে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ হইতে শ্রবণগুরুর যে লক্ষণের কথা উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাও উল্লিখিত "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত"-শ্লোকের অনুগতই।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রবণগুরু ও শিক্ষাগুরুর লক্ষণের কথা বলা হয় নাই ; কিন্তু দীক্ষাগুরুর লক্ষণ কথিত হইয়াছে। সে-স্থলেও প্রথমে সামান্যাকারে সংক্ষেপে, ভক্তিসন্দর্ভপ্রোক্ত শ্রবণগুরুর লক্ষণজ্ঞাপক "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্ ॥"-শ্লোকটীই উদ্ধৃত হইয়াছে (হ, ভ, বি, ১।২৭ ॥) ইহাতেও পরিষ্কারভাবে বুঝা যায়—শ্রবণগুরুর যে লক্ষণ, দীক্ষাগুরুরও সেই লক্ষণই। ইহার পরে মন্ত্রমুক্তাবলী-প্রভৃতি গ্রন্থ হইতেও দীক্ষাগুরুর কয়েকটী লক্ষণ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে কথিত হইয়াছে। কিন্তু এই লক্ষণগুলি যে "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত"-ইত্যাদি শ্লোকেরই বিশেষ বিবৃতি, টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাহা বলিয়া গিয়াছেন। 'শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতমিত্যাদিনা প্রাক্ সামান্যতঃ সংক্ষেপেণ গুরুলক্ষণান্যুল্লিখ্যাধুনা তান্যেব বিশেষেণ বিস্তার্য্য, কিংবা পূর্ব্বং গুর্ব্বাশ্রয়ানুষঙ্গেন গৌণতয়া লিখিত্বা ইদানীং মুখ্যত্বেন লিখতি অবদাতেত্যাদিনা ॥ হ, ভ, বি, ১।৩২-শ্লোকের টীকা।"

এইরূপে দেখাগেল—শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু-সকল রকমের গুরুর একই লক্ষণ।

(২) **শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসোক্ত দীক্ষাগুরুর লক্ষণ**

পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে শ্রবণগুরুর যে লক্ষণের কথা বলিয়াছেন, দীক্ষাগুরুরও সেই লক্ষণই। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দীক্ষাগুরুর লক্ষণ-প্রসঙ্গে "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত"-ইত্যাদি বাক্যে সেই লক্ষণেরই উল্লেখ করিয়া তাহার বিবৃতিরূপে যে-সকল লক্ষণের উল্লেখ করা হইয়াছে, এ-স্থলে তাহাদের মধ্যে কয়েকটী উদ্ধৃত হইতেছে।

"অবদাতান্বয়ঃ শুদ্ধঃ স্বোচিতাচারতৎপরঃ।
আশ্রমী ক্রোধরহিতো বেদবিৎ সর্ব্বশাস্ত্রবিৎ ॥
শ্রদ্ধাবাননসূয়শ্চ প্রিয়বাক্ প্রিয়দর্শনঃ।
শুচিঃ সুবেশস্তরুণঃ সর্ব্বভূতহিতে রতঃ ॥
ধীমাননুদ্ধতমতিঃ পূর্ণোঽহন্তা বিমর্শকঃ।
সগুণোঽর্চ্চাসু কৃতধীঃ কৃতজ্ঞঃ শিষ্যবৎসলঃ ॥
নিগ্রহানুগ্রহে শক্তো হোমমন্ত্রপরায়ণঃ।
উহাপোহপ্রকারজ্ঞঃ শুদ্ধাত্মা যঃ কৃপালয়ঃ।
ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তো গুরুঃ স্যাদ্ গরিমানিধিঃ ॥

—হ, ভ, বি, ১।৩২-৩৩-ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলীপ্রমাণ ॥

—যাঁহার বংশ পাতিত্যাদি-দোষহীন, যিনি স্বয়ং পাতিত্যাদি-দোষহীন, স্বীয় বিহিত আচারে নিরত, আশ্রমী, ক্রোধহীন, বেদবিৎ, সর্ব্বশাস্ত্রজ্ঞ, শ্রদ্ধাবান্, অসূয়াহীন, প্রিয়বাদী, প্রিয়দর্শন, শুচি, সুবেশধারী, যুবা, সর্ব্বভূতহিতে রত, ধীমান্, স্থিরমতি, পূর্ণ (আকাঙ্ক্ষা হীন), অহিংসক, বিবেচক, বাৎসল্যাদি গুণবান্, ভগবৎ-পূজায় কৃতবুদ্ধি, কৃতজ্ঞ, শিষ্যবৎসল, নিগ্রহ ও অনুগ্রহে সমর্থ, হোমমন্ত্র-

পরায়ণ, তর্কবিতর্কের প্রকারজ্ঞ, এবং যিনি শুদ্ধচিত্ত ও কৃপার আলয়, ইত্যাদি লক্ষণযুক্ত গুরুই গরিমার নিধিস্বরূপ।—শ্রীশ্যামাচরণ কবিরত্ন সম্পাদিত গ্রন্থের অনুবাদ।"

"নিস্পৃহঃ সর্ব্বতঃ সিদ্ধঃ সর্ব্ববিদ্যাবিশারদঃ। সর্ব্বসংশয়সংছেত্তাঽনলসো গুরুরাহৃতঃ॥
—হ, ভ, বি, ১।৩৫-ধৃত-বিষ্ণুস্মৃতিপ্রমাণ॥

—যিনি নিস্পৃহ, সর্ব্বতোভাবে সিদ্ধ, সর্ব্ববিদ্যাবিশারদ, সমস্ত সংশয়ের ছেদনে সমর্থ ও নিরলস, তিনিই গুরু নামে অভিহিত হয়েন।"

ছ। বিরোধ ও সমাধান

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে শ্রীনারদপঞ্চরাত্রের শ্রীভগবন্নারদসংবাদ হইতে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলিও উদ্ধৃত হইয়াছে।

"ব্রাহ্মণঃ সর্ব্বকালজ্ঞঃ কুর্য্যাৎ সর্ব্বেষ্বনুগ্রহম্। তদভাবাদ্দ্বিজশ্রেষ্ঠ শান্তাত্মা ভগবন্ময়ঃ॥
ভাবিতাত্মা চ সর্ব্বজ্ঞঃ শাস্ত্রজ্ঞঃ সৎক্রিয়াপরঃ। সিদ্ধিত্রয়সমাযুক্ত আচার্য্যত্বেঽভিষেচিতঃ॥
ক্ষত্র-বিট্-শূদ্রজাতীনাং ক্ষত্রিয়োঽনুগ্রহে ক্ষমঃ। ক্ষত্রিয়স্যাপি চ গুরোরভাবাদীদৃশো যদি॥
বৈশ্যঃ স্যাত্তেন কার্য্যশ্চ দ্বয়ে নিত্যমনুগ্রহঃ। সজাতীয়েন শূদ্রেণ তাদৃশেন মহামতে॥
অনুগ্রহাভিষেকৌ চ কার্য্যৌ শূদ্রস্য সর্ব্বদা॥ —হ, ভ, বি, ১।৩৬-ধৃত-নারদপঞ্চরাত্র-প্রমাণ॥

—সর্ব্বকালজ্ঞ (পঞ্চরাত্র-বিধানোক্ত-পঞ্চকালবিৎ) ব্রাহ্মণ সকল বর্ণের প্রতিই (মন্ত্রদানাদিরূপ) অনুগ্রহ করিবেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ! তদভাবে শান্তাত্মা, ভগবন্ময় (ভগবদ্গতচিত্ত), শুদ্ধচিত্ত (ভাবিতাত্মা), সর্ব্বজ্ঞ (সর্ব্বপ্রকার দীক্ষাবিধানবিৎ), শাস্ত্রজ্ঞ, সৎক্রিয়াপরায়ণ, (পুরশ্চরণাদিদ্বারা মন্ত্রসাধন, গুরুসাধন ও দেবতাসাধন-এই) সিদ্ধিত্রয়সমন্বিত ক্ষত্রিয়কে আচার্য্যত্বে অভিষিক্ত করিবে। ক্ষত্রিয়গুরু হইলে তিনি ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-এই তিন জাতিকে মন্ত্রদান-রূপ অনুগ্রহ করিতে সমর্থ, যদি ক্ষত্রিয় গুরুর অভাব হয়, তাদৃশ গুণসম্পন্ন বৈশ্য—বৈশ্য ও শূদ্র-এই দুই জাতির প্রতি নিত্য মন্ত্রদানরূপ অনুগ্রহ করিবেন। হে মহামতে! ঐরূপ গুণশালী শূদ্রও সজাতীয় শূদ্রের প্রতি মন্ত্রদানাদিরূপ অনুগ্রহ ও অভিষেক করিতে পারেন।"

আরও লিখিত হইয়াছে যে,

"বর্ণোত্তমেঽথ চ গুরৌ সতি যা বিশ্রুতেঽপি চ।
স্বদেশতোঽথবান্যত্র নেদং কার্য্যং শুভার্থিনা॥
বিদ্যমানে তু যঃ কুর্য্যাৎ যত্র তত্র বিপর্য্যয়ম্।
তস্যেহামুত্রনাশঃ স্যাত্তস্মাচ্ছাস্ত্রোক্তমাচরেৎ॥
ক্ষত্রবিট্শূদ্রজাতীয়ঃ প্রাতিলোম্যং ন দীক্ষয়েৎ॥—হ, ভ, বি, ১।৩৭-৩৮॥

—পূর্ব্বকথিত-গুণসম্পন্ন বর্ণশ্রেষ্ঠ গুরু স্বদেশে বা অন্যত্র বর্ত্তমান থাকিতে কল্যাণকামী কোনও ব্যক্তি তদপেক্ষা উচ্চবর্ণের কাহাকেও দীক্ষাদানাদি করিবেন না। বর্ণশ্রেষ্ঠ বিদ্যমান থাকিতে যিনি যথা তথা

বিপরীত আচরণ করেন, তাঁহার ঐহিক ও পারত্রিক উভয় প্রকার অর্থের বিনাশ হয়। অতএব শাস্ত্রোক্ত বিধির পালনই বিধেয়। ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শূদ্র-ইঁহারা প্রতিলোম-অনুসারে (অর্থাৎ নিজ অপেক্ষা উচ্চবর্ণকে) দীক্ষা দিবেন না।"

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা যায়—গুরুর জাতিকুলাদিও বিচার করা প্রয়োজন।

কিন্তু ইতঃপূর্ব্বে (৫।৬৮-ক- অনুচ্ছেদে) ভক্তিসন্দর্ভ হইতে উদ্ধৃত "কুলং শীলমাচারমবিচার্য্য গুরুং গুরুম্। ভজেত"-ইত্যাদি ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-প্রমাণ বলেন—শাস্ত্রোক্তলক্ষণবিশিষ্ট গুরুর কুলাদির বিচার করার প্রয়োজন নাই। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, শ্রীমন্‌মহাপ্রভু রায়রামানন্দের নিকটে বলিয়াছেন,

কিবা বিপ্র কিবা ন্যাসী শূদ্র কেনে নয়।
যেই কৃষ্ণ-তত্ত্ববেত্তা সেই গুরু হয়॥ শ্রীচৈ,চ, ২।৮।১০০॥ *

মনুসংহিতায়ও অনুরূপ প্রমাণ দৃষ্ট হয়।

"শ্রদ্ধধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি।
অন্ত্যাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি ॥২।২৩৮॥

—শ্রদ্ধাযুক্ত হইয়া ইতর লোকের নিকট হইতেও শ্রেয়স্করী বিদ্যা গ্রহণ করিবে। অতি-অন্ত্যজ চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরম ধর্ম্ম লাভ করিবে এবং স্ত্রীরত্ন দুষ্কুলজাত হইলেও গ্রহণ করিবে (শ্রীল পঞ্চানন তর্করত্নকৃত অনুবাদ)।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীমৎকল্লূকভট্ট "অন্ত্যাৎ"-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—"অন্ত্যশ্চণ্ডালঃ তস্মাদপি—অন্ত্যজ চণ্ডাল হইতেও পরম ধর্ম্ম গ্রহণ করিবে।" এবং "পরং ধর্ম্মং"-বাক্যের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—"পরং ধর্ম্মং মোক্ষোপায়মাত্মজ্ঞানম্—মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান।" অন্ত্যজ চণ্ডালও যে উপযুক্ত হইলে মোক্ষলাভের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান দিতে অধিকারী, অর্থাৎ তিনিও যে দীক্ষাগুরু হইতে পারেন, তাহাই এই মনুসংহিতাবচন হইতে জানা গেল।

এইরূপে দেখা যাইতেছে—শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসধৃত নারদপঞ্চরাত্র-বচনের সহিত, ভক্তি-সন্দর্ভে উদ্ধৃত ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণ-বচন, শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতোক্ত শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর বাক্য এবং মনুসংহিতার বচনের **বিরোধ** বর্ত্তমান। এই বিরোধের সমাধান কি ?

সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়। যাঁহার মধ্যে গুরুর শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণ বিদ্যমান, যে বর্ণেই তাঁহার উদ্ভব হউক না কেন, তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য। ইহা হইতেছে সাধারণ বিধি। আর, নারদপঞ্চরাত্রে যে জাতিকুলাদির বিচারের কথা দৃষ্ট হয়, তাহা হইতেছে বিশেষ বিধি। জাতিকুলাদির অভিমান যাঁহাদের আছে, যাঁহারা সমাজের বা লোকের অপেক্ষা ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের

* কেহ কেহ বলেন—শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর এই উক্তি হইতেছে কেবল শ্রবণগুরু সম্বন্ধে, দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে নহে। প্রকরণ হইতেই তাহা বুঝা যায়। এ সম্বন্ধে পরবর্তী আলোচনা দ্রষ্টব্য।

জন্যই এই বিশেষ বিধি। তাঁহারা যদি নিজেদের অপেক্ষা হীন বর্ণোদ্ভব কাহারও নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করেন, স্বজাতীয় লোকের নিকটে এবং সমাজের নিকটে তাঁহাদিগকে লাঞ্ছিত হইতে হইবে, সমাজ কর্ত্তৃক পরিত্যক্তও হইতে পারেন। সুতরাং তাঁহাদের ইহকালের অর্থ নষ্ট হয়। আর, লোক-কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হওয়ায় তাঁহারা যদি দীক্ষাগ্রহণের জন্য অনুতপ্ত হইয়া গুরুর প্রতি অশ্রদ্ধাদি প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরকালও নষ্ট হইয়া যায়। "তস্যেহামুত্রনাশঃ স্যাৎ॥"

কিন্তু যাঁহারা জাত্যাদির অভিমানশূন্য, লোকাপেক্ষাহীন, শুদ্ধভক্তিকামী, তাঁহাদের জন্য উল্লিখিত বিশেষ বিধি নহে। যিনিই কৃষ্ণতত্ত্ববেত্তা, ভজনবিজ্ঞ, রসজ্ঞ, তাঁহাকেই তাঁহারা গুরু রূপে বরণ করিতে পারেন—তিনি শূদ্রই হউন, কি ব্রাহ্মণই হউন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। কেননা, ভক্তির কৃপায়, অন্যের কথা তো দূরে, শ্বপচেরও, জাতিদোষ দূরীভূত হয় ; ইহা স্বয়ং ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন। "ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ॥ শ্রীভা, ১১।১৪।২১॥" এই শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপি।"

কেহ বলিতে পারেন, "কেবল শ্রবণগুরু সম্বন্ধেই বলা হইয়াছে যে, জাতিকুলাদির অপেক্ষার প্রয়োজন নাই, দীক্ষাগুরু সম্বন্ধে নহে।" কিন্তু তাহা নয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তিন প্রকারের গুরুর তিন প্রকার লক্ষণের কথা বলেন নাই। সকল প্রকার গুরুরই এক রকম লক্ষণের কথাই তিনি লিখিয়াছেন (পূর্ব্ববর্ত্তী চ (১)-উপ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। ব্যবহারতঃও তাহার সমর্থন দৃষ্ট হয়। গৌড়ীয় বৈষ্ণব সম্প্রদায়ে কায়স্থকুলোদ্ভব শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর মহাশয়ের অনেক ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন ; অদ্যাপিও ঠাকুরমহাশয়ের পরিবারভুক্ত বহু ব্রাহ্মণ বিদ্যমান। বৈদ্যকুলসম্ভূত শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুরেরও বহু ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, এখনও সেই পরিবারভুক্ত অনেক ব্রাহ্মণ আছেন। সদ্‌গোপকুলোদ্ভব শ্রীল শ্যামানন্দঠাকুরেরও বহু ব্রাহ্মণ মন্ত্রশিষ্য ছিলেন, এখনও শ্যামানন্দ-পরিবার-ভুক্ত বহু ব্রাহ্মণ দৃষ্ট হয়েন। শ্রীমন্‌ মহাপ্রভুর আবির্ভাবের পূর্ব্বে, শ্রীল রামানুজাচার্য্য যাঁহার নিকটে দীক্ষাগ্রহণের জন্য ব্যাকুল হইয়াছিলেন, তিনিও ব্রাহ্মণ ছিলেন না।

মূলকথা হইতেছে এই যে—জাতিকুলাদি হইতেছে প্রাকৃত দেহের ; ব্যবহারিক প্রাকৃত ব্যাপারেই এ সমস্তের মর্য্যাদা সমধিক। পারমার্থিক ব্যাপার প্রাকৃত জাতিকুলাদির অতীত। পারমার্থিক শ্রেয়োলাভের জন্য যাঁহার পিপাসা জাগে, তাঁহার পক্ষে জাতিকুলাদি অপেক্ষা পারমার্থিকতাই বিশেষ আদরণীয়। এজন্য শ্রীভগবান্‌ও বলিয়া গিয়াছেন—"ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্‌ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথাহ্যহম্॥ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস ॥১০।৯১-ধৃত ভগবদ্‌বাক্য।" শ্রীপ্রহ্লাদও বলিয়াছেন "বিপ্রাদ্‌দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভ-পাদারবিন্দবিমুখাৎ শ্বপচং বরিষ্ঠম্। মন্যে তদর্পিতমনোবচনেহিতার্থপ্রাণং পুনাতি স কুলং ন তু ভূরিমানঃ॥ শ্রীভা, ৭।৯।১০॥" এবং এজন্যই ইতিহাসসমুচ্চয় বলিয়াছেন—"শূদ্রং বা ভগবদ্‌ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবম্॥ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস॥ ১০।৮৬-ধৃত-প্রমাণ॥" আদি-

পুরাণে অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণের উক্তিও তদ্রূপ। "সর্ব্বত্র গুরবো ভক্তা বয়ঞ্চ গুরবো যথা॥ হ, ভ, বি, ১০।৯৩-ধৃত প্রমাণ।"

যাহা হউক, একজনই শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরু হইতে পারেন, তাহাতে বাধা কিছু নাই।

(১) বিরোধ-সমাধানে শ্রুতি-প্রমাণ

বিরোধের সমাধান-বিষয়ে উপরে যে কথাগুলি বলা হইল, শ্রুতি হইতেও তাহার সমর্থন পাওয়া যায়। তাহা প্রদর্শিত হইতেছে।

ছান্দোগ্যশ্রুতির পঞ্চম অধ্যায় হইতে জানা যায়—উপমন্যুর পুত্র প্রাচীনশাল, পুলুষপুত্র সত্যযজ্ঞ, ভাল্লবিপুত্র ইন্দ্রদ্যুম্ন, শর্করাক্ষপুত্র জন এবং অশ্বতরাশ্বপুত্র বুড়িল-এই পাঁচজন মহাশাল (খুব বড় গৃহস্থ) এবং মহাশ্রোত্রিয় (শ্রুতাধ্যয়নবৃত্ত সম্পন্ন) ব্রাহ্মণসন্তান মিলিত হইয়া আত্মতত্ত্ব ও ব্রহ্মতত্ত্ব নিরূপণের নিমিত্ত আলোচনায় প্রবৃত্ত হইয়া কিছু স্থির করিতে না পারিয়া মনে করিলেন, আরুণি উদ্দালক ঋষি তাঁহাদের অভীষ্ট তত্ত্ব তাঁহাদিগকে জানাইতে পারিবেন। তদনুসারে তাঁহারা উদ্দালকের নিকটে উপনীত হইলেন। উদ্দালক মনে করিলেন—কেকয়নন্দন রাজা অশ্বপতিই হইতেছেন তৎকালীন ব্রহ্মজ্ঞ ব্যক্তি ; সুতরাং তিনিই ব্রহ্মতত্ত্বোপদেশ-বিষয়ে উদ্দালক অপেক্ষাও যোগ্যতর ব্যক্তি। উদ্দালক তখন তাঁহাদিগকে লইয়া ক্ষত্রিয় অশ্বপতির নিকটে গেলেন। অশ্বপতি তাঁহাদিগকে যথোচিত সম্বর্দ্ধনা করিলে তাঁহারা তাঁহাদের অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলেন। অশ্বপতি বলিলেন, পরের দিন প্রাতঃকালে তিনি তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করিবেন। তদনুসারে পরের দিন পূর্ব্বাহ্নে, মুণ্ডকশ্রুতিপ্রোক্ত "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্"-বাক্যানুসারে সমিৎপাণি হইয়া তাঁহারা অশ্বপতির নিকটে উপনীত হইলেন। রাজা তাঁহাদের প্রত্যেককেই যথাযথ ভাবে তাঁহাদের অভিলষিত বৈশ্বানরবিদ্যা দান করিলেন। উদ্দালককেও তিনি বিদ্যা প্রদান করিয়াছিলেন।

এই বিবরণ হইতে জানা গেল—মহাশ্রোত্রিয় ব্রাহ্মণগণ তাঁহাদের কুলের এবং শাস্ত্রজ্ঞত্বের অভিমান সম্যক্‌রূপে পরিত্যাগ করিয়া অতি বিনীত ভাবে—গুরুর নিকটে উপনীত হওয়ার শ্রুতিপ্রোক্ত বিধানের অনুসরণ করিয়া—সমিৎপাণি হইয়া, তাঁহাদের অপেক্ষা হীন ক্ষত্রিয়কুলে উদ্ভূত রাজা অশ্বপতির সমীপে উপনীত হইয়াছিলেন। ছান্দোগ্যশ্রুতি হইতে জানা যায়, গুরুকে যেভাবে আহ্বান করিতে হয়, তাঁহারাও ঠিক সেইভাবে "ভগবন্" বলিয়া তাঁহাদের গুরু ক্ষত্রিয় অশ্বপতিকে আহ্বান করিয়াছেন।

বৃহদারণ্যকশ্রুতির দ্বিতীয় অধ্যায় হইতে জানা যায়—বালাকি-নামক গর্গবংশীয় গর্বিতস্বভাব এক ব্রাহ্মণ কাশীরাজ অজাতশত্রুর নিকটে উপনীত হইয়া বলিলেন—"আমি তোমাকে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিব।" কাশীরাজ তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিলেন, বালাকিও স্বীয় বুদ্ধি অনুসারে ব্রহ্মতত্ত্ব বলিতে লাগিলেন ; বালাকি যখন যাহা বলেন, অজাতশত্রু তখনই তাহা খণ্ডন করেন। বালাকির ব্রহ্মবিষয়কজ্ঞান নিঃশেষ হইয়া গেল, তিনি আর কিছু বলিতে অসমর্থ হইয়া অধোমুখে চুপ করিয়া রহিলেন। তখন অজাতশত্রু বলিলেন—

"এপর্য্যন্তই তো ? অর্থাৎ তোমার ব্রহ্মবিষয়ক জ্ঞান এখানেই কি পরিসমাপ্ত হইল ?" তখন বালাকি বলিলেন—"ইহার অধিক আমার জানা নাই।" তখন রাজা বলিলেন—"তোমার এই জ্ঞানই ব্রহ্মজ্ঞানের পক্ষে যথেষ্ট নহে।" তখন বালাকি কাশীরাজকে বলিলেন—শিষ্যরূপে আমি আপনার আশ্রয় গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করি। "স হোবাচ গার্গ্যে উপ ত্বা যানীতি ॥ বৃ, আ, ২।১।১৪ ॥" তখন কাশীরাজ অজাতশত্রু বালাকিকে বলিলেন—তুমি ব্রাহ্মণ, আমি ক্ষত্রিয় ; তুমি যে আমার নিকটে ব্রহ্মতত্ত্ব জানিতে চাহিতেছ, ইহা প্রতিলোম। যাহা হউক, আমি তোমাকে অবশ্যই ব্রহ্ম বিষয়ে জানাইব। "স হোবাচাজাতশত্রুঃ প্রতিলোমং চৈতৎ, যদ্ ব্রাহ্মণঃ ক্ষত্রিয়মুপেয়াদ্—ব্রহ্ম মে বক্ষ্যতীতি। ব্যেব ত্বা জ্ঞাপয়িষ্যামীতি ॥ বৃ, আ ২।১।১৫ ॥" এই কথা বলিয়া কাশীরাজ বালাকির হস্তদ্বয় ধারণ করিয়া উত্থিত হইলেন এবং উভয়ে একজন সুপ্ত পুরুষের নিকটে গেলেন ; কাশীরাজ সেস্থানে যথাযথ ভাবে বালাকিকে ব্রহ্মবিদ্যা উপদেশ করিলেন।

উল্লিখিত শ্রুতিকথিত বিবরণ হইতে জানা যায়, ব্রাহ্মণও ক্ষত্রিয়ের নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান লাভ করিতে পারেন।

নিম্নবর্ণের লোক উচ্চবর্ণের লোকের নিকট হইতে শিক্ষা লাভ করিলে তাহাকে বলে "অনুলোম" আচার ; আর, উচ্চবর্ণের লোক নিম্নবর্ণের লোকের নিকটে শিক্ষা লাভ করিলে তাহাকে বলে "প্রতিলোম" আচার। সামাজিক বিধানে অনুলোম আচারই বিধেয়, প্রতিলোম বিধেয় নহে। কিন্তু উল্লিখিত শ্রুতি-বিবরণ হইতে জানা গেল—পরমার্থ-বিষয়ে সামাজিক বিধানের প্রাধান্য নাই। বস্তুতঃ, যে সামাজিক আচার পরমার্থ-বিরোধী, পরমার্থ-বিষয়ে তাহার প্রাধান্য থাকা সঙ্গতও নয়। উপযুক্ত গুরুর নিকটে উপযুক্ত শিষ্য পরমার্থ-বস্তু লাভ করিতে গেলে যদি কোনও সামাজিক আচারের লঙ্ঘন করিতেও হয়, তাহা হইলে তাহাও কর্ত্তব্য। এতাদৃশ লঙ্ঘনে সমাজও যে কোনও আপত্তি করেনা, উল্লিখিত বিবরণ হইতে তাহাও জানা যায় ; কেননা, ছান্দোগ্য-শ্রুতির বিবরণে এবং বৃহদারণ্যক-শ্রুতির বিবরণে দেখা যায়, উভয় স্থানেই প্রতিলোম আচরণ করা হইয়াছে ; কিন্তু তজ্জন্য কাহাকেও যে সমাজে অবজ্ঞাত হইতে হইয়াছে, তাহার কোনওরূপ ইঙ্গিত পর্য্যন্তও শ্রুতিতে দৃষ্ট হয় না।

প্রশ্ন হইতে পারে—প্রতিলোম যদি পরমার্থ-বিষয়ে দূষণীয় না হইবে, তাহা হইলে বালাকি যখন অজাতশত্রুর নিকটে ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন, তখন অজাতশত্রু কেন বলিলেন—ইহা তো প্রতিলোম হয় ?

উত্তরে বলা যায়—বালাকির মধ্যে শিষ্যের যোগ্যতা আসিয়াছে কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্তই অজাতশত্রু উল্লিখিতরূপ কথা বলিয়াছেন। যোগ্য শিষ্য না হইলে কোনও যোগ্য গুরুই কোনওরূপ উপদেশ দেন না, তাহা শাস্ত্রের বিধানও নহে। কুলের এবং বিদ্যার গৌরবে বালাকি ছিলেন অত্যন্ত গর্বিত ; তাই তিনি অজাতশত্রুকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করিতে আসিয়াছিলেন—উপযাচক হইয়া। শেষ পর্য্যন্ত যখন বুঝিলেন যে, অজাতশত্রুকে ব্রহ্মজ্ঞান উপদেশ করার যোগ্যতা তাঁহার নাই, তখন

তাঁহার পূর্ব্ব ঔদ্ধত্যের কথা স্মরণ করিয়া বালাকি লজ্জায় অধোমুখ হইয়া রহিলেন এবং অজাতশত্রুর নিকটেই ব্রহ্মজ্ঞান প্রার্থনা করিলেন। তাঁহার ঔদ্ধত্য বা গর্ব্ব তখনও আছে কিনা, তাহা জানিবার নিমিত্তই অজাতশত্রু তাঁহাকে প্রাতিলোম্যের কথা জানাইলেন ; অজাতশত্রুর মুখে প্রাতিলোম্যেব কথা শুনিয়া বালাকি আরও লজ্জিত হইলেন ; তাঁহার এই লজ্জা দেখিয়াই অজাতশত্রু বুঝিতে পারিলেন—বালাকির গর্ব্ব দূরীভূত হইয়াছে, শিষ্য হওয়ার যোগ্যতা তাঁহার মধ্যে আসিয়াছে। তাই তিনি বলিলেন—"আমি তোমাকে ব্রহ্মজ্ঞান জানাইব।" বালাকির লজ্জা এবং তজ্জনিত সঙ্কোচ দূর করার জন্যই অজাতশত্রু তাঁহার হস্তদ্বয় ধরিয়া উঠিয়া তাঁহাকে ব্রহ্মজ্ঞান জানাইবার জন্য অগ্রসর হইলেন। ছান্দোগ্যকথিত বিবরণে উপমন্যু-পুত্র প্রভৃতি প্রথম হইতেই বিনীত ভাবে অশ্বপতির নিকটে উপনীত হইয়াছিলেন, তাঁহাদের চিত্তে কোনওরূপ অভিমান ছিলনা বলিয়া অশ্বপতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, তাঁহাদের মধ্যে শিষ্যের যোগ্যতা বিরাজিত ; তাই অনাবশ্যক বোধে তিনি তাঁহাদের নিকটে প্রাতিলোম্যের কথা উত্থাপন করেন নাই।

পারমার্থিক ব্যাপারেও যাঁহারা পরমার্থ-বিরোধী সামাজিক আচরণের উপরে প্রাধান্য দিতে চাহেন, সহজেই বুঝা যায়—পরমার্থভূত বস্তু অপেক্ষা সমাজই তাঁহাদের নিকটে অধিকতর আদরণীয়। তাঁহাদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁহাদের অভিরুচি অনুসারেই তাঁহারা চলিবেন এবং সেইরূপ ভাবে চলাই তাঁহাদের পক্ষে মঙ্গলজনক। নচেৎ, পরমার্থ-বিরোধী সামাজিক আচরণের প্রতি গুরুত্ব দেখাইতে যাইয়া পরমার্থভূত বস্তুসম্বন্ধীয় ব্যাপারে তাঁহাদিগকে হয়তো অপরাধী হইতে হইবে।

অশ্বপতি বা অজাতশত্রু কি দীক্ষাগুরু ?

প্রশ্ন হইতে পারে—অশ্বপতি বা অজাতশত্রু যে ব্রাহ্মণদিগকে ব্রহ্মজ্ঞান দিয়াছিলেন, তাঁহারা কি সেই ব্রাহ্মণদিগের দীক্ষাগুরু ?

এই প্রশ্নের উত্তর পাইতে হইলে দীক্ষা-শব্দে কি বুঝায়, তাহা জানা দরকার। বিষ্ণু-যামলের বচন উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন,

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥১।৭॥

—যেহেতু, দিব্যজ্ঞান প্রদান করে এবং পাতকরাশির বিনাশ করিয়া দেয়, এজন্য তত্ত্বকোবিদ্ গুরুজনেরা উহাকে দীক্ষা বলেন।"

দিব্যজ্ঞান লাভ হইলেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। সুতরাং দীক্ষার তাৎপর্য্য হইতেছে—দিব্য-জ্ঞান-প্রদান। ব্রহ্মজ্ঞানই দিব্যজ্ঞান। অশ্বপতি উপমন্যু-পুত্রাদিকে এবং অজাতশত্রু বালাকিকে দিব্যজ্ঞানই প্রদান করিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে দীক্ষাগুরু বলিতে কি আপত্তি থাকিতে পারে ?

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—তন্ত্রাদি শাস্ত্র হইতে জানা যায়, কতকগুলি শাস্ত্রবিহিত অনুষ্ঠানের

অন্তে যিনি শিষ্যকে মন্ত্রোপদেশ করেন, তিনিই দীক্ষাগুরু। অশ্বপতি বা অজাতশত্রু কি সেই রকম কিছু করিয়াছিলেন ? যদি না করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদিগকে শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরু বলা যায় ; কিন্তু দীক্ষাগুরু বলা যায় না।

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। দীক্ষাপ্রসঙ্গে তন্ত্রাদি শাস্ত্রে যে সমস্ত অনুষ্ঠানের কথা বলা হইয়াছে, সে-সমস্ত হইতেছে দীক্ষার অঙ্গ, কিন্তু অঙ্গী হইতেছে দিব্যজ্ঞান। গুরুদেবের চিত্তকে দীক্ষাদানের এবং শিষ্যের চিত্তকে দীক্ষাগ্রহণের উপযোগী করার জন্য সে-সমস্ত-অনুষ্ঠানের প্রয়োজনীয়তা অবশ্যই আছে। কিন্তু সে-সমস্ত অনুষ্ঠানের প্রত্যেকটীই অবশ্যকর্ত্তব্য বলিয়া মনে হয় না ; কেননা, সংক্ষিপ্ত-দীক্ষার বিধিও দৃষ্ট হয়। পারমার্থিক ব্যাপারে অঙ্গীরই প্রাধান্য, অঙ্গের প্রাধান্য নাই ; অঙ্গী মুখ্য, অঙ্গ গৌণ। যে-স্থলে অঙ্গী অবিকল থাকে, সে স্থলে অঙ্গ-বৈকল্য দূষণীয় হয় না; তাহা যদি হইত, তাহা হইলে সংক্ষিপ্ত-দীক্ষার বিধান থাকিত না। অশ্বপতি এবং অজাতশত্রুর ব্যাপারে অঙ্গীর বৈকল্য ছিলনা ; তাঁহারা দিব্যজ্ঞান বা ব্রহ্মজ্ঞানই দিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহাদিগকে দীক্ষাগুরু বলিয়া স্বীকার করিলে আপত্তির কিছু থাকিতে পারে বলিয়া মনে হয়না। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্। তস্মৈ স বিদ্বানুপসন্নায় সম্যক্ প্রশান্তচিত্তায় শমান্বিতায়। যেনাক্ষরং পুরুষং বেদ সত্যং প্রোবাচ তাং তত্ত্বতো ব্রহ্মবিদ্যাম্॥"-ইত্যাদি মুণ্ডকবাক্যে, যিনি উপযুক্ত শিষ্যকে ব্রহ্মবিদ্যা দান করেন, তাঁহাকেই গুরু বলা হইয়াছে। অশ্বপতি এবং উপমন্যু-পুত্রাদি, অজাতশত্রু এবং বালাকি, উদ্দালক এবং শ্বেতকেতু প্রভৃতির বিবরণ হইতে জানা যায় – শ্রবণ-গুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু সাধারণতঃ একজনই। উপমন্যু-পুত্রাদি, বালাকি, কিম্বা শ্বেতকেতু— ইঁহাদের কেহ যে অন্য কাহারও নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াছিলেন, শ্রুতি হইতে তাহা জানা যায় না। উপমন্যু-পুত্রাদিকে ব্রহ্মজ্ঞান জানাইয়া অশ্বপতি তাঁহাদিগকে বলেন নাই—"তোমরা এখন যথাবিধি দীক্ষা গ্রহণ কর।" অজাতশত্রুও বালাকিকে তদ্রূপ কোনও কথা বলেন নাই, উদ্দালকও শ্বেতকেতুকে তাহা বলেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়—তাঁহারাই তাঁহাদিগকে "দিব্যজ্ঞান—সুতরাং দীক্ষা" প্রদান করিয়াছিলেন, তাঁহারাই ছিলেন তাঁহাদের দীক্ষাগুরু।

যুক্তির অনুরোধে যদি স্বীকারও করা যায় যে, অশ্বপতি এবং অজাতশত্রু ব্রাহ্মণ উপমন্যু-পুত্রাদির দীক্ষাগুরু ছিলেন না, তাঁহারা ছিলেন শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরু, তাহা হইলেও ক্ষত্রিয় হইয়াও তাঁহারা যে ব্রাহ্মণের গুরু হইয়াছিলেন, তাহা অস্বীকার করা যায় না। শ্রবণগুরুও গুরু এবং শিক্ষাগুরুও গুরু। অশ্বপতি এবং অজাতশত্রু তাঁহাদের ব্রাহ্মণশিষ্যগণকে পরমার্থবিষয়েই শিক্ষা দিয়াছিলেন, বা শ্রবণ করাইয়াছিলেন ; সুতরাং কর্ম্মকাণ্ডবিষয়ক গুরু অপেক্ষা তাঁহাদের উৎকর্ষ অনস্বীকার্য্য। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২১১-অনুচ্ছেদে) লিখিয়াছেন—"স্বগুরৌ কর্ম্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যেত্যাহ—আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥" তিনি বলেন, "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"-ইত্যাদি শ্লোকটী "ব্রহ্মচারি-

ধর্ম্মান্তঃপঠিতমিদং—ব্রহ্মচারীর ধর্ম্ম বর্ণনপ্রসঙ্গে উল্লিখিত হইয়াছে।" ব্রহ্মচর্য্য হইতেছে কর্ম্মমার্গের চারিটী আশ্রমের মধ্যে প্রথম আশ্রম ; এজন্য উল্লিখিত শ্লোকের প্রমাণবলে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"কর্ম্মীদের পক্ষেও স্বীয় গুরুর প্রতি ভগবদ্দৃষ্টি কর্ত্তব্য।" সুতরাং যাঁহারা পরমার্থবিষয়ে উপদেষ্টা, তাঁহাদের প্রতিও যে ভগবদ্দৃষ্টি কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। "ততঃ সুতরামেব পরমার্থিভিস্তাদৃশে গুরাবিত্যাহ—যস্য সাক্ষাদ্ ভগবতি-ইত্যাদি ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥ ২১২ ॥" (পরবর্ত্তী ৭১-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। উপমন্যু-পুত্রাদির পক্ষেও অশ্বপতির প্রতি ভগবদ্দৃষ্টি - সুতরাং ভগবানের ন্যায়-পূজ্যত্ববুদ্ধি - কর্ত্তব্য। তাঁহারা তাহা করিয়াছেনও ; উপমন্যু-পুত্রাদি অশ্বপতিকে "ভগবন্" বলিয়া সম্বোধন করিয়াছেন। দীক্ষাগুরুর সম্বন্ধেও ভগবদ্বুদ্ধি এবং ভগবানের ন্যায় পূজ্যত্ববুদ্ধির পোষণ শিষ্যের পক্ষে কর্ত্তব্য। এইরূপে দেখা গেল—অশ্বপতি এবং অজাতশত্রু উপমন্যুপুত্রাদির এবং বালাকির শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরু হইলেও তাঁহারা দীক্ষাগুরুর ন্যায় পূজ্য। পূজ্যত্বাংশে দীক্ষাগুরু এবং শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরুতে পার্থক্য কিছু নাই। কিন্তু উপমন্যুপুত্রাদি এবং বালাকি ব্রাহ্মণ হইয়াও—সুতরাং ক্ষত্রিয়াদি সকল বর্ণের গুরু হইয়াও—পরমার্থোপদেষ্টা ক্ষত্রিয়কে ভগবানের ন্যায় পূজ্য মনে করিয়াছেন এবং ক্ষত্রিয়ের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধিও পোষণ করিয়াছেন।

ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদিকে গুরুরূপে বরণ করা-বিষয়ে আপত্তির একমাত্র কারণ হইতে পারে এই যে—ব্রাহ্মণ হইতেছেন ক্ষত্রিয়াদি অন্য সমস্ত বর্ণের গুরু—সুতরাং পূজ্য। ক্ষত্রিয়াদি কিন্তু ব্রাহ্মণের পূজ্য নহেন। সুতরাং ব্রাহ্মণ যদি ক্ষত্রিয়কে গুরুরূপে বরণ করেন, তাহা হইলে ক্ষত্রিয় হইয়া পড়েন ব্রাহ্মণের পূজ্য। ইহা সঙ্গত হয় না। উত্তরে বক্তব্য এই—বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যাপারে ইহা সঙ্গত না হইতে পারে ; কিন্তু পরমার্থ-বিষয়ে ইহা যে অসঙ্গত নহে, শ্রুতিপ্রোক্ত অশ্বপতি এবং অজাতশত্রুর বিবরণই তাহার প্রমাণ।

পরমার্থবিষয়ে শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরুর প্রতিও যখন দীক্ষাগুরুর ন্যায়ই ভগবদ্বুদ্ধি এবং ভগবানের ন্যায় পূজ্যত্ববুদ্ধি পোষণ করা কর্ত্তব্য, তখন প্রতিলোম-ক্রমে শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরুর চরণাশ্রয় অবিধেয় না হইলে, প্রতিলোম-ক্রমে দীক্ষাগুরুর চরণাশ্রয়েই বা আপত্তির কি হেতু থাকিতে পারে ?

যদি বলা যায়—ভক্তিমার্গের সাধনে, বিশেষতঃ রাগানুগার অন্তর-সাধনে দীক্ষাগুরু হইতেছেন সাধকের নিত্যসঙ্গী, সিদ্ধাবস্থাতেও দীক্ষাগুরু নিত্যসঙ্গী। কিন্তু শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরু তদ্রূপ নিত্যসঙ্গী নহেন। এই বিষয়ে দীক্ষাগুরুর একটী অসাধারণ বৈশিষ্ট্য আছে ; সুতরাং নিম্নবর্ণের লোক শিক্ষাগুরু বা শ্রবণগুরু হইতে পারিলেও দীক্ষাগুরু হইতে পারেন না।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। প্রথমতঃ, লোকের দেহই হইতেছে ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়াদি, দেহী জীবাত্মার কোনও বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই। "নাহং বিপ্রো ন চ নরপতিঃ"-ইত্যাদি বাক্যে শ্রীমন্মহাপ্রভুই তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। আবার. শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়া গিয়াছেন—পারমার্থিক ভজনাদি জড় দেহ বা দেহমধ্যবর্ত্তী ইন্দ্রিয়াদি করে না, দেহের বা ইন্দ্রিয়াদির

সহায়তায় ভগবদনুগ্রহে দেহীই করে। দীক্ষাদান এবং দীক্ষাগ্রহণও দেহের বা ইন্দ্রিয়ের সহায়তায় দেহীই নির্ব্বাহ করে, সুতরাং এ-বিষয়ে ব্রাহ্মণাদিরূপ দেহের প্রাধান্য কিছু নাই। সকল বর্ণের মধ্যেই দেহী এক রকম। দ্বিতীয়তঃ, রাগানুগামার্গের অন্তর-সাধনে শ্রীগুরুদেবের, বা শিষ্যের যথাবস্থিত দেহের চিন্তা করিতে হয় না, চিন্তনীয় হইতেছে উভয়েরই অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ। এই সিদ্ধদেহ গুরু ও শিষ্যের উভয়েরই একজাতীয়—ব্রজভাবের উপাসকের পক্ষে—গোপজাতীয়। সিদ্ধাবস্থাতেও উভয়েই গোপজাতীয়। যথাবস্থিতদেহের চিন্তা যখন নাই, তখন গুরুদেব যথাবস্থিত দেহে যে বর্ণসম্ভূতই হউন না কেন, তাহাতে কিছু আসে যায় না। যে বর্ণসম্ভূতই হউন না কেন, অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহ বা পরিকররূপ সিদ্ধদেহ গুরু ও শিষ্য উভয়েরই একজাতীয়। এ বিষয়ে ক্ষত্রিয়াদি অপেক্ষা ব্রাহ্মণের বৈশিষ্ট্য কিছু দৃষ্ট হয় না। এই আলোচনা হইতে বুঝা গেল—শিক্ষাগুরু বা শ্রবণগুরু হইতে সাধনবিষয়ে দীক্ষাগুরুর বৈশিষ্ট্য থাকিলেও অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে বা পরিকররূপ সিদ্ধদেহে যথাবস্থিতদেহের বৈশিষ্ট্যের কোনও স্থান নাই বলিয়া প্রতিলোম-ক্রমে দীক্ষাগ্রহণ ভজনবিরোধী—সুতরাং অবিধেয়—হইতে পারে না। যথাবস্থিত দেহের বর্ণাদির প্রতি গুরুত্ব-প্রদর্শন দেহাবেশেরই পরিচায়ক—সুতরাং তাহা পরমার্থ-বিরোধী বলিয়াই মনে হয়।

প্রতিলোম দীক্ষা এবং বর্ণাশ্রমধর্ম্ম

যদি কেহ বলেন—"বর্ণানাং ব্রাহ্মণো গুরুঃ"; ব্রাহ্মণই হইতেছেন সমস্ত বর্ণের গুরু; সুতরাং ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়াদির নিকটে দীক্ষা গ্রহণ হইবে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী। শ্রীমন্মমহাপ্রভুও সর্ব্বদা বর্ণশ্রামধর্ম্মের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া গিয়াছেন; তিনি যে ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণব্যতীত অপরের হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করেন নাই, তাহাই ইহার প্রমাণ।

উত্তরে বক্তব্য এই। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মই হইতেছে বৈদিক সমাজের ভিত্তি। বর্ণাশ্রম ধর্ম্ম পরিত্যাগের অধিকার যাঁহার জন্মে নাই, তাঁহার পক্ষে বর্ণাকম-ধর্ম্মের ত্যাগ বা অমর্য্যাদা যে অবিধেয়, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। ব্রাহ্মণই হইতেছেন বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষক; এজন্য বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-বিষয়ে ব্রাহ্মণই হইতেছেন সকল বর্ণের গুরু; তাহা অস্বীকার করা যায় না।

কিন্তু বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের বা কর্ম্মের অনুষ্ঠান যদি তত্ত্বজিজ্ঞাসায় বা পরমার্থে পর্য্যবসিত না হয়, তাহা হইলে সেই অনুষ্ঠানের সার্থকতা থাকে না। "ধর্ম্মস্য হ্যাপবর্গস্য নার্থোঽর্থায়োপকল্পতে। নার্থস্য ধর্ম্মৈকান্তস্য কামো লাভায় হি স্মৃতঃ॥ কামস্য নেন্দ্রিয়প্রাতি র্লাভো জীবেত যাবতা। জীবস্য তত্ত্বজিজ্ঞাসা নার্থো যশ্চেহ কর্ম্মভিঃ॥ শ্রীভা, ১।২।৯-১০॥"-বাক্যের তাৎপর্য্যও তাহাই (পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৩-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকদ্বয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। আবার, "ধর্ম্মঃ স্বনুষ্ঠিতঃ পুংসাং বিষ্বকসেনকথাসু যঃ। নোৎপাদয়েৎ যদি রতিং শ্রম এব হি কেবলম্॥ শ্রীভা, ১।২।৮॥"-বাক্যও তাহাই বলিয়াছেন। বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মকে সার্থক করিতে হইলে যদি তাহাকে পরমার্থভূত বস্তুতেই পর্য্যবসিত করিতে হয়, তাহা হইলে পরমার্থভূত বস্তু লাভের উদ্দেশ্যে বর্ণাশ্রম-বিহিত কোনও

আচারের লঙ্ঘনেও বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অমর্য্যাদা হইতে পারে না। পরমার্থভূত বস্তুর জন্য অধিকারীর পক্ষে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-ত্যাগের বিধানের অন্তরালেও সেই তত্ত্বই নিহিত রহিয়াছে। বিশেষতঃ, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, অনুলোম ব্যবহার হইতেছে একটী আচার মাত্র; ইহাকে বরং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের অঙ্গ বলা যায়; ইহা অঙ্গী নহে। পরমার্থভূত বস্তু লাভের জন্য যাঁহার আগ্রহ জন্মে, এই আচারের লঙ্ঘনে তাঁহার কোনওরূপ প্রত্যবায় হইতে পারে না; পরমার্থভূত বস্তুর জন্য অঙ্গী বর্ণাশ্রম-ধর্ম্ম-ত্যাগেও যখন কোনও প্রত্যবায় হয় না, তখন অঙ্গ আচারের লঙ্ঘনেও প্রত্যবায় হইতে পারে না। তাহাতে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শনও হয় না। পূর্ব্বে ছান্দোগ্যশ্রুতি এবং বৃহদারণ্যকশ্রুতি হইতে যে অশ্বপতি এবং অজাতশত্রুর বিবরণ উল্লিখিত হইয়াছে, তাহা হইতেও ইহা সমর্থিত হয়। উদ্দালক এবং উপমন্যু-আদির পুত্রগণ ব্রাহ্মণ হইয়াও যে ক্ষত্রিয় অশ্বপতির নিকটে ব্রহ্মবিদ্যা লাভের জন্য উপনীত হইয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ হইয়াও যে বালাকি ক্ষত্রিয় অজাতশত্রুর নিকটে ব্রহ্মবিদ্যা গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহাতে তাঁহাদের পক্ষে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের প্রতি অমর্য্যাদা প্রদর্শিত হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তাঁহারা সকলেই ছিলেন ব্রাহ্মণ—সুতরাং বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের রক্ষক এবং সকল বর্ণের গুরুস্থানীয়। ইহা তাঁহারা জানিতেনও। তথাপি যে তাঁহারা ব্রহ্মবিদ্যার্থী হইয়া ক্ষত্রিয়ের নিকটে আসিয়াছিলেন এবং "বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হইয়া আমাদের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ সঙ্গত নয়"-এইরূপ কোনও ভাবই যে তাঁহাদের মনে জাগে নাই, তাহাতেই বুঝা যায় যে, তাঁহারা মনে করিয়াছিলেন, পরমার্থভূত বস্তু লাভের জন্য ব্রাহ্মণের পক্ষে ক্ষত্রিয়ের শিষ্যত্ব অঙ্গীকার বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী নহে; ইহা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী হইলে বর্ণাশ্রমধর্ম্মের রক্ষক হইয়া তাঁহারাও ক্ষত্রিয়ের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিতেন না এবং ক্ষত্রিয়-রাজগণও তাঁহাদিগকে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিতেন না। ইহা বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী হইলে উদ্দালক-বালাকি প্রভৃতিকে ব্রাহ্মণসমাজে অবজ্ঞাতও হইতে হইত; কিন্তু এজন্য তাঁহারা যে ব্রাহ্মণ সমাজে অবজ্ঞাত হইয়াছিলেন, শ্রুতি হইতে তাহা জানা যায় না।

বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-কথনপ্রসঙ্গে মনু বলিয়াছেন—"অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে॥ মনু-সংহিতা॥ ২।২৪১॥—ব্রাহ্মণ ব্রহ্মচারী আপৎকালে অব্রাহ্মণ অর্থাৎ ব্রাহ্মণেতর বর্ণাদির নিকট অধ্যয়ন করিতে পারেন (পঞ্চাননতর্করত্নকৃত অনুবাদ)।" ব্রহ্মচারী ব্রাহ্মণের অধ্যয়ন হইতেছে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, পারমার্থিক ধর্ম্ম নহে। এ-স্থলে কেবল আপৎ-কালেই প্রতিলোমক্রমে অধ্যাপক গুরুগ্রহণের বিধান দেওয়া হইয়াছে; ইহা সাধারণ ব্যবস্থা নহে। কিন্তু বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-কথন-প্রসঙ্গেই মনু বলিয়াছেন—"শ্রদ্দধানঃ শুভাং বিদ্যামাদদীতাবরাদপি। অন্ত্যজাদপি পরং ধর্ম্মং স্ত্রীরত্নং দুষ্কুলাদপি॥ ২।২৩৮॥" (পূর্ব্ববর্ত্তী ছ-উপ অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। এই শ্লোকে বলা হইয়াছে—অতি অন্ত্যজ চণ্ডালাদির নিকট হইতেও পরমধর্ম্ম (মোক্ষের উপায়স্বরূপ আত্মজ্ঞান) লাভ করিবে। এ-স্থলে আপৎকালের জন্য এই ব্যবস্থা নহে; ইহা সাধারণ ব্যবস্থা। পারমার্থিক বস্তু লাভ-বিষয়ে পাত্রা-

পাত্রের বা জাতিবর্ণাদির বিচার করা সঙ্গত নহে—ইহাই মনুসংহিতার অভিপ্রায়। অব্যবহিত পরবর্ত্তী শ্লোকদ্বয়ে মনু তাহা বলিয়াছেন—"বিষাদপ্যমৃতং গ্রাহ্যং বালাদপি সুভাষিতম্॥"-ইত্যাদি। ইহার পরেই মনু বলিয়াছেন—"অব্রাহ্মণাদধ্যয়নমাপৎকালে বিধীয়তে॥" ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—যাহা কেবল বর্ণাশ্রমধর্ম্ম, পরন্তু পরমার্থভূত বস্তু নহে, তাহা কেবল আপৎকালেই হীন বর্ণ হইতেও গ্রহণ করা যায়। বর্ণাশ্রমধর্ম্ম কথন-প্রসঙ্গেই যখন মনু একথা বলিয়াছেন, তখন বুঝা যায়—হীন বর্ণ হইতে পরমার্থভূত বস্তুর গ্রহণ উচ্চবর্ণের পক্ষেও বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী নহে।

এইরূপে দেখা গেল—পরমার্থভূত বস্তুর জন্য উচ্চবর্ণ লোকের পক্ষে নিম্নবর্ণের লোকের নিকটে দীক্ষাদিগ্রহণ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের বিরোধী নহে; অন্ততঃ শ্রুতিস্মৃতি ইহাকে বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিরোধী বলিয়া মনে করিতেন না।

মহাপ্রভুর ভিক্ষাগ্রহণসম্বন্ধেও বিবেচ্য বিষয় আছে বলিয়া মনে হয়। ভোজ্যান্নত্ব-বিচার বা অভোজ্যান্নত্ব-বিচার হইতেছে একটী সামাজিক আচার-মাত্র। এই জাতীয় আচারের পরিবর্ত্তনও হয়। সন্ন্যাসীর আচরণ সম্বন্ধেই বিবেচনা করা যাউক। শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য বলিয়াছেন—"অন্নদোষে সন্ন্যাসীর দোষ নাহি হয়॥ 'নান্নদোষেণ মস্করী' এই শাস্ত্রের প্রমাণ॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১২।১৮৭-৮৮॥" শাস্ত্রপ্রমাণ হইতেছে এই :—"ন বায়ুঃ স্পর্শদোষেণ নাগ্নির্দহনকর্ম্মণা। নাপোমূত্রপুরীষাভ্যাং নান্নদোষেণ মস্করী॥ সন্ন্যাসোপনিষৎ॥ ৭২।—স্পর্শদোষে (অপবিত্র বস্তুর স্পর্শেও) বায়ু দূষিত হয় না, দহন-কার্য্যে (অপবিত্র অস্পৃশ্য বস্তুকে দগ্ধ করিলেও) অগ্নি দূষিত হয় না, মলমূত্রদ্বারা (মলমূত্রের সহিত মিশ্রিত হইলেও বৃহৎ জলরাশির) জল দূষিত বা অপবিত্র হয় না এবং অন্নদোষে (সামাজিক হিসাবে অস্পৃশ্য বা অনাচরণীয় লোকের অন্ন গ্রহণ করিলেও) সন্ন্যাসীর দোষ হয় না।" এক সময়ে এইরূপই বিধান ছিল। সন্ন্যাসীর পক্ষে তখন অন্নদোষের বিচার ছিল না। কিন্তু যে সময়ে শ্রীমন্মহাপ্রভু আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সেই সময়ে সন্ন্যাসীরাও ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণব্যতীত অপরের হাতে ভিক্ষা করিতেন না। নীলাচল হইতে প্রভু যখন বনপথে একাকী বৃন্দাবন গমন করিতে ইচ্ছা করিলেন, তখন স্বরূপদামোদর ও রায় রামানন্দ তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—'উত্তম ব্রাহ্মণ এক সঙ্গে অবশ্য চাহি। ভিক্ষা করি ভিক্ষা দিবে যাবে পাত্র বহি॥ বনপথে যাইতে নাহি ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ। আজ্ঞা কর সঙ্গে চলুক বিপ্র একজন॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১৭।১০-১১॥" সন্ন্যাসিগণ সেই সময়ে ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণব্যতীত অপর কাহারও অন্ন গ্রহণ করিতেন না বলিয়া অপর কেহ সন্ন্যাসীদের নিমন্ত্রণও করিতেন না। এজন্য মহাপ্রভুকে ভোজ্যান্নব্রাহ্মণের অন্নই গ্রহণ করিতে হইয়াছে। কোনও ভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ নিমন্ত্রণ করিলেও প্রভু "নিমন্ত্রণ মানিল তাঁরে 'বৈষ্ণব' জানিয়া॥ শ্রীচৈ,চ, ২।৮।৪৬॥" অভোজ্যান্ন কেহ নিমন্ত্রণ করিলে প্রভু যদি তাহা প্রত্যাখ্যান করিতেন, তাহা হইলেই বুঝা যাইত, এইরূপ আচরণকে তিনি অবশ্য-পালনীয় বলিয়া মনে করিতেন; কিন্তু তদনুরূপ কোনও প্রমাণ দৃষ্ট হয় না। বরং অন্যরূপ ব্যবহারের প্রমাণ পাওয়া যায়। মথুরায় সনৌড়িয়া ব্রাহ্মণ যখন প্রভুকে নিমন্ত্রণ করিলেন, তখন কথাপ্রসঙ্গে

সেই ব্রাহ্মণের মুখে প্রভু যখন শুনিলেন—শ্রীপাদ মাধবেন্দ্রপুরী তাঁহাকে শিষ্য করিয়া তাঁহার হাতে ভিক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তখন প্রভু বলিলেন—"পুরীগোসাঞির আচরণ—সেই ধর্ম্মসার॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১৭।১৭৫॥" মহাপ্রভু সেই সনৌড়িয়ার হাতেই ভিক্ষা করিতে চাহিলেন। সনৌড়িয়া ছিলেন অভোজ্যান্ন ব্রাহ্মণ। "সনৌড়িয়া ঘরে সন্ন্যাসী না করে ভোজন॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১৭।১৬৯॥" কিন্তু মহাপ্রভু তাঁহার ঘরে ভিক্ষা করিয়াছিলেন। "তবে সেই বিপ্র প্রভুকে ভিক্ষা করাইল॥ শ্রীচৈ,চ, ২।১৭।১৭৬॥"

সন্ন্যাসের পরে কাটোয়া হইতে প্রভু যখন শান্তিপুরে আসিয়াছিলেন, তখন আহারের জন্য শ্রীল অদ্বৈতাচার্য্য নিত্যানন্দ প্রভুকে এবং মহাপ্রভুকে গৃহমধ্যে যাইতে অনুরোধ করিলেন। তাঁহারাও উভয়ে গৃহমধ্যে প্রবেশ করিলেন; সে স্থানে অন্নাদি আহার্য্য বস্তু সমস্ত প্রস্তুত। তখন মহাপ্রভু মুকুন্দ ও হরিদাসকে আহারের জন্য ঘরের মধ্যে আসিতে ডাকিলেন। তাঁহারা অবশ্য তখন আহারের জন্য ঘরে প্রবেশ করেন নাই। হরিদাস ঠাকুর যদি যাইতেন, তাহা হইলে ভোজ্যদ্রব্য অপবিত্র হইয়াছে মনে করিয়া প্রভু নিশ্চয়ই আহার না করিয়া গৃহ হইতে বাহির হইয়া আসিতেন না। যবনকুলে হরিদাসের আবির্ভাব। তৎকালে প্রচলিত সামাজিক আচারের বিরোধী-ভাবের কথাই প্রভু বলিয়াছিলেন। শ্রীমদদ্বৈতাচার্য্যও সদাচারসম্পন্ন বহু ব্রাহ্মণের উপস্থিতি সত্ত্বেও হরিদাস ঠাকুরকে শ্রাদ্ধপাত্র দিয়াছিলেন। ইহাও সামাজিক আচরণের বিরোধী। তথাপি শ্রীল আদ্বৈতাচার্য্য হরিদাস ঠাকুরকে বলিয়াছিলেন—"সেই আচরিব, যেই শাস্ত্রমত হয়॥ 'তুমি খাইলে হয় কোটি ব্রাহ্মণ ভোজন।' এত বলি শ্রাদ্ধপাত্র করাইল ভোজন॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।২০৮-৯॥"

এ-সমস্ত বিবরণ হইতে জানা গেল—শাস্ত্রানুসারে যাহা পরমার্থভূত বস্তু, তাহার জন্য সামাজিক আচরণও লঙ্ঘিত হইতে পারে।

আলোচনার উপসংহার

পূর্ব্বোল্লিক্ষিত আলোচনা হইতে জানা গেল—দীক্ষাগুরুসম্বন্ধে পরস্পর-বিরোধী বাক্যসমূহের সমাধানসম্বন্ধে পূর্ব্বে (ছ-উপ অনুচ্ছেদে) যাহা বলা হইয়াছে, তাহা শ্রুতিসম্মত। পরমার্থভূত বস্তু লাভের জন্য যাঁহাদের বিশেষ আগ্রহ জন্মে, তাঁহারা তাঁহাদের অপেক্ষা নিম্নবর্ণে উদ্ভূত যোগ্য গুরুর চরণাশ্রয় করিতে পারেন; তাহাতে কোনও দোষ হয়না, তাহাতে বর্ণাশ্রধর্ম্মেরও অবমাননা হয় না। গৌড়ীয় বৈষ্ণব- সম্প্রদায় এই রীতি স্বীকার করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বোল্লিখিত নরহরি সরকার ঠাকুর, নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং শ্যামানন্দ ঠাকুরই তাহার প্রমাণ। তাঁহাদের কেহই ব্রাহ্মণকুলে জন্ম গ্রহণ করেন নাই, অথচ তাঁহাদের প্রত্যেকেরই ব্রাহ্মণ শিষ্য ছিলেন। তাঁহাদের শিষ্যপরম্পরার মধ্যে এখনও বহু ব্রাহ্মণ-সন্তান বর্ত্তমান, এই ব্রাহ্মণ-সন্তানগণকে এখনও ব্রাহ্মণসমাজে অবজ্ঞাত হইতে দেখা যায় না।

যদি বলা যায়—শ্রীল নরহরি সরকার ঠাকুর ছিলেন ভগবানের নিত্যপার্ষদ; শ্রীল নরোত্তনদাস ঠাকুর এবং শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরও ছিলেন পার্ষদতুল্য। তাঁহাদের আদর্শ অনুকরণীয় হইতে পারে-না।

ইহার উত্তরে বক্তব্য এই। জগতে ভজনের আদর্শ স্থাপনের উদ্দেশ্যে ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ নিত্যপার্ষদদের মধ্যেও লীলাশক্তি সাধকোচিত ভাব স্ফুরিত করাইয়া থাকেন। এজন্য নিত্য-পার্ষদগণও নিজেদিগকে নিত্যপার্ষদ বলিয়া মনে করেন না। বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাঁহাদিগকে তাঁহাদের লৌকিক পরিচয়েই পরিচিত করিয়াছেন। নিত্যভগবৎ-পার্ষদ শ্রীল রঘুনাথ দাস গোস্বামী কায়স্থকুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন। শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১।২-শ্লোকের টীকায় তাঁহাকে "কায়স্থ" এবং "পরমভাগবত" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। "শ্রীরঘুনাথদাসো নাম গৌড়কায়স্থকুলাব্জ-ভাস্করঃ পরমভাগবতঃ শ্রীমথুরাশ্রিতঃ"-ইত্যাদি। যিনি যে কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সমাজেও তিনি সেই কুলোদ্ভুত বলিয়াই পরিচিত হইতেন এবং তাঁহার আচরণও সাধারণতঃ তদনুরূপই ছিল। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর পার্ষদগণের মধ্যে যাঁহারা রথযাত্রা উপলক্ষ্যে নীলাচলে যাইতেন, তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা ব্রাহ্মণবংশে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারাই নিজেদের পাচিত অন্নদ্বারা মহাপ্রভুকে ভিক্ষা করাইতেন; যাঁহারা ব্রাহ্মণেতর কুলে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, তাঁহারা শ্রীজগন্নাথের মহাপ্রসাদ আনাইয়া প্রভুর ভিক্ষা করাইতেন।

এইরূপে জানা গেল—শ্রীল সরকারঠাকুর পার্ষদ ছিলেন বলিয়া এবং শ্রীল ঠাকুরমহাশয় এবং শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুর পার্ষদকল্প ছিলেন বলিয়াই যে বহু ব্রাহ্মণও তাঁহাদের শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। গুরুর শাস্ত্রবিহিত যোগ্যতা তাঁহাদের মধ্যে ছিল বলিয়াই এইরূপ হইয়াছিল। ব্রাহ্মণকে মন্ত্রদীক্ষা দিয়াছেন বলিয়া শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুর এবং শ্রীল শ্যামানন্দঠাকুর যে তৎকালীন বৃন্দাবনবাসী বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক, কিম্বা এতদ্দেশীয় বৈষ্ণবগণকর্ত্তৃক, এমন কি শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর নিকটে শিক্ষাপ্রাপ্ত শ্রীল শ্রীনিবাস আচার্য্যপ্রভুকর্ত্তৃক তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, তাহারও কোনও প্রমাণ নাই। শ্রীনিবাস আচার্য্য প্রভু তো শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর অভিপ্রায় জানিতেন। শ্রীল নরোত্তম-দাসঠাকুরের এবং শ্রীল শ্যামানন্দ ঠাকুরের আচরণ যদি শ্রীজীবপাদের অনভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে আচার্য্যপ্রভু যে তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মণ শিষ্য করিতে নিষেধ করিতেন, এইরূপ অনুমান অস্বাভাবিক নহে। তাঁহাদের মধ্যে গুরুর শাস্ত্রবিহিত লক্ষণ ছিল বলিয়াই আচার্য্যপ্রভু তাঁহাদিগকে নিষেধ করেন নাই। তাঁহারা নিজেরাও শ্রীজীবপাদের নিকটে শিক্ষা লাভ করিয়াছিলেন—সুতরাং শ্রীজীব-পাদের অভিপ্রায় জানিতেন। প্রতিলোম-ক্রমে দীক্ষা শ্রীজীবপাদের অনভিপ্রেত হইলে তাঁহারাও ব্রাহ্মণকে দীক্ষা দিতেন না।

সাধকের মঙ্গলের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে অবৈষ্ণবের নিকটে দীক্ষাগ্রহণ নিষেধ করিয়াছেন; কোনও স্থলে কেহ অবৈষ্ণবের নিকটে দীক্ষাগ্রহণ করিয়া থাকিলে, পুনরায় বৈষ্ণবের নিকটে দীক্ষাগ্রহণের উপদেশও দিয়াছেন (পূর্ব্ব-বর্ত্তী-গ-উপ অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। প্রতিলোম দীক্ষা যদি অবৈধ হইত, তাহা হইলে তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে যে তিনি তাহা নিষেধ করিতেন, তাহা স্বাভাবিক ভাবেই অনুমান করা যায়। কিন্তু তিনি তাহা

করেন নাই। ইহাতেই বুঝা যায়--যোগ্যস্থলে প্রতিলোম দীক্ষা শ্রীজীবপাদের অনভিপ্রেত নহে।

শ্রবণগুরুপ্রসঙ্গে যোগ্যগুরুর কুলশীলাদি বিচারের অনাবশ্যকতা-প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে শ্রীজীব-পাদ "কুলং শীলমাচারমবিচার্য্য"-ইত্যাদি যে পুরাণবচন উদ্ধৃত করিয়াছেন (২২৪১ পৃঃ দ্রষ্টব্য), তাহা যে শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু সম্বন্ধেও প্রযোজ্য, শ্লোকস্থ "শ্রবণাদ্যর্থী"-শব্দ হইতেই তাহা বুঝা যায়। কেবলমাত্র শ্রবণগুরুই যদি শ্লোকের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে "শ্রবণার্থীই" বলা হইত, "শ্রবণাদ্যর্থী" বলা হইতনা। "শ্রবণাদ্যর্থী"-শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে শিক্ষা এবং দীক্ষাই সূচিত হইতেছে। তাৎপর্য্য এই যে— যিনি শ্রবণার্থী, বা শিক্ষার্থী, অথবা দীক্ষার্থী, যোগ্য গুরু পাওয়া গেলে তিনি সেই গুরুর কুলশীলাদি বিচার করিবেন না। দীক্ষাগুরু বা শিক্ষাগুরু সম্বন্ধে এই শ্লোকপ্রমাণ যদি প্রযোজ্য না হইত, তাহা হইলে শ্রীজীবপাদ অবশ্যই তাহা পরিষ্কার ভাবে জানাইয়া দিতেন; কিন্তু তিনি তাহা করেন নাই। ইহা হইতেই তাঁহার অভিপ্রায় বুঝা যাইতেছে।

পূর্ব্বে ছ-উপ অনুচ্ছেদে নারদপঞ্চরাত্রাদি-স্মৃতিশাস্ত্র-বাক্যের যে সমাধান করা হইয়াছে, তাহা যে শ্রুতিসম্মত, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। তথাপি যাঁহারা উল্লিখিত স্মৃতিবাক্যের উপরেই অধিকতর গুরুত্ব স্থাপন করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের পক্ষে- "শ্রুতিস্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী"-এই বাক্যটী স্মরণ করা সঙ্গত বলিয়া মনে হয়। শ্রুতি ও স্মৃতির মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হইলে শ্রুতির অনুসরণই বিধেয়।

অবশ্য পরমার্থভূত বস্তুর জন্য যাঁহাদের প্রবল আগ্রহ জাগে নাই, সুতরাং সমাজের অপেক্ষা যাঁহারা ত্যাগ করিতে পারেন না, তাঁহাদের পক্ষে অনুলোম-দীক্ষা গ্রহণই সঙ্গত। প্রতিলোম-দীক্ষা গ্রহণ করিতে গেলে তাঁহাদের যে ইহলোক এবং পরলোক-তুইই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা আছে, তাহা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

জ। অ-গুরুর লক্ষণ

গুরুর লক্ষণ বলিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস "অ-গুরুর" লক্ষণের কথা, অর্থাৎ যাঁহার গুরু হওয়ার যোগ্যতা নাই, তাঁহার কথাও বলিয়াছেন।

"মহাকুলপ্রসূতোঽপি সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
সহস্রশাখাধ্যায়ী চ ন গুরুঃ স্যাদবৈষ্ণবঃ॥
গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকো বিষ্ণুপূজাপরো নরঃ।
বৈষ্ণবোঽভিহিতোঽভিজ্ঞৈরিতরোঽস্মাদবৈষ্ণবঃ॥ ১।৫০-৫১-ধৃত পাদ্মবচন॥

—মহাকুলপ্রসূত, সর্ব্বযজ্ঞে দীক্ষিত এবং সহস্রশাখাধ্যায়ী ব্রাহ্মণও অবৈষ্ণব হইলে গুরুরূপে বরণীয় হইতে পারেন না। যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজা-পরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব বলিয়া অভিহিত হয়েন; তদ্ভিন্ন অন্য ব্যক্তি অবৈষ্ণব।"

গুরুর লক্ষণে বলা হইয়াছে—যিনি পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন,

তিনিই গুরু হওয়ার যোগ্য। যিনি ভক্তিহীন, বা ভগবদ্‌বিমুখ, তাঁহার পক্ষে ব্রহ্মের অনুভব সম্ভব নহে। সর্ব্ববেদে অভিজ্ঞ ব্রাহ্মণও ভক্তিহীন হইতে পারেন, ভগবদ্‌বিমুখও হইতে পারেন। "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্‌ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ", "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভপদারবিন্দবিমুখাৎ"-ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ। সুতরাং মহাকুলজাত হইলেও এবং বেদজ্ঞ হইলেও যদি কেহ ভক্তিহীন হয়েন, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত না হয়েন, তিনি গুরু হওয়ার যোগ্য হইতে পারেন না।

যিনি মহাকুলপ্রসূত এবং সহস্রশাখাধ্যায়ী, তিনি ভজনসাধনহীনও হইতে পারেন, কোনও ভাবের সাধকও হইতে পারেন। যদি তিনি কোনওরূপ সাধনভজনই না করেন, তাহা হইলে পরমার্থবিষয়ে তিনি যে কাহারও গুরু হওয়ার যোগ্য নহেন, তাহা সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু তিনি যদি কোনও ভাবের সাধক হয়েন, তাহা হইলে তিনি কোন্ ভাবের সাধক, ভক্তিমার্গে দীক্ষাপ্রার্থীর পক্ষে তাহাও জানা দরকার। যদি তিনি কর্ম্মমার্গের, বা যোগমার্গের, বা জ্ঞানমার্গের সাধক হয়েন, তাহা হইলে তিনি ভক্তিমার্গে দীক্ষার্থীর গুরু হইতে পারেন না; কেননা, তিনি নিজেই ভক্তিমার্গের সাধক নহেন—সুতরাং তিনি বৈষ্ণব নহেন, অবৈষ্ণব। "অবৈষ্ণবোপদিষ্টেন মন্ত্রেণ নিরয়ং ব্রজেৎ।" বৈষ্ণব কাহাকে বলা হয়, তাহাও উল্লিখিত প্রমাণে বলা হইয়াছে—যিনি বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ, তিনিই বৈষ্ণব। বিষ্ণুমন্ত্রে বা কৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও যদি কেহ বিষ্ণুপূজাপরায়ণ বা কৃষ্ণপূজাপরায়ণ না হয়েন, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত হইয়াও যদি কেহ কর্ম্ম-যোগাদিমার্গের সাধন করেন, তাহা হইলেও তাঁহাকে বৈষ্ণব বলা সঙ্গত হইবে না—সুতরাং তিনি ভক্তিমার্গে দীক্ষার্থীর গুরু হইতে পারিবেন না,—ইহা জানাইবার উদ্দেশ্যেই বৈষ্ণবের লক্ষণে বিষ্ণুদীক্ষা এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণতা-এই উভয়ের কথা বলা হইয়াছে। কিন্তু বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত এবং বিষ্ণুপূজাপরায়ণ হইলেও যে পর্য্যন্ত তাঁহার পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব না জন্মে, সে পর্য্যন্ত তিনি দীক্ষাদানের অধিকারী হইবেন না; কেননা, "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত"-ইত্যাদি গুরুলক্ষণজ্ঞাপক মূলবাক্যে ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভবের কথা রহিয়াছে। তাহাই হইতেছে গুরুর মুখ্য লক্ষণ, অন্য লক্ষণগুলি আনুষঙ্গিক, বা ব্রহ্মবিষয়ে অপরোক্ষ অনুভবের ফলমাত্র।

যাহাহউক. শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে বিষ্ণুস্মৃতির একটী প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,

"পরিচর্য্যাযশোলাভলিপ্সুঃ শিষ্যাদ্ গুরুর্ন হি॥ ১।৩৫॥

—যিনি শিষ্যের নিকট হইতে পরিচর্য্যা, যশঃ ও ধনাদি লাভের কামনা পোষণ করেন, তিনি গুরুপদের উপযুক্ত নহেন।"

উল্লিখিতরূপ কামনা যাঁহার আছে, তিনি যে পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করেন নাই—সুতরাং গুরুর মুখ্য লক্ষণ যে তাঁহার মধ্যে নাই—তাহা সহজেই বুঝা যায়।

অ-গুরুর লক্ষণ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে তত্ত্বসাগর হইতে নিম্নলিখিত প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে।

বহ্বাশী দীর্ঘসূত্রী চ বিষয়াদিষু লোলুপঃ। হেতুবাদরতো দুষ্টোঽবাগ্বাদী গুণনিন্দকঃ॥
অরোমা বহুরোমা চ নিন্দিতাশ্রমসেবকঃ। কালদন্তোঽসিতৌষ্ঠশ্চ দুর্গন্ধশ্বাসবাহকঃ॥
দুষ্টলক্ষণসম্পন্নো যদ্যপি স্বয়মীশ্বরঃ। বহুপ্রতিগ্রহাসক্ত আচার্য্যঃ শ্রীক্ষয়াবহঃ॥ ১।৪২॥

—যিনি বহ্বাশী (অত্যধিক-ভোজনপরায়ণ), দীর্ঘসূত্রী, বিষয়াদিতে লুব্ধ, হেতুবাদরত (প্রতিকূল তর্কপরায়ণ), দুষ্ট, অবাচ্য-পরপাপাদিবক্তা, গুণনিন্দক, রোমহীন, বহুরোমবিশিষ্ট, নিন্দিত আশ্রমের সেবাপরায়ণ, কৃষ্ণবর্ণদন্তবিশিষ্ট, অসিতবর্ণ ওষ্ঠবিশিষ্ট, দুর্গন্ধপূর্ণ-নিশ্বাসবাহী, দুষ্টলক্ষণযুক্ত এবং স্বয়ং দানাদিতে সক্ষম হইয়াও বহুপ্রতিগ্রহে নিরত, তিনি শ্রী ক্ষয় করেন (অর্থাৎ গুরু হওয়ার অযোগ্য)।”

উল্লিখিত বাক্যে বিষয়লোলুপতাদিতে ভক্তিহীনতা সূচিত করিতেছে। ভক্তিহীন বলিয়া গুরু হওয়ার অযোগত্যা প্রদর্শিত হইয়াছে। আর, যিনি বহ্বাশী, কৃষ্ণবর্ণদন্তৌষ্ঠবিশিষ্ট, দুর্গন্ধপূর্ণ-নিশ্বাসবাহী, বহুপ্রতিগ্রাহী, শিষ্য তাঁহার প্রতি অবিচলিত শ্রদ্ধাপোষণ করিতে পারিবেন না বলিয়া এ-সমস্ত লক্ষণবিশিষ্ট লোককে গুরুত্বে বরণ করা সঙ্গত নহে।

দীক্ষাগ্রহণের সমস্যা

শাস্ত্রে গুরুর যে লক্ষণের কথা বলা হইয়াছে, সেই লক্ষণযুক্ত গুরু সকলের পক্ষে সুলভ নহেন। তাদৃশগুরুর যে আত্যন্তিক অভাব, তাহা বলাও সঙ্গত হইবেনা। শাস্ত্রীয় লক্ষণবিশিষ্ট গুরু অবশ্যই আছেন—যদিও তাঁহাদের সংখ্যা হয়তঃ প্রচুর নহে। কিন্তু থাকিলেও তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আত্মপ্রকাশ করিতে চাহেন না, কেহ কেহ বা কাহারও গুরু হইতে ইচ্ছুক নহেন। এজন্য অধিকাংশ দীক্ষার্থীর পক্ষেই শাস্ত্রীয় লক্ষণবিশিষ্ট গুরু সুলভ নহেন। অথচ ভজনেচ্ছুর পক্ষে অদীক্ষিত থাকাও সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ইহা এক সমস্যা। এই সমস্যার সমাধান কি, সুধীগণ তাহা দেখিবেন।

আমাদের মনে হয়, ভজন-সাধনের জন্য—সুতরাং দীক্ষাগ্রহণের জন্য—কোনও ভাগ্যে যাঁহার ইচ্ছা জন্মিয়াছে, শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর কৃপা লাভের সৌভাগ্য না হইলে তাঁহার পক্ষে অদীক্ষিত থাকা অপেক্ষা—যিনি শ্রীকৃষ্ণমন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিয়া অকপট ভাবে ভজন-সাধনে নিরত, বৈষ্ণবাচার-পরায়ণ, বিষয়ে অত্যাসক্তিহীন, স্নিগ্ধ-শান্তস্বভাব, নির্লোভ, নির্দম্ভ, নির্ম্মৎসর, হিংসাদ্বেষহীন, নিরভিমান, কৃপালুচিত্ত, বৈষ্ণবে শ্রদ্ধাবিশিষ্ট, দীক্ষাদানকে বা ভজনাঙ্গকে যিনি স্বীয় জীবিকানির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করেন না, এবং যিনি সচ্চরিত্রাদি গুণবিশিষ্ট, ব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন না হইলেও, তাঁহার চরণে শরণ গ্রহণ করিয়া তাঁহার নিকটে দীক্ষা গ্রহণই সঙ্গত। “ক্রমে ক্রমে পায় লোক ভবসিন্ধু পার॥”

ঝ। শিষ্যের লক্ষণ

যে-কোনও পণ্ডিত বা মহাকুলপ্রসূত ব্যক্তিও যেমন দীক্ষাগুরু হওয়ার যোগ্য নহেন, তদ্রূপ যে-কোনও লোকই দীক্ষাগ্রহণের যোগ্যও নহেন। শাস্ত্রে গুরুর যোগ্যতার কথা যেমন বলা হইয়াছে, তেমনি শিষ্যের যোগ্যতার কথাও বলা হইয়াছে।

পূর্ব্বে [৭০-চ (১) অনুচ্ছেদে] বলা হইয়াছে—শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং দীক্ষাগুরু-এই তিন রকম গুরুর একই লক্ষণ। তদ্রূপ শ্রবণার্থী, শিক্ষার্থী এবং দীক্ষার্থী-এই তিন রকম শিষ্যেরও একই লক্ষণ হইবে।

পূর্ব্বে (৬৮-গ অনুচ্ছেদে) শ্রবণার্থীর কিরূপ যোগ্যতা থাকা আবশ্যক, তাহা বলা হইয়াছে। দীক্ষার্থীরও সেই যোগ্যতাই। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে শিষ্যের যে লক্ষণ বলা হইয়াছে, পরবর্ত্তী ৮৫ ক (১)-অনুচ্ছেদে তাহা দ্রষ্টব্য।

কি কি দোষ থাকিলে শিষ্যত্বে গ্রহণ করা সঙ্গত নয়, অগস্ত্যসংহিতা হইতে শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাস, তাহাও বলিয়াছেন।

"অলসা মলিনাঃ ক্লিষ্টা দাম্ভিকাঃ কৃপণাস্তথা। দরিদ্রা রোগিণো রুষ্টা রাগিণো ভোগলালসাঃ॥
অসূয়ামৎসরগ্রস্তাঃ শঠাঃ পরুষবাদিনঃ। অন্যায়োপার্জিতধনাঃ পরদাররতাশ্চ যে॥
বিদুষাং বৈরিণশ্চৈব অজ্ঞাঃ পণ্ডিতমানিনঃ। ভ্রষ্টব্রতাশ্চ যে কষ্টবৃত্তয়ঃ পিশুনাঃ খলাঃ॥
বহ্বাশিনঃ ক্রূরচেষ্টা দুরাত্মানশ্চ নিন্দিতাঃ। ইত্যেবমাদয়োঽপন্যে পাপিষ্ঠাঃ পুরুষাধমাঃ॥
অকৃত্যেভ্যোঽনিবার্য্যাশ্চ গুরুশিক্ষাসহিষ্ণবঃ। এবম্ভূতাঃ পরিত্যাজ্যাঃ শিষ্যত্বে নোপকল্পিতাঃ॥১।৪৬॥

—যাহারা অলস, মলিন, বৃথা-ক্লেশভোগী, দাম্ভিক, কৃপণ, দরিদ্র, রোগী, ক্রুদ্ধ, বিষয়াসক্ত, ভোগলোলুপ, অসূয়াবান্, মৎসরগ্রস্ত, শঠ, পরুষভাষী, অন্যায়রূপে ধনোপার্জক, পরদারপরায়ণ, বিদ্বদ্‌গণের শত্রু, অজ্ঞ, পণ্ডিতম্মন্য, ভ্রষ্টব্রত, কষ্টে জীবিকানির্ব্বাহকারী, পরদোষকীর্ত্তনকারী, খল, বহুভোজী, ক্রূরকর্ম্মা, দুরাত্মা ও নিন্দিত ইত্যাদি এবং অপর যাহারা পাপিষ্ঠ, পুরুষাধম, যাহা-দিগকে কুক্রিয়া হইতে নিরত করা যায় না, যাহারা গুরুর উপদেশ সহ্য করিতে অক্ষম, এইরূপ লোকগণকে বর্জন করিবে, ইহাদিগকে শিষ্যত্বে গ্রহণ করিবে না।"

উল্লিখিত দোষ এবং গুণগুলির মধ্যে বোধহয় চিত্তগত দোষগুণগুলিরই মুখ্যত্ব, দেহগত দোষগুণগুলির বোধ হয় গৌণত্ব অভিপ্রেত। যাঁহার চিত্তগত গুণগুলি আছে, তাঁহার পক্ষে দীক্ষার ফল প্রাপ্তির অধিকতর সম্ভাবনা ; যাঁহার চিত্তগত দোষগুলি আছে, তাঁহার পক্ষে সেই সম্ভাবনা কম। আর দেহগতগুণগুলি থাকিলে শিষ্য অপেক্ষাকৃত নির্ব্বিঘ্নে সাধনভজন করিতে পারেন ; দেহগত দোষগুলি থাকিলে তাহাতে বিঘ্ন জন্মিতে পারে।

৭১। শ্রীগুরুদেবে ভগবদ্‌দৃষ্টি

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২১১-১২ অনুচ্ছেদে) লিখিয়াছেন—"অন্যদা স্বগুরৌ কর্ম্মিভিরপি ভগবদ্দৃষ্টিঃ কর্ত্তব্যা।—অন্যদা কর্ম্মিগণের পক্ষেও গুরুদেবে ভগবদ্‌দৃষ্টি করা কর্ত্তব্য।" ইহার প্রমাণরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত করা হইয়াছে।

"আচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ।
ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ॥ শ্রীভা, ১১।১৭।২৭॥

—(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন) আচার্য্যকে আমি বলিয়া মনে করিবে (অর্থাৎ আচার্য্যের প্রতি ভগবদ্বুদ্ধি পোষণ করিবে); কখনও তাঁহার অবমাননা করিবে না; মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে তাঁহার প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবে না; কেননা, গুরু হইতেছেন সর্ব্বদেবময়।" (পরবর্ত্তী ৭২-অনুচ্ছেদের শেষাংশ দ্রষ্টব্য)।

শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—ব্রহ্মচারীর ধর্ম্মমধ্যে উক্ত শ্লোকটী কথিত হইয়াছে। "ব্রহ্মচারি-ধর্ম্মান্তঃ পঠিতমিদম্।"

ব্রহ্মচর্য্যাদি হইতেছে কর্ম্মমার্গের অন্তর্গত। ব্রহ্মচারী যে আচার্য্যের (গুরুদেবের) নিকটে তত্ত্বোপদেশাদি গ্রহণ করেন, তাঁহার প্রতিও ভগবদ্বুদ্ধি পোষণের উপদেশই উক্ত শ্লোকে দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং যাঁহারা পরমার্থলাভের অভিলাষী, তাঁহাদের পক্ষে যে গুরুদেবের প্রতি ভগবদ্-বুদ্ধি পোষণ কর্ত্তব্য, তাহা বলাই বাহুল্য। "ততঃ পরমার্থিভিস্তাদৃশেগুরৌ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২১১॥" প্রমাণরূপে নিম্নলিখিত শ্লোকগুলি উদ্ধৃত হইয়াছে।

"যস্য সাক্ষাদ্ভগবতি জ্ঞানদীপপ্রদে গুরৌ। মর্ত্ত্যাসদ্ধীঃ শ্রুতং তস্য সর্ব্বং কুঞ্জরশৌচবৎ॥
এষ বৈ ভগবান্ সাক্ষাৎপ্রধানপুরুষেশ্বরঃ। যোগেশ্বরৈর্বিমৃগ্যাঙ্ঘ্রির্লোকোঽয়ং মন্যতে নরম্॥
—শ্রীভা, ৭।১৫।২৬-২৭॥

—(যুধিষ্ঠিরের নিকটে শ্রীনারদ বলিয়াছেন) জ্ঞানদীপপ্রদ গুরু সাক্ষাৎ ভগবানের স্বরূপ, যে ব্যক্তি তাঁহাতে (গুরুদেবে) "মর্ত্ত্য"-বুদ্ধি পোষণ করে, তাহার সমস্ত (শাস্ত্র-মন্ত্র) শ্রবণ হস্তিস্নানের ন্যায় ব্যর্থ হয়। এই গুরু সাক্ষাৎভগবান্ এবং প্রধান ও পুরুষের ঈশ্বর; যোগেশ্বরগণও ইঁহারই চরণ অন্বেষণ করিয়া থাকেন; লোকেরা যে ইঁহাকে মনুষ্য বলিয়া মনে করে, ইহা তাঁহাদের ভ্রান্তি।"

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—শ্রীগুরুদেবে ভগবদ্দৃষ্টি পোষণই সাধকের পক্ষে সঙ্গত।

৭২। শ্রীগুরুদেবে ভগবৎ-প্রিয়তমত্ব-বুদ্ধি

শ্রীগুরুদেবে ভগবদ্দৃষ্টির কথা বলিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন "শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ শ্রীভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২১৩॥-—মুখ্যবিবেকী শুদ্ধভক্তগণ মনে করেন, শ্রীভগবানের সহিত শ্রীগুরুদেবের এবং শ্রীশিবের যে অভেদ দৃষ্টির কথা বলা হয়, শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীশিব শ্রীভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই তাহা বলা হয় (অর্থাৎ শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীশিবও হইতেছেন ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত। ভগবানের প্রিয়তম

ভক্ত বলিয়াই ভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদের কথা বলা হয়, বাস্তবিক অভেদ নহে)।"

উল্লিখিত ভক্তিসন্দর্ভের উক্তির "শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে"-বাক্যের অন্তর্গত "একে"-শব্দের তাৎপর্য্য কি?

শ্রীমদ্ভাগবতের "ত্বয্যম্বুজাক্ষামলসত্ত্বধাম্নি সমাধিনাবেশিতচেতসৈকে ॥ ১০।২।৩০ ॥-শ্লোকে শ্রীকৃষ্ণকে লক্ষ্য করিয়া ব্রহ্মাদি দেবগণ বলিয়াছেন—হে অম্বুজাক্ষ! প্রধান বিবেকিপুরুষগণ সমাধিযোগে বিশুদ্ধসত্ত্বধাম আপনাতে আবিষ্টচিত্ত হইয়া ইত্যাদি।" এস্থলে "একে"-শব্দের অর্থে শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"একে মুখ্যা বিবেকিনঃ—মুখ্য বিবেকি-পুরুষগণ।" ভক্তিসন্দর্ভের বাক্যাংশেও "একে"-শব্দের অর্থ হইবে—"মুখ্য বিবেকিগণ" এবং "শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে" -বাক্যাংশের অর্থ হইবে—"মুখ্যবিবেকী শুদ্ধ ভক্তগণ।"* এস্থলে "একে"-শব্দের অর্থ "কেহ কেহ, বা কোনও কোনও" নহে; তাহাই যদি অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে "একে" না বলিয়া "কেচিৎ, বা কেচন" বলা হইত। কেননা, অসাকল্য বুঝাইতে হইলে "চিৎ" বা "চন" প্রত্যয় ব্যবহৃত হয়। "চিৎ-চনৌ অসাকল্যে।"

সুতরাং উল্লিখিত ভক্তিসন্দর্ভবাক্যের অর্থ হইবে—"মুখ্য বিবেকী শুদ্ধভক্তগণ (যাঁহারা শুদ্ধভক্ত, তাঁহারা মুখ্যবিবেকী; তাঁহাদের সকলেই) মনে করেন শ্রীগুরু ও শ্রীশিব ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া ভগবানের সহিত তাঁহাদের অভেদের কথা বলা হয়।" কিন্তু "কোনও কোনও শুদ্ধভক্ত তদ্রূপ মনে করেন" ইহা উক্তবাক্যের তাৎপর্য্য নহে।

যাহা হউক, শ্রীজীবগোস্বামিপাদ তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য প্রিয়স্য সখ্যুঃ ক্ষণসঙ্গমেন।
সুদুশ্চিকিৎস্যস্য ভবস্য মৃত্যোর্ভিষক্তমং ত্বাদ্য গতিং গতাঃ স্ম ॥ —শ্রীভা, ৪।৩০।৩৮ ॥

—(ভগবান্ অষ্টভুজ পুরুষকে প্রচেতাগণ বলিয়াছেন) হে ভগবন্! (সৎসঙ্গের ফল আমরাই অনুভব করিতেছি। কেননা) তোমার প্রিয়সখা ভবের (শ্রীশিবের) ক্ষণকালব্যাপী সঙ্গের প্রভাবেই আমরা তোমাকে প্রাপ্ত হইলাম—যে তুমি সুদুশ্চিকিৎস্য সংসারের এবং মৃত্যুর পক্ষে সদ্বৈদ্য এবং আদ্যগতি।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—শ্রীশিব হইতেছেন বক্তা প্রচেতাগণের গুরু। "শ্রীশিবো হ্যেষাং বক্তৄণাং গুরুঃ।" প্রচেতাগণ তাঁহাদের গুরু শ্রীশিবকে ভগবানের "প্রিয়" বলিয়াছেন; শুদ্ধভক্তগণও শ্রীগুরুদেবকে ভগরানের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই মনে করেন।

শ্রীজীবপাদ ইহাও বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয়তম বলিয়াই ভগবানের সহিত

---

* প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামিমহোদয়সম্পাদিত ভক্তিসন্দর্ভেও "একে" শব্দের এইরূপ তাৎপর্য্য গৃহীত হইয়াছে (২৭৪ পৃষ্ঠা)। ইহা যে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীরও অভিপ্রেত, পরবর্ত্তী আলোচনা হইতে তাহা জানা যাইবে।

গুরুদেবের অভেদদৃষ্টির কথা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, ইহাই শুদ্ধভক্তদের অভিমত। "শুদ্ধভক্তাস্ত্বেকে শ্রীগুরোঃ শ্রীশিবস্য চ শ্রীভগবতা সহাভেদদৃষ্টিং তৎপ্রিয়তমত্বেনৈব মন্যন্তে।"

পূর্ব্বোদ্ধৃত "বয়ন্তু সাক্ষাদ্ভগবন্ ভবস্য"—ইত্যাদি শ্রীভা, ৪।৩০।৩৮ শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকাতেও শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—"বয়ন্তু"-এই স্থলে "তু-শব্দাদন্যতো বৈশিষ্ট্যদ্যোতনায় প্রিয়স্য সখ্যুরিতি গুর্ব্বীশ্বরয়োশ্চাভেদোপদেশেহপীথমেব তৈঃ শুদ্ধভক্তৈর্মতম্।" এই টীকার তাৎপর্য্য প্রকাশ করিয়া প্রভুপাদ শ্রীল প্রাণগোপাল গোস্বামী তাঁহার সম্পাদিত ভক্তিসন্দর্ভে (২৭৪ পৃষ্ঠায়) লিখিয়াছেন—"শ্লোকে তু-শব্দের প্রয়োগহেতু অন্য সকল হইতে বৈশিষ্ট্য প্রকাশের নিমিত্ত শ্লোকোক্ত 'প্রিয়স্য সখ্যুরিতি'—প্রিয়সখার—এইরূপ প্রয়োগের তাৎপর্য্য এই—গুরু ও ভগবানে এবং শিব ও ভগবানে অভেদদৃষ্টির নিমিত্ত যদিও শাস্ত্রের উপদেশ আছে, তথাপি শ্রীগুরু ও শিবকে শ্রীভগবানের প্রিয় বলিয়া মনে করাই প্রসিদ্ধ শুদ্ধভক্তগণের অভিমত।" এই প্রসঙ্গে শ্রীল প্রভুপাদ বলিয়াছেন—যাঁহারা শ্রীগুরু এবং শ্রীভগবানে 'অভেদভাবে' উপাসনা করেন, "তাঁহাদের পক্ষে সম্বন্ধানুগরাগানুগা ভক্তি অনুষ্ঠানের প্রতিকূল হইয়া থাকে।" এই উক্তির সমর্থনেই তিনি পূর্ব্বোদ্ধৃত ক্রমসন্দর্ভের উল্লেখ করিয়াছেন।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-স্থলে বোধ হয় উভয় মতের সমন্বয় বিধান করিলেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৭১-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে, শ্রীজীবপাদ শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক দেখাইয়াছেন—কর্ম্মি-গণের এবং পরমার্থিগণের পক্ষেও শ্রীগুরুদেব সম্বন্ধে ভগবদ্দৃষ্টি (ভগবানের সহিত অভেদদৃষ্টি) পোষণ করা কর্ত্তব্য। আবার, এই স্থলেও (৭২-অনুচ্ছেদে) শাস্ত্রপ্রমাণ প্রদর্শনপূর্ব্বক তিনি দেখাইয়াছেন—শুদ্ধভক্তগণ শ্রীগুরুদেবকে শ্রীভগবানের প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া মনে করেন। তাঁহার উক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—এই দুইটী অভিমত পরস্পর-বিরোধী নহে, একটী অভিমত আর একটী অভিমতেরই পরিণাম। শ্রীগুরুদেব হইতেছেন ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত, প্রেষ্ঠ ; প্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই ভগবানের সহিত তাঁহার অভেদদৃষ্টির কথা বলা হইয়াছে। দুইজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সম্বন্ধে অভেদদৃষ্টি লৌকিক জগতেও বিরল নহে।

প্রশ্ন হইতে পারে—গুরুদেব যদি ভগবানের প্রিয়তম ভক্তই হয়েন, তাহা হইলে তো তিনি জীবতত্ত্বই হইয়া পড়েন। তাহা হইলে উদ্ধবের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ কেন বলিলেন—"ন মর্ত্ত্যবুদ্ধ্যাসূয়েত॥ শ্রীভা, ১১।১৭।২৭॥ (পূর্ব্ববর্ত্তী-৭১-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য॥)—মর্ত্ত্যবুদ্ধিতে গুরুদেবের প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবে না ?"

উত্তরে বক্তব্য এই। মর্ত্ত্য-শব্দের অর্থ হইতেছে—মৃত্যুর (উপলক্ষণে, জন্মমৃত্যুর) কবলে পতিত জীব, সাধারণ মায়ামুগ্ধ জীব। শ্রীকৃষ্ণোক্তির তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—"গুরুদেবকে জন্ম-মরণশীল সাধরণ মানুষ বলিয়া মনে করিবে না"। বস্তুতঃ শাস্ত্রীয় লক্ষণবিশিষ্ট গুরু হইতেছেন পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভবসম্পন্ন (৫।৬৮ক-অনু)—সুতরাং জীবন্মুক্ত , জীবন্মুক্ত বলিয়া তিনি সাধারণ

মানুষের ন্যায় জন্ম-মৃত্যুর অধীন নহেন, দেহভঙ্গের পরে তাঁহাকে আর সংসারে জন্ম গ্রহণ করিতে হইবেনা। ইহাই জন্ম-মরণশীল সাধরণ মানুষ হইতে শাস্ত্রীয়-লক্ষণবিশিষ্ট গুরুর বৈশিষ্ট্য।

শ্রীকৃষ্ণ আরও বলিয়াছেন—গুরুর প্রতি অসূয়া প্রকাশ করিবে না। অসূয়া-শব্দের অর্থ হইতেছে—"গুণে দোষারোপ"; যাহা বাস্তবিক গুণ, তাহাকেও দোষ বলিয়া মনে করা। গুরুদেবের গুণকে দোষ বলিয়া মনে করিবে না। ইহার তাৎপর্য্য হইতেছে এইরূপ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, শাস্ত্রীয় লক্ষণবিশিষ্ট গুরু হইতেছেন জীবন্মুক্ত; সুতরাং দেহেতে তাঁহার আত্মবুদ্ধি নাই, তাঁহার দেহাবেশ নাই, অহঙ্কৃত-ভাবও নাই। নির্বীর্য্য প্রারব্ধাদি তাঁহার দ্বারা যাহা করাইয়া থাকে, তাহাতে তাঁহার বুদ্ধি লিপ্ত হয়না, তিনি আসক্ত হয়েন না, তজ্জন্য তাঁহার বন্ধনও হয়না। তাঁহার এইরূপ নির্লিপ্ততা, আসক্তিহীনতা হইতেছে তাঁহার গুণ। তাঁহার এতাদৃশ কার্য্যকে সাধারণ লোকের কার্য্যের ন্যায় মনে করিয়া যদি অনুমান করা হয় যে—অন্য লোকের ন্যায় গুরুদেবও যখন কোনও কোনও কার্য্য করিয়া থাকেন, তখন অন্য লোকের যেমন সে-সমস্ত কর্ম্মে আসক্তি আছে, গুরুদেবেরও তদ্রূপ আসক্তি আছে, অন্য লোকের ন্যায় তাঁহাকেও এই সমস্ত কর্ম্মদ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইতে হইবে—তাহা হইলে গুরুদেবের নির্লিপ্ততা এবং অনাসক্তিরূপ গুণে দোষারোপ করা হইবে; কেননা, তিনি বাস্তবিক নির্লিপ্ত এবং অনাসক্ত হইলেও তাঁহাকে সেই-সেই কার্য্যে লিপ্ত এবং আসক্ত বলিয়া মনে করা হইতেছে। ইহাই হইবে গুরুদেবের প্রতি অসূয়া প্রকাশ। শ্রীগুরুদেবে এইরূপ অসূয়া প্রকাশ অন্যায়—ইহাই শ্রীকৃষ্ণের উপদেশের তাৎপর্য্য বলিয়া মনে হয়। অসূয়া-শব্দের আর একটী অর্থ হইতেছে—"পরোদয়ে দ্বেষঃ।-উ, নী, ম, ব্যভিচারিভাব-প্রকরণে ৮৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব॥—পরের সৌভাগ্যে দ্বেষ (অর্থাৎ পরশ্রীকাতরতা)।" শ্রীগুরু দেব-সম্বন্ধে ইহাও দোষাবহ।

৭৩। গুরুতত্ত্ব

পূর্ব্ববর্ত্তী অনুচ্ছেদের আলোচনা হইতে জানা গেল—শুদ্ধভক্তগণের মতে শ্রীগুরুদেব হইতেছেন ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত এবং প্রিয়তম ভক্ত বলিয়াই গুরুদেবের প্রতি ভগবদ্দৃষ্টি, বা ভগবানের সহিত গুরুদেবের অভেদ-দৃষ্টির কথা শাস্ত্রে বলা হইয়াছে। ইহা হইতে জানা গেল—ভগবান্ নিজেই যে গুরুরূপে আবির্ভূত হয়েন, তাহা নহে।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী, শ্রীপাদ রূপগোস্বামী, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথ ভট্ট গোস্বামী, শ্রীপাদ গোপাল ভট্ট গোস্বামী, শ্রীপাদ রঘুনাথ দাস গোস্বামী প্রভৃতি সকলেই শুদ্ধভক্ত। শ্রীপাদ জীব গোস্বামী শ্রীশ্রীরূপ-সনাতনের নিকটে ভক্তিশাস্ত্র অধ্যয়নও করিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের অভিপ্রায়ও তিনি জানেন। সুতরাং শ্রীপাদ জীব গোস্বামী এ-স্থলে গুরুতত্ত্ব-সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন,

তাহা যে শ্রীপাদ রূপ-সনাতনাদিরও অভিপ্রেত, তাহাতে সন্দেহ থাকিতে পারেনা। বিশেষতঃ, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার উক্তির সমর্থনে শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

শ্রীপাদ রঘুনাথ দাসগোস্বামী স্বরচিত মনঃশিক্ষায় বলিয়াছেন—"শচীসূনুং নন্দীশ্বরপতিসুতত্ত্বে গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর পরমজস্রং ননু মনঃ॥২॥—রে মন! শচীনন্দন শ্রীগৌরসুন্দরকে শ্রীকৃষ্ণরূপে এবং শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠরূপে (প্রিয়তম ভক্তরূপে) অনবরত স্মরণ কর।" ইহা শ্রীজীব-পাদের উক্তিরই প্রতিধ্বনি।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসাদি-শাস্ত্রে গুরুর যে সমস্ত লক্ষণ উল্লিখিত হইয়াছে, সে-সমস্তও ভক্তেরই লক্ষণ। "তস্মাদ্ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্। শাব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্॥ শ্রীভা, ১১।৩।২১॥—যিনি বেদাদি শাস্ত্রের তত্ত্বজ্ঞ, যিনি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের অপরোক্ষ অনুভবশীল, যিনি শ্রীকৃষ্ণ-ভক্তিযোগপরায়ণ, এইরূপ গুরুর শরণাপন্ন হইবে।" শ্রীভগবান্‌ও বলিয়াছেন—"মদভিজ্ঞং গুরুং শান্তমুপাসীত মদাত্মকম্॥—আমার ভক্তবাৎসল্যাদি মহিমা অনুভব করিয়া যিনি আমাকে পরিজ্ঞাত হইয়াছেন, যাঁহার চিত্ত আমাতেই সন্নিবিষ্ট এবং যিনি বাসনাশূন্য বলিয়া পরম শান্ত—এইরূপ গুরুর উপাসনা করিবে।"

শ্রুতিও তাহাই বলেন। "তদ্বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ সমিৎপাণিঃ শ্রোত্রিয়ং ব্রহ্মনিষ্ঠম্ মুণ্ডক॥ ১।২।১২॥—সেই পরম বস্তুকে জানিতে হইলে, সমিৎপাণি হইয়া ব্রহ্মনিষ্ঠ বেদবিৎ গুরুর নিকটে উপনীত হইবে।"

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীও তাঁহার বৃহদ্ভাগবতামৃতে গুরুদেবকে ভগবানের পরমপ্রেষ্ঠ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। শ্রীগোপকুমারকে মাথুরীব্রজভূমিতে যাওয়ার আদেশ করিয়া শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন—"তত্র মৎপরমপ্রেষ্ঠং লপ্স্যসে স্বগুরুং পুনঃ। সর্ব্বং তস্যৈব কৃপয়া নিতরাং জ্ঞাস্যসি স্বয়ম্॥২।২।২৩৬॥—সেই ব্রজভূমিতে আমার পরমপ্রেষ্ঠ স্বীয় গুরুকে তুমি পুনরায় প্রাপ্ত হইবে এবং সেই গুরুদেবের কৃপায় স্বয়ং সমস্ত বিষয় সম্যক্‌রূপে জ্ঞাত হইতে পারিবে।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন বিষয়টী আরও পরিস্ফুট করিয়া বলিয়াছেন। "ননু সাক্ষাদত্র ত্বমেব বিরাজসে, কর্ত্তব্যমশেষং তৎপ্রসাদাদ্ বিজানীয়াং, তত্র চ কোঽপি মদবলম্বো নাস্তীতি চেত্তত্রাহ—তত্রেতি। ব্রজভূমৌ মৎপরমপ্রেষ্ঠমিতি স্বস্মাদপি স্বভক্তানামধিকমহিম্নোঽভিপ্রায়েণ মত্তোঽপি তস্মাদধিকং জ্ঞাস্যতীতি ভাবঃ। অতএবোক্তং—'সর্ব্বং', 'নিতরাং', 'স্বয়ম্' ইতি॥—(গোপকুমার যদি বলেন) 'এ-স্থলে সাক্ষাৎ তুমিই বিরাজিত, আমার অশেষ কর্ত্তব্য তোমার প্রসাদেই জানিতে পারিব। সেখানে (ব্রজভূমিতে) কেহই আমার অবলম্বন নাই'—ইহার উত্তরেই বলা হইয়াছে—'ব্রজভূমিতে আমার পরমপ্রেষ্ঠ আছেন।' স্বীয় ভক্তের মহিমাধিক্য খ্যাপনের অভিপ্রায়ে বলা হইয়াছে—'আমার নিকট হইতেও তাঁহার নিকটে অধিক জানিতে পারিবে'—ইহাই হইতেছে ভগবদুক্তির তাৎপর্য্য। এজন্যই শ্লোকে 'সর্ব্বং,' 'নিতরাং', 'স্বয়ম্' বলা হইয়াছে।"

শ্লোকস্থ "পরমপ্রেষ্ঠ"-শব্দে যে "ভগবদ্ভক্তকেই" বুঝাইয়াছে, এই টীকা হইতে তাহা পরিষ্কারভাবে জানা গেল। এই ভক্তরূপ পরমপ্রেষ্ঠ হইতেছেন গোপকুমারের গুরু।

শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার গুর্ব্বষ্টকে লিখিয়াছেন—

"শ্রীবিগ্রহারাধননিত্যশৃঙ্গারতন্মন্দিরমার্জ্জনাদৌ।
যুক্তস্য ভক্তাংশ্চ নিযুঞ্জতোঽপি বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৩ ॥

—শ্রীবিগ্রহের আরাধন-ব্যাপারে যিনি নিত্যই শ্রীবিগ্রহের নানারূপ শৃঙ্গার (সজ্জা) এবং শ্রীমন্দির-মার্জ্জনাদিতে নিযুক্ত এবং যিনি ভক্তদিগকেও তত্তৎকার্য্যে নিয়োজিত করেন, সেই গুরুদেবের চরণকমলের বন্দনা করি।" এ-স্থলে শ্রীগুরুদেবে ভক্তের লক্ষণই ব্যক্ত করা হইয়াছে।

"সাক্ষাদ্ধরিত্বেন সমস্তশাস্ত্রৈরুক্তস্তথাভাব্যত এব সদ্ভিঃ।
কিন্তু প্রভোর্যঃ প্রিয় এব তস্য বন্দে গুরোঃ শ্রীচরণারবিন্দম্ ॥ ৭ ॥

—সমস্ত শাস্ত্রে শ্রীগুরুদেব সাক্ষাৎ হরিরূপে কথিত হইলেও এবং সৎলোকগণ ঐরূপ ভাবনা করিলেও তিনি কিন্তু শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্তই। আমি সেই শ্রীগুরুদেবের চরণারবিন্দের বন্দনা করি।"

গৌড়ীয়-বৈষ্ণবসম্প্রদায়ের ভজনপদ্ধতিতেও নবদ্বীপের ভজনে শ্রীগুরুদেবকে শ্রীগৌরাঙ্গের ভক্ত এবং বৃন্দাবনের ভজনে শ্রীকৃষ্ণের সেবাপরায়ণ ভক্ত (কান্তাভাবের উপাসনায় সেবাপরা মঞ্জরী) রূপে চিন্তা করার বিধিই প্রচলিত আছে। যে কোনও শাস্ত্রানুগত বৈষ্ণবসাধকের গুরুপ্রণালিকা এবং সিদ্ধপ্রণালিকা দেখিলেই তাহা জানা যায়। নবদ্বীপের গুরুধ্যানেও গুরুদেবের ভক্তভাব দৃষ্ট হয়। "কৃপামরন্দান্বিতপাদপদ্মং শ্বেতাম্বরং গৌররুচিং সনাতনম্। শন্দং সুমাল্যাভরণং গুণালয়ং স্মরামি সদ্ভক্তিময়ং গুরুং হরিম্।" ব্রজের মধুরভাবের ভজনে শ্রীগুরুদেবের স্বরূপসম্বন্ধে শ্রীল নরোত্তমদাস ঠাকুরমহাশয় বলিয়াছেন—"গুরুরূপা সখী বামে, দাঁড়ায়ে ত্রিভঙ্গঠামে"-ইত্যাদি।

প্রশ্ন হইতে পারে - শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতকার শ্রীল কৃষ্ণদাস কবিরাজগোস্বামীও শ্রীরূপ-সনাতন-শ্রীজীবাদিগোস্বামিগণের শিক্ষার শিষ্য। তাঁহাদের অভিমতের সহিত কবিরাজগোস্বামীর অভিমতের কোনওরূপ বিরোধ অসম্ভব। শ্রীজীবাদিগোস্বামিগণ বলিয়াছেন—শ্রীগুরুদেব হইতেছেন ভগবানের প্রিয়ভক্ত ; কিন্তু শ্রীল কবিরাজগোস্বামী বলিলেন—"কৃষ্ণ, গুরু, ভক্ত, শক্তি, অবতার, প্রকাশ। কৃষ্ণ এই ছয় রূপে করেন বিলাস। শ্রীচৈ, চ, ১।১।১৫ ॥" ইহাতে বুঝা যায়, গুরুরূপে শ্রীকৃষ্ণই বিলাস করেন, সুতরাং শ্রীকৃষ্ণই গুরুরূপে আবির্ভূত। ইহার হেতু কি ?

এই প্রশ্নের উত্তরে বক্তব্য এই। উল্লিখিত ছয় তত্ত্বের মধ্যে গুরুব্যতীত অপর পাঁচ তত্ত্ব—অর্থাৎ কৃষ্ণ, ভক্ত (নিত্যপার্ষদ), শক্তি, অবতার ও প্রকাশ এই পাঁচ তত্ত্ব—যে তত্ত্বতঃ একই বস্তু, এই পাঁচ তত্ত্বের মধ্যে যে স্বরূপতঃ কোনও ভেদ নাই, পঞ্চতত্ত্ব বর্ণন-প্রসঙ্গে কবিরাজগোস্বামী তাহা স্পষ্টভাবেই বলিয়াছেন। "পঞ্চতত্ত্ব এক বস্তু নাহি কিছু ভেদ। রস আস্বাদিতে তভু বিবিধ

বিভেদ। শ্রীচৈ, চ, ১।৭।৪॥” কিন্তু গুরুতত্ত্বের সহিত যে শ্রীকৃষ্ণতত্ত্বের ভেদ নাই, এই পঞ্চতত্ত্বের ন্যায় গুরুও যে স্বরূপতঃ শ্রীকৃষ্ণ—শ্রীকৃষ্ণ এই পঞ্চতত্ত্বরূপে যেমন আত্মপ্রকট করিয়াছেন, তদ্রূপ গুরুরূপেও আত্মপ্রকট করিয়াছেন—এইরূপ কথা তিনি কোথাও বলেন নাই। দীক্ষাদানাদিকালে তাঁহার প্রিয়তম ভক্তরূপ শ্রীগুরুর চিত্তে শ্রীকৃষ্ণ যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিরূপেই তিনি গুরুতে বিলাস করেন। শ্রীকৃষ্ণই গুরুশক্তির মূল আশ্রয়, শ্রীকৃষ্ণই সমষ্টিগুরু। ভজনার্থীদের মঙ্গলের উদ্দেশ্যে শ্রীকৃষ্ণই তাঁহার প্রিয়তম ভক্তে গুরুশক্তি অর্পণ করিয়া থাকেন। সেই শক্তিতে শক্তিমান্ হইয়াই গুরুদেব ভজনার্থী শিষ্যকে কৃতার্থ করেন। শ্রীল কবিরাজগোস্বামী “গুরুরূপে কৃষ্ণ কৃপা করেন ভক্তগণে॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১।২৭॥”-বাক্যে তাহাই প্রকাশ করিয়াছেন। শ্রীগুরুদেবের যোগেই শ্রীকৃষ্ণ ভজনার্থীকে দীক্ষাদিদ্বারা কৃপা করিয়া থাকেন।

শ্রীগুরুদেবের সম্বন্ধে ভগবদ্‌দৃষ্টি এবং কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ-দৃষ্টি—এই দুইয়ের যেমন সমাধান শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন, শ্রীল কবিরাজগোস্বামীও তেমন এক সমাধানের কথা বলিয়াছেন। শ্রীল কবিরাজও বলিয়াছেন—

যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস
তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১।২৬॥

শ্রীল কবিরাজগোস্বামী এ-স্থলে গুরুর তত্ত্বও বলিয়াছেন এবং গুরুদেবসম্বন্ধে শিষ্য কিরূপ ভাব পোষণ করিবেন, তাহাও বলিয়াছেন। “যদ্যপি আমার গুরু চৈতন্যের দাস”-এই বাক্যে তিনি গুরুর তত্ত্ব বা স্বরূপ প্রকাশ করিয়াছেন—“শ্রীগুরুদেব হইতেছেন তত্ত্বতঃ শ্রীচৈতন্যের (শ্রীভগবানের) দাস, প্রিয়ভক্ত।” গুরুদেব স্বরূপতঃ ভগবানের দাস বা প্রিয়ভক্ত হইলেও শিষ্য তাঁহার প্রতি কিরূপ ভাব পোষণ করিবেন, তাহাও তিনি পয়ারের শেষার্দ্ধে বলিয়াছেন—“তথাপি জানিয়ে আমি তাঁহার প্রকাশ।” শ্রীগুরুদেব ভগবানের প্রিয় ভক্ত হইলেও শিষ্য তাঁহাকে ভগবানের “প্রকাশ” বলিয়াই মনে করিবেন।

এ-স্থলে “প্রকাশ”-শব্দে পারিভাষিক “প্রকাশরূপ” বুঝায় না (১।১।৮৫-খ অনুচ্ছেদে পারিভাষিক “প্রকাশ”-রূপের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)। “প্রকাশরূপ” স্বয়ংরূপ হইতে সম্পূর্ণরূপে অভিন্ন। শ্রীকৃষ্ণের “প্রকাশরূপ” শ্রীকৃষ্ণেরই ন্যায় নবকিশোর নটবর, লক্ষ্মীশ্রীবৎসলাঞ্ছিত, শিখিপিচ্ছচূড়, সার্দ্ধচতুর্হস্তপরিমিত, ইত্যাদি। শ্রীগুরুদেব এতাদৃশ নহেন। এ-স্থলে “প্রকাশ”-শব্দ কবিরাজ-গোস্বামিকর্ত্তৃক সাধারণ অর্থেই ব্যবহৃত হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর ন্যায় গুরুদেবে ভগবদ্‌বুদ্ধির পোষণই শ্রীল কবিরাজগোস্বামীর অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়—গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণের প্রিয় ভক্ত বলিয়াই প্রিয়ত্বের দৃষ্টিতে অভেদ জ্ঞান।

উল্লিখিত পয়ারে “প্রকাশ”-শব্দের আর একটী ব্যঞ্জনাও থাকিতে পারে—শক্তির প্রকাশ। ভগবানের গুরুশক্তি শ্রীগুরুদেবের যোগেই শিষ্যের মঙ্গলের জন্য প্রকাশিত হইয়া থাকে; শ্রীগুরুদেবে

ভগবানের গুরুশক্তি প্রকাশিত হয় বলিয়াও গুরুদেবকে ভগবানের প্রকাশ--শক্তির প্রকাশ—মনে করা যায়।

ক। পূজ্যত্বাংশে ভগবানের সহিত শ্রীগুরুদেবের অভিন্নতা

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে, গুরুদেব হইতেছেন স্বরূপতঃ শ্রীভগবানের প্রিয় ভক্ত। প্রিয় ভক্ত যে ভগবানের তুল্যই পূজনীয়, একথা শ্রীভগবান্ নিজমুখেই বলিয়া গিয়াছেন। "ন মেঽভক্তশ্চতুর্ব্বেদী মদ্ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ। তস্মৈ দেয়ং ততো গ্রাহ্যং স চ পূজ্যো যথা হ্যহম্॥"

শ্বেতাশ্বতর-শ্রুতির সর্ব্বশেষ বাক্য হইতেও তাহা জানা যায়। "যস্য দেবে পরা ভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥—পরমদেবতায় (পরব্রহ্মে) যাঁহার পরাভক্তি আছে এবং পরমদেবতায় যেরূপ ভক্তি, শ্রীগুরুদেবেও যাঁহার তাদৃশী ভক্তি আছে, শ্রুতিকথিত তত্ত্বসমূহ সেই মহাত্মার নিকটেই প্রকাশ পায়।" এই শ্রুতিবাক্যে পরব্রহ্ম ভগবানে এবং গুরুদেবে একই প্রকার ভক্তির উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। সুতরাং পরব্রহ্ম ভগবান্ যেরূপ পূজ্য, শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপ পূজ্য, ইহাই শ্রুতির অভিপ্রায় বলিয়া জানা গেল।

শ্রীমদ্দাসগোস্বামীর "মনঃশিক্ষা" হইতে যে শ্লোকটী পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহার "গুরুবরং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে স্মর"-এই অংশের টীকায় লিখিত হইয়াছে---"এবং মুকুন্দপ্রেষ্ঠত্বে কৃষ্ণপ্রিয়ত্বে গুরুবরমজস্রং অনবরতং স্মর। নন্বাচার্য্যং মাং বিজানীয়ান্নাবমন্যেত কর্হিচিৎ। ন মর্ত্তবুদ্ধ্যাসূয়েত সর্ব্বদেবময়ো গুরুঃ"-ইতি একাদশস্কন্ধপদ্যেন গুরুবরস্য কৃষ্ণাভিন্নত্বেনৈব মননমুচিতং, কথং তৎপ্রিয়ত্বমননম্। অত্রোচ্যতে। প্রথমং তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যন্যথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥'-ইত্যনেন ভেদপ্রতীতেরাচার্য্যং মামিত্যত্র যৎ শ্রীগুরোঃ কৃষ্ণত্বেন মননং তত্তু কৃষ্ণস্য পূজ্যত্ববদ্ গুরোঃ পূজ্যত্বপ্রতিপাদকমিতি সর্ব্বমবদাতম্॥"

এই টীকার তাৎপর্য্য এই। শ্রীমদ্দাসগোস্বামী বলিলেন—শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণের প্রেষ্ঠ বা প্রিয়তম ভক্ত বলিয়া চিন্তা করিবে। কিন্তু "আচার্য্যং মাং বিজানীয়াৎ"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোক বলিতেছেন—শ্রীগুরুদেবকে শ্রীকৃষ্ণ হইতে অভিন্ন বলিয়া মনে করিবে। এই উভয়বিধ উপদেশের সমাধান হইতেছে এইরূপ। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (৪।১৩৪) হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণ নিজেই বলিয়াছেন—'প্রথমে শ্রীগুরুদেবকে পূজা করিয়া তাহার পরে আমার পূজা করিবে। যিনি এইরূপ করেন, তিনিই (ভক্তিযোগে) সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। অন্যথা সাধকের সমস্তই নিষ্ফল হয়।' এই উক্তিতে স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই গুরুদেবকে তাঁহা হইতে ভিন্ন বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন (আগে গুরুপূজা, তাহার পরে কৃষ্ণপূজা—এই বিধি হইতেই বুঝা যায়, গুরু ও কৃষ্ণ স্বরূপতঃ এক বস্তু নহেন)। শ্রীগুরুকে কৃষ্ণ বলিয়া মনে করার যে উপদেশ, তাহার তাৎপর্য্য এই যে, গুরুদেব শ্রীকৃষ্ণবৎ পূজ্য। সাধকের শ্রীকৃষ্ণে যেরূপ পূজ্যত্ববুদ্ধি থাকিবে, শ্রীগুরুদেবেও তদ্রূপ পূজ্যত্ববুদ্ধি থাকা আবশ্যক (শ্বেতাশ্বতর শ্রুতিও যে তাহাই বলিয়াছেন, তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে)।

পদ্মপুরাণ হইতেও তদ্রূপ উপদেশ জানা যায়।

"ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন স্বং দর্শয়তু মে হরিঃ ॥ হ, ভ, বি, ৪।১৪০ধৃত-পাদ্মবচন ॥

—(দেবহূতিস্তবে বলা হইয়াছে) হরির প্রতি আমার যেরূপ ভক্তি আছে, শ্রীগুরুদেবেও আমার সেইরূপ নিষ্ঠা থাকিলে, সেই সত্যদ্বারা শ্রীহরি আমাকে স্বীয় রূপ প্রদর্শন করুন।"

শাস্ত্রে আরও কথিত হইয়াছে,

গুরুর্ব্রহ্মা গুরুর্বিষ্ণু গুরুর্দেবো মহেশ্বরঃ।
গুরুরেব পরংব্রহ্ম তস্মাৎ সংপূজয়েৎ সদা ॥ হ, ভ, বি, ৪।১৩৯-ধৃত-প্রমাণ।"

এই বাক্যের তাৎপর্য্যও হইতেছে এই যে, ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিব, এমন কি পরব্রহ্মও যেরূপ পূজনীয়, শ্রীগুরুদেবও সেইরূপ পূজনীয়।

এইরূপে দেখা গেল—পূজ্যত্বাংশে শ্রীগুরুদেব এবং শ্রীভগবান্ অভিন্ন।

খ। বিশেষ দ্রষ্টব্য

এই প্রসঙ্গে একটী কথা প্রণিধানযোগ্য। শ্রীগুরুদেব শ্রীকৃষ্ণবৎ পূজ্য হইলেও যে সমস্ত উপচারের দ্বারা শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিতে হয়, ঠিক সেই সমস্ত উপচারে শ্রীগুরুদেবের পূজা বিধেয় নহে। পূজার তাৎপর্য্য হইতেছে পূজ্যের প্রীতিবিধান। যে ভাবের পূজায় শ্রীগুরুদেব প্রীতিলাভ করিতে পারেন, সেই ভাবেই তাঁহার পূজা করা কর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণপূজায় শ্রীকৃষ্ণচরণে তুলসী দেওয়ার বিধান আছে; কিন্তু শ্রীগুরুদেবের চরণে তুলসী অর্পণ সঙ্গত নহে; কেননা, শ্রীকৃষ্ণের প্রিয়তম ভক্ত শ্রীগুরুদেব তাহাতে প্রীতি লাভ করিতে পারেন না। শ্রীগুরুদেবের ভোগেও শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদই নিবেদন করা কর্ত্তব্য, তাহাতেই গুরুদেব প্রীতি লাভ করেন; অনিবেদিত বস্তু শ্রীগুরুদেবকে অর্পণ করিলে গুরুদেব প্রীত হয়েন না, তাহা গ্রহণও করেন না; কেননা, তিনি শ্রীকৃষ্ণপ্রসাদব্যতীত কিছু গ্রহণ করেন না। শ্রীকৃষ্ণে এবং শ্রীগুরুদেবে সমান পূজ্যত্ববুদ্ধি থাকা আবশ্যক; কিন্তু পূজা হইবে শ্রীকৃষ্ণ এবং শ্রীগুরুর স্বরূপতত্ত্বের অনুরূপ। সকল সন্তানের প্রতিই জননীর সমান স্নেহ; কিন্তু সন্তানদের রুচি অনুসারেই জননী তাহাদের আহার্য্য দিয়া থাকেন। পিতা ও মাতা সমভাবে পূজ্য; তাহা বলিয়া, মাতাকে সাড়ী দেওয়া হয় বলিয়া পিতাকেও সাড়ী দেওয়া হয় না; কিম্বা পিতাকে ধুতি দেওয়া হয় বলিয়া মাতাকেও ধুতি দেওয়া হয় না।

অষ্টম অধ্যায়

চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তি সম্বন্ধে আলোচনা

পূর্ব্বে (৫।৬০-অনুচ্ছেদে) সাধনভক্তির চৌষট্টি অঙ্গের কথা বলা হইয়াছে। এক্ষণে তন্মধ্যে বিশেষ বিশেষ সাধনাঙ্গসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

৭৪। গুরুপাদাশ্রয়

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে গুরুপাদাশ্রয়কে একটী প্রধান অঙ্গ বলা হইয়াছে। এই অঙ্গের অত্যাবশ্যকত্ব সম্বন্ধে শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটীও উদ্ধৃত হইয়াছে।

তস্মাদ্‌ গুরুং প্রপদ্যেত জিজ্ঞাসুঃ শ্রেয় উত্তমম্‌।
শব্দে পারে চ নিষ্ণাতং ব্রহ্মণ্যুপশমাশ্রয়ম্‌॥ শ্রীভা, ১১।৩।২১॥

(৫।৬৮ ক অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)

গুরুপাদাশ্রয়ের আবশ্যকতার কথা শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভেও বলিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ৬৭-খ-অনুচ্ছেদোল্লিখিত ত্রিবিধ গুরুর আবশ্যকতার কথা আলোচিত হইতেছে।

ক। শ্রবণগুরুর আবশ্যকতা

শ্রবণগুরুর পাদাশ্রয় সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"তত্র শ্রবণগুরুসংসর্গেণৈব শাস্ত্রীয়-জ্ঞানোৎপত্তিঃ স্যান্নান্যথেত্যাহ—

"আচার্য্যোঽরণিরাদ্যঃ স্যাদন্তেবাস্যুত্তরারণিঃ।
তৎসন্ধানং প্রবচনং বিদ্যা সন্ধিঃ সুখাবহঃ॥ শ্রীভা, ১১।১০।১২॥

—ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥২০৮॥

—শ্রবণগুরুর সংসর্গেই শাস্ত্রীয় জ্ঞানের উৎপত্তি হইতে পারে, অন্যথা তাহা হইতে পারে না। শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—'আচার্য্য (শ্রবণগুরু) হইতেছেন পূর্ব্ব অরণিস্বরূপ, শিষ্য উত্তর-অরণিস্বরূপ, আর গুরুর উপদেশ হইতেছে তন্মধ্যস্থ মন্থনকাষ্ঠস্বরূপ এবং সুখাবহ বিদ্যা হইতেছে তদুত্থ অগ্নিস্বরূপ।"

তাৎপর্য্য এই। আগুন জ্বালাইতে হইলে তিনখানা কাষ্ঠের প্রয়োজন হয়। একখানা কাষ্ঠ থাকে নীচে, একখানা উপরে এবং আর একখানা ঐ দু'খানার মধ্যস্থলে। উপরের ও নীচের কাষ্ঠদ্বয়ের ঘর্ষণে মধ্যস্থিত কাষ্ঠে আগুনের উদ্ভব হয়। আচার্য্যকে নীচের কাষ্ঠ,

শিষ্যকে উপরের কাষ্ঠ এবং আচার্য্যের উপদেশকে মধ্যস্থিত কাষ্ঠ বলার তাৎপর্য্য এই যে, গুরু ও শিষ্যের মধ্যে আলোচনার ফলেই গুরুর উপদেশ সম্যক্‌রূপে উপলব্ধির বিষয় হইতে পারে। গুরুর উপদেশেই অবিদ্যা ও অবিদ্যার কার্য্য দূরীভূত হইতে পারে। "গুরোর্লব্ধা বিদ্যা অবিদ্যা-তৎকার্য্যনিরসনক্ষমেতি স্ফুটীকর্ত্তুং বিদ্যোৎপত্তিং অগ্ন্যুৎপত্তিরূপেণ নিরূপয়তি আচার্য্য ইতি॥ শ্রীধরস্বামী॥"

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী কয়েকটী শ্রুতিবাক্যও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা,

"আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ; প্রবচনম্ সন্ধানম্॥ তৈত্তিরীয়॥ ১।৩।৩॥"। এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্য পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকেই ব্যক্ত হইয়াছে।

"তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ॥ মুণ্ডক॥১।২।১২॥" এই শ্রুতিবাক্যের তাৎপর্য্যও পূর্ব্বে (৫।৬৮ ক-অনুচ্ছেদে) প্রকাশ করা হইয়াছে।

"আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ॥ ছান্দোগ্য॥ ৬।১৪।২॥—যিনি আচার্য্যের চরণ আশ্রয় করিয়াছেন, তিনি (জগৎকারণ ব্রহ্মকে) অবগত হইতে পারেন।"

"নৈষা তর্কেণ মতিরাপনেয়া প্রোক্তান্যেনৈব সুজ্ঞানায় প্রেষ্ঠ॥ কঠ॥১।২ ৯॥

—হে প্রেষ্ঠ! তুমি যে মতি (সুবুদ্ধি) লাভ করিয়াছ, তর্কদ্বারা তাহা লাভ করা যায় না, (অথবা তর্কের সাহায্যে এই মতি অপনীত করা উচিত হয় না); পরন্তু অন্য (তত্ত্বদর্শী আচার্য্য) কর্ত্তৃক উপদিষ্ট হইলেই (আত্মা) যথাযথরূপে জ্ঞানের যোগ্য হয়।"

এই সমস্ত প্রমাণে শ্রবণগুরুর আবশ্যকতার কথা জানা গেল।

সাধকের পক্ষে শাস্ত্রজ্ঞান অপরিহার্য্য। শাস্ত্রও বলিয়াছেন, শব্দব্রহ্মে (বেদে) নিষ্ণাত হইয়াই পরব্রহ্মের উপলব্ধি লাভের চেষ্টা করা উচিত।* পরব্রহ্ম-ভগবানের তত্ত্ব কি, জীবের তত্ত্বই বা কি, ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধই বা কি, এসকল বিষয় অন্ততঃ সাধারণ ভাবে সকলেরই জানা দরকার। শ্রুতি বলিয়াছেন—প্রিয়রূপে পরমাত্মা ভগবান্ ব্রহ্মের উপাসনা করিবে, প্রেমের সহিত শ্রীহরির ভজন করিবে-ইত্যাদি। তাঁহার উপাসনা বা প্রেমসেবা শান্তদাস্যাদি কত রকম ভাবে করা যায়, এ-সমস্ত ভাবের কোন্ ভাবটী সাধনেচ্ছুর চিত্তবৃত্তির অনুকূল—তাহাও জানা নিতান্ত আবশ্যক। শ্রবণগুরুর নিকটে শাস্ত্রকথা-শ্রবণের দ্বারাই এ-সমস্ত অবগত হওয়া যায়। সুতরাং স্বীয় চিত্তবৃত্তির অনুকূল সাধনপন্থা অবলম্বনের জন্যও শাস্ত্রকথা শ্রবণের এবং শ্রবণগুরুর নিতান্ত আবশ্যকতা আছে।

খ। শিক্ষাগুরুর আবশ্যকতা

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শিক্ষাগুরুর আবশ্যকতার কথাও বলিয়াছেন এবং তদনুকূল শাস্ত্র-প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২০৯॥)।

* দ্বে বিদ্যে বেদিতব্যে হি শব্দব্রহ্ম পরঞ্চ যৎ। শব্দব্রহ্মণি নিষ্ণাতঃ পরং ব্রহ্মাধিগচ্ছতি॥ ব্রহ্মবিন্দুপনিষৎ॥৪।২॥

"বিজিতহৃষীকবায়ুভিরদান্তমনস্তুরগং য ইহ যতন্তি যন্তুমতিলোলমুপায়খিদঃ।
ব্যসনশতান্বিতাঃ সমবহায় গুরোশ্চরণং বণিজ ইবাজ সন্ত্যকৃতকর্ণধারা জলধৌ॥

—শ্রীভা, ১০।৮৭।৩৩॥

—(শ্রীভগবানের স্তব করিতে করিতে শ্রুতিগণ বলিয়াছেন) হে অজ! শ্রীগুরুদেবের চরণ আশ্রয় না করিয়া (অষ্টাঙ্গযোগ বা প্রাণায়ামাদিদ্বারা) ইন্দ্রিয়সকলকে এবং প্রাণবায়ুসমূহকে বশীভূত করিয়াই যাঁহারা (বিষয়ভোগে) অতিলোলুপ অদান্ত (অদম্য) মনোরূপ অশ্বকে সংযত করিতে চেষ্টা করেন, তাঁহারা সেই সকল (অষ্টাঙ্গযোগ প্রাণায়ামাদি) উপায় অবলম্বন করিয়া কেবল খেদই প্রাপ্ত হয়েন, (সে-সকল উপায়ে মনকে সংযত করিয়া ভগবদুন্মুখ করিতে পারেন না বলিয়া তাঁহাদের সংসার-বন্ধন ছিন্ন হয়না—সুতরাং অশেষ দুঃখই তাঁহাদিগকে ভোগ করিতে হয়)। কর্ণধার-বিহীন তরণী সমুদ্রে পতিত হইলে যে অবস্থা প্রাপ্ত হয়, এই সংসার-সমুদ্রে তাঁহাদেরও সেই অবস্থাই হইয়া থাকে। (গুরুদেব-প্রদর্শিত ভজনবিধির অনুসরণে ভগবদ্ধর্ম্মের জ্ঞান হইলে ভগবৎকৃপায় বা গুরুকৃপায় দুঃখরাশিদ্বারা অভিভূত না হইয়া শীঘ্রই মন নিশ্চল হইয়া থাকে—ইহাই তাৎপর্য্য। 'গুরুপ্রদর্শিত-ভগবদ্‌ভজনপ্রকারেণ ভগবদ্ধর্ম্মজ্ঞানে সতি তৎকৃপয়া ব্যসনানভিভূতৌ সত্যাং শীঘ্রমেব মনো নিশ্চলং ভবতীতি ভাবঃ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥২০৯॥)"

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণও তাহাই বলেন,

"গুরুভক্ত্যা স মিলতি স্মরণাৎ সেব্যতে বুধৈঃ।
মিলিতোঽপি ন লভ্যতে জীবৈরহমিকাপরৈঃ॥

—ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২০৯-ধৃত-ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-বচনম্॥

– গুরুভক্তিদ্বারা শ্রীভগবানের কথা স্মরণ হয় এবং এই স্মরণের ফলে ভগবান্‌কে পাওয়া যায়। বিজ্ঞব্যক্তিগণ গুরুদেবেরই সেবা করিয়া থাকেন। অহমিকাপর লোকসকল (আমি বেশ বুঝি, আমার আবার গুরুর প্রয়োজন কি, ইত্যাদি ভাবাপন্ন অহঙ্কারী লোকগণ) ভগবানের সহিত মিলিত হইয়াও (অর্থাৎ অহমিকাপর লোকগণ মনে করেন—এই তো আমি ভগবানের স্মরণ করিতেছি, ধ্যান করিতেছি, আমার চিত্তের সহিত ভগবানের মিলন হইয়াছে-ইত্যাদি। কিন্তু ইহা বাস্তবিক মিলন নহে, ইহা আত্মবঞ্চনামাত্র। যাহাহউক, তাঁহাদের ধারণা অনুসারে এই ভাবে মিলিত হইয়াও তাঁহারা কিন্তু) ভগবান্‌কে লাভ করিতে পারেন না।"

শ্রুতিও বলেন-"যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ শ্বেতাশ্বতর॥ ৬।২৩॥ –ভগবান্ পরব্রহ্মে যাঁহার পরা ভক্তি আছে, ভগবানে যেমন ভক্তি, গুরুদেবেও যাঁহার তেমন ভক্তি আছে, শ্রুতিকথিত তত্ত্বাদি তাঁহারই চিত্তে আত্মপ্রকাশ করে। (তাৎপর্য্য এই যে গুরুদেবে যাঁহার ভক্তি নাই, তাঁহার চিত্তে শাস্ত্রকথিত তত্ত্বসমূহ প্রকাশ পায় না)॥"

এই সমস্ত শ্রুতিস্মৃতি-প্রমাণ হইতে শিক্ষাগুরুর আবশ্যকতার কথা জানা গেল।

গ। মন্ত্রগুরুর বা দীক্ষাগুরুর আবশ্যকতা

শ্রবণগুরু এবং শিক্ষাগুরুর আবশ্যকতার কথা বলিয়া শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন,—শ্রবণগুরু এবং শিক্ষাগুরুর চরণাশ্রয় যখন একান্ত আবশ্যক, তখন মন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয়ের আবশ্যকতা আপনা-আপনিই আসিয়া পড়ে। "অতঃ শ্রীমন্ত্রগুরোরাবশ্যকত্বং সুতরামেব॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥২১০॥" মন্ত্রগুরুই পারমার্থিক গুরু; কেননা, মন্ত্রগুরু বা দীক্ষাগুরুই বস্তুতঃ জীবের পরমার্থ-পথপ্রদর্শক এবং পরমার্থিক পথে জীবের পরিচালক। "অখণ্ডমণ্ডলাকারং ব্যাপ্তং যেন চরাচরম্। তদ্‌পদং দর্শিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥" জ্ঞানাঞ্জন-শলাকাদ্বারা তিনিই অজ্ঞান-তিমিরান্ধ জীবের জ্ঞানচক্ষু উন্মীলিত করিয়া দেন। "অজ্ঞানতিমিরান্ধস্য জ্ঞানাঞ্জনশলাকয়া। চক্ষুরন্মীলিতং যেন তস্মৈ শ্রীগুরবে নমঃ॥"

শ্রীজীব পাদ বলেন—ব্যবহারিক গুর্ব্বাদি পরিত্যাগ করিয়াও পারমার্থিক গুরুর চরণাশ্রয় কর্ত্তব্য। "তদেতৎ পরমার্থগুর্ব্বাশ্রয়ো ব্যবহারিক-গুর্ব্বাদি-পরিত্যাগেনাপি কর্ত্তব্যঃ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২১০।" তিনি বলেন, শ্রীমদ্‌ভাগবতেই এইরূপ উপদেশ দৃষ্ট হয়। যথা,

"গুরুর্ন স স্যাৎ স্বজনো ন স স্যাৎ পিতা ন স স্যাজ্জননী ন সা স্যাৎ।
দৈবং ন তৎ স্যান্ন পতিশ্চ স স্যাৎ ন মোচয়েদ্ যঃ সমুপেতমৃত্যুম্॥ শ্রীভা, ৫।৫।১৮॥

—সমুপেত মৃত্যু হইতে (অর্থাৎ সংসারদশাপ্রাপ্ত জীবকে সংসারবন্ধন হইতে) যিনি মুক্ত করিতে পারেন না, সেই গুরুও গুরু নহেন, সেই স্বজনও স্বজন নহেন, সেই পিতাও পিতা নহেন, সেই জননীও জননী নহেন, সেই দেবতাও দেবতা নহেন, এবং সেই পতিও পতি নহেন।"

ব্যাসদেবের প্রতি দেবর্ষি নারদের উক্তি হইতেও উল্লিখিতরূপ কথাই জানা যায়। দেবর্ষি বলিয়াছেন,

"জুগুপ্সিতং ধর্ম্মকৃতেঽনুশাসতঃ স্বভাবরক্তস্য মহান্ ব্যতিক্রমঃ।
যদ্বাক্যতো ধর্ম্ম ইতীতরং স্থিতো ন মন্যতে তস্য নিবারণং জনঃ॥ শ্রীভা, ১।৫।১৫॥

—হে ব্যাসদব! (শ্রীহরির যশঃকথা প্রচুর ভাবে বর্ণনা না করিয়া মহাভারতাদিতে তুমি যে ধর্ম্ম বর্ণন করিয়াছ, তাহা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর, প্রত্যুত বিরুদ্ধই হইয়াছে; কেননা) যাহারা স্বভাবতঃই কাম্যকর্ম্মাদিতে অনুরক্ত, তাহাদের জন্য তুমি নিন্দনীয় কাম্যকর্ম্মাদিই ধর্ম্মরূপে উপদেশ দিয়াছ। ইহা তোমার পক্ষে মহা অন্যায় হইয়াছে। কেননা, তোমার কথায় বিশ্বাস করিয়া সাধারণ লোক কাম্যকর্ম্মাদিকেই মুখ্য ধর্ম্মরূপে স্থির করিবে; (তত্ত্বজ্ঞের, এমন কি তোমারও) নিবারণ তাহারা আর মানিবে না। (শ্রীধর স্বামিপাদের টীকানুযায়ী অনুবাদ)।"

এই শ্লোক হইতে বুঝা গেল—বেদবিহিত কাম্যকর্ম্মাদির উপদেশও যাঁহারা করেন, তাঁহারাও বাস্তবিক পরমার্থ-গুরু নহেন; কেননা, তাঁহাদের উপদেশের অনুসরণে সংসার-বন্ধন হইতে অব্যাহতি পাওয়া যায় না।

অতএব, যতদিন পর্য্যন্ত সংসার-বিমোচক গুরুর চরণাশ্রয় না করা হয়, ততদিন পর্য্যন্তই পিতা প্রভৃতির সহিত গুর্ব্বাদি-ব্যবহার কর্ত্তব্য। 'তস্মাৎ তাবদেব তেষাং গুর্ব্বাদিব্যবহারো যাবন্মৃত্যু-মোচকং শ্রীগুরুচরণং নাশ্রয়ত ইত্যর্থঃ ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥২১০ ॥"

পরমার্থ-গুরু লাভ হইলে পিতা-প্রভৃতিকে আর গুরুজন বলিয়া স্বীকার করা কর্ত্তব্য নয়—ইহাই শ্রীজীবপাদের উক্তির তাৎপর্য্য নহে। তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—পিতা-প্রভৃতি সকল সময়েই গুরু, কিন্তু তাঁহারা পরমার্থ-বিষয়ে গুরু নহেন; তাঁহারা ব্যবহারিক গুরু মাত্র।

ঘ। মন্ত্রগুরুর শ্রেষ্ঠত্ব

শ্রবণগুরু, শিক্ষাগুরু এবং মন্ত্রগুরু-এই তিন গুরুর মধ্যে ভজনব্যাপারে মন্ত্র গুরুরই শ্রেষ্ঠত্ব। কেননা, ভজনের দ্বারাই পরমার্থ-প্রাপ্তির সম্ভাবনা। পরমার্থ-মার্গে প্রবেশ করাইয়া দেন এবং সেই পথে অগ্রগতির সন্ধানও জানাইয়া দেন মন্ত্রগুরু। শ্রবণগুরুর নিকটে শাস্ত্রকথা শুনিয়া ভজনের ইচ্ছা জাগ্রত হইতে পারে; অনন্ত-রসবৈচিত্রীর সমবায় রসস্বরূপ পরব্রহ্মের কোন্ রসবৈচিত্রীতে চিত্ত আকৃষ্ট হয়, কোন্ রসবৈচিত্রী ভজনেচ্ছুর চিত্তবৃত্তির অনুকূল, তাহাও শ্রবণগুরুর নিকটে শাস্ত্রকথা-শ্রবণ হইতে নির্দ্ধারণ করা যায়। কিন্তু স্বীয় অভীষ্ট রসবৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ ভগবৎস্বরূপের সহিত সাধনেচ্ছুর সম্বন্ধের কথা মন্ত্রগুরুই মন্ত্রদ্বারা জানাইয়া দেন এবং মন্ত্রগুরুই সাধনেচ্ছুকে সেই অভীষ্ট স্বরূপের চরণে অর্পণ করিয়া থাকেন। তাহার পরেই ভজনের আরম্ভ। ভজনের আরম্ভ হইলেই ভজনবিধি জানি-বার জন্য শিক্ষাগুরুর চরণাশ্রয়। এইরূপে দেখা যায়, ভজনের আরম্ভই হয় মন্ত্রগুরুর কৃপায়। রাগানুগামার্গের সাধন-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, মন্ত্রগুরুই সাধককে সিদ্ধপ্রণালিকা দিয়া থাকেন। সিদ্ধপ্রণালিকার অনুসরণে যে ভজন, তাহাতে অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধদেহে দীক্ষাগুরুর সিদ্ধ দেহের আনু-গত্যেই ভজন এবং সিদ্ধ অবস্থায় অভীষ্ট পরিকরত্ব লাভ করিলেও দীক্ষাগুরুর বা মন্ত্রগুরুর সিদ্ধদেহের আনুগত্যেই অভীষ্ট শ্রীকৃষ্ণসেবা করিতে হয়। শ্রবণগুরু বা শিক্ষাগুরুর সিদ্ধদেহের আনুগত্যে ভজনের বা সেবার বিধান দৃষ্ট হয় না। এইরূপে দেখা গেল—দীক্ষাগুরুই সাধকের নিত্য অনুসরণীয়, সুতরাং তিন প্রকার গুরুর মধ্যে দীক্ষাগুরুরই শ্রেষ্ঠত্ব।

৭৫। দীক্ষা

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু গুরুপাদাশ্রয়ের ন্যায় দীক্ষাকেও ভজনের প্রধান অঙ্গ বলিয়াছেন।

কিন্তু দীক্ষা বলিতে কি বুঝায়? ভক্তিসন্দর্ভের ২৮৩-অনুচ্ছেদে এবং শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ২।৭-শ্লোকেও দীক্ষার তাৎপর্য্য বিবৃত হইয়াছে।

"দিব্যং জ্ঞানং যতো দদ্যাৎ কুর্য্যাৎ পাপস্য সংক্ষয়ম্।
তস্মাদ্দীক্ষেতি সা প্রোক্তা দেশিকৈস্তত্ত্বকোবিদৈঃ ॥

অতো গুরুং প্রণম্যৈব সর্ব্বস্বং বিনিবেদ্য চ।
গৃহ্লীয়াদ্ বৈষ্ণবং মন্ত্রং দীক্ষাপূর্ব্বং বিধানতঃ॥ বিষ্ণুযামল॥

—যাহা দিব্যজ্ঞান প্রদান করে এবং যাহা পাতকরাশিকে বিনষ্ট করিয়া দেয়, তত্ত্বকোবিদ্ উপদেষ্টৃগণ তাহাকেই দীক্ষা বলিয়া থাকেন। অতএব শ্রীগুরুদেবকে প্রণাম করিয়া এবং সর্ব্বস্ব শ্রীগুরুদেবে নিবেদন করিয়া দীক্ষাপুরঃসর যথাবিধানে বৈষ্ণব মন্ত্র গ্রহণ করিবে।”

টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—“দিব্যং জ্ঞানং হ্যত্র শ্রীমতি মন্ত্রে ভগবৎস্বরূপ-জ্ঞানম্, তেন ভগবতা সম্বন্ধবিশেষজ্ঞানঞ্চ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥২৮৩॥—উক্ত শ্লোকে দিব্যজ্ঞান-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই—শ্রীমন্ত্রে ভগবৎ-স্বরূপজ্ঞান এবং সেই ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষের জ্ঞান।” যে ভগবৎস্বরূপের উপাসনা সাধকের অভীষ্ট, সেই ভগবৎস্বরূপের স্বরূপ-জ্ঞাপক মন্ত্রই শ্রীগুরুদেব শিষ্যকে দিয়া থাকেন। সুতরাং মন্ত্র হইতেই স্বীয় অভীষ্ট ভগবৎ-স্বরূপের জ্ঞান লাভ হইতে পারে। আর, সম্বন্ধ-বিশেষের জ্ঞান হইতেছে এই ঃ— ভগবানের সহিত জীবের সম্বন্ধ হইতেছে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ। ইহা কিন্তু সম্বন্ধের সাধরণ পরিচয়। সেবক অনেক রকমের আছে এবং থাকিতে পারে, দাস্য-সখ্য-বাৎসল্যাদি নানা ভাবে ভগবানের সেবা করা যায় ; এই দাস্য-সখ্যাদি হইতেছে সম্বন্ধের বিশেষত্বের পরিচায়ক। সাধক দাস্য-সখ্যাদি ভাবের যেভাবে ভগবানের সেবা করিতে ইচ্ছুক, সেই ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ-স্বরূপের পরিচয় যেমন দীক্ষামন্ত্র হইতে পাওয়া যায়, স্বীয় অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সহিত সাধকের ভাবানুরূপ সম্বন্ধের পরিচয়ও সেই মন্ত্র হইতে জানা যায়। অর্থাৎ কি ভাবের লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণ সাধকের উপাস্য এবং অভীষ্ট-লীলাবিলাসী শ্রীকৃষ্ণের সহিত দাস্য-সখ্যাদি ভাবের মধ্যে কোন্ ভাবের অনুকূল সম্বন্ধে সাধক সম্বন্ধান্বিত, তাহাও মন্ত্র হইতে জানা যায়। এইরূপ জ্ঞানকেই উদ্ধৃত শ্লোকে “দিব্যজ্ঞান” বলা হইয়াছে। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডাদিতে অষ্টাদশাক্ষর-মন্ত্রপ্রসঙ্গে “দিব্যজ্ঞানের’ উল্লিখিতরূপ তাৎপর্য্য বিবৃত করিয়াছে।

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলেন—“কৃষ্ণদীক্ষাদিশিক্ষণং যথা,

“তত্র ভাগবতান্ ধর্ম্মান্ শিক্ষেদ্ গুর্ব্বাত্মদৈবতঃ।
অমায়য়ানুবৃত্ত্যা যৈ স্তুষ্যেদাত্মাত্মদো হরিঃ॥ শ্রীভা, ১১।৩।২২॥

—কৃষ্ণদীক্ষাদি-শিক্ষণের উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতে এইরূপ কথিত হইয়াছে ঃ—শ্রীগুরুদেবের নিকটে গমনপূর্ব্বক উপাসকের প্রতি আত্মপ্রদ আত্মা হরি যাহাতে সন্তুষ্ট হয়েন, সেইরূপ অনুবৃত্তি (সেবা) দ্বারা গুরুসেবাপূর্ব্বক শ্রীগুরুদেবে দেবতাবুদ্ধি পোষণ করিয়া তাঁহার নিকটে ভাগবতধর্ম্ম শিক্ষা করিবে।”

এ-স্থলে “ভাগবতধর্ম্ম”-শব্দে মন্ত্রগ্রহণপূর্ব্বক পূর্ব্বোল্লিখিত মন্ত্রার্থ (দিব্যজ্ঞান) শিক্ষার কথাই বলা হইয়াছে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে তত্ত্বসাগর হইতে দীক্ষার মাহাত্ম্যবাচক একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে।

"যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যং রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাবিধানেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাম্॥ হ, ভ, রি, ২।৭-ধৃত বচন ॥
—রসবিধানের দ্বারা (যথাবিধানে পারদের যোগে) কাংস্যও যেমন কাঞ্চনত্ব প্রাপ্ত হয়, তেমনি দীক্ষাবিধানের দ্বারাও নরগণের দ্বিজত্ব প্রাপ্তি হইয়া থাকে।"

জন্ম দুই রকমে হইয়া থাকে—ব্যবহারিক এবং পারমার্থিক। পিতামাতার শুক্রশোণিতে যে জন্ম, তাহা ব্যবহারিক জন্ম। আর, মন্ত্রদীক্ষা হইতে যে জন্ম, তাহা পারমার্থিক জন্ম। ব্যবহারিক জন্মের ফল—ব্যবহারিক সম্বন্ধ, পিতা-পিতামহাদি—ক্রমে বংশের আদিপুরুষের সহিত সম্বন্ধ। আর, পারমার্থিক জন্মের ফল—পারমার্থিক সম্বন্ধ, গুরু-পরমগুরু-ক্রমে স্বীয়-সম্প্রদায়ের আদিগুরুর সহিত এবং তাঁহার কৃপায় ভগবানের সহিত ভাবানুকূল সম্বন্ধ। ব্যবহারিক জন্মকে শৌক্র জন্ম এবং পারমার্থিক জন্মকে ভাগবত জন্মও বলা যায়। শৌক্র জন্মের ফলে পিতৃপিতামহাদির ব্যবহারিক সম্পত্তির অধিকারী হওয়া যায়; আর, ভাগবত-জন্মের ফলে গুরুপরম্পরার পারমার্থিক সম্পত্তির অধিকারী হওয়ার সম্ভাবনা জন্মে। শৌক্র জন্মই মানুষের প্রথম জন্ম; তাহার পরে দীক্ষা গ্রহণ করিলেই ভাগবত-জন্ম হয়; ইহা দ্বিতীয় জন্ম বলিয়া ভাগবত-জন্ম-প্রাপ্তকে দ্বিজ বলা হইয়াছে।

উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নৃণাং সর্ব্বেষামেব দ্বিজত্বং বিপ্রতা ॥—দীক্ষাবিধানে সকল মানুষেরই (শূদ্রাদিরও) দ্বিজত্ব বা বিপ্রতা লাভ হয়।" শৌক্র ব্রাহ্মণও বেদ পাঠ করিলেই "বিপ্র" হইতে পারেন, "বেদপাঠাদ্ ভবেদ্ বিপ্রঃ।" দীক্ষা-বিধানে শূদ্রাদিও বেদপাঠ না করিয়াও "বিপ্রতা" প্রাপ্ত হয়—এই উক্তির তাৎপর্য্য এই যে, দীক্ষাবিধানে শূদ্রাদিও বেদপাঠের ফল প্রাপ্ত হয়েন। বেদপাঠের মুখ্য ফল হইতেছে—ব্রহ্মজ্ঞান, পূর্ব্বকথিত "দিব্যজ্ঞান।" দীক্ষাবিধানে শূদ্রাদিরও বেদপাঠলভ্য ব্রহ্মজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান লাভ হইতে পারে বলিয়াই দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিকে দ্বিজ বা বিপ্র বলা হইয়াছে।*

---

* দীক্ষাবিধানে শূদ্রাদিরও যে দ্বিজত্ব জন্মে, তাহার ফলে যে উপনয়ন-সংস্কারে শূদ্রাদিরও অধিকার জন্মে, ইহাই উদ্ধৃত তত্ত্বসাগর-বাক্যের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না। কেননা, উপনয়ন-সংস্কার হইতেছে শৌক্রজন্মের অধিকারগত; শৌক্রদ্বিজসন্তানই পিতৃপিতামহাদির রীতি অনুসারে উপনয়ন-সংস্কার গ্রহণ করেন। উপনয়ন-সংস্কারের পরেই তাঁহার দ্বিজত্ব, তৎপূর্ব্বে নহে। মনুসংহিতা বলেন—উপনয়ন-সংস্কারের পূর্ব্বপর্য্যন্ত দ্বিজসন্তানগণ শূদ্রের সমান থাকেন। "শূদ্রেণ হি সমস্তাবদ্ যাবদ্বেদে ন জায়তে ॥ ২। ১৭২ ॥" শৌক্রদ্বিজ-সন্তানের দ্বিজত্ব ভাগবত-জন্ম নহে; উপনয়নের পরে বেদপাঠ করিলেই তাঁহার বিপ্রত্ব সিদ্ধ হয়; বেদপাঠের ফলে যদি তাঁহার ব্রহ্মজ্ঞান বা দিব্যজ্ঞান জন্মে, তাহা হইলেই তখন তাঁহার ভাগবত-জন্ম হইয়াছে বলা যায়। শৌক্র দ্বিজসন্তান উপনয়নবিধানে দ্বিজ হয়েন; কিন্তু নরমাত্রই—ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বৈশ্য-শূদ্র সকলেই—ভাগবতী দীক্ষা দ্বারা দ্বিজ হয়েন। ইহাতে বুঝা যায়—উপনয়নবিধানের দ্বিজত্ব এবং ভগবত-দীক্ষাবিধানের দ্বিজত্ব এক বস্তু নহে। উপনয়ন-বিধানের দ্বিজত্বে শৌক্রজন্মই অনুসৃত হয়; কিন্তু ভাগবত দীক্ষাবিধানের দ্বিজত্ব পারমার্থিকজন্ম বা ভাগবত-জন্ম সূচিত করে। উপনয়ন-বিধানে দ্বিজত্ব লাভ করিয়া বেদাদির অধ্যয়ন করিলেও লোক ভক্তিহীন, বা ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ হইতে পারেন। "ন মেঽভক্তশ্চতুর্বেদী মদ্‌ভক্তঃ শ্বপচঃ প্রিয়ঃ।" "বিপ্রাদ্দ্বিষড়্‌গুণযুতাদরবিন্দনাভপদারবিন্দবিমুখাৎ" ইত্যাদি শ্লোকই তাহার প্রমাণ। কিন্তু দীক্ষাবিধানের দ্বিজত্বে, বা ভাগবতজন্মে ভগবদুন্মুখতা জন্মে।

ভাগবত-জন্মদ্বারা গুরুপরম্পরা ক্রমে ভগবানের সহিত সম্বন্ধ জন্মে। ভগবদ্‌ভজনের জন্য এই সম্বন্ধের জ্ঞান অপরিহার্য্য। মন্ত্রদীক্ষাদ্বারাই এতাদৃশসম্বন্ধ জন্মিতে পারে বলিয়া ভজনেচ্ছুর পক্ষে দীক্ষাগ্রহণ যে একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাই বুঝা যাইতেছে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু স্বয়ংভগবান্; তাঁহার পক্ষে ভজনেরও কোনও প্রয়োজন নাই, সুতরাং দীক্ষাগ্রহণেরও কোনও প্রয়োজন নাই। তথাপি লৌকিকী লীলায় শ্রীপাদ ঈশ্বরপুরীর নিকটে তিনি দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন—কেবল দীক্ষাগ্রহণের অত্যাবশ্যকতা সাধককে জানাইবার জন্য। তাঁহার নিত্যসিদ্ধ পার্ষদদের দীক্ষাগ্রহণের তাৎপর্য্যও তদ্রূপই।

ক। দীক্ষার নিত্যতা

ভক্তিসন্দর্ভে এবং শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দীক্ষার নিত্যতার (অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণের অপরিহার্য্যতার) কথাও বলা হইয়াছে।

"দ্বিজানামনুপনীতানাং স্বকর্ম্মাধ্যয়নাদিষু। যথাধিকারো নাস্তীহ স্যাচ্চোপনয়নাদনু ॥

তথাত্রাদীক্ষিতানাস্তু মন্ত্রদেবার্চ্চনাদিষু। নাধিকারোঽস্ত্যতঃ কুর্য্যাদাত্মানং শিবসংস্তুতম ॥আগমবাক্য॥

—জগতে যেমন অনুপনীত দ্বিজসন্তানের স্বীয় কর্ত্তব্য অধ্যয়নাদিতে অধিকার থাকে না, কিন্তু উপনয়নের পরেই সেই অধিকার জন্মে; তদ্রূপ অদীক্ষিত ব্যক্তিরও মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনে অধিকার জন্মে না; অতএব নিজেকে শিবসংস্তুত (দীক্ষিত) করিবে।" [শিবসংস্তুতমিতি দীক্ষিতমিত্যার্থঃ ॥ টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী]

স্কন্দপুরাণে কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে শ্রীব্রহ্মনারদসংবাদেও বলা হইয়াছে,

"তে নরাঃ পশবো লোকে কিং তেষাং জীবনে ফলম্।
যৈর্ন লব্ধা হরের্দীক্ষা নার্চ্চিতো বা জনার্দ্দনঃ॥ হ, ভ, বি, ২।৩ ॥

—যাহারা বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করে না, জনার্দ্দনের অর্চ্চনাও করে না, তাহারা পশু; তাহাদের জীবনধারণে কি ফল?"

স্কন্দপুরাণে রুক্মাঙ্গদ-মোহিনী-সংবাদে এবং বিষ্ণুযামলেও বলা হইয়াছে,

"অদীক্ষিতস্য বামোরু কৃতং সর্ব্বং নিরর্থকম্।
পশুযোনিমবাপ্নোতি দীক্ষাবিরহিতো জনঃ॥ হ, ভ, বি, ২।৪ ॥

—হে বামোরু! অদীক্ষিত ব্যক্তির কৃত সমস্ত কর্ম্মই নিরর্থক (নিষ্ফল) হয়। দীক্ষাহীন ব্যক্তি পশুযোনি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

যদি বলা যায়—শাস্ত্র হইতে জানা যায়, যথাকথঞ্চিৎ ভগবান্ হরির অর্চ্চনা করিলেই মহাফল প্রাপ্ত হওয়া যায়; সুতরাং গুরুর নিকটে দীক্ষাগ্রহণের আবশ্যকতা কি? এই প্রশ্নের উত্তর বিষ্ণুরহস্যে দেওয়া হইয়াছে।

"অবিজ্ঞায় বিধানোক্তং হরিপূজাবিধিক্রিয়াম্।
কুর্ব্বন্ ভক্ত্যা সমাপ্নোতি শতভাগং বিধানতঃ॥ হ, ভ, বি, ২।৬॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥২৮৩॥

—শ্রীগুরুদেবের মুখ হইতে পূর্ব্ব-পূর্ব্ব উপদেষ্টৃগণকর্ত্তৃক যথাবিধানে উপদিষ্ট হরিপূজাবিধির ক্রিয়ানুষ্ঠান বিশেষরূপে না জানিয়া পরম আদরের সহিত অর্চ্চনা করিলেও পূজাফলের শতাংশের একাংশ ফলমাত্র প্রাপ্ত হওয়া যায় (অর্থাৎ পূজার সম্যক্ ফল পাওয়া যায় না)।"

এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে লিখিয়াছেন—"ভক্ত্যা পরমাদরেণৈব শতভাগং প্রাপ্নোত্যন্যথা তাবন্তমপি নেত্যর্থঃ॥ --এস্থলে 'ভক্তির সহিত' বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, পূজাবিধি না জানিয়া যদি পরম আদরের সহিত পূজা করা হয়, তাহা হইলেই শতভাগের একভাগ ফল পাওয়া যাইবে ; অন্যথা তাহাও পাওয়া যাইবে না।"

খ। পূর্ব্বপক্ষ ও সমাধান

(১) প্রথম পূর্ব্বপক্ষ

প্রশ্ন হইতে পারে, পূর্ব্ববর্ত্তী ক-অনুচ্ছেদে অর্চ্চন-প্রসঙ্গেই দীক্ষার অপরিহার্য্যতার কথা বলা হইয়াছে। অদীক্ষিতের অর্চ্চনে অধিকার নাই। কিন্তু শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির এক অঙ্গ সাধনেও যখন অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে [৫।৬০ক (৪) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য], তখন অর্চ্চনাঙ্গের অত্যাবশ্যকত্বও থাকিতে পারে না ; সুতরাং অর্চ্চনাঙ্গের অনুষ্ঠান না করিয়া অন্য কোনও এক বা একাধিক অঙ্গের অনুষ্ঠান যিনি করিবেন, তাঁহার পক্ষে দীক্ষাগ্রহণের অপরিহার্য্যতার কথা কিরূপে বলা যায় ?

সমাধান

উত্তরে বক্তব্য এই। নববিধা ভক্তির যে কোনও এক বা একাধিক অঙ্গের সাধনে অদীক্ষিত ব্যক্তিও ভক্তিমার্গের লক্ষ্য পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারিবেন—ইহাই ভক্তিশাস্ত্রের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না ; বরং দীক্ষিতের পক্ষেই উল্লিখিত ব্যবস্থা বলিয়া মনে হয়। কেননা, পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, চৌষট্টি-অঙ্গ-ভক্তির প্রথম বিশটী অঙ্গকে ভক্তির দ্বারস্বরূপ বলা হইয়াছে, (৫।৬০ক-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। দ্বার দিয়াই যেমন গৃহে প্রবেশ করিতে হয়, দ্বার ব্যতীত যেমন গৃহে প্রবেশ করা যায় না, তদ্রূপ এই বিশটী অঙ্গের গ্রহণ করিলেই সাধনভক্তিতে প্রবেশ সম্ভবপর হইতে পারে, অন্যথা নহে—ইহাই হইতেছে প্রথমোক্ত বিশটী অঙ্গকে ভক্তির দ্বারস্বরূপ বলার তাৎপর্য্য। এই বিশটীর মধ্যে আবার গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষা এবং গুরুসেবা-এই তিনটীকে বিশটীর মধ্যেও প্রধান বলা হইয়াছে ; ইহাদ্বারা ইহাই বুঝা যাইতেছে যে, সাধনভক্তিতে প্রবেশের পক্ষে এই তিনটী অঙ্গের গ্রহণ অপরিহার্য্য। রাজ-অন্তঃপুরে প্রবেশ করিতে হইলে অনেকগুলি মহলের দ্বার অতিক্রম করিতে হয়। প্রথম মহলের দ্বারই সর্ব্বপ্রধান দ্বার। ভক্তিরাণীর অন্তঃপুরে প্রবেশের পক্ষেও গুরুপাদাশ্রয়াদি তিনটী অঙ্গ হইতেছে প্রথম মহলের দ্বারসদৃশ। এই দ্বার অতিক্রম করিতেই হইবে, অর্থাৎ ভক্তিসাধন আরম্ভ করিতে হইলে গুরুপাদাশ্রয়, দীক্ষাগ্রহণ এবং গুরুসেবা অবশ্যকর্ত্তব্য।

এই অবশ্যকর্ত্তব্য বিষয়গুলির কথা বলিয়া তাহার পরেই নববিধা সাধনভক্তির (অথবা নববিধা সাধনভক্তির বিবৃতির) কথা বলা হইয়াছে। চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তির উপদেশের এইরূপ ক্রম হইতেই জানা যায়—গুরুপাদাশ্রয়-দীক্ষাগ্রহণাদির পরেই শ্রবণকীর্ত্তনাদি নববিধা ভক্তির, বা তন্মধ্যে এক বা একাধিক অঙ্গের, অনুষ্ঠান কর্ত্তব্য এবং এইরূপ করিলেই তাহা হইবে ভক্তিমার্গের সাধন, অন্যথা তাহা ভক্তিমার্গের সাধন হইবে না। অর্থাৎ দীক্ষাগ্রহণ ব্যতীত শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অনুষ্ঠান করিলে ভক্তিসাধনের সম্যক্ ফল পাওয়া যাইবে না।

দীক্ষাগ্রহণের অপরিহার্য্যতা-সম্বন্ধে শ্রুতিপ্রমাণ

শ্রুতিবাক্য হইতেও ইহার সমর্থন পাওয়া যায়। শ্রুতি বলিয়াছেন—তত্ত্বজ্ঞান লাভের জন্য গুরুর শরণ গ্রহণ করিতে হইবে। "তদ্‌বিজ্ঞানার্থং স গুরুমেবাভিগচ্ছেৎ ॥ মুণ্ডক ॥ ১।২।১২ ॥", পরব্রহ্মে যে রূপ পরাভক্তি, গুরুতেও যাঁহার তাদৃশী ভক্তি, শ্রুতিকথিত তত্ত্ব তাঁহার হৃদয়েই প্রকাশ পায়। "যস্য দেবে পরা ভক্তিঃ যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।২৩ ॥"; "আচার্য্যঃ পূর্ব্বরূপম্। অন্তেবাস্যুত্তররূপম্। বিদ্যা সন্ধিঃ ॥ তৈত্তিরীয় ॥ ১।৩।৩ ॥—আচার্য্য পূর্ব্বকাষ্ঠতুল্য, শিষ্য উত্তরকাষ্ঠতুল্য এবং বিদ্যা মধ্যমকাষ্ঠতুল্য। অর্থাৎ পূর্ব্বকাষ্ঠ এবং উত্তর কাষ্ঠের সংঘর্ষেই যেমন অগ্নির উৎপত্তি হয়, তদ্রূপ গুরু ও শিষ্যের সংযোগ ও আলোচনাদি দ্বারাই পরাবিদ্যার উদয় হইতে পারে"; "আচার্য্যবান্ পুরুষো বেদ ॥ ছান্দোগ্য ॥ ৬।১৪।২ ॥ –যিনি আচার্য্যবান্ (অর্থাৎ যিনি সদ্‌গুরু লাভ করিয়াছেন), তিনি ব্রহ্মকে অবগত হয়েন।"; "দুর্ল্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্ল্লভং তত্ত্বদর্শনম্। দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্‌গুরোঃ করুণাং বিনা ॥ মহোপনিষৎ ॥৪।৭৭॥—সদ্‌গুরুর করুণাব্যতীত বিষয়ত্যাগ দুর্ল্লভ, সহজাবস্থা (জীবের স্বরূপে অবস্থিতি) দুর্ল্লভ।"

উল্লিখিত শ্রুতিবাক্যসমূহ হইতে জানা গেল, শ্রীগুরুদেবের চরণাশ্রয়পূর্ব্বক দীক্ষাগ্রহণব্যতীত জীবের পক্ষে পরমার্থলাভ অসম্ভব। ইহাতেই দীক্ষাগ্রহণের অপরিহার্য্যতা সূচিত হইতেছে। শ্রুতিবাক্য সম্বন্ধে প্রাকৃতবুদ্ধিপ্রসূত বিতর্কের আবকাশ নাই; শ্রুতিবাক্যই মানিয়া চলিতে হইবে। "শ্রুতেস্তু শব্দমূলত্বাৎ ॥ ব্রহ্মসূত্র ॥"

(২) দ্বিতীয় পূর্ব্বপক্ষ

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের ২৮৪-অনুচ্ছেদে পূর্ব্বপক্ষের একটী উক্তি উদ্ধৃত করিয়া তাহার সমাধান করিয়াছেন। এই পূর্ব্বপক্ষ এবং তাহার সমাধানের মর্ম্ম অবগত হইতে হইলে নাম-সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনার প্রয়োজন।

নাম দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাবিধির অপেক্ষা রাখেনা

শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্ব পাপক্ষয়। নববিধ ভক্তি পূর্ণ নাম হৈতে হয় ॥
দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধি অপেক্ষা না করে। জিহ্বাস্পর্শে আচণ্ডালে সভারে উদ্ধারে ॥

আনুষঙ্গ ফলে করে সংসারের ক্ষয়। চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণ-প্রেমোদয় ॥

শ্রীচৈ,চ, ২।১৫।১০৮-১০॥

"আকৃষ্টিঃ কৃতচেতসাং সুমহতামুচ্চাটনং চাংহসা-

মাচাণ্ডালমমূকলোকসুলভো বশ্যশ্চ মুক্তিশ্রিয়ঃ।

নো দীক্ষাং ন চ সৎক্রিয়াং ন চ পুরশ্চর্য্যাং মনাগীক্ষতে

মন্ত্রোঽয়ং রসনাস্পৃগেব ফলতি শ্রীকৃষ্ণনামাত্মকঃ॥ পদ্যাবলী ॥২৯॥

—এই শ্রীকৃষ্ণনামাত্মক মন্ত্র (অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম) দীক্ষার অপেক্ষা রাখে না, সৎক্রিয়ার (সদাচারের) অপেক্ষা রাখে না, কিম্বা পুরশ্চরণের অপেক্ষাও রাখে না; কেবলমাত্র জিহ্বাস্পর্শেই (উচ্চারণমাত্রেই) ইহা ফল প্রদান করিয়া থাকে। এই শ্রীকৃষ্ণনাম স্বভাবতঃই পুণ্যাত্মা লোকদিগের চিত্তকে আকর্ষণ করিয়া থাকে এবং অতিমহৎ পাপসমূহকে দূরীভূত করিয়া থাকে। ইহা চণ্ডাল পর্য্যন্ত সমস্ত ক্ষুদ্রলোকদিগের (অথবা বাক্‌শক্তিসম্পন্ন লোকদিগের) পক্ষেও সুলভ এবং ইহা মোক্ষ সম্পত্তিরও বশীকারক বা প্রাপক।"

ভগবন্নামের এতাদৃশ অসাধারণ মহিমার হেতু এই যে—নাম চিদানন্দময়, নাম ও নামীতে কোনওরূপ ভেদ নাই। পরমস্বতন্ত্র ভগবানের সহিত অভিন্ন বলিয়া নামও ভগবানের ন্যায় পরম-স্বতন্ত্র, স্বপ্রকাশ; তাই ফলপ্রকাশ-বিষয়ে নাম অন্য কিছুরই অপেক্ষা রাখে না, কোনও বিধি-নিষেধের বা দেশ-কাল-দশাদিরও এবং শুদ্ধি-আদিরও অপেক্ষা রাখে না। "নো দেশ-কালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিত-কামদম্॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৪-ধৃত-স্কন্দপুরাণ-বচনম্॥" নামই কৃপা করিয়া নামগ্রহণকারীর অসদাচারাদি দূর করিয়া তাহাকে পরমপবিত্র করিয়া লইবেন; যেহেতু, নাম নিজেই পবিত্রতা-বিধায়ক। "চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৩-ধৃত-স্কান্দ-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচনম্॥"

এইরূপে দেখা গেল—শ্রীভগবন্নাম দীক্ষাদির অপেক্ষা রাখেনা; অর্থাৎ অদীক্ষিত ব্যক্তিরও নামকীর্ত্তনাদিতে অধিকার আছে এবং অদীক্ষিত ব্যক্তিও নামকীর্ত্তন করিলে নামের ফল পাইতে পারে, তাহারও সমস্ত পাপ বিনষ্ট হইতে পারে, মুক্তিলাভও হইতে পারে এবং নামকীর্ত্তনের ফলে চিত্ত শুদ্ধ হইলে যথাসময়ে তাহার চিত্তেও কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে।

পূর্ব্বপক্ষ। মন্ত্রে দীক্ষার অপেক্ষা কেন?

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—ভগবন্নামে যখন দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তখন ভগবন্নামাত্মক মন্ত্রেই বা দীক্ষার অপেক্ষা থাকিবে কেন? শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভের ২৮৪-অনুচ্ছেদে এই প্রশ্নের অবতারণা করিয়া আলোচনা করিয়াছেন।

"ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ। তত্র বিশেষেণ নমঃশব্দাদ্যলঙ্কৃতাঃ শ্রীভগবতা শ্রীমদ্-ঋষিভিশ্চাহিত-শক্তিবিশেষাঃ শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ। তত্র কেবলানি শ্রীভগবন্না-

মান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থপর্য্যন্তদানসমর্থানি। ততো মন্ত্রেষু নামতোঽপ্যধিকসামর্থ্যে লব্ধে কথং দীক্ষাদ্যপেক্ষা ?—মন্ত্রও ভগবানের নামাত্মকই ; মন্ত্রের মধ্যে বিশেষত্ব এই যে,—মন্ত্র নমঃ-শব্দাদি দ্বারা অলঙ্কৃত, মন্ত্রে শ্রীভগবান্ এবং ঋষিগণ একটা বিশেষ শক্তি সঞ্চারিত করিয়া দিয়াছেন এবং মন্ত্র শ্রীভগবানের সহিত সাধকের নিজের একটা সম্বন্ধপ্রতিপাদক। (এসমস্ত বিশেষত্ব হইতে বুঝা যায়, নাম অপেক্ষা মন্ত্রের সামর্থ্য বেশী)। এক্ষণে, ভগবানের কেবল (পূর্ব্বোক্ত বিশেষত্বাদিহীন কেবল) নামই যখন (দীক্ষাদির) কোনও অপেক্ষা না রাখিয়া পরমপুরুষার্থ পর্য্যন্ত ফল দান করিতে সমর্থ, তখন নাম-অপেক্ষা অধিক শক্তিবিশিষ্ট মন্ত্রেরই বা দীক্ষার অপেক্ষা থাকিবে কেন ?"

এই প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীব বলিতেছেন—"যদ্যপি স্বরূপতো নাস্তি, তথাপি প্রায়ঃ স্বভাবতো দেহাদিসম্বন্ধেন কদর্য্যশীলানাংবিক্ষিপ্তচিত্তানাং জনানাং তত্তৎ-সঙ্কোচীকরণায় শ্রীমদ্-ঋষিপ্রভৃতিভিরত্রার্চ্চন-মার্গে ক্বচিৎ ক্বচিৎ কাচিৎ কাচিন্মর্য্যাদা স্থাপিতাস্তি। ততস্তদুল্লঙ্ঘনে শাস্ত্রং প্রায়শ্চিত্তমুদ্ভাবয়তি। তত উভয়মপি নাসমঞ্জসমিতি। তত্র তত্তদপেক্ষা নাস্তি। যথা শ্রীরামচন্দ্রমুদ্দিশ্য রামার্চ্চনচন্দ্রিকায়াং—বৈষ্ণবেষ্বপি মন্ত্রেষু রামমন্ত্রাঃ ফলাধিকাঃ। গাণপত্যাদিমন্ত্রেভ্যঃ কোটিকোটিগুণাধিকাঃ॥ বিনৈব দীক্ষাং বিপ্রেন্দ্র পুরশ্চর্য্যাং বিনৈব হি। বিনৈব ন্যাসবিধিনা জপমাত্রেণ সিদ্ধিদা ইতি ॥—(শ্রীকৃষ্ণ-নামের ন্যায় শ্রীকৃষ্ণ-মন্ত্রাদির পক্ষে দীক্ষার অপেক্ষা) যদিও স্বরূপতঃ নাই (অর্থাৎ মন্ত্রের স্বরূপ বিচার করিলে দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই বটে,) তথাপি স্বভাবতঃ দেহাদিসম্বন্ধবশতঃ কদর্য্য-চরিত্র বিক্ষিপ্তচিত্ত জনসমূহের বিক্ষিপ্ত চিত্তকে সঙ্কুচিত করিবার উদ্দেশ্যে ঋষিগণ অর্চ্চনমার্গে কখনও কখনও কোনও কোনও মর্য্যাদাকে স্থাপিত করিয়াছেন (অর্থাৎ বিধি-নিষেধ পালনের ব্যবস্থা দিয়াছেন)। সে সমস্ত মর্য্যাদার (বিধিনিষেধের) লঙ্ঘনে শাস্ত্র আবার প্রায়শ্চিত্তের ব্যবস্থাও দিয়াছেন। এতদুভয়ের (বিধিনিষেধের অপেক্ষার এবং অপেক্ষাহীনতার) অসামঞ্জস্য নাই। স্বরূপগত শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রে যে বিধিনিষেধের বা মর্য্যাদার কোনও অপেক্ষা নাই, তাহার উদাহরণও আছে; রামার্চ্চনচন্দ্রিকায় শ্রীরামচন্দ্রকে লক্ষ্য করিয়া বলা হইয়াছে—'বৈষ্ণবমন্ত্রসমূহের মধ্যে রামমন্ত্রের ফলই অধিক ; গাণপত্যাদি মন্ত্র হইতে রামমন্ত্র কোটি কোটি গুণ অধিক। হে বিপ্রেন্দ্র! এই রামমন্ত্র দীক্ষা ব্যতীত, পুরশ্চর্য্যা ব্যতীত এবং ন্যাসবিধি ব্যতীতও জপমাত্রেই সিদ্ধি দান করিয়া থাকেন।"

ইহার পরে মন্ত্রদেব-প্রকাশিকা, তন্ত্র, সনৎকুমার-সংহিতাদি হইতে প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীজীব দেখাইয়াছেন যে—সৌরমন্ত্র, নারসিংহাদি বৈষ্ণবমন্ত্র, বরাহমন্ত্র, গোপালমন্ত্রাদি সম্বন্ধে সাধ্য-সিদ্ধাদি বিচারেরও অপেক্ষা নাই। এবং শ্রীগোপালমন্ত্র যে সকল বর্ণ, সকল আশ্রম এবং স্ত্রীলোকেরও অভীষ্ট ফল দান করে, তৎসম্বন্ধেও (অর্থাৎ বর্ণাশ্রম-স্ত্রী-পুরুষাদির অপেক্ষাহীনতা সম্বন্ধেও) শ্রীজীব প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন।

এ-স্থলে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী যাহা বলিয়াছেন, তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ :—

মন্ত্রও ভগবন্নামাত্মক ; মন্ত্রে আবার শ্রীভগবানের এবং ঋষিদের প্রণিহিত শক্তিও আছে ; সুতরাং স্বরূপতঃই মন্ত্র হইতেছে পরম-শক্তিসম্পন্ন। মন্ত্রের এতাদৃশ পরমশক্তিসম্পন্ন স্বরূপের বিচার করিলে অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে যে, মন্ত্রেও দীক্ষার অপেক্ষা থাকিতে পারে না। কিন্তু জ্যোতিঃস্বরূপ সূর্য্য সমস্ত জগৎকে স্বীয় জ্যোতিতে উদ্ভাসিত করিলেও জন্মান্ধ ব্যক্তির নিকটে সূর্য্য তেজোহীন বস্তুর তুল্য, জন্মান্ধব্যক্তি সূর্য্যের জ্যোতিঃ দেখিতে পায় না। তদ্রূপ, দেহাত্মবুদ্ধি কদর্য্যশীল ব্যক্তির, দুর্ব্বাসনা সমূহদ্বারা বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির, দেহেতে আবেশরূপ এবং বিক্ষিপ্তচিত্ততারূপ অন্ধতার জন্য স্বরূপতঃ পরমশক্তিসম্পন্ন মন্ত্রের শক্তি তাহার উপলব্ধির বিষয় হয় না, তাহার উপরে সম্যক্‌রূপে প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। জ্বলন্ত লৌহগোলকের স্পর্শেই স্পৃষ্ট বস্তু দগ্ধ হইয়া যায় ; কিন্তু কোনও বস্তু যদি এস্‌বেষ্টসের ন্যায় তাপের প্রভাব নিরোধক কোনও বস্তু দ্বারা সম্যক্‌রূপে আবৃত থাকে, তাহা হইলে জ্বলন্ত লৌহগোলকের তীব্র তেজঃ সেই বস্তুর উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারিবে না। অনাদিবহির্ম্মুখ সংসারাসক্ত জীবের চিত্তও অনাদিদুর্ব্বাসনাপুঞ্জের দ্বারা এমনিভাবে আচ্ছন্ন যে, পরম-শক্তিসম্পন্ন মন্ত্রের প্রভাব সেই চিত্তে অনুভূত হইতে পারে না। এতাদৃশ লোকের চিত্তে মন্ত্রের প্রভাব অনুভূত হয় না বলিয়া মন্ত্র যে শক্তিহীন, তাহা নয়। মন্ত্রের স্বরূপগত শক্তি নিত্যই বিদ্যমান। জন্মান্ধ ব্যক্তি সূর্য্য দেখেনা বলিয়া সূর্য্যের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইয়া যায় না। জন্মান্ধ ব্যক্তির অন্ধতা দূরীভূত হইলে সে যেমন সূর্য্য দেখিতে পায়, তাপ-প্রভাব-নিরোধক আবরণ অপসারিত হইলে তদ্দ্বারা আচ্ছাদিত বস্তু যেমন জ্বলন্ত লৌহগোলক-স্পর্শে দগ্ধ হইয়া যায়, তদ্রূপ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তির চিত্তবৃত্তিকে সঙ্কুচিত করিতে পারিলে, তাহার কদর্য্যশীলতা ক্রমশঃ দূরীভূত হইতে থাকিবে, সেই ব্যক্তিও ক্রমশঃ মন্ত্রের শক্তি অনুভব করিতে পারিবে। তাদৃশ লোকের চিত্তের এতাদৃশী অবস্থা আনয়নের জন্যই ঋষিগণ দীক্ষাগ্রহণের বিধান দিয়াছেন। দীক্ষা দানকালে শাস্ত্রোক্ত-লক্ষণ-বিশিষ্ট পরব্রহ্মের অপরোক্ষ অনুভূতিসম্পন্ন—সুতরাং অচিন্তনীয়-শক্তিসম্পন্ন—শ্রীগুরুদেব শিষ্যের মধ্যে যে শক্তি সঞ্চারিত করেন, সেই শক্তিই শিষ্যকে মন্ত্রজপের সামর্থ্য দান করে এবং ক্রমশঃ চিত্তকে মন্ত্রের বা মন্ত্রদেবতার দিকে কেন্দ্রীভূত হওয়ায় আনুকূল্য করিয়া থাকে। এজন্যই ঋষিগণ দীক্ষার বিধান করিয়াছেন এবং এই বিধানের অপালনে যে প্রত্যবায় হয়, তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

বস্তুতঃ কেবল মন্ত্রপ্রাপ্তির জন্যই দীক্ষার প্রয়োজনীয়তা নহে ; মন্ত্র গ্রন্থাদিতেও পাওয়া যায়। পূর্ব্বে বলা হইয়াছে—যাহাতে "দিব্যজ্ঞান" জন্মে, তাহাই দীক্ষা। মন্ত্রগুরুর শক্তিতেই এই দিব্যজ্ঞান জন্মিতে পারে। গুরুদেবের এই দিব্যজ্ঞানদায়িনী শক্তি এবং কৃপাশক্তির জন্যই মন্ত্রগুরুর চরণাশ্রয়ের, অর্থাৎ দীক্ষার, প্রয়োজনীয়তা।

যাহা হউক, শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—"তত উভয়মপি নাসমঞ্জসমিতি—মন্ত্রের স্বরূপ বিচার করিলে জানা যায়, মন্ত্রে দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই ; অথচ কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকদিগের চিত্তবৃত্তির

সঙ্কুচীকরণের নিমিত্ত ঋষিগণ দীক্ষার বিধান করিয়া গিয়াছেন।--এই উভয়ের মধ্যে অসামঞ্জস্য বা অসঙ্গতি কিছু নাই।”

সাধারণতঃ মনে হইতে পারে—মন্ত্রে যখন দীক্ষাদির অপেক্ষা নাই, তখন মন্ত্রে দীক্ষাদির বিধান সঙ্গত হয় না। কিন্তু পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে বুঝা যাইবে—ইহা অসঙ্গত নয়। মন্ত্রের পক্ষে দীক্ষাদির অপেক্ষাহীনতা ঋষিগণ অস্বীকার করেন নাই। তথাপি যে তাঁহারা দীক্ষার বিধান করিয়া গিয়াছেন, তাহা কেবল কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত লোকের অবস্থার দিকে লক্ষ্য রাখিয়াই, কিন্তু মন্ত্রের পক্ষে দীক্ষাদির অপেক্ষাহীনতার প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিয়া নহে। এজন্যই ঋষিদের দীক্ষাবিধান মন্ত্রের দীক্ষাদি-বিষয়ে অপেক্ষাহীনতার সহিত অসামঞ্জস্যপূর্ণ নহে।

যাহা হউক, দীক্ষাদিবিষয়ে ঋষিগণ যে মর্য্যাদা স্থাপন করিয়া গিয়াছেন, তাহাও শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দেখাইয়া গিয়াছেন।

“শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্র-বিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ব্রহ্মযামল॥

(৫।৩০ খ অনুচ্ছেদে এই শ্লোকের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)

ব্রহ্মযামলের এই বাক্যে বলা হইয়াছে—শ্রুতি-স্মৃতি-আদি শাস্ত্রবিধি পরিত্যাগপূর্ব্বক নিজের মনঃকল্পিত পন্থায় অত্যন্ত আগ্রহের সহিত ভজন করিলেও তাহাতে অভীষ্টসিদ্ধি হইতে পারে না, তাহাতে বরং নানাবিধ বিঘ্নেরই উদয় হয়।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৪-অনুচ্ছেদে) শ্রীমদ্ভাগবতের প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“অস্মিল্লোঁকেঽথবামুষ্মিন্ মুনিভিস্তত্ত্বদর্শিভিঃ। দৃষ্টা যোগাঃ প্রযুক্তাশ্চ পুংসাং শ্রেয়ঃপ্রসিদ্ধয়ে॥
তানাতিতিষ্ঠতি যঃ সম্যগুপায়ান্ পূর্ব্বদর্শিতান্। অবরঃ শ্রদ্ধয়োপেত উপেয়ান্ বিন্দতেঽঞ্জসা॥
তাননাদৃত্য যোঽবিদ্বানর্থানারভতে স্বয়ম্। তস্য ব্যভিচরন্ত্যর্থা আরব্ধাশ্চ পুনঃপুনঃ॥
শ্রীভা, ৪।১৮।৩-৫॥

—(পৃথিবীদেবী পৃথুমহারাজকে বলিয়াছিলেন) মহারাজ! তত্ত্বদর্শী মুনিগণ লোকদিগের পুরুষার্থ-সিদ্ধির নিমিত্ত, ইহলোকের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য কৃষিকর্ম্মাদি এবং পরলোকের অভীষ্টসিদ্ধির জন্য অগ্নিহোত্র-যজ্ঞাদি উপায়সকল দর্শন (নির্ণয়) করিয়াছেন এবং নিজেরাও অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। যিনি শ্রদ্ধান্বিত হইয়া পূর্ব্বতন মুনিদিগের প্রদর্শিত সেই সকল উপায় সম্যক্রূপে অনুষ্ঠান করেন, তিনি অর্ব্বাচীন হইলেও অনায়াসে স্বীয় উপেয়সকল (অভীষ্ট বস্তু সকল) লাভ করিতে পারেন। কিন্তু যে মূর্খ ব্যক্তি (শাস্ত্রকথিত পন্থায় অনাদর করেন বলিয়া মূর্খ) সে সকল উপায়ের প্রতি অনাদর প্রদর্শনপূর্ব্বক স্বয়ং কোনও কার্য্য আরম্ভ করেন (স্বীয় মনঃকল্পিত পন্থার অনুসরণ আরম্ভ করেন),

তাঁহার সমস্ত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইয়া যায়, যতবার আরম্ভ করুন না কেন, ততবারই ব্যর্থ হইয়া যায়। বরং তাহাতে নানাবিধ বিঘ্নই আসিয়া পড়ে।”

শ্রীজীবপাদ পদ্মপুরাণের একটী প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

“মদ্ভক্তো যো মদর্চ্চাঞ্চ করোতি বিধিবদৃষে।
তস্যান্তরায়াঃ স্বপ্নেঽপি ন ভবন্ত্যভয়ো হি সঃ॥

—(শ্রীনারায়ণ নারদকে বলিয়াছেন) হে ঋষে! আমাতে ভক্তিমান্ হইয়া যিনি শাস্ত্রবিধি অনুসারে আমার অর্চ্চনা করেন, স্বপ্নেও তাঁহার কোনও বিঘ্ন উপস্থিত হয় না, তিনি সর্ব্বপ্রকারেই নির্ভয় হয়েন।”

এ-স্থলে শাস্ত্রবিধির অনুসরণের মহিমার কথা বলা হইল।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী দীক্ষাপ্রসঙ্গেই উল্লিখিত ব্রহ্মযামলবাক্য, শ্রীমদ্ভাগবত-বাক্য এবং পদ্মপুরাণ-বাক্য উদ্ধৃত করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার অভিপ্রায় এই যে—শাস্ত্র যখন দীক্ষাগ্রহণের অত্যাবশ্যকতার কথা বলিয়া গিয়াছেন, তখন দীক্ষাগ্রহণ না করিয়া ঐকান্তিকভাবে ভজন করিলেও অভীষ্ট ফল পাওয়া যাইবে না, বরং নানাবিধ বিঘ্নেরই সৃষ্টি করা হইবে।

আলোচনার সারমর্ম্ম

উল্লিখিত আলোচনা হইতে যাহা জানা গেল, তাহার সার মর্ম্ম হইতেছে এই :—

মন্ত্রের স্বরূপ বিচার করিলে ভগবন্নামের ন্যায় মন্ত্রেও যে দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা নাই, তাহা স্বীকার করিতে হইবে। কেননা, মন্ত্রও ভগবন্নামাত্মক এবং মন্ত্রে শ্রীভগবানের এবং ঋষিদিগের প্রণিহিত শক্তিও আছে; সুতরাং মন্ত্র অপূর্ব্ব-শক্তিসম্পন্ন। তথাপি কিন্তু মহানুভব ঋষিগণ দীক্ষাগ্রহণের অবশ্যকর্ত্তব্যতার কথা বলিয়া গিয়াছেন। দীক্ষাগ্রহণের অত্যাবশ্যকত্বসম্বন্ধে তাঁহারা বলেন—দীক্ষা ব্যতীত (অর্থাৎ দীক্ষাদান-কালে শ্রীগুরুদেব যে শক্তিসঞ্চার করেন, সেই শক্তি ব্যতীত) কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত ব্যক্তিগণের বিক্ষিপ্তচিত্তবৃত্তি সঙ্কুচিত হইতে পারে না, সুতরাং মন্ত্রের প্রভাবও তাঁহাদের চিত্তে উপলব্ধ হইতে পারে না। ঋষিদের কথিত বিধানের প্রতি অনাদর প্রদর্শন করিলে যে কাহারও মঙ্গল হয় না, শাস্ত্রবিধির মর্য্যাদা-রক্ষণেই যে মঙ্গল লাভ হইতে পারে, শাস্ত্র তাহাও বলিয়া গিয়াছেন। সুতরাং শ্রেয়ঃকামীর পক্ষে শাস্ত্রবিধির পালনই কর্ত্তব্য, শাস্ত্রবিধির অনুসরণে শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে দীক্ষাগ্রহণ করিয়াই ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা সঙ্গত। তাহা না হইলে সাধকের অভীষ্ট পরমার্থ লাভ হইবে না, বরং তাঁহাকে নানাবিধ বিঘ্নের সম্মুখীন হইতে হইবে। এই প্রসঙ্গে ৫।৩০-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

এই প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী মন্ত্রসম্বন্ধে আরও একটী কথা বলিয়া গিয়াছেন। “মন্ত্রাঃ * * * শ্রীভগবতা সমমাত্মসম্বন্ধবিশেষপ্রতিপাদকাশ্চ।—মন্ত্রসমূহ শ্রীভগবানের সহিত সাধকের নিজের সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক।” ভগবানের সঙ্গে জীবের সাধারণভাবে সেব্য-সেবক-সম্বন্ধ

থাকিলেও যাঁহারা ব্রজের প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষী, ব্রজের দাস্য-সখ্যাদি চতুর্ব্বিধভাবের কোনও এক-ভাবের অনুরূপ সম্বন্ধে সম্বন্ধান্বিত হইয়াই তাঁহারা শ্রীকৃষ্ণের সেবা পাইতে বাসনা করেন। মন্ত্রের দ্বারাই তাঁহারা এই সম্বন্ধে প্রতিষ্ঠিত হইতে পারেন। সুতরাং শ্রীগুরুদেবের নিকট হইতে মন্ত্রগ্রহণ তাঁহাদের পক্ষে অপরিহার্য্য। শ্রীমন্‌মহাপ্রভু নিজেও দীক্ষা গ্রহণ করিয়া ব্রজের প্রেমসেবাকাঙ্ক্ষীর পক্ষে দীক্ষা গ্রহণের আবশ্যকতার কথা জানাইয়া গিয়াছেন।

গ। নাম ও সাধকের সম্বন্ধবিশেষ

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, নামে দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা নাই। দীক্ষাগ্রহণ না করিয়াও ভগবানের নাম কীর্ত্তন করা যায় এবং তাহার ফলে সমস্ত পাপও বিনষ্ট হয়, মুক্তি লাভও হর এবং নাম "চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়।" পূর্ব্বপক্ষের উক্তির মধ্যে শ্রীপাদ জীব গোস্বামীও বলিয়াছেন —"শ্রীভগবন্নামান্যপি নিরপেক্ষাণ্যেব পরমপুরুষার্থপর্য্যন্তদানসমর্থানি।—ভগবানের নামসমূহ দীক্ষাদির অপেক্ষা না রাখিয়াও পরমপুরুষার্থপর্য্যন্ত দান করিতে সমর্থ।"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতে পারে—শ্রীজীবপাদের উক্তি উদ্ধৃত করিয়া পূর্ব্বে বলা হইয়াছে যে, মন্ত্র হইতেছে শ্রীভগবানের সহিত সাধকের সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক। নামও যে তদ্রূপ সম্বন্ধবিশেষের প্রতিপাদক, তাহা বলা হয় নাই। ব্রজের প্রেমসেবায় দাস্য-সখ্যাদি ভাবের অনুরূপ সম্বন্ধের প্রয়োজন আছে। যাঁহারা দীক্ষাদিব্যতীত কেবল নামসঙ্কীর্ত্তন করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে ব্রজের প্রেম-সেবা লাভ সম্ভবপর হইবে কিনা? নাম যখন 'চিত্ত আকর্ষিয়া করে কৃষ্ণপ্রেমোদয়", তখন দীক্ষার অপেক্ষা না করিয়া কেবল নামকীর্ত্তনেই ব্রজের প্রেমসেবা লাভই বা হইবেনা কেন?

উত্তরে বক্তব্য এই। নামে যে প্রেম লাভ হয়, তাহা শাস্ত্রপ্রসিদ্ধ; নামে মুক্তিও হয়। নামের আভাসেও অজামিল বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব লাভ করিয়াছিলেন। যাঁহারা সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব প্রাপ্ত হয়েন, তাঁহারাও প্রেম লাভ করিয়াই মুক্ত হয়েন; কিন্তু তাঁহাদের প্রেম হইতেছে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান-প্রধান প্রেম, শান্তভাবের প্রেম, তাহাতে মমত্ববুদ্ধি নাই। সম্যক্‌রূপে মমত্ববুদ্ধিময় নির্ম্মল প্রেম হইতেছে একমাত্র ব্রজেরই সম্পত্তি। এতাদৃশ নির্ম্মল প্রেম হইতেছে দাস্য-সখ্যাদি- ভাবময় এবং তদনুরূপ সম্বন্ধবিশিষ্ট।

এখন বিবেচ্য হইতেছে—দীক্ষামন্ত্রদ্বারা ভগবানের সহিত সাধকের অভীষ্ট সম্বন্ধ প্রতিপাদিত হয়; দীক্ষা ব্যতীত কেবল নামের আশ্রয়ে তাহা হইতে পারে কিনা?

দীক্ষামন্ত্রব্যতীত কেবল নাম যে দাস্য-সখ্যাদি ভাবের অনুরূপ সম্বন্ধ প্রতিপাদন করে, তাহার কোনও স্পষ্ট উক্তি বা উদাহরণ পাওয়া যায়না। বিশেষতঃ, ব্রজের প্রেমসেবা পাইতে হইলে রাগানুগামার্গের ভজনে সাধকদেহে এবং সিদ্ধদহেও মন্ত্রদাতা গুরুর আনুগত্যেই ভজন করার বিধি শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। দীক্ষা গ্রহণ না করিয়া যিনি কেবল নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার পক্ষে গুরু দেবের বা গুরুদেবের সিদ্ধদেহের আনুগত্য সম্ভব নয়।

তবে নামসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যকথন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

সঙ্কীর্ত্তন হৈতে— পাপ-সংসার-নাশন। চিত্তশুদ্ধি, সর্ব্বভক্তি-সাধন-উদ্‌গম ॥
কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম, প্রেমামৃত-আস্বাদন। কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত-সমুদ্রে মজ্জন ॥
শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।১০-১১॥

এই উক্তি হইতে জানা যায়—"সঙ্কীর্ত্তন হৈতে সর্ব্বভক্তি-সাধন উদ্‌গম" হয়। ভক্তিমার্গে যে-যে সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানের প্রয়োজন, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে সে-সমস্তই চিত্তে স্ফুরিত হয় এবং নামসঙ্কীর্ত্তনই সাধকের দ্বারা সে-সমস্ত অনুষ্ঠান করাইয়া লয়। নামসঙ্কীর্ত্তনের ফলে চিত্তের মলিনতা যখন দূরীভূত হইতে থাকে, তখন চিত্ত ক্রমশঃ শ্রীকৃষ্ণে উন্মুখ হয়। তখন সৌভাগ্যবশতঃ যদি ব্রজের প্রেমসেবার জন্য সাধকের চিত্তে লালসা জাগে, তাহা হইলে নামই কৃপা করিয়া তাঁহার চিত্তে দীক্ষাগ্রহণের বাসনা জাগাইয়া দেয় এবং গুরুদেবের চরণাশ্রয়ও করাইয়া লয়। দীক্ষাগ্রহণের পরে নামসঙ্কীর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে রাগানুগার অন্তর-সাধন করিতে থাকিলে যথাসময়ে "কৃষ্ণপ্রেমোদ্‌গম—স্বীয় অভীষ্ট ভাবানুরূপ ব্রজপ্রেমের উদয়", "প্রেমামৃত-আস্বাদন" হইয়া থাকে এবং সাধনের পূর্ণতায় "কৃষ্ণপ্রাপ্তি, সেবামৃত সমুদ্রে মজ্জন" হইয়া থাকে।

এইরূপে দেখা যায়—দীক্ষাগ্রহণব্যতীত যিনি শ্রীভগবন্নামের আশ্রয় গ্রহণ করেন, তাঁহার চিত্তে যদি ব্রজের প্রেমসেবার বাসনা জাগে, তাহা হইলে শ্রীনামই কৃপা করিয়া তাঁহার চিত্তে দীক্ষাগ্রহণের বাসনা জাগাইয়া দেয় এবং দীক্ষাগ্রহণ করাইয়া ব্রজপ্রেম-প্রাপ্তির অনুকূল সাধন করাইয়া থাকে।

সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া যাঁহারা বৈকুণ্ঠ-পার্ষদত্ব লাভ করেন, বৈকুণ্ঠে পার্ষদ-রূপে তাঁহাদের পক্ষে গুরুদেবের সিদ্ধদেহের আনুগত্যের কথা জানা যায় না। সুতরাং দীক্ষাগ্রহণ না করিয়াও কেবল নামসঙ্কীর্ত্তনের ফলেই তাঁহাদের বৈকুণ্ঠপ্রাপ্তি সম্ভব হইতে পারে।

ঘ। মন্ত্র অপেক্ষা নামের শক্তির উৎকর্ষ

নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামের অসাধারণ অচিন্ত্যশক্তি। মন্ত্রে শ্রীভগবান্ এবং ঋষিগণ শক্তি প্রণিহিত করেন; কিন্তু নামে শক্তিপ্রণিহিত করিবার প্রয়োজন নাই; কেননা, নামী-ভগবানের ন্যায় নামেরই স্বরূপগত সমস্ত শক্তি আছে। এই বিষয়ে মন্ত্র অপেক্ষাও নামের মহিমার আধিক্য। অগ্নি-তাদাত্ম্য-প্রাপ্ত লৌহের দাহিকাশক্তি অপেক্ষা অগ্নির দাহিকাশক্তির যেমন স্বরূপগত উৎকর্ষ আছে, তদ্রূপ। এজন্য, নাম নিজেই, দীক্ষাদিনিরপেক্ষ ভাবে, দেহাত্মবুদ্ধি কদর্য্যশীল বিক্ষিপ্তচিত্ত জীবের চিত্তবৃত্তির সঙ্কুচীকরণে সমর্থ। ৫।১০৬-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

ঙ। দীক্ষাগ্রহণেচ্ছুর বিবেচ্য বিষয়

যিনি সাধন-ভজন করিতে ইচ্ছুক, নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয়ে তাঁহার লক্ষ্য রাখা প্রয়োজন।

প্রথমতঃ, শাস্ত্রোক্ত লক্ষণ-বিশিষ্ট গুরুর শরণ গ্রহণ করা প্রয়োজন। নচেৎ, সাধন-পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইবে না, নানাবিধ বিপর্য্যয়ও উপস্থিত হইতে পারে।

দ্বিতীয়তঃ, শ্রুতি-স্মৃতিতে সালোক্য, সার্ষ্টি, সারূপ্য, সামীপ্য ও সাযুজ্য এই-পঞ্চবিধা মুক্তির কথা আছে। তদতিরিক্ত আবার ব্রজের প্রেমসেবার কথাও আছে। এই প্রেমসেবার মধ্যে আবার দাস্য, সখ্য, বাৎসল্য ও মধুর ভাবের ভজনের কথাও আছে। সকল লোকের রুচি ও প্রবৃত্তি এক রকম নহে ; সুতরাং সকলের চিত্ত এক রকম লক্ষ্যের প্রতি আকৃষ্ট হইতে পারে না। কোন্ লক্ষ্যের প্রতি কাহার চিত্তের প্রবণতা আছে, তাহাও সাধারণতঃ সহজে ধরা যায় না। এজন্য সর্ব্বপ্রথমে উল্লিখিত লক্ষ্যগুলির স্বরূপসম্বন্ধে মোটামোটী জ্ঞানের প্রয়োজন। এই জ্ঞান লাভ করিতে হইলে শাস্ত্রজ্ঞানের আবশ্যক। এজন্যই সাধনেচ্ছুর পক্ষে সর্ব্বপ্রথমেই উপযুক্ত শ্রবণগুরুর শরণ গ্রহণ করা সঙ্গত। শ্রবণগুরুর মুখে শাস্ত্রকথা শুনিতে শুনিতে পঞ্চবিধা মুক্তি এবং দাস্য-সখ্যাদি চতুর্ব্বিধা ভগবৎ-প্রেমসেবাপ্রাপ্তির সম্বন্ধে জ্ঞান জন্মিতে পারে। চিত্তের প্রবণতা কোন্ দিকে, তখনই তাহা স্থির করা যায়। চিত্তবৃত্তির অনুকূল সাধনপন্থা অবলম্বন করিলেই সাধনে অগ্রগতি সুখকর হইতে পারে।

তৃতীয়তঃ, যেই ভাবের সাধনে চিত্তের প্রবণতা দেখা যায়, সেই ভাবের সাধকগুরুর নিকটেই দীক্ষা গ্রহণের নিমিত্ত উপনীত হওয়া সঙ্গত। যিনি যেই-পন্থার পথিক, তিনি সেই পন্থারই পরিচয় দিতে সমর্থ, অন্য পন্থার পরিচয় তাঁহার নিজেরই নাই ; তিনি কিরূপে সেই পন্থার পরিচয় অন্যকে জানাইতে পারেন ?

একই সাধকের পক্ষে একাধিক পন্থায় সিদ্ধিলাভ অসম্ভব

রসস্বরূপ পরব্রহ্মে অনন্ত রসবৈচিত্রীর সমবায়। যে রসবৈচিত্রীতে যাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তিনি সেই রসবৈচিত্রীর উপলব্ধির অনুকূল সাধনপন্থাই অবলম্বন করেন এবং সাধন-পূর্ণতায় সেই রসবৈচিত্রীর অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়া থাকেন। গুরুর যে সমস্ত শাস্ত্রোক্ত লক্ষণের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, তন্মধ্যে অপরোক্ষ অনুভবই হইতেছে মুখ্য লক্ষণ। যিনি যেই রসবৈচিত্রীর অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়াছেন, তিনি সেই রসবৈচিত্রীর পরিচয়ই অভ্রান্তভাবে অপরকে বা শিষ্যকে জানাইতে পারেন, অন্য রসবৈচিত্রীর অভ্রান্ত পরিচয় তিনি জানাইতে পারেন না। যেই রসবৈচিত্রীর অপরোক্ষ অনুভব যিনি লাভ করেন, সেই রসবৈত্রীতেই তাঁহার ঐকান্তিকী নিষ্ঠা লাভ হয়, তাহাতেই তিনি তন্ময় হইয়া থাকেন ; সেই রসবৈচিত্রীই তাঁহার সর্ব্বস্ব ; অন্য রসবৈচিত্রীর দিকে তাঁহার অনুসন্ধান থাকে না। শ্রীহনুমানের উক্তিই তাহার প্রমাণ। "শ্রীনাথে জানকীনাথে অভেদঃ পরমাত্মনি। তথাপি মম সর্ব্বস্বং রামকমললোচনঃ॥"

লৌকিক জগতে একই মেধাবী ব্যক্তি একাধিক বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হইতে পারেন, একই ব্যক্তি বহুবিষয়ে এম্, এ, পাশ করিতে পারেন। কিন্তু পারমার্থিক রাজ্যে একই সাধকের পক্ষে একাধিক সাধন-পন্থায় সিদ্ধ হওয়া সম্ভবপর নহে। কেননা, লৌকিক জগতের জ্ঞান, এমন কি বেদাদি শাস্ত্রের জ্ঞানও, অপরাবিদ্যার অন্তর্ভুক্ত ; যিনি কেবল অপরাবিদ্যারই অনুশীলন করেন, তিনি অপরা-

বিদ্যার অন্তর্গত কোনও বিষয়ে যতই অভিজ্ঞ হউন না কেন, বহিরঙ্গা মায়ারই অধীন তিনি থাকেন। এই মায়া সর্ব্বদাই জীবের চিত্তকে নানাদিকে পরিচালিত করে। এজন্য তিনি কোনও এক বিদ্যায় পারদর্শী হইলেও অপর বিদ্যা লাভের জন্য চেষ্টা করিতে পারেন। কিন্তু পারমার্থিক ব্যাপার হইতেছে পরা বিদ্যার আয়ত্তে। পরাবিদ্যার প্রভাবে সাধক রসস্বরূপ পরব্রহ্মের রসবৈচিত্রী-বিশেষের অপরোক্ষ অনুভব লাভ করিয়া সাধনে সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন। পরাবিদ্যা চিত্তকে একাধিক দিকে আকর্ষণ করে না, কেবল অভীষ্ট রসবৈচিত্র্যের দিকেই আকর্ষণ করে এবং তাহাতে নিষ্ঠা প্রাপ্ত করায়; তাহাতেই সাধক "ধীর" হইতে পারেন; ধীর হইলেই ব্রহ্মানুভব সম্ভব। শ্রুতিও বলিয়াছেন—"ধীরাস্তং পরিপশ্যন্তি।" এক সাধনে সিদ্ধি লাভ করিলে অন্য রসবৈচিত্রীর অনুভবের জন্য সাধনের কথা সিদ্ধ-সাধকের চিত্তে কখনও উদ্ভূত হইতেই পারে না এজন্যই বলা হইয়াছে, পারমার্থিক রাজ্যে একই সাধকের পক্ষে একাধিক সাধনপন্থায় সিদ্ধ হওয়া অসম্ভব। একরকম সাধন-পন্থার পরে আর এক রকম সাধন-পন্থা অবলম্বন করেন, এইরূপ সাধকের কথাও শুনা যায়। পন্থার পরিবর্ত্তনেই বুঝা যায়, যে পন্থা পরিত্যাগ করিয়া অন্য পন্থা অবলম্বন করা হয়, সেই পন্থায় তিনি নিষ্ঠা বা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন নাই, সিদ্ধি লাভের কথা তো দূরে।

এজন্যই বলা হইয়াছে, যিনি যে সাধন-পন্থার অনুসরণে ভগবদনুভব লাভ করিয়াছেন, সেই পন্থায় অপরকে অভ্রান্তভাবে পরিচালিত করিতে এবং সেই পন্থার লক্ষ্য রসবৈচিত্রীর জ্ঞান জন্মাইতে সমর্থ। অন্য পন্থায় তিনি কাহাকেও সার্থকভাবে পরিচালিত করিতে সমর্থ নহেন।

এজন্যই শাস্ত্র বলিয়াছেন, সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র নিষ্ফল হয়।

"সম্প্রদায়বিহীনা যে মন্ত্রাস্তে নিষ্ফলা মতাঃ ॥—ভক্তমালধৃত-পাদ্মবচন ॥"

কিন্তু সম্প্রদায়ই বা কি? সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্রই বা কি?

যাঁহারা একই ভাবের আনুগত্যে, একই রসবৈচিত্রীর উপলব্ধির জন্য উপাসনা করেন, তাঁহারাই এক সম্প্রদায়ভুক্ত। এইরূপে, বিভিন্ন ভাবের সাধকের বিভিন্ন সম্প্রদায় আছে। যিনি যে সম্প্রদায়ের সাধক, তিনি যদি অন্য সম্প্রদায়ের উপাসনা-মন্ত্র কাহাকেও দান করেন, তবে তাহা হইবে সম্প্রদায়বিহীন মন্ত্র, তাহা হইবে নিষ্ফল, সেই মন্ত্রদ্বারা অভীষ্ট ফল পাওয়া যাইবে না।

চতুর্থতঃ, যিনি ব্রজের প্রেমসেবাকামী, দাস্য-সখ্যাদি ভাবের কোন্ ভাবের প্রতি তাঁহার চিত্ত আকৃষ্ট হয়, তাহা তিনি স্থির করিবেন। সেই ভাবের সাধকগুরুর চরণই তিনি আশ্রয় করিবেন। সখ্যভাবের সাধকের নিকটে বাৎসল্যভাবের বা কান্তাভাবের উপাসনা-মন্ত্র গ্রহণ করিলে, কিম্বা কান্তাভাবের সাধকের নিকটে বাৎসল্যাদি ভাবের মন্ত্র গ্রহণ করিলে তাহা হইবে সম্প্রদায়বিহীন-মন্ত্র; তাহা অভীষ্ট ফলদায়ক হইবে না। তদ্দ্বারা ভজনের আনুকূল্যও হইবে না।

একথা বলার হেতু এই। শাস্ত্র উপদেশ করিয়াছেন, বৈষ্ণবসঙ্গ করিতে হইলে সজাতীয়-

আশয়যুক্ত বৈষ্ণবের সঙ্গ করিবে।* যাঁহারা একই ভাবের উপাসক, অর্থাৎ যাঁহারা দাস্য-সখ্যাদি চারিটী ভাবের কোনও একই ভাবে ব্রজেন্দ্রনন্দনের সেবা কামনা করেন, তাঁহাদিগকেই সজাতীয়-আশয়যুক্ত বলা যাইতে পারে; বাৎসল্যভাবের সাধক যদি মধুরভাবের সাধকের সঙ্গ করেন, তাহা হইলে কাহারও পক্ষেই প্রাণ-খোলা ইষ্টগোষ্ঠী সম্ভব হয় না; সুতরাং এইরূপ সঙ্গদ্বারা কাহারও ভাবপুষ্টির সম্ভাবনা থাকেনা। এই গেল সাধারণ বৈষ্ণবসঙ্গ-সম্বন্ধে। গুরুর সঙ্গ সাধকের পক্ষে বৈষ্ণব-সঙ্গ অপেক্ষা বহুগুণে প্রয়োজনীয় এবং অপরিহার্য্য। সুতরাং গুরু ও শিষ্য যদি একই ভাবের উপাসক না হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাদের পরস্পরের সঙ্গে কাহারও ভাব-পুষ্টির সম্ভাবনা থাকে না। গুরুসঙ্গ দুই রকমের—বহিরঙ্গ ও অন্তরঙ্গ; সাধকের যথাবস্থিত দেহে, গুরুর যথাবস্থিত দেহের সঙ্গ—বহিরঙ্গ সঙ্গ। আর সাধকের অন্তশ্চিন্তিত দেহে গুরুর অন্তশ্চিন্তিত দেহের সহিত সঙ্গ—অন্তরঙ্গ সঙ্গ। সেবা-শুশ্রূষাদি দ্বারা গুরুকৃপা লাভের জন্য বহিরঙ্গ-সঙ্গের প্রয়োজন। আর, সিদ্ধাবস্থায় সেবোপযোগী অন্তশ্চিন্তিত দেহের স্ফূর্ত্তি ও পুষ্টির জন্য অন্তরঙ্গ-সঙ্গের প্রয়োজন। সিদ্ধাবস্থায় অন্তশ্চিন্তিত সিদ্ধ-দেহেই ব্রজেন্দ্র-নন্দনের সেবা করিতে হয় এবং ভাবানুকূল সিদ্ধদেহপ্রাপ্ত গুরুর নির্দ্দেশেই সিদ্ধাবস্থায় সেবা করিতে হয়। কিন্তু গুরু ও শিষ্য যদি একভাবের উপাসক না হয়েন, তাহা হইলে সিদ্ধাবস্থায় তাঁহারা ব্রজেন্দ্র-নন্দনের একভাবের পরিকর-দলভুক্ত হইবেন না। গুরু যদি কান্তাভাবের উপাসক হয়েন, তবে তাঁহার কাম্যবস্তু হইবে সিদ্ধদেহে শ্রীবৃষভানুনন্দিনীর কিঙ্করীরূপে তাঁহার চরণসান্নিধ্যে থাকা; আর শিষ্য যদি বাৎসল্যভাবের উপাসক হয়েন, তবে তাঁহার কাম্যবস্তু হইবে, নন্দালয়ে শ্রীযশোদামাতার চরণ-সান্নিধ্যে থাকা। দুইজন দুইস্থানে থাকিতে বাসনা করিবেন; সুতরাং উভয়ের অন্তরঙ্গ-সঙ্গ সম্ভব হইবে না। এমতাবস্থায় সিদ্ধপ্রণালিকা দেওয়াই অসম্ভব হইবে। এই সমস্ত কারণে গুরু ও শিষ্য একই ভাবের উপাসক হইলেই ভাল হয়।

৭৬। গুরুসেবা

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের ২৩৭-অনুচ্ছেদে গুরুসেবার আবশ্যকতা প্রদর্শন করিয়াছেন। তিনি বলিয়াছেন—যদিও ভগবৎ-শরণাপত্তিতেই সমস্ত সিদ্ধ হইতে পারে, তথাপি যিনি বৈশিষ্ট্যলিপ্সু (বিশেষ-সেবারসাস্বাদনলিপ্সু), সমর্থ হইলে তিনি ভগবৎ-শাস্ত্রোপদেষ্টা বা মন্ত্রোপ-দেষ্টা গুরুর (অর্থাৎ যাঁহার সেবা সম্ভবপর হয়, তাঁহার) নিত্যই বিশেষরূপে সেবা করিবেন। কেননা, নিজের চেষ্টায় নানা উপায়েও যে সকল অনর্থ দূরীভূত হইতে পারেনা, গুরুকৃপাতে সে-সমস্ত দূরীভূত হইতে পারে এবং ভগবানের পরম অনুগ্রহ লাভও গুরুকৃপাতেই লাভ হইতে পারে। "যদ্যপি শরণাপত্ত্যৈব সর্ব্বং সিধ্যতি, * * *, তথাপি বৈশিষ্ট্যলিপ্সুঃ শক্তশ্চেত্ততো ভগবচ্ছাস্ত্রোপদেষ্টৄণাং

*সজাতীয়াশয়ে সিগ্ধে সাধৌ সঙ্গঃ স্বতো বরে॥ ভ, র, সি, ১।২।৪৩॥

ভগবন্মন্ত্রোপদেষ্টৄণাং বা শ্রীগুরুচরণানাং নিত্যমেব বিশেষতঃ সেবাং কুর্য্যাৎ। তৎপ্রসাদো হি স্ব-স্ব-নানা-প্রতীকারতুস্ত্যজানর্থহানৌ পরমভগবৎপ্রসাদসিদ্ধৌ চ মুলম্।"

এই উক্তির সমর্থনে তিনি শাস্ত্রপ্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা, অনর্থনিবৃত্তি সম্বন্ধে,

"অসঙ্কল্লাজ্জয়েৎ কামং ক্রোধং কামবিবর্জ্জনাৎ। অর্থানর্থেক্ষয়া লোভং ভয়ং তত্ত্বাবমর্শনাৎ॥
আন্বিক্ষিক্যা শোকমোহৌ দম্ভং মহদুপাসয়া। যোগান্তরায়ান্ মৌনেন হিংসাং কামাদ্যনীহয়া॥
কৃপয়া ভূতজং দুঃখং দৈবং জহ্যাৎ সমাধিনা। আত্মজং যোগবীর্য্যেণ নিদ্রাং সত্ত্বনিষেবয়া॥
রজস্তমশ্চ সত্ত্বেন সত্ত্বঞ্চোপশমেন চ। এতৎ সর্ব্বং গুরৌ ভক্ত্যা পুরুষো হ্যঞ্জসা জয়েৎ॥
—শ্রীভা, ৭।১৫।২২-২৫॥

—(শ্রীনারদ মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে বলিয়াছেন) সঙ্কল্প-পরিত্যাগের দ্বারা কামকে জয় করিবে, কামনাবিসর্জ্জনের দ্বারা ক্রোধকে জয় করিবে, অর্থে অনর্থদৃষ্টিদ্বারা লোভকে জয় করিবে, তত্ত্বজ্ঞানদ্বারা (প্রারব্ধফল অবশ্যই ভোগ করিতে হইবে; সুতরাং কে-ই বা কাহার দুঃখের বা ভয়ের হেতু—এইরূপ বিচার করিয়া) ভয়কে জয় করিবে। আত্ম-অনাত্ম-বিচারের দ্বারা শোক-মোহকে জয় করিবে, মহতের সেবাদ্বারা দম্ভকে জয় করিবে, মৌনাবলম্বন করিয়া সাধনের অন্তরায় লোকবার্ত্তাদিকে পরিত্যাগ করিবে, কামাদিবিষয়ে চেষ্টাপরিত্যাগের দ্বারা হিংসাকে জয় করিবে। যে সকল প্রাণী হইতে দুঃখ জন্মিতে পারে, তাহাদের প্রতি কৃপাদ্বারা সেই সকল প্রাণী হইতে সম্ভবপর দুঃখকে জয় করিবে, ভগবানে চিত্তের একাগ্রতা (সমাধি) দ্বারা দৈবদুঃখকে (বৃথা মনঃ-পীড়াদিকে) জয় করিবে, আত্মজন্য (দৈহিক) দুঃখকে প্রাণায়ামাদি যোগের প্রভাবে জয় করিবে, সত্ত্বগুণের সেবাদ্বারা নিদ্রাকে জয় করিবে। সেই সত্ত্বগুণের (সাত্ত্বিক আহারাদির) দ্বারাই রজঃ ও তমঃকে দূর করিবে এবং উপশমের (ঔদাসীন্যের) দ্বারা সত্ত্বকে জয় করিবে। শ্রীগুরুতে ভক্তির প্রভাবে উল্লিখিত সমস্ত অন্তরায়ই অনায়াসে দূরীভূত হইতে পারে।"

উল্লিখিত শ্লোকসমূহে কামক্রোধাদিকে জয় করার জন্য যে সমস্ত উপায়ের কথা বলা হইয়াছে, সে-সমস্ত উপায়েও তদ্রূপ জয় দুঃসাধ্য এবং সে-সমস্ত উপায়ে অনর্থরাশির সম্যক্ দূরীকরণও সম্ভব নয়। কিন্তু শ্রীগুরুদেবে ভক্তি থাকিলে কেবলমাত্র গুরুভক্তির প্রভাবে সমস্ত অনর্থ অনায়াসে দূরীভূত হইতে পারে।

ভগবানের পরম অনুগ্রহ লাভের মূলও যে গুরুকৃপা তাহাও শ্রীজীবপাদ দেখাইয়াছেন।

"যো মন্ত্রঃ স গুরুঃ সাক্ষাৎ যো গুরুঃ স হরিঃ স্বয়ম্।
গুরুর্যস্য ভবেত্তুষ্টস্তস্য তুষ্টো হরিঃ স্বয়ম্॥ বামনকল্পে ব্রহ্মবাক্যম্॥

—যিনি মন্ত্র, তিনিই গুরু; যিনি গুরু, তিনিই স্বয়ং হরি; গুরু যাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন, স্বয়ং শ্রীহরিও তাঁহার প্রতি প্রসন্ন হয়েন।"

অন্যত্রও দেখা যায়,

"হরৌ রুষ্টে গুরুস্ত্রাতা গুরৌ রুষ্টে ন কশ্চন।
তস্মাৎ সর্ব্বপ্রযত্নেন গুরুমেব প্রসাদয়েৎ॥

—হরি রুষ্ট হইলে গুরুদেব রক্ষা করিতে পারেন; কিন্তু গুরু রুষ্ট হইলে কেহই রক্ষা করিতে পারেন না। অতএব সর্ব্বপ্রযত্নে শ্রীগুরুদেবেরই প্রসন্নতা বিধান করিবে।"

শ্রীভগবান্‌ও অন্যত্র বলিয়াছেন,

"প্রথমন্তু গুরুং পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্।
কুর্ব্বন্ সিদ্ধিমবাপ্নোতি হ্যনথা নিষ্ফলং ভবেৎ॥

—প্রথমে গুরুর পূজা করিয়া তাহার পরে যিনি আমার অর্চ্চনা করেন, তিনিই সিদ্ধি লাভ করিতে পারেন; অন্যথা তাঁহার সমস্তই নিষ্ফল হয়।"

নারদপঞ্চরাত্রও বলিয়াছেন,

"বৈষ্ণবং জ্ঞানবক্তারং যো বিদ্যাদ্বিষ্ণুবদ্‌গুরুম্।
পূজয়েদ্বাঙ্‌মনঃকায়ৈঃ স শাস্ত্রজ্ঞঃ স বৈষ্ণবঃ॥
শ্লোকপাদস্য বক্তাপি যঃ পূজ্যঃ স সদৈব হি।
কিং পুনর্ভগবদ্‌বিষ্ণোঃ স্বরূপং বিতনোতি যঃ॥ ইত্যাদি॥

—যিনি জ্ঞানোপদেষ্টা বৈষ্ণবগুরুকে বিষ্ণুতুল্য জানেন, এবং কায়মনোবাক্যে তাঁহার পূজা (সেবা) করেন, তিনিই শাস্ত্রজ্ঞ এবং তিনিই বৈষ্ণব। ভগবদ্‌বিষয়ক শ্লোকের একপাদও যিনি উপদেশ করেন, তিনি সর্ব্বদাই পূজ্য। যিনি ভগবান্ বিষ্ণুর স্বরূপ প্রকাশ করেন, তিনি যে পূজ্য হইবেন, তদ্বিষয়ে পুনরায় আর কি বক্তব্য থাকিতে পারে?"

পদ্মপুরাণে দেবদ্যুতি-স্তুতিতেও দেখা যায়,

"ভক্তির্যথা হরৌ মেঽস্তি তদ্‌বন্নিষ্ঠা গুরৌ যদি।
মমাস্তি তেন সত্যেন সন্দর্শয়তু মে হরিঃ॥

—শ্রীহরিতে আমার যে পরিমাণ ভক্তি আছে, শ্রীগুরুদেবেও যদি সেই পরিমাণ নিষ্ঠা থাকে, তাহা হইলে সেই সত্যের ফলেই শ্রীহরি আমাকে দর্শন দান করুন।"

আগমে পুরশ্চরণ প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে,

"যথা সিদ্ধরসস্পর্শাৎ তাম্রং ভবতি কাঞ্চনম্।
সন্নিধানাদ্ গুরোরেবং শিষ্যো বিষ্ণুময়ো ভবেৎ॥

—সিদ্ধরস-স্পর্শে তাম্র যেমন কাঞ্চন হইয়া যায়, তেমনি শ্রীগুরুসন্নিধানে থাকিলে শিষ্যও বিষ্ণুময় হইয়া থাকেন।"

শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতে জানা যায়, শ্রীকৃষ্ণও শ্রীদাম-বিপ্রকে তাহাই বলিয়াছেন;

"নাহমিজ্যা প্রজাতিভ্যাং তপসোপশমেন বা।
তুষ্যেয়ং সর্ব্বভূতাত্মা গুরুশুশ্রূষয়া যথা॥ শ্রীভা, ১০।৮০।৩৪॥

(—শ্রীধরস্বামিপাদের টীকানুযায়ী মর্ম্ম) জ্ঞানপ্রদ গুরু হইতে অধিক সেব্য নাই, ইহাই পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। অতএব শ্রীগুরুসেবা হইতে যে অধিক ধর্ম্মও নাই, তাহাই বলা হইতেছে। (হে সখে শ্রীদাম !) আমি ইজ্যা (গৃহস্থধর্ম্ম), প্রজাতি (প্রকৃষ্ট জন্মোপনয়ন-ব্রহ্মচারিধর্ম্ম), তপস্যা (বানপ্রস্থ-ধর্ম্ম), কিম্বা উপশম (সন্ন্যাস-ধর্ম্ম বা যতিধর্ম্ম) দ্বারা পরমেশ্বর-আমি তত তুষ্টি লাভ করিনা, সর্ব্বভূতাত্মা হইয়াও গুরুশুশ্রূষাদ্বারা (গুরুসেবাদ্বারা) আমি যত তুষ্টি লাভ করিয়া থাকি।"

স্বামিপাদের টীকার সারস্য শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই ভাবে পরিস্ফুট করিয়াছেন। যথা, "শ্রীধরস্বামিপাদ যে জ্ঞানের কথা বলিয়াছেন, সেই জ্ঞান দ্বিবিধ—ব্রহ্মনিষ্ঠ-জ্ঞান এবং ভগবন্নিষ্ঠ-জ্ঞান। শ্রীধরস্বামিপাদ ব্রহ্মনিষ্ঠ-জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্লোকের উল্লিখিতরূপ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। ভগবন্নিষ্ঠ-জ্ঞানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া ব্যাখ্যা করিলে, "ইজ্যা"-শব্দের অর্থ হইবে "পূজা", "প্রজাতি"-শব্দের অর্থ হইবে "বৈষ্ণবদীক্ষা", "তপঃ"-শব্দের অর্থ হইবে "সমাধি" এবং "উপশম"-শব্দের অর্থ হইবে "ভগবানে নিষ্ঠা।" তাৎপর্য্য এই। শ্রীকৃষ্ণ বলিতেছেন—"গুরুসেবাদ্বারা আমি যত তুষ্টি লাভ করি, পূজা, বৈষ্ণবদীক্ষা, সমাধি বা ভগবানে নিষ্ঠাদ্বারাও আমি তত তুষ্টি লাভ করি না।" সারার্থ এই যে, যাঁহারা গুরুসেবা না করিয়া কেবল পূজা, বৈষ্ণবদীক্ষাগ্রহণ, সমাধি বা মনের একাগ্রতা-সাধন, কিম্বা ভগবানে নিষ্ঠালাভও করিয়া থাকেন, ভগবান্ তাঁহাদের প্রতি বিশেষ প্রসন্ন হয়েন না। গুরুসেবা না করিলে শ্রীগুরুদেবে উপেক্ষাই প্রকাশ পায়। গুরুদেব হইতেছেন ভগবানের প্রিয়তম ভক্ত; তাঁহার প্রতি উপেক্ষার ভাব প্রকাশ পাইলে ভক্তবৎসল ভগবান্ প্রসন্ন হইতে পারেন না।

উল্লিখিত শাস্ত্রবাক্যসমূহে গুরুসেবার আবশ্যকতা সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, শ্রুতিও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন। "যস্য দেবে পরাভক্তির্যথা দেবে তথা গুরৌ। তস্যৈতে কথিতা হ্যর্থাঃ প্রকাশন্তে মহাত্মনঃ॥ শ্বেতাশ্বতর ॥ ৬।২৩॥", "দুর্ল্লভো বিষয়ত্যাগো দুর্ল্লভং তত্ত্বদর্শনম্। দুর্ল্লভা সহজাবস্থা সদ্গুরোঃ করুণাং বিনা ॥ মহোপনিষৎ ॥৪।৭৭॥" [৫।৭৫-খ (১)-অনুচ্ছেদে এই শ্রুতিবাক্যদ্বয়ের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য]।

এই সমস্ত শ্রুতি-স্মৃতি-প্রমাণ হইতে গুরুসেবার আবশ্যকতার কথা জানা গেল।

ক। গুরুসেবা ও ভগবদ্ভজন

গুরুসেবার অত্যাবশ্যকত্ব-সম্বন্ধে এ-স্থলে যাহা বলা হইল, তাহার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার সঙ্গে সঙ্গে গুরুদেবের সেবা অত্যাবশ্যক; শ্রীকৃষ্ণসেবা পরিত্যাগপূর্ব্বক কেবল গুরুদেবের সেবা শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। "ভয়ং দ্বিতীয়াভিনিবেশতঃ স্যাদীশাদপেতস্য * * * বুধ আভজেত্তং ভক্ত্যৈকয়েশং গুরুদেবতাত্মা॥ শ্রীভা, ১১।২।৩৭॥", "প্রথমন্তু গুরুর পূজ্য ততশ্চৈব মমার্চ্চনম্। হ, ভ,

বি, ॥", "যস্য দেবে পরাভক্তি র্যথা দেবে তথা গুরৌ।"-ইত্যাদি স্মৃতিশ্রুতি-বাক্য হইতে জানা যায়—শ্রীকৃষ্ণসেবা এবং গুরুসেবা, উভয়ই অবশ্যকর্ত্তব্য। শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়া গিয়াছেন—"তাতে কৃষ্ণ ভজে, করে গুরুর সেবন। মায়াপাশ ছুটে, পায় কৃষ্ণের চরণ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।১৮॥" কৃষ্ণসেবা ব্যতীত গুরুদেবও তুষ্ট হইতে পারেন না; কেননা, তিনি কৃষ্ণপ্রেষ্ঠ, কৃষ্ণসেবা তাঁহার হার্দ্দ। কৃষ্ণ-ভজনকে গৌণরূপে গ্রহণ করিলেও গুরুদেব প্রসন্ন হইতে পারেন না। সমস্ত শাস্ত্র ভগবদ্‌ভজনেরই মুখ্যত্বের কথা বলিয়া গিয়াছেন। গুরুসেবা তাহার আনুকূল্যবিধায়ক, পূর্ব্বোল্লিখিত শ্রীজীব গোস্বামিপাদের আলোচনা হইতেই তাহা জানা যায়।

৭৭। সাধুবর্ত্মানুগমন

সাধুদিগের যে বর্ত্ম, তাহার অনুগমনই সাধুবর্ত্মানুগমন। বর্ত্ম অর্থ পথ; অনুগমন অর্থ—অনুসরণ, পেছনে পেছনে যাওয়া। সাধুবর্ত্মানুগমন অর্থ—সাধুমহাজনগণ যে পথে গমন করিয়া তাঁহাদের অভীষ্ট লাভ করিয়াছেন, সেই পথে তাঁহাদের পদচিহ্ন অনুসরণ করিয়া গমন। "গমন" না বলিয়া "অনুগমন" বলার তাৎপর্য্য এই যে, সাধুমহাজনগণ পথের যে যে স্থানে পা ফেলিয়া গিয়াছেন, ঠিক সেই সেই স্থান লক্ষ্য করিয়া চলিতে হইবে। অর্থাৎ কোনও সাধনপন্থার যে যে অনুষ্ঠান, সাধু মহাজনগণ নিজেদের অভীষ্টসিদ্ধির অনুকূল বলিয়া আচরণ করিয়া গিয়াছেন, সাধক নিজের অভীষ্টের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া, সেই সেই অনুষ্ঠানের আচরণ করিবেন। ইহাতে অভীষ্টসিদ্ধি-সম্বন্ধে একটা নিশ্চয়তার ভরসা পাওয়া যায়। এস্থলে একটী বিশেষ বিবেচ্য এই :—সকল সম্প্রাদায়েই সাধুমহাজন আছেন, তাঁহারা সকলেই নমস্য; কিন্তু সকলের আচরণ অনুসরণীয় নহে। আমার যাহা অভীষ্ট বস্তু, যে সাধু মহাজনের অভীষ্ট বস্তুও তাহাই ছিল, তিনিই আমার অনুসরণীয়, তাঁহার আদর্শই আমার আদর্শ। আমাকে যদি বৃন্দাবন যাইতে হয়, তাহা হইলে বৃন্দাবনে যিনি গিয়াছেন, তাঁহার পথেই চলিতে হইবে; যিনি কামাখ্যা গিয়াছেন, তাঁহার পথের খোঁজে আমার প্রয়োজন নাই।

এই প্রসঙ্গে স্কন্দপুরাণের প্রমাণ ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে উদ্ধৃত হইয়াছে।

"স মৃগ্যঃ শ্রেয়সাং হেতুঃ পন্থাঃ সন্তাপবর্জিতঃ।
অনবাপ্তশ্রমং পূর্ব্বে যেন সন্তঃ প্রতস্থিরে॥ ভ, র, সি ১।২।৪৬-ধৃতপ্রমাণ॥

—পূর্ব্বতন মহাজনগণ যে পন্থা অবলম্বন করিয়া পরম কল্যাণ লাভ করিয়াছেন, সে পন্থারই অনুসন্ধান করিবে, কেননা, তাহাতে পরমশ্রেয়ঃ লাভ হইয়া থাকে এবং কখনও সন্তপ্ত হইতে হইবেনা।"

"শ্রুতি-স্মৃতি-পুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা।
ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ভ, র, সি, ধৃত-ব্রহ্মযামল-বচন
ভক্তিরৈকান্তিকীবেয়মবিচারাৎ প্রতীয়তে।

বস্তুতস্তু তথা নৈব যদশাস্ত্রীয়তেক্ষ্যতে ॥ ভ, র, সি, ১।২।৪৭।

(৫।৩০-খ-অনুচ্ছেদে এই শ্লোকদ্বয়ের তাৎপর্য্য দ্রষ্টব্য)

এই শ্লোকদ্বয়ের প্রথম শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন—“তচ্চ সাধুবর্ত্ম শ্রুত্যাদিবিধানাত্মকমেব তত স্তদকরণে দোষমাহ শ্রুতীতি। শ্রুত্যাদয়োঽপাত্র বৈষ্ণবানাং স্বাধিকার-প্রাপ্তাস্তদ্‌ভাগা এব জ্ঞেয়াঃ। স্বে স্বে অধিকার ইত্যুক্তেঃ।—সাধুদিগের পন্থা শ্রুত্যাদি-বিধানাত্মকই হইয়া থাকে ; অতএব তাহার অনুসরণ না করিলে যে দোষ হয়, তাহাই ‘শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণাদি’-ইত্যাদি শ্লোকে বলা হইয়াছে। এ-স্থলে শ্রুতি-স্মৃতি-আদি বলিতে বৈষ্ণবদিগের স্বীয় অধিকারপ্রাপ্ত অংশই বুঝিতে হববে, অর্থাৎ শ্রুত্যাদি-শাস্ত্রের যে অংশ বৈষ্ণবদিগের অভীষ্টের অনুকূল, সেই অংশই অনুসরণীয়। স্ব-স্ব-অধিকারের কথা শাস্ত্রও বলিয়া গিয়াছেন।”

এই প্রসঙ্গে ৫।৩০-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

৭৮। সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা

সদ্ধর্ম্ম অর্থ—সতের ধর্ম্ম। সৎ-শব্দে সাধুমহাজনকে বুঝায়, আবার সচ্চিদানন্দ-বিগ্রহ শ্রীভগবান্‌কেও বুঝাইতে পারে। সুতরাং সদ্ধর্ম্ম শব্দে—সাধুমহাজনদের আচরিত ধর্ম্মকেও বুঝাইতে পারে এবং ভগবৎ-সম্বন্ধীয় বা ভাগবত-ধর্ম্মকেও বুঝাইতে পারে। পৃচ্ছা-শব্দের অর্থ—প্রশ্ন বা জানিবার ইচ্ছা।

তাহা হইলে সদ্ধর্ম্মপৃচ্ছা-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে—সাধুমহাজনগণ যে ভাগবত-ধর্ম্ম আচরণ করিয়া শ্রীকৃষ্ণ-সেবারূপ পরম মঙ্গল লাভ করিয়াছেন, তাহা জানিবার উদ্দেশ্যে গুরুদেবের বা কোনও বৈষ্ণবের চরণে নিজের জ্ঞাতব্য বিষয় নিবেদন করা।

এ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

“অচিরাদেব সর্ব্বার্থঃ সিদ্ধ্যত্যেষামভীপ্সিতঃ।
সদ্ধর্ম্মস্যাববোধায় যেষাং নির্বন্ধিনী মতিঃ ॥১।২।৪৭

—সদ্ধর্ম্ম অবগত হওয়ার জন্য যাঁহাদের আগ্রহশালিনী মতি জন্মিয়াছে, তাঁহাদের অভীষ্ট সর্বার্থ শীঘ্রই সিদ্ধ হইয়া থাকে।”

৭৯। কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ

এ-সম্বন্ধে পদ্মপুরাণ হইতে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।৪৮-অনুচ্ছেদে) নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

"হরিমুদ্দিশ্য ভোগ্যানি কালে ত্যক্তবতস্তব।
বিষ্ণুলোকস্থিতা সম্পদলোলা সা প্রতীক্ষতে॥

—আপনি শ্রীহরির প্রীতির উদ্দেশ্যে যথাকালে স্বীয় ভোগসকল পরিত্যাগ করিয়াছেন; বিষ্ণুলোকস্থিত অচঞ্চল সম্পদ্ আপনাকে প্রতীক্ষা করিতেছে।"

কৃষ্ণপ্রীতে ভোগত্যাগ হইতেছে—শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা লাভ করিবার উদ্দেশ্যে নিজের সুখ-ভোগাদির পরিত্যাগ। যতদিন পর্য্যন্ত নিজের সুখভোগের বাসনা হৃদয়ে থাকে, ততদিন ভক্তির কৃপা দুর্ল্লভ; এজন্য শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপার উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার চরণে সুখভোগের বাসনা দূর করিবার শক্তি প্রার্থনা করিবে এবং নিজেও যথাসম্ভব ভোগত্যাগের চেষ্টা করিবে; "যত্নাগ্রহ বিনা ভক্তি না জন্মায় প্রেমে। শ্রীচৈ, চ. ২।২৪।১১৫॥" এস্থলে শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পাঠ এই: "ভোগাদিত্যাগঃ কৃষ্ণস্য হেতবে।" শ্রীজীবগোস্বামিপাদ ইহার টীকায় লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণস্য ইতি কৃষ্ণপ্রাপ্তের্য হেতুস্তৎ-প্রসাদস্তদর্থমিত্যর্থঃ। * * * আদিগ্রহণাৎ লোকবিত্তপুত্রা গৃহ্যন্তে।"—কৃষ্ণপ্রাপ্তির হেতু হইল শ্রীকৃষ্ণের প্রসন্নতা; এই প্রসন্নতা লাভ করার জন্য স্বীয় ইন্দ্রিয়ভোগ্য বস্তু-আদি ত্যাগ করিবে। ভোগাদি-শব্দের অন্তর্ভূত "আদি"-শব্দ দ্বারা ইহাই বুঝাইতেছে যে—লোকাপেক্ষা, নিজের বিত্ত-সম্পত্তি এবং পুত্রকন্যাদিকেও কৃষ্ণ-প্রসন্নতা লাভের জন্য ত্যাগ করিতে হইবে—সেই সেই বস্তুতে আসক্তি ত্যাগ করিতে হইবে।

৮০। কৃষ্ণতীর্থে বাস

কৃষ্ণতীর্থ-শব্দে শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থানকে বুঝায়। লীলাস্থানে বাস হইতেছে একটী ভক্তি-অঙ্গ। এই ভক্তি-অঙ্গসম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পাঠ এইরূপ:—"নিবাসো দ্বারকাদৌ চ গঙ্গাদেরপি সন্নিধৌ।—দ্বারকাদি ধামে (আদি-শব্দে পুরুষোত্তম-ধামকেও বুঝায়) এবং গঙ্গাদির নিকটে বাস।" মথুরা-বাসকে একটী পৃথক্ অঙ্গরূপে বর্ণন করা হইয়াছে। তাৎপর্য্য বোধ হয় এই যে, কৃষ্ণতীর্থের মধ্যে মথুরাবাসের মাহাত্ম্যই সর্ব্বাধিক।

৮১। যাবদর্থানুবর্ত্তিতা বা যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ

এ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পাঠ—"যাবদর্থানুবর্ত্তিতা;" শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠ—"যাবন্নির্ব্বাহ-প্রতিগ্রহ।" তাৎপর্য্য একই।

যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ—যতটুকু প্রতিগ্রহ না করিলে কার্য্য-নির্ব্বাহ হইতে পারে না, ততটুকুমাত্র প্রতিগ্রহ (গ্রহণ) করা, তাহার বেশী নহে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর পাঠ বেশ পরিষ্কার

অর্থবোধক; "ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু যাবদর্থানুবর্ত্তিতা।" শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে যে নারদীয় বচন উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা আরও পরিষ্কার অর্থবোধক:—"যাবতা স্যাৎ স্বনির্ব্বাহঃ স্বীকুর্য্যাৎ তাবদর্থবিৎ। আধিক্যে ন্যূনতায়াঞ্চ চ্যবতে পরমার্থতঃ॥ ১।২।৪৯॥" ইহার টীকায় শ্রীজীব-গোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন, "স্বনির্ব্বাহ ইতি। স্ব-স্ব-ভক্তিনির্ব্বাহ ইত্যর্থঃ॥" অর্থাৎ যে পরিমাণ ব্যবহার গ্রহণ করিলে স্বীয় ভক্তি-নির্ব্বাহ হইতে পারে, সেই পরিমাণ ব্যবহারের অনুষ্ঠান করিবে; ইহার অধিক বা কম করিলে পরমার্থ হইতে ভ্রষ্ট হইতে হইতে হইবে। যেমন, আমার দিবসে দুই বেলা না খাইলে শরীর অসুস্থ হয়। এমতাবস্থায় আমাকে দুইবেলা খাইতে হইবে; নচেৎ শরীর অসুস্থ হইবে, শরীর অসুস্থ হইলে নিয়মিত-ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানে ব্যাঘাত জন্মিবে। দুই বেলার বেশী খাওয়াও সঙ্গত হইবে না; বেশী খাইলেও শরীর অসুস্থ হইতে পারে, অথবা শরীরে আলস্য জন্মিতে পারে, আলস্য জন্মিলেও ভক্তির অনুষ্ঠানে বিঘ্ন জন্মিবে। যে পরিমাণ অর্থোপার্জ্জন না করিলে সংসারী লোকের পক্ষে সংসার চালান অসম্ভব হইয়া পড়ে, সেই পরিমাণ অর্থই ধর্ম্মসঙ্গত উপায়ে উপার্জ্জন করিতে চেষ্টা করিবে; বেশীও নহে; কমও নহে। কম উপার্জ্জন করিলে সংসারে অভাব-অনটন উপস্থিত হইবে, তাহার ফলে নানাবিধ বিপদ ও অশান্তি উপস্থিত হইয়া ভজনের বিঘ্ন জন্মাইবে। বেশী উপার্জ্জন করিলেও অর্থের আনুষঙ্গিক কুফলসমূহ ভজনের বিঘ্ন জন্মাইবে। আত্মীয়-স্বজনের সঙ্গে যতটুকু ব্যবহার না করিলে চলে না, ততটুকুই করিবে; বেশীও নহে, কমও নহে; বেশী করিলে ক্রমশঃ আত্মীয়-স্বজনেই চিত্তের আবেশ জন্মিতে পারে এবং কম করিলেও তাঁহারা বিদ্বেষভাবাপন্ন হইয়া ভজনের বিঘ্ন জন্মাইতে পারেন। ইত্যাদি সব বিষয়েই, যতটুকু না করিলে ভক্তি-অঙ্গ নির্ব্বাহ হয় না, ততটুকুই করিবে; বেশীও নহে, কমও নহে। লক্ষ্য রাখিতে হইবে যে, সংসারে নির্ব্বিঘ্নে থাকিবার ব্যবস্থা—কেবল ভজনের জন্য, নিজের সুখ-স্বচ্ছন্দতার জন্য নহে। আহার করিতে হইবে বাঁচিয়া থাকার জন্য; বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন কেবল ভজনের জন্য। কত লক্ষ যোনি ভ্রমণ করিয়া ভজনোপযোগী মনুষ্য-জন্ম লাভ করিয়াছি; ভজন করিয়া তাহা সার্থক করিতে হইবে; যদি মৃত্যুর পরে আর মনুষ্যজন্ম না পাই, তাহা হইলে তো ভজন করা হইবে না; শ্রীমন্মহাপ্রভুর কৃপায় এই জন্মেই যথাসাধ্য ভজনের চেষ্টা করিতে হইবে; সুতরাং যদি সুস্থশরীরে কিছুদিন বাঁচিয়া থাকা যায়, তাহা হইলেই ভজনের সুবিধা হইতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই বাঁচিয়া থাকার প্রয়োজন। তজ্জন্য আহারাদির প্রয়োজন; যে পরিমাণ আহারাদি দ্বারা বাঁচিয়া থাকা যায়, সেই পরিমাণই আহার করা উচিত, উপাদেয় ভোজ্যাদি বা বিলাসিতাময় পোষাক-পরিচ্ছদের প্রয়োজন নাই।

প্রশ্ন হইতে পারে, অর্থাদি বেশী উপার্জ্জন করিয়া নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থদ্বারা ভগবৎ-সেবা ও বৈষ্ণবসেবাদি করিলে তো ভক্তির আনুকূল্য হইতে পারে; সুতরাং নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ উপার্জ্জন করিতে দোষ কি? ইহার উত্তর এই—অনেক সময় সাধুর বেশ

ধরিয়াও যেমন দুষ্ট লোক গৃহে প্রবেশ করিয়া গৃহস্থের অনিষ্ট সাধন করে, তদ্রূপ ভগবৎ-সেবা-বৈষ্ণবসেবাদি-বাসনার আবরণে আবৃত হইয়া আমাদের অর্থলিপ্সাও হৃদয়ে প্রবল হইয়া উঠিতে পারে। প্রথমতঃ, সেবাদির আনুকূল্যার্থ প্রচুর অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হইলে, অর্থোপার্জ্জনেই আবেশ জন্মিবে; মনে হইবে "আচ্ছা অন্য উপায়ে আরও কিছু টাকা সংগ্রহ করা যাউক; ঐ টাকা দ্বারা একটা বড় উৎসব করা যাইবে ইত্যাদি।" এইরূপে অর্থোপার্জ্জনেই প্রায় ষোল আনা মন ও সময় নিয়োজিত হইবে; ভজনের দিকে বিশেষ লক্ষ্য থাকিবে না। ক্রমশঃ সেবা-বাসনায় শিথিলতা আসিয়া পড়িবে, অর্থলিপ্সাই প্রবলতা লাভ করিবে। বিষয়ের ধর্ম্মই এইরূপ যে, ইহার সংশ্রবে থাকিলেই ইহা লোকের চিত্তকে কবলিত করিয়া ফেলে। এইরূপ আশঙ্কা করিয়াই ভক্তি-রসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন—"ধন ও শিষ্যাদির দ্বারা যে ভক্তি উৎপন্ন হয়, তাহা কদাচ উত্তমা-ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না; কারণ, এরূপ স্থলে ভক্তি-বাসনার শিথিলতাবশতঃ উত্তমতার হানি হয়।—ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যাভক্তিরুপপদ্যতে। বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা ॥ ১।২।১২৮॥" ইহার টীকায় শ্রীজীবগোস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতমিত্যাদি গ্রহণেন শৈথিল্যস্যাপি গ্রহণাদিতি ভাবঃ॥" এস্থলে আর একটী বিষয়ও বিবেচ্য। শ্রীরূপসনাতন-গোস্বামীর, কি শ্রীরঘুনাথ-দাস গোস্বামীর অর্থ কম ছিল না; তাঁহাদের প্রচুর অর্থ ছিল; তাঁহারা ইচ্ছা করিলে প্রত্যহই মহারাজোপচারে ভগবৎ-সেবা, মহোৎসবাদি করিতে পারিতেন; কিন্তু তাহা না করিয়া রাজৈশ্বর্য্য সমস্ত তৃণবৎ ত্যাগ করিয়া দীনহীন কাঙ্গাল সাজিয়া তাঁহারা ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করিয়াছেন—জীবের সমক্ষে উত্তমা ভক্তির আদর্শ রাখিবার জন্যই।

কেহ কেহ বলেন, এই ভক্তি-অঙ্গটী কেবল ভক্তি-অঙ্গের গ্রহণ-সম্বন্ধে—ব্যবহারিক বিষয় সম্বন্ধে নহে; অর্থাৎ যে পরিমাণে যে ভক্তি-অঙ্গ সাধনের সঙ্কল্প করিবে, তাহা যাহাতে সর্ব্বাবস্থায় রক্ষিত হইতে পারে, তৎপ্রতি দৃষ্টি রাখাই যাবৎ-নির্ব্বাহ প্রতিগ্রহ। দৃষ্টান্তস্বরূপে তাঁহারা বলেন—"কোনও ভক্ত অনুরাগবশতঃ সঙ্কল্প করিলেন, তিনি প্রত্যহ একলক্ষ হরিনাম করিবেন; পরে কোনও একদিন সাংসারিক কার্য্যাধিক্য বশতঃ লক্ষ নাম করিতে পারিলেন না; মনে করিলেন, পরের দিনের নামের সঙ্গে সেই দিনকার নাম সারিয়া লইবেন; কিন্তু কার্য্যাধিক্যবশতঃ পরের দিনও তাহা হইল না। ক্রমশঃ এইরূপ আচরণদ্বারা ভক্তির প্রতি অনাদর উপস্থিত হয়; অতএব, প্রত্যহ অবাধে যাহা নির্ব্বাহ হইতে পারে, তাহাই নিয়মরূপে পরিগ্রহ করিবে, বেশী বা কম হইলে ভক্তি পুষ্ট হইবে না।" এ-স্থলে আমাদের বক্তব্য এই ঃ—যাহা নিয়ম করিবে, তাহা রক্ষা করিবার চেষ্টা সর্ব্বোতোভাবেই কর্ত্তব্য। দু'একদিন নিয়ম লঙ্ঘন হইলেই ভজনে শিথিলতা আসিতে পারে; শিথিলতা আসিলে ভক্তি পুষ্টি লাভ করিতে পারে না। যে বিষয়কর্ম্ম গ্রহণ করিলে নিত্যকর্ম্মের ব্যাঘাত জন্মে, সেই বিষয় কর্ম্মে হাত দিবে না, ইহাই যাবৎ-নির্ব্বাহের তাৎপর্য্য; ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও ব্যবহারিক বিষয়ের কথাই বলিয়াছেন। "ব্যবহারেষু সর্ব্বেষু", ভক্তি-অঙ্গের কথা বলেন নাই। অবশ্য

যে পরিমাণ ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান নিয়মিতরূপে নিত্যনির্ব্বাহিত হওয়া সম্ভব, তদতিরিক্ত গ্রহণ করিলে নিয়মরক্ষার সম্ভাবনাও কমিয়া যাইবে। কেহ কেহ আবার বলেন, "যে পরিমাণ অনুষ্ঠানের নিয়ম করা যায়, কোনও দিন তদতিরিক্ত করিলেও প্রত্যবায় আছে। যদি লক্ষ হরিনামের নিয়ম করা যায়, তবে কোনওদিন লক্ষের বেশী নাম করিলে দোষ হইবে।" কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান যত বেশী করা যায়, ততই মঙ্গল। সর্ব্বদাই ভজন করিবে—"স্মর্ত্তব্যো সততং বিষ্ণুঃ"—ইহাই বিধি। বিষয়কর্ম্মাদির জন্য আমরা যে তাহা করিতে পারিনা, ইহাই দোষের ; বিষয়কর্ম্ম কমাইয়া, বা আলস্যের প্রশ্রয় না দিয়া যতবেশী ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠান করা যায়, ততই ভক্তিপুষ্টির সম্ভাবনা বেশী। নিয়মিত অনুষ্ঠানের অকরণে নিয়মভঙ্গ হয়। বেশী করণে নিয়মভঙ্গ হয় না। জলের আঘাতে পুকুরের তীরের আয়তন যদি কমিয়া যায়, তাহা হইলেই বলা হয়—পাড় ভাঙ্গিয়া গিয়াছে ; কোনও কারণে তীরের আয়তন বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইলে তাহাকে পাড় ভাঙ্গা বলে না।

৮২। হরিবাসর-সম্মান

শ্রীএকাদশী-আদি বৈষ্ণবব্রতের পালন করা বিধেয়। ৫।৩৯-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮৩। ধাত্র্যশ্বত্থাদিগৌরব

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের পাঠ হইতেছে—"ধাত্র্যশ্বত্থ-গোবিপ্র-বৈষ্ণব-পূজন ॥২।২২।৬৩॥"

ধাত্র্যশ্বত্থ—ধাত্রী ও অশ্বত্থ। ধাত্রী অর্থ আমলকী। অশ্বত্থ-বৃক্ষ ভগবানের বিভূতি বলিয়া পূজ্য। **গো-বিপ্র** —গো ও বিপ্র। গো-ব্রাহ্মণের হিতের জন্য শ্রীভগবান্ অবতীর্ণ হয়েন বলিয়া তাঁহারাও পূজ্য, শ্রীকৃষ্ণ গো-চারণ করিতেন বলিয়াও বৈষ্ণবের পক্ষে গো-জাতি অত্যন্ত প্রীতির বস্তু। গাত্রকণ্ডুয়ন, গো-গ্রাস দান এবং প্রদক্ষিণাদিদ্বারা গো-পূজা হইয়া থাকে। গো-জাতি প্রসন্ন হইলে শ্রীগোপালও প্রসন্ন হয়েন। "গবাং কণ্ডুয়নং কুর্য্যাৎ গোগ্রাসং গো-প্রদক্ষিণম্। গোষু নিত্যং প্রসন্নাসু গোপালোঽপি প্রসীদতি॥''—শ্রীগৌতমীয় তন্ত্র॥ যিনি ব্রহ্মের বা ভগবানের তত্ত্বানুভব করিয়াছেন, তিনি ব্রাহ্মণ, তিনি পরমভক্ত ; পরিচর্য্যাদির দ্বারা তাঁহার পূজা করিলে মঙ্গলের সম্ভাবনা আছে।

বৈষ্ণব-ভজন—বৈষ্ণবসেবা ভক্তিপুষ্টির পক্ষে বিশেষ প্রয়োজনীয়। পরিচর্য্যাদিদ্বারা বৈষ্ণবের প্রীতিবিধান করিবে। "ভক্তপদ-রজঃ আর ভক্তপদ-জল। ভক্ত-ভুক্ত অবশেষ এই তিন মহাবল॥ শ্রীচৈ,চ, ৩।১৬।৫৫॥" শ্রীলঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন—"বৈষ্ণবের পদধূলি, তাহে মোর স্নানকেলি, তর্পণ মোর বৈষ্ণবের নাম।"

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ১।২।৫৯-অনুচ্ছেদে স্কন্দপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

"অশ্বত্থ-তুলসী-ধাত্রী-গো-ভূমিসুরবৈষ্ণবাঃ।
পূজিতাঃ প্রণতা ধ্যাতাঃ ক্ষপয়ন্তি নৃণামঘঃ॥

—অশ্বত্থ, তুলসী, অমলকী, গো, ব্রাহ্মণ (ভূমিসুর) এবং বৈষ্ণব-ইঁহাদের পূজা, নমস্কার এবং ধ্যান করিলে মনুষ্যদিগের সমস্ত পাপ বিনষ্ট হয়।

৮৪। ভগবদ্‌বিমুখজনের সঙ্গত্যাগ

৫।৩৫-ঙ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

৮৫। শিষ্যাদ্যননুবন্ধিত্ব, মহারম্ভাদিতে অনুদ্যম, বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ত্যাগ, শাস্ত্রব্যাখ্যাকে উপজীব্য না করা

এ-সম্বন্ধে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।৫২-অনুচ্ছেদ) নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত হইয়্যছে।

"ন শিষ্যাননুবধ্নীত গ্রন্থান্নৈবাভ্যসেদ্‌বহূন্।
ন ব্যখ্যামুপযুঞ্জীত নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ॥ শ্রীভাঃ ৭।১৩।৮॥

—(মহারাজ যুধিষ্ঠিরের নিকটে নারদ বলিয়াছেন) বহু শিষ্য করিবেনা, প্রলোভন দ্বারা বল পূর্ব্বকও কাহাকেও শিষ্য করিবেনা, বহুগ্রন্থ অভ্যাস করিবেনা, শাস্ত্রব্যাখ্যাকে উপজীবিকা করিবেনা এবং কুত্রাপি মঠাদিব্যাপার আরম্ভ করিবেনা।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন "নানুবধ্নীত প্রলোভনাদিনা বলান্নাপাদয়েৎ। আরম্ভান্ মঠাদি-ব্যাপারান্।" শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও তাহাই লিখিয়াছেন।

উল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকের তাৎপর্য্য সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

ক। শিষ্য করা সম্বন্ধে। স্বামিপাদাদি টীকাকারদের অর্থানুসারে বুঝা যায়—কোনওরূপ প্রলোভন দেখাইয়া বলপূর্ব্বক কাহাকেও শিষ্য করিবেনা। প্রলোভনে লুব্ধ হইয়া যে ব্যক্তি শিষ্যত্ব অঙ্গীকার করে, দীক্ষাগ্রহণে তাহার যে ইচ্ছা নাই, তাহাই বুঝা যায়; সুতরাং বলপূর্ব্বকই তাহাকে শিষ্য করা হয়। এইরূপ ব্যক্তি শিষ্যত্বের অনধিকারী। ভক্তিরসামৃতসিন্ধুর টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও লিখিয়াছেন—"স্বস্ব-সম্প্রদায়বৃদ্ধ্যর্থমনধিকারিণোঽপি ন গৃহ্ণীয়াৎ—স্ব-স্ব-সম্প্রদায়ের বৃদ্ধির, বা পুষ্টির উদ্দেশ্যে অনধিকারী লোককে শিষ্যরূপে গ্রহণ করিবেনা।" কেবলমাত্র দলপুষ্টি বা শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে অনধিকারীকে দীক্ষা দেওয়া অন্যায়; ইহাও বলপূর্ব্বক দীক্ষাদানের সমান। শ্রীজীবপাদ আরও লিখিয়াছেন—"বহূনিতি

ভগবদ্‌বহির্ম্মুখানন্যাংস্ত্বিত্যর্থঃ—শ্লোকস্থ বহু-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে , ভগবদ্‌বহির্ম্মুখ অন্য লোকদিগকে শিষ্য করিবেনা।”

এ-সমস্ত উক্তি হইতে বুঝা গেল—ভজনের জন্য যাঁহার ইচ্ছা আছে, তিনি যদি যোগ্য হয়েন, তাহা হইলে তাঁহাকে শিষ্য করিবে। যাঁহার ভজনের ইচ্ছা নাই, দীক্ষা গ্রহণের যোগ্যতাও যাঁহার নাই, দলবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে বা নিজের শিষ্যসংখ্যাবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তাঁহাকে দীক্ষা দেওয়া সঙ্গত নহে।

(১) দীক্ষা গ্রহণের যোগ্যতা

কি রকম লোক দীক্ষাগ্রহণে অধিকারী বা যোগ্য, শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসে তাহা বলা হইয়াছে।

“শিষ্যঃ শুদ্ধান্বয়ঃ শ্রীমান্ বিনীতঃ প্রিয়দর্শনঃ। সত্যবাক্ পুণ্যচরিতোঽদভ্রধীর্দম্ভবর্জ্জিতঃ॥
কামক্রোধপরিত্যাগী ভক্তশ্চ গুরুপাদয়োঃ। দেবতাপ্রবণঃ কায়মনোবাগ্‌ভির্দিবানিশম্॥
নীরুজো নির্জিতাশেষপাতকঃ শ্রদ্ধয়ান্বিতঃ। দ্বিজদেবপিতৃণাঞ্চ নিত্যমর্চ্চাপরায়ণঃ॥
যুবা বিনিয়তাশেষকরণঃ করুণালয়ঃ। ইত্যাদিলক্ষণৈর্যুক্তঃ শিষ্যো দীক্ষাধিকারবান্॥
হ, ভ, বি, ১।৪৩-ধৃত মন্ত্রমুক্তাবলী॥

—শিষ্য শুদ্ধকুলসম্ভূত, শ্রীমান্, বিনয়ী, প্রিয়দর্শন, সত্যভাষী, পবিত্রচরিত্র, স্থিরবুদ্ধি, দম্ভহীন, কামক্রোধশূন্য, গুরুদেবে ভক্তিমান্, অহর্নিশি কায়মনোবাক্যে দেবতার প্রতি প্রবণ (উন্মুখ), নীরোগ, অশেষপাতকজয়ী, শ্রদ্ধাবান্, নিত্য দেবতা, দ্বিজ এবং পিতৃগণের পূজায় রত, যুবা, নিখিল-ইন্দ্রিয়জয়ী, এবং করুণালয় হইবেন। ইত্যাদিরূপ লক্ষণযুক্ত শিষ্যই দীক্ষাগ্রহণের অধিকারী।”

“অমান্যমৎসরো দক্ষো নির্ম্মমো দৃঢ়সৌহৃদঃ।
অসত্বরোঽর্থজিজ্ঞাসুরনসূয়ুরমোঘবাক্॥ শ্রীভাঃ ১১।২০।৬॥

—অভিমানহীন, মাৎসর্য্যহীন, দক্ষ (নিরলস), নির্ম্মম (ভার্য্যাদিতে মমতাহীন), গুরুর প্রতি দৃঢ়সৌহার্দ্দযুক্ত, অসত্বর (অব্যগ্র), তত্ত্বজিজ্ঞাসু, অসূয়াহীন, অমোঘবাক্ (ব্যর্থালাপহীন) ব্যক্তিই শিষ্যত্বের অধিকারী।”

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে এই প্রসঙ্গে অগস্ত্যসংহিতা এবং হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রের বহুবাক্যও উদ্ধৃত করা হইয়াছে। অবশেষে বলা হইয়াছে,—“যাঁহারা লোভাদির বশীভূত হইয়া এসকল অনধিকারী ব্যক্তিকে দীক্ষিত করেন, তাঁহারা ইহলোকে দেবতার আক্রোশপাত্র, দরিদ্র ও পুত্রকলত্রকর্ত্তৃক বর্জ্জিত হইয়া থাকেন এবং দেহাবসানে নরকভোগান্তে তির্য্যগ্‌যোনি প্রাপ্ত হয়েন।

যদ্যেতে হ্যুপকল্পেরন্ দেবতাক্রোশভাজনাঃ। ভবন্তীহ দরিদ্রাস্তে পুত্রদারবিবর্জ্জিতাঃ॥
নরকাশ্চৈব দেহান্তে তির্য্যঞ্চঃ প্রভবন্তি তে॥ হ, ভ, বি, ১।৪৭-ধৃত অগস্ত্যসংহিতা বাক্য।”

(২) গুরু-শিষ্য-পরীক্ষা

দীক্ষার পূর্ব্বে গুরু ও শিষ্য-উভয়েই উভয়কে পরীক্ষা করার বিধিও শাস্ত্রে দৃষ্ট হইয়া থাকে। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (১।৫০-অনু) হইতে নিম্নলিখিত কয়টী প্রমাণ এ-স্থলে উদ্ধৃত হইতেছে।

তয়োর্বৎসরবাসেন জ্ঞাতোন্যোন্যস্বভাবয়োঃ।
গুরুতা শিষ্যতা বেতি নান্যথৈবেতি নিশ্চয়॥ মন্ত্রমুক্তাবলী॥

—একবৎসরব্যাপী সহবাসদ্বারা পরস্পরের স্বভাব বিদিত হইলে উভয়ের গুরুতা (গুরুর যোগ্যতা) ও শিষ্যতা (শিষ্য হওয়ায় যোগ্যতা) পরিজ্ঞাত হওয়া যায়। অন্যরূপে জানিতে পারা যায়না, ইহা নিশ্চিত।”

“নাসংবৎসরবাসিনে দেয়াৎ॥ শ্রুতিঃ॥

—শ্রুতিতেও কথিত হইয়াছে যে, যিনি একবৎসর কাল গুরুর নিকটে বাস করেন নাই, তাঁহাকে মন্ত্রদান করিতে নাই।”

“সদ্গুরুঃ স্বাশ্রিতং শিষ্যং বর্ষমেকং পরীক্ষয়েৎ॥ সারসংগ্রহে॥

—সারসংগ্রহেও কথিত হইয়াছে যে, সদ্গুরু একবৎসর পর্য্যন্ত নিজের আশ্রয়ে রাখিয়া শিষ্যকে পরীক্ষা করিবেন।”

খ। মহারম্ভাদিতে অনুদ্যম

আলোচ্য শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকে বলা হইয়াছে—“নারম্ভানারভেৎ ক্বচিৎ—ন আরম্ভান্ (মঠাদি-ব্যাপারান্) আরভেৎ=মঠাদিব্যাপার কখনও আরম্ভ করিবেনা।” ইহাই শ্রীধরস্বামিপাদাদির অভিপ্রায়।

সাধকের পক্ষে মঠাদির ব্যাপারে (মঠ-স্থাপনাদি, মঠের পরিচালনাদি কার্য্যে) লিপ্ত হওয়া সঙ্গত নহে। কেননা, এই সমস্ত করিতে গেলে মঠাদির ব্যাপারেই চিত্ত ব্যাপৃত থাকে, তাহাতে সাধন-ভজনের বিঘ্ন জন্মে। আবার, লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির প্রতি চিত্তবৃত্তি ধাবিত হওয়ার সম্ভাবনাও আছে। শ্রীমন্মহাপ্রভু এ-সমস্তকে ভক্তিলতার উপশাখা বলিয়াছেন এবং ইহাও বলিয়াছেন যে, উপশাখা জন্মিলে শ্রবণকীর্ত্তনাদির ফলে উপশাখাই পুষ্টিলাভ করে, মুলশাখা (ভক্তি) স্তব্ধ হইয়া যায়।

কিন্তু যদি লতার অঙ্গে উঠে উপশাখা। ভুক্তি-মুক্তি-বাঞ্ছা যত— অসংখ্য তার লেখা॥
নিষিদ্ধাচার কুটিনাটি জীবহিংসন। লাভ-প্রতিষ্ঠাদি যত উপশাখাগণ॥
সেকজল পাঞা উপশাখা বাঢি যায়। স্তব্ধ হঞা মূলশাখা বাঢ়িতে না পায়॥

শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৪০—৪২॥

ভগবানের প্রিয়ভক্তের লক্ষণ-কথন প্রসঙ্গে শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে একটি লক্ষণ বলিয়াছেন—“সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী॥ গীতা॥ ১২।১৬”; যে ভক্ত সর্বারম্ভ পরিত্যাগ করেন, তিনি ভগবানের প্রিয়। এস্থলে সর্বারম্ভপরিত্যাগী-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ শঙ্কর লিখিয়াছেন—সর্বারম্ভপরিত্যাগী আরভ্যন্ত ইতি আরম্ভা ইহামুত্রফলভোগার্থানি কামহেতূনি কর্ম্মাণি সর্বারম্ভান্ পরিত্যক্তুং শীলমস্য ইতি সর্বারম্ভপরিত্যাগী—

যাহা আরম্ভ করা হয়, (যাহার উৎপাদনের বা সৃষ্টির জন্য নূতন উদ্যম করা হয়), তাহাকে বলে আরম্ভ। ইহকালের বা পরকালের ভোগসাধক কর্ম্মসমূহই হইতেছে সর্বারম্ভ ; এ-সমস্ত পরিত্যাগ করাই স্বভাব যাঁহার, তিনি সর্বারম্ভপরিত্যাগী।" শ্রীপাদ রামানুজ লিখিয়াছেন—"সর্বারম্ভপরিত্যাগী শাস্ত্রীয়-ব্যতিরিক্ত-সর্বকর্ম্মারম্ভপরিত্যাগী—শাস্ত্রীয় কর্ম্মব্যতীত অন্য সমস্ত কর্ম্মারম্ভকে যিনি পরিত্যাগ করেন, তিনি সর্বারম্ভপরিত্যাগী। শ্রীধর স্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সর্বান দৃষ্টাদৃষ্টার্থানারম্ভানুদ্যমান্ পরিতক্তুং শীলং যস্য সঃ—সমস্ত -দৃষ্ট (ইহকালের) এবং অদৃষ্ট (পরকালের) কাম্যবস্তু লাভের জন্য উদ্যম ত্যাগ করাই স্বভাব যাঁহার, তিনি সর্বারম্ভপরিত্যাগী।" শ্রীপাদ বলদেব-বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"স্বভক্তিপ্রতীপাখিলোদ্যমরহিতঃ—স্বীয় ভক্তির প্রতিকূল সমস্ত উদ্যমশূন্য ব্যক্তিই সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী।" শ্রীপাদ মধুসূদন স্বরস্বতীর অর্থ শ্রীপাদ শঙ্করের অর্থের অনুরূপ। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী লিখিয়াছেন—"সর্ব্বান্ ব্যবহারিকান্ দৃষ্টাদৃষ্টার্থাংস্তথা পারমার্থিকানপি কাংশ্চিৎ শাস্ত্রাধ্যাপনাদীন্ আরম্ভান্ উদ্যমান্ পরিহর্ত্তুং শীলং যস্য সঃ দৃষ্টাদৃষ্টার্থপ্রদ সমস্ত ব্যবহারিক উদ্যম এবং শাস্ত্রাধ্যপনাদি কোনও কোনও পারমার্থিক উদ্যমও পরিত্যাগ করিতে স্বভাব যাঁহার, তিনি সর্ব্বারম্ভপরিত্যাগী। (যেসমস্ত শাস্ত্রের অধ্যাপন ভক্তির প্রতিকূল, সে-সমস্ত শাস্ত্রের অধ্যাপনই বোধহয় এ-স্থলে চক্রবর্ত্তিপাদের অভিপ্রেত)।"

আচার্য্যবর্গের উল্লিখিত অভিমত হইতে বুঝা গেল—ভক্তির প্রতিকূল সর্ব্ববিধ উদ্যমই ভক্তি-সাধকের পক্ষে পরিত্যাগ করা সঙ্গত। ভক্তির প্রতিকূল উদ্যম সাধকের চিত্তকে তাঁহার ভক্তিসাধন হইতে অন্য দিকে চালিত করিতে পারে। এজন্য তাদৃশ উদ্যম পরিত্যাজ্য।

"আরম্ভ"-শব্দে নূতন কিছু করার জন্য উদ্যমও বুঝাইতে পারে। যাহা ভক্তিপুষ্টির অনুকূল নহে, নূতন করিয়া তাহা করার জন্য উদ্যত হইলে, তাহাতেই চিত্তের আবেশ জন্মিতে পারে ; তখন ভক্তিসাধন হইতে মন অপসারিত হইবে ; সুতরাং তাদৃশ উদ্যম পরিত্যাগ করাই সঙ্গত।

গ। বহুগ্রন্থাভ্যাস-ত্যাগ

বহুবিষয়ে বহুগ্রন্থের অনুশীলন করিতে গেলে চিত্তবৃত্তি বহুবিষয়ে বিক্ষিপ্ত হইয়া পড়ে, ভজনীয় বিষয়ে একাগ্রতা লাভ করিতে পারেনা। এজন্য এতাদৃশ অনুশীলন ত্যাগ করার কথা বলা হইয়াছে। স্বীয় ভাবপুষ্টির অনুকূল বহুগ্রন্থের অনুশীলন বোধ হয় নিষিদ্ধ নহে।

শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বহুগ্রন্থ-কলাভ্যাস-ব্যাখ্যান বর্জ্জিব॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৬৪॥" বহুবিষয়ক বহু গ্রন্থের, বহু কলার (বিদ্যার) অনুশীলন ও ব্যাখ্যান বর্জ্জন করিবে।

ঘ। শাস্ত্রব্যাখ্যাকে উপজীব্য না করা

শ্রীমদ্ভাগবত বলিয়াছেন—"ন ব্যাখ্যামুপযুঞ্জীত ॥৭।১৩।৮॥—শাস্ত্রব্যাখ্যাকে জীবিকানির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিবে না।"

ভগবদ্‌বিষয়ক শাস্ত্রাদির ব্যাখ্যা হইতেছে ব্যাখ্যাতার পক্ষে কীর্ত্তনাঙ্গের অনুষ্ঠান। তাহাকে জীবিকানির্বাহের উপায়রূপে গ্রহণ করিলে ভজনকে পণ্যরূপে পরিণত করা হয়। ইহাতে ভক্তিসাধনের আনুকূল্য হয় না, বরং প্রাতিকূল্যই হইয়া থাকে।

শ্রবণকীর্ত্তনাদি ভজনাঙ্গের লক্ষ্য হইতেছে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনার পুষ্টি, ভক্তির পুষ্টি; দেহের পুষ্টি কিম্বা দেহের সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণ ইহার লক্ষ্য নহে। দেহের বা আত্মীয়-স্বজনের ভরণ-পোষণকে লক্ষ্য বলিয়া মনে করিলে শ্রবণকীর্ত্তনাদির ভক্ত্যঙ্গত্বই সিদ্ধ হয়না; তাহাতে বরং শ্রবণ-কীর্ত্তনাদির অমর্য্যাদাই করা হয়।

এ-স্থলে শাস্ত্রব্যাখার উপলক্ষণে ভজনাঙ্গকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। প্রত্যক্ষ ভাবেই হউক, কি পরোক্ষভাবেই হউক, ভজনাঙ্গকে উপজীব্যরূপে গ্রহণ করা সাধন-ভজনের অনুকূল নহে।

খণ্ডবাসী শ্রীমুকুন্দকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—"তোমার যে কার্য্য—ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৫।১৩০॥" এ-স্থলে "ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন"-বাক্যের তাৎপর্য্য হইতেছে—ধর্ম্মপথে থাকিয়া, ধর্ম্মকে রক্ষা করিয়া, সাধন-ভজনের অনুকূল ভাবে বা অপ্রতিকূল ভাবে ধন উপার্জ্জন। ধর্ম্মের নামে ব্যবসায় করিয়া, ভজনাঙ্গকে পণ্যদ্রব্যে পরিণত করিয়া যে ধনোপার্জ্জন, তাহাকে "ধর্ম্মে ধন উপার্জ্জন" বলা যায়না। কেননা, ইহা ভক্তিবিরোধী। ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানে শ্রীকৃষ্ণপ্রীতি-বাসনাব্যতীত, ধনোপার্জ্জনের বাসনাদি অন্য যে কোনও বাসনা প্রকাশ্যে বা অপ্রকাশ্যে বিদ্যমান থাকিলেই তাহা ভক্তি-বিরোধী হইবে; কেননা, কৃষ্ণপ্রীতির অনুকূল এবং অন্যাভিলাষিতাশূন্য কৃষ্ণানুশীলনই হইতেছে ভক্তি। লাভপূজাদিকে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু ভক্তিলতার উপশাখাই বলিয়াছেন (শ্রীচৈ, চ, ২।১৯।১৪১॥)—যাহা ভক্তির অগ্রগতির বিঘ্ন জন্মায়।

কেহ বলিতে পারেন, শাস্ত্রব্যাখ্যাদিদ্বারা অর্থোপার্জ্জন করিয়া সেই অর্থ শ্রীকৃষ্ণসেবায় নিয়োজিত করিলে তাহাতে দোষের কিছু নাই। কিন্তু ইহা সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। কারণ, পতিব্রতা রমণী পতিসেবার জন্য দেহ বিক্রয় করেন না। যিনি কেবলমাত্র শাস্ত্রব্যাখ্যাদ্বারাই অর্থোপার্জ্জন করেন, তাঁহাকে উপার্জ্জিত অর্থ পরিবারের ভরণ-পোষণাদি ব্যবহারিক কার্য্যেও নিয়োজিত করিতে হয়।

৮৬। ব্যবহারে অকার্পণ্য

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।৫২-অনুচ্ছেদে) পদ্মপুরাণের একটী শ্লোক উদ্ধৃত হইয়াছে।

"অলব্ধে বা বিনষ্টে বা ভক্ষ্যাচ্ছাদনসাধনে।
অবিক্লবমতির্ভূত্বা হরিমেব ধিয়া স্মরেৎ॥

—হরি-স্মরণাদি-পরায়ণ ব্যক্তি ভোজন ও আচ্ছাদন-সাধনবিষয়ে লাভ না হইলে, কিম্বা লব্ধ বস্তুর বিনাশ ঘটিলে ব্যাকুলচিত্ত না হইয়া মনোমধ্যে শ্রীহরির স্মরণ করিবেন।"

টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—স্মরণাদি-পরায়ণদেরই এতাদৃশী রীতি। যাঁহারা সেবাপরায়ণ, তাঁহারা যথালব্ধ বস্তুদ্বারাই সেবার কার্য্য নির্ব্বাহ করিবেন। অতিরিক্ত যাচ্ঞাদিদ্বারাও অতিকার্পণ্য করা সঙ্গত নহে।

শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"হানি লাভ সম" জ্ঞান করিবে (শ্রীচৈ,চ, ২।২২।৬৫॥"

৮৭। শোকাদির বশীভুত না হওয়া

"শোকামর্শাদিভির্ভাবৈরাক্রান্তং যস্য মানসম্।
কথং তত্র মুকুন্দস্য স্ফূর্ত্তিসম্ভাবনা ভবেৎ॥ ভ.র.সি. ১।২।৫৩-ধৃত পাদ্মবচন॥

—যাহার চিত্ত শোক ও ক্রোধের দ্বারা আক্রান্ত, তাহার চিত্তে মুকুন্দের স্ফূর্ত্তির সম্ভাবনা কিরূপে হইতে পারে ?"

শোক-ক্রোধাদিগ্রস্ত চিত্ত সর্ব্বদা চঞ্চল থাকে, অন্যবস্তুতে আবিষ্ট থাকে। সেই চিত্তে চিত্তবৃত্তির একাগ্রতা—সুতরাং শ্রীকৃষ্ণস্ফূর্ত্তিও—সম্ভবপর হয় না।

৮৮। অন্যদেবতায় অবজ্ঞাহীনতা

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২.৫৩-অনুচ্ছেদে) পদ্মপুরাণের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

"হরিরেব সদারাধ্যঃ সর্ব্বদেবেশ্বরেশ্বরঃ।
ইতরে ব্রহ্মরুদ্রাদ্যা নাবজ্ঞেয়াঃ কদাচন॥

—সমস্ত-দেবেশ্বরদিগেরও অধীশ্বর শ্রীহরিই সর্ব্বদা আরাধনীয়; কিন্তু তাহা বলিয়া ব্রহ্ম-রুদ্রাদি অন্যান্য দেবতার প্রতি কখনও অবজ্ঞা প্রকাশ করিবেনা।"

শ্রীমন্মহাপ্রভুও বলিয়াছেন –"অন্য দেব অন্য শাস্ত্র নিন্দা না করিব॥ শ্রীচৈ,চ, ২।২২।৬৫॥" অন্য-দেবতাদির নিন্দা করিবে না; অন্য শাস্ত্রাদির নিন্দাও করিবে না। অন্য দেবতাদি সকলেই শ্রীভগবানের বিভূতি বা শক্তি; তাঁহারাও শ্রীকৃষ্ণভক্ত; সুতরাং তাঁহাদের নিন্দায় প্রত্যবায় হইয়া থাকে। তাঁহারা সকলেই স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের পরিবারভুক্ত; লৌকিক ব্যবহারে, একমাত্র স্বামীই সর্ব্বতোভাবে স্ত্রীলোকের পক্ষে সেবনীয় হইলেও, স্বামীর সম্বন্ধে যেমন পরিবারস্থ শ্বশুর, শ্বাশুড়ী, দেবর, ভাসুর, দেবর-পত্নী প্রভৃতি পরিবারস্থ সকলেই এবং স্বামীর অন্যান্য কুটুম্বাদিও

যেমন স্ত্রীলোকের পক্ষে যথাযোগ্য ভাবে সেবনীয়, তাঁহাদের সেবা না করিলে যেমন স্বামী সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না, সুতরাং স্ত্রীলোকের পাতিব্রত্যধর্ম্মেও যেমন দোষ পড়ে,—সেইরূপ বৈষ্ণবের পক্ষে একমাত্র শ্রীকৃষ্ণই (ও শ্রীমন্‌মহাপ্রভুই) সর্ব্বতোভাবে সেবনীয় হইলেও শ্রীকৃষ্ণের ভক্ত এবং তাঁহার বিভূতি-স্বরূপ অন্যান্য দেবতাদিও যথাযোগ্য ভাবে বন্দনীয় ; কেহই নিন্দনীয় বা অবজ্ঞার বিষয় নহেন ; তাঁহাদের প্রতি অবজ্ঞা করিলে শ্রীকৃষ্ণ প্রীত হইতে পারেন না। "ব্রাহ্মণাদি চণ্ডাল কুক্কুর অন্ত করি" সকলেই যখন বৈষ্ণবের পক্ষে দণ্ডবদ্‌ভাবে প্রণম্য, তৃণগুল্মাদি পর্য্যন্ত সমস্তজীবই যখন ভগবদধিষ্ঠান বলিয়া বৈষ্ণবের নিকটে সম্মানের পাত্র, তখন শ্রীভগবদ্‌বিভূতি-স্বরূপ বা শ্রীভগবৎ-শক্তি-স্বরূপ অন্য-দেবতাদির নিন্দা যে একান্ত অমঙ্গলজনক, তাহা সহজেই অনুমেয়। এই প্রসঙ্গে ৫।১৯-অনুচ্ছেদও দ্রষ্টব্য।

৮৯। প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া এবং অপরাধ-বর্জ্জন

প্রাণিমাত্রে উদ্বেগ না দেওয়া সম্বন্ধে ৫।৩৬ গ (৪)-অনুচ্ছেদের এবং সেবা-নামাপরাধাদি বর্জ্জন সম্বন্ধে ৫।৩৮-অনুচ্ছেদের আলোচনা দ্রষ্টব্য।

৯০। কৃষ্ণনিন্দা-কৃষ্ণভক্তনিন্দা সহ্য না করা

ভক্তিরসামৃতসিন্ধুতে (১।২।৫৫-অনুচ্ছেদে) শ্রীমদ্‌ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

"নিন্দাং ভগবতঃ শৃণ্বন্ তৎপরস্য জনস্য বা।
তততো নাপৈতি যঃ সোঽপি যাত্যধঃসুকৃতাচ্চ্যুতঃ॥ শ্রীভা. ১০।৭৪।৪০॥

—শ্রীশুকদেব বলিয়াছেন, ভগবানের বা ভগবৎপরায়ণ জনের নিন্দা শুনিয়া যে ব্যক্তি সেই স্থান হইতে পলায়ন না করে, সমস্ত সুকৃতি হইতে বিচ্যুত হইয়া সে ব্যক্তি অধোগামী হইয়া থাকে।"

শ্রীমন্‌ মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"বিষ্ণু-বৈষ্ণবনিন্দা গ্রাম্যবার্ত্তা না শুনিব॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৬৬॥"

বিষ্ণু-বৈষ্ণব-নিন্দা ইত্যাদি—বিষ্ণু-নিন্দা শুনিবে না, বৈষ্ণব-নিন্দা শুনিবে না, গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিবে না। বিষ্ণুর ও বৈষ্ণবের নিন্দা, সেবা-নামাপরাধাদি উপলক্ষ্যে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; এস্থলে, অন্য কেহ বিষ্ণুনিন্দা বা বৈষ্ণবনিন্দা করিলে তাহা শুনিতে নিষেধ করিয়াছেন ; যে স্থানে এরূপ নিন্দা হয়, সে স্থান ত্যাগ করিয়া চলিয়া যাইবে।

গ্রাম্যবার্ত্তা—স্ত্রী-পুরুষ-সংসর্গ-বিষয়ক কথাদি ; এস্থলে ভগবদ্‌বিষয় ব্যতীত অন্যবিষয়-সম্বন্ধীয় কথা শুনিতেই নিষেধ করিয়াছেন। গ্রাম্যবার্ত্তা শুনিতেই যখন নিষেধ করিতেছেন, তখন গ্রাম্যবার্ত্তা বলা যে নিষিদ্ধ, তাহা আর বিশেষ করিয়া উল্লেখের প্রয়োজন হয় না। শ্রীমন্মমহাপ্রভু দাস-গোস্বামীকে বলিয়াছেন—"গ্রাম্যবার্ত্তা না কহিবে, গ্রাম্য কথা না শুনিবে। শ্রীচৈ, চ, ৩।৬।২৩৪॥" "গ্রাম্যধর্ম্ম নিবৃ-

ত্তিশ্চ" ইত্যাদি শ্রীভা, ৩।২৮।৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ এবং চক্রবর্ত্তিপাদ গ্রাম্যধর্ম্ম-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—ত্রৈবর্গিক ধর্ম্ম, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-বিষয়ক কর্ম্ম, অর্থাৎ স্বসুখ-সম্বন্ধী বিষয়ব্যাপার।

৯১। বৈষ্ণবচিহ্ন-ধারণ

পদ্মপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলিয়াছেন,

"যে কণ্ঠলগ্নতুলসীনলিনাক্ষমালা যে বাহুমূলপরিচিহ্নিতশঙ্খচক্রাঃ।
যে বা ললাটফলকে লসদূর্দ্ধপুণ্ড্রাস্তে বৈষ্ণবা ভুবনমাশু পবিত্রয়তি॥ ১।২।৫৫॥

—যাঁহারা কণ্ঠদেশে তুলসীমালা, পদ্মবীজমালা ও রুদ্রাক্ষমালা ধারণ করেন, এবং বাহুমূলে শঙ্খচক্রের চিহ্ন ধারণ করেন এবং যাঁহাদের ললাটদেশে উদ্ধপুণ্ড্রে শোভমান্, তাঁহারাই বৈষ্ণব এবং তাঁহারাই ভুবনকে আশু পবিত্র করেন।"

বিস্তৃত আলোচনা ৫।৪০-অনুচ্ছেদে দ্রষ্টব্য।

৯২। শ্রবণ-কীর্ত্তনাদি নববিধা সাধনভক্তি

নববিধা সাধনভক্তির বিষয় পূর্ব্বেই (৫।৫৫-অনুচ্ছেদে) আলোচিত হইয়াছে।

৯৩। অগ্রে নৃত্যগীতাদি

শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছেন,

অগ্রে নৃত্য গীত বিজ্ঞপ্তি দণ্ডবৎ-নতি। অভ্যুত্থান অনুব্রজ্যা তীর্থগৃহে গতি॥
পরিক্রমা স্তবপাঠ জপ সঙ্কীর্ত্তন। ধূপমাল্য-গন্ধ মহাপ্রসাদ ভোজন॥
আরাত্রিক মহোৎসব শ্রীমূর্ত্তিদর্শন। নিজ প্রিয়দান ধ্যান "তদীয়"—সেবন॥
"তদীয়"—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা, ভাগবত। এই চারি সেবা হয় কৃষ্ণের অভিমত॥

—শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৬৮-৭১॥

এ-সমস্তও চৌষট্টি-অঙ্গ সাধনভক্তির অন্তর্গত। এই অঙ্গগুলিসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ বিবৃতি দেওয়া হইতেছে

অগ্রে নৃত্য ইত্যাদি—শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে নৃত্য ও গীত।

বিজ্ঞপ্তি—শ্রীকৃষ্ণচরণে নিজের মনোগতভাব নিবেদন করা। বিজ্ঞপ্তি তিন প্রকার :—সংপ্রার্থনাময়ী, দৈন্যবোধিকা (নিজের দৈন্য-নিবেদন) এবং লালসাময়ী। সংপ্রার্থনাময়ী, যথা—"হে ভগবন্! যুবতীদিগের যুবাপুরুষে যেমন মন আসক্ত হয় এবং যুবাপুরুষদিগের যুবতীতে যেমন মন আসক্ত হয়, আমার চিত্তও সেইরূপ তোমাতে অনুরক্ত হউক।" অথবা, শ্রীল ঠাকুর মহাশয়ের "গৌরাঙ্গ বলিতে হবে পুলক শরীর" ইত্যাদি প্রার্থনা। দৈন্যবোধিকা যথা, "হে পুরুষোত্তম! আমার তুল্য পাপাত্মা ও

অপরাধী আর কেহই নাই ; বলিব কি—আমার পাপ পরিহারের নিমিত্ত তোমার চরণে দৈন্য জানাইতেও আমার লজ্জা হইতেছে, এত পাপাত্মা আমি।” অথবা, শ্রীলঠাকুর-মহাশয়ের—“শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য প্রভু দয়া কর মোরে। তোমা বিনা কে দয়ালু এ ভব সংসারে॥ পতিত-পাবন হেতু তব অবতার। মো সম পতিত প্রভু না পাইবে আর॥” ইত্যাদি প্রার্থনা। লালসাময়ী—সেবাদির জন্য নিজের তীব্র লালসা জ্ঞাপন; “কবে বৃষভানুপুরে, আহিরী-গোপের ঘরে, তনয়া হইয়া জনমিব।” ইত্যাদি। “কালিন্দীর কূলে কেলিকদম্বের বন। রতন-বেদীর পরে বসাব দুজন॥ শ্যাম-গৌরী অঙ্গে দিব চুয়া চন্দনের গন্ধ। চামর ঢুলাব কবে হেরিব মুখ চন্দ।” ইত্যাদি।

দণ্ডবৎ-নতি—দণ্ডের মত ভূমিতে পতিত হইয়া প্রণতি। একটী দণ্ড ভূমিতে পতিত হইলে যেমন তাহার সমস্ত অংশই মাটীর সঙ্গে সংলগ্ন হয়, কোনও অংশই মাটী হইতে উপরে উঠিয়া থাকেনা, সেইরূপ; যেরূপ ভাবে নমস্কার করিলে দেহের সমস্ত অংশই মাটীর সহিত সংলগ্ন হইয়া যায়, কোনও অংশই উপরে উঠিয়া থাকেনা, তাহাকে দণ্ডবৎ নতি বলে। “দণ্ডবৎ”-শব্দের ইহাই তাৎপর্য্য। সাষ্টাঙ্গ-প্রণাম। নতি-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, দেহ ও মন উভয়েরই নত অবস্থা দরকার, কেবল দেহকে মাটিতে ফেলিয়া নমস্কার করিলেই হইবে না, মনকেও শ্রীকৃষ্ণচরণে লুটাইয়া দিতে হইবে।

অভ্যুত্থান—সম্যক্‌রূপে গাত্রোত্থান ; কোনও সাধক হয়ত বসিয়া আছেন, এমন সময় আর কেহ যদি শ্রীমূর্ত্তি লইয়া তাঁহার দৃষ্টিপথে আসেন, তাহা হইলে সেই সাধক-ভক্তের কর্ত্তব্য হইবে—দণ্ডায়মান হইয়া করযোড়ে শ্রীমূর্ত্তির প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শন করা। ইহাই অভ্যুত্থানের তাৎপর্য্য।

অনুব্রজ্যা—শ্রীমূর্ত্তি কোনও স্থানে যাইতেছেন দেখিলে, তাঁহার পশ্চাতে সঙ্গে সঙ্গে গমন করা।

তীর্থগৃহে গতি—শ্রীভগবৎ-তীর্থে অর্থাৎ ধামাদিতে গমন এবং শ্রীশ্রীভগবদ্-গৃহে অর্থাৎ শ্রীমন্দিরাদিতে গমন, শ্রীভগবদ্দর্শনের উদ্দেশ্যে।

পরিক্রমা—প্রদক্ষিণ ; শ্রীমূর্ত্তিকে ডাইন দিকে রাখিয়া ভক্তিভরে করযোড়ে তাঁহার চারিদিকে ভ্রমণ ; প্রদক্ষিণ-সময়ে শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া শ্রীমূর্ত্তির দিকে মুখ রাখিয়া চলিতে হইবে, যেন শ্রীমূর্ত্তি পশ্চাতে না থাকেন ; শ্রীমূর্ত্তির সম্মুখে আসিয়া দণ্ডবৎ প্রণাম কর্ত্তব্য। শ্রীহরিকে চারিবার প্রদক্ষিণ করা বিধেয়।

স্তব-পাঠ—শ্রীভগবানের মহিমাদি-ব্যঞ্জক উক্তিকে স্তব বলে। শ্রীমূর্ত্তির সাক্ষাতে, অথবা অন্যত্র শ্রীভগবানকে লক্ষ্য করিয়া স্তব পাঠ কর্ত্তব্য।

জপ—যেইরূপে মন্ত্র উচ্চারণ করিলে, কেবল মাত্র নিজের কর্ণগোচর হয়, অপরে শুনিতে পায় না, সেই অতি লঘু উচ্চারণকে জপ বলে। “মন্ত্রস্য সুলঘূচ্চারো জপ ইত্যভিধীয়তে” ॥ ভক্তিরসামৃত॥ ১।২।৬৫ ॥ ইষ্টমন্ত্রের জপ করিবে।

সঙ্কীর্ত্তন—নাম, গুণ, লীলাদির উচ্চ-কথনকে **কীর্ত্তন** এবং বহুলোক মিলিয়া খোল করতালাদি যোগে কীর্ত্তনকে সঙ্কীর্ত্তন বলে।

ধূপ-মাল্য-গন্ধ—শ্রীকৃষ্ণের প্রসাদী ধূপের গন্ধ সেবন, প্রসাদী মাল্যাদির গন্ধ ও কণ্ঠে ধারণ এবং প্রসাদী চন্দনপুষ্পাদির গন্ধ সেবন।

মহাপ্রসাদ ভোজন—শ্রীকৃষ্ণে নিবেদিত অন্নাদি সেবন। অনিবেদিত কোনও দ্রব্য ভোজন করিবে না। তুলসী-মিশ্রিত মহাপ্রসাদ চরণামৃতের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া গ্রহণ করার বিশেষ ফল শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। "নৈবেদ্যমন্নং তুলসীবিমিশ্রং বিশেষতঃ পাদজলেন সিক্তম্। যোঽশ্নাতি নিত্যং পুরতো-মুরারেঃ প্রাপ্নোতি যজ্ঞাযুতকোটিপুণ্যম্॥ ভ, র, সি, ১।২।৬৮॥" মহাপ্রসাদ অপ্রাকৃত চিন্ময় বস্তু; ইহাতে প্রাকৃত অন্নাদি-বুদ্ধি অপরাধ-জনক। শুষ্ক হউক, পচা হউক, অথবা দূরদেশ হইতে আনীত হউক, কালাকাল বিচার না করিয়া প্রাপ্তিমাত্রেই ভক্তির সহিত মহাপ্রসাদ গ্রহণ করা কর্ত্তব্য (অবশ্য শ্রীহরিবাসরে মহাপ্রসাদ ভোজন করিবে না, শ্রীহরিবাসরে মহাপ্রসাদ উপস্থিত হইলে দণ্ডবৎ-প্রণাম করিয়া পরের দিনের জন্য রাখিয়া দিবে।) একদিন শ্রীমন্‌মহাপ্রভু অতি প্রত্যূষে মহাপ্রসাদ লইয়া সার্ব্বভৌম ভট্টাচার্য্যের গৃহে গিয়াছিলেন; সার্ব্বভৌম তখন "কৃষ্ণ কৃষ্ণ" উচ্চারণ করিতে করিতে শয্যা-ত্যাগ করিতেছিলেন; এমন সময় প্রভু তাঁহার হাতে মহাপ্রসাদ দিলেন; সার্ব্বভৌম তখনই—যদিও তখন পর্য্যন্ত তাঁহার বাসিমুখ ধোওয়া হয় নাই, স্নান করা হয় নাই, ব্রাহ্মণোচিত সন্ধ্যাদি করা হয় নাই, তথাপি তখনই—"শুষ্কং পর্য্যুসিতং বাপি নীতং বা দূরদেশতঃ। প্রাপ্তমাত্রেণ ভোক্তব্যং নাত্র কালবিচা-রণা॥ ন দেশনিয়মস্তত্র ন কালনিয়মস্তথা। প্রাপ্তমন্নং দ্রুতং শিষ্টৈর্ভোক্তব্যং হরিরব্রবীৎ॥"—এই শ্লোক পাঠ করিতে করিতে মহাপ্রসাদ ভক্ষণ করিলেন। মহাপ্রসাদে দেশকালাদির বিচার নাই। মহা-প্রসাদ প্রাকৃত অন্ন নহে বলিয়া কোনরূপেই অপবিত্র হয় না, কুক্কুরের মুখ হইতে পতিত মহাপ্রসাদও অবজ্ঞার বস্তু নহে। মহাপ্রসাদ-ভোজনে মায়ার হাত হইতে উদ্ধার পাওয়া যায়, "উচ্ছিষ্টভোজিনো দাসাস্তব মায়াং জয়েম হি। শ্রীভা, ১১।৬।৪৬॥" মহাপ্রসাদের মাহাত্ম্যে অন্য কামনা দূরীভূত হয়, শ্রীকৃষ্ণ-সেবার কামনা পুষ্টিলাভ করে; "ইতররাগবিস্মারণং নৃণাং বিতর বীর নস্তেঽধরামৃতম্। শ্রী, ভা, ১০।৩১।১৪॥"; ভক্তি পুষ্টিলাভ করে।

আরাত্রিকাদি—আরাত্রিক দর্শন ও শ্রীমূর্ত্তি দর্শন।

আরাত্রিক—নীরাজন; আরতি। অযুগ্ম-সংখ্যক কর্পূর-বাতি বা ঘৃত-বাতি দ্বারা স্বর্ণাদি-নির্ম্মিত পবিত্র পাত্রে এবং সজল-শঙ্খাদি দ্বারা বাদ্যাদি সহযোগে শ্রীহরির আরতি করিতে হয়। আরতিকালে আরতি-কীর্ত্তন ও আরতি দর্শন বিধেয়, পাঁচটী, সাতটী, নয়টী ইত্যাদি বাতি দ্বারা শ্রীহরির চরণে চারিবার, নাভিতে একবার, বক্ষে একবার, বদনে একবার এবং সর্ব্বাঙ্গে সাতবার আরতি করিবে; শঙ্খদ্বারা সর্ব্বাঙ্গে তিনবার আরতি করিবে। কাহারও মতে বার-সংখ্যা অন্যরূপ। **মহোৎসব**—ঝুলন, দোল, রথযাত্রাদি মহোৎসব ভক্তিভরে দর্শন করিবে এবং যথাযোগ্যভাবে এসব উৎসবে যোগদান করিবে। পূজাদিও দর্শন করিবে। **শ্রীমূর্ত্তিদর্শন**—সাক্ষাৎ ভগবজ্‌জ্ঞানে শ্রীমূর্ত্তি দর্শন করিবে।

নিজপ্রিয় দান—শ্রীকৃষ্ণসেবার উপযোগী বস্তু সমূহের মধ্যে যে বস্তু নিজের অত্যন্ত প্রিয়, শ্রদ্ধা

ও প্রীতির সহিত তাহা শ্রীহরিকে অর্পণ করিবে। **ধ্যান**—শ্রীভগবানের রূপ, গুণ, লীলা ও সেবাদির সূক্ষ্ম চিন্তনকে ধ্যান বলে। 'ধ্যানং রূপগুণ-ক্রীড়া-সেবাদেঃ সূক্ষ্মচিন্তনম্। ভ, র, সি, ১।২।৭৭॥" রূপ-ধ্যান ঃ—নানাবিধ বিচিত্র বসন-ভূষণে ভূষিত শ্রীভগবানের চরণের নখাগ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ক্রমশঃ শ্রীবদনচন্দ্র পর্য্যন্ত একাগ্রচিত্তে চিন্তা করিবে। গুণধ্যান ঃ—শ্রীভগবানের ভক্তবাৎসল্য, অপার করুণা প্রভৃতি গুণের চিন্তা করিবে। লীলাধ্যান ঃ—একাগ্রচিত্তে লীলাপুরুষোত্তম শ্রীভগবানের মধুরলীলাসমূহ চিন্তা করিবে। সেবাদিধ্যান ঃ—মনঃকল্পিত উপচারাদি দ্বারা সানন্দ-চিত্তে শ্রীহরির সেবাদি ও তাঁহার পরিচর্য্যাদি চিন্তা করিবে। মানসিক পরিচর্য্যাদি সম্বন্ধে ব্রহ্মবৈবর্ত্তপুরাণের একটী সুন্দর কাহিনী পূর্ব্বেই (৫।৫৫-অনুচ্ছেদে) অর্চ্চন-প্রসঙ্গে বিবৃত হইয়াছে।

তদীয়-সেবন-তদীয়-শব্দের সাধারণ অর্থ—তাঁহার ; এখানে ইহার অর্থ—শ্রীভগবান্ আপনার বলিয়া যাঁহাদিগকে অঙ্গীকার করিয়াছেন, তাঁহারা। তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত এই চারি বস্তুই তদীয়-শব্দবাচ্য। **তুলসী**—তুলসী শ্রীকৃষ্ণপ্রেয়সী ; কৃষ্ণভক্তিপ্রদায়িনী। ভক্তবৎসল শ্রীহরি কাহারও নিকট হইতে একপত্রমাত্র তুলসী পাইলেই এত প্রীত হয়েন যে, তাঁহার নিকটে আত্মবিক্রয় পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন। "তুলসী-দল-মাত্রেণ জলস্য চুলুকেন বা। বিক্রীণীতে স্বমাত্মানং ভক্তেভ্যোভক্তবৎসলঃ।"—বিষ্ণুধর্ম্মবচন॥ তুলসী ব্যতীত সাধারণতঃ শ্রীকৃষ্ণের ভোগ হইতে পারে না। "ছাপ্পান্ন ভোগ ছত্রিশব্যঞ্জন বিনা তুলসী প্রভু একু নাহি মানি।" তুলসীর দর্শনে অখিল পাতক বিনষ্ট হয়, স্পর্শে দেহ পবিত্র হয়, বন্দনায় রোগসমূহ দূরীভূত হয়, তুলসীমূলে জলসেচনে শমন-ভয় দূর হয় ; তুলসীর রোপণে শ্রীভগবানের সান্নিধ্যলাভ হয় এবং শ্রীকৃষ্ণচরণে তুলসী অর্পিত হইলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। "যা দৃষ্টা নিখিলাঘ-সঙ্ঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃপাবনী। রোগাণামভিবন্দিতা নিরসিনী সিক্তান্তকত্রাসিনী। প্রত্যাসত্তিবিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা। ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥ শ্রীহরিভক্তিবিলাস॥ ৯।৩৩॥" চারিবর্ণের এবং চারি আশ্রমের স্ত্রী-পুরুষ সকলেরই তুলসী-পূজাদির অধিকার শাস্ত্রে দেখা যায়। "চতুর্ণামপি বর্ণানামাশ্রমাণাং বিশেষতঃ। স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি হি॥ তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ। আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা॥"—শ্রীহরিভক্তিবিলাস ৯।৩৬ ধৃত অগস্ত্য-সংহিতা-বচন॥

তুলসীর উপাসনা নয় রকমের ; যথা, প্রত্যহ তুলসীর দর্শন, স্পর্শ, চিন্তন বা ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম, গুণশ্রবণ, রোপণ, জলসেচনাদিদ্বারা সেবা ও গন্ধপুষ্পাদিদ্বারা পূজা। "দৃষ্টা স্পৃষ্টা তথা ধ্যাতা কীর্ত্তিতা নমিতা শ্রুতা। রোপিতা সেবিতা নিত্যং পূজিতা তুলসী শুভা॥ নবধা তুলসীং নিত্যং যে ভজন্তি দিনে দিনে। যুগকোটিসহস্রাণি তে বসন্তি হরের্গৃহে।" হঃ ভঃ বিঃ॥ ৯।৩৮॥

বৈষ্ণব—বৈষ্ণবসেবা। পরিচর্য্যাদিদ্বারা বৈষ্ণবের প্রীতি-সাধন। শ্রীভগবানের নাম ও রূপ-গুণ-লীলাদির কথা শুনাইয়া বৈষ্ণবের প্রীতিবিধানও বৈষ্ণবসেবার একটী মুখ্য অঙ্গ। শ্রীভগবানের পূজা অপেক্ষাও ভক্ত-পূজার মাহাত্ম্য অধিক, ইহা শ্রীভগবান্ই বলিয়াছেন, "মদ্ভক্তপূজাভ্যোঽধিকা॥

শ্রীভা, ১১।১৯।২১ ॥” “আরাধনানাং সর্ব্বেষাং-বিষ্ণোরারাধনং পরম্। তস্মাৎ পরতরং দেবি বৈষ্ণবানাং সমর্চ্চনম্ ॥” ভ, র, সি, ১।২।৯৯ ধৃত পাদ্মবচন ॥ বৈষ্ণবের পূজায় ভগবচ্চরণে রতি জন্মে ; “যৎসেবয়া ভগবতঃ কূটস্থস্য মধুদ্বিষঃ। রতিরাসো ভবেত্তীব্রঃ পাদয়োর্ব্যসনার্দ্দনঃ ॥ শ্রীমদ্ভাগবত ॥ ৩।৭।১৯ ॥” বৈষ্ণবের দর্শন, স্পর্শন, পাদপ্রক্ষালন ও আসনদানাদিতে দেহ ও মনের পবিত্রতা সম্পাদন তো করেই, স্মরণ মাত্রেই গৃহও পবিত্র হয়। “যেষাং সংস্মরণাৎ পুংসাং সদ্যঃ শুধ্যন্তি বৈ গৃহাঃ। কিং পুনঃ দর্শন-স্পর্শপাদ-শৌচাসনাদিভিঃ ॥ শ্রীভা, ১।১৯।৩৩ ॥” “গঙ্গার পরশ হৈলে পশ্চাৎ পাবন। দর্শনে পবিত্র কর এই তব গুণ ॥”—শ্রীল ঠাকুরমহাশয় ॥ “গুরু, কৃষ্ণ, বৈষ্ণব এই তিনের স্মরণ। তিনের স্মরণে হয় বিঘ্ন-বিনাশন ॥ অনায়াসে হয় নিজ বাঞ্ছিত পূরণ। শ্রীচৈ, চ, ১।১।৪ ॥” যাঁহারা কেবল শ্রীভগবানের ভজন করেন, কিন্তু বৈষ্ণবের সেবা করেন না, তাঁহারা শ্রীভগবানের ভক্তপদবাচ্য নহেন ; কিন্তু যাঁহারা বৈষ্ণবেরও ভজন করেন, তাঁহারাই বাস্তবিক শ্রীভগবানের ভক্ত—ইহা শ্রীভগবানের উক্তি। “যে মে ভক্তজনাঃ পার্থ ন মে ভক্তাশ্চ তে জনাঃ। মদ্ভক্তানাঞ্চ যে ভক্তা মম ভক্তাস্তু তে নরাঃ ॥ ভ, র, সি ১।২।৯৮ ধৃত আদিপুরাণ-বচন ॥” বৈষ্ণবসেবা ব্যতীত ভক্তিলাভ হইতে পারে না। তাই শ্রীল ঠাকুর মহাশয় বলিয়াছেন —‘কিরূপে পাইব সেবা মুঞি দুরাচার। শ্রীগুরুবৈষ্ণবে রতি না হইল আমার ॥” যাঁহারা বৈষ্ণবের চরণ আশ্রয় করিয়া ভজন করেন, শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে ত্যাগ করেন না। “আশ্রয় লইয়া ভজে, কৃষ্ণ তারে নাহি ত্যাজে, আর সব মরে অকারণ ॥”

মথুরা—শ্রীভক্তিরসামৃতসিন্ধুর ‘কুর্য্যাদ্‌বাসং ব্রজে সদা”—এই উক্তির সহিত মিলাইয়া অর্থ করিলে মথুরা-শব্দে এস্থলে শ্রীকৃষ্ণের অপার-মাধুর্য্যময়ী লীলার স্থান ব্রজমণ্ডলকেই বুঝায়। ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ বলেন, ত্রৈলোক্যমধ্যে যত তীর্থ আছে, মথুরা তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ; কারণ, সমুদয় তীর্থ-সেবনেও যে পরমানন্দময়ী প্রেমলক্ষণা ভক্তি সুদুর্ল্লভা-ই থাকিয়া যায়, মথুরার স্পর্শমাত্রেই তাহা লাভ হয়। “ত্রৈলোক্যবর্ত্তিতীর্থানাং সেবনাদ্দুর্ল্লভাহি যা। পরমানন্দময়ী সিদ্ধির্মথুরা-স্পর্শমাত্রতঃ ॥ ভ, র, সি, ।১।২।৯৬ ॥” মথুরামাহাত্ম্যাদির শ্রবণ, কীর্ত্তন, স্মরণ, মথুরাধামের স্মৃতি, মথুরাবাসের বাসনা, মথুরা-দর্শন, মথুরা-গমন, মথুরা-ধামের আশ্রয়গ্রহণ, মথুরাধামের স্পর্শ এবং মথুরার সেবা—জীবের অভীষ্টদ হইয়া থাকে। ‘শ্রুতা স্মৃতা কীর্ত্তিতা চ বাঞ্ছিতা প্রেক্ষিতা গতা। স্পৃষ্টা শ্রিতা সেবিতা চ মথুরাভীষ্টদা নৃণাম্ ॥ ভ, র, সি, ১।২।৯৬।”

ভাগবত—শ্রীমদ্‌ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত ও শ্রীচৈতন্যভাগবতাদি ভগবল্লীলা-বিষয়ক গ্রন্থাদির সেবা। ভাগবত-গ্রন্থাদির পাঠ, কীর্ত্তন, শ্রবণ, বর্ণন, ভগবদ্বুদ্ধিতে গন্ধপুষ্পতুলসী-আদির দ্বারা পূজা—এই সমস্তই ভাগবত-সেবা। শ্রীদ্‌ভাগবতোক্ত লীলা-কথাদির শ্রবণে ও বর্ণনে হৃদ্‌রোগ কাম দূরীভূত হয়, শীঘ্রই ভগবানে পরাভক্তি লাভ হয় ; “বিক্রীড়িতং ব্রজবধূভিরিদঞ্চ বিষ্ণোঃ শ্রদ্ধান্বিতোঽনুশৃণুয়াদথ-বর্ণয়েদ্ যঃ। ভক্তিং পরাং ভগবতি প্রতিলভ্য কামং হৃদ্‌রোগং আশ্বপহিনোত্যচিরেণ ধীরঃ ॥ শ্রীভা, ১০।৩৩।৩৯ ॥” শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতসম্বন্ধে শ্রীলকবিরাজ-গোস্বামিপাদ বলিয়াছেন—“যদিও না বুঝে

কেহ, শুনিতে শুনিতে সেহ, কি অদ্ভুত চৈতন্যচরিত। কৃষ্ণে উপজিবে প্রীতি, জানিবে রসের রীতি, শুনিলেই হয় তাতে হিত। শ্রীচৈ, চ, ২।২।৭৪॥" আবার "শুনিলে চৈতন্যলীলা, ভক্তিলভ্য হয়।" রসিক এবং সজাতীয়-আশয়যুক্ত ভক্তের সহিতই ভগবৎ-লীলা-গ্রন্থাদির আস্বাদন করিবে (শ্রীমদ্ভাগবতার্থানামাস্বাদো রসিকৈঃ সহ॥ ভ, র, সি, ১।২।৪৩॥); শ্রীশ্রীগৌরগোবিন্দচরণে যাঁহার রতি আছে এবং শ্রীগৌরলীলায় ও শ্রীগোবিন্দলীলায় যাঁহার প্রবেশ আছে, যিনি শ্রীগৌর-গোবিন্দ-লীলারসে নিমগ্ন, তিনিই রসিক ভক্ত।

এই চারি সেবা—তুলসী, বৈষ্ণব, মথুরা ও ভাগবত, এই চারি বস্তুর সেবায় শ্রীকৃষ্ণ অত্যন্ত প্রীত হয়েন।

৯৪। কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টাদি

শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর নিকটে শ্রীমন্মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা, তৎকৃপাবলোকন। জন্মদিনাদি মহোৎসব লঞা ভক্তগণ॥
সর্ব্বথা শরণাপত্তি কার্ত্তিকাদি ব্রত। চতুঃষষ্টি অঙ্গ এই পরম মহত্ত্ব॥ শ্রীচৈ, চ, ২॥২২।২৭-৭৩॥

কৃষ্ণার্থে অখিল চেষ্টা—কৃষ্ণার্থে অর্থাৎ কৃষ্ণের প্রীতির নিমিত্ত; অখিল-চেষ্টা অর্থ—সমস্ত কার্য্য। লৌকিক ব্যবহারে, বা অন্য অনুষ্ঠানে যাহা কিছু করিবে, তৎসমস্তই যেন শ্রীকৃষ্ণ-ভজনের অনুকূল হয়। ইহাদ্বারা ধ্বনিত হইতেছে যে, যাহা ভজনের অনুকূল নহে, তাহা কখনও করিবেনা। **তৎকৃপাবলোকন**—কবে আমার প্রতি পরম-করুণ শ্রীভগবানের দয়া হইবে, এইরূপ বলবতী আকাঙ্ক্ষার সহিত তাঁহার কৃপার জন্য প্রতীক্ষা করিয়া থাকা। অথবা, প্রত্যেক কার্য্যেতেই শ্রীভগবানের কৃপা অনুভব করা; নিজের সম্পদ, বিপদ, সুখ, দুঃখ সমস্তই মঙ্গলময় ভগবান্ আমার মঙ্গলের জন্যই কৃপা করিয়া বিধান করিয়াছেন, এইরূপ মনে করা। **জন্মদিনাদি মহোৎসব** ইত্যাদি—শ্রীকৃষ্ণের জন্মাষ্টমী, শ্রীরাধাষ্টমী, শ্রীগৌর-পূর্ণিমা প্রভৃতি জন্মযাত্রা এবং অন্যান্য ভগবৎ-সম্বন্ধীয় উৎসব বৈষ্ণব-বৃন্দ সহ অনুষ্ঠান করা। এ-সব উৎসবে নিজের বৈভব বা অবস্থার অনুরূপ দ্রব্যাদির যোগাড় করিবে।

সর্ব্বথা শরণাপত্তি—কায়-মনোবাক্যে সর্ব্ববিষয়ে শ্রীকৃষ্ণের শরণাগত হওয়া। ৫।৩৫-এঅ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

কার্ত্তিকাদি-ব্রত—কার্ত্তিক-মাসে নিয়ম-সেবাদি ব্রত। কার্ত্তিক-মাসে ভগবদুদ্দেশ্যে অল্প কিছু অনুষ্ঠান করিলেও শ্রীভগবান্ তাহা বহু বলিয়া স্বীকার করেন। "যথা দামোদরো ভক্তবৎসলো বিদিতো জনৈঃ। তস্যায়ং তাদৃশো মাসঃ স্বল্পমপ্যুকারকঃ॥ ভ, র, সি, ১।২।৯৯ ধৃত পাদ্মবচন॥" শ্রীবৃন্দাবনে নিয়মসেবা-ব্রতের মাহাত্ম্য অনেক বেশী। অন্যত্র পূজিত হইলে শ্রীহরি সেবকদিগের

ভুক্তি-মুক্তি প্রদান করেন, কিন্তু আত্মবশ্যকরী ভক্তি সহজে প্রদান করেন না ; কিন্তু কার্ত্তিকমাসে একবার মাত্র মথুরায় শ্রীদামোদরের সেবা করিলেই, তাদৃশী সুদুর্ল্লভা হরিভক্তিও অনায়াসে লাভ হয়। "ভুক্তিং মুক্তিং হরির্দ্দদ্যাদর্চ্চিতোঽন্যত্রসেবিনম্। ভক্তিস্তু ন দদাত্যেব যতোবশ্যকরী হরেঃ॥ সাত্বঞ্জসা হরের্ভক্তির্লভ্যতে কার্ত্তিকে নরৈঃ। মথুরায়াং সকৃদপি শ্রীদামোদর-সেবনাৎ॥—

ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ১।২।১০০। ধৃত-পাদ্মবচন॥"

৯৫। শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা

ক। মহিমা

শ্রদ্ধার (অর্থাৎ প্রীতি বা আদরের) সহিত শ্রীমূর্ত্তিসেবার উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। ভক্তিরসামৃতসিন্ধু বলেন—"অথ শ্রীমূর্ত্তিরঙ্ঘ্রিসেবনে প্রীতির্যথা আদিপুরাণে॥

মম নাম সদা গ্রাহী মম সেবাপ্রিয়ঃ সদা।
ভক্তিস্তস্মৈ প্রদাতব্যা ন তু মুক্তিঃ কদাচন॥

—শ্রীমূর্ত্তির চরণসেবনে প্রীতিসম্বন্ধে আদিপুরাণে বলা হইয়াছে—(ভগবান্ বলিয়াছেন) যিনি সর্ব্বদা আমার নাম গ্রহণ করেন, এবং আমার সেবাতে যিনি প্রীতি অনুভব করেন, আমি তাঁহাকে ভক্তিই প্রদান করিয়া থাকি, কখনও মুক্তি প্রদান করিনা।"

এই ভগবদুক্তি হইতে জানা গেল, শ্রদ্ধার সহিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা করিলে ভক্তি, অর্থাৎ প্রেম-ভক্তি, লাভ হইয়া থাকে।

খ। অষ্টবিধা শ্রীমূর্ত্তি

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে আট রকমের শ্রীমূর্ত্তির কথা বলিয়াছেন।

"শৈলী দারুময়ী লৌহী লেপ্যা লেখ্যা চ সৈকতী।
মনোময়ী মণিময়ী প্রতিমাষ্টবিধা স্মৃতা॥ শ্রীভা, ১১।২৭।১২॥

—শিলাময়ী, দারুময়ী (কাষ্ঠ-নির্ম্মিতা) লৌহী (সুবর্ণাদিধাতুময়ী), লেপ্যা (মৃত্তিকা-চন্দনাদি নির্ম্মিতা), লেখ্যা (চিত্রপটাদি-লিখিতা), সৈকতী (বালুকাময়ী), মনোময়ী (হৃদয়ে চিন্তিতা) , ও মণিময়ী—এই আট রকমের প্রতিমা (বা শ্রীমূর্ত্তি) হইয়া থাকে।"

সৈকতী প্রতিমাসম্বন্ধে শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভটীকায় লিখিয়াছেন—"এষা তু সকামানামেব ন তু প্রীতীচ্ছূনাম্। তদ্রক্ষণারক্ষণয়োঃ প্রীতিবিরোধাৎ॥ সৈকতী প্রতিমা কেবল সকাম ভক্তদের জন্য, প্রীতিকামীদের জন্য নহে। কেননা, ইহার রক্ষণ ও অরক্ষণ (বিসর্জ্জন) প্রীতির বিরোধী।" বালুকাময়ী প্রতিমা রক্ষিত হয়না ; বিসর্জ্জিত হয় বলিয়া প্রীতির অভাব সূচিত হয়।

শালগ্রাম হইতেছেন শৈলী (শিলাময়ী) শ্রীমূর্ত্তির অন্তর্ভুক্ত।

গ। প্রতিমা দ্বিবিধা—চল ও অচল

চল (স্থির) ও অচল (অস্থির) ভেদে প্রতিমা আবার দুই রকমের।

"চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্।
উদ্বাসাবাহনে ন স্তঃ স্থিরায়ামুদ্ধবার্চ্চনে॥ শ্রীভা, ১১।২৭।১৩॥

—(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) হে উদ্ধব! চল ও অচল এই দুই রকমের প্রতিমা হইতেছে ভগবানের অধিষ্ঠান। তন্মধ্যে স্থির (অর্থাৎ অচল) প্রতিমার অর্চ্চনাতে আবাহন ও বিসর্জ্জন নাই। অর্থাৎ প্রতিষ্ঠাকালে স্থায়িরূপে আবাহন করা হয় বলিয়া প্রতিষ্ঠার পরবর্ত্তী কালের অর্চ্চনায় কোনও সময়েই আর আবাহন বা বিসর্জ্জন করিতে হয়না।"

এই শ্লোকের টীকায় "জীবমন্দিরম্"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"জীবস্য ভগবতো মন্দিরম্—জীব অর্থ ভগবান্, তাঁহার মন্দির।" এ-স্থলে জীব-শব্দের অর্থ ভগবান্ কেন বলা হইল, শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উদ্ধৃত উক্ত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী তাহা জানাইয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"জীবয়তি চেতয়তীতি জীবো ভগবানেব তস্য মন্দিরমধিষ্ঠানম্॥—জীবন বা চেতন দান করেন যিনি তিনি জীব; এতাদৃশ জীব ভগবান্ই; (কেননা, ভগবান্ ব্যতীত অপর কেহ সকলের চেতনা বিধান করিতে পারেন না), তাঁহার মন্দির বা অধিষ্ঠান—শ্রীভগবানের অধিষ্ঠান; ইহাই হইতেছে জীবমন্দির-শব্দের অর্থ।" ভক্তিসন্দর্ভে ২৮৬-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"জীবস্য জীবয়িতুঃ পরমাত্মনো মম মন্দিরং মদঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরেকাকারতাস্পদমিত্যর্থঃ। অথবা জীবমন্দিরম্—সর্ব্বজীবানাং পরমাশ্রয়ঃ সাক্ষাদ্ভগবানেব প্রতিষ্ঠা ইত্যর্থঃ॥—জীবনদাতা বলিয়া পরমাত্মা আমাকে (শ্রীকৃষ্ণকে) জীব বলা হয়; (প্রতিমা হইতেছে এতাদৃশ) আমার মন্দির; কেননা প্রতিমা আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত একাকারতাস্পদ। অথবা, মন্দির-শব্দের অর্থ আশ্রয়। সমস্ত জীবের (প্রাণীর) পরম-আশ্রয় ভগবান্ই। সেই ভগবান্ই প্রতিমাতে প্রতিষ্ঠিত বলিয়া প্রতিমাকে জীবমন্দির বলা হইয়াছে (ইহাদ্বারা প্রতিমা ও ভগবানে অভেদ সূচিত হইতেছে)।"

যাহাহউক, অচল বা স্থির প্রতিমার অর্চ্চনে আবাহন-বিসর্জ্জন নাই—একথা বলার পরে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন,

"অস্থিরায়াং বিকল্পঃ স্যাৎ স্থণ্ডিলে তু ভবেদ্দ্বয়ম্। শ্রীভা, ১১।২৭।১৪॥

—অস্থির (চল) প্রতিমার (সৈকতী ও লেপ্যা প্রতিমার) অর্চ্চনে বিকল্প-ব্যবস্থা, অর্থাৎ কোনও কোনও স্থলে আবাহন ও বিসর্জ্জন আছে, কোনও কোনও স্থলে নাই (অর্থাৎ চল-প্রতিমাকে যদি কিছুদিন পূজার্থে রাখা হয়, তাহা হইলে যে কয়দিন রাখা হয়, সেই কয়দিন আবাহন-বিসর্জ্জন থাকেনা)। স্থণ্ডিলে (অর্থাৎ মন্ত্রাদিদ্বারা সংস্কৃত স্থলে) আবাহন ও বিসর্জ্জন-উভয়ই হইবে। [চক্রবর্ত্তি-পাদ বলেন—এ-স্থলে স্থণ্ডিল হইতেছে উপলক্ষণ; সৈকতী প্রতিমাতেও আবাহন-বিসর্জ্জন কর্ত্তব্য

(কেননা, সৈকতীপ্রতিমার অধিক কাল রক্ষণ সম্ভব নয়—দীপিকাদীপনটীকা)। শালগ্রামের অর্চ্চনায় আবাহন-বিসর্জন করিবেনা]”

ঘ। বিভিন্ন প্রতিমার স্নপনের প্রকার

শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন,

“স্নপনং ত্ববিলেপ্যায়ামন্যত্র পরিমার্জনম্॥ শ্রীভা, ১১।২৭।১৪॥

—লেপ্যা (মৃত্তিকা-চন্দনাদি নির্ম্মিতা) এবং লেপ্যা (চিত্রপটাদি) প্রতিমাকে বস্ত্রদ্বারা মার্জিত করিয়াই স্নানের কাজ সমাধা করিবে; তদ্ব্যতীত অন্যান্য (শৈলী, দারুময়ী প্রভৃতি) প্রতিমাকে জলের দ্বারা স্নান করাইবে।”

ঙ। শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনায় ধ্যেয় বস্তু

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৬-অনুচ্ছেদে) শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনায় ধ্যেয় বস্তু সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। সেই আলোচনার মর্ম্ম এ-স্থলে লিখিত হইতেছে।

কতকগুলি শ্রীমূর্ত্তি কর-চরণাদি আকার-বিশিষ্ট নহেন—যেমন শালগ্রাম-শিলাদি। আর কতকগুলি কর-চরণাদি আকার-বিশিষ্ট—যেমন শ্রীকৃষ্ণবিগ্রহাদি।

শালগ্রাম-শীলাদির অর্চ্চনায় ধ্যেয় বস্তু

গৌতমীয়তন্ত্র হইতে জানা যায়, গণ্ডকীনদী-প্রদেশে পাষাণ হইতে শালগ্রামের উদ্ভব হয়। শালগ্রাম কোনও লোকের দ্বারা নির্ম্মিত নহেন; গণ্ডকী-প্রদেশে আপনা-আপনিই শালগ্রামের উদ্ভব হয়। স্কন্দপুরাণ এবং অগ্নিপুরাণাদি হইতে জানা যায়, শালগ্রাম নানা রকমের; বিভিন্ন রকমের শালগ্রামের বিভিন্ন বর্ণ ও বিভিন্ন চিহ্ন বা লক্ষণ আছে। বিভিন্ন লক্ষণবিশিষ্ট শালগ্রাম বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের অধিষ্ঠান সূচনা করে। যে শালগ্রাম-শিলার চিহ্নাদি যে ভগবৎ-স্বরূপের অধিষ্ঠান সূচিত করে, সেই শালগ্রামে সেই ভগবৎ-স্বরূপই অধিষ্ঠিত। “শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ—যেস্থানে শালগ্রাম-শিলা, সে-স্থানে শ্রীহরি সন্নিহিত, অধিষ্ঠিত”-এই শাস্ত্র-বাক্যই তাহার প্রমাণ। সেই শালগ্রামশিলায় সেই ভগবৎ-স্বরূপ প্রকটিত বলিয়া তাঁহার অধিষ্ঠানের জন্য কোনওরূপ যত্ন করিতে হয় না, অর্থাৎ ভগবৎ-স্বরূপের আবির্ভাবের উদ্দেশ্যে, অন্য শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠার জন্য শাস্ত্রে যে সকল বিধান আছে, সেই সকল বিধানের অনুসরণ করিতে হয় না। এজন্যই স্কন্দপুরাণ কার্ত্তিকমাহাত্ম্যে লিখিত হইয়াছে—“শালগ্রামশিলার প্রতিষ্ঠা করিতে নাই, মহাপূজা করিয়া তৎপরেই শিলার অর্চ্চনা করিবে। শালগ্রামশিলায়াস্তু প্রতিষ্ঠা নৈব বিদ্যতে। মহাপূজাস্তু কৃত্বাদৌ পূজয়েত্তাং ততো বুধঃ॥ হ, ভ, বি, ৫।১২৫-ধৃত-প্রমাণ॥”

সাধকের ধ্যেয় ভগবৎ-স্বরূপ কর চরণাদি আকার-বিশিষ্ট; কিন্তু শালগ্রামশিলাদি তদ্রূপ নহেন। সুতরাং সাধকের উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের সহিত সেই ভগবৎ-স্বরূপের অধিষ্ঠানভূত শালগ্রাম-

শিলার বৈলক্ষণ্য বিদ্যমান। তথাপি কোনও শালগ্রামশিলার অর্চ্চনকালে সেই শিলার চিন্তা না করিয়া সেই শিলায় অধিষ্ঠিত ভগবৎস্বরূপের চিন্তা বা ধ্যানই কর্ত্তব্য।(১)

তন্মধ্যে, যে ভগবৎ-স্বরূপ সাধকের উপাস্য, সুতরাং অভীষ্ট, সেই ভগবৎ-স্বরূপের অধিষ্ঠান-ভূত শালগ্রামের অর্চ্চনাই যদি তিনি করেন এবং অর্চ্চনকালে স্বীয় অভীষ্ট ভগবৎস্বরূপের চিন্তা বা ধ্যানই যদি তিনি করেন, তাহা হইলে তাহা হইবে সুষ্ঠু সিদ্ধিপ্রদ; কেননা, সেই শালগ্রামশিলায় তাঁহার অভীষ্ট ভগবৎস্বরূপ স্বতঃই প্রকটিত আছেন (২)। সেই শালগ্রামশিলাই হইবে সাধকের স্বীয় অভিমত। স্বীয় অভিমত শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনার উপদেশ শ্রীমদ্ভাগবতেও দৃষ্ট হয়।

"লব্ধানুগ্রহ আচার্য্যাৎ তেন সন্দর্শিতাগমঃ।
মহাপুরুষমভ্যর্চ্চেৎ মূর্ত্ত্যাভিমতয়াত্মনঃ॥ শ্রীভা, ১১।৩।৪৮॥

—আচার্য্যের (গুরুদেবের) অনুগ্রহ লাভ করিয়া এবং তাঁহার নিকটে আগমবিহিত অর্চ্চন-প্রকার অবগত হইয়া স্বীয় অভিমত শ্রীমূর্ত্তিতে মহাপুরুষ ভগবৎস্বরূপের অর্চ্চনা করিবে।"

এই সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা যায়, গোবর্দ্ধন-শিলার অর্চ্চনেও ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণের ধ্যানই বিধেয়।

কর-চরণাদি-আকারবিশিষ্ট বিগ্রহের অর্চ্চনায় ধ্যেয় বস্তু

ভগবৎ-স্বরূপ বিভিন্ন বলিয়া এবং তাঁহাদের কর-চরণাদিবিশিষ্ট আকারও বিভিন্ন বলিয়া তাঁহাদের শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহও বিভিন্ন প্রকারের হইয়া থাকেন। দ্বিভুজ শ্রীকৃষ্ণের শ্রীবিগ্রহ দ্বিভুজ, চতুর্ভুজ নারায়ণের শ্রীবিগ্রহ চতুর্ভুজ ইত্যাদি। সুতরাং এ-সকল স্থলে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের সহিত তাঁহার শ্রীবিগ্রহের (বা প্রতিমার) আকারাদির বৈলক্ষণ্য নাই, বরং অভেদই দৃষ্ট হয়। আকারের ঐক্য আছে বলিয়া তত্তৎ-শ্রীবিগ্রহকে তত্তৎ-ভগবৎস্বরূপ বলিয়াই মহাত্মাগণ চিন্তা করিয়া থাকেন। "অথ শ্রীমৎপ্রতিমায়াস্তু তদাকাররূপতয়ৈব চিন্তয়ন্তি—আকারৈক্যাৎ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২৮৬॥" অন্যরূপ চিন্তায় নানাবিধ দোষের কথা শুনা যায়। যথা, "শিলাবুদ্ধিঃ কৃতা কিম্বা প্রতিমায়াং হরের্ময়া—(মহারাজ দশরথ মৃগভ্রমে অন্ধমুনির পুত্রকে বাণাঘাতে হত্যা করিয়া পরে নিজের ভ্রম বুঝিতে পারিয়া মৃত সিন্ধুমুনিকে যখন তাহার পিতা অন্ধমুনির নিকটে আনিয়াছিলেন, তখন অন্ধ-মুনি মৃতপুত্রকে লইয়া বিলাপ করিতে করিতে বলিয়াছিলেন) আমি কি কোনও দিন শ্রীহরির প্রতিমাতে শিলাবুদ্ধি করিয়াছিলাম যে, সেই অপরাধে আমার এই পুত্রশোক উপস্থিত হইল?" এই উক্তি হইতে বুঝা যায়, শ্রীমূর্ত্তিকে স্বীয় অভীষ্টদেব হইতে ভিন্ন মনে করিলে ব্যবহারিক অকল্যাণও উপস্থিত হয়।

---

(১) অথ পূজাস্থানানি বিচার্য্যন্তে। তানি চ বিবিধানি। তত্র শালগ্রামশিলাদিকং তত্তদ্ভগবদধিষ্ঠানমিতি চিন্ত্যম্। আকারবৈলক্ষণ্যাৎ। "শালগ্রামশিলা যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ" ইত্যাদ্যুক্তেঃ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২৮৬॥

(২) তত্র চ স্বেষ্টাকারস্যৈব ভগবতোঽধিষ্ঠানং সুষ্ঠু সিদ্ধিকরম্। তস্মিন্নেব অযত্নতঃ তদীয়প্রাকট্যাৎ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২৮৬॥

পূর্ব্বে ৫।৯৫-গ-অনুচ্ছেদে "চলাচলেতি দ্বিবিধা প্রতিষ্ঠা জীবমন্দিরম্॥ শ্রীভা, ১১।২৭।১৩॥"-শ্লোকের আলোচনায় দেখা গিয়াছে, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—"প্রতিষ্ঠা—প্রতিমা, জীবস্য জীবয়িতুঃ পরমাত্মনো মম মন্দিরং মদঙ্গপ্রত্যঙ্গৈরেকাকারতাস্পদমিত্যর্থঃ।" এই বাক্য হইতে জানা যায়, স্বয়ং শ্রীকৃষ্ণই বলিয়াছেন—"আমার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সহিত আমার প্রতিষ্ঠার (প্রতিমার বা শ্রীবিগ্রহের) কোনওরূপ ভেদ নাই।"

শ্রীমূর্ত্তির প্রতিষ্ঠা-ব্যাপারের কথা বিবেচনা করিলেও শ্রীমূর্ত্তির সহিত ভগবানের অভেদের কথা জানা যায়। হয়শীর্ষপঞ্চরাত্রে শ্রীমূর্ত্তি-প্রতিষ্ঠা-প্রসঙ্গে যে প্রমাণ দেখা যায়, তাহাতে আছে—"বিষ্ণো সন্নিহিতো ভব—হে বিষ্ণো! এই শ্রীমূর্ত্তিতে তুমি সন্নিহিত হও"-এইরূপ আহ্বানের পরে যে মন্ত্রটী আছে, তাহা হইতেছে এইরূপ :—

"যচ্চ তে পরমং তত্ত্বং যচ্চ জ্ঞানময়ং বপুঃ।
তৎসর্ব্বমেকতো লীনমস্মিন্ দেহে বিবুধ্যতাম্॥

—হে বিষ্ণো! তোমার যে পরমতত্ত্ব এবং তোমার যে জ্ঞানময় বপু (বিগ্রহ), তৎসমুদায় একতাপ্রাপ্ত এই হইয়া শ্রীমূর্ত্তিতে লীন আছে, ইহা জানিও।"

ইহাদ্বারা বুঝা যায়—প্রতিষ্ঠাক্রিয়ার অনুষ্ঠানের দ্বারা ভগবান্ শ্রীমূর্ত্তিকে সর্ব্বতোভাবে অঙ্গীকার করেন ; তখন শ্রীবিগ্রহে এবং ভগবানে কোনও পার্থক্যই থাকে না।

পরম-উপাসকগণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বররূপেই দেখিয়া থাকেন। ভেদস্ফূর্ত্তি হইলে ভক্তিবিচ্ছেদ হয় বলিয়া সর্ব্বদা অভেদবুদ্ধি পোষণই কর্ত্তব্য। 'পরমোপাসকাশ্চ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরত্বেনৈব তাং পশ্যন্তি। ভেদস্ফূর্ত্তেঃ ভক্তিবিচ্ছেদকত্বাত্তথৈব হ্যুচিতম্॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২৮৬॥"

শ্রীভগবানের উক্তি হইতেও ভগবানে ও তাঁহার শ্রীবিগ্রহে অভেদের কথা জানা যায়।

"বস্ত্রোপবীতাভরণ-পত্র-স্রগ্গন্ধলেপনৈঃ।
অলঙ্কুর্ব্বীত সপ্রেম মদ্ভক্তো মাং যথোচিতম্॥ শ্রীভা, ১১।২৭।৩২॥

—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন) আমার ভক্ত প্রীতির সহিত আমাকে বস্ত্র, উপবীত, আভরণ, পত্র, মালা, গন্ধ ও চন্দনাদি দ্বারা যথোচিতভাবে (আমার যে অঙ্গে যাহা শোভা পায়, সেই অঙ্গে তাহা দিয়া) আমাকে সুশোভিত করিবেন।"

বস্ত্রাভরণাদিদ্বারা সাধক-ভক্ত সাক্ষাদ্ভাবে শ্রীকৃষ্ণকে সাজাইতে পারেন না ; তাঁহার শ্রীমূর্ত্তিকেই সাজাইয়া থাকেন। এ-স্থলে শ্রীকৃষ্ণ শ্রীমূর্ত্তিকে সাজাইবার উপদেশই দিয়াছেন। অথচ, সেই শ্রীমূর্ত্তি বা শ্রীবিগ্রহকেই তিনি 'মাম্—আমাকে" বলিয়াছেন। ইহা দ্বারাই বুঝা যায়—শ্রীকৃষ্ণ এবং ভক্তসেবিত তাঁহার শ্রীবিগ্রহ—এই উভয়কেই শ্রীকৃষ্ণ অভিন্ন বলিয়াছেন। শ্লোকস্থ "সপ্রেম"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে—ভক্ত প্রীতির সহিত শ্রীবিগ্রহকে সজ্জিত করেন। ভক্তের প্রীতির বশীভূত হইয়াই ভক্তবৎসল শ্রীকৃষ্ণ ভক্তসেবিত শ্রীবিগ্রহকে আত্মসাৎ করেন,

শ্রীবিগ্রহ তখন শ্রীকৃষ্ণের সহিত তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত হইয়া যায়েন, তখন শ্রীবিগ্রহে এবং শ্রীকৃষ্ণে কোনও পার্থক্যই থাকে না।

বিষ্ণুধর্ম্মে দেখা যায়, শ্রীমূর্ত্তিকে লক্ষ্য করিয়া অম্বরীষের প্রতি শ্রীবিষ্ণু বলিয়াছেন,

"তস্যাং চিত্তং সমাবেশ্য ত্যজ চান্যান্ ব্যপাশ্রয়ান্।
পূজিতা সৈব তে ভক্ত্যা ধ্যাতা চৈবোপকারিণী॥
গচ্ছং স্তিষ্ঠন্ স্বপন্ ভুঞ্জংস্তামেবাগ্রে চ পৃষ্ঠতঃ।
উপর্য্যধস্তথা পার্শ্বে চিন্তয়ংস্তামথাত্মনঃ॥

—সেই শ্রীমূর্ত্তিতেই চিত্তের সম্যক্ আবেশ রাখিয়া অন্য বিষয়ে আবেশ পরিত্যাগ কর। ভক্তির সহিত পূজা করিলে এবং ধ্যান করিলে সেই শ্রীমূর্ত্তিই তোমার উপকারিণী হইবে। চলিবার সময়ে, কি দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট থাকাকালে, কি স্বপ্নকালে, কি ভোজনকালে—সকল সময়েই সেই শ্রীমূর্ত্তিকে তোমার অগ্রে, পশ্চাতে, উপরে, অধোদেশে, পার্শ্বে, সর্ব্বত্র অবস্থিত বলিয়া চিন্তা করিতে করিতে তুমি তৎস্ফূর্ত্তিময়তা প্রাপ্ত হইবে।"

এই শ্রীবিষ্ণুবাক্যেও শ্রীমূর্ত্তির সহিত ভগবানের অভিন্নতার কথাই জানা গেল। অভিন্ন না হইলে দারুময়ী বা শিলাময়ী শ্রীমূর্ত্তির চিন্তায় কাহারও কোনওরূপ কল্যাণ সাধিত হইতে পারে না।

সাধকের স্থান যাহাই হউক না কেন, যে ভগবৎস্বরূপের নিজস্ব যে ধাম, সেই ভগবৎস্বরূপের শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনায় সেই ধামেরই চিন্তা করা কর্ত্তব্য। [পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৬১(৬) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

৯৬। অর্চ্চনার আবশ্যকত্ব

অর্চ্চনে **অদীক্ষিত ব্যক্তির অধিকার নাই** (৫।৭৫-ক অনুচ্ছেদে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্রষ্টব্য)। দীক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিরই অর্চ্চনে অধিকার আছে।

ক। দীক্ষিতের পক্ষে অর্চ্চনের অত্যাবশ্যকত্ব

শাস্ত্রবাক্য উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন, দীক্ষিত ব্যক্তি নিত্য মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনা না করিলে প্রত্যবায়গ্রস্ত হইয়া থাকেন।

"লব্ধ্বা মন্ত্রন্তু যো নিত্যং নার্চ্চয়েন্মন্ত্রদেবতাম্।
সর্ব্বকর্ম্মাফলং তস্যানিষ্টং যচ্ছতি দেবতা॥ হ, ভ, বি, ৩।৩-ধৃত-আগমপ্রমাণ॥

—(আগমশাস্ত্র বলেন) মন্ত্র লাভ করিয়া যিনি প্রত্যহ মন্ত্রদেবতার অর্চ্চনা না করেন, তাঁহার সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফল হয় এবং মন্ত্রদেবতা তাঁহার অনিষ্ট করেন।"

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৮৩-অনুচ্ছেদে) এ-বিষয়ে আলোচনা করিয়াছেন।

তিনি বলিয়াছেন—"শরণাপত্তি-আদির কোনও এক অঙ্গের সাধনেই পুরুষার্থ সিদ্ধি হইতে পারে বলিয়া যদিও শ্রীভাগবতমতে পঞ্চরাত্রি-আদির বিধান অনুসারে অর্চ্চনমার্গের অত্যাবশ্যকত্ব নাই, তথাপি শ্রীনারদাদির পন্থানুসরণ পূর্ব্বক দীক্ষাবিধানের দ্বারা ভগবানের সহিত সম্বন্ধবিশেষ-সম্পাদনের উদ্দেশ্যে যাঁহারা শ্রীগুরুদেবের নিকটে দীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, দীক্ষান্তে তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চন অবশ্যকর্ত্তব্য। [সম্বন্ধ-স্থাপন-বিষয়ে ৫।৭৫-খ (২) অনুচ্ছেদের শেষভাগে আলোচনার সারমর্ম্ম দ্রষ্টব্য]।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী আরও বলিয়াছেন—"যাঁহারা সম্পত্তিমান্ গৃহস্থ, তাঁহাদের পক্ষে অর্চ্চন-মার্গই মুখ্য।" এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"অয়ং স্বস্ত্যয়নঃ পন্থা দ্বিজাতের্গৃহমেধিনঃ।
যচ্ছ্রদ্ধয়াপ্তবিত্তেন শুক্লেনেজ্যেত পুরুষঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮৪।৩৭॥

—(কুরুক্ষেত্রে মুনিগণ শ্রীবসুদেবের নিকটে বলিয়াছেন) যাঁহারা দ্বিজ (দীক্ষাবিধানেও যাঁহারা দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হইয়াছেন) , এতাদৃশ গৃহস্থদের পক্ষে পবিত্রভাবে উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা নিষ্কাম-ভাবে পরমপুরুষ ভগবানের অর্চ্চনা করাই মঙ্গলময় পন্থা।"

খ। গৃহস্থের পক্ষে অর্চ্চনাঙ্গের মুখ্যত্ব

শ্রীজীবপাদ বলেন—"সম্পত্তিমান্ গৃহস্থ শ্রীভগবানের অর্চ্চন না করিয়া নিষ্কিঞ্চনদের ন্যায় কেবল স্মরণাদিনিষ্ঠ হইলে, তাঁহার বিত্তশাঠ্যই উপস্থিত হয়। আবার, নিজে অর্চ্চনা না করিয়া তিনি যদি অপরের দ্বারা অর্চ্চনা করান, তাহা হইলেও তাঁহার ব্যবহারনিষ্ঠতা, অথবা আলস্য প্রতিপন্ন হয় (অর্থাৎ তিনি যে ব্যবহারিক কার্য্যে আসক্ত, অথবা অত্যন্ত অলস, তাহাই বুঝা যায়)। অপরের দ্বারা অর্চ্চনায়, অর্চ্চনার প্রতি যে তাঁহার শ্রদ্ধা নাই, তাহাই বুঝা যায়। সুতরাং অন্যদ্বারা অর্চ্চন-কার্য্য-নির্ব্বাহ প্রীতি-হীনতারই পরিচায়ক।"

এই প্রসঙ্গে ভক্তিরসামৃতসিন্ধুও বলিয়াছেন

"ধনশিষ্যাদিভির্দ্বারৈর্যা ভক্তিরুপপাদ্যতে।
বিদূরত্বাদুত্তমতাহান্যা তস্যাশ্চ নাঙ্গতা॥ ১।২।১২৮॥

—ধনের দ্বারা ও শিষ্যাদিদ্বারা যে ভক্তি (সাধনভক্তি) সাধিত হয়, তাহা উত্তমা ভক্তির অঙ্গ বলিয়া পরিগণিত হইতে পারে না ; কেননা, এ-স্থলে শৈথিল্যদ্বারা উত্তমতার হানি হয়।"

তাৎপর্য্য এই। উত্তমা ভক্তির লক্ষণে "অন্যাভিলাষিতাশূন্যং জ্ঞানকর্ম্মাদ্যনাবৃতম্"-ইত্যাদি বলা হইয়াছে। এ-স্থলে "আদি"-শব্দে "শিথিলতা"ও গ্রহণীয়। যিনি ধনের সাহায্যে পূজক নিযুক্ত করিয়া তাহাদ্বারা অর্চ্চনার কার্য্য করান, কিম্বা নিজের শিষ্যাদি—শিষ্য, পুত্র, বা কোনও আপন লোক—দ্বারা অর্চ্চনার কার্য্য করাইয়া লয়েন, অথচ নিজে করেন না, অর্চ্চনবিষয়ে তাঁহার যে শৈথিল্য আছে—সুতরাং শ্রদ্ধার অভাবও আছে—তাহা সহজেই বুঝা যায়। অর্চ্চন হইতেছে নিজের একটী ভজনাঙ্গ ; অত্যন্ত প্রীতি ও আগ্রহের সহিতই অর্চ্চন করা কর্ত্তব্য। প্রীতি ও আগ্রহের অভাব থাকিলে,

শৈথিল্য থাকিলে, তাহা উত্তম ভজনের অঙ্গরূপে পরিগণিত হইতে পারেনা। এতাদৃশ অর্চ্চন তাঁহার নিজের কৃত অর্চ্চনও হইতে পারে না।

যাহা হউক, শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে বলিয়াছেন—অন্যদ্বারা অর্চ্চন করাইলে শাস্ত্রের উপদেশও পালিত হয় না।

শাস্ত্র বলেন—

"স বেদ ধাতুঃ পদবীং পরস্য দুরন্তবীর্য্যস্য রথাঙ্গপাণেঃ।
যোঽমায়য়া সন্ততয়াঽনুবৃত্ত্যা ভজেত তৎপাদসরোজগন্ধম্॥ শ্রীভা, ১।৩।৩৮॥

—যিনি কপটতা পবিহারপূর্ব্বক ভগবদ্‌বিষয়ক আনুকূল্যের সহিত নিরন্তর ভগবানের পাদপদ্মের সৌরভ সেবন করেন, তিনিই দুরন্তবীর্য্য চক্রেপাণি জগদ্বিধাতা ভগবানের মাহাত্ম্য অবগত হইতে পারেন।"

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী আরও বলিয়াছেন—"পরিচর্য্যামার্গ যেমন দ্রব্যসাধ্য, অর্চ্চনমার্গও তেমনি দ্রব্যসাধ্য; এই বিষয়ে পরিচর্য্যামার্গ হইতে অর্চ্চনমার্গের কোনও বিশেষত্ব না থাকিলেও গৃহস্থ-দের পক্ষে অর্চ্চনমার্গেরই প্রাধান্য; কেননা, অর্চ্চনমার্গে অত্যন্ত বিধির অপেক্ষা আছে বলিয়া অর্চ্চন-মার্গাবলম্বী গৃহস্থদিগকেও বিধির অধীনে থাকিতে হয়, বিধির পালন করিতে হয়; তাহাতে তাঁহাদের পরম মঙ্গল সাধিত হইতে পারে।" তাৎপর্য্য এই যে, দেহ-গেহাদির সহিত সম্বন্ধবিশিষ্ট বলিয়া শাস্ত্রবিধির অধীনে না থাকিলে গৃহস্থগণ দেহ-গেহাদিবিষয়ক কার্য্যে লিপ্ত হইয়া উচ্ছৃঙ্খল হইয়া পড়িতে পারেন; কিন্তু অর্চ্চনমার্গের অনুরোধে শাস্ত্রবিহিত বিধির অনুশাসনে থাকিলে উচ্ছৃঙ্খলতার স্রোতে ভাসিয়া যাওয়ার সম্ভাবনা তাঁহাদের অনেক কমিয়া যায়।

স্কন্দপুরাণ হইতে জানা যায়, শ্রীপ্রহ্লাদ বলিয়াছেন—

"কেশবার্চ্চা গৃহে যস্য ন তিষ্ঠতি মহীপতে।
তস্যান্নং নৈব ভোক্তব্যমভক্ষ্যেণ সমং স্মৃতম্॥

—যাঁহার গৃহে কেশবের বিগ্রহ নাই, তাঁহার অন্ন কখনও ভোক্তব্য নহে; সেই অন্ন অভক্ষ্যের তুল্য।"

দীক্ষিত ব্যক্তি যদি অর্চ্চন না করেন, তাহা হইলে তাঁহার নরকপাতের কথাও শাস্ত্র হইতে জানা যায়।

"এককালং দ্বিকালং বা ত্রিকালং পূজয়েদ্ধরিম্।
অপূজ্য ভোজনং কুর্ব্বন্নরকাণি ব্রজেন্নরঃ॥ বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর॥

—এককাল, দ্বিকাল, বা ত্রিকাল শ্রীহরির পূজা করিবে। পূজা না করিয়া ভোজন করিলে লোককে বহু নরকে যাইতে হয়।"

এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল, দীক্ষিতের পক্ষে অর্চ্চন অত্যন্ত আবশ্যক।

গ। অর্চ্চনে অশক্ত ও অযোগ্য ব্যক্তির জন্য ব্যবস্থা

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, দীক্ষিত ব্যক্তিমাত্রের পক্ষেই অর্চ্চন অবশ্যকর্ত্তব্য; কিন্তু অত্যন্ত দারিদ্র্যবশতঃ, বা অঙ্গবৈকল্যাদিবশতঃ, কিম্বা অন্য কোনও কারণে যিনি অর্চ্চনবিষয়ে অসমর্থ হইয়া পড়েন, অথবা দৈহিক কোনও কারণবশতঃ যিনি অযোগ্য হইয়া পড়েন (যেমন, রজস্বলা নারী), তিনি কি করিবেন ? শাস্ত্রে তাঁহার জন্যও ব্যবস্থা দৃষ্ট হয়।

ভক্তিসন্দর্ভের ২৮৩ অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন "অশক্তমযোগ্যং প্রতি চাগ্নেয়ে—

পূজিতং পূজ্যমানং বা যঃ পশ্যেদ্‌ভক্তিতো হরিম্।
শ্রদ্ধয়া মোদয়েদ্ যস্তু সোঽপি যোগফলং লভেৎ॥
যোগোঽত্র পঞ্চরাত্রাদ্যুক্তং ক্রিয়াযোগঃ॥

—অগ্নিপুরাণ বলেন, যিনি অর্চ্চনে অশক্ত বা অযোগ্য, তিনি যদি ভক্তিযুক্ত হইয়া পূজিত বা পূজ্যমান (পূজা হইতেছে, এমন সময়ে) শ্রীহরির দর্শন করেন ও শ্রদ্ধার সহিত পূজাদির অনুমোদন করেন, তাহা হইলে তিনিও যোগফল (অর্থাৎ পঞ্চরাত্রাদিশাস্ত্র-কথিত পূজার ফল) লাভ করিয়া থাকেন।"

যাঁহার পক্ষে পূজাদর্শনের সুযোগও না থাকে, শ্রীজীবপাদ তাঁহার জন্য মানসপূজার বিধান দিয়াছেন।

"ক্বচিদত্র মানসপূজা চ বিহিতাস্তি। তথা চ পাদ্মোত্তরখণ্ডে—'সাধারণং হি সর্ব্বেষাং মানসেজ্যা নৃণাং প্রিয়ে' ইতি॥—কোনও কোনও স্থলে মানস-পূজারও বিধান আছে। যথা পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে আছে—'হে প্রিয়ে! সকলের পক্ষে মানস পূজাই সাধারণ। (অর্থাৎ শক্ত, অশক্ত, যোগ্য, অযোগ্য, সকলের পক্ষেই মানস-পূজা কর্ত্তব্য। শক্ত এবং যোগ্যব্যক্তি বহিরর্চ্চনার সঙ্গে মানসিক অর্চ্চনাও করিবেন; অশক্ত এবং অযোগ্যব্যক্তি কেবল মানস-পূজাই করিবেন)।"

বাহ্য অর্চ্চনায় যে ভাবে যে সকল উপচারে পূজা করা হয়, মনে মনে সে-ভাবে এবং সে-সমস্ত (মনঃপূত) উপচারের দ্বারা পূজাই হইতেছে মানস-পূজা। (পূর্ব্ববর্ত্তী-৫।৫৫-অনুচ্ছেদে অর্চ্চন-প্রসঙ্গে মানস-পূজার কথা যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহা এই প্রসঙ্গে দ্রষ্টব্য)।

অশক্ত ব্যক্তির জন্য শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ব্যবস্থা নিম্নে প্রদর্শিত হইতেছে।

"অথ শ্রীমন্নামাষ্টকপূজা।

ততোঽষ্টনামভিঃ কৃষ্ণং পুষ্পাঞ্জলিভিরর্চ্চয়েৎ। কুর্য্যাত্তৈরেব বা পূজামশক্তোঽখিলদৈঃ প্রভোঃ॥
শ্রীকৃষ্ণো বাসুদেবশ্চ তথা নারায়ণঃ স্মৃতঃ। দেবকীনন্দনশ্চৈব যদুশ্রেষ্ঠস্তথৈব চ॥
বার্ষ্ণেয়শ্চাসুরাক্রান্তভারহারী তথা পরঃ। ধর্ম্মসংস্থাপকশ্চেতি চতুর্থ্যন্তৈ র্নমোযুতৈঃ॥

—৭।১২৯-৩০॥

—(পূজাবিধি-বর্ণনের পরে বলা হইয়াছে) তৎপরে নামাষ্টকরূপ মন্ত্রদ্বারা শ্রীহরিকে কুসুমাঞ্জলি অর্পণ পূর্ব্বক পূজা করিবে। পূর্ব্বকথিত বিধানে অর্চ্চনা করিতে অক্ষম হইলে অষ্টনামেই পূজা করিবে, তাহা হইলে তদীয় নিখিল অর্চ্চনার ফল সিদ্ধ হইবে। উক্ত অষ্ট নাম যথা—শ্রীকৃষ্ণ, বাসুদেব, নারায়ণ, দেবকীনন্দন যদুশ্রেষ্ঠ, বার্ষ্ণেয়, অসুরাক্রান্তভারহারী ও ধর্ম্মসংস্থাপক। চতুর্থী বিভক্ত্যন্ত নমঃ-শব্দান্বিত নাম দ্বারা (অর্থাৎ 'শ্রীকৃষ্ণায় নমঃ'-ইত্যাদি প্রকারে) পূজা করিবে।”

টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—“কেহ কেহ মনে করেন, প্রত্যেক নামেরই পুষ্পাঞ্জলিদ্বারা পূজা করিবে; এইরূপে আট নামে আটটী পুষ্পাঞ্জলি হইবে। আবার কেহ কেহ বলেন, সমস্ত নাম একসঙ্গে বলিয়া তিনবার পুষ্পাঞ্জলি দিবে। এ-স্থলে সম্প্রদায় অনুসারেই কাজ করিতে হইবে।” তিনি আরও লিখিয়াছেন—“পূর্ব্বলিখিত বিধান অনুসারে পূজা করিতে অত্যন্ত অসমর্থ হইলে নামাষ্টকদ্বারা পুষ্পাঞ্জলি প্রদান পূর্ব্বক প্রভু শ্রীকৃষ্ণের পূজা করিবে। অথবা, উল্লিখিত অষ্টনামের কীর্ত্তনের দ্বারাই পূজা করিবে। 'যদ্বা তৈরষ্টনামভিঃ তৎকীর্ত্তনৈরেবেত্যর্থঃ।' তাহাতেই অশেষ পূজাফল সংসিদ্ধ হইবে।”

৯৭। ভক্তিমার্গে অর্চ্চনার বিধি

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিসন্দর্ভে (২৮২-অনুচ্ছেদে) লিখিয়াছেন, “অস্মিন্নর্চ্চনমার্গেঽবশ্যং বিধিরপেক্ষণীয়স্ততঃ পূর্ব্বং দীক্ষা কর্ত্তব্যা। অথ শাস্ত্রীয়ং বিধানঞ্চ শিক্ষণীয়ম্॥—এই অর্চ্চনমার্গে বিধি অবশ্যই অপেক্ষণীয়; অতএব অর্চ্চনারম্ভের পূর্ব্বেই দীক্ষা গ্রহণ কর্ত্তব্য। (কেননা, শাস্ত্রানুসারে অদীক্ষিতের অর্চ্চনে অধিকার নাই)। তাহার পরে, শাস্ত্রীয় বিধানও শিক্ষা করিতে হইবে (৫।৭৫-ক-অনুচ্ছেদে শাস্ত্রপ্রমাণ দ্রষ্টব্য)”।

ক। বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সম্মত বিধিই অনুসরণীয়

বহুবিধ উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য লোকে অর্চ্চনা করিয়া থাকে। উদ্দেশ্য-ভেদে অর্চ্চনার বিধানও ভিন্ন ভিন্ন হইয়া থাকে। ভক্তিমার্গের সাধকের একমাত্র উদ্দেশ্য হইতেছে ভক্তি। এজন্য শ্রীপাদ জীব গোস্বামী বলিয়াছেন—“বিধৌ তু বৈষ্ণব-সম্প্রদায়ানুসার এব প্রমাণম্॥ —ভক্তিমার্গের সাধকের পক্ষে বৈষ্ণব-সম্প্রদায়সম্মত বিধিরই অনুসরণ কর্ত্তব্য।” এই উক্তির সমর্থনে তিনি নিম্নলিখিত শাস্ত্রবাক্যগুলি উদ্ধৃত করিয়াছেন (ভক্তিসন্দর্ভ ॥২৮৩॥)।

অর্চ্চয়ন্তি সদা বিষ্ণুং মনোবাক্‌কায়কর্ম্মভিঃ।
তেষাং হি বচনং গ্রাহ্যং তে হি বিষ্ণুসমা মতাঃ॥ বিষ্ণুরহস্য॥

—যাঁহারা কায়মানোবাক্য এবং কর্ম্মদ্বারা সর্ব্বদা বিষ্ণুর অর্চ্চনা করেন (অর্থাৎ যাঁহারা অর্চ্চননিষ্ঠ), তাঁহাদের বাক্যই গ্রহণীয়; তাঁহারা বিষ্ণুতুল্য (অর্থাৎ বিষ্ণুবৎ প্রামাণ্য)।”

"সংপৃষ্ট্বা বৈষ্ণবান্ বিপ্রান্ বিষ্ণুশাস্ত্রবিশারদান্।
চীর্ণব্রতান্ সদাচারান্ তদুক্তং যত্নতশ্চরেৎ ॥ কূর্ম্মপুরাণ ॥

—বৈষ্ণব-শাস্ত্র-বিশারদ, সদাচারসম্পন্ন এবং বৈষ্ণব-ব্রতের আচরণকারী বৈষ্ণব ব্রাহ্মণ-সকলকে (বিধির কথা) জিজ্ঞাসা করিয়া তাঁহারা যাহা বলেন, যত্নপূর্ব্বক তাহারই অনুসরণ করিবে।"

"যেষাং গুরৌ চ জপ্যে চ বিষ্ণৌ চ পরমাত্মনি।
নাস্তি ভক্তিঃ সদা তেষাং বচনং পরিবর্জ্জয়েৎ ॥ বৈষ্ণবতন্ত্র ॥

"গুরুতে, জপ্য মন্ত্রে এবং পরমাত্মা বিষ্ণুতে যাঁহাদের ভক্তি নাই, তাঁহাদের বাক্য সর্ব্বদা বর্জ্জন করিবে।"

খ। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের অভিপ্রায়

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের পঞ্চমবিলাস হইতে অষ্টম বিলাস পর্য্যন্ত চারিটী বিলাসে (অধ্যায়ে) ক্রমদীপিকাদির প্রমাণ অনুসারে বিস্তৃতভাবে পূজার বিধি বর্ণিত হইয়াছে। অষ্টমবিলাসের উপসংহারে ভক্তিমার্গের পূজাবিধির নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছে।

"অয়ং পূজাবিধির্মন্ত্রসিদ্ধ্যর্থস্য জপস্য হি। অঙ্গং ভক্তে স্তুতন্নিষ্ঠৈর্ন্যাসাদীনন্তরেষ্যতে ॥ ৮।২২৫॥

—এপর্য্যন্ত (অর্থাৎ পঞ্চম বিলাস হইতে আরম্ভ করিয়া অষ্টমবিলাস পর্য্যন্ত) যে সমস্ত পূজা-বিধি কথিত হইয়াছে, তৎসমস্ত মন্ত্রসিদ্ধির নিমিত্ত অনুসরণীয়; তৎসমস্ত হইতেছে জপের অঙ্গ। (নব বিধা) ভক্তির অঙ্গ যে পূজা, ভক্তিনিষ্ঠদের পক্ষে ন্যাসাদিব্যতীতই তাহা সিদ্ধ হইতে পারে।"

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পূজাবিধি-প্রকরণে, অঙ্গন্যাস, করন্যাসাদি বিবিধ ন্যাসের কথা, বিবিধ মুদ্রার কথা, আবাহন-বিসর্জ্জনাদির কথাও লিখিত হইয়াছে। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকে বলা হইয়াছে—ভগবদ্ভক্তিপরায়ণ ব্যক্তিগণ সাক্ষাৎ ভগবদ্বুদ্ধিতেই শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনা করিয়া থাকেন। তাঁহাদের পক্ষে উল্লিখিত ন্যাসাদির, বা কতিপয় মুদ্রাদির, বা আবাহনাদির প্রয়োজন নাই। যাঁহারা ভক্তিকামী নহেন, পরন্ত অন্য কামনা সিদ্ধির জন্য যাঁহারা ভগবানের অর্চ্চনা করেন, মন্ত্রসিদ্ধিই তাঁহাদের প্রয়োজন; কেননা, মন্ত্রসিদ্ধির দ্বারাই তাঁহারা তাঁহাদের কাম্য বস্তু পাইতে পারেন। জপের দ্বারাই মন্ত্রসিদ্ধি হইতে পারে। তাঁহাদের পূজাবিধি হইতেছে জপের অঙ্গ। মন্ত্রের সহিত মন্ত্র-দেবতা ভগবানের অভেদ-প্রতিপাদনের জন্যই ন্যাসাদির প্রয়োজন। ভক্ত যখন অন্য কামনা পোষণ করেন না, তখন তাঁহার পক্ষে ন্যাসাদির প্রয়োজন নাই। উপরে উদ্ধৃত শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী যাহা লিখিয়াছেন, ইহাই তাহার সার মর্ম্ম। (১)

---

(১) টীকা। এবং ক্রমদীপিকাদ্যুক্ত্যনুসারেণ প্রায়ঃ কামপরাণাং পুজাবিধিং লিখিত্বা ইদানীং শ্রীভগবদ্-ভক্তিপরাণাং পুজাবিধিং তত্রৈব বিভজ্য দর্শয়তি অয়মিতি। পঞ্চমাদি-বিলাসচতুষ্টয়েন লিখিতোঽয়ং পুজাবিধিঃ শ্রীভগবদর্চ্চনপ্রকারঃ জপস্য অঙ্গং ক্রমদীপিকাদ্যভিপ্রেতস্য তত্তৎকামেন জপস্যৈব তত্র প্রাধান্যাৎ। কথম্ভূতস্য? —মন্ত্রস্য সিদ্ধিঃ সাধনং সৈব অর্থঃ প্রয়োজনং যস্য তস্য। অতস্তৎফলার্থং জপেন মন্ত্রসাধনস্যৈব বিধেয়ত্বাৎ মন্ত্রাদীনাং

দেবালয়ের পূজায় এবং ভক্তগৃহের পূজায়ও বিধির কিছু পার্থক্য আছে; ইহার পরে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস তাহাও বলিয়া গিয়াছেন।

"তত্র দেবালয়ে পূজা নিত্যত্বেন মহাপ্রভোঃ। কাম্যত্বেনাপি গেহে তু প্রায়ো নিত্যতয়া মতা।
সেবাদিনিয়মো দেবালয়ে দেবস্য চেষ্যতে। প্রায়ঃ স্বগৃহে স্বচ্ছন্দসেবা স্বব্রতরক্ষয়া॥

—৮।২২৬—২৭॥

—ভক্ত্যঙ্গ-পূজাবিধিতে দেবালয়ে পূজা উপাসকের পক্ষে নিত্যও হয়, কাম্যও হয়। কিন্তু ভক্তের নিজগৃহে যে পূজা হয়, তাহা নিত্য। দেবমন্দিরে যে পূজা, তাহাতে সেবাদির নিয়ম অবশ্য-রক্ষণীয়; কিন্তু ভক্তের নিজগৃহে যে পূজা হয়, তাহাতে স্বচ্ছন্দভাবে (অর্থাৎ নিজের ইচ্ছা এবং সামর্থ্যানুসারে) পূজা করা যায়, কেবল স্বীয় ব্রতভঙ্গ না হইলেই হইল।"

কোনও কোনও অবস্থাপন্ন গৃহস্থ দেবালয় প্রতিষ্ঠা করেন, অথবা পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠিত দেবালয়ের সেবা চালাইবার বন্দোবস্ত করিয়া থাকেন। এইরূপ সেবা কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেও হইতে পারে, ভগবৎ-প্রীতির উদ্দেশ্যেও হইতে পারে; অথবা কোনওরূপ ফললাভের আকাঙ্ক্ষাতেও হইতে পারে। এইরূপ দেবালয়ের সেবা-পূজা প্রায়শঃ নিয়োজিত লোকের দ্বারাই নির্ব্বাহিত হইয়া থাকে। নিয়োজিত লোকদের মধ্যে কেহ কেহ কেবল কর্ত্তব্যবুদ্ধিতেই পূজাদি করিয়া থাকেন, তাঁহাদের সকলের ভগবানে প্রীতিবুদ্ধি না থাকিতেও পারে। এজন্য দেবালয়ে পূজাদির নিয়ম সর্ব্বতোভাবে পালন করা আবশ্যক; নচেৎ সেবাই লোপ পাইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। প্রত্যহ একই সময়ে, একই নিয়মে পূজা করা কর্ত্তব্য। ভোগের সময় এবং ভোগ-বস্তুর পরিমাণাদিও সর্ব্বদা একই রূপ হওয়া আবশ্যক। অবশ্য বিশেষ বিশেষ উপলক্ষ্যে ভোগের বস্তুর পরিমাণের আধিক্য হইতে পারে, কিন্তু কম যেন না হয়। যে-স্থানে, যে সময়ে, যতবার নমস্কারাদি করার নিয়ম, বা যেরূপ স্তব-স্তুতি-আদির নিয়ম করা হয়, তাহাও অবিচলিত ভাবে পালন করা কর্ত্তব্য। সেবাপরাধাদি হইতেও সর্ব্বদা এবং সর্ব্বথা বিরত থাকা প্রয়োজন।

কিন্তু ভক্তের গৃহে যে সেবা, তাহা ভক্ত স্বচ্ছন্দ ভাবে, নিজের ইচ্ছানুসারে নির্ব্বাহ করিতে পারেন। তাঁহার পক্ষে দেশ-কাল-দ্রব্যাদি-সম্বন্ধে নিয়ম অবশ্য-পালনীয় নহে; কেননা, তাঁহার পক্ষে তাহা সম্ভবপর না হইতেও পারে। সম্ভবপর হইলে অবশ্যই করিবেন; নচেৎ, বিত্তশাঠ্যাদি বা শৈথিল্য আসিয়া পড়িতে পারে। যখন, যেস্থানে, যে দ্রব্যদ্বারা তিনি স্বীয় ইষ্টদেবের সেবা করিতে সমর্থ, তখন সেস্থানে, সেই দ্রব্যদ্বারাই তিনি তাহা করিবেন। "নিজগৃহে তু স্বচ্ছন্দেন নিজেচ্ছয়া বেষ্যতে। যদা যত্র যেন দ্রব্যেণ যথা সেবাকর্ত্তুং শক্যতে, তদা তত্র তেন তথা কার্য্যা, ন তু কাল-দেশ-

---

শ্রীভগবতা সহাভেদাপাদনার্থং তত্তন্ন্যাসাদিকমিতি ভাবঃ। ভক্তের্নববিধায়াস্ত অঙ্গং যঃ পূজাবিধিঃ, স চ ন্যাসাদীন্ প্রকারান্ অন্তরা বিনৈব ভক্তিনিষ্ঠৈরিষ্যতে। আদিশব্দেন আবাহনাদি কতিপয়মুদ্রাদি চ। ভক্তিপরৈঃ সাক্ষাদ্ভগবদ্বুদ্ধ্যা শ্রীমূর্ত্ত্যাদিপূজনে ন্যাসাত্মযোগাদিত্যেষা দিক্॥

দ্রব্যাদি-নিয়মেনেত্যর্থঃ ॥ টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী ॥" হরিবাসরাদি ব্রতোপবাসদিনে তিনি অন্যান্য দিনের ন্যায় অন্নভোগ না দিতেও পারেন, নিজে যাহা আহার করিবেন, তাহা মাত্র ভোগ দিতে পারেন। "অতো ব্রতদিনে কেচিদন্নঞ্চ ন সমর্পয়ন্তি। এবং যদা যান্যেবাত্মোপভোগযোগ্যানি, তদা তান্যেব ভগবতি সমর্প্যাণীতি ভাবঃ ॥ শ্রীপাদ সনাতন ॥" শ্রীপাদ সনাতনের এই উক্তি হইতে জানা গেল– কেবল ব্রতদিনে নহে, যে কোনও দিনেই সাধক ভক্ত স্বীয় উপভোগযোগ্য বস্তুই ভগবান্‌কে অর্পণ করিতে পারেন। ইহার হেতু হইতেছে এই যে—ভক্ত প্রীতির সহিতই নিজগৃহে স্বীয় ইষ্টদেবের সেবা করিয়া থাকেন ; ভক্তবৎসল ভগবান্ কেবল ভক্তের প্রীতিরই অপেক্ষা রাখেন, দ্রব্যাদির অপেক্ষা রাখেন না। ভক্তের সেবা হইতেছে লৌকিক বন্ধুবৎ সেবা। "এতচ্চ লৌকিকেন সেবা-শব্দেনাপি লৌকিকবন্ধুবৎ শ্রীভগবতি সূচিতেন ভাববিশেষেণানুমতমেব ॥ শ্রীপাদ সনাতন ॥"

টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন –"যদিও নিজগৃহের সেবাতেও সেবাপরাধাদি বর্জন করা কর্ত্তব্য, তথাপি– শ্রীবিগ্রহের সম্মুখে উচ্চ কথা বলা, পরস্পর কথা বলা প্রভৃতি হইতে বিরত থাকা প্রায়শঃ গৃহস্থের গৃহে সম্ভব নয়। 'যদ্যপি গৃহেঽপি পূজাপরাধবর্জনাদিকমপেক্ষ্যতে, তথাপি উচ্চৈর্ভাষা মিথো জল্প ইত্যাদ্যপরাধানাং প্রায়ো গৃহে বর্জনস্যাশক্যত্বাৎ তত্তন্নিয়মো ন সম্ভবেদিতে জ্ঞেয়ম্।' এক কাল, দ্বিকাল, ত্রিকাল, পূজার বিধান থাকিলেও ভক্ত নিজ গৃহে এক কালের পূজাও করিতে পারেন। 'ইত্থং চৈককালং দ্বিকালং বেত্যাদিবচনাৎ এককালমপি পূজা ॥' শ্রীপাদ সনাতন ॥"

ভোগসম্বন্ধেও দেবালয়ের নিয়ম রক্ষা করা গৃহস্থের পক্ষে সম্ভব নয়। কেননা, গৃহস্থের নিজ পরিবারের লোক আছে, ভৃত্য আছে, অতিথি-অভ্যাগত আছে ; এজন্য ভোগে প্রদেয় বস্তুর পরিমাণ কখনও বেশী, কখনও বা কম হইতে পারে। গৃহী ভক্তের পক্ষে তাহা মার্জনীয়। "গৃহস্থানামবশ্য-কৃত্য-কুটুম্বভরণাদি-ব্যাপার-পরতয়া নিজভৃত্যাতিথ্যাদ্যপেক্ষয়া চ তত্তন্নিয়মাসিদ্ধেঃ। অতো নিজপরিবার-বৈষ্ণবাভ্যাগতাদ্যপেক্ষয়া ভগবদর্প্যভোগস্য কদাচিদ্ বহুলতাল্পতা চ স্যাৎ ॥ শ্রীপাদ সনাতন ॥"

তবে সর্বাবস্থাতেই সাধককে স্বীয় ব্রতের রক্ষা করিতে হইবে। ভক্তির পুষ্টিসাধক যে সকল নিয়ম ভক্তসাধকের অবশ্য-পালনীয় বলিয়া শাস্ত্রে বিহিত হইয়াছে, তৎসমুদয়ের পালন করিতে হইবে ; অন্যথা বৈষ্ণবত্ব রক্ষিত হইবেনা, ভক্তিপথে অগ্রগতিও বিঘ্নিত হইবে।

গ। নিজ প্রিয়োপহরণ

উদ্ধবের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন,

"যদ্ যদিষ্টতমং লোকে যচ্চাতিপ্রিয়মাত্মনঃ।
তত্তন্নিবেদয়েন্মহ্যং তদানন্ত্যায় কল্পতে ॥ শ্রীভা, ১১।১১।৪১॥

—যে যে দ্রব্য লোকসমাজে অত্যুৎকৃষ্ট বলিয়া বিবেচিত এবং যে সকল দ্রব্য সাধকের এবং আমারও অতি প্রিয়, সে সকল দ্রব্য আমাকে নিবেদন করিবে ; তাহাতে অনন্ত ফল লাভ হইয়া থাকে।"

টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"যদ্ যদিতি চ-কারাস্মমপ্রিয়ঞ্চ- শ্লোকে 'যচ্চাতিপ্রিয়-মাত্মনঃ—যৎ চ অতিপ্রিয়ম্ আত্মনঃ'-এই বাক্যে যে 'চ'-শব্দ আছে, তাহার তাৎপর্য্য এই যে-যাহা আমারও (ভগবানেরও) প্রিয়, তাহাই আমাকে নিবেদন করিবে।" অর্থাৎ যাহা লোক-সমাজে অত্যন্ত প্রিয়, তাহার মধ্যে আবার সাধকের নিকটেও যাহা অত্যন্ত প্রিয়, তাদৃশ বস্তু মাত্রই যে ভগবান্‌কে নিবেদন করিতে হইবে, তাহা নহে, তাদৃশ প্রিয় বস্তুর মধ্যে যাহা ভগবানেরও প্রিয়, কেবলমাত্র তাহাই নিবেদন করিবে। শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার টীকায় ইহা বিশেষরূপে পরিস্ফুট করিয়া গিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন—"লোকে শাস্ত্রে চ যদিষ্টতমং তন্মহ্যং নিবেদয়েৎ। তেন দর্ভমঞ্জর্য্যাদীনি শাস্ত্র-বিহিতান্যপি লোকে ইষ্টতমত্বাভাবাৎ, তথা মদ্যাদীনি সঙ্কর্ষণ-প্রিয়াণ্যপি শাস্ত্রে ইষ্টতমত্বাভাবাৎ ন নিবেদয়েদিতি ভাবঃ। তত্রাপি আত্মনঃ স্বস্য অতিপ্রিয়ং তত্তু বিশেষতো নিবেদনীয়মিত্যর্থঃ॥—লোকসমাজে যাহা অভীষ্টতম বলিয়া বিবেচিত এবং শাস্ত্রেও যাহা আমার (ভগবানের) অভীষ্টতম বলিয়া কীর্ত্তিত, তাহাই আমাকে নিবেদন করিবে (তাৎপর্য্য এই যে, লোকের মধ্যে অতিপ্রিয় বলিয়া বিবেচিত হইলেও যদি শাস্ত্রবিহিত না হয়, তাহা নিবেদন করিবেনা ; এবং শাস্ত্র-বিহিত হইলেও যাহা লোকে প্রিয় বলিয়া মনে করেনা, তাহাও নিবেদন করিবেনা)। দর্ভ (দুর্ব্বা)-মঞ্জরী-আদি শাস্ত্রবিহিত হইলেও লোকসমাজে ইষ্টতম বলিয়া বিবেচিত হয়না বলিয়া তাহা নিবেদন করিবেনা এবং মদ্যাদি শ্রীসঙ্কর্ষণের প্রিয় হইলেও শাস্ত্রে প্রিয় বস্তু বলিয়া কথিত হয় নাই বলিয়া মদ্যাদিও নিবেদন করিবেনা। লোকে এবং শাস্ত্রে যে সমস্ত বস্তু অতিপ্রিয় বলিয়া কথিত হয়, সে-সমস্ত বস্তুর মধ্যেও আবার যাহা সাধকের নিজের অত্যন্ত প্রিয়, বিশেষ ভাবে তাহাই নিবেদন করা সঙ্গত।"

বৃহদারণ্যক-শ্রুতি প্রিয়রূপে পরমাত্মা ভগবানের উপাসনার উপদেশ দিয়াছেন ; এজন্য শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও লৌকিক বন্ধুরূপে ভগবানের সেবার কথা বলিয়াছেন। লৌকিক জগতে দেখা যায়, লোকসমাজে এবং নিজের নিকটেও যাহা অত্যন্ত প্রিয়, প্রিয়ব্যক্তিকেও তাহাই দেওয়া হয়। কিন্তু তাহা যদি সেই প্রিয় ব্যক্তির প্রিয় না হয়, তাহা হইলে তাঁহাকে তাহা দেওয়া হয়না। লোকসমাজে এবং নিজের নিকটেও যে সমস্ত বস্তু অতি প্রিয় বলিয়া বিবেচিত হয়, সে-সমস্ত বস্তুর মধ্যে যাহা-যাহা প্রিয় ব্যক্তিরও প্রিয়, তাহা-তাহাই প্রিয়ব্যক্তিকে দেওয়া হয়। ভগবানে নিবেদিত বস্তুসম্বন্ধেও তদ্রূপ। যাহা যাহা শাস্ত্রবিহিত, তাহাদের মধ্যে যে সমস্ত বস্তু লোকের এবং সাধকের নিজেরও প্রিয়, সে-সমস্ত বস্তুই ভগবান্‌কে নিবেদন করিবে। তাহাতেই ভগবানের প্রতি সাধকের প্রীতি বুঝা যায়।

নৈবেদ্যে নিষিদ্ধ বস্তুর বিবরণ শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে দ্রষ্টব্য। এ-স্থলে মোটামুটী ভাবে দু'য়েকটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইতেছে।

"নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষ্বপ্যজামহিষীক্ষীরং পঞ্চনখা মৎস্যাশ্চ।

—হ, ভ, বি, ৮।৬২-ধৃত হারীতস্মৃতিবাক্য॥

—হারীতস্মৃতিতে লিখিত আছে যে, অভক্ষ্য বস্তু নৈবেদ্যে অর্পণ করিবেনা। ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যেও অজাদুগ্ধ, মহিষীদুগ্ধ, পঞ্চনখযুক্ত জীব এবং মৎস্য অর্পণ করিবেনা।"

কুর্ম্মপুরাণের মতে পলাণ্ডু (পেঁয়াজ) এবং লশুন নিষিদ্ধ, (হ, ভ, বি, ৮।৬৪); যামল-মতে মদ্য-মাংস নিষিদ্ধ (হ, ভ, বি, ৮।৬৫)।

ভগবান্‌কে যাহা কিছু নিবেদন করিবে, তাহা প্রীতির সহিতই নিবেদন করিতে হইবে; অন্যথা তাহা তাঁহার সুখকর হয় না।

"নানোপচারকৃতপূজনমার্ত্তবন্ধোঃ প্রেম্ণৈব ভক্ত হৃদয়ং সুখবিদ্রুতং স্যাৎ।
যাবৎ ক্ষুদস্তি জঠরে জরঠা পিপাসা তাবৎ সুখায় ভবতো ননু ভক্ষ্যপেয়ে॥

—পদ্যবালী ॥১৩॥

—হে ভক্ত! বিবিধ উপাচারযোগে পূজা করিলেই যে আর্ত্তবন্ধু-শ্রীকৃষ্ণ সুখী হয়েন, তাহা নহে, প্রেমের সহিত পূজিত হইলেই তাঁহার হৃদয় সুখে বিগলিত হইয়া যায়। যেমন, যে পর্য্যন্ত উদরে বলবতী ক্ষুধা ও পিপাসা থাকে, সেই পর্য্যন্তই অন্নজল সুখপ্রদ বা তৃপ্তিজনক হইয়া থাকে।"

রসিক শেখর শ্রীকৃষ্ণ ভক্তের প্রেমরস-নির্য্যাস আস্বাদনের জন্যই লালায়িত, কেবল উপচারের জন্য তিনি লালায়িত নহেন। উপচার যদি ভক্তের প্রীতিরস বহন করিয়া আনে, তাহা হইলে সেই প্রীতিরসের জন্যই তিনি উপচার অঙ্গীকার করিয়া থাকেন। এমন কি, পত্র-পুষ্পও যদি ভক্তের প্রীতি বা ভক্তি বহন করিয়া আনে, তাহা হইলে সেই পত্র-পুষ্পও তিনি ভক্ষণ করেন—একথা তিনি নিজ মুখেই ব্যক্ত করিয়া গিয়াছেন।

"পত্রং পুষ্পং ফলং তোয়ং যো মে ভক্ত্যা প্রযচ্ছতি।
তদহং ভক্ত্যুপহৃতমশ্নামি প্রযতাত্মনঃ॥ গীতা॥ ৯।২৬॥

—(অর্জ্জুনের নিকটে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) যিনি ভক্তিপূর্ব্বক আমাকে পত্র, পুষ্প, ফল এবং জলমাত্রও প্রদান করেন, শুদ্ধচিত্ত ভক্তের ভক্তিপূর্ব্বক প্রদত্ত সেই পত্রপুষ্পাদিও আমি ভক্ষণ করিয়া থাকি।"

৯৮। অর্চ্চনে অধিকারী

ক। দীক্ষিত স্ত্রীশূদ্রাদিরও শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে অধিকার

পূর্ব্বে বলা হইয়াছে, অর্চ্চনার জন্য দীক্ষাগ্রহণ অবশ্যকর্ত্তব্য। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, দীক্ষিতের পক্ষে অর্চ্চনও অবশ্যকর্ত্তব্য। শ্রীকৃষ্ণ-ভজনে জাতি-কুলাদির বিচার নাই বলিয়া এবং ভজনের জন্য দীক্ষার অত্যাবশ্যকত্ব আছে বলিয়া জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই দীক্ষাগ্রহণে অধিকারী। ইহাতে বুঝা যায়—জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেই, এমন কি, স্ত্রীলোকও, দীক্ষিত হইলে অর্চ্চনে অধিকারী হইতে পারেন। দীক্ষিত হইলে শালগ্রাম-শিলার অর্চ্চনেও স্ত্রীশূদ্রাদির অধিকার জন্মিতে পারে।

শাস্ত্র পরিষ্কার ভাবেই তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

"এবং শ্রীভগবান্ সর্ব্বৈঃ শালগ্রামশিলাত্মকঃ।
দ্বিজৈঃ স্ত্রীভিশ্চ শুদ্রৈশ্চ পূজ্যো ভগবতঃ পরৈঃ॥

—হ, ভ, বি, ৫।২২৩-ধৃত-স্কন্দপুরাণ বচন॥

—শালগ্রামশিলাত্মক ভগবান্ ভগবৎ-পরায়ণ দ্বিজ, স্ত্রীলোক এবং শূদ্র—সকলেরই অর্চ্চনীয়।"

"ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়-বিশাং সচ্ছূদ্রাণামথাপি বা। শালগ্রামেঽধিকারোঽস্তি ন চান্যেষাং কদাচন॥
স্ত্রিয়ো বা যদি বা শূদ্রা ব্রাহ্মণাঃ ক্ষত্রিয়াদয়ঃ। পূজয়িত্বা শিলাচক্রং লভন্তে শাশ্বতং পদম্॥

—হ, ভ, বি, ৫।২২৪-ধৃত-স্কান্দপ্রমাণ॥

—ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য-ইঁহারা শালগ্রাম-শিলার অর্চ্চনে অধিকারী এবং সৎ (অর্থাৎ দীক্ষিত বৈষ্ণব) শূদ্রও অধিকারী ; (১) অপরের (অবৈষ্ণব শূদ্রের) অধিকার নাই। কি স্ত্রীলোক, কি শূদ্র, কি ব্রাহ্মণ, কি ক্ষত্রিয়াদি, যে কেহই হউন না কেন, শালগ্রামের অর্চ্চনা করিলে শাশ্বত পদ প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

খ। বিরুদ্ধ বাক্যের সমাধান

প্রশ্ন হইতে পারে, স্ত্রী-শূদ্রের পক্ষে শালগ্রাম-শিলার স্পর্শও যে নিষিদ্ধ, নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণ হইতে তাহা জানা যায়।

"ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহং শুচেরপ্যশুচেরপি।
স্ত্রীশূদ্রকর-সংস্পর্শো বজ্রাদপি সুদুঃসহঃ॥
প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ।
ব্রাহ্মণীগমনাচ্চৈব শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥ হ, ভ, বি, ৫।২২৪॥

—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) শুচি হউন বা অশুচি হউন, (২) ব্রাহ্মণই আমার অর্চ্চনে অধিকারী। স্ত্রীলোকের এবং শূদ্রের করস্পর্শ আমার পক্ষে বজ্র অপেক্ষাও দুঃসহ। শূদ্র যদি প্রণব উচ্চারণ করে, শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করে, অথবা ব্রাহ্মণীগমন করে, তাহা হইলে সে চণ্ডালত্ব প্রাপ্ত হয়।"

স্কন্দপুরাণ বলিয়াছেন—স্ত্রী-শূদ্রেরও শালগ্রামশিলার অর্চ্চনে অধিকার আছে, আবার "ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহম্"-ইত্যাদি বাক্যে বলা হইল—স্ত্রী-শূদ্রের পক্ষে শালগ্রামশিলার স্পর্শেও অধিকার নাই, শূদ্রের পক্ষে প্রণবোচ্চারণের অধিকারও নাই। এইরূপ পরস্পর-বিরুদ্ধ বাক্যদ্বয়ের সমাধান কি ?

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে ইহার সমাধান দৃষ্ট হয়।

---

(১) টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—সচ্ছূদ্রাণাম্ "সতাং বৈষ্ণবানাং শূদ্রাণাম্। অন্যেষাম্ অসতাং শূদ্রাণাম্॥"

(২) এ-স্থলে "অশুচি"-শব্দে জনন-মরণাশৌচই অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় ; মলমূত্রাদিজনিত অশুচিতা অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয় না।

"অতো নিষেধকং যদ্‌বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্‌।
অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্‌বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥　৫।২২৪॥

—(স্কান্দোক্তিতে স্ত্রীশূদ্রাদিরও শালগ্রামশিলার অর্চ্চনে অধিকার দৃষ্ট হয় বলিয়া) স্ত্রীশূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রামার্চ্চন-বিষয়ে যে নিষেধ-বচন স্পষ্ট শ্রুত হয়, তত্ত্বদর্শী ব্যক্তিদের মতে সেই নিষেধ-বচন হইতেছে অবৈষ্ণবপর (অর্থাৎ যাহারা বৈষ্ণব নহে, যাহারা বিষ্ণুভক্তিবিহীন, তাহাদের জন্যই সেই নিষেধবাক্য ; বৈষ্ণব স্ত্রী-শূদ্রাদিতে সেই নিষেধবাক্য প্রযোজ্য নহে। পূর্ব্বোদ্ধৃত স্কান্দবচনের 'ভগবতঃ পরৈঃ'-বাক্যেই বলা হইয়াছে—ভগবৎ-পরায়ণ অর্থাৎ বৈষ্ণব স্ত্রীশূদ্রাদিরই শালগ্রামশিলার্চ্চনে অধিকার, অবৈষ্ণব স্ত্রীশূদ্রাদির নহে)।"

টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"স্ত্রীশূদ্রকরসংস্পর্শো বজ্রপাতসমো মমেতি শালগ্রামশিলাপ্রসঙ্গে শ্রীভগবদ্‌বচনেন স্ত্রীশূদ্রাণাং তৎপূজা নিষিধ্যতে, তত্র লিখতি ভগবতঃ পরৈরিতি। যথাবিধি দীক্ষাং গৃহীত্বা ভগবৎপূজাপরৈঃ সদ্‌ভিরিত্যর্থঃ॥"-তাৎপর্য্য এই যে—যথাবিধি দীক্ষাগ্রহণ-পূর্ব্বক যাঁহারা ভগবৎ-পূজাপরায়ণ, সে-সমস্ত স্ত্রী-শূদ্রেরই শালগ্রামার্চ্চনে অধিকার আছে, ইহাই মূলশ্লোকস্থ "ভগবতঃ পরৈঃ"-বাক্যের তাৎপর্য্য। তাঁহাদের সম্বন্ধে নিষেধবাক্য প্রযোজ্য নহে।

টীকায় শ্রীপাদ সনাতন আরও লিখিয়াছেন—"অতএব শূদ্রমধিকৃত্যোক্তং বায়ুপুরাণে। অযাচকঃ প্রদাতা স্যাৎ কৃষিং বৃত্ত্যর্থমাচরেৎ। পুরাণং শৃণুয়ান্নিত্যং শালগ্রামঞ্চ পূজয়েদিতি। এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি বচনস্য বিরোধাৎ মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্‌॥
—অতএব শূদ্রসম্বন্ধে বায়ুপুরাণ বলিয়াছেন—'(শূদ্র) অযাচক হইবেন, দাতা হইবেন, কৃষিকে জীবিকানির্ব্বাহের বৃত্তিরূপে গ্রহণ করিবেন ; নিত্য পুরাণ শ্রবণ করিবেন এবং শালগ্রামের পূজা করিবেন।' এইরূপে, মহাপুরাণসমূহের বাক্যের সহিত 'ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহম্‌'-বাক্যের বিরোধ দৃষ্ট হয় বলিয়া, ইহা কোনও মাৎসর্য্যপরায়ণ স্মার্ত্তের কল্পিত বাক্য বলিয়াই মনে হয়।"

গ। ব্রাহ্মণের সহিত বৈষ্ণবের সমতা

শ্রীপাদ সনাতন টীকায় আরও বলিয়াছেন—"যদি চ যুক্ত্যা সিদ্ধং সমূলং স্যাত্তর্হি চ অবৈষ্ণবৈঃ শূদ্রৈস্তাদৃশীভিশ্চ স্ত্রীভিস্তৎপূজা ন কর্ত্তব্যা, যথাবিধি গৃহীতবিষ্ণুদীক্ষাকৈশ্চ তৈঃ কর্ত্তব্যেত্তি ব্যবস্থাপনীয়ম্‌। যতঃ শূদ্রেষ্বন্ত্যজেষ্বপি যে বৈষ্ণবাস্তে শূদ্রাদয়ো ন কিলোচ্যন্তে। তথা চ নারদীয়ে। শ্বপচোঽপি মহীপাল বিষ্ণোর্ভক্তো দ্বিজাধিক ইতি। ইতিহাসসমুচ্চয়ে—শূদ্রং বা ভগবদ্‌ভক্তং নিষাদং শ্বপচং তথা। বীক্ষতে জাতিসামান্যাৎ স যাতি নরকং ধ্রুবমিতি॥ পাদ্মে চ। ন শূদ্রা ভগবদ্‌ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ। সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দন ইতি।× ×। কিঞ্চ ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবেণ শূদ্রাদীনামপি বিপ্রসাম্যং সিদ্ধমেব। তথা চ তত্র। যথা কাঞ্চনতাং যাতীত্যাদি। অতএব তৃতীয়স্কন্ধে দেবহূতিবাক্যম্‌। যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্‌যৎপ্রহ্বণাদ্‌ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।

শ্বাদোঽপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ ॥ ইতি ॥ সবনায় যজনায় কল্পতে যোগ্যো ভবতীতীর্থঃ। এতএব বিপ্রৈঃ বৈষ্ণবানামেকত্রৈব গণনা।”

টীকার তাৎপর্য্য। “যদিও যুক্তিদ্বারা সমূল সিদ্ধ হয় (অর্থাৎ জাতিবর্ণ-নির্ব্বিশেষে সকলেরই ভগবদ্ভজনে—সুতরাং শালগ্রামশিলার্চ্চনেও—স্বরূপগত অধিকার যুক্তিদ্বারা সিদ্ধ হয়), তথাপি অবৈষ্ণব শূদ্রের পক্ষে শালগ্রাম-পূজা কর্ত্তব্য নহে ; যাঁহারা যথাবিধি বিষ্ণুদীক্ষা গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহাদের পক্ষেই শালগ্রামপূজার ব্যবস্থা হওয়া সঙ্গত। যেহেতু, শূদ্রের মধ্যে এবং অন্ত্যজের মধ্যেও যাঁহারা বৈষ্ণব, তাঁহারা শূদ্রাদি বলিয়া কথিত হয়েন না। নারদীয় পুরাণও তাহাই বলিয়াছেন ; যথা—‘হে মহীপাল! বিষ্ণুভক্ত শ্বপচও দ্বিজ হইতে অধিক (শ্রেষ্ঠ)।’ ইতিহাসসমুচ্চয়ও বলেন—‘ভগবদ্ভক্ত শূদ্র, বা নিষাদ, বা শ্বপচকেও যে ব্যক্তি সামান্য-জাতিরূপে দর্শন করে, নিশ্চয়ই তাহার নরক-গমন হয়।’ পদ্মপুরাণও বলেন—‘ভগবদ্ভক্তেরা শূদ্র নহেন, তাঁহারাও ভাগবত। যাঁহারা ভগবানের ভক্ত নহেন, সকল বর্ণের মধ্যে তাঁহারাই শূদ্র।’ এ-সমস্ত উক্তির হেতু এই যে, ‘যথা কাঞ্চনতাং যাতি-ইত্যাদি’-অর্থাৎ রসবিধানে কাংস্যও যেমন কাঞ্চনতা প্রাপ্ত হয়, তদ্রূপ দীক্ষাবিধানে মানুষমাত্রেই দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়’-পদ্মপুরাণের এই উক্তি অনুসারে ভগবদ্দীক্ষাপ্রভাবে শূদ্রাদিরও দ্বিজসাম্য সিদ্ধ হইয়া থাকে। শ্রীমদ্ভাগবতের ‘যন্নামধেয়’-ইত্যাদি (৩।৩৩।৬)-দেবহূতিবাক্য হইতেও জানা যায়—‘শ্বপচও যদি কদাচিৎ ভগবানের নাম শ্রবণ বা কীর্ত্তন করেন, কিম্বা ভগবান্‌কে নমস্কার করেন, তাহা হইলে তিনিও তৎক্ষণাৎ যজনের (পূজনের) যোগ্যতা লাভ করেন। ভগবানের দর্শনের কথা আর কি বলা যায়।’ অতএব বিপ্রের সঙ্গে বৈষ্ণবের একত্রই গণনা।”

শ্রীপাদ সনাতন তাঁহার উল্লিখিত টীকায় আরও অনেক শাস্ত্রপ্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শেষে বলিয়াছেন—“ইত্থং বৈষ্ণবানাং ব্রাহ্মণৈঃ সহ সাম্যমেব সিধ্যতি।—এইরূপে ব্রাহ্মণের সহিত বৈষ্ণব-দিগের সাম্যই সিদ্ধ হইতেছে।” এবং “অতো যুক্তমেব লিখিতং সর্ব্বৈর্ভগবতঃ পরৈঃ পূজ্য ইতি।—স্কন্দপুরাণে যে লিখিত হইয়াছে, শালগ্রামশিলা স্ত্রীশূদ্রাদি সমস্ত ভগবৎ-পরায়ণ লোকগণেরই অর্চ্চনীয়, তাহা সঙ্গতই হইয়াছে।”

তিনি আরও লিখিয়াছেন—“ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণে প্রিয়ব্রতোপাখ্যানে ‘ততঃ স বিস্মিতঃ শ্রুত্বা ধর্ম্মব্যাধস্য তদ্বচঃ’-ইত্যাদি বাক্যে ধর্ম্মব্যাধেরও যে শালগ্রামশিলা-পূজনের কথা ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে বলা হইয়াছে, তাহাও শাস্ত্রযুক্তিসঙ্গত।” আচরণেও যে তাহার প্রমাণ আছে, তাহাও শ্রীপাদ সনাতন বলিয়াছেন—মধ্যদেশে, বিশেষতঃ দক্ষিণদেশে, শ্রীবৈষ্ণবদিগের মধ্যে সৎলোকগণ (দীক্ষিত শূদ্রাদিও) শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা করিয়া থাকেন॥

ঘ। শ্রীভাগবতপাঠাদিতেও বৈষ্ণবমাত্রের অধিকার

শ্রীপাদ সনাতন আরও লিখিয়াছেন—“এবং শ্রীভাগবতপাঠাদাবপ্যধিকারো বৈষ্ণবানাং দ্রষ্টব্যঃ। যতো বিধিনিষেধাঃ ভগবদ্ভক্তানাং ন ভবন্তীতি দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাং পিতৃণামিত্যাদিবচনৈঃ,

তথা কর্ম্মপরিত্যাগাদিনাপি ন কশ্চিদ্দোষো ঘটত ইতি তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীতেতি যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবানিত্যাদিবচনৈশ্চ ব্যক্তং বোধিতমেবাস্তি॥—এইরূপে শ্রীভাগবতপাঠাদিতেও বৈষ্ণবের (বৈষ্ণব-শূদ্রাদিরও) অধিকার দ্রষ্টব্য।(১) যেহেতু, (সাধারণ লোকের জন্য যে সমস্ত বিধিনিষেধ পালনীয়, সে-সমস্ত) বিধিনিষেধ ভগবদ্‌ভক্তদিগের জন্য নহে। শ্রীমদ্‌ভাগবতেই তাহার প্রমাণ দৃষ্ট হয় ; যথা, ‘দেবর্ষিভূতাপ্তনৃণাম্-ইত্যাদি শ্রীভা ১১।৫।৪১-শ্লোকে’ বলা হইয়াছে, যাঁহারা মুকুন্দের শরণাপন্ন হয়েন, দেব-ঋষি-পিত্রাদির নিকটে ঋণে তাঁহাদিগকে ঋণী হইতে হয় না। ‘তাবৎ কর্ম্মাণি কুর্ব্বীত’-ইত্যাদি শ্রীভা ১১।২০।৯-শ্লোকে বলা হইয়াছে, যে পর্য্যন্ত নির্ব্বেদ না জন্মে, কিম্বা যে পর্য্যন্ত ভগবৎকথাদিতে শ্রদ্ধা না জন্মে, সেই পর্য্যন্ত কর্ম্ম করিবে ; সুতরাং কর্ম্মত্যাগাদিতেও বৈষ্ণবের কোনও দোষ হয় না। ‘যদা যস্যানুগৃহ্ণাতি ভগবান্॥ শ্রীভা ৪।২৯।৪৬॥’-শ্লোকেও বৈষ্ণবের পক্ষে কর্ম্মত্যাগে দোষহীনতার কথা বলা হইয়াছে।’’

তাৎপর্য্য এই যে শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রামশিলার অর্চ্চনাদি, কি শ্রীভাগবতপাঠাদি বর্ণাশ্রমধর্ম্মেই নিষিদ্ধ এবং অবৈষ্ণব শূদ্রাদির পক্ষেই নিষিদ্ধ ; বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ভগবৎ-পরায়ণ শূদ্রাদির পক্ষে নিষিদ্ধ নহে ; তাদৃশ শূদ্রাদি বর্ণাশ্রমধর্ম্ম-বিহিত বিধিনিষেধের অতীত, তাঁহারাও ব্রাহ্মণের সমান। এজন্যই মহাপুরাণাদি তাঁহাদেরও শালগ্রামশিলার্চ্চনের অধিকারের কথা বলিয়াছেন।

৬। প্রণবোচ্চারণেও বৈষ্ণব-শূদ্রাদির অধিকার

পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনা হইতে জানা গিয়াছে—দীক্ষার প্রভাবে শূদ্রাদিরও দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়, বিষ্ণুমন্ত্রে দীক্ষিত ভগবৎপরায়ণ শূদ্রাদিরও শালগ্রামশিলার অর্চ্চনে অধিকার আছে, শ্রীভাগবতাদি-পাঠেও তাঁহাদের অধিকার আছে ; তাঁহারা ব্রাহ্মণের সমান। সুতরাং প্রণবোচ্চারণেও যে বৈষ্ণব-শূদ্রাদির অধিকার আছে, তাহাও বুঝা যায়। শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের উক্তি হইতে তাহা জানা যায়।

পূর্ব্বোদ্ধৃত “প্রণবোচ্চারণাচ্চৈব শালগ্রামশিলার্চ্চনাৎ ··শূদ্রশ্চণ্ডালতামিয়াৎ॥ হ, ভ, বি, ৫।২২৪॥”-বাক্যে শূদ্রের পক্ষে প্রণবের উচ্চারণ এবং শালগ্রামশিলার অর্চ্চনা নিষিদ্ধ হইয়াছে বটে ; কিন্তু স্কন্দপুরাণাদি মহাপুরাণ-বাক্যের সহিত এই নিষেধ-বাক্যের বিরোধ দৃষ্ট হয় বলিয়া হরিভক্তি-বিলাস বলিয়াছেন—ঐ নিষেধবাক্যটী অবৈষ্ণবপর। “অতো নিষেধকং যদ্ যদ্ বচনং শ্রূয়তে স্ফুটম্। অবৈষ্ণবপরং তত্তদ্ বিজ্ঞেয়ং তত্ত্বদর্শিভিঃ॥ হ, ভ, বি, ৫।২২৪॥” শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী বহু শাস্ত্র-প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার টীকায় যে মহাপুরাণ-বাক্যের যাথার্থ্য প্রদর্শন করিয়াছেন, তাহাও পূর্ব্বে প্রদর্শিত হইয়াছে। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, উল্লিখিত নিষেধ-বাক্যটী মাৎসর্য্যপরায়ণ কোনও স্মার্ত্তেরই কল্পিত বলিয়া মনে করিতে হইবে। “এবং মহাপুরাণানাং বচনৈঃ সহ ব্রাহ্মণস্যৈব পূজ্যোঽহমিতি

---

(১) সুপ্রসিদ্ধ পুরাণবক্তা শ্রীলসূতগোস্বামীও ব্রাহ্মণেতর কুলে উদ্ভূত হইয়াছিলেন এবং শৌনকাদি ষষ্টিসহস্র ঋষির সভাতেও শ্রীমদ্ভাগবতাদি পাঠ করিয়াছিলেন।

বচনস্থ বিরোধাৎ মাৎসর্য্যপরৈঃ স্মার্ত্তৈঃ কৈশ্চিৎ কল্পিতমিতি মন্তব্যম্।" (এই নিষেধ-বাক্যটী কোনও প্রামাণ্য শাস্ত্রের উক্তি বলিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে উল্লিখিত হয় নাই)। এই নিষেধ-বাক্যটী অবৈষ্ণবপর বলিয়া বৈষ্ণবের প্রতি প্রযোজ্য হইতে পারে না; এজন্যই মহাপুরাণের প্রমাণবলে ভগবৎপরায়ণ বৈষ্ণব-শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রামশিলার্চ্চনের অধিকার যেমন স্বীকৃত হইয়াছে, তেমনি প্রণবোচ্চারণের অধিকারও স্বীকৃত।

শ্রীপাদ সনাতন পূর্ব্বোল্লিখিত তাঁহার টীকায় বৈষ্ণব-শূদ্রাদির পক্ষে শ্রীভাগবত-পাঠাদির অধিকারও স্বীকার করিয়াছেন; শ্রীভাগবতপাঠাদির অধিকার স্বীকার করাতেই তাঁহাদের প্রণবোচ্চারণের অধিকারও স্বীকৃত হইয়াছে। কেননা, শ্রীমদ্ভাগবতে "ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়"-ইত্যাদি স্থলে প্রণব বাদ দিয়া পাঠ করিতে হইবে, কিম্বা প্রণবের স্থলে অন্যকোনও শব্দের যোজনা করিতে হইবে—এইরূপ কোনও বিধান বৈষ্ণবশাস্ত্রে দৃষ্ট হয় না। নৈমিষারণ্যে শৌনকাদি ঋষির সমক্ষে শ্রীভাগবত কথা বর্ণনা-সময়ে ব্রাহ্মণেতর কুলে উদ্ভূত পরমভাগবত শ্রীসূতগোস্বামী যে প্রণব বাদ দিয়া, কিম্বা প্রণবের স্থলে অন্য কোনও শব্দের যোজনা করিয়া ভাগবত-কথা বর্ণন করিয়াছেন, তাহারও প্রমাণ নাই।

বৈষ্ণব-শূদ্রাদির পক্ষে শালগ্রামশিলার্চ্চনে অধিকারের স্বীকৃতিতেও প্রণবোচ্চারণের অধিকার স্বীকৃত হইয়াছে; কেননা, শাস্ত্রীয় বিধানমতে শালগ্রামের অর্চ্চনায় প্রণবের উচ্চারণ অপরিহার্য্য।

বৈষ্ণব শূদ্রাদির পক্ষে প্রণবের উচ্চারণ নিষিদ্ধ হইলে তাঁহাদের দীক্ষাগ্রহণও অসম্ভব হইয়া পড়ে। কেননা, প্রণব অনেক বৈষ্ণবমন্ত্রেরই অন্তর্ভুক্ত। মন্ত্রের অঙ্গীভূত প্রণবকে বাদ দিলে, কিম্বা তৎস্থলে অন্য শব্দের যোজনা করিলে মন্ত্রেরই অঙ্গহানি হইয়া থাকে। অঙ্গহীন মন্ত্র শাস্ত্রবিহিত মন্ত্র হইতে পারে না। অঙ্গহীন মন্ত্রে শাস্ত্রীয় দীক্ষাও সিদ্ধ হইতে পারে না। অঙ্গহীন মন্ত্রের জপেও, কিম্বা অঙ্গহীন মন্ত্রের দ্বারা অর্চ্চনাদিতেও, শাস্ত্রকথিত ফল পাওয়া যাইতে পারে না; বরং তাহাতে উৎপাতেরই সৃষ্টি হয়। "শ্রুতিস্মৃতিপুরাণাদি-পঞ্চরাত্রবিধিং বিনা। ঐকান্তিকী হরের্ভক্তিরুৎপাতায়ৈব কল্পতে॥ ব্রহ্মযামল॥", "যঃ শাস্ত্রবিধিমুৎসৃজ্য বর্ত্ততে কামচারতঃ। ন স সিদ্ধিমবাপ্নোতি ন সুখং ন পরাং গতিম্॥ গীতা॥ ১৬।২৩॥"-ইত্যাদি বাক্যই তাহার প্রমাণ।

সুতরাং বৈষ্ণবমন্ত্রে দীক্ষিত ভগবৎপরায়ণ শূদ্রাদিরও যে প্রণবোচ্চারণে অধিকার আছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না।

চ। শূদ্রাদির পূজিত শ্রীবিগ্রহের পূজাবিষয়ে নিষেধবাক্যের তাৎপর্য্য

শাস্ত্রে দেখা যায়, শূদ্রাদির পূজিত শ্রীবিগ্রহের পূজা অপরের পক্ষে নিষিদ্ধ। এ-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলেন—

"অত্র শূদ্রাদিপূজিতার্চ্চা-পূজা-নিষেধবচনমবৈষ্ণব-শূদ্রাদিপরমেব॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥২৮৬॥

—শূদ্রাদির পূজিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা করা নিষেধ-এইরূপ বচন যে শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়, তাহা

হইতেছে কেবল অবৈষ্ণব-শূদ্রপর (অর্থাৎ যে সকল শূদ্রাদি অবৈষ্ণব—বৈষ্ণব-মন্ত্রে দীক্ষিত নহেন—তাঁহাদের পূজিত শ্রীমূর্ত্তির পূজা শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; বৈষ্ণব-শূদ্রাদির পূজিত শ্রীবিগ্রহের পূজা নিষিদ্ধ নহে)।"

এই উক্তির সমর্থনে শ্রীজীবপাদ নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ন শূদ্রা ভগবদ্‌ভক্তাস্তে তু ভাগবতা নরাঃ
সর্ব্ববর্ণেষু তে শূদ্রা যে ন ভক্তা জনার্দ্দনে ॥ পদ্মপুরাণ ॥

—যাঁহারা ভগবদ্‌ভক্ত, তাঁহারা শূদ্র নহেন ; সে-সকল মানব হইতেছেন ভাগবত। যাঁহারা ভগবান্ জনার্দ্দনে ভক্তিশূন্য, সর্ব্ববর্ণের মধ্যে তাঁহারাই শূদ্র (অর্থাৎ ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদিকুলে উদ্ভূত হইলেও তাঁহারা শূদ্রমধ্যে পরিগণিত)।"

ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণও উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন—"ভক্তিঃ পুনাতি মন্নিষ্ঠা শ্বপাকানপি সম্ভবাৎ ॥ শ্রীভা, ১১।১৪।২১ ॥—আমাতে নিষ্ঠাপ্রাপ্তা ভক্তি শ্বপচকেও জাতিদোষ হইতে পবিত্র করে। (সম্ভবাৎ জাতিদোষাদপীত্যর্থঃ ॥ শ্রীধরস্বামী ॥)"

ভক্তির প্রভাবে শ্বপচেরও জাতি-দোষ দূরীভূত হয়, শ্বপচ আর তখন শ্বপচ-বৎ অপবিত্র থাকে না, পবিত্র হইয়া যায়। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৯৮-গ-অনুচ্ছেদে প্রদর্শিত হইয়াছে যে—দীক্ষাগ্রহণের ফলে মানুষমাত্রেরই দ্বিজত্ব সিদ্ধ হয়, কেহই আর শূদ্র থাকে না ; ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে—ব্রাহ্মণের সহিত বৈষ্ণবের সমত্ব শাস্ত্রসম্মত। সুতরাং বৈষ্ণব-শূদ্রেরও শালগ্রাম-শিলার্চ্চনে, ব্রাহ্মণের ন্যায়ই, অধিকার আছে (৫।৯৮-ক অনুচ্ছেদ)। অতএব বৈষ্ণব-শূদ্রের অর্চ্চিত শ্রীমূর্ত্তিতে, আর ব্রাহ্মণের অর্চ্চিত শ্রীমূর্ত্তিতে কোনওরূপ পার্থক্যই থাকিতে পারে না। এজন্য বৈষ্ণব-শূদ্রের অর্চ্চিত শ্রীমূর্ত্তির সেবায় ব্রাহ্মণাদির পক্ষে কোনও দোষের আশঙ্কা থাকিতে পারে না। অবৈষ্ণব-শূদ্রাদির শ্রীমূর্ত্তির অর্চ্চনে অধিকার নাই ; ঔদ্ধত্যবশতঃ যদি তাদৃশ শূদ্রাদি শ্রীমূর্ত্তির পূজা করে, তাহা হইলে সেই শ্রীমূর্ত্তির সেবাই ব্রাহ্মণাদির পক্ষে শাস্ত্রে নিষিদ্ধ হইয়াছে ; বৈষ্ণব-শূদ্রাদির অর্চ্চিত শ্রীমূর্ত্তির সেবা সম্বন্ধে সেই নিষেধ-বাক্য প্রযোজ্য নহে। ইহাই শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তির তাৎপর্য্য।

৯৯। নামসঙ্কীর্ত্তন

নাম এবং নামী যে অভিন্ন এবং নামসঙ্কীর্ত্তন যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভজনাঙ্গ, তাহা পূর্ব্বে [৫।৬০-ক (৫) অনুচ্ছেদে] বলা হইয়াছে। পূর্ব্ববর্ত্তী ৫।৫৫-অনুচ্ছেদেও নববিধা সাধনভক্তির অন্তর্গত "কীর্ত্তন" প্রসঙ্গেও নামসঙ্কীর্ত্তন-সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইয়াছে। কয়েকটী বিশেষ কথা এ-স্থলে উল্লিখিত হইতেছে।

ক। নাম

শাস্ত্রকথিত নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেছে ভগবানের নামের সঙ্কীর্ত্তন। এই নাম হইতেছে

ভগবানের বাচক শব্দবিশেষ ; যথা—কৃষ্ণ, হরি, নারায়ণ, বাসুদেব, মাধব, মধুসূদন, কেশব ইত্যাদি।

পরব্রহ্ম ভগবানের অসংখ্য নাম। কতকগুলি নাম তাঁহার গুণানুরূপ এবং কতকগুলি তাঁহার কর্ম্মানুরূপ বা লীলানুরূপ। শ্রীকৃষ্ণের নামকরণ-সময়ে গর্গাচার্য্য নন্দমহারাজের নিকটে বলিয়াছেন,

"বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে।
গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮।১৫॥

—তোমার এই পুত্রটীর (শ্রীকৃষ্ণের) গুণকর্ম্মানুরূপ বহু নাম এবং রূপ আছে ; সে-সমস্ত আমিও জানিনা, লোকসকলও জানে না (তানি সর্ব্বাণি অহমপি নো বেদ জনা অপি নো বিদুরিতি। টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ)।"

এই শ্লোকের "তান্যহং নো বেদ নো জনাঃ"—বাক্যের তাৎপর্য্য এই যে, ভগবন্নাম সংখ্যায় অনন্ত ; এজন্য গর্গাচার্য্যও সমস্ত নাম জানেন না, অন্য লোকও জানে না। যাহা একজনও জানিতে পারেন, তাহাকে অনন্ত বলা যায় না।

গুণানুরূপ নাম, যথা—ঈশ্বর, সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদি ; আর, কর্ম্মানুরূপ নাম, যথা—গোপতি, গিরিধারী, মধুসূদন, রাসবিহারী ইত্যাদি। "গুণানুরূপাণি॥ ঈশ্বরঃ সর্ব্বজ্ঞ ইত্যাদীনি, কর্ম্মানুরূপাণি গোপতি গোবর্দ্ধনোদ্ধরণ ইত্যাদীনি॥ শ্রীধরস্বামী॥"

ভগবানের নাম এবং ভগবান্ অভিন্ন (১।১।৭৪-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য) ; নাম ভগবানের প্রতীক নহে (১।১।৭৬-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

খ। ভগবন্নাম স্বতন্ত্র, দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির অপেক্ষাহীন

ভগবানের নাম এবং ভগবান্ অভিন্ন বলিয়া (১।১।৭৪-অনু) ভগবানেরই ন্যায় তাঁহার নামও পরম স্বতন্ত্র, কোনও কিছুরই অধীন নহে, বিধিনিষেধেরও অধীন নহে। নাম পরম-স্বতন্ত্র বলিয়া দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদির যেমন অপেক্ষা রাখেনা [৫।৭৫-খ (২)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য], তদ্রূপ দেশ-কাল-দশা-শুদ্ধি-আদির অপেক্ষাও রাখেনা ; সর্ব্বনিরপেক্ষ ভাবেই নাম নামকীর্ত্তনকারীর বাসনা পূরণ করিয়া থাকে।

নো দেশকালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে।
কিন্তু স্বতন্ত্রমেবৈতন্নাম কামিতকামদম্॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৪-ধৃত স্কান্দবচন॥

যে কোনও লোক, যে কোনও স্থানে, যে কোনও সময়ে, যে কোনও অবস্থায়, নামকীর্ত্তন করিয়া কৃতার্থ হইতে পারে। যাহারা অনন্যগতি, নিয়ত বিষয়ভোগী, পরপীড়ক, জ্ঞান-বৈরাগ্য-বর্জ্জিত, ব্রহ্মচর্য্যহীন, এবং সর্ব্বধর্ম্মত্যাগী, তাহারাও যদি শ্রীবিষ্ণুর নাম জপ করে, তাহা হইলে অনায়াসে ধর্ম্মনিষ্ঠদেরও দুর্লভ গতি লাভ করিতে পারে।

অনন্যগতয়ো মর্ত্যা ভোগিনোঽপি পরন্তপাঃ। জ্ঞানবৈরাগ্যরহিতা ব্রহ্মচর্য্যাদিবর্জ্জিতাঃ॥
সর্ব্বধর্ম্মোজ্‌ঝিতা বিষ্ণোর্নামমাত্রৈকজল্পকাঃ। সুখেন যাং গতিং যান্তি ন তাং সর্ব্বেঽপি ধার্ম্মিকাঃ॥
—হ, ভ, বি, ১১।২০১-ধৃত পাদ্মবচন॥

স্ত্রীলোক, শূদ্র, চণ্ডাল, এমন কি অন্য কোনও পাপযোনিজাত লোকও যদি ভক্তিভরে হরিনাম কীর্ত্তন করে, তাহা হইলে তাহারাও বন্দনীয়।

স্ত্রী শূদ্রঃ পুক্কশো বাপি যে চান্যে পাপযোনয়ঃ।
কীর্ত্তয়ন্তি হরিং ভক্ত্যা তেভ্যোঽপীহ নমো নমঃ॥
—হ, ভ, বি, ১১।২০১-ধৃত-শ্রীনারায়ণব্যূহস্তব-বচন॥

নামসঙ্কীর্ত্তন-ব্যাপারে স্থানের পবিত্রতা বা অপবিত্রতার বিচার করারও প্রয়োজন নাই, সময়-সম্বন্ধেও কোনওরূপ বিচারের প্রয়োজন নাই, উচ্ছিষ্টমুখে নামগ্রহণেরও নিষেধ নাই।

ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।
নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥
—হ, ভ, বি, ১১।২০২-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরবচন॥

অশৌচ-অবস্থায়ও নামকীর্ত্তনের বাধা নাই। ভগবানের নাম পরমপাবন, সমস্ত অশুচিকে শুচি করে, অপবিত্রকে পবিত্র করে। সকল সময়ে এবং সকল স্থানেই নাম কীর্ত্তনীয়।

চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ। নাশৌচং কীর্ত্তনে তস্য স পবিত্রকরো যতঃ॥
—হ, ভ, বি, ১১।২০৩-ধৃত স্কান্দ-পাদ্ম-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-প্রমাণ॥

ন দেশ-কাল-নিয়মো ন শৌচাশৌচ-নির্ণয়ঃ। পরং সঙ্কীর্ত্তনাদেব রামরামেতি মুচ্যতে॥
—হ, ভ, বি, ১১।২০৫-ধৃত বৈশ্বানরসংহিতা-বচন॥

চলা-ফেরা করার সময়ে, দাঁড়াইয়া বা বসিয়া থাকার কালে, বিছানায় শুইয়া শুইয়া, খাইতে খাইতে, শ্বাস-প্রশ্বাস ফেলার সময়ে, বাক্য-প্রপূরণে, কি হেলায়-শ্রদ্ধায় নাম উচ্চারণ করিলেও কৃতার্থতা লাভ হয়।

ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে। নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণো র্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্॥
কৃত্বা স্বরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥ —হ, ভ, বি, ১১।২১৯-ধৃত লিঙ্গপুরাণ-বচন॥

শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।১৪॥"

এ-সমস্ত বিধিনিষেধহীনতা ভগবন্নামের পরম-স্বাতন্ত্র্যই প্রমাণিত করিয়া থাকে।

পূর্ব্বোল্লিখিত প্রমাণ-সমূহ হইতে ইহাও জানা গেল যে, পরম-স্বতন্ত্র **ভগবন্নাম দেশ-কাল-পাত্র-দশাদির অপেক্ষা রাখেনা।**

গ। নাম এবং নামাক্ষর চিন্ময়

নাম এবং নামী ভগবান্ অভিন্ন বলিয়া নামী ভগবান্ যেমন অপ্রাকৃত, চিন্ময় সচ্চিদানন্দ, তাঁহার নামও তেমনি অপ্রাকৃত, চিন্ময়, সচ্চিদানন্দ। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম, কৃষ্ণগুণ, কৃষ্ণলীলাবৃন্দ। কৃষ্ণের স্বরূপসম সব চিদানন্দ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।১৭।১৩০॥"

নামী ভগবানের ন্যায় তাঁহার নামও পূর্ণ, শুদ্ধ, নিত্যমুক্ত এবং রসস্বরূপ। "নাম চিন্তামণিঃ কৃষ্ণশ্চৈতন্যরসবিগ্রহঃ। পূর্ণঃ শুদ্ধো নিত্যমুক্তোঽভিন্নত্বান্নাম-নামিনোঃ॥ ভক্তিরসামৃতসিন্ধু ॥১।২। ১০৮ধৃত পাদ্মবচন॥ হ, ভ, বি, ১১।২৬৯-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-বচন॥"

ভগবন্নামের চিৎস্বরূপত্বের কথা স্মৃতিশাস্ত্রেও দেখিতে পাওয়া যায়।

"মধুরমধুরমেতন্মঙ্গলং মঙ্গলানাং সকলনিগমবল্লীসৎফলং চিৎস্বরূপম্।

—হ, ভ, বি, ১১।২৩৯-ধৃত প্রভাসখণ্ড-বচন॥

—ভগবানের নাম হইতেছে সকল মধুরেরও মধুর, সকল মঙ্গলেরও মঙ্গল, সকল নিগমলতার সৎ-ফল এবং চিৎস্বরূপ (চৈতন্যস্বরূপ, জড় বা প্রাকৃত নহে)।"

ঋগ্বেদেও ভগবন্নামের চিৎস্বরূপত্ব কথিত হইয়াছে। "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্ বিবক্তন্-ইত্যাদি॥ ১।১৫৬।৩॥" এ-স্থলে নামকে "চিৎ—চিৎস্বরূপ" বলা হইয়াছে। ১।১।৭৪-অনুচ্ছেদে এই ঋগ্বাক্যের তাৎপর্য্য এবং নামের চিৎস্বরূপত্ব-সম্বন্ধে আলোচনা দ্রষ্টব্য।

ভগবানের নাম চিৎস্বরূপ বা চিন্ময় বলিয়া নামের অক্ষরসমূহও চিন্ময়। পরব্রহ্মের বাচক (নাম) প্রণব-সম্বন্ধে কঠোপনিষদ্ বলিয়াছেন—"এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম—ব্রহ্মের বাচক এই অক্ষরই ব্রহ্ম।" এ-স্থলে শ্রুতি নামাক্ষরকে ব্রহ্ম বলায়, নামের অক্ষর যে চিন্ময়, তাহাই বলা হইল; কেননা, ব্রহ্ম হইতেছেন চিন্ময়।

প্রাকৃত অক্ষরে ভগবানের নাম লিখিত হইলে কেহ মনে করিতে পারেন—ঐ অক্ষরগুলিও প্রাকৃত। কিন্তু বাস্তবিক তাহা নহে। প্রাকৃত দারু-পাষাণাদিদ্বারা নির্ম্মিত ভগবদ্বিগ্রহে ভগবান্ অধিষ্ঠিত হইলে সেই বিগ্রহ যেমন চিন্ময়ত্ব লাভ করে, তদ্রূপ প্রাকৃত অক্ষর দ্বারা লিখিত ভগবন্নামও চিন্ময় হইয়া যায়; যখনই অক্ষরগুলি ভগবন্নামে পর্য্যবসিত হয়, তখনই সেই অক্ষরগুলি চিন্ময়ত্ব লাভ করে; কেননা, নাম-নামী অভিন্ন।

নরাকৃতি পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের তত্ত্ব না জানিয়া বহির্ম্মুখ অজ্ঞ ব্যক্তিগণ তাঁহাকে যেমন প্রাকৃত মানুষ বলিয়াই মনে করে (অবজানন্তি মাং মূঢ়া মানুষীং তনুমাশ্রিতম্। পরং ভাবমজানন্তো মম ভূত-মহেশ্বরম্॥ গীতা॥ ৯। ১১॥ শ্রীকৃষ্ণোক্তি), তদ্রূপ নামের তত্ত্ব না জানিয়া আমরাও নামের অক্ষরকে প্রাকৃত বলিয়া মনে করি। বস্তুতঃ নরাকৃতি পরব্রহ্ম যেমন সচ্চিদানন্দ, তাঁহার নাম এবং নামের অক্ষরও তেমনি সচ্চিদানন্দ। এজন্যই শ্রুতিও নামাক্ষরকে ব্রহ্ম—সচ্চিদানন্দ—বলিয়াছেন। "এতদ্ধ্যে-বাক্ষরং ব্রহ্ম॥ কঠশ্রুতি॥"

প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে আবির্ভূত নামও চিন্ময়। প্রাকৃত জিহ্বায় যে নাম উচ্চারিত হয়, তাহাও অপ্রাকৃত, চিন্ময়; প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত হয় বলিয়াই তাহা প্রাকৃত শব্দ হইয়া যায় না। নামীরই ন্যায় নাম পূর্ণ, শুদ্ধ এবং নিত্যমুক্ত বলিয়া জিহ্বার প্রাকৃতত্ব তাহাকে আবৃত করিতেও পারে না, তাহার চিন্ময় স্বরূপেরও ব্যত্যয় ঘটাইতে পারে না। বস্তুতঃ জিহ্বার নিজের শক্তিতে, কিম্বা যাহার জিহ্বা, তাহার শক্তিতে, ভগবানের নাম উচ্চারিত হইতে পারে না। "অপ্রাকৃত বস্তু নহে প্রাকৃতেন্দ্রিয়-গোচর॥ শ্রী চৈ. চ, ২৷৯৷১৭৯॥"; যেহেতু, নাম অপ্রাকৃত চিন্ময়। "অতঃ শ্রীকৃষ্ণনামাদি ন ভবেদ্ গ্রাহ্যমিন্দ্রিয়ৈঃ। সেবোন্মুখে হি জিহ্বাদৌ স্বয়মেব স্ফুরত্যদঃ॥ ভ, র, সি, ১৷২৷১০৯ ধৃত পাদ্মবচন॥ —জীবের প্রাকৃত ইন্দ্রিয়ে অপ্রাকৃত শ্রীকৃষ্ণনামাদি গ্রহণীয় হইতে পারে না; যে ব্যক্তি নামকীর্ত্তনাদির জন্য ইচ্ছুক হয়, নামাদি কৃপা করিয়া স্বয়ংই তাহার জিহ্বায় স্ফুরিত হয়েন।" নাম স্বতন্ত্র এবং স্বপ্রকাশ বলিয়া নিজেই তাহার জিহ্বাদিতে আত্ম-প্রকাশ করেন, আবির্ভূত হয়েন। জিহ্বার কর্তৃত্ব কিছু নাই, কর্তৃত্ব স্বপ্রকাশ-নামের, নামের কৃপার। অপবিত্র আস্তাকুড়ে যদি আগুন লাগাইয়া দেওয়া যায়, তাহা হইলে সেই আগুন অপবিত্র হয় না; বরং তাহা আস্তাকুড়কেই পবিত্র করে; কারণ, পাবকত্ব আগুনের স্বরূপগত ধর্ম্ম। তদ্রূপ, চিন্ময়ত্ব হইল নামের স্বরূপগত ধর্ম্ম, প্রাকৃত জিহ্বার স্পর্শে তাহা নষ্ট হইতে পারে না। নাম জিহ্বায় নৃত্য করিতে করিতে বরং ক্রমশঃ জিহ্বার প্রাকৃতত্বই ঘুচাইয়া দেন। ভস্মস্তূপে মহামণি পতিত হইলে তাহা ভস্মে পরিণত হয় না, তাহার মূল্যও কমিয়া যায় না। মৃত্যুকালে অজামিল "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া তাঁহার পুত্রকেই ডাকিয়াছিলেন- তাঁহার প্রাকৃত জিহ্বাদ্বারা। তথাপি সেই 'নারায়ণ"-নামই তাঁহার বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তির হেতু হইয়াছিল। প্রাকৃত জিহ্বায় উচ্চারিত (প্রকৃত প্রস্তাবে, প্রাকৃত জিহ্বায় আবির্ভূত) নাম যদি প্রাকৃত শব্দই হইয়া যাইত, তাহা হইলে অজামিলের অশেষ পাপরাশিও ধ্বংস প্রাপ্ত হইত না, তাঁহার পক্ষে বৈকুণ্ঠ-প্রাপ্তিও সম্ভব হইত না। সূর্য্যের আলোক অন্ধকার গৃহে প্রবেশ করিলেও তাহা আলোকই থাকে, অন্ধকারে পরিণত হয় না।

এইরূপে, প্রাকৃত কর্ণে যে নাম শুনা যায়, প্রাকৃত মনে যে নামের স্মরণ করা যায়, প্রাকৃত চক্ষুদ্বারা যে নামাক্ষর দর্শন করা যায়, প্রাকৃত ত্বকে যে নাম লিখিত হয়, সেই নামও অপ্রাকৃত চিন্ময়।

খ। কীর্ত্তন ও সঙ্কীর্ত্তন

কীর্ত্তন। আমরা সাধারণতঃ কতকগুলি পদের সুর-তাল-লয়-বিশিষ্ট কথন-বিশেষকেই কীর্ত্তন মনে করি, কিন্তু তাহা হইতেছে কীর্ত্তনের একটী প্রকার-ভেদ মাত্র। কীর্ত্তন-শব্দের অর্থ অত্যন্ত ব্যাপক। কীর্ত্তন-শব্দের আভিধানিক অর্থ হইতেছে—কথন, বা বচন। "কীর্ত্তনম্ কথনম্। ইতি জটাধরঃ॥ শব্দকল্পদ্রুম॥" কোনও বিষয় সম্বন্ধে যে কোনও কিছু বলাই হইতেছে সেই বিষয়ের কীর্ত্তন। কাহারও গুণের কথা বলা হইলে তাহাকে তাহার গুণকীর্ত্তন বলা হয়। এই কীর্ত্তন (কথন, বা বলা) মৃদুস্বরেও হইতে পারে, উচ্চস্বরেও হইতে পারে; আবার সুর-তাল-লয়-যোগেও হইতে

পারে, একাকী এক জনেও সুর-তালাদিযোগে তদ্রূপ কথন (বা কীর্ত্তন) করিতে পারে, বহুলোক মিলিত হইয়া একসঙ্গেও তাহা করিতে পারে।

সঙ্কীর্ত্তন। সঙ্কীর্ত্তনও উল্লিখিত কীর্ত্তনেরই একটী প্রকার-ভেদ। সম্‌+কীর্ত্তন=সঙ্কীর্ত্তন=সম্যক্ প্রকারে কীর্ত্তন। সম্যক্‌রূপে উচ্চারণপূর্ব্বক কীর্ত্তন। "সম্যক্‌প্রকারেণ দেবতানামোচ্চারণম্। শব্দকল্পদ্রুম অভিধান॥"

বর্ত্তমান কলির উপাস্যের স্বরূপ এবং উপাসনা বাচক "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" ইত্যাদি শ্রীভা, ১১।৫।৩২ শ্লোকের টীকায় শ্লোকস্থ "সঙ্কীর্ত্তন"-শব্দের অর্থে শ্রীধরস্বামিপাদ লিখিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তনং নামোচ্চারণম্—ভগবন্নামের উচ্চারণই সঙ্কীর্ত্তন।" শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় লিখিয়াছেন—"সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্‌গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্—বহু লোক একত্রে মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণের নাম-রূপ-গুণাদির কীর্ত্তনকে সঙ্কীর্ত্তন বলে।"

এই টীকায় সঙ্কীর্ত্তনের অর্থসম্বন্ধে শ্রীধরস্বামিপাদের এবং শ্রীজীবপাদের উক্তিতে বাস্তবিক বিরোধ কিছু নাই। সম্মিলিতভাবে একত্রে বহু লোকের কীর্ত্তনও স্বামিপাদকথিত ভগবান্নমের উচ্চারণই। বহুলোক মিলিত হইয়া যে স্থানে কীর্ত্তন করেন, সেস্থানে উচ্চকীর্ত্তন হওয়াই সম্ভব এবং তাহা সুর-তাল-লয়-যোগে হওয়াই সম্ভব। "শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ" ইত্যাদি শ্রী ভা ৭।৫।২৩ শ্লোকের টীকায় শ্রীজীব-পাদ উচ্চকীর্ত্তনকেই প্রশস্ত বলিয়াছেন। "নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্।" "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-শ্লোকে বর্ত্তমান কলির উপাসনা সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারের দ্বারাই তাঁহার উপাসনা করিবে। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥" এস্থলে, "সম্মিলিতভাবে বহুলোকের উচ্চকীর্ত্তনই বর্ত্তমান কলির উপাস্য ভগবৎ-স্বরূপের অত্যন্ত প্রীতিপ্রদ"-ইহাই শ্রীজীবপাদের অভিপ্রায় বলিয়া মনে হয়।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১। ২৪১ অনুচ্ছেদেও "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্" শ্লোকটী উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন-"এবমপি কলৌ পূজাতঃ শ্রীমন্নাম সঙ্কীর্ত্তনস্য মাহাত্ম্যমেব সিদ্ধং দ্রব্যশুদ্ধ্যাদেরসম্ভবাৎ লিখিতন্যায়েন মাহাত্ম্যবিশেষাচ্চেতি দিক্।—এইরূপে ইহাও বুঝা গেল যে, কলিতে পূজা অপেক্ষাও নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্যই সিদ্ধ হইতেছে; কেননা, পূজোপকরণ-দ্রব্য সমূহের শুদ্ধি-আদি অসম্ভব, শ্লোকে লিখিত ন্যায় অনুসারেও নামসঙ্কীর্ত্তনের মাহাত্ম্য-বিশেষ (ভগবৎ-প্রীতিজনকত্ব) সিদ্ধ হইতেছে।"

যাহা হউক, উপরের আলোচনা হইতে জানা গেল—সম্যক্‌রূপে উচ্চারণ-পূর্ব্বক কীর্ত্তন, নামের উচ্চারণ, সম্মিলিতভাবে একসঙ্গে বহুলোক-কর্ত্তৃক উচ্চস্বরে কীর্ত্তন-ইত্যাদিই হইতেছে সঙ্কীর্ত্তন-শব্দের তাৎপর্য্য।

কীর্ত্তন, সঙ্কীর্ত্তন এবং নামের যে কোনও ভাবে উচ্চারণ—এ-সমস্ত অর্থেও যে সঙ্কীর্ত্তন-শব্দ ব্যবহৃত হয়, শ্রীশ্রীচৈতন্যচারিতামৃতে শ্রীল হরিদাসঠাকুরের প্রসঙ্গে তাহার প্রমাণ পাওয়া যায়।

শ্রীল হরিদাস যখন যশোহর জেলার অন্তর্গত বেণাপোলের জঙ্গলে নির্জ্জন কুটীরে বসিয়া একাকীই নাম গ্রহণ করিতেছিলেন, তখন একদিন স্থানীয় ভূম্যধিপতি বৈষ্ণববিদ্বেষী রামচন্দ্র-খানের প্রেরিত এক বারবনিতা রাত্রিকালে হরিদাসের নিকটে উপনীত হইলে তিনি সেই বারবনিতাকে বলিয়াছিলেন—"ইঁহা বসি শুন নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।১৩॥" এ-স্থলে হরিদাসের নামগ্রহণকে "সঙ্কীর্ত্তন" বলা হইয়াছে। ইহাকে আবার "কীর্ত্তন"ও বলা হইয়াছে। "কীর্ত্তন করিতে তবে রাত্রি শেষ হৈল॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।২২॥" শান্তিপুরে গঙ্গাতীরের নির্জ্জন গোঁফাতে বসিয়া হরিদাসঠাকুর একাকী যে নাম গ্রহণ করিতেছিলেন. তাহাকেও সঙ্কীর্ত্তনই বলা হইয়াছে। তাঁহার নিকটে উপস্থিত মায়াদেবীকে তিনি বলিয়াছিলেন—"সংখ্যানাম-সঙ্কীর্ত্তন এই মহা যজ্ঞ মন্যে॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।২২ ন।" ইহাকে আবার "কীর্ত্তন"ও বলা হইয়াছে। "কীর্ত্তন-সমাপ্তি হৈলে হয় দীক্ষার বিশ্রাম।। শ্রীচৈ, চ, ৩।৩। ২২৮।" উল্লিখিত উভয়স্থলেই হরিদাস অপরের শ্রুতিগোচর ভাবেই, উচ্চস্বরেই, নাম উচ্চারণ করিতে ছিলেন। তাঁহার নির্যানের প্রাক্‌কালে মহাপ্রভুর অঙ্গ-সেবক গোবিন্দ অন্যদিনের মতন একদিন হরি দাসের আহারের জন্য মহাপ্রসাদ লইয়া গিয়াছিলেন; তখন গোবিন্দ দেখেন—"হরিদাস করিয়াছে শয়ন। মন্দ মন্দ করিতেছে নাম-সঙ্কীর্ত্তন॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।১১।১৬॥" এ-স্থলে "মন্দ মন্দ"-শব্দ হইতে মনে হয়, হরিদাস ঠাকুর উচ্চস্বরে নাম করিতেছিলেন না, তবে স্পষ্ট ভাবে (সম্যক্‌রূপে) উচ্চারণ করিতেছিলেন; তথাপি তাহাকে "নাম-সঙ্কীর্ত্তন" বলা হইয়াছে।

এইরূপে দেখা গেল ভগবন্নামের যে কোনও ভাবের উচ্চারণকেই কীর্ত্তনও বলা হয়, সঙ্কীর্ত্তনও বলা হয়। শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের ন্যায় কেহ একাকী নাম-উচ্চারণ করিলেও তাহাকেও কীর্ত্তন এবং সঙ্কীর্ত্তন বলা হয়।

ঙ। জপ ও জপভেদ

জপ। জপ্‌-ধাতু হইতে জপ-শব্দ নিষ্পন্ন। জপ্‌-ধাতুর অর্থ—"হৃদুচ্চারে॥ বাচি॥ ইতি কবিকল্পদ্রুমঃ॥" জপ-শব্দের অর্থে শব্দকল্পদ্রুম অভিধানে লিখিত হইয়াছে—"মন্ত্রোচ্চারণম্—মন্ত্রের উচ্চারণ।"

এইরূপে জানা গেল—জপ-শব্দের অর্থ হইতেছে উচ্চারণ; জপ্‌-ধাতুর অর্থ বিবেচনা করিলে বুঝা যায়—এই উচ্চারণ মনে মনেও হইতে পারে (হৃদুচ্চারে) এবং উচ্চস্বরেও হইতে পারে (বাচি)।

জপভেদ। উচ্চারণের প্রকারভেদে তিন রকমের জপ আছে—বাচিক, উপাংশু ও মানসিক।

বাচিক জপ। যে জপে উচ্চ, নীচ ও স্বরিত (উদাত্ত, অনুদাত্ত ও স্বরিত)-নামক স্বরযোগে সুপরিস্কৃত অক্ষরে স্পষ্টভাবে মন্ত্র উচ্চারিত হয়, তাহাকে বলে বাচিক জপ। (ইহাতে বুঝা গেল, বাচিক জপ হইতেছে উচ্চকীর্ত্তন)।

যদুচ্চনীচস্বরিতৈঃ স্পষ্টশব্দবদক্ষরৈঃ।
মন্ত্রমুচ্চারয়েদ্‌ব্যক্তং জপযজ্ঞঃ স বাচিকঃ॥ হ, ভ, বি, ১৭।৭৩-ধৃত নারসিংহ-প্রমাণ॥

উপাংশু জপ। যে জপে মন্ত্রটী ধীরে ধীরে উচ্চারিত হয়, ওষ্ঠ কিঞ্চিন্মাত্র চালিত হইতে থাকে এবং মন্ত্রটী কেবল নিজেরই শ্রুতিগোচর হয়, তাহাকে বলে উপাংশু জপ।

শনৈরুচ্চারয়েন্মন্ত্রমীষদোষ্ঠৌ প্রচালয়েৎ।
কিঞ্চিচ্ছব্দং স্বয়ং বিদ্যাদুপাংশুঃ স জপঃ স্মৃতঃ॥ ঐ ঐ ॥৭৪॥

মানস জপ। নিজ বুদ্ধিযোগে মন্ত্রের এক অক্ষর হইতে অন্য অক্ষরের এবং এক পদ হইতে অন্য পদের যে চিন্তন এবং তাহার অর্থের যে চিন্তন, তাহার পুনঃ পুনঃ আবৃত্তিকে বলে মানস জপ।

ধিয়া যদক্ষরশ্রেণ্যা বর্ণাদ্বর্ণং পদাৎ পদম্।
শব্দার্থচিন্তনাভ্যাসঃ স উক্তো মানসো জপঃ॥ ঐ ঐ ॥ ৭৫ ॥

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১।২৪৭-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"বাচিকস্য কীর্ত্তনান্তর্গতত্বাৎ মানসিকস্য স্মরণাত্মকত্বাৎ—বাচিক জপ হইতেছে কীর্ত্তনের অন্তর্গত, মানস জপ স্মরণাত্মক।"

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১১শ বিলাসে শ্রীভগবন্নামের উল্লিখিত তিন রকম জপের মহিমাই কীর্ত্তিত হইয়াছে।

ভগবন্নামের **স্মরণ** (মানসজপ)-সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (২৭৬-অনুচ্ছেদে) লিখিয়াছেন,

"তত্র নামস্মরণম্—'হরের্নাম পরং জপ্যং ধ্যেয়ং গেয়ং নিরন্তরম্। কীর্ত্তনীয়ঞ্চ বহুধা নির্ব্বৃতীর্বহুধেচ্ছতা॥' ইতি জাবালিসংহিতাদ্যনুসারেণ জ্ঞেয়ম্। নাম-স্মরণন্তু শুদ্ধান্তঃকরণতামপেক্ষতে। তৎকীর্ত্তনাচ্চাবরমিতি মূলে তু নোদাহরণস্পষ্টতা॥

—নাম-স্মরণের বিধি জাবালিসংহিতাদি-অনুসারে বুঝিতে হইবে। জাবালিসংহিতা বলেন—'যিনি বহুপ্রকারে আনন্দ-লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সর্ব্বদা শ্রীহরির পর (শ্রেষ্ঠ) নাম জপ করিবেন, ধ্যান করিবেন, গান করিবেন এবং কীর্ত্তন করিবেন।'

(তাৎপর্য্য এই যে—"শ্রীহরিনামের জপে এক রকম আনন্দ, ধ্যান বা স্মরণে আর এক রকমের আনন্দ, গানে অন্য এক রকমের আনন্দ এবং কীর্ত্তনে অপর এক রকমের আনন্দ। একই হরিনামকে নানাভাবে আস্বাদন করা যায়)। নাম-স্মরণ কিন্তু শুদ্ধান্তঃকরণের অপেক্ষা রাখে, অর্থাৎ চিত্ত শুদ্ধ না হইলে নাম-স্মরণের আনন্দ পাওয়া যায় না। এজন্য, কীর্ত্তন হইতে স্মরণ ন্যূন (অর্থাৎ দুর্ব্বল। কীর্ত্তন চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা রাখে না বলিয়া স্মরণ হইতে অধিক মহিমাসম্পন্ন)। মূলে কিন্তু এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোনও উদাহরণ নাই।"

ইহা হইতে জানা গেল—নামের স্মরণ চিত্তশুদ্ধির অপেক্ষা রাখে বলিয়া সকলের পক্ষে সহজসাধ্য নহে।

চ। উচ্চকীর্ত্তনের মহিমা।

"শ্রবণং কীর্ত্তনং বিষ্ণোঃ"-ইত্যাদি শ্রীভা, ৭।৫।২৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—নামকীর্ত্তন উচ্চৈঃস্বরে করাই প্রশস্ত। "নামকীর্ত্তনঞ্চেদমুচ্চৈরেব প্রশস্তম্।" পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ড বলিয়াছেন—"হরেরগ্রে স্বরৈরুচ্চৈর্নৃত্যংস্তন্নামকৃন্নরঃ ॥ ২৪।১৩ ॥" এই বাক্য হইতে শ্রীহরির অগ্রভাগে নৃত্য করিতে করিতে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তনের বিধান দৃষ্ট হয়। সেই পুরাণ আরও বলিয়াছেন—"হরেঃ প্রদক্ষিণং কুর্ব্বন্নুচ্চৈস্তন্নামকৃন্নরঃ। করতালাদি-সন্ধানং সুস্বরং কলশব্দিতম্ ॥২৪।১৫॥" এস্থলে-করতালাদি সহযোগে সুমধুর স্বরে উচ্চৈঃস্বরে নামকীর্ত্তন করিতে করিতে শ্রীহরির প্রদক্ষিণ করার বিধান পাওয়া গেল। ষোলনাম বত্রিশাক্ষর তারকব্রহ্ম-নাম সম্বন্ধে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তর খণ্ড বলেন—"নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে ৬।৫৯ ॥—নামসঙ্কীর্ত্তন হইতেই তারক-ব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়।" সঙ্কীর্ত্তন শব্দের অর্থ—বহুলোক মিলিত হইয়া কৃষ্ণসুখকর গান (শ্রীজীব)। বহুলোক মিলিত হইয়া যে কীর্ত্তন করে, তাহা উচ্চকীর্ত্তনই হইবে।

গোপীপ্রেমামৃতের একাদশ পটলে আছে—"হরিনাম্নো জপাৎ সিদ্ধি র্জপাদ্ ধ্যানং বিশিষ্যতে। ধ্যানাদ্ গানং ভবেচ্ছে য়ঃ গানাৎ পরতরং ন হি ॥—হরিনামের জপে সিদ্ধি লাভ হয় ; জপ অপেক্ষা ধ্যানের বিশেষত্ব আছে ; ধ্যান অপেক্ষা গান শ্রেষ্ঠ ; গান অপেক্ষা উৎকৃষ্ট কিছু নাই।" গানই উচ্চসঙ্কীর্ত্তন। এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে উচ্চকীর্ত্তনের মহিমাধিক্যের কথাই জানা গেল।

শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃত-গ্রন্থের দ্বিতীয় খণ্ডের তৃতীয় অধ্যায়ে বলা হইয়াছে—জীবের চঞ্চল চিত্তে ভগবৎ-স্মৃতি সম্যক্‌রূপে সিদ্ধ হয় না ; চিত্ত স্থির হইলেই ভগবৎ-স্মৃতি প্রবর্ত্তিত হইতে পারে, স্মৃতির ফলও পাওয়া যাইতে পারে ; সুতরাং স্মরণ-সিদ্ধির জন্য চিত্তকে সংযত করা দরকার। কিন্তু চিত্তকে সংযত করিতে হইলে বাগিন্দ্রিয়কে সংযত করার প্রয়োজন ; কেননা, বাগিন্দ্রিয়ই হইল সমস্ত বহিরিন্দ্রিয়ের এবং চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয়ের চালক। সুতরাং বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত বহিরিন্দ্রিয় ও চিত্তাদি অন্তরিন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে।

> বাহ্যান্তরাশেষ-হৃষীকচালকং বাগিন্দ্রিয়ং স্যাদ্ যদি সংযতং সদা।
> চিত্তং স্থিরং সদ্ ভগবৎস্মৃতৌ তদা সম্যক্ প্রবর্ত্তেত ততঃ স্মৃতিঃ ফলম্ ॥
>
> —বৃহদ্ভাগবতামৃতম্ ॥ ২।৩।১৪৯ ॥

কিন্তু বাগিন্দ্রিয়কে সংযত করিতে হইলে নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রয়োজন। যেহেতু, নামসঙ্কীর্ত্তন বাগিন্দ্রিয়ে নৃত্য করিয়া তাহাকে সংযত করে, সঙ্গে সঙ্গে চিত্তমধ্যে বিহার করিয়া চিত্তকেও সংযত করে। আবার কীর্ত্তনধ্বনি কীর্ত্তনকারীর শ্রবণেন্দ্রিয়কেও কৃতার্থ করিয়া থাকে এবং নিজের ন্যায় অপরেরও (কীর্ত্তন-শ্রোতারও) উপকার করিয়া থাকে। এইরূপে দেখা যায়, নাম-সঙ্কীর্ত্তনই হইতেছে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেম লাভের উত্তম অন্তরঙ্গ সাধন। যাঁহারা মনে করেন—লীলাস্মরণই অন্তরঙ্গ সাধন, কিন্তু কীর্ত্তন নহে, তাঁহাদের পক্ষেও বস্তুতঃ নাম-সঙ্কীর্ত্তনই উত্তম সাধন ; কেননা, চিত্ত স্থির

না হইলে স্মরণ সম্ভবপর হয় না। এবং চিত্ত-স্থৈর্য্যের জন্য নামসঙ্কীর্ত্তনেরই প্রয়োজন।

প্রেম্ণোঽন্তরঙ্গং কিল সাধনোত্তমং মন্যেত কৈশ্চিৎ স্মরণং ন কীর্ত্তনম্।
একেন্দ্রিয়ে বাচি বিচেতনে সুখং ভক্তিঃ স্ফুরত্যাশু হি কীর্ত্তনাত্মিকা॥
ভক্তিঃ প্রকৃষ্টা স্মরণাত্মিকাস্মিন্ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণামধিপে বিলোলে।
ঘোরে বলিষ্ঠে মনসি প্রয়াসৈর্নীতে বশং ভাতি বিশোধিতে যা।
মন্যামহে কীর্ত্তনমেব সত্তমং লীলাত্মকৈকস্বহৃদি স্ফুরৎস্মৃতেঃ।
বাচি স্বযুক্তে মনসি শ্রুতৌ তথা দীব্যৎ পরানপ্যুপকুর্ব্বদাত্মবৎ॥

—বৃহদ্ভাগবতামৃতম্॥ ২।৩।১৪৬-৪৮॥

এ-স্থলে উচ্চ-কীর্ত্তনের কথাই বলা হইয়াছে—যাহা নিজেরও শ্রুতিগোচর হয় এবং অপরেরও শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে।

আবার নামামৃত একটী ইন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূত হইয়া স্বীয় মধুর-রসে সমস্ত ইন্দ্রিয়কেই সম্যক্রূপে প্লাবিত করিয়া থাকে।

একস্মিন্নিন্দ্রিয়ে প্রাদুর্ভূতং নামামৃতং রসৈঃ।
আপ্লাবয়তি সর্ব্বাণীন্দ্রিয়াণি মধুরৈ র্নিজৈঃ॥—বৃহদ্ভাগবতামৃতম্॥ ২।৩।১৬২॥

এইরূপে দেখা গেল, বৃহদ্ভাগবতামৃতের মতেও উচ্চ-সঙ্কীর্ত্তনেরই মাহাত্ম্য অধিক।

বাগিন্দ্রিয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক

উল্লিখিত বৃহদ্ভাগবতামৃতের প্রমাণে বলা হইয়াছে, বাগিন্দ্রিয়ই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের চালক। এই প্রসঙ্গে শ্রীল গৌরগোবিন্দ ভাগবতস্বামিমহোদয় তাঁহার "সাধন-কুসুমাঞ্জলি"-গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, তাহা এস্থলে উদ্ধৃত হইতেছে :—

"অগ্নির্ব্বৈ বাগ্ভূত্বা প্রাবিশৎ"-এই একটী শ্রুতিবাক্য আছে। এই শ্রুতির অর্থ এই যে, জীবের মনুষ্যাদি দেহে যে বাগিন্দ্রিয়টী আছে, তাহা অগ্নিই। এই বাক্রূপী অগ্নি শারীরিক প্রাণাগ্নিরই অংশ। আমাদের বাগিন্দ্রিয়-ব্যাপারে প্রাণশক্তিরই প্রধান ক্রিয়া প্রকাশ পায়। বাগ্বিশৃঙ্খলায় অর্থাৎ অপরিমিত বাক্চালনায় শরীর যেমন দুর্ব্বল হয়, মন যত বিক্ষিপ্ত হয় এবং প্রাণের গতি অসমান ও অস্বাভাবিক হওয়ায় যত বিশৃঙ্খলা হয়, তত দুর্ব্বল, বিক্ষিপ্ত এবং বিশৃঙ্খল অন্য কাহারও চালনায় সহজে হয় না। আবার এই অগ্নিরূপী বাগিন্দ্রিয়ের যথাযোগ্য পরিচালনা দ্বারাই প্রাণের অসমান গতি রহিত হইয়া স্বাভাবিক শৃঙ্খলতা প্রাপ্তি হয়। বাচিক জপদ্বারা ক্রমশঃ বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি পুষ্টিলাভ করিয়া প্রাণশক্তিকেই বৰ্দ্ধিত করে। এই অভিপ্রায়ে যোগসাধনের মধ্যে প্রথমেই "যম"-নামক সাধনে মৌনাবলম্বনটী বিহিত হইয়াছে। মৌনাবলম্বনে প্রাণাগ্নির ক্রিয়া বৰ্দ্ধিত হয়।**। কিন্তু শুদ্ধ মৌনব্রত হইতেও বাচিক জপ অধিকতর শ্রেয়ঃ এবং প্রাণের অত্যধিক হিতকর। শুদ্ধ মৌনব্রতে কেবলমাত্র বাগিন্দ্রিয়ের ব্যয় রহিত হয় বটে; কিন্তু এই প্রকার মৌনে ক্রমশঃ প্রাণাগ্নি বৰ্দ্ধিত হইলেও

উপযুক্ত আহার্য্য না পাইয়া স্বচ্ছ উজ্জ্বল হইতে পারে না। এইজন্য যোগশাস্ত্রে অষ্টাঙ্গ-যোগ-সাধনার মধ্যে "নিয়ম"-নামক সাধনের মধ্যে "স্বাধ্যায়" এবং জপের দ্বারা পরিমিত বাগিন্দ্রিয়-চালনার ব্যবস্থা বিহিত হইয়াছে। জপই সর্ব্বোৎকৃষ্ট স্বাধ্যায়। জপই প্রাণাগ্নির পুষ্টিকর আহার্য্য। * * ঈষদুচ্চারিত জপের দ্বারা প্রাণাগ্নিতে যথাসাধ্য পরিমিত আহুতি দানের কার্য্য হইতে থাকায়, সেই প্রাণাগ্নি হ্রাস পাইতে পারে না, বরং পরিমিত আহুতি পাইয়া অগ্নি যেমন উজ্জ্বল বীর্য্যশালী হয়, সাধকের প্রাণাগ্নিও তেমন উজ্জ্বল বীর্য্যশালী হইয়া উঠিতে থাকে। (৮৬-৮৭ পৃঃ)।

প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে ব্যাপিয়া আছে। বাক্, চক্ষু, শ্রোত্র, ঘ্রাণ, হস্ত-পদাদি ইন্দ্রিয়-সমূহের বৃত্তি অর্থাৎ স্থিতি-ব্যাপারাদি এক প্রাণেরই অধীন। "প্রাণো হ্যেবেতানি সর্ব্বাণি ভবতি"—এই শ্রুতির প্রমাণে সমস্ত ইন্দ্রিয় প্রাণই। বাচিক জপ দ্বারা প্রাণাগ্নিরই সাধন হয়; ফলে যাবতীয় ইন্দ্রিয়ের স্থিতি-ব্যাপারাদির উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খল গতি তিরোহিত হইয়া সমস্ত কেন্দ্রগত হইতে থাকে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়বর্গ স্বচ্ছ হইয়া স্বাভাবিক গতিতে মনের সহিত স্থিত হয় এবং প্রাণের অনুগতই হয়। ৮৭ পৃঃ।"

উল্লিখিত বিবরণ হইতে বুঝা গেল—প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়ের ব্যাপারকে ব্যাপিয়া আছে; বাগিন্দ্রিয়ও সেই প্রাণাগ্নিরই অংশ; আবার বাগিন্দ্রিয়ের ব্যাপারেই প্রাণশক্তির ক্রিয়া প্রধানরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকে। সুতরাং এই বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি (তেজঃ বা শক্তি) সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুষ্টিলাভ করিলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুষ্টিলাভ করিতে পারে; বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি অসংযত ও বিশৃঙ্খল হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও তদ্রূপ হইবে; যেহেতু, এক প্রাণাগ্নিই সমস্ত ইন্দ্রিয়কে ব্যাপিয়া আছে; এই অগ্নির প্রধান ক্রিয়াস্থল বাগিন্দ্রিয় হইতে এই অগ্নি যে রূপ লইয়া বিকশিত হইবে, অন্যান্য ইন্দ্রিয়কেও তদনুরূপ ভাবেই প্রভাবান্বিত এবং পরিচালিত করিবে। এজন্য বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নিকেই অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থিত অগ্নির পরিচালক এবং তজ্জন্য বাগিন্দ্রিয়কেও অন্যান্য ইন্দ্রিয়ের পরিচালক বলা যায়। সুতরাং এই বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলেই সমস্ত ইন্দ্রিয় সংযত হইতে পারে।

উল্লিখিত বিবরণ হইতে ইহাও জানা গেল—বাচিক জপের (অর্থাৎ উচ্চকীর্ত্তনের) দ্বারাই বাগিন্দ্রিয়স্থ অগ্নি সংযত ও সুশৃঙ্খল ভাবে পুষ্টিলাভ করিয়া থাকে; সুতরাং ঐ বাচিক জপের দ্বারা অন্যান্য ইন্দ্রিয়স্থ অগ্নিও পুষ্টিলাভ করিতে পারে। এইরূপে দেখা গেল, বাগিন্দ্রিয় সংযত হইলে অন্যান্য ইন্দ্রিয়ও সংযত হইতে পারে। বাচিক জপ বা উচ্চ-কীর্ত্তনই তাহার শ্রেষ্ঠ উপায়।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতেও জানা যায়—শ্রীল হরিদাস ঠাকুরও উচ্চৈঃস্বরে নাম-কীর্ত্তন করিতেন। শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর বিরচিত স্তবমালা হইতে জানা যায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভুও উচ্চস্বরেই তারকব্রহ্ম হরিনাম কীর্ত্তন করিতেন। "হরেকৃষ্ণেত্যুচ্চৈঃ স্ফুরিতরসনঃ-ইত্যাদি॥ শ্রীশ্রীচৈতন্যদেবস্য

প্রথমাষ্টকম্॥ ৫॥" ইহার টীকায় শ্রীপাদ বলদেব বিদ্যাভূষণ লিখিয়াছেন—"হরেকৃষ্ণেতি মন্ত্রপ্রতীকগ্রহণম্। ষোড়শনামাত্মনা দ্বাত্রিংশদক্ষরেণ মন্ত্রেণ উচ্চৈরুচ্চারিতেন স্ফুরিতা কৃতনৃত্যা রসনা জিহ্বা যস্য সঃ।" এই টীকা হইতে জানা যায়, শ্রীমন্ মহাপ্রভু ষোলনাম-বত্রিশ অক্ষর তারকব্রহ্ম নামই উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিতেন।

উচ্চস্বরে নাম-উচ্চারণরূপ কীর্ত্তনে অপরের সেবা করাও হয়। স্থাবর-জঙ্গমাদি তাহা শুনিয়া বা নামের স্পর্শ পাইয়া ধন্য হইতে পারে—ইহাই কীর্ত্তনকারীর পক্ষে তাহাদের সেবা। প্রহ্লাদও বলিয়াছেন—"তে সন্তঃ সর্ব্বভূতানাং নিরুপাধিকবান্ধবাঃ। যে নৃসিংহ ভবন্নাম গায়ন্ত্যুচ্চৈর্মুদান্বিতাঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৬৮ধৃত-নারসিংহ-প্রমাণ। –হে নৃসিংহ! যাঁহারা আনন্দের সহিত উচ্চৈঃস্বরে তোমার নাম গান করেন, তাঁহারাই সর্ব্বজীবের নিরুপাধিক (অকপট এবং নিঃস্বার্থ) বান্ধব।" অধিকন্তু, উচ্চস্বরে উচ্চারিত নাম উচ্চারণকারীর নিজের কর্ণেও প্রবেশ করিতে পারে এবং তাহাতে অন্য স্বর কর্ণে প্রবেশ করিবার পক্ষে বাধা জন্মাইতে পারে, তাঁহার চিত্তেও প্রভাব বিস্তার করিতে পারে, জিহ্বাকেও সংযত করিতে পারে। শ্রীবৃহদ্ভাগবতামৃতও তাহাই বলিয়াছেন (পূর্ব্বোদ্ধৃত প্রমাণ দ্রষ্টব্য)।

এক সময়ে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীলহরিদাস ঠাকুরকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"পৃথিবীতে বহু জীব স্থাবর-জঙ্গম। ইহা সভার কি প্রকারে হইবে মোচন॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।৬২॥" তখন শ্রীল হরিদাস বলিয়াছিলেন—

"* * * * * প্রভু, যাতে এ কৃপা তোমার। স্থাবর-জঙ্গমের প্রথম করিয়াছ নিস্তার॥
তুমি যেই করিয়াছ উচ্চ সঙ্কীর্ত্তন। স্থাবর-জঙ্গমের সেই হয় ত শ্রবণ॥
শুনিতেই জঙ্গমের হয় সংসারক্ষয়। স্থাবরে সে শব্দলাগে—তাতে প্রতিধ্বনি হয়॥
প্রতিধ্বনি নহে সেই করয়ে কীর্ত্তন। তোমার কৃপায় এই অকথ্য কথন॥

—শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।৬৩-৬৬॥"

শ্রীল হরিদাস ঠাকুরের উক্তির তাৎপর্য্য এই। কেহ যদি উচ্চস্বরে ভগবানের নাম কীর্ত্তন করেন, তাহা হইলে, যাহাদের শ্রবণশক্তি আছে, পশু-পক্ষী-আদি এতাদৃশ জঙ্গম জীবগণ তাহা শুনিতে পায়; তাহাতেই তাহাদের সংসার-বন্ধন ক্ষয় প্রাপ্ত হয়। আর বৃক্ষ-লতাদি যে সমস্ত স্থাবর প্রাণীর শ্রবণ-শক্তি নাই বলিয়া লোকে মনে করে, তাহারা ঐ নাম শুনিতে পায়না বটে; কিন্তু তাহাদের দেহেও উচ্চস্বরে কীর্ত্তিত নামের ধ্বনির স্পর্শ হয়; তাহার ফলে স্থাবরের দেহেও সেই নাম উচ্চারিত হয় এবং তাহার প্রতিধ্বনিও হয়। সেই প্রতিধ্বনি বস্তুতঃ স্থাবরকর্ত্তৃক নামের কীর্ত্তনই। তাহাতেই স্থাবর উদ্ধার প্রাপ্ত হইতে পারে। স্থাবরের দেহে কিরূপে নাম উচ্চারিত হইতে পারে, তাহা বিবেচিত হইতেছে।

আধুনিক জড় বিজ্ঞান বলে যে, শব্দ-সমূহ শব্দায়মান বস্তুর স্পন্দনের ফল। প্রতি পলে বা বিপলে কতকগুলি কম্পন হইলে কি শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহাও বিজ্ঞান-শাস্ত্র নির্দ্ধারিত করিয়াছে।

পুকুরের মধ্যে একটী ঢিল ছুড়িলে ঢিলের আঘাতে জলের মধ্যে কম্পন উপস্থিত হয়; এই কম্পন আঘাতস্থান হইতে চারিদিকে সঞ্চারিত হইতে থাকে; ইহার ফলেই জলের মধ্যে তরঙ্গ উদ্ভূত হয়; সেই তরঙ্গ যাইয়া তীরে আঘাত করিলে তীরেও একটা শব্দ উৎপাদিত হইয়া থাকে। তদ্রূপ, জিহ্বার আলোড়নে মুখগহ্বরস্থ বায়ুরাশি আলোড়িত হইতে থাকে; এই আলোড়ন বাহিরে বায়ুরাশিতে সঞ্চারিত হইয়া তাহাকে তরঙ্গায়িত করে। পুকুরস্থিত জলের তরঙ্গের ন্যায় বায়ুরাশির এই তরঙ্গ সঞ্চারিত হইয়া যখন আমাদের কর্ণ-পটহে আহত হয়, তখন ঐ পটহও তরঙ্গায়িত বা স্পন্দিত হইতে থাকে, এবং জিহ্বার আলোড়নে প্রতি পলে যতগুলি স্পন্দন হইয়াছিল, কর্ণপটহেও ততগুলি স্পন্দন হয়, তাহাতেই জিহ্বায় উচ্চারিত শব্দটী আমরা শুনিতে পাই; কর্ণপটহের স্পন্দনের ফলে তাহা আমাদের কর্ণে উচ্চারিত হয়। এইরূপে উচ্চ সঙ্কীর্ত্তনে ভগবন্নামের উচ্চারণে বায়ুমণ্ডলে যে স্পন্দন উপস্থিত হয়, তাহা স্থাবরাদির গাত্রে সংলগ্ন হইয়া স্থাবরাদিকেও অনুরূপ ভাবে স্পন্দিত করিতে থাকে; তখন স্থাবরাদির মধ্যেও অনুরূপ স্পন্দনেব ফলে ঐ নাম উচ্চারিত হইতে থাকে। এই উচ্চারণের ফলেই স্থারবাদির মুক্তি হয়।

প্রশ্ন হইতে পারে, স্থাবরাদির মধ্যে যদি অনুরূপ স্পন্দনই হয় এবং তাহার ফলে স্থাবরাদির দেহে যদি নাম উচ্চারিতই হয়, তাহা হইলে স্থাবরাদির দেহোচ্চারিত নাম নিকটবর্ত্তী লোক শুনিতে পায় না কেন? ইহার দুইটী কারণঃ—প্রথমতঃ, উৎপত্তিস্থান হইতে যতই দূরে যাইবে, ততই বায়ুমণ্ডলের তরঙ্গের তীব্রতা ক্ষীণ হইতে থাকিবে, দ্বিতীয়তঃ, স্পন্দনের তীব্রতা আহত স্থানের প্রকৃতির উপর নির্ভর করে; মানুষের কর্ণপটহ যেরূপ সূক্ষ্ম ও কোমল, স্থাবর-দেহ তেমন নহে; তাই, স্থাবর-দেহের স্পন্দন মানুষের অনুভূতির যোগ্য নহে। এজন্য তাহাদের ক্ষীণ শব্দ মানুষ শুনিতে পায় না; কিন্তু স্পন্দন হয়, ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য।

উচ্চ পাহাড়ের নিকটে কোনও শব্দ উচ্চারণ করিলে বায়ুমণ্ডলে যে তরঙ্গ উপস্থিত হয়, তাহা পাহাড়ের গাত্রে আহত হইয়া কিছু অংশ পাহাড়ের মধ্যে প্রবেশ করিয়া পাহাড়কে মৃদুভাবে তরঙ্গায়িত করে এবং বাকী অংশ পাহাড়ের গাত্রে প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে (যেমন পাহাড়ের গায়ে একটা ঢিল ছুড়িলে তাহা প্রতিহত হইয়া ফিরিয়া আসে) এবং উচ্চারণকারীর বা নিকটবর্ত্তী লোক-সমূহের কর্ণ-পটহে প্রবেশ করিয়া অনুরূপ শব্দ উচ্চারিত করে—ইহাই প্রতিধ্বনি। পাহাড় কেন, যে কোনও বস্তুতে প্রতিহত হইয়াই শব্দতরঙ্গ এই ভাবে প্রতি-শব্দ বা প্রতিধ্বনি উৎপাদিত করিতে পারে। ইহা বৈজ্ঞানিক সত্য। স্থাবর-দেহ হইতে এইরূপে ভগবন্নামের যে প্রতিধ্বনি হয়, তাহার কথাই এস্থলে বলা হইয়াছে। বৃহদ্‌বস্তুতে প্রতিধ্বনি যেরূপ স্পষ্টরূপে শুনা যায়, ক্ষুদ্র বস্তুতে তত স্পষ্ট শুনা যায় না। ইহার কারণ, প্রতিহত তরঙ্গের অল্পতা ও ক্ষীণতা।

স্থাবর-দেহ হইতে প্রতিহত শব্দতরঙ্গদ্বারা যে প্রতিধ্বনি হয়, তাহাকেই হরিদাস-ঠাকুর স্থাবরাদির কীর্ত্তন বলিয়াছেন। ইহা কেবল উৎপ্রেক্ষা মাত্র নহে, ইহাও বৈজ্ঞানিক সত্য। প্রতিধ্বনি দ্বারাই বুঝা যায়, স্থাবর-দেহে, উচ্চারণ-স্থানের অনুরূপ স্পন্দন-সমূহ আহত হইয়াছে; এইরূপে আহত

হইলে স্থাবর-দেহেও ঐ (ভগবন্নামের) শব্দ উচ্চারিত হইবে। সুতরাং প্রতিধ্বনিদ্বারাই সূচিত হইতেছে যে, স্থাবর-দেহে ঐ নাম উচ্চারিত হইতেছে।

মানুষ যে নামের উচ্চারণ করে, তাহাও মানুষের অঙ্গবিশেষের (জিহ্বার) স্পন্দন মাত্র। স্থাবর-দেহের স্পন্দনও স্থাবরকর্তৃক উচ্চারিত নামই।

১০০। দীক্ষামন্ত্রের জপ ও সংখ্যারক্ষণ

দীক্ষামন্ত্রের পুরশ্চরণ-প্রসঙ্গে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস—মালাতে, কিম্বা অঙ্গুলিপর্ব্বে সংখ্যারক্ষণ-পূর্ব্বক দীক্ষামন্ত্রজপের আবশ্যকতার কথা বলিয়াছেন এবং ব্যাসস্মৃতির প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া ইহাও বলিয়াছেন যে, অসংখ্যাত (সংখ্যাহীন) জপ নিষ্ফল হইয়া থাকে।

"অসংখ্যাতঞ্চ যজ্জপ্তং তৎ সর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥ হ, ভ, বি, ১৭।৬০-ধৃত বাসস্মৃতি-প্রমাণ।"

অন্যত্র কিন্তু অন্যরূপ বিধানও দৃষ্ট হয়। যথা,

"ন দোষো মানসে জপ্যে সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা। জপনিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ ॥
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্ বাপি। মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদাভ্যসেৎ ॥
— হ, ভ, বি, ১৭।৭৮-৯-ধৃত মন্ত্রার্ণব-প্রমাণ ॥

—হে দ্বিজশ্রেষ্ঠগণ! সর্ব্বত্র এবং সর্ব্বদাই মানস জপ হইতে পারে, তাহাতে দোষ নাই। জপনিষ্ঠ ব্যক্তি সর্ব্বযজ্ঞফল লাভ করিতে পারেন। অপবিত্র বা পবিত্র অবস্থাতেই হউক, কিম্বা গমন করিতে করিতে, দণ্ডায়মান হইয়া বা শয়ান অবস্থাতেই হউক, মন্ত্রৈকশরণ (যিনি একমাত্র মন্ত্রেরই শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাদৃশ) বিদ্বান্ ব্যক্তি মনে মনে সর্ব্বদাই মন্ত্রের অভ্যাস (আবৃত্তি) করিবেন।"

টীকায় "মন্ত্রৈকশরণঃ"-শব্দের প্রসঙ্গে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"মন্ত্রৈকশরণ ইত্যনেন পুরশ্চরণাদিপরস্তু যথোক্ত-দেশকালাদাবেবাভ্যসেদিত্যভিপ্রেতম্।—যিনি পুরশ্চরণাদিপরায়ণ, তিনি শাস্ত্রোক্ত দেশ-কালাদিতেই অভ্যাস (আবৃত্তি) করিবেন, ইহাই অভিপ্রায়।" এ-স্থলে টীকাস্থ "পুরশ্চরণাদি"-শব্দের অন্তর্গত "আদি"-শব্দে অন্য কোনও ফল (আত্মরক্ষা, পাপক্ষয়, স্বর্গাদি-লোকের সুখভোগ, মোক্ষপ্রাপ্তি প্রভৃতি) বুঝাইতেছে বলিয়া মনে হয়। কেননা, ত্রৈলোক্যসম্মোহন-তন্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের ১৭।৮৭-শ্লোকে বলা হইয়াছে, বিংশতিবার মন্ত্র জপ করিলে আত্মরক্ষা হয়, শতবার জপে দিনের পাপ ক্ষয় হয়, সহস্রবার ও অযুতবার জপে মহাপাতকের ক্ষয় হয়, লক্ষ জপে সুরপুরে দেববৎ আনন্দ-ভোগ প্রাপ্ত হওয়া যায়, এবং কোটি জপে মোক্ষ লাভ হয়। আবার ইহাও বলা হইয়াছে যে, চিত্তসংযমপূর্ব্বক যিনি অহোরাত্র মন্ত্র জপ করেন, তিনি নিঃসন্দেহে গোপবেশধারী শ্রীকৃষ্ণের দর্শন লাভ করেন। "অহর্নিশং জপেদ্‌যস্তু মন্ত্রী নিয়তমানসঃ। স পশ্যতি নিঃসন্দেহো গোপবেশধরং হরিম্ ॥ হ, ভ, বি, ১৭।৮৭ ॥"

এই টীকার তাৎপর্য্য হইতে বুঝা যায়, যিনি মন্ত্রসিদ্ধির উদ্দেশ্যে, কিম্বা পূর্ব্বোল্লিখিত অন্য কোনও উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য মন্ত্র জপ করিবেন, তাঁহাকে শাস্ত্রবিহিত দেশকালাদির অপেক্ষা রাখিতে হইবে। তাদৃশ ব্যক্তি মন্ত্রৈকশরণ নহেন। যিনি মন্ত্রৈকশরণ, তিনি সকল সময়ে, সকল স্থানে (স্থানের পবিত্রতা-অপবিত্রাদি বিচার না করিয়াও), সকল অবস্থায় (শুচি বা অশুচি অবস্থাতেও), চলা-ফেরার সময়েও, এমন কি শয়ান অবস্থাতেও মানস জপ করিতে পারেন, তাহাতে কোনও দোষ হয় না। ইহাতে অসংখ্যাতজপের কথাই বলা হইয়াছে ; কেননা, সর্ব্বদেশকাল-দশাদিতে সংখ্যা-রক্ষণপূর্ব্বক জপ করা সম্ভব নয় ; মলমূত্রত্যাগ-কালে, কিম্বা আহারাদির সময়ে সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নহে। "অহর্নিশং জপেদ্ যস্তু"-ইত্যাদি যে শ্লোকটী (হ, ভ, বি, ১৭।৮৭-শ্লোক) পূর্ব্বে উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতেও অহর্নিশি জপের কথা এবং তাদৃশ জপে গোপবেশ-শ্রীকৃষ্ণের দর্শন প্রাপ্তির কথাও বলা হইয়াছে। অহর্নিশি জপেও সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নয়। ইহাতেও অসংখ্যাত জপের কথা জানা গেল।

ব্যাসস্মৃতির প্রমাণে বলা হইল—অসংখ্যাত জপ নিষ্ফল হয় ; আবার, মন্ত্রার্ণবের প্রমাণে অসংখ্যাত মানস-জপের দোষহীনতার কথা এবং ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রের প্রমাণে অহর্নিশি অসংখ্যাত জপের ফলে শ্রীকৃষ্ণদর্শন-প্রাপ্তিরূপ মহাফলের কথাও বলা হইল। ইহার সমাধান কি ?

সমাধান বোধহয় এইরূপ। যাঁহারা কোনও ফলপ্রাপ্তির (পুরশ্চরণ-সিদ্ধি-আদির) উদ্দেশ্যে মন্ত্র জপ করিবেন, তাঁহাদের পক্ষে দেশকালাদির অপেক্ষা এবং সংখ্যারক্ষণ অবশ্যকর্ত্তব্য ; তাঁহাদের অসংখ্যাত জপ নিষ্ফল হইবে, অসংখ্যাত জপে তাঁহারা অভীষ্ট ফল পাইবেন না। কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ কোনও ফলের আকাঙ্ক্ষা করেন না, মন্ত্রদেবতার দর্শনাদির জন্য, শ্রীকৃষ্ণদর্শনের জন্যই, যাঁহারা একমাত্র মন্ত্রের শরণ গ্রহণ করিয়াছেন, তাঁহারা দেশকালাদির অপেক্ষা না রাখিয়া অহর্নিশি অসংখ্যাত জপ করিতে পারেন।

আরও একটী কথা বিবেচ্য। মন্ত্রার্ণবে লিখিত হইয়াছে—

"পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ। সৌষুম্নাধ্বন্যুচ্চারিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি হি ॥

হ, র, বি, ১৭।৭৬-ধৃত মন্ত্রার্ণব-প্রমাণ ॥

—কেবলমাত্র বর্ণরূপী (অক্ষরাত্মক) মন্ত্র পশুভাবে (অনুদ্ভূতশক্তিকভাবে) অবস্থিত। যদি উহা সুষুম্নানাড়ীর রন্ধ্রপথে সমুচ্চারিত হয়, তাহা হইলে শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।" (প্রভুত্বম্-সামর্থ্যম্। টীকায় শ্রীপাদ সনাতন)।

এই সঙ্গেই দেশকালাদি-নিরপেক্ষভাবে মানস জপের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে বুঝা যায়, মন্ত্রশক্তি উদ্বুদ্ধ করার জন্য মন্ত্রৈকশরণের পক্ষে দেশকালাদির অপেক্ষা না রাখিয়া অসংখ্যাত মানস জপ দোষের নহে :

মন্ত্রবিষয়ে মানস জপই প্রশস্ত। "উপাংশুজপযুক্তস্য তস্মাচ্ছতগুণো ভবেৎ। সহস্রো মানসঃ প্রোক্তো যস্মাদ্ধ্যানসমো হি সঃ ॥ হ, ভ, বি, ১৭।৭৬-ধৃত যাজ্ঞবল্ক্যবচন ॥—বাচিক জপ হইতে

উপাংশু জপ শতগুণে এবং মানস জপ সহস্রগুণে প্রধান ; কেননা, মানস জপ ধ্যানের তুল্য।” পুরশ্চরণ-প্রসঙ্গে এই প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। (তস্মাৎ “স্যাদ্বাচিকজপাচ্ছতগুণো ভবেদিতর্থঃ।” শ্রীপাদ সনাতন॥)

মন্ত্রার্ণবও বলেন—“গুরুং প্রকাশয়েদ্ বিদ্বান্ মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ॥ হ, ভ, বি, ১৭।৫৭-ধৃত মন্ত্রার্ণব-প্রমাণ॥—বরং গুরুকে প্রকাশ করিবে, তথাপি মন্ত্র প্রকাশ করা সুধীব্যক্তির কর্ত্তব্য নহে।”

ইহা হইতে জানা গেল, অপরে যাহাতে শুনিতে না পায়, এমন ভাবেই মন্ত্র জপ করা সঙ্গত। ইহাই মানসজপ।

সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক মন্ত্রজপ। যাহাহউক, পূর্ব্বোক্ত আলোচনা হইতে জানা গেল—মন্ত্রার্ণবের মতে মন্ত্রৈকশরণের পক্ষে এবং ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্রের মতে সংযতচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অসংখ্যাত মন্ত্রজপ দোষের নহে। কেবল যে দোষহীন, তাহা নহে, ত্রৈলোক্যসম্মোহনতন্ত্র যখন বলিয়াছেন যে, সংযতচিত্ত-ব্যক্তি অহর্নিশ (অর্থাৎ অসংখ্যাত) মন্ত্র জপ করিলে গোপবেশধর (ব্রজেন্দ্রনন্দন) শ্রীকৃষ্ণের দর্শন-রূপ পরমপুরুষার্থ লাভ করিতে পারেন, তখন বুঝা যায়, এতাদৃশ জপ অবশ্যকর্ত্তব্যও। যদ্দ্বারা পরম-পুরুষার্থ লাভ হইতে পারে, তাহা যে অবশ্যকর্ত্তব্য, ইহাতে সন্দেহ থাকিতে পারে না।

কিন্তু মন্ত্রৈকশরণ বা সংযতচিত্ত হওয়া সহজ ব্যাপার নহে। মন্ত্রৈকশরণ বা সংযতচিত্ত হওয়ার জন্যও উপায় অবলম্বন আবশ্যক। গুরুপ্রদত্ত দীক্ষামন্ত্রের জপ তাহার একটী উপায়। এই উপায়কে **ব্রতরূপে গ্রহণ করা আবশ্যক।** বাস্তবিক সমস্ত সাধনাঙ্গই ব্রতরূপে গ্রহণ করা কর্ত্তব্য। নচেৎ শৈথিল্য আসিতে পারে, সাধনাঙ্গের অনুষ্ঠানে বিঘ্ন জন্মিতে পারে এবং ক্রমশঃ অনুষ্ঠান বন্ধ হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনাও জন্মিতে পারে। যে নিয়ম গ্রহণ করা যায়, অবিচলিত ভাবে তাহার পালনই হইতেছে ব্রত। দীক্ষামন্ত্রের জপকেও ব্রতরূপে গ্রহণ নিতান্ত আবশ্যক। ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইলে সংখ্যারক্ষণ-পূর্ব্বক জপ করাই সঙ্গত ; তাহা না হইলে শৈথিল্যাদির আশঙ্কা আছে। এজন্য নিত্যই সংখ্যারক্ষণ পূর্ব্বক দীক্ষামন্ত্রের জপও সাধুসমাজে দৃষ্ট হয়, শ্রীগুরুদেবও তদ্রূপ আদেশ করিয়া থাকেন। এইরূপে দেখা গেল, সংখ্যারক্ষণ পূর্ব্বক মন্ত্রজপেরও বিশেষ আবশ্যকতা আছে। পূর্ব্বোক্ত আলোচনায় দেখা গিয়াছে, মন্ত্রের শক্তি উদ্বুদ্ধ করার জন্যও জপের প্রয়োজন। এই জপও ব্রতরূপে গ্রহণ করাই সঙ্গত।

নিত্য-নিয়মিত সংখ্যারক্ষণ পূর্ব্বক মন্ত্রজপের পরে সাধকের ইচ্ছা হইলে সংখ্যাহীন মন্ত্রজপ যে দোষের, তাহাও নহে। কেননা, মন্ত্রৈকশরণের বা সংযতচিত্তের পক্ষে অসংখ্যাত জপের বিধান হইতেই বুঝা যায়, অসংখ্যাত জপ স্বরূপতঃ দোষের নহে ; স্বরূপতঃ দোষের হইলে সংযতচিত্তের বা মন্ত্রৈকশরণের পক্ষেও তাহা দোষের হইত।

১০১। ভগবন্নামগ্রহণ ও সংখ্যারক্ষণ। ব্যবহারিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নামজপ

দীক্ষামন্ত্রবিষয়ে জপের সংখ্যারক্ষণ-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এক্ষণে ভগবন্নাম-গ্রহণ-বিষয়ে সংখ্যারক্ষণ-সম্বন্ধে শাস্ত্রের অভিপ্রায় কিরূপ, তৎসম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

ব্যবহারিক জগতের কাম্যবস্তুবিশেষ-সম্বন্ধে ভগবন্নামবিশেষের সেবামাহাত্ম্য-কথন-প্রসঙ্গে কুর্ম্মপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস (একাদশ বিলাসে) বলিয়াছেন—"জয় শ্রীনরসিংহ জয়" এবং "শ্রীনরসিংহ" একবিংশতি বার জপ করিলে বিপ্রহত্যাজনিত পাপও ক্ষয় প্রাপ্ত হয় (১১।১১৯) এবং "জয় জয় শ্রীনরসিংহ" একবিংশতি বার জপ করিলে মহাভয়ও নিবারিত হয় (১১।১২০)। এ-স্থলে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক নরসিংহ-নাম জপের বিধান দৃষ্ট হয়।

ইহার পরে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া কালবিশেষে মঙ্গল-বিশেষের (অবশ্য ব্যবহারিক জগতের মঙ্গল-বিশেষের) জন্য শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—পুরুষ, বামদেব, সঙ্কর্ষণ, প্রদ্যুম্ন ও অনিরুদ্ধ—এই পাঁচটী নাম যথাক্রমে পাঁচবৎসরে কীর্ত্তন করিবে (১১।১২১)। ইহার পরে—কোন্ অয়নে, কোন্ ঋতুতে, কোন্ মাসে, কোন্ তিথিতে এবং কোন্ নক্ষত্রে ভগবানের কোন্ নাম কীর্ত্তন করিলে ব্যবহারিক মঙ্গল লাভ হইতে পারে, তাহাও বলা হইয়াছে (১১।১২২-৩৫)। এ-স্থলেও সময়-বিশেষে নামবিশেষের কীর্ত্তনের কথা বলা হইয়াছে। ইহাতে মনে হইতে পারে—যে কোনও সময়ে যে কোনও নামের কীর্ত্তনে অভীষ্ট মঙ্গল পাওয়া যাইবে না।

এ-সম্বন্ধে হ, ভ, বি, ১১।১২৬-শ্লোকের টীকার উপক্রমে শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"নন্থ চিন্তামণেরিব সর্ব্বস্যাপি ভগবন্নাম্নঃ সমানফলং শ্রূয়তেঃ; তৎ কিং বিশেষনির্দ্দেশতো মাহাত্ম্য-সঙ্কোচাপাদনেন ? সত্যম্। অত্যন্তকামাত্মাপহতচিত্তানাং শ্রদ্ধাসম্পত্তয়ে তথোক্তম্। বস্তুতস্তু সর্ব্বদা সর্ব্বমেব নাম সেব্যমিত্যাহ সর্ব্বমিতি॥—চিন্তামণির ন্যায় ভগবানের সকল নামেরই সমান ফলের কথা শাস্ত্র হইতে জানা যায়। তাহা হইলে সময়-বিশেষে নামবিশেষ-কীর্ত্তনের নির্দ্দেশ করিয়া নামের মাহাত্ম্য সঙ্কোচ করা হইয়াছে কেন ? (উত্তরে বলা হইতেছে) যাহা বলা হইল, তাহা সত্য (কাল-বিশেষে নাম বিশেষের কীর্ত্তনের নির্দ্দেশে যে নামের মাহাত্ম্য সঙ্কুচিত করা হয়, তাহা সত্য)। (ইন্দ্রিয়-সুখকর ভোগ্য বস্তুর জন্য) কামনাদির দ্বারা যাহাদের চিত্ত অত্যন্ত আবিষ্ট, তাহাদের শ্রদ্ধা উৎপাদনের জন্যই সময়বিশেষে নামবিশেষের কীর্ত্তনের কথা বলা যইয়াছে (ইন্দ্রিয়-ভোগ্য বস্তু লাভের জন্যই যাহাদের তীব্র বাসনা, তাহারা যদি শুনে যে, অমুক সময়ে অমুক নাম কীর্ত্তন করিলে অভীষ্ট বস্তু পাওয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে সেই সময়ে সেই নাম কীর্ত্তনের জন্য তাহাদের আগ্রহ বা শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে এবং ফল পাওয়া গেলে শ্রদ্ধা গাঢতা লাভ করিতে পারে। তখন, সকল নামেরই যে সমান ফল এবং যে কোনও সময়ে যেকোনও নাম কীর্ত্তন করিলেই যে অভীষ্ট লাভ হইতে পারে—এই বাক্যেও তাহাদের শ্রদ্ধা জন্মিতে পারে। এই উদ্দেশ্যেই, নামের প্রতি তাদৃশ লোকের চিত্তকে প্রবর্ত্তিত করার জন্যই, কালবিশেষে নামবিশেষের কীর্ত্তনের উপদেশ দেওয়া হইয়াছে)। বস্তুতঃ কিন্তু সকল সময়েই ভগবানের সকল নাম সেব্য বা কীর্ত্তনীয়; তাহা জানাইবার জন্যই বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর, 'সর্ব্বং বা সর্ব্বদা'-ইত্যাদি বলিয়াছেন।"

"সর্ব্বং বা সর্ব্বদা নাম দেবদেবস্য যাদব।
নামানি সর্ব্বাণি জনার্দ্দনস্য কালশ্চ সর্ব্বঃ পুরুষপ্রবীরঃ।
তস্মাৎ সদা সর্ব্বগতস্য নাম গ্রাহ্যং যথেষ্টং বরদস্য রাজন্ ॥
—হ, ভ, বি, ১১।১২৬-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-প্রমাণ ॥

—(প্রতিপৎ হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চদশ তিথিতে যথাক্রমে ব্রহ্মা, শ্রীপতি, বিষ্ণু-ইত্যাদি পঞ্চদশ নামের স্মরণের উপদেশ দেওয়ার পরে বলা হইয়াছে) হে যাদব। দেবদেব ভগবানের সকল নামই সর্ব্বদা স্মরণ করিবে। হে রাজন্! তাঁহার নামকীর্ত্তনে সকল কাল এবং সকল পুরুষই শ্রেষ্ঠ হইয়া থাকে। অতএব, বরদ জনার্দ্দনের নামসমূহ সকল সময়েই যথেষ্ট গ্রহণ করা কর্ত্তব্য।"

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের উল্লিখিত প্রমাণ হইতে জানা গেল—ভগবানের যে-কোনও নাম যে-কোনও সময়েই কীর্ত্তনীয় এবং সর্ব্বদাই যথেষ্টরূপে কীর্ত্তনীয়। ইহাতে আরও জানা গেল—কালবিশেষে নামবিশেষের কীর্ত্তনের জন্য যে উপদেশ, বা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক নামবিশেষ জপের যে উপদেশ দেওয়া হইয়াছে, তাহার মুখ্যত্ব নাই। কামহতচিত্ত লোকদিগকে নামেতে প্রবর্ত্তিত করার উদ্দেশ্যেই তাদৃশ উপদেশ দেওয়া হইয়াছে। বস্তুতঃ ভগবানের নাম সকল সময়েই কীর্ত্তনীয় এবং "যথেষ্ট" ভাবেই (কীর্ত্তনকারী যতক্ষণ পর্যন্ত, বা যতসংখ্যক নাম, অথবা যে-সময়েই ইচ্ছা-সেই সময়েই) কীর্ত্তনীয় এবং সর্ব্বদাই কীর্ত্তনীয় (কীর্ত্তনে সময়ের কোনও অপেক্ষাই নাই)। শ্লোকস্থ "বরদস্য জনার্দ্দনস্য"-অংশের "বরদস্য—বরদাতার"-শব্দের তাৎপর্য্য এই যে, যিনি যে উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য নামকীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, যথেষ্টভাবে নাম কীর্ত্তন করিলেই তাঁহার সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। যেহেতু, নামের সহিত অভিন্ন ভগবান্ জনার্দ্দন হইতেছেন—বরদ, সর্ব্বাভীষ্টপূরক।

ব্যবহারিক মঙ্গল লাভের উদ্দেশ্যে যে নামকীর্ত্তন, তাহার সম্বন্ধেই উল্লিখিত কথাগুলি বলা হইয়াছে; এইরূপ কীর্ত্তনেও সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকত্ব নাই। অবশ্য, কেহ যদি এ-স্থলেও নাম-কীর্ত্তনকে ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে ইচ্ছা করেন, তিনি সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বকও নামকীর্ত্তন করিতে পারেন; তাহাতে কোনওরূপ নিষেধও নাই; বরং "যথেষ্টং গ্রাহ্যম্"-বাক্যে তাহার অনুমোদনই শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়।

১০২। পারমার্থিক মঙ্গলের উদ্দেশ্যে নামজপ ও সংখ্যারক্ষণ

ব্যবহারিক মঙ্গলের জন্য যে নামকীর্ত্তন, তাহাতে যে সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকত্ব নাই, পূর্ব্ববর্ত্তী আলোচনায় শাস্ত্রবাক্য হইতে তাহা জানা গিয়াছে। পারমার্থিক মঙ্গলের (মোক্ষলাভের, বা ভগবৎ-প্রেমলাভের) জন্য যে নামকীর্ত্তন, তাহাতে সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকত্ব আছে কিনা, তাহাই এক্ষণে বিবেচ্য।

ক। সংখ্যারক্ষণ সম্বন্ধে শাস্ত্রের নীরবতা

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে নামসঙ্কীর্ত্তনের মহিমার এবং অত্যাবশ্যকত্বের কথাও বলিয়াছেন এবং নামকীর্ত্তনের ফলপ্রাপ্তির জন্য অপরাধবর্জ্জন যে অত্যাবশ্যক, তাহাও বলিয়াছেন। কিন্তু সংখ্যারক্ষণের অপরিহার্য্যতার কথা বলেন নাই, সংখ্যারক্ষণ-সম্বন্ধে কোনও আলোচনাও তিনি করেন নাই।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসেও নামকীর্ত্তনের মহিমাদি সম্বন্ধে শাস্ত্রবাক্যের উল্লেখপূর্ব্বক বহু আলোচনা করা হইয়াছে; কিন্তু সংখ্যারক্ষণ-সম্বন্ধে কোনও কথাই তাহাতে দৃষ্ট হয় না। বরং হরিভক্তিবিলাসধৃত নিম্নলিখিত প্রমাণ-সমূহ হইতে, সংখ্যারক্ষণ যে অত্যাবশ্যক নয়, তাহাই জানা যায়।

"ন দেশনিয়মস্তস্মিন্ ন কালনিয়মস্তথা।

নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি শ্রীহরের্নাম্নি লুব্ধক॥ হ, ভ, বি, ১১।২০২-ধৃত বিষ্ণুধর্ম্ম-প্রমাণ॥

—হে লুব্ধক! শ্রীহরির নামকীর্ত্তন-বিষয়ে দেশ ও কালের নিয়ম নাই, উচ্ছিষ্টাদিতেও নিষেধ নাই।"

"ন দেশনিয়মঃ—দেশের বা স্থানের নিয়ম নাই।" যে কোনও স্থানেই, এমন কি মূল-মূত্রাদি-ত্যাগের স্থানেও নামকীর্ত্তন করা যায়। "নোচ্ছিষ্টাদৌ নিষেধোঽস্তি—উচ্ছিষ্টাদিতেও—উচ্ছিষ্টময় স্থানে, কি উচ্ছিষ্টমুখেও—নাম কীর্ত্তন করা যায়।" এই অবস্থায় সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নয়।

"চক্রায়ুধস্য নামানি সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তয়েৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।২০৩-ধৃত স্কান্দ-পাদ্ম-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-প্রমাণ॥ —চক্রায়ুধ ভগবানের নাম সর্ব্বদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তন করিবে।" সদা সর্ব্বত্র কীর্ত্তনেও সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নয়।

"নো দেশ কালাবস্থাসু শুদ্ধ্যাদিকমপেক্ষতে। হ, ভ, বি, ১১।২০৪ ধৃত স্কান্দবচন॥

—ভগবন্নাম গ্রহণে দেশের, কালের, অবস্থার এবং শুদ্ধ্যাদির অপেক্ষাও নাই।"

এই প্রমাণ হইতে জানা যায়—মলমূত্র-ত্যাগ-কালেও নাম গ্রহণ করা নিষিদ্ধ নহে। মল-মূত্র-ত্যাগ-কালে সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নহে।

"ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে। নামসঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্।

কৃত্বা সন্রূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।২১৯-ধৃত লৈঙ্গ-প্রমাণ॥

—চলিতে চলিতে, কি দণ্ডায়মান বা উপবিষ্ট অবস্থাতে, কি শয়নকালে, কি ভোজনকালে, শ্বাস-প্রশ্বাস-ত্যাগকালে, বা বাক্যপ্রপূরণে, কিম্বা হেলায়ও যিনি বিষ্ণুর কলিমর্দ্দন নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি বিষ্ণুর সারূপ্য (মুক্তি) পাইয়া থাকেন, ভক্তির সহিত কীর্ত্তন করিলে পরম ধামে গতি হয়।"

ভোজন-কালে সংখ্যারক্ষণ সম্ভব নয়।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।14॥" "খাইতে শুইতে" নামগ্রহণকালে সংখ্যারক্ষণ অসম্ভব।

উল্লিখিত প্রমাণ-সমূহ হইতে জানা গেল—যে সকল স্থানে বা অবস্থায় নামগ্রহণের বিধান দেওয়া হইয়াছে, যে সকল স্থানে বা অবস্থায় নামের সংখ্যা রাখা সম্ভবপর নহে। ইহাতেই বুঝা যায়, ভগবন্নাম-কীর্ত্তনে সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকত্ব শাস্ত্রের অভিপ্রেত নহে। কখনও সংখ্যা রাখিবে না—ইহাও অবশ্য শাস্ত্র বলেন নাই। তাৎপর্য্য এই যে, যখন সুবিধা বা ইচ্ছা হয়, তখন সংখ্যা রাখা যায় এবং যখন সুবিধা বা ইচ্ছা না থাকে, তখন সংখ্যা না রাখিলেও তাহা দোষের হয়না এবং কোনও সময়ে সংখ্যা না রাখিলেও তাহা দূষণীয় নহে।

খ। সংখ্যারক্ষণের রীতি ও আবশ্যকতা

তথাপি কিন্তু সাধকদের মধ্যে সংখ্যারক্ষণ-পূর্ব্বক নামকীর্ত্তনের রীতি সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়। শ্রীল হরিদাস ঠাকুর, এমন কি শ্রীমন্ মহাপ্রভুও তদনুকূল আদর্শ দেখাইয়া গিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য কি ?

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। অন্ততঃ দুইটী কারণে সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকতা আছে বলিয়া মনে হয়।

(১) প্রথমতঃ, **অপরাধ-খণ্ডন।** শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়,

এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ-নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু গদ্‌গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ তাহাতে প্রচুর। কৃষ্ণনামবীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥১।৮।২২-২৬॥

ইহা হইতে জানা গেল—একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই চিত্তে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবির্ভাব হয়, তাহার ফলে চিত্ত দ্রবীভূত হয় এবং দেহে অশ্রু-কম্প-পুলকাদি সাত্ত্বিকভাবের উদয় হয়। এই সাত্ত্বিকভাবের উদয়েই চিত্তদ্রবতার এবং প্রেমাবির্ভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু এতাদৃশ অদ্‌ভুত-শক্তিসম্পন্ন কৃষ্ণনাম বহু বহু বার উচ্চারণ করিলেও যদি প্রেমের আবিভাব না হয়—চিত্ত দ্রবীভূত না হয়, অশ্রুধারাও প্রবাহিত না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে যে, নাম-উচ্চারণ-কারীর পূর্ব্বসঞ্চিত প্রচুর অপরাধ (অর্থাৎ নামাপরাধ) আছে। যে চিত্তে অপরাধ আছে, সেই চিত্তে কৃষ্ণনাম ফল প্রসব করে না।

কিন্তু একবার মাত্র কৃষ্ণনাম উচ্চারণ করিলেই চিত্তে প্রেমের আবির্ভাব হয়—এতাদৃশ লোক অতিবিরল। তাহাতেই বুঝা যায়, সাধারণতঃ প্রায় সকলের চিত্তেই পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধ বিরাজিত। এই অপরাধ দূরীভূত না হইলে কৃষ্ণপ্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে না।

যাঁহারা কেবল মোক্ষকামী, প্রেমসেবাকামী নহেন, যে পর্য্যন্ত অপরাধ থাকিবে, সেই পর্য্যন্ত মোক্ষ লাভও তাঁহাদের পক্ষে অসম্ভব।

নামাপরাধ-খণ্ডনের উপায়

সুতরাং পরমার্থকামী সাধকমাত্রেরই অপরাধ দূর করার একান্ত প্রয়োজন। কিন্তু অপরাধ কিরূপে দূরীভূত হইতে পারে? পদ্মপুরাণের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া নামপরাধ-খণ্ডনের উপায় সম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—

"জাতে নামাপরাধেঽপি প্রমাদেন কথঞ্চন।
সদা সঙ্কীর্ত্তয়ন্নাম তদেকশরণো ভবেৎ। হ, ভ, বি, ১১।২৮৭-ধৃত পাদ্মবচন॥

—যদি কোনও প্রকার অনবধানতা (প্রমাদ) বশতঃ নামাপরাধ ঘটে, তাহা হইলে সর্ব্বদা নামকীর্ত্তন করিবে, একমাত্র নামের শরণাপন্ন হইবে।"

"নামাপরাধযুক্তানাং নামান্যেব হরন্ত্যঘম্।
অবিশ্রান্তপ্রযুক্তানি তান্যেবার্থকরাণি চ॥ ১১।২৮৮-ধৃত পাদ্মবচন॥

—যাহাদের নামাপরাধ আছে, নামসকলই তাহাদের সেই অপরাধ হরণ করে। বাস্তবিক, অবিশ্রান্তভাবে নামকীর্ত্তন করিলে সর্ব্বার্থ-সিদ্ধি হইয়া থাকে।"

"সর্ব্বাপরাধকৃদপি মুচ্যতে হরিসংশ্রয়ঃ। হরেরপ্যপরাধান্ কুর্য্যাদ্দ্বিপদপাংশনঃ॥
নামাশ্রয়ঃ কদাচিৎ স্যাত্তরত্যেব স নামতঃ। নাম্নোঽপি সর্ব্বসুহৃদো হ্যপরাধাৎ পতত্যধঃ॥

—হ, ভ, বি, ১১।২৮২-ধৃত পাদ্মবচন॥

—স্বকৃত সর্ব্ববিধ অপরাধ হইতেও শ্রীহরির আশ্রয় গ্রহণ করিলে মুক্ত হওয়া যায়। যে নরাধম শ্রীহরির প্রতিও অপরাধ করে, সে যদি কখনও নামের আশ্রয় গ্রহণ করে, তাহা হইলে নামের কৃপাতেই সেই অপরাধ হইতে পরিত্রাণ পাইতে পারে। নাম হইতেছে সকলের সুহৃৎ (বন্ধু), নামের নিকটে অপরাধ হইলে অধঃপতন সুনিশ্চিত।"

এই সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—নামের শরণ গ্রহণ করিয়া সর্ব্দা নামকীর্ত্তনই হইতেছে **নামাপরাধ-খণ্ডনের একমাত্র উপায়**। মালা প্রভৃতিতে সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন করিলেই নামের শরণ গ্রহণ সম্ভব হইতে পারে।

জপমালার সহায়তাব্যতীত সর্ব্বদা মুখে নামোচ্চারণের সঙ্কল্প করিয়া নামকীর্ত্তন আরম্ভ করিলেও অপরাধযুক্ত চঞ্চল মন কখন যে নাম হইতে অন্যত্র সরিয়া যায়, তাহা জানিতেও পারা যায় না। কিন্তু হাতে মালা থাকিলে মালাই তাহা জানাইয়া দিবে। বিশেষতঃ, প্রত্যহ নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক নামকীর্ত্তনের সঙ্কল্প করিয়া কীর্ত্তন আরম্ভ করিলে সেই সংখ্যাপূরণের জন্য একটা আগ্রহ জন্মিতে পারে; তাহাতে নিয়মিতভাবে নামকীর্ত্তনও চলিতে থাকে এবং নামে শরণাপত্তির ভাবও ক্রমশঃ পুষ্টি লাভ করিতে পারে। ইহাই সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক নামকীর্ত্তনের একটী বিশেষ উপকারিতা।

(২) দ্বিতীয়ঃ, **ব্রতরক্ষা**। যিনি যে ভজনাঙ্গই গ্রহণ করুন না কেন, ব্রতরূপেই তাহা গ্রহণ করা প্রয়োজন। যিনি নামসঙ্কীর্ত্তনকেই ব্রতরূপে গ্রহণ করিবেন (কিম্বা অপরাধ-খণ্ডনের উদ্দেশ্যে

যিনি নামের শরণাপন্ন হইবেন, তাঁহার পক্ষেও নামকীর্ত্তনকে ব্রতরূপে গ্রহণ করাই কর্ত্তব্য), তাঁহাকেও সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বকই নাম কীর্ত্তন করিতে হইবে ; নচেৎ ব্রতরক্ষা হইবে না, সাধনপথে অগ্রগতিও প্রতিহত হইবে (দীক্ষামন্ত্রের জপ-প্রসঙ্গে এই বিষয়ের আলোচনা দ্রষ্টব্য)। সুতরাং নামসঙ্কীর্ত্তনের ব্রতরক্ষার জন্যও সংখ্যারক্ষাপূর্ব্বক নামসঙ্কীর্ত্তনের আবশ্যকতা আছে।

ব্রতরূপে নামসঙ্কীর্ত্তনকে গ্রহণ করিলেই নামের কৃপায় অপরাধ দূরীভূত হইলে এবং চিত্ত নির্ম্মল হইলে শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমের আবির্ভাব হইতে পারে। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকই তাহার প্রমাণ।

"এবংব্রতঃ স্বপ্রিয়নামকীর্ত্ত্যা জাতানুরাগো দ্রুতচিত্তঃ উচ্চৈঃ।
হসত্যথো রোদিতি রৌতি গায়ত্যুন্মাদবন্নৃত্যতি লোকবাহ্যঃ॥ ১১।২।৪০ ॥

—এইরূপ নিয়মে (ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া) যিনি নিজের প্রিয় শ্রীহরির নাম কীর্ত্তন করেন, নামকীর্ত্তনের ফলে প্রেমোদয়বশতঃ তাঁহার চিত্ত দ্রবীভূত হয় ; তখন তিনি লোকাপেক্ষাহীন হইয়া উন্মাদের ন্যায় উচ্চৈঃস্বরে কখনও হাস্য করেন, কখনও চীৎকার, কখনও রোদন, কখনও গান এবং কখনও বা নৃত্য করিতে থাকেন।"

এইরূপে দেখা গেল—অপরাধ-ক্ষালনের জন্য এবং ব্রতরক্ষার জন্য সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক নামকীর্ত্তনের বিশেষ আবশ্যকতা আছে।

গ। সংখ্যারক্ষণ নামসঙ্কীর্ত্তনের অঙ্গ নহে, নামৈকতৎপরতাসিদ্ধির জন্যই আবশ্যক

যিনি যত সংখ্যা নাম গ্রহণ করিবেন বলিয়া ব্রতগ্রহণ করিয়াছেন, তদতিরিক্ত নাম— সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক, বা সংখ্যারক্ষণব্যতীত গ্রহণ করিলে যে তাহা দোষের হইবে, তাহা নয়। কেননা, সর্ব্বদা নামকীর্ত্তনই শাস্ত্রের বিধান এবং সংখ্যারক্ষণের অত্যাবশ্যকতার কথাও শাস্ত্র বলেন নাই। সংখ্যারক্ষণের প্রয়োজনীয়তা কেবল সাধকের নিজের জন্য—স্বীয় ব্রতরক্ষার জন্য, স্বীয় অপরাধ-ক্ষালনের উদ্দেশ্যে নামৈকতৎপরতা বা নামে শরণাপত্তি-সিদ্ধির জন্য।

ভক্তি-অঙ্গমাত্রই অন্যনিরপেক্ষ ; বিশেষতঃ নাম পরম-স্বতন্ত্র, সুতরাং পরম-নিরপেক্ষ ; নাম স্বীয় ফল-প্রকাশে সংখ্যারক্ষণের বা ব্রতরূপে গ্রহণের অপেক্ষা রাখে না। সাধকের পক্ষে নামে তৎপরতাসম্পাদনার্থই, নামে শরণাপত্তি সম্পাদনার্থই, সংখ্যারক্ষণাদির উপকারিতা। এ-সম্বন্ধে ভক্তি-সন্দর্ভে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী নিম্নলিখিত প্রমাণটী উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার বক্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছেন।

"নক্তং দিবা চ গতভীর্জিতনিদ্র একো নির্ব্বিণ্ণ ঈক্ষিতপথো মিতভুক্ প্রশান্তঃ।
যদ্যচ্যুতে ভগবতি স মনো ন সজ্জেন্নামানি তদ্রতিকরাণি পঠেদলজ্জঃ॥
—ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ২৬৩॥ শ্রীভগবন্নামকৌমুদ্যাং সহস্রনামভাষ্যে ধৃতপ্রমাণ।

—রাত্রি এবং দিবা উভয় কালেই নির্ভয়, জিতনিদ্র, নিঃসঙ্গ, নির্ব্বিণ্ণ, পারমার্থিক পথে নিবদ্ধদৃষ্টি, মিতভুক্ ও প্রশান্ত হইয়াও যদি কেহ অচ্যুত-ভগবানে মনের আসক্তি লাভ করিতে না পারেন, তাহা হইলে

তিনি লজ্জাহীন হইয়া (অর্থাৎ উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনাদিতে লজ্জা অনুভব না করিয়া) শ্রীহরির নাম পাঠ করিবেন। শ্রীহরিনামের এমনই অদ্ভুত শক্তি আছে যে, ভগবচ্চরণারবিন্দে রতি জন্মাইয়া দিতে পারে।”

এই শ্লোক উদ্ধৃত করিয়া শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—এই শ্লোকে গতভী, জিতনিদ্র ইত্যাদি যে সকল গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, সে সমস্ত গুণ কিন্তু নামকীর্ত্তনের অঙ্গভূত নহে; কেননা, ভক্তি-অঙ্গমাত্রই নিরপেক্ষ, ভক্তি-অঙ্গ ঐসমস্ত গুণের অপেক্ষা রাখে না। সাধকের নামৈকতৎপরতা-সম্পাদনের জন্যই ঐসমস্ত গুণের উল্লেখ করা হইয়াছে, অর্থাৎ ঐ সমস্ত গুণে গুণী হইতে পারিলে সাধক নামৈকতৎপরতা লাভ করিতে পারেন। “অত্র গতভীরিত্যাদয়ো গুণা নামৈকতৎপরতা-সম্পাদনার্থাঃ, ন তু কীর্ত্তনাঙ্গভূতাঃ। ভক্তিমাত্রস্য নিরপেক্ষত্বম্, তস্য তু সুতরাং তাদৃশত্বমিতি।”

এই উক্তির সমর্থনে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী শাস্ত্র-প্রমাণও উদ্ধৃত করিয়াছেন। বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরে এক দ্বিতীয়-ক্ষত্রবন্ধুর বিবরণ আছে; তিনি সর্ব্ববিধ পাতক, অতিপাতক, মহাপাতকের অনুষ্ঠান করিয়াছেন। এ-সমস্ত পাতকের খণ্ডনের জন্য এক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে কতকগুলি উপদেশ দিয়া বলিয়াছিলেন—

“যদ্যেতদখিলং কর্ত্তুং ন শক্নোষি ব্রবীমি তে।
স্বল্পমন্যন্ময়োক্তং ভো করিষ্যতি ভবান্ যদি॥

—আমি তোমাকে যে সকল সাধনের উপদেশ দিয়াছি, তাহার অনুষ্ঠানে যদি তুমি অসমর্থ হও, তবে অন্য একটী স্বল্প-সাধনের কথা তোমাকে বলিতেছি—অবশ্য যদি তুমি তাহার অনুষ্ঠান কর।”

তখন সেই ক্ষত্রবন্ধু বলিয়াছিলেন,

“অশক্যমুক্তং ভবতা চঞ্চলত্বাদ্ধি চেতসঃ।
বাক্‌শরীরবিনিষ্পাদ্যং যচ্ছক্যং তদুদীরয়॥

—আপনি যে সাধনের উপদেশ দিয়াছেন, চিত্তের চঞ্চলতাবশতঃ তাহা আমার পক্ষে অশক্য বলিয়া মনে হইতেছে। যদি বাক্য এবং শরীরের দ্বারা নিষ্পাদ্য কোনও সাধন থাকে, তবে তাহা আমি অনুষ্ঠান করিতে পারিব (অর্থাৎ মনের দ্বারা নিষ্পাদ্য হইলে তাহা আমার পক্ষে সম্ভবপর হইবে না; কেননা, আমার মন চঞ্চল)। এমন কোনও সাধন থাকিলে তাহাই বলুন।”

তখন ব্রাহ্মণ বলিয়াছিলেন—

“উত্তিষ্ঠতা প্রস্বপতা প্রস্থিতেন গমিষ্যতা।
গোবিন্দেতি সদা বাচ্যং ক্ষুত্তৃট্‌প্রস্খলিতাদিষু॥

—উঠিতে, ঘুমাইতে, চলিতে চলিতে, স্থিতিকালে, এবং ক্ষুধায়, পিপাসায়, বা পতনাদি-সময়েও সর্ব্বদা ‘গোবিন্দ’ ‘গোবিন্দ’ এই প্রকার কীর্ত্তন করিবে।”

এই শ্লোকের তাৎপর্য্য এই যে, নামসঙ্কীর্ত্তন দেশ-কালাদির বা অবস্থাদির, এমন কি চিত্ত-চাঞ্চল্যাদিরও অপেক্ষা রাখে না। নামসঙ্কীর্ত্তন সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ।

ইহার পরে এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকও উদ্ধৃত করিয়াছেন।

"ন নিষ্কৃতৈরুদিতৈর্ব্রহ্মবাদিভিস্তথা বিশুধ্যত্যঘবান্ ব্রতাদিভিঃ।
যথা হরের্নামপদৈরুদাহৃতৈস্তদুত্তমশ্লোকগুণোপলম্ভকম্॥ ৬।২।১১॥

—(অজামিলের প্রসঙ্গে বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণের নিকটে বলিয়াছেন) শ্রীহরির নামপদের উল্লেখে যেরূপ বিশুদ্ধি লাভ হয়, ব্রহ্মবাদীদের কথিত ব্রতাদিদ্বারা পাপী ব্যক্তি সেইরূপ বিশুদ্ধি লাভ করিতে পারে না। শ্রীহরির নাম কেবল যে পাপেরই বিনাশ সাধন করে, তাহা নহে; নামকীর্ত্তনকারীর পক্ষে ভগবদ্গুণসমূহের অনুভবের হেতুও হইয়া থাকে।"

এই শ্লোক-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-"ন চ পাপবিশোধনমাত্রেণাপক্ষীয়তে তন্নামপদোদাহরণং কিন্তু গুণানামপ্যুপলম্ভকমনুভবহেতুর্ভবতি।"

উল্লিখিত প্রমাণসমূহ হইতে জানা গেল— অন্যান্য ভক্তি-অঙ্গের ন্যায় নামসঙ্কীর্ত্তনও অন্যনিরপেক্ষ ভাবে স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে; সূর্য্য যেমন লোকের অবস্থিতি-স্থানের অপেক্ষা না রাখিয়া স্বীয় কিরণজাল বিস্তার করিয়া থাকে, তদ্রূপ। কিন্তু সূর্য্যের কিরণ স্পর্শ করিতে হইলে, কিম্বা সূর্য্যকে দর্শন করিতে হইলে যেমন গৃহের বা পর্ব্বতগুহাদির বাহিরে আসিতে হইবে, তদ্রূপ নামের মহিমা অনুভব করিতে হইলেও সাধককে অপরাধাদিজনিত চিত্তমালিন্যকে অতিক্রম করিতে হইবে। তাহা করিতে হইলে সর্ব্বতোভাবে নামেরই শরণ গ্রহণ করিতে হইবে এবং এই শরণাপত্তি-সিদ্ধির জন্য, সাধককে ব্রতরূপে নামগ্রহণ করিতে হইবে এবং ব্রতরূপে গ্রহণ করিতে হইলে সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বকই নামগ্রহণ করিতে হইবে। এইরূপে দেখা গেল —নামের সংখ্যারক্ষণ হইতেছে কেবল সাধকের ব্রতরক্ষার জন্য, নামের কৃপা-প্রকাশের জন্য নহে। নাম সংখ্যারক্ষণাদির অপেক্ষা না রাখিয়াই কৃপা প্রকাশ করিয়া থাকে; কিন্তু সেই কৃপার অনুভবের অন্তরায়-স্বরূপ অপরাধাদিজনিত চিত্তমালিন্য দূর করার জন্যই সাধকের পক্ষে ব্রতরূপে নামগ্রহণের এবং তজ্জন্য সংখ্যারক্ষণের প্রয়োজন। এজন্যই শ্রীজীব গোস্বামী বলিয়াছেন— গতভীত্বাদি (নির্ভীকত্বাদি) এবং (তদুপলক্ষণে নামের সংখ্যারক্ষণাদিও) ভজনাঙ্গের— সুতরাং নামসঙ্কীর্ত্তনের—অঙ্গভূত নহে। যাহা অঙ্গভূত, অঙ্গীর স্বরূপ-প্রকাশের জন্য তাহা অপরিহার্য্য, অবশ্যকর্ত্তব্য। সংখ্যারক্ষণাদির অপেক্ষা না রাখিয়াই যখন সর্ব্বনিরপেক্ষ এবং পরম-স্বতন্ত্র ভগবন্নাম স্বীয় প্রভাব বিস্তার করিয়া থাকে, তখন সংখ্যারক্ষণাদি নামের অঙ্গভূত হইতে পারেনা—সুতরাং স্বরূপতঃ অপরিহার্য্য হইতে পারেনা। তবে সাধকের পক্ষে যে তাহা আবশ্যক, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। নামৈকতৎপরতাসিদ্ধির জন্যই সংখ্যারক্ষণের আবশ্যকতা।

এ-সমস্ত আলোচনা হইতে বুঝা গেল—প্রত্যহ নির্দ্দিষ্টসংখ্যক নাম জপের পরেও সাধক যদি স্বীয় অভিপ্রায় বা সুবিধা অনুসারে সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক, অথবা সংখ্যারক্ষা না করিয়াও, তদতিরিক্ত নাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তাহা দোষের হইবে না; কেননা, তাহাতে নামকীর্ত্তনের অঙ্গহানি করা হইবেনা—সুতরাং নামের নিকটে অপরাধও হইবে না। তাহাতে বরং তাঁহার চিত্তশুদ্ধির আনুকূল্যই

সাধিত হইবে। এজন্যই শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"খাইতে শুইতে যথা তথা নাম লয়। দেশ-কাল-নিয়ম নাহি সর্ব্বসিদ্ধি হয়॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।২০।১৪॥"

১০৩। বত্রিশাক্ষরাত্মক তারকব্রহ্ম নাম এবং সংখ্যারক্ষণ ও উচ্চকীর্ত্তন

ক। তারকব্রহ্ম নামের রূপ

সন্ন্যাসের পূর্ব্বে শ্রীমন্মমহাপ্রভু যখন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তখন তিনি "বঙ্গের লোকের কৈলা মহা হিত। নাম দিয়া ভক্ত কৈল—পঢ়ঞা পণ্ডিত॥ শ্রীচৈ, চ, ১।১৬।১৭॥"; কিন্তু কি নাম দিয়াছিলেন? শ্রীচৈতন্যভাগবতের আদিখণ্ড দ্বাদশ অধ্যায় হইতে তাহা জানা যায়। তিনি পদ্মাতীরবর্ত্তী কোনও এক গ্রামের অধিবাসী তপনমিশ্রকে নিম্নলিখিত রূপ ষোলনাম-বত্রিশাক্ষরাত্মক নামের উপদেশ করিয়াছিলেন।

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

সন্ন্যাসের পরেও প্রভু নিজেও উল্লিখিত আকারেই বত্রিশাক্ষরাত্মক তারকব্রহ্ম নাম কীর্ত্তন বা জপ করিতেন, তাঁহার অনুগত তৎকালীন বৈষ্ণববৃন্দও এই রূপেই নাম কীর্ত্তন করিতেন এবং এখন পর্য্যন্তও ভারতের সর্ব্বত্র গৌড়ীয় বৈষ্ণবগণ এই রূপেই নাম কীর্ত্তন করিতেছেন।

তারকব্রহ্ম-নামের উল্লিখিত রূপটী ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের উত্তরখণ্ডেও দৃষ্ট হয়। তাহা হইতে জানা যায়—বৃষভানু-মহারাজ যখন চিদ্রূপা পরমেশানী কাত্যায়নী দেবীর উপাসনায় রত ছিলেন, তখন ক্রতুনামক মুনির নিকটে হরিনাম শ্রবণের জন্য এক অশরীরী আকাশবাক্য তাঁহাকে আদেশ করেন। তদনুসারে মহারাজ বৃষভানু ক্রতুমুনির শরণাপন্ন হইলে মুনিবর তাঁহাকে নাম উপদেশ করেন। মুনিবর কিরূপ নাম উপদেশ করিয়াছিলেন, বেদব্যাস কৃষ্ণদ্বৈপায়নের নিকটে লোমহর্ষণ সূত তাহা জিজ্ঞাসা করিলে ব্যাসদেব বলিয়াছিলেন—"এই হরিনাম-মন্ত্র গ্রহণ করিলে জীব ব্রহ্মময় হয়, সুরাপায়ী ব্যক্তিও নামগ্রহণমাত্রেই পরম পবিত্র হয় এবং সর্ব্বসিদ্ধিযুক্ত হয়। তুমি মহাভাগবত, তোমাকে এই মহামন্ত্র হরিনাম কহিতেছি।" একথা বলিয়া ব্যাসদেব বলিলেন—এই মহামন্ত্রটী হইতেছে এই:—

হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে।
হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥

—ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ-উত্তরখণ্ড॥ ৬।৫৫॥

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ হইতেছে অষ্টাদশ মহাপুরাণের অন্তর্গত, অপৌরুষেয়, ব্যাসদেবরূপে স্বয়ং ভগবান্‌কর্ত্তৃকই প্রকটিত (অবতরণিকায় ৯-অনু), পঞ্চমবেদের অন্তর্গত (অবতরণিকায় ৮-অনু); অপৌরুষেয় অষ্টাদশ মহাপুরাণ হইতেছে বেদার্থ-প্রতিপাদক। সুতরাং তারকব্রহ্ম-নামের যেই রূপ

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দৃষ্ট হয়, তাহা বেদসম্মত বলিয়াই গৃহীত হইতে পারে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে ব্যাসদেবও বলিয়াছেন —এই নামের মহিমা শ্রুতি, স্মৃতি, পুরাণ, ইতিহাস, আগম, মীমাংসা, বেদ, বেদান্ত এবং বেদাঙ্গে কীর্ত্তিত। "শ্রুতিস্মৃতি-পুরাণেতিহাসাগমমতেষু চ। মীমাংসা-বেদবেদান্ত-বেদাঙ্গেষু সমীরিতম্॥ ৬।৫৭॥" শ্রুতি-স্মৃতি হইতে জানা যায়—বেদ, ইতিহাস ও পুরাণ হইতেছে পরব্রহ্ম স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণেরই নিশ্বাসস্বরূপ, তাঁহারই বাক্য; সুতরাং তাহাতে ভ্রম-প্রমাদাদির অবকাশ নাই। স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই শ্রীশ্রীগৌরসুন্দররূপে অবতীর্ণ হইয়া যেই আকারে তারকব্রহ্ম হরিনামের প্রচার করিয়াছেন, তাহার সহিত অপৌরুষেয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে কথিত আকারের কোনও পার্থক্যই নাই। কিন্তু বোম্বাইস্থিত নির্ণয়-সাগর প্রেস হইতে প্রকাশিত "ঈশাদিবিংশোত্তরশতোপনিষদঃ" নামকগ্রন্থের কলিসন্তরণোপনিষদে এই তারকব্রহ্ম হরিনামের রূপটী অন্য রকম দৃষ্ট হয়। যথা,

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

কলিসন্তরণোপনিষৎ হইতে জানা যায়, দ্বাপরান্তে নারদ ব্রহ্মার নিকটে উপনীত হইয়া জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—"মর্ত্ত্যবাসী কলির জীব কিরূপে সংসার হইতে উত্তীর্ণ হইবে?" তখন ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—সর্ব্বশ্রুতিরহস্য এবং অতি গোপনীয় কথা শুন, যদ্দ্বারা কলিসংসার উত্তীর্ণ হইতে পারিবে। ভগবান্ আদিপুরুষ নারায়ণের নামোচ্চারণমাত্রেই কলির সমস্ত দোষ নির্ধূত হইয়া যায়। "স হোবাচ ব্রহ্মা সাধুপৃষ্টোঽস্মি সর্ব্বশ্রুতিরহস্যং গোপ্যং তচ্ছৃণু যেন কলিসংসারং তরিষ্যসি। ভগবত আদিপুরুষস্য নারায়ণস্য নামোচ্চারণমাত্রেণ নির্ধূতকলির্ভবতি॥" নারদপুনরায় জিজ্ঞাসা করিলেন— "তন্নাম কিমিতি—সেই নামটী কি?"; তখন ব্রহ্মা উল্লিখিত "হরে রাম হরে রাম"-ইত্যাদি আকারে ভগবানের নাম প্রকাশ করিলেন।

পশ্চিমভারতের লোকদের মধ্যে যাঁহারা গৌড়ীয় বৈষ্ণব, তাঁহারা "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি রূপেই তারকব্রহ্ম হরিনাম গ্রহণ করেন; কিন্তু অন্যান্যদের মধ্যে অনেকেই, বিশেষতঃ শ্রীরামচন্দ্রের উপাসকগণ, "হরে রাম হরে রাম"-ইত্যাদি আকারেই কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

কিন্তু জিজ্ঞাস্য হইতে পারে এই যে—শ্রীমন্মহাপ্রভুর উপদিষ্ট ও প্রচারিত এবং অপৌরুষেয় ব্রহ্মাণ্ডপুরাণে দৃষ্ট তারকব্রহ্ম নামের রূপ এবং কলিসন্তরণোপনিষদুক্ত নামের রূপ এক রকম নহে কেন? সুধীবৃন্দ এই জিজ্ঞাসার উত্তর দিবেন। "শ্রুতিস্মৃতি-বিরোধে তু শ্রুতিরেব গরীয়সী"-এই বিধানের বলে এ-স্থলে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের বাক্যকে উড়াইয়া দেওয়া যায় বলিয়া মনে হয় না; কেননা, শ্রুতি যাঁহাকে "রুক্মবর্ণ ব্রহ্মযোনি—অর্থাৎ পরব্রহ্ম" বলিয়াছেন—সুতরাং বেদ-পুরাণেতিহাস যাঁহার বাক্য—সেই শ্রীমন্মহাপ্রভুর সাক্ষ্য হইতেছে ব্রহ্মাণ্ডপুরাণের অনুকূলে।

আমাদের মনে হয়—নামকীর্ত্তনকারীর দিক্ হইতে এবং নামকীর্ত্তনের ফলের দিক্ হইতে বিচার করিলে উল্লিখিত দুই আকারের মধ্যে বিরোধও কিছু নাই। একটী আকারের প্রথমার্দ্ধস্থলে

আর একটী আকারের দ্বিতীয়ার্দ্ধ এবং দ্বিতীয়ার্দ্ধস্থলে প্রথমার্দ্ধ—ইহাই মাত্র বিশেষত্ব। প্রতিঅর্দ্ধই পূর্ণ; কেননা, শ্লোকের প্রতি অর্দ্ধেকেই পূর্ণতম শ্রীভগবানের কয়েকটী পূর্ণতম নাম বিদ্যমান। বত্রিশাক্ষরাত্মক নামটীতে দুই অক্ষরবিশিষ্ট ষোলটী নাম বিদ্যমান। বস্তুতঃ নাম তিনটী—হরিঃ, কৃষ্ণঃ, ও রামঃ। সম্বোধনে তাহাদের রূপ হইয়াছে—হরে, কৃষ্ণ ও রাম। এই তিনটী নামের বাচ্য একই। কিন্তু কে সেই বাচ্য? কলিসন্তরণোপনিষৎ বলিয়াছেন- এই নামগুলি হইতেছে—ভগবান্ আদিপুরুষ নারায়ণের নাম। আদিপুরুষ নারায়ণ হইতেছেন—স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ (১।১।১৭৭-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। শ্রীমদ্ভাগবতে শ্রীশুকদেবের উক্তি হইতেও জানা যায়—কলি অশেষ দোষের আকর হইলেও একটী মহান্ গুণ আছে এই যে, কৃষ্ণকীর্ত্তনের ফলেই সংসারাসক্তি হইতে মুক্ত হইয়া পরমধামে যাওয়া যায়। "কলের্দ্দোষনিধে রাজন্নস্তি হ্যেকো মহান্ গুণঃ। কীর্ত্তনাদেব কৃষ্ণস্য মুক্তসঙ্গঃ পরং ব্রজেৎ॥ শ্রীভা, ১২।৩৫১॥" শ্রীমদ্ভাগবত বলিতেছেন—শ্রীকৃষ্ণের (নামাদির) কীর্ত্তন হইতেছে কলিদোষাপহারক এবং কলিসন্তরণোপনিষৎ বলিতেছেন—আদিপুরুষ নারায়ণের নামকীর্ত্তন হইতেছে কলিদোষাপহারক। সুতরাং আদিপুরুষ নারায়ণ যে শ্রীকৃষ্ণই, তাহাই জানা গেল এবং ইহাও জানা গেল—হরি, কৃষ্ণ এবং রাম এই তিনটী হইতেছে স্বয়ংভগবান্ ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণেরই নাম। সর্ব্বচিত্তহর বলিয়া তিনি হরি, সর্ব্বচিত্তাকর্ষক বলিয়া তিনি কৃষ্ণ এবং সর্ব্বচিত্ত-রমণ (সর্ব্বচিত্তানন্দদায়ক) বলিয়া তিনি রাম (বা সর্ব্বরমণ)। যে-নামেই তাঁহাকে আহ্বান করা হউক না কেন, আহ্বান করা হয় কিন্তু এক এবং অভিন্ন বস্তু অদ্বয়জ্ঞানতত্ত্ব ব্রজেন্দ্রনন্দনকেই। সুতরাং আহ্বানকালে বিভিন্ন নামের উচ্চারণের ক্রমভেদে আহুত বস্তুর কোনওরূপ ভেদ হয় না। নামগুলি যদি বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপের হইত, তাহা হইলে উচ্চারণের ক্রমভেদে কোনও কোনও ভগবৎস্বরূপের মর্য্যাদাহানির প্রশ্ন উঠিতে পারিত; কিন্তু সকল নামের বাচ্য একই স্বরূপ বলিয়া এ-স্থলে সেই আশঙ্কাও থাকিতে পারে না। এজন্যই বলা হইয়াছে—বত্রিশাক্ষর তারকব্রহ্ম-নামের দুইটী রূপের মধ্যে বাস্তবিক পার্থক্য কিছু আছে বলিয়া মনে হয় না। আবার উল্লিখিত আকারদ্বয়ের যে কোনও আকারে ক্রমাগত কীর্ত্তন করিতে থাকিলে পূর্ব্বার্দ্ধ ও পরার্দ্ধেরও কোনওরূপ ভেদ থাকে না।

খ। বত্রিশাক্ষর নাম এবং কলির যুগধর্ম্ম

কলির যুগধর্ম্ম হইতেছে নামসঙ্কীর্ত্তন। বত্রিশাক্ষর-নামের কীর্ত্তনই যে কলির যুগধর্ম্ম, কলিসন্তরণোপনিষৎ হইতেও তাহা জানা যায়। নারদের নিকটে বত্রিশাক্ষর নাম প্রকাশ করিয়া ব্রহ্মা বলিয়াছেন ঃ—

"ইতি ষোড়শকং নাম্নাং কলিকল্মষনাশনম্। নাতঃ পরতরোপায়ঃ সর্ব্ববেদেষু দৃশ্যতে ॥১॥

—নামসমূহের মধ্যে 'হরে রাম হরে রাম'-ইত্যাদি ষোলটী নামই হইতেছে কলি-কল্মষ-নাশক। সমস্ত বেদে ইহা অপেক্ষা উৎকৃষ্টতর উপায় আর দেখা যায় না।"

ইহা হইতে পরিষ্কারভাবেই জানা গেল—ষোড়শনামাত্মক তারকব্রহ্ম নামের কীর্ত্তনই কলির যুগধর্ম্ম।

অবতরণের প্রাক্‌কালে বর্ত্তমান কলির উপাস্য শ্রীমন্মহাপ্রভু সঙ্কল্প করিয়াছেন—"যুগধর্ম্ম প্রবর্ত্তাইমু নামসঙ্কীর্ত্তন। চারিভাবের ভক্তি দিয়া নাচাইমু ভুবন॥ আপনি করিব ভক্তভাব অঙ্গীকারে। আপনি আচরি ভক্তি শিখাইমু সভারে॥ শ্রীচৈ, চ, ১৩।১৭-১৮॥"

তিনি যখন পূর্ব্ববঙ্গে গিয়াছিলেন, তখন পদ্মাতীরবর্ত্তী কোনও এক গ্রামে তপনমিশ্রনামক এক ব্রাহ্মণ তাঁহার শরণাগত হইলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু তাঁহাকে বলিয়াছিলেন—

কলিযুগ-ধর্ম্ম হয় নামসঙ্কীর্ত্তন। চারিযুগে চারিধর্ম্ম জীবের কারণ॥
'কৃতে যদ্ধ্যায়তো বিষ্ণুং ত্রেতায়াং যজতো মখৈঃ।
দ্বাপরে পরিচর্য্যায়াং কলৌ তদ্ধরিকীর্ত্তনাৎ॥ (১)'
অতএব কহিলেন নামযজ্ঞ সার। আর কোন ধর্ম্ম কৈলে নাহি হয় পার॥
রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে। তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে।
শুন মিশ্র কলিযুগে নাহি তপযজ্ঞ। যেই জন ভজে কৃষ্ণ তার মহাভাগ্য॥
অতএব গৃহে তুমি কৃষ্ণ ভজ গিয়া। কুটিনাটি পরিহরি একান্ত হইয়া॥
সাধ্যসাধন-তত্ত্ব যে কিছু সকল। হরিনাম সঙ্কীর্ত্তনে মিলিবে সকল॥
'হরের্নাম হরের্নাম হরের্নামৈব কেবলম্। কলৌ নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব নাস্ত্যেব গতিরন্যথা॥' (২)

অথ মহামন্ত্র

'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'
এই শ্লোক নাম বলি লয় মহামন্ত্র। ষোলনাম বত্রিশ অক্ষর এই তন্ত্র॥
সাধিতে সাধিতে যবে প্রেমাঙ্কুর হবে। সাধ্য-সাধন-তত্ত্ব জানিবা সে তবে॥

—শ্রীচৈতন্যভাগবত॥ আদিখণ্ড॥১০ম অধ্যায়॥

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উল্লিখিত প্রমাণ হইতেও জানাগেল—ষোলনাম বত্রিশাক্ষর তারকব্রহ্ম নামই কলির যুগধর্ম্ম। শ্রীমন্ মহাপ্রভু বর্ত্তমান কলিতেই এই যুগধর্ম্মের উপদেশ করিয়াছেন বলিয়া ইহা যে বর্ত্তমান কলিরও যুগধর্ম্ম, তাহাও পরিষ্কার ভাবে জানা গেল।

গ। তারকব্রহ্ম নাম ও অন্য ভগবন্নামের কীর্ত্তনীয়তা

ষোলনাম বত্রিশাক্ষর তারকব্রহ্ম নামের কীর্ত্তন যখন কলিযুগের যুগধর্ম্ম, তখন কলিযুগের

---

(১) শ্রীভা, ১২।৩।৫২॥ অনুবাদঃ—সত্যযুগে ধ্যান, ত্রেতাযুগে যজ্ঞ, দ্বাপরে পরিচর্য্যা করিয়া যাহা পাওয়া যায়, কলিযুগে শ্রীহরির কীর্ত্তন করিলেই তাহা পাওয়া যায়।

(২) বৃহন্নারদীয়-পুরাণ-বাক্য॥ অনুবাদঃ—কেবল হরির নাম, কেবল হরির নাম, কেবল হরির নামই; কলিতে আর অন্য গতি নাইই, অন্য গতি নাইই, অন্য গতি নাইই।

সাধক মাত্রের পক্ষেই এই নামের কীর্ত্তন অবশ্যকর্ত্তব্য ; কেননা, যে যুগের যাহা যুগধর্ম্ম, তাহা সেই যুগের সকলের পক্ষেই অনুসরণীয়। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ডও ষোলনাম বত্রিশাক্ষর নাম সম্বন্ধে বলিয়াছেন– শাক্ত, বৈষ্ণব, সৌর, শৈব বা গাণপত্য, এই নামের কীর্ত্তনে সকলেরই কর্ণশুদ্ধি হইয়া থাকে। "শাক্তো বা বৈষ্ণবো বাপি সৌরো বা শৈব এব বা। গাণপত্যো লভেৎ কর্ণশুদ্ধিং নামানু-কীর্ত্তনাৎ ॥৬।৬৪॥"

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই যে—বত্রিশাক্ষর নামই যদি কলিযুগের অবশ্য-কীর্ত্তনীয় হয়, তাহা হইলে শাস্ত্র কেন বলিয়াছেন, যে নামেতে যাঁহার অভিরুচি, তিনি সেই নামের কীর্ত্তন করিতে পারেন?

"সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ। যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ। সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ॥
—হ, ভ, বি, ১১।১৩৪-ধৃত পুলস্ত্যোক্তি॥

—ভগবান্ দেবদেব চক্রধারী সর্ব্বশক্তিসম্পন্ন ; অতএব, তাঁহার যে নামে যাঁহার অভিরুচি (প্রীতি) জন্মে, সকল উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্য তিনি সেই নামেরই কীর্ত্তন করিবেন। যেহেতু, পরব্রহ্ম হরির এই সকল নাম একার্থ-বোধক ; সুতরাং সকল নামেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে।"

টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীও তাহাই লিখিয়াছেন—"যস্য চ যন্নাম্নি প্রীতিস্তেন তদেব সেব্যং তেনৈব তস্য সর্ব্বার্থসিদ্ধিরিত্যাহ সর্ব্বার্থেতি দ্বাভ্যাম্॥"

ইহার সমাধান এইরূপ বলিয়া মনে হয়। পরব্রহ্ম শ্রীভগবানের মহিমা যেমন সকল যুগেই সমান, তাঁহার অভিন্নস্বরূপ শ্রীনামের মহিমাও সকল যুগেই সমান, একই রকম; কলিযুগে যে নামের মহিমা সমধিক, তাহা নহে। সর্ব্ববিষয়ে কলিজীবের চরম-দুর্দ্দশার অপেক্ষাতেই কলির যুগধর্ম্ম হইতেছে নামসঙ্কীর্ত্তন। অন্যান্য যুগে নামসঙ্কীর্ত্তন যে বর্জ্জনীয়, তাহা নহে। অন্য যুগত্রয়ের যে কোনও যুগেও সেই যুগের যুগধর্ম্মের আনুষঙ্গিক ভাবে নামসঙ্কীর্ত্তনের অনুষ্ঠান করা যায়। অন্য যুগের কোনও সাধক যদি সেই যুগের যুগধর্ম্মের আনুষঙ্গিক ভাবে নামকীর্ত্তন করিতে ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে অনন্ত-ভগবন্নামের মধ্যে যে নামে তাঁহার প্রীতি হয়, সেই নামই তিনি কীর্ত্তন করিতে পারেন। আর, যে কলিযুগে বত্রিশাক্ষর-তারকব্রহ্ম নামই যুগধর্ম্ম, সেই যুগেও যদি কোনও সাধক বত্রিশাক্ষর নামের আনুষঙ্গিক ভাবে অপর কোনও ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিতে ইচ্ছুক হয়েন, তাহা হইলেও, যেনামে তাঁহার অভিরুচি, সেই নামই তিনি কীর্ত্তন করিতে পারেন। ইহাই সমাধান বলিয়া মনে হয়।

শ্রীমন্মহাপ্রভুও উল্লিখিতরূপ সমাধানেরই ইঙ্গিত দিয়া গিয়াছেন। তিনি বত্রিশাক্ষর-নামও নিত্য কীর্ত্তন করিতেন এবং তদতিরিক্ত-"হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। যাদবায় মাধবায় কেশবায় নমঃ" ইত্যাদিও কীর্ত্তন করিতেন।

ঘ। বত্রিশাক্ষর নাম এবং উচ্চকীর্ত্তন ও সংখ্যারক্ষণ

পূর্ব্বেই (৫।১০২-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে যে, ভগবন্নামকীর্ত্তনে সংখ্যারক্ষণের অপরি-

হার্য্যতা নাই ; তবে ব্রতরক্ষাদির উদ্দেশ্যে সংখ্যারক্ষণের আবশ্যকতা আছে, তাহাও সাধকের নিজের নামৈকতৎপরতা-সিদ্ধির জন্য। আবার পূর্ব্বে (৫।৯৯-চ-অনুচ্ছেদে) ইহাও প্রদর্শিত হইয়াছে যে, নামের উচ্চ-কীর্ত্তনই প্রশস্ত। সকল ভগবন্নাম-সম্বন্ধেই এই ব্যবস্থা। কোনও বিশেষ নামের জন্য, কিম্বা বত্রিশাক্ষর তারক-ব্রহ্ম নামের জন্য, কোনওরূপ পৃথক্ ব্যবস্থা শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়না ; শ্রীজীবাদি-বৈষ্ণবাচার্য্যগণও তাহা বলেন নাই। ইহাতে বুঝা যায়—বত্রিশাক্ষর-নামের কীর্ত্তনেও সংখ্যারক্ষণের অপরিহার্য্যতা নাই এবং বত্রিশাক্ষর-নামের উচ্চকীর্ত্তনও নিষিদ্ধ নহে।

পূর্ব্ববর্ত্তী গ-অনুচ্ছেদে, শ্রীচৈতন্যভাগবত হইতে তপনমিশ্রের প্রতি শ্রীমন্‌মহাপ্রভুর যে উপদেশ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহাতে দেখা যায়, তপনমিশ্রের প্রতি উপদিষ্ট বত্রিশাক্ষর-নামকীর্ত্তন-সম্বন্ধেই মহাপ্রভু বলিয়াছেন,

রাত্রিদিন নাম লয় খাইতে শুইতে।
তাহার মহিমা বেদে নাহি পারে দিতে॥

"খাইতে শুইতে রাত্রিদিনে" নাম লইতে গেলে সর্ব্বদা সংখ্যারক্ষণ সম্ভবপর নহে। মহাপ্রভুর এই উক্তিতে সংখ্যারক্ষণের অপরিহার্য্যতার কথা জানা যায়না।

এ-সম্বন্ধে কলিসন্তরণোপনিষদুক্তির তাৎপর্য্যও উল্লিখিতরূপই। নারদের নিকটে কলিকল্মষ-বিনাশের উপায়রূপে ব্রহ্মা যখন বত্রিশাক্ষর-নামের উপদেশ করিলেন, তখন নারদ ব্রহ্মাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন—ভগবন্! আপনার উপদিষ্ট বত্রিশাক্ষর-নামকীর্ত্তনের বিধি কি? "পুনর্নারদঃ পপ্রচ্ছ ভগবন্ কোঽস্য বিধিরিতি।" তখন ব্রহ্মা বলিয়াছিলেন—ইহার কোনও বিধি নাই। শুচি হউন, কি অশুচি হউন, যিনি সর্ব্বদা এই নামকীর্ত্তন করেন, তিনি সলোকতা, সমীপতা, সরূপতা ও সাযুজ্য পাইতে পারেন। "তং হোবাচ নাস্য বিধিরিতি। সর্ব্বদা শুচিরশুচির্বা পঠন্ ব্রাহ্মণঃ সলোকতাং সমীপতাং সরূপতাং সাযুজ্যতামেতি।" (এ-স্থলে "সমীপতাম্"-শব্দে পার্ষদরূপে শ্রীকৃষ্ণসমীপে থাকিয়া তাঁহার প্রেমসেবা-প্রাপ্তিও বুঝাইতে পারে)।

এই শ্রুতিবাক্য হইতে জানা গেল—বত্রিশাক্ষর-নামের কীর্ত্তন-সম্বন্ধে কোনওরূপ বিধিই নাই। সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক নামকীর্ত্তন করিতে হইবে, যাহাতে অপরের শ্রুতিগোচর না হয়, সেই ভাবে নাম-কীর্ত্তন করিতে হইবে-ইত্যাদিরূপ কোনও বিধিরই অপেক্ষা নাই। অন্যান্য নাম-সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা, বত্রিশাক্ষর-নাম-সম্বন্ধেও সেই ব্যবস্থা। বত্রিশাক্ষর-নামকীর্ত্তন-সম্বন্ধে কোনও বিশেষ ব্যবস্থার কথা শ্রুতিও বলেন নাই, অন্যান্য শাস্ত্রও বলেন নাই।

শ্রীমন্ মহাপ্রভুও যে উচ্চস্বরেই বত্রিশাক্ষর-নাম কীর্ত্তন করিতেন, শ্রীপাদ রূপগোস্বামীর উক্তির উল্লেখ করিয়া তাহা পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। কথিত আছে, শ্রীল হরিদাস-ঠাকুরও তাঁহার নিত্যকীর্ত্তনীয় তিন লক্ষ নামের মধ্যে এক লক্ষ উচ্চস্বরে কীর্ত্তন করিতেন।

যদি বলা যায়, শ্রামন্ মহাপ্রভু এবং শ্রীল হরিদাস ঠাকুর সংখ্যারক্ষণ-পূর্ব্বক নামকীর্ত্তন করিতেন।

উত্তরে বক্তব্য এই। সংখ্যারক্ষণ পূর্ব্বক কীর্ত্তন করিলেও তাঁহারা যে উচ্চস্বরেই বত্রিশাক্ষর নামের কীর্ত্তন করিতেন, তাহা তো অস্বীকার করা যায়না ; সুতরাং বত্রিশাক্ষর-নাম যে উচ্চস্বরে কীর্ত্তনীয় নহে, তাহা বলা যায়না। বিশেষতঃ, যাহার উচ্চকীর্ত্তন একেবারেই নিষিদ্ধ, সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বকও তাহার উচ্চকীর্ত্তন বিধেয় নহে ; যেমন—দীক্ষামন্ত্র।

আর, তাঁহাদের সংখ্যারক্ষণ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই যে, ব্রতরক্ষার আদর্শ-প্রদর্শনের জন্যই তাঁহারা সংখ্যারক্ষা করিয়াছেন। শ্রাল হরিদাস ঠাকুরের ব্রত ছিল—তিনি মাসে কোটিনাম গ্রহণ করিবেন। শ্রীমন্ মহাপ্রভুও সাধকের ব্রতরক্ষার্থ সংখ্যারক্ষণের আদর্শই দেখাইয়া গিয়াছেন। বল্লবভট্টের গর্ব্ববিনাশার্থ মহাপ্রভু বলিয়াছিলেন—

> কৃষ্ণনাম বসি মাত্র করিয়ে গ্রহণে।
> সংখ্যানাম পূর্ণ মোর নহে রাত্রিদিনে॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৭।৬৮॥"

প্রভুর এই উক্তি হইতেই বুঝা যায়—সংখ্যারক্ষণ পূর্ব্বক ব্রতরূপে নাম গ্রহণের আদর্শই তিনি স্থাপন করিয়াছেন। কিন্তু বত্রিশাক্ষর-নাম কখনও অসংখ্যাত ভাবে কীর্ত্তন করিবেনা—ইহাও তিনি কখনও বলেন নাই।

ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ড "হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি তারকব্রহ্ম নামের প্রসঙ্গেই বলিয়াছেন—নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে॥—(এই ষোলনাম বত্রিশাক্ষর) নামের সঙ্কীর্ত্তন হইতেই তারকব্রহ্মের দর্শন পাওয়া যায়।" "কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাকৃষ্ণম্"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীব গোস্বামী লিখিয়াছেন, বহু লোক মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসুখকর নামের কীর্ত্তনকেই সঙ্কীর্ত্তন বলে। বহু লোকের মিলিত কীর্ত্তন উচ্চসঙ্কীর্ত্তনই হইবে। ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ তারকব্রহ্ম-নামের উচ্চকীর্ত্তনের কথাই বলিয়াছেন, সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক উচ্চকীর্ত্তনের কথা বলেন নাই।

শ্রীচৈতন্যভাগবতের উক্তি

শ্রীল বৃন্দাবনদাস ঠাকুর তাঁহার শ্রীচৈতন্যভাগবতের মধ্যখণ্ডে ত্রয়োবিংশ অধ্যায়ে শ্রামন মহাপ্রভুর উপদেশ রূপে লিখিয়াছেন—

> আপনে সভারে প্রভু করে উপদেশ। "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ॥
> 'হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে। হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে॥'
> প্রভু বোলে "কহিলাঙ এই মহামন্ত্র। ইহা গিয়া জপ' সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥
> ইহা হৈতে সর্ব্বসিদ্ধি হইব সভার। সর্ব্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর॥
> দশে-পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া। কীর্ত্তন করিহ সভে হাথে তালি দিয়া॥

'হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ। গোপাল গোবিন্দ রাম শ্রীমধুসূদন ॥'
কীর্ত্তন কহিল এই তোমা সভাকারে। স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর' গিয়া ঘরে ॥"

এ-স্থলে শ্রীমন্‌মহাপ্রভু বলিলেন—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি বত্রিশাক্ষর শ্রীকৃষ্ণনামটী হইতেছে "মহামন্ত্র"। তিনি আরও বলিয়াছেন -"সর্ব্বক্ষণ এই মহামন্ত্র বলিবে—'বাল'; এই বিষয়ে অন্য কোনও বিধি নাই—'ইথে বিধি নাহি আর।' অর্থাৎ সর্ব্বক্ষণ এই মহামন্ত্র বলিবে (উচ্চারণ করিবে), ইহাই একমাত্র বিধি, এ-সম্বন্ধে অন্য কোনও বিধি নাই। কি ভাবে এই মহামন্ত্রের জপ বা উচ্চারণ করিতে হইবে, তাহাও তিনি বলিয়াছেন—"নির্ব্বন্ধ করিয়া জপ করিবে।"

কিন্তু "নির্ব্বন্ধ"-শব্দের অর্থ কি? শব্দকল্পদ্রুম-অভিধানে লিখিত আছে "নির্ব্বন্ধঃ—অভিনিবেশঃ। নিবন্ধোঽপি পাঠঃ। ইতি হেমচন্দ্রঃ॥ অভিলষিত-প্রাপ্তৌ ভূয়ো যত্নঃ। যথা শিশুগ্রহঃ॥ শিশূনাং স্বেচ্ছাবিশেষঃ। আখটি ইতি খ্যাতঃ। ইতি কেচিৎ। ইতি গ্রহশব্দটীকায়াং ভরতঃ॥"

এইরূপে, আভিধানিকদের উক্তি হইতে জানা গেল, নির্ব্বন্ধ (পাঠান্তরে-নিবন্ধ)-শব্দের অর্থ হইতেছে—অভিনিবেশ, গাঢ় মনোযোগ; অভিলষিত বস্তুর প্রাপ্তির নিমিত্ত পুনঃ পুনঃ প্রয়াস; শিশুদের 'আখটি'র ন্যায়। কোনও বস্তুর জন্য যদি শিশুদের লোভ জন্মে, তাহা হইলে সেই বস্তুটী যে পর্য্যন্ত পাওয়া না যায়, সেই পর্য্যন্ত শিশুরা যেমন তাহাদের "বায়না" বা "জেদ" ছাড়েনা, তদ্রূপ "জেদ", বা "আখটি" বা "অভিনিবেশের" সহিত সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ বত্রিশাক্ষর মহামন্ত্রের জপ করিবে—ইহাই প্রভুর উপদেশ।

ইহাদ্বারা মহামন্ত্রের জপকে ব্রতরূপে গ্রহণ করার উপদেশই পাওয়া গেল। ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়া অত্যন্ত অভিনিবেশের সহিত সর্ব্বদা পুনঃ পুনঃ নাম জপ করা কর্ত্তব্য।

পূর্ব্বেই (৫।৯৯-ঙ অনুচ্ছেদে) বলা হইয়াছে, জপ-শব্দের অর্থ—উচ্চারণ। এই জপ তিন রকমের—বাচিক উপাংশু ও মানস। মহামন্ত্রের কোন্ রকম জপ করিতে হইবে, মহাপ্রভু তাহা বিশেষ করিয়া বলেন নাই। "ইথে বিধি নাহি আর"-এই বাক্য হইতে বুঝা যায়—সাধকের অভিরুচি অনুসারে, তিন প্রকারের জপের মধ্যে যে-কোনও প্রকারেই মহামন্ত্রের জপ করা যায়; বাচিক—অপরের শ্রুতিগোচর হইতে পারে, এমন ভাবেও—জপ করা যায়। বাচিক জপই উচ্চ কীর্ত্তন। মহাপ্রভু মহামন্ত্রের উচ্চকীর্ত্তন নিষেধ করেন নাই।

যদি বলা যায়, দীক্ষামন্ত্রের জপ করিতে হয়—অপরের শ্রুতিগোচর যাহাতে না হয়, সেইরূপ ভাবে। প্রভু যখন বত্রিশাক্ষর-নামকে "মহামন্ত্র" বলিয়াছেন, তখন ইহাই বুঝা যায়, ইহাও মন্ত্রের ন্যায়ই অতি গোপনে জপ্য—ইহাই প্রভুর অভিপ্রায়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। কেবল বত্রিশাক্ষর-নামই যে মহামন্ত্র, তাহা নহে। ভগবানের নামমাত্রই মহামন্ত্র। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—"কৃষ্ণনাম মহামন্ত্রের এইত স্বভাব। যেই জপে তার কৃষ্ণে উপজয়ে ভাব ॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৭।৮০ ॥"

শাস্ত্রপ্রমাণের উল্লেখ করিয়া "আসন্ বর্ণা স্ত্রয়ো হ্যস্য"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৮।১৩-শ্লোকের বৈষ্ণবতোষণীটীকা বলিয়াছেন—ভগবানের নামসকলের মধ্যে "কৃষ্ণাখ্য"-নামই মুখ্যতর এবং এই নামের প্রথম অক্ষরটীও মহামন্ত্র। "নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপেতি চ। যস্যাস্য যশ্চ প্রথমমপ্যক্ষরং মহামন্ত্রত্বেন প্রসিদ্ধম্॥" পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডও হরিনামকে মহামন্ত্র বলিয়াছেন—"হরিনামমহামন্ত্রৈ র্নশ্যেৎ পাপ-পিশাচকঃ॥ ২৪।৬॥—হরিনাম-মহামন্ত্রে পাপ-পিশাচ বিনষ্ট হয়॥"

দীক্ষামন্ত্র হইতে যে ফল পাওয়া যায়, ভগবন্নাম হইতেও সেই ফল পাওয়া যায়; এজন্য নামকেও মন্ত্র বলা হয়। কিন্তু দীক্ষামন্ত্র অপেক্ষা নামের মাহাত্ম্য অনেক বেশী বলিয়াই নামকে মহামন্ত্র বলা হয়। মহিমার আধিক্য বলিয়াই ভগবন্নাম দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা রাখে না; কিন্তু মন্ত্র তাহা রাখে। ভগবন্নাম ও ভগবান্ অভিন্ন বলিয়া নাম পরম-স্বতন্ত্র, কোনও বিধিনিষেধের অধীন নহে। এজন্য ভগবন্নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয়; কিন্তু মন্ত্র উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় নহে।

যদি বলা যায়, "অন্য নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় হইতে পারে; কিন্তু বত্রিশাক্ষর নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় নহে।" এইরূপ উক্তিও বিচারসহ নহে; কেননা, শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বত্রিশাক্ষর-নামের উচ্চকীর্ত্তন করিয়াছেন। ষোলনাম বত্রিশাক্ষর নামসম্বন্ধেই ব্রহ্মাণ্ডপুরাণ উত্তরখণ্ড "সঙ্কীর্ত্তনের—উচ্চকীর্ত্তনের" কথা বলিয়াছেন। "নামসঙ্কীর্ত্তনাদেব তারকং ব্রহ্ম দৃশ্যতে॥৬৫৮॥" শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর মতে "সঙ্কীর্ত্তন" হইতেছে বহুলোকের মিলিত কৃষ্ণসুখকর গান। বহুলোকের মিলিতকীর্ত্তন উচ্চকীর্ত্তনই হইবে। যাহা হউক, যদি বলা যায়, মহাপ্রভু সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক বত্রিশাক্ষরের উচ্চ কীর্ত্তন করিয়াছেন। তাহা হইলেও বক্তব্য এই যে, সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বক হইলেও তিনি বত্রিশাক্ষর-নামের উচ্চকীর্ত্তন তো করিয়াছেন; কিন্তু সংখ্যারক্ষণপূর্ব্বকও দীক্ষামন্ত্রের উচ্চকীর্ত্তন নিষিদ্ধ।

সুতরাং বত্রিশাক্ষর-নামের (বা যে কোনও ভগবন্নামেরই) অতিগোপন-জপ্যত্ব বলিয়াই যে তাহাকে 'মহামন্ত্র" বলা হয়, তাহা নহে; মন্ত্র অপেক্ষাও নামের মহিমাধিক্যবশতঃই নামকে মহামন্ত্র বলা হয়। গোপী-প্রেমামৃত একাদশ পটল বলেন—সমস্ত মন্ত্রবর্গের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হইতেছে শ্রীহরিনাম। "সর্ব্বেষু মন্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং শ্রীহরিনামকম্॥"

মন্ত্রের শক্তি থাকে প্রচ্ছন্ন ভাবে; জপের দ্বারা তাহার শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়। "পশু-ভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ। সৌষুম্নাধ্বন্যুচ্চারিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি হি॥ হ, ভ, বি, ১৭।৭৬ ধৃত মন্ত্রার্ণব-প্রমাণ॥" কিন্তু নামের শক্তি কখনও প্রচ্ছন্ন থাকে না; কেননা, নাম ও নামী অভিন্ন। স্বরাদি ভ্রংশবশতঃ, ব্যুৎক্রমোচ্চারণাদিবশতঃ, দেশ-কাল-পাত্রাদিবশতঃ এবং অন্যান্য কারণেও মন্ত্রের সাধনে অনেক ত্রুটি থাকে; নাম নামীরই ন্যায় পূর্ণ এবং স্বতন্ত্র বলিয়া দেশ-কাল-পাত্রাদির কোনও অপেক্ষা যেমন রাখে না, তেমনি আবার মন্ত্রাদির সাধনে যে অপূর্ণতা বা ত্রুটি থাকে, তাহাকেও পূর্ণ করিতে পারে।

মন্ত্রতস্তন্ত্রতশ্ছিদ্রং দেশকালার্হবস্তুতঃ। সর্ব্বং করোতি নিশ্ছিদ্রমনুসঙ্কীর্ত্তনং তব।
—শ্রীভা, ৮।২৩।১৫॥ ভগবানের প্রতি শ্রীশুক্রবাক্য ॥

এতাদৃশই হইতেছে মন্ত্র অপেক্ষা নামের মহিমাধিক্য। এজন্যই নাম কোনও বিধিনিষেধের অধীন নহে; "মনে মনে কীর্ত্তন করিবে, উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিবেনা"—এইরূপ কোনও বিধিরও অধীন নহে। শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও সুস্পষ্ট ভাবেই বলিয়াছেন—"ইথে বিধি নাহি আর।" এবং তিনি নিজেও বত্রিশাক্ষর নাম উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তন করিয়া তাহা দেখাইয়া গিয়াছেন।

আবার যদি বলা যায়—মহামন্ত্র সম্বন্ধে যদি উচ্চস্বরে কীর্ত্তনের কোনও বাধাই না থাকে, তাহা হইলে মহাপ্রভু মহামন্ত্রের জপের কথা বলিয়া "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ"-ইত্যাদি নাম "দশে-পাঁচে মিলিয়া, করতালি দিয়া কীর্ত্তনের" কথা বলিলেন কেন? তাঁহার উপদেশ হইতে মনে হয়—মহামন্ত্র গোপনে জপ্য, অন্য নাম প্রকাশ্যে উচ্চস্বরে কীর্ত্তনীয়।

এ-সম্বন্ধে বক্তব্য এই। বত্রিশাক্ষর-নামরূপ মহামন্ত্রের কীর্ত্তন হইতেছে কলির যুগধর্ম্ম। এজন্য কলিযুগে এই নাম প্রত্যেকেরই অবশ্যকীর্ত্তনীয়, অত্যন্ত আগ্রহ এবং অভিনিবেশ সহকারে ব্রতরূপে কীর্ত্তনীয়। একাকী নির্জনে জপ বা কীর্ত্তনই মনের গাঢ় অভিনিবেশের অনুকূল। এজন্যই মহাপ্রভু বলিয়াছেন—"ইহা গিয়া জপ সভে করিয়া নির্ব্বন্ধ॥" প্রতিদিন নির্দ্দিষ্ট-সংখ্যক নামের জপে বা কীর্ত্তনেই "নির্ব্বন্ধ" সিদ্ধ হইতে পারে, ব্রতরক্ষা হইতে পারে। একাকী নির্জনে বসিয়া ব্রতরূপে গৃহীত নামকীর্ত্তন শেষ করিয়া অন্য লোকের সঙ্গেও নামকীর্ত্তন করা যায়। "দশে-পাঁচে মিলি নিজ দুয়ারে বসিয়া"-ইত্যাদি বাক্যে প্রভু তাহাই বলিয়াছেন। প্রভুর এই বাক্যগুলি উপলক্ষণ মাত্র। "দশে-পাঁচে" মিলিয়া কীর্ত্তন করিবে, দশজন বা পাঁচ জনের বেশী বা কম যেন না হয়—ইহা প্রভুর অভিপ্রেত হইতে পারেনা; দশ-পাঁচের উপলক্ষণে বহু লোকের কথাই প্রভু বলিয়াছেন। নিজ দুয়ারে বসিয়া কীর্ত্তন করিবে—ইহাও উপলক্ষণমাত্র; নিজ দুয়ার ছাড়া অন্যত্র কীর্ত্তন করিবেনা, কিম্বা বসিয়া বসিয়া ছাড়া দাঁড়াইয়া বা নৃত্য করিতে করিতে কীর্ত্তন করিবে না—ইহা প্রভুর অভিপ্রেত হইতে পারেনা। হাতে তালি দিয়া-ইহাও উপলক্ষণ; হাতে তালির উপলক্ষণে খোল-করতালাদির সহযোগে কীর্ত্তনও প্রভুর অভিপ্রেত। "স্ত্রীয়ে পুত্রে বাপে মিলি কর' গিয়া ঘরে"—ইহাও উপলক্ষণ। স্ত্রী-পুত্র ব্যতীত অন্যের সঙ্গে কীর্ত্তন করিবেনা, কিম্বা ঘরে ব্যতীত কখনও বাহিরে কীর্ত্তন করিবেনা-ইহা প্রভুর অভিপ্রেত হইতে পারে না। তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, যে কোনও লোকের সঙ্গে, যে-কোনও স্থানে করতালাদি-সহযোগে কীর্ত্তন করিবে; অন্য লোক পাওয়া না গেলে নিজের বাড়ীর লোকদের লইয়া নিজের বাড়ীতেই কীর্ত্তন করিবে। এ-সমস্ত যেমন উপলক্ষণ, তদ্রূপ এ-সমস্তের সঙ্গে কথিত "হরয়ে নমঃ কৃষ্ণ যাদবায় নমঃ"ইত্যাদি নামও উপলক্ষণ মাত্র। এই কয়টী নামের উপলক্ষণে, সাধকের অভিরুচি অনুসারে অন্য নামও যে কীর্ত্তনীয়—ইহাই প্রভু জানাইয়াছেন। বত্রিশাক্ষর নামও ইহাদ্বারা উপলক্ষিত হইয়াছে বলিয়া মনে করা যায়। কেননা, বহু লোক মিলিত হইয়া বত্রিশাক্ষর নাম কীর্ত্তন করা সঙ্গত

নহে —এইরূপ কথা মহাপ্রভু কোনও স্থলে বলেন নাই, শাস্ত্রেও এইরূপ নিষেধ দৃষ্ট হয়না। বরং এই বত্রিশাক্ষর নামসম্বন্ধেই প্রভু বলিয়াছেন—"সর্ব্বক্ষণ বোল, ইথে বিধি নাহি আর॥"

শ্রীপাদ জীব গোস্বামীর উক্তিও বহুলোক মিলিত হইয়া বত্রিশাক্ষর-নামকীর্ত্তনের অনুকূল বলিয়া মনে হয়।

"কৃষ্ণবর্ণং ত্বিষাঽকৃষ্ণং সাঙ্গোপাঙ্গাস্ত্রপার্ষদম্। যজ্ঞৈঃ সঙ্কীর্ত্তনপ্রায়ৈর্যজন্তি হি সুমেধসঃ॥ শ্রীভা ১১।৫।৩২॥"-শ্লোকে বর্ত্তমান কলির উপাসনাসম্বন্ধে বলা হইয়াছে—"সঙ্কীর্ত্তন-প্রধান উপচারের দ্বারাই বুদ্ধিমান্ ব্যক্তিগণ কলির উপাস্যের যজন করেন।" এই শ্লোকের ক্রমসন্দর্ভ-টীকায় সঙ্কীর্ত্তন-শব্দের অর্থে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন-"সঙ্কীর্ত্তনং বহুভির্মিলিত্বা তদ্গানসুখং শ্রীকৃষ্ণগানম্।—বহু লোক মিলিত হইয়া শ্রীকৃষ্ণসুখকর শ্রীকৃষ্ণগানই হইতেছে সঙ্কীর্ত্তন।" শ্রীকৃষ্ণগান বলিতে" শ্রীকৃষ্ণের নাম, গুণ, লীলাদির গানই বুঝায়।" নাম সঙ্কীর্ত্তনও বহু লোক মিলিত হইয়া কর্ত্তব্য, এ-স্থলে তাহাই বলা হইল। কলির যুগধর্ম্ম বত্রিশাক্ষর নামের প্রচারক বা প্রবর্ত্তকও হইতেছেন বর্ত্তমান কলির উপাস্য যিনি, তিনিই। তাঁহার প্রচারিত নামের কীর্ত্তনে যে তিনি সমধিক আনন্দ লাভ করিবেন—ইহা নিত্যান্ত স্বাভাবিক। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে "বহুলোক মিলিত হইয়া বত্রিশাক্ষর নামের কীর্ত্তনও" শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর অভিপ্রেত বলিয়া বুঝা যায়।

ইহার ব্যবহারও প্রচলিত আছে। শ্রীবৃন্দাবনাদি ভগবদ্ধামে ভজনপরায়ণ নিষ্কিঞ্চন বৈষ্ণবগণও স্মরণাতীত কাল হইতেই খোল-করতালাদি-যোগে বহুলোক মিলিত হইয়া বত্রিশাক্ষর-নামের কীর্ত্তন করিয়া আসিতেছেন।

শ্রীমন্মহাপ্রভুর উল্লিখিত উপদেশের মধ্যে একটী কথা বিশেষভাবে প্রণিধানযোগ্য। যাহা সর্ব্বতোভাবে গোপনীয় (যেমন দীক্ষামন্ত্র), তাহা কখনও উচ্চৈঃস্বরে কীর্ত্তনীয় নহে, অপরের শ্রুতিগোচর হয়—এমনভাবে কথনীয়ও নহে। দীক্ষামন্ত্রসম্বন্ধে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন—বরং গুরুকে প্রকাশ করিবে, তথাপি মন্ত্রকে প্রকাশ করিবে না। "গুরুং প্রকাশয়েদ্বিদ্বান্ মন্ত্রং নৈব প্রকাশয়েৎ॥ হ, ভ, বি, ১৭।৫৭॥"; কেবল মন্ত্রগোপনের কথাই নহে, মন্ত্রজপের মালাকেও গোপনে রাখার কথা, এমন কি গুরুকেও যেন জপমালা দেখান না হয়—সে কথাও হরিভক্তিবিলাস বলিয়াছেন। "অক্ষমালাঞ্চ মুদ্রাঞ্চ গুরোরপি ন দর্শয়েৎ॥ ১৭।৫৮॥" যে মন্ত্র সর্বতোভাবে গোপনীয়, তাহার সম্বন্ধে এইরূপই ব্যবস্থা। কিন্তু ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্র সম্বন্ধে যে এইরূপ ব্যবস্থা প্রযোজ্য নহে, মহাপ্রভুর উক্তি হইতেই তাহা বুঝা যায়। তিনি সকলকে লক্ষ্য করিয়া বলিয়াছেন "কৃষ্ণনাম মহামন্ত্র শুনহ বিশেষ।" তাহার পরে সঙ্গে সঙ্গেই মহামন্ত্রটী বলিলেন—"হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ'-ইত্যাদি। উচ্চৈঃস্বরে, সকলের শ্রুতিগোচর ভাবেই যে মহাপ্রভু এই মহামন্ত্রটী বলিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহের অবকাশ থাকিতে পারে না। প্রত্যেককে পৃথক্ পৃথক্ ভাবে ডাকিয়া নিজের নিকটে আনিয়া যে প্রভু তাঁহার কানে কানে এই মন্ত্রটী বলিয়াছিলেন, তাহার কোনও উল্লেখ নাই, বৃন্দাবনদাস ঠাকুরের

লিখিত বিবরণ হইতে তাহা অনুমিতও হইতে পারে না। উপস্থিত লোকগণের সকলেই যাহাতে শুনিতে পায়—সেই ভাবেই মহাপ্রভু "হরে কৃষ্ণ"-ইত্যাদি মহামন্ত্রটীর উচ্চারণ করিয়াছিলেন। কিন্তু দীক্ষা-মন্ত্রের এতাদৃশ উচ্চারণ নিষিদ্ধ ; শ্রীগুরুদেব যখন শিষ্যকে দীক্ষা দেন, তখনও তিনি শিষ্যের কর্ণমূলে—অপর কেহ শুনিতে না পায়, এই ভাবেই—মন্ত্রটী জানাইয়া দেন। প্রভুর আচরণ হইতেই জানা যায় –"হরেকৃষ্ণ"-ইত্যাদি মহামন্ত্র দীক্ষামন্ত্রের ন্যায় গোপনীয় নহে। এইরূপে দেখা গেল—ষোলনাম বত্রিশাক্ষরাত্মক মহামন্ত্রের উচ্চকথন বা উচ্চকীর্ত্তন মহাপ্রভুর অনভিপ্রেত নহে, ইহা বরং তাঁহার অভিপ্রেতই।

১০৪। নামাভাস

ভগবানের নাম এবং নামাভাসে কিঞ্চিৎ পার্থক্য আছে। প্রয়োগ-স্থানের পার্থক্যবশতঃই এই পার্থক্য। ভগবানের নাম যদি ভাগবানেই প্রয়োজিত হয়, অর্থাৎ ভগবান্‌কে লক্ষ্য করিয়াই উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহা হয় "নাম" ; আর, সেই নাম যদি ভগবানে প্রয়োজিত না হইয়া অন্য কোনও বস্তুতে প্রয়োজিত হয়, অন্য কোনও বস্তুকে লক্ষ্য করিয়া উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে "নামাভাস।" যেমন, একজন লোকের নাম আছে "নারায়ণ।" এই নামটী কিন্তু প্রকৃতপ্রস্তাবে ভগবান্ নারায়ণেরই নাম। ভগবান্ নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়া যদি "নারায়ণ"-শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে "নাম।" আর, ভগবান্ নারায়ণকে লক্ষ্য না করিয়া যদি নারায়ণ-নামক লোকটীকে লক্ষ্য করিয়া—"ওহে নারায়ণ কথা শুন"-এই ভাবে "নায়ায়ণ"-শব্দ উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে তাহা হইবে "নামাভাস।"

"অন্য সঙ্কেতে অন্য হয় 'নামাভাস'। শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।৫৪॥"

কোনও বস্তুর নাম হইতেছে বাস্তবিক সেই বস্তুর পরিচায়ক একটী সঙ্কেত-মাত্র। "নারায়ণ"-শব্দটী হইতেছে ভগবান্ নারায়ণেরই পরিচায়ক সঙ্কেত ; সঙ্কেত হইলেও ইহা হইতেছে ভগবান্ নারায়ণের মহিমাব্যঞ্জক সঙ্কেত—তিনি নারসমূহের অয়ন (আশ্রয়) বলিয়া তাঁহাকে "নারায়ণ" বলা হয়। সুতরাং "নারায়ণ"-শব্দের বাস্তব বাচ্য ভগবান্ নারায়ণই। কোনও জীব বাস্তবিক "নারায়ণ—নারসমূহের আশ্রয়" হইতে পারে না ; তথাপি লৌকিক জগতে ভগবানের নামেও ব্যক্তিবিশেষের নাম রাখা হয়। যেমন, এক জন লোকের নামও নারায়ণ, বা কৃষ্ণ, বা দামোদর-ইত্যাদি রাখা হয়। ইহা হইতেছে সেই লোকের পরিচায়ক সঙ্কেত মাত্র, ইহা তাহার গুণবাচক বা মহিমা-বাচক নহে। অন্ধব্যক্তির নামও পদ্মলোচন রাখা হয়। "নারায়ণ"-শব্দটী হইতেছে স্বরূপতঃ ভগবানেরই যথার্থ সঙ্কেত ; অপরের পক্ষে—নারায়ণ নামক লোকের পক্ষে—তাহা হইবে বস্তুতঃ "অন্য সঙ্কেত",

অপরের (নারায়ণ ব্যতীত অপরের) পরিচায়ক যে সঙ্কেত, সেই সঙ্কেত। এইরূপ "অন্য সঙ্কেতে" যখন "অন্যকে—নারায়ণব্যতীত অপরকে" আহ্বান করা হয়, তখন তাহা হইবে "নামাভাস।"

ক। নামাভাসের মহিমা

ভগবানের নাম ও নামী ভগবান্ অভিন্ন বলিয়া ভগবানের নামাভাসের মহিমাও অসাধারণ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, প্রয়োগ-স্থলের পার্থক্যেই নাম ও নামাভাসের পার্থক্য। ভগবানের নাম ভগবানেরই ন্যায় অপ্রাকৃত চিন্ময় বলিয়া যে বস্তুতেই প্রয়োজিত হউক না কেন, তাহার মহিমা ক্ষুণ্ণ হইতে পারে না। একটী বহুমূল্য রত্নকে যে-স্থানেই রাখা হউক না কেন, তাহার মূল্য কমিবে না। রত্নবিক্রেতার সিন্ধুকে বহুমূল্য বস্ত্রের আবরণে অবস্থিত অবস্থাতে রত্নের যে মূল্য, ভস্মস্তূপে থাকিলেও সেই মূল্য। কয়েকটী প্রাকৃত অক্ষর সম্মিলিত হইয়াও যখন ভগবানের নামে পরিণত হয়, তখন সেই নাম এবং নামাক্ষরগুলিও অপ্রাকৃত চিন্ময় হইয়া যায় (৫।৯৯-গ-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)। এজন্যই নামাভাসেরও আসাধারণ মহিমা। নামাভাসে মুক্তিলাভও হইতে পারে।

"যদ্যপি অন্যসঙ্কেতে অন্য হয় 'নামাভাস'।
তথাপি নামের তেজ না হয় বিনাশ॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।৫৪॥"

ইহার অনুকূল শাস্ত্রপ্রমাণও দৃষ্ট হয়।

"দংষ্ট্রি-দংষ্ট্রাহতো ম্লেচ্ছো হারামেতি পুনঃপুনঃ।
উক্ত্বাপি মুক্তিমাপ্নোতি কিং পুনঃ শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

শ্রীচৈ, চ, ৩।৩-ধৃত নৃসিংহপুরাণ প্রমাণ॥

—বৃহদ্দন্তবিশিষ্ট শূকরের (যবন-ভাষায় হারামের) দন্তদ্বারা আহত হইয়া যবনব্যক্তি বারম্বার "হারাম, হারাম"-শব্দের উচ্চারণ করিয়াও যখন মুক্তিলাভ করে, তখন শ্রদ্ধাপূর্ব্বক হরিনাম কীর্ত্তন করিলে যে মুক্তি লাভ করা যায়, ইহাতে আর বিচিত্রতা কি আছে?"

যাবনিক ভাষায় শূকরকে "হারাম" বলা হয়। কোনও যবন শূকর (হারাম)-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া নিজের উদ্ধারের জন্য অপরের দৃষ্টি আকর্ষণের উদ্দেশ্যে যদি পুনঃ পুনঃ "হারাম—শূকর"-শব্দের উচ্চারণ করে, তাহাহইলে তাহার দ্বারা "রাম"-শব্দ উচ্চারিত হইয়া থাকে। কিন্তু ভগবান্ রামের প্রতি তাহার লক্ষ্য থাকেনা, লক্ষ্য থাকে শূকরের প্রতি। তাই এ-স্থলে রাম-নামের উচ্চারণ হয়না, নামাভাসেরই উচ্চারণ হয়। তাহার ফলেও সেই যবন মুক্তি লাভ করিতে পারে। মুক্তিদায়কত্ব হইতেছে ভগবন্নামের স্বরূপগত মহিমা। এজন্যই নামাভাসেও মুক্তি হইয়া থাকে; ভগবন্নাম সর্ব্বাবস্থাতেই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম প্রকাশ করিয়া থাকে। জ্বলন্ত কয়লাখণ্ড যে-স্থানেই থাকুক না কেন, তাহার স্বরূপগত-দাহিকা-শক্তি হারায় না। অগ্নিতুল্য উত্তপ্ত জলেরও অগ্নি-নির্ব্বাপকত্ব শক্তি থাকে।

খ। অজামিলের বিবরণ

শ্রীমদ্‌ভাগবতে বর্ণিত অজামিলের ঐতিহাসিক বিবরণ হইতে নামাভাসের সর্ব্বপাপ-বিনাশকত্বের এবং মুক্তিদায়কত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

অজামিল ছিলেন প্রথমে সদাচারনিষ্ঠ ব্রাহ্মণ-সন্তান। কিন্তু পরে এক দাসীর মোহে পতিত হইয়া পিতা-মাতা এবং সতীসাধ্বী পতিব্রতা পত্নীকে ত্যাগ করিয়া দাসীগৃহে গিয়া অবস্থান করিতে থাকেন। নিজের, দাসীর এবং দাসীর কুটুম্বদের ভরণ-পোষণের নিমিত্ত সর্ব্ববিধ অসদুপায়ে অর্থোপার্জনে রত হইয়া তিনি মহা পাপিষ্ঠ হইয়া পড়েন। দাসীর গর্ভে তাঁহার কয়েকটী সন্তানও জন্মিয়াছিল। তাঁহার বৃদ্ধাবস্থায় তাঁহার কনিষ্ঠপুত্রের জন্ম হয়; তিনি তাহার নাম রাখিয়াছিলেন—"নারায়ণ"; তিনি তাঁহার এই কনিষ্ঠপুত্রের প্রতি অত্যন্ত আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন; তাহার স্নানাহার-বেশভূষাদি তিনি নিজেই সম্পাদন করিতেন। তাঁহার অন্তিম-সময়ে একদিন তাঁহার শিশু কনিষ্ঠপুত্র তাহার ক্রীড়নক লইয়া খেলায় নিমগ্ন। তখন অজামিলের মৃত্যুকালও উপস্থিত; কিন্তু তখনও তিনি তাঁহার নারায়ণ-নামক বালকের প্রতিই তাঁহার মতিকে নিবিষ্ট করিয়া আছেন।

স এবং বর্ত্তমানোঽজ্ঞো মৃত্যুকাল উপস্থিতে।
মতিঞ্চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে॥ শ্রীভা, ৬।১।২৭॥

মহাপাপী অজামিলকে নরকে নেওয়ার জন্য পাশহস্ত তিনজন ভীষণদর্শন যমদূত আসিয়া তাঁহার নিকটে উপস্থিত হইল। তাহাদিগকে দেখিয়া অজামিল ভয়ে ব্যাকুল হইয়া প্লাবিত উচ্চৈঃস্বরে "নারায়ণ, নারায়ণ" বলিয়া দূরে ক্রীড়নকাসক্ত তাঁহার পুত্রটীকে ডাকিতে লাগিলেন।

দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং নারায়ণাহ্বয়ম্।
প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈরাজুহাবাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥ শ্রীভা, ৬।১।২৯॥

ম্রিয়মাণ অজামিলের মুখে উচ্চারিত ভগবান্ শ্রীহরির "নারায়ণ" নাম শুনিয়া তৎক্ষণাৎ চারুদর্শন চারিজন বিষ্ণুদূত আসিয়া সে-স্থানে উপস্থিত হইলেন এবং যমদূতগণের সঙ্গে ধর্ম্মবিচার করিয়া তাহাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে, যদিও অজামিল অসংখ্য পাপকর্ম্মে পাপিষ্ঠ ছিলেন, তথাপি যখনই তাঁহার জিহ্বায় "নারায়ণ"-এই চারিটী অক্ষর উচ্চারিত হইয়াছে, তখনই তাঁহার কোটিজন্মসঞ্চিত সমস্ত পাপরাশি ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছে।

অয়ং হি কৃতনির্ব্বেশো জন্মকোট্যংহসামপি।
যদ্ ব্যজহার বিবশো নাম স্বস্ত্যয়নং হরেঃ॥
এতেনৈব হ্যঘোনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্॥
যদা নারায়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্॥ শ্রীভা, ৬।২।৭-৮॥

কেননা, (পুত্রাদির) সঙ্কেতেই হউক, কি পরিহাসের সহিতই হউক, কিম্বা গীতালাপ-পূরণার্থ

(স্তোভ), বা হেলার সহিতই হউক, যে কোনও ভাবে ভগবানের নাম উচ্চারণ করিলেই অশেষ পাপ বিদূরিত হইয়া যায়।

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা।
বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥ শ্রীভা, ৬।২।১৪॥

যেহেতু, ভগবানের নামোচ্চারণই হইতেছে সমস্ত পাপীর একমাত্র সুনিশ্চিত প্রায়শ্চিত্ত; কেননা, যখনই কেহ ভগবান্ বিষ্ণুর নাম উচ্চারণ করে, তখনই বিষ্ণুর তদ্‌বিষয়া মতি হয় (যিনি নামোচ্চারণ করেন, তাঁহার বিষয়ে ভগবানের মতি হয়; 'এই নামোচ্চারণকারী আমারই জন, সর্ব্বতো-ভাবে আমাকর্ত্তৃক রক্ষণীয়'—ভগবানের চিত্তে এইরূপ ভাব জাগ্রত হয়। তদ্বিষয়া নামোচ্চরক-পুরুষ-বিষয়া মদীয়োঽয়ং ময়া সর্ব্বতো রক্ষণীয় ইতি বিষ্ণোর্মতির্ভবতি'॥ শ্রীধরস্বামী)।

সর্ব্বেষামপ্যঘবতামিদমেব সুনিষ্কৃতম্।
নামব্যহরণং বিষ্ণোর্যতস্তদ্‌বিষয়া মতিঃ॥ শ্রীভা, ৬।২।১০॥

মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে অজামিলের প্রসঙ্গ বর্ণন করিয়া শ্রীল শুকদেবও উপসংহারে বলিয়াছেন,

"ম্রিয়মাণো হরের্নাম গৃণন্ পুত্রোপচারিতম্।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়াগৃণন্॥ শ্রীভা, ৬।২।৪৯॥

—মৃত্যুসময়ে পুত্রকে উপলক্ষ্য করিয়া শ্রীহরির নাম উচ্চারণ করিয়া অজামিলও (অজামিলের ন্যায় মহাপাপীও) ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধার সহিত হরিনাম কীর্ত্তন করিলে যে ফল হয়, তাহার কথা আর কি বলিব?"

বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণের বন্ধন হইতে অজামিলকে মুক্ত করিয়া অন্তর্দ্ধান প্রাপ্ত হইলেন। পুত্রের উপলক্ষ্যে "নারায়ণ"-নাম উচ্চারণের ফলেই অজামিল সংসার-মুক্ত হইয়া ভগবৎ-পার্ষদত্বলাভ করিয়াছিলেন। এতাদৃশই নামাভাসেরও মহিমা।

যদি কেহ বলেন, যমদূতগণকে দেখিয়া অজামিল যখন "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়াছিলেন, তখন ভগবান্ নারায়ণের প্রতিই তাঁহার লক্ষ্য ছিল, তাহা হইলে বক্তব্য এই যে—ভগবান্ নারায়ণের প্রতি তখন যে তাঁহার মন ছিল না, শ্রীমদ্‌ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায়। শ্রীভা, ৬।১।২৭-শ্লোকে বলা হইয়াছে, নারায়ণ-নামক পুত্রের প্রতিই তখন অজামিলের মতি ছিল। "মতিঞ্চকার তনয়ে বালে নারায়ণাহ্বয়ে॥" পরবর্ত্তী ৬।১।২৯-শ্লোকেও বলা হইয়াছে—দূরে অবস্থিত ক্রীড়নকাসক্ত নারায়ণ নামক পুত্রকেই তিনি উচ্চৈঃস্বরে ব্যাকুলতার সহিত ডাকিয়াছিলেন। "দূরে ক্রীড়নকাসক্তং পুত্রং নারায়ণাহ্বয়ম্। প্লাবিতেন স্বরেণোচ্চৈরাজুহাবাকুলেন্দ্রিয়ঃ॥" ভগবান্ নারায়ণকে লক্ষ্য করিয়াই যদি অজামিল "নারায়ণ"-নাম উচ্চারণ করিতেন, তাহা হইলে বিষ্ণুদূতগণও তাঁহার এই উচ্চারণকে "সাঙ্কেত্যম্" বলিতেন না (শ্রীভা; ৬।২।১৪) এবং স্বয়ং শুকদেবও ইহাকে "পুত্রোপচারিত নাম"

বলিতেন না (শ্রীভা, ৬।২।৪৯)। বস্তুতঃ, বিষ্ণুদূতগণের মুখে, যমদূতগণের নিকটে কথিত, ভাগবত-ধর্ম্মের কথা শ্রবণ করার পরেই অজামিল ভগবানের প্রতি ভক্তিমান্ হইয়াছিলেন এবং নিজের পূর্ব্বকৃত দুষ্কর্ম্মের জন্য অনুতাপগ্রস্ত হইয়াছিলেন; তাহার পূর্ব্বে নহে। "অজামিলোঽপ্যথাকর্ণ্য দূতানাং যমকৃষ্ণয়োঃ। ধর্ম্মং ভাগবতং শুদ্ধং ত্রৈবেদ্যঞ্চগুণাশ্রয়ম্ ॥ ভক্তিমান্ ভগবত্যাশু মাহাত্ম্যশ্রবণাদ্ধরেঃ। অনুতাপো মহানাসীৎ স্মরতোঽশুভমাত্মনঃ ॥ শ্রীভা, ৬।২।২৪-২৫ ॥ পূর্ব্ববর্ত্তী ২১৫৩ পৃষ্ঠায় এই শ্লোকের অনুবাদ দ্রষ্টব্য।" ইহা হইতে জানা গেল—অজামিল যখন যমদূতগণকে দেখিয়া "নারায়ণ নারায়ণ" বলিয়া পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন, তখন পর্য্যন্ত ভগবান্ নারায়ণের প্রতি তাঁহার শ্রদ্ধাদি কিছুই ছিল না, ভগবান্ নারায়ণের কথাও তখন তাঁহার মনে জাগে নাই। তাঁহার ক্রীড়নকাসক্ত পুত্রই তখন তাঁহার সমস্ত চিত্তকে অধিকার করিয়া বর্ত্তমান ছিল।

যাহা হউক, অজামিলের দৃষ্টান্তে সর্ব্বমুক্তির প্রসঙ্গ আসিতে পারে না। চিত্তে যদি অপরাধ থাকে, তাহা হইলে নামাভাসের উচ্চারণে মুক্তি হয় না। (১) নামাভাসে নিরপরাধ লোকের মুক্তি হইতে পারে বটে, কিন্তু ভগবদ্‌বিষক প্রেম লাভ হয় না।

১০৫। ভগবত্ত্বারোপিত জীবের নামের কীর্ত্তন

ক। জীবেশ্বরে সমত্বজ্ঞান অপরাধজনক

জীব ও ভগবান্ কখনও সমান নহে। চিদংশে তুল্যতা থাকিলেও মহিমায় অনেক পার্থক্য। ভগবান্ ব্রহ্ম হইতেছেন বিভুচিৎ, জীব হইতেছে অণুচিৎ; অণু এবং বিভু কখনও সমান হইতে পারে না। জলদগ্নিরাশি এবং স্ফুলিঙ্গের কণা সমান হইতে পারে না।

জীব (আর) ঈশ্বর-তত্ত্ব কভু নহে সম।
জলদগ্নিরাশি যৈছে স্ফুলিঙ্গের কণ ॥ শ্রীচৈঃ চঃ ২।১৮।১০৬॥

জীব যখন সম্যক্‌রূপে মায়ানির্ম্মুক্ত হইয়া স্বরূপে অবস্থিত থাকে, তখনও অণুই থাকে, বিভু হয়না; কেননা, অণুত্বই হইতেছে জীবের স্বরূপ।

ভগবান্ অনন্ত-অচিন্ত্যশক্তিসম্পন্ন, জীব অল্পশক্তি। ভগবান্ মায়ার অধীশ্বর; অনাদি-বহির্ম্মুখ জীব মায়ার অধীন। হ্লাদিনী-সন্ধিনী-সংবিদাত্মিকা স্বরূপশক্তি ভগবানে নিত্য অবস্থিতা; জীবে স্বরূপ-শক্তি নাই। এ-সমস্ত কারণে জীব এবং ঈশ্বর কখনও সমান হইতে পারে না।

যেই মূঢ় কহে—জীব ঈশ্বর হয় সম।
সেই ত পাষণ্ডী হয় দণ্ডে তারে যম ॥ শ্রীচৈঃ চঃ ২।১৮।১০৭॥

জীবের কথা তো দূরে, ব্রহ্মারুদ্রাদি দেবতাগণকেও যদি ভগবান্ নারায়ণের সমান মনে করা হয়, তাহাহইলে তাহাও যে নিত্যন্ত দোষাবহ, শাস্ত্র তাহাই বলিয়া গিয়াছেন।

---

(১) লেখক-সম্পাদিত গৌরকৃপাতরঙ্গিনী টীকা সম্বলিত শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের তৃতীয় সংস্করণে ৩।৩।১৭০ পয়ারের টীকায় এ-সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে আলোচনা করা হইয়াছে।

"যস্তু নারায়ণং দেবং ব্রহ্মরুদ্রাদিদৈবতৈঃ।
সমত্বেনৈব বীক্ষেত স পাষণ্ডী ভবেদ্ ধ্রুবম্॥

—হ, ভ, বি, ১।৭৩-ধৃত পাদ্মোত্তরখণ্ড-বচন॥

—যে জন ব্রহ্মা ও রুদ্রাদি (ব্রহ্মা, রুদ্র এবং ইন্দ্রাদি) দেবতাগণের সহিত শ্রীনারায়াণদেবকে সমান মনে করে, সে জন নিশ্চয়ই পাষণ্ডী।"

এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"কিঞ্চ যস্ত্বিতি। আদি-শব্দেন ইন্দ্রাদয়ঃ। অয়ংভাবঃ—শ্রীব্রহ্মরুদ্রৌ গুণাবতারৌ, ইন্দ্রাদয়ো বিভূতয়ঃ, ভগবান্ শ্রীনারায়ণোঽহ-বতারী পরমেশ্বরঃ ইত্যেতৎ শাস্ত্রৈঃ প্রতিপাদ্যতে, অতোঽন্যৈঃ সহ তস্য সাম্যদৃষ্ট্যা শাস্ত্রানাদরেণ পাষণ্ডিতা নিষ্পাদ্যতে ইতি। অতএবোক্তং বৃহৎসহস্রনামস্তোত্রে শ্রীমহাদেবেন। নাবৈষ্ণবায় দাতব্যং বিকল্পোপহতাত্মনে। ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীনায় বিষ্ণুসামান্যদর্শিন ইতি॥ তদন্তে শ্রীদুর্গাদেব্যা চ। অহো সর্ব্বেশ্বরো বিষ্ণুঃ সর্ব্বদেবোত্তমোত্তমঃ। জগদাদিগুরুর্মূঢ়ৈঃ সামান্য ইব বীক্ষ্যতে ইতি॥"

মর্ম্মার্থ। শ্লোকস্থ 'আদি'-শব্দে ইন্দ্রাদি দেবতাগণকে বুঝাইতেছে। ব্রহ্মা এবং রুদ্র হইতেছেন গুণাবতার, ইন্দ্রাদিদেবতাগণ হইতেছেন ভগবান্ নারায়ণের বিভূতি; আর ভগবান্ নারায়ণ হইতেছেন অবতারী পরমেশ্বর, সমস্ত শাস্ত্রেই ইহা প্রতিপাদিত হইয়াছে। অতএব অন্যের সহিত শ্রীনারায়ণের সমত্বদৃষ্টিদ্বারা শাস্ত্রের অনাদরই করা হয়; শাস্ত্রের অনাদরের দ্বারাই পাষণ্ডিত্ব নিষ্পন্ন হয়। এজন্যই বৃহৎসহস্রনাম-স্তোত্রে শ্রীমহাদেব বলিয়াছেন—'ভক্তিশ্রদ্ধাবিহীন রজস্তমোদ্বারা উপহতচিত্ত অবৈষ্ণবকে দান করিবেনা এবং যাহারা অন্যের সহিত বিষ্ণুর সমতা মনন করে, তাহাদিগকেও দান করিবেনা।' তাহার পরে, শ্রীদুর্গাদেবীও বলিয়াছেন—'অহো! সর্ব্বদেবোত্তমোত্তম জগতের আদিগুরু সর্ব্বেশ্বর বিষ্ণুকে মূঢ়ব্যক্তিগণ সামান্য (অন্যের সমান) বলিয়া মনে করে।'

গুণাবতার ব্রহ্মা এবং রুদ্রের সহিত এবং ভগবানের বিভূতি ইন্দ্রাদি দেবতাগণের সহিত যে ব্যক্তি নারায়ণের সমতা মনন করে, তাহাকে পাষণ্ডী বলার হেতু উল্লিখিত টীকা হইতে জানা গেল। অবতারী পরমেশ্বর শ্রীনারায়ণের সঙ্গে তাঁহারই গুণাবতারের সমত্ব-মনন এবং বিভূতির সহিত বিভূতি-বান্ পরমেশ্বরের সমত্ব-মনন হইতেছে শাস্ত্রবিরোধী, শাস্ত্রের অনাদরত্বসূচক। যাহারা শাস্ত্রের অনাদর করে, তাহাদিগকেই পাষণ্ডী বলা হয়। বেদাদি-শাস্ত্রের অনাদর বা অবজ্ঞা হইতেছে একটী নামাপরাধ। সুতরাং অন্যের সহিত পরমেশ্বর এবং অবতারী নারায়ণের সমত্বমননও অপরাধজনক।

ব্রহ্মার সৃষ্ট জীব কখনও কোনও বিষয়েই ব্রহ্মার সমান হইতে পারেনা, ইন্দ্রাদি ভগবদ্-বিভূতিগণের সমানও হইতে পারে না। ব্রহ্মাদিকেও ভগবান্ নারায়ণের সমান মনে করাই যদি পাষণ্ডিত্বের এবং অপধাধের হেতু হয়, তাহা হইলে ব্রহ্মাণ্ডস্থ কোনও জীবকে নারায়ণের সমান মনে করিলে যে পাষণ্ডিত্ব এবং অপরাধ জন্মিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি থাকিতে পারে?

সমান মনে করিলেই যদি পাষণ্ডিত্ব এবং অপরাধ জন্মে, তাহা হইলে কোনও জীবকে নারায়ণ (বা ভগবান্ নারায়ণের কোনও স্বরূপ) মনে করা যে কতদূর দোষাবহ, তাহা বলা যায় না। তাহাতে কেবল বেদাদি-শাস্ত্রের অবজ্ঞাই করা হয় না, ভগবানের অপরিসীম মহিমাকেও খর্ব্ব করার চেষ্টা হইয়া থাকে ; ইহাতে ভগবানের নিকটেও অপরাধ হইয়া থাকে। ভগবানে অপরাধের ফল কিরূপ সাংঘাতিক, নিম্নোদ্ধৃত প্রমাণ হইতেই তাহা জানা যায়।

"জীবন্মুক্তা অপি পুনর্যান্তি সংসারবাসনাম্॥
যদ্যচিন্ত্যমহাশক্তৌ ভগবত্যপরাধিনঃ॥ বাসনাভাষ্যধৃত-পরিশিষ্টবচনম্॥
—যদি অচিন্ত্য-মহাশক্তিসম্পন্ন ভগবানে অপরাধ হয়, তাহা হইলে জীবন্মুক্তগণও পুনরায় সংসার-বাসনা প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।"

শাস্ত্রের এইরূপ প্রমাণ থাকা সত্ত্বেও কেহ কেহ শাস্ত্রমর্ম্ম না জানিয়া, আবার কেহ বা শাস্ত্রমর্ম্ম জনিয়াও, যে শাস্ত্রোক্তির প্রতিকূল আচরণ করিয়া থাকে, শ্রীমদ্ভাগবত হইতেই তাহা জানা যায়।

ভরতবংশজাত নৃপতিদিগের বর্ণনা-প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব-গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন,

"ভরতস্যাত্মজঃ সুমতির্নামাভিহিতো যমু হ বাব কেচিৎ পাষণ্ডিন ঋষভপদবীমনুবর্ত্তমানঞ্চানার্য্যা অবেদসমাম্নাতাং দেবতাং স্বমনীষয়া পাপীয়স্যা কলৌ কল্পয়িষ্যন্তি॥ শ্রীভা, ৫।১৫।১॥

—ভরতের পুত্র ছিলেন সুমতি। তিনি ঋষভদেবের মার্গানুবর্ত্তী (জীবন্মুক্ত-মার্গানুবর্ত্তী—শ্রীধরস্বামী। ঋষভদেবের ন্যায় আচারবান্—চক্রবর্ত্তী) ছিলেন-(একথা) জানিয়া কলিকালে পাষণ্ডিগণ নিজেদের পাপীয়সী বুদ্ধিদ্বারা তাঁহাকে দেবতারূপে কল্পনা করিবে ; কিন্তু বেদে সুমতি-নাম্নী কোনও দেবতার প্রসঙ্গ নাই (অবেদসমাম্নাতাং দেবতাম্)।"

"অবেদসমাম্নাতাং দেবতাম্"-এই বাক্যে শ্রীশুকদেবগোস্বামী জানাইলেন যে, যে ভগবৎস্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, বেদে তাঁহার নামের উল্লেখ থাকে। এই উক্তির উপলক্ষণে ইহাও তিনি জানাইলেন যে, বেদে উল্লিখিত যে ভগবৎ-স্বরূপ ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হয়েন, কোন্ সময়ে কি উদ্দেশ্যে কিরূপে তিনি অবতীর্ণ হয়েন, ইত্যাদি বিষয়ও বেদে উল্লিখিত থাকে। ভগবৎ-স্বরূপসমূহ সকলেই নিত্য, অনাদি, নিত্যকিশোর, জরা-ব্যাধিহীন, মৃত্যুহীন ; ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাদের এ-সকল লক্ষণ বিদ্যমান থাকে ; তখনও তাঁহাদের দেহে বার্দ্ধক্যের লক্ষণ প্রকাশ পায় না, গুম্ফ-শ্মশ্রু জন্মে না, কোনও রোগ থাকে না, মৃত্যুও হয় না অর্থাৎ মৃত্যুভে জীবের অচেতন দেহ যেমন পড়িয়া থাকে, তাঁহাদের তদ্রূপ কিছু থাকে না। তাঁহাদের অন্তর্দ্ধানমাত্র হয়, অবশেষ রূপে দেহাদি কিছু পড়িয়া থাকে না। ব্রহ্মাণ্ডে অবতীর্ণ হইলেও তাঁহাদের দেহের

অসাধারণ বৈশিষ্ট্য—করচরণাদির বিশেষ-চিহ্নাদি, দেহের চতুর্হস্ত বা সার্দ্ধচতুর্হস্তাদি পরিমাণ—অপ্রকট অবস্থার মতনই থাকে (১।১৯৪-ক, খ,-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য)।

যাহাহউক, শ্রীল শুকদেবগোস্বামী তাঁহার দিব্যদৃষ্টির প্রভাবে দ্বাপর যুগেই দেখিতে পাইয়াছিলেন—কলিযুগে কতকগুলি "পাষণ্ডী" তাহাদের "পাপীয়সী মনীষার" সহায়তায় ভরত-মহারাজের পুত্র সুমতিকে ঋষভদেবের অবতার বলিয়া প্রচার করিবে। শ্রীশুকদেবের বাক্যে "ঋষভদেব" এবং "সুমতি" বোধ হয় উপলক্ষণমাত্র। কেননা, শ্রীল বৃন্দাবনদাসঠাকুরের শ্রীচৈতন্য-ভাগবত হইতে জানা যায় –শ্রীল বৃন্দাবনদাস-ঠাকুরের সময়ে, অর্থাৎ প্রায় চারিশতাধিক বৎসর পূর্ব্বেই একজন লোক নিজেকেই "রঘুনাথ" বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন (বোধহয় তাঁহার নিজের নামও রঘুনাথই ছিল) এবং অপর একজন আবার নিজেকে "গোপাল" বলিয়া প্রচার করিয়াছিলেন (সম্ভবতঃ তাঁহার নিজের নামও গোপালই ছিল)। এই দুই জন নিজেদিগকেই ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিতেন। ইঁহারা বেশ সুচতুর ছিলেন বলিয়া মনে হয় ; কেননা, বেদে অপ্রসিদ্ধ কোনও দেবতা বলিয়া তাঁহারা নিজেদিগকে ঘোষণা করেন নাই, পরন্তু বেদপ্রসিদ্ধ "রঘুনাথ" এবং "গোপাল" বলিয়া নিজেদিগকে প্রচার করিতে চেষ্টা করিয়াছেন।

আজকাল আবার দেখা যাইতেছে, কোনও বিশেষ-শক্তিসম্পন্ন সাধকবিশেষকেও কেহ কেহ ভগবান্ বা স্বয়ংভগবান্ বলিয়াও প্রচার করিতেছেন এবং কেহ কেহ বা তাদৃশ সাধকবিশেষকে বেদপ্রসিদ্ধ এবং সাধকসমাজে বিশেষভাবে পূজিত কতিপয় ভগবৎ-স্বরূপের সম্মিলিত রূপের অবতার বলিয়াও প্রচার করিতেছেন। সেই সেই ভগবৎ-স্বরূপের কোনও সম্মিলিত রূপের কথা, সেই সম্মিলিত রূপের কোনও ধামের কথা, বা কোনও সময়ে তাঁহাদের ব্রহ্মাণ্ডে অবতরণের কথা কোনও শাস্ত্রে আছে কিনা, তৎসম্বন্ধে কোনওরূপ অনুসন্ধানের অপেক্ষাও তাঁহারা রাখেন না। তাঁহাদের কল্পিত ভগবানে বেদপ্রসিদ্ধ কোনও ভগবৎ-স্বরূপের স্বাভাবিক লক্ষণাদি আছে বা ছিল কিনা, কিম্বা জরা-ব্যাধি-মৃত্যু-প্রভৃতি আছে বা ছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে কোনওরূপ বিবেচনা করার আবশ্যকতা আছে বলিয়াও তাঁহারা মনে করেন না। কোনও কোনও স্থলে প্রচারকারীদের অদ্ভুত মনীষার প্রভাবে কল্পিত ভগবানের মন্ত্রাদিরও সৃষ্টি হইতেছে এবং তাঁহার নামকীর্ত্তনের প্রচার-প্রয়াসও দৃষ্ট হইতেছে। এতাদৃশ নামকীর্ত্তনের কোনও সার্থকতা আছে কিনা, পারমার্থিক মঙ্গলকামী শাস্ত্রবিশ্বাসী সাধকগণের পক্ষে তৎসম্বন্ধে অনুসন্ধান অস্বাভাবিক নহে। এজন্য এ-স্থলে সেই বিষয়ে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

খ। ভগবত্তারোপিত জীবের নামকীর্ত্তন

যাঁহাতে ভগবত্তা আরোপিত হয়, সেই সাধকজীবের নাম যদি কোনও বেদপ্রসিদ্ধ ভগবৎ-স্বরূপের নামের অনুরূপ হয় (অর্থাৎ তাঁহাদের নাম যদি রাম, কৃষ্ণ, বা নারায়ণ ইত্যাদি হয়), তাহা হইলে তাঁহার নামের কীর্ত্তনে "নামাভাস" মাত্র হইতে পারে, কিন্তু "নাম" হইবেনা। কেননা, তাঁহার নাম যদি "নারায়ণ" হয়, তাহা হইলে এই নামের কীর্ত্তন-কালে কীর্ত্তনকারীদের লক্ষ্য থাকে

নারায়ণনামক সেই সাধকের প্রতি, নারায়ণনামক ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি তাঁহাদের লক্ষ্য থাকে না; যেমন অজামিল যখন "নারায়ণ" বলিয়া তাঁহার পুত্রকে ডাকিয়াছিলেন, তখন তাঁহার লক্ষ্য ছিল তাঁহার পুত্রের প্রতি, নারায়ণ-নামক ভগবৎ-স্বরূপের প্রতি অজামিলের লক্ষ্য ছিল না, তদ্রূপ।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে—নামাভাসে অজামিলের মুক্তি—পার্ষদত্ব--লাভ হইয়াছিল। তদ্রূপ উল্লিখিতরূপ নামাভাসে উল্লিখিত কীর্ত্তনকারীদের মুক্তি লাভ হইবে কিনা?

উত্তরে বলা যায়, তাঁহাদের মুক্তি লাভ হইবে বলিয়া মনে হয় না। কেননা, অজামিলের কোনও অপরাধ ছিল না *; পুত্রকে তিনি ভগবান্ নারায়ণ বলিয়াও মনে করেন নাই, পুত্র বলিয়াই মনে করিয়াছিলেন; সুতরাং জীবে ঈশ্বর-মননজনিত অপরাধও তাঁহার হয় নাই। সম্পূর্ণরূপে নিরপরাধ ছিলেন বলিয়া তাঁহার মুক্তি লাভ হইয়াছে। কিন্তু উল্লিখিত কীর্ত্তনকারীরা যে অপরাধ-নির্ম্মুক্ত, তাহা বলা যায় না। একথা বলার হেতু এই। শ্রীশুকদেব গোস্বামীর উক্তি অনুসারে "পাপীয়সী মনীষার" প্রভাবেই তাঁহারা জীববিশেষকে ভগবান্ বলিয়া প্রচার করিয়া থাকেন, ইহা তাঁহাদের পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধের পরিচায়ক। আবার, সর্ব্বদা জীবে ঈশ্বরমনন-জনিত নূতন অপরাধও তাঁহাদের সঞ্চিত হইতেছে। নামাভাসে সাপরাধ ব্যক্তির মুক্তি লাভ হইতে পারে না। নামাভাসের পুনঃ পুনঃ কীর্ত্তনেও অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে না। একান্ত ভাবে ভগবন্নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলেই নামের কৃপায় অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে [৫।১০২-খ (১) অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য]।

আর, যাঁহাতে ভগবত্তা আরোপিত হয়, তাঁহার নাম যদি বেদপ্রসিদ্ধ কোনও ভগবৎ-স্বরূপের নামের অনুরূপ না হয় (অর্থাৎ পূর্ণচন্দ্র, সূর্য্যকান্ত, কুমুদবন্ধু-ইত্যাদি কোনও একটী নামে যদি তিনি অভিহিত হয়েন), তাহা হইলে তাঁহার নামকীর্ত্তনে নামাভাসও হইবে না; কেননা, ভগবানের নামেরই নামাভাস হয়; তাঁহার নাম ভগবানের নামের অনুরূপ নহে। এরূপ স্থলে কেবল অপরাধেরই সঞ্চয় হয়, অন্য কিছু হয় বলিয়া মনে হয় না।

অবশ্য, ভগবানের ন্যায় পূজ্যত্ববুদ্ধিতে স্ব-সম্প্রদায়ের সাধকমহাপুরুষদের স্বরূপতত্ত্বের অবিরোধিভাবে সেবাপূজাদি, তাঁহাদের শাস্ত্রসম্মত আচরণের অনুকরণাদিও দূষণীয় নহে, তাহা বরং সাধনের আনুকূল্য-বিধায়কই হইয়া থাকে।

১০৬। ভগবন্নাম ও মন্ত্র

কেহ কেহ মনে করেন—ভগবানের নাম এবং মন্ত্র একই; শাস্ত্রে যে নামকীর্ত্তনের কথা দৃষ্ট হয়, দীক্ষামন্ত্রের জপই সে-স্থলে অভিপ্রেত।

---

* এতেন অজামিলস্য প্রাচীনার্বাচীন-নামাপরাধরাহিত্যমেব গম্যতে॥ শ্রীভাঃ ৬।২।১৩-শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তী॥—অজামিলের যে প্রাচীন বা আধুনিক কোনওরূপ নামাপরাধই ছিলনা, ইহাদ্বারা তাহাই জানা যায়।

কিন্তু ইহা বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। এ-সম্বন্ধে একটু আলোচনা করা হইতেছে।

ভগবন্নাম এবং মন্ত্র যে এক নহে, তাহাই প্রদর্শিত হইতেছে।

প্রথমতঃ, শাস্ত্রে যে-খানে যে-খানে নামের মহিমা কীর্ত্তিত হইয়াছে, সে-খানে সে-খানেই কৃষ্ণ, রাম, নারায়ণ, গোবিন্দ, বাসুদেব, হরি,-ইত্যাদি ভগবৎ-স্বরূপ-বাচক শব্দবিশেষই উল্লিখিত হইয়াছে; কোনও স্থলেই কৃষ্ণ-রামাদির মন্ত্রের কথা বলা হয় নাই। ভগবৎ-স্বরূপ-বাচক শব্দবিশেষই যে অভিপ্রেত, তাহার স্পষ্ট উল্লেখও দৃষ্ট হয়। যথা,

"বাসুদেবেতি মনুজ উচ্চার্য্য ভবভীতিতঃ।
তন্মুক্তঃ পদমাপ্নোতি বিষ্ণোরেব ন সংশয়ঃ॥

—হ, ভ, বি, ১১।২২৬-ধৃত-আঙ্গিরসপুরাণ-প্রমাণ॥

—'বাসুদেব'-এই নামটীর উচ্চারণ করিলেই ভবভয় হইতে মুক্ত হইয়া লোক বিষ্ণুপদ লাভ করিয়া থাকে, ইহাতে কোনও সংশয়ই নাই।"

"নারায়ণমিতি ব্যাজাদুচ্চার্য্য কলুষাশ্রয়ঃ।
অজামিলোঽপ্যগাদ্ধাম কিমুত শ্রদ্ধয়া গৃণন্॥

—হ, ভ, বি, ১১।২২৪-ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ॥

—কলুষাশ্রয় অজামিলও তাঁহার পুত্রকে ডাকিবার ছলে "নারায়ণ"—এই শব্দটীর উচ্চারণ করিয়া ভগবানের ধাম প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রদ্ধার সহিত উচ্চারণের মহিমার কথা আর কি বলা যায়?"

উল্লিখিত দুইটী প্রমাণেই ভগবৎ-স্বরূপ-বাচক "বাসুদেব" এবং "নারায়ণ"-এই শব্দদ্বয়ের কথাই বলা হইয়াছে, মন্ত্রের কথা বলা হয় নাই।

"নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্॥

হ, ভি, বি, ১১।২৬৪-ধৃত প্রভাসপুরাণ-প্রমাণ॥

—(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন) হে পরন্তপ! আমার নাম-সকলের মধ্যে 'কৃষ্ণাখ্য নাম'ই মুখ্যতর; ইহা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এবং প্রধান মুক্তিদায়ক।"

এ-স্থলেও "কৃষ্ণাখ্যং নাম"-শব্দে অক্ষরদ্বয়াত্মক কৃষ্ণ-শব্দের কথাই বলা হইয়াছে, মন্ত্রের কথা বলা হয় নাই।

অক্ষর-সংখ্যার উল্লেখপূর্ব্বকও শাস্ত্র দেখাইয়াছেন—ভগবৎ-স্বরূপের বাচক-শব্দবিশেষই নাম।

"এতেনৈব হ্যঘনোঽস্য কৃতং স্যাদঘনিষ্কৃতম্।
যদা নারয়ণায়েতি জগাদ চতুরক্ষরম্॥ শ্রীভা, ৬।২।৮॥

—(বিষ্ণুদূতগণ যমদূতগণের নিকটে বলিয়াছেন) এই পাপী অজামিল যখন 'নারায়ণ' এই চারিটী অক্ষরের উচ্চারণ করিয়াছে, তাহাতেই তাহার সমস্ত পাপের প্রায়শ্চিত্ত হইয়া গিয়াছে।"

এ-স্থলে নারায়ণের মন্ত্রের কথা বলা হয় নাই। এই জাতীয় আরও বহু প্রমাণ শাস্ত্রে দৃষ্ট হয়। বাহুল্যভয়ে সমস্তের উল্লেখ করা হইল না।

দ্বিতীয়তঃ, মন্ত্রকে "নাম" বলা হয় না। মন্ত্রের মধ্যে ভগবানের নাম থাকে বলিয়া মন্ত্রকে "নামাত্মক"ই বলা হয়। শ্রীপাদ জীবগোস্বামী মন্ত্রকে নামাত্মকই বলিয়াছেন। "ননু ভগবন্নামাত্মকা এব মন্ত্রাঃ ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥২৮৪॥"

মন্ত্রে "নমঃ", "ওঁ" "ক্লীং,", "স্বাহা"-ইত্যাদি থাকে; কিন্তু ভগবন্নামে এ-সমস্ত থাকে না।

তৃতীয়তঃ, মন্ত্র ও নামের মহিমাও সমান নহে। মন্ত্র অপেক্ষা নামের মহিমা অত্যধিক বলিয়া নামকে "মহামন্ত্র" বলা হয়।

চতুর্থতঃ, মন্ত্র দীক্ষাপুরশ্চর্য্যাবিধির অপেক্ষা রাখে; কিন্তু নাম দীক্ষা-পুরশ্চর্য্যাদির অপেক্ষা রাখে না।

পঞ্চমতঃ, মন্ত্রের শক্তি থাকে সুপ্ত; জপাদিদ্বারা তাহার শক্তিকে উদ্বুদ্ধ করিতে হয়।

"পশুভাবে স্থিতা মন্ত্রাঃ কেবলং বর্ণরূপিণঃ।
সৌষুম্নাধ্বন্যুচ্চারিতাঃ প্রভুত্বং প্রাপ্নুবন্তি হিঃ॥

—হ, ভ, বি, ১৭।৭৬ ধৃত-মন্দ্রার্ণব-প্রমাণ॥

—কেবলমাত্র বর্ণরূপী মন্ত্র পশুভাবে সংস্থিত। সুষুম্না-নাড়ীর রন্ধ্রপথে উচ্চারিত হইলেই তাহা শক্তি প্রাপ্ত হইয়া থাকে।"

কিন্তু ভগবন্নামের শক্তি সর্ব্বদাই উদ্বুদ্ধ থাকে। এজন্য অবশে, বা হেলায়-শ্রদ্ধায়, বা বা কীর্ত্তনাদির পাদপূরণে, এমন কি কৃষ্ণকে গালি দেওয়ার নিমিত্ত উচ্চারিত হইলেও, বা অন্যসঙ্কেতে নামাভাসরূপে উচ্চারিত হইলেও, পরিহাসের সহিত, বা অনিচ্ছার সহিত উর্চ্চারিত হইলেও নাম স্বীয় মহিমা প্রকাশ করিয়া থাকে।

সাঙ্কেত্যং পরিহাস্যং বা স্তোভং হেলনমেব বা। বৈকুণ্ঠনামগ্রহণমশেষাঘহরং বিদুঃ॥
পতিতঃ স্খলিতো ভগ্নঃ সংদষ্টস্তপ্ত আহতঃ। হরিরিত্যবশেনাহ পুমান্নার্হতি যাতনাঃ॥
অজ্ঞানাদথবা জ্ঞানাদুত্তমঃশ্লোকনাম যৎ। সঙ্কীর্ত্তিতমঘং পুংসো দহেদধো যথানলঃ॥

—শ্রীভা, ৬।২।১৪,১৫,১৮॥

অনিচ্ছয়াপি দহতি স্পৃষ্টো হুতবহো যথা। তথা দহতি গোবিন্দনাম ব্যাজাদপীরিতম্॥

—হ, ভ, বি, ১১।১৪৭-ধৃত-পাদ্মবচন॥

কৃষ্ণে গালি দিতে করে নামের উচ্চারণ। সেই নাম হয় তার মুক্তির কারণ॥

শ্রীচৈ, চ, ৩।৫।১৪৬॥

অপ্যন্যচিত্তোঽশুদ্ধো বা যঃ সদা কীর্ত্তয়েদ্ধরিম্। সোঽপি দোষক্ষয়ান্মুক্তিং লভেচ্চেদিপতির্যথা॥

—হ, ভ, বি, ১১।২১০-ধৃত ব্রহ্মপুরাণ-প্রমাণ॥

ষষ্ঠতঃ, নামের অক্ষরসকল ব্যবহিত হইলেও, কিম্বা নামের উচ্চারণ অশুদ্ধ হইলেও, এমন কি অসম্পূর্ণ হইলেও, নামের প্রভাব প্রকাশ পাইয়া থাকে।

"নামৈকং যস্য বাচি স্মরণপথগতং শ্রোত্রমূলং গতং বা
শুদ্ধং বাশুদ্ধবর্ণং ব্যবহিতরহিতং তারয়ত্যেব সত্যম্॥ হ, ভ, বি, ১১।২৮৯ ধৃত পাদ্মবচন॥"

টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন "ব্যবহিতং শব্দান্তরেণ যদ্ব্যবধানং বক্ষ্যমাণ-নারায়ণ-শব্দস্য কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং প্রসঙ্গাদাপতিতং শব্দান্তরং তেন রহিতং সৎ। যদ্বা যদ্যপি হলং রিক্তমিত্যাদ্যুক্তৌ হকাররিকারয়োঃ বৃত্ত্যা হরীতি নামাস্ত্যেব, তথা রাজমহিষীত্যত্র রামনামাপি, এবমন্যদপি উহ্যম্, তথাপি তত্তন্নামমধ্যে ব্যবধায়কমক্ষরান্তরমস্তীত্যেতাদৃশব্যবধানরহিতমিত্যর্থঃ। যদ্বা ব্যবহিতঞ্চ তৎ রহিতঞ্চাপি বা তত্র ব্যবহিতং নাম্নঃ কিঞ্চিদুচ্চারণানন্তরং কথঞ্চিদাপতিতং শব্দান্তরং সমাধায় পশ্চান্নামাবশিষ্টাক্ষরগ্রহণম্ ইত্যেবং রূপং, মধ্যে শব্দান্তরেণান্তরিতমিত্যর্থঃ। রহিতং পশ্চাদবিশিষ্টাক্ষরগ্রহণবর্জিতং কেনচিদংশেন হীনমিত্যর্থঃ। তথাপি তারয়ত্যেব সর্ব্বেভ্যঃ পাপেভ্যঃ অপরাধেভ্যশ্চ সংসারাদপ্যুদ্ধারয়ত্যেবেতি সত্যমেব।"

টীকানুযায়ী শ্লোকার্থ। ভগবানের একটী নাম যদি কাহারও বাগিন্দ্রিয়ে উচ্চারিত হয়, অথবা স্মৃতিপথে উদিত হয়, কিম্বা শ্রুত হয়, তাহাহইলে সেই নাম নিশ্চয়ই সকল পাপ হইতে এবং সংসার হইতে তাহাকে উদ্ধার করিয়া থাকে। সেই নাম শুদ্ধবর্ণই হউক, কিম্বা অশুদ্ধবর্ণই হউক (কৃষ্ণ-স্থলে যদি কেষ্টও হয়), কিম্বা নামের অক্ষরগুলি যদি পরস্পর অব্যবহিত হয় [যেমন, 'হলরিক্ত' এই শব্দটীর অন্তর্গত 'হ' এবং 'রি' অক্ষরদুইটীতে 'হরি' নাম হয় বটে ; কিন্তু 'হ' এবং 'রি' অক্ষরদ্বয়ের মধ্যে 'ল' অক্ষরটী তাহাদের ব্যবধান জন্মাইয়াছে ; কিম্বা যেমন 'রাজমহিষী' শব্দের অন্তর্গত 'রা' এবং 'ম' অক্ষরদ্বয়ে 'রাম' নাম হয় বটে ; কিন্তু 'জ' অক্ষরটী তাহাদের মধ্যে ব্যবধান জন্মাইয়াছে। নামের অক্ষরগুলির মধ্যে এতাদৃশ ব্যবধান যদি না থাকে। অথবা, যেমন 'নারায়ণ' শব্দ বলিতে যাইয়া তাহার কিছু অংশ (যেমন 'নারা') উচ্চারণের পরে কোনও কারণে যদি অন্যকোনও শব্দ বা কথা বলিতে হয় এবং তাহার পরে যদি নামের বাকী অংশ (যেমন, 'য়ণ') উচ্চারণ করা হয়, তাহা হইলেও নামের দুইটী অংশ পরস্পর ব্যবহিত হইয়া পড়ে ; এইরূপ ব্যবধান যদি না থাকে। এই ভাবে নামের অক্ষরগুলি যদি পরস্পর অব্যবহিত হয়], অথবা নামের অক্ষরগুলি যদি পরস্পর ব্যবহিতও হয় (যেমন নামের একাংশ উচ্চারণের পরে কোনও কারণে যদি অন্য শব্দাদির উচ্চারণ করিতে হয় এবং তাহার পরে নামের বাকী অংশের উচ্চারণ করা হয় এবং এইরূপে অন্য শব্দাদি যদি নামের অংশদ্বয়ের ব্যবধান জন্মায়), তাহা হইলেও, কিম্বা নামের একাংশ উচ্চারণের পরে কোনও কারণে অন্য শব্দ বা কথা উচ্চারণ করিতে হইলে তাহার পরে নামের অবশিষ্ট অংশ উচ্চারিত না হইলেও এতাদৃশ নামও সকল পাপ হইতে এবং সংসার হইতেও সেই লোককে উদ্ধার করিয়া থাকে।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও বলেন,

নামের অক্ষর সভের এই ত স্বভাব।
ব্যবহিত হৈলে না ছাড়ে আপন প্রভাব॥ ৩।৩।৫৭ ॥

কিন্তু মন্ত্রের এতাদৃশ প্রভাবের কথা শুনা যায় না। মন্ত্রের শব্দগুলি পরস্পর ব্যবহিত হইলে, কিম্বা অসম্পূর্ণভাব উচ্চারিত হইলে, কিম্বা অশুদ্ধ বর্ণ যদি উচ্চারিত হয়, তাহা হইলে মন্ত্রের ফল পাওয়া যাইবে কি না সন্দেহ। আবার নামাভাসের ফল আছে ; মন্ত্রাভাসের প্রশ্নই উঠিতে পারে না।

সপ্তমতঃ, নাম উচ্চৈঃস্বরেও কীর্ত্তনীয়, বরং উচ্চকীর্ত্তনেরই মহিমার আধিক্য। কিন্তু মন্ত্র উচ্চৈস্বরে কীর্ত্তনীয় নয়, মনে মনেই জপ্য।

অষ্টমতঃ, মন্ত্র কোনও যুগের যুগধর্ম নহে ; নাম কিন্তু কলিযুগের যুগধর্ম্ম। কলিসন্তরণোপনিষদে কলির যুগধর্মরূপে কীর্ত্তনীয় বলিয়া যাহার উল্লেখ আছে, তাহা হইতেছে "হরি, কৃষ্ণ, রাম" এই তিনটি ভগবন্নামেরই সম্মিলন ; তাহা মহামন্ত্র বটে, কিন্তু কাহার দীক্ষামন্ত্র নহে।

এই সমস্ত কারণে বুঝা যায়—নাম ও মন্ত্র এক নহে এবং শাস্ত্রে যে নামকীর্ত্তনের উপদেশ দৃষ্ট হয়, তাহা দীক্ষামন্ত্রের জপ নহে। গোপীপ্রেমামৃত একাদশ পটলে বলা হইয়াছে—সমস্ত মন্ত্রবর্গের মধ্যে শ্রীহরিনামই হইতেছে শ্রেষ্ঠ। "সর্ব্বেষু মান্ত্রবর্গেষু শ্রেষ্ঠং শ্রীহরিনামকম্ ॥" ইহা হইতেও মন্ত্র অপেক্ষা নামের বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যাইতেছে।

অবশ্য মন্ত্রজপ যে নিষিদ্ধ, তাহা নহে। সকলযুগেই মন্ত্র জপ্য। যিনি মন্ত্রৈকশরণ, তিনি যে-কোনও স্থানে, শুচি বা অশুচি অবস্থাতেও, চলাফেরার সময়ে, কি স্থির ভাবে থাকার সময়ে, কি শয়নকালেও, মন্ত্রের মানস-জপে সর্ব্বযজ্ঞফল লাভ করিতে পারেন। মন্ত্রৈকশরণের পক্ষে মন্ত্র সর্ব্বদাই মানসে জপ্য।

ন দোষো মানসে জপ্যে সর্ব্বদেশেঽপি সর্ব্বদা। জপনিষ্ঠো দ্বিজশ্রেষ্ঠাঃ সর্ব্বযজ্ঞফলং লভেৎ॥
অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি গচ্ছংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নপি। মন্ত্রৈকশরণো বিদ্বান্ মনসৈব সদা জপেৎ ॥
—হ, ভ, বি, ১৭।৭৮-৭৯ ধৃত-মন্ত্রার্ণব-প্রমাণ ॥

১০৭। ভগবন্নামের প্রারব্ধবিনাশিত্ব

অনেকে বলেন, সাধন-ভজনের ফলে প্রারব্ধব্যতীত অন্য কর্ম্মের ক্ষয় হইতে পারে ; কিন্তু প্রারব্ধকর্ম্মের ক্ষয় হয় না। কিন্তু শ্রীমদ্ভাগবত বলেন, নামকীর্ত্তনের প্রভাবে প্রারব্ধও ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে।

"নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধকৃন্তনং মুমুক্ষতাং তীর্থপদানুকীর্ত্তনাৎ।
ন যৎ পুনঃ কর্ম্মসু সজ্জতে মনোরজস্তমোভ্যাং কলিলং ততোঽন্যথা ॥
—শ্রীভা, ৬।২।৪৬ ॥

—(শ্রীল শুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন) তীর্থপদ ভগবানের নামকীর্ত্তন ব্যতীত অপর কিছুই মুমুক্ষুদিগের কর্ম্মনিবন্ধের (পাপের মূলের) উচ্ছেদক নহে। এতদ্ভিন্ন অন্য যে-সমস্ত প্রায়শ্চিত্তের বিধান আছে, সে-সমস্ত প্রায়শ্চিত্তে রজঃ ও তমোগুণের দ্বারা মনের মলিনতা থাকিয়াই যায় (তাহাতে পুনরায় কর্ম্মে আসক্তি জন্মে) ; কিন্তু ভগবৎকীর্ত্তনে মন সম্পূর্ণরূপে নির্ম্মল হয়, পুনরায় কর্ম্মে আসক্ত হয় না।"

"যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ আতুরঃ পতন্ স্খলন্ বা বিবশো গৃণন্ পুমান্।
বিমুক্তকর্ম্মার্গল উত্তমাং গতিং প্রাপ্নোতি যক্ষ্যন্তি ন তং কলৌ জনাঃ॥

—শ্রীভা, ১২।৩।৪৪ ॥

—(শ্রীল শুকদেবগোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন) যিনি আসন্নমৃত্যু, আতুর, কূপাদিতে পতনোন্মুখ, বা পতিত, কিম্বা চলিতে চলিতে যাঁহার পদস্খলন হইতেছে, তিনি তত্তৎকালে বিবশ হইয়াও যাঁহার নাম উচ্চারণ করিতে করিতে কর্ম্মরূপ অর্গল উন্মোচন করিয়া উত্তমাগতি (বৈকুণ্ঠ) লাভ করিয়া থাকেন, কলিযুগে জনগণ তাঁহার অর্চ্চনা করিবেনা।"

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়ের উল্লেখ করিয়া (১১।১৭৬-৭৭) বলিয়াছেন,

"উক্ত্যা কর্ম্মনিবন্ধেতি তথা কর্ম্মার্গলেতি চ।
অবশ্যভোগ্যতাপত্তেঃ প্রারব্ধে পর্য্যবস্যতি॥ হ, ভ, বি, ১১।১৭৭॥

—উল্লিখিত প্রথম শ্লোকে 'কর্ম্মনিবন্ধ' এবং দ্বিতীয় শ্লোকে 'কর্ম্মার্গল'-এই শব্দদ্বয় আছে। এই শব্দদ্বয়ের উক্তিদ্বারা, ঐ কর্ম্ম যে অবশ্যভোগ্য, তাহাই পাওয়া যাইতেছে। যে কর্ম্ম অবশ্যভোগ্য, তাহা প্রারব্ধ কর্ম্মই ; কেননা, প্রারব্ধ-কর্ম্মব্যতীত অন্য কর্ম্ম যে যথাবস্থিত দেহে অতি অবশ্য ভোগ করিতেই হইবে, তাহার কোনও নিয়ম নাই। অতএব উল্লিখিত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকদ্বয়ে যে কর্ম্মের ক্ষয়ের কথা বলা হইয়াছে, সেই কর্ম্মসম্বন্ধে 'নিবন্ধ' ও 'অর্গল' শব্দদ্বয়ের প্রয়োগ করা হইয়াছে বলিয়া সেই কর্ম্মের অবশ্যভোগ্যতার কথা জানা যাইতেছে ; সুতরাং সেই কর্ম্ম প্রারব্ধকর্ম্মেই পর্য্যবসিত হইতেছে, অর্থাৎ ভগবন্নামকীর্ত্তনে যে প্রারব্ধকর্ম্মেরও ক্ষয় হয়, তাহাই শ্লোকদ্বয়ে বলা হইয়াছে।"

উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকদ্বয়ের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী (শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায়) লিখিয়াছেন—"কর্ম্মনিবন্ধনকৃন্তনমিত্যশেষপ্রারব্ধকর্ম্মচ্ছেদনমেবোক্তম্—শ্লোকোক্ত 'কর্ম্মনিবন্ধনকৃন্তনম্'-শব্দের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, ভগবন্নামের অনুকীর্ত্তনে প্রারব্ধকর্ম্ম নিঃশেষরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হয়।" শ্রীপাদ সনাতন এ-স্থলে "কর্ম্মনিবন্ধন"-শব্দের অর্থ করিয়াছেন—"প্রারব্ধকর্ম্মজনিত বন্ধন।" শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে, "নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধনম্"-ইত্যাদি শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের অব্যবহিত পূর্ব্ববর্ত্তী শ্লোকে বলা হইয়াছে—"নরকে পচ্যমানানাং নরাণাং পাপকর্ম্মণাম্। মুক্তিঃ সঞ্জায়তে তস্মান্নামসঙ্কীর্ত্তনাদ্ধরেঃ॥ ইতিহাসোত্তম-প্রমাণ॥—পাপকর্ম্মনিরত—সুতরাং নরকানলে পাচ্যমান—নরগণের হরিনাম-সঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবেই সেই নরক হইতে মুক্তি লাভ হইয়া

থাকে।" শ্রীপাদ সনাতন বলেন—এই ইতিহাসোত্তম-বাক্যে নামকীর্ত্তনের দুষ্প্রারব্ধ-নিবারকত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে; তাহার পরে "নাতঃ পরং কর্ম্মনিবন্ধনকৃন্তনম্"-ইত্যাদি শ্লোকে পাপের মূল ছেদনের কথা বলা হইয়াছে। "এবং দুষ্প্রারব্ধনিবারকত্বমেব দর্শিতং তদেবাভিব্যজ্য লিখতি, নাতঃ পরমিত্যাদিনা ভাসতে নর ইত্যন্তেন। কর্ম্মনিবন্ধনস্য পাপমূলস্য কৃন্তনং ছেদকমতঃ পরং নাস্তি।" এ-স্থলে তিনি "কর্ম্মনিবন্ধন"-শব্দের অর্থ লিখিয়াছেন—"পাপের মূল।" পাপের মূলই যদি ছিন্ন হইয়া যায়, তাহা হইলে কোনওরূপ পাপই—প্রারব্ধকর্ম্মও—আর থাকিতে পারে না। এইরূপেই "কর্ম্মনিরন্ধন"-ছেদনে প্রারব্ধকর্ম্মেরও ছেদনই সূচিত হইতেছে। তিনি আরও লিখিয়াছেন-"নারকুদ্ধারপর্য্যন্তেন দুষ্প্রারব্ধনিবারকত্বং লিখিত্বা ইদানীং সর্ব্বপ্রারব্ধক্ষপণং লিখতি নাত ইত্যাদিনা।—ভগবন্নামকীর্ত্তনের নারকীদের উদ্ধার পর্য্যন্ত দুষ্প্রারব্ধনিবারকত্ব লিখিয়া এক্ষণে 'নাতঃ পরম্' ইত্যাদি বাক্যে সর্ব্বপ্রারব্ধ-নাশকত্বের কথা লিখিত হইতেছে।" রোগাদি-দুঃখজনক প্রারব্ধই দুষ্প্রারব্ধ।

আবার, "যন্নামধেয়ং ম্রিয়মাণ"-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় "বিমুক্ত-কর্ম্মার্গলঃ"-শব্দসম্বন্ধে তিনি লিখিয়াছেন—"বিমুক্তাঃ কর্ম্মরূপা অর্গলাঃ অবশ্যভোগ্যত্বেন দুর্ব্বারা অপি প্রতিবন্ধা যস্য সঃ।—কর্ম্মরূপ অর্গল, অর্থাৎ অবশ্যভোগ্য বলিয়া দুর্ব্বারপ্রতিবন্ধ, হইতে (নামকীর্ত্তন-প্রভাবে) বিমুক্ত হইয়াছেন যিনি, তিনি।" যে কর্ম্ম ফলোন্মুখ হইয়াছে, তাহাকেই বলে প্রারব্ধ। 'যৎ ফলোন্মুখং কর্ম্ম, তদেব প্রারব্ধমুচ্যতে॥ শ্রীপাদ সনাতন॥" ইহা অবশ্যই ভোগ করিতে হয়। সুতরাং শ্রীপাদ সনাতন "কর্ম্মার্গলঃ"-শব্দের অর্থে যে "অবশ্যভোগ্য দুর্ব্বার-প্রতিবন্ধ" লিখিয়াছেন, সেই অবশ্যভোগ্য কর্ম্ম হইতেছে—প্রারব্ধকর্ম্ম।

এইরূপে দেখা গেল—নাম-সঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে যে প্রারব্ধকর্ম্মও ক্ষয় প্রাপ্ত হয়, শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকদ্বয় হইতে তাহাই জানা গেল। 'উক্ত্যা কর্ম্মনিবন্ধেতি"-ইত্যাদি শ্লোকে শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসও তাহাই বলিয়াছেন।

শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—"দ্বাভ্যামেব শ্লোকাভ্যামশেষপ্রারব্ধ-বিনাশিত্বমেব দর্শয়তি॥-শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকদ্বয় দ্বারা নামসঙ্কীর্ত্তনের অশেষ-প্রারব্ধবিনাশকত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে।"

এই উক্তির সমর্থনে বৃহন্নাদীয় পুরাণের একটী প্রমাণও উদ্ধৃত হইয়াছে।

"গোবিন্দেতি জপন্ জন্তুঃ প্রত্যহং নিয়তেন্দ্রিয়ঃ। সর্ব্বপাপবিনির্ম্মুক্তঃ সুরবৎ ভাসতে নরঃ॥

—হ, ভ, বি, ১১।১৭৮-ধৃত-বৃহন্নারদীয়প্রমাণ॥

—সৎকর্ম্মাদির অভাবে কীটাদি জন্তুতুল্য ব্যক্তিও ইন্দ্রিয়-সংযমনপূর্ব্বক 'গোবিন্দ'-এই নাম প্রতিদিন জপ করিতে করিতে সর্ব্বপ্রকার পাপ হইতে সর্ব্বতোভাবে নির্ম্মুক্ত হইয়া, মনুষ্য হইয়াও সেই মনুষ্য দেহেই ইন্দ্রাদি-দেবতা, অথবা পরমপদদাতা ভগবৎপার্ষদের ন্যায় দেদীপ্যমান হইয়া থাকে।"

টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—"সর্ব্বপাপেভ্যোঽশেষদুষ্প্রারব্ধেভ্যো বিশেষেণ

নির্ম্মুক্তশ্চ সন্ নরোঽপি সুরবদ্ ভাসতে তস্মিন্নেব দেহে ইন্দ্রাদিবৎ, যদ্বা সুশোভনং পদং রাতি দদাতি ইতি সুরো ভগবৎপার্ষদস্তদ্বদ্বিরাজতে। অত্র পাপশব্দেন স্বর্গাদিফলকং পুণ্যমপি সংগৃহ্যতে, ক্ষয়িষ্ণু ফল-কত্বাদিনা তস্যাপি পাপেষ্বেব পর্য্যবসানাৎ। অথবাত্র শ্লোকে দুষ্প্রারব্ধমাত্রবিনাশিত্বমেবোক্তম্। ততশ্চ সুরবদ্ দেববদিত্যেব।”

এ-স্থলে শ্রীপাদ সনাতন “সর্ব্বপাপ”-শব্দের অর্থে লিখিয়াছেন—“দুষ্প্রারব্ধ” অর্থাৎ রোগাদি বা নরকযন্ত্রণাদি। শ্রীমদ্ভাগবতের শ্লোকদ্বয়ের টীকাতেও এক রকমের অর্থে তিনি লিখিয়াছেন—“যদ্যপি কর্ম্মনিবন্ধনকৃন্তনমিত্যশেষপ্রারব্ধকর্মচ্ছেদনমেবোক্তং তথাপি অখিলপ্রারব্ধক্ষয়ে দেহপাতাপত্ত্যা ভগবদ্ভজনাসম্ভবাৎ দুষ্প্রারব্ধক্ষয় এবাভিপ্রেতঃ।—যদিও কর্ম্মনিবন্ধনকৃন্তন-শব্দে অশেষ-প্রারব্ধকর্ম্মচ্ছেদনের কথাই বলা হইয়াছে, তথাপি সমস্ত প্রারব্ধের ক্ষয় হইয়া গেলে দেহপাতের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে বলিয়া এবং দেহপাত হইলে ভগবদ্ভজনও অসম্ভব হইয়া পড়ে বলিয়া এ-স্থলে কর্ম্মনিবন্ধনকৃন্তন-শব্দের দুষ্প্রারব্ধক্ষয় অর্থই অভিপ্রেত।”

ইহার পরে শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—“অতএব নামশ্রুতিভাষ্যে লিখিতং—‘প্রারব্ধপাপ-নিবর্ত্তকত্বঞ্চ কদাচিদুপাসকেচ্ছাবলাদিতি।’ অন্যথাত্র প্রস্তুতাজামিলাদিভি র্বিরোধাপত্তেঃ।—এজন্য নামশ্রুতিভাষ্যেও লিখিত হইয়াছে যে, ‘প্রারব্ধপাপনিবর্ত্তকত্ব কদাচিৎ উপাসকের ইচ্ছাবশেই হইয়া থাকে। অন্যথা, অজামিলাদির সহিত বিরোধ উপস্থিত হয়।” তাৎপর্য্য এই :—“গোবিন্দেতি জপন্”-ইত্যাদি শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন, এই শ্লোকে দুষ্প্রারব্ধবিনাশই অভিপ্রেত, সর্ব্ববিধ প্রারব্ধের বিনাশ অভিপ্রেত নহে। এই উক্তির সমর্থনে তিনি নাম-শ্রুতিভাষ্যের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়াছেন। এই শ্রুতিভাষ্য-প্রমাণ বলেন—উপাসকের ইচ্ছা অনুসারেই কোনও কোনও স্থলে সর্ব্ববিধ প্রারব্ধের বিনাশ হইয়া থাকে; উপাসকের ইচ্ছা না হইলে সর্ব্বপ্রারব্ধের বিনাশ হয় না। ইহা স্বীকার না করিলে অজামিলাদির ব্যাপারে বিরোধ উপস্থিত হয়। অজামিলকে যখন যমদূতগণ পাশবদ্ধ করিয়াছিলেন, তখনই তাঁহার সমস্ত প্রারব্ধের খণ্ডন হইয়া গিয়াছিল, নচেৎ তাঁহার মৃত্যু আসন্ন হইত না, যমদূতগণও তাঁহাকে যমালয়ে নেওয়ার জন্য বাঁধিতেন না। কিন্তু বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাকে বন্ধনমুক্ত করিয়া দিলেন; তাহার পরেও তিনি যথাবস্থিত দেহে কিছুকাল সাধন করিয়াছেন। *প্রারব্ধ খণ্ডনের পরে তিনি নিজদেহে জীবিত থাকিতে পারেন না। তথাপি যে জীবিত রহিয়াছেন,* তাহার হেতু এই যে, পুত্রোপচারিত নারায়ণের নামোচ্চারণের ফলে নামাপরাধশূন্য অজামিলের দুষ্প্রারব্ধমাত্র খণ্ডিত হইয়াছিল, কিন্তু সমস্ত প্রারব্ধের খণ্ডন হয় নাই বলিয়াই তাঁহার দেহপাত হয় নাই।

কিন্তু এইরূপ সমাধানও বিচারসহ বলিয়া মনে হয় না। কেননা, যমদূতগণ কর্ত্তৃক তাঁহার বন্ধনই তো তাঁহার মৃত্যু—সুতরাং প্রারব্ধক্ষয়—সূচিত করিতেছে। তাহার পরে আবার তাঁহার জীবিত থাকা সম্ভবপর হইতে পারে না। যদি বলা যায়, যমদূতগণকর্ত্তৃক বন্ধনও দুষ্প্রারব্ধ। তাহাও সঙ্গত

মনে হয় না, নামোচ্চারণ যদি কেবল দুষ্প্রারব্ধ-নাশকই হয়, তাহা হইলে যমদূতগণকর্তৃক বন্ধনের পূর্ব্বেই তাঁহার দুষ্প্রারব্ধের খণ্ডন হইয়া গিয়াছে; যেহেতু যমদূতগণকে দেখিয়াই ভীত অজামিল "নারায়ণ" বলিয়া তাঁহার পুত্রকে আহ্বান করিয়াছেন এবং যমদূতগণের আগমনের পূর্ব্বেও নামকরণের পর হইতে তিনি তাঁহার পুত্রের আহ্বানের উপলক্ষ্যে বহুবার নারায়ণ-নামের উচ্চারণ করিয়াছেন। সুতরাং তাঁহার দুষ্প্রারব্ধ বহু পূর্ব্বেই খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে। যমদূতগণর্তৃক বন্ধনজনক দুষ্প্রারব্ধ তখন আর থাকিতে পারে না।

ভগবন্নামোচ্চারণের দুষ্প্রারব্ধ-নাশকত্বমাত্র স্বীকার করিতে হইলে বুঝা যায়, পুত্রের নামকরণের পরে যখন অজামিল "নারায়ণ" বলিয়া পুত্রকে আহ্বান করিয়াছেন, তখনই তাঁহার দুষ্প্রারব্ধ খণ্ডিত হইয়া গিয়াছে, অন্য প্রারব্ধ বর্ত্তমান ছিল। সেই অবশিষ্ট প্রারব্ধ শেষ হইয়া যাওয়ার পরেই যমদূতগণ তাঁহাকে যমালয়ে নেওয়ার জন্য আসিয়াছেন। তাঁহারা নামমাহাত্ম্য জানিতেন না বলিয়াই অজামিলকে যমালয়ে নিতে আসিয়াছিলেন; কিন্তু বিষ্ণুদূতগণের মুখে নামমাহাত্ম্য শুনিয়া অজামিলকে বন্ধনমুক্ত করিয়া চলিয়া গেলেন। নামশ্রুতিভাষ্যের মর্ম্ম হইতে বুঝা যায়—প্রারব্ধনিবর্ত্তকত্ব অজামিল ইচ্ছা করেন নাই বলিয়াই তাহার পরেও তিনি জীবিত ছিলেন।

কিন্তু ইহাও সন্তোষজনক সমাধান বলিয়া মনে হয় না। কেননা, যমদূতগণের আসার সময়েই অজামিলের সমস্ত প্রারব্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়াছিল; নতুবা যমদূতগণই বা আসিবেন কেন? তাহার পরে আবার প্রারব্ধরক্ষার ইচ্ছাই বা কিরূপে হইতে পারে? ইচ্ছা হইলেও যাহার অস্তিত্বই নাই, তাহার রক্ষণ কিরূপে সম্ভবপর হইতে পারে?

যাহাহউক, শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী উল্লিখিত শ্রীমদ্‌ভাগবত-শ্লোকদ্বয়ের দুই রকম অর্থ করিয়াছেন—সর্ব্বপ্রারব্ধ-বিনাশকত্বপর এবং দুষ্প্রারব্ধমাত্র-বিনাশকত্বপর। তন্মধ্যে সর্ব্বপ্রারব্ধ-বিনাশ-কত্বপর অর্থই তাঁহার নিজের অভিপ্রেত বলিয়া মনে হয়। কেননা, টীকার শেষভাগে তিনি লিখিয়াছেন—শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকদ্বয়ে নামকীর্ত্তনের অশেষ-প্রারব্ধ-বিনাশিত্বই প্রদর্শিত হইয়াছে। "যদ্বা দ্বাভ্যামেব শ্লোকাভ্যামশেষ-প্রারব্ধ-বিনাশিত্বমেব দর্শয়তি যন্নামেতি।" শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস-কারেরও তাহাই অভিপ্রেত। প্রকরণ হইতেই তাহা জানা যায়। নামকীর্ত্তনের "প্রারব্ধবিনাশিত্বম্" প্রকরণেই তিনি শ্রীমদ্‌ভাগবতের শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়াছেন এবং "উক্ত্যা কর্ম্মনিবন্ধেতি" ইত্যাদি উপসংহার-শ্লোকও-"প্রারব্ধে পর্য্যবস্যতি"-বাক্যে প্রারব্ধ-বিনাশিত্বই দেখাইয়াছেন।

শ্রীহরিনামের মহিমা-কথন-প্রসঙ্গে শ্রীমন্‌মহাপ্রভুও বলিয়াছেন—

> যৈছে তৈছে যোই-কোই করয়ে স্মরণ।
> চারিবিধ পাপ তার করে সংহরণ॥ শ্রীচৈ, ২।২৪।৪৫॥

চারিবিধ পাপ—পাতক, উপপাতক, অতিপাতক ও মহাপাতক। অথবা, অপ্রারব্ধফল, ফলোন্মুখ

(প্রারব্ধ), বীজ (বাসনাময়) এবং কূট (প্রারব্ধভাবে উন্মুখ), এই চারি রকমের পাপ বা কর্ম্মফল। এস্থলেও নামের প্রভাবে প্রারব্ধ-খণ্ডনের কথা জানা যায়।

এই উক্তির সমর্থনে শ্রীমন্ মহাপ্রভু শ্রীমদ্ভাগবতের একটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

"যথাগ্নিঃ সুসমৃদ্ধার্চ্চিঃ করোত্যেধাংসি ভস্মসাৎ।
তথা মদ্বিষয়া ভক্তিরুদ্ধবেনাংসি কৃৎস্নশঃ॥ শ্রীভা ১১।১৪।১৯॥

—(শ্রীকৃষ্ণ উদ্ধবের নিকটে বলিয়াছেন) হে উদ্ধব! প্রজ্বলিত অগ্নি যেমন সমস্ত কাষ্ঠরাশিকে ভস্মীভূত করে, তদ্রূপ মদ্‌বিষয়ক-ভক্তি সমস্ত পাপকে নিঃশেষরূপে দগ্ধ করে।" নামকীর্ত্তনও ভক্তি—সাধনভক্তি।

'ভক্ত্যাহমেকয়া গ্রাহ্যঃ" ইত্যাদি শ্রীভা, ১১।১৪।২০ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ বিশ্বনাথ চক্রবর্ত্তীও লিখিয়াছেন—"তেন প্রারব্ধপাপ-নাশকতা ভক্তের্বুধ্যতে॥ —ভক্তির (সাধন-ভক্তির, সুতরাং নামকীর্ত্তনেরও) যে প্রারব্ধ-পাপ-নাশকারিণী শক্তি আছে, তাহাই বুঝা যাইতেছে।"

এইরূপে জানা গেল—কেবল নামসঙ্কীর্ত্তনের নহে, ভক্তি-অঙ্গমাত্রেরই প্রারব্ধ-নাশকত্ব প্রভাব আছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীও তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (১২৮ অনুচ্ছেদে) শ্রীমদ্ভাগবতের নিম্নলিখিত শ্লোকদ্বয় উদ্ধৃত করিয়া কোনও কোনও স্থলে ভগবন্নামের প্রারব্ধহারিত্ব প্রদর্শন করিয়াছেন।

"যন্নামধেয়শ্রবণানুকীর্ত্তনাদ্ যৎপ্রহ্বণাদ্ যৎস্মরণাদপি ক্বচিৎ।
শ্বাদোহপি সদ্যঃ সবনায় কল্পতে কুতঃ পুনস্তে ভগবন্নু দর্শনাৎ॥
অহো বত শ্বপচোহতো গরীয়ান্ যজ্জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে নাম তুভ্যম্।
তেপুস্তপস্তে জুহুবুঃ সস্নুরার্য্যা ব্রহ্মানূচুর্নাম গৃণন্তি যে তে॥　　শ্রীভা, ৩।৩৩।৬-৭॥

—(জননী-দেবহূতি ভগবান্ কপিলদেবের নিকটে বলিয়াছেন) হে ভগবন্! যে তোমার শ্রবণ বা নিরন্তর কীর্ত্তনের প্রভাবে এবং তোমার চরণে প্রণামের বা তোমার স্মরণের প্রভাবে শ্বাদও (কুক্কুরমাংস-ভোজন অভ্যাস যে জাতির, সেই জাতিতে জাত লোক-বিশেষও) সদ্যই সবন-যাগের (সোমযাগ করার) যোগ্যতা লাভ করেন, সেই তোমার সাক্ষাদ্দর্শনের প্রভাবে দুর্জ্জাতিও যে সোমযাগের যোগ্যতালাভ করিবে, তাহাতে আর বক্তব্য কি আছে? অহো! যাহার জিহ্বার অগ্রভাগে তোমারই সুখের জন্য তোমার নাম বিদ্যমান (তোমার সুখের উদ্দেশ্যে যিনি তোমার নামকীর্ত্তন করেন), এতাদৃশ শ্বপচও (কুক্কুরমাংসভোজী কুলে উদ্ভূত ব্যক্তিবিশেষও) গরীয়ান্ (গুরুজনের তুল্য পূজনীয় ও আদরণীয়); কেন না, যাঁহারা তোমার নাম কীর্ত্তন করেন, সমস্ত তপস্যা, সমস্ত যজ্ঞ, সমস্ত তীর্থ-স্নান, সমস্ত ভগবৎস্বরূপের অর্চ্চন এবং সমস্ত বেদের অধ্যয়নও তাঁহাদের অনুষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে (অর্থাৎ তপস্যাদি সমস্তই তোমার নামকীর্ত্তনের অন্তর্ভুত, তপস্যাদি সমস্ত অনুষ্ঠানের ফল নামকীর্ত্তনের ফলেরই অন্তর্ভূত)।"

উল্লিখিত শ্লোকদ্বয়-প্রসঙ্গে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী লিখিয়াছেন—"ততশ্চাস্য ভগবন্নাম-শ্রবণাদ্যেকতরাৎ সদ্য এব সবনযোগ্যতা-প্রতিকূল-দুর্জ্জাতিত্ব-প্রারম্ভক-প্রারব্ধপাপনাশঃ প্রতিপদ্যতে ॥—দেবহূতির বাক্যে ইহাই প্রতিপাদিত হইল যে, ভগবন্নামের শ্রবণকীর্ত্তনাদির যে কোনও একটীর প্রভাবেই সবনযোগ্যতার প্রতিকূল দুর্জ্জাতিত্ব-প্রারম্ভক প্রারব্ধ-পাপ বিনষ্ট হয়।" তাৎপর্য্য এই যে, শ্বপচ-আদি হীনজাতিতে জন্ম হইতেছে সবনযাগের প্রতিকূল, শ্বপচাদি হীনকুলে জন্ম হইলে কেহই সোমযাগের যোগ্য হইতে পারেনা। যে-প্রারব্ধ-কর্ম্মের ফলে শ্বপচাদি হীনকুলে জন্ম হয়, নাম-কীর্ত্তনাদির প্রভাবে সেই প্রারব্ধই বিনষ্ট হইয়া যায়; হীনকুলে জন্মের হেতু যাহা, তাহাই যখন বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন দুর্জ্জাতিত্ব-দোষও বিনষ্ট হইয়া যায়, তখন আর শ্বপচকুলে জাত লোক শ্বপচ থাকে না। নামকীর্ত্তনাদির ফলে যে প্রারব্ধ নষ্ট হইয়া যায়, ইহাই তাহার প্রমাণ।

ক। অশেষ-প্রারব্ধক্ষয়ে সাধকের দেহপাত হয় না কেন

এক্ষণে প্রশ্ন হইতেছে এই। নামকীর্ত্তনের (বা ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের) ফলেই যদি প্রারব্ধপর্য্যন্ত সমস্ত কর্ম্মফল নিঃশেষে বিনষ্ট হইয়া যায়, তাহা হইলে কি নামকীর্ত্তনাদি-মাত্রেই সাধকের দেহপাত (মৃত্যু) হইবে? প্রারব্ধক্ষয় হইয়া গেলেই তো জীবের মৃত্যু হইয়া থাকে।

উত্তর এই। পূর্ব্বোল্লিখিত নামশ্রুতি-ভাষ্যে লিখিত আছে—"প্রারব্ধপাপ-নিবর্ত্তকত্বঞ্চ কদাচিদুপাসকেচ্ছাবশাদিতি।" ইহা হইতে জানা যায়—কদাচিৎ কোনও সাধক যদি প্রারব্ধপাপের বিনাশ ইচ্ছা করেন, তাহা হইলে তাঁহার প্রারব্ধ বিনষ্ট হইয়া যায়; যিনি ইচ্ছা করেন না, তাঁহার প্রারব্ধ থাকিয়া যায়, সুতরাং তাঁহার তখন দেহপাতও হয় না। তবে কি নামের প্রভাব সাধকের ইচ্ছার অধীন? না, তাহাও হইতে পারেনা; কেননা, নাম পরম-স্বতন্ত্র, সর্ব্বতোভাবে অন্যনিরপেক্ষ। নামকীর্ত্তনের ফলে প্রারব্ধ ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে স্বাভাবিক ভাবে সাধকের দেহপাত হইবেই, সাধকের ইচ্ছা কেবল উপলক্ষ্যমাত্র। জীবিত থাকিয়া আরও ভক্তিপুষ্টির অনুকূল সাধন-ভজন করার জন্য যাঁহার ইচ্ছা নাই, তিনিই প্রারব্ধ-বিনাশ ইচ্ছা করেন। এতাদৃশ সাধক কেবলই মুক্তিকামী। কিন্তু যাঁহারা ভগবানের প্রেমসেবাকামী, তাঁহারা প্রারব্ধক্ষয় বা মুক্তি কামনা করেন না। প্রারব্ধক্ষয় হইয়া গেলেও ভক্তিপুষ্টির জন্য ভজন-সাধনের জন্য, তাঁহাদের ইচ্ছা থাকে, তাই তাঁহারা জীবিত থাকিতে ইচ্ছা করেন - কেবল ভজনের জন্য, দেহসুখ-ভোগের জন্য নহে। পরম-কৃপালু নামও তাঁহাদের অভিলাষ পূর্ণ করেন, তাঁহাদের প্রারব্ধকে ধ্বংস করেন না; তাঁহাদের দেহত্যাগ হয় না। ভক্তির আনুকূল্যবিধায়ক বলিয়াই নাম ইহা করিয়া থাকেন। ইহাই নামশ্রুতি-ভাষ্যের তাৎপর্য্য।

উপরে উদ্ধৃত শ্রীমদ্ভাগবত-শ্লোকের টীকায় (শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসের টীকায়) শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—

"ততশ্চাশেষপ্রারব্ধক্ষয়েণ দেহপাতাপত্তৌ সত্যামপি নামসঙ্কীর্ত্তন-প্রভাবতো

নিত্যপ্রলয়াদিন্যায়েন তদানীমেব ভগবদ্ভজনার্থং তদ্যোগ্যদেহান্তরোৎপত্ত্যা, কিংবা পূর্ব্বদেহমেব সদ্যোজাত-ভগবদ্-ভজনোচিতগুণবিশেষবত্তয়া নবীনমিবাসৌ প্রাপেত্যাহুম্।"

মর্ম্মার্থ। অশেষ-প্রারব্ধের ক্ষয় হইয়া গেলে দেহপাতের প্রসঙ্গ আসিয়া পড়ে বটে; তথাপি কিন্তু নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই সেই সময়েই ভগবদ্ভজনার্থ সাধক ভজনোপযোগী অন্যদেহ প্রাপ্ত হয়; কিম্বা, সাধকের পূর্ব্বদেহই সদ্যোজাত ভগবদ্ভজনোপযোগী গুণবিশেষ লাভ করিয়া একটা নূতন দেহের মতনই হইয়া যায়। শ্রীপাদ সনাতন ধ্রুবের দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিয়াও ইহা প্রতিপাদিত করিয়াছেন। পরম-পদারোহণ-সময়ে ধ্রুব যে দেহ লইয়া গিয়াছিলেদ, লৌকিক-দৃষ্টিতে তাহা ছিল তাঁহার পূর্ব্বদেহই; কেননা, তাঁহার পরিত্যক্ত কোনও দেহ পড়িয়া ছিলনা। কিন্তু বস্তুতঃ তাঁহার পূর্ব্বদেহেই তিনি পরম-পদ আরোহণ করেন নাই। শ্রীধরস্বামীর টীকা অনুসারে বুঝা যায়, ধ্রুবের সেই পূর্ব্বদেহই চিন্ময়ত্বাদি পার্ষদ-দেহোচিত গুণযুক্ত হইয়াছিল। সুতরাং এই পার্ষদ-দেহোচিত-গুণযুক্ত দেহ পূর্ব্বদেহ হইতে ভিন্নই ছিল। পূর্ব্বদেহে পার্ষদোচিত গুণাদি ছিলনা।

তাৎপর্য্য হইতেছে এই। প্রারব্ধক্ষয়ের পরেও লৌকিক-দৃষ্টিতে ভজনার্থী সাধকের পূর্ব্বদেহই থাকিয়া যায়, দেহপাত হয়না। কিন্তু বস্তুতঃ, তাহা পূর্ব্বদেহের অনুরূপ হইলেও পূর্ব্বদেহ নহে, তাহা হইয়া যায়—ভজনের উপযোগী একটা নূতন দেহ। নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবেই ইহা সম্ভবপর হয়। অথবা, সাধকের পূর্ব্বদেহেই ভগবদ্ভজনের উপযোগী গুণবিশেষের আবির্ভাব হয়। সুতরাং প্রকৃত প্রস্তাবে তাহা আর পূর্ব্বদেহ নহে, তাহাও একটী নূতন দেহের তুল্যই। সার কথা এই যে, নামসঙ্কীর্ত্তনের প্রভাবে ভক্তিকামী সাধকের সমস্ত প্রারব্ধ নিঃশেষরূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া গেলেও তাঁহার দৃশ্যমান দেহই থাকিয়া যায়, ভজনোপযোগী গুণাদি লাভ করিয়াই থাকিয়া যায়—কেবল ভজনের জন্য। নামসঙ্কীর্ত্তনের অচিন্ত্য-প্রভাবেই ইহা সম্ভব হয়।

এ-স্থলে **অজামিলের প্রসঙ্গও** বিবেচিত হইতে পারে। বিষ্ণুদূতগণ যখন তাঁহাকে যমদূতগণের কৃত বন্ধন হইতে মুক্ত করিলেন, তখনই তিনি পার্ষদদেহ-প্রাপ্তির—সুতরাং বৈকুণ্ঠ-গমনের—যোগ্য; কেননা, তাঁহার সমস্ত প্রারব্ধই তখন সম্যক্‌রূপে বিনষ্ট। কিন্তু বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাকে বৈকুণ্ঠে নিয়া গেলেন না কেন?

"ত এবং সুবিনির্ণীয়···ববন্দে শিরসা বিষ্ণোঃ কিঙ্করান্ দর্শনোৎসবঃ॥"-ইত্যাদি শ্রীভা ৬।২।২০-২২ শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তিতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন—"শ্রীভগবন্নামগ্রহণং খলু দ্বিধা ভবতি কেবলত্বেন স্নেহসংযুক্তেন চ। তত্র পূর্ব্বেণাপি প্রাপয়ত্যেব সদ্যস্তল্লোকং নাম। পরেণ চ তৎসামীপ্যমপি প্রাপয়তি। ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥ ইতি বাক্যাৎ॥ কিন্তু নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয় ইতি তদ্বাক্যদিশা বিলম্বেন প্রাপয়তি। স্নেহস্তু অমীষামনু-বৃত্তির্মদনুসেবৈব বৃত্তি র্জীবনহেতুস্তদর্থমিত্যভিপ্রায়ো দর্শিতঃ। তদেবং সতি অজামিলোঽপ্যয়মারো-

পিতনাম্নঃ পুত্রস্য সম্বন্ধেন তন্নাম্নাপি স্নিহ্যতি স্ম তস্মিন্ চ নাম্নি শ্রীভগবতোঽপি অভিমানসান্দ্রো দৃশ্যতে। যতস্তদ্‌বিষয়া মতিরিত্যত্র। যতঃ পার্ষদানামপি মহানেব তত্রাদরো দৃষ্টঃ তস্মাৎ স্নেহসম্বলনয়া গৃহীতস্বনাম্নি তস্মিন্ উৎকণ্ঠাপূর্ব্বক-সাক্ষান্নিজকীর্ত্তনাদিদ্বারা সাক্ষান্নিজস্নেহং প্রকৃষ্টং দত্ত্বা নেতুমিচ্ছতি প্রভুরিতি জ্ঞাত্বা সহসা নাত্মভিঃ সহঃ ন নীতবন্ত ইতি সর্ব্বং সমঞ্জসম্।" ইহার স্থূল তাৎপর্য্য এই :— দুই রকমে ভগবন্নাম গ্রহণ করা যায়—কেবল রূপে এবং স্নেহসংযুক্ত রূপে। কেবল রূপে (অর্থাৎ ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া শ্রদ্ধার সহিত ঐকান্তিক ভাবে) নামগ্রহণ করিলে নাম সদ্যই নামগ্রহণকারীকে ভগবল্লোক প্রাপ্তি করাইয়া থাকেন। আর, স্নেহযুক্ত ভাবে নাম গ্রহণ করিলে ভগবৎ-সামীপ্য প্রাপ্তি করান। "ময়ি ভক্তির্হি ভূতানামমৃতত্বায় কল্পতে। দিষ্ট্যা যদাসীন্মৎস্নেহো ভবতীনাং মদাপনঃ॥"-ইত্যাদি শ্রীভাঃ ১০।৮২।৪৪-শ্লোকে শ্রীভগবানের উক্তিই তাহার প্রমাণ। (এই শ্লোকের প্রথমার্দ্ধে ভক্তি-শব্দে কেবলা ভক্তির কথা বলা হইয়াছে, তাহার ফলে যে অমৃতত্ব—পার্ষদদেহ—প্রাপ্তি হয়, তাহাও বলা হইয়াছে। দ্বিতীয়ার্দ্ধে বলা হইয়াছে—ভগবানে যে স্নেহ, তাহা 'মদাপন'-অর্থাৎ ভগবৎ-প্রাপ্তি করাইতে, ভগবানের সামীপ্য দান করিতে সমর্থ, তাহাই বলা হইয়াছে)। কিন্তু "নাহং তু সখ্যো ভজতোঽপি জন্তূন্ ভজাম্যমীষামনুবৃত্তিবৃত্তয়ে॥—শ্রীকৃষ্ণ ব্রজসুন্দরীদিগের নিকটে বলিয়াছেন—সখীগণ! যাহারা আমার ভজন করে, আমার স্মরণ-মনন-ধ্যানাদিদ্বারা আমার সম্বন্ধে তাহাদের স্নেহ বা অনুরাগ যাহাতে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইতে পারে, তাহার সুযোগ দেওয়ার জন্য আমি তাহাদের ভজন করি না (স্নেহ বর্দ্ধিত হইলেই ভজন করি)"-ইত্যাদি শ্রীভা, ১০।৩২।২০-শ্লোকে শ্রীভগবদুক্তি হইতে জানা যায়, স্নেহযুক্ত নামে কিঞ্চিদ্ বিলম্বেই ভগবানের সামীপ্য পাওয়া যায়। (শ্লোকস্থ "অনুবৃত্তিবৃত্তয়ে" শব্দ হইতেই বিলম্বের কথা ধ্বনিত হইতেছে ; যেহেতু) অনুবৃত্তি-শব্দের অর্থ হইতেছে—অনু (নিরন্তর) সেবা ; অনুবৃত্তি-বৃত্তি-শব্দের অর্থ হইতেছে—অনুসেবাই বৃত্তি বা জীবনহেতু যাহার। স্নেহের জীবনহেতু হইল—অনুবৃত্তি, স্নেহের পাত্রের নিরন্তর সেবা বা ধ্যান ; তাহাতেই স্নেহ ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হয়। (স্নেহসংযুক্ত ভাবে যিনি নামকীর্ত্তন করেন, ধ্যানাদিদ্বারা তাঁহার স্নেহবৃদ্ধির উদ্দেশ্যেই, সহসা তাঁহাকে ভগবল্লোকে না নিয়া কিঞ্চিৎ বিলম্বে নেওয়া হয়)। ইহাই অভিপ্রায়। অজামিলের ভগবানে স্নেহ ছিল না ; স্নেহ ছিল তাঁহার নারায়ণনামক পুত্রে ; পুত্রের প্রতি স্নেহ বশতঃই অজামিল পুনঃ পুনঃ পুত্রকে ডাকিতেন, তাহাতে "নারায়ণ—ভগবানের নাম" উচ্চারিত হইত। "যতস্তদ্‌বিষয়া মতিঃ"-ইত্যাদি শ্রীভাঃ" ৬।২।১০-শ্লোক হইতে বুঝা যায়, নামে শ্রীভগবানেরও বিশেষ প্রীতি (নতুবা যে কোনও উপলক্ষ্যে কেহ তাঁহার নাম উচ্চারণ করিলে ভগবান্ তাঁহাকে আপন জন বলিয়া অঙ্গীকার করিবেন কেন ?)। ভগবৎ-পার্ষদদিগেরও ভগবন্নামে বিশেষ প্রীতি দৃষ্ট হয় (নতুবা ভগবন্নামের উচ্চারণ-মাত্রেই তাঁহারা অজামিলকে যমদূতগণের হাত হইতে উদ্ধার করার জন্য ব্যাকুল হইবেন কেন ?)। তাঁহারা ইহাও মনে করিয়াছিলেন—অজামিল তো নারায়ণের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া "নারায়ণ"-নাম উচ্চারণ করেন নাই ; এক্ষণে ভগবানের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উৎকণ্ঠার সহিত ভগবানের নামকীর্ত্তনাদি করুক

এবং নামকীর্ত্তনাদির ফলে ভগবানে তাঁহার স্নেহ প্রকৃষ্টরূপে বর্দ্ধিত হউক ; তাহার পরেই অজামিলকে বৈকুণ্ঠে নেওয়া হইবে—ইহাই তাঁহাদের প্রভু ভগবানের ইচ্ছা। তাই বিষ্ণুদূতগণ তাঁহাকে তৎক্ষণাৎই তাঁহাদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে নিয়া যান নাই।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর উক্তি হইতে বুঝা যায়—নামকীর্ত্তনাদিদ্বারা ভগবানে এবং ভগবন্নামে অজামিলের প্রীতি উৎপাদন এবং প্রীতিবর্দ্ধনের সুযোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যেই যমপাশ হইতে মুক্ত করিয়াও বিষ্ণুদূতগণ অজামিলকে তাঁহাদের সঙ্গে বৈকুণ্ঠে লইয়া যায়েন নাই। ভজনের উদ্দেশ্যে অজামিলের পূর্ব্বদেহেই ভজনোপযোগী গুণসমূহ সঞ্চারিত করিয়া অজামিলকে রাখিয়া গিয়াছেন।

খ। ভজনপরায়ণ সাধকের দেহে বাহ্য সুখদুঃখ কেন

আবার প্রশ্ন হইতে পারে—প্রারব্ধের ফলেই দেহাদিতে সুখ-দুঃখ অনুভূত হয়, রোগাদিরও আবির্ভাব হয়। প্রারব্ধ সম্যক্‌রূপে ক্ষয় প্রাপ্ত হইলে তো সাধকের সুখ-দুঃখ-রোগাদির কোনও সম্ভাবনাই থাকে না। তথাপি কিন্তু ভজন-পরায়ণ সাধকেরও তো অন্য সংসারী লোকের ন্যায় কখনও কখনও দুঃখ-ব্যাধি-আদি দেখা যায়। ইহার হেতু কি ?

ইহার উত্তরে উক্ত টীকাতেই শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—ভক্তের প্রতি কৃপাবশতঃ তাঁহার মধ্যে আবির্ভূত ভক্তির মাহাত্ম্য লোকনয়নের গোচর হইতে সংগোপনের জন্যই ভগবান্ বাহ্য-সুখ-দুঃখাদিদ্বারা ভক্তিমহিমাকে আচ্ছাদিত করেন, কখনও কখনও বা ভক্তও স্বীয় ভক্তি-শক্তিতে নিজের মধ্যে ভক্তিমহিমাকে আচ্ছাদিত করিয়া রাখেন। "যচ্চ বহিঃসুখদুঃখফলকে প্রারব্ধে ক্ষীণেঽপি পশ্চাত্তস্য কদাচিৎ কিঞ্চিৎ দেহাদৌ বাহ্যসুখং দুঃখঞ্চ দৃশ্যতে, তচ্চ লোকে ভক্তিমাহাত্ম্য-সংগোপনার্থং শ্রীভগবতা ভক্তেন বা তেনৈবাচ্ছাদনার্থং শক্ত্যা সংপ্রদর্শ্যত ইতি জ্ঞেয়ম্। এবং সর্ব্বমনবদ্যম্।"

ভক্তির মাহাত্ম্য লোকনয়নের গোচরে প্রকাশ পাইতে থাকিলে সাধকের ভজনের বিঘ্ন জন্মিতে পারে, লোকে তাঁহার ভূয়সী প্রশংসা, বা পূজাদি করিতে পারে। তাহাতে সাধকের চিত্তেও ভক্তিবিরোধী লাভ-পূজা-প্রতিষ্ঠাদির লোভ জন্মিতে পারে। তাহাতে ভক্তির পুষ্টি প্রতিহত হইতে পারে। এজন্যই ভক্তবৎসল ভগবান্ নিজের শক্তিতে ভক্তের ভক্তিমহিমাকে প্রচ্ছন্ন করিয়া রাখেন, কখনও বা ভক্তও তাহা করিয়া থাকেন।

শ্রীপাদ সনাতন লিখিয়াছেন—কদাচিৎ ভক্তের দেহাদিতে "বাহ্যসুখদুঃখঞ্চ দৃশ্যতে—বাহ্যসুখ-দুঃখ দেখা যায়।" ইহার তাৎপর্য্য এই যে, অন্য লোকের মত ভক্তের যে সুখ-দুঃখ দেখা যায়, তাহা "বাহ্য"-মাত্র, আন্তরিক নহে ; অর্থাৎ ভক্ত সেই সুখ-দুঃখে অভিভূত হয়েন না, মনে কোনওরূপ কষ্টও অনুভব করেন না। ইহা কেবল বাহিরের আবরণমাত্র।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে (১৫৮-অনুচ্ছেদে) লিখিয়াছেন—"কেচিত্তু সাধারণস্যৈব প্রারব্ধস্য তাদৃশেষু ভক্তেষু প্রাবল্যং তদুৎকণ্ঠাবর্দ্ধনার্থং স্বয়ংভগবতৈব ক্রিয়ত ইতি মন্যন্তে॥—কেহ কেহ মনে করেন, ভজনবিষয়ে এবং ভগবৎ-প্রাপ্তিবিষয়ে উৎকণ্ঠা-বৃদ্ধির জন্য ভগবান্

নিজেই তাদৃশ (জাতরতি) ভক্তে সাধারণ প্রারব্ধের প্রাবল্য প্রকাশ করাইয়া থাকেন।" শ্রীজীবপাদ এই প্রসঙ্গে ভরত-মহারাজের মৃগদেহ-প্রাপ্তির উল্লেখ করিয়াছেন এবং শ্রীনারদের পূর্ব্বজন্মে (দাসীপুত্ররূপে জন্মে) জাতরতি-অবস্থাতেও কষায়-রক্ষণের দৃষ্টান্তও দেখাইয়াছেন।

বলা বাহুল্য, যাঁহাদের নামাপরাধাদি নাই, তাঁহাদেরই সর্ব্ববিধ প্রারব্ধের সম্যক্ ক্ষয় সম্ভব এবং উল্লিখিত প্রকারে ভজনের জন্য পূর্ব্ব বা পূর্ব্ববৎ দেহে থাকিয়া ভগবৎ-প্রেরিত দৈহিক সুখ-দুঃখাদি "বাহ্য" বলিয়া মনে করা, অভিভূত না হওয়া, সম্ভব। কিন্তু যাঁহাদের নামাপরাধাদি আছে, তাঁহাদের প্রারব্ধের সম্যক্ বিনাশ হয় না ; অবশিষ্ট প্রারব্ধবশতঃ তাঁহাদের যে দৈহিক সুখ-দুঃখাদির উদয় হয়, তাঁহারা তাহাকে "বাহ্য" বলিয়া মনে করিতে পারেন না, তাহাতে তাঁহারা অভিভূত হইয়া পড়েন।

১০৮। শ্রীকৃষ্ণনামের মহিমার আধিক্য

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে পুলস্ত্যের নিম্নলিখিত উক্তিটী উদ্ধৃত হইয়াছে।

"সর্ব্বার্থশক্তিযুক্তস্য দেবদেবস্য চক্রিণঃ।
যথাভিরোচতে নাম তৎ সর্ব্বার্থেষু কীর্ত্তয়েৎ॥
সর্ব্বার্থসিদ্ধিমাপ্নোতি নাম্নামেকার্থতা যতঃ।
সর্ব্বাণ্যেতানি নামানি পরস্য ব্রহ্মণো হরেঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।১৩৪॥

—ভগবান্ দেবদেব চক্রধারী সর্ব্বার্থশক্তিসম্পন্ন ; অতএব, তাঁহার যে কোনও নামে যাঁহার রুচি হয়, তাঁহার পক্ষে সেই নামের কীর্ত্তন করাই সর্ব্বাতোভাবে কর্ত্তব্য। কেননা, পরব্রহ্ম হরির এই নাম সকল একার্থবোধক ; সুতরাং সকল নামেই সর্ব্বার্থসিদ্ধি ঘটিয়া থাকে।"

এই উক্তি হইতে মনে হয়—ভগবানের সকল নামেরই সমান শক্তি, সমান মাহাত্ম্য।

আবার কোনও কোনও শাস্ত্রপ্রমাণে কোনও কোনও নামের বৈশিষ্ট্যের কথাও দৃষ্ট হয়। যথা, পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে বৃহদ্‌বিষ্ণুসহস্রনাম-স্তোত্র হইতে জানা যায়—মহাদেব ভগবতীকে বলিয়াছেন, এক রাম-নাম সহস্র নামের তুল্য।

"রামরামেতি রামেতি রমে রামে মনোরমে।
সহস্রনামভিস্তুল্যং রামনাম বরাননে॥

—হে বরাননে! রামনাম বিষ্ণুসহস্রনামের তুল্য (অর্থাৎ বিষ্ণুসহস্রনাম একবার আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, রামনাম একবার আবৃত্তি করিলেই সেই ফল পাওয়া যায়)। এজন্য আমি সর্ব্বদা 'রাম রাম রাম' এইরূপে রামনাম কীর্ত্তন করিয়া মনোরম রামচন্দ্রে রমণ করি (পরমানন্দ অনুভব করি)।"

ইহা হইতে সহস্রনাম হইতে রামনামের বৈশিষ্ট্যের—অধিক মহিমার—কথা জানা গেল।

আবার ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ হইতে জানা যায়,

"সহস্রনাম্নাং পুণ্যানাং ত্রিরাবৃত্ত্যা তু যৎ ফলম্।
একাবৃত্ত্যা তু কৃষ্ণস্য নামৈকং তৎ প্রযচ্ছতি॥

—হ, ভ, বি, ১১।২৫৮-ধৃত-ব্রহ্মাণ্ড-পুরাণ-বচন॥

—পবিত্র বিষ্ণুসহস্র-নাম তিন বার (অর্থাৎ এক রামনামের তিনবার) আবৃত্তি করিলে যে ফল হয়, শ্রীকৃষ্ণের (কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি) একটী নামের একবার আবৃত্তি করিলেই সেই ফল পাওয়া যায়।"

টীকায় শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামী লিখিয়াছেন—"কৃষ্ণস্য কৃষ্ণাবতারসম্বন্ধি নামৈকস্যাপি তৎফলম্।—কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি একটী নামের একবার উচ্চারণেই সেই ফল পাওয়া যায়।" কৃষ্ণাবতার-সম্বন্ধি-নাম হইতেছে, স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নাম ; যথা, গোবিন্দ, দামোদর, পূতনারি, গিরিধারী-ইত্যাদি।

এই প্রমাণ হইতে জানা গেল—রামনাম হইতেও কৃষ্ণনামের মহিমা অধিক।

পাদ্মোত্তর-পাতাল-খণ্ডের অপর এক প্রমাণেও রামনাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের এক অসাধারণ বৈশিষ্ট্যের কথা জানা যায়। মহাদেবের মুখে মথুরা-মাহাত্ম্য-শ্রবণের পরে ভগবতী পার্ব্বতী মহাদেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন।

"শ্রীপার্ব্বতীপ্রশ্নঃ। উক্তোঽদ্ভুতশ্চ মহিমা মথুরায়া জটাধর॥
মুনের্ভুবো বা সরিতঃ প্রভাবঃ কেন বা বিভো।
কৃষ্ণস্য বা প্রভাবোঽয়ং সংযোগস্য প্রতাপবান্॥

শ্রীমহাদেবোত্তরম্॥
ন ভূমিকাপ্রভাবশ্চ সরিতো বা বরাননে। ঋষীণাং ন প্রভাবশ্চ প্রভাবো বিষ্ণুতারকে॥
তথা পারকচিচ্ছক্তেরুভে তৎপদকারকে। তদেব শৃণু ভো দেবি প্রভাবো যেন বর্ত্ততে॥
শ্রীকৃষ্ণমহিমা সর্ব্বশ্চিচ্ছক্তের্য প্রবর্ত্ততে। তারকং পারকং তস্য প্রভাবোঽয়মনাহতঃ॥
তারকাজ্জায়তে মুক্তিঃ প্রেমভক্তিশ্চ পারকাৎ। তত্রৈব শ্রীভগবদ্বাক্যম্॥
উভৌ মন্ত্রাবুভৌ নাম্নী মদীয়প্রাণবল্লভে। নানা নামানি মন্ত্রাশ্চ তন্মধ্যে সারমুচ্যতে॥
অজ্ঞাতমথবা জ্ঞাতং তারকং জপতে যদি। যত্রতত্র ভবেন্মৃত্যুঃ কাশ্যান্তু ফলমাদিশেৎ॥
বর্ত্ততে যস্য জিহ্বাগ্রে স পুমাল্লোঁকপাবনঃ॥ ছিনত্তি সর্ব্বপাপানি কাশীবাসফলং লভেৎ॥
ইতি তারকমন্ত্রোঽয়ং যস্ত কাশ্যাং প্রবর্ত্ততে। স এব মাথুরে দেবি বর্ত্ততেঽত্র বরাননে॥
অথ পারকমুচ্যেত মহামন্ত্রং যথাবলম্। পারকং যত্র বর্ত্তেত ঋদ্ধি-সিদ্ধি-সমাগমঃ॥
পূজ্যো ভবতি ত্রৈলোক্যে শতায়ুর্জায়তে পুমান্। অষ্টসিদ্ধিসমাযুক্তো বর্ত্ততে যত্র পারকম্॥
পারকং যস্য জিহ্বাগ্রে তস্য সন্তোষবর্ত্তিতা। পরিপূর্ণো ভবেৎ কামঃ সত্যসঙ্কল্পতা তথা॥

দ্বিবিধা প্রেমভক্তিস্তু শ্রুতা দৃষ্টা তথৈব চ। অখণ্ড-পরমানন্দস্তদ্‌গতো জ্ঞেয়লক্ষণঃ॥
অশ্রুপাতঃ ক্বচিন্নৃত্যং কচিৎ প্রেমাতিবিহ্বলঃ। ক্বচিত্তস্য মহামূর্চ্ছা মদ্‌গুণো গীয়তে ক্বচিৎ॥
—মথুরামাহাত্ম্যে ধৃত প্রমাণ॥”

সার মর্ম্ম। চিচ্ছক্তি হইতেই ভগবানের মহিমা এবং তাঁহার নামের মহিমা উদ্ভূত। ভগবানের যত নাম বা মন্ত্র আছে, তন্মধ্যে তারক (রাম নাম) এবং পারক (কৃষ্ণনাম) হইতেছে সার। তারক (রামনাম)-জপের ফলে মুক্তি লাভ হয়, কাশীবাস হয়; আর পারক (কৃষ্ণনাম)-জপের ফলে প্রেমভক্তি লাভ হয়। যিনি পারক (কৃষ্ণনাম) জপ করেন, তিনি প্রেমবিহ্বল হইয়া কখনও অশ্রুপাত করেন, কখনও নৃত্য করেন, কখনও প্রেম-মূর্চ্ছা প্রাপ্ত হয়েন, কখনও ভগবদ্‌গুণ কীর্ত্তন করেন।

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত হইতে জানা যায়, ভগবতীর উক্তিও উল্লিখিতরূপই। তিনি বলিয়াছেন,

মুক্তিহেতুক ‘তারক’ হয় রামনাম।
কৃষ্ণনাম ‘পারক’ হয়ে—করে প্রেমদান॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৩।২৪৪॥

এইরূপে দেখা গেল—শাস্ত্রে সকল ভগবন্নামের সমান মহিমার কথাও বলা হইয়াছে; আবার সহস্রনাম অপেক্ষা রামনামের এবং রামনাম হইতেও কৃষ্ণনামের মহিমাধিক্যের কথাও বলা হইয়াছে। এক নাম হইতে অপর নামের মহিমার উৎকর্ষ যদি থাকে, তাহা হইলে সকল নামের মহিমা কিরূপে সমান হইতে পারে? ইহার সমাধান কি? শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী ইহার নিম্নলিখিতরূপ সমাধান করিয়াছেন।

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাস বলেন—“শ্রীমন্নাম্নাঞ্চ সর্ব্বেষাং মাহাত্ম্যেষু সমেম্বপি। শ্রীকৃষ্ণস্যৈবাবতারেষু বিশেষঃ কোঽপি কস্যচিৎ॥ ১১।২৫৭॥—সমস্ত ভগবন্নামের সমান মহিমা হইলেও ভগবৎস্বরূপ-সমূহের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের কোনও কোনও নামের কোনও কোনও বিশেষত্ব আছে।” এই শ্লোকের টীকায় শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামী লিখিয়াছেন—“সামান্যতো নাম্নাং সর্ব্বেষামপি মাহাত্ম্যং লিখিত্বা ইদানীং বিশেষতো লিখন্ তত্র মাহাত্ম্যস্য সাম্যেঽপি কিঞ্চিৎ বিশেষং দৃষ্টান্তেন সাধয়তি। শ্রীমদিতি শ্রীমতো ভগবতঃ শ্রীমতাং বা অশেষশোভাসম্পত্ত্যতিশয়যুক্তানাং নাম্নাং কস্যচিৎ নাম্নঃ কোঽপি মাহাত্ম্যবিশেষোঽস্তি। ননু চিন্তামণেরিব ভগবন্নাম্নাং মহিমা সর্ব্বেঽপি সম এব উচিত ইত্যাশঙ্ক্য দৃষ্টান্তেন সাম্যেঽপি কিঞ্চিদ্ বিশেষং দর্শয়তি কৃষ্ণস্যেবেতি। যথা শ্রীনৃসিংহরঘুনাথাদীনাং মহাবতারাণাং সর্ব্বেষাং ভগবত্তয়া সাম্যেঽপি কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ংমিত্যুক্ত্যা কৃষ্ণস্যাবতারত্বেঽপি সাক্ষাদ্-ভগবত্ত্বেন কশ্চিদ্ বিশেষো দর্শিতস্তদ্বদিতি। এতচ্চ শ্রীধরস্বামিপাদৈ র্ব্যাখ্যাতম্। * *। পূর্ব্বং বহুবিধ-কামাপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নামবিশেষ-মাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফল-সিদ্ধয়ে নামবিশেষ-মাহাত্ম্যমিতি ভেদো দ্রষ্টব্যঃ।” এই টীকার সারমর্ম্ম এই রূপ:—রাম-নৃসিংহাদি অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ (অবতার) আছেন; তাঁহারা সকলেই ভগবান্, সুতরাং ভগবান্-হিসাবে শ্রীরাম-

নৃসিংহাদি এবং শ্রীকৃষ্ণ ইঁহারা সকলেই সমান। কিন্তু সকলে ভগবান্ হিসাবে সমান হইলেও, "কৃষ্ণস্তু ভগবান্ স্বয়ম্"-এই প্রমাণ অনুসারে, তাঁহাদের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণের একটা বিশেষত্ব আছে—তিনি স্বয়ং ভগবান্, ইহাই তাঁহার বিশেষত্ব; অপর ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহের মধ্যে কেহই স্বয়ংভগবান্ নহেন। তদ্রূপ, শ্রীরাম-নৃসিংহাদির নাম এবং শ্রীকৃষ্ণের নাম—ভগবানের নাম হিসাবে এই সকল নামই সমান; এই সকল ভগবন্নামের মধ্যে শ্রীকৃষ্ণ-নামের বিশেষত্ব আছে—শ্রীকৃষ্ণের নাম হইল স্বয়ংভগবানের নাম; রাম-নৃসিংহাদির নাম ভগবন্নাম বটে, কিন্তু স্বয়ংভগবানের নাম নহে; ইহাই শ্রীকৃষ্ণের নামের বিশেষত্ব।

অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপ-সমূহ হইলেন অখিল-রসামৃত-বারিধি শ্রীকৃষ্ণেরই অনন্ত-রস-বৈচিত্রীর মূর্ত্তরূপ; তাঁহারা সকলেই শ্রীকৃষ্ণের বিগ্রহের মধ্যে অবস্থিত। "একোঽপি সন যো বহুধা বিভাতি। শ্রুতি। একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ। বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্॥" তাঁহারা সকলেই নিত্য এবং স্বরূপে পূর্ণ। "সর্ব্বে পূর্ণাঃ শাশ্বতাশ্চ॥" শক্তি-বিকাশের পার্থক্যানুসারেই তাঁহাদের পার্থক্য। শ্রীরামচন্দ্রে শক্তিসমূহের এক রকম বিকাশ, শ্রীনৃসিংহদেবে আর এক রকম বিকাশ; শ্রীনারায়ণে আর এক রকম বিকাশ; ইত্যাদি। কিন্তু স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে সর্ব্বশক্তিরই সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ। অন্যান্য স্বরূপে শক্তিসমূহের আংশিক বিকাশ; তাই অন্যান্য স্বরূপকে শ্রীকৃষ্ণের অংশ বলা হয়।

নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া রাম-নাম এবং রাম-স্বরূপও অভিন্ন। সুতরাং শ্রীরামচন্দ্র-স্বরূপের যেই মহিমা, তাঁহার রাম-নামেরও সেই মহিমা। এইরূপে যে কোনও ভগবৎ-স্বরূপের যেই মহিমা, তাঁহার নামেরও সেই মহিমা। স্বয়ংভগবান্ বলিয়া শ্রীকৃষ্ণেই সর্ব্বশক্তির পূর্ণতম বিকাশ বলিয়া তাঁহার নামেও সর্ব্বনাম-মহিমার পূর্ণতম বিকাশ, শ্রীকৃষ্ণ স্বয়ংভগবান্ বলিয়া তাঁহার নামও স্বয়ংনাম। স্বয়ং-ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণে যেমন অপর সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপ অবস্থিত, সুতরাং এক শ্রীকৃষ্ণের পূজাতেই যেমন অপর সকলের পূজা হইয়া যায়, তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণের নামের মধ্যেও অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নাম অবস্থিত, শ্রীকৃষ্ণের নামের উচ্চারণেই অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নামোচ্চারণ হইয়া যায়, শ্রাকৃষ্ণের নামোচ্চারণেই অপর সকল ভগবৎ-স্বরূপের নামোচ্চারণের ফল পাওয়া যায়। একথাই শ্রীপাদসনাতন গোস্বামীর পূর্ব্বোদ্ধৃত টীকার শেষাংশে বলা হইয়াছে। "পূর্ব্বং বহুবিধ-কামাপহতচিত্তান্ প্রতি তত্তৎকামসিদ্ধ্যর্থং তত্তন্নামবিশেষ-মাহাত্ম্যং লিখিতম্, অত্র চ সর্ব্বফলসিদ্ধয়ে নামবিশেষমাহাত্ম্যমিতি ভেদঃ—সকাম ব্যক্তিদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন লোকের ভিন্ন ভিন্ন কামনা; এই সকল ভিন্ন ভিন্ন কামনা সিদ্ধির নিমিত্ত পূর্ব্বে ভিন্ন ভিন্ন নামের মাহাত্ম্যের কথা (কোন্ নামের কীর্ত্তনে কোন্ কামনা সিদ্ধ হইবে, তাহা) লিখিত হইয়াছে। এক্ষণে সর্ব্বফল-সিদ্ধির নিমিত্ত নামবিশেষের (শ্রীকৃষ্ণনামের) মাহাত্ম্য লিখিত হইতেছে। অর্থাৎ শ্রীকৃষ্ণনাম সমস্ত ভগবৎ-স্বরূপের নামের ফল দিতে সমর্থ; অপর ভগবৎ-স্বরূপের নাম অপেক্ষা শ্রীকৃষ্ণনামের ইহাই ভেদ।" সকল নামের সমান মাহাত্ম্য সত্ত্বেও ইহাই শ্রীকৃষ্ণনামের বিশেষত্ব।

"সন্ত্ববতারা বহবঃ পঙ্কজনাভস্য সর্ব্বতো ভদ্রাঃ। কৃষ্ণাদন্যঃ কো বা লতাস্বপি প্রেমদো ভবতি ॥" এই প্রমাণ বলে ভগবানের অনন্ত স্বরূপ থাকাসত্ত্বেও যেমন শ্রীকৃষ্ণব্যতীত অপর কোনও স্বরূপ প্রেম দান করিতে পারেন না—ভগবত্তাহিসাবে সকল ভগবৎ-স্বরূপ সমান হইলেও ইহা যেমন স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণচন্দ্রের একটী বৈশিষ্ট্য—তদ্রূপ শ্রীকৃষ্ণ ও তাঁহার নাম অভিন্ন বলিয়া ইহাই সূচিত হইতেছে যে, অনন্ত ভগবৎ-স্বরূপের অনন্ত নাম থাকিলেও এবং সেই সমস্ত নামের মাহাত্ম্য সমান হইলেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামই প্রেম দিতে পারে, ইহাও শ্রীকৃষ্ণনামের একটী বৈশিষ্ট্য।

একটী উদাহরণের সাহায্যে সমানের মধ্যে বৈশিষ্ট্য বস্তুটী বুঝিবার চেষ্টা করা যাউক। কোনও কলেজে কয়েকজন অধ্যাপক আছেন, একজন অধ্যক্ষও আছেন, অধ্যক্ষও একজন অধ্যাপক। অধ্যাপক-হিসাবে তাঁহারা সকলেই সমান; এই সমানের মধ্যে অবশ্য অধ্যাপকদের পরস্পরের মধ্যে বৈশিষ্ট্য আছে—এক এক জন এক এক বিষয়ের অধ্যাপক, সকলে একই বিষয়ের অধ্যাপক নহেন। আবার সকলের মধ্যে অধ্যক্ষের একটী বিশেষত্ব আছে- তিনি অধ্যাপক তো বটেনই, আবার অধ্যক্ষও। অধ্যক্ষ হিসাবে কলেজের পরিচালনে এবং অধ্যাপকদের পরিচালনেও তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা আছে। তাঁহার এই বিশেষত্ব হইল সমানের মধ্যে বিশেষত্ব। তদ্রূপ, সকল ভগবন্নামের সমান মহিমা সত্ত্বেও স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণের নামের এক অপূর্ব্ব বৈশিষ্ট্য আছে। ইহাই শ্রীশ্রীহরিভক্তি-বিলাসের এবং শ্রীপাদ সনাতন গোস্বামীর সমাধান।

ভগবানের সকল নামের মধ্যে "কৃষ্ণ"-নামই যে শ্রেষ্ঠ, তাহার স্পষ্ট, প্রমাণও দৃষ্ট হয়।

"নাম্নাং মুখ্যতরং নাম কৃষ্ণাখ্যং মে পরন্তপ।
প্রায়শ্চিত্তমশেষাণাং পাপানাং মোচকং পরম্ ॥

—হ, ভ, বি, ১১।২৬৪-ধৃত-প্রভাসপুরাণ-প্রমাণ ॥

—(শ্রীভগবান্ বলিয়াছেন) হে পরন্তপ! আমার নাম-সকলের মধ্যে কৃষ্ণনামই শ্রেষ্ঠতর; ইহা অশেষ পাপের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ এবং পরমমুক্তিকর (প্রেমপাপক)।"

"সত্যং ব্রবীমি তে শম্ভো গোপনীয়মিদং মম।
মৃত্যুসঞ্জীবনীং নাম কৃষ্ণাখ্যমবধারয় ॥

—হ, ভ, বি, ১১।২৬৭-ধৃত পাদ্মবচন ॥

—(ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ মহাদেবের নিকটে বলিয়াছেন) হে শাম্ভো! আমি সত্য বলিতেছি, আমার কৃষ্ণাখ্য নাম অতি গোপনীয়; ইহাকে মৃত্যুসঞ্জীবনী বলিয়া নিশ্চিত জানিও।"

শ্রীশ্রীহরিভক্তিবিলাসে কৃষ্ণনামের শ্রেষ্ঠত্ব-বাচক আরও বহু প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে। বাহুল্য-ভয়ে এ-স্থলে সে-সকল উল্লিখিত হইল না।

১০৯। নাম-মাহাত্ম্য।

ভগবন্নামের কীর্ত্তন, স্মরণ, ও জপের অসাধারণ মহিমার কথা সমস্ত শাস্ত্রই বলিয়া

গিয়াছেন। নাম ও নামী অভিন্ন বলিয়া নামের মহিমাও নামী ভগবানের মহিমার তুল্য। নামীর ন্যায় নামও চিন্ময়, আনন্দস্বরূপ ; নামের অক্ষর-সমূহও তদ্রূপ।

ভগবন্নামে সর্ব্ববিধ পাপ, কোটিজন্মের সঞ্চিত পাপও, ক্ষয় প্রাপ্ত হইয়া থাকে। নাম সর্ব্বাভীষ্ট-পরিপূরক । নাম-সম্বন্ধে কঠোপনিষৎ বলিয়াছেন—নামের কৃপা হইলে "যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ।"

যত রকম সাধন-পন্থা প্রচলিত আছে, নামসঙ্কীর্ত্তন যে তাহাদের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ, তাহা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। ৫।৬০ ক (৫)-অনুচ্ছেদ দ্রষ্টব্য।

ক। নামসঙ্কীর্ত্তন চতুর্ব্বর্গ-প্রাপক

শ্রীমদ্‌ভাগবত বলেন—"এতন্নির্ব্বিদ্যমানানামিচ্ছতামকুতোভয়ম্। যোগিনাং নৃপ নির্ণীতং হরের্নামানুকীর্ত্তনম্॥ ২।১।১১ ॥—ফলাকাঙ্ক্ষী সকাম-ব্যক্তিদিগের অভীষ্ট-প্রাপ্তি বিষয়ে, নির্ব্বেদ-ভাবাপন্ন মুমুক্ষুদিগের মোক্ষ-প্রাপ্তি-বিষয়ে, যোগীদিগের পরমাত্মার সহিত মিলন-প্রাপ্তি-বিষয়ে—কর্ম্মি যোগি-জ্ঞানীদিগের স্ব-স্ব অভীষ্ট ফল-প্রাপ্তি-বিষয়ে—শ্রীহরির নামকীর্ত্তনই হইতেছে একমাত্র বিঘ্নাদির আশঙ্কাশূন্য নিরাপদ পন্থা।" বরাহপুরাণও বলেন—"নারায়ণাচ্যুতানন্ত বাসুদেবেতি যো নরঃ। সততং কীর্ত্তয়েদ্ ভূমি যাতি মল্লয়তাং স হি॥—হ, ভ, বি,। ১১।২০৮ ধৃত প্রমাণ॥—ভগবান্ বলিতেছেন, হে ভূমি! যে ব্যক্তি নিরন্তর হে নারায়ণ! হে অচ্যুত! হে বাসুদেব! এই সকল নাম কীর্ত্তন করেন, তিনি আমার সহিত সাযুজ্য-মুক্তি লাভ করিয়া থাকেন।" গরুড়পুরাণও বলেন—"কিং করিষ্যতি সাংখ্যেন কিং যোগৈর্নর-নায়ক। মুক্তিমিচ্ছসি রাজেন্দ্র কুরু গোবিন্দকীর্ত্তনম্॥ হ, ভ, বি,। ১১।২০৮ ধৃত প্রমাণ॥—হে রাজেন্দ্র! সাংখ্যযোগে বা অষ্টাঙ্গ-যোগে কি করিবে? যদি মুক্তি ইচ্ছা কর, তাহা হইলে গোবিন্দ-নাম কীর্ত্তন কর।" এ-সমস্ত প্রমাণ হইতে জানা গেল—কেবল মাত্র নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলে সকাম সাধক তাঁহার অভীষ্ট স্বর্গাদিলোকের সুখ-ভোগ পাইতে পারেন, যোগমার্গের সাধক তাঁহার অভীষ্ট পরমাত্মার সহিত মিলন লাভ করিতে পারেন, নির্ব্বিশেষ-ব্রহ্মানুসন্ধিৎসু তাঁহার আভীষ্ট সাযুজ্য-মুক্তিও লাভ করিতে পারেন। আবার, নাম-সঙ্কীর্ত্তনের ফলে যে সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি লাভ করিয়া সাধক মহা বৈকুণ্ঠে বা বিষ্ণুলোকেও পার্ষদত্ব লাভ করিতে পারেন, তাহাও শাস্ত্র হইতে জানা যায়। লিঙ্গপুরাণে দৃষ্ট হয়, নারদের নিকটে শ্রীশিব বলিতেছেন—"ব্রজংস্তিষ্ঠন্ স্বপন্নশ্নন্ শ্বসন্ বাক্যপ্রপূরণে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনং বিষ্ণোর্হেলয়া কলিমর্দ্দনম্। কৃত্বা সরূপতাং যাতি ভক্তিযুক্তঃ পরং ব্রজেৎ॥ হ, ভ, বি, ১১।২১৯ ধৃত প্রমাণ॥—গমনে, উপবেশনে বা দণ্ডায়মান অবস্থায়, শয়নে, ভোজনে, শ্বাস-প্রক্ষেপ-কালে, কি বাক্য-পূরণে, কি হেলায়ও যদি কেহ কলিমর্দ্দন হরিনাম গ্রহণ করেন, তাহা হইলে তিনি হরির সরূপতা (ব্রহ্মত্ব বা মুক্তি) লাভ করেন ; আর, ভক্তিযুক্ত হইয়া যিনি নামকীর্ত্তন করেন, তিনি বৈকুণ্ঠ-লোক প্রাপ্ত হইয়া পরমেশ্বরকে লাভ করিতে পারেন।" নারদীয়পুরাণে দৃষ্ট হয়, ব্রহ্মা বলিতেছেন—"ব্রাহ্মণঃ শ্বপচীং ভুঞ্জন্ বিশেষেণ রজস্বলাম্। অশ্নাতি সুরয়া পক্কং মরণে হরিমুচ্চরন্॥

অভক্ষ্যাগম্যয়োর্জ্জাতং বিহায়াঘৌঘসঞ্চয়ম্। প্রযাতি বিষ্ণুসালোক্যং বিমুক্তো ভববন্ধনৈঃ॥ হ, ভ, বি,। ১১।২২০ ধৃত প্রমাণ॥—ব্রাহ্মণও যদি রজস্বলা শ্বপচীতে গমন করেন, কিম্বা যদি সুরাদ্বারা পাচিত অন্নও ভোজন করেন, তথাপি যদি তিনি মৃত্যুকালে হরিনাম উচ্চারণ করেন, তাহা হইলেই অগম্যা-গমন ও অভক্ষ্য-ভক্ষণ জনিত পাপ হইতে এবং সংসার-বন্ধন হইতে মুক্ত হইয়া বিষ্ণুসালোক্য প্রাপ্ত হইয়া থাকেন।" বৃহন্নারদীয়-পুরাণে দৃষ্ট হয়, বলিমহারাজ শুক্রাচার্য্যকে বলিতেছেন—"জিহ্বাগ্রে বর্ত্ততে যস্য হরিরিত্যক্ষরদ্বয়ম্। বিষ্ণুলোকমবাপ্নোতি পুনরাবৃত্তিদুর্ল্লভম্॥ হ, ভ, বি, ১১।২২১ ধৃত প্রমাণ।—যাঁহার জিহ্বাগ্রে হরি এই অক্ষর দুইটী বর্ত্তমান, তাঁহার বিষ্ণুলোকে গতি হয় এবং তাঁহাকে আর সংসারে আসিতে হয় না।"

খ। নামের ভগবদ্‌বশীকরণী শক্তি, প্রেম-প্রাপকত্ব

এইরূপে দেখা গেল—সকাম সাধকের ইহকালের বা পরকালের সুখ-ভোগাদি হইতে আরম্ভ করিয়া পঞ্চবিধা মুক্তি পর্য্যন্ত, কেবল মাত্র নামকীর্ত্তনের ফলেই পাওয়া যাইতে পারে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তি হইল ঐশ্বর্য্য-জ্ঞানমিশ্র ভক্তিমার্গের ফল। কিন্তু এ সমস্তই নাম-সঙ্কীর্ত্তনের একমাত্র ফলও নহে, মুখ্য ফলও নহে। নাম-সঙ্কীর্ত্তনের মুখ্য ফল বা পরম ফল হইতেছে—প্রেম, ভগবদ্‌বিষয়ক প্রেম, যাহার ফলে ভগবান্ অত্যন্ত প্রীতি লাভ করেন এবং নামকীর্ত্তন-কারীর বশীভূত হইয়া পড়েন।

পূর্ব্বোল্লিখিত স্বর্গাদি-সুখভোগ বা পঞ্চবিধা মুক্তিও ভগবান্‌ই দিয়া থাকেন; নামকীর্ত্তনের ফলে তিনি প্রীতি লাভ করেন এবং প্রীতি লাভ করিয়াই নাম-কীর্ত্তনকারীকে তাঁহার অভীষ্ট বস্তু দিয়া থাকেন—"যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্।"-এই গীতাবাক্যানুসারে। কিন্তু যে প্রীতির বশে তিনি এ-সমস্ত ফল দিয়া থাকেন, তাহা—নামের মুখ্য ফল যে ভগবৎ-প্রেম, সেই প্রেম হইতে ভগবানের চিত্তে উদ্বুদ্ধ প্রীতি নহে। ফলকামী বা সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তিকামী—ইঁহাদের প্রত্যেকেই নিজের জন্য কিছু চাহেন—কেহ চাহেন স্বর্গাদি-সুখ, কেহ চাহেন মায়াবন্ধন হইতে মুক্তি এবং তাহার পরে সাযুজ্য বা সালোক্যাদি। এ-সকল দিলেই ভগবান্ যেন সাধকের নিকট হইতে "ছুটি"-পাইয়া যায়েন; দেনা-পাওনা যেন কতকটা শোধ-বাদ হইয়া যায়। এই ভাবে কেবল ভুক্তি-মুক্তি যাঁহারা চাহেন, ভগবান্ তাঁহাদিগকে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া থাকেন; এবং ভুক্তি-মুক্তি পাইয়াই সাধক নিজেকে পরম-কৃতার্থ মনে করেন, মনে করেন—ভগবানের নিকটে যাহা চাহিয়াছি, তাহাই পাইয়াছি; আর আমার প্রার্থনার কিছু নাই। এইরূপই যাঁহাদের মনের অবস্থা, ভগবান্ তাঁহাদিগকে নামের মুখ্য ফল যে প্রেম, তাহা দেন না। "কৃষ্ণ যদি ছুটে ভক্তে ভুক্তি-মুক্তি দিয়া। কভু প্রেমভক্তি না দেয়, রাখেন লুকাইয়া॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৮।১৬॥" প্রেম-শব্দের অর্থই হইল—শ্রীকৃষ্ণ-সুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনা। সুতরাং যাঁহারা এই প্রেম চাহেন, তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছুই চাহেন না, এমন কি, সংসার-বন্ধন হইতে মুক্তিও তাঁহারা চাহেন না। ভগবান্ যদি তাঁহাদিগকে পঞ্চবিধা মুক্তিও দিতে চাহেন, তাহাও তাঁহারা গ্রহণ করেন না; যেহেতু, তাঁহারা চাহেন—একমাত্র

শ্রীকৃষ্ণের সেবা, শ্রীকৃষ্ণের সুখের জন্যই শ্রীকৃষ্ণের সেবা ; তাহার বিনিময়েও তাঁহারা নিজেদের জন্য কিছু চাহেন না। তাই ভগবান্ বলিয়াছেন—"সালোক্য-সার্ষ্টি-সারূপ্যসামীপ্যৈকত্বমপ্যুত। দীয়মানং ন গৃহ্ণন্তি বিনা মৎসেবনং জনাঃ॥ শ্রীভা, ৩।২৯।১৩॥" এইরূপই যাঁহাদের মনের অবস্থা, তাঁহাদের নিজের জন্য দেওয়ার কিছুই ভগবানের পক্ষে থাকে না ; সুতরাং ভগবানের পক্ষে তাঁহার "যে যথা মাং প্রপদ্যন্তে তাংস্তথৈব ভজাম্যহম্॥"-বাক্যই তাঁহাদের সম্বন্ধে নিরর্থক হইয়া পড়ে। তাঁহাদের নিজেদের জন্য কিছু দেওয়া তো সম্ভবই নয় ; আবার, তাঁহারা যাহা চাহেন, তাহা দিতে গেলে ভগবানের নিজেরই কিছু পাওয়া হইয়া যায়—তাঁহাদের কৃত স্বীয় সুখ-হেতুক সেবন। এইরূপ সাধকদের সাধনে তুষ্ট হইয়া ভগবান্ যদি তাঁহাদের সাক্ষাতে উপনীত হইয়া বলেন—"কি চাও, বল; যাহা চাও, তাহাই দিব। সালোক্যাদি মুক্তি চাহিলে তাহাও দিব", তাহা হইলে ভক্ত সাধকগণের প্রত্যেকেই বলিবেন—"প্রভু, আমি সালোক্যাদি কোনওরূপ মুক্তি চাইনা। আমি চাই তোমার চরণ; কৃপা করিয়া চরণ-সেবা দিলেই আমি কৃতার্থ হইব।" পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি অনুসারে সত্যবাক্, সত্যসঙ্কল্প ভগবান্‌কে "তথাস্তু" না বলিয়া উপায় নাই ; ভক্তকে স্বীয় চরণ দান করিতেই হয়। ইহাতেই তিনি নিজে আট্‌কা পড়িয়া গেলেন, সেই সাধক-ভক্তের নিকট হইতে তাঁহার আর চলিয়া যাওয়ার—ছুটি পাওয়ার—উপায় থাকে না। যাঁর চরণই আট্‌কা পড়িয়া গেল, তিনি আর চলিয়া যাইবেন কিরূপে ? "ভক্তিবশঃ পুরুষঃ।" সেই সাধকদের প্রেমবশ্যতা অঙ্গীকার করিয়া তাঁহাদের হৃদয়েই পরমানন্দে অবস্থান করিয়া থাকেন এবং তাঁহাদের নিকটে ভগবানের বশ্যতা ক্রমশঃ বর্দ্ধিতই হইতে থাকে, তিনি আর তাঁহাদের নিকট হইতে "ছুটি" পাইতে পারেন না, তাঁহাদের প্রীতির বশীভূত হইয়া তাঁহাদের প্রীতিরজ্জুদ্বারা তাঁহাদের চিত্তে চিরকালের জন্যই তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকেন এবং এইরূপ আবদ্ধ হইয়া থাকিতেই তিনিও পরম আনন্দ অনুভব করিয়া থাকেন। এইরূপই প্রেমের **ভগবৎ-বশীকরণী শক্তি**। সর্ব্বেশ্বর, সর্ব্বশক্তিমান্, পরম-স্বতন্ত্র হইয়াও ভগবান্ যে প্রেমের নিকটে এই ভাবে বশ্যতা স্বীকার করেন, সেই প্রেম যে সাধন-ভজনের সর্ব্ববিধ ফলের মধ্যে মুখ্যতম ফল, তাহা অনায়াসেই বুঝা যায়। যাঁহারা ভুক্তি-মুক্তি না চাহিয়া কেবল মাত্র এই জাতীয় প্রেম লাভের বাসনা হৃদয়ে পোষণ করিয়া নাম-সঙ্কীর্ত্তন করেন, সঙ্কীর্ত্তনের ফলে তাঁহারা এতাদৃশ শ্রীকৃষ্ণ-বশীকরণী শক্তিসম্পন্ন প্রেমই লাভ করিতে পারেন। ইহাই নামের মুখ্য ফল।

আদিপুরাণে দেখা যায়—শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনের নিকটে বলিতেছেন, "গীত্বা চ মম নামানি নর্ত্তয়েন্মমসন্নিধৌ। ইদং ব্রবীমি তে সত্যং ক্রীতোঽহং তেন চার্জ্জুন॥ গীত্বা চ মম নামানি রুদন্তি মম সন্নিধৌ। তেষামহং পরিক্রীতো নান্যক্রীতো জনার্দ্দনঃ॥ হ, ভ, বি, ১১।২৩, ধৃত প্রমাণ।—হে অর্জ্জুন ! যাঁহারা আমার নাম গান করিয়া আমার সাক্ষাতে নৃত্য করিয়া থাকেন, আমি সত্য করিয়া বলিতেছি, আমি তাঁহাদের দ্বারা ক্রীত হইয়া থাকি। যাঁহারা আমার নাম গান করিয়া আমার সমক্ষে রোদন করিয়া থাকেন, জনার্দ্দন আমি সর্ব্বতোভাবে তাঁহাদেরই ক্রীত—বশীভূত হইয়া থাকি। অপর কাহারও

ক্রীত হই না।” আবার মহাভারত হইতে জানা যায়—বিষম বিপদে পতিত হইয়া—দ্রৌপদী—“গোবিন্দ, গোবিন্দ” বলিয়া উচ্চস্বরে আর্ত্তকণ্ঠে শ্রীকৃষ্ণকে ডাকিতেছেন। শ্রীকৃষ্ণ তখন দ্রৌপদী হইতে বহুদূরে—দ্বারকায় অবস্থিত; তথাপি কৃষ্ণার আকুল প্রাণের কাতর আহ্বান তাঁহার হৃদয়ে এক তীব্র আলোড়নের সৃষ্টি করিয়াছে, শ্রীকৃষ্ণকে বিহ্বল করিয়া তুলিয়াছে। এই বিহ্বলতার ফলে শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—“ঋণমেতৎ প্রবৃদ্ধং মে হৃদয়ান্নাপসর্পতি। যদ্ গোবিন্দেতি চুক্রোশ কৃষ্ণা মাং দূরবাসিনম্॥ হ, ভ, বি, ১১।২৩১ ধৃত মহাভারত-বচন;—কৃষ্ণা যে দূরবাসী আমাকে আর্ত্তকণ্ঠে “গোবিন্দ-গোবিন্দ” বলিয়া উচ্চস্বরে ডাকিতেছেন, তাঁহার এই গোবিন্দ-ডাকই আমর প্রবৃদ্ধ—ক্রমশঃ বর্দ্ধনশীল—ঋণ হইয়া পড়িয়াছে, ইহা আমার হৃদয় হইতে অপসৃত হইতেছে না।” তাৎপর্য্য এই যে—আর্ত্তকণ্ঠে আমার ‘গোবিন্দ’ নাম উচ্চারণ করিয়া কৃষ্ণা আমাকে চিরকালের জন্য অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ করিয়া রাখিয়াছেন; তাঁহার নিকটে আমার প্রেম-বশ্যতা ক্রমশঃই পরিবর্দ্ধিত হইয়া চলিতেছে।”

উক্ত আলোচনায় পুরাণেতিহাসের যে সকল প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে, তাহা শ্রুতি-বাক্যেরই প্রতিধ্বনি। ভগবন্নামের ঐরূপ মাহাত্ম্যের কথা শ্রুতিও বলেন। তাহাই দেখান হইতেছে।

কঠোপনিষৎ বলেন—“এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ ১।২।১৬॥—এই প্রণবের (১) (নামের) অক্ষরকে জানিলেই যিনি যাহা ইচ্ছা করেন, তিনি তাহা পাইতে পারেন।” তাৎপর্য্য হইল এই—কি ইহকালের সুখ, কি পরকালের স্বর্গাদিসুখ, কি সাযুজ্যাদি পঞ্চবিধা মুক্তির কোনও এক রকমের মুক্তি, কি প্রেম, এ-সমস্তের মধ্যে যিনি যাহা পাইতে ইচ্ছা করেন, নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে তিনি তাহাই পাইতে পারেন। উক্ত শ্রুতিবাক্যের অব্যবহিত পরবর্ত্তী বাক্যে কঠোপনিষৎ নামাশ্রয়ে প্রেম-প্রাপ্তির কথা এবং তদ্দ্বারা জীবের পরম-পুরুষার্থলাভের কথাও বলিয়া গিয়াছেন। “এতদালম্বনং

---

(১) শ্রুতি বলেন, প্রণবই ব্রহ্ম। “ওম্ ইতি ব্রহ্ম॥ তৈত্তিরীয়॥ ১।৮॥” সর্ব্বোপনিষৎসার শ্রীমদ্ভগবদ্ গীতা বলেন—শ্রীকৃষ্ণই প্রণব, শ্রীকৃষ্ণই পরব্রহ্ম॥ “পিতাহমস্য জগতো মাতা ধাতা পিতামহঃ। বেদ্যং পবিত্রমোঙ্কার ঋক্ সাম যজুরেব চ॥ ৯।১৭॥ পরং ব্রহ্ম পরং ধাম পবিত্রং পরমং ভবান্। পুরুষং শাশ্বতং দিব্যমাদিদেবমজং বিভুম্॥ ১০।১২॥” এই প্রণব-স্বরূপ পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণ অনাদিকাল হইতে অনন্ত-স্বরূপ-রূপে আত্মপ্রকটিত অবস্থায় আছেন। “একোঽপি সন্ যো বহুধা বিভাতি॥ গোপাল-তাপনীশ্রুতি॥” গুণ-কর্ম্মানুসারে পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণেরও বহু নাম আছে এবং তাঁহার অনন্ত-স্বরূপ-সমূহেরও বহু নাম আছে। তাই গর্গাচার্য্য নন্দমহারাজের নিকটে বলিয়াছেন—“বহূনি সন্তি নামানি রূপাণি চ সুতস্য তে। গুণকর্ম্মানুরূপাণি তান্যহং বেদ নো জনাঃ॥ শ্রীভা, ১০।৮।১৫॥” প্রণব যেমন তাঁহার স্বরূপ, প্রণব আবার তাঁহার বাচকও—নামও। পতঞ্জলই একথা বলিয়াছেন—“ঈশ্বর-প্রণিপানাদ্ বা। তস্য বাচকঃ প্রণবঃ॥ সমাধিপাদ। ২৭॥” প্রণব-স্বরূপ শ্রীকৃষ্ণের বিভিন্ন প্রকাশ যেমন বিভিন্ন ভগবৎ-স্বরূপ, তদ্রূপ তাঁহার বাচক-প্রণবের বিভিন্ন প্রকাশও হইতেছে তাঁহার বিভিন্ন নাম। অনন্ত-ভগবৎ-স্বরূপ যেমন এক শ্রীকৃষ্ণেতেই অবস্থিত (একই বিগ্রহে করে নানাকার রূপ; বহুমূর্ত্ত্যেকমূর্ত্তিকম্), তদ্রূপ তাঁহার এবং তাঁহার অনন্ত স্বরূপের নামও তাঁহার বাচক প্রণবের মধ্যে অবস্থিত। সুতরাং তাঁহার বাচক-প্রণবের উল্লেখে তাঁহার অনন্ত নামই উল্লিখিত হইয়া থাকে।

শ্রেষ্ঠমেতদালম্বনং পরম্। এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে॥ ১।২।১৭ ॥—এই প্রণব বা নামই হইতেছে শ্রেষ্ঠ এবং পরম অবলম্বনীয়। এই অবলম্বনকে জানিলে জীব ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হইতে পারে।" কিন্তু উপরে উদ্ধৃত শ্রুতিবাক্যে উল্লিখিত ব্রহ্মলোকই বা কি এবং ব্রহ্মলোকে মহীয়ান্ হওয়ার তাৎপর্য্যই বা কি ?

কঠোপনিষৎ পরব্রহ্মের কথাই বলিয়াছেন। "এতদ্ধ্যেবাক্ষরং ব্রহ্ম এতদ্ধ্যেবাক্ষরং পরম্। এতদ্ধ্যেবাক্ষরং জ্ঞাত্বা যো যদিচ্ছতি তস্য তৎ॥ কঠ ১।২।১৬॥" সুতরাং ব্রহ্মলোক বলিতেও এস্থলে সেই পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লোক বা ধামের—ব্রজধামের—কথাই বলা হইয়াছে—ঋগ্‌বেদের "যত্র গাবো ভূরিশৃঙ্গাঃ"-বাক্যেও যে ব্রজধামের কথাই বলা হইয়াছে।

নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব পরব্রহ্ম শ্রীকৃষ্ণের লীলাস্থান ব্রজধামে মহীয়ান্ হইতে পারে। কিরূপে ?

কোনও বস্তুর স্বরূপগত-ধর্ম্মের সম্যক্ বিকাশেই সেই বস্তু সম্যক্‌রূপে মহীয়ান্ হইতে পারে। একটা দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে যে অগ্নি-শিখা পাওয়া যায়, তাহার দাহিকা-শক্তি হইল তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম। ঐ শিখাটী দ্বারা একখণ্ড ক্ষুদ্র কাগজও পোড়ান যায়, আবার গ্রামকে গ্রামও ভস্মীভূত করিয়া দেওয়া যায়। ক্ষুদ্র কাগজ-খণ্ডকে দগ্ধ করা অপেক্ষা গ্রামকে গ্রাম জ্বালাইয়া দেওয়াতেই দিয়াশলাইয়ের কাঠি হইতে জাত অগ্নিশিখার স্বরূপগত ধর্ম্মের বিকাশ বেশী এবং তাহাতেই অগ্নিশিখা বেশী মহীয়সী হইয়া থাকে। জীব স্বরূপে নিত্য কৃষ্ণদাস বলিয়া শ্রীকৃষ্ণসেবাই তাহার স্বরূপগত ধর্ম্ম এবং শ্রীকৃষ্ণসেবার বাসনাই হইল তাহার স্বরূপগত-বাসনা। তাহার এই স্বরূপগত-বাসনা যখন অপ্রতিহত ভাবে সর্ব্বাতিশায়ী বিকাশ লাভ করে এবং সেই সর্ব্বাতিশায়িরূপে বিকাশ-প্রাপ্ত শ্রীকৃষ্ণসেবা-বাসনা যখন সেবারূপ কার্য্যে সম্যক্‌রূপে রূপায়িত হয়, তখনই বলা যায়—সেই জীব মহীয়ান্ হইয়াছে। সাযুজ্যমুক্তিতে জীব-ব্রহ্মের ঐক্যজ্ঞান থাকে বলিয়া সেব্য-সেবকত্বের ভাবই স্ফুরিত হয় না, সেবা-বাসনা-স্ফুরণ তো দূরে। সালোক্যাদি চতুর্ব্বিধা মুক্তিতে সেব্য-সেবক-ভাব স্ফুরিত হয় বটে ; কিন্তু ভক্তের চিত্তে ঐশ্বর্য্যজ্ঞান প্রাধান্য লাভ করে বলিয়া সেবা-বাসনা সঙ্কুচিত হইয়া যায়, সম্যক্ বিকাশ লাভ করিতে পারে না। ব্রজধামে মমত্ববুদ্ধির আধিক্যবশতঃ শ্রীকৃষ্ণের ঐশ্বর্য্যের জ্ঞান প্রচ্ছন্ন হইয়া থাকে, পরিকর ভক্তগণ ব্রজে শ্রীকৃষ্ণকে নিজেদের আপনজন বলিয়া মনে করেন। ঐশ্বর্য্যজ্ঞান তাঁহাদের সেবাবাসনাকে বিকাশের পথে বাধা দিতে পারে না। নামের কৃপায় সাধক এই ধামে পরিকরত্ব লাভ করিতে পারেন এবং তখন তাঁহার সেবা-বাসনাও সম্যক্‌রূপে বিকাশ লাভ করিতে পারে এবং সেই বাসনাও সেবায় পর্য্যবসিত হইতে পারে। তখনই সেই জীব সম্যক্‌রূপে মহীয়ান্ হইতে পারেন। শ্রীকৃষ্ণসুখৈক-তাৎপর্য্যময়ী সেবার বাসনার নামই প্রেম। সুতরাং নামের আশ্রয় গ্রহণ করিলে জীব যে ব্রজেন্দ্র-নন্দন শ্রীকৃষ্ণবিষয়ক প্রেমলাভ করিয়া এবং শ্রীকৃষ্ণের প্রেমসেবা লাভ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারেন, কঠোপনিষদের "এতদালম্বনং জ্ঞাত্বা ব্রহ্মলোকে মহীয়তে"—বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।

গ। বেদে নামের মাহাত্ম্য

নামের মাহাত্ম্যের কথা ঋগ্‌বেদও বলিয়া গিয়াছেন। "ওঁ আহস্য জানন্তো নাম চিদ্‌বিবক্তন্ মহস্তে বিষ্ণো সুমতিং ভজামহে॥ ওঁ তৎ সদিত্যাদি। ১।১৫৬।৩॥—হে বিষ্ণো! তে (তব) নাম চিৎ (চিৎস্বরূপম্) অতএব মহঃ (স্বপ্রকাশরূপম্) তস্মাৎ অস্য (নাম্নঃ) আ (ঈষদপি) জানন্তঃ (ন তু সম্যক্ উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদিপুরস্কারেণ, তথাপি) বিবক্তন্ (ব্রুবাণাঃ, কেবলং তদক্ষরাভ্যাসমাত্রং কুর্ব্বাণাঃ) সুমতিং (তদ্বিষয়াং বিদ্যাম্) ভজামহে (প্রাপ্নুমঃ) যতঃ ওঁ তৎ (প্রণবব্যঞ্জিতং বস্তু) সৎ (স্বতঃসিদ্ধম্) ইতি। শ্রীজীব।" তাৎপর্য্য এই:—হে বিষ্ণো! তোমার নাম চিৎস্বরূপ, অতএব স্বপ্রকাশ। সুতরাং এই নামের উচ্চারণ-মাহাত্ম্যাদি সম্যক্‌রূপে না জানিয়াও, সামান্য কিছুমাত্র জানিয়াও যদি আমরা কেবল সেই অক্ষর মাত্র উচ্চারণ করিয়া যাই, তাহারই ফলে আমরা তোমাবিষয়িনী বিদ্যা (ভক্তি) লাভ করিতে পারিব। যেহেতু, ইহা প্রণবব্যঞ্জিত বস্তু, সুতরাং স্বতঃসিদ্ধ।

"ওঁ তৎ সৎ। ওঁ পদং দেবস্য নমসা ব্যন্তঃ শ্রবস্যবশ্রব আন্নমৃক্তম্
নামানি চিদ্দধিরে যজ্ঞিয়ানি ভদ্রায়ান্তে রণয়ন্তঃ সংদৃষ্টৌ।

—হ, ভ, বি, ১১।২৭৫-ধৃত বেদপ্রমাণ॥

—হে পরমপূজ্য! আপনার পদারবিন্দে আমি বারংবার প্রণাম করি; কারণ, ঐ শ্রীচরণমাহাত্ম্য শ্রবণ করিলে ভক্তগণ যশঃ ও মোক্ষের অধিকারী হইতে পারে; অন্য কথা কি, যাঁহারা ঐ শ্রীপাদপদ্ম নির্ব্বাচনের জন্য বাদ-বিসংবাদে প্রবৃত্ত হন এবং পরস্পর কীর্ত্তনে উহার অবধারণ করেন, তাঁহাদের অন্তরে আসক্তির বিকাশ ঘটিলে, তাঁহারা সাক্ষাৎকারের জন্য চৈতন্যস্বরূপ আপনারই নামাশ্রয় করিয়া থাকেন।—শ্রীপাদ সনাতনগোস্বামীর টীকানুযায়ী পণ্ডিতপ্রবর শ্রীশ্যামাচরণকবিরত্নকৃত অনুবাদ।"

নবম অধ্যায়

সাধন-ভক্তির অন্তরায়

১১০। সাধারণ আলোচনা

দেখিতে পাওয়া যায়, সাধকদের মধ্যে ভজনে কেহ কেহ প্রচুর আনন্দ পায়েন, ভজনে তাঁহাদের আগ্রহও অত্যধিক। আবার, কেহ কেহ মোটেই আনন্দ পায়েন না, সাধন-ভজনে তাঁহাদের আগ্রহও নাই ; নিম্ব-নিসিন্দা-পানের মতনই প্রীতিহীন ভাবেই তাঁহারা গুরুর উপদেশ পালন করিয়া যায়েন। কোনও ফল পাইতেছেন না দেখিয়া কেহ কেহ বা আবার সাধন-ভজন পরিত্যাগও করেন।

সাধন-ভজন যে কোনও ফলই প্রসব করেনা--যাঁহারা ভজনে আনন্দ পায়েন, আগ্রহ অনুভব করেন, তাঁহাদের দৃষ্টান্ত দেখিলে—তাহা স্বীকার করা যায় না। সূর্য্যকিরণ বরফের উপর পতিত হইলে বরফ উত্তপ্ত হয় না বলিয়াই যে সূর্য্যকিরণের কোনও তাপ নাই, তাহা বলা যায়না ; কেননা, বরফের উপরে যেই সূর্য্যকিরণ পতিত হয়, সেই সূর্য্যকিরণই ধাতব-পাত্রে পতিত হইয়া সেই পাত্রকে উত্তপ্ত করিয়া তোলে। সূর্য্যকিরণের উত্তাপদায়িনী শক্তি নিশ্চয়ই আছে ; ধাতব-পাত্রের তাহা গ্রহণ করিবার সামর্থ্য আছে, বরফের নাই—ইহাই স্বীকার করিতে হইবে। তদ্রূপ, সাধন-ভজনের প্রভাব আছে ; কাহারও চিত্তে তাহা গৃহীত হয়, আবার কাহারও চিত্তে গৃহীত হয় না। যাঁহাদের চিত্ত তাহা গ্রহণ করিতে পারে না, তাঁহারাই আনন্দ পায়েন না, সাধন-ভজনে তাঁহাদের উৎসাহও থাকে না। ইহাতে পরিষ্কার ভাবেই বুঝা যায়—তাঁহাদের চিত্তের অবস্থা সাধন-ভজনের প্রতিকূল, সাধন-ভজনের অন্তরায়।

কিন্তু তাঁহাদের চিত্তের এইরূপ প্রতিকূল অবস্থা কেন হয় ?

শ্রীপাদ জীব গোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন, যাঁহাদের চিত্ত বিষয়াসক্তি প্রভৃতিদ্বারা দূষিত, যাঁহারা মিথ্যাভাষণ, মিথ্যা আচরণাদি ছাড়িতে পারেন না, তাঁহাদের চিত্তের অবস্থা সাধন-ভজনের অনুকূল নহে, তাঁহারা সাধন-ভজনে আনন্দ বা উৎসাহ পায়েন না।

"রাগাদিদূষিতং চিত্তং নাস্পদং মধুসূদনে। বধ্নাতি ন রতিং হংসঃ কদাচিৎ কর্দ্দমাম্বুনি ॥

ন যোগ্যা কেশবং স্তোতুং বাগ্ দুষ্টা অনৃতাদিনা। তমসো নাশনায়ালং নেন্দোর্লেখা ঘনাবৃতা ॥

—ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥ ১৫৩-ধৃত-বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-প্রমাণ ॥

—কর্দ্দমযুক্ত জল যেমন হংসের প্রীতি আকর্ষণ করিতে পারে না, তদ্রূপ রাগাদির (ইন্দ্রিয়-ভোগ্যবস্তুতে

আসক্তি-প্রভৃতির) দ্বারা দূষিত চিত্তও ভগবান্ মধুসূদনে স্থিতি লাভ করে না। (তাৎপর্য্য এই—ভগবানে চিত্ত স্থির রাখার একমাত্র হেতু হইতেছে ভগবানের করুণা বা প্রীতি। বিষয়মলিন চিত্ত ভগবানের করুণাকে বা প্রীতিকে উদ্বুদ্ধ করিতে পারেনা ; এজন্য সেই চিত্ত ভগবানে স্থিতি লাভ করিতে পারে না)। মেঘাচ্ছন্ন চন্দ্রের কিরণ যেমন অন্ধকারকে দূরীভূত করিতে পারে না, তদ্রূপ মিথ্যাদিদ্বারা দূষিত বাগিন্দ্রিয়ও ভগবান্ কেশবের স্তব করার পক্ষে যোগ্য নহে (তাৎপর্য্য এই—ভগবানের স্তব করা হয়, ভগবানের করুণা-রশ্মিকে চিত্তে স্পর্শ করাইবার জন্য। কিন্তু চন্দ্র এবং অন্ধকারের মধ্যে যদি মেঘ থাকে, তাহাহইলে সেই মেঘকে ভেদ করিয়া চন্দ্রের কিরণ যেমন অন্ধকারকে স্পর্শ করিতে পারে না—সুতরাং অন্ধকারকে বিনষ্টও করিতে পারেনা, কিরণ-স্পর্শের অন্তরায়রূপে মেঘ যেমন উভয়ের মধ্যে অবস্থান করে, তদ্রূপ মিথ্যাদিজনিত দোষরূপ অন্তরায় ভগবানের করুণারশ্মি এবং বাগিন্দ্রিয়ের মধ্যে অবস্থান করে বলিয়া করুণারশ্মি বাগিন্দ্রিয়কে স্পর্শ করিতে পারেনা ; এজন্য বাগিন্দ্রিয়ও চিত্তের সহিত করুণারশ্মির স্পর্শ-সংঘটনের উপযোগী স্তব উচ্চারণ করিতে পারে না)।”

ইহার পরে শ্রীজীবপাদ লিখিয়াছেন—“সিদ্ধানামাবৃত্তিস্তু প্রতিপদমেব সুখবিশেষোদয়ার্থা ; অসিদ্ধানামাবৃত্তিনিয়মঃ ফলপর্য্যাপ্তিপর্য্যন্তঃ, তদন্তরায়েঽপরাধাবস্থিতিবিতর্কাৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥ ১৫৩॥”

এই উক্তির তাৎপর্য্য এই। “আবৃত্তিরসকৃদুপদেশাৎ ॥ ৪।১।১॥”-এই ব্রহ্মসূত্রে বলা হইয়াছে—“পুনঃ পুনঃ ভজনাঙ্গের অনুশালন করিবে, ইহাই বেদের উপদেশ।” ভজনাঙ্গের অনুশালনের উদ্দেশ্য হইতেছে চিত্তের মলিনতা দূর করা ; চিত্তের মলিনতা দূরীভূত হইলেই তত্ত্বজ্ঞান লাভ হইতে পারে, বিশুদ্ধ চিত্তে ভগবানের স্ফূর্ত্তি হইতে পারে, প্রেমসেবাকামীদের চিত্তে প্রেমেরও আবির্ভাব হইতে পারে। “নিত্যসিদ্ধ কৃষ্ণপ্রেম সাধ্য কভু নয়। শ্রবণাদিশুদ্ধ চিত্তে করয়ে উদয় ॥ শ্রীচৈ, চ, ২।২২।৫৭॥” একবার মাত্র অনুশীলনেই (যেমন একবার মাত্র কৃষ্ণনামের উচ্চারণেই) যদি কাহারও তত্ত্বজ্ঞান বা ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি লাভ হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার চিত্ত নির্ম্মল। যাঁহার চিত্ত তাদৃশ নির্ম্মল নহে, পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের ফলে তাঁহার চিত্তের নির্ম্মলতা সিদ্ধ হইতে পারে। তখন তাঁহাকে সিদ্ধ (অর্থাৎ ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেল্প ফল প্রাপ্ত) বলা যায়। এতাদৃশ সিদ্ধ-সাধকগণও পুনঃ পুনঃ ভজনাঙ্গের অনুশীলন করিয়া থাকেন ; কিন্তু এই অনুশীলনের উদ্দেশ্য চিত্তশুদ্ধি নহে ; কেননা, তাঁহাদের চিত্তশুদ্ধি পূর্ব্বেই হইয়া গিয়াছে। তাঁহাদের পক্ষে পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে, এই অনুশীলনে প্রতিপদেই তাঁহারা সুখবিশেষ— ভগবানের স্ফূর্ত্তিবশতঃ সুখবিশেষ—লাভ করেন ; এজন্য তাঁহারা অনুশালন ত্যাগ করিতে পারেন না। কিন্তু যাঁহারা তাদৃশ সিদ্ধি লাভ করেন নাই, তাঁহাদের জন্যই বিশেষ করিয়া পুনঃ পুনঃ অনুশীলনের নিয়ম বিহিত হইয়াছে ; এইরূপ অনুশীলনের ফলেই তাঁহাদের চিত্ত শুদ্ধ হইতে পারে, ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি লাভ হইতে পারে। সুতরাং তাঁহাদের পক্ষে পুনঃ পুনঃ অনুশীলন হইতেছে বাধ্যতামূলক। কেননা, পুনঃপুনঃ অনুশীলনেও যদি সুখোদয় না হয়, তাহা হইলেই বুঝিতে হইবে—সুখোদয়ের কোনও অন্তরায় আছে ; সেই অন্তরায় হইতেছে—অপরাধ। এই

অপরাধরূপ অন্তরায় যতক্ষণ থাকিবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত চিত্ত থাকিবে অশুদ্ধ ; অশুদ্ধচিত্তে ভগবৎ-স্ফূর্ত্তি হইতে পারেনা, সুতরাং ভগবৎ-স্ফূর্ত্তিজনিত সুখেরও উদয় হইতে পারে না।

'কৃষ্ণ' বলিলে অপরাধীর না হয় বিকার॥ শ্রীচৈ, চ, ১।৮।২১॥
এক কৃষ্ণনামে করে সর্ব্বপাপ-নাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ কম্প পুলকাদি গদ্গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণনাম যদি লয় বহুবার। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণনাম-বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥

শ্রীচৈ, চ, ১।৮।২২-২৬॥

পূর্ব্বে বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর-প্রমাণে বিষয়াসক্তি-প্রভৃতিরূপ এবং মিথ্যাদিরূপ যে সকল অন্তরায়ের কথা বলা হইয়াছে, এক্ষণে বুঝা গেল, সে-সমস্ত অন্তরায়ের হেতুও হইতেছে—অপরাধ। এই অপরাধই হইতেছে ভক্তির অন্তরায়, সাধনভক্তির বিঘ্ন।

এই ভক্তিবাধক অপরাধ সাধকের বর্ত্তমান জন্মেরও হইতে পারে, পূর্ব্ব পূর্ব্ব জন্মেরও হইতে পারে। অপরাধ নানা রূপে আত্মপ্রকট করে ; যথা—কৌটিল্য, অশ্রদ্ধা, ভজনাদি-বিষয়ে অভিমান এবং এই জাতীয় অন্যান্য দোষ। মহৎসঙ্গাদিরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুশীলনের ফলেও যখন উল্লিখিত কৌটিল্যাদি দোষের দূরীকরণ দুষ্কর হইয়া পড়ে, তখন বুঝিতে হইবে, প্রাক্তন এবং বর্ত্তমান অপরাধ চিত্তে বিদ্যমান রহিয়াছে এবং কৌটিল্যাদিও সেই অপরাধেরই পরিচায়ক। "যতঃ কৌটিল্যম্, অশ্রদ্ধা, ভগবন্নিষ্ঠা-চ্যাবক-বস্ত্বন্তরাভিনিবেশঃ, ভক্তিশৈথিল্যম্, স্বভক্ত্যাদিকৃতমানিত্বমিত্যেবমাদীনি মহৎসঙ্গাদি-লক্ষণ-ভক্ত্যাপি নিবর্ত্তয়িতুং দুষ্করাণি চেত্তর্হি তস্যাপরাধস্যৈব কার্য্যাণি তান্যেব চ প্রাচীনস্য তস্য চ লিঙ্গানি॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ১৫৩॥"

শ্রীল নরোত্তমদাসঠাকুর মহাশয়ও বলিয়া গিয়াছেন,

"সাধুসঙ্গে কথামৃত, শুনিয়া বিমল চিত, নাহি ভেল অপরাধ-কারণ॥"

ভক্তিসন্দর্ভ-কথিত কৌটিল্যাদি ভক্তিবাধক দোষগুলি সম্বন্ধে শ্রীপাদ জীবগোস্বামীর আনুগত্যেই কিঞ্চিৎ আলোচনা করা হইতেছে।

১১১। কৌটিল্য

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী তাঁহার ভক্তিসন্দর্ভের ১৫৩-অনুচ্ছেদে লিখিয়াছেন—কুটিলচিত্ত লোকগণ অতি উত্তম নানাবিধ উপচারের দ্বারাও যদি ভগবানের অর্চ্চনা করেন, ভগবান্ তাহা অঙ্গীকার করেন না। দূত্যগত দুর্য্যোধনের উপচারই তাহার প্রমাণ। কুরুক্ষেত্র-যুদ্ধের প্রাক্কালে কুরু-পাণ্ডবদের মধ্যে

সন্ধির প্রস্তাব উত্থাপনের জন্য হস্তিনাপুরে উপস্থিত হইয়া স্বয়ংভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ দূতরূপে দুর্য্যোধনের নিকটে যাইতেছিলেন। তাঁহাকে বশীভূত করিয়া নিজের পক্ষে আনয়নের উদ্দেশ্যে কুটিলমতি দুর্যোধন পথিপার্শ্বস্থ প্রতিগৃহে নানাবিধ উপাদেয় উপচার-সহযোগে "কৃষ্ণায় নমঃ" বলাইয়া শ্রীকৃষ্ণের পূজা ও স্তব করাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এ-সমস্ত আয়োজন ব্যর্থ হইয়া পড়িল। কেননা, শ্রীকৃষ্ণ সে-সমস্তের প্রতি উপেক্ষা প্রদর্শন করিলেন। পূজার সম্ভার যেন দেখিতে না হয়, এজন্য শ্রীকৃষ্ণ নয়ন মুদ্রিত করিয়া চলিতে লাগিলেন এবং স্তবাদি যেন শুনিতে না হয়, এজন্য তিনি কর্ণে অঙ্গুলি দিয়াছিলেন।

ভগবান্ হইতেছেন ভাবগ্রাহী, সকলের অন্তর্দ্রষ্টা। পূজার আবরণে আবৃত স্বার্থবুদ্ধি তিনি কি জানিতে পারেন না? তাহাতে তিনি প্রীতি লাভ করিবেন কেন? দুর্য্যোধনের বহিঃপূজা অঙ্গীকার করিলেন না।

এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ আরও লিখিয়াছেন—আধুনিক লোকদিগের মধ্যেও যাঁহাদের চিত্তে অপরাধ আছে, তাঁহারা শাস্ত্রাদি-শ্রবণের ফলে দৃশ্যমান ভাবে বাহিরে ভগবানের, গুরুদেবের এবং ভক্তাদির অর্চ্চনা আরম্ভ করিলেও অন্তরে অপরাধজাত অনাদর থাকে বলিয়া তাঁহাদের অর্চ্চনাও কৌটিল্যেই পর্য্যবসিত হয়। এজন্যই শাস্ত্র বলেন—অকুটিল-চিত্ত লোক যদি শাস্ত্র-জ্ঞানহীন মূর্খও হয়েন, ভজন তো দূরে, ভজনের আভাসাদিদ্বারাও তিনি কৃতার্থ হইতে পারেন। কিন্তু যাঁহারা কুটিলচিত্ত, তাঁহাদের ভক্তির অনুবৃত্তিও হয় না। যথা,

"ন হ্যপুণ্যবতাং লোকে মূঢ়ানাং কুটিলাত্মনাম্। ভক্তির্ভবতি গোবিন্দে কীর্ত্তনং স্মরণং তথা॥

—স্কন্দে শ্রীপরাশরবাক্য।

—অপুণ্যবান্ কুটিলচিত্ত মূর্খগণের শ্রীগোবিন্দে ভক্তি হয় না; তাঁহাদের কীর্ত্তনও হয় না, স্মরণও হয় না।" অর্থাৎ কৌটিল্য হইতেছে সাধন-ভক্তির বাধক।

বিষ্ণুধর্ম্মোত্তরও বলিয়াছেন,

"সত্যং শতেন বিঘ্নানাং সহস্রেণ তথা তপঃ।
বিঘ্নাযুতেন গোবিন্দে নৃণাং ভক্তির্নিবার্য্যতে॥

—শত বিঘ্নে সত্যতা নষ্ট হয়, সহস্র বিঘ্নে তপস্যা নষ্ট হয়, অযুত বিঘ্নে নরদিগের গোবিন্দ-ভক্তি বাধিত হয়।"

ইহাদ্বারা জানা গেল—যে-স্থলে শ্রীগোবিন্দের ভজন বাধা প্রাপ্ত হয়, সে-স্থলে অপরাধজাত অসংখ্য বিঘ্ন বিরাজিত।

শ্রীমদ্ভাগবত এজন্যই বলিয়াছেন,

"তং সুখারাধ্যমৃজুভিরনন্যশরণৈর্নৃভিঃ।
কৃতজ্ঞঃ কো ন সেবেত দুরারাধ্যমসাধুভিঃ॥ শ্রীভা, ৩।১৯।৩৬॥

—(শ্রীসূতগোস্বামী শৌনকাদি ঋষিগণের নিকটে বলিয়াছেন) সরল (অকুটিল)-চিত্ত এবং অনন্যভাবে শরণাগত লোকদিগের সুখারাধ্য সেই শ্রীকৃষ্ণকে কোন্ কৃতজ্ঞ ব্যক্তি সেবা না করে ? (অর্থাৎ তাদৃশ সকলেই শ্রীকৃষ্ণের সেবা করিয়া থাকেন)। কিন্তু অসাধু (কুটিলচিত্ত) লোকদিগের পক্ষে তিনি দুরারাধ্য।"

তাৎপর্য্য হইতেছে এই ঃ—যাঁহারা অকুটিল, সরলচিত্ত, এবং যাঁহারা অনন্যভাবে শ্রীকৃষ্ণেরই শরণাপন্ন হয়েন, তাঁহাদের ভজনও সুখদায়ক ; তাদৃশ ভজনেই অনায়াসে শ্রীকৃষ্ণচরণসেবা লাভ হইতে পারে। তাঁহারাই সাধু। আর যাঁহারা কুটিলচিত্ত—সুতরাং যাঁহারা দুর্য্যোধনের ন্যায় পাটোয়ারী-বুদ্ধির আশ্রয় গ্রহণ করেন—তাঁহারা অসাধু ; তাঁহাদের পক্ষে শ্রীকৃষ্ণ দুরারাধ্য।

ইহার পরে, ভক্তিসন্দর্ভের ১৫৪-অনুচ্ছেদে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—ভগবদ্ভক্তগণও অকুটিল অজ্ঞগণকেও অনুগ্রহ করিয়া থাকেন ; কিন্তু কুটিলচিত্ত বিজ্ঞগণকেও কৃপা করেন না। এই উক্তির সমর্থনে তিনি শ্রীমদ্ভাগবতের দুইটী শ্লোকেরও উল্লেখ করিয়াছেন।

"দূরে হরিকথাঃ কেচিদ্দূরে চাচ্যুতকীর্ত্তনাঃ। স্ত্রিয়ঃ শূদ্রাদয়শ্চৈব তেঽনুকম্প্যা ভবাদৃশাম্ ॥
বিপ্রো রাজন্য-বৈশ্যৌ বা হরেঃ প্রাপ্তাঃ পদান্তিকম্। শ্রৌতেন জন্মনাথাপি মুহ্যন্ত্যাম্নায়বাদিনঃ ॥
—শ্রীভা ১১।৫।৪-৫ ॥

—(নবযোগীন্দ্রের একতম শ্রীচমস নিমিমহারাজকে বলিয়াছেন) হে রাজন্ ! যে সকল স্ত্রী-শূদ্রাদির পক্ষে হরিকথা (বধিরত্বাদিবশতঃ) দূরে (অর্থাৎ বধিরত্বাদি বশতঃ যাহারা হরিকথা শুনিতে পায় না) এবং (মূকত্বাদিবশতঃ) হরিকীর্ত্তনও দূরবর্ত্তী (অর্থাৎ মূক বলিয়া যাহারা হরিকীর্ত্তন করিতে পারে না), তাহারা আপনাদের ন্যায় লোকদিগের অনুকম্পার পাত্র। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয় ও বৈশ্য—ইঁহারা উপনয়ন-বেদাধ্যয়নরূপ শ্রৌত জন্মদ্বারা হরি-পাদপদ্মের নিকটবর্ত্তী হইয়াও (অর্থাৎ হরিপাদপদ্ম-ভজনের উত্তম অধিকার প্রাপ্ত হইয়াও) বেদের কর্ম্মকাণ্ডবাদী হইয়া কর্ম্মেই আসক্ত হইয়া পড়েন।"

শ্রৌতজন্মপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়াদি সম্বন্ধে টীকায় শ্রীধরস্বামিপাদ বলিয়াছেন—"জ্ঞানলব-দুর্বিদগ্ধাস্তুচিকিৎস্যত্বাৎ উপেক্ষ্যা ইত্যাশয়েনাহ বিপ্র ইতি।—যাঁহারা বেদের সামান্য জ্ঞান লাভ করিয়াই দুর্বিদগ্ধ (উদ্ধত) হইয়া পড়েন, তাঁহারা দুশ্চিকিৎস্য—সদুপদেশাদিতে তাঁহারা তাঁহাদের ঔদ্ধত্য পরিত্যাগ করেন না। তাঁহারা উপেক্ষণীয়—'বিপ্র-রাজন্য'-ইত্যাদি বাক্যে তাহাই বলা হইয়াছে।"

তাৎপর্য্য এই। শাস্ত্রজ্ঞানাদি সম্বন্ধে কিছু জানেনা বলিয়া স্ত্রী-শূদ্রাদি অজ্ঞ ; কিন্তু সাধারণতঃ তাহাদের ঔদ্ধত্যাদি নাই, বিজ্ঞত্বের অভিমান নাই, কুটিলতাদিও নাই। তাহারা নিমিমহারাজের ন্যায় পরমভাগবতদিগের কৃপার পাত্র। তাহাদের মধ্যে আবার যাহারা বধিরতাদি-বশতঃ হরিকথাদি শুনিতে পারে না, কিম্বা মূকত্ববশতঃ যাহারা কীর্ত্তনও করিতে পারে না, তাহারা পরমভাগবতদিগের বিশেষ কৃপার পাত্র। ভাগবতগণ মূকদিগকে উপদেশাদি দিয়া, বধিরাদিকে দর্শন-স্পর্শন-পদরেণু-আদি দিয়া কৃতার্থ করেন। কিন্তু ব্রাহ্মণাদিবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও এবং বেদাধ্যয়নাদি

করিয়াও যাঁহারা উদ্ধত, কুটিল, দাম্ভিক হইয়া পড়েন, বেদের কর্ম্ম-কাণ্ডাদিতে মুগ্ধ হইয়া অনিত্য স্বর্গাদিসুখ-লাভের জন্যই চেষ্টা করিয়া থাকেন, বেদের ব্রহ্মকাণ্ডে যাঁহাদের অনুরক্তি নাই, পরম-ভাগবতগণ তাঁহাদের প্রতি উপেক্ষাই প্রদর্শন করেন; তাঁহাদের ঔদ্ধত্য, কুটিলতা, দাম্ভিকতাদি দুরপনেয় মনে করিয়া ভাগবতগণ তাঁহাদিগকে উপদেশাদি দিতে উৎসুক হয়েন না।

১১২। অশ্রদ্ধা

ভক্তিসন্দর্ভের ১৫৫-৫৬ অনুচ্ছেদে অশ্রদ্ধা-সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। শ্রীপাদ জীব-গোস্বামী বলেন—শ্রীভগবান্, ভগবন্নাম, বৈষ্ণবাদি সম্বন্ধে মহিমাদির কথা দেখিয়া-শুনিয়াও অসম্ভাবনা ও বিপরীত-ভাবনাদিদ্বারা বিশ্বাসের যে অভাব, তাহারই নাম অশ্রদ্ধা। যেমন, শ্রীকৃষ্ণের বিশ্বরূপ-দর্শনাদির ফলেও শ্রীকৃষ্ণের ভগবত্তা-সম্বন্ধে দুর্য্যোধনের অবিশ্বাস। ইহা অশ্রদ্ধা। শৌনকাদি ঋষিগণ শ্রীসূত গোস্বামীর নিকটে বলিয়াছিলেন,

“আপন্নঃ সংসৃতিং ঘোরাং যন্নাম বিবশো গৃণন্।
ততঃ সদ্যো বিমুচ্যেত যদ্বিভেতি স্বয়ং ভয়ম্॥ শ্রীভা, ১।১।১৪॥

—হে সূত! যে ভগবন্নামের ভয়ে স্বয়ং ভয় পর্য্যন্ত ভীত হয়, ঘোরতর সংসারদশাপ্রাপ্ত লোক বিবশে (অননুসন্ধানেও) সেই ভগবন্নাম কীর্ত্তন করিয়া সদ্য সংসারদশা হইতে বিমুক্ত হইয়া থাকে।”

এই শাস্ত্রবাক্যেও যে কাহারও কাহারও বিশ্বাস হয়না, তাহাও অশ্রদ্ধা এবং তাহা অপরাধেরই ফল।

কেহ কেহ অজামিলের বিবরণেও বিশ্বাস স্থাপন করিতে পারেন না; বলেন—“নারায়ণ-নামক পুত্রের প্রতি মন রাখিয়া ‘নারায়ণ’ বলিয়া পুত্রকে আহ্বান করার ফলে অজামিলের মুক্তি হয় নাই; এ-ভাবের নামোচ্চারণে মুক্তি অসম্ভব। ভগবান্ নারায়ণের প্রতিই অজামিলের মন ছিল’-ইহাও নামমাহাত্ম্যে অবিশ্বাস; অপরাধের ফলেই এইরূপ অবিশ্বাস বা অশ্রদ্ধা জন্মে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এই প্রসঙ্গে প্রহ্লাদের কথাও উল্লেখ করিয়াছেন। স্বীয় পিতা হিরণ্য-কশিপুকর্ত্তৃক তাঁহার উপরে অত্যাচারসম্বন্ধে প্রহ্লাদ বলিয়াছিলেন,

“দন্তা গজানাং কুলিশাগ্রনিষ্ঠুরাঃ শীর্ণা যদেতে ন বলং মমৈতৎ।
মহাবিপৎপাতবিনাশনোহয়ং জনার্দ্দনানুস্মরণানুভাবঃ॥ বি, পু, ১।১৭।৪৪॥

—বজ্র হইতেও নিষ্ঠুর হস্তিদিগের দন্তসকল যে বিশীর্ণ হইয়াছিল, তাহা আমার শক্তিতে নহে; মহাবিপদ্ বিনাশক জনার্দ্দনের অনুস্মরণেরই এইরূপ প্রভাব। (অর্থাৎ হস্তীদিগের বজ্রসম কঠিন দন্তও যে নবনীততুল্য সুকোমল বলিয়া আমার অনুভব হইয়াছিল, তাহা কেবল ভগবৎ-স্মরণের প্রভাবে, আমার নিজের কোনও প্রভাবে নহে)।”

এ-স্থলে ভগবৎ-স্মরণের যে অদ্ভুত মহিমার কথা প্রহ্লাদ ব্যক্ত করিলেন, অপরাধজনিত অবিশ্বাসবশতঃ তাহাও কেহ কেহ বিশ্বাস করিতে পারেন না, তাঁহারা ইহাকে অসম্ভব বলিয়া মনে করেন।

সংসার-ক্ষয়, বিপদাদির নিবারণ, লোকের নিকটে সমাদর প্রাপ্তি প্রভৃতি হইতেছে কিন্তু শুদ্ধাভক্তির আনুষঙ্গিক ফল—মুখ্য ফল নহে ; মুখ্য ফল হইতেছে, ভগবচ্চরণ-সেবা-প্রাপ্তি। বিপদ্-বিনাশনাদি আনুষঙ্গিক ফলও প্রহ্লাদের যেমন অনুভূত হইয়াছিল, তেমন ভাবে সকলের অনুভব-গোচর হয় না। যাঁহাদের অনুভব হয়, তাঁহারাও নিজেদের মহিমা-খ্যাপনের জন্য তাহা প্রকাশ করেন না, ভগবানের বা ভক্তির মহিমা-খ্যাপনের জন্যই তাহা করিয়া থাকেন ; যেমন প্রহ্লাদ বলিয়াছেন —"আমার শক্তিতে আমি বিপদ্ হইতে উদ্ধার লাভ করি নাই, আমার তাদৃশী কোনও শক্তিই নাই ; ভগবৎ-স্মরণের প্রভাবেই আমাকে বিপন্মুক্ত করিয়াছে।" নিজের প্রভাব খ্যাপনের জন্য যদি কেহ তাহা প্রকাশ করেন, তাহা হইলে তাহা হইবে তাঁহার পক্ষে ভক্তিবাধক, ভক্তির অন্তরায়, তাঁহার অপরাধেরই ফল।

বস্তুতঃ শুদ্ধাভক্তির কৃপা যাঁহাদের প্রতি হয়, তাঁহারা বিপন্নিবারণাদির জন্য প্রার্থনাও করেন না ; দুঃখ ভোগ করিয়াও যদি ভক্তির পথে অগ্রসর হওয়া যায়, তাহা হইলে সেই দুঃখও তাঁহাদের বরণীয়। পরীক্ষিৎ-মহারাজের উক্তিই তাহার প্রমাণ। ব্রহ্মশাপে তক্ষক-দংশনে সপ্তাহমধ্যে অবধারিত-মৃত্যু পরীক্ষিৎ মহারাজ গঙ্গাতীরে প্রায়োপবেশন-রত হইয়া বলিয়াছিলেন,

"দ্বিজোপসৃষ্টঃ কুহকস্তক্ষকো বা দশত্বলং গায়ত বিষ্ণুগাথাঃ॥—শ্রীভা, ১।১৯।১৫॥

—(আমার প্রতি যিনি অভিসম্পাত করিয়াছেন, সেই) ব্রাহ্মণ-প্রেরিত কুহকই (মায়াবী) আসুক, কিম্বা তক্ষকই আসিয়া আমাকে দংশন করে, করুক ; আপনারা ভগবৎ-কথা কীর্ত্তন করুন।"

পরীক্ষিতের উক্তির তাৎপর্য্য এই। ভক্তি স্বীয় প্রভাবে ভক্তের সর্ব্ববিধ বিঘ্নই বিনষ্ট করিতে পারে ; কিন্তু পরম-ভাগবত মহারাজ পরীক্ষিৎ ভক্তির বা ভগবানের নিকটে তক্ষক-দংশন হইতে অব্যাহতি-লাভের প্রার্থনা করিলেননা, তদ্রূপ কোনও ইচ্ছাও মনে পোষণ করেন নাই। তিনি ভগবৎ-কথা-শ্রবণরূপ ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠানের জন্যই লালায়িত ছিলেন ; কেননা, তাহার ফলেই তিনি, ভক্তের একমাত্র কাম্য ভগবচ্চরণ-সেবা লাভ করিতে পারিবেন। ভগবৎ-কথা শুনিতে শুনিতে এবং তাহার ফলে ভগবৎ-স্মৃতি হৃদয়ে পোষণ করিতে করিতে যদি তাঁহার মৃত্যু হয়, তাহা হইলে তিনি ভগবচ্চরণ-লাভ করিতে পারিবেন। কেননা, অর্জ্জুনের নিকটে ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণই বলিয়া গিয়াছেন—"যং যং বাপি স্মরন্ ভাবং ত্যজত্যন্তে কলেবরম্। তং তমেবৈতি কৌন্তেয় সদা তদ্‌ভাবভাবিতঃ॥ গীতা॥ ৮।৬॥— হে কৌন্তেয়! অন্তকালে যিনি যে যে ভাব চিন্তা করতঃ কলেবর ত্যাগ করেন, সর্ব্বদা সেই সেই ভাবে নিমগ্ন থাকেন বলিয়া তিনি সেই সেই ভাবই পাইয়া থাকেন।" এতাদৃশ ভাব হৃদয়ে পোষণ করিতেন বলিয়া তক্ষক-দংশনে মৃত্যুও ছিল মহারাজ পরীক্ষিতের পক্ষে বরণীয়। এজন্য তিনি

তক্ষক-দংশন হইতে অব্যাহতি কামনা করেন নাই, কামনা করিয়াছেন ভগবচ্চরণ-সেবা-প্রাপক ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান। ভক্তবৎসল এবং ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু ভগবান্ তাঁহার বাসনা পূর্ণ করিয়াছেন।

সাধন-ভক্তির প্রভাবকে দেহ-দৈহিক ব্যাপারে প্রয়োগ করা যে সঙ্গত নয়, পরীক্ষিতের দৃষ্টান্ত হইতে তাহাই জানা গেল। দেহ-দৈহিক কোনও উদ্দেশ্য-সিদ্ধির জন্য ভক্তি-অঙ্গের অনুষ্ঠান করিতে গেলে ভক্তির মহিমাকেই খর্ব্ব করা হয়। এইরূপ উদ্দেশ্যের উৎপত্তিও হয় অপরাধ হইতে এবং ইহার ফলও হয় অপরাধই।

যাহা হউক, পরিক্ষিৎ মহারাজ তক্ষক-দংশন হইতে অব্যাহতি কামনা করেন নাই বলিয়া তক্ষক-দংশনেই তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সাধন-ভক্তির যে কোনও প্রভাব নাই, ইহা হইতে তাহা মনে করা সঙ্গত হইবেনা। তাহার হেতু পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—পরমভাগবতের লক্ষণবিশিষ্ট আধুনিক কোনও ভক্তের যদি বিপদ্ দেখা যায়, তাহা হইলে তাঁহার প্রতি অবিশ্বাস—তিনি বাস্তবিক ভক্ত নহেন, এইরূপ মনে করা অন্যায়। "অতএবাধুনিকেষু মহানুভাবলক্ষণবৎসু তদ্দর্শনেহপি নাবিশ্বাসঃ কর্ত্তব্যঃ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ১৫৬॥" কেননা, বিপদ্ হইতে উদ্ধার হইতেছে সাধনভক্তির আনুষঙ্গিক ফল। কোনও কোনও স্থলে ভগবদুপাসনা-বিশেষেই তাদৃশ আনুষঙ্গিক ফলের উদয় হয়, সর্ব্বত্র হয়না। যেমন, রাজপুত্র ধ্রুব যখন এক পদের উপর দণ্ডায়মান হইয়া সমাধিস্থ হইয়াছিলেন, তখন তাঁহার অঙ্গুষ্ঠভরে পৃথিবী অর্দ্ধেক অবনত হইয়াছিল,—গজরাজ কোনও নৌকাতে উঠিলে নৌকাখানি যেমন পদে পদে ইতস্ততঃ চালিত হইয়া নমিত হয়, তদ্রূপ।

যদৈকপাদেন স পার্থিবাত্মজস্তস্থৌ তদঙ্গুষ্ঠনিপীড়িতা মহী।
ননাম তত্রার্দ্ধমিভেন্দ্রধিষ্ঠিতা তরীব সব্যেতরতঃ পদে পদে॥

—শ্রীভা, ৪।৮।৭৯॥

পৃথিবী উল্লিখিতরূপে নমিত হউক—ইহা ধ্রুবের ইচ্ছা ছিলনা। তথাপি এইরূপ হইয়াছিল। এ-সম্বন্ধে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—ধ্রুব সর্ব্বাত্মক-ভাবেই সর্ব্বব্যাপক বিষ্ণুতে সমাধিস্থ হইয়াছিলেন; এজন্য তাঁহার অপ্রার্থিত ভাবেই উল্লিখিতরূপ ফলের উদয় হইয়াছিল। তাঁহার এইরূপ উপাসনাও ভাবী জ্যোতির্ম্মণ্ডলাত্মক-বিশ্বপরিচালন-পদের উপযোগিতারূপেই উদিত হইয়াছিল, মনে করিতে হইবে। "অত্র সর্ব্বাত্মকতয়ৈব বিষ্ণুসমাধিনা তাদৃক্ ফলমুদিতম্। এতাদৃশ্যুপাসনা চাস্য ভাবি-জোতির্ম্মণ্ডলাত্মক-বিশ্বচালন-পদোপযোগিতয়োদিতেতি জ্ঞেয়ম্॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥১৫৬॥"

তাৎপর্য্য এই। ধ্রুবের পিতৃপুরুষগণও যে লোক প্রাপ্ত হয়েন নাই, এমন একটী অপূর্ব্ব লোক-প্রাপ্তির বাসনাতেই ছিল তাঁহার উপাসনা, ইহা তাঁহার উপাসনার বিশেষত্ব। তাঁহার অঙ্গুষ্ঠের চতুর্দিকে পৃথিবীর অবনমন বা পরিচালন তাঁহার অভীষ্ট ছিলনা। তাঁহার উপাসনার ফলে ভগবৎকৃপায় পরে তিনি তাদৃশ একটী লোক পাইয়াছিলেন; এই লোকটীর নাম হইয়াছিল—ধ্রুবলোক। এই ধ্রুব-

লোকের চতুষ্পার্শ্বেই জ্যোতির্ম্মণ্ডলাত্মক বিশ্ব ভ্রমণ করে, যেন এই ধ্রুবলোকের দ্বারাই পরিচালিত হইয়া থাকে। ধ্রুবের সমাধি-অবস্থায় পৃথিবীর অবনমনের বা কম্পনের উপলক্ষ্যে ভগবান্ কৃপা করিয়া তাঁহাকে যেন জানাইয়া দিলেন—"ধ্রুব! তোমার অভীষ্ট লোকটী তুমি ভবিষ্যতে পাইবে। তোমাকে এমন একটী লোক দিব, যাহার চারি পার্শ্বে জ্যোতির্ম্মণ্ডলাত্মক বিশ্ব পরিভ্রমণ করিবে, এক্ষণে তোমার অঙ্গুষ্ঠের চতুর্দ্দিকে যেমন এই পৃথিবীটী কম্পিত হইয়া অবনমিত হইতেছে, তদ্রূপ।"

উল্লিখিত আলোচনার তাৎপর্য্য হইতেছে এই যে—কোনও পরমভাগবতের মধ্যে যদি কখনও দুঃখ-দৈন্যাদি দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে তাঁহার পরম-ভাগবতত্বে কেহ যদি অবিশ্বাস করেন, তাহা হইলে সেই অবিশ্বাসের হেতু হইবে তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধ। দুঃখ-দৈন্যাদির মোচন হইতেছে ভক্তির আনুষঙ্গিক ফল। উপাসনা-বিশেষেই আনুষঙ্গিক ফলের উদয়, তাহাও ভগবানের ইচ্ছাতে। প্রারব্ধক্ষয়ের পরেও যে ভজনপরায়ণ সাধকের দেহে বাহ্য সুখ-দুঃখ দৃষ্ট হয়, তাহার হেতু পূর্ব্বেই (৫।১০৭-খ-অনুচ্ছেদে) প্রদর্শিত হইয়াছে।

১১৩। ভগবন্নিষ্ঠার চ্যুতি-সম্পাদক অন্য বস্তুতে অভিনিবেশ

একমাত্র ভগবান্ বা ভগবদ্ভজনেই যদি অভিনিবেশ জন্মে, তাহা হইলেই সাধক ভজন-পথে অগ্রসর হইতে পারেন। কিন্তু অন্য বস্তুতে—দেহ-দৈহিকাদি-বস্তুতে—যদি অভিনিবেশ জন্মে, তাহাহইলে তাদৃশ অভিনিবেশ হয় ভজনের অন্তরায়; এইরূপ অভিনিবেশে ভগবানে বা ভগবদ্ভজন-বিষয়ে নিষ্ঠা ক্ষীণ হইতে হইতে শেষকালে একেবারে দূরীভূত হইয়া যাইতেও পারে। এই প্রসঙ্গে শ্রীজীবপাদ ভরত-মহারাজের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন।

"এবমঘটমানমনোরথাকুলহৃদয়ো মৃগদারকাভাসেন স্বারব্ধকর্ম্মণা।
যোগারম্ভণতো বিভ্রংশিতঃ স যোগতাপসো ভগবদারাধন-লক্ষণাচ্চ॥ শ্রীভা, ৫।৮।২৬॥

—(ভগবদ্ভজনের জন্য লালসান্বিত হইয়া মহারাজ ভরত স্ত্রী-পুত্র-বন্ধুবান্ধব এবং ভারতের সাম্রাজ্য পর্য্যন্ত মলবৎ ত্যাগ করিয়া গিয়াছিলেন এবং সাধন-ভজনে নিবিষ্ট হইয়া পড়িয়াছিলেন। দৈবাৎ একটী মৃগশাবকের প্রতি তিনি আসক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহার ন্যায় ভজনে অভিনিবিষ্ট পরম-ভাগবতের পক্ষে একটী মৃগশাবকের প্রতি অভিনিবেশ হইতেছে এক অঘটন—অসম্ভব—ব্যাপার; তথাপি তিনি মৃগশাবকে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই প্রসঙ্গে শ্রীশুকদেব গোস্বামী মহারাজ পরীক্ষিতের নিকটে বলিয়াছেন) ভরত-মহারাজের স্বীয় আরব্ধকর্ম্মই মৃগশাবকরূপে প্রতিভাসমান হইয়াছিল। সেই আরব্ধ কর্ম্মের দ্বারাই তিনি মৃগশাবকে অসম্ভব-মানস-অভিনিবেশ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। সেই আরব্ধ-কর্ম্মজনিত অভিনিবেশের ফলে যোগতাপস রাজর্ষি ভরত যোগারম্ভ হইতে বিশেষ ভাবে ভ্রষ্ট হইয়া পড়িলেন এবং ভগবদারাধনা হইতেও বিচ্যুত হইলেন (অহর্নিশি কেবল মৃগশাবকটীর চিন্তাই করিতে লাগিলেন)।"

কিন্তু রাজর্ষি ভরতের উল্লিখিত আরব্ধকর্ম্ম টী কি জাতীয় ? শ্রীপাদ জীবগোস্বামী বলিয়াছেন—সামান্য প্রারব্ধকর্ম্ম ভগবদ্‌ভক্তির অন্তরায় হইতে পারেনা ; কেননা, সামান্য প্রারব্ধ কর্ম্ম (মায়াশক্তির সামান্য কার্য্য বলিয়া) দুর্ব্বল ; (স্বরূপ-শক্তির বৃত্তিরূপা ভক্তির উপরে ইহা প্রভাব বিস্তার করিতে পারেনা)। "অত্রৈবং চিন্ত্যম্। ভগবদ্‌ভক্ত্যন্তরায়কং সামান্যং প্রারব্ধকর্ম্ম ন ভবিতুমর্হতি, দুর্ব্বলত্বাৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ। ১৫৭॥"

তবে ইহা কিরূপ প্রারব্ধ ? শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—ভক্তির অন্তরায় এই প্রারব্ধ হইতেছে প্রাচীন অপরাধ-বিশেষ ; ইহাই মনে করিতে হইবে। ইন্দ্রদ্যুম্নাদিরও অপরাধবশতঃ এইরূপ অবস্থা জন্মিয়াছিল। "ততঃ প্রাচীনাপরাধাত্মকমেব তল্লভ্যত ইন্দ্রদ্যুম্নাদীনামিবেতি ॥"

মহারাজ ইন্দ্রদ্যুম্ন যখন ভগবদারাধনা করিতেছিলেন, তখন তাঁহার দর্শনাভিলাষী হইয়া অগস্ত্যমুনি আসিয়াছিলেন। কিন্তু ইন্দ্রদ্যুম্ন তাঁহার সমাদর করেন নাই। এই অপরাধের ফলে তিনি পরে হস্তিজন্ম লাভ করিয়াছিলেন। এতাদৃশ কোনও প্রাচীন অপরাধের ফলেই ভরত-মহারাজ মৃগ-শাবকে আসক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন এবং তাহার ফলে ভগবদারাধনা হইতেও বিচ্যুত হইয়াছিলেন।

১১৪। ভক্তি-শৈথিল্য

ভক্তি-শৈথিল্য হইতেছে সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে শিথিলতা। ভক্তিসন্দর্ভের ১৫৯-অনুচ্ছেদে শ্রীপাদ জীবগোস্বামী এ-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন।

সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানে যিনি উল্লাস প্রাপ্ত হয়েন না, অথচ দেহের সুখ-দুঃখাদিতে যাঁহার বিশেষ আবেশ দেখা যায়, যিনি দৈহিক দুঃখে অত্যন্ত ব্যাকুল হইয়া পড়েন এবং দৈহিক-সুখাদিতেও অত্যন্ত উল্লসিত হইয়া পড়েন, বুঝিতে হইবে—তাঁহার ভক্তিশৈথিল্য জন্মিয়াছে। অপরাধের ফলেই এইরূপ ভক্তিশৈথিল্য জন্মে।

সাধন-ভজনের অনুষ্ঠানে যাঁহাদের শৈথিল্য নাই, যাঁহারা সর্ব্বদা ভজন-পরায়ণ, তাঁহাদেরও অবশ্য দৈহিক সুখ-দুঃখাদি, আধ্যাত্মিকাদি তাপ, দৃষ্ট হয়। কিন্তু তাহাতে তাঁহারা অভিনিবিষ্ট হয়েন না—দুঃখেও অভিভূত হয়েন্ না, সুখেও উল্লসিত হয়েন না। দৈহিক সুখ-দুঃখাদিতে তাঁহাদের অনাদরই দৃষ্ট হয়। সহস্রনাম-স্তোত্রে বলা হইয়াছে,

"ন বাসুদেবভক্তানামশুভং বিদ্যতে ক্বচিৎ।
জন্ম-মৃত্যু-জরাব্যাধি-ভয়ঞ্চাপ্যুপজায়তে ॥

—যাঁহারা বাসুদেবের ভক্ত, তাঁহাদের কোনও অমঙ্গল নাই। জন্ম, মৃত্যু, জরা, ব্যাধি হইতেও তাঁহারা ভয় প্রাপ্ত হয়েন না।"

সৎসাধকেরও যে মনুষ্য-দেহ রক্ষার জন্য ইচ্ছা জন্মে, তাহা মৃত্যুর ভয়ে নহে, দৈহিক-সুখাদি

উপভোগের উদ্দেশ্যে বাঁচিয়া থাকার জন্যও নহে, তাঁহারা বাঁচিয়া থাকিতে চাহেন কেবলমাত্র উপাসনা-বৃদ্ধির লোভে। দীর্ঘকাল বাঁচিতে পারিলে দীর্ঘকাল ভজনের সুযোগ হইতে পারে। "নরদেহই ভজনের মূল ; অনেক সৌভাগ্যের ফলে নরদেহ পাওয়া গিয়াছে ; মৃত্যুর পরে পুনরায় নরদেহ লাভ না হইতেও পারে। যদি ইহার পরে নরদেহ লাভ না হয়, তাহা হইলে ভজন চলিবেনা। এই নর-জন্মে যতটুকু ভজন করা যায়, ততটুকুই লাভ"—এ-সমস্ত ভাবিয়াই তাঁহারা মনুষ্যদেহ রক্ষার জন্য ইচ্ছা করেন। সুতরাং সৎসাধকদের এইরূপ ইচ্ছাতে ভক্তির তাৎপর্য্যহানি হয়না।

কিন্তু যে স্থলে কেবল দেহের সুখভোগের জন্যই বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছা, সে স্থলে সেই ইচ্ছাতে ভক্তি-তাৎপর্য্য থাকে না। এমন কি, যাঁহারা বিবেক-সামর্থ্যযুক্ত, হিতাহিত বিবেচনা করিতে সমর্থ, মধ্যে মধ্যে সাধনভক্তির অনুষ্ঠানে রুচি জন্মিলেও, সেই সাধনভক্তির অনুষ্ঠানের দ্বারা যদি তাঁহাদের ভক্তি-তাৎপর্য্যহীন কর্ম্মাদিতে অনুরক্তিজনিত-ভক্তি-শৈথিল্য দূরীভূত না করা হয়, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহাদের অপরাধ আছে এবং সেই অপরাধবশতঃই তাঁহাদের ভক্তি-শৈথিল্য জন্মে। তাৎপর্য্য এই যে—বিচারবুদ্ধি-বিশিষ্ট ব্যক্তির যদি মধ্যে মধ্যে ভক্তি-সাধনে রুচি জন্মে, তাহা হইলে তাঁহার বুঝা উচিত যে, ভক্তি-সাধনে বাস্তবিক আনন্দ পাওয়া যাইতে পারে, মানব-জন্মের সার্থকতাও লাভ হইতে পারে ; সুতরাং ভক্তিতাৎপর্য্যহীন ব্যাপারে অভিনিবিষ্ট না হইয়া ভজনে নিবিষ্ট হওয়াই সঙ্গত। ইহা বুঝিয়াও যদি তিনি ভক্তি-সাধনের অনুষ্ঠানে প্রাধান্য না দিয়া ভক্তিতাৎপর্য্যহীন কর্ম্মেই অধিকতর আদর দেখান, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—তাঁহার পূর্ব্বসঞ্চিত অপরাধ আছে, সেই অপরাধের ফলেই সাধন-ভক্তিতে তাঁহার শৈথিল্য জন্মিতেছে। তিনি বিচার-সমর্থ ; সুতরাং কোন্ টী অপরাধ, কোন্ টী অপরাধ নয়, তাহা তিনি বুঝিতে পারেন। তথাপি তিনি যদি ভক্তিতাৎপর্য্যহীন কর্ম্মেই অধিক আদর দেখান, তাহা হইলে বুঝিতে হইবে, তাঁহার অপরাধই ইহার হেতু।

কিন্তু যাঁহারা মূঢ়, কোন্ টী অপরাধ, কোন্টী অপরাধ নহে, তাহা যাঁহারা বুঝিতে সমর্থ নহেন, অল্পমাত্র সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠানেই তাঁহারা কৃতার্থ হইতে পারেন। কেননা, তাঁহাদের প্রতি দীনদয়াল ভগবানের কৃপা অধিকরূপে প্রবর্ত্তিত হয়। "দীনেরে অধিক দয়া করে ভগবান্॥ শ্রীচৈ, চ, ৩।৪।৬৪॥"

আবার কিন্তু বিবেক-সামর্থ্যযুক্ত ব্যক্তি—যিনি বুঝিতে পারেন, এইটী অপরাধ, ভক্তির অন্তরায়, তিনি—ভক্তিসাধনে প্রাধান্য না দিয়া ভক্তিতাৎপর্য্যহীন কর্ম্মেই অত্যধিক আদর-প্রদর্শনের দ্বারা যে অপরাধ করিয়া থাকেন, তাহা অত্যন্ত দৌরাত্ম্য-বশতঃই। আর "ইহা অপরাধ"-ইহা বুঝিবার সামর্থ্য নাই বলিয়া যিনি অপরাধ করিয়া থাকেন, তাঁহার সেই অপরাধ যে দৌরাত্ম্যবশতঃ নয়, তাহাই বুঝিতে হইবে। এজন্য বিবেক-সামর্থ্যযুক্ত এবং পূর্ব্বাবস্থায় ভগবদুপাসক মহারাজ শতধনু শ্রীকৃষ্ণের প্রতি যে দৌরাত্ম্য করিয়াছিলেন, তাহা তাঁহার ভজনের অন্তরায় হইয়াছিল। আবার, কিন্তু (গো-গর্দ্দভতুল্য) মূঢ় ব্যক্তি স্বীয় অজ্ঞতাবশতঃ যে অপরাধ করিয়া থাকেন, দীনদয়ালু ভগবান্ তাহাও ক্ষমা করেন। কেননা, তাঁহাতে দৌরাত্ম্য বা ঔদ্ধত্য নাই। ভজনের স্বরূপগত প্রভাব সেই অজ্ঞানকৃত অপরাধকে অতিক্রম

করিয়াই উদিত হইয়া থাকে। "দৌরাত্ম্যাভাবেন ভজনস্বরূপ-প্রভাবস্থাপরাধমতিক্রম্যোদয়াৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥ ১৫৯॥"

১১৫। স্বীয় ভজনাদিবিষয়ে অভিমান

কিছুকাল সাধন-ভক্তির অনুষ্ঠান করিতে করিতে যদি কাহারও মনে এইরূপ অভিমান জাগে যে-"আমার মত ভজন আর কেহই করে না, আমি একজন উচ্চ অধিকারী ভক্ত, ইত্যাদি", তাহা হইলে বুঝিতে হইবে—প্রাচীন বা আধুনিক কোনও অপরাধের ফলেই উল্লিখিতরূপ অপরাধের উদয় হইয়াছে। এইরূপ অভিমান পোষণ করাও অপরাধ ; কেননা, তাহার ফলে আবার বৈষ্ণবের অবমাননাদি রূপ অন্যান্য অপরাধেরও উৎপত্তি হইয়া থাকে। "অথ ভক্ত্যাদিকৃতাভিমানিত্বঞ্চাপরাধকৃতমেব, বৈষ্ণবাবমাননাদি-লক্ষণাপরাধান্তর-জনকত্বাৎ ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ ॥ ১৫৯॥" প্রজাপতি দক্ষই তাহার প্রমাণ।

প্রজাপতি দক্ষ তাঁহার পূর্ব্বজন্মে শ্রীশিবের নিন্দা করিয়াছিলেন। পরজন্মে তিনি প্রচেতা-নন্দন রূপে জন্মগ্রহণ করেন এবং প্রজাপতি পদবী লাভ করেন। তিনি তখন ব্রহ্মার আদেশে দশ সহস্র প্রজা উৎপাদন করেন এবং ভগবদুপাসনাদ্বারা শক্তি লাভ করিয়া প্রজা উৎপাদনের জন্য তিনি পুত্রদিগকে আদেশ দেন। তদনুসারে তাঁহারা যখন ভগবদুপাসনায় রত ছিলেন, তখন দেবর্ষি নারদের সঙ্গ-প্রভাবে তাঁহাদের সন্তানোৎপাদনের বাসনা তিরোহিত হইল। প্রজাপতি দক্ষ এই সংবাদ শুনিতে পাইয়া নারদের প্রতি অত্যন্ত কুপিত হইলেন এবং আর প্রজা সৃষ্টি করিবেন না বলিয়া সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু ব্রহ্মার আদেশে তিনি পুনরায় দশ সহস্র প্রজা সৃষ্টি করেন এবং তাঁহাদিগকেও তিনি, তাঁহাদের অগ্রজদের প্রতি যেরূপ আদেশ দিয়াছিলেন, সেইরূপ আদেশ দিলেন। তদনুসারে তাঁহারাও ভগবদা-রাধনায় প্রবৃত্ত হইলেন এবং নারদের সঙ্গপ্রভাবে তাঁহারাও তাঁহাদের অগ্রজদের অবস্থা প্রাপ্ত হইলেন। ইহা শুনিয়া প্রজাপতি দক্ষ নারদের প্রতি ক্রোধে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া উঠিলেন। দক্ষকেও ভগবদ্‌ভজনে প্রবৃত্ত করাইবার জন্য নারদ যখন তাঁহার নিকটে আসিলেন, তখন দক্ষ নারদকে ভর্ৎসনাদি দ্বারা অব-মানিত করিয়াছিলেন। ইহাতে দক্ষের যে অপরাধ জন্মিল, তাহাও তাঁহার পূর্ব্বজন্মকৃত শিবনিন্দাজাত অপরাধেরই ফল। এক অপরাধ হইতে যে অন্য অপরাধের উদয় হয়, দক্ষের দৃষ্টান্তে তাহাই জানা গেল। শিবনিন্দারূপ অপরাধের ফলেই দক্ষের ভজনবিষয়ে অভিমান জন্মিয়াছিল ; সেই অভিমানের ফলে তিনি পুনরায় নারদের অবমাননা করিয়া নূতন অপরাধে পতিত হইয়াছিলেন।

ক। সাধনভক্তির একবার অনুষ্ঠানের ফল

প্রশ্ন হইতে পারে—ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেও যদি ভক্তিবাধক অভিমান উদিত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে, তাহা হইলে শাস্ত্রে কেন বলা হইয়াছে যে, একবার মাত্র ভজনাঙ্গের (যেমন, শ্রীকৃষ্ণ নামোচ্চা-রণের) ফলেই ভক্তিফল প্রেম পাওয়া যাইতে পারে ?

এইরূপ প্রশ্নের উত্তরে শ্রীজীবপাদ বলিয়াছেন—যদি প্রাচীন বা নবীন কোনওরূপ অপরাধই না থাকে, তাহা হইলেই একবার মাত্র ভজনাঙ্গের অনুষ্ঠানেই সাধনভক্তির ফল পাওয়া যাইতে পারে, অপরাধ থাকিলে তাহা পাওয়া যায়না। "তদেবং যৎ সকৃদ্‌ভজনাদিনৈব ফলোদয় উক্তস্তদ্‌যথাবদেব, যদি প্রাচীনোঽর্ব্বাচীনো বাপরাধো ন স্যাৎ॥ ভক্তিসন্দর্ভঃ॥ ১৫৯॥"

শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতও তাহাই বলিয়া গিয়াছেন ঃ—

এক কৃষ্ণনাম করে সর্ব্বপাপনাশ। প্রেমের কারণ ভক্তি করেন প্রকাশ॥
প্রেমের উদয়ে হয় প্রেমের বিকার। স্বেদ কম্প পুলকাশ্রু গদ্‌গদাশ্রুধার॥
অনায়াসে ভবক্ষয়, কৃষ্ণের সেবন। এক কৃষ্ণনামের ফলে পাই এত ধন॥
হেন কৃষ্ণ নাম যদি লয় বহু বার। তবে যদি প্রেম নহে, নহে অশ্রুধার॥
তবে জানি অপরাধ আছয়ে প্রচুর। কৃষ্ণনাম বীজ তাহে না হয় অঙ্কুর॥ ১।৮।২২-২৬॥

১১৬। অন্যান্য অন্তরায়

যাহা হউক, শ্রীপাদ জীবগোস্বামী ভক্তিবাধক কৌটিল্যাদি পাঁচটী দোষ সম্বন্ধেই আলোচনা করিয়াছেন। তদতিরিক্ত তাদৃশ দোষ যে আরও আছে, "যতঃ কৌটিল্যম, অশ্রদ্ধা...স্বভক্ত্যাদিকৃতমানিত্বমিত্যেবমাদীনি"-বাক্যের সর্ব্বশেষ "এবমাদীনি—ইত্যাদি"-শব্দেই তিনি তাহা বলিয়া গিয়াছেন।

পূর্ব্বে [৫।৩৮-ঙ (২)-অনুচ্ছেদে] ভুক্তি-বাসনা, নিষিদ্ধাচার, কুটিনাটি, লাভ, পূজা, প্রতিষ্ঠাদি ভক্তিলতার যে-সমস্ত উপশাখার কথা বলা হইয়াছে, সেগুলিও ভক্তির অন্তরায়।

অসূয়া, হিংসা, দ্বেষ, মাৎসর্য্য, পরশ্রীকাতরতা, নিষ্ঠুরতা, দাম্ভিকতা, জাতি-কুল-বিদ্যা-ধনাদির অভিমান-প্রভৃতিও সাধন-ভক্তির বিঘ্ন জন্মাইয়া থাকে। পূর্ব্ব অপরাধ হইতেই এ-সমস্তের উদ্ভব হয় এবং এ-সমস্তই আবার বৈষ্ণবাবমাননাদি নানাবিধ অপরাধের হেতু হইয়া থাকে।

অপরাধ হইতেই যখন এ-সমস্তের উদ্ভব, তখন অপরাধ দূর হইলেই এ-সমস্তেরও অবসান ঘটিতে পারে। একান্ত ভাবে ভগবন্নামের আশ্রয় গ্রহণ করিয়া নিষ্ঠার সহিত নাম গ্রহণ করিলেই নামের কৃপায় ক্রমশঃ অপরাধ দূরীভূত হইতে পারে।

অনর্পিতচরীং চিরাৎ করুণয়াবতীর্ণঃ কলৌ
সমর্পয়িতুমুন্নতোজ্জ্বলরসাং স্বভক্তিশ্রিয়ম্।
হরিঃ পুরটসুন্দরদ্যুতিকদম্বসন্দীপিতঃ
সদা হৃদয়কন্দরে স্ফুরতু নঃ শচীনন্দনঃ॥

ইতি গৌড়ীয় বৈষ্ণব-দর্শনে পঞ্চম পর্ব্ব সমাপ্ত।

শুদ্ধিপত্র

(পৃষ্ঠা। পংক্তি অশুদ্ধ—শুদ্ধ)

১৪৩৯।৪ উদ্ধত—উদ্ধৃত
১৪৬৩।১ স্বষ্টি—সৃষ্ট
১৪৬৩।১৭ অনুকূল্য—আনুকূল্য
১৪৬৩।২৯ **প্রকৃাতর স্বভাব—প্রকৃতির স্বভাব**
১৪৬৫।১৮ পুরুষ্যথ্যং—পুরুষাথ্যং
১৪৮১।১৪ অণুমধে—অণুমধ্যে
১৪৮৭।১৫ অপ্সরনা—অপ্সরা)
১৪৯০।১ ।কছুই—কিছুই
১৪৯২।৭ বলিয়—বলিয়া
১৪৯৪।১৬ টঙ্কাচ্ছন্ন—টঙ্কচ্ছিন্ন
১৫৩১।৪ কিরূপ—কিরূপে
১৫৪০।২৯ নামে—নামের
১৫৪৪।৪ ভিম্ন—ভিন্ন
১৫৫৬।৪-৫ তত্র—তত্র
১৫৫৭।২১ কস্তু—বস্তু
১৫৬০।১ নাই—নহে
১৫৬১।২৭ ব্যাতিরেকেণা—ব্যতিরেকেণা
১৫৬৮।৭ তদন্যত্বমা—তদনন্যত্বমা
১৫৭২।১২ চিন্তিত—অচিন্তিত
১৫৭৭।১২ তদন্যত্বমিত্যো—তদনন্যত্বমিত্যো
১৫৭৯।২৬ কর্য্যের—কার্য্যের
১৫৮০।১৫,১৭পুর্ব্বে—পূর্ব্বে
১৫৯৫।২২ মূর্খ্য—মুখ্য
১৫৯৬।১২ থকে—থাকে
১৫৯৯।২৪ **প্রকারে—স্বীকারে**
১৬০৪।৭ ভ্রমাবভাসিভ—ভ্রমাবভাসিত
১৬১১।৮ পুর্ব্বোদ্ধৃত—পূর্ব্বোদ্ধৃত
১৬১৩।১ বিষয় কশ্রুতিবাক্য—বিষয়ক শ্রুতিবাক্য
১৬৪০।১০ বন্ধ্যা প্রস্যগাম্—বন্ধ্যাপ্রসূরয়ম্
১৬৬৭।৩০ স্বপ্নে—স্বপ্নে।
১৭০৬।১০ যস্থাবক্ত্যং—যস্থাব্যক্তং
১৭১৮।২৫ ব্রহ্মতর্ক—ব্রহ্মতর্ক
১৭৬১।৮ তাঁহর—তাঁহার
১৭৬১।১৫ ইহ—ইহা
১৭৬২।৩০ চিত্যাবিদ্যা—চিত্যবিদ্যা
১৭৭৬।২৭ যইতেছে—যাইতেছে
১৭৮৩।২০ ধাকে—থাকে
১৭৯২।১২ কর্ত্তুমিহার্হসি—কর্ত্তুমিহার্হসি
১৭৯৭।৪ ব্যাধ-ভ্রান্তি—ব্যাধ-ভ্রান্তি
১৭৯৯।১১ যগুত্ব-জাভি—ষণ্ডত্ব-জাতি
১৮২৩।২৭ পরে—পড়ে
১৮৩০।২৪ সম্বন্বই—সম্বন্ধই
১৮৩৬।১৩ দ্রষ্টৃভেদে—দ্রষ্টৃভেদে
১৮৪৪।২৫ অনুকূল্যার্থ—আনুকূল্যার্থ
১৮৫২।১ মাধ্বগত—মাধ্বমত
১৮৭৩।২৬ ভজনের আদর্শ স্থাপন—ভাবে ভজন
১৮৮২।১৪ সর্ব্বাইণ—সর্ব্বার্হণ
১৮৯২।৯ করিরা—করিয়া
১৮৯৫।১৬ বণাদিধর্ম্ম—বর্ণাদিধর্ম্ম
১৯০৩।৮ কচিদিচ্ছয়া—কচিদিচ্ছয়া
১৯০৬।২ কল্মভট্ট—কল্মকভট্ট
১৯০৬।১০ উদ্ধত—উদ্ধৃত
১৯১৬।১৬ স্বতঃস্ফর্ত্ত—স্বতঃস্ফূর্ত্ত
১৯১৬।২৮ স্ফর্ত্তি—স্ফূর্ত্তি
১৯২৪।২৫ উপলদ্ধি—উপলব্ধি
১৯৪৯।২ বৃণোতি—বৃণুতে
১৯৫২।২ মায়াবদ্ধ—মায়াবন্ধ

শুদ্ধিপত্র

১৯৬৬।২৮ যচ্ছন্দঃ—যচ্ছ্রদ্ধঃ

১৯৬৭।২৭ আধ্যাত্মতত্ত্ব—অধ্যাত্মতত্ত্ব

১৯৭৪।১৫ **ক।-ক (১)।**

১৯৮৭।২০ দদার্সি—দদাসি

১৯৯৮।৭ মসর্থক—সমর্থক

২০১৩।১১ **খ।—ঘ।**

২০২০।১৫ ভক্ত—ভক্তঃ

২০২৬।৯ নিস্পৃহ—নিস্পৃহ

২০২৯।৩০ ভগগবান্—ভগবান্

২০২৯।৩১ তাঁহাদ্—তাঁহার

২০৩৩।১৮ আমর—আমার

২০৩৮।৫ **সাধুর লক্ষণ—ক। সাধুর লক্ষণ**

২০৪২।২৮ ঋষির—ঋষির

২০৫৬।১২ র্বিষ্ণ্বর্চ্চনং—বিষ্ণ্বর্চ্চনং

২০৫৮।২১ উর্দ্ধপুণ্ড—উর্দ্ধপুণ্ড্র

২০৬০।১৪ শাস্ত্রে—শাস্ত্রে

২০৬০।১৯ উর্দ্ধপুণ্ড—উর্দ্ধপুণ্ড্র

২০৭০।১৫ অহেতুকং—অহৈতুকং

[illegible] **গ।—জ।**

[illegible] নিজেকে—নিজেকে

[illegible] শ্রবণবং কীর্ত্তনের—শ্রবণকীর্ত্তনের

২১১৬।২৯ শমন্বিতায়—শমান্বিতায়

২১১৯।৩০ ভক্তির হইতে—ভক্তি হইতে

২১২২।৪ ধর্ম্মের—বা ধর্ম্মের

২১২৯।১১ উদ্ধত—উদ্ধৃত

২১৫১।২৪ লাগিলেম—লাগিলেন

২১৬৪।১৩ প্রেম্ণ—প্রেম্ণা

২১৬৮।১৬ **স্বরূপাসদ্ধা—স্বরূপসিদ্ধা**

২১৬৮।২৪ অন্যাক্তিলাষিতাশূন্যং—অন্যাভিলাষিতাশূন্যং

২১৭০।২০ ডোজন—ভোজন

২১৭৪।১৩ ক্ষেদকৈতবাত্বম্—ক্ষেদকৈতবত্বম্

২১৮০।১৫ কামাভক্তি—সকামাভক্তি

২১৮৩।২২ পর্য্যাবসান—পর্য্যবসান

২১৯৮।১৭ স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত—স্ফূর্ত্তিপ্রাপ্ত

২১৯৮।২৬ প্যানসন্ধেয়ম্—প্যানুসন্ধেয়ম্

২১৯৯।১১ তাদাত্ম্যপ্রাপ্ত—তাদাত্ম্যপ্রাপ্তি

২২০৫।২১ ষা—বা

২২২০।২২ অনর্থোদূগমের—অনর্থোদ্গমের

২২৪৪।২০ রুচিপ্রধান—রুচিপ্রধান

২২৪৮।২০ পূর্ব্বোদ্ধত—পূর্ব্বোদ্ধৃত

২২৫১।১১ অবনগুরুর—শ্রবণগুরুর

২২৬২।১ বর্ণাশ্রমধর্ম্মের—বর্ণাশ্রমধর্ম্মের

২২৬৯।১২ ইত্যেবমাদয়োহপন্যে—ইত্যেবমাদয়োহপ্যন্তে

২২৭২।২৯ সাধরণ—সাধারণ

২২৮৯।৭ সৎক্রেয়ার—সৎক্রিয়ার

২৩০১।৩০ গুরুর—গুরুং

২৩০৮।১ ১।২।৫৯—১।২।৫০

২৩০৮।৩ নৃণামঘঃ—নৃণামঘম্

২৩১১।১২ শাস্ত্রাধ্যপনাদি—শাস্ত্রাধ্যাপনাদি

২৩২১।৯ শ্রীমূর্ত্তিরঙ্ঘ্রিসেবনে—শ্রীমূর্ত্তেরঙ্ঘ্রিসেবনে

২৩৪০।১৮ মন্ত্র—মন্ত্র

২৩৪৯।১৩ ভবেচ্ছেয়ঃ—ভবেচ্ছ্রেয়ঃ

২৩৫৩।১৩ স্থাবরাদির—স্থাবরাদির

২৩৬০।২১ আবিভাব—আবির্ভাব

২৩৬১।৩ নামপরাধ—নামাপরাধ

২৩৬৫।৬ পঢ়এগ—পঢ়াএগ

২৩৭২।৪ ‘বাল’—‘বোল’

২৩৭২।২০ বা,চিক—বাচিক

২৩৭৩।২২ মন্ত্রেবর্গেষু—মন্ত্রবর্গেষু

২৩৮০।১৬ বিভূ—বিভু

২৩৮১।২ বীক্ষেভ—বীক্ষেত

২৩৮২।২৭ মৃত্যুভে—মৃত্যুতে

২৩৮৮।১৩ মান্ত্রবর্গেষু—মন্ত্রবর্গেষু

২৩৮৯।১০ পতনোম্মুখ—পতনোম্মুখ

২৩৯১।১০ ভগবদ্জনও—ভগবদ্ভজনও

২৪০৮।৩ বিক্ষে—বিক্ষো

দ্রষ্টব্য : মুদ্রণকালে উপরের অংশ মুদ্রিত না হওয়ায় কোনও কোনও স্থলে “ি” এবং “ী” হইয়া পড়িয়াছে “।” বা “।”।

সংযোজন

২২০০।১৫ পংক্তির "সার্দ্ধচব্বিশ অক্ষরের" পাদটীকারূপে নিম্নলিখিত অংশ সংযোজনীয় :—

কামগায়ত্রীর অক্ষর-সংখ্যা। সংস্কৃত শ্লোকাদির অক্ষরগণনায়—ব্যঞ্জনবর্ণের সহিত সংযুক্ত স্বরবর্ণকে, হসন্ত ব্যঞ্জনবর্ণকে, অনুস্বারকে, বিসর্গকে এবং লুপ্ত অকারকে পৃথক্ অক্ষররূপে গণনা করা হয় না (অর্থাৎ এ-গুলি পূর্ণ এক অক্ষরও নয়, অর্দ্ধাক্ষরও নয়)। আবার, সংযুক্ত বর্ণে ও ফলাযুক্ত বর্ণে একাধিক অক্ষর থাকিলেও একটীমাত্র অক্ষররূপেই তাহারা গণ্য হয়। এইরূপে কোনও শ্লোকস্থিত "চেৎ"-শব্দে অক্ষরসংখ্যা হয় এক, "সোঽহং"-শব্দে দুই, "অতঃপরম্"-শব্দে এবং "সর্ব্বধর্ম্মান্"-শব্দে চারি ; ইত্যাদি। উল্লিখিতরূপে হিসাব না করিলে, শ্লোকে বা শ্লোকপাদে অক্ষর-সংখ্যা যত হওয়া বিধেয়, তদপেক্ষা অনেক বেশী হইয়া পড়ে। কামগায়ত্রীর অক্ষরগুলির মধ্যে অবস্থিত "ঽ (লুপ্ত-অকার)" এবং "ৎ (হসন্ত ত)" বাদ গেলে কামবীজসহ অক্ষর-সংখ্যা হয় পঁচিশ। কিন্তু শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃত বলেন, কামগায়ত্রীর অক্ষর-সংখ্যা হইতেছে সার্দ্ধচব্বিশ (মহাপ্রভুর উক্তি)। শ্রীশ্রীচৈতন্যচরিতামৃতের সংস্কৃতটীকাকার শ্রীল বিশ্বনাথ- চক্রবর্ত্তীর উক্তিতে ইহার সমাধান পাওয়া যায়। তিনি লিখিয়াছেন, শ্রীপাদ প্রবোধানন্দ গোস্বামীর কৃত কামাগায়ত্রীর ব্যাখ্যানে একটী প্রমাণ উদ্ধৃত হইয়াছে এইরূপ—"য়ং চন্দ্রার্দ্ধং বৈভবঞ্চ বিলাসো দারুণং ভয়মিতি ব্যাড়িঃ। ইহা হইতে জানা যায়—কামগায়ত্রীর "য়"-অক্ষরটী হইতেছে অর্দ্ধাক্ষর। চক্রবর্ত্তিপাদ আরও লিখিয়াছেন—"ব্যন্ত-য়-কারোঽর্দ্ধাক্ষরং ললাটেঽর্দ্ধচন্দ্রবিম্বঃ। তদিতরং পুর্ণাক্ষরং পুর্ণচন্দ্রঃ॥" অর্থাৎ কামগায়ত্রীতে যে "য়"-কারের পরে "বি"-অক্ষর আছে, তাহা অর্দ্ধাক্ষর ; (শ্রীকৃষ্ণের) ললাটে এই অর্দ্ধাক্ষররূপ অর্দ্ধচন্দ্র। এতদ্ব্যতীত অন্য অক্ষরগুলির প্রত্যেকেই পুর্ণাক্ষর এবং পুর্ণচন্দ্র (শ্রীকৃষ্ণাঙ্গে)। যে "য়"-কারের পরে "বি" থাকে" তাহা যে অর্দ্ধাক্ষররূপে পরিগণিত হয়, বর্ণাগমভাস্বৎ-নামক গ্রন্থ হইতে তাহার প্রমাণও তিনি দিয়াছেন। "বি-কারান্ত-য়-কারেণ চার্দ্ধাক্ষরং প্রকীর্ত্তিতম্॥ বর্ণাগমভাস্বদি॥" কামাগায়ত্রীর অক্ষরগুলির মধ্যে ষষ্ঠ অক্ষরটী হইতেছে "য়" এবং তাহার পরের অক্ষরটী হইতেছে "বি"; সুতরাং এই "য়"-অক্ষরটী হইবে অর্দ্ধাক্ষর ; তাহাতে কামগায়ত্রীর অক্ষর-সংখ্যাও হইবে পঁচিশের পরিবর্ত্তে "সার্দ্ধচব্বিশ।"

২২৮৮।১৮ পংক্তির "বিষয়ত্যাগ দুর্ল্লভ"-এর পরে "তত্ত্বদর্শন দুর্ল্লভ", সংযোজিত হইবে।

২৩৬৬।২৮ পংক্তির সঙ্গে সংযোজনীয়ঃ—বিশেষতঃ, শ্রুতির মর্ম্ম স্মৃতিতে ব্যক্ত হইলেও সাধারণতঃ সর্ব্বতোভাবে একই রকম ভাষায়, একই রকম শব্দবিন্যাসে, বা একই ক্রমে প্রকাশিত হয় না ; সুতরাং শ্রুতি ও স্মৃতি বাক্যের তাৎপর্য্যে বিরোধ থাকিলেই তাহাদের মধ্যে বিরোধ আছে বলিয়া মনে করা হয় এবং তখনই উল্লিখিত বিধান প্রযোজ্য। এ-স্থলে শ্রুতিবাক্য এবং ব্রহ্মাণ্ডপুরাণরূপ স্মৃতিবাক্যে যে কোনওরূপ পার্থক্য নাই, তাহা পুর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে ; সুতরাং "শ্রুতিস্মৃতিবিরোধে তু"-ইত্যাদি বিধানের প্রয়োগও এ-স্থলে অসার্থক।